সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মাসিক বসুমতী

॥ কার্তিক, ১৩৭০ ॥

(কাঠ-খোদাই)

পশ[illegible]র হৃদয়

—শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

'জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ করফলায়তে'।'

এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজার হাজার জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো করব। মনে হয় খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব উঠে?

তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম করিলেই তপস্যা করা হয়। কর্মযোগীরা কর্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, তেমনই আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়।

হিন্দু যেন কখনও তাহার ধর্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্মকে উহার নির্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে, আর সমাজকে উন্নতি করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সমুদয় অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দু ধর্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন। ইহার ফল কি হইল?—নিষ্ফলতা! বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন।

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল; সুতরাং ফল দাঁড়াইল সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইহাই পথ—আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্মধন উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছি, তাহাকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

মানুষ কি বলে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য করিতে সমর্থ হয়?—বীর্য। বীর্যই সাধুত্ব; দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোনো শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা 'অভীঃ'; যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয় তবে তাহা এই 'অভীঃ'।—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু। ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্মুখী। পাশ্চাত্য দেশ ধর্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তি লাভ করিতে হইলে, তাহা ধর্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও পীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও। এখনও আমি বলিতেছি, এগিয়ে যাও। বৎস ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত-তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না—ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধা-বিঘ্ন-রূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া সন্ন্যাসীর বেশ-সহায়ে। অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না তোমরা দুর্বল; বাস্তবিক সেই আত্মা সর্বশক্তিমান।

অজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি ও বাসনা এই তিনটিই মানবজাতির দুঃখের কারণ, আর উহাদের মধ্যে একটির সহিত অপরটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একজন মানুষের আপনাকে অপর কোনো মানুষ হইতে, এমন কি পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাবিবার কি অধিকার আছে? বাস্তবিক ত' সর্বত্রই এক বস্তু বিরাজিত। 'ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী'—'তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।'

সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা—যে ব্যক্তিতে এইগুলি বর্তমান স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে এমন কোনো শক্তি নাই যে, উহাদের অধিকারীর কোনো ক্ষতি করিতে পারে। এইগুলি সম্বল থাকিলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেও এক ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারে।

সর্বোপরি সাবধান হইতে হইবে, অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সহিত আপোস করিতে যাইও না। আমার এই কথা বলিবার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু সুখেই হউক দুঃখেই হউক, নিজের ভাব সর্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে। দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মতগুলিকে অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না। তোমার আত্মা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, তোমার আবার অপর আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত অপেক্ষা কর; যদি কোনো সাহায্যকারী না পাও, সময়ে পাইবে। তাড়াতাড়ির আবশ্যকতা কি? সমস্ত মহৎ কার্য আরম্ভের সময় উহার অস্তিত্বই যেন বুঝা যায় না, কিন্তু তখনই বাস্তবিক উহাদের যথার্থ কার্যশক্তি সঞ্চিত থাকে।

কর্ম করা অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা না করা, লোককে সাহায্য করা অথচ তাহার নিকট হইতে কোনো প্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা অথচ উহাতে তোমার নাম-যশ হইল বা না হইল, এ বিষয়ে একেবারে লক্ষ্য না করা—এইটিই এই জগতে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে, তখন অতি ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পাইলে অতি আহাম্মক ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য সফল করিতে পারে, কিন্তু নিজ প্রতিবাসীদের স্তুতি প্রশংসা না চাহিয়া, অথবা সেদিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া সর্বদা সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

৬৩

রামানন্দ বললে, 'তবে এবার নান্দী শ্লোক পড়ো।'

রূপ পড়তে লাগল।

'হরিলীলা কথা তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত অতৃপ্ত ভোগবাসনা হরণ করুক। কী রকম সে কথা? যেন চিনিপাতা দই। তাতে ব্রজসুন্দরীদের প্রণয়কর্পূর মেশানো। তাতেই সুগন্ধি করা। এমন সে সুধা যা চন্দ্রসুধার মাধুর্যগর্বকে ম্লান করেছে। সে স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু পানায় সংসার পথশ্রান্ত সন্তপ্ত প্রাণীদের তৃষ্ণা দূর করে। দুর্বিষয়ের তৃষ্ণা।'

রামানন্দ বললে, 'এবার ইষ্টদেবের বর্ণন করো।'

প্রভু সামনে বসে, কী করে পড়ে? রূপ কুণ্ঠিত হয়ে রইল।

'সে কি, সঙ্কোচ কিসের?' প্রভু আশ্বাস দিলেন: গ্রন্থের ফল সমস্ত বৈষ্ণবসমাজকে শোনাও।'

রূপ পড়ল: 'পুরটসুন্দরদ্যুতি শচীনন্দন হরি [illegible]দের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোক। যিনি উন্নত-উজ্জ্বল [illegible] ভক্তিশ্রী করুণা করে বিতরণ করছেন—যে [illegible] বহুদিন ধরে সংসারে অনুপস্থিত।'

সকলে বলে উঠল: 'এই শ্লোক শুনে কৃতার্থ হলাম। রূপ, তুমি এই শ্লোক শুনিয়ে সকলকে কৃতার্থ করলে!'

রামানন্দ জিগগেস করল, 'তোমার নাটকে প্রস্তাবনা কী নিয়ে? সূত্রধার এসে কী বলছে?'

'বলছে, বসন্তকাল সমাগত। এবার পূর্ণচন্দ্র বিশাখা তারার সঙ্গে মিলিত হবেন।' 'অর্থাৎ' রূপ বললে, 'পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ রুচিরা রাধিকার সঙ্গে মিলিত হবেন।'

'তারপর বলো কী নাটকের প্ররোচনা?'

শ্রোতাদের প্রশংসা করে তাদের উন্মুখ করার নাম প্ররোচনা। আর সেই সঙ্গে লেখকের দৈন্য জানানো।

'প্ররোচনা এই ভাবে।' রূপ বললে, 'স্বভাবোজ্জ্বল ভক্তরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। গোপিনীবন্ধু কৃষ্ণ সজ্জিত হয়েছেন। বৃন্দাবনের রাসস্থলীও নৃত্য-কলাবিধির উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। মনে হয় আমার মত অভাজনেরও কিছু পুণ্য ফল ছিল। হে বুধমণ্ডলী আমি ক্ষুদ্র হলেও আমার কথা তুচ্ছ হবে না। কেন না সে কথা হরিগুণময়ী কথা, হরির গুণবর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে কথা সিদ্ধার্থবিধাত্রী। আপনাদের যা অভীষ্ট এই কথা তারই সিদ্ধি এনে দেবে। নীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাঠ ঘষে আগুন উৎপাদন করে সে আগুন কি স্তিমিত হয়, না কি সেই আগুনে সোনার অন্তর্মল দুরীভূত হয় না? আমি লঘু হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় লঘু নয়। আমি হীন হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় গুণগরীয়ান।'

রামানন্দ বললে, 'তবে এবার প্রেমোৎপত্তির কারণগুলি বলো।'

'রতির আবির্ভাবের কারণ সাতটি। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব।'

অভিযোগ কী রকম? বিশাখাকে বলছে রাধিকা, 'যমুনার পারে গিয়ে দেখলাম, কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে, এমন নির্লজ্জ, আমার অধরের দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছে আর সতেজ লতার নতুন পাতা দংশন করছে। যেন দাঁতে পাতা কাটছে না, আমার হৃদয় কাটছে।'

বিষয়? রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয়। কৃষ্ণের রূপ দেখে, কৃষ্ণের মুখের তাম্বুল আস্বাদ করে, কৃষ্ণের গাত্রগন্ধে, কৃষ্ণের পদশব্দে বা বংশীধ্বনিতে বা কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ স্পর্শে যে রতির উদয় তার নাম বিষয়।

সম্বন্ধ? বলবীর্য শৌর্য সৌন্দর্যশীল ও সৌশীল্য সম্পর্কে গৌরববোধই সম্বন্ধ। কৃষ্ণের লোকাতীত চরিত্র চিন্তা করলে কে ধৈর্য রক্ষা করবে? বলছে ব্রজাঙ্গনা। সেই রূপ ও গুণের কাছে কে না চাইবে নিজেকে উৎসর্গ করি?

অভিমান? মমতাবুদ্ধির আধিক্য থেকেই অভিমান। এক সখী এসে রাধিকাকে বলছে, তোমার কৃষ্ণ বহুবল্লভ, তোমার কৃষ্ণ লম্পট, নিষ্প্রেম, তার প্রতি তোমার অনুরাগ কেন? আর কোনো রূপ গুণান্বিত ব্যক্তিকে বেছে নাও। রাধিকা বলছে, আমার অন্যে দরকার নেই, থাকুন অনেক পুরুষ, মাধুর্যের সমুদ্র, বৈদগ্ধ্যের পর্বত, গুণবতী রমণীরা তাদের বরণ করুক। আমার ঐ মাথায় শিখিপুচ্ছ, মুখে বাঁশি, পায়ে তিলকচিহ্ন সেই মনোহরেই একমাত্র রুচি। অন্যকে আমি তৃণতুল্য মনে করি। এই যে মনোভাব এইটিই অভিমানে। আর এই অভিমানেই রতির উদ্ভব।

তদীয় বিশেষ হচ্ছে কৃষ্ণের সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু। যেমন কৃষ্ণের গোষ্ঠ, কৃষ্ণের গাভী, কৃষ্ণের প্রিয়জন, কৃষ্ণের পদচিহ্ন।

কেউ কৃষ্ণ সেজেছে বা কেউ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করছে তা দেখেও রতির উদ্রেক হতে পারে। এর নাম উপমা।

আর স্বভাব? কোনোই কারণ নেই, আপনা-আপনি এসে হঠাৎ দেখা দেয়। আর সব যে রীতি বলা হল সে লৌকিক রীতি। আসলে কৃষ্ণরতি স্বাভাবিকী। রাধিকার কৃষ্ণরতি নিত্যসিদ্ধ।

রামানন্দ প্রশ্ন করল: 'পূর্বরাগবিকার কী বলো? কাকে বলে চেষ্টা? কী বা কামলেখন?'

'নায়ক-নায়িকার সঙ্গমের আগে যে দেখাশোনার স্বাদ তাই পূর্বরাগ। আর শঙ্কা ব্যাধি শ্রম ক্লম দৈন্য অসূয়া চিন্তা নিদ্রা জড়তা উন্মাদ নির্বেদ ঔৎসুক্য, মোহ ও মৃতি—এ-সবই বিকার। শরীর চাঞ্চল্যই চেষ্টা। আর প্রেমপত্রই কামলেখন।

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের তখনো দেখা হয় নি, কৃষ্ণের নাম শুনেছে, বাঁশি শুনেছে, আর ছবি দেখেছে। তিন জনের প্রতি আমার রতি জন্মাল, ছি ছি, আমার মরণই শ্রেয়। রাধিকা কাঁদছে আর বলছে ললিতাকে। 'কষ্টং ধিক পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সীং। এইখানে নাম, ধ্বনি আর চিত্রপট তিন বস্তুই রাগোৎপত্তির হেতু।

রাধাহৃদয়বেদনা সুদুঃসাধ্য। এর চিকিৎসা শুধু চিকিৎসকের নিন্দা। এই ব্যাধিই পূর্বরাগের বিকার।

কৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠাল রাধা: তুমি চিত্রপট রূপ ধারণ করে আমার মন্দিরে বাস করছ। তোমাকে দেখলেই আমার চিত্ত বিকার ঘটে, ভয়ে আমি পালিয়ে যাই, কিন্তু কোথায় যাব, যেখানে যাই সেখানেই তোমার ছবি দেখি। সর্বত্রই তুমি এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াও। সর্বত্রই তোমার স্ফূর্তি, তোমার উদ্দীপন।

ময়ূরপুচ্ছ দেখে রাধিকা কাঁদছে, গুঞ্জাবলী দেখে শোকাকুল হয়ে আর্তনাদ করছে, কখনো বা ছুটোছুটি করছে পাগলের মত। কোনো দুষ্ট গ্রহ তাকে নিশ্চয়ই ভর করেছে। কে জানে রাধিকার নবানুরাগই এই দুষ্ট গ্রহ।

রাধিকার দুখে বিশাখা কাঁদছে। তুমি কেন কাঁদছ? রাধিকা বলছে বিশাখাকে, 'কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ, তাতে তোমার কী অপরাধ? আমিই মরব। আমার মৃতদেহকে তমালের ডালে এমনি করে বেঁধে দিও যেন আমি তাকে আমার ভুজবল্লরী দিয়ে আলিঙ্গন করে আছি। আমার এই মিলনেচ্ছাকে বৃন্দাবনে অবিনশ্বর করে রেখো।' রামানন্দ বললে, 'এবার তবে প্রেমের স্বভাব কী বলো।'

'প্রেমে যে পরিমাণে সুখ সেই পরিমাণে দুঃখ। বিষ আর অমৃত এক সঙ্গে।'

'এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সে-ই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥'

'সহজ প্রেম, স্বাভাবিক প্রেমের লক্ষণ কী?'

রূপ বললে, 'লক্ষণ, প্রিয়ের দোষে-গুণে প্রেমের দোষে-গুণে প্রেমের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। প্রিয় যদি স্তুতি করে, মনে হয় বুঝি উপেক্ষা করছে আর যদি

নিন্দা করে, মনে হয় পরিহাস। উপেক্ষায় দুঃখ, পরিহাসে আনন্দ।

কৃষ্ণের উৎসঙ্গ সুখের আশায় গুরুলজ্জা শিথিল করে দিলাম, রাধিকা-সখীদের কাছে বিলাপ করছে, তোমার প্রাণের চেয়েও সুহৃত্তম তোমাদেরই বা কত ক্লেশ দিলাম, সাধ্বীসেবিত মহান পাতিব্রত্য ধর্মেরও সম্মান রাখলাম না, তবুও কৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করল, তারপরেও পাপীয়সী আমি বেঁচে আছি, আমার ধৈর্যকে ধিক। তারপর বলছে কৃষ্ণের উদ্দেশে, এ কী তোমার ঠিক হল? নিজের বাল্যস্বভাবে ঘরের মধ্যে আমরা খেলা করি, ভালো-মন্দ ভদ্র-অভদ্র কিছুই জানি না, আমাদের এ-রকম নিরাশ্রয় অবস্থায় টেনে আনা কি উপযুক্ত হয়েছে? তারপর টেনে এনে উদাসীন হয়ে থাকা কি আর তোমার পক্ষে সঙ্গত?

ললিতা বলছে, অসুরক্লেশে কলঙ্কিত হয়ে যম-পুরীতে চললাম, আর উনি এখনো প্রবঞ্চকের হাসি হাসছেন। হে মেধাবিনী রাধিকে, এই একটা গভীর কপট আভীরপল্লীর ধূর্তের সঙ্গে তোমার কী করে প্রেম হল?

দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে বললে, 'কৃষ্ণ, তুমি সমুদ্র, আর রাধিকা বাহিনী, নদী। ধর্মসেতু ভেঙে দিয়ে সে এসেছে। বেদধর্ম লোকধর্ম আর্যপথ স্বজন ভবন সব সে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু তোমাতে মিলিত হবার জন্যে। ছেড়েছে ধব-তরু বা পতিচ্ছায়ার সান্নিধ্য, লঙ্ঘন করেছে সমস্ত গুরু-পর্বত। আর তুমি কিনা কপট বাকচাতুরীতে তার প্রতি বিমুখতা দেখাচ্ছ?'

সকলে একবাক্যে বলে উঠল: 'চমৎকার।'

রামানন্দ প্রশ্ন করল: 'বৃন্দাবনের কেমন বর্ণনা করলে? মুরলীধ্বনির? আর কৃষ্ণ-রাধিকাকেই বা কী রকম চিত্রিত করলে?'

'কৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলছে, মধুমঙ্গল, দেখ আম্রমুকুল থেকে মকরন্দ ক্ষরিত হচ্ছে, তার সুগন্ধে-মধুরে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর এসে বন্দীকৃত হচ্ছে, চন্দনগিরির মন্দানিলে আন্দোলিত বৃন্দাবন, আমার অতুল আনন্দের আস্পদ।

এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়ের আনন্দবর্ধন। কোথাও ভ্রমরীর গান, কোথাও অনিলভঙ্গির শীতলতা, কোথাও বল্লীলাস্য বা লতানৃত্য, কোথাও মল্লীপরিমল বা মল্লিকা ফুলের গন্ধ কোথায় বা রসভর 'দাড়িম্বের স্তূপ। ভ্রমরীর গান কানের তৃপ্তি, শিশিরবায়ুর স্পর্শ ত্বকের, লতানৃত্য চোখের, মল্লিকাগন্ধ নাকের আর দাড়িম্ব রসনার।

কল্যাণী কেলীমুরলী কৃষ্ণকরে বিলাস করছে। মুরলীর দুই প্রান্তে তিন আঙুল পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণিতে খচিত, তারপরের তিন আঙুল পরিমিত স্থান দু'দিক থেকেই অরুণমণিতে খচিত, ঠিক মধ্য-স্থলটি সোনা দিয়ে মোড়া আর সেই সোনায় আবার হীরে বসানো।

মুরলীকে সম্বোধন করে রাধিকা বলছে, হে মুরলি, তুমি তো জাতিতে সরল, জড়বংশে জন্ম বলে তোমার তো কুটিলতা থাকার কথা নয়, আছও তো পুরুষোত্তমের হাতে, তবে কার কাছে গোপাঙ্গনাদের বিমোহনের বিষমদীক্ষা নিলে, কোন গুরুর কাছে?

হে সখি মুরলি, তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পূর্ণ, তুমি লঘু, অতি কঠিনা নীরসা গ্রন্থিলা, তবু কোন পুণ্যের ফলে কৃষ্ণকরের আলিঙ্গন ও কৃষ্ণাধরের চুম্বন পাচ্ছ? আমার কি সেই পুণ্য হয় না।

হায় কৃষ্ণের বাঁশি! এই বাঁশির ধ্বনিতে মেঘের গতি স্তম্ভিত হয়, তুম্বুরু ঋষি যে স্বরনাদ-বিশারদ, গায়কশ্রেষ্ঠ, সেও বিস্ময়ে চমকে ওঠে। যারা ব্রহ্মাসক্ত, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, সেই সব সনক-সনন্দনের ধ্যান ভেঙে যায়, ব্রহ্মা তার সৃষ্টিকার্য ভোলে, পাতালের প্রতিমূর্তি বলিও চঞ্চল হয় আর অনন্তদেব যে পৃথিবীকে মাথায় ধরে আছে সেও পারে না নিশ্চিল থাকতে। সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে, লোকে-লোকান্তরে।

দেখ কৃষ্ণকে দেখ। তার নয়নচ্ছটায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত, তার পীতাম্বরে নবকুঙ্কুমের শোভা পরাভূত, তার আরণ্য অলঙ্কারে মণিরত্নের আভরণ বিড়ম্বিত। সেই উজ্জ্বলাঙ্গকে হরিকে দেখ, তার কান্তি হরিণ্মণিমনোহর। বামজঙ্ঘার অংসপুটে দক্ষিণ চরণটি ন্যস্ত দেহের তিনস্থান কিঞ্চিৎ বাঁকা করে রাখা, স্কন্ধ বক্রভাবে স্তম্ভিত, নেত্রপ্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত, সঙ্কুচিত অধরে লোলাঙ্গুলিসঙ্গত বাঁশি, নীলকমলের উপর ভ্রমরের মত নয়নের উপরে যার ভ্রূ নৃত্য করছে সেই পরমানন্দ পুরুষকে অঙ্গীকার করো।

বিশ্বকর্মা পাথর কেটে ও ছিদ্র করে কতশত মণিমুক্তা বসিয়ে দেবতাদের গড়-চত্বর নির্মাণ করে।

এ কে নতুন বিশ্বকর্মা যে তার শাণিত অপাঙ্গের অস্ত্রে গোপতরুণীদের প্রস্তর কঠিন কুলধর্ম চূর্ণ করে নিজের গোষ্ঠস্থল খেলার মাঠ তৈরি করছে!

ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্র কে এই নবীন যুবা? স্থিরা পতিব্রতা রমণীদের নীবিবন্ধের অর্গল ছেদনের কৌতুকে নিরন্তর এ কার বাঁশি জয়যুক্ত হচ্ছে?

আর রাধিকা?

তার নয়নশোভায় নবকুবলয় পরাজিত, যার মুখোল্লাসে ফুল্ল কমলবন উল্লজ্জিত, যার আঙ্গিকরুচিতে স্বর্ণকান্তি লাঞ্ছিত, রাধার সেই অনির্বচনীয় বিচিত্ররূপ ঝলমল করছে।

মধুমঙ্গলকে কৃষ্ণ বলছে, চন্দ্র দিবাভাগে বিরূপ হয়ে যায়, শতপত্র পদ্ম শর্বরীমুখে সন্ধ্যাকালেই ম্লান হয়, আমার প্রেয়সার শ্রিয়োজ্জ্বল মুখের সঙ্গে কার তুলনা করব?

আনন্দরসতরঙ্গে কপোল যার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কন্দর্পধনু জ্রলতা যার নৃত্য করছে, ঘন সন্নিবিষ্ট পক্ষ্মযুক্ত যার চক্ষু, তারই কটাক্ষ আমাকে দংশন করছে।

রামানন্দ বললে, 'তোমার কবিত্ব অমৃত নির্ঝর। এবার তবে দ্বিতায় নাটক ললিতমাধবের কথা বলো।

'তুমি সূর্য আর আমি খদ্যোত,' বললে রূপ, 'তোমার কাছে কিছু ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা আমার ধৃষ্টতামাত্র।'

'না, না, পড় নান্দীশ্লোক।'

রূপ পড়ল: 'নিশানাথ চন্দ্র রাত আনে আর রাত এলেই চক্রবাক মিথুন বিহারবর্জিত হয় আর কমলও বিশীর্ণ হয়ে যায়। তাই চন্দ্র চক্রবাক মিথুন ও কমলের খেদের কারণ। কী রকম চক্রবাক? না, অসুরকামিনীর স্তন। আর কী রকম কমল? না, অসুরকামিনীর মুখ। কৃষ্ণ যশঃশশীও অসুরকামিনীর স্তনদ্বয় রূপ চক্রবাক মিথুনেরও মুখ রূপ কমলের খেদ উৎপাদন করে। যেহেতু কৃষ্ণ তাদের স্বামীদের বধ করেছেন। স্তনে পতিকরস্পর্শের অভাব ও মুখে পতির অধরস্পর্শের অভাব থেকেই খেদ। কিন্তু চন্দ্রে উল্লাসও তো আছে। উল্লাস চকোরের। চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে চলে চন্দ্রোদয়ে তার অসীম আনন্দ। তেমনি কৃষ্ণের দর্শনে, কৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে সুহৃদ ও ভক্তদের আনন্দ। তাই কৃষ্ণের যশঃশশী অখিল সুহৃচ্চকোরনন্দী।'

'তারপরে দ্বিতীয় নান্দী বলো।' রামানন্দ বললে, 'রাতে ইষ্টদেবের চরণবন্দনা।'

আবার সঙ্কুচিত হল রূপ। তবু পড়ল থেমে-থেমে: 'যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হয়ে স্বীয় প্রেমসুধা অকাতরে বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি অজ্ঞান-তিমির নাশ করেছেন। যিনি বশীকৃতজগন্মনা, জগজ্জনের মন যাঁর বশীভূত, সেই শচীসুতশশী দিকে-দিকে আনন্দ ঢালুন।'

অন্তরে উল্লসিত হলেও বাইরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করলেন প্রভু: 'কৃষ্ণরসকাব্যসুধাসিন্ধুর মধ্যে আমার মিথ্যাস্তুতির ক্ষারবিন্দু মিশিয়েছ কেন? তাতে অমৃতের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেল।'

রামানন্দ বললে, 'অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশল। তাতে আনন্দচমৎকারিতা আরো বেড়ে গেল।'

'তোমার এতে উল্লাস হচ্ছে? শুনতে লজ্জা করে, লোকে উপহাস করবে।'

'এ শুনে লোকের আনন্দ বাড়বে।' বললে রামানন্দ, 'অভীষ্টদেবের স্মৃতি চিরজাগরূক থাকবে।' তাকাল রূপের দিকে: 'ললিতমাধবের কী বিষয়বস্তু?'

'কৃষ্ণ কিরাতরাজ কংসকে নিধন করবে ও রাধাকে বিবাহ করবে।' বললে রূপ, 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পূর্তির জন্যে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন

বংশীধ্বনির গুণকীর্তন শুনুন।

যে দূতী নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দেয় তাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলে। বরবংশজকাকলী অর্থাৎ বংশীধ্বনি সেই নিসৃষ্টার্থা দূতী। রাধিকার কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে পৌঁছে তাকে বিলজ্জা করে কৃষ্ণের কাছে টেনে নিয়ে আসে। রজ আর তম দুই-ই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটায় বৃন্দাবনে। রজ মানে গো-ধূলি আর তম মানে সন্ধ্যার অন্ধকার। সাধারণত রজ আর তমগুণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু বৃন্দাবনে বিপরীত। এখানে রজ আর তমই কৃষ্ণমিলনের সহায়ক। তাই ব্রজাঙ্গনার ভজনকৌশল বেদেরও অপ্রকট।

হে সহচরি, যে নবজলধরকান্তি, মদমত্ত মাতঙ্গের মত যার বিলাস সেই নির্ভীক নিরাতঙ্ক যুবক কে? কোথা থেকে এসেছে ব্রজমণ্ডলে? হায়, তার কটাক্ষ দস্যু আমার চিত্তধনাগার থেকে ধৈর্যধন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আর কৃষ্ণ বলছে রাধিকার উদ্দেশে: 'যে আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহার মন্দাকিনী, যে আমার নয়ন-চকোরের শারদীয় চন্দ্রপ্রভা, যে আমার হৃদয়াকাশের চারুতারাবলী, বহুকালব্যাপী উৎকণ্ঠার ফলে তাকে আমি পেয়েছি।'

রামানন্দ সহস্র মুখে রূপের কবিত্বের প্রশংসা করতে লাগল। সেই কবির কাব্য-রচনায় প্রয়োজন কী যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আনন্দে না তাকে অভিভূত করে? সেই ধনুর্ধারী'র বাণনিক্ষেপেই বা কী প্রয়োজন যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে তার মূর্ছা না ঘটায়?

প্রভুকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোমার শক্তিতেই এই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।'

'প্রয়াগে এর সঙ্গে দেখা। এর বড় ভাই সনাতন, বললেন প্রভু, 'তারও বিষয়ভোগ তোমার মতই। এই দু'ভাইকে আমি বৃন্দাবনে পাঠালাম, ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করবার জন্যে শক্তিসঞ্চার করে দিলাম। দেখ গ্রন্থ কেমন মধুর, প্রসন্ন ও সালঙ্কার হয়েছে। কবিত্ব থাকলেই তো রসপ্রচার হবে।'

'সবই তোমার ইচ্ছায়।' বললে রামানন্দ, 'তুমি ইচ্ছে করলে কাঠের পুতুল নাচাতে পারো। গোদাবরী তীরে আমার মুখে যে-সব রসতত্ত্ব বলালে সব আবার এই রূপের লেখায় স্থাপিত হয়েছে। ভক্তের প্রতি কৃপায় ব্রজরস প্রচার করতে চাও, যাকে দিয়ে তুমি করাবে সেই করবে, সমস্ত জগৎ তোমার বশংবদ।'

রূপকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। আর রূপকে দিয়ে সকল ভক্তের চরণবন্দনা করালেন। সকলে চলে গেল হরিদাস একান্তে এসে আলিঙ্গন করল রূপকে। বললে, 'তোমার কী ভাগ্য, কে বলবে তোমার রচনার কী মহিমা।'

'আমি কিছুই জানি না। প্রভু যেমন বলিয়েছেন তেমনি বলেছি।'

প্রভুর ভক্ত গোঁসায়েরা চার মাস থেকে গৌড়ে ফিরল। রূপ থেকে গেল নীলাচলে। দোলযাত্রার পরে প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। বললেন 'তুমি সেখানে থাকো, একবার সনাতনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

রূপ প্রভুকে প্রণাম করে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশে গৌড়ে এল। [ক্রমশ।

হৃষীকেশ

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

মনোরম এক মন্দির আছে হিমালয় সানুদেশে,
হরিদ্বারেতে 'দুয়ার' [illegible], '[illegible]' সে হৃষীকেশে।

কেহ যদি যায় [illegible] সেই তীর্থের পথে,
ধাব হ'তে কভু ফেরে না সে [illegible] হৃষীকেশ হ'তে।

স্তব্ধ সেথায় আকাশ [illegible],
মহাযোগীবর গিরীশের ধ্যানে [illegible]।

[illegible] এই, [illegible],
সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত [illegible]।

জীবন মুক্ত [illegible],
সংসারী হেথা [illegible]।

কালী কমলীর [illegible],
দেহধারণের প্রয়োজন সবই মেলে সেথা দুই বেলা।

গৈরিক বেশে কত সাধুজন করে পথে আনাগোনা,
চরণে লুটায় তাপিত হৃদয়, মাগিয়া করুণাকণা।

জাহ্নবী তীরে অপূর্ব এক প্রশান্ত পরিবেশ,
সখ্য সেথায় মানুষে ও মীনে নাহি হিংসার লেশ।

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

হেথা [illegible],
প্রণাম জানাই, হৃষীকেশ, চাই তোমার [illegible] স্থান।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ।।

ব্রহ্মবাদিরা আপনার মাঝে কহেন পরস্পরে
কোথা হতে জাত ? কি করিয়া বাঁচি যাব বা কোথায় পরে ?
ব্রহ্ম কি সবে করেন পালন
প্রলয়ের কালে কে করে ধারণ
সুখ দুখ ভোগ কার নির্দেশে হয় বলো সবাকার ?
ব্রহ্ম কি এই জগত কারণ ? তাঁরি পরে সব ভার ?

(২)

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ।।

সকল জীবের শেষ পরিণাম কারণ কি কাল তবে ?
স্বভাব নিয়তি যখনি যা ঘটে নিশ্চয় কেবা কবে ?
ইহারা কারণ কখন ত' নয়
সকলের যোগ যদিও বা হয়
জীবাত্মা তবু বহে চিরকাল পাপ পুণ্যের ভার
থাকিলেও মিশে জগতের গতি কারণ নহে ত' তার।

(৩)

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ।।

পরমাত্মাই নিখিল কারণ তাঁর মতে সবে ধায়
কাল ও জীবের গতিপথ বাধা সেই ধারা বয় যায়
ঋষিরা সমাধি যুক্ত হইয়া
জেনেছেন তাহা সত্য করিয়া
সত্ত্ব ও রজ তম তিন গুণ পথপ্রান্তেতে তাঁর
সবের আধার অতুলন সেই প্রণম্য সবাকার।

(৪)

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ।

মায়াশক্তি যে পরমাত্মার রথ চক্রের শেষ
ত্রিগুণ ধারায় আবৃত সেই ষোড়শ গুণের বেশ
পঞ্চাশ যার চক্র শলাকা
বিংশতি চক্র শলার খিলিকা
ছয় অষ্টক কাম পাশ দ্বারা আবদ্ধ সেই জন
পাপ ও পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান সবের মধ্যে রণ।

(৫)

পঞ্চস্রোতোম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্ ।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ।।

পাঁচটি জ্ঞানের ইন্দ্রিয় যথা পাঁচটি ধারার মত
পঞ্চভূতের দ্বারে দুস্তর জটিল পথেতে গত
পঞ্চ কর্ম ইন্দ্রিয় যাঁর
তরঙ্গ সম হইল যাঁহার
চঞ্চলপ্রিয় পঞ্চজ্ঞানের মনটি যাঁহার মূল
পঞ্চশব্দ আবর্ত যাঁর শুধু যাঁর নাহি কূল।

পঞ্চদুঃখ যাঁর স্রোতাবেগ সোপানে পঞ্চক্লেশ
পঞ্চাশরূপে যাঁর পরকাশ সেই জন পরমেশ
হেথা নদীরূপে তাঁহারে স্মরিয়া
আমরা সকলে পরাণ ভরিয়া
অপরূপ রূপা সে স্রোতসলিলা প্রণমি জুড়িয়া কর
পঞ্চনদীর স্রোতসমা সেই অপরূপ মনোহর।

(৬)

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ।।

মিছে আপনারে বিভিন্ন ভেবে যেই জন দূরে রয়
ব্রহ্মচক্রে কারণ ও লয়ে পতিত যখন হয়
যখন বোঝে সে সব মিছে ভুল
সেখানে যে জীব সর্ব সমতুল
ব্রহ্মজ্ঞান লভিছে তখন আপনি অমর হয়
সবাকার মাঝে তাঁহারে লভিয়া আপনি অমৃতময়।

(৭)

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ।

এই মায়াতীত রূপে বেদান্ত তাহারি মহিমা গায়
ভোগ্য ভোক্তা ঈশ্বর সাথে এক হয়ে বিরাজয়
অচল রূপেতে প্রতিষ্ঠা যাঁর
ক্ষয় রূপেতে নাহিক বিকার
এ মায়ার মাঝে ঈশ্বর জানি যত জ্ঞানী ঋষিগণ
সমাধি লভিয়া ব্রহ্মতে মিশে জনম মুক্ত হন।

(৮)

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ

বিনাশের রূপে অবিনাশী জন সবেতে যুক্ত রন
কার্যকারণে যুক্ত করিয়া রহিয়াছে সেই জন
আবার সেজন জীবরূপে রয়
সুখ দুখ রত হয় মোহময়
আবার সেজন জ্ঞানলাভ করি ছিঁড়ি সব বন্ধন
ব্রহ্মে লভিয়া ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্মতে লীন হন।

(৯)

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ।

এই ঈশ্বরই জ্ঞানী-অজ্ঞানী দাস প্রভু দুই সাজে
অনাদি অতীত স্বয়ম্ভু সেই থাকে সবাকার মাঝে
ভোগ্য ভোক্তা ভোগ জেন সেই
আপনা আপনি প্রভু হয় যেই
তিনের মধ্যে তাঁহারে লভিয়া জ্ঞানী ও সাধকজন
অনন্ত এই ব্রহ্মস্বরূপে লভিয়া মুক্ত হন।

অনুবাদিকা—পুষ্প দেবী

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

[শ্রীচৈতন্যদেবের কিশোর জীবনে একমাত্র যিনি তাঁকে আকর্ষণ করেছিলেন সেই প্রথম পরিণীতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার কাহিনী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, কবিকর্ণপুর, কিশোর গৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ হতে গৃহীত ও কিছু কল্পিত।]

ভাগীরথীর পূর্বতটে নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে বল্লভাচার্য সদাচারী ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মী তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র কন্যা। পরমা সুন্দরী। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কন্যা-গৌরবে নিজেরা যেমন খুশি, প্রতিবেশীরাও তেমনি বিমুগ্ধ। লক্ষ্মীর বয়স তখন ছয়-সাত বছর। তখনই সে লক্ষ্মীপ্রতিমা।

নবদ্বীপের নদীতট।

স্নানের ঘাট অতি বিস্তৃত—সেখানে কাতারে কাতারে লোক স্নান করে। ঘাটের সারি সারি সোপানগুলি বেশ চওড়া। ঘাট যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে খেয়াঘাটের আরম্ভ। সেখানে খেয়ার নৌকো, পানসি, জেলেডিঙ্গি, মাল যাতায়াতের ভড় দু'চারখানা বাঁধা আছে। স্নানার্থীর বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপবীত-ধারী, মুণ্ডিতশীর্ষ। মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা, তরুণী বধূরা ঘোমটায় মুখ ঢেকে টুপ টুপ করে ডুব দেয়, ছেলে-ছোকরার দলও নেহাৎ কম নয়; তারা সাঁতার কাটে, জল তোলপাড় করে; মেয়েদের কাছে গিয়ে উৎপাত করে। কোন পণ্ডিত তেল মাখতে মাখতে তর্ক তোলেন, পক্ষাপক্ষ হয়ে ভীড় জমে যায়, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্ক চলে, কোন ব্রাহ্মণ আবক্ষ জলে নেমে পূবমুখী হয়ে আহ্নিক করেন। বল্লভ-গৃহিণী রোজ ঘাটে আসেন। মাঝে মাঝে মেয়ে লক্ষ্মীকেও নিয়ে আসেন।

সেদিন লক্ষ্মীকে নিয়ে এসেছেন বল্লভ-গৃহিণী। আলাপ চলে সমস্থানীয়া পরিচিতাদের সঙ্গে। এমন সময় রব উঠল 'ঐ এলো' 'ঐ এলো' বলে। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বৃদ্ধারা রঙ্গ দেখতে লাগলেন। মেয়েরা আঁচল দিয়ে পুজোর নৈবেদ্য ঢেকে দাঁড়ালো। গিন্নীরা যে যার মাথার ওপর নৈবেদ্য তুলে নিলেন। লক্ষ্মীও নৈবেদ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'এলো এলো' রব শুনে বড় বড় কালো চোখে অবাক হয়ে চারদিকে চাইতে লাগল। সে ঘাটে খুব কমই আসে, ঘাটের ব্যাপার সে কিছুই জানে না। তার ওপর মিতভাষিণী বালিকা।

সাবধান করতে না করতে মূর্তিমান উপদ্রবের মত দশ-এগার বছরের একটা ছেলে ঘাটে এসে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলে। সে এর ফুলের মালা গলায় পরে, ওর পুজোর উপচার ছড়িয়ে দেয়—মুহূর্তে যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়! ছোটরা কাঁদতে আরম্ভ করে, কোন কোন মেয়েরা মিনতি করে বলে—নিমাই, লক্ষ্মী আমার, তুই যা চাইবি তাই দেবো, নৈবিদ্যি নষ্ট করে দিস নি ভাই।

চঞ্চল নিমাই এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—কি দিবি? দাঁড়াতে পারব না—

ঘাটের বর্ষীয়সীরা এতক্ষণ কথা ভুলে এই দুরন্তের কীর্তি দেখছিল। এবার শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী চোখ টিপে বললে—ওরা হরিবোল দেবে রে, তা হলে খুশি হবি তো নিমাই।

মালিনী শচীদেবীর সখী—নিমাইয়ের খবর সে জানে। এদিকে ঘাটের মেয়েরা 'হরি' 'হরি' বলতে লাগল। লক্ষ্মী বিস্ময়ে চেয়ে থাকে—নিজের নৈবেদ্যটি কোলের কাছে আগলে রাখে। দু' চোখে চঞ্চল চাহনি, পালায় নি, ভয় পায় নি, একটি কথাও বলে নি।

হঠাৎ নিমাই চেয়ে দেখে একটা নতুন মুখ, একেবারে কচি, যেন একটা তুলতুলে পুতুল। কিন্তু তার চোখ যেন ভর্ৎসনা করে বলছে—ছি:, এ কি তোমার স্বভাব, তুমি তো ভাল ছেলে নও, দুষ্টের শিরোমণি।

সবাই 'হরি' বলছে, লক্ষ্মী বলে নি। এক চমকে দেখে নিমাই পা বাড়ায়..

—এগিয়ো না বলছি, খবরদার।

—ইস বড় অহঙ্কার, নিমাইকে শাসন···

ততক্ষণে চার-পাঁচজন আধাবয়সী মেয়েরা এসে নিমাইয়ের পথ আগলায়। বলে—নিমাই, চলে যেও না, এগুলো তুমি নাও, বলে নিজেদের নৈবেদ্যর উপকরণগুলি ধরে দেয়।

মালিনী কপট রাগ করে বলে—এই মেয়েরা, তোদের নিজেদের ভাগ থেকে কিছু কিছু নিমাইকে দে না। নইলে এখুনি শাপ দেবে—কাকে বলবে বুড়ো বর হবে, সতীন হবে, যা দজ্জাল ছেলে।

নিমাই কথাটা শুনতে পেয়ে বললে—দেবই ত' শাপ, পুজো করতে এয়েছেন সব, আগে আমার পুজো কর, তারপর অন্য পুজো।

মালিনী বল্লভ-গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—এই আপনার মেয়ে লক্ষ্মী··না।

ব্রাহ্মণী মৃদুহাস্যে মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ।

মালিনী কৌতুকে নিমাইকে বললেন—নিমাই, ওর নৈবেদ্য নিবি।

নিমাই ফেটে উঠল, বলে—ওর নৈবেদ্য আমি ছুঁই না, ও 'হরি' বলে না।

লক্ষ্মী বিদ্যুতের মত বললে—আমার নৈবেদ্য আমি দেব না। হরি বলাও দেবো না। এই তো 'হরি' বলছি, নাও দেখি নৈবেদ্য কেমন করে নেবে।

রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা।

নিমাই স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

মেয়েরা প্রাণ খুলে হাসে।

মালিনী প্রমাদ গণে, এই বুঝি লাগে—নিমাইকে লজ্জা দেবার জন্যে বললেন—আচ্ছা নিমাই, ওর নৈবেদ্য না হয় না নিলি, ওকে বিয়ে করবি। কেমন সুন্দর মেয়েটি।

(কথা শেষ না হতেই কাল্পনিক পদাঘাত করেই)

—পায়ে ধরে সাধলেও ওকে বিয়ে করব না, বলে মেয়েটির প্রতি মুখ বিকৃতি করে যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি আচমকা চলে গেল।

মেয়েরা একচোট হেসে নিয়ে বলাবলি করতে লাগল—এ মেয়েও ঠিক নিমাইয়ের জুড়িদার, রূপে, গুণে, কথায়—

(ঘাটের যত মেয়েদের লক্ষ্মীর দিক দৃষ্টি পড়লো)

সর্বাঙ্গসুন্দরী মেয়ের মার দীর্ঘশ্বাস পড়ল, বললেন—সে ভাগ্য কি হবে, আমার মেয়ের···

মায়ের হাত ধরে বাড়ি ফেরার সময় লক্ষ্মী ভাবছিল—আহা, কে যাচ্ছে ওর পায়ে ধরে সাধতে, দুষ্ট ছেলে, পাজি ছেলে কোথাকার।

অলক্ষে দেবতা হাসলেন।

বছর গড়িয়ে যায়।

মাঝে মাঝে ঘাটে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয় নিমাইয়ের, কিন্তু কথা মোটেই হয় না, বরং দু'জনে দু'জনকে এড়িয়েই চলে। নিমাইও কখন সেধে কথা বলে নি, আর লক্ষ্মীও মিতভাষিণী।

এর মাঝে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হয়। তখন নিমাইয়ের বয়স এগার বছর।

আরও কিছু দিন যায়। অধ্যয়ন কয়েক বছর ধরেই চলে। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য ক্রমে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পনর বছর বয়সে নিমাই টোল খোলে। ছাত্রেরা তার পাণ্ডিত্যে মুখর হয়ে পড়ে।

বল্লভাচার্য বাড়িতে এসে নিমাইয়ের গুণকীর্তন করেন। মনে মনে আশা পুষে রাখেন নিমাইকে জামাই করবার। কিন্তু নিমাইয়ের যত যশ বাড়তে থাকে—তাঁর আশাও ক্ষীণ হতে থাকে—কারণ তাঁরা দরিদ্র।

এখন কত সভাপণ্ডিত, রাজপণ্ডিতরা নিমাইকে জামাই করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝত বাপ-মা নিমাইকে জামাই করতে চায়। লক্ষ্মীর কি তাই মনে হয়? মনে মনে ভাবে পুরোনো কথা—পায়ে ধরে সাধলেও লক্ষ্মীকে ঘরে নেবো না। আর ভাবে নিমাইয়ের কি এত দিন একথা মনে আছে।

অভিমানিনী স্ফুরিতাধরে বলে—আমার বয়ে গেছে পায়ে ধরে সাধতে—।

লক্ষ্মীর ক্রমে বয়স হল বারো। সে একে স্বভাব-গম্ভীর—তার ওপরে দরিদ্র কন্যা। তার বিশেষ সখী-সহচরী ছিল না। ঘাট বিরল হলে—দ্বিপ্রহরে কখনও মার সঙ্গে কখনও বা একলা ঘাটে এসে স্নান করে

এমনিই একদিন। নির্জন ঘাট। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব লক্ষ্মী ঘাটে এসে স্নান সেরে সবে নৈবেদ্য [illegible] হঠাৎ উচ্চহাস্য। চকিত হয়ে দেখলে—কিশোর নিমাই সাঁতরে পাশেই উঠেছে—সঙ্গে সখা পুরুষোত্তম (উত্তরকালে স্বরূপ দামোদর)। কুমারী মেয়েরা তখন ঘোমটা দিত। নতনয়না লক্ষ্মী ঘোমটা সুদীর্ঘ করে—অপেক্ষা করে আছে—ওরা চলে গেলেই পুজো দেবে।

দু'বন্ধুর আলাপ আর শেষ হয় না। বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মী বঙ্কিম নয়নে ফিরে তাকাল। ঘোমটা সরে যায় খানকটা। সঙ্গে সঙ্গে নিমাই স্মিতহাস্যে বলে উঠল তাকে—

—আমার পুজা আমি মহেশ্বর
আমারে পুজিলে পাবে অভীপ্সিত বর।

বালিকা লক্ষ্মী প্রমাদ গণে।

আবার সেই ছোটবেলাকার খেলা। কি দুষ্টু ছেলে রে বাবা··· এতদিনেও ভোলে নি যে লক্ষ্মী সেদিন পুজো দেয় নি।

সে দিন ঘাটে লোক ছিল।

আর আজ নির্জন ঘাট···

আজ আর তার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না—

হাতে মালা চন্দন নৈবেদ্য বিনাবাক্যে উজাড় করে দিলে তার সামনে।

মালা গলায় পরে চন্দন মেখে নিমাই বলল—

'সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্বো ভগবতীনাং মদর্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি।' (ভা ১০-১২)

(সাধ্বীগণ আমার সেবা করতে চাও তোমরা, তোমাদের সঙ্কল্প আমি জানি। আমি অনুমোদন করছি তোমাদের কামনা সত্য হবার যোগ্য)

এই বলে পার্শ্বস্থিত বিমূঢ় পুরুষোত্তমের হাত ধরে হাসতে হাসতে চললো নিমাই। (তারুণ্যচর্চা নিমাইয়ের স্বভাব নয়—স্ত্রীলোক দেখলেই মাথা নীচু করে—এই প্রথম একজনকে নিমাই পরিহাস করেছিল—তাই পুরুষোত্তম বিমূঢ়।)

এখন লক্ষ্মীর বয়স বারো-তেরো। গঙ্গার স্নানে চলেছে। সঙ্গে সাথী সমবয়স্কা। অনেকদিন পরে নিমাইয়ের সঙ্গে পথে হঠাৎ দেখা। নিমাই যখন লক্ষ্মীর দিকে চাইলেন তখন তিনি এক অভিনব আনন্দ অনুভব করলেন তাঁর শরীর ও মন এক তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, শিউরিয়ে উঠল। লক্ষ্মী নিমাইকে কখনও লজ্জা করত না, কিন্তু আজ এই চারচোখের মিলনে—সেও লজ্জায় একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ল। সে মাথা নীচু করে গঙ্গায় দ্রুত চরণে চলে গেল। আর ঘাটে পৌঁছেও তার দুরুদুরু ভাব কমে নি—তবুও সে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল।

এই কি নিমাই-লক্ষ্মীর অনুরাগ?

বাঙলা দেশে সেকালে বিয়ের আগে পূর্বরাগ খুব কমই দেখা যেত। নিমাই নিজের বিয়ের ঘটকতার ভার নিজেই নিলেন। পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন নিমাই তাঁর মনের কথা কাকে জানাবেন। বাড়ির বৃদ্ধ পরিচালক ঈশান তো আছেই—তাঁর একমাত্র সুখ-দুঃখের সঙ্গী। তাকেই ইঙ্গিতে জানালেন।

বনমালী ঘটক বল্লভাচার্য। বনমালীর সঙ্গে লক্ষ্মীর পিতার বন্ধুত্ব ছিল। লক্ষ্মীর সঙ্গে চারচোখের মিলনের দু'একদিন পরেই নিমাই একদিন বনমালীর বাসগৃহে বেড়াতে গেলেন। নিমাইয়ের এই হঠাৎ আগমনের কারণ বনমালী আঁচে বুঝে নিলেন।

যেদিন নিমাইয়ের সঙ্গে বনমালীর দেখা হল, তার পরদিন বনমালী শচীর গৃহে দেখা দিলেন।

বনমালী ভক্তির সঙ্গে শচীকে প্রণাম করলেন—কুশল প্রশ্ন করলেন, স্থির হয়ে আসন গ্রহণ করলেন—তারপর শচীমাকে বললেন—আপনি কি বল্লভাচার্যের মেয়ে লক্ষ্মীকে দেখেছেন—দেখেছেন নিশ্চয়ই কারণ এই নবদ্বীপে তার মত সুন্দরী, তেমন সুশীলা, তেমন গুণশালিনী, মধুরভাষিণী কন্যা তো আর নেই? আপনার ছেলে যেমন ভরদ্বাজ গোত্রীয় কুলীনের ছেলে, লক্ষ্মীও তেমনি কুলীনের মেয়ে। লক্ষ্মীর বাবা বল্লভাচার্য কুলে, শীলে ও সদাচারে সম্পূর্ণ নির্দোষ

একে একে বনমালী কন্যার গুণের কথা বলে চললেন—ভুলেও একবার নিমাইয়ের গুণের কথা বললেন না—নিমাইকে জামাই পায় মেয়ের বাপ যে কৃতার্থ হবেন—সে সব কথা কিছুই বললেন না এতে শচীর ভাল লাগল না—তিনি বললেন—

'আই বলে পিতৃহীন বালক আমার,
জীউক পড়ুক আগে, তবে কার্যভার।'

আমার ছেলে পিতৃহীন, নাবালক, আগে বেঁচেবর্তে থাকুক, প্রতিষ্ঠিত হোক, তবে না বিয়ের কথা, এখন বিয়ের কথা করে কি করব?

বনমালী শচীর কথা শুনে দুঃখিত হয়ে বাড়ির পথ ধরলেন—নিমাই ওৎ পেতে ছিলেন—বনমালীকে পথে পেয়ে—একেবারে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় গেছলেন?

বনমালী বললেন—তোমার মার কাছে, লক্ষ্মীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা বলতে।

নিমাই বললেন—তা মা কি বললেন?

বনমালী বললেন—

'তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তারে
না জানি, শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিলা কেনে।'

মা, তিনি তো একদম আমলই দিলেন না। বললেন ছেলে আমার নাবালক, আগে প্রতিষ্ঠিত হোক। তবে তো বিয়ে।

নিমাই শুনে অত্যন্ত বিমনা হয়ে বাড়ি ফিরলেন—মনে অভিমান—একেবারে বাড়িতে কোন কথাটি না কয়ে—পুঁথি নিয়ে বসলেন।

শচী জানতেন—নিমাই বাড়িতে বেশির ভাগ সময়ে···বই নিয়ে থাকেন—সুতরাং বিশেষ কিছুই বললেন না।

কিছুক্ষণ বাদে নিমাই এদিক ওদিক করে মায়ের কাছে এসে বললেন—মা, আজ বনমালী আচার্য আমাদের বাড়ি এসেছিলেন—না?—কেন?

মা নিমাইয়ের মনের কথা বুঝলেন—আনন্দিত হলেন—হেসে বললেন—বনমালী এসেছিল রে তোর বিয়ের কথা বলতে। আমার কাছে আবার সে আসবে, তাকে শীগ্‌গিরই ডেকে আনবে। সে আমার কথা ভাল করে বুঝতে পারে নি।

মায়ের কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে নিমাই চললেন তাঁর একমাত্র সুখ-দুঃখের সাথী ঈশানের কাছে সুখবরটি শোনাতে।

এবার বনমালী ঘটকের আগমন বল্লভাচার্যের বাড়িতে। চতুর ঘটক এখানে কেবল নিমাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বল্লভাচার্য বনমালীর প্রস্তাব শুনে তখনই সম্মতি দিলেন। নিমাইয়ের মত জ্ঞানী-গুণীকে জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা মনে করলেন। আর বললেন—

'সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই
আমি তো নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই!
কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরীতকী দিয়া,
এই আজ্ঞা সবে তুলি আনিবে মাগিয়া।'

একদিন শাঁখ বেজে উঠল।
বিয়ের শাঁখ।

নিমাইকে আমরা শচীমার উঠোনে নাচতে দেখেছি, গঙ্গার ধারে খেলা করতে দেখেছি—গঙ্গার এপার ওপার করতে দেখেছি—সতীর্থদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে দেখেছি, দেখেছি গঙ্গাদাসের টোলে। ললাটে চন্দনের রেখা, বক্ষে যোগপট্টের ন্যায় উত্তরীয়, শাস্ত্র চিন্তায় মগ্ন—দেখেছি টোলে পড়ুয়াদের সাথে অধ্যয়নে রত—এবারে তাঁকে বিবাহের সজ্জায় বরবেশে দেখলুম। বয়স তখন ষোল; কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ ঠাম, উজ্জ্বলবর্ণে কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম।

পাড়ার বৌয়েরা এসে নিমাইকে বরবেশে সাজাতে লাগল। কিশোর বর সেদিন নবদ্বীপ উজ্জ্বল করে সেজেছিলেন। শচীর ওই ছোট্ট কুটিরে জনসমাবেশে তিল ধারণের স্থান ছিল না। কেউ আসে, কেউ যায়, সবাই ব্যস্ত, সবাই আনন্দিত। মেয়েদেরও আসার বিরাম নেই—আমোদে, আলাপে, হাস্য-কৌতুকে নিমাইয়ের গৃহ আজ ভরপুর। অগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম দিয়ে অপরূপ সাজে আজ তারা নিমাইকে সাজাচ্ছে।

'নবীন কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ,
সুমেরু পর্বত জিনি অঙ্গের গঠন।
সহজ রূপের নাহি ভুবনে তুলনা,
যজ্ঞসূত্রে অতিশয় তাহাতে শোভনা।
দীঘল সুন্দর আঁখি পুণ্ডরীক জিনি,
অপরূপ তাতে চারু সুন্দর চাহনি।'

আর এদিকে বিবাহ-বাসর। সেখানেও জনতা। তারই মাঝে গৃহ আলো করে আছে এক লক্ষ্মী-প্রতিমা। সে কিশোরী, সুন্দরী, সর্বমনোহারিণী। তার কি তখন সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ছে—পায়ে ধরে সাধলেও বিয়ে করবো না—না—না। না, সে তখন গোরাচাঁদের অনিন্দ্যসুন্দর রূপের মাঝে নিজেকে লীন করে দিয়েছে। তবুও মনে তার ভয়, উদ্বেগ, আনন্দ মিশে এক অপূর্ব মাধুরীতে ভরে উঠেছে। তারই মাঝে চারচোখের মিলন।

বধূমুখ দেখে পাড়া-প্রতিবেশীদের মনে হল—একি রূপ—

'অতি সুকোমল তনুখানি।
হাসি-মাখা বদন পূর্ণিমার চাঁদ জিনি।'

নিমাই যে পূর্ণিমার চাঁদ, তাকেই তো জয় করে এনেছে। আর শচীদেবী বধূমুখ দেখে ভাবছেন—এ যে স্বয়ং লক্ষ্মী। এঁর আগমনে চারদিকেই পদ্ম গন্ধ—

'কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তয়ে সদায়।
আই চিন্তে—বুঝিলাম কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার।'

বধূমাতা লক্ষ্মী এসে সংসারের সব ভার গ্রহণ করলেন—সেবায়, নিরলস গৃহস্থালীর সবই—ক্লান্তিহীন ভাবে যেন তিনিই শচীমায়েরই মা।

আর স্নেহে, যত্নে, ভালবাসায় নিমাইয়ের যেন আর অপূর্ণতা কিছু নেই। তিনি আজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন সারা দেহে-মনে।

নিমাইয়ের যশোগৌরব ধাপে ধাপে বেড়ে চলল। এরই মধ্যে একদিন তিনি কেশব কাশ্মীরীকে তর্কে পরাজিত করে দিগ্বিজয়ী হলেন। নিমাইয়ের জয়ে নবদ্বীপবাসীর জয়োল্লাস।

এমনি করেই দিনের পর দিন কাটে এই সুখী সংসারে—স্নেহময়ী মা, সেবাপরায়ণা স্ত্রী আর আনন্দমুখর পরিবেশ। তবুও যেন কি—এত পূর্ণতার মাঝেও কোথায় যেন অপূর্ণতা রয়ে গেছে। নিমাইও বোঝে না, লক্ষ্মীও যেন মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে পড়ে—তবে কি?

হঠাৎ একদিন নিমাই মাকে বললে—মা, আমি কিছুদিনের জন্যে ওপার বাংলা দেশ ঘুরে আসি—দেখে আসি আমার পিতৃভূমি—শ্রীহট্ট।

মা নিশ্চিন্তে মত দিলেন।

কিন্তু বধূমাতা লক্ষ্মীর চোখে জল। আসন্ন পতিবিরহ না ভাবী বিচ্ছেদ? তিনি কি কোন অমঙ্গলের সূচনা অনুভব করতে পেরেছেন?

লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে নিমাই যাত্রা করেন।

লক্ষ্মীর অস্থিরতা বেড়ে যায়। একটি নিষ্পাপ পবিত্র ফুল ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যেতে লাগল। এমনি ভাবেই দু'মাস কেটে গেল। না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে'র অবস্থা। লক্ষ্মী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলো—এই বুঝি তার প্রিয়-দেবতার সন্ন্যাসের পূর্বলক্ষণ।

দুর্যোগের রাত্রি দিনে দিনে কাটে। সেদিনও অবসান হল। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বারিবর্ষণ শেষ হচ্ছে। প্রভাতের বুকে আলোর রেখা ফুটে উঠল। সেদিন লক্ষ্মী স্থির, ধীর, হাস্যময়ী। শাশুড়ীমাতার পরিচর্যার বুঝি শেষ নেই। কোন দিকেই কোন সেবার ত্রুটি সে রাখে নি। শচীমাতা মনে করলেন—বধূমার বুঝি মানসিক উদ্বেগ কিছু কমে গেছে, নিমাইয়ের যাত্রার পর থেকে তিনি যে চঞ্চলতা, যে অস্থিরতা লক্ষ্মীর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন—বুঝি তার কিছুটা স্তিমিত হয়েছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে—গৃহকর্ম সব সেরে শচীমায়ের অনুমতি নিয়ে জল আনতে গেলেন গঙ্গায়। নির্জন সোপানে মৃৎপাত্রটি রেখে—বসে বসে গঙ্গার জলতরঙ্গ দেখতে লাগলেন। ম্লান মুখ, অশ্রুভরা চোখ, গভীর চিন্তা। মনে মনে বুঝি বলেছিলেন তুমি আমায় ভুল বুঝ না প্রভু। আমি তোমার পথের কাঁটা হব না—আমি ঝরা ফুল হয়ে বিছিয়ে থাকব সেই পথে, যে পথ দিয়ে তুমি যাবে শুধু শুধুই যেন, তোমার চরণস্পর্শ পাই। আমি আকুল হয়ে এই নদীয়ার ধূলি-কণার সঙ্গে মিশে থাকব তোমার চরণকে বুকে তুলে নিতে—সেই দিনের প্রতীক্ষায়, যে দিন তুমি প্রেম-বিরহে কাঁদবে, জগতকে কাঁদাবে—সেই শুভ-সন্ধিক্ষণের আশায়। এখন থেকে শুধু তুমি আমার নও, তুমি সকল দেশের, সকল মানুষের।

যে ঘাটে দু'জনের প্রথম দেখা হয়েছিল সেই ঘাটেই লক্ষ্মী ঢলে পড়লেন—আর উঠলেন না। দিনান্তের শেষ সন্ধ্যাটি ম্লানমুখে নিঃশব্দে অনন্তকালের বুকে মুখ লুকাল।

নিমাই ফিরে এসে শুনলেন—তিনি ঘর ছাড়বার আগেই—তাঁর বিচ্ছেদ-ভীতা সঙ্গিনী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন সেই অনন্তধামে। অনন্তের কাছে।

আকাশে উঠেছে চাঁদ

(মূল জার্মান কবিতা Der mond ist aufgegangen থেকে)

মাটিয়াস ক্লাওডিয়ুস

আকাশে উঠেছে চাঁদ
স্বর্ণ তারকারাজি নির্মেঘ উজ্জ্বল আকাশে
ঝিকমিক করছে।
তমসাবৃত বনানী রয়েছে নীরব—
প্রান্তর থেকে ওপারে উঠে যাচ্ছে অপরূপ শুভ্র কুজ্ঝটিকা।
নিবন্ধ মোহিনী পৃথিবী রয়েছে শান্ত
নিঝুম কক্ষের মত।...
সেথায় ঘুমিয়ে
তুমি ভুলে যেতে পার দুঃখের দিনগুলি।...
দেখ—ঐ তো চাঁদ—আধখানি
কিন্তু তবুও বৃত্তাকার কি অপূর্ব সুন্দর!
অমনিভাবেই আমরা দেখি সব জিনিসকে
আর [illegible] হাসি—
কারণ আমাদের চোখ দেখতে পায় না সব জিনিসকে।

অলস, দরিদ্র, পাপী, গর্বিত মানব আমরা
কিছুই জানি না,
নানা ফন্দী-ফিকির খুঁজি
আর লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাই।...
ভগবান! তোমার করুণা আমাদের রক্ষা করুক—
ক্ষণস্থায়ী কোন জিনিসকে আমরা যেন বিশ্বাস না করি,
অহংকারে উল্লসিত না হই।...
যেন সরল হতে পারি
এই পৃথিবীতে তোমার সামনে
যেন শিশুর মত পবিত্র সুখী হতে পারি।..

ভ্রাতৃবৃন্দ!
এস ভগবানের নাম নিয়ে আমরা শুয়ে পড়ি—
...হিমেল হাওয়া বইছে...
ভগবান! শান্তি দিয়ে আমাদের রক্ষা কর...
...আমরা আর পীড়িত প্রতিবেশীরা
যেন শান্তিতে ঘুমোতে পারি!

অনুবাদ—সুবীরকান্ত গুপ্ত

নজরুল জীবনের এক অধ্যায়

আবদুল আজীজ আল্-আমান

প্রথম জীবনে নজরুলের অন্যতম বন্ধুদের মধ্যে জনাব আফজালুল হক অন্যতম একজন। আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক বড় মধুর, বড় পবিত্র। আন্তরিকতায় নিবিড়তা এলে যা হয়—অনেক গোপন কথার প্রকাশ, অনেক রসিকতার নিবিড়তা।

আমরা আমাদের চলার পথে এমন অনেক রসিকতা করি যা অনেক ক্ষেত্রে কিছু স্থুল কিন্তু বড় মধুর। বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় বসে কোন সুন্দরী তরুণীকে যেতে দেখলে আমাদের। কেউ কেউ অনেক সময় এমন মন্তব্য প্রকাশ করেন যা অনেক ক্ষেত্রেই মার্জিত থাকে না—কিন্তু আনন্দের খোরাক থাকে প্রচুর। সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এমন কিছু গোপন তথ্য পরিবেশন করেছেন পরিমল গোস্বামী। তিনি তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁর (বিভূতিবাবুর) চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি খুব উপভোগ্য ছিল।··· একদিন বিভূতিবাবু···কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে চলছিলেন, হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেন বিভূতিবাবু একটি ছুটে চলা মোটরের দিকে চেয়ে আছেন কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই বিভূতিবাবু ডান হাতে বুক চাপড়ে বলে উঠলেন, 'মেরে দিয়ে গেল!' অর্থাৎ ঐ মোটরে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল, তাঁর চোখ ঝলসে দিয়ে সে চকিতে মিলিয়ে গেল। কি সাংঘাতিক ঘটনা!

ঘটনাটি স্থুল নিশ্চয়ই—কিন্তু দিলখোলা বিভূতিবাবুকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হয় না আর এই সঙ্গে যে আনন্দ আমরা উপভোগ করলাম সেটিও কম মূল্যবান নয়। নজরুলও মাঝে মাঝে অনুরূপ ভাবে রসিকতা করতেন। ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীটের যে ঘরে তিনি থাকতেন সেখান থেকে পথচারীদের দেখতে কোনই অসুবিধা হ'তো না। তাঁর রসিকতার ধরণটা কতক এই রকম ছিল:

কোন তরুণীকে যেতে দেখলে তিনি সব কাজ ফেলে অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়াতেন—হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোর জন্য উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়তো এবং তাঁর বিস্ময়ভরা আয়ত আঁখির দৃষ্টি অনুসরণ করে পথের দর্শনীয় সজীব দেহটি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতো। সকলে তরুণীটির দিকে তাকিয়েছে এমন বুঝতে পারলে কবি ধীরে টেনে টেনে উচ্চারণ করতেন, এক লাইন কবি-ই-তা আ!

হাসির হুল্লোড় পড়ে যেত সঙ্গে-সঙ্গে।

কিন্তু সবদিন কবি কেবল এক লাইন কবিতা বলতেন না। সৌন্দর্যের পার্থক্য থাকলে তাঁর চলাতেও তর-তম স্পষ্ট হ'য়ে উঠতো অপূর্ব সুন্দরী অথচ শান্ত পদবিক্ষেপে চলা রমণীকে দেখলে তিনি বলতেন 'কবিগুরুর' কবিতা, চপল ভঙ্গীতে চলা তরুণীকে দেখে বলতেন সত্যেন দত্তের লাইন।

কবির প্রথম বিবাহ হয় কুমিল্লার অন্তর্গত দৌলৎপুর নিবাসী আলী আকবর খানের ভাগ্নী নার্গিস-আসার খানমের সঙ্গে। নানা কারণে এ বিয়ে সুখের হয় নি, এমন কি কেবল নামমাত্র বিয়ে ছাড়া এটিকে প্রকৃত কোন বিয়েই বলা চলে না। রাতে বিয়ে হ'য়েছিল এবং বিয়ের পর কবি আসর ত্যাগ করে চলে আসেন! এমন এই বিয়ে সুখের না হওয়ার মূলে কবির কোনই দোষ ছিল না—ত্রুটি ছিল অন্যত্র। সে অন্য কথা।

এই বিয়েতে যে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হ'য়েছিল তা'তে নাম ছিল আলী আকবর খানের, কিন্তু সমগ্র পত্রটি কবির রচনা। নিমন্ত্রণপত্রও যে কতখানি সাহিত্য হ'য়ে উঠতে পারে—এই পত্রটি তার নিদর্শন। কুমিল্লা থেকে কবি নিমন্ত্রণ করেছিলেন আফজালুল হক সাহেবকে—সেই নিমন্ত্রণপত্রখানি আজও হক সাহেবের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। সেই অপ্রকাশিত পত্রখানি আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম:

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

> 'জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে,
> এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।'
>
> —রবীন্দ্র।

এ বিশ্ব-নিখিলের সকল শুভকাজে যাঁর প্রসন্ন কল্যাণ আঁখি অনিমিখ হয়ে জেগে রয়েছে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার করুণাধারা শ্রাবণের ধারার মতই ব্যাকুলবেগে আজ আমার ঘরে—আমাদের বুকের 'পরে বুকের 'পরে ঝরে পড়ছে; তাঁর কল্যাণ-

একটি গান

কাজী নজরুল ইসলাম

চোখের নেশার ভালবাসা সে কি কভু থাকে গো।
জাগিয়ে স্বপনের স্মৃতি স্মরণে কে রাখে গো ।।
তোমরা ভোলো গো যারে
চিরতরে ভোলো তারে
মেঘ গেলে আবছায়া থাকে কি আকাশে গো।
পুতুল লইয়া খেলা
খেলেছ বালিকা-বেলা
খেলিছ পরাণ লয়ে তেমনি পুতুল খেলা।
ভাঙিছ গড়িছ নিতি হৃদয় দেবতাকে গো ।।
চোখের ভালোবাসা গলে
শেষ হয়ে যায় চোখের জলে,
বুকের ছলনা সে কি নয়ন-জলে ঢাকে গো ।।
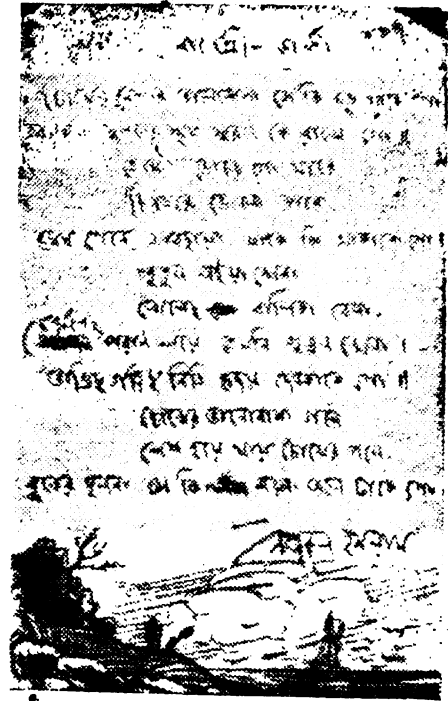
নজরুলের মূল হস্তলিপি

ভাবাতুর আনত আঁখির সু-নিবিড় চাওয়া কেমন এক সুধা-করুণ আশীষে ছেয়ে ফেলেছে!

শিশির-নত ফুলের মতই আজ তাই আমার সকল প্রাণ-দেহ-মন তাঁর চরণধূলোর তলে লুটিয়ে পড়ছে। তাঁর ঐ মহাকাশের মহাসিংহাসনের নীচে আমার মাথা নত করে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে:

'আমার পরম আদরের কল্যাণীয়া ভাগ্নী নার্গিস-আসার খানমের বিয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশবিখ্যাত পরম-পুরুষ, আভিজাত্য গৌরবে বিপুল গৌরবান্বিত, আয়মাদার, মরহুম মৌলবি কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দেশ-বিশ্রুত পুত্র মুসলিম-কুল-গৌরব মুসলিম-বঙ্গের 'রবি'-কবি দৈনিক নবযুগের ভূতপূর্ব সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। বাণীর দুলাল দামাল ছেলে, বাংলার এই তরুণ সৈনিক-কবি ও প্রতিভান্বিত লেখকের নতুন করে নাম বা পরিচয় দেবার দরকার নেই। এই আনন্দ-ঘন চির-শিশুকে যে দেশের সকল লেখক-লেখিকা, সকল কবি ভক্তিভরা ভালোবাসা দিয়েছেন, সেই বাঁধন-হারা যে দেশমাতার একেবারে বুকের কাছটিতে প্রাণের মাঝে নিজের আসনখানি পাতে চলেছে, এর চেয়ে বড় পরিচয় তার আর নেই।

আপনারা আমার বন্ধু, বড় আপনারজন। আমার এ গৌরবে, আমার এ সম্পদের দিনে আপনারা এসে আনন্দ করে আমার এ কুটিরখানিকে পূর্ণ আনন্দ দিয়ে ভরাট করে তুলুন, তাই এ আমন্ত্রণ।

এমন আচমকা না-চাওয়া পথে কুড়িয়ে-পাওয়া যে সুখে আমার হৃদয় কানায় কানায় পুরে উঠেছে, আপনাকেও যে এসে তার ভাগ নিতে হবে। এদের পাশে দাঁড়িয়ে, মাথায় হাত দিয়ে প্রাণভরা আশীর্বাদ করতে হবে! আর একা এলে তো চলবে না, সেই সঙ্গে আপনি আপনার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে আমার হয়ে পাকড়াও করে আনবেন এ মঙ্গল-মধুর দৃশ্য দেখতে।

বিয়ের দিন আগামী ৩রা আষাঢ়, শুক্রবার নিশীথ-রাত্তি। নিশীথ-রাতের বাদল ধারার মতই আপনাদের সকলের মঙ্গল-আশীষ যেন এদের শিরে ঝরে পড়ে এদিন!

আমি আজ তাই জোর করেই বলছি, আমার এত বড় চাওয়ার দাবির অধিকার ও সম্মান হতে—আপনার প্রীতি ও শুভেচ্ছা হতে আমায় বঞ্চিত করে আমার চোখে আর পানি দেখবেন না। আরজ—

দৌলতপুর, ত্রিপুরা, বিনীত—
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ বাং আলী আকবর খান।'

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নানা কারণে এ বিয়ে সেই দিনই ভেঙে গিয়েছিল এবং কবি বিবাহ-বাসর ত্যাগ করে চলে আসেন। তিনি ঐ দিন রাতে দৌলতপুর হতে কান্দিরপাড়ে চলে আসেন। এখানে তিনি বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারের 'একজন হয়ে' দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। এই পরিবারের সবচেয়ে স্নেহশীলা মহিলা শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবীকে তিনি মা বলেন। বলা বাহুল্য, বিরজাসুন্দরী দেবী

কবিকে আপন পুত্রের মতই ভালবাসতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই মহীয়সী মহিলার হাতে নেবুর রস পান করে কবি হুগলী জেলে তাঁর ঐতিহাসিক অনশনব্রত ভঙ্গ করেন। কুমিল্লা হতে আফজালুল হককে লেখা একটি চিঠিতে এই 'মায়ের স্নেহে'র কথা উল্লেখ করেছেন। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়: চিঠিতে কবি আফজাল সাহেবকে 'ডাবজল' বলে সম্বোধন করেছেন। উভয়ের মধ্যকার প্রীতির সম্পর্কটুকু সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। আমরা নিয়ে এই অপ্রকাশিত পত্রখানির অনুলিপি প্রকাশ করলাম:

Kandirpar,
Comilla,
15th Chaitra,

ভাই ডাবজল!

'মোসলেম ভারত' কি ডিগবাজি খেল না কি? খবর কি? 'ব্যথার দান' কেমন কাটছে? কত কাটল? অন্যান্য কাগজে সমালোচনা বা বিজ্ঞাপন বেরুল না কেন? 'সার্ভেন্ট' আর 'মোহাম্মদী'র সমালোচনা এবং 'বিজলী' ও 'বাংলার কথা'র বিজ্ঞাপন দেখেছি মাত্র। 'আরবী ছন্দ' দেখেছেন? কে কি বললে? আপনার মুমূর্ষু অবস্থা দেখেই ওটা প্রবাসীতে দিয়েছি। তার জন্যে দুঃখিত হয়েছেন না কি? আর সব খবর কি? 'মোসলেম ভারতে'র অবস্থা জানবার জন্যে বড্ডো উদ্বিগ্ন রইলুম। এতদিন চট্টোগ্রাম বা অন্য কোথাও যেতে পারি নি, তার কারণ এ বাড়িতে অন্তত, দু'জন করে অনবরত শয্যাগত রোগশয্যায়। এখন আবার বসন্ত হয়েছে মেয়েদের। এসব ছেড়ে যেতে পারি নি। তা ছাড়া মায়ের স্নেহ আর নিজের আলস্য-ঔদাস্য তো আছেই। চট্টোগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে আসবেন না কি? আমি যাব নিশ্চয়ই দেখতে। দুই কাজই হবে। নিজের শরীরও ভাল নয়। মনের অশান্তির আগুন দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। অবশ্য, 'আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন!' হ্যাঁ, আমায় আজই কুড়িটি টাকা টেলিগ্রাফ মনি অর্ডার করে পাঠাবেন kindly, বড্ডো বিপদে পড়েছি। কারুর কাছে চাইতে লজ্জা হয়। অন্য কারুর কাছে আমি যাই-ই হই, আপনার কাছে আমি হয় তো ভালোতে মন্দতে মিশে তেমনি আছি। এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে আপনারই স্মরণ নিলুম। আশা করি বঞ্চিত হব না। তা' আপনি যত কেন দুর্দশাগ্রস্ত হোন না কেন। টাকা চাই-ই চাই ভাই। নইলে যেতে পারব না। অনেক কষ্ট দিলুম—আরও দেব। 'ব্যথার দান' মোট নয়খানা পেয়েছি মাত্র আরও খান পনের আমার দরকার। খুবই দরকার—আজই পাঠাবেন। বাড়িতে একখানাও নেই। সে যাক্ টাকা পাঠাবেনই যে কোরে হোক।

আমার লেখাটা তা' হ'লে 'উপাসনায়' দিয়ে দেবেন যদি মো: ভা: না বেরোয়।

চির স্নেহাবদ্ধ
নজরুল

এ চিঠিতে ডাকঘরের যে শীলমোহর আছে তা'তে তারিখ হ'লো '28 March, 1922.'

এই চিঠিতে কবি লিখেছেন, 'চট্টোগ্রাম বা অন্য কোথাও যেতে পারি নি।' এর পিছনে একটি ইতিহাস আছে। কবি এবং জনাব মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' বার হ'য়েছিল—কিন্তু নানা কারণে তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উভয়ে যৌথভাবে মূলধন সংগ্রহ করে নতুন একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা 'দি ন্যাশন্যাল জার্নালস্ লিমিটেড জয়েন্ট স্টক কোং' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারা বাংলায় শেয়ার বিক্রয়ের আয়োজন হয় এবং এই উদ্দেশ্যে কবিকে চট্টোগ্রামে পাঠানো হয়। কিন্তু কবি চট্টোগ্রামে না গিয়ে ওঠেন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে।

চিঠিতে কবি যে টাকা ও 'ব্যথার দানের' কথা বলেছেন তা' হক সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উভয়ের পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যে চিঠিখানির অসীমগুরুত্ব রয়েছে তা' অনস্বীকার্য।

[স্বীকার: নজরুলের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রটির কিয়দংশ আমি অন্যত্র ব্যবহার করেছি। সম্পূর্ণ নিমন্ত্রণপত্রটি এখানেই প্রকাশ করা হ'লো।]

মাইকেলের সমাধিস্থলে

পরিমল চক্রবর্তী

নীরবতা, নীরবতা, চতুর্দিকে গাঢ় নীরবতা।
বিরাজিত এইখানে; একজন কবির হৃদয়
এখানে ঘুমিয়ে আছে, জীবনের সব জ্বালা ভুলে
শুয়ে আছে মাথা রেখে প্রকৃতিমাতার শান্ত কোলে।

ব্যাকুল হাওয়ার খেলা দেখে দেগে অতীতের কথা
বিদ্যুল্লেখার মতো জ্বলে ওঠে প্রাণে, স্মৃতিময়;
চতুর্দিক অন্ধকার লতা, গুল্ম, ঘাস, ফল ফুলে—
পুণ্যময় এই তীর্থে এলে মন সব গ্লানি ভোলে।

মৃত্যুর উল্লাস নেই মৃত্যুত্তীর্ণ কবির হৃদয়ে
এ-মুহূর্তে; জাগতিক ঐশ্বর্যের দাম্ভিক মহিমা
অর্থহীন মনে হয় বুঝি তাই এইখানে এলে;
পৃথিবীর ক্রূরতায়, জীবনের রণে রক্তক্ষয়ে
চিরদিন হেরে গিয়ে, কবি আজ মরণের সীমা
পার হয়ে নিদ্রাবৃত, বিষাদের স্থির শিখা জেলে।।

রেজাউল করীম

প্রাচীনকালে এমন দেশ ছিল না, যেখানে কিছু না কিছু শিল্পকার্যের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। কারণ, মানুষের আদিম প্রয়োজন মেটাবার জন্যই শিল্পকার্যের আবিষ্কার। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু স্মরণাতীত যুগে বিজ্ঞানের ততটা উন্নতি হয় নি। তাই সে যুগে প্রতিটি শিল্পকার্য হাতের সাহায্যেই করা হ'ত। অবশ্য তার মধ্যেও যে কিছুটা বিজ্ঞানী-মন ছিল না তা বলা যায় না। কিন্তু মোটামুটি-ভাবে অধিকাংশ শিল্পকার্য হাতের সাহায্যেই হ'ত। হাতের দ্বারা হ'ত বলে তার মধ্যে থাকত একটা রুচিবোধ, একটা মমতা ও শালীনতাবোধ। শিল্পী তার মন-প্রাণ ও অন্তর দিয়ে তার কাজ করে যেত। অতীতযুগের সেই সব শিল্পের যে সব নিদর্শন আজ আমরা পাই তা সত্যই বিস্ময়কর। মাটি খুঁড়ে সে যুগের বহু শিল্প উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে আমরা পাই সে যুগের মানুষের একটা পরিচয়। সভ্যতার পথে সে যুগের মানুষ কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, এই সব শিল্পের নিদর্শন তা প্রমাণ করে। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়ে কতটা উন্নতি লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রাক-বৈদিক যুগ হ'তে আরম্ভ ক'রে গুপ্তযুগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ যুগকেই প্রাচীন যুগ বলব। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈদিক যুগের পূর্বেও ভারতবর্ষে একটা উচ্চদরের সভ্যতা বিরাজিত ছিল। যে যুগকে বলা হয় মহেন-জো-দারোর যুগ। সিন্ধু উপত্যকার নানাস্থানে খনন করার ফলে সে যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি অত্যন্ত বিস্ময়কর। তা প্রমাণ করে যে, আর্যদের আগমনের পূর্বেও ভারতের সর্বত্র না হোক অন্তত একটি অঞ্চলে একটি সুসভ্য জাতির বসতি ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা যে, সে যুগের বিস্তৃত বিবরণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। আরও দুঃখের বিষয় যে, সে অঞ্চল এখন পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত। বিপুল অর্থব্যয় করে পাকিস্তানীদের সে সব অঞ্চল খনন করার আগ্রহের একান্ত অভাব। যদি কোনদিন সেসব অঞ্চলে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা হয় তবে আরও বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হ'তে পারে।

আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৈদিক যুগ আরম্ভ হয়। প্রাচীন যুগের আর্যজাতি কেবল বড় বড় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেই সময় কাটান নি। তাঁরা সংসারের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার কথাও চিন্তা করেছিলেন। তাই দেখি শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। সে যুগে সুদক্ষ শিল্পীর সংখ্যা ছিল অগণ্য। বিভিন্ন শিল্পকার্য করে তাঁরা যে উচ্চতর স্থান অধিকার করেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দেখা যায় যে, সে যুগে বহু ছোটখাট শিল্পকার্য সমাজের মেয়েরাই করত। সমসাময়িক যুগে প্রাচীন গ্রীস দেশেও মেয়েরাই এসব কাজ করত। মেয়েরা তাঁত বুনতে পারত। তাঁতের টানা-পোড়েন এই দুই কাজই মেয়েদের দ্বারা সম্পন্ন হ'ত। তারা হাতের সাহায্যে মেষের লোম দিয়ে সূতীবস্ত্র প্রস্তুত করত এবং তা দিয়ে জামা তৈরি করত। লোম দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদিকে সাদা করবার বা রঙদার করবার নিয়মও তারা জানত। মেষপালকের দেবতার নাম ছিল 'পুষণ'। তিনি আর্যদেরকে প্রচুর পশম দান করতেন। সে যুগে প্রত্যেক গ্রামে সূত্রধর ছিল। এরাই গাড়ি, শকট, রথ বা অশ্বরোপর যান-বাহন তৈরি করত। তা'ছাড়া প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল স্বর্ণকার, কুম্ভকার ইত্যাদি বৃত্তিধারী সম্প্রদায়। নানারূপ যন্ত্র, পাত্র ও অলঙ্কারের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণ হয় যে, সে যুগে কারুকার্যের কোন অভাব ছিল না, ক্ষৌরকারের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। সর্বত্র ছিল তাদের যাতায়াত, বৈদিক যুগের পূর্বেও এদের অস্তিত্ব ছিল। দাবানল দ্বারা কোন বনসম্পদ বিদগ্ধ হ'লে বনের সেই হতশ্রী অবস্থাকে বলা হ'ত যেন কোন ক্ষৌরকার তার অস্ত্র দিয়ে গোটা বনকে চেঁছে দিয়েছে। যুদ্ধের জন্য যেসব অস্ত্র প্রস্তুত হ'ত তার মধ্যে ছিল একটা শোভা ও শ্রী। সোনার শিরস্ত্রাণ দুর্ভেদ্য ঢালের অস্তিত্বের কথা সে যুগের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে।

সিন্ধু-উপত্যকার শিল্পকার্য ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরণের। মহেন-জো-দারোর আবিষ্কারের মধ্যে রূপার পাত্র পাওয়া গেছে। তামা ও ব্রোঞ্জ নির্মিত অস্ত্রাদির ফলকের ভগ্নাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে এসবের ব্যবহার হ'ত। তামার তরবারি, বল্লম, ছোরা, তীর, বাটালি এসবের নিদর্শন মহেন-জো-দারোর খননকার্য থেকে পাওয়া গেছে। সে যুগে যে সীসে ব্যবহৃত হ'ত তারও প্রমাণ আছে। আবিষ্কৃত 'গদার' মাথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধাতুর কাজ তারা জানত। যাঁতাপেষা কল, প্রস্তরনির্মিত কুম্ভকারের যন্ত্রাদি, শীলমোহর, বাটখারা প্রভৃতি সাক্ষ্যদান করে যে, মহেন-জো-দারোতে একটা উন্নত ধরণের শিল্পব্যবস্থা ছিল। সে যুগের সাধারণ লোকও জানত কেমন করে শ্বেতপ্রস্তর, নুড়ি, স্ফটিকপ্রস্তর ব্যবহার করতে হয়। তারা পাকা ঘরের মজবুত ছাদ তৈরি করতেও জানত। খননকার্য থেকে একপ্রকার দাগ দেওয়া পাথর ও স্ফটিকের প্রদীপাধার পাওয়া গেছে। সে যুগে যে বহু ঘরে তুলার কাপড় বোনা হ'ত তার প্রমাণ আছে সূতা তৈরি করবার জন্য ঘূর্ণায়মান মাকু ব্যবহৃত হ'ত। অবশ্য আর্যযুগে এসব শিল্প আরও উন্নতি লাভ করেছিল। আর্যযুগের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সে যুগে মেয়ে এবং পুরুষ তাদের অবসর মত সূতা কাটত। প্রস্তর দিয়ে তৈরি নানাপ্রকার পাত্র ব্যবহার করত। সিন্ধু-উপত্যকায়ও পাথরের ব্যবহার ছিল, সেখানকার সভ্যতা অনেকটা নগর কেন্দ্রিক ছিল। প্রাচীন দ্রাবিড়জাতিও স্থাপত্য-কার্য জানত। দ্রাবিড়দের নির্মিত বড় বড় অট্টালিকা ছিল। এমনও অট্টালিকা ছিল যার থামের সংখ্যাই ছিল এক হাজারের অধিক। ঋগ্বেদের যুগে এ ধরণের অট্টালিকার কথার উল্লেখ নেই। তবে একশ' পাথরের নির্মিত নগর অট্টালিকার উল্লেখ আছে।

সিন্ধু-উপত্যকার নানা স্থানে মৃন্ময় শিল্পের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে বহু মৃন্ময় পাত্র পাওয়া গেছে। এই সব পাত্রে লাল রঙের আবরণ ছিল। কোন কোন পাত্রে ঘনকৃষ্ণ রঙের আবরণও

ছিল। তাদের ডিজাইন বা নক্সাও অত্যন্ত সুন্দর। এসব পাত্রের মাটি নদী থেকে লওয়া হ'ত। সেই মাটিকে কিছু বালি ও চূনের সহিত মেশান হত। একটা চাকার উপর স্থাপন করে মাটিকে নানা প্রকার আকার দেওয়া হত। হাতের কাজ দেখে মনে হয় যে, পুরুষরাই এসব কাজ করত। পাত্র নির্মিত হয়ে গেলে পরে মেয়েরা তাকে মার্জিত করবার জন্য একবার তাদের কোমল হাতের পরশ বুলিয়ে দিত। তারা পাত্রকে চিত্রাঙ্কিত করত। এগুলির অলঙ্করণের জন্য মেয়েরা লাল গিরিমাটি ব্যবহার করত। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই লালমাটি পারস্য উপসাগরের নিকটস্থ হারমুজ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হ'ত। তাহলে অনুমিত হয় যে, পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের সহিত এদের যোগাযোগ ছিল।

সে যা হোক, মহেন-জো-দারোতে আবিষ্কৃত বহু মৃৎপাত্রের ঔজ্জ্বল্য এখনও মলিন হয় নি। মাটির কাজ যে খুব উন্নত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চকচকে স্বচ্ছ আঠা ব্যবহার করা হ'ত। পাত্রের শোভা বৃদ্ধির জন্য পশু-পাখির মূর্তিও আঁকা হ'ত। সে যুগে হাতির দাঁত ব্যবহার করা হ'ত। সিন্ধু-উপত্যকাতে হাতির অস্থির ও পিতলের ফুলদানিমত যেমন বহু নির্মিত হ'ত। আর্যগণ উত্তরাধিকারসূত্রে এসব লাভ করেন এবং এগুলিকে আরও উন্নত করেন।

আর্যদের যুগে জহুরী, স্বর্ণকার, মৃৎশিল্পী এসব ত' ছিলই, তদুপরি আরও নানাপ্রকার শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। বৈদিক যুগে কৃষিকার্য বেশ উন্নত ছিল। কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুটকি বা শুকনা মাছ বিক্রিত হত। পেশাদার ব্যক্তিরা নিজেদের কসরৎ দেখিয়ে দু' পয়সা রোজগার করত। সে যুগে জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে। তার ফলে নিজের বিদ্যার সাহায্যে এক শ্রেণীর লোক বেশ উপার্জন করত। তারা মানুষকে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারত। জ্যোতির্বিদ্যার বিজ্ঞানের দিকটাও আর্যগণ বিশেষভাবে চর্চা করতেন। বেদের যুগে ঔষধ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা ছিল। ঔষধ প্রস্তুতকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হ'ত। আবার অপর দিকে মন্ত্রপাঠদ্বারাও রোগ দূর করার ব্যবসায়ও চলত।

বৈদিক যুগ থেকে ভারতে ভাস্কর্য বা খোদাই কাজ প্রচলিত ছিল। এসব শিল্পকলা তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা পরিচয় প্রদান করে। তবে বৈদিক যুগের পর এগুলি সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আর্যগণের মধ্যে যে রীতিমতভাবে সঙ্গীত চর্চা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সঙ্গীতের জন্য ব্যবহৃত বহু যন্ত্র প্রমাণ করে যে, সে যুগে সঙ্গীত চর্চা ছিল একটা নিত্য কাজের ব্যাপার। বাঁশী, বায়ুদের শাঁখ, বীণা, গিটার, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, তানপুরা এসব বিভিন্ন সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হ'ত। তা'ছাড়া করতাল, তবলা, ঘটা এসবেরও ব্যবহার ছিল। সে যুগের মানুষের গৃহের আসবাব দেখলে মনে হয় যে তাতেও আর্যদের বেশ একটা রুচি বোধ ছিল। অমরাবতীতে যে সব খোদাই করা কাজের নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে সোফা, মোড়া, চেয়ার বেঞ্চ প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে একপায়া বিশিষ্ট ছোট ছোট টেবিলের চিহ্ন আছে। সাঁচীতে একটা রান্নাঘরের দৃশ্য আছে। তাতে দেখা যায় একটা বাসনকরা পাখা কাঠে হামানদিস্তা উদুখলের দণ্ড, রুল, তরকারী কোটা পাথর, পিটুলি তৈরি করার একটা টেবিল।

প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষে নানা প্রকার চর্মশিল্প গড়ে উঠেছিল। চামড়ার বোতলের কথা উল্লিখিত আছে। তাতে জল সংগ্রহ করা হ'ত। চামড়া দিয়ে ধনুকের ছিলা তৈরি হত। হস্তবন্ধনী, রথের বিভিন্ন অংশকে বাঁধবার জন্য চামড়ার দড়ি ছিল। লাগাম, চাবুক, থলে এসব চামড়া দিয়ে তৈরি হ'ত। চামড়াকে 'ট্যান' করার রীতি জানা ছিল। নানা প্রকার বৃত্তিধারী লোক ছিল, তার মধ্যে মুচি, ধোপা, ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, অগ্নিরক্ষক কর্মচারী, পদাতিক, সংবাদবাহী ভৃত্য, রঙকর, ধাতুগালাইকারী, ধীবর এসব সমাজের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করত। তারা নিজের নিজের বৃত্তি অনুসারে কাজ করত। নিজেদের শক্তি অনুসারে প্রতিযোগিতা করত। নিজ নিজ কাজে উন্নতি লাভ করবার জন্য চেষ্টিত হ'ত। ফলে দিন দিন উন্নত ধরণের জিনিষপত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হ'ত। এ কথা সত্য যে, সে যুগে বড় বড় ফ্যাক্টরী বা কারখানা ছিল না। মানুষ ব্যস্ত থাকত তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও উৎপাদন করতে। সেই আদিম যুগ থেকেই তাঁদের কাজ চলে আসছিল, বৈদিক যুগের শেষের দিকে তাঁদের সবিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বস্তুত ভারতের কুটিরশিল্প যে পরে পৃথিবীময় খ্যাতি অর্জন করেছিল তার গোড়ার পত্তন আরম্ভ হয় এই যুগে।

উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে জৈন ও বৌদ্ধযুগের উন্নতির যুগে। স্থাপত্য-শিল্পের গোড়ার পত্তন হয় বহু পূর্বে। কিন্তু এই দুই যুগে এই শিল্প চরম বিকাশ লাভ করে। তার নিদর্শন ভারতের নানা স্থানে আজও পাওয়া যাবে। উড়িষ্যার পাহাড়ে খোদাই করা যে সব অপরূপ নিদর্শন আজ দেখতে পাওয়া যায় তা বৌদ্ধযুগের বলে অনুমিত হয়। নবম খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপত্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। জৈনমন্দিরের গম্বুজবিশিষ্ট ছাদগুলি এই যুগের গৌরবের অনুপম নিদর্শন। এর কাজগুলি সুন্দরভাবে খোদাই করা হয়েছে। ঊর্ধ্ব মিনারে আছে প্রচুর অলঙ্করণ।

মৌর্যযুগে ভারতের সহিত বহির্বিশ্বের আদান-প্রদান চরম সীমায় উপনীত হয়। এর পূর্বেও আদান-প্রদান ছিল। কিন্তু মৌর্যযুগের জন্য বিশেষ ভাবে খ্যাতি অর্জন করে। তার ফলে এদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি হতে লাগল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত অবিচ্ছেদে জড়িত আছে শ্রমিক-সমস্যা। সে যুগে শ্রমিকদের ও কারিগরদের স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি 'গিল্ড' বা কারিগর সংস্থা ছিল। মধ্যযুগে লণ্ডন শহরে যেমন কর্মীদের সমাজ ছিল এগুলিও ছিল কতকটা সেই ধরণের। এক একটা শিল্পের নেতৃত্ব করত কতকগুলি লোক। পৌরাণিক-যুগে পশম ও কার্পাস নির্মিত সুন্দর সুন্দর বস্ত্রবয়ন হ'ত। রেশম শিল্পেরও প্রচলন ছিল। বণিক-গোষ্ঠীর পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম ছিল। যেসব বণিক লাভের জন্য কারবার করত, তাদের লাভ-লোকসানের হিসাব, কারবারে শেয়ার বা অংশ অনুসারে নির্ধারিত হ'ত। অথবা প্রথম থেকে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ত তদনুসারে। ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ব্যবস্থা ছিল। তিনি জিনিষপত্রের বণ্টন ও মূল্যনির্ধারণ করতেন। সে যুগে সুদূর এশিয়া মাইনর থেকেও চামড়া আমদানী করা হ'ত। আর চীনদেশ থেকে আসত রেশম। অবশ্য পরে এ দেশেই রেশমের চাষ আরম্ভ হয়। প্রতি নগরের

তোরণদ্বারে একজন করে শুল্ক-অফিসার থাকতেন। তিনি দ্রব্যাদির আমদানীকে উৎসাহ দিতেন। ধর্মের কাজে ব্যবহৃত বস্তুর উপর কোন শুল্ক ধার্য হ'ত না। মফস্বল থেকে মালপত্র নগরে আমদানী হ'লে নগর-শুল্ক আদায় করা হ'ত। তার পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাজাকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, মুনাফাখোরদের হাত থেকে দেশকে সর্বদাই রক্ষা করতে হবে। রাজা নিজেই একজন বাণিজ্যপতি। তাঁর বড় বড় গুদামঘর আছে। বন্দীখানাতে বন্দীরা যে সব কাজ করত তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এইসব রাজকীয় গুদামঘরে সঞ্চিত থাকত। জঙ্গলে, কারখানাতে রাজার পক্ষ থেকে বহু কাজ হ'ত। সেসব উৎপন্ন দ্রব্য রাজার গুদামঘরে সঞ্চিত হ'ত।

মৌর্যযুগে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও ঘনীভূত হয়। তার ফলে ভারতের শিল্পকলারও সবিশেষ উন্নতি হ'তে লাগল। এই যুগের তৈরিকোটা শিল্প বা পোড়ামাটির কাজ এর অতীত যুগ থেকে বহুলাংশে উন্নত হয়। এই যুগে ভারতে চীনামাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত হতে থাকে পোড়া ইট ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। সম্রাট অশোকের সময় বড় বড় মনুমেণ্ট বা কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। বৌদ্ধ চৈত্যেরও নির্মাণকৌশল আরও উন্নত। এসব তৈরি হ'ত পাহাড়ের শক্ত পাথর কেটে। পোড়া ইটের বহু অট্টালিকার নিদর্শন আছে। মিহি চুন ও পাথর দিয়ে তৈরি বহু স্তম্ভ ছিল। তা যেমন বিশাল তেমনি সরল ও সহজ আর্টের পরিচায়ক। এর পর থেকে অট্টালিকা নির্মাণের জন্য প্রস্তর ব্যবহার হ'তে থাকে। তার নিদর্শন সারনাথ ও বুদ্ধগয়াতে পাওয়া যাবে।

বেদোত্তর যুগের পর পেশা ও বৃত্তিমূলক কাজ বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেশের নানা অঞ্চলে ছোট বড় রাজ্য স্থাপিত হ'তে লাগল। কতকগুলি ছিল নগর-রাষ্ট্র তার ফলে বহু লোক সরকারী বিভাগে চাকরীতে নিযুক্ত হ'ল। সেখানে কর্মচারিগণ দু'রকমভাবে বেতন পেত—কেউ কেউ পেত নগদ টাকা; আবার কেউ পেত টাকার বদলে ভূমি জায়গীর অথবা খাদ্য। কর্মকার, কুম্ভকার, রজক, কলু, দরজী, এসবের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'তে লাগল। এদের জীবিকার জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হ'ত না। কারণ এদের প্রয়োজন সর্বত্র ছিল। বেত ও বাঁশের কাজের দ্বারা অনেকের জীবিকা-নির্বাহ হ'ত। পশু-পাখী শিকার ক'রে বহুলোক রোজগার করে ভরণ-পোষণের সংস্থান করত। চামড়ার কাজ করত বহু লোক। আরও বহু লোক ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করত। ছোট-খাট নানা প্রকার ব্যবসায় করত। সে যুগে ধৌতকার্যের সহায়ক এক প্রকার কল আবিষ্কৃত হয়েছিল। তা দিয়ে গালিচা ইত্যাদি পরিষ্কার করা হ'ত। সূতী কাপড় পরিষ্কার করবার জন্য সরষে বা রাই ব্যবহার করা হ'ত। তেল-ব্যবসায়িগণ নিজেরাই এক প্রকার পেষণযন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। রজকগণ কাপড় পরিষ্কার করার আর্ট জানত। তারা তুলার বীজ থেকে সূতা তৈরি করত। রেশম ও সরু সূতাও প্রস্তুত হ'ত।

বৌদ্ধযুগের যে সব চিহ্ন আজিও বিদ্যমান আছে, তার মধ্যে অশোকস্তম্ভগুলি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। মহারাজ অশোকের স্তম্ভগুলি এক বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ কাজ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের সময়েও এসব স্তম্ভগুলি খাড়ারেখায় দাঁড়িয়েছিল। এসব দৃশ্য দেখে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যে, অলৌকিক সাহায্য ব্যতীত কোন মানুষই এসব নির্মাণ করতে পারে না। তাঁর মতে রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ করবার সময় অশোক কোন অশরীরী আত্মার সাহায্য গ্রহণ করেন। এই প্রাসাদের দরজা, প্রাচীর এবং নক্সা মানুষের কাজ নয়। তিনি অতঃপর দুঃখ করে বলেছেন যে, এই বিরাট কীর্তি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। লুম্বিনী উদ্যানে যেখানে মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, তার সৌন্দর্যও অবর্ণনীয়। সেটা প্রত্যেক বৌদ্ধের নিকট পবিত্র স্থান। অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর ওই স্থান দর্শন করেন। অশোক সেই পবিত্র স্থানে একটি কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য আদেশ দেন। এই স্তম্ভ আজিও বিদ্যমান আছে। তাতে অশোকের শুভ্র কথাও খোদিত আছে। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তুতে, সারনাথে যেখানে তিনি প্রথম প্রচার করেন এবং বুদ্ধগয়াতে যেখানে তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন—এই সব পবিত্র স্থান স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নের দ্বারা অমর হয়ে রয়েছে। উজ্জয়িনীর নিকট সাঁচীস্তূপে যে সব চিহ্ন আজিও বিদ্যমান আছে তা সে যুগের গৌরব ঘোষণা করছে। মিঃ ফারগাসন (Fergusson) এই স্তূপের তোরণদ্বারের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

এই সব ফটকের স্থাপত্য শিল্পে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাগুলি ছবির মধ্যে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব নির্মিত হয়েছিল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে।

ভাস্কর্য ও মন্দিরের গৌরবে দক্ষিণ ভারতেরও একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে। এসব এত সুন্দর যে, আজও তা দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। কতকাল পূর্বে এসব নির্মিত হয়েছিল। সে যুগের মহামানুষগণ নির্মল ধর্মভাবে বিভোর হয়ে এই সব বিরাট কীর্তি নির্মাণ করেন। আজকার যুগের মানুষ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে তাঁদের কথা স্মরণ করে। পল্লব রাজাগণ সমুদ্রতীরে মহাবলী পুরমের যে মন্দির নির্মাণ করেন, তা সত্যই অপূর্ব। পাথরের উপর এমন সুন্দর কাজ অন্য কোথাও দেখা যায় না। দক্ষিণ প্রদেশে অন্য অঞ্চলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ দূরবর্তী পাহাড়ে তাঁদের মঠ নির্মাণ করেছেন। সেখানে পাথর কেটে সুন্দর সুন্দর বিহার ও চৈত্য তৈরি করা হয়েছে। শিল্পের দিক দিয়ে সেগুলি অমূল্য। দক্ষিণ ভারতের আরও নানা স্থানে প্রাচীন যুগের বহু স্থাপত্যের নিদর্শন আছে। তাদের বিরাট মহান রূপ এযুগের মানুষকেও মোহিত করে। প্রত্যেক শিল্পের পশ্চাতে থাকা চাই একটা মহান আদর্শ। সে যুগ ছিল ধর্মপ্রাণতা। এই ধর্মপ্রাণতাই রাজা, সন্ন্যাসী ও সাধারণ লোককে দিয়েছিল একটা উন্মাদনা। সেই উন্মাদনা ছিল বলেই তাঁরা এত বিরাট ও বিশাল কীর্তি রেখে গেছেন। সেই উন্মাদনাই তাঁদেরকে সত্যকারের শিল্পী করতে পেরেছে। দেবতার ধ্যান মানুষকে দেয় সন্তোষ তাকে স্বর্গে নিয়ে যায়। প্রাচীনযুগের মানুষ স্বর্গের সাধনা করতেন বলেই তাঁরা মহত্তাও বিরাট কীর্তি রেখে গেছেন। এযুগের জড়বাদী মানুষ তাঁদের যুগের মন নিয়ে এসব যদি না দেখে তবে সে সব সুন্দর জিনিষের উৎস খুঁজে পাবে না।

কান্তকবির ৫৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
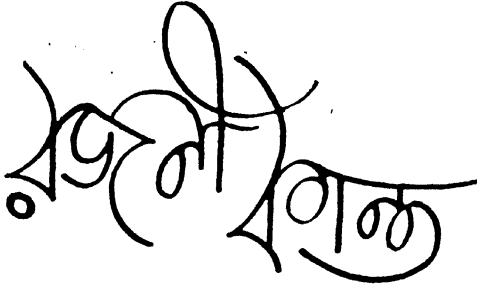
রবীন্দ্রনাথ একদিন যাঁর মধ্যে 'মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ' লক্ষ্য করে অভিভূত হয়েছিলেন, সেই কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের তিরোধান দিবস উপলক্ষে এই কথাই বার বার মনে হচ্ছে যে, এমন কান্তমধুর সুরও আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। একাধারে কবি ও সুরশিল্পী রজনীকান্ত যে সুললিত কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন এবং তাঁর মোহিনী সুরের মন্দাকিনী ধারায় বাংলা দেশকে যে ভাবে প্লাবিত করেছিলেন, তা স্মরণে রাখার মত নিদর্শন আমরা কতটুকুই বা সঞ্চয় করে রেখেছি। রজনীকান্তের অমূল্য দান আমরা হেলায় নষ্ট করেছি। তাঁর দু'চারটি সঙ্গীত হয়ত আজ অনেরা নাড়াচাড়া করছি, কিন্তু সেগুলির রচয়িতা যে কান্তকবি রজনীকান্ত তা'ও যেন আমরা ভুলতে বসেছি।

সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার পরিচয়। কিন্তু কান্তকবির ক্ষেত্রে হৃদয়ের গভীরতম উৎস থেকে উৎসারিত এমন ঐকান্তিক বিশ্বাসের বাণীও আমাদের কাছে কতটুকু মর্যাদা পেয়েছে? অথচ আজকের এই সঙ্কটকালে 'নাগিনীরা যখন চারিদিকে বিষাক্ত নিশ্বাস' ফেলছে, হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে পরস্পর হানাহানি এবং সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্যে মানুষ যখন দিশেহারা, নিত্য দ্বন্দ্বে সে যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন কান্তকবির এই বিশ্বাসের বাণী কত না সান্ত্বনা আনতে পারত আমাদের মনে।

উনবিংশ শতাব্দীতে একাধারে কবি, গীতিকার ও সুরকার রূপে যে কয়টি প্রতিভা গাঙ্গেয় বাংলার সরস পলিমাটিকে সঙ্গীতের বন্যায় আরও রসসিক্ত করে তুলেছিলেন, বাঙালীর কোমল প্রাণে ভক্তির সুরধুনী বইয়ে দিয়েছিলেন, আর তাদের অন্তরে স্বদেশ-চেতনার উদ্বোধন করেছিলেন, কান্তকবি রজনীকান্ত তাঁদেরই একজন। তাই অলোকসামান্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে রজনীকান্তের নাম। কিন্তু উপযুক্ত আলোচনার অভাবে আজ রজনীকান্তের মত মরমী কবি ও সুরস্রষ্টা বাঙালীর অন্তর থেকে অন্তর্হিত হতে চলেছে। তাই তাঁর এই মৃত্যুতিথি উপলক্ষে কান্তকবির কবিতা ও কবিপ্রতিভার বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এতে শুধু তাঁকে স্মরণ করাই হবে না, এতে ঘটবে আত্মোপলব্ধির উন্মেষ।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই রজনীকান্তের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন মুন্সেফ। রজনীকান্তের জন্ম পাবনায় হলেও তিনি রাজসাহীর কবি বলেই পরিচিত। তাঁর জ্যেঠামশাই ছিলেন রাজসাহীর প্রখ্যাত উকিল। কালক্রমে কবিও রাজসাহীকেই ভালবেসে ফেললেন। রাজসাহী কলেজে থেকেই কবি এফ-এ পাশ করেছিলেন। তারপর সিটি কলেজ থেকে বি-এ ও বি-এল পাশ করেন। তিনি ওকালতি শুরু করেন রাজসাহী শহরেই।

ওকালতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তাঁর সাহিত্য সাধনা। বস্তুত ওকালতি ব্যবসায়কে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। শৈশব থেকেই সাহিত্যের প্রতি, কবিতার প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। ক্রমে কবিতা ও গান রচনা হয়ে উঠল তাঁর জীবনের চরম আনন্দ। রাজসাহীতে তিনি পেলেন নিদারুণ জনপ্রিয়তা। কান্তকবির অনুপস্থিতিতে রাজসাহীর সভা-সমিতি, উৎসব-অনুষ্ঠান অর্ধেক জৌলুষ হারিয়ে ফেলত।

এমনি ভাবে কবিতা রচনা করে, গান গেয়ে এখানকার দিনগুলি আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে কান্তকবি ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রায় দেড় বছর ক্যান্সার রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করবার পর তাঁর এই প্রাণের 'উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা' পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর বাঁশীর মরমী মোহিনী সুর চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

কবির মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর তিনখানি কাব্যগ্রন্থ: 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫) এবং 'অমৃত' (১৯১০)। মৃত্যুর পরে তাঁর আরও পাঁচখানি কাব্য মুদ্রিত হয়: 'আনন্দময়ী', 'বিশ্রাম', 'অভয়া', 'সদ্ভাব-কুসুম' ও 'শেষ দান'।

কান্তকবি রজনীকান্ত যে সমস্ত কবিতা রচনা করে গেছেন তার অধিকাংশই গীতিকবিতা ও গান। তাঁর দেহের প্রতি অণুতে ছিল সঙ্গীত।

তাঁর 'বাণী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় ঐতিহাসিক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছিলেন: 'কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সঙ্গীত।'

তাঁর কবিতা বা সঙ্গীতগুলিকে স্পষ্টতই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—ভক্তি সঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত আর হাস্যরসাশ্রিত সঙ্গীত। তবে তিনি প্রধানত ভক্তি সঙ্গীতের কবি। তাঁর কবিপ্রতিভার প্রকৃত স্ফুরণ ও পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় ভক্তি সঙ্গীতের মধ্যে। ভক্তিমূলক গানে তিনি তদানীন্তন বাংলা দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের দিনে যখন অবিশ্বাসের বিষে মানুষের মন জর্জরিত, দ্বিধায় আন্দোলিত মানুষের মন, যখন আঁকড়ে ধরার মত নিশ্চিত আশ্রয় পাচ্ছে না, তখন রজনীকান্তের ভক্তিমূলক গানগুলির নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

কান্তকবির ভক্তি সঙ্গীতগুলির মধ্যে কবির ভক্তিমার্গে উত্তরণের অতি সুন্দর একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। কবি বাংলার ভক্তিসাধনার

প্রাচীন ধারা অনুসরণ করেই ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথ খুঁজেছিলেন।

ভগবানে নিবেদিত প্রাণ না হলে ভক্তিমার্গের বন্ধুর পথে চলা দুরূহ। কান্তকবি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন। নিজেকে তিনি 'সেই নিখিল-পরমবন্ধুর' মধ্যে লীন করে দিয়েছিলেন। আর এটুকু সম্ভব হয়েছিল তাঁর সুগভীর বিশ্বাসের ফলেই।

কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস একদিনেই আসে নি। ভক্তিতে স্থির নিশ্চয় হয়েছেন তিনি ধীরে ধীরে।

ভক্তিমার্গে চলতে গিয়ে প্রথমদিকে কবির মনে অবিশ্বাস জেগেছে। কবির নিজের কথাতেই শোনা যাক :

যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ
অবিশ্বাস ঘনমেঘে ;
বহিল প্রবল পাপ-পবন ;
ডুবাইল ঘোর অন্ধতিমিরে।

স্বাভাবিকভাবেই এসেছে সংশয়—

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

এমন কি উত্তরজীবনে যখন তিনি বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত তখনও তিনি প্রথম জীবনের সংশয়ের কথা স্বীকার করেছেন—

লোকে বলিত তুমি আছ,
ভেবে দেখি নি আছ কি না,
তখন আমি বুঝি নি, প্রভু,
নাস্তি গতি তোমা বিনা।

কিন্তু এই সংশয় কবির মনে সম্পূর্ণ নৈরাশ্য আনে নি। সংশয় থেকে তাঁর মনে ধীরে ধীরে জাগছে প্রত্যয়ের আলো। তখন তাঁর গানে প্রত্যয়ের আভাস :

আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,
আছে মাত্র একজন, চিরবন্ধু দুখে-সুখে ;
বিপন্নের ত্রাণকর্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,
পাপপথে পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের বাসা ;
কাঁদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ-করে,
(আজি) সেই যদি করে গো উদ্ধার !

তবে ঈশ্বর সম্পর্কে কবি তখনও একেবারে সুনিশ্চিত হন নি। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা তখনও তাঁর ঘটে নি। তাই কবির মুখে শুনি :

ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।

ক্রমে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কবি স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন। তিনি জেনেছেন তাঁরই 'কাছে আছে শান্তি-সুখ-সুধা।' তখন অবিচল বিশ্বাসে তিনি বলতে পেরেছেন :

আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপীলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে।

কবির মন থেকে সংশয়জাত নৈরাশ্য ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে ঈশ্বরে জেগেছে আস্থা, করুণাময়ের করুণায় এসেছে অগাধ বিশ্বাস। তাই তাঁর কণ্ঠে জেগেছে আশার বাণী, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, নবজীবনের গান :

ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি,' ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
... ...
জাগাও বিশ্বপুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে ভক্তি। ভক্তি ও বিশ্বাস তখন একাকার হয়ে গেছে। বস্তুত ভক্তি আর বিশ্বাস ভগবদ সাধনায় একই সোপানের দুই পিঠ। কান্তকবির মধ্যে এ দু'য়ের সার্থক মিলন দেখি :

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

ক্রমে ভক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে কবি এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছেন যেখানে তিনি ঈশ্বরকে অতি আপনজন বলে মনে করেছেন, সখা বলে আপন বুকে টেনে নিয়েছেন ; আবার করুণাময় ভগবানও কবির নিজের সৃষ্ট বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য কবিকে বুকে করে রেখেছেন। কবির শত অপরাধ ক্ষমা করে করুণাময় তাঁর অজস্র করুণা বর্ষণ করেছেন কবির শিরে।

(তব) আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে ;
তবু দয়া ক'রে কেবলই দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাও নি।

কবি আরও বলেছেন :

আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র !
তবু, তুমি মোরে ভালবাস··

ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁর কোনদিন ম্লান হয় নি কারণ ঐ ভক্তির মূল নিহিত ছিল তাঁর জীবনের অতি গভীরে। তাঁর এই ভক্তি কোনদিন কোন কারণেই শিথিল হতে পারে নি।

একদিকে মানব-প্রেম, অন্যদিকে ভগবদ্-প্রেম—এ দু'টি রজনীকান্তের কাব্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাঁর ভগবদ-প্রেমের উৎস হল মানুষের প্রতি তাঁর প্রীতি। মোহ ও অহমিকামুক্ত না হলে মানুষকে ভালবাসা যায় না, এ উপলব্ধি তাঁর অন্তরে ছিল সুদৃঢ়। আর তাঁর অন্তরে এ বোধও ছিল সুগভীর যে, মানুষকে ভালবাসার সোপান অতিক্রম করতে না পারলে ভগবদ-প্রেমের সিংহদ্বারে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ রূপের মধ্যে দিয়েই অরূপে পৌঁছুতে হয়।

মোহমুক্ত হওয়ার সাধনায় কবি যখনই গেয়ে উঠলেন :

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক, মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।

তখনই বুঝতে পারি তাঁর ভগবৎ উপলব্ধি কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল।

আবার যখন তিনি গেয়ে ওঠেন :

তব, শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।

তখন দেখি তাঁর মধ্যে মোহমুক্ত আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা।

মোহমুক্ত না হতে পারলে যেমন মানুষকে ভালবাসা যায় না, মানুষের সঙ্গে একাত্মতা জন্মায় না, তেমনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভও সম্ভব হয় না। তাই কবির আকুল প্রার্থনা বার বার :

কবে তোমাতে হয়ে যাব,
আমার আমি-হারা।

তারপর মোহমুক্ত হয়ে উত্তরকালের উপলব্ধিতে কবি বলতে পেরেছেন :

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।

রজনীকান্তের কবিতা ও গীতাবলীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতির সরল ও অকপট প্রকাশ। তাঁর কোমলকান্ত কবিতারাজি এক অভিনব শান্তরসে সিঞ্চিত।

কান্তকবির ভগবৎ নির্ভরতা ও অনন্তলীলাময়ের চরণে আত্মনিবেদনের সঙ্গীতগুলি অন্তরকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় তাদের সহজ আবেদনের জন্য। যখন তাঁর গান শুনি :

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে

তখন তাঁর সুগভীর ঈশ্বরোপলব্ধিতে মন আপ্লুত হয়। এই পর্যায়ে মৃত্যুকেও 'রসাল নন্দন' বলে চিন্তা করতে মনে কোন দ্বিধা আসে না। কিন্তু এই নিগূঢ় তত্ত্বের প্রকাশও কত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

আপন হৃদয়ের সুদৃঢ় অনুভূতিকে ও প্রগাঢ় ভগবদ্বিশ্বাসকে তিনি এমন স্বচ্ছ, নির্মল ও অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করেছেন যা অতি সহজেই মর্মস্থলে গিয়ে প্রবেশ করে। এ ক্ষমতা সত্যই দুর্লভ।

অন্যভাবে বলা যায়, স্রষ্টাকে তিনি আপন হৃদয়ের গভীরে একান্ত আপনার ক'রে অনুভব করেছিলেন বলেই এমন সহজ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। সেই গভীর অনুভূতির ফলেই সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন স্রষ্টাকে। সেই অনুভূতিরই সহজ-স্বচ্ছ প্রকাশ তাঁর কবিতার ছত্রে :

তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন প্রভাময়!

যুগের দাবি আর স্বীয় অন্তরের দাবিকে অস্বীকার করতে পারেন নি রজনীকান্ত। তাই সেই জাতীয় আন্দোলনের যুগে তাঁর কলমে স্বদেশী সঙ্গীতও ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

কান্তকবির স্বদেশী সঙ্গীতের গোড়াপত্তন হয়েছিল দেশমাতৃকার বন্দনায় :

জয় জয়, জন্মভূমি জননী,
যাঁর স্তন্য সুধাময়, শোণিত ধমনী,
কীর্ত গীতিজিত, স্তম্ভিত অবনত
মুগ্ধ লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী।

নিজের দেশকে এমন করে ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। বাংলা দেশে যখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ এল কান্তকবির যশোসূর্য তখন মধ্যগগনে। এই সময়ে লেখা তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতগুলি আপামর সাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর সেই চিরবিখ্যাত গান :

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে'রে ভাই
দীন-দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই—

তাঁকে আমাদের অতি প্রিয় 'কান্তকবি' নামে পরিচিত করেছে।

১৯০৫ সালের সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কবির চিত্ত নিদারুণ ব্যথিত হল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। দেশমাতৃকার আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি নেমে এলেন পথের ধূলোয়। রাজসাহী শহরের তথা সমগ্র বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে উঠল তাঁর স্বদেশী গানের পাগল-করা সুরে। আমাদের সামর্থ্য ক্ষুদ্র সম্বল সীমিত, কিন্তু তবুও আমাদের সম্মিলিত শক্তি সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ চূর্ণ করবে। সেই শক্তিরই উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন কবি তাঁর প্রাণমাতানো গানে :

নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোট,
তবু আছি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠ।

হাসির গানেও কান্তকবির জুড়ি নেই। তাঁর কতকগুলি গানে যেমন নির্মল-বিশুদ্ধ হাস্যরসের নিদর্শন আছে, তেমনি কতকগুলিতে আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সেই অতিপরিচিত গান :

যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত পানতোয়া শত শত,
আর সরষের মত হত মিহিদানা বুঁদিয়া বুটের মত।

অথবা, তাঁর 'তামাক প্রশস্তি' সরল হাস্যরসের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কান্তকবির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের গানগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব খুব স্পষ্ট।

মূলত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব থাকলেও কান্তকবির হাসির গানে যেন অশ্রুর আভাস। জীবনের পরিণামের কথা চিন্তা ক'রে নিতান্ত বাস্তব এক জীবনদর্শন জেগেছে কবির মনে। শেষের সে দিন যখন আসবে, তখন :

বসবে ঘিরে মাগ-ছেলে ;
বলবে, 'ব'লে যাও গো, কোন্ সিন্দুকে
কি রেখে গেলে।'

হাস্যরসাত্মক বাক্যের ও ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটলেও এর মধ্যে সংসার-জীবনের এক করুণ ব্যর্থতার সুর বেজে উঠেছে।

কান্তকবির সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার বর্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। হৃদয়ের সুধারস নিঙড়ানো সুগভীর প্রত্যয়মূলক বক্তব্য সঙ্গীতের রচয়িতা সম্পর্কে আমরা যে অত্যন্ত উদাসীন সে বিষয়ে নিজেদের সচেতন করে তোলার চেষ্টাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

W. B. N. V. F.

॥ পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ॥

(ডব্লিউ, বি, এন, ভি, এফ)

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

বিশেষ করে রাজনীতিক কারণে একটি কথা বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়—বাঙালী কর্মী বা শ্রমবিমুখ। দেশের আপৎকালীন বা জরুরী অবস্থায়ও যখন বাঙালী হটে আছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর বহুমুখী কর্মপ্রতিভার প্রতি দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ নিবন্ধ। জীবন-যজ্ঞের বহুক্ষেত্রে বাঙালীর তিতিক্ষা, কর্মনিষ্ঠা ও সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির যে আদর্শবাদ এ বাহিনী দেশের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তা বহুক্ষেত্রেই অপরিজ্ঞাত—অবহেলিতও বটে। এ বাহিনীর ঐতিহ্যের মূলেও অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা আর উজ্জ্বল আদর্শ সৃষ্টির প্রয়াস। শ্রমবিমুখ বাঙালীর কলঙ্ক দূর করার মানসে প্রবীণ ও অনলস কর্মী শ্রীভূপতি মজুমদার একটি আশার স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বা ভূতপূর্ব কিছু সংখ্যক সামরিক কর্মী ও কর্মচারী নিয়ে গঠন করলেন বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদল বা বি জে আর ডি। অন্তরে মহান উদ্দেশ্য—বাঙালীদের সামরিক শিক্ষাদান ও সীমানা রক্ষার জন্য রক্ষীদল তৈরি করা।

কিন্তু ব্যাপার তো সহজ নয়? ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, সাজ সরঞ্জাম নেই, নেই কোনো হাতিয়ার—তদুপরি অর্থাভাব। কলকাতা থেকে প্রায় ৪১ কিলোমিটার দূরে কল্যাণী সংলগ্ন চান্দামারী গ্রামে এর প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আর্থিক দৈন্য থেকেই যায়। কাগজ পত্র নেই—দেয়ালের গায়েই হিসেব লিখো। এমনি করে কাজ এগিয়ে চলে। মহৎ প্রচেষ্টা—মহান ব্যক্তির দৃষ্টি এড়ায় না। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্রের দৃষ্টি এ দেশাত্মবোধক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি মুগ্ধ হন। উপলব্ধি করেন—স্বাধীন দেশের সরকারের এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। তা ছাড়া সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এ কাজ চলতে পারে না। ১৯৪৯ সালে একটি আইন পাশ করে সরকার কর্তৃক এর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কল্যাণীতে এর প্রথম কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এরপর শুধু অগ্রগতির ইতিহাস। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শিবির পর পর স্থাপিত হয় হাসিমারা, কুচবিহার ও কার্শিয়াং-এ। জেলা থেকে লোক নিযুক্ত হয় এ বাহিনীর জন্য। ৭৫ দিনে এদের যে শিক্ষা দেয়া হয় তা হচ্ছে—বুনিয়াদী সমর শিক্ষা। বৎসরে ৪টি শিক্ষা সেশন বা শিক্ষা-বর্ষ। বেশির ভাগ লোক আসে গ্রাম থেকে—আর কলকাতা থেকে। জরুরী অবস্থার প্রতি পর্যায় শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। হাসিমারায় বর্তমান শিক্ষার্থী নেয়া হচ্ছে ৫৫০, কল্যাণীতে ৫০০, কুচবিহার ও কার্শিয়াং কেন্দ্রে ১০০ শত জন করে। অবস্থা অনুযায়ী এ সংখ্যার ব্যতিক্রম হয়। শিক্ষা শিবিরে ভর্তি হওয়ার নিয়মে বিশেষ কঠোরতা নেই। যেটুকু আছে তা শুধু শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য।

বয়েস পনের বৎসরের কম হলে চলবে না। ছাত্রদের ক্ষেত্রে আঠারো। শারীরিক যোগ্যতা কিছুটা চাই—নইলে সামরিক শিক্ষা সম্ভব নয়। একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশেষ প্রয়োজন নেই। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলেই ভাল হয়। শিক্ষা-শিবিরে কি কি শিক্ষা দেওয়া হয়? সেটা বলার চেয়ে বোধ হয় এই বলাই সহজসাধ্য যে, কি শিক্ষা দেওয়া না হয়? যে শিক্ষা আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সামরিক শিক্ষার শুরুতে তাদের সেই মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া হয়—নিজের দেশকে জানো—দেশাত্মবোধের অমৃতবাণী। নিজের দেশকে জানার শিক্ষার সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে শেখানো হয়—দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত ও গৌরবময় ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান। এ শিক্ষা থেকেই স্বেচ্ছাসেবিগণ দেশসেবার সর্বকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ভাবতে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় জাগে, মাটি কাটার কাজ থেকে শুরু করে নিরক্ষর স্বেচ্ছাসেবী শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নই হন নি। এর বহুল দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ করে অনেক স্বেচ্ছাসেবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করে আজ গেজেটেড অফিসার।

বাঙালীর এ গর্বময় সাধনার কাহিনী দেশবাসীর কাছে অপরিজ্ঞাত। শিক্ষা-শিবিরের পরিবেশও মনোরম। নিত্যকার শিক্ষাসূচীতে রয়েছে স্নানাগার ও বিশ্রাম সময় ব্যতীত সমস্ত দিনের কর্মতৎপরতা। শরীর চর্চা, ড্রিল, প্যারেড, কুচকাওয়াজ, মৌখিক ক্লাস, রাইফেল, বেয়নেট

পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর একটি উত্তরণ কুচকাওয়াজ।

ট্রেনিং তা ছাড়া সামাজিক উন্নতিমূলক শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষার্থিগণ মাটি কাটেন, বাগান বা ঘর তৈরি করেন, সাঁকো বাঁধা থেকে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ শেখেন; তা ছাড়া দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার কাজ হাতে কলমে শেখেন। এ সময়ে থাকা, খাওয়া, শয্যা, পোশাক থেকে শুরু করে সমস্ত ঔষধপত্র বা চিকিৎসার ব্যয়ভার কর্তৃপক্ষ বহন করেন এবং কিছু নগদ অর্থ দৈনিক হাত খরচ বাবদ দেওয়া হয়। প্রতি শিক্ষা সেসান অন্তে একটি মনোজ্ঞ উত্তরণ কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান হয়, তৎপর শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অনেককে বিশেষ কর্মকুশলতার জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের অফিসারগণ এই স্বেচ্ছাসেবীদের কুচকাওয়াজ দর্শনান্তে মুগ্ধ হয়েছেন, বলেছেন—এই স্বল্প-সময়কালীন শিক্ষার কুচকাওয়াজ সামরিক শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জনৈক অফিসার প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধ লেখকের নিকট এই মন্তব্য করেছেন যে, গ্রামাঞ্চল থেকে সদ্য আগত এ-ধরণের যুবকবৃন্দই ভাল সৈন্য হয়। এতে নানা প্রশ্ন জাগলেও উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য···

শিক্ষান্তে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী গৃহে চলে যান তাঁদের নাম জেলাভিত্তিক তিন থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তালিকাভুক্ত রাখা হয়। রাজ্যের জরুরী অবস্থার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে তাঁরা জেলাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। জেলাবাহিনী পরিচালনার জন্য মহকুমা হাকিম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলাধিনায়ক ও কিছু কর্মচারী রয়েছেন। এই তালিকাভুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সপ্তাহে চারঘণ্টা কুচকাওয়াজ করতে হয়। এ সময়ও তাদের কিছু সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়। এরপর এদের যোগ দিতে হয় বাৎসরিক যৌথ শিক্ষণ-শিবিরে। এখানে স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্য থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী ক্যাডার কোর্সের উপযুক্ত পদের জন্য বাছাই করা হয়। জরুরী কাজে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়োগকালে তাদের যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদি ছাড়া দৈনিক সাড়ে তিন টাকা দেওয়া হয়। যে কোন জরুরী অবস্থায় এই এন ভি এফ কি কাজ করেন? এখানেও সেই কথা কি কাজ না করেন? এ কাহিনীই বাঙালীর কর্মনিষ্ঠা ও গৌরবের ইতিহাস, কর্মবিমুখ বাঙ্গালীর দেশহিতৈষণার দীপ্ত দৃষ্টান্ত। কলকাতার আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করে এই স্বেচ্ছাসেবকগণ সুষ্ঠু ও নির্বাধ কর্মের যে নজীর স্থাপন করেছেন তা দেশবাসীর অজ্ঞাত নয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এ কাজ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন—বাঙালী যথার্থ শ্রমের মর্যাদার আদর্শ স্থাপন করলেন। এই স্বেচ্ছাসেবিগণ নীরবে বহু কাজ করেছেন বা করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে নানাস্থানে বন্যাত্রাণ ও রিলিফের কাজ, ঘর বাড়ি রাস্তা ঘাট তৈরি করা ছাড়াও হাসপাতালে সর্বশ্রেণীর রোগীর প্রতি স্বেচ্ছাসেবীদের সেবার আদর্শ সকলের শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। যক্ষারোগীদের সর্বপ্রকার সেবা ছাড়াও এককালে পায়খানার বদ্ধ নালাও নিজ হাতে পরিষ্কার করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আরেকটি নির্দেশ, কারুর বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের বিদ্বেষ নেই। সব কিছু সহ্য করে দেশের সেবা, দশের সেবা করে—মানবতার মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ হন। বিপন্ন মানবতার ক্ষেত্রেই আপনারা শুধু কাজ করবেন···

মালদহের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শান্তি স্থাপনে স্বেচ্ছারক্ষীদের অনলস কর্মে এবং চীনা আক্রমণের পর প্রায় সাত হাজার রক্ষী দেশ রক্ষার কাজে ব্রতী ছিলেন। সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে বারো হাজার ব্যক্তি স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত আছেন বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থায়, ভারতীয় সেনাবাহিনী, পশ্চিমবঙ্গ দমকলবাহিনী, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিশবাহিনী, সওদাগরী বাণিজ্য জাহাজ প্রভৃতিতে। এ ছাড়া বিশেষ সম্মানজনক চাকুরিতেও স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন—সেটি ভারতের রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষার দলে। দুর্গাপুরে প্রায় বারোশত স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে একটি স্থায়ী সামরিক ধরণের অগ্রগামী দল গঠিত হয়েছে 'প্রথম বিশ্বকর্মীবাহিনী' নামে। এঁরা বহু কাজে বিশেষজ্ঞ। শুনতে বিস্ময় লাগে দুর্গাপুরের সমগ্র রাস্তা এঁদের দ্বারা তৈরি হয়েছে। চেকবিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় এঁরা কলকাতা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত গ্যাস পাইপ বসিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে—উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজেও এই সুশিক্ষিত এন ভি এফদের নিয়োগ করা হবে। সার্থকনামা বাহিনী বিশ্বকর্মার মতই সর্ব শিল্প-কর্মে পারঙ্গম। আজকে বাঙালী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কর্মকাণ্ডের যে ইতিহাস বর্ণনা করা হল তাতে বাঙালীদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন বা বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়ার উচ্চাশা কি নিষ্ফল হবে?

এ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত রয়েছেন। তন্মধ্যে বারো হাজারের মত স্থায়ীকর্মে রত। অবশিষ্ট সবই বেকার। এ কথা ভাবাই যায় না। লক্ষ লক্ষ বেকারের সঙ্গে এই ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবকগণও কাজের প্রচেষ্টায় ঘুরছেন। এ বিষয়ে অনেকটা মীমাংসা হতে পারে আমাদের সরকার—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারী বেসরকারী সংস্থা যদি সজাগ হন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষীদলে এঁরা সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন—এ ক্ষেত্রে বাঙালী নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। পুলিশবাহিনীতে এঁদের আরও বেশি করে নিয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তৎপরতার অভাব রয়েছে। এ ছাড়া 'শিল্পে শান্তি' বলে একটি কথা বহুল প্রচারিত। চুক্তি করলেও শান্তি কতটুকু বজায় থাকছে? শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে এই নিয়ম-শৃঙ্খল জ্ঞানযুক্ত যুবকদের অধিক সংখ্যায় কাজ দিয়ে শান্তি প্রচেষ্টাকে সুসংহত করতে পারে নিশ্চয়ই। এ বিষয়েও উদাসীনতা রয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবীদের কর্মকুশলতার প্রচার ও নিয়োগে আরও তৎপরতার প্রয়োজন। দেশের সমস্ত নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আর দেশবাসী সচেতন থাকলে এই কর্তব্যপরায়ণ বাঙালীদের বেকারত্ব অনেকটা ঘুচবে আর সরকার দৃঢ়-তৎপর হলে দেশে বা সামান্তে সীমান্তে ভারতের জয়যাত্রার নিশান উঁচুতে তুলে 'কর্মবিমুখ' বাঙালীবাহিনীই যোগ্যতার প্রত্যুত্তর দেবে—

'আমরা ঘুচাব কালিমা তোর।'

॥ আধুনিক ইংরেজী উপন্যাস : কাম ও প্রেম ॥

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের যাত্রাপথে কাম ও প্রেমের পদক্ষেপ কি অনুপাতে ঘটে চলেছে তা নিয়ে বিতর্ক এখন পুরোদমে চলছে সমালোচকদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আধুনিক ইংরেজী ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রেমের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, আবার অনেকে বলেন, আধুনিক ইংরেজী ঔপন্যাসিকরা প্রেমের মনোহর স্তবলিকে দৃঢ়হাতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, কামবাদকে মুখ্য করেছেন তাঁদের সাহিত্যে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সেরে নেওয়া যাক।

ইংরেজী উপন্যাসের যাত্রা সুরুর মধ্যপথে আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছি ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি, বাটলার এবং গিসিং-এর— যাঁদের লেখনীর মধ্যে ঋতু বদলের বিচিত্র আভাস। বিংশ শতাব্দীর সুরুতেই ইংরেজী উপন্যাস-সাহিত্যে সেই ঋতু বদলের সংবাদ ঘোষিত হলো যে, সংবাদের মূল সুর হলো ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রোহ। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, উদ্ভাবন (মোটর গাড়ি, টেলিফোন, গ্রামোফোন ইত্যাদি) মানুষের চিন্তায় বিপুল পরিবর্তন আনল। লেখনীর সুর হলো বাস্তবনিষ্ঠ, গলস্‌ওয়ার্দি (Galsworthy), ওয়েলস (Wells) প্রভৃতি ঔপন্যাসিকরা মূল্যবোধের বিকৃতিতে ব্যথিত হয়ে Forster-এর কথার প্রতিধ্বনি করলেন—'Everything exists, nothing has value.'

এবার আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি, আধুনিককালের মানব-মন সমাজসংস্কারের বিরোধী, সাহিত্যে গম্ভীর কথা তারা স্বীকার করে না। তাই সমস্ত সমাজ-সমস্যাই এখন খোলাখুলি ভাবে আলোচিত হচ্ছে—যৌনসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় এখন আর দ্বিধার কোন কারণ নেই। আগেকার কালের মানুষ যৌনচেতনার বহিঃপ্রকাশ যদি সাহিত্যে ঘটত তাহলে লজ্জায় মুখ নীচু করতেন, এখন তাঁরাই জানাচ্ছেন উৎসাহ। নৈতিক পরিবোধের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিষিদ্ধ কথাটি এখন সাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছে, Lady Chatterley's Lover-এর মত উপন্যাস রচিত হয়ে রক্তে জাগাচ্ছে আদিম কামনার শিহরণ। ইংরেজী উপন্যাসের আধুনিক ধারায় কামবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রেম সম্বন্ধে আধুনিক ইংরেজী ঔপন্যাসিকদের ধারণা পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে স্বতন্ত্র। আধুনিক ইংরেজী ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রেম কোন বিশিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, তাঁদের মতে সমাজের মানুষের প্রেম-চেতনা এখন পারস্পরিক সম্পর্কহীন মনুষ্যকণার সমবায় মাত্র। প্রথম এবং দ্বিতীয়, দু'টি রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজে যে অবক্ষয়ের প্রতিধ্বনি, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে পূর্ণভাবে। তাই আধুনিক ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রেমের প্রকাশ যতটা না কল্পনার রসে উজ্জীবিত, তার চেয়ে বেশি বাস্তবতার রূঢ়তায় প্রতিভাত।

আধুনিককালের তিনজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বেনেট, গলস্‌ওয়ার্দি এবং ওয়েলসের রচনায় প্রেম-চেতনার বহিঃপ্রকাশ খুবই কম। গলস্‌ওয়ার্দির সাহিত্যে যে প্রেম-চেতনা তা নর-নারীর দেহকেন্দ্রিকতায়ই শুধু সীমিত নয়—সেই প্রেম-প্রীতি সকল দেশের, সকল মানুষেরই অধিকারে। সেদিক দিয়ে ওয়েলস্‌কে স্বতন্ত্র পথের যাত্রী বলা যায়। ওয়েলস সজীব চরিত্র অঙ্কনে সম্পূর্ণ সফল।

আধুনিক ইংরেজী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর নাম অতি পরিচিত তিনি, ডি এইচ্ লরেন্স। লেডি চ্যাটার্‌লি এবং তাঁর সেই প্রেমিকটির সঙ্গে এই যুগের প্রায় তিন মিলিয়ন লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। নর-নারীর যৌনজীবনকে বন্ধ ঘরে বদ্ধ রাখতে কখনই চান নি লরেন্স। পৌরুষ এবং অতীন্দ্রিয়তার সন্ধানে তথা অপরিমেয় স্বাস্থ্যের খোঁজে লরেন্সকে অবশ্যই অতীতগামী হতে হয়েছে, আদিম মানবের দেহবাদ শিহরিত হয়েছে তাঁর কলমে। লরেন্সকে যৌন-সচেতন লেখক বললেই সব বলা হবে না, নর-নারীর যৌন-জীবন বর্ণনায় যেখানে লরেন্স চরমে উঠেছেন—লেখক হিসেবে সেখানেই তিনি সার্থক। তাঁর 'Lady Chatterley's Lover' উপন্যাসে যদিও একটি সামগ্রিক বাঁধন নেই, ঐক্য নেই ভাবধারায়, তবুও কনি এবং মেলোর, ক্লিফোর্ড ও তার নার্স বোলটনের নিপুণ চরিত্র বর্ণনায় লরেন্স সার্থক। লরেন্স এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, নর-নারীর জীবনে প্রেমের সম্পর্ক সূচনা মাত্র। জীবনে প্রেম অতৃপ্ত বলে যদি কেউ থাকে, লরেন্সের মতে, লোলুপ মাংসের প্রতি সে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট। লরেন্স বলেছেন যৌন-সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে কোন প্রতিবাদ নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে—'ideal, sterile, innocense and similiarity between a boy and a girl. We mean pure maleness in a man and femaleness in a woman.'—উক্তিটি লরেন্সের যৌনচেতনার পরিচায়ক।

এ কালের ইংরেজী উপন্যাসের আর একজন বুদ্ধিদীপ্ত কাম-সচেতন লেখক হলেন হাক্সলি। অবশ্য লরেন্সের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনারীতি লরেন্সের মত নয়। লরেন্সের মত তিনিও মানুষ নামে এক মননশীল জীবকে নিয়ে খুবই চিন্তিত; কিন্তু লরেন্সের মত যৌন সম্পর্ককে তিনিও একই সঙ্গে সুস্থ বলতে পারেন নি। তাঁর কাছে কামের যেমন মূল্য, প্রেমেরও তেমনি। তার উদাহরণ এর্ণেস্টিক হে-র মিসেস ভিভিয়েন। প্রেমিকের যুদ্ধে নিহত হওয়ায় মিসেস ভিভিয়েনের যে নিদারুণ দৈন্যদশা তা আমরা ভুলতে পারি না। After many a summer উপন্যাসটি হাক্সলির পুরস্কার বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুরধার রচনারীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন যৌন সম্ভোগের বাসনায় সুদীর্ঘ দিন-যাপন করতে করতে ধন ও যৌবনের অধিকারী কেমন করে একটি মর্কটে রূপান্তরিত হলো।

মিসেস উল্‌ফের (Mrs. Virginia Woolf, 1882-1941) উপন্যাসে কিন্তু দেহকেন্দ্রিক প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রতিভাত হয়। প্রসঙ্গত

ক্রীতদাসের মত পালন করিয়া চলে। 'স্বয়ং-নির্দেশ' রোগীর অল্প জ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। রোগী মনে করে আমায় এই শব্দাংশটির উপর তোতলাইতে হইবে। তাই সে তোতলায়। কখন কখন রোগী মনে করে যে, তাহার কাছে কেহ 'কয়টা-বাজে' জিজ্ঞাসা করিলে সে সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারিবে না। কারণ সে তোতলা। ঠিক সেই সময় কেহ তাহার কাছে 'সময় কত' জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই তার উত্তর দিতে পারিবে না। সেই সময় সে যদি অন্যমনস্ক থাকিত কিংবা সে যে তোতলা এই কথাটি তাহার মনে উদয় না হইত, তাহা হইলে সে পরিষ্কারভাবে এবং বেশ দ্রুততার সহিতই উত্তর দিতে পারিত।

রাতের মুক্ত নীলাকাশে চাঁদ উঠিলে কাহার না নববিবাহিতা স্ত্রীর নিকট চাঁদনি রাতের সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু রামবাবুর পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। কারণ তার মনের ভিতর 'স্বয়ং নির্দেশ'-এর পোক্ত ঘাঁটি আছে। সে তার স্ত্রীকে যেই 'কি সুন্দর চাঁদনি রাত' এই কথা কয়টি বলিতে যায় তৎক্ষণাৎ স্বরযন্ত্রের নিকট স্বয়ংসংকেত আসে 'চাঁদনি'র 'নি'তে হোঁচট খাইবে। শুধু এইটুকু হইলে হয়ত রামবাবু 'কি সুন্দর চাঁদ রাত' বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত, কিন্তু পারে না। কারণ স্বরযন্ত্রের উপর যে সতর্ক প্রহরী আছে সে তৎক্ষণাৎ বাধা সৃষ্টি করিয়া 'নি' অক্ষরটিকে পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করাইতে বাধ্য করে। এদিকে রামবাবুর স্নায়ুকেন্দ্র হইতে 'চাঁদনি রাত' সম্বন্ধীয় জমায়েত ভাবরাশি সকল কথার আকারে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত দ্রুত গতিতে স্বরযন্ত্রের আধখোলা দরজায় আসিয়া অনবরত ঘা মারিতে থাকে। অক্ষম স্বরযন্ত্র তখন সতর্ক প্রহরীর নির্দেশে সম্মোহিতের ন্যায় বার বার 'চাঁদনি' শব্দের 'নি' অংশের উপর হোঁচট খাইতে থাকে। রামবাবুর পক্ষে আর সে সময় স্ত্রীকে 'কি সুন্দর চাঁদনি রাত' বলা সম্ভব হয় না।

মনে অযৌক্তিক ভাবসমষ্টির সমাবেশ

(Irrational association of ideas)

শৈশবে কোন অপারেশনের পর তোতলামি দেখা দেওয়াও সম্ভব। যেমন কোন শিশুকে টন্‌সিল অপারেশনের পূর্বে যদি বলা হয় যে টন্‌সিল অপারেশন করিলে গলার স্বর বসিয়া যায় বা তোতলামি দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহার মনে এইরূপ ভীতি দৃঢ়মূল হইবে যে, যেহেতু তাহার টন্‌সিল অপারেশন হইয়াছে সেইহেতু সে একটু তোতলাইতেছে। অন্য কারণেও সে হয় তো তোতলাইতে পারে। উহার উপর ভিত্তি করিয়া তাহার মনে অনিচ্ছাকৃত স্বয়ংনির্দেশ বা Auto-suggestion স্থাপিত হয় এবং উহা হইতে মনে নানারকম অযৌক্তিক ভাবসমষ্টির সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, রোগীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তোতলামির উৎস পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে হিপনোটিক ট্রিটমেণ্ট খুবই উপকারী।

স্নায়ুচাঞ্চল্য এবং ভাবাবেগ

শুধু মাত্র স্নায়ুচঞ্চলতা (nervousness) বা ভাবাবেগ থাকিলেই তোতলামি দেখা যায় না। তাহার সাথে দ্রুত কথা বলার আবেগ (haste) থাকা চাই, তবেই তোতলামি দেখা দেয়।

ইচ্ছাকৃত অসহযোজন

(ক) নকল: প্রধানত শৈশবে কাহাকেও নকল করিবার অভ্যাস দেখা যায়। বিশেষ করিয়া বোবা এবং তোতলাদের নকল করিয়া ক্ষেপাইবার প্রবণতা অনেকেরই থাকে। বিদ্রূপের ছলে ক্ষেপানোর ক্ষেপামী কিছুকাল চলিতে থাকিলে শেষে উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে শিশু বা কিশোর প্রথম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্বরযন্ত্রের গতিবেগে একটা শ্লথ ভাব সৃষ্টি করে। সে নিজের জ্ঞাতসারেই স্নায়ুকেন্দ্র এবং স্বরযন্ত্রের মধ্যে অসমন্বয় সৃষ্টি করে। পরিশেষে উহা তোতলামিতে পরিণত হইয়া যায়। সে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্লথতার সহিত তোতলাইয়া কথা বলিতে বাধ্য হয়।

(খ) মনে মনে নকল করা: অনেকেই সিনেমার কোন হিটসং, শুনিবার পর আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করে। এমন কি খাওয়া কিংবা পড়িবার সময়ও বাদ যায় না। ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরযন্ত্রে গানের কলি কয়টি ভাসিয়া আসে। ইহা এক ধরণের স্বয়ং-নির্দেশ বা Auto-suggestion. যদিও রোগটি খুব মারাত্মক নয়।

অসহযোজন হইতে মুক্তি

দ্রুত কথা বলার চেষ্টা এবং উহার ফলস্বরূপ অসহযোজনই হইল তোতলামির মূল কারণ। অতএব দ্রুত কথা বলার আবেগ দমন এবং অসহযোজন হইতে মুক্তি পাইলেই যে তোতলামি শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহ। অসহযোজন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা কয়টি সর্বাগ্রে পালন করা প্রয়োজন।

(১) খুব ধীরে ধীরে কথা বলা (২) প্রতিটি শব্দ বা শব্দাংশের শেষে প্রয়োজন মত এক সেকেণ্ড বা দুই সেকেণ্ড হিসাবে সমভাবে সময় ক্ষেপণ করা (৩) স্নায়ুকেন্দ্রের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে স্বরযন্ত্রের গতি বৃদ্ধি করা এবং (৪) ফুসফুসে বায়ু নিঃশেষিত অবস্থায় কথা না বলা।

বয়স.

শৈশব অবস্থায় আড়াই-তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত অধিকাংশ মেধাই (faculty) সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সময় স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা একেবারেই থাকে না। শিশু তখন ভাই-বোনেদের মুখে যাহা শোনে তাহাই দম দেওয়া মেসিনের মত সারাদিন ধরিয়া আওড়াতে থাকে। সাধারণত তিন-চার বৎসর বয়স হইতে শিশুর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা জাগে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তিন-চার বৎসর বয়স হইতে দশ-এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত (অর্থাৎ যে বয়সে যৌনচেতনা জাগ্রত হয়) তোতলামির প্রবণতা দেখা দেয়। কারণ এই সময়ে স্বরযন্ত্রের গতি অতি দ্রুত থাকার ফলে স্নায়ুকেন্দ্র সমতালে ভাবসমষ্টি প্রেরণ করিতে পারে না। ফলে স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত স্বরযন্ত্রের অসমন্বয় সাধিত হয়। শিশু কথার খেই হারাইয়া পূর্ব বক্তব্যে বার বার ফিরিয়া আসে এবং সে তোতলাইতে থাকে। বাড়ির কোন অভিভাবক বা বয়স্ক অফিস হইতে বাড়িতে ফিরিলে বাড়ির শিশুরা একযোগে সেদিনকার স্থানীয় চাঞ্চল্যকর খবরাখবর বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ওঠে। সবারই আশঙ্কা যে, তাহার অপেক্ষা অন্যে প্রথমে খবরটি হয় তো দিয়া বসিবে।

তাই সবাই সমস্বরে বলিতে চাহে। এর মধ্যে যাহার স্নায়ুকেন্দ্র একটু পোক্ত, যে ঘটনাটি মনে মনে পূর্বের থেকেই ছক করিয়া রাখে, কিন্তু যাহার স্বরযন্ত্রের গতির সাথে স্নায়ুকেন্দ্রে ভাবরাশি জমায়েত তথা সেখান হইতে স্বরযন্ত্রে প্রেরণের সমন্বয় সাধিত হয় নাই সে-ই পরাজিত হয়। শিশু তখন 'তার পর' 'তার পর' বলিয়া তোতলাইতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত অসহিষ্ণু অভিভাবক বা শিক্ষকের খারাপ ব্যবহারের ফলে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ আমরা জানি যে, শিশুর তিন-চার বৎসর বয়স হইতে দশ-এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক বহুরকম সুপ্ত ধীশক্তির কিংবা ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ ঘটিয়া থাকে এবং এই সময় সে জাগতিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হইয়া ওঠে। সে তাহার স্বল্প চিন্তাশক্তির দ্বারাই সেই সময় কোন বিষয় সম্বন্ধে একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যখন তার পক্ষে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইয়া ওঠে না তখন সে তার অভিভাবক বা শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। এই সময় অসহিষ্ণু অভিভাবক বা শিক্ষক তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের পরিবর্তে যদি অন্যায়ভাবে পীড়ন করেন তবে তার সে ধীশক্তিটির উন্মেষণা বা বৃদ্ধির পক্ষে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি হয়। শিশু তখন নিজেকে হীনমন্য মনে করে। তার মনের ভিতর তখন ক্রমান্বয়ে অনিশ্চয়তা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং আবেগপ্রবণতা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়—যাহার চরম পরিণতি ঘটে সার্বিক চঞ্চলতা এবং তাড়াহুড়া করিয়া কথা বলার অভ্যাসে। শিশু তখন যে-কোন অপরিচিত লোকের কাছে চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং তাড়াতাড়ি কথা শেষ করিয়া প্রস্থান করিতে চাহে। তাহার ফলে তার আঘাতপ্রাপ্ত স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত স্বরযন্ত্রের অসমন্বয় ঘটে। শিশু তখন তোতলাইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কল্পনাশক্তির জন্ম হয়। কল্পনাশক্তির সাথে আসে চিন্তাশক্তি, চিন্তাশক্তির সাথে আসে জ্ঞান এবং জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে আত্মবিশ্বাসে। অতএব শিশুকে এমনভাবে পীড়ন করা উচিত নয় যার ফলে সে তার আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে বা তার কোনরকম প্রতিভার উন্মেষণা বা বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। নচেৎ, শৈশবে তোতলামির মত অন্য কোন জটিল উপসর্গও দেখা দিতে পারে।

শৈশব অবস্থায় তোতলামি দেখা দিলে অভিভাবকদের উচিত তাহাকে তোতলামির মূল কারণ সম্বন্ধে অবহিত করা। অভিভাবকগণ সান্ত্বনার ছলে বলিতে পারেন যে, অনেকেরই শৈশব অবস্থায় এইরূপ তোতলামি দেখা দেয়। তোতলামি কাহারও ইচ্ছাকৃত নয় কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিও নয়। শারীরিক সবলতায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং মানসিক চঞ্চলতাও কমিয়া যায়। শিশুকে তার সঙ্গিগণ তোতলামির জন্য বিদ্রূপ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সে সব সঙ্গিগণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা উচিত। তোতলামির প্রথম অবস্থায় অন্য কোন চরম তোতলার সহিত মেলামেশা করা উচিত নয়। কারণ ইহার ফলে তাহার মনে এইরূপ একটি বদ্ধ ধারণা সৃষ্টি হইবে যে তোতলামি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে ভীষণ মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়, যাহা রোগীর পক্ষে প্রভূত ক্ষতিকর।

তোতলামি বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে। তাই উহার চিকিৎসা খুব সহজসাধ্য নয়। এইজন্য প্রচুর সময় এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন। সাধারণত নিজের চিকিৎসা নিজের দ্বারা সম্ভব হয় না। একজন অভিজ্ঞ মনঃসমীক্ষকের অধীনে চিকিৎসিত হওয়া উচিত। কারণ তোতলামির তিন-চতুর্থাংশ মানসিক এবং এক-চতুর্থাংশ শারীরিক কারণে ঘটিয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি পাঠক্রম দেওয়া হইল।

প্রথম পর্যায়

বড় বড় শব্দ সকল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি পড়িবে না। ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া প্রতিটি শব্দাংশ বা শব্দের শেষে সমপরিমাণ সময় ক্ষেপণ করিবে। ইহার ফলে প্রতিটি শব্দের শেষে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ক্ষেপণের এক অভ্যাস সৃষ্টি হইবে। যেহেতু স্বরযন্ত্রের গতির চেয়ে ভাবাবেগ দ্রুত হওয়ায় অসহযোজন সৃষ্টি হয়, এইরূপ অভ্যাসে রোগীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা সাময়িক লুপ্ত হওয়ায় ভাবাবেগ দ্রুত হওয়ার কোন কারণ ঘটিবে না। স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত স্বরযন্ত্রের সমন্বয়ও সাধিত হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

স্বরযন্ত্রের গতিবৃদ্ধির সাথে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা জাগ্রত করিতে হইবে। এই পর্যায়ে বহির্সহায়ক হিসাবে পুস্তক সরাইয়া চার-পাঁচটি শব্দ সম্বলিত ছোট ছোট বাক্য রচনা করিবে। বাক্যের প্রতিটি শব্দ থামিয়া থামিয়া উচ্চারণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া প্রতিদিন দশ-পনেরো মিনিট অন্তত তিন-চার সপ্তাহ চালানো উচিত।

তৃতীয় পর্যায়

ছোট ছোট বাক্য রচনা করিবার ফলে রোগীর স্বরযন্ত্র একটু দৃঢ় হইয়া আসিলে পরবর্তী পর্যায়ে মুখে মুখে ছোট আকারের গল্প বা ভ্রমণ কাহিনী রচনা করিবে। কাহিনীসমূহ যাহাতে কল্পনাপ্রবণ হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

চতুর্থ পর্যায়

এইরূপ পরিশ্রমের ফলে স্বরযন্ত্রের সহিত স্নায়ুকেন্দ্রের যে সমন্বয় পুনঃস্থাপিত হইল তাহা যাহাতে বিনষ্ট না হয় এবং ক্রমান্বয়ে দৃঢ় হইয়া ওঠে, তাহার জন্য সারাদিনে বেশ কিছুক্ষণ সময় মৌন থাকা প্রয়োজন। সম্ভব হইলে একদিন অন্তর একদিন মৌনব্রত পালন বাঞ্ছনীয়। এই সময়ে মনে কথা বলিবার তাগাদা অনুভব করিলে কথা বলিবে। অপ্রয়োজনে এবং অসতর্কতার সহিত কথা বলা অনুচিত।

অন্যান্য প্রক্রিয়া

(১) শারীরিক: শরীর সুস্থ এবং সবল থাকিলে মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে। শরীর দুর্বল এবং রোগাক্রান্ত থাকিলে, মানসিক অবসাদ আসে এবং রোগী আত্মবিশ্বাস হারাইয়া বসে। ডাক্তারের সহিত পরামর্শক্রমে শরীরে যে জাতীয় দ্রব্যের ঘাটতি আছে তাহার পূরণ এবং শরীর যাহাতে সবল হয় প্রতিদিন খাদ্যের ব্যবস্থা সেইভাবে করা উচিত। অপ্রয়োজনে শক্তির অপচয় করিতে নাই। শক্তির উৎস যাহাতে ঠিক থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

(২) ডেমস্থিনিস্ প্রক্রিয়া (Demosthenes method): শুনা যায় বিখ্যাত গ্রীকবাগ্মী ডেমস্থিনিস্ প্রথমাবস্থায় তোত্‌লা ছিলেন। তিনি জিভের নীচে একখণ্ড গোল পাথর রাখিয়া নির্জন স্থানে বসিয়া চেঁচাইয়া পড়িতেন এবং উহার ফলে তাঁহার তোত্‌লামি সারিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তোতলামি কোন্ প্রকারের ছিল আজ তাহা জানা না গেলেও এটা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জিভের নীচে কোন দ্রব্য রাখিয়া কথা বলিতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই স্বরযন্ত্রের দ্রুতগতি কমিয়া আসে এবং অসহযোজন সৃষ্টি বন্ধ হয়। অসহযোজন সৃষ্টি বন্ধ হইলেই তোত্‌লামির আশঙ্কা কমিয়া যাইবে।

(৩) মনের ভিতর হইতে স্বয়ংনির্দেশের ভূত টানিয়া বাহির করিতে হইবে। ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইবে যে, আমি তোত্‌লা নই, কখনও তোত্‌লাইব না। এইরূপ আত্মবিশ্বাস একবার দৃঢ় হইলে রোগী নিঃসন্দেহে শতকরা ৯০ভাগ আরোগ্যলাভ করিবেন।

(৪) মাঝপথে কথা আটকাইয়া গেলে থামিয়া পড়িবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সন্ত্রাস বা কম্প দূর হয় ততক্ষণ কথা আরম্ভ করা উচিত নয়। কষ্টকল্পিত উপায়ে বাধা অতিক্রম করিবে না।

(৫) কথা বলিবার পূর্বে প্রতিটি বক্তব্য গুছাইয়া লইবে তারপর বলিবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে, কাহার নিকট বলিতে হইবে, কোথায় বলিতে হইবে এবং কি বলিতে হইবে। একবার ডারউইনকে (Darwin) (তিনি তোত্‌লা ছিলেন) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি কথা বলিবার সময় তোত্‌লামির জন্য কোনরূপ অসুবিধা বোধ করেন কি না। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কথা বলার পূর্বে তিনি বেশ ভালভাবে চিন্তা করিয়া লন, তারপর কথা বলেন। তাই তাঁর কোন কষ্ট হয় না।

(৬) যে সব শব্দের উপর তোত্‌লামির প্রবণতা আছে, বিশেষ করিয়া সে সব শব্দের ক্ষেত্রে টানিয়া টানিয়া এবং নিম্নস্বরে কথা বলা উচিত। প্রয়োজনে জোরে কথা বলিবে।

(৭) কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণের পূর্বে 'স্বয়ং নির্দেশে'র আভাস পাইলে তৎক্ষণাৎ সমার্থক বিকল্প শব্দ প্রয়োগ করিয়া বা ঐ শব্দটিকে বাক্যের কোন নিরাপদ স্থানে বসাইয়া অথবা প্রয়োজন-বোধে বাক্যটির সমগ্র অংশ পরিবর্তন করিয়া কথা বলা চলিতে পারে। যদিও এইরূপ প্রক্রিয়া তোত্‌লামির প্রতিকারে কোনরূপ সহায়তা করে না কিংবা অনেকক্ষেত্রেই বাক্যের সৌন্দর্য নষ্ট করে, তথাপি আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রহণীয়।

(৮) এমন বন্ধু বা সঙ্গী নির্বাচন করা উচিত, যাহাদের নিকট রোগী কোন ক্ষেত্রেই লজ্জা বা ভাবাপ্লুত হইয়া পড়িবে না। কিছুদিন পর পর সঙ্গীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে তাহার কতদূর উন্নতি হইল। অপর পক্ষে সঙ্গিগণ তাহাকে সময়মত উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে বিদ্রূপ করিবে না। হাল্কাভাবে উৎসাহ প্রদান এবং বিদ্রূপ দুই-ই সমতুল্য। উহাতে রোগী আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে।

পরিশেষে একটি বক্তব্য যে, সর্বদা একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করিবে এলোমেলো ভাবে চিকিৎসা করা উচিত নয়। তাহাতে রোগের প্রতিকারের পরিবর্তে অবস্থা আরো জটিল হইয়া পড়ে।

অপরিচিতার চিঠি

অনুরাধা গুপ্তা

ওগো বাঁশিওয়ালা,
থামাও তোমার বাঁশি,
তোমার ওই একটানা মিঠে সুর
করল আমায় আনমনা,
কোন দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা ?
দীর্ঘদিন গেল তবু ভুলতে পারলাম না।

হঠাৎ সেদিন ঘুমের ঘোরে
শুনি তোমার ধ্বনি
সারা রাত্রি কেটে গেল
শুধু তোমার সুর শুনি,
সেই সুর বাজে মনে
অকারণে,
অতীত দিনের কান্নাহাসি,
বাঁশিওয়ালা থামাও তোমার বাঁশি।

আমি সংসারী
সারাদিন কাটে সংসারে
এ গোপন প্রেম, কারো কাছে হয় নি বলা
রইল শুধু অন্তরে
অন্তরে জাগে তোমার সুর
মনে হয় বুঝি এল মরণ সাগরের ডাক
ওগো বাঁশিওয়ালা
তুমি তো নির্বাক ;
আঁখির জলে যায় গো ভাসি
বাঁশিওয়ালা, আমি তোমার ভালবাসি।

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

গোঁসাইজী

অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করে, সমস্ত জীবন দারিদ্র্য-বরণে জর্জরিত হয়ে, নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলে এসে,—পঞ্চাশোর্ধ্বে যখন হাসপাতালে অর্ধাঙ্গ-অবশ-অবস্থায় শয্যাশায়ী, তখন আর অর্থের কি মূল্য থাকে তাঁর নিকট? তখন তাঁকে টাকার তোড়া দিয়ে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন,—অথবা রাজমুকুট শিরে তুলে দেওয়ার আর কি সার্থকতা?

ঠিক এই অম্ল-মধুর ঘটনাটিই কিছুদিন পূর্বে ঘটে শান্তিনিকেতন হাসপাতালে। পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, পরম পণ্ডিত, পরম ভক্ত, আজীবন বিশ্বভারতীর শিক্ষক,—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিতাইবিনোদ গোস্বামীকে সেদিন রাজ্য সরকার পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিয়ে করেন সম্মানিত! হাসপাতালের ভিতরেই একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা হয় উদ্‌যাপিত।! সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি ও বাংলা দেশের মধ্যে মাত্র পাঁচটি কর্তব্যপরায়ণ, অক্লান্তকর্মী, আদর্শ শিক্ষকের ভিতরে গণ্য হয়ে তিনি রাজ-স্বীকৃতির জয়মুকুট মাথায় নিলেন!

বছর পাঁচেক পূর্বে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রাস্তায় দেখি এক সাধু-পুরুষকে। উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চেহারা, দুধে-আলতা রং, স্বল্প বিলম্বিত শ্বেত কেশজাল ও শ্মশ্রু,—দর্শনমাত্র মনে সম্ভ্রম জাগায়। কে ইনি? জিজ্ঞাসায় জানি—এখানকার সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক 'গোঁসাইজী'। শান্তিনিকেতনে তিনি গোঁসাইজী নামেই প্রসিদ্ধ।

পরের বুধবার প্রত্যূষে মন্দিরে গিয়ে দেখি, আচার্যের পদে বৃত তিনি—আসনখানা সরিয়ে রেখে অনাবৃত মেঝেতে বসে আচার্যের কাজ সমাপ্ত করেন। তাঁর এ আচরণে কৌতূহল জাগে; জিজ্ঞাসাবাদে শুনি—গোঁসাইজীর ধারণা,—তাঁর মতে যে মন্দিরে আসনে বসে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আচার্যের কাজ করে গিয়েছেন,—সেখানে তিনি আসনে বসে সে কাজের অত্যন্ত অনুপযুক্ত। তাঁর বিনয়ে মুগ্ধ হয়েই তাঁর কথা আরও জানতে চাই,—কিন্তু এর বেশি আর বিশেষ কিছুই তখন জানা যায় না।

দু'তিন বৎসরের মধ্যে হঠাৎ শুনি তাঁর পক্ষাঘাতের আক্রমণে দেহের অর্ধাংশ অবশ,—আছেন হাসপাতালে। এমন সুন্দর, এমন জ্ঞানী, বিদ্বান মানুষটির অকস্মাৎ এই অবস্থা? মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়ে সাধু-সন্দর্শনে ধন্য হই!

চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় এত অসুস্থতার মধ্যেও তিনি রীতিমত পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকেন। সেদিন গিয়ে দেখি—বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণখানা খুলে অর্ধশায়িত অবস্থায় পাঠাভ্যাসে মগ্ন। বললেন—সীতার বিবাহের সময় তাঁর বয়স রামচন্দ্রের বয়স নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। তিনি যথার্থ সত্য অনুসন্ধান করে দেখছেন। রুগ্ন মানুষ—বেশিক্ষণ বিরক্ত করা যায় না—অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিই, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আরও জানার জন্য মনে জাগে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা!

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কতকগুলি কাগজপত্র হাতে আসে। তাতে দেখা যায়, তাঁর সমগ্র জীবনের বহু পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও ৺বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অন্য অনেকের বহু চিঠি। কত যে সংস্কৃত পরীক্ষায় পাশ করেছেন তিনি—সংস্কৃত, বাংলা, পালি, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি কত ভাষায় অর্জন করেছেন অসামান্য দক্ষতা! তাঁর ছাত্রী এক প্রতিবেশিনীর নিকট শুনি, গোঁসাইজী প্রায় দশ-বারোটি ভাষা জানেন ও তাতে অনর্গল কথা বলতে পারেন।

শান্তিপুরে বাড়ি—নাম তাঁর শ্রীযুক্ত নিতাইবিনোদ গোস্বামী—পিতা ৺রাধিকানাথ গোস্বামী। শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নহৃদয়-সহচর, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর তিনি—প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর জ্ঞাতি—সম্পর্কিত জ্যেষ্ঠতাত।

গোঁসাইজীর বংশ গুরুবংশ। এ বংশের সকলেই দীক্ষাদান করেন, ইহাই তাঁদের কুলধর্ম। কিন্তু গোঁসাইজী বলেন, আমি দীক্ষাদান করব না, আমি করব শিক্ষাগ্রহণ! এ কি সামান্য কথা? দীনাবতার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তিনি—তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, বহু জ্ঞান আহরণ ও সমস্ত জীবনই শিক্ষাগ্রহণ করে!

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্যতীর্থ উপাধি পান গোঁসাইজী। তারপর কাশী, বৃন্দাবন, কলকাতা, ঢাকায় কত বিভিন্ন সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর সনদ পান, যে দেখে বিস্মিত হতে হয়!

৺বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে লেখা এক চিঠিতে জানা যায়—অনেকদিন যাবৎ শাস্ত্রীমশাই 'অভিধর্মের' একটি উপযুক্ত ছাত্রের অনুসন্ধানে ছিলেন—গোঁসাইজীর সন্ধান পেয়ে তিনি আনন্দিত হন এবং তাঁকে জানান,—অভিধর্মের প্রচার তোমার দ্বারাই হবে। তাঁরই আগ্রহে সামান্য একটি বৃত্তি পেয়ে গোঁসাইজী বৌদ্ধধর্মের গবেষকরূপে প্রথম শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে।

সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নানা দেশে তিনি গবেষণার কাজে কিছুদিন করে কাটিয়ে আসেন। যেখানেই যে কাজে গিয়েছেন, সেখানেই তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার বিদ্বৎসমাজ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর মত বিদ্বানের উপযুক্ত অনেক বড় কাজ প্রত্যাখ্যান করেও তিনি সামান্য বেতনে বিশ্বভারতীতে বাংলা, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি নানা ভাষায় অতি যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষাদান করেন, আকস্মিক অসুস্থ হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত। তিনি বলেন, শান্তিনিকেতনের মাটির এক মোহ আছে—একবার এখানে এলে আর এ স্থান ছাড়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শুধু ভাষাতত্ত্বের চর্চা ছাড়াও আরও এক দিকে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ছিল। তিনি নানা বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ও অভিনয়বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। গুরুদেব তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের এত পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর নাটকে স্থান দেবার জন্য গোঁসাইজী স্থানান্তরে থাকলেও পুনঃ পুনঃ তারযোগে জানাতেন জরুরী আহ্বান!

তাঁর পারিবারিক জীবন-কথা শুনি তাঁর প্রতিবেশিনী এক মহিলার নিকট। সে জীবন যেমন করুণ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। প্রথম যখন তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন—সঙ্গে ছিল স্ত্রী ও একটি কিশোর পুত্র। গুরুপল্লীর একটি মাটির বাড়িতে তাঁদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। সুন্দর ছেলেটি পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী। ক্রমশ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে সে ওঠে কলেজের গণ্ডীতে। সামান্য বেতনে গোঁসাইজীর পুত্রের কলেজি শিক্ষার ব্যয় বহন করা হয় কষ্টসাধ্য।

সুবিবেচক গুরুদেব আপনা থেকেই এই সময়ে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর আর্থিক কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না। গোঁসাইজী হাসিমুখেই জবাব দেন—চলে যাচ্ছে এক প্রকার।

কিন্তু উদার হৃদয় গুরুদেব তাঁকে নিজে থেকেই করেন কিছু বেতন বৃদ্ধি।

এই কিশোর বালকের শান্তিনিকেতনে হয় তখনকার দিনের দুরারোগ্য টাইফয়েড জ্বর। ভাগ্যদেবতার এক ফুৎকারে এখানেই হয় তার জীবন-প্রদীপ অকালে নির্বাপিত! ঘটনার আকস্মিকতায় ও গুরুত্বে শোকে মুহ্যমান হলেও নির্লোভ গোঁসাইজী গুরুদেবকে আবার গিয়ে বলেন,—যে প্রয়োজনে আমি আপনার নিকট হতে বর্ধিত হারে বেতন গ্রহণ করেছিলাম, সে প্রয়োজন ত' মিটে গেল, এখন আর আমার বাড়তি টাকার দরকার কি? আপনি আমার পূর্ব বেতনই ধার্য করুন।

কালের গতিতে দিন যায়। ক্রমে এখানে তাঁর দু'টি কন্যার জন্ম হয়। 'আলো-ছায়া' এখানকার উদার আকাশের আলো-ছায়ার সহযোগিতায়, এখানকার মাটিতেই ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে শশিকলার মত। তাদের বিবাহের বয়স না আসতেই তাদের মার ডাক এলো পরপার থেকে। গোঁসাইজীর কর্তব্যপরায়ণা স্নেহময়ী পত্নী অকালে সকলকে কাঁদিয়ে অজানার উদ্দেশে চলে গেলেন জন্মের মত!

এবার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে আপন-ভোলা, গ্রন্থকীট, গোঁসাইজী বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েন। বিধাতা এবার খেললেন আর এক খেলা। পাশের বাড়ির আটটি সন্তানের জননী, গ্রন্থাগারকর্মী সত্যচরণবাবুর স্ত্রী, বুকে তুলে নিলেন ফুলের মত সুন্দর মা হারা মেয়ে দু'টিকে। মেয়েরা তাঁকেই মা বলে ডাকে ও থাকে তাঁরই স্নেহছায়ায়। গোঁসাইজী নিজের পঠন-পাঠনে আরও গভীরভাবে মন-প্রাণ ঢেলে দেন।

এ ভাবেই যদি জীবন কেটে যায়, তা'হলেও বোধ হয় ভগবানের রাজ্যে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে,—খেলা বুঝি তাঁর ষোলকলায় পূর্ণ হয় না! সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় বড় কন্যা 'আলোর' বিবাহ যথাসময়ে সম্পন্ন হয় ভাল পাত্রে। তারপরই আসে বিধাতার চরম আঘাত!

এবার ভাগ্যদেবতা তাঁর তূণের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণটি ছাড়েন গোঁসাইজীকে লক্ষ্য করে। জগতে বোধ হয় বড় আধারেরই আসে বড় আঘাত! বুঝি তাদের সহনশীলতা পরীক্ষারই কৌশল এটা।

হঠাৎ পক্ষাঘাতের আক্রমণে অর্ধাঙ্গ অবশ হয়ে যায় গোঁসাইজীর। চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে মুহূর্তে হয়ে পড়েন তিনি একান্ত অসহায়—সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী, ছোট কন্যা 'ছায়ার' বিবাহ তখনও বাকী। বয়স মাত্র ষাট কি পঁয়ষট্টি, পৃথিবীতে তাঁর কত কি করার, কত কি দেবার ছিল—সব অসমাপ্ত রেখে পিয়ার্সন হাসপাতালের এক কোণে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন,—প্রায় তিন বৎসর।

অবিবাহিতা ছোট মেয়েটি সুন্দরী, সুশিক্ষিতা,—তার বিবাহ অনায়াসেই সুসম্পন্ন হয়। দু'বোনই আজ স্বামীর ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিতা।

গোঁসাইজী হাসপাতালের ঘরে শুয়ে সর্বক্ষণ পাঠে নিমগ্ন থাকেন ও মাঝে মাঝে বলেন,—আর কত দিন শুয়ে থাকব বিছানায়? এ রোগ যেন শত্রুরও না হয়। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, বিদ্যাবত্তা ও সহনশীলতা এ যুগের মানুষের মনে আনবে অনেক শক্তি!

জীবনসায়াহ্নে ভাগ্যক্রমে আমি শান্তিনিকেতনে প্রথম দর্শনের আনন্দ ও ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরি বিশ্বভারতীর ক্লাশে ক্লাশে। সঙ্গীতভবনের যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগে সেতারের ক্লাশে এসে থমকে দাঁড়াই। এক অনিন্দ্যসুন্দর বিদেশী যুবক প্রকাণ্ড সেতারখানা নিয়ে পা মুড়ে মাটিতে বসেছে ভারতীয় ওস্তাদের ভঙ্গীতে। তার চেহারা দেখেই চমক লাগে, সত্যই দেখার মত চেহারা। যেন শ্বেতমর্মরে গড়া নিখুঁত একটি ইটালীয়ান ভাস্কর্যের নিদর্শন! ঢিলা পাজামা ও পাঞ্জাবী পরিধানে—কে এই যুবক?

পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানি,—নাম মাইকেল অথবা মিগেল। জার্মান ভাষাভাষী বিদেশী যুবক। ভারতীয় সঙ্গীতচর্চার জন্য কিছুকাল-যাবৎ শান্তিনিকেতনবাসী 'কিছু দেব,—কিছু নেব'—এই নীতিতে এখানে সেতার শেখেন এবং জার্মান ভাষা শিক্ষা দেন।

সেতারের অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করি,—এই বিদেশী ছেলেটি সেতারের মত কঠিন যন্ত্র কি বাজাতে পারেন? তিনি যদি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে অভিজ্ঞও হন,—তবুও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রভেদ যেন আকাশ আর পাতাল। তা সত্ত্বেও উনি কি বুঝতে পারেন আমাদের সুর?

অধ্যাপক এই উচ্চশ্রেণীর পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন,—এদের অনেকের চেয়ে মাইকেল সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য ধরতে পারে অনেক বেশি,—বিশেষত আলাপে।

পরে আস্তে আস্তে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্মিত হই তার গুণে। একাধারে এত গুণের সমাবেশ? নাচ, গান, অঙ্কন, সূচিশিল্প,—চারুকলার কোনটিই বাদ যায় না, এই যুবকের শিক্ষার তালিকা থেকে। রাধাকৃষ্ণের ছবি, বাটিকের কাজ, জয়পুরী বাঁধনী—সবই অপূর্ব হয়ে ফুটে ওঠে বিদেশী ছেলেটির হাতে। আহার-নিদ্রায় মন নেই, রাত দিন মশগুল আপন ভাবে, আপন কাজে।

ভারতীয় পদ্ধতিতে শুদ্ধভাবে সেতার বাজাতে হলে, তার সঙ্গে চাই তবলা-সঙ্গত। মাইকেল মহা চিন্তিত। মাইনে করা তবলচি রাখার পয়সা নেই,—বিশ্বভারতীতে ভাষা-শিক্ষাদানের বিনিময়ে সামান্য যে অর্থাগম হয়, তাতে অতি সাধারণভাবে ঘরের ভাড়া দিয়ে, স্বপাক খাওয়া চলে,—তার অতিরিক্ত খরচ করা অসম্ভব। উপায়? সঙ্গীত শিক্ষায় কি ইতি দিতে হবে? না—এতবড় প্রতিভা কোথাও বন্ধ হয় না,—নিজের পথ করে নেয় নিজেই!

সঙ্গীত-ভবনে যাতায়াতের পথে মাইকেল দেখতে পায়,—গাছতলায় বসে বেহারী দরোয়ান পা চাপড়ে ভিতরের গানের সঙ্গে তাল দেয়। অমনি মাথায় এলো,—একেই গড়ে পিটে, এর দ্বারা তবলচির স্থান পূর্ণ করার। অধ্যবসায়ে কি না হয়? এই মূর্খ সঙ্গীত-ভবনের দরোয়ান, মাইকেলের শিক্ষায় তবলায় হাত পাকিয়ে একাধারে হয় তার পার্শ্বচর ও তবলচি। এই দরোয়ানকে মাইকেল এতই ভালবেসেছিল যে, তার নিকট থেকে উচ্চ-নীচ, ভেদাভেদ-জ্ঞান একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল,—তবে তার এই বাড়াবাড়ির দরুণ সে অনেকেরই অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তবলচির অভাব পূর্ণ হওয়ার পর আবার আর এক সমস্যা—যে বাড়ির অংশই ভাড়া নিক না কেন,—তার বাজনা, নাচ, বেহারী অশিক্ষিত গোয়ালা, রিক্সাওয়ালা, দরোয়ান প্রভৃতি নিয়ে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হৈ-হল্লা, কোন বাড়িওয়ালাই বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারেন না,—অবিলম্বে বাড়ি ত্যাগের নোটিশ দেন।

একদিকে নৃত্যশিক্ষা, অন্যদিকে সেতার,—তার উপরে কলা বিভাগের প্রত্যেক শাখার বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা,—আবার দেহাতী মানুষগুলোর নিকট এদেশের লোক-সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ের স্পৃহা,—এতগুলি বিষয় শিক্ষার উৎসাহের আধিক্যে তার আশেপাশের শান্তিপ্রিয় মানুষদের প্রাণান্ত হবার যোগাড়। দু' মাসের বেশি সে স্থান পায় না কোন বাড়িতে।

এমন সময়ে একবার তার সঙ্গে দেখা। বলে,—এবার ভাবছি লোকালয় থেকে দূরে, শান্তিনিকেতনের পাশে, একটি ছোট্ট মাটির বাড়ি নিজেই করব। সবচেয়ে কম খরচে যা হয়, তাতেই আমার চলে যাবে। চব্বিশঘণ্টা নৃত্য, গীত, বাদ্যের অনুশীলন সাধারণ লোকেরই বা ভালো লাগবে কেন? কিন্তু আমার যখন আবেগ আসে তখন রাত বারোটা কি দু'টো—কিছুই বুঝতে পারি না। আর এখানকার বেহারী গরীবদের পাড়াগেঁয়ে অসংস্কৃত সুর আমার এত মিষ্টি লাগে যে, এ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা যায় না। খেটে খাওয়া মানুষ—সময় তাদের রাত্রে দশটার পর; ঐ অসময়ে আমি তাদের ঢোলক বাজিয়ে গাইতে বললে—আমার বাড়িওয়ালা তেড়ে আসবে না ত' কি করবে? কাজেই আমার লোকালয়ের বাইরে গিয়ে থাকাই ভাল।

শান্তিনিকেতন কেমন লাগে জিজ্ঞাসা করলে বলে,—এখানটা এত ভাল লেগেছে যে, এখানেই বাকী জীবন কাটাবো মনে করছি। অল্পদিনের জন্য অন্য কোথাও গেলেও, শান্তিনিকেতনে আবার ফিরে আসবই। এ স্থানের সঙ্গে কেমন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করি।

অপরের নিকট শুনি, মাইকেলের পূর্ব পুরুষ ইটালীয়ান,—বোধ হয় বহুকাল পূর্বে এসে জার্মানীর বাসিন্দা হন। মায়ের দিক থেকে বোধ হয় জার্মান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। শিল্পানুভূতি দু'দিক থেকেই প্রাপ্ত। নিজ দেশে সঙ্গীত চর্চা করেছে শিশুকাল থেকে,—অল্পবয়সেই পিয়ানো, গীটার প্রভৃতিতে দক্ষতা অর্জন করেছে অসামান্য!

শুনি মাইকেলের বাবা ছিলেন পিয়ানো-নির্মাণকার। অতি শৈশব থেকেই বাবার কাছে তার পিয়ানোতে হাতেখড়ি। জার্মানীর বড় বড় নামকরা পিয়ানোবাদক এসে তার বাবার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, পিয়ানো পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে,—কাজেই শিশুকাল থেকেই সে দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে অযাচিতভাবে। তাঁদের উচ্চাঙ্গ বাজনায় কান অভ্যস্ত হয়েছে প্রথম থেকেই। ষোলবৎসর বয়সের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রে পরিপক্ক হয়ে, মন দেয় ব্যালে নৃত্যের দিকে।

প্যারিসের এক বিখ্যাত ব্যালেরিণার স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার পর আরও নানাস্থানে নৃত্যশিক্ষা করে, ম্যাড্রিড সহরের 'স্প্যানিশ রয়েল অপেরা'তে, প্রফেশন্যাল ব্যালে ডান্সাররূপে খুব নাম হয় মাইকেলের। এখানে সে সুন্দর স্প্যানিশ গীটার বাজাতে শেখে।

এই সময়ে ভারতীয় নৃত্যশিল্পী রামগোপালের দল ম্যাড্রিডে আসে তাদের কলা-কৌশল দেখাতে। মাইকেল এখানেই প্রথম ভারতীয় নৃত্য, গীত-বাদ্যে এত মুগ্ধ হয় যে,—এই শিক্ষার জন্য তার মনে জাগে তীব্র আকাঙ্ক্ষা! কিছুকাল ছুটির সময়ে রামগোপালের দলে যোগ দেয়,—ভারতীয় নৃত্য-বাদ্যে এখানেই হয় তার হাতেখড়ি। তারপর অনেক কষ্টে ভারতে আসার সুযোগ করে, চলে আসে শান্তিনিকেতনে।

অপূর্ব শিল্প-প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এই শিল্পী। ক'বছরই বা ছিল শান্তিনিকেতনে,—এরই মধ্যে যায় একবার মাদ্রাজের 'কলা-ক্ষেত্রে'। কয়েক মাসের ভিতরেই দক্ষিণী-পদ্ধতিতে বীণা বাদন শিক্ষা করে, প্রকাণ্ড এক বীণা নিয়ে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে এলো,—তখন আবার দেখা। বলি,—একদিন এসে বীণা শুনবো!

হাসিমুখে স্বাগত জানায়,—কিন্তু তার বীণা আর শোনা হল না। হঠাৎ শুনি এলাহাবাদে এক কাজ পেয়ে, মাইকেল শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছে। অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষায় সুন্দর কথা বলা, অথবা সেতার, বীণা প্রভৃতি যন্ত্রে এবং কথাকলি প্রভৃতি নৃত্যে এতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করা,—বোধ হয় মাইকেলের মত গুণী ছেলের পক্ষেই সম্ভব!

জেন্

পৃথিবীর অপরপ্রান্তে অবস্থিত ইণ্ডিয়ানার সঙ্গে ইণ্ডিয়ার কি কোন সংযোগ আছে? হয়ত বা কোনকালে ছিল, না হলে নামের এত সামঞ্জস্য কোথা থেকে এলো?

সুদূর ইণ্ডিয়ানার মেয়ে জেন্ চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভের আশায় এসেছে শান্তিনিকেতন। ইণ্ডিয়ার মাটিতে পা দিয়ে, ইণ্ডিয়ানার তরুণী যেন ভারতেরই আদরের দুলালী হয়ে গেল। দূরে গেল পোষাক-আসাক,—দূর হল আহার-বিহারের বিলাসিতা,—আরও দূরে গেল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দারুণ গ্রীষ্মে কষ্ট-বোধ!

বীরভূমের কড়া গরমে জেন্‌কে দেখি,—বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলার মত সামান্য বসনাবৃতা হয়ে রং-তুলির বাহুতে মেতে আছে। কোথায় গরম? ভারতীয় আমরা গরমে অস্থির হয়ে উঠলেও জেন্

ইজেলের উপরে বড় বড় ছবিতে রং-এর স্পর্শ বুলিয়ে চলে অক্লান্ত ভাবে। মাঝে মাঝে ছবি আঁকায় ক্লান্তি এলে,—আঙ্গিনায় অগ্নিবর্ষী রৌদ্রে নিজেকে ছড়িয়ে দেয় ভূমিশয্যায়! ভীষণ গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, নিজেই দু' বালতি কুয়োর ঠাণ্ডা জল তুলে মাথায় ঢেলে—সেই ভিজে জামা-কাপড়, গা-মাথা নিয়েই আবার শুয়ে পড়ে অনাবৃত রোদ্দুরে। আশে-পাশের মানুষ সাবধান করে,—কর কি জেন্? সর্দিগর্মি হয়ে মরে যাবে যে এত রোদ্দুরে!

ভ্রূক্ষেপ নেই জেনের, বলে—কি আরাম! রৌদ্র-স্নান করছি; এমন পরিষ্কার সূর্যের রূপ এই ভারত ছাড়া আর কোথায় আছে?

একদিন তার ঘরে যাই তার আঁকা ছবিগুলো দেখতে। সাদরে বসিয়ে খুলে দেখায় তার ছবির বোঝা। সব ছবিই খুব বড় আকারের, একখানা ছবি দেখিয়ে বলে,—এখানা আমার ভারতবর্ষ প্রথম দর্শনের ভাব নিয়ে আঁকা। অবাক হয়ে চেয়ে রই,—ছবি কোথায়? শুধু কতকগুলো উজ্জ্বল রং আকৃতিহীনভাবে ছিটিয়ে দেওয়া যেখানে সেখানে। হলুদ, সবুজ, লাল এই তিনটি রং-এর আধিক্যেই ভারতের রূপ ধরা পড়েছে বিদেশিনী শিল্পীর চক্ষে। ছবি না বলে তাকে রং ছড়ানোর খেলা বললেই মানায় ভালো!

তারপর দেখি সাঁওতাল মেয়েদের কত ছবি। আঁটসাঁট গড়নের কালো কুচকুচে সাঁওতাল মেয়েরা জেনের চোখে ধরা দেয় অপূর্ব সুন্দর হয়ে। দিনের পর দিন সে ঘুরতে থাকে সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে। তাদের উৎসব, তাদের নাচ, তাদের সাজ,—সবই জেন্ ফুটিয়ে তোলে ক্যানভাসের বুকে রং-এর আঁচড়ে! বলি,—তুমি এত বড় বড় ছবি এঁকেছ,—এগুলো নিয়ে যাবে কি করে সুদূরের রাস্তায়?

সুন্দরী জেন্ ভুবনমোহন হাসি হেসে বলে,—চেষ্টার অসাধ্য কি কোন কাজ আছে? কাঠের ফ্রেম করে সব নিয়ে যাব।

যে বাঙালী পরিবারটির পাশে এসে জেন্ বাসা বেঁধেছিল, তাঁদের মুখে শুনি,—জেনের খাওয়া দাওয়া কোন বিষয়েই ছিল না একবিন্দু আপত্তি। তাঁদের কাছেই সে ক্ষুধা-তৃষ্ণার চাহিদা মিটায় অনেকদিন। সাধারণ বাঙালী রান্না—ডাল, ভাত, মাছ, তরকারী, সুক্তো, ঘণ্ট কিছুতেই তার আপত্তি ছিল না, উপরন্তু যে রাঁধুনী মেয়ে তার খাবার পৌঁছে দিত, তাকে করত কত আদর! বিশ্রামের সময় তাকে ডেকে নিত নিজের শয্যাসঙ্গিনী করে! ভদ্র-অভদ্র, গরীব-ধনীর কোন পার্থক্য ছিল না জেনের নিকট। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' আমাদের দেশের এই কথাটি বোধ হয় সাগর পারের ওরাই সার্থক হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে!

সাধারণের থেকে আলাদা ভিনদেশী অস্থায়ী শিল্পী মেয়েটি আজ আর শান্তিনিকেতনে নেই,—কিন্তু মনে রেখে গেছে একটি স্থায়ী ছাপ।

[ক্রমশ।

● ● ●

ফুল ফোটার কাল

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আমার উদ্যানে আজ একটি ফুল ফোটার কাল এসেছে।
আমার উদ্যানে আজ বসন্তকালীন হাওয়ারা
ভীষণভাবে ব্যস্ততায় মগ্ন হয়েছে।
উদ্যানে আমি এর আগে কোনদিনও,
পাতায় পাতায় বৃন্তে বৃন্তে মহীরুহের অথবা তরুদের
এতো ব্যস্ততা দেখি নি তো?
অথবা কোন দিনও উদ্যানের অন্যান্য বৃক্ষদেরও
এমন ভাবে ব্যস্তভরে আন্দোলিত হতে দেখি নি তো?
তবে কি ফুল ফোটানোর কালে
প্রত্যেক বৃক্ষই করে স্বদেহের রক্তস্রাব,
যেমন জননী করে তার সন্তানের জন্মদান কালে?
হয়তো বা তাই, কেন না উভয়েই দেয়
শাশ্বত পবিত্র সুন্দরের জন্ম।
হয়তো বা তাই, কেন না উভয়েই আনে
মর্ত্যলোকে নন্দনের সংবাদ।
হয়তো বা তাই, কেন না উভয়ের মধ্যেই
নিহিত সম্ভাবনার বীজ।
উদ্যানে এর আগে আমি এতোদিন যেভাবে
নিজের প্রয়োজন মেটাতে এসেছি
এখন থেকে আমি আর সেইভাবে আসব না।

নিহত প্রার্থনা

সুশান্ত ঘোষ

নিহত প্রার্থনারাশি স্ফুরিত শব্দ নেই আর
ওষ্ঠপুটে মৃত মগ্ন অন্ধকার অনুভবে মনে
প্রত্যেক দিনের শেষে শোনা যায় স্পষ্ট সমাচার
নিষ্ঠুর স্থবির রক্তে করাঙ্গুলি নৃত্য সমর্থনে?

নির্ব্যূঢ় জীবনস্বত্বে দানপত্র লিখে দিতে চায়
সকলেই, তবু কেউ বহুদর্শী সকলের আগে
প্রগাঢ় চিন্তার রেখা রেখে যায় পাতায় পাতায়
দৃষ্টির সীমায় তার অপ্রাকৃত জাগে কি না জাগে:

নদী তীরে শোঁ শোঁ হাওয়া যেন সহসা নির্বোধ
শিশিরে শিশিরে মাঠ কেঁপে ওঠা, যত আকুলতা
চারিদিকে রোদ বৃষ্টি ছড়াছড়ি ঋতুর প্রমোদ—
মুকুরের মত শূন্যে প্রতিভাত হয়ে থাকে কথা।

কিংবা আগে কথা ছিল এখন নিঃশব্দে থাকে সব
অনুভবে শোনা যায় নিহত শ্লোকের কলরব।

পরদিন সকালে ও সি স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে নিয়ে গেলেন। কাউকে সনাক্ত করতে পারবেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তারবাবু বলছিলেন—না। কারণ সবাই মুখোশ পরে ছিল। তবে যে ছেলেটি স্টেশন থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, আবছা আলোয় দেখা হলেও তাকে হয়ত চিনতে পারেন, কারণ স্টেশনে, দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলেছেন খানিকক্ষণ তার সঙ্গে।

একটু থেমে ও সি আবার শুধালেন—কেউ আপনার শত্রু আছে মিল এলাকায়? যে কোন কারণের জন্য হোক?

কি একটা ভেবে নিয়ে ডাক্তার বললেন—সাক্ষাৎভাবে আমার শত্রু নেই এখন কেউ।

দারোগা কোন সূত্রই পেলেন না। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা রতনকে ডেকে পাঠালেন থানায়। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদেই বেরিয়ে পড়ল, দারোগার সন্দেহ সমর্থিত হল রতনের বক্তব্যে। মিলের লোকের ষড়যন্ত্র ছাড়া এ ধরণের ঘটনা হতেই পারে না এবং নামটিও নোট করে নিলেন রতনের কাছ থেকেই। রতন শেষে রাগ সামলাতে না পেরে ইঙ্গিতে বলে দিল—তার মেয়েকে ভাড়া খাটিয়ে সে ঐ সব গুণ্ডার দল পোষে।

—আচ্ছা তুমি যাও আজ। দরকার হলে আমাদের সাহায্য করতে হবে কিন্তু তোমাকে এই গুণ্ডা দমনের কাজে।

—নিশ্চয়ই করব। আচ্ছা আজ আসি। নমস্কার। চলে গেল রতন।

রঙ্গলালের দ্বিতীয় অভিযান ফেঁসে যাওয়াতে এবার সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল রতনের উপর। এবার ব্যাপারটা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ানোতে রঙ্গলাল একেবারে যেন ঝিম মেরে গেল। রতন এইবার খুব জোর গলায় রঙ্গলালের বিরুদ্ধে বলে বেড়াতে লাগল। এমন কি এ-কথাও শোনা যেতে লাগল রঙ্গলালকে এবার শ্রীঘর দেখতে হবে।

হরিমতী সেদিন কথাটা শুনে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—বাবা, শীগগির এখান থেকে পালাও। যদি পুলিশে ধরে।

এত দুঃখেও হাসি এল। রঙ্গলাল বলল—পালিয়ে গেলে কি পুলিশের হাতে নিস্তার পাওয়া যায়? তা ছাড়া—খাব কি?

তবে কি হবে? শুনছি না কি তুমি গুণ্ডাদের দলে ভিড়েছ, ডাক্তারবাবুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে?

দূর ও-সব বাজে কথা। ঐ রতনা ছোঁড়াটা যত নষ্টের মূল।

তোমার জামাইকে একবার খবর দেব? তার হাতেও অনেক জানাশোনা লোক আছে। যদি কিছু করতে পারে। এবার উৎসাহিত হল

রঙ্গলাল—তাই নাকি? আচ্ছা তবে খবর দে। না,—না, আমিই যাব একদিন তার কাছে।

কাল যাবে? এ-সব কাজে দেরি করা ঠিক নয়। এরপর ডাক্তারবাবুর আস্কারা পেয়ে রতন তোমার মাথা কাটবে। এর একটা বিহিত করা দরকার এখনই।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। মিলের আলোগুলো রাতকে দিন করে ফেলেছে। কুলি লাইনের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু রঙ্গলালের ঘরেই শুধু অন্ধকার। চিন্তান্বিত রঙ্গলাল বাইরে একটা খাটিয়ায় বসে কথা বলছিল। মেয়ে ও মা-ও ছিল সেখানে, হরিমতীর মা হঠাৎ একটা ইঙ্গিত করতেই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু এসে দাঁড়ালেন কাছে। রাস্তার আলো এসে

প্রায়শ্চিত্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কালপুরুষ

পড়েছিল ওদের বসবার স্থানটুকুতে। তাতে বেশ স্পষ্টই সব বোঝা যাচ্ছিল। রঙ্গলাল মেয়েকে একটা মোড়া আনবার জন্ত বলতেই তিনি থামিয়ে দিলেন—তুই বোস হরিমতী। আমি বসব না। তারপর হরিমতীকে দেখে বলে উঠলেন—ভালো আছিস তো! তুই কি মোটা হয়েছিস। কতদিন তোকে দেখি নি—কেন রে?

হরিমতীর মা মাঝে থেকে বলল—ডাক্তারবাবু, মেয়ের যে এতদিনে ছেলেমেয়ে হল না, মুটিয়ে যাচ্ছে—এ ত' ভাল নয়—একটা ওষুধ যদি দিতেন!

—সে তো এখানে হয় না। হাসপাতালে অথবা বাড়িতে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

হরিমতীর মা বলল—তবে থাক, দরকার নেই।

ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের উত্তরে হরিমতী বলল—আমি আসি তো মাঝে মাঝে। আপনার সঙ্গে দেখা হয় না। একটু ইতস্তত করে শুধাল—আচ্ছা, লছমী কেমন আছে ডাক্তারবাবু?

—সে তো ভালই আছে। হেসে বললেন—ওঃ, তার বাবুগিরি যদি দেখিস তো তাক লেগে যাবে।

গম্ভীর হয়ে গেল হরিমতী; বলল—তা আর হবে না কেন? আপনার কাছে যখন আছে, তখন আর সে খারাপ থাকবে কেন? একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল হরিমতী।

—তা বটে, ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, চলি এখন। আছিস তো দু-একদিন?

—না, কালই যাব।

—আচ্ছা দেখা হবে আবার। ডাক্তারবাবু বাসামুখো পা বাড়ালেন। ভাবতে ভাবতে চললেন—হরিমতীর পরিবর্তনটাও তো কম হয় নি। আগে দেখা হলে প্রণাম করত, এবার সেটা করল না। বাপের শিক্ষা হতে পারে হয়ত। একটা সন্দেহের ছায়া বিন্দুর আকারে দেখা দিল ডাক্তারের মনে। এতক্ষণে আবার মনে পড়ল—সেদিনের সেই রাত্রির অপরিচিত অতিথির আহ্বানের কথা। রঙ্গলাল ছিল নাকি পিছনে?

বাসায় আসতেই লছমী এসে দাঁড়াল সামনে—আজ এত মুখটা গম্ভীর দেখছি কেন বাবু?

—কৈ না তো—জোর কোরে হাসি টেনে বললেন ডাক্তারবাবু।

লছমী তা বিশ্বাস না করে এগিয়ে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখে বলল—না; গা তো ভালই দেখছি।

—দেখলি তো পাগলী! বলছি কিছু হয় নি! যা চা নিয়ে আয়।

নিশ্চিন্ত চলে গেল লছমী। ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

লছমী চা নিয়ে এলে ডাক্তার বললেন—শোন লছমী, আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।

—কি?

—অনেকদিন পর হঠাৎ হরিমতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—ইয়া মোটা হয়েছে দেখলাম। বলে হাত দু'টো প্রসারিত করে দেখালেন ডাক্তারবাবু।

লছমী কিন্তু হাসল না তাতে, বরং উল্টে প্রশ্ন করল—আমার কথা কিছু শুধায় নি?

—হ্যাঁ। আমি বললাম লছমী ভাল আছে। তার বাবুগিরি বেড়েছে।

—সে কি বলল?

—মনে হল হিংসেয় ফেটে পড়ল। বলল—সে তো আপনারই জন্তে হয়েছে, কথায় সুরটা বাঁকা মনে হতেই আমি চলে এলাম।

—জানি আমি। আর সেইজন্তেই তো মা বাবার কাছে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কি জানি কোনদিন যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবু। দাও, আর এককাপ করে আনি। কাপটা ডাক্তারের হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই চলে গেল লছমী।

রতন আর লছমীর বাপ গিয়েছিল মাইলখানেক দূরে এক যাত্রা-গান শুনতে। গান যখন শেষ হয়ে গেল, তখন রাত্রিও প্রায় শেষ হবার মুখে। গানের আসরে রঙ্গলালকে দেখে একটু অবাক হয়েছিল রতন, লছমীর বাপ হরবংশও। কারণ ওরা আজ সকালে যখন সবাই বেরিয়ে আসে ঘর তালাবন্ধ করে, তখন মনে করেছিল বোধ হয় মেয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্তেই চলেছে রঙ্গলাল।

রতন রঙ্গলালের দিকে বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল। রঙ্গলালের দৃষ্টিও একবার তার দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছিল। কিন্তু রঙ্গলাল তখনই বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখ নীচু করেছিল। এর খানিকক্ষণ পরেই রঙ্গলালকে আর আসরে দেখা যায় নি। এমন কি ও যে কখন উঠে গিয়েছে তাও ঠিক লক্ষ্য রাখতে পারে নি রতন। একবার হেসে হরবংশের গায়ে একটা ঠেস দিয়ে বলেছিল রতন—ভালই হল হরদা'। এক আকাশে যেমন দু'টো সূর্য ধরে না, এক আসরে তেমনি আমাদের দু'জনের ঠাঁই নেই। যাদুধনকে এবার ফাঁদ দেখাচ্ছি—দেখে নি তো কোনদিন। ঘুঘুই শুধু দেখেছে।

কিন্তু রতনের হিসাবে ভুল হয়েছিল। আসর থেকে বাইরে পান খেতে এসে সে ভুল ভাঙল। রঙ্গলাল এবং আরও কয়েকজন লোক একটা পান-বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনছে।

কে ওরা? রতন সন্দিগ্ধ চিত্তে ফিরে এসে আসরে বসল। কথাটা বলল হরবংশকে।

হরবংশ বলল—সেদিন ডাক্তারবাবুকে যারা ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল সেই দলের কেউ নয় তো?

সন্দেহ গাঢ় হয়ে এল রতনের মনে। হয়ত হরদা'র কথাই ঠিক তা হলে এবার খোদ রতনেরই পালা। আচ্ছা দেখে নেব। মনে মনেই একবার কথাটা উচ্চারণ করল। দেখি তুমি কেমন বাপের ছেলে! আর আমিই বা কোন বাপের ছেলে!

রাত্রিশেষের মৃদু ঝির ঝিরে হাওয়ায় সটকাট রাস্তা বেয়ে আসছিল ওরা দু'জন। আকাশে প্রভাতী তারা। সম্মুখের পথে বেশিদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় না; দু'ধারে বন-জঙ্গলের গাছপালায় যেন আতঙ্কের শিহরিত বাণী ফিস ফিস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপরিসর রাস্তাটাও ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে। অনেক দূরে কোথাও সচকিত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে কম্পিত হচ্ছে শেষরাত্রির বাতাস। হঠাৎ সাইকেলের ব্রেক কষে বলল রতন—নামো নামো হরদা', শীগগির। বলতে বলতেই পিছনের ক্যারিয়ার থেকে হরবংশ নামবার আগেই, সাইকেলের সামনে একখানা আস্ত বাঁশ এসে পড়ায় চাকা স্লিপ করে সাইকেল-

শুরু, দু'জনেই পড়ে যায় রাস্তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে আরও জন চারেক লোক এসে ওদের টেনে নিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। ওরই মধ্যে একজন এসে রতনের বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরে। হরবংশও চোখের নিমেষে এসে তক্ষকারেই আততায়ীকে জাপটিয়ে ধরে জোরে। কিন্তু হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ করে আততায়ী ঢলে পড়ে যায় পাশে। রতনও উদ্ধার পায়। তখন আর আততায়ীর দলের কারও সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবত প্রথমজনের ঢলে পড়া দেখে আর কেউ এগোতে সাহস করে নি।
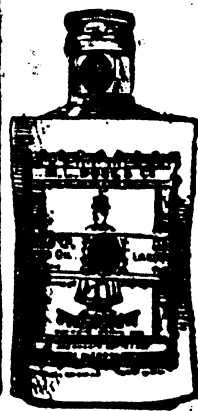
হরিমতীর কাছে এসে সব ঘটনা বলল তার স্বামী। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে কেঁদে উঠল হরিমতী। সেই অবস্থাতেই স্বামীকে বলল, শীগগির থানায় খবর দাও গো—আমার বাপকে ওরা মেরে ফেলেছে।

হরিমতীর স্বামী গিয়ে থানায় এজাহার দিয়ে এল—গত রাত্রিতে যাত্রা দেখে ফিরবার পথে তার শ্বশুর রঙ্গলালকে কে বা কারা জঙ্গলের মধ্যে গলা টিপে খুন করেছে।

দারোগা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখলেন—সত্যি সত্যি খুন হয়ে গিয়েছে একটা। ঘুরে ফিরে দেখলেন নিশ্চল মৃতদেহটা। মৃতের গলায় কয়েকটা আঙুলের দাগ বসে গিয়েছে। তার ফটো তুলে নিলেন।

নানা সাক্ষ্য-সাবুদে প্রমাণ পাওয়া গেল—ওর শত্রুপক্ষ রতন ও হরবংশকে সেদিন যাত্রার আসরে দেখা গিয়েছে এবং ওরা শেষ পর্যন্ত সোজা পথ ধরে না গিয়ে এই জঙ্গলের রাস্তাই বেছে নিয়েছিল যে-পথ দিয়ে রঙ্গলালের ও অন্যান্যের ফিরবার কথা।

রঙ্গলাল পড়ে যাওয়ার পরই রতন আর হরবংশ বাইরে এসে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। মুক্ত হাওয়ায় বুক ভরে বাতাস নিয়ে আবার ছুটল সাইকেলে। সাইকেলটা তখনও কি ভাগ্যি জঙ্গলের কিনারাতেই পড়ে ছিল। রতন এসে ডেকে তুলল ত্রস্তে ডাক্তারবাবুকে।

ধড়মড়িয়ে উঠলেন ডাক্তার—কি হল, কি হল।

রতন বলল—খুন হয়ে গেল ডাক্তারবাবু, খুন।

—কে খুন হল? কেমন করে?

ইতিমধ্যে লছমী জেগে উঠেছে। দাঁড়িয়েছে এ ঘরে। ভয়ে বোবা হয়ে গিয়েছে সে।

রতন সংক্ষেপে ঘটনা বলতেই লছমী চীৎকার করে কেঁদে উঠল—বাবাকে বাঁচাও ডাক্তারবাবু। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি বাবু।

সস্নেহে লছমীর হাত দু'টো ধরে গম্ভীর স্বরে বললেন ডাক্তারবাবু—শোন লছমী, এ সময় কাঁদতে নেই। সব ভেবে চিন্তে দেখতে হবে। আচ্ছা যা, তোরা ঘরে যা। আমি দেখছি। ওরা চলে গেলেও লছমী কিন্তু গেল না।

বাকী রাতটুকু ডাক্তারবাবুও ঘুমোন নি, লছমীও জেগে কাটিয়েছে।

রতন ও হরবংশ দু'জনকেই 'অ্যারেস্ট' করলেন দারোগা।

বছরখানেক কেস চলেছিল। মামলার সব খরচই ডাক্তারবাবু যোগান দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না। দায়রা বিচারে হরবংশের সাজা হয়ে গেল। রতন খালাস পেল—তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই।

ডাক্তারবাবুর সার্টিফিকেট হরবংশের পক্ষে তো যায়ই নি; উপরন্তু ঐ সার্টিফিকেটখানা তাঁর নিজের জীবনেও দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তাঁর সম্মান, গৌরব—সব ধূলি-লুণ্ঠিত করেছে। আশ্চর্য! ডাক্তারবাবু সেজন্য দুঃখিত হন নি একটুও।

জেরায় ডাক্তারবাবু নির্বিবাদে স্বীকার করেছিলেন,—হ্যাঁ, ও সার্টিফিকেট তাঁরই দেওয়া।

—কি লেখা আছে ওতে আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

—হ্যাঁ, হরবংশ সেদিন অসুস্থ ছিল।

—মৃতের গলায় যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে হরবংশের আঙুলের ছাপ হুবহু মিলে গিয়েছে, এ কথা জানেন?

—না। তবে একথা জানি, মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

জজসাহেব গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—আচ্ছা আপনি নেমে যান। উকিলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন অতঃপর—আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই তো আপনার?

—নো, মি লর্ড।

* * * *

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে মেঘমুক্ত নীল-আকাশ। পৃথিবীতে রূপোলী আলো স্বপ্নের মায়াজাল বুনে চলেছে। স্মৃতির বোঝা যাদের দুঃখ দিয়েছে, সুখে ভরিয়ে দিয়েছে—সব একত্রে ভিড় করে আসে এমন দিনে; মনের গহন অন্তস্তল থেকে বাইরের জগতে উঁকি মারে অসংখ্য স্মৃতির অস্ফুট শতদল। নিঝুম রাত—পিন পড়লেও বোধ হয় শব্দ শোনা যায়।

রাত দু'টোর কাছাকাছি। রাউণ্ডে এসেছি। সারা জেলখানাটা যেন মূর্চ্ছা গিয়েছে—কচিৎ কোন ওয়ার্ড থেকে সারাদিনের কর্মক্লান্তির নিশ্ছিদ্র আলস্যের অবসরে বন্দীদের নাসিকাধ্বনি ভেসে আসছে; কালো কম্বলের খাড়া খাড়া রোঁয়াগুলো অথবা মশকবাহিনীর পুলকিত কোরাস তাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাতই করতে পারছে না। রক্তপিপাসু বিপুলকায় ছারপোকাগুলো ছাদের কড়ি-বরগা থেকে টুপটাপ করে পড়ে গায়ের উপর, ভাঙা দেয়ালের গর্ত থেকে সদলবলে বেরিয়ে আক্রমণ করে ঘুমন্ত বন্দীর দলকে—তবুও তাদের ঘুম ভাঙে না। ভেসে আসছে ওয়ার্ডারপুঙ্গবের সবুট পদক্ষেপের আওয়াজ।

হঠাৎ চমকে গেলাম ডাঃ অরিন্দম মুখার্জীর সেলের সামনে এসে—এ কি, এখনও আপনি ঘুমোন নি!

—ঘুম আসছে না।

—কেন?

—এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। আর মনটা বড়ই উতলা হচ্ছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকালাম ডাক্তারের মুখের দিকে। আমার পিছনের দিকে চাঁদের আলো, আমাতে বাধা পেয়ে আবছা এসে পড়ছে সেলের সামনের বারান্দায়।

ডাক্তার বললেন—সে এক অদ্ভুত কাহিনী। অবিশ্বাস্য তার রূপ। অচিন্ত্য তার গতি।

—কি সে কাহিনী শুনতে পাই?

গলাটা খাটো করে বললেন—শুনবেন?—তারপর একেবারে দরজার কাছে এসে বললেন—শুনুন; কিন্তু কাউকে বলবেন না যেন—হঠাৎ হাত দু'টো চেপে ধরে বললেন।

আমি বুঝতে পারলাম, উষ্ণ অশ্রুজল কয়েক ফোঁটা পড়ল হাতের উপর।

আবারও শুধালেন ডাক্তারবাবু—কাউকে বলবেন না কোনদিন ?

কথা দিলাম—না। আচ্ছা তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

—স্বচ্ছন্দে।

—আপনি মিথ্যে সার্টিফিকেট দিতে গেলেন কেন সামান্য একটা কুলির জন্যে ?

—সেই কাহিনীই তো আপনাকে বলব, কেউ যা জানে না। আপনি জানেন না ওর জন্যে আমি সব করতে পারি। ও যে আমার একদিন কি উপকার করেছে তা আর বলবার নয়। ওর মহৎ-উদার অন্তঃকরণের পরিচয় তো আপনারা কেউ জানেন না, পৃথিবীর কেউ জানবে না কোনদিন আমি ছাড়া।

এবার আমাকে বসতে হল। সেলের সিঁড়িতেই বসে পড়লাম। ডাঃ মুখার্জী হাসলেন—শেষে মাটিতেই বসে পড়লেন।

আমিও হেসে উত্তর দিলাম—এ মাটির সঙ্গে যোগাযোগ তো খুব কমই ঘটে। তা ছাড়া চেয়ার, নয় টুল, নয় তক্তপোষ—এর উপরই তো কাটে অনেকটা সময়।

—তা বটে। মাটির মোলায়েম স্পর্শ লাগানো ভাল। শরীরের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান তো। কাজেই—কিন্তু আপনার কাজের ক্ষতি হবে না তো ?

—কাজ করতেই তো এসেছি। আপনাদের খবরদারী ; এই তো রাতের কাজ। সিপাইরা ঘুমাবে, আপনারা ঘুমান, কিন্তু আমাদের ঘুমানো চলবে না। যাক বলুন—

—তখন আমি ডাক্তারী পাশ করেছি। সেবার দুই-তিন মাসের জন্য বেড়াতে গিয়েছি রাঁচীর দিকে। একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকি। বাড়িতে কাজ করার জন্য আছে একজন সমর্থ পুরুষ—সে ঐ হরবংশ। মাঝে মাঝে ওর অসুখ-বিসুখ করলে আসত একটি মেয়ে। এমনভাবে গুছিয়ে ও ঘরের কাজ করত, ঠিক গৃহলক্ষ্মীর মত। সমস্ত বাড়িখানা ভরে উঠত কল্যাণীর হাতের স্পর্শ লেগে। নানা ছুতায় হরবংশকে তাই আমি সরিয়ে দিতাম কখনও কখনও। ওকে করতে দিতাম আমার সকল কাজ। এইভাবে মেয়েটির আসা-যাওয়াতে এ বাড়ির সঙ্গে ওর যেমন অন্তরঙ্গতা বাড়ল আমারও তেমনি ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল ওর সঙ্গে। এ বাড়ির মালিকের অন্তরে ওর আসন যেমন প্রতিষ্ঠিত হল, ওর হৃদয়েও বোধ করি তেমনি এক ভিন্‌দেশীয় পুরুষের ছায়া মুদ্রিত হয়ে গেল।

একদিন মেয়েটির বাপের হল কঠিন অসুখ। আমাকে দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে বললে মেয়েটী—ডাক্তারবাবু, আমার বাপাকে বাঁচিয়ে তুলুন ডাক্তারবাবু। আমার যে বাবা ছাড়া আর কেউ নেই।

উপেক্ষা করতে পারি নি তার ডাক। এ তো শুধু সম্পর্কবর্জিত রোগী দর্শনই নয়—আত্মদর্শনও। গেলাম। দিন সাত-আট-এর মধ্যেই তার বাপকে খাড়া করে তুললাম।

বুড়ো তো কৃতজ্ঞতায় কি করবে ভেবে পায় না। কিন্তু মেয়েটার যেন কি হয়েছে। যে বুড়ো মানুষটাকে ভাল করবার জন্যে তার সেবা-যত্নের সীমা ছিল না, সে-ই যখন ভাল হয়ে উঠল, সবই আগেকার মত চলতে লাগল, কিন্তু ছন্দপতন ঘটে গেল মেয়েটির ক্ষেত্রে। সে আমার বাসায় আর আগেকার মত আসে না। বুড়ো তাই নিয়ে রাগারাগি করে। আমিও ওকে না দেখে থাকতে পারি নে যেন। হরবংশকে শুধালে সে কিছু বলতে পারে না।

সেদিন হরবংশ নিজেই খবর আনল বুড়োর মেয়ের খুব অসুখ আজ কয়েকদিন ধরে।

শুনেই আমি ছুটে গেলাম। গিয়ে বুড়োকে বললাম—ওর অসুখ তো আমাকে খবর পাঠাও নি কেন ?

বুড়ো বললে—ঐ মেয়েই তো মানা করেছিল।

গম্ভীরমুখে এগিয়ে গেলাম—ওর বিছানার উপর বসে পড়ে বললাম—চিকিৎসকের কর্তব্য না হয় না-ই করতে দিলে, মানুষ হিসাবে কর্তব্যটা থেকেও কি বঞ্চিত করবে আমাকে ?

রোগিণীর কোন উত্তর নেই। চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। দেখে তাড়াতাড়ি রুমালটা বের করে জলটা মুছিয়ে দিলাম। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। উত্তরের আশায় তাকিয়েছিলাম আমিও একদৃষ্টে তার মুখের দিকে। লজ্জায় তার মুখ যেন লাল হয়ে গেল। কোন কথা বলতে পারল না। অথচ মনে হল সে যেন কিছু বলতে চায়।

আমি শেষে একটু ঝুঁকে পড়ে বললাম—এখানে থাকলে অসুখ সারবে না ; আমার বাসায় যাবে ? হাঁ, অবশ্য তোমার বাবাও যাবে।

দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্ক মানুষ জেগে উঠলে দেখে, তার দৈহিক কোন ক্ষতি হয় নি ; কিন্তু তবু তার আঘাতটা অন্তরে অন্তরে ব্যথা দিতে থাকে। আমিও যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে শুনতে পেলাম—মেয়েটি বলছে, না, যাবো না আপনার বাড়িতে।

সেদিন চলে এলাম। পরদিন দেখি বৃদ্ধ স্বয়ং মেয়েটিকে একটি গাড়ি করে এনে একেবারে পায়ের গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে বললে—বাবু, আপনি না হলে এ কখনই বাঁচবে না। কাল জ্বরের ঘোরে কেবলই চীৎকার করেছে—ডাক্তারকে ডাক, আসছে না কেন সে ? যাব না তার বাড়িতে। কেন যাবো ? এমনি সব আবোল-তাবোল বকুনি। ও রইল এখানে। আপনার যা ভালো মনে হয় করুন। আপনার হাতে মরলেও আমার শান্তি।

কয়েকদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় তাকে সারিয়ে তুললাম। একদিন বললাম—এবার বাড়ি যেতে পারো।

করুণ দৃষ্টিতে তাকাল সে—আপনি বলছেন বাড়ি যেতে ? যদি না যাই ? বলে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে নিজেই বলল—এটা কি বাড়ি নয় ?

আমি আমতা আমতা করে বললাম—না, না,—তা কেন ?

তবে—? আমি যাব না। জোর করে ঠেলে দেবেন ?

উত্তরে তাকে কাছে টেনে এনেছিলাম দু'হাতে জড়িয়ে।

এমনি এক জ্যোৎস্না রাতে সমস্ত শরীর ও মন ভরে উঠেছিল রোমাঞ্চে, বাতাসে ছিল মাদকতা, আকাশে ছিল রূপালী স্বপ্নমায়া। দু'জনে বেড়াতে গিয়েছিলাম দূর পাহাড়-অঞ্চলে। বেশ বুঝতে পারছি রাত অনেকটা হয়েছে, কিন্তু সেও চায় না ফিরতে, আমিও কিছুই বলছি না।

ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। অদূরে একটা জলধারার অঙ্গে

অঙ্গে শত শত চূর্ণ চাঁদ। হঠাৎ সে উঠে পালাল খেলার ছলে। কস্ত আমি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সারা শরীর আমার যেন মত্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছি সেও ভীরু হরিণীর মত কাঁপছে আমার আলিঙ্গনের মধ্যে।

হঠাৎ একটা সিপাই এসে স্যাল্যুট করাতে চমকে গেলাম। জেলখানার পেটা ঘড়িতে কখন যে তিনটে বেজেছে—খেয়াল করি নি। ডিউটি বদলী হয়েছে সিপাইদের। এবার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম—প্রায় এক ঘণ্টা হল এসেছি।

—তারপর ?—আমি শুধালাম ডাক্তারবাবুকে।

—তারপরই তো যা ঘটেছে তার জন্মে দায়ী পৃথিবীতে সুন্দর—অসুন্দর, হিংসা-দ্বন্দ্ব, খুন-খারাপী,—সব কিছু। তারই জন্মে ঘটেছে রাজ্যের উত্থান-পতন, মসনদের মালিকানা মিলিয়ে গেছে কালের সমুদ্রে নিমেষ মধ্যে।

নারীর ভালবাসা। ভালবাসার ভিখারী সেই চিরন্তন পুরুষ আমিও সেই মুহূর্তে ভুলেছিলাম সব কিছু—স্থান, কাল, পাত্র। তারপরই কেমন করে কোথা দিয়ে যে চরম অঘটনটা ঘটে গেল, তা আমি আজও মনে করতে পারি না।

এরপর আমি আরও কয়েক মাস ওখানে ছিলাম। কিন্তু সে আর আমাদের বাসায় আসত না। তবে আমাকে ওদের বাড়িতে আর একবার যেতে হয়েছিল—ওর বাবার মৃত্যুশয্যায় ওর বাবা জিজ্ঞেস করেছিল—মেয়েটিকে দেখবে বাবা ? কি বলেছিলাম উত্তরে, আজ আর তা মনে পড়ে না।

হরবংশ ছিল আমার খুব বাধ্য এবং ভক্ত। তাকে বলেছিলাম—মেয়েটার কেউ নেই, ও যদি ওকে বিয়ে করে, তবে ওর একটা কিনারা হয়। সরল প্রাণে বিশ্বাস করে হরবংশ আমার কথা মেনে নিয়েছিল। বিয়ে করেছিল তাকে।

যেদিন রাঁচী ছেড়ে চলে আসি, সেদিন গোপনে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং আমার ঠিকানাও দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম—কোন অসুবিধা হলে এই ঠিকানায় চিঠি লিখ, অথবা চলে যেও। কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে এসেছিলাম।

একখানা চিঠি দিয়েছিল সে একটি মেয়ের জন্ম দেবার পর। তারপর আর কোন চিঠিপত্র দেয় নি। আমি তো মনে করেছিলাম—মরেই গেল বুঝি সব।

আবার হঠাৎ দেখা হল আমি ঐ মিলের ডাক্তার হয়ে আসবার পর। চমকে উঠেছিলাম হরবংশকে দেখে। সে কিন্তু খুব খুশি হয়েছিল তার পুরনো মনিবকে দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিয়েছিলাম ওর কে কে আছে এখানে। তার ক'দিন পরেই ওকে বলেছিলাম—তোর মেয়েটাকে দেনা আমার বাসায় কাজ করবার জন্মে। ওর কোন কষ্ট হবে না দেখিস। একটা লোক খুঁজছি, পাচ্ছি না মনোমত।

—বেশ তো। বলে লছমীকে ডাক দিল। সে এসে দাঁড়াতেই বলল—এই আমার মেয়ে লছমী—প্রণাম কর ডাক্তারবাবুকে।

আমি সেই মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে হরবংশ বলল—কি দেখছেন ডাক্তারবাবু ?

—দেখছি ? ও, হ্যাঁ তোর মেয়েকে দেখছি। বড় লক্ষীমন্ত মেয়ে রে তোর !

একটু করুণ হাসল হরবংশ—তাই বটে, লক্ষীমন্তই বটে, বাপ যার করে কুলিগিরির কাজ, মা যার ভ্রষ্টা—সে তো হবেই লক্ষীমন্ত !

এমন সময় লছমীর মা ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল—আবার কোন্ হতভাগার সঙ্গে কথা বলছিস রে ?

ঠিকই বলেছে লছমীর মা 'হতভাগা', সে তার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। পৃথিবীর পুরুষমানুষের উপর তার কেমন সন্দেহ, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা এসে গেছে। সে ভাবে—ওদের মধ্যে এমন একটা শ্রেণী আছে, যারা স্বার্থপর, অথচ সমাজ-সচেতন। তার নারীত্বের মর্যাদার বিনিময়ে যা সে পেয়েছে একটা জীবনে তার দাম আজ তাকে একান্ত মূল্যহীন, লজ্জাহীন, অস্বস্তিকর অবস্থায় এনে ফেলেছে। নিজের ভুলের পুনরাবৃত্তি মেয়ের জীবনে যেন না হয়। তাই মেয়েকে সে চোখে-চোখে রাখে। পুরুষ দেখলে সে 'হতভাগা' 'হতচ্ছাড়া' ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে না।

আমার প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণটা, বলা বাহুল্য, আমার কানে মধুবর্ষণ করে নি। আমাকে যেন কশাঘাত করে উঠল তীব্রভাবে। আমি যথাসম্ভব দ্রুত স্থানত্যাগ করলাম।

লছমীও বিদ্যুদ্বেগে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। মায়ের মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল—কাকে কি যে বলো মা, তার ঠিক নেই। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—ডাক্তার ? মানে মিলের ডাক্তার ? কেন এসেছিলেন তিনি ?

—আমাকে তাঁর বাসায় কাজের জন্য বলছিলেন।

—না, যাওয়া হবে না তোমার।

—কিন্তু বাবা যে কথা দিয়ে ফেলেছে।

লছমীর কাছেই শোনা এসব কথা। ও সেই থেকেই আমার কাছে আছে। এখন বলুন—হরবংশের জন্মে একটা মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে কি আর এমন অন্যায় করেছি !

চাঁদ অস্ত নামল। জেল প্রাচীরের ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে এসে অন্ধকার করে দিল সামনের সামান্য উঠোনটুকু। ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেলেন নিজের বিছানায়। তাকিয়ে রইলেন সামনের অন্ধকার উঠোনের দিকে। আলোয়ভরা উঠোনটুকু কেমন ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে গেল !

বাকী রাতটুকু বিনিদ্র কেটেছে আমারও। ডাক্তারের কথা মনে পড়ছিল কেবলই। একটা দুষ্কৃতির লজ্জা ঢাকতে গিয়ে স্বেচ্ছায় যে এত বড় দুর্গতির বোঝা মাথায় তুলে নেয়, আইনের চোখে তার কোন মর্যাদা নেই, নেই কোন সম্মান, নেই কোন সহানুভূতি তার পক্ষে। স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে ডাক্তার কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ? হরবংশকে বাঁচানো কি সত্যিই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এতদিন পরে ?

লছমীর মায়ের কথাও ভাবছিলাম ঐ সঙ্গে। ভালবাসা যেখানে অপরাধ, ঘনিষ্ঠতা যেখানে সামাজিক বাধা, অন্তরঙ্গতা যেখানে মহা শত্রু—জেনে শুনেও সেখানে শত শত লছমীর মায়েরা আসে। শেষ পরিণাম হয় লাঞ্ছনা, অপমান আর বিড়ম্বনা। হারিয়ে যেতে হয় তাদের এমনি করেই কুলী-বস্তীর মাঝে।

সমাপ্ত
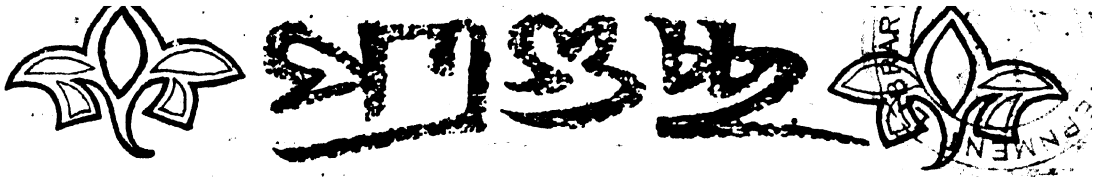
স্বামী বিবেকানন্দের একটি অপ্রকাশিত পত্র

একদিন কবিগুরুর মুখে শুনেছিলাম—

'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে,
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে।'

সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে যে নরদেবতা (Man-Gods) আছেন তাঁকেই কল্পনা থেকে টেনে এনে রাজসিংহাসনে বসালেন যিনি আধুনিককালে, তিনিই বিবেকানন্দ—কারণ শুধু যে তাঁর উপাস্য ছিল সর্বত্যাগী শংকর উমানাথ তা নয় তিনি বলতেন যে, ভুলিও না—নীচ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। কবির ভাষায়—

'পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর'

১৩৩৫ সালের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় অমিয় চক্রবর্তী ও ডাঃ সরসীলাল সরকারের পত্রালাপের মুখবন্ধে তিনি বলেছিলেন—আধুনিককালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন। সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন—তোমাদের মধ্যে আছে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে, সেই শক্তির পথ মানুষের প্রাণ-মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে···

শতবার্ষিকী বর্ষে দেশে-দেশান্তরে বিবেকানন্দের প্রশস্তি গীত হচ্ছে, তাঁর কর্মপ্রণালী, তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাঁর সংগঠনশক্তি, তাঁর চারিত্র বল, তাঁর আত্মনিষ্ঠা ও সেবার আদর্শ নিয়ে বহু কথা বলা হয়েছে ও হবে—তাই সেদিক দিয়ে না গিয়ে তাঁরই একটি অপ্রকাশিত পত্রের উল্লেখ করে আমার প্রণাম নিবেদন করবো।

ভারতবর্ষ পরিক্রমা করছেন এক তপস্বী পরিব্রাজক। দণ্ড হাতে গৈরিক পরিহিত সেই তেজঃপুঞ্জ ছবিটি আপনিই স্মরণে আসে। কন্যাকুমারী থেকে ফিরছেন স্বামীজী, ত্রিবান্দ্রম হয়ে এসেছেন পণ্ডিচেরীতে। সেখানে দেখা মাদ্রাজের ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে। দণ্ডকমণ্ডলু হাতে স্বামীজীকে দেখে তিনি চিনতে পারেন যে এই সন্ন্যাসীই ত্রিবান্দ্রমে অধ্যাপক সুন্দরম আয়ারের ঘরে অতিথি ছিলেন। মন্মথবাবু মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ন্যায়রত্নগোষ্ঠী গীতার মহাভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীর অধস্তন বংশ। মন্মথবাবু যখন ত্রিবান্দ্রমে, তখন স্বামীজী একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বল্লেন—মশায়, দক্ষিণী রান্না খেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি—ডাল, ভাত, সুক্তো, চচ্চড়ি খাওয়ান—

মন্মথবাবুর সঙ্গে স্বামীজী মাদ্রাজে এলেন এবং মন্মথবাবুর অতিথি হলেন—তার ফলে ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসভবনটি একটি সদাজাগ্রত কল্যাণকেন্দ্র ও বেদান্তচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠলো, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে। এই সময়েই স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব হচ্ছিল এবং তাঁর ভক্ত, অনুরাগী ও বন্ধুরা (যেমন রামনাদ ও খেতরীর রাজা) সকলে মিলে পশ্চিম যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন—১৮৯৩ সালের মে মাস—

I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child and christianity but a distant echo.

তাঁর বন্ধু ও অনুরাগী মন্মথবাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। আমেরিকা থেকে বহু পত্রালাপ তিনি করেছেন—এমনি একটি পত্রের কিছুটা সারাংশ আজ এখানে লিপিবদ্ধ করছি। মূল পত্রটি আমার কাছে আছে—তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যানিস্কাম থেকে লেখা—সমুদ্রতীরবর্তী একটি গ্রাম, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের নিকট। ঠিক যেদিন ঐ চিঠিটা লেখা হয়, সেদিন হাজার হাজার

মাইল দূরে কলকাতার টাউন হলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে (রবীন্দ্রনাথের—মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে স্মরণ করুন) একটি বিরাট জনসমাবেশে চিকাগোর ধর্মসভায় স্বামীজীর অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুরেন বাঁড়ুজ্যে ভূপেন বসু, রায় যতীন্দ্র চৌধুরী, নগেন ঘোষ, নরেন সেন, ডাক্তার ডেলী প্রভৃতি বহু মনীষী উপস্থিত ছিলেন। চিকাগো সভার সভাপতি ডাঃ জন হেনরী বারোজ প্যারীমোহনকে পত্র দেন যে :

চিকাগোর ধর্ম-মহামণ্ডলীতে আপনার বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হয়েছিলেন—তিনি বাগ্মিতা-শক্তিতে সকলকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করেছিলেন, স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব সম্যকরূপে বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন—প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা ও অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হইতেছে—আমেরিকার জনমণ্ডলী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেছে—আমাদের বিশ্বাস যে, আপনাদের সুপ্রাচীন সাহিত্য হতে আমাদের অনেক কিছু গ্রহণ করবার আছে ইত্যাদি।

শ্রদ্ধেয় সত্যেন মহাশয়ের বিবেকানন্দচরিত ও অন্যত্র এর পূর্ণ বিবরণ আছে।

মন্মথবাবুকে লিখিত যে পত্রটির আমি উল্লেখ করেছি সেটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পত্র এবং এটি প্রকাশিত না হওয়াই উচিত এমন মতামতও সুধী-সজ্জনমণ্ডলীর কেউ কেউ দিয়েছেন। এই পত্রটিতে স্বামীজীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের, চরিত্রের, নিষ্ঠার ও আদর্শপ্রীতির যে নিদর্শন আছে সেইটুকু লোকগোচর করাই উদ্দেশ্য। কারণ মহাপুরুষরা কালাতীত, লোকাতীত আত্মীয়তা সম্বন্ধের অতীত এমন এক তুরীয়লোকে থাকেন যে, মহত্তমদের আশীর্বাদ সকলেরই প্রাপ্য—তাঁদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মের ধারাই সেই আশীর্বাদকে প্রস্ফুট করে তোলে। তাঁরা কোন গোষ্ঠীর বা জাতির বিশেষ সম্পত্তি নন, তাঁরা সকল কালের, সকল যুগের, সকল দেশের, সকল মানবের, সেইজন্য তাঁদের বক্তব্য তাঁদেরই, যদিও স্বামীজী নিজে লিখেছেন,—'প্রত্যেক কথাটি হুঁসিয়ার হয়ে বলতে হয়—public man—সব ব্যাটারা ওৎ পেতে আছে।' এই পত্রের প্রথমে আছে—সেদিনের আমেরিকান সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র যেমন—

'এদেশে রুমালে হাজার নাক ঝাড়, কোনও দোষ নেই কিন্তু ঢেঁকুর তোলা মহা অসভ্যতা···এরা হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে ধনীজাত···'

'যদি একঝাঁক করে হিন্দুস্থানের লোক দুনিয়া ফিরে ঘরে যায়, হরেক বৎসর, তা'হলে—ভারতবর্ষের ২০ বৎসরে চেহারা ফিরে যাবে আর কিছু চাই না···'

'এদের দেশে টাকার নদী, বিত্তের ছড়াছড়ি, রূপের তরঙ্গ, স্বাস্থ্যকর দেশ, এ দুনিয়া ভোগ এরা খুব জানে। এদেশের মধ্যবিত্ত লোকের বাড়িতে যা আসবাব আছে তা ইউরোপে বড় বড় লর্ডের নেই···বড় বড় ইউরোপের প্রিন্স এদের যে করাতে আসে···'

তারপর তিনি লিখলেন ওদেশের মেয়েদের কথা—

'কত গুণ, কত দয়া, কত ধর্ম, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী···আমি আমেরিকার মেয়েদের পুষ্যিপুত্র—এরা যথার্থই আমার মা—এদের কল্যাণ হবে না ত' কাদের হবে···'

তারপর লিখলেন···keeping aloof from the community of nations is the only cause of downfall of India. Since the English have come, they are dragging you back into communion with other races and you are visibly rising again. Everyone that comes out of the country confers a benefit to the nation. For it is alone by doing that your horizon will expand. And as women could not avail themselves of this advantage, they have almost made no progress in India. (এই প্রসঙ্গে মেরী লুই বার্কের New Discoveries পুস্তকে রমাবাই circle সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য লক্ষণীয়)...'either you progress upwords or go back and die out. The only sign of life is onword and forword and expansion—contraction is death. Why you shall do good to others ? —because that is the only condition of life, because thereby you expand beyond your little self and live and grow. All narrowness, contraction, selfishness is simply slow suicide and when therefore a nation commits that fatal mistake of contracting itself and thus cutting off all expansion and life, it must die......Oh ! who would break this horrible crystalization of death. Lord help us.'

মধ্যে থ্রীন্‌একর বলে এক জায়গায় ছিলেন, সেখানে নানা উপদেশ দিয়েছেন সে কথাও আছে এই চিঠিতে—শিষ্য-শিষ্যারা তাঁকে গাছের তলায় ভারতবর্ষীয় প্রথায় ঘিরে বসতো আর তিনি উপদেশ ও ভাষণ দিয়ে যেতেন। এইগুলিই পরে Inspired talks বা দেববাণী নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ই তিনি বলেছিলেন :

I long—oh long for my rags, my shaven head, my sleep under the trees and my food from my begging.

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রথম কথাই হোল—অগ্নিমীলে—অগ্নি মানে অভীপ্সা, অগ্নি মানে আস্পৃহা—যিনি অগ্রণী তিনিই অগ্নি—হও আগুয়ান—চরৈবেতে—হে মহীদাস এগিয়ে চলো,—এই তো প্রথম ঋক্ প্রথম অনুবাক্—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি নজরুল ইসলামের অপ্রকাশিত পত্র

(অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা)

কৃষ্ণনগর
১।৩।২৮, বিকেল

প্রিয় মোতিহার।

তোমায় এবার থেকে মোতিহার ব'লে ডাকব। কাল সকাল সাড়ে দশটায় তোমার চিঠি পেয়েছি। কালই উত্তর দিতাম, কিন্তু পরশু রাত্তির থেকে জ্বরটা ও গলার ব্যথা বড্ডো বেড়ে ওঠায় কিছুতেই বসতে পারলাম না। তোমাদের চিঠি পাওয়ার পর জ্বর আরো বেড়ে ওঠে। সমস্ত দিন-রাত্তির ছিল—আজ ছেড়েছে সকালে। জ্বর ছেড়েছে কিন্তু গলার ব্যথা সারে নি। কথা বলতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে—আজও উপোস করছি। আল্লা মিঞা রোজা না রাখার শোধ তুলে নিবেন দেখছি—আচ্ছা করেই।

বড্ডো 'শক' পেয়েছি কাল উঁর চিঠি পড়ে। শরীর-মন দুই-ই অসুস্থ বলে হয়ত এতটা লাগল—হবেও বা। কেমন লাগল—জান? বাজপাখীর ভয়ে বেচারী কোকিল রাজকুমারীর ফুলবাগানে লুকোতে গিয়ে সহসা ব্যাধের তীর বিঁধে যেমন ঝাড়মুড়ে মুষড়ে পড়ে তেমনি।

কাল থেকেই কোথায় পালাই—কোথায় পালাই করছিল মনটা। দৈব মুখ তুলে চেয়েছে। একটু আগে দিলীপের তার পেলাম,—আমি ফিরেছি কি না জানতে চেয়েছে। এখখুনি তার করলাম—ফিরেছি। কাল দুপুরে কোলকাতা যাচ্ছি। এখন সেখানেই দুদশদিন থাকব। অতএব তোমরা কেউ পত্র দিলে সেখানেই দিও। আমার কোলকাতার ঠিকানা—১৫ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার (musician) থাকেন। যাঁকে 'বাঁধনহারা' dedicate করেছি।

এর মধ্যে তোমাদের চিঠি এসে পড়লে কোলকাতায় redirected হয়ে যাবে—ব্যবস্থা করে গেলাম।

তোমার অভিমান-তপ্ত চিঠি আমার যে কি ভালো লাগছে—তা আর কি বলবো! কতবারই না পড়লাম—যেন প্রিয়ার চিঠি—! ভাগ্যিস তুমি মেয়ে হয়ে জন্মাও নি—নৈলে এবার তোমারই হয়ত ভালোবেসে ফেলতাম ঢাকা গিয়ে। এমন দর্পণের মত স্বচ্ছ, শহদের মত মিষ্টিমন কোথায় পেলে বলত নীরস গণিতবিদ!

কাল তোমার চিঠিটা যদি এসে না পড়তো—তোমার চিঠির সাথে,—তাহলে কি যে হত আমার—তা ভাবতেও পারি নি।

সে থাক। আজ যে তোমার চিঠি পাবই মনে করেছিলাম। কেন চিঠি এল না বলত? আমি রবিবারে তোমার চিঠি পোষ্ট করেছি এখানে। সে চিঠি অন্তত মঙ্গলবারে পাওয়া উচিত ছিল তোমার দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে late-fee দিয়ে পোষ্ট করতে দিয়েছিলাম নিজে যেতে পারি নি পোষ্ট করতে—কিন্তু যাকে দিয়েছি—সে ত' ভুল করে না।

কাল তোমার চিঠি পাবই আশা করছি। বোধ হয় নিরাশ হব না। আর যদি হই, কি আর করব।

তুমি ছাড়া আর কারুর চিঠি পেতে ভয় করবে আমার—যদি ঐ রকম চিঠি হয়! তবে, ঐ এক চিঠি পেয়েই যতদূর বুঝেছি—আমায় তিনি দ্বিতীয় চিঠি দিয়ে দয়া করবেন না।

তোমার চাওয়া গানটা এবং তোমার লেখা (অগ্রদূত) চিঠিটা পাঠালাম। কপি করবার মত হাতে জোর নেই ভাই। কি যে দুর্বল হয়ে গেছি, তা ভাবতে পার না। গলার ভিতর ঘা-ই হল না কি, solid কিছু খেতে পারছি নে। এর জন্যও অন্তত কোলকাতা যাওয়ার দরকার আমার। অগ্রদূতের চিঠিটা তোমার দেখা হলে পর আবার আমায়—পাঠিয়ে দিও কোলকাতায়। ওটার উপর তোমার কোন দাবী নেই।

বুদ্ধদেব বসুকে একটা কবিতা পাঠালাম। গজল-গানের স্বরলিপিও পাঠাচ্ছি আজকালের মধ্যে—দেখা হলে বলো।

আবুল হোসেন খুব রেগেছেন নয়? ওঁর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ো। আমি যে কেমন করে ফিরে এসেছি আমিই জানি নে।

আবুল হোসেন, মিঃ বোরা, কাজী ওদুদ প্রভৃতিকে আমার অপরাধ ক্ষমা করতে বলো।

বুদ্ধদেব খুব রেগে চিঠি দিয়েছে—কেন অমন করে না বলে চলে এলাম। কেন যে এলাম তা কি আমিই জানি।

আচ্ছা মোতিহার! তুমি কোনদিন কাউকে ভালবেসেছিলে—? তখন তোমার কি মনে হত? খুব কি যন্ত্রণা হত বুকে? সে ছাড়া জগতের আর সব কিছুই কি বিস্বাদ ঠেকত তখন?

এত সুন্দর এত কোমল—একমুঠো ফুলের মত তোমার মন—হয়ত আজো পিষ্ট হয় নি কোন বেদরদীর চরণে। তোমার চিঠি পড়ে এক একবার হাসি পাচ্ছে, আবার খুসিও হয়ে উঠছি—যে তুমি ত' পুরুষ মানুষ—তোমারই যদি এই অবস্থা হয়—আমায় দেখে, ভাল লাগে—তা হলে কোন তরুণী যদি কোনদিন ভালবাসতো আমায় তা হলে তার কি অবস্থা হত।

তুমি এক জায়গায় লিখেছ,—মনে, হয় যেন একটু দুঃখ পাচ্ছি—কিন্তু 'কি মধুর সে দুঃখ!' এ-দুঃখ কি আমাকে পারিয়ে? আমায় বলতে তোমার সঙ্কোচ হবে না নিশ্চই। 'সেতুই কি শেষে জলে পড়ে গেল?' আচ্ছা মোতিহার! তুমি যে দেবতার পায়ে 'চুঙ্গল' অবশ্য তোমার এ কথাটার মানে জানি না) এবং মাথায় শিং দেখেছ—সে দেবতা কি আমিই? আমার বন্ধুরা আমার গোঁ ও শরীর দেখে আমায় 'বাবা তারকনাথের ষাঁড় বলে গালি দেন—শত্রুরাও অন্তত এই শরীরটার আর শিং দু'টোর জন্যই ভয়ে জড়সড়—কিন্তু এরি মধ্যে তুমি এ-কথা জানলে কি করে—বল ত'! এ জানার সোর্স কি অন্য কেও? তুমি আমার শিং দেখেছ—তিনিও আমার হয়ত দশটা মুণ্ডু বিশটা হাত দেখেছেন!—কোরানে আছে—শয়তানের চেয়ে সুন্দর করে কাউকে সৃষ্টি করেন নি খোদা।—আমরাও বিউটিফুলের উপাসক—জগতে সুন্দর ছাড়া—পাপ-পুণ্য মন্দ ভালোর খবর রাখি নে—কাজেই শিং যে দেখবে ফুলচন্দন দিতে এসে—তাতে আর বিচিত্র কি!

আচ্ছা, সত্যি করে লিখো ত,' আমি যে তোমায় টিঁটি—এ খবর তুমি জেনেছিলে—না দেখেছিলে—?

গত বছর এমনি দিনে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—ঢাকায়। কিন্তু সেবার ত' তুমি অনেকটা দূরে-দূরেই ছিলে। এবার কি খুব বড় একটা দুঃখের ভিতর দিয়েই আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেয়েছি? এ রহস্যের ত' হদিস খুঁজে পাচ্ছি নে বন্ধু। তোমরা গণিতবিদ, ক্লিয়ার ব্রেন তোমাদের, হয় তো এর solution খুঁজে পাবে।

'sympathetic vibration' music-এই আছে জানতাম—ওটা যে mathematics-এও আছে জেনে mathematics-এ আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, telepathyটা কি science-এর না কাব্যের? এমনি দু-একটা জায়গায় এসে অঙ্কে কবিতায়—বিজ্ঞানে—সুরে—হৃদয়-বিনিময়—হয়ে গেছে বোধ হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে—এইবার আমার নতুন করে মনে হচ্ছে, স্রষ্টা—গণিতবিদ না কবি? লোকটা এত হিসেবী অথচ এত সুন্দর। আমার বেদনা অনেকটা উপশম হয়েছে এই ভেবে যে,—অন্তত একজনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছে আমার পত্রের প্রতীক্ষায় থেকে—তা হোক না সে পুরুষ। আচ্ছা বন্ধু, এত শক্ত মনের পুরুষ, তার কান্না পায়—আমার একটুক অবহেলায়,—আর একজন নারী—হোক না সে পাষাণ-প্রতিমা—তার কিছু হয় না? কিন্তু বুঝতে পারছি নে, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বন্ধু, একজন নারী সে এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে?

যাক্, আজ ডাকের সময় যাচ্ছে। আবার লিখব—। কোলকাতাতে ঐ ঠিকানায় চিঠি দিও। তুমি আদর ভালোবাসা নাও। খোকা-খুকীদের চুমু দিও। ইতি—

তোমার—নজরুল

অবচেতন

তারাশঙ্কর পাণিগ্রাহী

হৃদয় বয়স্ক হয়। বিমূঢ় চেতনা।
রোগতুষ্ট সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে,
ছাদের কার্নিশে পড়ি। টবের ক্যাক্টাস।
নরম কমলা রোদে হাসে শুধু হাসে।
যন্ত্রণায় দগ্ধনীল এ যন্ত্র হৃদয়···
উত্তুরে বাতাস যেন সদ্যোস্নাতা কুমারীর মন,
রোদ, জল, বৃষ্টি, ঝড়, আকাশ, পৃথিবী—
শিলীভূত কামনার সমাপ্তি এখন।
রূপোলী, সোনালী, নীল, হরিৎ, বেগুনী,
অপূর্ব বর্ণাঢ্য শোভা। রক্তের অঙ্গার।
মুক্তোর সান্নিধ্যে তপ্ত ঝিনুকের সাধ,
শূন্য তায় কেঁপে ওঠে ভৃঙ্গার-ভৃঙ্গার।
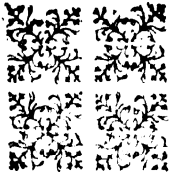
ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু

[বিদগ্ধ বিজ্ঞান সাধক—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান]

বিজ্ঞানের সাধনায়, অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন যাঁরা, যাঁদের প্রতিভা দেশের বিজ্ঞানচর্চার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেছে—বাঙলা তথা ভারতের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর পূর্ণেন্দুকুমার বসু তাঁদেরই একজন।

পশ্চিম বাঙলার অন্তর্গত সোনারপুরে ১৯১৬ সালে বাঙলার এই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের জন্ম। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ও অতুলবালা বসু মহাশয়ার ছয় পুত্রের মধ্যে ইনি পঞ্চম। অন্যান্য ভ্রাতারা সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য ও সফলতার অধিকারী। বালিগঞ্জে জগদ্বন্ধু স্কুল থেকে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্সে ইনি সসম্মানে এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরিসংখ্যানবিদ্ হিসাবে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ১৯৩৯ থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানবিদ্যার স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৫০ সালে ঐ বিভাগের প্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজেও ইনি এক বৎসর অধ্যাপকরূপে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিদ্যায় ডক্টর অফ ফিলসফি উপাধির তিনিই প্রথম প্রাপক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ইনি নয়াদিল্লীর আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৫০)। ১৯৫৪ সালে এ্যামস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণিত কংগ্রেসে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা গণিত সভা এবং কলকাতা পরিসংখ্যান সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন। ট্রায়ারে অনুষ্ঠিত জার্মান পরিসংখ্যান সম্মেলনেও ইনি আমন্ত্রিত হন। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় তিনি পরিদর্শন করেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিসংখ্যান বিভাগে ইনি পৌরোহিত্য করেন। ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি নানাভাবে সংযুক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং এ্যাকাডেমি কাউন্সিলের তিনি অন্যতম সদস্য। খড়গপুরের ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির গণিত বিভাগের পরিদর্শক কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য। ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি কনট্রোলের সংগঠন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে এন পি সি দলটি প্রেরিত হয় ডক্টর বসু সেই দলের নেতা নির্বাচিত হন। ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদ, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এ্যাসোসিয়েশন, গণিত সভা, ভারত সরকারের ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের পরিসংখ্যান পরিষদ, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান পরিষদের তিনি অন্যতম সভ্য এবং কলকাতা পরিসংখ্যান সংস্থার তিনি সচিব। মোহনবাগান, সি এ বি এবং এরিয়ান্স ক্লাব প্রভৃতি বিখ্যাত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট।

অনন্যসাধারণ দক্ষতা এবং অক্লান্ত কর্মোদ্যম তাঁর জীবনের মূলধন। এই মূলধন তাঁকে উপনীত করেছে সফলতার সমুন্নত শীর্ষে। প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিক এখনও পঞ্চাশে পৌছন নি। কামনা করি, আরও দীর্ঘকাল তিনি আমাদের মধ্যে থাকুন এবং তাঁর অনন্য প্রতিভায় দেশ ও জাতিকে আরও নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলুন।

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[সাহিত্যরসিক ও প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক]

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, কঠোর পরিশ্রম ও কর্মে সততা যে মানুষের জীবনে সাফল্য আনয়ন করে, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। বাংলা দেশে যে পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসা বহুবিধ ব্যবসার অন্যতম একটি মর্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যবসা হিসাবে গণ্য, সেই ব্যবসায় শচীন্দ্রনাথ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসে যশোহর জেলার এক পল্লীতে শচীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার মালিপোতায়। শচীন্দ্রনাথের পিতামহ পরে যশোহর জেলার মহারাজপুর গ্রামে বসবাস করেন। পিতামহ বা পিতা স্বর্গত হরভূষণ মুখোপাধ্যায় কোনদিন চাকুরী করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যা ছিল তাতেই মোটামুটি স্বচ্ছন্দে চলে যেত তাঁর। সে কারণ, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে কোনদিন কাছছাড়া করতে চান নি। কিন্তু শৈশব থেকেই পড়াশোনায় প্রতি আগ্রহ দেখে, তাঁর মাতুল তাঁকে কলকাতায় এনে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে (মেন) ভর্তি করে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'বছরের মধ্যেই মাতুলের মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয় এবং এক বছর নলডাঙ্গা রাজ-স্কুলে পড়ার পর খুলনা জেলার একটি স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯২৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন শচীন্দ্রনাথ।

পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে পিতার আর্থিক বিপর্যয়হেতু তাঁকে নিজের চেষ্টায় পড়াশোনার সমস্ত ব্যবস্থা করতে হয় এবং ১৯৩০ সালে বি-এ পাশ করেন। ইংরেজীতে এম-এ পড়ার সময়েই সাতক্ষীরা বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা উমা দেবীর সঙ্গে ১৩৪১ সালে তাঁর বিবাহ হয়। উমা দেবীর মাতা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রী (ভ্রাতষ্পুত্রের কন্যা)। উক্ত সময় সংসারের অধিক দায়িত্বের জন্য শেষ পর্যন্ত এম-এ পড়ার ইস্তফা দিতে তিনি বাধ্য হন এবং রিপন কলেজে আইন পড়া ও সেই সঙ্গে সামান্য কিছু উপার্জনের জন্য প্রখ্যাত প্রকাশক কমলা বুক ডিপোতে সেলস্‌ম্যানের চাকুরী গ্রহণ করেন। এই ভাবে দু'বছর চাকুরী করার পর কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে প্রকাশনা বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব দেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যের প্রতি শচীন্দ্রনাথের অনুরাগ প্রকাশ পায়। হাতের লেখা পত্রিকায় তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে কিশোরদের উপযোগী উপন্যাস 'মৃত্যুর কবলে' ও 'চীন-জাপানের এ-ও-তা' প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়কুমার সরকার। পরাধীন ভারতে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ও সিমলা ব্যায়াম সমিতির সভ্যরূপে শরীর চর্চাতেও শচীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ পায়। আজ তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও সুগঠিত ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং অক্লান্তকর্মী।

কমলা বুক ডিপোর প্রকাশনা বিভাগের কর্তৃত্ব পাওয়ায় বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসার তাঁর সুযোগ ঘটে এবং ঐ সময় থেকেই কিছুদিন নিজের উদ্যোগে ও কিছুদিন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে 'সবুজ সাহিত্য' 'আয়রণ' নামে প্রকাশনা আরম্ভ করেন। কমলা বুক ডিপোর মাধ্যমেই এই সকল গ্রন্থ বিক্রিত হ'ত।

এদিকে দেশে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে, চাকুরী ও টিউসনির অর্থে সংসার ব্যয় নির্বাহ করা দুষ্কর, এমন সময় প্রখ্যাত লেখক মনোজ বসুর সঙ্গে কমলা বুক ডিপোর লেখক হিসাবেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁরই আগ্রহে তাঁর কয়েকখানি প্রকাশিত গ্রন্থ ও শচীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি নিয়ে ১৯৪৩ সালের ১১ই আগষ্ট যুক্তভাবে বেঙ্গল পাবলিশার্সের প্রতিষ্ঠা হয়। শচীন্দ্রনাথের জীবনের এ এক বিশেষ ক্ষণ বলা যায়। অতি সামান্য মূলধন সম্বল করে এই রাষ্ট্র বিপর্যয়ের মধ্যেই তিনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতকেই বরণ করে নেন। এই কার্যে তাঁকে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করেন তাঁর সহধর্মিণী। সুখে লালিত-পালিত স্বচ্ছল পরিবারের কন্যা হয়েও, সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তিনি নানাভাবে স্বামীর এই প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তুলতে চেষ্টা করেন।

নতুন ব্যবসা শুরু করার এক মাসের মধ্যেই তাঁর প্রিয় প্রথমা কন্যার মৃত্যু হয়। নিজেও প্রায় একমাস অসুস্থ থাকেন। তার উপর উক্ত সময়েই কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ে। রোগ, শোক, ও রাষ্ট্রবিপর্যয় সত্ত্বেও তাঁর কর্মকুশলতা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বেঙ্গল পাবলিশার্স সাধারণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের জন্য দেশের সাহিত্যিকদের আন্তরিক সহানুভূতির কথাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রায় তিনবৎসর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রদের 'বাক্‌-সাহিত্য' নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান করে দিয়েছেন। তাঁর সুপরিচালনায় গুণে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিও প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই প্রকাশকদিগের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

জিজ্ঞাসিত হলে শচীন্দ্রনাথ বলেন, উপযুক্ত গ্রন্থ-নির্বাচন, বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন, সততা ও গ্রন্থকারদের সঙ্গে সম্প্রীতিরক্ষাই পুস্তক-ব্যবসায়ে উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপান। তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত

[পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যা]

সর্বসাধারণের জন্যে অন্তহীন সহানুভূতি, উন্নয়নধর্মী আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গী, দরদ আন্তরিকতায় ভরপুর একটি কল্যাণধর্মী মন যাঁদের জনপ্রিয়তার উচ্চশীর্ষে উপনীত করেছে, বাংলার স্বনামধন্যা সমাজ সেবিকা পশ্চিম বাংলার বিধানসভার সদস্যা শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত সেই তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। যে সব মহিলার কর্মক্ষেত্র গৃহকোণের চার দেওয়াল অতিক্রম করে বহুদূরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে সুধারাণী দত্ত তাঁদেরই সমগোত্রা। সংসারধর্ম নিখুঁতভাবে পালন করেও বাইরের পৃথিবীর নানা কর্মে সমান ভাবে ভূমিকাগ্রহণে এঁদের দক্ষতা ও শক্তিমত্তার ছাপ বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে এলাহাবাদে শ্রীমতী দত্তের জন্ম। পিতৃনাম স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মিত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত উপাচার্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্যান্সার ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুবোধ মিত্র এঁর পিতৃব্য। বিখ্যাত মহিলা-শিক্ষাব্রতী ডক্টর শোভা বসু এঁর অগ্রজা।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের দশম শ্রেণীতে পাঠরতা অবস্থায় প্রখ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ ডাঃ মন্মথনাথ দত্তের সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন শ্রীমতী দত্ত। স্কুলের ছাত্রী হিসাবে গান-বাজনায় প্রভৃত সুনাম অর্জনে সুধারাণী সমর্থ হন এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে শুশ্রূষাশিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করেন। সেবাব্রত ও সমাজকল্যাণে দীক্ষালাভ তাঁর ছাত্রীজীবনেই ঘটে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং সক্রিয় সংযোগ তাঁর সেবাব্রতী মনের পরিচয় বহন করে। খেলাধুলাতেও ছাত্রীজীবনে তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। উত্তরজীবনে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর উদ্যম এবং আগ্রহের অন্ত মেলা ভার।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলভুক্ত হিসাবে ইনি রাইপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। অন্যান্যদের জামানত পর্যন্ত জব্দ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনও তাঁর ললাটে এঁকে দিয়েছে জয়তিলক।

তাঁর তত্ত্বাবধানে রাইপুর কেন্দ্রে গড়ে উঠেছে বহু শিক্ষায়তন যাতলার আগামী দিনের অনেকানেক নাগরিকবৃন্দ আজ সেখানে পাঠ গ্রহণের দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সেখানে গড়ে উঠেছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নিত্যনিয়ত অসংখ্য রোগজর্জর মানুষের শুশ্রূষা পরিচর্যা চলছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের পরিদর্শক কমিটির ইনি একজন প্রাক্তন সদস্যা।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শক কমিটী, এ. আই. ডব্লিউ. সি এবং বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এ্যাসোসিয়েশানের ইনি অন্যতমা সদস্যা। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যতমা কর্মকর্ত্রী হিসাবেও ইনি সংশ্লিষ্ট। উত্তরকলিকাতা মহিলা সমিতির ইনি অন্যতমা পৃষ্ঠপোষিকা। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশানের ইনি সহকারী সভানেত্রী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের মহিলা বিভাগ, উইমেনস স্পোর্টস ফেডারেশান, ভারত সেবক সমাজ (বাঁকুড়া), রাণী বাঁধ অনুন্নত জনসেবাসমিতি এবং রাইপুর গার্লস জুনিয়ার হাই-স্কুলের সভানেত্রীর সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ আসনে ইনি সগৌরবে সমাসীনা।

শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

[প্রথিতযশা আলোকচিত্রী]

ট্রেন ছাড়ার সময় ঘনিয়ে আসে। একটি জনবিরল সেকেণ্ড ক্লাস কামরা। সে কামরায় যাত্রী বলতে শুধু তের-চোদ্দ বছরের একটি বালক। ট্রেন প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে হঠাৎ ছুটতে ছুটতে তিন-চারজন যুবক সেই কামরায় উঠে পড়লেন একের পর এক। ট্রেন ছুটে চলে, কখনও ঘন জনবসতির ভিতর দিয়ে পথ করে, কখনও সীমাহীন উন্মুক্ত সবুজের মধ্যে দিয়ে এক অপূর্ব যান্ত্রিক শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে করতে। কিছুক্ষণ পরের কথা নেই কামরাতেই উঠলেন এক চেকার। যুবকদের কাছে টিকিট চাইলেন—তারা অকপটে বললে, টিকিট কাটা হয় নি, আমরা পরের স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে যথাযথ টিকিট কিনে নিচ্ছি। চেকার সন্তুষ্ট হলেন না। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে হঠাৎ জাত তুলে গালি দিয়ে বসলেন যুবকদের। ছেলেটি এতক্ষণ নির্বাক দর্শকের মত কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল, বাঙালীর অসম্মান তার বালকচিত্তকে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলল—উপরের বাঙ্ক থেকে চেকারটির উদ্দেশে সে বাক্স ছুঁড়ে মারল—যুবকবৃন্দ জানালাটি খুলে চেকারটিকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে দিল—যুবকবৃন্দ লক্ষ্য করল বালকটির স্বাজাত্যাভিমান, দুর্জয় সাহস এবং অদম্য মনোবল, যুবকবৃন্দের মধ্যে একজন প্রাতঃস্মরণীয় বাঘা যতীন, আর একজন পরবর্তীকালের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বালকটি বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী শ্রীযুক্ত কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত সন্তোষপুরে আদি নিবাস। কলকাতা মহানগরীতে ১৩১০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯০৩ খৃঃ) কাঞ্চনকুমারের জন্ম। পিতার নাম স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিপন স্কুলে বিদ্যারম্ভ হয় কাঞ্চনকুমারের। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এইখানে পাঠ নিলেন। এরপর অভিভাবকবর্গ তাঁকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করা স্থির করলেন পরবর্তী অধ্যয়নের জন্য। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হ'ল। যাবার সময় ট্রেনে ঘটল পূর্বোক্ত ঘটনা। পরাধীনতার অক্টোপাশে জাতীয় সত্তা তখন নিষ্পেষিত, শাসন আর শোষণে দলিত জাতির অন্তরাত্মা তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, কয়েকজন মুক্তিকামী যুবক

শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

তখন মুক্তির মন্ত্র পৌঁছে দিচ্ছেন ঘরে ঘরে, তাঁদের নেতৃত্বে সারা দেশে এক অনবদ্য জাগরণ দেখা দিয়েছে—জননীর শৃঙ্খলমোচনের তপস্যাতেই বাঘা যতীন, সুরেশ মজুমদার প্রমুখ তরুণ দল সেদিন মগ্ন। কাঞ্চনকুমারের মত তেজোদ্দীপ্ত বালককে আপন দলভুক্ত করার বাসনা জাগল তাঁদের মনে। মাতুলালয়ে তাঁদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ ঘটে কাঞ্চনকুমারের। বিপ্লবের পথ হাতছানি দেয় কাঞ্চনকুমারকে। বাড়ি থেকে অনুমতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব কৌশল অবলম্বন ছাড়া পথ কোথায়? বুকে বেদনার ছল করলেন, বহু চিকিৎসককে দেখানো হ'ল কেউই কিছু করতে পারলেন না। আসল ব্যাপারটি এক মুহূর্তে পরীক্ষা করেই ধরে ফেললেন সারা ভারতের ধন্বন্তরী চিকিৎসক পশ্চিম বাংলার লোকান্তরিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাড়িতে তখন আর কারো জানতে বাকী রইল না যে, বিপ্লবে যোগদানের জন্যে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ত্যাগ করার এই কৌশল।

তারপর জীবনের যাত্রাপথের মোড় ফেরে। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে বছর পাঁচেক পাঠ নেন। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করে তাঁর পৈতৃক 'মহিলা প্রেস'-এ যোগ দিলেন। আলোকচিত্রে তাঁর দক্ষতা বাল্যকাল থেকেই। 'বসুমতী' পত্রিকাতেই বাংলার সুপ্রসিদ্ধ প্রেস ফোটোগ্রাফার কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের হাতেখড়ি। ১৯১৯ সালের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হল 'বসুমতী'র সঙ্গে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের পরদিন তিনি প্রেস ফোটোগ্রাফার হিসাবে স্বীকৃত হলেন। পরের ইতিহাস কৃতিত্বে ভরপুর, গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল, অসাধারণ দক্ষতায়, নৈপুণ্যে এবং কর্মকুশলতায় প্রেস ফোটোগ্রাফারদের পুরোভাগে আসন অর্জন করতে সমর্থ হলেন। এই সুদীর্ঘকালে মহানগরীতে যত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে, তাদের প্রত্যেকটির স্মৃতি জীবন্ত হয়ে আছে তাঁর ক্যামেরার মধ্যে। গণনাতীত দিকপাল নায়করা ধরা দিয়েছেন তাঁর ক্যামেরার সামনে। বসুমতীর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের যোগ এখনও অটুট সময়ের অগ্রগমনে সেই যোগ ক্রমেই, দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠছে। তাঁর তোলা আলোকচিত্র নিয়মিতভাবে বসুমতীর পৃষ্ঠা ভরিয়ে তুলেছে। ১৯৩২ সালে তাঁর সুবিখ্যাত ব্লকনির্মাণ ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ফোটোটাইপের পত্তন হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁর অভিজ্ঞ নেতৃত্বে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও সুনাম অর্জন করেছে।

আলোকচিত্র তাঁর ধ্যান জ্ঞান সাধনা হলেও জীবনকে তিনি প্রসারিত করে দিয়েছেন নানা দিকে, বন্দুক ছোড়া ও মাছ ধরা তাঁর বিশেষ শখ। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সাহিত্যের রসাস্বাদ করে থাকেন। নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের তিনি আজীবন সদস্য। প্রেস ফোটোগ্রাফার্স এ্যাসোসিয়েশান অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতিরূপে আসন তাঁর দ্বারা দু'বার অলঙ্কৃত হয়েছে, ঐ প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে তিনি সহকারী সভাপতি, (বর্তমান সভাপতি—মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে) এ্যাসোসিয়েশান অফ মাস্টার্স প্রিণ্টার্সের তিনি সদস্য।

তাঁর মতে এখনকার আলোকচিত্র অনেক প্রগতিশীল সেইজন্যই তার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আলোকচিত্রীর পক্ষে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। চোখই হচ্ছে প্রধান মাধ্যম। দু'চোখ ভরে দেখে যেতে হবে, দেখা যত নিখুঁত হবে ব্যাপক হবে, গভীর হবে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে তত সহজ। কাঞ্চনবাবুর অভিমতে—আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে সারা ভারতের তুলনায় বাংলার স্থান অনেক উচ্চে।

॥ আবারো রৌদ্রের দিন ॥

সরিৎ শর্মা

আবারো রৌদ্রের দিন : চতুর কোকিল ডাকে অতি সুনিপুণ,
ডেকে ডেকে কী নিষ্ঠুর স্বরের তূরপুণ
ব্যবহারে একটানা ছিদ্র করে কঠিন হৃদয়—
অথচ সামনে ছাখ অমোঘ তর্জনী তুলে শাসক সময়।

এলোমেলো হাওয়া দেয়, পাতা ঝরে বনের—মনের,
আগুনের আঁচে কাঁপা দূর আকাশের
ভেসে-আসা নিঃসঙ্গ সুতীক্ষ্ণ কোনো চিলের চিৎকার
ধূ-ধূ করে কেমন কেমন করা উধাও প্রসার··
কি করে বোঝাই কাকে, কি যে চেয়ে কি জ্বালায় জ্বলি—
শুধু দেখি খাঁ খাঁ রোদে ছায়া খুঁজে
বুকে হাঁটে এ-পাড়ার গলি।

আমিও কোকিল এক—যন্ত্রণার রুক্ষ মাঠে
চলি ডেকে ডেকে··

হঠাৎ-বৃষ্টির মত যদি কোনো কবিবন্ধু
চিঠি লেখে কলকাতা থেকে।

॥ গান ॥

(John Hall Wheelock এর 'Song' কবিতার অনুবাদ)

স্বপ্নেন্দু ভৌমিক

দূরে বায়ু, তুমি পূর্বকালীন সমুদ্রবায়ু,
আমার স্বপ্নে আমাকে জাগিয়েছো,
তোমার মৃদু বায়ু, স্মৃতির কোনো সমুদ্রে
আমাকে ভাসিয়েছে,
আমিও চিরদিন স্বপ্নে ভেসেছি,
আমি জেগেছি, তবুও সমস্ত কিছুকে মনে হয়েছে
অন্ধকার স্বপ্ন, মিথ্যে ভাবে সত্যি—
অন্ধকারই রাত্রি, স্বপ্নের অন্ধকারে
আমি ভেসেছি।
তবে, মিথ্যে কি, সত্যি কি?
যে মৃদু বায়ু বয়েছে
কোনো দূর সমুদ্রের বায়ু
আমাকে স্বপ্নে জাগিয়েছে ॥
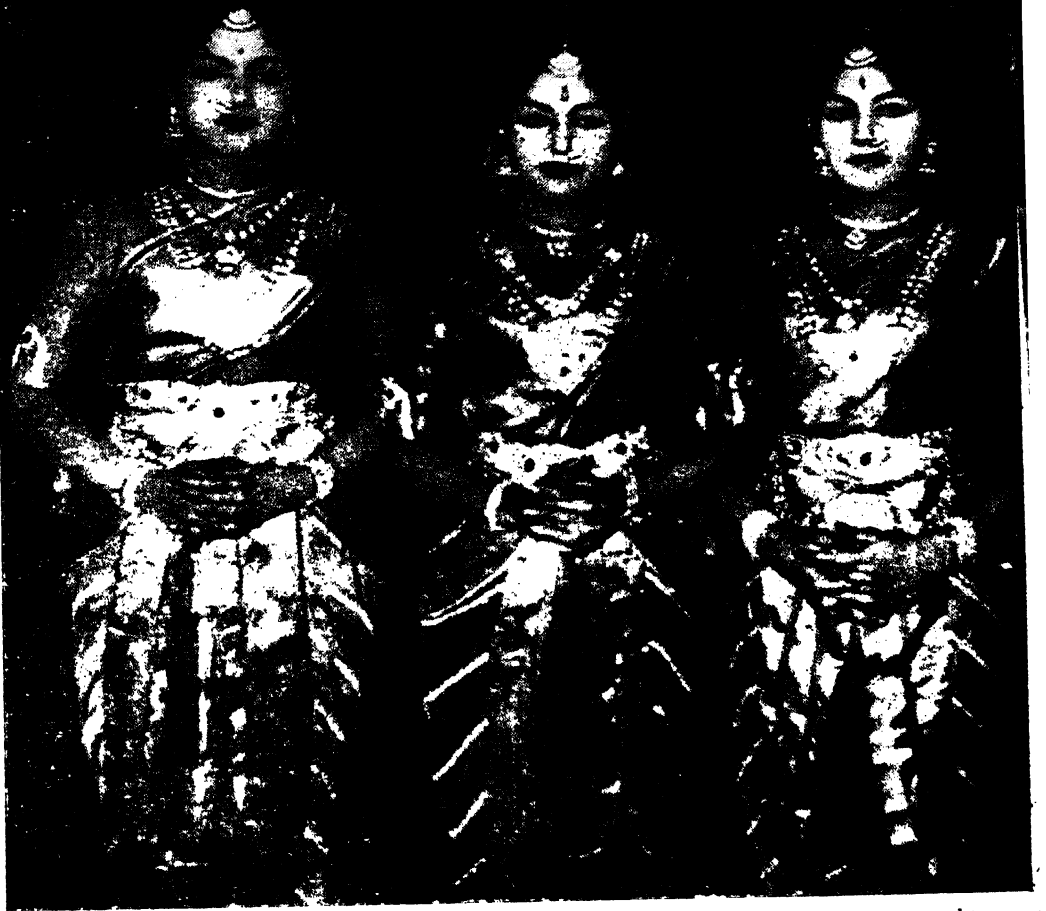
তিন বোন

—গোপাল রায়
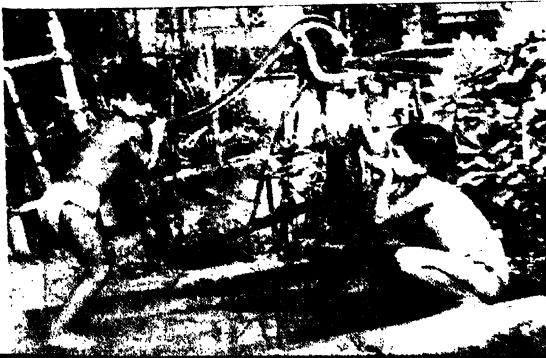
আলোকচিত্র

সাহায্য

—মানস কুণ্ডু চৌধুরী

কাশীর গঙ্গা

—শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

জলছবি

—নীরোদ রায়
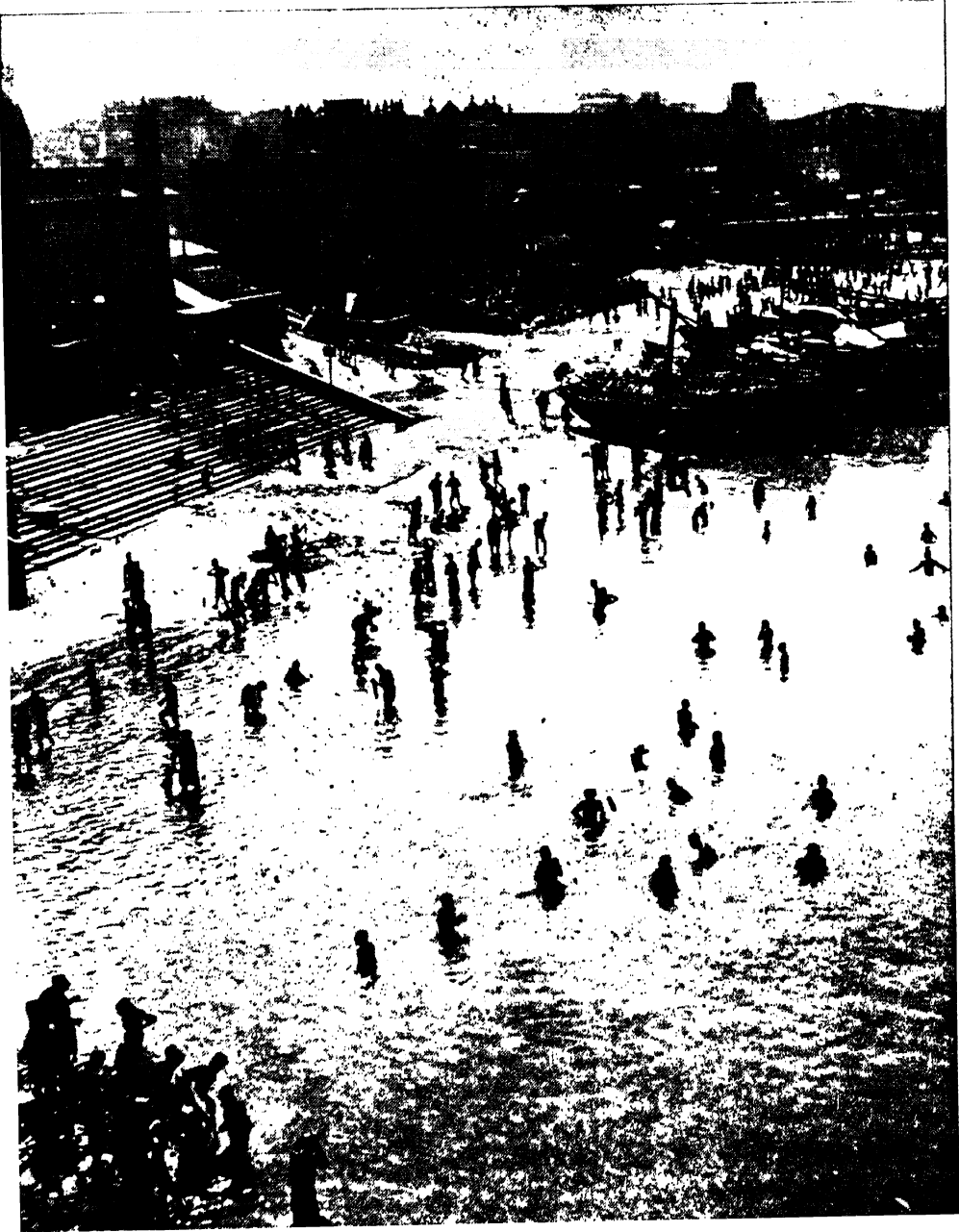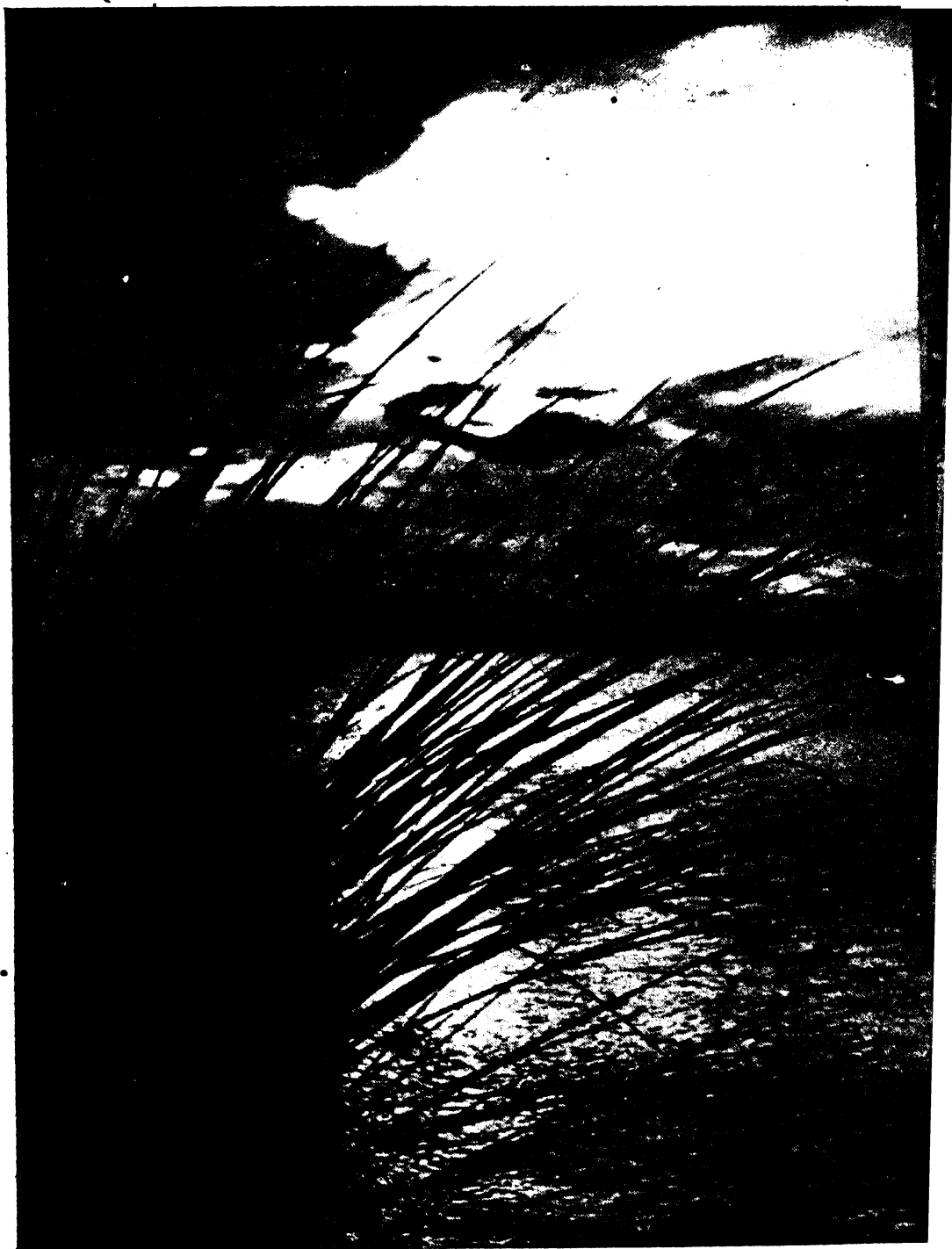
ষাণী —সুনীল ঘোষ

কলকাতা —দীপককুমার বণিক

নিতকনে —নীলু পাল

প্রতিবিম্ব —বৈদ্যনাথ ভড়

হীরের হার

শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত

আমার স্ত্রীর নাম সুভাষিনী। নামটা সেকেলে কিন্তু তিনি ভারী একেলে। তাঁর চলায় চটক। তাঁর কথায় চটক। তাঁর চাউনিতে চটক।

কিন্তু এ আমি করছি কি? নিজের স্ত্রীর রূপ বর্ণনা করা কোন স্বামীর পক্ষেই শোভন নয়। কিন্তু, যে গল্পটা আপনাদের বলতে বসেছি সেটা ভারী ব্যক্তিগত কাজেই স্ত্রীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় থাকা আশু প্রয়োজন। সেই পরিচয় আপনাদের দেবার জন্যে যখন আর কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না কাজেই আমাকেই তাঁর রূপ আর চরিত্র ব্যাখ্যান করতে হচ্ছে, এতে আমারও লজ্জা কম নয়।

আমার স্ত্রী আবার ভারী স্নেহশীলা। তাঁর অপত্য স্নেহ যাদের উপর বর্ষিত হতে পারত আমি তাদের জোগান আজও দিয়ে উঠতে পারি নি কাজেই তিনি নিজেই একটি পাত্র জোগাড় করে এনেছেন। লোমশ। ছোট ছোট চোখ। ছোট ল্যাজ। একটি ক্ষুদে কুকুর। একে ইনি সদাক্ষণ সোহাগ করেন। আদর করেন। আবার সোনা মাণিক বলে কোলে টেনে নেন।

আমাকেও যে মধ্যে মধ্যে সোনা মাণিক বলেন না তা নয় তবে যখনই বলেন তখনই বুঝি একটা বিশেষ কিছু কাজ আমাকে করতে হবে এবং যাতে আমার দিক থেকে কোন ওজর আপত্তি না উঠতে পারে সেজন্য তিনি এই মিঠে রসের আমদানী করেন যে রসের খরস্রোতে আমার দ্বিধা বাধা সবই শুকনো কাঠের মত ভেসে যাবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সুভাষিনী বললেন—চারুদি'কে মনে আছে তোমার? চারুদি' আমাকে আজকে প্রকাণ্ড একটা চিঠি লিখেছেন।

—তাতে আমি সোনা মাণিক হয়ে উঠলাম কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি।

—যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলাই যায় না। সব সময়ে রসিকতা, উনি যেন একটি রসরাজ। চারুদি' লিখেছেন গোপালপুর থেকে দশ মাইল দূরে ঠিক সমুদ্রের উপরে তাঁর পরিচিত লোকের একটা বাংলো খালি পড়ে আছে। ইচ্ছা করলে আমরা বাংলোটা ভাড়া করতে পারি। তুমি তো অনেক দিন ছুটি নাও নি, তাই ভাবছিলাম মাসখানেক ওখানে থেকে এলে বেশ হ'ত। মেনটুর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না।

আমি বললাম, তথাস্তু। সেটাও এমন একটা কিছু নতুন কথা বললাম না, কারণ স্ত্রী বাক্যে তথাস্তু বলাটা আমার স্বভাবও বলতে পারেন, বিলাসও বলতে পারেন।

সন্ধ্যাবেলা শিস দিতে দিতে বাড়ি ফিরলাম। সুভাষিনী একটা ফিকে গোলাপী রংয়ের শাড়ী পরেছিলেন। তাঁকে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছিল। তিনি যখন চায়ের পেয়ালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তখন আমি পকেট থেকে বের করলাম একটা রিসিট। দুপুরবেলায় বাড়িওয়ালার সন্ধান করে, তাকে টাকা দিয়ে গোপালপুরের সেই বাংলোটি ভাড়া করে এসেছিলাম। আশা ছিল আমার কর্মতৎপরতা দেখে সেই ফিকে গোলাপী শাড়ী পরা ললনার মুখে দেখা দেবে স্বচ্ছ একটা হাসি কিন্তু রিসিটটা দেখার পরেই তার ভ্রূ বেশ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। আমি ভাবিত হ'লাম। বুঝলাম কথার খরস্রোত আরম্ভ হবে।

আরম্ভও হল।

তোমাকে সাত তাড়াতাড়ি বাড়িটা ঠিক করতে বলেছিল কে? মুখ দিয়ে কথা বের করবার যো নেই অমনি উনি ছুটলেন। কোন খোঁজ নিলে না সেখানে ডাক্তার আছে কি না। ভেট্ আছে কি না। রোজ মাংস পাওয়া যায় কি না? ভাবলে না একবারও মেনটু খাবে কি? অসুখ হলে তাকে দেখবে কে?

ইতিমধ্যে মেনটুও ভেউ ভেউ করে তার কর্ত্রীঠাকুরাণীর সঙ্গে এক যোগে ভং'সনা করছিল।

আমি বললাম, কিন্তু চারুদি' যে চিঠি লিখেছিলেন—

—চারুদি'র কি, তিনি তো চিঠি লিখেই খালাস। তোমার তো কর্তব্যজ্ঞান থাকা উচিত।

—আচ্ছা, আমি না হয় শনিবার দিন গোপালপুর চলে যাই। সেখানে সব কিছু ঠিক করে আসি তারপর তুমি আর মেনটু যাবে। আমি বলি—

এবার স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল। আমিও শনিবার দিন গোপালপুর রওনা হয়ে গেলাম।

গোপালপুর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে বাংলোটা। সুন্দর বাংলো। ঝকঝকে তকতকে। সামনে প্রকাণ্ড পীচঢালা রাস্তা—সোজা গোপালপুর থেকে টানা একশ' মাইল চলে গেছে সমুদ্রের ধার দিয়ে। আমার বাড়ির পরে রাস্তা। তারপর ফাঁকা সমুদ্র। জায়গাটা ভারী নির্জন। চারিদিকে জনমানব নেই। চীৎকার করলে নিজের গলার স্বর নিজের কানেই বীভৎস হয়ে ফিরে আসে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাত্রিবেলা ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে বসেছি। বেয়ারা সেলাম জানিয়ে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে গেছে। আমি সিপ করে করে ব্র্যাণ্ডি খেতে লাগলাম আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা লোমহর্ষক একটা কাহিনী পড়তে সুরু করলাম। ইতিমধ্যে রাত্রি বাড়ছে। সমুদ্রের শাঁশানি বাড়ছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক বাড়ছে আর বাড়ছে চাঁদের আলো। সমুদ্রের মাথার উপর ফুটন্ত একটা চাঁদ হাসছে আর আকাশের গা দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে জোছনা ফুটেছে। চাঁদের আলো এসে মিশেছে গ্লাসের ব্র্যাণ্ডির রং-এ। আর এই রং দেওয়া নেওয়ার ফলে ব্র্যাণ্ডি তার রং বদলেছে, তার স্বাদও বদলেছে। এই ব্র্যাণ্ডি-ই সেই অমৃত—চাঁদের রং মিশিয়ে দেবতারা যা খান। হঠাৎ দূর থেকে প্রচণ্ড বেগে একটা মোটর ছুটে আসবার শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। পীচের রাস্তার উপরে এসে পড়ল চোখ ঝলসান হেড লাইটের আলোটা রাস্তার উপরে ছুটে যেতেই নজরে পড়ল কালো রংয়ের একটা হু'মৌটার গাড়ি গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে।

আমার চোখের সামনে দিয়ে উল্কার মত গাড়িটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ করে গাড়িটা আমার বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গাড়ি থেকে খুব ত্বরিত গতিতে নামলেন একটি মহিলা। তিনি বনেট খুললেন, বুঝলাম গাড়িটার ইঞ্জিন বিগড়েছে। গাড়ি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বহুদিনকার, কাজেই ভাবলাম এই বিপদে মহিলাটিকে সাহায্য করা আমার আশুকর্তব্য। আমি বাগান দিয়ে হেঁটে গেট খুলে মহিলাটির কাছে অভিবাদন করে বললাম—যা স্পীডে আসছিলেন, বিগড়েছে তো গাড়িটা?

মহিলাটি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। চাঁদের আলোতে মহিলাটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। এমনিতেও তিনি খুবই সুন্দর কারণ ওর চোখে দেখলাম রয়েছে রাজ্যের রূপ, ওর ঠোঁটে ধরা রয়েছে অপার সৌন্দর্য আর ওর সমস্ত দেহে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে এমনি লাস্যময়ী একটা যৌবন-চাঞ্চল্য যা দেখলে তপোবনের বেবাক মুনি-ঋষি এক সঙ্গে পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু এটাও সহজেই বুঝলাম যে, আমার উপর তিনি কেমন যেন বিনা কারণেই চটে আছেন, যেন তাঁকে সাহায্য করতে আসাটাই আমার পক্ষে ভারী অন্যায় হয়েছে। আমি ইঞ্জিন দেখছিলাম। এটা নাড়ছিলাম, সেটা নাড়ছিলাম। তিনি আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা গাড়িতে গিয়ে বসলেন। স্টার্ট দিলেন। গাড়িটা গোঁ গোঁ করে উঠে থেমে গেল। আবার স্টার্ট দিলেন। গাড়িটা আবার গোঁঙিয়ে উঠল কিন্তু তারপর থেকে একেবারে নীরব, নিশ্চল, জগদ্দল পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চাঁদের আলোতে ওর কালো রংয়ের বাহার দেখাতেই মনঃসংযোগ করল।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম গাড়িটার ইঞ্জিন বেশ ভালভাবে জখম হয়েছে। কারখানায় নিয়ে ওটাকে আমূল সংশোধন করতে হবে। মহিলাটিকে সে কথা বললাম কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই শুনবেন না, আমার দিকে তাকাবেনই না স্থির করে বসে আছেন। উনি ওঁর আঙুল ইঞ্জিনটার মধ্যে যন্ত্র-তন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলেন যেন এমনি ভাবে আঙুল সঞ্চালন করতে করতে হঠাৎ একটি অদৃশ্য বোতামের সন্ধান পাওয়া যাবে যেটা টিপলে অমনি গাড়িটা বিদ্যুদ্বেগে চলতে আরম্ভ করবে। মহিলাটির অভদ্র ব্যবহার দেখে আমি ভীষণ চটেছিলাম। তারপর ভাবলাম, মধ্য রাত্রিতে সুন্দরী মহিলারা স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পান। এই ভয় মহিলাদের একান্তভাবে নিজস্ব ভয় এবং এই ভয়ের যোগান দিই আমরা। কাজেই মনে মনে তাঁকে মাফ করলাম, বললাম ভদ্রে! মাডাম! এই যে বাংলোটি দেখছেন এর ভেতরে দুর্গসদৃশ একটি কামরা রয়েছে। এই কামরার দরজা সেগুন কাঠের। এই দরজার তালা টিবাসের তৈরি। গৃহস্বামী বোধ হয় এখানে হীরে জহরৎ রাখতেন। চোরেরা কদাপি এই হীরে জহরতে হাত দিতে পারে নি। আপনি এই ঘরে গিয়ে দরজার কুলুপ লাগিয়ে নিরাপদে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারেন

এইবার মহিলাটি আমা- দকে তাকালেন। দেখলাম দু'

আমি তো গোপালপুরেই যাচ্ছি। চলুন আমার সঙ্গে।

চোখ থেকে যা বর্ষিত হচ্ছে সাধু বাংলায় তাকে সহজেই ক্রোধাগ্নি বলে বর্ণিত করা যায়। কি আর আমি করতে পারি এই অবস্থায়? ভাবছিলাম আস্তে আস্তে স্থান ত্যাগ করে আমি নিজের ঘরে চলে যাব তারপর শকুনের ডাক শুনে পড়িমড়ি করে এই ললনাটি নিজেই আমার বারান্দায় এসে আশ্রয় নেবেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে রাতটা কাটাবেন। তাই ওঁর পক্ষে ভাল। চলে আসছিলাম এমনি সময় রাস্তা কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে আলো ছড়াতে ছড়াতে একটা ধূলি-ধূসরিত লরী এসে উপস্থিত হল। লরীটা থামতেই তা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল চাপদাড়িওয়ালা পাগড়ী মাথায় বিশাল আকারের একটি শিখ ড্রাইভার। মহিলাটি তাকে দেখা মাত্র অনর্গল হিন্দী ভাষায় কথা সুরু করলেন আর সেই সর্দারজী হাতের আস্তিন গুটিয়ে অচল গাড়িটাকে সচল করবার জন্য প্রাণপাত করতে লাগলেন।

কতক্ষণ পরে গাড়িটির নিচে থেকে মাথাটা বের করে সর্দারজী বললেন, না মেমসাহেব। এ গাড়ি কারখানায় দিতে হবে। ভারী জখম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

মহিলাটি বললেন, আচ্ছা তাই করব কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে গোপালপুরে পৌঁছে দিতে পারেন কি?

—আমি তো গোপালপুরেই যাচ্ছি। চলুন আমার সঙ্গে।—সর্দারজী উত্তর দিল।

এমন সময় আমি সর্দারজীকে বললাম, খুব তো মেহনৎ করলেন। একটু ব্রাণ্ডি চলবে কি?

ব্রাণ্ডি!—সর্দারজীর গলা দিয়ে স্বরটা নৃত্য করতে করতে বের হ'ল। ব্র্যাণ্ডি চলবে কি না জিজ্ঞাসা করছেন? পেলে বেঁচে যাই। সারাদিন যা ধকল গেছে।

আমি মহিলাটির দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর আমার বাড়িতে ঢোকবার একদম ইচ্ছা নেই কিন্তু সর্দারজী কোন আপত্তি শুনলেন না, বললেন—মেমসাহেব! সমুদ্রের হাওয়া ভারী বজ্জাত। দেখে মনে হয় ভারী ফুরফুরে হাওয়া, কিন্তু সর্দ্দি জমাতে, কাশি জমাতে, বুকে নিউমোনিয়ার আস্তানা গাড়তে এই হাওয়ার জুড়ি আর নেই। শীগ্‌গির আসুন। গরম জল দিয়ে আপনিও একটু ব্রাণ্ডি খান। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন এই গাড়িটাকে ঠেলে আপনার গ্যারেজে তুলে দিই।

গাড়িটা গ্যারেজে রেখে, গ্যারেজটা তালা বন্ধ করে আমি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সর্দারজী একরকম টানতে টানতে সেই মহিলাটিকে নিয়ে আমার বসবার ঘরে এসে বসলেন। আমি দু'টো গেলাস বের করে মুক্ত হস্তে তাতে ব্রাণ্ডি ঢাললাম। সর্দারজী চোঁ চোঁ করে ব্রাণ্ডি খেতে লাগল। মহিলাটি দু'এক সিপ খেয়ে সর্দারজীকে তাড়া দিতে লাগলেন গোপালপুর যাবার জন্যে। এক ঢোঁকে তিন পেগ ব্র্যাণ্ডি গলাধঃকরণ করে সর্দারজী লাফিয়ে গিয়ে লরীতে উঠলেন। মহিলাটিও চট করে তার পাশে বসে পড়লেন। লরীটা গর্জন করে পীচ ঢালা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। আমি দেখলাম লরীটার পেছনের লাল আলোটা ফিকে হতে হতে রাত্রির আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

ঘরে ফিরে আসব বলে পা বাড়িয়েছি কিন্তু থম্‌কে দাঁড়াতে হল।

গ্যারেজ থেকে একটা নিঃশ্বাস নেবার শব্দ যেন কানে শুনতে পাচ্ছি। কার যেন খুব কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। ভাবলাম চারদিকে জনমানব নেই, গ্যারেজের মধ্যে কে নিঃশ্বাস নিচ্ছে? গ্যারেজের তালাটা খুললাম। টর্চের আলো গাড়িটার ভেতরে ফেলতেই চমকে উঠলাম।

গাড়িটার মধ্যে হুমড়ী খেয়ে পড়ে আছে একটা লোক। তার বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। বুকের কাছটায় একটা গভীর ক্ষত। বাঁটশুদ্ধ একটা ছোরা বুকে বিঁধে রয়েছে। আমি দরজা খুলে তাকে ধরতে গেলাম কিন্তু দরজা খুলতে না খুলতেই একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে লোকটা মরে গেল। টর্চের আলোতে দেখলাম গাড়িটার সীটে তাড়া তাড়া নোট সাজান রয়েছে। একশ' টাকার নোট। এত নোট আমি কোনদিন এক সঙ্গে দেখি নি। তবে নোটের চিন্তা বেশিক্ষণ স্থান পেল না। চোখের সামনে একটা খুন হয়ে গেল। এখন আমাকে কতদিন থানা আর পুলিশ করতে হয় এই ভাবতে লাগলাম। এখন বুঝলাম ঐ মেয়েটি এত তাড়াতাড়ি ভাগবার চেষ্টা কেন করছিল। ভাবতে ভাবতে ঘরে গেলাম। টেবিলের দিকে তাকাতেই চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। যে দু'টি গেলাসে সর্দারজী আর সেই মেয়েটি ব্র্যাণ্ডি খেয়েছিল সেই গেলাস দু'টো রয়েছে আর মেয়েটি যে গেলাসে খেয়েছিল সেই গেলাসে রয়েছে তার আঙ্গুলের ছাপ। বহরমপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাণ্ডের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। ভাবলাম ঐ গেলাসটা যদি তার কাছে পৌঁছে দিই আর আমি চাক্ষুষ যা দেখেছি তার বিবরণ যদি তাকে বলি তবে পুলিশ দানেনবাবুর ভাষায় ঐ রূপসী বোম্বেটের সন্ধান একদিন না একদিন পাবেই।

কাক ভোরে ঘুম ভাঙ্গল। ভাবলাম দিনের আলোয় একবার গ্যারেজটা দেখে আসি। গ্যারেজের তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম সেই গাড়িটা নেই। মৃত লোকটা নেই। সেই নোটের তাড়া নেই। সবই ভোজবাজির মত উড়ে গেছে। ভাবলাম রাত্রিতে যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন ঐ মেয়েটা সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে এসে সব কিছু সরিয়েছে। ডাঁহাবাজ মেয়ে বলতে হয়। কালবিলম্ব না করে আমি বহরমপুর রওনা হয়ে গেলাম।

পাণ্ডের কাছে গিয়ে গেলাসটা বের করে বললাম, দেখ তো হে, তোমার ডিপার্টমেণ্ট এই আঙ্গুলের ছাপের অধিকারিণীকে চেনে কি না?

পাণ্ডে বলল, কেন কি হোল? তারপর বেল টিপতেই এক পুলিশ অফিসার এসে উপস্থিত হল; তার হাতে গেলাসটা দিয়ে পাণ্ডে তাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে জীনের বোতলটা খুলে বসল। আমরা দু'জনে জীন খেতে খেতে কলেজ দিনের গল্প করতে করতে যে এক ঘণ্টা কাটিয়ে ফেলেছি খেয়াল ছিল না, খেয়াল হল তখন যখন সেই অফিসারটি গেলাসটি পাণ্ডেকে ফেরৎ দিল আর সেই সঙ্গে হাতে লেখা একটি রিপোর্ট পেশ করল। পাণ্ডে সেই রিপোর্ট কতক্ষণ পড়ল তারপর বলল, এ যে দেখছি একটা ডাকু মেয়ের আঙ্গুলের ছাপ। এ গেলাস পেলে কোথায়?

আমি বললাম, বাঁচলাম বাবা। তা হ'লে তোমরা একে চেন?

চিনি মানে? উড়িষ্যার পুলিশ একে চেনে। ইউ-পির পুলিশ একে চেনে। এর নাম হল জর্দনবাই। আর এর সাকরেদের নাম হল মোহন সিং। এরা দু'জনে মিলে ইউ-পি আর উড়িষ্যায় যে কত ডাকাতি করেছে আর কত লোককে এরা বেঘোরে হত্যা করেছে তার কোন হদিশই নেই। প্রাদেশিক পুলিশ আর কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ ওদের ধরবার চেষ্টা করেছে বহু কিন্তু কখনও ওদের ধরা সম্ভব হয় নি।

—আগে যদি জানতাম!

—আগে জানলে করতে কি?

—কালকে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বুদ্ধি খরচ করলে হয়ত ধরতেও পারতাম।

—কোন ব্র্যাণ্ডের হুইস্কী খাচ্ছ আজকাল—না স্রেফ গাঁজা ধরেছ? পাণ্ডের মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

আমি বললাম, রসিকতা ছাড়। আগে যদি জানতাম ঠিক তাদের এনে উপস্থিত করতাম তোমার সামনে।

পাণ্ডে বললে—শোন তবে। জর্দনবাই বলে যে ডাকু মেয়েটার কথা তোমাকে বলছিলাম আজ থেকে দশ বছর আগে গোপালপুরের কছে একটা ডাকাতি করে তার সাগরেদ মোহন সিং এর সঙ্গে একটা গাড়িতে চড়ে পালাচ্ছিল। মাঝরাস্তায় টাকা নিয়ে দু'জনের মধ্যে লাগে ঝগড়া। জর্দনবাই তার সাগরেদের বুকে চালিয়ে দেয় একটা ছোরা। রক্ত পড়তে পড়তে মোহন সিং গাড়ির মধ্যেই মারা যায়। তুমি যে বাংলোতে ছিলে সেইখানে জর্দনবাইয়ের গাড়িটা যায় বিগড়ে। গাড়ি থেকে নেমে কি করবে ভাবছে, এমনই সময় লরী চালিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটি শিখ ড্রাইভার। জর্দন বাই সেই লরীতে চেপে বসে চলল গোপালপুরের দিকে। মাঝ রাস্তায় গাড়িটা বেসামাল হয়ে একটা খাদে গিয়ে পড়ে। জর্দনবাই আর সেই শিখ ড্রাইভারটির ওইখানেই মৃত্যু হয়। কাজেই—

পাণ্ডের মুখে আবার হাসি। বুঝলাম এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কিছুই ও বিশ্বাস করে না। স্টেশনে এলাম কল্‌কাতার গাড়ি ধরবার জন্যে। এক কাপ চা খাবার পর চকিতে মনে হ'ল স্তূপীকৃত সেই নোটের কথা। ভাবলাম কয়েকটা হাতালে ভাল হত।

সুভাষিনী সব কথা শুনে একটু মৃদু হাসলেন। মেনটু তাঁর কাছে এসে অনবরত ল্যাজ নাড়ছিল। তার পিঠে হাত দিয়ে সুভাষিনী বললেন—জানিস মেনটু, তোর বাবামশায় ভারী বোকা। ঐ টাকাগুলো আনলে তোকে একটা হীরের হার গড়িয়ে দিতাম।

সমুদ্রের সম্পদ

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার ইতিকথা অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, যুগে যুগে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করেছে প্রাকৃতিক পদার্থ উৎপাদনের স্বার্থে ব্যবহার করার উপর। প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্র যুগ, এই সব নামকরণ হয়েছে এই জন্য যে, যুগ বিশেষে পাথর বা লোহা কিম্বা তামার সাহায্যে মানুষ তার উৎপাদনের হাতিয়ার গড়েছে।

ভূগর্ভে প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভার রয়েছে অফুরন্ত কিন্তু তার কতটুকুই বা মানুষ ব্যবহার করতে পারে? ভূগর্ভের গভীরে মানুষ এখনো বেশিদূর যেতে পারে নি এবং বেশি গভীর থেকে ধাতুনিকাশ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তার চেয়ে অনেক সোজা হবে যদি সমুদ্রের জল থেকে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক পদার্থগুলি আহরণ করতে পারা যায়। সমুদ্র হচ্ছে এক অশেষ রত্নাকর। রুশ বিপ্লবের পরেই ১৯১৮ সালে লেনিন সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের সমুদ্র সন্ধানে ব্রতী হতে অনুরোধ করেছিলেন জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি সাধনের জন্যে। 'সোভিয়েত সরকারের আশু কর্তব্য' নামে এক প্রবন্ধে তিনি কাস্পিয়ান সাগরের একটি উপসাগরকে রসায়ন শিল্পে রসদ জোগানের জন্য কাজে লাগাবার কথা উল্লেখ করেন।

মহাসাগরের সীমাহীন জলরাশি আদিম কালে মানুষকে যেমন ভীতি-স্তম্ভিত করত তেমনি আবার স্থলে শিকারের অভাব হলে খাদ্যও জোগাতো।

মানুষ সাগরকে দেবতা বলে পূজা করত, সমুদ্রের মাঝখানে একচোখো সাইক্লপদের সন্ধান করত। এমন কি কলাম্বাসের সমুদ্রযাত্রার পরেও স্পেনীয় নাবিক জুয়ান পন্স দা লিয়ন ১৫১৩ সালে 'স্বর্গদ্বীপের' সন্ধানে গিয়ে গাল্ফ, স্ট্রীমের উৎপত্তিস্থান ফ্লোরিডা প্রবাহে উপস্থিত হন।

আজ আর সে দিন নেই। সমুদ্রের ওড়নার বেশ কিছুটা মানুষ খুলে ফেলেছে, সমুদ্রগর্ভে নেমেছে ১১ কিলোমিটার পর্যন্ত। কিন্তু এখনো সমুদ্রের অনেক কিছু রহস্য উদ্ধার হয় নি। মহাসাগরের নিচে জল বদল হয় কি করে, কি করে এখানে-ওখানে এক একটি পাহাড় বা পর্বতমালা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে ভয়াবহ 'এল নিনো' বন্যার জন্ম হয় কেন, 'লাল স্রোতে' লক্ষ লক্ষ মাছ মারা যায় কেন, সমুদ্রগর্ভে কোন্ শক্তি টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে দেয়, জাপানে 'সুনামি' নামে ঘূর্ণিবাত্যার আবির্ভাব কেন হয়, এইরকম কত শত প্রশ্নের জবাব মানুষ এখনো জানে না।

সমুদ্র অফুরন্ত শক্তির অধিকারী। তার জোয়ার-ভাটা, ঢেউ আর তাপকে মানুষ বিজলী উৎপাদনে ব্যবহার করছে। রত্নাকরের কিছু কিছু রত্ন মানুষ ব্যবহার করছে কিন্তু তা তার রত্নভাণ্ডারের হাজার ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম।

সামুদ্রিক গবেষণার ইতিহাস

মানব সভ্যতার আদিযুগে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার জাতিগুলি জিব্রল্টার প্রণালীকে পৃথিবীর পশ্চিম সীমা বলে মনে করত। আর পূর্বসীমা ছিল কাস্পিয়ান সাগর যাকে তারা বলত 'সূর্যকুণ্ড'। হিরোডটাসের লেখায় দেখা যায় যে মিশরের ফ্যারও খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতকে তিনটি
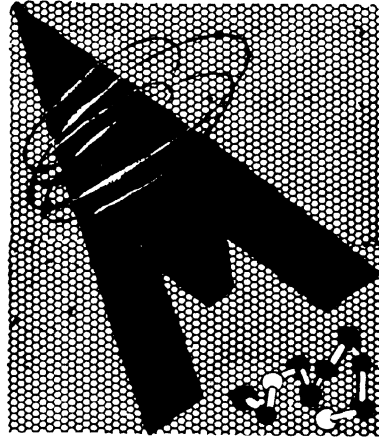
জাহাজ পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রা করে। তিন বছর পরে একটি মাত্র জাহাজ পূব দিক থেকে ফিরে যায়। তার ১০০ বছর পরে কার্থেজের নাবিক হিম্লিকো জিব্রল্টার প্রণালী পার হয়ে অতলান্তিক অভিযানে বার হন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ফ্রান্সের মাসিলিয়া (বর্তমানে মার্সাই) বন্দর থেকে পিথিয়াস নামে এক ভূগোলশাস্ত্রী আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত ঘুরে আসেন।

খৃষ্টোত্তর দশম শতাব্দী থেকে সমুদ্র পথে ভূ-প্রদক্ষিণের হিড়িক বেড়ে যায়। সেই সময়ে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় নাবিকরা গ্রীণল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারপর কলাম্বাস, মেগেলন, ভাস্কো দা গামা প্রমুখ নাবিকেরা বিশ্বসন্ধানে বার হন।

সমুদ্রের জৈব ও খনিজ সম্পদ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য গবেষণা করেন বিজ্ঞানাচার্য শের্বাকভ.

ইতিমধ্যে চীনে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং আরবী ভূগোলশাস্ত্রী ইদ্রিসি পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র রচনা করেন। মহাসাগরের প্রথম মানচিত্র তৈরি করেন ওয়াগেনোর নামে এক ওলন্দাজ। ১৮ শ শতকে রুশ নাবিক বেরিং ও চিরিকফ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের নক্সা রচনা করেন এবং বেলিং হাউসেন ও লাজারেফ নামে দু'জন রুশ ক্যাপ্টেন আণ্টার্টিকা আবিষ্কার করেন।

স্থলের সঙ্গে জলের লড়াই

স্থলের বিরুদ্ধে সমুদ্রের রণকৌশল বড় যে সে ব্যাপার নয়। জোয়ারের ও বন্যার জল, স্থল ধুয়ে নিয়ে যায় খনিজ পদার্থ সমেত, কোন জায়গা গ্রাস করে ফেলে। এ হোল সম্মুখ যুদ্ধ। ওদিকে ডাঙ্গার বহু পিছনের দিকে মেঘ পাঠিয়ে সমুদ্র স্থলকে পিছন থেকে আক্রমণ করে, বৃষ্টির জলে নদনদীর জল ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মাটি ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বহু কোটি বছর ধরে এই ভাঙ্গনের খেলা চলে আসছে। প্রতি সাড়ে তিন বছর অন্তর একবার করে মিসিসিপি নদী এক ঘন কিলোমিটার ধাতুকণা ধুয়ে নিয়ে মেক্সিকো উপসাগরে ফেলে। মিশরের নীলনদ প্রতি ৩০ বছরে একবার এইভাবে ভূমধ্যসাগরের জলকে ধাতুসমৃদ্ধ করে। ভূত্বক গঠিত হবার পর থেকে ২০০কোটি বছরে মহাসাগরের তলায় ৯০ কোটি ঘন কিলোমিটার ধাতব পলি জমা হয়েছে। এই পলির মোট পরিমাণ পৃথিবীর পরিদৃশ্যমান স্থলভাগের ৬ গুণ। এই পলি যদি সমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সমুদ্রতল তিন কিলোমিটার উঁচু হয়ে যাবে অর্থাৎ বহু জায়গায় স্থল জলের জায়গা দখল করে নেবে। কিন্তু সেরকম ঘটে না কেন? ঘটে না এই জন্য যে ভূত্বকের চাপ পৃথিবীর সব জায়গায় সমান। স্থলের তুলনায় জলের ওজন কম বলে স্থলাংশে ভূত্বকের ওজন ও ঘনত্ব জলাংশের ভূত্বকের চেয়ে বেশি। এইভাবে সমগ্র পৃথিবীতে জল ও স্থলের ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। সমুদ্রের তলায় ভূত্বক প্রধানত ভারি কৃষ্ণবর্ণ আগ্নেয় প্রস্তর দিয়ে তৈরি, কিন্তু স্থলভাগে ভূত্বক তৈরি হাল্কা দানাদার পাথরে। সেইজন্যে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে যে সব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে সেগুলির গলিত ধাতুর প্রধান উপকরণ হচ্ছে আগ্নেয় পাথর এবং স্থলভাগের আগ্নেয়গিরি থেকে বার হয় দানাদার ও আগ্নেয় পাথরের গলিত স্রোত।

পলি জমা হতে হতে সমুদ্রতল ক্রমশ উঁচু হতে থাকে। তারপর এমন সময় আসে যখন ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং পলির চাপে মহাদেশীয় কিনারায় ভূত্বকে ভাঙ্গন ধরে, যার ফলে সমুদ্রতল আবার নেমে যেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মহাদেশগুলি উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। মহাসাগরের তলা যখন ১৭৫ মিটারে নামে তখন মহাদেশ ১০০০ মিটার উঁচু হয়ে ওঠে এবং ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাণের উদ্ভব মহাসাগরে

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল মহাসাগরে। তারপর কোন এক জল ও স্থলের পতন-উত্থানের যুগে কোনো কোনো জীব ডাঙ্গায় উঠে পড়ে যেগুলি বিবর্তনের ধারায় উভচর জীবের জন্ম দেয় এবং উভচর জীব থেকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য উচ্চতর জীবের আবির্ভাব ঘটে। পরে অবশ্য কিছু কিছু প্রাণী আবার সমুদ্রে ফিরে যায় এবং তারা হচ্ছে প্রধানত তিমির মত জলচর স্তন্যপায়ী জীব। তাদের পাগুলি ক্রমশ আবার পাখনায় রূপান্তরিত হয়।

পৃথিবী এ পর্যন্ত চারবার তুষার যুগের মধ্যে দিয়ে এসেছে। চতুর্থ তুষার যুগে (যে যুগের শেষ অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি) সাগরতলের দেড়শো থেকে হাজার মিটার পর্যন্ত অবনমন ঘটে। দু'টি তুষার যুগের মধ্যবর্তী কালে হিমবাহগুলি গলে যেতে থাকলে সাগরের জল ফুলে উঠে স্থলে হানা দেয়। পরে তুষার যুগের পুনরাবির্ভাবে জল আবার স্থলভাগ করে নেমে যায়। রেখে যায় বহু সামুদ্রিক জীবজন্তু ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ এবং জলের স্থলাভিযানের চিহ্ন। হিমালয় পাহাড়ে এবং কাশ্মীরে হিমালয়ের পাদগিরিমালায় সমুদ্র জলের আঘাতের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় এবং সামুদ্রিক প্রাণীর কংকালও পাওয়া গিয়েছে। তেমনি আবার সমুদ্রতলে প্রাগৈতিহাসিক মানব সমাজের বিভিন্ন জিনিষ পাওয়া গিয়েছে যেমন পাওয়া গিয়েছে উত্তর সাগরের তলদেশে প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার।
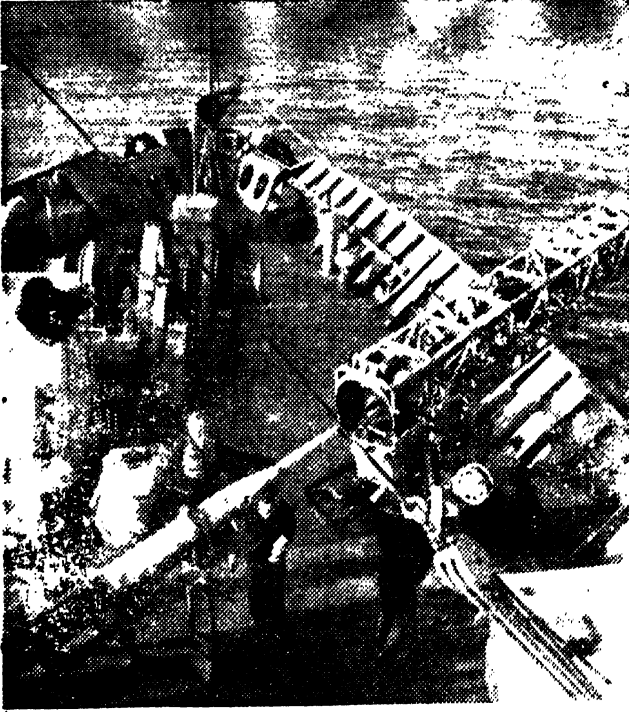
ভারত মহাসাগরে আবহমণ্ডল পরীক্ষায় সোভিয়েত জাহাজ 'ভিতিয়াজ'

বর্তমানে আণ্টার্টিকা ও গ্রীণল্যাণ্ডের হিমবাহগুলির গলন শুরু হয়েছে এবং মহাসাগরের জল বাড়ছে। গত ২৫ বছরে প্রতি বছরে গড়ে ১১ মিলিমিটার করে জলের উচ্চতা বেড়ে আসছে। পৃথিবীর আবহাওয়া হচ্ছে উষ্ণতর।

আধুনিক কালের গবেষণা

আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসরে বিভিন্ন দেশের কতকগুলি ভাসমান গবেষণাগার মহাসাগরের রহস্য সন্ধানে বার হয়। সোভিয়েত জাহাজ 'ভিতিয়াজ' প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভ থেকে বহু রহস্য উদ্ধার করেছে। এ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে যে গভীরতম এলাকা আবিষ্কৃত হয়েছে সেটির নাম মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। সেখানে জলের গভীরতা ১১০৩৪ মিটার অর্থাৎ এভারেস্ট শৃঙ্গের চেয়েও বেশি।

অতলান্তিকের তলায় ১০ হাজার মাইল লম্বা এক পর্বতমালা আছে যা এত দুর্গম যে সেখানে গভীর জলের কয়েকরকম অদ্ভুত মাছ ছাড়া আর কোন জীব সেখানে যেতে পারে না। সেই সব মাছের কেউ বা অন্ধ, কারো বা একটি মাত্র প্রকাণ্ড চোখ যা থেকে জ্যোতি বার হয়। সেখানে মাঝে মাঝে অতিকায় অক্টোপাস জাতীয় জীবের সঙ্গে তিমির দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধে। অক্টোপাস তার শুঁড় দিয়ে তিমিকে এমন ভাবে জলের নিচে চেপে রাখে যে তিমির বুকে অক্সিজেন যায় ফুরিয়ে। তখন সে দম বন্ধ হয়ে মরে।

সমুদ্রের অতল গর্ভও নিষ্প্রাণ নয়। ভারত মহাসাগরের গর্ভে ৬ কোটি বছর আগেকার এক রকম নীল রঙের দুই মিটার লম্বা মাছের বংশধরেরা আজও বেঁচে বর্তে আছে, আরো আছে ২৫ মিটার লম্বা, চিংড়ির মত লেজওয়ালা এক রকমের ভয়ংকর সাপ।

সোভিয়েতের সামুদ্রিক গবেষণার আর একটি জাহাজের নাম মিখাইল লোমনোসফ। ১৯৫৭ সালে জাহাজটি আজোর্স দ্বীপপুঞ্জের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখে সমুদ্রগর্ভ থেকে কালো রঙের ধোঁয়া উঠছে। দেখতে দেখতে সেই ধোঁয়া একটি বটগাছের মত আকাশ ছেয়ে ফেলল। সেই জায়গায় পরে এক নতুন দ্বীপ সাগর ভেদ করে মাথা তুলেছে।

'সেভেরিয়াকো' নামে সোভিয়েতের এক ডুবো জাহাজও সামুদ্রিক গবেষণায় অংশ গ্রহণ করে। এ ছাড়া পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ 'লেনিন' উত্তরমেরু অঞ্চলে সামুদ্রিক গবেষণা চালিয়ে আসছে। দক্ষিণ মেরুতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ওব ও লেনা নামে দু'টি জাহাজ।

সমুদ্রের জৈব ও খনিজ সম্পদ

পৃথিবীর সমস্ত সাগর মিলিয়ে ১৪০ কোটি ঘন কিলো মিটার জল আছে যার মধ্যে রয়েছে ১৬০০ কোটি টন জৈব ও উদ্ভিদীয় পদার্থ এবং ৪৬০০ কোটি টন খনিজ পদার্থ। এ সবই বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে স্থলের তুলনায় তিনগুণ হারে। সমুদ্রের জলের খনিজ পদার্থের মধ্যে লবণের ভাগ সবচেয়ে বেশি। সারা দুনিয়ার লবণের চাহিদার শতকরা পঁচিশ ভাগ আসে সমুদ্র থেকে (ভারতে ব্যবহৃত লবণের অধিকাংশই হচ্ছে সামুদ্রিক)। ম্যাগনেসিয়াম, ব্রোমিন, পটাসিয়াম, ইত্যাদি আরো বহু প্রয়োজনীয় ধাতু সমুদ্রজল থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

মানুষের জৈবখাদ্যের বেশ বড় একটি অংশ আসে সমুদ্র থেকে। প্রতি বছর পাঁচ লক্ষের মত জাহাজ সমুদ্রে মাছ ধরে মোট প্রায় তিন কোটি টনের মত, ঝিনুক শামুক জাতীয় আহার্য জীব ধরে কুড়ি লক্ষ টন, আট লক্ষ টন চিংড়ি এবং সত্তর হাজার টন অন্যান্য খাদ্য। বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রের এক একটি এলাকায় সমুদ্রের মধ্যেই মাছের চাষ হবে জলের জমিতে সার দিয়ে।

এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে গড়ে মাথা পিছু বছরে মাত্র দশ কিলোগ্রাম সামুদ্রিক খাদ্য ব্যবহার হয়।

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

পৃথিবীতে শক্তির একমাত্র উৎস হচ্ছে সূর্য। সারা বছরে সূর্য যে ২৪৬×১০^{১৮} কিলোওয়াট শক্তি পাঠায় তার শতকরা মাত্র ০·২ ভাগ গাছপালাগুলি জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে। পৃথিবীতে যদি মরুভূমি, হিমবাহ ও মেরুর তুষারমুক্ত না থাকত, তাহলে সেই সব জায়গা সবুজে ছেয়ে যেত এবং ফলে বছরে গাছপালা থেকে ৫০×১০^{১৩} কিলোওয়াটের সমান জৈবশক্তি আহরণ করা যেত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে দৈনিক তিন হাজার ক্যালরি খাদ্য দিতে লাগে মাত্র ৩৮×১০^{১০} কিলোওয়াট জৈবশক্তি। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে
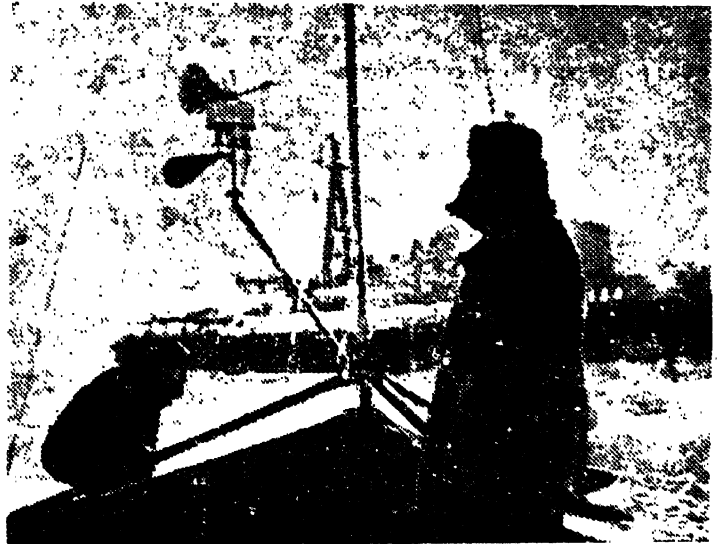
উত্তর মেরুতে সামুদ্রিক গবেষণারত পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ 'লেনিন'
রাত্রিকালের দৃশ্য
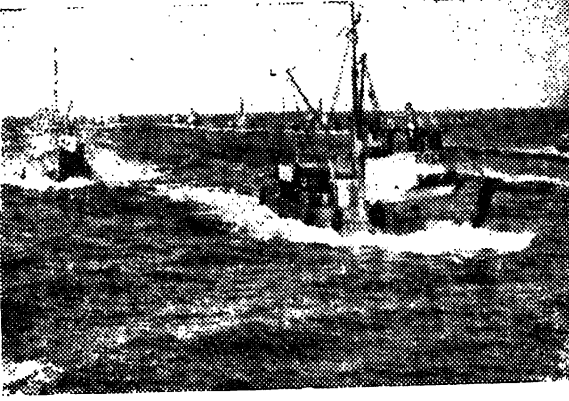
মৎস্যশিকারী নৌবহর ওখত্‌স্ক সাগরে অভিযানে বার হয়েছে

ক্লোরেলা নামে এক রকমের সামুদ্রিক উদ্ভিদ। সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরেলা এক আজব জিনিষ। এক হেক্তার অর্থাৎ সাড়ে সাত বিঘা লোনা জলায় চাষ করে ৪৩টন ক্লোরেলা পাওয়া যায়, যেক্ষেত্রে গম পাওয়া যায় বড় জোর ৬ টন। কিন্তু গমে যে ক্ষেত্রে প্রোটিনের অনুপাত শতকরা মাত্র ১২ ভাগ, সেক্ষেত্রে ক্লোরেলার হচ্ছে শতকরা ৫০ ভাগ। এই ক্লোরেলা থেকেই ভবিষ্যতে মহাকাশযাত্রীদের খাদ্য তৈরি হবে বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন।

এ ছাড়া আরো নানারকমের অত্যন্ত পুষ্টিকর সামুদ্রিক উদ্ভিদ আছে, যেগুলি সৌরশক্তির সাহায্যে সাগর জলের বিভিন্ন খনিজ পদার্থ মানুষের খাদ্যে রূপান্তরিত করে।

শামুক ঝিনুক ইত্যাদি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে প্রোটিন থাকে খুব বেশি। সেগুলি মানুষের এবং পালিত পশুর পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর। এবং তাদের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে।

মানুষ তার খনিজ পদার্থের প্রয়োজন মেটায় ভূত্বকের মাত্র এক-চতুর্থাংশ থেকে। বাকি তিন-চতুর্থাংশে হচ্ছে সাগর। কিন্তু সমুদ্রের তলায় মৃত ও পচা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের দেহাবশিষ্ট জমা হয়ে হয়ে অফুরন্ত পুষ্টিকর ও জৈব পদার্থ সঞ্চিত হতে থাকে। এইভাবে উত্তর আমেরিকার ভ্যাংকোভারের কাছে সাগরতলে প্রচুর কয়লা পাওয়া গিয়েছে। ক্যালিফর্নিয়ার কাছে সমুদ্রের নিচে ১০০ কোটি টন ফস্ফেট সঞ্চিত আছে এবং নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে জলের তলায় যে ৩৫০ কোটি টন লোহার খনি আছে সেখান থেকে লোহা নিকাশ করা হচ্ছে। এইরকম ভাবে কাস্পিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, ক্যারিবিয়ান ও আলাস্কার প্রচুর তৈল ও গ্যাসের খনি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে ম্যাঙ্গানিজ আছে ১০ হাজার কোটি টনের মত।

সব শেষে বলা যায় যে, মানুষ যখন তাপ পারমাণবিক ক্রিয়াকে বশে আনতে পারবে তখন সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশিকে সে পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করবে। বর্তমানে তাপ পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করার জন্য। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে এই প্রচণ্ড শক্তিকে (এক লিটার জল থেকে তাপ পারমাণবিক ক্রিয়ার দ্বারা ৩০০ লিটার পেট্রলের সমান শক্তি উৎপন্ন করা যাবে) অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য গবেষণা চলেছে। জলের হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীন ৪ কোটি ডিগ্রী উত্তাপে যখন প্লাজ্‌মায় রূপান্তরিত হয় তখন ১ লিটার প্লাজ্‌মা ১০ কোটি কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে পারে। পৃথিবী থেকে মানুষ যেদিন যুদ্ধকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করবে, সেদিন রত্নের অফুরন্ত আকর মহাসাগর বিশ্বমানবের যে কতখানি উন্নতি সাধনের রাস্তা খুলে দেবে তা আজও আমাদের কল্পনাতীত।

চিঠি

চিত্ত রায়

যৌবন চিঠি দিয়েছে।
সে কাঁদে,
আমার ধূসর জীবনের নীরব বিদ্রূপে।

আকাশে মরাচাঁদ,
আমি চলেছি।
সূর্য পাটে গেল,
বিশ্রাম কোথায়!

কার যেন ঘন ঘন চুম্বনে
চোয়াল ব'সে গেছে।
সান্দ্র আলিঙ্গনে
পাঁজরের হাড় জাগছে।

চোখের নীচে কালো দাগ।
বাদামী বসন্ত
শুধু বিবর্ণ বিষাদ—
দু'হাতে ছড়ায়েছে।

যৌবন!
মিছেই কড়া নাড়ছো,
অনেকক্ষণ ছিটকিনি প'ড়েছে।

[সম্পূর্ণ উপন্যাস]

সতীকান্ত গুহ

তন্বী, গৌরী, রূপসী বললেও অত্যুক্তি হয় না। বড়ঘরের শিক্ষিতা সুবেশা মেয়ে সুহাসিনী। খোলস দেখে তাকে আধুনিকা বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু মনটা তার বড় সেকেলে। পুরাণ কিংবা কিংবদন্তীর নায়িকাদের সঙ্গে এ বিষয়ে তার আশ্চর্য মিল। তাদেরই মত সে তাই মনের নিভৃত কোণে একান্তে প্রেমের তপস্যা করত। সে তপস্যা ছিল সতীপ্রেমের তপস্যা।

ষোল বছর থেকে বিশ বছর এই··· চারটা বছর সে শয়নে-স্বপনে এই প্রার্থনা করত, হে ঠাকুর, আমি যেন স্বামীকে ভালোবেসে সার্থক হতে পারি, তাঁর পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারি। হালফ্যাসানী তন্বী সুহাসিনীকে দেখে তার এই গোপন প্রার্থনার কথা কেউ কল্পনায়ও আনতে পারতো না।

শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হবার পর সুহাসিনী ধনী মামার কাছেই পালিত হচ্ছিল।—একদিন মহা ধূমধামে মামার বাড়িতেই সুহাসিনীর বিয়ে হয়ে গেল। মফস্বলের সহরটা এই বিয়ের ধমকে চমকে গেল। সুহাসিনীর বুকে সেদিন পূর্ণিমার বিপুল টানে সাত সাগরের ঢেউ উঠল পড়ল।

বিয়ের পিঁড়িতে বসে সুহাসিনী বরের পানে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারল না।

বর্ষীয়সীরা ফিস-ফাস করে বললেন, এ কি সুহাস! চোখ নামা।

কিন্তু আত্মহারা হয়ে সে তার ভাবী স্বামীর পানে তাকিয়ে রইল। মনে মনে সে চমকে উঠে ভাবল। এ কি দেবতার মত সুন্দর বর এসেছেন আমাকে গ্রহণ করে ধন্য করতে! এঁর পায়ে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ না করে দিলে তো আর কোন উপায় থাকবে না।

সাতপাকের পর চার চোখের মিলনের সময় সুহাসিনী নীরব ভাষায় তার স্বামীকে জানাল—তোমার সুখ আমার সুখ, তোমার দুঃখ আমার দুঃখ, আমি একান্ত তোমার। আমায় গ্রহণ করো। আমি আকাশের মত তোমায় ঘিরে থাকবো। বাতাসের মত তোমায় ঘিরে থাকবো। বাতাসের মত তোমার দেহ-মন জুড়োবো। আলোর মত তোমায় জড়িয়ে ধন্য হব।

মেয়েরা সুহাসিনীর বিহ্বল ভাব দেখে চাপা গলায় টিপ্পনি কেটে বলল। সুহাসের হল কি! বিয়ে শেষ না হতেই দেখি ও বাসরের স্বপ্ন দেখছে।

সুহাসিনীর সেই নিষ্পলক দৃষ্টির তীব্রতায় অস্বস্তি বোধ করে স্মৃতিভূষণ চোখ ফিরিয়ে নিল। বাসরের প্রথম পর্বে কড়ি আর আংটির খেলা সুরু হল। বর স্মৃতিভূষণ হেরে হেরে নাকাল হল। তরুণীদের কলহাস্যে বিদ্রূপে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সুহাসিনীর মুখে বিরক্তি প্রকাশ পেল।

স্বামীর হাতটা সরিয়ে নিয়ে সে ফিস-ফিস করে বললে, খেলো না তুমি ওদের সঙ্গে, তুমি সোজা মানুষ, ওদের সঙ্গে চালাকীতে পেরে উঠবে না।

তারপর তার আত্মীয়া ও সঙ্গিনীদের তিরস্কার করে বলল, তোমাদের কি একটু বিবেচনা নেই, সারাদিন লোকটা না খেয়ে আছে, তোমরা ওকে কেন জ্বালাতন করছ?

বাসরসঙ্গিনীরা টিটকিরি দিয়ে উঠলো, আড়ালে সবাই চোখ কপালে তুলে বলল, ছি ছি, কি বেহায়া মেয়ে বলতো ?

সুহাসিনীর মামী শুধু মৃদু হেসে বললেন, তোমরা তো জানো ও কি পাগল মেয়ে! ও-কি জেনে-বুঝে কিছু বলছে! তোমরা অপরাধ নিও না।

বাসর যখন নির্জন হল সুহাসিনী স্বামীকে বলল, তুমি শোও। আমি বরং জেগে থাকি।

স্বামীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে সুহাসিনী বলল। নূতন জায়গায় তোমার এমনিই হয়তো ঘুম হবে না। তাছাড়া এতদিন একা শুয়ে থাকার অভ্যেস তোমার। হঠাৎ আজ—

স্মৃতিভূষণ এবার না হেসে পারল না। তারপর ঈষৎ মাথা নেড়ে বলল—গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমার মাথায় ছিট আছে। দেখছি সন্দেহ অমূলক নয়।

সুহাসিনী হেসে বলল, আচ্ছা তা'হলে তুমি আগে শোও। আমি বরং একটু পরে। কি বলো ?

হেসে স্মৃতিভূষণ বললে, তোমার যা খুসি করো। আমার তো ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে।

স্বামী শোবার পর ঘর অন্ধকার করে সুহাসিনী একটু তফাতে বসে রইল। যখন বুঝল স্বামী ঘুমিয়েছে, সে স্বামীর শিয়রে এসে বসল। অন্ধকারেই স্বামীর মুখের পানে সে নির্নিমেষে চেয়ে রইল। তারপর, দু' তিন বার ইতস্তত করে স্বামীর মাথায় আলগোছে হাত বুলোতে লাগল।

গভীর রাত্রে, চারিদিক যখন একান্ত নির্জন, সুহাসিনী স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার চোখে সহজে ঘুম এলো না। তার বিশ বছরের জীবন তোলপাড় করে কি সে আকাশপাতাল ভাবলো! তারপর এক সময় কি ভেবে নিজের আঙুল থেকে আংটিগুলো খুলে নিয়ে স্বামীর আঙুলে পরিয়ে দিলে। তাতেও তার তৃপ্তি হল না। তখন সে তার স্বামীর ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতে নিয়ে আরামে আয়েসে চোখ মুদল।

রেল থেকে স্টিমার, স্টিমার থেকে রেল—এই করে, পদ্মা পাড়ি দিয়ে, মফস্বলের মেয়ে সুহাসিনী এলো কলকাতায় তার শ্বশুরবাড়িতে। স্মৃতিভূষণ মেয়ে না পেয়ে শেষটা মফস্বলে গিয়ে মাথা মুড়লো এই ভেবে আত্মীয়-পরিজনেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। নূতন বৌকে দেখে তাঁদের মনের সেই গুমোট ভাবটা কেটে গেল। একহারা ফর্সা মেয়েটির সরল মুখ দেখে সকলেরই একটা মায়া হল।

মেয়েরা বললেন, আহা, মার কোল থেকে ছিনিয়ে এ কাকে নিয়ে এলো স্মৃতিভূষণ, এ যে একেবারে সকালের ফুল! আমাদের ঘরে না যায়!

শাশুড়ী সৌদামিনী নূতন বৌয়ের মুখে মধু দিয়ে বললেন, সুখী হও মা, তারপর এক সময়ে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন, এখানে অনেকেই অনেক কথা বলবে, তাতে কান দিও না। এত মেয়ে দেখে শুনে তোমায় কেন পছন্দ করলুম জানো ? তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে বলে, তার প্রমাণ আছে তোমার দেহের লক্ষণে। বৌকে আদর করে কোলে টেনে এনে তার কপালে একটা চুমু দিয়ে সৌদামিনী বললেন, দেখি তোমার বাঁ হাতটা ?

সভয়ে সুহাসিনী হাতটা এগিয়ে দিল। তার বাঁ হাতের অনামিকায় পদ্মচিহ্ন।

সৌদামিনী আঙুলটা সস্নেহে নেড়ে চেড়ে বললেন, এটা হচ্ছে তোমার লক্ষ্মীর আঙুল। সৌভাগ্যবতী হও, সুখী হও।

কাঁপতে কাঁপতে জলভরা চোখে সুহাসিনী শাশুড়ীকে প্রণাম করতে গেল, শাশুড়ী তাকে বুকে তুলে নিলেন।

ফুলশয্যা, বৌভাত ইত্যাদির হাঙ্গামা চুকবার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা সুহাসিনী স্মৃতিভূষণের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। স্মৃতিভূষণ একটা বই পড়ছিল, পড়তে পড়তেই সে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই বলো।

কিছু না বলে সুহাসিনী ইতস্তত করতে থাকল।

স্মৃতিভূষণ এবার বইটা মুড়ে রেখে বলল, কি চাই বলেই ফ্যালো না।

সুহাসিনী স্বামীর সামনে টেবিলের উপর একটা কনুই রেখে বলল, ভাবছিলুম তোমার কিছু কাজ-কর্ম যদি আমায় দাও।

আমার কাজ-কর্ম ? স্মৃতিভূষণ সবিস্ময়ে বলল, আমার কাজ-কর্ম তোমাকে করতে হবে কেন ?

যাতে তুমি একটু হাল্কা হতে পারো! অত কাজ তুমি একা পেরে উঠবে কেন ? সুহাসিনী গম্ভীর হয়ে বলল, তাছাড়া শরীরের দিকটা দেখতে হবে তো!

স্মৃতিভূষণ শুধু বলল, হুঁ বইয়ের আর একটা পাতায় সে মন দিল, সুহাসিনী এক সময়ে নিঃসাড়ে স্বামীর চেয়ারটার পিছনে এসে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে স্বামীর মাথায় হাত বুলোতে সুরু করল।

একটা দীর্ঘশ্বাসের চাপা শব্দে স্মৃতিভূষণ চমকে উঠল। বইয়ের পাতাটা মুড়ে ফেলে সে বললে, কি ব্যাপার! কি হয়েছে তোমার!

আমার আবার কি হবে! কিন্তু তোমার ব্যাপার-স্যাপারে চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি। সুহাসিনী মৃদু কণ্ঠে বলল।

আমার ব্যাপার-স্যাপারে। এবার বইটা টেবিলে রেখে দিয়ে স্মৃতিভূষণ সুহাসিনীর পানে পিছনে ফিরে তাকালো।

সুহাসিনী বলল, তোমায় কদিন ধরে বলব বলব ভাবছি। তুমি অত চিন্তা কর কেন ? অত চিন্তা করো বলেই তো গায়ে মাংস লাগে না। বিয়ে করেছ, এখন কিন্তু এত রোগা থাকলে চলবে না।

স্মৃতিভূষণ ক্ষীণ হেসে বলল, তা হলে কি করতে হবে ?

সুহাসিনী বললে, চিন্তা বাদ দিয়ে আমোদ আহ্লাদে থাকবে। খাবে দাবে শরীর ভাল রাখবে।

স্মৃতিভূষণ বলল, কিন্তু চিন্তা বাদ দিয়ে তো মানুষের জীবন নয়। চিন্তা যখন করতেই হবে, আমার চিন্তাটা কে করবে ?

সুহাসিনী ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলল, কেন আমি আছি কিসের জন্য! আমি করব।

মালা সিন্‌হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

"লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে"

— উনি বলেন

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 145-140 BG

স্মৃতিভূষণ এবার না হেসে পারল না। বলল, তুমি? আমার চিন্তা আমার হয়ে তুমি করবে?

সুহাসিনী তার দু'টি বড় চোখ স্বামীর মুখের উপর রেখে বলল, কেন, তাতে দোষের কিছু আছে?

স্মৃতিভূষণ তরুণী স্ত্রীর কথায় কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর বলল, সুহাসিনী। দোষের কথা হচ্ছে না। কিন্তু তা' যে হবার নয়। মানুষের চিন্তা হচ্ছে তার পথের মাশুল। ও মাশুল ধার করে দেওয়া চলে না। ওখানে যে-ই খাতক, সে-ই মহাজন। ধারও সে-ই দেয়, সুদও সে-ই উশুল করে।

স্বামীর চুলে একটা টান দিয়ে মধুর ভ্রূভঙ্গি করে সুহাসিনী বলল, থাক থাক—মানুষ বুঝি আর ধার করে না।

স্মৃতিভূষণ ছিল একটা সৃষ্টিছাড়া মানুষ, সত্যযুগের উদার মন নিয়ে সে কলিযুগের চক্রান্তে এসে পড়েছিল। সে প্রতিপদে আছাড় খাচ্ছিল। কিন্তু মনের ধর্মকে মলিন হতে দেব না এই সঙ্কল্প করে সে বার বার ধূলো ঝেড়ে উঠছিল এবং কঠিন পণ করে তার জীবনের দুর্গম পথে এগোচ্ছিল।

বাদশার দম্ভ ছিল তার চরিত্রে কিন্তু তার জীবনে বাদশাহীর ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। ফলে মাঝে মাঝেই তার বাদশাহী মুলুকে হাঙ্গামা বাধতো। তার তক্তাউস কেঁপে উঠত।

তার ছিল দেবার একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা অহোরাত্র তার শোণিতে শিরায় শিরায় ডাক দিয়ে ফিরত। তার পার্থিব ও অপার্থিব তহবিল তার দানের দৌরাত্ম্যে ফতুর হতে বসেছিল। তার তহবিলের টাকার অঙ্ক যেমন ক্ষয়ের অঙ্কে গিয়ে পৌঁচেছিল তেমনি অপাত্রে দানের ফলে তার অন্তরের তোষাখানা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে ভরে গিয়েছিল।

স্মৃতিভূষণের লৌকিকজীবনের বাধাবিপত্তির রূপটা আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবদের অজানা ছিল না। যাঁরা সুবিধে নিয়ে তার অসুবিধে করতেন, আর যাঁরা নিজেদের অসুবিধে করে তার সুবিধে কখনোই করেন নি, তাঁরাও অনুকম্পা করে বলতেন, স্মৃতি বুঝেসুঝে নিজেকে সামলে চলো। এভাবে ফতুর হয়ে লাভ কি!

কিন্তু অনুকম্পায় তার দম্ভে আঘাত লাগতো, আর দম্ভ জিনিষটা এমনই যে, সামান্য আঘাতে সে তার বিরাট ফণা তুলে মারাত্মক আস্ফালনে মেতে ওঠে, দংশনের হলাহলে সে নিজেই জর্জর হয়ে যায়।

স্মৃতিভূষণের সত্যিকারের সমস্যা যে কোথায় তা বুঝবার মত সহানুভূতি বা শক্তি একটি মানুষ ছাড়া আর কারো ছিল না। মায়ের অন্তঃকরণ দিয়ে সৌদামিনী কিছুটা বুঝতেন। কিন্তু হেঁয়ালী তাঁর কাছে হেঁয়ালীই থেকে গিয়েছিল। স্মৃতিভূষণের জীবনে একটার পর একটা বিপদ আসছে। সে একটা চিন্তার বোঝা নিয়ে ফিরছে এই ভেবে তাঁর মনে শান্তি ছিল না।

সমস্যার ভিতরকার রূপটা দেখেছিলেন, দেখে বুঝেছিলেন স্মৃতিভূষণের পিতা শশিভূষণ। চাকুরী থেকে অবসর নেবার পর শশিভূষণ সংসারের কাজ থেকেও নিজের ছুটি করে নিয়েছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন অবসরের সুরে নিজেকে বেঁধে নিয়ে একটা আধ্যাত্মিকতার জগতে ঢুকে পড়েছিলেন। গৃহের এক প্রান্তে নিজের ঘরে বসে গীতা, উপনিষদ, পুরাণে মগ্ন হয়ে থাকতেন। কখনো নিঃশব্দ ভাষায় নিজেই বক্তা নিজেই শ্রোতা হয়ে তত্ত্বের বিতর্কে মত্ত হয়ে যেতেন। কখনো, যখন ডাক এসে পৌঁছুতো, ঠাকুরঘরে গিয়ে উপাস্যদেবতার আরাধনায় বসতেন।

একদিন আক্ষেপ করে সৌদামিনী বললেন, ছেলেটা বেহুঁসের মত চলেছে। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, একবার খোঁজ করলেও তো পারো! কোন্ বিপদ ওকে সর্বনাশা টানে টানছে ভেবে মন আমার ভয়ে অশান্তিতে ভরে যায়।

শশিভূষণ শান্তকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, ওকে পথ দেখাবার কি ওর জন্য ভাববার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ওর অদৃষ্টে যা আছে খণ্ডানো যাবে না। ও হচ্ছে যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসী। শাস্তি পেতে পৃথিবীতে এসেছে। যতক্ষণ পাওনা শাস্তি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে না নিচ্ছে, ওর মুক্তি নেই।

এ কথার উত্তরে সৌদামিনীর আর বলবার কিছু থাকতো না।

স্মৃতিভূষণের বিপদের বীজ ছিল তার চরিত্রের ভিতর। জীবনে সে না বলতে চাই তো না। হার অনিবার্য জেনেও সে হার মানতে পারতো না। ফলে, যেমন সে একদিকে দিতে দিতে ফতুর হচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে সে ক্ষতির ব্যবসায় টান সামাল দিতে গিয়ে ক্রমশ বেসামাল হয়ে পড়ছিল। তার সঙ্কটের রূপটা আগে থেকেই আভাসে দেখেছিল। কিন্তু সাবধান হতে, ব্যবসার রশি গুটিয়ে নিতে তার শৌর্যে বাধতো। অদৃষ্টের সঙ্গে সন্ধি না করে তার হাতে মার খেয়ে মরবার সঙ্কল্পও করে ফেলেছিল।

কিন্তু বিয়ের পর তার মনে এল দুর্বলতা। শেষ হবার কথা ভাবতে গেলে তার পাঁজরটা একটা নিবিড় ব্যথায় টনটন করে উঠত। সেই ব্যথার কোথাও সুহাসিনীর দু'টি বিষণ্ণ চোখের ছায়া বিরহের আভাসে জড়িয়ে থাকতো। তার ও তার অদৃষ্টের মাঝখানে সুহাসিনী এসে দাঁড়িয়েছিল।

স্মৃতিভূষণের চরিত্রে ছিল ট্রাজিডির পৌরুষের দুর্বারতা। মহাশ্মশানের শেষ অঙ্কের শেষ পাঠের জন্য একদিন নিজেকে বলি দিতে হতে পারে। এ তত্ত্বটা যৌবনের গোড়ায়ই তার মনে উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। কারণ ইংরেজ সরকারের অসন টলাতে যে সন্ত্রাসবাদের জোয়ার এসেছিল, সে একদা তার প্রচণ্ড স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। কিন্তু প্রেমের রূপ তখনও সে দেখে নি। প্রেমের চেয়েও যে সর্বনাশা আকর্ষণ সেই প্রেয়সীর চরাচরব্যাপী কটাক্ষ তখনও তার জীবনের ওপর এসে পড়ে নি। ফলে স্মৃতিভূষণের জীবনে এক কূটসমস্যার উদয় হল। শেষ হতে যখন আর বাকী নেই, তখন যে শেষ হবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। এখন সে করে কি!

স্মৃতিভূষণের সমস্যা ছিল দু'টো—আর্থিক সঙ্কট ও মানসিক বিপর্যয়। এই আর্থিক সঙ্কটটাই কিন্তু শেষে তার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ব্যবসার দাবী, সংসারের দাবী কোনোটাই আর মেটানো সম্ভব রইল না। ঋণ আর উপার্জন থেকে যা আসতে লাগল, তা ঋণের সুদ মেটাতেই শেষ হতে থাকল। শেষে একটা কানা গলির শেষ সীমায় পৌঁছুল।

স্মৃতিভূষণের চরিত্রে সাহসের সঙ্গে ছিল একটা কাপুরুষতা। কুৎসিত ও অসুন্দরের সঙ্গে সে মুখোমুখী হতে ভয় পেত। রূঢ় ও অশালীন আচরণের সম্মুখে সে সঙ্কোচে লজ্জায় মরে যেত। ফলে

উত্তমর্ণদের শাসনে ও তাড়নায় সে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। রাত্রের অন্ধকার কাটবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি দিন এসে তাকে লাঞ্ছনার কশাঘাতে জর্জর করে দিতে থাকল। টাকার খোঁজে সে পাগল হয়ে চারিদিক তোলপাড় করে ফিরতে লাগল।

একদিন শীতের গভীর রাত্রে স্মৃতিভূষণ বাড়ি ফিরে দেখল, সুহাসিনী প্রতি রাত্রের মতই তার অপেক্ষায় বসে আছে। তার মুখে একটা কঠোর সংকল্পের আভাস, স্মৃতিভূষণের নজর এড়ালো না। নিজের দুর্গতির মর্মান্তিক রূপ সে সুহাসিনীকে দেখতে দিতে চায় নি। তাই, সুহাসিনীর পানে তাকিয়ে, সে মনে মনে প্রমাদ গণল।

সুহাসিনী স্মৃতিভূষণের গায়ের শালটা নিয়ে ভাঁজ করতে করতে বলল, খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে স্মৃতিভূষণ বললে, কি কথা! বলো।

সুহাসিনী স্থির দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখতে দেখতে বলল, তোমার কি বিপদ আমায় খুলে বলতে হবে। আর আমার কাছে লুকিয়ো না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্মৃতিভূষণ বলল, লুকোবার কি আছে! টাকার অনটন বেড়েই চলেছে।

রুদ্ধশ্বাসে সুহাসিনী বলল, তোমার কত টাকার দরকার, কবে দরকার, কি হলে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো, আমায় খুলে বলো।

স্মৃতিভূষণের পৌরুষে কোথায় যেন একটা আঘাত লাগলো। কোন লজ্জায় সে স্ত্রীর কাছে হাত পাতবে? বলল, চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করছি না। কিন্তু হঠাৎ চারিদিকেই যেন সবাই হাত গুটিয়েছে দেখছি, শুধু ঘুরে মরাই সার হচ্ছে।

সুহাসিনী ধরা গলায় বলল, শুধু কি তুমিই চেষ্টা করবে? আর আমি বসে বসে তোমাকে এ ভাবে ক্ষয় হতে দেখব!

স্মৃতিভূষণ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, আমি যেখানে এসে পৌঁচেছি সুহাস, সেখানে টাকার জন্য চেষ্টার ভিতর আছে লাঞ্ছনা ও ক্লেশ, তোমাকে এই চেষ্টায় জড়িয়ে লাভ কি?

সুহাসিনী বলল লাভ, এই যে, তোমার একার বোঝাটা দু'জনে মিলে বইতে পারি। তোমার বিপদে আমি কিছুই করব না, তুমি কি এই চাও?

স্মৃতিভূষণ উদাসী স্বরে বলল, কি করবে? তোমার পক্ষে কি করা সম্ভব?

কি করা সম্ভব! সুহাসিনীর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। যা করতে পারি তা করা তো সম্ভব বটেই, তারপর—

এই বলে দুঃখে অভিমানে কাঁপতে কাঁপতে সে গা থেকে একটার পর একটা অলঙ্কার খুলতে লাগল। গায়ের অলঙ্কার শেষ হবার পর সে বাক্স থেকে তার যত অলঙ্কার ছিল বার করে এনে টেবিলের ওপর স্তূপ করল। তারপর দৃপ্তকণ্ঠে সে বলল, এ অলঙ্কার শুধু আমার নয় তোমারও, কবে থেকে আমি আর আমার অলঙ্কার তোমার পর হল। তারপর সে স্বামীর হাতদু'টো শক্ত করে নিজের মুঠোয় ধরে বলল, আমাকে যেমন নিয়েছ এই অলঙ্কারও নাও, আমাকে এটুকু অধিকার দাও।

কোন কথাই স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে স্মৃতিভূষণ বলতে পারল না।

কিন্তু সুহাসিনীর অলঙ্কার দিয়ে স্মৃতিভূষণের বিপদের বন্যায় বাঁধ দেওয়া গেল না। তার সর্বনাশের সমুদ্রে তখন পূর্ণিমার জোয়ার এসেছে। বিপদের সাগর উত্তাল হয়ে ঢেউ তুলে স্মৃতিভূষণ ও সুহাসিনীর জীবনের ওপর আছড়ে পড়ল।

স্মৃতিভূষণ যেন ভেঙ্গে পড়ল। অধমর্ণের দল কৈফিয়তের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। উত্তমর্ণরা অস্থির হয়ে পড়েছে। চারিদিকে তাকিয়ে তার জীবনের দিগন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও স্মৃতিভূষণ কোনো কূল-কিনারা দেখতে পেল না।

শশিভূষণের সংসার যদি এই বিপদে তার পাশে দাঁড়াতে পারতো তাহলে স্মৃতিভূষণ হয় তো মনে বল রাখতে পারতো। কিন্তু এ সংসারের রথ তখন হোঁচট খেতে খেতে চলেছে, শশিভূষণ পেন্সন নেবার পর তাঁর সঞ্চিত টাকা কিছুটা ছিল ব্যাঙ্কে কিছুটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর শেয়ারে। দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই ওপর শনির দৃষ্টি পড়ে' লাল বাতি জ্বললো। জ্যেষ্ঠ পুত্র চির উদাসীন। ভোগে বা উপার্জনে—কোনোটাতেই তাঁর আসক্তি ছিল না। বাড়ির মেজ ছেলেই শুধু ওকালতির রোজগার থেকে কিছু টাকা সংসারে এনে দিতেন। স্মৃতিভূষণ ছিল তৃতীয়। কনিষ্ঠ কীর্তিভূষণ তখনো উপার্জনের রাস্তায় পা দেয় নি।

শশিভূষণের সংসার আমিরী চালে চলত। স্মৃতিভূষণ তাঁর বাদশাহী মেজাজের সবটা না হলেও খানিকটা উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিল। অর্থের অভাব সত্ত্বেও ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে শশিভূষণের সংসারে অস্বচ্ছলতা বেড়েই চলল। যখন ঠাট কমানো হল, তখন সংসারে হতাশার সুর বেজে উঠেছে।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার অসহায়তার কথা ভেবে সুহাসিনীর মন অস্থির হয়ে পড়ল। কি করে স্বামীকে সে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করবে, ভেবে সে কোনো উপায়ই খুঁজে পেল না, কয়েকটা দিন রাত সে প্রতিমুহূর্ত এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। কিন্তু কোন আশার আলো সে দেখল না।

তখন সে তার পিসতুতো ভাইকে ডেকে পাঠালো। উকিল হিসেবে তার পসার ছিল। সে সব শুনে বলল, টাকার যখন সংস্থান নেই, তখন একমাত্র পথ হচ্ছে আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। স্মৃতিভূষণকে দেউলে হতে বলো। পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচবার আর কোনো রাস্তা নেই।

সুহাসিনী মুখ কালো করে বলল, কিন্তু সে তো ঠকানোর পথ—তাতে কি ও রাজী হবে?

উকিল বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, কিন্তু রাজী হলে বুদ্ধিমানের কাজ করবে, ধর্মবোধ অত উগ্র হয়ে থাকে তো যখন টাকা-পয়সার মুখ দেখবে তখন বেন ধার শুধে দেয়।

সুহাসিনী আড়ালে স্বামীকে ডেকে এনে বলল, আমার পিসতুতো ভাই তো দেউলে হবার পরামর্শ দিচ্ছে। বলছে, পরে টাকা শুধে দিও। তুমি কি বলো।

স্মৃতিভূষণের মুখে অপমানের অসহ্য ব্যথা ফুটে উঠল। সে আহত দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চেয়ে বলল, তুমি কি চাও আমি আইনের অজুহাতে শঠতা করি?

সুহাসিনী স্বামীর হাত ধরে ফেলে বলল, ছিঃ, আমি কি তোমাকে তাই করতে বলতে পারি। থাক, তুমি ও কথা আর ভেবো না দেখি কি করতে পারি।

কিন্তু সুহাসিনী নিজের মনে কোন ভরসাই পেল না। কোথা থেকে সে টাকা আনবে? স্বামীর এ বিপদের কথা কি করে সে কাউকে জানাবে? জানিয়েই বা কি ফল হবে? মামার বাড়ির কথা যে একবার তার মনে এলো না তা' নয়, কিন্তু সেখানে সে কোন লজ্জায় টাকার কথা বলবে! তাছাড়া তার মামারবাড়ির কাছে স্বামীর মাথা হেঁট হয়, এমন কাজ কি করে করা চলে! কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে সে মামারবাড়ির কথাটাই কয়েকবার মনে তোলপাড় করলে। তারপর, একদিন সন্ধ্যাবেলা, সে একটা দৃঢ়সংকল্পে বুক বেঁধে স্মৃতিভূষণের কাছে কথাটা পাড়ল।

স্মৃতিভূষণ অন্ধকারে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। তার জীবনের রঙের সঙ্গে রাত্রের অন্ধকারের রঙটি বেশ মিলত। এই অন্ধকারে বিলীন হয়ে নিঃসঙ্গ বসে থাকতে সে বেশ একটা শান্তি পেত। আলোয় যে আশ্রয় যে অভয় সে মাথা কুটে মরেও পায় নি, অন্ধকারে তা অনায়াসে পেত, এই অন্ধকারে বসে গভীরতর আর এক অন্ধকারের চিন্তা এসে তার মনে হানা দিত। কিন্তু সুহাসিনীর মিনতি ও তিরস্কারভরা দু'টি চোখের কথা ভেবে এই চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারত না।

সুহাসিনী এসে স্বামীর পাশে দাঁড়ালো। বলল, একটা কথা আছে।

স্মৃতিভূষণ বলল, বলো কি কথা?

সুহাসিনী ধীর কণ্ঠে বলল, ঠিক করেছি মামার কাছে লিখবো!

স্মৃতিভূষণ কোন কথা বলল না। সুহাসিনী বলল, মামা আমাদের বিপদের কথা জানলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। ভেবে দেখলাম এতে লজ্জার কিছু নেই। এ-তো হাত পেতে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না। ধার নিচ্ছি। হাতে টাকা এলে ধার শুধে দেবো। কি বলো?

স্মৃতিভূষণকে নীরব থাকতে দেখে সুহাসিনী পুনরায় বলল, মামার কাছে এতে লজ্জারই বা কি আছে। আমি তো দেখছি এই হচ্ছে সোজা পথ। তাহলে লিখে দিই। আপত্তি কোরো না।

স্মৃতিভূষণ ক্ষীণস্বরে বলল। আচ্ছা। কিন্তু তার বুকের ভিতর একটা তুমুল আলোড়ন সুরু হল। সুহাসিনীর অলঙ্কার নেবার পর তার পৌরুষে এই দ্বিতীয়বার আঘাত লাগল।

সৌদামিনী একদিন দুপুরবেলা সুহাসিনীর ঘরে ঢুকে বললেন, বৌমা, একবার তেতলায় ওঁর ঘরে এসো। উনি ডাকছেন।

শাশুড়ীর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুহাসিনীর হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠল। সে শুয়েছিল। শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ম্লানমুখে শাশুড়ীর পিছন পিছন শ্বশুরের ঘরে এসে ঢুকল।

শশিভূষণ ইজিচেয়ারে শুয়ে সামনের দেয়ালের দিকে নির্নিমেষে

তাকিয়েছিলেন। তাঁর পাশে টিপয়ের ওপর একটা খোলা চিঠি পড়েছিল।

সুহাসিনীকে একটু দেখে নিয়ে শশিভূষণ বললেন, তোমার মামার কাছ থেকে এই চিঠিটা এসেছে, পড়ে দেখ।

কম্পিত হস্তে চিঠিখানা নিয়ে সুহাসিনী পড়ল। অক্ষরগুলো তার চোখের সামনে নাচছিল। সেই সঙ্গে তার পায়ের তলার মেঝেটা যেন সরে যাচ্ছিল। সে পড়ে যাচ্ছিল। সৌদামিনী এগিয়ে আসবার আগেই শশিভূষণ বিষয়টা অনুমান করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পুত্রবধূকে ধরে ফেলেছিলেন। দু'জন মিলে তাকে বসালেন। দু'জনের ভিতর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হল।

চাপা গলায় সৌদামিনী বললেন, স্বামীর বিপদ নিয়ে মেতে আছে—আমার ত্রিসীমানায় কি আজকাল ঘেঁসে যে জানবো, বা বুঝবো? নিজে থেকে মুখ খুলে তো একটা কথাও বলবে না।

শশিভূষণ বুঝলেন স্বামীর বিপদে সুহাসিনী কি পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হয়ে আছে—তার অন্তঃসত্ত্বা হবার খবরটা তার শাশুড়ীকে দেওয়া পর্যন্ত সে প্রয়োজন বোধ করে নি।

চিঠিটা তার হাতের মুঠোয় আগুনের মত জ্বলছিল। সেই অবস্থায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সুহাসিনী তার ঘরে ফিরে এলো। চিঠিটা সামনে রেখে অবিশ্বাসে অপমানে কাঠের পুতুলের মত বসে রইল।

চিঠিতে সুহাসিনীর মামা শশিভূষণকে যথারীতি সম্ভাষণ ও লৌকিকতার পর লিখেছেন যে, তাঁর ভাগ্নীর মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না এই বিশ্বাসে ও আশ্বাসে তিনি শশিভূষণের সংসারে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জামাতা যে ঋণের দায়ে জেলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল একথা তাঁর জানা ছিল না। তাহলে তাঁর এই চিঠি লেখারও কোনো প্রয়োজন হত না। স্মৃতিভূষণের পক্ষে সুহাসিনীর ওপর চাপ দিয়ে একটা মোটা টাকা চেয়ে পাঠানো শুধু গর্হিত নয়, বলতে গেলে তাঁর উপর অত্যাচার—বিশেষ করে তিনি যখন প্রচুর ব্যয় করে সালঙ্কারা বধূকে তার হাতে সমর্পণ করেছেন। তাছাড়া সুহাসিনী এখন শশিভূষণের সংসারের একজন। তার স্বামীর বিপদে সাহায্যটা শশিভূষণের তরফ থেকেই প্রথম আসা উচিত। তিনি পাঁচ হাজার টাকা পাঠালেন। এর পর তাঁর উপর যেন আর কোনো দাবী কিম্বা উৎপাত না করা হয়।

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সুহাসিনী তার ও তার স্বামীর বিপদের কথা ভুলে গেল। শশিভূষণের অপমানটা তার মনে বিষ ঢেলে দিলে। শ্বশুরবাড়িতে চিরজন্মের জন্য যে তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। এই কটা টাকার জন্য তার মামা তাকে এভাবে আঘাত করতে পারলেন? শ্বশুরবাড়ির এ অপমানের কৈফিয়ৎ সে কি দেবে। আর স্মৃতিভূষণ এ অপমানের পর এ টাকা কি সে স্পর্শ করবে।

সুহাসিনীর কাছে পৃথিবীর মুখোসটা খসে পড়ে যে স্বরূপ প্রকাশ পেলো, তার বীভৎসতার কথা চিন্তা করে সে শিউরে উঠল।

কখন দুপুরের রোদ হেলে পড়েছে, রাস্তার কলে জল এসেছে সুহাসিনীর খেয়াল ছিল না। সে যেন স্থান কাল ভুলে গিয়ে একটা দুঃস্বপ্নের জগতে অস্তিত্বের অশুভ তপস্যায় বিভোর হয়েছিল। স্মৃতিভূষণ ঘরে ঢুকতে তার হুঁস হল।

স্মৃতিভূষণ সুহাসিনীর বিবর্ণ মুখ দেখে চেয়ারে বসতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে মেঝের ওপর দেখল তার শ্বশুরের চিঠি আর পাঁচ হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট।

স্মৃতিভূষণ চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে সুহাসিনীকে বলল, বাবার এ অপমানের জন্য আমি দায়ী। আমাকে দুর্বলতা পেয়ে বসেছিল। না হলে আমি তো তোমাকে থামাতে পারতুম।

সুহাসিনীকে মেঝে থেকে আস্তে আস্তে তুলে বিছানায় বসিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে সে বলল, তুমি ভেবো না। ও টাকা আমরা ফেরত পাঠিয়ে দেবো। তোমার মামার কাছে আমাদের জন্য তোমাকে হেঁট হতে দেব না।

কিন্তু এখন উপায় কি হবে? কাতরকণ্ঠে সুহাসিনী বলল।

কিসের উপায় সুহাসিনী? স্মৃতিভূষণ জিজ্ঞাসা করে।

তোমার টাকার উপায়? অপমান তো যা হবার হল। কিন্তু কি করে তোমার বিপদ কাটাই। সুহাসিনীর বিহ্বল স্বরে একটা অসহায়তার হাহাকার জেগে উঠল।

বিপদের কথা এখন থাক। তুমি এখন একটু জিরোও। তারপর পরামর্শ করে দেখা যাবে। চিঠিটা আর পাঁচ হাজার টাকার ড্রাফ্‌টটা পকেটে রাখতে রাখতে স্মৃতিভূষণ বলল। সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শশিভূষণের ঘরে স্মৃতিভূষণ ও সুহাসিনীর ডাক পড়ল। সুহাসিনীর পিছন পিছন মুখ কালো করে হেঁট মস্তকে স্মৃতিভূষণ এসে শশিভূষণের সম্মুখে দাঁড়াল।

শশিভূষণের পাশে সৌদামিনী বসে ছিলেন। ছেলে আর ছেলে-বৌকে দেখে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

শশিভূষণ বললেন, তোমাদের বিপদ এতদূর গড়িয়েছে ঘুণাক্ষরেও তো জানাও নি। বিপদ একটা চলেছে জানি, কিন্তু তোমরা যে শেষে বেয়াইমশাইকে পর্যন্ত চিঠি লিখে বসেছো জানতুম না।

একটু থেমে বললেন, আমার জমানো টাকার একটা কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। কার কাছেই বা চাই! তবে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবো না বলে উপদেশ পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করতে পারবো না, একথা তোমরা কি করে ভাবলে?

উপদেশ পরামর্শের কথায় সৌদামিনী স্বামীর পানে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করলেন।

স্মৃতিভূষণ কি বলতে যাচ্ছিল, সুহাসিনী ইসারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা! অপরাধ আমার। ও কিছুই জানতো না। ওকে লুকিয়ে আমি মামাকে চিঠি দিয়েছিলুম।

শশিভূষণ সুহাসিনীর কথা শুনে বললেন, চিঠি লিখে তুমি কোনোই অপরাধ করনি মা। স্মৃতির অভাবটা হচ্ছে অপরাধ! কিন্তু আর একটা বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না। শশিভূষণ সুহাসিনীর হাত ও গলার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সুহাসিনী ও স্মৃতিভূষণ দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সৌদামিনীর মুখের রেখা কঠোর হয়ে এলো।

শশিভূষণ বললেন, সুহাসিনীর দু' হাত খালি। গলায় সে আঁচল জড়িয়ে থাকে। বঝতে পারছি গলাও তার নিশ্চয়ই খালি। অলঙ্কার

গেছে—গেছে, তার জন্য আক্ষেপ করি না। কিন্তু দু' গাছা চুড়ি আর একগাছা হার রেখে দিতে কি বাধা ছিল।

সুহাসিনী আঁচল খুঁটতে খুঁটতে বলল, ও গয়না বিক্রির কথা কিছুই জানে না বাবা। শুনলে ও বেচতে দিত না। আমি সেভিংস ব্যাঙ্কে জমানো টাকা থেকে তুলে দিচ্ছি বলে ওকে বুঝিয়েছিলুম।

অতি দুঃখেও শশিভূষণ হেসে ছিলেন। বললেন, মা সব দোষই কি তোমার? স্মৃতির অভাবটাও হয় তো তোমারই একটা মস্ত অপরাধ।

সৌদামিনী অধীর হয়ে বলে উঠলেন, ঐ তো বৌয়ের দোষ! স্বামীকে আড়াল করে বাহাদুরী নিতে গিয়েই তো আজ ওর এই সর্বনাশ!

শশিভূষণ বললেন, তোমাদের আর্থিক বিপদ কি করে ঘুচবে বুঝতে পারছি না! আমি নিরুপায়। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন। কিন্তু একটা কথা তোমাদের দু'জনকেই বলতে চাই। সুহাসিনী অন্তঃসত্ত্বা। দুশ্চিন্তা থেকে ও যত তফাতে থাকে ততই ভালো। ওর সন্তানের ভালো মন্দর জন্য আমরা সবাই দায়ী। স্মৃতির বিপদের কথা স্মৃতিই আজ থেকে ভাববে। ও পুরুষ মানুষ। ও কাজ ওকেই সাজে।

মাথা হেঁট করে স্মৃতিভূষণ ও সুহাসিনী চলে যাচ্ছিল। সৌদামিনী পিছন থেকে ডেকে বললেন, বৌমা একবার এদিকে এসো।

সুহাসিনী কম্পিত চরণে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সৌদামিনীর নিজের হাত থেকে কয়েক গাছা চুড়ি ও গলার হার খুলে নিয়ে সুহাসিনীকে পরিয়ে দিলেন।

শাশুড়ীর চোখে জল দেখে সুহাসিনীর চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামলো।

স্বামী-স্ত্রী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে অন্ধকারে বসে রইল। তারপর রাত একটু গভীর হলে দু'জনেই বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলে। রাত আরও গভীর হল। স্মৃতিভূষণ যখন ঘুমে অচেতন, সুহাসিনী উঠে সন্তর্পণে ঘেরাটোপ দেওয়া আলোটা জ্বেলে টেবিলে গিয়ে বসল। নিঃশব্দে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে একতাড়া কাগজ বার করল। স্মৃতিভূষণের পাওনাদারদের একটা ফর্দ সে করে ফেলল। একটা বইয়ের ভাঁজে ফর্দটা গুঁজে রেখে দিল, যাতে স্মৃতিভূষণের নজরে সেটা না পড়ে। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে সে স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বামীর মুখ সে বিভোর হয়ে দেখল। দেখতে দেখতে তার মুখে বেদনা ছাপিয়ে একটা সকরুণ হাসি ফুটল। সে হাসিতে ছিল অভয় ও সান্ত্বনা।

স্ত্রীর আড়ালে থেকে অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে স্মৃতিভূষণ নিজের চোখে নিজে নেমে গিয়েছিল। শশিভূষণের কথায় তার মন মর্মান্তিক ধিক্কারে ভরে গেল। সে স্থির করল যদি তাকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে হয়, তাও ভালো, সে আর সুহাসিনীকে নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়াবে না।

এই সংকল্প এঁটে সে নিজের দিকে তাকিয়ে তার জীবনের ফাঁকা অন্ধকার রূপটা দেখে আঁতকে উঠল। কৈশোর থেকে একা থাকার নেশায় মশগুল হয়ে সে মানুষের সঙ্গ প্রায় বাদ দিয়ে রেখেছিল। তার মনে আত্মবিনিময়ের এক গভীর সুর বাজত, সে সুরে কেউ সাড়া দিতে পারে নি। রবি ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে জোড়াসাঁকোয় একটি ছেলের ভাবময় দু'টি চোখ দেখে তার ভালো লেগেছিল। বন্ধুত্বের একটি তিক্তমধুর ভূমিকার পর সে বন্ধুত্বও একদিন মরীচিকার মত মিলিয়ে গিয়েছিল। ফলে এত বড় পৃথিবীতে সে ছিল বন্ধুহীন একা।

মেয়েদের সম্বন্ধে তার মনে ছিল একটা গভীর আধ্যাত্মিকতা। কিছুতেই যাতে তার এ ধ্যানের ধনের সস্তা রূপ বেরিয়ে না পড়ে, তাই সে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের তফাতে রেখে চলেছিল। তার জীবনে প্রথম নারী সুহাসিনী এবং এই সুহাসিনীর ভিতর দিয়েই নারীর সঙ্গে তার প্রথম নিবিড় পরিচয়।

স্মৃতিভূষণ নিজের জীবন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল তার সহায় সম্পদ বলতে ঐ এক সুহাসিনী। সেই সুহাসিনীকে ছাড়বার কথায় তাই সে ভয় পেল। কিন্তু তার পৌরুষ বারবার তাকে বিদ্রূপ করল। তার সুনিশ্চয় জেনেও স্মৃতিভূষণ তাই একাই জীবন-যুদ্ধে এগোবার সঙ্কল্প করল।

সুহাসিনীর বুঝতে বাকি রইল না, তার স্বামীর মনে কি অপমান ও বেদনার নিপীড়ন সুরু হয়েছে। তাই স্মৃতিভূষণ যখন তাকে একা কথা বলার সময় বসতে বলল, তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

স্মৃতিভূষণ ম্লান হেসে বলল, আমার জন্য তো কম করলে না, লাভ কি হল?

সুহাসিনী আর্দ্র কণ্ঠে বলল, তোমার জন্য করাটাই আমার মস্ত লাভ হয়েছে।

স্মৃতিভূষণ বলল, তাহলে লাভটা এখন থেকে এক আমার হোক।

সুহাসিনী সভয়ে বলল, সে কি কথা! শ্বশুরঠাকুর মামার চিঠি পেয়ে কি বলেছেন। মনে রেখো না।

স্মৃতিভূষণ ব্যথিত কণ্ঠে বলল, মনে না রেখে পারছি না সুহাসিনী। লজ্জার কাপুরুষতার তো একটা সীমা আছে।

সুহাসিনী দৃপ্তকণ্ঠে বলল, কে বলে তুমি কাপুরুষ? তুমি কোমল। তুমি যে কি, আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝি।

স্মৃতিভূষণের চোখে জল এল, সে বলল, সুহাসিনী! তুমি আমায় বোঝো বলে পৃথিবী তো আর আমাকে রেহাই দেবে না। আমার কাপুরুষ বলে নাম রটেছে। কে জানে কে কোথায় টিটকারি দিচ্ছে। একবার আমায় একা এগোতে দাও। হারতে দাও। অপমান অসম্মানের হাত হতে বাঁচতে দাও।

সুহাসিনী বলল, তুমি তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে, আমি কি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব?

স্মৃতিভূষণ এবার গম্ভীর গলায় বলে। না দেখে উপায় কি সুহাসিনী! শুধু আমার কথা ভাবলে তো চলবে না। আমার হয়ে আর একজনের কথাও তো ভাবতে হবে। তোমার শরীরের যে অবস্থা তোমায় সরে দাঁড়াতেই হবে।

সুহাসিনী খানিকক্ষণ খাটের ওপর বসে কাঁদল। তারপর চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তবু একেবারে বাদ দিও না। আড়াল থেকে যদি কিছু করতে পারি, বাধা দিও না।

স্মৃতিভূষণ চলে যাচ্ছিল। সুহাসিনীর ডাকে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুহাসিনী বলল, ড্রাফ্‌টা কই? আমায় দাও।

স্মৃতিভূষণ ড্রাফ্‌টা দিতে সুহাসিনী বলল, এটা আমি ভাঙিয়ে নিও।

স্মৃতিভূষণ সুহাসিনীর কথা যেন বুঝতে পারল না। বলল, এই ড্রাফ্‌টটা ভাঙিয়ে নেবে—তাহলে যে বাবার অপমানের সীমা থাকবে না।

সুহাসিনী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, অপমানের উত্তর আমি দেবো। বাবার ও টাকায় আমার যোল আনা অধিকার। বাবার বিষয় আশয় আমার প্রতিপালনের জন্য মামার হাতে এসেছিল। আমি বলছি। তুমি আমার কথা রাখো।

স্মৃতিভূষণ বলতে গেল, কিন্তু—

সুহাসিনী ব্যথিত কণ্ঠে বলল, কোন কিন্তু নেই, তুমি আমায় আর কষ্ট দিও না।

স্মৃতিভূষণ একবার সুহাসিনীকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

ড্রাফ্‌টের টাকায় পাওনাদারদের সঙ্গে আপাততঃ একটা সন্ধি হল—কিছুকালের মেয়াদ পাওয়া গেল।

ইতিমধ্যে স্মৃতিভূষণ বিশেষ চিন্তার পর একটা সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিল। সে দেখল যে ঋণের পাহাড়ের উপর সুদের বিরাট একটা জঞ্জাল জমেছে। শেষে পাহাড়ের চেয়ে জঞ্জালটা বড় হয়ে না ওঠে! টাকা ধার করে এনে তাই ধার শোধ দেবার কোন অর্থ হয় না। তার চেয়ে একটা চাকরীর চেষ্টা করা ভালো। পাওনাদারদের সামনে মাসের রোজগার ফেলে দিয়ে বলা ভালো, তিলে তিলে যে ধার বেড়েছে তার শোধও তিলে তিলে হবে।

স্মৃতিভূষণের মনে একবার একটা সন্দেহ উঁকি দিল, যদি পাওনাদাররা রাজী না হয়!

সুহাসিনী তার সেই উকিল জ্ঞাতিভাইকে ডেকে পাঠালো। সে বলল, রাজী না হলে কোর্টে যাক। ডিক্রি হবে! রোজগারের থেকে বেশি কিস্তি তো আদালত আর দেবে না।

স্মৃতিভূষণ মনে মনে ভাবলে, আইনের আশ্রয়ে তো মানুষের নরম মনটা আশ্রয় পায় না। হীন উত্তমর্ণদের বর্বরতা ইতরতা যে তাকে তলোয়ারের চেয়েও কঠিন খোঁচা দেয়!

উকিল স্মৃতিভূষণের মনের ভাবটা আঁচ করে বললেন, মনটাকে শক্ত করে বাঁধতে শেখো ভায়া। ইমোশনাল হলেই বিপদ। একেবারে নির্বিকার হয়ে যাও। ঐ কথায় আছে না, আমি কাণে দিয়েছি তুলো, আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো।

স্মৃতিভূষণের মুখে কে কালি ঢেলে দিল।

শোভাবাজারের অক্ষয় সোম তাঁর তেজারতী কারবারের অফিসে বসে আছেন। কতকগুলো হ্যাণ্ড ও হ্যাণ্ডনোট সম্বন্ধে একটা নোট তৈয়ারি করছিলেন। এই সময় বেয়ারার পিছন পিছন এক তরুণী এসে ঢুকলো। অক্ষয় সোম গভীর বিস্ময়ে তরুণীর দিকে তাকালেন। তাঁর অফিসে ঋণের ব্যাপারে অনেকেই আসে। কিন্তু তরুণীর আগমন এই প্রথম।

তরুণী নমস্কার করে বলল, আপনিই কি অক্ষয়বাবু?

অক্ষয় সোম প্রতিনমস্কার করে বললেন, হাঁ। বলে তরুণীকে বসতে বললেন।

তরুণী বলল, আপনি স্মৃতিভূষণবাবুর কাছে কত টাকা পান?

অক্ষয় সোম সখেদে বললেন, তা সুদে আসলে সাত হাজার তো হবেই। আপনি কি স্মৃতিভূষণবাবুর কাছ থেকে আসছেন?

তরুণী বলল, হাঁ। আমার নাম সুহাসিনী দেবী। আমি ওঁর স্ত্রী।

অক্ষয় সোম সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, আপনি তাঁর স্ত্রী? কিন্তু সে অর্থাৎ স্মৃতিভূষণ কোথায়?

সুহাসিনী বলল, তিনি আছেন। কলকাতাতেই আছেন, তবে তাঁর বদলে আমিই এলুম। ভবিষ্যতে আমিই আসবো।

অক্ষয় সোমের সন্দেহ বৃদ্ধি হল। তিনি বললেন, কিন্তু টাকাটা—টাকাটার কি হবে?

সুহাসিনী বলল, কি হবে আবার! টাকা পাবেন। তবে ঝট করে পাবেন না। আস্তে আস্তে সবটাই পাবেন। আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে ধার শোধ নেবেন। সুদটা ছেড়ে দিতে হবে।

অক্ষয় সোম সুহাসিনীকে দেখে তার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুহাসিনী যেন তাঁর মনে একটা রেখাপাত করল। গভীর কৌতূহলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, স্মৃতিভূষণের কি কোনো অসুখ করেছে? সে থাকতে আপনি কেন আসছেন?

সুহাসিনী হেঁয়ালীর সুরে বলল, আমার স্বামীর অসুখটা নূতন নয়। ঐ অসুখ নিয়েই তিনি জন্মেছেন।

অক্ষয় সোম চিন্তিত হয়ে বললেন, কি অসুখ মা তোমার স্বামীর ?

তিনি যে আপনি থেকে তুমিতে চলে গেলেন তারজন্য মোটেই বিব্রত বোধ করলেন না। মা সম্বোধন করে যেন একটা গভীর তৃপ্তি পেলেন। সুহাসিনীরও তা বুঝতে বাকী রইল না।

ধরা গলায় সুহাসিনী বলল, আপনাকে তাহলে খুলেই বলছি। আমার স্বামী পাওনাদারদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। মিনতি করতে তাঁর মর্যাদায় বাধে। অপমানে অসম্মানে ভেঙ্গে পড়েন। রফা করতে গেলে যেটুকু নীচু হতে হয় কিম্বা যে কটুক্তি সহ্য করতে হয় তা ওঁকে মুহ্যমান করে দেয়।

অক্ষয় সোমের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আজ এখানে আসবে স্মৃতিভূষণ জানে ?

সুহাসিনী বলল, না। জানলে আসতে দিতেন না। কিন্তু নিজেও লজ্জায় আসতেন না।

অক্ষয় সোম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হুঁ, বুঝেছি। তবে শোন মা, তেজারতির ব্যবসা করে খাই বলে মনটা এখনও পুরোপুরি বরবাদ হয়ে যায় নি। তা ছাড়া মানুষ যে চিনি না, মানুষের সুখ-দুঃখ যে মনটাকে একেবারে নাড়া দেয় না—তা নয়। কিন্তু আমি নয় মা তোমার কথা মেনে নিলুম, স্মৃতিভূষণের আরো তো অনেক পাওনাদার আছে—তারা কি সবাই মানতে চাইবে ?

সুহাসিনী বলল, আমার স্বামী চাকরির চেষ্টা করছেন। আজ না হলেও কিছুদিনের ভিতর চাকরি জুটবেই। জোটাতেই হবে। উনি আর ধার করবেন না, পাবেনও না। ঐ চাকরীর টাকা থেকে পাওনাদাররা সুদ বাদে তাঁদের আসল পাওনা বুঝে নেবেন। আপাতত ছ' মাসের সময় আমার স্বামীকে দিতে হবে।

অক্ষয় সোম বললেন, স্মৃতিভূষণের অবস্থায় পড়লে আমিও এই প্রস্তাবই দিতুম। কিন্তু জানো তো মা পাওনাদাররা ছাড়বার আগে একটা শক্ত কামড় দেবার চেষ্টা করবে। অনেকে এই কামড়ের ভয়ে নিজেদের সর্বনাশ করেও পাওনাদারদের দাবী মিটোয়।

সুহাসিনী বলল, আমার স্বামী সর্বনাশের শেষ সীমায় এসেই এই প্রস্তাব দিচ্ছেন। তাঁর আর কোনো উপায় নেই।

অক্ষয় সোম কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, মা তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আমার হাতে আর স্মৃতিভূষণের সর্বনাশ হবে না। সে যেভাবে তার সুবিধা ধার শোধ করুক। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য পাওনাদাররা বেঁকে না বসে।

সুহাসিনী বলল, তাদের রাজী করাতেই হবে। এই সংকল্প করেই আমি বেরিয়েছি।

অক্ষয় সোম সুহাসিনীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখছিলেন। বললেন, তুমি যে স্মৃতিভূষণের পাওনাদারদের সঙ্গে দেখা করবে—তারা তো সবাই এক জায়গায় থাকে না—সঙ্গে গাড়ি এনেছো ?

সুহাসিনী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, গাড়ি তো নেই, অনেকদিন হল বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আমি ট্রামে এসেছি।

অক্ষয় সোম চিন্তাকুল কণ্ঠে বললেন, ট্রামে করে এসেছো! কিন্তু তা তো উচিত হয় নি। তোমার তো এ অবস্থায় সতর্ক হওয়া উচিত।

নিজের দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী দুঃখে সঙ্কোচে মাথা নামিয়ে নিলে। সে যে অন্তঃসত্ত্বা তা অক্ষয় সোমের চোখ এড়ায় নি।

অক্ষয় সোম কি একটা কথা মনে তোলপাড় করছিলেন। সুহাসিনীকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাকে লজ্জা দিতে চাই নি মা। বরং এই অবস্থায় তুমি স্বামীর কাজে বেরিয়েছ, ভেবে আমি তোমায় কি বলব—কি করে তোমায় আমার মনের কথা বোঝাবো বুঝতে পারছি না। স্মৃতিভূষণের অদৃষ্ট একদিকে ভেঙেছে বটে, তবে আর একদিকে সে মহা ভাগ্যবান।

অক্ষয় সোম একটু থেমে বললেন, চিমনলালই হচ্ছে স্মৃতিভূষণের বড় মহাজন। মহাপাজী লোক। তাকে রাজী করাতে পারলে, ছোটখাটো কসাইদের আমি সায়েস্তা করতে পারবো।

বেয়ারাকে ডেকে অক্ষয় সোম তাঁর লাঠি আর চাদর আনতে বললেন। সুহাসিনীকে গাড়িতে পাশে বসিয়ে চিমনলালের গদীর উদ্দেশে রওনা হলেন।

অনেক ঝুলোঝুলির পর চিমনলাল রাজী হল। টাকার জন্য হা হুতাশ করে পরে সে হঠাৎ খুসি হয়ে পড়ল। স্মৃতিভূষণের ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ থেকে যাতে সে বাদ না পড়ে এই কথাটাও সে জানিয়ে দিলে। সুহাসিনীকে লজ্জা পেতে দেখে অক্ষয় সোম বললেন, ওদের ওই রকমই মা। কিন্তু ও কথা বলে ও তোমাকে মায়ের সম্মানই দিচ্ছে। অফিসে ফিরে এসে অক্ষয় সোম তাঁর গাড়ি করেই খানিকটা পথ সুহাসিনীকে যেতে বললেন।

বিদায় নেবার সময় হঠাৎ সুহাসিনী যখন উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল, অক্ষয় সোমের দু'চক্ষু আর্দ্র হয়ে এলো। সুহাসিনী চলে গেলে পর তিনি খানিকক্ষণ টেবিলে কোনো কাজে হাত দিতে পারলেন না।

অক্ষয় সোমের সঙ্গে সুহাসিনীর সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টা স্মৃতিভূষণকে জানানো হল না। তাঁর পরামর্শে সুহাসিনী সেই রাতেই স্মৃতিভূষণকে দিয়ে তাঁর কাছে একখানা চিঠি লেখালো। চিঠিতে রইল ছ'মাসের মেয়াদের আর সুদ মাপ করে দেবার সর্ত।

দু'দিন বাদেই অক্ষয় সোমের কাছ থেকে চিঠি এলো যে যদিও পাওনাদারদের কিছু লোকসান হল, স্মৃতিভূষণের অবস্থা বিবেচনা করে পাওনাদারদের এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং তাঁরা সর্ত দু'টি মেনে নিচ্ছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছ'মাস বাদে নিয়মিত কিস্তিতে স্মৃতিভূষণ ঋণের আসল শুধে দেবেন।

চিঠিখানা স্মৃতিভূষণের নামে এসেছিল। চিঠির বক্তব্য পড়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে দ্রুতপদে খোলা চিঠি হাতে ঘরে ঢুকে সুহাসিনীকে বলল, এই ভাখো অক্ষয়বাবু চিঠির জবাব দিয়েছেন।

চিঠির জবাব দিয়েছেন? অক্ষয়বাবু? তাই না কি। কৃত্রিম বিস্ময়ে সুহাসিনী বলে।

হ্যা, পড়ে ভাখো, স্মৃতিভূষণ চিঠিখানা সুহাসিনীর হাতে দিলে।

চিঠি পড়ে সুহাসিনী বললে, তুমি এতও জানো বাপু! এমন চিঠিই লিখলে যে দু'দিনেই জবাব এসে গেল।

স্মৃতিভূষণ একটু যে আত্মপ্রসাদ বোধ করে নি, তা নয়। তবে সে বেশ বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। সে পূর্বেও পাওনাদারদের চিঠি লিখেছে। জবাবে যে ভাষায় যে মন্তব্য পেয়েছে, তা ভাবতেও তার দেহ-মন গ্লানিতে ভরে যায়। আজ হঠাৎ পাওনাদারদের শিষ্টাচারে জীবনের একটা সংযত রূপ দেখে সে একটু আশ্বস্ত হল।

স্মৃতিভূষণ বলল, বিশ্বাসের অতীত ঘটনা—যা এত দিন হয় নি—আজ হল।

সুহাসিনী বলে, তবু তুমি বলো যে তুমি কোন কাজের নও। তুমি শুধু হটেই যাচ্ছ।

স্মৃতিভূষণ বলল, এতদিন তো তাই হয়েছে।

সুহাসিনী হেসে বলল, এখন তো উল্টোটা হল। তুমি নিজের ভিতর বিশ্বাস হারিয়ে ছিলে কিন্তু আমি হারাই নি। তুমি সব পারো এ ধারণা আমার গোড়া থেকেই ছিল। আজ তা প্রমাণ হয়ে গেল।

স্মৃতিভূষণ কি ভেবে বলে, এর ভিতর এমন একটা রহস্য আছে যা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করব না। এইটুকু শুধু মনে রাখবো যে তুমি না থাকলে চিঠি লিখতুম না, না লিখলে জবাবও পেতুম না। তুমি পাশে থাকলে হয় তো সবই সম্ভব।

সুহাসিনী বাধা দিয়ে বলল, ওকথা বোলো না। আমি তোমার পাশে কি! তুমি ভস্মে ঢাকা ভোলানাথ। তুমি নিজেকে যেদিন পুরোপুরি জানবে সেদিন সব বুঝবে, সব পারবে।

ছ' মাসের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে সুহাসিনী ও স্মৃতিভূষণ কিছুক্ষণ নীরবে মুখোমুখি বসে রইল। স্মৃতিভূষণ তার পর একসময় বলল, এখন আদাজল খেয়ে চাকরীর চেষ্টায় লাগতে হবে। একটা চাকরী পেলে মনে হচ্ছে বিপদের একটা কূল কিনারা হয়।

সুহাসিনী স্বামীর পানে কটাক্ষ করে বলে, চাকরী তোমার হবেই। চাকরী হলে কিন্তু একটা জিনিষ আমি চাইবো। তখন কিন্তু না বোলো না।

কি পাগল! স্মৃতিভূষণ অনুযোগের স্বরে বলল, আমার চাকরী হলে দেখে নিও তখন। কিন্তু কি চাও—আর চাইতেই বা হবে কেন। একে একে গয়নাগুলো নতুন করে গড়িয়ে দেবো।

সুহাসিনী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, গয়না চাইতে যাবো কেন—ও তো সবাই চায়। আমি যা চাই শুনলে হাসবে।

হাসবো না। বলো। স্মৃতিভূষণ বলল।

সুহাসিনী বলল, আমি কি চাই জানো। আমি চাই একটা কবিতা।

কবিতা। কবিতা তোমার ভালো লাগে না কি? স্মৃতিভূষণ সবিস্ময়ে বলল। সে একদা লিখতো, ভালোই লিখতো। কিন্তু ব্যবসার ফাঁদে পা দেবার পর কাব্যচর্চার অকাল যবনিকা পড়েছে।

ভালো আবার লাগে না। কবিতার জন্য মনটা হাঁপিয়ে ওঠে। তুমি তো ছাই লিখবে না। সুহাসিনী কৃত্রিম অভিযোগের স্বরে বলল।

স্মৃতিভূষণ বলল, বেশ। দেখে নিও লিখি কি না। বললে এরই ভিতর লিখতুম।

সুহাসিনী বলল, থাক এখন হাঙ্গামা করে লাভ নেই। পরে লিখো। চাকরী হোক। তখন একটা খুব ভালো করে লিখো।

স্মৃতিভূষণ বলল, কিন্তু তোমাকেও একটা আমার জন্য লিখতে হবে।

সুহাসিনী শিউরে উঠে বলল, ওরে বাবা! সে কি আর আমি পারি। তারপর তার মুখে একটা চটুল হাসি ফুটলো। এ ধরণের হাসি তার মুখে এই প্রথম দেখল স্মৃতিভূষণ। সে মুগ্ধ হল।

সুহাসিনী বলল, একটা কথা বলব। কাউকে বলতে পারবে না কিন্তু। যদি বলো তবে জীবনে আর কথা বলব না।

স্মৃতিভূষণ সহাস্যে বলল, এ শাস্তি কি করে সইব! যা হোক বলো।

সুহাসিনী বলল, দেখ, আমার ক্লাসে যারা কবিতা লিখতো তাদের দেখে আমার ভীষণ হিংসে হত। আক্ষেপ হত আমি কেন কবি হতে পারি না। তখন আমি একটা ফন্দি আঁটলুম। ডান হাতের দু'টি আঙুলে সুহাসিনী ফন্দি আঁটবার একটা বিচিত্র মুদ্রা দেখালে। স্মৃতিভূষণের মনটা হাল্কা বাতাসে পাতার মত কাঁপলো। সুহাসিনী বলল, যখন দেখলুম কবি হওয়া আমার কর্ম নয় তখন ভাবলুম মূর্তিমতী কবিতা হতে পারলে কেমন হয়! কবিতা হবার জন্য তখন মরীয়া হয়ে গেলুম। কিন্তু শেষে কবিদের টনক নড়িয়ে ছেড়ে দিলুম।

স্মৃতিভূষণ স্তব্ধ হয়ে সুহাসিনীর এই নূতন প্রকাশ দেখছিল।

সুহাসিনী বলল, প্রসাধনের সাধনায় সব মেয়ে হার মেনে গেল। সাজে-সজ্জায় কবিতার সব কটি লক্ষণ প্রকাশ পেল। তবু কবিদের চোখের সামনে ক্লাস থেকে কমনরুমে, কমনরুম থেকে লাইব্রেরীতে হাল্কা চালে ঘুরতুম ফিরতুম। কবিদের দশা দেখে পেট ঠেলে হাসি আসতো।

স্মৃতিভূষণ মাথা নেড়ে বলল, তুমি তো লোক সুবিধের নও, সুহাসিনী। যা হোক তোমার ওই ভক্ত কবিদের কি হলো?

সুহাসিনী বলল, বিয়ের লুচিমণ্ডা খেতে সবকটা এসেছিল। তোমাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। শাপ দিয়েছে। সবচেয়ে যেটা পাজি সে কি বলেছিল জানো? বলেছিল—গান্ধারীর মত তোমার পুত্র সৌভাগ্য হোক।

স্মৃতিভূষণ বলল, কি সর্বনাশ!

সুহাসিনীর হিসেবে বিশ্বের কাব্যসাহিত্যের বিনিময়ে একখানা মনের মত অলঙ্কার বেছে নেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমতীর কাজ। কিন্তু স্মৃতিভূষণের জন্য সে হিসেব সে ভুলতে প্রস্তুত। তার কুমারী জীবনের যে কাহিনী সে স্মৃতিভূষণকে বলল, তার ষোলো আনাই ছিল কল্পনা। কিন্তু এই মনগড়া কাহিনী সত্য বলে চালাতে মিথ্যা-ভাষণের বিন্দুমাত্র গ্লানি তাকে স্পর্শ করল না। স্মৃতিভূষণ সুখী হল, এই ভেবে সে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব ভুলে গেল।

কয়েকটা দিন এ ভাবে সুখস্বপ্নে কাটলো। স্মৃতিভূষণ চাকরীর চেষ্টায় সকাল থেকে সন্ধ্যা সহরের পথগুলি সচকিত করে ফিরতো। সারাদিন সুহাসিনী সংসারের কাজে আর তার ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর শুভ কামনায় রত থাকত। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জন মুখোমুখি বসে আশায় ও আশ্বাসে ভবিষ্যতের ছবি মধুররঙে আঁকত। কিন্তু হঠাৎ মামাবাড়ি থেকে এলো টেলিগ্রাম। মামীর মৃত্যু-সংবাদে সুহাসিনী খানিকটা কাঁদলো। মামী ছিলেন তার মা'র সমান। তারপর চোখ মুছে বাক্স সাজিয়ে যাবার জন্য তৈরি হল। স্মৃতিভূষণকে চাকরীর চেষ্টায় থেকে যেতে হল। সঙ্গে গেল স্মৃতিভূষণের ছোট ভাই কীর্তিভূষণ।

গাড়ি ছাড়বার সময় সুহাসিনী স্বামীর পায়ের ধুলো নিলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সাবধানে থেকো। আমার জন্য ভেবো না। চাকরী হলে তক্ষুনি টেলিগ্রাম করতে ভুলো না।

স্মৃতিভূষণ যখন গাড়ি থেকে নামছিল, তখন সুহাসিনী স্বামীর পকেটে একগোছা নোট রেখে দিয়ে বলল, দরকার মতো খরচ কোরো।

এ টাকা সুহাসিনী কোথায় পেল, স্মৃতিভূষণ ভেবে বিস্মিত হল।

চাকরীর খোঁজে স্মৃতিভূষণ সহরটা চষে ফেলল। বিজ্ঞাপনের মারফৎ সে দেশের দিকে-দিগন্তে, দেশের বাইরে বিদেশে, চাকরীর খোঁজে হাত বাড়ালো। চাকরীগুলো সোনার হরিণের মত তাকে একটা আশার জগতে ছুটিয়ে মারল। স্মৃতিভূষণের জীবন ক্লান্তিতে ভরে গেল। ব্যর্থতার একটা নিদারুণ আশংকা তাকে বিহ্বল করে তুলল। একটা মাস কেটে গেল, চাকরী হল না।

একদিন ট্রামে সুহাসিনীর দেওয়া টাকার অবশিষ্ট যা ছিল, পকেটমার হয়ে খোয়া গেল। এ দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলতে তার সাহস হল না। স্বাচ্ছন্দ্যের দিনে যে ক্ষতির কাহিনী সহানুভূতির উদ্রেক করে, আর্থিক সংকটের মুহূর্তে তা অবিশ্বাসের অনলে ইন্ধন জোগায়। হেঁটে হেঁটে চায়ের বদলে রাস্তার কলের জল খেয়ে, স্মৃতিভূষণ চাকরীর উমেদারী করে চলল। শেষে তার শরীর ভেঙে পড়ল।

একদিন সন্ধ্যায় এসে স্মৃতিভূষণ শয্যা নিলে। শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এসে তাকে বেহুঁস করে দিলে। রাতে সে খেল না। গভীর রাতে সে প্রলাপ বকতে সুরু করল। কিন্তু পরদিনই তার জ্বরের উপশম হল। কিন্তু অসম্ভব একটা দুর্বলতা বোধ করে সে আর বেরুল না। এর পর থেকে সেই দুর্বলতা বেড়ে চলল। সকালে সন্ধ্যায় তার ঘুষঘুষে জ্বর হতে লাগল।

সৌদামিনী ডাক্তার এনে দেখালেন। ডাক্তারের কথা শুনে তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বললেন, তাহলে উপায়।

ডাক্তার বললেন, উপায় আছে। গোড়াতেই ধরা পড়েছে যখন যত্নে থাকলে কয়েক মাসের ভিতর সুস্থ হয়ে উঠবে।

সৌদামিনী শশিভূষণকে বললেন, এখন কি করা যায়। সুহাসিনীকে জানানো দরকার। এসে স্বামীর সেবা করুক।

শশিভূষণ খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, সুহাসিনী অন্তঃসত্ত্বা। মামীর মৃত্যু শোকে সে একটা আঘাত পেয়েছে। তারপর স্মৃতির অসুখের কথা লিখলে সে কি সামলাতে পারবে? আমি তো বলি, আরো কয়েকটা দিন দেখা যাক।

স্মৃতিভূষণের ব্যাধি ক্রমেই তাকে নিস্তেজ করে ফেলল। ডাক্তার

সৌদামিনীকে বললেন, স্মৃতিভূষণ মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। মন না বাঁধলে এ ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

সৌদামিনী একদিন বললেন, স্মৃতি, সুহাসিনীকে আসতে লিখি। তাহলে তোর একটু যত্ন আত্তি হয়।

স্মৃতিভূষণের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। তারপরে সে ক্ষীণস্বরে বলল, এখন থাক। আর কটা দিন যাক।

শেষে একদিন সৌদামিনী বিদ্রোহ করে বসলেন। শশিভূষণকে বললেন, তোমাকে বললে তুমি বলো, আর কটা দিন যাক। স্মৃতিও সেই কথাই বলে। কিন্তু যদি সর্বনাশ হয়ে যায়, তখন সুহাসিনীকে কি কৈফিয়ৎ দেব, বলো।

শশিভূষণ বললেন, তাহলে কীর্তিকে যেতে বলো। ও গিয়ে ওর বৌদিকে নিয়ে আসুক। টেলিগ্রাম কোরো না—সুহাসিনী হঠাৎ একটা শক্ পেতে পারে।

সৌদামিনী স্মৃতিভূষণকে বললেন, স্মৃতি, কর্তা তো সুহাসিনীকে আনবার জন্য লোক পাঠাতে বলছেন। ভাবছি কীর্তিকে পাঠাই।

স্মৃতিভূষণ একটা খোলা চিঠি তার শিয়রের পাশ থেকে এনে তার মার হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ। সুহাসিনী লিখেছে। পাঁচ শো টাকা পাঠিয়েছে। ক'টা দিন থাকতে পারলে আরো পাঁচ শো পাঠাতে পারবে। তার কোন এক বোনপোর কাছে কি টাকা পেত। সে এখন আস্তে আস্তে টাকাটা শোধ দিচ্ছে।

সৌদামিনী বললেন, এখানে ওর বোনপো বাকী টাকাটা পাঠিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তার জন্য সুহাসিনীর থাকবার কি দরকার! ও চলে আসুক। তোর দেখাশোনা আমি আর কতোটা করতে পারছি। সুহাসিনীর কাছে কি তোর চেয়ে টাকাটা বড়?

স্মৃতিভূষণের মুখ ম্লান হাসিতে ভরে গেল। বলল, চিকিৎসার জন্যও তো টাকার দরকার। আমার অসুখটা সংসারের ওপর একটা বোঝা হয়ে পড়ছে। সে জন্যই বলছি। সুহাসিনীর চিঠির রকমে মনে হচ্ছে টাকাটার জন্য তার ওখানে থাকা দরকার।

সৌদামিনী বললেন, যেমন তোর কপাল, তেমন সুহাসিনীর। তবে এখন থাক—কিন্তু সুহাসিনীকে শীগ্‌গিরই নিয়ে আসতে হবে।

সৌদামিনীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে গভীর ক্লান্তিতে স্মৃতিভূষণ চোখ মুদলো।

সুহাসিনীর কাছ থেকে একখানা চিঠি এলো। চিঠিতে সে লিখেছে যে, একা একা আর সে থাকতে পারছে না। তার মন মোটেই ভালো নেই। স্মৃতিভূষণ ভালো আছে তো? যা হোক, তাকে এখনও কয়েকটা দিন মাতুলালয়ে থাকতে হবে। টাকাটা এখনও হাতে আসে নি। স্মৃতিভূষণ যেন শরীরের যত্ন নেয়। তেমন একটা চিন্তা ভাবনা যেন না করে।
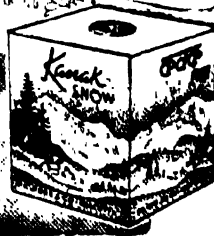
চিঠির বিষন্ন সুরটা স্মৃতিভূষণের মনে একটা অদ্ভুত করুণতার সৃষ্টি করে। কোথা থেকে সুহাসিনী এসে তার জীবনের ঘাঁটি আগলে বসেছে। সব দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে। যাকে চিনতো না, তাকে কি করে একান্ত আপন বলে চিনে নিল! কত সুখীই না সুহাসিনী হতে পারত যদি স্মৃতিভূষণ তাকে একটা সুখের সংসারে বসাতে পারত।

যে ব্যাধি তাকে ধরেছে, এ ব্যাধির শেষ কোথায়! ইহলোক থেকে যদি হঠাৎ সরে যেতে হয়, তাহলে সুহাসিনীকে সে কি সম্পদ দিয়ে যাবে! কি নিয়ে, কাকে নিয়ে, কিসের আশায় সুহাসিনী বেঁচে থাকবে! তার জীবনের এই ভাবী অধ্যায়—সেখানে সে নাও থাকতে পারে—তার ভয়ঙ্কর রূপটা ভেবে স্মৃতিভূষণ শিউরে উঠত। সুহাসিনী তাকে সুখী করার জন্য, নিজে সুখী হবার জন্য, যে চেষ্টা করছে তার জবাবে কোন চেষ্টাই যে সে করতে পারল না, শেষে কঠিন ব্যাধির কবলে পড়ে গেল, ভেবে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার বুক ভরে যেত।

সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা, প্রতি বছরের মতই বাড়িতে পূজার আয়োজন হয়েছিল। রোগশয্যা ছেড়ে স্মৃতিভূষণ প্রতিমাকে প্রণাম করতে যেতে পারে নি। মনে কোন জোর, কোন উৎসাহ বোধ করে নি। সৌদামিনী এসে কপালে আশীর্বাদ ছুঁইয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন সুহাসিনীর চিন্তাটা তার চোখে স্বপ্নের মত নেমে এলো। সুহাসিনীও কি আজ উপবাসী থেকে শুচিবাস পরে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করছে? তার তন্বী দেহে পূজারিণীর রূপটা কি রকম খুলেছে সে ভাববার চেষ্টা করল। তার নিস্তেজ দেহমনে সুহাসিনীর এই মধুর ধ্যান একটা আচ্ছন্নের ভাব এনে দিল।

গভীর রাত্রে নির্জন ঘরে স্মৃতিভূষণ কার উপস্থিতির একটা অলৌকিক আভাস পেল। চোখ মেলতে তার সাহস হল না। কিন্তু একটা সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অনুভূতিতে সে সব দেখল, বুঝল।

সে দেখল, ধূপের ধোঁয়া ও আলো মিশে ঘরটা একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরে গিয়েছে। ফুল ও চন্দনের অপরূপ গন্ধে ঘরে একটা উন্মাদনা জেগেছে। দেহ ও মনের অতীত একটা অবর্ণনীয় পুলকে স্মৃতিভূষণের অন্তরাত্মা সাড়া দিয়ে উঠলো।

ঘরে কার সন্তর্পণে চলা ফেরার আভাস? এই আলো, ধূপের ধোঁয়া, ফুল ও চন্দনের সৌরভ নিয়ে কে তাকে ধন্য করতে এলো, কেন এলো, ভেবে স্মৃতিভূষণের মনে বিস্ময়ের অতীত এক আকুতি জাগলো।

রহস্য সঞ্চারিণী বললেন, চোখ মেলে তাকাও। আমি এসেছি।

ভয়ে সঙ্কোচে স্মৃতিভূষণ বলল, কেন এসেছ! তুমি কে? সেই ধূপের ধোঁয়া মেশানো আলোয় রহস্যময়ীর মুখের হাসিতে এক অপরূপ দীপ্তি প্রকাশ পেলো। সে হাসিতে ছিল সান্ত্বনা ও তিরস্কার।

বললেন, তোমার জন্মজন্মান্তরের সাধনার আড়ালে আমি ছিলুম। তোমার সুখ-দুঃখের অংশ নিতে এসেছি। আজ আমি না এসে পারলুম না।

স্মৃতিভূষণ বলল, আমায় কি করতে বলো?

রহস্যময়ী বললেন, আমাকে তোমার কাছে আসতে দাও। কিন্তু কোরো না। ভয় নেই। আমি তোমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

স্মৃতিভূষণ কাতর কণ্ঠে বলল, সে কি? আমি রোগশয্যায় অশুচি—তুমি কেন আমায় স্পর্শ করবে?

রহস্যময়ী বললেন, তুমি যে আমার একান্ত আপনার। তোমার কাছে না এলে যে আমার শান্তি নেই।

নিমীলিত চক্ষে স্মৃতিভূষণ সব দেখল, শুনল। রহস্যময়ী মশারিটা তুলে তার শিয়রে এসে বসলেন। তাঁর দু'টি করুণ চোখের গভীর চাহনি তার ওপর এসে পড়ল। তাঁর কোমল হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শান্তির অভিষেকের পুণ্যধারার মত বয়ে গেল।

স্মৃতিভূষণ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। আলোটা জ্বাললো। ঘরের কপাট ভিতর থেকে বন্ধ। চারিদিক নির্জন। কিন্তু একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ ও সৌরভের আভাস তখনও পাওয়া যাচ্ছে। কে এলো, কি ঘটনা ঘটল, ভেবে স্মৃতিভূষণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

স্মৃতিভূষণের চোখে আর ঘুম এলো না। নিশীথের সেই জ্যোতির্ময়ী অভিসারিকার কথা ভাবতে থাকলো। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে বিস্মিত হয়ে দেখল—সেই জ্যোতির্ময়ীর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, গ্রহ-নক্ষত্র নীহারিকালোকের পরপারে, অফুরন্ত দিগন্তের মহাকাশের ওপারে সেই রহস্যময়ীর দু'টি চক্ষু গভীর প্রেম ও করুণায় তার পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তার বুকের পাঁজরে একটা ব্যথা টনটন করে উঠল। স্মৃতিভূষণ বুঝতে পারল, বুঝে অবাক হল, সে তার স্ত্রী সুহাসিনীর কথা ভাবছে।

স্মৃতিভূষণের অবস্থা হঠাৎ ভালোর দিকে মোড় নিলে। ডাক্তার সৌদামিনীকে বললেন, হঠাৎ একটা আশ্চর্য উন্নতি দেখছি। এবার স্মৃতিভূষণ সেরে উঠবে।

সৌদামিনী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে গৃহদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, তাই যেন হয়।

স্মৃতিভূষণকে বললেন, এখন একটু বল রেখে ভালো করে খাওয়া দাওয়া কর—দেখবি খুব শীগ্‌গির সেরে উঠবি।

স্মৃতিভূষণ মার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হেসে বলল, তুমি আর ভেবো না মা। আমায় সেরে উঠতেই হবে। মনে মনে স্মৃতিভূষণ ভাবল, সেরে না উঠে তার উপায় কি! যে শক্তি তাকে বিপুল টানে অন্ধকার থেকে আলোয় টানছে, তাকে অস্বীকার সে করে কি করে!

চাকরীর চেষ্টায় একটা ছেদ পড়েছিল। চেষ্টা আবার সুরু না করলে নয়। সুহাসিনী ফিরে আসার আগেই যদি কোনো ব্যবস্থা হয় তো বড় ভালো হয়। স্মৃতিভূষণ যখন উমেদারীর নূতন কাণ্ডের জন্য তোড়জোড় করছিল, তার মামাশ্বশুরের কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। চিঠিতে তিনি লিখেছেন তাঁর দুর্ভাগ্য বিয়ের পর কোনো একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য জামাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপ নেই। সম্পর্কও ছিন্ন হতে বসেছে। এক্ষেত্রে জামাইকে নিমন্ত্রণ জানাবার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু বিপদে তিনি নিশ্চয়ই তাকে স্মরণ করতে পারেন। হাঙ্গামাটা সুহাসিনীকে নিয়ে, স্মৃতিভূষণ অবিলম্বে না এলে হাঙ্গামা মেটানো সম্ভব নয়। স্মৃতিভূষণের মন একটা ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। সে সেদিনই শ্বশুরবাড়ি রওনা হল।

স্মৃতিভূষণের গাড়ি তার শ্বশুরবাড়ির ফটকে এসে থামতে শ্যালক-শ্যালিকা দু'চারজন লৌকিক অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন। সংক্ষেপে প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে স্মৃতিভূষণ সোজা সুহাসিনীর ঘরে চলে গেল।

সুহাসিনী তার ঘরে একা বসেছিল। স্মৃতিভূষণ ঢুকতেই সে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলো। মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে সে বলল, তুমি কেন আমাকে না জানিয়ে এলে ?

স্মৃতিভূষণ সবিস্ময়ে বলল, তোমার মামার চিঠি পেলুম—লিখেছেন তোমার নিয়ে কি হাঙ্গামা বেঁধেছে। কি করে না এসে পারি বলো! এখন বলো, কি ব্যাপার !

সুহাসিনী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, ব্যাপার কিছুই নয়। শুধু তোমাকে লজ্জা দিতে এখানে আনা !

স্মৃতিভূষণ নির্বাক বিস্ময়ে সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে রইল। সুহাসিনীর কথার তাৎপর্য সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

সুহাসিনী বলল, তুমি বোসো। আমি বলছি।

স্মৃতিভূষণ বসলে পর সে আরো কাছে এসে বলল, তুমি নিশ্চয়ই আমায় অবিশ্বাস করবে না।

স্মৃতিভূষণ ধরাগলায় বলল, তোমায় অবিশ্বাস করার কথা আমার মনেই আসে না।

সুহাসিনী বলল, তা হলে শোনো, আমাকে আমার মামার ভাগ্নে নরেশ বেকায়দায় ফেলেছে। অপমান যা করবার করেছে। এখন মামাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে তোমাকে এনে সেই অপমান ও লজ্জায় জড়ানোর ফন্দি এঁটেছে। কিন্তু আমাকে ওরা ভেবেছে কি ! আমি সুহাসিনী। বাক্স আমার গুছানো। আজই আমার রওনা হয়ে যাবো।

স্মৃতিভূষণ বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার মামাতো ভাইরা কি করছেন ?

সুহাসিনী জবাব দিতে গিয়ে কাকে সেদিকে আসতে দেখে তফাতে সরে গেল। সুহাসিনীর মামা এসে ঘরে ঢুকলেন। জামাই পায়ের ধুলো নেবার পর বরেন্দ্রনাথ তক্তপোষে বসলেন। স্মৃতিভূষণকে বসতে বললেন। ভাগ্নী ও ভাগ্নীজামাইকে উদ্দেশ করে ভাঙা গলায় বললেন, আমি সুহাসিনীকে নিয়ে বিপদে পড়েছি স্মৃতিভূষণ। সে কলকাতায় কি করে না করে তোমরা জানো। অন্তত আমি কোনো খোঁজ রাখি না। কিন্তু এখানে এমন একটা হাঙ্গামা বাঁধিয়েছে যে, আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না।

স্মৃতিভূষণ নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল। বলল, বিষয়টা খুলে বললে আমার পক্ষে বুঝতে সুবিধে হয়।

বরেন্দ্রনাথ বললেন, খুলে বলতে যে আমার মাথা কাটা যায়। সুহাসিনী হয় তো ভাবছে আমি ওর প্রতি অবিচার করছি। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার ছেলেদের অবিশ্বাস করে তাদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে তারা ক্ষুণ্ণ হবে।

স্মৃতিভূষণ বলল, আমি যা সত্য শুনতে প্রস্তুত। বিশেষ করে আমার স্ত্রী যখন ব্যাপারটাতে জড়িত।

বরেন্দ্রনাথ বললেন, সুহাসিনী সিন্দুক থেকে একহাজার টাকা নিয়েছে। নিয়েছে তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার টাকা ও নিয়েছে বেশ করেছে। বলে নিলে তো কোনো কথাই উঠত না। কিন্তু সে কথা যাক্—কেন নিয়েছে, কাকে দিয়েছে, তাকে হাজারবার জিজ্ঞেস করেও জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ খানিকটা হৈ-চৈ হবার পর ছেলেরা আমায় জানিয়েছে।

স্মৃতিভূষণের সামনের দেয়ালটা যেন সরে গেল। ঘরটা যেন দুলতে থাকল।

সে গভীর অবিশ্বাসের সুরে বলল, সুহাসিনী টাকা নিয়েছে।

বরেন্দ্রনাথ বলল, ছেলেরা তো তাই বলছে। কিন্তু সুহাসিনী তো একটা কথারও জবাব দিচ্ছে না।

স্মৃতিভূষণ সুহাসিনীর দিকে তাকাতে সে চক্ষের দৃষ্টিতে স্বামীকে ভর্ৎসনা করে দৃঢ়কণ্ঠে মামাকে বলল, জবাব দেবার থাকলে আগেই দিতুম। তুমি ভুল শুনেছো মামা। আমার দাদারা সাতে পাঁচে নেই। নরেশ তোমাকে যেমন দাদাদেরও তেমনি ভুল বোঝাচ্ছে। ও ভেবেছে আমার স্বামীকে এনে তাকে অপমান করে আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করবে। ও গুড়ে বালি! সুহাসিনী কচি খুকি নয়।

স্মৃতিভূষণ বলতে গেল, ছিঃ সুহাস—

কিন্তু সুহাসিনী কটাক্ষে তাকে থামতে বলে বলল, মামা! তোমার হয়েছে কি ? তুমি ভালমানুষ হয়ে কেন এই জঞ্জাল ঘাঁটছ! ও অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, তাদের ঘাঁটতে বলো।

বরেন্দ্রনাথ বললেন, মা, তোমার জবাবের জন্য ওরা আমায় শুদ্ধ পাগল করে ছাড়ছে। তুমি শুধু বলে দাও কাকে দিয়েছ। আমি ওদের থামিয়ে দিচ্ছি।

আমি কোনো জবাবই দেব না। জবাব দেবার আমার কিছুই নেই। সুহাসিনী দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

বরেন্দ্রনাথ বললেন, মা তুই তো এই বাড়ির হালচাল জানিস। দেখছিস তো তোর মামীর মৃত্যুর পর এ সংসারে কি তাণ্ডব সুরু হয়েছে। নরেশ তো জবাব না পেলে ছাড়বে না। হয় তো কুৎসা রটাবে।

সুহাসিনীর মুখ ঘৃণায় ভরে গেল। বলল, নরেশকে বলে দিও সুহাসিনী জবাব দেবে না।

স্মৃতিভূষণ ইতস্তত করে বলল, তুমি যখন নাও নি, তখন সন্দেহের পথ রাখছ কেন? বলে দাও, তুমি নাও নি।

সুহাসিনী কঠোর কণ্ঠে বলল, কেন বলব নিই নি। কেমই বা বলব নিয়েছি। যদি ওই টাকায় আমার অধিকার থাকে তাহলে আমায় জবাবদিহি করতে হবে কেন?

নরেশ কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরের কথাবার্তা শুনছিল। সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, জবাবদিহি এইজন্তে করতে হবে যে, টাকাটা এখনও তোমার নয়।

সুহাসিনীর দু'চোখ জ্বলে উঠলো। বলল, টাকাটা আমার মায়। মায় সবটাকা আমার। বিয়ের রাতেই মামী আমায় বলেছিলেন। সিন্দুকের সব অলঙ্কার, সব টাকা আমার। কিন্তু আমার লোভ কম বলে মুখ ফুটে দাবী করি নি। একহাজার টাকা নিয়ে হৈ-চৈ বাঁধিয়েছ বলে ভাবছি এবার দাবীটা ভালোমতই করব।

নরেশ বলল, দাবী করলেই আমরা সুড়সুড় করে দাবী মেনে নেবো ভেবো না।

বরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা ঝগড়া করছ কেন? আর্থিক বিষয় ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করা ভালো। তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি বললেন, যদি তোমাদের সন্দেহ হয় সুহাসিনী টাকা নিয়েছে, বেশ আমি সুহাসিনীর হয়ে হ্যাণ্ডনোট দিচ্ছি তোমাদের। স্মৃতিভূষণ নয় জামিন হবে।

সুহাসিনী এবার হেসে দিল। বলল, মামা, টাকাটা আমার হলে কেন তুমি হ্যাণ্ডনোট দেবে? আমার না হলে টাকাটা তোমার। হ্যাণ্ডনোটের কথা সেক্ষেত্রে ওঠে কি করে!

বরেন্দ্রনাথ বললেন, না মা, টাকার ব্যাপারে হিসেব পরিষ্কার থাকা ভালো। পরে এই নিয়ে আবার একটা ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

নরেশ বললে, তাছাড়া ড্রাফ্‌টের পাঁচহাজার টাকাটারও কোন প্রমাণ পত্র আমাদের কাছে নেই।

স্মৃতিভূষণ বলল, আজই সুহাসিনীকে নিয়ে আমায় রওনা হতে হচ্ছে। তার পূর্বেই আমি মোট ছ' হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট সই করে দিয়ে যাবো।

বরেন্দ্রনাথের মুখের ভাবে মনে হল তাঁর মন থেকে একটা দুশ্চিন্তা দূর হল।

কিছুক্ষণ স্বামী-স্ত্রীর ভিতর কোন কথা হল না। নীরবতা ভাঙলো স্মৃতিভূষণ।

· তুমি টাকা নাও নি, অথচ ওনারা গায়ের জোরে অপবাদ দিচ্ছেন, এ রহস্যের কিনারা করা আমার সাধ্যের অতীত। স্মৃতিভূষণ মৃদুস্বরে মন্তব্য করলে:

তুমি একবার যদি বলতে টাকাটা নাও নি, আমায় সুবিধে হত। ধৃষ্টতাকে প্রশ্রয় দিতুম না।

সুহাসিনী ধীরকণ্ঠে বলল, তুমি এখন জানতে চেও না। বিশ্বাস করো, কোন হীন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

স্মৃতিভূষণ ক্লান্তকণ্ঠে বলল, সেই জন্তেই তো আমার বিস্ময়ের সীমা নেই।

কলকাতায় ফিরে এসে স্মৃতিভূষণ পুনরায় চাকরীর চেষ্টায় মন দিলে। সুহাসিনীর নামে টাকা চুরির অপবাদটা তার মনে কাঁটার মত বিঁধে রইল। মাঝে মাঝে সেখানটা ব্যথা করে উঠত, কিন্তু ক্রমশ সে-ব্যথার তীব্রতা কমে গিয়ে সহ্যের ভিতর এলো।

সুহাসিনী গম্ভীর ও নীরব হয়ে গিয়েছিল। সে স্বামী ছাড়া কারো সঙ্গে তেমন একটা কথা বলত না। তবু তার এই গাম্ভীর্য ও নীরবতা শ্বশুরবাড়ির কারোরই চোখ এড়ালো না। তারা ভাবলেন, সন্তানের মা হতে যাচ্ছে, ফলে হয় তো দেহের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেও একটা পরিবর্তন এসেছে।

একদিন সুহাসিনী স্মৃতিভূষণকে বলল, আমি একটা সঙ্কল্প করেছি, তার জন্ত রোজ পুজায় যেতে হবে।

স্মৃতিভূষণ বলল, রোজ পুজায় যাবে—তোমার এই অবস্থায়? মা কি যেতে দেবেন?

সুহাসিনী বলল, হ্যাঁ, মাকে বলে রাজী করিয়েছি। একা যাব শুনে সাবধানে যেতে বলেছেন।

স্মৃতিভূষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, একা যাবে কেন? আমিও তো সঙ্গে যেতে পারি!

সুহাসিনী জবাব দেয়, ঐ তো হয়েছে মুস্কিল। এ সঙ্কল্পের পুজা কি না! যেতে হবে একা, তবে তুমি চিন্তা করো না। আমি খুব সাবধানে যাবো আসবো।

স্মৃতিভূষণ একটু যেন চিন্তিত হল। কিন্তু বাধা দিল না।

শনিবার রবিবার বাদে সুহাসিনী পুজায় বেরোতে সুরু করল। সে ঘড়ি ধরে যেত। ঘড়ি ধরে ফিরত।

একদিন সৌদামিনী স্মৃতিভূষণকে বললেন, স্মৃতি! বৌ কোথায় পুজা দিতে যায় রোজ, খোঁজ রাখিস? কোনো কথা তো খুলে বলবে না। পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করে। মুখ শুকিয়ে ফেরে প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে। কোনোদিন কোনো অনর্থ না হয়!

স্মৃতিভূষণ মার কথা শুনে জবাব দিল না। সে জানতো সুহাসিনী যখন সংকল্প করেছে, তাকে টলানো যাবে না।

একদিন স্মৃতিভূষণ ট্রাম ধরতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, দেখল সুহাসিনী মন্দ গতিতে এগোচ্ছে। তার মুখে অপরিসীম ক্লান্তি। স্মৃতিভূষণের বুঝতে বাকী রইল না, সুহাসিনী পুজায় যাচ্ছে। হঠাৎ একটা কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। সুহাসিনী কোথায় কোন্ বিগ্রহের পুজা দিতে যায়, দূর থেকে দেখলে ক্ষতি কি?

স্মৃতিভূষণ খানিকটা তফাতে তফাতে সুহাসিনীর অনুসরণ করে চলল। সুহাসিনী হাজরা রোডের মোড়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে হাজরা রোড ধরে পূবমুখো এগিয়ে চলল। একটা হলুদ রঙের বাড়ির সামনে এসে সে থামল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

স্মৃতিভূষণ একটা গ্যাসপোষ্টের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে সে ব্যাপারটা দেখল। একটা চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে সে একথা সেকথা ভেবে সময় কাটাতে লাগল। বাড়িটার উপর সে নজর রাখল। কেউ বার হলে তার দৃষ্টি এড়াবে না।

ঘণ্টা তিনেক বাদে সুহাসিনী বেরিয়ে এলো। তার ক্লান্ত দেহে তখন যেন আর শক্তি নেই। সে খুঁকতে খুঁকতে অবশ্য প্রায়

কি ধবধবে ফরসা! কি পরিষ্কার! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার ক'রে কাচার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর, কী প্রচুর ফেনা! সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, চোলি, শার্ট, প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়...আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা, সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU. 36-140 BG

চলেছে। স্মৃতিভূষণের একটা প্রবল বাসনা তাকে ঘিরে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সুহাসিনীকে সে অনুসরণ করছে, এ বিষয় জানতে দেওয়ার পথে বাধা আছে—প্রধান বাধা সুহাসিনীর অনুশাসন।

স্মৃতিভূষণ মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুহাসিনী রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হলে পর সে সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। একজন শিখ সেখানে বসে গ্রন্থ পাঠ করছিল।

স্মৃতিভূষণ জিজ্ঞাসা করল, সর্দারজী! ভিতরে কোনো মন্দির-বিগ্রহ আছে?

সর্দারজী অবাক হয়ে বলে, বিগ্রহ! মন্দির! না না। এ তো স্কুল আছে বাবুজী।

স্কুল! ঐ যে বাঙালী মাইজী বার হয়ে গেল, উনি এখানে কি করেন বলতে পারো? স্মৃতিভূষণ প্রশ্ন করল।

সর্দারজী তার গ্রন্থে মন দিতে যাচ্ছিল। মুখ তুলে বলল, ঐ মাইজী। উনি তো এখানে আধ রোজ কাম করেন। বড় ভালো মাইজী।

স্মৃতিভূষণ মনে একটা বিরাট ভার নিয়ে বাড়ি ফিরলো। তার চোখে-মুখে নিদারুণ ক্লান্তির ছাপ।

চেয়ারটা টেনে সুহাসিনীর কাছে গিয়ে বসে স্মৃতিভূষণ বলল, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। পুজো সেরে এইমাত্র ফিরেছ বুঝি।

সুহাসিনীর মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটল। বলল, হ্যাঁ।

স্মৃতিভূষণ বলে, পুজো আর কতদিন দিতে হবে?

সুহাসিনী বলল, যতদিন পারি দেবো। যখন পারবো না তখন ঠাকুর বুঝবেন।

স্মৃতিভূষণ কাতরকণ্ঠে বলে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার কোনো কথা জানতে চাই না। কিন্তু তোমার এ অবস্থায় প্রত্যেকদিন গিয়ে পুজো দেওয়ায় বিপদ আছে। ঘরে বসে সংকল্প করে পুজো দিলে কি চলে না?

সুহাসিনী বলল, চলে না বলেই তো এতো কষ্ট করে যাই। তুমি ভেবো না, আমি কোনো অনর্থ ঘটতে দেব না।

স্মৃতিভূষণ উদাসভরা স্বরে বলে, সুহাসিনী, তুমি তো জীবন ভরে পুজো দিয়েই চলেছ, কিন্তু আমি যে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ছি।

সুহাসিনী এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে স্মৃতিভূষণের একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিল। পরে হাতখানা তার কপালে রাখল।

মাসের গোড়ায় সুহাসিনী একশটা টাকা এনে স্মৃতিভূষণের হাতে দিল। স্মৃতিভূষণের বুঝতে বাকী রইল না, টাকাটা কোথা থেকে এলো।

সুহাসিনীর একটি ছেলে হল। ছেলে হবার সাতদিন বাদেই স্মৃতিভূষণের একটা চাকরী হল। লম্বা মাইনে না হলেও ঋণের কিস্তি দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার চলে যাবে।

চাকরীর চিঠিটা নিয়ে স্মৃতিভূষণ হাসপাতালে গেল। সুহাসিনী জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিল। অর্থাভাবে স্মৃতিভূষণ তার জন্য স্বতন্ত্র কেবিনের ব্যবস্থা করতে পারে নি।

জেনারেল ওয়ার্ডে ঢুকে স্মৃতিভূষণ সংকুচিত হয়ে পড়ত। তার স্ত্রী ও সন্তানকে সে তাদের জীবনের এই বিশেষ সময়টিতে একটা নিভৃত আশ্রয় দিতে পারল না ভেবে তার আত্মগ্লানির সীমা থাকত না। স্মৃতিভূষণের জন্য এই দেখাশোনার সময়টিতে সুহাসিনী উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করত। দূর হতে স্বামীকে দেখতে পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

সেদিন স্মৃতিভূষণের হাতে একখানা খাম দেখে আশায়, উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। স্মৃতিভূষণ কাছে আসতে সে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বসল, চাকরীর চিঠি নয়? দাও। কত মাইনে?

চিঠিটা পড়তে পড়তে তার মুখে একটা শান্তি ও তৃপ্তির ছায়া নেমে এলো। সে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তার স্বামীর পানে তাকিয়ে বলল, তোমার চাকরী হল। এতদিনে আমার কাজ ফুরলো। এখন আর আমার কোনো ক্ষোভ কোনো দুঃখ নেই। যা পাবার সব পেয়েছি। এই বলে সে তার পাশে শায়িত নবজাত সন্তানের কপালে হাত রাখল।

স্মৃতিভূষণ বলল, সে কি! তুমি না বলেছিলে চাকরী হলে একটা কবিতা আদায় করে ছাড়বে।

সুহাসিনী হেসে বলে, ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলুম। লিখো একটা কবিতা—খোকাকে নিয়ে লিখো।

স্মৃতিভূষণ পরিহাস করে বলল, কেন, খোকার মা বুঝি ভেসে যাবে।

গদগদকণ্ঠে সুহাসিনী বলে, আহা, ভাসতে যাবো কেন? তবে সত্যি বলতে তুমি আর খোকা থাকলে আমি ভেসে যেতে ভয় পাই না।

শশিভূষণের সংসারে স্মৃতিভূষণের পুত্রলাভ ও কর্মলাভ—এই দুটি ঘটনা একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করল। কারণ, দীর্ঘকাল পরে শশিভূষণের পরিবারে একটি পুত্রসন্তানের আগমন। এই যে স্মৃতিভূষণের জীবনে একটার পর একটা ব্যর্থতা এসে শশিভূষণের সংসারে স্মৃতিভূষণ সম্বন্ধে একটা গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছিল। স্মৃতিভূষণ জীবনে কখনো দাঁড়াতে পারবে, এ বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে গিয়েছিল। স্মৃতিভূষণের চাকরীটা তার জীবনে একটা মঙ্গল পর্বের সূচনা করল।

সুহাসিনী যেদিন সন্তান নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরল, বাড়িতে রীতিমত একটা উৎসব হয়ে গেল। শিশুর সুন্দর মুখের পানে তাকিয়ে সুহাসিনীর জায়েরা বললেন, বাপের ছেলেবেলার মুখখানা কে যেন এনে বসিয়ে দিয়েছে!

সৌদামিনী বৌ আর নাতিকে নিয়ে কি যে করবেন ভেবে পেলেন না। একবার সুহাসিনীকে একা পেয়ে বললেন, বৌ, তোমাকে পছন্দ করে আনবার পর স্মৃতির যে হাঙ্গামা সুরু হল, ভাবলুম, তাহলে কি ভুল করলুম? কিন্তু যে লক্ষণ দেখে তোমায় ঘরে এনেছিলুম তাতে তো আমার ভুল হবার কথা নয়। প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় তাই ঠাকুরকে ডেকে বলেছি, ঠাকুর, মুখ তুলে চাও, ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে দাও। এতদিন বাদে সকলের ভুল ভাঙলো যে আমি ভুল করি নি।

সুহাসিনীর বাঁ হাতের পদ্মচিহ্নাঙ্কিত অনামিকায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, স্মৃতিকে বোলো, এই আঙুলের যেন অমর্যাদা না হয়। অবস্থা ফিরলে একটা ছোট্ট হীরের আংটি যেন তৈরি করে দেয়।

শাশুড়ীর কথায় লজ্জায় সুখে সুহাসিনীর মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। সেদিন সৌভাগ্যের মুহূর্তে সুহাসিনী কল্পনাও করতে পারে নি যে তার অগ্নিপরীক্ষা হতে এখনও বাকী। স্বামীর সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় তার তখনো আসে নি। তার জন্য তাকে কোন্ কঠিন মূল্য দিতে হবে অদৃষ্ট তখনও সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছয় নি।

সুহাসিনী অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠে সংসারের কাজে মন দিল। স্বামী ও সন্তান নিয়ে তাদের তিনজনের ক্ষুদ্র সংসারটিতে তার কল্যাণস্পর্শে একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটলো। তার জীবনে যখন সুখ ও সৌভাগ্যের পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে তখন অকস্মাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

একদিন জ্বর-জ্বর বোধ করে স্মৃতিভূষণ একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির সামনে এসে সে থমকে গেল। ফটক দিয়ে একটি লোক দ্রুতপদে বার হয়ে এলো। তারই পশ্চাদনুসরণ করে আরক্তমুখে ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল সুহাসিনী। তার চোখে মুখে উত্তেজনার আভাস। ক্রোধে সে যেন ফেটে পড়ছিল। স্মৃতিভূষণের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা হন্ হন্ করে চলে গেল। তার মুখের অর্থপূর্ণ হাসি স্মৃতিভূষণের দৃষ্টি এড়ালো না।

স্মৃতিভূষণ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালো। লোকটাকে অনুসরণ করা উচিত হবে কি না চিন্তা করে শেষে বাড়িতেই ফিরল। ততক্ষণে সুহাসিনী উপরে উঠে এসেছে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে স্মৃতিভূষণ বলল, লোকটা কে? কি চায়?

সুহাসিনী বলল, ভীষণ পাজি লোক। আমার পিছনে লেগেছে। টেলিফোন করে করে আমাকে হায়রাণ করে। বলে তার না কি, কি কাজের কথা আছে। আজ একেবারে বাড়ি এসে উপস্থিত।

লোকটাকে চেনো না কি? স্মৃতিভূষণ প্রশ্ন করল।

এমন কিছু চেনা নয়। চিনলেই বা কি সাতখুন মাপ! সুহাসিনী চাপা গর্জন করে বলে।

কি বলতে চায়? এসেছিল কেন? স্মৃতিভূষণ প্রশ্ন করল।

ও সব পাজি লোক কি আর ভালো মতলবে আসে? হাতের নাগালে পেতুম তো শিক্ষা দিয়ে দিতুম। স্মৃতিভূষণের পোষাক আলমারিতে তুলে রাখতে রাখতে সুহাসিনী বলল।

কি ভেবে স্মৃতিভূষণ এ আলোচনায় আর বেশিদূর অগ্রসর হল না।

• • • •

জ্বরজ্বর ভাবটা যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। হাতে পায়ে একটা বিশেষ দুর্বলতাও বোধ হচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা স্মৃতিভূষণ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার সংকল্প নিয়ে বার হল। কিছুক্ষণ বাদে তার মনে হল কে যেন তার অনুসরণ করছে।

স্মৃতিভূষণ দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় সে স্পষ্ট চিনল লোকটি কে। এই লোকটাকেই সে বাড়ির গেট দিয়ে ছুটে যায় হতে দেখেছিল।

স্মৃতিভূষণকে থামতে দেখে মুখে অপরিমিত বিনয় ও সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে লোকটি তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। স্মৃতিভূষণ দেখল লোকটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবান, বয়স পঁচিশের বেশি নয়।

গম্ভীর গলায় স্মৃতিভূষণ বলল, আমার সঙ্গে আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

লোকটি ঈষৎ হেসে বলে, বিশেষ। সেইজন্যই অপেক্ষায় ছিলুম।

কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলায় আমার ঘোর আপত্তি। আপনি আমার বাড়ি আসতে পারেন? স্মৃতিভূষণ বলল।

ওরে বাপ রে, আপনার বাড়িতে? সুহাসিনীর হাতে মার খেতে বলেন না কি? লোকটা কৃত্রিম ভয় প্রকাশ করে বলে।

স্মৃতিভূষণ উচ্চস্বরে বলল, আমার স্ত্রীর নাম ধরে বলছেন—চেনেন না কি?

লোকটা হতাশার ভাণ করে বলে, চিনি বলেই তো হাঙ্গামা—না চিনলে তো কোনো কথাই ছিল না।

লোকটার কথার আপত্তিকর ইঙ্গিত ও ভঙ্গি স্মৃতিভূষণকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মনে কৌতূহলের সঙ্গে একটা আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠেছিল। এক মুহূর্তে কি ভেবে সে বলল, চলুন। ঐ রেস্তোরাঁয় বসে আপনার কথা শুনবো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভালো, চা খেতে খেতে কথা হবে—বলে লোকটি স্মৃতিভূষণের পিছনে পিছনে রেস্তোরাঁয় এসে উঠল।

চায়ের ফরমাশ দিয়ে স্মৃতিভূষণ লোকটিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকলো।

সেদিন আপনার স্ত্রী মানে সুহাসিনী যা রেগে গিয়েছিল আপনি এসে না পড়লে হয় তো রাস্তায় বেরিয়েই দু' এক ঘা দিয়ে বসত। বলে লোকটা মুচকি হাসল।

স্মৃতিভূষণ গলা খাটো করে কঠোর স্বরে বলল, ভণিতা ছেড়ে সংক্ষেপে যা বলার বলুন। তা ছাড়া চেঁচাবেন না।

লোকটি বলল, দেখুন, আমি সুহাসিনীর বাল্যবন্ধু। ওর মামার বাড়িতে ছেলেবেলা থেকেই বিস্তর যাওয়া আসা। ওকে তো আমরা সবাই ভালো বলেই জানতুম। কিন্তু বিয়ের পর মামা বাড়ি গিয়ে যে কাণ্ড করল—এটুকু বুঝল না যে কথাটা আপনাদের কানে উঠলে ওর অবস্থাটা কি হবে।

স্মৃতিভূষণ বলল, কোন কাণ্ড? সিন্দুক থেকে এক হাজার টাকা নিয়েছে বলে ওর মামার ভাগ্নে নরেশ রটিয়েছিল, সেই বিষয়টার কথা বলছেন?

লোকটা বলল, এক হাজার টাকার কথা তো নয়। আসলে তো টাকাটা ও সিন্দুক থেকে নেয় নি। নিয়েছে কে—বলে লোকটা মুচকি হাসল।

সুহাসিনীকে কে যেন কলকাতা থেকে এক হাজার টাকা পাঠায়। সুহাসিনী এক হাজার টাকা পেয়েছে শুনে নরেশ সিন্দুক থেকে এক হাজার টাকা সরিয়ে ফেলে।

লোকটার কথা স্মৃতিভূষণের কানে হেঁয়ালীর মত ঠেকল। লোকটা এবার হেঁয়ালীর উপর টিপ্পনি কেটে বলল, আসলে হয়েছে কি, সুহাসিনীর টাকাটা এসেছিল ড্রাফ্‌টে। সঙ্গে ছিল একটা চিঠি। ঐ চিঠিতে কি সব কথা ছিল মশাই—নরেশ চিঠিটা হাত করে। সুহাসিনীকে বলে, হয় টাকা দাও, না হলে চিঠির কথাটা ফাঁস করে দেবো। নয় তো চুরির দায়ে জড়াবো। তখন চোখের জলে পথ দেখবে না। সুহাসিনী যখন বেঁকে বসল তখন নরেশ সিন্দুক থেকে এক হাজার টাকা সরিয়ে সুহাসিনীর মামাকে বলে, সুহাসিনী কোথা থেকে এক হাজার টাকা পেয়েছে জিজ্ঞেস করো। সিন্দুক খুলে দেখো টাকাপত্র ঠিক আছে কি না; মামা লোক ভালো. তবে টাকার জন্য প্রাণ দিতে পারেন। তক্ষুনি ছুটে এসে সিন্দুক খুলে দেখেন এক হাজার টাকা কম।

স্মৃতিভূষণ বলল, আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

লোকটা বলল, আহা! নরেশের হয়ে চিঠিটা তো আমিই সরাই। সিন্দুক থেকে টাকাটা অবশ্য ও নিজেই সরিয়েছিল। পরের টাকায় হাত দেওয়া মশাই আমার স্বভাব নয়।

স্মৃতিভূষণ বলল, চিঠিটা কার কাছে আছে?

লোকটা হেসে বলে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন মশাই। ও চিঠি হাত না করে খামখা আপনাদের হায়রাণ করতে আসি নি।

স্মৃতিভূষণ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, চিঠিটা দিন।

লোকটা অবাক হয়ে স্মৃতিভূষণের পানে তাকালো। বলল, সে কি মশাই। আগে কথাবার্তা হোক, একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হোক—

স্মৃতিভূষণ ফিসফাস্ করে গর্জন করে বলল, আপনি কি ব্যবস্থার কথা বলছেন?

লোকটা একটু তফাতে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বলল, দেখুন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। মান মর্যাদা বোধ আছে। তা ছাড়া বাড়ির সুনাম দুর্নামের কথাও ভাবেন নিশ্চয়ই। ঐ সুহাসিনীকে মশাই ঘরে রাখবেন না। ও আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে কি যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ও নষ্ট। ওকে ঘরে রাখলে মান সম্মান আর থাকবে না।

কোনো প্রকারে নিজেকে সংযত করে নিয়ে স্মৃতিভূষণ বলে, সুহাসিনীকে যদি তাড়িয়ে দি, তাতে আপনার কি লাভ?

লোকটার মুখ কি একটা আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, বিলক্ষণ! সব চেয়ে বড় লাভ যে আপনাদের একটা উপকার হবে। তারপর বুঝলেন না আমিও সংকাজের একটা সুযোগ পাবো। আমার আওতায় এসে যদি ওর চরিত্রের সংশোধন হয়—

স্মৃতিভূষণ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে লোকটার সার্টের কলারটা ধরে ফেলল। একটা প্রচণ্ড টানে লোকটাকে টেবিলের ওধার থেকে এধারে নিয়ে এলো। চায়ের প্লেট পেয়ালা সশব্দে মেঝের পড়ে চুরমার হল।

রেস্তোরাঁয় একটা কলরব পড়ে গেল। ম্যানেজার তার বাক্স ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। স্মৃতিভূষণ এক হাতে লোকটার গলা টিপে ধরে আর এক হাত তার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। বার হয়ে এলো চিঠি। খামের উপর সুহাসিনীর নাম লেখা।

চিঠিটা পকেটে রেখে লোকটাকে দু'টো প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে স্মৃতিভূষণ একেবারে ছুড়ে দিল। লোকটা একটা বিকৃত শব্দ করে ছিটকে মেঝের খানিকদূরে গিয়ে পড়ল। তারপর গা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে সভয়ে স্মৃতিভূষণকে দেখতে দেখতে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার ভিড়ে উধাও হল।

প্লেট পেয়ালার দাম চুকিয়ে দিয়ে ম্যানেজারের কাছে ত্রুটি স্বীকার করে স্মৃতিভূষণ রেস্তোরাঁ থেকে টলতে টলতে বার হয়ে রাস্তায় নামল। তার দেহে তখন একবিন্দু শক্তি নেই। মাথা ঘুরছে। বুকে একটা অব্যক্ত জ্বালা। তার জীবনে তখন লঙ্কাকাণ্ড সুরু হয়ে গিয়েছে।

স্মৃতিভূষণের পায়ের শব্দ পেয়ে সুহাসিনী ঘরের কপাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাকে দেখে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে কয়েক পা হটে এসে খাটের বাজুটা ধরে দাঁড়ালো।

তোমার কি হয়েছে, ফিরে এলে কেন? রুদ্ধশ্বাসে সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করে।

নীরবে স্মৃতিভূষণ সুহাসিনীর সামনে চিঠিখানা মেলে ধরল। সুহাসিনী তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে স্তব্ধ হয়ে চিঠিটা দেখল। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল, এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?

স্মৃতিভূষণ তিক্তকণ্ঠে বলল, কোথা থেকে পেয়েছি, সেটা প্রশ্ন নয় সুহাসিনী। প্রশ্ন হচ্ছে এরকম চিঠি তোমার কাছে আসে কেন? সঙ্গে টাকাই বা থাকে কেন? তা ছাড়া এসব ব্যাপার তুমি আমার কাছ থেকে আগাগোড়া লুকিয়েছিলে কেন?

সুহাসিনী বিস্ময়ে বেদনায় আশঙ্কায় স্মৃতিভূষণের দিকে তাকিয়ে রইল। স্মৃতিভূষণের ভিতর সে যেন তার নিদারুণ অদৃষ্টকে দেখছে।

এ রকম চিঠি আরো তুমি কত পেয়েছ কে জানে। কারা লেখে, কেন লেখে, কেন টাকা পাঠায়, তুমি জানো আর ঈশ্বর জানেন। স্মৃতিভূষণের কথায় দুঃখ ক্ষোভ ও বেদনা ঝরে পড়ল।

হঠাৎ টলতে টলতে চেয়ারে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে সে বিকৃত

কণ্ঠে বলে উঠল, আমাকে যখন সর্বস্ব দিয়ে বাঁচাচ্ছো, সেই সঙ্গে নির্মম হাতে সর্বস্বান্ত করছ—আমি তোমায় চিনলুম না, সুহাসিনী।

সুহাসিনী ধীরপদে গিয়ে কপাটটা বন্ধ করে দিল। তারপর খাটের ধারে ফিরে এসে বলল, চেঁচিও না। আমার কথা শোনো। আমার সর্বনাশ কোরো না।

তোমার সর্বনাশ আমি কি করবো সুহাসিনী! তোমার সর্বনাশ নিজ হাতে তুমিই করছো, বলে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে স্মৃতিভূষণ উঠে দাঁড়ালো।

কথা রাখো, একটু বোসো, আমার কথা শোনো বলে হাঁপাতে হাঁপাতে সুহাসিনী স্মৃতিভূষণকে ধরে ফেলল। জোর করে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। চোখের জলে আলো পড়ে তার চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করতে থাকল।

কি কথা তুমি বলবে! শুনেই বা কি হবে। এতদিন আমায় ভুলিয়েছো, আর আমায় ভুলিও না সুহাসিনী। স্মৃতিভূষণের কথাটা হাহাকারের মত শোনালো।

সুহাসিনী আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, তোমায় ভোলাই নি। কখনও ভোলাবোও না। তা ছাড়া আজ তোমায় ভোলাতে পারবো না। যা দেবার ছিল, তোমায় সব দিয়েছি। আজ শুধু এই ভিক্ষা দাও—আমার কথা শোনো।

স্মৃতিভূষণের মুখ একটা মর্মান্তিক হাসিতে বিকৃত হল। সে কোনো কথা বলল না।

সুহাসিনী বলল, তুমি ভাবছো আমি তোমায় ঠকিয়েছি। কিন্তু আমি সজ্ঞানে তোমায় ঠকাই নি। তোমার কাছ থেকে অনেক কথা লুকিয়েছি। কিন্তু তা ঠকানোর জন্য নয়। যাতে তুমি লজ্জা না পাও, তোমার মনে আঘাত না লাগে, সেজন্য।

ঐ যে চিঠি দেখছো ওটা আগাগোড়া জাল। খামে যে চিঠি এসেছিল, সে চিঠিটা সরিয়ে নিয়ে ওখানে ঐ নোংরা চিঠি রেখেছে নরেশ। ও চিঠি পড়ে তুমি আমার বিচার কোরো না।

স্মৃতিভূষণ এবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, খামে কি চিঠি এসেছিল?

সুহাসিনী সহজ কণ্ঠে বলল, অক্ষয় সোম লিখেছিলেন সুদ মাফ হবার ফলে তোমার এক হাজার টাকা পাওনা হয়েছিল। সেই টাকাটাই পাঠিয়েছিলেন।

স্মৃতিভূষণ প্রশ্ন করল, আমি থাকতে তোমাকে পাঠালেন কেন?

সুহাসিনী বলল, আজ তাহলে তোমাকে সব কথা খুলে বলছি। অক্ষয়বাবুর কাছে আমিই গিয়ে তোমার ঋণশোধের ব্যবস্থা করেছিলুম। উনিই আমায় চিমনলালের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাছে তুমি লজ্জা পাও, আমাকে তোমার হয়ে পাওনাদারদের কাছে যেতে না দাও, বাধ্য হয়ে তোমার কাছ থেকে ব্যাপারটা আগাগোড়া লুকিয়েছিলুম।

স্মৃতিভূষণ বলল, অক্ষয়বাবু কেন তোমার কথায় হঠাৎ এত কাণ্ড করতে গেলেন?

সুহাসিনী অতি দুঃখেও হাসল। ব্যথিতকণ্ঠে বলল, অক্ষয়বাবু না হয়ে তুমি হলেও আমার জন্য সেদিন ওটুকু না করে পারতে না। সেদিন আমাকে দেখে অক্ষয়বাবু বুঝেছিলেন কত বড় দুঃখে আমি স্বাধীন হয়ে ভিক্ষায় বেরিয়েছিলুম। আমায় মা বলে ডেকে আমার দুঃখ লজ্জা তিনি ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি তাঁকে সন্দেহ কোরো না, অবিচার কোরো না।

সংশয় ও বেদনার স্বরে স্মৃতিভূষণ বলে, তুমি একা কা'র কা'র কাছে গিয়েছ, কি ভিক্ষা নিয়েছ, নিজের কি সর্বনাশ করেছ,—

স্মৃতিভূষণের কথায় বাধা দিয়ে সুহাসিনী এবার কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে, ও-কথা মুখে এনো না। বিপদের পথে তোমারই জন্য নেমেছিলুম। না নেমে উপায় ছিল না। তাহলে তোমাকে রাখতে পারতুম না। তোমাকে রাখতে গিয়ে আমি মান মর্যাদার দিকে তাকাতে পারি নি। কিন্তু এ কথা জেনো, যা তোমাকে দিয়েছি তা আর কাউকে দিই নি, দিতে পারি না। অন্তঃসত্ত্বা ছিলুম। তোমার সন্তান আমার ভিতর থেকে আমার বল জুগিয়েছিল। নিঃশব্দে সে আমায় ডাকতো। ওই ডাকের ভিতর আমি তোমারই ডাক শুনতে পেতুম। পাপের পাঁকে আমি কি করে ডুবি বলো?

সুহাসিনীর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। কেঁদে কেঁদে সে বলল, কি করে আমার দিন কেটেছে তুমি তার কি জানো? তুমি পায়ে হেঁটে কলের জল খেয়ে সারা দুপুর চাকরীর উমেদারী করতে। তখন মিছে কথা বলে মায়ের চোখে ধূলো দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তুম তোমারই কাজে। তোমার চাকরীর জন্য কার কাছে না গিয়েছি—মানুষের কি বীভৎস রূপই না দেখেছি। টাটানগরের ঘোষাল আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়েছে, তোমার চাকরীর মুখ চেয়ে বাধা দিই নি। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে সে আংটি আমি পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। পরতে পারি নি। তোমায় চাকরী দেবার লোভ দেখিয়ে চৌধুরী জমিদার আমায় ফাঁদে ফেলার কম চেষ্টা করে নি। তার হাতে আমার দাঁতের ছাপ এখনো হয় তো আছে। তোমার জন্য সাপ নিয়ে খেলা করেছি, তারা ফণা তুলেছে, কিন্তু মন্ত্র ছিল আমার অন্তরে, বিষ ঢালতে পারে নি।

স্মৃতিভূষণ ভাঙা গলায় বলল, তাহলে আমার এই চাকরী—এও কি—

সুহাসিনী বাধা দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তোমার চাকরী আমাকেই জোটাতে হয়েছে। মনে ব্যথা পাবে বলে তোমাকে জানতে দিই নি। কিন্তু তার জন্য পাপের কাছে মাথা নীচু করি নি। বিলাসপুরের বৈজনাথ চৌবে বিজ্ঞাপন পড়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। তার মতলব কি ছিল জানি না। তখন আমি পুরুষের সঙ্গে লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাকে বললুম, বৈজনাথজী, আমি তোমার বোন, আমার দুঃখের সীমা নেই, একবার আমার মুখের পানে চেয়ে এমন একটা কাজ করো যাতে পুরুষের উপর আমার শ্রদ্ধা ফিরে আসে। ঐ খোট্টার ভিতর ছিল সত্যিকারের মানুষ। ওর সাহেবিয়ানা আর ভোগাসক্তির আড়ালে ছিল বীরের সংযম। ও বলল, তুমি ভেবো না বোনজী, দেখে নিও তোমার স্বামীর চাকরী আমি করে দিতে পারি কি না। ওরই চেষ্টায় সব হল। তুমি ইন্টারভিউ পেলে, তোমার চাকরী হল।

সুহাসিনী কাঁদতে কাঁদতে আঁচলে মুখ ঢাকল।

স্মৃতিভূষণ ক্লান্তিতে বেদনায় হাহাকার করে বলল, তোমায় কে এ সব করতে বলেছিল সুহাসিনী! আমি নয় তলিয়ে যেতুম, কিন্তু তোমার মধুরতা নিয়ে তুমি থাকতে। কেন তুমি পথে নেমে ধূলো

জানবার জন্য কখনো কখনো তার কৌতূহল হত। কিন্তু তা চরিতার্থ করবার আকাঙ্ক্ষা কখনো প্রবল হয়ে তার শোণিতে আলোড়ন তোলে নি।

আজ এই বাড়িটা তাকে প্রচণ্ডবেগে আকর্ষণ করল। সে যন্ত্রচালিতের মত বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত কি একটা কথা চিন্তা করে সে ফিরবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। একটি কোমল বাহু তাকে বাড়ির ভিতর টেনে নিল। দু'টি অভিজ্ঞ চক্ষের তীব্রদৃষ্টি তাকে যেন আগুনের শলার মত বিঁধে দিল। স্মৃতিভূষণ গণিকালয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

চন্দ্রিকা সকৌতুকে তার এই নূতন অতিথিটিকে নিরীক্ষণ করছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরই তার কৌতুক কৌতূহলে এবং কৌতূহল বিস্ময়ে গিয়ে পৌঁছল।

স্মৃতিভূষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসেছিল।

চন্দ্রিকা জিজ্ঞাসা করে, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

স্মৃতিভূষণ সংক্ষেপে বলল, না। তারপর চন্দ্রিকার দিকে না তাকিয়েই বলল, আমি একটু বসি।

চন্দ্রিকা মৃদু হেসে বলে, বসবেনই তো। এসেছেন যখন তখন কি অমনিই চলে যাবেন?

স্মৃতিভূষণ আবার নীরব হল।

চন্দ্রিকা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

স্মৃতিভূষণ নীরবে মাথা নাড়ল।

চন্দ্রিকা তার এই নূতন অতিথিকে নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করল। পরিহাসের চেষ্টায় বলল, সঙ্গে টাকা এনেছেন?

স্মৃতিভূষণ জিজ্ঞাসা করে, কত টাকা?

চন্দ্রিকা টাকার অঙ্কটা বলতে সে বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে দু'টো নোট বার করে সামনের টিপয়ে রাখল।

চন্দ্রিকা জিজ্ঞাসা করল, কিছু খাবেন?

স্মৃতিভূষণ মাথা নাড়ল।

চন্দ্রিকা এবার বলল, গেলাসে করে একটু দেবো?

স্মৃতিভূষণ বলল, আমি ও সব খাই না।

আজ একটু খান, চন্দ্রিকা ইচ্ছা করেই বলে।

স্মৃতিভূষণ এবার প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, বিশ্বাস করুন, আমি ও সব খাই না!

চন্দ্রিকা মনে মনে হাসল। কটাক্ষে স্মৃতিভূষণকে বিদ্ধ করে সে কাছে এলো। স্মৃতিভূষণের গায়ের শালটা নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, শালটা কার?

স্মৃতিভূষণ পরনারীর স্পর্শে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, এটা আমার বিয়ের শাল।

বৌ দিয়েছে বুঝি? চন্দ্রিকা পরিহাসচ্ছলে প্রশ্ন করে।

স্মৃতিভূষণ হ্যাঁ বলতে গিয়ে ঘাড় নাড়ল।

শালটা নিয়ে নিজের গায়ে আলগোছে জড়িয়ে চন্দ্রিকা আরামে আলস্যে বলল, আঃ যেমন নরম, তেমনি গরম। আপনার বৌটি বুঝি এই শালেরই মতন?

স্মৃতিভূষণ এ কথার কোনো জবাব দিল না।

চন্দ্রিকা স্মৃতিভূষণের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার একটা কাঁধে আস্তে হাত রাখল। স্মৃতিভূষণ মুখ তুলতে নরম গলায় তার পালঙ্ক দেখিয়ে বলে, আসুন, ওখানে একটু বসবেন।

স্মৃতিভূষণ স্বপ্নচারীর মত তার পিছন পিছন এসে পালঙ্কে বসল।

চন্দ্রিকা আদর করে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তার পানে নিবিড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ও ভাবে বসে থাকলেই কি চলবে?

স্মৃতিভূষণ যেন এবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল। সে সভয়ে বলল, না, আজ থাক।

চন্দ্রিকা বলল, সে কি? আজ থাকবে কেন? কাল যদি না আসেন?

স্মৃতিভূষণ নিরুত্তর।

চন্দ্রিকা এবার প্রশ্ন করে, কার কাছে যান? সে ভাগ্যবতীটি কে? স্মৃতিভূষণকে তবু নিরুত্তর দেখে সে বলে, আপনার কি এই প্রথম?

নৈরাশ্যে স্মৃতিভূষণ ঈষৎ মাথা নাড়ল।

চন্দ্রিকা এবার বলল, হঠাৎ কেন এই খেয়াল হল, বলুন তো?

স্মৃতিভূষণ নীরব।

চন্দ্রিকা বলল, বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন নি তো?

স্মৃতিভূষণ এতেও কোনো কথা বলল না দেখে চন্দ্রিকা বলল, আপনি আমায় কি বিপদে ফেললেন দেখুন তো? কি করলে আপনার একটু ভালো লাগবে, বুঝবার চেষ্টায় তো হয়রাণ হয়ে গেলাম। ভদ্রতা করেও তো একটা কথা বলা চলে। হাজার হলেও আমি মেয়েমানুষ তো!

স্মৃতিভূষণ বলল, আমি কি বলবো আমার বলবার কিছু নেই। বিশ্বাস করুন। আমার আর বাঁচবারও ইচ্ছে নেই।

সে কি! আত্মহত্যা করতে বেরিয়েছেন না কি! না, না, ওসব ছেলেমানুষী করবেন না। বলুন, কি করলে আপনার মনটা একটু ভালো লাগবে, আমি নয় একটু চেষ্টা করে দেখি। বলে চন্দ্রিকা ঈষৎ হাসল। সে-হাসিতে শুধু চপলতাই ছিল না, একটা করুণার আভাসও যেন ছিল।

স্মৃতিভূষণ বলল, আমার জন্য আমি আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি।

চন্দ্রিকা ব্যথিতকণ্ঠে বলে, চলে গিয়েছে বুঝি! কেন চলে গেল?

স্মৃতিভূষণ উদাসকণ্ঠে বলল, ও চলে যাওয়া নয়। আমার জন্য তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার উপর আমি অধিকার হারিয়েছি।

চন্দ্রিকা বলল, বৌ, কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না বুঝি? ওতে মন খারাপ করার কিছু নেই। দু'দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্মৃতিভূষণ বলল, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমিই তার কাছে যাবার বল পাচ্ছি না। আমার জন্য সে এত দু'খ পেয়েছে, কলঙ্ক মেখেছে, আমি তাকে আর আপন বলে ভাববার সাহস পাচ্ছি না।

একটু থেমে ধীরস্বরে স্মৃতিভূষণ বলে, যদি সে আমার দুর্ভাগ্য থেকে তফাতে থাকত, লজ্জার হাত থেকে বাঁচতুম। সব খোয়া গেলেও তার উপর দখল থাকত।

চন্দ্রিকা বলল, দেখুন, আপনি যে টাকা দিয়েছেন তাতে কম করে একটা ঘণ্টা আপনি এখানে জিরোতে পারেন। আপনাকে চিনি না, কিন্তু কেমন একটা মায়া হচ্ছে। যদি দুঃখের কথাটা বলেন, হয় তো পরামর্শ দিতে পারি। দু'টো সান্ত্বনার কথাও বলতে পারি।

স্মৃতিভূষণের চক্ষে জলের আভাস দেখা গেল।

চন্দ্রিকা এবার সরে এসে হাত ধরে বলে, আপনি যে বিপদে পড়ে পথ ভুলে এসেছেন বুঝতে বাকি নেই। বলুন না, কি আপনার বিপদ! আমাদের এখানে সব সময়েই যে শুধু লম্পটেরাই ভিড় করে আসে তা নয়। দুঃখে বিপদে পড়ে আপনার মতো ভালোমানুষেরাও নিজেদের ভুলতে আসে। তাদের কথা শুনে শুনে পৃথিবীর দুঃখের ইতিহাস আমরা যতটা জানি সতী-সাবিত্রীদের পক্ষে ততটা জানা সম্ভব নয়। বলুন। মনে করুন আপনি গল্প বলছেন, আমি শুনছি।

স্মৃতিভূষণের কাহিনী শেষ হলে চন্দ্রিকা বলল, বুঝেছি। স্ত্রীর ব্যথা বুকে বেজেছে, লজ্জাও পাচ্ছেন। এত বেশি তিনি নিয়েছেন যে, নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়েছেন। কিন্তু এ অহঙ্কার ছাড়ুন তো। জীবনে আরো ধাক্কা আসবে। হয় তো আপনি সামলাতে পারবেন না। তখন স্ত্রীর কাছে হয় তো ঋণ আরো বাড়বে। উনি ধূলোয় নেমেছেন বলে হাহাকার করছেন, আপনার জন্য পাঁকে নামা দরকার হলে উনি তাও নামবেন, পিছপা হবেন না।

চন্দ্রিকা স্মৃতিভূষণের হাতে তার দেওয়া নোট দু'টো ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এ টাকা নিতে লজ্জায় বাধলো। আপনার স্ত্রীর মতন পারবো না কিন্তু আপনার কথা শুনে আপনার জন্য একটু ভালোবাসা যে হচ্ছে না তা নয়।

শালটা স্মৃতিভূষণের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, ভালোবাসায় পাপপুণ্যের বিচার, ধর্মাধর্মের হিসেব অচল! তাছাড়া, আপনার স্ত্রী পাপ করেন নি। আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে পাপের সঙ্গে লড়াই করে আসতে পেরেছেন। যান, এক্ষুণি গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিন যে তাঁর ভালোবাসার কি মূল্য আপনি দিতে চান! দিতে পারেন না বলে কি গভীর আপনার দুঃখ।

স্মৃতিভূষণ কি একটা কথা বলতে গেল, বলতে পারল না। চন্দ্রিকা তার হাত শক্ত করে মুঠো করে ধরে বলল, ভগবান আপনাকে সুখে রাখুন। তারপর তাকে কপাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, কখনও আর এ মুখো হবেন না।

গভীর রাত্রে স্মৃতিভূষণ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখল সুহাসিনী খাটের উপর স্থির হয়ে তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

স্বামীকে দেখে ত্রস্তে উঠে এসে বলল, কোথায় গিয়েছিলে? আমি তো ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম!

স্মৃতিভূষণ বলল, একটা কবিতা লেখার কথা একদিন বলেছিলে। মনে আছে?

সুহাসিনী তার প্রেমগভীর দৃষ্টি স্বামীর দিকে তুলে বলে, হ্যাঁ, মনে আছে।

ঐ কবিতার মাল মশলা জোগাড় করার জন্য পৃথিবীর পথে বেরিয়েছিলুম। অবিচলিত কণ্ঠে স্মৃতিভূষণ বলল।

সুহাসিনী স্বামীর পানে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল।

—শেষ—

বিশ্বকবির খেয়াল-খুশী

সাধনা দেবী

প্রকৃত রসবেত্তা, সার্থক শিল্পী মানেই মহৎ স্রষ্টা। আর এই সৃষ্টির বিচিত্র আকিম্পনের পরিপ্রেক্ষিতে অজস্র অস্বাভাবিক কামনা রূপায়িত হয়ে অনাবিল চরিতার্থতার আস্বাদ পায়। এটা যে ঠিক খেয়ালের দাসত্ব করা তা নয়। আসলে শিল্পী জীবনবীণার প্রতিটি তন্ত্রীতেই অবাঙ্‌ময় মানস আকূতির স্পন্দন জাগাতে ভালোবাসেন— পরীক্ষা করে দেখেন প্রাণের অনুভূতির সত্যরূপ সমরাগিণীর কায়াতে ধরা পড়ে কি না। আমাদের চোখে তো এই ছন্দের রূপটুকু কেন্দ্রিত হয়ে ওঠে না— আমরা দেখি শিল্পীর খামখেয়ালী মনোভাব·····

'আজ গড়ি খেলাঘর
কাল তারে ভুলি—
ধূলিতে যে লীলা তারে
মুছে দেয় ধূলি।'

কবিগুরুর নিজস্ব স্বীকৃতিও তাই।

'ভোলানাথের খেলার তরে
খেলনা বানাই আমি,
এই বেলাকার খেলাটি তার
ওই বেলা যায় থামি।'

তাঁর খেলনা বানাবার খেয়াল-খুশী বিশেষ ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর মধ্যে।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি বহুকালের পৈত্রিক ভবন; পূর্বপুরুষের পরিকল্পনায় গড়া নিরেট নিশ্ছিদ্র—কবি ওতে আর হাত দেন নি। ওকে ভেঙেচুরে গড়তে গেলে ওরও কৌলীন্য যেত, কবির মৌলিকতাও সার্থক হোতো না। শান্তিনিকেতন পরিপূর্ণভাবে কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এরই আধারে কবির খেয়ালী মন পরিতৃপ্তির সাধ মিটিয়েছে। বারবার ভেঙেছে বারবার গড়েছে আবার নতুন করে—ব্যক্তিগত খেয়াল আর স্বপ্রকাশের দুর্দমনীয় আকুলতা মিশে গেছে একীভূত হয়ে···

'বিশ্বের হৃদয়-মাঝে
কবি আছে সে কে,
কুসুমের লেখা তার
বারবার লেখে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা
বারবার মোছে
অশান্ত প্রকাশ-ব্যথা
কিছুতে না ঘোচে।'

অশান্ত প্রকাশব্যথা [illegible] এই দ্বন্দ্ব ও প্রচেষ্টা, মাঝে, শান্তিনিকেতনের বাসকালীন সময়গুলোতে বেড়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। [illegible] দেহ [illegible]। অতীব মনের আধার দেহ; সেই দেহের [illegible] সম্পর্কেও [illegible] তিনি [illegible] হয়ে উঠলেন। সেই সময়কার সৃষ্টি—'[illegible]'।

[illegible] পরিবর্তনের [illegible] ঠিক কখন [illegible] বলা শক্ত। হয় তো [illegible] তাঁকে মাটির বাড়িতে থাকবার প্রেরণা দেয়। [illegible] করতে পারতেন— প্রচণ্ড গ্রীষ্মে [illegible] অনাচ্ছাদন [illegible] দিয়ে [illegible] সাক্ষ্য দিয়েছে [illegible]। [illegible] ঠিক যে কোন মাটির বাড়িতে বাস করতে তাঁর মন চাইল, বলা শক্ত। স্থানীয় আদিবাসীদের [illegible] পারে। অদূরে [illegible] বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি [illegible] আদিবাসীদের [illegible] জাগাতেই [illegible] সুরেন্দ্রনাথ [illegible] মাটির বাড়ি করে দিতে হবে। [illegible] গড়া হয়েছে [illegible] কবির সাধের বাড়ি স্রেফ জলে গলে [illegible] গেল।

আবার নতুন করে শুরু করলেন ভুবনবাবু। কিন্তু কাজ সুরু করার পথে [illegible] দিল। ওখানকার [illegible] কিংবা কাঁকুরে মাটি নয়, বাড়ি তৈরির এঁটেল মাটি অনেক দূর থেকে আনাতে হয়—লরী বা ট্রাক আনা-যাওয়া করার রাস্তা নেই, গরুর গাড়ি করে [illegible] অনুমানেই ভুবনবাবু [illegible]। অনেক মজুর লাগে এতে, সময়, পরিশ্রম ও টাকা খরচের তো কথাই নেই। এদিকে কবিরও [illegible], কতদিন হয়ে গেল। কি করেন! কবির কাছে সব খবর একেবারে চেপে যাওয়া হোলো। তারপর মাটি দিয়ে মোটেই নয় পাকা বাড়ির [illegible] ইটের গাঁথুনি তোলো। ইটের পাকা দেওয়ালের ওপর [illegible] দিয়ে এবড়ো খেবড়ো করে মাটির প্রলেপ। কার সাধ্য ধরে যে পাকা বাড়ি! তবে চালটা আর করা গেল না। ভুবনবাবুর ইচ্ছে ছিল পাতলা করে সিমেন্ট ঢালাই করে গড়ানে ছাদ বানিয়ে তার ওপর বাতা

সমেত খড়ের চালা লাগিয়ে দেবেন। সেটা কিন্তু সম্ভব হোলো না। মিস্ত্রীরা পারলে না। ফলে চালটা কাঁচাই রয়ে গেল। এখনো বর্ষাকালে ঝড়বৃষ্টির দাপট বেশি হলে 'শ্যামলী'র চাল খসে পড়ে। ফের মেরামত করে দিতে হয়।

কোলকাতা থেকে ফিরে, যেমন এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি মাটির বাড়ি তৈরি দেখে কবি তো ভারি খুশী। আরাম করে গুছিয়ে বসলেন নতুন বাড়িতে।

তারপর ভূধরবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন: ভূধর, তোমরাও কেন সবাই এক একখানা এরকম বাড়ি বানিয়ে নাও না? খড়, বাঁশ, মাটি সব তো তোমার নিজস্ব রয়েছে। দেখলে তো কেমন বুদ্ধি করলাম বিনা খরচে বাড়ি হয়ে গেল।

মনে মনে হাসলেন ভূধরবাবু। বিনা খরচেই বটে। ঐ মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'তে যে পরিমাণ সময়, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয়েছে, তাতে একখানা কেন দু'খানা দু'মহলা কোঠাবাড়ি উঠতে পারতো। কিন্তু সে কথা বলবে কে? ঘাড় কাৎ করে তাই গুরুদেবের সঙ্গে সম্মতি জানালেন ভূধরবাবু। শ্যামলীর [illegible] কথা কবি আর জানলেন না।

মৃত্তিকাশ্রয়ে শুধু বাস করলেই [illegible] আনুষঙ্গিক অন্যান্য সরঞ্জামও চাই। [illegible] কবির [illegible] মাথার জন্য যে বাড়ি, [illegible] ভাষায় 'মেটো পাতনা' বলে সেই পাতনায় করে চানের জল থাকবে মাটির উঠোনে, তাতে মাটির গেলাস ডুবিয়ে কবি চান করবেন। সে গেলাস আবার এমনি গেলাস হলে চলবে না। ভাঁড় ও ঘটির মাঝামাঝি আকৃতির হওয়া চাই। ফরমাস অনুযায়ী কুমোরকে দিয়ে সেই অসাধারণ পাত্রটি গড়ানো হোলো। কবি অতি আনন্দে রোজ মনের মাধুরী মিশায়ে চান করেন।

কবির অতি পুরাতন ভৃত্য বনমালীর কথা বা নামটা অন্তত অনেকেই জানেন যার—

'ভূতের মতো চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর'

—সেই বনমালীই শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। কলে জল দিয়ে সকালে বনমালী ঐ পাতনা ভরে রাখতো।

বিরাট পাতনা—কবি তার অনেক জলে স্নান সারাতেন। একদিন [illegible] জল এলো না। বনমালী মহা [illegible]।

স্নান করবার সময় [illegible] কবি [illegible] উঠলেন।

বনমালী [illegible]: আজ্ঞে কাল আজ জল আসে নি— [illegible]।

কবি [illegible]: কাল জল আসে নি! তা আর কি [illegible] আছে সেইটাই দে।
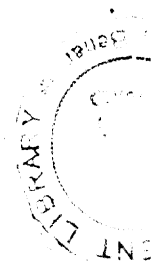
বনমালী কাঁচুমাচু ভাবে বললে : বাসি জল তো রাখি না, কালকে যা বেশী জল ছিল ফেলে দিয়েছি। আমি মনে করলাম—

বনমালীকে কথা শেষ করতে দিলেন না কবি। স্মিতভাবে বললেন : মনে কিছু এ'র থেকে আর করিস নি বনমালী, কল তো যন্ত্র মাত্র ওকে কখনো বুদ্ধি দিয়ে একান্তভাবে বিশ্বাস করে বসিস নে।

ব্যস্। বনমালী তাঁর কথার কতটা বুঝলে কে জানে কবি আবার লিখতে বসে গেলেন যেমন ছিলেন তেমনি। স্নান যে হোলো না, চড়া রোদের দিন—সারা দিন আর গায়ে এক ফোঁটা জল পড়বার সম্ভাবনা রইলো না : মনে এককণা উত্তাপ জমলো না তার জন্য।

কিন্তু এ খেয়াল বেশীদিন স্থিতিলাভ করতে পারলো না। শ্যামলীরই কাছে আরেকখানি ছোটো একতলা শ্যামলীর পরিমার্জিত সংস্করণ তৈরী করবার আদেশ দিলেন গুরুদেব। 'শ্যামলী' হয়ে বাড়তির ভাগ এটি—'পুনশ্চ'। পুনশ্চ তৈরী হবার পর দেখেশুনে কবি মহ খুশী। তবে ফরমাস করলেন পুনশ্চের কম্পাউণ্ডের সামনেই তাঁর ব্যক্তিগত দরোয়ান অর্থাৎ বনমালীর ঘর তুলে দিতে হবে একখানা। কথানুযায়ী বনমালীর ঘর উঠলো। বনমালীর ঘরখানি দেখে কবি আরো খুশী। এত পছন্দ হয়ে গেল তাঁর যে তৎক্ষণাৎ পুনশ্চ ছেড়ে দরোয়ানের ঘরে এসে কায়েমী হলেন।

: বেশ ঘর হয়েছে শুধু এর সঙ্গে একটি চানের ঘর আর একটি চৌবাচ্ছা তৈরী করে দাও। ডায়াবিটিস্ ছিল কবির—অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ না হলে চলতো না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পাল্টা বদল হয়ে গেছে—ভৃত্যকক্ষে মনিব ও মনিবগৃহে ভৃত্য। কবি বনমালীকে আদেশ দিয়েছেন : তুই আমার ঘরে থাকবি এখন থেকে। কিন্তু, কিন্তু করেও বনমালীকে রাজী হতে হয়েছে। এমনও হয়েছে একদিন····মৌজা থেকে নতুন আমলা এসেছে, তথাকথিত সার্ভেণ্টস্ কোয়ার্টারে অবস্থিত কবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়ে গৃহাধিষ্ঠিতা বনমালীকে আভূমি গড় করে অভিবাদন জানিয়েছে।

শুধু কি এই? উত্তরায়ণের বিশাল কম্পাউণ্ডে এক এক করে তৈরী তোলা। সূর্যের দিকে মুখ করে 'কোণার্ক'—সূর্যাস্তের রাঙিমায় উদ্ভাসিত 'উদীচী' আর প্রখর সূর্যের দীপ্তিতে ভাস্ব 'চিত্রভানু'। প্রত্যেকটিই কবির অতি প্রিয় হয়ে ওঠে—যখন তৈরী শেষ হয় খুব উৎসাহের সঙ্গে দু'চার দিন বসবাস করেন আবার ক'দিন পরেই সেই পরিচিত সুর বেজে ওঠে কণ্ঠে : না হে, ঠিক জুৎসই হচ্ছে না যেমন মনোমত তোলো ভেবেছিলাম মনের সেই বিশেষ মতটি যেন আর মিলছে না। তাকে তারপরে চলবে না ঠিক কাঠামোটি গড়ে থাপে থাপে বসাতে হবে। অতএব আবার,

'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।'

চলো 'মালঞ্চে', চলো 'কণিকায়'।

রসিকতাও করতেন মাঝে মাঝে,—ভূধর, কি চেয়েছি তোমার কাছে বলো তো!

'ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা ধরণীর এক কোণে'···

বাসাই করলেন অবশেষে। পাখীর নীড়ের অনুকৃতি। গাছের পরে তাঁর এই বাসার নাম হোলো 'কুলায়'। এখানে কিছুদিন থাকতে পেরেছিলেন মনস্থির ক'রে। দু'টি সম্পূর্ণ নাটকের জন্মস্থান এই 'কুলায়'।

গাছের 'পরের বাসা যখন তছনছ হয়ে গেল ঝড়ে তখন বসলেন গাছের নীচে—ছাতিমতলায়। নির্বিকারচিত্তে সুরু করলেন নতুন প্রবন্ধাবলী। দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'জীবনের বৈচিত্র্যশালায় অক্ষুণ্ণ থাকে মানসিক সজীবতা। বৈচিত্র্যের জারকরসে ভিজিয়ে তোলো শুকনো মনকে দেখবে তখন, পারিপার্শ্বিক মননের কাঠামোতে সেটা আপনি সেঁটে বসেছে। খেয়াল বলে তখন সেটাকে ছেঁটে ফেলতে যেও না।'

চিরখেয়ালী নিজেও তা করেন নি।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আভা পাকড়াশী

আবার বেরোলাম। রাত্রি দশটা। এবার প্রশেসন ফিরবে। মাইশোর আলোয় আলো, মনে হচ্ছে রূপকথার রাজা ইন্দ্রপুরী। লোকেরা উৎসুক হয়ে উঠেছে। আমার সামনের রোতে সেই চপলা। কি দুষ্টুমীই না করছে। এখন নীল নাইলনে নীল পরী সেজেছে। মাথায় ফুলের মালা, একেবারে অভিসারিকা। প্রশেসন এসে পড়লো। এর নাম টর্চ লাইট প্রশেসন। প্রত্যেকের হাতে একটা কোরে জ্বলন্ত মশাল। দূর থেকে মনে হচ্ছে একরাশ জোনাকি জ্বলছে। কাছে এসে পড়লো বিরাট প্রশেসন। আরও তিন চারটে ব্যাণ্ডপার্টি পারে জয়েন কোরে থাকবে। কি সুন্দর ভাবে পুরো প্রশেসন প্রাসাদে ঢুকে গেলো। তবে মহারাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তাই বোলেন রাস্তে ফিরলেন।

কাল আবার চপলাদের চিড়িয়াখানায় আর মিউজিয়মে দেখেছি। আমাকে চিনতে পেরে নড্ কোরেছিল। আর মিউজিয়মে অনেকক্ষণ কথা বোলেছিলাম। এখানে চিড়িয়াখানায় তিন-চারটে সিংহ আর সিংহী আছে, তিন চার রকম ভাল্লুক আছে। আফ্রিকান আর দেশী দুরকম হাতী আছে। ছোটর মধ্যে বেশ ভরা Zoo। আফ্রিকান হাতির পিছনটা কেমন ছোট মতন। চপলাকে দেখলাম হাতির পিঠে রাণীর মত বসে আছে। জগমোহন প্রাসাদে আর্ট গ্যালারি আছে সঙ্গে মিউজিয়মও। সংশ্লিষ্ট মিউজিয়মও কৃষ্ণরাজা ওয়াডিয়ারের ব্যবহৃত জিনিসে ভরা। কত দেশের কত রকমের যে বাজনা ছিল তাঁর সবই নাকি তিনি বাজাতে পারতেন। তার মধ্যে বাঁশিই কত রকমের। বেশ গুণী রাজা ছিলেন ইনি। ছবির কলেকশনও ভাল। রবি বর্মা থেকে আরম্ভ কোরে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, এছাড়া আরও অনেক দেশী বিদেশীর আঁকা ভাল পোর্ট্রেট আছে।

এখানে ও আর আমি একলা পড়েছিলাম। প্রথমে ছবির বিষয়ে কথা হ'ল। পরে আমি বললাম যে, আমি আর্টিষ্ট হোলে নিশ্চয়ই ওর একটা ছবি আঁকতাম। খুব হাসছিল। বলা বাহুল্য সব কথা হিন্দিতে হল।

আজ সকালে খুব ভোরে উঠেছি। ওকে একলা পাবার এটাই প্রশস্ত সময়। ক'দিন তো দেখছি, যখন সবাই ঘুমোয় তখন ও উঠে স্নানে যায়। দরজা আর খোলা হল না। বাইরে থেকে গানের আওয়াজ আসছে মানে বাথরুমের দিকের বারান্দা থেকে। আরে এ যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত চপলা গাইছে গুনগুনিয়ে ভারি চেনা সুরটা—ভারী আনন্দ হোল ওর মুখে বাংলা গান শুনে। তবে কি ও বাংলা জানে? হয়তো আমার ন্যাশনাল ড্রেস দেখে আমাকে অবাঙালী মনে কোরেছে। বেরুতে যাব এমন সময়ে দেখি ভাইয়া ওর চুল টেনে ধরে পিঠে গুম্ গুম্ কোরে কিল বসিয়ে দিয়ে বলছে, 'আর করবি রাক্ষুসী?'

খিল খিল কোরে হাসতে হাসতে চপলা বলে, 'না কোরব না ছাড়'।

যেই ছাড়া অমনি ছুটে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ কোরে দিয়ে বলে, 'আরও কোরবো বেশ কোরবো'। বেচারী ভাইয়া আস্তে আস্তে বাথরুমে ঢোকে। আমার মন বলে ওরা নিশ্চয়ই বাঙালী।

আজ ওরা কোথায় যাবে জানি না। ক'দিন তো প্রায় এক সঙ্গেই ঘুরেছি। ওদের আর আমার ঘরের মাঝে একটা দরজা আছে তাতে একটা চাবির ফুটো আবিষ্কার করেছি। তুই যে কি ভাবছিস জানি না কিন্তু আমার তখন অবস্থা সঙ্গীন, নেশা ধরে গেছে। ওরা আজ কোথাও গেল না। রবিবার, আমারও ডিউটি নেই। ফুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখছি, খাটে শুয়ে ভাইয়া খবরের কাগজ পড়ছে আর মাঝখানে মাটিতে বোসে ওরা তিনজন লুডো খেলছে। ঘরটা ডবল বেডের। দুই পাশে দু'টো খাট মাঝখানে একটু জায়গা, ওদিকে বাথরুমের বারান্দার দরজা এদিকে সামনের বারান্দার দরজা। মুখের দিকে আলনা ও পায়ের দিকে একটি ড্রেসিং-টেবিল আছে। দেখি ভাইয়া চপলার ঘাড়ের ওপর পা তুলে দিয়েছে, প্রথমবারে সরিয়ে দিলো দ্বিতীয়-বারে এক চিমটি, তৃতীয়বারে রেগে গিয়ে বলে, 'কি চাও বল তো? হাড় জ্বালাচ্ছ কেন? খেলতে দেবে না?'

'না।'

'কেন?'

'গান কর।'

ছোটভাই দু'টিও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে হ্যাঁ হ্যাঁ বাঈ গান কর। বোধ হয় ওরা হারছিল।

'কোনটা গাইবো?' কৃত্রিম রাগে জিজ্ঞেস করে চপলা।

'সেই যে সকালে যেটা গাইতে গাইতে আমার গায়ে জল ছিটোচ্ছিলে।' উত্তর দেয় ভাইয়া। এতক্ষণে কিলোকিলির অর্থ বোধগম্য হোল। এবার গান সুরু হোল,

> 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
> খুলিও হৃদয় দ্বার খুলিও
> ভুলিও আপন পর ভুলিও
> ....।

আবেগময় উদাত্তস্বরে গেয়ে চলে চপলা। বহুদিন পরে বাংলা গান শুনে আমার সঙ্গীতপিপাসা কিছুটা মিটল।

অ্যাটাচিকেস বাজিয়ে সঙ্গত কোরলো বছর চোদ্দ বয়সের ভাইটি। বেশ তালে বাজালো। তাতেই মনে হোল এদের বাড়ি গানের চর্চা আছে। কথায় কথায় জানলুম কাল ওরা চামুণ্ডা মন্দিরে যাবে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠিক করলাম কাল আরও ভোরে উঠবো তবে নিশ্চয়ই একা পাব।

পরদিন সকাল, উঠে চুলটা একটু ঠিক কোরে নিলাম। কলের জল পড়ার শব্দ শুনছি নিশ্চয়ই স্নান করছে। আমার ঘরে কিন্তু বাথরুমের দিকেও একটা জানলা ছিল। তবে জানলার সামনে বাথরুম নয় একটা ছোট বারান্দা। জানলা দিয়ে দেখতে গেলাম কতটা বেলা হয়েছে? ছি! ছি! ভাই-বোনে এ কি কাণ্ড? ভাইয়া পলাকে জড়িয়ে ধরেছে।

তারপর চপলা ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ফুটো দিয়ে দেখি ভাইয়া ওকে ধরবার চেষ্টা করছে আর ও খাটে বসে পা দুলিয়ে জিভ ভেঙ্গিয়ে বলছে, 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। এই দুষ্টু? উঠে পড় তো।' আর খুব হাসছে। ভাইয়া কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এখন আমার অবস্থাটা বুঝে দেখ, একেবারে যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মনকে সান্ত্বনা দিই হয় তো এমনি আদর করছিল বোনকে। যাই হোক, ওদের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ করতে হবে আর দেরী নয়। একটু পরেই ওরা বেরিয়ে গেল। আমিও বাথরুমে ঢুকে গলা ছেড়ে গাইতে লাগলাম, 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' এককালে আমিও যে মন্দ গাইতাম না সে তো তুমি জানই।

ওদের follow কোরে আমিও চলেছি চামুণ্ডা মন্দির পূজো দিতে—মানে দেখতে। বাস এঁকে-বেঁকে ওপরে উঠছে। দূরে মহারাজার গ্রীষ্মাবাস 'ললিতা মহল' ছোট্ট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। জগন্মোহন প্যালেস যেখানে মিউজিয়ম হয়েছে, সেটা কত ছোট্ট দেখাচ্ছে ওপর থেকে। এই চামুণ্ডা পাহাড়ের ওপর থেকে মাইশোরের দৃশ্য অতি সুন্দর লাগে। মন্দিরটি বহু পুরানো আর অপূর্ব কারুকার্য এই মন্দিরের। ভেতরে আছে মা দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তি। এরা বলে 'চামুণ্ডী বেট্টা'। বেট্টা মানে পাহাড়। এখানের নন্দী মানে ষাঁড় হচ্ছে দোতলা সমান, কালো কষ্টিপাথরে গড়া, আর মহিষাসুর চারতলা সমান বিরাট দেহ। ঠিক মন্দিরের সামনেই এই মূর্তি। প্রথম দৃষ্টিতেই চমকে উঠতে হয় বিস্ময়ে, মনে হয় সত্যি বুঝি বা একটা রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট ডালায় ফুল, আস্ত নারকোল, কলা, ধূপ আর রোলী দিচ্ছে। কিনে নিয়ে পূজো দিয়ে আবার ডালিটি ফিরিয়ে দিতে হয়। চার আনা ডালি, যার যার সব ডালা নিয়ে বোসে আছে। অনেকটা ওপরে উঠেছি দেড়ঘণ্টা ধরে, এবার ডালা কিনছি। পাশেই শুনি পরিচিত কণ্ঠে অথচ ভিন্ন ভাষায়।

'এত দেরী যে?' ছদ্মবিস্ময়ভরে বলি, 'এ কি আপনি? কি কোরে জানলেন আমি বাঙালী? আর আমি যে এখানে আসবোই তাই বা কি কোরে জানলেন?'

হেসে বলে, 'কোন উত্তরটা আগে দেই? প্রথমত 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, আর দ্বিতীয়ত রোজই তো এক সঙ্গে ঘুরছি বলতে গেলে।'

'বাঃ, আমি যখন গেয়েছি তখন তো আপনারা বেরিয়ে গেছেন।'

'গিয়েছিলাম, কিন্তু ভাইয়া পাশ ফেলে আসায় আনতে গিয়ে আপনার গান শুনে ফেললাম।'

'আচ্ছা উনি মানে আপনার দাদাও জানেন আমি বাঙালী ?'

'দাদা শুধু আমার নয় আপনারও'।'

অবাক হয়ে বলি, 'মানে ?' 'সেইটেই তো বোলবো, আপনি শীঘ্র পুজো দিয়ে আসুন। তবে অমনি কোরে তাকালে কিন্তু কিচ্ছু বলব না'।

অপ্রস্তুত হয়ে বলি, 'এক্ষুণি আসছি।

ওর লালপাড় গরদ পরা লক্ষ্মীমূর্তি হয় তো আমার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলেছিল। একটু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু আপনি একলা যে ?'

আমার ভাব দেখে দুই গালে দুই টোল ফেলে খিল খিল কোরে হেসে বলে, 'ডালি ফেরাতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওরা সব ওখানে ডাব খাচ্ছে। আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে থাকবো, আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবেন 'ভাইসাব,' আমি এখনো চা খাই নি।'

তাহলে ও আমার জন্য অপেক্ষা করে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চলেছে পুজো দিতে। কি জানি অন্তর্যামী চণ্ডীকা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন কি না। এখানে আবার পুজো দেবার টিকিট কিনতে হয় বাইরে থেকে। ভেতরে গিয়ে ঐ টিকিট দেখালে তবে পুজো দিতে হয়। ভেতরে অসম্ভব ভীড়। কোনরকমে পুজো সেরে মার কাছে আকুল নিবেদন জানিয়ে তাড়াতাড়ি বাস স্টপে ফিরে চললাম। সামনেই সেই বিরাট মতিসাগর মূর্তি। তার আমার চপলার লালপাড় শাড়ীর আঁচলও উড়ছে। এখানকার মেয়েরা যেমন কালো তেমনি বিকট ঘোর রং-এর শাড়ীও ব্যবহার করে। তার মধ্যে সাদা শাড়ী ব্যতিক্রম বৈ কি।

বাসের টিকিট কোরেই রেখেছিল ওরা।

সামনের সিটে আমি আর ভাইয়া পেছনে ওরা তিনজন। হাসতে হাসতে ভাইয়া বলেন, 'কোন্ উদ্দেশ্যে মহাশয় আত্মপরিচয় গোপন করেছিলেন বলুন তো ? যাক আজ আমাদের টুটুর জন্মদিনে আপনি আমাদের ঘরে চা খাবেন। আর উপস্থিত আমার একটু ঘটকালি করবার ইচ্ছে আছে, যা কিছু জিজ্ঞেস কোরবো কিছু মনে না কোরে উত্তর দেবেন কেমন ?'

আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম, আজ সকালে না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। মেঘ না চাইতেই জল। হে মা চণ্ডীকা মনস্কামনা পূর্ণ কোরো। বিনয়ে বিগলিত হয়ে উত্তর দিই, 'কি যে বলেন, যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করুন।'

শুরু হয় প্রশ্নোত্তর। 'বেশ বেশ প্রথমেই বলুন আপনি কি বিবাহিত'

'না'।

'আপনার নাম ?' 'সোমনাথ মুখার্জি।'

'বাড়ি কোথায় ? কি কাজ করেন ? অভিভাবক কে ?'

'বাড়ি কলকাতায় আমার পোষ্ট এ-টি-এস সাদার্ণ রেলোয় উপস্থিত হেডকোয়ার্টার মাইশোর। অভিভাবক হচ্ছেন আমার দাদা শ্রীঅমরনাথ মুখার্জি।'

'এত ভাল কাজ করেন তবু এখনো আইবুড়ো কার্তিক ? বাঃ চমৎকার। আচ্ছা অমরনাথবাবু কি কলকাতায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করেন ? আর আপনার বাবার নাম কি অমৃতনাথ ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আরে আপনি তো আমাদের চেনেন দেখছি।'

'ঐ অমরনাথ আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। প্রেসিডেন্সিতে আমরা যে একসঙ্গে পড়েছি।'

'তাহলে আপনি আমায় তুমিই বলুন।'

'যা বলেছ। তাহলে তুমি আমার ভায়রাভাই হচ্ছ কি বল ?'

আমার ততক্ষণে গলা শুকিয়ে উঠেছে, তবু বললাম কোন রকমে আড়চোখে একবার পেছনে তাকিয়ে, 'মানে আপনার শ্যালিকা কি ইনি ?'

এখনো যে কতটা প্রহসন বাকি কিছুই বুঝি নি তখন। হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠে বলেন, 'তাই তো বলি এত আগ্রহ কেন ? না ভাই ওটি একান্ত আমারই ওর পরেরটি তোমার।'

লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে আমার। পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'আরে এতে লজ্জার কি আছে ? তুমি তো আর সেই মুসৌরীর ভদ্রলোকের মত ওকেই বলে বসো নি যে, তোমাকে ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই। তবে দোষটা তোমার চেয়ে আমাদেরই বেশী।'

বেশ ক্ষ্যাপাতেও ভালবাসেন, দুষ্টু হেসে পেছন ফিরে বলেন, 'তাই না গুঞ্জা ?' আমায় বলেন, সেই ভদ্রলোককেই ভায়রাভাই বানাতাম হে, তবে পাঞ্জাবী বলে মা রাজী হলেন না। যাক আয়েশার প্রণয়ী যখন দু'জন থাকতে পারে না সুতরাং ও দিকেতে চেও না চেও না।

চাইতে বারণ করলেও চেয়ে দেখি ওর মাথার দিকে। কেন সিঁদুরটাও চোখে পড়ে নি ? লক্ষ্য করলাম, মাথার সামনে একটা চুলের পাক থাকায় সিঁদুর পরেছে মাঝখানে। আর সিঁথিটি এত সরু যে সিঁদুর সহসা চোখেই পড়ে না। আর আমি কল্পনাও করি নি যে ও দুটি ওর ছেলে আর উনি ওর স্বামী।

ভদ্রলোক খুব রসিক। হোটেলের ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে বলেন, 'ওঃ ! শ্যালিকা তো আমার একটি, সেটি দিয়ে না হয় এর মুখ বন্ধ করলাম, তারপর ? এবার থেকে কিন্তু সাবধান !'

এখন নাম জেনেছি আর চপলা বলব না।

গুঞ্জা সরোষে বলে, 'আহা, কে কাকে সাবধান করছে, নিজেই বড় কম যান।'

আমি তখন আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, কি অদ্ভুত স্বাস্থ্য এই মহিলার ! ঐ ক'টি সন্তানের জননী হয়েও লোকের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করছে। কে বলে বঙ্গললনা কুড়ি পেরোলেই বুড়ি। এরপর চা খেতে খেতে ওঁদের কীর্তিকাহিনী শুনলাম।

ওই ভাইয়া মানে মানস মুখার্জির বাবা জব্বলপুরে মুন্সেফ ছিলেন আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সুতরাং এঁর ছোটবেলাটা ওখানেই কাটে আর এই গুঞ্জাবাঈ পড়শী কন্যা। মানসবাবু মায়ের এক ছেলে—তাই স্বভাবতই এঁর মা'র মনে কন্যার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই গুঞ্জা সারাদিন এঁদের বাড়িতে থাকতো আর মানসবাবুর ওপর দৌরাত্ম্য করত। একাদিক্রমে বারো-তেরো বছর এঁরা এভাবে ছিলেন। এর মধ্যে আর একটি শিশুকন্যা রেখে গুঞ্জার মা মারা যান। তখন দু'টি বাড়িও এক হয়ে যায়, তারপর মানসবাবুর বাবা কলকাতায় বদলি

হন। ওঁর মা গুঞ্জাকে বৌ ক'রে আর ওর বোন আর প্যারালিসিসে পঙ্গু বাবাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন। বছর চারেক আগে তিনি মারা গেছেন। ছোট থেকেই মারামারি আর চুলোচুলিটা তাই এমনি মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, আজও ছাড়তে পারেন নি। মারামারি ক'রে মা'র কাছে নালিশ করতেন, অবশ্য এখনো করে থাকেন, আর তিনিও বেশ উপভোগ করেন এঁদের এই ছেলেমানুষি। এরপর আমার হবুস্ত্রীর গুণকীর্তন আরম্ভ করলেন। ওঁর ভাষাতেই বলি, ভাই আমারটি শ্যামা শিখরদশনা, কিন্তু তোমারটি গৌরাঙ্গী ও শান্তস্বভাবা মানে এঁর মত কলহপ্রিয়া নয়। ভেবেছিলাম তো দু'জনেই আমার সেবা করবে। কিন্তু ইনি ঈষৎ হিংসাপরায়ণা তাই একটু মুস্কিল হয়েছে আর কি। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, আমাকে লুকিয়ে গুঞ্জা কিল তুলেছে। বেশ আছে এরা, না জানি আমারটি কেমন হবে।

ওঁদের স্নেহময়ী মাটিকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছেলের ঠাকুমাকে মা আর মাকে যা বলে, তা আগেই বলেছি। গুঞ্জা ছোটবেলা থেকেই মানসবাবুকে ভাইয়া বলতো, এখনো তাই বলে আর ছেলেরাও তাই শিখেছে। ওঁদের আর একটি মেয়ে আছে ঠাকুমার কাছে তার নাম ছবুলা। তুই হয় তো ভাবছিস বাঙালী যদি তো ওরকম নাম কেন? বহুদিন জব্বলপুরে থাকার দরুণ বাঙালী হয়েও ওদের বাবা মেয়েদের নাম ও-দেশী প্রথায় গুঞ্জাবাঈ, রঞ্জাবাঈ রেখেছিলেন।

যাক তুই ভাই দাদাকে বলে যা ব্যবস্থা করার সব করবি। অবশ্য এঁরা দাদাকে বলবেন এখান থেকে ফিরে। কি আর করি, দুধ যখন পেলাম না, তখন ঘোলই সই। আসলে এটা তো দুধেরই অন্য সংস্করণ। মা-বাবাকে কবেই হারিয়েছি, তাই বৌদিকেই বেশী মনে পড়ছে। বলতে গেলে তো আমি তাঁর স্নেহচ্ছায়াতেই বেড়ে উঠেছি। এই সব বিদেশে পড়ে আছি, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

তুই বলিস আমার চিঠি পেতে তোর খুব ভাল লাগে, কেন না অনেক বর্ণনা আর অভিজ্ঞতা থাকে—তাই এই চিঠিটা খুব বড় হয়ে গেল তোকে সব খুলে জানাতে গিয়ে।

উপস্থিত শুভস্য শীঘ্রম। আমি ছুটির দরখাস্ত করেছি। এখন দেখবই ওপর সব নির্ভর করছে। ভালবাসা নিস্। ইতি—

তোর 'সমু'

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম্

—তুমি বুদ্ধিমতী সিস্টার। গভীর চিন্তার শক্তি রাখ তুমি। আমি জানি এমন অবস্থার মুখোমুখি তুমি হতে পার, অন্যদের যা নিয়ে অনুরোধ করা চলে না। তোমায় বলা উচিত হচ্ছে না—কিন্তু সিস্টার পলিন আমার কাছে আগেই এসেছিল। যে বিদ্বেষের কথা তুমি বলছ, সেটা উভয়ত।

সিস্টার সোজা তাকান সুপিরিয়রের চোখের দিকে।

—বুঝতেই পারছ তার অনেক অভিযোগ। এককথায় তার মতে তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু তুমি চালবাজ। সে বলে তোমার নম্রতা নেই মোটেই আর কোনদিন যে তুমি আয়ত্ত করতে পারবে তাও সে বিশ্বাস করে না। কেন যে তুমি কনভেন্টে এসেছ সেটাই তার কাছে বিস্ময়।

—আমি খুবই লজ্জিত মাদার, তাঁর জন্যেও, আমার জন্যেও। আপনার মুখে শুনে সবটাই ভারি ছেলেমানুষী মনে হচ্ছে।

—ছেলেমানুষী ঠিক এটা নয়। কোন বড় নানের দিক থেকে এ রকম ব্যবহারকে কেউ ছিদ্রান্বেষী বা অকরুণ বলতে পারে, ছেলেমানুষী বলা চলে না। আমার ধারণা তার বিদ্বেষের কারণ ভয়, সে ভয় পাচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না, পারলেও তোমার চেয়ে অনেক নীচে থাকবে। বোঝ নিশ্চয় একজন নতুন নান যদি বড় সিস্টারকে ছাড়িয়ে যায় তো অনেক অসুবিধে সৃষ্টি হতে পারে। পড়াশুনায় তুমি যেমন এগিয়ে গেছ খবর পেয়েছি, সিস্টার পলিনের অবস্থা তাতে সেইরকমই দাঁড়াবে।

সিস্টার লুকের বক্ষস্পন্দন দ্রুত হল। ছোট ঘরখানা···অন্ন
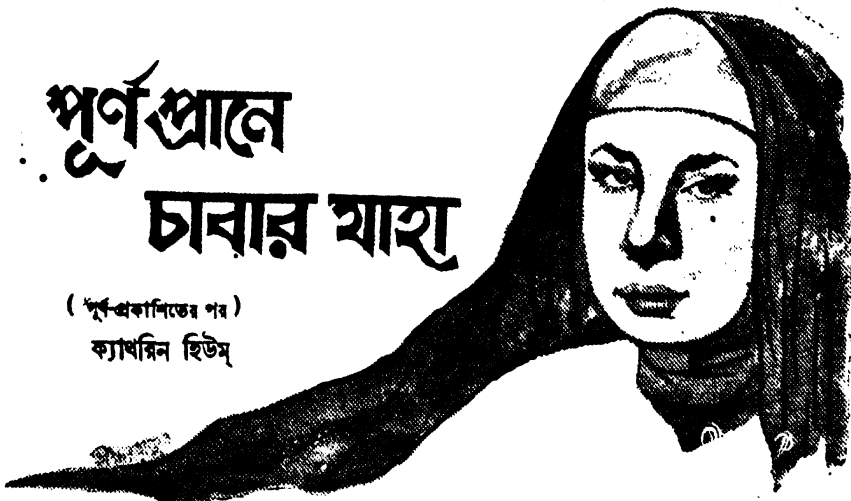
পরিসরে ডেস্ক, চেয়ার, লম্বা একটা বুককেশ নিয়ে সাজানো।…ঐ বুককেশ থেকেই তাদের ধর্মীয় পাঠের বই দেওয়া হয়—সবকিছু মিলে যেন বাক্সের মত ঘিরে ধরেছে তাকে।

মাদার সুপিরিয়র একদৃষ্টে তাকিয়ে তার দিকে, চোখে নীরব দ্বিধা। আসা করছেন যেন যে কথা বলতে গিয়ে তিনি ইতস্তত করছেন সেই নিজে হতে সে প্রস্তাব করবে।…ক্রুশিফিক্সটার ওপর হাতটা দৃঢ় হ'ল ক্রমে।

—ভগবানের নামে আত্মত্যাগ করবার একটা মস্ত সুযোগ এসেছে তোমার। মূল্যবান সম্পদ দিয়েছেন তিনি তোমায়—স্মরণশক্তি তোমার অসাধারণ। কি করবে জিজ্ঞাসা করছিলে।…সিস্টার লুক, এত উদার, এত মহৎ তুমি হতে পার কি যার জোরে এই পরীক্ষাটায় ফেল করতে পার ?

সারা দেহে বৈদ্যুতিক কম্পন একটা।…মাটিটা কেঁপে উঠল বুঝি।…সিস্টার লুক সচমকে আহত দৃষ্টিতে তাকাল সুপিরিয়রের দিকে।

উজ্জ্বল দু'টি চোখে অসীম মমতায় চেয়ে আছেন তিনি তার দিকে। যা বলেছেন ভালই জানেন তার তাৎপর্য।

…বহু প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মনের মধ্যে। উনিই কি ঠিক, নির্ভুল ? এমন কোন প্রস্তাব করবার অধিকার কি আছে কারো—স্বয়ং সুপিরিয়র জেনারেলেরই কি আছে ?…মন উত্তর দিচ্ছে সুপিরিয়র জেনারেল কেন, এ অধিকার সবার আছে। এই ঈশ্বর-চরণে সমর্পিত বিশেষ জগতটায় অন্তত যে কেউ বলতে পারে এ কথা—যদি দেখা যায় কারো মধ্যে নম্রতার একান্ত অভাব, অথবা যেটুকু নম্রতা আছে সেটুকুকে আরও জোরালো করা দরকার।

…তাই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে…এই যা ঘটছে, প্রথম থেকেই তা অপরিহার্য ছিল। তার স্বীকার করতে এ-ঘরে এসেছি বটে, কিন্তু এই যে নীচু হয়ে তার স্বীকার করছি এতেই আমি গর্বিত হয়েছি।

নিষ্ফল ক্রোধে হাত দু'টোকে নিষ্পেষিত করছে, বাহুতেই দেখা যাচ্ছে স্ক্যাপুলারটা নড়ছে তাই।

অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তাই মনস্থ করতে পারি আমি মাই মাদার—যদি…যদি মাদার হাউস জানেন এবং অনুমোদন করেন।

…অন্তরের মানুষটা বলে উঠল এ যে ঈশ্বরের সঙ্গে দর-কষাকষি। তিনি যে পূর্ণতা চান এ তা নয়।

—সে তো তা'হলে শুধু ভগবানের জন্যে হবে না। সিস্টার লুক জানত সুপিরিয়র এই উত্তরই দেবেন।—সে হবে—আমরা যাকে বলি নম্রতা প্রকাশে পিছু টান থেকে যাওয়া, যে নম্রতায় আত্মত্যাগের প্রতিদান চাওয়া হয় কিছু। এখানে যেমন এই সান্ত্বনা থেকে যাচ্ছে যে মাদার হাউস জানেন।

সিস্টার লুকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সাহস তো সাক্ষী চায় মাই মাদার।

কথাটা বাবা বলতেন।

—তা বটে। কিন্তু তেমনি আবার বিশুদ্ধ নম্রতা আত্মা থেকে ঈশ্বরে প্রবেশ করে, আর কেউ তাকে দেখতে পায় না।

আর একটা প্রশ্ন কেবল বাকি তার।…এ তার সারা ধর্মজীবনের জিজ্ঞাসা—বহুবার বহু অবস্থায় যে প্রশ্ন করবে সে—এমনি নতজানু হয়ে।

—কি করে জানব এই তিনি চান আমার কাছে ?

—যাও, সে প্রশ্ন তাঁকেই কর।

আশীর্বচনের জন্য মাথা নত করল সিস্টার লুক।

যে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এই মুহূর্তটি পর্যন্ত কাটল সেটা যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সামনে অপেক্ষা করে আছে তার সূচনামাত্র।

দ্রুতপায়ে চ্যাপেলে এসে দু'হাতে ঢেকে ফেলল মুখখানা।

…আত্মত্যাগের প্রস্তাবটা বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করছে। এমন একজন করেছেন প্রস্তাবটা যাঁকে সহজেই ঈশ্বর-নির্বাচিত যন্ত্র বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।…কল্পনায় দেখছে ডাঃ গোভার্টস আর পরীক্ষা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন প্রশ্নগুলোর ভুল উত্তর দিচ্ছে পিতৃবন্ধু অবিশ্বাস মেশানো বিরক্তি নিয়ে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে।

…মাইক্রোসকোপে চোখ রেখে দেখছে।

…ড-টিউবের ওপর বাবার মুখখানা ভেসে উঠল স্পষ্ট। বিহ্বল বেদনাহত, তার অসাফল্যে লজ্জিত।

অস্ফুটকণ্ঠে বলল, হে ঈশ্বর, এই আট মাস ধরে পড়লাম—এতগুলো দিন তাহলে তো শুধু তোমার সময় নষ্ট হল।

মুখে বলছে বটে, কিন্তু তার শিক্ষা ভিতর থেকে বিপরীত কথা বলছে। বলছে, নম্রতার সাধনায় তাঁর সময় নষ্ট হয়ও যদি, তবু তিনি খুশি হবেন। এ সবই অবিসংবাদিত। যে সুযোগ আজ এসেছে তার কাছে, তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করছে বটে, কিন্তু এমন সুযোগ সে আর কোনদিন পাবে না। তাঁর অনন্ত সম্পদের মধ্যে প্রতিটি আত্মার জন্য একটিমাত্র ক্ষণ তিনি নির্দিষ্ট করে দেন—তাঁর চরণে আপনাকে উৎসর্গ করে দেবার ক্ষণ সেটি।

…এই ক্ষণটি আমার। এখন যদি মাদারের আদেশ গ্রহণ করি যদি—প্রভু তবে সামান্য একটু অনিশ্চয়তার সংকেত হয় তো তিনি প্রকাশ করবেন না।…অথবা হয় তো করুণাবশত অভিষিক্ত করে দেবেন আমায়।…এই হওয়ার পথে স্বীকৃতি দেবেন। আর যদি না করি গ্রহণ—

—এ ক্ষণটি পাবের না প্রভু।

নির্জনহীন এই চ্যাপেলে সুপিরিয়রের তার সামনে তুলে ধরেছে, ভীতিকর এক অন্ধকার—সে অন্ধকারে নিজের চারপাশে অহংকারের বাঁধনগুলো দেখতে পাচ্ছে সে এবার। একদিন ভাবত সব বন্ধন সে ছিঁড়ে ফেলেছে। দেখেছে যে লোহার বন্ধন রেশমী বাঁধন এ নয়, একেবারে মোটা কাছি। একটা-দু'টো নয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বুনো লতার মত। আর এদের মূল সেই ছেলেবেলায়। 'ডাক্তার পরিবার' সম্প্রদায়টায় এমন কিছু ছিল যা সমাজের সাধারণ স্তর থেকে পৃথক করে দিয়েছিল তাদের। সেই একটা কিছু দম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়—পারিবারিক অহংকার। সেই বহুবিস্তৃত অহংকারের মূল পর্যন্ত সন্ধান করে দেখছে এখনও তাদের ভিত কত দৃঢ়, কত ব্যাপক…তার বুদ্ধির দম্ভ, বিচার-বিবেচনার দম্ভ, যে কোন কাজে সফল হওয়ার, ভাল হওয়ার দম্ভ।

—হে ঈশ্বর, তোমার জন্য এ কি আমায় করতেই হবে! সত্যিই কি এই তোমার আদেশ!

…অশ্রুসিক্ত চোখে সিস্টার লুক অপেক্ষা করে আছে।…

চ্যাপেল ভরা নিবিড় স্তব্ধতা শুধু। ঈশ্বর কথা না বলুন, যদি চান তো ওরই বিবেকের মধ্যে দিয়ে উত্তর দেবেন। তখনই আবার এ কথাও মনে হ'ল, তখনও কিন্তু কখনই জানতে পারা যাবে না এ কি তোমারই কল্পনা, আচ্ছাদিত বাসনা না কি তাঁরই অনুপ্রেরণা।··· পবিত্র মহান আত্মারা কেবল নিঃসংশয় হতে পারেন।

···আমার উচিত হয় নি নান হবার চেষ্টা করা···আমার শক্তির তুলনায় এ পথ অত্যধিক বন্ধুর···

চোখের জলের সঙ্গে নান-জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার স্বাদ পাচ্ছে—ক্লিষ্ট আত্মার আকুল আহ্বান ঈশ্বরের অখণ্ড নীরবতায় নিমজ্জিত। বিবেক তাকে কিছুই বলছে না···ব্যাধিগ্রস্ত অংগের মত অসাড় হয়ে আছে।

হঠাৎ নবীশদের মিসট্রেসের কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল।··· ধর্মজীবনে একটি মাত্রই লক্ষ্য থাকবে তোমার, নিবেদনের একটি মাত্রই অর্থ, একটি মাত্র বাসনা—তা হ'ল ঈশ্বরকে খুশি করা। আর কিছুর কোন মূল্য নেই, কোন কিছুরই না। ফুল যেমন 'রূপে-বর্ণে-গন্ধে' বিকশিত হয়ে ওঠে শুধু দেবতার চরণে অঞ্জলি হতে, তাঁকে আনন্দ দিতে—ফুলের এই আদর্শই আমাদের জীবনেরও আদর্শ। রান্নাঘরে, স্কুলরুমে, হাসপাতালে যত কঠোর পরিশ্রমই কর—সে সবই তাঁর কাজ এও ঠিক; তবু ঈশ্বরের প্রকৃত আনন্দ নির্ভর করে তোমার অন্তরূপের ওপর। তাই বোধ হয় প্রকৃতির কোলে এত ফুল ফুটিয়েছেন তিনি, তাদের দেখে আমরা যাতে এই চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

রান্নাঘরে, ধোলাই খানায় কিংবা বাগানে যে নানরা কাজ করেন, দৈবাৎ অন্য কোন মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় তাঁদের—বাগানের লিলি তাঁরাই। যীশুর চরণে সমর্পিত জীবনে কোন মানোন্নয়নের প্রশ্ন তাঁদের নেই, তাঁদের যন্ত্রপাতি আর রাঁধবার বাসনপত্র সে সুযোগও দেয় না। নিজেদের গুরুপরিশ্রম নিয়ে তাঁরা হাসি-তামাশা করেন, খুশি থাকেন সর্বদা। নানের আদর্শ বিবেক তাঁদেরই আছে। বিবেক-বুদ্ধি গড়ে ওঠার আগে শিশুর বিবেকের ওপর অন্য কিছু ছায়া ফেলে না যেমন, ওঁদের বিবেকও তেমনই।

চোখের জলে ভেজা হাতে জোরে চেপে আছে চোখ দু'টো—হাত আর চোখের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু থেকে তবু সেই ভৌতিকর আয়নাটার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারছে না। স্পষ্টত দেখছে এখন রক্তবর্ণ গোলাকার পদার্থগুলো ভেসে ভেসে যাচ্ছে। বিশালাকার দেখছে তাদের, মাইক্রোস্কোপে দেখে যেমন।···এটা পাখীর রক্ত, পরেরটা বাঁদরের···এবার মানুষের রক্ত আসছে—দেখছ তো প্রভু, কত তাড়াতাড়ি আমি ধরতে পারি কোন্‌টা কি! ওখানে তো ধরতেই হবে আমায় এসব—পোষা মুরগীর ছানা, গরু আর বাঁদরের রক্তে ট্রপিক্যাল অসুখগুলো খুঁজে বার করতে হবে। ওদের সংস্পর্শেই বেশী আসে দেশীয় মানুষগুলো আর তোমার যে সব পাদ্রীরা আর সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেটররা সেই পাণ্ডববর্জিত জংগলে নিঃসংগ পোস্টে থাকেন, তাঁরাও।···যে জ্ঞান কাজে লাগবে সেখানে তা নিয়ে গেলে তুমি খুশি হবে না?···হে প্রভু, কংগো যাবার আশা ছাড়তে আমায় বোল না।···

চারদিক ব্যেপে অন্তহীন নিস্তব্ধতা···দৈর্ঘ্যে প্রস্থে, গভীরতায় ভীতিপ্রদ। তার মধ্যে তার হৃৎপিণ্ডের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে যেন।

সারা চ্যাপেল নির্বাক, নিস্তব্ধ।

কিন্তু এই প্রথম সে পূর্ণ গভীরতায় অনুভব করতে পারছে প্রকৃত নম্রতা কাকে বলে এবং সে নম্রতার কতটুকু আছে তার নিজের। এই দীর্ঘ দু'বছর ধরে ছোটখাট অহংকারগুলোকে অবধি ধরে ধরে হনন করার পর এখন উপলব্ধি করছে এতদিনে ঐ অহংবোধের গভীর অরণ্যের প্রান্তভাগটুকু মাত্র সে স্পর্শ করতে পেরেছে—'আমি,' 'আমাকে' আর 'আমার'-এরই কত সহস্ররূপ ছড়িয়ে আছে সেখানে। সে যে নিজের মূল্য সম্বন্ধে এত বেশী সচেতন তা সে নিজেও জানত না।···এই মুহূর্তে নম্রতার যে প্রস্তাব এসেছে, যে নম্রতার কথা ঈশ্বর জানাবেন কেবল আর যার অর্থ চিকিৎসাজগতে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যাওয়া—তার দিকে তাকাতে গিয়ে সে বুঝেছে এত গভীরে চাপা নিজের মূল্যায়নের দম্ভ যে সে নিজেও দেখে নি।

—নম্রতা—নিজের মনেই সতৃষ্ণ মৃদুস্বরে একবার উচ্চারণ করে দেখল শব্দটা।

আইরিশ মেয়েরা একবার তাদের দেশীয় কবির একটা শ্লোক শিখিয়েছিল—

সহস্র স্বর্গীয় বৃদ্ধি বিকশিত পত্র-পুষ্প-ফলে,
তারা সব, কোমল নম্রতা-মূল হতে মাথা তোলে।

সে অনেকদিন আগে—মাদার হাউসে। এ জীবনে তখনও সে শিশুমাত্র ছিল। ভাবত নম্রতা মানে বুঝি অভিবাদন জানানো, নত হওয়া আর ক্ষমা-ভিক্ষা করে নেওয়া।

বহুক্ষণ পরে চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে এল সে।

শেষ সপ্তাহ দু'টো এমনই ভয়ংকরতায় কাটল, এতই চাপ পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর—সিস্টার লুকের পাণ্ডুর ভাবটা কেউ লক্ষ্য করল না।

দু'টো পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে সে—একটা নিজের নম্রতার, অন্যটা ট্রপিক্যাল মেডিসিনের, সেটা সহজতর।

প্রত্যহ ট্রলি থেকে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট অবধি সিস্টার পলিনের পাশাপাশি হেঁটে যায়, ছোট সিস্টার দু'জন ঠিক পিছনে থাকে। পার্শ্ববর্তিনী নীরব একেবারে, তার নার্ভের অবস্থা ভেবে এখন শুধুই করুণা হয় তার ওপরে। নিজের মানসিক যন্ত্রণার সংগে একবারও তাই ওকে সে জড়ায় নি।

ক্লাসে মন দিয়ে পড়াশুনা করে। আত্মজিজ্ঞাসার ফল কি হবে জানতও যদি, যদি জানত স্বেচ্ছায় ফেল করার শক্তি খুঁজে পাবে, তবু পড়াশুনা চালিয়ে যেত। নান হতে গিয়ে ঈশ্বরের সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা পেয়েছে। এখন এই শেষের দু'টো সপ্তাহে মনোযোগের ভাণ করে সময় নষ্ট সে করবে না। পড়তে এসেছে এখানে, পড়ার কাজ যতক্ষণ থাকবে সাধ্যমত নিপুণভাবে করতে হবে তা।

বিশাল কোর্সটা পুনরালোচনা করিয়ে দিতে গিয়ে ডাঃ গোভার্টস প্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।···কংগো গমনেচ্ছু মুখগুলোর ওপর দিয়ে

জ্বরের উত্তাপে ছলছলে চোখ দু'টো, দ্রুতবেগে ঘুরে আসে—এ পথ বেছে নিয়েছে বলে অন্তরে অন্তরে তিনি স্নেহ করেন তাদের, অথচ ভাব দেখান যেন নেহাৎ অবজ্ঞার পাত্র তারা। আলোচনার মাঝে মাঝে দম নিতে থাকেন যখন—কলমের খস্ খস্ আওয়াজ কানে আসে, তখনও এমন উত্তেজিত দেখায় তাঁকে, এমন আগ্রহ ফুটে থাকে রক্তবর্ণ দুই চোখে—যেন নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবেন তিনি ওদের মধ্যে···ওরা, যারা ওই মারাত্মক অথচ অত্যাশ্চর্য জগতটার ভার নিতে চলেছে, তাদের মধ্যে।

শেষের ক'দিন মাঝে মাঝেই তিনি ক্লাসের পর সিস্টার লুকের পাশাপাশি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছেন কেমন বললেন ক্লাসে। কোন ডাক্তার কোন ডাক্তার-কণ্যাকে যেমন প্রশ্ন করেন, তেমন করেই।

একদিন বললেন একদিন তার বাবাকে ফোন করেছিলেন সে কেমন করছে কোর্সটায় তাই জানাতে।···শুনে যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

পরে ভেবে দেখেছে এটুকুও প্রাপ্য ছিল। বাবাকে এ কথাও বলা দরকার ছিল যে সে বংশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেই চলছিল।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে রিসিভার ধরে মৃদু মৃদু হাসছেন আর মাথা নাড়ছেন বাবা পুরোনো বন্ধুর কথা শুনে, তোমার মেয়ে মন্দ করছে না খুব একটা—সত্যি কথা বলতে কি ভালই করছে বেশ।

বাবার জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখছে কি অসম্ভব ত্যাগস্বীকারের প্রস্তাব করা হয়েছে তার কাছে। মঠ-সীমানার বাইরে কোন মন এ আত্মত্যাগের যুক্তি কোনমতেই বুঝবে না। যুক্তিটা নিজের মনে কিন্তু সে বারবার আওড়াচ্ছে: আমি এখনও দাম্ভিক এবং তাতে করে আমি ঈশ্বরের বেদনা বাড়াচ্ছি শুধু। আমার লক্ষ্য ছিল ভাল নান হওয়া, সম্ভব হলে সবচেয়ে ভাল। পথ খুঁজছিলাম, এখন সেই পথের নির্দেশ এসেছে একটা···কেবল মৌখিক পরীক্ষায় আমাকে বলতে হবে, মনে হয় আফ্রিকার সেসি মাছিদের কালোর চেয়ে সাদা রঙের ওপর উড়ে এসে বসবার প্রবণতা বেশী···যদিও জানি হৃদয়বান ঔপনিবেশিকরা তাঁদের দেশীয় কর্মচারীদের যথাসম্ভব সাদা পোষাক যে পরান সে শুধু কালো চামড়ার ওপরই এই মাছিগুলোর এসে বসবার ঝোঁক বেশী বলে। স্লিপিং সিকনেস্ তাই ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বরং কম, কৃষ্ণকায়দের মধ্যে মারাত্মক।···ভুল বলাটা এমনি অপ্রমাণিত কিন্তু প্রায়শ দৃষ্ট বিষয় থেকে শুরু করে প্রামাণ্য তথ্য পর্যন্ত টানতে হবে। ইচ্ছাকৃত ভুলক্রমে বলতে হবে ইয়স এক ধরণের সিফিলিস, সংক্রামক রোগ এটা।···ভুল বলা, আর শক্ত কি, মশার বিষয় যা জানি সব উল্টো বলতে পারি। যে কোন পূর্ণবয়স্ক মশা ফল আর গাছের রস টেনে নিয়ে বাঁচে, স্ত্রীমশার কিন্তু রক্ত-খাদ্য চাই ডিমগুলো পরিণত হওয়ার জন্য—মানুষ বা স্তন্যপায়ীর রক্তই যে হতে হবে এমন নয়, পাখীর বা সরীসৃপের রক্ত হলেও চলে। আমি বলতে পারি পাখী বা সাপের দেহে মশা কখনও বীজ ছড়ায় না।

বলতে পারি প্রভু, স্লিপিং সিকনেসের প্রাথমিক অবস্থার সবচেয়ে বিশিষ্ট আর চোখেপড়া লক্ষণ লিমফ্যাটিক গ্ল্যান্ড-স্ফীতি নয়—যদিও প্রাথমিক পর্যায়ের এই গ্ল্যান্ড-স্ফীতির অনেক ফোটো আমি দেখেছি, একশোটারও বেশী—লক্ষণটা চিরতরে গাঁথা হয়ে গেছে মনে। প্রধান লক্ষণ কি তাহলে বলব আমি? সময় এলে তুমি বলে দিও প্রভু।

প্রচণ্ড বিক্ষোভে সমস্ত অন্তর আলোড়িত। মনটা বহুধা বিভক্ত হয়ে দুটো বিতর্ক দল হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। পরস্পরের যুক্তি খণ্ডন করে উভয়েই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। মনের মধ্যে এই অবিরাম দ্বন্দ্ব যে সহ্য করতে পারছে তার মূলে আছে কনভেন্টের শিক্ষা—নিজে সে তা উপলব্ধি করতে পারছে না এখন।

শেষের দিকে বেশীর ভাগই পড়ার সময় পড়া ছেড়ে চ্যাপেলে চলে যেত। সেখানে সেই একই আবহাওয়া—নিস্তব্ধ গম্ভীর। চ্যাপেলের আলোটাকে মনে হয় যেন ডাঃ গোভাটিসের রক্তাভ চোখ, ঐ আলোটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কানে শুধুই বাজে নিজের আর প্রোফেসরের কণ্ঠস্বর···যদিও এ দু'টোকেই এড়িয়ে সে কান পেতে থাকে তৃতীয় এক স্বর্গীয় কণ্ঠ শুনবে বলে। তার বদলে তার চোখের ওপরই ঐ আলোটা ক্রমেই আরও বড়, আরও লাল হয়ে ওঠে···প্রোফেসার প্রশ্ন করতে থাকেন···বোর্ড তোমার কাছে জানতে চান সিস্টার, কিসের কিসের মধ্য দিয়ে বীজাণু ছড়ায় আর অল্প কথায় বুঝিয়ে বল কি কি তার লক্ষণ। শিক্ষানবীশদের মিসট্রেস বলেছিলেন, এ এক অসাধারণভাবে যাপিত সাধারণ জীবন, এই আমাদের পথের মূলমন্ত্র। যতদিন না অভিজ্ঞতা তোমাদের এই মন্ত্র স্মরণ করিয়ে দেয় সর্বদা, আমরা প্রায়ই মনে করিয়ে দেব। ডাক্তার অধ্যাপকদের সম্বোধন করে পরীক্ষার্থিনী সিস্টার লুক তৎক্ষণাৎ বলতে শুরু করেছে, এ এক অসাধারণভাবে যাপিত সাধারণ জীবন···লাল চোখটা আরও বিস্ফারিত হয়ে যায়—চীৎকার করে ওঠেন প্রোফেসর, নানের জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাই নি আমি সিস্টার।

চামড়ার ওপর টিউমার সৃষ্টি করে—সেটা একটা ছোলার মত থেকে একটা মুরগীর ডিমের মত অবধি নানা আকারের হতে পারে।···এই উত্তরই আমি দিয়ে ফেলব প্রভু! তুমি যদি অন্য উত্তর না জুগিয়ে দাও।

সিস্টার পলিন একদিন বলল তাকে, এত ঘন ঘন চ্যাপেলে যাওয়া কি এখন বুদ্ধির কাজ! আমার তো মনে হয় এখন সব সময় পড়াশুনা নিয়ে থেকেই, ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশী সেবা করতে পারব আমরা। কেউ একজন আমাদের মধ্যে ফেল করে যদি মাদার হাউসের পক্ষে সেটা কতটা কলঙ্কের হবে ভেবে দেখেছ?

সিস্টার পলিনের উগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক লাগছে সিস্টার লুকের—প্রকৃত উদ্বেগের চিহ্ন তাতে।

শান্তস্বরে বলল, খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি সিস্টার, ওটা আমি ভগবানের হাতে দিয়ে রেখেছি।

—এ মনোভাব প্রশংসনীয় ঠিকই, কিন্তু তিনিও নিশ্চয় আশা করেন তিনি যেমন পরীক্ষার আটদিন সাহায্য করবেন আমাদের, আমরাও তেমনি অর্ধেক পথ এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করব তাঁকে। তাছাড়া আমাদের সংকল্প যাতে পূর্ণ হয় সেজন্য মাদার হাউসে আগামী কালের ম্যাস উৎসর্গ করা হবে। যে সাহায্য দরকার আমাদের চাওয়া হবে তা।

এই আটমাস সরে এসে মাদার হাউসের ধর্মসংগীত গায়িকা সিস্টারদের স্মৃতি ম্লান হয় নি, ভোলে নি কি পূর্ণ পবিত্রতার প্রত্যয়ের

ম্যাস উৎসর্গ করেন তাঁরা। হয় তো আজই রাত্রে রিক্রিয়েশনে রেভারেণ্ড মাদার ইমান্নুয়েল মনে করিয়ে দিচ্ছেন কাল থেকে তাঁদের চারজন সিস্টারের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

শুনে কোন শিল্পী নান কিংবা অফিসে কাজ করেন এমন কোন সিস্টার বলবেন হয় তো, এত অল্প সময়ের মধ্যে পোকা-মাকড়, মশা-মাছি সব কিছু সম্বন্ধে এত কিছু শিখে ফেলা···এ খুব কষ্টকর মাই মাদার।

···কাল তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে গাইবে আমাদের জন্য···আমার জন্য···

বই খুলে পড়তে শুরু করল। সেট্‌সি মাছিতে রক্ত-মেশা বীজাণুগুলো প্রকাশ পায় অন্ত্রে, মুখের নানা অংশে আর স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডগুলোয়—এই সব জায়গাগুলোতেই তারপর বহুগুণ বৃদ্ধি পায় তারা।···কোনদিকে যে পা বাড়াচ্ছে সিস্টার লুক তা নিজেই জানে না।

জানলও না পরীক্ষক বোর্ডের সামনে মৌখিক পরীক্ষায় তার পালা না এল যতক্ষণ। লম্বা টেবিলে আরও ছ'জন ডাক্তার নিয়ে ডাঃ গোভার্টস্ বসে, সে দরজায় এসে দাঁড়াতে একটু পক্ষপাতিত্বের চিহ্ন দেখানো দূরের কথা মনে হল না যে চেনেন তাকে। কিন্তু সে যখন তাদের সামনাসামনি এসে বসল, চকিতে একবার দেখলেন তাকে, সে দৃষ্টিতে নীরব সমর্থনের আভাস।

বললেন, আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মীরা প্রথম প্রশ্ন করুন। কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জের সুর বলতে চান যেন, দেখ বন্ধুরা এই মেয়েটির ভুল ধরতে পার কি না।

ম্যালেরিওলজিস্ট গলা ঝেড়ে ভাবগম্ভীর স্বরে প্রথম প্রশ্ন করলেন, সিস্টার লুকের মনে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করছেন যেন, ক্রমিক বা লেটেণ্ট ম্যালেরিয়ার থেকে পৃথক করে পার্নিসাস ম্যালেরিয়ার বিশেষ বিশেষ অসুস্থতার ধরণগুলোর সার-সংকলন চোট জানতে চান সিস্টারের কাছে—লক্ষণ দিয়ে যেমন ধরা যায় তেমন অন্ততপক্ষে চার রকমের নাম করতে হবে সেই সংগে।

স্ক্যাপুলারের নীচে রাখা হাতের আঙুলে পাঁচ রকম গুণল সিস্টার লুক···সেরিব্রাল, এ্যালজিড, পিত্তাধিক্যবশত রেমিটেণ্ট ফিবার, ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার আর ব্রংকোনিউমোনিক।

ডাক্তার বলে চলেছেন তখন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে খানিকটা সময় আপনি নিতে পারেন সিস্টার, আমরা এ নিয়ে কাজ করছি সেই ১৮৮০ সাল থেকে।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—মনে মনে শুধু এইটুকু বলে নেওয়ার মত সময় সে নিল। বলতে শুরু করল তারপর।

আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার আগেই সিস্টার লুক জেনেছিল সে পাশ করেছে। পরীক্ষার শেষ দিকে ডাঃ গোভার্টস্ সিস্টার চারজনের সংগে এগিয়ে এসেছিলেন দরজার দিকে।

না ভেবে-চিন্তেই সিস্টার লুকের উদ্দেশ্যে বললেন হঠাৎ, বাবাকে আজ রাত্তিরে ফোন করে বলতে পার কনভেণ্টে তোমার জন্যে বড় এক ডিশ অয়েস্টার পাঠিয়ে দিতে।

তার হয়ে সিস্টার পলিন উত্তর দিল, মিঃ ডক্টর, কোন ব্যক্তিগত খবর দেবার জন্যে টেলিফোন করার অনুমতি নেই আমাদের।

প্রত্যুত্তরে টুপিটা শুধু একটু তুললেন ডাঃ গোভার্টস্, নিজের গাড়ির দিকে চলে গেলেন। চকিতদৃষ্টিতে তাঁর কৌতুক মেশানো ছিল, কিন্তু সে দৃষ্টি বলে দিয়ে গেল বাবাকে ফোন তিনিই করবেন।

অয়েস্টার কথাটার উল্লেখ যত বিভ্রান্তিকরই মনে হয়ে থাক নীরবতার নিয়ম কোন প্রশ্ন করতে দিল না সিস্টার পলিনকে। কিন্তু তার চোখের চাউনি বলে দিল তার হয়ে যে সব ডাক্তাররা সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেন নানদের সংগে এবং যে সব নান এ ধরণের ঘনিষ্ঠতায় প্রশ্রয় দেয় তাদের সম্বন্ধে কি ভাবছে সে।

সেদিন রাত্রে রিক্রিয়েশান মাদার মারসেলা সবার সামনে জানালেন চারজন সিস্টারই পাশ করেছে পরীক্ষায়। ওদের ডিপ্লোমাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়ে দিলেন। প্রত্যেক ডিপ্লোমাই কালোনিতে কাজ পাবার যোগ্যতায় গ্যারাণ্টি দিয়েছে। নিজেরটা পেয়ে অবাক লাগছে সিস্টার লুকের—এ কি সে নিজে অর্জন করে নিল না কি ঈশ্বর দিলেন?

মাদার সুপিরিয়র তাকে এক পাশে ডেকে বললেন, যে প্রস্তাব তোমায় দিয়েছিলাম সেজন্য আমার অনুতাপ করা উচিত কি না জানি না সিস্টার। যা বলেছিলাম তোমায়, মুহূর্তের অনুপ্রেরনায় বলেছিলাম, এইমাত্র জানি···তুমি তোমাদের ক্লাশের আশিজনের মধ্যে চতুর্থ হয়েছ।

—আমি জানি না মাই মাদার, প্রশ্নগুলোর উত্তর কে আমাকে যুগিয়ে দিল। একটু থেমে ডিপ্লোমাটার দিকে তাকাল একবার, যাই হোক এতো আমার নয়, মঠের। এর জোরে যা মাইনে পাওয়া সম্ভব তাও।

—ও হ্যাঁ, নিশ্চয়। মঠ লাভবান হবে বই কি সিস্টার লুক।

মুহূর্তের জন্য চুপ করলেন সুপিরিয়র।

সত্বরভাবে বললেন তারপর তোমার অসাফল্য কিন্তু ঈশ্বরের চরণে অপূর্ব এক অর্ঘ্য হত···এমন অর্ঘ্য নিবেদনের সুযোগ কদাচিৎ মেলে।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

A Government conscious of rectitude of intention, cannot be afraid of public scrutiny by means of the Press, since this instrument can be equally well employed as a weapon of defence, and a Government possessed of immense patronage is more especially secure, since the greater part of the learning and talent in the country being already enlisted in the service, its actions, if they have any shadow of Justice, are sure of being ably and successfully defended. —*Raja Rammohan Roy*

।। ধারাবাহিক উপন্যাস ।।

নীলনয়নী ! ! !

কুঞ্জবনের আড়াল থেকে অদূরে তাকিয়ে মোহনের মাথা থেকে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত যেন একটা আচমকা আতঙ্কের শীতল শিহরণ খেলে গেল। কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব, অবর্ণনীয় অশরীরী ভয়। সেই ভয়ের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিশেছিল এক বিমুগ্ধ বিস্ময়। যাকে দেখবার একান্ত কামনা নিয়ে সে এসেছে এই গা ছম্ ছম্ করা ছায়াচ্ছন্ন নিরালায়, কিন্তু দেখতে পাবে বলে আশা করে নি, চোখের সামনে অদূরে এসে দীঘির পাড়ের সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়েছে সেই বিদেহিনী নীলনয়নী! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না মোহন, ভাবল এ হয় তো তার চোখের ভুল, কল্পনা-মাতাল মনের ভ্রান্তিমাত্র। কিন্তু না, এ তার চোখের ভুল নয়, দীঘির জলে সাঁতার কাটা সমাপ্ত করে উঠে এসে তীরে দাঁড়িয়েছে মুক্তবেণী নিরাবরণা নীলনয়নী।

এত কাছে—কুঞ্জের আড়াল ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই তার সামনে পৌঁছনো যায়—কিন্তু তবু তাদের দু'জনের মাঝখানে কি অসীম দূরত্ব। এদিকে মোহন, ওদিকে নীলনয়নী, মাঝখানে মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকা। কিম্বদন্তীতে নীলনয়নীর মৃত্যুর কাহিনীটুকুই শুনেছে মোহন, জানতে পারে নি সেই মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু, না আকস্মিক দুর্ঘটনা। কিন্তু কই,—ভাবল মোহন—মৃত্যু তো নীলনয়নীর মুখমণ্ডলে বা সারা দেহের কোথাও এতটুকু বীভৎসতার চিহ্ন এঁকে দেয় নি, আরো সুন্দর করে অতুলনীয় সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছে তাকে। এমন অপরূপ সুঠাম সুসমঞ্জস দেহ সৌন্দর্য, আর সেই একদেহে এত রূপ মানুষের কল্পনার বাইরে। তহমিনা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ম্লান গোধূলির ছায়ামেশানো রক্ত আলোয় তার নিরাবরণ রূপ অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। তবু মোহন ভাবল বিদেহিনী ছায়ামূর্তি এত সজীব, এত স্পষ্ট হয় কি করে?

ওদিক থেকে মোহন চোখ ফেরাতে ভয় পাচ্ছিল, পাছে চোখ ফিরিয়ে নিলে নীলনয়নী অদৃশ্য হয়ে যায়; আবার তাকিয়ে সে তাকে আর দেখতে না পায়। কিন্তু এ ভাবে আড়ালে লুকিয়ে কোনো নিরাবরণার দিকে চুরি করে তাকিয়ে দেখাও অত্যন্ত অশোভন, অন্যায়, কাপুরুষোচিত বলে মনে হচ্ছিল তার—হলোই বা সেই নিরাবরণা বিদেহিনী। আড়াল থেকে বেরিয়ে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো দীঘির পাড়ে তহমিনার দিকে। তহমিনা তখন বিপরীত দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার এদিকে ফিরতেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মোহনকে দেখে ভীষণ চমকে উঠল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে।

'কে তুমি? কি চাও এখানে?' চীৎকার করে বলে উঠল তহমিনা।

হঠাৎ ভুল ভেঙে গেল মোহনের। তহমিনার কণ্ঠস্বর এবং দেহ দু'টিই এখন এত স্পষ্ট লাগল যে কোনোটাই বিদেহিনীর বলে মনে হলো না। এতক্ষণ অহেতুক আতঙ্কে অভিভূত হয়ে কি ভুলই সে করেছিল! লজ্জায়, ধিক্কারে ভরে উঠল মোহনের মন আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল আগামী কুস্তি প্রতিযোগিতার কথা, যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে, সারা বাংলার সেরা মল্ল অর্থাৎ 'রুস্তম-এ-বঙ্গাল' প্রমাণিত করবে নিজেকে।

'আমি মোহন।' বলল মোহন। 'রুস্তম-এ-বঙ্গাল।'

'রুস্তম ? ? ?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল তহমিনা। তার মনে পড়ল সোহরাব-রুস্তমের কাহিনী, যাতে মহাবীর রুস্তমের পত্নী তহমিনা হয়েছিল রুস্তম-পুত্র বীর বালক সোহরাবের জননী।

মোহন বলল, 'হ্যাঁ, রুস্তম-এ-বঙ্গাল। আর তুমি ?'

'আমি তহমিনা।' বলল তহমিনা।

কিন্তু সোহরাব রুস্তমের কাহিনী জানা ছিল না মোহনের। সে বলল, 'আমাকে মাফ করো। আমি ভুল করে তোমাকে নীলনয়নী ভেবেছিলাম।' বলে ঘাসের ওপর থেকে তহমিনার দেহাবরণটি তুলে নিয়ে তহমিনার দিকে ছুড়ে দিল।

তহমিনা লক্ষ্য করল মোহনের দৃষ্টি আর তার নিরাবরণ দেহের দিকে নেই।

মোহন বলল, 'আমি তোমাকে নীলনয়নী বলে ভুল করেছিলাম।'

তহমিনা—তখন আর নিরাবরণা নয়—সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাকাল মোহনের দিকে। এমন আশ্চর্য পুরুষ আর কখনো তার চোখে পড়ে নি। যেমন স্নিগ্ধ সুন্দর, তেমনি বীর্যদীপ্ত চেহারা মোহনের। পুরুষের লোলুপদৃষ্টি প্রচুর দেখেছে তহমিনা কিন্তু মোহনের চোখের দৃষ্টি একেবারে আলাদা জাতের।

তহমিনা বলল: 'আমি নীলনয়নী। চেয়ে দেখ আমার দু' চোখের দিকে।'

'কাছে এসো।' বলল মোহন। আদেশ আর মিনতির অপরূপ সংমিশ্রণ সেই কণ্ঠস্বরে। দৃঢ়পায়ে নির্ভয় বিশ্বাসে এগিয়ে গিয়ে মোহনের দু'টি চোখের পানে তাকাল তহমিনা। মোহন বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে দেখল তহমিনার আশ্চর্য সুন্দর মুখে দু'টি আশ্চর্য সুন্দর চোখ, আর সেই দু'টি চোখে আশ্চর্য নীল দু'টি চোখের তারা।

এত কাছে তহমিনা, কিন্তু তবু যেন তাকে কেমন রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল। সে স্বপ্ন না বাস্তব, দেহধারিণী না বিদেহিনী, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যই মোহন কিছু ভয়ে আর কিছু সংকোচে দু' হাতে তহমিনার দু'টি বাহু স্পর্শ করল। না, এ অলীক মায়া নয়, সত্যিই রক্তমাংসের দেহ। আর সেই আশ্চর্য স্পর্শে, অপূর্ব শিহরণ সারা দেহে অনুভব করল তহমিনা। পুরুষের স্পর্শ তার জীবনে এই প্রথম নয়, কিন্তু তার মনে হলো পুরুষের মতো পুরুষের অমৃত পরশ সে জীবনে এই প্রথম পেলো, এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকমধুর অভিজ্ঞতা।

কাহিনীর এইখানে নিমাই মিত্তির বললেন, 'তহমিনা-মোহন কাহিনী এবপর সংক্ষেপে সেরে ফেলব ধনঞ্জয়বাবু। কারণ বাতাসী বিবি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে।'

'এতক্ষণ তা হলে অনেক অবান্তর কথা শোনালেন ?'

'কিছু অবান্তর নয়। এসব হলো, কবিগুরুর ভাষায়, দীপ জ্বালাবার আগে সল্‌তে পাকানো।' বললেন ভুক্তপূর্ব আর্টিস্ট নিমাই মিত্তির। 'বাতাসী বিবির কাহিনী বুঝবার জন্য এ সব কিছু আপনার শোনা দরকার ছিল। অনাবশ্যক ভণিতা যে কিছুই করি নি তা যথাকালে বুঝবেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বাদশা পালোয়ানের জীবনের কলঙ্ক-কাহিনীর নায়িকা কি করে হলো রূপসী তহমিনা, সে কথাটা তো পরিষ্কার হলো না মিত্তির মশাই। আপনি তো তহমিনার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলেন বাদশা পালোয়ানের ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী বহিরাগত তরুণ মল্ল মোহনকে।'

নিমাই মিত্তির হেসে বললেন, 'আমি ভেড়ালাম না, ভেড়ালেন স্বয়ং বিধাতা, সিরাজ আমাদের মাধ্যমে। ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে যদি বলি সিরাজই অপরূপা লাস্যময়ী বিনোদিনী উর্বশী তহমিনাকে ভিড়িয়ে দিয়েছিল মোহনের সঙ্গে। মোহনের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলও বলতে পারেন। সিরাজের কথায় তহমিনা বুঝতে পারল তহমিনাকে সে বাগানবাড়িতে নিয়ে এসেছে তার নিজের কামনা মেটাবার জন্য নয়, তার পেয়ারের দোস্ত, নারীসঙ্গ বঞ্চিত নওজওয়ান মোহনকে একাদিক্রমে কিছুদিন আর কিছুরাত অকুণ্ঠভাবে অন্তরঙ্গতম সাহচর্য দিতে। প্রিয় বন্ধুর কামনাতৃপ্তির পুরস্কার হিসেবে সুন্দরীকে অকৃপণ হাতে প্রচুর অর্থ আর উপহার দেবে সিরাজ। সিরাজের দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রলোভন অগ্নির আকর্ষণ এড়াতে পারবে না মোহন-পতঙ্গ, নিঃসন্দেহে ঝাঁপিয়ে পড়বে আত্মহারা হয়ে, পুড়িয়ে ফেলবে পাখা। ওদিকে যখন আগামী কুস্তি প্রতিযোগিতার জন্য পূর্ণ সংযমে একাগ্রভাবে শক্তি-সাধনা করে তৈরি হতে থাকবে বাদশা পালোয়ান, এদিকে তখন এই বিজন বাগানবাড়ির একান্ত নিরালায় দিনের পর দিন অসংযমের সাধনায় মেতে শক্তি চর্চা ভুলে থাকবে মোহন, রাতের পর রাত এই বিমোহিনীর বাহুবন্ধনে অন্তরঙ্গতম দেহবিলাসে শক্তিক্ষয়ের সাধনা করবে; ফলে অসংযমের জোয়ারে ভেসে গিয়ে শেষকালে এতো শক্তি হারিয়ে ফেলবে যে বাদশা পালোয়ানের সযত্ন অর্জিত সযত্ন সঞ্চিত পূর্ণশক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব হবে না তার পক্ষে এবং তার ফলে হবে কি,

যে বিজয়মাল্য নিশ্চিত ছিল মোহনের গলায় উঠবে বলে, তা উঠবে বাদশা পালোয়ানের গলায়। সব কিছু নির্ভর করছে তহমিনার সাফল্যের ওপর। তহমিনার অসাফল্য মানেই বাদশার নিশ্চিত পরাজয়, যে পরাজয় তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বেদনাময়। যে পরাজয়ে মর্মাহত হবেন বাদশার ওস্তাদ মল্লগুরু বসির পালোয়ান, আর তার দুলালী কন্যা নাসিম, যে বিজয়ী বাদশার বেগম হবার জন্য বরমাল্য হাতে নিয়ে দিন গুণছে। রূপ-যৌবন গরবিনীর সামনে যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল সিরাজ। সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল তহমিনা—দুরন্তযৌবনা, লাস্যময়ী, মোহময়ী, লজ্জাহীনা তহমিনা। কিন্তু—'

'কিন্তু কি, মিত্তির মশাই?'

'হেরে গেল তহমিনার রূপ-যৌবনের যাদু। ফাঁদে ধরা পড়ল না মোহন। এক নম্বর—শক্তি প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য অর্জনের প্রতিজ্ঞায় সে একাগ্র, কামনার বা প্রেমের চর্চায় সেই সাধনার পথ থেকে সে বিচ্যুত হতে রাজি নয়। আর দু' নম্বর—কিন্তু দু' নম্বর শুনে আপনার কি লাভ হবে, ধনপতিবাবু?'

'হবে। বলুন।'

'সেই যে আড়াল থেকে মোহন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে ফেলেছিল তহমিনার সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ, বলেছি তো আপনাকে। ঐ নিরাবরণ, স্বাভাবিক সৌন্দর্যে প্রকৃতিরই অংশ হয়ে গিয়েছিল তহমিনা, পুরুষ-চিত্তকে প্রলুব্ধ করবার জন্য সে নিজের দেহ অনাবৃত করে তুলে ধরে নি, তার ঐ রূপের সঙ্গে লাস্য মেশানো ছিল না। ছিল না কামনা-জাগানো ইঙ্গিত। ঐ আশ্চর্য রূপকে প্রকৃতির রূপের সঙ্গে মিলিয়ে বিস্মিত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিল রূপমুগ্ধ মোহন, তাই তহমিনার একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও সাময়িক কামনা মেটাবার উপকরণরূপে ব্যবহার করে অমর্যাদা করতে সে কিছুতেই রাজি হতে পারল না।'

'ভারি অদ্ভুত লাগছে।'

'অদ্ভুত! কিন্তু সত্য।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'দুনিয়ার অনেক সত্যই অবিশ্বাস্য, ধনপতিবাবু। কিন্তু আমাদের কাছে অবিশ্বাসেও সত্য কখনো মিথ্যে হয়ে যায় না।'

আমি একটু অধীর হয়েই বললাম, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হলো? কুস্তি প্রতিযোগিতায়—'

'হাজির হলো মোহন।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'সংক্ষেপে বললে সেই পরিস্থিতি, সেই আবহাওয়া, সেই নাটকীয়তা কিছুরই আভাস দিতে পারব না, কিন্তু আপনি বাতাসী বিবির জন্যে বড় বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, কাজেই এদিকে সংক্ষেপ করতেই হবে, বাতাসী বিবিকে বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। প্রতিযোগিতার মাঠে লোকে-লোকারণ্য। কুস্তি দেখতে অনেক মেয়েরাও এসেছিলেন, তাদের ভেতর ছিল বাদশা পালোয়ানের ভাবী বেগম নাসিম, ছিল মর্জিনা বিবি, আর ছিল তহমিনা। মল্লক্ষেত্রে নেমে লোকারণ্যের বেশীর ভাগ চোখের মুগ্ধদৃষ্টির লক্ষ্য হলো মোহন। আশ্চর্য সুগঠিত তার দীর্ঘ প্রশস্ত দেহ, আশ্চর্য সুন্দর তেজোদ্দীপ্ত তার চেহারা। পর পর কয়েকটি দুর্ধর্ষ প্রতিযোগী হেরে গেল মোহনের কাছে, যেমন হেরেছিল কয়েকজন বাদশা পালোয়ানের কাছে। কিন্তু শেষকালে বাদশার সঙ্গে যখন মোহনের লড়বার পালা, তখন মোহন লড়তে রাজি হলো না কিছুতেই। এতে বিস্মিত হলো অসংখ্য দর্শক, বিস্মিত হলেন এই বিরাট প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ধনকুবের চৌধুরীরা, এমন কি স্বয়ং বাদশা পালোয়ান পর্যন্ত, মোহনের কাছে পরাজয়ের আশংকায় যার মন ভরে উঠেছিল। কিন্তু বিস্মিত হলো না বটে, কিন্তু তার মন ব্যথায় ভরে উঠল। আর কেউ না জানলেও তহমিনা জানত শুধু তারই অনুরোধের মর্যাদা রাখবার জন্য অসাধারণ শক্তিমান মোহন বাদশার সঙ্গে লড়তে রাজি না হয়ে বাদশাকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল এবং নিশ্চিত বিজয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নিজের প্রাপ্য বিজয়মাল্য বাদশার গলায় তুলে দিল। মোহন সরে দাঁড়াবার ফলে বাকি মল্লদের মধ্যে বাদশার সমকক্ষ কেউ রইল না। বিজয়ী ঘোষিত হলো বাদশা পালোয়ান।'

'আশ্চর্য!' বললাম আমি। 'এত অর্থ, এত বড় খ্যাতি আর সম্মান। তার এত দিনের আশা, মোহন এ সমস্তই ত্যাগ করল ঐ এক রূপ-ব্যবসায়িনীর কথায়?'

নিমাই মিত্তির কবিগুরুর কবিতা থেকে আবৃত্তি করলেন:

'রমণীর মন

সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।'

তারপর বললেন, 'কে কাকে কখন কেন কি চোখে দেখে তা তো সব সময় ঠিক বোঝা যায় না ধনপতিবাবু। মোহন হয় তো তহমিনাকে ঠিক রূপ-ব্যবসায়িনী রূপে দেখেই নি। তা'হলে আরেকটু বলি শুনুন। নিজের জীবন-যৌবন-ধন-মান সব কিছু তার জীবনের পরম পুরুষ মোহনের পায়ে অঞ্জলি দিতে চেয়েছিল তহমিনা, সেধেছিল আর কেঁদেছিল তার পায়ে ধরে। কিন্তু মোহন পরম শ্রদ্ধায় তহমিনার সেই অঞ্জলি ফিরিয়ে দিয়েছিল। তখন একটি ভিক্ষা তহমিনা প্রার্থনা করেছিল মোহনের কাছে। জানি না সে ভিক্ষাকে আপনি নোংরা বা অশ্লীল বলবেন কি না।'

'কি সে ভিক্ষা?'

'সন্তান ভিক্ষা চেয়েছিল মোহনের কাছে।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'জীবনসঙ্গিনীর মর্যাদা মোহন তাকে দিতে পারবে না জেনেও তহমিনা প্রার্থনা করেছিল তার সন্তানের জননী হবার গৌরব। মোহনকে রুস্তম বলে জেনে তহমিনা বোধ করি চেয়েছিল নতুন সোহরাবের জননী হতে। কিন্তু যাকে পত্নীত্ব দিতে পারবে

া, তাকে তার সন্তানের মাতৃত্ব দিতে মোহন রাজি হয় নি। যখন তহমিনা গভীর দুঃখে বলেছিল, তুমি কি আমায় ঘৃণা করো? মোহন বলেছিল, না তহমিনা তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি। এমন কোনো অনুরোধ করো, যা আমি রাখতে পারি। আমি নিশ্চয় রাখব ন অনুরোধ। তখন এই ভিক্ষা চাইল তহমিনা।'

'কি ভিক্ষা?'

'দঙ্গলে নামবে মোহন, কিন্তু বাদশার সঙ্গে কিছুতেই লড়বে না। হঠাৎ মুখ কালো হয়ে গেল মোহনের। কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে বলল, কথা দিলাম। কথার মর্যাদা সে রেখেছিল তা তো বললাম আপনাকে।'

'কিন্তু এত বড় সম্মান থেকে যাতে বঞ্চিত হতে হলো, এমন অনুরোধ মোহনকে করল কেন তহমিনা?'

'কারণ, হয় তো তহমিনীর বিশ্বাস হয়েছিল বাদশাকে হারিয়ে বিজয়ী হলে মোহনের জীবন বিপন্ন হবে।'

'তারপর? বাদশা পালোয়ানের কলঙ্কটা কোথায় হলো?'

নিমাই মিস্ত্রির বললেন, 'কুস্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বীর বাদশা পালোয়ানের চারদিকে জয়জয়কার, বাদশা পালোয়ানও মনে মনে গর্বিত। এমন সময় একদিন চুপি চুপি মোহন এসে হাজির। বলল, চুপি চুপি আখড়ায় চলো, সে দিন কুস্তি লড়েছি' একটা তালিম নিয়ে যাবো তোমার কাছে। সেই বাদশা আখড়ায়। সেইখানে লড়ে মোহন নিঃসংশয়ে বাদশাকে বুঝিয়ে দিল বিজয়ীর গৌরব আসলে মোহনেরই প্রাপ্য ছিল, বাদশা যে গৌরব লাভ করেছে তার জন্য সে এক আওরতের কাছে ঋণী, যার অনুরোধে মোহন নিজের জয়লাভ নিশ্চিত জেনেও বাদশার সঙ্গে লড়তে রাজি হয় নি। কে সেই মেয়েটি, যার অনুরোধে এত বড় ত্যাগস্বীকার করেছে মোহন? মোহন তা বলতে রাজি হলো না।

বাদশা এই মিথ্যা সম্মানের বোঝা প্রকাশ্যে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু মোহনের একান্ত অনুরোধেই তা করে নি। সুতরাং তার বিজয়-গৌরব নিজের বাহুবলে অর্জিত নয়, এজন্যে সে এক আওরতের কাছে ঋণী, এই কলঙ্ক তার জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। বাদশা পালোয়ান জানল না, এই কলঙ্ক নাটিকার নায়িকা তহমিনা।'

আমি নিমাই মিস্ত্রির কাহিনীর খেই ধরিয়ে দিতে বললাম, 'এ তো গেল অনেকদিন আগেকার কথা। আপনি বলছিলেন এর অনেকদিন পরের কথা, যেদিন ভোরবেলা, রবিবার, মেটিয়াবুরুজে এই বাদশা পালোয়ানের কুস্তির আখড়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ কুস্তি লড়তে চলেছিলেন ছানুবাবুর আখড়ার পাঁচজন কুস্তিগীর, তাঁদের মধ্যে একজন আপনার পিতৃদেব 'পালোয়ান-আর্টিস্ট' নটবর মিস্ত্রি।'

একটু ভেবে নিমাই মিস্ত্রি বললেন, হাঁ, তাই বলছিলাম বটে। পাঁচজন কুস্তিগীর পৌঁছলেন বাদশা পালোয়ানের আখড়ায়। পেলেন আন্তরিক সম্বর্ধনা। তারপর শুরু হলো কুস্তি। ছানুবাবুর আখড়ার কুস্তিগীরেরা লড়তে লাগলেন বাদশা পালোয়ানের সাগরেদের সঙ্গে, পালাক্রমে। কুস্তির মাটির ওধারে বসে বাহবা দিতে দিতে দেখতে লাগলেন মল্লগুরু বাদশা পালোয়ান। আর নেপথ্যে লুকিয়ে দেখতে লাগল আশ্চর্য একজোড়া মেয়েলী চোখ। সে দুটি চোখের মালিক এক আশ্চর্য স্ত্রীলোক। তার নাম—'

'তার নাম???'

'বাতাসা বিবি।'

[ক্রমশ।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

বিংশস্তবক

রাস-বিলাস

১। কৃষ্ণ-বাণীর ভাবালুতায়, মদ না খেয়েও যেন মাতাল হয়ে উঠল রমণীরত্নদের সেই সভা।

কৃষ্ণ-মুখের সুধা-ধারায়, আগুন নিভে গেল যেন তার অন্তরের। বিপুল মধুরিমার উচ্ছ্বসনের মধ্যে, জয়ধ্বনি করে উঠল সেই সৌভাগ্যবতী সভা। কি তার তখনকার সেই লাবণ্য-বিথার রূপ! কোটি মদনের যেন নত হয়ে গেল বাণ।

সভাস্থ সমস্ত বিস্ময় যেন নয়ন হয়ে দেখতে লাগল···নয়নের বিস্ময়কে, নয়নের উৎসবকে।

২। তরঙ্গিত হয়ে উঠল কৃষ্ণেরও কৌতুক। মুহূর্তে মনস্থ করলেন···তিনি নাচবেন। তিনি নৃত্য করবেন 'হল্লীশক'-নৃত্য। কোনো অসাধারণ নট···কোনোদিন···আবিষ্কার করতে পারেন নি এই নৃত্য; একমাত্র শুভব্রত ভরতমুনিই অভিনায়িত করেছিলেন এই নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ মনস্থ করলেন,···তাল-বন্ধ-মণ্ডল-ভেদে তিনি স্বয়ং হল্লীশক-নৃত্যেই দান করবেন রাসলীলার রূপ। এই লাস্য-বিশেষের মধ্যে এতটুকুও স্থান নেই···লেশমাত্র আবিলতার। আহা, কি আনন্দেই না ভরে উঠবে প্রাণপ্রিয়া ব্রজগোপীদের মন! ঐ যে তাঁর চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে প্রণয়িনীদের সদয় সমাজ, রমণীয় রত্নখণ্ডের যশঃ-পতাকার মত যে সমাজ ঐ কাঁপছে, সেই সমাজের মনের মধ্যে আধান করে দিতে হবে এর আনন্দ।

৩। তাই বিশ্বের যিনি একমাত্র বিস্ময়, তিনি বলে উঠলেন,—

'হে আমার প্রেয়সী সমাজ, আশা করি আপনাদের আনন্দিত করতে পেরেছে আমার আশ্বাসবাণী। মণ্ডল রচনা করে এবার আমার চতুর্দিকে আপনারা দাঁড়ান। চেয়ে দেখুন, ঐ যমুনার পুলিন···কত দূর···আহা কতদূর···ছড়িয়ে পড়েছে ওর সৌন্দর্যের শুভ্রমায়া। এতটুকুও কোথাও নেই কাঠিন্য। যেন পড়ে রয়েছে ঘনসারের সার-ছড়ানো একখানি সমতল ক্ষেত্র। যেন যমুনা দেবীই প্রকাশ করে দিয়েছেন নিজের নিরঙ্কুশ কল্যাণময় হৃদয়।

এইখানে মণ্ডল রচনা করে যদি আপনারা দাঁড়ান, তাহলে যথাযথ বোধগম্য হবে এই পুলিনের অবস্থান, বুঝতে পারা যাবে, এখানে মানানসই বা মাপসই হবে কি না আপনাদের পরিমণ্ডল।'

৪। অচিরে উত্তর দিলেন ব্রজগোপীরা,—

'না না তা হয় না। মণ্ডল রচনা করে আমরা দাঁড়ালে আপনি আপনার ঐ নীলকমলজয়ী রূপের ছটা নিয়ে আমাদের কাছ থেকে অনেকদূরে চলে যাবেন। ও-কথা ভাবতেও ভয় হয়, হৃদয় কাঁপে। না না, দূরে চলে যাবার উৎসাহ আমাদের নেই; আর আমরা নতুন করে সইতে পারবো না দুঃখ।'

৫। পুনর্বার বললেন শ্রীকৃষ্ণ,—'আশা করি, আমার শিক্ষণ-কৌশল তোমরা দেখবে। পৃথিবীতে রসের খেলায় কে পারবে, আমার মত তোমাদের সকলের মাঝখানে থেকেও, ক্ষিপ্রভাবে বিভ্রান্ত প্রমাণ করতে, ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেককে অনুগুঞ্জন করতে, রঞ্জিত করতে করতে নিত্য নিকটে প্রকট হয়ে থাকতে প্রত্যেকের?'

কৃষ্ণের আলাপ শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন খণ্ডিত হয়ে গেল গোপীদের সন্দেহজাল। কি জানি কি তাঁরা দেখতে পেলেন কৃষ্ণনয়নের অদ্ভুত চাহনিতে, কি জানি কি তাঁরা আভাস পেলেন সেই চাহনির ঝলকিত রহস্যে,···তাঁরা তুষ্ট হয়ে উঠলেন···অতিমাত্রায় তাঁদেরও যেন পেয়ে বসল অদ্ভুত—কিছু একটা দেখবার অদম্য কৌতুক।

তাঁরা স্থির করলেন···মণ্ডল রচনা করবেন এবং তাই ইনি-ওঁর উনি-তাঁর হাত ধরাধরি করে, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন যমুনার পুলিনে, বন্ধানুবন্ধক্রমে, লীলায়িত তনুলতায়···জ্যোৎস্না-সমুদ্রের ভাঙা ভাঙা ঢেউগুলির মত আনন্দে!

৬। অনিন্দ্যসুন্দর···ঐ ধীর ধীর বলয়াকারে মণ্ডলগুলির ছড়িয়ে-পড়াটি। এর এক-একটি নানা-বিস্তার···হৃদয়ে নিয়ে যায় এক-একটি ভাবের রাজত্বে, নয়নকে পৌঁছিয়ে দেয় এক-একটি ছবির রাজত্বে, আনন্দকে নিয়ে যায় এক একটি ব্যঞ্জনার রাজত্বে।

প্রথম যখন চমকে উঠল সেই মণ্ডল তখন মনে হল, কৃষ্ণ-মনোরথ-মহীরুহের যেন প্রোথিত রয়েছে মহামূল, আর মরি মরি একখানি সোনার আলবাল যেন তার চতুর্দিক ঘিরে প্রতিরোধ করছে প্রণয়-সুধাসলিলের নিঃসরণ।

তারপরেই মণ্ডলের লাস্যরূপ গেল বদলিয়ে। তখন মনে হল···মহামত্ত যেন এক কৃষ্ণ কলভ রয়েছে দাঁড়িয়ে, আর তাকে বন্দী করবার অভিপ্রায়ে যেন কোনো বিলাসরস-সম্রাট বলয়ের মত গোল করে নিক্ষেপ করছেন তাঁর সোনার ফাঁস।

তার পরের বিস্তারেই চেহারা বদলিয়ে গেল মণ্ডলের ছবির। সেই ছবি যেন দেখিয়ে দিলে···কৃষ্ণ-মনোমীনটিকে ধরবার আগ্রহে যেন আকুল হয়ে কন্দর্প-ধীবর ছড়াচ্ছেন তাঁর বলয়াকৃতি কাঞ্চন-জাল, আর জালের মাথায় মাথায় সাজানো রয়েছে শুকনো লাউয়ের ভেলার বদলে কুচ-কোরকের অরুণবরণ ভেলা।

তার পরের বিস্তারেই মণ্ডলটি যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল···এক কৃষ্ণ-বন্দী জ্যোৎস্না-দুর্গের স্বপ্নে; তোরণে তোরণে যার বসানো রয়েছে সোনার মঙ্গলঘটের মত ব্রজগোপীদের চন্দ্রানন, শিখরে শিখরে যার অসংখ্য তিমির-পতাকার মত কাঁপছে গোপীদের মুক্তবেণীর চঞ্চল দণ্ড।

যতই ছড়িয়ে পড়ল ততই বাড়ল যেন মণ্ডলের চিত্ররূপ।

একবার মনে হল, ও বুঝি বিলাসময়ী পৃথিবীর সৌখীন সোনায়-বাঁধানো কানবালা; আবার মনে হল, না না, ও নিশ্চয় পুলিন-লক্ষ্মীর বুকের উপরকার চাঁপাফুলের গোড়ে···নিশ্বাসে কাঁপছে।

একবার মনে হল, ও বুঝি কৃষ্ণ-রত্নসানুর চতুর্দিকে কৈলাস পর্বতের কনকবলয়; আবার মনে হল, না না, ও বুঝি বা হবে পূর্ণজ্যোতিঃ কৃষ্ণ-কলানিধির মহাপরিধি।

নাচতে নাচতে আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ল ব্রজরমণীদের ঐ রত্নমণ্ডল। ঐ গুলের ভ্রমণ দেখতে দেখতে মনোরম ভ্রমও যে দেখতে থাকবে কবির নয়ন, তাতে আর আশ্চর্য কি !

তিনি যেন দেখলেন,—জাগতিক সমস্ত রতিরসের কুলালচক্র ঘুরছে, আর তার কেন্দ্রে যেন সৃষ্টি হয়ে চলেছে শিল্পসার এক অপূর্ব নটন-ঘট।

তিনি যেন দেখলেন,—এক মূর্তিমান চিত্রকাব্যের বিরচন,···যার পাতায় পাতায় ঝরছে সুখ, যার এক-পদে অনুলোম ও অন্য-পদে প্রতিলোমের লীলা, যার একাক্ষর রয়েছে চরণ এবং যার নটন-ভাষায় ফুটে উঠেছে অদ্ভুত লালিত্য।

তিনি যেন দেখলেন,—এক শব্দালঙ্কারের নাচ, যেখানে বিরাজ করছে সদাশ্লেষ, যেখানে নিত্য চলেছে ছেকবৃত্তির অনুপ্রাস এবং যেখানে ঝকমক করছে পুনরুক্তবৎ 'আভাস'-নামক অলঙ্কার ! এক দোলে তো তিন খোলে।

তিনি যেন দেখলেন,—একটি নয়নের স্বপ্ন···তারকাটি যার কৃষ্ণ।

তিনি যেন দেখলেন,—দুলছেন ছন্দ,···সমভাব ও বিষম-ভাবের রমণীয় ভাবালুতায় আর্দ্র হয়ে।

তিনি যেন দেখলেন,—যমুনা পুলিনের কর্পূরশুভ্র বালুকায় চমকাচ্ছে এক বলয়াকার রমণীমণ্ডল, হঠাৎ ফুটে-ওঠা অভ্র কাঞ্চন কল্পলতার একটি স্বপ্ন···যাদের শাখায় ডগায় ডগায় দর্শনীয় হয়ে উঠেছে আলিঙ্গনের বৈশিষ্ট্য, যাদের পাতার মাথায় মাথায় লোভনীয় হয়ে উঠেছে স্বেদসম শিশিরের শোভা।

৭। ইত্যবসরে কখন যে দেবী যোগমায়া সেখানে এসেছেন, কখন যে তিনি তৎকালোচিত কঙ্কণ-গুণ্ঠনে সাজিয়ে দিয়েছেন ব্রজ-গোপীদের কারোর চোখে পড়ল না তা। কৃষ্ণের কেবল ভরে উঠল মন, কেবল তাঁরি অতি মনোহর লাগল সেই অলঙ্করণ। আর বলিহারি যাই কৃষ্ণের হৃদয়ানুরঞ্জনের বহরখানি ও দেবীটির।···তাঁর কৃপায়, বিপুল হর্ষের মধ্য দিয়ে প্রথমেই সেই রমণীসমাজ দেখতে পেলেন, মণ্ডল আলো করে কৃষ্ণের সঙ্গেই মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করছেন···যেন চিত্রীভূত···তাঁদের বৃষভানুনন্দিনী, যিনি অসামান্যা, যিনি সর্বমান্যা, যিনি ব্রজরমণীগণের মুকুটমণি।

৮। তারপরে সেই মণ্ডলীর ভাবনা হল, বেশী ছড়িয়ে পড়ছেন না তো তাঁরা ? যদি সে পালায়, যদি সে পালায় ! অতএব, গায়ে গায়ে সেঁটে দাঁড়াতে লাগলেন তাঁরা,···গাঢ়বন্ধ দিয়ে কবিতার শিথিলবন্ধ দোষটাকে দূর করে দেন যেমন করে কবি।

ইনি ওঁর কাঁধে, উনি এঁর কাঁধে, বাহুমূল বিন্যস্ত করে মণ্ডলে মণ্ডলে দাঁড়ালেন আভীরিণীরা।

৯। মাঝখানটিতে দাঁড়িয়েছিলেন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। হঠাৎ তাঁর চরণে জাগল সরসতার গতিমান এক আবেগ ! তিনিও প্রবেশ

করলেন, আর শিথিল হয়ে খুলে খুলে যেতে লাগল দু'টি দু'টি রমণীর প্রত্যেকের অংশতট। পুরঃপশ্চাদ্ভাবে তিনি প্রবেশ করলেন তাঁদের মধ্যে। দু'টি দু'টি করে গোপীদের মাঝখান দিয়ে ভুজবন্ধনে তাঁদের কণ্ঠ জড়িয়ে, বিভ্রান্ত-তাণ্ডবে শৃঙ্গাররসের সমস্ত হাবভাব বিকশিত করতে করতে; অলাত-চক্রের মত ভ্রমণ করতে লাগলেন তিনি। অদ্ভুত অত্যদ্ভুত সেই ভ্রমণ, সেই রাসতাণ্ডব যোগেশ্বরের। প্রতিলোম ও অনুলোম-ক্রমে যেন সৃষ্টি হয়ে যেতে লাগল একখানি চিত্রকাব্য, গোমূত্রিকা বন্ধপ্রায়। কলাবতীরা সকলেই মনে করতে লাগলেন···তাঁরই কাছে রয়েছেন কৃষ্ণ, তাঁকেই ঘিরে নাচছেন কৃষ্ণ, তিনি তাঁর, তিনি তাঁর,···এমনি স্পন্দমান হল রাসতাণ্ডবের ক্ষিপ্রতা।

একজনের দক্ষিণস্কন্ধে তাঁর দক্ষিণ ভুজ-বলয়, আর একজনের বামস্কন্ধে তাঁর বাম ভুজ-বলয়, একসঙ্গেই দু'টি কান্তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে যখন আলিঙ্গন করলেন কৃষ্ণ। তারপরে তাঁদেরি দু'জনের দেওয়া পথ ধরে, একজনকে পিছনে ছাড়তে ছাড়তে এবং আর একজনকে সামনে টানতে টানতে, আবার নিমেষে কৃষ্ণ তড়িৎ-নর্তনে এগিয়ে গেলেন আর দু'টি কান্তার যুগপৎ আলিঙ্গনের নিবিড়তায়। এমনি ধারায় ছুটে চলল সেই নৃত্য।

১০। প্রতিলোম ও অনুলোম ভ্রমণের কৃপায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে লাগল এই অদ্ভুত নৃত্য-কাব্যের গোমূত্রিকা-বন্ধ; পুরঃপশ্চাৎ সমালিঙ্গনের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে লাগল এই অদ্ভুত নৃত্যের লাঘব-কৌশল। ব্রজগোপীদের সঙ্গে জোড়ে জোড়ে এই নৃত্য করতে করতে কৃষ্ণ আবার যখন এই প্রণালীতে নৃত্যোন্মত্ত হয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যগতা প্রধানা সখীটির সঙ্গে, তখন যেন ঝরণা খুলে গেল উৎসবমুখের পরমকৌতুকের আনন্দের।

১১। প্রচণ্ড বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে, সুখাবলোকনের আশায়, জ্যোতিশ্চক্রের মত ঝুলতে ঝুলতে, অম্বরতলে ভিড় জমিয়ে ফেললেন সস্ত্রীক চারণেরা, কিন্নরেরা, সিদ্ধ-সাধ্য গন্ধর্বেরা, বিদ্যাধরেরা। বিমানে বিমানে যদিও ছেয়ে গেল আকাশপথ, তবু কোথায় যেন ভেসে গেল তাঁদের মান এবং তাঁদের মর্যাদাবোধ। লেখাজোখা নেই এত এসে দাঁড়ালেন রেখাশ্রেণীর মত দেবতারা।

১২। বাজতে আরম্ভ হয়ে গেল দেব-দুন্দুভি দিব্যবাদ্য। ললিত মুরজবন্ধ চিত্রকাব্যের ন্যায়, স্বচ্ছন্দ খর-বোলে বেজে উঠল মুরজ; বেজে উঠল নির্দোষ মৃদঙ্গ; আনন্দের বিকিকিনির যেন হাট খুলে বসল পণব। আলিঙ্গ্য-অঙ্ক-প্রভৃতি কত মৃদঙ্গে, কত আনকে, কত দুন্দুভিতে নাটকীয়ভাবে যে মুখরিত হয়ে উঠল সমুদ্রগম্ভীর আনন্দ ধ্বান তার ইয়ত্তা নেই। বাজল বাঁশী, বাজল বীণ, আকাশে আকাশে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ পক্ষধ্বনি বিহঙ্গের।

১৩। স-ভ্রমর ফুল ছুড়তে লাগলেন, না না, কাজলটানা চোখের জলের যেন আনন্দ-বৃষ্টি করতে লাগলেন···নন্দনবনের বনবিহারিণীরা। অঙ্গনাদের সঙ্গে নিয়ে সহর্ষে গান আরম্ভ করে দিলেন গন্ধর্বেরা; ললিতকণ্ঠে উঠল যশোদানন্দনের যশোগান।

ব্রজগোপীদের ও শ্রীহরির তখন পায়ে পায়ে হেসেছে,···হল্লীশ-নৃত্যের তাল-বিভঙ্গ, গতিভেদে ছন্দ। রুণ করে বাজছে মুখর নূপুর, কিন্‌কিন্ করে বাজছে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী। কি তাদের মধুরোল। এ রোলের বিকিরণ যেন শ্রবণের অমৃত,···নষ্ট করে দিতে চায় অমৃত-ভোজীদের রসনার রস।

দু'টি দু'টি করে সুদর্শনা কান্তা···আলিঙ্গন-ভ্রান্তা,···আর তাঁদের মাঝখান দিয়ে নৃত্যবেগে অনুপ্রবেশ করে চলেছেন নীলাঞ্জনবর্ণ ঘনশ্যাম। কি অশ্রান্ত-সুন্দর নৃত্য! কি অদ্ভুত-সুন্দর এই মণ্ডলীর মাল্যরূপ! আকাশ থেকে এ কি দেখছেন তাঁরা··· দেবতারা? এ মালা যে সব মালাকেই হার মানিয়ে দিলে!

এ কি জ্যোৎস্নায় আর তিমিরে গাঁথা মালা? এ কি দামিনী আর মেঘে বিনোট মালা? এ কোন চম্পক আর কুবলয়ের মালা? এ কোন কাঞ্চন আর ইন্দ্রমণির ফুলহার?

১৪। কখনও কখনও আবার গোমূত্রিকাবন্ধ পরিত্যক্ত হয়ে স্বচ্ছভূমিতেই আরম্ভ হয়ে গেল···শ্রীকৃষ্ণের চক্রাকার-নর্তনের আবর্তন। বেঁকে বেঁকে দুলতে লাগল বীরবৌলি···দু'কানে; বুকের উপর নাচতে লাগল মন্দারের মাল্য; কিন্‌কিন্ কন্‌কন্··বাজল কাঞ্চী, বাজল কঙ্কণ-কিঙ্কিণী; গা থেকে খসে পড়তে লাগল উত্তরীয় শ্রীকৃষ্ণের; চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ। আর সেই মেঘ-চক্রাকার সর্বব্যাপী আলোকতরঙ্গে মৃগনয়নারা সকলেই ভাসতে লাগলেন···নভস্থির যেন বিদ্যুতের দল।

এই নাচ নাচতে নাচতে যা ঘটল, তা অত্যাশ্চর্য এবং সম্পূর্ণ বিচিত্র।

কনক-মণি-কর্ণিকার মত কেন্দ্রস্থিতা শ্রীরাধিকাকে ঘিরে হ্রস্বাবর্তে নাচতে নাচতে, দীর্ঘাবর্তে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ পৌঁছে যেতে লাগলেন মণ্ডলস্থিতা প্রিয়াদের সান্নিধ্যে। অন্তর্মণ্ডল ও বহির্মণ্ডলে একসঙ্গে এই বিভ্রান্তি ঘটিয়ে বারবার পরিভ্রমণ করতে লাগলেন শ্রীহরি। সে কি অদ্ভুত সরস নাচ!··সুতোর বাঁধন খুলে কে যেন তাঁকে সবেগে ঘুরিয়ে দিয়ে চালিয়ে নিয়েছে···একজোড়া খেলনার চাকার মত পান্নার; আর সেই যুগ্ম লীলাচক্র বন্‌ বন্ করে ঘুরছে, সৃষ্টি করে পান্নার দু'টি মণ্ডল···যুগপৎ। [ক্রমশ।

১৮২৩, মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একটি ধনী বাঙালী বাবুর বাড়িতে একটি 'পার্টি'তে গিয়াছিলাম। বাড়ির বড় ছাতায় বেশ ভালো রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজী পোড়ান হইয়াছিল। বাড়ির ঘরে-ঘরে নাচওয়ালীরা নাচ-গান করিতেছিল··· উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল; কতকগুলি সুর বেশ মিষ্ট; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকী ও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য-জগতের কাটালানি বলা হইত।

—ফ্যানি পার্কসের রচনা হইতে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

ইন্দ্রনাথ যে ওকে একেবারে এভাবে কোমরে হাত বেড়িয়ে তুলে তার ঘরে নিয়ে আসবে, শিবানী তা ভাবতে পারে নি। ইন্দ্রনাথ আর কোনদিন এ রকম করে নি। ঘরের দরজায় ইন্দ্রনাথের ভেলভেটের চটির নিঃশব্দ শব্দ এসে থামতে শিবানীর অন্তরাত্মা তিক্ততায় বিষিয়ে উঠেছিল এই মনে করে, ইন্দ্রনাথের সেই অঙ্গবিন্যাসগুলি ফের আবার দেখতে হবে যেগুলি দেখতে দেখতে শিবানীর দু'চোখ পচে গেছে। সেই দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলা। সেই ঠোঁট বাঁকানো। সেই দু'চোখ তীক্ষ্ণ করে তুলে নির্নিমেষ লক্ষ্যে তাকিয়ে থাকা।

সেই দরজার মুখ জুড়ে সমান্তরাল রেখায় দাঁড়ানো। যেন পাশ কাটিয়েও শিবানীর পক্ষে ঘর থেকে বেরোনো সম্ভব না হয়। যেন বেরুতে হলে ইন্দ্রনাথকে দরজা ছেড়ে দিতে শিবানীকে বলতেই হয়। পেছনের অনুভূতিটা যেন ঘিন ঘিন করে উঠেছিল শিবানীর।

ইন্দ্রনাথ ওকে বাঁধতে চায়! কিন্তু হায়, যে কাজটা সব চাইতে সহজ, উল্টো পথে চলে সে কাজটাই কত কঠিন করে তুলছে ইন্দ্রনাথ!

'হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব'—

গান দিয়ে দরজা খুলবার বিদ্যে ইন্দ্রনাথের অজ্ঞাত। সে জানে হাতের ধাক্কাটার কথা। হৃদয়ের দরজা আর ঘরের দরজা খুলবার পদ্ধতি যে এক নয় ইন্দ্রনাথ তা জানে না!

কিন্তু আজ ঐ বিদ্যেটি কোথা থেকে এসে ইন্দ্রনাথের উপর ভর করল?

খাওয়ার টেবিলেই আজ ইন্দ্রনাথের হাত ধরা, কথা বলা শিবানীর হৃদয়ে বিয়ের রাতের সেই মনে যাওয়া মন্ত্রকে—সপ্তসুরে বাজিয়ে তুলেছিল—

ইন্দ্রনাথ কি প্রেমিক হয়ে উঠল আজ?

ইন্দ্রনাথ শিবানীকে মাটি থেকে অনেকটা উপরে তুলে নিয়েছিল। শিবানীর পা মেঝের উপর থেকে আধবিঘত আন্দাজ উপরে ঝুলছিল। আর শিবানীর ঠোঁট দু'টো গিয়ে ইন্দ্রনাথের ডান দিকের ঘাড় স্পর্শ করছিল।

না শিবানী চোখ বুজল না। এত সহজে আত্মসমর্পণ করবার মতো বিশ্বাস তার নেই ইন্দ্রনাথের উপর।

সে তাকিয়ে রইল।

ইন্দ্রনাথের ঘাড়ের ছাঁটা চুলের সবুজ আভা, ঘাড়ের উপর জমে ওঠা বড় বড় ফোঁটার ঘাম, গায়ের দামী সেন্টের মৃদু সৌরভ—ফের আর একবার বন্য হয়ে উঠবার তাগিদ তুলল শিবানীর ভেতরে। ইন্দ্রনাথের ঘাড়টা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার উপর দু'ঠোঁট চেপে ধরতে ইচ্ছে করল অদ্ভুত এক তৃষ্ণায়।

কিন্তু এবারও আত্মসমর্পণ করল না শিবানী।

এবারও চোখ বুজল না শিবানী।

কিছুই করল না সে।

ওর ভারেই হয়ত ইন্দ্রনাথের ঘাড়ের ফুলে ওঠা মোটা মোটা নীল শিরা দু'টোর দিকে তাকিয়ে রইল খোলা চোখে। যে বিষে সে ইন্দ্রনাথকে সকাল বেলা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই বিষের জ্বালারই ক্রিয়া এগুলি ইন্দ্রনাথের। প্রেমের ক্রিয়া নয়। ইন্দ্রনাথ প্রেমিক হতে জানে না। কোন পুরুষ জানে, তাও শিবানী বলতে পারে না।

বয়সের ক্ষুধা নিয়ে হাকপাঁক করে বেড়ায় তরুণরা আর দৃষ্টিক্ষুধা নিয়ে হাকপাঁক করে বেড়ায় বৃদ্ধরা। এরা কি প্রেমিক?

কেউ না।

কতগুলি বয়সের তাড়না। কতগুলি শরীরের ক্ষুধা। কতগুলি অভ্যাস ছাড়া এসব আর কিছু নয়। একটা রোম্যান্টিক মন দুর্লভ বস্তু। যদি কোন মেয়ের সেই চাওয়া থাকে তবে তাকে কাঁদতে হয়।

এ ঘর থেকে ও ঘরে ঢোকার মুখের দরজার ভারি পর্দাটা শিবানীর

মুখের উপর দিয়ে সরসর করে চলে গেল চুল নষ্ট করে দিয়ে। কপালের মাদ্রাজী ঝুরা-কুমকুমের টিপটা লেপ্টে দিয়ে।

শিবানীকে খাটের উপর ছেড়ে দিয়ে মাথার চুলটা পেছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে ইন্দ্রনাথ তার ভারি আর দ্রুত হয়ে আসা নিশ্বাস-প্রশ্বাসটা সহজ করে নিতে লাগল। শিবানী যতই হাল্কা হোক, কবুতর ওজন নয়। ইন্দ্রনাথের শরীর যতই মজবুত হোক একজনকে বয়ে আনার কিছুটা পরিশ্রম আছেই।

খোলামেলা ওর ঘর থেকে ইন্দ্রনাথের বন্ধঘরে এসে প্রথমটা সব অন্ধকার দেখল শিবানী। ইন্দ্রনাথের ঘর সব দিক বন্ধ—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। আলো না জ্বাললে কাচের জানালার ভারি পর্দাগুলি সরিয়ে না দিলে প্রায় রাতের অন্ধকার বিরাজ করে ঘরে। এয়ার কুলার মেশিনের লোভনীয় ঠাণ্ডাকেও শিবানী দূরে ঠেলে রেখেছে শুধুমাত্র ঘরের জানালা বন্ধ করে দিতে হবে বলে। বিছানায় শুয়ে যদি আকাশ দেখা না গেল, চাঁদ দেখা না গেল, ভোরের শুকতারা দেখা না গেল, তবে মরণ ভালো অবশ্যি শিবানী ভাবে না কিন্তু মন ভরে না তার, সে ঠিক শুয়ে শুয়ে চাঁদের আকাশ পরিক্রমা দেখে। এই এ জানালায় পুরো চাঁদই ঝকমক করছে, কিছুক্ষণবাদেই অন্য জানালায় সরে গেছে। তার কিছু বাদে আর এক জানালায়। যেন একেবারে চোখের ওপর চাঁদকে হেঁটে যেতে দেখে শিবানী। ওর মনে হয়'ও নিজেও ঘরে নেই। চাঁদের সঙ্গে ফুরফুরে বাতাসে মহাবিশ্বে হাঁটছে। এ যে কি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয় তখন মনের, শক্তি নেই ভাষায় প্রকাশ করে। শরীরের ঠাণ্ডা কি সত্যি ঠাণ্ডা করতে পারে কোন জ্বালাকে? মন ঠাণ্ডাই হলো সত্যিকারের ঠাণ্ডা। মনটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় শিবানীর। যে ব্যবস্থায় ঘরের জানালা রুদ্ধ করে দেয়, সে ব্যবস্থায় যত আরাম, যত বিলাসই থাক, তা শিবানীর জন্য নয়।

নশ্বাস-প্রশ্বাস যেটুকু দ্রুত হয়েছিল, তা শান্ত করে নিয়ে ইন্দ্রনাথ একবারে শিবানীর পায়ের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরজোড়া নরম কার্পেট, সেখানে শোয়াতে কিছু আসে যায় না—শিবানী নিজে সরে বসতে যাচ্ছিল কিন্তু সে সরে বসবার আগেই ইন্দ্রনাথ তার দু' পা দু' হাতে টেনে নিয়ে মুখের ওপর চেপে ধরল। অস্বস্তিতে চিড়বিড় করে উঠে পা টেনে নিতে চেষ্টা করল শিবানী। পারল না। ইন্দ্রনাথ চেপে ধরে রইল। সেই ভাবেই বসে থাকতে হল শিবানীকে। নিজেকে শান্ত করল শিবানী—কি আর হয়েছে। ধুলো মাটি থাকে বলেই পা—পা। তাকে হাতের মত মুখ চেপে ধরা যায় না। ওর পা এখন ওর হাতের তালুর চাইতেও পরিষ্কার। কাচ্চির হাতে ঘষা মাজা ধোয়া ইয়ার্ডলির লোশন মাখা।

ঘরে শুধু এয়ার কুলার মেশিনের অতি মৃদু একটা শোঁ শোঁ শব্দ উঠতে লাগল।

যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে থেকেই হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রনাথ তার খাটের গায়ের সুইচ টিপে বেড লাইটটা জ্বেলে দিল। মুহূর্তে যেন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। শিবানীর মনে হলো, ছাই রং-এর অন্ধকার অন্ধকার ঘরটার ভেতর যেন হঠাৎ সমুদ্রের একটা সবুজ রং-এর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে গেল। ঘরের বিছানা বালিশ গদী পর্দা সব কিছু সাদা ভেলভেটের। দীর্ঘ লম্বা ভেলভেটের পর্দাগুলি মোটা মোটা ভাঁজে সিনেমা থিয়েটারের হলের স্ক্রিনের মতো নিথর হয়ে পড়ে আছে বাতাস বন্ধ করে। এমন কি মেঝের কার্পেটটা পর্যন্ত সাদা। আর এই সাদা কার্পেট আর ভেলভেটের ওপর সবুজ আলোটা জ্বলে উঠে সমুদ্রের সুষমা ছড়িয়ে দিল যেন।

এবার বুঝল শিবানী হ্যাঁ, অনেকদিন বাদে সে এ ঘর দেখছে। এ বাড়ির ভেতর সব চাইতে কাছে কিন্তু সবটাই অপরিচিত ঘর তার এটা। ঘরের পর্দার রং বদল হয়েছে। কার্পেটের রং বদল হয়েছে। হলদে আর কমলা রং-এর বদলে সব সাদা হয়েছে। কবে হয়েছে শিবানী জানে না, দেখে নি। সমস্ত বাড়ির আলো-হাওয়া ফুল-ফল গাছপালার আবহাওয়া থেকে ইন্দ্রনাথের এই ঘরটা যেন বিচ্ছিন্ন—তার

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
কি তাজা, ঝরঝরে লাগছে !
লাইফবয় মেখে স্নানে সত্যিকারের স্নানের
আনন্দ। তাছাড়া, লাইফবয়ে ধুলোময়লার
রোগবীজানু পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে যায়।
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রতিদিন পরিবারের
সবাই লাইফবয় মেখে স্নান করুন।
L. 39-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আমলের এক প্রমোদকক্ষ। আর ও বসে রয়েছে উপভোগের জন্য দস্যুবৃত্তি করে নিয়ে আসা বন্দিনী।

ঘরের ঠাণ্ডাটা কি ইন্দ্রনাথ হিমাঙ্কে রেখেছে। দেয়ালে টাঙ্গানো ব্যারোমিটারে কত ডিগ্রি চলছে কে জানে। পা দু'টো ঠাণ্ডা হতে পারে নি। ইন্দ্রনাথের হাতের গরম, নিশ্বাসের গরমে গরম রয়েছে। কিন্তু হাত দু'টোর আঙুলের ডগাগুলি বরফের টুকরোর মতো লাগছে। শাড়ি, জামা, পেটি, পকেট যেন রেফ্রিজেটার থেকে বের করে পরেছে। একবার কাশল শিবানী। কাশির শব্দে এতক্ষণে যেন শব্দের কথা মনে পড়ল শিবানীর। ভাষার কথা মনে পড়ল, কথার কথা মনে পড়ল শিবানীর।

ওর পা ঢাকা ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার পা দু'টোকে এভাবে আর কতক্ষণ বেঁধে রাখবে। উঠে একটা দড়ি গামছা যা পাও, তাই নিয়ে এসো। তারপর তাই দিয়ে বেঁধে রাখো। আমি চেঁচাবো না।

পা দু'টো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দুই গালে চেপে রেখে ইন্দ্রনাথ শিবানীর দিকে তাকাল। বলল, চেঁচাবে না?

না।

কিন্তু হাত দু'টো তো বাঁধনি খুলে ফেলবে।

হাত দু'টোও বাঁধ।

সে ডবল গার্টুনি—এই বেশ।

আমার পা ধরে গেছে।

তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দাও, হাত দু'টো দাও।

ও, আমার হাত হোক, পা হোক তুমি তোমার খুঁটিতে বেঁধে রাখবে?

বাইরের দরজায় টোকা পড়ল। ইন্দ্রনাথ সাড়া দিতে আবদুল জানাল, মেমসাহেবের ফোন এসেছে।

ছোটো স্প্রীং এর মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। বলল, আমি যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে শিবানীও উঠে দাঁড়াল দীপ্তভঙ্গিতে। বলল, ফোন এসেছে আমার। তুমি যাবে কেন?

হ্যাঁ, আমিই যাবো। ইন্দ্রনাথের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠতে চাইল।

শিবানীর চোখ মুখও বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে উঠল। এই—এই ইন্দ্রনাথের আসল চেহারা। এইজন্যই নিজেকে টেনে রেখেছে শিবানী। আত্মসমর্পণ করে নি। কিন্তু আত্মসমর্পণ না করুক, প্রশ্রয়ে সে নরম হয়ে গিয়েছিল—সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যেন সেই রাগে আর আক্রোশেই চেঁচিয়ে উঠল শিবানী, তুমি যাবে কেন। আমার ফোন আমি যাবো। বদ্ধঘরের চার দেয়ালে তার গলার শব্দগুলি যেন বাড়ি খেলে। এতটা উত্তেজিত হবার আগে একবার ভাবলে না শিবানী যে, সে নিজেই সকাল থেকে ইন্দ্রনাথকে সন্দিগ্ধচিত্ত করে তুলেছে। মিথ্যে অভিনয়ে কেবল তার সন্দেহকে উসকে দিয়েছে। এখন যদি ইন্দ্রনাথ সন্দেহে জ্বলতে থাকে তবে দোষ তার নয়।

ইন্দ্রনাথ তাকিয়ে রইল শিবানীর দিকে। সে তাকানো নির্নিমেষই কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়। একটা বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে শিবানীর দিকে। শিবানী যাবার জন্য পা বাড়ালে নীরবে সরে দাঁড়াল।

আবারও একবার ইন্দ্রনাথ যেন ছুঁয়ে ফেলল শিবানীর মনকে।

যদি ইন্দ্রনাথ জুলুম করত তবে জোর করত শিবানী। নীরবে সরে দাঁড়িয়ে সে যেন শিবানীকে হারিয়ে দিল। অত জোরে চেঁচিয়ে, এমন দীপ্তভঙ্গিতে পা ফেলে গিয়ে ও কার ফোন ধরবে! শিবানী তো জানে, ল্যাবোরেটার ভেতর যাব বলেছিল সে দিদিকে। দেরি দেখে দিদিই ফোন করছে।

আবদুল জানে কতটা সময় অপেক্ষা করার পর উল্টোপক্ষ ফোন ছেড়ে দেয়। সে সে-সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পর ফোন তুলে কানে লাগিয়ে দেখল দরর দরর শব্দ হচ্ছে। অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে ফোন ছেড়ে দিয়েছে। মিনিট দশেক বাদে আবার ফোন বেজে উঠল। আবার দরজায় টোকা দিয়ে আবদুল জানাল, মেমসাহেবের ফোন এসেছে।

শিবানী যে ফোন ধরতে যাবে না—ইন্দ্রনাথ ভাবে নি। সে গিয়ে আরাম কেদারায় বসে সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে একবার করে সিগারেটে টান দিচ্ছিল আর মুখ উঁচু করে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে চলছিল। শিবানীকে না যেতে দেখেও কিছু বলল না। শিবানীও তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আবার এসে আবদুল ফোন এসেছে জানাতেই আপনা থেকেই শিবানীর দৃষ্টি গিয়ে ইন্দ্রনাথের মুখের উপর পড়ল। সে ভেবেছিল একটা বাঁকা হাসি দেখবে সে মুখে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের কোন ভাবান্তরই দেখল না। সে যেমন সিগারেটে একটা করে টান দিচ্ছিল আর অন্যমনস্কভাবে মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছেড়ে চলছিল, ঠিক তাই করে চলল। শিবানী বেরিয়ে এলো। ওর কানের, গলার, হাতের পান্নার গয়নাগুলি যেন রোদের আলোয় জ্বলে উঠল। বারান্দার পরে এসে অন্যমনস্কভাবে ফোন তুলে নিল শিবানী। বলল, হ্যালো···

কে শিবানী?

দিদি?

হাঁ, কোথায় ছিলি ফোন ধরে ধরে ছেড়ে দিলাম।

ও, তুমি ফোন করে ছিলে বুঝি?

হাঁ তো। দেরি করছিস কেন? চলে আয় না।

এই·····কাজে·······ওখানে·····

ও রকম আমতা আমতা করছিস কেন?

না, বলছিলাম কি···যোগ—

ব্যাপার কি রে?

না ব্যাপার-স্যাপার কিছু নয়। আমি বলছিলাম—রাগ করো না কিন্তু দিদি—আজকে থেকে যেতে গলার স্বরে শিবানী, দুপুরে আসতে পারছি নে—

সে কি রে!

একটু অসুবিধে হয়ে গেল হঠাৎ। আমি পরে তোমায় কারণটা বলব। রাগ করো না লক্ষ্মীদিদি।

থমথমে কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বলল, ইন্দ্রনাথ আসতে দিচ্ছে না বুঝি?

না···এই···

বুঝতে পারছি—কি একটা বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়েও ইন্দ্রাণী

সামলে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, তবে থাক। অশান্তি করে এসে দরকার নেই। তোর জন্মদিন। তোকে নিয়ে সে যদি আনন্দ করত, তবে তো খুশির কথাই ছিল—যাক গে। কালকে অফিস ফেরত একবার আসবি তো?

বাঃ, আসব না। খাওয়া ছাড়তে পারি, শাড়ি ছাড়তে পারব না। নিশ্চয় আসব। কাল অফিস ফেরত এসে তোমার দেওয়া শাড়ি পরে দু' বোনে ছবি দেখব—কেমন?

ক্ষুন্নমনা দিদি হেসে উঠল। বলল, ঠিক আছে। রাখছি?

আচ্ছা। তৈরি থেকো কিন্তু ছবি দেখতে যাবার জন্য।

থাকব।

এবার ললিতার কাছে ফোন করল শিবানী। ললিতা আছে? ও বাড়ি নেই? মার্কেটে গেছে। আচ্ছা, তুমি ওর ছোট বোন সুজাতা কথা বলছ তো? দেখেছ কেমন গলা চিনি আমি। আচ্ছা, শোন, তুমি ললিতাকে বলবে, আজ একটা বিশেষ দরকারে আটকা পড়ে যাওয়ায় সন্ধ্যায় আসতে পারছি নে। ও যেন কিছু মনে না করে।...ভীষণ খারাপ লাগছে তোমার? উঁহু, তোমার খারাপ লাগা নিয়ে আমি একটুও ভাবিত নই। তোমার সঙ্গে আমার কি কথা ছিল দুষ্টু মেয়ে? আমার সঙ্গে একদিন এসে সমস্ত দিন থাকবার কথা ছিল না? তাই তোমার সঙ্গে আমার রাগ। তোমার দিদির সঙ্গে আমার ভাব তো, তাই তার কথাই আমি ভাবছি—

ছোট মেয়ে বেচারা জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। হেসে উঠল শিবানী। বলল, এই তো হাসছি দেখছ তো? তাই খুব একটা ভীষণ রাগ তোমার উপর নেই। একদিন এসে আমার সঙ্গে কথামত থাকলেই ভাব হয়ে যাবে। দিদি নিয়ে আসে না? ও, তবে তো গোড়ায় ভুল। রাগ তো তবে দিদির ওপর। বেশ দিদিকে বলো, সেই রাগেই আজ আমি আসব না। যাঃ কি—হ্যাঁ গো—আচ্ছা দিদিকে বলো কেমন—হেসে ফোন নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল শিবানী। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল—

এবার?

এবার কি করবে সে?

কিসের জন্য যে সব নেমন্তন্ন ও না করে দিল তার কোন স্পষ্ট ধারণা শিবানীর নেই। শুধু এটুকুই সে বুঝতে পারছে, সকালবেলা ইন্দ্রনাথকে উচ্ছেদ করে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র যে উগ্র বাসনাটা তার মনে ছিল, সেটা এখন একেবারেই অনুপস্থিত। উৎসাহ যদি অনুপস্থিত হয়ে যায়, কর্তব্য বা প্রয়োজনের তাগিদও যদি না থাকে—তবে পা দু'টোকে চালনা বড় কঠিন। সে কিছুতেই চলতে চায় না।

তা চলাটা বাদ দেওয়া গেল। ঘরে এসে বসাও গেল—ঘরে এসে বসল শিবানী। কিন্তু তারপর? ইন্দ্রনাথের ঘরটা যে তাকে ভেতরে ভেতরে টানছে সেটা বুঝতে পারল শিবানী কিন্তু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সম্পর্কটা এমনই হয়ে গেছে যে, আর ইন্দ্রনাথ এসে ওকে যেভাবে তুলে তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে এসে তুলে নিয়ে গেলেই শিবানী ইন্দ্রনাথের ঘরে যেতে পারে। সেটা যেতে পারে না। নিজে নিজেই হেসে ফেলল শিবানী কথাটা মনে করে।

হাতে একপাঁজা ইস্তিরি করা শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল কাঞ্চি। শিবানীকে যেন সে দেখলই না। তৈরি হয়ে কেন ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে জিজ্ঞাসাও করল না। শিবানী বেরিয়ে গেলে যেমন খালিঘরে নিজের মনে কাজ করে, তেমনি হাতের শাড়ি-ব্লাউজ আলমারীতে ভরে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল। ছাড়া জামা-কাপড় তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিবানী বুঝল, কাঞ্চি এই আবহাওয়াটায় একটুকু নাড়া দিতে চায় না। যদি ভেঙ্গে যায়। যদি শিবানী ঝট করে উঠে বেরিয়ে পড়ে। কাঞ্চির গিন্নীপনায় হাসল শিবানী। একবার উঠল। একবার বসল। একবার ভাবলে কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলে। আবার তক্ষুণি ভাবলে, না—এক্ষুণি হয়ত ইন্দ্রনাথ উঠে এসে বিদ্রূপে ঠোঁট মুখ বাঁকিয়ে তুলে বলবে, কি বন্ধুদের বুঝি আর বিলম্ব সইছে না। লাঞ্চের নেমন্তন্ন—এগারোটা থেকেই ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে। ওকেও তক্ষুণি তো বেরিয়ে পড়তে হবে। শ্রাবণ আকাশটার মতই আজ ইন্দ্রনাথ অনিশ্চিতরূপ ধরেছে। বুঝতে পারছে না শিবানী ইন্দ্রনাথকে।

কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল ইন্দ্রনাথের কোন সাড়া শব্দই পেল না শিবানী। একটু বিস্মিতই হলো সে। সে হয়ত ভেবেছে ও বেরিয়ে গেছে। এটা আরো বিস্ময়ের কথা। শিবানীকে এত নিরুপদ্রবে বেরিয়ে যেতে দেবে সে—সত্যি আশ্চর্য! আজ ইন্দ্রনাথ কেবলি ওকে অবাক করছে।

কাঞ্চিটা এলে ওর সঙ্গে কথা বলে। শুনতে পেলে ইন্দ্রনাথ বুঝত ও বেরোয় নি। কিন্তু সেই যে কাঞ্চি গেছে আর আসছে না।

আব্দুল—ইন্দ্রনাথ ডাকল।

শিবানীর হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খেল ভেতরে।

আব্দুল—ইন্দ্রনাথ তার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ফের ডাকল আবদুলকে। শিবানীর ঘরটা অতিক্রম করতে গিয়ে জানালার উন্মুক্ত পর্দার ফাঁকে চোখ পড়াতে দেখল শিবানী বসে আছে—ড্রেসিং-টেবিলের সামনের টুলের ওপর। দুই চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল ইন্দ্রনাথের। শিবানীর ঘরে এসে প্রবেশ করল সে। বলল, তুমি বেরোও নি যে?

এ কথার জবাবে শিবানী কি বলতে পারে না আমি বেরুচ্ছি না? হাতের ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল শিবানী। বলল, সত্যি বড্ড দেরি হয়ে গেল—এইবার বেরুব।

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলল না। শিবানীর ঘর থেকে বেরিয়েই দেখল আবদুল দাঁড়িয়ে। তাকে বাড়িতে খাচ্ছে না জানিয়ে ফের গিয়ে তার ঘরে ঢুকল।

শিবানী খাবে না আগেই জানা ছিল। এবার ইন্দ্রনাথও জানিয়ে দিল সে খাবে না। তবে আর খাবে কে। দোকানের ঝাঁপ ফেলার মতো বাড়ির কর্মচাঞ্চল্য যেন ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। বাবুর্চি জিনিষপত্র কিছু রান্না করা, কিছু তৈরি করা, কিছু কাঁচা—সব এনে ফ্রিজে ঢোকালো।

এ কিন্তু এ বাড়ির নতুন ঘটনা নয়। প্রায়ই ওদের রান্না ফ্রিজে ঢোকাতে হয়।

ইন্দ্রনাথ খাবে না মানে, সে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কাঞ্চি এসে ঘরে ঢুকতেই শিবানী খেঁকিয়ে উঠল, তুই কি মরে গেছিস ?

কেন ?

তোর টিকিটিও যে দেখতে পাচ্ছি নে।

এই তো এসেছি। বল কি করতে হবে।

শান্ত ঠাণ্ডা কাঞ্চি। অবাক চোখে তাকাল শিবানী কাঞ্চির দিকে। আজ কি বাড়ির সবাই ওর বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই চালাচ্ছে! শিবানী বলল, তুই যেন একেবারে নেতিয়ে গেছিস।

কাঞ্চি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তবে তার এখনকার এ চুপ করে থাকা—ঠিক চুপ করে থাকা নয়। তার যা বলবার, তা সে বলবেই শিবানীর অলস সময়ে। এখন নয়।

কাঞ্চি বলল, কি করব বল ?

কিছুই শিবানীর বলার ছিল না কাঞ্চিকে। তাই ফের ধমকে উঠল, যা, চলে যা। কিচ্ছু দরকার নেই তোকে।

খোঁপাটা ঢিলে হয়ে গেছে। ফের বেঁধে দেব ?

আবার ধমকে উঠল শিবানী, যা বলছি।

কপালের টিপটা ঘষে গেছে। দিয়ে দেব ?

ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল শিবানী কাঞ্চির দিকে।

কাঞ্চি চলে গেল।

ফের ডাকল তাকে শিবানী। বলল, জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে যা।

সবগুলো ?

হ্যাঁ, সবগুলো।

জানালা বন্ধ করে কাঞ্চি চলে গেল।

এইবার যা করতে পারে শিবানী তা হলো কাপড়-জামা ছেড়ে শুয়ে পড়ে চোখ বোজা। কিন্তু ইন্দ্রনাথ চলে না যাওয়া পর্যন্ত বিছানায় গা দিতে পারে না শিবানী। দিলে ইন্দ্রনাথকে ডাকার মতো যেন হয়ে যায়। শিবানী বসে রইল ইন্দ্রনাথের বেরিয়ে যাবার অপেক্ষায়। কিন্তু তার বেরুবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মাঝের দরজার পর্দাটা শিবানীর ঘরের পাখার বাতাসে মাঝে মাঝে অল্প দুলে উঠছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না ঘরের। তা দেখা না যাক শোনা তো যাবে। আবদুলের যাওয়া আসার। সাহেবকে কোট, জুতা, মোজা পরতে সাহায্য করার। কই কিছুই তো সাড়া মিলছে না। ঘরটা যেন ঘুমিয়ে আছে।

একটা বাজে। বেয়ার-বাবুর্চি-আয়ার বিশ্রী অবস্থা। সাহেব, মেমসাহেব বেরিয়েও যাচ্ছেন না। খাচ্ছেনও না। ওরা খেতে পারছে না। যেতে পারছে না। গা ছেড়ে বসতে পারছে না।

নিশ্চয় ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেছে ইন্দ্রনাথ। উঠে গিয়ে পর্দা ফাঁক করল শিবানী। নাকে মুখে ঠাণ্ডা ঝলক এসে লাগল। দেখল, যা ভেবেছে ঠিক তাই। ইন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে সোনালী মদের টলটলে গেলাস। হাতে সিগারেট। ঠিক আগের মতই সিগারেট টানছে আর কত কি ভাবতে ভাবতে যেন ধোঁয়া ছাড়ছে।

পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে চলে আসছিল শিবানী, ইন্দ্রনাথের তক্ষুণি চোখ পড়ল তার উপর। গেলাস হাতেই উঠে এল সে। এসে দরজার পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। চোখ দু'টো একটু লাল। একটু ঘোর লাগা। হাতের ঘড়ি দেখে বলল, বেলা একটা। তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে তোমার বন্ধুরা মনের দুঃখে লাঞ্চে বসে গেছে শিবানী।

বোধ হয়।

তুমি খাবে কি ?

তোমার হোটেলের লাঞ্চটাইমও আর বেশীক্ষণ থাকছে মনে হয় না।

সে জন্য আমার তাড়া নেই।

কেন ? তুমি তো বাড়িতে খাচ্ছ না বললে।

আমি খাব না বলেছি হোটেলে লাঞ্চ খেতে যাবার জন্য নয়। আমি খাব না বলে।

ওগুলো খাবে ? চোখ দিয়ে হাতের গেলাসটা দেখাল শিবানী।

আদতে ব্যাপারটা তাই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ স্বীকার করল না। বলল, তা নয়। ক্ষিদে পেতে দেরি হবে মনে হচ্ছে, তাই এটা বলে ওদের খেয়ে নিতে বললাম। যদি ইচ্ছে করে, খাবো তখন। বোধ হয় সকালের খাওয়াটাই বেশী ভারি হয়ে গেছে।

বাজে কথা। ব্রেকফাষ্ট খাও নি, সে আমি দেখেছি।

হঠাৎ ভীষণভাবে হেসে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, আমি সকালে কিছু খাই নি তুমি দেখেছ! আর এ যে একেবারে স্ত্রীর মতো কথা হয়ে গেল। গেলাসের মদটা এক নিশ্বাসে গিলে গেলাসটা ছুড়ে দিল শিবানীর খাটের গদির উপর। তারপর একবার ডান হাতে আর একবার বাঁ হাতে পাঞ্জাবীর হাতা গোটাতে গোটাতে বলল, শীগগির তুলে নাও কথাটা—

দু'পা পিছোলো শিবানী। বলল, কথাটা তুললে তো আর সম্পর্কটা উঠবে না। সম্পর্ক তুলতে আদালতে যেতে হবে।

তা সম্পর্কটা পাতবার জন্য পুরুত ডাকা হয়েছিল, তুলবার জন্য না হয় উকিল ডাকা যাবে—কিন্তু কতজন ডাকবে ? শত উকিলের শত ওকালতির প্যাঁচেও কুলোবে না তোমাকে আমার কাছ থেকে নেওয়া—

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর।

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া

চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া—

কি যেন—কি যেন, মাথা চুলকাল ইন্দ্রনাথ—কোন কালে যেন কবিতাটা পড়েছিলাম—

আসল লাইনটাই ভুলে গেলে—

আসল লাইন ? কোন্‌টা ?

তুই যে আমার বন্দী অভাগী, বাঁধিয়াছি কারাগারে—

না, ওটা আসল লাইন নয়। আসল লাইন হলো—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,

চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া।

—বলতে বলতে এগিয়ে এসে শিবানীকে বুকের উপর টেনে নিল। এদিকে, ওদিকে, ডাইনে বাঁয়ে চোখে-মুখে উপর্যুপরি চুমু খেতে খেতে সকাল বেলার মত আবারও শিবানীকে আলগা করে তুলে তার ঘরে নিয়ে এলো ইন্দ্রনাথ।

শিবানীদি'…উচ্চস্বরে ডাক এলো বারান্দা থেকে।

—সবিতা! ইন্দ্রনাথকে ঠেলে সরিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে

চাইল শিবানী খাট থেকে। ললিতা ওর ঘরে আসবার আগেই চাইল নিজের ঘরে চলে আসতে—

ইন্দ্রনাথ দিল না।

কলেজী মেয়ের মতো পায়ের চটিতে চটপট চটপট শব্দ তুলতে তুলতে ললিতা এসে ঢুকল শিবানীর ঘরে। বলল,কি অন্ধকার রে বাবা। কোথায় তুমি শিবানীদি'? ঘরে? নীচে? ওপরে? না বাইরে? বলে হেসে উঠল। বেরিয়ে এসে ডাকল কাচ্চি।—বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আপন মনে বলল, আরে, গেল কোথায় সব!

ঝাড়ন কাঁধে ব্যস্ত পায় আবদুল এলো।

ললিতা বলল, মেমসাহেব বেরিয়ে গেছেন?

আবদুল জানাল, সে ঠিক বলতে পারছে না। তবে বোধ হয় এতক্ষণে বেরিয়েই গেছেন।

কাচ্চি কোথায়?

আবদুল এদিক-ওদিক তাকাল।

ললিতা মনে মনে মুখ ভেঙ্গাল। তুমি জান না। তুমি জান বুঝি কেবল তোমার সাহেবের সংবাদটি। আর তোমার সাহেব যখন বাড়ি নেই তুমিও এ মুলুকে নেই। মুখে বলল, আমি বসছি। তুমি একটু দেখ তো কাচ্চি কোথায়।

আচ্ছা—বলে যাওয়ার সময় আবদুল জানিয়ে গেল, সাহেব ঘরে আছেন।

সাহেব ঘরে আছেন! দাঁড়িয়ে পড়ল ললিতা। শিবানী সকালবেলা বলল যে ইন্দ্রনাথ তার ব্যবসার কাজে বাইরে গেছে! নিজেকে বিষম বিপদগ্রস্ত মনে হলো ললিতার। এখন কি করবে সে। ইন্দ্রনাথের সাথে তার অবশ্যই দেখা করে যেতে হয়। কিন্তু তার ঐ বদ্ধঘরে ঢোকবার কথা মনে হতেই বুকটা দুরদুর করে উঠল ললিতার। শিবানীর উপস্থিতিতে সে ইন্দ্রনাথের কাছে সহজ হতে পারে হয়ত কি শিবানীর অনুপস্থিতিতে কিছুতেই সহজ হতে পারে না সে তার কাছে। ইন্দ্রনাথের জন্যই পারে না। ললিতার যে রূপটা প্রথমদিনই মত্ত ইন্দ্রনাথকে লোলুপ করে তুলেছিল, তার সেই মেয়েলি রূপটার প্রতি ইন্দ্রনাথের ভেতরে একটা লোভ যে রয়ে গেছে—নারী বলেই ললিতা তা বোঝে।

কি করবে না করবে ভেতরের দিশেহারা ভাবটা কিছু স্থির করবার আগেই ললিতার পা হাঁটতে শুরু করল। পায়ের চটির সেই চটপট চটপট শব্দটা একেবারে কমিয়ে ফেলে ললিতা এমনভাবে নীচে নেমে এলো, যেন পা টিপে টিপে পালাল সে।

কিন্তু গাড়িতে বসে লজ্জায় লাল হতে লাগল সে। এটা করল কি সে! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? অপমানটা ইন্দ্রনাথকে বেশী করা হলো না?

[ক্রমশ।

কাঠবেড়ালী আর বাবুই

কার্তিক ঘোষ

সেদিন বাবুইয়ের মেয়ের বিয়ে। সকাল থেকে হৈ-হুল্লোড় চলছে। হাজার হাজার বাবুই এসেছে। কিচিরমিচির ক'রে লাফালাফি করছে ওদের ছানা-পোনাগুলো। বড়রা সব কাজ নিয়েই ব্যস্ত। কতো দেশ থেকেই না এসেছে আত্মীয়স্বজন। তা' ছাড়াও পাড়া প্রতিবেশীরা তো আছেই। পাশেরবাড়ি থেকে চড়ুইগিন্নী এসেছে ওর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। কর্তা যেন কি এক জরুরী কাজের জন্যে কোথায় বেরিয়েছে তবে বাবুইয়ের সংগে দেখা ক'রে বলে গেছে দুপুরের আগেই ফিরে পড়বে। সাঁইবাবলার বন থেকে এসেছে গাঙ-শালিখ আর সবুজ টিয়ের মাসী। ময়না দিদির শরীর খারাপ। না হ'লে সে এসে পড়তো সকাল করে। বুলবুলিদের পাড়ায় বাবুইগিন্নী নিজেই গেছে নিমন্ত্রণ করতে আর কাকে বলতে বাকী রইল এই কথাই বাবুই ভাবছিল আপন মনে।...

এমন সময় হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে এলো সবুজ টিয়ের মাসী।

—হ্যাঁগো বাবুই, তোমার তো বাপু মেয়ের বিয়ে। কিন্তু, কি চাই না চাই সে সব কি আমাদেরই ব্যবস্থা করতে হবে!

—না-না-না, তা' কেনো করবে টিয়েদি'! কি হয়েছে বলো তো?

নাক মুখ ঘুরিয়ে সবুজ টিয়ের মাসী বললো,—যা ই হোক মেয়ের বাপ বটে তুমি! বলি, তোমার কি একটুও জ্ঞান-গম্যি নেই? গিন্নীর মতো কোমরে হাত দিয়ে বাবুইয়ের দিকে তাকালো টিয়ের মাসী। বললো, মেয়ের যে গায়ে হলুদ হবে—হলুদ কোথা তোমাদের? তারপর সিঁদুর, আলতা, ফুলেরমালাও তো দরকার! সে সব কিছু জোগাড় করেছো তোমরা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। ও সব তো চাই।

একটু লজ্জা হ'লো হয় তো। তাই মাথা নত করেই বললো, তুমি যদি একটু ব্যবস্থা করতে পারো তা'হলে খুব ভালো হয়। কারণ, দেখছো তো টিয়েদি' নানান কাজের ঝামেলায় আমি ওদিকে নজরে দিতেই পারছি না...।

—সে কথা তো আগে বললেই হ'তো।—হ্যাঁ, যতো সব.. রাগে গজ গজ করতে ক'রতে সবুজ টিয়ের মাসী চলে গেলো বাড়ির মধ্যে। সদর দুয়ারে পায়চারী করতে করতে বাবুইয়ের যেন হঠাৎ কি একটা মনে পড়ে গেলো। তাই একেবারে ফুড়ুৎ—উড়ে গেলো চোখের পলকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে হাজীর হ'লো কাঠবেড়ালীর বাড়ির কাছে। বাসার পাশে জামরুল গাছটায় খেলা করছিল কাঠবেড়ালীর বাচ্ছা মেয়েটা। বাবুইকে দেখে মোটেই চিনতে পারলো না। স্বভাব সুলভভঙ্গীতে ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্লো। বাবুই কিন্তু ওকে ঠিকই চিনতে পারলো। তাই একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, তোমার বাবা কোথায়?..

—বাবা তো বাড়িতে নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছে। একটু হেসে আবার বললো, চলুন আমাদের বাসায়। একটু বসবেন। বাবা এখুনি এসে পড়বে।

বাচ্ছা মেয়েটাই বাবুইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লো কাঠবেড়ালীর বাসায়। নারকেল গাছের মাথায় কি সুন্দর ক'রে বাসাটা তৈরি ক'রেছে! আহা ...অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলো বাবুই।

কাঠবেড়ালীর বাচ্ছা মেয়েটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হঠাৎ এক সময় বাবুই ব'লে ফেললো, তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হবার পর থেকে তোমাদের এ বাড়িতে একদিনও আসি নি। আজ এই এলুম।

—বাবার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া? বাচ্ছাটা যেন বাবুইয়ের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। বাবুই কিছু বলতে পারলো না। মাথা নত করে রইল কিছুক্ষণ। তারপরে একটু সহজকণ্ঠে বললো, তোমার মা কোথায়! তোমার মা'কে তো দেখছি নে?

—মা'তো নেই। অনেক দিন হ'লো মা স্বর্গে গেছে। বাচ্ছা ছানাটার ছলছল ক'রে উঠলো চোখ দু'টো।

—তাই না কি! বিস্মিতকণ্ঠে বাবুই বললো, তোমার মা বুঝি মারা গেছে?

—আপনি বুঝি জানতেন না! রূপোলী লোমের লেজ নেড়ে নেড়ে বাচ্ছা মেয়েটা বললো, সেই যে

বছর খু-উব ঝড় হয়। আমাদের ঘর ভেঙে গেলো ঝড়ে। সেই বছরই তো—

এবার বাবুইয়ের মনে পড়ে গেলো সব কথা।

এই তো বছরখানেক হ'লো একটা বিরাট ঝড় এসেছিল। কতো মানুষের ঘর-বাড়ি ভাঙলো। পশু-পক্ষীর বাসা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেলো। আর সেই বছরই তো ভেঙে গেছলো কাঠবেড়ালীর বাসা। একটু আশ্রয়ের জন্যে বাবুইয়ের কাছেই ছুটেছিল সেদিন। কিন্তু বাবুই বন্ধুর মতো ব্যবহার করে নি। মুখের ওপর বলেছিল, এখানে জায়গা হবে না।...

তারপর আর কোনোদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি দু'জনের। ইচ্ছে করেই তো বাবুই বিবাদ ক'রেছে কাঠবেড়ালীর সঙ্গে। ভাবতে কষ্ট হয় বাবুইয়ের। অনুশোচনায় চোখটা ছলছল ক'রে ওঠে।...

—কি খবর বাবুই!...

বাবুই চমকে ওঠে। পিছনে দাঁড়িয়ে কাঠবেড়ালী হাসছে। যেমনি আগে হাসতো। ঠিক তেমনি মিষ্টি। তেমনি মধুর।

—আমাকে ক্ষমা করতে পারলে বন্ধু! কান্নায় গলা বুজে আসে বাবুইয়ের। কাঠবেড়ালীকে জড়িয়ে ধ'রে বলে,—আজ আমার মেয়ের বিয়ে। তোমাদের আনতে এসেছি। এক্ষুনি যেতে হবে আমার সঙ্গে।...

—যাবো না মানে! তোমার মেয়ের বিয়ে আর আমি যাবো না। এক্ষুনি যাবো! আনন্দে দু'হাত তুলে লাফাতে লাগলো কাঠবেড়ালী।...

বাবুইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার একবার ফিক্ ক'রে হেসে উঠলো কাঠবেড়ালীর বাচ্চা মেয়েটা।...

যাদুকর কার্ল হার্জ

যাদুকর বি, দাস

পৃথিবী-বিখ্যাত যাদুকর হুডিনী, গোল্ডিন বা মাস্কেলীনের পর্যায়ে হার্জ কোনদিন উঠতে যদিও পারেন নি, কিন্তু তাঁর মত হৃদয়বান যাদুকর সমগ্র যাদুবিদ্যার ইতিহাসে মাত্র কয়েকটিই পাওয়া যাবে। লোক ঠকানোই না কি যাদুকরদের কাজ, তা সত্ত্বেও মানবিক গুণের এমন সুন্দর প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়।

আপনার বিরুদ্ধে কেউ যদি এমন কিছু প্রচার করে যাতে আপনার মান-সম্মান এবং ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে তার সাথে আপনি কি রকম ব্যবহার করবেন? খুব প্রীতিপ্রদ নয় নিশ্চয়ই, কারণ আমরা কেউই বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্টের পর্যায়ে পড়ি না। এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে উল্টো ব্যবহার করতেন যাদুকর কার্ল হার্জ (Carl Hertz)। এক সময়ে তিনি নিজেকে পাখীসহ খাঁচা অদৃশ্য করার খেলাটির আবিষ্কর্তা বলে প্রচার করেন। ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা যাদুকর বহু পত্র-পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, তিনি ঐ খেলাটির আবিষ্কর্তা নন—আসল আবিষ্কর্তার নাম ডি কোল্টা (De Kolta)। এই ভাবে ধরা পড়ে অপদস্থ হওয়ার পরেও কিন্তু তিনি সেই যাদুকরের সাথে কোনরকম খারাপ ব্যবহার তো করেনই নি বরং পরবর্তী জীবনে তাকে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা যাদুকরের কথা মনে পড়ে যাঁরা অপরের খেলাকে নিজের বলে চালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়ার পর বিরুদ্ধ-পক্ষের লোকেদের, পারেন তো হাতে মাথা কাটেন, এই রকম অবস্থার সৃষ্টি করেন। মানুষে মানুষে কত তফাৎ ভেবে অবাক হই।

যাদুকর হার্জের সেই বন্ধুই পরবর্তী জীবনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

'—To Carl's eternal credit, he never bore me any ill-will over that matter—he declared I was the best friend he ever had..!'

নিজের ঢাক নিজে পেটাতে হার্জের মত ওস্তাদ যাদুকর খুব কম দেখা যায় (আমাদের দেশে এই জাতীয় কয়েকজন আছেন)। ব্যবসায়িক বুদ্ধি কিন্তু তাঁর ছিলো অত্যন্ত প্রখর। সিনেমা-শিল্প তখন দ্রুত অগ্রগতির পথে। সিনেমার সম্ভাবনা বুঝতে পেরে তিনি ম্যাজিকের সাথে সাথে সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থাও করেন। অষ্ট্রেলিয়াতে তিনিই প্রথম বহুলোককে একসাথে সিনেমা দেখান। সিংহলের কলম্বোতে সিনেমা প্রদর্শনের উপযোগী হল না পাওয়ায় একটি অস্থায়ী হল তৈরি করান এবং ছ'সপ্তাহ প্রদর্শনী চলার পর হলটি আবার ভেঙ্গে ফেলা হয়। হল তৈরি করতে এবং ভাঙ্গতে তাঁর মোট খরচ পড়ে দু' পাউণ্ডেরও কম অর্থাৎ ২৫ টাকার মত! ব্যবসায়িক বুদ্ধির এটা একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়?

যাদুকর হিসেবে পৃথিবীর বিখ্যাত যাদুকরদের সমকক্ষ হতে না পারলেও কেবল ম্যাজিক দেখিয়েই তিনি প্রায় ১০০০,০০০ ডলার উপার্জন করেছিলেন।

তাঁর দুটি প্রধান খেলা ছিলো 'পাখীসহ খাঁচা অদৃশ্য করা' এবং স্টেজের ওপর থেকে একটি মেয়েকে অদৃশ্য করা। এই দুটি খেলাতেই তাঁর দক্ষতা ছিলো অতুলনীয়। অবশ্য খেলা দুটিই যাদুকর ডি, কোল্টার কাছ থেকে ধার করা। হার্জ বিশ্বাস করতেন যে, অন্য যাদুকরকে নকল করে এবং তার সাথে নিজের প্রদর্শন ভঙ্গী (Showmanship) যোগ করে তাদেরও ছাড়িয়ে

যেতে পারবেন তিনি। কয়েকজন প্রখ্যাত যাদুকরের খেলা নকল করে দেখিয়ে তাঁর কথার সত্যতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন, কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে (Palace Theatre) আমেরিকান যাদুকর হোরেস গোলডিনের খেলা নকল করে দেখাতে গিয়ে। দর্শক এবং যাদুকরদের কাছ থেকে একটু একটু করে যে সম্মান তিনি সঞ্চয় করেছিলেন এতদিন ধরে সবটুকু বিসর্জন দিতে হলো একটা ভুলের জন্যে। বড় বড় রঙ্গমঞ্চে আর সুযোগ না পেয়ে ইউরোপের মধ্যম শ্রেণীর হলগুলোতে খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন তিনি। কেবল পাখীসহ খাঁচা অদৃশ্য করার খেলাটিই তাঁর খ্যাতিকে ম্লান হতে দেয় নি। মৃত্যুর কিছুকাল আগে ইংলণ্ডে একটা ঘটনায় কিছুদিনের জন্যে ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন হয়—কিন্তু সে আর ক'দিন?

ঐ সময়ে ইংলণ্ডে একটি আইন পাশ হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন প্রদর্শনীতে পশু-পাখী ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। এই আইন পাশ হওয়ায় যাদুকর হার্জের পাখীসহ খাঁচা অদৃশ্য করার খেলাটির ওপর জনসাধারণের তরফ থেকে আসে আঘাত। পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির (Royal Society for prevention of cruelty to Animals) একজন পদস্থ কর্মচারী বলেন যে, হার্জের খাঁচা অদৃশ্য করার খেলায় যে পাখী ব্যবহার করা হয় তা প্রায়ই আঘাতপ্রাপ্ত হয়, না হলে মারা যায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিলো না হার্জের। কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়, কারণ খাঁচাটা ভাঁজ হয়ে অদৃশ্য হবার পর পাখীটা সেই চাপে মরবে না বাঁচবে তা নির্ভর করতো পাখীটার ভাগ্যের ওপর। পরবর্তীকালের যাদুকরেরা সেইজন্যে জীবন্ত পাখীর পরিবর্তে নকল পাখী দিয়েই খেলাটি দেখাতেন এবং আজও দেখাচ্ছেন।

এই আইনটিকে কেন্দ্র করে যে সব তর্ক বিতর্কের অবতারণা হয় তার মীমাংসার জন্যে একটি কমিটী গঠন করা হয়। ঠিক হয় এই কমিটী তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল পার্লিয়ামেন্টে পেশ করবেন। পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির (R. S. P. C. A.) একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ঐ কমিটীর সামনে পাখীসহ খাঁচা অদৃশ্য করার খেলাটি করে দেখান যে, সত্যি সত্যি পাখীটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। শেষে অবশ্য পাখীটিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে যাদুকর হার্জের ডাক পড়ে ঐ সমিতির সভ্যদের সামনে তাঁর খাঁচা অদৃশ্য করার খেলা দেখাবার জন্যে। খবর শুনে হার্জের তো অবস্থা কাহিল। ছুটলেন সেই যাদুকর বন্ধুর কাছে পরামর্শের জন্যে।

বন্ধুকে বললেন, যদি সমিতির সদস্যদের সামনে খেলা দেখাবার সময় পাখীটা কোনরকমে আঘাত পায় তবে আর রক্ষে থাকবে না। আর যদি না যাই তবে তাঁরা ভাববেন আমি মিথ্যে কথা বলছি। এখন উপায় কি বল তো?

বন্ধু তাকে সাহস দিয়ে বললেন, তোমার ভয় নেই। আমি এমন একটা খাঁচা তৈরী করে দেবো যেটা ভাঁজ হয়ে গেলেও পাখীটার গায়ে কোন আঘাত লাগবে না। হাতে কয়েকদিন সময় থাকায় বন্ধুর কাছ থেকে সাহস পেয়ে হার্জ ব্যাপারটাকে ফলাও করে প্রচার করতে লাগলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সামনে খেলাটি দেখিয়ে বেশ ভালোরকম প্রচারের ব্যবস্থাও করে ফেললেন।

নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা দিতে গিয়ে হার্জ একেবারে ছেলেমানুষের মত ভেঙ্গে পড়লেন। কেবল বলতে লাগলেন, যদি খেলাটা ঠিক ভাবে দেখাতে না পারি, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না! যাই হোক, কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে পাখীসহ খাঁচাটি দু'হাতের মাঝে চেপে ধরলেন তিনি। তারপর...চোখের নিমেষে পাখীসহ খাঁচা অদৃশ্য হয়ে গেলো সকলের চোখের সামনে থেকে! কয়েক মিনিট পর সেই পাখীটা একেবারে অক্ষত অবস্থায় পকেট থেকে বার করে দিলেন যাদুকর হার্জ।

এই ঘটনার পর বড় বড় হলের সাথে চুক্তি করতে আর বিশেষ বেগ পেতে হোলো না তাঁকে। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক থেকে সাউদাম্পটনে আসছিলেন জাহাজে, ইংলণ্ডের কয়েক জায়গায় খেলা দেখাবার জন্যে। ঐ জাহাজে কয়েকজন কুখ্যাত জুয়াড়ী হার্জের হীরের আংটি ইত্যাদি দেখে লোভে পড়ে তাঁকে জুয়া খেলতে বসালো। কিছুক্ষণ খেলার পর হার্জ যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি ঠকছেন তখন নিজেই তাসগুলো নিয়ে বিলি করতে লাগলেন। খেলার শেষে হার্জ জিতলেন ২৫০০ ডলার মাত্র। পরে যাদুকর হার্জের আসল পরিচয় জানতে পেরে ঐ জুয়াড়ীর দল তাদের হেরে যাওয়া টাকা দাবী করলো। হার্জ তাদের ভুলিয়ে নিজের কেবিনে আনবার বদলে জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরে নিয়ে হাজির করলেন। জাহাজের কালো খাতায় লেখা হয়ে গেলো তাদের নাম। জাহাজ থেকে নেমেই হার্জ ঐ ২৫০০ ডলার নাবিকদের এক অনাথ আশ্রমে চাঁদা স্বরূপ দান করে দিলেন।

সারা জীবনে যাদুকর হার্জ যা ব্যয় করেছেন তার পরিমাণ মোটামুটি প্রায় ২০০,০০০ ডলার, অবশ্য এই হিসেবের মধ্যে জুয়াখেলায় যে ৫০০,০০০ ডলার হেরেছিলেন সারা জীবনে, তা ধরা হয় নি। তাহলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭০০,০০০ ডলার। যিনি

এরকম একটা মোটা অঙ্ক খরচা করতে পারেন তাঁর উপার্জনের পরিমাণ সহজেই কল্পনা করা যায়। মানুষ হিসেবে হার্জের দয়া এবং বন্ধু-বাৎসল্যের তুলনা নেই। আজকের যাদুকরদের মধ্যে যে দু'টো জিনিষের অভাব সবচেয়ে বেশি।

বেহালা-বাদক

(গ্রিমের রূপকথা)

একজন লোকের মাধব নামে এক বোকা চাকর ছিল। বোকা হলেও মাধব খুব খাটতে পারত। যখন যে কাজ বলা হোক না কেন মাধব তখনই তা করত। তাই তাকে আটকে রাখবার জন্য তার মনিব খাওয়া পরা ছাড়া এক পয়সাও মাইনে মাধবকে দিত না।

এইভাবে বছর তিনেক কাজ করবার পর মাধবের নিজের গ্রামে ফিরে যাবার ইচ্ছা হল। তাই সে মনিবের কাছে মাইনে চাইল। মনিব অনেক ভেবে চিন্তে মাধবকে তিনটি পয়সা দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার তিন বছরের মাইনে একসঙ্গেই দিলাম।'

মাধব পয়সাকড়ির হিসাব বুঝত না। কাজেই একসঙ্গে তিনটে চকচকে পয়সা পেয়ে সে মহাখুসী। বাড়ি যাবার পথে মাঝে মাঝেই সে পকেটের পয়সা তিনটে নাড়াচাড়া করে আর তাদের টুংটাং শব্দ শুনে আনন্দে হাসতে থাকে।

এইভাবে খানিকদূর যাবার পর মাধবের এক বামনের সঙ্গে দেখা হল। বামন বলল, 'ভাই হে, দেখে মনে হচ্ছে কোন কারণে তোমার খুব আনন্দ হয়েছে। ব্যাপার কি বল তো?'

মাধব একগাল হেসে বলল, 'হবে না আনন্দ? আমি যে এখন বড়লোক হয়ে গিয়েছি। একসঙ্গে তিন বছরের মাইনে, তিন তিনটে চকচকে পয়সা এখন আমার সম্পত্তি।'

পাছে বামন তার কথা বিশ্বাস না করে, তাই মাধব পকেট থেকে পয়সা তিনটে বের করে দেখাল।

বামন বলল, 'তাই তো, এ যে দেখছি অনেক পয়সা। তা ভাই, আমাকে যদি ঐ থেকে একটা পয়সা দাও তো বড় ভাল হয়। আমি গরীব মানুষ, তায় বুড়ো হয়েছি, খেটে খাবার শক্তিও নেই আমার।'

বুড়ো বামনের দুর্বল শরীরের দিকে চেয়ে মাধবের দয়া হ'ল। সে বলল, 'একটা কেন? তিনটে পয়সাই তুমি নাও। আমার গায়ে যথেষ্ট জোর আছে। আমি খেটে খেতে পারব।'

বুড়ো বামন পয়সা তিনটে নিয়ে খুসী হয়ে বলল, 'তুমি বেশ ভাল লোক। এই পয়সা তিনটির বদলে আমি তোমাকে তিনটি বর দেব। তোমার কি চাই বল?'

মাধব একটু ভেবে বলল, তা, যদি কিছু দিতেই চাও তো আমাকে এমন একটা বন্দুক দাও যা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। দ্বিতীয় বরে আমাকে এমন একটা বেহালা দাও যার বাজনা শোনা মাত্রই লোকে নাচতে থাকবে। আমার শেষ ইচ্ছা এই যে আমি যার কাছে যা চাইব সে যেন খুসী মনেই তাই দেয়।'

মাধবের কথা শেষ হতেই বামন তার আলখাল্লার পকেট থেকে একটা বন্দুক আর একটা বেহালা বের করে দিল, যেন সে আগেই জানত মাধব ঠিক এই জিনিষ দু'টিই চাইবে।

'তোমার তৃতীয় ইচ্ছাও পূর্ণ হবে। তুমি যার কাছে যা চাইবে তাই পাবে।' এই বলে বামন অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাধব আবার আনন্দে গান গাইতে গাইতে পথ চলল।

গ্রামের কাছাকাছি এসে মাধব দেখল তাদের গ্রামের সবচেয়ে নিষ্ঠুর সুদখোর মহাজন একটা কাঁটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে একটা গাছের মাথার দিকে চেয়ে আছে। গাছের উপর একটা খুব সুন্দর পাখী বসে গান গাইছিল। তাই শুনে মহাজন আপন মনে বলছিল, 'এইটুকু পাখী কি করে এত সুন্দর গান গাইছে? কোন রকমে পাখীটাকে ধরতে পারলে এখনি খাঁচায় পুরতাম।'

'এই নাও, আমি এখনই পাখীটাকে পেড়ে দিচ্ছি।' বলে মাধব পাখীটার একটা পায়ে গুলি করতেই সেটা ঝটপট ঝটপট করে কাঁটা ঝোপে গিয়ে পড়ল।

'আমাকে পাখীর বদলে কি দেবে?' মাধব জিজ্ঞাসা করল।

কৃপণ বুড়ো তখন সাবধানে কাঁটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পাখী খুঁজছিল। সে বলল—'এইটুকু পাখীর জন্যে কি আর দেব? কিছুই না।'

কৃপণের কথা শুনে মাধবের মাথায় হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি জাগল। সে তার বেহালাটা নিয়ে বলল 'বেশ, তবে একটু বাজনা শোন।'

তারপর যেই না বেহালা বাজাল অমনি কৃপণ বুড়ো সেই কাঁটা ঝোপের মধ্যেই দুই হাত তুলে নাচতে আরম্ভ করেছে—তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।

নাচতে নাচতে কাঁটায় লেগে বুড়োর জামা কাপড় ছিঁড়ে, হাত, পা, গা সব ছড়ে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করল। কিন্তু কিছুতেই সে নাচ থামাতে পারল না। তখন সে বলল—

'ওহে থাম, থাম। বাজনা থামাও। আমি তোমাকে এক থলে মোহর দেব।'

'বেশ, দাও।' মাধব বাজনা থামিয়ে বলল, 'ঐ এক থলে মোহর পেলে গ্রামের গরীব লোকেরা খুব খুশী হবে।'

কৃপণ বুড়ো তার পকেট থেকে এক থলে মোহর বের করে মাধবকে দিল। মাধব চলে যেতেই সে শহরে গিয়ে জজসাহেবের আদালতে নালিশ করল।

'মাধব নামের একজন লোক আমাকে মেরে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।'

বুড়োর ছেঁড়া জামা কাপড় আর রক্তাক্ত শরীর দেখে জজসাহেব তার কথা বিশ্বাস করলেন। তাঁর আদেশমত আদালতের লোকেরা গিয়ে মাধবকে ধরে আনল।

মাধব বলল, 'দোহাই জজসাহেব, আমি বুড়োকে মার ধর কিছুই করি নি। সে নিজেই আমাকে মোহরের থলে দিয়েছে। আর কাঁটা ঝোপে ঢুকে পাখী খুঁজতে গিয়ে ওর জামা-কাপড় ছিঁড়ে শরীর ছড়েছে।'

জজসাহেব মাধবের কথ[illegible] [illegible]াস করলেন না। তিনি জানতেন বুড়ো ভীষণ কৃপণ। [illegible]ই সে নিজের ইচ্ছায় একথলে মোহর কখনও মাধবকে দেবে [illegible]।

সেই শহরের আইন অনুসারে জজসাহেব মাধবকে রাস্তায় ডাকাতি করার অপরাধে ফাঁসীর শাস্তি দিলেন।

মাধব বলল, 'হুজুর প্রাণ তো যাবেই, জেলে যাবার আগে একবার প্রাণভরে বেহালা বাজিয়ে নেবার অনুমতি দিন।'

মাধবের কথা শুনে কৃপণবুড়ো লাফিয়ে উঠল।

'খবরদার, হুজুর, খবরদার। ওকে ঐ সর্বনেশে বেহালা ছুঁতে দেবেন না।

কিন্তু জজসাহেব বুড়োর কথা শুনলেন না। বামনের তৃতীয় বর ছিল মাধব যার কাছে যা চাইবে তাই পাবে। কাজেই জজসাহেবও মাধবকে বেহালা বাজাবার অনুমতি দিলেন।

তারপর আর কি? যেই না মাধব বেহালা বাজিয়েছে অমনি নিজের নিজের আসন ছেড়ে উঠে,—

জজ নাচে, উকীল নাচে, নাচে পাহারাদার,
বুড়ো কৃপণ নাচে যে ভাই দু'হাত তুলে তার।
তা তা থৈ থৈ। তা তা থৈ থৈ। তা তা থৈ থৈ।

মাধব তন্ময় হয়ে এত তাড়াতাড়ি বেহালা বাজাতে লাগল যে ঘরসুদ্ধ লোক শেষকালে বাজনার তালে তালে তড়াং তড়াং করে লাফাতে লাফাতে এ ওর ঘাড়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। বাজনা যতক্ষণ না থামবে ততক্ষণ ওদের নাচতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত জজসাহেব হাঁফাতে হাঁফাতে কোনরকমে বললেন, 'দোহাই মাধব, বাজনা থামাও। তোমার শাস্তি রদ করে দিলাম। তুমি মুক্ত।'

একথা শুনে মাধব বাজনা থামাল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে যার আসনে গিয়ে বসল।

মাধব তখন কৃপণ বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, 'এই মোহরের থলে তুমি কোথায় পেয়েছ! সত্যি কথা বল, নইলে আবার বেহালা বাজাব।'

কৃপণ বুড়ো বলল, 'আমি ঐ থলে গ্রামের জমিদার বাড়ি থেকে চুরি করেছি।'

তার কথা শুনে জজসাহেব তখনই তাকে জেলে পাঠালেন। মাধব খুশী মনে তার গ্রামে ফিরে গেল।

অনুবাদিকা—পুষ্পদল ভট্টাচার্য

কবি কৃষ্ণ সেন

শ্রীআর্যকুমার পালিত

তোমরা কবি কৃষ্ণ সেনের নাম শুনিয়াছ?

সম্প্রতি বাঁকুড়ায় 'চণ্ডীদাস চরিত' নামে এক মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে! যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই পুঁথি ছাপাইয়াছেন। ইহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের দৃষ্টান্ত হিন্দুধর্মের সহিত ইসলামের সমন্বয় প্রভৃতি নানা জ্ঞানমার্গের কথা আছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ইঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ সেন। ইংরজী ১৭০০ সালে কৃষ্ণপ্রসাদ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৬৫০ সালে ছাতনার রাজা উত্তরনারায়ণ তাঁহার কবিরাজ উদয় সেনকে 'চণ্ডীদাস চরিত' বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। উদয় সেন নানাস্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতে 'চণ্ডীদাস চরিতামৃতম্' নামে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের মাত্র একখানি পাতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উদয় সেনের দুই পুত্র—আনন্দ ও মহানন্দ। আনন্দ রাজার প্রধান অমাত্য ও মহানন্দ তাঁহার মুন্সী ছিলেন। ইঁহাদের এক খুড়তুতো ভাই রাজার বক্সী ছিলেন। আনন্দের তিন পুত্র—হীরালাল, মতিলাল, ফতেলাল। হীরালাল বহুকাল রাজগন্তাইত ছিলেন। হীরালালের বিবাহ হইল কিন্তু পুত্র হয় না। জ্যোতিষীরা বলিলেন, ভদ্রাসন দোষযুক্ত। এই কারণে হীরালাল ছাতনা ছাড়িয়া অন্য গ্রামে গিয়া বাসের সংকল্প করিলেন। রাজা লছমীনারায়ণ এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে লথ্যাসোল নামক মৌজা কিঞ্চিৎ পত্তনে

ইংরাজী ১৭৭১ সালে তিন সহোদরকে অর্পণ করেন। তখন সে সব অঞ্চলে বাঘ, ভালুক ও দস্যুর ভয় ছিল। মাঝে মাঝে হাতীর পাল আসিত। হীরালাল সে গ্রামে গেলেন না। পাশের হামুলা গ্রামে বাসাবাড়ি করিলেন। সেখানে তিনি কার্তিকেয় পূজা আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদের জন্ম হইল।

চারিবর্ষ পরে কৃষ্ণপ্রসাদের হাতেখড়ি হয়। ক্রমিক বারো বৎসর পড়িয়া তাঁহার ব্যাকরণ ও কাব্যজ্ঞান জন্মে। নানা শাস্ত্র দেখিয়া, চরক, সুশ্রুত, নিদান, আদি বৈদ্যক পঞ্চ-শাস্ত্র পড়িয়া, নানাস্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি পিতার নিকট ছাতনায় আসেন। ভাগ্যক্রমে তিনি রাজকুমার বলাইনারায়ণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে বলাইনারায়ণ রাজা হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেনকে 'চণ্ডীদাস চরিতামৃতম্' গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণ সেন উদয় সেনের প্রপৌত্র ছিলেন। ইংরাজী ১৮০৩ সালে বলাইনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। ইহার দশ-বারো বৎসর পরে কৃষ্ণ সেন, উদয় সেনের পুঁথি আশ্রয় করিয়া বিবিধ ছন্দে 'বাসলী ও চণ্ডীদাস' এই নামে পুঁথি লিখিয়াছিলেন।

কবি কৃষ্ণপ্রসাদ শেষে রাজপুত্র লছমীনারায়ণের কোপে বিষম্বরূপ হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের কথা

সাধনা কর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মহাপ্রমাদ! পাণ্ডবপক্ষের প্রধান যোদ্ধা সব্যসাচী অর্জুন। বনবাসকালে বছরের পর বছর ধরে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনে করেছেন কঠোর তপস্যা। সিদ্ধ হয়েছেন অস্ত্র-শাস্ত্রে। অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার সংকল্প হয়েছে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। সেই অর্জুনের আজ এ কি দুর্বলতা!

এমন মন নিয়ে যুদ্ধ করা চলে না। যোদ্ধাকে হতে হবে ইস্পাতের মত শক্ত,—তৃণজ্ঞানে মারতে হবে শত্রুকে। অর্জুনের বৈকল্যে বিকল হবেন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব। বিহ্বল হবে স্বপক্ষের সৈন্যদল। এ যে যুদ্ধের আগেই হার মানা।

সঞ্জয়ের মুখে সব শুনতে শুনতে বিপুল হর্ষে মেতে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র। আশা কি তাঁর এত সহজে পূর্ণ হবে, দুর্যোধন করবে রাজ্যলাভ।

সর্বজ্ঞ সঞ্জয়—বুঝতে পারলেন অন্ধের মনের উল্লাস। তাড়াতাড়ি কথা সুরু করলেন :—হে রাজন, যুদ্ধে অর্জুনের বৈকল্য দেখে তৎপর হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

বিহ্বল হোয়ো না পার্থ, নয় এতো উচিত তোমার,
ত্যজ ক্ষুদ্র দুর্বলতা, উঠ শীঘ্র, লও রণভার।

একি হল তোমার। কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে—মনে আছে?—শত্রু বিনাশ, নয় প্রাণ বিসর্জন। কোথায় রইল সে প্রতিজ্ঞা! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শপথ ত্যাগ মৃত্যুর বাড়া, যশের ক্ষতিকর। যুদ্ধই যে তাঁর কীর্তি, যুদ্ধই স্বর্গ, যুদ্ধই মুক্তি। সন্ন্যাস নয় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। বৈরাগ্য ব্রাহ্মণের শোভা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কাপুরুষতা। তুমি এত ক্লীব, এত অক্ষম?

আত্মসম্মানে লাগল আঘাত, অর্জুন বলে উঠলেন—সখা, ভয় নয়, বিহ্বলতা নয়, মমতা বা কোনো দুর্বলতাই আমাকে কাতর করে নি। আমি পরন্তপ, দুষ্ট দমনকারী, শিষ্টের পালক। তেজ ও বীর্য আমার অক্ষুণ্ণই রয়েছে।

একথা ঠিক তাই—ভুল বলেন নি অর্জুন। মেঘে ঢেকে ফেলে সূর্য নষ্ট করতে পারে কি তার তেজরাশি? ধুলো জমে উঠে দর্পণে—দূরে যায় কি তার স্বচ্ছতা? বীর্য তেজ [illegible] তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ? তাঁর সারথি হয়েছেন সানন্দে। আসলে অর্জুনের মন বিকল হয়েছে বিবেকের দ্বন্দ্বে—বিচার বুদ্ধিতে ঢেকেছে ভালোমন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়ের প্রশ্ন।

[illegible] তাই ক্ষুব্ধ হলেন অর্জুন। বললেন—সখা, যুদ্ধ আমি করব না। আত্মীয় ও গুরুজনদের সঙ্গে বিবাদ করা অন্যায়, নিতান্ত গর্হিত কাজ। [illegible] অনিষ্টকারী। [illegible] তিনি [illegible] স্বজনের রক্তে রাঙা রাজ্য [illegible] হবে না অভিশপ্ত? তাদের [illegible] করার চেয়ে ভিক্ষান্ন [illegible] তার থেকে কাতর হয়েছি, [illegible] শোকের হাত থেকে কেউ কি [illegible] জ্ঞানী ও যে কাতর হয়ে পড়েন প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায়। সিদ্ধ যোগী যিনি, তাঁরও কি অন্তরে বিহ্বলতা ঘটে না? বলতে বলতে মৌন হলেন অর্জুন। [illegible] হাসলেন। সেই হাসিতে [illegible] ভাবের ইঙ্গিত। হাসি দিয়েই [illegible] উড়িয়ে দিলেন সব্যসাচীকে।

প্রথমে হাসির প্রসন্নতা পলকে জাগাল উৎসাহ, সচেতন করে তুললে দেহ মন, অর্জুন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। পরক্ষণেই হাসির তীব্র ঝিলিক ধিক্কারে বিঁধল অন্তরে—ছি, অর্জুন ছি। এখনি যে তোমার ব্যবহারে—শত্রু মিত্র ছোট বড়ো সবাই হেসে লুটোপুটি খাবে। যুদ্ধের নিমিত্তই না তুমি কত দুঃখ ভোগ করে লাভ করলে ব্রহ্মাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র! সেই তুমি আজ এমন কাতর।

এর পরে হাসির রহস্যময় আরেক রেখা যেন বুঝিয়ে দিলে—

হে কৌন্তেয়, দ্বন্দ্ব জেগেছে মনে? ভেবেছিলাম

পরম জ্ঞানী তুমি, এখন দেখতে পাচ্ছি তা তো নয়, প্রকৃত জ্ঞানই তোমার নেই।

এইরূপে এক হাসিতে মনে নানা কথা জাগিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন—কিসের জন্য শোক করছ পার্থ, কার জন্যেই বা শোক। যুদ্ধে নষ্ট হবে মাত্র এই নরদেহটা,—আত্মা তো অবিনশ্বর।

আত্মা কি জানো? আমাদের এই দেহমন ও বুদ্ধির অতিরিক্ত আরো একটা কিছু—কিছু আছে যার বিকার নেই, বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই। সেইটেই হচ্ছে আত্মা—চির-অমর, নিত্য প্রবাহিত। জগতে কোন কিছুই হারিয়ে যায় না, ফুরিয়ে যায় না—শুধু সরে যায় চোখের সামনে থেকে। সে কেমনতরো? সমুদ্রে তরঙ্গ উঠছে তরঙ্গ পড়ছে, নাচছে ছুটছে—একের পর এক যাচ্ছে মিলিয়ে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। সমস্ত সংসার তেমনি জীবময়, বস্তুময়।—জল-তরঙ্গের মতোই তারা খেলা করে বেড়াচ্ছে। এক-একটি বস্তু বা প্রাণী আড়াল হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মধ্যে—খেলা করে বেড়াচ্ছে অন্যরূপে অন্য কোথাও।

অর্জুন তুমি আমি, এই যত রাজা-রাজড়া সৈন্যসামন্ত সকলেই আমরা বহুবার জন্মেছি, মরেছি, আবার জন্ম নিয়েছি, ফের সবাই মরব। চলে যাব চোখের আড়ালে। কিন্তু এই বিশ্বের মধ্যেই তো থাকব। থাকব অন্যরূপে। তবে কেন বৃথা শোক।

বেঁচে থেকেও কি আমরা মরে যাই নে, গ্রহণ করি নে রূপান্তর? বহুবার রূপ বদল হয়—শিশু থেকে কিশোর হই, কিশোর থেকে যুবা, যুবক থেকে বুড়ো হয়ে তারপর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলে যাই অন্য রূপে। স্রোতের টানে যেমন তরতর করে বয়ে যায় নৌকো, জীবন-তরীও কালের স্রোতে বয়ে যায় পলে পলে। কাঁদি কি তার জন্যে? কাঁদি কি এই ব'লে,—শিশু ছিলাম, যুবক হলাম কেন, যুবক থেকে বুড়ো হতে আর চাই নে। বরং এক রকম অবস্থায় থাকলেই দুঃখ পাই, পঙ্গু ব'লে পাই সবার অবহেলা। পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ জড়-অজড়,—ক্ষয় সকলেরই আছে। সেই ক্ষয়েরই একটা রূপ—মৃত্যু। এ সত্য সবার জানা। তবু কেন কাঁদি মৃত্যু হলে? কাঁদি এই জন্যে যে, কি রূপ পাব, আর কোথায় চলে যাব, তাই জানি নে। নয় তো এ-যেন ঠিক পুরোনো কাপড় ছেড়ে ফেলে নূতন কাপড়পরা—

> জীর্ণ হল বস্ত্র, তারে ত্যাগ করে নর
> নূতন বসন পরে হরষ অন্তর।
> দেহ জীর্ণ হলে পরে আত্মা দেহ ছাড়ে
> নব রূপে নব ভাবে পুনঃ দেখি তারে।
> নূতন বসন পেলে আনন্দ অপার
> নব দেহে পায় আত্মা নব ছন্দ তার।

অর্জুন, আবার বলি—আত্মার বিনাশ নেই, বিকার নেই, আদি নেই, অন্ত নেই, কোনো কিছুতেই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

> শস্ত্র তারে নাহি কাটে, অগ্নি তারে না করে দহন
> বারি নাহি সিক্ত করে, নাহি শোষে দুরন্ত পবন।

আকাশ বিশ্ব জুড়ে রয়েছে, বাতাস আকাশ ঘিরে বর্তমান, কিন্তু কোন কিছুতেই আকাশও বাধা পায় না, বাতাসও ধাক্কা খায় না। আত্মাও তেমনি জল-বায়ু-আগুন মাটি সব কিছুতেই বিরাজ করছে, বাধা পড়ছে না কোনোখানে, কাতর হচ্ছে না কোনো রকমে। জন্ম আর মৃত্যু—আসা আর যাওয়া—এই তো বিশ্ব জগতের লীলা।

> জন্মিলে মরিতে হবে, মরিলেও জন্ম স্থির
> কেন তবে দুঃখ করো, ধনঞ্জয় জ্ঞানবীর।

বলো জিষ্ণু, কতটুকু জানো জীবন-মরণের রহস্য, কত সামান্য। এ জন্মের আগে কোথায় ছিলে? পেয়েছিলে কোনো আকার? এর পরেই কোন্ রূপ নেবে? কিছুই তো জানো না—সব অজানা, অন্ধকার। কেবল জানা এইটুকু—জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানকার অবস্থা। তবে আর শোক কেন? ওঠো বীর তুলে নাও ধনুর্বাণ—যুদ্ধে হও জয়ী।

পরমোৎসাহিত হয়ে অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ তখনো বলেই চলেছেন—জেনে রেখো পার্থ, তুমি কিছুই নও, সব কিছু যিনি পরিচালনা করেন তিনি পরমেশ্বর। সেই পরম-আত্মা থেকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মা থেকে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ এমন কি বালুকণাটি পর্যন্ত তাঁরই নিয়মে চলে। জীবের তবে ক্ষমতা কতটুকু?

> কর্ম তার—নয় ফল;
> ফলের আশা শুধু ছল।

ফলের উপরে কারুর হাত নেই—ফলদাতা পরমেশ্বর। কর্ম করে যেতে হবে, শান্ত চিত্তে মানতে হবে পরিণাম। যিনি এ রকম হতে পারেন তিনিই স্থিতধী—

> দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্ন, সুখেও যার স্পৃহা নেই
> বীতরাগ ভয় ক্রোধ স্থিত-প্রজ্ঞ জানবে সে-ই।

প্রশ্ন তুলবে—মানুষ কি হতে পারে এমন বিকারহীন—ধীর স্থির শান্ত।

কামনা ত্যাগ করে তবে সবাই কি হবে সন্ন্যাসী। তা নয়।

> ত্যাগ ক'রে ভোগ করো,
> পরধনে কোরো নাকো লোভ;
> বাসনার নাই শেষ
> এই জেনো, রেখো না বিক্ষোভ।

[ক্রমশ।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ক্ষয়তরু—স্থালীবৃক্ষ [হিঃ বেনিয়া পিপর]। পর্যায়—নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহ, গজপাদপ, ক্ষীরী।

ক্ষয়নাশিনী—জীবন্তী বৃক্ষ।

ক্ষরপত্রা—দ্রোণপুষ্পী।

ক্ষব—রাই সর্ষে।

ক্ষবক—১ আপাং গাছ, ২ রাই সর্ষে, ৩ রাধিকা বিশেষ, ৪ ভূতাঙ্কুশ।

ক্ষবকৃৎ—ক্ষুপবিশেষ, ছিকনী।

ক্ষবপত্রা—দ্রোণপুষ্পী, ঘলঘসে।

ক্ষবিকা—ওষধি বৃক্ষ, বৃহতি বিশেষ। পর্যায়—সর্পতনু, পীততণ্ডুলা, পুত্রপ্রদা, বহুফলা, গোধিনী।

ক্ষারছলা—চিল্লিশাক, ছোট বেতুয়া।

ক্ষারদশক—১ সজনে, ২ মূলা, ৩ পলাশ, ৪ চুক্রিকা, ৫ চিতা, ৬ আদা, ৭ নিম, ৮ ইক্ষু, ৯ অপামার্গ, ১০ মোচা।

ক্ষারদ্রু—ঘণ্টা পারুল গাছ।

ক্ষারপত্র—বেতো শাক।

ক্ষারপত্রা—চিল্লী শাক।

ক্ষারমধ্য—আপাং।

ক্ষারবৃক্ষ—মুষ্কবৃক্ষ। ঘণ্টাপারুল।

ক্ষারষটক—১ ধব, ২ আপাং, ৩ কুষ্টক, ৪ ঈষলাঙ্গলা, ৫ তিল, ৬ ঘণ্টাপারুল।

ক্ষিতিথাম—খদির বৃক্ষ।

ক্ষিপ্রপাকী—১ গাঁধিভাট, ২ গন্ধভেদানিয়া।

ক্ষীরক—ক্ষীরমোরটলতা (!)।

ক্ষীরকর্থড়ুকী—ক্ষিরীশ বৃক্ষ।

ক্ষীরকন্দা—কাল ভুঁইকুমড়া।

ক্ষীরকাণ্ডক—১ মনসা, ২ আকন্দ।

ক্ষীরকাষ্ঠা—বটীবৃক্ষ—

ক্ষীরক্ষব—শিরগোলা গাছ।

ক্ষীরদল—আকন্দ।

ক্ষীরদ্রুম—অশ্বত্থবৃক্ষ।

ক্ষীরনাশ—সাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ।

ক্ষীরপর্ণী—আকন্দ।

ক্ষীরপলাণ্ডু—শাদা পেঁয়াজ।

ক্ষীর মোচক—Moringa hyperanthera.

ক্ষীরমোরট—লতাচিঃ, মোরটলতা। পর্যায়—সিতরু, সুদল, ক্ষীরক।

ক্ষীরকলতা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরবিদারী—কাল ভুঁইকুমড়া। পর্যায়—মহাশ্বেতা, ঋক্ষগন্ধিকা, ইক্ষুবল্লরী, ইক্ষবল্লী, ক্ষীরকন্দ, পয়স্বিনী, ক্ষীরশুক্লা পয়ঃকন্দা, পয়োলতা, পয়োবিদারিকা।

ক্ষীরবিষাণিকা—১ বিছুটী, ২ ক্ষীরকাকলী।

ক্ষীরবৃক্ষ—১ যজ্ঞডুমুর, ২ ক্ষীরিকাবৃক্ষ, ক্ষীর অশ্বত্থ, ৪ ক্ষীরিণী ৫ ন্যগ্রোধ, ৬ মউয়া।

ক্ষীরশুক্রী—ক্ষীরকাকোলী।

ক্ষীরশুক্ল—পাণিফল।

ক্ষীরশুক্লা—১ রাজাদনী, ২ শুক্লভূমি কুষ্মাণ্ড।

ক্ষীরাবী—ক্ষীরই। পর্যায়—গ্রাহিণী, কঞ্চুরা, আম্বুল, মরুস্তবা।

ক্ষীরাহ্ব, ক্ষীরাহ্বয়—সরলদ্রুম।

ক্ষীরিকা—ক্ষীরবিদারী ক্ষীরবৃক্ষ ক্ষীর খেজুর। পিণ্ডখেজুর। খর্জুদ্রু°।

ক্ষীরা—শসাদ্রু°।

ক্ষীরাই। ক্ষীরী—[সং ক্ষীরাবী] ক্ষুপ আদিবর্গের বর্ষায়ু শাকাব°। emphorbia pilulifera. ঘাসের মধ্যে জন্মে। গাছ ভাঙ্গিলে দুধ বাহির হয়। প্রকার ভেদ—(১) বড় ক্ষীরী—লতানিয়া গাছ, পাতা খরলোমকা, পাতায় শিরা স্পষ্ট। (২) ছোট ক্ষীরী—লতানীয় গাছ E. microphylla.

ক্ষীরিণ—[হি° ক্ষীরণী ও ক্ষীরী] বকুলাদিবর্গের তরুাব°, mimusops hexandra. পাতা চকচকে। ফুল ছোট আপাণ্ডুর। ফল একবীজ।

ক্ষীরিণী—১ বৃক্ষবিং। পর্যায়—কাঞ্চনক্ষীরী, কর্ষণী,

পটুকর্ণিকা, তিক্তদুগ্ধা, হৈমবতী, হিমদুগ্ধা, হিমবতী, হিমাদ্রিজা, পীতদুগ্ধা, যবচিঞ্চি, হিমোত্থরী, হৈমী, হিমজা। ২ গাণ্ডারী, ৩ ক্ষীর কাঁকলা, ৪ শ্বেতসারিবা

ক্ষুণ—বিঠেগাছ।

ক্ষুৎ—দেধান।

ক্ষুতক—কালসরিষা।

ক্ষুদ্রকণ্টকারী—অগ্নিদমনীবৃক্ষ।

ক্ষুদ্রকণ্টকী—বৃহতী।

ক্ষুদ্রকণ্টিকা—কণ্টকারিকা।

ক্ষুদ্রকারণিকা—ক্ষুদ্রকারবেল্লী।

ক্ষুদ্রকারবেল্লী—ছোট করলা।

ক্ষুদ্রক্ষুর—ক্ষুদ্রগোক্ষুর।

ক্ষুদ্রখদির—দুধখদির।

ক্ষুদ্রগোক্ষুরক—গোক্ষুর বৃক্ষবিষ। পর্যায়—ত্রিকণ্টক, কণ্ট, ষড়ঙ্গ, বহুকণ্টক, ক্ষুর, গোকণ্টক, কণ্টফল, পলঙ্কষা, ক্ষুদ্রক্ষুর, ভক্ষটক, স্থল শৃঙ্গাটক, ইক্ষুগন্ধ, স্বাদুকণ্ট।

ক্ষুদ্রখোনী—চিবিল্লিকা বৃক্ষ।

ক্ষুদ্রচঞ্চু—কটুকা।

ক্ষুদ্রজাতিফল—আমলকী।

ক্ষুদ্রজীর, ক্ষুদ্রজীরক—ক্ষুদিয়া জীরা।

ক্ষুদ্র জীরা—জীবন্তী লতা

ক্ষুদ্রতুলসী—বাবুই তুলসী বিস।

ক্ষুদ্রদুরালভা—দুরালভা দ্র°।

ক্ষুদ্রধাত্রী—কর্কটবৃক্ষ।

ক্ষুদপত্রা—চুকো পালং।

ক্ষুদ্রপনস—১ লকুচ, মাদার, ২ ছোট কাঁটাল।

ক্ষুদ্র পাষাণভেদা—প্রস্তরভেদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পর্যায়—চতুঃপত্রী, পার্বতী, নগভু, অশ্মকেতু, গিরিভু, কন্দরোদ্ভবী, গিরিজা, নগজা।

ক্ষুদ্রপোতিকা—মূলপোতী।

ক্ষুদ্রভণ্টাকী—তিৎবেগুন।

ক্ষুদ্রমস্তা—কেশুর।

ক্ষুদ্ররসা—তিক্ত গুঞ্জোলতা।

ক্ষুদ্রবর্ষাভূ—রক্তপুনর্ণবা।

ক্ষুদ্রবল্লী—একরকম পুঁইশাক। মূলগোতিকা।

ক্ষুদ্রবার্তাকিনী—শ্বেত কণ্টকারী।

ক্ষুদ্রশীর্ষ—ময়ূরশিখা বৃক্ষ।

ক্ষুদ্র শ্যামা—কটভী বৃক্ষ।

ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাত্বক—ভূকর্বুদারক।

ক্ষুদ্রশ্বেতা—আমেন্দ্রপুষ্পী। অর্কাদিবর্গের।

ক্ষুদ্রহিন্দুনিকা—কণ্টকারী।

ক্ষুদ্রা—১ কণ্টকারী, ২ আমরুল, ৩ গড়গড়ে ধান।

ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ—ছোট গণিয়ারী। পর্যায়—তপন, বিজয়া, গণিকারিকা, অরণি, কুথুমন্থ, তেজোবৃক্ষ, তন্থুরচা।

ক্ষুদ্রপামার্গ—রক্ত অপামার্গ।

ক্ষুদ্রাম্র—কোষাম্র, কেওড়া গাছ।

ক্ষুদ্রাম্লপনস—লাকুচ।

ক্ষুদ্রাম্লা—আমরুল।

ক্ষুদ্রাম্লিকা—[হি আবর্বতি, আবতা] পর্যায়—চাঙ্গেরী, চুক্রাম্লা, চক্রিকা, লোণাম্লা, চতুঃপত্রী, লোণা, বোঢ়া, অম্লপত্রিকা, অম্বষ্ঠা, অম্লবতী, অম্লা, দন্তশঠা, শাখাম্লা, অম্লপত্রী।

ক্ষুদ্রৈলা—ছোট এলাইচ।

ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা—কাকোদুম্বরিকা।

ক্ষুদ্রোপদকনাম্নী—মূলপোতী শাক।

ক্ষুধাকুশল—বিশ্বান্তর বৃক্ষ।

ক্ষুধাভিজনন—রাই সর্ষে।

ক্ষুধামার—অপামার্গ।

ক্ষুর—গোক্ষুর।

ক্ষুরক—১ তিল বৃক্ষ, ২ কোকিলাক্ষ, ৩ গোক্ষুর, ৪ ভূতাঙ্কুশ বৃক্ষ।

ক্ষুরপত্রিকা—পালঙ্ক শাক।

ক্ষেত্র পর্পটি—বালকী, বাঙ্গি কাঁকুড়, ক্ষেতপাপড়া, খেতপাপড়া দ্র°।

ক্ষেত্রচিভিটা—কাঁকুড়।

ক্ষেত্রজা—১ শ্বেত কণ্ঠকারী, ২ শশাণ্ডুলী, ৩ গো-মূত্রিকা তৃণ, ৪ চণিকাতৃণ।

ক্ষেত্রদূতী—শ্বেতকণ্টকারী।

ক্ষেতপাপড়া—[সং ক্ষেপর্পটক] আচ্ছুকাদিবর্গের বর্ষায়ু ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ, oldenlandia corymbosabiflora. পাতা ছোট ও সরু। ফুলের বোঁটা লম্বা সরু। পর্পট দ্র°।

ক্ষেত্ররুহা—বাঙ্গি কাঁকুড়।

ক্ষেত্রসম্ভব—চঞ্চুশাক।

ক্ষেত্রসম্ভবা—শশাণ্ডুলী

ক্ষেত্রসম্ভূত—কুন্দরাতৃণ।

ক্ষেত্রামলকী—ভুঁই আমলা।

ক্ষেমফলা—উদুম্বর বৃক্ষ।

ক্ষৌদ্র—চম্পক বৃক্ষ।

খয়ের—খয়ের দ্র°।

খয়ের মৌরী ধান—ধান বি°।

খগগড়—তৃণ বি°। পর্যায়—পোটগল, বৃহৎকাশ, কাকেক্ষু Baccharum spontaneum.

খগবক্ত্র—লকুচ বৃক্ষ।

খগশত্রু—পশ্নিপর্ণী, চাকুলে।

[ক্রমশ;

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

২৬

সেদিন দুপুরে চুপ করে বসে আছি দোকানে—বাচ্চা চাকর এসে বলল, আপনাকে ও বাড়ির মা ডাকছেন।

প্রশ্ন করবার আগেই সামনের দিকে নজর পড়ল। জানালার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাপড়ির মা।

আস্তে আস্তে উঠে গেলাম। ওদের দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠলাম। সবটাই কেমন আবছা আবছা, যেন আমি নেই—আমার ভেতরের একটা যন্ত্র ঠেলে চালাচ্ছে—আমি একটা ডামি—মনুষ্য নামধারী পুতুল—

(কি হবে? কি হবে ওখানে গিয়ে⋯কিছুই না—কিছুই না)

—এস। বোস। তোমার কথাই ভাবছিলুম ক'দিন।

সাদা থান, সাদা জামা পরণে স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি। এত ভাল লাগে সেই শুভ্র, পবিত্রতার দিকে তাকিয়ে—যেন পুরুষের কলুষস্পর্শ কখনও পায় নি সেই দেহ।

ভাল লাগে বলেই মনে হয় অবান্তর। ধারকরা রূপ। কি আশ্চর্য মুখোস এরা পরেছে মা, মেয়ে দু'জনেই। মুখোস বলে যা চেনা যায় না। আমাকেও প্রায় বিশ্বাস করে তুলতে চায়⋯

আমাকে সঙ্গে নিয়ে উনি একটি ঘরে ঢোকেন। ছাদটা টিনের, দেওয়াল ছাঁচিবাঁশের আর মেজেটা সিমেন্টের। দোতলার ঘর। এরই এই রকম অবস্থা। ওখানে এমনি ধরণের বাড়ি অনেক ছিল—যেমনি শহর—তেমনি বাড়ি হবে তো—

ঘরে একটা আসবাব নেই, একটুও ময়লা নেই, ঝকঝকে তকতকে মেজে। এককোণে কয়েকখানা কাঁসার বাসন সোনালী হাসি হাসছে। আর একটা কোণ জুড়ে প্রকাণ্ড এক নীচু চৌকী। অনেক ফুলের সমাবেশ দেখে বুঝলাম ওদিকে ঠাকুর আছে—আর ওদিকে তাকালাম না—

—আমি রোজই তোমার কথা ভাবি⋯

(শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। আপনি হয়ত শুনেছেন, আমি খুব বড়লোক, কিন্তু সে ধারণা ভুল। আমার বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রচুর টাকা নিয়েই শেষজীবন বসতে পারতেন, কিন্তু, ঘুষ নেবার অপরাধের শাস্তির হাত থেকে এড়াবার জন্যই তাঁকে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছে)

—তোমার মত ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি ⋯

(কেন? মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। মুখোসটা খুলুন মুখটা দেখি—তারপর নমস্কার করে কেটে পড়ি। আপনি তো জানেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মুখোসের রং না চিনতে পারছি ততক্ষণে আমার শান্তি নেই⋯)

—রোজ ভাবি, তোমাকে ডাকব—ঠিক সুবিধে করতে পারি না?

(কেন! কেন? কেন?)

—কেন? কি দরকার? হঠাৎ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি। এত জোরে যে উনি চমকে ওঠেন।

—কেন আমাকে কি দরকার? তারপরে ভ্রূ কুঁচকে পরম অভদ্রভাবে বলি, আপনি কি ধারে জিনিষপত্র চান।

—না বাবা। উনি মিষ্টহাসি হাসেন, ধার আমি করি না। আজ পর্যন্ত অনেক কষ্ট পেয়েছি কিন্তু কখনও ধার করি নি। সেজন্য নয়। এমনিই। তোমার মুখটা এত স্বাভাবিক যে তোমাকে কাছে ডাকতে ইচ্ছে হয়—কথা বলতে ইচ্ছে হয়। জানই তো স্বাভাবিক লোক পৃথিবীতে খুব কম।

(নিশ্চয়ই জানি। আমার চেয়ে তো আর কে বেশি জানে। কিন্তু কি আশ্চর্য—আমি হলাম স্বাভাবিক। উনি কি পাগল। আমি যদি স্বাভাবিক তবে অস্বাভাবিক কে? কিছুই জানেন না উনি⋯কিংবা জেনেও ভাণ করছেন।)

—আজ দু'মাস হল এখানে এসেছি—প্রথমদিনই তোমাকে দেখে এত ভাল লাগল—

(ভাণ করছেন। কিন্তু কেন⋯কি চান আমার কাছে উনি)

—মনে হল অনেকদিন পরে ঠিক আঠারো বছর পরে একটি মুখ দেখলাম যাকে কাছে ডাকতে ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয় মনের কথা খুলে বলতে⋯

(আশ্চর্য। আমি—বিমান মিত্র—আমি এইরকম একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো মহিলার মুখোসটা ধরতে পারছি না—কি হয়েছে আমার। আচ্ছা, শুনি, উনি কি বলতে চাইছেন)

—জান বিমান, তোমাকে আমার জীবনের সব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। যে কথা পাপড়ির বাবাকেও কখনও বলি নি সে-সব কথাও। পাপড়ির বাবাকে কখনও বলি নি,—আমি খুব ছোট বয়স থেকেই ছেলের মা হতে চেয়েছিলাম—মেয়ে চাই নি—বলি নি—বলতে পারি নি···

(কি বিচিত্র এই মনের খেলা। সত্যিই, পৃথিবীতে অনেক জিনিস আছে যা কল্পনাতেও ভাবা যায় না। আমার নিজের মনটাই বা কি কম আশ্চর্য। কেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর সব কথা—শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হচ্ছে—ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে)

—আমি গ্রামের মেয়ে। গ্রাম মানে অজ পাড়া গাঁ। কাছাকাছি একটা হাট পর্যন্ত নেই। তুমি বোধ হয় হাট কি জান না। সপ্তাহে একদিন করে কাছাকাছি গ্রাম থেকে সব লোক আসে—যার যেটা বেশি হয় সে তা বিক্রী করে দেয়—বিনিময়ে খুবই অল্প পায়। যা পায় তাতেই খুব খুশি।

আমার মনে আছে ছেলেবেলায় সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিষ ভাবতাম নুন। কারণ ঐটেই একমাত্র কিনতে হত। আর সবই নিজেরা তৈরি করতাম।

জ্ঞান হওয়া অবধি সেই সংসারকেই জগৎ বলে মনে করেছি। ঘুম থেকে উঠে গোবরছড়া দেওয়া, উঠোন নিকানো, বাসি এঁটো বাসন মেজে, চান করে এসে আর মুখে একটা পান দিয়ে উনুন ধরানো। গরু-ছাগলকে নিজের একান্ত পরিজন বলে ভাবা, তুলসীতলাকে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

আট বছর বয়সে ঠাকুমা শিবপূজা ধরালেন। এতটুকু মেয়ে—নির্জলা উপোস করতাম। কিন্তু কি ভালই যে লাগত।

দশ বছর বয়স থেকেই বিয়ের চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু না দেবতা, না মানুষ—কারো চেষ্টাতেই ফল হল না—বয়স বেড়ে বেড়ে আঠারো হল। পাড়াগাঁতে সে যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। দিনে দিনে বয়স বেড়ে যাওয়া—যা আমি কিছুতেই বন্ধ করতে পারব না—তারি জন্য দিনরাত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা।

সবার কাছে বকুনি খেয়ে আমি আমার ঠাকুরের কাছে চোখের জল ফেলতাম—ক্যালেণ্ডারের একটি ছবি ঐ আমার ঠাকুর।

শেষে ঠাকুরই সমস্যার সমাধান করলেন—তা নইলে অমন অদ্ভুত ব্যাপার কেন ঘটবে।

আমাদের গ্রামে দত্তরা ছিল গ্রামের কর্তা। সব কিছু ব্যাপারেই ওদের কথা সবাই মানত। সেই দত্তবাড়ির গিন্নী একদিন মাকে ডেকে পাঠালেন। ভয়ে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলেন মা—ঘরে অবিবাহিতা সোমত্ত মেয়ে—ফিরে এলেন নাচতে নাচতে।

আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন দত্ত-গিন্নী। আমাদের ওখান থেকে তিন-চার মাইল দূরে একটি পাত্র আছে। বয়স্ক। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হবে—এতদিন বিয়ে করবে না ভেবেছিল—এখন তিন-চার বছর হল বিয়ের মত হয়েছে—

—আগে দেখুক, তবে তো কথা—ঠাকুমা বললেন।

—মেয়ে দেখেছে। আমার সরলাকে দেখে পছন্দ হয়েছে বলেই দত্তবাড়িতে বলেছে। দত্তবাড়ির মেজকর্তা ওর খুব বন্ধু।

—ওমা। আমার নাতনী তা'লে স্বয়ংবরা হয়েছে—কি লো নাতনী···।

—ও কিছু হয় নি, মা তাড়াতাড়ি বাধা দেন, ও তো জানেই না—সেদিন জল আনতে গিয়েছিল বিলের ধারে—তখন দেখেছে···

কিন্তু মা ভুল বললেন। আমি দেখেছিলাম। বিল পার হয়ে মধুপুকুর। খুব মিষ্টি জল আছে বলে সবাই বলে মধুপুকুর। সেই জল এনে কাসুন্দী করতে হয়। আমি গিয়েছিলাম জল আনতে—দেখি একটা অপরিচিত লোক বিলের পাশে চুপ করে বসে আছে। কৌতূহলী হয়ে তাকালাম—তখনই লোকটি চোখ তুলল। কি অদ্ভুত চোখ দুটি ওঁর। ঠিক যেন আমার ছবির ঠাকুরের চোখ।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে হয়ে গেল। আমার স্বামী ঐ গ্রামেরই স্কুলে কাজ করতেন। লেখাপড়া বেশী শেখেন নি—ম্যাট্রিক পাশ। একটু অন্য ধরণের—সবাই বলত পাগলা ঠাকুর।

বাড়িতে কেউ নেই। উনি একাই থাকতেন। ছোট্ট একখানা ছনের ছাউনি দেওয়া ঘর। কিন্তু বাড়িটা যেন ছবির মত। গ্রামে সব বাড়ির ভিতই তো মাটির কিন্তু এ বাড়িটার ভিতের মাটিটা যেন অন্য ধরণের—সাদা, ধবধবে, চকচকে। সমস্ত বারান্দা জুড়ে রং বেরং-এর লতা, ফুল। ছোট্ট উঠোনের চারিপাশ ঘিরে ফুলের গাছ—তুলসীমঞ্চ। ঘরে নানা রঙের মিকে-মাটির পাত্রগুলির গায়ে ছবি আঁকা।

ফুলশয্যার রাতে আমার স্বামী বললেন, জান, কেন এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করলাম!

চুপ করে রইলাম।

—আমার একটি মেয়ে চাই—একটি মেয়ে···।

জীবনে এই প্রথম পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলছি—লজ্জায় মাথা বুকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল—কিন্তু এই অদ্ভুত দাবীতে মুখ না তুলে পারি না—

উনি তাকিয়ে আছেন দেওয়ালের গায়ে একটি ছবির দিকে। সেদিক তাকিয়েই নিজের মনে বলতে থাকেন, মেয়ে—হ্যাঁ, মেয়ে চাই—এবং তা খুব তাড়াতাড়ি·····

ফুলশয্যার পরের দিন থেকেই আমি সংসারের কর্ত্রী হলাম। দ্বিরাগমন হল না—স্বামী যেতে দিলেন না—এতদিন তো ওখানেই ছিলে, উনি বললেন, এখন তুমি এখানে এসেছ—আর যেতে পারবে না—

ওখানকার সবাই হাসল—বুড়ো বয়সের বৌ তো—গলার মালা।

গলার মালা—হ্যাঁ, ওর গলা কেন মাথার মুকুট হয়েছিলাম—কিন্তু, তা বুড়ো বয়সে বিয়ে করবার জন্য নয়—

ফুলশয্যার রাতে যে কথা বলেছিলেন তাই ওঁর অন্তরের কথা—মেয়ে চাই—একটি মেয়ে চাই—

কয়েকদিন পরে যখন সঙ্কোচ কমে গেছে, হেসে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়ে মেয়ে করছ কেন বল তো। লোকে তো ছেলে চায়।

—মেয়ে কেন চাইছি জান? উনি বললেন, তাহলে শোন, বলি। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকি। আর তখন থেকেই স্বপ্ন দেখেছি একটি স্বর্গীয় হাসি আঁকব। মোনালিসার নাম শুনেছ!

—না।

—মোনালিসা একটি ছবি—একটি মেয়ে হাসছে। নারীর অতল রহস্যময়তার হাসি। আমি আঁকব এমন একটি হাসি—যাতে ফুটে উঠবে নারীর অপার-অরূপ সৌন্দর্য। যে রূপের কণামাত্র নিয়ে সৃজিত হয়েছে উর্বশী, লক্ষ্মী, তিলোত্তমা। সেই সৌন্দর্যের পূর্ণতার ছবি আঁকব আমি।

—তা বেশ তো।

—বেশ তো। বললেই তো হয় না। মডেল চাই। অনেক খুঁজেছি। তখন হঠাৎ একদিন মনে হল—এই কুটিলতাময় পৃথিবীতে কোথায় পাব সেই রূপ—আমি চাই যুবতীর দেহ—শিশুর মুখ।

—মানে? শরীরটি বেড়ে যাবে—আর মুখটা কচি থাকবে···

—না, না, মুখটাও বড় হবে—কিন্তু তাতে পৃথিবীর ছাপ পড়বে না—এমনিতে তো, দেহ বাড়বার আগেই মন বুড়িয়ে যায়—অনেক খুঁজে খুঁজে মনে হল—নিজেই সৃষ্টি করব সেই কন্যাকে—তারপরে তাকে তুলির টানে অমর করে রাখব।

পাপড়ি হবার আগে উনি যা করেছেন তাকে এক কথায় বলা যায় বাড়াবাড়ি। সবাই হাসত ওঁর কাণ্ড দেখে। ঘরনী সব সময়ে সাদা ফুলে ভরে রাখতেন আমাকে পরতে হত লালপাড় সাদা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। সাদা মানে পবিত্রতা—লালপাড় সেই রঙীন হাসি। আরও যা যা করতেন তা মা হয়ে তোমার কাছে বলতে পারি না, বাবা।

সবাই আমাকে বলত ভাগ্যবতী বৌ। উপহাস করত, হিংসে করত। ভাবত আমার জন্যই বুঝি উনি ব্যস্ত—কিন্তু আমিই শুধু জানতুম আসল কথাটা।

সত্য সত্যই একটা মেয়ে হল। উনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, দেখলে তো।

—তুমিই তো ডেকে ডেকে মেয়ে আনলে—তারপর আস্তে আস্তে লজ্জা ত্যাগ করে বললাম, আমার খুব ছেলের সখ ছিল।

—আচ্ছা, আচ্ছা, এর পর যা হবে সব তোমার। দরাজকণ্ঠে বলেন।

—জমিদারী ভাগ করছ বলে মনে হচ্ছে। ঠাট্টা করি।

ঐ একধরণের লোক ছিলেন তো। ঠাট্টাও বুঝতেন না। বললেন, না, না, সত্যিই, আমার আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। এখন এই মেয়েকে বড় করে তোলাই হবে আমার সাধনা—ধীরে ধীরে ওর দেহ ভরে উঠবে যৌবনের রেখা ও রঙে। কিন্তু কোথাও পড়বে না পৃথিবীর ছাপ। ওর রূপে থাকবে প্রকৃতির পূর্ণতা।

ওঁর কথা আমি সব বুঝতে পারতাম না—কিন্তু, তবুও ভাল লাগত।

একদিন আমাকে খুব ব্যস্ত হয়ে ডাকছেন, কি ব্যাপার ভয় পেয়ে ছুটে গেলুম···

—দেখ, কি সুন্দর হাসছে।

—ও। এই। সেজন্য এত চীৎকার। সব শিশুই ঐরকম হাসে।

—হ্যাঁ, শিশুরা হাসে। কিন্তু বড় হলে আর হাসতে পারে না পৃথিবীর উত্তাপে শুকিয়ে যায়। আমরা ওর হাসি বজায় রাখতে চেষ্টা করব।

পাপড়ির যখন ছ'মাস বয়স তখন উনি মারা গেলেন। হঠাৎ একদিনের জ্বরে। মৃত্যুসময়ে বিড়বিড় ... যেন বলছিলেন, আমি মুখের কাছে কান পাতলাম। স্পষ্ট শুনলাম—আমার ছবি—হাসি—পাপড়ি—

ওঁর মৃত্যুর পরে বাবা আমাকে ওদের ওখানে গিয়ে থাকতে বলেছিলেন। ওখানে অনেক ছেলেমেয়ে—না, পাপড়িকে আমি একা মানুষ করতে চাই—উনি যে রকম ভাবে বলেছেন—ঠিক তেমনি ভাবে—

ওঁর কিছু জমানো টাকা ছিল—জমিজমাও ছিল—খাওয়া-পরার কোন কষ্ট হয় না—আমি সংসারের কাজ করি আর সজাগ দু'চোখ মেলে পাহারা দিই পাপড়িকে—

ও যেখানে যায়—আমি সেখানেই যাই—এমন কি ছোট ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও। মেয়েটাও একটু অন্য ধরণের ছিল—আমার কাছেই থাকতে ভালবাসতো।

আমরা দু'জনে দু'জনের বন্ধু।

এইভাবেই বড় হল ও। আর ওর সেই অম্লান হাসি দেখে আমার মন ভরে উঠত—আকাশের দিকে তাকাতাম। মনে হত একাকোণে বসে উনি আমাদের আশীর্বাদ করছেন—

গ্রামের লোকরা বলত—পাগলী। পাগল বাবার পাগলী মেয়ে পড়াশুনোয় খুব মাথা। গ্রামে বসে বসে ম্যাট্রিক পাশ করল তারপরে, এখানে এলাম···

পাপড়ির মা কথা শেষ করেন। ঘরটা অনেকক্ষণ চুপচাপ।

—এখানে কোন আত্মীয়স্বজন নেই?

—না, কে আর থাকবে। সলিল নামে একটি ছেলে ছিল আমার স্বামীর ছাত্র—সে এখানে এই বাড়িটা ঠিক করে দিয়েছে—তা এখন নেই ভাল চাকরি পেয়ে কোথায় চলে গেছে—

—সলিল? ও, সলিল সরকার।

—হ্যাঁ।

তাহলে সলিলের মাথায় পোকাও পাপড়ির বাবাই ঢুকিয়ে ছিলেন। ও, ভদ্রলোক মারা গেছেন—তা নইলে পাপড়ির খোঁজ নিতুম।

পৃথিবীর আরও কয়েকটি মাথায় যদি এমনি পোকা ঢোকাতে পারতেন—তাহলে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হত।

—এ সব কথা আর কখনও কাউকে বলি নি, পাপড়িকে না বললেন, তোমাকে দেখেই মনে হল···

—কেন মনে হল? কি দেখলেন আপনি আমার মধ্যে অসভ্যভাবে চেঁচিয়ে উঠি।

পাপড়ির মা স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন।

—দেখলাম, যা দেখতে শিখিয়েছিলেন আমার স্বামী। দেখলাম একটি চিরন্তন আত্মা।

—আত্মা! আমি জোরে হেসে উঠি। হাসতেই থাকি। আত্মা? আপনি আমার মধ্যে আত্মা দেখলেন—ও তো নেই—মরে গেছে অনেকদিন—আমি তাকে মেরে ফেলেছি নিজের হাতে···

ঠিক সেই সময়ে পাপড়ি ঘরে ঢুকল। আর, আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে হেসে উঠল সেই অপরূপ হাসি।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি সেই হাসির দিকে।

···হাজার হাজার বছরের পুরোন পৃথিবীতে, কত লক্ষ কোটি বছরের বুড়ো সূর্যের আলোর নীচে হয়ত এমনি ভাবে হেসেছে কত মেয়ে—কিন্তু তাদের কারো হাসি কি এমন ছিল···

—আপনি এসেছেন—খুব ভাল লাগছে। পাপড়ি বলে।

[ক্রমশ।
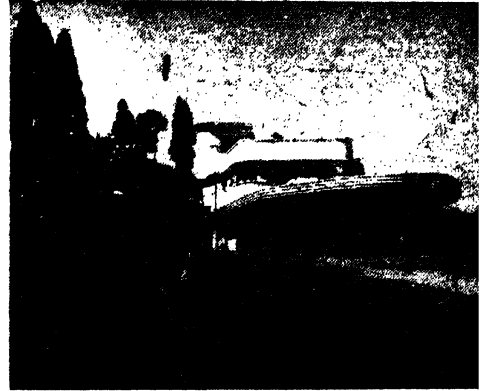
দার্জিলিং স্টেশন

—সুধাবিন্দু বিশ্বাস

মৌখিক

—দেবু দাশ
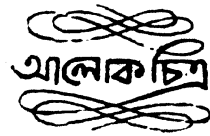
মাসিক বসুমতী

'কার্তিক / '৭০

বিড়ালের রাগ

—মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

লছমনঝোলা

—কেশবরঞ্জন সেন

পাহাড়ী ঝর্ণা

—রামকিঙ্কর সিংহ
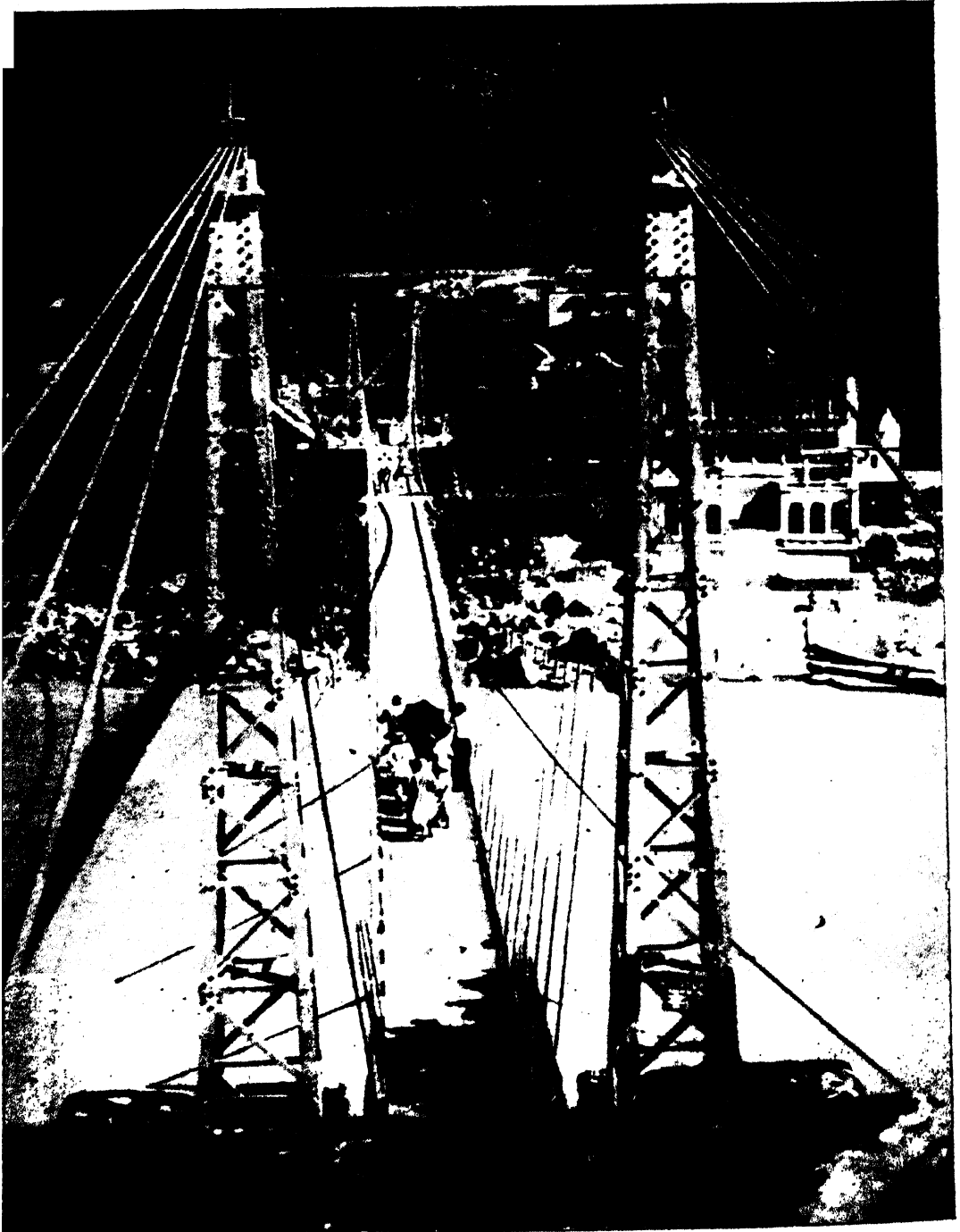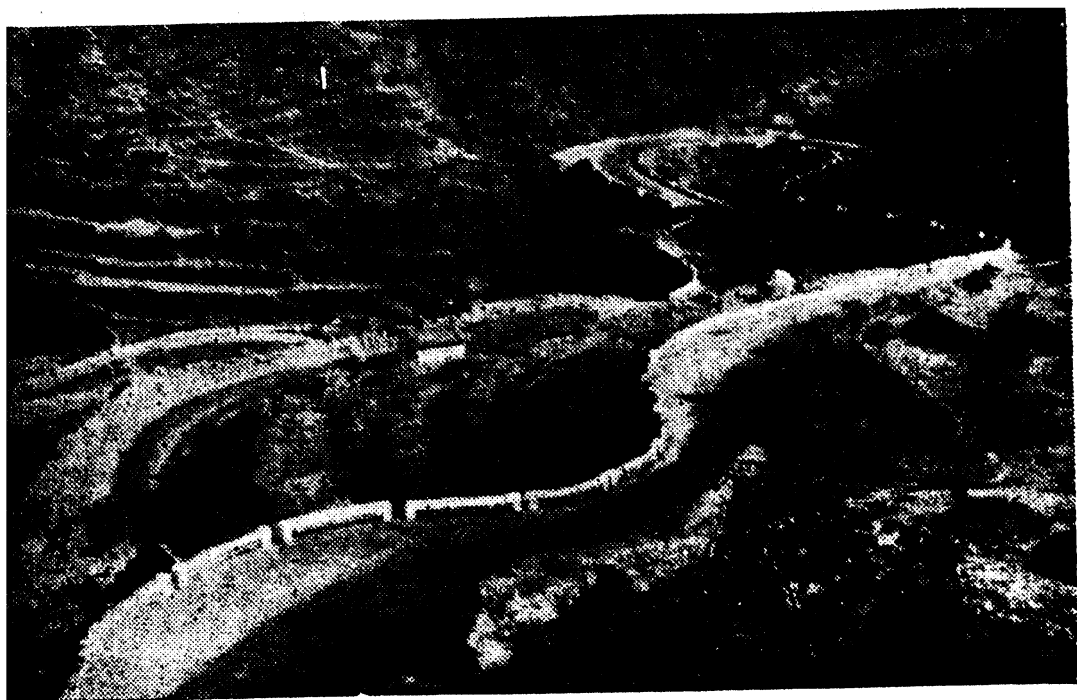
মুসৌরী লুপ্‌

—সত্যেন ঘোষ

শিশুর হাসি

—বৈদ্যনাথ ভড়

শকুন্তলা

বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা বলে যে ক'জন মনীষীকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বললেও বোধ হয় অতিশয়োক্তি দোষ ঘটে না, কারণ আবাল-বৃদ্ধবনিতার হাতে তুলে দেওয়ার উপযোগী ও সেই সঙ্গে সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার মত রচনা সর্বপ্রথম তাঁর দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছিল, আলোচ্যগ্রন্থটি তাঁর রচনা সম্ভারের এক মূল্যবান অংশ। মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য-নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', এর আখ্যানভাগই বাংলায় সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে, ভাষার গাম্ভীর্য ও ভাবের ব্যঞ্জনায় মূল গ্রন্থের রস প্রায় অবিকৃতই রয়েছে এবং এই দুরূহ কর্ম এক বিদ্যাসাগরের প্রতিভাই সম্পাদন করতে সক্ষম, কারণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' পৃথিবীর অমর সাহিত্য কর্ম নিচয়েরই অন্যতম এবং তার উৎকর্ষ এতই বেশী যে অনুবাদের মাধ্যমে তার সম্যক পরিচয় দেওয়া প্রায় অসম্ভব। আলোচ্য রচনায় বিদ্যাসাগরের লিখন প্রতিভার এক সমুজ্জ্বল স্বাক্ষরের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বাংলা ভাষার ধ্রুপদী প্রকৃতিকেও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। সাহিত্যের আসরে এই সব পুরাতন সাহিত্য-কর্মের পুনরুজ্জীবনের যে প্রয়াস দেখা যাচ্ছে তা আশাপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ লিখিত পরিচায়িকা আলোচ্য গ্রন্থের আকর্ষণ সমধিক বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থী ও সাহিত্যজিজ্ঞাসু এতদুভয়েরই পক্ষে এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। আঙ্গিক রুচিস্মিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পরিচায়িকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশনায়—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

ব্রহ্মবিদ্যা

মানুষকে যা অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পরিচিত করে তোলে তাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা। আলোচ্য ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকাটিতে লেখক এই সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন। ভারতের ধর্মীয় শিক্ষকবৃন্দ ও ঈশ্বরানুরাগী মহাপুরুষগণ পরমব্রহ্মকেই আরাধনা করে তাঁতেই লীন হওয়ার সাধনায় জীবনপাত করে গেছেন, এই ব্রহ্মের স্বরূপ যে বিদ্যার সাধনায় মানুষের বোধের সীমানায় ধরা দেয় সংক্ষেপে তাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়ে থাকে, বর্তমান গ্রন্থে এই বিষয়ে যেটুকু আলোকপাত করা হয়েছে, তা থেকে অনুসন্ধিৎসু মনের কৌতূহল কিছুটা মিটবে বলেই মনে হয়। বইটির আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীরামেশ্বর পাল, বি-এ বি টি, ডি, পি, আই সাংখ্যতীর্থ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, দাম—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

নীল-দর্পণ

একদা যগান্তকারী নাটক নীল-দর্পণ, বস্তুত—বহুবিধ উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করলেও সাহিত্যের দরবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা পেয়েছিলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, নীল-দর্পণেরই মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে যে সব রচনা কালজয়ী নিঃসন্দেহে এই নাটক তাদেরই অন্যতম, বস্তুত অপর কোন কিছু রচনা না করে দীনবন্ধু যদি শুধুমাত্র 'নীল-দর্পণ'ই রচনা করে যেতেন তাহলেও তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত। এই উল্লেখ্য নাটকখানি শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর সম্পাদনায় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রসজ্ঞ ও শিক্ষার্থী এই দুই জাতের পাঠকই আলোচ্য গ্রন্থটি হাতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—দীনবন্ধু মিত্র, সম্পাদনা—প্রমথনাথ বিশী, প্রকাশনায়—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা।

ভ্রান্তিবিলাস

ভ্রান্তিবিলাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৬১ সালে। সেক্সপীয়রের মূল রচনা থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর এটি রচনা করেন—প্রধানত বাংলায় নির্মল চিত্তবিনোদনের উপযোগী রচনার অভাব পূরণার্থে। মূল রচনায় যে যে স্থানে শালীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে সে সমস্তই তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) সতর্কতার সঙ্গে বাদ দিয়ে গেছেন। মূল বিষয়বস্তু ছন্দে রচিত একটি নাটক কিন্তু বিদ্যাসাগর কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন গদ্যের মাধ্যমে এবং তা সত্ত্বেও যে কাহিনীর লাবণ্য বা প্রাণশক্তি এতটুকুও ব্যাহত হয় নি তাতেই বোঝা যায় যে তিনি কত বড় শক্তিধর সাহিত্যকার। রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের জনক হলেও প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরই তার ধারক ও বাহক। বাংলা গদ্যে সত্যকার প্রাণ ও শক্তি তিনিই সঞ্চারিত করে গেছেন এবং সেই স্বাক্ষরই সমুজ্জ্বল তাঁর সমগ্র রচনা—যার মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থের নামও উল্লেখ্য। অভিনেতা শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য লিখিত ভূমিকাটি আকর্ষণীয়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

পলাশীর যুদ্ধ

বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা; বাঙালীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাকে দায়ী করতে হয়, পলাশীর যুদ্ধ তার অন্যতম। কাব্যে নাটকে, প্রবন্ধে ও গল্পে তাই পলাশীর যুদ্ধ এত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে,

শিক্ষা ব্যাপারে বহুদিনাবধি জড়িত থাকায় এ সম্বন্ধে তাঁর অধিকারকে প্রামাণ্য বলতেও বাধা নেই এবং সেজন্যই তাঁর রচনা শুধু পাণ্ডিত্যের ভারবাহী না হয়ে প্রকৃতার্থে তথ্যনিষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—হুমায়ুন কবির। প্রকাশক ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

প্রেমের গল্প

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প সংকলন, যদিও সেগুলির লেখিকা একজনই। মিষ্টি ও করুণ কয়েকটি কথিকার মাধ্যমে লেখিকা এক পরিচ্ছন্ন জীবনবোধের পরিচয় এঁকে গিয়েছেন কোন টাঁট্ দেওয়ার চেষ্টা নেই, নেই কোন বিশেষ মতবাদের জটিল ব্যাখ্যা করার অপপ্রয়াস। স্বচ্ছন্দ চিত্তে পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে যেতে পারেন পাঠক, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় সব কটি গল্পের মধ্যেই সুস্পষ্ট—তবু ওদেরই মধ্যে 'শৃঙ্খল' নামে গল্পটি সত্যই অনন্য। যে গভীর শিল্পবোধের সাক্ষাৎ মেলে এই গল্পটির মাঝে, তাতে লেখিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করা চলে স্বচ্ছন্দেই। আমরা গ্রন্থটিকে সানন্দে স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—আশা দেবী। পরিবেশক—ত্রিবেণী প্রকাশনী, কলিকাতা-৯। প্রকাশক—এস, ঘোষ, ১১, দীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা।

বেদনাহত

'অ্যাণ্টন পাভলোভিচ শেখভ' ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যে এক স্মরণীয় নাম; সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন যদিও ছোট গল্পেই তাঁর প্রতিভা সমধিক বিকশিত। আলোচ্য গ্রন্থটি শেখভের এক রচনার বঙ্গানুবাদ। শেখভের জীবন দর্শন এই স্বল্পপরিসর উপন্যাসে বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে, যে নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতাবোধ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক মিশেল যেন তারই প্রতীক; জীবনের অসঙ্গতি ও বিকৃতরূপ মানব দরদী সাহিত্যকারকে গভীরভাবে পীড়া দিয়েছে বারবার এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে; বর্তমান গ্রন্থ ও সেই একই ব্যর্থতাবোধের স্বাক্ষরবাহী যে সমাজ জীবনের পটভূমিতে শেখভ রচনা করে গেছেন, আজ আমাদের স্বদেশের পটভূমি প্রায় সেই পর্যায়ভুক্ত এবং সেজন্যই আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাঙালীপাঠকের মনে সাড়া জাগায় সহজেই, অনুবাদক তাঁর কাজে সম্পূর্ণ সফল, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে ভাষান্তরিত করায় মূল কাহিনীর রস অব্যাহত থেকে গিয়েছে। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অ্যাণ্টন শেখভ। অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক, প্রকাশক—জ্ঞানতীর্থ, ১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

মন চল দেবভূমে

আলোচ্য গ্রন্থটি রম্যরচনা জাতীয়, লেখকের হিমালয় ভ্রমণ কথা বস্তু এর মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু রাগ-সঙ্গীতের বিস্তার যেমন মূল সঙ্গীতকে ছেড়ে বিস্তৃত হয় বারবার তেমনই লেখক বহু ঘটনা ও মানুষের মিছিলে আবর্তিত হয়েছেন বারবার, পথ চলার গান তাঁর স্বরে উঠেছে রূপে-রসে-ছন্দে। সহজ ও আরামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছেড়ে দুর্গম পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন লেখক হিমালয়ের আকর্ষণে, যে আকর্ষণে ঘর ছাড়ে রাধা হিয়া বোধ হয় এই সব প্রকৃতি পূজারীরাও সেই আকর্ষণই অনুভব করেন হিমালয়ের প্রতি, নচেৎ কেন তাঁদের এ দূরাভিসার? ভ্রমণের আনন্দ যেন সঞ্চারিত করে দেন লেখক কি এক অবিশ্বাস্য মন্ত্রবলে পাঠক মনেও, বইটি পড়তে পড়তে মন ছুটে চলে তুষারমৌলী নগাধিরাজের রাজ্যের পথে পথে, সেই চির তুষারের রাজ্য অপার্থিব মহিমায় কি যেন প্রবল বাঁধনে বেঁধে ফেলতে চায় সমস্ত দেহ মন প্রাণ। লেখার রমণীয়তাকে রম্যতর করেছে সুন্দর ও মূল্যবান ফটোগ্রাফগুলির সমাবেশ; নয়ন ও মন এ দুই বস্তুই সমানভাবে পরিতৃপ্ত হয় বর্তমান গ্রন্থটি পাঠে। বইটি পড়ে আমরা আশাতীত আনন্দ পেয়েছি একথা অনস্বীকার্য। বইটির আঙ্গিক রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—প্রবোধ দে, প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা—৭, দাম—ছয় টাকা।

রঙ্গ-চিত্র

প্রবীণ সাহিত্যকারের এই রচনা সংকলনটি নানা কারণেই উল্লেখ্য, আলোচ্য রচনাগুলি প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের স্মৃতিচারণ, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই কিছুটা বিতরণ করেছেন লেখক এর মাধ্যমে। এজন্যই রচনাগুলি বিভিন্ন জাতের, এর কতকটা গল্প, কতকটা প্রবন্ধ, কতকটা নাটকীয়তা ও কতকটা রম্যরচনা জাতীয়। মূলত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সমাজসংস্কারমূলক; মনে হয় সমাজের নানান অসঙ্গতি ও গ্লানির বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযান এবং সেই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্যই তিনি রঙ্গ-রসের মাধ্যমে আপন মতবাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলেই আলোচ্য রচনাসমূহের প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব। লেখকের আন্তরিকতায় রচনাগুলি সত্যই উপভোগ্যতায় রমণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—পরিমলেশ্বর কালিদাস রায়, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

চেরী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক সংক্ষিপ্ত আকৃতির কাব্য সংকলন, তরুণ কবির তারুণ্য কাব্যগুলি প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছে; গভীর কোন অনুভূতির ইঙ্গিতের স্বাক্ষরবাহী না হয়ে তাই এরা মনের সহজ আনন্দকেই বিকশিত করে তোলার পক্ষপাতী। নির্জন অপরাহ্নে অলসভাবে বিশ্রাম করতে করতে কাব্যগুলিতে মগ্ন হওয়া যায়, প্রায় ছোট গল্প পড়ার অনুভূতি জাগে, যে গল্প মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর বন্ধনকে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করে দেয়। সাহিত্যের আসরে অপেক্ষাকৃত নবাগত হলেও বর্তমান রচনার মাধ্যমে কবি তাঁর প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ভবিষ্যতের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছেন। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক শোভন। লেখক—সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক—বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—দুই টাকা।

কিংশুকরাগিনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

১২

রাগিণীর ভারি রাগ হল। সেই যে 'ডুইংরুমসীন্' দেখবার জন্য আসি বলে গেল আর পাত্তা নেই। দু'দিন লোক পাঠিয়েছে নিজেও একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে। দেখা মেলে নি।

দিন কয়েক বাদে একদিন বিকেলে তনুকা এসে হাজির হল।

—তুই তো আচ্ছা মেয়ে, তারপর থেকে আর পাত্তা নেই।

—বিশ্বাস কর গিনী মোট্টে সময় পাই নি। মরবার ফুরসুৎ ছিল না।

—কি এমন রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলে যে মরবার ফুরসুৎ অবধি ছিল না? তা আজ কই বা মরবার ফুরসুৎ মিললো কি করে?

—আজকেও যদি না মেলে তাহলে তুই মেরে ফেলবি বলে। তাছাড়া বীরু আজ বিকেলের ট্রেনে—।

—বীরু। বীরু কে?

তনুকার খেয়াল হল রাগিণীকে কিছুই বলা হয় নি। বললে—তুই তো কিছুই জানিস্ না।

—না বললে জানবো কি করে? বীরু কে?

—মহাবীর।

বিস্মিত হয়ে রাগিণী বললে—মহাবীর। আমাদের ঐ মুটকে—।

তনুকা মুখভার করে বললে—তা সবাইকে যে মুটকো হতে হবে এমন কোন কথা আছে। মোটা রোগা কি কেউ ইচ্ছে করে হয়। ওর কন্‌স্টিটিউশনই ঐ রকম। বাবা এগজামিন করে দেখেছেন।

রাগিণী লজ্জিত হয়ে তনুকার একখানা হাত ধরে বললে—না, না আমি সে ভাবে—বিশ্বাস কর তনু। রাগ করলি—। আমি জানতুম না। বল, রাগ করিস্ নি।

—না তুই বলে নয়, সবাই ঐ কথা বলে। সেদিন বাপিও ঐ কথা বলে ওকে অপমান করলে। আমার তখন ইচ্ছে করছিল গিয়ে প্যাঁকচুন্নীটার চোখ দুটো গেলে দি। দাঁড়া না, এরপর কেমন চোখ টাটিয়ে মরে দেখিস্।

যেন অন্যায় কিছু জিজ্ঞেস করছে এমনভাবে রাগিণী বললে—কেন?

—পেত্নীটা শুনেছে যে দু'লাখ টাকার মালিক তার ওপর যখন মাস তিনেক বাদে ওকে দেখবে তখন ডেলা চোখ প্লেন হয়ে যাবে। বাবা বলেছেন কায়কল্প করিয়ে ওর চেহারার ভোল পাল্টে দেবেন।

রাগিণী চোখ বড় বড় করে বললে—তাই হয় বুঝি!

—হয় না, কায়কল্পে সব হয়।

—কায়কল্প কি রে?

—কায়কল্প কি জানিস্ না।

—কি করে জানবো? কি ব্যাপার আমায় গোড়া থেকে খুলে বল

—ও হ্যাঁ, তোকে তো কিছুই বলা হয় নি।

—সেইদিন ডুইংরুমসীন্ দেখেছিলি?

—তা আর দেখি নি। হ্যাঁ রে, কাজল আসে।

—না এসে যাবে কোথায়?

—দুধ আর তামাক দুইই খেতে চায়।

—খাওয়ার কথা থাক দেখার কথা বল।

তনুকা সব শুনিয়ে বললে—সেই সময় বীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল। ঠিক ওমনি ভাবে ভালবেসে আমিও তো প্রতিদানে আঘাত পেয়ে ফিরে গেছি। সে যে কি কষ্ট তা বলে বোঝান যায় না। ও যখন গাছতলায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলে আমার নিজের চোখও তখন শুকনো ছিল না। সেই মুহূর্তে ওকে আমার পরম আপনার বলে মনে হল। মনে মনে ওকেই আত্মসমর্পণ করলাম। বল অন্যায় করেছি।

এ কথায় জবাব না দিয়ে রাগিণী বললে—খুব ভাল লাগছে না রে!

তনুকা কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে জানিয়ে বললে,—তুইও যদি আমার মত খুশিতে থাকতিস তাহলে আরও ভালো লাগত।

—একটা কথা বলব রাগ করবি না, বল।

—রাগ কেন করব তুই বল।

—ভুল করিস নি তো। আগে যেমন ভুল করে দিলে—।

—না, এবার যে ভুল করি নি সে বিষয়ে আমি তোকে লিখে দিতে পারি।

—তাহলেই হ'ল।

—ও ভারি ভাল রে। একটু মোটা সত্যি ঠিক।

সান্ত্বনা দিয়ে রাগিণী বললে—তাতে কি! সবাইকে যে রোগা হতে হবে এমন কি কোনও কথা আছে। তারপর মেসোমশাই তো বলেছেন যে—কি করবেন যেন।
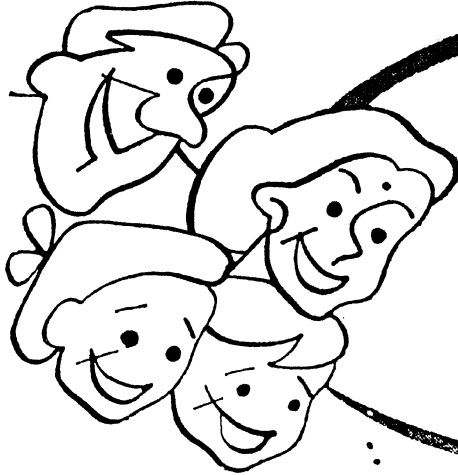
—কায়কল্প।

—হ্যাঁ, কায়কল্প করবেন, তাতেই তো চেহারা পাল্টে যাবে।

আদি

মিল্ক অফ্

ম্যাগনেসিয়া

পরিবারের সকলের
পক্ষেই আদর্শ

বিরেচক-অম্লনাশক

এই নিশ্চিত উপায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হচ্ছে!

• কেবলমাত্র **একটিই** খাঁটি ফিলিপ্স মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়া আছে—সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক যে অম্ল-নিরোধক কোষ্ঠ পরিষ্কারক ওষুধটি জানেন ও ব্যবহার করেন। কোষ্ঠকাঠিন্য ও তার উপসর্গ থেকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্যে মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়ার চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।

GENUINE
PHILLIPS'
MILK OF MAGNESIA
CONCENTRATED LIQUID MAGNESIA
STERLING PRODUCTS INTERNATIONAL
SHAKE WELL BEFORE USING
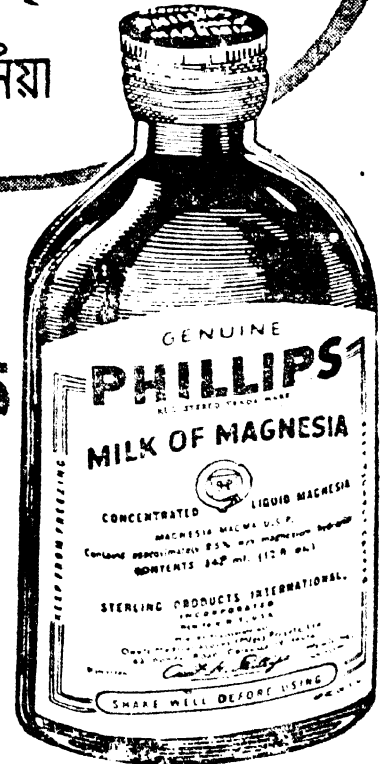
প্রস্তুতকারক রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী: দে'জ মেডিকেল স্টোর্স (ম্যানুঃ) প্রাঃ লিঃ

IPB/MOM—L-1/64/B

—ওর যা জ্ঞান না, তোকে কি বলব ? কত যে পড়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। সাত্যিই ভাই বি-এ, এম-এ, পাশ করলেই জ্ঞান বাড়ে না। বীরু যখন কথা বলে আমি অবাক হয়ে শুনি। নিজেকে ওর তুলনায় ভারি খাটো মনে হয়।

—ওই তোকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে।

—তাই তো নিচ্ছে। বললে ভাবি তনুটা চাল মারছে, কাল ওর সঙ্গে এমন সব কথা বলেছি যা' পরে ভেবে নিজেই অবাক হয়ে গেছি। এ-কথা বললে কে আমি! পরে বুঝলুম এ ওরই কাছ থেকে পাওয়া। সে-সব কথা শুনলে তুইও অবাক হয়ে যাবি।—

এখন কাজের কথায় এস, খাওয়াচ্ছ কবে।

—খা না, আজকেই খা। কি খাবি বল।

—উঁহুঁ সে খাওয়া নয়। বিয়ের খাওয়া।

তনুকা মাথা দুলিয়ে বললে—তা হচ্ছে না। এমনি খেতে চাও খাওয়াতে পারি, যাকে তোমরা বিয়ে বল তা' আমাদের বেলায় হবে না।

বিস্মিত হয়ে রাগিণী বললে—তবে কি হবে ?

—দেখতেই পাবি। তবে লোকে যাকে বিয়ে বলে তা যে হবে না সে-বিষয়ে ডেড্ সিওর থাক। কাল পাকা কথা হয়ে গেছে। আনন্দদা'র বিয়ে। তার সঙ্গে আজ কলকাতায় গেল বিয়ের বাজার করতে। তাই আজ সময় পেলুম তোর কাছে আসবার।

—কি কথা হ'ল শুনি।

তনুকা একটু চুপ করে থেকে লজ্জিত হয়ে বললে—ধ্যেৎ আমি বলতে পারবো না, লজ্জা লাগছে।

—আহা: আমাকেও তোর লজ্জা!

—না গিনী, সত্যিই আমার ভারি লজ্জা লাগছে।—বলে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বললে—তুই শুনে ছেলেমানুষ ভাববি।

—ভাববো না তুই বল।

তনুকা মুখ ঢাকা অবস্থাতেই বললে,—পারবো না। আমার লজ্জা লাগছে।

—রাগিণী একটু চুপ করে ভেবে বললে—তাহলে অজিত রায়চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করি।

—তাই কর উনি সব জানেন।

(অজিত রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন)

সন্ধ্যা হয়-হয়। আকাশের এখানে-ওখানে লাল রং তখনও লেগে আছে আর তারই ছায়া পড়েছে জুবিলীট্যাঙ্কের বুকে।

ট্যাঙ্কের আশেপাশে চওড়া বাঁধান রাস্তায় বহু লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বসে গল্প-গুজব করছে। ট্যাঙ্কের দক্ষিণ দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, কর্তৃপক্ষ ঐদিকে গোটা কয়েক ঝোপ-ঝাড় করে রেখেছেন। কি উদ্দেশ্যে ঐ নিরিবিলি জায়গায় ওগুলো করা হয়েছিল তা জানি না তবে বর্তমানে ওগুলো কাজে লাগছে। স্টুডেন্টরা ঐ জায়গাটার নাম দিয়েছেন লাভার্স গ্রোভ, সিনিকেরা বলে ম্যানস্ গ্রেভ, ফচকেরা নাম দিয়েছে মদনদা'র খুপরী।

মহাবীর ও তনুকা এরই একটা দখল করে বসেছিল। তখনও আশেপাশে লোকজন চলাচল করছিল এবং ভাল করে সন্ধ্যা হয় নি বলে দু'জনে ঘন হয়ে বসতে পারে নি। মহাবীর পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে পুড়তে পুড়তে আগুন যখন কাঠিটার শেষপ্রান্তে এল তখন ফেলে দিয়ে বললে—তনু, এই কাঠিটা যেমন আস্তে আস্তে আগুনে পুড়ে গিয়ে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেললে আমরাও তেমনি ভালবাসার আগুনে আস্তে আস্তে পুড়ে গিয়ে নিজেদের ক্ষইয়ে ফেলব।

—ক্ষইয়ে ফেলব কেন ? ক্ষইয়ে ফেললেই ত' পুড়ে যাবে।

—না তনু, ক্ষওয়া মানে পুড়ে যাওয়া নয়। ক্ষওয়া মানে এগিয়ে যাওয়া। জুতো ক্ষয়ে যায়, ইট মীনস্ আমরা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। না হাঁটলে জুতো ক্ষইবে কি করে। তেমনি নিজেদের ভালোবাসার আগুনে ক্ষইয়ে ফেলা মানেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। মৃত্যুই তো বার বার জীবনকে পূর্ণতা দান করে।

—তুমি আমায় কত ভালোবাস বীরু!

—কত ভালবাসি! তনু, তোমার ভালবাসা আমায় পাগল করেছে, আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, ডিসপেপসিয়া ধরিয়েছে। আমি এখন ভাত খাই নে, গোলাপী লাড্ডু খাই। কট্ কট্ করে কামড়ে গোলাপী লাড্ডু খাই, মনে হয় তোমাকে যেন চিবিয়ে খাচ্ছি।

—সে কি!

—হাঁ তনু! তোমাকে আমার চিবিয়ে খেতেই ইচ্ছে করে।

তখন নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

গুরুদেব কি চমৎকার ভাবেই না বলে গেছেন।

—গুরুদেব বেশ লিখতেন না ?

—নিশ্চয়।

—আমার ইংরেজী কবিতা মনে পড়ে গেল, যেটা সেদিন তুমি বলেছিলে।

—না না, ইংরেজী নয়।

—তুমি আজকাল ইংরেজী কথা খুব কম বল, কেন বল দেখি।

—কি জান ইংরেজীতে কথা বলা যায় কিন্তু ভালবাসা যায় না। মনে হয় যেন ইণ্টারপ্রেটারের থ্রু দিয়ে কথা বলছি। কি কবিতার কথা বলেছিলে ?

—না থাক তুমি ঠিকই বলেছ ওতে ভালবাসা যায় না, কেবল কথা বলাই যায়।

—না তুমি বল, আমার এখন কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। কার কবিতা বলেছিলুম।

—ডেভিসের।

—জান, ড্যাফোডীর গোলকীপার-এর নাম ছিল ডেভিস।

—তা তো জানতুম না,—বলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে মহাবীরের দিকে চেয়ে থেকে বললে—বীরু তুমি জ্ঞানের নলেজের স্টোর হাউস। এত জ্ঞান তুমি রাখ কোথায় ?

—ঠিক এই কথাই এক কবিরাজ, না তোমার বাবা নন অন্য একজন আমায় প্রায়ই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তুমি অমিত প্রতিভাধর এত প্রতিভা এই দেহে কি করে সম্ভব। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও তিনি তোমায় এত দিয়েছেন। আমি কেঁপে উঠেছিলুম তাঁর কথা শুনে। মানুষ কেন কথায় কথায় ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। এর চেয়ে বড় পাপ যে মানুষের আর কিছু নেই তা কি সে

জানে না। কোনও দিনই কি মানুষের ভগবানের হাত থেকে মুক্তি হবে না।

—বীরু তোমাকে যতই দেখছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি। তুমি আমার কাছে পিরামিডের মত বিস্ময়। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত ভীষণ। তোমাকে নিয়ে আমি কি করব।

আঁধার নেমে গেছে। মহাবীর হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে তনুকাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে—কি করবে তা জানি নে তবে আর কিছু না পারো মৌন থেকো। মন থেকে মনে কথা যাবে যার দাম মুখের কথার চেয়ে অনেক বেশি।

—বেশ তাহলে এখন থেকেই বন্ধ হলো কথা, আজকের মত, এ জীবনের মত।

—তাই হোক কথা বন্ধ হোল, মন খোলা রইল, হাত ধরা থাকল।

দু'জনেই চুপ করে রইল। আশেপাশের কলরব আর মশার গুন্‌-গুন্‌ শব্দ কানে আসতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে মহাবীর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করলো। কিছুক্ষণ বাদে আবার—হাঃ, হাঃ। হিস্‌, হাঃ।

তনুকা ভয় পেয়ে গেল—সাপখোপ নয় তো, বললে—কি?

অন্যদিক থেকে জবাব নেই দেখে তনুকা আবার বললে—কি গো, বল না, বাবা, কথা বলবে না তো বলবেই না। যদি না বলো আমি চলে যাবো। সত্যিই যাবো কিন্তু, জন্মের মত চলে যাবো, বলবে না, তো, অসভ্য। তবে চললুম। বলে উঠে দাঁড়াল।

মহাবীর হাত ধরে বসিয়ে বললে—ইঁদুর কিঁচুর হবে। বোস। তা আমার [illegible] নইলে নয়। এই না বলে এ জীবনের মত কথা বন্ধ।

তনুকা হেসে বললে—এ জীবন তো আমার শেষ হয়ে গেছে।

মহাবীর বিস্মিত হয়ে বললে—শেষ হয়ে গেছে! কবে থেকে?

—যবে থেকে তোমাকে পেয়েছি।

মহাবীর নিবিড়ভাবে তনুকাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বললে—অপূর্ব, অনুপম, বিউটিফুল, নো ওয়াণ্ডারফুল। তবু তোমার তুলনা নেই।

তনুকা মহাবীরের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রেখে বললে—বলতে পারো কেন তোমাকে গাল দিলাম। কেন ঝগড়ার সুর বেজে উঠল আমার কণ্ঠে!

—আমি কিন্তু এইটেই চাইছিলাম। তুমি আমায় গাল দেবে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার বড় ভাল লাগে।

—ঝগড়া করতে ভালো লাগে! তুমি কি বলছ ঠিক?

—ঠিকই বলছি। ঝগড়াই যদি না হবে তাহলে বুঝব কি করে যে আমরা বেঁচে আছি। শান্তিতে থাকা, তাকে তো বাঁচা বলে না, পড়ে থাকা বলে। যেমন দু'টো পাথরের স্ল্যাব পড়ে থাকে। প্রাণ যার আছে গতিবেগও তার আছে আর গতি থাকলে ক্ল্যাস বাঁধবেই, ওটা প্রকৃতির নিয়ম। আগেকার তরুণ-তরুণী পড়ে থাকতো এখনকার তরুণ-তরুণীরা বেঁচে থাকে কারণ তারা 'এ্যাংগ্রি ইয়ং মেন এণ্ড উইমেন।'

তনুকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—বুঝেছি, বুঝেছি। ঝগড়ার কথা বল, বাঁচার পাঁচালী শোনাও।

—তুমুল ঝগড়া হবে আমাদের, আমি হয়ত ধাক্কা মেরে তোমায় ফেলে দেবো, কপাল কেটে গিয়ে রক্ত পড়বে তীব্রবেগে তোমার মুখ বেয়ে বুক বেয়ে, আস্বাদ করবে নিজের রক্তের, মা কালীর মত রক্তের তৃষ্ণায় সংহারের তৃষ্ণায় তুমি মেতে উঠবে।

—আমাদের দেবতাদের মধ্যে মা কালীকে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

—কেন বল দেখি?

—বোধ হয় তার শক্তি দেখে।

—না।

—তবে?

—উনিই একমাত্র দেবী যিনি বুঝেছিলেন নগ্নতাই নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।

মহাবীর এ কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তনুকার দিকে চেয়ে রইল তারপর অনেকক্ষণ বাদে বললে—তনু, তুমি আমার কাছে সমুদ্রের রহস্য নিয়ে জেগে উঠেছ। শুকদেবের পর নগ্নতার এত বড় কমপ্লেমেণ্ট আর কারুর মনে জাগে নি। তাই তো তোমার উদ্দেশে আমি বার-বার বলি—

গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।

—এ যে শেষের কবিতার লাবণ্যের উক্তি।—বলে বিষাদের সুরে বললে—বেচারী লাবণ্য! অমিতের সঙ্গে ওর বিয়ে হল না।

—সেই জন্যই ত' ওদের জীবন ধন্য হল। তুমি কি চাও আমাদের বিয়ে হোক সাধারণের মত।

তনুকা সমস্যায় পড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বললে—তুমি কি চাও না?

—না তনু চাই না। আর এ-ও জানি তুমিও সেটা কামনা কর না। সাধারণের মত পুরুত আসবে না শিলা নিয়ে, লোকে ভোজও খাবে না, আমাদের মিলনের কথা জানবে উন্মুক্ত আকাশ বিরাট পৃথিবী আর দু'টি মন। আমাদের হবে মিলন, লোকে যাকে বলে বিয়ে তা-ও বলতে পারো, তবে তার আগে ইনটেলেকচুয়াল কথাটা যোগ করতে হবে। ইনটেলেকচুয়াল ম্যারেজ। আমাদের বাইরের কোন পরিবর্তন হবে না; তোমার নামের আগের 'মিস্‌' কথাটা মিশিয়ে যাবে না, আমার পদবীও তোমার সঙ্গে জুড়বে না। কিছুই হবে না, হবে শুধু মিলন। মাইণ্ড ইট। বিয়ে নয় মিলন। য়্যাণ্ড নো সানাই, নো পাতা পেতে ভোজ খাওয়া।

(অজিত রায়চৌধুরীর বলা শেষ হল)

তনুকা মুখ তুলে রাগিণীকে বললে—তুই হাসছিস্‌ গিন্নী! ছেলেমানুষ ভাবছিস্‌।

—ভাল লাগছে রে। বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করলো। ছেলেমানুষ নইলে কি প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায়।

—তনুকা আশ্বস্ত হয়ে বললে—এখন তুইই বল, এরপর ওকে কি করে বলি, সাধারণের মত আমাদের বিয়ে হোক সবাই পাতা পেতে লুচিমণ্ডা খাক। বলা যায়, বল?

—না না, ওকথা মুখেও আনিস্‌ নি। মহাবীরবাবু দুঃখিত হবেন।

[ক্রমশ।
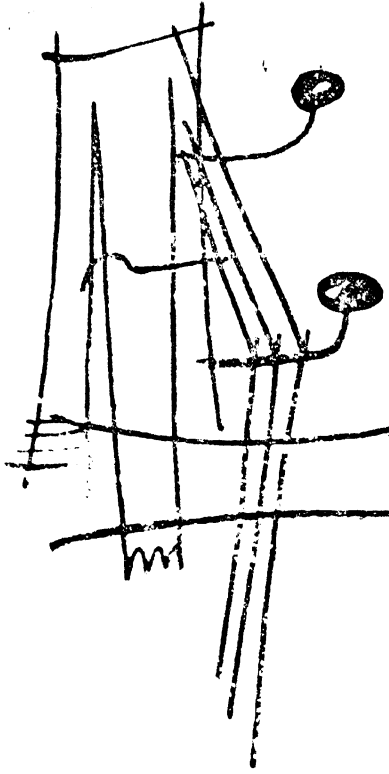
বাংলার লোকসাহিত্যে প্রেম-সঙ্গীত

মনিরুল ইসলাম

প্রেম মানুষের জীবনে চিরন্তন এবং শাশ্বত। প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রেম ছাড়া প্রাণী-জগতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব নয়। অবশ্য প্রেমের প্রকৃতি ও রূপ বিভিন্ন হতে পারে।

প্রেম-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া নরনারী পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের অনুভূতি ব্যক্ত করিয়া থাকে। লোকসঙ্গীতের মধ্যেই প্রেম-সঙ্গীতের অভিব্যক্তি বেশী। আদিম সমাজে জৈব প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই প্রেম-সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছিল। তখন মানুষ নানারূপ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিত। ফলে নৃত্যেরও এক সময় উদ্ভব হয়। তাই প্রেম-সঙ্গীত ও নৃত্যকলা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আদিম সমাজেও নৃত্য সঙ্গীতের সহচর ছিল। আজ সভ্যযুগে প্রেম-সঙ্গীত ও নৃত্যকলা যদিও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির রূপ পরিগ্রহ করেছে তবুও পরস্পর পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজকাল প্রেম-সঙ্গীত ভাবানুভূতি দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

দেশ কাল পাত্র ভেদে প্রেম-সঙ্গীতের ভাষা বিভিন্ন হলেও এদের মূলসূত্র একই। ভাবের দিক দিয়া আমাদের দেশের প্রেম-সঙ্গীতগুলি অন্য দেশের প্রেম-সঙ্গীতের সহিত তুলনীয়। অরণ্যের আদিম অধিবাসী ও নগরের সুসভ্য নাগরিক সকলেই একই ভাবানুভূতি দ্বারা প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। ইংরেজ কবি ব্রাউনিঙের একটি প্রেম-সঙ্গীত আমাদের দেশের প্রেমানুভূতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

> Come by this road : go by that road,
> As you journey, hold in your mind the image
> of your darling,
> And let that love be seen in your eyes.

প্রেমের এই অনুভূতি মানুষের মনের সুগভীর তলদেশে বিরাজ করে। এর মত আন্তরিক অনুভূতি আর কিছুই নাই। তাই সব প্রেম-সঙ্গীতই একই ভাবাদর্শে একই স্পর্শ কাতরতায় গাঁথা। যেখানে অন্তরের রাজা মানুষের—মানুষের সেখানে ভেদাভেদ নাই, কোন বৈষম্য নাই। সেইজন্য প্রেম-সঙ্গীতগুলি সমগ্র

জগদ্ব্যাপী একই অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত। একমাত্র ভাষাগত দুর্বোধ্যতা এই সর্বজনীন রসোপলব্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে। তা না হইলে সর্বদেশের সর্ব কালের প্রেম-সঙ্গীতের মূল ভাবগত ঐক্য একই। ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আদিবাসীর প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে সভ্য জগতের প্রেম-সঙ্গীতের ভাবের মাধুর্য একই ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণত অবসর সময়ে মানুষের মনে প্রেম-সঙ্গীতের উদয় হয়ে থাকে। যখন দুপুর বেলায় কোন কৃষক মাঠে কাজ করিতে করিতে গাছের তলায় বিশ্রাম নেয়, তখন গেয়ে ওঠে :

ওরে বন্ধু, আর কি বলিব তোরে
ও তুই অল্প বয়সে পীরিতি শিখায়ে
রহিতে না দিলি ঘরে।

কিম্বা নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মাঝি যখন অথল বৈঠাটি সোজা করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে তখন গেয়ে ওঠে :

আমি তো নূতন মাঝি
বাইতে জানি না,
জলে ঢেউ দিও না।
সব সখীকে পার করিতে
লিব আনা আনা
বেউল্যা সুন্দরীকে পার করিতে
লিব কানের সোনা॥

এই হল আমাদের বাংলা দেশের প্রেম-সঙ্গীতের ভাবব্যঞ্জনা। সমস্ত দিনের কর্ম হইতে অবসর লইয়া যখন কেহ তার ক্লান্ত দেহ সবুজ ঘাসের উপর এলাইয়া দেয় তখন মনের মধ্যে আপনা আপনি পল্লীজীবনে প্রেম-সঙ্গীতের উদ্ভব হয়। এতে মন ও প্রাণকে আবার কর্মে প্রেরণা জোগায়। গৃহে তার কোন মানসী কন্যার ছবি এঁকে মনের মধ্যে সান্ত্বনা পায়।

বাংলা দেশের প্রেম-সঙ্গীতের একটা বৈশিষ্ট্য হল—অধিকাংশ প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে নারীমনের অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের গায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ। নারীমনের নিগূঢ় অনুভূতি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া পুরুষগণই ব্যক্ত করিয়া থাকে।

বাংলার প্রেম-সঙ্গীত সাধারণত ভাটিয়ালী সঙ্গীত। পূর্ববঙ্গে ইহার প্রচলন বেশী। এই সব সঙ্গীতের বিশেষ কোন তাল নাই। তবে সুরের মধ্যে মাধুর্য আছে। ভাটিয়ালী সঙ্গীত নৌকার মাঝিদের মধ্যে অবসর সময়ে ইহার বেশী প্রচলন। তবুও গ্রামের পথে পথে বা নদীর ধারে বসে লোকের মুখে সাধারণত এই ভাটিয়ালী সঙ্গীত শোনা যায় :

ওই ভরা নদীর বাঁকে
কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে
সেথায় বন্ধু থাকে লো
সেথায় বন্ধু থাকে।

পূর্ববঙ্গে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র বহু অংশ প্রেম-সঙ্গীত রূপে গাওয়া হয়ে থাকে। নিম্নের এই প্রেম গীতিটি পূর্ববঙ্গে বেশী প্রচলিত :

আমার বাড়ি যাইও রে বন্ধু, বসতে দিব পিঁড়ে।
জলপান যে করতে দিব শালি ধানের চিঁড়ে॥
শালি ধানের চিঁড়ে নারে বিন্নি ধানের খই—।
বাড়ির গাছের শবরীকলা গামছা বান্ধা দই॥

এই সব সঙ্গীতের মধ্যে প্রাণে এক সূক্ষ্ম আবেশ ও অনুভূতি জন্মে। তাছাড়া পল্লীজীবনের একটি চিত্রও ফুটে ওঠে।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অনেক সুপরিচিত অংশ আজকাল বাংলা দেশে প্রেম-সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়ে থাকে। এই প্রেমগীতিগুলিতে স্বাধীন প্রেমগীতির মত স্বচ্ছল ভাবানুভূতি নাই। ইহার একটি প্রশ্ন ও উত্তরবাচক :

নারী :—কঠিন তোমার মাতাপিতা
কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যৈবনকালে না করাইছে বিয়া।
পুরুষ :—কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন
আমার হিয়া।
তোমার মতন নারী পাইলে আমি করি বিয়া॥
নারী :—লাজ নাই রে নির্লজ্জ ছেলে
লজ্জা নাই রে তোর—।
গলায় বান্ধিয়া কলস জলে ডুইব্যা মর॥

সাম্প্রতিক লণ্ডন সফরকালে 'বিচিত্রা'র অনুষ্ঠানে যোগদানরত বিশ্বসঙ্গীত সভায় বাঙলার দুই কীর্তিমান সন্তান পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ওস্তাদ আলী আকবর। বিচিত্রার প্রযোজক শ্রীবিনয় রায়কে মধ্যস্থলে দেখা যাচ্ছে

পুরুষ :—কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা,
কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাং, আমি ডুইব্যা মরি ॥'

ভাবগৌরবে এই পদ কয়টি বেশ সুন্দর আর প্রাণোজ্জ্বল।

প্রেমের মধ্যে যখন নৈরাশ্যের ভাব ফুটে ওঠে তখন সেই ভাব সঙ্গীতের ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে। তাই প্রেম-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অংশই বিরহ। বেদনার সুগভীর ভাবই সঙ্গীতের জননী। প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে বিরহের ভাব যেখানে পরিস্ফুট হইয়াছে সেইখানেই প্রেম-সঙ্গীতের সুর মধুরতম হইয়াছে।

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughtd'.

বাংলা সঙ্গীতে যেমন :

বিধি যদি দিত রে পাখা
উইড়া যাইয়া দিতাম দেখা—
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর ঠ্যাশে রে।

বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে বেশীর ভাগই গার্হস্থ্য জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বিরহিণী নারীর মনের একটি সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কোন কোন পল্লীকবিগণ ইহার মনোবিশ্লেষণের উপর জোর দিয়া থাকেন। কেউ বা প্রকৃতির বর্ণনার উপর জোর দিয়াছেন। বেশীর ভাগ সঙ্গীতই তুলনামূলক—

'ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধু যদি কেওয়া বনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে ॥
তুমি যদি হইতে রে বন্ধু আসমানেরই চান্দ
রাত্র নিশা চাইয়া থাকিতাম খুলিয়া নয়ান।'
—মৈমনসিংহ গীতিকা

বঙ্গ সাহিত্যে চণ্ডীদাস ও রামীর উপাখ্যানগুলিও প্রেম-সঙ্গীতের উপকরণ জোগাইয়াছে। এই পদাবলীগুলি শুধু বৈষ্ণবদের কণ্ঠে নহে, ইহা ভক্ত গায়কদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়ে থাকে। চণ্ডীদাসের দু'একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রেম-সঙ্গীতের প্রসঙ্গ শেষ করিব।

'বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ;
দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান।'

রামীর পদ—

'কোথা যাও ওহে প্রাণ বঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক ধৈরজ ধরিতে নারি ॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি ॥'

মধ্যযুগে বাংলার লোক-সঙ্গীতে এই সব প্রেম-সঙ্গীতগুলি এক অমূল্য অবদান জুগিয়েছে—যা আজো বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। আজো বাংলার পথে ঘাটে মাঠে নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে এগুলি শোনা যায়। দৈনন্দিন কর্মজীবনে মানুষের মনে এগুলি আপনা আপনি স্বতঃস্ফূরিত হয়ে এক করুণ ভাবাবেগের সৃষ্টি করে তাই এগুলি মহামূল্য ও অনবদ্য।

'মেঘদূত' কাব্যেও বিরহিণী যক্ষের এমনই ধারা মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। মেঘ বা পবনকে নিজের দূত বানাইয়া প্রিয়ার নিকট সংবাদ পাঠানো বিরহের এক উজ্জ্বলদৃষ্টান্ত।

আকাশে মেঘ দেখা দিলে একান্ত পরাধীন ব্যক্তি ছাড়া প্রিয়তমাকে কে উপেক্ষা করিতে পারে। রাত্রিতে প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন বারিপাতের শব্দ হয় তখন মনের মধ্যে অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করে। দিবসে নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া আশার আশ্বাসে কোন প্রকারে বিরহিণীর সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু যখন গভীর রাত্রিতে নির্জন শয়নগৃহে বিরহ শয়নে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন মন প্রবোধ মানে না। তখন সে—

'বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভি-
র্নিষিক্ত বিম্বাধর চারু পল্লবা।'

'নয়নেন্দীবর বিগলিত বারি ধারায় মনোহর বিম্বাধর পল্লব সিক্ত করে।' তখন প্রেমার্দ্র হৃদয় মধ্যে নানা আশা সঞ্চারিত হয়। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া পুনর্মিলনের আশায় মন উন্মুখ হইয়া উঠে। 'আশয়া হি কিমিব ন ক্রিয়তে।'

কালক্রমে বাংলার প্রেম-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারাও বাংলার প্রেম-সঙ্গীত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত গানগুলি ভাবে ও মাধুর্যে অপূর্ব। অনেকগুলি গানে আশাহতা প্রণয়িনীর অন্তর্বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আসবে বলে এলো না গো আমার চিকন কালা।
অঙ্গে রইল সাজসজ্জা মনে যৌবন জ্বালা ॥

কিংবা—

ছি ছি মরি লাজে,
কে সখি এলাম বনমাঝে।
জেগে রাত্তি সারারাত্তি
জাগিলাম গো মিছে কাজে ॥
আমার কালা এলো না গো
রইল কাহার প্রেমে মজে।
প্রতিজ্ঞা করিলাম সখী
হেরবো না আর রাখাল রাজে ॥
যমুনার ঐ কালো জলে
ভাসাও গো মোর ফুলসাজে ॥

আমার কথা (১০৪)
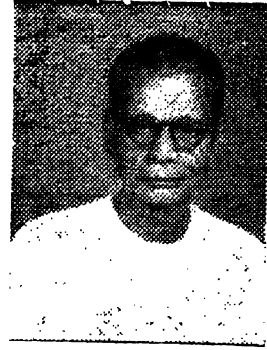
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার এক গৃহকোণে তিয়াত্তর বৎসর বয়স্ক ধর্মপ্রাণ ও প্রচারবিমুখ এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীর কথা যেমন শুনেছি—সেইমত লিপিবদ্ধ করছি। মনে হ'ল যেরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা এই সমস্ত প্রবীণ শিল্পীদের প্রাপ্য—সেরূপ দেখাতে আমরা যেন কার্পণ্য দেখাই। যাই হোক, শিল্পী শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানান :—

'১২৯৭ সালের ১১ই আষাঢ় মঙ্গলবার কলিকাতায় আমি জন্মাই। পিতা ৺রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ৺লক্ষ্মীমণি দেবীকে ছয় মাস বয়সে হারাই। আদি-নিবাস বর্ধমান জিলার পাড়াতল। একটু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৃহে যাই—গেরুয়া কাপড় পরি—তিন বৎসর পরে ফিরি। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট গান শিখিতে থাকি। আমার কণ্ঠে 'জোলে' আওয়াজ তখন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট ও পরে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে খেয়াল ও ঠুংরী শিখি।

১৯৩৩ সালে নিজের আগ্রহে গোয়ালিয়রে আসিয়া ধর্মশালায় উঠি। পরে প্রখ্যাত সেতারী ওস্তাদ হাফেজ আলীর কাছে থাকিয়া অধ্যাপক রাজাভাই কুচওয়ালের নিকট শিক্ষা লই। এ ছাড়া শঙ্কর পণ্ডিতও সাহায্য করেন। ছয় মাস পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

আমি ইতিপূর্বে লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে ভাতখণ্ডে, আলাউদ্দীন, নাসিরুদ্দীন খাঁ, আলাবন্দে খাঁ, হাফেজ আলী খাঁ, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রাধিকা গোস্বামী ইত্যাদির সহিত যোগদান করি। ক্রমশ কলিকাতায় বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন ও বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানে গায়ক হিসাবে উপস্থিত থাকি।

সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবে প্রথম আমি যোগদান করি—বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘ'-এ। ইহার পর ডায়োসেশন, ব্রাহ্ম বালিকা, বেথুন স্কুল ও কলেজে মেয়েদের গান শিখাইতে থাকি। পরলোকগত হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী সুগায়িকা শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর আমার নিকট উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শেখেন। কাজেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। পাথুরিয়াঘাটার শ্রীবৃন্দাবন মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গীতের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য। আমার গান শুনিয়া তিনি 'রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীতায়ন'-এর ভার আমার উপর ছাড়িয়া দেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই আমি উহার সহিত যুক্ত হই এবং এখনও সেখান হইতে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করি।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ৺কাশীধামে শ্রীহারাণচন্দ্র কবিরাজের গৃহে অনুষ্ঠিত এক বিরাট মজলিসে আমাকে 'সঙ্গীত-রত্ন' উপাধি দেওয়া হয়।

জনাই সিমলাই পরিবারের শ্রীমতী পারুলবালা দেবী হলেন আমার সহধর্মিণী।

মূল 'গীত-অধ্যায়', 'সঙ্গীত-রত্নাকর' ও অন্যান্য সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া—সেগুলি পাঠ করি ও সঙ্গীত শিক্ষা করি।'

আমার জিজ্ঞাসায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, খেয়ালে চৌতাল ও ধামার বাদে সব তাল পাওয়া যায়। ধ্রুপদ-অঙ্গের সব তালেই মধ্যে চৌতাল, ধামার ইত্যাদিও থাকে। ধ্রুপদ ও ধামার ভক্তিমূলক সঙ্গীত।

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—অলোক রায়চৌধুরী

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

চল্লিশ

হরি এবং হর, বৃন্দাবন এবং বারাণসী, বৈষ্ণব এবং শাক্ত, বাঁশি এবং ডমরু, পীতাম্বর ও দিগম্বর সে 'এক'-এরই আরেক আরেক হ'য়ে দেখা দেওয়া কেবল তার প্রমাণ কাশী গেলেও পাওয়া যাবে, বৃন্দাবন গেলেও। এবং ও জায়গার একটিতেও না গেলে। ঘরে বসেই কেউ দেখা পেয়ে যেতে পারে তার, নয়ন যার ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না। প্রশ্ন করছে, 'হায় রে ওকে যায় না কি জানা'। যদি জানা যায় কি না জিজ্ঞেস করো তা'হলে বলব জানা যায় না। জানার ব্যাপার নয়। জানান দেন যদি তিনি—যাবে জানা। কাকে দেবেন, কেন দেবেন, কখন দেবেন তা নিয়ে কেঁদে লাভ নেই। কারণ লোকে জানে না তাই বলে ডাকার মতো ডাকলে তবে সাড়া দেন। না। নাও দিতে পারেন সহস্র ডাকে। না ডাকলেও দেখা দিতে পারেন সহস্রবার। আমরা মনে করি আমরাই বুঝি তাঁকে ডাকছি। তিনি যে আমাদের ডাক দিয়েছেন কোন্ সকালে তা আমরা জানি না, কারণ আমরা ঘুমিয়ে আছি অনেক বেলা পর্যন্ত। ভক্তই কেবল কাঁদে না; ভগবানের চোখেও অকারণ অবারণ জল ভক্তের জন্যে। অসীম বেদনার নামই ঈশ্বর।

কে বললে দেখা পা ়য়াই একমাত্র কথা। দেখা না পাওয়াও তো সেই 'এক' মাত্রেরই খেলা। দেখা পাওয়ায় আছেন, দেখা না পাওয়ায়ও আছেন তিনি। রূপে ও অরূপে, নীলে ও অনীলে, মলে ও পরিমলে, ডাকায় না-ডাকায়, থাকায় না থাকায় মিশে আছেন তিনি। ডাকলে তবেই যিনি সাড়া দেন, না ডাকলে দেন না, তিনি দিল্লীশ্বর হতে পারেন; তিনি জগদীশ্বর নন কখনই। এ তাঁর ইচ্ছা, এই লীলায় মাত্র। কারুর কাছে তাঁর পাবার নেই কিছু, দেবার আছে। কেউ তাঁর দেখা পায় না; তিনি দেখা দেন। যাকে দেন তিনি কেবল তাঁরই মন; যাকে দেখা দেন না তিনি তাঁরও। কেবল ভুল করে যে তাঁর কাছেই তিনি বাস্তব এ ধারণা যার, সে জানে না সে কাকে খুঁজছে। যে তাঁকে চাইছে না, তিনি তাঁকেও চাইছেন। জীবকে যিনি বুক থেকে ফেলতে পারেন না, তিনিই শিব।

রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকেছিলো বলে পেয়েছিলো যদি তা'হলে কংস, প্রহ্লাদ, জগাই-মাধাই, গিরিশ ঘোষও তাঁকে পায় কেন? পায়, তার কারণ, শেষ পর্যন্ত ও পায় না পৌঁছে সবাই নিরুপায়, তাই পায় ওঁকে। যাকে চেয়ে পায় না কেউ; কেউ পায় না চেয়েই। যিনি হ্লাদিনী শক্তি, তিনিই যে বিনোদিনীর অভিনয় শক্তি আবার তিনিই যে গীতার নিরাসক্তি। এ বোঝবার নয়, এ বুকে বাজবার। যার বাজে তাকেই সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।

যে পারে সেই কেবল ফুল ফোটাতে পারে না। যে পারে না তাকে দিয়েও পারান তিনি। ফুল ফোটাতে ফোটাতে কখন্ সেও ফুল ফোটায় যে, সে নিজেও জানে না এবং জানে না বলেই মনে করে বৃন্দাবন এবং বারাণসী বুঝি আলাদা। হরি ও হর বুঝি হরিহরাত্মা নয়। যিনি হরি, তিনিই যে হর একথা অহরহ ঘোষিত হচ্ছে বৃন্দাবনে বারাণসীতে, তবুও শৈব আর বৈষ্ণব আর শাক্ত এ নিয়ে তর্কের সুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। শুধু কি তাই? জ্ঞানী এবং মূঢ়ে, সাধু এবং পাপীতে, দ্বিজে ও চণ্ডালে, রাজা ও প্রজায়, ভক্তে ও ভগবানে ভেদ আছে মনে করে অনাদিকালের বিবাদ অনন্তকাল ধরে অব্যাহত রইবে। কেবল ফুল ফুটবে যার, সুগন্ধ পাবে শুধু সেই। ভালোবেসেই জেনে যাবে সে তাকে, জ্ঞান যাকে পায় না, বিজ্ঞান যাকে অস্বীকার আর শাস্ত্র যাকে নিয়ে তর্ক করতে চায়, সেই অনাদি অনন্তর অনুভূতি যখন ফুল হয়ে ফুটবে তখন, কেবল তখনই তাকে জানতে দেওয়া হবে বলে সে জানবে, মানবে যে সবই 'আমি'। তুমি বলে কেউ নেই।

আমিই সে-ই। আমারই চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয়েছে যে খালি। পাপ ও পুণ্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধন

ও দারিদ্র্য, বুদ্ধি ও নিবুদ্ধিতা,—এ আমারই চেতনার চেহারা। মল ও পরিমল, চোর ও মনোচোর, রত্নাকর ও বাল্মীকি আমিই। আবার এই সবের যে অতীত, শবের অতীত যে উৎসব কোনও দেশে কোনও কালে পরিমাপ নেই যার। নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, রূপ নেই, ধাম নেই,—এই আমিই তখন নেই-আমি। এই আমিই হরি। এই আমিই হর। এই আমিই বৃন্দাবন, এই আমিই বারাণসী। আমারই সংগে আমার খেলা।

দিল্লীশ্বর জিজ্ঞেস করলেঃ ঈশ্বর এই মুহূর্তে কি করছেন?

হিন্দু সন্ন্যাসী তার জবাব দিলে চোখের পলক পড়বার আগেইঃ এই মুহূর্তে তোমার চোখে গুরু আমার চোখে শিষ্যরূপে গুরুশিষ্য সংবাদ করছেন।

একথা বলতে পারে কে? সেই আমি-ই বলতে পারে, এসেই যে বলে, সোহং। বারাণসীতেই যে বৃন্দাবন এর অলস্ত, জাগ্রত, জীবন্ত প্রমাণ এই মুহূর্তেই স্থূল শরীরে বর্তমান। কালীই কৃষ্ণ শাক্তই বৈষ্ণব একই বারাণসীতে বাস করেন না কেবল, শিবালয়ে দু'জনেই সমান আদৃত,—একথা জানবার জন্যে তর্ক করার প্রয়োজন নেই, একবার যাবারও দরকার নেই কাশীতে, যে বৃত্তান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করছি,—কূট তর্কে আবদ্ধ যে কেউ তার থেকে নীর ত্যাগ করে এই ক্ষীরটুকু নিতে পারেন যে মহামায়ায় ও শ্রীবিষ্ণুচ্ছায়ায় কোন বিরোধ নেই। ওঁদের রূপ নিয়েই তর্ক, যেখানে ওঁরা দু'জনেই অপরূপ সেখানে তর্কের অবকাশ নেই, কারণ সেখানে নয়ন সার্থক।

এই বিবরণ যিনি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন তিনিও জীবিত। শুধু জীবিত নয়, হাজার হাজার ছাত্রকে যিনি আদর্শ অধ্যাপক হিসাবে সঞ্জীবিত করে যাচ্ছেন যাতে তারা পড়ার বই-এর বাধ্যতা থেকে বই পড়ার আনন্দে উত্তীর্ণ হবার পথ খুঁজে পায়। অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এই বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁর খ্যাতির চেয়ে অনেক বড় মানুষ। এখন শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। মাঝে কাশী চলে গিয়েছিলেন, ওখানেই থাকবেন বলে। পারেন নি থাকতে। ছাত্রদের আহ্বানে ফিরে এসেছেন পীঠস্থানে। কলেজের সেক্রেটারী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য একটি চিঠিতে কাশীবাসী বিনোদবিহারীকে লেখেনঃ সংশিক্ষা থেকে অসংখ্য ছাত্রকে উপবাসী রেখে কাশীবাসী বিনোদবিহারী কি পাবেন?

সে কথার প্রতিধ্বনি করে বিনোদবাবুকে আমিও বলি, বিশ্বের যতেক অনাথ যদি তিনি দেখেন তবে বিশ্বনাথ কি তাঁকে দেখবেন না? এ কখনও হতে পারে। বুঝি, বই পড়ার পৃথিবী থেকে, বিশ্বদেবের পায়ে পড়ার পৃথিবী বহির্ভূত বারাণসী আজ তাঁর মন টানে। কিন্তু দেবী ভারতীর কাজ তাঁকে দিয়ে যে আজও 'অশেষ'। তাঁর মুখে তো আমরা কাশী যাবার কথা শুনব না। তাঁর মুখে আমরা শুনব নতুন করে সেই পুরানো কথাঃ

'পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি ধরণীতে—
আবার আহ্বান?'—

এবং সেই আহ্বানের উত্তরে কবির একথা তো তাঁর মুখেই মানায়ঃ

'হবে, হবে, হবে জয়— হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।'

অধ্যাপক, ভক্ত, মহৎ মানুষ বিনোদবাবু এত [illegible] আর এটুকু জানেন না যে, দেবী ভারতীর সাধনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যখন, তখন তারই মধ্যে দিয়ে বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতিও আপনিই হয়েছে সার্থক।

কাশীর যে দু'জনের কথা বলতে যাচ্ছি তাঁদের স্থূল দৃষ্টির বিচারে বিপুল ব্যবধান। একজন পুরুষ আরেকজন স্ত্রীলোক। একজন সংসারী, আরেকজন সন্ন্যাসিনী। একজন বিবাহিত, আরেকজন বিধবা। একজন গৌরাংগ, আরেকজন শ্যামাংগী। একজন কালীমায়ের পূজা করেন; অন্যজনের পরমগুরু হচ্ছেন শ্রীকাঠিয়াবাবা। একজনের বাড়িতে শ্রীবিন্দুবাসিনী কালীমায়ের নিত্যপূজা; আরেকজনের আশ্রমে শ্রীসন্তদাস বাবাজী ও তাঁর স্ত্রী অন্নদা দেবীর প্রস্তরমূর্তি প্রত্যহ পূজিত। একজন শাক্ত; আরেকজন বৈষ্ণব। কিন্তু দু'জনেই ভক্ত, সাধক। একজনের নাম—শ্রীপ্রণবনাথ মুখোপাধ্যায়; অন্যজনের নাম,—শ্রীগংগামাতা। দু'জনকেই যুক্ত করে বারবার করে জানাই প্রণাম।

শিবালয়ে থাকেন দু'জনেই। একজনের গৃহস্থাশ্রমের থেকে আরেকজনের আশ্রম,—পাঁচ-ছ' মিনিটের পথ।

দেবী বিন্দুবাসিনীর পূজাই শ্রীপ্রণবনাথের প্রধান নিত্যকর্ম। পুরোহিত আছেন, দু'বেলা পূজা করে যান। কিন্তু প্রণবনাথের পূজা যখন-তখন চলছে। দেবীমূর্তির

সামনে ভক্তের মূর্ত মুখোমুখি। গংগাজল আছে কখনও, কখনও নেই। প্রণবনাথের মাতৃপূজার সম্বল,—চোখের জল।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য থেকে শুরু করে, অধ্যাপক, সিভিল সার্জন, ছোট বড় অভূতপূর্ব লোকসমাগমে প্রণবনাথের কুটীর জাগ্রত তীর্থ। প্রণবনাথ বলেন, যিনি সত্যকে ধরে থাকেন, মিথ্যা তাঁকে কখনও ধরতে পারে না। তাঁর মুখ দিয়ে মিথ্যা বেরয় না। এ উক্তির উজ্জ্বলতম উদাহরণ প্রণবনাথ নিজে ছাড়া আর কে? সাক্ষী স্বয়ং অধ্যাপক বিনোদবাবু। বিনোদবাবু একদিন, বোধ হয় প্রণবনাথের সংগে সাক্ষাতের প্রথম দিন, ঢুকেছেন সবে ঘরে। দেখেন প্রণবনাথের কন্যা মহামায়া বসে আছেন বাবার কাছে। কন্যাকে পিতা প্রণবনাথ বলেছেন বিনোদবাবুকে দেখিয়ে—এত বড় ইংরেজির অধ্যাপক এসেছেন বাড়িতে, এবারে তুমি ইংরেজিতে পাস করবেই।

কন্যা তবুও আবার জিজ্ঞেস করে: সব বিষয়ে পাস করব তো? পিতা প্রত্যুত্তর করেন পুনরায়: গত বছর ইংরেজিতে ফেল করেছিলে, এবারে ইংরেজিতে পাস করবে। অসংপৃক্ত হয় না উত্তর মহামায়ার। আবার প্রশ্ন করে সে: অন্য সব বিষয়ে কি হবে? পিতা প্রণবনাথ এবার নিরুত্তর। পরীক্ষার ফল বেরুতে বোঝা গেলো কেন প্রণবনাথ নিরুত্তর ছিলেন। ইংরেজিতে পাস করেছে মহামায়া কিন্তু ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতিতে অকৃতকার্য হয়েছে।

মহামায়ার ভক্ত সেই বাস্তব সত্য দেখেও বলতে পারেন নি মহামায়ার মনে কষ্ট দেবার ভয়ে। মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াও সত্যাশ্রয়ীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই নিরুত্তর ছিলেন তিনি।

১৯৬৩ সালে, কয়েক মাস আগে, মে-জুনে কাশীতে এক নবাগত বৃদ্ধকে সবাই পরামর্শ দিলেন ওই দুই মাস অন্য জায়গায় কাটাতে। কারণ মে-জুনের 'লু'-তে কাশীর একবার পাঁচশোরও বেশি লোক মারা যায়। নতুন লোক সেই গরম হাওয়া সহ্য করতে পারে না। ভদ্রলোক কাশী ত্যাগ করতে চান না কিছুতেই। প্রণবনাথ অভয় দিলেন: থাকুন কাশীতে কিছু হবে না। এবারে কাশীতে সবাই এলো, শুধু, 'লু' এলো না একবারও।

প্রণবনাথ মা-কালীর ভক্ত কিন্তু জীবহিংসার ভক্ত নন। তিনি নিরামিষাশী। জীবহিংসা পাপ, কিংবা তাতে সত্ত্বশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এই নৈয়ায়িকী বিচার নয়, জীবহিংসা থেকে বিরত থাকার কারণে প্রণবনাথের এই নৈসর্গিকী মতি। তাঁর গুরু সাধু তারাচরণের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস উপলক্ষে সভা-সমিতির আহ্বান এলে, সভারম্ভের সময় নির্দিষ্ট থাকে না। তিনি বলেন যে ভক্তসমাগমে বিলম্ব হলে, সভার সময় পিছিয়ে দিতে হয় এবং তার ফলে সত্যরক্ষা হয় না।

প্রণবনাথকে পল্লীর লোকেরা কেউ কেউ স্বামীজী সম্বোধন করলেও তিনি গেরুয়া পরেন না। বাইরে থেকে দেখলে একজন সাধারণ বাঙালী,—এই মনে হয়। বয়স ষাটের কাছাকাছি। প্রণবনাথের ছেলেরা বিদেশে কাজ করেন। সংগে আছেন কুমারী কন্যা মহামায়া এবং সহধর্মিণী,—আর শ্রীবিন্দুবাসিনী কালীমূর্তি,—এই নিয়ে তাঁর সংসার।

প্রণবনাথ প্রায়ই বাড়ির বাইরে যান না। কচিৎ হয়ত গংগাস্নানে যান। সর্বদাই প্রায় আত্মসমাহিত। সহধর্মিণীর সংগে কথাবার্তা কম; অবস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন কি না বলা শক্ত। এই মহীয়সী মহিলার ওপরেই সংসার রক্ষার সমস্ত ভার। বিনোদবাবু বলছেন:

'গৃহীসন্ন্যাসী প্রণবনাথ তান্ত্রিক সাধক কি না বুঝা যায় না, কিন্তু আত্মজ্ঞানী প্রণবনাথের আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহার সহধর্মিণীই যে পরমা প্রকৃতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

এবং অধ্যাপকের পরিশেষের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

'কাশীধাম প্রধানত সন্ন্যাসিগণের ধর্মক্ষেত্র। প্রণবনাথের মত গৃহীসাধুর কাশীতে অবস্থিতি বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার চিরন্তন লীলার এক অপূর্ব অভিব্যক্তি।'

সেই চিরন্তন লীলার সহচরী গংগামাতাও। তাঁর কথা এরপর বলবো। [ক্রমশ ।

ধর্ম

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন তন্মধ্যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্মলাভে অধিকারী করিয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্যনামের এত গৌরব হইয়াছে এবং এই দুই বিষয়ে কৃতকার্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সুখ যে এমন অনির্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্মস্বরূপ মহজ্জ্যোতি তদপেক্ষাও শতগুণ উৎকৃষ্ট।

—অক্ষয়কুমার দত্ত

ভারতে ডেভিস কাপের অনুষ্ঠান

সম্প্রতি বোম্বাইতে এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অর্থাৎ ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালের অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। আমেরিকা সহজেই ৫—০ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কৃতিত্ব অর্জন কোরেছে। ফাইন্যাল খেলাটি ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর এডিলেডে অনুষ্ঠিত হবে।

গত ১৯৬১ সালে আমেরিকা আঞ্চলিক ফাইন্যালে ৩—২ খেলায় ভারতকে পরাজিত করেছিল।

ভারত ও আমেরিকার এবারকার আঞ্চলিক ফাইন্যালের তাৎপর্য ছিলো অনেকখানি। উভয় দলই বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অপেশাদার খেলোয়াড় লইয়া গঠিত হয়। আমেরিকা দলে এ বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন 'চাক' ম্যাকিনলে, রালস্টন ও ফ্রাঙ্ক ফ্রোয়েলিং প্রভৃতি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় ছাড়াও কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় থাকেন।

ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণের উপরও ভারতের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু কৃষ্ণাণ সকলকে হতাশ করেন। তিনি রালস্টনের নিকট পরাজয় বরণ করবেন ইহা কেহই আশা করেন নি। ১৯৬১ সালে 'চাক' ম্যাকিনলে কৃষ্ণাণের নিকট পরাজয় বরণ করেন। কিন্তু তারপর তিনি দু'বার কৃষ্ণাণকে পরাজিত করেছেন। এবার কৃষ্ণাণ শেষ

ডেভিস কাপের সিঙ্গলস খেলার বিজয়ী আমেরিকার 'চাক' ম্যাকিনলে (দক্ষিণে) ও ডেনিস রালস্টন (বামে)
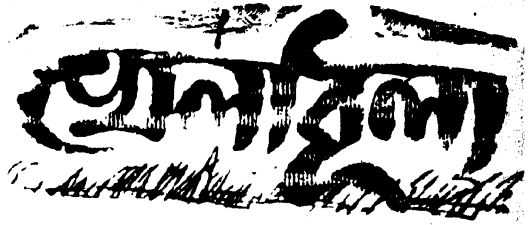
সিঙ্গলস খেলায় 'চাক' ম্যাকিনলের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেন।

ভারতের দু'নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড় হিসাবে জয়দীপ মুখার্জীর পরিবর্তে প্রেমজিৎলালের নির্বাচন টেনিস মহলে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এ নিয়ে চারদিকে সমালোচনার ঝড় উঠে। তবে কৃষ্ণাণ বলেছেন যে, অনুশীলনের সময় প্রেমজিৎলাল নাকি উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে জয়দীপ মুখার্জী ভারতের দু'নম্বর খেলোয়াড়। বিভিন্ন খেলায় প্রেমজিৎলালকে তিনি পরাজিত করে তাঁর স্বীকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও প্রেমজিৎলালের নির্বাচন সত্যই সমালোচনার যোগ্য। কৃষ্ণাণ টেনিস জগতে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন সত্য। তিনি এখনও ভারতের সেরা খেলোয়াড় সেই বিষয়ে

ডেভিস কাপ খেলার পর ভারতের জয়দীপ মুখার্জী পানীয় গ্রহণ করিতেছেন

সন্দেহ নেই। তবে তিনি খেলোয়াড় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন তা বলা চলে। তাঁর পরেই জয়দীপ মুখার্জী-ই ভারতের একমাত্র খেলোয়াড় যাঁর উপর কিছুটা নির্ভর করা যায়। কিন্তু এবার ভারতের টেনিস কর্ণধাররা যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাতে তরুণ খেলোয়াড়কে নিরুৎসাহ করাই স্বাভাবিক।

এবার ডাবলসের খেলায় ভারতের তরুণ জুটি জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিৎলাল যেরূপ উন্নত ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়। তাঁদের খেলা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

আমেরিকার রালস্টনের খেলা বিশেষ প্রশংসনীয় হয়। তিনি কৃষ্ণাণের বিরুদ্ধে যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা বোম্বাইয়ের উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর অনেকদিন মনে থাকবে, তাঁর আক্রমণাত্মক খেলা বিশেষ করে লং ও সট পাসের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাণ কিছুই খেলতে পারেন নাই। তৃতীয় সেটে কৃষ্ণাণ কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে রালস্টনের নিকট স্ট্রেট সেটে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান বৎসর উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলায় কৃষ্ণাণের নিকট রালস্টন পরাজয় বরণ করেছিলেন। এইবারের খেলায় রালস্টন কৃষ্ণাণকে পরাজিত করে তাঁর পূব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন বলা যেতে পারে।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান 'চাক' ম্যাকিনলে দুইটি সিঙ্গলস খেলাতেই জয়লাভ করেন। তাঁর জোরালো সার্ভিস, 'টপস্পিন' ও আড়াআড়ি সট তাঁর খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ডাবলসের খেলাতেও ম্যাকিনলে রালস্টনের সাহায্যে ভারতীয় জুটি জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেছেন। তবে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় তিনি যে উন্নত ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, এবারের প্রতিযোগিতায় তাঁর খেলায় সে জৌলুষ দেখা যায় নি। নিম্নে সকল খেলার ফলাফল দেওয়া হলো :—

ডেভিস কাপের খেলায় 'চাক' ম্যাকিনলের একটি 'সট' কৃষ্ণাণ প্রতিহত করছেন

সিঙ্গলস

'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা) ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—০ সেটে প্রেমজিৎলালকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডেনিস রালস্টন (আমেরিকা) ৬—৪, ৬—১ ও ১৩—১১ সেটে রমানাথন কৃষ্ণাণকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মার্টিন রীজেন (আমেরিকা) ৬—৩, ২—৬, ৬—০ ও ৬—১ সেটে প্রেমজিৎলালকে (ভারত) পরাজিত করেন।

'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা) ১০—৮, ৬—৮, ৬—২, ২—৬ ও ৬—০ সেটে রমানাথন কৃষ্ণাণকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস

'চাক' ম্যাকিনলে ও ডেনিস রালস্টন (আমেরিকা) ৬—৮, ৬—৩, ১২—১০ ও ৬—৪ সেটে জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিৎলালকে (ভারত) পরাজিত করেন।

কলিকাতায় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস

বর্তমান বছরে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে। ছাত্র বিভাগে মোট একুশটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রী বিভাগে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এটা কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের খেলার আয়োজন, অবশ্য মূল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের বিজয়ী বনাম দক্ষিণাঞ্চলের বিজয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা এই সর্বপ্রথম কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব সঞ্চার হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার বয়স মাত্র ছয় বছর। ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা সুরু। এর মধ্যে ৪ বছর বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল। গত বছর তারা ফাইন্যালে যাদবপুরের নিকট পরাজয়বরন করেছিল। এ বছর উত্তরাঞ্চলের বিজয়ী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩—২ ম্যাচে পরাজিত করে পুনরায় হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। গত বছরের বিজয়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দলকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে জব্বলপুরের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অবশ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তাদের দলের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ও বর্তমানে বাংলার ১নং খেলোয়াড় মলয় ভট্টাচার্য হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল সেমি-ফাইন্যালে দিল্লীর নিকট ৩-১ ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় প্রসাদ ব্যানার্জীর খেলা ভাল হয়। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে একমাত্র অপরাজিত খেলোয়াড় দিল্লীর জি, এস, মানীর বিরুদ্ধে একটা গেমে জয়লাভ করেন। জি, এস, মানী দিল্লীর ৩নং খেলোয়াড়, তিনি উত্তরাঞ্চল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে দিল্লীর ১নং খেলোয়াড় প্রমোদ নারায়ণকে পরাজিত করিবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বোম্বাইয়ের নিকট দিল্লী পরাজিত হলেও জি, এস, মানী দুইটি সিঙ্গলস খেলাতেই জয়লাভ করেন। বোম্বাইয়ের খোদাজী তাঁর বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালালেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্ট্রেট সেটে পরাজয় বরণ ক'রতে হ'য়েছে। একমাত্র প্রসাদ ব্যানার্জী ছাড়া জি, এস, মানী সিঙ্গলসের খেলায় তাঁর প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেই স্ট্রেট সেটে জয়লাভ করেছেন। মানীর চাবুকের মত মার ও ডিপ-চপ উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

ছাত্রী বিভাগে বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় এই সর্বপ্রথম এই

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার ছাত্রী বিভাগে জয়ী বিক্রম দলের খেলোয়াড়গণ।

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। দলের এই সাফল্যের মূলে রয়েছেন অধিনায়ক মৃণালিনী খোট। এই খেলোয়াড়টি সারা প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থাকেন। বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বোম্বাই দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালালেও শেষ পর্যন্ত ৩-২ ম্যাচে পরাজয় বরণ করেছে। বোম্বাইয়ের ন্যাটা খেলোয়াড় গীতা নন্দার খেলাও উপভোগ্য হয়।

প্রাক-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

টোকিওর জাতীয় স্টেডিয়ামে সম্প্রতি টোকিও ক্রীড়া সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে। এই প্রাক-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৩৪টি দেশের প্রায় ৬ শত প্রতিযোগী যোগদান করেন। ভারত থেকেও দু'জন মুষ্টিযোদ্ধা ও চারজন রাইফেলচালক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ক্রীড়া সপ্তাহ অনুষ্ঠানটি পরিসমাপ্ত হওয়ায় ১৯৬৪ সালে জাপান অলিম্পিকের উদ্যোক্তারা অলিম্পিকের প্রস্তুতিপর্বে সাফল্যের সঙ্গে আরও একধাপ অগ্রসর হয়েছে। আশা করা যায় যে, জাপান অলিম্পিকের উদ্যোক্তারা মূল প্রতিযোগিতা আরও উন্নত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার আয়োজন করবে। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য জাপান প্রায় এক ট্রিলিয়ন ইয়েন (১৪০০ কোটি টাকা) ব্যয় করবে বলে ঠিক করেছে।

অনেকেই মনে করেছেন যে, প্রাক-অলিম্পিক ক্রীড়া সপ্তাহে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করলেও পরিতাপের বিষয় যে, এই অনুষ্ঠানে কোন নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয় নি। ভারতীয় রাইফেল চালকরা ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জন করলেও শেষ অবধি বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। ভারতের দু'জন মুষ্টিযোদ্ধা যোগদান করে ফাইন্যালে পর্যন্ত ওঠেন। তবে ফাইন্যালে তাঁদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে ভারতীয় প্রতিনিধিরা প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং জাপানের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। টোকিও অলিম্পিকে ভারত আরও বিভিন্ন বিভাগে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

হকিতে ভারতের বিশ্ব স্বীকৃতি

ফ্রান্সের লিঁয়তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারত সাফল্য অর্জন করায় এখানকার কর্মকর্তারা হকিতে বিশ্ব বিজয়ী আখ্যা পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত হয়েছেন। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত এখনও মিলিত হয় নি। তবে তারা বিভিন্ন দেশে সফর করে উন্নত ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছে।

দিল্লীর খ্যাতনামা খেলোয়াড় ভি. এস. মানী আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

অলিম্পিকের প্রস্তুতি

টোকিও অলিম্পিকে ভারত যাতে তার বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় ফিরে পায় এখন থেকেই তার প্রস্তুতিপর্ব চলছে। ভারতীয় দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাপান ও ব্রিটিশ হকি দল ভারত সফরে আসছে। স্পেন, কেনিয়া ও মালয়েশীয় হকি দলের ভারত সফরের ব্যবস্থার চেষ্টা চলছে। তা ছাড়া ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিক ক্রীড়ার পূর্বে ভারতীয় দলকে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরে পাঠান হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ভারতের প্রতিটি ক্রীড়ামোদী আশা রাখেন যে, এবারকার অলিম্পিকে ভারত হকিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করবে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

আঠারো

পথে দময়ন্তী একটি কথাও বলে নি। কেন তাকে কাঠুরে চৌধুরীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, সে কথাও ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। কিন্তু বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে সব কিছু অকপটে জানিয়েছিল। বাবার কথাও বলতে দ্বিধা করে নি।

সব কথা শুনে লীলাবতী শুধু একটি কথা বলেছিলেন: জানোয়ার।

কাঠুরে চৌধুরীকেই যে বলেছিলেন, দময়ন্তীর তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু লীলাবতীর মনের কথা সে বুঝতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে তিনি যে নিজেই হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন, তাও সে জানতে পারে নি। যখন কিছু জানল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তখন আর কিছু করবার নেই। তার জীবনের উপর দিয়ে যে এতবড় একটা ঝড় ব'য়ে যাবে, তা কি সে কল্পনা করতে পারত! সেই শান্ত অনভিজ্ঞ দময়ন্তী সহসা পৃথিবীর অন্য রূপ দেখল। নূতন সূর্যের আলোয় তার মনের কোমল পাপড়িগুলি অসময়ে শুকিয়ে গেল।

কয়েক মাস আগের ঘটনা দময়ন্তীর আজ বিশ্বাস হলো। হোস্টেলে তাকে নিয়ে সবাই তামাসা করে। এত বয়সেও এমন ছেলেমানুষ কেউ থাকতে পারে, অন্য মেয়েদের এ কল্পনার অতীত ছিল। এমন কোমল, এমন ভীরু, এমন লাজুক। সেই দময়ন্তী আজ কাঠুরে চৌধুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার অপরাধের কৈফিয়ৎ চাইতে পারল।

শুধু কয়েকটি মাসের ব্যবধান। এই কয়েকটি মাস যেন কয়েকটি বছরের চেয়েও বেশি। রাজকন্যা দময়ন্তী হয়েছে রাজার রাণী দময়ন্তী, আর শনির কোপদৃষ্টিতে তার দুর্দশার মাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু নল আর যুদ্ধ করবে না, ভাগ্যের সঙ্গে দময়ন্তীকে বোধ হয় একা যুদ্ধ করতে হবে।

লীলাবতী সেই সন্ধ্যার ঘটনা শুনে দময়ন্তীকে দোষ দেন নি। বরং বলেছেন: এ ভালই হয়েছে।

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে: কেন?

তুই বুঝবি না।

লীলাবতীর নিঃশ্বাস পড়েছিল ঘন ঘন, খুবই উত্তেজিত দেখিয়েছিল তাঁকে। তারপর বলেছিলেন: আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।

ভয়ে ভয়ে দময়ন্তী বলেছিল: কি সন্দেহ মা?

লীলাবতী মেয়ের উপরেই এবারে রেগে উঠলেন, বললেন: তোর কি বয়েস হবে না! কোনদিনই বুঝবি না কোন কথা!

দময়ন্তী আর কোন প্রশ্ন করে নি। শুধু চুপচাপ সব দেখে গেছে, আর শুনে গেছে। তারপর পালন করেছে মায়ের আদেশ। কলেজ খোলবার আগেই কলকাতার হোস্টেলে ফিরে গেছে।

বিদায় দেবার আগে মেয়েকে জড়িয়ে লীলাবতী কেঁদেছিলেন। দময়ন্তীও কিছু না বুঝে কেঁদেছিল। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে মায়ে মেয়েয় এমনি করে কাঁদে। অবুঝের মত কান্না। দুঃখের নয়, শোকের নয়, আনন্দেরও নয়। চারিদিকের আনন্দের মধ্যে বিচ্ছেদের একটা বেদনা আছে প্রচ্ছন্ন। সে শুধু মা মেয়ের মনেই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু লীলাবতী আজ এমন করে কেন কাঁদলেন দময়ন্তী তা বুঝল না।

এক সময়ে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন: যা বলেছি সব মনে আছে তো?

আছে।

সে কথা তো ভুলবার নয়, দময়ন্তী সে কথা ভুলতে পারবে না। নিজের কাছে ডেকে নিয়ে কাল রাতে মা বলেছিলেন: দময়ন্তী, তোর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি।

দৃষ্টি তাঁর ছলছল করে উঠেছিল।

দময়ন্তী বলেছিল: এ কি কথা মা?

লীলাবতী এ কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন: জগদীশকে আমি সব কথা লিখে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু—

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন: কিন্তু সে চিঠি বোধ হয় তার হাতে পৌঁছবে না।

কেন?

থাক সে কথা।

তারপর মেয়ের কানের কাছে মুখ এনে বললেন: জগদীশের নামে একখানা চিঠি তোর বাক্সের ভিতর দিয়ে দিয়েছি। কলকাতায় পৌঁছে সেটা ডাকে দিস।

দময়ন্তী এই সতর্কতার কারণ বুঝল না। ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

লীলাবতী বললেন: চিঠিটা খোলা আছে, ইচ্ছা হলে পড়ে দেখিস। তোকে আমি তারই হাতে সম্প্রদান করলাম।

দময়ন্তী চমকে উঠল।

লীলাবতী তার কাঁধে একখানা হাত রেখে বললেন: ভয় নেই রে, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। তার মনের কথা আমি সেদিন জেনে নিয়েছি।

একটু থেমে বললেন: এত তাড়াহুড়ো করতাম না। করছি ভয়ে। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

দময়ন্তী এবারে বিহ্বল হল।

লীলাবতী বললেন: ভয় পাস নে। আমার ভয় মিথ্যাও হতে পারে। তবু যখন কথাটা মনে হয়েছে, তোকে বলে রাখি। আমার মৃত্যু সংবাদ পেলেও এখানে ছুটে আসিস না। বরং খবর পাওয়া মাত্র রাঁচিতে পালিয়ে যাস। জগদীশকেও আমি এই কথা জানিয়ে রাখলাম।

দময়ন্তী জোরে জোরে মাথা নাড়াল, বলল: এ সব কথা হলো না মা, আমার বড় ভয় করছে।

মেয়ের কথায় কান না দিয়ে লীলাবতী বললেন: এখানে এলেই তুই কাটুরে চৌধুরীর হাতে পড়বি। ওই লোকটা তোকে গিলে খাবে। ভারি পাজী, ভারি ধূর্ত লোক। আর ঐ শয়তানটার সঙ্গে তোর বাবার বন্ধুতা হয়েছে।

রাত্রে দময়ন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কাল তাকে কলকাতায় যেতে হবে। তার বাবার যেতে দেবার একেবারে ইচ্ছা নেই। কলেজ খুলতে যখন দেরি আছে, তখন যাবার তাড়া কিসের। কিন্তু মা তাকে কিছুতেই এখানে থাকতে দেবেন না। বিষাক্ত এখানকার আবহাওয়া। এখানে থাকলে তাঁর মেয়ে বাঁচবে না। দময়ন্তীকে পাঠাতেই হবে।

সেই দময়ন্তী যাবার আগে মাকে জড়িয়ে কাঁদল। মাও কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলেন: যা বলেছি, সব মনে আছে তো?

আছে।

সে কথা তো ভুলবার নয়, সে কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেল। সারাজীবনেও যে এ কথা আর ভোলা যাবে না।

বেশিদিন নয়, অল্পদিন পরেই দময়ন্তী মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিল টেলিগ্রামে। কিন্তু তাকে নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসে নি। দময়ন্তী শোক পেয়েছিল যত, তার চেয়ে ভয় পেয়েছিল বেশি। মায়ের প্রথম আশঙ্কা তো সত্য হল, এবারে হয় তো—

দময়ন্তী আর ভাবতে পারে নি। তার মায়ের উপদেশের কথা মনে পড়েছিল। মা তাকে অবিলম্বে রাঁচিতে আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। কিন্তু তাতে যে গভীর লজ্জা। নিজে থেকে কি করে সে যাবে। মাকে যখন কথা দিয়েছিল, তখন সে ভাবতে পারে নি যে এত শীঘ্র তাকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু মা কেন মারা গেলেন! মায়ের তো কোন রোগ ছিল না, আকস্মিক দুর্ঘটনারও সম্ভাবনা নেই। টেলিগ্রামটা সে বার বার পড়ল, প্রাণভরে কাঁদল। তার ঘরের অন্য মেয়েটাও তার কান্না দেখে কাঁদল। কিন্তু মা হঠাৎ কেন মারা গেলেন, তা বলতে পারল না।

বন্ধুদের কেউ বলল : করোনারি থ্রম্বসিস।

কেউ বলল : না। মেয়েদের ও রোগ হয় না।

আবার কেউ বলল : নিশ্চয়ই একটা কিছু মারাত্মক রোগ হয়েছিল।

কিন্তু দময়ন্তী কাউকে বলল না যে তার মা আগে থেকেই মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিলেন। করোনারি থ্রম্বসিস কি নোটিশ দিয়ে হয়, না অন্য কোন মারাত্মক রোগ। মানুষের যখন প্রাণের আশঙ্কা হয়, তখন রোগের বীজাণু তার শরীরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু মার শরীরে কোন রোগ ঢুকেছিল! সে তো কিছুই দেখে নি! তবে কি মা আত্মহত্যা করলেন! দময়ন্তীর মনে হল, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তার বিয়ে না দিয়ে তিনি কিছুতেই মরবেন না। কঠিন রোগে ধরলেও ভগবানের কাছে তিনি কয়েকদিন জীবন প্রার্থনা করবেন। তাড়াহুড়ো করে তার বিয়ে দিয়ে বলবেন, এবারে নাও।

তবে ?

এই তবের যে উত্তর, সে বড় বীভৎস। সে কথা ভাবতে গেলে তার বুক কেঁপে ওঠে। গভীর আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড থেমে পড়তে চায়। মনে হয়, সেই মৃত্যু তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করবে, বাধ্য করাবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জীবনটা বিকিয়ে দিতে। সেই বিশ্রী বর্বর কাঠুরে চৌধুরী এসে সামনে দাঁড়াবে। যে জীবন সে ফুলের মতো পবিত্র রেখেছিল দেবতার জন্যে, দানব এসে তার দুর্মদ পায়ে সে জীবন পদদলিত করবে।

হায় দময়ন্তী, তোমার জীবনের পরীক্ষা যে বিবাহের আগেই শুরু হয়ে গেল। সে এখন কি করবে।

মেয়েরা বলল : বাড়ি যাবি না ?

দময়ন্তী না বলতে পারল না। বলল : যাব।

তারপর হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে রাঁচির গাড়িতে উঠল। তার মা তাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মায়ের দূরদৃষ্টি আছে। তাঁর উপদেশের অসম্মান করার সাহস দময়ন্তীর হল না। ঠিক এই মুহূর্তে সে লজ্জার কথা ভুলে গেল।

উনিশ

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে নরোত্তম খেমলানি এখানে আসবেন কি না সেই কথা কাঠুরে চৌধুরী ভাবছিল। মেয়ের দুর্ভাগ্যের খবর পেয়ে বাপ ছুটে আসবে, এই তো স্বাভাবিক কথা। নরোত্তমবাবু জরায় স্থবির নন, এমন দূরেও যাবেন না যে যাতায়াতের পথ নেই, কিংবা সে পথ দুর্গম দুঃসাধ্য। কাজেই তাঁর আসা উচিত। তবু এই প্রশ্ন কেন মনে এল, সেই কথাই কাঠুরে চৌধুরী ভাবছিল।

কয়েকমাস আগে হলে এ সন্দেহ তার মনে আসত না। নরোত্তম খেমলানির সম্বন্ধে তার যে ধারণাই থাক,

রিবার সম্বন্ধ কোন ধারণা তার ছিল না। অন্তত সে ার পারিবারিক ব্যাপারে কৌতূহলী ছিল না। ঐ দ্রলোকের আগ্রহেই বার কয়েক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত রেছিল। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে তার দেরি হয় নি। কছু মূলধন পাবার আশায় নিজের কন্যাকে উপঢৌকন দতে তাঁর দ্বিধা হয় নি। উপঢৌকন ললে লোকে কদর্থ করবে। বিবাহ বলা উচিত। ৎপাত্র ভেবে কন্যা সম্প্রদান করার নামই বিবাহ দেওয়া। কন্ত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাহ দেওয়াকে কাঠুরে চৌধুরী ববাহ মনে করে না। বিবাহ একটা ধর্মের কাজ, সেখানে াত্র-পাত্রী ছাড়া অন্য কারও স্বার্থ থাকা উচিত নয়। বশেষত কন্যার বিবাহে। সৎপাত্রের জন্য পণ দেওয়া াপ নয়, কিন্তু অর্থ লোভে কন্যা দান মহা পাপের কাজ। ই জন্যেই কাঠুরে চৌধুরীর উপঢৌকন কথাটি মনে সেছিল। আজ নয়, অনেক আগেই মনে এসেছিল। তার পরিণামের কথাও মনে আছে। দময়ন্তীর সঙ্গে স অন্যায় আচরণ করেছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তার ংযত হওয়া উচিত ছিল।

দময়ন্তীর মায়ের মৃত্যুর খবর সে পেয়েছিল এবং ৃত্যুটা যে স্বাভাবিক নয় সে কথাও শুনেছিল লোকের মুখে। কউ বলেছে হত্যা, কেউ বলেছে আত্মহত্যা, স্বাভাবিক ৃত্যু বলেছে শুধু ডাক্তার। তার জন্য নাকি নরোত্তম-াবুকে অনেক পয়সা খরচ করতে হয়েছে।

হত্যা করলে—কে হত্যা করল। স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করবে, সে এক অসম্ভব ব্যাপার। তাঁদের যা বয়স সেই বয়সে কেলেঙ্কারীর কথা চিন্তা করা যায় না। সংসারে এমন কোন অশান্তি ছিল না যে আত্মহত্যার প্রয়োজনও হতে পারে। তবু লীলাবতী মারা গেলেন। কোন অসুখে বা দুর্ঘটনায় মারা গেলে কাঠুরে চৌধুরী খুশি হত। তাতে পৃথিবীতে একটা অপরাধ কম ঘটত। হত্যা তো অপরাধই। আত্মহত্যাও অপরাধ।

এই মৃত্যু নিয়ে কিছু আলোচনাও কাঠুরে চৌধুরীর কানে গেছে। নরোত্তমবাবুর সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তারাই এই সব আলোচনা করেছে। কিছুদিন থেকে নাকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। নানা কারণে বিবাদ। তার মধ্যে প্রধান হল কন্যার বিবাহ। মা তাঁর দেশী একটি পাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করছিলেন। বাপের সেই চাকুরে পাত্র পছন্দ নয়। প্রসঙ্গত জানা গেছে যে তাঁরাও এক দেশের নন। একজন সিন্ধী, অপর জন গুজরাতী। তাঁরা বিবাহ করেছেন ভালবেসে, পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কন্যার বিবাহ নিয়ে বাপ-মায়ে বিরোধ কোন নূতন জিনিষ নয়। তার জন্য একটা মৃত্যুর কথা চিন্তা করা যায় না।

এই ঘটনার সঙ্গে লোকে যে তার নামও যুক্ত করেছে, সে কথাও তার কানে গেছে। লোকে তাকেও দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী ভেবেছে। সে বোধ হয় তারই জন্য। নরোত্তম খেমলানির বাড়িতে তাকে কয়েকবার যেতে দেখা গেছে। দময়ন্তী যখন এখানে ছিল না, তখন সে যেত না। সে চলে যাবার পরেও আর যায় নি। লোকে তাই খেমলানি পরিবারের সঙ্গে তার কোন প্রীতির সম্বন্ধ খুঁজে পায় নি। পেয়েছে দময়ন্তীর সঙ্গে। দময়ন্তীও যে তার কাছে এসেছে, সে খবরটাও গোপন থাকে নি।

তাই লীলাবতীর মৃত্যুর প্রসঙ্গে তার নামটাও আলোচিত হয়েছে। কাঠুরে চৌধুরীর সন্দেহ করবার আরও একটু কারণ ঘটেছিল। এই মৃত্যু নিয়ে পুলিশ কিছুদিন অনুসন্ধান করেছিল। তখন তার উপরেও যে তারা নজর রেখেছিল, সে তা জানে। একদিন এক অপরিচিত ভদ্রলোক তার সঙ্গে আলাপ করতে এসে-ছিলেন। ভদ্রলোক কাঠের ব্যবসা করবেন। তার অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারলে তাঁর সুবিধা হবে।

স্বভাবতই কাঠুরে চৌধুরী স্বল্পভাষী। তার উপর অপরিচিত মানুষ। কথায় সে আরও কৃপণ হল। ভদ্রলোক তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসবার চেষ্টা করে-ছিলেন। বলেছিলেন : আপনি এখানে একা থাকেন?

হ্যাঁ।

পরিবারের আর সবাই?

কেউ নেই।

আপনি বিবাহ করেন নি?

আপনার কি কন্যাদায় উপস্থিত?

না, তা নয়। বলছিলাম—

কিছু নাই বা বললেন।

এর পরে ভদ্রলোক বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে আর এক ভদ্রলোক এসে ঘটক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। কাঠুরে চৌধুরী তাঁকে খুবই আপ্যায়িত করেছিল। আগের ভদ্রলোকের কথা তার মনে ছিল। তিনি চলে যাবার পরে তার মনে হয়েছিল যে, কাজটা ঠিক হয় নি। সহজভাবে কথাবার্তা না বললেই লোকের সন্দেহ হয়। ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে সে সন্দেহের ভাগী হয়েছে। এবারে সে তার ভুল সংশোধন করবে বলে স্থির করে নিয়েছে।

ভদ্রলোক জানালেন যে, তাঁর খাতায় দু-তিনটি ভাল পাত্রীর সন্ধান আছে।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : আমাকে দেখছেন তো, যেমন চেহারা তেমনি কাজ। আমার সঙ্গে মানায় এমন মেয়ের সন্ধান থাকলে দিন।

আপনার সঙ্গে চেহারায় মানাতেই হবে তার কি দরকার আছে!

না মানালেই বিপদ। একটা সুন্দর মেয়ে ধরে আনলে লোকে হাসবে, বলবে, বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার। বলেই হাহা করে বিকট হেসে উঠল।

সেই হাসিতে ভয় পেয়েই ভদ্রলোক পালিয়ে গেলেন।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হয়েছিল, এঁরা পুলিশের লোক। তাকে বাজিয়ে দেখবার জন্যে ঘোরাঘুরি করছে।

একটা কথা তো মিথ্যা নয়। নরোত্তমবাবু তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাধা পেয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে। এই ঘটনাটা অন্যভাবে এই রকম—কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। বাপ রাজী ছিলেন, আপত্তি মায়ের। সেই মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হল। অর্থাৎ বিবাহের আর কোন বাধা রইল না। কাজেই কাঠুরে চৌধুরীকে এই মৃত্যুর রহস্যের সঙ্গে যুক্ত করার উপযুক্ত কারণ আছে। পুলিশকে দোষ দেওয়া চলে না।

গোয়েন্দা বিভাগ গোপনে এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে কি না কাঠুরে চৌধুরী সঠিক জানে না। কিন্তু নরোত্তমবাবু যে অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণার ভিতরে আছেন সে খবর তার কাছে পৌঁচেছে। স্ত্রীর অকালমৃত্যুর শোক, না কন্যার পালিয়ে যাবার দুঃখ, তা বলা যায় না। অন্য কিছুও হতে পারে। একটা কারণ সে জানে, ব্যবসায়ীর কাছে সেটা আরও মর্মান্তিক। তাঁর লাক্ষার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। বাজারে এই জংলী লাক্ষার আর দাম নেই। বিদেশে রপ্তানি একেবারে বন্ধ। সিন্‌থেটিক ল্যাক বাজার মাৎ করেছে। এ খবর পুরনো। কিন্তু নরোত্তমবাবুর ভিতরটা যে একেবারে ফোঁপরা ছি[ল] কাঠুরে চৌধুরীর তা জানা ছিল না। ব্যবসায়ী হিসে[বে] সিন্ধী ও গুজরাতীরা যে মাড়োয়াড়ীদের মতো সেয়ান[া] এই ধারণাই তার ছিল। এখন জেনেছে যে, খেমকা[র] কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, টাকার অভাবে তারা অ[ন্য] ব্যবসা শুরু করতে পারছে না। বাইরে ঋণও আছে নতুন ঋণ পাওয়াও নরোত্তমবাবুর পক্ষে অসম্ভব হয়েছে কি করে আত্মরক্ষা করবেন সেই ভাবনাতেই তি[নি] বেশি কাতর হয়েছেন।

নরোত্তমবাবুকে কাঠুরে চৌধুরীর বাঙালী বলে ম[নে] হল। বাঙালীর ব্যবসা ঠিক এই রকম। বাহিরে চাল-চালিয়াতি রাখতে গিয়েই তাঁদের ভেতরটা ফোঁপর হয়ে যায়। দূরদৃষ্টির অভাবও আছে বাঙালীর নরোত্তমবাবুরও ছিল। তা না হলে এখনও তি[নি] পাষাণ আঁকড়ে বসে থাকতেন না।

আর একটা কথা ভেবে কাঠুরে চৌধুরীর বিস্ময় বো[ধ] হল। জীবনে তো ভদ্রলোক কম রোজগার করেন নি সে সব টাকা কোথায় গেল! দেশে বাড়ি-ঘর করেন [নি] কলকাতাতেও না। সম্পত্তিও কেনেন নি কোনখানে কোনখানে টাকা থাকলে আজ তাঁকে বিপদে পড়[তে] হত না। শুধু মদ খেয়ে কি এত টাকা ওড়ানো যায়!

ভদ্রলোক আজ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন ব্যবসা গেছে, স্ত্রী গেছে; মেয়েও পর হয়ে গেছে আজ তিনি কি নিয়ে বাঁচবেন। কাঠুরে চৌধুরীর দুঃ[খ] হল এই ভদ্রলোকের জন্য।

ড্রাইভার ওঝাকে কাঠুরে চৌধুরী বলে দিয়েছে ডাক্তার সেনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সে নরোত্তমবাবুকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেবে। প্রয়োজন হলে তাঁকে গাড়িতে তুলেই নিয়ে আসবে। ডাক্তার সেনের সঙ্গে তিনি আসতে পারেন।

কিন্তু তিনি কি আসবেন না! মেয়ের উপরে কি তিনি আজও অভিমান করে থাকবেন! মেয়ে তাঁকে উপেক্ষা করে অপমান করতে পারে, কিন্তু তিনি কি মেয়েকে অস্বীকার করতে পারবেন! আর একটু পরেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। কাঠুরে চৌধুরী তার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

রাঁচিতে জগদীশ মেহতার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দময়ন্তীর লজ্জার সীমা ছিল না। সীতার কথা তার মনে পড়ছিল। এই এমনই লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি পৃথিবীকে বলেছিলেন, দ্বিধা হও। পৃথিবী দ্বিধা হয়ে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছিল।

এখানে দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে দেখল যে, জগদীশই তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করল। দু'হাত বাড়িয়ে বলল: এস এস।

বারান্দা থেকে বসবার ঘরে তাকে টেনে আনল। নিজে একবার ভেতরে গিয়ে কিছু ব্যবস্থা করে এসে জিজ্ঞাসা করল: কলেজ এখন ছুটি না কি?

না।

হাসতে হাসতে জগদীশ বলল: তবে কি কলেজ পালিয়ে?

দময়ন্তী বলতে পারল না যে তাও না।

জগদীশ বলল: খুব ভাল করেছ। কিছুদিন বড় একা বোধ হচ্ছিল, কাজেও মন লাগছিল না। ভাবছিলাম, কলকাতায় তোমার হোস্টেলটাই দেখতে যাব কি না।

দময়ন্তী হাসতে পারল না, পারল না সহজ হতে।

জগদীশই আবার বলল: বাবা মা কেমন আছেন?

দুর্ভাবনায় দময়ন্তীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। বলল: মা নেই।

নেই! জগদীশ চমকে উঠল।—কি হয়েছিল তাঁর?

জানি নে।

তারপরেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জগদীশ আর কোন কথা কইতে পারল না। কি সান্ত্বনা দেবে! আর প্রশ্ন করে জানবারই বা কি আছে!

খানিকক্ষণ পরে দময়ন্তী বলল: তোমার কাছে আমি আশ্রয়ের জন্য এসেছি।

আশ্রয়, আমার কাছে!

জগদীশ আরও বিস্মিত হল।

মার চিঠি তুমি পাও নি?

পেয়েছি।

তাতে তো সবই লেখা ছিল।

ছিল।

জগদীশ এক মুহূর্ত থেমে বলল: আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম।

কি উত্তর?

দময়ন্তী উৎকণ্ঠায় সোজা হয়ে বসল।

কিন্তু জগদীশ অন্য কথা বলল: সে এখন থাক।

না না, থাক নয়। তোমার উত্তর আমি আজই জানতে চাই। আজই। তারপরেই এখান থেকে আমি চলে যাব।

সহসা এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। লজ্জায় দময়ন্তী পিছিয়ে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি জগদীশকে ধিক্কার দিলেন: ছি ছি! এখনও তুমি ইতস্তত করছ!

জগদীশ ফিরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল: আপনি!

ভদ্রলোক কঠিন ভাবে ভর্ৎসনা করলেন: একটা সিদ্ধান্ত নিতে তোমার এত দেরি হয়!

না, ঠিক তা নয়।

তবে তুমি একটা স্পষ্ট উত্তর দিচ্ছ না কেন?

জগদীশ বেশ করুণভাবে বলল: জীবনের এ হল সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত। একটু ভেবে দেখব না?

সেই ভদ্রলোক দময়ন্তীর দিকে ফিরে বললেন: তবে তুমি আমার বাড়িতে এস মা, ও ভেবে দেখুক।

জগদীশ সবিস্ময়ে বলল: এ আপনি কি বলছেন!

আমি ঠিকই বলছি জগদীশ। মুক্তো দেখে তোমার মন ভোলে নি, তুমি এখন মোটাবুদ্ধির লাভ-ক্ষতির হিসেব করবে। কর। আমি একে নিয়ে যাচ্ছি। এস মা। বলে দময়ন্তীকে ডাকলেন।

আপনি! আপনি!

জগদীশ হাত কচলাতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন: আমার বয়েস হয়েছে ঠিক, কিন্তু আমার ছেলে এবারে পাশ করে বেরুবে।

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়েছিল এই ভদ্রলোকের অন্তর্দৃষ্টি দেখে। তার দৃষ্টিতে সেই প্রশ্ন দেখে ভদ্রলোক বললেন: জগদীশ আমাকে তোমার কথা বলেছিল। তোমার মায়ের চিঠি দেখিয়ে আমার কাছে পরামর্শও চেয়েছিল। এস।

দময়ন্তী এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করে নি।

বেশি দূর নয়, পাশের বাড়িতেই তিনি থাকেন। এইটুকু পথ আসতে আসতে বললেন: জগদীশের বাড়িতে

ঢুকতে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, তোমারই নাম দময়ন্তী। আমি তাই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করি নি।

দময়ন্তীর মুখে প্রশ্ন এল : কেন?

কেন! এইটুকুই অভিজ্ঞতার কথা। বয়সের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা হয়। তোমার মায়ের চিঠি আমি পড়তে পারি নি। ও ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু জগদীশের মুখে তার মানে শুনে বুঝেছিলাম যে একটা পারিবারিক দুর্যোগ তোমাদের ঘনিয়ে উঠেছে। কেউ শক্তভাবে হাল ধরবার থাকলে দুর্যোগ কেটে যেতেও পারে। তা না হলে সংসারটা ছারখার হয়ে যাবে। তোমাকে একা আসতে দেখে আমি খাপটাই সন্দেহ করেছিলাম।

চা খেতে খেতে তিনি দময়ন্তীর সব কথা জেনে নিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : তোমার ভারি ক্ষতি হল।

তারপরে বললেন : দেখি, কি করতে পারি।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে জগদীশের সম্বন্ধের কথা দময়ন্তীর জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস হয় নি। ভদ্রলোক বোধ হয় কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন : জগদীশ যে আমার আত্মীয় নয় তা বুঝতেই পারছ। আমি বাঙালী, আর সে তোমার দেশের ছেলে। সরকারী অফিসে সে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেই তার ওপর আমার জোর। আমার নাম ভট্টাচার্য।

দময়ন্তীর চোখের দৃষ্টি বিপন্ন দেখাল।

মিস্টার ভট্টাচার্য এই বিপন্ন ভাবের কারণ বুঝলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন : কি হল?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে দময়ন্তী বলল : আপনি ওর বন্ধু হলেই ভাল হত।

বুঝেছি। তুমি ভাবছ, সে আমাকে খুশি করবার চেষ্টা করতে পারে। তা করবে না।

কেন?

আমরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বুড়ো বয়সে যে জায়গায় পৌঁচেছি ও দু'দিন পরেই সেখানে পৌঁছবে। ও জানে যে আমাকে খুশি না করলেও তার চলবে। কেন না আমার ওপরওয়ালা হয়ে বসবার সম্ভাবনাও তার আছে।

দময়ন্তী ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। মিস্টার ভট্টাচার্য তার মুখের দিকে তাকিয়েই এ কথা বুঝতে পারলেন। বললেন : চাকরির এ মাহাত্ম্য তুমি বুঝবে না মা, আমাদেরই বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল।

একটু থেমে বললেন : হিন্দু কোড বিল পাস হয়ে দেশে ধর্ম সংস্কার হল, কিন্তু সমাজ সংস্কার হল না। গান্ধীজী হরিজনদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, কিন্তু সরকারী অফিসের হরিজনরা কোনদিনই জাতে উঠবে না। এ একটা দুঃখেরই কথা।

মিস্টার ভট্টাচার্য হঠাৎ লজ্জিত হলেন। বললেন : এই আমাদের দোষ। সুযোগ পেলেই নিজেদের দুঃখের কথা বলি, দেখি এস তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিই।

দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে দেখল, বাড়িতে আর কেউ নেই, কিন্তু একাধিক লোকের থাকবার ব্যবস্থা আছে। একটি শোবার ঘরে এনে মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন : এইটি আমার মেয়ের ঘর, তুমি এইখানেই থাক।

দময়ন্তী খানিকটা সহজ হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল : আপনার মেয়ে কোথায়?

মিস্টার ভট্টাচার্য হেসে বললেন : ছেলেমেয়েরা সবাই হোস্টেলে। ওদের মা নেই বলে এখানে কাউকে রাখি নি। ওরা ছুটিতে এখানে আসে।

দময়ন্তীর মনে পড়ল যে আজ সকলেরই ছুটি। আজ রবিবার। সেইজন্যেই আজ তাঁদের বাড়িতে পাওয়া গেছে। অফিসে যাবার তাড়া কারও নেই।

দময়ন্তীর মনে আছে যে, দুপুরবেলায় একা ঘরে তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কলকাতা ছাড়বার আগে তার ভবিষ্যৎ এমন অন্ধকার মনে হয় নি। জীবনের আকাশে যে মেঘ দেখেছিল, তাকে হাল্কা বলেই ভেবেছিল। এখানে এসে তার ভুল ভেঙ্গেছে। জীবনের মেঘ শরতের মেঘের মতো লঘু নয় ভারিও নয় বর্ষার মেঘের মতো, সে মেঘ পাহাড়ের মেঘের মতো, কখনও সমস্ত আচ্ছন্ন করে খেলার ছলে, কখনও পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকে সারাক্ষণ। তার জীবনের মেঘ সরে যাবে কি না দময়ন্তী ভাবছিল।

এমনি সময়ে জগদীশ এল ছুটে। চেঁচিয়ে ডাকল: দময়ন্তী কোথায়?

মিস্টার ভট্টাচার্যের গলা শোনা গেল: কি দরকার তাকে?

তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

একটা অবিবাহিত ছোকরার বাঙলোয় সে যাবে না।

জগদীশের পরের কথা শুনে দময়ন্তীর রোমাঞ্চ হল। নিতান্ত নির্লজ্জের মতো জগদীশ বলে উঠল: তাকে আমি বিয়ে করব।

তাই না কি! মিস্টার ভট্টাচার্য হেসে উঠলেন।

আপনি হাসছেন যে?

বিয়ে না করেই তুমি বৌ নিয়ে যেতে চাও! বেশ ছোকরা তো!

তারপরেই দময়ন্তীকে ডাকলেন: শুনছ মা, জগদীশের আক্কেলের কথা শুনে যাও। লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে বসে আছে।

বারান্দায় বেরুতে দময়ন্তীর লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু ভিতরে থাকবারও উপায় নেই। মিস্টার ভট্টাচার্য ডাকাডাকি করেই তাকে বার করলেন। বললেন: দেখলে তো মা, এতক্ষণে জগদীশ মুক্তোর দাম বুঝল। হাজার হলেও বেনের ছেলে তো!

এ কথা বলেই প্রশ্ন করলেন: মেহতারা তো জাতে বেনে বলে শুনেছি। তাই না?

জগদীশ এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল: কি বলছেন বলুন না।

বলছিলাম আর কি! বাপের অমতে বিয়ে, মাও বেঁচে নেই। কাজেই পাওনা-গণ্ডা শূন্য। দময়ন্তীর ভাগ্য যে পয়সার চেয়ে ওর দাম তুমি বেশি দিলে।

মিস্টার ভট্টাচার্যের বাড়িতে দময়ন্তীকে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল, তিনিই জোর করে ধরে রেখেছিলেন। জগদীশের সঙ্গে দময়ন্তীর বিয়ে হল রেজেষ্ট্রি করে। তারপরে মিস্টার ভট্টাচার্য দময়ন্তীকে ছেড়ে দিলেন। তিনি বলতেন: আজকালকার ছেলেদের কিছু বিশ্বাস নেই। হাতের মুঠোয় পেলে দাম দেবার কথা ভুলে যায়। দময়ন্তীকে আমি কোন ভুল করতে দেব না।

মিস্টার ভট্টাচার্যের পরামর্শে নরোত্তম খেমকানিকে তারা খবর দিয়েছিল। তিনি কোন উত্তর দেন নি। দময়ন্তী তার মামাকেও খবর দিয়েছিল জুনাগড়ে। উত্তর পেয়েছিল মামীর কাছ থেকে। তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছিলেন। দময়ন্তী এর কারণ না বুঝে কয়েকদিন কেঁদেছিল।

জগদীশ মেহতাও তার বাড়িতে খবর দিয়েছিল। তাঁরা কোন উত্তর দেন নি। জগদীশ জানত যে, উত্তর পাবে না। দময়ন্তীকে সে বলতে দ্বিধা করে নি যে, সে তাঁদের হতাশ করেছে? তার জন্যে অনেক পয়সা খরচ হয়েছে, অথচ বিবাহের ব্যাপারে সে তাঁদের সম্মান দিল না। জগদীশের বিবাহ দেবার অধিকার যে তাঁদের আছে, এ কথা তার বোঝা উচিত ছিল। ভয়ে ভয়ে দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল: কি হবে এখন।

আমরা নিজেদের পৃথিবী গড়ব।

দময়ন্তীর মনে পড়েছে, এ কথা বলবার সময় জগদীশের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল।

তাদের নূতন পৃথিবীতে প্রথম আত্মীয় হবার সুযোগ ছিল মিস্টার ভট্টাচার্যের। কিন্তু তা হল না। তিনি বদলি হয়ে গেলেন। যারা রইল তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের প্রশ্ন ওঠে নি। সরকারী বন্ধুতা একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। এ যে নিতান্তই সাময়িক সম্বন্ধ তাতে কারও সন্দেহ হয় না।

জগদীশের একটা দুর্বল রূপ দময়ন্তী মাঝে মাঝে দেখতে পেত। সেই প্রথম দিনের আচরণের জন্য একটা অপরাধবোধ। জগদীশ বোধ হয় ভাবত যে, দময়ন্তীর মন থেকে সেই অভিমান নিঃশেষে মুছে ফেলতে সময় লাগছে। তার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। কিন্তু জগদীশের ধৈর্য ছিল না। তার ব্যবহারে ও কাজে দময়ন্তী একটা আবেগ দেখতে পেত। আশ্চর্য হত। তারপর তার কারণ বুঝল আচম্বিতে। সেই বিশ্রী ঘটনায় সমস্ত সরল হয়ে গেল। দময়ন্তীর মাথা হেঁট হয়ে গেল সকলের কাছে। জগদীশ এমন করে তাকে ঠকাল! ছি ছি!

[ক্রমশ।

আঁদ্রে জিদ্

সুনীলকুমার নাগ

বিশ বছরেরও বেশি ফ্রান্স তথা ইয়োরোপের বিদগ্ধ মহলে প্রায় একঘরে হয়ে জীবনযাপন করবার পরে ১৯৫১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী জিদ্ যেদিন দেহত্যাগ করলেন তারপর থেকে কয়েকটা মাস দেখেছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির নবমূল্যায়ন। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ জিদের বিভিন্ন রচনার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নি, এ রকম ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম—অন্তত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে; বর্তমানে আমরা এইরকম মাত্র একজনেরই একটি রচনার কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করবো। ইনি হলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ফরাসী দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক তথা দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্র। সার্ত্র লিখলেন:

এই বুড়ো মানুষটি, বয়স আশীর ওপর হয়ে গেছে, লেখা বলতে গেলে 'একরকম ছেড়েই দিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই, অথচ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কি ভীষণভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিলেন আমাদের সাহিত্যকে, ভাবলে বিস্ময় মানতে হয়।... জিদ্‌কে আমরা অনেকেই ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারি নি বলেই আমার মনে হয়।...জিদ্ তাঁর সমস্ত জীবন সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করে গেছেন। চলমান জীবনের পরিবর্তনশীল আচার-বিচার, সামাজিক অনুশাসন-এর সঙ্গে মানুষ হিসেবে আমাদের যে সমস্ত কাল-নিরপেক্ষ আশা-আকাঙ্ক্ষা তার বোঝাপড়া; গোঁড়া প্রোটেস্টান্টবাদের সঙ্গে শিথিল যৌনতন্ত্রের বোঝাপড়া; অভিজাত বুর্জোয়া গোষ্ঠীর গর্বিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে মার্কসবাদের বোঝাপড়া এবং এই রকমই আরো অনেক পরস্পরবিরোধী বিষয়ের বোঝাপড়া ঘটাতে চেয়েছিলেন। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, জিদ্ তাঁর সমকালের মানুষের প্রায় সমস্ত প্রধান সমস্যা সম্পর্কেই সজাগ ছিলেন।

কৃতির বিশিষ্টতার জন্য পাঠক যেমন জিদের প্রতি আকৃষ্ট হন, তেমনি তাঁর রচনার [illegible], খৃষ্টধর্মের প্রতি সুগভীর অনুরক্তি এবং সেই সঙ্গে সুতীব্র যৌনচেতনা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এই যে পরস্পরবিরোধী কতকগুলি চিন্তা ও বিষয়বস্তুর সংঘাত জিদের ব্যক্তিগত জীবন তথা সাহিত্যসৃষ্টিতে বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে, তার সূত্রপাত বলতে গেলে একেবারে শৈশবেই শুরু হয়েছিল। একটি অত্যন্ত গোঁড়া খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঁদ্রে জিদ (২২শে নভেম্বর, ১৮৬৯)। জিদ্ পরিবারের স্থায়ী বসবাস প্যারিসেই ছিল। জিদের বাবা ছিলেন আইনের অধ্যাপক। সাধারণভাবে পরিবারের অন্যান্যেরাও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কাজেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জিদ্ যে জিনিসটি পেলেন পরিবারের বড়োদের মধ্যে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবার জন্য তা হলো প্রথমত ধর্ম এবং দ্বিতীয়ত জ্ঞানার্জনের বাসনা। নিয়মমাফিক পড়াশুনা খুব যথাসময়েই শুরু হয়েছিল কিন্তু সবসময়ে বড়োদের পছন্দ হতো না বলে, কখনো বা বালক নিজের নিতান্তই ভালো লাগেনি বলে একাধিকবার স্কুল বদলাতে হয়েছে জিদ্‌কে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তরুণকালে যে উৎকট ধর্মবিশ্বাসিতা দেখা দিয়েছিলো তার কবল থেকে জিদ্‌কে রক্ষা করবার জন্য বয়স্ক আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে উৎকণ্ঠার অবধি ছিলো না। এর ফলে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ স্বাধীনতা বাল্য বা কৈশোরে জিদ্ তেমন পান নি এবং এই সব নানা ব্যাপারে জিদের প্রথম জীবন এমন ভাবে কেটেছে যে, অনেকের মতেই তাঁর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নজর দেওয়া হয়ে যেতো। দি

সুখের বিষয়, মাত্রাতিরিক্ত নজরের ফলে সাধারণত, ছেলেরা যে-রকম নষ্ট হয়ে যায়, জিদের বেলায় তা' হয় নি। বড়োরা ঠিক যে রকমটি চেয়েছিলেন জিদ্ ঠিক তেমনি ক্রমশ গোঁড়া ধার্মিক এবং বিদ্যানুরাগী হয়ে উঠলেন। এবং এ-দু'টো এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে, একুশ বছর বয়সে জিদ্ যখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করলেন তখন তরুণমহলে সকলের কাছে তাঁর নামের চাইতেও বেশি পরিচিতি হয়েছিলো তাঁর গুণাগুণের এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের। কেউ বলতো—আঁদ্রে জিদ্, সে কে? ও, বুঝতে পেরেছি সেই যে যুবকটি সবসময় বগলে বাইবেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারো কাছে জিদের প্রধান পরিচয় এই ছিল যে, একেবারে প্রথম থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ফরাসী-সাহিত্যের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতা, এমন কি নাটকের কথোপকথন পর্যন্ত বেশ কয়েক লাইন উনি মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। এ জন্যে তাঁর বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হতো না। কারো কাছে জিদের প্রধান পরিচয় ছিলো তাঁর অতিমাত্রায় ভদ্রতা এবং শিষ্টাচারবোধ। অস্কার ওয়াইল্ড এক সময় জিদ্‌কে বলেছিলেন:

আপনার ঠোঁট দু'খানা আমার একদম পছন্দ হয় না। কারণ, এমন সরল রেখার মতো আপনার ঠোঁট দু'খানি যে দেখলেই মনে হয় এ লোক কখনো মিথ্যে কথা বলে নি।

সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছেলেবেলা থেকে থাকলেও নিজে কিছু সৃষ্টি করবার যে অত্যুগ্র বাসনা তার জন্যে জিদ্ বোধ হয় ম্যালার্মের নিকটই সর্বাধিক ঋণী। যদিও ব্যক্তিগতভাবে ম্যালার্মের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই জিদ্ তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেছিলেন এবং ম্যালার্মে এবং মেতরলিঙ্ক সে রচনার প্রশংসাও করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পরেই জিদ্ ম্যালার্মের গোষ্ঠিভুক্ত হয়ে গেলেন এবং তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই জিদ্ ছোটো একটি কাহিনী রচনা করলেন 'দি ইমমরালিষ্ট।'

ইতিমধ্যে জিদের বাবা মারা গেলেন টি-বি-তে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুবক জিদের এই রকম একটা ধারণা সৃষ্টি হলো যে, উনিও অকালে টি-বি-তেই মারা যাবেন। এ ধারণাটা ওঁর মধ্যে সে সময়ে এতই প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে সকলে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ওঁকে পরামর্শ দিলেন কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসবার জন্যে। আর ঠিক সেই সময়ই জিদের এক শিল্পীবন্ধু আসছিলেন আফ্রিকা। জিদ্ও তাঁর সঙ্গ নিলেন। আফ্রিকায় এসে প্রথম কিছুদিন ওঁরা টিউনিসের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন, তারপর বিসক্রায় এসে স্থায়ী আস্তানা করে নিলেন। বিসক্রায় ওঁদের বাসস্থানের নিকটেই ছিলো একটি মরুদ্যান। দুই বন্ধুতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় লোকজনের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠলেন এবং জিদের মধ্যে দেখা দিলো কবিতা রচনার জন্যে একটা প্রেরণা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উনি কয়েকটি কবিতা রচনা করে ফেললেন।

কিন্তু শরীরের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হলো না বলে কিছুদিনের জন্যে জিদ্ একটা স্যানাটোরিয়ামে আশ্রয় নিলেন; যদিও টি-বি হয়েছে এমন কথা নিশ্চয় করে কোনো ডাক্তারই বলেন নি।

বৎসরাধিককাল বাইরে কাটাবার পরে জিদ্ যখন প্যারিস ফিরে এলেন তখন তাঁর মন শহুরে কৃত্রিমতায় ঘোরতর বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে তাই আবার চলে এলেন আফ্রিকায়।

এবারে প্রথমে টিউনিসিয়া গেলেন না জিদ্। প্রথমে এলেন আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে এবং এইখানেই কয়েকদিন পরে ঘটনাচক্রে জিদের পরিচয় হয়ে গেলো অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে। অস্কার ওয়াইল্ড সে সময়কার ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে সর্বত্র স্বীকৃত। এবং একটা বিশেষ ধরনের যৌনতার প্রবক্তা বলে তাঁর অখ্যাতিও কম ছিলো না। ওয়াইল্ডের সঙ্গে যে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এটাকে জিদ্ তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে মনে করতেন।

কয়েক সপ্তাহ আলজিয়ার্সে কাটাবার পরে আবার ঘুরতে ঘুরতে জিদ্ বিসক্রাতেই চলে এলেন এবং এবার ঠিক করলেন যে, বিসক্রাতেই সারাজীবন কাটাবেন। এটা মনস্থ করেছিলেন বলেই বিসক্রার মরূদ্যানের সন্নিকটে একখণ্ড জমি কিনলেন জিদ্ এবং ছোট্ট একটি কুটির তৈরি করে সাহারার শোভা দেখে বেড়াতে লাগলেন। অনেকদিন বাদে একবন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন জিদ্‌কে যে সাহারা তো একটা মরুভূমি, তার আবার শোভা কি? জিদ্ সক্ষোভে উত্তর দিয়েছিলেন যে, প্যারিসের কৃত্রিমতার চাইতে মরুর শূন্যতাও ভালো।

সেখানে সারাজীবন কাটাবেন বলে জিদ্ জায়গা কিনে কুটির তৈরি করে বসবাস শুরু করলেন, সেখানে বছরখানেকের বেশি থাকা হলো না ওঁর। প্যারিস থেকে টেলিগ্রাম গেলো জিদের মা মৃত্যুশয্যায়, অবিলম্বে চলে এসো। ছেলেবেলায় জিদ্ অতিমাত্রায় বাধ্য ছিলেন মায়ের। বাবার মৃত্যুর পরে ওঁর মা একাই মা এবং বাবা দু'জনের কাজ করে চলেছিলেন। বিসক্রার আস্তানা গুটিয়ে অবিলম্বে জিদ্ ফিরলেন প্যারিসে মায়ের ডাকে। মা মারা গেলেন কয়েকদিন পরেই। যে মাত্রাতিরিক্ত নজর জিদ্ একেবারে শৈশব থেকে পেয়ে আসছিলেন তার শেষ হলো এতদিনে। মা অবশ্য প্রচুর বিত্ত সম্পত্তি রেখে গেলেন জিদের জন্যে।

বারো বছর বয়স থেকে একটি মেয়ের সঙ্গে জিদের বিয়ের ঠিক হয়েছিলো। মায়ের মৃত্যুর কিছু পরেই এবার সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করে আবার আফ্রিকা চলে গেলেন জিদ্। এটা ১৯০৫ সালের কথা। তিন বছর আগে যে কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন জিদ্ এবার আফ্রিকা এসেই সেগুলির পরিমার্জন করলেন। ১৯০৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো এই কবিতাগুলি। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'দি ইমমরালিস্ট' রচনায় জিদ্ যেমন দেহ ও মনের অভিনব সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবার এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে তেমনি সমাজ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ফুটে বেরুলো।

এরপর প্রায় পাঁচ বছর জিদ্ ছোটো ছোটো প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত রইলেন। ফ্রান্সের সমস্ত প্রথমশ্রেণীর সাপ্তাহিক তথা মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণ সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন জিদের রচনার জন্যে। তা' ছাড়া কিছু কিছু দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতাও এরই মধ্যে অর্জন করলেন উনি। জার্মানী, ইতালী, স্পেন, গ্রীস, তুরস্ক,

অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের তরুণ সাহিত্যসেবী মহলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠলেন জিদ্। এই সময়েই একবার ইয়োরোপ ভ্রমণ করতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন অল্প কিছুদিনের আলাপের ফলেই জিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সখ্যতা হয়েছিল। যার ফলে কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদ করাবেন ঠিক করলেন (এটা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার পূর্বের কথা) তখন এককপি গীতাঞ্জলি উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জিদের কাছে ডাকযোগে, সঙ্গে একখানি পত্র, একখানি অনুরোধ পত্র যেন জিদ্ তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তাঁর পছন্দমত কাউকে দিয়ে কবিতাগুলির (ইংরেজী) একটা ফরাসী অনুবাদ করিয়ে দেন। কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের মন খুশিতে ভরে উঠেছিল যখন উত্তরে জিদ্ জানিয়েছিলেন যে, উনি নিজেই গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এই সময়ের মধ্যে জিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে একখানি সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। জিদের নাম এর সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে যদিও ছিলো না—কিন্তু তবু সকলেই জানেন যে জিদ্ই ছিলেন এর প্রাণ। রচনা নির্বাচন, [illegible] সম্ভাবনার লক্ষণ পেলেই তার পেছনে নিজে থেকে তাকে ছাপাবার উদ্যোগ করা এবং ছাপিয়ে তরুণ লেখকদের উৎসাহিত করা, নিত্যনূতন লেখক খুঁজে বের করা এবং এই ধরণেরই কাজে জিদ্ নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন কয়েকটা বছর। বছর পার না হতেই পত্রিকাখানি সে সময়কার ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাহিত্য পত্রিকার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে ফরাসী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন এ রকম অন্তত বিশজন সাহিত্যিকের সাহিত্যসাধনার সুরু হয়েছিল এই পত্রিকার মাধ্যমেই। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন রজার মার্টিন দ্যু গার্ড, জুলে রোমেইন্‌স, জাঁ রিচার্ড ব্লচ, [illegible] প্রভৃতি। মার্টিন দ্যু গার্ড তো তাঁর সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কারই লাভ করেছিলেন ([illegible] সালে)।

এই সময়েই অর্থাৎ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্ট্রেট ইজ দি গেট' প্রকাশিত হলো এবং এখন থেকে লেখক তথা সমালোচকরা স্বীকার করলেন যে, আঁদ্রে জিদ্ শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক, অদ্ভুত প্রবন্ধকার বা কাব্যধর্মী ব্যক্তিই নন, একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকও বটেন।

স্ট্রেট ইজ দি গেট-এর বিষয়বস্তু যেমন অভিনব, জিদের রচনাশৈলীও তেমনি আশ্চর্য বিকাশ দেখা যায় বইখানিতে। এর কাহিনীভাগে দেখা যায়, নানা বিচিত্র ঘটনা তথা এলিসার মানসিকতার [illegible]:

একজন বিত্তশালী ব্যাঙ্ক মালিক স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত কিন্তু স্ত্রী তার প্রতি মোটেই কর্তব্যপরায়ণা নয়। তাই দেখা যায় যদিও সে একাধিক সন্তানের জননী কিন্তু তবু স্বামী এবং সন্তানদের মায়া কাটিয়ে সে একদিন নিজের স্বতন্ত্র পথ বেছে নিলো। ব্যাঙ্ক মালিকের বড়ো মেয়ে এলিসা কিশোরী বয়স থেকেই একটি তরুণকে ভালোবাসে। তার নাম জেরোম। জেরোম এবং এলিসা উভয়েই জানে যে যথাসময়ে ওদের বিয়ে হবে এবং নিজের সংসার গড়ে তুলবার নানা রঙিন স্বপ্নও এলিসা দেখে থাকে। কিন্তু ক্রমশ ঘটনার আবর্ত কিছুটা ভিন্নতর অবস্থার সৃষ্টি করতে লাগলো। এলিসা বাপের বড়ো মেয়ে। স্ত্রী চলে যাবার পর থেকে এলিসাই বলতে গেলে বাপের একমাত্র বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি সংসারে। মা চলে যাবার পর থেকে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বাপের মানসিকতায় যে কি পরিবর্তন প্রত্যহ হতে আরম্ভ করলো, তা এলিসা নিজের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে বুঝতে লাগলো। প্রায় সর্বক্ষণ বিষণ্ণ বাপের সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে এলিসার মানসিকতায়ও বেশ লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ক্রমশ এলিসা নতুনভাবে ভাবতে সুরু করলো। কি হবে বিয়ে করে? জেরোম কি সুখী হবে আমাকে নিয়ে? সেইখানে এ প্রেমের শেষ কোথায়? যে প্রেমের শেষ আছে, সে কি প্রকৃত প্রেম? না তা হয় কি করে? প্রেম যে স্বর্গীয় বস্তু, স্বর্গীয় বস্তুর কি কখনো শেষ থাকে? কিন্তু বাবার তা হলে আজ এ অবস্থা কেন হলো? সর্বক্ষণ বিষণ্ণ আর অনুতাপে ভরা কেন তার চোখ-মুখ? তরুণী এলিসা নিজের মনে মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করে, সব কিছুই বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কোনো প্রশ্নেরই একটা [illegible] সদুত্তর নিজের মনে জেগে ওঠে না।

এই রকম একটা মানসিক অবস্থাতেই দেখা যায়, এলিসা একদিন নিজের মনে সিদ্ধান্ত করে ফেললো যে, জেরোমকে বিয়ে করে প্রেমের সমাধি ও রচনা করবে না—বরং জেরোমের প্রতি তার ভালোবাসাকে অমর করে রাখবার জন্য তাকে দেহের [illegible]। এই মনস্থ করে এলিসা ক্রমশ সুপরিকল্পিতভাবে এমন সব কাজ করতে লাগলো, জেরোমের সঙ্গে এমন ব্যবহার [illegible] যে [illegible] প্রতি জেরোমের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। [illegible] বছরের এই সমস্ত পরিবর্তন [illegible]। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেলো তার বিপরীতই হলো। এলিসা জেরোমকে নিজের প্রতি বেশ খানিকটা বিরূপ করে তুলতে সমর্থ হলো এবং [illegible] ওদের বিয়ের [illegible] এলিসা সরাসরি [illegible] জেরোমের বরং জুলিয়েটকে [illegible] বিয়ে করা উচিত, কারণ জুলিয়েট তাকে ভালোবাসে।

এলিসার এ পরামর্শ অবশ্য জেরোম কানে নিলো না এবং তখনকার মতো জেরোম ক্ষুব্ধ মনে বিদায় নিয়ে ভাবতে লাগলো কি ব্যাপার—এলিসার হঠাৎ এই এতখানি পরিবর্তনের কি কারণ থাকতে পারে?—যে মেয়ে, দশ-বারো বছরের বেশি ধরে মেলামেশা চলছে। কিছুদিন ধরে অবশ্য এলিসার অনেক কিছুই খুব ভালো লাগছে না, ওর চাল-চলনের ভেতর কেমন যেন একটা দুর্বোধ্যতাও দেখা দিয়েছে, সে কথাও ঠিক; কিন্তু তার মানে তো আর এই নয় যে দীর্ঘ বারো বছরের সম্পর্কটা মুছে যেতে পারে? জুলিয়েটকে বিয়ে করবার অনুরোধটা এলিসা মুখে আনলো কি করে? একটুও কি বাধলো না?—এই রকমই সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলো জেরোম। কয়েকটা দিন এই ভাবেই চললো তারপর একদিন এলিসার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলো জেরোমের। তিনি বললেন যে, আসল ব্যাপার হচ্ছে

বুড়ো বাপকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলে এবং ছোট অবুঝ বোনকে বাপের ওপর ছেড়ে দিয়ে এলিসা বিয়ে করতে চাইছে না। তোমাকে (অর্থাৎ জেরোমকে) প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে ওর নিজের মনেও নেহাৎ কম বাজে নি—কিন্তু বাপের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে নিজের কর্তব্য করতে এলিসা সত্যি বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটে যেতে জেরোম এলিসাকে পাবার জন্যে আবার কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠলো। কারণ ওর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এবেল-এর সঙ্গে জুলিয়েটের একটু একটু করে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হতে লাগলো এবং তারপর উভয়েই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো যে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে এবং ওরা বিয়ে করবে। জেরোম মনে করলো এবার নিশ্চয়ই এলিসা আর কোনই আপত্তি তুলবে না বিয়ের বিরুদ্ধে। কারণ ছোটো বোনেরও বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গেলো আর তা' ছাড়া বুড়ো বাপকেও সবাই মিলে দেখাশুনোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা আবার অন্যদিকে মোড় ফিরলো। একদিন নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এবেল ধরে ফেললো যে, একসময় জুলিয়েট জেরোমকেই ভালোবাসতো, কিন্তু জেরোম বরাবরই ওকে কিছুটা অনুকম্পা, কিছুটা বা অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। এবেল যখন আরো প্রশ্ন করতে লাগলো তারপরেও, তখন অপরিণতবুদ্ধি জুলিয়েট খোলাখুলিই স্বীকার করলো যে, জেরোমকে ও এখনো ভালোবাসে মনে মনে। এরপর এবেল আর জুলিয়েটকে বিয়ে করতে রাজী হলো না। জেরোমকেই ও অনুরোধ করলো জুলিয়েটকে বিয়ে করবার জন্যে; কিন্তু জেরোমও কর্ণপাত করলো না সে-কথায়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রাগে, দুঃখে, অভিমানে এবং নিজের প্রতি চরম অশ্রদ্ধায় জুলিয়েট এমন একজনকে বিয়ে করলো যাতে তার বাবা, দিদি, জেরোম এবং এবেল সকলেই কমবেশি দুঃখিত এবং আশ্চর্য হয়ে গেলো। জুলিয়েট বিয়ে করলো বয়সে নিজের চাইতে অনেক বড়ো অবস্থাপন্ন সুরা ব্যবসায়ী এডওয়ার্ডকে—শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি বলে যার কিছু নেই।

এদিকে জেরোম ধীরে ধীরে লক্ষ্য করতে লাগলো যে, এলিসার মধ্যে যেন একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটছে। চিঠি লিখে যে ভাব এবং ভাষায় এলিসা উত্তর দেয় সে যেন সাধুসন্তদের ভাষা। এইরকম সময় দেশের জরুরী অবস্থার জন্যে জেরোম সামরিক বিভাগে ঢুকতে বাধ্য হলো।

জেরোম যখন লড়াই থেকে ফিরে এলো তখন ওর চিন্তাধারা এবং এলিসার ভাবধারণায় অনেক দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে গেছে। জেরোম নিজে কিছুটা ধর্মভীরু প্রকৃতির ছিল আগে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দেশ-বিদেশের নানা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা প্রভৃতির ফলে ও কার্যত নাস্তিক হয়ে উঠেছে আর এলিসাকে দেখা গেল ও রীতিমতো গোঁড়া ধার্মিক হয়ে উঠেছে। সাহিত্যবিষয়ক বইপত্র যা পড়াশোনার ভীষণ নেশা ছিল ওর, এখন দেখা গেল সে সবের নাম পর্যন্ত শুনতে রাজী নয়। ধর্মের বই ছাড়া আর কিছুই ওর আর পড়তে ভালো লাগে না বা পড়েও না। ধর্ম বিষয় ছাড়া আর কিছু আলোচনা করতেও ওর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই।

কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়। সে হলো জেরোম যতটা তীব্রভাবে এলিসাকে চায়, এলিসাও আসলে জেরোমকে তার চাইতে কম চায় না। কিন্তু তফাৎ হলো এইখানে যে জেরোম তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে—সে সমস্তভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে উদগ্রীব আর এলিসা এক তো প্রকাশ্যে একথা কখনোই বলে না; আর দ্বিতীয়ত ও যে জেরোমকে চায় সেজন্যে অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গেও ওকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয় সর্বক্ষণ। বুকের ভেতর থেকে যখনই একটা তীব্র বাসনা ওর সত্তাকে নাড়া দেয় প্রেমের পার্থিব রূপকে গ্রহণ করবার জন্যে, তখনই এলিসা তার সজ্ঞান মন দিয়ে ধর্মের পুঁথিপত্তরের চাপে অন্তরের ক্ষুধাকে দলে-পিষে মারতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ফলে ওর মধ্যে চলতে থাকে অবিশ্রান্ত একটা সংঘাত এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় দীর্ঘকাল জ্বলতে জ্বলতে এলিসা যে কখন কি ভাবে রোগের শিকার হয়ে পড়েছিল, তা কেউই বুঝতে পারে নি। জেরোম লড়াই থেকে ফেরবার পর যখন একদিন জোরের সঙ্গে এলিসাকে বলতে লাগলো, আজেবাজে আধ্যাত্মিক চিন্তায় অসময়ে ব্যস্ত না হয়ে বিয়েটা চুকিয়ে নিয়ে সংসার পাতবার কথা, ঠিক সেই সময়েই জানা গেল চিকিৎসার জন্যে অবিলম্বে এলিসাকে একটা নার্সিং হোমে যেতে হবে। এলিসা নার্সিং হোমে গেল এবং সেখানেই অকস্মাৎ একদিন তার মরদেহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

একটি মেয়ের শৈশব থেকে সুরু করে পরিণত তরুণ বয়সের মাঝামাঝি পর্যন্ত নানা মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ জিদ তাঁর এ উপন্যাসে করেছেন। বর্তমানের বস্তুতান্ত্রিক জগতে এ ধরণের বিষয়বস্তু অর্থাৎ পার্থিব সুখ এবং অপার্থিব পূর্ণতা—এ ধরণের জিনিসের আলোচনা বা তার সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ সম্পর্কে জিদ্ নিজেই একসময়ে বলেছিলেন যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে মানুষ দিন দিন যতই বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠুক না কেন, তার মানসিক প্রয়োজনেই সে অপার্থিব কোনো বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে পার্থিব সুখ-সুবিধার তুলনা করবে।

জিদের পরবর্তী বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ভ্যাটিকান সুইণ্ডল্' প্রকাশিত হয় পাঁচ বছর পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। মানুষের ধর্মের প্রতি ঝোঁক এবং অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সংঘাতশীলতা, কঠোরতা এবং রূঢ়তা এইসবের নানা বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, এ উপন্যাসের তাই উপজীব্য। কাউণ্ট জুলিয়াস, তার সৎ ভাই লাফকাডিয়ো, বোন ভেরোনিকা এবং ভগ্নীপতি এনথিম—এরাই হলো এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এর কাহিনীভাগ নানা শাখা-উপশাখা বিস্তার করে রয়েছে—তবে মূল কাহিনীর প্রধান সূত্রটিকে এইভাবে রূপ দেওয়া যেতে পারে:

এনথিমের একটি পা খোঁড়া, বাতে পঙ্গু ও একজন বিজ্ঞানী এবং গবেষক এবং বলাই বাহুল্য একজন ঘোরতর নাস্তিক। ভার্জিন মেরীর একটি মূর্তির সামনে ওর স্ত্রী স্বামীর রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করছে দেখে রাগে এবং ঘৃণায় একটা ক্রাচ ছুঁড়ে মারলো স্ত্রীর দিকে। ক্রাচটা গিয়ে পড়লো মেরীর প্লাস্টিক মূর্তির ওপর। ফলে মূর্তির একখানি হাত ভেঙে গেলো। সেইদিনই রাতে এনথিম স্বপ্ন দেখলো যেন মেরী তার পায়ের ব্যথার জায়গায় হাত বুলোচ্ছে। ঘটনাচক্রে পরদিন ঘুম থেকে উঠে এনথিম দেখতে পেলো, সত্যি সত্যি আর কোনো রকম ব্যথা নেই। ক্রাচ ছাড়াই সে হাঁটাচলা করতে পারছে। এরপর ঘোরতর নাস্তিক, বিজ্ঞানী

এবং গবেষক এনথিম ধর্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো এবং নতুন করে দীক্ষিত হলো একটা গির্জায় গিয়ে। খবরটা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এনথিমের গবেষণায় যে সমস্ত লোকজন অর্থ সাহায্য করতেন তাঁরা তাঁদের সাহায্য বন্ধ করে দিলো। ফলে এনথিমের আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলো। আর্থিক সঙ্কট দেখা দেওয়া মানেই বিজ্ঞান সাধনা অসম্ভব হয়ে ওঠা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা (অর্থাৎ নিজের জীবনের) এনথিমের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। বাতের ব্যথার উপশম হয়েছে বলেই যে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করা, তার ফলে কি ভগবানকেই ছোট করা হয় না? আর তা' ছাড়া একটা স্বপ্ন দেখা বা ব্যক্তিবিশেষের বাতের ব্যথার উপশম হলেই তার ফলে ভগবানের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায় না। এনথিমের সত্যানুসন্ধানী মন নানা-রকম চিন্তার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। অবশেষে একদিন ওর মনে হলো মধ্যে কিছুদিন বাতের ব্যথাটা প্রায় সেরে যাবার মতো হয়ে থাকলেও আবার যেন একটু একটু করে সুরু হলো ব্যথাটা। তারপর একদিন দেখা গেলো বাতের ব্যথাটা যেই কে সেই। নিজের কাছেই নিজেকে নিতান্ত ছোটো মনে হলো এনথিমের। 'সত্য' যে যে-কোনো ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে সে কথাটা আর একবার মর্মে মর্মে অনুভব করলো ও এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো যে কিছুদিনের জন্যে একটা ভ্রান্তির কবলে পড়েছিলাম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনো বৈজ্ঞানিকের কাছেই সত্য হতে পারে না। কাজেই আমার কাছেও নয়। এই কথা বলে এনথিম আবার নতুন করে তার ল্যাবরেটরী সাজাতে আরম্ভ করলো। আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো গবেষণা, আর একদিকে চলতে থাকলো ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম, নিদারুণ দৈহিক কষ্ট স্বীকার; কিন্তু তবু এনথিম এবার সুখী, কারণ সে আত্মপ্রতারণা করছে না। নিজের বিবেকের কাছে সে আর ছোটো বোধ করে না, কারণ যা সত্য বলে তার ধারণা সেই মতো সে চলছে।

ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিদের পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ লেখকগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই কোনো না কোনো সামরিক বিভাগের কাজে যোগদান করতে বাধ্য হলো। জিদ নিজেও। জিদ নিজে গেলেন বেলজিয়াম সীমান্তে উদ্বাস্তু হয়ে যারা বাইরে থেকে আসছে কিম্বা জার্মান সীমান্ত থেকে যাদের সরিয়ে আনা হচ্ছে নিরাপত্তার কারণে তাদের সুখ-সুবিধা দেখাশোনার জন্যে। প্রায় দেড় বছর নিরলসভাবে জিদ এদের মধ্যে কাটালেন। আর তারই ফলে তাঁর নিজের ভাবধারণাতেও একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিলো। বেশ কিছুটা মরমিয়াপন্থীর লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগলো জিদের কথাবার্তায়, লেখায় এবং চাল-চলনে। মানুষের অপার দুঃখে এক এক সময় অন্তরাত্মা ওঁর কেঁদে উঠতো। এই সময়েই জিদ্ নতুন ধরণের একটা রচনায় হাত দিলেন—'ডায়ালগস উইথ ক্রাইস্ট'।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে সব মিলিয়ে দেখা গেলো আঁদ্রে জিদই ফরাসী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক—আনাতোল ফ্রাঁস সে সময় বেঁচে কিন্তু তবু জনপ্রিয়তা যে জিদেরই সব চাইতে বেশি ছিলো তার কারণ তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগতভাবে যাদের সৌভাগ্য হতো জিদ্‌কে জানবার; তারা দলমতনির্বিশেষে এমনই মুগ্ধ হয়ে যেতো যে, তারা স্বেচ্ছায় উচ্ছ্বসিতভাবে বলতো জিদের মহত্ত্ব এবং প্রতিভা বৈশিষ্ট্যের কথা। ফলে দেখা গিয়েছিলো অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসেবীর ভাগ্যে সমস্ত জীবন এবং মৃত্যুর একশো বছর পরেও যতোটা আলোচনার বিষয় হবার সুযোগ ঘটে, জিদ তাঁর জীবদ্দশাতেই, মৃত্যুর অন্তত ত্রিশ বছর পূর্বেই সাহিত্যরসিক সাধারণ পাঠক তথা সাহিত্যসেবী মহলে তার চাইতেও বেশি আলোচিত হচ্ছেন।

কারো ভাগ্যে অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভ হলে আর একদল অনেক সময় ঈর্ষাবোধ করে এবং এই ঈর্ষার তাড়নায় তাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবারও নানা চেষ্টা করে থাকে। জিদের ভাগ্যেও ঘটনাচক্রে সেই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো। কয়েকজন ধুরন্ধর সাংবাদিক এবং সাহিত্যসমালোচক জিদের বিরুদ্ধে দল পাকালো। একেবারে প্রথম থেকে আরম্ভ করে জিদের সমস্ত লেখা তন্ন তন্ন করে খুঁজে খুঁজে কখনো দু'টি লাইন, কখনো বা বিচ্ছিন্নভাবে একটি লাইন তুলে দিয়ে তারা বলতে আরম্ভ করলো যে, জিদ্ ফরাসী দেশের জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র নিয়ে খেলা করছেন। সমাজবদ্ধ জীবনে যে ন্যূনতম সুরুচির প্রয়োজন—বিশেষ করে যৌন সম্পর্কে, জিদ্ তা মানেন না, ইত্যাদি। কেউ বা এনথিমের চরিত্রটি সামনে রেখে লম্বা-চওড়া একটি প্রবন্ধ রচনা করে উপসংহার টানলেন যে, জিদ ধর্ম নিয়েও পরিহাস করছেন।

এ সমস্ত ব্যাপারের ফলে প্রথম দিকে জিদ্ বেশ কৌতুকবোধ করতেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সমস্ত রকমের বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে একখানি ছোটো বই প্রকাশ করলেন জিদ 'করিডন,' আত্মজীবনী লিখলেন—'ইফ ইট ডাই'। তা' ছাড়া একখানা উপন্যাস 'দি কাউন্টারফিটার্স'-এর পাণ্ডুলিপিখানা এক প্রকাশক বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে রাগে দুঃখে অভিমানে জিদ্ দেশত্যাগী হলেন। এটা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দেশত্যাগী হবার আগে তাড়াতাড়ি করে এমন একটা কাজ করলেন জিদ্ যে, তার ফলে বিরোধীপক্ষেরও অনেকে পরে দুঃখ প্রকাশ করেছিলো। জিদ্ তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি করে দিলেন, এমন কি বহু বছর ধরে বহু আয়াসে সংগৃহীত মূল্যবান লাইব্রেরীটির সমস্ত বইও বিক্রি করে দিলেন।

আফ্রিকার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জিদ্ একেবারে তরুণ বয়স থেকেই বোধ করতেন। ফ্রান্স ছেড়ে তাই আবার আফ্রিকাতেই এলেন জিদ্। তবে এবার আর টিউনিসিয়া বা আলজিরিয়া নয়, এবার চলে এলেন মধ্য আফ্রিকাতে—প্রথমে এলেন কঙ্গোতে। দেশ ছাড়বার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন জিদ্—সভ্য সমাজে সবকিছুই কৃত্রিম, যেমন সহরের বাড়িগুলি—আলো নেই, হাওয়া নেই, কিম্ভূতকিমাকার দেখতে—তেমনি মানুষের মন—জটিলতায় ভরা—আমি আফ্রিকায় যাবো—প্রকৃতি যেখানে এখনো দুষ্ট নয় সভ্য (?) মানুষের স্থূল হস্ত অবলেপনে, মানুষের মন যেখানে এখনো স্বার্থবুদ্ধির পঙ্কিলতায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে নি……।

বেলজিয়ান কঙ্গোতে এসে প্রকৃতির শোভা জিদ্ অবশ্যই দেখলেন। কিন্তু সে ক'দিন মাত্র। যে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে জিদ প্রকৃতিকে দেখতে লাগলেন সেখানে যেন অকস্মাৎ কাঁটা ফুটলো। নজরে এলো স্থানীয় লোকদের দুর্দশা। শ্বেতকায়গণ কর্তৃক কৃষ্ণকায়দের শোষণ—

নানা ভাবে, নানা ছলে কি ভাবে ইয়োরোপ, বিশেষ করে বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স আফ্রিকাকে শোষণ করছে দিনের পর দিন জিদ্ তারই বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে লাগলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রাদিতে।

জিদের প্রতিভার দীপ্তি এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত বিরোধীচক্র ওঁর দেশত্যাগের সময় যাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন এই কথা মনে করে যে, জিদ্‌কে তাঁরা 'খতম' করে দিতে সক্ষম হয়েছেন ; স্তব্ধ করে দিতে পেরেছেন তাঁর বিস্ময়কর বাকপটুতাকে, এবারে তাঁরা আবার নতুন করে প্রমাদ গণলেন—বছর ঘুরে না আসতেই। কঙ্গো থেকে প্রেরিত জিদের লেখাগুলিতে এমন একটা স্বর ধ্বনিত হলো ঠিক যে-রকমটি এর আগে কেউ কখনো শোনে নি। কৃষ্ণকায়দের শ্বেতকায়রা তো শোষণ করবেই এজন্যে আবার দুঃখ করবারই বা কি আছে, প্রতিবাদ করবারই বা কি আছে? এইটেই তো স্বাভাবিক, চিরকাল এইরকমই তো হয়ে আসছে—এইটেই তো হওয়া উচিত, ভাবলেন ওঁরা। তবে কি জিদ্ রুশিয়ার বেয়াড়া লোকগুলির মতাবলম্বী হয়ে উঠলেন? (মাত্র সাত বছর আগে রুশিয়াতে ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল) জিদের জনপ্রিয়তায় যেন নতুন করে বান ডাকলো এর ফলে। এই তো গেল একদিক। জিদের প্রতিভার অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার নতুনতর বিকাশও ঘটলো এই সময়ে—দেশত্যাগের সময় যে পাণ্ডুলিপিখানা রেখে এসেছিলেন এক প্রকাশক-বন্ধুর কাছে, সেখানাও ছেপে বেরুল—দি কাউণ্টার-ফিটার্স। ফ্রান্স বা গোটা ইয়োরোপে যারা জিদ্‌পন্থী তাঁরা তো বটেই, এমন কি বিরোধীচক্রেও যেসব সমালোচকগণের মধ্যে অন্তত সাহিত্যের প্রতি কিছুটা সততা অবশিষ্ট ছিল তাঁরাও ঘোষণা করলেন—এখন পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পৃথিবীর যে কোনো ভাষার উপন্যাসের মধ্যে দি কাউণ্টারফিটার্স অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

এটা ১৯২৬ খ্রীঃ অব্দের কথা। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক আঁদ্রে জিদ্ 'ন্যাশন্যাল হিরো' হয়ে উঠলেন। এক বছর বাদে দেশে ফিরে এসে জিদ্ তাঁর ঔপনিবেশিকতাবাদ সম্বন্ধে লেখাগুলি পুস্তকাকারে বের করলেন—ট্রাভেল্‌স্ ইন কঙ্গো। এ বই প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ফরাসী সরকার জিদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। অন্তত পাঁচ বছর ধরে জিদ্ অবিশ্রান্তভাবে সরকারের ঔপনিবেশিক পলিসির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা চালাতে লাগলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই যে বিষয়টা সম্পর্কে এতদিন ওপর-ওপর একটু পড়াশুনো ছিল এবার তার সম্পূর্ণটা পড়ে ফেললেন জিদ্—সে হলো মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন প্রভৃতির রচনাবলী।

১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে জিদ্ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী—সমাজব্যবস্থা হিসেবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সমর্থক (কারণ তা' ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ এবং সভ্যতার অন্যান্য কালিমা দূর হতে পারে না)। তিন বছর বাদে কমিউনিজমের তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনে গেলেন জিদ্। খাস রাশিয়ায় এসে কমিউনিষ্ট থিয়োরীর যেভাবে রূপদান হচ্ছিলো তা' দেখে কিন্তু জিদের অন্তরে আর একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল। আজীবন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক অবস্থায় মানুষ এবং তার প্রবল সমর্থক জিদ্ সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তা' দেখে বিশেষ করে লাল সরকার কর্তৃক সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ তথা কালেকটিভ ফার্মিং প্রবর্তনের নামে পাইকারী হারে নানাপ্রকার সরকারী অনাচার, অত্যাচার এবং উৎপীড়ন দেখে জিদ্ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এই সময়কার মানসিক অবস্থায় রচিত 'দি গড্ দ্যাট ফেইল্ড'-এ জিদের প্রবন্ধ সারা ইয়োরোপের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ধনতন্ত্রী সমাজের সমস্ত ব্যাধির দূরীকরণের জন্যে বুঝে বা না বুঝে যারা রাশিয়ার দিকে তাকাচ্ছেন তাঁরা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলেন কমিউনিজম সম্পর্কে।

কয়েক বছর পরে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় জিদ্ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করে রাজতন্ত্রীদের সাহায্য করলেন—যদিও বহুদিন ধরে খাস ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে জিদ্‌কে তাদের নিজ নিজ দলে টানবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার পূর্ব থেকেই জিদের ঘোরতর ফ্যাসি-বিরোধিতা দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে যেতেন। হিটলার এবং মুসোলিনিকে জিদ্ ইয়োরোপের অনেক পেশাদার রাজনীতিবিদের চাইতেও অনেক আগে চিনতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও একেবারে বাল্যকাল থেকে জিদ্ বরাবরই একক, একান্ত নিঃসঙ্গ—প্রায় সর্বদাই একেবারে কাছের মানুষটিও জিদ্‌কে সঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। যাদের ভাবধারণা সময়কে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে তাদের বোধ হয় সারাজীবনই জিদের মতো ভুগতে হয়—প্রতিভার চমকে আকৃষ্ট হলেও তার [illegible] কিছুটা ভীত এবং বিস্মিত হয়ে যায় সাধারণ মানুষ, এ ভয় নিজেকে হারিয়ে ফেলবার ভয়।

জিদের অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মধ্যে উপন্যাস হিসেবে প্রমিথেউস ইলবাউণ্ড (১৯১৯); দি প্রডিগ্যাল সন (১৯২৮); দি স্কুল ফর ওয়াইভস (১৯২৯) প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়। জিদের প্রতিভা বহুমুখী সে কথা আমরা আগেই বলেছি। জিদের দু'খণ্ড জার্নাল এক বিচিত্র সৃষ্টি। কতকগুলি ছোট ছোট রচনার সমষ্টি হলো এই জার্নালস। কোনোটি হয়তো একটি শব্দ-চিত্র, প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে রচনা করেছেন জিদ্। এ জাতীয় রচনাগুলি কাব্যরসে পরিপূর্ণ। কোনোটি হয়তো ডায়েরীর আকারে রচিত নেহাৎ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনো নিতান্ত সাধারণ ঘটনা বা, বস্তু [illegible] করে লেখা। আবার কোনোটি হয়তো একটা পুরোবস্তু [illegible] গল্পই হয়ে গেছে। শ্লেষাত্মক রচনাও আছে কিছু কিছু। [illegible] সাহিত্য সমালোচনা আছে, আবার আধ্যাত্মিকতায় ভরা কিছু [illegible] স্থান পেয়েছে জিদের এ জার্নালস-এ। সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় [illegible] হলো এই যে, অল্প সময়ের মধ্যে জিদের সম্বন্ধে যদি কারো মোটামুটি একটা ধারণা করতে হয় তা' হলে অন্য সব বই বাদ দিয়ে এই 'জার্নালস' পড়লেই তা লাভ করা স্বল্পায়াসে সম্ভব! [illegible] প্রাবন্ধিক হিসেবেও জিদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে স্বদেশ এবং বিদেশে জিদের সমকক্ষ খুব বেশি লেখকের আবির্ভাব হয় নি এযুগে। প্রবন্ধের বই হিসেবে অস্কার ওয়াইল্ড (১৯০৫); ডস্টয়েভস্কি (১৯২৩); এসেজ অন মঁতেইন (১৯২৯); দি লিভিং থটস অব ম্যা[illegible] (১৯৩৯) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। রিটার্ন ফ্রম দি ইউ. এস. এস.

আর (১৯৩৭) ভ্রমণকাহিনী হিসেবে ততোটা উল্লেখযোগ্য নয়, যতোটা মার্কসবাদের সমালোচনা হিসেবে।

সবার শেষে এবার আমরা জিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি দি কাউণ্টারফিটার্স সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো। কারণ, এ বই সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু না বললে জিদ্ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

জিদের রচনায় নীতিবোধের অভাব বা প্রচলিত নৈতিকবুদ্ধির তিনি বিরোধিতা করে থাকেন—এ জাতীয় অভিযোগ কমবেশি জিদের সমালোচকমাত্রেই করেছেন। আমরা সর্বপ্রথম এই প্রসঙ্গেই কিছু বলবো। প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক আর্নল্ড বেনেট জিদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। উনি এক জায়গায় বলেছেন :

জিদ্ একজন নীতিবাগীশ শিল্পী, তাঁর প্রত্যেকটি রচনার প্রেরণা কোনো না কোনো নীতিবোধ থেকে। নৈতিক সমস্যা শুধু যে তাঁর লেখার পটভূমিকা রচনা করে, তাই নয়, তাঁর রচনায় আজকের নৈতিক সমস্যাসঙ্কুল জীবনে সরলতা ও সুষ্ঠুতা আনবার জন্যে নৈতিক সমাধানেরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে।

জিদ্ তাঁর ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোনো রচনাতেই ব্যক্তিসত্তার ওপর বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন। ব্যক্তিকে বন্দী করে যে সমষ্টির মুক্তির কথা এটাকে জিদ্ নেহাৎ বাকচাতুরী মনে করে থাকেন। জিদ্ নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে অত্যন্ত অকপটভাবে বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই পথ ভিন্ন, যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি ভিন্ন এবং প্রত্যেকেই যে তার নিজ নিজ পথে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে এবং তাই করে থাকে—এ বিষয়েও জিদ্ দৃঢ় মত পোষণ করে থাকেন। কাজেই এর এটা একান্ত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রত্যেকটি মানুষ যদি ভিন্ন হয় প্রত্যেকের চলার পথ এবং জীবনের উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন হয় তা হলে নীতিবোধটাও সকলের পক্ষে ব্যক্তি নির্বিশেষে এক হতে পারে না।

কাউণ্টারফিটিং বলতে জিদ্ কি বলতে চান তা একটু ভেবে দেখবার মতো। জিদ বলেন যে, মানুষমাত্রেই আদর্শ পাগল, কিম্বা অন্যভাবে বলা যায় যে উন্মত্ত পাগল। একটা কিছুর জন্য সে সর্বদাই ছুটছে; অক্লান্তভাবে অবিশ্রান্ত ছুটছে। তার এ লক্ষ্যটা যদি তার পক্ষে বাস্তব; এই বাস্তবকে তার নিজের পক্ষ থেকে নতুন নিজস্ব রূপদানের যে চেষ্টা, অর্থাৎ বাস্তবকে 'কপি' করবার বা অনুসরণ করবার যে চেষ্টা তা কার্যত 'কাউণ্টারফিটিং' হয়ে দাঁড়ায়। মানবজীবনে এটা একটা স্থায়ী সমস্যা—অর্থাৎ এই আদর্শে পৌঁছুবার কসরৎ।

'দি কাউণ্টারফিটার্স'-এর কাহিনী অংশে দেখা যায় কয়েকটি তরুণ পরস্পর পরস্পরের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ছে এবং প্রায় সর্বদাই প্রতিটি তরুণ কোনো না কোনো বয়স্ক চরিত্রের আওতায় কাটাচ্ছে। (বয়স্ক চরিত্রটি এখানে আদর্শ এবং তরুণটি তার সব কিছু কপি করতে গিয়ে যা করছে সেইটেই কার্যত কাউণ্টারফিটিং হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এডোয়ার্ড (জিদ নিজে) ঔপন্যাসিক। একদিন লরা নামে একটি বিশেষ পরিচিত তরুণীর চিঠি পেয়ে প্যারিস চলে এলো। কি ব্যাপার? না ও প্রতারিত হয়েছে। লরা বিবাহিতা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ও একটি তরুণকে ভালোবেসে ফেলে এবং ওদের এই মেলামেশার ফলে লরা আজ গর্ভবতী; অথচ এদিকে সেই তরুণটিও (ভিনসেণ্ট) উধাও। এডোয়ার্ড প্যারিস এসে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলো যে ভিনসেণ্ট (এডোয়ার্ডের আত্মীয়) কাউণ্ট পাঁসাভা নামে একজন বড়লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে—একাধিক রমণীর বিলাস-ব্যসনের চাহিদা যিনি হাসিমুখে মিটিয়ে থাকেন। এই কাউণ্টের প্রণয়িনীদের পাল্লায় পড়েই ভিনসেণ্ট ওর সব টাকাকড়ি অপব্যয় করে ফেলে এবং সেইজন্যে যথাসময়ে ও লরাকে সাহায্য করতে পারে নি। এডোয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলবার পরে ভিনসেণ্ট নিজের কৃতকর্মের জন্যে মর্মাহত হলো এবং মনে মনে ঠিক করলো যে, সব নষ্টের মূল কাউণ্টের অন্যতম প্রণয়িনী লিলিয়ানকে ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। কয়েকদিন নিবিড় প্রেমের অভিনয় করে ভিনসেণ্ট লিলিয়ানকে নিয়ে বেড়াতে এলো আফ্রিকায় এবং এখানেই হত্যা করলো ওকে। এর প্রতিক্রিয়া খুব সত্বর দেখা দিলো ভিনসেণ্টের ওপর। ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেলো।

দূরসম্পর্কের একটি তরুণ অলিভিয়ার এডোয়ার্ডের প্রতি এতো আকৃষ্ট যে, অন্য কারো সম্পর্কে এডোয়ার্ডের কিছুমাত্র সময় বা শক্তি ব্যয় হ'ক, তা ও সহ্য করতে পারে না।

এডোয়ার্ড এবং লরা পরস্পরকে ভালোবাসে—সে কথা বার্নার এডোয়ার্ডের সুটকেশে একখানা ডায়েরী এবং চিঠির বাণ্ডিল থেকে ধরে ফেলে। কিন্তু ওদের মিলনের কোনই সম্ভাবনা নেই।

অলিভিয়ার অতিমাত্রায় সংবেদনশীল এবং ঈর্ষাপরায়ণ—এডোয়ার্ডের দিক থেকে সামান্যতম মনোযোগের অভাব ও সহ্য করতে না পেরে বকাটে কাউণ্ট পাঁসাভার অনুচর হয়ে গেলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বয়স কিছু বাড়বার পরে আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে এডোয়ার্ডের কাছেই ফিরে এলো। কিন্তু কাউণ্ট বিত্তশালী ব্যক্তি নিত্য নতুন তরুণমতি কিশোর এবং যুবকদের আকৃষ্ট করবার নানা উপায় এবং সত্তায় তার আছে।

মন্দ দিকে আদর্শ স্থানীয় হলো কাউণ্ট এবং ভালোর দিকে এডোয়ার্ড মোটামুটিভাবে এই দু'জনকে কেন্দ্র করেই কতকগুলি তরুণ চরিত্রের ক্রমবিকাশ হলো জিদের এ উপন্যাসের উপজীব্য। কাউণ্টের যেমন একমাত্র লক্ষ্য হলো কি করে লোককে বকানো যায় এডোয়ার্ডের তেমনি একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কি করে আরো একজনকে ভ্রান্ত পথ থেকে, ভুল আদর্শ থেকে উদ্ধার করে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেওয়া যায়।

কোনো চরিত্রের ওপর জিদকে (অর্থাৎ এডোয়ার্ডকে) বিরক্ত হতে দেখা যায় না। কারণ এডোয়ার্ড জানে যে প্রত্যেকেই, যে যা করে না করে পারে না বলেই করে থাকে। কাজেই তাকে বরদাস্ত করতে সব সময়েই এডোয়ার্ডের একটা সুতীব্র বাসনা দেখা যায়—যা পাঠককে বিস্মিত করে দেয়।

এ উপন্যাসের নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে জিদ্ নিজে এক সময় যে কথা বলেছিলেন আমরাও সেই কথা বলে আপাতত শেষ করবো।

আমার বিশেষ চলার ভঙ্গির জন্যে প্রায় সময়ই আমাকে গাল-মন্দ শুনতে হয়, কারণ আমি একটু ঝুঁকে চলি কি না। কিন্তু বলতে পারেন হাওয়াটা যখন বিপরীতমুখী তখন ঝুঁকে না চলে উপায় কি? আপনারা যারা হাওয়ার দিকে গা এলিয়ে দিয়েছেন বা একেবারেই উবে গেছেন, তাঁরা তো আমার সমালোচনা করবেনই, আমি যে হাওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এখনো সংগ্রাম করছি।

উতলা কলাপী

সোমেন্দ্রনাথ রায়

সুবিমল লেখে।

সুবিমল সেন। বেশ নামকরা রাইটার। খানপাঁচ-সাত ছোট গল্পের বই, খানদশ-বারো উপন্যাস ওর চলেছে বাজারে। সম্প্রতি কালে চলতি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ওর ধারাবাহিক রচনা 'তারায় তারায়' দস্তুরমত আলোড়ন তুলেছে পাঠক-পাঠিকা মহলে। অনেক চিঠি আসে পত্রিকা আপিসে। তার কিছু-কিছু ছাপাও হয়েছে আলোচনা-স্তম্ভে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

বেলাকে আপনারা চেনেন না। বেলা সেন, সুবিমলের বউ।

অবশ্য এমন কিছু আহামরি মেয়ে নয় যে একডাকে চিনতে হবে। দেখতে মোটামুটি। বাঙালী মেয়ে,—মাজা রঙ, মাঝারি স্বাস্থ্য আর মোলায়েম শ্রীটুকু নিয়ে যেমন লাগে আর কি! দু-দণ্ড আলাপ করতে মন্দ লাগে না।

এখন এই বছর সাতাশ বয়েস। শরীর একটু ভারী হয়েছে; চলা-ফেরায় দোলা লাগে নিতম্বে। ব্রেসিয়ারের কারচুপিতে পুরুষের চোখে লোলাতুরদৃষ্টি ঘনিয়ে তুলতে পারে অনায়াসে।

পাড়ার অনেকেই বেলাকে চেনে। সুবিমলের বৌ বলেও বটে, তা'ছাড়া এমনিতেও। অল্পবয়সের মেয়েরা ঈর্ষা করে। লেখকের স্ত্রী, স্বামীর খ্যাতিতে গরবিনী, সাহিত্যিকের মানসলোকের প্রিয়তমা। হয়তো কত কাহিনীর প্রেরণাদাত্রী!

তাদের মা-পিসি-দিদিরা অবিশ্যি অমন চোখে দেখে না। শান্ত বউটি। একটি মাত্র ছেলে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। বেশ গুছোনো মেয়ে। আজকালকার ধিঙ্গিদের মত কথায় কথায় রঙ মেখে সিনেমা দেখতে ছোটে না। কথা শোনে মন দিয়ে। ঠোঁট টিপে হাসে। বেশ মিশুকে বউ।

সুবিমলের বন্ধুরাও পছন্দ করে বেলাকে। যখন তখন বৌদি বলে হাঁক দিয়ে চায়ের ফরমাস করে। রাত এগারটা পর্যন্ত ওদের বাড়িতে আড্ডা দিয়েও শুনতে হয় না ঠারেঠোরে বাঁকা কথা। একটু বেচাল বে-হিসাবী আলোচনার মাঝখানে বেফাঁস কথা বলে ফেলে অপ্রস্তুতে পড়তে হয় না বড় একটা। আবার কি চাই?

সুবিমল নিজেও যথেষ্ট কৃতজ্ঞ বেলার কাছে। অগোছানো স্বভাবের বলে কথা শুনতে হয় না কখনো। সংসারের ঝামেলা চুকিয়েও যথেষ্ট সময় করে নেয় স্বামীর লেখাপত্র গোছগাছ করতে। সংসারের হিসেব, প্রয়োজন, দায়, সব নিজের ঘাড়ে নিয়ে হাল্কা রেখেছে স্বামীকে। এমনকি ছেলের পড়াশুনোর ঝক্কিটুকু পর্যন্ত নিজেই পোহায়।

বিয়ে হয়েছিল ভালবেসে, সে আজ বছর আষ্টেকের কথা।

তখন কিছুই করে না সুবিমল। মানে, মেসে থেকে টিউশনি করে গোটা দুই আর এক-আধটা গল্প লেখে এদিকে-সেদিকে। চাকরি পাবার মত যোগ্যতার অভাব ছিল না। কিন্তু বাঁধা চাকরির কথা মনে হলেই গায়ে জ্বর আসে। ও-রে বাবা! দশটা পাঁচটা কলম পেষা? প্রত্যহ ঘড়ি ধরে দাড়ি কামানো, স্নান করা, লেট হবার ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা? পাগল? যাদের দিয়ে কিছু হবে না কোন দিন, তারা চাকরি করুক।

পড়াতো বেলার খুড়তুতো ভাইকে। সপ্তাহে পাঁচ দিন। মাইনের অঙ্কটা লোভনীয়। মেসের পুরো খরচ উঠে আসে। তা' ছাড়া অতিরিক্ত আকর্ষণ ওই বেলা!

তখন ছিপছিপে দীঘল চেহারা ছিল বেলার। স্কুল-ফাইনালের গণ্ডি পেরিয়ে বহু সাধনায় ঢুকতে পেরেছে কলেজে। বিধবা মা সঞ্চয়ের থলি আঁকড়ে বসে আছেন মেয়েকে পার করার দুশ্চিন্তায়। কলেজে পড়ানোর বিলাসিতা প্রশ্রয় দেওয়ার মত মনোভাব ছিল না। কাকাও খুব রাজি ছিলেন না কলেজের ব্যয় বহন করতে। কাঁদা-কাটা, অনুরোধ-উপরোধ, শেষ পর্যন্ত সনাতন অনশন। একখানা সাড়ি কলেজে যাবার মত। কোন বাধাই টলাতে পারে নি। তবু হল না পড়াশুনো। ফেল করলো ইণ্টারমিডিয়েটে। কলেজ ছাড়তে বাধ্য হল। তার কারণ ওই সুবিমল।

ছাত্র গৌতম চোদ্দ বছরের ছেলে। যতটা দেখতে পেত, অনুমান করত তার চেয়েও বেশি। তবে বুদ্ধি ছিল খুব। হৈ চৈ করে নি কোনদিন। পরিবর্তে ঘুষ দিতে হয়েছে সুবিমলকে। টার্জনের সিনেমা, গল্পের বই, খেলার টিকেট।

বছর দেড়েক বড় কষ্টে কেটেছে। বহু সাবধানে, কত রকমের ছুতোয়, কচিৎ দেখা করতে পেরেছে দু'জনে। নিভৃতে মিলিত হয়েছে পর্দাঢাকা রেস্তোরাঁর কেবিনে। পিপাসা বেড়েছে শুধু দিন থেকে দিনে। তারপর প্রসন্ন হয়েছে বরাত।

খান দুই উপন্যাস ততদিনে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বই 'যন্ত্রণার রাত' এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ছাপা হয়েছে। দু-বছরে তিনটে এডিশান। পুজো সংখ্যার জন্যে ডাক আসে নাম করা পত্র-পত্রিকা থেকে। চাকরিও একটা ঠিক করে দিল পাবলিশার হরেন চাকলাদার। ওষুধের কোম্পানীতে পাবলিসিটি অফিসারের চাকরি। বাঁধা-ধরা এটেন্‌ডেন্‌সের বালাই নেই। কাজের চাপ কম থাকলে কামাই করা যায় স্বচ্ছন্দে। মাইনে সে তুলনায় ভালই। বেলার কথা ভেবে চাকরি নিল সুবিমল।

মেয়ের মতি-গতি কিছুটা টের পেয়েছিলেন বেলার মা। সাবধান করবার চেষ্টা করেছেন যথেষ্ট। হলেই বা নামকরা লেখক। না হয় দু'শ টাকা মাইনের চাকুরে। তাই বলে অন্য জাতের ছেলেকে বিয়ে করতে চাইবে খুলনার ডাকসাইটে মিত্তির বংশের মেয়ে দু'পাতা ইংরেজি পড়েছে কিম্বা কর্তা আজ বেঁচে নেই বলে?

কিন্তু বেলার চোখে তখন লেখক সুবিমল রূপান্তরিত হয়েছে নায়কে। যে আশ্চর্য যাদুর স্পর্শে কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার হাসি-কান্নার দোলায় দুলতে থাকে পাঠক-পাঠিকার বুক, সেই যাদু, স্রষ্টার সেই বিচিত্র হৃদয় আপন হাতের দোলে দোলাবার আকাঙ্ক্ষা তার। মায়ের নিষেধ—প্রচণ্ড সেই আকর্ষণের কাছে কি তুচ্ছ!

কাকা সদানন্দ মিত্তিরমশাই মার্চেন্ট আপিসের চাকুরে। বেঙ্গল চেম্বারের আইন অনুযায়ী ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েন্স মিললেও সংসার যাত্রার ব্যয় বেড়েছে চতুর্গুণ। ছেলের পড়াশুনোয় মোটা খরচ। মেয়ের বিয়েতে দেনা হয়েছে যথেষ্ট। ভাইঝিকে পার করতে পারলে বেঁচে যান। দাদার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ অজানা নয়। সাধারণভাবে বিয়ে দিতে গেলেও হাজার পাঁচেক লাগবে। তার মানে তাঁর কো-অপারেটিভের দেনার অঙ্ক বাড়বে আরও হাজার দেড়েক। সুবিমলের প্রস্তাবে কূল পেলেন একটা। বউদিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আজকাল এ রকম আকছার হচ্ছে। জোর করে বাধা দিতে গেলে হয় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে, তাতে শত্রুর মুখে হাসি ফুটবে। না হলে আত্মহত্যা করবে। সে আরও কেলেঙ্কারী। তার চেয়ে সুবিমল ছেলেটি তো ভালই! সংসারে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদের ঝামেলা থাকবে না। চাকরিই বা মন্দ কি? দু'শ মাইনের পাবলিসিটি অফিসার। তার ওপরে বই লেখে। সিনেমায় বই লাগলে আরও কত রোজকার করবে। সুখে থাকবে মেয়ে।

দেওরের যুক্তির সারবত্তায় নয়, মেয়ের জেদেই শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন বেলার মা। থান কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে, নিজের গায়ের যে কটি অলঙ্কার ছিল, তাই ভেঙে বদল করে, পাঠিয়ে দিলেন মেয়েকে স্বামীর ঘর করতে। সে আজ আট বছরের কথা।

বিয়ের পর লেখার যেন বন্যা নেমেছিল সুবিমলের কলমে।

প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেত বেলা। আধখানা লেখা ফেলে রেখে চলে গেছে সুবিমল আপিসে। ঘরের সামান্য কাজ-কর্ম সেরে সেই লেখা নিয়ে বসত সে। আকাশ-পাতাল ভেবেও শেষটা কেমন হবে ধরতে পারত না। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে আর হয়তো সে লেখায় হাত দিত না সুবিমল। মাথায় তখন অন্য লেখা। উত্তেজনা রাঙা মুখ। অর্ধেক রাত পর্যন্ত একটানা লিখে চলেছে। কাপের পর কাপ চা জুগিয়েছে বেলা। চারমিনারের উৎকট গন্ধে ঘরের বাতাস আবিল। রাতের খাবার ঢাকা দিয়ে বাইরের বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে ঘুমে ভেঙে পড়েছে শরীর। লেখা শেষ করে বাইরে এসে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে গেছে সুবিমল। আহ্লাদে, আবেশে জড়িয়ে ধরেছে বেলা স্বামীকে। নিবিড় আশ্লেষে গলে যাবার মুহূর্তেও সকালের লেখার কথা ভোলে নি। জিজ্ঞাসা করেছে, 'অন্য লেখা ধরলে কেন? সুলতার গল্পটা শেষ করলে না?'

'সেটা আবার কোনটা?' লেখকের মনে সকালবেলা আধখানা লেখার স্মৃতি কখন উবে গেছে সন্ধ্যাবেলার নতুন প্রেরণার বাতাসে।

'বাঃ, সকালে যেটা লিখছিলে? সেই যে মেয়েটা অসুস্থ স্বামী আর ছেলেকে বাঁচাতে চাকরি নিল রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেসের।'

স্ত্রীর নরম শরীরে আদরের ঠোঁট বুলোতে বুলোতে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল সুবিমল সব কৌতূহল। 'দূর! ও লেখাটা সুবিধের হয় নি। ইণ্টারেস্ট পেলাম না। এখন যেটা লিখছি, দেখো। পড়লে চোখে জল আসবেই। একটা সিচুয়েশন এঁকেছি, শুনবে? না, এখন থাক, অনেক রাত হল। তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে?'

এ সব ঘটনাও অনেক আগের। বাবলু তখনও পেটে আসে নি। শুধু স্বামীকে নিয়েই মেতে আছে বেলা মনে মনে। যেমন করে শিশুবয়সে কুমোরের প্রতিমা গড়া দেখে আশ মেটে না। যেমন অবাক বিস্ময়ে মাদারির খেলা প্রত্যক্ষ করে অপরিণত মন, তেমনি করেই শেষটায় মোচড় দেওয়া ছোট গল্প, ঘটনা-বহুল বড় গল্প, জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, খুদে খুদে কালির আখরে তৈরি হতে দেখেছে সে সাদা কাগজের বুকে। তার আর একটা রূপ পত্রিকার ছাপা পাতায়। ছবি আর লেটারিং-এর অলঙ্করণে যেন ডাকের সাজে সাজানো প্রতিমা। সুবিমল শুধু অতি পরিচিত, গৌতমের মাস্টার-মশাই নয়, নয় শুধু প্রেমিক স্বামী: সে শিল্পী, স্রষ্টা। নেশাগ্রস্তের মত আত্মহারা হয়ে থাকত বেলা স্বামীর এই কারুকৃতিত্বে।

না হলে, ওর কত বদভ্যাস নিশ্চয়ই পীড়িত করত বেলাকে। স্বভাবে সে ছোটবেলা থেকে একটু পরিচ্ছন্ন। বাবা বলতেন, 'কোন্ বামুনের ঘরের বিধবা মরে এসে জন্মেছেন তাঁদের ঘরে। এই বয়সে শুচিবাই নাহলে হবে কেমন করে?'

ময়লা মোটে সহ্য করতে পারে না বেলা। পায়ের তলায় ধুলো পড়লে সারা গায়ে অস্বস্তি হয়। প্রতিদিন জামা কাপড় সাবান না দিলে খুঁত খুঁত করতে থাকে মন। সেই বেলা সহ্য করেছে সুবিমলকে নির্বিবাদে। একটা গেঞ্জি পাঁচ দিন ধরে গায়ে দিচ্ছে। ময়লায় ছোপ ধরে গেছে। কাছে গেলে ঘামের গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু এই সব ছোট খাট ব্যাপারে কিছু বলতে গেছে বিরক্ত হয় সুবিমল। ঘরের চারিদিকে ছাই, সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ, দেশলাইয়ের

খোল পড়ে থাকবে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে সুবিমল, ঘর ঝাঁট দেবার উপায় নেই। যেদিন আপিসে যায় না, বসে বসে লেখে কিম্বা পড়ে সারাদিন, সেদিন নরককুণ্ড হয়ে ওঠে ঘরটা। কি খারাপ যে লাগে ঘরে পা দিতে! সে বিরক্তি চেপে হাসি মুখে বার বার চা নিয়ে যায় ঘরে। সিগারেটের প্যাকেট ফুরোলে নিজেই গলির মোড়ের পানের দোকান থেকে কিনে আনে চারমিনার। কত দিন রাজ্যের বদ লোকের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁষি করে বাজার করেছে বেলা। দোকানে গিয়ে জিনিষপত্র কিনে এনেছে ... তবু লেখা পড়ায় ডুবে থাকা সুবিমলকে দোকানে বাজারে পাঠাতে পারে নি।

সব দেখে শুনেও নির্বিকার থেকেছে সুবিমল। লেখা পড়ায় ডুবে থাকলে বিশ্বসংসার ভুলে থাকে সে। আর তাই যদি না রইল, লিখবে কেমন করে? বাজার দোকান করে, সংসারের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা সেরে, বাকি যে মনটুকু থাকে, তা দিয়ে হয়তো আপিসের ফাইল লেখা যায়। সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। ময়ূর পোষার অনেক ঝামেলা। কবে পেখম তুলে নাচবে, সেই আশায় তোয়াজ করতে করতে সারা হয়ে যেতে হয়। শালিখ পাখি পুষতে আর কি কষ্ট!

তারপর বাবলু হয়েছে। পালটাতে হয়েছে অভ্যস্ত জীবনধারা। স্বামীর প্রতি এক মুঠী মন বিভক্ত হয়ে গেছে। নিজের সৃষ্টি, রক্ত মাংসের একরত্তি সন্তানের দিকে মুগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে বেলা সময়ে অসময়ে। শিশুর হাসি-কান্না, আবদার-অভিমান আর এক জগতে পৌঁছে দিয়েছে বেলাকে। ভুলে গেছে সেই মুহূর্তে স্বামীর কথা। ঘাড় গুঁজে হয়তো লিখছে তখন সুবিমল, কিম্বা চিৎপাত হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছে। বা হয়তো চিবুকে হাত দিয়ে পড়ছে আর উল্টে যাচ্ছে বইয়ের পাতা। প্রতিভাবান স্বামীর আকর্ষণ ধীরে ধীরে মুছে গেছে মন থেকে। লেখকের পাণ্ডুলিপি পড়ার আগ্রহ তেমন নেই। অর্ধসমাপ্ত কাহিনীর শেষ কেমন হবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা হয় না এতটুকু। ছাপা পত্রিকা হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে না। অপঠিত থেকে যায় নতুন রচনা। শেষ বইটা প্রকাশিত হল। স্ত্রীকে উৎসর্গ করল সুবিমল, সমালোচকেরা প্রশংসার বান ডাকিয়ে দিলেন কাগজে। সন্তান আর সংসারে এমন নিবিড় ভাবে ডুবে গেছে বেলা যে সময় করে উপন্যাসটা পড়ে উঠতে পারল না। ভাগ্যে লেখা সম্পর্কে স্ত্রীর মতামত জানতে চায় নি সুবিমল!

একদিন এই লেখা পড়েই মুগ্ধ হয়েছে বেলা। লেখকের প্রতি নিগূঢ় শ্রদ্ধা রূপান্তরিত হয়েছে ভালবাসায়। স্রষ্টার সম্পর্কে কৌতূহল মানুষটিকে নিবিড়ভাবে জানার আগ্রহে পরিণত হয়েছে। বিয়ের পর পরম প্রাপ্তির আনন্দে, সৌভাগ্যে, গর্বে আত্মহারা হয়ে যেত কত সময়ে। এখন সে সব কথা মনেও পড়ে না একবার। নিতান্ত সহজ, স্বাভাবিক, অভ্যাসমত ব্যাপার যেন। তার থেকে বাবলুর হাসি, কান্না, দুষ্টুমী, লেখাপড়া অনেক বেশি আকর্ষণ করে মনকে।

অভ্যাসবশেই লেখার আলমারি ঝাড়তে বসে মাঝে মাঝে। পূজো এসে গেল। মানে আষাঢ় মাস পড়েছে। অন্তত পঁচিশটা গল্প তৈরি করতে হবে সুবিমলকে দু-আড়াই মাসের মধ্যে। পুরোনো লেখা, বাতিল গল্প, অর্ধসমাপ্ত রচনা, এমনি যা কিছু অপ্রসন্ন হাতে গুঁজে রেখেছে নিচের তাকে, তাই টেনে নামাতে হয় বেলাকে। অবসরমত ঘষে মেজে, কেটে ছেঁটে, নতুন করে লিখে নেবে সুবিমল। বেলা কিছুটা সাহায্য করে তাকে। নিজে কোনদিনই লিখল না এক কলম। কিন্তু সুবিমল বেশ জানে, কোন্ বাতিল লেখাকে ঘষে মেজে নেওয়া যায়, কোন্ অসম্পূর্ণ গল্প অল্প খেটে শেষ করা সম্ভব, সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে বেলার। স্ত্রীর ওপরে যথেষ্ট নির্ভর করে সে। কিন্তু আগে যেমন প্রাণের তাগিদে স্বামীকে সাহায্য করত বেলা, এখন আর তেমন করে পারে না। নিষ্প্রাণ, দায়সারা ভাবে কাজ করে যায়। সেই অলৌকিক আনন্দের স্বাদ আর পায় না যেন।

ইদানিং, এই কিছুদিন হল, আবার সাড়া জাগছে মনে নতুন করে। আবার উচ্চকিত হয়ে উঠছে বেলা অপ্রত্যাশিত চমকের আশায়।

ওদের বাসা ছাড়িয়ে ফার্লংটাক গেলেই পার্ক। মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। ছেলেকে স্নান করিয়ে খাইয়ে বেলা দশটার মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে বেলা। সুবিমল ঘরে না থাকলে চাবি দিয়ে যেতে হয়। পাশেই তপতীদের বাড়ি। ওদের কাছে চাবি দিয়ে গেলে হঠাৎ ফিরে এসে অসুবিধেয় পড়ে না সুবিমল।

সেই অবশ্যকর্তব্যও ভুল হয়ে যাচ্ছে আজকাল। অন্যমনস্ক-ভাবে চাবিটা ব্যাগে বন্ধ করে বাবলুর হাত ধরে টান দিল বেলা। 'চল বাবলু, দেরি হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে দিদিমণি ক্লাশে ঢুকতে দেবেন না।'

ছেলেকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে যতটা না হোক, ওর নিজের পথ চারণায় যে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেই দুশ্চিন্তায় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

পার্কে পা দিয়ে অভ্যস্ত চোখে তাকাল বেলা।

নেমে এসেছেন ভদ্রলোক তেতালার ঘর থেকে। অস্থির পায়চারি থেকে অসহিষ্ণু মনের আঁচ পাওয়া যায়। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আজ প্রায় পাঁচ মিনিট লেট।'

সলজ্জ হাসি দিয়ে অপরাধ স্খালন করতে চাইল বেলা। সত্যি, অযথা উদ্বেগে কষ্ট পেয়েছেন ভদ্রলোক এতক্ষণ ধরে। কোণের লাল বাড়িটায় থাকেন। দোতালায় দু-খানা ঘর নিয়েছেন। একটায় স্টুডিয়ো। চাকর রান্না বান্না করে। একা মানুষ। জামা কাপড় ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। পরিষ্কার করে কামানো মুখে মৃদু হাসি। আলাপ হয়েছে কিছুদিন যাবৎ।

বেশ খোলা মন, সঙ্কোচের বালাই নেই। চেনেন না তাকে নামকরা লেখক সুবিমল সেনের স্ত্রী বলে। বাংলা গল্প উপন্যাস পড়েন বলে মনে হয় না। জিজ্ঞাসা করে নি বেলা। পাছে পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়।

প্রথম দিন বলেছিলেন, 'স্টুডিয়োর জানলা থেকে প্রত্যহ দেখি আপনাকে। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসেন। গাছের ছায়ায় ছায়ায় আপন মনে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যান। খুব সুন্দর লাগে। কিছু মনে করবেন না, একটা ছবি এঁকেছি আপনার।'

বেলার ছবি? বিস্মিত হয়েছিল সে। ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিল প্রথম যৌবনের দিনগুলোর মত।

'রোজ দেখি আর আলাপ করতে ইচ্ছে হয়। ভরসা পাই নি। আজ ভাবলাম, চুলোয় যাক দুশ্চিন্তা। যদি কিছু মনে করেন, মাপ চেয়ে নেব। তাই বলে কতকাল আর ইচ্ছেটাকে চেপে রাখি!'

সলজ্জ স্মিত হাসি ফুটে উঠেছিল বেলার মুখে। চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সে সঙ্কোচে। স্বামীর বন্ধুদের দৌলতে পুরুষদের সঙ্গে আলাপে জড়তা নেই তার। তবু চোখ তুলে তাকাতে পারে না বেলা ভাল করে।

'অবশ্য আপনি কিছু মনে করলে দোষ দিতে পারি না। গায়ে-পড়ে আলাপ পছন্দ করেন না সকলে। কোন খারাপ মতলব আছে সন্দেহ করেন।'

না, তেমন সন্দেহ বেলা করে না। ভদ্রলোকের মুখ চোখ দেখে বদ লোক বলে মনে হয় না। তা ছাড়া নির্বোধ নয় সে। নিজেকে রক্ষা করার মত সাহস এবং ক্ষমতা কোনটারই অভাব নেই।

'আপনার চলার ভঙ্গীটা এত সুন্দর, বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি কথা দিয়ে তো মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি না। পারি তুলি দিয়ে। আসুন না একদিন আমার স্টুডিয়োয়। ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন আমার বক্তব্য।'

সেদিন ওই পর্যন্ত একতরফা আলাপ। পরের দিন আবার দেখা হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে পার্কের ভিতরে। ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছিল বেলা, 'আপনি কি শুধু ছবিই আঁকেন?'

'তা ছাড়া আর কি করব?' হেসেছিলেন ভদ্রলোক।

'মানে, অন্য কোন কাজ টাজ—'

'ছবি আঁকা কি একটা কাজ নয়? কতদিন লেগে যায় এক একটা ছবি আঁকতে। অবশ্য আর্টস্কুলে ক্লাশ নিতে হয় সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা। সেটা এমন কিছুই নয়। আসল ঝামেলা হয় এগ্জিবিশনের ব্যবস্থা করলে। আমাদের এ দেশে এগ্জিবিশন করার মত জায়গা বেশি নেই। কাজেই মনের মত জায়গা জোগাড় করতে খুব অসুবিধে হয়। তারপর বেশ কিছু ছবি টাঙানো, আর্ট ক্রিটিক, খবরের কাগজের রিপোর্টার, কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি, সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হয়, খাতির করতে হয়। যেমন টাকার শ্রাদ্ধ তেমনি সময় আর এনার্জির অপব্যয়। অথচ এটুকু পাবলিসিটি না হলেও চলে না।'

'আপনার বুঝি ফাইন আর্ট?'

'তা তো বটেই। আসলে আমরা যে স্কুল ফলো করি, সেটা হল, এ্যাবস্ট্রাক্ট প্রসেস অব ডিসইন্টিগ্রেশন, রিফ্লেকটিং অন টোটাল এফেক্ট। ইম্প্রেসনিস্টরা যেমন রেখা দিয়ে ছবির ক্যারাক্টার ফোটাতে চান, আমরা তেমনি চাই রঙ আর শেড দিয়ে। অবশ্য এখনো এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ। চলুন না একদিন, বুঝিয়ে দেব।'

'আমি কিছু বুঝব না।' হেসে মাথা নেড়েছিল বেলা।

পরের দিন আবার দেখা। ভদ্রলোক বললেন, 'এবার এগ্জিবিশনে আপনার ছবিটাই বেস্ট এগ্জিবিট হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

নিজের ছবি এই অসাধারণ শিল্পীর তুলির আঁচড়ে কেমন হয়েছে দেখতে সে সম্পর্কে মনে অসামান্য কৌতূহল থাকলেও প্রকাশ করে নি বেলা একবারও। ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আপনি একবার দেখবেন না?'

মৃদু হেসে প্রস্তাব এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল বেলা। বুঝে তিনি আর অনুরোধ করেন নি।

কিন্তু তাই বলে প্রত্যহ নিয়মমাফিক কয়েক মিনিটের জন্য আলাপচারিতে ছেদ পড়ে নি একটি দিনের জন্যেও। ছুটির দিনে দেখা হয় না এবং মজার কথা, সেদিন বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব করে না বেলা। অথচ ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেবার বেলা হলে কি রকম উত্তাল হয়ে ওঠে বুকের স্পন্দন। দেখা না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

কত কথা শুনিয়েছেন ভদ্রলোক একটু-একটু করে। ছাত্র-জীবনের কত মজার গল্প, মা-বাবার কথা, ছোট বোনটির চাপল্য, নিজের ভবিষ্যতের প্ল্যান, দুরূহ অঙ্কন পদ্ধতি ও প্রয়োগ পরীক্ষার ইতিবৃত্ত। নীরব শ্রোতারূপে শুনে গেছে বেলা প্রত্যেক দিন। কচিৎ মন্তব্য করেছে। মনে মনে রচনা করেছে আর্টিস্টকে ঘিরে এক আশ্চর্য জগৎ। তার সম্পর্কে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করেন নি, আর একবারও স্টুডিয়োয় যেতে অনুরোধ করেন নি। ওঁর এই সুবিবেচনায় ধন্যবাদ জানিয়েছে মনে মনে।

আজ তাই মায়া লাগল পাঁচ মিনিট দেরি করে আসার জন্য।

এটা তো সে অস্বীকার করতে পারবে না যে এই ক'টি মুহূর্তের আশায় সমস্ত সকাল ধরে তারই মত প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে থাকেন ভদ্রলোক। পার্কটা একবার ঘুরে আসা। পদচারণার ফাঁকে ফাঁকে কত আলাপ। কত বিচিত্র দেশ ঘুরে এসেছে বেলা শিল্পীর কথা শুনতে শুনতে। কত সমুদ্রের সূর্যাস্ত, কত পাহাড়ের সূর্যোদয়, কত শ্যামল অরণ্যের নিবিড় বর্ষা উপভোগ করেছে সে। বিশাল প্রান্তর, প্রকৃতির কোলে ছুটে বেড়িয়েছে আর্টিস্টের হাত ধরে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে অমূল্য মুহূর্তগুলি অতিবাহিত করেছে। ধন্য হয়েছে, সার্থক হয়েছে শিল্পীর সঙ্গ লাভ করে। ওঁকে সামান্যটুকু খুশি করতে পারলেই যেন বেঁচে যায় সে। আজ তাই নিজে থেকে ওঁর স্টুডিয়োয় যাওয়ার প্রস্তাব করবে ভাবল বেলা মনে মনে।

'আজ দেরি হয়ে গেছে' হেসে বলল বেলা, 'একে পৌঁছে দিয়ে আসি তাড়াতাড়ি। ফেরার পথে গল্প করব। আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

'অসুবিধে?' সুন্দর হাসি ফুটে উঠেছিল ভদ্রলোকের ঠোঁটে। 'আপনার জন্যে অপেক্ষা করাটা নেশার মত পেয়ে গেছে।'

পার্ক ছাড়িয়ে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। স্কুল থেকে ফেরার পথে দ্রুত পা চালাল বেলা। ভদ্রলোক তার অপেক্ষায় আছেন, ভাবতে ভাল লাগে। তবু সেই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা উপভোগ করবে মনে মনে, এটা অত্যন্ত অনুচিত। নিজে থেকে স্টুডিয়োতে যাওয়ার প্রস্তাব কেমন করে তুলবে, সেই চিন্তায় রক্তের উচ্ছ্বাসে রাঙা হয়ে উঠল মুখ।

দূর থেকে তাকে দেখে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। নাম জানা হয় নি আজও। আশ্চর্য! অন্তরে অন্তরে যাঁর সাথে নিবিড় সখ্যতায় বাঁধা, তাঁর নামটুকু জানতেও কত সংকোচ! সভ্যতা আর শালীনতাবোধ কত বিড়ম্বিত করে সামাজিক মানুষকে।

'আজ আমার চাকরটার শরীর খারাপ। কাল রাত থেকে বেশ জ্বর হয়েছে। শুয়ে আছে। সকালবেলা নিজে নিজে আর রান্নার হাঙ্গামা করি নি। ভেবেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা হলে কোথাও

চায়ের দোকানটায় বসে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে। কিন্তু আপনার সময় হবে তো?'

'চলুন'। হেসে এগিয়ে গিয়েছিল বেলা।

'এই আষাঢ়ের আকাশ কি রকম কালো হয়ে ধানক্ষেতের ওপরে নেমে আসে দেখেছেন?' পর্দাঢাকা কেবিনে চায়ের কাপ ঠোঁটে তুলে বললেন ভদ্রলোক। 'মাইল পাঁচ-সাত দূরে গেলে দেখতে পাবেন, সহরের আওতা ছাড়ালেই আকাশের রঙ পাল্টে যায়। খুব ইচ্ছে করে আপনাকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখিয়ে আনি। কয়েক ঘণ্টার জার্নি। যাবেন একদিন?'

'যাব', এই কথা সমস্ত প্রাণ দিয়ে বলতে সাধ যায়। কিন্তু তা কি সম্ভব? তাই পরিবর্তে বলল, 'আপনার স্টুডিও দেখতে যাওয়া হল না। আজ ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু বেশ দেরি হয়ে গেল।'

'বেশ তো, কাল যাবেন। আমি একটু গুছিয়ে রাখব। চাকরটার শরীর খারাপ কি না।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আনমনে বাড়ির পথে পা চালালো বেলা। একটু দেরি হয়ে গেছে। হোক। প্রাত্যহিকতার বাঁধাধরা একঘেয়েমী যেন চেপে বসেছে বুকে। নিশ্বাস ফেলার অবকাশটুকু কত দুর্মূল্য!

আগামীকাল যাবে সে আর্টিস্টের স্টুডিয়োয়। তারপরে কোনদিন অনেক দূরে গ্রামের শান্ত নির্জন পরিবেশে নতুন করে পরিচয় হবে শিল্পীর সঙ্গে। তারও পরে হয়তো সৌন্দর্যপিপাসু চোখ তৃপ্ত হবে কোণার্কে, আগ্রায়, অজন্তায়, ইলোরায়। ঘটনায়, সংলাপে, বিন্যাসে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করবে তার সৃষ্টি।

বাড়ির দরজায় পা দিয়ে চমকে উঠল বেলা। সুবিমল পায়চারি করছিল উত্তেজিত মনে। দরজায় তালা বন্ধ। তাড়াতাড়িতে মনের ভুলে তপতীদের বাড়ি চাবি রেখে যায় নি সে। অপ্রস্তুত হয়ে হাতব্যাগ খুলে চাবি বার করল।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুবিমল। 'বাবলুর স্কুল তো দশটায়। এখন এগারটা বাজে।'

উত্তর না দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো বেলা।

কি করে বোঝাবে লেখককে, নতুন সৃষ্টিতে নিজেই সে হাত দিয়েছে কিছুকাল যাবৎ? যদিও জানে না এখনো, হঠাৎ চমকে দেওয়া ছোট গল্পে সেটা শেষ হবে, না ঘটনাবহুল বড় গল্পে গিয়ে দাঁড়াবে, না কি বহু পরিচ্ছেদে বিভক্ত জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্য অপেক্ষা করে আছে তার পরিণতি!

এপার : ওপার

রমেন চৌধুরী

সেই এক কথা—
আশা অনুরূপ নেই এই অভাজন
বঙ্গো শুনি তোমার বারতা!
নদীর ওপারে যত হাসি আলো শত সম্ভাবন।
তোমার ধারণা,
সুদৃঢ় বিশ্বাস বলা চলে—
মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান এ ধরায় আছে যারা
আমি না কি তাহাদের দলে।
আমার মুহূর্তগুলি রঙে রঙে রাঙা হয়ে ওঠে
আমারে ঘিরিয়া সুখ ঢেউ ঢেউ-এ ছোটে
আমি মালাকার গাঁথি
আকাশ-কুসুম;
তুমি তো জানো না ফের চোখে লাগে আলেয়ার ধূম।
সুখ বলে ভাবো যারে
দুখের সে মাত্র নামান্তর
নিষ্ফল আক্রোশে মাথা খুঁড়ে মরে এ দীর্ণ অন্তর!
আমার বেদনা কতো বন্ধমূল তুমি তো জানো না,
এ তো নয় সোনা;
এ যে সীসা বিষবাষ্পে ভরা
অর্থহীন এই বসুন্ধরা!
তারি মাঝে বেঁচে আছি রাত্রি প্রভাতের আশা নিয়ে
কে দেবে ফিরিয়ে
পাখির কাকলিমাখা একটি সকাল;
সালংকারা হাতখানি প্রেমভরে ছুঁয়ে যাবে
এই দগ্ধ ভাল!!

● ● ●

॥ রাত্রি ॥

ছায়া সাহা

ধূম্রমলিন সূর্যাস্ত। নিঃশব্দে স্পর্শ করলাম আমার আঁখি।
সম্মুখে অন্ধকার পূতিগন্ধময় বনানী।
আলোর চুমকিগুলো যেন কিলবিল করছে।
পেছন ফিরে দাঁড়ালাম।
আর আমার পেছনে রয়েছে অন্ধকার রাত্রি।
ওপরে তাকালাম। সব তারা।
এখন রাত্রি। ঘুমোবার সময়।
আমার স্বপ্নে কোথাও নেই আকাশ।
আমি স্বপ্ন দেখি না।
আকাশের জন্যেই আমার জীবনের দ্রুত চলা।
কিন্তু শক্তি ক্ষয় করে ছুটে ছুটে পাই—
শুধু একটি তারা।
আমার জন্য আকাশ নয়।
আমার জন্যে সূর্য নয়, আলো নয়।
আমার শুধু অন্ধকার।
শুধুই রাত্রি॥

বৃত্ত

কৃষ্ণা দাস

ভিড়ের চাপ এড়িয়ে কামরার মধ্যে কোনমতে ঢুকলো রেখা। এমন কি বরাতের জোর, বেঞ্চের একধারে একটু জায়গা করে বসতেও পারলো। কিন্তু বসতে গিয়ে সুখ নেই, জায়গা করে যতটুকু স্থান পাওয়া গেল, তার অর্ধেকটা দখল করে নিল এক গেরুয়াধারী।

রেখা চেয়ে দেখলো, গেরুয়াধারী মানে সন্ন্যাসী নয়, আধুনিক যুগের খদ্দরের জামা—অর্থাৎ পাঞ্জাবী পায়জামা পরা একটি লোক তার পাশ ঘেঁষে পরমানন্দে এসে বসলো।

প্যাসেঞ্জার গাড়ি, ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রেখা হাতঘড়ি উল্টে দেখলো ছ'টা বাজে। পাঁচটা পঁয়ত্রিশের গাড়ি, বাকি সময়টা লেট। তার ওপর আকাশ জুড়ে মেঘের ঘটা। বৃষ্টি হলে কি অবস্থায় পড়তে হবে— সে কথা ভেবে এখন থেকেই চিন্তিত হল রেখা।

গাড়ির ভিতর ঘামের গন্ধ আর ঠাসাঠাসি ভিড়ের যন্ত্রণা এড়াতে রেখা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, গাড়ি ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে ছুটছে, কিন্তু ভীষণ যন্ত্রণা, গেরুয়া পাঞ্জাবীর হাঁটুর সঙ্গে অনবরত হাঁটুর ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

—একটু সরে বসুন। বিরক্ত রেখা না বলে পারলো না।

—কোথায় সরবো? লোকটা মুখ ফেরাল। দেখছেন তো ভেতরের অবস্থা। বসারও জায়গা নেই। দাঁড়াবারও জায়গা নেই। দেশলাইয়ের খোলের মত হয়ে আছি। একটু কষ্ট করতেই হবে।

লোকটা বোধ হয় সত্যবাদী যুধিষ্ঠির গোছের কেউ হবে। কথাবার্তা কাটা কাটা। স্বরের মধ্যে মিষ্টতার ছোঁয়া কোথাও নেই। রেখা জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো। আকাশে মেঘের সমারোহ। তারই মাঝে টিপটিপে বৃষ্টি নেমেছে। কিন্তু এতো আচ্ছা জ্বালা!—

—আপনি কি আমায় ঠেসে ধরে মারতে চান?

গেরুয়া পাঞ্জাবীর হাঁটু ছেড়ে এবার কাঁধের সঙ্গে কাঁধ ঠোকাঠুকি হচ্ছে। রেখার বিরক্তি এবার চরমে উঠলো। মানুষটার শরীরে কি সাড় নেই। অসাড় হয়ে গেছে চেতনা!

রেখার গলা আর একটু চড়লো—শুনছেন।

গেরুয়া পাঞ্জাবী মুখ ফেরাল—আমায় বলছেন?

রেখা কঠিন গলায় বললো—হ্যাঁ বলছি। আপনি হয় সরে বসুন নয় উঠে দাঁড়ান।

—সরবই বা কোথায়, দাঁড়াবই বা কোথায়—আপনি দেখিয়ে দিন।

দেখানোর ভার এবার রেখাকে নিতে হল না, সে কাজ অন্য প্যাসেঞ্জাররা যথারীতি সারলো। কামরার সঙ্গে মুহূর্তে রীতিমত হৈচৈ লেগেছে—ও দাদা, শুনছেন, বসার সুখটি এবার ছাড়ুন। আসুন, উঠে এসে আমাদের সঙ্গে দাঁড়ান। এতগুলো লোক যখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, আপনিও না হয় গেলেন।

পিছন থেকে কে যেন টিপ্পনী কাটলো—কষ্ট হলেও এ কাজ করতে হবে দাদা, উপায় কি।

সমস্ত টীকা-টিপ্পনীর আগেই গেরুয়া পাঞ্জাবী উঠে পড়েছে। দীর্ঘকায় চেহারা। কাঁধে একটা কিসের ঝোলা রয়েছে। মনে হয় জিনিষপত্র বাঁধা। যাই হোক লোকটা সেই বোঝা সহ নিজের দেহটি কোনমতে ভিড়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দাঁড়াতে পারলো।

যাক বাবা, বাঁচা গেল!—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করে রেখা ফের জানলার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। বৃষ্টি নামলো অঝরে। জল পড়ার কায়দা দেখে মনে হয়—এ বৃষ্টি সহসা থামবে না। আগরপাড়া স্টেশনে নেমে বাড়ি অবধি বেশকিছুটা হাঁটা পথ। হেঁটে বাড়ি পৌঁছবার আগে বৃষ্টিতে ভিজে আজ স্নান করতে হবে।

রেখা নিজে বড় বিব্রতবোধ করলো। জল ঝড় মাথায় করে নিত্য নৈমিত্তিক এই কলকাতা আগরপাড়া করতে হচ্ছে—এ আর ভাল লাগে না। আসলে কাজ করতে যে রেখা বিমুখ—তা নয়। কাজটাই আসলে কাজের মত নয়। রেখা কুসুমিকা পারফিউমার্সে কাজ করে। সেলসগার্লের কাজ। সামান্য কিছু মাইনে। বাকিটা বিক্রির কমিশনের উপর নির্ভরশীল। আজ বছর দু'য়েক যাবৎ এই কাজ করছে। বাবা অবনী বিমাতার প্ররোচনায় ভুলে জোর করে এই কাজে ঢুকিয়েছেন—নতুবা রেখার নিজের ইচ্ছে ছিল না। ওর উচ্চাশা

ছিল।—অন্তত দু'টো পাশ করে যে কোন জায়গায় একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে নেবে। মাইনেও থাকবে সম্মানও থাকবে। এর যেন কিছুই নেই। জাতও যাচ্ছে পেটও ভরছে না।—

বিরক্ত ধরা মন নিয়ে রেখা চেয়ে দেখলো আগরপাড়া স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে। কিন্তু থামলে কি হবে কলকাতার বৃষ্টি আগরপাড়ায় বান ডাকিয়ে দিয়েছে প্রায়। এর মধ্যেই গোড়ালী ডোবা জল হয়ে গেছে। মানুষজন কম। সন্ধ্যের আগেই রাতের সুর। আজ যদি ছাতাটা আনতো।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে রেখা স্টেশনে নেমে পড়লো। সেই সঙ্গে মনে হয় প্রায় ধাক্কা দিয়ে আরও কেউ নামলো যেন। বৃষ্টি মাথায় করেই কোনমতে ঘাড় ফিরিয়েছে রেখা।—কি আশ্চর্য এ যে সেই গেরুয়া পাঞ্জাবী।

অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যে রেখা নিজেকে বড় অসহায় মনে করলো। লোকটার ভাবগতিক তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতা থেকে গাড়িতে ওঠার সময় পাশাপাশি উঠেছে গাড়িতে, উঠেও পাশাপাশি সীটে বসেছে। আবার স্টেশনে নেমেছে তা-ও জল-ঝড় মাথায় করে এখানে এসে উঠলো। ভেবেছে কি। লোকটা কি তাকে ফলো করতে চায়?

বুকের মধ্যে বিনা কারণেই গুরগুরিয়ে উঠেছে। এদিকে ট্রেন চলে গেছে। স্টেশনে লোকজন নেই বললেই হয়। বৃষ্টিতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেজা যায় ভেবে পেল না রেখা। কানে গেল গেরুয়া পাঞ্জাবী আপশোষ করছে—ইস্, কি জ্বালায় পেড়া গেলম বাবা।

আকাশের দিকে নজর তুলতে চেষ্টা করলো রেখা। যা মেঘ জমেছে। বৃষ্টি কমলে বাড়ি যাব মনে করলে, ধরে রাখতে হবে বাড়ির সামনে অন্তত একহাটু জল দাঁড়াবে তখন।

—কতদূর যাওয়া হবে?

রেখা বিস্ময়ে থ। গেরুয়া পাঞ্জাবী গম্ভীরভাবে তাকেই প্রশ্ন করছে। রেখার এতক্ষণে ভীত ভাবটা কেটে গিয়েছে। বিরক্ত-ধরা মন নিয়ে বললো—যেখানেই যাই, আপনার দরকার কি?

—দরকার কিছু নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকের মত ভিজছেন তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

—আপনিও তো ভিজছেন। গলায় স্বর খুব নরম করতে চাইলো রেখা। বললো,—আপনার আসল মতলবটা কি বলুন তো?

গেরুয়া পাঞ্জাবী এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে বললে,—মতলব আপাতত ধারে কাছে একটা চায়ের দোকান পাওয়া। যা ভেজা-ভেজি, এক কাপ গরম চা খাওয়া একান্ত দরকার। আপনি জানেন দোকান-টোকান এখানে কোথায় আছে—?

লোকটার বদমতলবের স্রোত কোথা গিয়ে থামবে রেখা যেন ভেবে পেল না। হাজার হোক চোখে তো আর ঠুলি পরে নেই। সামনের রাস্তায় টিনের চালার তলায় চায়ের দোকান রয়েছে—দেখতে পায় না।

কাঁপাস গলায় রেখা বললো—সামনের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, চায়ের দোকান দেখতে পাবেন।

—ওমা। তাই তো। আমি কি বোকা দেখুন।

গেরুয়া পাঞ্জাবী উটস্থ হয়ে উঠলো যেন।—আসুন, সামান্য রাস্তাটুকু দৌড়ে চলে আসুন—

মাথাটা একটু নিচু করে পায়জামা ঈষৎ গুটিয়ে গেরুয়া পাঞ্জাবী দৌড় দিল, সঙ্গে সঙ্গে রেখা।

টিনের চালা দেওয়া চায়ের দোকান। সামনের দিকে উনুনে কেটলী বসানো আছে। চায়ের জল অনবরত ফুটছে। ভেতরে লোকজন এলে বসে। ভেতরে ঢুকে গেরুয়া পাঞ্জাবী নিজে একখানা চেয়ার দখল করে অপর খানায় রেখাকে বসতে বললো—বসুন, এককাপ চা পেটে পড়লে দেখবেন মন, মেজাজ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে। বসুন।

রেখাকে বসতে বলে দু'কাপ চা আর কিছু বিস্কুটের অর্ডার দিল লোকটা।

বাইরে তখনও সমান গতিতে বৃষ্টি হচ্ছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে। মনে হয় কত যেন রাত, কিন্তু ঘড়ি দেখলে সে ভুল ভাঙে। মাত্র পৌনে সাতটা। বৃষ্টি না নামলে এখনও বিকেলের আমেজ থাকতো হয় তো। কিন্তু ভেবে লাভ নেই, যে করে হোক বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচা যায়।

কিন্তু বাড়ি বলতে সেই ছোট্ট খুপরী একটু ঘর। অসুস্থ বাবা, সংমায়ের নিরন্তর গঞ্জনা আর বৈমাত্র ভাইবোনগুলোর উৎকট কলরোল, ঝগড়া মারামারি—কেন যেন এই তিক্ত বস্তুটিকে আগে হতে সহজে গলাধঃকরণ করা গিয়েছিল—আজকাল যেন আর কিছুতেই করা যায় না, খারাপ লাগে। বাড়ি ফেরার কথাটা আজও তেমন উৎসাহ সঞ্চার করলো না রেখার কাছে।

গেরুয়া পাঞ্জাবী জিজ্ঞেস করছে—আপনার বাড়ি কতদূর।

সামনের সর্পিল রাস্তাটা আঙুল দিয়ে দেখালে রেখা।—ঐ রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। বেশ খানিকটা পথ।

—তাহলে তো ভিজতে হবে। গেরুয়া পাঞ্জাবী কিছু ভাবলো। আপনার বাড়ি তো এখানে বললেন। কিন্তু কলকাতা গিয়েছিলেন কেন? পড়াশুনা না বন্ধুবান্ধবের বাড়ি।

লোকটার গায়েপড়া স্বভাব দেখলে গা জ্বলে যায়। তবু রেখা নিজেকে সংযত করলো। বললে—না, কোনটাই না। কাজ করতে হয় আমায়। কুসুমিকা পারফিউমার্সের আমি একজন সেলসগার্ল। আপনি? আপনি কি করেন?

চায়ের দোকানের ছেলেটা সামনে চা-বিস্কুট রেখে গেছে। গেরুয়া পাঞ্জাবী তার একটা নিজের দিকে টেনে অপরটা রেখার সামনে রাখলো। বললো—আমিও কাজ করি। কলকাতার বিভূপদ প্রকাশনী আছে, কাজটা সেখানকার। বই বিক্রি, টাকা কালেকশন ইত্যাদি।

একটু হেসে গেরুয়া পাঞ্জাবী মুখ তুললো—দেখুন, আমরা এতক্ষণ ধরে এত কথাবার্তা বলছি, আসলে কেউ কারো নাম অবধি জানি না। আমার নাম মনোময় বাকচী। আপনি?

—রেখা আঢ্য। রেখা একটু হেসে চায়ের কাপ মুখে তুললো।

মনোময় একটু চিন্তা করে বললে,—চাকরি তো করেন বুঝলাম বাড়িতে কে কে আছেন?

—বাবা, সৎমা, তাঁদের পেটের চারটি ছেলেমেয়ে। আপনার?

মনোময় হেসে বললো—কপালের দৌড় আপনার চাইতে আমার খুব বেশি পৃথক নয়। আমারও কেউ নেই। মা-বাবা ছোটবেলায় মারা গিয়েছেন। একটি ভাই আছে অবিশ্যি। তবে হাবা-কালা।

রেখা লোকটার দিকে এতক্ষণে ভাল করে চেয়ে দেখলো। লাইটের আলোটা তির্যক হয়ে মুখের উপর এসে পড়েছে। রেখার মনে হল মনোময়ের মুখখানা বড় ম্লান। বেদনার ছায়ায় ভারাক্রান্ত। রেখা কথা বললো না—চায়ের কাপে মুখ ডোবাল।

বাইরে বৃষ্টি কমে এসেছে, লোক চলাচল স্বরু হয়েছে। ছপছপে কাদা ভেঙ্গে মানুষ চলেছে। রেখা হাতঘড়ি উল্টে দেখলো, আটটা বেজে গেছে। সর্বনাশ! বাড়িতে না জানি কি কাণ্ড হচ্ছে।

কথাগুলো নিজে ভেবে দেখার আগে মনোময়ই চেয়ার ছেড়েছে। চায়ের দোকানের পয়সা মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বললো—বৃষ্টি যে কমেছে, এবার যাওয়া যাক। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।

পা বাড়াল মনোময়। বাইরে অন্ধকার। মনোময়ের ছায়ার আশ্রয়ে পা রাখলো রেখা। আজ সমস্ত পরিবেশটা কেমন বিচিত্র আর মোহময় লাগছে। এ যেন একটা স্বপ্ন। যেন সে ঘুমেরঘোরে নানা সুন্দর স্বপ্নের ছবি দেখে চলেছে।

নয় তো কুসুমিকা পারফিউমার্সের অসংখ্য সেলসগার্লের একজন রেখা। বাবার অসুখ আর মায়ের তাড়না, এই নিয়ে সে একুশটা বছর অতিক্রম করে এসেছে।—বাকি জীবন করার জন্যেও সে প্রস্তুত হয়েছিল—তার জীবনে এ কি অধ্যায়! দশটা পাঁচটার চাকুরে রেখা—সেখানে আজ অবধি কোন পুরুষের অবলম্বনের ছায়া পড়ে নি। দশটায় বেরোয় সোজা কুসুমিকা পারফিউমার্সে। সেখান থেকে মালপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়। জীবনে রূপ-রস রোমান্সের কোন মুহূর্ত নেই। শুকনো নিরস হিমানী পাউডার সেন্ট সাবানের গুণকীর্তন করে দু' পয়সা রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

আর এই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারটা নিজের কাছেই যে ক্রমাগত তিক্ত হয়ে উঠছিল। মনে মনে এর অবসান চাইছিল রেখা আজকের মত আর কোনদিন জানতে পারে নি।

মনোময়ের পাশাপাশি চলতে চলতে রেখা বললো—আসল কথা জানা হয় নি, আপনি কোথায় চলেছেন।

—বইয়ের দোকানে। টাকা-কালেকশনের কাজে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রেখা বললো—টাকা আদায় করে এত রাতে নিশ্চয়ই ফিরতে পারবেন না?

—পাগল! মনোময় অন্ধকারে হাসলো,—টাকা আদায় ব্যাপারটা এত সহজ কথা নয়। যেতে কয়তে আমার কাল সকাল হবে। আপনিও তো কাল যাচ্ছেন, না কি?

—নিশ্চয়ই। যেতে ভাল না লাগলেও যেতে হবে, উপায় নেই।

কথা বলতে বলতে রেখা বাড়ির কাছে চলে এসেছিল। একটু থেমে দাঁড়িয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো—নমস্কার। এটুকু রাস্তা আমি নিজেই যেতে পারবো। আর একটা কথা বলি, গাড়ির কথাটা আপনি মনে রাখবেন না। কেমন।

রেখার গলায় কি ছিল কে জানে, মনোময় হেসে ফেললো। বললো—কোন্ জন্মে সে কথা ভুলে গেছি। গাড়িতে অমন হয়।

একটু হেসে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে মনোময় পিছন ফিরে চলতে সুরু করেছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল রেখা। যদিও বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা অব্যক্ত ক্ষোভ বাজছেই। শুধু মনে হচ্ছে এতক্ষণ কি যেন ছিল এবং কি যেন নেই।

বাড়ি ঢোকার মুখেই মায়ের খনখনে গলা পাওয়া গেল। চিৎকার করে বলছেন—রোজগেরে মেয়ের নামে একগরাস ভাত বেশি খাও। এখন দেখ, চাকরে মেয়ের রোজগারে কতদিন খেতে পার। গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।

—টেঁপির মা!

বাবা ঘরের ভিতর থেকে সাঁই সাঁই গলায় ধমক দিতে চাইতে পাল্টা গলায় ধমক দিয়েছে টেঁপির মা।—বলি সত্যি কথা বলবো, তাতে এত ভয়টা কিসের। সাত-সকালে বেরোনো হয়—পিরীত সেরে বাড়ি ফিরতে রাত ভোর। কেন, একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে না। ছেলেমেয়েগুলোকে একটু দু'চোখ দিয়ে দেখলেও যে রাতের পিণ্ডি রাঁধার ব্যবস্থাটা করে উঠতে পারি।

বাবার কালী ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো রেখা। বিচিত্র এক ক্ষোভে বেদনায় নিজের শ্রান্ত দেহটা অলস হয়ে পড়লো যেন। রেখার মনে হল—ও অহেতুক এই স্নেহ-প্রীতি-মমতাশূন্য মানুষগুলির জন্য নিজের দেহটাকে আর ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারছে না। ও ক্লান্ত, ও আশ্রয় চায়।

কিন্তু যা চাওয়া যায়—তা পাওয়া যায় কোথায়। হাতের ব্যাগ তক্তপোষের একধারে নামিয়ে রেখে জানলার কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো রেখা। বাইরে তখনও টেঁপির মা মুখ দিয়ে বিষ ঢালছে।—ঢলানী, দিনে দিনে বাড়ি আসবে! রাত কাবার না হলে ঘরের কথা মনে হয় না হারামজাদির।

টেঁপি মাকে সাবধান করছে—আজ রাতে বাড়ি ফিরলে দরজা খুলো না, বুঝেছ মা।

রেখা অনুভব করলো ওর চোখের দু'টো কোণ বেয়ে জল নেমেছে। ভিতরের আত্মাটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাঁদছে। গুমরে গুমরে কাঁদছে।

ভোরবেলা আজ তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলো রেখার। ঘুম ভেঙ্গে অনুভব করলো সমস্ত শরীরটা খুব হাল্কা লাগছে, সেই সঙ্গে ভারি দুর্বল। মনে পড়লো কাল খাওয়া হয় নি, মনোময় সন্ধ্যেবেলা যে চা খাইয়েছিল তারপর আর জলস্পর্শ করার সুযোগ ঘটে নি।

বুকের মধ্যে একটা ব্যথা যেন ভার হয়ে উঠেছে। তক্তপোষের ওপর শুয়ে দূরের দিকে চেয়ে রইলো রেখা। মনে হল তার কেউ নেই। এত বড় পৃথিবীটা তার কাছে নিঃস্ব-রিক্ত-সম্পর্কশূন্য। আর এই অবস্থায় তাকে কাজে বেরোতেই হবে। সেই কুসুমিকা পারফিউমার্স, সেই হিমানী পাউডারের কাল্পনিক বিজ্ঞাপন—সেই লোকের দরজায় দরজায় ঘোরাঘুরি।

তিক্ত মন নিয়ে অনেকক্ষণ বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে রইলো রেখা। শেষ অবধি বেলা বাড়ছে দেখে, এক সময় উঠে পড়লো।

সারা রাতের না খাওয়া শরীর টলছে যেন। বাইরে এসে দেখলো ভাইবোনগুলোর মুখ ভার, তার বাবা বিছানায় পড়ে ধুঁকছেন, কিন্তু কথ

বললো না। মায়ের অবস্থা তার চাইতে খারাপ। আষাঢ়ে মেঘের মত মুখের ভাব। কালো হয়ে রয়েছে।

অন্যদিন হলে হয় তো রেখা এই অবস্থায় সেধে কথা বলতো। এদের মনোরঞ্জন করতে চাইতো। কিন্তু আজ কি যেন হল—কথা বলা বা সাধার মত প্রবৃত্তি হল না। তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া শেষ করে কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

সকাল থেকে আজ রোদ উঠেছে। কালকের বৃষ্টির ভিজে ভিজে ভাবটা এখনও গাছের পাতায় পাতায় লেগে রয়েছে। কি সুন্দর যে লাগছে দেখতে। রেখার মনে হল এমন সুন্দর আকাশ বাতাস আর সকাল সে অনেকদিন দেখে নি।

রেখা দ্রুতপায়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। প্রথম ট্রেনটা আসতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি।

আরও তাড়াতাড়ি আরও দ্রুত। স্টেশনে এসে যখন পৌছুলো রেখা বঝতে পারলে বুকের মধ্যে বিচিত্র একটি কম্পন থরথরিয়ে কাঁপাচ্ছে। ওকে অস্থির করছে। নিজেকে কঠিন প্রয়াসে সংযত করলো রেখা।

—নমস্কার! আপনি আসবেন, আমি জানতাম।

বুকের মধ্যে উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গ। নিজেকে কোনমতে সংযত করলো রেখা। আরক্ত মুখে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো—আপনি বুঝি হাত গুণতে জানেন?

—তা একটু-আধটু জানি।

সুদীর্ঘ চেহারা, স্বাস্থ্যবান, গেরুয়া পাঞ্জাবী পাজামায় মানিয়েছে মৎকার। মনোময়ের বুকখানা কি চওড়া।

রেখা হেসে বললে—হাত গুণতেও জানেন?

—তা একটু-আধটু জানতে হয় বৈ কি। মনোময় সামনের দিকে তাকাল—ঐ দেখুন, আমাদের গাড়ি আসছে। প্রচুর ধোঁয়া উড়িয়ে গাড়ি ছুটে আসছে, ন'টার গাড়ি। ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে তিলধারণের স্থান নেই। কামরার ধার দিয়ে ছুটোছুটি করতে করতে একটা কামরায় উঠে পড়লো রেখা ও মনোময়।

অবস্থা এখানেও সঙ্গীন। তবু যাইহোক করে একটু বসার জায়গা পাওয়া গেল। রেখা হাঁপিয়ে পড়েছিল, মনোময় ঘামে-ভেজা মুখখানা রুমাল দিয়ে মুছছিল। বললো—ভালভাবে বসুন।

রেখা গুটিয়ে বসে, পাশের জায়গায় মনোময়কে বসতে বললো। বললো—বসুন। যা জায়গা আছে দু'জনের বসা যায়।

একটু ইতস্তত করে মনোময় পাশে বসলো। একটু হেসে বললো—কালকের মত আবার উঠিয়ে দেবেন না তো?

—বসেই দেখুন। আরক্তিম ভাব চাপতে অন্যদিকে চাইলো রেখা। মনে হল ও আজ খুব শক্ত একটা খুঁটি ধরতে পেরেছে।

গাড়ি ছুটতে সুরু করেছে। মনোময়ের হাঁটুর সঙ্গে বার বার হাঁটু ঠেকেছে। আজ আর পা সরিয়ে নিল না রেখা। একসময় খুব মৃদু গলায় বললো—শুনুন।

মনোময় মাথা নামালো—কি?

—আপনার কলকাতার ঠিকানাটা দিন, মাঝে মাঝে দরকারে দেখা করবো।

—সত্যি! কৃতার্থ মনোময়—পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ঠিকানা লিখে দিল—'বিভূপদ প্রকাশনী'। যখন ইচ্ছে যেতে পারেন। অবিশ্যি দশটা থেকে পাঁচটার মধ্যে হলেই ভাল হয়।

কাগজটা হাত পেতে নিল রেখা। চোখ নামিয়ে বললো—আপনিও আসতে পারেন বুদ্ধিকা পারফিউমারসে। আমি অপেক্ষা করবো। কেমন?

নেদারল্যাণ্ডের স্কেটিং

সম্প্রতি নেদারল্যাণ্ডের সমস্ত ঘটনার মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত ঘটেছে। নেদারল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্তের প্রদেশ দীর্ঘ ফ্রিজল্যাণ্ডের বরফ জমা হ্রদ ও খালগুলি দিয়ে ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ পথ জুড়ে যে স্কেটিং দৌড় হয়, তাই হল অদ্ভুততম ঘটনা। ঐ প্রদেশের ১১টি সহরকে যুক্ত করে যে সব খাল রয়েছে, তীব্রতম শীতে সেগুলি যখন জমে যায়, হাজার হাজার দর্শক ও প্রতিযোগীদের ভার বহন করার মতো যথেষ্ট পুরু হয়ে বরফ পড়ে একমাত্র তখনই এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই বছরে এতো তীব্র শীত পড়ে যে, এই ক্রীড়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় সবগুলি অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়। সুতরাং একদিন অত্যন্ত ঠাণ্ডা এক প্রভাতে সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ১০ হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী তাঁদের জুতোর নীচে এক জোড়া স্কেট বেঁধে দৌড় তথা ভ্রমণ প্রতিযোগিতা সুরু করলেন। আবহাওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, ওলন্দাজ আবহাওয়ার মান অনুযায়ীও তা ছিল ভয়ঙ্কর। কারণ সমস্ত দিনের মধ্যে উত্তাপ, হিমাঙ্কের ১৮টি ডিগ্রীর নীচে ছিল এবং বরফাচ্ছাদিত সমতলভূমির ওপর দিয়ে বিপুলবেগে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। এই দৌড়ের বিজয়ী, বরফ, হাড় জমানো শীতের মধ্যে দিয়ে ১১ ঘণ্টারও কম সময়ে বিকেল সাড়ে চারটার সময় এই অতীব কঠিন ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌছান। নেদারল্যাণ্ডের রাণী জুলিয়ানা নিজের থেকেই সৈন্যবাহিনীকে একটি হেলিকপ্টার পাঠাতে বলেন এবং তাঁকে উত্তর প্রদেশের এই মেরুসদৃশ সমতলভূমিতে নিয়ে যেতে বলেন। বিজয়ীকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানানোর জন্য তিনি ঠিক সময়মতো সেখানে গিয়ে পৌছান। তাঁর স্বামী নেদারল্যাণ্ডের প্রিন্স, একটি হেলিকপ্টারে করে প্রতিযোগিগণের মাথার ওপর দিয়ে ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছিলেন বলে তিনি সেখানে আগে থেকেই পৌছে গিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় ৩৩ বছর বয়স্ক একজন ক্রীড়াশিক্ষক বিজয়ী হন। এই ভ্রমণে ১০ হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ৫১ জন লোক শেষপ্রান্তে উপস্থিত হতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে অনেকের দৃষ্টিশক্তি বরফের জন্য অকেজো হয়ে গিয়েছিল, চোখের পাতা, হাত-পা জমে গিয়েছিল। তবুও এই বছরের বিপুল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে তাঁরা যে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছেন তাতেই তাঁরা খুশি।

হলেন একমাত্র পরিচালক যিনি দু'বার সেলৎ জনিক গোল্ডেন লরেল পুরস্কার লাভ করলেন।

শুধু সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলার মধ্যে যে সকল অভিনেত্রী আত্মিক সত্তাকে অভিনীত চরিত্রের সাথে একাত্ম করেন, ছবির আবেদনকে বাঙ্ময় করেন তাঁদের ভূমিকাও বিশিষ্ট। একথা চরম উল্লাসের যে, বাংলা দেশের অভিনেত্রী বিশ্বের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কৃতা হয়েছেন। মস্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (যার ব্যাপকতা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং দর্শনীয়) ভারতের প্রতিযোগী চিত্র ছিল বাংলা ছবি 'সাত পাকে বাঁধা।' ছবিটি প্রদর্শিত হওয়ার পর সুধীসমাজ ও দর্শকের সমবেত ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং নায়িকা অর্চনার চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের অভিনয় সকলের হৃদয় স্পর্শ করে।

অর্চনার জীবনযন্ত্রণা যেন সংবেদনশীল বিশ্বহৃদয় সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করে। শ্রীমতী সেনের এই অভিনয়কর্মে তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর দুর্লভ সম্মান অর্পণ করা হয়েছে। শ্রীমতী সেনের এই সম্মান প্রাপ্তি একক শিল্পীর পক্ষেই গৌরব জনক নয় এ যেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী অভিনয় ধারার নব মূল্যায়ন। কিন্তু বিজয়মুখর আনন্দের দিনে নির্লিপ্ত ভাবে উল্লাস প্রকাশ না করে আমি সমীক্ষার অবকাশ অন্বেষণ করি। কেন না আজ বাংলা দেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, ভাবতে গেলে তার সঙ্গীন অবস্থার কথা মনে পড়ে। সরকারও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জনৈক বিচারপতির ওপর এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের ভার অর্পণ করেছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে সালতামামি হিসেবের খতিয়ানে দেখা যাচ্ছে বাংলা ছবি উত্তরোত্তর সংখ্যায় কম প্রযোজিত হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলা ছবির বাজারও অত্যন্ত সীমিত। এই কলকাতা শহরেই মাত্র ষোলটি চিত্র গৃহে নিয়মিত বাংলা ছবি প্রদর্শিত হয়। এই দুর্গম সংকুল অনিশ্চিত পটভূমিতে বাংলা চলচ্চিত্র তার মান, ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী হচ্ছে এবং যথার্থ শিল্প সুষমায় ভাস্বর হচ্ছে।

আঁধারের মাঝে আশার আলোকোচ্ছাস বাংলা ছায়াছবিকে প্রদীপ্ত করুক ইহাই কামনা করি।

দেওয়া নেওয়া

মহৎ বক্তব্যের স্বাক্ষরবাহী বা বৃহত্তর সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিপুষ্ট না হলেও এক অফুরন্ত রুচিস্নিগ্ধ নির্মল আনন্দের আধার হয়ে দেওয়া নেওয়া ছবিটি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ছবিটির মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসের ধারা প্রবহমান যা ছবিটিকে বিশেষভাবে উপভোগ্য করে তুলেছে। দুঃখবেদনার আলেখ্য এ ছবিতে অবশ্যই অনুপস্থিত নয়। কিন্তু সব কিছুর সমন্বয়ে ছবিটি এক নির্দিষ্ট আনন্দময় পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

এক গায়কের জীবনের আদর্শ, সঙ্ঘাত, প্রেম, বেদনা, আনন্দই এই ছবির উপজীব্য। লক্ষ্ণৌবাসী ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র সঙ্গীতকেই জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা হিসাবে বরণ করল। সুরু হ'ল সদাগরীমনের সঙ্গে শিল্পিমনের সঙ্ঘাত—একদিকে নীরস, নিষ্প্রাণ ব্যবসায়িক পরিবেশ অন্যদিকে রূপ-রসের আকৃতিতে ভরপূর অনুভূতিমগ্ন শিল্পীপ্রাণ এই দু'য়ের সঙ্ঘাতে শিল্পীর সাধনা কেমন করে জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য অর্জন করল—সেই উপভোগ্য কাহিনীই এখানে রূপায়িত হয়েছে। প্রখ্যাত শিল্পী শ্যামল মিত্র প্রযোজিত এই ছবির পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকের মন ভরিয়ে তুলেছেন রুচিসম্মত আনন্দের উপাদানে। ছবিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা এবং সেই সঙ্গে যথোচিত সংযমেরও পরিচয় দিয়েছেন। এমন অনেক ঘটনা আছে, যা নানা ভাবে পল্লবিত করা যেত কিন্তু পরিচালক সেই পথ অবলম্বন করে ছবিটিকে অকারণ দীর্ঘায়িত করে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটান নি। ছবিটির আঙ্গিকে, বিন্যাসে, গঠনকুশলতায় তিনি প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। পূর্বের কথা পুনরাবৃত্তি করেই বলছি, এই ছবিটির মধ্যে বেদনার দিকও অবশ্যই আছে। প্রতিভাবান শক্তিশালী কবির অর্থাভাবে শোচনীয় অবস্থা দর্শকের অনুভূতিশীল অন্তরে রেখাপাত করে। ছবিটির অলঙ্করণকর্মেও দক্ষতার পরিচয় মেলে। সঙ্গীতাংশ সুপরিচালিত এবং গানগুলি সুগীত। ছবিটির গতি শ্লথ নয়, শেষাংশে যথেষ্ট পরিমাণে চিত্তগ্রাহী। কাহিনী বিস্তারে, পরিবেশ সৃজনে, রস-সৃষ্টিতে এই ছবিটি দর্শকচিত্ত জয় করার প্রতিশ্রুতি বহন করে। এক নিটোল মধুর অব্যক্ত প্রেমকে অবলম্বন করে যে কাহিনী রচিত তার সার্থক চিত্রায়ণ ঘটেছে এই ছবিটির মাধ্যমে। গায়কের জীবনে বৈচিত্র্য,

'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রের একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী।

বিভিন্ন ভঙ্গিমায় গীতালি রায়

সাধনা এবং আদর্শ তথা সামগ্রিকভাবে তার জীবনধর্মের যথাযোগ্য প্রতিফলন ঘটেছে এই ছবিটিতে। সেদিক দিয়ে এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

অভিনয়ে নায়িকা চরিত্রের রূপ দিয়েছেন বোম্বাইয়ের শিল্পী তনুজা। তাঁর জননী এবং অগ্রজা উভয়েই যশস্বিনী অভিনেত্রী। নায়িকা চরিত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তনুজা। তাঁর অভিনয় যেমনই সার্থক তেমনই চিত্তাকর্ষক। উত্তমকুমারের অভিনয়ও অভিনন্দনের দাবীদার, চরিত্রটি তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর অভিনয়-দক্ষতায়। রুগ্ন কবির ভূমিকায় প্রেমাংশু বসুর রূপদানও তাঁর শক্তির পরিচায়ক। পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, তরুণকুমার, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ছায়া দেবী, লিলি চক্রবর্তী, সুস্মিতা সান্যাল, কবিতা রায় প্রভৃতির অভিনয়ও দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে। কণ্ঠশিল্পী এবং সুরকার হিসাবে শ্যামল মিত্র যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারী। প্রযোজক হিসাবেও এই ছবিটিতে তিনি শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। ভবিষ্যতে আশা করি বাঙলা দেশকে তিনি আরও বহু পরম উপভোগ্য ও চিত্তস্পর্শী ছবি উপহার দেবেন।

কাঞ্চনকন্যা

ভবিতব্যকে কখনও খণ্ডন করা যায় না। ললাটলিপির ফল ফলবেই, মানুষের ইচ্ছানুসারে তাকে কখনও প্রতিরোধ করা যায় না। মানুষ তার শত সহস্র বুদ্ধি, চেষ্টা, কৌশল সত্বেও বিধাতার অমোঘ বিধানকে উল্টাতে পারে না। তার কারণ তা মনুষ্যশক্তির বাইরে। মানুষের হাজার বুদ্ধি ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। মানব জীবনের এই এক মহান সত্যকে উপজীব্য করেই কাঞ্চনকন্যার কাহিনী রচিত হয়েছে। এই সত্যের স্বাক্ষর জীবনে জীবনে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রতিষ্ঠা।

বিরাট বিষয় সম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর পূর্ণেন্দু ছেলেবেলা থেকে ঘর ছাড়া। বহু সাধনায়, অলৌকিক শ্রমে, প্রচুর অর্থব্যয়ে সে প্রতিষ্ঠার মুখ দেখেছে। এমনি সময় তাকে ফিরে যেতে হ'ল তার গৃহে। পৈতৃক আপন সম্পদ, নিজের জমিদারীতে ম্যানেজার জগদীশ, কেউ তাকে চিনত না। সম্পত্তির লোভে এক নকল পূর্ণেন্দু এসে হাজির। তার পর নাটকীয় ভাবে সকল সমস্যার এক মধুময় সমাধানে ছবির পরিসমাপ্তি।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুখেন চক্রবর্তী। ছবির সূচনায় তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কৌতূহল আছে এবং এই কৌতূহল পরিচালক শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এই কৌতূহলের প্রসাদে ছবিটি দর্শককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার যোগ্যতা বহন করে। ঘটনা সংস্থাপনে, সংলাপ সৃষ্টিতে এবং শিল্পালঙ্করণে ছবিটি দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। কিন্তু স্থানে

স্থানে কয়েকটি অসংগতি চোখে ধরা পড়ে। পূর্ণেন্দু যতদিন পরেই দেশে ফিরুক, কেউ না কেউ তাকে চিনবেই, সে একেবারে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় যদি গৃহের সঙ্গে সম্পর্ক হারাতো তবে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু একজনও তাকে চিনল না এ অবাস্তব ঘটনা সমর্থন করা যায় কি? উমার মামাতো বোনের চরিত্র সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল, কাহিনীর সঙ্গে ঐ চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে, অকারণ একটি চরিত্র যোজন করে, তার মুখে সংলাপ যোজন করে, তাকে দিয়ে নাচিয়ে গাইয়ে খানিকটা লঘু চিত্তবিনোদন ছাড়া আর কিছুই করানো হয় নি যা বিশেষ উল্লেখের দাবী করতে পারে। এই আধিক্যের দোষেই কাহিনীর মূলসূত্র হারিয়ে যায়। বাড়িতে বাউল এসে গান গেয়ে শুধু হাতে ফিরে গেল—এটাও বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, অমর গঙ্গোপাধ্যায় ও অনুপকুমার। শেষোক্ত দু'জন অল্প সুযোগ পেয়েছেন তার মধ্যেই আপন আপন শক্তিমত্তার ছাপ সগৌরবে রেখে যেতে পেরেছেন। পাহাড়ী সান্যালের স্নেহপ্রবণ, অনুভূতিঘনচিত্ত বিশুকাকার চরিত্রায়ণ ভোলবার নয়। নায়ক অরুণ মুখোপাধ্যায় স্থানে স্থানে সুঅভিনয় করেছেন। নায়িকা [illegible]কণিকা মজুমদার প্রশংসার অধিকারী। গঙ্গাপদ বসু, শান্তি দাস, কুমার [illegible] ও সুমিতা সান্যাল প্রভৃতি [illegible] অভিনয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

সুমিতা সান্যাল

সূর্যশিখা

পুরুষের জীবনে নারীর আসন সহকর্মিণীর না সহধর্মিণীর সেই বিরাট প্রশ্নটিই 'সূর্যশিখা' ছবির [illegible] তুলে ধরা হয়েছে। পুরুষের জীবনের [illegible]পথে নারী সহকর্মিণীর না সহ[illegible] অংশ নেবে সেই সমস্যা অনেক [illegible] জীবনে বিরাট ভাবে জড়িয়ে আছে। [illegible] দীপ্ত কাজ পাগল মানুষ। [illegible] সমস্ত তার জীবনের মাত্র [illegible] সাধনা লোকহিতকর কর্ম ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা নেই। অচেনাকে সে সহধর্মিণীর হিসাবে বরণ করলেও তাকে পেতে চায় সহকর্মিণী হিসাবে। কিন্তু অচেনা চায় একটি শান্তির নীড়। প্রেমে ঘেরা, প্রীতিতে ভরা, ভালবাসায় ভরপুর। সে স্বপ্ন দেখে এক মঙ্গলময় সংসার জীবনের। এখানেই দীপ্তর ভাবধারার সঙ্গে লেগে যায় তার ভাবধারার সংঘাত। সেই সংঘাতই ছবির প্রধান উপজীব্য। শেষে কাহিনী কি ভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দান করে পূর্বাহ্নে দর্শকের কৌতূহল নষ্ট করে দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নয়। দাম্পত্য জীবনের একটি বিশেষ দিকের বিশ্লেষণ এই ছবির গুরুত্ব ও বিশেষত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

পরিচালক সলিল দত্ত অক্লান্ত কর্মোদ্যম এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর [illegible] জীবনবোধ এবং গভীরতার [illegible] মেলে। পরিচিত পরিসরে মধ্যেই জীবনের একটি বিচিত্র

অনুরূপ উন্মোচনে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের চিহ্ন রেখেছেন। যথাযোগ্য পরিচালনা ও সুষ্ঠু প্রয়োগ পদ্ধতির কল্যাণে ছবিটি মনে দাগ রেখে যেতে সমর্থ হয়। গল্পটিকে সাজানও হয়েছে যথাযথ। কাহিনী বিন্যাসে, পরিবেশ গঠনে, ঘটনা সংস্থাপনে বৈশিষ্ট্যের ছাপ মেলে। অভিনয়সম্পদ এই ছবিটিকে যথেষ্ট পরিমাণে ভরিয়ে তুলেছে। উত্তমকুমারের অনবদ্য অভিনয় দর্শকসাধারণকে অভিভূত করে তোলে। দীপ্ত চরিত্রের আবেগ, আদর্শনিষ্ঠা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয়ও তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষরবাহী। স্বর্গত নট ছবি বিশ্বাসকেও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা গেছে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, শোভা সেন, উৎপল দত্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সংবাদ বিচিত্রা

আধুনিক বাঙলার নবগঠনে পশ্চিম বাঙলার স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান যেমনই অনন্যসাধারণ তেমনই গুরুত্বসম্পন্ন। তাঁর লোকান্তরের পর আজ ষোলোটি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আজকের বাঙলা দেশ অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে বহন করে চলেছে তাঁর অসাধারণ কর্মকীর্তির চিহ্ন। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী অবলম্বন করে 'বাঙলার কর্মযোগী' শিরোনামায় একটি প্রামাণ্যচিত্র গড়ে উঠছে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন কমল মুখোপাধ্যায়।

• •

বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিপুল যশ ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়ে যাঁরা দেশজননীর মুখ উজ্জ্বল করে চলেছেন বিশিষ্ট প্রযোজক বাঙলার সন্তান উমেশ মল্লিক তাঁদের অন্যতম। বর্তমানে রবার্ট ক্লাইভের একটি জীবনীচিত্র নির্মাণে তিনি ব্যস্ত। সে উপলক্ষে ভারতবর্ষে তাঁর আগমন হচ্ছে। এই বিরাট পরিকল্পনার রূপ দিতে যথাযোগ্য সর্ববিধ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হচ্ছে। এই চিত্রের সুরযোজনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শোনা যাচ্ছে মীরজাফর এবং ক্লাইভের ভূমিকাভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সোরাব মোদী এবং পিটার ফিঞ্চ। শেষোক্ত জন ক্লাইভের আত্মীয়গোষ্ঠীর সন্তান। বিখ্যাত চিত্র তারকা জিন সিমন্স (৩৫) প্রধান নারীচরিত্রে অবতীর্ণা হচ্ছেন। ছবিটির কিয়দংশ ভারতবর্ষে এবং কিয়দংশ ইংল্যাণ্ডে গৃহীত হবে।

• • • •

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় নাট্য ও চিত্রজগতের ইতিহাস সম্পর্কে যে অক্লান্ত গবেষণা করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। 'বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' গ্রন্থটি তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা এবং দক্ষতার পরিচায়ক। এই গ্রন্থটি চলচ্চিত্র সম্পর্কে নানা তথ্যের আকর, নানা জিজ্ঞাসার উত্তর।

শর্মিলা ঠাকুর। ছায়াছবির বাইরে

ছায়াছবির এই ইতিহাস রচনার জন্যে ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশান তাঁকে নগদ দু' হাজার টাকার একটি পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার অর্পণ করা হবে।

* * *
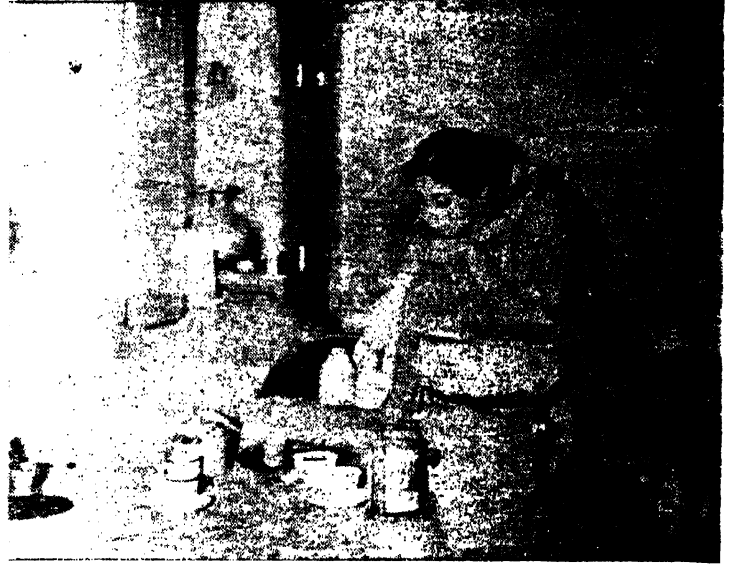
পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পর্ষদের পদাধিকারবলে সদস্যগণ ব্যতীত আরও ছয়জন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর দ্বারা ঐ পর্ষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। নবনির্বাচিত এই সদস্যদের নাম—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীসুধাংশুকুমার বসু, শ্রী ডি. প্রামাণিক ও শ্রীমতী শাকিলা খাতুন।

* * *

বিগত যুগের জনপ্রিয় চিত্রতারকা শ্রীমতী আশালতা বিশ্বাসকে দীর্ঘকাল পরে আবার রূপালী পর্দায় শিল্পী হিসাবে দেখা যাবে। গোপ প্রোডাকসন্সের 'বিবাদরি' চিত্রের শিল্পী-তালিকায় তাঁর নাম প্রচারিত হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে তাঁর পুনরাবির্ভাবের সংবাদ চিত্রামোদীদের যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দ দেবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত শ্রেয়সীর একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

• • • •

কাহিনীকার হিসাবে বাঙলার ছেলে ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের চিত্ররাজ্যে বর্তমানে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি এবং এক বিশেষ আসনের অধিকারী। বর্তমানে তিনি চিত্র পরিচালনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রযোজক সিপ্পির আগামী ছবির পরিচালনভার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে। তবে এই পরিকল্পিত ছবিটির কাহিনী তাঁর লেখনীজাত নয়। চিত্রনাট্য অবশ্যই তাঁর রচনা।

• • • •

প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী সরোজা দেবী চিত্রগ্রহণের সময় আকস্মিক ভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন। চিত্রগ্রহণের বিষয়বস্তু ছিল তাঁর হাতের একটি পাত্রকে পাথর দিয়ে আঘাত করা। ঘটনাচক্রে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই পাথর পাত্রে না লেগে লাগে শিল্পীর মাথায়—নিষ্করুণ প্রস্তরের নির্মম আঘাতে শিল্পী গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

• • • •

'মবি ডিক' 'মুলা রুজ' ছবি দু'টির কথা দর্শক সাধারণ কোনদিন ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। দর্শকচিত্তে ঐ ছবি দু'টির স্মৃতি অমলিন। উভয় চিত্রই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ পরিচালক জন হাষ্টনের পরিচালন প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। মনস্বী ফ্রয়েডের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত আগতপ্রায় চিত্রটি এঁরই পরিচালনাধীনে গড়ে উঠছে বর্তমানে রোম থেকে প্রচারিত হয়েছে প্রযোজক ডিনো ড' লরেন্তিসের 'বাইবেল' চিত্রটির পরিচালনদায়িত্ব হাষ্টন গ্রহণ করেছেন।

সুটিং-এর অবসরে তন্দ্রা বর্মণ

দক্ষ পরিচালকের পরিচালনায় এই ব্যয়বহুল বিরাট পরিকল্পনা—সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার স্পর্শে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এ আশা অন্তরে পোষণ করা যায়।

• • • •

কাঠমাণ্ডু থেকে জানা গেছে যে নেপাল সরকার সুপ্রসিদ্ধা বৃটিশ অভিনেত্রী এ্যান টড (৪১)—কে—কাঠমাণ্ডু ও পোখরা উপত্যকায় তাঁর আগামী চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। এই ছবির কিয়দংশ ইটালিয়ান আল্পসেও গৃহীত হবে। এই চিত্রে শ্রীমতী টড অভিনয়ও করবেন বলে ঘোষিত হয়েছে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

কিনু গোয়ালার গলি

প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী সন্তোষকুমার ঘোষের বহুলপঠিত রচনা 'কিনু গোয়ালার গলি' স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী ও সি গাঙ্গুলীর পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, জহর রায়, সুমিত্রা দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, গীতা দে প্রভৃতি। এই ছবিটির মাধ্যমে বাঙলা ছায়াচিত্রে সুমিত্রা দেবীর আবার দীর্ঘ বিরতির পর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

বিভাস

খ্যাতিমান সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'বিভাস' চিত্রটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায় আর ডি বনশাল নিবেদিত এই চিত্রটি পরিচালিত হয়েছে বিনু বর্ধনের দ্বারা। সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় মমতাজ আহমদ, তরুণকুমার, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, সুমিত্রা সান্যাল প্রভৃতি।

গোধূলিবেলায়

জনপ্রিয় লেখক ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বধূ' উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক চিত্ত বসু 'গোধূলিবেলায়' ছবিটির রূপ দিয়েছেন। চিত্রের নির্মাণকার্য সমাপ্ত। বর্তমানে ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষিত। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিকাশ রায়, বিশ্বজিৎ, বিপিন গুপ্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, দিলীপ রায় ও সন্ধ্যারাণী দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সান্যাল প্রভৃতি।

শৌখীন সমাচার

প্রত্যাবর্তন

কলকাতা ডিভিশান জীবনবীমা কর্মচারী সমিতি প্রশান্ত চৌধুরীর 'প্রত্যাবর্তন' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। খ্যাতনামা অভিনেতা তারক ঘোষের পরিচালনায় এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন যোগীন বসু, ক্ষিতিপতি দাস, সুবল দে, নির্মল সাঁই, তপন রায়চৌধুরী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, করুণাময় ভট্টাচার্য, তারা ভাদুড়ী, লীলাবতী (করালী) দেবী প্রভৃতি।

মেঘে ঢাকা তারা

বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা কাঞ্চনজঙ্ঘা রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' নিবেদন করলেন। গোপাল দাস পরিচালিত এই নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন কমল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বিশ্বাস, বিপিন দাস, গোপাল দাস, দীপালী ঘোষ, তাপসী গুহ প্রভৃতি।

পথিক

স্বর্গত নট-নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটকটি মহুয়া নাট্যগোষ্ঠী অভিনয় করলেন জ্যোতিপ্রকাশের পরিচালনায়। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন হেমন্ত নিয়োগী, সনৎ বসু, নবকুমার গুপ্ত, সুনীল সুর, রূপক মজুমদার, শ্যাম সাহা, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ, শাশ্বতী রায়, রাণু রায় প্রভৃতি।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'অশান্ত ঘূর্ণির একটি দৃশ্যে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও নবাগতা নায়িকা জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্ডিও মীরেন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

সন্তোষকুমার দে

কলেজের খাতায় একটি নাম লেখা আছে, কিন্তু আমি যাই নে, মানে নিয়মিত যাওয়ার সময় করে উঠতে পারি নে। কত কাজ হাতে, এসব ফেলে ক্লাস করি কখন? অবশ্য তা নিয়ে আমায় কেউ জ্বালাতন করে না। বাবা দিনরাত ব্যস্ত, রাতকে তিনি দিন করছেন, দিনকে রাত। ওকালতি ব্যবসায়ে পয়সা আছে কি না বাবা তার হৃদ্দমুদ্দ দেখে ছাড়ছেন। বাবা নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতায় এসেছিলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখনও বেলেঘাটার একটা একতলা বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। এখন ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের জমি কিনে তিনতলা তুলেছেন। এক মক্কেল-এর কাছ হতে গাড়িও যোগাড় হয়েছে একখানা। ফোন আছে। ঠাকুর, চাকর, ঝি, ছেলেমেয়েদের পড়াবার মাস্টার—ভদ্দরলোকের বাড়িতে যা যা থাকলে লোকে তাকে একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ মনে করে বাবা তার সব কিছুরই ব্যবস্থা করেছেন। পারেন নি কেবল আমার সঙ্গে। আমাকে তিনি সম্ভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, সম্ভ্রান্ত মানে পাস-টাস করে তাঁর মত সামলা ঝুলিয়ে মামলা করে বেড়ানো—এটাই আমার চরম এবং পরম পরিণতি হোক এটা বাবা নিশ্চয়ই মনে মনে চাইতেন। পারেন নি আমার মায়ের জন্ত। মা আমায় রক্ষা করেছেন, বলেছেন, সাতটা-পাঁচটা নয়—একটি মাত্র ছেলে, সে কেন তোমার মত মুখ্যু হয়ে থাকবে, সে একটা মানুষের মত মানুষ হবে। সে একজন জওহরলাল নেহরু হবে, দেশ পরিচালনা করবে, দেশের সেরা জননায়ক হবে।

আমার মাকে আপনারা হয় তো অনেক সভা-সমিতিতে দেখেছেন, নাম বললে চিনবেনও, নামটা তাই বলব না। হ্যাঁ, আমাদের সংসারে বাবা দিনরাত ধ্যান করছেন,—কি করে মক্কেল চরিয়ে আরও দু' হাজার টাকা হাতে এসে যায়, আর মা ভাবছেন, কোন্ সমিতিতে, কোন্ উপসমিতিতে নিজের ঠাঁই করে নেবেন, কেবল বক্তৃতা করবেন, দেশের লোকে তাঁকে জানবে, মানবে। এখন মহিলারা অ্যাম্বাসাডার হতে পারেন, গভর্নর হতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন—আর আমার মা কি কিছুই হতে পারবেন না? নিশ্চয় পারবেন এবং এই কংগ্রেসী রেজিমেই। মা একবার কংগ্রেস নমিনেশন পেতে পেতে পান নি, পেলে যে তিনি একটা গদি জুড়ে বসতেন তাতে তাঁর সন্দেহ নেই, আমি মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও মুখে মাকে সাপোর্ট করি। ওটা একটা ট্যাকৃটিক্স, মানে, মা যাতে আমার অবাধ চলাফেরার অনুমতিটা প্রত্যাহার না করেন।

আমি তাই রাজনীতি করি এবং তার সবটা যে নিছক দেশের হিতার্থে নয় তাও কিছুটা জানি। দেখুন, দেশ কথাটার অর্থ টানলে বাড়ে, ছাড়লে কমে। দেশ বলতে আমরা কোনও ক্ষুদ্রগণ্ডীকে বুঝতেও চাই নে, বুঝাতেও চাই নে। সমগ্র বিশ্বের যেখানেই শোষিত-নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের বসতি আছে সেখানেই আমাদের দেশ এবং সেখানকার দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার মহৎ দায়িত্ব ভগবান, (থুড়ি—ওই নামটা না বললেও মুখে এসে যায়,) সেই দায়িত্ব জনগণ আমাদের দিয়েছে। তাদের উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমরা অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে যাব এবং করছিও তাই।

সংগ্রামের রকমফের আছে। রাস্তায় ট্রাম-বাস পোড়ানোও তার মধ্যে পড়ে—এবং সে কাজে আমাদের উৎসাহ অল্প নয়। কিন্তু গল্পটা কেবল ট্রাম-বাস পোড়ানোর নয়—যদিও আরম্ভ ওখান থেকেই।

যে কলেজে আমি পড়ি অর্থাৎ আমার নামে যেখানে প্রক্সি দেওয়া হয়ে থাকে, সেখানেই পড়ান প্রফেসর পরেশ পাকড়াশি। নামটা চেনা চেনা লাগছে বুঝি? না লাগলেই বিস্মিত হতাম—কারণ তাঁকে বিখ্যাত করবার জন্ত আমরা আদাজল খেয়ে লেগেছিলাম। তিনি অধ্যাপক আর আমরা তাঁর ভক্ত ছাত্র। বাহ্যত সম্বন্ধ এইটুকুই, কিন্তু ভিতরে যা আছে তা ক্রমশ প্রকাশ্য। পরেশবাবুর পত্নী পরমাসুন্দরী, বিদুষী, স্বাস্থ্যবতী। এ যুগে গুরুপত্নীকে কেউ আর মাতৃ সম্বোধন করে না, তাই আমি তাঁকে দিদি বলি। তিনি একটু রাজনীতিঘেঁষা মেয়ে হলেও আমার মায়ের মত অত উগ্র সমাজসেবী নন। তবে কমপক্ষে হাজারবার তিনি গর্কির মাদার-এর প্রসঙ্গ এমন ভাবে তুলেছেন যে, আমার, বা আমাদের দলের লোকেদের বুঝতে বাকী নেই, তিনি আমাদের জন্ত সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কেবল শুভমুহূর্তটির অপেক্ষা।

শুভমুহূর্ত এলো, আমাদের ক্লাসেরই ছাত্র উগ্র রাজনীতিবাগীশ রাজেন একদিন ট্রামে আগুন দিতে গিয়ে নিজেই আগুনে খানিকটা ঝলসে গেল। ব্যাটা গোঁয়ার নিজেও মরতে বসল, আমাদেরও মারতে ছাড়ল না? ধরা পড়লে পার্টির দুর্নাম, রাজেনকে সবাই চেনে। আমি তাকে আহত অবস্থায় দিদির ঘরে নিয়ে আশ্রয় দেব ঠিক করলাম এবং কয়েকটি গলি খুঁজে গোপন পথের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাজেনকে দিদির বাড়িতে নিয়ে গেলাম। তখনও রাজেনের ঝলসে যাওয়া গায়ের যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র উপশম হয় নি। তাকে রাতের মত পুলিশের চোখ থেকে বাঁচাতেই হবে।

দিদির বাড়ি কড়া নাড়তে দিদি এসে দোর খুললেন। তাঁকে আমাদের বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও তিনি নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁকে দাঁড়ালেন। অধ্যাপক বাড়িতে নেই, তিনি না ফিরলে কোনও ঝুঁকি নিতে দিদি রাজি হতে পারেন না।

অবিচলিতকণ্ঠে দিদি মিথ্যা বলে গেলেন—কারণ অধ্যাপক পরেশ পাকড়াশি মশাই যে বাড়ির ভিতরেই ছিলেন এবং আমাদের দেখে, বিশেষ করে রাজেনকে দেখেই সরে গেছেন এতে আমার সন্দেহ ছিল না।

রাজেনকে নিয়ে সেদিন অনেক কষ্টে অন্য আশ্রয়ে এনে তুলেছিলাম, অধ্যাপক পাকড়াশি বা তাঁর পত্নীর ব্যবহার যেমনই লাগুক, পার্টির নির্দেশমত তাঁদের তোষামোদ করতে ফের গেলাম।

আমাদের প্রয়োজন ছিল পাকড়াশি পরিবারের, কারণ অধ্যাপক শ্রেণীর লোক হাতে থাকায় সুবিধা আছে। তাঁর বক্তৃতার অগ্রিম দক্ষিণা, তাঁর রচনার উচ্চ পারিশ্রমিক আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। নানা সূত্রে টাকা আসত, কোন উপলক্ষ করে তার মোটা মোটা অঙ্ক নবীনদের হাতেও ছড়িয়ে পড়ত—পাকড়াশি পরিবার তো প্রবীণের কোঠায় পড়েছেন, সুতরাং তাঁদের ভাগটা একটু ভারি হলেই তো ভালো। ওই টাকাতেই যে তাঁদের বাড়ি গাড়ি হয়েছে এমন নিন্দনীয় কথা আমি কখনই বলি নে, তবে বাড়ির বাহারি গ্রীল কিম্বা গাড়ির নতুন আপহোলস্ট্রিটুকুও কি হয় নি?

দুর্বলতা হয়ত ছিল, অস্বীকার করে লাভ নেই; তবে সে দুর্বলতা আমার একার নয়, সকলের। এমন কি দাদারাও অধ্যাপক মশাইকে সমীহ করতেন। আগামী ইলেকসনে তাঁকে এম এল এ হতে হবে একথাও আমরা তাঁকে শুনিয়েছি। কোনও বিদেশী রাষ্ট্র যদি আমাদের দেশ আক্রমণ করে, তবে তাদের আক্রমণকারী বলা ঠিক হবে কি না এ সব নিয়ে আলোচনাতেও চায়ের কাপে তুফান তুলেছি। তিনি যথারীতি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছেন, এমন কি বক্তৃতার বয়ানও বলে দিয়েছেন—আমরা সবাই নোট নিয়েছি এবং যথাসময়ে সেগুলি পথের মোড়ে পার্কে, জুট মিলের, কটন মিলের, শ্রমিকদের কাছে উগরে দিয়েছি।

কাজ ভালো চলছিল। রতিদা' দিন দিন রাশভারী হচ্ছিলেন। পরিস্থিতি ঘোরালো, সুতরাং নেতাদের মন ভালো থাকতেই পারে না। বিশেষ করে এখানে-সেখানে তখন রতিদা'র কুশপুত্তলী দাহ সুরু হয়েছে। যারা করছে তারা জানে না, রতিদা'র এতে কোন ক্ষতি নেই, বরং তাঁর ওজন তাতে বাড়বে বৈ কমবে না।

আমাদের কাজও ভালোই চলছিল। পাহাড়ের জনমানবহীন অঞ্চলে কোথায় সামান্য কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের ছিল না কিন্তু যাদের মাথা ব্যথা তারা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল এবং একদিন অভাবনার ভাবনাই ঘটল—সুরু হল ধরপাকড়। দাদারা একে একে শ্রীঘরে আশ্রয় নিলেন, এক হিসাবে ভালোই হল, কুশপুত্তলিকা দাহ দেখবার হাত হতে বাঁচালেন তাঁদের। বড় বড় নেতা সবাই গেলেন। ফ্রন্ট লাইন ক্লিয়ার, এবার আমাদের ভরসাস্থল প্রবীণ অধ্যাপক পাকড়াশি মশাই

অবশেষে একদিন কাগজে কাগজে খবরটা বেরুল—চরম বিপদের দিনে অধ্যাপক মশাই আমাদের শিবির ত্যাগ করে নির্দলীয় হয়ে গেলেন। আমরা ক'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, আর কি-ই বা করতে পারি। সেই রাজেন রায়ই পরামর্শ দিলে, পাকড়াশির ক্লাস বয়কট করে আমরা প্রতিবাদ জানাবো। আমি অবশ্য এমনিতেই ক্লাসে কমই যাই, তাই এ প্রস্তাবে আন্তরিক সমর্থন জানাতেই তা গৃহীত হয়ে গেল আমরা রেষ্টুরেন্টে গেলাম আর একবার চা খেতে খেতে রাজনীতি আলোচনা করতে

তুমি হও

পরেশচন্দ্র মণ্ডল

চাঁপার কলির মতো ফুটে ওঠো তুমি,
দিগন্তের অরুণিমা ধরা দিক্ এসে
তোমার লাবণি মুখে, তোমার দু'ঠোঁটে,
একবার তুমি মিতা ওঠো শুধু হেসে।
চাঁপার সুরেলা গন্ধ বাতাসে বিলাও,
পাখীর কাকলি-কণ্ঠে করো গো কূজন,
আকাশের অসীমতা চোখের কাজলে
এঁকে যাক্ ভরে যাক্ সরসীর মন।
অথবা ছায়ায় ঘেরা শান্ত নদী-বুকে
রাজহংসা হয়ে যাও মেখলা এ দিনে,
শূন্যচর পাখীগুলো যদি উড়ে যায়—
ব্যথা যেন পেয়ো নাগো মিতা আমা' বিনে।
তার চেয়ে তুমি হও আকাশের মেঘ,
শ্রাবণের সহচরী, চাতকের জল,
শরতের পেঁজা তুলো, বসন্তের মীড়,
আমার মনের ছায়া, মরমের ছল।

সৈনিক

প্রদীপ মৈত্র

সুপ্তিমগ্না বসুন্ধরা
নিবিড় রাত্রির বুকে
বৃক্ষপত্রে নাহি জাগে সাড়া
চাঁদ বুঝি ঘুম যায় আকাশের বুকে।
পৃথিবীর বুকে প্রতিটি শহরে, নগরে,
পল্লীতে পল্লীতে দেশবাসী ঘুমে অচেতন
স্তব্ধ, জমাট এক নীরবতা ধরণীর 'পরে
নিশ্চিন্ত আলস্যে সবে নিমগন।
এই নীরবতার মাঝে কারে ঐ হেরি—
স্থির, ঋজু, দীপ্ত ভঙ্গিমাতে
এই সুপ্তির মাঝে কে জাগে শর্বরী
ঘুম বুঝি নাই আঁখিপাতে।
ধীর কণ্ঠে শুধালাম তারে—
কে তুমি জাগ্রত? কে তুমি নির্ভীক
উত্তর আসিল শান্ত দৃঢ়স্বরে—
আমি দেশসেবী, দেশের সৈনিক।

কামরাজ পরিকল্পনার পর

রাজনৈতিক জগতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে তাহা কামরাজ পরিকল্পনা। জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৬৩ সালের ইতিহাসে ইহা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বেই, উহা উত্থাপিত হওয়ার সময় হইতেই শুধু রাজনৈতিক জগতেই নহে, জনজীবনেও যে বিরাট ও ব্যাপক সাড়া জাগাইয়াছে তাহা তুলনাবিরল। প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইল, গৃহীত হইল, শেষে কার্যকরীও হইল তথাপি ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনার এখনও সমাপ্তি নাই! এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে এই সম্পাদকীয় বিভাগেই আমরাও আলোচনা করিয়াছিলাম—পাঠক সাধারণের আশা করি তাহা স্মরণে আছে।

এই প্রস্তাবটি হঠাৎ উত্থাপিত হয় নাই, ক্ষণকালের পটভূমিতে ইহার বীজ বপন হয় নাই, উর্বর মস্তিষ্কের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই পরিকল্পনার রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই দেখা যাইবে সেখানকার পরিস্থিতি আদৌ আশানুরূপ নহে, বরং তাহা ভয়াবহই। কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে কোন্দল, দলাদলি, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঈর্ষা সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকেই ভিতর হইতে ক্ষত-বিক্ষত, দুর্বল ও জীর্ণ করিয়া তুলিতেছে।, এই সকল অনভিপ্রেত হিংসা, ঈর্ষা ও দলাদলির মুখ্য বা একমাত্র কারণই হইল প্রশাসনিক ক্ষমতালাভ। প্রশাসনিক ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার লালসা এত অধিকমাত্রায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে বিরাট জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির কথা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাওয়া যাইতেছে না। সমষ্টিস্বার্থকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিস্বার্থ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলচিন্তা লোপ পাইতে লাগিল। গঠনমূলক কার্যেও ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল!

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমের পরাজয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জয়লাভ এক প্রকার সুনিশ্চিতই ছিল—তিনি যে পরাভূত হইবেন তাহা বারেকের জন্যও কল্পনা করা যায় নাই। অথচ তাহাই ঘটিল কিন্তু এই পরাজয়ও কারণশূন্য নহে। কংগ্রেসের এই দলাদলিই বিরোধীপক্ষের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। এই গৃহবিবাদের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতেছেন বিরোধীপক্ষসমূহ।

সকল প্রকার অচলাবস্থা রোধ করার জন্যই কামরাজ পরিকল্পনার উদ্ভব। এই সকল গলদ,' স্বার্থসিদ্ধির প্রসারতা দেশ ও জাতির মঙ্গলকামী উন্নয়নধর্মী রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তিত করিয়া তুলিল, দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যাজ্ঞিক, প্রায় অশীতিবর্ষের ঐতিহ্য এবং গৌরব সমৃদ্ধ এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটিকে আর অধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইতে না দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিয়া কামরাজ পরিকল্পনার সৃষ্টি হইল। এই গলদ, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা নিবারণের মহান আয়ুধ বলিয়া পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

পরিকল্পনা কার্যকরীও হইল। ছয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ছয়জন মুখ্যমন্ত্রী গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য পদত্যাগ করিলেন দলাদলির জন্য কংগ্রেসের যে বিরাট ক্ষতি ইতোমধ্যেই হইয়া গিয়াছে তাহা পূরণের কার্যই হইবে তাঁহাদের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা। কংগ্রেসের শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া তাহাকে পূর্বের ন্যায় সুগঠিত শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলাই হইবে তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য।

এই মহান সঙ্কল্প নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবেই অভিনন্দনীয়। তাই এই সংবাদ বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেমিক মহলে অপরিসীম আনন্দের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল কিন্তু ইহা কার্যকরী হওয়ার পর দেখা গেল যে সকল আশাভরসা একটি মধুর স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নহে। যাহার অবসানকল্পে ইহার উদ্ভব সৃষ্টির পর এই পরিকল্পনা তাহাকেই আরও প্রসারিত করিয়া তুলিল এবং পরোক্ষভাবে তাহার বিকাশে সহায়তা করিল। যে অশান্তির আগুন রাজনৈতিক গগনমণ্ডলকে রক্তরাঙা করিয়া তুলিয়াছে তাহার শিখা আরও লেলিহান হইয়া উঠিল। দলাদলি এবং ঈর্ষা ব্যাপক হইতে যেন ব্যাপকতর হইয়া উঠিল। এই পরিকল্পনার সমালোচনাই প্রধান কার্য হইয়া দাঁড়াইল। কেহ ইহাকে সাধুবাদ দিয়া স্বাগত জানাইলেন, কেহ ইহার দোষত্রুটি দর্শাইয়া ইহার ব্যর্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করিলেন। একটি মহান প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় সহস্র বাধা আসিয়া এইভাবে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলে তাহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। চতুর্দিকে চাপা অসন্তোষ, চাপা বিক্ষোভের ভিতর দিয়া কংগ্রেসকে আজ অগ্রসর হইতে হইতেছে। কাইরণ, সুচেতা কৃপালনী, জীবরাজ মেহতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া কম অশান্তির সৃষ্টি হয় নাই। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ নানাস্থানে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনায় বহু সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। পদত্যাগী মন্ত্রীদের মধ্যেও অসন্তোষ অনুপস্থিত নহে। দেশের বিরাট সমস্যা ভুলিয়া এখন এই পারস্পরিক সমালোচনায় সমগ্র শক্তি ও সময় উৎসর্গ করা যে কতখানি অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক তাহা যদি অভিজ্ঞ রাজনৈতিকদের এখনো বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিতে হয় তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা বেদনার আর কিছুই নাই।

সমস্যা মিটিল না উপরন্তু আরও বর্ধিত হইল। একদিকে চীন

অন্যদিকে পাকিস্তান যে ভারতের কত বড় বন্ধু (?) তাহা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অনুভব করা প্রয়োজন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসের দায়িত্ব কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ তাহা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র নহে। আজ একটি বিশাল রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের জীবনমরণের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত এই সময়ে দেশীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে প্রতিষ্ঠানটিকে খণ্ড বিখণ্ড দুর্বল করিয়া দিয়া বহিঃশত্রুর অভিলাষসিদ্ধিতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করার অপর নাম দেশদ্রোহিতা নয় কি?

এক অভিনব চিকিৎসাপদ্ধতি

জীবনে আমরা বহুপ্রকার 'দাওয়াই'-এর নাম শুনিয়াছি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নয়নে নিত্য নব নব ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া চিকিৎসাবিদ্যার প্রগতি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু 'দমদম দাওয়াই'-এর নাম এই প্রথম শ্রুত হইল। এ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ হইতে শুরু করিয়া হাকিমী ব্যবসায়ীরাও কেহই এই অভিনব দাওয়াই-এর নামের সহিত ইতঃপূর্বে পরিচিত ছিলেন না। ইহার ফরমূলাও কোন ধুরন্ধর চিকিৎসকের জানা নাই।

এই দাওয়াই নির্মিত হইয়াছে বহু বঞ্চনার, বহু বেদনার, বহু অতৃপ্তির, বহু হাহাকারের ফরমূলায়। অগণিত নরনারীর ক্ষুধাতুর নয়নের অশ্রু এই দাওয়াই-এ তারল্য আনিয়াছে।

এই ঔষধের বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রয়োগ অব্যর্থ। দৈহিক ব্যাধির অপেক্ষাও মুনাফাব্যাধি অধিকতর মারাত্মক। সাধারণের দৈনন্দিন মুখের গ্রাসে মুনাফা রাখা শুধু অপরাধই নয়, এক অভিশপ্ত ব্যাধিও। কয়েকশ্রেণীর ব্যবসায়িবৃন্দ বর্তমানে এই ব্যাধির বিষে ঘননীল হইয়া উঠিয়াছিলেন, ব্যবসায়ে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা রাখা তাঁহাদের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ঘরে ঘরে হাহাকার; শূন্যতা, অভাব তাঁহাদিগকে সেই অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। আশা ও আনন্দের কথা 'দমদম দাওয়াই' তাঁহাদিগকে রোগের বিষাক্ত কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ঔষধের এমনই গুণ যে, ইহা একবারমাত্র প্রয়োগ করিলেই তাহা ফলদায়ক হয়, দুইবার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনই হয় না;

বর্তমানকালে মধ্যবিত্ত সমাজ কি সুখে (?) কালাতিপাত করিতেছেন সে বিষয়ে কাহারও অজানা নাই। অবশ্য এই সর্বহারাদের ক্রন্দনের ধ্বনি অনেক পোর্টিকো, লন, দ্বারবান অতিক্রম করিয়া উপরতলায় পৌঁছাইতে পারে না, এমনিতেই ক্ষুধার জ্বালায় সে ধ্বনি ক্ষীণ, তৎসত্ত্বেও যদি বা সে ধ্বনি কোনপ্রকারে যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারে তবুও তাহাতে কোন কাজ হয় না, ট্রানজিস্টারের মধুর বিলাতি সঙ্গীত সেই করুণ রোদনধ্বনিকে আবৃত করিয়া দেয়। দিনের অন্ন, বস্ত্র বাড়িভাড়া, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা, আধিব্যাধি, সামাজিকতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়গুলি নির্বাহ করিয়া কিভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের সংসার-তরণী প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে তাহা ভাবিলে বেদনা ও ক্ষোভের অন্ত থাকে না। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ অথবা একটি আঠারো বছরের কিশোরের উপর বহু সদস্যবিশিষ্ট এক সমগ্র পরিবার নির্ভরশীল।

বিলাসব্যসন তো কিম্বদন্তী। একটু আরাম স্বাচ্ছন্দ্যও দূরের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য ব্যয়নির্বাহ করাই যে দুরূহ হইয়া উঠিতেছে তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুভব করিবেন।

এই সময়েই সুযোগ বুঝিয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির দোহাই দিয়া মুনাফাখোরের দল বহু উদর শূন্য করিয়া আপন আপন উদরগুলি পূরণ করিতে লাগিলেন। শিশুর খাদ্যে, রোগীর পথ্যে ভেজাল মিশাইতে ইঁহাদের বিবেকে বাধিল না, মানুষের মুখোসের অন্তরালে অবস্থিত ইঁহাদের পশুসত্তা ইঁহাদিগকে নিত্যনিয়ত সমাজবিরোধী কার্যে পরিচালিত করিতেছে। ঘরে ঘরে হাহাকার, কর্মহীনতার বেদনা, রুগ্ন সন্তানকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনায় ব্যর্থ শোকাতুরা জননীর গগনবিদারী ক্রন্দন ইঁহাদের অর্থলালসাকে বিন্দুমাত্র সংযত করিতে পারে নাই।

কিন্তু বেদনার ঝঞ্ঝামুখর ত্রিযাম রাত্রের পর উজ্জ্বল মেঘমুক্ত প্রভাতের আগমন ঘোষিত হইতেছে। এই অর্থগৃধ্নুদের অত্যাচারে, কুটিলতায়, ষড়যন্ত্রে তিলে তিলে অবক্ষয়ের শেষ বিন্দুতে উপনীত হইয়া বাঙালী জনতা আজ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আশার কথা, তাঁহাদের সংগ্রাম এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। তাঁহাদের প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করিয়াছে। মুনাফাখোরের দল সমুচিত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। দমদম হইতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সঙ্ঘবদ্ধতার সূত্রপাত, নিমুলিয়া অঞ্চলেও তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। উহাতেও চৈতন্য না হইলে কলিকাতার সর্বস্থানে ঐ দাওয়াইয়ের প্রয়োগ হইতে পারে। তিলে তিলে, পলে পলে বিনষ্টির শিকার হইয়া বাঙালী জনতা আজ এই দুর্নীতির অবসানকল্পে যে অপূর্ব সঙ্ঘবদ্ধ মনের পরিচয় দিয়াছে তাহা সারা দেশে যে বিপুল সাড়া জাগাইয়াছে তাহা বিরল দৃষ্টান্ত। এই 'দাওয়াই' জনগণের মধ্যে যে বিপুল সমর্থনলাভ করিল তাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে, প্রকৃত কল্যাণকর কার্য জনসমাজ হইতে যথাযোগ্য সমর্থনলাভে কখনও বঞ্চিত হয় না। বাঙলার জনসাধারণ যে কতখানি শক্তিমান, কত নির্ভীক এবং অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে বদ্ধপরিকর এই দাওয়াইকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। বাঙলার জনগণকে সহস্র বেদনা, সহস্র বঞ্চনা, সহস্র দুর্ভোগ বিচ্ছিন্ন তো করিতে পারেই নাই বরং সমগ্র জাতিকে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ ও একতাবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। যে জাগ্রত শক্তির পরিচয় মিলিল ইহাতে সারা দেশে যে বিপুল আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল তাহা বহু ভগ্নোদ্যম, আশাহত মনে মৃতসঞ্জীবনীর কার্য করিল।

শুধু চাল, মাছ, মিষ্টান্নকেই কেন্দ্র করিয়া নহে যে কোন কল্যাণকর কার্যে বাঙলার জনশক্তি এইরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে একত্র হইলে কোন কিছুই তাঁহাদের অজেয় থাকিবে না। সর্বপ্রকার বাধা তাঁহাদের নিকট তৃণসম গণ্য হইবে। জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য চিরদিনই তাঁহাদের কণ্ঠ বেষ্টন করিবে। সফলতার জয়তিলকে চিরকালই তাঁহাদের ললাট সুশোভিত হইবে।

এই জাগ্রত ও দুর্বার জনশক্তিকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা সরকারেরও নাই। এই মহৎ কর্মের উদ্দেশে সর্বাঙ্গীণ শুভকামনা ও পূর্ণ সহানুভূতি নিবেদন করি।

ফরাক্কা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশের সর্বাত্মক উন্নয়নে এবং দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সরকার কর্তৃক যে সকল বৃহৎ পরিকল্পনা গৃহীত হইল, ফরাক্কা পরিকল্পনাটি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কল্যাণ কামনা হইতে যাহার উদ্ভব, ঘটনাচক্রে সেই পরিকল্পনাটিই আজ সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখনীয় যে, এই সমালোচনাও ভিত্তিহীন বা যুক্তিবর্জিত নয়। ইহার পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। ফরাক্কার প্রধান খালের মাটি কাটার জন্য বিপুলসংখ্যক অবাঙালী শ্রমিকের নিয়োগ ঘটিতেছে। বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়া অন্য প্রদেশের অধিবাসীকে কর্মে নিযুক্তিকরণ স্বভাবতই বাঙালীর মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ও বেদনার সৃষ্টি করিতে পারে। যেখানে বেকারত্ব এক বিরাট সমস্যার আকার ধারণ করিয়া আকাশ-বাতাস বিষণ্ণ করিয়া তুলিতেছে, কর্মহীনতার জন্য যেখানে অধিকাংশ ঘরে হাহাকার, দিনের অন্নসংস্থানের চিন্তায় যেখানে সাধারণ মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব, সেখানে এই ঘটনা যে কতখানি মর্মান্তিক এবং পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়।

বহির্বঙ্গ হইতে যে শ্রমিক আনা হইল, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া সমস্যা আরও ব্যাপক হইবে, যেখানে গৃহবাসীর উপযোগী চাল বাড়ন্ত সেখানে অতিথিসংকার কল্পনাতীত, খাদ্য সমস্যায় যে দেশ জর্জরিত, সেই দেশে কোথা হইতে এত অধিকসংখ্যক বহিরাগতের অন্ন মিলিবে তাহা যথেষ্ট চিন্তনীয়। অথচ বাঙালী শ্রমিক নিয়োগ করিলে এই অতিরিক্ত ব্যয়েরও প্রয়োজন হইত না। বেকারীর অনেকখানি সমাধান হইত, গৃহে গৃহে আবার হাসির বন্যা আসিত।

আমরা স্বীকার করি, গ্রামাঞ্চলের অনেকের মধ্যেই এক শিক্ষানুরাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষণীয়, বহু তরুণ শিক্ষিত হইয়া উন্নততর জীবনযাপন করিতে চায় কিন্তু তাহা হইলেও শ্রমিকের অভাব হইত না। ফরাক্কা এলাকা হইতে প্রয়োজনানুযায়ী শ্রমিক পাওয়া না যাইলে সমগ্র বাঙলা দেশ হইতে নিশ্চয়ই প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক মিলিত। বাঙলার উন্নয়নে বাঙলার ছেলে, বাঙলার মেয়ে পাশাপাশি শ্রমদেবতার পাদপদ্মে মিলিত অঞ্জলি প্রদান করিয়া কর্মের মধ্যে নবজীবনের জয়গান গাহিত। সেই গানের সুরে সুরে, তালে তালে, ছন্দে ছন্দে নতুন বাঙলা দেশ গড়িয়া উঠিত—কিন্তু পক্ষপাতের এবং অবিচারের নির্লজ্জ ও বিষাক্ত আঘাতে সেই মহৎ প্রদীপ্ত সম্ভাবনা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের আর কি থাকিতে পারে ?

সরকারী পরিকল্পনাও রূপলাভের পর সর্বক্ষেত্রেই যে সফলতা বরণ করিতেছে তাহা তো কোনমতেই বলা চলে না এবং তাহার কোন কোন ব্যর্থতাও সুবিদিত। সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় নানাক্ষেত্রে চাষজমি জলাজমিতে পরিণত হইল। গণনাতীত ভূমিহীন চাষীর আজ দিন নির্বাহ হইতেছে খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া। বহির্বঙ্গ হইতে শ্রমিক না আনিয়া ইহাদের এই কাজে আহ্বান করিলে ইহারা পরম আনন্দে সেই ডাকে সাড়া দিত। সর্বোপরি তাহাতে সরকারকে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইত না, সরকারেরও ব্যয় কমিত, বেকারত্বের কিছু সমাধান ঘটিত এবং কিছু মানুষের বেদনা-পাণ্ডুর বিষণ্ণ মুখ আবার আনন্দের আলোয় উদ্ভাসিত হইত।

শ্রমের সাধনায় বঙ্গসন্তান কোনদিনই বিমুখ ছিল না। আজও নহে, তাহারা অপারগ বলিয়া বহিরাগতদের নিয়োগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে—এখন এই প্রসঙ্গে যদি এই যুক্তি দর্শানো হয় তাহা হইলে তদুত্তরে আমরাও মুক্তকণ্ঠে বলিব ইহা যুক্তি নহে। স্বপক্ষীয় দুর্বলতা ঢাকিবার এক নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র। একটি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যার উদ্ভব করিয়া তোলায় আর যাহাই প্রতীয়মান হউক সঙ্গলতা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত।

॥ শোক-সংবাদ ॥

দুর্গাপুরী দেবী

সারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষা পরম শ্রদ্ধেয়া দুর্গাপুরী দেবী গত ২৭-এ কার্তিক রাত্রি বারোটায় ৬৯ বছর বয়েসে দেহরক্ষা করেছেন। সংসার-জীবনে এঁর নাম ছিল যুগলকিশোরী। ১৩০২ সালের মহানবমীর দিন নদীয়া-শান্তিপুরের বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কন্যা যুগলকিশোরীর জন্ম। সেইজন্যে তাঁর আর এক নাম নবদুর্গা। ১১ বছর বয়েসে শ্রীমার কাছে ইনি দীক্ষা নেন ও ১৩ বছর বয়েসে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। শ্রীগৌরীমা ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। গৌরীমার দেহত্যাগের পর ইনি আশ্রমের অধ্যক্ষা হন। শ্রীশ্রীমার আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙলার নারীসমাজকে জননী সারদা দেবীর পবিত্র আদর্শে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নারীজাতির কল্যাণ ও উন্নয়নসাধনে তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা নানাভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ও বুৎপত্তি ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও গৌরীমা সম্বন্ধীয় বহুলতথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাদি রচনা করে বাঙলার ঘরে ঘরে তিনি ঠাকুরের নামকীর্তন করেছেন।

অক্ষয়কুমারী দেবী

বাঙলার বিশিষ্ট ইষ্টক ব্যবসায়ী ও রাণাঘাট হিঙ্গুলি গাঙ্গুলী ব্রাদার্সের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত গণেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী অক্ষয়কুমারী দেবী গত ২১-এ কার্তিক ৯৮ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। ইনি অতিশয় ধর্মপ্রাণা, দয়াশীলা ও পরোপকারী মহিলা ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র, পাঁচ পুত্রবধূ, তিন কন্যা, এক জামাতা ও নাতিনাতনী প্রভৃতি বর্তমান।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুষার ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
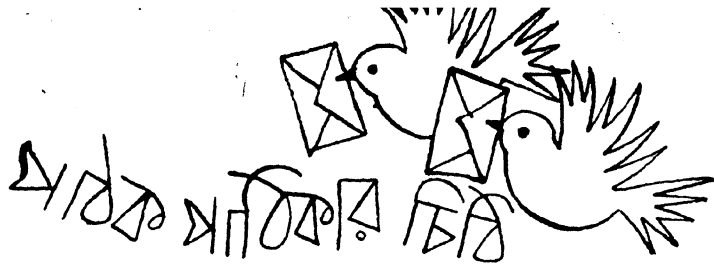
পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকাটি যে বাঙলা দেশের একটি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা সে বিষয়ে আমি এবং আমার বন্ধুমহল একমত। কয়েকটা উপভোগ্য রচনা সম্বন্ধে আপনাকে এবং লেখকদের অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রমণ কাহিনী 'ইওরোপের সূর্য' পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। পুনরায় তাঁর লেখা মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখলে সত্যি খুব আনন্দিত হব। তাছাড়া অজিতকুমার রায়চৌধুরীর 'কিংশুক রাগিণী,' অভিতকৃষ্ণ বসুর 'বাতাসী মঞ্জিল,' রাণু ভৌমিকের 'এক কলেজের চারটি মেয়ে' ও সুলেখা দাশগুপ্তের 'হৃদয় পাতো' এই ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি খুবই আনন্দদায়ক। রামকিঙ্কর বসুর আলোকচিত্রগুলি আমার ভারি ভাল লাগে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রচনা ও গল্পে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। 'মাসিক বসুমতী'র সমৃদ্ধি এবং প্রসার কামনা করি। পাঠক-পাঠিকার চিঠির পাতায় চিঠিটা ছাপালে বাধিত হব। ইতি—শ্রীপ্রীতীন্দু দাশগুপ্ত। পোঃ—বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)।

মহাশয়, বর্তমানে সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে আপনার 'মাসিক বসুমতী' বিশিষ্টতম স্থানের অধিকারী। গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী, কবিতার সুষ্ঠু অথচ সংযত পরিবেশন অন্যান্য পত্রিকায় বিশেষ দৃষ্ট হয় না। আমার মনে হয়, আর একটু পরিবর্তন করলে বইটি পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠু হইতে পারে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি এক একটি বিষয় একসাথে প্রকাশিত হইলে সুন্দর হয়। পাঠকের পক্ষেও সুবিধাজনক হয়। ইতি—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী। কৃষ্ণবন রোড, আগরতলা।

মহাশয়, ১৩৭০ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'চারজন' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের জীবনী প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে: 'মুখোপাধ্যায়দের আদি নিবাস যশোহর·····' (৭৮১ পৃঃ ২য় অনুচ্ছেদ) আবার ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালের শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকায় 'পরলোকে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক নিবন্ধে লিখিত হইয়াছে—'বর্ধমান জেলার আমেদপুর গ্রামে আদি নিবাস হলেও তাঁর জন্ম হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে··' (৫৮৬ পৃঃ ২য় অনুচ্ছেদ) যেহেতু উভয়েই সহোদর ভাই সেইহেতু উভয়েরই আদি নিবাস এক হওয়া উচিত। আমার মনে হয় এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে যে কোনও একটির মধ্যে কিছু গলদ রহিয়াছে। আশা করি আপনি আমাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিবেন। আমি নিছক সত্য সংবাদ জানিতে পারিলেই সুখী হইব। নমস্কারান্তে, ইতি—শ্রীলাবণ্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, পোঃ ও গ্রাম—দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪-পরগণা।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, আমার নিকট নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীর বাঁধানো সেট আছে। আমি এইগুলি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। প্রতি ছয় মাসের সেট—৪'০০ টাকা, পুরা বৎসরের সেট—৮'০০ টাকা। আপনার 'মাসিক বসুমতী'র আশ্বিন বা কার্তিক সংখ্যায় 'পাঠক-পাঠিকার' চিঠি বিভাগে ক্রয়েচ্ছু গ্রাহকদের জানাইয়া দিলে বাধিত হইব।

১৩৫৭ বাং কার্তিক-চৈত্র।	১৩৫৮ বাং বৈশাখ-আশ্বিন
১৩৬০ „ বৈশাখ-আশ্বিন।	১৩৬০ „ কার্তিক-চৈত্র
১৩৬১ „ বৈশাখ-আশ্বিন।	১৩৬১ „ কার্তিক-চৈত্র
১৩৬২ „ কার্তিক-চৈত্র।	১৩৬৩ „ বৈশাখ-আশ্বিন
১৩৬৩ „ কার্তিক-চৈত্র।	১৩৬৪ „ বৈশাখ-আশ্বিন
১৩৬৪ „ কার্তিক-চৈত্র।	১৩৬৫ „ বৈশাখ-আশ্বিন
১৩৬৫ „ কার্তিক-চৈত্র।	১৩৬৬ „ বৈশাখ-আশ্বিন
১৩৬৬ „ কার্তিক-চৈত্র।	১৩৬৭ „ কার্তিক-চৈত্র
১৩৬৮ „ বৈশাখ-আশ্বিন।	১৩৬৮ „ কার্তিক-চৈত্র

ইতি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস। পি ২৪৮ বসুনগর, পোঃ মধ্যমগ্রাম, ২৪-পরগণা।

প্রিয় মহাশয়, ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৮ ইংরাজী সালের মধ্যে আপনাদের পত্রিকাতে মায়া দেবী বসুর 'বংশ গৌরব' নামক উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি জানি না, সেই উপন্যাসের সমস্ত খণ্ডগুলি আপনাদের কাছে আছে কি না। যদি তাহা থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া নিচের ঠিকানায় বইগুলি যদি ভি-পি করিয়া পাঠাইয়া দেন বাধিত হইব। পুরা উপন্যাস হওয়া চাই। আর যদি উপন্যাসখানি বই আকারে বাহির হইয়া থাকে তাহা হইলে কোথায় পাওয়া যাইবে কিম্বা যদি আপনারা দিতে পারেন, তাহা হইলে ভি-পি করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। নমস্কার লইবেন। ইতি—শ্রীমতী গৌরী সান্যাল। ৮।৪, কর্ণফিল্ড রোড, বালীগঞ্জ, কলি-১৯।

মহাশয়, 'মাসিক বসুমতী'র 'আমার কথা' বিভাগের মাধ্যমে ভারত বিখ্যাত সরোদী রাধিকামোহন মৈত্র, ভারত বিখ্যাত বীণাবাদক ও ধ্রুপদ শিল্পী ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খান এবং বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখবৃন্দের আত্মকথা প্রকাশ করলে বাধিত হব। এঁরা বাস্তবিক পক্ষে সঙ্গীত জগতের দিকপাল, কাজেই এঁদের আত্মজীবনী প্রকাশে আপনাদের বাধা থাকা উচিত নয়। আশা করি আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। নমস্কার জানাবেন। শ্রীউদ্দালক সমাদ্দার। কালিঘাট।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

এন, বসু সহকারী ফোরম্যান, অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরী, ভুসাভাল, (ই, কে,) মহারাষ্ট্র * * * সচিব, নেতাজী স্মৃতি পাঠাগার (রুরাল লাইব্রেরী) ডাক—নাজীরহাট, কুচবিহার, পঃ বঙ্গ * * * Sri H. K. Choudhury. Post Box No. 82. MBALE Uganda. East Africa * * * শ্রীজ্যোতির্ময় পুরকায়স্থ প্রধান পণ্ডিত, জলেশ্বর, এম, ই, বিদ্যালয়, জামালপুর (কাছাড়) * * * ডাঃ ডি, সি, মজুমদার, নন্দীরাম লেন, লাবন, শিলং * * * শ্রীমতী গীতা পাণ্ডে, অবধায়ক—নরেশপ্রসাদ পাণ্ডে, গ্রাম ও ডাক—ভাগলপুর, বিহার * * * Mrs. Ranu Banerji. C/o R. N. Banerji, Post Box No. 20576. Daressalam. Tanganyika. East Africa * * * Mrs. Anjali Roy C/o. Dr. Sudhir Kumar Roy. Queen's Park Hospital. Black Burn (Dence). England * * * সচিব, দি রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, ডাক—করিমগঞ্জ, জেলা—কাছাড়, আসাম * * * শ্রীমতী বাণী গুপ্তা, অবধায়ক—সি, আর, গুপ্ত, কালাদীঘি পাড় (পূর্ব) কৈলা সহর, ত্রিপুরা, ভারত * * * অবৈতনিক সচিব, স্টাফ ক্লাব বোরাই টি এস্টেট, হালেম, পি, ও, এ্যাণ্ড পি, ও, জেলা—দারাং আসাম।

Remitting annual subscription of Rs. 15/- for the 'Monthly Basumati' please send the magazine regularly. Mrs. Santi Lahiri, C/o S. N. Lahiri, Dehradun—Cantt, U. P.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের অগ্রিম চাঁদা ১৫·০০ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী এস, ব্যানার্জী অবধায়ক—এ, এন, ব্যানার্জী, ঢেনকানল, উড়িষ্যা।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা কার্তিক ১৩৭০ হইতে আশ্বিন ১৩৭১ পর্যন্ত ১৫·০০ টাকা পাঠাইলাম। নমস্কার জানিবেন। শ্রীমতী তারা চ্যাটার্জী, অবধায়ক—এ, এম, চ্যাটার্জী, ডাকঘর—কুলটি, বর্ধমান।

বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ পাঠাইলাম।—আমাকে গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী বাণী গুপ্তা, অবধায়ক—সি, আর, গুপ্ত, কৈলা সহর, ত্রিপুরা।

Sending herewith Rs. 15/- as yearly subscription for the magazine Basumati please acknowledge receipt and send the magazine regularly. Hony. Secretary, staff club, Boroi Tea Estate, Halem P. O. & T. O, Dist. Darrang, Assam.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্বক চলতি মাস হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, ডাকঘর—করিমগঞ্জ কাছাড়, আসাম।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠান হইল। পত্রিকা নিয়মিত প্রতিমাসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীশ্রীশোভা মা, শান্তাশ্রম, বারাণসী।

I am sending herewith Rs. 15/- only being my annual subscription for the monthly Basumati. Please send the copies regularly. Sm. Anima Chakraverty. C/o Akshay Kumar Chakraverty, P. O. Silchar, Dt. Cachar, Assam.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ টাকা পাঠান হইল। কার্তিক মাস হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জী, অবধায়ক—বি, কে, মুখার্জী, ডাকঘর—ভাওরা, জেলা—ধানবাদ।

Sending Rs. 15/- as annual subscription please send the monthly Basumati every month regularly. Headmaster, R. B. S. D. High School. Dubrajpur, Birbhum.

I am sending herewith Rs. 15/- only being the annual subscription of the 'Masik Basumati'. Please send the magazine regularly. Mr. D. P. Gupta, Manager, Dilli Colliery, P. O. Borhat, Assam.

Please find herewith one year's annual subscription of Rs. 15/- only. Kindly send the magazine regularly. Mrs. Sudhira Ghosal. 52/2,c, Luxa, Varanasi.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ টাকা পাঠাইলাম। প্রতিমাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী কমলাবালা পাত্র, অবধায়ক—ক্যাপ্টেন বি, এন, পাত্র। ডাকঘর—মাকুড়না, মেদিনীপুর।

আমার মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দানে বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী উমা সেনগুপ্তা, অবধায়ক—মণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ডাকঘর—করিমগঞ্জ, জেলা—কাছাড়।

Sending our annual subscription of Rs. 15/- for the Masik Basumati. Please send the magazine regularly.—Teacher-in-charge, Burdwan, Harisava Hindu Girls' High School, Burdwan.

অদ্য মাসিক বসুমতীর সডাক বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দানে সুখী করিবেন।—শ্রীমতী পি, বি, ঘোষ, অবধায়ক—ডাক্তার এস, কে ঘোষ, পাটনা।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ পাঠান হইল। প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা মিত্র, ডাকঘর—ভদ্রক, উড়িষ্যা।

এক বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি স্বীকারে বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী শ্যামলী গিরি, অবধায়ক—নারায়ণপ্রসাদ গিরি। গ্রাম ও ডাকঘর—দ্বারিকনগর, জেলা—২৪-পরগণা।

Herewith please find a remittance of Rs. 15/- only being annual subscription of your esteemed journal Masik Basumati. Please send the issues regularly. Mrs. Uma Basu, C/o Shri P. K. Basu, Advocate, Siliguri, Darjeeling.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৪২শ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

সর্বোপরি স্মরণ রাখিতে হইবে মানুষের কথা, মনুষ্যত্বগুণের কথা। কদাপি তাহার কথা বিস্মৃত হইও না। দরিদ্র সেবা, শিশুসেবা ও মানবসেবা—এইসব শিক্ষাবিধির অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ।

জগতের প্রাচীন ও নবীন সকল ধর্মকেই আমি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করি, অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা করি। আবার অনাগত ভাবীকালে সত্যের কোনো নূতনতর, নবীনতর অভিব্যক্তি যদি সম্ভব হয় তবে তাহাকেও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিবার জন্ত হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিয়া আমি অপেক্ষমান। চিরন্তন সত্যের অনন্ত প্রকাশে সুন্দর হোক নারায়ণী পৃথিবী, শান্তি ও আনন্দময় হউক মানব সমাজ।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই মহান লক্ষ্যে পরিচালিত হউক।

মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে বাহ্ বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অন্তর্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। যোগীরা এই একাগ্রতা শক্তির বল অতি মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সমুদয় সত্য—বাহ্ ও অন্তর, উভয় জগতের সত্যই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে! মন একাগ্রতাসম্পন্ন হইলে এবং ঘুরাইয়া উহার উপর প্রয়োগ করিলে আমাদের ভিতরের সমস্তই আমাদের প্রভু না হইয়া আজ্ঞাবহ দাস হইবে।

ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনে কর, আমি একখানা পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক ঐ পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই। উহা কেবল মনে অবস্থিত। বাহিরের কোনো কিছু ঐ আকৃতিটিকে জানাইয়া দেয় মাত্র; বাস্তবিক উহা চিত্তেই আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি যাহা তাহাদের সম্মুখে আসিতেছে, তাহাদেরই সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদেরই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার মন শান্ত হইবে. 'তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ' (পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১০) —অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে, মন এইরূপ নিরন্তর সংযত অবস্থায় থাকিতে পারে, তখন মন নিত্য একাগ্রতা শক্তি লাভ করে।

অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত; শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে জ্ঞানচর্চায় অধিকতর সুখ পাইয়া থাকে। তখন সে বিষয়ভোগে তত সুখ পায় না।

অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

● কেনেডি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫শ রাষ্ট্রপতি জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির পরিচয় শুধু রাষ্ট্রনায়ক হিসাবেই নয়—পুরস্কারবিজয়ী লেখকদের তালিকায়ও তাঁর নামটি খুঁজে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ শঙ্কাকুল দিনগুলিতে সুদক্ষ সমরনায়করূপেও তাঁর প্রতিভা লাভ করেছে স্বীকৃতি ও সমাদর।

মার্কিন মুল্লুকের রাষ্ট্রনায়ক হলেও কেনেডিরা এ্যামেরিকান নন। আয়ার্ল্যাণ্ড তাঁদের দেশ। পূর্বপুরুষ দেশত্যাগ করে বসতি স্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁরই বংশধর একদিন সেই রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হবেন এ চিন্তা সেদিন তাঁর মনে বারেকের তরেও উদিত হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই।

রোম্যান কাথলিক ও বিরাট ধনীপরিবারের সন্তান জন জন্মগ্রহণ করেন ম্যাসাচুসেটসের ব্রুকলিনে। জন্মের তারিখ ২৯-এ মে। সাল ১৯১৭। চারভাই পাঁচবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বাড়িতে এবং সাধারণ বিদ্যালয়াদিতে পাঠগ্রহণের ১৯৩৫ সালে জন স্নাতক পর্যায়ভুক্ত হন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র আঠারো। স্নাতক হওয়ার পর বাবা মার্কিন মুল্লুকের আর একজন খ্যাতনামা সন্তান জোসেফ কেনেডি (জন্ম ১৮৮৮) তাঁকে পাঠালেন লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে। সেখানে আচার্যরূপে পেলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক হ্যারল্ড জে, ল্যাস্কিকে।
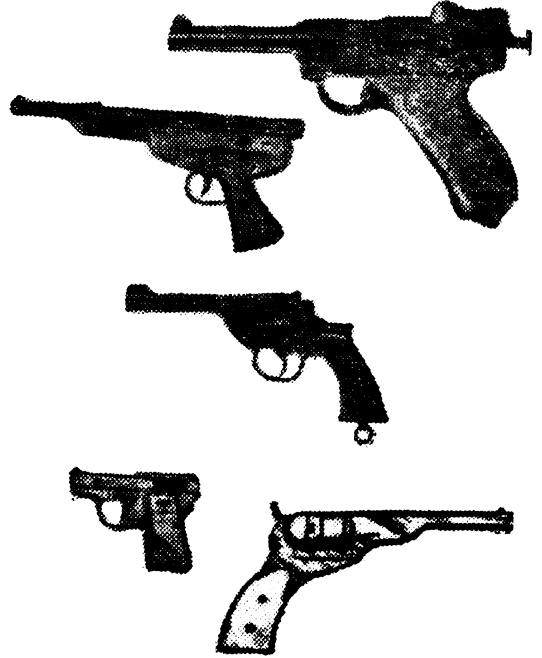
নৌবাহিনীতে যোগ দিলেন ১৯৪১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জ শাখায় একটি পি-টি-বোটের নির্দেশদানের ভার পেলেন ১৯৪৩ সালে। এই সময়ে দু'টি জাপানী ডেস্ট্রয়ার তাঁর বোটকে ধাক্কা দেওয়ায় তিনি গুরুতর আহত হন। পৃষ্ঠদেশে পান দারুণ আঘাত। কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য ও শক্তির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করলেন নেভি এ্যাণ্ড মেরিন কোর মেডেল।

এরপর শুরু হ'ল সাংবাদিক জীবন। কিন্তু রাজনীতি তাঁর রক্তে রক্তে। প্রতিনিধি পরিষদে তিনি নির্বাচিত হলেন ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৮ ও ৫০ সালে হ'লেন পুনর্নির্বাচিত। ১৯৫২ সালে সেনেটার ক্যাবট লজকে ৭১০০০ ভোটে পরাজিত করে সেনেটের সদস্য তালিকাভুক্ত হলেন। ১৯৫০ সালে উপরাষ্ট্রপতিপদে

কেনেডির জীবনালেখ্য

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেনেটার কাবুভারের সঙ্গে এক আকর্ষণীয় ভোটযুদ্ধে কেনেডি পরাস্ত হন। তাঁর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারকার্যের দেখা যাচ্ছে সূচনা এই সময় থেকেই। ১৯৫৮ সালে সেনেটে তিনি পুনর্নির্বাচিত হলেন।

১৯৬০ সালে লস এ্যাঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ার জুলাই সম্মেলনে রাষ্ট্রপতিপদের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাঁকে প্রার্থিরূপে মনোনীত করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন ১৯৬০ সালের ৮ই নভেম্বর। আসনে অভিষিক্ত হলেন ১৯৬১ সালের ২০-এ জানুয়ারী। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগগনে উদয় হ'ল নতুন সূর্যের। সত্তরোত্তীর্ণ আইসেনহাওয়ারের আসন এল চল্লিশোত্তীর্ণ কেনেডির অধিকারে।

রাষ্ট্রপতির আসনে কেনেডি অধিষ্ঠিত ছিলেন মাত্র তিনটি বছর। নিষ্ঠুর মৃত্যু পৃথিবীর কল্যাণকামী অশান্তির আগুনে ও হাহাকারের ঝঙ্কনায় ভরা পৃথিবীতে এক অখণ্ড শান্তি প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ একটি মহৎ প্রাণকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এই মৃত্যুর সঙ্গে কত যে মহৎ সম্ভাবনা বিলুপ্ত হল তার তুলনা নেই।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল বলিষ্ঠতায় এবং বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। আইসেনহাওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধান ছিল আকাশ-পাতাল। ভারতের এই দুর্দিনে তিনি ছিলেন এক নির্ভরযোগ্য শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। চৈনিক আক্রমণে এবং আরও নানা ক্ষেত্রে ভারতকে তিনি অকুণ্ঠিত সাহায্য দান করেছেন। দু'টি দেশের মধ্যে রাজনীতি ব্যতীত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রীতি ও মৈত্রীবর্ধনেও তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

নিগ্রো-জগতে তিনি চিরদিন বিরাজ করবেন ধ্রুবতারার মহিমায়। তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অগ্রগণ্য বোধ করি তাঁর নেতৃজীবনেও সবচেয়ে বৃহত্তর কীর্তি।

● এই কি সেই হত্যাকারী

অসওয়াল্ড ?

? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

● এই কি সেই রাইফেল

যদ্দ্বারা কেনেডি নিহত হন ?

১৯৫৩ সালে জ্যাকলিন কোভিয়ারকে (জন্ম ২৮-এ জুলাই ১৯২৯) জন কেনেডি বিবাহ করেন। স্ত্রী জ্যাকলিন একটি পুত্র ও একটি কন্যা ব্যতীত কেনেডির বাবা মা রোজ কেনেডি (জন্ম ১৮৯০), দিদিমা (৯১), ভাই এ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি ও সেনেটার এডওয়ার্ড কেনেডি, ভগ্নীবৃন্দ বর্তমান। প্রখ্যাত অভিনেতা পিটার লফোর্ডের সহধর্মিণী প্যাট্রিসিয়া লফোর্ড তাঁর অনুজা।

কেনেডির এই আকস্মিক এবং অকালমৃত্যু শুধু এ্যামেরিকাতেই শূন্যতা সৃষ্টি করল না। জগতের মানব-সমাজেও এই মৃত্যু এক নিদারুণ অভাব সূচিত করল।

আমেরিকার যেস্থানে

ওপরে নীল আকাশ।

নীচে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত টেক্সাস।

আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক শিষ্ট অঙ্গ। এর পরিধি ২৬৭, ৩৩৯ বর্গ মাইল। এর লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষের ওপর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃত টেক্সাস রাজ্য একমাত্র স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এই বিশাল তৃণাচ্ছাদিত ভূমির ইতিহাস প্রতিবেশী মেক্সিকোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম ইউরোপীয় অভিযাত্রীদল যাঁরা এই দেশে পদার্পণ করেন তাঁরা হলেন জাতিতে স্পানিয়ার্ড। ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই স্পানিয়ার্ডরা এই রাজ্যে কতকগুলি মিশন সংস্থা স্থাপন ছাড়া আর কিছুই করেন নি। কিন্তু ১৭৩০ সালে প্রথম নাগরিক হিসেবে বাস করেন সান অ্যান্টোনিও।

১৮২১ খৃষ্টাব্দ। আধুনিক টেক্সাসের ইতিহাসের সূচনা হল। এই বছরেই মেক্সিকো স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করল। এই বছরেই মোজেস অষ্টিন নামে একজন আমেরিকান মেক্সিকো সরকারের কাছ থেকে তিনশ' জন আমেরিকান পরিবারের স্থায়িভাবে বাসের অধিকার লাভ করেন। একই বছরের এই দু'টি ঘটনা ভাবীকালের ইতিহাস রচনায় রথাপাত করে।

মোজেস অষ্টিন মারা গেলে তাঁর ছেলে ষ্টিফেন অষ্টিন ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রথম স্থায়ী অ্যাংলো-আমেরিকান বাসিন্দারূপে সান ফিলিপি ড অষ্টিনে বাস করেন। পরবর্তী ১৫ বছরে আরও ত্রিশহাজার আমেরিকান আসে এখানে বসবাস করতে।

● নিদারুণ ঘূর্ণিবাত্যার আক্রমণে আক্রান্ত ডালাসের ভয়াবহ প্রাকৃতিক অবস্থার একটি দৃশ্য। ছবিটি একটি সুউচ্চ গৃহের ৩৭ তলা থেকে গৃহীত।
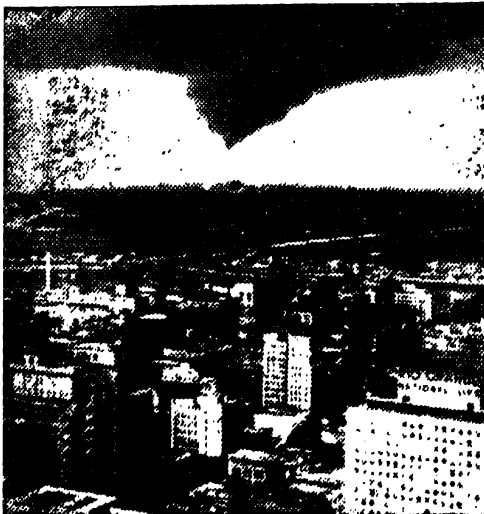
মেক্সিকোর রাজধানীর ঘটনাবলী—সরকারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও তার স্থায়িত্বের অভাব এইগুলি এই সুদূর অঞ্চলকে এক প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসিত সরকার গঠনের সাহায্য করে।

১৮২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় মেক্সিকান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। টেক্সাস ও কোয়াহুইলা মেক্সিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থায় টেক্সাসবাসিগণ নিজেদের খুব খুশি মনে করে।

তারপর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ কুখ্যাত মেক্সিকান জেনারেল ও শাসনকর্তা অ্যান্টোনিও লোপেজ ড সান্টা অ্যানা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বাতিল করে দেন। টেক্সানগণ জেনারেল সান্টা অ্যানার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করে এবং মেক্সিকান উদারপন্থী যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তনে সচেষ্ট ছিলেন—তাঁদের সহযোগিতায় একটা অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করে।

এই ঘোষণার প্রত্যুত্তরে সান্টা অ্যানা টেক্সাসবাসিগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। জেনারেল তখন অ্যালামো অবরোধের জন্য সৈন্য চালিত করেন। টেক্সান প্রতিরোধকারীদের মধ্যে অনেকেই নিহত হন—সেই তারিখটা ছিল ১৮৩৬ সালে ৬ই মার্চ। তখন তাদের পরাজয় হল বটে কিন্তু তারপর ২১-এ এপ্রিলে সান জেসিন্টোর যুদ্ধে সান হাউস্টন পরিচালিত টেক্সান সৈন্যদলের দ্বারা উক্ত জেনারেল বন্দী হন। টেক্সানরা বিজয়ী হন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টেক্সাস স্বাধীনজাতি বলে পরিগণিত ছিল। সান হাউস্টনকে রাষ্ট্রপতি করে একটি স্থায়ী সরকার অক্টোবর ১৮৩৬ সালে গঠিত হয়।

এর পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রাজ্য হিসেবে প্রবেশলাভের জন্য টেক্সাস আবেদন করে। কিন্তু টেক্সাসের উপনিবেশ তাদের সঙ্গে ক্রীতদাস এনেছিল। সুতরাং টেক্সাস সংযোজন আবেদন পত্রখানি বিরোধীপক্ষের বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যদিও অবশেষে ১৮৪৫ সালে টেক্সাস ইউনিয়নে সংযুক্ত হয়।

রাজত্বের ১৫ বছর পরে টেক্সাস ইউনিয়ন ত্যাগ করে ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই সময় টেক্সাস চক্রান্তকারীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকে ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী উপকূল আক্রমণ করে, কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। টেক্সাসের মাটিতেই ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২।১৩ই মে রিক গ্রাণ্ডে নদীর ধারে প্যালো আল্টোতে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়।

আবার ১৮৭০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৩, ১৪, ১৫ সংশোধিত ধারা অনুমোদনের সময় এই রাজ্য পুনরায় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯০০ সালে টেক্সাসের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষিবিভাগই শ্রেষ্ঠ ছিল। এক বছর পরে স্পিণ্ডটপ অয়েলফিল্ডের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রসারতার এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে।

ও ডালাস

প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিহত হন।

তেলের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে টেক্সাসের নতুন অভিজ্ঞতা দ্রুত প্রসারিত হতে লাগল। ১৯১০ সালে এই রাজ্যের জনসংখ্যা হল ৩,৮৯৬,৫৪২ অর্থাৎ ১৯০০ সালের ওপর শতকরা আটাশ ভাগ বেশি। আজকের দিনেও টেক্সাস দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ও নানা পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। একদা বিস্তৃত অনুন্নত ও প্রায় পতিত জমি অধ্যুষিত টেক্সাস আজ ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমানা রিও গ্রাণ্ড নদীর ধারে প্রচুর জমি আজ লেবুগাছের ফলন ও প্রসারতার জন্য প্রভূতভাবে চাষ হচ্ছে। গরু, মহিষ, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু এবং পশমের শ্রেণি-বিভাগের জন্য আজ টেক্সাস উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। এখানের অ্যাঙ্গোরা ছাগের উৎকৃষ্ট লোম প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। অপর যে কোন রাজ্যের চেয়ে এখানে অনেক বেশি কৃষিক্ষেত্র আছে। রাজ্যের বৃহত্তম সব্জি কারবার আছে। তুলোর চাষে এই রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করে আছে—জমির আয়তন প্রায় ৮,৫০০,০০০ একর আর মটরশুটি ও লেবর চাষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

পেট্রোলিয়ামকে পরিশোধন করা এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবসায়, শুধু তাই নয়, এই রাজ্য গন্ধক ও রাসায়নিক শিল্পেও অগ্রণী।

উচ্চশিক্ষার জন্য টেক্সাসে ১২৬টি প্রতিষ্ঠান আছে।

যদিও ষ্টিফেন অষ্টিনের নামানুসারে অষ্টিন শহর এই রাজ্যের রাজধানী, কিন্তু হাউস্টন, ডালাস ও ফোর্টওয়ার্থ—এগুলিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শহর। এই সব শহরের প্রধান আকর্ষণীয় জিনিষ হচ্ছে—প্রত্যেক জিনিষের নতুনত্ব। এই শহরগুলির কোনটিই একশ বছরের ওপরে বেশি পুরানো নয়। হাউস্টন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এটিই হচ্ছে সব চেয়ে পুরাণো, তারপর ডালাস ১৮৪১ আর ফোর্টওয়ার্থ ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। ডালাস হচ্ছে টেক্সানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর—জন- সংখ্যা ৬৭৯ ৬৮৪। ১৯৫০-৬০-এর মধ্যে বৃহত্তম যুক্তরাষ্ট্রের শহরের ২২শ স্থান থেকে উন্নীত হয়ে এখন এর স্থানর চতুর্দশ। ডালাসে শ্রমিকশক্তি হচ্ছে ৪৭৪,০৪০ জন, তার সঙ্গে শতকরা ২৫ জন উৎপাদন কাজে নিযুক্ত।

এই শহর প্রধানত পরিবেশন, অর্থ ও জীবন-বীমার কেন্দ্র। দক্ষিণাংশের শ্রেষ্ঠ পাইকারী ব্যবসায় কেন্দ্র। এই শহরে ৮টি রেলপথ ও আকাশচারী বিমান পথ পরিবহন ও যোগাযোগে সাহায্য করে।

ডালাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলোর বাজারে অন্যতম শীর্ষস্থান অর্জন করে আছে। ডালাসের তুলো বছরে প্রায় ২০ লক্ষ গাঁট রপ্তানি হয়। বিরাট পেট্রোলিয়াম ও স্বাভাবিক গ্যাস উৎপাদন-কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হিসেবে ডালাস অংশ গ্রহণ করে আছে। অধিকাংশ তৈল ব্যবসায়ীর কার্যকরী সমিতিগুলি এই ডালাসে অবস্থিত।

এই শহর জীবন-বীমা কার্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। এই শহরের অর্থনৈতিক কাঠামো হচ্ছে উৎপাদনী শক্তি। এখানের প্রধান শিল্প পোষাক-পরিচ্ছদ, টাটকা খাদ্য, এয়ার ক্র্যাফট, ইলেকট্রোনিক্স, অটোমোবাইল অ্যাসেম্ব্লি ও আরও অনেক ব্যবসায়।

ডালাসে বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এই শহরে একটি আধুনিক সাধারণ শিক্ষানৈতিক প্রতিষ্ঠানও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদিত পরিকল্পনার অধীনে এর শিক্ষায়তনগুলি শান্তিপূর্ণভাবে একত্রিতকরণের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বছর।

উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে আছে—সাউদার্ণ মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটি বেলর ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ডেনটিষ্ট্রী, সাউথওয়েষ্ট মেডিকেল কলেজ অফ দি ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস ও ডালাস থিওলজিক্যাল সেমিনারী।

ডালাস সিম্ফোনী অর্কেষ্ট্রা সমগ্র জাতির গৌরব।

ডালাসে অনেকগুলি বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত মিউজিয়াম আছে। অনেকগুলিতেই এই রাজ্যের ইতিহাস ও উপনিবেশের প্রামাণ্য সুন্দর সংগ্রহ আছে।

ডালাসের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই ডালাস শহরের প্রথম বাসিন্দা হন টেনেসী অধিবাসী জন নীলী ব্রেয়ন ১৮৪১ সালে। ব্রেয়ন ছিলেন একজন আইনজীবী ও ব্যবসায়ীদের অগ্রগণ্য। তিনি ঘোড়ায় চড়ে আরকান্‌সাস থেকে আসেন। তিনি ট্রিনিটি নদীর ধারে যেখানে আজ কোর্টহাউসের অঙ্গন রয়েছে সেইখানে তিনি একটি ঘরযুক্ত এক কাঠের বাড়ি তৈরি করেন। সেই দিন থেকেই ডালাস শহরের প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

এরপর ক্যাপ্টেন এম গিলবার্ট তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে ঐ ট্রিনিটি নদীর ওপর দিয়ে শালতিতে চড়ে এসে ব্রেয়নের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর জন বীম্যানের পরিবারবর্গও আসেন ওয়াগনে চড়ে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একটা গ্রাম গড়ে উঠল। ডালাস শহরের প্রথম দেশ গঠনের পদক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি জর্জ মিফলিন ডালাসের সম্মানার্থে এই শহরের নামকরণ হয়।

১৮৫৬ সালে ডালাস শহর হিসেবে গণ্য হয়—১৮৭১ সালে সনন্দদ্বারা নগরে রূপান্তরিত হয়।

দুটি রেলপথের আবির্ভাব হয় ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালে—লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সূচনা করে। ১৮৭২ সালে লোকসংখ্যা ৩০০০ আর ১৮৯০ সালে দাঁড়ায় ৩৮,০৬৭।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত ডালাস তার অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আজ সে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের অতি প্রয়োজনীয় প্রধান নগর।

● টেক্সাস, ডালাসের সেই বিখ্যাত গৃহশীর্ষ।

কেনেডি পরিবারের আত্মজনবর্গ

[রাষ্ট্রনীতির কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করলে ওয়াশিংটনের এক রকম ছবি পাওয়া যাবে কিন্তু সেইটেই তার একমাত্র মূর্তি নয়। ওয়াশিংটনের আভ্যন্তরীণ চেহারা আর এক রকম, সংবাদ-পত্রও সবসময়ে যার নিখুঁত আলেখ্য অঙ্কন করতে অক্ষম। ওয়াশিংটনের বৃহদায়তন সুসজ্জিত অভ্যর্থনাকক্ষগুলি এবং সুইমিংপুলের দিকেও চোখ ফেরানো প্রয়োজন। সে সব স্থানে এমন অনেক কিছু ঘটে যার সঙ্গে অনেকেরই যোগসূত্র থাকে। অর্থাৎ সেখানকার আলাপ আলোচনায়, বাক্যে বচনে এমন অনেক কিছু গড়ে ওঠে যার সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও সামগ্রিকভাবে একটা সম্পর্ক রূপ নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সংস্কৃতির প্রতি কেনেডির অনুরাগ প্রকাশ পেল, এই অনুরাগ প্রকাশেরই ফল একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক সমাবেশের রূপায়ণ। সঙ্গীত জগতের দিকে যদি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি পড়তো তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে ঐ জগতের এবং ঐ জগতের দিকপালদের আরও বৃহত্তর উন্নয়ন সাধিত হাত।

ওয়াশিংটন আজ জাঁক-জমকের শহরে পরিণত। জৌলুষ ও চাকচিক্যে সে পরিপূর্ণ। সমগ্র শহরটি চিত্রতারকাতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সমাজজীবনে, বিশেষভাবে দর্শনীয় যে সমাজ-ব্যক্তিত্বদের অনেকের চাকচিক্য ও জৌলুষের কাছে চিত্রতারকারাও নিষ্প্রভ। সমাজব্যক্তিত্ব হিসাবে রাজনৈতিক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতরাও চিহ্নিত। অর্থাৎ আজকের রাজনীতিজগতে সমাগত নবীন নায়কের দল। যেমন—দন্তশোভাযুক্ত কেনেডি (দুর্ভাগ্য, আজ আর তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না), জমকালো পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা জ্যাকলিন কেনেডি, সুকঠিন রবার্ট কৃষ্ণ পিয়েরে, আর্থার শ্লেসিঙ্গার জুনিয়ার, রবার্ট ফ্রস্ট প্রভৃতি। জনপ্রিয়তায় এঁদের অন্ত নেই, কিন্তু এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার উৎস কোথায় কি তার পটভূমি? সে কাহিনী যেমনই বিস্ময়কর তেমনই রোমাঞ্চকর। সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনীগুলি মাসিক বসুমতীর পাঠক পাঠিকার দরবারে তুলে ধরা হল।—স]

১। **জিমি ডুরান্ট** ঃ ক্রীস্টোফার লফোর্ডের ইনি ধর্মপিতা। ক্রীস্টোফার হচ্ছেন সিডনি, ভিক্টোরিয়া, রবীন লফোর্ডের অনুজ। এঁদের বাবা হচ্ছেন পিটার লফোর্ড এবং মা হচ্ছেন পেট্রিসিয়া কেনেডি—রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির অনুজা।

জন এফ, কেনেডি

২। **ডাচেস মিটফোর্ড** ঃ ইউনিটি, ডায়না, জেসিকা এবং ডেবরা মিটফোর্ড এঁরই ভগিনীবৃন্দ। শেষোক্তা ডিভোনশায়ারের একাদশ ডিউক এ্যাণ্ড্রু রবার্ট বাক্সটন ক্যাভেণ্ডিসের সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধা। ডিউকের ভ্রাতা হার্টিংটনের মার্কুইস উইলিয়াম জন রবার্ট ক্যাভেণ্ডিস বিবাহ করেন রাষ্ট্রপতি কেনেডির সহোদরা ক্যাথলিন কেনেডিকে।

৩। **ফ্রেড এ্যাস্টেয়ার** ঃ কেনেডি সহোদরা ক্যাথলিনের স্বামী হার্টিংটনের মার্কুইসের নিকট-তম আত্মীয় (uncle) লর্ড চার্লস এ. এফ. ক্যাভেণ্ডিসের সহধর্মিণী এডেল এঁর ভগিনী।

৪। **গোর ভিডাল** : ইউজিন ভিডা এবং নিনা গোরের পুত্র। হিউ ডি, অকিনক্ল পরবর্তীকালে নিনাকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহ করেন। এঁর তৃতীয় স্ত্রী জেনেট লি পূর্বে জন ভেরনু বোভিয়ারের (তৃতীয়) সহধর্মিণী ছিলেন। সেই বিবাহে জেনেট দুই কন্যার জননী হন। কন্যা দু'টির নাম লি এবং জ্যাকলিন (কেনেডি-জায়া)।

জ্যাকলিন বি, কেনেডি

৫। **স্যামুয়েল গোল্ড্ইন ঃ** ইনি বিবাহ করেন ফ্র্যান্সেস হাওয়ার্ডকে। সেই বিবাহে তাঁদের একটি পুত্র হয়। স্যামুয়েল গোল্ড্ইন জুনিয়ার হচ্ছেন সেই পুত্র। জুনিয়ার গোল্ড্ইন বিবাহ করেন ক্লেয়ার জেনেস এমস হাওয়ার্ডকে। ক্লেয়ার হচ্ছেন ক্লেয়ার জেনেস এমস এবং নাট্যকার সিড্নী সি. হাওয়ার্ডের কন্যা। নাট্যকার হাওয়ার্ডের দ্বিতীয়া সহধর্মিণী ছিলেন ওয়াল্টার ড্যামরসের কন্যা লেপোল্ডাইন ড্যামরস। এই বিবাহে নাট্যকার হাওয়ার্ড একটি কন্যার জনক হন। সেই কন্যা অর্থাৎ সিড্নী ডি. হাওয়ার্ড কেনেডি-জায়া জ্যাকলিনের ভগিনী লি বোভিয়ারের প্রথম স্বামী মাইকেল ক্যানফিল্ডের ভ্রাতা ক্যাস ক্যানফিল্ড জুনিয়ারের সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৬। **ওয়াল্টার ড্যামরস ঃ** এঁর চার কন্যার মধ্যে অন্যতমা লেপোল্ডাইন ব্রেন ড্যামরস বিবাহ করেন নাট্যকার সিড্নী হাওয়ার্ডকে। তাঁদের কন্যা সিড্নী ডি. হাওয়ার্ডের স্বামী ক্যাস ক্যানফিল্ড জুনিয়ারের (ক্যাস ক্যানফিল্ডের পুত্র) ভ্রাতা মাইকেলকে কেনেডি পত্নী জ্যাকলিনের সহোদরা লি প্রিন্স স্ট্যানিস্লাস রাজিউইলকে বিবাহ করার পূর্বে বিবাহ করেন।

৭। **টমাস কে ফিনলেটার ঃ** বিমান-বাহিনীর প্রাক্তন সচিব। নাটোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত। লোকান্তরিত রাষ্ট্রনেতা কেনেডির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। টমাস বিবাহ করেন গ্রেচেন ড্যামরসকে। তাঁদের কন্যা লিলি হলেন ক্যাস ক্যানফিল্ড জুনিয়ারের সহধর্মিণী। কেনেডি-শ্যালিকা লি ছিলেন ক্যাস ভ্রাতা মাইকেলের সহধর্মিণী। টমাসের পত্নী গ্রেচেন ছিলেন ওয়াল্টার ড্যামরস এবং মার্গারেট ব্লেনের কন্যা ও নাট্যকার সিড্নী সি. হাওয়ার্ডের স্ত্রী লেপোল্ডাইন ব্রেন ড্যামরসের ভগিনী। তাঁদের কন্যা সিড্নী ডি. হাওয়ার্ডও পূর্বোক্ত ক্যাস ক্যানফিল্ড জুনিয়ারকে বিবাহ করেন (ক্যাস যখন তাঁর আত্মীয়া লিলিকে বিবাহ করেন সেই বিবাহে সিড্নী ডি. হাওয়ার্ড ছিলেন অন্যতমা নীতকনে)।

৮। **সিডনী হাওয়ার্ড ঃ** নাট্যকার। কেনেডি শ্যালিকা লির প্রথম স্বামী মাইকেলের ভ্রাতৃজায়া সিডনী ডি হাওয়ার্ড এঁর কন্যা।

[কেনেডির অতিথিবর্গ]

রাষ্ট্রদূত ও শ্রীমতী হার্ভে অ্যালফান্দ; হোয়াইট হাউসের সোশ্যাল সেক্রেটারী লিটিশিয়া 'টিষ' বলড্রিজ; শ্রী ও শ্রীমতী রিচার্ড ব্যারেট (শ্রীমতী ব্যারেট ক্লার্ক ক্লিফোর্ডের কন্যা); ক্যালিপ্সো গায়ক হ্যারিও শ্রীমতী বেলা ফোঁ; বাজেট ব্যুরোর পরিচালক ডেভিড ও শ্রীমতী বেল; রাষ্ট্রপতির বিশেষ পরামর্শদাতা কারমিন ও শ্রীমতী বেলিনো; রাষ্ট্রদূত ও শ্রীমতী চার্ল্স উর্টিস বোলেন; 'টাইম' সাময়িকীর এ্যানি চেম্বারলেন; 'ন্যাশনাল অবজার্ভার'-এর সংবাদদাতা পিটার ও শ্রীমতী চিউ; মেজর জেনারেল ও শ্রীমতী চেস্টার ভি. (টেড ক্লিফ্টন; কেণ্টাকির সেনেটার জন শেরম্যান ও শ্রীমতী কুপার; নিউ ইয়র্কের শ্রী ও শ্রীমত ফ্রেড কাশিং; শ্রী ও শ্রীমতী স্পোসার ডেভিস শ্রী সি. ওয়্যাট ডিকার্সন ও সি. বি. এ সংবাদদাতা শ্রীমতী ন্যান্সি ডিকার্সন; রাষ্ট্রপতি বিশেষ সহকারী র‍্যালফ ও শ্রীমতী ডাঙান শ্রী ও শ্রীমতী কোর্টনি ইভান্স; নিউ ইয়র্ক 'হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এর ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদা শ্রীরোনাল্ড ও শ্রীমতী ইভান্স জুনিয়ার নৌবাহিনীর আণ্ডার-সেক্রেটারী শ্রীপল বি. 'রে ও শ্রীমতী ফে; শ্রীমতী জন আর 'ফিফি' ফে শ্রী ও শ্রীমতী মেল ফেরার; কৃষিসচিব ও শ্রীম ওরভিলি ফ্রিম্যান; শ্রীমতী বেলি 'পি গিমবেল; মহাকাশচারী ও শ্রীমতী জন গ্লেন সহযোগী বিচারপতি আর্থার ও শ্রীম গোল্ডবার্গ; বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ও লেডি ওর্মস গোর; ওয়াশিংটন পোস্টের প্রকাশক ফিলি ও শ্রীমতী গ্রেহাম; বিচার বিভাগের প্রধ প্রেস অফিসার এডউইন ও শ্রীমতী গাথম্যা এ্যাটর্নি জেনারেলের বিশেষ সহকারী ডেভিড শ্রীমতী হ্যাকেট; সহকারী রাষ্ট্রসচিব এ্যাভা ও শ্রীমতী হ্যারিম্যান ইত্যাদি।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

প্রথম শীক্ষাবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক্ ও শান্তিপাঠ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি॥ ১।১

দিবসপ্রতীক হে প্রাণসূর্য, আনন্দ দাও হে,
নিশীথ দেবতা হে বরুণ, তুমি সুখ দাও সুখ দাও!
দৃষ্টিপ্রতীক অর্যমা, তুমি হও মঙ্গলকর!
বুদ্ধি ও বাণী বৃহস্পতির আনন্দ দিক আনি।
তেজদর্পিত ইন্দ্রশক্তি হোক চিরসুখকর।
জগদ্ব্যাপক বিষ্ণুআলোক ঝরুক মানবকল্যাণে।
বিশ্বের বীজ সূত্রব্রহ্ম, তোমারে নমস্কার।
তুমি সেই বায়ু প্রাণস্বরূপ তোমারে নমস্কার।
তুমি যেন মোর মানসমুকুরে, চোখে চোখে দেখা ব্রহ্ম।
(তোমার মাঝারে তাঁহার প্রকাশ দেখেছি নিত্য নিত্য।)
দেখেছি তোমায় জেনেছি তোমায় চিরপ্রাণময় সত্য!
স্থির নিশ্চয় তুমিই আমার ব্রহ্ম!
বায়ুরূপী সেই সূত্রব্রহ্ম রক্ষা করুন আমারে।
আমার গুরুকে রক্ষা করুন তিনি। (১)

মিত্র, বরুণ, অর্যমা প্রভৃতি সূর্যেরই বিভিন্ন নাম। এঁরা সকলেই বৈদিক দেবতা।

মিত্র। দিবসপ্রতীক সূর্য। এই দেবতাটি ইরাণে 'মিথ্' নামে পরিচিত ছিলেন। পারস্যবিজয়ের পরে রোমীয় রাজা এই দেবতা রোম নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বরুণ। রাত্রিতে প্রচ্ছন্ন অস্তগত সূর্যরূপ। বরুণকে নিয়ে ঋগ্বেদে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এইখানে শুধু এইটুকু বলা যাক যে, প্রথমে তাঁর সেই রূপটাই প্রধান ছিল, যে-রূপে তিনি সূর্যপথকে পরিস্ফুট করেছিলেন। ক্রমে তাঁর সেই রূপটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল, যে রূপে তিনি অস্তপথে প্রবেশ করে রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন।

বরুণকে ন্যায় ও ধর্মের অধিপতি বলা হোত। ক্রমে তিনি জলদেবতার (পুরাণে) রূপ নিলেন। এখনো নৌকায় বরুণ দেবের ছবি আঁকা হয়।

অর্যমা। আদিত্য বা সূর্যকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতা বলা হয়। অর্যমাও সূর্যের সেই আদিত্যরূপ।

১। এই উপনিষদের শান্তিপাঠ ও প্রথম অনুবাক এক। এই মন্ত্রের প্রথম দিকে সূর্যের বিভিন্ন নামরূপের স্তুতি করে ঋষি সেই বিচিত্র নামাভিমানী সূর্য দেবতার কাছে সুখের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

ইন্দ্র। তেজ ও বলের অধিপতি।

বৃহস্পতি। বুদ্ধি ও বাক্যের দেবতা।

বিষ্ণু। বেদে বিষ্ণুকেও সূর্যরূপে পূজা করা হয়েছে। বিষ্ণু সূর্যের সেই বিশ্বচারণ রূপ, যে রূপে তিনি তাঁর এক একটি পদক্ষেপের দ্বারা বিশ্বভ্রমণ করেন। পুরাণের যুগে, বিষ্ণুর বামনাবতারে তিন পদক্ষেপের দ্বারা ত্রিলোক পরিক্রমার নায়ক বোধ হয় এই উরুক্রম বিষ্ণু। ইনি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিন পদক্ষেপের দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত করেন; তাই জগদ্ব্যাপক এঁর মহিমা।

বায়ু। বায়ুকে শুধু পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে দর্শন করেছেন ঋষি। বায়ু অথবা প্রাণ এই সমস্ত নামরূপময় বিশ্বজগৎকে ধারণ করে নিত্যবহমান। প্রাণসূত্রে গাঁথা আছে সমস্ত ভুবন। তাই বায়ুই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ। বায়ুই প্রাণরূপে দেহময় প্রবাহিত হয়ে প্রতি মানুষের দ্বারা প্রকাশিত চিৎশক্তির এক একটি বিশেষ রূপকে আমৃত্যু সঞ্জীবিত করে রাখছে।

আনন্দগিরি প্রভৃতি টীকাকারেরা বলেছেন যে, রাজদর্শনে গিয়ে কোন কোন লোক যেমন দ্বারীকেই 'তুমি রাজা' বলে স্তুতিবাদ করে—তেমনি ব্রহ্ম দর্শনেচ্ছু প্রাণকেই 'তুমি ব্রহ্ম' বলে স্তুতি করেছেন ঋষি।

তবে এও মনে হয় যে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্তুতিবাদে বায়ুকে ভুলিয়ে ব্রহ্ম সমীপে যেতে চান নি। হয়ত তিনি সত্যিই বিশ্বে এবং প্রাণে প্রবাহিত বায়ুকে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ প্রাণে—তাই প্রাণকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেছেন ঋষি। প্রতীকোপাসনার এই বোধ হয় প্রথম সূত্রপাত।

দ্বারীর উপমাটাও একটু অন্যভাবে নেওয়া চলে।—রাজার ঐশ্বর্যের প্রথম প্রকাশ যেমন দ্বারীতে, তেমনি প্রাণেই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। তাই প্রাণকেও ব্রহ্ম বলা যেতে পারে। সূর্যের আলোকে যেমন সূর্য বলা যেতে পারে।

বিষয়াহত ইন্দ্রিয়জনিত অহঙ্কার কখনো কখনো আপন বার্থ অস্তিত্বের বেদনায় ক্ষুব্ধ হয়ে অন্তরস্থ সত্যস্বরূপকে জানতে চায়। কিন্তু তিনি কোথায়?

প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজা যেমন বসে থাকেন রত্ন-সিংহাসনে, তেমনি ব্রহ্ম আছেন বসে হৃদয়-সিংহাসনে। কিন্তু দ্বারে আছেন দ্বারী। দ্বারীর খাজনা মিটিয়ে প্রাণের দাবী চুকিয়ে তবে সেই রাজদরবারে প্রবেশ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অনুবাক

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বর। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্ত শীক্ষাধ্যায়ঃ।

শিক্ষা ব্যাখ্যা করব এখন,—
বর্ণ ও স্বর মাত্রা বলের কথা;
সমতা এবং সংহিতা,—এই সবে মিলে,
রচিত শিক্ষা অধ্যায়।**

[ক্রমশ।

অনুবাদ : চিত্রিতা দেবী।

** যদিও উপনিষদের প্রাধান্য তার অর্থবোধে, উপনিষদের উদ্দেশ্য মন্ত্রার্থ হৃদয়ে প্রবেশ করানো, উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যাওয়া—তবু শব্দ ও বাক্যের বহিরঙ্গ দিকটাও তুচ্ছ করবার নয়। শব্দের যথার্থ উচ্চারণে, তেজ, দীপ্তি এবং মাত্রা স্বর প্রভৃতির নির্ভুলতাও বিশেষ প্রয়োজন। অশুদ্ধ উচ্চারণে,—স্তিমিত ক্ষীণকণ্ঠের মন্ত্রপাঠ অর্থকেও অবজ্ঞায় ব্যাহত করে। তাই ঋষি প্রথমেই যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণপদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন।

বিতর্কের ঝড়ে জন্ম

জন, এফ, কেনেডির সঙ্গে কথোপকথন

[লণ্ডনের প্রখ্যাত পত্রিকা 'সানডে টাইমস'-এর প্রধান সাংবাদিক মিঃ হেনরী জেমস-এর 'এ্যাজ উই আর' (As welare) সঙ্গে জন আমেরিকান প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ। অনুবাদ সূচী-পত্রানুযায়ীই আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে শীর্ষে এনে দিল। এই বিবরণ থেকেই কেনেডির সংশয়, দ্বিধাহীন মুক্তপ্রাণের পরিচয় পাওয়া যাবে। ব্যক্তিগত জীবনে জন, এফ, কেনেডি আমেরিকার বিশিষ্ট ধনী-পরিবারের সন্তান। ছাত্রাবস্থায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেশী ও বিদেশী স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন। সাহিত্যে 'পুলিৎজার' পুরস্কার পেয়েছেন। উড্রো উইলসনের পরে তিনিই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ও পণ্ডিত রাষ্ট্রবিদ্। আবার, যুদ্ধকালে, তরুণ বয়সে নৌ-বাহিনীতে সাহসিক বীরত্বের জন্য দু'-দু'বার সম্মান-প্রতীক লাভ করেন। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর হৃদয়ে মানবতাবোধ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই ছিল তাঁর নীতি। তাই তাঁকে এই মাশুল দিতে হলো। দেবতাকে ধ্বংস করবার জন্য দানব সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু, দেবত্বের বিনাশ নেই। আজ রক্তসিক্ত জমিতে তিনি যে বীজ বপন করে গেলেন—কালে তাতে নিশ্চয়ই অমৃত ফল ফলবে।]

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

ওয়াশিংটনের মধ্যস্থলে অবস্থিত সুরুচিসম্মত সুরক্ষিত বনেদী-পাড়া জর্জটাউনে সিনেট সদস্য কেনেডির প্রাচীন চমৎকার অট্টালিকায় বসে কমলালেবুর রস ও ডিমের পোচের ফাঁকে ফাঁকে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। সারাদিনে বোধ হয় এই সময়টাই ওঁর একমাত্র অবসর মুহূর্ত। কারণ, মনোনয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনের দু' সপ্তাহ আগে তাঁর শকটকে ত্বরবেগ দেবার প্রয়াসে তিনি তীব্র ঝঞ্ঝাক্রান্তের মতো ছটফট করছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা পাঁচ মিনিট দেরীতে প্রবেশের জন্য সিনেটার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ইঞ্জিন খারাপ হবার দরুণ ভোর তিনটেয় ওয়াশিংটনে পৌঁচেছে। কিন্তু এখন, এই সকাল ৮-৪৫-এ তিনি একদম প্রস্তুত—আর একটি উন্মত্ত দিনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব।

ঢাকা বারান্দায় টেবিল পাতা হয়েছিল। সিনেটার যখন দেখলেন যে সেখানে আমার টেপ-রেকর্ডার চালাবার মতো বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই তখন তিনি নিগ্রো পরিচারককে ঘরের মধ্যে প্রাতরাশ দিতে বললেন। আমরা সময় নষ্ট না করে রোদের আঁকা উজ্জ্বল নির্মল নীল আকাশের নীচে নরম, আরামপ্রদ সাটিনের কাপড়ের ঢাকা সমন্বিত চেয়ারে বসে পড়লাম। এক অপরূপ, শান্ত, স্বর্গীয় দীপ্তি বাড়িটাকে ঘিরে আছে। দেওয়ালে সাদা ও হলদে রং-ই বেশি, মাঝে মাঝে লালের ছাপ। বর্ণসমাবেশ অত্যন্ত সুষমামণ্ডিত। বইয়ের তাক ও বিভিন্ন আকারের ছোট টেবিলের উপরিস্থিত আর্টের বই মিসেস কেনেডির রুচির ছাপ বহন করছে।

পানীয়তে এক চুমুক দিয়েই সিনেটার আমাকে সময় নষ্ট না করে আরম্ভ করবার ইঙ্গিত দিলেন। প্রশ্নে কোন দ্বিধাবিহ্বলতা চেপে রাখবার চেষ্টা, চীৎকার, চেঁচামেচি বা স্নায়ুপীড়া নেই। ইনি
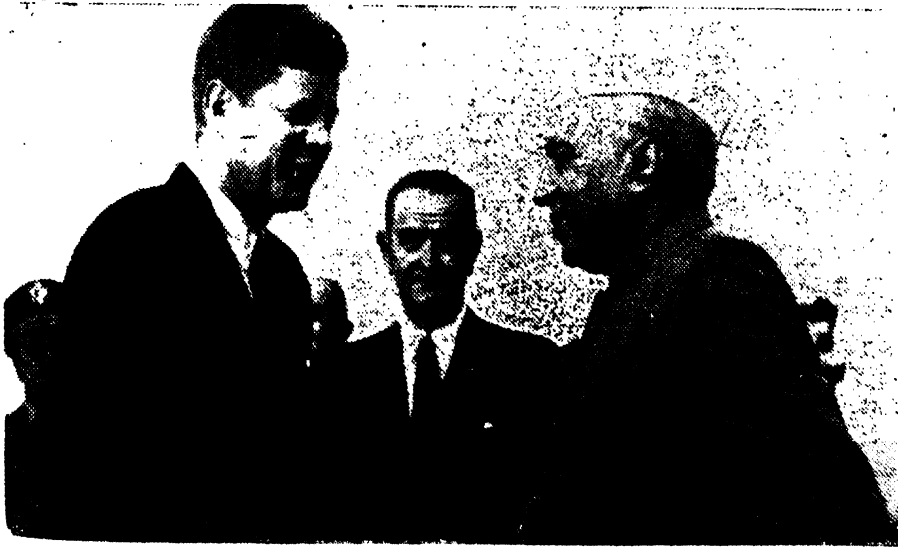
● কেনেডি, জনসন ও নেহরু

এমন একজন রাজনীতিবিদ যিনি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং আনন্দের সঙ্গেই তা সম্পাদন করেন। তাঁর বক্তব্যে ভাবাবেগ, উত্তেজনা অথবা ক্রোধের প্রকাশ নেই। কোন প্রশ্ন ওঁর স্পর্শকাতর স্নায়ুতে আঘাত করলেও মুখে কুঞ্চন রেখা বা দৃষ্টিতে আভাস দেখা দেয় না। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, সুশৃঙ্খল মন দৃষ্টিগোচর সমস্ত সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেছে এবং সেজন্যই তাঁর উত্তর অত সংক্ষিপ্ত ও সতেজ, একঘেয়ে, নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল যে, সমকালীন নানা সমস্যা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তিত। যদিও ওঁর ভাবভঙ্গী অত্যন্ত অনাসক্ত ও অসংলগ্ন তবুও তা সুগম্ভীর, সুচিন্তিত বিশ্বাস উদ্রেক করে কিন্তু বিচার করা কঠিন যে এই বক্তব্য তাঁর বিবেকের মূলদেশে কতটা গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে।

আমি 'জ্যাক' কেনেডিকে বেশ কয়েক বৎসর হলো জানি কিন্তু, তবুও যেন এখনও ওঁকে আমি চিনি না। আশ্চর্যের কথা এই যে, যাঁরা ওঁকে আজীবন জানেন, যাঁরা ওঁর স্কুলের সহপাঠী তাঁদের অনুভূতিও ঠিক এই, তিনি এতো আত্মসমাহিত, এতো নিরাসক্ত যে তাঁর মনে কি আছে কোন অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁকে চালিত করছে তা বোঝা কঠিন।

আমার মতে জ্যাক কেনেডি চঞ্চলমতি বালক এবং ইতিহাস ও রাজনীতির একাগ্রচিত্ত ছাত্রের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ওঁর আপাত অবহেলার পেছনে লুক্কায়িত জ্বলন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি প্রথম আমি ধরতে পারি নি। কিন্তু ১৯৫৬ সালে গণতান্ত্রিক সম্মেলনের একমাস মাত্র আগে তিনি যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার প্রয়াস সম্বন্ধে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করলেন তখনই উপলব্ধি করলাম তাঁর উচ্চাশা কতটা ঊর্ধ্বগামী। কিন্তু, আমি কখনও সন্দেহ করি নি যে, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য চেষ্টা করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি যুগধর্মী। আধুনিক জনমন চালিত করবার সহজাত দক্ষতা তাঁর আছে। নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন এবং তিনি তা গোপন করবার চেষ্টা করেন না—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবেলা করেন।

সরলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহল বোধ হয় তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ। হয় তো এইজন্যই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁর জন্য কাজ করতে এতটা উৎসুক। তাদের কাছে তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক নূতন সৃষ্ট ব্যক্তি, এক নূতন টাইপের উদারনীতিবাদী, ক্রমবর্ধমান সুপ্তশক্তি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাস্তববাদী—রুক্ষ ও দৃঢ়চিত্ত বাস্তববাদী এবং উপযোগধর্মী মানবতাবাদী। হয় তো তাঁর মনে উত্তাপের অভাব আছে, হয় তো তিনি অত্যন্ত নিস্পৃহ ও হিসেবী কিন্তু যারা তাঁর জন্য খাটতে উৎসুক তাদের ধারণা অন্তত আশা এই যে, তাঁর কথায় ও কাজে মিল থাকবে। ওরা তাঁকে এমন একটি কর্মী ভাবে যিনি শুধুমাত্র নিজের চারিদিকে বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রহ ও জমায়েত করতে জানেন না—যিনি সেই প্রতিভা দিয়ে কার্যকরী রাজনৈতিক যন্ত্র সৃষ্টি করতে জানেন।

যেমনি অকস্মাৎ ও অসতর্কভাবে আমাদের সাক্ষাৎকার শুরু হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবেই তা শেষ হলো। 'হিলে' একটা জরুরী সভা ছিল তিনি দ্রুতপদক্ষেপে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে উঠতে উঠতে আমার চোখে পড়ে আমার প্রাতরাশের ঐ প্লাস খালি কিন্তু উনি ডিম, বেকন, টোস্ট স্পর্শই করেন নি।

১৯৬০ সাল—১৩ই জুন।

ব্রাউন। প্রেসিডেন্টের পদের জন্য চেষ্টা করবার কথা সর্বপ্রথমে কখন আপনার মনে এলো?

কেনেডি। ১৯৫৬ সালে গণতান্ত্রিক সম্মেলনে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদের জন্য চেষ্টা করবার পরেই আমার এ কথা মনে হয়েছে। ১৯৫৬ সালের সংগঠনে ও ব্যাপক প্রচারকার্যে শুধুমাত্র ম্যাসাচুয়েটসের নয় জাতীয় নায়ক রূপেই আমি কাজ করেছিলাম। তারপরে গভর্ণর ষ্টিভেনসন ১৯৫৬ সালে পরাজিত হবার পরে ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে এই আশা মনে মনে পোষণ করতে থাকি।

ব্রাউন। আপনার কি মনে হলো যে পথ পরিষ্কার অথবা কোন বাধ্যবাধকতার জন্য।

কেনেডি। বোধ হয় দু'টি কারণই ছিল। প্রথমত একদিক থেকে দেখতে গেলে মাঠ ফাঁকা—কাজেই সুযোগ রয়েছে—তাছাড়া এমন ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম যে আমার নাম অপরাপর প্রার্থীদের সঙ্গে সমভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা অবশ্য এই যে প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্টের পদই কর্মকেন্দ্র। আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর আমি কংগ্রেসে আছি এবং যদিও আইনত আমরা সবাই সমান ও সরকারের বিভিন্ন শাখামাত্র কিন্তু ঘটনার চাপ ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক প্রেসিডেন্টকে প্রভাবশালী করে তুলেছে। এর প্রয়োজন আছে—বিশেষত বৈদেশিক রাজনীতিক্ষেত্রে। তাই আমি চৌদ্দ বৎসর আগে কংগ্রেসে কিংবা আট বৎসর পূর্বে সিনেটে ঢোকবার জন্য যেমন চেষ্টা করেছিলাম এখন এই প্রেসিডেন্ট পদের জন্যও তাই করেছি। আমেরিকা কোন পথে যাচ্ছে, কোন অংশ অভিনয় করছে, কি কি দায়িত্ব নিয়েছে—এ সম্বন্ধে আমি উৎসুক ছিলাম—এবং প্রেসিডেন্টের পদই হচ্ছে কর্মের কেন্দ্রস্থল।

ব্রাউন। আপনার মতে প্রেসিডেন্ট হতে হলে কি কি মৌলিক গুণ থাকা প্রয়োজন—এবং নিজের কি কি গুণ আছে বলে মনে করেন।

কেনেডি। আমার মতে তাঁর চরিত্র, বিচারশক্তি, বুদ্ধিপ্রধান কৌতূহল, ইতিহাসের জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকা অত্যাবশ্যক। আর অন্যান্য গুণ থাকলে সুবিধে হয় কিন্তু আমি বলবো যে কোন সার্থক প্রেসিডেন্টের এই গুণগুলি থাকতেই হবে।

ব্রাউন। লোকের মতে আপনার বিপক্ষে দু'টি কথা—আপনার বয়স কম ও আপনি ক্যাথলিকধর্মী।

কেনেডি। হ্যাঁ। এই দু'টো ব্যাপারকেই খরচের খাতায় লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু এটি খুব বেশিমাত্রায় ক্ষতিজনক নয়। অল্প বয়স—আমি এমন এক সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে এসেছি যখন নেতৃত্ব ছিল বৃদ্ধের। প্রেসিডেন্ট বৃদ্ধ—ভগ্নস্বাস্থ্য। নেতৃত্ব অসার্থক। এবং সেইজন্যই ইতিহাসের একটি নূতন পাতা ওল্টাবার—নূতনতর নেতৃত্বে শুরু করবার ইচ্ছা জেগেছিল—যা সজীব ও বলিষ্ঠ, আমার মনে হয়, এ হিসেবে 'যৌবন' প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান—যদিও তার খারাপ দিকটাও আছে।

আমার ধর্মমতও প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল এবং আমাকে বিতর্কমূলক নায়কে—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে বিতর্কেই আমার জন্ম। কিন্তু ৫৭, ৫৮, ৫৯ সালের

পরিপ্রেক্ষিত দিকে তাকিয়ে বলতে পারি যে এতে—অর্থাৎ যেভাবেই হোক বিতর্কমূলক চরিত্র হওয়াতে লাভই হয়েছে।

ব্রাগুন। এর জন্যই সারা দেশে আপনার নাম প্রচারিত হয়ে যায়—

কেনেডি। ঠিকই। যেভাবে ঘটনাটা দাঁড়িয়েছে তাতে তাই মনে হয় বটে। আমার মতে মনোনয়নের আশা যথেষ্ট ছিল—ধর্মমত ও যৌবন সত্ত্বেও তাই আমি বলতে পারি না যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে এরা অনতিক্রমণীয় বাধা।

ব্রাগুন। পশ্চিম ভার্জিনিয়া—যেখানে মাত্র শতকরা পাঁচভাগ ক্যাথলিক—সেখান থেকে আপনার জয়লাভের পরও কি আপনার মনে হয় যে আমেরিকার রাজনীতিতে ধর্ম একটি প্রধান বিচার্য বিষয়।

কেনেডি। হ্যাঁ, তাই বটে। কিন্তু আগের চেয়ে প্রাধান্য অনেক কমে গেছে। কিছুদিন মনে হয়েছিল এটাই যেন একমাত্র বিচার্য বিষয় এবং তা খুবই খাপাপ। এখন এটা অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে একটি—তবুও বিচার্য বিষয় তো বটে। ধর্ম-স্বাধীনতার জন্য সমুদয় যুদ্ধ, ধর্মবিপ্লবের জন্য ক্রটিহীন একাগ্র চেষ্টা, যুক্তপ্রদেশের অবিকৃত চরিত্র—এসব কিছুই ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী প্রেসিডেণ্টের সম্ভাবনাতে অনেক আমেরিকাবাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তবে অধিকাংশই কতগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন এবং যুক্তিসম্মত উত্তর পেয়ে যাবার পরে তাঁরা যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। কয়েকজন কখনই কোন কথা শুনবেন না···

ব্রাগুন। প্রোটেষ্টাণ্ট ভোটদাতাদের বিরুদ্ধতার কথাই প্রায় শুনে থাকি, কিন্তু আপনার কি মনে হয় ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরুদ্ধবাদী আছে?

কেনেডি। কয়েকজন। কিন্তু, আমার এই বিশ্বাস যে রিপাবলিকানরাই তাদের রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন করবে। ধর্মের ভিত্তিতে বিরোধিতা না পাবার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আর একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, তাহলে আমার বিপরীতধর্মীরাও আমাকে ভোট দেবে না। কাজেই ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি বিরুদ্ধতা থেকে থাকে তাহলে আমার আশা যে তা রিপাবলিকান সভ্যদের মধ্যে সামায়িত।

ব্রাগুন। অনেক ইঙ্গিত···যেমন···জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বক্তব্যে অথবা 'রোমিও অবজার্ভেটোরি'র কতকগুলি সম্পাদকীয় মন্তব্যে—যা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনার নির্বাচন প্রার্থীদের কূট সমালোচনা।

কেনেডি। আমার বিশ্বাস যে তা ঠিক নয়। নির্বাচনে আমার দাঁড়ানোর কথা ওদের মনেই ছিল না। তা ভালো মন্দ দুই-ই হতে পারে—কিন্তু আমার মনে হয় ১৯৬০ সালের মনোনয়নের সময় অপেক্ষা তাদের দৃষ্টি ছিল অনেক সুদূরপ্রসারী। কাজেই তারা হয় তো তাদের মন্তব্যে আমার নির্বাচনে কি ইঙ্গিত করে আসছিল সে সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করে নি—এবং আমার মতে তাতে ভালোই হয়েছে। যদি পুরোহিত সম্প্রদায় আমার নির্বাচন সম্পর্কে বক্তৃতা করতে থাকে তাহলে ক্যাথলিক রাজনৈতিক এবং ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে অন্যায়, অবিবেচনাসূচক সম্পর্ক আছে বলে যে অভিযোগ আছে তা প্রমাণিত হবে। আমার

● কেনেডি ও শ্রীমতী জ্যাকলিন●

বক্তব্য হচ্ছে যে তা নেই এবং এই সকল মন্তব্য থেকে তাই প্রমাণিত হয়—যা আমার নির্বাচনের পক্ষে খুব বেশি মাত্রায় ক্ষতিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এবং এতে এই বোঝাত যে, এটা গোপনীয় চক্রান্ত নয়।

ব্রাণ্ডন। শুনেছি যে, ক্যাথলিক চার্চের ক্যাথলিক প্রেসিডেণ্ট অপছন্দ করবার একটি কারণ হচ্ছে যে, যুক্তরাজ্য সেই স্বল্পতম দেশের অন্যতম, হয় তো, শেষ দেশ—যেখানে গীর্জা এখনও নূতন সভ্য সংগ্রহ করতে পারে—যেখানে এখনও মিশনারীদের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র আছে। হিসেব করে দেখা যায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্যাথলিকরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছে এবং বৃহত্তর লাভের আশা আছে—কিন্তু ক্যাথলিক প্রেসিডেণ্ট থাকলে হয় তো তা অতটা সহজ হবে না।

কেনেডি। জানি না, কাদের এই রকম অভিমত—কিন্তু আমার তা মত নয়—এবং আমি ভাবি না যে যুক্তরাজ্যের চার্চের নীতি পরিচালনায় অসুবিধে হতে পারে ভেবে ক্যাথলিকদের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে সরে থাকা বিজ্ঞোচিত, যুক্তরাজ্যের পুরোহিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই কথা সত্য সত্যই ভাবে বলে আমার মনে হয় না—এবং যদি তা হয়েও থাকে তাতে আমি সায় দিতে পারব না। আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে, প্রেসিডেণ্টের ধর্মমতানুসারে আমেরিকাবাসীরা নিজেদের গীর্জা ঠিক করবে এবং যদি তা তারা করে তবে ধর্মান্তরের ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। জানি না প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ধর্মমত কি—তিনি কি—প্রেসবিটারিয়ান?

ব্রাণ্ডন। হ্যাঁ।

কেনেডি। আমি নিশ্চিত জানি না, তিনি কতজনকে ধর্মান্তরিত করেছেন। অথবা, প্রেসবিটারিয়ান চার্চে প্রবেশের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

ব্রাণ্ডন। মানে, তারা সবাই ঠিক একই রকম ধর্মান্তর 'ব্যবসায়' লিপ্ত নয়? তাই নয় কি? (হাস্য)

কেনেডি। এরা সকলেই নিজেদের বার্তা প্রচার করতে চায়। তারা তাই করুক।

ব্রাণ্ডন। আচ্ছা, প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আপনার যদি সেই ধর্মমতের বিরোধিতা করতে হয় তাহলে কি চার্চের পক্ষে অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না?

কেনেডি। কি নীতি?

ব্রাণ্ডন। যেমন ধরুন না কেন পোপের মুখপাত্র। রোমিও অবজার্ভিটরি। যা বলেছে, যদিও গীর্জার সভ্যরা 'যথেষ্ট স্বাধীনতা' পেয়ে থাকেন কিন্তু তাঁরা যেন এ কথা না ভুলে যান যে বিশ্বাসী ও নাগরিকের মধ্যে কোন ফাটল থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

কেনেডি। আমার মনে হয় যুক্তরাজ্যের ক্যাথলিক চার্চের অবস্থা শাসননীতির কাঠামো অনুযায়ী ঠিক-ই আছে—কারণ, গীর্জা ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি প্রবল ভাবে এই মতবাদ সমর্থন করি। আপনার প্রশ্নের ইঙ্গিত যদি ধরতে যাই তবে যুক্তরাজ্যের সিনেটার হওয়াই আমার উচিত নয় কারণ প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আমি সেই শপথই গ্রহণ করেছি।

ব্রাণ্ডন। যেমন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে·····

কেনেডি। তাই কি?

ব্রাণ্ডন। আমি বলতে চাই যদি চার্চ বলে, এই আমাদের অবস্থা এবং আপনি প্রতিবাদ করেন -আপনার কি মনে হয় না তাতে তাদের অসুবিধে সৃষ্টি হবে।

কেনেডি। আনুগত্যের শপথানুযায়ী রাজকর্মচারী শাসনতন্ত্র রক্ষা করতে বাধ্য—আইনানুসারে যে শপথ বা স্বীকৃতি সে নিয়েছে, ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছে। সেই শপথ ভাঙা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। গীর্জা ও রাজ্যের পৃথকীকরণ প্রেসিডেণ্টের পক্ষে শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের এবং যে ভাবে যুক্তরাজ্য রক্ষা পেতে পারে তার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে—

আমার মতে এখানে কোন বিরোধ নেই। যদি থাকতো তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বলতে পারতেন যে, আমার ধর্মাবলম্বীরা শপথ নিতে পারে না। ক্যাথলিক বিচারকরা প্রত্যহ বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে রায় দিচ্ছেন যদিও তাঁরা নিজেরা বিবাহবিচ্ছেদে বিশ্বাসী নন। আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জনগণের কর্মচারী হিসেবে সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে তফাৎ করতে হবে। আমি এ ভাবে তফাৎ করে নিতে একটুও অসুবিধে বোধ করি না।

আমার মনে হয় এই কথাটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো হয়েছে। যদি আপনি এই মত গ্রহণ করেন যে, প্রেসিডেণ্ট তাঁর ধর্মের বাধার জন্য শাসনতান্ত্রিক শপথ গ্রহণ করতে পারেন না তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে, সিনেট সদস্য অথবা প্রতিনিধিরাও তাঁদের কর্তব্য সমাপনে অক্ষম। মূলনীতি একই, এখানে আমরা পূর্ণ সার্থকতায় এই নীতি অনুযায়ী কাজ করেছি। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি সুপ্রীম কোর্টের দু'জন প্রধান বিচারক ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী মোটের উপর যা সীজারের প্রাপ্য এবং যা ঈশ্বরের প্রাপ্য তার মধ্যে তফাৎ করতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় নি।

ব্রাণ্ডন। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজনৈতিকরা রাজনীতির সুন্দর সুষ্ঠু প্রকাশ এবং দলগত রাজনীতির উগ্র চালনার উভয়সঙ্কটে পড়ে মুস্কিলে পড়ে যান, আপনি রাজনীতি ক্ষেত্রে কি নীতি দ্বারা পরিচালিত হন।

কেনেডি। আমি বলবো সুষ্ঠু নীতির অভাবে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক আত্ম-পরিচালক ব্যক্তি আছেন। সার্থক রাজনৈতিকরা খুব কমই বিধি লঙ্ঘন করেন।

ব্রাণ্ডন। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হয় যে, যদি পুত্র হবে পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়. তো সেই প্রতিমূর্তিরই অনুকরে কেটে খোদাই করা। পিতার সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক?

কেনেডি। আমি বলতে বাধ্য যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনার বর্ণিত পর্যায়ে পড়ে না। অনেক অমিল আছে। আমার ব্যাপারে বলতে পারি যে, বহু বৎসর থেকেই নীতির দিক দিয়ে মিল নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিনিধি সভার সভ্য হিসেবে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ আমার যা মত, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সাংসারিক অনেক ব্যাপারেও তাঁর মত প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু, এখুনি ঠিক আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। আমাদের মতের অমিল আছে কিন্তু আমি তাঁকে মতান্তরে নিতে চেষ্টা করি না এবং তিনিও তা করেন না—কাজেই এটা ব্যক্তিগত গণ্ডীর বাইরেই থাকে এবং আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক সত্যই প্রীতিজনক।

ব্রাওন। হয় তো তাঁর নিজের মতের সঙ্গে মিল হওয়ার চেয়ে পুত্রকে সম্ভবপর ভাবী প্রেসিডেণ্টরূপে দেখার গর্বই তাঁর নিকট বড়—কেমন তাই নয় কি?

কেনেডি। না, তা মোটেই নয়। ব্যাপারটা এই যে, তিনি অনুভব করেন যে তাঁর পরিবার বিরাট—এবং তাদের উচিত নিজেদের জীবনযাত্রা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করা ও নিজেরাই সিদ্ধান্ত স্থির করা। তাঁর নিজের রাজনৈতিক মতবাদ জোর করে সন্তানের ওপরে না চাপাবার গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপরে ন্যস্ত। আমার মতে যখন পিতা-মাতারা তা চাপান না তখনই সার্থক ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

ব্রাওন। যদি পিতার পথে না চলে থাকেন তবে কি অথবা কোন ঘটনা আপনাকে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রেরণা দেয়।

কেনেডি। অভিজ্ঞতা এবং আমার নিজের পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের বাস্তব মূল্য-সম্পর্কিত বিচার। তা ছাড়া আমার মনে হয়, বহির্জগৎও আমাকে ও আমার বিচারশক্তিকে প্রভাবিত করেছে। কথা হচ্ছে যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয় তো সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে সকলেই হয় পিতার মতের প্রতিধ্বনি অথবা বিপ্লবী। আমি আশা করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সম্পর্ক আমাদের মতো। ভিন্ন জগতে বাস করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম সমস্যাপীড়িত হয়ে এরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়—কিন্তু এদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুরই থাকে।

ব্রাওন। সেদিন আর্থার মিলার আমাকে বলছিলেন যে, যদি কোন কঠিন আন্তর্জাতিক সঙ্কটজনক পরিস্থিতি যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হয় তাহলে ম্যাকারথিজমের আবির্ভাব হবে। কারণ তাঁকে রক্ষণশীলরাই পরাজিত করেছেন—উদারনৈতিক বা বামপন্থী যাঁরা তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে কিছু জানেন তাঁরা নন, আপনার কি এই মত।

কেনেডি। কথা হচ্ছে যে, কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঠিক সেই ভাবেই পুনরাবৃত্ত হয় না। আমার মনে হয়, ইউ-২ সঙ্কটকালের পর গত কয়েক মাস 'তোষণ', 'সাম্যবাদ সহনশীল' এই কথাগুলি খুব জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে। পেনিসিলভানিয়ার সিনেট সদস্য স্কট জানিয়েছেন যে, আমাকে ও গভর্ণর ষ্টিভেনসনকে নিজেরা উপস্থিত হয়ে 'তোষণবাদী' অপবাদ মুক্ত হতে হবে—যেহেতু আমরা ইউ-২-এর বদ শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় সম্মত হতে পারি নি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যুক্তরাজ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা রাজনৈতিক চাপে বিরক্ত হয়ে দেওয়াল থেকে খড়্গ টেনে নিয়ে পুরাতন রীতিতে ফিরে যেতে প্রস্তুত।

ব্রাওন। আপনি ম্যাকারথিজমের সময়ে যেমনি নিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে কি তদপেক্ষা বলিষ্ঠতর স্থান অধিকার করবেন।

কেনেডি। ঐ রীতিই আমার পছন্দ নয়—যদি এটাই আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে—এবং কখনও করি নি।

ব্রাওন। চার্চিলের সূত্রানুযায়ী বৃটেনের বৈদেশিক নীতি তিনটি বৃত্তের ওপরে স্থাপিত—বৃটেনকে মাঝখানে রেখে এক, এ্যাংলো-আমেরিকান মৈত্রী, দ্বিতীয় ইয়োরোপ, তৃতীয় কমনওয়েলথ। আমার মনে হয়, এই মূলভিত্তি কিছুমাত্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আপনার মতানুসারে জগতে বৃটেনের কি ভূমিকা।

কেনেডি। আমার মতে বৃত্ত তিনটি এখনও আছে। প্রকৃতপক্ষে এ্যাংলো-আমেরিকা মৈত্রী সত্য সত্যই দুই দেশের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি। কমনওয়েলথের বন্ধনও অত্যন্ত প্রকট। বর্তমানে মাথা ঘামানোর ব্যাপার অবশ্য তৃতীয় বৃত্ত—গ্রেটবৃটেন ও ইয়োরোপের সম্পর্কে। যুক্তরাজ্য, কমনওয়েলথ ও ইয়োরোপের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য গ্রেটবৃটেনের গুরুত্ব কমে গেছে, কিন্তু তবুও সে এখনও এ তিনটি বৃত্তের মধ্যে সম্পর্কসূত্র।

ব্রাওন। আপনার কি মনে হয় বৃটেন কমন-মার্কেটে যোগ দেবে?

কেনেডি। বৃটেনের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত। গ্রেটবৃটেনের মতো জটিল সমস্যাসঙ্কুল দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বাইরের কারো শোভা পায় না। সে কি করবে, না করবে, সে বিষয়ে তার দেশের লোকরাই বিচার করতে সক্ষম। বোধ হয়, বৃটিশরা এই সমগ্র উন্নতিমূলক ব্যাপারটার জন্য আরও বুদ্ধিজনোচিত ও বিজ্ঞতর নীতি নিতে পারতো—কিন্তু আমার পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতে যাওয়া ঠিক নয়।

ব্রাওন। আপনি কি ইয়োরোপে জাতি উর্ধ্বে অবস্থিত কোন কর্তৃত্ব দেখতে চান? অন্তত সেদিকে প্রবণতা?

কেনেডি। হাঁ, চাই। আমরা ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারি—অন্যান্য ব্যাপারে উন্নতি করতে পারি। কিন্তু একটা সীমা আছে, যার বাইরে বিশেষত অদূর ভবিষ্যতে আমরা অগ্রসর হতে পারব না।

ব্রাওন। আজ, কাল যেদিনই হোক যুক্তরাজ্যের প্রচুর আণবিক বোমা হবে, যাতে তার ইয়োরোপের নীতির ওপর নির্ভর করতে হবে না। আপনার কি মনে হয় তখন সে স্বাধীন নীতি গ্রহণ করবে।

কেনেডি। না। আমার মতে যুক্তরাজ্য ও ইয়োরোপের বন্ধন মৌলিক এবং সহযোগিতার প্রয়োজন থাকবেই—হয় তো দৃঢ়তররূপে

● পুত্রসহ কেনেডি কর্মরত

এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আমরা একই ভিত্তিতে যেতে পারি। ঘাঁটির প্রয়োজনেই আমরা গত পনের বৎসর যাবৎ ইয়োরোপের উন্নতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সাহায্য করতে চেষ্টা করি নি। আমার মনে হয়, এক কর্ম উৎসাহপূর্ণ স্বাধীন ইয়োরোপ, অর্থনীতিতে বিস্তৃত, অনুন্নত দেশগুলিকে যথোচিত সাহায্যদানকারী, পশ্চিমকে রক্ষায় যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ—এই সব সাধারণ উদ্দেশ্যসাধন ঘাঁটির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

ব্রাগুন। আপনি কি বলতে চান অবস্থার এই উন্নতির পরেও 'নাটো' টিকে থাকবে ?

কেনেডি। পশ্চিম ইয়োরোপকে আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিভূ হিসেবে, সামরিক সাহায্য একীভূত করা অর্থে 'নাটো' নিশ্চয়ই টিকে থাকবে এবং আমার আশা এই যে, আরও শক্তিশালীরূপে থাকবে যাতে পশ্চিম ইয়োরোপ ও যুক্তরাজ্যের উত্তম নূতনতর দায়িত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরীরূপে মিলিত হতে পারে। সামরিকরূপে বদলাতে পারে কিন্তু মূলগত ঐক্য থাকবে—যা 'নাটো'র দ্বারা প্রকাশিত হবে।

ব্রাগুন। মিলিটারী বলতে কি আপনি ইয়োরোপে অবস্থিত আমেরিকান সৈন্য বোঝাচ্ছেন ?

কেনেডি। না, আমি ঘাঁটির কথা বোঝাতে চাইছি। ওখানে আমেরিকান সৈন্য রাখাই বিজ্ঞোচিত হবে—এমন কি যখন আমাদের বিমানঘাঁটির প্রয়োজন হবে না তখনও। এই সৈন্যদল ওখানে কেবলমাত্র বিমানঘাঁটি রক্ষা করবার জন্য নেই—পরন্তু 'নাটো'তে এবং পশ্চিম জার্মানী ও বার্লিনে যে কথা দিয়েছি, তা রক্ষার জামিনস্বরূপ রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত বার্লিন এইরূপ প্রদাহের প্রকোপে থাকছে ঘাঁটীর প্রয়োজন থাক না থাক সৈন্যদল ওখানে থাকবে।

ব্রাগুন। দেখা যাচ্ছে যে, জার্মানী দশ বৎসর বিভক্ত থাকবে হয় তো আরও বেশি—তাহলে কি বার্লিনে ঐরকম অবস্থা রাখা সম্ভব হবে।

কেনেডি। আমার মনে হয় কেউ বলতে পারে না পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে কি ঘটবে! আমি শুধু বলবো, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইয়োরোপ, কিংবা পশ্চিম জার্মানী বা বার্লিন পশ্চিম বার্লিনের স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ দেখতে প্রস্তুত নয়। আমার মনে হয় সেটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জানি না, জার্মানী অথবা বার্লিনের কি অবস্থা হবে—জানি না, পরবর্তী দশ বৎসরে সোভিয়েট ইউনিয়ন কি নীতি অনুসারে চলবে—কিন্তু অন্তত মূলগত প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের স্মরণে থাকবে।

ব্রাগুন। আপনার কি মনে হয় 'ইউনাইটেড নেশন' এর সাহায্যে আমরা বার্লিনকে স্বাধীন রাখতে পারি।

কেনেডি। যদিও পশ্চিম জার্মানীর স্বাধীনতার প্রধান দায়িত্ব যুক্তরাজ্য, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানদের নিজের ওপরেই থাকবে তথাপি প্রতিভূ প্রতিজ্ঞায় ইউনাইটেড নেশনের অংশগ্রহণ সুবিবেচনক।

ব্রাগুন। আপনি যদি এক নজরে রাশিয়া-আমেরিকার সম্পর্ক—কেন এই আগামী দশ বৎসরের জন্যে দেখেন—তাহলে ভবিষ্যতে কি দেখতে পান ?

কেনেডি। যে ছবিটা আমার চোখের সামনে জাগে তা হচ্ছে সাময়িক হৃদয়-উষ্ণতা ও সাময়িক ঠাণ্ডা তিক্ততার লড়াই। আমার মনে হয় না আগামী দশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা চীনে এমন কোন পরিবর্তন আসবে যাতে তাদের নীতির আমূল পরিবর্তন হবে। লয়ের পরিবর্তন হতে পারে—উদ্দেশ্যের হবে না। আমি এই মত প্রকাশ করতে বেশ ইতস্তত করছি, কারণ জগৎ গত দশ বৎসর—অন্তত পনের বৎসরে এত বদলে গেছে। কিন্তু আমি বিচার করছি বিশেষত বর্তমানে যে সব খবর আমার কাছে এসেছে তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, প্রতিযোগিতা যুদ্ধ চলবেই এবং আমরা যে কর্মসূচী নেব তার দ্বারা উত্তম পরিবর্তিত হবে।

ব্রাগুন। অনেকের মত এই যে শীঘ্র অথবা বিলম্বে রাশিয়া চীনের বিরুদ্ধে 'পশ্চিমে'র পক্ষে যোগ দেবে। আপনার কি মনে হয় এটা অসম্ভব যে···

কেনেডি। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শনে যে তফাৎ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের চেয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে ভাবের ঐক্য দেখতে আরও অনেক বৎসর দেরি আছে।

ব্রাগুন। আপনার কি মনে হয় চীনকে জগৎ-সম্প্রদায় থেকে, ইউনাইটেড নেশন থেকে ভবিষ্যতে বর্তমানের মতো সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে ?

কেনেডি। যদি তাদের নীতি পরিবর্তিত হয়, যদি এরকম কোন ইঙ্গিত দেখা যায় যে তারা আমাদের ও দক্ষিণের দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে থাকতে উৎসুক এবং যেখানে আমাদের মতদ্বৈধ আছে সেখানে তারা হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায় তাহলে আমি বলবো সে সম্পর্ক আরও সুসমঞ্জস্য হবে। কিন্তু, এখন কোন মূর্খও বিশ্বাস করবে না যে, চীন সাম্যবাদীদের ইউনাইটেড নেশনে আনলে তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা—তাদের বাইরের অথবা ভেতরের বিশেষ প্রচেষ্টা কমাবে।

ব্রাগুন। আপনার কি মনে হয় যুক্তরাজ্য 'ফরমোসা' ছেড়ে দিতে পারে ?

কেনেডি। কিসের বিনিময়ে ? অথবা কি কারণে বা কি সর্তানুসারে ? বরঞ্চ এটা সম্ভব যে ফরমোসা একটি স্বাধীন রাজ্য বলে পরিগণিত হবে—এবং সেভাবেই থাকবে—কিন্তু সেটা যুক্তরাজ্য ও সাম্যবাদী চীনের সম্পর্কের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে তারা তাদের বর্তমান স্টালিনপন্থী নীতি কতটা জোরের সঙ্গে চালাচ্ছে এবং ভারত ও দক্ষিণপূর্বকে জোরদখল করতে চাইছে। আমার মনে হয় যুক্তরাজ্যের উচিত জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ এবং পরমাণবিক পরীক্ষায় সাম্যবাদী চীনকে ভাবধারা ও মতবাদ বিনিময়ের জন্য উৎসাহিত করা। যদি তারা এতে কৃতকার্য হয়, তাহলে আমরা অন্যান্য ব্যাপারে যে সব সমস্যা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি—যেমন সংবাদপত্রের লোকদের যেতে দেওয়া, ভ্রমণ এবং এভাবে একটি সন্তোষজনক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমি এতটা আশাবাদী নই যে ভাবতে পারি সাম্যবাদী চীন উচিতমূল্য দিতে প্রস্তুত—অন্তত তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব একটুও শিথিল করবে—আমাদের সঙ্গে একতালে গলা মেলাবে—অথবা 'ইউনাইটেড নেশনে' প্রবেশের জন্য যে সব সর্ত আছে তা পূরণ করবে। আমার মনে হয় তারা আরও স্থিরসংকল্পীকৃত, আরও নিষ্ঠুর এবং এক ভাবে

তারা তাদের এই বর্তমান অবস্থা পছন্দ করে—যাতে তারা বাধাবন্ধহীনভাবে নিজেদের খেয়াল খুশীমতো চলতে পারে।

ব্রাগুন। দূরবর্তী দ্বীপগুলি সম্বন্ধে আপনি কি ভাবেন ?

কেনেডি। আমার মতে কোয়ামি ও মাৎসুতে সীমারেখা টানা বোকামী। ফরমোসা রক্ষার জন্য তারা প্রয়োজনীয় নয় এবং তাদের রক্ষা করাও কঠিন। পাঁচ বৎসর আগে ফরমোসা নেবার সময়েই আমি তাদের ঢোকাতে অমত করেছিলাম এবং আমি বারবার বলেছি যে, এখানে সীমারেখা টানা উচিত নয়। ফরমোসা অবশ্য আমরা রক্ষা করবো।

ব্রাগুন। শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা থেকে আপনি কি শিক্ষা পেলেন ?

কেনেডি। হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারলাম যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্কের উন্নতির আভাস কতটা প্রলোভনজনক, এই সম্পর্ক যে কোন সময়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে এবং আমার মনে হয় জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা শক্তি বজায় রেখে চলবো—যাতে ভাবের আদান প্রদান সার্থক হলে আমরা লাভবান হই এবং তা বিফল হলে আমাদের নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষমতা থাকে। এই হচ্ছে প্রথম কথা।

দ্বিতীয়ত: আমি ভেবেছিলাম ইউ—২ উড্ডয়ন শীর্ষ সম্মেলনের এতো কাছাকাছি করা বোকামী। আমার মনে হয় পরিচালনা সময় ও প্রশস্তির অভাব যেজন্য এই ইঞ্জিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং তারই ফলে শীর্ষ সম্মেলন নষ্ট হয়ে গেল।

ব্রাগুন। আপনি কি আবার ইউ—২ উড্ডয়ন করতে চান ?

কেনেডি। না, ওটা মানসিক শক্তি বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল—কিন্তু, চালিয়ে গেলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

ব্রাগুন। আর একটি শীর্ষ সম্মেলনে সম্মিলিত হওয়ার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ?

কেনেডি। যতদিন না দ্বিতীয় স্তরে যুক্তিগ্রাহ্য সার্থক কর্মপন্থা নেওয়া হয়—তা বিদেশী মন্ত্রণালয়, রাজদূতবর্গীয় অথবা ইউনাইটেড নেশনে যাই হোক—যাতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে শীর্ষ সম্মেলন সার্থক হবে—এবং এতে রাশিয়া প্রকৃতই উৎসুক।

ব্রাগুন। আপনি ভারতকে সাহায্য করার জন্য এতো কিছু করেছেন—কিন্তু আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে কিছু ভেবেছেন কি ?

কেনেডি। মানে, এতে একটু প্রভেদ আছে—প্রথমত অনেকগুলি দেশ এতো অনুন্নত যে তাদের কোন কার্যকরী উন্নতিমূলক সাহায্য যা ভারতবর্ষকে দেওয়া যায়, তা দেওয়া যায় না। স্বাধীন আফ্রিকায় যুক্তরাজ্যের সাহায্য ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হতে হবে। শিক্ষকতা, অর্থনৈতিক সাহায্য, দান, শিক্ষামূলক ফাণ্ড, চিকিৎসক আদান প্রদান আমরা সহজভাবে করতে পারি। এবং আমার মনে হয় তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার দিকে আমাদের আরও সহানুভূতির প্রয়োজন।

ব্রাগুন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আপনার আলজেরিয়ান বক্তৃতায় একটা কথা ছিল, 'পশ্চিমীদের তাদের বিলম্বিত সাম্রাজ্যবাদের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

কেনেডি। হ্যাঁ, এর ওপরে চমকপ্রদ কাজ হয়েছে অবশ্য এখনও অনেক স্থান আছে যেখানে পশ্চিমীরা কলঙ্ক মুক্ত নয় এবং অনেক দেশ আছে যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পশ্চিমের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে। কিন্তু আমি বলবো যে গত পনের বৎসরে এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে যাতে আফ্রিকা পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস আওতা থেকে মুক্ত হয়েছে।

আগামী দশ বৎসরে আফ্রিকার স্বাধীনতা হবেই সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রধান সমস্যা এই যে এই সব স্বাধীন দেশের কি হবে—তারা কি স্বাধীন সমাজ রক্ষা করতে পারবে ! যে সব ইতস্তত সমস্যার মুখোমুখী হবে তা কি তারা সমাধান করতে পারবে ? সবাই যেমন আশা করছে যে জীবন তাদের নিকট সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে—তেমনি সেই জীবনকে উদারভাবে ভোগ করাও একটি বড় সমস্যা। আফ্রিকার নেতা এবং আমরা যারা স্বাধীন আফ্রিকার ওপরে বাজী ধরে বসে আছি তাদের সকলের নিকটই এটা কঠিন সমস্যা।

ব্রাগুন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বৃটিশরা আফ্রিকার সমস্যা ও আফ্রিকার লোকদের সঙ্গে মাঝামাঝি পথে মিলিত হতে চাইছে এবং আমার মনে হয় তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে অর্ধপথে কোন কাজ হয় না।

কেনেডি। দেখুন গণতন্ত্র খুব স্পর্শকাতর বৃক্ষ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্পৃহা, বলতে গেলে জোয়ারের মতো আফ্রিকাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর ওপরে কিছু গড়ে তোলা বিশেষত গণতন্ত্র আমার মনে হয় অত্যন্ত কঠিন।

আফ্রিকানদের স্থির সঙ্কল্প যে তারা স্বাধীন হবে এবং তাই হওয়াই উচিত। আফ্রিকার কঠিন সংগ্রামের দিন এখনও বাকী আছে। এবং একটা সমস্যা হলো যে এখানে আফ্রিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও কৌতূহলের অভাব অত্যন্ত বেশি। আফ্রিকার নীতি নিয়ে বৃটিশ দলে তর্কবিতর্ক হয় এবং গ্রেট বৃটেনের রাজনৈতিক পত্রিকাগুলিতে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখানে, এই যুক্তরাজ্যে যে

● কেনেডি—নিজের ছবি দেখছেন

তুলনায় খবর অত্যন্ত অল্প। এখানে এটা কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। কোন বলিষ্ঠ ভাবাবেগ নেই। সংবাদের দিক দিয়ে এখনও এটা আমাদের কাছে অন্ধকার দেশ।

ব্রাগুন। অপ্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করে আমেরিকার টাকা নষ্ট করবার সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কি করে যুক্তরাজ্য ক্রিমানের মতো এই প্রাচুর্য নিয়োগ করতে পারে যাতে সে প্রতিশ্রুতি-সমূহ রক্ষা করতে এবং পশ্চিম সমাজকে বলিষ্ঠ করতে পারে।

কেনেডি। আমার মনে হয়, যদি স্বাধীনতার মহান রক্ষক হিসেবে আমরা আমাদের অংশ অভিনয় করি—সমগ্র প্রতিশ্রুতি পালন করা, যেমন এক লোক সংখ্যার জন্য প্রস্তুত হওয়া যা আজ যা আছে কাল তার দ্বিগুণ হবে, তা হলে আমার প্রধান কাঠামো বজায় রাখতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি, স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি, গৃহ ও আমোদ প্রমোদের সুবিধে এবং আরও সব ব্যাপার এবং সেজন্য জনসাধারণের চেষ্টা প্রয়োজন—শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দেশের প্রয়োজন মিটলে হবে না। এই দায়িত্ব মোটাবার ভার স্থানীয় রাজ্য ও জাতীয় সরকারের নেওয়া উচিত। এবং এটা নিয়ে সর্বদা বাগ-বিতণ্ডা চলবে—কারণ, এর অর্থই হলো জনসাধারণের ব্যবহার্য থেকে কিছু সরিয়ে নেওয়া (যা অবিলম্বে ঘটবে) এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মলধন সৃষ্টি যা সহজে চোখে পড়বে না।

ব্রাগুন। কিন্তু আপনি কি করে লোককে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে পারবেন? এই ধরুন না কেন আরও কম টেলিভিশন সৃষ্টি করতে?

কেনেডি। কিন্তু আমি তো তাদের অপেক্ষাকৃত কম টেলিভিশন যন্ত্র তৈরি করতে বলছি না।

ব্রাগুন। ধরুন, কাপড় কাচার কল···

কেনেডি। কাপড় কাচার কল। আমার মনে হয় না তা প্রচুর আছে। আমার মতে কাপড় কাচার কল ও টেলিভিশন আমাদের জীবনের অঙ্গাঙ্গ। কাপড় কাচার কল জীবনের ভার সরিয়ে নিয়েছে এবং অনেকের মনের জানালা খুলে দিয়েছে। জনগণের খাতে অবশ্য কতকগুলি খরচ আছে যা করতেই হবে—এবং এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই উচিত। বাকী যা রইলো—যা সরকার যথাযুক্ত ভাবে ট্যাক্স তুলে করতে পারে না—তা জনসাধারণ নিজেরাই ব্যয় করুক। তারা তা নিয়ে আমাদের অপেক্ষা ভালো ভাবে কাজ করতে পারবে। কিন্তু আমি মনে করি যে, জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতেই হবে।

ব্রাগুন। আপনি যেন বুদ্ধি দিয়ে না চালিয়ে ট্যাক্সের ওপরে চালাতে চাইছেন?

কেনেডি। চালানোটাই উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচুর ট্যাক্স যোগাড় করা যাতে আমরা সাধারণ প্রতিশ্রুতি যা মেটানো প্রয়োজন তা মেটাতে পারি—যাতে জনগণের জীবনে এক অপরূপ সুসমঞ্জস ভাব আসে। আমরা লোকের রুচি নিয়ন্ত্রিত করতে চাই না। আমার মনে হয় না এখনও সে সীমায় পৌছুতে পেরেছি—এবং সরকার কখনও তা করতে সক্ষম

অনুবাদিকা—রাণু ভৌমিক

● জ্যাকলিন, নেহরু, ইন্দিরা

বিবাহে বৈচিত্র্য

এম, আব্দুর রহমান

পত্নী নির্বাচনে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

বিবাহের মাধ্যমে, একে অপরের পরিপূরকরূপে নারী এবং পুরুষের মিলনে মানুষ হয় পূর্ণাঙ্গ। সুন্দর দেহের জন্য অঙ্গ পরস্পরের সুসামঞ্জস্য প্রয়োজন। কোন অঙ্গ বিকৃত, দুর্বল, বেমানান বং বেঠিক হ'লে যেমন দেহ, ়য়োজনীয় রূপ শক্তিশালী এবং সুন্দর হয় না, তমনি পত্নী এবং পতির মধ্যে যদি ভিন্ন াদর্শ এবং ভিন্ন চরিত্র থাকে, তাহলে দাম্পত্য ীবন আশানুরূপ সুন্দর ও সুখকর হয় না। হিন্দুধর্ম াস্ত্রের পবিত্র-গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর' অর্গলা-স্তোত্রের প্রার্থনা-ন্ত্রে বলা হয়েছে।

'ভার্যাং মনোরমাম্ দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্'

হে দেবী তুমি আমাকে এমন মনোরমা পত্নী াদান কর, যে পত্নী আমার মনের ইচ্ছামত চ'লে, ামার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত ক'রে তোলে'—অতি ন্দর এই প্রার্থনার অভিব্যক্তি। জাতিধর্মনির্বিশেষে বশ্বের সকল পুরুষের ইহাই তো মনের কথা!

নারী এবং পুরুষের দাবী-দাওয়ায় এবং অধিকার ম্পর্কে মুসলিম ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরানশরীফে বিঘোষিত য়েছে—'নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে রুষের উপরেও নারীর ঠিক তেমনি অধিকার আছে।' ই অধিকার এবং দাবী-দাওয়া যে নারী এবং পুরুষ রল ও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারবে—তাদের মধ্যেই তি-পত্নী সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। কেন না—'They wives) are raiment for you (husband) and you re raiment for them—' নারী পুরুষের আবরণ এবং রুষরা নারীদের পরিচ্ছদ।(১)—শরীরের আবরু-ক্ষা—লজ্জা নিবারণ এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য য়োজন পোষাক-পরিচ্ছদের, বস্ত্রের। পশুদের বস্ত্রের য়োজন হয় না। তাদের লজ্জাবোধ নেই। কিন্তু ানুষের আছে। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষরূপে সেছে দেবতা। মানুষ সাধনাবলে অর্জন করতে পারে েবত্ব। মর্ত্যের এই মানুষ, স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে ব এবং দেবী ক'রে গড়ে তুলতে পারে, যদি উভয়ের াকে মনুষ্যত্বের সাধনা। আবার স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে চরম অপমানিত এবং লজ্জিত করে তুলতে পারে, জীবনকে ক'রে তুলতে পারে বিষময়। এজন্য পতি এবং পত্নী নির্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

অর্থ, আভিজাত্য, সৌন্দর্য এবং চরিত্র পাত্রীর এই চারটি গুণ দেখে তাকে পত্নীত্বে বরণ করা যেতে পারে। তবে যে নারী সাধ্বী ও পুণ্যময়ী তাকেই বিবাহ করা শ্রেয়, ইসলামের হাদিস-শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি পাওয়া যায় বিবাহ সম্পর্কে।

পণ্ডিত ফুলার (FULLER) বলেছেন: Take the daughter of a good mother পুণ্যময়ী মায়ের মেয়েকে বিবাহ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ ভালো ঘরের এবং ভালো মায়ের মেয়েরা সাধারণত ভালোই হয়।

মহামতি স্মাইলস্ সাহেবও এই মতে সায় দিয়েছেন: Most men and specially women are the moral slaves of the class or cast which they belong....

এই সব বিজ্ঞ পণ্ডিতদের কথা সত্য হলেও তার ব্যতিক্রম নেই, তা নয়।

সাধারণ ভাবে কোন বংশ এবং 'কওমকে' চিরকালের জন্য সামগ্রিকভাবে দোষী করা ঠিক হবে না। তবে যে, যে বংশের সন্তান, সে বংশের কিছু কিছু দোষ গুণ তার মধ্যে থাকা স্বাভাবিক।

আর্থিক দুর্দশার জন্য অনেক সময় উঁচু বংশ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যায়। আবার অর্থের স্বচ্ছলতা লাভ ক'রে এবং শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নীচু বংশ ক্রমে ক্রমে উঁচু দিকে উঠে যায় এরূপ নজিরের অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও তাদের মধ্যে নিজ নিজ বংশের ঐতিহ্য ও 'আখ্‌লাক' থেকে যায় কিছু কিছু। যেখানে এই 'আখ্‌লাক্' ও 'খোশসলৎ' অর্থাৎ আচার-ব্যবহার-স্বভাব এবং চরিত্র নিন্দনীয় নয়, সেখানে সৎ-সন্তানদের জন্ম সম্ভবপর হতে পারে।

অনুলোম বিবাহ

আদিযুগ হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন 'জামানায়' এরূপ বহু 'নজির' রয়েছে, সেখানে উচ্চ বংশের পুরুষ অনুন্নত বংশের মেয়েকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন। উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ, নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করলে সে বিবাহ 'অনুলোম' বিবাহ নামে আখ্যাত হয়। এরূপ

১। কোরআন, সুরা বাকারা আয়েত ২২৮ এবং ১৮৭।

২৫—৩

বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান খ্যাতিমান হতে পারে। 'বশিষ্ঠ'পুত্র 'শক্তি' চণ্ডাল জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পরাশরকে জন্ম দেন। পরাশর মুনির ঔরসে এবং বৈশ্যকন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্ম হয় বেদব্যাসের। বেদব্যাস যশস্বরনামা মানুষ।(২)

যৌন-বিজ্ঞানীদের মতে একই বংশ-গোত্রের মধ্যে বার বার বিয়ে না হয়ে যেমন মুসলমানদের মধ্যে হয়, যদি মর্যাদাসম্পন্ন ভিন্ন-গোত্রের মেয়ে আনা হয়, তাহলে তাদের সন্তান প্রতিভাসম্পন্ন হওয়া সমধিক সম্ভব।

মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয় বিবাহ বহুলপ্রচলিত। বারবার আত্মীয় বিবাহের ফলে, সে বংশে যে সব সন্তান জন্মায়, তাদের অধিকাংশই প্রতিভাহীন হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গসৌষ্ঠবও তাদের সুন্দর হয় না। কয়েকটি মুসলিম পরিবারের তিন হতে চার পুরুষ পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা করে ইহা দেখা গেছে। এজন্য মনে হয় যৌনবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis) সাহেবের উক্তি সত্য। তিনি বলেছেন:

এক বংশের সঙ্গে আর এক বংশের বারবার বিবাহের কুফল

Wherever the races have remaind comparatively pure, we have seldom find any high or energetic civilisation and never any fine flowering genius. (৩) জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণ যেখানে কম ঘটেছে, সেখানে সভ্যতা জোরালো হবার অথবা উচ্চস্তরে উঠবার সুযোগ পায় নি। তিনি আরও বলেছেন:

Wherever on the other hand, we find a land, where two unlike races, each of fine quality, have become intermingled and are in process of fusion, there we find a breed of men who have left their mark on the world and have given birth to great poets and artists. (৪)....

—পক্ষান্তরে সেখানেই ভিন্ন প্রকৃতির দু'টো উচ্চস্তরের বংশের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে, সেইখানেই আমরা দেখতে পাই একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা কালের ললাটে রেখে গেছেন তাঁদের স্বাক্ষর এবং পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন বড় বড় কবি এবং শিল্পী।

যৌন ও মনোবিজ্ঞানীদের এবম্বিধ অভিমত যেমন আঙুলের তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি আবার সকল ক্ষেত্রে নির্বিবাদে অব্যর্থ বলে স্বীকার করাও যায় না। তবে ইহা না মেনে উপায় নেই যে, উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত কৃষ্টিসম্পন্ন বিভিন্নগোত্রের নর-নারীর মিলনে যে সন্তানের জন্ম হয়, সে সন্তানের মধ্যে প্রতিভার বিকাশের সম্ভাবনা স্বাভাবিক। এজন্য বিবাহের পূর্বে বংশের শিক্ষা-দীক্ষা, মান-মর্য্যাদা, ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে 'ওয়াকিফ্‌হাল' হওয়া দরকার। বংশ তথা জাতিকে উন্নত করে গড়ে তুলতে হলে বিবাহকালে পাত্র-পাত্রীর জীবনধারায় ও বংশ-কুলজি পরীক্ষা করা দরকার। অনেকেরই অভিমত:

Biological selection is the method of race-improvement.

সৌন্দর্য স্বর্গীয় বস্তু। কাজেই রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু রূপের মধ্যে যদি গুণের সমাবেশ না থাকে, তা'হলে সে রূপ শেষ পর্যন্ত মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এজন্য কেবলমাত্র রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করলে ঠকতে হয়। মানুষের রূপ-যৌবন অস্থায়ী কিন্তু অন্তরের রূপ-গুণ চিরস্থায়ী। এজন্য রূপের চেয়ে গুণের মূল্য ঢের ঢের বেশী কিম্মতী। একই সঙ্গে রূপ এবং গুণ পাওয়া ভাগ্যের কথা। সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করতে হবে, যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে সে তার ভাবী বংশধরের সত্যিকার মা হতে পারবে কি না। সে সৎ-সন্তানের জননী হয়ে বংশকে উন্নত উজ্জ্বল ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারবে কি না এবং তার হাতে জীবন ও জীবনের সব কিছু সঁপে দিলে সে দায়িত্ব সে বহন করতে পারবে কি না।

গুণহীন রূপ কিম্মতী নহে

মহামতি লুথার এ বিষয়ে যে উক্তি করেছেন, তা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন:

The utmost blessing that God confer on a man is the possession of a good and pious wife, with whom we may live in peace and tranquility whom he may confide his whole possession even his life and welfare.

পুরুষ যেমন রূপ সৌন্দর্যময়ী গুণবতী স্ত্রী চায় নারীও চায় তেমনি মনোমত স্বামী। মন সকলের এক নয়। এ বিষয়ে নানান কিসিমের নারীর নানান রূপ পছন্দ। 'ফরাসী জনমত পরিষদ' এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। সে দেশের নারীদের প্রথম পছন্দ হ'ল স্বামীর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব।

নারীরা কেমন স্বামী চায়

ফরাসী মেয়েদের শতকরা পঞ্চাশ জন চায়, তাদের স্বামীরা হবে শুভ্র চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বে উচ্চ স্থানে

২। জয়িষ্ণু হিন্দু: পৃ: ১৪।

৩। Views and Reviews by Havelock Ellis, page 83.

৪। Views and Reviews, page 83.

অধিকারী। শতকরা উনচল্লিশজন মেয়ের ইচ্ছা স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর হবে তাদের স্বামী।

শতকরা ছয়জন মেয়ে এমন স্বামী চায়, যে স্বামী একান্ত ভাবে ভালবাসবে তার স্ত্রীকে। স্বামী সম্পূর্ণ 'কাবেজে' থাকবে স্ত্রীর। শতকরা পাঁচজন নারীর কাম্য, তাদের স্বামী হবে উচ্চপদস্থ, অর্থবান এবং সমাজের উঁচুতলার মানুষ। শতকরা তিনজন জানানা এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাদের স্বামীরা সব কিছু দিয়ে যেন তাদের মন জয় করতে পারে। শতকরা দুইজন পাত্রী চায় এমন পাত্র, যারা হবে উন্নত রুচির মানুষ। শতকরা আটজন কনে চায় এমন বর, যারা হবে সকল রকম গুণের অধিকারী। (৫) আমাদের দেশে এরূপ কোন হিসাব তালিকা সংগ্রহের সুযোগ কম। তথাপি আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞানীরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সকল দেশের মেয়ের ঠিক এক না হলেও তাদের বাসনা কামনার ধারা অনুরূপ। তার মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক নেই।

নারীরা রূপবান স্বামী চাইলেও, ও-বিষয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা তীব্র নয়। তারা সাধারণভাবে চায় পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামী, সচ্চরিত্র, সহৃদয় এবং স্বাস্থ্যবান স্বামী, সমাজে এবং দেশে যার প্রতিষ্ঠা আছে আর আছে অর্থ এমন পুরুষ।

পণপ্রথা দুরারোগ্য

বর্তমান অর্থনৈতিক প্রাধান্যের যুগে সবচেয়ে বড় হয়ে, প্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে 'রূপেয়া'। মেয়ে রূপ-গুণবতী হলেও তার বিয়ে দিতে গিয়ে বাপ-মার চোখে সর্ষেফুল ফোটে। উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারলে ভালো ঘর-বর পাওয়া যায় না। পণপ্রথা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের পক্ষে নিদারুণ এক অভিশাপস্বরূপ। এই অভিশাপের হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে বহু 'স্নেহলতাকে'ই জীবন আহুতি দিতে হয়েছে। এরূপ আত্মদানের ফলে দেশবাসীর মনোভাব সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত না হলেও সমাজের চিন্তানায়কদের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। এ সব দেখেও মুসলিম কওমের শিক্ষিত (?) সমাজের মধ্যে অবহিত হবার লক্ষণ দেখা দূরে থাকুক, তাঁরা নূতন করে নব উদ্যমে পণপ্রথাকে আঁকড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছেন। উপোষী ছারপোকার কামড় যে অধিকতর তীব্র হবে এ তো জানা কথা!

সুখের কথা, এক শ্রেণীর শিক্ষিতা হিন্দু মেয়ে এই অবাঞ্ছিত পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মত শক্তি সঞ্চয় করেছেন। তাঁদের একাংশ আজ চিরকুমারী হয়ে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইহা আকাঙ্ক্ষিত না হলেও বর্তমান অবস্থায় তাঁদের সৎসাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

পণপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন করবার জন্য শিক্ষিতা মেয়েরা চিরকুমারী থাকুন, এরূপ উপদেশ আমরা দিতে চাই না। তবে বাপ-মাকে ভিটে ছাড়া করার চেয়ে চির-কুমারী থাকা ভালো। মেয়েদের দৃঢ়তা দেখে অনেক শিক্ষিত ছেলের সুবুদ্ধি উদয় হতে পারে এবং দু' একটি ক্ষেত্রে তা' হচ্ছেও।

পণলোভী পিতার পরাজয়

আমাদের জানা দু'একটি ঘটনা হতে আমরা এরূপ আশা পোষণ করেছি। কয়েক বছর আগেকার কথা এক ইঞ্জিনিয়ার চাকুরে ছেলের বাপ, অনেকদিন ধরে বিশ হাজার টাকা পণ হেঁকে বসেছিলেন। অনূঢ়া কন্যার বাবারা আসছেন, যাচ্ছেন, দরবার করছেন কিন্তু ভদ্রলোকের সেই এক কথা। নগদ বিশহাজার তঙ্কা গুণে না দিলে তিনি ছেলের বিয়ে দেবেন না। এ দিকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, বাবা গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। অপর দিকে ছেলে কিন্তু বসে নেই। দূর প্রবাসে ছেলে একটি শিক্ষিতা মেয়েকে রেজেস্টারী করে বিয়ে করে ফেললেন। পরে বাবা ছেলের কীর্তির কথা শুনলেন। ছেলের মুখ দেখা বন্ধ করলেন। ছেলেরও বন্ধ হ'ল বাড়ি আসা। তারপর এই ইঞ্জিনিয়ার-দম্পতির ঘরে এলো নব-জাতক। ছেলের মায়ের দৌত্যে পিতা-পুত্রে মিলন হ'ল। বিশহাজার রূপেয়া ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকলো না। এই নিয়ে আজও তিনি আপশোস করেন।

৫। 'ফরাসী জন পরিষদের' এই ফিরিস্তি সংকলন করেছিলেন, যুগান্তর পত্রিকায় তৎকালীন ফরাসী দেশস্থ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দিলীপ মালাকার মহাশয়। আমরা যুগান্তরের ২৫।১১।৫৯ তারিখে প্রকাশিত তাঁর 'প্রেম ও বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং উক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। —লেখক।

'সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশমাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।'

—বঙ্কিমচন্দ্র

গ্রীক ক্ল্যাসিকস্

এ্যাসকাইলাস বিরচিত 'প্রমিথিয়ুস ভিংকাটস্' মহানাট্যের কয়েকটি দৃশ্য অনুসরণে

বন্দী প্রমিথিয়ুস

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

[পুরাণ-কথা ঃ দেবতাদের পল্লী ছিল উচ্চভূমিতে, স্বর্গপুরে। তাঁরা বাস করতেন প্রাসাদে, হর্ম্যশীর্ষে, স্ব মন্দিরে। মানুষ বাস করত বনে। বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় একাধিপত্য ছিল দেবতার। আয়ত্তাধীন ছিল বজ্র, বা বায়ু, বাষ্পের শক্তি। কলা-কৌশল বর্জিত মানুষ, বিতাড়িত পশুর মতো গুহায়, বৃক্ষকোটরে অতিবাহি করত জীবন।

দেববংশজাত প্রমিথিয়ুস ছিলেন দিব্যদর্শী। একদা অরণ্যবাসী মানবের বেদনায় বিচলিত হয়ে, সর্ব শা উৎস অগ্নিশিখা, দেবতাদের অগোচরে মানুষকে করলেন দান।

অন্ধকার মানব পল্লীতে অকস্মাৎ একদিন দীপালী উৎসব দেখে চমকে উঠলেন দেবরাজ জীয়ুস। গ উঠে বললেন,—'দেবতার আধিপত্য বিনষ্ট করল কে? বজ্রধারী জীয়ুসকে অবমাননা করবার শক্তি আছে কা

ধরা পড়লেন প্রমিথিয়ুস। নির্বাসন দণ্ড হল তাঁর। ককেসস্ পর্বতের চূড়ায়, শৃঙ্খলিত, শল্যবিদ্ধ অবস্থায় ব রইলেন তিনি।

কিন্তু ভবিষ্যৎদর্শী প্রমিথিয়ুস জানতেন যে, একটি রহস্যময় বিবাহের ফলে, আপন পুত্র হস্তেই জীয়ুসের চ নিগ্রহ ও বিনাশ। তাই নিষ্পেষিত, নির্যাতিত হয়েও তিনি দৃপ্তকণ্ঠে অস্বীকার করলেন শক্তিদম্ভী জীয়ুসের শ্রেষ্ঠত্ব।

আপন অনাগত ভবিষ্যৎ জানবার উৎকণ্ঠায় জীয়ুসও কঠোর উৎপীড়ন শুরু করলেন শৃঙ্খলিত প্রমিথিয়ুসের উপর।

দৃশ্য

ককেসস্ পর্বত। বন্দী প্রমিথিয়ুস, শক্তি ও সন্ত্রাসের প্রতীক—বাহুবল ও যন্ত্রশিল্পী হিফেস্টাস।

বাহুবল। হেথা পৃথিবীর সীমা, আর নাহি পথ।
হেরো এই মহারণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বত—
দৃষ্ট-অদৃষ্টের মাঝে তুলি অন্তরাল
বিস্তারিছে নিত্যকাল আতঙ্কের জাল।
পাণ্ডুর শিখর প্রান্তে, সর্বসময়,
জলেস্থলে, অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত শুধু ভয়।
সুররাজ জীয়ুসের মানিয়া শাসন,
উদ্ধত তস্করে দিতে দণ্ড, নির্বাসন,
হেথায় এনেছি টানি। আমি বাহুবল,
প্রমিথিয়ুসেরে দিতে সমুচিত ফল।
স্বর্গ হতে অগ্নিশিখা হরি অগোচরে।
দীপালী জ্বালালো মূঢ় মানুষের ঘরে।
দেবতার মুখে কালি দিল কুলাঙ্গার।
লভিবে চরম শাস্তি, রক্ষা নাহি আর।
দেবশিল্পী হিফেস্টাস, দক্ষ লোহকার,
সমাধান কর এবে কর্তব্য তোমার।
যন্ত্রবলে তৎপরতা করিয়া প্রকাশ,
অঙ্গে এর লগ্ন কর লৌহময় পাশ।
কীলকে গ্রথিত করি পর্বতচূড়ায়,
দাম্ভিকের দম্ভ নাশো মুদ্গরের ঘায়।
স্পর্ধিত অন্যায়কারী, সুরপুর-অরি।
নম্রতা শিখাও এরে শল্য বিদ্ধ করি।
মানুষের দুঃখে ওর বড় কাঁদে প্রাণ!
দেখি আজি কে উহারে করে পরিত্রাণ।

হিফেস্টাস। পালিলে প্রভুর আজ্ঞা তুমি বাহুবল—
সন্ত্রাসের মুখ্যমন্ত্রী, কর্তব্যে অটল!
কিন্তু মনে দ্বন্দ্ব মম জাগে বারংবার,
কেমনে বন্ধন দিব অঙ্গে দেবতার?
কেমনে গ্রথিব এরে গিরিশৃঙ্গ 'পর,
হুহু রবে ঝঞ্ঝা যেথা বহে নিরন্তর?
ভাবিতে হৃদয় মোর শতধা বিদারে।
তবু জীয়ুসের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে কে পারে?
ক্ষণিকের চিত্তক্ষোভ ক্ষমো বাহুবল।
মুহূর্তে পরাব এরে বেষ্টনী, শৃঙ্খল।
হায় থিমিসের পুত্র। আদর্শ-পূজারী।
তব অপমানে অশ্রু সংবরিতে নারি।

জীয়ুসের আজ্ঞাবাহী এ-যান্ত্রিক হাত,
অনিচ্ছাতে অঙ্গে তব করিছে আঘাত।
হায় বন্দী! কর্ণে তব না পশিবে আর,
মর্ত্ত্য-মানবের কণ্ঠ, বাণী মমতার!
অতিম্র প্রস্তরসম এই শৈলচূড়ে
পাশবদ্ধ রবে একা। সূর্যতাপে পুড়ে,
কালি হবে শুভ্রকান্তি, তনু হবে ক্ষীণ।
তিমিরবসনা রাত্রি চাবে উদাসীন
লক্ষ চক্ষু মেলি তব ক্লান্ত মুখপানে।
সন্তাপহারিণী স্নিগ্ধ নিশা অবসানে,
উদিবে মার্তণ্ড পুনঃ, খর তাপে তার
গলিবে পর্বতশীর্ষে নিশার তুষার।—
হিমস্পর্শে শিহরিবে তব, নগ্নদেহ।
তোমারে ত্রাণিতে আজো জন্মে নাই কেহ।
এ কি হেরি অদৃষ্টের অপরূপ খেলা,
দেবকুলে জন্মি সহ দেবতার হেলা!
বুদ্ধিহীন মানবের নাশি দুঃখভার,
ভালবেসে আলো জ্বেলে ঘরে দিলে তার।
সেই ক্রোধে সুরপতি হারাইয়া জ্ঞান,
সুকঠোর দণ্ড তব করিল বিধান।
জনশূন্য, রুক্ষ এই গিরিপ্রান্ত দেশে,
নির্যাতিত হবে তুমি নিমেষে নিমেষে।
বন্ধনে আড়ষ্ট তনু রবে যষ্টি প্রায়।
নিদ্রা না রহিবে চোখে উদগ্র ব্যথায়।
নিরুদ্ধ নিশ্বাস তব, আর্ত কণ্ঠস্বর,
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি শৈল শ্রেণী 'পর
মিলাইয়া যাবে ধীরে অনন্ত আকাশে।
সান্ত্বনা দানিতে কেহ না রহিবে পাশে।
শক্তিমান্ জীয়ুসের ক্ষমাহীন নীতি,
সঞ্চারিবে বক্ষে তব অন্তহীন ভীতি।
হায় এ কি অভিশপ্ত রাজসিংহাসন!
যে-ই বসে সে-ই হয় পশুর মতন?

বাহুবল। কাজ কর, কাজ কর, কর্মে দেহ মন!
বন্ধ কর, নারীসম ব্যাকুল ক্রন্দন
না শোভে তোমারে। ঘৃণিত এ সুর অরি,
নরলোকে আলো জ্বালে প্রবঞ্চনা করি।

হিফেস্টাস। হোক সে অপাত্র তবু দেবের আত্মীয়।

বাহুবল। সত্য বটে, কিন্তু চোর নহে বরণীয়।
কার কে আত্মীয় তাতে কিবা আসে যায়?
এড়াইতে চাহ বুঝি কর্তব্যের দায়?

হিফেস্টাস। নির্মম, কঠোর তব দয়াহীন মন!

বাহুবল। ক্রন্দনে কি হবে এর বন্ধন মোচন?
অপচয় না করিয়া মিথ্যা আঁখিজল,
হাপরে উত্তপ্ত কর শলকা সকল!

হিফেস্টাস। কি কুক্ষণে করেছিনু যন্ত্র আবিষ্কার!

বাহুবল। যন্ত্রে না দোষিয়ো বৃথা, যন্ত্র নির্বিকার।

হিফেস্টাস। ইচ্ছা হয় অন্যে দিতে এ কর্মের ভার।

বাহুবল। নিজ ইচ্ছা বলি কিছু নাহিকো তোমার।
একমাত্র ইচ্ছাময় জীয়ুসই প্রধান,
সমস্বরে গাহি মোরা তাঁরি জয়গান।

হিফেস্টাস। জানি তাহা ভালমতে, করি তা স্বীকার।

বাহুবল। দুর্জনে দণ্ডিতে তবে কেন এ বিকার?
না জানি কখন হেথা আসে সুরপতি।—
সুদৃঢ় বন্ধনে বাহু বাঁধ শীঘ্রগতি!

হিফেস্টাস। বেশ, তবে লৌহবালা দিলাম পরায়ে।

বাহুবল। না না, এ রয়েছে ঢিলা, হাতুড়ির ঘায়ে
বারে বারে ঠুকে এরে শক্ত কর আরো,
প্রস্তরে কীলক যাতে প্রবেশে প্রগাঢ়!

হিফেস্টাস। অমস্থর, অবিশ্রাম করিতেছি কাজ।

বাহুবল। ত্রুটি যদি থাকে কিছু সে তোমারি লাজ।
বড় ধূর্ত, হস্তে এর আরো বেড় দাও।
সূচ্যগ্র সুযোগ পেলে হবে এ উধাও!

হিফেস্টাস। গ্রথিনু পাষাণ গাত্রে বলয় ইহার।
এ বাহু শিথিল করে সাধ্য আছে কার!

বাহুবল। ধন্য যন্ত্রী! বাঁধ এবে অন্য বাহুখান!
লৌহময় যুক্তি হানি প্রকাশ প্রমাণ—
জীয়ুসের সমতুল্য নহে সে চতুর!
দেবদ্রোহী দুরাত্মার দর্প হোক চূর!

হিফেস্টাস। বন্দী, তব ব্যথা মোরে করিছে বিহ্বল!

বাহুবল। জীয়ুসের বৈরী লাগি ফেলো অশ্রুজল?
যন্ত্রশিল্পী হিফেস্টাস, হয়তো ও চোখে
ফেলিতে হইবে অশ্রু তব নিজ শোকে!

হিফেস্টাস। কি যন্ত্রণা সহে দেখ, দন্তে দন্ত চাপি!

বাহুবল। দুঃখ কিবা, কর্মফল ভোগ করে পাপী।
পার্শ্বে ওর তীক্ষ্ণ শল্য করহ ভিড়ন!

হিফেস্টাস। এ কার্যে আমারে আর না কর পীড়ন!

বাহুবল। রাজ-আজ্ঞা পালিতেছ, পীড়ন কে বলে?
দক্ষতা দেখাও বেড়ি অর্পি পদতলে।

হিফেস্টাস। যা কিছু বন্ধন-কর্ম করিয়াছি শেষ।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য, অন্য কি আদেশ?

বাহুবল। বলয়, কীলক, শল্য হাতুড়ির ঘায়
ঠুকে ঠুকে দেখ, ঢিলা কি আছে কোথায়!

হিফেস্টাস। বাক্য ও বদন তব বড়ই ভীষণ!

বাহুবল। নারীসম নমনীয় নহে এই মন।

লাভিলে তো পরিচয় মোর দৃঢ়তার ?
সম্ভ্রম করিতে শেখো শক্তিরে আমার।
হেফেস্টাস। শৃঙ্খলিত সর্বঅঙ্গ আর চিন্তা নাই।
বন্দী আজি অগ্নিবাহ।—চল ফিরে যাই।
বাহুবল। অগ্নি-অপহারী ওরে উদ্ধত তস্কর।
আনন্দে এ গিরিশৃঙ্গে থাক নিরন্তর।
শিখায়েছ নরে বটে অগ্নি ব্যবহার,
তাহে কি লাঘব হবে যন্ত্রণা তোমার ?
শুনেছিনু পূর্বে তব নামের ব্যাখ্যান—
ভবিতব্য জ্ঞাত তুমি দিব্যদৃষ্টিমান্।
কোথা তব দিব্যদৃষ্টি ? কত তার বল ?
অহঙ্কারী। ভাঙ্গ দেখি এ বজ্র শৃঙ্খল।

[প্রস্থান।

(প্রমিথিয়ুসের নৈরাশ্য ও উদ্‌বোধন)

প্রমিথিয়ুস। অনন্ত বিস্ময়ে পূর্ণ হে নভোমণ্ডল !
ঝঞ্ঝাপক্ষ, বেগবান্ পবন চঞ্চল,
স্রোতস্বিনী, মহাসিন্ধু—তরঙ্গ উত্তাল,
মাতা বসুমতী চেয়ে দেখ ক্ষণকাল !
হে সূর্য, তুমিও দেখ প্রদীপ্ত আলোকে,
দেবতার নির্যাতন, সর্বদর্শী চোখে !
অহর্নিশি সহিতেছি অসম্মানভার,
সহস্র বর্ষেও তবু নাহিকো নিস্তার।
নৈরাশ্যের পারাবারে তরঙ্গ দুর্দাম,
আমারে ঘেরিয়া নৃত্য করে অবিশ্রাম !
রিপু মোর সুররাজ, নবশক্তিধর !
দাঙিল বান্ধিয়া অঙ্গে এ বজ্র-নিগড়।
অন্তহীন যন্ত্রণার নাহিকো বিরাম
সকলি অদৃষ্ট হায় ! একি পরিণাম।
ধৈর্য ধর। ক্ষুব্ধ মন, না হও অস্থির !
মোর চক্ষে গূঢ় নহে ভবিষ্য তিমির।
নাম মোর দিব্যদর্শী। দূরাদৃষ্টে জয়
সহস্র বৎসর অন্তে করিব নিশ্চয়।
কালগ্রস্ত জীয়ুসের গর্ব, অহঙ্কার,
লুপ্ত হবে বাহুবল, যন্ত্রবল তার।
আজি যদি কথা কই হইয়া মুখর,
অথবা এ শৈলসম থাকি নিরুত্তর—
উভয়ে যন্ত্রণা মম। তাই শুধু বলি,—
মানবকল্যাণ লাগি এনেছিনু ছলি
সর্বসহায়ক অগ্নি অস্ত্র—পৃথিবীতে।
প্রগতিবিহীন নরে দীক্ষাদান দিতে।
এই মোর অপরাধ, দণ্ড তারি তরে।
কীলক গ্রথিত অঙ্গ পর্বত শিখরে।
শ্যামলা বসুধা নিম্নে, সূর্য মহাকাশে,
ঝঙ্কৃছে শৃঙ্খল মম ঝঞ্ঝার নিশ্বাসে।

(প্রমিথিয়ুস ও চারণগণ)

প্রমিথিয়ুস। স্তব্ধ হয়েছিনু আমি কহি নাই কথা,
গর্ব এর অর্থ নয়, এ নহে ভীরুতা।
হেরি যবে অঙ্গলগ্ন এই লৌহপাশ,
বক্ষ ভেদি বাহিরায় নিরুদ্ধ নিশ্বাস !
মর্ত্যলোকে অগ্নি-বিধি করিয়া বিস্তার,
আধিপত্য হরেছিনু, স্বর্গে দেবতার।
এ-কাহিনী গুপ্ত নহে বিদিত সর্বথা।
শুন কিছু মানবের ইতিবৃত্ত কথা !
কদর্য, পঙ্কিল ছিল বসবাস তার,
কৃমিসম বংশ শুধু করিত বিস্তার।
শিল্পকলা বিবর্জিত, বোধ, বুদ্ধিহীন,
গুহায়, কোটরে বৃক্ষে কাটাইত দিন।
অলস, অকর্মা সবে 'ভয়'-দেবতারে,
নরনারী বলি দিয়া পূজিত আঁধারে।
চক্ষুষ্মান্ ছিল তারা, না ছিল দর্শন।
কর্ণধারী ছিল তবু না ছিল শ্রবণ।
শৌর্যশূন্য, বলহীন, ম্লান দেহ-মন,
অনন্ত দুঃস্বপ্ন মাঝে যাপিত জীবন।
না জানিত শিল্পরীতি গৃহ রচনায়,
না জানিত কাষ্ঠ, লৌহ, অস্ত্র ব্যবহার।
কবে যে রাক্ষসী—শীত করে আক্রমণ ?
বসন্তে ঘটিবে কবে পুলক-মিলন ?
গ্রীষ্ম এলে বাহিরিবে খুঁজিতে আহার ?—
এ-সবের পূর্বজ্ঞান না ছিল তাহার।
শিখানু মানবে সূর্য, তারকার গতি,—
শক্তি উৎস পাবকের নিয়োগ পদ্ধতি
শিখানু তাহারে চিহ্ন সংখ্যা গণনায়,
উদ্‌ঘাটিনু বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার।
সংগঠিনু চক্রযান, দ্রুত ভ্রমিবারে,
পশুপালনে বিদ্যা শিখাইনু তারে।
প্রসারিত শুভ্র পালে বায়ু-শক্তি ভরি,
উত্তাল তরঙ্গ পরে ভাসাইনু তরী।
সঞ্চারিনু বক্ষে তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী আশা,—
মূক মানবের কণ্ঠে দানি দেবভাষা।
কত না কৌশলে নরে সঁপি অগ্নিবল,
আজি নিজ মুক্তি লাগি না মিলে কৌশল !
চারণগণ। এ কি তব পরিণাম, হায় হায় হায় !
ব্যাধিগ্রস্ত বৈদ্যরাজ ঔষধ না পায়

প্রমিথিয়ুস। আরো শুন মানবের ইতিহাসধারা।
রোগ-ব্যাধি নিবারিতে না জানিত তারা।
না জানিত ঔষধের সঞ্জাত কল্যাণ,
রোগীরে বর্জিত দেহে থাকিতেই প্রাণ,
ব্যাধি নিবারণী বিদ্যা করি তারে দান—
ঔষধ-প্রয়োগরীতি, অংশ পরিমাণ,
পাচক, রেচক আদি শিখানু তাহারে।
ভূতল, ভূধর খুঁজি ধৈর্যসহকারে—
স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহ, কাংস্য করিয়া সন্ধান,
অকিঞ্চন নিঃস্ব নরে করি বিত্তবান্।
পৃথক পৃথক করি কি লাভ বর্ণিয়া,
সর্বশিল্প মানবেরে দিনু সমর্পিয়া

চারণগণ। মর্ত্যলোকে আর্তজনে দানিলে অভয়,
হায়! তবু ভাগ্য তব অন্ধকারময়।
জীয়ুসে হানিয়া যবে হইবে স্বাধীন,
না জানি হেরিব কবে সেই শুভদিন?

প্রমিথিয়ুস। নহে নহে অদৃষ্টের ইচ্ছা তাহা নয়,
যতদিন আছে দুঃখ ভুঞ্জিব নিশ্চয়।
নিত্য দহি জীয়ুসের রোষাগ্নি বর্ষণে,
নিয়তিরে জানি লব নির্মল-দর্শনে।

চারণগণ। নিয়তি কাহার সংজ্ঞা? কেবা সেইজন?

প্রমিথিয়ুস। দুর্ভাগ্যের দেবী তিনি, রুষ্ট সদা মন।

চারণগণ। জীয়ুসের পরে দেবী তুষ্ট বুঝি অতি?

প্রমিথিয়ুস। নিয়তির হাতে কারো নাহি অব্যাহতি।

চারণগণ। সম্মানের সিংহাসনে চির-অধিকার,—
এই বুঝি দেবী-রোষে দুর্ভাগ্য তাহার?

প্রমিথিয়ুস। এ প্রশ্নের আজি আমি না দিব উত্তর।

চারণগণ। গোপন বারতা বুঝি? তাই এত ডর?

প্রমিথিয়ুস। সময়ে ফলিবে ফল, শুধায়ো না আর,
এ-বার্তা প্রচ্ছন্ন রবে অন্তরে আমার।
নীরবে মানিয়া লব সর্ব নির্যাতন,
শুভলগ্নে ভগ্ন হবে এ ঘোর বন্ধন।

(প্রমিথিয়ুস কর্তৃক জীয়ুসের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার)

প্রমিথিয়ুস। জানি জানি একদিন লভিবে বিরতি,
স্বেচ্ছাচারী জীয়ুসের গর্বোদ্ধত গতি।
নিদারুণ নিয়তির উচ্চ পরিহাসে,
আবদ্ধ হবে সে গূঢ় পরিণয়-পাশে।—
জন্মিবে সন্ততি তার। দুর্দৈব ভীষণ।
সেই পুত্র উচ্ছেদিবে পিতৃ-সিংহাসন।
অনাগত এই দূর ভবিষ্যের কথা,
পড়িতে শেখে নি কোনো স্বর্গের দেবতা।
নাম মোর দিব্যদর্শী, চৈতন্য আলোকে,
জীয়ুসের ভাগ্যলিপি হেরি দিব্য-চোখে।
সৈন্য তার, শক্তি তার, যন্ত্র, ধনবল,
নারিবে রক্ষিতে তারে, হবে সে বিফল।
বজ্র হতে ভয়ঙ্কর, বৈরী আত্মজাত,—
দর্পিত দেবতারাজে করিবে উৎখাত।
দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের এই দুর্লঙ্ঘ্য বিচার—
আপন আত্মজ হস্তে ধ্বংস অনিবার।
রাজত্ব দাসত্ব মাঝে কত ব্যবধান,
শিখাবে নিয়তি তারে, চূর্ণি অভিমান।

চারণগণ। ভবিষ্যদ্বাণী তব চিত্তের দুরাশা।

প্রমিথিয়ুস। চিত্ত মম নিত্য জ্ঞাত অদৃষ্টের ভাষা।

চারণগণ। জীয়ুস কি যোগ্য শাস্তি পাবে অতঃপর?

প্রমিথিয়ুস। মোর দণ্ড হতে তাহা আরো ভয়ংকর।

চারণগণ। উপেক্ষিছ দেবরাজে, নাহি তব ভয়?

প্রমিথিয়ুস। গ্রাহ্য নাহি করি তারে, আমি মৃত্যুঞ্জয়।

চারণগণ। জানিলে যন্ত্রণা তব বাড়াইবে অরি।

প্রমিথিয়ুস। হানুক সকল শক্তি, তারে নাহি ডরি।

চারণগণ। বুদ্ধিমান নত হয় শক্তির সম্মুখে।

প্রমিথিয়ুস। সে-ই হবে নত যার ধৈর্য নাই বুকে।
কুটিল জীয়ুসে আমি করি অস্বীকার।
জানি মনে সীমাবদ্ধ আস্ফালন তার।
শাসন সুদীর্ঘ কভু নহে সুরপুরে।
দেখ দেখ, রাজদূত ওই আসে দূরে।
জীয়ুসের অনাগত, অদৃষ্টের ভাষা,
জানিবে সন্ত্রাসি মোরে,—করেছে দুরাশা।

(হারমেসের প্রবেশ)

হারমেস। পাপাত্মা, কৌশলী, ধূর্ত, হীন ফন্দিবাজ,
রসনায় বিষ তোর, নাহি শঙ্কা, লাজ।
দেবতার শক্তি উৎস পাবক-প্রধান,
চুরি করি নরলোকে করে এলি দান।
যাক এবে শুন মম প্রভুর বারতা,—
তুমি নাকি জান তাঁর ভবিষ্যের কথা।
অজানিত পরিণয়ে জন্মিবে তনয়,
তারি হাতে জীয়ুসের দণ্ড, পরাজয়।
দিব্যদর্শী, কি দেখেছ? সত্য করি কহ।
জেগেছে প্রভুর বক্ষে দুশ্চিন্তা, দুঃসহ।
কি ঘটিবে ভবিষ্যতে জানা যদি যায়,
শক্তিধর দেবরাজ নিবারিতে তায়।
হেথা মম আগমন এই সে কারণ।
না ভাণ্ডাও মোরে,—কহ সত্য বিবরণ।
প্রভুর রোষের হেতু না হইয়ো আর,
জীয়ুস দয়ালু বড়, আজ্ঞা মান তাঁর।

প্রমিথিয়ুস। উচ্চাঙ্গের বাক্য তব, পূর্ণ আড়ম্বর—
যেমন পালক তার তেমনি নফর!
লভিয়াছ নব শক্তি, নূতন শাসন,
তাই তব লজ্জাহীন, রুক্ষ সম্ভাষণ।
দুর্ভাগ্য মেলিবে যবে নিরন্ধ্র তিমির,
বাক্যজালে বাধা তারে দিও সুরবীর!
অদৃষ্টের ভিত্তি 'পরে রাজ সিংহাসন,
নিত্য করে টলমল! পূর্বে দুইজন,
শক্তি লোভী মূল্য তার করে গেছে দান।
তৃতীয় জীয়ুস, তারো নাহি পরিত্রাণ!
দম্ভ তার ক্ষণস্থায়ী, অল্পদিন পরে,
নিশ্চিহ্ন হবে সে জানি অতল গহ্বরে।
শক্তি মদ্যপানে আজি মত্ত সুরপতি।
ভেবেছ কি ভয়ে তারে জানাইব নতি?
দূর হও, পদ-পঙ্কে দ্রুত কর ভর,
তোমার প্রশ্নের কোনো দিব না উত্তর।

হারমেস। এই অবিনয় আর অবাধ্যতা তরে,
শল্যবিদ্ধ আজি তুমি পর্বত শিখরে।

প্রমিথিয়ুস। যতই রাঙাও চোখ, জেনে রেখো সার,
তোমা সম ভৃত্য নহি জীয়ুস রাজার।

হারমেস। হেরি তব জীর্ণ, নগ্ন, শৃঙ্খলিত দেহ,
মনে হয়, জীয়ুসের দাসত্বই শ্রেয়।

প্রমিথিয়ুস। ঘৃণিতের শ্লাঘা তার নিজ ঘৃণ্য কাজে!

হারমেস। সে উল্লাস, অঙ্গে তব ঝঙ্কারিয়া বাজে!

প্রমিথিয়ুস। বৈরীর বিনাশ হেরি, তাই এ উল্লাস।
তুমি তারি একজন হীন ক্রীতদাস!

হারমেস। দুষ্ট কর্ম সাধি তবু তর্জিছ নিলাজ?

প্রমিথিয়ুস। নরলোকে আলো জ্বালা নহে দুষ্ট কাজ!
আলো, হাওয়া, শিল্পকলা, আরাম, বিশ্রাম,
সুরপুরে সীমাবদ্ধ যবে হেরিলাম,—
তখনি জানিনু মম দিব্যদৃষ্টি বলে,
স্বার্থপর সুররাজ্য যাবে রসাতলে!
দেবতা প্রাসাদে রবে? মানুষ কাননে?
সর্ব দেবতারে আমি ঘৃণা করি মনে!

হারমেস। বাক্য তব সাক্ষ্যদানে,—ব্যাধি গুরুতর!

প্রমিথিয়ুস। মিথ্যা নহে। ঘৃণারোগে অঙ্গ জরজর!

হারমেস। মুক্ত হলে কি করিতে, ভাবা নাহি যায়!

প্রমিথিয়ুস। পাশবদ্ধ বন্দী আমি, কি করিব হায়!

হারমেস। জীয়ুসের মুখে কিন্তু হা-হুতাশ নাই।

প্রমিথিয়ুস। দুর্দিনের কাছে মোরা বহু শিক্ষা পাই।

হারমেস। তবু না সংযম হেরি জিহ্বার বিকাশে!

প্রমিথিয়ুস। সত্য বটে, তাই আজো ভাষি ক্রীতদাসে!

হারমেস। বালক নহিকো আমি ভুলাবে বচনে।
জীয়ুসের ভাগ্যফল কহ এইক্ষণে!

প্রমিথিয়ুস। জ্ঞান তব গণ্ডিবদ্ধ, শিশুর স্বভাব,
তাই ভাবিতেছ পাবে প্রশ্নের জবাব।
আজি তব মহাপ্রভু আতঙ্কে চঞ্চল,
গোচর করিতে নিজ অদৃষ্টের ফল।
অনাগত, অনিশ্চিত, অজানার ভয়,
তাহারে করিবে আরো নির্মম, নির্দয়।
নব নব নির্যাতন করি আবিষ্কার,
বাড়াইবে পলে পলে যন্ত্রণা আমার।
তবু না জানিবে কবে নিজ পুত্র তার,—
চূর্ণিবে সকল দর্প প্রমত্ত পিতার!

হারমেস। মন্ত্র-উক্তি উদ্গিরণে মুক্তি কি মিলিবে?

প্রমিথিয়ুস। জানি তব প্রভু মোরে আরো শাস্তি দিবে।
সুররাজ জীয়ুসের অনন্ত শক্তির,
নাহি তব জ্ঞান বন্দী, নত কর শির!

প্রমিথিয়ুস। স্তব্ধ হও! ত্যজো তব নির্লজ্জ ভাষণ:
ওই হেরি কালগ্রস্ত রাজ সিংহাসন!
ক্রীতদাস, স্থির তুমি জানিও নিশ্চয়,
দিব্যদর্শী, দেবরাজে নাহি করে ভয়!
জীয়ুসের পদতলে যুক্ত করি কর,
মাগিব না মুক্তি কভু, জানিও নফর!

হারমেস। অবোধে বুঝানো দায়, ওরে ছিন্নমতি,
অবাধ্য ভুজঙ্গসম বক্র তব গতি।
বিদ্রোহ-মশাল তব শৃঙ্খলিত করে,
নিমেষে নিবিবে রুষ্ট জীয়ুসের ঝড়ে!
বন্ধহীন বেদনার তরঙ্গ ভয়াল,
তৃণসম উৎক্ষেপিবে তোরে চিরকাল!
বজ্রাঘাতে দীর্ণ করি এ মহাপর্বত,
তোমারে ফেলিবে নিম্নে ভগ্ন পাত্রবৎ।
নিষ্পেষিত অঙ্গ তব শিলাখণ্ডভারে,
রুদ্ধ রবে অন্তহীন ঘোর অন্ধকারে!
তারি মাঝে পক্ষধারী শকুন্ত বিকট,
তিমিরে আসিবে উড়ে তোমার নিকট।
তীক্ষ্ণনখে বক্ষপেশী করিয়া মোক্ষণ,
হৃদয়ের মেদমাংস করিবে ভক্ষণ।
নিত্য আসি চঞ্চুঘাতে বাড়াইবে ক্ষত।—
জীয়ুসের রসাতলে শাস্তি এই মতো!
এ নহে অলীক বাক্য, নহে ইহা ছল,
দিব্যদর্শী, চাহ যদি আপন মঙ্গল,
ব্যক্ত কর জীয়ুসের ভাগ্য বিড়ম্বনা!
সত্বরিত মুক্তি পাবে, ঘুচিবে যন্ত্রণা!

চারণগণ। দেবপ্রতিনিধি ভাষে যুক্তিযুক্ত বাণী,
দিব্যবোধ! উপরোধ লহ তাঁর মানি!

প্রমিথিয়ুস। বৈরীদূত বৈরী তারে না করি প্রত্যয়,
জ্ঞাত ছিনু আজি মোরে দেখাইবে ভয়।
করুক যা সাধ্য তার প্রভু শক্তিমান্!
ঝলসে উঠুক তার বিদ্যুতের বাণ!
গরজে উঠুক বজ্র ভেদিয়া আকাশ,
পবনে প্রগল্‌ভ হোক ঝটিকা নিশ্বাস!
বসুধা কম্পিত হোক বাসুকির শিরে,—
কল্লোলিত ক্ষিপ্তসিন্ধু প্রলয় তিমিরে
প্রমত্ত নর্তনে মাতি বাধাবন্ধহারা
নিষিক্ত করুক নভে সূর্য, চন্দ্র, তারা!
বজ্রযন্ত্র হানি মম অঙ্গে দম্ভভরে,
নিক্ষিপ্ত করুক নিম্নে অতল গহ্বরে!
হেথা তার সর্বশক্তি লভিবে বিলয়।
তবু না জিনিবে মোরে,—আমি মৃত্যুঞ্জয়!

হারমেস। বুদ্ধি তব ব্যাধিগ্রস্ত নাহি তাহে ভুল,
প্রলাপ বকিছ তাই হইয়া বাতুল!
শুন হে চারণবৃন্দ, যে পাপীর তরে
মমতায় অশ্রুরাশি আঁখি হতে ঝরে,
তাহারে বর্জিয়া এবে কর পলায়ন!
জীয়ুসের বজ্রাঘাতে সমস্ত গগন
ভাঙিয়া পড়িবে এই দুর্জনের শিরে।
পালাও, পালাও ত্যজি এ মহাপাপীরে!

চারণগণ। সদাশয় স্বর্গদূত, সুমন্ত্রণা তব,
পালিতে অক্ষম মোরা। মাথা পাতি লব,
প্রমিথিয়ুসের সাথে সর্ব দুঃখ তার।—
চারণ-সঙ্গীতে নাশি প্রলয় আঁধার!

হারমেস। মরমী গায়ককুল শুন বলি তবে'—
কল্পনা-অতীত তব এখনি যা হবে!—
বাহুবল, যন্ত্রবল, বিত্তবলে বলী,
জীয়ুস হানিবে বজ্র ধ্বংসি ভূমণ্ডলী!
বন্দীর প্রলাপ বাক্যে করিয়া নির্ভর,
বিনষ্ট না হও সবে!—ওই আসে ঝড়

প্রমিথিয়ুস। এলো এলো, এলো অশুভ লগন!
ভূতল, ভূধর কাঁপে! অনন্ত গগন
ঘোর অন্ধকার মগ্ন! বিদ্যুৎ-নাগিনী
মেঘমঞ্চে নৃত্যপরা। গর্জন রাগিণী
বাজিয়া উঠিছে ওই লক্ষ বজ্ররবে!
উত্তরে, দক্ষিণে আর পশ্চিমে পূরবে,
ঝঞ্ঝাবাতে উৎপাটিছে বৃক্ষ, বনস্পতি।
ঘূর্ণবায়ু মেলে বাহু ঊর্ধ্ব পানে গতি।
বন্যাবেগে অগ্নি বাষ্প প্লাবিয়া সংসার,
আকাশে সমুদ্রে মিশে হল একাকার।
জীয়ুস হানিয়া তার জড়শক্তি বল
অমৃত আত্মারে মোর করেছে বিকল।
মুহূর্তের লাগি! বসুমাতা দেখ চেয়ে!
অনাচারী, স্বার্থপর সত্যে ফেলে ছেয়ে!
হে সূর্য, তুমিও দেখ সর্বদর্শী চোখে,
দেবতার অসম্মান হেরো দেবলোকে!

পথ চলা

মাণিক মুখোপাধ্যায়

শুভ্র ডানা বিহংগেরা ফিরে যায়
খরতাপ বৈশাখের শ্রান্তি নিয়ে চোখে,
চুপিসার এককোণে দীঘিটার পাশে
নীরব বিশ্রামে আর্ত, জীবিকার শোকে!

দিগন্তের সার বেয়ে বেয়ে রাশি রাশি মেঘ
মর্ত্যের তৃষ্ণাকে নিয়ে শূন্যপথে ধায়,
সারাদিন সারা রাত দাহনের জ্বালা
যেন এক চক্রান্তের যন্ত্রণা বিলায়!

কি আশ্চর্য, তবু এই কঠিন মাটিতে
অপরূপ ফুল ফোটে, প্রেম ভালোবাসা
দীপ্ত থেকে দীপ্ততর জীবনের ঘরে
অহর্নিশ দেয় এক শ্রাবণের আশা।

হাতে তাই হাত রাখি, কথা বলি কত
নানা সুরে নানা রাগে কতো না সংহত।

জনতা

বীরু চট্টোপাধ্যায়

এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে দুর্জয় বিষাণ,
জয়মাল্য এক হাতে, অন্য হাতে রক্তের নিশান।
কখনো উল্লাসে মত্ত, কখনো বা সক্রুদ্ধ গর্জন।
আলিঙ্গনে মুক্তকণ্ঠ, মুহূর্তেই সরোষ বর্জন।
সচ্ছলে বিহ্বল চিত্ত, অভাবে স্বভাব প্রতিরোধ,
শত্রুতে জ্বলন্ত দৃষ্টি, স্বজনের প্রতি মিত্র বোধ।
কখনো পলায় ত্রাসে, কখনো মরণে দেয় ঝাঁপ।
ন্যায়েতে বশিষ্ঠ মুনি, অন্যায়েতে বিষধর সাপ।
কভু বা দক্ষিণে হেলে, কভু তার বামপন্থা গতি,
কখন কিরূপ থাকে দেবের অজানা সেই মতি।
সরল বিশ্বাসে হৃষ্ট, রাত্রিশেষে পুরো অবিশ্বাসী,
আজ যারে গালি পাড়ে কাল তার প্রতি ফোটে হাসি।
এমনি যে সিদ্ধিদাতা পরম জনতা তারই নাম।
তারই পায়ে অবনত যুগে যুগে রাজ্যের প্রণাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবার জন্যে ব্যাকুলতা জাগল শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। তাঁর অনুরোধে রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে। শারীর লক্ষণ দেখবার জন্যে মহর্ষিকে গাত্রবাস উন্মোচন করতে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন দেবেন্দ্রনাথ। ঠাকুর দেখলেন, তাঁর গৌরবর্ণ বক্ষদেশে যেন অজস্র সিঁদুর ছড়ানো—বিশেষ কোনো যোগাভ্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ এটি।

দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ঠাকুর মহিমাচরণপ্রমুখ ভক্তদের নিকট বলেছিলেন—'দেখলাম যোগ-ভোগ দুইই আছে, অনেক ছেলেপুলে ছোট ছোট, ডাক্তার এসেছে,—তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক-ওদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি'। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।'

তখন বেদ থেকে কিছু পাঠ করে পরমহংসদেবকে শোনালেন মহর্ষি। পঞ্চবটীতে ধ্যানযোগ অভ্যাসকালে একবার ঠাকুরের যে-রকম দর্শন হয়েছিল, তার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বেদব্যাখ্যানের মিল দেখে বিস্মিত হলেন ঠাকুর।

দুই মহাপুরুষের এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারকালে মহর্ষির কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিতান্তই শিশু। রমাঁ রলাঁ তাঁর The Life of Ramkrishna (tr. by E. F. Malcolm-Smith) নামক বইয়ের (4th impression, P. 162, F. N. I) এই প্রসঙ্গে বলেছেন : Rabindranath Tagore was then four years old. অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ছিল তখন চার বছর। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল ছোট ছোট ছেলেপুলের কথা উল্লেখ করেছেন, শিশু-রবি ছিলেন হয় তো তাদের একজন।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের যখন দেখা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স যে ছিল চার বছর রলাঁ একথা উল্লেখ করেছেন কতকটা আন্দাজের উপর নির্ভর করে। কেন না এই সাক্ষাৎকারের কাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। রলাঁ নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন :—

'It has not been possible for me to ascertai[n] precisely the date of his visit to Devendra Nat[h] Tagore. The Hindu authorities do not agre[e] upon this point. It cannot have been later tha[n] 1869-1870. The Tagores give 1864-65 as th[e] approximate date. The authorised biographer [of] Ramkrishna, M. (Mohendra Nath Gupta[)] ascribes it to 1863 on the ground that Ramkrish[na] gave it to be understood that in the course [of] this visit he saw Keshab Chandra Sen officiati[ng] in the pulpit of the Adi-Brahmo Samaj. Kesh[ab] was only the minister of the Samaj from 1862 [to] 1865 and there are several reasons why Ra[m]krishna could not have made the journey [in] 1864-5'.

(*The Life of Ramkrishna*, p. 97, F. N.

রবীন্দ্রনাথ

যাই হোক ঠাকুর এবং মহর্ষির সাক্ষাৎকারের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এ বিষয়ে সংশয় নেই যে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের নিতান্তই শৈশবকালে এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে থাকলেও সেই ঘটনার কোনো ছাপ শিশু-রবির মনে না পড়ার সম্ভাব্যতাই সমধিক।

আদি, নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই তিনটি শাখার সঙ্গেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত। ব্রাহ্মসমাজের বহু উৎসবানুষ্ঠানে ঠাকুরের উপস্থিতির বিবরণ সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই কথামৃত (৮র্থ ভাগ, চতুর্থ খণ্ড) থেকেই জানতে পারা যায় যে, ১৮৮৩ সালের ২রা মে নন্দনবাগানে 'আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী' ৺কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে রাখাল, শ্রীম প্রমুখ ভক্তগণসহ উপস্থিত হয়ে একটি উৎসবে যোগদান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে শ্রীম বলেছেন :

'ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্মভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি জানকীনাথ ঘোষালও (সরলা দেবীর পিতা) এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সেদিন যে কথালাপ হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল ষড় রিপুর মোড় ফেরানো।

ঠাকুরের শ্রীমুখাৎ সেদিন ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। তাঁর বয়স তখন বাইশ বৎসর। ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে ব্রাহ্মসমাজে তখন তিনি বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই তিনটি শাখারই নানা অনুষ্ঠানে তাঁর যোগদানের কথা জানতে পারা যায় সেকালের পত্র-পত্রিকা থেকে।

কেশবের 'নববিধান' ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান। কিন্তু 'আদি' ও 'সাধারণ' ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে রল্যাঁ বলেছেন :

'The other two branches of the Brahmo Samaj showed him for less regard. The most recent the Sadharan Samaj, owed him a grudge on account of his influence over Keshab. At the Adi Brahmo Samaj of Devendranath he was doubtless regarded as belonging to a lower level.'

অর্থাৎ, ব্রাহ্মসমাজের অপর দু'টি শাখা তাঁর প্রতি খুব কমই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল। কেশবের উপর প্রভাবের দরুন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ছিল তাঁর ওপর বিরূপ। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে তিনি নিঃসন্দেহে নীচুস্তরের লোক বলে গণ্য হতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের এই উন্নাসিকতাপূর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল নন্দনবাগানের উৎসবে আমন্ত্রিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অসৌজন্যপূর্ণ আচরণে। উৎসব শেষ হল রাত ন'টায়। সুরু হল লুচি-মিঠাই ইত্যাদি পরিবেশনের পালা। কিন্তু দেখা গেল, ঠাকুর এবং তাঁর সঙ্গে আগত ভক্তদের সম্বন্ধে সবাই উদাসীন। এই প্রসঙ্গেই রল্যাঁ বলেছেন :—

'At one visit which he paid to it (May 2, 1883), and which Rabindra Nath Tagore may perhaps remember, since he was present as a lad, his reception was hardly courteous.'

(*Life of Ramkrishna*, P/84 F. N I.)

অর্থাৎ, একবার যখন তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজে যান (মে ২, ১৮৮৩), তখন তাঁর প্রতি যে ধরণের আচরণ করা হয়েছিল তাকে শিষ্টাচার সম্মত বলা চলে না। এই ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে থাকতে পারে, কেন না বালক রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ঘটনা সম্বন্ধে বা শ্রীরামকৃষ্ণকে আর কখনো তিনি দেখেছিলেন কি না, সে সম্পর্কে কোথাও কিছু বলেছেন কি না তার হদিস এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ সমকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীদের এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল সেই মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্ম-ভাবনা কি কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে নি রবীন্দ্রনাথের উপর। এই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পেয়েছি ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁর রচনায়। তিনি শুধু যে রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্যকেই সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তা নয়, সক্ষম হয়েছিলেন ভারতের আত্মাকেও আবিষ্কার করতে *The Life of Vivekananda and The Universal Gospe* নামক তাঁর বিখ্যাত বইয়ে (3rd impression, P. 318...19)

রল্যাঁ বলেছেন :

'.........As for Tagore, whose Goethe-like genius stands at the junction of all the rivers of India, it is permissible to presume that in him are united and harmonised the two currents of the Brahmo Samaj (transmitted to him by his father, the Maharshi) and of the New Vedantism of Ramkrishna and Vivekananda Rich in both, free in both, he has serenely wedded the west and the east in his own spirit.'

অর্থাৎ, যাঁর গ্যেটে-সদৃশ প্রতিভা দাঁড়িয়ে আছে ভারতের যাবতীয় ভাব-প্রবাহিনীর সঙ্গমস্থলে সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁর মধ্যে একীভূত এবং সমন্বিত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজের দুইটি ধারা (তাঁর মধ্যে তাঁর পিতা মহর্ষি দ্বারা সঞ্চারিত) এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নব বেদান্তবাদ। এতদুভয় ধারায় সমৃদ্ধ এবং বিমুক্ত হয়ে স্বীয় আত্মায় প্রশান্তভাবে মিলন ঘটিয়েছেন তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের।'

রবীন্দ্রনাথের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে রল্যাঁর মন্তব্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি অসতর্ক উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে অবান্তর হবে না বলে মনে করি। প্রভাতবাবু রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি, ১৩৬৯, দেশ পত্রিকায় 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার' (পৃঃ ১১৪) অভিধাযুক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন : 'রম্যাঁ রল্যাঁকে (sic) দিয়েও পরমহংস ও বিবেকানন্দের জীবনকথা লেখানো হয়েছে এবং তাঁকে যে সব উপকরণ সরবরাহ করা হয়, তাতে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিশুদ্ধতা সর্বত্র রক্ষিত হয় নি বলেই জানি।'

এই উক্তি শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, আপত্তিজনকও বটে। প্রশ্ন এই যে রলাঁ কি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন অপরের অনুরোধে? বইখানি যদি তাঁকে দিয়ে লেখানোই হয়ে থাকে। তা'হলে কি এ-কথাই সত্য বলে মেনে নিতে হবে যে, এই গ্রন্থ রচনার পিছনে তাঁর অন্তরের তাগিদ ছিল না? এ-সম্বন্ধে রলাঁর নিজের উক্তি থেকে কিন্তু মনে এই প্রতীতিই জন্মে যে, এই গ্রন্থ রচনার উৎসাহ এবং উদ্যম সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর অন্তরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের *The Face of Silence* নামক বইখানা পড়ে। *The Life of Ramkrishna* গ্রন্থের Bibliography অংশে (পৃ: ৩২৫) উপরোক্ত বইখানি সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

'For my own part I can never forget that it was to the perusal of this beautiful book that I owe my first knowledge of Ramakrishna and the impetus leading me to undertake this work.' বইয়ের গোড়াকার দিকে সন্নিবিষ্ট To My Eastern Readers এবং To My Western Readers শীর্ষক অধ্যায় দু'টি অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলেও এ বিষয়ে বিগত-সংশয় হওয়া যায় যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী রলাঁকে দিয়ে 'লেখানো' হয় নি, অন্তর্লোকের অধ্যাত্মভাবনাই তাঁকে এই কৃত্য সম্পাদন দু'টি বৎসর ব্যয়িত করতে প্রবৃত্ত করেছিল। তা ছাড়া রলাঁর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনীতে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিশুদ্ধতা কোন্ কোন্ স্থানে বক্ষিত হয় নি, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করাই ছিল সমীচীন। রলাঁ কিন্তু তাঁর রামকৃষ্ণ-জীবনীতে To My Western Readers শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃ: ১১) নিজের সম্বন্ধে 'An historian by profession' এই কথাগুলির উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া বইয়ের ভূমিকায় যাঁদের নিকট তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন, তাঁদের যোগান দেওয়া তথ্যাদির নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত।

"বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি'র বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে রলাঁর দৃষ্টি কত সজাগ ও সতর্ক তা বইখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করলেই বোধগম্য হয়। রলাঁ রচিত এই জীবনীগ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ার কারণ এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের বিবৃত ঘটনাসমূহের সমাহরণ ও সন্নিবেশ—এমন ধারণা যদি কেউ পোষণ করেন, তাহলে তাঁর পক্ষে বিবেকানন্দের প্রমুখাৎশ্রুত বিবরণের উপর ভিত্তি করে ম্যাক্সমূলার রচিত পরমহংসদেবের জীবনী(১) সম্বন্ধে রলাঁর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি।

রলাঁ বলেছেন:

Max Muller......took down from the lips of Vivekananda an account of the life of Paramahamsa and faithfully reproduced it in his precious little book. For he maintained that what he calls the 'dialogue of dialectic process' used to describe events seen and experienced by contemporaries, a process, which is a kind of inversion of reality, by credible and live witnesses, is one of the indispensable elements of history.'

(*Life of Ramakrishna*, P, 23, F. N.)

রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে রলাঁর রামকৃষ্ণ জীবনী সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না এই জন্যে যে, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ এবং রলাঁ তিনজনেই এঁরা ভারতপথিক, অধ্যাত্মলোকের দূরাভিযাত্রী এবং পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। রলাঁর রামকৃষ্ণ জীবনীতে নানা স্থানে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এই ত্রয়ীর আত্মিক সম্পর্ককে খণ্ডিত ও বিকৃত করে দেখলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

১। এই জীবনীগ্রন্থের প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত এবং অনৈতিহাসিক উক্তি করেছেন প্রভাতবাবু 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের' প্রথম ইংরেজী জীবনী লিখলেন ম্যাক্স মূলার। অর্থাৎ পশ্চিমের পণ্ডিতদের প্রশস্তির দ্বারা তাঁর মহত্ব প্রচারিত হল।'...প্রকৃত তথ্য কিন্তু অন্যরূপ। ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবন-চরিত রচয়িতা ম্যাক্স মূলার নয়। তার বহু পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই কৃত্যটি সম্পন্ন করেন। '১৮৭৯ খৃ: অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় The Theistic Quarterly Review পত্রের ৩২-৩৯ পৃষ্ঠায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'The Hindu Saint' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৮৭৬ খৃ: ১৬ই এপ্রিলের। Sunday Mirror পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্ট খণ্ড পৃ: ৪৬৩) যে সকল কারণে ম্যাক্স মূলার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী প্রণয়নে প্রণোদিত হন, তার অন্যতম হচ্ছে প্রতাপ মজুমদার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাঠ ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত,' 'ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিয়ান টনি মহোদয় লিখিত' রামকৃষ্ণচরিতও তাঁকে এই মহা জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে A Real Mahatma শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খৃ: আগষ্ট মাসের The Nineteenth Century পত্রে। এই প্রবন্ধটিই পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খৃ:। অর্থাৎ প্রতাপ মজুমদারের রচনা প্রকাশের উনিশ বছর পরে। রলাঁ যাঁকে 'The authorised biographer of Ramakrishna' বলে উল্লেখ করেছেন সেই শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) লিখিত *The Gospel of Sri Ramakrishna Or The ideal Man for India and The World* অভিধাযুক্ত গ্রন্থ দুই খণ্ডে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। এই বইয়ের সম্পর্কে রলাঁ বলেছেন—'This Gospel of Sri Ramakrishna is as valuable as the great Biography (No. 1)...(The Life of Ramakrishna. P 323). রলাঁর উল্লিখিত *The Great Biography* (No. 1) গ্রন্থ হচ্ছে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ।'

রবীন্দ্রনাথ যে একবার রামকৃষ্ণের মুখে অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান শুনেছিলেন তা এই প্রবন্ধে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর যৌবনকালেই এই মহাপুরুষের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ শিক্ষিত বাঙালীর মনোজগতে যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে-বিষয়েও অনবহিত ছিলেন না তিনি। কিন্তু শিক্ষিত মহলে প্রচলিত ধারণা এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে কোনো উক্তিই করেন নি রবীন্দ্রনাথ। এই ধারণারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই প্রভাতকুমারের রচনায়, রবীন্দ্রজীবন কথায় (পৃ: ২৩২) তিনি বলেছেন—'...রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্যও চার পংক্তি কবিতা ও তার ইংরেজি তর্জমা লিখে পাঠালেন। কবি এ পর্যন্ত কখনো পরমহংসদেবের সম্বন্ধে কোনো ভাষণ বা উক্তি করেন নি; এবার যে করলেন তার পিছনে ছিল অন্যের অনুরোধ।'

রবীন্দ্র জীবনীকারের এই উক্তিটি কিন্তু তথ্য সমর্থিত নহে। শতবার্ষিকী উৎসবের পূর্ব পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'ভাষণ' হয় তো 'করেন নি' (?), কিন্তু অন্তত একটি উক্তি যে করেছিলেন তার প্রমাণ ঐ উৎসবের সুদীর্ঘকাল পূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'রাজা ও প্রজা' গ্রন্থের 'পথ ও পাথেয়' শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ। তাতে ভারতের মহান্ ঐক্য সংস্থাপকদের—রলাঁর ভাষায় 'The Builders of Unity'—প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :—'এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায় বিরোধ বিচ্ছিন্নতায় চতুর্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শংকরাচার্য সেই সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিক জ্ঞান-প্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষে জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকারী অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল—তখন চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতি অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদাঘাত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনি যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।'

শতবার্ষিকী উৎসবের পূর্বে এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আর কোথাও উল্লেখ করেছেন কি না বা তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কি না তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাদিতে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলে রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু কিছু অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া অসম্ভব নয়।

অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক তরুণ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন সিমুলিয়া পল্লীর ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় (নভেম্বর, ১৮৮১) তখন তাঁকে তিনি শুনিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজে লেখা দু'টি গান। তারপর নরেন্দ্রনাথের যাতায়াত শুরু হল দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে গেলেই ঠাকুরকে গান শোনাতেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন: 'প্রথম যখন নরেন্দ্র এলো, তখন বাংলা গান বেশি জানত না।' ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণ গীতিকারদের রচনায় ব্রাহ্মসমাজের সংগীত ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে লাগল এবং নরেন্দ্রনাথও নবরচিত গানগুলি আয়ত্ত করলেন। 'কথামৃত' গ্রন্থে দেখতে পাই ১৮৮২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত শ্রবণে দিব্যানন্দলাভ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

১৮৮৫ সালের ২৪শে অক্টোবর ভক্ত দেবেন্দ্রর বাড়িতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেন্দ্র গুপ্ত, মহিমা চক্রবর্তী প্রভৃতির উপস্থিতিতে ঠাকুরের আদেশে নরেন্দ্র যে ছয়টি গান গেয়েছিলেন তন্মধ্যে (১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা আর (২) মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ—এই দু'টি গান রবীন্দ্ররচিত।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর। বেলা সাড়ে পাঁচটা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সার রোগে ক্লিষ্ট। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার এসে তাঁর হাত দেখলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। নরেন্দ্রনাথ গান ধরলেন 'চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার'। গান শুনতে শুনতে গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় নরেন্দ্রর কণ্ঠে প্রথমই নিঃসৃত হল রবীন্দ্রসংগীত: 'এ কি এ সুন্দর শোভা কি মুখ হেরি এ'।

ঠাকুরের সন্নিধানে আর যে সকল গান গাইতেন নরেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি আমি যুগান্তর সাময়িকীতে।

এবার ১৩৩৭ সালের ৩রা মার্চ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে সভাপতিরূপে প্রদত্ত, রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এ বিষয়েও রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার সত্যের অপলাপ করেছেন। তিনি বলেছেন—'শতবার্ষিক' কমিটির ধর্মমহাসম্মেলনে কবি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি পরমহংসদেবের ধর্মমত ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নি, কেবল বুঝিয়েছিলেন ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকার কি সর্বনাশা পরিণাম।'

—রবীন্দ্র-জীবন-কথা পৃঃ ২৩২।

এই মন্তব্য যে ভ্রান্ত তার প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের ভাষণের গোড়ার দিক থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণের বরণীয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"I venerate Paramahamsa Deb because he, in an arid age of religious nihilism, proved the truth of our spiritual heritage by realizing it, because the largeness of his spirit could comprehend seemingly antagonistic modes of Sadhana, and because the simplicity of his soul shares for all time the pomp and pedantry of pontiffs and pundits,....."

অর্থাৎ, আমি পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধা করি কেন না ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদের বন্ধ্যা যুগে আত্মোপলব্ধির দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন তিনি আমাদের অধ্যাত্ম উত্তরাধিকারের সত্যতা। তাঁর উদার অন্তরাত্মা

আপাত পরস্পরবিরোধী রূপে প্রতীয়মান বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল এবং তাঁর আত্মার সারল্যের কাছে পণ্ডিত এবং ধর্মযাজকদের বাহ্যাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যাভিমান চিরকালের জন্য ধিক্কৃত।

এই ভাবেরই আর এক জায়গায় বলেছেন: 'Great souls, like Ramakrishna Paramahamsa, have a compr-ehensive vision of truth, they have the power to grasp the significance of each different form of the reality that is one in all....'

অর্থাৎ, রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত মহাত্মাদের আছে সত্যের প্রতি এক ব্যাপক দৃষ্টি, যে সত্য সামগ্রিকভাবে এক তার প্রত্যেকটি বিভিন্ন রূপের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করবার শক্তি আছে তাঁদের।

উদ্ধৃতিগুলি অনুধাবন করলে এ-কথাই কি মনে হয় না যে, পরমহংসদেবের 'ধর্মমত এবং ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে সারকথাই বিধৃত রয়েছে এই একটিমাত্র পঙ্‌ক্তির মধ্যে। কারুর অসতর্ক কোনো বিশেষ মনোভাবপ্রসূত উক্তির দরুণ এ বিষয়ে সাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া একান্তই অবাঞ্ছিত।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ *The Cultural Heritage of India* নামক বিরাট গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের গোড়ার দিকে The Spirit of India শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাতে উদ্ঘোষিত হয়েছে ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্ম আকূতি এবং এষণার কথা। তিনি বলেছেন,...

What India truly seeks is not a peace which is in negation, or in some mechanical adjustment, but that which is in *Sivam*, in goodness, which is in Advaitam, in the truth of perfect union, that India does not enjoin her children to cease from *Karma* but to perform their Karma in the presence of the Eternal, with the pure knowledge of the spiritual meaning of existence; that is the true prayer of Mother India.'

এই শতবার্ষিক অনুষ্ঠানেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে গিয়ে কবি একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অনবদ্য এবং অমূল্য কবিতায় বলেন:

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা,
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'

ভারতের অধ্যাত্ম-ভাবনার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনা নিগূঢ় তাৎপর্যটি যে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিভাসিত হয়েছিল সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টির সমক্ষে তারই অনন্ত নিদর্শন এই পঙ্‌ক্তি কয়টি। এই কবি-প্রণামের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের বরণীয় স্মৃতির উদ্দেশে।

অল্ডাস হাক্সলি

শিল্পী ও জীবন

(১৮৯৪-১৯৬৩)

'...I write with care, earnestly, with passion even, just as if I had a soul to save by giving expression to (my thoughts).'

উপরোক্ত উক্তিটি যদিও হাক্সলির আত্মজীবনীতে লেখা হয় নি, তাঁর লেখা 'দোজ ব্যারেন লিভস্' উপন্যাসের লেখক চরিত্র এই উক্তি করেছে, তবুও উক্তিটিকে অল্ডাস হাক্সলির আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তি বললে ভুল করা হবে না। হাক্সলির ব্যক্তিগত জীবন এবং সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা স্বচ্ছ তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মানব-জীবনে প্রেম, কাম এবং কল্পনার প্রভাবের কথা সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন হাক্সলি এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি যাতে এক একটি বিশেষ মানসিকতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে তার প্রতি। হাক্সলির সাহিত্যিক চেতনায় একদিকে যেমন যুদ্ধোত্তর যুগের হতাশা প্রতিবিম্বিত হয়েছে বিপরীতে তাঁর চেতনায় ধ্বনিত হয়েছে আর একটি সুর, যে সুরটির জন্ম হয়েছে পুরাতনের প্রতি হাস্যকর আকর্ষণের উৎস থেকে।

হাক্সলি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের ঋতু বদলের কথা মনে পড়ে যায়। বিশশতকের ইংরাজী উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে নব নব সৃষ্টির দ্বার দিয়ে—পুরণো নীতিবোধ ধূলোয় লুটিয়ে গিয়েছে এ কালের মানুষ যা আলোচনা করছে সাহিত্যের পাতায় তা আর কিছু নয়, যৌন বিকারের বাস্তব রূপ লরেন্সের 'Lady Chatterleys Lover' উপন্যাসে কামবাদের যাত্রা শুরু হলো—যার বিবর্তন হাক্সলির সাহিত্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। হেনরি জেমস্, কনরাড, গলস্ওয়ার্দি, ওয়েলস এবং লরেন্সের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে এগিয়ে ছিলেন অল্ডাস হাক্সলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে।

১৮৯৪ সালে যাঁর জন্ম সেই হাক্সলি কিন্তু মাত্র ১৯১০ সালে অনুভব করতে থাকেন প্রথম মহাযুদ্ধের দূরাগত পদধ্বনি। সে সময়ে অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করে গ্র্যাজুয়েট তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি প্রথমে সরকারী অফিসে চাকরী শুরু করেন এবং পরে স্কুল মাস্টারী শুরু করেন। যুদ্ধ শেষে কিছুদিন পত্রিকা অফিসে কাজ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

'মর্টাল কয়েলস' (১৯২২) এবং 'ক্রম ইয়েলো', 'অ্যান্টিক হে', 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট,' 'দোজ ব্যারেন লিভস', হাক্সলির সাহিত্য সাধনার প্রথম ফসলগুচ্ছ। এগুলির প্রথমটিকে বাদ দিলে দেখি অন্যগুলির মধ্যে 'যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ী সমাজ জীবনের' কথা ফুটে উঠেছে। অবশ্য লেখাগুলির মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবেই বিদ্রূপ ঝরে পড়েছে। এ যুগের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পুরণো নীতিবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ—হাক্সলির উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে সেই সব গুণগুলি ফুটে উঠেছে। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা কি 'এ্যান্টিক হে'র সেই প্রেমিকহারা মিসেস ভিভিয়েস অথবা 'ক্রম ইয়লোর' সেই সংস্কৃতিবান স্বামী-স্ত্রীকে ভুলতে পারেন?

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে হাক্সলির সাহিত্য চেতনা মোড় ঘুরলো—এ যুগের উপন্যাসগুলিতে মানবিকতার প্রাধান্য রূপ পেলো, বুদ্ধিবাদ ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। লরেন্সীয় দর্শন তাঁর চেতনায় সাড়া জাগাতে সুরু করলো। সে সময়ে ব্যক্তিগত জীবনে

লরেন্সের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব বেশ গভীর হয়ে উঠেছিলো। 'আইলেস ইন্ গাজা' (১৯৩৬) এবং 'এণ্ডস এ্যাণ্ড মিনস্' (১৯৩৭) গ্রন্থ দু'টিতে হাক্সলির সামগ্রিক চিন্তাধারা বিকশিত হয়ে উঠলো। তবে হাক্সলির চেতনা কেবলমাত্র সৃষ্টি ধর্মেই সীমায়িত থাকে নি। তাঁর ভারতীয় বুদ্ধিবাদ এবং অধ্যাত্মবাদের ওপর গভীর প্রীতির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এরপর হাক্সলি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব যেমনি তাঁর সাহিত্যে প্রভাব ফেলতে পারে নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও তেমনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি—এর মধ্যে যদি পলায়নী প্রবৃত্তি খুঁজতে যাওয়া হয় তা'হলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে। কেন না যুদ্ধের পটভূমিকায় হয়ত মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে—কিন্তু তা লেখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যুদ্ধের সঙ্গে যিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। হেমিংওয়ে, ওয়েন, ব্রুক প্রভৃতির সাফল্য সেকারণেই। সেও এক কারণ, তাছাড়া যুদ্ধের দানবীয়তার রূপায়ণের চিন্তা কোনদিনও হাক্সলির চেতনায় বিধৃত হয় নি। এর পরিচয় পাবেন 'এ্যান্টিক হে' উপন্যাসে—যেখানে সমস্ত কাহিনী যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অথচ যুদ্ধের কোন বর্ণনা গ্রন্থের কোথাও করেন নি হাক্সলি। আমেরিকায় বসে লেখা 'আফটার মেনি এ সামার' (১৯৪০) এবং 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ' (১৯৪৫)—দু'টিই যুদ্ধকালীন রচনা; কিন্তু কোনটিতেই যুদ্ধের কোন কথা নেই।

যন্ত্র সভ্যতার ক্রমাগত উন্নতিতে কোন বিদ্রূপ করেন নি হাক্সলি—ভীত হয়েছেন। 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসে সেই সব মানুষদের এঁকেছেন তিনি যারা কেবল দিনের পর দিন কলের পুতুলের মত হুকুম মত কাজ করে চলেছে, যাদের কোন মৌলিক অধিকার নেই—জীবনের রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ থেকে যারা বঞ্চিত। এই উপন্যাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলেন হাক্সলি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের হৃদয়-রসকে কি ভাবে নিংড়ে নিচ্ছে, যুদ্ধের বিভীষিকায় বিজ্ঞান কি আনন্দে মারণনৃত্যে উৎসুক তার ছবি এঁকেছেন অনেক আগে লেখা 'আইলেস ইন গাজা'-তে। 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ' উপন্যাসটিতে যেন হাক্সলিরই পূর্ণাবয়ব ছবি দেখি। এই উপন্যাসটি কিন্তু পূর্বসূরীদের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাতে পারে নি—সে কারণে সাহিত্য সমালোচকেরা গ্রন্থটির শিল্প-সার্থকতার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। এই উপন্যাসে তাঁর বুদ্ধিবাদ আবার ঘুরে ফিরে এসেছে এবং তার মাত্রা এবার প্রবল। অবশ্য শেষ দিকে যে ক'টি উপন্যাস লিখেছেন হাক্সলি তার মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা অনেক বাস্তব চিন্তাসমৃদ্ধ হয়েছে। বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রগুলি যে কত ভয়াবহ হতে পারে তার সব রূপ বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু রচনায় যে পথ তিনি খুঁজেছেন, যে পথে আধুনিক সভ্যতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, সে পথে চলতে গিয়ে স্বেচ্ছায় হোক বা অচেতনভাবেই হোক মানব সংস্কৃতির সমস্ত সঞ্চয় এবং বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করেছেন। সমস্ত প্রগতিবাদকে তিনি ধূসরতায় চিহ্নিত করেছেন।

হাক্সলির সাহিত্যে যৌন-জ্বালা লরেন্সের মত প্রবল না হলেও, তাতে বুদ্ধিদীপ্ত যৌন সচেতনতার ছাপ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। লরেন্সের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনারীতি লরেন্সের মত নয়। অবশ্য লরেন্সের মত তিনিও মানুষ নামক এক মননশীল পশুকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। কিন্তু লরেন্সের মত যৌন সম্পর্ককে তিনিও একই সঙ্গে সুস্থ বলতে পারেন নি। কারণ যৌন জীবনের আবেদন তাঁর কাছে কাম না হলেও তার প্রকট রূপের মধ্যে কোন সৌন্দর্যের আস্বাদ পান নি হাক্সলি। 'আফটার মেনি এ সামার' উপন্যাসটি হাক্সলির পূর্বেকার বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুরধার রচনা-রীতির কথা স্মরণ করায়। এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন যৌন সম্ভোগের বাসনায় সুদীর্ঘ দিনযাপন করতে করতে ধন ও যৌবনের অধিকারী কেমন ক'রে একটি মর্কটে রূপান্তরিত হলো।

হাক্সলির সাহিত্য-সাধনার সার্থক রূপ 'এপ এণ্ড এসেন্স' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে এবং উপন্যাসে সাহিত্যিক চেতনার সঙ্গে রাজনীতির ভবিষ্যৎ—দর্শন প্রচ্ছন্নভাবে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। হাক্সলি দেখেছেন তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটতে চলেছে—তার অবশ্যম্ভাবী ফল কিভাবে সমস্ত মানব সমাজকে ফলে ফুলে ভরে না তুলে বিপরীতে আগুন জ্বালিয়ে তুলবে, তার স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে মানবসভ্যতা ধ্বংসভূমিতে পরিণত হবে, বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেবে, 'নপুংসক পুরোহিত'রা পাশবিক অত্যাচারে উন্মত্ত হয়ে উঠবে—উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে হাক্সলি সে কথাই বলতে চেয়েছেন। বিংশ শতকের অগ্রণী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অল্ডাস হাক্সলি পথিকৃৎ স্থানীয় নিঃসন্দেহে। হাক্সলির মনটি ছিল কবির, উপন্যাসের সুর রোমান্টিক বুদ্ধিপ্রভাব সঞ্জাত। আঁদ্রে জিদ ও লরেন্সের ভাবশিষ্য হাক্সলি এককালে ইংরাজী সাহিত্যের পরিচয় ছিলেন। সমকালীন সমাজ জীবন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে হাক্সলির একটি বিশেষ ধারণা ছিল এবং উপন্যাসে সেই ধারণাগুলিকে তিনি সব সময়েই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে এবং প্রবন্ধগুলিতে তিনি জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন।

—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

এই অত্যদ্ভুত চক্র-ভ্রমরীনৃত্য দেখে চমকে উঠলেন তৌর্যত্রিকের (নৃত্য গীত বাদ্য) দেবীগণ তাঁদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড নৃত্যবাসনা। বপু গ্রহণ করে তাঁরা উপস্থিত হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

১৬। আর কি তখন ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারেন নৃত্য-গীত-বাদ্যাধ্যায়ের উপাধ্যায়েরা? তাঁরাও পৌঁছে গেলেন তাঁদের দেবীদের চরণোপাসনায়। অপরিমিত আনন্দের আবেশে দেবীরা প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করতে লাগলেন নিতান্ত নৈপুণ্যবতী।

তাঁরা প্রথমেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন হস্তাধ্যায়-দেবীকে।

এই দেবীটির প্রধান কার্য হচ্ছে, হস্ত-পদের অঙ্গুলিগুলির বিশিষ্ট বিন্যাসের মাধ্যমে পদার্থের আকৃতি প্রকট করা, এবং তন্মূলে রুচি জন্মিয়ে দেওয়া নর্তনে। তিনি এলেন, এবং এসেই…তর্জনীমূলে লীলাভরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ঠেকিয়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরভাবে অন্য করাঙ্গুলি-গুলিকে প্রসারিত করে এমন সুষ্ঠু প্রকাশ করলেন পতাকা-নামক হস্তক-ভেদ, যে মনে হল ধনিক মণিকাদের গৃহে গৃহে সত্যই বুঝি ললিত পতাকা উড়ছে।

তারপরে তিনি দেখালেন ত্রিপতাক-মুদ্রা। পতাকা-হস্ত রচনা করে এমন লীলাভরে তিনি বাঁকাতে লাগলেন অনামিকাটি, যে মনে হল যাজ্ঞিকদের সত্রে সত্রে যেন পতাকার মতই হোমধূমাবলী উঠছে।

তারপরে, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমা, এই তিনটি অঙ্গুলিকে মিলিতাগ্র করে, এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাটিকে পৃথক পৃথকভাবে ঊর্ধ্বমুখী করে এমনভাবে তিনি প্রকাশ করলেন হংসাস্য-মুদ্রা, যে সকলেরই মনে হল তাঁরা যেন সত্যিই দেখছেন একটি হাঁসের মুখ, আর সেই মুখটি যেন ধীরে ধীরে নাড়ছে, না না নরম করে নিয়ে চিবোচ্ছে একগাছি মৃণাল সানন্দে। এইভাবে তিনি তাঁর অঙ্গুলি-ভঙ্গে কত যে প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাতে লাগলেন হস্তক-মুদ্রার, ইয়ত্তা নেই তার। দ্বিতীয়ার চাঁদ এঁকে গেল…কর্তরীমুখ। টিয়ে পাখীর ঠোঁটের মত দেখতে ঐ বাঁকা বাঁকা পলাশকলিগুলোকে যেন ফুটিয়ে দিয়ে গেল তাঁর হাতের শুকতুণ্ডমুদ্রা। সাঁড়াশী দিয়ে তপ্ত সোনার সুতো টেনে বার করবার নাটক দেখিয়ে গেল সংদংশমুদ্রা। খটক-বাদ্য বাজাচ্ছেন মহাদেব…এই ছবিটি ফুটিয়ে তুলল খটকমুখ-মুদ্রা। পদ্মকোশে উৎকণ্ঠিত মধুকরশ্রেণীর যেন গুঞ্জন শোনাল পদ্মকোশ-মুদ্রা। সাপুড়ের সাপ ধরার খেলা দেখিয়ে গেল অহিতুণ্ডক। অঙ্গুলিগুলি যেন সীবন-শিল্পকলায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, এই ভঙ্গিটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করে দিল সূচীমুখ। মৃগশিরা-নক্ষত্রযুক্ত অগ্রাণপূর্ণিমার স্বপ্ন দেখিয়ে গেল মৃগশীর্ষ-মুদ্রা। অষ্টমীর চাঁদ আঁকল অর্ধচন্দ্র-মুদ্রা। কত আর বলি বলুন, কার্তবীর্য-মূর্তির মত সেই বিশুদ্ধ-সহস্রহস্তা হস্তাধ্যায়-দেবীকে অনুগৃহীত করতে দ্বিধা করলেন না তৌর্যত্রিকের দেবীগণ।

এঁদের পরেই এলেন…হরিবিলাস স্বরার্থাদি ও স্বরপাঠ বিরুদাদি সম্বলিত নানা প্রবন্ধাদির, এবং এবার যিনি গান-দেবতা, তিনি। তাঁর কৃপায় প্রকাশ পেল দু'টি মার্গতাল…চচ্চৎপুট ও চাচপুট; তিনটি দেশী তাল…হংসলীল, গজলীল ও সিংহনন্দন; প্রকাশ পেল এইগুলিরই মত আরো অনেক মহাতাল। আদিতাল, একতালী, রূপক, প্রতিমণ্ঠ, নিসারু, যতিতাল, ত্রিপুট ও আড্ডতালেরও পরিচয় দিতে বিলম্ব করলেন না তিনি।

তিনি বিদায় নিতেই, প্রবেশ করলেন দেশীয় গান দেবতা। তিনি শুনিয়ে গেলেন দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ ও পাশ্চাত্যদেশীয় গান।

বিংশ স্তবক

রাস-বিলাস

তারপরেই ঝঙ্কার তুলে আবির্ভূত হলেন…মালব, মল্লার, ভৈরব, কেদার, সারঙ্গ, নট, কর্ণাট, কামোদ, সাম, বেশাগ, গান্ধার, কল্যাণ, বসন্ত—আদি রাগসমূহ; এবং আবির্ভূতা হলেন…গুর্জরী, বিপুল-গুর্জরী, বারাটী দেশিকা, ভৈরবী, বেলাবলী, রামকিরী, প্রাসিকা, শ্রী-পালী, গৌরী, তোড়ী, গৌণ্ডগিরী, কল্যাণিকা, পৌরবী, সৈন্ধবী, শোভনবতী, আশাবরী দেশবড়ী, গোড়ী পঠমঞ্জরী, ললিতা, দেশাখী, মাগধী, কৌশিকী, প্রভৃতি রাগিণীগণ।

এঁদের সঙ্গে এলেন…সপ্তস্বর, একবিংশতি মূর্ছনা, তিনগ্রাম, অষ্টাদশ জাতি, দ্বাবিংশতি শ্রুতি এবং মাতু ও ধাতুদেবতা।

এঁদের সকলের আবির্ভাবে তৌর্যত্রিকের দেবীগণের মনে হল, তাঁরা যেন আবির্ভাব দেখলেন মূর্তিমতী নানাধ্যায়—সঙ্গীত। অনুগৃহীতা হয়ে তিনি বিদায় নিতেই, আবির্ভূতা হলেন বাদ্যাধ্যায়ের দেবতা। তাঁকে আশ্রয় করে মধুর কলধ্বনি তুলে প্রথমে এলেন বংশী, মুরলিকা, পাবিকা, উপাঙ্গাদি বিবিধ শুষির বাদ্য; তারপরে এলেন তন্ত্রাশ্রিত বীণার দল, যথা;—মহতী কবিলাসিকা, বিপঞ্চী, স্বরমণ্ডলিকা, রুদ্রবীণা, কিন্নরীবীণা; তারপরে এলেন বিবিধ আনদ্ধ-বাদ্য, যথা:—মৃদঙ্গ, ঢক্কা, ডমরু; শেষে এলেন ঘন-বাদ্য, যথা:—মন্দিরা, নূপুর, করতাল।

অনুগৃহীতা হয়ে এঁরা যখন সরে দাঁড়ালেন তখন বিলম্বিত ও মধ্য-লয়ে কান্তি প্রকাশ করতে করতে লীলাঙ্গনে আবির্ভূতা হলেন অঙ্গহারশ্রী।

১৭। তিনি প্রস্থান করতেই তাঁদের মধ্য থেকে এবার উঠে দাঁড়ালেন কয়েকটি বীণাধারিণী। কবিলাসিকা বীণায় তাঁরা ঝঙ্কার দেখাতে লেগে গেলেন স্বরমণ্ডলিকা, বিপঞ্চিকা, মহতী, রুদ্রবীণা ও তুম্বুরী বীণায়।

বিস্মিত হলেন দেবতারা। আসন্ন রাসলীলা-মহোৎসবে এ যেন সঙ্গীত-শাস্ত্রের উপনিষদগুলির মূর্ত আবির্ভাব। পদ্মের কুঁড়ির মত তাঁদের প্রত্যেকটির মুখে সে কি সরস হাস্যের শৌখিনতা। তাঁদের দেখাদেখি মৌরজিকীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন বীণাবাদিনীরা ও বেণুবাদিনীরা। এলেন গায়নীরা, তালধারিণীরা। করাঙ্গুলির বিচিত্র মুদ্রার খেলা দেখাতে দেখাতে এলেন উপাঙ্গিকীও।

…তারপরে নক্ষত্রের মত ঝলমল করতে করতে নাচতে নাচতে

এলেন বর-নর্তকীরা। কথা বলে বলে গান গাইতে গাইতে তাঁরা লাস্য-নেতৃত্ব করলেন শুদ্ধাঙ্গ-শুদ্ধতর-কর্কশ-মার্গের। তাঁরা প্রত্যেকেই যেন সঙ্গীততত্ত্বরহস্যে পারদর্শিনী।

যে গান গাইতে গাইতে তাঁরা নাচলেন, মার্গ ও দেশীয়-ভেদে সে গীত দ্বিবিধ। চচ্চৎপুটাদি পঞ্চপ্রকারের বিভিন্ন তালের খেলা দেখিয়ে তাঁরা প্রকাশ করলেন চৌত্রিশ রকমের মার্গ-প্রভেদ, এবং বিয়াল্লিশ রকমের দেশীয়প্রভেদ।

১৮। অতএব, স্বয়ং উল্লসিত হয়ে উঠলেন তালপাঠ। ফুটল বোল,—

'থৈয়া ত থ ত থ থৈয়া,

ত থ ত থ থৈয়া ত থ ত্তিথ থৈয়া।

থৈয়া ত থ থৈয়া,

থ গ থ গ থ গ—তত্তি-তধি গণ থৈ।'

১৯। অতএব, এই শব্দগুলিকে গ্রহণ করে জনৈকা তালধারিণী কাংস্যময় করতাল-যোগে, ডাইনে বাঁয়ে উর্ধ্বে অধে করপদ্ম নিক্ষেপ করতে করতে, উপারটন করতে লাগলেন অনির্বচনীয় এক অষ্টম স্বর। লঘু, গুরু, প্লুত, দ্রুত ও বিরাম—এই মাত্রা-বিধি-অনুসারে, ঐ স্বর কখনও হয়ে উঠল স-শব্দক, কখনও অ-শব্দক।

অতএব, মুরজবাদিনীর হাতখানি যেই মুরজে তুলল ঐ বোল, অমনি সেই বোলগুলি ফুটে উঠল উপাঙ্গধারিণীর উপাঙ্গে উপাঙ্গে, স্ফুরিত হল তাঁর অধর-দল, কম্পিত হল কণ্ঠ। এবং গায়নীরাও অস্ফুট গুঞ্জনে সময়োচিত রাগগুলি আলাপ করতে করতে, যন্ত্রে যন্ত্রে ঝঙ্কার তুলে, কান খাড়া করে, উপভোগ করতে লাগলেন সেই নিখিল ধ্বনি-মিলনের মাধুরী।

প্রাদুর্ভূত হলেন সপ্তস্বর,···রাজার মত বাদী, শত্রুর মত বিবাদী, মন্ত্রীর মত সম্বাদ ও ভৃত্যের মত অনুবাদী,···এই চতুর্বিভেদ নিয়ে।

নিজ নিজ গরিমায় প্রাদুর্ভূত হলেন একবিংশতি শ্রুতি, শ্রুতিসম তিন গ্রাম এবং মূর্চ্ছনা।

পূর্ণাদি-ভেদে ত্রিধা প্রাদুর্ভূত হলেন পঞ্চাশৎ রাগ বিশুদ্ধ ও সংকীর্ণ ভেদে···আরো বহুবিধ রাগ; এবং এঁদের সঙ্গে এলেন,··· পরিচিত অষ্টাদশ জাতি, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সতের হাজার নয় শত ত্রি-লক্ষণ তান।

এবার ঘটে গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সকলেই জানতেন···শ্রুতি-জাতি-মূর্চ্ছনার, এবং পঞ্চদশ গমকের প্রকাশ হয় না কণ্ঠতটে; চলাচল-বীণেই এটি প্রশস্ত,···কিন্তু অত্যাশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটল এখানে। রাসের আরম্ভ-লীলায় গোপীদের কণ্ঠের মাধ্যমেই চল-বীণায় ও অচল বীণায় আরম্ভ হয়ে গেল ঐ মূর্চ্ছনা গমকাদির পরস্পরের পরীক্ষা।

তারপরে প্রকট হলেন আদি, যতি, নিসারু আড়তাল, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্পক, মঠ ও একতাল। এই নবতালের নৈপুণ্য প্রকাশ পেলেন অত্যন্ত মনোরঞ্জনকারী সূড়। বিবিধা এবং বিষমা গতি নিয়ে তখন কণ্ঠে দীপ্তপ্রকাশ হল ধ্রুবলক্ষণ শুদ্ধ-সূড়ের, ও মঠলক্ষণ সালগ-সূড়ের।

২০। তারপরে যেই আরম্ভ হয়ে গেল প্রবন্ধগান, এবং··· থৈ থৈ থৈ থৈ তিগড় তিগথৈ থা।'··শব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বোল, অমনি তাল-পাঠের অনুকরণে তালে তালে মাটিতে পা ফেলতে লেগে গেলেন মণ্ডলস্থা গোপসুন্দরীরা, অম্বরীকে বিন্যাস করতে লেগে গেলেন বাহুলতা, একবার বামাবর্তে একবার দক্ষিণাবর্তে, ফিরে ফিরে আরম্ভ করে দিলেন নাচ··মধুর মধুর···যেন ঝরিয়ে ঝরিয়ে রস।

তাঁদের··গান গাইতে লাগল মুখ, নাটক করতে লাগল হাত, তাল দিতে লাগল চরণ; তাঁদের··দোলন ফোটালো নেত্রযুগ, কম্পন দেখালো গ্রীবাভাগ, ডাইনে বাঁয়ে তূর্ণবেগে ঘূর্ণী দেখালো দেহরাগ।

একই সঙ্গে একই রঙ্গে

একই ছন্দে একই ভঙ্গে

একটি তারায়

ঠেকলো তাঁদের দৃষ্টি।

হৃদয় মাঝে মোহন সাজে

একটি কৃষ্ণ যেথায় রাজে

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্···

হোলো প্রেমের বৃষ্টি।

উল্লাস-ঘন দ্রুততালে চলতে লাগল নাচ। তবুও যুগ্ম ভূরুর সে কি সুন্দরিত নর্তন, সে কি নর্তন···কমলিত চরণের! থর থর করে কাঁপতে লাগল ভুবন, আকাশ চিরে চলতে লাগল জানু-রাজির উৎক্ষেপণ। সগর্ভ-ঘূর্ণনে নাচতে লাগল মণ্ডলী। যেন ডাইনে বাঁয়ে নেচে চলেছে অভঙ্গ অবক্র একগাছি মাল্য···সূত্রটি যার অম্বরলহরী মুকুন্দ-কান্তির।

পড়ে চরণ বাজে নূপুর··

রুণ রুণ ঝুন্ ঝুন্

ঝুন্ ঝুন্ রুণ রুণ

ধি ধি ধি ধি

তধি ধি

অনুপম মধুর রোল

মিশতে থাকে বোল।

দোল দোল···বাম অঙ্গ দোল,

উতরোল···ডাহিন অঙ্গ দোল,

খসে অঞ্চল বক্ষ-লোল।

না না, ভয় ছিল; মচ্‌কায়নি কটি

যায়নি খুলে বাজুবন্ধ, লপটি লপটি

হর্ষের আবর্ত নাচে···দু' বাহু উল্লাল।

এই আনন্দিত নৃত্য-রোল সঞ্চারিত হয়ে পড়ল সর্বত্র। পায়ে পায়ে ঠেকা দিতে দিতে, দেখতে দেখতে, মুহু মুহু নাচ আরম্ভ করে দিলেন বীণাবাদিনীরা বেণুবাদিনীরা। বাজল বেণু, বাজল বীণ। গীতের তালে তাল রেখে নৃত্য করতে লাগলেন গায়নীরা, এমন কি তালধারিণীরাও। বোল তুলতে তুলতে নৃত্য মেতে উঠলেন মুরজবাদিনীরাও। নর্তকীদের সঙ্গে যেন এক সূতোয় গাঁথা হয়ে গিয়ে নাচতে লেগে গেলেন সকলে। বাদ পড়লেন না চামরধারিণীরা, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীরাও।

২১। তারপরে যেই আরম্ভ হয়ে গেল দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত নৃত্য, অসীম হয়ে উঠল কৌতুকরস তাণ্ডবের।

বামাবর্তে যেই ঘুরতে লাগলেন কৃষ্ণ, অমনি তৎক্ষণাৎ সনুর্ধীন হয়ে

মণ্ডলের লীলাময়ীরা অবলম্বন করলেন দক্ষিণাবর্ত রীতির নটনবিলাস। রসিক ও রসিকার চিরন্তন নৃত্যলীলায় যেন ভাঙতে লাগল রসের ঢেউ।…এই রীতিতে অথবা তার ব্যুৎক্রমে, প্রাতিলোম্য ও আনুলোম্যের এত নিবিড় হয়ে উঠল পরিগ্রহণ, যে কৃষ্ণও পারলেন না এবং লীলাময়ীরাও পারলেন না,…পরপারে পৌঁছে যেতে সেই রমণী-নটনকলাকেলি-পারাবারের।

একটি দীপের আলো যেন বামদিক দিয়ে নেচে চলেছে সমানে, আর তারই পিছনে ডানদিক দিয়ে নেচে চলেছে তারি অন্ধকারের গুচ্ছ, …এমনি হল ঐ নৃত্যের কৌতুকচির। এ এক অনন্ত নৃত্যক্রীড়া, যেখানে প্রকট হয় অন্ত্যান্ত ; যেখানে মরি মরি তাঁর ও তাঁদের উভয়েরই ব্যত্যয়েরও ঘটে ব্যত্যয় ;

বিরামহীন রভসে এগিয়ে চলল নৃত্য। নৃত্যের তালে তালে বিলাসবতীদের বিলাস-করকমলে বাজতে লাগল মণ্ডলবিলাসী বাদ্য। ঝিমিকি ঝিমিকি ঝিমি ঝিমি, ঝিমিকি ঝিমিকি রিণ্ রিণ্। সহায় হল শ্রীহরির নর্তনের। কিন্তু আশ্চর্য, ভূপক্ষেরই গান হয়ে গেল ভিন্ন। সুলোচনাদের অধরতটে ঝরতে লাগল কৃষ্ণের অখিল গুণগান আর কৃষ্ণের মুখে ফুটতে লাগল আকাশভরা চাঁদনী-রাতের গান আর সুন্দরীদের সঙ্গীতের ললিতললিত মূর্চ্ছনা।

ছন্দে ছন্দে পড়ে তাল…চরণে। মুক্তির আনন্দ বাজে পদ্ম-হাসা চরণে। আগো, আঘাতও এত মধুময় হয়! মরি মরি, সেই চরণ-কমলের মধুতে মধুতেই যেন সিক্ত হয়ে গেল যমুনার জোৎস্না-পুলকিত পুলিনভাগ। ধূলো উড়ল না এক কণিকাও। যেন ধূলোই নেই। অত নাচ, ঐ প্রচণ্ড নর্তন, নর্তনের ঐ দুরন্ত আবেগ, এককণাও তবু ধূলো উড়ল না ; যেন ধূলিগুলিও এলিয়ে পড়েছে আনন্দিত জড়িমায়।

সুন্দরীদের দীঘল দীঘল নয়নের নীচ গালের পাতায় পাতায় ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। প্রত্যেকটি বিন্দুতেই বিম্ব-সমান ফুটে উঠল নৃত্যশীল শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গিম রূপ। অঙ্গনাদের বদন-কমল দোলে, আর সেই গালের কৃষ্ণ যেন চোখের কৃষ্ণকে বলে,…

'না না না, তুমি তেমনটি নাচতে জান না এ যেমনটি যেমন নাচে।'

গানের ভাষায় ভাসলো কোনো কোনো সুন্দরীর নয়নের পদ্মদুটি, রঙ্গে তরঙ্গে দুললো কোনো কোনো সুন্দরীর চরণের মরালপাখী। জলোৎসবের মত তাঁদের অঙ্গে অঙ্গে পরশ দিয়ে গেল ঘনশ্যামের আলিঙ্গনের রঙ্গ। শিহর জাগল রোমে রোমে নবাঙ্কুরের ছন্দে। নাচতে নাচতে-আবার ক্ষণকাল নাচও ভুলে গেলেন তাঁরা। উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ ছেড়ে তখন গেয়ে উঠলেন অন্ত গান। বলিহারি যাই সে গানের মাধুরীর। সে গান শুনে বারংবার মূর্চ্ছা গেলেন সঙ্গীতের দেবীরাও!

একটি সুন্দরী তোড়ায় তোড়ায় কুটিয়ে তুললেন স-গান্ধারগ্রাম সুস্বর। কোথাও সঙ্কীর্ণ হল না তাতে জাতি-শ্রুতি-গমকের রসতা, খণ্ডিত হল না একটুকুও। তখন কি আনন্দ হৃষীকেশের! তিনিও যোগ দিলেন সেই স্বরালাপে। 'সাধু সাধু' বলতে বলতে, হৃদয় থেকে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল তাঁর পুঞ্জ…সুন্দরীর নয়নে।

সুমঙ্গল শ্রুতি-সনাথ তাঁদের সেই স-গ-রি-ম-প-ধ-নি-র রূপগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখতে পেলেন কাব্যালঙ্কারের মণি-কাঞ্চন। কি আশ্চর্য, ঐ রূপগুলিই কি প্রকাশ করে দিচ্ছে না তার স-গরিম-পালন লাবণ্য-ধনাদি ঐশ্বর্য? বিরাট প্রীতিতে উচ্ছল হয়ে উঠল তাঁর নাচ।

আর সেই নাচের সঙ্গে…তা ধিক্ তা ধিক্ (তাঁরা ধিক্ তাঁরা ধিক্)—বোলে উদ্দাম বেজে উঠল গোপীদের মৃদঙ্গ। বোল শুনে চমকে উঠলেন সুরপুরীর নর্তকীসমাজ। ভারী অন্যায় তো, আমাদের নিন্দে করছেন কেন এঁরা?…কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হলেন নর্তকীরা। কান যে তাঁদের জুড়িয়ে যাচ্ছে মৃদঙ্গের বোল-তানে।

২২। বিরামহীন নৃত্য বিরামহীন বাদ্যের স্রোত বইছে, লাগলেন মণ্ডলের রমণী-মণিরা। আর তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে নেচে চললেন মুকুন্দ, যিনি অনন্ত-রস, প্রত্যেকের অন্তরে একত্রে সঞ্চয় করে দিয়ে কাম, গর্ব ও আনন্দ। নাচতে নাচতে তিনি নয়ন তুলে চাইলেন শ্রীরাধার মুখের দিকে। দেখলেন…ও মূর্তিটিকে যেন রচনা করেছেন তাঁরি বৈদগ্ধীদেবী স্বয়ং। অখিল-তৃপ্তিবাহিনী রসাধিকারিণী শ্রীরাধাই যেন তাঁর সিদ্ধৌষধি স্বয়ং, যেন তিনিই সেই তিনি, যেখানে একমাত্র জুড়োয় গিয়ে তাঁর সমস্ত জ্বালা সমস্ত ক্লেশ। দেখেই, শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র সত্তায় শ্রাবণ-বর্ষণ হতে লাগল প্রেম-পীযূষের। মণ্ডলনৃত্য সমাপ্ত হতেই, দুবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে শিখণ্ডমৌলি ঘিরে ফেললেন তাঁর রাধাকে, রাধাও ঘিরে ফেললেন তাঁর কৃষ্ণকে,… যেমন করে সোনার দামিনীকে জড়ায় কৃষ্ণমেঘ, যেমন করে তমালকে জড়ায় হেমবল্লরী। তারপরে সে কি দোঁহার দ্বন্দ্বালের নর্তন, নর্তনের কি শিল্পশোভা শোভায় কি অনন্ত কৌতুক!

কত মন্মথের যে পরাজয় হল কে তা খোঁজ রাখে। এ এক অদ্ভুত চুম্বকমণি, যা কুঁড়িকেও আকর্ষণ করে ফুলের। তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন রাধা। সুঠাম বঙ্কিম হয়ে গেল মণ্ডলরমণীদের ভ্রূ। বাক্যহারা বিস্ময়ে তাঁরা দেখতে লাগলেন সেই নাচ। তাঁদের স্পৃহা হল…অনুকূল্য করবেন ঐ লাস্যের। তালে তালে তাই, তাঁরা আরম্ভ করে দিলেন গান, আরম্ভ করে দিলেন বাজনা। কিন্তু হায় রে, সে নর্তনের মহিমময় রূপ কেমন করে ফোটাবেন তাঁরা পারে? পারলেন না।

২৩। গুণ, সম্প্রসারণ, বিকার এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ ভাব…এইগুলি অভ্যাসধর্মের লক্ষণ ; তবুও কোথাও কোথাও এর ব্যভিচার দেখা যায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এইটেই কি আশ্চর্যের বিষয় নয়, যে নৃত্যাভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও, স্বভাবসিদ্ধ বলেই রাধার নর্তন আবিষ্কৃত হল নৃত্য-গীত-পাণ্ডিত্যের সম্প্রসারণ, ঔৎসুক্য-মত্ততা-চাপল্য-আবেগাদি মনোবিকারের প্রকাশবাহুল্য বা প্রকাশ-স্বল্পতা?

২৪। রাধার এই স্বভাবসিদ্ধত্ব দেখে বশীভূত হয়ে গেলেন উর্বশী, লজ্জার সায়রে যেন ডুব দিলেন অপ্সরার দল, এবং অরণ্যের সীমা পার হয়ে যেন পালিয়ে বাঁচলেন চারণবধূরা। আর ওদিকে নারীদের যা উচিত কাজ তাই করতে লাগলেন সিদ্ধনারীরা, গন্ধর্বীরা এবং দেব ও মুনিদের বধূরা। তাঁরা কেবল বর্ষণ করতে লাগলেন নন্দনকুসুম, তাঁরা কেবল স্মরণ করতে লাগলেন শ্রীমনের মাহাত্ম্য এবং সৌভাগ্য।

আর সেই বর্ষণের ও স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন…রাধা আর কৃষ্ণকে…তাঁরা নাচছেন ; তাঁরা উল্লাসিত হয়ে করতে নাচাচ্ছেন স্বরগুলিকে…গা রে মা নি রি গা মা। ধৈবতের আগ্রহান্বিত প্রেক্ষাস

ও গের-ব্যঞ্জক অংশভাগ, এই দুটির সঙ্গে আরোহণ ও অবরোহণে স্বরগুলিকে উল্লাসিত করতে করতে তাঁরা নাচছেন, আহা, সেগুলিকে রম্য গমক-ময় করতে করতে তাঁরা নাচছেন। রাধাকৃষ্ণ সমস্তপদে নাচছেন। সে রাগ-সৌহিত্যের সে কি গতিমান আবেগ! 'তেনা তেনা'···এই মঙ্গলসূচক আলাপের মুখে তাঁরা যুগলে বিস্তার করে চলেছেন নানান রস, নৃত্য ও গান। এ লোকের নয় যেন সেই শব্দপ্রবাহ। আর সেই নৃত্যের গতি বেগ, কৌতুক ও উল্লাসের সৌখিনতায় রাধা জয় করতে চাইছেন কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ জয় করতে চাইছেন রাধাকে।

আর তাঁরা দেখতে পেলেন,—তালের অবসান সময়ে নিজের করপদ্মকোষটিকে শ্রীহরি তাঁর প্রিয়তমার বুকের উপর রাখছেন। এবং রাধাও তাঁর পাণিপদ্মকোরকটিকে আস্ফালিত করে বিশেষ ভঙ্গীতে নিরস্ত করছেন তাঁর প্রিয়তমের বাহুদণ্ডের আঘাত।

২৫। শ্রীকৃষ্ণের উন্মুখ প্রণয়ে বঞ্চনার লেশমাত্র প্রকাশ ছিল না কোথাও। তিনি সম্পূর্ণ হরণ করে ফেললেন নিখিল সুন্দরী সমাজের হৃদয়। তিনি যে অতি সহৃদয়। ফুটে উঠল তাঁরও হৃদয়ে শ্রীমদনের হর্ষরোল, আমোদ ও অতি উল্লাস। তাঁকেও ঘিরতে চেষ্টা করল আলস্যের মোহনতা। কিন্তু তবু তাঁর ছেদ পড়ল না নৃত্যে। তিনি নাচতে লাগলেন তাঁর তুলনাহীন নাচ; ক্ষণনৃত্য···মণ্ডলগতা আভীর নারীদের সঙ্গে ক্ষণ নৃত্য···মণ্ডল—মধ্যস্থিতা শ্রীরাধিকার সঙ্গে।

২৬। লয়ের বা রসের এতটুকুও ত্রুটি ঘটল না কোথাও রাসমণ্ডলের এই নৃত্যবিলাসে। এই ভাবে কিছুকাল নাচতে নাচতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হল তিনি দেখবেন প্রত্যেকটি সুন্দরীর তর-তম লাস্য। ভাবের ঘোরে পৃথক্ পৃথক্ লাস্য, অতি কোমল করকমলের লাস্য কামনার ধন অমল আননের লাস্য। তাই তিনি বললেন,—

'কিছুক্ষণ বন্ধ হোক, নাচ, পরে আবার দেখা যাবে। আপনাদের একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

২৭। যমুনা-পুলিনের কর্পূরশুভ্র হিমবালুকায় গোপাঙ্গনারা তখন লীলাভরে এলিয়ে দিলেন নিজেদের। একটু যেন বিশ্রামের প্রার্থী হয়ে উঠেছিল তাঁদের অঙ্গ, তাই বড় আরামের হয়ে উঠল এই বসে-পড়াটি বালুকার শীতলতায়। কালাচার-অভিজ্ঞা বৃন্দাবনদেবী বৃন্দা ও ভগবতী যোগমায়া সপরিজন উপস্থিত হয়ে গেলেন সেখানে। প্রীতি-ভিখারিণী তাঁরা শ্রীগোবিন্দের ও গোপবধূদের। মণিময় চষককেও হার মানিয়ে দেয় এমন পলাশপাতার দোলায় করে তাঁরা সকলের হাতে তুলে ধরলেন অতি মধুর হিমশীতল ফল, ফলের রস, ফুলের রস। তারপরে তাঁরা নিয়ে এলেন তাম্বূল, মাল্য ও অনুলেপনের অপরিমিত সম্ভার।

২৮। বিরাট আয়োজন দেখে শ্রীকৃষ্ণের মন যেন ভুলে যেতে বসলো···বয়স্যদের সঙ্গে একদা তাঁর পুলিন-ভোজনের ইতিহাস। আর আজ এ কি পরিচ্ছন্নতা পরিপাটি আয়োজনের কিন্তু এবার তিনি যেই বয়স্যাদের কাছে বৈদগ্ধ্যপ্রকাশ করতে লাগলেন সহভোজন-সম্বন্ধে অমনি ভাবী কৌতুকদর্শনের বাসনায় উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন দ্যুলোকের অধিবাসীরা। অপরাধ করছেন জেনেও তাঁরা সম্বরণ করতে পারলেন না রহস্য-ভোজন-দর্শনের লোভ, সরেও পড়তে পারলেন না। নিজের সূক্ষ্ম বসনের অঞ্চলগুলি ঝুলিয়ে দিয়ে তাঁরা রচনা করে বসলেন তিরস্করণী।

২৯। বিপুল কৌতুক, রহস্য হাস্য, গহন উপহাস, মদন-গর্বের নাট্যবেগ, কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল ব্রজাঙ্গনাদের। তাঁরা যেন ভাসতে লাগলেন রস থেকে রসান্তরে, প্রেমানন্দ-সাগরের বড় বড় ঢেউ-এর নিরুপাধিক শিখরে শিখরে। শ্রীকৃষ্ণের ভারী মিঠে লাগল বনদেবীদের ঐ অনাচ্ছন্ন সমাদর, তাঁদের ঐ ফল-ফুলের সরবত্তের সরবরাহটি, অতি শীতল সলিলের আনয়ন-ভঙ্গীটি এবং কর্পূরবাসিত তাম্বুলের উপহার-প্রকরণটি। তাঁর ভারী মিষ্টি লাগতে লাগল···যখন কুমুদগন্ধি বাতাসের ভেট পাঠিয়ে দিলেন সূর্যনন্দিনী শ্রীযমুনা, এবং সেই বাতাস টানতে টানতে নিয়ে এল মাতাল কলহংস ও সারসের দাব ঝঙ্কার।

ফুরফুরে বাতাসে অতি সরসতার প্রেরণায় লীলাসন ছেড়ে পুনর্বার উঠে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ। বীরপানের পর কামসংগ্রাম-কলার মত, তিনি এবার আরম্ভ করলেন তাঁর লাস্যলীলা।

তিনি তুলে নিলেন তাঁর বাঁশরী। যে গান ধরলেন বাঁশরীতে, হায় রে, পূর্বে সে গান কখনও আবিষ্কার করেন নি কোনো সঙ্গীত-দেবতা কোথাও। এ যেন এক অতিরিক্ত গান, যা দুর্গম সঙ্গীতাচার্যদের কাছেও! সেই গানের অনুগানে তিনি নিয়োজিত করে দিলেন গান্ধারগ্রামকে। ধুয়া ধরলেন গায়নীরা পাখোয়াজের তালে তালে।

দেখতে দেখতে ঝংকার নিয়ে বেজে উঠল তন্ত্রীদল, মুখর হয়ে উঠল কণ্ঠ। শ্রেণিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন···সোনার পাপড়ির মত গায়নীরা। তারপরে যেই কান্ত-মিলন ঘটল সর্বস্বরের এবং যেই সোমে এসে থামল তাল, অমনি ঝন্ ঝন্ ঝন্ শিঞ্জন তুলে তড়িদ্বেগে আবির্ভূতা হলেন নৃত্যপরা এক রাধা-সখী,···পদ্মের যেন কর্ণিকা, সঙ্গীতবিদ্যার যেন সমুৎকীর্ণ ঝংকার-ধাম।

জানুদু'টিকে ঈষৎ কুঞ্চিত করে, নিতম্ব-শীর্ষের বিশালতায় অর্ধচন্দ্র মুদ্রায় বাম হাতখানি রেখে, তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারপরে ক্ষীণক্ষীণ কটিভাগের নিম্নস্থিত ত্রিবলির সূক্ষ্ম রেখার উপর দিয়ে, কফোনি কুঞ্চিত করে, তিনি তাঁর সমুন্নত স্তনশিখরে উঠিয়ে নিয়ে এলেন দক্ষিণ হস্তের পদ্মকোষ-মুদ্রাটিকে। মৃদু লালিত্যে উৎফুল্ল করলেন পদ্মকোষ। আর সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে সম্মিলিত হয়ে পড়তে লাগল তাঁর দু'নয়নের কালো তারায় নাচ।

নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন রাধার সখী···ধীরে ধীরে। তালে তালে সর্পলীলায় দুলতে দুলতে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল পড়তে লাগল হাত। প্রসারণ ও আকুঞ্চনের সে কি সুললিত ভঙ্গী। অভিনয়-কুশলায় অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে কত যে খেলে গেল হংসাস্য, কর্তরীমুখ, পদ্মকোষ, ইয়ত্তা কোথায় তার? নব নবাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাচতে লাগল লাক্ষার মত চিকণ চিকণ গ্রীবা-ললাটাদি অঙ্গ। মরি মরি কি অসাধারণ তাঁর বিষম ছাঁদের পায়ের কাজ। নাচিয়েদের যা দুঃসাধ্য তাই নাচতে লাগলেন রাধার সখী···হেলাভরে···উল্লাসে।

[ক্রমশ।

রামায়ণ-সার

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান গ্রন্থরূপে রামায়ণ সুপ্রাচীনকাল হইতেই সমগ্র ভারতবাসীর নিকট সমাদৃত। ইহার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতির অধ্যাত্ম সাধনার স্বরূপ বিধৃত রহিয়াছে। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রামচরিতকার রামলীলার আস্বাদন করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব সমাজে 'তণি শ্লোক' নামে সুপরিচিত বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে সংগৃহীত। এক শ্লোক সংগ্রহে প্রায় সাত শত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যযুক্ত শ্লোকে সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণের বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিশেষ তাৎপর্যযুক্ত এই শ্লোক সংগ্রহের মধ্য দিয়া সমগ্র রামায়ণের সারভূত বস্তু ও ভক্তিবাদী ব্যাখ্যাকেই তুলিয়া ধরা হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের সমগ্র সত্তাই যেন সর্বাঙ্গ স্বরূপে পূর্ণ বিকশিত হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। গ্রন্থকার সাধক ও সুপণ্ডিত। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু আকর গ্রন্থ তিনি বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করিয়াছেন। প্রাচীনকালে রামানুজ বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণের সম্পর্কে চিন্তাধারার অমূল্য ভাণ্ডার হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়া রামায়ণের এই সুন্দর অভিনব যে ব্যাখ্যাটি তিনি সম্পাদনা করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবনে তাঁহার এই মহৎ প্রচেষ্টা সমাদরণীয়। একাধিক ত্রিবর্ণ চিত্র, সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বই এর মর্যাদার উপযুক্ত। লেখক—আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস। প্রকাশক—শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম—সাড়ে ছয় টাকা।

কমলাকান্তের দপ্তর

'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিম প্রতিভার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর. বস্তুত এরূপ সরস অথচ ভাবগর্ভ রচনা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়; সুধী ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচকগণের মতে উক্ত রচনা না পাঠ করলে বঙ্কিমের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিতি সম্ভব নয়, সুতরাং এই মূল্যবান গ্রন্থের সঠিক নব সংস্করণ প্রকাশ করে প্রকাশক বোদ্ধা পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হলেন। সুখ্যাত সাহিত্যরসিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় এর ভাষ্যকার, অতি সুন্দর ভাবে লেখকের বক্তব্যকে তিনি টীকার মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমের রচনার মূল সুর যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধে অনুরণিত, সে কথাটা খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন টীকাকার। বস্তুত আলোচ্য গ্রন্থের ভাব গাম্ভীর্য, সরসোজ্জ্বল বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে যে রসের অবতারণা করে, তা যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। বিশদ ভাষ্যকারের ভাষ্যের মাধ্যমে তাই সপ্রমাণিত হয়, সাহিত্য-জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী এই উভয়বিধ পাঠকই সুবিখ্যাত রচনার এই নব সংস্করণটি হাতে পেয়ে আনন্দিত হবেন। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাষ্যকার—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—ছ' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিখ্যাত শিকার-কাহিনী

শিকার এমনই এক বস্তু যে, ছেলে-বুড়ো সকলেরই তার প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ আছে, অবশ্য সকলেই শিকারী হতে পারেন না, কিন্তু শিকার-কাহিনী উপভোগ করেন না এমন লোক বিরল; সম্ভবত মানুষের মনে রোমাঞ্চের প্রতি যে অবুঝ আসক্তি আছে তাই এই আকর্ষণের মূল কারণ। সে যাই হোক শিকারের গল্পে আসর জমানো যে মোটেই কঠিন নয় একথা অবশ্য স্বীকার্য; আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুও তাই কৌতূহলোদ্দীপক বলেই পরিগণিত হতে বাধ্য। বিশ্বের শিকার ও শিকারীর ইতিহাসে ভারতের অবদান মোটেই নগণ্য নয়। কারণ, আফ্রিকার পরই অরণ্য ও আরণ্যক প্রাণীদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে ভারতই অগ্রবর্তী। আগেকার কালে সব প্রদেশেরই ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শিকার ছিল এক অতিপ্রিয় ব্যসন এবং ভীরু বলে বাঙালীর যতই অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকুক না কেন, অবিভক্ত বাঙলার বিত্তবান সমাজেও দেখা যায় নি এর ব্যতিক্রম কোনদিনই, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালীর শিকার-কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করার সে রকম কোন প্রয়াস এযাবৎ দেখা যায় নি, বর্তমান গ্রন্থ রচয়িতা এই অভাব পূরণার্থে অগ্রণী হয়ে নিঃসন্দেহে শিকার প্রিয় ব্যক্তিদের ধন্যবাদভাজন হলেন। কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী শিকারী ও শিকারপ্রিয় ব্যক্তির শিকার সম্বন্ধীয় রচনা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শ সেগুলি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি রোমাঞ্চকর। বলা বাহুল্য মাত্র রচয়িতাদের মধ্যে সকলে এখন জীবিত না থাকলেও শিকার প্রসঙ্গে তাঁরা চিরস্মরণীয়। সম্পাদনার যে উৎকর্ষ গ্রন্থটির মাধ্যমে পরিস্ফুট তা বড় সামান্য নয়। এজন্য বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক প্রভূত সাধুবাদের অধিকারী, প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্রের এক বিশেষ অভাব তাঁর দ্বারা মোচিত হল। গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিখ্যাত শিকারীদের আলোক চিত্রসম্বলিত পৃষ্ঠাটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। অঙ্গসজ্জা সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সম্পাদক—শ্রীবিত মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬, দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাম্রাজ্য বিস্তার, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সংঘ

সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ কেমন করে একদিন দূষিত করে তুলেছিল বিশ্বের আবহাওয়াকে—ইতিহাসকে অনুসরণ করে তাই প্রথমে দেখিয়েছেন লেখক, এরপর ধাপে ধাপে কথিত হয়েছে বিজিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথা এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সংস্থা যে কি ধরণের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাও পর্যালোচনা করা হয়েছে, সমস্ত বিষয়টি এত বৃহৎ যে একটি মাত্র স্বল্পপরিসর গ্রন্থে তার বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নয় এবং লেখকের উদ্দেশ্যও তা নয়, স্বল্প কয়েকটি রেখার আঁচড়ে সামগ্রিকভাবে কোন চিত্রকর্মের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের মতই বর্তমান গ্রন্থের লেখক গ্রন্থোক্ত বিষয়বস্তুকে পাঠকের মনে পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন। আপন উদ্দেশ্যে তিনি যে সফল হয়েছেন সেটা বলা যায় স্বচ্ছন্দেই। বিশ্ব রাজনৈতিক বিবর্তনের এক সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য পরিচয় বলে আলোচ্য গ্রন্থটিকে অভিহিত করা অসঙ্গত হবে না। বইটির প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডক্টর পরিমল রায়। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—পাঁচ টাকা।

সাহিত্য সাধক বিবেকানন্দ

বৈপ্লবিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম যে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা, একথা মনে করার প্রয়োজন অনেকেই হয়ত উপলব্ধি করেন না এবং সেজন্য অধ্যাত্মবাদী বৈদান্তিক বলে তাঁর যতটা পরিচিতি, অসাধারণ বক্তা হিসাবে তাঁর যে খ্যাতি ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত, সাহিত্যকার হিসাবে তিনি ততটাই অবহেলিত।' ভারতের অধ্যাত্মবাদ, মন্ত্রের উদ্গাতা হিসাবে, ও মানব সেবা ধর্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী হিসাবে বিবেকানন্দ বাঙলা দেশে সর্বত্র আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে আসছেন, অথচ বাংলা সাহিত্যের পরিসরেও যে তাঁর একটি উল্লেখ্য ভূমিকা রয়েছে—সে সম্বন্ধে সকলেই নীরব। আলোচ্য গ্রন্থে স্বামীজীর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে গ্রন্থকার একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করে বিবেকানন্দের সাহিত্যিক মন ও তাঁর শিল্পকর্মকে উদঘাটন করে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক এবং সে প্রচেষ্টা তাঁর সার্থকও হয়ে উঠতে পেরেছে আন্তরিকতার প্রসাদে। বইটি পড়লে স্বামীজীর প্রতিভার এই বিশেষ দিকটা সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হতে পারা যায় এবং সেখানেই এর উদ্দেশ্য সফল। আমরা এই বইটি পড়ে খুশি হয়েছি। অঙ্গসজ্জা শোভন ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডঃ শ্রীঅধীর দে, এম-এ, ডি-ফিল। প্রকাশক—সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৪১বি, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪। পরিবেশক—কল্লোল প্রকাশনী, এ-১৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা মাত্র।

ওরা থাকে ওধারে

বর্তমানে নাট্য আন্দোলনের ধুমধাম পড়ে গেছে, চারিদিকে চলছে নাটক ও মঞ্চাভিনয় নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা এবং একথাও অনস্বীকার্য যে, অনেক নতুন নাটকেই সন্ধান মিলবে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার এবং যুগ মানসিকতার, কিন্তু একাধারে পরম উপভোগ্য অথচ বস্তুনিষ্ঠ নাটকের সন্ধান মেলে কমই, আলোচ্য নাটকের ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয়েছে। দেশ ভাগের পর পূর্ব পশ্চিম এক হয়ে গেছে, একই বাড়ির দু'টি দিক অধিকার করে আছেন দুটি এই জাতীয় পরিবার, ঘটি হরিমোহনবাবুর প্রতিবেশী বাঙাল শিবদাসবাবু; সুখে দুঃখে, হাসি-তামাসায়, সাময়িক কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়ে দিন কাটে দু'টি পরিবারের, ভাবও যত ঝগড়াও তত। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান নিয়ে ঘটি-বাঙালের চিরন্তন বিবাদ তো আছেই, কিন্তু সে সব ছাপিয়ে আর একটি পরিচয় আছে তাঁদের তা হল তাঁরা সকলেই বাঙালী আর শুধু বাঙালীই নন মধ্যবিত্ত সমস্যাপীড়িত আজকের বাঙালী। দেশকালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে নাট্যকার আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে এই কথাটিকে তাঁর রচনার মাধ্যমে সোচ্চার করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এবং সেজন্যই নাটকটি শুধু রমণীয়তারই রম্য নয়, এক বলিষ্ঠ জীবন দর্শনেরও পরিচায়ক। সরস সংলাপ এই নাটকের আর এক আকর্ষণ, অবশ্য পূর্ববঙ্গীয় সংলাপের অংশটাই বেশি মজাদার এবং তার প্রধান হেতু এই যে, নাটকটির অন্যতম প্রধান চরিত্র নেপাল এই জাতীয়, সরল ও গোঁয়ার, এই নেপাল চরিত্রটিকে নাট্যকার সত্যই বড় দরদ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, পাঠকের আট আনা মনোযোগ এর জন্যই ব্যয়িত হয়। পরিণত লেখনীর সৃষ্টি বর্তমান রচনা এই নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের পরিসরে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রকাশনায়—আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২, দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

কাদম্বরী

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যানভাগ মূল সংস্কৃত থেকে গৃহীত 'কাদম্বরী' বহু পুরাতন সাহিত্যগ্রন্থ সুবিখ্যাত রাজা হর্ষবর্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্ট এর রচয়িতা। দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃতজ্ঞ রসিকজনেরা এই গ্রন্থের রসাস্বাদনে তৃপ্ত হয়ে আসছেন এবং বাংলাতেও এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ যাবৎ প্রকাশিত অনুবাদ সমূহের মধ্যে বর্তমান অনুবাদকের অনুবাদখানিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করে; আলোচ্য গ্রন্থটি তারই পরিমার্জিত সটীক সংস্করণ। তারাশঙ্কর তর্করত্নের ভাষা সংস্কৃতবহুল ও ধ্বনিব্যঞ্জক। বর্তমানে এ ভাষা অপ্রচলিত হলেও এর এক বিশেষত্ব আছে। বিষয়বস্তুর ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে এ ভাষা সমতাবাহী, মূলের গম্ভীর সৌন্দর্যেরও একটা আভাস পাওয়া যায় এর মাঝে। রবীন্দ্রনাথ কৃত 'কাদম্বরী চিত্র' নামক প্রবন্ধটি গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত হওয়ায় মূল গ্রন্থটির তাৎপর্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করাটা পাঠকের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। সম্পাদনক্ষেত্রে যে উৎকর্ষের স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাও নিতান্ত সামান্য নয়; সাহিত্য-শিক্ষার্থী ও বোদ্ধা এই উভয়বিধ পাঠকের কাছেই আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে বলেই আমরা আশা করি। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—তারাশঙ্কর তর্করত্ন। সম্পাদক—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। প্রকাশনায়—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের স্থান ছিল চিহ্নিত এক সেই সময়ে এই বিদ্যা, যশ ও মানের সর্বোচ্চ সম্মানদ্বারাও অভিনন্দিত হয়েছে বারবার, অধুনা এ শাস্ত্র চর্চার উৎসাহ অনেক হ্রাস পেয়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আর আগের মত অনুভূত হয় না এবং হয়ত সেজন্যই আয়ুর্বেদকে শাস্ত্র হিসাবে চর্চা করার মত শিক্ষার্থীরও অভাব দেখা যায়; কিন্তু তা হলেও যে বিদ্যা একদিন আমাদের দেশে সর্বজনধন্য বলে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল, তাকে বিলুপ্তির অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেওয়াটাও তো সঙ্গত নয় এবং সেই কারণেই এই শাস্ত্রের এক ধারাবাহিক ও প্রামাণ্য ইতিহাস থাকাটা প্রয়োজন, বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই প্রয়োজনটাই মিটিয়েছেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ইতিহাস লিখতে ব্রতী হয়ে এযাবৎ তিনি যে ক'টি পুস্তক রচনা করেছেন বর্তমান গ্রন্থটি তারই অঙ্গ। আয়ুর্বেদের কয়েকটি বিষয়ের উপর কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণাদি সন্নিবেশিত হয়েছে এই খণ্ডে; আলোচ্য বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকের কাছে বর্তমান রচনা সমাদৃত হওয়ারই যোগ্য। ছাপা বাঁধাই ও আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দশ টাকা।

গ্রীষ্ম বাসর

বর্তমানের যন্ত্রণাময় মানসিকতাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারছেন যে ক'জন শক্তিধর, আজ সাহিত্যের পরিসরে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী, বর্তমান গ্রন্থ লেখক তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য রচনায় প্রেমের এক বি ... রূপায়ণ করা হয়েছে; যে বন্য হিংসা এক ধরণের প্রেমের স্বভ ... তারই পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি বোনকে বিচার করেছেন লেখক; নারীমনের অলি-গলিরও সন্ধানে নিপুণ তাঁর লেখনী বড় নির্মম তাই তো হার মেনে আর বাঁচতে পারে না তপতী, জীবন দিয়েই জীবনের ভুল সংশোধন করে সে। নায়ক অরুণ চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, দোটানায় দ্বিধাগ্রস্ত অরুণও লেখকের তথা পাঠকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় সহজেই; কাহিনীর প্রধানতম বৈচিত্র্য এই যে, একটি সন্ধ্যার প্রীতি-সম্মিলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সব কিছু; এর ফলে পাঠকের কৌতূহল সহজেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের শৈলী এককথায় অপূর্ব; বস্তুত প্রাণময়তাই তাঁর ভাষা ভঙ্গীর প্রধান ধর্ম আর সেটাই বিষয়বস্তুতে এক বৈদ্যুতিক দীপ্তি সঞ্চারিত করেছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—ছ' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

পলাশীর পর বক্সার

ইতিহাসকে অনুসরণ করে যে অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্য রসিক অবহিত হয়েছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থও সেই ধারারই উত্তরসাধক। বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলেও স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বাঙালীরা সত্যই বিশেষ কিছু জানি না। এ অজ্ঞানতা কিন্তু সর্বাংশে স্বেচ্ছাকৃত নয়, আসলে ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় নথিপত্রগুলিকে উদ্ধার করে পাঠকের সামনে কোন প্রামাণ্য কাহিনীর মাধ্যমে ধরে দেওয়ার মত উৎসাহেরই ছিল একান্ত অভাব; বর্তমানে যে ক'জন শক্তিধর এই অভাব পূরণার্থে এগিয়ে এসেছেন, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম। প্রথম গ্রন্থ পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খ্যাতিলাভ করেন এবং ওই একটিমাত্র রচনার মাধ্যমেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক চিহ্নিত স্থানের অধিকারী বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা বিবৃত করেছেন, বস্তুত ভারতে তথা বাঙলা দেশে 'বণিকের মানদণ্ড' যে কি ভাবে ধীরে ধীরে শাসকের রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল, বর্তমান গ্রন্থ যেন তারই একপ্রকার ভাষ্য রচিল। বাংলা সাহিত্যের পরিসরে পলাশীর পর বক্সার, নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি

আলোচ্য গ্রন্থটি এক উল্লেখ্য ছোটগল্প সংগ্রহ; উল্লেখ্য এইজন্য যে, বর্তমানে যে সব রচনা ছোটগল্পের নামে আত্মপ্রকাশ করছে তার ভিতর বেশির ভাগই ছোট হলেও গল্প নয়; কিন্তু আলোচ্য গল্পগুলি তার ব্যতিক্রম। এরা স্বভাবে ও মেজাজে যে সম্পূর্ণভাবেই ছোট গল্প বলে অভিহিত হওয়ার দাবী রাখে এ কথায় সন্দেহমাত্র নেই। জীবনের নানান দিক থেকে চরিত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত এই গল্পগুলির মাঝে ফুটে উঠেছে লেখকের গভীর জীবনবোধ ও আন্তরিকতা; চলমান জীবনের যে টুকরো টুকরো ছবি তিনি এঁকেছেন তা সহজেই মনকে স্পর্শ করে। লেখকের মাঝে যে প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা রয়েছে তা সত্যই আশাপ্রদ। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রকাশক—অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌ কলিকাতা, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিষ্ণুপুর ঘরাণা

সঙ্গীত জগতে 'বিষ্ণুপুর ঘরাণা' কথাটি পরিচিত এবং সঙ্গীতবোদ্ধা মাত্রই এই ঘরাণাকে এর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে থাকেন, আলোচ্য গ্রন্থে এই ঘরাণারই বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঘরাণা কথাটির আসল অর্থ হল পরিবার বা গোষ্ঠী, সাঙ্গীতিক ঘরাণা বলতে বিশেষ এক ধরণের সঙ্গীতধারা যা সচরাচর বিশেষ কোন পরিবারের দ্বারাই অনুসৃত হয় ও প্রচারিত হয় তাকেই বোঝায়। বাংলা দেশের বিষ্ণুপুর ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান এবং এখানে বহুদিনাবধি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুশীলন চলে এসেছে, প্রধানত ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ সঙ্গীতের চর্চাই ছিল বিষ্ণুপুরের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য ধারার সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতেরও চর্চা ছিল, তবু ধ্রুপদী সঙ্গীতের ধারাই বিষ্ণুপুরে বরাবর প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বর্তমান গ্রন্থে এ সবেরই এক পরিচ্ছন্ন বিবরণ স্থান পেয়েছে, যার ফলে সঙ্গীতরসিক পাঠকের কাছে এর আদর হতে বাধ্য। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—বুক ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, দাম—পাঁচ টাকা।

ভিলা মাধবী

আলোচ্য উপন্যাসে বর্তমান সাহিত্যাকাশের এক অম্লান জ্যোতিষ্ক সুবোধ ঘোষকে যেন নতুন করে চেনা যায়; কাহিনী বয়নে ও ভাষার সুষমায় যে ঐন্দ্রজালিক পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন তাতে যেন আবিষ্ট হয়ে যেতে হয়। বর্তমান যুগের ভাঙ্গনধরা দাম্পত্য জীবনের পটভূমিতে দক্ষ সাহিত্যিকার এঁকে গিয়েছেন এক অপরূপ ছবি; বিশ্বাসঘাতক এক প্রেমের স্মৃতি কেমন করে জানি অমল সারা জীবন ধরে একটি হৃদয়ে, যে হৃদয় ব্যথা দিতে চাইল যত তার চেয়ে ব্যথা পেল বেশি, যে হৃদয় পলাতকা এক সুরভিমন্দির স্মৃতির পেছনে ছুটে বেড়াল অনুক্ষণ, যে জীবনের ভোগের ভাঙ্গা আসরে বাতিগুলো অমল যত না জ্বাল'ল তার চেয়ে অনেক বেশি। ব্যর্থ বঞ্চিত প্রেমের অপরূপ এই রূপকথা স্পর্শ করে মনকে, নাড়া দেয় গিয়ে গভীরে; হতভাগ্য সুজীবনের ব্যথায় আলোড়িত হয় অন্তর—মথিত হয় মনন। লেখকের অনুপম শৈলী অবশ্য তাঁর রচনার উৎকর্ষের জন্য প্রায় অঙ্গাঙ্গী দায়ী, সংস্কৃত সাহিত্যের মনোরম ভাষারীতিকেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করা যায় বাংলা সাহিত্যের পরিসরে। ভাব ও ভাষার এমন সার্থক মিলন বোধ হয় কমই দেখা যায়। রসোত্তীর্ণ এক সফল রচনা বলেই গণ্য হওয়ার দাবী রাখে এই 'ভিলা মাধবী'। প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ ছাপা বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—সুবোধ ঘোষ। প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

মহারাণী কুন্তী

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপের প্রকৃষ্ট পরিচয় মহাভারতে বিধৃত। মহাভারত যুগে যুগে তাই ভারতের সর্বত্র আপামর নরনারীর নিকট জনপ্রিয় ও চিরনূতন। মহাভারত নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিলে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্যকরূপে প্রতিভাত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে মহাভারতের একান্ত অনুগত হইয়া ইহার অন্যতম মহীয়সী চরিত্র কুন্তীর চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর বাগচীর জনসাধারণ প্রতিভা, মননশীলতা ও মহাভারত সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিদগ্ধমহলে অপরিচিত নয়। মহারাণী কুন্তীচরিত্রের যে বিশদ ও সর্বতোমুখী আলোচনা এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই পুস্তকের প্রায় সওয়া দুইশত পৃষ্ঠায় তিনি করিয়াছেন, তাহা এক কথায় অপূর্ব এবং তাঁহার খ্যাতিরই অনুরূপ ও পরিচায়ক। এই গ্রন্থে মুখবন্ধে নবনালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন—'ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ আমার গুরুদেব (ডঃ বাগচী) যে দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ শক্তি লইয়া মহারাণী কুন্তীর চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।'......দীর্ঘদর্শিনী মহাভাগা পতিব্রতা কুন্তী যেন গ্রন্থকারের নিকটে নিজে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলের অব্যক্ত গভীর বেদনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। মহারাণীর চরিত্রের যতগুলি দিক হইতে আলোচনা করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার সমস্ত দিক হইতেই এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগচী। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম—৮' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

মুজফ্ফর আহ্মদ

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রবীণ সদস্য ও নেতা মুজফ্ফর আহ্মদের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন। এতে উক্ত নেতার জীবন ও কর্মধারার এক সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কর্মী ও মানুষ 'মুজফ্ফর আহ্মদের' এক পরিচ্ছন্ন ছবি পাওয়া যায় এই রচনার মাধ্যমে, বিশেষ ভাবে যাঁরা এঁর রাজনৈতিক জীবনকে জানতে চান তাঁরা বর্তমান পুস্তিকাটিকে মূল্যবান বলেই মনে করবেন। ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। প্রকাশনায়—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সপ্তস্বরী পিনাকিনী

আলোচ্য উপন্যাসের লেখক জনপ্রিয়তায় চিহ্নিত, অতএব তাঁর এই নবতম অবদান যে বেশ কয়েকজনকে খুশি করে তুলবে এটা হয়ত আশা করা অন্যায় নয়। কাহিনী মামুলী, অপরাধ ও অপরাধী যে ঠিক এক নয় সেই বহুশ্রুত তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে নানা চমকপ্রদ ঘটনাবলীর মাধ্যমে। সমাজের ওপরতলার জীবেরা যে অপরাধ প্রবণতায় নীচের তলাকে বহুদূর অতিক্রম করে মূলত এটাই লেখকের বক্তব্য এবং সেই হিসাবেই দাঁড় করিয়েছেন তিনি কাহিনীকে। সস্তা হলেও 'সাধারণত লোকে এই ধরণের গল্প চায় ও লেখকের ভাষারীতিতে একটা বন্য আবেগ থাকায় তাঁর এই রচনায় একটা আন্তরিকতার দেখা মেলে যা কাহিনীকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সত্যকার রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত না হলেও একটা সহজ গতিবেগ আছে কাহিনীর, যার ফলে রচনাটি পাঠ্য বলে গণ্য হতে পারে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—অবধূত, প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬, দাম—তিন টাকা।

বসন্ত বিলাপ

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে, প্রাচীন পুরাণাদি থেকে চারটি যুবতী নায়িকাকে বেছে নিয়ে কবি তাঁদের বাসন্তী বিরহব্যথাকে রূপ দিয়েছেন। বসন্ত ঋতু যৌবনেরই পাদপীঠ, চিরদিন যৌবনই করে তাকে আবাহন, গায় তার বন্দনা গান। কিন্তু যে যৌবন ক্ষুধিত, বঞ্চিত? পারে কি সেও মধুঋতুকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে? আলোচ্য কাব্য-কাহিনীর নায়িকা চতুষ্টয়ের মধ্যে কেউ বঞ্চিতা, কেউ উপেক্ষিতা, কেউ বা প্রবঞ্চিতা। কিন্তু তাদের বেদনার মূল একটাই আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় সান্নিধ্যে বঞ্চিত থাকা। এই ব্যথাকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করেছেন লেখক, অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই তা যেন অলক্ষ্যে সঞ্চারিত পাঠকমননে। দেশ, কাল, ধর্মকে অতিক্রম করে যে হৃদয় তারই এক বেদনা-মধুর বার্তা যেন বহু যুগের ওপার হতে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় পাঠকের অন্তরকেও এবং এটাই এ কাব্যের রচয়িতার সার্থকতম পরিচয়। কাব্যের আঙ্গিক পারিপাট্যেও কবি সচেতন, ফলে কবিতাগুলি ধ্বনিমধুর ও আমরা এই কাব্যগ্রন্থটি পড়ে সত্যই আনন্দলাভ করেছি। আঙ্গিক শোভন অপরাপর যথাযথ। লেখক—চিত্তরঞ্জন মাইতি। প্রকাশক—রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

পিকিনিজ

—নীরোদ রায়

উত্তরপুরুষ

—সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়
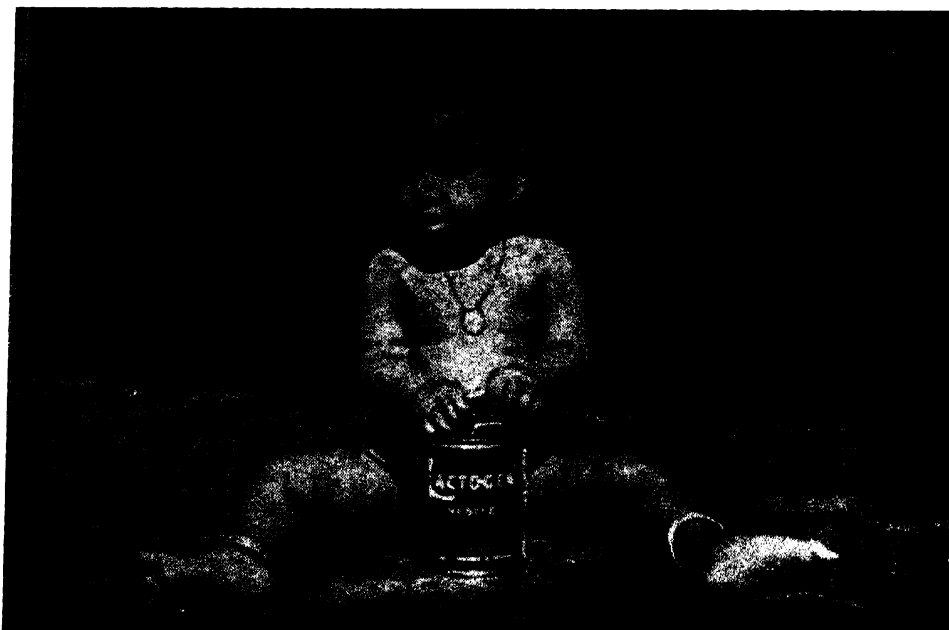
বিজ্ঞাপন নয় —জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক বসুমতী / অগ্রহায়ণ / '৭০

ফাংসন —নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্ষুরত্ন

—এ. দাশগুপ্ত

ত্রয়ী

— এ. দাশগুপ্ত
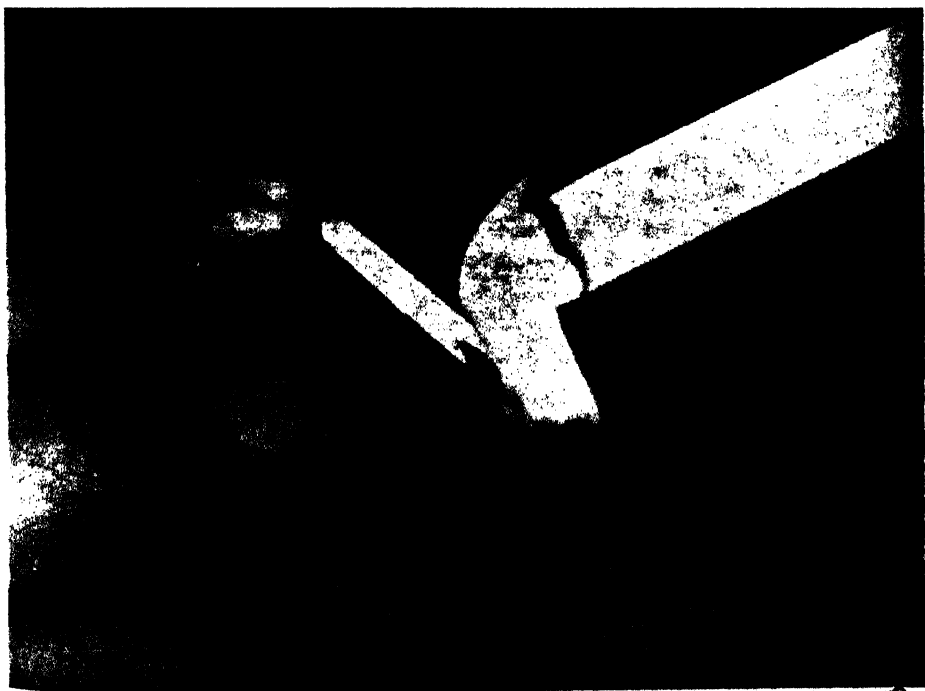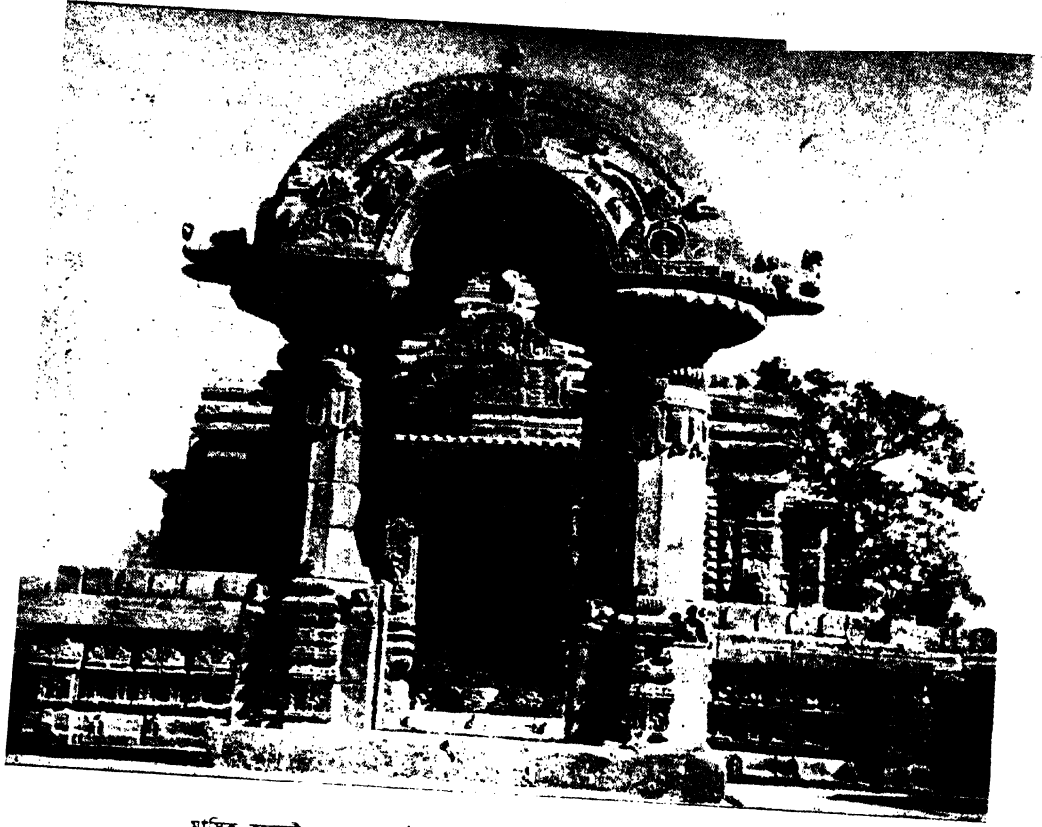
দুধকুণ্ড (ভুবনেশ্বর)

—শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

শোভাদর্শন

—চণ্ডী চট্টোপাধ্যায়
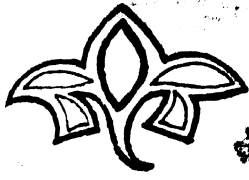
পত্র সাহিত্যে বিবেকানন্দ

প্রাণের সাথে যারা খেললে মরণ খেলা, পার্থিব শান্তির নীড় থেকে অন্তরকে যারা করলে নির্বাসিত, আপনাকে যারা দিলে অগ্নিতে আহুতি সচ্চিদানন্দ তাঁদেরই অন্যজন। জগৎ তাকিয়ে আজও সেই বিস্ময়পুরুষ বিবেকানন্দের প্রতি। স্বামীজীর জীবনদর্শন যে বিরাট বিপুলতার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, তা সম্পূর্ণ অনুধাবন করা অতি বড় সূক্ষ্মবুদ্ধির পক্ষেও কষ্টসাধ্য, সম্ভবত অসম্ভব। কিন্তু স্বামীজীকে আমরা এমন এক জায়গায় দেখেছি যেখানে তিনি অন্যের মাঝে বহুরে করেছিলেন উপস্থিত। সেখানেও তাঁর অন্তর দুয়ার খুলে এসে আপন হস্তে তুলে নিতে চেয়েছিল সবার প্রাণের দহনেরে, বুলিয়ে দিতে চেয়েছিল শান্তির স্পর্শ, বলেছিল : 'বিবেক তুই শুদ্ধ হস্ নে, কিন্তু শান্ত হ।' বিবেকানন্দের সেই সামান্য কয়েকটি পত্রে এর ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। বিস্ময় এসে পথরোধ করে, যখনই ভাবা যায়—এত অল্পে এত ভার সহিল কেমনে?

বাংলা সাহিত্যের আর এক নতুন পাড়ার পথ চিনিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারও বহু আগে পত্র সাহিত্যের কদর বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা অজানার স্পর্শে রয়ে গেছে, ধূলিলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনে ঢাকা। সেদিনের সে সাহিত্য নিজেকে রেখেছিল আড়ালে, বুঝেছিল আমি যে নগ্ন। এমন একদিন ছিল যখন চিঠি বলতে বোঝাতো 'তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি' বা ঐ ধরণের কিছু। কিন্তু এই 'আছি'র পরেও যে বহু কিছু রয়ে গেল তার সন্ধান সেদিনের মানুষের মনের গোপনে সুখনিদ্রায় ছিল মগ্ন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম পত্র সাহিত্যকে জাতে উঠালেন। রবীন্দ্রনাথের কথাই বিশেষ করে বলছি তার কারণ—বাঙালী তার অন্তরের যে ক্ষেত্রটিতে সাহিত্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম পুরুষ, যিনি সেই অন্তর্ভূমির ওপর দিয়ে পত্রধারার স্রোতকে টেনে এনেছিলেন সর্বসাধারণের সভায়। প্রথমে তাকে তিনি যে বেশে এনেছিলেন তা পাণ্ডিত্যের বেশ নয়। পাণ্ডিত্যের ওপরে কাব্যের এক আবরণ টেনে অপরূপ মহিমায় সাজান যেন কয়েকটা ছন্দ। উদ্দেশ্য সহজেই প্রাণকে দোলা দেওয়া। পত্র সাহিত্যের ভাব্য সমাদর হয়ত আজও আমরা করতে শিখি নি, কিন্তু জীবনযুদ্ধে এ সাহিত্য যে বিরাট ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে, তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

যে সাহিত্য সমগ্র মানব জাতিকে উন্নতির সোপানে উঠতে সহায়তা করে বিবেকানন্দ নিয়েছিলেন সেই সাহিত্য। তাই তাঁর পত্রের প্রতিটি ছত্রেই দেখতে পেয়েছি কর্মকে তিনি অন্তর জুড়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। শাওন রাতে প্রকৃতি মায়ের আঁচলপাতা রূপ দেখে তিনি যে কখনও মোহিত হন নি একথা কেমন করে বলি? কিন্তু সেই রূপকে কেমন করে কাব্যিক ছাঁচে ঢেলে—যাকে আমরা ভাষাকে নিয়ে খেলা করা বলি, নিপুণ কারিগরের মতো ভাষার ইমারত তৈরি করা বলি, তা তাঁর কোন পত্রে অকারণ উপস্থিত করতে দেখি নি। সে সাহিত্য অনেকের জন্য, বিবেকানন্দের জন্য নয়। মানুষের জীবনে যার প্রয়োজন যত বেশি, তার গুরুত্বও তত বেশি। কর্মক্লান্ত মনের অবসাদকে ভুলিয়ে দেবার

নুও এক প্রকার সাহিত্যের প্রয়োজন থাকতে পারে।

কিন্তু বিবেকানন্দের পত্রাবলী যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে তার গুরুত্ব বহু বহু গুণ বেশি। যে সাহিত্য মানুষকে দেবতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে সে-ই যথার্থ সাহিত্য। যদি সে কথা সত্য হয় তবে স্বামীজীর পত্রাবলী বিশ্বসাহিত্যের রাজদরবারে স্বর্ণ সিংহাসনের অধিকারী। জীবন পথের পথিককে চলতে-ফিরতে-ঘুরতে বহু কাঁটার সম্মুখীন হতে হয়। চতুর্দিকে আবেষ্টিত এই সব কাঁটা গাছের বেড়াজালকে জীর্ণ করে কেমনভাবে নিজের উদ্দেশ্য পথে, নিজের পিতার কাছে, নিজেকে পৌঁছে দেওয়া যায় তার পথ দেখিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তারপর যে বড় কথাটা আসছে তা হচ্ছে—বিবেকানন্দের পত্রাবলী বিবেকানন্দের জীবনী। সে জীবনী তাঁর নিজের লেখা। সেখানে তিনি রং ছড়ান নি, কল্পনাকে দেন নি আশ্রয়। কারণ তাঁর কারবার ওদের সঙ্গে নয়। আবার বলছি সে কারবারী তিনি নন।

বিবেকানন্দের যে চিঠিগুলো জীবিত আছে তার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশো। এতে কোথাও তাঁকে দেখা যায় ভ্রমণকারীরূপে কোথাও বা দেশীয় শিক্ষার কথা ভেবে তাঁকে বড় চিন্তিত বোধ হয়েছে, আবার সেই শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু রকম সমাধানকে করেছেন উপস্থিত। তা'ছাড়া পাশ্চাত্য দেশে তাঁর কর্মধারা ও পাশ্চাত্যবাসী সম্বন্ধে তাঁর মতামত এখানে সুস্পষ্ট। সেই সঙ্গে ভারত সম্পর্কে নানাবিধ মত প্রকাশ পেয়েছে বহু চিঠিতে।

১৮৯৩-এর জুলাই-এ স্বামীজী চলেছেন আমেরিকার পথে। বোম্বাই থেকে যাত্রা সুরু হল। কপর্দকশূন্য অবস্থা। ভরসা শুধু তিনিই, যিনি জগতকে চালাচ্ছেন। অজানার সংগে একলা যুঝতে হবে ভেবে মন বিচলিত হয়েছে। কিন্তু অসাধারণ কর্তব্যবোধ, সাহস ও দৃঢ়তাকে রেখেছে খাড়া করে। নামলেন কলম্বোয়। সেখানে এক বুদ্ধদেবের মন্দির ছাড়া বড় কিছু মনে পড়ে না। এখানকার পুরোহিতরা শুধু মাত্র সিংহলী ভাষাতেই কথা বলে। তাই আলাপের আশা ত্যাগ করে এগুতে হল। পিনাঙে কিছু সময় কাটিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরে। দূরে দেখা যাচ্ছে সুমাত্রা। আগে এখানে জলদস্যুদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে আছে ওদের ঘাঁটিগুলো। কাপ্তেন সেগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য বহু কিছুর মধ্যে যাদুঘর একটি। এ ছাড়া খুব বেশি করে যা চোখে পড়বে তা হচ্ছে প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্ধেক নাবিক নেমে এরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, যেখানে সুরা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে।'

হংকং দেখে চীনে এসেছি বলে ভুল হতে পারে। এখানে চীনেদের প্রভাব খুব বেশি। জাহাজ নোঙর করা মাত্র ডাঙায় পৌঁছে দেবার জন্য শত শত চীনে নৌকো এসে ভিড় করে। এরা আলাদারকম কোন বাসা বাঁধে না, পরিবার নিয়ে নৌকোতেই তাদের সংসার। চীনে মায়েরা হালে বসেন। তাঁদের শতকরা নব্বই জনের পিঠে ঝোলান থাকে একটি করে শিশু। তাকে থলির মতো এমন একটা জিনিসের মধ্যে বসান হয় যাতে করে সে হাত-পা নেড়ে সহজেই প্রকৃতির সাথে মিতালী পাতিয়ে হাসে, কথা বলে। তার কর্মক্লান্ত মা ভারি ভারি বোঝা টানছেন, লাফ মেরে এক নৌকো থেকে আর এক নৌকোয় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। খোকার কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে শুধু তার মায়ের দেওয়া দু'একটা চালের পিঠে পেয়েই সন্তুষ্ট। তার এই ভাবুকতা লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন—

'চীনে-খোকা একটি রীতিমতো দার্শনিক।' কিন্তু এ দর্শন তাঁকে বেশিদিন ভুলিয়ে রাখতে পারে না। ভারতীয় শিশু যে বয়সে হামাগুড়ি দিতেও ভয় পায়, চীনে-খোকা সে বয়সে শিখে নিয়েছে প্রয়োজনীয়তার দর্শন। দারিদ্র্যতাই এর মুখ্য কারণ। সে তখন স্থির হয়ে কাজে বসে। তিনদিন হংকং-এ থেকে এলেন ক্যান্টনে। ৮০ মাইল পথ নৌকোতে কাটিয়ে তবে এখানে আসা। পৌঁছে দেখা গেল প্রাণের স্ফূর্তির সাথে কর্মব্যস্ততা মিলে সে এক মহাকলরোল, যেন সময় নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। মল্লরা তাই পাল্লা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। যাত্রী নৌকো বাদে বহু বহু নৌকো বসবাসের কাজে বাঁধা পড়েছে। এক একটা দোতলা তিনতলা বাড়ির সমান। নৌকোর চারপাশে বারাণ্ডা, মধ্য দিয়ে পথ, সমস্তই জলের 'পরে দাঁড়িয়ে। চীনেদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের ভদ্র-পরিবারভুক্ত বলে মনে করেন, তাঁদের পর্দা আছে। সর্বসাধারণের সামনে বেরোন না। একমাত্র শ্রমজীবীদেরই রাস্তাঘাটে বড় একটা দেখা যায়।

চীনেদের বহুমন্দির দেখা যাবে এই ক্যান্টনে। এখানকার সর্ববৃহৎ মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত করা হয়েছে প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট ও সর্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর স্মরণার্থে। স্বয়ং বুদ্ধদেব হলেন প্রবীণ মূর্তি। প্রতিটি মূর্তিই কাঠের 'পরে সুন্দর খোদাই করা। ক্যান্টন থেকে আবার হংকং। সেখান থেকে জাপান। বিনা ছাড়পত্রে বিদেশীর প্রবেশ সেখানে চলে না। এরা বুঝেছে এরও প্রয়োজনীয়তা ছিল। এ দেশের স্থল-সৈন্যেরা শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। যে কামান এরা

ব্যবহারের জন্য রেখেছে তা এদেরই এক কর্মচারীর সৃষ্টি। এই কামান পৃথিবীর কোন কামান অপেক্ষা কম শক্তিশালী বলে মনে হয় না। এ ছাড়া নৌবলেও তারা ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। দেশলাই কারখানা একটা দেখবার জিনিস বটে। এরা প্রয়োজনীয় সমস্তই নিজের দেশে তৈরির চেষ্টা করে। এখানে বহু বহু মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের গায়েই কিছু কিছু সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা হয়েছে। পুরোহিতদের মধ্যে খুব অল্পই আছেন যাঁরা সংস্কৃত সামান্য বোঝেন। নবজাগরণের একটা প্রবলতৃষ্ণা এ সম্প্রদায়ের মধ্যেও বয়ে চলেছে। ভারতীয়েরা জানলেন না—জীবন কি?

এতক্ষণ প্রাচীন সমাজের এক চিত্র খুলে বসেছিলেন। এ গেল ভ্রমণের কয়েকটা পাতা। এছাড়া এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে আরো আরো। পাঠক! আমি জানি না আমার বর্ণনা আপনাকে ক্লান্ত করে তুলেছে কি না তবে ভ্রমণ থেকে এখানেই আমি ক্ষান্ত হতে চলেছি।

'আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে, তাকে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' বলে জাগিয়ে দিলেই হল।' প্রতি যুগেই দেখা গেছে মুষ্টিমেয় লোকে বেশি জ্ঞান লাভ করে নি। সে কারণ আমাদের উচিত শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে আমরণ 'লাগিয়া পড়িয়া' থাকা। পরাধীনতার এক বিরাট যুগকে আমরা পুষে রেখেছি আত্মার চারপাশে—ব্রহ্মশক্তিকে করেছি খাটো। কেন এ সম্ভব হলো? উত্তর পেয়েছি শিক্ষা শুধুই শিক্ষা। যার অভাব আজ সমগ্র ভারতে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তার বহিঃপ্রকাশই হলো প্রকৃত শিক্ষা। ভারত, মিশর, রোম প্রভৃতির প্রাচীন সভ্যতা ইউরোপীয় প্রভৃতি দেশের আধুনিক সভ্যতার দিকে পৃথিবী তার দু'নয়ন মেলে সেইদিন থেকে তাকিয়ে ছিল—যেদিন শিক্ষা নেমে এসেছিল নিম্ন সাধারণের সদর দরজায়। সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আজ উপলব্ধি করা সহজ হয়ে এসেছে যে, সাধারণের বিদ্যাবুদ্ধির উপর সমগ্র দেশ বা তার জাতি করুণার প্রার্থী। শিক্ষা বলেই আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে ভিতরের ব্রহ্ম সাড়া দেন। ভারতবর্ষের সর্বনাশের কারণ এই শিক্ষা। সে চায় মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ রেখে মূর্খ সাধারণের উপর চাবুক চালাতে।

স্কুল বালক যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে তা নিতান্তই অশিক্ষা। ফল দাঁড়াচ্ছে শ্রদ্ধাহীনতা। বেদ-বেদান্তের মূলমন্ত্রই হলো তাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই একদিন নচিকেতাকে যমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী করেছিল, সমগ্র জগতের চাকা ঘুরছে এই শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করে। সেই শ্রদ্ধা আজ লুপ্ত হতে চলেছে। তাই ত' 'বিনাশ' ভারতবাসীর এত আপন হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের সকল দর্শনেই পাওয়া যায় যে, তারা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা কোন সময়েই বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে ফিরে আসে না। প্রথমে একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করে চুলচেরা বিচার চলে। অথচ ঐ প্রতিজ্ঞাটিই সম্পূর্ণ ভুল বা নিতান্তই শিশুজনোচিত। এ থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে 'স্বাধীন' চিন্তা বলে যে বস্তুটি তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হতে চলেছে। যে হিন্দু-জাতির মধ্যে একদিন বহুগুণের সমাবেশ ও প্রখর বুদ্ধির মিলন ঘটেছিল, সে আজ কেমন করে সবার পেছনে সরে যাচ্ছে তা ভাবলে বিস্ময়াবদ্ধ হতে হয়। ঈর্ষাই এদের কাল হল। যেদিন থেকে এদের ধমনীতে এই ঈর্ষার বীজ সংক্রামিত হল সেদিন হতে, এরা পাঁচ মিনিটকালও স্থির হয়ে মিলেমিশে কাজ করতে পারলে না। যেদিন ভারতবাসী 'ম্লেচ্ছ' শব্দটি আবিষ্কার করলে সেদিন থেকে ভারতের আকাশে সর্বনাশের ঘনঘটার ঘটা ঘনিয়ে এলো। তাই বলছি শিক্ষাকে সামান্য গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার ব্যর্থ চেষ্টা না করে সাধারণের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু অশিক্ষিতেরা তো শিক্ষিতের পাড়ায় ভুলেও সহজে ঢোকে না। তবে উপায়?

আমাদের বাংলায় এ রকম একটা প্রবাদ আছে—পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না যায় তবে মহম্মদকেই পাহাড়ের কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ এই সব নিম্নসাধারণ যদি স্কুলে এসে শিক্ষালাভ করতে না চায় তবে তাদের গৃহে গৃহে শিক্ষককে শিক্ষা বিতরণ করে ফিরতে হবে। কল্পনা করুন কোন গ্রাম্য আকাশ, তারা ভরা ঘোমটায়, সন্ধ্যা-বধূ সাজতে প্রস্তুত হয়েছে। ক্লান্ত চাষীরা ফিরেছে তাদের ঘরে। একটা গাছের তলায় তারা সমবেত হয়ে গল্প করে তাদের ক্লান্তিকে চাইছে ঘুম পাড়াতে। এমন সময় দু'জন সন্ন্যাসী এসে ছায়াচিত্র বা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে বা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস নিয়ে এদের বোঝাতে লাগলেন। আবার একদিন বা বিভিন্ন দেশ কেমন করে কৃষিক্ষেত্রে বা যান্ত্রিক সভ্যতায় এগিয়ে চলেছে গল্পচ্ছলে তারই একটি বর্ণনাকে করলেন উপস্থিত। এইভাবে নানান কথা শুনতে শুনতে একদিন এদের মধ্যে আসবে অজানাকে জানবার স্পৃহা। তখন আমাদের চিন্তার ছুটি। ওরা সব কিছু জোর করে জানতে চাইবে। তাই দেখা যাচ্ছে চক্ষুই একমাত্র শিক্ষালাভের পথ নয়—কর্ণও এ বিষয়ে বিরাট ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে।

জাতির পরিত্রাণ করে নারী-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। যে দেশে নারীকে অশিক্ষিত হয়ে স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হয় সে দেশ কোনদিন বিশ্ব-সাহিত্যে মাথা তুলে কথা বলতে শেখে না। তাই নারী-শিক্ষা আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অশিক্ষিত নারীকে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তার ভিতরের সেই বিপুলা মাতৃশক্তিকে জাগিয়ে তুলে আগুনের মতো চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। সেইদিন জগতের সকল সমাধান এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়াবে তার পদতলে। আমাদের মধ্যে যদি পাঁচটি নারীও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে তবে তারা জগতকে তোলপাড় করে ছেড়ে দিতে পারে। এরজন্য দরকার আমাদের কিছু সংখ্যক বিধবা নারীকে শিক্ষিতা করে গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহে গিয়ে নারী-শিক্ষার বীজ বপন করে আসা। বিবেকানন্দ তাঁর সেই কালকে স্মরণ করে বলেছেন, নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সর্বপ্রথম বন্ধ করতে হবে বাল্য-বিবাহ ও সেই সাথে বিধবা-বিবাহ। বাল্য-বিবাহের মতো জঘন্যতম কাজ আর কিছু ভাবা যায় না। আমাদের সমাজে এই পৈশাচিক রীতি প্রচলিত থাকায় আমরা ক্রমশ পশুস্তরে নেমে আসছি। মনু বলেছেন—

কন্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

অর্থাৎ ৩০ বৎসর পর্যন্ত ছেলেদের যেমন ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হবে, মেয়েরাও সেই রকম করবেন। অন্যথা আমাদের পশুজন্ম ঘুচবে না। বিধবা-বিবাহের ক্ষেত্রে সংস্কারকগণ যদি মনে করে থাকেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার 'পরেই সমাজ নির্ভর করে তো এর চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে? সমাজের অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার ওপর, বিধবাগণের স্বামীর ওপর নিশ্চয়ই নয়। আমাদের সংস্কারকগণ যখনই দেখেছেন সমাজ দ্রুত ভাঙনের পথে চলেছে তখনই তাঁরা যা হোক একটা পথ বের করেছেন। ফলে সাময়িকভাবে সমাজ ভাঙনের পথরোধ হয়েছে ঠিকই তবে ভবিষ্যৎ ফল দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত খারাপ। যা হয়েছে বিধবা-বিবাহের ক্ষেত্রে।

এখন আমাদের কর্তব্য এই ভাঙনধরা সমাজের শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন—সাধুতার, শক্তিতে বিশ্বাস, হিংসা ও দাম্ভিকভাবের বিসর্জন ও সৎকাজে সতত সহায়তা করা।

নিঃস্বার্থ সহায় সম্বলহীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। দূর থেকে আমেরিকাকে যা মনে হয়েছিল আমেরিকা তা নয়। সকলেই ব্যস্ত। কারো দিকে দৃক্পাত করে না। দেশবাসীর কাছ থেকেও নেই কোন সাড়া শব্দ। তবে কি ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বিবেকানন্দ তো জীবনভোর কোন কাজে পিছু হটেন নি—পত্রাবলীর প্রথম পাতা শেষ করবার আগেই সেকথা আমার জানা হয়েছিল। এমন সময় দেখলাম ঈশ্বর তুমি আছ। বস্টনের কাছেই কোন এক গ্রাম। সেখানে পরিচয় হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ডক্টর রাইটের সঙ্গে। তিনি বোঝালেন—আপনার ধর্মমহাসভায় যাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেখানে সমস্ত আমেরিকা জাতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করা সহজ হয়ে আসবে। পরিচয় করিয়ে দেবার ভার নিলেন সহৃদয় রাইট ও ডাক্তার ব্যারোজ নামে অপর এক ভদ্রলোক।

১৮৯৩-এর ২রা সেপ্টেম্বর—তুমি আমার প্রিয় দিন। তুমি আমার ভারতবাসীর অন্তরের অন্তরেষু। তুমি হলে সেই দিন—যে দিন সমগ্র আমেরিকাবাসী আমাদের সেই দেবপুরুষ দর্শনের, তাঁর বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্যের গরিমায় সশ্রদ্ধনেত্রে তাকিয়েছিল। ঐ দিনটির সফলতায় ভবিষ্যৎকালে স্বামীজীকে তারা বসিয়েছিল যীশুখৃষ্টের আসনে। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কে জন্মেছিলেন? আর একজনও নয়।

ধর্মমহাসভার সময় আগতপ্রায়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সমাবেশে গৃহের গাম্ভীর্যকে আরো বেশি গম্ভীরতর করে তুলেছে। এতটুকু জায়গা চোখে পড়ে না যেখানে আর একটি প্রাণকে কোন মতে স্থান করে দেওয়া যেতে পারে। সেই সভায় হিন্দু ধর্মের উপর বক্তৃতা করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দকে, যিনি ইতিপূর্বে সাধারণের সামনে কখনো বক্তৃতা করেন নি। দুরু দুরু বক্ষে, ঈশ্বরকে স্মরণ রেখে উচ্চারণ করলেন 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'—এরপর দু'মিনিট কোন কথা বলতে তারা দেয় নি। উন্মত্ত শ্রোতা করতালি ধ্বনিতে ঘর ভেঙে পড়বার জোগাড়। পরদিন কাগজে কাগজে আমেরিকার বাতাসে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন সেই মানুষটি। খুব গোঁড়া সম্প্রদায়ের লোকেরাও স্বীকার করেছিলেন যে—'এই সুন্দর ও বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন।' জীবনের প্রথম বক্তৃতা সভা বিদেশের দরবারে রাজলক্ষ্মী পরালেন কণ্ঠে মণিহার।

—[illegible] বিশ্বাস
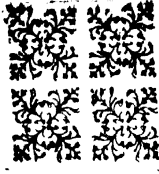
রমেন্দ্রনাথ রায়

[ডোমিনিক্যান গণতন্ত্রের কনসাল ও মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি]

দেশমাতৃকার সোনার অঙ্গ থেকে বিদেশী শাসকের নিগড় মোচনের পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করে প্রাসাদ শিখর থেকে সর্বসাধারণের পুরোভাগে স্থান নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলার ভূস্বামী সম্প্রদায়ের যে তরুণ সদস্যরা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন—রমেন্দ্রনাথ রায় সেই তালিকায় একটি বিশিষ্ট নাম। সময়ের পরিবর্তনে তাঁর জীবনের ধারা ভিন্নমুখে পরিচালিত হয়ে গেলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন জেলা ও গ্রামের ভূমিকার ইতিহাসে তাঁর নাম মালিন্যের গণ্ডিভুক্ত হওয়ার নয়।

ভাগ্যকুলের সুবিখ্যাত রায় পরিবারের স্বর্গত রাজা জানকীনাথ রায় ও রানী যশোদাময়ী রায়ের পুত্র রমেন্দ্রনাথ ভাগ্যকুলে ১৮৮৩ সালের ২১-এ এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ছ' বছর বয়েস থেকে রমেন্দ্রনাথের নিয়মিত কলকাতা বাস শুরু হয়। এরিয়ান বিদ্যালয়ে (বর্তমানের সারদাচরণ এরিয়ান বিদ্যালয়) পাঠজীবন শুরু হয়। হিন্দু স্কুল ও ডাফটন কলেজিয়েট স্কুলেও রমেন্দ্রনাথ পাঠগ্রহণ করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই রক্তরাঙা দিনগুলো এসে গেল। দেশজোড়া সে কি অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। জননীর বন্ধনমোচনের জন্য সারা দেশের জীবনপণ। এক অভাবনীয় দেশজোড়া আন্দোলন। রমেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমিকমন সেই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারল না। স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে সর্বতোভাবে জড়িয়ে দিলেন। অনুশীলন সমিতির দলভুক্ত হলেন। সমগ্র বিক্রমপুর জেলা হল এঁর কর্মক্ষেত্র। প্রায় সাত আট শ' কর্মী এঁর নির্দেশন্যায় এবং অধিনায়কত্বে কাজ করতে লাগলেন। রমেন্দ্রনাথ জাহাজের খালাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে জেলায় পাঠিয়ে দিতেন। এদিকে সাহেব সম্প্রদায় এবং পুলিশবাহিনীর সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্ব রেখেছিলেন। সেই বন্ধুত্বও তাঁর আসল উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তাই করল, তবু এত সতর্কতার ভিতরেও কয়েকজনের দৃষ্টি তাঁর প্রতি পতিত হয়, খালি কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁদের হাতে ছিল না।

১৯১০ সালে রমেন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রা করলেন। কুচবিহারের রাজপরিবারকে পেলেন সহযাত্রী হিসাবে। সেখানেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দৃষ্টি তাঁকে অব্যাহতি দেয় নি। বিদেশে ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যাণ্ডে শিক্ষানবীশ হিসাবে তিনি যুক্ত হলেন, সভ্য হলেন লণ্ডন চেম্বার্স অফ কমার্সের। সাড়ে তিন বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে সুবিশাল জমিদারীর তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করেন। একাদিক্রমে প্রায় পনেরো-ষোল বছর যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করেন। ১৯২৯ থেকে সুপ্রসিদ্ধ প্রেমচাঁদ জুট মিলসের প্রস্তুতিকার্য শুরু হয়। ১৯৩২ সালে হয় তার প্রতিষ্ঠা। প্রেমচাঁদ জুট মিলস রমেন্দ্রনাথের শিল্পদক্ষতার একটি উজ্জ্বল পরিচায়ক। এই জুট মিলের অগ্রগমন ও জয়যাত্রার ইতিহাসে তাঁর অবদান ও অক্লান্ত কর্মদক্ষতা অপরিসীম। ইস্টবেঙ্গল রিভার স্টিম সার্ভিসের তিনি চেয়ারম্যান, জুট মিলগুলির এবং বেঙ্গল স্পাইনিং এ্যাণ্ড উইভিং মিলসের তিনি পরিচালক।

শিকারে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা। বাল্যকাল থেকে ক্রীড়াবিষয়ে তিনি গভীর উৎসাহী। ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট ও ফুটবল বিভাগের তিনি বহুকাল অধিনায়ক ছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের তিনি অন্যতম ন্যাসরক্ষক। বর্তমানে তিনি মোহনবাগানের সভাপতি।

১৯৩৮ সালে তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ডোমিনিকান গণতন্ত্রের কনসাল নিযুক্ত হন। রমেন্দ্রনাথের পূর্বে বহু দেশের এবং প্রথম বাঙালী কনসাল ও কনসাল জেনারেল স্বর্গত ডাঃ স্যার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এই দেশটিরও কনসাল পদে সমাসীন ছিলেন। বর্তমানে কলকাতায় অবস্থিত কূটনীতিবিদদের ইনি প্রবীণতম এবং জ্যেষ্ঠতম।

ভ্রমণে তাঁর প্রবল আগ্রহ। শ্রীকৈলাস ও মানস-সরোবর নামক একটি ভ্রমণ কাহিনীর তিনি রচয়িতা।

কাজের ও অধ্যয়নের মধ্যে তাঁর দিন হয় অতিবাহিত। জীবনের অশীতিবর্ষ রমেন্দ্রনাথের অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কর্মোদ্যম ও প্রাণ-প্রাচুর্য তাঁর বিন্দুমাত্র নিঃশেষিত হয় নি।

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

[প্রবীণ শিল্পী ও শিল্পসমালোচক]

শিল্পের রূপ-রস-রেখা-রঙের সঙ্গে আইনের যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণের সন্ধি ঘটেছে যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে তাঁর নাম অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শিল্পক্ষেত্রে এই নাম একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নামান্তর, আইনের জগতে এই নাম একজন দিক্‌পালের। আবার এঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে অজানা নয় যে নিরহঙ্কারিতা সদালাপিতা এবং বিনয়গুণ এঁর চরিত্রের এক একটি বিশেষ ভূষণ।

মহানগরী কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের মুখ যাঁরা উজ্জ্বল করেছেন অর্ধেন্দ্র-কুমার তাঁদের একজন। ১৮৮১ সালের ১লা অগস্ট স্বর্গত অর্কপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র অর্ধেন্দ্রকুমারের জন্ম। রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের রামপ্রসাদ পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রথম বিদ্যারম্ভ। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশানের বড়বাজার শাখার ছাত্র হিসাবে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
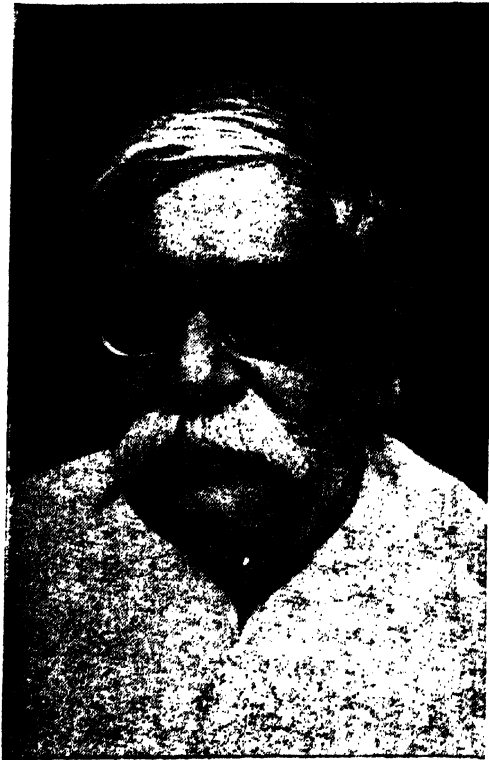
অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

হলেন ১৮৯৬ সালে। ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে বি-এ পরীক্ষায় হলেন সসম্মানে উত্তীর্ণ। ইংরাজীতে অনার্সে লাভ করলেন তৃতীয় স্থান। গ্রেগরি জোন্সের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান থেকে সসম্মানে প্রযুক্তি পরীক্ষায় (Attorneyship) হলেন উত্তীর্ণ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি যুক্ত থাকেন (১৯০৩—০)। সম্পর্কিত ভ্রাতা অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রযুক্তিবিদ। তাঁর আকস্মিক লোকান্তরের পর লর্ড সিংহ, সতীশরঞ্জন দাস, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতির ইচ্ছায় তাঁর প্রতিষ্ঠানটির ভার গ্রহণ করেন ও প্রতিষ্ঠানটির স্বত্ব ক্রয় করে নেন।

মাতামহ শ্রীনাথ ঠাকুর (দ্বারকানাথ ঠাকুরের অগ্রজ রাধানাথ ঠাকুরের বংশধর শ্রীনাথ ঠাকুর নন) ছিলেন মূর্তিকর। ভগ্নীপতি অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন রসগ্রাহী পণ্ডিত ব্যক্তি। মাতামহের নিকট পান শিল্পের প্রেরণা, আর অভয়চরণের মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্যের জগতে প্রবেশের পথ খুঁজে পান। জীবনে প্রথম ছবি যখন আঁকেন তখন বয়েস তের। শিল্পাচার্য যামিনীপ্রকাশের মাধ্যমে পরিচিত হলেন গগনেন্দ্রনাথের ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। দক্ষিণের বারান্দায় নিত্য উপস্থিতি ঘটতে লাগল তাঁর। তাঁর চোখের সামনে জন্ম নিল অসংখ্য ঐতিহাসিক চিত্রকলা। গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র ছিলেন যামিনীপ্রকাশের পিতার মাতুল আর অর্ধেন্দ্রকুমার ছিলেন যামিনীপ্রকাশের সম্পর্কিত ভ্রাতা (উভয়েই বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান)।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টসের সচিবের আসনে তিনি ছিলেন সগৌরবে সমাসীন। সোসাইটির মুখপত্র 'রূপম' তাঁরই অসাধারণ প্রতিভা ও নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল পরিচায়ক। শিল্পপত্রিকা হিসাবে রূপমের বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা সর্বকালের সুধীসমাজের অনস্বীকার্য। ১৯১৪ সালের প্যারিসের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্র-বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিল্পীর ছবি তাঁরই দ্বারা প্রেরিত হয়। শিল্পাচার্য নন্দলাল, মনস্বী রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (এঁর জননী অর্ধেন্দ্রকুমারের পিতৃস্বসা), ভ্রাতা স্বর্গত শিল্পী অনীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সমভিব্যাহারে অর্ধেন্দ্রকুমার দক্ষিণভারত ভ্রমণ করেন। এই দক্ষিণভারত ভ্রমণ অর্ধেন্দ্রকুমারের জীবনে এক গভীর তাৎপর্য বহন করছে। সেখানকার স্থাপত্যকলা ও শিল্পসৌন্দর্য তাঁর মনশ্চক্ষে এক অভিনবত্ব নিয়ে ধরা দেয় ও রসঘন অন্তরে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করে। জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গড়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং অধ্যাপনা গ্রহণ করার সময়ে এ্যাটর্নির পেশা ত্যাগ করেন। সারা ভারতের অগণিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। বৌদ্ধশিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিত অভ্যাগত হিসাবে ইনি চীনযাত্রা করেন। এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমানে তিনি প্রবীণতম সদস্য। এই প্রতিষ্ঠান তাঁকে যদুনাথ সরকার স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করেন। ললিতকলা আকাদামী তাঁকে সদস্যরূপে বরণ করেন। শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অবনীন্দ্র পরিষদের তিনি প্রাক্তন সভাপতি।

সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্রোঞ্জ, দুই খণ্ডে মডার্ণ ইণ্ডিয়ান পেণ্টার্স (প্রথম খণ্ডে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও দ্বিতীয় খণ্ডে অসিতকুমার হালদার), মাস্টারপিসেস অফ রাজপুত পেণ্টিংস, দুইখণ্ডে রাগস এ্যাণ্ড রাগিণীস, আর্ট অফ জাভা, ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার্স, লাভ পোয়েমস ইন হিন্দী, ল্যাণ্ডস্কেপ অফ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার এ্যাণ্ড আর্ট, ভারতের ভাস্কর্য, রূপশিল্প, শিল্প পরিচয় এবং আরও বহু সারগর্ভ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। পাশ্চাত্য দেশসমূহের বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

চারু রায়

[প্রবীণ চিত্র পরিচালক ও সুদক্ষ শিল্পী]

এদেশের চলচ্চিত্রলোক তার শৈশবকালে যে প্রতিভাধর কুশলীদের করস্পর্শে যথেষ্ট সমৃদ্ধির সম্মুখীন হতে পেরেছে প্রবীণ শিল্পী চারু রায় তাঁদেরই অন্যতম। ভারতীয় সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডাটি যাঁদের কল্যাণে স্মরণীয় হয়ে আছে, সেই তালিকায় চারু রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

বহরমপুরে ১৮৯০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর চারু রায়ের জন্ম। পাবনাবাসী স্বর্গত শ্যামাচরণ রায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গত মহেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্যামাচরণের একমাত্র পুত্র তিনি। মহেশচন্দ্রের পুত্র বাংলার প্রবীণ কথাশিল্পী ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। চারু রায়ের জননীও ছিলেন একজন শক্তিময়ী শিল্পী। বহরমপুর থেকে ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের ছাত্র হিসাবে ১৯১৪ সালে তিনি আই এস সি পরীক্ষায় এবং বি এস সি পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করলেন ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে। বার্ড কোম্পানীতে যোগ দিলেন চারু রায় জিওলজিস্ট হিসাবে। দু'বছর তাঁর বার্ড কোম্পানীতে অতিবাহিত হল। সাড়ে চারশ' টাকা বেতনে চাকরি পেলেন মার্টিন বার্ণে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বললেন—'বেশ আছেন চারুবাবু, আয়ও যেমনি বাড়বে তখন দেখবেন আয়ের তুলনায় ব্যয়ও অনুপাতে বেড়ে যাবে'—কথাটি চারু রায়ের মনে গভীরভাবে ছায়াপাত করল। চাকরি তিনি ছেড়ে দিলেন অবিলম্বে।

চিত্রাঙ্কন শুরু হয় তাঁর বাল্যকাল থেকে। দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে তাঁর ছবি আঁকা শুরু। জীবনে ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা পান দু'জনের কাছে। প্রথম জন—মা আর দ্বিতীয় জনের নাম ব্রজ পাল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় চারু রায়ের প্রথম চিত্র প্রকাশিত হয়। ক্রমে শিল্পী হিসাবে প্রভূত জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিল্প-নির্দেশক হিসাবে তাঁর আবির্ভাব 'মুক্তার মুক্তি' নাটকটিকে কেন্দ্র করে। নাটকটি উৎসর্গীত হয়েছে তাঁরই উদ্দেশে। শিশির-কুমারের অভিনয়ধন্য 'সীতা'র শিল্প নির্দেশক ছিলেন তিনি। সহযোগী শিল্পনির্দেশক হিসাবে এই নাটকটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিশির সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধানতম বিখ্যাত শিল্পনির্দেশক স্বর্গত রমেন্দ্রনাথ (দেবু) চট্টোপাধ্যায়। ঋষির মেয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণ নাটকেরও শিল্পনির্দেশক ছিলেন বিদগ্ধ শিল্পনির্দেশক চারু রায়। ১৯২৫ সালে চারু রায়ের জীবনের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। আত্মীয় ও সহপাঠী স্বনামধন্য স্বর্গত হিমাংশু রায় চারু রায়কে নিয়ে এলেন চিত্র জগতে শিল্পনির্দেশক হিসাবে। বীণা শিথ (সীতা দেবী) অভিনীত 'লাইট অফ এশিয়া' চারু রায়ের প্রথম ছবি। তাজমহলের নির্মাতা ভাস্কর শেরাজের জীবনী চিত্রে সাজাহানের ভূমিকায় অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন চারু রায়। মিসেস ভবনানী মমতাজ চরিত্রটির রূপ দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে 'এ থ্রো অফ ডাইস' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯২৯ সালে চিত্রজগত তাঁকে পেল পরিচালকরূপে। 'লাভস অফ এ মোগল প্রিন্স' (আনারকলি) তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি। প্রবীণ সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এই ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসাবে যুক্ত হন। প্রবীণ ও প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে চিত্র ও মঞ্চ জগতের যোগাযোগ চারু রায়ই প্রথম ঘটিয়ে দেন। বিগ্রহ, চোরকাঁটা, স্বামী রাজনটী, বসন্তসেনা বাঙালী, হিন্দী ডাকু-কা-লড়কী, গ্রহের ফের, পাথেয় এবং কয়েকটি মাদ্রাজী ছবি পরিচালনা করে ইনি প্রভূত যশ ও সুনামের অধিকারী হন। চোরকাঁটা ছবিটিকে কেন্দ্র করেই বাঙলায় তথা ভারতের চিত্রলোকের দিকপাল শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের চিত্রজগতে প্রথম আবির্ভা

ঘটে, বাঙলার ছায়াছবির ইতিহাসে সেই দিক দিয়েও এই ছবিটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। আজকের দিনে সুপ্রসিদ্ধ বহু শিল্পী, বহু কৃতবিদ্য পরিচালকের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রসিদ্ধির মূলে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। 'বায়স্কোপ' পত্রিকাটির সম্পাদনায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সে যুগে বাঙলা দেশে চিত্রজগতে ম্যাডানের ছিল একাধিপত্য, সে ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক দুঃসাহসেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু বিমল পালের সঙ্গে টকী শো হাউসের প্রতিষ্ঠা করে সেদিন চারু রায় সেই দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দিয়েছিলেন।

নীরদ রায়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য আলোকচিত্র আধিকারিক এবং কৃতী আলোকচিত্রী]

নীরদ রায়

বর্তমান বাঙলায় আলোকচিত্র শিল্পের উৎকর্ষসাধনে যাঁরা সবিশেষ যত্নবান, অফুরন্ত কর্মশক্তি এবং অদম্য উৎসাহ যাঁদের জীবনে এনে দিয়েছে সাফল্যের আলো—কৃতী আলোকচিত্রী শ্রীনীরদ রায় তাঁদের অন্যতম। পঞ্চাশ সমীপবর্তী এই শক্তিধর আলোকচিত্রী আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে যে প্রতিভা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

আদিনিবাস পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ গ্রাম। পিতৃদেব স্বর্গত চন্দ্রকুমার রায় আসাম সরকারের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। গৌহাটিতে ১৯১৫ সালে নীরদ রায়ের জন্ম। স্থানীয় কটন কলেজিয়েট স্কুল ও কটন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কলেজের ছাত্র হিসাবেই আলোকচিত্র বিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। আনুমানিক ১৯৩৪ সালে ইলাস্ট্রেটেড উইকলির আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় তাঁর চিত্র স্থানলাভ করে। ঐ বছরেই তাঁর তোলা গান্ধীজীর আসাম ভ্রমণকালীন একটি চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, সংবাদচিত্রজগতে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। সাধারণ দৃশ্যবহুল চিত্র এবং সংবাদচিত্র উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। অতঃপর তাঁর এই দুই জাতীয় ছবিই লণ্ডনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল। ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর অসংখ্য চিত্রাবলী প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় এসে ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত হন। এক বছর পর গৌহাটিতে ফিরে গিয়ে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের পত্তন করে নানা প্রতিবন্ধকতার ভিতর একটি রমণীয় চিত্র নির্মাণ করেন। যুদ্ধের ভয়াবহতায় জগতের আবহাওয়া তখন ঘোর দুর্যোগসঙ্কুল। ১৯৪৪ সালে তিনি বাঙলা সরকারের প্রথম আলোকচিত্রধর নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য আলোকচিত্র আধিকারিক।

আলোকচিত্র বিদ্যার প্রসার ও উন্নয়নে তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। বহু আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠানকে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছেন। নানা স্থানে আলোকচিত্র বিচারকের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। প্রেস ফটোগ্রাফার্স এ্যাসোসিয়েশানের পক্ষে সংবাদচিত্র প্রদর্শনী এবং গত বৎসর রাষ্ট্রনায়ক বিধানচন্দ্রের জীবনালেখ্য প্রদর্শনী তাঁরই কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ১৯৪৯ সালে বিলেতের রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির ইনি এ্যাসোসিয়েট নির্বাচিত হন। কলকাতার স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনোলজির সঙ্গে আলোকচিত্র পরীক্ষক হিসাবে ইনি যুক্ত। 'ছবি তোলা' ও 'ডার্করুম' শীর্ষক দুইখানি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। নবাগতদের পক্ষে গ্রন্থ দু'টি বিশেষ সহায়ক। সারা ভারত তিনি পর্যটন করেছেন। ভ্রমণে তাঁর অপার আনন্দ।

বিখ্যাত চিত্রকর নীরদ রায়ের জীবনকাহিনী আলোচনায় যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং যা এক বিস্ময়ের সৃষ্টি সেটি হচ্ছে ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম একটি ক্যামেরার মালিক হন। অথচ তার বহু পূর্বেই আলোকচিত্রী হিসাবে প্রভূত যশ ও সুনাম তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছে।

হেনরিক ইবসেন

সুনীলকুমার নাগ

প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইবসেন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে জর্জ বার্নার্ড শ' একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্নটি লো এই যে, শেক্সপীয়ার বা মলিয়েরের নাটকগুলি তাঁদের সময়ে লোকে ড়েছে এবং দেখেছে আবার আজকের দিনেও দেখছে বা পড়ছে; এই দখা বা পড়ার ফলে পাঠক বা দর্শকের মনে বিশেষ কোনও আলোড়ন াদের সময়ে যেমন হতো না, আজকের দিনেও হয় না। অথচ বসেন কিম্বা টলস্টয়, ভাগনার বা স্ট্রিণ্ডবার্গ, গোর্কি বা চেকভের কোনো পাঠক তাঁর ভেতরে একটা এমন আলোড়ন অনুভব করেন অনেক সময়ে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকেই নাড়া দিয়ে যায়। এর কারণ ? এঁরা কেউ যে শেক্সপীয়ার, মলিয়ের, ডিকেন্স বা ডুমার চাইতে শ্রেষ্ঠতর স্রষ্টা শ' তাও মানতে নারাজ। শেক্সপীয়ার বা মলিয়েরের ঙ্গে তুলনাটা একদিক থেকে একটু অর্বাচীন হয় কারণ, ওঁরা অনেক াগের; তাই বয়সে মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের বড়ো ডিকেন্সের ঙ্গে ইবসেনের তুলনা করে শ' বলছেন যে, বহির্বিশ্বকে দেখবার বা াকে বুঝবার ক্ষমতা ইবসেনের নিশ্চয়ই ডিকেন্সের চাইতে বেশি লো না। কিন্তু এ হেন যে ডিকেন্স যাকে সবদিক দিয়েই একেবারে াধুনিক বলা চলে, তাঁর রচনা পড়েও পাঠকের মনে এরকম কোনো ালোড়ন সৃষ্টি হয় না ঠিক যেমনটি ইবসেনের পাঠকের হয়। এর ারণ কি ? শ' বলছেন যে এর কারণ হলো এযুগের লেখকগণ মনে তাঁদের পূর্ববর্তীগণের তুলনায় আত্মিকশক্তিতে অধিকতর বলীয়ান। It is as if these modern men had a spiritual rce that was lacking in even the greatest of eir forerunners.)

শ'য়ের এই যে শেষোক্ত অভিমতটি, এর সঙ্গে বেশির ভাগ পাঠকই যে একমত হবেন, এ-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কেউ যদি শ'য়ের এ কথা স্বীকার না করেন এবং তাঁর নিজস্ব বলবার মতো কোনো কথা থাকে, তা'ও নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। আমরা কেউই ঐ 'আলোড়ন' অনুভব করবার কারণটি সম্পর্কে অভ্রান্ত না হতে পারি। কিন্তু ইবসেন তথা এ যুগের আরো অনেকের রচনা পাঠ করলে আমাদের মনে যে একটা নতুন ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি হয়—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক ধারণা ও বিশ্বাস, সমাজ, সংসার এবং জগৎ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় ভাবধারণায় একটা যে দারুণ নাড়া লাগে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না—ঠিক যে রকমটি আগে কখনো হতো না—এই ব্যাপারটা অন্তত ইবসেন সম্পর্কে শ'ই প্রথম লক্ষ্য করেন এবং নানা প্রবন্ধ এবং আলোচনার মাধ্যমে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ইবসেন-ব্যাখ্যাতা হিসেবে শ'য়ের স্থান যে প্রথম সারিতে এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কাজেই বর্তমানের আলোচনায় ইবসেনকে কিছুটা আমাদের শ'য়ের দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। অবশ্য আমরা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েও এই বিরাট মহান এবং কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টাকে বুঝবার চেষ্টা করবো।

ইওরোপে যে দীর্ঘকাল ধরে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসন দখল করে রয়েছে, কেউ যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র নিত্যনতুন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করবার শক্তিরই এর কারণ তা' হলে খুব সম্ভবত সত্য কথা বলা হবে না এবং প্রকৃত কারণও আমরা বুঝতে পারবো না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়

যে, একটা আশ্চর্য প্রাণশক্তির প্রেরণায় ইওরোপ সর্বক্ষণ জীবনের সমস্ত বিষয়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং উদ্ভাবনে ব্যস্ত। যেদিন ইওরোপ জেগেছে, সেই আড়াইহাজার কি তিনহাজার বছর আগের কথা, সেদিন থেকে কখনোই ইওরোপ আর ঘুমিয়ে পড়ে নি, মাঝে মাঝে দু'-একটা শতাব্দীতে হয় তো দেখা গেছে তার ব্যস্ততা কিছুটা কম ; কিন্তু একেবারে স্তব্ধ সে কখনো হয় নি। ইওরোপের তুলনায় ভারত, মিশর, এশিয়া-মাইনর বা চীন অনেক আগে জেগেছে—সে হয় তো চার কি পাঁচহাজার বছর আগের কথা ; কিন্তু তারপর থেকে কতোবারই না আমরা ঝিমিয়ে পড়লাম বা একেবারে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রাণশক্তির এই যে কৃপণতা, বলতে গেলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলের মানুষ কম বেশি কখনো-না-কখনো যা অনুভব করেছে, ইওরোপেরও কোনো কোনো অঞ্চল কখনো কখনো করেছে ; কিন্তু সমগ্রভাবে দেখতে গেলে ইওরোপের কখনোই এ জিনিষটির অভাব হয় নি। ফলে আমরা দেখছি, গত আড়াইহাজার বছর ধরেই দেখছি ইওরোপের এক-একটি দেশ এক এক সময় বলতে গেলে পৃথিবীর নেতৃত্ব করছে—এ নেতৃত্ব শুধু সামরিক শক্তির নয় ; সমস্ত কিছু সম্পর্কেই—সমাজ, ধর্ম, নীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, কিছুই এর আওতার বাইরে নয়। যে সমস্ত দেশে এই সমস্ত দিকে সাফল্য রাজনৈতিক তথা সামরিক শক্তির সাফল্যের সঙ্গে যুগপৎ ঘটেছে তাদের প্রভাব দেখা দিয়েছে খুবই ব্যাপকভাবে এবং কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, স্পেন বা গত একশ' বছরের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীকে আমরা যেমন দেখেছি। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে কোনও দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় যখন অধঃপতনের সূচনা হয়েছে বা চরম অধঃপতন ঘটে গেছে সে অবস্থাতেও সে দেশের মানুষ সৃজনধর্মী কাজে সক্ষম হয়েছে, বিশেষ করে সাহিত্যক্ষেত্রে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাহিত্য যেন কিছুটা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয়। যেমন ঘটেছিল ফ্রান্স, রাশিয়া বা আয়ারল্যাণ্ডে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুইদশক থেকে ইওরোপের সাহিত্যের আসরে নরওয়ের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি চমকপ্রদ। আকস্মিক, কারণ, যে-কোন বৃহৎ ঘটনার পূর্বে যে ছোটো ছোটো এক-আধটা ঘটনার প্রকাশ দেখা যায় এ সময়ে তা দেখা যায় নি এবং নরওয়ের মতো একটা দেশের কাছ থেকে কারো কিছু আশা করবার ছিলো বলেও হয় তো কেউ মনে করতো না। নরওয়ের আবির্ভাব বলতেই আমরা ইবসেনের আবির্ভাব বোঝাতে চাইছি। এ আবির্ভাব চমকপ্রদও বটে, কারণ, প্রথম আবির্ভাবেই এই দেশটি বিশ্বসাহিত্যে নিজের স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি কথা আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার। তা' হলো এই যে, সাহিত্যক্ষেত্রে ইবসেনের অর্থাৎ নরওয়ের যে সাফল্য তা একান্তভাবেই সাহিত্যিক সাফল্য। কারণ নরওয়ের যেমন কখনই উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় নি ; ব্যক্তিগত-ভাবে ইবসেনও তেমনি দীর্ঘকাল স্বদেশের শাসনকর্তাদের বিষ-নজরে থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন।

হেনরিক ইবসেন (Henrik Johan Ibsen, March 20, 1828—May 23, 1906) ছিলেন এক ব্যবসায়ীর ছেলে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কিশোর ইবসেনের জীবনে দেখা দিলো এক দারুণ সঙ্কট। মাত্র কয়েক মাস হলো কবিতা লিখতে সুরু করেছেন, স্কুলের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে করতে হচ্ছিল কাজটা। কত দিনে স্কুলের পড়াশুনো শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো সুরু করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আধুনিক' পরিবেশে, শিক্ষিত এবং সমঝদার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করে মনের মতো করে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন এই-ই যখন ছিলো তাঁর একমাত্র চিন্তা, ঠিক সেই সময়েই তাঁর জীবনে দেখা দিলো এক নিদারুণ সমস্যা। যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা একটু বেশি বয়সে সকলকেই করতে হয়—অর্থাৎ জীবনধারণের রসদ সংগ্রহের সমস্যা, অর্থোপার্জনের চেষ্টা। চলছিলো ভালোই, ওঁর বাবার ব্যবসাটি ছোটো হলেও অন্তত কুড়ি বছর তিনি এই ব্যবসায়ের ওপর নির্ভর করেই চলতে পারছিলেন, কিন্তু এবার একেবারেই অচল হয়ে গেলো। পর পর তিন বছরের লোকসান ছোট প্রতিষ্ঠান সামলাতে পারলো না, ইবসেনের বাবা ব্যবসা তুলে দিয়ে বেকার হয়ে বাড়ি এসে বসলেন, মানসিক অবস্থার সঙ্গে তাঁর শরীরটাও বেশ কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছিলো না, এ অবস্থায় ক্রমাগত অর্থচিন্তা করতে হলে বাবা যে আর বেশিদিন বাঁচবেন না এ কথা ইবসেন বুঝতে পারলেন। তাই তিনিই প্রস্তাব করলেন যে, অবিলম্বে একটা রোজগারের পথ করবেন নিজের জন্যে, তাতে যদি প্রয়োজন হয় কিছুদিনের জন্যে পড়াশুনো বন্ধই থাকবে। এ সময়ে ছেলের এই প্রস্তাবেই রাজী হওয়া ছাড়া ইবসেনের বাবার আর কিছু করবার ছিলো না এবং বাবার এক বন্ধুর সুপারিশেই ইবসেন একটা ওষুধের দোকানে সামান্য একটা চাকরী জোগাড় করলেন।

এই ওষুধের দোকানের মালিক ভদ্রলোকটি ছিলেন একটু সদাশয় প্রকৃতির। নানা বিষয়ে কিশোরের উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখে তিনি প্রথম থেকেই খুব খুশি ছিলেন। এবার ওদের পরিবারের কিছুটা আকস্মিক আর্থিক দুর্বিপাক এবং তার ফলে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে কিশোরের পড়াশুনোটাও বন্ধ হয়ে গেছে একথা জেনে তিনি ব্যথিত হলেন এবং যাতে অন্তত ওর পড়াশুনোটা চলতে পারে চাকরী বজায় রেখে তার জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত করে দিলেন। এইভাবেই ইবসেন স্কুলের পড়াশুনো কোনমতে চালাতে লাগলেন। তারপরে, ওষুধের দোকানের মালিক ভদ্রলোকের পরামর্শ মতোই ইবসেন মনস্থ করলেন যে ডাক্তারী পড়বেন। কাজেই ডাক্তারীতে ভর্তি হবার জন্যে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় তার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। কিন্তু এ পরীক্ষায় ইবসেন পাশ করতে পারলেন না। ওষুধের দোকানের চাকরীটি এ সময় পর্যন্ত বজায় ছিলো। ইবসেনের তখন বয়স ঠিক একুশ। মালিক বললেন আবার পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে। কিন্তু ততদিনে ডাক্তার হবার বাসনা ইবসেনের মন থেকে চলে গিয়েছিলো। তার বদলে মনে ওঁর দানা বেঁধে উঠছিলো অন্য বৃহৎ একটা কল্পনায়—একটা মহান্ কিছু সৃষ্টি করবার বাসনা।

বলাই বাহুল্য, কাব্যচর্চা এবং সাহিত্যের নানা বিষয়ে পড়াশুনো সেই যে সুরু হয়েছিলো তা আর বন্ধ হয় নি, বরং অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো না করতে পারার ঘাটতিটা ইবসেন ভালো ভাবেই পুষিয়ে নিচ্ছিলেন। ওঁর জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এরকম অনেকেই বলেছেন যে, ডাক্তারীতে ভর্তি হবার পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে ইবসেন ফেল করেছিলেন তার

একমাত্র কারণ হলো ওঁর সাহিত্যপাঠের নেশা। আসলে পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট বইগুলি উনি পড়বার সময় পেতেন কি না সন্দেহ, পড়ে থাকলেও ও সমস্ত পড়াশুনোয় ওঁর মন যে আদৌ বসতো না, তা তো পরীক্ষার ফল দেখেই বোঝা গিয়েছিলো।

এই পরীক্ষায় ফেল করবার খবর জানবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইবসেন মনস্থ করে ফেলেছিলেন যে, শিল্পের সাধনাতেই জীবনটা কাটাবেন। লেখার চর্চা যে অনেক আগেই সুরু হয়েছিলো সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এবার ইবসেন এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। একখানা সাহিত্য-পত্রিকা চালাতে হলে যে আথিক সঙ্গতি, ছোটোবড়ো নানা শ্রেণীর লেখকদের সহযোগিতা, বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করা তথা প্রচারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন—এর কোনদিকেই ইবসেন বা বন্ধু কারুরই কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিলো না। কাজেই পত্রিকা বের করে উভয়েই যাকে বলে ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন। প্রায় ন' মাস চলেছিলো, অর্থাৎ চালানো হয়েছিলো; তারপর বন্ধ হয়ে গেলো। কোনো পত্রিকা চালাতে গেলে নিজের লেখার খুবই ক্ষতি হয়। ন' মাস পত্রিকা চালিয়ে এ বিষয়ে ইবসেনের ধারণা হয়ে গিয়েছিলো বলেই পরবর্তী জীবনে অনেকে প্রচুর টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও উনি কখনো আর নিজে পত্রিকা চালাবার ঝুঁকি নিতে চান নি, যদিও লেখক হিসাবে অনেক পত্রিকাই ওঁর সহযোগিতা পেয়েছে।

পত্রিকার ব্যাপার নিয়ে প্রায় বছরখানেক কাটবার পরে ইবসেন আবার নতুন করে নিজের লেখা এবং পড়ায় মনোনিবেশ করলেন। এবার বিশেষ করে নাটকের দিকে ওঁর ঝোঁক দেখা গেলো। প্রাচীন আধুনিক কিছুই বাদ দিতেন না। বিশেষ করে ইসকাইলাস, ইউরিপিদেস, সোফোক্লেস, আরিস্তোফানেস, কালদেরন, শেক্সপীয়ার এবং মলিয়েরের সমস্ত রচনা একাধিকবার পড়ে ফেললেন ইবসেন। বালক এবং কিশোর ইবসেনকে যাঁরা জানতেন তাঁরা অনেকদিন ধরেই আশা করছিলেন ছাপার অক্ষরে ওঁর কিছু বই দেখবার জন্যে। কিন্তু বছরের পর বছর চলে যায়, বয়স কুড়ি পার হয়ে গেলো অথচ একখানাও বই বেরুলো না দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলো যে লেখা বা পড়াটা আসলে ওঁর একটা খেয়াল। লেখক হবার কোন বাসনা ওঁর নেই।

লেখার চর্চা অনেকদিন থেকে করলেও ইবসেনের প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিলো ওঁর ঠিক বাইশ বছর বয়সে! ইবসেনের প্রথম বইয়ের নাম 'ক্যাটিলিনা'—একখানি নাটক। লুসিয়াস সের্গিয়াস ক্যাটিলিনা রোমান রাজনীতির একটি অতি জটিল চরিত্র। দীন-দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও ক্যাটিলিনা নিজের যোগ্যতার জন্যে অল্পবয়সেই সরকারী চাকরী লাভ করেন এবং এক সময়ে আফ্রিকায় রোমের শাসনাধীন সমস্ত অঞ্চলের গভর্ণর পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সিসেরো এবং অন্য কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যে অকালেই তাঁর পতন হয়। একাধিক ইতিহাসকার ক্যাটিলিনাকে একজন 'হিরো' গোত্রীয় চরিত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। ইবসেনও সেইভাবেই তাঁর নাটকখানি রচনা করলেন। এ নাটক পদ্যে রচিত। প্রথম মঞ্চস্থ হবার পরে সাহিত্য হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্যাটিলিনার প্রচুর সুখ্যাতি হলো কিন্তু দর্শকমহল খুব ভালোভাবে নিলেন না। এর একটি প্রধান কারণ হলো একটানা দীর্ঘ, প্রায় বক্তৃতার মতো কথোপকথন। মঞ্চে ক্যাটিলিনার আশানুরূপ সফলতা না দেখে ইবসেন মনস্থ করলেন যে, নাটক লেখার সঙ্গে সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করবার কলাকৌশলও শিখবেন।

একটানা আট বছর চাকরী করবার পরে এবার ওষুধের দোকান থেকে বিদায় নেবার সময় এলো। মঞ্চের প্রয়োগকৌশল শেখবার বাসনা জন্মালেও ঠিকমতো যোগাযোগ হয়ে উঠছিলো না। কিন্তু একটা কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরী যোগাড় হয়ে গেলো। ওষুধের দোকানের মালিক ভালো মনেই ছেড়ে দিলেন ইবসেনকে। সম্পর্কটা মালিক এবং কর্মচারীর হলেও উভয়ে উভয়ের প্রতি মানুষ হিসেবে খুবই প্রিয় ছিলেন, আর তা' ছাড়া এইখানে কর্মরত অবস্থাতেই বাস্তব এবং ব্যবহারিক জীবনের অনেক কিছু সম্পর্কেই প্রচুর জ্ঞানলাভ করেছিলেন ইবসেন, নানা ধরণের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে। তাই জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দিকে পা বাড়াতে হলেও ইবসেন এই ছোটো ওষুধের দোকানটি ছেড়ে আসবার সময় ব্যথিত হয়েছিলেন।

দু' বছর সাংবাদিকতার পরে ইবসেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত একটা কাজ পেলেন একটা থিয়েটারে। প্রথমে সহকারী পরিচালক তারপর পরিচালকের কাজ। এটা হলো বার্গেনের 'ওল বুলস্' থিয়েটার। এর পরে ক্রিশ্চিয়ানার ন্যাশন্যাল থিয়েটারেও পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন ইবসেন। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬২ মোট এই ন' বছর দু'টো থিয়েটারের সঙ্গে পরিচালক হিসেবে যুক্ত থাকবার সুযোগ পেয়ে এবার মঞ্চের ওপর নাটকের সাফল্য অর্জনের জন্যে যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করলেন ইবসেন। ক্যাটিলিনা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে; তারপর থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত আর যে ক'খানি নাটক ইবসেন রচনা করলেন তার প্রত্যেকটিই মঞ্চেও অভাবিত জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এবং দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে ইবসেন স্বীকৃতিলাভ করলেন। 'লেডী ইনগার অব অস্ট্রাট', 'দি ভাইকিংস অব হেলগেল্যাণ্ড' ও 'দি রাইভাল কিংস'। এ তিনখানা নাটকের উপজীব্যই হলো উত্তর ইয়োরোপ অর্থাৎ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসের ছায়ানুসরণে রচিত কাহিনী। এ পর্যন্ত নাট্যকার হিসেবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বাইরে ইবসেনের তেমন কিছু পরিচিতি ঘটে নি। যদিও জার্মানীতে তাঁর দু'খানা নাটকের অভিনয় হয়েছিলো।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬৪ সালে একটা ব্যাপার ঘটলো যে জন্যে ইবসেন দেশত্যাগী হলেন। কয়েকটি দ্বীপের মালিকানা তথা সীমান্ত নিয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে জার্মানীর সৃষ্টি হলো বিরোধ। ক্ষুদ্র ডেনমার্ক জার্মানীর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন একা। তাই সে চাইলো নরওয়ের সাহায্য। কিন্তু নরওয়ে এগুতে সাহস পেলো না। জাতীয় সরকারের এই দুর্বলতা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন ইবসেন। নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের অধিবাসীরা সংস্কৃতিগতভাবে বলতে গেলে একই। রাজনীতির টানাপোড়েনে কখনো কখনো এই তিনটি অঞ্চলের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে শাসকের প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও নরওয়ের একজন সাধারণ মানুষ ডেনমার্কের একজন সাধারণ মানুষকে বরাবরই একান্ত আপনার মনে করে। দেশের সরকারের দুর্বলতার তীব্র প্রতিবাদ করলেন ইবসেন প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে, তারপর দেশত্যাগী

হলেন। দীর্ঘ আটাশ বছর (১৮৬৪-৯২) ইবসেন দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। এই আটাশ বছর জার্মানী এবং ইতালীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ইবসেন। তবে রোম, ড্রেসডেন এবং মিউনিখে কয়েক বছর করে বাস করেছেন। দেশত্যাগ করলেও স্বদেশে ইবসেনের জনপ্রিয়তা তখন এতই ব্যাপক হয়ে উঠেছিলো যে, বিদেশে অর্থকষ্টে কাটাচ্ছেন দু' একটি পত্রিকায় এ সংবাদ বেরোবার পরেই স্বদেশের সরকার বাধ্য হয়েছিলেন ইবসেনের জন্যে একটা মাসিক ভাতা বরাদ্দ করতে। এটা ১৮৬৬ সালের কথা। এরপর ইবসেন আরো চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন এবং নাম, খ্যাতি ও রোজগারের দিক থেকে ইবসেনের তখন এমনই সুসময় যে তখন কোনও 'ভাতা'র আর প্রয়োজন ছিলো না।

১৮৬৪ সালে ইবসেন যখন দেশত্যাগী হলেন তখন থেকে ওঁর জীবনের দ্বিতীয়পর্ব সুরু বলা যেতে পারে। এই পর্বভাগটা আমরা ইবসেনকে বুঝবার সুবিধের জন্যেই করছি। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্বের কার্যকাল বলে আমরা মনে করবো। ১৮৭৭ থেকে ইবসেনের জীবনের তৃতীয় পর্বের সুরু বলে আমরা মনে করবো। কারণ ঐ বছরই তাঁর সমাজসমস্যামূলক বাস্তবধর্মী গদ্য নাটকগুলির প্রথমটি—'দি পিলারস অব সোসাইটি' প্রকাশিত হয়।

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই নাটক রচনার ব্যাপারে ইবসেনের দক্ষতা যেমন প্রাচীনপন্থী যে কোনো নাট্যকারের দক্ষতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পরে এইরকম উচ্চমানে উন্নীত হয়েছে, ঠিক তেমনি যে কোনো নাটকের মঞ্চ-সাফল্যের জন্যে প্রয়োগ-কৌশল সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান অসাধারণ। রোমে আসবার পর অনেক তরুণ নাট্যসম্প্রদায়ের উৎসাহী শিল্পীরা আসতেন মঞ্চ-প্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে ইবসেনের কাছ থেকে শেখবার জন্যে এবং বুঝবার জন্যে। ড্রেসডেন এবং মিউনিখেও ঠিক একই অবস্থা হতো। বলাই বাহুল্য, তরুণ নাট্যকার এবং শিল্পীরা সবসময়ই ইবসেনের কাছ থেকে পরামর্শ পেতেন। দ্বিতীয় পর্বে ইবসেন মোট তিনখানি নাটক রচনা করেছিলেন 'ব্র্যাণ্ড' (১৮৬৬); 'পীয়ার গিণ্ট' (১৮৬৭) এবং এমপারার এণ্ড গ্যালীলিয়ান' (১৮৭৩)। পদ্যে রচিত ক্লাসিকধর্মী এই নাটক তিনখানিকে প্রাচীনপন্থী ভাববিলাসী ইবসেনের কাব্য ও নাট্যপ্রতিভার পরিণত প্রকাশ মনে করা যেতে পারে। কেন, আমরা একে একে এবং সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো।

দেশত্যাগ করবার সময় নাট্যকার হিসেবে ইবসেনের স্বীকৃতি প্রধানত নরওয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু ব্র্যাণ্ড প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইবসেন গোটা ইয়োরোপে একজন প্রথম-শ্রেণীর নাট্যস্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। ব্র্যাণ্ড নাটকে কবি হিসেবে যেমন ইবসেনের প্রতিভা পাঠককে মুগ্ধ করে, বিষয় নির্বাচনও তেমনি অনায়াসেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরাতনের খোলস বজায় রেখেই যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায় ব্র্যাণ্ড তারই প্রমাণ।

ব্র্যাণ্ড একজন পাদ্রী। সজ্ঞানে কোনোপ্রকার অন্যায় না করতে ব্র্যাণ্ড দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তার এই দৃঢ়তা একাধিকবার একাধিকজনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। অন্যায় কি? কি কাজ করলে ন্যায় হয়, কি করলেই বা অন্যায় হয়? ব্র্যাণ্ড তার নিজস্ব কতকগুলি ধারণার দ্বারা আগাগোড়া পরিচালিত। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে তার নিজস্ব ধারণা আছে এবং সেই ধারণানুযায়ী কোনো অবস্থাতেই সে কোনোপ্রকার অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলে না। ব্র্যাণ্ড যেমন পরিশ্রমী তেমনি দুঃসাহসী। কোনো অবস্থাতেই কর্তব্যকর্ম থেকে কেউ তাকে বিচ্যুত করতে পারে না, এমন কি নিজের মৃত্যুভয়ও না। একদিনের ঘটনা:

ব্র্যাণ্ডের কানে গেলো যে একটি কৃষকের মেয়ে মৃত্যুশয্যায়। কাজেই সেখানে অবিলম্বে ব্র্যাণ্ডের উপস্থিতি প্রয়োজন। কারণ জায়গাটা ব্র্যাণ্ডের গীর্জার অঞ্চলভুক্ত। কৃষকটি নিজে বারবার ব্র্যাণ্ডকে বারণ করতে লাগলো যে, এই দুর্যোগের মধ্যে বের হবেন না। কারণ একে তো দারুণ কুয়াশা পড়ছে, দু'গজ দূরেরও কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তারপর সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হলে একটা নদী পেরুতে হবে—যে নদীর জল খুব সম্ভব এতক্ষণে জমতে আরম্ভ করেছে নিদারুণ ঠাণ্ডায়। জমতে আরম্ভ করেছে কিন্তু একেবারে জমে নি; অর্থাৎ নদীর নীচের জল এখনো তরল কিন্তু ওপরের অংশ জমতে আরম্ভ করেছে, তার ফলে ওপরের তুষারখণ্ডগুলি এখন রীতিমতো সঞ্চরণশীল তার ওপর দিয়ে না চলে হাঁটা, না চালানো যাবে সে নদীতে নৌকো—কাজেই সে নদী পার হওয়াই অসম্ভব। নিজের কন্যার মৃত্যুকালীন পাদ্রীদর্শন এবং পাদ্রীর মুখের পুণ্যবাণী শ্রবণের চাইতে পাদ্রীর জীবনরক্ষার সং পরামর্শ দেওয়া কৃষক অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করলো। কিন্তু ব্র্যাণ্ড ভিন্নজাতের মানুষ। কর্তব্যের চাইতে বড়ো তার কাছে কিছুই নয়। তাই দেখা যায় জীবনের অনিত্যতা, তুচ্ছতা এবং সতস্র ত্রুটির কথা উল্লেখ করে, জোরদার একটা বক্তৃতা দিয়ে ব্র্যাণ্ড কৃষকটিকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো তার দুঃসীম কর্তব্যসাধনের জন্যে। আর একদিনের ঘটনা:

ব্র্যাণ্ড একটা ফিওর্ডের (পর্বতসংকুল তীরভূমির মধ্যে ঢুকে-পড়া সমুদ্রের খাঁড়ি) পাড়ে দাঁড়িয়ে। এখুনি অবিলম্বে তাকে ওপারে যেতে হবে। কেন না তার কাছে খবর এসেছে, একটি লোক যে বেশ কয়েকটা খুনজখম করেছে বর্তমানে মৃত্যুশয্যায়, পাদ্রী ব্র্যাণ্ডের মুখের দু'চারটি পূত-পবিত্র সান্ত্বনাবাক্য না শুনে সে মরতে পারছে না, কাজেই এখুনি ব্র্যাণ্ডের ওপার যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাওয়া যাবে কি করে? কোনো মাঝি বর্তমানে এই ফিওর্ডের মধ্য দিয়ে নৌকো চালাতে রাজী নয়, কারণ প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। বাতাসের যে তীব্রতা তাতে দম নেওয়াই দুষ্কর, এর মধ্যে কি আর নৌকো চালানো সম্ভব? ব্র্যাণ্ড অনেক করে জেলেদের বোঝাবার চেষ্টা করলো, তারা ব্র্যাণ্ডের মস্তিষ্কের স্থৈর্য সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত একটি মহিলা ব্র্যাণ্ডের আদর্শবাদে মুগ্ধ হয়ে রাজী হলো ওকে সাহায্য করবার জন্যে। নারী ধরলো হাল আর ব্র্যাণ্ড পালের দড়ি ধরলো। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ব্র্যাণ্ড রওনা হলো তার কর্তব্য সমাধা করবার জন্যে। এই রমণীকেই পরে ব্র্যাণ্ড তার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। কারণ নিজেকে যেমন সে আদর্শ পুরুষ হিসেবে মনে করে এই রমণীর মধ্যে তেমনি আদর্শ নারীর সমস্তগুণের লক্ষণ ব্র্যাণ্ড দেখতে পেলো। যথা সময়ে একটি ছেলে হলো ওদের। দু'জনেই সুখী ওদের সন্তান নিয়ে। কিছুকাল পরে

মারা গেলো ছেলেটি দারুণ ঠাণ্ডায় ভুগে। ব্র্যাণ্ডের স্ত্রী মৃতসন্তানকে কোলে করে বসে কাঁদছে, এমন সময় ওদের সামনে এলো একটি জিপসী—তার বিবস্ত্র শিশুটি ঠাণ্ডায় জমে আসে আর কি। ব্র্যাণ্ড নির্দেশ দিলো স্ত্রীকে তার মৃতসন্তানের জামাটা খুলে জিপসীকে দিতে। কয়েকটা জামাই ওর গায়ে ছিলো। শোকে বিহ্বল নারী একটি বাদে আর সব ক'টা জামাই তার মৃতশিশুর গা থেকে খুলে জিপসীকে দিয়ে দিলো। ঐ একটি ছোট্ট জামা ও রেখে দিতে চায় তার সন্তানের স্মৃতিস্বরূপ। কিন্তু ব্র্যাণ্ড বললো, না, তা' চলবে না। এটা আদর্শের প্রশ্ন। জিপসীর সন্তানকে বাঁচাবার সমস্ত চেষ্টাই করা দরকার। কাজেই স্মৃতির ভুয়ো প্রশ্ন তুলে ঐ জামাটাও রাখা চলবে না। স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ মেনে চললো। কিন্তু এতে শোকের তীব্রতা এতই বেড়ে গেলো যে তার নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু ব্র্যাণ্ড তবু কর্তব্যে অটল। এমনিধারা একটির পর একটি ঘটনার দ্বারা ব্র্যাণ্ডের চরিত্র যেভাবে প্রকটিত হলো তাতে সাধারণের কাছে ও একজন সন্ত হিসেবে খ্যাত হলো। নবনির্মিত ছোটো গির্জাটিতে আর লোক ধরে না ব্র্যাণ্ডের উপদেশ শোনবার জন্তে। বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা, তুষারপাত হচ্ছে। তারই মধ্যে ব্র্যাণ্ড আহ্বান জানায় সবাইকে—এখানে এই ছোটো জায়গায় কি আর ঈশ্বরের কথা বলা যায় না শোনা যায়। চলো আমরা সবাই ঈশ্বরের নিজস্বভূমিতে, ঐ সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে আমাদের ধর্মালোচনা সুরু করি। এই বলে ধর্মোন্মাদ ব্র্যাণ্ড বেরিয়ে এগুতে লাগলো পাহাড়ের দিকে। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকটা এগুবার পরই স্খলিত হিমানীস্তূপের মধ্যে তার দেহ হারিয়ে গেলো।

ব্র্যাণ্ডের চরিত্র যা ইবসেন এঁকেছেন তা' যে রীতিমতো Heroic সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু, পাত্রী না বানিয়ে ইবসেন তাকে অন্য কিছুও বানাতে পারেতেন। ধর্মে নিষ্ঠার নামে এই যে গোঁড়ামী বা গোঁয়ার্তুমি এটা ইবসেন ধর্মের বিরুদ্ধতা করবার জন্তে ব্যঙ্গ করেই করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। শ'রের ভাষায় পাত্রী ব্র্যাণ্ড is a villain by virtue of his determination to do nothing wrong.

ইবসেনের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় সৃষ্টি হলো 'পেয়ার গিন্ট' (১৮৬৭)। 'পেয়ার গিন্ট' প্রায় পৌনে তিন শ' পৃষ্ঠার একখানি বিরাট নাট্যকাব্য। পাঁচ অঙ্কে মোট পঁয়ত্রিশটি দৃশ্যে এই নাটকখানি রচিত হয়েছে। এর স্থান নির্বাচনেও ইবসেন আন্তর্জাতিকতার পরশ দেবার চেষ্টা করেছেন। নরওয়ের একটি পার্বত্য অঞ্চলে এ নাটকের সুরু এবং আর একটি পার্বত্য অঞ্চলে এর শেষ দৃশ্য রচিত—কিন্তু এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই নায়ক পেয়ারকে কখনো মরক্কোতে, কখনো সাহারায়, কখনো বা কাইরোর পাগলাগারদে। জীবনের প্রথম দু'টি পর্বের মধ্যে 'পেয়ার গিন্ট' যে ইবসেনের শ্রেষ্ঠকীর্তি এ বিষয়ে সমস্ত দেশের সমালোচকগণই একমত। তবে কেন ইবসেন এ নাটকখানি রচনা করেছিলেন সে সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে।

আমরা যদি ইবসেনকে রবীন্দ্রনাথ ধরে সেই আলোচনার খাতিরে এগুই, তা হ'লে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর জীবদ্দশায় জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের কাছে হার মানতেন, পেয়ার গিন্ট-এর প্রকাশ পর্যন্ত স্বদেশে ইবসেনেরও অনেকটা সেই রক অবস্থা ছিলো দেখা যায়। ইবসেনের নামোল্লেখেই সবাই মা নোয়াতো, কিন্তু সে হলো শ্রদ্ধার নিদর্শন—একটা বিরাট কিছু এক সবাই বলছে, কিন্তু তার বিরাটত্বকে বুঝবার কষ্টটা কেউ বড়ো এক করতে রাজী নয়—কাজেই জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে দেখা যে বিয়র্ণস্টার্ণ বিয়র্ণসন সকলের ওপরে। বিয়র্ণসন ছিলেন গল্পকার এ ঔপন্যাসিক, ওঁর 'আর্ণে' এবং 'ইন গডস ওয়ে' নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণী সৃষ্টি; বিয়র্ণসনকে নোবেল-পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু আজকের দিনে এ কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে কি বিষয় নির্বাচন আর কি গভীরতাবোধ বা জীবনের ব্যাপকতাবোধ ইবসেনে সঙ্গে বিয়র্ণসনের কোনো তুলনাই হয় না—যেমন রবীন্দ্রনাথের স শরৎচন্দ্রের তুলনা করা সঙ্গত হয় না। আর তা' ছাড়া, বয় ইবসেন মাত্র চার বছরের বড়ো হলেও বিয়র্ণসন নিজে বুঝতেন ইবসেন কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী, তাই দেখা যায় 'পেয়ার গি প্রকাশিত হবার পরে স্বদেশের একখানি মাসিকপত্রে বিয়র্ণসন রচনার আলোচনা করে নানা কথার পরে বলছেন:

নরওয়েজীনদের যা কিছু দোষ, তাদের অতিমাত্রায় অহংবো সঙ্কীর্ণতা, আত্মসন্তুষ্ট ভাব—এ সব কিছুরই চমৎকার শ্লেষপূর্ণ রচ পেয়ার গিন্ট, এর রচনাশৈলীতে আমি মুগ্ধ, অন্তরে আমি বার বা লেখককে আমার শ্রদ্ধা জানিয়েছি—এবং এখন প্রকাশ্যে আর একবা জানাচ্ছি।

কিন্তু ডেনমার্কের প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক জর্জ ব্রাণ্ডে বলেছেন: জার্মানীর সাহিত্যরসিকমহলে সকলের ধারণা বিয়র্ণসন নরওয়ের যে যুবসমাজের জয়গানে মুখর, যাদের কোনো দোষ তাঁর চোখে পড়ে নি, ইবসেন ঠিক তাদেরই দুর্বল দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন এ নাটকে; কাজেই সজ্ঞানভাবে তাঁকে বিয়র্ণসনের বিরোধিতায় নামতে হয়েছে। প্রখ্যাত ফরাসী সমালোচক অগাষ্ট এরহার্ডও এই মত পোষণ করতেন। এ সমস্ত ধারণার মধ্যে যে কতটা সত্যতা আছে তা আজকের দিনে বুঝতে যাওয়ার অনেক বাধা আছে। এ নাট্যকাব্য রচনার মূল প্রেরণা ইবসেন যেখান থেকেই পেয়ে থাকুন না কেন, কিছুটা অগোছালো ভাবে ছড়ানো এ নাটকের নানা গভীরতত্ত্ব সমস্ত অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। যাঁদের এ নাটক ভালো লাগে নি তাঁরাও ইবসেনকে বুঝবা জন্তে এ নাটকখানির বিশেষ গুরুত্ব দেন। যাঁদের ভালো লেগেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ'। শ'য়ের মতে 'পেয়ার গিন্ট' সমস্ত দিক দিয়েই ব্র্যাণ্ডের পরে একটা লক্ষণীয় অগ্রগতি। যাঁদের ভালো লাগে নি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জর্জ ব্রাণ্ডেস (ইবসেন ব্যাখ্যাতা হিসেবে এঁর স্থান শ'য়ের ওপরে না হলেও নিশ্চয়ই সমান সমান)। ব্রাণ্ডেস তাঁর তুলনামূলক সাহিত্যালোচনার বই ইবসেন এণ্ড বিয়র্ণসন'-এ পেয়ার গিন্ট সম্বন্ধে লিখছেন:

'কি বিরাট এবং মহান্ সৃষ্টি-শক্তি একটা মাথামুণ্ডুহীন রচনা তৈরির জন্তে অপচয় করা হয়েছে। আত্মার অবমাননা এবং মানবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা—এর ওপর ভিত্তি করে কখনো সাহিত্য রচিত হতে পারে না।' ব্রাণ্ডেস ইবসেনের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন ব্রাণ্ডেস-এর স্বভাবই ছিলো স্পষ্ট করে খোলাখুলি ভাবে নিজের ম

প্রকাশ করা। ব্রাণ্ডেস-এর উক্তির ফলে ইবসেনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা জানা যায় না।

কিন্তু সে সময়কার ডেনমার্কের আর একজন বিখ্যাত সমালোচক ক্লেমেন্স পেটারসেন যখন একটা পত্রিকায় লিখলেন যে :

বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা দৃশ্য পেয়ার গিন্টের মন্দ হয় নি, কবিতা হিসেবে দু'একটা লাইন মন্দ নয় কিন্তু সমগ্রভাবে রচনাটি একটি নিকৃষ্ট কীর্তি—তখন দেখা গেলো ইবসেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই সময়ে বিয়র্ণসনকে একখানি চিঠিতে ইবসেন লিখেছিলেন :

'পেয়ার গিন্ট একখানি খাঁটি কাব্য। এ কথা এখনই স্বীকৃত না হলেও, পরে প্রমাণিত হবে। আপনারা দেখতে পাবেন, আমাদের দেশের অর্থাৎ নরওয়ের কবিতা ও কাব্য বিচারে 'পেয়ার গিন্ট'ই ভবিষ্যতে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হবে।'

ইবসেনের এ ধারণা তাঁর জীবদ্দশাতেই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। এ ছাড়াও দেখা যায় ইবসেন তাঁর প্রকাশককে পেয়ার গিন্টের প্রথম তিনটি দৃশ্যের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন :

'এই রচনাটিতে হাত দেওয়ার পর থেকেই মনে আমার একটা নতুন ধরণের অনুভূতিবোধ করছি, লেখা যতোটুকু হয়েছে তাতেই আমার নিজের বিশ্বাস যে মনে মনে আমি ঠিক যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, তা করতে পেরেছি, আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।'

পেয়ার গিন্ট প্রকাশিত হবার পরে প্রথম যে নিন্দা এবং প্রশংসার ঝড় উঠেছিলো তার প্রায় দশ বছর পরে ইবসেন তাঁর বন্ধু সমালোচক ব্রাণ্ডেসকে লিখেছিলেন :

'পেয়ারকে কি আপনার ভালো লাগে নি? আমার ধারণা এ একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র। আর পেয়ারের মা? এ রকম একজন মাকে কার না ভালো লেগে পারে? সে যে আমারও মা। আমারও বাবা' পেয়ারেরই মতো খুব অল্পবয়সে বিত্তহীন অবস্থায় মারা যায়...।'

ইবসেনের এই চিঠি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পেয়ার গিন্ট নাট্যকাব্যে তাঁর নিজের জীবনের বেশ খানিকটা রয়ে গেছে। এবং সেই জন্যেই সমগ্রভাবে ইবসেনকে বোঝবার জন্যে পেয়ার গিন্ট একখানা অবশ্যপাঠ্য রচনা।

হ্যামলেট, ফাউস্ট বা প্যারাসেলসাস যেমন শেক্সপীয়ার, গ্যয়টে বা ব্রাউনিং-এর পূর্ব থেকেই কিংবদন্তীতে খুবই জনপ্রিয় ছিলো 'পেয়ার গিন্ট'ও অনেকটা সেই রকম। প্রাচীন ভাইকিংদের যুগের অবসানের পরে ইয়োরোপের উত্তরাঞ্চলে এমন কি মধ্য ইয়োরোপেরও পার্বত্য অঞ্চলে একশ্রেণীর লোক দেখা যেতো—তারা হলো শিকারী। এদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সাধারণের কখনই খুব বেশি কিছু জানা সম্ভব হয় না। কখনো সখনো লোকালয়ের সংস্পর্শে যখন এরা এসে পড়ে তখনই সাধারণ মানুষের এদের সম্পর্কে জানবার সুযোগ হয়। আর তা ছাড়া অপেশাদার শিকারীদের মুখ থেকেও এদের সম্পর্কে নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক শ' বছর থেকে নরওয়েতে এমনই একটি শিকারীর কাহিনী লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। সেই [illegible] এই 'পেয়ার গিন্ট'। ইবসেন এই কিংবদন্তীমূলক চরিত্রটিকে [illegible] তাঁর পেয়ার গিন্ট' নাট্যকাব্য রচনা করলেন। বলাই বাহুল্য [illegible] তাঁর রচনায় যে কাহিনী পরিবেশন করলেন তা যেমন তাঁর [illegible], নাটকে যা বক্তব্য তা'ও তাঁর নিজস্বতায় ভাস্বর।

'পেয়ার গিন্ট' একজন ভাববিলাসী যুবক, ব্র্যাণ্ডের মতো ভুল সে করে না। নিজের আদর্শ রূপায়ণের জন্যে সে ব্র্যাণ্ডের মতো কঠোর বা দৃঢ়চেতা নয়। ব্র্যাণ্ডের বেলায় দেখা গেছে তার আদর্শ সে জবরদস্তি করে নরনারী নির্বিশেষে সকলের ওপর চাপাচ্ছে, কিন্তু পেয়ার তা করে না; পেয়ার তার আদর্শকে একান্তই তার নিজস্ব বলে মনে করে এবং তার আদর্শের গোপনীয়তাও রক্ষা করতে চেষ্টা করে। এ্যাডভেঞ্চারই হলো পেয়ারের জীবনাদর্শ। পেয়ার পাহাড়ের ওপর তার কুটীরের দরজায় লিখে রেখেছে : 'পেয়ার গিন্ট, এমপারার অব হিমসেলফ।' নানা উপায়ে শিকারের নানা পদ্ধতি পেয়ার ক্রমাগতই উদ্ভাবনের চেষ্টা করে। কখনো বা দেখা যায় অতি-প্রাকৃত উপায়ও সে অবলম্বন করছে। একসময় ওদের অঞ্চলে নবাগত একটি পরিবারের সঙ্গে পেয়ারের পরিচয় হয়, তাদের একটি মেয়ে সোলভেগ এর সঙ্গে পেয়ারের প্রণয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেলো। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা গেলো পেয়ার একসময় আমেরিকায় এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করলো। তারপর আমেরিকা থেকে আফ্রিকা আসবার সময় পেয়ারের হলো এক দুর্বিপাক—যে ছোট্ট জাহাজে করে ও এসেছিলো সেখানা করলো একজনে চুরি, কিন্তু তারপরে চোখের ওপরই দেখলো বন্দরের ফেটে ছোট্ট জাহাজখানা ধ্বংস হয়ে গেলো। এরপর দেখা পেয়ারকে একটা সাদা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে চলেছে তার এ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্যে। মরু অঞ্চলে এক আরব উপজাতি থাকে। তাদের চোখে সাদা ঘোড়ার সওয়ার মানেই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ। তারা সেইভাবেই পুজো করতে লাগলো পেয়ারকে। পেয়ার এতদিনে বুঝলো যে সে তার অন্তর্নিহিত গুণের জন্যেই সমাদর পাচ্ছে (যদিও আসলে তা নয়, আরবদের কুসংস্কারই হচ্ছে এর কারণ)। কিন্তু এই ধর্মগুরুগিরি পেয়ারের বেশিদিন করা হলো না। এক নর্তকীর প্রেমে পড়লো। কিন্তু এই নর্তকী ওর সাদা ঘোড়াটি চুরি করে চরম বিপদে ফেললো পেয়ারকে। ঘুরতে ঘুরতে পেয়ার ফিনক্স-এর কাছে এসে পৌঁছলো। সেখানে পরিচয় হলো এক জার্মানের সঙ্গে। এই জার্মানটি পেয়ারকে নিয়ে এলো কাইরোর পাগলা-গারদে। এখানকার পাগলেরা তাদের রক্ষীদের বন্দী করে নিজেরা স্বাধীনভাবে হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে। এই পাগলেরা পেয়ারকে পেয়ে খুবই খুশি—তাদের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হলো পেয়ার। এইভাবে নিজের খেয়াল এবং এ্যাডভেঞ্চারের নেশা চরিতার্থ করতে করতে পেয়ার এক সময় আবার স্বদেশে তার প্রথম প্রণয়িনীর কাছে ফিরে এলো। এখন পেয়ারও প্রৌঢ়, নারীও প্রৌঢ়া—সমস্ত জীবনটাই যে একটা খেয়ালের ওপর কেটে গেলো এতদিনে পেয়ার তা উপলব্ধি করছে। পেয়ার নিজের বাস্তব জীবন পর্যালোচনা করে দেখতে পারছে যে, তার আদর্শ কোথাও কখনো পূর্ণ হয় নি, উপরন্তু নানা ঘটনার প্রবাহে তার নিজেরই প্রকৃতি গেছে পাল্টে। তাই পেয়ার সোলভেগ-এর কল্পনায় এখনো যে যুবক 'পেয়ার'-এর স্মৃতির পরশ পায় তার মধ্যেই দেখতে পায় আদর্শ পেয়ার গিন্টকে।

দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় সৃষ্টি 'এম্পারার এণ্ড গ্যালিলীয়ান' পেয়ার গিন্ট'-এর দু'বছর পরে প্রকাশিত। আয়তনে বিরাট এ নাটকখানির মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে দু'খানা নাটকের মালমশলা রয়েছে।

'জুলিয়ান এণ্ড দি ক্রাইষ্ট' নামেও কেউ কেউ নাটকখানির অনুবাদ করেছেন। যীশুর আবির্ভাব এবং তার ফলে রোমান সাম্রাজ্যে যে নানা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিলো এই সুবৃহৎ নাটকে ইবসেন তারই কিছু কিছু দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে এর মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে ইবসেনের নিজস্ব ব্যাখ্যাও এ নাটকের অন্যতম সম্পদ।

সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের পরিবর্তন ঘটানো জীবনের যে কোনোদিকেই অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে এ জিনিষটা আরো বেশি কষ্টকর ব্যাপার। কারণ কিছুদিন লেখার চর্চা করার পরে দেখা যায় প্রত্যেক লেখকেরই একটা নিজস্ব ধরণ গড়ে ওঠে এবং প্রকৃতই অসাধারণ স্রষ্টা ব্যতীত অর্থাৎ অফুরন্ত ভাবধারণার উৎস যাঁদের মধ্যে রয়েছে তাঁরা ব্যতীত নিজের একটি বিশেষ ধরণের বাইরে যেতে পারেন না বা একাধিক ধরণের সৃষ্টিও করতে পারেন না। ইবসেনের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখে যায় যে, উনি প্রকৃতই একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী স্রষ্টা ছিলেন। তাই দেখা যায় প্রথম যৌবনে যিনি সুন্দর সুন্দর প্রেমের কাহিনীর নাট্যরূপ রচনা করছেন, পরিণত বয়সে তিনিই সমাজ-সংসারমূলক, চাই কি সামাজিক সম্বন্ধে আমূল পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারাপূর্ণ নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। সেও একটি বা দু'টি নয়; একটির পর একটি করে মোট বারোটি। নাট্যসাহিত্যে যুগপ্রবর্তক হিসেবে ইবসেনের যে খ্যাতি তা প্রধানত জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে রচিত এই বারোখানি গদ্যে রচিত সামাজিক নাটকের জন্যে। এ পর্বের সুরু ১৮৭৭ সালে এবং শেষ ১৯০০ সালে। '৭৭ সালে প্রকাশিত হয় 'দি পিলারস অব সোসাইটি' এবং ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় ইবসেনের শেষ রচনা 'হোয়েন উই ডেড এ্যাওয়েকেন'। এ ছাড়া অন্য নাটকগুলির নাম হলো 'এ ডলস হাউস' (১৮৭৯); 'গোস্টস' (১৮৮১); 'এ্যান এনিমি অব দি পিপল' (১৮৮২); 'দি ওয়াইল্ড ডাক' (১৮৮৪); রসমারসহলম (১৮৮৬); 'দি লেডী ফ্রম দি সী' (১৮৮৮); 'হেড্ডা গ্যাবলার' (১৮৯০); 'দি মাস্টার বিল্ডার' (১৮৯২); 'লিট্‌ল ইয়লফ' (১৮৯৪); 'জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান' (১৮৯৬)।

নাট্যকার হিসেবে ইবসেনের জীবনের সুরু অর্থাৎ 'ক্যাটিলিনা' থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত আমরা তাঁর যতোগুলি নাটকের নাম পেয়েছি তা ছাড়াও আরো দু'খানি নাটক ইবসেন রচনা করে গেছেন। তার একখানির নাম 'লাভস কমেডি' (১৮৬২) এবং অন্যটির নাম 'দি লীগ অব ইয়ুথ' (১৮৬৯)। রচনাকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এর প্রথমখানি ইবসেনের জীবনের প্রথম পর্বে রচিত এবং দ্বিতীয়খানি দ্বিতীয় পর্বে রচিত। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় আমরা এ নাটক দু'খানির উল্লেখ এই জন্যে করি নি যে, নাট্য-সাহিত্যে আধুনিকতার জনক হিসেবে ইবসেনের যে খ্যাতি, অর্থাৎ জীবনের তৃতীয় পর্বের যে বারোখানি সামাজিক গদ্য নাটক তার কিছুটা আভাস এই দু'টি নাটকে পাওয়া যায়। কাজেই ভাবের দিক থেকে, অনেক আগের রচনা হলেও, নাটক দু'টি ইবসেনের জীবনের তৃতীয় পর্বের সঙ্গেই যুক্ত।

তৃতীয় পর্বের মোট বারোখানির প্রত্যেকটি নাটক নিয়ে আলোচনা বর্তমানে সম্ভব নয়। তবে দু'টি নাটক সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করবো। বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে, বা তারো দশ কি পনেরো বছর আগে থেকে বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো—তার জন্যে বেশ কিছুটা কৃতিত্ব যে একা ইবসেনের, তৃতীয় পর্বের এই দু'খানা নাটকের আলোচনার ফলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমেই বলতে হয় 'এ ডলস্ হাউস'-এর কথা। এ নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে এই রকম:

মিঃ হেলমার, তার স্ত্রী নোরা এবং তাদের তিনটি সন্তান এই নিয়ে একটি ছোট্ট কিন্তু সুন্দর গোছানো সুখের সংসার। পরস্পরের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একদিকে যেমনই মধুর এবং আন্তরিক, অন্যদিকে তেমনি সরলতায় ভরা। পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়াটা এককথায় যাকে বলে চমৎকার। বলতে গেলে একটা আদর্শ সংসার। মিঃ হেলমার যেমন স্বামী এবং বাপ হিসেবে আদর্শস্থানীয়, নোরাও ঠিক তেমনি স্ত্রী এবং মা হিসেবে। কিন্তু কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা ওদের সংসার ভেঙেচুরে তচনচ করে দিলো। তার মূল কারণ অন্য কেউ বা বাইরের কিছু অতোটা নয় যতোটা তারা নিজেরা, বিশেষ করে নোরা নিজে। নোরা তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে জীবনের, বিশেষ করে সংসারের ভিত্তি রচনা করবার জন্যে অনেক সময় যে ভুয়ো এবং নানা মিথ্যা ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, তার অসারতা বুঝতে পারে।

স্বামী অসুখ থেকে উঠেছে, সবাই বলে বায়ুবদল করতে পারলে ভালো হবে, তাড়াতাড়ি শরীর ঠিক হবে। কিন্তু সংসার ওদের ঠিক ততটা স্বচ্ছল নয়। অথচ স্বামীর বায়ুবদল অবশ্যই দরকার। তাই নোরা টাকা সংগ্রহ করলো। স্বামীকে সে জানালো যে ওর বাবা টাকাটা দিয়েছেন, কাজেই এটা নিতে দোষ নেই। মিঃ হেলমার নিলো সে টাকা। কিন্তু এই ঘটনা থেকেই নাটকে জটিলতা দেখা দিলো। কারণ, বাস্তবিকপক্ষে নোরার বাবা কোন টাকা দেন নি। টাকাটা নোরা নিজেই সংগ্রহ করেছে একজন সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট দিয়ে। তা'ও নিজের হ্যাণ্ডনোট নয়। মহাজন জানালো যে, নোরার বাবা হ্যাণ্ডনোটে সই দিলে সে টাকা ধার দিতে পারে, তা' না হলে নয়। নোরা বললো, বাবার সই এনে দেবে। হ্যাণ্ডনোটের কাগজে নোরার বাবার নামের যে সই পড়লো তা আসলে নোরার হাতের। মহাজন ব্যাপারটা যে একেবারে বুঝলো না তা' নয়; কিন্তু অন্য কাউকেও কিছুই বুঝতে দিলো না। কারণ, ও জানে যে, অনেক সময় খাঁটি সইতে লোকে ধার শোধ না করলেও জাল সইয়ের জন্যে করে থাকে। তাই সে টাকা দিলো নোরাকে।

কিছুদিন পরের কথা। মিঃ হেলমার যে ব্যাঙ্কে চাকুরী করতো, যোগ্যতা এবং সততার জন্যে ও সেইখানেই ম্যানেজারের পদ লাভ করলো। সুদখোর মহাজনটি কিছুকাল ধরেই ঐ ব্যাঙ্কে একটা ভালো মাইনের চাকুরীর জন্যে চেষ্টা করছিল। এবার মিঃ হেলমার ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হওয়াতে ওর মনে হলো যে, এবার নিশ্চয়ই পদটি লাভ করা যাবে, কেন না জাল সইয়ের ভয় দেখিয়ে নোরাকে দিয়ে তার স্বামীকে প্রভাবিত করা যাবে [illegible]

করলো। কিন্তু কার্যত তা হলো না। নোরা হেসেই উড়িয়ে দিলো লোকটার ভয় দেখানোকে। ও বললো, বাবার সই আমি জাল করে থাকলেও তাতে কিছুই আসে যায় না যে পর্যন্ত তুমি টাকা পাচ্ছো? নোরা আন্তরিক ঘৃণা করতো এই লোকটাকে যে জন্তে স্বামীর কাছে এর বিষয়ে সুপারিশের কথা ও মনেও আনলো না। কিন্তু এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। মহাজনের আবেদন মিঃ হেলমার তো প্রত্যাখ্যান করলোই উপরন্তু পূর্বে একসময় ঐ লোকটি যে একটা দলিল জাল করেছিল সে সম্পর্কে তীব্র ভাষায় বললো নোরাকে। জাল করা বা মিথ্যা সম্পর্কে স্বামীর এই জোরালো উক্তি শোনবার পরে এতদিনে নোরার টনক নড়লো। ওর একটা ধারণা ছিলো যে, বাবার সইটা আমি মেয়ে হয়ে জাল করেছি তাতে এমন আর কি হয়েছে। কিন্তু এবার বুঝলো, না ব্যাপারটা যতো ছেলেখেলা নয়। মিঃ হেলমার আরো উক্তি করলো যে, ব্যবহারিক জীবনে মানুষের অসাধুতার সূত্রপাত হয় মায়ের দোষে। নারা এরপর থেকে নিজের সম্পর্কে ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। সন্তানদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার পক্ষে ক্রমশ মন নিজেকে অযোগ্য বলে মনে হতে লাগলো। শুধু যে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি বা খেলা করলে বা ওদের ভালোভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখলেই কর্তব্য সমাধা হয়ে যায় না, বা এইগুলিই যথেষ্ট নয়, এ কথা নারা প্রতিমুহূর্তেই মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলো। জাল ান্ডনোটের বাকী টাকাটা শোধ করবার জন্তে নোরা মনস্থ করলো র স্বামীর এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকাটা ধার নেবে। স্বামীর সঙ্গে নারার সম্পর্ক খুবই মধুর। প্রত্যেক সংসারেই দেখা যায় স্বামীর াছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত কিছু আদায় করবার জন্তে প্রত্যেক স্ত্রীই র নিজস্ব একটা পন্থা উদ্ভাবন করে নেয়। কোথাও রাগ, কাথাও অভিমান কোথাও বা অন্ত কোনো উপায়। নোরারও একটা জস্ব পদ্ধতি আছে। ঘটনাচক্রে দেখা যায়, সম্পূর্ণ নিজের জ্ঞাতসারে নোরা তার স্বামীর বন্ধুর সঙ্গেও টাকা ধার করবার াপারে ঠিক সেই ভাবে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই ুটি ছোট চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু তার ফল হলো অতি রাত্মক।

হেলমারের বন্ধু নোরার চালচলনকে পূর্বরাগের লক্ষণ মনে রে নিজেই প্রেম নিবেদন করে বসলো। নোরা, সরলপ্রকৃতি এবং স্ত্রী নোরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে নিজের বুদ্ধিতাই স্বামীর বন্ধুকে প্রেম নিবেদন করতে প্ররোচিত করেছে । এই সঙ্গে আর একটি জিনিস যা নোরা বুঝতে পারে তাও লজ্জাকর নয় ওর পক্ষে—ও বুঝতে পারলো যে স্বামীর ছ থেকে যখনই ও যা কিছু আদায় করেছে, তার পেছনে আসলে জ করেছে স্বামীর যৌনক্ষুধার তাড়না—ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ সবে সে সমস্তের মধ্যে নোরা সাফল্যের কিছুই দেখতে পায় না। রা মনস্থ করলো সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, র জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিজেকে মানুষ করে বে—এবং এটা যতদিন করা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন স্বামী সন্তানদের কাছ থেকে নিজেকে দূরেই সরিয়ে রাখবে। মিঃ মার সব ব্যাপারটা জানতে পেরে এবং স্ত্রীর মানসিক যন্ত্রণা বুঝতে পেরে প্রস্তাব করলো যে, অন্তত সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচবার জন্তে একই জায়গায় যা হোক করে থাকা যায় কি না। কিন্তু যা মিথ্যা, যা অলীক এই রকম একটা 'শো' বজায় রেখে চলবার, কোনো আকর্ষণই নোরা আজ আর বোধ করছে না, তাই স্বামীর এ প্রস্তাব সে মানলো না এবং গৃহত্যাগ করলো।

বিবাহিত এবং ঘরোয়া জীবনের ঠুনকো দিকগুলি সম্বন্ধে 'এ ডল্‌স হাউস'-এ ইবসেন অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াস পেলেন এবং এ বিষয়ে যে ইবসেন যথেষ্ট সাফল্যলাভ করলেন সে সময়কার পত্র-পত্রিকাদিতে অসংখ্য সক্রোধ আক্রমণ এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক আলোচনা ও প্রবন্ধ তার সাক্ষ্য বহন করে। পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা হয়ে উঠলেন মারমুখো; যাঁরা উদারনৈতিক, তাঁরা বললেন:

নাট্যকারের বক্তব্যের মধ্যে প্রচুর ভাববার কথা আছে, কারো কারো ভালো লাগছে না বলেই কথাগুলি অসার বা অপ্রয়োজনীয় তা নাও হতে পারে আর যাঁরা প্রগতিশীল, তাঁরা বিনা আলোচনাতেই ইবসেনের বক্তব্যের সবটুকুই অভ্রান্ত বলে মেনে নিলেন।

ইবসেন তাঁর পরবর্তী নাটক 'গোস্টস' রচনা করলেন যেন তাঁর বিরোধীদের চোখ ফোটাবার জন্তেই। কোনটা আসল? সামাজিক এবং পারিবারিক বন্ধন না মানুষের জীবন? এই রূঢ় কিন্তু বাস্তব প্রশ্নটি নানাভাবে ভেবে দেখবার জন্তে একটি অতিশয় সুপরিকল্পিত কাহিনী পল্লবিত হলো 'গোস্টস' নাটকে। মিসেস আলভিং একজন আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ জননী। স্বামী এবং সন্তানের জন্যে ও নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করছে সর্বক্ষণ। নিজের যে কোনো পৃথক সত্তা আছে সেই সত্যটাই যেন অনেক সময় ওর মনে থাকে না। মিঃ আলভিং বেশ কিছুটা ভোগপ্রিয় মানুষ। সমাজে প্রকাশ্যভাবে যৌন যথেচ্ছাচার অনুমোদন লাভ করে না, তাই মিঃ আলভিংকে গোপনতার আশ্রয় নিতে হয় তার অতিমাত্রায় যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্তে। বিয়ের পূর্ব থেকেই মিঃ আলভিং এমনিধারা অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছে। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আলভিং একটা দারুণ অস্বস্তিবোধ করতে আরম্ভ করলো, তার কারণ নববধূর আন্তরিকতা, স্বামীকে সমস্ত বিষয়ে খুশি করবার জন্তে তার সর্বক্ষণের জন্তে একটা অক্লান্ত আগ্রহ। কিছুদিন পরেই দেখা যায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব, এমন কি পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বও স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে মিঃ আলভিং আমোদ ফুর্তিতে মেতে উঠেছে। মদ্যপান, নভেল পড়া এবং ঝি-চাকরদের সঙ্গে নষ্টি-নষ্টি করে কাটানোটাই তার একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে একটি ঝির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একটু বেশিদূর অবধি গড়াতে লাগলো। ইতিমধ্যে একটি ছেলে হয়েছে মিসেস আলভিং-এর। কাজেই সবকিছু বুঝতে পেরেও স্বামীর জন্তে, সন্তানের জন্তে এবং সংসারের জন্তে তাকে মুখ বুজে থাকতে হয়। প্রায় সময়ই মনের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিলেও মাত্র একবার ব্যতীত মিসেস আলভিং তা প্রকাশ করে না। একবারই মাত্র দেখা যায় যে তার মধ্যে যেন কিছুটা ব্যক্তিসত্তা এখনো অবশিষ্ট আছে।

ওদের বিয়েটা স্বাভাবিকভাবে পূর্ব-মেলামেশার পরিণতি হিসেবে

হয় নাই। মিসেস আলভিং প্রাক-বিবাহিত জীবনে এক পাদ্রীকে ভালোবাসত। পাদ্রী ম্যানডারস একজন প্রকৃত সৎ আদর্শবাদী কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ। পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা যখন মি: আলভিং-এর সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন, মিসেস আলভিং তখন সেটাকে একটা পবিত্র কর্তব্য হিসেবেই স্বীকার করে নিয়ে বিয়েতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু একে একে স্বামীর স্বরূপ প্রকটিত হবার পরে একদিন দেখা গেলো বাড়ি ছেড়ে ও চলে এসেছে পাদ্রী ম্যানডারস-এর কাছে আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু ধর্মভীরু কর্তব্যনিষ্ঠ প্রণয়ীর কাছে ও আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় পেলো না। ম্যানডারস উপরন্তু পারিবারিক জীবনের ভালোর দিকটার কথা তুলে মিসেস আলভিংকে হাল্কা করবার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তুললো পৃথিবীতে মানুষের কর্তব্যের কথা। কি আমাদের ভালো লাগে বা না লাগে তার চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান কাজ যে বিনা প্রতিবাদে কর্তব্য করে যাওয়া পাদ্রীর এ কথা মিসেস আলভিংও মেনে নিতে বাধ্য হলো। তাই দেখা যায় আবার বাড়ি ফিরে এসে মিসেস আলভিং তার লম্পট স্বামীর সংসার গোছাবার দায়িত্ব নিলো।

মিসেস আলভিং এমন যোগ্যতার সঙ্গে ঘরে বাইরের সমস্ত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলো দিনের পর দিন যে, কারো পক্ষেই ভেতরের কোনো ব্যাপার অর্থাৎ স্বামীর কোনো কুকীর্তি বুঝতে পারবার কোনো উপায় রইলো না। ক্রমশ মিসেস আলভিং নিজেকে একেবারেই বিলিয়ে দিলো।

স্বামী যদি বাইরে যথেচ্ছভাবে মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি করে বেড়ায় তা'হলে লোকে হাসবে তাই দেখা যায় ঘরেই স্বামীকে প্রাণভরে মদ খাওয়াবার সমস্ত বন্দোবস্ত করলো মিসেস আলভিং; চাই কি মাঝে মাঝে নিজেও স্বামীর পান-বিলাসে সঙ্গদান করতে লাগলো। এখানে সেখানে মেয়েমানুষের পিছু পিছু ঘুরলে স্বামীর বদনাম হবে কাজেই মিসেস আলভিং স্বামীকে সুযোগ করে দিলো বাড়ির মধ্যেই তার প্রিয় ঝিয়ের সঙ্গে যাতে অবাধ মেলামেশা করতে পারে। কিছুদিন বাদে স্বামীর ঔরসে ঐ ঝির যখন একটি মেয়ে হলো, মিসেস আলভিং তাকেও পরিবারের মধ্যেই রেখে দিলো। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই মেয়েটিও পরিবারের একজন ঝি হয়ে গেলো। এদিকে ছেলে বড়ো হয়ে উঠছে, কাজেই সংসারটা যে পাপের বাসা হয়ে উঠছে তার হাত থেকে একমাত্র সন্তানকে রক্ষা করবার মিসেস আলভিং ওকে দূরে সরিয়ে দিলো। প্যারিসে থেকেই ও পড়াশুনো করবে, সেই রকমই বন্দোবস্ত করা হলো।

পাদ্রী ম্যানডারস মিসেস আলভিং-এর এই কর্তব্যনিষ্ঠায় পরিচালিত সংসারযাত্রা দেখে খুবই খুশি। ও নিজে যে ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে সেদিকে ম্যানডারস-এর কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ও যে একটা আদর্শ বিবাহিত জীবনযাপন করছে শুধুমাত্র একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলছে তার প্রশংসাতেই পাদ্রী পঞ্চমুখ। কিছুদিন পরে মি: আলভিং মারা গেলো। পাড়াপড়শী সকলের কাছে সুনাম বজায় রেখেই মারা গেলো। স্বামী মারা যাবার পরে মিসেস আলভিং-এর মনে হলো যে এখন ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা চলে—এখন তো আর চোখের ওপর বাপের অধঃপতিত কার্যকলাপ পড়বার আশঙ্কা নেই। তাই ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হলো। বর্তমানে ও যৌবনে পা দিয়েছে। ছেলেটির নাম অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড বাড়ি ফেরবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মিসেস আলভিং বুঝতে পারলো যে তার দুর্ভাগ্যের শেষ তো হয় নি বরং এবার বৃহত্তর আঘাত আসবে। স্বামীর সব দোষই সন্তানের মধ্যে দেখে মায়ের বুক ভেঙ্গে গেলো। সেই মদ্যপান, সেই অকারণ অর্থহীন ভাবে বারে বসা, সর্বোপরি মেয়েদের দিকে ঝোঁকটাও তার বাপেরই মতো। অসওয়াল্ডও বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়লো। মিসেস আলভিং জানে এ ঝি-টি তারই বাপের ঔরসজাত। তাই অসহায়তা প্রতি মুহূর্তেই বাড়তে লাগলো। এখন কি উপায়? মিসেস আলভিং-এর মনে হলো কাউকেই জবরদস্তি করে তার নিজের পথ থেকে ঘুরিয়ে এনে ভালো করা যায় না বা সুখী করা যায় না। তাতে বরং তার কষ্ট বাড়ে। ভোগাসক্তি বাড়ে। প্রথম দিকে স্বামীর ওপর জবরদস্তি করে নিজের আদর্শ চাপাতে গিয়ে বেচারাকে গোপন উপায়ে বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিলো। সেজন্যে দুরারোগ্য যৌনব্যাধিও তার হয়েছিল। জোর করে ছেলেকে ভালো করতে গেলে যদি সে-ও বাইরে যায় এবং ঐ ব্যাধির শিকার হয়? তা'হলে তার তো জীবনটাই পণ্ড হয়ে যাবে। স্বামীকে বয়ে যেতে দেখে মিসেস আলভিং-এর মনে দুঃখ বিশেষ কিছুই হয় নি, কিন্তু তার সম্ভাবনা ছেলের মধ্যে দেখে ও আঁতকে উঠলো কারণ ছেলেকে ও ভালোবাসে—অসওয়াল্ড ওর বুভুক্ষু হৃদয়ের যাবতীয় সঞ্চিত স্নেহ-ভালবাসার একমাত্র পাত্র। সেই ছেলেকে কি জোর করে ভালো করতে গিয়ে অসুখী করা যায়, না কি ঘর ছেড়ে তাকে বাইরের নোংরামির মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়।

অসওয়াল্ড কথায় কথায় একদিন মাকে জানিয়ে দিলো যে, বাপের কুৎসিত রোগ ওর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে এবং প্যারিসের এক ডাক্তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে ভবিষ্যতে উন্মাদ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে হবে। জীবনের সেই দুঃসহ অবস্থা যদি কখনো এসেই পড়ে, তা'হলে সেই মুহূর্তে জীবনের শেষ করবার জন্যে সব সময় যে ও পকেটে একটা বিষের শিশি রেখে দেয় তা-ও জানালো মাকে।

মিসেস আলিভিং আর সময় নষ্ট না করে মনস্থ করলেন যে ঝিয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবেন—হোক না সে সৎ বোন, তবু তার ছেলে তার স্নেহের একমাত্র পাত্র সুখী হোক। কিন্তু ঝি-ই অসওয়াল্ডকে বিয়ে করতে রাজী নয় দেখা গেলো, কারণ ও জানতে পেরেছে ওর রোগের কথা এবং ও পালিয়ে গেলো বাড়ি থেকে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। মা আর ছেলে একটা ঘরে বসে নিজেদের নিরানন্দের জীবনের কথা ভাবছে। এমন সময় অসওয়াল্ড বিষের শিশিটা চাইলো মায়ের কাছে, বললো, দাও একটু নাড়াচাড়া করি। মিসেস আলভিং তাকালো ছেলের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে আশঙ্কিত রোগের লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

ইয়োরোপের কয়েকটি রাজধানীতে 'গোস্টস' মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলতে গেলে সারা ইয়োরোপের শিল্প-সাহিত্যমহলে তোলপাড় সুরু হয়ে গেলো। কোনো কাগজ লিখলো—এতো নাটক নয়, একটা খোলা নর্দমা। কেউ বললো, আশা করি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এই

কদর্য জিনিষটা মঞ্চস্থ হবে না। আবার অনেক পত্রিকা অবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলো নাট্যকারকে শায়েস্তা করবার জন্যে এবং এ নাটক যারা মঞ্চস্থ করবার জন্যে প্রয়াস পেয়েছে তাদের নোংরামীর জন্যে অভিযুক্ত করবার জন্যে।

ঢিলটা যে ঠিক মৌচাকেই পড়েছিল তা মৌমাছিদের ভ্যানভ্যানানিতেই বোঝা গিয়েছিলো। সে সময়ে ইয়োরোপে যৌনব্যাধি একটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে চলেছিলো, কাজেই ইবসেন একটা বাস্তব সমস্যাকে চোখের সামনে তুলে ধরে নোংরামী কিছুই করেন নি বরং সমাজ সেবাই করেছেন আর সেই সঙ্গে সূচনা করে দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর শিল্পসাহিত্যের নতুন পথের। সমাজের নানা দিক—ধর্ম, নীতিবোধ, কর্তব্য, ব্যক্তিগত রুচি, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক—এ সমস্ত কিছু সম্পর্কেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে সারা পৃথিবীতে যে শত শত নাটক রচিত এবং মঞ্চস্থ হচ্ছে তার মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে ইবসেনের এই দু'খানি নাটক—'এ ডলস্ হাউস' এবং 'গোস্টস'।

'গোস্টস' নাটক প্রকাশিত হবার পরে অনেক পত্র-পত্রিকা মিথ্যাচার এবং অজ্ঞানতাই যাদের একমাত্র মূলধন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কিন্তু ক্ষতির কুসংস্কার জিইয়ে রাখবার জন্য নিত্য নূতন চটকদার বাক্য রচনা করাই হচ্ছে যাদের একমাত্র কাজ, তারা ইবসেনকে আখ্যা দিলেন জনগণের শত্রু বলে। ইবসেনও ঠিক তাদের কথাটা তুলে এনেই নিজের পরবর্তী নাটকের নামকরণ করলেন—জনগণের শত্রু (এ্যান এনিমি অব দি পীপল)। কিন্তু জনগণ কারা ? জনগণের শত্রুরই বা প্রকৃত রূপ কি ?

এ নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে একটি নূতন ধরণের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ইবসেন এ যুগের একটি গালভরা সান্ত্বনা বাক্য 'গণতন্ত্র'র সমালোচনা করেছেন—

একটি ছোট্ট শহর। দূর দূর জায়গা থেকে মানুষ আসে এ শহরে এখানকার জলে স্নান করবার জন্যে। এখানকার হোটেলের সুখাদ্য খাবার জন্যে। কিন্তু কিছুদিন হলো রাস্তার নর্দমার নোংরা জল এখানকার পানীয় এবং স্নানের জলের সঙ্গে মিশে গেছে। স্নানাগারের মালিক, তথা হোটেল মালিক সবাই ব্যাপারটা জানে এবং জেনে না জানবার ভাণ করে ব্যাপারটা চেপে যায়। কারণ তা হলে আর লোক আসবে না এ শহরে, তাদের স্নানাগারে এবং হোটেল রেঁস্তোরায়, কাজেই তাদের ব্যবসার নামে হীন উপায়ে অর্থোপার্জন যাবে বন্ধ হয়ে। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন জোর গলায় বলতে লাগলো সত্য কথাটা তখন ব্যবসায়ীরা যারা সংখ্যায় বেশি তাকে আক্রমণ করলো জনগণের শত্রু বলে। সংখ্যায় বেশি হলেই যে তাদের মত বা পথ কিছু অভ্রান্ত হতে পারে না এবং সংখ্যায় বেশি বলেই তারা যা করে তাতে সকলের মঙ্গল হতে পারে না—এই সূক্ষ্ম জিনিষটার দিকে মনোযোগী পাঠক এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এ নাটকের উদ্দেশ্য। এ দিক দিয়ে ইবসেন যে খুব সফল হয়ে ছিলেন তা বলা যায় না। কারণ 'গণতন্ত্র'র স্তোকবাক্যের দিকে সাধারণ মানুষের ঝোঁক ক্রমশই বাড়ছে ছাড়া কমছে না! শ' দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন যে, এককালে রাজাদের পূজো করাটা যেমন অন্যায় এবং ভুল হয়েছিলো, একালে গণতন্ত্র বা এইরকম গালভরা নামওয়ালা 'পাবলিক অরগানাইজেশন'গুলির কাছে বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নোয়ানোও ঠিক তেমনি ভুল কাজ হচ্ছে।

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস, তা যে কোনো দিকেই হোক না কেন, আলোচনা করলে দেখা যাবে যে পরিবর্তন অর্থাৎ উন্নতিটা সবসময়েই ব্যক্তি বিশেষের চিন্তার ফল—কোনও গোষ্ঠীর আবিষ্কার বা উদ্ভাবন হিসেব তা কদাচ দেখা দেয় না।

মানুষের প্রবর্তিত যে কোনও অনুশাসনের অনেক ঊর্ধ্বে যে মানুষের জীবন—প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে যে তার নিজস্ব একটা আদর্শ থাকা প্রয়োজন এবং সেইটেই স্বাভাবিক অগ্রগতির লক্ষণ—ইবসেনের পর থেকে এ কথা আজ আর কারুর বলতে বা এই বক্তব্যকে উপজীব্য করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বাধে না। ইবসেন যথেষ্ট শ্রেণী-সচেতন ছিলেন না বলে ইবসেন-বিরোধীদের নিরূপ উক্তি শোনা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে নির্দিষ্ট কোনো কালের জন্যে যাঁরা সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হন, ইবসেন ঠিক সে জাতের ছিলেন না। ইবসেনের বেশির ভাগ রচনার মধ্যেই এমন অনেক কিছুই রয়ে গেছে শ্রেণী-সংগ্রামের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবার বহু পরেও যা মানুষকে আনন্দ দেবে এবং তাকে ভাবিত করবে।

আসাম

শ্রীমতী হাসি গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর হে আসাম, প্রান্তর তব শ্যাম।
পর্বত নীল যার, লাল নদী কি বাহার।
চঞ্চল নির্ঝর, ছুটে চলে তর্‌তর্,
লাল নীল পীত ফুল, তার কর্ণের দুল,
সুন্দরী কিশোরী, সেজেছে কি আ-মরি!
রাঙ্গা পাহাড়ের গায়, লাল আবির কে ছড়ায়।
ভানু যার এক নাম, সকল দেশেতে ধাম।
পাপিয়া অজানা কত, গাহে গান অবিরত,

সাজিয়া নানান বেশে, চলেছে অচিন্ দেশে।
বুনো কদলীর সারি, পরেছে হরিৎ শাড়ী।
উতরোল কাননবন, কেড়ে নিল মোর মন।
নাগাকন্যারা আসে, গাঢ় রং ভালবাসে,
পীত, নীল, গাঢ় লাল, গোলাপী দু'খানি গাল।
অসমীয়া কন্যারা, আদর্শ নারী যারা,
পুঁতির মালাটি গলে, মেখলা উড়ায়ে চলে।
(আর) নাগা পর্বত যার নয়নেরি অঞ্জন

প্রভাতে ভানুর করে অম্বর উজ্জ্বল,
সুন্দর আসাম দেশ, ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দশ

॥ খ ॥

বিচিত্র একটা অস্থিরতায় যেন শিবনাথ ছটফট করছিল। আজকের দিনের সঙ্গে সে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, শিক্ষা পেতে চায় কিন্তু আজকের দিন বলতে যে সব মানুষগুলোকে বোঝায়—যাদের চিন্তা ও কর্মধারা বোঝায়, তাদের কারও সঙ্গেই ত' শিবনাথের অদ্যাবধি বলতে গেলে কোন পরিচয়ই হয় নি। পরিচয়ের কোন সুযোগই হয় নি।

কাউকেই সে দেখে নি। কাউকেই সে চেনে না। কয়েকটা নামমাত্র শুনেছে সে আজ পর্যন্ত। মাত্র কয়েকটা নাম।

রাজা রামমোহন রায়, জয়রাম ঠাকুরের বংশজাত দ্বারকানাথ ঠাকুর, শোভাবাজারের রাজবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দেবের পুত্র রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, কলুটোলার কাপড়ের ব্যবসায়ী চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র মতিলাল শীল—ডেভিড্ হেয়ার ও পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও।

দেশের লোকের মুখে মুখে নামগুলো ফেরে—বহু লোকের মুখে শুনেছে শিবনাথ যখন তখন—তাই বোধ করি মাত্র নামগুলোর সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটেছিল এবং ঐটুকুই, তার চাইতে বেশী কিছু নয়। ঐ নামগুলো সম্পর্কে তার মনের মধ্যে কোন অনুসন্ধিৎসা বা কোন প্রশ্নই জাগে নি কিন্তু আজ যেন হঠাৎ অনেকগুলো প্রশ্ন এসে তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। জীবনের এতদিনকার বিশ্বাস ও সংস্কারের—জ্ঞান ও ধারণার মূলে যেন ঐ প্রশ্নগুলো এসে আঘাত করেছে। যে ভাবে তার জীবনটা চলেছে সেইটাই তার জীবনের শেষ কথা নয়। তার জীবন বলতে তার নিজস্ব, সুখ দুঃখটুকুই নয়। জীবনটা তার আরো বিস্তৃত আরো ব্যাপক।

চারপাশে এই শহরে যারা আছে তারা—এদের কাজ কারবার—ধর্ম, সংস্কার, চালচলন—উত্থান-পতন তার জীবনেরই অংশ। যে অংশ নিয়েই সে সম্পূর্ণ। নচেৎ সে অসম্পূর্ণ। অর্থহীন—

মিথ্যা বলে নি। ঠিকই বলেছে জীবনকৃষ্ণ। সত্যিই—আজকের সমাজ—আজকের ধর্ম—শিক্ষা সব কিছু নিয়ে আজকের দিনে যে জনগণের মধ্যে চলছে একটা আন্দোলন, তার কিছুই সে জানে না। তার কোন সংবাদই সে রাখে না—লজ্জার কথা। সত্যিই লজ্জার কথা!

কি রকম যেন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যেই এক সময় পায়ে পায়ে গিয়ে শিবনাথ মৃন্ময়ীর কক্ষের দ্বারে এসে দাঁড়ায়। মৃন্ময়ীর কক্ষের দরজাটা খোলাই ছিল। ভিতরে যে আলো জ্বলছিল তারই আবছা মৃদু একটা আভাস দরজার গোড়া পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। দরজা পর্যন্ত এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শিবনাথ। গতরাত্রের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মৃন্ময়ীকে তার বলা উচিত হবে কি না সেই কথাটাই হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় এবং মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে। কেনই বা সে হঠাৎ কথাটা মৃন্ময়ীকে বলবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কি হবে মৃন্ময়ীকে কথাটা জানিয়ে। দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করতে থাকে শিবনাথ এবং তার মনে হয় সেই সঙ্গে, কেন সে জানাবে না।

জানান তার কর্তব্য। মৃন্ময়ীকে সব কথা বলতে হবে। হঠাৎ ঐ মুহূর্তে আর একজনের কথাও মনে পড়ে যায় শিবনাথের। সুন্দর সাহেবের কথা।

সুন্দর সাহেবের আশ্রিত সে। শুধু কি আশ্রিতই? আজ সে তার অন্নদাত—পালনকর্তা। সর্বাগ্রে ত' তাকেই সব কথা তার বলা কর্তব্য। কিন্তু কৈ। এখন পর্যন্ত ত' তাকে কোন কথাই সে জানায় নি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় সুন্দর সাহেবকে গত রাত্রের কথাটা জানান কি ভাল হবে। সুন্দর সাহেব যদি অন্য রকম কিছু ভাবে।

কি ভাববে সুন্দর সাহেব। কি ভাবতে পারে সে। আর ভাবলেই বা কি আর এসে যায় তাতে। আশ্রিত হিসাবে তার যতটুকু কর্তব্য তা সে করবে।

শিবনাথ ফিরে চলল সুন্দর সাহেবের ঘরের দিকে। সুন্দর সাহেবের ঘরের দরজাটা ভেজানই ছিল। ঈষৎ ঠেলা দিতেই দরজার কবাট দু'টো খুলে গেল

অন্ধকার ঘর। থমকে দাঁড়াল শিবনাথ।

সুন্দর সাহেব ঘরে নেই। সুন্দর সাহেব এখনো তাহলে ফেরে নি।

গত রাত থেকে তাহলে সুন্দর সাহেব গৃহে ফেরেই নি নাকি? অন্যমনস্কভাবে কথাটা চিন্তা করতে করতে শিবনাথ মৃন্ময়ীর ঘরের দিকেই পা বাড়ায় এবং এবারে আর কোন রকম ইতস্তত না করে সোজা গিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

ঘরের এককোণে কুলুঙ্গীতে প্রদীপ জ্বলছিল। তারই ম্রিয়মাণ আলোয় কক্ষটি স্বল্পালোকিত। সেই স্বল্প আলো-ছায়াভরা ঘরের খোলা জানালাটার সামনে পিছন ফিরে মৃন্ময়ী দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য দিনের মত শয্যায় শুয়ে ছিল না।

কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের পদশব্দে ফিরে তাকাল মৃন্ময়ী, কে!

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে দণ্ডায়মান শিবনাথের প্রতি নজর পড়ে মৃন্ময়ীর এবং মৃন্ময়ী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে শিবনাথের মুখের দিকে। শিবনাথও চেয়ে থাকে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে

পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি স্থির নিবদ্ধ। অকস্মাৎ মৃন্ময়ীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসির বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হাস্যস্ফীত কণ্ঠে বলে মৃন্ময়ী, কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলে কেন অমন করে, এসো—

অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল শিবনাথ মৃন্ময়ীর দিকে।

স্বল্প প্রদীপের আলো মৃন্ময়ীর চোখে-মুখে এসে পড়েছে এবং সেই স্বল্প আলোয় মৃন্ময়ীকে যেন অপরূপ দেখাচ্ছে। তার চোখ কপাল ভ্রূ-যুগল চিবুক ওষ্ঠ এলায়িত কেশরাশি সব কিছুর উপর যেন প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো পড়ে মৃন্ময়ীকে স্বপ্নময়ী করে তুলেছে।

এতদিন এ বাড়িতে আছে শিবনাথ ইতিপূর্বে কতবার দেখেছে ঐ মৃন্ময়ীকে কিন্তু তাকে ত' কখনও এমন অপরূপা, অনন্যা মনে হয় নি। এমনি করে ত' মৃন্ময়ী তার চোখে আবির্ভূত হয় নি। এ যেন তার পরিচিতা মৃন্ময়ী নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিতা—প্রথম দেখা এক নারী। শিবনাথ আদি পুরুষের চোখের সামনে যেন মৃন্ময়ী আদি নারী।

কি দেখছো অমন করে?

মৃদু শান্তকণ্ঠে মৃন্ময়ীই প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—

চমকে ওঠে শিবনাথ।

কি দেখছো আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে শিবনাথ? স্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে মৃন্ময়ী শিবনাথকে।

তোমাকে দেখছি—

আমাকে দেখছো?

হ্যাঁ।

কেন, আমি কি নতুন। আমাকে কি আর আগে দেখ নি?

আশ্চর্য! সত্যিই তুমি নতুন লাগছো আমার চোখে আজ মৃন্ময়ী

সত্যি?

হ্যাঁ।

মৃন্ময়ী মৃদু হাসে। নিঃশব্দ একটা হাসির ঢেউ যেন ওর ওষ্ঠ-প্রান্তে জেগে ওঠে।

হেসো না। মৃন্ময়ী—সত্যিই বিশ্বাস করো তোমাকে আজ নতুন লাগছে।

হঠাৎ মৃন্ময়ী ডেকে ওঠে, শিবনাথ।

কিছু বলছিলে মৃন্ময়ী?

হ্যাঁ—তুমি আজ না এলে আজ রাত্রে হয়ত তোমার ঘরে আমি যেতাম।

আমার ঘরে যেতে রাত্রে!

হ্যাঁ।

কেন!

এখান থেকে আমি চলে যাবো

চলে যাবে এখান থেকে!

হ্যাঁ।

কোথায়?

শিবনাথের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই। মৃন্ময়ীর কথাটা যেন আদৌ বুঝতে পারছে না এমনিভাবে চেয়ে থাকে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

জানি না কোথায় যাবো! তবে চলে যাবো।

সুন্দর সাহেব—

শিবনাথের কথাটা শেষ হলো না। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ভাবছো সুন্দর সাহেব জানতে পারবে। না। সে জানতে পারবে না। কেমন করে জানবে। আমি রাত্রির বেলা সবার অজ্ঞাতে পালিয়ে যাবো

তুমি বলছো তুমি কোথায় যাবে তা তুমি জান না। কিন্তু একজায়গায় যেখানেই হোক তোমাকে ত' যেতেই হবে?

বললাম ত' জানি না কোথায় যাবো। আর যাবোই বা কোথায়, বাড়িতে ত' কিছু আর ফিরে যেতে পারব না।

কেন? কেন পারবে না বাড়িতে ফিরে যেতে।

কেন তা বোঝ না! বিধর্মী দস্যুরা আমাকে লুণ্ঠন করে এনেছে! জাত গেছে আমার।

দস্যুরা তোমাকে লুঠ করে এনেছে, তোমার কি দোষ।

আমারই ত' দোষ। আমার ভাগ্যের দোষ।

মনে পড়ে হঠাৎ জীবনকৃষ্ণের কথাগুলো শিবনাথের। জীবনকৃষ্ণ সেদিন বলছিল, সংস্কার আজ আমাদের এমনি অন্ধ করে তুলেছে যে, আমাদের সমস্ত বিচার-বুদ্ধি-বিবেক—সেই সংস্কারের মূলে বলি দিয়ে বসে আছি। ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে একদফা ধর্মের যূপে নিজেদের বলি দিচ্ছি আর একদফা চোখ বুজে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করছি।

কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবনাথ ডাকে, মৃন্ময়ী।

কি?

তুমি এখনই হুট করে কোথায়ও যেও না!

যাবো না!

না।

আর আমাকে কথা দাও মৃন্ময়ী, আমাকে না বলে, আমাকে না জানিয়ে এ বাড়ি থেকে তুমি কোথায়ও যাবে না।

কিন্তু শিবনাথ—

শোন মৃন্ময়ী, আমি তাহলে কথাটা তোমাকে স্পষ্টই বলি। আমি

লক্ষ্মীবিলাস আপনার সকল সমস্যার সমাধান করবে।
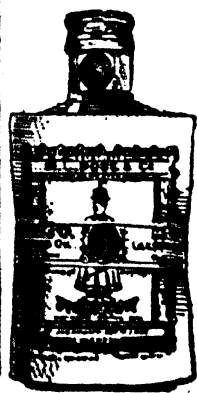
লক্ষ্মীবিলাস
তেল

এম. এল. বসু এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস :: কলিকাতা—৯

নিজেও আর এখানে থাকতে চাই না। এক মুহূর্তও আর এখানে আমার থাকবার ইচ্ছা নেই।

সত্যি, সত্যি বলছো শিবনাথ! পরম আগ্রহে মৃন্ময়ী শিবনাথের মুখের দিকে তাকায়। কি এক প্রত্যাশায় তার চোখের মণি দু'টো চিক চিক করতে থাকে।

হ্যাঁ মৃন্ময়ী, এখানে আর আমি থাকবো না। অন্য কোথায়ও আমি আশ্রয়ের সন্ধান করছি। পেলেই আমি চলে যাবো।

আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে?

হ্যাঁ—আর চোরের মত পালিয়ে যাবো না। কেনই বা চোরের মত পালিয়ে যাবো! সুন্দর সাহেবকে বলেই যাবো।

কিন্তু যদি সে আমাদের না যেতে দেয়!

কেন যেতে দেবে না। নিশ্চয়ই দেবে।

না, না—তুমি ওকে চেন না শিবনাথ। ও জানতে পারলে যেতে দেবে না। কিছুতেই হয়ত যেতে দেবে না।

জোর করে সে আমাদের এখানে ধরে রাখবে?

পারে সে। সব পারে—

না। হঠাৎ যেন শিবনাথের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে। সে বলে, জোর করে ধরে রাখতে সে আমাকে পারবে না। এটা কোম্পানীর রাজত্ব। জোর যার মুলুক তার আর চলে না। তারপরই হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে শিবনাথ, সুন্দর সাহেবকে তাঁর ঘরে দেখলাম না। স কি ফেরে নি?

বোধ হয় না। কাল রাত থেকেই সে ফেরে নি।

ফেরে নি!

না।

কোথায় গিয়েছে বলতে পার?

তা জানি না। তবে এরকম মধ্যে মধ্যে ত' সে দু'চার দিনের জন্য কোথায় যেন যায়। কিন্তু আর তুমি এঘরে থেক না শিবনাথ, দাক্ষায়ণী হয়ত এখুনি এঘরে আসবে।

তা এলেই বা—

না, না—তুমি হয়ত লক্ষ্য কর নি কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তোমাকে আর আমাকে একত্রে দেখলেই ও যেন কেমন করে চেয়ে থাকে। সে সময়কার ওর চোখের দৃষ্টি আমার আদৌ ভাল লাগে না।

কিন্তু ও ত' বদ্ধ কালা—

আমার সন্দেহ আছে তাতে—

কি বলছো মৃন্ময়ী।

হ্যাঁ—আমার যেন মনে হয়—মৃন্ময়ীর কথা শেষ হলো না। কার যেন পদশব্দ শোনা গেল বাইরের বারান্দায়, পায়ের শব্দটা ঐ ঘরের দিকেই এগিয়ে আসে—মৃন্ময়ী বলে—চুপ, কে যেন আসছে এ দিকে—

[ক্রমশ।

সান্ধ্য-চিত্র

পরিমল চক্রবর্তী

সেই কখন থেকে থেকে-থেকে
রঙ পাল্টাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশ :
কখনো লাল কখনো সাদা
আবার কখনো বা ঘন নীল
উদাসী মেঘের মেলা
ভেসে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে দিয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে আমি দেখছি
তাকিয়ে তাকিয়ে—
রঙ-বেরঙের পাখিগুলো
অসীম আকাশে সাঁতার কেটে কেটে
ফিরে আসছে
রাত্রির আশ্রয়ে : তাদের আপন আপন নীড়ে।

এদিকে ওদিকে একটি দু'টি করে
বাতি জ্বলে উঠছে
গ্রাম গ্রামান্তের ঘরে ঘরে ;
সকলেই ফিরে আসছে যার যার বাড়ি,
আর ঝোপে জঙ্গলে জোনাকিগুলো
টিপ্ টিপ্, টিপ্ টিপ্, জ্বলছে :
আর চারিদিকে ঘনাচ্ছে আসন্ন রাত্রির গাঢ় অন্ধকার।

অরণ্য রাতি

বন্দে আলী মিয়া

সম্মুখে অনন্ত রাত্রি—গরজায় বিক্ষুব্ধ পাথার
ডাকিছে ইঙ্গিতে মোরে ধূম্রাচ্ছন্ন অরণ্য পর্বত,
জীবনসায়াহ্নে আজ নেমে আসে বিষন্ন আঁধার—
ভাগ্যের নিষ্ঠুর করে নির্দেশিছে সীমাহীন পথ।

দিগন্ত কাঁপিছে ত্রাসে—অন্তহীন ঝড়ের উদ্বেগ—
একটি বিহঙ্গ আজ দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরে যায় ;
মেলিয়া সহস্র ফণা ধেয়ে আসে ঈশানের মেঘ
কামনা কমল দল ছিন্ন হলো পথের ধূলায়।

অযুত বসন্ত সাধ—দু'টি চোখে অনন্ত প্রবাহ
সমগ্র নিখিল ব্যাপি হৃদয়ের আকুল পিয়াস,—
একদা উন্মত্ততায় হেরেছিনু অনল প্রবাহ
মনের অঙ্গন তলে পর্ণে পুষ্পে স্বপন বিলাস।

কভু কি উন্মত্ততা দেখা দেবে জীবনে আবার
প্রসন্ন কপালি সাথে পূর্ণ হবে মোর অবকাশ।
আজিকে দিগন্ত ভরি নামিয়াছে ঝড়ের আঁধার
এসেছে অরণ্য রাত্রি—কাঁদিতেছে বিষন্ন আকাশ।

চোয়ালের হাড়ের রহস্য

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

হয়তো কোন পুরানো বাড়ির ধূলিমলিন বিস্মৃত চিলেঘরের আবর্জনার মধ্যে বা কোন দোকানের অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে গুদামঘরে আত্মগোপন করে রয়েছে এমন একটি চোয়ালের হাড় যা এক সময় বিক্রি হয়েছিল মাত্র চার পেনিতে কিন্তু আজ যার দাম অর্ধ মিলিয়ন পাউণ্ড।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে, শরতের এক সন্ধ্যায় সাফোক (Suffolk)-এর অন্তর্বর্তী ইপস্যুইচ (Ipswich) শহরের পানশালায় প্রবেশ করল ময়লা পোষাক-পরা একজন মজুর। বগলে তার খবরের কাগজে জড়ানো একটি পুলিন্দা। পানশালায় তখনও ভিড় তেমন জমে নি। এদিকে-ওদিকে একবার তাকিয়ে মজুরটি এগিয়ে গেল ভদ্র পোষাকধারী একজন খরিদ্দারের দিকে। 'বার'র কাছেই ছোট একটি টেবিলের ধারে বসে বীয়ারের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল সে।

'আমার কাছে এমন একটি জিনিস আছে যা আপনি ছ' পেনিতে কিনতে পারেন,' দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে বললে এবং কথাটা শেষ করেই পুলিন্দাটি খুলে মেলল তার সামনে। পুলিন্দার ভিতর থেকে অমনি বেরিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড একখানা শিলীভূত চোয়ালের হাড়। সেটা যে মানুষেরই তা সহজেই অনুমান করা যায়।

'আজ সকালে ফক্সহলে (Foxhall) মাটি কাটছিলাম আমরা, মাটির নীচে হঠাৎ এক সময় এই হাড়খানা পেয়ে গেলাম। এত বড় চোয়ালের হাড় কেউ কোনদিন দেখে নি। ছ' পেনির বিনিময়ে এটা যদি নেন, লোকসান হবে না আপনার।'

বিরক্তির সঙ্গে চোয়ালের হাড়খানার দিকে একবার তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল খরিদ্দারটি। বললে, 'কেউ যদি ওটা বিনামূল্যেও দেয় তাহলেও নেব না আমি। অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখো।'

আর যারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিল প্রত্যেকের কাছেই সে তার আবেদন নিয়ে হাজির হল, কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করলো না।

নিতান্ত হতাশ হয়ে মজুরটি আর একবার চেষ্টা করে দেখল। দেখুন। আমি একপাত্র বীয়ার খেতে চাই। চার পেনি পেলেই আমি এটা হস্তান্তর করতে পারি।'

কাউন্টারে মদ বিক্রি করছিল যে লোকটি, সে মজুরটিকে কাছে ডাকল হাতের ইশারা ক'রে। কাউন্টারের শেষ দিকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বললে, 'হাড়খানা রেখে দাও ঐখানে। ওর বদলে চার পেনির বীয়ার তোমায় দিচ্ছি।'

দিন কয়েক পরে, ইপস্যুইচ-এর এক রাসায়নিক কাউন্টারের উপর ঐ অস্থিখানা দেখে, মদ্য ব্যবসায়ীকে ছ'শিলিং ছ'পেনি দিয়ে ওটা নিয়ে গেলেন নিজের দোকানে।

দোকানের কাচের জানলায় ওটা রাখা হল পথচারীদের বিশেষ করে খরিদ্দারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

কিছুদিন পরে রাসায়নিক ঐ অদ্ভুত হাড়খানা উপহার দিলেন স্থানীয় এক জমিদারকে। জমিদার আবার সেটা উপহার দিলেন রবার্ট কোলিয়ার (Robert H. Collyer) নামে একজন মার্কিন চিকিৎসককে যিনি তখন ইপস্যুইচেই চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

পুরাতত্ত্ববিদ হিসাবে ডাক্তার কোলিয়ারের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল ইয়োরোপ ও আমেরিকায়। অনুসন্ধানের ফলে তিনি জানতে পারলেন, ঐ বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে মাসকয়েক আগে ওই হাড়খানা পাওয়া যায় মাটির ষোলো ফুট নীচে যখন ফক্সহল-এর নিকটে মাটি কাটছিল মজুররা।

ওই চোয়ালের হাড় সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কোলিয়ার। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সমস্ত নিদর্শন ইতিপূর্বে ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হয়েছে, ওই নবাবিষ্কৃত অস্থিটি তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন।

ওই অস্থিটির স্কেচ তৈরি করে তিনি পাঠিয়ে দিলেন Anthropological Review পত্রিকায় এবং তাঁর মতামতও জানালেন ওই সম্পর্কে। তাঁর লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। তিনি দৃঢ়ভাবে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ঐ চোয়ালের হাড় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের যে ঐ ইপস্যুইচ অঞ্চলে বাস করত অন্যূন দশ লক্ষ বৎসর আগে।

তাঁর এই সিদ্ধান্তে ইংরাজ পুরাতত্ত্ববিদরা কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না—নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেন। এরপর ডাক্তার কোলিয়ার যখন ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের কালনির্ণয়ে ঐ অস্থিটি সাহায্য করতে পারে—তখন সারা ইংলণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলী উপহাস করলেন তাঁকে।

এর কিছুদিন পরে, সম্ভবত ইংরাজ পুরাতাত্ত্বিকদের বিদ্রূপে ক্ষুব্ধ হয়ে ডাক্তার কোলিয়ার স্বদেশে ফিরে গেলেন ঐ চোয়ালের হাড় সঙ্গে নিয়ে।

এরপর দীর্ঘকাল কেটে গেল, ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজ ওই চোয়ালের হাড়ের কথা একরকম ভুলেই গেলেন। কিন্তু ১৯২০ সালে আবার ওই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ইংলণ্ডের একজন প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তার ময়ের (Dr. J. Reid Moir) Anthropological Review পত্রিকায় প্রকাশিত কোলিয়ারের লেখা প্রবন্ধটি পড়ে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ঐ চোয়ালের হাড় নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তার প্রতিটি যুক্তি তিনি বিচার করে দেখলেন, পত্রিকায় ঐ হাড়খানার যে স্কেচ ছাপা হয়েছিল তাও পরীক্ষা করলেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তারপর কোলিয়ারের সমকালীন পুরাতাত্ত্বিকদের যে কাজটি করা উচিত ছিল তা করলেন। অর্থাৎ ফক্সহলে গিয়ে মজুর জোগাড় করে ভূমি খননের ব্যবস্থা করলেন। ষোলো ফুটেরও বেশি মাটি খোঁড়া হল এই আশায় যে কঙ্কালের অবশিষ্ট অংশের সন্ধান হয় তো মিলতে পারে।

কঙ্কালের বাকী অংশ মিলল না বটে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐ জায়গাটা যখন সমুদ্রের তটভূমি ছিল তখন ওই অঞ্চলে যে মানুষের বাস ছিল, তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেল। মাটির নীচে যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কৃত হল তার মধ্যে ছিল পাথরে তৈরি যন্ত্রপাতি, কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড যার ওপর একদা আগুন জ্বালা হয়েছিল এবং কাঠকয়লার টুকরা। নানা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে ডাক্তার ময়ের প্রমাণ করলেন, ওখানে আগুন জ্বালা হয়েছিল অন্যূন দশ লক্ষ বৎসর আগে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সমস্ত নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে ডাক্তার ময়ের-এর আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর আবিষ্কৃত দশ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত বহুলপ্রচারিত Neanderthal Man, Java Man, Heidelberg Man, এমন কি Peking Man-এর চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীন।

ডাক্তার ময়ের-এর এখন কর্তব্য হল ঐ জায়গা থেকে ১৮৫৫ সালে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যে অস্থিখানি পাওয়া যায় সেইটাকে খুঁজে বের করা। ঐ অদ্ভুত চোয়ালের হাড়টাকে পুনরুদ্ধার করা যে কঠিন হবে তা তিনি গোড়াতেই বুঝেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখলেন এ কাজ অসম্ভবের সামিল।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ডাক্তার ময়ের-এর আবিষ্কারের কাহিনী পড়ে চমৎকৃত হলেন। ডাক্তার কোলিয়ার ও ওই চোয়ালের হাড়ের সন্ধান শুরু করলেন তাঁরা, কিন্তু মুস্কিল হল এই যে

আমেরিকার কোথায় তাঁর বাড়ি তা কোলিয়ার ইংলণ্ডের কোন লোককেই বলেন নি। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ডাক্তার রবার্ট আব্রাহাম কোলিয়ার ১৮৩১ সালে ম্যাসাচুসেটস্-এর অন্তর্বর্তী পিটস্‌ফিল্ড-এর বার্কশায়ার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন কিন্তু ঐ কলেজটি অনেককাল আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

'বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কোলিয়ার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে উঠে পড়ে লাগলেন। এমন কি গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হল কোলিয়ারের বাসস্থান খুঁজে বের করবার জন্য, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল এই মর্মে যে, যদি কেউ ডাক্তার কোলিয়ারের হদিশ পাওয়া যেতে পারে এমনি কোন সংবাদ দিতে পারেন তাহলে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত মৃত্যুকালে ডাক্তার কোলিয়ার সন্তানাদি রেখে যান নি। তা'ছাড়া, হয় তো তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে দেহত্যাগ করেন। কারণ তাঁর মত বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে সামান্যতম তথ্য সংগ্রহ করতে না পারাটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদরা ঐ নিরুদ্দিষ্ট চোয়ালের হাড়ের মূল্য নির্ধারণ করলেন প্রায় অর্ধ মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং। নিউ ইয়র্ক, চিকাগো এবং লস্ এঞ্জেলেস্-এর সংবাদপত্রগুলি ঐ অস্থিটি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। পুরস্কারের মোট পরিমাণ দাঁড়াল পনেরো হাজার ডলারের বেশি।

এই পুরস্কার ঘোষণার ফলে সন্ধানের কাজ চলল পূর্ণোদ্যমে, কিন্তু কোথাও ঐ হারিয়ে যাওয়া অস্থিটির হদিশ মিলল না।

ডাক্তার ময়ের-এর দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ অস্থিটি ডাক্তার কোলিয়ার সযত্নে কোথাও রেখে গেছেন। অভিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি ওর মূল্য ভালরকমই জানতেন যদিও ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজের কাছে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের বিনিময়ে পেয়েছিলেন শুধু ঘৃণা ও ধিক্কার। তবে ঐ মূল্যবান বস্তুটি কোথায় রয়েছে তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

ডাক্তার ময়ের বলেন, 'আমার বিশ্বাস আদি মানবের (Dawn Man) ঐ চোয়ালের হাড় পড়ে আছে কোন পরিত্যক্ত চিলেকোঠার অভ্যন্তরে অথবা কোন দোকান ঘরের পুরানো অকেজো মালপত্রের মধ্যে। এ কথা চিন্তা করাও যায় না যে, ডাক্তার কোলিয়ার ঐ দুর্লভ হাড়খানা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন সমুদ্রের জলে। তাঁর মত একজন বিচক্ষণ পুরাতাত্ত্বিক ও কাজ কখনও করতে পারেন না। আমরা আশা করতে পারি, একদিন ঐ অস্থিটি কারও নজরে পড়বে এবং সে নিশ্চয়ই ওটা সমর্পণ করবে বিজ্ঞানীদের হাতে। ডাক্তার কোলিয়ারের আবিষ্কৃত আদি মানব (Dawn Man) প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন এবং ঐ নিরুদ্দিষ্ট চোয়ালের হাড় আমাদের জানিয়ে দেবে কত কাল আগে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীর বুকে।'

যে ভাগ্যবান ব্যক্তি কঙ্কালের ঐ অস্থিটি খুঁজে বের করতে পারবে তার জন্য কতকগুলি পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে আজও আমেরিকায়। ডাক্তার ময়ের-এর মত পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বিশ্বাস করেন, একদিন ঐ নিরুদ্দিষ্ট অস্থিখানির হদিশ মিলবে একান্ত আকস্মিকভাবে।

এক কলেজের চারটি মেয়ে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকি। এ কথা কি ও আমাকেই প্রথম বলল। জীবনে আর কাউকে বলে নি। তাকায় নি! ঐ দৃষ্টিতে।

—তুমি যাও। হাতমুখ ধোবে চল। ওর মা বল্লেন, বিমান তোমাকেও এক কাপ চা পাঠিয়ে দিই।

ওঁরা দু'জনে চলে যান—আর এতক্ষণে আমি খেয়াল করি অনেক ছবি পড়ে আছে ঘরের এককোণে।

একে একে ছবিগুলি তুলে তুলে দেখি। ছবির সমজদার আমি নই, তবুও বুঝতে পারি এগুলি আধুনিক ছবি নয়—হাঁসকে হাঁস, মেয়েকে মেয়ে, বাড়িকে বাড়ি বলেই বোঝা যাচ্ছে—সিম্বল কোথায়?

কিন্তু কি সুন্দর! হাঁসের গায়ে যে সাদা রং, তা প্রকৃত হাঁসের গায়ে দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের মনে হাঁসের যে শুভ্র রূপের চিত্র আছে,—যে হাঁস মানস সরোবরে বিহার করে—সেই হাঁস ঠিক এমনই।

ছবিগুলি যেন বিধাতার প্রথম সৃষ্টি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এই ছবিগুলি বিক্রী করে দিলে এদের অনেকটা সাহায্য হতে পারে।

—এক কাপ চা খাও বাবা। পাপড়ির মা ঘরে ঢোকেন। শুধু চা-ই, আর কিছু নেই।

(পাপড়ি কি খেল?)

বোধ হয় আমার মনের না বলা প্রশ্নের উত্তরই উনি দেন, ও তো কলেজ থেকে এসে ভাত খায়। কোন হাঙ্গামা নেই।

—ছবিগুলো পড়ে আছে, বিক্রী করছেন না কেন? অসংলগ্ন ভাবেই প্রশ্নটা বেরিয়ে যায় মুখ থেকে।

—ছবি! ও, তুমি আমার স্বামীর আঁকা ছবিগুলির কথা বলছ।

—হ্যাঁ। যদি বলেন তো আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি··

পাঁচ বছর বয়স থেকে গড়ে-ওঠা যে মন, প্রথম দিন থেকেই এঁর দিকে অবিশ্বাস ও অস্বস্তিভরে তাকিয়েছিল। সে এবারে মুচকি হেসে বলল, এইবারে পথে এস চাঁদ। এত ভাল ভাল কথার পেছনে কিছু না কিছু স্বার্থ থাকতে বাধ্য।

—না, বাবা। ও ছবি আমি বিক্রী করব না। ওঁর স্মৃতিচিহ্ন—তা কি বিক্রী করে যেতে পারি। পড়ে নেই বাবা ছবিগুলি, সবচেয়ে যত্নে ওগুলোকে রাখি—আমার ট্রাঙ্কের তলায়—আজ ট্রাঙ্কটা রোদে দিয়েছি—তাই বাইরে আছে—

ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকি। এরকম অপমানিত জীবনে কখনও হয় নি। ইচ্ছে হয় চা ফেলে রেখেই উঠে চলে যাই—

ঠিক এই সময় পাপড়ি ঘরে ঢোকে। আঁট করে টেনে বাঁধা চুল, পরণে ডুরে শাড়ী, প্রসাধনহীন মুখ আর ঐ অপরূপ হাসি—আমি উঠতে পারি না—কিছুতেই উঠতে পারি না—

··কোন অদৃশ্য হাত আমাকে কেটে দু'টো ভাগে ভাগ করে দিল পুরোন 'আমি' অবাক হয়ে দেখলুম উঠতে পারছি না কিছুতেই—উঠতে পারছি না—ঐ হাসি চুম্বকের মত আমাকে টানছে যতক্ষণ না ও আমাকে ছেড়ে দেয়—আমার নিষ্কৃতি নেই··জানেন, আজ কলেজে কি কাণ্ড হয়েছে। বলেই হাসতে শুরু করে ও।

চুপ করে তাকিয়ে থাকি সেই হাসির দিকে। কতক্ষণ পরে দেখি নিজের অজান্তেই হাসছি।

(বাঃ, বাঃ, বেড়ে হাসছ দেখছি। অনেক উন্নতি হয়েছে তোমার বিমান মিত্র)

সত্যিই তো, কেন হাসছি। অকারণ অনর্থক। কিন্তু কেন ফুলগুলি হাসির আলো ছড়ায়? কেন আকাশভরা চাঁদের হাসি?

শুধু সেদিন নয়,—সেদিন, পরদিন আরও অনেকদিন আমি ওখানে গেলাম। তারপরে একদিন·····

২৭

হ্যাঁ, সেই একদিনে ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। সরোজ বসে আছে একটা চেয়ারে আর সামনে দাঁড়িয়ে পাপড়ি হাসছে। ঠিক যেমনি হাসি ও হাসে আমার সামনে বসে—কোন তফাৎ নেই—একই রং, একই সুর, একই গান।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—কালো একটা ছায়ার মত। তারপরে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম··যে সরোজের সামনে হাসে—সে আমার সামনে হাসতে পারে না—

··পারে না··পারে না··পারে না··

(আমি তো অনেক আগেই বলেছি বাওয়া, ওসব হাসি তোমার জন্যে নয়। 'দু'দিনের জন্য হেসেছিল তোমার দিকে তাকিয়ে—হয়ত কোন উদ্দেশ্য ছিল নয়ত এমনিই—ঢলানী··ঢলানী মেয়ে··কেটে পড় —কেটে পড় এখান থেকে ফিরে চল নিজের জায়গায়··)

অনেকদিন পরে সুবিধে পেয়ে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ছাড়তে থাকে সে।

অনেকদিন পরে ফিরে যাই সেই দোকানে। এই ক'দিন সন্ধ্যেটা আমার কেটেছে পাপড়ির ওখানে—ওর হাসির নেশায় মাতাল হয়ে। আজ আবার ফিরে এসেছি পুরোন নেশায়। কিন্তু··

না, কিছুতেই নেশা জমতে চায় না। গেলাসের পর গেলাস খাচ্ছি কোন তৃপ্তি নেই,—উত্তেজনা নেই—শুধু বারবার মনে পড়ছে একটি দৃশ্য—সরোজের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে পাপড়ি··

ভুলতে হবে—এই দৃশ্যটা আমাকে ভুলতেই হবে—গেলাস—গেলাসের পরে গেলাস··তারপর, আর মনে নেই।

শুনেছিলাম, জ্ঞান হয়েছিল আমার পুরো একদিন পরে। দোকানের লোকরাই গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়েছিল বাড়িতে—ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। ডাক্তার আমার সেই পুরোন বন্ধু—শৈবালদি'কে যে ভাল করেছিল—অবশ্য বাবা সে কথা না জেনেই ডেকেছিলেন

দু'দিনেই ভাল হয়ে গেলাম। দোকানে বসতে শুরু করলাম। তখনই একদিন উনি এলেন। চারিদিক তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ওঃ, তাই

—কি ?

—কাঁচা পয়সা। তা মশাই, একটা কথা শুনুন। ঐ মদের নেশা সর্বনেশে—ওতে বেশি ডুবেছেন কি মরেছেন—

ভ্রূ কুঁচকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি।

—তা মশাই, আপনি রাগ করেন আর যাই করেন, সত্যি কথাই বলব নেশা করবেন এমন যাতে যৌবন স্থায়ী হবে, দেহের কান্তি হবে উজ্জ্বল—সে নেশা কিসের জানেন।

—জানি। রুক্ষভাবে বলি, জানি যেটা আপনি করেন কিন্তু, তা তো ডাক্তারী না করলে সুবিধে করা যায় না—যথাযথ মূল্য দিয়ে করতে গেলে তো ফতুর হতে হবে।

ডাক্তারবাবু আর একটি কথা না বলে চলে যান।

বেশ ছিলাম পুরোন জীবনে' এখন যে কি মুস্কিলে পড়েছি মাঝখানে কয়েকদিনের জন্য মনটার যে ভাগ হয়েছে—সে আর কিছুতেই মিলতে চাইছে না—কি রকম অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে।

—এ ক'দিন আমাদের বাড়িতে যান নি কেন

সামনেই দাঁড়িয়ে পাপড়ি কিন্তু আজ এই প্রথম ওর মুখটা গম্ভীর দেখলাম।

—এমনি-ই। অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিই।

—আমি কত ভাবছিলুম আপনার জন্য। দোকানে এসে দেখে গেছি আপনি নেই—

আশ্চর্য। সব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বাস করে আনন্দে মন ভরে উঠছে—

বাঃ বাঃ সোনার চাঁদ, আনন্দ হচ্ছে ? লজ্জা করে না।)

—কেন আমাকে খোঁজ করছেন আপনি ? কেন ?

—আপনাকে না দেখতে পেয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে—

—মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমাকে না দেখতে পেয়ে ওর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—কি আশ্চর্য সুন্দর এই কথা ক'টি—পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য এক করলেও এর তুলনা হয় না—

(হ্যাঁ, তার তো তুলনাই হয় না। সরোজের কথা ভুলে গেছ এরই মধ্যে, বোকারাম। তোমাকে যা বলেছি ঠিক এই ক'টি কথাই সরোজকে বলেছে—আরও বলেছে কতজনকে—)

—আপনি এখান থেকে চলে যান—মুখ ফিরিয়ে দম বন্ধ করে ক'টি কথা বলি।

তারপরে অনেকক্ষণ—মনে হল যেন অনন্তকাল পরে আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম—

তখনও দাঁড়িয়ে আছে ও।

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? চেঁচিয়ে উঠি।

ও হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপরে বিদ্যুতের মত এসে আমার হাত ধরে বলে, আপনি খুব রেগে গেছেন, কেন বলুন তো। চলুন তো মার কাছে যাই।

অত ভাল লাগে বলেই বোধ হয় অত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

—না, না, না, তুমি বেরিয়ে যাও—শীগগির বেরিয়ে যাও—

এক টানে হাতটা ছাড়িয়ে নিই। আমার ধাক্কা খেয়েও এক কোণে চলে যায়।

তাকাই নি—তবুও বুঝতে পারি ও কাঁদছে—অঝোর ধারায় কাঁদছে।

—চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত বৃষ্টি হয়েছিল—পৃথিবী ডুবে গিয়েছিল একটা মানুষ কতটুকু কান্নায় ডোবে।—

কিন্তু, আমি ডুবি নি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম।

কতক্ষণ পরে—কতক্ষণ পরে জানি না—ওর মার স্নিগ্ধ কণ্ঠের আহ্বান শুনলাম, বাবা।

—কি ?

পাপড়ি খুব কাঁদছে। জীবনে ও এই প্রথম কাঁদল। কি হয়েছে আমাকে বল—

—ওকে এই দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি—

—কিন্তু কেন বাবা।

—কিন্তু, কেন বাবা ? চিবিয়ে চিবিয়ে বলি, ও না-হয় আপনার ভাবায় শিশু, কিন্তু, আপনার তো বুদ্ধি আছে—আপনি কি বলে কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে এ-ভাবে যার-তার সঙ্গে মিশতে দেন।

—শুধু কি আমার সঙ্গে। ব্যঙ্গের ঝলক আমার কণ্ঠে, আমিই তো একটা যা-তা। আমার সম্বন্ধে কিছু শোনেন নি ··

উনি চুপ করে রইলেন

—চুপ করে রইলেন কেন ? বলুন।

—হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি নি।

—কেন করেন নি। যা শুনেছেন সবই সত্য। লোকে বলে আমি চরিত্রহীন। 'চরিত্র' কি পদার্থ আজ এত বছরের মধ্যেও তা জানতে পারি নি—তবে 'চরিত্র' মানে যদি ধোপার তোলা, ইস্ত্রি করা, পাতলা কাগজে মুড়ে আলমারির তাকে তুলে রাখা জিনিষ হয়, তবে

আমি সত্যিই চরিত্রহীন এবং সেজন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। ওরা বলে আমি মদো-মাতাল। হ্যাঁ, আমি মদ খাই, সহ্যের অতিরিক্ত খাই—একদিন মদ খেয়ে দোকানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম···

একটু চুপ করে ওঁর ব্যথাভরা অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে খুব হাসতে থাকি—

—কি হল তো। সব মিটে গেল। কি বলছিলেন! দেবতার আশীর্বাদ আছে আমার মুখে, দেবতার নয়—আশীর্বাদ আছে দানবের। আমি আমার আত্মাকে দান করেছি দানবকে—স্বেচ্ছায় খুশিমনে···—কারণ? কারণ আমি সুখী হতে চাই। আর এই পৃথিবীতে সুখী হবার একমাত্র উপায় বিবেককে বিক্রী করে দেওয়া।

লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। আকাশ নেশা করেছে—ভাবে প্রতিমা। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নেশা চাই। এমন কি আকাশেরও। নেশার চালেই জগৎ চলছে।

আজ আমি বুঝতে পারি এই নেশা-ই হত্যা করেছিল আমার দাদু জমিদার ত্রিপুরাশঙ্করকে। বড় সাংঘাতিক নেশা ছিল তাঁর। মদের নয়, বাঈজীর নয়, দানের নেশা।

এই নেশাই আমার দাদুকে শেষ করে দিয়েছিল—আমার বাবাকে করেছিল পথের ভিখারী—আর আমার জীবনে এনে দিয়েছে চিরস্থায়ী অভিশাপ, আমি জানি এই অভিশাপের হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

এতদিন এই অভিশাপের নাগপাশ থেকে মুক্তি আমি চাই নি। এই বিষের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেই ভালো লেগেছিল। সেই নেশার তীব্র উত্তেজনার আনন্দ শিহরণে সমগ্র পৃথিবী-ই অপরূপ হয়ে উঠেছিল আমার চোখে। কিন্তু, আজ আকাশের ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে·····

ও তো আলো নয়—ও যে হাসি। আকাশের হাসি, বাতাসের হাসি—পৃথিবীর হাসি—পাপড়ির হাসি। পাপড়ির নীল আকাশের [illegible]কে গেলে একটি নিখুঁত চামড়ার মুখ—হাসছে তো হেসেই চলছে।

ঐ ভাবে যদি আমি হাসতে পারতাম। টেবিলের ঢাকার ওপরে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে প্রতিমা। লাল সুতোর গোলাপটাতে মুখ চেপে বলে, তা' কি সম্ভব ছিল সেই মেয়েটির পক্ষে।

সেদিনের সেই ছোট মেয়েটিকে আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শঙ্খের মতো সাদা রং—পরণে দামী পুরোন ছেঁড়া শাড়ি—পিঙ্গল চুল আর পিঙ্গল চোখ। ভাঙ্গা পাঁচীল ঘেরা বিরাট এক মরা বাগানে সে বসে আছে। বয়সে নিতান্তই কিশোরী কিন্তু চোখে রিক্ততার ক্লান্তি।

পুচ্ছহীন মৎস্যনারী করুণ চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে—সেই ছোট মেয়েটির দিকে। চারিদিকে শুধু অচেনা লতা, ধুলো, বালি, কাটাগাছ। সেখানে বসে মেয়েটি নীরবে তাকিয়ে থাকতো পুচ্ছহীন মৎস্যনারীর দিকে।

প্রকাণ্ড দালানে খেতে বসতো ওরা চার ভাইবোন, সর্বজ্যেষ্ঠ প্রতিমা কিশোরী—সর্বকনিষ্ঠ শোভন শিশু। সাদা মুখ থেকে পিঙ্গল [illegible] সরিয়ে ভাঙা কলাইয়ের থালায় মোটা চালের ভাত ও একমাত্র উপকরণ [illegible]লের মতো ডালের দিকে একবার তাকাতো, দেখতে পেতো অনেক [illegible]দিন—দেখতে পেতো সেই মেয়ে—সে দেখতো অতীতকে রূপোর থালা—রূপোর গেলাস—চারিদিকে দাস-দাসীর ভিড় আর যত্ন—আর সে কল্পনা করতো ভবিষ্যতের ছবি।

তার দাদু জমিদার ত্রিপুরাশঙ্করকে সে স্বচক্ষে দেখেছিল।

ওর যখন বছর চারেক বয়স তখনই একদিন মুহূর্তের মধ্যে সব ঐশ্বর্যের সমারোহ শেষ হয়ে গেল। ঠিক যেন বিরাট শক্তির একটা আলোকে কেউ সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল।

ওর দাদু ত্রিপুরাশঙ্কর-ই ছিলেন সেই সুইচ। তাঁর মৃত্যুতে মুহূর্তের মধ্যে সব অন্ধকার হয়ে গেল। কিংবা চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলেই তিনি মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মৃত্যু তাঁর নিকটে স্বেচ্ছায় আসে নি। তিনি জোর করে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলেন।

ত্রিপুরাশঙ্কর বিপত্নীক। একটি ছেলে রেখে অনেকদিন আগেই তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর ছেলে বড় হয়েছে—বিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নাতনী হয়েছে একটি। কিন্তু, এখনও যেন তিনি বাইরের লোক—সম্পূর্ণ বাইরের।

বাইরের দিকের প্রকাণ্ড ঘরটায় উনি থাকতেন। ঘরটায় অনেকগুলি জানালা—দু'টো দরজা। কখনও উনি জানালা বা দরজা বন্ধ করেন নি। যে লজ্জা পাবে সে সামনে থেকে সরে যাও—আমার দ্বার অবারিত।

দু'টি ভৃত্য এঁকে দেখাশোনা করতো। সেদিন সকালে দরজা বন্ধ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল তারা। তাদের কর্মজীবনে আজ পর্যন্ত কোনদিন এ রকম ঘটনা ঘটে নি। বিহ্বলের মতো ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কতক্ষণ ওরা এভাবে দাঁড়িয়েছিল কে জানে? ওদের তো মনে হচ্ছিল—অনন্তক্ষণ। ঘড়ির ঘণ্টার হিসেব হারিয়ে ফেলেছিল তারা।

—সর্বপ্রথমে এই ব্যাপার সেই ছোট মেয়েটির চোখে পড়ে, নীল ঢাকাতে মুখ লুকিয়ে ধীরে ধীরে বলে প্রতিমা, সেই মেয়েটি-ই তো যখন-তখন যেতো ওঁর কাছে। একটুও ভয় পেতো না।

সেদিন সকালে দূর থেকে দরজা বন্ধ দেখে ও থমকে দাঁড়ায়। কিছু একটা ঘটেছে! ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ফিরে যায় মা'র কাছে।

—মা।

—কি? রাধারাণী প্রাতঃকালীন প্রসাধনে ব্যস্ত ছিলেন—অবাক হয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকান।

—দাদুর কি হয়েছে? উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বলে, দাদু'র ঘরের দরজা বন্ধ।

বিদ্যুতের মতো ফিরে দাঁড়ান রাধারাণী—হাতের চিরুনী মাটিতে পড়ে যায়। বন্ধ? দরজা বন্ধ? সে কি?

আর একটি কথা না বলে তিনি ছুটে স্বামীর ঘরের দিকে চলে যান।

তারপরে, বহুজনের সশব্দ পদক্ষেপ, উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা। [illegible] বৎসরের মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে কিন্তু ভয় পায় নি। শুধু বিস্মিত হয়ে ভাবছিল—কি?··কি আছে এর 'পরে।

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সবাই থমকে দাঁড়ায়। নির্বিকার

OATINE
Oatine Cream

প্রশান্ত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন জমিদার ত্রিপুরাশঙ্কর। আর, এ তো দূর থেকেও বোঝা যায় সে নিদ্রা—মহানিদ্রা। আর কখনও তাঁর ঐ মুদ্রিত চোখ দু'টি খুলবে না। যাঁর হাঁকে, ডাকে বাড়ি তটস্থ হয়ে থাকতো তিনি চলে যাবার সময়ে একটিও কথা বলে যাবেন না!

মাটির মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়েছিল সবাই এমন কি রাধারাণীও। বিয়ের সময়ে একবার দুধে-আলতায় এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রাধারাণী, আর এই দ্বিতীয়বার তিনি এখানে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে তার কিংবা উপস্থিত কারো কোন চেতনা ছিল না।

দারোয়ান তার চাকুরী জীবনে এই প্রথম গেট ছেড়ে চলে এসেছিল। তাই বুঝি সেই লোকটি নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই ভিড়ের মাঝখানে—আর···

—মেমসাব, সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা সচেতন হয়ে, সোজা হয়ে উঠে বসে। ভৃত্যের পরিস্থিতিকে সচেতন হবার এই অনুভূতি যেন জন্মগত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—মেমসাব···ভৃত্য আবার বলে।

কাকে বলছে! ভাবে প্রতিমা। ঘরের চারিদিকে সে ব্যর্থ অনুসন্ধানে তাকায়। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে—

ত্রিশ বৎসরের পৃথিবীর ছাপপড়া একটি মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ মুখ, ঐ ছায়াকেই ডাকছে এরা।

ভৃত্যরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে কে জানে? নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পরক্ষণে ঘরে ঢোকে প্রবীর বসু। পৃথিবীর অন্যতম ধনী। জগতের রকফেলার।

এবারেও অভ্যাসবশতই প্রতিমা উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনও ওর মাথা ঘুরছে—নইলে সে প্রবীরের পরিবর্ত্তন দেখতে পেতো।

—প্রতিমা। গম্ভীর মিষ্টকণ্ঠে প্রবীর ডাকে

উদাসীন চোখে তাকায় সে।

—প্রতিমা, আমি চলে যাচ্ছি।

চমকে জেগে ওঠে প্রতিমা—অবাক চোখে তাকায়। প্রবীরের দিকে ফিরে চরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। এ কি চেহারা প্রবীরের? প্রবীরকে অনেক ভাবেই দেখেছে সে—প্রেমিক প্রবীর—কামনার আগুনে উচ্ছ্বসিত প্রবীর—মাতাল প্রবীর—অত্যাচারী প্রবীর—শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গম্ভীর প্রবীর বসু।

কিন্তু এ রকম রিক্ত হতশ্রী চেহারা—

—কি হয়েছে তোমার? কোথায় যাচ্ছ?

—প্রতিমা, এই প্রথম তুমি আমাকে একটি প্রশ্ন করলে যা আমার ব্যবসায় নয় ব্যক্তি সম্পর্কীয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় আমি তোমাকে কোন উত্তর দিতে পারছি না। কারণ, নিজেই জানি না কোথায় যাচ্ছি।

প্রবীর বসুর ভাব এমন—কোথায় যাবে ও! এই ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ছেড়ে। কিন্তু ও যাবেই। ওর চোখে যে ছায়া দেখছি সেই ছায়া—যে ছায়া মৃত ত্রিপুরাশঙ্করের সর্ব অবয়বে দেখেছিলাম।

—তুমি যেও না। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে ওঠে প্রতিমা।

—কেন? ভ্রূ কোঁচকায় প্রবীর। দু' মিনিট থেমে বলে, সব বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, নগদ টাকা, কারবার সবই তোমার নামে করে দিয়েছি। কোন ভাবনা নেই তোমার। সব ফেলে রেখে যাচ্ছি।

—সব ফেলে রেখে যাও—কিন্তু আমাকে···আমাকে রেখে যেও না।

ওর দিকে একবার তাকায় প্রবীর। মৃত্যুর সেই কালোছায়া যেন মুহূর্তের জন্য সরে যায় চোখ থেকে। পরক্ষণেই উচ্চকণ্ঠে হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। তবু প্রতিমা দমে না। অনেক অন্যায় সে করেছে—আজ তার প্রায়শ্চিত্তের দিন।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি···তুমি আমাকে ক্ষমা কর···আমি তোমাকে ভালোবাসি—করুণ আর্তি যেন ঝরে পড়তে থাকে প্রতিমার কণ্ঠে।

প্রবীর মুখ ফিরিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে ওর সমস্ত দেহটাই উল্টো দিকে ঘুরে যায়। কোন এক অদৃশ্য যন্ত্রণা যেন পাকে পাকে বেঁধে ওকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

—শোন···প্রতিমা সামনে এসে দাঁড়ায়।

—না, হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে প্রবীর। না, দশ বৎসরের অধীর প্রতীক্ষায় প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত এই কথা ক'টি শুনতে চেয়েছি—কিন্তু আজ আর নয়—তুমি সেই জেলে ও দৈত্যের গল্প তো জানো। দৈত্য বললো, প্রথম বৎসরে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে তাকে আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর করবো—কিন্তু কেউ আমাকে উদ্ধার করে নি—পরের বৎসর প্রতিজ্ঞা করলাম উদ্ধারকারীকে পৃথিবীর অধীশ্বর করে দেব—কিন্তু সেবারেও কেউ এলো না। তৃতীয় বৎসর স্থির করলাম এবারে যে আমাকে তুলবে তাকে হত্যা করবো।

—মিলটা কোথায় ঠিক বুঝতে পারলাম না, প্রতিমা আহত কণ্ঠে বলে।

—আমিও যে ঠিক তেমনি ভাবে অপেক্ষা করেছিলাম—সহস্রদল গোলাপের মতো আমার সেই প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিকার আমি দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে—তুমি ফিরে তাকাও নি। তারপরে আমি অপেক্ষা করেছি ব্যর্থ কামনায়—কামনার বিষে হৃদয় আমার নীল হয়ে গেছে—আর আজ আমি তোমাকে ঘৃণা করি—

—কিন্তু ঠিক আজ—এই মুহূর্তেই কেন?

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রবীর বলে, আকাশের ঐ লাল রং—ঐ আমার মুক্তিদাতা। আমার দাসত্বের নাগপাশ··

—দাসত্বের নাগপাশ! পাগলের মতো কি বকছো!

—তোমার রূপের মোহে বন্দী হয়েছিলাম আমি। তাই ক্রীতদাসের মতো চিরজীবন তোমার জন্য সংগ্রহ করেছি রূপা—তোমার ওই ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছি।

—শুধু আমার—তোমার নয়।

—না, আমার নয়। সবুজের স্বপ্ন দেখেছিল আমার মন—কিন্তু আমাকে চাষ করতে হয়েছে হলুদের। চারিদিকে এ কি স্বর্ণ বিভীষিকা? আজ তুমি পরিতৃপ্ত কাজেই মুক্তি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি।

আর একটি কথা না বলে প্রবীর বেরিয়ে যায়। মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে থাকে প্রতিমা।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে—আর সেই ঘণ্টা শেষ হবার আগেই ভজুয়া ঘরে ঢোকে।

—মেমসাব।

নীরব দৃষ্টি তুলে তাকায় প্রতিমা।

ভজুয়া দ্রুতকণ্ঠে যা বলে যায় তা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে একজন বাবু, একটি বৌ এসেছে। আর কি জানি কেন বৌটি খুব কাঁদছে।

প্রতিমা অবাক হয়। তাদের বাড়িতে কাঁদবার জন্য কে এলো!

—কোথায় বসিয়েছিস। বসবার ঘরে!

না, বাবুটি কিছুতেই বসবার ঘরে বসতে রাজী হলেন না। পাশের ঘরে বসলেন।

রাজকীয় সমারোহপূর্ণ বসবার ঘরের পাশে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর আছে। একটু নীচুস্তরের অভ্যাগতরা সেখানে বসেন। বাবুটি নিজেই গিয়ে বসলেন।

তাহলে তিনি ঘরটার সম্বন্ধে জানেন—জানেন নিজের অবস্থা। কে সে?

প্রতিমা চট করে পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। মোটাসোটা কালো যে মহিলা পুনরায় কাঁদবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে-ও উঠে দাঁড়ায়—তাকিয়ে দেখেই কিন্তু তার মুখভাব বদলে যায়—অস্ফুটে অসহায় কণ্ঠে সে বলে, প্রতিমা··

প্রতিমা ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। হ্যাঁ, মেয়েটিকে সে চিনতে পেরেছে। স্কুলে কিছুদিন একসঙ্গে পড়েছিল। তারপর··মুখ কালো হয়ে ওঠে প্রতিমার। একের পর এক সেই অপ্রীতিকর কাহিনীগুলি মনে পড়ে যায়।

ত্রিপুরাশঙ্করের মৃতদেহের সামনে তারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল আরও কিছুক্ষণ থাকতো, যদি না সেই লোকটি সরাসরি এসে ঘরের মধ্যে ঢুকতো। বিস্মিত কেউ বাধা দেবার আগেই লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় এবং প্রায় পনের মিনিট তাকিয়ে থেকে যখন বুঝতে পারে উনি সত্যই মৃত তখন চেঁচিয়ে ওঠে, জোচ্চোর।

তিন অক্ষরের একটি শব্দ। তাতেই যেন বিদ্যুতের মতো সব লোক চমকে জেগে ওঠে। সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন নায়েবমশাই।

—কাকে আপনি জোচ্চোর বলছেন? আপনার সাহস তো কম নয়। চাপা রাগে কঠিন হয়ে ওঠে নায়েবের কণ্ঠ।

লোকটি কিন্তু একটুও বিচলিত হয় না। সে নায়েবের আপাদমস্তক ভালোভাবে লক্ষ্য করে।

—যদি কেউ টাকা ধার নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে ফেরৎ দেবার কথা দিয়ে কথা না রাখে, তবে সে জোচ্চোর হয় কি না? লোকটা দরজার সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে—এমন কি রাধারাণীও।

—জমিদার ত্রিপুরাশঙ্কর আজ আমাকে ধার শোধ দেবেন বলেছিলেন? এখন তো দেখছি তিনি দিব্যি ফাঁকি দিয়ে··

—খবরদার। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে রাধারাণী। নায়েবমশাই ওঁকে বলে দিন, আমার শ্বশুর জীবনে কাউকে ফাঁকি দেন নি—মৃত্যুতেও দেবেন না। কত টাকা ওঁর প্রাপ্য!

তখনই, আধঘণ্টার মধ্যে রাধারাণী গায়ের সমস্ত অলঙ্কার—সিন্দুকে মজুত অলঙ্কার একটা ট্রেতে করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হাতে ছিল শুধু দু'টি শাঁখা। দু'টো চাকর সেই ভারি ট্রেটা বয়ে এনেছিল। অপমানে লোকটার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। তখন বেশ ভালো লেগেছিল প্রতিমার।

তারপরে নায়েবমশাইয়ের কাছে সব কথাই শুনতে পেয়েছিল ওরা। নেশা—ত্রিপুরাশঙ্করের নেশার কথা। বিলাস নয়, ব্যসন নয়—শুধু দানের নেশা। দান করেই একটা ছোট জমিদার শেষ হয়ে গেল। অনেকদিন আগেই নায়েবমশাই সাবধান করেছিলেন ত্রিপুরাশঙ্করকে—অমন যে মাটির মতো মানুষ—নায়েব বলেন তা যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। গর্জন করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও। ভয়ে ভয়ে চোরের মতো বেরিয়ে এলাম। খানিকটা পরে ডাকলেন—বললেন, আশ্রিতকে যদি প্রতিপালন না করতে পারি তবে জীবন রেখে কি লাভ? তাই করলেন উনি—যখন দেখলেন আর চালানো যাবে না—তখন জীবন দিয়ে দিলেন—নায়েব হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন।

মুহূর্তের মধ্যে যুগান্তর হয়ে গেল। অসূর্যম্পশ্যা রাধারাণী ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সব কিছুর ভার নিলেন। প্রতিমার বাবা দেবব্রত চিরদিনই শিশু—এই আঘাতে তিনি আরও অসহায় হয়ে পড়লেন।

গয়না, আসবাবপত্র, দামী জিনিষপত্র, বাড়ির কিছুটা অংশ বিক্রী করে সব দেনা মিটিয়ে দিলেন রাধারাণী।

সেই ভাঙাবাড়ি ও মরা বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতো প্রতিমা—আর ভাবতো করে সে ফিরিয়ে আনবে ঐশ্বর্যের সমারোহ। আবার হাসবে ফুলের বাগান। শূন্য জলাধারে আর কাঁদবে না ভগ্নপুচ্ছ মৎস্যকন্যা।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন মনস্থির করে ফেলল সে। স্কুলে ভর্তি হবে। তখনও মনে কোন পরিষ্কার ধারণা দানা বাঁধে নি—কিন্তু এটুকু তার মনে হয়েছিল চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। কিছু একটা করতে হবে।

বাবাকে সে কথা বলতে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে অসহায় কণ্ঠে বলেন, স্কুল? এ বাড়ির মেয়ে কখনও স্কুলে যায় নি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মুখে এসেছিল মেয়েটির, তখন বাড়িটা ছিল একটা পুরো বাড়ি—তখন পরীদের পাখায় প্রাণ ছিল। মৎস্যকন্যা শুকনো মরুতে বসে কাঁদে নি এখন, এই ভাঙা ধ্বংসস্তূপের মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

কিন্তু তা সে বলে নি। দেবব্রতের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারে নি। শুধু বললো তখন তো কাছাকাছি স্কুলই ছিলো না। এখন তো এই কাছেই স্কুল হয়েছে—মেয়েরা পড়তে যাচ্ছে—আমিও যাব।

দেবব্রত আর কোন কথা বলেন না। কিন্তু প্রবলতর বাধা দিয়েছিলেন রাধারাণী—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেছিলেন, নিজেদের লাঞ্ছনা, অপমান লোকের কাছে প্রকাশ না করলে বুঝি চলছে না।

কিশোরী মেয়ে প্রতিমা কোন উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু তার জেদ—আগুনের মতো যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তার মনে জ্বলছিল তা কখনও একটু কম্পিত ত' হয় নি।

—লাঞ্ছনা? অপমান? প্রতিমা বসুরায় দামী পার্শিয়ান কার্পেটের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, মা, তুমি কথা দু'টি উচ্চারণ করেছিল মাত্র—কিন্তু তার রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তোমার। তুমি বুঝতেও পারবে না প্রতি মুহূর্তে কি অসহ্য অপমান আমাকে সইতে হয়েছে।

স্কুলে আমাকে যেতে হয়েছিল পুরোন, দামী ঢাকাই শাড়ি পরে—যে ঢাকাই ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে বিক্রী হয় নি। ওতে আমার অপটু হাতের রিপুর কাজ অনেক ছিল। রিপুর কাজ ওরা দেখে নি—ওরা দেখলো সেই ঢাকাই শাড়ি আর আমাকে। আমি জানতাম আমি ওদের মতো নই—কিন্তু সে প্রভেদ যে এতো বেশি—সে প্রভেদ যে লোকের মনে এতো বিরক্তি ও বিদ্বেষ উদ্রেক করে তা কখনও ভাবি নি। মুহূর্তের মধ্যে সব মেয়েগুলি যেন একীভূত হয়ে গেল—এক প্রকাণ্ড দেহের এক চোখ, এক কান, এক নাক।

বড় দিদিমণি আমাকে ক্লাশে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি জানি তাঁর মোটা, কালো দেহের পাশে আমার শঙ্খশুভ্র রং শুভ্রতর ও তরুণ দেহটি কৃশতর দেখাচ্ছিল। মেয়েদের চোখে দেখলাম, অপরিচয় ও অবিশ্বাসের স্বাক্ষর।

তখন পা দু'টি আমার ভারী হয়ে এসেছিল—মনে হচ্ছিল এখানেই বেঁচে যেতাম আমি যদি শেষ হয়ে যেতে পারতাম—এই মুহূর্তেই আমার ছাত্রী হয়ে আসাটা যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না এরা?

বরফের পা দু'টি টেনে টেনে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। নিঃশব্দে, নীরবে বসেছিলাম পেছনের বেঞ্চে—আর সমস্ত স্কুলজীবন আমার কেটে গিয়েছিল এই ভাবে··নির্জন একাকীত্বের যে দেওয়াল আমাকে গৃহে ঘিরে ছিল তা এখানেও আমাকে বেষ্টন করে রইলো।

[ক্রমশ।

এ্যাণ্টনি ভ্যান লিউওয়েনহেক

(অণুব্রহ্মাণ্ডবীক্ষণের পথিকৃৎ)

দেহবিজ্ঞানী বা জীবাণুবিজ্ঞানীদের কাছে এ্যাণ্টনি ভ্যান লিউওয়েনহেকের নাম মোটেই অপরিচিত নয়। তিনিই সজীব জীবাণুজগৎ আবিষ্কার করে এবং তাঁর বাড়ি থেকেই পুনরুৎপাদী পুরুষ জীবকোষের (শুক্রকীট) আবিষ্কারবার্তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভ্যান লিউওয়েনহেক, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর ডেলফট্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ঝুড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই যুগে ডেলফট্ সহরে তৈরি চীনামাটির বাসনপত্র বিশ্ববিখ্যাত ছিল এবং ঝুড়িতে করে এই সব জিনিস বিদেশে চালান দেওয়া হোত। লিউওয়েনহেকের মা ছিলেন একজন মদ্য প্রস্তুতকারীর মেয়ে এবং এঁরা ছিলেন নগরপিতাগণের আত্মীয়। ভবিষ্যতে বস্ত্র ব্যবসাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা নিয়ে তিনি আমষ্টারডামে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ঐখানে শিক্ষা গ্রহণ কালেই তিনি ম্যাগনিফাইং কাচের সংস্পর্শে আসেন, কারণ এই কাচ দিয়ে বস্ত্রের সূতোর সংখ্যা তাঁকে গুণতে হোত। ১৬৫৪ সালে ডেলফট্ সহরে নিজের বস্ত্র ব্যবসা সুরু করেন। সেই সময়ে এই সহরটি হল্যাণ্ডের বৃহত্তম সহর ছিল। দু'টি প্রাচীন নথিতে দেখা যায় যে, ১৬৬০ সালে তিনি সহরের অল্ডারম্যানের সহকারী নিযুক্ত হন। এর কিছুকাল পরেই তিনি মিউনিসিপ্যালিটির মদ্য পরীক্ষকের কাজও করতে থাকেন। ওই সময়ে তিনি জমি জরীপের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন।

যতদূর পর্যন্ত জানা যায় তাতে মনে হয় যে, প্রায় ৪০ বছর বয়সে ভ্যান লিউওয়েনহেক অণুবীক্ষণিক পরীক্ষা সুরু করেন। তিনি অবশ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা নন (যদিও অনেকে তাঁকেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা বলে থাকেন) তবে এই যন্ত্রটির বহু ব্যবহার সম্পর্কে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইটালীর বৈজ্ঞানিক মারসেলি ম্যালপিঘি, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক এবং ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক জ্যান্ সোয়ামারড্যামকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

ভ্যান লিউওয়েনহেক তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর একজন চিকিৎসক বন্ধু তাঁকে এই ফলাফলগুলি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে পাঠাতে রাজী করান। ভ্যান লিউওয়েনহেক ল্যাটিন ভাষা এমন কি কোন বিদেশী ভাষাই জানতেন না ফলে রয়েল সোসাইটিকে, ওলন্দাজ ভাষায় লেখা তাঁর প্রত্যেকটি চিঠির অনুবাদ করে নিতে হোত। তবে তাঁর পত্রগুলি বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করতো বলে রয়েল সোসাইটি তাঁকে তাঁর গবেষণার ফলাফল নিয়মিতভাবে জানাতে অনুরোধ করেন। এর ফলে ১৬৭৩ সাল থেকে ১৭২৩ সাল পর্যন্ত ৫০ বছর ধরে তিনি আড়াই কোটিরও বেশি প্রবন্ধ রয়েল সোসাইটিতে পাঠান এবং সেগুলি সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করে।

ভ্যান লিউওয়েনহেক নিজেই তাঁর সমস্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে নিতেন। এগুলি সাধারণ দেশলাইয়ের বাক্সের চাইতে বড় হোত না। দু'টি ধাতু পাত এক সঙ্গে জুড়ে তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি ছিদ্রে, সাধারণ পিনের মাথার আকারের একটিমাত্র লেন্স লাগিয়ে নিতেন। তিনি যে কি উপায়ে এই লেন্স তৈরি করতেন তা জানার উপায় নেই, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই গুপ্ত তথ্যটিরও মৃত্যু হয়েছে। তিনি কয়েক

শো এই রকম অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন এবং সেগুলির মধ্যে কয়েকটি এখন পর্যন্ত রয়েছে। লিডেনে অবস্থিত বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত জাতীয় যাদুঘরে এবং উট্রেখটের বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে এই রকম দু'টি অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি রয়েছে সেটিই সব চাইতে মজবুত এবং এর বড় করে দেখবার শক্তি হ'ল ২৭০।

এগুলি তৈরি করা ভ্যান লিউওয়েনহেকের কাছে বিশেষ কোন সমস্যা ছিল বলেই মনে হয় না। কিন্তু নিজের হাতে তৈরি এই রকম অতি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তিনি কি করে এতো সঠিক পর্যবেক্ষণ করলেন এবং কি করে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এতো গভীরে প্রবেশ করলেন তা আমরা আধুনিক যুগের মানুষ বুঝতেই পারি না। সেই যুগে অণুবীক্ষণ জগত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এতো অল্প ছিল যে, তাঁর লেন্সের নীচে প্রতিটি স্লাইড নতুন নতুন এবং প্রায়ই আশ্চর্যজনক তথ্য উদ্ঘাটিত করতো। তাঁর হাতে যা আসতো তাই নিয়ে তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন। একমাত্র জীবজগতের ক্ষেত্রেই তিনি ২০০টি বিভিন্ন রকমের জীব নিয়ে পরীক্ষা করেন।

ভ্যান লিউওয়েনহেক আরও অনেক রকম জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করেন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, দুধ ও মাখন, চুল ও নখের বৃদ্ধি, অস্থি, দাঁত ও হাতীর দাঁত, চামড়া ও মাংসপেশী, চোখ ও স্নায়ু নিয়েও তিনি পরীক্ষা করেন। মাংসপেশীর তন্তু এবং মাছের রক্তের রক্ত কণিকার কোষের যে ছবি তিনি এঁকে গেছেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তিনি কীট পতঙ্গেরও চক্ষুর গঠন প্রণালী ও কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করেন। ঈল মাছেরও যে আঁশ আছে তা তিনিই আবিষ্কার করেন এবং এরই ফলে গাছের কাণ্ডের গোল রেখা দেখে গাছের বয়স নির্ণয় করা যায় তেমনি মাছের গায়ে আঁশের ক্রমিক পর্যায় দেখে মাছের বয়স নির্ণয় করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ভ্যান লিউওয়েনহেকের পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক ম্যালপিঘি ও গ্রু কাঠের গঠন প্রণালীর যে সব চিত্র এঁকে গেছেন সেগুলির সঙ্গে তাঁর অঙ্কিত

ত্রগুলির তুলনা করলেই বোঝা যায় যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর লো। চিকিৎসা জগতের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ছিল আংশিক কিন্তু ই ক্ষেত্রেও তাঁর একটি গবেষণা ছিল অমূল্য—তা হ'ল জীবাণু-জগতে। নি ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এই সম্পর্কে রয়েল সোসাইটিকে জানালেও তিনি এই সোসাইটির সদস্যগণ তখনও বুঝতে পারেন নি যে, এক সম্পূর্ণ তুন জগত তাঁদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ভ্যান উওয়েনহেক যখন রোটিফেরা, প্রোটোজোয়া ও ব্যাকটিরিয়া সম্পর্কে না তথ্য দিয়ে খব বড় একখানা চিঠি লেখেন তখনই শুধু এই াবিষ্কারের সত্যিকারের মূল্য স্বীকৃত হয়।

ভ্যান লিউওয়েনহেক তাঁর হিসেবের ভিত্তি হিসেবে জনাদের বীচি বালুকণার সঙ্গে পরীক্ষিত বস্তর তুলনা করতেন। স্বহস্তে র্মিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তিনি যে ক্ষুদ্রতম বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন। আমরা খালি চোখে যে ক্ষুদ্রতম বস্তু দেখতে পাই তার চাইতেও • লক্ষ ভাগ ছোট। প্রথম দিকে লণ্ডনের বিশেষজ্ঞগণ ভ্যান উওয়েনহেকের এই সব আবিষ্কার বিশ্বাস করেন নি কিন্তু পরে যখন রা এই সত্যগুলি উপলব্ধি করলেন তখন লিউওয়েনহেক সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। ইংলণ্ডের রাজা থেকে সুরু করে বজ্ঞানিকগণ পর্যন্ত সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। তাঁর াবিষ্কারগুলির ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে অনেক বৈজ্ঞানিক বেষণা হয়। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ৯০ বছর বয়সে এই বৈজ্ঞানিক রলোকগমন করেন।

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে সমুদ্রের ভূমিকা

'অনুসন্ধানী'

এই প্রবন্ধটি পড়ে শেষকরা অবধি অর্থাৎ সামান্য ক'মিনিটের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৮০০০ শিশু জন্ম নেবে। র্তমান পৃথিবীর সাড়ে তিনশ' কোটির বেশি অধিবাসীর খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের যে সমস্যা রয়েছে তার সঙ্গে এদের খাওয়া-পরার সমস্যাও যুক্ত হবে।

আবার এর পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যেই গৃহপালিত পশু জন্ম নেবে তিন লাখ পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি। এদেরও খাদ্য এবং আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এই সব পশুর এক দশমাংশেরও কিছু কম মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

সমগ্র বিশ্বের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং পদার্থবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি মানুষ ও পশুর অসম্ভব রকম বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে ভাবছেন। এই আতংকজনক অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাব্য সকল বিষয় নিয়েই তাঁরা আলোচনা করেছেন। এই পৃথিবীবাসীদের বাঁচতে হলে যে সমুদ্রের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হতে হবে এ বিষয়ে তাঁরা অনেকেই একমত হয়েছেন।

তবে সমগ্র বিশ্বেই বিজ্ঞানীরা সমুদ্রপ্রাপ্ত খাদ্য যেমন মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর পরিমাণ বাড়ানোর উপায় উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করছেন। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চল এই সকল খাদ্য থেকে যাতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যও বিজ্ঞানীরা উদ্যোগী হয়েছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র, বিশেষ করে জাপানে সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কি না সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দূরপ্রাচ্য এলাকায় জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। সেই বিপুল জনসংখ্যার জন্য প্রোটিন ও আয়োডিন সমৃদ্ধ খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজন সামুদ্রিক খাদ্য দিয়ে মেটানো যেতে পারে। সামুদ্রিক গুল্ম 'কেলপ' শুকিয়ে রেখে তা থেকে রুটি, কেক তৈরি হতে পারে। রান্না করেও খাওয়া যেতে পারে।

'কেলপ'-এ আছে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন। সমুদ্র থেকে খাদ্যবস্তুর সন্ধান, সংগ্রহের ও উৎপাদনের চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলেছে। বিশ্বের বহু বিজ্ঞানীরই ধারণা এ বিষয়ে সুপরিকল্পিত যোজনা কার্যকরী করা হলে বিশ্ববাসীর মোট খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশই সমুদ্র থেকে নানাভাবে মেটানো যেতে পারে।

সমুদ্র বিজ্ঞানীরা সাগর ও সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছুবার বহু রকমের বাহন নিয়ে গবেষণা করছেন, পিকার্ড নামে জনৈক বিজ্ঞানীই প্রথম সমুদ্রের বহু গভীরে নামতে পেরেছিলেন। সেই তথ্যসন্ধানী পরিক্রমায় তিনি এত নীচে নেমেছিলেন যে, তা বিশ্বাস করাই ছিল তখন কঠিন। তারপর থেকেই এই বিষয়ে অভিযান চলেছে। সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টার দিনে সমুদ্রের ফিজিক্যাল তথ্য সংগ্রহই ছিল লক্ষ্য, তখন ছিল অজানাকে জানবার আগ্রহ। কিন্তু আজ মানুষের খাদ্যের কোন উৎসের সন্ধান সমুদ্রে যেতে পারে কি না তারই চেষ্টা চলছে। এর উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জনৈক বিজ্ঞানীর দৃঢ় অভিমত সমুদ্রের হাজার হাজার ফুট জলের নীচে মানুষের খাদ্যের উপযোগী প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণী রয়েছে। এসব সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়ার সুযোগ মানুষের আজও আসে নি। ঐ বিজ্ঞানীর দৃঢ় অভিমত সমুদ্রের হাজার হাজার ফুট নীচে জলের তলা থেকে এসব প্রাণী সংগ্রহ করে সমগ্র বিশ্বের খাদ্যের বাজারে পাঠানো সম্ভব হবে। খাদ্য ছাড়া প্রচুর ধাতবদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ধাতু-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। পৃথিবীর ধাতবদ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে—সমুদ্র থেকে তা পূরণ হতে পারে।

সমুদ্রের নীচে বসবাস করার সহরের কথা ঔপন্যাসিকেরা কয়েক যুগ থেকেই কল্পনা করে আসছেন, তাঁরা এ নিয়ে নানা কাহিনীও রচনা করেছেন। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন জ্যাক ইভস কাস্টোর নির্দেশে জলের তলায় যান্ত্রিক উপায়ে বসবাস করা যে সম্ভব সে বিষয়ে পরীক্ষাও হয়ে গেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সুরাহার ব্যাপারে সমুদ্র সহায়ক হতে পারে এ বিষয়ে যে সকল সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে সে সকলই প্রত্যক্ষ এবং কার্যত সম্ভব বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হলে সমুদ্র সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়ে বড় বড় পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হবে। সমুদ্রকে মানুষের কাজে লাগাতে হলে তার আগে সামুদ্রিক

প্রবাহ, সামুদ্রিক প্রাণী, সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব, সমুদ্রের জল সংক্রান্ত ভৌতবিজ্ঞান বিশেষভাবে পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তবে হাজার হাজার সমুদ্রবিজ্ঞানী বর্তমানে এ সকল ক্ষেত্রে তৎপর হয়েছেন, বহু তথ্যই ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। এ সকল তথ্য ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগবে।

এই তথ্য সংগ্রহের জন্যই জান হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এডোয়ার্ড গ্রুপ বর্তমানে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে আছেন। নিউগিনির ৯০০ মাইল পূর্বে ১৬টি দ্বীপ নিয়ে ওই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত।

১৯৫২ সালে যে তিনজন বিজ্ঞানী নিরক্ষীয় অন্তঃপ্রবাহ আবিষ্কার করেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি এ বিষয়ে এবং গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে একটি স্থায়ী-সমুদ্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত মানমন্দির স্থাপন সম্পর্কে আরও তথ্যানুসন্ধান করবেন। হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একদল সমুদ্রবিজ্ঞানী বালটিমোরের নিকটবর্তী এলাকায় নিজ গৃহে ফিরে এসেছেন। তাঁরা খুব বড় আকারের একটি কাঠামোদান গড়ে তুলছেন। এর সাহায্যে চেসাপীক উপসমুদ্রে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

কুমেরু অঞ্চলে সমুদ্রের যে স্ফীতি দেখা দেয় তার ধাক্কা এসে পড়ে আলাস্কার উপকূলে। লাজোলা স্ক্রীপস ইনষ্টিটুট অব ওশানোগ্রাফির কয়েকদল সমুদ্রবিজ্ঞানী প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্রে তথ্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে সারা বছর কাটিয়ে থাকেন। বর্তমানে হপকিন্স মেরিন লেবরেটরী, উডসহোল ও ওশানোগ্রাফিক ইনষ্টিটুট এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংস্থা সমুদ্র সম্পর্কে মূল্যতথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত রয়েছে। কোনদিন হয় তো তাদের এই তথ্যসন্ধানী চেষ্টার ফলেই এই প্রবন্ধটি পড়া সুরু করার সময় থেকে শেষ পর্যন্ত যে নূতন ১৯৮০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাদের অন্ন ও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

মেডিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং

ডাঃ সঞ্জয় রায়চৌধুরী

মেডিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং কথাটা শুনতে একটু গালভরা মনে হলেও বিচার করলে দেখা যাবে যে, দৈনন্দিন জীবনে শরীরের সুস্থতা ও ভালমন্দের সাথে এর ব্যবহার বা প্রয়োগ বিশেষভাবে জড়ানো। কৃত্রিম অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন এমন মানুষ আমাদের মাঝে বিরল নয়। ব্লাডপ্রেসার যন্ত্র, এক্সরে মেশিন এগুলির সাথেও রোগী হিসেবে লোকের পরিচয় নিবিড়। এসব যন্ত্রপাতির সৃষ্টি কিন্তু ডাক্তাররা করেন নি, করেছেন কারিগরী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বা ইঞ্জিনীয়াররা।

আজকের চিকিৎসা-জগতে এই বিশেষ ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অবদান, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে সত্যিকারের কল্যাণরূপ ধারণ করেছে। দু-চারটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখা যাক :

'কনজেনিট্যাল হার্ট ডিজিজ' বা জন্মগত হৃৎপিণ্ডের অসুখের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। নানা কারণে শিশু হৃদযন্ত্রের মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর সব ছিদ্র নিয়ে জন্মায়। এর ফলে পরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার রক্তের সংগে মিলে গিয়ে প্রথম দিকে শিশুটিকে অত্যন্ত দুর্বল করে রাখে এবং পরে সামান্যতম অসুস্থতায় মৃত্যু ঘটায়। আগেকার দিনে এ ধরণের জন্মগত দোষ নিয়ে রোগী এলে তাকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেওয়া হোত। ক্রমে অপারেশান করে এই সব ফুটো বন্ধ করার চেষ্টা হ'তে থাকলো। কিন্তু সর্বদা রক্তসঞ্চালন করাই যার কাজ সেই হৃৎপিণ্ডের ওপর কাটা-ছেঁড়া করা সহজ নয়। তাই নিয়ে অনেক গবেষণার ফলেই আবিষ্কার হয়েছে হার্ট-লাঙ মেশিন। হৃদযন্ত্রের ওপর অপারেশানের সময় এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল ও শোধন কার্য সম্পন্ন হয়। শল্য-চিকিৎসকেরা সাধারণ এ্যাপেনডিক্স কাটার মত শুকনো রক্তবিহীন হার্টের ওপর অপারেশন করেন। যদি কখনও এই অপারেশান থিয়েটারের ভেতর উঁকি মারেন তবে সেটাকে কারিগরের ওয়ার্কসপ বলে ভুল হবে; কত রকম যন্ত্রপাতি আর তাতে ঘরটা ভর্তি। এ সবই সম্ভব হয়েছে মেডিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মত বিশেষ ধরণের কারিগরী বিদ্যার দৌলতে।

কত দুর্ভাগা লোহার বা কাঠের তৈরি কৃত্রিম অংগের সাহায্যে আবার নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে এবং নিজের জীবিকা উপার্জন করে চলেছে। সময়ে সময়ে এগুলো শরীরের সংগে এমন নিখুঁত হয়ে মিশে যায় যে, সত্যি-মিথ্যে তফাৎ করা শক্ত হয়ে পড়ে। আমার হাসপাতালে একজন বয়স্ক টেলিফোন-অপারেটার ছিল। তার সাথে প্রায়ই দেখা হোত এবং তাকে গাড়ি চালাতেও দেখেছি। তার হাতে-পায়ে দোষ আছে বলে কোনদিনও মনে হয় নি। ভেবে দেখুন আমি কতখানি অবাক হয়েছিলাম যখন একদিন সে আমাকে বললো যে সে জুতোর দোকানে যাবে, কারণ তার ডান পায়ের জুতোটা বেশি ক্ষয়ে গেছে। পরে জেনেছিলাম গত মহাযুদ্ধে সে একটি পা হারিয়েছে কিন্তু কৃত্রিম অংগের দৌলতে তার উপার্জনক্ষমতার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এখানে হার্টফোর্ডশায়ার ও সমুদ্র উপকূলে দু'খানি বাড়ি করেছে এবং সে একটি চমৎকার গাড়িরও মালিক।

কিন্তু এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবিষ্কারের উৎসটা কোথায়? যখন মানুষের জীবনে সমষ্টিগত দুর্ঘটনা ঘটে, সেই দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহজ সহানুভূতিতেই মানুষ এই সমস্ত সমাজ কল্যাণমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবিষ্কারে মন সঁপে দেয় এবং অনেক দুর্ভাগার জীবনেই আশা-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনে।

সম্প্রতি 'থ্যালিডিওমাইড শিশুদের' জন্য নতুন গবেষণার পথ খুলে দিয়েছে। 'থ্যালিডিওমাইড' হচ্ছে একটি বিশেষ ধরণের ঘুমের ওষুধ। ১৯৬১ সালের শেষাশেষি অবধি এর যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে। গর্ভবতী মেয়েদেরও এ ওষুধ প্রচুর দেওয়া হয়েছিল এর অন্য বিশেষ গুণের জন্য। 'থ্যালিডিওমাইড' শেষ পর্যন্ত এক বিপর্যয় সৃষ্টি করল। নানা চেহারায় অংগ-প্রত্যংগহীন শিশু জন্মাতে সুরু ক'রল যাদের মায়েরা গর্ভাবস্থায় এই ওষুধ খেয়েছিলেন। সুন্দর ফুটফুটে শিশু, অথচ একটি কাঁধের পরে আর কিছু নেই, হাত, হাতের পাতা কিছু না। হয় তো একটি সুগঠিত আঙুল সেই কাঁধের সাংগে লেগে আছে। অনেক শিশুর আবার পা নেই। নিম্নাঙ্গে hip joint থেকে হয় তো শুধু পায়ের ক'টি আঙুল লেগে আছে। এই ধরণের শিশুদের প্রতি জনসাধারণের বিশেষজ্ঞদের সমবেদনার আর সীমা রইল না। নানাভাবে এই

বাচ্চাদের কর্মক্ষম করার চেষ্টা চলতে লাগল। কৃত্রিম অংগ-প্রত্যংগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক নব উদ্যম দেখা দিল।

এই সব বিকলাংগ শিশুদের কাঠ বা অনুরূপ জিনিষের হাত বা পা লাগাবার যথেষ্ট অসুবিধা। প্রাপ্তবয়স্কদের যখন এ ধরণের জিনিষ লাগানো হয় তখন সেটাকে ধরে রাখবার জন্যে হাঁটু বা হাতের ছোট একটি অংশ বা stump বেড়িয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে কৃত্রিম অংশটিকে লাগানো সহজ। কিন্তু এই শিশুদের ক্ষেত্রে যেখানে আটকে রাখার মত কোন অংশ নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা যারা কখনও হাত-পা চালায় নি, তার পক্ষে নিজের শক্তি দিয়ে ঐ কৃত্রিম অংগ চালানোও সম্ভব নয়। সুতরাং হাত-পা তৈরির সাথে সেটা চালাবার শক্তির কথাও চিন্তা করতে হ'ল। প্রথম পর্যায়ে এক ধরণের internal motor যা গ্যাসে চলে তাই দিয়ে পরীক্ষা সুরু হ'ল। কৃত্রিম অংগের সাথে এই ধরণের 'মোটর' যার মধ্যে কারবন-ডাই-অক্সাইড ভরা সিলিণ্ডার আছে তাই বাচ্চার পিঠে বেঁধে দেওয়া গেল। সিলিণ্ডারের একটিতে যদি প্রেসার বেড়ে যায় তবে অন্যটিতে কমে যাবে এবং সেই অনুযায়ী হাত ওঠা নামা করবে। লণ্ডনের ওয়েস্ট হেনডন হাসপাতালে এই ধরণের কাজ হওয়াতে এর নাম হয়েছে 'Hendon Motor'। এতে তো হাত চললো। আবার হাতের পাতা চালাবার জন্যে হাতের গোড়ায় একটি ছোট মোটর জুড়ে দেওয়া গেল যাতে করে ওই জায়গায় নাইলন ও রবারের তৈরি কৃত্রিম মাংসপেশী চলবে এবং হাতের সঞ্চালন প্রায় স্বাভাবিক হাতের মতই হবে। এই ধরণের চলাফেরা সুরু করতে অবশ্য বাচ্চার কাঁধের জোড়ের সাথে যে অংশটুকু থাকে তাতেই কাজ হয়।

তাহলে আমরা দেখলাম যে 'হেনডন মোটর'—চালাতে শিশুর হাত বা পায়ের ছোট্ট অংশ বা Stump থাকা দরকার যা থেকে চলাচল সুরু হতে পারবে। কিন্তু এমন যদি হয় যে সে অংশটুকুও নেই বা থাকলেও একেবারে অসার? অর্থাৎ কোনরকম সঞ্চালনই যেখানে সুরু করা চলছে না সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে একালের নবতম অবদান ইলেকট্রনিক্স। এর প্রয়োগ খুবই জটিল। তবে মোটামুটি এই বলা চলে যে, আমরা যখন কোন পেশী চালাই তখন তার সীমায় এক ধরণের প্রক্রিয়া ঘটে যার সঙ্গে বিদ্যুতের action-potential-এর তুলনা করা চলে। মাংসপেশী অসার হয়ে গেলেও এ ধরণের একটা ক্ষমতা তার থাকে। বর্তমানে এই শক্তির ব্যবহার করে এদেশে কৃত্রিম অংগ চালাবার গবেষণা করা হচ্ছে।

যাঁদের অংগ অচল হয়েছে, বিজ্ঞানের নব ব্যবস্থায় তাঁরাও নানা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন। এক ধরণের typewriter-এর সৃষ্টি হয়েছে যা চালাতে হাত বা পায়ের প্রয়োজন হয় না। এক বিশেষ ধরণের রবার টিউবের মধ্যে দিয়ে ফুঁ দিলে এবং হাওয়া চুষে নিলে, তার থেকে একরকম electro-mechanical শক্তির সৃষ্টি হয় যা দিয়ে হাতের মতই type-writing চলে।

এক ধরণের হার্টের অসুখ আছে যাতে হৃৎস্পন্দন এলোমেলো হয়ে যায়। Electrical Pacemaper বলে এক ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে যা দিয়ে হার্টের ছন্দোপতন স্বাভাবিক করা যায়। এর প্রয়োগ, অনেকদিন ধরেই চলেছে। বুকের ওপর বাইরে থেকে লাগিয়ে এক ধরণের বিশেষ 'শক' দিয়ে এই যন্ত্রের কাজ চালানো হচ্ছিল। এটা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ ও রুগীকে শয্যাশায়ী থাকতে হত। বর্তমানে transistor-এর যুগে এমন একটি ছোট্ট Pacemaper বেরিয়েছে যা বুকের চামড়া ভেদ করে হৃদ্‌যন্ত্রের গায়ে সেলাই করে দেওয়া হয় এবং ব্যাটারীর দৌলতে বছরের পর বছর নিশ্চিন্তে টিকটিক করে চলে হৃৎস্পন্দনকে ঠিক তালে রেখে।

কানে শোনা ও কথা বলার ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর দান অভিনব। মূক ও বধিরের জীবনে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। নানা কারণে যাঁদের vocal cord (স্বরক্ষেপণের পর্দা) অপারেশান করে বাদ দিতে হয়েছে, তাঁরা চিরদিনের মত মূক হয়ে থাকেন। এখন এই যন্ত্রের সাহায্যে হাওয়া গেলা ও বার করার রকমফেরে তাঁরা কথা বলার ক্ষমতা খুঁজে পেয়েছেন। অপারেশান করে যাঁদের larynx বা স্বরনালী বাদ দিতে হয়েছে তাদের মুখে এক ধরণের buzzer (গলার মধ্যে বায়ুচাপ পরিবর্তনের সাথে সাথে যার মধ্যে দিয়ে আওয়াজ হয়) বসিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে দিয়ে কথা বলার ধরণে মুখ ও ঠোঁট নাড়লেই কথা বেরিয়ে আসবে। এ ধরণের ভাষা শুনতে একটু একঘেয়ে আর অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মূক যে, ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে পারছে এটুকুই কি আশাতীত নয়?

আবার এক ধরণের computer যন্ত্র বেরিয়েছে যা ব্যাকটিরিওলজিস্টদের বিশেষভাবে সাহায্য করছে। কোন রোগীর থুথু, মল বা মূত্র পরীক্ষা করে তিনি হয় তো মোটামুটি একটি জীবাণুগোষ্ঠীর সন্ধান পেলেন। এবারে তিনি যদি সেই পরীক্ষাগুলির ফলাফল ঐ computer যন্ত্রে জুড়ে দেন তবে সেটা নিমেষেই একটা সমাধান বার করে দেবে যাতে জানা যাবে এই ধরণের পরীক্ষাগুলো কোন কোন জীবাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঠিকঠিক জীবাণুটি চিনে নিতে অসুবিধা হবে না।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে কা'রা মেডিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মত বিশেষ ধরণের কারিগরী বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন? সচরাচর যা দেখা যায় তা হ'ল, একশ্রেণীর ডাক্তার যাঁদের ইঞ্জিনীয়ারিং-এ উৎসাহ আছে আর একশ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার যাঁদের সমান উৎসাহ ডাক্তারীতে। এঁরা সকলেই উৎসাহী ও নতুন কিছু করার জন্যে সদাই ব্যাকুল। কিন্তু বাধাও তো কম নেই। প্রথমত যে সমস্ত ইঞ্জিনীয়ার চিকিৎসকদের আওতায় কাজ করেন তাঁরা পারিশ্রমিক ভালো পান না। তাছাড়া পুরাতনপন্থী তথাকথিত বিজ্ঞ যাঁরা, দূরদর্শিতা যাঁদের প্রধান গুণ নয়, সেই সব কর্তাব্যক্তিদের বিধিনিষেধের 'অচলায়তন' ভেদ করাও বড় সামান্য কাজ নয়।

তবু একথা নিশ্চিত যে শুভ প্রয়াসে মানুষের জয় হবেই। এই ধরণের সমাজকল্যাণকামী কর্মীরা সকলে মিলে নানা ধরণের সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন, যা তাঁদের ও তাঁদের গবেষণার স্বার্থরক্ষা করতে পারে। দেশের ও দশের সেবায় বহু যন্ত্রবিজ্ঞানী আজ চিকিৎসকদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। একদিন এই সব আবিষ্কারের সুফল আমাদের দেশে গিয়েও পৌঁছবে। নিয়তির বিধানে বিড়ম্বিত মুমূর্ষু মানুষের মনে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের আলো দেখা দেবে সে বিষয়ে আজ আর সংশয় নেই।

—লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।

হাতীর আচরণ

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ)

নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে বিচক্ষণ লোকেরা দৃষ্ট বিষয়ে কতকগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া যান। পরবর্তী লোকেরা ইহার ফলে বিশেষ উপকৃত হন। মানুষের প্রয়োজনে আসে এসব প্রাণী ও পদার্থ সম্বন্ধে নানাভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ নির্ধারিত নিয়ম মানিয়া অধিকাংশেই জীবনগতি পরিচালিত করেন। এইসব সত্ত্বেও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

গরু, ঘোড়ার মত হস্তী মানুষের এত পরিচিত জন্তু নয়। হস্তীর প্রকাণ্ড আকৃতি এবং তদনুযায়ী বল, সহজেই ইহাদের দিকে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নানা ক্ষেত্রে, ভারতবাসী বিশেষত রাজন্যবর্গ, হস্তীকে নানা কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ফলে, প্রাচীন ভারতের অনেক পুস্তকে হস্তীর সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পালকাপ্য মুনির হস্ত্যায়ুর্বেদ এই শ্রেণীর একটি মহামূল্যবান পুস্তক। Tanjore Library হইতে সংগৃহীত ইহার চিত্রিত সংস্করণের নকল মহারাজা শশিকান্ত আচার্য বাহাদুর আমাকে দেখাইয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে উল্লিখিত পুস্তকের সহজ অনুবাদ করিয়া অন্তত একখণ্ড বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্য তিনি শেষ করিয়াছিলেন কি না জানি না। বহুকাল পূর্বে ১৯০৮ ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মদীয় পিতৃদেব ৺কুমুদচন্দ্র সিংহ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'প্রাচীন ভারতে পশু-চিকিৎসা' এবং 'হস্তী প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে এই পুস্তক সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেই হস্তীকে মানুষের কার্যে বহুকাল হইতে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়।

মোটর গাড়ির বহুল প্রচলন হইবার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে ইহাদের প্রয়োগ হইত। কাজেই, বর্তমানের পশ্চিমী বিশেষজ্ঞগণ আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে ইহাদের সম্বন্ধে বহু উপযোগী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সরকারী কার্যে হস্তীর অপব্যবহার নিবারণ ও সুনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য Mr. Milroy-এর ছোট বইটি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। নানা দিক দিয়া বিবেচনা করিলে Dr. Evans-এর বইখানা বর্তমানের হস্তী সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে।

মুক্তাগাছার জমিদার ৺কেশবচন্দ্র আচার্য মহাশয় বাংলায় বহুকাল পূর্বে দেশীয় পদ্ধতিতে হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি বিশেষ মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করিয়া হস্তী পালকদের উপকার করিয়াছেন। এখনও এই সম্বন্ধে ধারাবাহিক গবেষণা করা উচিত। গৌরীপুরের স্বর্গীয় জমিদার মহাশয়ের প্রকাশিত বাংলা পুস্তিকাও উল্লেখযোগ্য।

এই সব সত্ত্বেও হস্তী সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজেও সাধারণ জ্ঞানের একান্ত অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শিশু পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে হস্তী-শাবক শুঁড় দিয়া মাতৃস্তন্য পান করে। একটা পুস্তকে ছবি দেখিয়াছি হস্তিনীর স্তন গরু-মহিষের মত পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত! ভারতীয়ের এরূপ অজ্ঞতায় আমাদের বর্তমানের জাতিগত তমোগুণের প্রভাবই প্রকট হয়। দুঃখের বিষয় হস্তী সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য তাঁহারাও হস্তীর প্রয়োজনীয় অনেক খবর রাখেন না। বহু হস্তী নানাভাবে দেখার সুযোগ এবং প্রবৃত্তি না থাকার ফলেই এরূপ হয় ইহাই আমার বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটা হস্তীর স্বভাবের সহিত পরিচিত হইয়া এবং এই সম্বন্ধে প্রচারিত সাহিত্যের অনুধাবন করিয়া কখনও কখনও যখন বিশেষজ্ঞের মর্যাদার দাবী করেন, তখন তাহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। যাঁহারা সুলিখিত পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের উপর প্রধানত লক্ষ্য রাখিয়া মতামত প্রকাশ করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সত্যকার নির্ভরযোগ্য আধুনিক ভারতীয় হস্তী বিশারদদের বই যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর অথবা তাহারও পূর্বে লেখা হইয়াছে। অবশ্য Mr. Champion-এর মত লেখকের স্থান পৃথক। হস্তী সম্বন্ধে তাঁহার লেখা খুবই সীমিত। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের পূর্বে লিখিত অন্তত বন্যহস্তীর স্বভাবাদি, বর্তমানের বন্যহস্তীর আচরণের সহিত অনেকাংশে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য। পূর্বে লোকলোচনের বাহিরে বহু মহারণ্যই হস্তীর স্বচ্ছন্দ বিচরণের ক্ষেত্র ছিল আর বর্তমানে লোকের সংস্রবহীন এবং মোটরগাড়ির পক্ষে অগম্য কোনও অরণ্য আছে কি না ইহা আমার জানা নাই। এই পরিস্থিতিতে পূর্বের ভারতীয় বন্যজন্তুর সহিত বর্তমান ভারতের আরণ্য জীবের স্বভাবের বহু পার্থক্য হইতে দেখা স্বাভাবিক। আজকাল কোলাহলপূর্ণ সহরে মানুষের নানা প্রকার স্নায়বিক রোগের বৃদ্ধি দেখা যায়। দূর দূরান্তর বনেও আজকাল জন্তুরা নানা অপরিচিত শব্দ ও অন্যান্য উত্তেজনায় অতিরিক্ত উত্যক্ত হয়। বন্য পশুর মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়ার বিশেষ পর্যবেক্ষণ ফল ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। এই বিষয়ে গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

'ফুলমালা' পর্বের পর, হস্তীর আচরণ সম্বন্ধে লেখার জন্য অনেক পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তি বারম্বার বলায় এই বিষয়ে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

আশৈশব নানাভাবে বহু হস্তী দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি বিশেষ শিক্ষার ভিত্তি না থাকায় ইহাদের স্বভাব পর্যবেক্ষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। এতৎ সত্ত্বেও বাংলায় আমার এই প্রবন্ধ লিখিতে দুঃসাহসের কারণ, বাংলায় জন্তু-জানোয়ারের প্রবন্ধ এখনও প্রায় কল্পনার মোহে ও ভাষায় পারিপাট্য প্রকাশের প্রয়োজনে লেখা হয়। ইহাতে সহায়ক তথ্যের আভাস কমই থাকে। আমার অজ্ঞতাপ্রসূত দুষ্ট স্মৃতির সাহায্যে এই বৃদ্ধ বয়সের লেখার ত্রুটি কেহ মার্জনা করিবেন কি না জানি না। যে কয়েকটি প্রশ্ন আমাকে করা হইয়াছে, তাহার কতক উত্তর দিতেছি।

(১) হস্তীর ভিতর সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় কি না?

আমার দেখা এবং বিশেষ নির্ভরযোগ্য গারো আদিবাসী বন্ধুর নিকট শোনা স্মৃতি হইতে লিখিতেছি। বন্য অবস্থায় দলবদ্ধ হস্তীর মধ্যে যখ[ন] কোনও হস্তিনী প্রসব করে তখন আহার পর্যাপ্ত থাকিলে সমস্ত দল অথবা আহার্যের অভাব হইয়া আসিলে দলের দায়িত্বশীল একাংশ, বাচ্চা সম্পূর্ণ সচল না হও[য়া] পর্যন্ত সেই বনেই বিপদের মুখেও অপেক্ষা করে। সাধারণত আট-দশ দিনেই বাচ্চা মায়ের সংগে মোটামু[টি] চলাফেরা করিতে পারে। 'খেদার' সময় হাতীর দ[ল] ঘেরাও করার পক্ষে 'পাঞ্জালী'র (tracker) এই সংবাদে[ও] বিশেষ সহায়ক মনে করা হয়।

কোনও প্রবীণ দন্তী (সেই হস্তীকে আমি জংগ[লে] দুই-একবার দেখিয়াছি) একবার এই অবস্থায় আস[ন্ন] বিপদ বুঝিতে পারিয়া গারো পাহাড়ে দারেক নাম[ক] স্থান হইতে নিজের দাঁতের উপর সদ্যঃপ্রসূত শাবককে স[যত্নে] উঠাইয়া, শুঁড় দিয়া ধরিয়া বহুদূরে নিরাপদ অঞ্চ[লে] লইয়া গিয়াছে। পলায়নরত অবস্থায় দিনের বেল[া] রংরেং পালের বহু গারো নর-নারী এই দৃশ্য দেখিয়াছে[ন]। ঘটনার কয়েকদিন পর আমি সেখানে গেলে মধ্যমা এ[ই] অঞ্চলে উৎসাহভরে ঘটনার বিবরণ সবিস্তারে বলি[য়া] হস্তীর পলায়ন চিহ্ন আমাকে দেখাইয়াছেন।

আমার পিতামহ 'খেদায়' একদল হস্তী ধরে[ন]। দুঃখের বিষয় শাবক ধরা হইয়া গেলে দেখা গেল, কোনও কারণেই হৌক, তাহার মাতা ধরা পড়ে না[ই]। ধৃত হস্তী সব নদীর ধারে গাছে বাঁধা হইল। ত[খন] মা আসিয়া বাচ্চাটাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য ক্রমা[গত]

চেষ্টা চালাইয়া ছিল। এই অবস্থায় 'দাইদার' (Head nooser), হস্তিনীকে 'পরতালা' প্রথায় ধরার চেষ্টা করিল। এই প্রথায় 'কিল্লা'র (Stockade-এর) বাহিরে মদমত্ত হস্তীকেই ধরা হইত। হস্তিনী ধরা হইয়াছে এমন ঘটনা কাহারও জানা ছিল না। বাচ্চার মায়ায় যখন হস্তিনী তাহার কাছে দাঁড়াইয়াছে, তখন অন্য হস্তিনী ভিড়াইয়া অনায়াসে 'দাইদার পরতালা' প্রথায় তাহাকে বন্দিনী করিল। এই হস্তিনীই সুসঙ্গের বিখ্যাত আচানকমালা ইহার সাহস, বুদ্ধিমত্তা, শক্তি, সৌন্দর্য এবং শান্ত সুন্দর স্বভাবের খ্যাতি সেই অঞ্চলে পরবর্তীকালে প্রবাদে দাঁড়াইয়াছিল। এর নাতিনী যদিও উচ্চতায় মাত্র ৭´ পর্যন্ত ছিল, কিন্তু তাও অন্য বিষয়ে তাহার পিতামহীর সুযশ বহাল রাখিয়াছিল।

খেদার হস্তী যখন সর্দারের নেতৃত্বে 'গুলানে অওলারা' (beater) 'কোটের' (stockade) এর দিকে তাড়াইয়া আনিবার চেষ্টা করে তখন হঠাৎ তাহারা বাচ্চা সহিত হস্তিনীর আক্রমণকে সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ মনে করে। এই অবস্থায় বাচ্চার মায়ায় বহুবার হস্তিনী গুলানে অওলাকে মারিয়া ফেলিয়াছে ইহা জানি। এমনও হইয়াছে গুলানে অওলা দৌড়াইয়া মোটা গাছে আশ্রয় নিয়াছে, হস্তিনী তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে না পারায় দলীয় হস্তীকে শব্দনাদে সংকেত দিতেই অনেক হস্তী একত্রে সেই গাছে ধাক্কা দিতে দিতে মানুষ গাছ হইতে ছিট্কাইয়া পড়িতেই তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। মদমত্ত হস্তী অথবা গুলীর আঘাতপ্রাপ্ত হস্তী ছাড়া অন্য কোনও হস্তীকে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে সাধারণত দেখা যায় না।

সদ্যঃপ্রসূত হস্তিনীর গর্ভফুল খাইবার লোভে এবং সুযোগ সুবিধায় সদ্যোজাত শিশুকে খাওয়ার লোভে অনেক সময় দলবদ্ধ রয়েল টাইগার হস্তিযূথের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঘের মুখ হইতে বাচ্চাকে রক্ষা করার সদাজাগ্রত চেষ্টা কেবল হস্তী-মাতাই করে না, বাচ্চার প্রতি মায়াবদ্ধ অন্যান্য হস্তিনীকেও ইহা করিতে দেখিয়াছি। ইহা যেমন বন্যহস্তীর মধ্যে দেখা যায় তেমন পোষা হস্তীর বেলায়ও খাটে।

একটি পোষা হস্তিনীকে অন্যান্য হস্তিনীর বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত যেভাবে তাহার প্রতি আসক্ত থাকিতে দেখিয়াছি, তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বাচ্চার সঙ্গে মাকে দূরে নিলে সে যে ভাবে মাটিতে গড়াগড়ি খাইয়া কাঁদিতে থাকিত তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিত। 'জার্নাপিয়ারী'র স্বভাব অতি মৃদু এবং উদার, তৎসত্ত্বেও বাচ্চাকে বিরক্ত করিলে মাহুতকেও শুঁড় তুলিয়া ভয় দেখাইত।

(২) হস্তীর গোষ্ঠী প্রীতি।

এই বিষয়ে বহু কথা মনে পড়িতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় বড় বড় দলের হস্তী যখন শীতকালে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া নানা বনে ঘুরিয়া আহার সংগ্রহ করে, তখন প্রিয় গোষ্ঠী লইয়া দল ভাগ করে। সাধারণত বয়স্কা ভগিনী আর তাঁদের সন্তান-সন্ততি লইয়া একটা দল ভাগ করিয়া লয়। সেই দলে বাহিরের কেহ আসিয়া জুটিলে তাহার স্থান সহজে হয় না।

পোষা হস্তীকে যখন স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুবিধা দিবার জন্য গভীর বনে ছাড়িয়া দেয়, তখন দলের সব হস্তীর প্রিয়টিকে অথবা অনেক হইলে, বিশেষভাবে নির্বাচন করিয়া সেই হস্তীকে 'বাণ্ডা' দিয়া (অর্থাৎ সম্মুখের পা দুইটি একত্রে বাঁধিয়া) ছাড়িয়া দিত। ফলে এই সব হস্তী বেশিদূর যাইতে পারিত না। সুতরাং অন্য হস্তীগুলি ধরিবার কার্য সহজ হইত। দলের সব হস্তী নিকটেই পাওয়া যাইত।

দুইটি মাসতুতো ভগিনী পরস্পরের প্রতি খুবই আসক্ত ছিল। একটিকে বনে ছাড়িয়া দিয়া অপরটিকে পিল্খানায় বাঁধিয়া রাখিলে মুক্ত ভগিনী জঙ্গল হইতে চলিয়া আসিয়া বদ্ধ বোনের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিত, ঘটনাধীনে এক বোনকে যদি দূরে কাজে পাঠান হইত সেই রাত্রিতে অপরটি আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিত। পিল্খানায় দুইটির পাশাপাশি আস্তানা না হইলে তাণ্ডব বাঁধাইত।

দলের হস্তীর প্রতি অনুরাগ ও তাহার বাহিরের প্রতি উৎকট বিরাগের এক কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য বাহাদুরের খেদায় ধরা একদল হস্তী ছিল। দলপতি দন্তী প্রায়ই দলীয় হস্তিনীদিগকে সন্তান উপহার দিত এবং তাহাদের প্রতি অনুরাগ অবিচলিত ছিল। কিন্তু দল বহির্ভূত কোনও হস্তিনীকে সহ্য করিতে পারিত না। মত্ত অবস্থায়ও তাহার মেজাজ এত ভাল থাকিত যে, তখন তাহার দাঁতে এবং শুঁড়ে আমি হাত দিতে কোনও দ্বিধা করি নাই। এক বিকাল বেলায় পিল্খানার দারোগাবাবু, এই হস্তী আমাকে দেখাইলে তার আকৃতি, আচরণ এবং সাহস ইত্যাদির অনেক প্রশংসাই করিলাম। কিন্তু পরদিন ভোরে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া শুনি দূরে হস্তীর আর্তনাদ, আর দেখি প্রকাণ্ডকায় দন্তী তাহার শুঁড় আকাশে উঠাইতেছে, আর দাঁত ও কপালে রক্তধারা বহিতেছে। দল বহির্ভূত তিনটি হস্তিনীকে বধ করিয়া সে গৌরবে শুঁড় ঘুরাইতেছে। মাহুত কিন্তু মদস্রাবী এই হস্তীকে অনায়াসে নিহত হস্তিনীদের নিকট হইতে সরাইয়া আনিল।

শিকারে হস্তীর শ্রেণী গঠন করিতে প্রায় সময়ই

কোনও হস্তীকে কোনও একটার নিকটে অথবা কোনওটার দূরে রাখিতে হইত। প্রথম ক্ষেত্রে একের সাহসে অপরটি সাহস পাইত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনবধানতাবশত দুইটি খুব কাছাকাছি হইলে মাহুত ঘাড়ে থাকা সত্ত্বেও একে অন্যকে আক্রমণ করিত।

(৩) হস্তী নির্দয় ব্যবহারের প্রতিশোধ লয় কি না?

একটি খেদায়ধরা হস্তীকে শিক্ষা দিবার সময় মাহুত দারোগাবাবুর উপর রাগ করিয়া হস্তীটাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে। ফলে এই মাহুত হস্তীটাকে শিক্ষা দিতে গেলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং তাহার নিকট হইতে কোনও শিক্ষাই লইত না। মাহুতকে পরিবর্তন করার ফলে স্বভাব অনেকটা সংশোধিত হয়।

একবার আমাদের গ্রামের পার্শ্বের সোমেশ্বরী নদীর পশ্চিমতীরে মহারাজা শশিকান্ত আচার্য বাহাদুরের হস্তীর অস্থায়ী পিল্‌খানা করা হয়। সংবাদ পাইলাম এক প্রকাণ্ড দন্তী তাহার মেট মাহুতকে বিলে 'লাদ' আনিতে গিয়া 'খুন' করিয়া সেই মৃতদেহ লইয়া রীতিমত খেলা করিতেছে। গ্রামবাসীরা আতঙ্কে অস্থির হইয়াছে এবং পিল্‌খানার কোনও মাহুত হস্তী নিয়াও তাহার নিকট যাইতে সাহস পাইতেছে না। অথচ মহারাজার পিল্‌খানায় একাধিক বদমেজাজী দন্তী থাকিত এবং তাহাদের বশে আনিবার সব ব্যবস্থাই থাকিত। পরদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে হস্তীটা অবিলম্বে গুলি করিয়া মারিতে অনুরোধ করিয়া তার পাঠাইলেন। আমি মহারাজা বাহাদুরকে এই কথা জানাইয়া দিই এবং দারোগাবাবুকে জানাইয়া দিই তিনি যেন হস্তীটাকে অবিলম্বে বাঁধাইবার ব্যবস্থা করেন। আমি দূর হইতে সেই দিন হস্তীটাকে দেখিতে গেলাম। হস্তীটা তখনও শবদেহটাকে একবার শুঁড় দিয়া তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে আর পরমুহূর্তে আক্রোশে তাহাকে দাঁত দিয়া আক্রমণ করিতেছে। দূর হইতে আমার হস্তীর গন্ধ পাইয়া আরও উত্তেজনাভরে এই খেলা চালাইল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর না দেখিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং পথে দারোগাকে বলিলাম, হস্তী অবিলম্বে আয়ত্তে না আনিলে রাত্রি কিম্বা প্রত্যূষে হস্তীর মৃত্যু নিশ্চিত। বহু চেষ্টাতেও হস্তীর নিকটেই কেহ যাইতে সাহস পাইল না। পাঁচ-ছয়টা প্রকাণ্ড হস্তিনীকে লইয়াও নিকটে যাইবার সাহস পাইল না। কিন্তু গভীর রাত্রিতে হস্তী আপনা হইতে আসিয়া নিজের স্থানে দাঁড়াইলে মাহুত নিকটে যাইয়া অনায়াসে তাহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া দিল। ইতিমধ্যে মানুষটার পচন ধরায় হস্তী শবদেহ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। হস্তী যখন বুঝিয়াছে মানুষটা নিশ্চিত মরিয়াছে, তখনই তাহার আক্রোশ মিটিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিয়াছি হস্তীটাকে লাদ আনিতে নিবার পূর্বে সামান্য কারণে লোকটি অনাবশ্যক প্রহার করিয়া হস্তীর মেজাজ নষ্ট করিয়াছিল।

নির্দয় আচরণের প্রতিশোধ লইবার ঘটনা আরও জানা আছে। বাহুল্যের ভয়ে তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম।

(৪) হস্তীর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির পরিচয়

বহুকাল পরও হস্তী অনায়াসে তার পুরাতন বাসস্থান চিনিয়া লইতে পারে। বহু দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ে 'বাণ্ডাভরিয়া' ছাড়িয়া দিলেও আতরভরী পাঁচ-সাত দিনের পথ অতিক্রম করিয়াও অনায়াসে তার অভ্যস্ত বাউসামের হাওরে চলিয়া আসিত। আসাম মিরি গ্রাম হইতে কমলপ্রসাদকে কিনিয়া আনিবার বহুদিন পরও কোনও কারণে পলায়নপর হইলে, যে পথ ধরিয়া তাহাকে আমাদের কাছে আনা হইয়াছিল সেই পথ ধরিয়া তাহার খোঁজ করিলেই ঐ পথেই কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইত। আতরভরীর মা আচানকমালাকে মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর কিনিয়া নিবার বহুদিন পর শ্যামগঞ্জ বাজারে অন্যান্য হস্তীর সঙ্গে বিশ্রাম করিতেছিল। বাবা তখন সেই বাজার হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে ডাকবাংলোয় বিশ্রাম করিতেছিলেন। নিকটে আতরভরীর উপর গাদি চড়াইয়া মাহুত এক আমগাছের নীচে অপেক্ষা করিতেছিল। বাবা সেই হস্তীতে চড়িয়া বাড়ি ফিরিবেন। হঠাৎ আতরভরী শব্দনাদ করিয়া উঠিবার কিছু পরেই দেখা গেল বাজারের দিক হইতে একটা প্রকাণ্ড হস্তিনী মাহুতের নির্দয় প্রহার উপেক্ষা করিয়াও আতরভরীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—আসিয়া আতরভরীর সংগে মিলিত হইয়া তাহাকে শুঁড় বুলাইয়া অজস্র আদর করিতেছে আর আতরভরীও অস্ফুটনাদে মায়ের আদর কুড়াইতেছে। এই অবস্থাতেও মাহুত যখন গজবাগের খোঁচায় হস্তীর মাথা ও কান রক্তারক্তি করিতেছে দেখিয়া বাবা একদা অতিপ্রিয় হস্তীর এই করুণ অসহায় অবস্থা দেখিয়া মাহুতকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া এই নিষ্ঠুর আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। মা'ও সন্তানের মিলন ত' প্রাণস্পর্শী হইলই, আচানকমালা যখ[ন] বাবার শরীরে বার বার শুঁড় বুলাইয়া দিতে দিতে অজস্র ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিল তখন উপস্থিত প্রত্যেকেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হন। ঘটনাটা নাটকীয় শোনা গেলেও অতি বাস্তব।

আচানকমালার বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদে[র] অঞ্চলে স্থানীয় প্রবাদে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তার মধ্যে বহুশ্রুত একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট মনে করি। তখ[ন] আমার পিতামহ জীবিত। অন্যান্য হস্তীর সংগে আচান[ক]মালাকেও বাউসামের হাওরে শীতকালে স্বচ্ছন্দ আহারের জন্য ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে। একদিন এক গোয়া[লা]

দুই ধামা কলা আনিয়া পিতামহদেবের সম্মুখে রাখিয়া জানাইল যে, সে আচানকমালা হস্তিনীকে খাওয়াইবার জন্য কলাগুলি আনিয়াছে। হঠাৎ এই হস্তিনীকে কলা খাওয়ানোর ইচ্ছা কেন হইল জিজ্ঞাসা করায় সে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করিল। উল্লেখ করা দরকার, বাউসাম হাওরে কাঁচর (cross between half-wild female and wild bull buffaloes) মহিষের বাথান থাকায় মৈমনসিংহ জেলায় ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। কাঁচর মহিষ অনেক সময় বন্য মহিষের চেয়ে হিংস্র প্রকৃতির হইত। অভ্যস্ত লোক ভিন্ন কাঁচর মহিষের বিচরণ ভূমির নিকট দিয়া কেহ চলাফেরা করিতে সাহস পাইত না।

একদিন এই ব্যক্তি বাথান হইতে দুধ নিয়া অন্যত্র যাইবার পথে হঠাৎ এক কাঁচর মহিষকে দূর হইতে আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া দুধের ভাণ্ড ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে। মহিষও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এই অবস্থায় প্রকাণ্ড এক হস্তিনীকেও তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া সে একেবারে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই অবস্থায় সে দেখিল হস্তিনী তাহাকে আক্রমণ না করিয়া সোজা আক্রমণশীল মহিষের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মহিষ যতই ঘুরিয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে হস্তিনীও আবার তাহার গতিরোধ করে। হস্তিনীটিকে দেখিয়া যখন আচানকমালা বলিয়া চিনিতে পারিল তখন তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না হস্তিনী বিপদ দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে। তখন ইঙ্গিত করা মাত্র হস্তিনী বসিলে তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বাথানে আশ্রয় নিয়া বাঁচিল। অন্যান্য দুই-একটি হস্তীরও প্রায় মানুষের মত বুদ্ধি দেখানোর কথা জানি। কিন্তু উপরোক্ত কাহিনীর মত বিস্ময়কর ঘটনা কমই শোনা যায়, তাই ইহার উল্লেখ করিলাম।

হস্তিমূর্খ কথা যিনি প্রথম প্রচার করিয়াছেন—তাঁহার বিচক্ষণতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবার কারণ আছে। হস্তীর শারীরিক গঠনের জন্য, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তার কতকগুলি দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াই এই কথার চলন হইয়াছে। কিন্তু গঠনের দুর্বলতার জন্য মানুষকেও অনেক ক্ষেত্রে অপদস্থ হইতে হয়। [ক্রমশ।

জীবনে হয়রানি সত্য

সুধীর বেরা

জীবনে হয়রানি সত্য।
এর চেয়ে সত্য কিছু নাই।
যতদিন বেঁচে থাকা—
জীবনের পাকে পাকে
পাক খেয়ে চলা,
পদে পদে অশেষ হয়রানি।

চাওয়া পাওয়া হারানোর
কলগানে মুখর ধরণী ;
তার চেয়ে অনেক সত্য
না পাওয়ার ব্যথা।
বারে বারে ফিরে ফিরে
ব্যর্থতার বোঝা
আরো ভারী হয়—
এই ভার, এ ভারের দায়

জীবনে এই সত্য, এই বিড়ম্বনা।
জীবনে কোথায় ব্রহ্ম ?
মিথ্যা ব্রহ্ম—সত্য সে হয়রানি।
অনন্ত যে কাল—
সেও ক্ষয়িষ্ণু
অক্ষয় কিন্তু হয়রানি জীবনে।

ট্রেন থামে

শ্রীবংশী মণ্ডল

আমরা ট্রেন থেকে নামব ভিড় ঠেলে বিকাল চারটায়
তারপর চলে যাব ঘুরে ফিরে দূরের মাঠটা পার হয়ে
প্রতিদিনের ক্লান্তিজরা ঘুম ঠেলে মনের সীমায়
বসব চুপ করে অন্ধকারে একখানি সুরের আশ্রয়ে।

আমরা উদ্ভিদ যত মাটি জলে প্রেমের স্যানিটোরিয়ামে
একটা রোগী দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে বন্ধু চলে গেছে কাল
টুকরো আশার জাল বুনে হালকা সহরে গ্রামে গ্রামে
জমে ভিড় ভাঙ্গা মেলা উৎসব ভালবাসার জঞ্জাল।

এতক্ষণ ভিড় ছিলো হাঁক ডাক কুলি ও মেয়েদের যাওয়া আসা
লোকজন চলে গেছে রিক্সায় নরনারী ভিড়েছে সৈকতে
হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি ফেলে আসা হাসি ও তামাসা
বাতাসে ঘামের গন্ধ ইঁদুরেরা ভেসে গেছে স্রোতে।

রোজই তো ভিড় হয়। ছেঁড়া মেঘে চিন্তা আর ঘুমের জগতে
রাত্রি নামে ;—আকাশ রাতের গন্ধে বিশ্রামের হয় আয়োজন
জীর্ণ ঝুলি কাঁধে নিয়ে মানুষেরা চলে পথে পথে
ভরে নেয় অন্ধকার। ভাঙ্গা কাচ ট্রেন থামে বুকের কাঁপন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারজীবন

শ্রীরমা দে

বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সংসারের অনেক কিছুই চোখে পড়ে না। তাই সংসারের কঠিন বেড়াজালের মধ্যে কিছু ভালভাবে লক্ষ্য করতে হলে অন্তর্দৃষ্টি রাখতে হয়। সাদা চোখে দেখে যাকে শুধু সন্ন্যাসী বা উদাসীন বলেই মনে হয়েছে, একটু বিচার করে তাকে দেখলে বুঝা যায়, সাদা চোখে দেখার অবিশ্বাস ঘুচে গেছে। তাকে আর পাঁচজনের মতই সংসারধর্মী বলেই মনে হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকেও বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ইনি একজন কেবলই নিরাসক্ত, সন্ন্যাসী, সংসার-বুদ্ধিহীনও বটেন। যদিও এই সন্ন্যাসী কেবলই শুকনো সন্ন্যাসী নন, রসিক সাধক বা সন্ন্যাসীই। ভবতারিণী মায়ের কাছে তিনিই প্রার্থনা করেছিলেন, 'আমায় রসে-বশে রাখিস মা, আমায় শুকনো সন্নিসী করিস নি।' মায়ের ছেলে মায়ের কাছে অনেক কিছুই চাইতে পারে। তাই হয়ত ঠাকুর মায়ের কাছে অমন ভাবখানা চেয়ে নিয়েছিলেন—যা তাঁর জীবনের আনন্দরস।

কিন্তু, তিনি কি শুধুই সন্ন্যাসী। ওই 'রস-বশ' কথার মধ্যেও তো রয়েছে কোমল হৃদয়ের কথা। এখানেই একটু অন্তর্দৃষ্টি ফেললে বুঝা যাবে তিনি কেবলই কঠিন সাধন ভজন চান নি। সংসারে থেকেই সন্ন্যাসী হতে চেয়েছেন। নিরাসক্ত অবশ্য ঠিকই, কিন্তু সংসারীও বটে। একদিকে কামিনী-কাঞ্চন বেষ্টিত হয়েও নির্লোভ ও নিষ্কাম সিদ্ধপুরুষ, সংসারকে মায়া ভেবেও তাকে সাধনার তপোক্ষেত্রে পরিণত করার জন্যে রেখেছেন গভীর উদ্যম, আবার সংসারও করেন নি ত্যাগ। নিজে সংসারীও হয়েছেন। স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দেন নি। স্ত্রীও ছিলেন কাছে কাছেই সঙ্গিনী হয়ে। সেবিকাও ছিলেন তিনি। শুধু কি তাই? স্ত্রী সারদা দেবী এই নিরাসক্ত স্বামীর ঘরে একই শয্যাপার্শে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছেন পূত-পবিত্রভাবে। ইনিও সস্নেহে গ্রহণ করেছেন, কামজয়ী বিজিত পুরুষ হয়েও তিনি তাঁকে শুনিয়েছেন কত সংসারের কথা। দেখিয়েছেন তিনি নিজে কত বড় সংসারী। তা তো ঠাকুরের কত কথায়, কত ভাবে, আবার কত আচার-আচরণে বেশ প্রমাণ রয়েছে।

নারীত্বের পূর্ণ সম্মান রেখে স্ত্রীকে আদর্শ স্ত্রী গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর সহধর্মিণী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাকে প্রথমেই শিখিয়েছিলেন, 'যখন যেমন, তখন তেমন; যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যাহাকে যেমন, তাহাকে তেমন।' সত্যি কথা বলতে গেলে বলা চলে, এইটেই কি নিত্যকারের পাঁচজনকে নিয়ে গড়া সংসারে সংসার করার মূলমন্ত্র নয়? আর এই মন্ত্রটি শিখেছিলেন বলেই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের লীলাবসানের পর তাঁর জীবনে, নিজ স্বভাবগুণের জন্যেও, নানা পরিবেশে, নানা দুঃখ ঝড় ঠেলে প্রতি কার্যে প্রতি ব্যবহারে হাসিমুখে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন তাই হয়েছেন স্নেহময়ী, করুণাময়ী মা, শিষ্য ও সাধারণের মা।

কিন্তু, ঠাকুরের শুধু উপদেশ দিয়েই সরে যাওয়া ছিল না। যদিও অধ্যাত্মধারা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তবুও তিনি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। স্ত্রীকে তাই উপদেশ দিয়ে উদাসীন হয়ে যান নি। তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদাই দৃষ্টি ছিল সজাগ। তাই, ঠাকুর ব্যথিত হয়েছিলেন বলেই তো বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের মায়ের জন্যে নির্দিষ্ট ছোট নহবৎ খানা যেন খাঁচা! শুধু কি তাই? ভাইঝি লক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীমা সেখানে থাকতেন। ঠাকুর যদিও বলতেন, খাঁচায় শুক-সারী আছে, আবার ছোটঘরের অপরিসর বদ্ধজীবন মায়ের পক্ষে যে কত কষ্টের তা উপলব্ধি করেই তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলতেন, 'বুনো পাখী খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়, মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে মায়ের দুঃখকে অনুভব যিনি করেছেন তিনি বাইরে যত বড় সাধক হন না কেন তিনি যে কেবল কঠিন সন্ন্যাসী নন তা তো ঐ অনুভব শক্তিতে বুঝা যায়। কিন্তু শুধু ঐ বলেই ঠাকুরের কর্তব্য যেন শেষ হতো না। দুপুরবেলা যখন আবার কোনদিন মন্দিরপ্রাঙ্গণ জনশূন্য হত তখন তিনি নিজেই মাকে সঙ্গে করে কালীবাড়ির খিড়কী দরজা দিয়ে পাড়ার প্রতিবেশী গিন্নীদের কাছে পৌঁছে দিতেন মাকে। তাই তিনি সঙ্গীহীনা দেখে কষ্ট নিজেও পেতে চান নি, শ্রীশ্রীমাকেও একাকী থাকার কষ্ট বোধ করতেও দেন নি। এ কি কম রসিক সংসারী?

মায়ের সামান্য অসুখ-বিসুখ হলেও ঠাকুরের আবার চিন্তার যেন শেষ থাকত না। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় সেদিন, যেদিন মায়ের মাথা ধরাতে তিনি শুনেই তাঁর ভাইপো রামলালকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'ওরে রামলাল মাথা আবার ধরল কেন রে? কিছু হবে না তো?' সামান্য ব্যাপারে কত উদ্বিগ্নতা! অথচ এও ঘটেছে, মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে থেকেও কখন কখনও মায়ের সঙ্গে তাঁর দু'-ছমাস দেখাও হত না। ভাবোন্মাদে বিভোর হয়ে যেন সব ভুলে যেতেন। কিন্তু, অন্তরে অন্তরে মায়ের জন্যে কত চিন্তা কত ব্যাকুলতা যে থাকত ভাবোন্মাদের মধ্যে তার প্রকাশও পেয়েছে। তবে সে প্রকাশ যে সব কথায় পাই, তার মাপ করা যায় না। গম্ভীরতা তার একটু বেশি। তাই, যখন তিনি সংসারের কথাবার্তা বা সাংসারিক আচার-ব্যবহার থেকে সরে যেতেন তখন মাঝে মাঝে

যে সব কথা বলেছেন তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ধরলে বুঝা যায়, ভালবাসার বাইরের প্রকাশটুকুই ভালবাসার পূর্ণতা নয়।

তিনি বলেছেন, 'কলসী যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য থাকে ততক্ষণই তার বকবকানি শব্দ ওঠে, যেই পূর্ণ হয় অমনি তার কোন শব্দ হয় না। কারণ পূর্ণতায় মিশে গিয়েছে বলে বাইরের—প্রকাশটুকু আর কাঁদে না।' আবার বলেছেন, 'লুচি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণই ঘিয়ের কলকল শব্দ ওঠে, যেই মাত্র ঘিয়ের সঙ্গে একেবারে মিশতে পাবে অমনি সব শব্দ থেমে যায়।' তাই পঞ্চাশ হাত দূরে থেকেও শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে যে ঠাকুরের ভালবাসা ঠুন্‌কো হয়ে গেছে তা নয়। নিস্তব্ধতার মধ্যে গভীর ভালবাসার অনুভব তিনি করেছেন। নতুন করে আবার তাদের কথাবার্তা আলাপ ফুটে উঠেছে। একে অপরকে নিঃশব্দে যেন উপলব্ধি করেছেন। একে অপরের মাঝে রয়েছেন লীন। তাই, যদি বাইরে ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়, তাতে ক্ষতি কি?

আবার দেখা গেছে, শ্রীশ্রীমায়ের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও ঠাকুরের কত না ভাবনা! একদিন মায়ের ভরণ-পোষণের কথা চিন্তা হওয়াতে মাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ক' টাকা হলে হাত খরচ চলে গো?'

মা বললেন, 'এই পাঁচ-ছ' টাকা হলেই চলে।'

আবার শুধালেন, 'হ্যাঁ গা, বিকেলে ক'খানা রুটি খাও?'

প্রশ্নটি আন্তরিক বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীমা রুটি খাওয়ার কথা শুনে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইলেন। সত্যি তো? খাবারের কথা মেয়েমানুষ হয়ে স্বামীর কাছে কি করে বলেন? কিন্তু ঠাকুর নাছোড়বান্দা। উত্তর তাঁর চাইই!

আস্তে আস্তে মা তখন বললেন, 'এই পাঁচ ছ'খানা খাই।'

অমনি ক্ষেপা পাগল ঠাকুরের একটা নির্ভুল হিসেব কষা হয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন, 'বেশ, বেশ, তাহ'লে পাঁচ-ছ' শ' টাকায় তোমার খুব চলে যাবে। কি বল?'

কি সুন্দর গবেষণা! অঙ্কশাস্ত্রে যেন নিরক্ষরের দ্বারাই একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার ঘটে গেল।

পরে মায়েরই ভবিষ্যতের জন্য ঐ পরিমাণ টাকা বলরামবাবুর কাছে জমা রাখেন। ঐ টাকা জমিদারীতে খাটিয়ে বলরামবাবু ছ'মাস অন্তর ত্রিশ টাকা করে মাকে সুদ পাঠিয়ে দিতেন। এতেই বুঝা যায়, ঠাকুর রসে-বশে সন্ন্যাসী বটে। যেমন মায়ের জন্যে ভেবেছেন, তেমনি সংসারজীবের মত তাঁকে ভালওবেসেছেন। যাহোক, এই তো গেল খাওয়া-পরার ব্যাপারে মায়ের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা। আবার আত্মভাবে বিভোর—ঠাকুরের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁর সংসারে মায়ের প্রত্যেক কাজের দিকে কতরূপে ছড়িয়ে গেছে। সামান্য প্রদীপের সলতেটি থেকে, সুপুরী কাটা পর্যন্ত তিনি কত যত্ন করেই না মাকে শিখিয়েছিলেন। যেন সাংসারিক ঘরকন্নায় মায়ের কোথাও ত্রুটি না থাকে। মা যেমন তাঁর শিশুকে সদুপদেশ দিয়ে রক্ষা করে চলেন, এই আত্মভোলা সাধক ঠাকুরও শ্রীশ্রীমাকে তেমনি কিন্তু সংসারযাত্রায় নানা উপদেশ দিয়ে রক্ষা করেছেন, গড়ে তুলেছেন। তাই দেখি মাকে বলতেন, 'কোথাও যেতে হলে আগে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়, আবার নামবার সময় সকলের শেষে চারদিক দেখে নামতে হয়।' পথ চলায় যে কত রকম সতর্কতা ও বিবেচনার দরকার হয় তা, এই প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীশ্রীমার এ শিক্ষালাভ যেন শিশুর মত প্রথম পাঠ নেওয়া।

আবার অবাক হতে হয়, মায়ের সঙ্গেই তাঁর এত আলাপনের মাঝেও কোথাও দৃঢ়বাক্য বা কটুবাক্য নেই। শ্রীশ্রীমায়ের কথাতেই পাওয়া যায়, তিনি বলতেন, 'আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে, তিনি কখনও জ্ঞানত আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেন নি।' ঠাকুর কখনও ফুলটি দিয়েও আঘাত দেন নি। কেবলি 'তুমি' বলতেন।' কিন্তু একদিন ঠাকুর মাকে তাঁর ভাইঝি লক্ষ্মী মনে করে 'তুই' কথা বলে ফেলেছেন। পরে জানতে পেরেই ঠাকুরের ক'দিন ধরে কত না ব্যাকুলতা কত না অনুতাপ হয়েছিল। যেদিন বলে ফেলেছিলেন, সেদিন তো সারারাত তাঁর ঘুমই হয় নি। পরের দিনও মাকে বলেছিলেন, 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয় নি এই ভেবে ভেবে কেন, এমন রূঢ়বাক্য বলে ফেললুম।' সাধকের মনও গলেছিল সংসার রসে। আদর্শ ভালবাসা বেসেছিলেন স্ত্রীকে। তাই ঠাকুর দেখেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে সব স্ত্রীলোকের মধ্যে জগদম্বার প্রতিচ্ছবি বলে। তিনি তাই-ই বলেছেন, 'ও আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে আমি পরে ওঁকে প্রণাম করি। কারণ ওঁর মধ্যেও যে আমার মাকেই আমি দেখতে পাই। তাই তো ও যদি বিরূপ হয়, তাহলে আমার সংসার নষ্ট হয়ে যাবে।' সাংসারিক কাজকর্মের খুঁটিনাটি বিষয়ে হাতে করে মাকে শিখিয়ে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আন্তরিক ভালবাসা দেখিয়েছেন। আর তাই দেখিয়েছেন বলেই তো স্ত্রীকে কত বড় উচ্চকোটি ভক্তির আসনে বসাতে পেরেছেন। এতে ঠাকুর পূর্ণ হয়েছেন এমন ভালবাসা দিয়ে, শ্রীশ্রীমা ধন্য ও আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠেছেন ঠাকুরের অফুরন্ত ভালবাসা পেয়ে।

এইভাবে তিনি শ্রীশ্রীমাকে সর্বদা সম্মানের চোখে দেখলেও তিনি জানতেন, বয়েস ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মায়ের অনেক পার্থক্য। তাই তো সাধন ভজনের ক্ষেত্রে ও গৃহস্থালী কাজকর্মে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের কেউ না থাকাতে তিনি নিজের হাতে তা গ্রহণ করেছেন। সেখানে তিনি স্ত্রীকে শিষ্যারূপেই গ্রহণ করেছেন। এইরূপে ঠাকুরের সংসারে জগৎ-পূজিত আদর্শ দম্পতির সাংসারিক জীবন, কত না ভক্তি-ভালবাসায় গড়ে উঠেছিল তার কি শেষ আছে? না শেষ হয়। আবার স্ত্রী কাছে কাছে থাকলেও, সংসারের খুঁটিনাটি খবর নিলেও ঠাকুরের সংসার করায় কোনরূপ মলিনতা নেই। ঠিক পিঁপড়ের আদর্শ, বালি থেকে চিনি তুলে নেওয়া। হাঁসের আদর্শ জল থেকে দুধ টেনে নেওয়া। সারদাদেবীও ঠাকুরের এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়ে তিনি হয়েছেন আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ শিষ্যা, আদর্শ পতিগুরুদেবতায়। তাতেই তো তিনি আমাদের কাছেও দেখা দিলেন সকলের স্নেহময়ী মা রূপে। ঠাকুরের ভালবাসা ছিল প্রাণঢালা, সাধারণভাবে ভাল লাগার নিম্নমুখী আবেগ ছিল না। তাই—তিনি সাধক হলেও সংসারে সবই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেজন্যেই বলি, এমন ঠাকুরের সংসার করাকে কি—উড়িয়ে দেওয়া যায়? এই তো আদর্শ সংসারযাত্রা। আবার বলতে হয়, তা না হ'লে শ্রীশ্রীমা বলতেন না যে তিনি ঠাকুরের কাছে কখনও ফুলের আঘাতটুকু পান নি।

ইঞ্চুপিসী

শ্রীমতী প্রতিমা সেন

ইঞ্চুপিসীর ভয়ে সবাই ত্রস্ত, ত্রিসীমানায় যেতে চায় না কেউ, তার উপর এই ঠাণ্ডা, কখন কাকে ধরবেন তাকে ভিজে কাপড় না করিয়ে ছাড়বেন না।

এই তো একটু আগে শেফালিকে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলেন ইঞ্চুপিসী, 'ওখানটা মাড়ালি তো, শীগগিরি যা, চান করে আয়। এত করে বলে রাখলাম ওখানটা ধোয়া হয় নি।'

'ওখানটা তো পরিষ্কার পিসী' ভয়ে ভয়ে বলে শেফালি।

'আ মর্‌ পরিষ্কার কোথায় দেখলি, এখানের নোংরা জলের ছিটে গিয়ে পড়েছে, শুকিয়ে গেলেই সব পরিষ্কার? যা কলে যা, ছিষ্টির জিনিষ তো ছুঁয়ে মরবি।'

অগত্যা শেফালিকে কলে ঢুকতে হয়। কোনরকমে মুখ হাত ধুয়ে শীতে হি হি করতে করতে শুকনো গামছা পরে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু পিসীর জ্বালায় শেফালিকে বেশি দূর এগোতে হয় না। পিসী চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আ ম'ল যা শুকনো গামছাই যদি পরলি তো ও জামা-কাপড়গুলো কি দোষ করেছিল। গায় এক ঘটি জল দিয়ে গামছা কেচে জামাকাপড় ভিজিয়ে আয়। মাটিতে কাপড় জামা ভিজিয়ে রাখিস।'

শেফালিকে তাই করতে হয়। ভিজে গামছা পরে উপরে ওঠে। এ রকম শাস্তি প্রায়ই কারুকে না কারুকে ভোগ করতে হয়। তাই সকলেই যতটা পারে এড়িয়ে চলতো ইঞ্চুপিসীকে, বিশেষ করে শীতকালে।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে আবার দুষ্টুমি করে সব পিসীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবে। বেশি গরম হলেই পিসীর সামনে দিয়ে নোংরা মাড়াবে, পিসীর চোখে তা এড়াবে না, অমনি কলে ঢোক চান কর।

অন্তদের কাছে বার বার স্নান করার সুযোগ হতো না, সর্দিগর্মি হবে? কিন্তু ইঞ্চুপিসীর সে সব ভাবনা নেই, কে কোথায় কি ছুঁল তাই দেখছে।

অবশ্য গ্রীষ্মকালের ঐ দুষ্টুমি পিসী ধরে ফেলতেন। তাই সকলের আর স্নান করা হতো না। ইঞ্চুপিসী সকলকে তাড়া করতেন, 'যা যা এখানে কি করতে? গরম পড়লেই পিসীকে বড্ড ভালবাসা দেখানো হয়, অন্য সময় তো টিকি দেখতে পাওয়া যায় না।'

এসব দুষ্টুমি বাড়ির ছেলেমেয়েরাই করতো, কিন্তু বাড়ির বৌ মেয়েদেরও কম শাস্তি ছিল না ইঞ্চুপিসীর জন্যে!

'ছোট বৌ ঘর থেকে এলে, কৈ কাপড় কাচলে না তো।'

'কিছু ছুঁই নি ঠাকুরঝি, মেঝেতে কাচা কাপড়গুলো রেখে এলাম।'

'তোমাদের সেই এক কথা, বলি আঁচলে দরজাটাও কি ঠেকে নি, না দোরগোড়া মাড়াও নি।'

ছোট বৌ গজগজ করতে করতে কলে যায়। ভিজে কাপড়েই কাজ করতে থাকে।

ইঞ্চুপিসী নিজের মনেই এখানে ধুচ্ছেন ওখানে ধুচ্ছেন, এটা কাচছেন ওটা কাচছেন। তার ফাঁকে ফাঁকে একে ওকে ধরছেন।

'ওকি তুমি রাঁধতে বসলে কেন? এই মাত্র তো তোমায় রবি ছুঁয়ে গেল, তোমাদের কি এতটুকু আচার বিচার নেই, সংসারের মঙ্গল-অমঙ্গল মান না।'

'রবি তো এই স্নান করে উঠলো ঠাকুরঝি,' বলে বড় বৌ, ছেলেপুলের সংসারে অত ছুঁই ছুঁই করলে চলে, ওতেও তো মঙ্গল-অমঙ্গল হতে পারে।'

—'তোমাকে আর মঙ্গল-অমঙ্গল শেখাতে হবে না। এককালের বুড়ি তিনকালে ঠেকেছি, সারাজীবন এই করে এলাম। আর ছেলেপুলে কি আমার হয় নি, মরে গেছে বলে সব সময় খোঁটা, থাকলে তো তার সংসারেই থাকতাম, এখানের অনাচার সহ্য করতে হতো?'

বড়বৌ হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'না, না, ঠাকুরঝি সে কথা বলি নি, তুমি ভুল বুঝছো কেন? রবি এই স্নান করে এসেছিল বলেই ভেবেছিলাম ওতে কোন দোষ নেই।' বলেই বড়বৌ ঠাকুরঝিকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলে, 'কাল তো যাচ্ছি ঠাকুরঝি, খোলটা ধুয়ে যাবো।'

ইঞ্চুপিসীর রাগ অভিমান কমে যায়। বলেন, 'সে যা হয় কর।'

ইঞ্চুপিসীর রাগকে এবাড়ির দুই বৌ-ই ভয় পায়, বিশেষ করে বড়বৌ।

ইন্দুমতীর এ-বাড়িতে বিশেষ সম্মান। বাড়ির কর্তা শম্ভু চৌধুরীকে ইন্দুমতীই মানুষ করেন। শম্ভুর যখন বছরখানেক বয়স তখনই শম্ভুকে ইন্দুমতী মার কাছ থেকে নিয়ে আসেন।

মা হরিমতীর তেরো সন্তানের প্রথম ইন্দুমতী। হরিমতীর অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। ইন্দুমতীর বিয়ে হয় খুব বড় ঘরে, রূপ দেখেই বিয়ে হয়। অবস্থাও খুব ভাল ছিল। এক ছেলে হওয়ার পর আর সন্তান হয় নি। তাই মায়ের পর পর ছেলেমেয়ের কিছু ভার লাঘব করার জন্য ভাই শম্ভুকে নিয়ে আসেন। কিন্তু শম্ভুকে নিয়ে এসে আরো দুই ছোট ভাইবোনও ইন্দুমতীর ঘাড়েই পড়ে। ছোটটিই শাম্মুকে রেখেই হরিমতী ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইন্দুমতীর শারীরিক এবং আর্থিক দুই বলই ছিল। তাই খুব আদর যত্নেই তিন ভাইবোনকে মানুষ করেন। কিন্তু নিজের একমাত্র ছেলেকে মানুষ করতে পারেন নি অল্পবয়সেই মারা যায়। নিজের সন্তানের মতই তাই ভাইবোনেরা মানুষ হয়। ভাইরা বড় হয়ে এই ইন্দুমতী হাজার অন্যায় করলেও কিছু বলতো না এবং বলার সাহসও রাখত না। মুখ বুজে সহ্য করতো। সেই কারণে বৌদেরও মুখ বন্ধ করে থাকতে হতো।

ইন্দুমতী রাগ করলে তাই বড়বৌ ছোটবৌ দু'জনেই ভয় পেয়ে যায়। ছেলেমেয়েদেরও কম ভয় নয় ইঞ্চুপিসীকে? এ বাড়ির বড় ছেলে শিবুই ইন্দুমতীর অপভ্রংশ বার করে ইঞ্চুপিসী। ইন্দুমতীর সম্মানের আরো একটা কারণ, তাঁর সম্পত্তির উপরও কম লোভ নয়। সকলেই জানে ইন্দুমতী দুই ভাইকেই সব দিয়ে যাবেন।

ইন্দুমতীর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুঁই ছুঁই বাইটা যেন আরো বেড়ে যায়। আগে ছেলেরা পালাতো এখন বৌরাও গা ঢাকা দেয়।

শরীর খারাপ হলে তো কথাই নেই। নিজে দশবার স্নান

ছেন সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দের‌ও করাচ্ছেন। ভয়ে ভয়ে কেউ ইন্দুমতীর ই ঢোকে না।—দোরের কাছ থেকে বড়বৌ খোঁজ নিয়ে যায়, কিছু য়াজন কি না।

ইন্দুমতীর রোগেও কিন্তু এক কথা, 'দোর ছোঁও নি ত'—হয় তো ার সুরটা একটু নরম।

রোগ থেকে উঠেই আগাগোড়া ঘর নিজের হাতে গোবরজলে বেন, তারপর গঙ্গাজলে ধোবেন। দেওয়ালও বাদ পড়ত না। পের আবার কোন কোনবার ঘর চূণকাম হয়ে যেত। ছুঁচিবাইর ঙ্গ ইন্দুমতীর পরিষ্কার পরিপাটিও খুব বেশি ছিল। গোবরজলে াজলে দেওয়ালের আর কোন শ্রী থাকত না, তাই আবার নূতন করে র চূণকাম করা হতো।

মাঝে মাঝে বৌদের ইন্দুমতী বলে রাখতেন, 'আমি ম'লে ঘর যেন মনি ফেলে রেখো না, গোবরজল গঙ্গাজলে ধুয়ে চূণকাম করাতে লো না। ভাল করে চূণকাম করিও, এখন তো দেখে শুনে মি করাচ্ছি।'

ছোটবৌ একটু বা আধুনিক। শুনে বড়বৌকে বলতো, 'ওই রুন বড়দি, এখানে ধোয়া ওখানে মোছা, তার উপর আবার দু'দিন ন্তর এঘর চূণকাম ওঘর চূণকাম। মরলে কি করতে হবে তারও খন থেকে ফর্দ তৈরি হচ্ছে।'

বড়বৌ চুপ করে থাকে, বলে, 'তা আর কি করবো, শাশুড়ীর মত বড় ননদ। আর এতদিন আমাদের ধরে ধরে যা শেখালেন, আমরাই কি আর পারব, না করে? উনি না থাকলেও অভ্যেসবশে হয়ে যাবে।'

—'আমার দ্বারা অত হবে না বাবা, যা করি সব ভয়ে ভয়ে, অত পায়া যায়, যা রয়সয় তাই ভালো, তারপর শেষ বয়সে ছেলেমেয়েদের গালাগালি খাই!'

—'তা সত্যি। উনি ঝাড়া হাত পা তাই এ বয়স পর্যন্ত একভাবে চালালেন। ছুঁচিবাইয়ের জন্ত কম খাটতেও তো হয় না।'

—'পয়সাও লাগে বড়দি, এই তো সেদিন একটা আস্ত বিছানার চাদর ফেলে দিলেন। কিসের দাগ লেগেছে কেচে কেচেও উঠছে না। তাই।'

সেবারে অসুখটা ইন্দুমতীর বেশি বেশি রকমের হোলো। ডাক্তার ডাকার জন্ত ভাই শম্ভু, শামু হৈ হৈ করলো, কিন্তু ইন্দুমতী ডাকতে দেবেন না।

অনেক বোঝাল ভাইরা কিন্তু ইন্দুমতী তা বুঝবেন না। 'ডাক্তারে কাজ নেই, দশবাড়ি রুগী দেখে আমাকে দেখতে আসবে। তাই আমি ছুঁতে দিই আর কি, এই রোগের উপর দশবার স্নান করতে হবে।

শম্ভু বলে, 'অত বিচার নাই বা করলে দিদি, রোগ হলে কি বিচার করা চলে।'

'তাই বলে দশটা রুগীর ছোঁয়া হয়ে পড়ে থাকব? একপাশে পড়ে আছি কারুর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে না, এই ভালো।'

ভাই বুঝলো ডাক্তার দেখান যাবে না। তাই রোগের বর্ণনা বলে বা ঔষধ আনে, তাও স্নান করে রাস্তায় কিছু না মাড়িয়ে অতি সাবধানে আনে।

ইন্দুমতী কয়েকদিন পরে সেরে উঠলেন। শরীরে বল না পেলেও রোগটা সেরে যায়, ক'দিন অসুখে প্রায় উপবাসীই ছিলেন, মাটিতেই একপাশে বিছানা করেছিলেন। উঠেই আগে সে বিছানা কাচা হলো। এমনিতেই ইন্দুমতী প্রত্যহ বিছানা থেকে উঠে বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর সব কাচতেন। ইন্দুমতী বলতেন, 'ঘুমোলে মানুষ জ্যান্ত থাকে নাকি, ওতো মরা মানুষের সামিল, বিছানা কাচবো না।'

রোগ সারলো বটে কিন্তু ইন্দুমতীর বাতিক যেন অতিমাত্রায় বেড়ে গেল। প্রত্যেককে ব্যস্ত করে তুললেন, ছেলে-বুড়ো কেউ বাদ গেল না। সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এই এটা ছুঁলি, ওটা ছুঁলি, এটা নাড়ালি। এই করছেন দিবারাত্র, ভয়ে কেউ নীচে নামার সাহস করে না। বৌরাও খুব সন্তর্পণে ঠাকুরঝির সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করে।

বড়বৌ বলে, 'একি রোগ হলো, মানুষকে তো অতিষ্ঠ করে তুললেন, ছেলেমেয়েগুলো তো নীচে নামতে চায় না।'

ছোটবৌ রেগে বলে, 'রোগ আবার কি! মরণ রোগ। মরবার কালে ভীমরতি হয়েছে। মানুষকে পাগল করে ছাড়লেন। অফিস থেকে আসতেই ওঁকে ভিজে কাপড়ে উঠিয়েছেন। ভয়ে বলছেন, 'দিদি কখন শোন, সেই সময় বাড়ি আসবো।'

সত্যি আজকাল রীতিমত ভয়ের কারণ হয়েছেন ইন্দুমতী। হঠাৎ সেদিন ভোরে উঠে বড়বৌ অবাক হয়ে যায়, ভাবে এখনও ঠাকুরঝি ওঠেন নি কেন? এদিকে সব বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, থান সব শুকোচ্ছে। চতুর্দিকে গোবরজল ছিটানো ব্যাপারটা যে কি বুঝতে পারে না বড়বৌ। ভাবে রোগশরীরে অত কাচাকুচি সইবে কেন! কাচাকুচি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সব সময় অত খাটলেই তো হলো না। মনে মনে এত কথা ভাবলেও বড়বৌ চিন্তিত হয়ে পড়ে। এরকম তো কোনদিন হয় নি।

ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখে বড়বৌ, দেখে অবাক হয়ে যায়। ইন্দুমতী গামছা পরেই মেঝেতে শুয়ে আছেন, খাটের বিছানা একপাশে করে রাখা রয়েছে।

বেলা বাড়ে, কিন্তু ইন্দুমতী আর ওঠেন না। ভাই শম্ভু, শানু ডাক্তার ডেকে আনে, ডাক্তার জানায় অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছেন।

বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। ছেলেমেয়েরা কোনদিনও পিসীর ঘরে ঢোকে নি, তাই আজও ভয়ে কেউ কাছে আসে না।

বড়বৌ কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ঠাকুরঝি এভাবে তুমি চলে যাবে ভাবি নি, গোবরজলটা অবধি ছিটিয়ে গেছো।'

ছোটবৌ বলে, 'কিছুই তো করতে পারলাম না ঠাকুরঝির, ঘরটায় ভাল করে চুণকাম ফেরাতে হবে।'

শিমূলতলা

শ্রীমতী শান্তি বসু

শিমূলতলা দিল যে দোলা
আমার মনে
স্মৃতিটুকু তাই ছড়িয়ে দিনু
কুড়িয়ে এনে।

শিমূলতলা
তোমায় ঘিরে লাট্টু পাহাড়
ছড়িয়ে বিশাল দেহটি তার
আহা সাজাল তোমারে
কিবা রূপসম্ভারে।

ওগো চলদি ঝরণা
পর্বত কন্যা তুমি অনন্যা
মনের মণিকোঠায় তাই
তোমারে ভ'রে নিয়ে যাই।

শীলাভরণ চিত্তহরণ
নিতুই করে পথিকবরে
আপন আনন্দে, কাহারে বন্দে
হাসির তরঙ্গে মুক্তা ঝরে।

ছড়িয়ে আবির রবি ওঠে
রাখাল বালক যায় গো গোঠে
সূর্যমুখী চাইলো সুখে
সূর্যের আলো গায়ে মেখে।

বিহগকুল ভৈরোবাগে
গান গেয়ে সব উঠলো জেগে
এবার নীল আকাশে দিয়ে সারি
দূরপাল্লায় দেবে পাড়ি।

চাকাই রোড ঘুরে
পথ গিয়েছে দূরে
ফুলবাগিচা ঐ যে হাসে
কুটিরগুলির আশে পাশে।

রেললাইন পাশে রেখে
বাঁকা রোড গেছে বেঁকে
নদীর কিনারায়
গড়িয়ে বেলা তুফান আসে
যাত্রী নিয়ে দূর প্রবাসে
পৌঁছে দিতে আপন ঠিকানায়।

সাত

মাদার হাউসের নির্দেশ-পত্রে কারণ কিছু দেওয়া ছিল না কেন সিস্টার লুককে কংগো পাঠানো হচ্ছে না সোজা। দক্ষিণ বেলজিয়ামে সংঘের মানসিক রোগের স্যানাটোরিয়াম আছে একটা, এখন সেখানেই কাজ করবে সে, কতদিন তাও কিছু ঠিক নেই।

নিজের মনে ভেবে দেখল সিস্টার লুক সাইকিয়াট্রিক নার্সিংয়ে তার ডিপ্লোমা আছে বলেই এখানে নিয়োগ করা হ'ল তাকে, সুপিরিয়র জেনারেল নিশ্চয় চান মেন্টাল নার্সিং কিছুদিন সে হাতে-কলমে অভ্যাস করুক, কংগোর কাছে তার দাম আরও বাড়বে তাতে। সিদ্ধান্তটা করে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বই থেকে ট্রপিক্যাল নিউরাসথাজিয়া আর পেলাগ্রা থেকে মানসিক পরিবর্তনের ওপর অধ্যায়গুলো আবারও পড়ে ফেলল এবং ভাবতে চেষ্টা করল অনুমানটা নির্ভুল হয়েছে তার। অথচ অনুমানের বিষয়টা এমন যার সম্বন্ধে অনুমান করবার কোন অধিকারই তার নেই। কনভেন্ট যেখানেই পাঠাবে নির্বিবাদে যেতে হবে, 'কেন' নেহাৎ অবান্তর প্রশ্ন।

শেষ রিক্রিয়েশনে এক সংগে বসে সিস্টার পলিনকে জিজ্ঞাসা না করে পারল না মানসিক অসুস্থতা কংগোয় খুব বেশি কি না। ডিপ্লোমা পাবার পর থেকে সিস্টার পলিন একেবারে বদলে গেছে, সেই বিরোধী ভাবটাই আর নেই।

—কংগোতে সবারই বোধ হয় একটু-আধটু পাগলামির ভাব আছে যাই সিস্টার জানো। দেশটাতেই কি একটা উন্মত্ততার ছোঁয়াচ আছে ···ঘন সবুজ বন, সুনীল আকাশ আর সেই বিশাল দিগন্ত—ঃ সে যে কি দিগন্ত সিস্টার!··· অবশ্য সে কথা তুমি জিগোস কর নি।

যে দেশে আবার ফিরে যাচ্ছে সিস্টার পলিন তারই কথা বলছে যখন মুখখানা দেখে সিস্টার লুকের মনে পড়ে যাচ্ছে কনভেন্ট পত্রিকায় দেখা নানদের ছবি—দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার মিশনের কাজে ফিরে যাচ্ছেন। এক একটা দলের ছবির ওপর শিরোনাম দেওয়াঃ দ্বিতীয় ক্ষেপের যাত্রীদল··তৃতীয় ক্ষেপের যাত্রীদল···আবদ্ধ ছবিতে সাদা আঁট কয়কের ফ্রেমে আটকানো মুখগুলো এমনই জীবন্ত মনে হবে যেন যাবার আগে ওর দিকে চেয়ে কাগজের কোন সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে গোপনে হাসলেন একটু।

—পাগলামি বলতে আমরা যা বুঝি ওখানে তা নেই বললেই চলে। আমি তো বলব পৃথিবীর যে-কোন জাতের চেয়েই আমাদের কংগোবাসীরা স্বাভাবিক। গাছ-গাছড়া থেকে একরকম অদ্ভুত বিয়ার তৈরি করে তারা, সেই বিয়ার যখন খায় তখনই কেবল আর স্বাভাবিক থাকে না তারা। কি গাছ থেকে এ বিয়ার তৈরি করে তারা কেউ জানে না—ম্যানিওক লতা হতে পারে, সঠিক কেউ বলতে পারে না, কেউ খুঁজেও পায় না। সেই বিয়ার খেয়ে ওরা মাদল বাজিয়ে নাচে আর নেচে যদি নেশা না ছোটে তো অনেক সময় হঠাৎ খুন করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে। সেটা সাময়িক অবশ্য।

সিস্টার লুক দেখছে সেই গোপন হাসির আভাস সিস্টার পলিনের মুখেও ফুটল। একটু থেমে কংগোর মাদলের শব্দ শুনছে যেন কান পেতে।

—ওরা তাকে বলে সিম্বা। কাতাংগায় বেলজিয়ানরা যে বিখ্যাত সিম্বা বিয়ার চোলাই করে তার সংগে এর কোন মিল নেই। নামটাই যা এক। সিম্বা—ওদের ভাষায় সিংহ।

—সিম্বা—সিস্টার লুকও একবার উচ্চারণ করে দেখল কথাটা। তার কিসওয়াহিলি ভাষার প্রথম শব্দটা একেবারে সাদাসিধে, বলতে কোন কষ্ট নেই। দীর্ঘশ্বাস যেমন আপনি বেরিয়ে আসে ভিতর থেকে, এ কথাটাও যেন তেমনি সহজে বেরিয়ে এল।

প্রাতরাশের পর সোজা খাবার ঘর থেকেই বোর্ডিং ছাড়ল সে। কনভেন্টের নিয়মে মাদার সুপিরিয়র ছাড়া আর কেউ কখনও বিদায় সম্ভাষণ জানায় না। যে চলে যাচ্ছে মাদার সুপিরিয়র তার সংগে হাউসের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত আসেন এবং আশীর্বাদ জানান। তবু

ননরাও ছোটখাট ইংগিতে বিদায় জানালেন—সুপিরিয়র পিছন ফিরতে সাবধানে হাত নেড়ে স্মিত হাসলেন···স্পষ্ট লেখা ছিল তাতে, তোমার অভাব বোধ করব আমরা।

বহির্দ্বারের ঠিক পিছনে দু'গালে চুম্বন করে আলিংগন করলেন মাদার মারসেলা। সন্ন্যাসিনীর পোশাক গ্রহণানুষ্ঠানের সময় সিস্টারদের সংগে আলিংগনের পর এই প্রথম তাকে কেউ স্পর্শ করল। আশীর্বাদ নিতে নতজানু হ'ল সে।···সুপিরিয়র দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন চ্যাপারণ দাঁড়িয়ে আছে কি না বাইরে, দেখে বিদায় জানিয়ে হাসলেন একটু।

মাদার হাউসে নয়, কিন্তু অন্য যে কোন কনভেন্ট হাউসে নানরা ছাড়া চ্যাপারণ নামে এক শ্রেণীর মহিলা বাস করে। এরা সবাই বয়স্কা এবং সংসারে এদের কেউ নেই, সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে তাদের বৃদ্ধাবাসে যাবার কথা। কিন্তু তাদের মাধ্য কেউ কেউ তখনও কর্মঠ আর ছটফটে আছে বিবেচিত হ'লে নানদের সংগে কনভেন্টে থাকবার অনুমতি পায়। থাকবার ছোট ছোট ঘর পায় তারা, খেতে পায়, ইউনিফর্মের মত কালো রঙের ভদ্র পোশাক পায় পরবার জন্য। পরিবর্তে ছোটখাট নানা কাজ তারা করে—কোন নানকে সংগে করে ডেনটিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া—নিয়ে আসা, টিকিট কিনে আনা, ওষুধের দোকানে যাওয়া বা নানরা সবাই যখন চ্যাপেলে তখন টেলিফোনের কাছে বসা। তাদের সব থেকে প্রিয় কাজ কোন নানকে শহরের রাস্তায় আগলে নিয়ে যাওয়া। ওদের চোখে সিস্টাররা পৃথিবীর আদর্শ, লোকের ভীড়ে সারাক্ষণ তাঁদের মূল্যবান সম্পদের মত চোখে-চোখে রাখে সেজন্য।

এমনই একজন চ্যাপারণ—তার নাম সোফিয়া। ইতোমধ্যে ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। খুঁটিয়ে দেখে নিল সিস্টার লুক বাইরে যাবার দস্তানাটি অবধি পরেছে কি না ঠিক মত, নিজের হাতের দস্তানাটা টেনে সমান করে নিল একটু, ট্যাক্সির দরজা খুলে দিল তারপর। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল রেল-স্টেশনের সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরতে। তীক্ষ্ণ চোখ দু'টো ট্যাক্সি-মিটারের দিকে নিবদ্ধ, তারা বলতে চায় যেন: আমাদের মত দরিদ্রতার ব্রত যারা নিয়েছে, ঘোরা-পথের বিলাস তাদের জন্য নয়।

স্টেশনে সোফিয়া তাকে দরজার কাছে অপেক্ষা করার ইংগিত করে টিকিট কেনার জন্য লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। দু'টো লোক ধস্তাধস্তি করছিল···সিস্টার লুক দেখছে তার বৃদ্ধা সংগিনী কনুয়ের ধাক্কায় তাদের ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল—যাতে তার নানটিকে সে সময়মত ট্রেনে তুলে দিতে পারে, তৃতীয় শ্রেণীর ভীড়ে জানলার ধারে বসবার সুবিধা করে দিতে পারে। কিন্তু সোফিয়া জানে না ট্রেনের কামরায় জায়গার অভাব নানদের কখনও হয় না। হ্যাবিট চোখে পড়লে বাইরে থেকেই লোকে সরে সরে যায়—নানের পাশে বসার চেয়ে অন্য যে কোন জায়গা তাদের পছন্দ। কখনও কোন যাত্রী ট্রেনে উঠতে গিয়ে কামরায় মুখ বাড়িয়ে কোন নানকে বসে থাকতে দেখে যদি, চলে যেতে যেতে পিছনের সংগীদের উদ্দেশ্যে বলে, এখানে হবে না, কালো কাক রয়েছে একটি।···গলার স্বরটাও একটু নীচু করার কথা ভাবে না।

কালো কাক বললে সিস্টার লুক এখনও একটু বেদনাবোধ করে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে তার এই নতুন কর্মক্ষেত্র, বেলজিয়ামের এক প্রান্তে। দৃশ্যে শব্দে, নিয়মে এমনই অদ্ভুত, এমনই অপার্থিব যে কংগোর মত অন্য একটা মহাদেশে কেন জায়গাটা গ্রহান্তরেও হতে পারত। আয়তনে একটা পুরো গ্রামের মত। খুব উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সুরক্ষিত। বাসিন্দারা সব মেয়ে—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব, আপন মনে গজগজ করছে, গালাগাল দিচ্ছে।

ফ্রি ওয়ার্ডের কোনখান থেকে কে চীৎকার করে বলছে খুব লম্বা ক'জন নানকে, তোদের গায়ে আমি থুথু দিই—থুথু দিই তোদের গায়ে।

ওদিকের পেয়িং ওয়ার্ডে সবাই তাদের হ্যাবিট-পরা অভিভাবিকাদের ডাকছে, কাকের দল! যাদুকরীর দল!

যাদের থেকে বিপদের সম্ভাবনা আছে তাদের ছাড়া আর কাউকে বন্ধ করে রাখা হয় না এখানে।

সুপিরিয়র মাদার ক্রিস্টোফি ভারি ভাল। পূর্বাশ্রমে ইংরেজ ছিলেন—হাজারখানেক অপ্রকৃতিস্থা স্ত্রীলোক আর শ'খানেক অতি-পরিশ্রান্ত নানের বিপর্যস্ত জগতটা তিনি সুষ্ঠুভাবে শাসন করেন। অনেকখানি সাহস আর সমতাজ্ঞানের প্রমাণ সেটাই। কোন কিছুতেই আড়ম্বর নেই কোন, বরং সব কিছুই সহজ করে নেন—নানদেরও শেখান তাই। নিজেই সিস্টার লুককে ঘুরিয়ে দেখালেন অনেকটা, অনর্গল ফ্রেঞ্চে তার এলাকার খবরাখবর দিয়ে গেলেন, চমৎকার উচ্চারণ। যাবার পথে যে যে রোগিণী পড়ল তাদের প্রত্যেকের নাম-ধাম খুঁটিনাটি বিবরণও জানা হয়ে গেল তাঁর মুখ থেকে।

নতুন কমিউনিটি সম্বন্ধে সিস্টার লুকের প্রথমে ধারণা এই হ'ল যে, জীবনের আয়তনের চেয়ে এখানকার বাসিন্দারা আরও বড়। আর সবারই চোখ এখানে অতিরিক্ত সজাগ, এমন সজাগ চোখ আগে কখনও দেখে নি। সব নানদের চোখ চারপাশে ঘুরছে, মঠ জীবনের অভ্যাসের সেটা এমনই বিপরীত যে, মনে হয় তাঁদের পোশাকটাই ছদ্মবেশ বুঝি। চারপাশের শব্দ, ইংগিত বা শব্দ-পরিবর্তনের প্রতি তাদের মনোযোগ প্রায় উপলব্ধির পর্যায়ে উঠেছে। তা ছাড়া উপায়ও নেই, নিরবচ্ছিন্ন, সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ওপর জীবন নির্ভর করে এখানে। মাদার হাউসে শিক্ষানবীশ ছিল যখন একটা ব্যাপার ধাঁধাঁ লাগত তার, আজ হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। বাইরে থেকে নানরা যখন নির্জনবাসের জন্য ফিরতেন স্থানীয় সিস্টাররা ঠিক ঠিক দেখিয়ে দিতে পারতেন তাঁদের মধ্যে উন্মাদ চিকিৎসাবিদ সিস্টার কারা। দিতেনও দেখিয়ে ছোট সিস্টারদের, ঐ যে উনি আর উনি—ওঁরা আমাদের উন্মাদাশ্রম থেকে আসছেন। বহিরাগত সমস্ত চেতনাকে দমন করে যাঁদের জীবন কাটে, তাঁদের পাশে এঁদের সম্পূর্ণ ভিন্ন লাগবেই—বাইরের প্রতিটি শব্দ-সাড়ায় অতি সচেতন, এঁরা।···মনে পড়ে মাদার হাউসের খাবারঘরে একটা কাঁটা পড়লে একমাত্র তাঁদের চোখই শব্দটা কোথা থেকে এল দেখত তাকিয়ে।

সাহায্যের জন্য যেসব সাধারণ নার্স আছে, তাদেরও তেমনই তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। তারা সব শক্তসমর্থ খামারের মেয়ে, এক একটা মেয়েদৈত্য যেন। নানরা তাদের কাজ শিখিয়ে নিয়েছেন, না হলে সাইকিয়াট্রিতে ডিপ্লোমা তাদের নেই। বাগানে প্রত্যেক নানের সংগে দু'জন করে থাকে, হাত মুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাশে আর নানটি ঈষৎ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে নিনিমেষ দৃষ্টিতে ঐ স্ত্রীলোকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রতিদানে তারা হিংস্রচোখে অভিসম্পাত দেয়, নাছোড়বন্দা প্রেমিকার মত।

মাদার ক্রিস্টোফি বললেন, আমাদের প্র্যাক্‌টিক্যাল নার্স্‌রা চার ঘণ্টার সিফ্‌টে ডিউটি দেয়, তার বেশি পারে না। সিস্টাররা কিন্তু আমাপা ডিউটি দেন—কখনও কখনও একসংগে আট-দশ ঘণ্টা পর্যন্তও। মধ্যে হয় তো খাওয়া বা প্রার্থনায় সামান্য একটু বিশ্রাম পেলেন।

অবজারভেটরি থেকে ঘোরা শুরু হয়েছিল। সব নতুন রোগিণীকে এখানে সপ্তাহখানেক সপ্তাহদু'য়েক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়—অপ্রকৃতিস্থতার ধরণ আর গভীরতা জানার জন্য। বেলজিয়ামের অনেক শীর্ষস্থানীয় উম্মাদবিশেষজ্ঞ আছেন এখানে, সিস্টার লুক তাঁদের অনেকের নাম শুনেছে। অবজারভেটরি থেকে মাদার ক্রিস্টোফি ওকে পেয়িং পেসেন্টদের চত্বরে নিয়ে গেলেন।

এ্যালকহলিক, এপিলেপটিক, সেমি-এ্যাজিটেটেড—নন-ডেনজারাস্‌ সব রোগিণীদের জন্য বিলাসোপকরণে সাজানো আলাদা আলাদা ঘর। সিস্টার লুক দেখল এক ব্যারনেস্‌ তাঁর জানলায় সাজানো উইণ্ডো-বক্স থেকে জেনারিয়াম গাছ খাচ্ছেন বেশ ধীরে-সুস্থে।

কানে এল সুপিরিয়র শান্তকণ্ঠে বলছেন, কাল আবার ক'টা এনে পুঁতে দিতে হবে।

আর এক ঘরে একটি যুবতী মেয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে মাটিতে রাখা প্লেট থেকে খাচ্ছে।

—ইনি হলেন 'কাউন্টেস ভি। ওঁর ধারণা উনি একটা কুকুর, তাই ঐ মোটা ডিসে মেঝের ওপর খাবার না দিলে ছোঁবেনই না। তা না হলে উনি রীতিমত বুদ্ধিমতী এবং বিদুষী—তুমি নিজেই দেখতে পাবে। এই চত্বরেই কাজ করবে তুমি।

এই চত্বরেই প্রাইভেট 'কামরাগুলো ছাড়িয়ে লম্বা করিডরে বদ্ধ পাগলদের প্যাডেডসেলগুলো বিপদের সম্ভাবনা আছে যাদের থেকে তারা এখানে থাকে। প্রত্যেক সেলে ইঞ্চিখানেক পুরু কাঠের জানলা, ওপরটায় ছোট একটা ফোকরমাত্র খোলা। ওরা যাওয়ার সময় সেই ফোকর দিয়ে দেখছিল যারা তাদের সংগে কথা বললেন সুপিরিয়র।

একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখালেন—গৌরবর্ণা, নীলাক্ষী। সুস্মিত হাসিমুখে চায়না-নীল চোখে সে তারই দিকে তাকিয়েছিল।

—ও ভাবে ও বুঝি দেবদূত-প্রধান গ্যাব্রিয়েল, আমরাও ওকে তাই বলেই ডাকি।

সেলটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, এ সেলে একা কখনও ঢুকবে না—সব সময় দু'জন বা তিনজনে।

সেলগুলো পেরিয়ে লম্বা করিডরের শেষে বাথরুম। সাংঘাতিক কেসগুলোর বড় রকম একটা চিকিৎসা এইখানেই হয়। সুদৃঢ় জানলার মধ্যে দিয়ে সিস্টার লুক যেন প্রেতলোকের দৃশ্য দেখছে। ঘরটার মধ্যে গোটা বারো টব, প্রত্যেকটার ওপর ক্যানভাস বা স্ক্রু দিয়ে আঁটা কাঠের তক্তার ঢাকনা। একদিকটায় একটা গর্ত মতন জায়গা খোলা আছে [illegible]

আছে বাইরে। দরজার ছোট একটা গর্তে তিনকোণা খাঁজকাটা চাবিটা আটকানো, এদিককার হাতলহীন দরজাগুলো এই চাবি দিয়েই খোলে। সেই ছিদ্রপথে একটা অস্পষ্ট অমানুষিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটিমাত্র নান এই বিরাট স্নানপর্বের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

—ভেতরে গেলে আর আমার কথা শুনতে পাবে না তুমি। সাংঘাতিক পাগলদের জন্যে এই চিকিৎসা। আমরা ওদের ভেসলিন মাখিয়ে গরম জলে ডুবিয়ে রাখি—জলের উত্তাপ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সমান রাখা হয়। ডাক্তারের নির্দেশমত প্রতিদিন চারঘণ্টা থেকে আটঘণ্টা এমনি জলে রাখতে হয় এদের। ভেতরের আবহাওয়াটা এমনই অশান্ত যে, ডিউটিতে যে সিস্টারটি থাকে মাঝে মাঝে তাকে একটু বিশ্রাম দিতে চাই আমরা—আট-দশ ঘণ্টা থাকতে হয় তো! তাই তোমাকে দরকার হ'ল—এখন যেসব সিস্টাররা নতুন কাজে লাগছে তাদের মধ্যে একমাত্র তোমারই সাইকিয়াট্রিতে ডিগ্রি আছে, এখানে কাজ করতে গেলে যা দরকার।

—বুঝেছি মাই মাদার। আকস্মিক স্বস্তিটুকু প্রকাশ না করতেই চেষ্টা করল সিস্টার লুক, কিন্তু মাদার ক্রিস্টোফির কাছে মুহূর্তেই ধরা পড়ে গেল।

—কংগোয় যাবার পক্ষে এখনও বড় ছেলেমানুষ তুমি। জানি মন তোমার চলেই গেছে সেখানে—রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল সম্ভবত আমাদের কাছে পাঠাতেন না তোমাকে—যতই দরকার থাক আমাদের, একটু বড় হতে যদি তুমি, কনভেন্ট জীবনের ছাঁচে আর ক'টা বছর কাটত যদি তোমার।

সস্নেহ কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাসমাত্র নেই। তাঁর কাছে সে যে নেহাৎ অনিচ্ছায় এসেছে জানেন তা তবুও।

দরজাটা খুলতেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ আর্ত রবটা প্রকট হয়ে উঠল। কেউ গান গাইছে···কেউ গালাগাল দিচ্ছে···প্রার্থনা করতে করতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে কেউ—থেমে গিয়ে শুরু করছে আবার···সব মিলিয়ে প্রচণ্ড একটা ঢেউ—ছন্দহীন, ভয়ংকর। আর বিরামহীন। চলেছেই···চলেছেই, শেষ নেই কোথাও।

ঘরের মধ্যে ডিউটিতে আছেন যে নানটি, দরজার দিকে পিছন ফিরেছিলেন তিনি। সিস্টার লুক পিছন থেকেই দেখছে তাঁকে তাকিয়ে তাকিয়ে—দিনে আট-দশ ঘণ্টা পাগলদের সংগে বদ্ধ হয়ে থাকার শক্তি রাখেন তিনি। টবাস্থিতাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘুরে চাইলেন, উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে অভিবাদন করলেন সুপিরিয়রকে। কি ছিল সেই অভিজাত প্রণামের ভংগীতে, নিমেষের জন্য টবের বদ্ধ গর্জন থেমে গেল, বদ্ধ চোখগুলো দেখতে লাগল চেয়ে-চেয়ে। পরমুহূর্তেই আগেকার গর্জন আবার শুরু হল। নানটি একটুকরো কাগজে নিজের নাম লিখে ততক্ষণে বাড়িয়ে ধরেছেন তার দিকে। সিস্টার মেরি ডি জেসাস! হস্তাক্ষরগুলো ভ্যালেনসিয়েনসের লেখার মত সৌখীন হস্তাক্ষর

সিস্টার লুক ভাবছে এমন বিশিষ্টতা-ভরা চেহারা কখনও দেখি নি, এমন শক্ত সাহসও না। ভাবতে গিয়ে ঐ দীর্ঘাঙ্গী নানটির সংগে কেমন একটা একাত্মতা অনুভব করছে এই মুহূর্তেই।

টবের ফাঁকগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, ফিরে কাগজটার দিকে [illegible]

দুমদুম্‌ শব্দ শুনল, ওরা ওপর-নীচে গোড়ালি ঠুকছে। এত জোরে ঠুকছে তো, কিন্তু ওরা নিজেরা টেরও পাচ্ছে না।

···সিস্টার লুক গোড়ালি ঠোকার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু গর্জনের স্রোতে যত কিছু শব্দ সব একাকার হয়ে মিশে গেছে।

সিস্টার মেরি চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিলেন ওদের জন্য, ওরা

বেরিয়ে যেতেই ওই পাগলদের বীভৎস চীৎকারের মধ্যে আবার বন্দী করলেন নিজেকে।

সিস্টার লুক ভাবছে, এ কেবল নানরাই পারেন।

এখনই যে পরিবেশ থেকে এল তার তুলনায় প্যাডেড্ সেলের করিডর নিস্তব্ধ প্রায়। তার মধ্যে এসেও কান দু'টো ওর ঝাঁ ঝাঁ করছে।

আর্কেঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল কাচের ওপর মুখটা চেপে চেঁচিয়ে উঠল, গুড বাই চেরি···বিদায় এখন!

চেরি ডাকটা এতকাল কানে আসে নি যে হঠাৎ শুনে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল।

প্যাভেলিয়ন থেকে বেরিয়ে এল যখন, কাঁপছে। মৃত্যু নিকটে এলে কেমন একটা পূর্বাভাষ সে চিরদিনই পায়, তারই কম্পমান শিখা দেখতে পাচ্ছে যেন এই মুহূর্তে। এই বিচিত্র উপলব্ধিটুকু তার চিরদিনের সংগী—জীবনের যতগুলো দিন তার স্মরণে আসে সবগুলো দিনের। এ উপলব্ধি ডাক্তারদের সামনে অনেক সময়ই তাকে অসুবিধায় ফেলেছে।

রোগনির্ণয় করে তাঁরা যখন আসার কথা বলেছেন সে হয় তো মাথা নেড়ে বলেছে, কিছু যদি মনে না করেন ডক্টর, আমার মনে হয় একজন প্রিস্টকে আমাদের ডাকা উচিত।

প্রাইভেট পেসেণ্টদের বাগানে বেগনিয়া ফুলের কেয়ারিগুলোর চারদিকে ফুট বারো উঁচু বেড়া দেওয়া। রোগীরা মন্থরগতিতে ঘুরছে এধার ওধার। সিস্টার লুক দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে আর ভাবছে অন্তত জনা বারো মানুষ আছে এখানে যারা যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। অশুভ চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল। সিস্টার মেরির বড় বড় কালো দু'টি চোখ আর আর্কেঞ্জেল গ্যাব্রিয়েলের চায়না-নীল চোখ দু'টি তবু চিন্তায় জড়িয়ে আছে। পরে কতদিন মনে পড়েছে···যে তিনজনকে চিরকাল মনে থাকবে তাদের দু'জনের সাক্ষাৎ ইতোমধ্যেই পেয়েছে···তৃতীয় জন—দীর্ঘাংগী বর্ষীয়সী মহিলা একটি···বেগনিয়ার কেয়ারির মধ্যে দিয়ে এখন তাদের দিকেই আসছেন।

মহিলাটির মাথায় একটা ব্রাউন পেপারের ব্যাগ। কিন্তু ব্যাগটার চেয়েও তাঁর চলনভংগী বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করল সিস্টার লুকের—ঋজু স্বচ্ছন্দ ভংগীতে কনভেণ্টের ছাপ সুস্পষ্ট। চোখ নীচু করে এগিয়ে এলেন সুপিরিয়রের কাছে কোন সিস্টার যেমন আসেন তারই অনুকরণে। মাদার ক্রিস্টোফিকে তাঁর সেই নকল-করা শ্রদ্ধা নিবেদন—সুসম্পূর্ণ···ত্রুটিহীন, সিস্টার লুক দেখছে চেয়ে চেয়ে। মনে পড়ে গেল পাগলদের এটা একটা সহজাত গুণ। অভিবাদন করে ভদ্রমহিলা চোখ তুলে তাকালো—সিস্টার লুক দেখল ব্রাউন পেপারের ব্যাগের নীচে শিশুর মত সুকুমার একখানি মুখ, শিশু মুখের মতই মসৃণ, রেখাহীন।

পরে মাদার ক্রিস্টোফি বললেন, উনি একজন এ্যাবেস ছিলেন। যতক্ষণ তুমি এঁকে কাগজের ব্যাগ দিয়ে যেতে পারবে ততক্ষণ এঁর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। শীত-গ্রীষ্ম, রাত-দিন নির্বিশেষে একটা ব্যাগ ওঁর মাথায় দিয়ে থাকা চাই।

—যে কেউ আপনা থেকেই বুঝতে পারবে যাই মাদার যে উনি নান ছিলেন। সিস্টার লুক মন্তব্যটা না করে পারল না।

—ছিলেন তো তাই—এক ধর্মীয় সংঘের এ্যাবেস ছিলেন এককালে।

সচমকে একবার কাগজের কয়ফ-পরা মহিলাটির দিকে ফিরে চাইল সিস্টার লুক—এককালে মাননীয়া অধ্যক্ষা ছিলেন।···সহবাসিনীকে একজন বক্‌বক্ করছে কাছে এসে, এ্যাবেস ঠোঁটে আঙুল দিয়েছেন তাই। নীরবতার নিয়ম পালন করছেন।

এখানকার নিয়মে কিছুদিনের মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেল সিস্টার লুক। শিখল, রোগীকে শান্ত করবার আর কোন উপায় না থাকলে তবেই শেষ অবলম্বন হিসেবে উত্তেজনা-প্রশমক কোন অষুধ দেওয়া যেতে পারে—তাও যদি দিতেই হয় তো যেটুকু না দিলেই নয় সেইটুকুই দেবে শুধু। শিখল, ভয়ংকর কোন রোগিণীর কাছে যেতে হলেও ধীর ভাবে নিজের বিবেচনা শক্তির ওপর আস্থা রেখে যেতে হয় আর তারা যাই করুক না কেন, সব কিছুকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হয়। যে রোগিণীরা ম্যাসে যোগ দিতে চ্যাপেলে আসে তাদের পাহারা দেবার ভার যেদিন তার ওপর পড়ে, সেদিন বড় বড় চোখে চেয়ে প্রার্থনা করতে হয়, ক্রমে তাও অভ্যাস হয়ে গেল। শিখল কি করে চোখ দু'টোকে অভিজ্ঞ সিস্টারদের মত ব্যবহার করতে হয়। অপ্রকৃতিস্থা ঐসব নারীদের ভাব-ভংগী লক্ষ্য করার জন্য সর্বদা চরকির মত ঘুরবে তারা চারপাশে, কিন্তু চোখে-চোখে রাখা হচ্ছে যাদের, তারা টেরও পাবে না যে কেউ লক্ষ্য করছে তাদের এবং তাদের ব্যবহারের যে কোন পরিবর্তনের উপযোগী ব্যবস্থা করতে মুহূর্তমাত্রও সময় লাগবে না।

সব সিস্টারদের চিনে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে গেল। এই উন্মত্ত জগৎটাকে চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক চোখে পাহারা দিতে হয়, কাজেই অর্ধেক সিস্টার দিনের বেলা ঘুমোন। সিস্টার মেরির আয়ত দু'টি চোখ সে খুঁজতো প্রায়ই, কিন্তু সে আসার ক'দিন পরেই তাঁর নাইট-ডিউটি পড়ল। আবার সাক্ষাৎ পেল হঠাৎ মাসখানেক পরে, অবশ্য রিক্রিয়েশনে আগেও দেখেছে।

অন্য সিস্টারদের কাছে শুনেছে, সিস্টার মেরি ডে-ডিউটিতে এলে চ্যাপেলে রোগীদের দিকে আমাদের আর কাউকে বসতে হয় না। জান উনি যখন ওদের মধ্যে থাকেন, তখন কোন কিছুই ঘটতে পারে না।

ওরা বলে সে ক্ষমতা ওঁর চোখের দৃষ্টিতে। গানের মধ্যে কোন পাগল বীভৎস চীৎকারে যোগ দিতে যাচ্ছে যখন, উনি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে সে ভাবটা প্রশমিত হয়ে যাবে। ম্যাসে যে যোগ দিতে চায়, তিনি কখনও বিমুখ করেন না তাকে। তাঁর বিশ্বাস এই যে সব উন্মাদদের তিনি সেবা করেন, চ্যাপেলের উপাসনায় তারা শুধু উপস্থিত থাকলেই কোন না কোন ভাবে তাদের উপকার হবে। বিশ-তিরিশজনের মধ্যে বসেন, কখনও একটু শব্দও শোনা যায় না। একমাত্র বৃদ্ধারা যখন অল্টারের প্রিস্টদের ভংগিমার মোহগ্রস্ত অনুকরণে দু' বাহু ঊর্ধ্বে তোলেন তখন যা গাঁটে গাঁটে মটমট্ শব্দ হয়।

রিক্রিয়েশনে মাদার ক্রিস্টোফি অনুমতি দিয়েছেন নিজের নিজের কাজ নিয়ে কথাবার্তা বলতে। কার্যক্ষেত্রে যত-কিছু সমস্যা দেখা দেয়, যত কিছু বিপদ আসে, রিক্রিয়েশনে বসে আলোচনা করার সময় সেগুলোই অনেক হাল্কা হয়ে যায়, তিক্ত অভিজ্ঞতার ভার নেমে যায় বুক থেকে। রিক্রিয়েশনের সময়টুকু তাই দিনের উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট, তা' বলে এখানে নানদের যে দৈত জীবন যাপন করতে হয় পাল্লাটা তার অদ্ভুত দিকটাতেই বেশি

ঝুঁকে যাবে সময়টা এতক্ষণ নয়। সে আশংকা থাকত যদি তো এ অনুমতি নিশ্চয়ই মিলত না। একে তো এই উন্মাদাশ্রমের সেবিকার কাজে নানের নিয়মানুগ জীবনের কিছুটা ব্যাহত হয়ই, কাজেই যতটা প্রয়োজন তার এতটুকুও বেশি অভিনিবেশ অপরাধের পর্যায়ে গিয়ে পড়বে।

রিক্রিয়েশনের আলাপ-আলোচনা সিস্টার লুক জ্বলন্ত কৌতূহলে শোনে। বোর্ডিংয়ে থাকতে অবশ্য মাঝে-মাঝে রিক্রিয়েশনে যোগ দিত, নাহলে প্রধানা নানদের সংগে রিক্রিয়েশনের অভিজ্ঞতা এই তার প্রথম।···দেখে পূর্ণতার ধারণা এক এক জনের এক এক রকম। দারিদ্র্যব্রতের ওপর বেশি জোর দেন কেউ, কেউ বদান্যতার ওপর। আত্মোপলব্ধির এই সব চিরন্তন যুদ্ধের আলোচনার সংগে প্রায় একই নিঃশ্বাসে তাঁরা ডিমেনসিয়া প্রিকক্সের নানা দিক দিয়ে আলোচনা করেন, বিভ্রান্তিকর সব লক্ষণে সাড়া দেবার কথা বলেন, বলেন রোগীরা যখন যে হ্যালিউসিনেসন দেখে সত্যি বলে মেনে নিয়ে, তাঁদেরও ভান করতে হয় যেন তাঁরাও সে সব অলীক দৃশ্য চোখের সামনে দেখছেন। তাদের সংগে যুক্তি দিয়ে কথা বলার একটা চমৎকার উপায় এটা।···শুনতে শুনতে অস্বস্তি লাগে কেমন।

পাগলদের কাছে এই যুক্তি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করার নীতি প্রথম প্রথম ওর কাছে প্রায় বোকামি মনে হ'ত। সিনিয়র সিস্টার-দের সংগে ওয়ার্ডে যখন কাজ করে···পাগলরা তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে···এ প্রধানা তাঁদের কাছে থেকে, কতটা মাশুল আদায় করে নেয়, চোখে পড়ে না তা। চোখে পড়ে সন্ধ্যায় তাঁরা রিক্রিয়েশনে আসেন যখন—মুখগুলো দেখলে মনে হয় রক্ত শুষে নিয়েছে যেন কে। চোখগুলো উজ্জ্বলতা হারায় না তাই, নাহলে ঐ রোগিণীদের সংগে কোন প্রভেদ থাকত না। ওর বাবা দেখলে তখনই বলতেন- এ-সব কেসগুলোকে শান্ত করার পক্ষে এক প্রস্থ হিপনোটিজম্ বা সম্মোহনই যথেষ্ট—এগুলোর পিছনে এতখানি শক্তি খরচ করা বোকামি কেবল, আর কিছু নয়।···কিন্তু ও জানে এ পদ্ধতি নানদের জন্য নয়। তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন অক্ষয়, অবায় আত্মা সবার মধ্যে আছেই—এরাও বঞ্চিত নয়। ধৈর্য, সাহস ও অবিরাম যত্নে স্পর্শ করা যায় সে আত্মাকে—স্পর্শ তাকে করতেই হবে।

এই রকম পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত না হওয়া অবধি সাপ্তাহিক কুলপা নেহাৎ অর্থহীন লাগবে। কোন পাগল তোমাকে তাড়া করে আসছে—তখনও তুমি যদি আর কিছু বিচার-বিবেচনা না করে দ্রুত পায়ে হেঁটে থাক, তবুও তা হঠকারিতাই। প্রকাশ্য অধিবেশনে সব সিস্টার-দের সামনে স্বীকার করতে হবে তোমায় সে কথা। সে আত্মম্ভরিতা আর অতি আস্থার জন্য এ অবস্থার মুখোমুখি হতে হ'ল তোমায় তাদের কথাও জানাতে হবে। কোন রোগী তার প্রাইভেট ঘরের বাথরুমে আটকে রেখেছিল তোমায়, একটা মেডিটেশনে যোগ দিতে পার নি তাই—সেও তোমারই ত্রুটি! ঘরে ঢুকেছিলে যখন খেয়াল রাখ নি মেডিটেশনের সময় হয়ে এল, অথচ অভিজ্ঞতা থেকে জান শান্তভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে যত রকম কৌশল করতে হবে তার জন্য সময় দরকার। কোন নান অবশ্য কখনও বলেন না কেন দেরী হ'ল, কিংবা উল্লেখ করেন না কোন উপাসনায় যোগ দিতে পারেন নি তিনি। পরিস্থিতির পশ্চাদপট থেকে তাকে সম্পূর্ণ কেটে এনে মৃদুকণ্ঠে শুধুমাত্র অপরাধগুলির উল্লেখ করেন যখন তুমি আপনা হতেই চিনতে পার—সে ঘটনায় প্রায়শঃই তুমি একজন আতংকিত সাক্ষী।

প্রতি বুধবার আর শুক্রবার ডরমিটেরিতে আলো নিভে গেলে সিনিয়র সিস্টার মিসারেরে শুরু করেন···চেনের শব্দ আসে···অনাবৃত পিঠের ওপর আঘাত পড়ছে তুমি তো জানই···ও শব্দে তুমিও যোগ দিয়েছ···দিয়েও প্রথম প্রথম তোমার মনে হ'ত শব্দটা মাত্রাধিক—এক তো আধুনিক জগতে এ ধরণের রূঢ়তার বিধান মাত্রাতিরিক্ত রকম খাঁটি এবং বীরোচিত, তার ওপর এখানকার মত যেখানে সর্বদাই নানা তপশ্চারণ আর আত্মত্যাগের মধ্যে নানদের দিন কাটে সেখানেও এ বিধানের প্রয়োগ অমানুষিক। সেই সময়···প্রভু যিশু কাছে এসে দাঁড়ান যখন···অতি পরিচিত মঠটা এক পলকে অনুতাপী কয়েকটি মানবীর সংরক্ষণ-কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়! তারপর প্রত্যহ হ্যালিউসিনেসনের যে সব অলীক দৃশ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় তাকে, সেই দৃশ্যগুলোর মতই এ বেদনাদায়ক ছবিটাও মিলিয়ে যায়।···কশাঘাত করে চল তুমি···নিজের পাপের কথা ভাবতে ভাবতে স্তবের শেষ লাইনগুলো উচ্চারণ কর মৃদুকণ্ঠে; তাহলে এই বিহিত অর্ঘ, এই বলিদান গ্রহণ কর তুমি···এর পর ঐ শৃংখলাস্থাপকটাকে চামড়ার থলিটায় রেখে দিয়ে তোমার খড়ের বস্তার বিছানায় উঠে পড়তে পার—তোমার জন্য পুরস্কার অপেক্ষা করে আছে সামনে··চোখ বন্ধ করতে পাওয়ার পুরস্কার। [ক্রমশ

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়।

হে দীঘা, বিদায়

শ্রীমতী হাসি গঙ্গোপাধ্যায়

হে দীঘা, বিদায়!
ফেনিল উচ্ছল ঐ
সাগরের জলে
কত রাতে
দেখেছি তোমায়।
ঝাউ মর্মর মাঝে
বসন্তে নূপুর বাজে,
হরিৎ শ্যামল ভূমি
সলাজ আঁখিটি মেলি চায়,
হে দীঘা, বিদায়!
(তুমি) শীতের কুয়াসা ঠেলি
হাতে আবিরের থালি
সাগরে সিনান করি
হয়েছ উদয়,
আবার বিদায়ক্ষণে
হয় তো আপন মনে
মুঠো মুঠো আবিরেরে
গিয়াছ ছড়ায়,
হে দীঘা, বিদায়!

যে পথ দিয়ে হেঁটে এসেছ সে পথ কি কখনও পেছন ফিরে তাকিয়েছ ? যদি তাকিয়ে থাক তো দেখবে কত ভুল-ভ্রান্তির ছায়া পড়েছে সে পথে। যাকে আপাতদৃষ্টিতে এক ভাবা যায়, অনেকদূর থেকে দেখলে তাকে দেখায় অন্য এক। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এসেছিলাম লণ্ডনে—শ্রমণ হয়ে। আজ বাত রোগগ্রস্ত ভিক্ষু আমি। না ভিক্ষু না—মহানায়ক, শ্রমণ-শ্রাবক-উপাধ্যায়, অধিনায়ক, মহানায়ক—কত সিঁড়ি তুমি পার হোয়েছ উদ্দালক। কি দিয়েছ জীবনকে ? পঁয়ত্রিশ বছর ? না অনেককে করুণা আর মৈত্রীর বাণী ? প্রথম যবে এসেছিলে তখন কেউ কেউ তোমাকে বলত 'অলস শ্রমণ উদ্দালক,' এত অলস শ্রমণ যে তুমি বোধ হয় কোনদিন ভিক্ষুও হ'তে পারবে না বলতো ওরা। লণ্ডনের সংঘে এসেছিলে সেবা করতে। আর প্রতিদিন পিছন ফিরে তাকাতে কাণ্ডির সংঘের জন্যে। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে তার কথা ভেবে। সেই অশোক-কানন, সেই বকুল-বীথি, তার পর আবার কাণ্ডিতে গেলে, আবার ফেরৎ এলে লণ্ডনে। সেই থেকে আছ লণ্ডনে। বত্রিশ বছর হয়ে গেল দ্বিতীয় বার আসার পর। মনে পড়ে কি ভিক্ষু মেত্তা আর উপাধ্যায় আনন্দের কথা ? মৈত্রেয় বুদ্ধের পথ চেয়ে তাদের প্রস্তুতি ? পঁয়ত্রিশ বছর। অনেক দিন। আর মনে পড়ে লণ্ডনের প্রথম রবিবারগুলো।

রবিবার দিন আমার একদম ভাল লাগতো না লণ্ডনে। রবিবার যে একটা বিশেষ বার তা কাণ্ডিতে থাকার সময় জানতাম না। আমার সব দিনই ছিল সমান। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত এই ছিল আমার ঘড়ি। সূর্যের চেয়ে বেশি ভাবতাম চাঁদের কথা। বিশেষ পূর্ণিমার কথা। ২৫০০ বছর আগে এই পূর্ণচাঁদের আলোয় বৈশাখী পূর্ণিমায় শাক্যমুনি জন্মেছিল। তথাগত বুদ্ধ। তখনও রবিবার ছিল নিশ্চয়। কিন্তু লণ্ডনের রবিবার—তা অতুল্য।

রবিবার সাধারণত দানের দিন পড়তে লণ্ডনে, সিংহলী বৌদ্ধরা একটা কিছু উপলক্ষ্য করে সংঘে দান করতো—ভিক্ষু সেবা করত, ভিক্ষু ভোজন করাতো প্রথম দানের ব্যাপারটা মনে পড়লে আজ হাসি পায়। যারা 'দানের আয়োজন' ক'রেছিল তারা নিজেরাই সব খাবার সামগ্রী সওদা করে এনেছিল। মাছ তরী-তরকারী, কাটা-মুর্গী সব কিছু। রাঁধতে গিয়ে ওরা দেখে যে নুন কেনা হয় নি। শনিবার দিন আমি নজর করেছিলাম—নুন বাড়ন্ত। ঠিক ছিল বিকেলের দিকে বাজার থেকে কিনে আনবো। ঠিক বিকেলের মুখে একরাজ্যের চিঠি টাইপ করতে দিয়ে গেল উপাধ্যায় আনন্দ। আমাকে সেগুলো টাইপ করে পাঠাতে হবে রাষ্ট্রদূত ভবনে আর ছাত্রাবাসে। টাইপ করতে করতে নুনের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। দু' হাজার বছর আগে যে শ্রমণ, ভিক্ষু হবার জন্যে ভিক্ষু সেবা করত সে বোধ হয় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতো না যে টাইপ করা ভিক্ষু সেবার এক অংগ !

নুন কিন্তু সেদিন মহা সমস্যায় ফেলেছিল। লণ্ডনের দোকান বাজার সাধারণত রবিবার দিন বন্ধ থাকে। কোন কোন পাড়ায় অবশ্য ছোটখাট দোকান খোলা থাকে—কিন্তু আমাদের সংঘ লণ্ডনের যে পাড়ায় সেখানে তো ছোটখাট দোকানপাটের বালাই নেই। একেবারে খানদানী পাড়া। আমি তখন মন্দিরের ঘণ্টা পালিশ করছিলাম যখন ওদের একজন মন্দিরের দরজায় এলো।

'নমস্কার শ্রমণ উদ্দালক' একটু হেঁট হয়ে আমাকে সম্মান জানাল। মুখ তুলে তাকালাম।

'আমাদের একটু নুন দরকার রাঁধবার জন্যে। বলে দেবেন কি, কোথায় আছে ভাঁড়ার ঘরের ?'

'নুন তো ফুরিয়ে গেছে গতকাল, কেন তোমরা অন্য সামগ্রীর সংগে নুন আনো নি ?'

'কিন্তু আমরাও যে নুন কিনতে ভুলে গেছি'—মেয়েটি বললে।

সিংহলের সংঘ হ'লে তখুনি চলে যেতাম লবণ-ভিক্ষা করতে। কিন্তু লণ্ডনে লবণ ভিক্ষা ! কি জবাব দেব ভাবছিলাম।

'তোমাদের কেউ কি তার বাড়ি থেকে নুন নিয়ে আসতে পারে না ? এ ছাড়া তো কোন পথ দেখছি না কারণ এ অঞ্চলের কোন দোকানই আজ খোলা পাবে না।'

একটু পরে মন্দির থেকে কোথায় যেন যাবার সময় শুনলাম ওরা আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে।

'কি অলস শ্রমণ বাবা ! এমনটি জন্মেও দেখি নি। এখানকার ভিক্ষুরা বোধ হয় উপবাসে দিন কাটায়।'

'ভাঁড়ার ঘরে নুন অবধি নেই।'

'ওর আর একটা নাম আছে জান কি ? অলস উদ্দালক'

অলস শব্দটা খুব টেনে টেনে বলা হোল।

কিছু না বলে চলে এলাম। আমার কিছুই বলার নেই ওরা গৃহী। ভুল তো ওরা করবেই। ওরা দুঃখ-ক্রোধে অভিভূত হবে। তাই তো ওরা অসম্পূর্ণ। এই তার—প্রথমে আশ্রয় ক'র

ওদের মনকে—তারপর দেহকে। এই অনিত্যতা পঞ্চখণ্ডে প্রকাশ পাবে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার আর বিজ্ঞানে।

লাইব্রেরী ঘরে সেদিন কেন জানি না উপাধ্যায় আনন্দকে আমার মন্তরে এসেছিল। উপাধ্যায় আনন্দই আমাকে মাঝে মাঝে বলতো —'অলস উদ্দালক।' কালো রং-এর আনন্দ। কুচকুচে কালো—ঠিক সিংহলী মুর। অথচ চোখ দু'টো কটা। আমি আনন্দের তত্ত্বাবধান ক'রতাম। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই উপাধ্যায়ের কাছে আমাকে একবাটি কফি পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। এই তোল আমার প্রথম কাজ। তারপর প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর বাটির পর বাটি। আমার দু'-একবার দেরী হয়েছিল—ঘুম থেকে উঠতে। ভুলও হয়েছিল দু'-একবার। তাই আমার নাম হোল 'অলস-উদ্দালক।' আনন্দ সিংহলের অনুরাধাপুরে শ্রমণ ছিল অনেক বছর আগে। ভিক্ষু পর্যায়ে আসবার আগে অন্তত পাঁচবছর শ্রমণ হয়ে থাকতে হয়। এই পাঁচবছর সংঘের সেবাই হোল শ্রমণের প্রধান কাজ। রাজনীতির নামকরা ছাত্র ছিল আনন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবন না নিয়ে সে নিল ভিক্ষুর ভিক্ষাভাণ্ড।

আর এক রবিবারের দানের কথা মনে পড়ে। মালিনী সামরতুংগা সেদিন দান করছিল তার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে। আজকের তারিখে তার মা মারা গেছেন পাঁচবছর আগে।

'আমার সাতজন অতিথি আছে—যারা এখানে খাবে, আর সংঘের আপনারা পাঁচজন। সকলে মিলে হোল তেরজন। এই সামগ্রীতে হবে কি?'

থলি থেকে ও একে একে সব সামগ্রী বের ক'রলো। মস্ত বড় বড় দু'টো ম্যাকেরেল মাছ, চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, আর ফরাসবীন্। আর একটিন কফি।'

'মাংস ভাল পেলাম না—তবে ম্যাকেরেল মাছটা খুবই ভাল। রান্না আমরা তিনজনে মিলে কোরব। আপনাকে খালি দু'-একটা জিনিষ দেখিয়ে দিতে হবে।'

'সবই তো তোমার জানা আছে।' বললাম, 'শুধু জল-ব্যবহার করার সময়ে একটা ন্যাকড়ায় জলটা ছেঁকে নিও। যদি অসাবধানে কোন জীব জলে পড়ে থাকে তো জীবহত্যার দায় হবে।' এই একই কথা সংঘে যারা রান্না করে তাদের বারে বার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। অসাবধানতায় জীবহত্যার দায় থেকে ওদের সাবধান করা। এই নিয়ে এক তামিল-হিন্দু-সিংহলী ওদের সংগে বাদানুবাদও করেছে।

'রাঁধবার সময় যে জল ব্যবহার ক'রবে সেটা একটা ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিও আগে। অসাবধানে যদি কোন জীব থাকে ওই জলে তো জীব হত্যার দায় হবে।' এই কথাটি আবার বলেছিলাম।

তামিল ছেলেটি আমি রান্নাঘরের চৌকাঠ পার না হোতেই ব্যঙ্গ করেছিল। 'জল ছেঁকে জীবহত্যা নিবারণ হ'চ্ছে, কিন্তু এই যে উত্তম মৎস্য ও কখন সখন কুক্কুট-মাংস ভোজন হয়, সেটা কি জাতীয় জীব-প্রেম?'—

তামিল ছেলেটির অজ্ঞতা আমাকে পীড়া দিয়েছিল। ভিক্ষু যে দাতাকে কখনও বিমুখ কর'তে পারে না ও তা জানে না। কুক্কুট-মাংস ভোজন ভিক্ষু স্ব-ইচ্ছায় করে না, ভিক্ষুকে দান করা হয় বলে সে গ্রহণ করে। শাক্যসিংহ শবর-প্রদত্ত শূকর-মাংস গ্রহণ ক'রেছিলেন দাতাকে প্রত্যাখ্যান চলে না। সংঘে যে দানের আয়োজন হয়ে থাকে তা হয় দাতার ইচ্ছায়। ভিক্ষুকে যা নিবেদন করা হবে, সে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। সাধারণ লোক কিন্তু তা বোঝে না। তারা তলিয়ে দেখে না—অকারণ দোষারোপ করে ভিক্ষু আর শ্রমণকে।

লণ্ডনের রবিবার। তোমাকে কত ভাবে মনে পড়ে।

২

পায়ের ব্যাণ্ডেজটায় হাত দিয়ে দেখছি—গেঁটেবাত বেশ কাবু করেছে আমাকে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা। পাশ ফিরে শুলাম। মহানায়ক উদ্দালক কি ভাবছ? ভাবছি—তার পরের অংশ।

খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল—মহানায়ক অতীশ গল্প বলছিলেন—জাতকের গল্প। আমি আজকে ওদের সংগে একাসনে বসে খেয়েছি। খাবার টেবিলে মালিনী আর কান্তি—দু'জনে পাত্র করে গরম জল দিয়ে গেল। হাত ধুলাম আঙুল ডুবিয়ে আমরা সকলে, একে একে। তারপর তোয়ালে এনে দিল ওরা হাত মোছার। আমরা সকলে হাত মুছলাম। এবার ওরা ছোট ছোট কফির পাত্রে কফি নিয়ে এলো।

'সাদা কফি না কালো কফি' ওরা প্রশ্ন কোরল। আমরা সকলেই সাদা কফি পেলাম। কালো কফি কেউ পেতাম না। 'ছোট এব বাটিতে আনন্দের গণ্ডূষ পান হবে'—বলে মহানায়ক অতীশ হাসলেন আমরা সকলেই হাসলাম। আমি বেশ জোরে জোরে। রোজই তে আমাকে বাটির পর বাটি কফি তৈরি ক'রতে হয় আনন্দের জন্যে কফি খাবার শেষ হবার পর মহানায়ক ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তি করলেন তিন বার—একের পর এক। তারপর আমরা আবৃত্তি করলাম ত্রি-শরণ গমন। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণম্ গচ্ছামি।'

ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তির সময়ে আমার এখনও মনে পড়ে মেত্তাকে। আমি যেদিন প্রথম সংঘে এসেছিলাম কাণ্ডিতে, সেদিন মেত্তা ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তি করেছিল। গম্ভীর, গভীর সেই ডাক প্রতিদিন প্রভাতে যখন নিজে ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তি করি তখন মেত্তাকে আমার মনে আসে না। মনে আসে তখন অমিতাভ বুদ্ধের কথা। প্রস্ফুটিত কৌমুদীর মত যার মুখ-পদ্ম। লাঞ্ছন-হীন শশাঙ্ক নীলোৎপলের মত যার চোখ, কনক-পর্বতের আভার মত যা দেহ-দ্যুতি। অগ্নিশিখার শিখার মত দীপ্ত, মহাশূন্যের মত যে নির্মল অথচ দান উপলক্ষে যখন জাতকের গল্প বলার আগে যখন মহানায়ক অধিনায়ক বা উপাধ্যায় যে কেউ ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তি করে তখন মনে আসতো অধিনায়ক মেত্তাকে। কাণ্ডির সংঘের অধিনায়ক মেত্তা আমি যখন শ্রমণ হয়ে প্রথমে আসি সেখানে তখন মেত্তা ছিল অধিনায়ক, বয়স তখন তার পঁচিশ কি ছাব্বিশ। সবল-ঋজু দেহ আনন্দের মত সেও ছিল ইউনিভার্সিটির নাম করা ছাত্র। শুধু লেখা পড়ায় না—সব দিক দিয়ে। এমন সুকণ্ঠ গায়ক তখন সেই অঞ্চলে আর কেউ ছিলো না। তার আবৃত্তি শুনতাম উদগ্র শ্রবণে। য থেকে সে সুর আসতো না—আসতো নাভিপদ্ম থেকে। মেত্তার ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তিতে রোমাঞ্চ হোত দেহে, মন উধাও হো নভসীমে। ভাবতাম অমিতাভ বুদ্ধের কথা। কি গভীর সেই বা যার জন্যে যুগে যুগে গৃহী ঘর ছেড়েছে—শ্রেষ্ঠী সর্বস্ব দান করেছে

টা নূপুর খসিয়ে ক'রেছে মস্তক মুণ্ডন। আর আজ ভিক্ষু-আনন্দ াজনীতির এম এ ডিগ্রী ছেড়ে নিয়েছে গৈরিক-কন্থা। ক্ষু-ভাণ্ড।

জাতকের গল্প বলা শেষ হয়ে গিয়েছিল মহানায়ক অতীশের। হানায়ক গাত্রোত্থান ক'রলেন। আজ আমার উচ্ছিষ্ট মুক্তির কাজ নই। অব্যাহতি পেয়েছিলাম। মালিনী আর কান্তি সেই কাজ রবে। কিন্তু এর চেয়ে আরো এক বড় কাজ আছে। অপরাহ্নে নতলার লাইব্রেরীঘরে যে সভা হবে—তার কিছু কাজ বাকি। পাধ্যায় আনন্দ—দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার াহিনী নিয়ে আলোচনা ক'রবেন। ভিক্ষুরা সামাজিক ভাবে আর ষ্ট্রীয় জীবনে অতীতে যে ভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—জদূত হিসাবে তাঁরা যে ভাবে পররাষ্ট্রে যেতেন বৌদ্ধ-মহিমা প্রচারে, ই হোল বিষয়বস্তু।

সেদিনের বিকেলের সভায় জনসংখ্যা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। কেলের জন-সভায় আলোচনায় সাধারণত শ্রোতৃবর্গ থাকে কিছু হলী, কিছু ভারতীয় আর কিছু ইংরাজ। কদাচ দু'একজন কিনীও এসে থাকেন, মহানায়ক বা অধিনায়ক অথবা কোনও বিশেষ ামন্ত্রিত ব্যক্তি কোনও এক বিষয়বস্তু নিয়ে বলে থাকেন। আমরা কি সভার এক পার্শ্বে শ্রোতৃবর্গের অপর পার্শ্বে বক্তৃতার শেষে শ্রোতারা শ্ন করে তাদের জিজ্ঞাসা। এই হোল সাধারণ নিয়ম। আজকের নসংখ্যা মাত্র পাঁচজন—আর তারা সকলেই সিংহলী। উপাধ্যায় নন্দ, মহানায়ক অতীশকে বললেন যে, তাঁরা ঘরোয়াভাবে কিছু ালোচনা করতে চান। মহানায়ক সম্মতি দিয়ে উঠে গেলেন—ামরাও একে একে চলে এলাম। এ ঘটনা আমি আর একবারও খেছিলাম—আর সেবারের ঘটনা জলের দাগের মত মুছে যায় নি—রণ সেইবারের আলোচনাসভার চিঠি অবধি আমাকে টাইপ রতে দেওয়া হয় নি। উপাধ্যায় আনন্দ নিজের হাতে সে চিঠির কানা লিখে স্বয়ং পোস্ট করে এসেছিলেন। উপাধ্যায় আনন্দ কদিন রাজনীতির ছাত্র ছিলেন জানি—কিন্তু আমার যখনই মনে াত যে সংঘে বোধহয় রাজনীতি হয়, তখন আমার ভাল লাগতো না। কদিন আনন্দকে খুব উত্তেজিত ভাবে এই বিষয় আলোচনা করতে নেছিলাম। শাক্য-সিংহ নিজেই ছিলেন রাজপুত্র—তাঁর রাজত্বও ল। শাক্য-সিংহের মত রাজা আসুক, এই যেন হয় প্রতিটি ক্ষুর কাম্য আর তার জন্য প্রস্তুতি চাই। সুবর্ণপ্রভাস সূত্রেতে খা আছে যে, যে রাজা হয়ে জন্মায় সে পায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা। বরের বিভব তার আয়ত্তে আসে তাই সে নর-দেহে হয় বুদ্ধ। নন কি বৌদ্ধ-ইতিহাসের যে অংশ অনুরাধাপুর-কাল বলে উল্লিখিত খানে আছে বোধি-রাজ সম্বন্ধে আলোচনা। উপাধ্যায় আনন্দ ত্রেয় বুদ্ধে বিশ্বাসী। বুদ্ধ-গৌতমের মহা-নির্বাণের চারহাজার র পরে মৈত্রেয়বুদ্ধ আসবে নর-দেহে। হীনায়ণ আর মহায়ণ য় সম্প্রদায়ের অনেকেই তাই মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রত্যাশায় আছে। ধি-গয়ার কাছে কক্কুট-পদে পর্বতের সন্নিকটে কাশ্যপ বুদ্ধের সমাধি। ত্রেয় যবে পৃথিবীতে জন্মাবে, সে তখন এসে দাঁড়াবে কক্কুট-পাদ-দর সামনে। স্তূপ তখন আপনা-হোতে হ'য়ে যাবে দ্বিধাবিভক্ত। শ্যপ-বুদ্ধ দেবে মৈত্রেয় বুদ্ধকে ভিক্ষুর গাত্রাবাস। এই অনাগত দিনের বোধিরাজের জন্তে ভিক্ষুদের প্রস্তুতি চাই—বিশ্বাস চাই-আয়োজন চাই। এ কি তার আয়োজন ?

মেত্‌তাও মৈত্রেয় বুদ্ধের বোধি-রাজত্বে বিশ্বাসী ছিল। আমা এই নিয়ে সে কতবার কত কথা বলেছে—তার কিছু ভাল লাগত কিছু লাগতো না। কিন্তু একটা জিনিষ উপলব্ধি করতাম। যেন সে পায় নি। কিসের যেন সে সন্ধানে আছে তার নাগা পেয়েও বোধ হয় পাচ্ছে না। সে কি করুণা ? বোধ হয় সে অসী করুণাকে সসীমের পর্যায়ে দেখতে চায়। না সে বৌদ্ধ-রাজের স্ব মগ্ন ? সিংহলে বোধি-রাজ আসুক ভিক্ষুর মন্ত্রণায় রাজত্ব চলুক ভিক্ষুর ছিন্ন-কন্থা আর ভিক্ষা-ভাণ্ডে যে প্রশ্নের উত্তর আছে—সে প্রশ্ন কি মেত্‌তার ছিলো না ? আমি শ্রমণ উদ্দালক তো তখন গেরুয়া গাত্রাবাস আর ভিক্ষুর ভিক্ষা-ভাণ্ড পেলে সব পেয়েছি ব মনে করতাম। ওরা তা পেয়েও কেন আরও চেয়েছিল ? মেত্‌ত তার জবাব পায় নি—আমি তা জানি। আমি তা দেখেছি উপাধ্যায় আনন্দ তুমি কি বোধি-রাজত্বের স্বপ্ন আজও দেখ ?

৩

দমকা বাতাস অসেছে কোথা থেকে ? আমার বাত আবার বেড়ে যায় এই বাতাস লাগলে। নতুন শ্রমণ চিত্রল বোধ হয় জানলাট ভাল করে বন্ধ করে নি। দেওয়ালে রাখা শ্রী-লংকার ম্যাপটা উড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে আবার—শ্রী-লংকা তোমাকে লণ্ডন ফেরং দেখেছিলাম নতুন চোখে। লণ্ডন থেকে কান্তির সংঘে ফেরং এসেছিলাম ভিক্ষু হতে। নতুন চোখেই দেখলাম।

আবার যেন নতুন করে দেখলাম তোমাকে শ্রী-লংকা। তোমার আলো এত যে চোখে ধাঁধা লাগে। তোমার নীল এত নীল যে কে তার গভীরতা মাপতে পারে ? আবার তোমার মেঘ এত কালো হয়ে আসে সহসা যে মনে হয় সব যেন ডুবে যাবে। শ্রীলংকা—সাগর মেখলা। সাগর মেখলা কেন ভাবলাম ? ভিক্ষুর পৃথিবীতে নারীর অস্তিত্ব নেই। বসুন্ধরাকে নারী কল্পনা করে তার নীবিতে সাগর হয়েছে মেখলা। পর্বতচূড়া তার উত্তুঙ্গ স্তন-ভার। এ নিশ্চয় ব্রাহ্মণ কবির কষ্ট কল্পনা। আমার তা কোন দিনও মনে হবে না। তবু সিংহলকে দেখে আনন্দ হয়। ভিক্ষুর এ ভাবান্তর সাজে না।

কান্তির সংঘে শ্রমণ উদ্দালকের জীবন সমাপ্তি, ভিক্ষু উদ্দালকের জীবন আরম্ভ। লণ্ডনে উপাধ্যায় আনন্দ সম্মতি দিয়েছে আমার ভিক্ষু হবার। পরীক্ষায় পাশ করেছে অলস-শ্রমণ-উদ্দালক। সংঘে ভিক্ষু-জীবনের অভিষেক হবে। হ্যাঁ অভিষেকই। স-সাগরা পৃথ্বীর যে রত্ন-ভার আছে সকলের অগম্য সেই অনন্ত রহস্যপূর্ণ জীবনের দরজা খুলে যাবে আমার সামনে। প্রবেশাধিকার লাভ করবে উদ্দালক। ঝাপসা হয় নি সে দৃশ্য এখনও দেখছি তা স্পষ্ট।

'নমো তস্স ভাগবতো অর্হতো সমসম্যোবুদ্ধস্য' পালিতে আবৃত্তি করছিলেন নব গৃহে মহানায়ক যেখানে আমাদের ভিক্ষু জীবনের অভিষেক হবে। হাতে আমার ভিক্ষুর গৈরিক গাত্রাবাস। মহানায়ক বসে আছেন গালিচায়। হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি। 'ভগবান আমাকে করুণা কর, করুণা কর, করুণা কর' বললাম তিনবার। এই ভিক্ষুর গৈরিক গাত্রাবাস আমাকে দান করুন মহানায়ক, এই গাত্রাবাসে আমার প্রব্রজ্যা হোক' আমার নির্বাণের সহায় হোক।'

খুলে দিলাম আমার অংগের পার্থিব বাস। মহানায়ক হাতে তুলে দিলেন ভিক্ষুবাস। 'কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক···ত্বক দন্ত নখ লোম কেশ' ত্বক পঞ্চক আবৃত্তি করলেন মহানায়ক। আমার দৈহিক দেহের মরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'সজ্ঞানে এই ভিক্ষু-বাস নিলাম আমি—শীত নিবারণের জন্য আতপ ক্লেশ নিবারণের জন্য, কীট-পতংগ দংশন রোধের জন্য আমার নগ্নতা আবরণের জন্য'—অতি দীনতার সংগে বললাম। 'আমার যদি কোন ত্রুটি থাকে, হে ভগবান তার জন্যে বারেবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ত্রি-রত্ন আর দশ শিক্ষাপদ দান করুন আমাকে।

'তোমার নাম উদ্দালক?'—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মহানায়ক।

'হ্যাঁ ভগবান।'

'তোমার সংঘগুরু উপাধ্যায় আনন্দ?'

'হ্যাঁ ভগবান।'

'এই কি তোমার ভিক্ষাভাণ্ড আর ভিক্ষু জীবনের গৈরিক গাত্রাবাস?

'হ্যাঁ ভগবান।'

'উদ্দালক, যাও তুমি পাদ-পীঠে গিয়ে দাঁড়াও'—আদেশ হোল আমার প্রতি।

স্তূপের পাদপীঠে এসে দাঁড়ালাম। মহানায়ক তখন সমবেত ভিক্ষুদের বললেন—'উদ্দালক ভিক্ষু-জীবন চায় সমবেত ভিক্ষুরা। আপনারা তার নিজ মুখে স্বীকৃতি শুনুন। আর উদ্দালক, তোমাকে যে প্রশ্ন করা হবে তার সত্য উত্তর দেবে—সম্পূর্ণ সত্য, কোনও কিছু যেন গোপন না থাকে।'

'উদ্দালক, তোমার কি কুষ্ঠব্যাধি আছে বা মৃগী-রোগ। কোনও ক্ষত, কোনও দুষ্ট ব্রণ?'

'না ভগবান।'

'উদ্দালক তুমি কি পুরুষ?'

'হ্যাঁ ভগবান।'

'তুমি কি স্বাধীন? স্বেচ্ছায় ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করছ—অ-ঋণী?'

'হ্যাঁ ভগবান।'

সমবেত ভিক্ষুদের সম্মতি পেলাম। মহানায়ক আমাকে পরিয়ে দিলেন গৈরিক গাত্রাবাস। হাতে দিলেন ভিক্ষুর ভিক্ষাভাণ্ড। আমার নতুন জীবন আরম্ভ হোল। কত বছর হবে? তিরিশ—না আরও বেশি।

নতুন জীবনের কথা ভাবছি আমি—মহানায়ক উদ্দালক। কাণ্ডিতে নতুন জীবন আরম্ভ হোল—কিন্তু মেত্তা তখন নেই সেখানে। মেত্তার সংগে কাণ্ডির কত জায়গায় আমি যে গিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

এই পথেও কতবার হেঁটেছি—এবারে আমার অংগে ভিক্ষুর গাত্রাবাস। এবারে আমি শ্রমণ নই ভিক্ষু। অধিনায়ক মেত্তার সংগে এই পথে কতবার হেঁটেছি। গ্রাম যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অরণ্যানীর সুর। গলাগলি করে নিবিড় ভাবে বন আরম্ভ হয়েছে—পায়ে চলা পথ তার তলায়। একটু এগিয়েই জলাভূমি। অসংখ্য কপিবৃন্দের অবিশ্রান্ত আলাপ শোনা যাবে দূর থেকে। পাখীর ডাকের সংগে তার ঐকতানের অপূর্ব সমন্বয়। বানরেরা যদি মানুষের আসার শব্দ পায়, হঠাৎ সে সুর উঁচু সুরে উঠে একেবারে থেমে যাবে। মেত্তার সংগে যেতাম ভেদ্দাদের আস্তানায়।

ভেদ্দারা সিংহলের আদিবাসী। কুচকুচে কালো এরা নয়—এদের রং বাদামী। চকোলেটের মত। মাথায় এক মাথা চুল ঝাঁকড়া হয়ে আছে। চুল এরা কাটবে না, মাথায় ছোটও সিংহলীদের চেয়ে—চলন চিতার মত ক্ষিপ্র। নাকটা মোটা। ভেদ্দাদের ধর্ম নেই, ঈশ্বর নেই—শুধু আছে ভয়। মৃতদেহকে এরা ভয় করে। শব অতি ভয়াল, ঈশ্বর-ভীতি? না ঈশ্বরকে তারা ভয় করে না ভালও বাসে না। ঈশ্বর আবার কে? কেউ কি তাকে কখনও চাক্ষুষ দেখেছে যে লোকে ভগবান ভগবান করে মাথা কুটছে। সে লোকটা কি মেয়ে না ছেলে? সে থাকে বা কোথায়? পাহাড়ে? জংগলে? জলায়? মানুষের প্রথম সৃষ্টি কবে হয়েছিল তা নিয়েও ওরা মাথা ঘামায় না। ওদের কাছে সব চেয়ে বড় হোল 'নে ইয়াকু'। পাহাড়ের গুহায় নদীর স্রোতে, জলার ঝাঁকির মধ্যে অশরীরী তারা আছে। সেই হোল সব চেয়ে বড়।

ভেদ্দাদের মেয়ে কাপুরু আসতো কাণ্ডির সংঘে প্রায়ই। আমি তখন নতুন শ্রমণ—মেত্তা উপাধ্যায়, গভীর জংগল থেকে কাপুরু আনতো ফল-মূল আর মধু। 'তোমাদের ভগবানকে দান কোরব' বলে জিনিষগুলো রাখতো নামিয়ে। আমি সে দান গ্রহণ করতে গেলে—সে রাজী হোত না দিতে। 'তোমাকে নয়, তোমাকে নয়, উদ্দালক শ্রমণ, তুমি তো ভিক্ষু নও। আমি দান এনেছি উপাধ্যায় মেত্তার জন্যে।' ভিক্ষু আর শ্রমণের পার্থক্য কাপুরুর জানার কথা নয়। কি করে ও জেনেছিল জানি না। মেত্তা সংঘে না থাকলে বা কোনও কাজে ব্যস্ত থাকলে ও বসে থাকতো অনেকক্ষণ। মেত্তার অপেক্ষায়। আমার হাসি পেত ওর ছেলেমানুষী দেখে, দানের শেষে কাপুরু কিন্তু চলে যেত না। বসে থাকতো বলতো—'তোমরা তো দানের শেষে গল্প বল। আমাকে গল্প বলবে না?'

'গল্প নয় কাপুরু, এ হোল জীবন-দর্শন। (জীবন-দর্শন কি বস্তু ভেদ্দারা কি মানতো?) জাতকের গল্পে যে উপদেশ আছে তা অমূল্য। 'এসো তোমাদের জাতকের কথা বলি।' এই বলে মেত্তা যারা দান করতে এসেছে সকলকে এক সংগে গম্ভীর, গম্ভীর সুরে গল্প শোনাত।

কাপুরুকে আমার প্রথমে নজরে আসে নি। আসার কথাও নয়। সংঘে কত দরিদ্রজন আসে। বস্তুতঃ সংঘে যারা আসে তাদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশি। শুধু নজরে এসেছিল আমার ওর জেদের জন্য। দানের সামগ্রী আমাকে কিছুতেই দেবে না। মেত্তাকে দিতে হবে। কাপুরুকে আমি কখনও বিশেষ ভাবে দেখিও নি। শ্রমণের পৃথিবী আলাদা—সেখানে নারীর স্থান নেই। নারী হোল মারের দোসর। তার আছে চৌষট্টি কলা—প্রলোভনের চৌষট্টি কলা।

জিজ্ঞাসুকে ভিক্ষু কখনও বিমুখ করে না যেমন সে করে না দাতাকে। কাপুরু শুধু দাতা ছিলো না, সে ছিল জিজ্ঞাসুও মেত্তাকে সে হাজিজারি কত প্রশ্ন করতো, যার মাথা-মুণ্ডু নেই মেত্তা তার জিজ্ঞাসা সানন্দে গ্রহণ কোরত। কাপুরুর এই অকার

প্রশ্নগুলো আমার ভাল লাগতো না। আর তাই বোধ হয় আমার চোখে, কাপুরু অন্য একজন হয়ে গেল। আমার নজরে এলো াপুরু শুধু নারী নয়—উদ্ভিন্ন-যৌবনা।

ও এতো 'মধু আনে কোথা থেকে?' মেত্তাকে বোলতাম। দুলাদের একে পয়সা কড়ি কিছুই নেই। ওরা অতি দীন, এই মধু ক্রি করে ওদের চলে, আর এই গরীব মেয়েটা রোজ মধু আনছে ামাদের জন্যে? ফলমূলের কথা আলাদা। কিন্তু এতো মধু ও পায় কোথা থেকে। ওর কি মধুর খনি আছে? দেখেও তো মনে হয় ও শ গরীব—বিক্রি বা করে না কেন কোথাও?' এক নিঃশ্বাসে এই গুলো কথা বলেছিলাম মেত্তাকে। মেত্তার ভিক্ষু-সুলভ খে ভাবান্তর দেখলাম না। 'ওরা বনে-জংগলে থাকে, সেখানে া কত মৌমাছির চাক। এসো আমার সংগে—আমি তোমাকে খিয়ে দেব।'

মেত্তার সংগে তাই জলা-জংগল পার হয়ে অরণ্যানীতে গিয়েছি। দুলাদের আবাসও দেখেছি দূর থেকে। মেত্তা কখন কখনও হুরাধাপুরের সাথে যেত। বোধ হয় রাজনৈতিক ব্যাপারে। এইরকম দিন বাইরে থেকে ফিরে আসার পরে মেত্তাকে দেখলাম। খলাম ভয় ওর মুখ—কেমন উদ্‌ভ্রান্ত।

'তোমার ভিক্ষু হতে আর কত দেরী উদ্দালক?' মেত্তা মাকে প্রশ্ন করলো।

'ভগবান বুদ্ধ জানেন উপাধ্যায়—কাশ্যির সাথে তিন বছর সেবা র বৈশাখ মাসে। আরো দু' বছর তো লাগবেই।'

'জান উদ্দালক, শ্রমণ যখন ভিক্ষু হয়, তখন তাকে কি কি স্মরণে খতে হয়? চতুর্বিধ পাপের কথা। এই পাপ থেকে সে নিজেকে ক্ত করবে। ভিক্ষা-ভাণ্ডে যে অন্ন আছে—তাই দিয়ে হোক উদর ণ। অন্ন সঞ্চয় পাপ। শীত তপ নিবারণের জন্য গাত্রাবরণ—াত্রাবরণ দেহ-শোভার জন্য নয়। স্ত্রী-সম্ভোগ পরম পাপ। যৌন-াসনাও যেন ভিক্ষুর মনে না আসে সে বাসনা মৃত্যু-তুল্য, আর ক্ষুক যা দান করা হবে সে শুধু তাই গ্রহণ করবে, এ ছাড়া কিছু াসের শীষও নয়।'

'অবাক হয়ে তাকালাম মেত্তার দিকে। চতুর্বিধ পাপের কথা কেন বলছে?'

'উদ্দালক, ভিক্ষু জীবন কি চায় জান কি? যে ভিক্ষু মৈত্রেয়বুদ্ধে াসী, সে চায় বোধি-রাজ। বোধি-রাজ আসুক সিংহলে। কিন্তু বিক করুণা ছাড়া তা সম্ভব নয়। কিন্তু চতুর্বিধ পাপের ছায়া ভিক্ষুকে স্পর্শ করেছে, সে কি মৈত্রেয়বুদ্ধের কথা ভাববার যোগ্যতা র?'

মেত্তা আর কিছু বলে নি। নিজ-গৃহে প্রবেশ করেছিল সংঘের। মি কিছু জিজ্ঞাসা করার ভরসাও করি নি। সেই রাত্রে প্রচণ্ড নেমেছিল। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ আর বজ্রপাত হচ্ছিল মুহুর্মুহু। ঘর চারদিকে জল জমে সংঘকে দেখাচ্ছিল ছোটখাট একটা দ্বীপের। ভোরবেলায় ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তি করে মেত্তার ঘরের নে এলাম বকি নিতে। দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার। কফির নিয়ে সংঘের চারদিকে ঘুরলাম, উঠোনে এলাম। তখনও বৃষ্টি ছে টিপ্‌ টিপ্‌ করে। সামনের বকুল গাছে হঠাৎ নজর গেল। বিস্ময়ে, আতংকে মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো। বকুল গাছের শাখায় ঝুলছে—মেত্তার গৈরিক গাত্রাবাস। বকুলকাণ্ডে দেখলাম তার ভিক্ষুর ভিক্ষা-ভাণ্ড। কেন এ কাজ করলে, কেন এ কাজ করলে মেত্তা বার বার বললাম। চতুর্বিধ পাপের কোন পাপ তোমাকে আশ্রয় করেছিল?

মেত্তা মুক্তি পেয়েছে। ভিক্ষু-জীবন থেকে মুক্তি নিয়েছে। যে ভিক্ষু-ভাণ্ডের জন্য আমার তপস্যা সেই ভিক্ষু-ভাণ্ড মেত্তা হেলায় ফেলে দিয়ে গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরে গেল। বললাম মনে মনে মেত্তা তুমি ও শ্রমণ হয়ে আমার মত জীবন আরম্ভ করেছিলে অমিতাভ-বুদ্ধের অমিত করুণা প্রত্যাশায়। তোমার শ্রমণ-তপ সার্থক হোল যবে তুমি পেলে ভিক্ষুর গৈরিক গাত্রাবাস আর ভিক্ষা-ভাণ্ড। আজ তোমার ভিক্ষু-বাস আর ভিক্ষা-ভাণ্ড পরিত্যাগ করে তুমি আমাদের জানালে যে তুমি ভিক্ষু-জীবন শেষ করে আবার গার্হস্থ্য-জীবনে চলে এলে। সংঘের আমরা সেদিনে অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু কৈফিয়ৎ তলব করার চেষ্টাও করি নি, তোমার পিছনে 'মার' আছে সর্বদা। দূষিত জীবনে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টাও আছে তার। তুমি যদি পূতিগন্ধময় জীবনের ডাকে তার পঙ্কিল আবর্তে ডুবতে চাও তো সে তোমার আপন ইচ্ছা!

উদ্দালক, তুমি এর কিছুদিন পরে লণ্ডনে চলে এলে কিন্তু তোমার মনে সেই জিজ্ঞাসা ছিল—মেত্তার চতুর্বিধ পাপের জিজ্ঞাসা। হাঁ, আমার সেই জিজ্ঞাসা ছিল। তাই আবার যখন কাণ্ডিতে ফেরং এলাম ভিক্ষু অভিষিক্ত হতে তারপর একদিন চলতে সুরু করলাম বন-পথে।

সংঘের দক্ষিণ দিক দিয়ে যে পথ গেছে, সেই পথে আমি এর আগে বহুবার হেঁটেছি। তখন ছিলাম শ্রমণ—এবারে ভিক্ষু। একটু এগিয়ে বন—তারপর জলা-জংগল পেরিয়ে ভেদ্দাদের আবাস। মনে ছিল একটা প্রশ্ন। কাপুরুকে যদি দেখি তো প্রশ্ন করি—মেত্তা কোথায়? সে কি সত্যই গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরে গেছে—না মারের প্রলোভনে সে তলিয়ে গেছে অতলে।

জলা-জংগল পেরোতে পেরোতে নাকে এলো একটা বিশ্রী গন্ধ। বাতাসে তা আসছে। কি যেন পুড়ছে। হিন্দুদের শ্মশানের পাশ থেকে মাঝে মাঝে এই বিশ্রী গন্ধ পেয়েছি। বাতাস গন্ধে ভারি হয়ে গেছে। আর একটু এগিয়ে দেখলাম—এক জায়গায় কয়েকজন ভেদ্দা জটলা করে বসে আছে, আগুন জ্বলছে তাদের মাঝখানে। আমাকে দেখে ওরা সব আলাদা হয়ে গেল, দেখলাম আগুনে ওরা একটা লাংগুর বানর ঝলসাচ্ছে। অগ্নি-জ্বালা-পক্ক লাংগুর ভোজন হবে। আমাকে কোন প্রশ্ন করতে হয় নি। ওদেরই একজন এগিয়ে এলো—অন্যেরা রইল দাঁড়িয়ে।

'তুমি এখানে কেন এসেছ আমাদের আস্তানায়—কি দরকার তোমার?' সে প্রশ্ন করলো। কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়, চোখ দু'টো তার কাঠের আগুনের ধোঁয়ায় লাল হয়ে গেছে। আমার উত্তর দেবার আগেই ভিড় সরিয়ে আর একজন এগিয়ে এলো। একে আমি চিনতাম, এ হোল কাপুরুর বাবা।

'দু বছর আগে তো একটা ন্যাড়া মাথা সন্ন্যাসী আমাদের অনেক জ্বালিয়ে গেছে? তুমিও তখন আসতে তার সংগে। এতদিনে তুব

মেরেছিলে—আবার কি মতলব তোমার? যুবতী মেয়ের খোঁজে এসেছ? ওসবটি আর হবে না—যদি মেয়ের খোঁজে আস তো মানে মানে বিদায় হও'—আহতস্বরে সে বলল।

'আমি তো সংগে কাউকে যাবার কথা কখনও বলি নি।' বললাম আমি, 'যদি কেউ স্বেচ্ছায় আসে তো আমি কি করবো?'

'ন্যাড়া মাথাকে কেন দোষ দিচ্ছ তুমি?' যে লোকটি সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিল সে বলল। 'মেয়েটাই তো নষ্টা ছিল। সেই ন্যাড়া মাথাটা তো পরমোলাকে খুন করে নি। পরমোলা নিজের দোষেই মরেছে—'

'কে কাকে খুন করেছে?' ভয়ে ভয়ে বললাম। 'পরমোলাই বা কে? আমার তো এসব কিছুই জানা নেই।'

আস্তে আস্তে সব শুনলাম। যে রাত্রে মেত্‌তা তার ভিক্ষুজীবন শেষ করে সেই দিনই ও এসেছিল ভেদ্দাদের আস্তানায়। কাপুরু ওকে ডেকে এনেছিল। বলেছিল, 'আমাদের তোমার ঠাকুরের কথা শোনাও, আমাদের অনেকের শোনার ইচ্ছে আছে কিন্তু সকলে সংগে যেতে ভয় পায়।' মেত্‌তা তাই এসেছিল এখানে। আমি মেত্‌তাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম, মেত্‌তা সেই প্রশ্ন করেছিল কাপুরুকে।

'এত মধু তুমি আনো কোথা থেকে। রোজ যে সংগে মধু দিয়ে যাও তা পাও কোনখানে?'

'ঐ যে খাড়াই পাহাড় আছে—তার গায়ে বুনো মৌমাছির চাক বাঁধে। সেখান থেকে আনি।'

'কিন্তু ও যে ভীষণ খাড়াই। ওখানে তো ওঠা যায় না—আন কি করে?'

হি-হি-হি-হি করে হেসে উঠেছিল কাপুরু—তার বাদামী মুখে সাদা দাঁত চরিবি ফলার মত ঝকমকিয়ে উঠেছিল। আর তার সংগে যোগ দিয়েছিল পরমোলা আর নীলা ভেদ্দা। কাপুরুর সংগে পরমোলার বিয়ে হবার প্রায় ঠিক, তবু নীলা ভেদ্দা ছিনে জোঁকের মত পিছে লেগেছিল। তাই কাপুরু তখনও মনস্থির করে উঠেনি।

'চল তোমাকে দেখাচ্ছি আমরা কি করে মধু আনি'—ওরা বলেছিল।

চারজন রওনা দিল খাড়াই পাহাড়ের দিকে। পরমোলার হাতে এক আকাশ প্রমাণ উঁচু মই। সে আর নীলা হাঁটছিল আগে। পেছনে কাপুরু আর মেত্‌তা। খাড়াই পাহাড়ের ধারে এসে ওরা ওপরের দিকে তাকাল—তারপর পাহাড়ের ওপরে উঠতে সুরু কোরল, একটু পরেই ওরা একটা খাদের ধারে এসে দাঁড়াল। এরই এক পাশে পাহাড়ের পাথরে পাথরে ঝুলছে অসংখ্য মৌচাক। একটা সুবিধে মত জায়গায় পরমোলা মই লাগাল পাহাড়ের গায়ে—তারপর মেত্‌তার দিকে চেয়ে বলল—'এসো তুমি এই মইটা চেপে ধরবে এস। বড় নড়বড়ে এটা।'

'আমি কেন, তোমার বন্ধু মই ধরুক। আমার বড় ভয় হচ্ছে।' মেত্‌তা বলে।

'নীলা কি করে মই ধরবে,' কাপুরু বলেছিল 'নীলা তো মই ধরতে পারে না। নিয়ম নেই তার।'

'মই ধরার আবার নিয়ম আছে না কি?' মেত্‌তা অবাক হয়ে বলেছিল।

'ওমা তুমি এত জান আর এও জানো না' কাপুরু বলেছিল। আমাকে যে পরমোলা আর নীলা দু'জনেই বিয়ে করতে চায়, তাই পরমোলা যদি মইয়ে চড়ে তো নীলার ধরার নিয়ম নেই। আর নীলা চড়লে পরমোলা ধরতে পারবে না। যদি কেউ কাউকে ফেলে দেয় আমাকে বিয়ে করার জন্য। তাই হোল এ নিয়ম, আর তুমি তো আমাকে বিয়ে করবে না তাই তুমি নিশ্চয়ই মই ধরতে পারো।'

নিমরাজী হয়ে মেত্‌তা মই ধরেছিল। কাঠবেড়ালীর মত ক্ষিপ্রগতিতে পরমোলা উঠে গেল সেই মইয়ের আগায়। তারপর মৌচাকের কাছে এসে ছোট একটা খন্তা দিয়ে আঘাত করল মৌচাকে। জীবহত্যার দায়ে নিজেকে অসহায় ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে তখন মেত্‌তা। মই ছাড়বার উপায়ও নেই। কাপুরুর দিকে সে তাকাল—দেখলো কাপুরু হাসছে। যেমন যেন ব্যংগ মাখান সেই হাসিতে। মেত্‌তা কিছুই বুঝলো না—কিসের সেই হাসি।

ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভন্-ভন-ভন্-ভন এক ঝাঁক বুনো মৌমাছি এসে সহসা আক্রমণ কোরল মেত্‌তাকে কাপুরুর দিকে না তাকিয়ে

থাকলে সে হয় তো একটা অসাবধানী হোত না। হাত থেকে মই ছুটে গেছে তার তখন, 'সামাল সামাল' নীলার চীৎকারে সে নিজেকে সামলে নিল কিন্তু ততক্ষণ পাহাড়ের চুড়ো থেকে পরমোলা পড়ে গেছে পাশের খাদে। সে খাদ থেকে আর সে উঠে আসে নি। কাপুরু কিন্তু এর পরে নীলাকে আর বিয়ে করে নি। এক কালো রং-এর খৃশ্চিয়ান সাহেবের সংগে সে চলে গিয়েছিল মালয়ের রাবার ক্ষেতে।

'মেত্তা কি করেছিল তখন?' প্রশ্ন করেছিলাম।

'ভয় পেয়েছিল—ভীষণ। আমরা যত বোঝাই যে মধু আনতে গেলে এমন দু'-একটা দুর্ঘটনা আমাদের মধ্যে প্রতি বছরই হয়ে থাকে সে কিছুতেই বুঝবে না। 'আমি খুনী, আমি খুনী, আমি মহাপাতকী' এই কথা সে বারবার বলছিল। আমরা কয়েকজন মিলে ওকে জলাজঙ্গল পেরিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম গ্রামের পথে।'

'ওই ন্যাড়া মাথাগুলোর জন্যে আমার সোমত্ত মেয়ে বে-জাতের কুত্তার সঙ্গে চলে গেছে' বলে থু থু করে কাপুরুর বাবা আমার মুখে থুথু ফেলল। তারপর 'ন্যাড়া-মাথারা সব দূরে যাও তফাৎ যাও' বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। যারা লাঙল-বানর বলসাচ্ছিলো তারা সামলালো ওকে।

'ওর সঙ্গে কেন খারাপ ব্যবহার কোরছ তোমরা, ওর কি দোষ' বলে আর একজন অল্পবয়সের ভেদ্দা এগিয়ে এলো।

'আমি নীলা ভেদ্দা—সেদিন মেত্তার সঙ্গে ছিলাম। আমি জানি তার কোনও দোষ ছিলো না। ঐ নষ্টা মাগী তো ঐ ন্যাড়া-মাথার দিকে তাকিয়ে কেমন মোহিনী হাসি হেসেছিল। সে-ই তো যত নষ্টের গোড়া।'

আবার জলা-জঙ্গল পেরিয়ে ফেরৎ এসেছিলাম আমি। ভাবছিলাম—উপাধ্যায় মেত্তা, তুমি চতুর্বিধ পাপের কথা আমাকে বলেছিলে সেদিন। কিন্তু প্রাণ-হত্যার কথা তো বলো নি। প্রাণ হত্যা যে পরম পাপ। তুমি প্রাণ-হত্যা করো নি জানি। কিন্তু কি দেখেছিলে তুমি ঐ ভেদ্দা মেয়ের মোহিনী হাসিতে?

৫

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজছে লণ্ডনের সংঘে, নতুন শ্রমণ চিত্রল ঘণ্টা বাজাচ্ছে কতকাল হয়ে গেছে এই ঘণ্টা শুনি। কত যুগ—কত বছর। প্রতিদিন শুনি একই ঘণ্টা—তবু মধুর লাগে। কাণ্ডির ঘণ্টাকে কত মধুর লাগতো—আজ তাকে ছাপিয়ে গেছে লণ্ডনের সংঘের ঘণ্টা এর সঙ্গে আমি একীভূত হয়ে গেছি—অলস-শ্রমণ-উদ্দালক হয়ে গেছে মহানায়ক উদ্দালক। কাণ্ডির সংঘ যেন স্বপ্ন হয়ে গেছে। সেই বকুলবীথি সেই অশোক কানন যেমন মঞ্জুরিত হোত তেমনি এখানে মঞ্জুরিত হয় লোবীলিয়া আর ব্লু-বেল। এই আমার গৃহ আমার চৈত্য আমার স্তূপ।

বাতের ব্যথা নিয়ে শুয়ে আছি তিনতলায়। নীচে বড় একটা নামি না। নতুন শ্রমণ চিত্রল এসে সব খবর দিয়ে যায়। গতকাল কলম্বো থেকে ডাক্তার গুণবর্ধন বলে একজন নামী লোক এসেছে সংঘের রবিবাসরীয় আলোচনায় বক্তৃতা দিতে। সংঘ এখন আমাদের অনেক বড় হয়েছে এর শাখা খোলাও হয়ে গেছে। সংঘের মাননীয় অতিথিদের থাকার ব্যবস্থাও আমরা আজকাল করি, অতিথিরা সংঘে থাকেন দু'-একদিন কেউ কেউ।

ঘণ্টার ধ্বনি থেমে গেল। চিত্রল এবারে নিজের ঘরে গিয়ে ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তি করবে। তারপর এক ঘণ্টা পরে আসবে আমার কাছে প্রাতরাশ নিয়ে। আজকে বৈশাখী পূর্ণিমা শাক্য-সিংহের আবির্ভাব আজকার দিনে হয়েছিল কপিলাবস্তুতে ঐ মুখারবিন্দ দেখবার জন্য মন-প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠলো। দোতলার মন্দিরে যাবার জন্যে উঠে বসলাম। বাতগ্রস্ত শরীরকে কোন ক্রমে নিয়ে এলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে। বৌদ্ধ-মন্দিরের দরজা খোলা—দেখলাম হাঁটু গেড়ে বসে কে একজন প্রার্থনা করছে। মাথার চুলগুলো প্রায় সব সাদা, অপরিচিত মুখ। বুঝলাম ডাঃ গুণবর্ধন এসেছেন মন্দিরে।

বাতের ব্যথাটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সিঁড়িতে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফিরে যাবার উপায় নেই। 'নমো তস্স ভগবতো অর্হতো সম্মসম্বোবুদ্ধস্স' পালিতে আবৃত্তি করছেন শুনলাম ডাঃ গুণবর্ধন। গলার স্বর আছে—বয়সের জন্য একটু ভেঙে গেছি। হঠাৎ চোখের সামনে থেকে কে যেন পর্দা তুলে নিল। এই কণ্ঠস্বর যে আমি চিনি। এই ত্রি-শরণ গমন আবৃত্তি হ'লে আমার প্রতি রোমকূপে শিহরণ জাগতো, এই উদাত্ত গম্ভীর ডাক আমি কি ভুলতে পারি? অমিতাভ বুদ্ধ। তোমার অমিত করুণা। ও ফিরে এসেছে। তোমার করুণা ভিক্ষা করছে। ভিক্ষুর গাত্রাবাস আর ভিক্ষাভাণ্ড মেত্তা ফেলে দিয়েছিল আজ ডাঃ গুণবর্ধন হয়ে সে তোমার করুণা চাইছে। ওর চোখে জল। কিন্তু এ কি, আমি কেন কিছু দেখছি না চোখে, আমার চোখ কেন এত ঝাপসা। নোনতা জলের স্বাদ আমার মুখে। আমারও চোখে কি এতই জল?

আলো-দাও। হে তথাগত আলো দাও—ধর্মবাদের ত্রি-শিক্ষার আলো দাও। বোধির জন্য আলো দাও—শীল সমাধি আর প্রজ্ঞার আলো দাও তুমি মেত্তাকে। মৈত্রী আর করুণা দাও ওর অন্তরে। ওর চতুর্বিধ পাপ মুক্ত হোক ওর অশ্রুধারায়। 'নমো তস্স ভগবতো অর্হতো সম্মসম্বোবুদ্ধস্স, নমো তস্স ভগবতো অর্হতো সম্মসম্বোবুদ্ধস্স, নমো তস্স ভগবতো অর্হতো...'

রিক্সতে আধঘণ্টা

শ্রীহীন মুসাফীর

[শ্রীহীন মুসাফীর লোকটি আমার নাম বেমালুম ব্যবহার করেন নিজ পরিচয় দেবার সময়। শুনেছি, বলেন নাকি আমরা অভিন্ন হৃদয়! আমি কস্মিনকালেও জানি না তাঁকে—কারণ তাঁর মতো আজগুবি গল্প বানাবার শক্তি আমার নেই। রহস্যময় লোকটিকে দেখিও নি কখনো! অথচ য' ত্তা লেখা সরাসরি কোনো সম্পাদককে না পাঠিয়ে, পাঠান আমার নামে রেজাস্ট্রি পোষ্ট করে। যে ঠিকানা লেখেন, সে নামে গ্রাম, শহর পৃথিবীতে নেই। আমি নিজের পয়সায় ডাক-পিওনকে খুশি করি; আবার লেখাটাকেও পাঠাই নিজের খরচে। নাম ভাড়াতেও লোকটা ওস্তাদ, তার প্রমাণও পেয়েছি সত্ত। সম্পাদক মশায় বিচার করবেন লেখাটা 'ছাপ্য' কিনা—আমি এর জহুরী নই তাত—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন।]

স্টেশনে নামলাম—চিনতে পারি নে, এই কি সেই বোলপুর স্টেশন। স্টেশনের বাইরে বের হই নি—ওভার-ব্রিজের পাঁচিলের ওপর থেকে রিক্সওয়ালারা চেঁচাচ্ছে—'বাবু আমি নিয়ে যাবো', 'বাবু আমি নিয়ে যাবো'। বের হলাম—ধাক্কাধাক্কির মধ্যে কে কার তোয়াক্কা করে—সবাই আগে এবং একসংগে বের হতে চায়। স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম—বহুকালের পূর্বের ছবি মনে এলো। অর্ধশতাব্দীর বেশি হয়ে গেছে এখানে ছিলাম। সে-যুগে স্টেশনের বাইরে এসে ভুবনডাঙার মহন্তোদের গরুর গাড়ি পেতাম। কিন্তু কোথায় তারা। বাইরে দেখি চার-পাঁচটা মোটরবাস, ছাদের মাথায় হরেক রকমের মোট বসানো, কোনো কোনো গাড়ির মাথায় সাইকেল পর্যন্ত চেপেছে। কৌতূহল হলো গাড়িগুলো কোথায় যাচ্ছে দেখার জন্তে। গাড়ির মাথায় লেখা নান্নুর-কীর্ণাহার, সিউড়ি, ইলাম-বাজার প্রভৃতি। পরিচিত জায়গার নাম সবই। এককালে হেঁটে, সাইকেলে, গো-যানে এসব জায়গা ঘুরেছি। কালান্তর হয়েছে।

বাসওয়ালা হাঁকছে—'মুলুক, সিয়ান, সংসদ'—তাড়াতাড়ি করুন, এখনি ছাড়বে। গাড়ি ভরতি হয়ে গেল—ব্ল্যাক হোল। পাশে হাঁকছে—'ইলামবাজার—ইলাম-বাজার—দুর্গাপুরের বাস ধরিয়ে দেবে—দুর্গাপুর, দুর্গাপুর…' তাহলে লোকে তিন মাইল পথ মুলুক যেতেও গাড়ি চাপে। চাপবে না কেন? সময় কম লাগে কত—কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার কি হয়। জানি না।

স্টেশন কত বড় হয়েছে। ১৮৫৯ সালে তৈরী রেলপথ—স্টেশনও সেই সময়ের। মাঝে সামান্য অদল বদল হয়। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই স্টেশনের আমূল পরিবর্তন হয়। শুনলাম ১৯৬১ সালের আগে প্ল্যাটফর্মের আচ্ছাদনটা তৈরী হয়। রাতদিন লোক খেটে সেটা শেষ করে। এখন দেখলাম বোলপুর স্টেশনের নাম হয়েছে 'বোলপুর-শান্তিনিকেতন'। বেশ ভালো লাগলো দেখে—শান্তিনিকেতন নামটা মেনে নিয়েছেন রেলবোর্ড।

নাছোড়বান্দা এক রিক্সওয়ালা কাছে এসে বললে, 'দেখতে এসেছেন তো, সব দেখিয়ে দেবো। বাবুলালকে সবাই চেনে, চলে আসুন; রিক্স নয় তো ট্যাক্সি, উঠুন।' অসংখ্য রিক্স চলেছে—তার মধ্যে আমাকে নিয়ে বাবুলাল চলেছে, গতি থেকে আওয়াজ হচ্ছে বেশি—কারণে-অকারণে হর্ণ বাজাচ্ছে। হর্ণ শুনেও লোক সরে না। দেখি তিনজন নওজোয়ান তিনটি সাইকেল নিয়ে রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। রিক্সওয়ালা বললে, 'দেখলেন বাবু, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে—নড়বে না; বলতে গেলেই শুনতে হবে, ঘুরে যেতে পারো না। পাণ্টালুন বাবুদের বড় ডরাই আমরা।'

তার বক্তৃতা শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি—কিন্তু এ কোন বোলপুর। ঠিক বর্ধমান, টিটাগড়, খুলনা, মেদিনীপুর শহরের মতই একই মুখ। কবির ভাষায় বলি—'মুখ নয় তো মুখোশ।' মুখ তো জনে-জনের পৃথক হয়, একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; রাম থেকে শ্যামকে আলাদা করা যায় চোখমুখ দেখে। কিন্তু মুখোশপরা মানুষ আর মুখোশআঁটা শহর—দেখতে সবাই এক। সেই প্লাস্টিকের, নাইলনের, এল্যুমিনিয়মের, কাজের-অকাজের রাশি রাশি মাল সাজানো। বাটার দোকান, মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান। দোকানের পর দোকান। ভাবি এত লোকও আছে কেনবার।

বাবুলাল বলছে, 'সাহেব'—হঠাৎ সে আমাকে সাহেব ভাবলে কেন জানি না—বলছে, 'সাহেব আসতেন যদি হাটের দিনে রবিবারে, তবে দেখতেন ভিড়টা—আজ তো চলেছি গড়ের মাঠ দিয়ে, আর হাটের দিন এ পথ তো আপিস-টাইমের চিৎপুর রোড।' সামনে এসে পড়লো এক মেয়েন ঝুড়ি-ঝাবড়া নিয়ে, বাবুলালের ধমকানি তখন সপ্তম সুরে উঠলো, 'কানা রাস্তা দেখে চলতে পারো না।' তে-মাথায় এসে পড়লাম—চিনতে পারি নে। রবীন্দ্র-স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া হয়েছে; চারদিকটা ঘেরা, ভালোই লাগলো তাদের সুরুচি দেখে। পিছনে বিরাট দোকান। দোকান দেখেই বুঝলাম, দেশের এক শ্রেণীর লোকের হাতে কাঁচা পয়সা নিশ্চয়ই জমেছে, তা না হ'লে এসব সাজসজ্জার খরিদ্দার কে হবে। নাইলনের শাড়ি, গাবাডিনের পোষাক, সবই কাচের আলমারিতে সাজানো। কে বলে এ দেশ দরিদ্র।

বাঁ-দিকের রাস্তা চলে গেছে সুরুলে। মনে পড়ে

অনেক বছর আগেকার কথা...রবীন্দ্রনাথ সুরুলে কুঠিবাড়ি কিনেছেন—দেখতে গিয়েছিলাম। জঙ্গল-ভরা ভাঙা-ভাঙা বাড়ির মাঝখানে একটা দোতলা বাড়ি—সাবেককালের সাহেবিঢঙের তৈরী। জঙ্গল ভেঙে ঘুরে ঘুরে দেখতাম।—চীপ্ সাহেবের কুঠির ভাঙা-বাড়ি, নীলের কারখানা ঘর সব মনে পড়ছে। বাবুলাল বললে 'জনাব'—হঠাৎ জনাব শুরু করলে বোধ হয় আমার দাড়ি দেখে—'জনাব, এই সড়ক শ্রীনিকেতন গিয়েছে—আপনাকে সব দেখিয়ে দেবো। কোন্ গাড়িতে ফিরবেন? সব দেখিয়ে পাঁচটার গাড়ি ধরিয়ে দেবো—কিন্তু চারটাকা চাই বাবু—গরীব মানুষ।'

আমি বললাম—'হবে বাবুলাল—ভয় পেয়ো না—তোমায় খুশি করে দেবো।'

গম্ভীর ভাবে দার্শনিকের মতো সে উত্তর করলে, 'কর্তা, দুনিয়াটা যদি খয়রাতি করেন, তবুও মানুষ খুশি হয় না। তখন সে দেবতাদের স্বর্গটা চেয়ে বসে।' না চাইতে হাতিটা, চাইলে পরে হাতিটা বলে সে সুর ধরলো।

'বাবুলাল, এটা কি কল—মনে হচ্ছে আটা-ভাঙা কল।'

'না হুজুর, শুধু আটা নয়—ধান, গম, যব, বেসন, ছাতু—সব এখন এখানে পেশাই হয়।'

কিছু মনে করবেন না বাবু, একটা কথা শুধুই—আপনার ধানের জমিটাম আছে?'

আমি বললাম, 'বাবুলাল, তুমি ভুল করছো—আমি মুসাফীর মানুষ—আমি পথে পথে ঘুরি—দুনিয়াকে দেখে বেড়াই। আমার ধানের ক্ষেত থাকলে আমি কি করতাম শুধুতে চাও তো?'

বাবুলাল বললে, 'গাঁয়ে যদি গেরস্ত হয়ে থাকতেন তো বুঝতেন। উপরে উপরে ঘুরে যান—যেমন জীপে করে আজকালকার বড় সাহেবরা—বড় কেন—মেজো, ছোট, ছে পো—সকলেই জীপে ঘুরে যান।—যাক্ সে-কথা বাবু, গাঁয়ের ভেতরের খবর নেবেন, একবার—যার দু'টো পয়সা হচ্ছে সেই পালিয়ে আসছে শহরে—দেখছেন তো কত দোকান—এই 'হাকিং' মেশিন গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। এসেছেন—দু'দিন দেখে যান্ না অবস্থাটা। যে পয়সাটা ছিল হাজার ঘর গরীবের মধ্যে তা এখন জমছে দশজন পুঁজিপতির হাতে। ...বেশ আছি বাবু, বেশ আছি। বাবুসাহেব, আমাদের কর্তারা দিব্যি ছিলেন খোশ মেজাজে চেয়ার গদি চেপে, হঠাৎ তাঁদের সকলের এক সঙ্গে মাথার ব্যারাম দেখা দল কেন?'

আমি বললাম, 'বাবুলাল, আমি ঘুরে বেড়াই, উড়ো খবর শুনি—কে কি মতলবে গদি ছাড়ছেন, চড়ছেন তা আমার মতো লোক কেমন করে বলবে; দেবতারাও জানেন না, তাঁদের পেটের কথা...।'

পথের পাশে বিরাট গুদামঘর—শুনলাম যুদ্ধের পর তৈরি হয়েছিল সরকারী ধান-চালের আড়ত। এই তো সেই ভুবনডাঙার মাঠ—এর চারপাশে এত ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। 'কোথায় গেল সেই শালবন'—শুধালাম বাবুলালকে।

সে হেসে বললে, 'বনমহোৎসবের শুরু হলো যে বৎসর সেই বৎসর এই শালবন উচ্ছেদ শুরু হয়।'

তার শ্লেষটা বুঝলাম না। সে নিজেই পরিষ্কার করে বললে, 'জমিদারী উচ্ছেদ হবার আগে তো সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁরা জমি-জমা কেড়ে নেবেন; তাই চোরকে বললেন চুরি করো, গেরস্তকে বলে দিলেন সাবধান হও, তাই রাতারাতি জমিদাররা সবাই বেনাম করলো কালতু জমি; আর ডাঙা, ডহর, পুকুর, গো-পথ সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল—আর এই বন কেটে শহর হলো। ভাগ্যে তখন পার্টিশন্ হয়েছিল—তাই উদ্বাস্তুরা এসে জমির দাম বাড়িয়ে দিলো; জমিদারেরা লাল হয়ে উঠলেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ হে, মাঠের মধ্যে ঐ হলদে রঙের বাড়িটা কিসের? ওটা তো নতুন মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে, হুজুর ওটা ইউথ হোটেল। তা পেরাই দু'বছর তৈরি হয়েছে—তবে মানুষ আসতে দেখি নি কখনো ওতে। দু'টো ঘর রাতে খোলা থাকে, কাদের জন্যে বলতে পারি নে—আমরা গরীব লোক—ওদিকে যাই নে। যদি থাকেন এখানে, এই বাড়িটি দেখে যাবেন—শিক্ষাবিভাগের ফরমাইসে নাকি তৈরি হয়েছে। বাবুমশায়, আপনি যদি ঐ বাড়ির কয়েকটা ঘরের দরজা দিয়ে সোজা হয়ে একটুও কাত না হয়ে ঢুকতে পারেন, তবে আমি আজকার ভাড়াটা আপনাকে ফেরত দেবো;—সন্ধ্যায় বিকেশের দোকানে আজ না হয় ঢুকবো না। কিন্তু সোজা হয়ে ঢুকতে হবে।'

পরে শুনেছিলাম কতকগুলি ঘরের দরজা নাকি দুই ফুট প্রস্থ! এই ইঞ্জিনীয়ারের নাম আগামী বারে 'পদ্মশ্রী'র তালিকার মধ্যে দেখতে পাবো বোধ হয়।

ডাকবাংলোর বাড়িটা চোখে পড়লো। মনে হলো তার দিন ফুরিয়েছে। যাঁরা এখানে আসেন যান, তাঁদের কাছে শুনেছি আজকাল এ বাংলোয় ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা হাকিম বা সাহেবরা কেউ ওঠেন না; তাঁরা ওঠেন 'ফরেস্ট ডাকবাংলোয়'—দূরে তেপান্তরের মাঝে খড়ের ডাকবাংলো—rural touch

দেওয়া হয়েছে। অথবা তাঁরা ওঠেন ইরিগেশন্ পল্লীর বাংলোয়, জনতার কাছ থেকে দূরে থাকেন সব। হায় রে একে বলে জনসংযোগ! অথচ এই ডাকবাংলোয় সে যুগের আই সি এস্ ইংরেজও এসে উঠতো। কাল বদল হয়েছে যে। এখানে কি আর ওঠা যায়—যত কোম্পানীর দালাল, আবগারীর দারোগা, সেল্‌ট্যাক্সের ছয়ধাপ নিচের বাবুরা ওঠেন, সেখানে ওঠা অসম্ভব! ইজ্জত বজায় রাখতে হবে যে।

'বাবুমশায়, গুরুদেবের মূর্তিটা দেখে যান্ একবার।'

আমি অবাক হয়ে শুধুই—'এখানে কবির মূর্তি কারা আনলো?'

বাবুলাল বলে, 'ছেলে বাবুদের মন উঠলো না চৌমাথার থামে, তাঁরা শান্তিনিকেতনের এক নামকরা কারিগরের মূর্তি এনে খাড়া করলেন এখানে। কলকাতা থেকে বাবুরা এলেন, বক্তৃতা করলেন; তাঁরা পেরভাতবাবুর কাছে গেলেন, আপনি তাঁর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। গুরুদেবের মতো চেহারাটা বাগিয়েছেন। আর লোকে বলে রবিঠাকুর সম্বন্ধে কি সব লিখে খুব মান পেয়েছেন। লোকটা বাবু পাঁড় নাস্তিক, দেবতা, দানব, আচার-বিচার কিছু মানে না। ছেলেদের নাকি বলেছিলেন—'আমি ঠাকুর দেবতা মানি নে যে, কোনো মূর্তির ধার ধারি নে—রবিঠাকুরের মূর্তিও নয়।' লোকে মূর্তিটা দেখে কেন হাসাহাসি করে বলতে পারেন? বলে কি জানেন—'আকৃতি হয় নি, বিকৃতি হয়েছে। গুরুদেবও বোধ হয় নিজের মূর্তি দেখে লজ্জা পাচ্ছিলেন, তাই বোধ হয় মনে মনে স্বর্গ থেকে ইন্দ্রকে বলে পাঠালেন, বাবাজি, আমার ওই বিকৃতিটার কোনো সদ্‌গতি করতে পারো? ইন্দ্র সে কথা শুনে একদিন দুপুরবেলায় ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মাঝে কড়কড়িয়ে নেমে পড়লেন মূর্তিটার মাথায়! চৌচির হলো। কিন্তু লোকে বেরসিক—বুঝলো না দেবতার কথা—আবার তাপ্পি লাগাচ্ছে! বাবু, আমরা মূর্খ, গরীব, ছোটলোক, মাতাল, জুয়াড়ি—আমরাও বলাবলি করি, রবি ঠাকুরকে নিয়ে ছেলেমিটা না করলে হতো না।'

'হ্যাঁ হে বাবুলাল, এই বাড়িটা দেখছি নূতন কারা থাকেন?'

'আজ্ঞে, এটা 'বোড' বাবুরা বানিয়েছেন—তাঁদের বড় সাহেবরা এসে থাকবেন। বাবুমশায় ভেতরে গিয়ে দেখবেন মেঝে কেমন বানিয়েছে—পা পিছলে যাবে—বলে মোজাযিক। দু'টো ঘর—একটা বৈঠকখানা—। বাড়িটা এখনো শেষ হয় নি। কুলিদের কাছে শুনি দোতলা হবে—মাত্র দু'জন সাহেব আর তাঁদের বিবিরা এসে থাকতে পারেন—কিন্তু যদি কখনো আরও দু'জন সাহেব আসেন! তবে?—তাই দোতলার কথা হচ্ছে। শুনি ইতিমধ্যে হাজার পঞ্চাশ খরচ হয়েছে।...

আমি শুধোই, 'বাবুলাল তুমি এতো খবর কি করে পাও?'

সে বলে, 'বাবুমশায়, বাবুরা যখন কথাবার্তা বলেন তখন আমাদের তো মানুষ বলে মনে করেন না, তাই সবকথাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন—আমরা রিক্স নিয়ে খাড়া থাকি—সব শুনতে পাই। বাড়ির ঝি-চাকর যত খবর রাখে, তত খবর কে রাখে—। হ্যাঁ, ঐ দেখুন,—আরও নতুন বাড়ি হচ্ছে অনেকগুলো...'

আমি অবাক হয়ে দেখি, তাই তো বটে, মাঠটার ওপর এবার সরকারের দৃষ্টি গিয়েছে—ধূম্রাক্ষের চোখ পড়েছে—বোলপুরের গৌরব ছিল এ মাঠ—এবার এ যাবে—ভস্মলোচনের লোলুপ দৃষ্টি!

বাবুলাল বললে, 'ছ'খানা বাড়ি হয়েছে—শুনছি মুখে মুখে ভি-আই-পিরা থাকবেন। কর্তা, 'ভি-আই-পি' কথাটার অর্থ কি? ভি-পি জানি পোষ্টাপিসে আসে—আই-পি জানি—আমার ভাইপোটা ইণ্ডিয়ান পুলিশে ঢুকেছে! আর ছোটবেলায় স্কুলে যখন পড়তাম তখন বিশুমাস্টার পরীক্ষার আগে বইতে দেগে দিতেন V I P—বলতেন, খুব ভালো করে পড়বে এটা। ভেরি ইম্‌পরট্যাণ্ট প্যাসেজ! তার সঙ্গে তো মেলে না; এ 'ভি-আই-পি'র মানে কি? সেদিন—এই গত চোদ্দই অগষ্ট কলেজের ছেলেদের প্যারেড্ হলো—তাতে কার্ড ছেপে নিমন্ত্রণ হয়েছিল—তাতে লেখা ছিল V I P।'

আমি বললাম, 'সে তুমি এখনকার বাবুদের শুধিয়ো—তাঁরা জানবেন। আমি সাধারণ মানুষ—তার ওপর মুসাফীর।'

বাবুলালের উৎসাহ কমে না, সে বললে, 'বাবু, মাঠটা ঘুরিয়ে দেখাই আপনাকে। ঐ দেখুন বাড়ি তৈরি হতে-না হতেই তাপ্পি বসেছে। সত্যই তো দেওয়ালের গায়ে পাঁচইঞ্চি করে ইট্ লাগানো একটা জায়গায়।

'বাবুমশায়, মিস্ত্রী আর কুলিদের কাছে শুনবেন—বাড়ি হচ্ছে—প্ল্যান বদলাচ্ছে নিত্যি। কি ব্যাপার? না, ভুল হয়েছে—এটা এভাবে হবে না—ঐভাবে হবে। বাবু, আমরা গরীব লোক—ছোটলোক বোকা।—আমরা ভাবি, এই যে এক কাজে পাঁচবার রদবদল হয়—তার জন্যে যে খরচ বা বাজে খরচ হয়—সেটা কি বড় সাহেবদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া উচিত নয়। আমি হলে সাহেবদের বলতাম, তোমাদের হাজার-দু'হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছি—তোমাদের প্ল্যান পাঁচবার

বদলাবে কেন? খেসারতটা তোমাদেরকেই দিতে হবে।'—

—'কিছু এসে যায় না,—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। আর আমরা ভুল করি—বড়সাহেব চার্জসিট দাখিল করবেন বলে হুমকী দেখান! হ্যাঁ, এই দু'টা বাড়ির পাশে হচ্ছে রান্নাঘর, খাবার ঘর—তার সামনে হবে তেতলা অতিথিশালা,—তার সামনে সাঁতারের পুকুর—খেলার মাঠ। আমি তো জানি—এমাঠ কি উঁচু—এখানে পুকুর হয় না—বাঁধ হতে পারে।'

বাবুলাল বললে, 'স্নানের পুকুর হবে—জল কোথা থেকে আসবে ভাবছি বাবু! যদি এই টাকাটা দিয়ে সরকার বোলপুরে জলের কল করতেন—তবে লোকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতো; এখন ফাল্গুন মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত অভিশাপ দেয়। বাবুমশায়, গরীবের শাপ কি বড়লোকের গায়ে লাগে? বোধ হয় না। কি জানি'—বলে বাবুলাল খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর হঠাৎ বললো, 'বাবুমশায়, সেদিন সন্ধ্যেয় বিবেকের দোকানে না ঢুকে হঠাৎ ধর্মকথা শোনবার ইচ্ছাটা হয়; তাই শুভেন্দু চাটুজ্জের বাড়ি যাই। লোকটা শুনেছি বাবু ভারি পণ্ডিত; সন্ধ্যের সময় ভাগবত পড়ে শোনান। সেদিন জড়ভরতের কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছিলেন; একটা জায়গায় বাবু খুব ভালো লাগলো, বাবুকে বললাম পরে ঐ জায়গাটা লিখে দেবেন। শুভেন্দুবাবু বললেন, 'কোন জায়গাটা বাবুলাল?' আমি বললাম, 'সেই গরীবদের সম্বন্ধে যে কথাটা আছে।' পণ্ডিতমশায় লিখে দিলেন—আমি সেটা রেখে দিয়েছি।'

আমি বললাম, 'দেখি কি লেখা।' বাবুলাল আমাকে সিট থেকে নামিয়ে গদির তলা থেকে একটুকরো কাগজ দিলো। তাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা:

'এই যে সমধিক ক্লেশে দীনদশাপন্ন শোচনীয় লোকগুলিকে আপনি বলপূর্বক ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি যে আপনি 'আমি প্রজাগণের পালক' এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, এই ধৃষ্টতাহেতু জ্ঞানিগণের সভায় আপনার সমাদর হইবে না।'

—লেখাটুকু পড়ে ভাবছি, সত্যিই তো, আজকের রাজা কালকের ফকির। আজ যিনি গর্দান নিলেন, কাল তাঁর গর্দান লোকে নিল, এতো আকছার দেখতে পাচ্ছি।

বাবুলাল বলে উঠলো—'সাহেব অনেকক্ষণ বকছি, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, একটু চা খেয়ে নিই। এই সিনেমার সামনের দোকান থেকে।' আমি তাকে ছয়টা পয়সা দিলাম। সে বললে, 'বাবু, ও পয়সায় আর চা পাওয়া যায় না, দশ পয়সা লাগে—চিনি তো সহজে মেলে না, কার্ডের চিনিতে কুলোয় না কারো, বেশি দাম দিলেই পাই বেশিটা...ওসব কথা ছেড়ে দিন।'

আমি ভাবলাম, আমার তো জাতি নেই, আমিও কেন বসে যাই না চায়ের দোকানে। চায়ের দোকানের স্তরভেদ আছে, দেখেছি বৈকি। কলকাতার সাহেবী-মহলে রেস্তোঁরা, সর্বজনপ্রিয় কেবিন, বসন্ত কেবিন, আবার পাড়ার ছেলেদের ফুটপাথের উপর বেঞ্চ রেখে চা-এর মজলিশ, মেছোবাজার, রাজাবাজারের মোড়ের চা ঘর, সবারই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানেও দেখলাম, এখানকার মতোই বৈশিষ্ট্য আছে; সবাই প্রায় পরস্পরের চেনা, আমিই কেবল অজানা অতিথি। আমাকে দেখে লোকে উশখুশ করতে লাগলো, আমারই অস্বস্তি বোধ হলো। বললাম, 'আমি তোমাদেরই একজন—আমি মুসাফীর, নিশ্চিন্ত হয়ে চা খাও।'

রিক্সাতে ওঠবার আগে বাবুলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবুলাল, সত্যি করে বলো তো তুমি কি বরাবরই রিক্সওয়ালা?'

হঠাৎ বাবুলালের চোখমুখের চেহারা গেল বদলে। সে বলে উঠলো, 'কর্তা, পুরানো কথা শুধুবেন না, সব ভুলে গেছি। কিন্তু সব ভুলতে এখনো পারি নি, এখনো মনে পড়ে, ছোট বোন্‌টাকে, স্কুলের সেরা ছাত্রী ছিল...যেদিন বাপ-মার সামনে অপমান করে তাকে নিঃশেষ করলো, সে দৃশ্য ভুলতে পারি নে যে বাবু, খুঁটিতে বাধা আমি—দেখলাম নিষ্ঠুরভাবে মারলো বাপ-মাকে। যদি তাঁদের আগে মারতো, ভালো হতো। ও সব কথা থাক, আমার সব অতীত মুছে গেছে, আমি এখন রিক্সওয়ালা, মাতাল, জুয়াড়ি। ছোটলোকের দলে ভর্তি হয়েছি, জয় হোক ছোটলোকের, বোলেই সে থামলো।' তারপর বললো, 'বাবুমশায়, সব ভুলে গেছি কিন্তু ভুলতে পারি নে সবটা। এখনো শুনতে পাই ছোট বোনটার আর্তনাদ, ঘুম ভেঙে যায় দেখি রিক্সর মধ্যে কুঁকড়ে-মুঁকড়ে শুয়ে আছি, দূরে ঘরটা পুড়ছে, তার মধ্যে বাবা, মা, বোনটাও।' হঠাৎ থেমে গেল—দেখি ময়লা জামাটার আস্তিন দিয়ে চোখ মুছছে। গাড়িতে হর্ন দিয়ে চলতে সুরু করে গান ধরলে—

'হেড অপিসের বড়বাবু লোকটা বেজায় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানতো।'

ইভেতি

গী দ্য মোঁপাসা

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রিচি কাফে থেকে ওরা দু'জন বা'র হয়ে পথে নামল। জিন দ্য সার্বভিগনি বলল : 'একটু হেঁটে বেড়াই কি বল ? একটা নিলেও মন্দ হয় না।'

বন্ধু লিওন স্যাভাল সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িয়ে বলল : 'কোনটাতেই আপত্তি নেই।'

'এখন মাত্র এগারটা। আমরা গভীর রাতের আগেই সেখানে পৌঁছে যাব। সুতরাং ধীরে ধীরে গেলেও চলবে।'

সার্বভিগনি যেন অঙ্ক করে বলল। স্যাভাল মুখে কিছু না বলে হেঁটে যেতে লাগল।

রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো পরস্পরের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পর পর অনেকগুলো বৃত্ত রচনা করেছে। তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাস্তার দীর্ঘ সরল রেখাটা। চলমান জনতার পদক্ষেপে রাস্তার বুকটা বুঝি হাঁপিয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গরমের রাতে রাস্তাগুলো কোলাহলে মুখর হয়ে থাকে। এই সময়টায় সব মানুষ যেন নিজেদের আনন্দের সাগরে ডুবিয়ে রাখতে চায়।

রাস্তার দু'পাশে সারি সারি নতুন গজিয়ে ওঠা কাফে। প্রত্যেকটা কাফের বাইরে ছোট ছোট টেবিল পাতা। আর সেই টেবিলগুলোর চারপাশে মানুষের উল্লাস, কাফের উজ্জ্বল আলো এবং বোতলের ঠোকাঠুকির শব্দ—সব মিলিয়ে গোটা শহরটা এক অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরা থাকে।

দুই বন্ধু ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে এগোতে লাগল। ওদের মুখের সিগারেটগুলো জোনাকির মত জ্বলছে, নিভছে। দু'জনেরই পরনে সান্ধ্য-পোষাক। হাতের ওপর ওভারকোট ঝোলানো। ওভারকোটের বোতাম ঘরে গোঁজা ফুলটাও পরিষ্কার দেখা যায়। মাথার টুপিটা একদিকে একটু বেশি কাং করা।

সেই কোন স্কুলজীবন থেকে ওরা বন্ধু। শুধু বন্ধু বললেই বোধহয় নিবিড়তার পরিমাপটা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় না।

দু'জনের মধ্যে সারভিগনি একটু খাটো। খুব শক্তিশালীও নয়। মাথায় চকচকে একফালি টাক। তবুও সমস্ত দেহ জুড়ে একটা নিখুঁত পারিপাট্য। ঠোঁটের ওপর পাকানো গোঁফজোড়া চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি ওকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। যদিও ওকে সর্বদা ক্লান্ত দেখায়, তবুও ঐ ক্লান্তির মধ্যে রাত-জাগা কোন পাখির মত নির্মল প্রশান্তি। ও যেন সেই সমস্ত প্যারিসিয়ানদের মধ্যে একজন যারা জিমনাস্টিক, অসিক্রীড়া ইত্যাদি থেকে একটা কৃত্রিম স্নায়বিক শক্তি পায়। এ ছাড়াও ওর ঐশ্বর্য এবং আমোদপ্রিয়তা ওকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এমন কি ওর প্রেমের বিষয়ও অনেকের বিস্ময়ের বস্তু।

অন্যদিকে ও একজন সত্যিকারের প্যারিসিয়ান। কারণ ওর চটপটে কথা বলার ভঙ্গি, সবকিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা, আবার কোনকিছুই না বোঝার অক্ষমতা, দৃঢ়তার অভাবেও দুর্দম উৎসাহ, নীতির ক্ষেত্রে আত্মাভিমান আবার আবেগে অন্যের উপকার করার প্রচেষ্টায় ও এক জন পুরোপুরি প্যারিসিয়ান। তবে ও ওর আনন্দের মধ্যে সীমিত রাখে আবার স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আনন্দে মেতে ওঠে। একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমাবেশ হয়েছে ওর মধ্যে। নিজেকে সবার মধ্যে প্রকাশ বা তার সব কিছু এক সঙ্গে ভোগ করার প্রবৃত্তির উম্মাদনায় ও সর্বদাই কাকের মত অস্থির, চঞ্চল।

ওর বন্ধু স্যাভালও একজন ধনী। ও তাদের মধ্যে একজন যারা
র মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে মেয়েদের ঘরে দাঁড়াতে
করে। ওকে দেখলে মনে হয় ও বুঝি কোন একজিবিসনের
। দেখতে ও খুব সুন্দর, খুব লম্বা, খুব শক্তিশালী—যেন সব
। বাহুল্যই ওর ত্রুটি। বহু হৃদয়কে আহত করার অপরাধে ও
ন অপরাধী।

াটতে হাঁটতে ওরা দু'জনে ভদেভিলীতে এসে পৌছাল। স্যাভাল
স করল: 'যার কাছে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই মহিলাকে তুমি চেন

ারভিগনি হাসল। তারপর বলল: 'বন্ধু, আগে মাবকুইস
কে চেন। তা ছাড়া, তুমি কোন বাসে উঠবার আগে, বাসের
রকে বল কি যে তুমি ওরই বাসে উঠছ?'

কটু হকচকিয়ে গেল স্যাভাল। তারপর একটু হতাশ হয়ে
'তা না হয় হলো। কিন্তু কে তিনি?'

ত্তরে বন্ধু জানালো: 'একজন আধুনিকা প্রতারক এবং সুন্দরী
কোথা থেকে যে উদয় হলেন তা বোধ হয় ভগবানই জানেন।
লেন, কিন্তু কেমন করে এলেন সেটা জানাও ঐ ভগবানেরই
রে। আর আবির্ভাবেই নিজেকে বিখ্যাত করে তুললেন। যাই
সেটা আমাদের না জানলেও চলবে। ওর আসল নাম নাকি
বার্ডিন। তবে ওর খৃষ্টান নামের প্রথম অক্ষরটা রেখে
পাধির শেষের অক্ষরটা ছেঁটে দিয়ে উনি হন ওবার্ডি। উনি
আকর্ষণীয়া নিঃসন্দেহে। আর তোমার যা চেহারা, তাতে
সঙ্গে ওর মিলবে ভাল। হ্যাঁ, আর একটা কথা। যদিও সেখানে
প্রবেশাধিকার যে কোন দোকানে ঢোকার মত নির্বিঘ্ন, তবু
ইচ্ছে তাই কিনতে পার না কিন্তু। বুঝলে তো, প্রেম আর
ক্রির পণ্য হলেও কেউ তোমাকে কিনতে বাধ্য করবে না। তাই
সেখানে ঢোকর পথ যেমন সহজ, বের হবারও তেমনি।

ন বছর হল উনি কোয়াটার দি ইতোয়লিতে একটা বাড়ি
। শহরটা একটু স্যাঁতসেঁতে এবং কণ্টিনেণ্টের সমস্ত
আসবার পথ একেবারে খোলা।

মি এই বাড়িতে গিয়েছিলাম। কেমন করে তা আমার মনে
তবে আমি গিয়েছিলাম, যেমন করে অন্য সবাই যায়। কারণ
জুয়া আছে। সেখানকার মেয়েরা সহজলভ্য আর ছেলেরা
দ। সেখানকার দোপদুরস্ত বোহেমিয়ান জনতা আমার ভাল লাগে।
াই বিদেশী, সবাই অভিজাত, সবাই শিক্ষিত। কেবল মাত্র
ছাড়া সবাই নিজেদের দূতদের কাছে অপরিচিত। একটু
হলেই সবাই নিজেদের প্রতিপত্তির কথা, নিজেদের জীবনের
ইতিহাস বর্ণনা করে আর পূর্বপুরুষের পরিচয় যায় এড়িয়ে।
বাই মিথ্যেবাদী, চোর, তাদের মত বিপজ্জনক, নিজেদের
মত শঠ। কিন্তু ওরা সাহসী। কেন না তা না হয়ে ওদের
ই।

টকথা ওদের আমার ভাল লাগে। ওদের জানার মধ্যে
শোনার মধ্যে একটা তৃপ্তি, অন্তত ফরাসী অফিসের কেরাণীদের
মার্কা নয়। ওদের বৌগুলোও বেশ সাধারণ, তবে একটু
চিতার গন্ধ আছে। আর অতীত জীবন সম্পর্কে খানিকটা
রহস্যও থাকতে পারে। অর্ধেকেরই বোধ হয় লাল ঘরটা চেনা।
অধিকাংশেরই উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর চুল আর সত্যিকারের পেশাদারী
দৈহিক গড়ন। প্রায় প্রত্যেকেরই এমন একটা লাবণ্য আছে যা
নেশা ধরায়, মানুষকে পাগল করে তোলে। এদের আকর্ষণকে
অস্বীকার করি কি করে?

ওবার্ডি এদেরই একজন। বয়সটাই একটু বেশি হয়ে গেছে।
তবুও এখনও মুগ্ধ হবার মত সুন্দর ও চতুর। দেহের প্রতিটি লোমকূপে
দুষ্কর্মের প্রবৃত্তি।'

'তুমি ওর প্রেমিক ছিলে, না আছ?' স্যাভালের গলায় সম্মোহিতের
স্বর।

'আমি কোনদিন ছিলাম না, এখনও নেই এবং অদূর ভবিষ্যতেও
হব না। তবু আমি যাই ওর মেয়ের জন্য।'

'ও হো: তাই বলো। ওর মেয়েও আছে দেখছি।'

'নিশ্চয়ই। চুম্বক দেখেছ? তাই বলতে পারো। সেই
দীর্ঘাঙ্গী তো এখন প্রধান আকর্ষণ। বয়স আঠারো। সুতরাং ভরা
পূর্ণিমা বলতে পার। ওর মা যতখানি কুৎসিত ও ততখানি ভাল।
সব সময় লাফাচ্ছে, নতুন নতুন কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে।
গলার শেষ শক্তি দিয়ে কথা বলছে, সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে নাচছে। কে
ওকে পাবে কিংবা কে ওর ছিল—কেউ জানে না। বুঝলে, আমরা
দশজন সার বেঁধে আছি ওর অপেক্ষায়।

ওবার্ডির গর্ভে ওর মত মেয়ে একটা বিরাট সৌভাগ্য। কেউ হাত
বাড়াতে সাহস পায় না। অথচ সবাই কি যেন একটা ধরার অপেক্ষায়
ওত পেতে বসে আছে। কিন্তু একথা আমি বলে রাখছি, যদি কোনো
দিন সুযোগ এসে যায় সেদিন আমি সেই সুযোগ সফল করবার চেষ্টা
নেবোই।

ইভেতি মেয়েটাই আমাকে একেবারে বশ কোরে ফেলেছে।
জানো, ও একটা রহস্য। ও যদি কোনো বিকৃত ক্ষুধার মায়াবিনী না
হয় তবে সত্যি বলছি, ওর মত শান্ত স্নিগ্ধ মিষ্টি মেয়ে আর দু'টি হয় না।
আর ভাবো তো ও কেমন সুন্দর এক রাশ নোংরার মধ্যে অনায়াসে
দিন কাটাচ্ছে।

অনুর্বর মাটির ওপর একটা সুন্দর লতার মত এক দুঃসাহসিকতার
মেয়ে ইভেতি। আমার মনে হয় কি জানো, ও হয় তো কোন প্রকৃত
অভিজাত, শিল্পী, কোন যুবরাজ কিংবা কোন রাজার সন্তান যিনি ওর
মায়ের সঙ্গে একটা রাত কাটিয়ে ছিলেন। কেউ বুঝতে পারে না
ও কি কিংবা ও কি ভাবছে। তুমি দেখলেই সব বুঝবে।'

এতক্ষণে স্যাভাল চীৎকার করে হেসে বলল: 'তুমি দেখছি ওকে
ভালবেসে ফেলেছ।'

ওর কথা শেষ না হতেই সারভিগনি জোর গলায় প্রতিবাদ করে
বললো: 'উঁহু:—আমি একজন অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। তা হলেই
বুঝতে পারছ, তোমার কথা ঠিক নয়। যাই হোক, আমার অন্যান্য
প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু ব্যাপারটা
কি জানো, আমার একটা সুবিধে আছে। আমার সুরুটাই খুব
চটকদারী হয়ে গেছে। আমার ওপরও ওর একটা বিশেষ দৃষ্টি আছে।'

'না ভাই, তুমি সত্যিই প্রেমে পড়েছ।' স্যাভাল ওর আগের
কথারই প্রতিধ্বনি করল।

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ-এ

একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট

খুলতে পারেন

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ১০০ বছর

ব্যাঙ্ক চার্জ লাগেনা—
বরং বছরে ৩% হিসেবে
সুদ পাওয়া যায়

আজই আপনার নিকটবর্তী শাখায় দেখা করুন:

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(যুক্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ • সদস্যদের দায়িত্ব সীমিত) NGB/61&BEN

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ: ১২, নেতাজী সুভাষ রোড; ২২, নেতাজী সুভাষ রোড, (লেডেন্স ব্রাঞ্চ); ৩১, চৌরঙ্গী রোড; ৪১, চৌরঙ্গী রোড, (লেডেন্স ব্রাঞ্চ); ৬, চার্চ লেন; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড; ১বি, কনভেন্ট রোড, ইন্টালী, ১৭ এসডি, ব্লক এ, বলিবী চন্দ্র এভিনিউ, নিউ আলিপুর; ১৩৩, রাসবিহারী এভিনিউ।

সারভিগানির গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল: 'তুমি বুঝতে পারছ না কেন? ও আমাকে বিরক্ত করে, প্রলুব্ধ করে, আমাকে এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। কখনও আমাকে কাছে টানে, কখনও আমি ভয় পাই। কখনও আবার আমাকে একটা ফাঁদে ফেলবে বলে ওকে অবিশ্বাস করি! তবু একটা তৃষ্ণার্ত লোক যেমন এক গেলাস জলের জন্য ফেউ ফেউ করে বেড়ায়, আমিও ওর জন্য তাই করি। আমি ওর সৌন্দর্যভোগ করি, কাছে টানি। কিন্তু এমন করে, যেন ধূর্ত চোর সন্দেহে একটা লোকের সঙ্গে একই ঘরে আছি। অথচ কি বিচিত্র মন ছাখো, ওর উপস্থিতিতে ওর সহজতায়, সরলতায় একটা অদ্ভুত বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। মনে হয় যেন জাগতিক নিয়মের উর্ধ্বে একটা নিরীহ জীবের নিবিড় সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। অথচ সেই সান্নিধ্য আমার কেমন লাগছে, সেটুকু বোঝার মত তখন বোধশক্তিও থাকে না।'

স্যাভাল এই নিয়ে তৃতীয়বার বলল: 'আমি বলছি, তুমি ভালবেসেছ। তুমি যখন ওর সম্পর্কে বল, তখন তো তুমি রীতিমত একজন কবি! তোমার কণ্ঠস্বরে যেন ফ্রান্সের কোন প্রাচীন কবির গীতি-কবিতা বেজে ওঠে। সুতরাং তুমি তোমার ঐ হৃদয়টাকে তোলপাড় করে নিজেকেই নিজে খুঁজে ছাখো, তাহলে তোমাকে আমার কথা স্বীকার করতেই হবে।'

কেমন যেন একটু নিস্তেজ হয়ে পড়ল সারভিগানি। মিয়ানো গলায় বলল: 'কি জানি, হয় তো হবে। তবে ও আমার সম্পূর্ণ মনটাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাহলে বোধ হয় আমি ভালই বেসেছি। জানো, আমি ওঁর কথা ভীষণ ভাবি। ঘুম আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে আর চোখ মেলতেই সবচেয়ে আগে ওকেই আমার মনে পড়ে। সব সময় ওর ছায়া যেন আমার পেছনে ফেরে। শুধু পেছনে কেন, সর্বদাই আমার চারপাশ ঘিরে আছে। এটাই কি প্রেম? ওর মুখটা আমার মনে এমন ভাবে গেঁথে গেছে যে চোখ বুজলেই মুখখানা পরিষ্কার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অস্বীকার করি না ওকে দেখামাত্রই যেন হৃৎপিণ্ড থেকে একেবারে অনেক বেশি রক্ত বেরিয়ে আসে। ওকে পেতে চাই, কেমন করে তা ঠিক বলতে পারি না। কিন্তু ওকে আমার স্ত্রীরূপে কখনই ভাবতে পারি না। একটা বাজপাখীর তাড়ায় যেমন করে অন্য পাখী ভয় পায়, আমি ঠিক তেমনি করে ভয় পাই। আমি ওকে হিংসেও করি—ওর ঐ হৃদয়ের ভেতরের কথাগুলো জানতে পারি না বলে। অনেক সময় নিজেকেই প্রশ্ন করি, সত্যিই ওর বালক-সুলভ চপলতার সময় পেরিয়ে যায় নি, না ঐ সরলতার অন্তরালে ওর মায়েরই স্বরূপ প্রচ্ছন্ন? কখন কখন ওর আচরণে ওর পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। আবার অন্য সময় মনে হয়, ও নিশ্চয়ই অস্পর্শ। ও আমাকে উদ্দীপ্ত করে, বারাঙ্গনার মত উত্তেজিত করে তোলে, আবার তখনই নিজেকে এমন এক শাসনে বেঁধে ফেলে যেন নিজের পবিত্রতা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। মনে হয় ও আমাকে ভালোবাসে, উপহাসও করে। আবার আমরা যখন আলাদা থাকি তখন ওর ব্যবহার দেখে মনে হয় আমি ওর ভাই কিংবা পেয়াদা।

সময় সময় মনে হয় ওর মায়ের মত ও নিজেও বহু পুরুষে আসক্তা। আবার সময়ান্তরে মনে হয় জীবন সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই।

ও খুব উপন্যাস পড়তে ভালবাসে। বর্তমানে আমিই ওকে ওর মনমতো বিভিন্ন বই আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি। জানো, এই বই পড়ার নেশা ওর মধ্যে একটা খিচুড়ি পাকিয়ে তুলেছে। আমার ধারণা, এই নেশাই ওর মধ্যে কতকগুলো পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ-কথা তো সত্যি, যদি তুমি জীবনকে পনের হাজার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যাচাই করবার চেষ্টা করো, তবে তুমি কোনো কিছু সম্পর্কে সঠিক ধারণাই করতে পারো না।

তবে আমার দিক থেকে আমি অপেক্ষা করব। আর এটাও সত্যি, ওর প্রতি আমার অনুভূতির এতখানি তীব্রতা আর কোন দিন অন্য কোন মেয়ের জন্য অনুভব করি নি। সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ঠিক ওকে কোনদিন বিয়েও করব না। যদি ওর অন্য প্রেমিক থেকে থাকে, আমি তাদের একজন হবো। আর যদি না থাকে তবে আমিই হবো প্রথম।

তা ছাড়া আমার নিজের মনে হয় কি জানো—ও নিজেও যেমন বিয়ে করতে পারে না, তেমনি ওবাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতেও কেউ চাইবে না। কারণ বাড়িটা ওদের না বলে সর্বসাধারণের বলাই ভালো। এ ক্ষেত্রেই ইভেত্তির ভূমিকা হলো, বাড়ির অভ্যাগতদের তুষ্ট রাখা। সুতরাং সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের কেউ ওকে বিয়ে করতে রাজি হবে না।

আর তাই ওর সন্ন্যাসিনী না হয়ে কোন উপায় নেই। সেটাও সম্ভব নয়। কারণ ও যে পরিবেশে মানুষ, সেখান থেকে সর্বত্যাগী মনোভাব গড়ে তোলা দুঃসাধ্য। সুতরাং ওর একটা মাত্র জীবিকা থাকতে পারে। সেটা হল প্রেমের অভিনয় করা। আর এই জীবিকা যদি ও এখন পর্যন্ত গ্রহণ করে না থাকে তবে এটা ওকে দু'দিন বাদে নিতে হবে।

এই পরিবর্তনটাই আমি দাঁড়িয়ে দেখতে চাই। তুমি দেখবে সেখানে ওর প্রেমিকদের—একজন গ্রেক নাম মঁসিয়ে অ বেলভিন, একজন রাশিয়ান যে নিজেকে যুবরাজ ক্র্যাভেলো বলে পরিচয় দেয়, একজন ইটালীয়ান নাম চিভেলিয়র ভল বিয়েলি। সব চেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো, এরা প্রত্যেকেই জানে, এদের একটা প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। আরও যারা আছে, তাদের কথা না হয় ছেড়েই দাও।

আর ওবাড়ির কাজ হল এদের প্রত্যেকের ওপর নজর রাখা। একটা সুখের কথা, ওবাড়ির সুদৃষ্টি আমি অর্জন করেছি। ও জানে আমার রূপার খবর, যা নাকি অন্যান্যদের সম্পর্কে ওর জানা নেই।

ওর বাড়ির মত একটা অদ্ভুত বাড়ি, আমি সত্যি বলছি, কোনদিন দেখি নি। সেখানে তুমি বেশ কিছু সংখ্যক বিচিত্র চরিত্রের সন্ধান পাবে। আরেকটা বিস্ময়ের ব্যাপার কি জানো? ওবাড়ির সব অবাক করে দেওয়া মেয়ে সংগ্রহ। ভগবানই জানেন, কোথাকে ও এদের সন্ধান পেয়েছিল। তা আবার কি—নিঃসন্তান কোন মেয়ে ওর দলে ভর্তি হতে পারে না। তার ফলে যে কোন অনভিজ্ঞ যুবক ভাবতে বাধ্য যে সে নিশ্চয়ই একটা সৎ-পরিবেশে আসতে পেরেছে।'

হেঁটে হেঁটে গল্প করতে করতে ওরা দু'জন চ্যামস ইলিসি অ্যাভেন্যুতে এসে পৌঁছাল। একটা ঠাণ্ডা বাতাস গাছের পাতাগুলোর কানে

কানে কি যেন সব বলে গেল। গাছের তলের ছায়াগুলোও বাতাসে একটু কাঁপল। যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ কিংবা নির্লজ্জ কোন ঘটনা একে অন্যকে ফিসফিসিয়ে বলে গেল।

কিন্তু সারভিগনির বক্তব্য তখনও শেষ হয় নি। ও বলে চলল: 'তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছ না, অন্তত বাইরের দৃষ্টিতে তুমি কি রকম একটা সম্ভ্রান্ত জায়গায় যাচ্ছ। ও হ্যাঁ—ছাখো, আমি কিন্তু তোমাকে কাউণ্ট স্যাভাল বলে পরিচয় দেব। কারণ শুধু স্যাভাল বললে তুমি মোটেও জনপ্রিয় হতে পারবে না।'

স্যাভাল চীৎকার করে এর প্রতিবাদ করে বলল: 'না, না, তা কক্ষনোই নয়। ওখানকার যে পরিচয় তুমি দিয়েছ তাতে আর এক রাত্রির উজীর হবার সাধ আমার নেই।'

সারভিগনি অত্যন্ত বিজ্ঞের মত হেসে বলল: 'তুমি তো দেখছি একেবারেই বোকা। ওখানে আমার নাম কি জানো? ডাক অ সারভিগনি। আমি নিজেও জানি না কেন আমার এ নাম হল। কিন্তু এজন্য তো আমি মোটেও ভাবিত নই। কারণ আমি জানি, এছাড়া আমি ওখানে নগণ্যই থেকে যেতাম।'

স্যাভাল এ সব যুক্তিকে কোন মূল্য দিতেই রাজি নয়। বলল: 'ছাখো, ওসব নামের ভার আমি বহন করতে পারব না। আমি যা, আমি তাই। তা সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক; তা ছাড়া আমার তো মনে হয় আমার চাকচিক্যহীনতাই সেখানে আমার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে।'

সারভিগনিও ঠিক সমপরিমাণে এক বোখা। ও-ও নিজের কথাকেই ওপরে রাখতে চায়। বলল: 'আমি বলছি তা কোনমতেই সম্ভব নয়। একদল সম্রাটের মধ্যে একজন মজুরের ওপর কি কারো নজর পড়ে? তার চেয়ে এ ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। তোমার পরিচয় হবে উত্তর মিসিসিপির ভাইসরয়।'

এবারে স্যাভাল একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। একটু উত্তেজিতও। প্রায় চীৎকার করেই বলল: 'না, না তা হবে না। তোমাকে আবার বলছি, আমি তা পারব না।'

হতাশ হয়ে সারভিগনি বলল: 'বেশ, তোমার ইচ্ছে মতই হবে। আমিই বোকা লোক। তাই তোমাকে এতক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম।'

ওরা ডানদিকে ঘুরে বো দি লেরীতে ঢুকলো। বাড়িটা অতি আধুনিক। প্রথম তলায় উঠে ওরা দু'জন ওদের ওভারকোট আর ছড়ি অপেক্ষমান দারোয়ানের হাতে দিল। ফুলের মিষ্টি সৌরভে সমস্ত বাড়ির বাতাস ভারী। পেছনের ঘরগুলোর উচ্চকিত কলস্বর এখান থেকেই শোনা যায়।

এক ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। দেখেই মনে হয় অনুষ্ঠান পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ওদের দু'জনের সামনে এসে অভিবাদনের ভঙ্গীতে একটু বাঁকা হয়ে পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর স্যাভালের দিকে তাকিয়ে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: 'দয়া করে নামটা জানতে পারি কি?'

'মঁসিয়ে স্যাভাল।' উত্তরটা সারভিগনিই দিল।

তারপর সেই ভদ্রলোক খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'মঁসিয়ে লি ডাক অ সারভিগনি। মঁসিয়ে লি ব্যারণ স্যাভাল।'

প্রথম ঘরটা মেয়েদের আনাগোনায় মুখর।

বাড়ির এক মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল। ঘোষণা শুনেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসল।

হঠাৎ এই মহিলার অনুচ্চ মাথাটা সারা ঘরময় ছিটানো ঘন কালো চুলের অরণ্যে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার ওকে দেখা গেল। চলনসই লম্বা। তবে একটু মোটা। বয়সটা একটু বেশি হলেও সারা অঙ্গের আগুন এখনও জ্বালা ধরায়। সুন্দর সোনালী চুলের নীচে একজোড়া কাজল-কালো হরিণচোখ স্বপ্ন-মদির। নাকটা ঈষৎ মোটা হলেও মুখগহ্বর দেখলেই মনে হয় শুধু কথা বলে জয় করার জন্যই ঐ গহ্বরের প্রয়োজন।

কিন্তু মহিলার সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় অংশটাই বুঝি কণ্ঠস্বর। বসন্তের ছোঁয়ায় যেমন জল নতুন প্রাণ পায়, ঠিক তেমনি ওর গলা থেকে স্বর বেরিয়ে আসে অনায়াসে, মিষ্টিতে ভিজে, হৃদয়-ছুঁয়ে। ঐ কণ্ঠস্বর যেন শ্রবণেন্দ্রিয়কেও সম্মোহিত করে আর চোখ দু'টোকে বাধ্য করে কথা বলার সময় ঐ রক্ত-লাল ঠোঁটদু'টোর নড়াচড়ার ওপর নিষ্পলক দৃষ্টি রাখতে।

সেই মহিলা একখানা হাত বাড়িয়ে দিল সারভিগনির দিকে। সারভিগনি আলতোভাবে একটা চুমু খেল। আর সোনার সূক্ষ্ম কাজ করা পাখাটা রেখে দিয়ে অন্য হাতটা এগিয়ে দিল স্যাভালের দিকে। তারপর বলল: 'আসুন মঁসিয়ে ব্যারণ। আমার এ বাড়ির দরজা সারভিগনির যে কোন বন্ধুর জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত।'

এবারে সেই মহিলা অর্থাৎ ওবাড়ি পূর্ণভাবে তাকালো স্যাভালের দিকে। ওবাড়ি গায়ে বোধ হয় কোন আমেরিকান কিংবা ভারতীয় সেণ্ট লাগিয়েছিল। গন্ধের তীব্রতায় মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে।

এর মধ্যে অন্যান্য অভ্যাগতরাও একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। ওবাড়ি সারভিগনির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। মাতৃত্বের মাধুর্যভরে বলল: 'ছাখো ইভেতি কোথায়। এ বাড়ি তো তোমাদেরই।'

এই বলে ওবাড়ি ওদের রেখে চলে গেল। অন্যান্য অতিথিদেরও ওকে অভ্যর্থনা জানাতে হচ্ছে। শুধু যাবার আগে আরেকবার স্যাভালের দিকে এমন করে তাকালো যে দৃষ্টির ইংগিত হলো, আমি মুগ্ধ।

এবারে সারভিগনি বন্ধুর হাতটা তুলে নিল। তারপর বলল: 'অবাক হচ্ছ? আমিই তোমাকে চালিয়ে নেব। বর্তমানে আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেটা সম্পূর্ণ মণিপুরের দেশ। তুমি কি বুঝতে পারছ না, কেমন একটা দেহের গন্ধ এখানকার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে? তা সে টাটকাই হোক্ আর যাই হোক্। বুঝলে তো দর কষাকষিতে অনেক দামী জিনিসও কম দামে বিকিয়ে যায়। ঐ ছাখো, বাঁদিকে চলছে জুয়া। ওটাকে তুমি রূপার মন্দির বলতে পারো।

আর ওই যে দূরে, ওখানে নাচ। ওটাকে কি বলবে? ওটাকে নিরাশার মন্দির বলতে পারো। ওখানে মেয়েদের অশান্ত যৌন-ক্ষুধার ফলকে হত্যা করা হয়। বুঝলে, ওখানে আইনামুগ সঙ্গমও ধিকৃত হয়। ওখানে আবার নৈতিক রোগের একটা মিউজিয়ামও আছে। চল, গিয়ে দেখে আসি।'

এই বলে ওরা দু'জন এগিয়ে গেল। যেতে যেতে সারভিগিনি ডাইনে বাঁয়ে শিষ্টাচার অনুযায়ী ঘাড় নোয়াতে লাগল। কখনও বা দু' একটা কথা। কিংবা নগ্ন কাঁধের উপর লোভাতুর অথচ পরিচিত এক পলক চাউনি।

দ্বিতীয় কক্ষের প্রায় শেষপ্রান্তে ওয়ালটের সুর বাজছে। দরজার সামনে এসে ওরা দাঁড়ালো। দেখলো ভেতরে প্রায় পনের জোড়া নাচছে। ছেলেরা ঈষৎ গম্ভীর আর মেয়েদের ঠোঁটে মুচকি হাসি।

হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী অন্যান্য নর্তকীদের ভিড় ঠেলে ছিটকে বেরিয়ে আসতেই চীৎকার করে উঠল: 'একি মুসকাদ! কেমন আছ মুসকাদ?'

মেয়েটির সারা মুখে ঝিলকিয়ে উঠেছে জীবন, ঝিলকিয়ে উঠেছে অফুরন্ত খুশি। ওর সোনালী চুলের সঙ্গে গায়ের রং একাকার হয়ে গেছে। আর সেই সোনালী চুলের বাঁকা বাঁকা ঢেউ যেন কপাল বেয়ে ঘাড়ের ওপর এসে লুটিয়ে পড়েছে।

ওর মা যেমন কথার যাদু জানে ও-ও তেমনি ওর দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কত সহজভাবে নাড়াচাড়া করতে পারে। শুধু ওর হাঁটা, চলা, মাথা নামানো ওঠানোর মধ্যে কতখানি পরিপূর্ণতা!

'কি মুসকাদ, বলো না তুমি কেমন আছ।' মেয়েটি ওর আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল।

সারভিগিনি ওর হাতটা ধরে এত জোরে নাড়ালো যেন ও ওর কোন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করছে। তারপর বলল: 'ইভেত্তি, এই আমার বন্ধু ব্যারণ স্যাভাল।'

এতক্ষণে ইভেত্তি স্যাভালের দিকে তাকালো। ওকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রথম কথাই বলল: 'আচ্ছা, আপনি এত লম্বা পোষাক পরেন কেন? চিরদিনই কি এ রকম?'

'না, না, তা হবে কেন?'

ইভেত্তির সামনে নিজেকে স্বাভাবিক করবার প্রচেষ্টায় সারভিগিনি অনাবশ্যক সহজ কণ্ঠে বলে চলল: 'আজ তোমার মাকে খুশি করবার জন্যই ও ওর সবচেয়ে লম্বা এবং দামী পোষাকটা পরে এসেছে।'

'ও—তাই বলো।'

ইভেত্তি গলায় কপট-গাম্ভীর্য এনে বলল: 'কিন্তু যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন এত লম্বা পোষাক কখনও পরবেন না। আমি মাঝামাঝিটাই পছন্দ করি।'

বলেই ইভেত্তি মুসকাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো চোখে চোখ রেখে বলল: 'তুমি নাচবে মুসকাদ? চল না, একটু নেচে আসি।'

সারভিগিনি মুখে কোন উত্তর দিল না। কিন্তু চকিতে এক দমকা ঘূর্ণী হাওয়ার মত ইভেত্তির কোমর জড়িয়ে ধরে উধাও হয়ে গেল।

তারপর নাচের আসরে গিয়ে ওরা নাচতে লাগলো। অন্যান্যদের তুলনায় অনেক দ্রুতলয়ে। একটা পশুর মত উল্লাসে। একে অন্যকে এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে যেন দেখে মনে হয় একজন। ওদের মাঝখান থেকে ক্লান্তিও বুঝি হার মেনে দূরে পালিয়ে গেছে। অন্যান্য সবাই নাচ শেষ করে চলে গেল। কিন্তু ওদের কোন যতি নেই। যেন ওরা নিজেরাই জানে না ওরা কোথায় কিংবা কি করছে। অর্কেষ্ট্রা বাজছে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে। আর ওদের মুগ্ধদৃষ্টি শুধু পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ। যারা আসরে উপস্থিত আছে, তাদের প্রত্যেকেরই চোখে অপার বিস্ময়। শেষ পর্যন্ত যখন ওদের নাচ থামল তখন কেউই ওদের নাচের প্রশংসা না করে পারলো না।

ক্লান্তিতে উত্তেজনায় ইভেত্তি আরক্ত। চোখের দৃষ্টিও আর আগের মত স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন উজ্জ্বল হলেও চঞ্চল।

সারভিগিনিও খুব পরিশ্রান্ত। ও একটা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো নিজের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্য।

ইভেত্তি ওর কাছে সরে এল। বলল: 'তুমি বড় দুর্বল মুসকাদ। আমার মত শক্ত হতে পার না? ছাখো তো আমি কেমন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।'

সারভিগিনি হাসল। কিন্তু হাসিতে ওর স্বভাবোচিত উচ্ছলতা নেই। কেমন যেন মিয়ানো। দু' চোখে জ্বলন্ত ক্ষুধা।

ইভেত্তি ওর সামনে তেমনি অনায়াসভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নীচুকণ্ঠে বলল: 'জানো, বিড়াল শিকার ধরবার আগে যেমন করে থাকে, কোন কোন সময় তোমায় দেখে আমার সেই বিড়ালেরই কথা মনে পড়ে। এসো তো, দেখি তোমার সেই বন্ধু কোথায় গেলেন।'

কোন কথা না বলে সারভিগিনি ওকে অনুসরণ করলো।

এদিকে স্যাভাল কিন্তু একাকী নেই। ও দিব্যি ওবার্ডির সঙ্গে গল্পে মশগুল। ও ওবার্ডির কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে আছে। আর ওবার্ডি কথা বলছে হৃদয়ের ভেতর থেকে সুর ঢেলে ঢেলে। সারভিগিনিকে দেখে ওবার্ডি একটু হাসল। তারপর বলল: 'ডাক্, তুমি শুনেছ কি আমি বুগিভালে এক মাসের জন্য একটা বাড়ি নিয়েছি? তুমি নিশ্চয়ই আসবে আর তোমার এই বন্ধুকেও নিয়ে আসবে—কেমন না? আমি আসছে সোমবার নাগাদ ওখানে যাচ্ছি—তাহলে তোমরা দু'জনই আগামী শনিবার থেকে একটা সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে কাটাবে, তাই তো?'

সারভিগিনি ইভেত্তির দিকে তাকালো।

ইভেত্তি খুব সুন্দর করে হাসলো। মাকে আশ্বাস দিয়ে বলল: 'তা মুসকাদ আসবে, থাকবে—এ আর ওকে জিজ্ঞেস করবার কি আছে? সেখানে আমাদের আনন্দের সব রকম ব্যবস্থাই থাকবে।'

কিন্তু সারভিগিনির যেন মনে হল ইভেত্তি ঠিক অন্তর দিয়ে ওর আসাটা কামনা করছে না।

ওবার্ডি স্যাভালের দিকে তাকিয়ে বলল: 'কি ব্যারন, তুমিও তো নিশ্চয়ই আসছো?'

স্যাভাল ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

ঘরের অপর প্রান্ত থেকে একদল লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। ইভেত্তি সারভিগিনির কাঁধের উপর থুতনি রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল: 'ছাখো মুসকাদ, আমার আর এই সব অনুরাগীদের ভালো লাগে না।' ওর বাচনভঙ্গীতে সত্যি বিন্দুমাত্র কপটতা নেই।

'তুমি ঠিক বলছ ইভেত্তি?' সারভিগিনি মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

সারভিগিনির নিঃশ্বাস ইভেত্তির মুখের ওপর পড়ছে।

স্যাভাল হঠাৎ প্রশ্ন করল: 'আচ্ছা, ইভেত্তি কেন আমার বন্ধুকে 'মুসকাদ' বলে ডাকেন?'

এ কথা শুনে ইভেত্তি হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। হাসির বেগ চেপে কোনমতে বলল: 'ও যে যাদুকরের মুসকাদের মত দেখতে তাই।'

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
GLUCOSE
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০
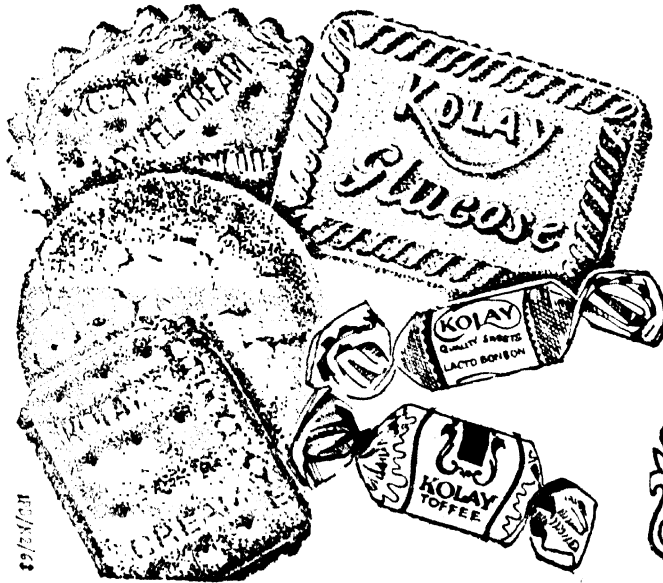
'একেবারে ছেলেমানুষ!' হেঁয়ালিভরে মন্তব্য করল ওবার্ডি।

কিন্তু কথাটা শুনে ফেলল ইভেন্তি। চট্ করে উচ্চকণ্ঠে বলল: 'কক্ষনো নয়। আমার যা মনে আসে, তাই আমি বলি। মুসকাদকে আমার ভাল লাগে। অথচ ও আমায় সব সময় কেন যেন এড়িয়ে চলে।'

শেষের দিকে ইভেন্তির কণ্ঠস্বর একটু করুণ শোনালো। সারভিগনি হকচকিয়ে গেল। অবস্থাটা সামলে নেবার জন্য বলল: 'এবারে দেখ, দিন-রাত্রি কখনও তোমায় ছেড়ে থাকব না।'

ইভেন্তি কপালের উপর চোখ তুলে সাবধান করে বলল: 'উঁহুঁ! তা তো আমি বলি নি। তুমি সমস্ত দিন আমার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু রাত্তিরে নয়।'

'কেন?'

হঠাৎই বুঝি সারভিগনির বয়সটা বিশ বৎসর কমে গেল। যেন ও কিছুই বোঝে না।

'আমি তোমায় খালি গায়ে দেখতে নারাজ।'

হাসতে হাসতে বলল ইভেন্তি।

ওবার্ডি বলল: 'কি সব আবোল-তাবোল বলছ ইভেন্তি?'

'আমিও তাই বলি।'

সমর্থন পেয়ে সারভিগনি গলা উঁচিয়ে বলল। ইভেন্তি একটু আহত হল। উদ্ধত কণ্ঠে বলল: 'সারভিগনি, তোমার মুখে ও-সব কথা মানায় না।'

বলেই ইভেন্তি ঘুরে দাঁড়ালো। চীৎকার করে ডাকলো: 'চিভেলিয়র তাড়াতাড়ি এসো। ভাখো এরা আমার অপমান করছে।'

বলতেই একটা মোটা কালো লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: 'কে সে?'

ইভেন্তি সারভিগনিকে দেখিয়ে বলল: 'এই যে ও। অথচ তোমাদের সকলের মধ্যে আমি ওকেই সব চেয়ে বেশি পছন্দ করি।'

লোকটি বিনীতকণ্ঠে জানালো: 'ভাখো, কতটুকু আর আমাদের সামর্থ্য? তবে আমরা ওর মত আকর্ষণীয় না হতে পারি, কিন্তু ওর মত আমরাও তোমার অনুরাগী।'

ঠিক এই সময় লম্বা, দাড়ি গোঁফ ভর্তি, শক্ত-সমর্থ একটা লোক যাচ্ছিল। ইভেন্তিকে দেখেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল: 'কিছু বলবে ইভেন্তি?'

'এই যে মঁসিয়ে ক্র বেলভিন।'

বলেই ইভেন্তি স্যাভালের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য: 'এই যে আরেক জন-আমার অনুরাগী। ওকে দেখতেই পাচ্ছেন লম্বা, মোটা, মূর্খ এবং ধনী। কিন্তু কি আশ্চর্য জানেন, ওদের এ ভাবে বললেও খুশি। ও একজন ফিল্ড-মার্শাল।'

বলতে বলতে একটু থামল ইভেন্তি। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে স্বভাবোচিত প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল: 'ও-হো: আপনার তো কোন নাম দেওয়া হয় নি। দেখুন, ঐ একটা আমার বদ অভ্যাস। প্রত্যেকের একটা নতুন নাম দেওয়া। ঠিক আছে আপনাকে আমি জুনিয়র ড.স্ বলে ডাকব। তা যা হোক আমি যাচ্ছি—শুভ রাত্রি।'

ইভেন্তি লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

এতক্ষণ ধরে ওবার্ডি ওকে লক্ষ্য করছিল। এবারে মুখ খুলল:

'তোমরাই ওকে ক্ষেপিয়ে তুলছো। ওর সমস্ত সরলতাকে নষ্ট করে কতকগুলো বদ-অভ্যাসে রপ্ত করাচ্ছ।'

'ওর লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে?'

জিজ্ঞেস করলো স্যাভাল।

কিন্তু যেন শুনতেই পায় নি ওবার্ডি। অন্যদিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। তারপর আরও এক নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে ছুটলো!

'এই যে প্রিন্স। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

সারভিগনি নতুন অতিথিকে দেখে স্যাভালের হাতে আস্তে চাপ দিয়ে বলল: 'ওই যে আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ওরই নাম প্রিন্স ব্র্যাভেলো। কি বন্ধু, ওবার্ডিকে দেখে কেমন মনে হল?'

'মা মেয়ে দু'জনেই সমান।'

'তাই না কি?' চল এবার, রূপার মন্দিরটা দেখে আসি।' বলল সারভিগনি।

ওরা দু'জন জুয়া খেলার ঘরে গেল।

প্রত্যেকটা টেবিল ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবাই যেন কিসের সম্মোহনে প্রায় নির্বাক হয়ে আছে। মাঝে মাঝে চাক চাক সোনা আছড়ে পড়ছে খেলার আসরে। সোনার ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজের সঙ্গে মানুষের গুন-গুন শব্দ একাকার হয়ে গেছে।

প্রত্যেকেই বিচিত্র পোষাক পরিহিত। কারো সঙ্গে কারো কোন মিল নেই। কিন্তু মুখের চিন্তার ছাপটা প্রায় প্রত্যেকের এক। তবুও ওদের আলাদা করে বুঝতে অসুবিধে হয় না। কারণ দাড়ি কাটার বৈচিত্র্যে সবারই স্বাতন্ত্র্য প্রকট। যেমন একজন আমেরিকান, যার দাড়ি ঘোড়ার খুরের মত। একজন ইংরাজ যার বুকভর্তি লোম। একজন রোমান, যার গোঁফ ভিক্টর ইমানুয়েলের মত ঘন ও কালো। একজন স্পেনিয়ার্ড যার চোখ পর্যন্ত লোমাবৃত। একজন অস্ট্রিয়ান যার শুধু চিবুকটাই নিখুঁত করে কামানো। একজন রাশিয়ান জেনারেল, যার গোঁফজোড়া তীরের মত। একজন ফ্রেঞ্চ যার গোঁফ দেখলেই রসিক মনের পরিচয় মেলে। মনে হয় এই ঘরে বুঝি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষৌরশিল্পীদের অপূর্ব কারুকার্যের এক বিচিত্র সম্মেলন ঘটেছে।

'কি, তুমি খেলবে?'

সারভিগনি জিজ্ঞেস করল।

'উঁহুঁ তুমি?'

স্যাভালের পাল্টা প্রশ্ন।

'আমি এখানে কখনো খেলি না। তা'হলে এখন যাবে না কি? আজ বড্ড ভিড়। অন্যদিন বরং দেখা যাবে।'

'বেশ তা হলে চলো।'

ওরা হল ঘরে এসে উপস্থিত হলো।

যখন ওরা রাস্তায় এসে নামলো, তখন সারভিগনি শুধালো: 'কি, কেমন লাগলো?'

'খুব মজার ব্যাপার তো। কিন্তু এখানকার ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি বাহাদুর। আর মুগ্ধ হবার মতোও বটে।'

স্যাভালের কথায় সারভিগনি যেন আর্তনাদ করে উঠল?

'হায় ভগবান! এখানকার মেয়েরাই তো মারাত্মক। বেলুনের

বাতাসের মতই এখানকার প্রেম। ভাবো তো, কি নিখুঁত শিল্পী এরা। অভিনয়ে কি পরিমাণ দক্ষতা। রুটিওয়ালার কাছ থেকে তুমি কোনদিন কেক্ খেয়েছো? দেখে সত্যিই লোভনীয় মনে হয়। খেতে গেলে দেখবে মোটেও স্বাদ নেই। জানো, এ সব মেয়েদের প্রেমের সঙ্গে এইসব রুটিওয়ালার কেকের কোন পার্থক্য আমি খুঁজে পাই না। হ্যাঁ, প্রেমের অনুভূতি যদি বুঝতে হয় তবে ওই ওবার্ডির সংস্পর্শে আসতে হয়। ওদের হাতে তৈরি কেক্ যেমন দেখতে, খেতেও তেমনি। আর একথাও সত্যি, ভাল জিনিষ পেতে গেলে দু' পয়সা তো বেশি খসবেই।'

অতর্কিতে স্যাভাল প্রশ্ন ছুড়ল: 'আচ্ছা, ওবার্ডির সম্মোহনী দৃষ্টিতে এখন কে আটকে আছে?'

সারভিগনি জানালো: 'কি করে বলি। তবে আমি জানি শেষ ব্যক্তিটি ছিল এক ইংরেজ। তাও মাস তিনেক তো হবেই সে চলে গেছে। বর্তমানে ওবার্ডি বোধ হয় শুধু হৈ-চৈ দিয়েই নিজেকে ভরিয়ে রেখেছে। তবে শীগগির সব বোঝা যাবে। আগামী শনিবার তো আমরা ওদের কাছে যাচ্ছি। পরিবেশটাও অনেক শান্ত থাকবে। আর সুযোগ বুঝে আমাকেও সেদিন জানতে হবে, ইভেন্তির চিন্তাধারা কোন্ খাতে বইছে।'

স্যাভাল নিরুৎসাহ হয়ে বলল: 'আমি ভাই ওসব সাত-পাঁচ ঝামেলার মধ্যে নেই। দেখো, সেদিন আমি নীরব দর্শকের ভূমিকা নেব।

মাথার ওপর রাত্রির অভিন্ন হৃদয়বন্ধু তারা চক্মক্ করছে। রাস্তার দু'পাশে বসানো বেঞ্চগুলোয় কাতারে কাতারে ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে।

সারভিগনি আনমনে হাঁটতে লাগল। কতগুলো বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা ওর মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এটা ধরে টানতে টানতেই ওটায় যায় জড়িয়ে। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে পা ফেলতে লাগল সারভিগনি।

তারপর এক সময় বলল: 'দ্যাখো, সম্পূর্ণ প্রেমের ব্যাপারটাই কি রকম হাস্যাস্পদ! তবুও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। জিনিষটা কত সাধারণ, অথচ কি দুর্নিবার তার আকর্ষণ! যেন সব কিছু আমাদের মধ্যে অন্য একটা মন এসে করে দিয়ে যায়। তা না হলে ভাবো তো যেখানে একটা মেয়েকে অনায়াসে একটা মাত্র ফ্রাঁকের বিনিময়ে পাওয়া যায়, সেখানে আমি অকাতরে মন-মেজাজ-অর্থব্যয় করে যাচ্ছি।

থামলো সারভিগনি। তবুও বুঝি ওর সব বুঝিয়ে বলতে পারল না। কি যেন বলতে চায়। অথচ ভাষায় ফুটিয়ে উঠতে পারছে না। না পারার ব্যর্থতাই ওকে নীরব করে দিল। চুপচাপ দু'জনে হাঁটতে লাগল। স্যাভালও আর কিছু ভাবতে পারছে না। ওর সমস্ত ভাববার শক্তিই বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। অন্যমনস্ক থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা বলতে ভাল লাগছে না। এমন কি শুনতেও না।
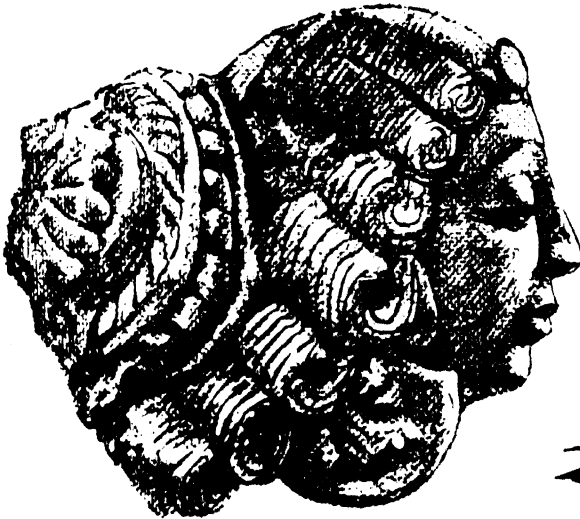
শেষ পর্যন্ত আবার ঠোঁট খুললো সারভিগনি: 'তবু আমি দেব।

সব দেব। আমার মন, দেহ, অর্থ। সব, সব। আমার বলতে কিছুই রাখবো না। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেব। ইভেত্তির প্রথম প্রেমিক হবার গৌরব তো নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না।'

এক সময় পথ ফুরিয়ে এল। ততক্ষণে জনকল্লোলে মুখরিত শহরে নেমেছে গভীর সুষুপ্তি। একটা দুঃসহ অসারতায় যেন গোটা শহরটা আচ্ছন্ন।

স্যাভাল ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বারান্দার উপর একটা টেবিল পাতা। এখান থেকে অদূরের নদীটা পরিষ্কার দেখা যায় না। পাহাড়ী এলাকায় নতুন বাড়ি নিয়েছে বাড়ি। বাড়ির সামনে বাগানের পাশ দিয়ে সীন নদী একটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে। বাড়ির পেছন দিকে ক্রোশী দ্বীপ। লম্বা লম্বা গাছের ছায়ায় শান্ত স্নিগ্ধ দ্বীপটা বাড়িটার একটা সুন্দর পশ্চাদপট।

নদীর একপাশে দিনের শেষে সূর্যটা হারিয়ে যেতে চায়। শান্ত, স্তব্ধ রাত্রি আসছে। একটা অপূর্ব প্রশান্ত অনুভূতিতে তন্ময় হয়ে আছে সন্ধ্যাটা, একটুও বাতাস নেই গাছের পাতাগুলোকে নাড়া দেবার জন্য। কি সুন্দর মৌন সৌন্দর্য। একটা উষ্ণ হাওয়ার মৃদু স্পর্শ সন্ধ্যাটাকে মধুর করে তুলেছে।

সূর্যের বিলীয়মান রশ্মিটুকু গাছের পাতায় দুষ্টুমি করছে। পরিষ্কার ঢালু আকাশটা যেন ঘুম জড়িয়ে দেয় দু'-চোখে।

সত্যি, দু' চোখ ভরে পান করার মত একটা স্বর্গীয় সৌন্দর্যসুধা ছড়িয়ে আছে আকাশে, বাতাসে, গাছপালায়, নদীর বুকে।

ওরাও সবাই মুগ্ধ। সবাই নীরবে গিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসল। একটা অদৃশ্য খুশির ঝরণায় ওদের অন্তঃকরণ প্লাবিত। আর সেই খুশিতে মনে হারিয়ে গেছে কথার উৎস।

ওবাডি স্যাভালের হাতটা তুলে নিল। আর ইভেত্তি সারভিগানির। চারজনের না-বলা কথায় থম থম করছে সন্ধ্যাটা। ওদের জোড়া জোড়া স্বপ্ন-মদির চোখে কি যেন গভীর প্রত্যাশা!

ওবাডি আর ইভেত্তি যেন আজ ওদের বহু কষ্টার্জিত প্যারিসিয়ান সত্তাকে ভুলে গেছে। ইভেত্তিও যেন হঠাৎ রাতারাতি পাল্টে গেছে। অনেক কম কথা বলছে। একটু গম্ভীর। হাসতে বুঝি ভুলে গেছে। কোথায় যেন উধাও হবার সাধ।

স্যাভাল যেন গোটা পরিবর্তনটাকে ঠিক মত ঠাওর করতে পারছিল না। ও জিজ্ঞেস করল ইভেত্তিকে: 'কি ব্যাপার! তুমি যেন গত সপ্তাহের তুলনায় একটু গম্ভীর?'

ইভেত্তি একটু হেসে বলল: 'বোধ হয় পরিবেশের প্রভাব। তা ছাড়া আমি বুঝি হঠাৎই পাল্টে যাই। আজ হয় তো আমি খুব উচ্ছল। কালই কেন জানি না, কবরের বিষণ্ণতা আমাকে চেপে ধরে। হাওয়ার মত আমার এই পরিবর্তনের কারণ সত্যিই আমি খুঁজে পাই না। কোন কোন সময় বোধ হয় আমি মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারি। আবার কখন কখন কিছুই না পাবার বেদনায় কাঁদি। কত চিন্তা যে আমার মাথায় দাপাদাপি করে তার ঠিক নেই। তবে সবটুকু নির্ভর করে ঠিক ঘুম ভাঙার মুহূর্তের ভাবনার উপর। সত্যি বলছি, ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারি সারাটা দিন আমার কেমন কাটবে। এ সবের উপর বোধ হয় কিছুটা স্বপ্নের প্রভাব আছে। আর কিছুটা যে বই পড়ি তার।'

ইভেত্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা ফ্লানেলে ঢাকা। বুকের অন্তর্বাসটা ঢিলে করে বাঁধা। তাতে ওর সুগঠিত বক্ষদেশের রূপ আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। থরে থরে সাদা মাংস সাজিয়ে তৈরি ওর সরু গলার দু'পাশ বেয়ে নেমে এসেছে এক রাশ সোনালী চুল।

অনেকক্ষণ ধরে সারভিগানি ওর কথা শুনছিল। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এবার বলল: 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

ইভেত্তি নেতিবাচককণ্ঠে চাতুর্যের ছোঁয়া লাগিয়ে বলল: 'অমন করে বোলো না মুসকাদ। সময় এলে তোমার কথা আমি দু'চোখ, দু' কান ভরে শুনব।'

ওবাডিকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। ও সম্পূর্ণ কালো রংয়ের পোষাক পরেছে। গাউনের প্রতিটি ভাঁজের সঙ্গে দেহের কাঠামোটা সুন্দর মিলে গেছে। ওর লাল অন্তর্বাসটা পরিষ্কার দেখা যায়। একটা লাল গোলাপ ওর চুলে বাঁধা—ও বুঝি সত্যি আবার যৌবনে ফিরে এসেছে।

স্যাভালও একটু গম্ভীর। কিছুক্ষণ পর পর ওর অভ্যাস অনুযায়ী দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে। পরক্ষণেই আবার চিন্তার সাগরে ডুব দিচ্ছে।

চুপচাপ। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ কোন কথা বলল না।

শেষ পর্যন্ত সারভিগানিই নীরবতা ভেঙে বলল: 'কিছু না বলার মধ্যেও একটা মাধুর্য আছে। নির্বাক থেকে আপন জনকে অনেক কাছে পাওয়া যায়। তাই নয় কি?'

ওবাডি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল: 'ঠিক। এক সঙ্গে একই জিনিস ভাবাতে যে অদ্ভুত আনন্দ আছে।'

তারপর ওবাডি ওর পূর্ণদৃষ্টি মেলে দিল স্যাভালের দিকে। ওরা পরস্পরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সারভিগানি তাকালো ইভেত্তির দিকে। ওর চোখে আগের মতই সপ্রশংস বিস্ময়। বলল: 'ইভেত্তি, তুমি কি শুধু জ্বালা দিতেই জন্মেছ? কেন তুমি আমাকে একটা কুহেলিকার মধ্যে ফেলে রেখেছ? সত্যি, আজও বুঝতে পারলাম না তুমি কাকে ভালবাসো? আজ আমি সেটা স্পষ্ট করে জানতে চাই। জানি, তোমার অনেক অনুরাগী আছে, যাদের তুমি সামান্য কৃপা করতেও নারাজ। তাই যাদের নিয়ে আমার সন্দেহ শুধুমাত্র তাদের কথাই বলছি। প্রিন্স ব্র্যাভেলো সম্পর্কে তোমার মত কি?'

নামটা শুনেই ইভেত্তি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তারপর বলল: 'তুমি এসব কি ভাবছ মুসকাদ। ও তো একটা রাশিয়ান মোমের পুতুলের মত দেখতে। শুনেছি চুল ছাঁটার ব্যাপারে ও নাকি একটা মেডেলও পেয়েছে।'

সারভিগানি খুশি হল। ওর দ্বিতীয় প্রশ্ন: 'বেশ, তাহলে যুবরাজকে বাদ দিলাম। কিন্তু বেলভিলকেই কি তোমার পছন্দ?'

এবারে হাসিতে ফেটে পড়ল ইভেত্তি। হাসতে হাসতেই পাল্টা প্রশ্ন করল: 'তুমি কি কখনও আমাকে ওর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছ না ওর কানে মুখ রেখে আমাকে বলতে শুনেছ, হে আমার প্রিয়তম বেলভিল, তোমার ওই কুকুরের মত মাথাটা আমাকে চুমু খেতে দাও।'

সারভিগনি আরও খুশি হল। আবার জিজ্ঞেস করল: 'বাক দু'জন কমলো। এবার আসছে চিভেলিয়র। ওকে তো ওবার্ডি খুব খাতির করে।'

এবং ইভেত্তি এ কথাতেও আগের মত হেসে বলল: 'কি বললে, কবর দেওয়া লোকটার কথা? প্রত্যেকটা বড় বড় কবরের সময় ওকে পাওয়া যাবেই। জানো, ওকে দেখলেই আমার মনে হয় মৃত্যু এসে বুঝি আমাকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করছে।'

সারভিগনির খুশির মাত্রা আরও বাড়ল। ওর চতুর্থ জিজ্ঞাসা: 'তা হলে বাকি থাকছে ব্যারণ স্যাভাল। ওকেই তুমি ভালোবাসো?'

ইভেত্তি আরও বেশি উথলে উথলে হাসতে লাগল: 'ওকে? কক্ষনোই নয়। ও অনেক বেশি শক্তিশালী। ওকে সামলানো আমার কাজ নয়।'

সারভিগনির উচ্ছ্বাস, উৎসাহ, কৌতূহল শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। এবারে ও পরিষ্কার বলল: 'তা হলে এটা অত্যন্ত সহজ কথা যে তুমি আমাকেই ভালবাসো। কেন না বাকি থাকছি একমাত্র আমি। সংকোচ আর সম্মানের মাধ্যমেই আমার নামটা সবার পেছনে রেখেছি। যা সেটুকু বাকি থাকলো, তা হ'ল তোমায় ধন্যবাদ জানানো।'

ইভেত্তি এবার এমনভাবে তাকালো সারভিগনির দিকে, যে দৃষ্টি অনায়াসে একেবারে অন্তরের ভেতরে ঢুকে যাবার পথ পায়। বলল ইভেত্তি: 'কি বলছ মুসকার? তুমি? না, না, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।.....কিন্তু ভালবাসি না.....অপেক্ষা করো। তোমার সুযোগ আছে.....ধৈর্য ধরো মুসকার। প্রেমকে আগে বুঝতে শেখ। এ জিনিস পাবার যে কঠোর সাধনা, তাই আগে শেষ করো। আমার মেজাজমাফিক চলবার চেষ্টা করো, যা বলব' তাই করবার জন্য প্রস্তুত থাকো। তোমাকে আমি হতাশ করছি না মুসকার। জানো তো সবুরে মেওয়া ফলে।'

চকিতে ফ্যাকাশে হয়ে গেল সারভিগনি। নিস্তেজ গলায় বলল: 'যদি তুমি কিছু মনে না করো, আমি তোমার সব মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু পরে।'

'কি পরে মুসকার?'

নিস্পৃহকণ্ঠে বলল ইভেত্তি।

বোধ হয় সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হল সারভিগনি। তাড়াতাড়ি বলল: 'কেন, তুমি বুঝতে পারছ না? তোমার ভালবাসা পাবার পর থেকে।'

'বেশ, আমার ব্যবহার অন্য রকম হলেও তোমার আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাস রাখো।'

সারভিগনির বক্তব্যকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল ইভেত্তি।

কিন্তু সারভিগনি খেই হারাতে রাজী নয়। ও জের টেনেই বলল: 'তবু আমি বলব...।'

ওকে থামিয়ে দিল ইভেত্তি। বিরক্ত হয়ে বলল: 'অনেক হয়েছে মুসকাদ। এ ব্যাপারটা এখনকার মত থাক।'

সারভিগনি আর এগিয়ে যাবার পথ পেলো না। বাধ্য হয়ে ওকে থামতে হল।

ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। আকাশটা কনে-দেখা আলোয় আরক্তিম। নদীর জলে ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে সেই রক্তেরই প্রতিফলন। চারপাশটাও সেই আলোয় উজ্জ্বল।

ইভেত্তির দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত। ওবার্ডির একটা হাত তখন পর্যন্ত স্যাভালের মুঠোয়। ইভেত্তি ঘুরতেই ওবার্ডি হাতটা সরিয়ে গাউনের ভাঁজটা ঠিক করে নিল।

সারভিগনি এতক্ষণ ওদের লক্ষ্য করছিল। এবার বলল: 'ইভেত্তি, যদি তোমার খারাপ না লাগে, তবে চল না, খাওয়ার পর ওই দ্বীপটাতে একটু বেড়িয়ে আসি।'

কথাটা ইভেত্তির মনে লাগল। খুশি হয়ে বলল: 'এই তো একটা ভালো কথা বলেছে। ঠিক আছে, যাব। কিন্তু শুধু আমরাই।'

'বেশ তাই হবে।'

এটুক বলে সারভিগনি আর বলার মত কিছু পেল না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

কারোরই কিছু বলবার নেই। চারপাশটাও নিঝুম। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা স্তব্ধ প্রশান্তি। মুহূর্তগুলোও নীরবে গুটিগুটি পায় পেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা সবাই চুপচাপ হৃদয় স্পন্দনের টিপ-টিপ শব্দ শুনতে লাগল। চাকরগুলোও চলাফেরা করছে নিঃশব্দে, সতর্কে। ওদের সামনে আকাশ ছাই-রঙা হল। তারপর ছাইরঙ পাল্টে গেল কালোতে। আর এখন বোবা অন্ধকার রাত্রি।

এতক্ষণ পরে মুখ খুলল স্যাভাল। ওবার্ডিকে বলল: 'তোমরা কি এখানে বেশ কিছুদিন থাকছো?'

'হ্যাঁ, এখানে বেশ ভাল লাগবে মনে হচ্ছে।' উত্তর দিল ওবার্ডি কথাগুলো কেটে কেটে।

ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল একটা চাকর। চারিদিকের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ল্যাম্পটাকে খুব অসহায় বলে মনে হল। অসংখ্য ছোট

ছোট পোকা আলো দেখে কোত্থেকে ছুটে এল। ল্যাম্পটাকে কেন্দ্র করে এলোপাতাড়ি ঘুরতে লাগল। টেবিলের উপর খাবারগুলো সাজানো। পোকাগুলো উড়তে উড়তে মদের গেলাস, খাবারের উপর পড়তে লাগলো। নিরুপায় হয়ে মদগুলো ফেলে দিয়ে খাবারগুলো ঢেকে দেওয়া হল। পোকাগুলো ওদের গা-মাথায় উড়ে উড়ে বসছে। ইভেতি একটা নতুন মজা পেল পোকাগুলোর এই চঞ্চলতায়। উপায়ান্তর না পেয়ে ওদের খাওয়া শেষ করতে হল।

খাওয়া শেষ হলেই ইভেতি বলল: 'চল, বেড়িয়ে আসি।'

বোঝা গেল, ইভেতি সারভিগনির কথাগুলো ভোলে নি।

ওবাড়ি ইভেতির কথা অনুসরণ করে বলল: 'বেড়াতে যাচ্ছ? বেশি দেরি কোরো না কিন্তু। চল, তোমাদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সারভিগনি আর ইভেতি বেরিয়ে গেল। সামনে ইভেতি, পেছনে সারভিগনি। ওরা শুনতে পাচ্ছে, ওদের পেছনে স্যাভাল আর ওবাড়ি কথা বলতে বলতে আসছে। চারপাশে ঘন অন্ধকার।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর পারে এসে পৌঁছাল। নদীর কালো জলে আকাশের তারার প্রতিচ্ছবি মানিয়েছে বেশ। নদীর পাড় ঘেঁষে ব্যাঙগুলো কোঁক কোঁক করে ডাকছে। বাতাসে নাইটিঙ্গেলের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে।

থমকে দাঁড়িয়ে ইভেতি বলল: 'একি, ওরা তো আমাদের পেছনে আসছে না। ওরা কোথায় গেল?'

চারদিকে তাকিয়ে 'মা' বলে ডাকলো। কোন উত্তর এলো না।

ইভেতি আবার বলল: 'ওরা কোথায় গেল? কিছুক্ষণ আগেই তো ওদের কথা শুনেছি।'

সারভিগনি বলল: 'তাহলে ওরা নিশ্চয়ই ফিরে গেছে।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটা সরাইখানায় এলো। ওদের ডাকাডাকিতে একটা লোক বেরিয়ে এলো। তারপর ওরা একটা নৌকায় উঠল। মাঝি বৈঠা দিয়ে পাড়ে ঠেলা দিতেই নৌকাটা এগিয়ে চলল। নদীর জল ছল ছল করে উঠল। তারার প্রতিচ্ছবিগুলো খিল-খিল করে হেসে উঠল।

ওরা ওপারে গিয়ে পৌঁছাল। লম্বা লম্বা গাছে ছাওয়া স্বপ্নময় দ্বীপে এসে ওরা নামলো। বহুদূর থেকে পিয়ানোর মিষ্টি সুর বাতাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভেসে আসছে।

সারভিগনি ইভেতির হাতটা ধরল। তারপর কোমর জড়িয়ে ধরে মৃদু চাপ দিল। মুখে বলল: 'কি ভাবছ ইভেতি?'

'আমি?···কিছু না···খুব ভাল লাগছে।'

'এখন আমাকে তোমার ভয় করছে না?'

'করছে বৈকি, খুব করছে। কিন্তু মুখে ও কথা বোলো না। তুমিই বলো, এমন সুন্দর পরিবেশে তোমার ও কথা কি বেমানান নয়?'

ইভেতির আপত্তি সত্ত্বেও সারভিগনি ওকে আরও নিবিড় করে নিল। ফ্লানেল পোষাকের উপর দিয়ে দেহের উষ্ণতা অনুভব করল।

'ইভেতি!'

আধবোজা গলায় ডাকল সারভিগনি।

'এ সব কি?'

বিরক্তি মিশিয়ে উত্তর দেয় ইভেতি।

'তুমি তো আমার।'

'ওসব বোলো না মুসকাদ।'

'উঁহু—আমি বলবোই। এ তো আমার দীর্ঘ তপস্যার একমাত্র কথা।'

ইভেতি নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা তখন করছিল। পরস্পরের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় ওরা এঁকে বেঁকে হাঁটছিল। ওদের দেখলে প্রচুর মদ খেয়েছে বলে ভুল হয়।

সারভিগনি মুখে কোনো কথা বলছে না। কিন্তু ভাবছে কি বলা যায়। কোনো কথা বলা ঠিক হবে না যাতে ইভেতি রেগে যায়। তাই ওকে ভাবতে হচ্ছে কথা বলার জন্য।

একসময় সারভিগনি বলল: 'ইভেতি, তুমি কথা বলছো না কেন?'

সারভিগনি চকিতে ওর চিবুকের উপর একটা চুমু খেল।

এবার ইভেতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল: 'না:, এসব অসহ্য। তুমি আমাকে একা ঘুরতে দাও।'

কিন্তু মনের বিরক্তি কথা বলার ঢংয়ে অতখানি প্রকাশ পেলো না। সারভিগনির এই ফাঁকটুকু দৃষ্টি এড়ালো না। ও আবার ঘাড়ের উপর, সোনালী চুলের উপর ঠোঁট ছোঁয়াল।

ইভেতি সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করল। সারভিগনি এবার ওকে আরও নিবিড় করে নিল। ইভেতির মুখটা নিজের মুখের উপর চেপে ধরল।

ইভেতি একটা আকস্মিক ঝটকায় নিজেকে ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

সারভিগনি কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। ও ইভেতির আকস্মিক তৎপরতায় এবং অন্তর্ধানে বিমূঢ় হয়ে গেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ কোন সাড়া না পেয়ে নীচু গলায় ডাকলো: 'ইভেতি!'

কিন্তু কোন সাড়া পেল না। সারভিগনি হাঁটতে আরম্ভ করলো। অন্ধকারে যতখানি সম্ভব দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ রেখে। কিন্তু পেলো না কাছাকাছি কোনখানে। ও আরও একটু জোরে ডাকলো: 'ইভেতি!' ততক্ষণে নাইটিঙ্গেলের ডাকও বন্ধ হয়ে গেছে। এবারে সারভিগনি একটু বিব্রত বোধ করল। চীৎকার করে ইভেতিকে ডাকতে লাগলো।

কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না। সারভিগনি একটু দাঁড়ালো। সমস্ত দ্বীপটা যেন সমাধিস্থ। কেবল মাত্র পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। আর ব্যাঙের কোঁক কোঁক শব্দ।

সারভিগনি সমস্ত দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সেই সরাইখানায় ফিরে এলো। চীৎকার করে ডাকলো: 'ইভেতি, সাড়া দাও। তুমি কোথায়?'

দূরে একটা ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা বেজে উঠলো। সারভিগনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলো ক'টা বাজলো। এখন নিশুতি রাত। দু' ঘণ্টা ধরে সারভিগনি সমস্ত দ্বীপ জুড়ে খুঁজে বেড়িয়েছে ইভেতিকে। কোথায় গেল ইভেতি? বাড়িতেই কি? একটা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে সারভিগনি বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বাড়ি ঢুকতেই দেখল একটা চাকর দোরগড়ায় ঘুমোচ্ছে। সারভিগনি ওকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'ইভেত্তি ফিরেছে তো? আমার অন্তখানে একটা কাজ ছিল বলে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি দশটার মধ্যেই ফিরেছেন।'

নিশ্চিন্ত হয়ে সারভিগঁনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শু'ল কিন্তু দু' চোখ থেকে ঘুম বুঝি পালিয়ে গেছে। ইভেত্তিকে জোর করে চুমু খেয়েছিল বলেই কি রুষ্ট হয়েছে? তবে ও কি চায়? সারভিগনির ভাবনা থৈ পায় না। ইভেত্তি কি ভাবে? অথচ কি মালাই না দিতে জানে মেয়েটা! তাই বলে সারভিগনি একথা অস্বীকার করতে পারে না যে ওর মুমূর্ষ জীবনটাকে আবার নতুন করে বাঁচবার পথ দেখিয়েছে ইভেত্তি। নিজেকে গড়ে তোলবার প্রেরণা জুগিয়েছে ইভেত্তি।

সারভিগনি শুয়ে শুয়ে চলমান রাতের নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনতে লাগলো।

শুয়ে শুয়ে একটা বাজলো, জানলো। তারপর দু'টো। সারভিগনি বুঝলো আর ওর সারারাত ঘুম আসবে না। গরমে ঘেমে উঠল ও। উঠে জানালাটা খুলে দিল।

একদমকা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকলো। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল সারভিগনি। বাইরে গভীর রাত্রি ধ্যানমগ্ন। কিন্তু হঠাৎ বাগানে জোনাকীর মত একটা আগুনকে জ্বলেই নিভে যেতে দেখল সারভিগনি। সারভিগনি ভাবল ওটা নিশ্চয়ই সিগারেট। তবে কি স্যাভাল? ও মোলায়েম করে ডাকল: 'লি—ওন।'

'কে—কৌন?'

'হ্যাঁ—দাঁড়াও আমি আসছি।'

সারভিগনি চট্ করে পোষাকটা পরে নিল। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলো। এসেই জিজ্ঞেস করলো: 'তুমি এখানে, এত রাত্তিরে কি করছ?'

'এই বিশ্রাম আর কি।'

বলেই স্যাভাল হেসে উঠল। সারভিগনি ঊর্দ্ধাঙ্গ একটু নীচের দিকে বাঁকিয়ে বলল: 'তোমাকে আমার অভিনন্দন।'

'তুমি আমাকে বলছ।'...

স্যাভালের কণ্ঠে বিস্ময়।

সারভিগনি যোগ করল: 'হ্যাঁ, তোমাকেই। ইভেত্তি ওর মার মত নয়।'

'কি হল শুনি।'

সারভিগনি সমস্ত ঘটনা বন্ধুকে জানালো। তারপর বললো: 'ও আমাকে সত্যিই ভয় পায়। তুমি বুঝতে পারছ না, দু' চোখে আমার ঘুম এলো না। শুধু ভাবছি, মেয়েরা কি এক বিচিত্র বস্তু। বাইরে থেকে মনে হয় কত সহজ, সরল। কিন্তু ভেতরে একেক জন অপার রহস্য। যে ব্যক্তি ভালবেসে বিয়ে করতে পেরেছে সে ছাড়া মেয়েচরিত্র আর কেউ জানতে পারে না। যেমন তোমার আমার মত যুবক একজন যুবতীর স্বরূপ বার করতে পারব না। আর আমাকে সত্যিই ভাবতে হচ্ছে—ও আমাকে খেলাচ্ছে না তো।'

স্যাভাল প্রথমটার কিছু বলল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল: 'সাবধান বন্ধু সাবধান। ও তো তোমাকে বিয়ে করবে। ইতিহাস মনে রেখ, কেমন নীচু বংশজাত হয়েও মণ্টি জো সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। সাবধান, কখনও নেপোলিওন হোয়ো না।'

সারভিগিনি বলল: 'সে রকম আশঙ্কা কোরো না। আমি একটা মূর্খও নই, সম্রাটও নই। তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'মোটেও না।'

'তবে চলো না, নদীর পাড় দিয়ে বেড়িয়ে আসি।'

'আপত্তি কি, চলো।'

ওরা দু'জনে পা বাড়ালো।

রাত্রির শেষ যাম। ঘুমটা সবচেয়ে গাঢ় হয় এই সময়েই। রাত্রিটাও বুঝি এখন ঘুমিয়েছে। নাইটিঙ্গেলের ডাক শেষ। ব্যাঙগুলো চুপচাপ। একটা নাম-না-জানা রাতজাগা পাখী একটানা ডেকেই চলেছে। যেন কোন একটা যন্ত্র চলছে। এত একঘেয়ে।

কোন কোন সময় সারভিগিনি পুরোপুরি কবি হয়ে যায়। দার্শনিকতা এসে স্থান নেয়। এখনই বোধ হয় সেই সময়। ও বলল: 'জানো, দিন দিন মনে হয় আমি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছি। পাটিগণিতে শিখেছি একে একে দুই। আর প্রেমেরক্ষেত্রে হয় জানি, একে একে এক। অথচ আমার ক্ষেত্রে ঐ দু-ই থেকে যাচ্ছে। তুমি ভালবাসা জিনিষটা অনুভব করেছ কোন দিন? একটা মেয়ের মধ্যে নিজেকে কিংবা নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে দেওয়ার অনুভূতিটা। তুমি বুঝেছ কোন দিন? আমি কিন্তু দৈহিক তৃপ্তির কথা বলছি না। একটা হৃদ্দিক আত্মিক যোগাযোগের কথাই বলতে চাইছি। কিন্তু জানো, তুমি অন্য একটা হৃদয়ের ব্যথা বেদনা আনন্দ উচ্ছ্বাস সব নিজের করে নিতে গিয়েও পারছো না, এ যে কত বড় ব্যর্থতা তা তুমি বুঝবে না। এই বাইরের চোখ দু'টোর ভেতরে তো আরও দু'টো চোখ আছে তার সমস্ত ইঙ্গিতকে বোঝা সত্যিই বড় কঠিন।'

স্যাভাল অত্যধিক সতর্ক সুরে বলল: 'জানো, অত ভেতরটা দেখবার মত ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু বাইরেরটা জানতে চাই।'

মিয়ানো গলায় বলল সারভিগিনি: 'তুমি যাই বলো, ইভেত্তি একটা অদ্ভুত জীব। আমি তো ভাবতেই পারছি না, সকালে ওর ব্যবহারটা কেমন হবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যখন নদীর পাড়ে এসে পৌঁছাল, তখন পূব-আকাশে দিনের আবাহন লেগে গেছে। খামারে খামারে মোরগগুলো ডেকে উঠছে। পাখীর ডাকে ঘুম-ভাঙা আবেশ জড়ানো।

স্যাভাল বলল: 'প্রায় সকাল। চল, ফিরি।'

ওরা দু'জন বাড়ির দিকে ফিরল।

সারভিগিনি যখন ঘরে ঢুকল, তখন খোলা জানালা দিয়ে সিঁদুর-রাঙা দিগন্ত দেখা যাচ্ছে। ও বিছানায় শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইভেত্তিকে ঘিরে কত বিচিত্র স্বপ্ন দেখলো।

একটা অদ্ভুত শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল, কান পেতে রইল অনেকক্ষণ। শুনল না কিছুই। তারপর আবার সেই ঝন্ ঝন্ শব্দ।

ও লাফিয়ে এল জানালার কাছে। জানালা খুলে নীচে তাকাতেই দেখলো ইভেত্তি বাগানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে মুঠো মুঠো কাঁকর ছুঁড়ছে। ও পরেছে গোলাপী রঙের গাউন। মাথায় একটা মিলিটারী কায়দার টুপি। আর ঠোঁটে একটা দুর্ভেদ্য হাসি। ঐ হাসি আরও একটু তরল করে বলল: 'কি ব্যাপার মুসকাদ, এখনও ঘুমাচ্ছ। রাত জেগে কোন এ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিলে?'

'দাঁড়াও ইভেত্তি আসছি, এক মিনিট।'

সারভিগিনি দোতলার ঘর থেকে কথাগুলো সজোরে নীচে ছুঁড়ে দিল।

ইভেত্তি ওর প্রতিধ্বনি করল: 'দেরি কোরো না তাড়াতাড়ি। এখন তো বেলা দশটা বাজে। একটা নতুন প্ল্যান বের করেছি। তাড়াতাড়ি এসো।'

সারভিগিনি নীচে নেমে দেখল, ইভেত্তি একটা বেঞ্চে হাঁটুর উপর উপন্যাস রেখে বসে আছে।

সারভিগিনি কাছে আসতেই ইভেত্তি ওর একটা হাত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিজের কোলের উপর টেনে নিল। যেন গতরাতে কিছুই ঘটে নি। এত সহজতা দেখে আরেকবার প্রচণ্ড বিস্মিত হল সারভিগিনি।

ওরা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে বাগানের কোণায় গেল। ইভেত্তি বলল: 'তাহলে আমার প্ল্যানটা শোন। আমরা মার অবাধ্য হব ভাবছি। তুমি আমাকে ঐ দ্বীপের কাফেতে নিয়ে যাবে। মা বলছিলেন, ভাল মেয়েরা নাকি ওখানে যেতে পারে না। তুমি তো জানো, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে মুসকাদ? আমরা ওখানে অক্লাজনের সঙ্গে নদীতে সাঁতার দেব।'

সারভিগিনি ইভেত্তির দেহ থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না এটা কিসের গন্ধ। কারণ ওবাড়ি যে সেন্ট ব্যবহার করে এটা যে তা নয় সে বিষয়ে ওর কোন সন্দেহ নেই।

গন্ধটা আসছেই বা কোত্থেকে? ওর পোষাক থেকে? চুল থেকে? না সারা অঙ্গ থেকে? ইভেত্তি মুখের কাছে মুখ এনে কথা বলছে। ইভেত্তির নিঃশ্বাস পড়ছে ওর সারা মুখে। সারভিগিনির সমস্ত চেতনা বুঝি ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছে। তবে কি ও যে গন্ধটা পাচ্ছে সেটা কি ওর সম্মোহিত চেতনারই কল্পনা? ইভেত্তির প্রদীপ্ত যৌবন-উজ্জ্বল্যের মোহ জন্য নিঃসরণ?

ইভেত্তি আবার বলল: 'কি মুসকাদ, যাবে তো? দুপুর খাওয়ার পর দেখো কি গরম পড়ে। মা কিন্তু তখন বার হতে দেবে না। মা তো গরমটা একেবারে সহ্যই করতে পারেন না। তখন তোমার বন্ধুকে মার কাছে বসিয়ে রেখে আমরা সরে পড়ব। ভান করব যেন ধারে কাছে কোথাও যাচ্ছি।'

সীন নদীর মুখোমুখি হয়ে ওরা দাঁড়ালো। শান্ত নদীর বুকে সূর্যের আলো গলানো রূপোর মত ঝকঝক করছে। মাঝে মাঝে এক আধটা নৌকো নদীর বুকে সাঁতরে চলে যাচ্ছে। দূরে রবিবারের ব্যস্ত ট্রেনের হুইসিল শোনা যাচ্ছে।

এর মধ্যে খাওয়ার সময় হয়ে গেল। ওরা ভেতরে গেল।

চুপচাপ খাওয়ার ব্যাপারটা শেষ করে ফেললো। বাইরে জুলাই মাসের ঘর্মাক্ত দুপুর। দেহ-মন অবশ করে দেওয়া প্রচণ্ড গরম। কথা বলতেই ইচ্ছে করে না। সবটাতেই যেন একটা বিশ্রী অসহনীয় অবসাদ।

ইভেতি মুখে চুপচাপ থাকলেও ওর চলাফেরায় কিন্তু বেশ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাচ্ছে। খাওয়া শেষ হতেই ও বলল: 'এই গরমে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে খুব মজা।'

ওবাড়িকে সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগছে। ও প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: 'তুমি ক্ষেপেছো না কি? এই গরমে কেউ ঘরের বার হতে পারে।'

চট করে ইভেতি উত্তর দিল: 'বেশ, তুমি ম'সিয়ে ব্যারণের সঙ্গে গল্প কোরো। আমি আর মুসকাদ গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসে বসে বই পড়ব।'

তারপর ইভেতি সারভিগনির দিকে ঘুরে বলল: 'তাই না মুসকাদ—তুমি কি বলো?'

সারভিগনি বলল: 'তুমি যা বলো, আমি তো তাতেই রাজী।'

তৎক্ষণাৎ ইভেতি দৌড়ে গেল টুপি আনতে। ওবাড়ি কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল: 'মেয়েটা সত্যিই পাগল।'

আলস্যে ওবাড়ি ওর শুভ্র সুন্দর সুডৌল হাতখানা বাড়িয়ে দিল। স্যাভাল হাতের উপর ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেল।

ইভেতি আর সারভিগনি বেরিয়ে গেল। ব্রীজ পার হয়ে ওরা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছালো। তারপর নদীর পাড়ে উইলো গাছের নীচে গিয়ে বসলো। কারণ কাফেতে যাবার সময় এখনও হয় নি।

ইভেতি বসেই চট্ করে পকেট থেকে একটা বই বের করে হাসতে হাসতে বলল: 'মুসকাদ, তুমিই পড়ে শোনাবে, তাই না?'—বলে বইটা সারভিগনির দিকে এগিয়ে দিল।

সারভিগনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল: 'কি বললে, আমি? আমি পারব না।'

ইভেতি বলল: 'উঁহু, তা হবে না। মুসকাদ, তুমি তো খুব লক্ষ্মী।'

নিরুপায় হয়ে সারভিগনি বইটা তুলে নিতেই বিস্মিত হল? এ বই পড়বার শ্রম-স্বীকার তাকে করতে হবে? বইটা এক ইংরাজ লেখকের লেখা পিপীলিকাদের জীবনেতিহাস। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবল, ইভেতি ওর সঙ্গে মজা করছে না তো?

'কি হ'ল পড়ো?' ইভেতি তাড়া দিল।

'তুমি কি ঠাট্টা করছো?' সারভিগনির সংশয়-সংকুল প্রশ্ন।

ইভেতি জোরগলায় প্রতিবাদ করে বলল: 'কখনোই নয়। দোকানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পিপীলিকাদের সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে ভালো বই। আর দ্যাখো তো, এখানে বসে ওদের জীবনও যেমন জানা যাবে, তেমনি এই যে ঘাসের উপর দিয়ে ওরা ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে ওদের তেমনি চেনাও যাবে। সুতরাং লক্ষ্মীটি, আর দেরী কোরো না।'

ইভেতি ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। হাত দু'টো ভাঁজ করে তার উপর মাথাটা রেখে ঘাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

সারভিগনি পড়তে সুরু করল: 'নিঃসন্দেহে, মানুষের সঙ্গে বানরের শারীরিক সাদৃশ্য অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু আমরা যদি পিপীলিকার অভ্যাস, ওদের সামাজিক গঠন, ঘর-বাড়ির নির্মাণ-কৌশল, স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা প্রণালী এমন কি চাকর রাখার কথা চিন্তা করি তবে বুদ্ধির দিক থেকে মানুষের পরেই ওদের স্থান একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।'

সারভিগনি একটানা পড়ে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে থেমে থেমে জিজ্ঞেস করে 'থামব?'

ইভেতি মাথা ঝাঁকিয়ে নেতিবাচক ইংগিত করে। ও একটা ঘাসের ডগায় একটা পিঁপড়ে তুলে নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে খেলাতে লাগলো। আর নিবিষ্ট হয়ে পিঁপড়েদের জীবন কাহিনী শুনতে লাগলো—কেমন করে ওদের জন্ম হয়, রক্ষিত হয়, খাইয়ে বাড়িয়ে তোলা হয়।

শুনতে শুনতে যেন একটা মাতৃত্বের অনুভূতি ইভেতির সারা দেহে নাড়া দিয়ে গেল। ইভেতি পিঁপড়েটাকে ঘাস থেকে আঙুলের ডগায় তুলে নিল। স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চুমু খেতে চাইল। যখন সারভিগনি পড়ছিল কেমন করে সমাজবদ্ধ হয়ে ওরা বাস করে, কেমন করে খেলাধূলা করে তখন ইভেতি চুমু খেতে পিঁপড়েটাকে মুখের কাছে আনতেই পিঁপড়েটা সারা মুখে ছুটতে লাগলো। আর তাতে ইভেতি এমন ভাবে কেঁপে উঠলো, যেন ও ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে।

সারভিগনি চীৎকার করে হেসে উঠল। ইভেতির চুলের কাছ থেকে পিঁপড়েটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল তার পরিবর্তে ঠিক ওই জায়গাতেই সারভিগনি একটা দীর্ঘ চুমু খেল।

ইভেতি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল: 'উপন্যাসের চেয়ে এসব বই আমার অনেক বেশি ভাল লাগে। যাক্‌গে, চল, এখন কাফেতে যাই।'

ওরা দ্বীপের এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল যেখানটা পার্কের

মত অনেক গাছের পাতায় সমাচ্ছন্ন। সীন নদীর পাড় ঘেঁষে অনেক দম্পতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, নদীর উপর দিয়ে নৌকাগুলো ভেসে যাচ্ছে। ছেলে মেয়ে—প্রত্যেকের হাতে কোট আর মাথার পেছন দিকে লম্বা টুপী। শিশুরা মুরগীর বাচ্চার মত ওদের মা-বাবার চারপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছে। চারদিক মানুষের কলকণ্ঠে উদ্বেলিত। হঠাৎ দেখা গেল, একটা বিরাট ছইয়ালা নৌকা পাড়ে এসে ঠেকছে। নৌকাটা ছেলে মেয়েতে বোঝাই। সবাই একটা প্রকাণ্ড টেবিলের চারপাশে বসে, দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে, চীৎকার করছে, গান করছে, হাসছে, নাচছে। আর লম্বা, লাল চুল মেয়েগুলো ওদের বুকের সমুন্নত উদ্ধত যৌবনকে নিয়ে সবাইকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে। অন্যান্য মেয়েরা প্রায় অর্ধনগ্ন ছেলেদের সামনে উন্মত্ত হয়ে নাচছে। কেউ কেউ আবার নৌকার ছইয়ের উপর থেকে নদীর বুকে লাফিয়ে পড়ছে। এক পৈশাচিক আনন্দে আশে পাশের লোকের গায়ে জল ছিটোচ্ছে।

ওদিকে নদীতে ততক্ষণে তোলপাড় লেগে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকোর আনাগোনা অনবরত চলছে। ফাঁকে ফাঁকে ডিঙিগুলো সাঁ সাঁ করে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে। অধিকাংশ মেয়েদের পরিধানে লাল ও নীল রঙের গাউন। মাথায়ও একই রঙের ছাতা। পরিষ্কার সূর্যের আলোয় এই রঙ-বাহার মিলেছে বেশ।

ইভেতি সারভিগনির হাত ধরে এই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। ওকে দেখে খুব খুশি খুশি লাগছে। ও বলল: 'ছাখো, মুসকাদ, মেয়েটার চুলগুলো কি সুন্দর! আর ছাখো, প্রত্যেকেই কেমন আনন্দ করছে।'

এর মধ্যে এক পিয়ানোবাদক পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করল। বাজনা শুনেই ইভেতি ওর সঙ্গীর কোমর জড়িয়ে নাচতে সুরু করল। ওদের নাচ এত দীর্ঘ এবং দ্রুত লয়ে যে সমস্ত দর্শক বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। যারা এতক্ষণ বসে বসে মদ খাচ্ছিল তারাও এবার টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পায়ের শব্দ করতে লাগলো। পিয়ানো-বাদকও বুঝি পাগল হয়ে গেছে। ও নাচের লয় রাখতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমস্ত দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে পিয়ানোর উপর আঙুল চালিয়ে যেতে লাগলো।

হঠাৎ পিয়ানোবাদক থেমে গেল। মাটির উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে ওকে মৃতের মত মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটল দর্শকদের মধ্যে। চারজন লোক এসে পিয়ানোবাদককে তুলে নিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোক ছুটলো ওদের পেছন পেছন।

ইভেতিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে লাগলো। ও শুধু হাসছে। হাসিতে টলে পড়ছে। নিজেকে বুঝি হারিয়ে দিতে চায় এই উন্মত্ত আনন্দে। যুবকেরা নগ্নদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সারভিগনি কেমন যেন একটা নগ্ন আশংকায় স্তিমিত হল।

এদিকে সেই পিয়ানোবাদককে নিয়ে সমস্ত লোক ছুটতে লাগলো। হঠাৎ ওরা নদীর দিকে ঘুরে গেল। নদীর পাড়ে এসে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। বিশাল জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠল। আর বেচারা পিয়ানোবাদক জলে পড়ে সমানে হাঁচতে লাগলো।

ইভেতিও আনন্দে মেতে উঠলো। হাততালি দিয়ে চীৎকার করে বললো: 'ছাখো মুসকাদ, ছাখো, ছাখো।'

সারভিগনি কিন্তু রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। ও খুব বিস্মিত হল, কেমন করে ইভেতি এই অস্বাভাবিক এবং অমানুষিক আনন্দের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারছে দেখে। ওর আভিজাত্য বোধটা আহত হল। কেন ইভেতি নিজেকে এত নিম্নস্তরের আনন্দে নিজেকে বিলীন করে দিচ্ছে? তবে কি এই সব অসভ্য অশ্লীল জনতার সঙ্গে ইভেতির কোন পার্থক্যই নেই?

ইভেতি বলল 'মুসকাদ, জানো আমার খুব স্নান করতে ইচ্ছে করছে।'

'বেশ।'

সারভিগনি নিজের মনোবেদনাকে গোপন করে সায় দিল।

ওরা স্নানঘরে ঢুকলো স্নানের পোষাক পরে নেবার জন্য। প্রস্তুত হয়ে দু'জনে এসে জলে নামলো।

ইভেতি এত অনায়াসভঙ্গীতে সাঁতার কাটছে যেন যে কোন মুহূ ও নদীটা পেরিয়ে যেতে পারে। সারভিগনি ওর সঙ্গে গতির সম রক্ষা করতে পারছে না। ইভেতি বুঝতে পেরে ওর গতি কমিয়ে দিল জলের উপর চিৎ হয়ে আলতোভাবে ভেসে রইল। সারভিগনি অধ চোখে যেন কোন বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলো মনে হচ্ছে যেন একখণ্ড পেঁজা তুলোকে মানুষের আকারে জলের উ ফেলে রাখা হয়েছে। গলা থেকে পেট পর্যন্ত একটা সুন্দর নদীর ঢেউকেও হার মানিয়েছে। উরুর অর্ধেকটা জলের উপর নগ্ন পা দু'টো জলের উত্তালতার সঙ্গে খেলছে। ইভেতিও সারভিগনিকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে। কখনও ধরা তো পরক্ষণেই যায় পালিয়ে। সারভিগনিকেও যেন একটা আ কামনা হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ ইভেতি ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল: 'তোমার মাথ কি সুন্দর!'

সারভিগনি একটু আহত হল। এই আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চাইল ইভেতিকে আঘাত করে। ও বলল: 'এ রকম জীবনই তুমি চাও—তাই না ইভেতি?'

'কি রকম?'

ইভেতি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল।

'কি বলতে চাইছি, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো।'

'সত্যিই বলছি পারি নি।'

'আনন্দটা মোটামুটি মন্দ হ'ল না।'

'তুমি যেন কেমন ছেড়ে ছেড়ে কথা বলছ।'

'জাখো, না বোঝার মত বোকা মেয়ে তুমি নও। তা ছাড়া গতরাতেই তো আমার কথা তোমায় বলেছি।'

'কি যেন বলেছিলে? আমি একদম ভুলে গেছি।'

'তোমায় ভালবাসি।'

'কে—তুমি?'

'হ্যাঁ—আমি।'

'কি মিথ্যে তুমি বলছো।'

'এর চেয়ে বড় সত্যি আমার কাছে আর কিছু নেই।'

'প্রমাণ কি?'

'তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই নে।'

কানে কানে কথা

—গোপাল চক্রবর্তী

পদ্মপাতায় জল

—তারকনাথ ঘোষাল

মত অনেক গাছের পাতায় সমাচ্ছন্ন। সীন নদীর পাড় ঘেঁষে অনেক দম্পতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, নদীর উপর দিয়ে নৌকাগুলো ভেসে যাচ্ছে। ছেলে মেয়ে—প্রত্যেকের হাতে কোট আর মাথার পেছন দিকে লম্বা টুপী। শিশুরা মুরগীর বাচ্চার মত ওদের মা-বাবার চারপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছে। চারদিক মানুষের কলকণ্ঠে উদ্বেলিত। হঠাৎ দেখা গেল, একটা বিরাট ছইয়ালা নৌকা পাড়ে এসে ঠেকছে। নৌকাটা ছেলে মেয়েতে বোঝাই। সবাই একটা প্রকাণ্ড টেবিলের চারপাশে বসে, দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে, চীৎকার করছে, গান করছে, হাসছে, নাচছে। আর লম্বা, লাল চুল মেয়েগুলো ওদের বুকের সমুন্নত উদ্ধত যৌবনকে নিয়ে সবাইকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে। অন্যান্য মেয়েরা প্রায় অর্ধনগ্ন ছেলেদের সামনে উন্মত্ত হয়ে নাচছে। কেউ কেউ আবার নৌকার ছইয়ের উপর থেকে নদীর বুকে লাফিয়ে পড়ছে। এক পৈশাচিক আনন্দে আশে পাশের লোকের গায়ে জল ছিটোচ্ছে।

ওদিকে নদীতে ততক্ষণে তোলপাড় লেগে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকোর আনাগোনা অনবরত চলছে। ফাঁকে ফাঁকে ডিঙ্গিগুলো সাঁ সাঁ করে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে। অধিকাংশ মেয়েদের পরিধানে লাল ও নীল রঙের গাউন। মাথায়ও একই রঙের ছাতা। পরিষ্কার সূর্যের আলোয় এই রঙ-বাহার মিলেছে বেশ।

ইভেতি সারভিগানির হাত ধরে এই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। ওকে দেখে খুব খুশি খুশি লাগছে। ও বলল: 'দ্যাখো, মুসকাদ, মেয়েটার চুলগুলো কি সুন্দর! আর দ্যাখো, প্রত্যেকেই কেমন আনন্দ করছে।'

এর মধ্যে এক পিয়ানোবাদক পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করল। বাজনা শুনেই ইভেতি ওর সঙ্গীর কোমর জড়িয়ে নাচতে শুরু করল। ওদের নাচ এত দীর্ঘ এবং দ্রুত লয়ে যে সমস্ত দর্শক বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। যারা এতক্ষণ বসে বসে মদ খাচ্ছিল তারাও এবার টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পায়ের শব্দ করতে লাগলো। পিয়ানো-বাদকও বুঝি পাগল হয়ে গেছে। ও নাচের লয় রাখতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমস্ত দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে পিয়ানোর উপর আঙুল চালিয়ে যেতে লাগলো।

হঠাৎ পিয়ানোবাদক থেমে গেল। মাটির উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে ওকে মৃতের মত মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটল দর্শকদের মধ্যে। চারজন লোক এসে পিয়ানোবাদককে তুলে নিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোক ছুটলো ওদের পেছন পেছন।

ইভেতিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে লাগলো। ও শুধু হাসছে। হাসিতে টলে পড়ছে। নিজেকে বুঝি হারিয়ে দিতে চায় এই উন্মত্ত আনন্দে। যুবকেরা নগ্নদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সারভিগানি কেমন যেন একটা নগ্ন আশংকায় স্তিমিত হল।

এদিকে সেই পিয়ানোবাদককে নিয়ে সমস্ত লোক ছুটতে লাগলো। হঠাৎ ওরা নদীর দিকে ঘুরে গেল। নদীর পাড়ে এসে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। বিশাল জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠল। আর বেচারা পিয়ানোবাদক জলে পড়ে সমানে হাঁচতে লাগলো।

ইভেতিও আনন্দে নেচে উঠলো। হাততালি দিয়ে চীৎকার করে বললো: 'ভাখো মুসকাদ, ভাখো, ভাখো!'

সারভিগানি কিন্তু রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। ও খুব বিস্মিত হল, কেমন করে ইভেতি এই অস্বাভাবিক এবং অমানুষিক আনন্দের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারছে দেখে। ওর আভিজাত্য বোধটা আহত হল। কেন ইভেতি নিজেকে এত নিম্নস্তরের আনন্দে নিজেকে বিলীন করে দিচ্ছে? তবে কি এই সব অসভ্য অশ্লীল জনতার সঙ্গে ইভেত্তির কোন পার্থক্যই নেই?

ইভেতি বলল 'মুসকাদ, জানো আমার খুব স্নান করতে ইচ্ছে করছে।'

'বেশ।'

সারভিগানি নিজের মনোবেদনাকে গোপন করে সায় দিল।

ওরা স্নানঘরে ঢুকলো স্নানের পোষাক পরে নেবার জন্য। প্রস্তুত হয়ে দু'জনে এসে জলে নামলো।

ইভেতি এত অনায়াসভঙ্গীতে সাঁতার কাটছে যেন যে কোন মুহূর্তে ও নদীটা পেরিয়ে যেতে পারে। সারভিগানি ওর সঙ্গে গতির সমতা রক্ষা করতে পারছে না। ইভেতি বুঝতে পেরে ওর গতি কমিয়ে দিল। জলের উপর চিৎ হয়ে আলতোভাবে ভেসে রইল। সারভিগানি অবাক চোখে যেন কোন বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলো। মনে হচ্ছে যেন একখণ্ড পেঁজা তুলোকে মানুষের আকারে জলের উপর ফেলে রাখা হয়েছে। গলা থেকে পেট পর্যন্ত একটা সুন্দর ঢেউ নদীর ঢেউকেও হার মানিয়েছে। উরুর অর্ধেকটা জলের উপর। নগ্ন পা দু'টো জলের উত্তালতার সঙ্গে খেলছে। ইভেতিও যেন সারভিগানিকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে। কখনও ধরা দেয় তো পরক্ষণেই যায় পালিয়ে। সারভিগানিকেও যেন একটা অদম্য কামনা হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ ইভেতি ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল: 'তোমার মাথাটা কি সুন্দর!'

সারভিগানি একটু আহত হল। এই আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চাইল ইভেতিকে আঘাত করে। ও বলল: 'এ রকম জীবনই তুমি চাও—তাই না ইভেতি?'

'কি রকম?'

ইভেতি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল।

'কি বলতে চাইছি, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো।'

'সত্যিই বলছি পারি নি।'

'আনন্দটা মোটামুটি মন্দ হ'ল না।'

'তুমি যেন কেমন ছেড়ে ছেড়ে কথা বলছ।'

'ভাখো, না বোঝার মত বোকা মেয়ে তুমি নও। তা ছাড়া গতরাতেই তো আমার কথা তোমায় বলেছি।'

'কি যেন বলেছিলে? আমি একদম ভুলে গেছি।'

'তোমায় ভালবাসি।'

'কে—তুমি?'

'হাঁ—আমি।'

'কি মিথ্যে তুমি বলছো।'

'এর চেয়ে বড় সত্যি আমার কাছে আর কিছু নেই।'

'প্রমাণ কি?'

'তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই নে।'

কানে কানে কথা
—গোপাল চক্রবর্তী

পদ্মপাতায় জল
—তারকনাথ ঘোষাল

ডালিয়া

—বিজয়া দাশগুপ্ত

—প্রাণগোপাল পাল

আনা-লেক (আজমীঢ়)

—দেবব্রত গুপ্ত

পশরা

—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জল ও জাল

—বিশ্ববন্ধু বসাক

'বেশ, দেখব।'

'কি দেখবে, তা তো গত রাত্তিরে বলো নি।'

'তুমি তো জানতে চাও নি।'

'উঁহুঁ, তা অসম্ভব।'

'তা ছাড়া আমি তো একাই সবটুকু বলবার অধিকারী নই।'

'কে তা হ'লে?'

'আমার মা।'

জোরে হেসে উঠল সারভিগনি। বলল: 'তো—মার মা! খুব বেশি বলছো না কি!'

হঠাৎ ইভেত্তি গম্ভীর হয়ে গেল। সারভিগনির চোখে চোখ রেখে বলল: 'শোনো মুসকাদ, যদি সত্যি আমাকে ভালবাসো, যদি সত্যি আমাকে বিয়ে করতে চাও তবে সব চেয়ে আগে মা'কে বলো। তারপর আমায় কথা বলবো।'

কেমন যেন সন্দিগ্ধ হল সারভিগনি। তবে কি এখনো ইভেত্তি ওর সঙ্গে ছলনা করছে? কণ্ঠে উষ্মা মিশিয়ে বলল: 'তুমি আমাকে কি ভাবো ইভেত্তি? তোমার ওই অনুরাগীদের একজন?'

ইভেত্তি শান্ত গলায় বলল: 'সত্যি তোমাকে আজ সত্যিই বুঝতে পারছি না।'

সারভিগনি তখনও শান্ত হতে পারে নি। আগের মতই ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল: 'ভাখো ইভেত্তি, আমরা অনেক দিন থেকেই এই হাস্যাস্পদ খেলা খেলে আসছি। এর একটা শেষ হবার প্রয়োজন আছে। তুমি নিজেকে খুব সাধু বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করো। কিন্তু বিশ্বাস করো, তুমি সেই অভিনয়ে নেহাৎই বেমানান। তা ছাড়া তোমার বোঝা উচিত, তোমার সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হতে পারে না। কেবলমাত্র ভালবাসা ছাড়া। আর সেই কথা আমি আবারও বলছি।'

এতক্ষণ ওরা পাশাপাশি সাঁতার দিচ্ছিল। কিন্তু সারভিগনির কথা শেষ হতেই ইভেত্তি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। কেমন যেন একটা নিস্তেজ ভাব। তারপর হঠাৎ দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে পালিয়ে গেল ইভেত্তি।

সারভিগনি ওর সমানে সাঁতার কাটতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠল। সারভিগনি দেখল, ইভেত্তি জল থেকে উঠে পেছনে একবারও না তাকিয়ে সোজা চলে গেল।

সারভিগনি ধীরে ধীরে জল থেকে উঠে পোষাক পরল। হঠাৎ কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেল। হকচকিয়ে গেছে সারভিগনি। ভাবলো, এরপর ইভেত্তিকে কি বলবে? নাকি ইভেত্তির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে? কিংবা আরও ধৈর্য ধরবে?

একাকী একটু সঙ্কুচিত হয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল সারভিগনি। মাথার ভেতর বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলো কুয়াশার মত এলোপাতাড়ি ভেসে বেড়াচ্ছে।

ওবার্ডি তখন স্যাভালের হাত ধরে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারভিগনিকে দেখেই ওবার্ডি বলল: 'আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম, এই গরমে বেরিয়ো না। নাও, এখন তো ইভেত্তির সর্দিগর্মি লেগে গেছে। ও তো সোজা বিছানায় শুয়ে পড়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই রোদে ঘুরেছিলে। ইভেত্তির যতটুকু আছে, তোমার ততটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নেই।'

ইভেত্তি খেতেও এলো না। অন্ত কিছু খাবে কি না জিজ্ঞেস করাতে বলল ওর খিদেই পায় নি। দরজায় ছিটকানি লাগিয়ে ও একাই থাকতে চায়।

সারভিগনি আর স্যাভাল আবার বৃহস্পতিবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাত দশটায় চলে গেল।

ওবার্ডি খোলা জানালার কাছে চুপচাপ বসে রইল। কতকগুলো দুর্বল মুহূর্ত এসে ওকে এমন দুর্বল করে ফেলে যে কোন কোন সময় ওর সমস্ত অভিজ্ঞতার মূল্য যায় হারিয়ে। ওর সমস্ত সত্তাকে এমন প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে যায় যে, ও আবার সেই ছোট্ট শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পৃথিবীটা নতুন দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছে করে। নতুন ভাবে জীবন গড়ে তুলতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু ওবার্ডি সেই সব মেয়েদের একজন, যারা সহজেই ভালবাসা অর্জন করতে পারে—ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। ভালবাসার আবরণে নিজেদের সত্যিকারের স্বরূপ সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলতে পারে। তাই যেমন সহজে অর্থ দেওয়া যায়, তেমনি সহজে আলিঙ্গন গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। একজন পরিব্রাজক যেমন বাঁচবার তাগিদে সব কিছু খেতে পারে, ওবার্ডিও যে কোন পুরুষের যে কোন অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে পারে।

তবুও সময় আসে। যখন একটা দুঃসহ জ্বালা দেহের ভেতরে-বাইরে পুড়িয়ে দিতে থাকে। অভিজ্ঞতা থেকেই অনুভব করেছে ওবার্ডি, যে পুরুষ ওকে বেশি মুগ্ধ করতে পেরেছে তার জ্বালাই তত বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ও বুঝি ওর সমস্ত দেহ-মন দিয়ে ভালবেসে ফেলে। নদীতে আত্মহত্যার মত প্রেমের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবার ঝোঁকেই ওবার্ডির কি এক তীব্র সুখানুভূতি। প্রত্যেকবারই ওর মনে হয় অনুভূতির এত তীব্রতা বুঝি আর কোনদিন ওর ভেতর এত আলোড়ন তোলে নি। তখন যদি ওকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, আরও এমনি কত কত পুরুষকে ঘিরে ও আজকের মত অনেক তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাতের পর রাত পার করে দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই খুব বিস্মিত হবে ওবার্ডি।

এমনিতর এক অনুভূতির জ্বালায় আজকে আবার ওকে জ্বলতে হচ্ছে। আবার আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পথের নিশানা পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কৈ তবুও তো স্যাভালকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না। বার বার যেন স্যাভালের ছায়া ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওর সমস্ত চেতনাকে আড়াল করে দেয়। কেমন করে যেন স্যাভাল ওর সমস্ত দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। স্যাভালকে ভাবতে ভাল লাগছে ওবার্ডির। আবার নতুন নতুন স্বপ্নের জাল বুনতে ভাল লাগছে তার।

পেছন থেকে একটা শব্দে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওবার্ডি। ইভেত্তি এসেছে। দিনের পোষাকটাই এখনও পরে আছে ইভেত্তি। খুব ক্লান্ত লাগছে ওকে। খুব নিস্তেজ। চোখ দু'টো অস্বাভাবিক ভাবে জ্বল জ্বল করছে। খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ইভেত্তি। ধরা গলায় বলল: 'তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।'

ওবার্ডি খুব বিস্মিত হল। তাকালো ওর দিকে। ইভেত্তিকে ওবার্ডি ভালবাসে। কিন্তু তা তো নিতান্তই স্বার্থপুষ্ট ভালবাসা। মেয়ের সৌন্দর্যে গর্বিতা ওবার্ডি। যেন একটা বিরাট মহামূল্য ঐশ্বর্য ওর আয়ত্তে। ঐশ্বর্যকে ও কোন মতেই হাত ছাড়া হতে দিতে রাজি নয়। এই ঐশ্বর্যের সংরক্ষণের জন্য যে কোন পথ নিতে পারে ওবার্ডি। তাই ইচ্ছে করেই ইভেত্তি সম্বন্ধে ওবার্ডি চিরদিন অচেতন থাকবার চেষ্টা করে এসেছে ? ওবার্ডি বলল : 'বলো কি বলছিলে, আমি শুনছি।'

ইভেত্তি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। মায় ভেতরটা দেখবার জন্য। ওর প্রতিটি কথায় মায় মুখের প্রতিটি পরিবর্তন লক্ষ্য করবার জন্য ও বলল : 'হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ভাবে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কি সেটা ?'

'মঁসিয়ে সারভিগনি আমায় বলছিল, ও আমায় ভালবাসে।'

ওবার্ডি বুঝি মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল। ও ইভেত্তির পরবর্তী কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ইভেত্তির নীরবতা দেখে বলল : 'সে কি বলছিল ?'

ইভেত্তি মায় পায়ের কাছে বসল। বলল : 'আমাকে বিয়ে করবে বলেছে।'

আকাশ থেকে পড়ল ওবার্ডি। চীৎকার করে উঠল : 'কে ? বিয়ে করবে সারভিগনি ? তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়েছ।'

ইভেত্তি মায়ের চোখে চোখ রেখেই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : 'আমি পাগল হবো কেন ? আর সারভিগনিই বা আমায় বিয়ে করবে না কেন ?'

একটু বিচলিত হল ওবার্ডি। বলল : 'তুমি নিশ্চয়ই ভুল শুনেছো। এটা কখনই হতে পারে না। সারভিগনি এতবড় ধনী যে তোমাকে কখনও বিয়ে করতে পারে না। তা ছাড়া আদবকায়দায় এত বেশি প্যারীসিয়ান যে ওরা কখনও বিয়ে করতে পারে না।'

ইভেত্তি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বলল : 'আর যদি আমায় সত্যি ভালবেসেই থাকে।'

ওবার্ডি একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। বলল : 'ভেবেছিলাম, পৃথিবীটাকে ঠিকমত চেনার, জানার বয়স তোমার হয়েছে। কিন্তু দেখলাম তা হয় নি। একেবারেই হয় নি। সারভিগনিই সত্যিকারের মানুষ। তাই স্বার্থবাদী। শোন, ও বিয়ে করবে ওই সমাজের কাউকে। তা সত্ত্বেও যদি তোমায় বিয়ে করতে যায় তার অর্থ···তার অর্থ··'

মা হয়ে মেয়ের কাছে ওবার্ডি কি করে মনের সংশয়টাকে প্রকাশ করে ? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল : 'যাও, এখন শুতে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।'

'যাচ্ছি।'—বলে ইভেত্তি মা'র কপালে চুমু খেয়ে শান্ত পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। [illegible] পেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ওবার্ডি ডেকে জিজ্ঞেস করল : তোমার শরীর কেমন ?

ইভেত্তি জানাল : 'অসুস্থতা আর নেই, শরীর ভাল।'

ওবার্ডি আবার বিরক্ত হল। পাশ কাটিয়ে বলল : 'যাক, এ ব্যাপারে আবার পরে কথা বলব। তবে কিছুদিনের জন্য আর সারভিগনির সঙ্গে একাকী বেরিও না। আর তুমি নিঃসন্দেহে থাকতে পারো ও তোমায় বিয়ে করবে না। ও যেটা চায়, সেটা হল তোমাকে একেবারে নিবিড় করে পেতে।'

এর চেয়ে অর্থপূর্ণ ভাষা আর পেল না ওবার্ডি, যা দিয়ে ওর মনের সন্দেহটা প্রকাশ করতে পারে।

ইভেত্তি কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেল।

একমাত্র বাইরের অন্ধকার কালো রাত্রিকে সঙ্গী করে ওবার্ডি বসে রইল তখনও। সব যেন কেমন করে ওলোট-পালোট হয়ে গেল। একটা কেমন যেন ইচ্ছে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক ইচ্ছাটা যে কি বোঝাও যায় না।

কাম ও কাঞ্চনের চাকচিক্যের মধ্য দিয়ে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে ওবার্ডি। কিন্তু নিজের মন ভারাক্রান্ত হবার ভয়ে ও সব সময় থেকেছে সাবধান। তাই ইচ্ছে করেই ইভেত্তির জন্য সমস্ত ভাবনাগুলো যতদিন পারা যায় দূরে সরিয়ে রেখে এসেছে এতকাল। শুধু এই আশ্বাস নিজেকেই নিজে দিয়েছে, সময় এলে ভাবা যাবে। আজ সেই সময় এসেছে। কিন্তু আজ তো থৈ পায় না ইভেত্তি। এতদিনকার জমানো ভাবনাগুলো যেন আজ এক সঙ্গে ওর সামনে থেই থেই করে নাচছে।

তা ছাড়া নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ওবার্ডি। এই সচেতনতা থেকে ওর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, নেহাৎ ভাগ্যের জোর না থাকলে ইভেত্তিকে কোন সৎ বংশজাত ধনী বিয়ে করতে রাজি হবে না। আর এই সৌভাগ্য সম্পর্কেও যথেষ্ট স্পর্শকাতরতা ছিল ওবার্ডির। কারণ ও জানে, যদি সত্যি কোনদিন এমনিতর সৌভাগ্য এসে উপস্থিত হয় ইভেত্তির জীবনে, সেদিন কখনই নিজের প্রকৃত পরিচয়কে অন্তরালে রাখতে পারবে না।

ওবার্ডির এতকাল ধারণা ছিল, ইভেত্তি হয় তো ওর মায়েরই পদাংক অনুসরণ করবে। ভালবাসার মন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু এই পরিবর্তন কেমন—কেমন করে আনবে একথা ভেবে দেখতেও সাহস পায় নি ওবার্ডি।

কিন্তু আজ ওবার্ডিকে ভাবতে হচ্ছে। ভাবতে হচ্ছে ইভেত্তিকে নিয়ে। ইভেত্তির ভবিষ্যত নিয়ে। আর শুধু এলোমেলো ভাবলেই চলবে না। ভাবতে হবে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে। একটা কিনারে এসে পৌছাতে হবে। অথচ এমন ভাবনাটার কোন সহজ মীমাংসা নেই। নেই কোন সহজ উত্তর কিংবা কোন সহজ প্রতিবিধান। তবুও অতলান্ত ভাবনার সাগরে ডুবতেই হবে ওবার্ডিকে।

জীবনের বিচিত্র পথে ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতাও কম সঞ্চয় করে নি ওবার্ডি। এই অভিজ্ঞতা দিয়েই চিনেছে সমগ্র পুরুষ জাতটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তাই ইভেত্তির কথায় ও অমন করে চীৎকার করে বলেছিলো : 'সারভিগনি তোমায় বিয়ে করবে ? তুমি কি পাগল হয়েছ ?'

হায় সারভিগনি। তুমিও শেষ পর্যন্ত শহরে বুদ্ধিমান লম্পটদের মত বিয়ে করবার প্রলোভন দেখিয়ে অত্যন্ত সহজ পুরোনো মতলবটাই অবলম্বন করেছ।

আর ইভেত্তি। তোমার দু' চোখের সামনে কি'করেই বা সম্পূর্ণ পৃথিবীটার আসল রূপটা তুলে ধরি ? আজো তুমি কিছুই চিনতে

পারো নি। তাই প্রকৃতির সবুজতা, নির্মলতা, বিশুদ্ধতা এখনও তোমার দু' চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায় নি।

ওবার্ডি কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। ওর এতকাল ধরে অর্জিত সমস্ত মানসিক ধৈর্য, অভিজ্ঞতা সবকিছুই যেন অনর্থক মনে হচ্ছে। এই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার কোন পথই বুঝি নেই।

খুব ক্লান্ত মনে হল নিজেকে। সারা জীবনের সমস্ত ক্লান্তি আজ যেন একসঙ্গে ছেয়ে ফেলছে ওকে। ভাবতেও আর পারছে না ও। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল: 'এখন থেকে ওদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবো। তারপর যা করার করা যাবে। প্রয়োজন হলে না হয় এ সম্পর্কে সারভিগনির সঙ্গেই কথা বলবো। ও খুব বুদ্ধিমান আছে, ইঙ্গিতেই সব বুঝবে।'

কিন্তু কি বলবে তা ভাববার আর কোন প্রয়োজন অনুভব করল না ওবার্ডি। বরং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার সুরাহা করা যাবে এ আশা করতে পেরেই খুশি হল।

আর ঠিক এই ভাবনাটা সরে যেতেই ওর সামনে ভেসে উঠল একটি মুখ। একটি ছায়া। একটি নাম। স্তাভাল। স্তাভাল। সর্বত্রই বুঝি ছড়িয়ে আছে স্তাভাল। অন্ধকার রাত্রির বুক থেকে দৃষ্টিটা কেড়ে নিয়ে ওবার্ডি তাকালো প্যারিস শহরের দিকে। ওদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে অসংখ্য চুমু খেল বাতাসে। বাতাসে ভেসে ভেসে সবকটা চুমুই যেন ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে স্তাভালের কাছে। আর ওর অজান্তে বসন্তের ছোঁয়ায় গলে যাওয়া বরফের মত ওর দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গলে এলো: 'আমি তোমায় ভালবাসি স্তাভাল, খুব বাসি।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইভেন্তিরও দু'চোখে ঘুম নেই। মার মত ও খোলা জানালার কাছে বসে। ওর দু'চোখে জল। ইভেন্তির জীবনে এই প্রথম কান্না। বেদনা থেকে যে কান্নার উৎস।

উচ্ছ্বসিত যৌবনের উদ্বেলতার মধ্য দিয়েই এতগুলো দিন কাটিয়ে এসেছে ইভেন্তি। কিন্তু আজ এ কি সংশয়? এ কি অনিশ্চয়তা? এ কি বিপর্যয়? ও কেন আর পাঁচটা মেয়ের মত জীবন পাবে না? কেন আজ ওকে এত দ্বিধা-সংশয়-সংকোচের জ্বালায় জ্বলতে হচ্ছে? ও সব বিষয়ে কথা বলে তাই কি? ওর চারপাশে যারা থাকে তাদের সঙ্গে একীভূত হতে পারে বলে কি? কিন্তু আসলে তো ও সাধারণ মেয়ের চেয়ে বেশি কিছু জানে না। তবুও ওর সহজতায় লোকে এত সন্দিহান কেন?

জীবনে একটা যে জটিল দিকও আছে, আর তাকে যে অবহেলায় চিরদিন দূরে সরিয়ে রাখাও যায় না, সে কথা কোনদিন উপলব্ধি করবার সুযোগ পায় নি ইভেন্তি। আর এই কারণেই কি এতদিন পুঞ্জীভূত জটিলতাগুলো জলপ্রপাতের মত উদ্দাম উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনেক উঁচু থেকে ইভেন্তির বুকের ভেতর? ইভেন্তি পারছে না। পারছে না নিজেকে সেই জলপ্রপাতের উদ্দামতার সম্মুখে দাঁড় করাতে। প্রতি নিমেষেই মনে হয় এই বুঝি ভেঙে-চুরে টুকরো টুকরো হয়ে মিলিয়ে যাবে জলপ্রপাতের অসীম জলধারায়।

কি জ্বালা! কি যন্ত্রণা! কি অস্বস্তি!

সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে সারভিগনির উপর। কেন—কি দরকার ছিল—এমন কি ক্ষতি করেছে ইভেন্তি সারভিগনির যার জন্যে চোখের জলে এমন করে আকুল হয়ে উঠবে ও। তবে কি সারভিগনি দূরে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে—কেমন করে একরত্তা মেয়েটা আশংকা-সংশয়-অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে জ্বলে মরছে ইভেন্তি? তাই কি সেদিন ওর সঙ্গে সারভিগনি এমন একটা আঘাত দেওয়া ব্যবহার করেছিল? সেই জন্যই কি সেদিন সারভিগনি ওকে অমন করে কতগুলো অসংলগ্ন দুর্বোধ্য কথা চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলো? এ রকম ইচ্ছেই যদি ওর থেকে থাকে তবে আসুক আজ, নিজচোখে দাঁড়িয়ে দেখুক ইভেন্তি জ্বলছে! আর সেই জ্বলুনিতে চোখের জলে দু'চোখ ফুলে টস-টস করছে।

কতবার চেয়েছে ইভেন্তি ভুলে যেতে। কোন-কিছুকেই স্মরণে রাখতে চায় না। কতবার শপথ করে সব ভাবনাগুলোকে ঠেলে দিয়ে হাসতে চেয়েছে। কিন্তু হাসতে গিয়েই যেন কান্নাই বেরিয়ে এসেছে। নিজের কানেই বিসদৃশ লেগেছে ইভেন্তির। আবার ভেঙে পড়েছে। কতবার ভেবেছে চেনে না ও। সারভিগনি বলে কেউ ওর জীবনে আসে নি। সারভিগনি বলে কোন লোকের সঙ্গে ওর কোনদিন পরিচয়ও হয় নি। সব মিথ্যে। সব ভুল। কিন্তু তাই করে কি সব-কিছুকে উড়িয়ে দিতে পেরেছে না পারছে?

সেদিন ইভেন্তি সারভিগনিকে ফেলে পালিয়ে এসেছিল। আঘাতে ভেঙে যাওয়া মনের টুকরোগুলো মেলাতে মেলাতে। কিন্তু সারভিগনি কি ওর বেদনার কিছুমাত্র অনুভব করতে পারে নি? পারে নি। কখনই পারে নি। হয় তো কোনদিনই পারবে না। অথচ ওর সেই কথাগুলো মনে পড়তেই আজও যেন ইভেন্তির বুকে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে থাকে। অথচ কথাগুলোর অর্থ আজ পর্যন্ত ও বুঝে উঠতে পারে নি। বিশেষ কেন সারভিগনি তাকে বলল: 'তুমি বেশ ভালো করেই জানো, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।'

তবে ও কি চায়? কিই বা বলতে চায়? কেন এ ভাবে সেদিন অপমান করলো? তাহলে কি কিছু লজ্জাকর গোপনীয়তা ইভেন্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, যার জন্যে ওকে এত অবজ্ঞা? তাই যদি হয়, তবে তা কি?

হঠাৎ যেন ওর সামনে থেকে সমস্ত আলো নিভে গেল। ইভেন্তির চারিদিকে অন্ধকার। শুধু অন্ধকার। ঘোর অন্ধকার। একটা না-জানা কলংক যেন সাপের মত ফণা তুলে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোবল মারবার মত সুযোগ খুঁজছে। সব কিছু বুঝি তলিয়ে যাচ্ছে। যে খাটের উপর বসে আছে সেই খাটটা। ওর সামনের টেবিলটা। ঘরটা, দরজাটা, জানলাগুলো। তারপর চেতনা। মিলিয়ে যাচ্ছে সব কিছু, সব কিছু। ওর সামনে দিয়ে সব কোথায় যেন সরে যাচ্ছে। ও উঠতে পারছে না। ধরতে পারছে না। কোন কিছু আগলে রাখতে পারছে না। ধীরে ধীরে ও নিজেই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু ওর কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ও কাঁদছে। দু' চোখের জলে নিজেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে চাইছে।

চোখের জলেই বুঝি খানিকটা ক্লান্তি ধুয়ে গেল। কেটে গেল খানিকটা দূষিত ভাবনা।

একটা ফুরফুরে বাতাস খোলা জানলায় পর্দায় নাচছে...

জাসটা নাচতে নাচতে ইভেভির চোখে মুখে বুকে সারা দেহে একটা
ই স্পর্শ দিয়ে গেল। একটা নতুন ভাললাগার মন্ত্র শিখিয়ে
ল। এক বুক সজীব নির্মল বাতাস টেনে নিল ইভেভি।

আমি তো কোন এক রাজার মেয়েও হতে পারি। কেন না তা
রা মোটেই অসম্ভব নয়। কত উপন্যাসে তো এরকম লাখো
খো উদাহরণ পেয়েছি। মা-ও তো সেই রাণী হতে পারে।
পর হয় তো একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে জন্য বাবা
ক দিলেন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে। রাজরাণী হয়েও মা বাধ্য
ন আমাকে নিয়ে পথে নামতে। কত দুঃসহ দুঃখ-বেদনা,
ঞ্জনা, অপমান-প্রত্যাখ্যান মা মুখ বুজে সইলো শুধু আমার
র দিকে তাকিয়ে। আমাকে মানুষ করে তোলার কঠোর
স্থায়। আমি বড় হয়ে উঠলাম। অনেক বড়। সমস্ত লোক
ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মা আমার প্রশংসায় গৌরব বোধ করে
অগোচরে নীরবে চোখের জল ফেলে। তারপর আমরা একদিন
াদের দুঃখের রজনী পেরিয়ে এলাম। বাবা আবার একদিন
াকে মাকে বুকে টেনে নিলেন। আমরা ফিরে পেলাম আবার
াদের জীবন, সমাজ, সম্মান, সম্পত্তি। সব। সব। অনেক।
॥

আর পারলো না। পারলো না আর ইভেভি কোন-একটা
না জানা নদীর বুকে নিজের সুখ-স্বপ্নের নৌকাখানাকে ছলছলিয়ে
। নিয়ে যেতে। হঠাৎ যেন থমকে গেল। হোঁচট খেল
যেতেই বুঝতে পারল না ও ঘুমাচ্ছে না জেগে আছে। যদি
সত্যি ওর স্বপ্নটা বাস্তবে মিলে যেত, তবে? তখন? কেমন
তা ওর? কি জানি ছাই! নিজেও বুঝতে পারে না ইভেভি।
মন অবোধ শিহরণটা দেহের প্রতিটি লোমকূপে সাড়া জাগিয়ে
তবুও বুঝি ভালো লাগছে ভাবনার একটা ডাল থেকে অন্য
া ডালে লাফিয়ে যেতে।

কিংবা এ-ও তো হতে পারে হয় তো ইভেভি কোন সম্ভ্রান্ত
রের গোপন প্রেমের ফল। জন্মাবার পরই ওকে ওবার্ডির হাতে
দেওয়া হল। ওবার্ডির হৃদয়টাও তখন অতৃপ্ত মাতৃত্বের বেদনায়
কার করছিল। সেই মুহূর্তে ইভেভিকে পেয়ে ওবার্ডি বেঁচে
। নিজের অন্তরে জমাকরা সবটুকু স্নেহসুধা উজাড় করে ঢেলে
ইভেভিকে মানুষ করে তুলবার জন্যে।
নয় তো এটাও হতে পারে·····
তা না হলে·····
অগনিত হাজার ভাবনা ওর, মাথায় সাপের মত কিলবিল
বেড়াতে লাগল। ঠিক নির্দিষ্ট কোন একটাকে আঁকড়ে ধরে
পারছে না। ভাবতে ভাবতে কোন কোন সময় আনন্দে
নিয়ে উঠছে। আবার কখন ঝিমিয়ে পড়ছে। তবু নিজেকে
-আত্মত্যাগ-অহমিকা মিলিয়ে একটা জীবন্ত রূপে দেখতে ভালো
লে। যেন ইভেভি নিজেই ক্লাইব কিংবা স্যাণ্ডেলের উপন্যাসের
া হয়ে গেছে।
গোটা দিন ধরে শুধু আবোল-তাবোল ভাবল। ভাবতে ভাবতে
লল যে করেই হোক ওবার্ডির কাছ থেকে নিজের পরিচয়টা জেনে
হবে।

দিন পেরিয়ে গেল। এল রাত্রি। অন্ধকার রাত্রি। যে
অন্ধকার কথা বলে না। যে অন্ধকার বোঝা যায় না। জানা যায়
না। অথচ যে রাত্রি সব-কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে কান পেতে শোনে সব-
কিছু। চোখ মেলে দেখে সব-কিছু। যে অন্ধকারের শেষ নেই।
যখনই আসে তখনই মনে হয় বুঝি সসাগরা পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন
করে এল। তবুও এই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ইভেভি। এই
অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে ওর পথ। এখান থেকেই বের করে নিতে
হবে ওকে ওর হারিয়ে যাওয়া পথ।

একবার ভাবলো মাকে গিয়ে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলে কেমন
হয়। আবার নিজেই বুঝল ব্যাপারটা অত সহজে সমাধান হবার
নয়। তাই যদি হত তবে আজ ওকে এমনি করে এক দুঃসহ জ্বালায়
জ্বলতে হত না।

তবুও একবার ওবার্ডির কাছে গেল। হাবে-ভাবে, আকার-
ইংগিতে মনের আশংকাটা মাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওবার্ডি
যেন কেমন নিরুত্তাপ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ইভেভির কথাগুলোকে
এড়িয়ে এড়িয়ে উত্তর দিল ওবার্ডি। আজই প্রথম ওবার্ডিকে এত
দুর্বোধ্য মনে হল ইভেভির।

চুপচাপ চলে এল নিজের ঘরে। জ্বালা যেন আরও বেশি বেড়ে
গেল। মনের আশংকাটাকে এবার যেন ওর সত্যি বলেই মনে হল।
ওর মাথার উপর কে যেন একটা দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ও
আর বইতে পারছে না সেই ভার। জানালার শিক ধরে ও দাঁড়াল।
দু' চোখ দিয়ে শীতের বরফের মত ঝুর্ ঝুর্ করে জল ঝরতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে ও কাঁদলো। সমস্ত দেহ-মন জুড়ে একটা বিশ্রী
অবসাদ। কোন্ ছোট্ট বেলায় কোনদিন কেঁদেছিল কি না আজ ও
মনে করতেও পারে না। এতদিনকার সমস্ত কান্না বুঝি আজ ও শেষ
করে ফেলবে।

কখন যে ও জানালা থেকে খাটের উপর বসে ছিলো জানে না।
কখন যে টেবিলের উপর দু'হাতের মধ্যে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ও
টেরও পেল না।

পরদিন এবং তারও পরদিন ও বাড়ির কারো সঙ্গে প্রয়োজন
ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কথা বলল না। মনের আশংকা যেন ওকে
বার বার সতর্ক করে বলছে তুমি বেশি হেসো না, কথা বোলো না,
লাফিও না। আজ এই অশান্তিই হল তোমার প্রায়শ্চিত্ত। তোমার
বাহুল্য দোষেই তুমি আজ এত যন্ত্রণা ভোগ করছ। অবিশ্বাসটা যেন
ওর সমস্ত সত্তাটাকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। কাউকে আর
বিশ্বাস করতে মন চায় না। এমন কি মাকেও না।

বৃহস্পতিবার ও ঘুম থেকে উঠেই ঠিক করল ওকে একজন অভিজ্ঞ
গোয়েন্দার চেয়েও বেশি সতর্ক হতে হবে। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে
লড়বার মত শক্তি ওকে সঞ্চয় করতে হবে। কেন না আর কেউ নয়,
কিছু নয়, কেবলমাত্র একজন সত্যিকারের মানুষের মত বেঁচে থাকবার
মত তাগিদে ওকে লড়তে হবে। কঠোর পরীক্ষা দিতে হবে।
দুঃসাধ্য সাধনায় মাথতে হবে। জীবনের পেয়ালাকে ও এমনি করে
শূন্য থাকতে দিতে পারে না।

এই দিন স্যাভাল আর সাবরিনদির আসবার কথা। তারা ঠিক
বেলা দশটায় মধ্যেই এসে পৌঁছাল। ওদের দেখে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে

ইভেভি হাত বাড়িয়ে দিলে। মৃদুস্বর হবার চেষ্টা করলেও ওর গলা দিয়ে গম্ভীর আওয়াজই বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল: 'সুপ্রভাত রুসকাদ। কেমন আছ?'

কুশল জানিয়ে সারভিগনি পাল্টা জানতে চাইল: 'তুমি কেমন আছ ইভেভি?'

ইভেভির পরিবর্তনটুকু কিন্তু সারভিগনির নজর এড়ালো না। একটু বিস্মিত হল। ইভেভির এই রূপও সারভিগনির কাছে মোটেও পরিচিত নয়। তবে কি কোন নতুন কৌশল ইভেভির?

এর মধ্যে ওবার্ডি এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। ওরা চারজন বাগানে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এক সময় ইভেভি আর সারভিগনি আলাদা হয়ে হাঁটতে লাগল। ইভেভি পা ফেলছে। কিন্তু তাতে ভাবনারা ছায়া ফেলছে। ওর দৃষ্টি মাটির উপর। সারভিগনি কি বলছে তা বোধ হয় ও ভাল করে শুনতেই পাচ্ছে না। কোনোটার জবাব দিচ্ছে। কোন কোন কথা নীরবতায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ইভেভি চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল: 'তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু, তাই না রুসকাদ?'

'তোমার কি এখনো সন্দেহ আছে?'

ইভেভির অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সারভিগনি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল।

'না, না তা বলছি না। কিন্তু তুমি বলো সত্যি কি না।'

'সত্যি।'

'তা হলে তুমি কখন আমার কাছে মিথ্যে বলবে না?'

'প্রয়োজন হলেও না।'

সারভিগনির বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল।

'অপ্রিয় হলে সত্যিটাই তুমি বলবে তো?'

ইভেভি সারভিগনির স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় করে নিতে চাইল।

'বলব ইভেভি।'

বিস্ময়ে সম্মোহিত সারভিগনি।

'বেশ। তাহলে বলো, ব্র্যাভেলো সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

'হা ভগবান!'

সারভিগনি প্রশ্ন শুনে একটু হতাশ হল।

'এই তো তুমি মিথ্যে বলবার সুযোগ নিচ্ছ।'

'উঁহুঁ:। কি ভাবে বললে সবটুকু বলা হবে তাই ভাবছি।... বেশ তবে শোন, ও একজন প্রকৃত রাশিয়ান। রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে, রাশিয়ায় ওর জন্ম। বোধ হয় ফ্রান্সে আসবার ওর একটা পাসপোর্টও আছে। কেবলমাত্র ওর নাম, পরিচয় বাদ দিয়ে ওর মধ্যে আর কোন মিথ্যে নেই।'

ইভেভি সারভিগনির দিকে তাকালো। বলল: 'তা হলে তুমি বলতে চাইছ...'

সারভিগনি ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল: 'একজন দুঃসাহসী।'

'তা হলে চিভেলিয়রের সঙ্গে ওর একটা খুব পার্থক্য নেই।'

'মনে হয় তাই।'

'কিন্তু মঁসিয়ে দি বেলভিল?'

ইভেভি এবার দ্বিতীয় পুরুষ।

'ও একেবারে আলাদা। ও একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক সম্মানীয়ও বটে। তবে কি জানো ওকে দেখে মনে হয়, আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য পিপীলিকার পাখা সত্যি করেই গজায়।'

'তুমি?'

ইভেভির সরাসরি প্রশ্নে আক্রান্ত হল তৃতীয় পুরুষ।

অসংকোচে সারভিগনি বলে চলল: 'আমি? আমাকে বলত পারো একটা ঝাঁকালো কুকুর। একটা সম্ভ্রান্ত বংশের অবিবাহি যুবক। যার বুদ্ধি ছিল। অথচ নষ্ট করছে। যার স্বাস্থ্য ছিল অথচ চক্রিকবাজীতে ক্ষয় পাচ্ছে। যার ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু নিঃ থেকে ফুরিয়ে আসছে। যার জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে। বি কোন কুসংস্কার নেই। স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের সম্পর্কেই যার গভী ঘৃণা। আবার নিজের কাজ সম্পর্কে নিজেই চরম উদাসীন। আ আছে অন্যায়কে মুখ বুজে সইবার মত ধৈর্য। তাছাড়া আমার মধ সততা আছে তা তুমি জানো। আমি ভালবাসতে জানি তা বোধ হ তুমি অনুভব করেছ। এত সব দোষ গুণ মিলিয়ে আমার অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি তোমার উপর।'

ইভেভি হাসল না। কিন্তু গম্ভীরও হল না। ঠিক যেমন ছি তেমনি থাকল। অথচ মনোযোগ দিয়ে ওর প্রত্যেকটা কথা শুনল প্রত্যেকটা কথা অনুভব করার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাক পর ইভেভি আবার জিজ্ঞেস করল: 'আচ্ছা, স্যামীকে তোমার কে লাগে?'

'কোনো মেয়ে সম্পর্কে আমাকে মতামত দিতে বোলো না ইভেভি'

'কারো সম্পর্কে নয়?'

'উঁহুঁ।'

'তা হলে বুঝতে হবে মেয়েদের সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব ন কিন্তু এর কি কোন ব্যতিক্রম নেই?'

সারভিগনি উদ্ধত হাসি হাসল। এই ঔদ্ধত্য একটু অদ্ভু বললে বেপরোয়া ভাবটাই যেন ওর জীবনসংগ্রামের একমাত্র অ ও হাসতে হাসতে বলল: 'থাকবে না কেন? আমার সাম আছে সেই একজন ব্যতিক্রম।'

ইভেভি একটু আরক্ত হল। কিন্তু সলজ্জ ভাবটা চেপে জিজ্ঞেস করল: 'তাহলে আমাকে তোমার কি মনে হয়?'

'জানতে চাও? শোনো। আমার মনে হয় তোমার অভি কিছু কম নেই। সবকিছু বোঝার মত বয়সও তোমার হয়েছে। নিজেকে আবডালে রেখে তোমার মন কাউকে খুলে না দিয়ে সবার সহজ ভাবে মিশবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আয়ত্ত করেছ। আর ধৈ হারিয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতেও জানো।'

সারভিগনি থামতেই ইভেভি জিজ্ঞেস করল: 'এ কি, হয়ে গে'

'হ্যাঁ, আমার যতটুকু ধারণা, ততটুকুই তো বলব না কিছু রং চ বলব?'

একটু থেমে ইভেভি গম্ভীরভাবে উত্তরে বলল: 'আমার স তোমার ধারণা পাল্টে দেব।'

সারভিগনি সরাসরি চাইল ওর মুখের দিকে। দেখল একট প্রতিজ্ঞার ছায়া সারামুখে থির থির করছে। সারভিগনি অ অবাক হল।

ওবার্ডি তখন ছোট ছোট পা ফেলে মাথা নীচু করে হাটছে। যেন স্যাভালকে গভীর সুরে কোন গভীর কথা বলছে। ইভেত্তি মার কাছে এগিয়ে গেল। ওবার্ডি তখনও স্যাভালের হাত ধরে খুব নিবিড় হয়ে কথা বলে চলেছে। ইভেত্তি থমকে দাঁড়ালো। তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে একবার তাকালো। চকিতে একটা সন্দেহ ওর মনে ছায়া ফেলে সরে গেল।

ঠিক তখনই খাবার ঘন্টা পড়ল।

খাওয়ার টেবিলে সবাই চুপ চাপ। কেউ কোন কথা বলল না।

সারা আকাশময় থরে থরে কালো মেঘ জমে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এক পশলা ঝড় জল হওয়া অসম্ভব নয়।

ওরা বারান্দায় এসে কফি খেতে বসল। কফি খেতে খেতে হঠাৎ কথাটা ওবার্ডি মুখ ফসকে ইভেত্তিকে বলে বসল: 'তুমি কি সারভিগনিকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছ? আজ কিন্তু সত্যি একটা ঘুরে বেড়াবার দিন।'

ইভেত্তির দৃষ্টি শাণিত হল। তারপর চোখ নামিয়ে বলল: 'না, আজ আমি যাচ্ছি না।'

ওবার্ডি বুঝি হতাশ হল। কিন্তু অত সহজে হাল ছেড়ে দিতে রাজী নয়। আবার ও যোগ করল: 'না, না, যাও বেড়িয়ে এসো। আমার ভালো লাগবে।

উঁহুঃ। আজ আমি বাড়িতেই থাকবো আর কেন যাবো না সে তা তোমাকে সেদিন রাত্তিরেই বলেছি।'

একটু চঞ্চল হল ওবার্ডি। স্যাভালকে নিরালায় পাবার আশায় ও সব ভুলে গিয়েছিল। একটু লজ্জিত হল ওবার্ডি। মনের চাঞ্চল্যকে চেপে রেখে বলল: 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

ইভেত্তি একটা এমব্রয়ডারি নিয়ে বসল।

বছরে এই কাজটা বোধ হয় পাঁচ ছয় দিনের বেশি ও হাতে তুলে নিত না। যেদিনগুলো ওর কাছে খুব বিস্বাদ বলে মনে হত।

ইভেত্তি গিয়ে ওর মার পাশের খালি চেয়ারটাতে বসল। স্যাভাল আর সারভিগনি তখন বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

ঘন্টাগুলো এগিয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো অকারণ কথা। নিস্তরঙ্গ পুকুরে নুড়ি ছুঁড়ে 'টুপ' করে একটা শব্দ তুলে মিলিয়ে যাওয়ার মত। একবার ওবার্ডি করুণ চোখে স্যাভালের দিকে তাকালো। মেয়ের হাত থেকে আজ বুঝি আর ওর নিস্তার নেই। এক ফাঁকে সারভিগনিকে ওবার্ডি বলল: 'ডাক্, কাল কিন্তু সবাই রেস্তরেন্টে লাঞ্চ খেতে যাব।'

সারভিগনি হেসে সায় দিয়ে বলল: 'বেশ তো।'

আবার কথা নেই। ততক্ষণে সারা আকাশময় মেঘগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। একটা ঝড় নির্ঘাৎ। চার দিক থম্ থমে।

রাত্রির খাওয়াটাও শেষ হল নীরবতার মধ্য দিয়ে। একটা ঝড় আসছে। কালো মেঘ জমছে শুধু স্তরে স্তরে। কখন যে পাগলের মত এসে সব কিছু উল্টে পাল্টে তছ নছ করে দেবে তার ঠিক কি? শুধু একটা ঝড়! এর বেশি আর অনুভূতি প্রবেশ করতে চায় না বা ঢুকতে পারে না।

ওরা বারান্দাতেই বসে থাকল। খুব কম কথা বলছে ওরা। রাত্রি গাঢ়তর হচ্ছে। হঠাৎ আকাশে মেঘের বুক চিরে একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বাতাসের গতিবেগ বাড়ল। শাঁ শাঁ শব্দ। নিস্তেজ রাত্রির নীরবতা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল।

ইভেত্তি উঠে দাঁড়ালো। বলল: 'আমি ঘরে যাই। এই ঝড়ো-হাওয়াটা আমার ভাল লাগছে না।'

ইভেত্তি সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল।

বারান্দার ঠিক উপরের ঘরটাই ইভেত্তির। বারান্দার সামনের বাদাম গাছটা ইভেত্তির ঘর পর্যন্ত উঠে গেছে। ইভেত্তির ঘরের সবুজ আলোয় গাছটা স্পষ্ট হল। সারভিগনির নিষ্পলক দৃষ্টি গাছটার গায়। তারপর এক সময় গাছটা আবার অন্ধকারে ডুব দিল। ওবার্ডি জানালো: 'ইভেত্তি শুয়ে পড়ল।'

সারভিগনি উঠে দাঁড়ালো: 'যদি কিছু মনে না করেন তো আমিও শুতে যাই।'

ধীরে ধীরে চলে গেল সারভিগনি।

বারান্দায় থাকল স্যাভাল আর ওবার্ডি। হঠাৎ জড়িয়ে ধরল ওবার্ডি স্যাভালকে। স্যাভাল বাধা দিতে চাইল। ওবার্ডি ওর মুখের কাছে মুখ এনে বলল: 'না, না, তোমাকে আমি বিদ্যুতের আলোয় দেখব।'

ইভেত্তি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে নি। ও নিঃশব্দে খালি পায় ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। ওর মনের সন্দেহটাই ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। বারান্দার টুকরো টুকরো কথাগুলোকে শোনার চেষ্টা করল। ও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ফিস্ ফিস্ শব্দ ছাড়া অন্য কোন কথা ও শুনতেও পাচ্ছে না। কিন্তু নিজের বুকের ভেতরের টিপ-টিপ শব্দটা ও পরিষ্কার টের পাচ্ছে। ওদিকের জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। সারভিগনি শুয়ে পড়ল বুঝি। তা'হলে কি এখন শুধু স্যাভাল আর মা বারান্দায়?

চকিতে বিদ্যুৎ ঝলকালো। সমস্ত দ্বীপটা এক ঝলক পরিষ্কার দেখা গেল। যেন একটা স্বপ্নপুরী। ঠিক এই সময়ই নীচ থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, 'তোমায় সত্যিই ভালবাসি।'

ইভেত্তি আর শুনতে পেল না। বিদ্যুতটা বুঝি নিজের দেহের ভেতরই চমকালো।

তারপর আরও কয়েক বার ইভেত্তি শুনতে পেল একই কথা। কে বলছে তা বুঝতে দেরি হবার কথা নয় ইভেত্তির। আর যা হোক ওবার্ডির কণ্ঠস্বরকে ও কখনও ভুল করতে পারে না।

কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা ওর মাথার উপর পড়ল। বৃষ্টি আসছে।

ঝম্‌ঝম্ করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির ঝাপটায় ও একেবারে নেয়ে উঠল। চুল মুখ গাউন সব ভিজে সপ সপ করতে লাগল। তবুও নড়তে পারল না। কে যেন ওকে ব্যালকনির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ও শুনল ওরা ঘরে গেল। দরজা বন্ধ করার শব্দও পেল।

ইভেত্তিকে যেন কিসের নেশায় পেয়ে বসেছে। সেই নেশায় তাড়িত হয়ে ও উপর থেকে নীচে এল নিঃশব্দে। বৃষ্টির মধ্যে বাগানে গিয়ে জানালার কাছে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

প্রথমেই ওর মাকে দেখতে পেল। আর একটা ছায়া। পাশাপাশি। তারপর এক হয়ে গেল। নিবিড়ভাবে। দুজন বলে বোঝা যায় না। কিন্তু দুজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আবার বিদ্যুৎ চমকালো। যেন একেবারে ঘরের ভেতর।

কেমন যেন হয়ে গেল ইভেতি। তবে কি ওর আশংকাই ঠিক ? ঐ ভদ্রমহিলার নামই কি ওবাড়ি ? ওর মা ? না, না, তা হতে পারে না। ভুল দেখেছে। নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে। ওর মা কখনও এমন হতে পারে না। তবে যা দেখল তা কি মিথ্যে ? আর যদি মিথ্যেই হবে তাহলে কি ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে ? না, না, ও যা দেখছে এই বৃষ্টিতে ভিজে, বাগানের কোণায় দাঁড়িয়ে তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য। তাকে অস্বীকার কোনভাবেই করা যায় না। একটা বিষাক্ত সাপের বিষে ও যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল : 'মা।'

আর্তনাদটা বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। তবুও ঘরের ছায়াদুটো বুঝি শুনতে পেল। কেন না এবারে ছায়া দুটো আলাদা হয়ে গেল। একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। আরেকটা ছায়া বাগানের দিকে কিছু দেখবার চেষ্টা করল।

ইভেতি ভয় পেয়ে গেল। যদি ওর মা ওকে দেখে ফেলে। ও দৌড়ে পালিয়ে এল নিজের ঘরে। চলতি পথে জল-কাদা মাখা পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে গেল। ঘরে এসেই দরজায় ছিটকানি তুলে দিল নিঃশব্দে। আর সঙ্গে সঙ্গে আকুল হয়ে ভেঙে পড়ল। ও এখন কি করবে ? ও যে কিছুই বুঝতে পারছে না। ওর চারদিকে শুধু অন্ধকার। ঘ। অন্ধকার। ও দু' হাঁটু ভেঙে বসল : হে ঈশ্বর! এ তুমি আমায় কি দেখালে ? আমায় ভেঙে ফেলো না। আমায় দাঁড়াবার শক্তি দাও। সাহস দাও। বাঁচবার পথ বলে দাও।' অসহায় হয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করল। নিজেকে সঁপে দিল ঈশ্বরেরই হাতে।

বিদ্যুতের আলোয় নিজের দিকে তাকালো। চুল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। গাউনটা ভিজে দেহের সঙ্গে লেপটে আছে। নিজেকেই নিজের বুঝতে অসুবিধে হল ইভেতির। নিজের ভাবনার নাগাল ও নিজেই পায় না।

তবুও ঐভাবে বসে থাকল। অনেকক্ষণ। কতক্ষণ তার হিসেব নেই। এক সময় বাইরে বাতাস থামল। বৃষ্টি থামল। আকাশে আলোর রেখা ফুটল।

ইভেতি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। ভিজে পোষাক খুলে ফেলল। বিছানায় গিয়ে উঠল। কিন্তু ঘুম এলো না। আজ আর বোধহয় আসবেও না। বাইরে তাকিয়ে অন্ধকার কেটে যাওয়া দেখতে লাগল। এক সময় দু'চোখ ছাপিয়ে কান্না নামল। কখন যেন আবার চোখের জলও গেল শুকিয়ে। আবার কি যেন সব ভাবতে লাগল।

ওর মা। মা হয়েও মেয়ের সামনে এ কি ব্যভিচার ? কি লজ্জা। অবশ্য এ ধরণের ঘটনা যে না ঘটে তা নয়। কিন্তু এমনিতর একটা ঘটনা যে ওর জীবনে আসবার জন্য অপেক্ষা করেছিল এতদিন তা জানতো না ইভেতি। তাই আজ সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ও এতখানি ভেঙে পড়ছে। ও সব ভুলে গেল। নিজেকে। সারভিগনিকে। কেবল মা ও ওবাড়ি ওর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে থাকল। এক সময় দৃঢ় হবার চেষ্টা করল : 'যেমন করেই হোক মাকে আমার বুঝিয়ে দিতেই হবে, মা, তুমি যে পথে যাচ্ছ ওটা ঠিক পথ নয়, ওটা ভুল। ও ভাবে তুমি নিজের সর্বনাশ কোরো না। আর—আর আমাকে এমন করে অকূলে ভাসিও না।'

কিন্তু কি করে বাঁচাবে ? এ বিষয়ে কি মার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করবে ? করে কতটুকুই বা লাভ হবে ?

ভাবতে ভাবতে রাত্রির শেষের যাম পেরিয়ে গেল। ভোর হল। বৃষ্টি-ধোওয়া পৃথিবীটা সূর্যের আলোয় বুঝি খুশিতে নেচে উঠল। ঝি এল কফি নিয়ে। ঝিকে বলল : 'মাকে বলবে আমার শরীর ভালো নেই। সারারাত আমি ঘুমাই নি। এখন আমি ঘুমাবো। আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।'

ঝিটা অবাক চোখে দেখল মেঝের উপর ভিজে পোষাক পড়ে আছে।

ইভেতির কথার কোন জবাব না দিয়ে ও পাল্টা জিজ্ঞেস করল : 'আপনি কি রাত করে বেরিয়েছিলেন ?'

ইভেতির নজর এতক্ষণে পড়ল ভিজে জামা কাপড়ের দিকে। একটু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল : 'হাঁ।'

ঝি আর কোন কথা না বলে ভিজে জামাগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল।

আর ইভেতি নীরবে মুহূর্তগুলো গুণতে লাগলো বসে বসে। কেন না ও জানতো ঝি গিয়ে মাকে বলা মাত্র মা নিশ্চয়ই আসবে।

ওবার্তিও বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইভেতির কথা শুনে প্রায় ফুটে গেল। গত রাত্রিটাকে তখনও মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে নি। বার বার যেন সেই 'মা' বলে আর্তনাদটা ওর কানে ভেসে আসছে। ও এসেই ইভেতিকে ব্যস্তভাবে উদ্বিগ্ন মিশিয়ে প্রশ্ন করল : 'কি হয়েছে তোমার ?'

যদিও ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যই দীর্ঘ সময় থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ইভেতি, কিন্তু মাকে চোখের সামনে পেয়েই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। থতমত খেয়ে বলল : 'আমার···আমার···'

বাকীটুকু আর শেষ করতে পারলো না। অনেকক্ষণকার জমাট কান্নায় ভেঙে পড়ল ইভেতি। ওবার্তি বিস্মিত হল। আবার জিজ্ঞেস করল : 'এ কি ? কি হলো ?'

ইভেতি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। সারারাত ভেবে ভেবে ঠিক করেছিল যে ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি মার সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু সব কিছু বুঝি বেমালুম ভুলেই গেছে। শুধু অথৈ কান্নায় ভাসতে লাগল।

ওবার্তিও ঠিক কি করবে চট্ করে ওর মাথায় এলো না। নির্বাক হয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। শুধু একটা অনুমানের কুয়াশা ওর সমস্ত মনটাকে ছেয়ে ফেলল। সাময়িক অপ্রস্তুত অবস্থাটাকে কাটিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : 'ছিঃ, এমন করে কাঁদছ কেন ? আমায় সব খুলে বল।'

কোনো মতে কান্নার আবেগ চেপে ইভেতি ধরা গলায় বলল : 'জিজ্ঞেস করছ ?···গত রাতে···মাদি···তোমার জানলা দিয়ে দেখেছি··'

অবশিষ্টটুকু আর বলার প্রয়োজন ছিল না। মানুষের মনকে এক লহমায় বুঝে নেবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ওবার্তির। সেই ক্ষমতার জোরেই ও বুঝতে পারলো ওর অনুমান একেবারে অভ্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে ওর সারামুখে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল। খুব ফ্যাকাশে দেখালো ওবার্তিকে। তবুও সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল : 'কি দেখেছ ?'

ইভেতি এবার আরও জোরে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো। কি বলবে মাকে ? সব ভেঙে বলতে হবে মাকে ? মা কি ওর কথা বুঝতে পারে নি ? ওর অতটুকু ইঙ্গিতই কি মার বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? না কি মা বুঝেও অবুঝের ভাণ করছে ? সব কথা শুনতে চায় মা পরিষ্কার করে ইভেতির মুখ দিয়ে ?

ওবার্তি এবারে কিন্তু হয়ে উঠল। নিজের ঠোঁট দুটো অবজ্ঞায় ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে বলল : 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, তোমার মাথার ঠিক নেই।'

এবারে ইভেতি মুখ তুলল। কান্নার বেগ জোর করে আটকে দিল। জল ভেজা চোখ দু'টো সোজাসুজি মার চোখে রাখল। কণ্ঠে মাখল ফুলোই মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গাম্ভীর্য—বলল : 'না, না মা, আমার মাথায় কিছু হয় নি। আমার সব ঠিক আছে। আমি বলছি। সব খুলে তোমায় বলছি। কিন্তু তার আগে তুমি বলো তুমি সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে রাজী আছো। আমরা গ্রামে চলে যাবো। সাধারণ কৃষকের মত বাস করব। এমন জায়গায় যাবো, যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, জানবে না। বলো মা, বলো তুমি রাজী।'

ওবার্তি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর পরে কি বলবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু ইভেতি কি সব বুঝতে পেরেছে ? ওর সমস্ত সাবধানতা কি ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে ? একটু সংকুচিত হল ওবার্তি। কিন্তু ওর প্রেম ? ভালবাসা ? কেন ও কাউকে ভালবাসতে পারবে না ? কি ওর বাঁধন ? সারা জীবনের তৃষিত হৃদয়টাকে কেন ও তৃপ্ত করতে পারবে না ? কেন ও কাউকে অবলম্বন করে সুখস্বপ্ন রচনা করতে পারবে না ? কেন ওর সমস্ত কামনা-বাসনা নস্যাৎ করে দিতে চায় ইভেতি ?

মিয়ানো গলায় বলল : 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

এক অব্যক্ত বেদনায় কাঁপছে ইভেতি। নিজেকে যথাসম্ভব আয়ত্তে রেখে বলল : 'গত রাত্তিরে আমি তোমাকে দেখেছি····তুমি আর কক্ষণো··চলো, তার চেয়ে চলো তুমি আর আমি চলে যাই। আমি তোমাকে এত ভালবাসবো যে তুমি সব ভুলে····'

আবার অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে ছড়িয়ে গেল ইভেতি।

এবারে ওবার্তি একটু কঠোর হল। উত্তেজনায় গলার স্বর কাঁপতে লাগল। বলল : 'তাখো, এখনো তোমার অনেক জানার বাকী। যাক্ গে, কিন্তু তুমি····তোমাকে মানা করছি····আর কোনদিন এসব কথা বোলো না।'

ইভেতিও নিজেকে শক্ত করবার চেষ্টা করল। মার কথার সুরে সুর মিলিয়ে জবাব দিল : 'না, মা। তাখো, আমি আর ছোটটি নেই। আমার সব বোঝার বয়স হয়েছে। আমি জানি কি ধরণের লোক আমাদের এখানে আসে আর কি জন্য আমাদের এখানে এত অবজ্ঞা। আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না। তুমি সব ছেড়ে দাও। বিক্রী করে দাও। আমরা চলে যাই। দরকার হলে খেটে খাব। কিন্তু সৎ জীবন আমরা ফিরে পাব।'

আর নিজেকে আগলে রাখতে পারলো না ওবার্তি। মনের ঝাঁঝ গলায় প্রকাশ পেল : 'তুমি নিশ্চয়ই ক্ষেপেছ। তার চেয়ে এখন উঠে এসে সবার সঙ্গে খেতে বসলেই ভালো হয়।'

'তা হয় না। তুমি জানো এ বাড়িতে এমন একজন আছে যার সঙ্গে আমার আর কোনোদিন কথা বলা পর্যন্ত সম্ভব না। হয় সে এ বাড়ি ছেড়ে যাবে নতুবা আমি। এ দু'টোর একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে।'

ততক্ষণে ইভেতি বিছানার উপর উঠে বসেছে। কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটছে। চূড়ান্ত একটা নিষ্পত্তি ও চায়। ও বাঁচতে চায়। পৃথিবীর জঞ্জাল হয়ে নয়। বাঁচবার দাবী নিয়ে। অধিকার নিয়ে।

মীনাকুমারীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

'লাক্স আমার ত্বককে আরও লাবণ্যময় ক'রে তোলে'

— উনি বলেন।

'[illegible] রূপচর্চার [illegible] —
লাক্স। [illegible] নরম সরের মত
ফেনায় আমার ত্বক আরও সুন্দর
হয়ে ওঠে। সুগন্ধি লাক্স ছাড়া
অন্য কিছু ব্যবহার করতে
আমার মন ওঠে না।
আপনারও তাই মনে হয় না?'

মীনা কুমারী, কমাল আমরোহীর 'পাকীজা' চিত্রের নায়িকা

লাক্স টয়লেট সাবান চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

LTS. 147-140 BO

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
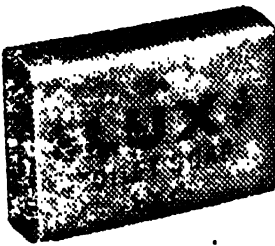
ওবার্ডি কিছু বলবার না পেয়ে পুরোনো কথারই প্রতিধ্বনি করল 'ভাখো, তুমি খুব উত্তেজিত। সব কিছু বিচার করবার, ভাববার, ক্ষমতা এখন তোমার নেই।

'না মা আমার কথার কোনো নড়চড় হবে না।'

'কিন্তু কোথায় যাবে, কি করবে, তা কিছু ভেবেছ ?'

'না। তবুও এই বিকৃত ধিক্কৃত জীবন থেকে মুক্তি চাই।'

ইভেতির কথার গমকে ঘৃণা।

আর সেটাই সহ্য হল না ওবার্ডির। প্রায় চীৎকার করে উঠল : 'চুপ কর। আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে আমি অনেক ভাল। আমি আমার পরিচয় সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু তার জন্য মোটেও দুঃখিত নই। শুধু একটা কথা জেনো। আমি তোমার মনের মত একডজন সৎ মেয়েদের চেয়ে অনেক অনেক দামী।'

হঠাৎ যেন ইভেতি অথৈ জলের মধ্যে পড়ে গেল। হাবুডুবু খেতে লাগল। উঠে আসবার পথ নেই। এতটা সহজ স্বীকারোক্তি কখনো আশা করে নি ইভেতি ওবার্ডির কাছ থেকে।

কিন্তু তখন ওবার্ডি উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে চলল : 'আজ যদি আমার এই জীবিকা না থাকতো তবে তোমার কি অবস্থা হত তা কখনো ভেবেছো ? তোমাকে ঝি-গিরি করতে হত, যা একদিন আমাকে করতে হয়েছে। যেখানে একটু আলসেমীতে শুধু তিরস্কার। আর আজ ? তোমার দিনগুলোই আলসে। তার একমাত্র কারণ আমার এই পথেই উপার্জিত অর্থের প্রাচুর্য। তাই শুধু একটু জেনে রাখো', আমাদের এই দেহের উপরই আমাদের অস্তিত্ব। অন্য কোনো কদরই আমাদের নেই। হবেও না।'

ওবার্ডি নিজের বুকের উপর করাঘাত করতে করতে এগিয়ে এল। ও হাঁপিয়ে পড়েছে। একটু দম নিয়ে আবার বলল : 'আর যদি ঐ তোমার সৎ জীবনের বড়াই নিয়ে আজ থাকতে, দেখতে, অভাবগুলো কেমন কুৎসিত ভাবে তোমার সামনে নেচে বেড়াত। তখন তোমার পাগল হয়ে যেতে হত। আমি বলেছি ও। ছাড়া কোন উপায় থাকতো না। আর তোমার ভাষায় ঐ সৎ মেয়েদের পরিচয় শুনবে ? ওদের বিয়ে করতে হয় কেন না ওদের বিয়ে না করে উপায় নেই। কিন্তু বিয়ের আগে কি পরে ওরা যে কত নোংরা ব্যভিচারে নিজেদের ডুবিয়ে দেয়, তার কতটুকু তুমি জানো।'

ওবার্ডি হাঁপাতে হাঁপাতে ইভেতির বিছানা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

ইভেতিও আর শুনতে চায় না। ওকে যদি কেউ এখান থেকে টেনে নিয়ে যেত। কিংবা ও যদি এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারত। নিরুপায় হয়ে শিশুর মত শব্দ করে কাঁদতে লাগল ইভেতি।

ওবার্ডি থামল। মেয়ের দিকে তাকালো। মেয়ের হতাশার বেদনায় নিজের অন্তরটা শূন্যতায় ছেয়ে গেল। বঞ্চনার বেদনাই মানুষের সবচেয়ে বড় বেদনা। সেই বেদনা কি অনুভব করে নি ওবার্ডি! সেই কবেকার, পুরোনো, ভুলে যাওয়া ব্যথাটা আজ যেন নতুন করে মোচড় দিয়ে উঠল ওবার্ডির ভেতর। দু' চোখে দুঃসহ জ্বালা। জলে ভরে গেল। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। ভেঙে পড়ল বিছানার উপর। তারপর বলল : 'তুমি জানো না ইভেতি, আমার কোথায় হাত দিয়েছো।'

কারো মুখে আর কোন কথা নেই। শুধু চোখের জলে ভেতরের না-বলা কথা ব্যথা হয়ে বেরিয়ে আসছে।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। ওবার্ডি উঠল। সস্নেহে বলল : 'কিন্তু ইভেতি, আর কোন উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না. প্রতিদিনকার ঘটনাই যে জীবন।'

কিন্তু ইভেতি যে সব বুঝেও কিছুই বুঝতে চায় না। এই গোলক ধাঁধা থেকে আর বুঝি বেরিয়ে আসা যায় না। কঠোর হলেও এই সহজ সত্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে হবেই—তা যে করেই হোক।

ওবার্ডি আবার সান্ত্বনা দিয়ে বলল : 'ওঠো, অমন করে ভেঙে পড়লে কি চলে ? এটাই তো পৃথিবী। এই পৃথিবীর হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা নিয়েই তো জীবন। এখানে তো দুর্বলের কোন স্থান নেই। ওঠো, অবুঝ হোয়ো না।'

ইভেতি মাথা ঝাঁকালো। কথা বলতে পারছে না। কিছুক্ষণ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল : 'আমি যে কিছুতেই পারছি না। ওরা না-যাওয়া পর্যন্ত আমি আর বার হবো না। তবে ওরা যদি আবার আসে, তখন আর আমাকে তুমি দেখবে না।'

ওবার্ডি বলল : 'আচ্ছা সে পরে হবে। তা হলে তুমি ঘরেই থাকো। বিকেলে আবার আসবো।'

মেয়ের কপালে স্নেহের চুম্বন এঁকে ওবার্ডি নিজের ঘরে চলে গেলো। পোষাক বদলাতে। নিজের সহজতা ফিরিয়ে আনতে।

ওবার্ডি চলে যাওয়ার পর আবার দরজায় ছিটকানি তুলে দিল ইভেতি। ও একা থাকতে চায় : একেবারে একা। লোক-জন, আমোদ-উল্লাস, সব কিছু ওর কাছে দুঃসহ মনে হচ্ছে।

এগারটার সময় চাকর দরজায় ধাক্কা দিয়ে জানতে চাইল : 'মা জিজ্ঞেস করলেন আপনার কি চাই আর কি খাবেন ?'

ইভেতি জানালো : 'কিছু লাগবে না। কিছু খাবেও না। আমাকে কেউ ডাকাডাকি কোরো না। আমাকে একা থাকতে দাও।'

সারাটা দিন ইভেতি শুয়েই কাটাল। কখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। কখনও চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে। আর বাকী সময়টা আবোল-তাবোল ভাবনা ভেবে।

তিনটের সময় আবার দরজায় করাঘাত শুনে ইভেতি সজাগ হল। জিজ্ঞেস করল : 'কে ?'

ও-পাশ থেকে মার গলা ভেসে এল : 'আমি। দরজা খোলো। কেমন আছ ?'

ইভেতি ইতস্তত করল। বিরক্তি এল। কি জন্য মা আবার এসেছে ? আবার কোন নতুন কথা শোনাবে ? একটু ভেবে দরজাটা খুলে দিল। ওবার্ডি ঢুকেই সস্নেহে জিজ্ঞেস করল : 'কেমন আছ ? একটা ডিম এনে দেব ?'

'না—কিছু না। ওরা চলে গেছে ?'.

'হাঁ।'

উত্তর দিয়ে ওবার্ডি গিয়ে ইভেতির বিছানার উপরে বসল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ইভেত্তি, ওবার্তি নিশ্চল জড়ের মত বসে রইল।

ওবার্তি বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করল : 'এখন উঠবে তো?'

'না।'

বলে একটু থামল ইভেত্তি। তারপর ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল : 'আমি অনেক ভাবলাম। সারা দুপুর ধরে। যা হয়ে গেছে তা ঘেঁটে আর লাভ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতটা পাল্টাতে হবে। মজুরা আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে।'

ওবার্তি ভেবেছিল, ইভেত্তি বোধ হয় এতক্ষণে সব-কিছু সামলে নিতে পেরেছে। আবার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। কিন্তু ঠিক উল্টোটা দেখে একটু বিরক্ত হল। অস্বস্তি বোধ করল। উত্তপ্ত হল ইভেত্তির কথা এড়িয়ে গিয়ে বলল : 'এখন ওঠো তো।'

'হ্যাঁ, উঠছি।'

ওবার্তি উঠে গিয়ে ওর গাউন মোজা নিয়ে এল। ইভেত্তি পরে নিল।

ওবার্তি বলল : 'চল, একটু বেড়িয়ে আসি। শরীরটা হাল্কা হবে।'

ইভেত্তি আপত্তি করল না বলল : 'বেশ, চলো।'

ওরা নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে লাগল। আর হাঁটতে হাঁটতে ওদের মাঝখানটা অনাবশ্যক কথাবার্তায় ভরে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালেই ইভেত্তি বাড়ি থেকে বার হল। একা একা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে একদিন সারভিগনি ওকে পিপীলিকার জীবন-কাহিনী শুনিয়েছিল সেখানে গিয়ে বসল।

আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। মনে মনে ঠিক করল ইভেত্তি।

সামনে চটুল বালিকার মত উচ্ছসিত বহতা নদী। ঘূর্ণীগুলো নদীর বুকে ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে যাচ্ছে। তারপর কোন্ অসীমে গিয়ে হারিয়ে যায় কে জানে। বুদবুদগুলো তীব্র স্রোতের টানে চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়।

ও যেন চোখের সামনে গোটা সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলো ছক কেটে এঁকে রেখেছে। কোন্ ফাঁক দিয়ে এই নরক থেকে বেরিয়ে আসা যাবে তাও। শুধু এখন বেরিয়ে আসার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু ওবার্তি যদি সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা না করে তবে? যদি ওবার্তি ওর অভ্যস্ত জীবন, ওর বন্ধুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ইভেত্তির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে রাজী না হয় তখন কি-ই বা করতে পারে ইভেত্তি?

আছে কিন্তু তাতো একমাত্র পথ। সে পথ হল ওর একাই চলে আসা। কিন্তু একাকী বেরিয়ে এসে কোথায় যাবে? কেমন করেই বা বাঁচবে? বাঁচবে কি করে?—কাজ করে? কি কাজই ব

...? কে ওকে কাজ দেবে? কিন্তু একটা কাজও না হয় পেল, ... ওই কাজের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারবে তো? একটু ... হয়ে পড়ল ইভেভি। ও খেটে-খাওয়া মেয়েদের দেখেছে। ... মোটে সম্মানীয় নয়। তা ছাড়া সেটা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে ও কখনো বেড়ে ওঠে নি। ... হলে।

হঠাৎ একটা মিষ্টি ভাবনা ওর মাথায় এল। ও তো অনেক ... জানে পড়েছে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের গভর্নেস থাকে। ...নেসের সঙ্গে সেই বাড়িরই কারো ভালোবাসাবাসি হয়, বিয়ে হয়। ...দি এমন একটা কাজ পেয়ে যায়। আর শেষ পর্যন্ত ভালোবাসাটাও ... গেল। তখন গৃহকর্তা নিশ্চয়ই ডেকে ওর পরিচয় জানতে চাইবে। ...বা ঈশ্বর। তখন যদি ও গর্বভরে বলতে পারত: 'আমার ... ইভেভি। আমিও একজন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। কেবল ভাগ্যের ...ফেরে আজ আমাকে এ কাজ করতে হচ্ছে।'

আবার হতাশা। এ রকম সুরে ও কোনদিনই নিজের পরিচয় ...তে পারবে না। ওর যে কোন পরিচয়ই নেই। একটা পথের ...রের সঙ্গে ওর পার্থক্য কতটুকু।

না, না। সামলে নিল ইভেভি নিজেকে। এমন পরিস্থিতি ...নও ওর জীবনে আসবে না। এটা সম্পূর্ণই ওর মনের কল্পনা।

কোন আশ্রমে গিয়ে থাকাটাও ও ভাবতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে ...নামক সংকীর্ণ মনোভাবটার ওপর ওর কোনদিন কোন আকর্ষণ ...ভব করে নি। বরং ভিক্ষুণীদের দেখলে ওর যেন কেমন করুণা করতে ... করে। ওকে যে কেউ চটপট বিয়ে করে ফেলবে সে রকম ...বনাও নেই। তাহলে কি সত্যিই কোন পথ নেই? সামনে ...ধু শূন্যতা।

তবুও ইভেভি এমন কিছু করতে চায় যা ভয়ংকর হলেও মহত্ত্বে ...সিকতায় দীপ্ত। যা প্রত্যেকের সামনে উদাহরণ হয়ে বেঁচে থাকবে। ...ত পারলে বোধ হয় ওর এই ইচ্ছে পূর্ণ হত।—মৃত্যু? হ্যাঁ—মৃত্যুর ... দিয়েই ও নিজেকে সবার কাছে জানিয়ে যেতে চায়। সমস্ত ...ন-শংকা-সংকোচের ঊর্ধ্বে একমাত্র নির্ভীক পথ ইভেভির সম্মুখে, যা ... কোনদিন বন্ধ করে দিতে পারবে না। যেখানে সবাইকে ফাঁকি ... দিতে যাওয়া যায়।

তাহলে ইভেভি মরবে। কেন না এ ছাড়া অন্য কোন পথ ওর ...। নিজেকে প্রকাশ করবার অন্য কোন পথ ওর জানা নেই। ... একবারও তলিয়ে ভাবলো না মৃত্যু কি জিনিস।—মৃত্যু। যার ...র সুরু নেই। আরম্ভ নেই। ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। ...র থেকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত বিদায়।

তবুও ও হারিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, মুছে যাবে এটা ভাবতেই ...ভীষণ ভালো লাগল। কিন্তু কেমন করে মরবে ইভেভি? মৃত্যুর ...অন্য পথ ওর মনে এল সব কটাই ভীষণ বেদনাদায়ক।

ছুরি কিংবা পিস্তলের সাহায্য ওর পক্ষে অসম্ভব। কেন না ও দুটো ...তবে কেমন বিশ্রীই করবে। শেষ করবে না। ও দুটো অস্ত্র ...রে ও জানে না। ফাঁস দিয়ে? না, না, ওটা নয়। ওটা ...কর্ষ, দুর্গন্ধ। যারা খেতে পায় না, তারাই সাধারণত ফাঁস ...য়। ইভেভি ফাঁস দিয়ে মরলে লোক এমনিতেই একটা কিছু সন্দেহ করবে। কিন্তু তা তো ইভেভি চায় না। জলে ডুবে ওর পক্ষে মরা সম্ভব নয়। কেন না ও খুব ভাল সাঁতার জানে।

তাহলে? তাহলে ও বিষ খেতে পারে। কিন্তু কোন্ বিষ? সবগুলোই খুব পীড়াদায়ক। কিন্তু ও মরতে চায় হাসতে হাসতে, আনন্দে, শান্তিতে, পরিতৃপ্তিতে। এদিক থেকে ক্লোরোফর্মটা বোধ হয় ভালো। আর ক্লোরোফর্মে আত্মহত্যার সংবাদ তো ও খবরের কাগজে পড়েছে তাহলে··

ওর ভাল লাগলো। খুশি হল। বাড়ি শুদ্ধ সবাই দেখবে ওর দৈর্ঘিতা। আঃ! আত্মগরিমায় ডগ-মগ করে উঠল।

বুগিভালে ফিরে এল ইভেভি সঙ্গে সঙ্গে। একটা ওষুধের দোকানে দাঁতের ব্যথার নাম করে একটু ক্লোরোফর্ম চাইল। দোকানদার ওকে চিনত। ছোট্ট একটা ফাইল দিল। তারপর ইভেভি ক্রুইসীতে দ্বিতীয় এবং চ্যাটনে গিয়ে তৃতীয় ফাইল পেল। রুইলে গিয়ে চতুর্থ ফাইল সংগ্রহ করে বাড়ির দিকে পা ফেরাল। খাবার সময় হয়ে গেছে।

বাড়িতে এসে পেট পুরে খেল। হাঁটাহাঁটিতে খিদেও পেয়েছিল বেশ। ওবাড়ি ওর খাওয়া দেখে খুব খুশি। ভাবলো, মেয়েটার মাথা থেকে পাগলামিগুলো বোধ হয় দূর হয়ে গেছে। খাওয়ার শেষে ইভেভিকে বলল: 'ইভেভি আগামী রোববার আমাদের বন্ধুরা আসছেন। আমি সবাইকে নেমন্তন্ন করেছি।'

ইভেভি একটু ফ্যাকাশে হল। আবার? মুখে কিছু বলল না। খানিকবাদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে এল। একটা প্যারিসের টিকিট কিনল।

সমস্ত বিকেল গোটা প্যারিস শহর ঘুরে ঘুরে শুধু ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করল।

সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরল তখন ওর পকেটগুলো ছোট্ট ছোট্ট শিশিতে ভর্তি হয়ে গেছে।

পরদিনও একই অভিযানে বের হল। সেদিন ও এক দোকান থেকেই আধ পাইন্ট ক্লোরোফর্ম জোগাড় করল।

শনিবার ও বাড়ি থেকেই বার হল না। দিনটা মেঘলা, ঘোলাটে। সারাটা দিন বারান্দায় আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিল। আজ আর ও কোন কিছুই ভাবতে পারছে না। ওর সব ভাবনাই বুঝি শেষ হয়ে গেছে। শুধু একটা অদ্ভুত প্রশান্তি ওর চোখে, মুখে, ভেতরে, বাইরে।

পরদিন। ইচ্ছে হল নিজেকে ইভেভি সুন্দর করে সাজিয়ে অপরূপ, অতুলনীয় করে তোলে। করলও তাই। নীল রঙের গাউনটা পরল। এটাতেই ওকে মানায় সবচেয়ে বেশি। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই মনে পড়ল: আগামীকাল আর থাকবো না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি সারা দেহে ছড়িয়ে গেল। ওর মনে হল: 'আমি মরে যাব। আমি আর কথা বলব না। আর হাসতে পারব না। ভাবতে পারব না। কেউ আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না। দেখবে না। আমিও আর কাউকে কিছু বলতে পারব না। দেখতে পারব না।'

নিজের মুখখানাকেই ওর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার বার দেখতে ইচ্ছে করল। এই যেন প্রথম ও নিজেকে দেখছে। কোনদিন নিজেকে

এমন করে দেখে নি। কোনদিন নিজেকে এমন করে চেনে নি। কোনদিনও নিজেকে এমন করে দেখে বিস্ময় জাগে নি। লোমকূপে শিহরণ লাগে নি। মনে হল বুঝি কোন অপরিচিতার মুখোমুখি ও দাঁড়িয়ে। নিজেকে নিজে বলল: 'আয়নায় কার ছায়া? কার ছবি? আমার? আমি বুঝি এত সুন্দর। নিজেকে দেখার মধ্যে এত বিস্ময় লুকানো।'

আয়না সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইভেন্তি একগোছা চুল বুকের উপর এনে ফেলে দিল। একটু ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো। একবার পেছন ফিরে আড়চোখে তাকালো। নিজের চেহারার বিচিত্র-ভঙ্গিমার প্রতিফলন আয়নায় দেখতে পেয়ে ওর খুব ভাল লাগছে। অবাক চোখে তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করছে। ও ভাবল: 'কি সুন্দর আমি! অথচ কাল আমি মরে যাব। ঐ বিছানায় উপর আমার মৃতদেহটা পড়ে থাকবে।'

ইভেন্তি ঘুরে তাকালো বিছানার দিকে। স্বচ্ছ-শুভ্র চাদরটা বড় ফ্যাকাশে মনে হল। ইভেন্তি তাকিয়েই থাকলো, যেন নিজের দেহটাকেই অসাড় হয়ে পরে থাকতে দেখতে পাচ্ছে ও।

সত্যি—মৃত্যুটা কি বিচিত্র। কি নিষ্ঠুর। শীতল। স্তব্ধ। আর মাত্র এক সপ্তাহ পর এই দেহ, এই মুখ, এই চোখ একটা বাক্সে ভরিয়ে মাটির তলে পুঁতে দেওয়া হবে। তারপর একদিন পচে-গলে দেহটা কালো মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে।

ভয় পেল ইভেন্তি। ভাবতেই একটা ভয়ার্ত শিহরণ সারা দেহে জেগে উঠল।

চারদিক ঝকঝকে সূর্যের কিরণে ঝলমল। সকালের ফুরফুরে বাতাস জানালা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকছে।

ইভেন্তি বসে পড়ল। ও মরবে। আর সেই ভয়েই যেন সমস্ত পৃথিবীটা ওর কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে। তবুও পৃথিবীর কোন পরিবর্তন হবে না। কোন দিন তা হয় না। এই যে ইভেন্তি এ ঘরটায় বসে আছে, ও মরে গেলেও এই ঘরটা এমনি ভাবেই থাকবে। বিছানাটা ওখান থেকে নড়বে না, যদিও ওর মৃতদেহটা ওটার উপরই থাকবে। টেবিল, চেয়ার, আলমারী যেখানে যা আছে সেখানেই নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। শুধু ও থাকবে না। আর এক মুহূর্তের জন্যও ঘুরে আসবে না। কেউ অনুভবও করবে না ওর অনুপস্থিতি। ওর সমস্ত অস্তিত্ব একদিন হবে ইতিহাস। জীর্ণ পাতার মত সবাই যাবে মাড়িয়ে। একবার নজরেও পড়বে না। হয় তো একদিন এক বারের জন্য কেউ বলবে: মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী ছিল। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। নিজের হাতখানার দিকে তাকালো ইভেন্তি। অন্য হাত দিয়ে আলতোভাবে হাত বুলালো। অমনি যেন মাংস পচার একটা ভ্যাপসা গন্ধ ওর নাকে এল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ভয়ার্ত চীৎকার দেহের ভেতর থেকে উঠে এসে দেহের ভেতরই খান খান হয়ে ছড়িয়ে গেল। কিন্তু পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ভোগ না করে ও কেমন করে শেষ হয়ে যাবে? হারিয়ে যাবে? এই ঘর, এই বাড়ি, ঐ বাগ, বাতাস, সূর্য, আলো, আকাশ সবখানেই যেন ওর স্পর্শ লেপ্টে আছে। এত সব ছেড়ে ও কেমন করে যাবে?

বাগান থেকে উচ্চ-হাসি, হৈ-হট্টগোলের শব্দ ভেসে এল। অতিথিরা সবাই এসে গেছে। আজ রোববার। ইভেন্তি গলায় স্বরে বুঝল, বেলভিন গান গাইছে।

ঝট করে উঠে পড়ল ইভেন্তি। নীচে নেমে এল। ওকে দেখে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। ইভেন্তি দেখল সবাই এসেছে। দু'জন নবাগত। এদের ইভেন্তি চেনে না।

চকিতে ওর মনে হল ওরা কেন এসেছে এখানে? আনন্দ করতে? নিজের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে? তারই রসদ বুঝি জার্তি-ইভেন্তির মত মেয়েরা? ছিঃ—ছি—কি লজ্জা। কি অপমান। ঘুরে দাঁড়ালো ইভেন্তি।

তখনই খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

'আমি সবাইকে দেখাব, আত্মমর্যাদাবোধ কি জিনিস।'

মনে মনে দৃঢ় হল ইভেন্তি। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এল। সবার সঙ্গে করমর্দন করল।

সারভিগনি জিজ্ঞেস করল: 'তোমাকে যেন কেমন লাগছে?'

ইভেন্তি বড় গম্ভীর কণ্ঠে বলল: 'আজ আমি আনন্দ করতে চাই। ভীষণ আনন্দ। সুতরাং সাবধান।'

হঠাৎ বেলভিনের দিকে ঘুরে ইভেন্তি সহজ সুরে বলল: 'বুঝলে, তুমি কিন্তু আজ আমার পেট। খাওয়ার পর আমরা সবাই আজ মার্লির মেলায় যাব।'

মার্লিতে মেলা তখন পূর্ণোদ্যমে জমে উঠেছে।

খেতে বসে কি কি আনন্দ করা হবে এবং কেমন করে তার একটা পুরো ফিরিস্তি দিয়ে গেল ইভেন্তি। আজ ও অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশি কথা বলছে। যাতে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবার সুযোগ না পায়। তারপর যখন সবাই দেখবে, ইভেন্তি মৃত, তখন সবাই অবাক হয়ে বলবে, 'কি অসম্ভব ব্যাপার। এ যে কল্পনারও বাইরে।' ওকে সত্যিই খুব উচ্ছল দেখাচ্ছে। কেউ বুঝতেও পারবে না, ওর ভেতরে তখন অন্য কি ভাবনা চলছে।

ঠিক করল সন্ধ্যায় যখন সবাই বারান্দায় জড়ো হয়ে খেতে উঠবে, তখন একফাঁকে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নিঃশব্দে উঠে আসবে ইভেন্তি। তারপর...থাক, এখন এ সব ভাবনা দিয়ে নিজেকে ভাবিয়ে রাখতে চায় না ইভেন্তি।

আজ ইভেন্তি মদ খেল প্রচুর—যতখানি পারল খেল। খাওয়া শেষে চীৎকার করে বলল: 'চল এখন যাই।'

ইভেন্তি বেলভিনের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। অভ্যাগতদের পর পর সাজিয়ে বলল: 'এস, আজ তোমরা আমার সৈন্যদল। সারভিগনি তুমি আমার সার্জেন্ট। তুমি আমার ডানদিকে থাকবে। সবার পেছনে নবাগত দু'জন। চল, পা চালাও।'

ওরা চলতে লাগল। সারভিগনি বিগল বাজাবার ভঙ্গিমায়—আর নবাগত দু'জন ড্রামের।

বেলভিন ইভেন্তির নতুন হুজুগে ইতস্তত করে বলল: 'এসব কি ছেলেমানুষি করছ?'

'কথা বোলো না।'

ইভেন্তি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল: 'আমাদের মত মেয়েদের সঙ্গে থেকে তো তোমাদের কোন সংকোচ থাকা ঠিক না।'

গোটা শহরটা ওরা ঘুরে বেড়ালো। সমস্ত লোক ওদের দেখে প্রথমে বিস্ময় তারপর ওদের সঙ্গে মেতে উঠল।

ইভেত্তি সামরিক কায়দায় পা ফেলছে। সারভিগনির একটা হাত ধরে আছে। যেন কোন কোন বন্দীকে ও নিয়ে চলেছে। হাসছে না। বেশি কথা বলছে না। বেশ গম্ভীর।

ওরা যখন মেলায় পৌঁছাল, সমস্ত মেলায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সমস্ত লোক চীৎকার করে ওদের আনন্দে অংশ নিল। এক স্থূলকায় ভদ্রলোক তার স্ত্রীর হাত ধরে ঈর্ষাকাতর কণ্ঠে বলল: 'ভাখো, কি আনন্দ ওদের!'

হঠাৎ একটা নতুন বুদ্ধি ইভেত্তির মাথায় এল। মেলার একটা মজার খেলার দিকে ওরা এগিয়ে গেল। একটা কাঠের ঘোড়ার উপর জোর করেই বেলভিনকে তুলে দিল। বিশাল জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

ওখান থেকে ওরা নদীর কিনারে এসে উপস্থিত হল। ইভেত্তির মাথায় একটা নতুন পরিকল্পনা এল। ও সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করালো। তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে বলল: 'যে আমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

কেউ এগিয়ে এলো না।

ততক্ষণে ওদের ঘিরে অনেক লোক জমে উঠেছে।

ইভেত্তি আবার বলল: 'তা হলে তোমরা কেউ রাজী নও, অর্থাৎ আমি বুঝবো.....'

কথা শেষ হবার আগেই সারভিগনি এগিয়ে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর বুকে। নদী থেকে জল লাফিয়ে এসে ইভেত্তির পা ছুঁলো। ইভেত্তি একটা কাঠের টুকরো নদীর বুকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল: 'ওটা তুলে আনো।'

সারভিগনি কুকুরের মত কাঠের টুকরোটা মুখে করে জল থেকে উঠে এল।

ইভেত্তি টুকরোটা হাতে নিল। সারভিগনির পিঠ চাপড়িয়ে বলল: 'এই তো, বেশ কুকুর বনে গেছ।'

ওদিক থেকে এক মহিলা মন্তব্য করল: 'ছিঃ! এ সব কি?'

আরেকজন বলল: 'কেন, বেশ মজার ব্যাপার তো।'

'তবুও ব্যাপারটা খুব কদর্য।'

আরেকটা মন্তব্য।

কিন্তু এদিকে খেয়াল নেই ওদের। ইভেত্তি বেলভিনের একটা হাত তুলে নিয়ে বলল: 'তুমি একটা আস্ত বুদ্ধু। তুমি কি হারালে জানো?'

তারপর ওরা বাড়ির পথ ধরল। রাস্তার দু'পাশের লোক দেখে ইভেত্তি বলল: 'ভাখো, কি নির্বোধ দৃষ্টি। ঠিক তোমার মত।'

পেছনে তাকিয়ে দেখল ইভেত্তি, সারভিগনির পোষাক জলে ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে হাঁটছে। নবাগত দু'জনকেও খুব ক্লান্ত লাগছে।

ইভেত্তি হেসে বলল: 'সবাই খুব ক্লান্ত—তাই না? কিন্তু আনন্দও তো খুব হল। তোমরা তো আনন্দ করতেই এসেছো।'

আর কোন কথা না বলে ইভেত্তি হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ বেলভিন দেখল ইভেত্তি কাঁদছে। সচকিত হয়ে বিরক্ত বলল: 'এ কি ইভেত্তি, কি হল তোমার?'

ফিসফিসিয়ে ইভেত্তি বলল: 'কথা বোলো না। তোমার কিছু করণীয় নেই।'

কিন্তু বোকার মত বেলভিন আবার বলল: 'তা বলছি না। তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে?'

বিরক্ত হয়ে ইভেত্তি বলল: 'আঃ—চুপ করো তো।'

বলতেই আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না ইভেত্তি। ওর আলা বোকার মত লোক সারা পৃথিবীতে কেউ নেই। দু' হাতে মুখ ঢেকে রাস্তার উপর বসে পড়ল।

বেলভিন অসহায় হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল: 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সারভিগনি এগিয়ে এল। গলায় সহানুভূতি মিশিয়ে বলল: 'ওঠ ইভেত্তি। লোকে দেখলে কি বলবে বলো তো। ছেলেমি কোরো না, ওঠো লক্ষ্মীটি।' সারভিগনি ওকে হাত ধরে ওঠাল।

বাড়ি ফিরেই ইভেত্তি নিজের ঘরে চলে গেল। আর তখুনি দরজায় ছিট্‌কানি তুলে দিল।

খাওয়ার আগে আর ও এলো না। খাওয়ার সময় যখন এলো তখন ওকে দেখে খুব ম্রিয়মাণ আর গম্ভীর দেখালো।

আর বাকী সবাই উৎফুল্ল। সারভিগনি কোত্থেকে শ্রমিকের পোষাক এনে পরেছে। কার্পাসের সাধারণ ট্রাউজার। ফুলকাটা শার্ট। কথাও বলছে শ্রমিকের মত।

ইভেত্তি খাওয়া শেষ করেই আবার নিজের ঘরে এল। নিচে হুল্লোড়ের শব্দ ওর ঘর পর্যন্ত ভেসে আসছে। চিভেলিয়র বিদেশী হাসির গল্প বলছে। ইভেত্তি এখানে বসেও তা শুনতে পাচ্ছে। সারভিগনি আধা মাতাল শ্রমিকের মত কথা বলছে। ওবাড়িকে 'মিসেস ওবার্ডি' বলে ডাকছে। হঠাৎ একবার স্যাভালকে বলল 'হ্যালো মিষ্টার ওবার্ডি।' সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হাসির শব্দে গোটা বাড়িটা মুখর হয়ে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত সাপটা ছোবল মারল ইভেত্তিকে। ইভেত্তি বুঝতে পারছে, বিষটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীরে। বেশ বুঝতে পারছে ঝিমিয়ে আসছে চেতনা। ও বুঝল ওর সময় হয়ে এল। একটুকরো কাগজ তুলে নিল। তাতে লিখল:

বুগিভাল
রবিবার,
সকাল ন'টা

'আত্মহত্যা করছি। যাতে আমায় রক্ষিতা না হতে হয়।'

ইভেত্তি।

কাগজটার নিচে 'পুনশ্চ' লিখে লিখল:

মা,

'বিদায়। আমাকে ক্ষমা কোরো।'

খাম কয়েক নিজের মনে পড়ল। তারপর একটা খামের ভেতর ঢুকিয়ে খামের উপর মার নাম লিখল।

চেয়ারটা টেনে জানালার কাছে নিয়ে এল। হাতের কাছে একটা

ছোট টেবিল টানল। ক্লোরোফরমের বোতল আর একমুঠো তুলো টেবিলের উপর রাখলো।

লতানো গোলাপ গাছটা ওর জানালা পর্যন্ত বেয়ে এসেছে। গাছ ভর্তি ফুল। একটা মিষ্টি গন্ধে বাতাসটা ভারী। বুক ভর্তি কয়েকবার মিষ্টি বাতাস টেনে নিল ইভেতি। দ্বিতীয়ার চাঁদ আকাশে মেঘের সঙ্গে, তারাদের সঙ্গে বন্ধুতা করছে।

ইভেতি ভাবল: 'আমি মরতে যাচ্ছি। আমি মরব।'

আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ওর বুকের উপর এক দুঃসহ অভিমানের বোঝা চাপিয়ে দিল। ও আর সেই ভার সইতে পারছে না। ওর সমস্ত সত্তা কেঁদে উঠল ক্ষমার আশায়। সবকিছু ধরে রাখবার আশায়। ভালবাসা পাবার আশায়।

সারভিগনির গলার স্বর শুনতে পেল ইভেতি। গল্প বলছে সারভিগনি। মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হাসির দমকে গল্পের সুর যায় কেটে। সবচেয়ে বেশি ভাল লাগছে ওবার্ডির। থেকে থেকে ও বলছে: 'ওর মত গল্প কেউ বলতে পারে না।'

ইভেতি বোতলের কর্কটা খুলে ফেলল। খানিকটা তুলোর মধ্যে ঢালল। একটা মিষ্টি গন্ধ। তুলোটা তুলে আনল নাকের কাছে। ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল ইভেতির মাথাটা।

একটা হাত দিয়ে মুখটা চেপে ইভেতি নিঃশ্বাস টানল। চোখ দু'টো বুজে এল। পর পর কয়েকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে নিল ইভেতি।

ধীরে ধীরে সমস্ত অনুভূতিগুলোর উপর একটা পর্দা নেমে এল। ইভেতি জানে না ও কি করছে।

মনে হল ইভেতির হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফুলতে ফুলতে দেহের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। ও যেন অনেক হাল্কা হয়ে আসছে। নাকের কাছে ধরে রাখা তুলোটার মতো।

একটা সুন্দর অনুভূতি মাথার চুলের গোড়া থেকে সুরু করে পায়ের নখ অবধি ঢেউ খেলে খেলে মিলিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটা তন্দ্রা। একটা ভাবালুতা!

শুকিয়ে এল তুলোটা। হঠাতই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল ইভেতি। এ কি! ও তো মরল না। ওর সমস্ত চেতনাগুলো যেন নতুন প্রাণ পেল। আগের চেয়ে অনেক সজীব। তীব্র। তীক্ষ্ণ। বারান্দার প্রতিটি কথা ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। জ্যাভেল্লো বলছে, ও কেমন করে এক অষ্ট্রিয়ান সেনাপতিকে হারিয়ে ছিল।

দূর থেকে রাত্রির চাপা শব্দ ওর কানে আসছে। অবিরাম কুকুরের ডাক, ব্যাঙের কোঁক্ কোঁক্ শব্দ, পাতার মর্মরধ্বনি—সব, সব শুনতে পাচ্ছে ইভেতি। বুঝতে পারছে।

তা হলে সত্যিই মরে নি ইভেতি? কেন মৃত্যু এত দেরি করছে, আলা দিচ্ছে তার স্নিগ্ধ, শীতল, ক্ষমা—সুন্দর কোলে টেনে নিতে? আরো খানিকটা ক্লোরোফরম ঢেলে তুলোটা ভিজিয়ে নিল ইভেতি। নাকের কাছে ধরে একটানা শুঁকতে লাগল। কিছুক্ষণ ও কিছুই বুঝল না। তারপর ঠিক প্রথমবারের মত অনুভূতি। প্রথমবারের মতই ভালোলাগা। কেমন যেন একটা ভালোলাগা ওর সমস্ত শরীরে থির-থির করছে। যে ভালোলাগা বোঝা যায় না। অথচ লাগে।

পর পর দু'বার ভেজালো তুলোটা। সারা শরীরে কিসের উন্মাদনা জেগেছে। চেতনাটা যেন ওকে একলা রেখে পালিয়ে যেতে চায়। ওর বুঝি হাড়-মাংস, হাত-পা কিছুই নেই। সব যেন কে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু বুঝতে পারে নি ইভেতি। কেবলমাত্র মস্তিষ্কটা আছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত। অনেক বেশি স্পর্শকাতর।

সব কিছু আবার ফিরে আসছে ওর স্মরণপথে। কত কি যে ও ভুলে গিয়েছিল। সব ভুলে যাওয়া কথার মালা ওর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। ও তার গন্ধ পাচ্ছে। ছোটবেলার টুকরো টুকরো কথা। অবাক লাগে, ঐ টুকটুকে বাচ্চা মেয়েটাই কি আজকের ইভেতি? না। না, তা হতে পারে না। তা কেমন করে হয়? কিন্তু হবেই বা না কেন? ঐ তো স্পষ্ট মুখের আদলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাত পা নাড়ার ভঙ্গিমায় মিলে যাচ্ছে। কথার সুর ঠিক একই রকম। এ কি? সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল কেন? হারিয়ে গেল কেন, কোথায় গেল? বেশ তো লাগছিল ওর। বেশ তো খুশিতে ছুপ ছুপ করে উঠছিল ওর মনটা। কেন ওদের কেড়ে নিল? ইভেতি তো কোন অন্যায় করে নি। তবে কেন? এ কি ও কে? ও আবার কে এল? ওকে তো চেনে না। কোনদিন দেখেছে বলেও তো মনে পড়ে না। তবে এলো কেন? না, না ওর সঙ্গে কোন কথা নেই। ওটা ওকে মেরে ফেলতে চায়। হটিয়ে দিতে চাইছে। না, না, ও কিছুতেই যাবে না। মরবে না। কেন, কি দুঃখে ও মরবে? সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে? কি বলছে? ভবিষ্যৎ? ওর নাম ভবিষ্যৎ? সে আবার কি? বাঃ—বেশ তো দেখতে। কেমন সুন্দর ঝলমলে পোষাকে ঝিলমিল করছে। আর ছাখো, ছাখো, কি সুন্দর হাসছে। দাঁতগুলো কি সুন্দর। এত সুন্দর হাসি তো ও আর কোনদিন দেখে নি। না, না, তুমি রাগ কোরো না। তোমাকে আমি খু-উ-ব ভালবাসি। আগে বুঝি নি বলেই অমন রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু লক্ষীটি, তাই বলে তুমি কিন্তু আমার উপর রাগ কোরো না। তা হলে কিন্তু আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাবে। আর—আর বলো তুমি, বলো আমায় ছেড়ে কোনদিন পালিয়ে যাবে না। জানো, সবাই আমায় দেখে উপহাস করে। সেইজন্যই তো আর কাউকে সহ্য করতে পারি না। তোমাকেও ঐ কারণেই ভুল বুঝেছিলাম। ছাখো এবার থেকে আর কোনদিন তোমার উপর রাগ করবো না। এবারের মত আমাকে ক্ষমা কোরো।

কোথেকে কতগুলো শব্দ আসছে। ইভেতি বুঝতে পারছে না। একটা শব্দের সঙ্গে অন্যটা যায় মিলিয়ে।

কিন্তু এখানে ওকে কে নিয়ে এলো? ও যে এখানে আসবে তা তো কোনদিন ভাবতেই পারে নি। ঠিক এ রকম একটা জায়গায় স্বপ্নেই না ও কতদিন দেখেছিল। কি সুন্দর! কি অপূর্ব! ছবির মত আঁকা-বাঁকা নদীটা। তার বুকে একটা বিরাট নৌকা। নৌকায় বসে ইভেতি। নদীর পাড়টা কত সুন্দর সুন্দর ফুলে থরে থরে সাজানো। কিন্তু পাড়ে দাঁড়িয়ে অত অগুণতি লোক কার জন্য অপেক্ষা করছে? ওরই জন্য কি? পাড়ে এসে নামল ও। নেমেই দেখল ওর সামনে দাঁড়িয়ে সারভিগনি। যুবরাজের পোষাক পরা। ওকে এখানে কেন নিয়ে এল? ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে ষাঁড়ের লড়াই দেখাবার জন্য। রাস্তাগুলো লোকে গম্ গম্ করছে। ওদের কথা শুনল ইভেতি। কিন্তু বিস্মিত হল না। ওরা তো কত চেনা, কত পরিচিত। তার পর? তার পর? তার পর?'

তারপর কোথায় যেন সব গেল হারিয়ে? আবার জেগে উঠল ইভেতি। বারান্দা থেকে হাসি-গল্পের শব্দ আবার পরিষ্কার ওর কানে এলো।

কৈ, তবুও তো মরতে পারছে না ইভেতি?

কিন্তু এখন কি ও সত্যিই মরতে চায়? এই যে এত স্বাচ্ছন্দ্য, এত তৃপ্তি—সব কিছুকে অত সহজে তো অস্বীকার করতে পারছে না। এইভাবে যদি চিরকালটা রচনা করে নিতে পারত।

ও আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিল। গাছের উপর চাঁদটা ওর মুখোমুখি। কেন যেন ওর আর মরতে ইচ্ছে করছে না। বাঁচতে চায়।

ও কেন মরবে? কি ওর অপরাধ? ও কেন ভালবাসা পাবে না? ও কেন সুখীজীবন পাবে না? সবই তো ওর ন্যায্য পাওনা। পাওয়া উচিত। পেতেও পারে। জীবনের সবটুকুই তো সুন্দর। যতটুকু কুৎসিত সেটুকু তো সুন্দরকে সুন্দরতর করে তোলার জন্যই ক্লোরোফরম যেন ওকে এই কথাই শিখিয়ে দিল। ক্লোরোফরম ওর সত্তায় নতুন নেশা ছড়িয়েছে।

আবার ভিজিয়ে নিল তুলোটা। ও আবার স্বপ্ন দেখতে চায়। ক্লোরোফরমে তো সেই স্বপ্নের সন্ধান লুকানো।

চাঁদের দিকে তাকালো ইভেতি চাঁদের গায়ে একটা মেয়ের মুখ। ও আবার সেই জায়গায় ফিরে এল। আকাশের ঠিক মাঝখানে একটু মুখ ভাসছে। মুখটা গান গাইছে। একটা পরিচিত সুর। ওবাড়ি ভেতরে গেল পিয়ানো বাজাতে।

ইভেতির মনে হল যদি ওর একজোড়া সুন্দর পাখা থাকতো তা হলে ও এখনি উড়ে যেতে পারত আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা মেয়েটার কাছে। পাশে বসে বসে ওর গান শুনতে পেত। কি বিস্ময়। ভাবতে-ভাবতেই ওর শুভ্র-সুন্দর দু'টি পাখা গজিয়ে উঠল। ও উড়বার চেষ্টাও করল।

সত্যি উড়েও গেল। রাত্রির বুক চিরে। বন-জঙ্গল, নদী-নালা পেরিয়ে। মনের আনন্দে উড়ে চলেছে ইভেতি বাতাস কেটে-কেটে। বাতাস লাগছে ওর সারা গায়। দ্রুতগতিতে। এত তাড়াতাড়ি যে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবারও অবকাশ নেই। উড়তে উড়তে একটা পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসল। মাছ ধরবে বলে।

এক সময় ছিপে টান লাগল। টান দিল ইভেতি। উঠে এল একটা সুন্দর হার; অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ইভেতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এমনি একটা হার কতদিন ও আশা করছিল। খুব খুশি হল।

হঠাৎ দেখল ওর পাশে বসে সারভিগনিও মাছ ধরছে। সারভিগনি একটা কাঠের ঘোড়া টেনে তুলল। বোকা দৃষ্টি মেলে তাকালো সারভিগনি ইভেতির দিকে। চোখে চোখ পড়তেই দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠল।

ঠিক তখনই ইভেতি শুনলো ওবাড়ি নীচ থেকে ডেকে বলছে: 'ইভেতি, বাতি নেভাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: 'ইভেতি, বাতি জ্বালিয়ে রেখো না।'

আবার খানিকটা ক্লোরোফরম ঢালল ইভেতি তুলোয়। একটু দূরে তুলোটা রাখল। ঘরের বাতাস ক্লোরোফরমের গন্ধে ভারী হয়ে এল। আর সজাগ হয়ে রইল, কারো আসার অপেক্ষায়।

তখুনি ইভেতি শুনল, ওবাড়ি বলছে: 'ইভেতি বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি গিয়ে একটা ঝিকে পাঠিয়ে দিই।'

ঝি এসে ইভেতির দরজায় ধাক্কা দিল। জোরে জোরে ডাকল। কোন উত্তর পেল না।

আবার ধাক্কা দিল। ডাকল। বলল: 'উঠে জানালা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিন।' এবারও কোন উত্তর এল না। ঝিটা একটু ঘাবড়ে গেল। লাফিয়ে গিয়ে ওবাড়িকে জানালো: 'অনেক ডেকে ডেকেও তো কোন সাড়া পেলাম না।'

ওবার্ডি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল: 'কিন্তু ওর ঘুম তো খুব পাতলা।'

নিরুপায় হয়ে সবাই নীচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল: 'থ্রী চীয়ার্স্ ফর ইভেত্তি। হিপ-হিপ-হুররে।'

চীৎকারটা রাত্রির বুকে হোঁচট খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে হতে অনেকদূরে মিলিয়ে গেল। বিলীয়মান একটা ট্রেনের শব্দের মত।

ওবার্ডি এবার আরও বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল: 'ওর নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।'

সারভিগনি গোলাপ গাছটা থেকে ফুল কুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ইভেত্তির জানালা দিয়ে ছুড়তে লাগল। প্রথমটা ইভেত্তির গায়ে লাগল। একটু আঁতকে উঠল। তারপর কোনটা গায়ে, কোনটা চুলে, কোনটা মাথার উপর দিয়ে বিছানায় উপর বৃষ্টির মত পড়তে লাগল।

ওবার্ডি প্রায় বোজাগলায় ককিয়ে উঠল: 'ইভেত্তি, লক্ষ্মীটি, সাড়া দাও।'

সারভিগনিও একটু সন্দিহান হয়ে উঠল। ও বলল: 'সত্যি, কেমন যেন মনে হচ্ছে। আমি ব্যালকনি বেয়ে উপরে উঠবো।'

চিভেলিয়র এগিয়ে এসে বাধা দিল: 'কেন, তুমি কেন? আমরা পারি নে।'

অন্যান্য সবাই গোটা ঘটনাকে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে উপভোগ করছে। একটু নতুন কিছুর সম্ভাবনায় ওরা মেতে উঠল। চিভেলিয়রকে সমর্থন জানিয়ে সবাই বলল: 'তাই তো। তুমি কেন? আমরা কি নেই?'

ওবার্ডি বিরক্ত এবং অসহিষ্ণু হয়ে বলল: 'এখন ওসব বাদ দিয়ে আগে একজন উঠে দ্যাখো, ব্যাপারটা কি।'

এ কথায় অন্যান্য সবাই বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হল। ব্র্যাভেলো নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল: 'ওঁর একটু সারভিগনির উপর পক্ষপাতিত্ব আছে। উনি আমাদের উপর অবিচার করছেন।'

চিভেলিয়র বলল: 'তার চেয়ে টস করা হোক, কে উঠবে।' বলেই পকেট থেকে একটা একশ' ফ্রাংকের মুদ্রা বার করল।

প্রথম ব্র্যাভেলো ডাকল: 'টেল।'

হ'ল 'হেড'।

তারপর স্তাভাল ডাকল: 'হেড।'

হ'ল টেল।

একে একে সবাই নিজেদের সুযোগ হারাল। বাকি থাকলো শুধু সারভিগনি। ওর এসব ছেলেমি মোটেও ভাল লাগছিল না। ও উৎকণ্ঠে বলল: 'ও সব বুজরুকি রাখো।'

ব্র্যাভেলো একটা হাত বুকের উপর রেখে বিনীত কণ্ঠে বলল: 'বেশ তো, নিজেই টস কর।'

সারভিগনি কালক্ষেপ না করে মুদ্রাটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বলল: 'হেড।'

হল 'টেল।' সারভিগনি ওকে থামটা দেখিয়ে বলল: 'তা হলে দেরি কোরো না। চটপট উঠে পড়ো।'

এবারে ব্র্যাভেলোকে কেমন যেন অসহায় দেখাল।

চিভেলিয়র জিজ্ঞেস করল: 'কি ভাবছ?'

ব্র্যাভেলো আমতা-আমতা করে বলল: 'আমার···আমি···একটা মই···?'

সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল।

স্তাভাল এগিয়ে এসে বলল: 'উঁহুঃ। তোমাকে এমনিই উঠতে হবে। এস, তোমাকে সাহায্য করছি।'

স্তাভাল ওর শক্ত-সবল হাত দিয়ে ওকে উপরে ঠেলে দিতে দিতে বলল: 'হাঁ, এই তো, এইবার ব্যালকনিটা ধরো।'

ব্র্যাভেলো ধরতেই স্তাভাল ওর হাতটা সরিয়ে নিল। শূন্যে একটা বাদুড়ের মত ঝুলতে লাগল ব্র্যাভেলো। সারভিগনি এগিয়ে এসে ওর দোদুল্যমান পা দু'টোকে একটা অবলম্বন দেবার চেষ্টা করতেই, ব্র্যাভেলো একটা বস্তার মত ধপ করে পড়ে গেল।

সারভিগনি জিজ্ঞেস করল: 'এবার কে?'

কেউ এগিয়ে এলো না।

সারভিগনি বেলভিনকে বলল: 'কি ব্যাপার, এসো।'

বেলভিন নিজের অক্ষমতা জানিয়ে বলল: 'না, না, বাবা, আমার হাতগুলো লোহার নয়।'

'তা হলে চিভেলিয়র? তুমি না বাধা দিয়েছিলে।'

চিভেলিয়র দু'পা পিছিয়ে গেল।

সারভিগনি আবার বলল: 'তাই বলো, ওদের বীরত্ব অতি সহজেই শুকিয়ে আসে।'

বলেই সারভিগনি থামটা বেয়ে ব্যালকনি ধরল। সেখান থেকে জিমন্যাস্টের কায়দায় এক ঝোঁকে রেলিং-এর ওপারে গিয়ে পৌঁছল।

সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে উপরের দিকে।

একটু পরেই সারভিগনি চীৎকার করে উঠল: 'তাড়াতাড়ি এসো। ইভেত্তি অজ্ঞান হয়ে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ওবার্ডির আর্তনাদ যেন সমস্ত বাড়িটাতে বিপদের পরোয়ানা জারী করে দিল।

ইভেত্তির চোখ বোজা। মৃতের মত পড়ে আছে। ওবার্ডি ছুটে ঘরে ঢুকল। মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল: 'ওর কি হয়েছে বলো।'

সারভিগনি মেঝে থেকে ক্লোরোফরমের বোতলটা তুলে নিতে নিতে বলল: 'আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো।'

তারপর ইভেত্তির বুকের উপর কান পেতে বলল: 'তবে, এখনো মরে নি। আচ্ছা, এমোনিয়ার মত কিছু আছে?'

বিভ্রান্ত ঝিটা ছুটে এসে বলল: 'কি বললেন?'

'এমোনিয়া জাতীয় কিছু।'

'নিয়ে এসো। আর সব জানলা, দরজাগুলো খুলে দাও।'

ওবার্ডি হাঁটুর উপর মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে বলছে: 'ইভেত্তি, সাড়া দাও। হা ঈশ্বর, এ তুমি কি করলে? আমাকে আর কত শাস্তি তুমি দেবে?'

সবাই আকস্মিক ঘটনায় হকচকিয়ে গেছে। আকস্মিকতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কেউ জল, কেউ তোয়ালে, কেউ এটা, কেউ সেটা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে।

একজন বলল: 'ওর জামাগুলো খুলে দাও।'

ওবার্ডির কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। যে যা বলছে ও তাই

করছে। ইভেত্তির জামাগুলো খুলে ফেলবার চেষ্টা করল। ভয়ে, উত্তেজনায় ওর হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

ঝি ওষুধের বোতল নিয়ে ফিরে এল। সারভিগনি ওষুধটা খানিকটা রুমালে ঢেলে রুমালটা ইভেত্তির নাকের কাছে ধরল। কিছুক্ষণ পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল: 'যাক্ বিপদ কেটে গেছে।'

সেই ওষুধমাখানো রুমালটা দিয়েই সারভিগনি ইভেত্তির কপালের দুই পাশ, ঘাড়, গলা ভালো করে মুছে দিল। ঝিকে ইংগিত করল ইভেত্তির পোষাকগুলো খুলে ফেলবার জন্য। শুধু অন্তর্বাসটা থাকল। তারপর সারভিগনি ওকে আলতোভাবে দুই হাতের উপর তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। একটা তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল সারভিগনির সারা দেহে। ইভেত্তি অর্ধনগ্না—ওর নরম মাংসের স্পর্শ এই প্রথম পেল সারভিগনি।

সারভিগনি ওকে শুইয়ে দিয়ে বলল: 'অনেকটা সুস্থ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে।'

সারভিগনি দেখল সবাই ইভেত্তির দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে। পায়ের রক্ত দপ করে যেন মাথায় উঠে গেল। ও এগিয়ে এসে বলল: 'এত লোকের এখানে দরকার নেই।'

যেন হুংকার দিল সারভিগনি। একে অন্যের দিকে বোকার মত এক পলক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। থাকল শুধু সারভিগনি, স্যাভাল আর ওবার্ডি।

ওবার্ডি স্যাভালের কাঁধের উপর অধীর আবেগে ভেঙ্গে পড়ে বলল: 'ওকে তোমরা যে করেই পারো বাঁচাও।'

সারভিগনি ঘুরে দেখল টেবিলের উপর একটা চিঠি। ঠিকানাটা নজরে পড়ল। চকিতে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। খামটা খুলে লাইন দু'টো পড়ল:

'আমি মরছি। যাতে আমাকে কারো রক্ষিতা হতে না হয়।'

—ইভেত্তি

পুনশ্চ:—মা, বিদায়! আমাকে ক্ষমা কোরো।'

থেমে উঠল সারভিগনি। যতটা সহজ ব্যাপারটা ভেবেছিল, আদপেই সেটা ততটা নয়। চিঠিটা অন্যের নজর এড়িয়ে লুকিয়ে ফেলল পকেটে।

বিছানার কাছে ফিরে এল সারভিগনি। ইভেত্তিকে চিঠিটা দেখানো ঠিক হবে কি? একটু ভাববার চেষ্টা করল সারভিগনি।

ওবার্ডি তখনও কাঁদছিল। ও বলল: 'একজন ডাক্তার ডাকবে কি?'

তখন সারভিগনি ফিসফিসিয়ে স্যাভালকে কি বলছিল। ওবার্ডির কথায় ও বলল: 'আর দরকার নেই। একটু বাইরে যান। ফিরেই দেখবেন ইভেত্তি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

স্যাভাল ওবার্ডির হাত ধরে বেরিয়ে এল।

সারভিগনি বিছানার একপাশে বসল। ইভেত্তির একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিল। ডাকল: 'ইভেত্তি, আমার কথা শোন।'

ইভেত্তি চোখ মেলল না। কথা বলল না। ওর ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। নড়তে ইচ্ছে করছে না। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এভাবেই ওর ভাল লাগছে। ভাল লাগছে ওর এইভাবে শুয়ে থাকতে। রাত্রির হাল্কা বাতাস আসছে। গাছে গাছে সাড়া জাগিয়ে বাতাস ভর করে আসছে। চোখে-মুখে তার আলতো ছোঁয়া লাগছে। ঘরময় গোলাপের কুঁড়ি, ফুল ছিটানো। ঘরময় একটা মিষ্টি গন্ধ। যদি এভাবে সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারত ইভেত্তি।

বাতাস, ফুলের গন্ধ, দূরের নদীর শব্দ, রাত্রির সঘন স্বপ্নে মৌনতা যেন ওকে এক নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে গেল। আর ওর মরতে ইচ্ছে করছে না। ও বাঁচতে চায়। ও বাঁচবে। ও ভালবাসা পেতে চায়। ওকে ভালবাসবে। ভালবাসার পরিপূর্ণতায় ও হবে পরিপূর্ণ। ভালবাসার পবিত্রতায় ও হবে নতুন কিশলয়।

সারভিগনি আবার ডাকল: 'ইভেত্তি, লক্ষ্মীটি, চোখ খোল, সাড়া দাও।'

যেন নতুন শপথ নিয়ে জেগে উঠল ইভেত্তি। চোখ মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ইভেত্তি।

রুদ্ধকণ্ঠে বলল সারভিগনি: 'ছি ছি, কি সর্বনাশ তুমি করছিলে! আমার কথা একটুও ভাবলে না তুমি?'

ইভেত্তির ঠোঁট দু'টো কাঁপছে। সারা মুখে এক পশলা [illegible] হাসি ছড়িয়ে বলল: 'মুসকাদ! খুব ভাল লাগছে!'

সারভিগনি ইভেত্তিকে নিজের বুকের ভেতর [illegible] বলল: 'আমার গা ছুঁয়ে বলো, এমন কাজ আর কোনদিন করবে না।'

ইভেত্তি মুখে কিছু বলল না। মাথা নেড়ে সায় দিল।

সারভিগমি দেখল ইভেত্তিকে, ইভেত্তি হাসছে। এমন করে কি ও কোনদিন দেখেছিল ইভেত্তিকে। সারভিগনি পকেট থেকে চিঠিটা বের করে বলল: 'এটা তোমার মাকে দেখাবো?'

ইভেত্তি এবারও মুখে কিছু বলল না। শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে নিষেধ করল।

তখন সারভিগনি কি বলবে কথা খুঁজে পায় না। ওর সব কথা যেন বলা হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে। ও যেন কিসের পরিপূর্ণতার আস্বাদে থমথমে।

কিছুক্ষণ পর সারভিগনি বলল: 'এমন আর কোনদিন কোরো না ইভেত্তি। জীবনে সব সুখ-দুঃখকে আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব। কেন তুমি সবটুকু নিজের করে নিচ্ছিলে?'

'মুসকাদ, তুমি কত ভাল।'

এতক্ষণে কথা বলল ইভেত্তি।

আবার চুপচাপ। সারভিগনির দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ইভেত্তির উপর। ইভেত্তি ওকে আরও কাছে টেনে নিল। সারভিগনি আরও নিবিড় হল। ঠোঁটে ঠোঁট মিলল।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়ালো সারভিগনি। ইভেত্তি আবার ইশারায় কাছে ডাকল। সারভিগনি বলল: 'দাঁড়াও, তোমার মাকে ডেকে আনি।'

'এখন নয়। তুমি যেও না লক্ষ্মীটি।'

আবার নীরবতা। একসময় ইভেত্তি বলল: 'তুমি তোমার ভালবাসা এত বেশি, মুসকাদ।'

মুসকাদ কোন কথা বলল না। শুধু নিজের বুকের সঙ্গে বেঁধে ফেলল ইভেতিকে।

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। উঠে দাঁড়ালো সারভিগিনি। ইংগিতপূর্ণ ভাষায় বলল : 'আসতে পারো। সব শেষ হয়ে গেছে।'

ওবার্ডি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল ইভেতিকে। ওর দু' চোখও তখন অশ্রুসিক্ত।

আর সারভিগিনি? ধীর স্থির পদক্ষেপে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। ও পেয়েছে। যা চেয়েছিল তাই। পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে ওর সমস্ত অস্তিত্ব থির্‌থির্‌ করছে। এত আনন্দ, এত সুখ যে এতদিন কোথায় লুকিয়েছিল জানতো না সারভিগিনি। আজ যেন সব আনন্দ একসঙ্গে ওকে দিশেহারা করে দিতে চায়।

রাত্রির বুক থেকে সজীব নিঃশ্বাস টেনে নিল সারভিগিনি।

—শেষ—

অনুবাদ—উষাকান্ত দত্ত

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ

বর্তমান যুগ অগ্রগমনের প্রতীক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অকল্পনীয় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় ভবিষ্যৎ-মানবের অভিধানে বোধ হয় অসম্ভব বলে কোন শব্দের আর ঠাঁই হবে না। মানুষ আজ শুধু পার্থিব সমস্যার সমাধান করেই সন্তুষ্ট হয় না। চিরদিনের চিরকালের বাসস্থান এই পৃথিবীটার বাইরে কি আছে, সে সম্বন্ধেও তার মাথাব্যথার অন্ত নেই এবং তারই ফলে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে বিচরণ করে বেড়ানোর কথাটাও আজ আর তার কাছে শুধু একটা কল্পনাবিলাস মাত্রই নয়; সেজন্য উদ্যোগ-আয়োজনেরও ত্রুটি নেই তার, যার ফলে মহাকাশেও ঘটেছে তার দর্পিত পদক্ষেপ। কিন্তু তবু রয়ে যাচ্ছে কোন্‌খানে যেন একটা বড়গোছের খট্‌কা। মনে হয় যেন সবই ফাঁকি, বাইরের আড়ম্বর যতটা, আসল বস্তুতে বোধ হয় ততটাই খাদ। নইলে কেন আজও মনুষ্যত্বের সঙ্গে পশুত্বের সংগ্রামের বিরতি ঘটল না এক তিলও? সভ্য হয়েছে বলে মানুষের আত্মাভিমান যেক্ষেত্রে আকাশস্পর্শী, সেখানেই কেন অনুষ্ঠিত হয় এমন অপরাধ যা একান্তভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় সেই আদিম মানবকে হিংসাই ছিল যার একমাত্র পরিচয়। গায়ের চামড়াটায় প্রভেদ থাকলেই যে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটতে পারে না এই ছোট্ট সাধারণ কথাটি বুঝতে চাইল না একদল মানুষ; অবশ্য মনুষ্যত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুসারে বোধ হয় এদের মানুষ বলাটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু বলতে তো হবে একটা কিছু সেই হিসাবে বলা, সে যাক্‌ এই ছোট্ট কথাটা তারা বুঝতে চাইলে না বলে যে হিংসার আগুন জ্বলল, তাতে বলি হতে হল পৃথিবীর অন্যতম সেরা মানুষকে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবকে আর কোন মৃত্যুই এভাবে নাড়া দিয়ে যায় নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই দুই মৃত্যুর একাত্মতা আদর্শবাদের উপর যে অবিচল আস্থা একদিন প্রবীণ জননায়ককে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিজের মৃত্যুর পরোয়ানায় নিজ হাতে স্বাক্ষর করতে আমেরিকার তরুণ রাষ্ট্রনায়ক জন কেনেডিও ঠিক তাই করে গেলেন। নিগ্রোদের স্বাধিকার দান করতে দৃঢ়সংকল্প, নিষ্ঠায় অবিচল, কর্তব্যে মহান্‌ কেনেডি জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন, 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আশা, উদ্দীপনা, কর্মশক্তি, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা একটা তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেল, কিন্তু আদর্শ রইল বেঁচে, তাই না সমস্ত বিশ্বের আঁখি আজ বেদনার অশ্রুতে ভরা, আপন কীর্তির আলোয় মানুষের মনের সিংহাসনে কেনেডি এবার যে আসন পাতলেন কার সাধ্য আর তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের ভিতর জীবনপণ করা সংগ্রাম তার সমিধ জোগাতে গিয়ে নিঃশেষে নিজেকে আহুতি দিয়েছেন কত মহাপ্রাণ আর সেই আহুতির অগ্নি থেকে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে যাত্রা সুরু করেছেন তাঁদেরই উত্তরসাধক। হিংসার প্রসারিত করকে গ্রাহ্যমাত্র না করে এগিয়ে গিয়েছেন অকম্পিত পদক্ষেপে আদর্শনিষ্ঠ, সৎ ও কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত এই ইস্পাত কঠিন মানুষগুলির জন্যই আজও বিশ্বমানবতা আদর্শ শুধু একটা কথার কথাতেই পর্যবসিত হয় নি—বোধ হয় সেজন্যই প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মতন মহাপ্রাণের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্পণ করতে বসলে, একাধারে শোক ও সান্ত্বনা এই দুটোই উদ্বেলিত করে তোলে মনকে, বিয়োগ বিধুর সন্তপ্ত হৃদয়ে চির অম্লান দীপশিখার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আদর্শনিষ্ঠা ও সততার এক অপরূপ পরিচয়। মনে হয় পশুত্বের আস্ফালনটাই যদি চরম সত্য হয়, তবে মানুষের মাঝে কখনই কি সম্ভব হত এ সব বস্তুর সন্ধান মেলা? লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্বের আজও যে বিলুপ্তি ঘটতে পারল না সে তো শুধু এঁদেরই মত কয়েকজনের প্রসাদে। আজ মরণের মাঝে অমরতায় চিরনিদ্রিত বীর যোদ্ধাকে উদ্দেশ করে বুঝি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সেই অপরূপ কথাকটিই বারবার বলতে সাধ হয়—

'এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান'।

উদ্ভিদ-অভিধান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

খঞ্জকারি—সুস্না, পৈশাবী।

খটিকা, খর—বেনা দ্র°। andropogon muricatus.

খট্টা—তৃণ বি°, andropogon serratus.

খড়াকান (দেশজ)—চর্ম ঘাস।

খড়ী—ধান্যাদিবর্গের তৃণ বি°, saccharum fiescum. পূর্ববঙ্গে জন্মে। আক গাছের ন্যায় ৪,৫ হাত লম্বা হয়, কিন্তু ভিতর ফাঁপা।

খড়্গাকোষ—লতানিয়া গাছ। scirpus maximus.

খড়্গাট—১ বৃহৎ কাশ, কাপড়, ২ খাগড়া।

খড়্গাপত্র—খড়্গাকোষ দ্র°।

খণ্ডকর্ণ—আলু বি°; শকরকন্দ।

খণ্ডশাখা—মহিষবল্লী লতা বি°।

খণ্ডী—বনমুদ্গা।

খণ্ডীর—পীতবর্ণ মুদ্গা।

খণ্ডুল—stercula urens. সিংহল ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে।

খদির—[হি° খয়ের, তৈ° খদিরমু বা পোদলামানু, তা° বোদলয়, দক্ষিণে—কর্বাকংকর, পঞ্জাব—খয়েক] খয়ের। খদির শব্দে খয়ের, গাছ, কাণ্ডক ও কাষ্ঠকে বুঝায়। খয়ের, শমী ও বাব্‌লা গাছ একরূপ দেখিতে বলিয়া সাধারণত লোকে সবগুলিকেই শমী ও বাব্‌লা বলে। কোচবিহারে সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সেখানকার লোকে জ্বালানি কার্যে ইহা ব্যবহার করে। (১) খদির, গায়ত্রী—বব্বুলাদি বর্গের বৃক্ষ বি° acacia catechu, mimosa c. (২) সোমবল্ক—সাঁইকাঁটা a, polycantha, m. sama. (৩) বিট্‌খদির—গুয়ে বাব্‌লা। দুর্গন্ধযুক্ত খয়ের, a. faruesiana. (৪) বল্লী খদির—m, dumosa. (৫) তাম্রকণ্টক। (৬) অরি। (৭) রক্ত খদির—লাল খয়ের uncaria gambier অঙ্কুকাদিবর্গের ক্ষুপ বি°। সিঙ্গাপুর, মলাক্কা প্রভৃতি দেশে জন্মে। পাকা খয়ের। (৮) শ্বেত খদির—সাদা খয়ের, পাপড়ি খয়ের। (৯) ক্ষুদ্র খদির—হ্রস্ব্‌খদির, সার খদির, মহাসার খয়ের গাছের নির্যাসকে খয়ের বলে। পানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বাজারে পাঁচ প্রকার খয়ের দেখা যায়—১ পাপড়ি, ২ জনকপুরী, ৩ পেস্ত, ৪ তিলি, ৫ বেলগুটি। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে খয়ের দুই প্রকার। শাখা ও পাতা সিদ্ধ করিয়া যে খয়ের পাওয়া যায় তাহা কৃত্রিম। আর কাঠের ভিতর যে নির্যাস সঞ্চিত হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খয়ের দুই রকম (১) সাদা ও (২) কালো। সাদা খয়ের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কালো খয়ের শিল্প ও রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুতের প্রকারভেদে দুই রকম রং হয়। পর্যায়—বালতনয়, দন্তধাবন তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম, বালপত্র, খণ্ডপত্রী, ক্ষিতিক্ষম সুশল্য, বক্রকণ্ঠ, যজ্ঞাঙ্গ, জিহ্বাশল্য, কণ্ঠী, সারদ্রুম কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য, বালপুত্র, কর্কটী, জিহ্বশল্য কুষ্ঠহৃৎ, যূপদ্রুম।

খদিরকা—খয়ের।

খদির পত্রিকা—১ অরিমেদ বৃক্ষ, গুয়েবাবলা, লজ্জালুলতা।

খদির পত্রী, খদিরা—লজ্জালুলতা।

খদিরাষ্টক—১ খদির, ২-৪ ত্রিফলা, ৫ নিম্ব, ৬ পলতা, গুলঞ্চ, ৮ বাসক।

খদিরিকা—লজ্জালুলতা।

খদিরী—১ লজ্জালুলতা। পর্যায়—নমস্কারী, গণ্ডকারী সভঙ্গা, গণ্ডকারী, শমীপত্রা, রক্তপত্রী, অঞ্জলিকারি রাস্না,। ২ হাড়যোড়া।

খদিরোপম—কদর, কাঁটা বাবলা।

খণ্ডপত্রী—খদির।

খদ্যোতম—একপ্রকার বিষাক্ত ফলযুক্ত বৃক্ষ।

খর্মূলিকা, খমূলী—কুম্ভিকা, পানা।

খম, খম্বা—আহ দ্রঃ।

খয়ের—খদির দ্র°।

খরকাষ্ঠিকা—বলা, বেড়েলা গাছ।

খরগন্ধানিভা—নাগবল, গোরখ-চাকুলে ।
খরগন্ধা—নাগবলা ।
খরঘাতন—নাগকেশর ।
খরচ্ছদ—১ উলপতৃণ, উলুখড়, ২ ইৎকট, ওকড়া, ৩ কুন্দরতৃণ, ৪ শেওড়া ।
খরত্বচ—অলম্বুষা, লজ্জালুবিশেষ ।
খরদণ্ড—পদ্ম ।
খরদলা—ডুমুর ।
খরদূষণ—ধুতরা ।
খরনাল—পদ্ম ।
খরপত্র—১ সেগুন, ২ ক্ষুদ্র তুলসী গাছ, ৩ যবনাল শর (?), ৪ মরুর বৃক্ষ, ৫ হরিবর্ণ তৃণ ।
খরপত্রক—তিনক বৃক্ষ ।
খরপত্রী, খরপর্ণিনী—১ গোজিহ্বা বৃক্ষ, দাবিয়া শাক; ২ কাক ডুমুর ।
খরপাদাঢ্য—কপিথ বৃক্ষ ।
খরপুষ্প—নাগদানা ।
খরপুষ্পা, খরপুষ্পী—বাবুই তুলসী ।
খরপুষ্পিকা—বর্বরা বৃক্ষ ।
খরমঞ্জরী—অপামার্গ ।
খরবল্কা—তৃণ-বিশেষ ।
খরবল্লরী, খরবল্লিকা, খরবল্লী—নাগবলা ।
খরবুজ, খরবুজ—[সং বড়ভুজা, খর্বুজ, নোমক, হিং খরবুজা মং খর্বুজ, ওং তরিয়া শকরটেটী কং, বড়জগোতে, তৈং খরবুজং, ফাঃ খরপুজা অং বিত্তিথ ইং musk melon কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের কাঁকুড় সদৃশ গাছ । Cucumis melo. কাবুল দেশে জন্মায় ।
খরশাক, খরশাকা—ভার্গী, বামুনহাটী ।
খরসোনি—লোহিকালতা ।
খরস্কন্দ—পিয়াল গাছ ।
খরস্কন্ধা—খেজুর গাছ ।
খরস্পর্শা—১ পীতপুষ্প, দেবদালীলতা, ২ হলদে ফুল, ঘোষালতা ।
খরস্বরা—১ কাঠ মল্লিকা, ২ ত্রিপুর মল্লিকা ।
খরা—দেবতাড় বৃক্ষ ।
খরাগরী—দেবতাড় বৃক্ষ ।
খরাহ্বা—বন জোয়ান ।
খরী (দেশজ)—ইক্ষু বিশেষ saccharem semi-decembens
খর্জু—খর্জুর বৃক্ষ ।
খর্জুর—১ চক্রমর্দ বৃক্ষ, চাকুন্দে, ২ ধুতুরা, ৩ আকন্দ ।
খর্জুর, খর্জুরী—[হিং খজুর, মং শিন্দী, গুং খজুরী, কং ইচিল্, তৈং ইচাচেট্টু, ইং wild date tree] খেজুর, খাজুর phoemix sylvestris. প্রকার ভেদ—(১) পিণ্ডখর্জুরী—[সং মধুখর্জুরিকা, রাজখর্জুরী, দীপ্যা, দুলেমানী, হোহারা, হিং পিণ্ডখজুর, মং খজুরী, গুং খজুর, খারক, কং সিংহ ইচিল্, তৈং খজুরপ পুণ্ডু, কাং ভমর ক্রহর্, অং খুসমাতির্, খুর্মাখুক] পিণ্ড খেজুর p. dactylifera. আরব ও তুরস্কে জন্মে । খেজুর গাছের মত কেবল কাঁটা নাই । (২) ভূখর্জুরী—(ক) অতি ক্ষুদ্র গাছ, কাণ্ড নাই, p. acculis, p. farinifera. ৮।১০ বৎসরের গাছ ৮।১০ আঙ্গুলের বড় হয় না । খেজুর গাছের মত পাতা তবে ছোট, বিহারে জন্মে । বাঙলায় বংলী খেজুর । (খ) অপর ভূখর্জুর—কাণ্ড ১ হাতের বড় হয় না । ইহা গোদাবরী সাগর সঙ্গমের নিকট বালুকাময় ভূমিতে জন্মায় । ইহার ফল পাকিলে কাল রংয়ের হয় ও শাঁস খুব কম । (৩) বড় খর্জুর—[সং খর্জুরিকা, উং খজিরি] বাঙলা দেশে জন্মায় ।
খর্পরাল—বৃক্ষবিশেষ ।
খর্বপত্রিকা, খর্বপত্রা—দ্রোণপুষ্পী ।
খর্বুর—তরমুজ বৃক্ষ ।
খর্বুজ—খরমুজ দ্রঃ ।
খল—তমালবৃক্ষ ॥ শবরং ॥
খল—১ এক প্রকার ধান, ২ ছোলা, বুট ।
খলঘী—আকাশবল্লী ।
খসকন্দ—ক্ষীরীশ বৃক্ষ ।
খসখস—[পারসী] ১ উশীর দ্রঃ । ২ গুজরাতে পোস্তর বীজকে খসখস বলে ।
খসতিল—খাখস, পোস্তদানা ।
খসফেনক্ষীর—আফিঙ (?) ।
খসম্ভবা—আকাশমাংসী বৃক্ষ ।
খসরভু—লকুচ, ডেও ।
খসকাডুমুর (দেশজ)—একপ্রকার ডুমুর ।
খাঁড়াকাপ (দেশজ)—চর্মঘাস ।
খাগ, খাগড়, খাগড়া—[ইং Reeds] Phragmites Karka. Saccharum Spontanum. স্থানবিশেষে খাগ ও খাগড়া ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয় । খাগড়া, যাহার মধ্যে শোষ থাকে । খাগ যাহার মধ্যে শোষ নাই ।
খাজা কাঁঠাল (দেশজ)-যে কাঁঠালের কোয়া বেশি নরম হয় না ।
খাজুর—খর্জুর, দ্রঃ ।
খাজুরচাঁড়—Leonotis nepetoefolia.
খাড়া, (দেশজ)—সজনের খাড়া বা ডাঁটা
খাদোদক—নারিকেল ফল ॥ ত্রিকাণ্ড ॥
খামআলু (দেশজ)—আলুবিং dioscorea alta. [ফলদা

পলাশীর পর

কমল কুমার

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ, ২৩শে জুন—

মুর্শিদাবাদ হইতে চাল্লিশ মাইল দূরে পলাশী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, আম্রকাননবেষ্টিত, উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথীর দূরত্ব মাত্র একশ' পঞ্চাশ গজ।

পার্শ্বে নবাবের প্রাচীরবেষ্টিত 'শিকার গাহ'। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দিন প্রভাতে পূর্বদিগন্তে সূর্যের আভাস ইঙ্গিত মাত্র পাখীদের কূজন সবে শুরু হইয়াছে। তারপর তিন-ঘণ্টা অতিক্রম করিয়াছে। হঠাৎ কর্ণ বিদীর্ণ করিয়া কামানের গোলাবর্ষণের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। নবাবের সৈন্য ছিল পাঁচহাজার মোগল অশ্বারোহী, সাতহাজার রাজপুত ও পাঠান পদাতিক এবং পঁয়তাল্লিশ জন ছিলেন ফরাসী 'Helper' গোছের। সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন মীরমদন ও মোহনলাল। পশ্চাৎ দিকে ছিলেন অধিনায়ক ইয়ার লুৎফা খান, সেনাপতি জাফর খাঁ ও রায়দুর্লভ। আর ছিল তিপ্পান্নটি কামান, পঁয়ত্রিশহাজার অনুচর ও ভৃত্যের দল।

বিপরীত পক্ষে ছিল নয়শ' পঞ্চাশজন পদাতিক (ইংরাজ), ভারতীয় ছিল একুশ শত এবং অন্যান্য নানা জাতের সৈন্য। রবার্ট ক্লাইভের পক্ষে ছিল জাফর খাঁ, কূটবুদ্ধি রায়দুর্লভ ও তাহাদের নিষ্ক্রিয় সৈন্য।

প্রথমে ফরাসী গোলন্দাজ, ইংরেজ বাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ সুরু করিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজের পক্ষে ত্রিশজন সৈন্য নিহত হইল। ক্লাইভের পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিম দিগন্ত প্রসারী কৃষ্ণ মেঘ এক ঘন অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলিল। তারপরেই প্রবল বারিবর্ষণ সুরু হইয়া গেল। বৃষ্টিধারায় বারুদ সিক্ত হওয়ায় নবাবের পক্ষে কামান ব্যবহার অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিন ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হইল।

কিন্তু মধ্যাহ্নের পূর্বেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ইংরাজের নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা মীরমদনের মৃত্যু ঘটাইল। মীরমদনের মৃত্যুতে সমস্ত পলাশী বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। দুঃসংবাদে সিরাজ ভেঙে পড়লেন। একমাত্র মোহনলালই ভরসা। জাফরআলি খাঁ নিশ্চল ও স্থাণুর মত অবিচলিত। মীরজাফর খাঁকে নিজ শিবিরে আহ্বান করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া অনুনয় করিলেন, 'আপনি আমার একমাত্র ভরসা, আপনি বাঙলার তথা বাঙালীর মান রক্ষা করুন।'

বিশ্বাসঘাতকের মুখে এক কুটিল রেখার আভাস দেখিতে পাওয়া গেল। তিনি কোরাণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'আমি এই শপথ করিতেছি, বাঙলার তথা বাঙালীর সম্মান রক্ষার্থে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করিব।'
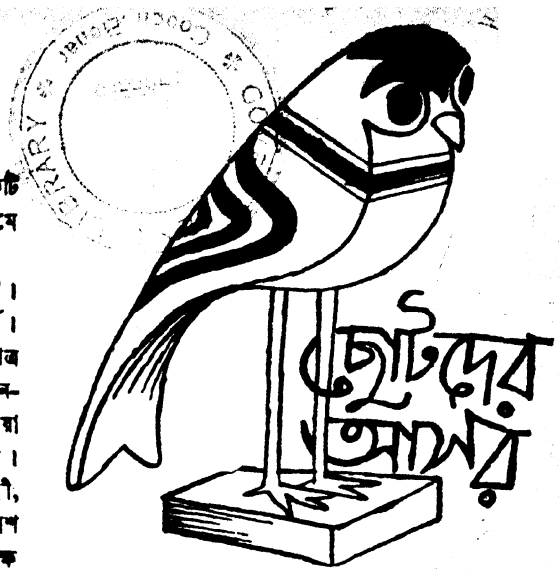
এর পরের ইতিহাস যেমন জঘন্য তেমন কলঙ্কময়। পশ্চিম গগনে সূর্যাস্তের পূর্বেই বাঙালীর স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে আশীজন সৈন্য হতাহত হন এবং নবাবের পক্ষে হন পাঁচশত জন। এই যুদ্ধে বীর মোহনলাল, মাণিক চাঁদ, খাজা হাদী আহত হইলেন।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে প্রিয়তমা পত্নী বেগম লুৎফাউন্নিসা, বিশ্বাসী ভৃত্য 'খোজা'র সহিত পাটনার পথে যাত্রা করিলেন। স্থলপথে বিপদ ভাবিয়া জলপথ যাত্রা নিরাপদ ভাবিলেন। ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া উজানস্রোতে পাটনার দিকে ভাসিলেন। পথিমধ্যে আহারের জন্য নৌকা তীরসংলগ্ন করিলেন। সেখানে 'কানকাটা' দানা শাহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূর্বপ্রতিশোধের সংকল্পে তিনি গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন, নিরস্ত্র সিরাজ সহজেই বন্দী হইলেন।

গভীর রাত্রে সিরাজের আগমনে জাফর খাঁ সন্ত্রস্ত হইলেন। তিনি জানিতেন শত দোষ সত্ত্বেও সিরাজ জনগণের সহানুভূতি পাইবেন। সিরাজের বাল্যের বন্ধু কৈশোরের সখা, যৌবনের সহচর, কর্মজীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী মীরজাফর-পুত্র মীরণের নিম্ববৃক্ষরাজীবেষ্টিত উদ্যান বাটিকায় বন্দী রহিলেন।

নবাবপুত্র মীরণ অবিলম্বে সিরাজকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। গভীর রাত্রে ঘাতক মুহম্মদী বেগ প্রবেশ করিল। এই মুহম্মদী বেগ সিরাজের পিতার নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিল। সিরাজের মাতা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল। সিরাজ পূর্ব পরিচয়ের দাবীতে

কৃতজ্ঞতায় আবেদন করিলেন। বলিলেন, 'আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিব, আমায় সেই সময়টুকু দাও। আমি বহুদূরে চলে যাব। শৈশবে একবার তোমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহার প্রতিদান হিসাবে আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও'—কিন্তু বেগ নিরুত্তর। শাণিত কৃপাণ হস্তে বেগ অগ্রসর হইলে, সিরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিম্ববৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় লইলেন। শেষ পর্যন্ত দূর হইতে নিক্ষিপ্ত ছুরিকায় সিরাজ ভূপাতিত হইলেন। সিরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্ত বারংবার ছুরিকাঘাত করা হইল।

পরদিন প্রত্যুষে সিরাজের রক্তাক্ত দেহ হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া নগর দর্শন করান হইল। নিম্নোল্লিখিত নগরবাসী মীরণের চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিল না। তাহারা এই মৃতদেহ দর্শনে বিস্মিত হয় নাই।

গঙ্গার তীরে ক্ষুদ্র গ্রামে সিরাজের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হইল। প্রিয়তমা বেগম সুখদুঃখের অংশভাগিনী লুৎফা রাজধানীর ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সমাধির অদূরে এক কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন।

আজও মুর্শিদাবাদের 'খোশ বাগে' সিরাজের সমাধি নিম্ববৃক্ষ ও বেগমের কুটির করুণ কাহিনীর নীরব সাক্ষী রূপে রহিয়াছে।

শ্যাওলাও খাওয়া চলে

রাণী মজুমদার

বিশ্বের বর্তমান খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্তে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা জোর গবেষণা চালিয়েছেন। উদ্দেশ্য—সহজলভ্য, পুষ্টিকর, উপাদেয় নতুন খাদ্যের সন্ধান। শ্যাওলাকে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় কি না—এই সম্পর্কে তাঁরা গবেষণা করে যা ফল পেয়েছেন—তা খুবই আশাপ্রদ। আপাতত তাঁরা ক্লোরেলা নামক শ্যাওলা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে এই সুফল লাভ করেছেন।

পৃথিবীতে এযাবৎ প্রায় ১৭০০০ বিভিন্ন জাতীয় শ্যাওলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে কোন্‌গুলি মানুষের খাদ্যোপযোগী, আর কোনগুলি নয়—তা নিয়েও গবেষণা চলছে।

আমাদের দেশে তো বটেই, পৃথিবীর সর্বত্র—এমন কি মেরু অঞ্চলেও শ্যাওলা জন্মায়। এদের কোন আদর যত্ন করতে হয় না, আপনা থেকেই জন্মায়।

শ্যাওলা এককোষী জলজ উদ্ভিদ। তবে কোন কোন জাতের শ্যাওলা স্থলেও জন্মায়। এরা এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। কোষ-বিভাজন পদ্ধতিতে এদের দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হয়। সাধারণত আমরা সবুজ রঙের শ্যাওলার সঙ্গে বেশি পরিচিত। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাল, বাদামী, নীল, সাদা প্রভৃতি রঙের শ্যাওলার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

খাদ্য হিসাবে শ্যাওলার ব্যবহার নানাদিক থেকে লাভজনক। শ্যাওলার কোষের সবটাই খাওয়া যায়, কিছুই বাদ দিতে হয় না। কারণ ডাঁটা, পাতা, শিকড়, ফুল প্রভৃতি কিছুই নেই। আর শরীরের পুষ্টিকর উপাদানও এর থেকে পাওয়া যায়; যেমন—প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, ধাতব পদার্থ, শ্বেতসার এবং বিভিন্ন ভিটামিন, শুকনো শ্যাওলায় প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি থাকে। এত বেশি পরিমাণে প্রোটিন আর কোন গাছে পাওয়া যায় না। শ্যাওলার চাষেও কোন হাঙ্গামা নেই। যে কোন স্থানে, যে কোন ঋতুতে এর চাষ করা যায়।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে ক্লোরেলা নামক শ্যাওলা মহাকাশযাত্রীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে মহাকাশ যাত্রীর খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। তা'ছাড়া ক্লোরেলা থেকে প্রচুর অক্সিজেন পাওয়া যাবে। ফলে মহাকাশযাত্রীর অক্সিজেন সরবরাহে অনেক সুবিধা হবে।

ভারতবর্ষ, জাপান, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), আমেরিকা, জার্মেনী, ইজরাইল প্রভৃতি দেশে এই বিষয়ে গবেষণা চলছে। কোন কোন দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্যাওলার চাষও সুরু হয়েছে।

যাঁরা ক্লোরেলা নামক শ্যাওলা খেয়েছেন—তাঁদের মতে এটি শুধু পুষ্টিকরই নয়, মুখরোচকও বটে। এদের স্বাদ ও গন্ধ খুব তীব্র নয়—স্বাদ অনেকটা কড়াইশুঁটির মতো এবং গন্ধ অনেকটা সবুজ ঘাসের মতো। শ্যাওলার রুটি, শ্যাওলার ঝোল, শ্যাওলা দিয়ে তৈরি আইসক্রীম খুব উপাদেয় খাদ্য। চায়ের সঙ্গে শুকনো ক্লোরেলার গুঁড়া মিশিয়ে খেতে খুব সুস্বাদু হয়।

মানুষের খাদ্য হিসাবে শ্যাওলার ব্যবহার সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা চলছে। যদি শ্যাওলাকে ব্যাপকভাবে আমাদের খাদ্য হিসাবে চালু করা সম্ভব হয়, তবে খাদ্য-সঙ্কটের তীব্রতা যে বেশ কিছুটা লাঘব হবে সে বিষয়ে বোধ হয় কোন দ্বিমত নেই।

বেথ্‌ গিলার্ট—একটি কুকুরের কবর

ধীরেন্দ্রনাথ বসু

ইংলণ্ডের রাজা জনের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ এবং এ-ও বোধ হয় শুনেছ যে, সংসারে দু'টি মাত্র প্রাণীকেই তিনি ভালবাসতে পেরেছিলেন। এই দু'টি প্রাণীর একটি হ'লো তাঁর মেয়ে যোয়ান এবং

অপরটি হ'লো তাঁর প্রিয় গ্রেহাউণ্ড্ কুকুর গিলার্ট। এই দু'টি প্রাণী ছাড়া তিনি আর কারুকে ভালবাসতে পেরেছিলেন ব'লে শোনা যায় না। ওয়েল্স্-এর রাজকুমারের সঙ্গে যোয়ানের বিয়ে হয়। বিয়ের বিশেষ যৌতুক হিসেবে রাজা জন্ যোয়ানকে দিলেন তাঁর অতি প্রিয় গিলার্টকে। গিলার্টের নতুন প্রভু হলেন ওয়েল্স্-এর রাজকুমার।

ভালো শিকারী হিসেবে রাজকুমারের তখন খুব নাম ডাক। কাজেই গিলার্টের মতো বিশ্বাসী শিকারী কুকুরকে শিকারের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে তাঁর আনন্দের আর সীমা রইলো না। মনের মতো কাজ পেয়ে গিলার্টও খুব খুশি।

শিকার করতে যাবার আগে রাজকুমার প্রাসাদের ফটকে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতেন। আর অমনি গিলার্ট ভেতর থেকে ছুটে আসতো। প্রথম দিনেই গিলার্ট একটা হরিণকে এমন তাড়া করলে যে, বেচারা হরিণ পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দম ফুরিয়ে মরে গেল। রাজকুমারের আনন্দ দেখে কে!

একদিন শিকারে যাবার আগে রাজকুমার অনেকক্ষণ ধরেই বাঁশী বাজালেন কিন্তু গিলার্ট আর আসে না। অবশেষে রাজকুমার 'গিলার্ট' 'গিলার্ট' ব'লে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু তবুও গিলার্টের দেখা নেই। এ-দিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে রাজকুমার গিলার্টকে বাদ দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু শিকারে সেদিন তাঁর মন বসলো না। গিলার্টকে বাদ দিয়ে সেদিন শিকার জমলো না। হতাশ হ'য়ে রাজকুমার ফিরে এলেন।

বাড়ির ফটকের মধ্যে পা' দেওয়া মাত্রই ক্ষত-বিক্ষত শরীরে গিলার্ট এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে। তার মুখ দিয়ে অজস্রধারে রক্ত পড়ছে। তার চোখে কি রকম একটা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি। তাকে সেই অবস্থায় দেখে রাজকুমার অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই কোনো একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে।

তিনি হেঁকে উঠলেন, কুকুরটা কি পাগলা হ'য়ে কারুকে কামড়েছে না কি?

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মনে দুশ্চিন্তার একটা তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। তাঁর মনে পড়লো যেদিন শিকারে যাওয়া হয় না, গিলার্ট সেদিন সারাক্ষণই তাঁর এক বছরের শিশুপুত্রটির সঙ্গে খেলা ক'রে। তাই যাবার সময় যে ঘরে শিশুটিকে ঘুমোতে দেখে গিয়েছিলেন সেই ঘরের দিকে ছুটলেন তিনি। গিলার্টও তাঁর পেছনে পেছনে ছুটলো। শিশুর ঘর পর্যন্ত রক্তের চিহ্ন দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন রাজকুমার। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর তলোয়ার টেনে বার করলেন।

ঘরে গিয়ে রাজকুমার যা দেখলেন তা'তে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। শিশুর দোলনাটা ওল্টানো রয়েছে এবং দোলনার নিচেই রক্তের নদী বইছে। শিশুটির চিহ্ন কোথাও নেই।

রাগে অন্ধ হ'য়ে রাজকুমার আর স্থির থাকতে পারলেন না। তলোয়ারটাকে সোজা গিলার্টের বুকের ওপর বসিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন: শয়তান তোকে এতোদিন ছেলের মতো মানুষ করলুম, আর তুই কি না শেষ পর্যন্ত আমার ছেলেকেই খেলি!

একটা তীব্র আর্তনাদ ক'রে গিলার্ট লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তার নির্বোধ চোখ দু'টো তখনও বিশ্বাসী বন্ধুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে প্রভুর মুখের দিকে। তার অন্তিম চীৎকারে যেন সে ব'লে গেলো, আমি আপনার স্নেহযত্নের অমর্যাদা করি নি কখনো; মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বিশ্বাসী ভৃত্যের মতোই কাজ করেছি।

গিলার্টের আর্ত চীৎকারের জবাব দিল একটি শিশুর করুণ কান্না। শিশুটি একবার কঁকিয়ে উঠলো।

দোলনাটা উল্টে দিতেই চমকে উঠলেন রাজকুমার। একটা সদ্যমৃত নেকড়ের বুকে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে তাঁর ছেলে। এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন কেন গিলার্ট সকালে তাঁর ডাকে সাড়া দেয় নি। নেকড়ের গন্ধ পেয়ে সারাদিন সে ঘুরেছে তার সন্ধানে। তারপর শিশুর ঘরে তার সন্ধান পেয়ে তাকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হয় নি।

দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়লেন রাজকুমার। মৃত গিলার্টের দেহের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে তিনি কেঁদে উঠলেন: আর তোকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না গিলার্ট! কিন্তু তোকে মরতেও দেব না আমি। তোকে আমি অমর ক'রে রাখবো!

তারপর সেই পাহাড়ের ওপর, যেখানে গিলার্ট তার প্রথমদিনের শিকার-যাত্রায় শুধু তাড়া দিয়েই একটা হরিণকে মেরে ফেলেছিল, তাকে কবর দিলেন রাজকুমার।

তারপর কতো শত বছর কেটে গেছে। যতো পথিক গেছে সেই পথে, তারা সবাই এক একটা পাথর রেখে গেছে সেই বিশ্বাসী কুকুরের কবরের ওপর। এই ভাবে সেখানে জমে উঠেছে একটা পাথরের স্তূপ। সেই পাথরের স্তূপ স্মৃতিস্তম্ভের মর্যাদায় আজো দাঁড়িয়ে আছে। আজও কোনো পথিক সেই পথে যাবার সময় থমকে দাঁড়ায় গিলার্টের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে। কতোবছর আগের পুরানো একটা ঘটনা নতুন ক'রে মনে পড়ে তাদের।

সেই পাথরের স্তূপটাকে লোকে আজও বলে বেথ্ গিলার্ট—গিলার্টের কবর। •

• ইংরাজীর অনুসরণে

কুরুক্ষেত্রের কথা

সাধনা কর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বলতে বলতে কৃষ্ণ বলে ফেললেন আত্ম-রহস্য,—পার্থ, আমিই সেই পরম-কারণ পরমেশ্বর—অজর অমর অক্ষর। সকল অণু-পরমাণুতে আমারই শক্তি, জলে স্থলে আমারই প্রকাশ। আমি সচ্চিদানন্দ। ত্রিলোকে আমার চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, নেই কোনো কর্তব্য। তবে কেন আছি বন্ধনে বন্ধনে জড়িয়ে? বার বার কেন জন্ম নিয়ে আসি নেমে পৃথিবীতে?

শোন তবে,—

ঘটে যবে ধর্মগ্লানি ;—
বেড়ে ওঠে হানাহানি,
অন্যায়েতে ছায় চতুর্দিক,
রক্ষা হেতু সজ্জনের
নেমে আসি হেথা ফের
এই আমি দেবের প্রতীক।
দুর্জনের অত্যাচার
দূর করি বারবার,
যুগে যুগে নাশি দুঃখ ক্লেশ,
মুক্তি দেই ভক্তজনে,
থাকি আমি মনে মনে;
—আমিই সে জেনো পরমেশ।

কৃষ্ণের কথা শুনতে শুনতে অর্জুনের মনে জেগে উঠল শত শত প্রশ্ন, অজানাকে জানবার বাসনা হলো প্রবল। বলে উঠলেন—হে সখা, তুমি বলবে সবই পরমেশ্বরের—ভালো মন্দ সৎ অসৎ উচ্চ নীচ, তাঁরই সৃষ্টি, একটি কীটনাশও তাঁর কাছে সমগ্র বিশ্বনাশের তুল্য। কেন তবে তুমি সজ্জনকে রক্ষা করবে, আর দুর্জনকে করবে ধ্বংস। এ তোমার কি রকম রীতি?

কৃষ্ণ বললেন—ঠিক কথা বলেছ সখা, প্রাজ্ঞ জনোচিত প্রশ্ন। এর উত্তর কি জানো? দুষ্টকেও আমি বিনাশ করি না, কোনো কিছুরই তো বিনাশ নেই। দুষ্টকে আমি দমন করি মাত্র। এক দেহ থেকে দেহান্তরে নেওয়া—এক আত্মা থেকে সুন্দরতরো আত্মায় রূপান্তর।

অর্জুন, মানুষের কর্মই আসল। কর্ম করে বাসনা ক্ষয় করতে হয়। ফল সব আমাতে অর্পিত হলে সবাই মুক্ত হতে পারে। আমাতে মন দাও, বুদ্ধি দাও, কর্ম দাও, দাও জ্ঞান ভক্তি—আমাকেই তবে পাবে। ভক্তের প্রেমে ভগবান বাঁধা। ভক্ত বা অভক্ত দু'জনেই ভগবানের সন্তান। ভক্ত জানতে পারে ঈশ্বরের প্রকৃত মহিমা, আর ভক্তিহীন যে, সে থাকে বঞ্চিত।

শুনতে-শুনতে অর্জুন দৈববলে হলেন বলীয়ান। বলতে লাগলেন—হে গোবিন্দ, হৃষীকেশ, জীবন-মরণ-বিরচন, তোমার কথায় দূর হল আমার মোহ। বুঝলাম—কোনো কাজেই আমার কিছুমাত্র হাত নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, আত্মীয়বধ কিছুই আমাকে স্পর্শ করবে না। আমি জানবো—তুমিই কর্তা, আমি কর্মী। হে কৃষ্ণ, তোমাকে সখারূপেই জেনে এসেছি। ভাবতেই পারি নে; কেমন তোমার সেইরূপ, যে-রূপে তুমি জগৎকর্তা, ত্রিলোক-ত্রাতা। তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি নে, তবু এ যে কল্পনার অতীত। একবার দেখাও তোমার সে-রূপ, সেই ঐশ্বর্য।

সখার আকৃতিতে তুষ্ট হলেন ভগবান। বললেন—পার্থ, ভগবানে বিশ্বাস যার অটুট, তাঁর চরণে যার একান্ত ভক্তি, সেই তোমাকেই দেখাব এবার আমার দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য।

কৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করলেন। বৃহৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের সবই মাত্র জুড়ে আছে কৃষ্ণের উদরের ক্ষুদ্র এক অংশ। তাঁর যে জ্যোতি, যে শক্তি,—হাজার-হাজার সূর্যের তেজ তার কাছে ম্লান। শত শত মুখ, শত-সহস্র চোখ, কোটি কোটি দন্তপাঁতি। সে দাঁতে লেগে আছে অগণিত হাড় আর মাংস; রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে অবিরল ধারায়। সে আকৃতি দেখে দেব-দানব ভীত সন্ত্রস্ত, জোড়হাতে স্তবস্তুতি ক'রে চলেছে।

কিন্তু সে মূর্তি কি শুধুই ভয়াল, শুধুই পীড়াদায়ক। সে-রূপ যে ভীষণে-মধুরে অপরূপ শত-সহস্র দিব্যবস্ত্র, দিব্যমাল্যাভরণ শোভিত,—পরম মনোরম বিভা। সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য তার সামান্য প্রকাশ মাত্র।

বিস্ময়ে পুলকে ধনঞ্জয় দেখতে লাগলেন। পার্থিব দৃষ্টিতে নয়, সে-রূপ দেখলেন নির্মল প্রশান্ত দিব্যদৃষ্টিতে। রোমাঞ্চ কলেবর হয়ে বারবার প্রণাম করে বললেন—

হে ভগবান, এ কি রূপ তোমার। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে বিরাজ করছ তুমি? যে দিকে চোখ যায় তোমাকেই দেখছি যে। আদি নেই, অন্ত নেই, কেবল তুমি। ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শল্য সকলেই প্রবেশ করেছে তোমার করালগ্রাসে। বিপুল জলরাশি নিয়ে যেমন নদী ধেয়ে চলে সমুদ্রের দিকে কুরুগণও তেমনি অগণিত জনসমূহ নিয়ে ধেয়ে চলেছে তোমারই জলন্ত মুখ-গহ্বরে। সেই যেন চরম স্থান। তোমার রুদ্র তেজে বিশ্ব-জগৎ কম্পিত। হে কৃষ্ণ, কে তুমি? আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি নে।

দেবতা, ঋষি এবং পরম ভক্তগণই এ অনন্ত রহস্য বুঝতে অপারগ, আমি তো কোন্ ছার। সখা, আমাকে বুঝিয়ে দাও তোমার রহস্য। তুমি না বুঝিয়ে দিলে এ বিশ্বের একটি প্রাণীরও সাধ্য নেই তোমাকে বোঝে।

[ক্রমশ
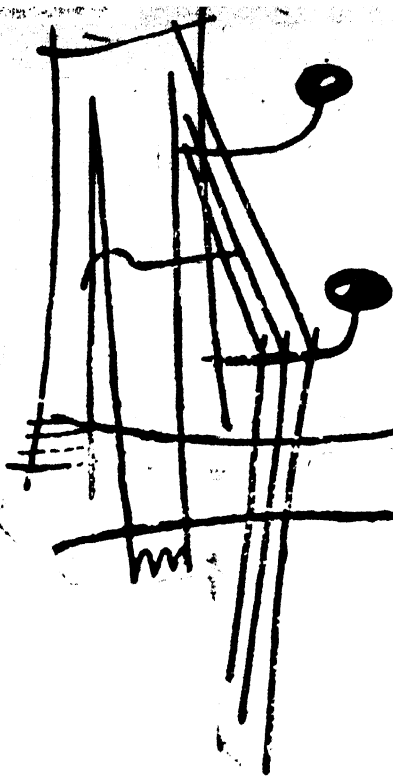
সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

যাঁরা গান করেন, যন্ত্র বাজান বা গান-বাজনা শোনেন তাঁরা সবাই তাল শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। অতি পরিচিত বলেই এর শাস্ত্র, বিজ্ঞান বা তত্ত্ব নিয়ে কেউ বিশেষ আলোচনা করেন না, যেমন গাছ থেকে ফল পড়া অতি সাধারণ ব্যাপার বলে নিউটনের আগে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। সংগীতের তাল নিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকার ও মনীষীরা অনেক কথা বলে গেছেন; এখনও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন কথা বলে থাকেন। সে সকল কথাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

নিয়মিতভাবে কোন কিছুর বারবার আবর্তনে সৃষ্টি হয় ছন্দের। ২৪ ঘণ্টা পর পর সূর্যের উদয়, ৩৬৫ দিন পর পর নববর্ষের আগমন—এতেও ছন্দ রয়েছে। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

'ছন্দে উঠিছে তারকা, ছন্দে রবি শশী উদিছে।'

নদীর তীর ঘেঁষে নারিকেল বৃক্ষের সারি, পর্বতমালায় শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, রেললাইনে সমব্যবধানে স্থাপিত স্লীপারসমূহ এই সকল দৃশ্যের মধ্যেও রয়েছে ছন্দ। কোন বক্তৃতা বা প্রবন্ধে কোন একটি ব্যাপার বা বিষয়ের একটু পর পর উল্লেখ হলে তাও এক রকমের ছন্দ হয়ে ওঠে।

দ্রঃ—'Rhythm means periodicity or the persistent recurrence of something, whether it is a pattern in wall paper, an ornament in architecture, a peak in a chain of mountain peaks, an idea in an essay or a section in a musical composition'—

Understanding Music by S. Newman.

উল্লিখিত সব রকমের ছন্দ মানুষের সাধারণ উপলব্ধির মধ্যে আসে না। কিন্তু মানুষের হাঁটায়, মাঝির দাঁড় টানায়, ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে, সৈন্যদের মার্চ করায় যে ছন্দ রয়েছে তা সহজেই আমাদের উপলব্ধিতে আসে। এইভাবে আমরা প্রকৃতির সর্বত্র এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজের মধ্যে দেখতে পাই ছন্দ। ছন্দ আছে বলেই সর্বত্র শৃঙ্খলা

রয়েছে, নইলে জগৎ জুড়ে বিরাজ করতো এক বিরাট্ বিশৃঙ্খলা।

দ্রঃ—উৎপত্ত্যাদিত্রয়ং লোকে যতস্তালেন জায়তে।
কীটকাদি-পশূনাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ॥
যানি কানি চ কর্মাণি লোকে তালাশ্রিতানি চ॥
আদিত্যাদি গ্রহাণাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ॥
—রাগকল্পদ্রুমঃ

(এখানে তাল ছন্দ শুধু) শৃঙ্খলাই রাখে না, মনে আনন্দও দিয়ে থাকে। সংস্কৃত ছন্দ্ ধাতুর অর্থ আনন্দ দেওয়া, তার সঙ্গে অসুন্ প্রত্যয় যোগে ছন্দস্ (ছন্দঃ) শব্দ গঠিত হয়েছে, কাজেই ছন্দস্ শব্দের যৌগিক অর্থ আনন্দদায়ক।

ছন্দের ব্যাপক অর্থ ছেড়ে দিয়ে কবিতার মধ্যে অক্ষর, যতি, প্রস্বন ইত্যাদির যে নিয়মিত ও সুসংবদ্ধ আবৃত্তি সাধারণ ভাবে তাকেই বলে ছন্দ। আর কবিতায় যা ছন্দ সংগীতে তারই নাম তাল।

দ্রঃ—'Tal is to Music. What metre is to poetry'
—Prof. Sambamurti.

ইংরেজীতে কবিতা ও সংগীত উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দকে বলা হয়েছে Rhythm (রীদ্‌ম্), তবে বিশেষ বিশেষ তালকে বলা হয়েছে Time measure বা musical measure.

তালের সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে তা নিয়ে সংগীত-শাস্ত্রকার আর বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজ নিজ বিভিন্ন মত প্রকাশ করতে গিয়ে প্রায় একই কথা বলেছেন—তালের সৃষ্টি নৃত্য থেকে। শৈবদের মত বা সাধারণ চলতি মত হলো যে ত্রিপুরাসুর বধের পর দেবতাদের উৎসবে মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করেন, আর পার্বতী করেন লাস্য নৃত্য। এই তাণ্ডবের 'তা' আর লাস্য থেকে 'ল' নিয়ে তাল শব্দের গঠন হয়েছে, আর তালের সৃষ্টিও হয়েছে সেই সঙ্গে।

তাণ্ডবস্তান্তবর্ণেন লকারো লাস্যশব্দভাক্।
যদা সংগচ্ছতে লোকে তদা তালঃ প্রকীর্তিতঃ॥

বৈষ্ণবদের মত হল্ যে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের নৃত্য থেকে বিভিন্ন তালের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্রঃ—'তালের প্রভেদ যত তার নাই অন্ত।
শ্রীরাসমণ্ডলে সবে হৈলা মূর্তিমন্ত॥'
'ললিতাদি যূথেশ্বরী সখী রাধিকার
পৃথক্ পৃথক্ তাল করয়ে প্রচার॥'
—ভক্তিরত্নাকর।

সম্বমূর্তি বলেছেন—আদিম মানব যখন আনন্দে মেতে নৃত্য করেছিল তখনই সৃষ্টি হয়েছিল ছন্দের অর্থাৎ তালের ('When the primitive man danced in ecstasy rhythm came into existence'). অর্থাৎ সবাই একই কথা বলেছেন—তালের সৃষ্টি নৃত্য থেকে।

মিঃ পপ্‌লি কিন্তু ভারতীয় তাল সম্বন্ধে বলেছেন যে, ভারতে কবিতার ছন্দ থেকে তাল এসেছে ('Musical time in India, more obviously than elsewhere is a development from the prosody and metres of poetry') তাঁর এ মত উন্নত তালপদ্ধতি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। প্রাকৃত জনের সহজ স্বাভাবিক ভাষার বিশ্লেষণ করে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাকরণের। পরে আবার ব্যাকরণের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে উন্নত ও মার্জিত ভাষা। তাল সম্বন্ধেও সেই কথা—পপ্‌লির মত সেই ব্যাকরণ সৃষ্ট সম্বন্ধেই খাটে। গীতসূত্রসারে কৃষ্ণধনবাবু সংগীতের ছন্দ বা তাল সম্বন্ধে যা বলেছেন তার লক্ষ্যও উন্নত ধরণের, যাঁরা পুরাণ, শাস্ত্র ইত্যাদি মানেন তাঁরা বলতে চান যে, হরপার্বতীর নৃত্য বা শ্রীকৃষ্ণ ও সখীদের নৃত্য থেকে যে তালের সৃষ্টি হয়েছিল তা একেবারে চরম উন্নত ধরণের, দিনে দিনে তার ক্রমাবনতি হয়ে চলেছে। এঁরা হলেন প্রতীপবাদী এ দের কাছে আগের সবকিছুই ছিল ভাল ও উচ্চাঙ্গের। ক্রমে সবকিছুর অবনতি হয়ে চলেছে। আর একদল হলেন প্রগতিবাদী, তাঁদের মতে আদিম মানবের নৃত্য থেকে যে তালের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিশেষ সুসংবদ্ধ রূপ ছিল না। ক্রমে তাকে অবলম্বন করে তালের ব্যাকরণ হয়েছে, তা থেকে সৃষ্ট হয়েছে নানারূপ সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত তাল। সেই উন্নত তাল পদ্ধতির কথাই পপ্‌লি ও কৃষ্ণধনবাবু বলেছেন।

'সংগীতের কালকে একই ভাবে তুল্য বিভাগ করিলে সংগীত একঘেয়ে হইয়া পড়ে। অতএব কালপরিমাণের অভিনবতা বিচিত্রতার জন্য ছন্দের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক ছন্দে কালেরও তুল্যতা রক্ষা হয় এবং সুরসকল নানাপ্রকার নিয়মানুসারে লঘুগুরু হইয়া সংগীতের কাল-ক্রিয়ার বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়।'

এই উক্তি তালের মধ্যে ছন্দোবৈচিত্র্য অথবা সংগীতে বিভিন্ন রকমের তাল প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ নানাভাবে তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি বা নির্বচন (etymology) দেখিয়েছেন। যথা—(১) তাণ্ডব শব্দ থেকে 'তা' ও লাস্য শব্দ থেকে 'ল' নিয়ে তাল শব্দের গঠন, একথা আগেই বলা হয়েছে।
(২) সংগীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—
'তালস্তল প্রতিষ্ঠায়াম্ ইতি ধাতোর্ঘঞি স্মৃতঃ।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্॥'

যেহেতু গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালের উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই প্রতিষ্ঠার্থক 'তল্' ধাতুর পর ঘঞ্ (অ) প্রত্যয় যোগ করে তাল শব্দ গঠিত হয়েছে। (৩) আবার কেউ বলেছেন যে তল অর্থাৎ

করতল থেকে উৎপন্ন বলে নাম হয়েছে তাল, তল+অন্ বা ক্ব (……tala from karatala literally meaning bottom of hand—Indians keep time by clapping palms—O Goswami). নরহরি চক্রবর্তীর সংগীত সারসংগ্রহ ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তালার্ণব থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে যাতে উপরের তিনটি নির্বচনই রয়েছে। 'তকার ঈশো গিরিজা লকারস্তালস্ততঃ স্যাৎ শিবশক্তিযোগাৎ। তলেস্তু ধাতোর্ঘঞি বেহ তাল স্তালোঽথবা স্যাৎ তলয়োস্তু যোগাৎ। এখানে শ্লোকের প্রথম লাইনটিকে (৪) নং নির্বচন রূপে ধরা যায়, কারণ অর্থটি ঠিক তাণ্ডবের 'তা' ও লাস্যের 'ল' নিয়ে 'তাল' শব্দ হয়েছে এরূপ নয়। ত-কার শিববাচক ও ল-কার পার্বতীবাচক, তাই নিয়ে তাল শব্দ হয়েছে। ('ত-কারে শঙ্করঃ প্রোক্তো, ল-কারে পার্বতী স্মৃতা। শিবশক্তি-সমাযোগাৎ তাল ইত্যভিধীয়তে')। (৫) নরহরি চক্রবর্তী রত্নমালা থেকে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। যার অর্থ ত-কার শরজন্মা বা কার্তিক, আ-কার বিষ্ণু, ল-কার মারুত, এই কয়টি দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলে নাম হয়েছে তাল।

ত-কারঃ শরজন্মা স্যাদ্ আকারো বিষ্ণুরুচ্যতে।
লকারো মারুতঃ প্রোক্তস্তালে দেবা বসন্ত্যমী ॥

সংগীতে তালের প্রয়োজনীয়তার কথা পণ্ডিতগণ নানাভাবে বলেছেন। তালের কাজ সংগীতে সময়ের সমতা বিধান, শ্রোতার মনোরঞ্জন আর সংগীতকে সুগঠিত রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। ভক্তি রত্নাকরে নরহরি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

'সময়স্তু সমত্বেন রঞ্জকত্বেন চাধিকম্।
তালয়ত্যেব সংগীতং যৎ তৎ তালো নিগদ্যতে ॥'

আরও বলেছেন—

'গীতে তাল যুক্ত তাল বিনা শুদ্ধি নয়।
যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা ঐছে হয়।'
'বিনা তালেন গীতা দের্গতিস্তাদৃক জায়তে।
কর্ণধারং বিনা নাব ইবাতস্তান্ প্রচক্ষতে ॥'
—তালার্ণব।

তাল ছাড়া গান কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত। সংগীতদর্পণকার সংগীতকে মত্ত গজ আর তালকে তার অঙ্কুশ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী বলেছেন। দ্রঃ—

তৌর্যত্রিকং চ মত্তেভ স্তালং তত্রাঙ্কুশং বিদুঃ।
ন্যূনাধিক প্রমাণস্ত প্রমাণং ক্রিয়তে যতঃ ॥

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সরস্বতী বীণা

প্রভাকর সেন

ভারতে যতগুলি আদি সঙ্গীত যন্ত্রের ব্যবহার আছে তার মধ্যে সরস্বতী বীণা একটি।

আমরা জানি যে বহুকাল আগে ভারতবর্ষে দেব-দেবীদের যুগ ছিল। তাঁরা নানারকম সব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন, তার কিছু বর্ণনা শাস্ত্র প্রভৃতিতে আছে। এখন সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বলেন যে, সে যুগে এক এক দেবতা মানুষের হিতার্থে এক এক বিদ্যা দান করেছিলেন। বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী মানুষ বা মানব জাতিকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন পরম বিদ্যা হিসাবে। এই সূত্রে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি সরস্বতী বীণাও মর্ত্যলোকে প্রচলন করেন।

আমরা দেবী সরস্বতীর হাতে যে বীণা দেখতে পাই এবং যার জন্যে তাঁকে বীণাপাণি বলি তা হল তাঁর সৃষ্ট—সরস্বতী বীণা।

ভারতের দক্ষিণ অংশেই এর সমধিক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারত কারুকার্যে সুদক্ষ; বীণাতেও তাই তার প্রকাশ দেখি। দক্ষিণীরা প্রায় সব রকম তন্ত্র যন্ত্রেই অল্প বিস্তর কারুশিল্পের ব্যবহার করে থাকেন।

সরস্বতী বীণার অবয়ব অনেকটা সেতারের ধরণের। এর নিম্ন অংশটি বৃহৎ এবং প্রশস্ত, উপর অংশটি সিংহের মুখমণ্ডলের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত। এই জন্যে কেউ কেউ একে 'সিংহ-বীণা' (Lion Veena) বলে থাকেন; অবশ্য, তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপরের দণ্ডে একটি লাউ (লাউয়ের খোল—gourd) থাকে। এই খোলটি সত্যিই নয়নাভিরাম। এর উপর নানপ্রকার কারুকার্য করা হয়। অনেকে আবার লাউয়ের খোলাটির উপরে সোনার পাত লাগান। এই পাতের উপরে সাধারণত আলঙ্কারিক কাজ করা হয়ে থাকে। আর, নীচের লাউটি বা খোলটিতে বিশেষত গজদন্তের কারুকার্য করা হয়। আমাদের রুদ্রবীণা, সেতার, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রে যেমন সাতটি কান থাকে এই বীণাতেও সেই রকম সাতটি কান থাকে। তারগুলি সাধারণত পেতল এবং স্টীলের হয়। এ ছাড়া এতে প্রায় বাইশটি পর্দা (fret) থাকে। রাগ অনুসারে পর্দাগুলি সরিয়ে সুর বাঁধা হয় (সুরবাহার, সেতার, এস্রাজ ইত্যাদিতে যেমন হয়ে থাকে)।

সরস্বতী বীণার সঙ্গে মৃদঙ্গ সঙ্গত করা হয়। বাজাবার জন্যে ডান হাতের চারটি অঙ্গুলি (তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা) এবং বাম হাতের তিনটি অঙ্গুলির (তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা) প্রয়োজন হয়। ডান হাতের চারটি অঙ্গুলিতেই স্টীলের ত্রিকোণ পদার্থ বা 'মিজ্রাব' পরা হয়।

আসনপীঁড়ি হয়ে বসে উপরের লাউটি বাম উরুর উপর রেখে এবং নিম্ন অংশটি ডান উরুর কাছে মাটিতে কাৎ করে রেখে ধরা হল এই যন্ত্র বাদনের এবং ধারণের একটি অপরিহার্য ভঙ্গী (posture)।

বলা বাহুল্য সরস্বতী বীণা বাদনের একটি বিশেষ রীতি আছে যা উত্তর ভারতের বীণা বাদনের থেকে পৃথক। দক্ষিণ ভারতীয়রা মধ্যমগ্রামে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আর উত্তর ভারতে সে জায়গায় ষড়জ গ্রাম প্রচলিত আছে। দাক্ষিণবাসীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বীণা বাজিয়ে থাকেন।

আর্যাবর্তের বীণ্‌কারেরা বলেন যে, তাঁরা যে বীণা বাজান তাইই সরস্বতী বীণা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হল রুদ্রবীণা।

বাস্তবিকই দক্ষিণ ভারতের বীণাই আদি সরস্বতী বীণা এবং উত্তর ভারতের বীণা হল আদি রুদ্রবীণা।

আমার কথা (১০৫)

শিল্পী—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতবছর বয়স থেকে সঙ্গীত শিক্ষায় হাতেখড়ি, প্রেরণা অবশ্যই গৃহের এবং বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে সঙ্গীত পরিবেশন করে আসছি।

কথা হচ্ছিল সঙ্গীত-শিল্পী রবীন্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গীত সাধনার কথা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।
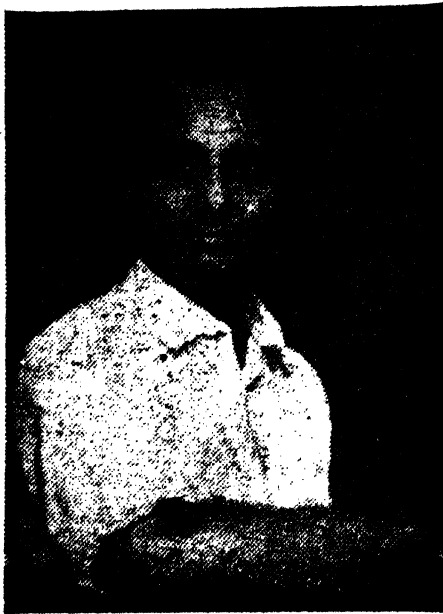
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতার নাম ৺রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ হুগলী জেলার গোপীনাথপুর। জন্ম ১৯৩২ সনে কলকাতায়। মানুষও কলকাতায়। গান শিখেছেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের কাছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, অবশ্য ছোটবেলা থেকেই রেডিওর 'গল্পদাদুর আসরে' (তখন দাদুমণি ৺ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) 'মাষ্টার রবীন' নামে নিয়মিত ভাবে প্রতিপক্ষে গান গেয়ে এসেছেন। বৃহত্তর সঙ্গীতের আসরে প্রথম প্রবেশ করেন পাথুরিয়াঘাটার মন্মথবাবুর নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়। এখানে পরপর তিনবছর সাতটি বিষয়ে (খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, তারানা, পুরাতনী বাংলা গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ভজন) প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন, মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন, বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদ এবং এলাহাবাদের নিখিলভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' থেকে সঙ্গীত বিশারদ উপাধি পান ১৯৫৩ সনে। এ সময় তিনি শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

লঘু সঙ্গীতের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ। তার উজ্জ্বল নিদর্শন হিজ মাষ্টার্স ভয়েস থেকে প্রকাশিত তাঁর সাম্প্রতিক আধুনিক গানের রেকর্ড 'নীড় ভেঙে যায়' ও 'বসে আছি আমি একা।' শ্রীসত্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আধুনিক গানের পাঠ নেন। শ্রীপঙ্কজ মল্লিকের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। হিজ মাষ্টার্স ভয়েস থেকে তাঁর কয়েকটি লোকগীতির রেকর্ডও আছে। পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষা নেন এই সময়। চলচ্চিত্রে সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন কর্মফল, মাণিকজোড়, অভাগীর স্বর্গ, রাত একটা, শুভযাত্রা, সংঘাত প্রভৃতি একাধিক চিত্রে। নেপথ্যে কণ্ঠ দান করেছেন কয়েকটি চিত্রে। তার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, সাধক রামপ্রসাদ, টাকা আনা পাই প্রভৃতি অন্যতম।

১৯৫০ সন থেকে নিয়মিতভাবে রেডিওর লঘু সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গান করে আসছেন। 'রম্যগীতি' অনুষ্ঠানে তার কয়েকটি রেকর্ডও আছে।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ শিল্পী। প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পটভূমিকায় লঘু সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারলেই লঘু সঙ্গীতের সার্থকতা, এ কথায় তিনি বিশ্বাসী। কথা ও সুরের শুভ সমন্বয়েই আধুনিক গান। নামে লঘু হলেও এর ভাবগম্ভীরতা সুদূর-প্রসারী বললেন শিল্পী।

নীলকণ্ঠ

একত্রিশ

'So this is Benares!....So this is India's holiest city!..But Benares! You may be the hub of Hindu culture, yet please learn something from the infidel whites and temper your holiness with a little hygiene!'

—A SEARCH IN SECRET INDIA

[*Paul Brunton*]

কাশীতে এসেছিলেন বিদেশী পর্যটক পল ব্রান্টন। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে ভারতবর্ষে যাঁরা এসেছেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কুৎসা গাইতে অথবা এখনও যাঁরা আসছেন রাজনৈতিক ভবিষ্যবাণী করে সস্তায় হাততালি কুড়োতে তাঁদের একজন নন ব্রান্টন। ব্রান্টন এসেছিলেন সেই ভারতবর্ষকে দেখতে যে ভারতবর্ষ মানুষের মহত্তম চিন্তার সাগরতীরে শতসহস্র বৎসর ধরে একটি কথাই বলছে। বলছে যে :

'We seek the condition of sacred trance, for in that condition man obtains perfect proof that he is a soul. Then it is that he frees his mind from his sorroundings; objects fade away and the outside world seems to disappear. He discovers the soul as a living, real being within himself; its bliss, peace and power overwhelm him. All he needs is a single experience of this kind to obtain the proof that there is a divine and undying life in himself; never again can he forget it.'

ভারতবর্ষের, যে ভারতবর্ষ চিরকালের, জীবন ও বাণীই হচ্ছে এই : মৃত্যু বলে কিছু নেই। মানুষ মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুর তমসার ওপারে আছেন মহত্তম জ্যোতির্ময় এক যাঁর শ্রীপদে পৌঁছনই মানুষের পথ-চলার একমাত্র লক্ষ্য। ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা। কারণ ভালোবাসাই ঈশ্বরের সবচেয়ে ভালোবাসা। মণিকে মণি বলে না মানায়, না-জানাকে জানায়, অর্থ, সামর্থ্য, খ্যাতির পরাহত হতে হতে একদিন সে নিরাময় হবার জন্যে নিরাহত হবে,—এই হচ্ছে ভারতবর্ষের মন্ত্র, সাধনা ও সংকল্প।

খোলা চোখ নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন পল ব্রান্টন। ভারতের অপরিচ্ছন্নতা চোখে পড়েছে তাঁর যেমন, সেই পাঁকে শতদল ফুটে আছে এও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কে মোহান্ত ভিখারী, কে যাদুকর, আর কে পেয়েছে তাঁর সন্ধান যাঁর খবর পেলে মণিকে মণি বলে মানে না আর মন সেই অরুণাচলের ঋষি মহর্ষি রমণ,—সকলেরই কাছে গেছেন তিনি। বুঝেছেন বলে দম্ভ করেন নি। ভারতবর্ষের বাণী তাঁর বুকে বেজেছে।—**A search in secret India,**—প্রাণের আহ্বানই পল ব্রান্টনকে টেনে এনেছে এই সময়ের চেয়েও সনাতন ভারতবর্ষে। এত লক্ষ কোটি বিদেশীর মধ্যে একটি মানুষের লক্ষ্য কেন নিবদ্ধ হয় যা পাওয়া যায় না তাই পাবার জন্যে, এবং উত্তর তিনি আর কোথাও পান নি ভারতবর্ষে ছাড়া।

দক্ষিণ ভারতীয় এক যোগী ব্রান্টনকে বলেছেন :

'Last night my master appeared to me. He spoke to me about yourself. He said: 'your friend, the Sahib, is eager for knowledge. In his last birth he was among us. He followed Yoga practices, but they were not of our school. To-day he has come again to Hindusthan, but in a white skin. What he knew then has now been forgotten; yet he can forget for a while only. Until a master bestows his grace upon him he cannot become aware of this former knowledge. The master's touch is needed to help him recover that knowledge in this body. Tell him that soon he shall meet a master. Thereafter, light will come to him of its own accord. This is certain. Bid him cease his anxiety. Our land shall not be left by him until this happens. It is the writing of fate that he may not leave us with empty hands'.

এই পল ব্রান্টন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁর রহস্যের তল্লাস নিতে। অনিবার্যভাবেই তাঁকে যেতে হয়েছে কাশীতে। কারণ কাশীকে না জানলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না। আর কাশীকে জানতে হলে যেতে হবে সেই সব যোগীদের কাছে যাঁরা অনাদিকাল ধরে জেগে আছেন; রাত্রির তপস্যায় যাঁরা নিরত। সমস্ত মানুষের জন্যে সেই 'দিন-টিক' এগিয়ে আনতে যেদিন সমস্ত মানুষ তার সন্ধান পাবে যার খবর পেলে মণিকে, কোটিকে গোটিক, মণি বলে মানে না; ফেলে দেয় জলে।

মণিকে জলে ফেলে দিয়ে, চোখের জলে নীলমণির পায়ে মাথার মতো কেঁদে পড়াই শিবের পায় সতীর মতো জগতাই মুক্তির উপায়। যিনি শব তিনিই শিব; তিনিই কেশব। এই আকাশ—

র জন্যে নয়, মুক্তির জন্যে কেঁদেছে। কে শব কে শিব এ নিজ তার ছন্দ কাটে নি। তাই বৃন্দাবন আর কাশীতে, পীতাম্বরে দিগম্বরে কোনও পার্থক্য নেই। সার্চ অথবা রিসার্চ করে রিয়াম ইশ্বর অন্তর্ভেদ অসম্ভব। অন্তর্যামীর অহৈতুকী কৃপা এক পা উপায় নেই এগুবার।

পল ব্রান্টনও একদিন সেই কৃপা পাবেন যে তার প্রমাণই এই ইন মিস্টিরিয়াস ইণ্ডিয়া। সব সার্চ, সব রিসার্চ শেষ করে হাল ছেড়ে দেবেন যখন তখনই দেখবেন, পরশপাথরের স্পর্শে সব বাসনা হয়ে গেছে কখন টেরই পান নি। বাসনা মরে শবাসনা গা পর্যন্ত একাশিবার কাশী গেলেও কিছু হবার নয়। কারুরই

শী তীর্থক্ষেত্র নয় কেবল। কাশী ভারতের কুরুক্ষেত্র। ঃ 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—ই ঘোষণা, শঙ্খের মুখে অসাধারণ ত, বারবার রক্ষিত হবে। সমস্ত মানুষ যে এক পৃথিবীর স্বপ্ন তা শক্তিতে সম্ভব হবে না। সে অসম্ভব সম্ভব হবে ক্তিতে। কাশীর শক্তি সেই নিরাসক্তি।

শুদ্ধানন্দের সংগে কাশীতে পল ব্রান্টনের দেখা হয়। পল তাঁকে ম্যাজিসিয়ান বলেছেন।

শুদ্ধানন্দের বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে। তাঁর বড় বড় চোখ ব্রান্টনের চোখ এড়ায় নি। সাহেবকে নিরীক্ষণ করেন ।। সে দৃষ্টি কঠিন ; নিরুত্তাপ। সাহেব সে দৃষ্টিকে অণুবীক্ষণের তুলনা করে বলেছেন, বুকের ভেতর তাঁর ধ্বক করে উঠেছে। শক্তি সমস্ত ঘরে ধাক্কা দিচ্ছে। পল ব্রান্টন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ন। তার আগেই আগন্তুক তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। এসেছেন প্রাচ্যজ্ঞানের মহিমা প্রত্যক্ষ করতে। অবগাহন ভারতীয় জীবনদর্শনের গংগাযমুনায়। ঘট ভরে নিয়ে ফিরে এসেছেন মহামানবের সাগরতীরে।

শুদ্ধানন্দ সাহেবকে গ্রাহ্য করবেন সাধুর শিষ্যরা তা ভাবতে নি। তাঁদেরই একজনকে বিশুদ্ধানন্দ বললেন সাহেবকে বলবার র, গোপীনাথ কবিরাজকে ভাষ্যকার হিসেবে সংগে না আনলে কিছু বলতে নারাজ।

রের দিন বিকেল চারটের সময় ঠিক হলো সাক্ষাতের। সংগে ভাষ্যকারের থাকা চাই। সাহেব রাজি করালেন ডক্টর গোপীনাথ কে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন গোপীনাথ। বিশুদ্ধানন্দের ও পরম সার্থক শিষ্য।

শুদ্ধানন্দের কাছে সকবিরাজ ব্রান্টন পৌঁছলো নির্দিষ্ট সময়ে, নন্দ তাঁকে একটু কাছে আসতে বললেন। সাহেব মাটিতে বিশুদ্ধানন্দের আসনের কাছে। বিশুদ্ধানন্দ আরম্ভেই জিজ্ঞেস : অলৌকিক কিছু দেখতে চাও ?

দি দেখান তো অনুগৃহীত হব।—সাহেবের উত্তর।

মার রুমালখানা দাও—বিশুদ্ধানন্দের কথা সাহেবের ভাষায় করলেন ডক্টর গোপীনাথ ; এই রুমালে যে কোনও মনোমত সৃষ্টি করা হবে শুধু সূর্যরশ্মি ও একখানা লেন্স সম্বল করে। রুমাল হলে ভালো হয়।

রেশম রুমালই সাহেবের সংগে ছিলো। জেসমিনের গন্ধ সাহেব পছন্দ করলেন। রুমালখানা বাঁ হাতে নিয়ে তার ওপর লেন্সটাকে ধরলেন বিশুদ্ধানন্দ। দু' সেকেণ্ড ধরে সূর্যস্নাত হলো সাহেবের রুমাল। তারপর সাহেবের হাতে রুমাল ফিরে আসতে শুঁকে দেখলেন জেসমিনের গন্ধে রুমাল ভুরভুর করছে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আরও দু'বার পরীক্ষা করলেন ব্রান্টন। রোজ ও ভায়োলেট-এর গন্ধ বার করলেন সাহেবের ইচ্ছা মতো। তারপর নিজের ইচ্ছে মতো সৃষ্টি করলেন সাহেবের অজানা তিব্বতি ফুলের সুরভি।

সাহেবের মনে সন্দেহের দোলা লাগে। বিশুদ্ধানন্দের আচ্ছাদনের অন্তরালে কোন সুগন্ধি লুকানো আছে। কিন্তু সাহেব নিজেই সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। তা কি করে হবে ? কারণ তাহলে বহু সুগন্ধি থাকা চাই সংগে। সাহেব কোন্ গন্ধ শুঁকতে চাইবেন তা জানবেন কি করে সাধু ? লেন্স পরীক্ষা করে ব্রান্টন সন্দেহজনক কিছু পেলেন না। হিপ্নোটিজমের প্রভাবও ধোপে টিকলো না ; সাহেব ঘরে ফিরে গিয়ে যাদের হাতে রুমাল দিলেন তারাও ঐ গন্ধ পেল। তাহলে ?

বিশুদ্ধানন্দ আরও বিস্ময়কর একটি অভিজ্ঞতা উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে তার জন্যে অনেক তীব্র সূর্যালোক চাই, তাই অন্য একদিন দ্বিপ্রহরে আসতে বললেন সাহেবকে। সেদিন সূর্যের আলো নরম হয়ে এসেছে তখন। আর একদিন এলে, সম্পূর্ণ মৃতদেহে সাময়িক প্রাণ সঞ্চার করে তিনি দেখাতে পারেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন।

সাহেব কাজে কাজেই আবার গেলেন বিশুদ্ধানন্দের কাছে। সাধু বললেন, তিনি ছোটো ছোটো প্রাণীর ওপরেই এই সাময়িক পুনর্জীবন ক্রিয়া দেখাতে সমর্থ। সাধারণত পাখীর মৃতদেহেই কিছুক্ষণের জন্যে আবার প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। অতএব একটি চড়ুই পাখী মারা হলো। মারার পর একঘন্টা ফেলে রাখা হলো, যাতে পাখীর মৃত্যু সম্পর্কে সাহেবের মনে সন্দেহের অবকাশ না থাকে। চোখ-এর ঘূর্ণন থেমে গেল, শরীর শক্ত হয়ে গেলো।

তখন বিশুদ্ধানন্দ তাঁর সূর্যরশ্মিস্নাত আতস কাচকে ধরলেন পাখীটার একটা চোখের ওপর। বিশুদ্ধানন্দের পলকহীন দৃষ্টি পাখীর ওপর নিবদ্ধ। সূর্যরশ্মি বিদ্ধ করছে পাখীর চোখ। সাহেবের অজ্ঞাত ভাষায় কি মন্ত্র যেন পড়লেন সাধু। একটু বাদেই পাখীর শরীর ছটফট করতে লাগলো। পল ব্রান্টন বলেছেন যে মৃত্যু-আসন্ন একটি কুকুরকে তিনি এরকমই কঁকড়ে যেতে দেখেছেন। এরপর পাখীর পালকে প্রাণের সাড়া এলো। তারপর দেখা গেল পাখীটা তার দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠেছে। ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একসময়ে সেই পাখী উড়তে সুরু করলো। সাহেব শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি সজাগ করে অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা। স্বপ্ন, না, সত্য ? কিন্তু তখনো বিস্ময়ের বুঝি কিছু বাকী ছিলো। পাখীটা পরবর্তী পর্যায়—আধঘন্টা পর, সাহেবের পায়ের কাছে এসে পড়লো। পরীক্ষায় দেখা গেল পাখীটা আবার মরে পড়ে আছে।

পল ব্রান্টন, বিস্মিত বললে যাকে কিছুই বলা হয় না, তবু প্রশ্ন করলেন ; এই পাখীটার বেঁচে থাকার মেয়াদ কি আপনি আরও বাড়িয়ে দিতে পারতেন ?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিশুদ্ধানন্দ উত্তর দেন : এখন এইটুকুই তোমাকে

দেখাতে পারি,—এর বেশি পারি না। গোপীনাথ কবিরাজ ব্যাখ্যা করলেন বিশুদ্ধ বক্তব্য : ভবিষ্যতে আরও চমৎকারতর ফল বেরুবে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে। এও বললেন যে তাঁর গুরুর বিস্ময়কর কাজ আরও আছে কিন্তু তাঁকে অত্যধিক পীড়ন করা উচিত নয়। শূন্য থেকে ফল-মিষ্টি, মরা গোলাপের জরা দূর করে তাকে আবার তাজা করার ক্ষমতা বিশুদ্ধানন্দের আয়ত্তে। সাহেব নিরস্ত হলেন। রহস্যাতুর হয়ে উঠছে আবার সেই ঘর। হাওয়া হয়ে উঠেছে ভারি। পল ব্রান্টন তখনকার মতো নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বাইরে জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ শাসনে লৌকিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসছে দীপ্ত দিবাকরকে যথারীতি। বিশুদ্ধানন্দ সাহেবকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছেন। তিনি বাঙালী। তের বছর বয়সে তাঁকে বিষাক্ত কোনও জানোয়ার কামড়ায়। মৃত্যু সুনিশ্চিত জ্ঞানে তাঁকে গংগায় স্নান করাবার জন্যে নিয়ে গেলে একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটে। যতবার তাঁর দেহ জলে নামানো হয় ততবার জল নেমে যায়। দেহ ওঠাবার সংগে সংগে জল উঠে আসে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। গংগা বিশুদ্ধানন্দের অমর দেহকে মরদেহ বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

তীরে বসেছিলেন এক যোগী। তিনি প্রত্যক্ষ করেন সমস্ত ঘটনা। বলেন যে তের বছরের বালক একদিন সার্থক যোগী হবে। একটি শিকড় বালের মুখে ঘসে দিয়ে চলে যান তিনি। সাতদিন বাদে বালকের বাপ-মাকে বলেন যে বিষ সম্পূর্ণ চলে গেছে। এই সাতদিনের মধ্যে তের বছরের ওই ছেলের মধ্যে জীবনযোগীর লক্ষণ দেখা দেয়। সংসার ত্যাগ করে সার খুঁজতে বেরিয়ে যান তিনি এর কয়েক বছর পর।

তিব্বতের পথ ধরেন বালক। একজন যোগীর কাছে যোগশিক্ষা না করলে যোগী হওয়া যায় না। ভারতবর্ষের বিশ্বাস হচ্ছে এই। দক্ষিণ তিব্বতে দেখা পান তাঁর গুরুর যাঁর বয়স বারোশো বছর। তাঁর কাছে মানব দেহের ওপর নিঃসংশয় কর্তৃত্বের যোগশিক্ষা করেন তিনি। পল ব্রান্টন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে ওই যে কোনও গন্ধ সৃষ্টি করা, মরাকে জীবন দেওয়া, কি উপায়ে সম্ভব করেন তিনি ?

বিশুদ্ধানন্দ উত্তর দেন এইরকম : তোমাকে যা দেখিয়েছি তা 'যোগ'-ফল নয়, সূর্য-বিজ্ঞান। যোগ মানে ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন ; মনঃসংযোগ শক্তি। সূর্য-বিজ্ঞান সাধনায় তার কোনও প্রয়োজন হয় না। কয়েকটা সূত্র জানলেই চলে ; বিশেষ সাধনারও কিছু নেই। পশ্চিমের জড়বিজ্ঞান যেভাবে চর্চিত হয়, এর চর্চা সেভাবেই করা যায়।

ডক্টর গোপীনাথ বলেন যে সূর্যবিজ্ঞানের মিল বিদ্যুৎ ও চুম্বক-বিজ্ঞানের সংগেই বেশি।

বিশুদ্ধানন্দ অবশ্য আরও বিশ্লেষণ করেন তাঁর নিজের ... তিব্বত থেকে আগত এই সূর্যবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতে ... ছিলো না। এখন এদেশে দু'চারজন ছাড়া ব্যাপারটা প্রায় ... সূর্যের রশ্মিতে প্রাণদায়িনী শক্তি। সেগুলিকে আলাদা ... নিতে পারলে যে কেউ মরাকে বাঁচাতে পারে।

এছাড়া সূর্যের 'ইথেরিক' শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে ... সম্ভব করা যায়।

আপনি এ বিজ্ঞান আপনার শিষ্যদের শেখাচ্ছেন ?—ব্রান্টনের ... অতঃপর।

না। এখনও নয়। বিশুদ্ধানন্দের উত্তর : তবে কোনও ... নির্বাচিত শিষ্যকে শেখানো হবে। এর জন্যে পরীক্ষাগার তৈরি করেছি ... সেখানে হাতে কলমে কাজ চলছে—

ল্যাবরেটরি দেখলেন পল ব্রান্টন। জানলায় কাচ নেই। বিরা... আকারের রংগীন কাচ চাই, যার মধ্যে দিয়ে সূর্যস্রোত বইতে পারে। পল ব্রান্টন পরে জানতে পারেন যে সারা য়ুরোপে একজন কাচ... কারবারী নেই যে ওই কাচের যোগান দিতে পারে। বিশুদ্ধানন্দের প্রয়োজন 'এয়ার বাবল'-হীন রংগীন কাচ, দৈর্ঘ্যে বারো, চওড়ায় আট এবং গভীরত্বে এক ইঞ্চি। কাচ রংগীন হওয়া চাই, আবার একই সংগে তার মধ্যে দিয়ে সূর্যরশ্মি চলা চাই। ব্রান্টনকে য়ুরোপের বড় ব... কাচওয়ালারা জানিয়েছে যে এয়ারবাবল-শূন্য এত বড় এত গভীর কা... বিশুদ্ধানন্দের ফরমাস মতো নিখুঁত সাপ্লাই সম্ভব নয়। রংগীন কা... সূর্যরশ্মি ভেদ করতে পারে না বলেও তারা বলেছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একবার বিশুদ্ধানন্দ পল ব্রান্টনকে অযাচিত ব... বলেন : তিব্বতি গুরুর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে শিষ্য হিসেবে স্বীকার করতে পারব না—

কিন্তু আপনার তিব্বতী গুরু তো অনেকদূরে—

প্রতি মুহূর্তে অন্তরসেতু পথে তাঁর সংগে আমার আদানপ্রদান চলছে,—ব্রান্টের ব্রান্ট প্রশ্নের জবাবে সন্ন্যাসীর নির্দ্বিধ জবাব।

পল ব্রান্টনের শেষ প্রশ্নটি সিম্পল : জীবনের কোনও উদ্দে... এবং লক্ষ্য আছে ?

অন্য শিষ্যরা হাস্য গোপন করেন। গোপীনাথ জবাব দেন ... নিশ্চয় আছে। ঈশ্বরসমীপে পৌঁছবার জন্যে প্রস্তুত হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।

বারাণসীতে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ব্রান্টনের সংগে ঘটে বিখ্যা... জ্যোতিষী সুধীরবাবুর। ব্রান্টন তাঁর বইতে সুধীরবাবুকে ভুল ক... সুধেইবাবু লিখেছেন।

[ক্রমশ

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী— পুলক বিশ্বাস

ডাক ও তার বিভাগের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনরত কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন।

মার্কিন সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল টেলারের সঙ্গে কথোপকথনরত আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী।

পালাম বন্দরে বৃটেনের রাজকীয় বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি লর্ড ডেনিং উপনীত হলে তাঁকে স্বাগত জানান ভারতের আইন এবং ডাক ও তার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন।

কিংশুক রাগিণী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

—বল। তবে তুই যদি লুচিমিষ্টি খেতে চাস্ তোকে না হয় একদিন চুপি চুপি—

—আচ্ছা তনু, তুই আমাকে কি ভাবিস্ বল দেখি। এরপরও আমি খেতে চাইব? আমার মনটা কি বালু দিয়ে তৈরি!

তনুকা লজ্জিত হয়ে বললে—না, না, তা নয়। তবে সেই যে কথায় বলে না মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ—

রাগিণী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললে—আমি ইতর জন!

—তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে!

—আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি না?

—বলেছিলুম যে চলো দিদির সঙ্গে [illegible] করিয়ে দি। তা বললে, উঁহু তুমি নও কিংশুক আমায় [illegible] দেবে, সেই অপেক্ষায় আছি। আসুক কলকাতা থেকে তোর কথা বলব'খন।

—আসবেন কবে?

—বলে তো গেল তিন-চারদিনের মধ্যে ফিরবে। এখন ক'দিন বাদে ফেরে কে জানে। সুরে আবার দলবল রয়েছে। ভারি খারাপ লাগছে। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। চল, জুবিলি ট্যাঙ্ক থেকে ঘুরে আসি। এখনও বেশ বেলা আছে। কিছু ভাল লাগছে না।

কলেজ থেকে ফিরে, কি করি কি করি ভাবছে কিংশুক। শেষে ঠিক করল জুবিলি পার্কে সেমি-ফাইন্যাল ফুটবল খেলা দেখতেই যাবে। ফিরে এসেই পড়তে বসবে। এরপর আবার বিয়ের হৈ চৈতে কতদিন বইপত্তর শিকেয় ওঠে, তার ঠিক কি।

পার্কে যাবার পথে রাগিণীদের ও বীথিদের বাড়ি পড়ে। রাগিণীদের বাড়ি দেখলে আনন্দ ও বীথিদের বাড়ি দেখলে হয় আতঙ্ক। সেদিনও তাই হল। রাগিণীদের বাড়ির সামনে আসতেই মনে পড়ে গেল গত সপ্তাহের কথা। সেই কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে বীথিদের বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে, তা খেয়ালই নেই। খেয়াল হল যখন অত্যন্ত নিকটে তরুণী কণ্ঠের 'কিংশুকদা' [illegible] কানে এল। চমকে উঠে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখে বীথিদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর মণ্ডল ও বীথি।

প্রফেসর বললেন—তুমি তো আচ্ছা আত্মভোলা হে। রাস্তা দিয়ে [illegible] হাঁটো। অ্যাক্সিডেন্ট হবে যে।

কিংশুক জোর করে হাসি এনে বললে—না মানে, ভাবছিলুম কি না—

বীথি বললে—এসো, ভেতরে এসো। এই রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছিলে?

প্রফেসর বললেন—যাও, ভেতরে গিয়ে তোমরা বস।

—তুমিও এসো না, ড্যাডি, যাবার আগে আর এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবে।

প্রফেসর হেসে বললেন—না, বড্ড ভাবি চা খাওয়া কমিয়ে দেব তোর জন্যে আর তা হবে না। চল, বলছি যখন খেয়েই যাই। এস কিংশুক। জান, চা আর সঙ্গে যদি কেক থাকে, তা যদি আবার গণির তৈরি কেক হয়, তাহলে আমি অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিতে পারি। বস।

হয়ে গেল কিংশুকের ফুটবল খেলা দেখা!

প্রফেসর মানুষ, বক্ বক্ করতে না পারলে সুখ হয় না—তা কেউ শুনুক আর না শুনুক। প্রফেসর মণ্ডলও বকে চলেছেন নিতান্ত দায়ে না পড়লে কিংশুক সাড়াশব্দ দিচ্ছে না। এক একবার প্রফেসরের বলার তোড় কমে আসে কিংশুক ওঠবার জন্যে উসখুস করে, প্রফেসর আবার নিভে যাওয়া পাইপে দেশলাইয়ের কাঠি ঠেকান। এইভাবে সন্ধ্যে হল। এবার শুধু কিংশুকই নয় বীথিও উসখুস করতে লাগলো, ড্যাডি কি উঠবে না। বললে—ড্যাডি তোমার আজ বেড়ান হল না। ডেভারেও গড়াই-এর বাড়ি যাবে বলেছিলে না।

—হ্যাঁ!—বলে হাতের ঘড়ি দেখে বললেন—এখন পৌনে সাতটা, তিনি ইভনিং ওয়াক-এ বেরিয়েছেন। সাড়ে সাতটার আগে ফিরবেন না, তারপরই যাব।

বীথির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল তাকে আর কিংশুককে একলা পাওয়া যাবে না। সিংহকে ফাঁদে আটকেও ছেড়ে দিতে হল। নিজেরই দোষ। ড্যাডি ত' বেরুচ্ছিলেনই। চা খাবার কথাটা না বললেই হোত।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে—তাহলে তুমি একাপ—।

প্রফেসর আড়মোড়া ভেঙে বললেন—না গো, আর না।

বীথি হেসে বললে—না নয়, কফি। দেখি বর্ড বোধ হয় কোথাকে বসে আছে; বর্ড বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে সদর দরজায় এসে দেখে রোয়াকে বর্ড বসে নেই। আশে পাশে কোথাও আছে কি না দেখবার জন্যে চাইতেই দেখে তনুকা ও রাগিণী আসছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় মধ্যে প্ল্যান এসে গেল। তনুকা ও রাগিণী দূর থেকে বীথিকে দেখে ভেবেছিল যে অন্যপথ ধরবে, কিন্তু যখন দেখল যে সে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে তখন সে চেষ্টা না করে দিধে এগোতে লাগল। বীথি

রাস্তায় নেমে একটু এগিয়ে ওদের দু'জনকে ধরে বললে - বেড়াতে গিয়েছিলি বুঝি ?

তনুকা বললে—হ্যাঁ।

—চল আমাদের বাড়ি চা খেয়ে যাবি।

রাগিণী বললে—আজ থাক ভাই অন্য আর একদিন আসব। সন্ধ্যে হয়ে গেল মাকে বলে আসি নি, মা ভীষণ বকবেন।

—আজ ছাড়ছি নে। সেদিন আমি তোদের বাড়ি চা খাই নি, তবে তুই খাবি না কেন ?

—বলছি তো আর একদিন আসব। না ভাই আজ···।

ততক্ষণে তিনজন বাড়ির ভেতরে উঠে পড়েছে। সামনে ড্রইংরুমের দরজায় পর্দা। ঝুলছে ভেতরে আলো জ্বলছে, কারা যেন কথা বলছেন, মাঝে মাঝে দরাজ গলায় হেসেও উঠছেন।

রাগিণী নীচু গলায় বললে—আর একদিন আসব কেমন ? ঘরে কারা বসে আছেন রে, গলার স্বর চেনা চেনা ঠেকছে।

—ড্যাডি আর কিংশুক। ভেতরে আয়।

কিংশুক ! শুনেই দুই সখী দু'জনের দিকে তাকাল তারপর আর বিরুক্তি না করে দ্রুতপায়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ? বীথি এরকম দেখে মুখ টিপে হাসল।

বীথি ঘরে ঢুকে আড়চোখে কিংশুককে দেখে নিয়ে বললে— আমাদের ক্লাসের দু'টি মেয়ে এসেছিল। নিউটাউন-এ থাকে।

—ভেতরে নিয়ে এলে না কেন ?—প্রফেসর বললেন।

—এল না।

পথে তনুকা একবার শুধু বললে। 'বীরু বড় মুখ করে বলেছিল, কিংশুক কক্ষণোও এ বাড়িতে আসবে না। ছি ইজ, নট সো চীপ.। ছিঃ, ছিঃ, নিজের লজ্জা-সরম তো বিসর্জন দিয়েইছে বন্ধুর মুখে অবধি চুণকালি দিলে। বীরু কি এরপর এ-পথ দিয়ে হাঁটতে পারবে। ভেবেছিল ও তো কোলকাতায় গেছে এই ফাঁকে যাতায়াত করলে আর কেউ টের পাবে না। ছিঃ ছিঃ।

প্রফেসর বললেন—বাড়ি যাবে ত' ?

—হ্যাঁ স্যার।

—বস, আমি একটু ওপর থেকে আসছি। ঐ দিকেই যাব।

প্রফেসর ভেতরে চলে যেতে বীথি বললে—তুমি আবার কবে আসবে? আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারি না। মহাবীর বলেছিল তুমি নাকি আর এ বাড়িতে আসবে না। ইউ আর নট সো চীপ.। আমি সে কথার জবাব দিই নি। পাগলের কথার কে জবাব দেয় বল, আমি জানতুম তুমি আসবে। কবে আমাকে তোমার বাড়িতে নেবে? কিংশুক চুপ করে রইল। বীথি আবার বললে—কবে আসবে বল?

—আসবো না।

—কেন?

—ভালো লাগে না।

—কি ভালো লাগে না। আমাকে?

—কিংশুক জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

—আমাকে কি রাগিণীর চেয়ে খারাপ দেখতে?

কিংশুক হো-হো করে হেসে উঠল।

—হাসছ যে?

—রাগিণী দেবী, বুঝলে, সে দেবী। তার কাছে তুমি! তার কাছে আঙ্গলের যোগ্য তুমি নও। এই তো ছিরি।

বীথি রাগে জ্বলে উঠলো—আচ্ছা!—গটগট করে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

তের

কিংশুক খাচ্ছিল, চাকর একখানা চিঠি নিয়ে এসে বললে—দাদাবাবু চিঠি।

তরুবালা কাছেই ছিলেন, বললেন—আমায় দাও শ্রীকান্ত। খেতে বসে চিঠি নিতে নেই। কে লিখলে?

কিংশুক খেতে খেতেই বললে—মহাবীররা তো কোলকাতায় গেছে ওরাই কেউ লিখে থাকবে। আমাকে আর কে লিখবে। দু'টি ভাত দিতে বল।

তরুবালা বললেন—কুসুম ভাত নিয়ে এস। এতো ডাকের চিঠি নয়। কিংশুক মুখ তুলে বললে—কই দেখি।

শ্রীকান্ত বললে—না মা, যোড়ল সাহেবদের চাকর নিয়ে এসেছে।

কিংশুক আঁতকে উঠে বললে—কে!—তারপরেই খেয়াল হ'ল যে মা সামনে আছেন, বললে—হ্যাঁ, বুঝেছি ঠিক আছে যাও।

তরুবালা বললো—যোড়ল সাহেব, আবার কে?

কিংশুক বললে—ঐ আমাদের—কথাটা বাকী রেখেই···

শ্রীকান্তকে বললে—ঠিক আছে যাও।

কিন্তু 'যাও' বললে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যাবে এমন পাত্র শ্রীকান্ত নয়।

সে বললে—যোড়ল সাহেব, আমাদের খ্রীষ্টান যোড়ল। দাদাবাবুদের যে পড়ায়। তিতির মত বার মেয়ে নীচু দি'মণির।

কিংশুক মার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললে—বুঝেছি বুঝেছি। এখন একটু চুপ কর, খেয়ে নি।

শ্রীকান্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললো—চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে কি বলব। সে বললে যে দিদিমণি—

তরুবালা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—কি বলবে তাও বলে দিতে হবে। বলো গে যাও যে দাদাবাবুকে চিঠি দিয়েছি। এই নে—বলে কিংশুকের আসনের পাশে চিঠি রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন—যে চিঠিই হোক খেতে খেতে পড়তে নেই। খাওয়া দাওয়ার পরে পড়ো। তাই বলে যেন তাড়াতাড়ি ভাত ফেলে উঠে যেও না।

মার গমন পথের দিকে চেয়ে কিংশুক বিড়বিড় করে আপন মনে বললে—চিঠি বাজে—চিঠি আবার কিসের জন্যে।—কি লিখেছে?

—দূর ঘোড়ার ডিম। ভাল লাগে না। বলে নাকে মুখে গুঁজে উঠে পড়ল।

ছোটখাটো নোংরা জিনিষ যেমন আলতোভাবে লোকে দু'আঙুলে তুলে ধরে ঠিক সেইভাবে একটা কোণা ধরে কিংশুক খামটা সবার চোখের সামনে দিয়ে দোলাতে দোলাতে নিজের ঘরে নিয়ে এলো। সবাই দেখুক কিংশুক দত্ত রাখা ঢাকার মধ্যেই নেই। তার কাছে এ চিঠি মূল্যহীন। ঘরে এসে একবার ভাবল দরজাটা বন্ধ করে চিঠিটা পড়ে নেয়। যতই কিছু নয় ভাব দেখিয়ে দোলাতে দোলাতে চিঠি নিয়ে আসুক বুকের ভেতরে যা দোলা আরম্ভ হয়েছে তা চিঠি না পড়া হলে থামবে না। আবার কে বলতে পারে যে চিঠি পড়ার লোভেতে তখন ভেতরে ঢুকবে না। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে পিছিয়ে এল, না, দরজা বন্ধ করলেই কানাকানি পড়ে যাবে। দরজা খুলেও পড়তে সাহস হল না। শেষে ঠিক করল বাড়িতেই পড়বে না, ক্ষেথা নয়, অন্য কোথা। কিন্তু কোনখানে তা ভেবে ঠিক করতে পারল না।

রঙিন সুদৃশ্য খাম। এই ধরণের খাম নববিবাহিতেরা বিয়ের পর ব্যবহার করে থাকে বলে বিশেষ পুরু করে তৈরি যাতে খামের ভেতরকার চিঠিতে যেটুকু উত্তাপ জড়িয়ে থাকে বাইরের হাওয়া লেগে তা উবে না যায়। বীথি এ খাম পেল কোথায়? ওর তো বিয়ে হয় নি। খামের ওপর মোটা মোটা অক্ষরে ইংরেজীতে নাম-ঠিকানা লেখা মি: কিংশুক দত্ত—

পথে ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলো। কোথায় বসে পড়া যায়? ক্লাসে বসে পড়া যাবে না, নিরিবিলি তো দূরের কথা ভাগিস্ সবছেলে ক্লাস করে না, করলে বসবার ঠাঁই মিলতো না। তাছাড়া সাদা খাম দেখলেই সবাই ছুটে আসবে। রঙিন খাম দেখলে তো কথাই নেই। কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে এবং রাস্তায় কেটে আসা ঘুড়ি বহু মালিকের টানাটানিতে যেমন মুহূর্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় চিঠিরও সেই দশা হবে। তবে কখন হবে? অসম্ভব। পা রাখবার জায়গা মেলা ভার। বিলোল রেস্তোরাঁর বসে? উঁহুঁ। তাহলে উপায়? এ তো এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল? চলতে চলতেই বুকপকেটের দিকে নজর দিলে। কি সর্বনাশ, বুকপকেটের ওপরেও আর ইঞ্চিটাক সগর্বে মাথা উঁচু করে খামটা বেরিয়ে আছে! বন্ধু-বান্ধবের দল কেউ দেখলে আর রক্ষে নেই। 'কি রে' বলে হোঁ মেরে তুলে নেবে। তাড়াতাড়ি বাইরের বুক পকেট থেকে বের করে ভেতরের পকেটে চিঠিটা চালান করে দিলে। চিঠিটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বুকগুরুনি আরো বেড়ে গেল।

ক্লাসে গিয়ে বসল। কিছুই ভালো লাগছে না। প্রফেসার পড়াচ্ছেন কিন্তু কি পড়াচ্ছেন কিছুই কানে আসছে না। আমার তো

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

মন খাব ভেসে বেড়াচ্ছে। হাতটা বারেবারেই ভেতরের পকেটে দিতে ইচ্ছে করছে। এতো এক আচ্ছা জ্বালা হল দেখছি।

বাবা অফিস থেকে বাড়ি এসে দেখে কিংশুক বসে। বললে—ব'স আসছি। বলে ভেতরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—কি ব্যাপার বল দেখি।

—চিঠি পেয়েছি।

—কার?

—বীথির।

—বীথির!— কি লিখেছে?

ভেতরকার পকেট থেকে খামসমেত চিঠি বার করে মামার দিকে ফেলে দিয়ে কিংশুক বললে—পড়ে দেখ।

একটা লম্বা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে খামটা নাকের ডগায় ধরে মামা বললে—ও বাবা, এ যে আবার সেন্টে ডোবানো!

কিংশুক তাড়া দিলে—পড় পড়।

—পড়ছি। বলে খামের ভেতর থেকে চিঠি বার করে চোখ বুলিয়ে বললে—আরম্ভটা কড়া করেছে, ডার্লিং সুখ। সুখ যে সেই ত' ডার্লিং। আবার ডার্লিং যে সে সুখ ছাড়া আর কি হবে। বাঃ! ছুঁড়িটার কলম তো বেশ খোলে।

কিংশুক চটে গিয়ে বললে—নারে বাপু। ডার্লিং সুখ মানে ডার্লিং কিংশুক।

—ও? বলে মনে মনে পড়তে পড়তে একসময় বললে—এটা কি রকম হল। মহাবীর যেদিন আমায় অপমান করে শাসিয়ে যায় যে তুমি নাকি তোমার বীথির বাড়িতে আর আসবে না সেদিন সে কথা বিশ্বাস করি নি। বড়মুখ করে তাকে বলে ছিলুম বীথি তার সুখকে জানে। মানুষ নিঃশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে পারে কিন্তু সুখ তার বীথিকে না দেখে থাকতে পারবে না।

—মহাবীরের সঙ্গে তাহলে এক পত্তন হয়ে গেছে। কবে হল?

—কি জানি। আমায় কিছুই বলে নি।

—আমার সে সুখ তুমি রেখেছ। যদিও মহাবীরকে আমার সেকথা ডেকে বলা হয় নি। তা না হোক তোমাকে ত' আবার ফিরে পেয়েছিলুম সেই আমার ভাগ্য। তারপর তুমি আসতে নিয়মিত ভাবে। তোমার ভালবাসায় আমায় কানায় কানায় ভরিয়ে দিলে। এক একদিন আনন্দে আমি সারারাত কেঁদেছি। তারপর একদিন কি যে হল জানি না। হল কথা কাটাকাটি, আসবে না বলে রাগ করে চলে গেলে। ভেবেছিলুম আগেও যেমন রাগ করে চলে গেছ তারপর শান্ত হয়ে ফিরে এসে তোমার প্রেমের বন্যায় আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছ এবারও বুঝি তাই হবে। কিন্তু দিন গড়িয়ে রাত হয় রাত ফুরিয়ে দিন আসে তবু বীথির সুখ দেখা দেয় না। তরুণী হৃদয়ের বুকভাঙা দীর্ঘ নিশ্বাসে—এহে হে দীর্ঘ বানান ভুল করেছে—নিশ্বাসে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। তোমার ভালবাসা যে পেয়েছে, তার আর চাইবার কিছু নেই। তার মত ধনী কে? আর সে ভালবাসা পেয়ে যে হারায় তার মত কাঙালিনী—কাঙালিনী বানান 'ঙ' দিয়ে? যাকগে, তুই আবার খচে যাচ্ছিস।—বলে আবার পড়ায় মন দিলে।

চিঠিপড়া শেষ করে কিংশুকের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে—ধ্যাত্তি মাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ। তুই নিজে বীথিকে বলেছিস যে তাকে বিয়ে করবি?

কিংশুক মাথা নেড়ে বললে—না, ঠিক তা নয়।

—তা নয় মানে? এই যে লিখেছে—কোথায় গেল এই—তবে কেন সেদিন বললে বিয়ের কথা? কেন, এক নিষ্পাপ সরলা তরুণীর সামনে স্বর্গের সুখের ছবি এঁকে তার কুমারী-হৃদয়ের অধীশ্বর হয়ে বসলে? কেন নিজের মুখে আমায় গ্রহণ করবে কথা দিয়ে আজ ছলনা করছ? শুধু আমাকে নয়, রাগিণীকেও বলেছ যে তুমি বীথিকেই বিয়ে করবে।—না বললে লিখবে কেন?

কিংশুক চটে গিয়ে বললে—তুই-ই তো বলেছিলি।

মামা বিস্ময়ে বললে—বিয়ে করবি বলতে বলেছিলুম?

—বলিস্ নি যে যদি দেখিস্ বাড়াবাড়ি করছে, তুইও ক্যাবলা সেজে আলতু-ফালতু যা প্রাণে চায় তাই বলবি।

—হ্যাঁ, মাণিক বিয়ের কথাটা আলটু-বালটু কথা হল? তাও আবার যাকে-তাকে বলা নয়, একেবারে আসল লোককেই বলে ফেললি। বুঝলুম, প্রাণে ঐটেই চাইছিল। তবে আর কেঁদে পড়ছ কেন? বাড়িতে বলতে লজ্জা করে? বল আমি বলছি। শুভকাজ্টা হয়ে যাক।

—দেখ মামা, সব সময় চ্যাংড়ামো ভালো লাগে না।

মামা চটে গেল, বললে—চ্যাংড়ামো ভালো লাগে না। চ্যাংড়ামো করবার বেলায় মনে থাকে না। এ ছুঁড়ি তোকে ছেড়ে দেবে ভেবেছিস্। কোর্ট-ঘর দেখিয়ে ছাড়বে।

কিংশুক শঙ্কিত হয়ে বললে—কেন?

—কেন কি? এই তো লিখেছে এই যে—আমি কঠিন হতে চাই না, চাই না অন্য কিছুর সাহায্য নিতে। আমি শুধু তোমাকে চাই। আমাকে দয়া করো, তোমার কথা রাখো। অন্য কিছুর সাহায্য মানে হচ্ছে আইন। এসব ব্যাপারে কেস্ করা যায়। বিয়ের কথাই যখন নিজের মুখে বলেছিস্ তখন কে জানে চিঠি-ফিটি ছেড়ে বসে আছিস্ কি না।

কিংশুক শুকনো গলায় বললে। না সে সব কিছু নেই।

মামা বিড়ি ধরিয়ে বললে। ব্যাপারটা কি বল দেখি। কিছু পেটে কিছু মুখে না রেখে খোলসা করে বল।

সব শুনে মামা বললে। দেখ দিকি কাণ্ড। কই এসব কথা তো সেদিন আমার কাছে ভাঙো নি। যদি পাঁচন্ খেচা করবেন দেবে চেপে গেল আর তুই জেলার সেরা ব্যবসায়ীর ঘরের ছেলে হয়ে আগ বাড়িয়ে অতবড় একটা কথা বললি। আগে পুরোটা শোন, আমাকে তুমি বিয়ে করবে না খুন করবে, কোন কথাটা বলে। ভাল করে দেখ এঁড়ে কি বকনা। তবু রক্ষে যে লেখাপড়ার ভেতরে কিছু নেই আর তোর মুখের কথাটা তৃতীয় প্রাণী কেউ শোনে নি—হ্যাঁ মহাবীর শুনেছে তবে তোর মুখের কথা নয় বীথির। কড় লেখো নি ফেকের কাপটা খেয়েছে। মহাবীরের কথা ছেড়ে দাও, ও দলের লোক। এখন ফাঁড়া কাটে কি করে?
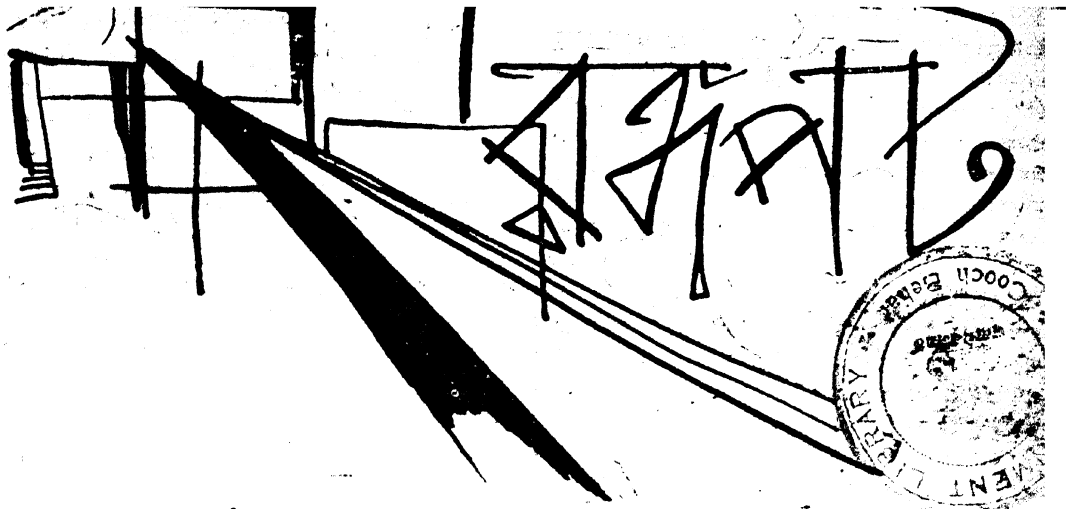
কিংশুক আস্তে আস্তে বললে। যা হোক একটা কিছু উপায় বল—দোহাই তোর আর বাঁ হাত এগিয়ে দিস্ নি।

[ক্রমশ।

নাট্যসাধনায় এ্যামেরিকার নিগ্রো সমাজ

রিচার্ড এল কু

যখন কোনো নিগ্রো নাট্যকার বর্ণ-বৈষম্যের বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন বিষয়বস্তু লইয়া নাটক লিখিতে সুরু করিবেন তখনই আমেরিকার থিয়েটারের সহিত নিগ্রো সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে।

এইরূপ একটি ব্যাপার প্রায় ঘটিতেছে। নিগ্রো লেখক বর্ণ-বৈষম্যের বিষয়ের সহিত স্বাভাবিকভাবেই জড়িত। কিন্তু এই লইয়া যদি নাটক লেখা যায়, তাহা হইলে সেই নাটকের সাফল্য বা […] পরীক্ষামূলক হইতে বাধ্য। অথচ নাটককে যদি দীর্ঘদিন ধরিয়া দর্শকদের আকর্ষণ করিতে হয় তাহা হইলে বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু কিছু চিরন্তন উপাদান চাই। কারণ 'নাটকের বিচারক নাটকের অনুরাগী দর্শকগণই।'

১৯৫৯ সালে লরেন হ্যান্সবেরি তাঁহার 'এ রেজিন ইন দি সান' নামে নাটক লিখিয়া নিউ ইয়র্কের নাট্য সমালোচক মহলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তিনিই প্রথম নিগ্রো এবং তৃতীয় মহিলা, যিনি এইরূপ সম্মানের অধিকারী হন। বর্তমানে মিস হ্যান্সবেরি তাঁহার নূতন নাটক লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ঘটনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত অনুল্লেখভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা উত্থাপিত […] পাইয়াছে। তাঁর এই নূতন নাটকের নাম 'দি সাইন ইন সিডনি ব্রুস্টেইনস উইনডো।' আগামী বৎসর এই নাটকটি মঞ্চস্থ হইবে।

মিস হ্যান্সবেরি তাঁহার 'রৌদ্রে একগুচ্ছ কিসমিস' নাটকের কাহিনীতে শিকাগোর একটি নিগ্রো পরিবারের পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। এই নাটকে একটিমাত্র চরিত্রই শ্বেতকায় এবং এই চরিত্রটিও একেবারে দুর্বৃত্ত নয়, কেবল বিশেষ একটি মনোভাব প্রকাশের প্রতীক হিসাবে এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মিস হ্যান্সবেরি তাঁহার নূতন নাটকে যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্বেতকায়। ইহাতে কেবলমাত্র একটি নিগ্রো চরিত্র রহিয়াছে।

মিস্ হ্যান্সবেরি এই নূতন নাটকের কাহিনী সম্পর্কে বলেন যে,

নায়ক উত্তমকুমার : নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

ইহার মূল চরিত্র একজন ৩০ বৎসরের যুবককে কেন্দ্র করিয়া রচিত এই যুবকটি এই বর্তমান যুগের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমেরিকার এক আধুনিক শহরের একটি বোহেমিয়ান পরিবারে তাহার বাস। জীবন ও সমাজের পুরাতন মূল্যবোধ ও আদর্শকে বাতিল করিয়া দিয়া নূতন মূল্যবোধের ও আদর্শের অন্বেষণই লেখিকার এই নূতন নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

অবশ্য ইহাই স্বাভাবিক যে, নিগ্রো লেখকগণ, তাঁহাদের নিজেদের কথা লইয়াই সর্বাগ্রে সাহিত্য রচনা করিবেন। একজন নিগ্রো নাট্যকার তাঁহাদের নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন যে 'যখন কোন নিগ্রো, সচেতনতার সহিত বর্ণ-বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন, তখনই দৃঢ়পদক্ষেপে তিনি প্রগতির পথে অগ্রসর হন।'

ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নূতন নিগ্রো নাট্যকার একটি উল্লেখযোগ্য পদ অধিকার করিয়া আছেন। এই কবি ও নাট্যকারের নাম ওয়েন ডডসন। ইনিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু স্নাতক সারা আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ও. সি. গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'কিনু গোয়ালার গলির' নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুন্দর রঙ্গমঞ্চ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মার্কিন বিয়োগান্ত নাটক রচয়িতা ইরা আলড্রিজের নামানুসারেই এই মঞ্চের নামকরণ করা হইয়াছে। আলড্রিজের নাটকের প্রশংসা ইংলণ্ড হইতে জারশাসিত রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগামী ১৯৬৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপিত হইবে। এই উপলক্ষে ডডসন একটি নাটক রচনার কাজে হাত দিয়াছেন। তাঁহার এই নাটকে, বাইবেলের বিরাট বীরত্বমণ্ডিত চরিত্রগুলিকে, মানুষের চরিত্ররূপেই দেখাইবার পরিকল্পনা আছে এবং দেখা যাইবে যে, এই চরিত্রগুলির মধ্যে নৈতিকতার এবং আধ্যাত্মিকতার দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি, ঔপন্যাসিক এবং অধ্যাপক ডডসন সম্প্রতি 'মিডিয়া ইন আফ্রিকা' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে একজন গ্রীক নায়িকাকে, উনবিংশ শতাব্দীর ইথিওপীয়ান রাজকুমারীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান চরিত্র জেসন দক্ষিণ আফ্রিকার এক শ্বেতকায় খনি শ্রমিক। নিউ ইয়র্কে শীঘ্রই এই নাটক প্রদর্শন শুরু হইবে। এছাড়াও ডডসন ইবসেনের 'পিয়ার জিন্ট' নাটকটিকে লুইজিয়ানার একটি গল্পে রূপান্তরিত করিয়াছেন। গল্পটির নাম 'বেইউ লিজেণ্ড'।

গত কয়েকটি মরশুমে নিউ ইয়র্কে যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছে, সেইগুলির মধ্যে অভিনেতা ওসি ডেভিসের নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকটি বিখ্যাত পুলিৎসার পুরস্কারও লাভ করে। নাটকটির নাম 'পারলি ভিক্টোরিয়াস' একটি খুব সহজ, সরল, সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করিয়া ইহা রচিত। জর্জিয়ার একটি কার্পাস ক্ষেত্রে একজন নিরক্ষর নিগ্রো, ক্ষেত হইতে তুলা সংগ্রহ করাই তাহার কাজ। কিন্তু সরস বুদ্ধি এবং মজার কথা বলার দিক হইতে সে তাহার শ্বেতাঙ্গ কর্তাকে টেক্কা দিত। এই নাটকের একটি হাসির কথা সারা মরশুমে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কথাটি হইল, 'তুই নিগ্রো নাবের কর্ত'।

নিগ্রো নাট্যকারের নিজেকে লইয়া উপহাসের এই মনোভাবের মধ্যে বস্তুত বর্তমান আবহাওয়ার একটি অংশের প্রতিফলন ঘটিয়াছে এবং নাট্যকার সেই প্রতিফলনকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে স্থান করিয়া দিয়া উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। এই মরশুমে তাঁহার যে 'ব্যালার্ড অব নিগ্রোয়ার' মঞ্চস্থ হইবে তাহাতেও শাণিত বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন।

আমেরিকায় নিগ্রো নাট্যকারগণ যে সব নাটক লিখিয়াছেন সেগুলির মধ্যে এখন একটি বিশেষ লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, এই নাটকগুলি বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও বহু পর্যায়ের মধ্য দিয়া, অধিকতর সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এইগুলির রচনার মানও উন্নত হইয়াছে। গালাগালি, অপরিচ্ছন্ন বিদ্রূপ এই পর্যায়গুলি তাঁহারা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। নূতন যে সব নাটক রচিত হইতেছে, তাহাতে সাধারণ জীবনে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্ক সহজ ও সুন্দরভাবে এবং কোনরূপ আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ না করিয়াই, নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। এই মনোভাব এবং এইরূপ বিষয়বস্তুই নাট্যকার এবং শ্রোতা উভয়কেই প্রভাবিত করে।

ভি, আই, পিজ-এর স্যুটিং-এ

শ্রীদীপংকর ঘোষ

স্টুডিওর কথা মনে করলেই আমাদের মন একটা স্বপ্নের রাজত্বে গিয়ে হানা দেয়। বাইরে থেকে স্টুডিও সম্বন্ধে একটা অজানা কৌতূহল বোধ হয় অল্পবিস্তর সবার ভেতরেই কিছুটা আছে। আর এ কৌতূহলটা থাকা একেবারে অহেতুক একথাও বোধ হয় বলা যায় না।

কিছুদিন আগে লণ্ডনের বাইরে বোরহামউড মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের (Metro Goldwyn Mayer) স্টুডিওগুলো ঘুরে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। কোলকাতায় ওখানকার বিখ্যাত স্টুডিওগুলো অল্পবিস্তর দেখেছিলাম। অবশ্য তখন আমার অপরিণত বয়সে কলাকৌশলের চেয়ে স্টুডিও রাজ্যের বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরই বেশি লক্ষ্য করার কৌতূহল ছিল। কিন্তু এখানে এম, জি. এমের : ভি. আই. পি'জ-এর স্যুটিং-এ এসে মিলিয়ন ডলার অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের চেয়ে বোধ হয় এখানকার স্টুডিওর কলাকৌশলই আকৃষ্ট করেছে বেশি।

এ দেশে সূর্যের প্রখরতা যে খুবই কম সে কথা সবাই জানেন। আর বছরে ক'দিন উজ্জ্বল রোদ্দুর থাকে তা দু'হাতে গুণে বলা যায়! অথচ ছবি তোলার ব্যাপারে অনুকূল আলোর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা বোধ করি আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তাই এদেশে ছবি তোলার একটা বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় সমস্ত ছবির শতকরা পঁচানব্বুই ভাগই স্যুটিং করা হয় স্টুডিওর মধ্যে। বাকি পাঁচ ভাগ তোলা হয় বাইরে—বা আউটডোর স্যুটিং। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ অনেক সময় আবার ঐ পাঁচভাগ আউটডোর স্যুটিং পঁচানব্বুই ভাগ ইনডোর স্যুটিং-এর সমান সময় নিয়ে নেয়।

ভি. আই. পি'জ ছবির কথাই ধরা যাক। একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যে নিউইয়র্কের প্লেনের জন্য লণ্ডন বিমানবন্দরে ভিন্নশ্রেণীর ভি. আই. পিজ অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আবহাওয়ার গোলমালের দরুণ চব্বিশঘন্টার মধ্যে কোন প্লেন বিমানবন্দর ছাড়তে পারছে না। এম, জি, এম-এর স্টুডিওতে যখন ঢুকলাম হঠাৎ মনে হলো আমি বোধহয় ভুল করে লণ্ডনের পশ্চিমপ্রান্তে ইণ্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্টে এসে হাজির হয়েছি!

প্রায় ছ' থেকে সাত বিঘা জমির ওপর এম. জি. এমের তিন নম্বর সেটে পুরো লণ্ডন বিমান বন্দরের ডিপার্চারের নকলে একটা বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা ছবিটি দেখবেন তাঁরা যদি মনে করেন অন্তত খানিকটা লণ্ডন বিমান বন্দরের ছবি দেখতে পেলেন, তাহলে তাঁরা ভুলই করবেন। এমন কি কুয়াশায় প্লেনগুলো সারিসারি দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টার থেকে এলিজাবেথ টেলর নামলেন সব কিছুই স্টুডিওর ভেতর তোলা।

যাঁরা স্টুডিওতে গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, অতবড়ো একটা স্টুডিওকে আলোকিত করতে কতগুলো আর্ক-ল্যাম্পের প্রয়োজন। এই সেটে প্রায় আড়াই হাজার আর্কল্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সমস্ত স্টুডিওকে কুয়াশাঘেরা দিনের মত দেখায়।

এরপর দেখা যাক আর সব কারিকুরি কৌশলের ব্যাপার। ছবির গতি, অবস্থান এবং কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দৃশ্যটি দর্শকদের কাছে আরো মনোগ্রাহী হবে এর জন্যে এঁরা অনেক দৃশ্য ক্রেন-ক্যামেরার সাহায্যে নিয়ে থাকেন। আবার কোন কোন সময় দু'টো, তিনটে বা তার চেয়ে বেশি ক্যামেরায় বিভিন্ন কোণ থেকে ছবি তুলতে থাকেন।

ভি. আই. পি—পরিচালক এ্যন্টনী এসকুইথকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন যে এতে ছবির গতি বৃদ্ধি পায় এবং দর্শকমনকে নিবিড়ভাবে ছবির প্রতি আকৃষ্ট করে রাখা যায়। যে ছবির প্রায় সম্পূর্ণটাই বন্ধ দরজার মধ্যে তোলা হচ্ছে সে ছবি মাঝে মাঝে একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে। ক্যামেরার এই সামঞ্জস্য রক্ষার ফলেই, ছবিটি যখন পরে পর্দায় দেখলাম, কোথাও মনে হয় নি যে ছবি চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে।

পরিচালক বয়োবৃদ্ধ, বিশেষ বিনয়ী এবং কাজ সম্বন্ধে খুব বেশি সচেতন। যে দৃশ্যটিতে মার্গারেট রাদারফোর্ড ভ্যাকসিনেসান সার্টিফিকেট খুঁজে পাচ্ছেন না ঐ একটি সট নিতে তিনি সাড়ে চার ঘণ্টার মতো সময় ব্যয় করলেন। তাঁর কথামতো স্টুডিওতে সব অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরই একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। যার জন্যে তিনি তার অন্যথায় এলিজাবেথ টেলরকেও মাপ করেন নি। একটি দৃশ্যের কথা বলছি। এই দৃশ্য লিজ টেলর প্রথম ভি. আই. পি'জ রুম থেকে স্বামীর সঙ্গে বাইরে আসছেন এবং মার্কের সংগে দেখা হল। এই দৃশ্যটি বাইশ বার ধরে তোলা হয়েছিল।

আর একটা জিনিষ সহজেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি হ'ল, এখানকার পরিচালক এবং সহপরিচালকরা নায়ক-নায়িকার হাঁটা-চলা-ফেরা এবং অন্যান্য অংগভংগীর সংগে তাঁদের ব্যাকগ্রাউণ্ড এ্যাকসন বা পারিপার্শ্বিক ও চারদিকের প্রত্যেটি খুঁটিনাটির দিকে সমান নজর দেন। সমস্ত বিমান বন্দরেই নানা রকম লোকের চলাফেরা কথাবার্তা আর এর মাঝে যখন নায়ক-নায়িকা বা প্রধান চরিত্রগুলো চলাফেরা করছেন তখন খেয়াল করে দেখলে বরাতে

ডিক বার্টন : লিজ টেলর

পারবেন এঁদের চেয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক লোকেদের আচার ব্যবহারই বেশি লক্ষ্য করার মতো। আমাদের দেশের অনেক ছবিতে কিন্তু এই দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায় না।

সব মিলিয়ে ছবিটি শেষ করতে সময় লেগেছে প্রায় তিন মাস। এর মধ্যে প্রায় বারো দিন আমি নানা দিক থেকে ছবিটির নির্মাণ-কৌশল লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এক কথায় বলতে পারি যে ষ্টুডিওর মধ্যে ছোট থেকে বড়ো—বয়স বা কাজে যেদিক থেকেই হোক, সবাই নিজের নিজের কাজে অত্যন্ত মনোযোগী এবং ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা কোথাও ছিল বলে আমার মনে হয় নি।

এঁদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এঁরা সব কাজই একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে করেন। যার ফলে সময়ে সব কাজ শেষ হয় এবং খরচের পরিমাণও আয়ত্তের মধ্যে থাকে।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে দু'-এক কথা না বললে প্রসংগটা বোধ করি একটু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এলিজাবেথ টেলর যিনি এই ছবিতে ফ্রান্সেস-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তাঁর সংগে যে দু' একটা কথা বলার সুযোগ হয়েছিল তাতে মনে হলো, তিনি যে ছবিতেই বা যে পারিশ্রমিকেই কাজ করুন না কেন, ছবির সাফল্যই তাঁর কাছে প্রধান লক্ষ্য।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও নানা মুখে এদেশে এলিজাবেথ টেলর সম্বন্ধে হরেক রকম গল্প প্রচলিত আছে। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে দেখলাম ভদ্রমহিলা কথাবার্তায় বিশেষ মার্জিত এবং কথার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে। সমস্ত ষ্টুডিওতে যখন একটি ছোট্ট মেয়ের মত ঘুরে বেড়ান কে মনে করবে যে ইনিই বিখ্যাত ক্লিওপেট্রা ছবির পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা (মিলিয়ন ডলার) 'নজরানা' (!) পাওয়া সেই স্বনামধন্যা অভিনেত্রী। গলার স্বর একটু খসখসে আর তাতেই বোধ হয় মাইকে নিজের গলাটা অত সুন্দর শোনায়। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে খালি চোখের চেয়ে ক্যামেরায় মিস টেলরকে যেন আরো সুষমান্বিতা বলেই মনে হয়।

কয়েক বছর আগে বিখ্যাত 'টড-আও'-এর আবিষ্কারক মাইকেল টড, যিনি লিজ টেলরের তৃতীয় স্বামী ছিলেন তিনি মারা যান। ঠিক তারপরেই মিস টেলরও অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। গলার শ্বাসনালী কেটে শরীরে অক্সিজেন প্রয়োগ করে বহু কষ্টে বাঁচানো হয়েছিল লিজকে। গলার দাগটা এখনো সেই মৃত্যুর সংগে লড়াইয়ের চিহ্ন বহন করে বেড়াচ্ছে। মাইকেল টডের প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী লিজ টেলর প্রায় তিন বছর আগে এডি ফিশার-এর সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু গত বছর ক্লিওপেট্রা স্যুটিং-এর সময় ফিশারের সংগে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত এবং পরে ভি. আই. পিজ ছবিতে যিনি পলের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সেই রিচার্ড বার্টনের সংগে ওঁর মেলামেশা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে নানা রকম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তিনি বেশির ভাগ লোকজনকেই আজকাল এড়িয়ে চলতে চান।

আর একজন অভিনেতা যিনি ভি. আই. পিজ ছবিতে মার্কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তিনি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি হলেন লুই জর্দঁ। তবে অভিনয়ে সেই জিজি ছবির লুইকে খুঁজে পাওয়া গেল না—কেমন যেন আড়ষ্ট। সহজ সরল এই ফরাসী ভদ্রলোকের ব্যবহারে সবাইকে আপন করে নেবার ক্ষমতা আছে। —'লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।'

'অনুষ্টুপ ছন্দ'-এর একটি দৃশ্যে এন বিশ্বনাথন, গীতা মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী।

সুবোধ ঘোষের দু'টি রচনার চিত্ররূপ

বর্তমান বাংলার সাহিত্যসমাজের পুরোভাগে যাঁদের আসন সসম্মানে চিহ্নিত সুবোধ ঘোষ তাঁদেরই একজন। রসিকসমাজে তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। এই জীবনপিপাসু লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এবং গভীর অন্বেষণে জীবনের এক বিচিত্র আলেখ্য তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই বিচিত্ররূপই স্থান পেয়েছে সাহিত্যের পাতায় তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। রহস্য, বঞ্চনা, পরিণতিময় বিচিত্র জীবনকে নানা কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করার এবং হৃদয় দিয়ে তাকে উপলব্ধি করার জীবনরসিক লেখকের কাছে তার সকলচিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে রসপিপাসু সাহিত্য পাঠকসমাজকে নানাভাবে উপকৃত করেছে। শ্রীসুবোধ ঘোষের দু'খানি রচনার চিত্ররূপ বর্তমানে মহানগরীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। তাঁর শ্রেয়সী একখানি মঞ্চসফল নাটকের চিত্ররূপ। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার সময়ে শ্রেয়সী যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। নারীর স্বরূপ ও নারীজীবনের সার্থকতাসম্বন্ধে এই গ্রন্থে একটি শাশ্বত সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাতৃত্বের মধ্যেই নারীর পূর্ণবিকাশ ও চরম সার্থকতা—নারীজীবনের এই মহান সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে বাঙলার নারীত্বকে পরিপূর্ণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে দু'টি নারীর কাহিনীই এর উপজীব্য। দু'টি বিপরীতধর্মী নারীর ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের মধ্যে কাহিনীকে পরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বর্ণালীও সুবোধ ঘোষের বৈশিষ্ট্যবান রচনাগুলির এক অসামান্য নিদর্শন। এখানে একটি নারীকে কেন্দ্র করে দু'টি বিপরীতধর্মী পুরুষের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এই রচনায় লেখক তথাকথিত রক্তকৌলীন্যকে কশাঘাত করেছেন তাঁর শক্তিমান লেখনীর মাধ্যমে। ছলনা, প্রতারণা মনের সঙ্কীর্ণতার একটি উজ্জ্বল চিত্রের মাধ্যমে সমাজের এক স্বরূপ এখানে তিনি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। তারই মধ্যে একটি নিটোল রসমধুর প্রেমের স্পর্শে কাহিনীকে রসস্নিগ্ধ করে তুলেছেন ছবি দু'টি আঙ্গিকে, বিন্যাসে, গঠনকৌশলে প্রশংসার দাবী রাখে। কোথাও কৃত্রিমতা বা অস্পষ্টতার পরিচয় মেলে না। পরিবেশ গঠনে এবং কাহিনীর বিস্তাররীতিতে উভয় পরিচালকই নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। দর্শকের মনে ছবি দু'টি এক আবেদন জাগাতে সক্ষম হয়েছে। শ্রেয়সীর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিখ্যাত নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। ছবি দু'টির পরিচালক যথাক্রমে শ্যাম চক্রবর্তী এবং অজয় কর। শ্রেয়সীর নায়িকার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় আর একবার প্রমাণ করলেন যে সমকালীন অভিনেত্রীদের মধ্যে তিনি অতুলনীয়া। তাঁর অভিনয় যেমনই বলিষ্ঠ, তেমনই ব্যক্তিত্বসমন্বিত। নায়ক বসন্ত চৌধুরী তাঁর যথেষ্ট শক্তির সাহায্যে চরিত্রটির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় কুশলতা প্রদর্শন করেছেন। সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই) প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। কমল মিত্রের অভিনয় অনবদ্য। সর্বহারা অথচ পূর্ব পুরুষের মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন কমল বিশ্বাসের চরিত্রটি তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, এন বিশ্বনাথন, তরুণকুমার, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি। বর্ণালীর নায়িকার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর সু-অভিনয় করেছেন। ধীর স্থির সংযত অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শককে তিনি আনন্দ দিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও এন বিশ্বনাথনের সার্থক অভিনয়ও দর্শকসমাজে পরিবেশন করেছে অফুরন্ত পরিতৃপ্তি। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, ছায়া দেবী, গীতা মুখোপাধ্যায়, স্মিতা সিংহ প্রভৃতি।

বাদশা

পেশা মানুষকে পরিপূর্ণরূপে কখনই প্রভাবিত করতে পারে না। পেশায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করলেও মানুষের সহজাত মানবিক প্রকৃতির মৃত্যু কখনও ঘটে না। কোন আকস্মিকতার মধ্যে একদিন না একদিন তার প্রকাশ ঘটে থাকে—মানবজীবনে এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। তাই কোন দুর্ধর্ষ দস্যু অসংখ্য নররক্তরঞ্জিত হাত দিয়ে পরম স্নেহে কোন শিশুকে যখন বুকের মধ্যে টেনে নেয় বাৎসল্যের পরিচয় দিয়ে তখন তা বিস্ময়কর হলেও স্বভাববিরোধী নয়। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বাদশা' কাহিনীটির মধ্যে এই বক্তব্যই প্রচারিত হয়েছে।

অগ্রদূত পরিচালিত এই ছবিটিতে আবেগ এবং অনুভূতির এক

অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটি মানুষের সুগভীর বাৎসল্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর বক্তব্য দর্শকচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করে। হিংসা, ক্রূরতা ও ভয়াবহতার নৃশংস প্রকাশের ভিতরেও যে একটি স্নেহের ফল্গু লুকিয়ে ছিল এক পরম সৌন্দর্যের পবিত্র স্পর্শে তার স্রোতোমুখ সহসা খুলে যাওয়ার রসমধুর কাহিনী দর্শকচিত্তে যথেষ্ট পরিমাণে অভিভূত করে। পরিচালনায় পরিচালকগোষ্ঠী কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ছবিটির বিন্যাসে, গঠনভঙ্গিমায়, ঘটনার সংস্থাপনে, বিস্তাররীতিতে, প্রয়োগপদ্ধতিতে এক সর্বাঙ্গীণ নৈপুণ্যের ছাপ পাওয়া যায়। প্রধান ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় এক কথায় বিস্ময়কর। তাঁর প্রতিভার অসামান্যতা এই অভিনয়ে ধরা পড়েছে। বালকশিল্পী শ্রীমান শঙ্কর অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন! তাঁকে আমরা অভিনন্দিত করি। অন্যান্য চরিত্রে বিকাশ রায়, অসিতবরণ, সন্ধ্যারাণী, তরুণকুমার, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতির অভিনয়ও দক্ষতার স্পর্শসমৃদ্ধ।

সংবাদবিচিত্রা

বাঙলার তথা ভারতের যে সব লব্ধপ্রতিষ্ঠা অভিনেত্রী প্রযোজিকা হিসাবেও চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করার ব্রত গ্রহণ করেছেন, সেই তালিকায় এবার সুমিত্রা দেবার নামটিও যুক্ত হতে চলেছে। কথাশিল্পী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাজবন্দ' কাহিনীটির চিত্রস্বত্ব তিনি ক্রয় করেছেন। প্রদীপকুমার অবতীর্ণ হবেন নায়কের ভূমিকায়। অভিনেত্রী হিসাবে সুমিত্রা দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে কুড়ি বছরেরও পূর্বে। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর অধিকারগত হয়েছে। প্রযোজিকা হিসাবেও আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

• • • •

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কুছু ফিল্মস্

'সুর তাঁবার গান'-এর পরিচালক উৎপল দত্ত নির্দেশ দিচ্ছেন নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়কে ও ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্তকেও ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

অন্যতম। কিছুকাল পূর্বে এঁরা 'কোয়েস্ট ফর ও ইণ্ডিয়ান জোগীস' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। এই চিত্রটি প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হচ্ছে যে, একজন ভারতীয় যাদুকরকে এই চিত্রে অন্যতম শিল্পী হিসাবে দেখা গেছে। এই যাদুকরের নাম—এ সি সরকার। এঁর অনেক বিস্ময়কর যাদুক্রীড়া চিত্রটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

• • • •

চিত্রজগতের বিভিন্ন সংবাদ যাঁদের জ্ঞাত, ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নামটি তাঁদের অজানা নয়। বিভিন্ন চিত্র প্রচেষ্টাকে ঋণ দান করে চলচ্চিত্র নির্মাণ পরিকল্পনাকে সহায়তা করা এঁদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী সাহায্য ও সমর্থনপ্রাপ্ত। বর্তমানে এঁদের একটি আচরণ শুধু চিত্রামোদীই নয়, সমগ্র রুচিবান সমাজকে বিস্মিত এবং সেই সঙ্গে বেদনাহতও করেছে। প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা মোতিলালের 'ছোটি ছোটি বাতেঁ' ছবিটির জন্য ঋণদানের আবেদন এই প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়েছে। কারণস্বরূপ এঁরা জানিয়েছেন যে, এ ছবিকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে না যেহেতু এতে কোন যৌন আবেদন নেই। একটি সরকারী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের এবম্বিধ আচরণ যে সমগ্র রুচিবান সমাজকে বেদনাহত করবে তাতে কি কোন দ্বিমত থাকতে পারে? সুন্দর, শোভনতা ও শালীনতার উপাসক হিসাবে এই নিন্দনীয় আচরণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। চলচ্চিত্রের মধ্যে যাঁরা কাহিনী, আবেদন, বক্তব্যের কোন মূল্য দেন না, যৌন আবেদনই যাঁদের কাছে মুখ্য সেরূপ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সমাজের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়।

• • • •

ভারতীয় ও মার্কিন প্রযোজকদের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত চিত্র 'হাউস হোল্ডার' ছবিটি বর্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। এই চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বর্ণাঢ্যনী ভারতীয় অভিনেত্রী লীলা নাইডু। এই চিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে 'মাদমোয়াজেল' সম্মান এনে দিয়েছে। আমেরিকার এক সাময়িকপত্রের দ্বারা মাদমোয়াজেল লীলা নাইডু বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে বিবেচিতা হয়েছেন। ভিভিয়েন লি, এ্যান ব্যানক্রফট, কিম নোভাক প্রভৃতি অর্জিত এই সম্মান এই প্রথম একজন ভারতীয় শিল্পীর উদ্দেশে উৎসর্গিত হল।

• • • •

বিশ্বজিৎ ও সায়রাবানু অভিনীত 'এপ্রিল ফুল' নামক হিন্দী ছবিটির প্রযোজক সুবোধ মুখোপাধ্যায়। এই ছবিটি প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘোষণা আছে। ছবিটিতে এক জলনাটিকার দৃশ্য আছে। আট মিনিটব্যাপী এই জলনাটিকার দৃশ্যে নায়িকা সায়রাবানুসহ দশজন ফরাসী সুন্দরীকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে। ইস্টম্যান কলারে এই দৃশ্যটি গৃহীত হবে।

• • • •

আসাম রাজ্যের জনসংযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযাদব দত্ত

বিশ্বজিৎ ও অনৈক শিশু শিল্পী

জানিয়েছেন যে, আসাম রাজ্যে স্থানীয় রাজ্য সরকার একটি ফিল্ম ষ্টুডিও নির্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করছেন। অসমীয় চিত্রগুলি এখন কলকাতায় এবং অন্যান্য চিত্রনির্মাণকেন্দ্রে নির্মিত হয়ে থাকে।

• • • •

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের আগামী অবদান 'দ এগনি এ্যাণ্ড দ এক্সট্যাসি'। আর্ভিং স্টোনের এই বিখ্যাত উপন্যাসটির সঙ্গে বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেরই পরিচয় আছে। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস এবং মাইকেলাঞ্জেলোর সম্বন্ধ এই উপন্যাসের উপজীব্য। ছবিটি ইতালি ও হলিউডে গৃহীত হবে। মাইকেলেঞ্জেলোর ভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রখ্যাত অভিনেতা চার্লটন হেস্টন।

• • • •

জনপ্রিয় অভিনেতা ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার ব্যক্তিগত জীবনে সম্প্রতি এক বিরাট বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। তাঁর পুত্র ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা জুনিয়ারকে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে একদল দস্যু আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে একটি মটেল থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মুক্তিমূল্য স্বরূপ দস্যুদল দাবী করেছিল দু' লক্ষ চল্লিশ হাজার ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় বারো লক্ষ টাকা। এই দাবী মিটিয়ে পুত্রকে দস্যুর কবল থেকে মুক্ত করেছেন ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা। পুলিশও এত বড় ঘটনায় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে নি। আশার কথা যে, এক বড় দুষ্কর্মকারী দস্যুদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

দেবতার গ্রাস

রবীন্দ্রনাথের অমর কাব্যসৃষ্টি 'দেবতার গ্রাস'কে চলচ্চিত্রের রূপ দিতে মনস্থ করেছেন তরুণ চিত্রপরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। বাঙলার রসিকসমাজে এই সংবাদ সাড়া জাগাবে এ আশা পোষণ করা যায়। চরিত্রগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, রুমা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। এই অভিনন্দনীয় প্রয়াসে পার্থপ্রতিম পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করুন এই কামনা করি।

তা হ'লে?

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত 'তা হ'লে' ছবিটি মুক্তির দিন গুণছে। এক অভিনব আঙ্গিকে গৃহীত হাস্যরসাশ্রয়ী এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন গুরু বাগচী। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অমিত দে, অনুপকুমার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, সন্ধ্যা রায়, গীতা দে, রেণুকা রায় প্রভৃতি।

সুলতা চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় : নির্মীয়মাণ এক বিশিষ্ট চিত্রের রূপসজ্জায় ।

সিঁদুরে মেঘ

সরোজ সেনগুপ্ত প্রোডাকসান্সের প্রথম অবদান 'সিঁদুরে মেঘ' ছবিটি পরিচালনা করছেন সুশীল ঘোষ। সুরারোপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অসিতবরণ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, গীতা দে প্রভৃতি শিল্পিবর্গ বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন।

শৌখীন সমাচার

দুর্গাদাস

ন্যাশনাল এ্যাণ্ড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশান ক্লাবের [illegible] শাখার সভ্যরা দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন সনৎ গোস্বামী, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন রায়, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বিশ্বাস, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ বসু, রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন সেনগুপ্ত, সুবোধ দাস, অশোক গুপ্ত, [illegible] রায়চৌধুরী, রূপম বসু, বৈদ্যনাথ মিত্র, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, গীতা প্রধান প্রভৃতি শিল্পিবর্গ।

কর্ণার্জুন

মুর্শিদাবাদ আবকারী বিভাগের সভ্যগণ অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকটি অভিনয় করলেন। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন সুব্রত ঘোষ, কালীকৃষ্ণ দত্ত, রমেন মুখোপাধ্যায়, অমূল্য চক্রবর্তী, সন্তোষ সমাদ্দার, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদ বসু, অজিত নাথ, বিপ্রদাস সিংহ প্রমুখ শিল্পীর দল।

টিপু সুলতান

বেহালা কল্যাণ সঙ্ঘের সভ্যরা নিবেদন করলেন 'টিপু সুলতান' নাটকটি। চরিত্রগুলির রূপদান করেন তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন চৌধুরী, নির্মলকুমার ঘোষ, দিলীপকুমার বিশ্বাস, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, অজয় চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব দাশগুপ্ত, সুধীরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমল সিংহ, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল মুখোপাধ্যায়, তপন সেনগুপ্ত, শান্তিরাম দে মল্লিক, বনানী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা দত্ত, শীলা মুখোপাধ্যায়, সতী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি শিল্পিবৃন্দ।

বর্তমান সংখ্যার রূপপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী চিত্ত মণ্ডল, সোনা চৌধুরী, অমল ঘোষ ও ষ্টুডিও মীরেন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

ওঁ শান্তি।

শতাব্দীর সীমারেখা অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই মার্কিন মুলুককে আরও একবার সেই ভয়াবহ চিরনিন্দিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। আরও একটি মহৎ প্রাণের বলি হইল রাজনীতির যূপকাষ্ঠে। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে লিঙ্কনহত্যার মত মোটরে ভ্রমণরত কেনেডি হত্যাকাণ্ডও এ্যামেরিকার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে কালিমা লেপন করিল। দুঃখ-জর্জর, সমস্যাপ্রপীড়িত, সঙ্কটসঙ্কুল বর্তমান পৃথিবীর গতিপথ কেনেডিই পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। অশান্তি অসন্তোষের নিদারুণ গহ্বর হইতে শান্তি ও সমৃদ্ধির আনন্দঘন প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তিনিই পৃথিবীকে উপনীত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এক অদ্বিতীয় ছাপ রাখিয়া গিয়াছে মানবসমাজে। তার বিষবাষ্প শুধুমাত্র হিরোশিমা নাগাসাকিকেই ধ্বংস করে নাই, তাহার সর্বনাশা লেলিহান শিখা মানবসমাজের সর্ববিধ আনন্দ, সম্ভাবনা ও প্রশান্তিকে গ্রাস করিয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। যে মুক্ত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত হাসির হিল্লোলে জগৎসমাজ পরিপ্লাবিত হইয়া যাইত সেই হাসি আজ শুধু একটি সুখস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নহে। মুক্ত প্রাণের সঙ্গীতের যে সুরধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিত তাহার সুর আজ কাটিয়া গিয়াছে। ঘটিয়াছে তালভঙ্গ। যে প্রাণস্পন্দন সমগ্র মানবসমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে সে স্পন্দন আজ যেন স্তব্ধ। জগতের এই সর্বনাশা দুর্যোগে সারা জগৎকে এক মিলনের মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া এক নবতর জগৎ গঠনে আত্মসমাহিত ছিলেন দেশদেশান্তরবন্দিত এই জননায়ক।

এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে তাঁহার আবির্ভাব। রাষ্ট্রপতির আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন মাত্র তিনটি বৎসর। এই তিনটি বৎসর অজস্র সমস্যা তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। রাষ্ট্রপতি হিসাবে কুসুমাকীর্ণ পথে পা ফেলিবার তিনি অবকাশ পান নাই, দুর্গম পথেই তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গুরুতর বিষয়গুলির প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনায় ইনি যে অভূতপূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন ইতিহাস তাহার সাক্ষী হইয়া রহিল। এ্যামেরিকার তরুণতম মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়জন। এই তালিকায় থিওডোর রুজভেল্টের নামটি প্রথম স্থানাধিকারী, কিন্তু আয়ুষ্কালের দিক দিয়া তিনিই তরুণতম। বিশ্বের ঘোরতর দুর্দিনে শান্তির পবিত্র বার্তাবহ হিসাবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কেনেডির আবির্ভাব ঈশ্বরের এক শুভ আশীর্বাদ। কিন্তু এই অসময়ে করুণভাবে তাঁহার প্রয়াণে ঈশ্বরের কি অভিলাষ পূর্ণ হইল তাহা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কাহারও জ্ঞাত নহে। সর্বনাশের অন্ধকারে তিনি ছিলেন আশার আলো। শান্তির বাণী তিনি পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন মিলনের মহান মন্ত্র তিনি জগতকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় সারা পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে এই অবস্থায় মিলন, ঐক্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য ব্যতীত আজ আর পৃথিবীর বাঁচিবার অন্য কোন পথ নাই—এই মহান সত্যটিকেই তিনি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই শান্তির মঙ্গলশঙ্খে ধ্বনিতরঙ্গ তুলিবার কার্যকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন জীবনের সাধনা হিসাবে।

কেনেডি তাঁর রাষ্ট্রনায়ক জীবনকে কেবল তাঁর প্রধান কর্মে অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার পুণ্যকর্মে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারে এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক উন্নয়নমূলক কার্যে তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ট্রুম্যান আইসেনহাওয়ারের এ্যামেরিকার আকৃতি-প্রকৃতির সহিত কেনেডির এ্যামেরিকার আকৃতি-প্রকৃতির আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আমাদের ভারতরাষ্ট্রের এক ঘনিষ্ঠ, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। ভারতের দুর্যোগে তাঁহার বন্ধুর হস্তটি ভারতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতে তিনি কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সময়ে ভারতরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের নিকট নানা ভাবে সহযোগিতা পাইয়া আসিয়াছে। ভারতের উন্নয়নে কেনেডির উৎসাহের অন্ত ছিল না।

জীবনে মৃত্যু অপেক্ষা বড় সত্য আর নাই। জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু জীবনের সম্মুখে পরিপূর্ণতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

কেনেডি

মৃত্যুই মানুষকে জীবন হইতে জীবনাতীতে লইয়া যায়। 'মৃত্যু অমৃত করে দান,' মৃত্যুতেই মহাজীবনের সূচনা সুতরাং মৃত্যু জীবনের সার সত্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জানিয়াও এই বেদনা কেন? তাহার উত্তর—ভবজলধির সমুদ্র অতিক্রম করার কৌশল যে কর্ণধারের জানা তাঁহার অভাবে যাত্রীদের কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা অনুভবের বিষয়। তেমনই, বর্তমান পৃথিবীর এই ভয়াবহ অবস্থায় অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু মানব সমাজে কি ভয়ঙ্কর শূন্যতা সৃষ্টি করিল এবং কি বিপর্যয়ের রূপ লইয়া দেখা দিল সে বিষয়ে আজ লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এ ক্ষেত্রেই মৃত্যু বেদনাদায়ক। তাঁহার অসমাপ্ত কার্য কে সমাপ্ত করিবেন জানি না।

এই গভীর শোক শুধু শ্রীমতী জ্যাকলিনের নহে, তাঁহার পুত্র কন্যার নহে, আত্মীয়-স্বজনের নহে, স্বজন-সমাজ দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এই শোক সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, সারা জগতের এই শোকে সমান অংশ। রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এই বেদনাঘন মুহূর্তে আমরা ইহাও বলি কেনেডির ন্যায় চিত্তবিত্তের মহান অধীশ্বরের মৃত্যু নাই, তাঁহাদের ন্যায় মহান বিশ্বাসীদের বিনাশ ঘটে না। কেনেডির জয় হউক।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি

অভিনন্দনযোগ্য

যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের অসহায় পরিবারবর্গের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সহানুভূতিশীল ও হৃদয়ধর্মী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দনীয়। এই সৈনিকদের নিকট আমাদের ঋণের সীমা-সংখ্যা নাই। সে ঋণ অপরিশোধনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুকঠোর সাধনায় এবং শত শত আত্মদানে ও সীমাহীন লাঞ্ছনা ও নির্যাতন বরণে যে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে তাহা রক্ষার দায়িত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই দায়িত্বপালনে যাঁহারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা জাতির নমস্য। তাঁহাদের নিকট আমাদের শুধু ঋণই নয় যথেষ্ট কর্তব্যও আছে। দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যাঁহারা জীবন বিপন্ন করিয়া অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সদা সর্বদা সীমান্তরক্ষায় নিয়োজিত বা যাঁহারা মহামূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়া শত্রুকে প্রতিরোধে সচেষ্ট—বস্তুত তাঁহাদের কল্যাণেই আমাদের পক্ষে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনযাপন সম্ভব হইতেছে। আমাদের শান্তি নিরাপত্তার জন্য ইঁহারা জীবনপণ করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। জননীর স্নেহক্রোড়, প্রিয়ার আলিঙ্গন, সন্তানের সান্নিধ্য হইতে বহুদূরে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ইঁহাদের বাসা বাঁধিতে হয়, যে কোন মুহূর্তে জীবননাট্যের যবনিকাপাত ঘটিতে পারে—যে কোন পরিবেশে প্রিয়জন হইতে বহুদূরে স্বজনবিহীন অবস্থায় ইঁহাদের নিকট পরপারের ডাক আসিবার সম্ভাবনা সর্বতোভাবে বিদ্যমান। সুখশয্যা, মধুর স্বপ্ন ইঁহাদের জন্য নহে, সন্ধ্যার দীপালোক, ঘরের মঙ্গলশঙ্খ ইঁহাদের জীবনে তখন স্মৃতিমাত্র। প্রিয়জনের বাক্যালাপ, স্নেহমধুর সম্ভাষণ, আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখময় একটি সামাজিক জীবন, গৃহকোণের কল্যাণীবধূর সাহচর্যে একটি মধুর রাত্রি, একটি গান, একটি কবিতা, সব স্মৃতি। সম্মুখে তখন শত্রুসৈন্যের গুঢ় ফণা সদা উদ্যত, ইঁহাদের আকাশ তখন মেঘমুক্ত ঘননীল, তারাভরা নহে। ইঁহাদের আকাশে তখন যুদ্ধমেঘের সমারোহ, চতুর্দিকে বজ্রের ভ্রুকুটি, অন্ধকারের অভিসার। কিন্তু এই শত সহস্র প্রতিকূলতার অন্ধকারেও এক দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞাই ইঁহাদের আলো দেখায়। দুর্বার দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত এই সৈনিক সম্প্রদায়ের মূলধন অটুট মনোবল এবং দেশমাতৃকার সুবর্ণ অঙ্গকে সর্বপ্রকার অশুভ অকল্যাণ ও অসুন্দরের স্পর্শ হইতে যোজন-যোজন দূরে রাখা ইঁহাদের একমাত্র সাধনা। নিশ্চিত মৃত্যুও ইঁহাদের পথভ্রষ্ট বা লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না।

এই মৃত্যুপণ বীরসেনানীদের অসহায় পরিবারবর্গের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মোট ছয় হাজার একর জমি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই পরিবারবর্গের জন্য এই সকল জমিতে কলোনী গড়িয়া তোলার প্রয়াস চলিতেছে, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষাদান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদানেরও আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। জাতির জন্য যে বীরবৃন্দ প্রাণপাতেও অগ্রসর, তাঁহাদের পরিবারবর্গের সর্বপ্রকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার জাতির। জাতির প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যসরকার এই ভার গ্রহণ করিয়া কর্তব্যবোধের এক উজ্জ্বল পরিচয় দান করিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সাধুসঙ্কল্প সর্বসাধারণের নিকট যথেষ্ট সমর্থন নিশ্চয়ই লাভ করিবে।

শুধু তাহাই নহে ইহার আরও একটি দিক আছে। সরকারের এই ব্যবস্থা সৈনিকসমাজে যথেষ্ট আশা, উদ্দীপনা ও আনন্দের সঞ্চার করিবে, আত্মীয়স্বজনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা চিন্তার হাত হইতে অনেকখানি অব্যাহতি পাইবেন যাহা তাঁহাদের মনোবল, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শক্তি তথা দেশপ্রেমকে দ্বিগুণ করিবে। ফলত তাহা জাতির পক্ষেও যথেষ্ট কল্যাণকর হইবে।

সরকারের এই একটি ব্যবস্থা একাধিক সুফলেরও প্রতিশ্রুতি বহন করিতেছে। যথা—নিঃসম্বল পরিবারবর্গের সুব্যবস্থা, বিনামূল্যে শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধালাভ, আত্মজন সম্পর্কে সৈনিকদের দুর্ভাবনার বহুল অবসান, সেনামহলে মনোবল ও শক্তিবৃদ্ধি, প্রতিরক্ষাব্যবস্থার আরও দৃঢ়ীকরণ এবং সর্বোপরি জাতির কল্যাণসাধন।

এই সাধুপ্রচেষ্টা অবলম্বনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

অতি বুদ্ধির গলায়…

অতি চতুর ব্যক্তিও এক একটি নিদারুণ ভুল করিয়া বসেন। চাতুর্যের সমারোহের কোন ছিদ্র দিয়া তাহাদের চরিত্রে গর্ব ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করিয়া সকল বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া দিশাহারা করিয়া দেয় সে মহত্ত্বের সূত্র বোধ করি বিধাতাপুরুষ ছাড়া দ্বিতীয় কাহারও জ্ঞাত নহে। গর্বে দিশাহারা হইয়া সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বুদ্ধিবৃত্তি এবং চাতুর্য একমাত্র বুঝি তাহারই অধিকারগত। তখনও সে কি পূর্ণাকারে উপলব্ধি করিতে পারে যে এই নিদারুণ অহমিকা, চাতুর্যের গর্ব তাহার ভাগ্যকে এক সর্বনাশা পতনের অভিমুখে ধাবিত করিতেছে? পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাইয়ের বর্তমান অভিনব ক্রিয়াকলাপাদি এই কথাগুলিকেই স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এ কথা কোনরূপেই অস্বীকার করা চলে না এবং আশা করি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানবদরদী সমাজপ্রেমী ব্যক্তিমাত্রেই এ বিষয়ে আমাদিগের সহিত একমত হইবেন যে, যেখানে বহু অশান্তি, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও নিদারুণ বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত পৃথিবী শান্তির জন্য ব্যাকুল, শান্তির সাধনায় সর্বশক্তি দিয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে সেক্ষেত্রে এই দুই রাষ্ট্রই তাহার সকল সাধনাকে, মহৎ প্রচেষ্টাকে বানচাল করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। লোভের ও ঈর্ষার অগ্নিতে ইহারা জ্বলিতেছে, স্বার্থসিদ্ধির অজুহাতে যে কোনপ্রকার কুকর্ম করিতে ইহাদের হস্ত সদা প্রসারিত। সমগ্র বিশ্বশান্তির প্রধান অন্তরায় এই দুটি রাষ্ট্র। সারা বিশ্বে ইহাদের স্বরূপ চিনিতে কাহারও বাকী নাই। অতি বড় দুঃখের দিনেও হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইল যেদিন জানা গেল যে রাম-লক্ষ্মণ এই দুইটি ভ্রাতা শান্তি স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশে দেশে শান্তির বাণী শুনানোই নাকি এখন ইঁহাদের প্রধান কর্মসূচী। বিশ্বশান্তিক্ষেত্রে ইহা যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ।

লাই (যে ইংরাজী শব্দটির বাঙলা অর্থ 'মিথ্যা') এবং খাঁ সাহেবদের উভয়ে এত বুদ্ধিমান পররাজ্য গ্রাসের কতপ্রকার ফন্দী-ফিকির তাঁহাদের জানা, পররাজ্যের বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচারের কত কৌশল তাঁহাদের করায়ত্ত অথচ এই সামান্য বুদ্ধিটুকু তাঁহাদের মাথায় আসিল না যে, তাঁহাদের শান্তির মুখোশের অন্তরালে যে কুৎসিত মুখ আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে বর্তমানকালের বিশ্ববাসীর কোন অস্পষ্টতা নাই। যেমন কোন লম্পট অপর ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া তাহার প্রতিকার দাবী করিলে বা কোন দাগী চোর চুরির অভিযোগে অন্য কোন ব্যক্তির গ্রেপ্তার প্রার্থনা করিলে যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় আন্তর্জাতিক সমাজে ইঁহাদের এই শান্তিভিক্ষার আবেদনও তাহাই ঘটিতেছে। সারা বিশ্বের নিকট এই লাই-খাঁ দুটি নিজেদের হাস্যাস্পদই করিয়া তুলিলেন। জগৎ দেখিল শুধু নীচতা, লোভ ও হিংসাবৃত্তিতেই নয় মূর্খামির ক্ষেত্রেও ইঁহাদের জুড়ি নাই।

খাঁ সাহেব চাহিলেন দ্বিতীয় বান্দুং সম্মেলন, লাই মহাশয় দৃষ্টিপাত করিলেন আফ্রিকার দিকে। ভাবিলেন এই অনগ্রসর দেশগুলিকে হাতে আনা খুব সহজ হইবে। ইহাদের বুঝানো খুব সোজা যে ভারতটা অতি দুর্বৃত্ত, আমি অতি সজ্জন, অতএব যে শত্রুকে!

আমাকে ভজনা কর। কিন্তু ইহা বুঝিলেন না যে আফ্রিকার আকাশে অন্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের, সভ্যতার ও বুদ্ধির সূর্যের সুপ্রসন্ন আবির্ভাব ঘটিতেছে, এই মনোহর সূর্যের অভ্যুদয়ে আফ্রিকা আজ সর্বপ্রকার অন্ধকারের কবল হইতে মুক্তি পাইতেছে। খাঁ সাহেব সিংহলে আসর জাঁকাইয়া বাজী মাৎ করিবার চেষ্টা করিলেন এমন কি টীকা-টিপ্পনী ব্যাখ্যার জন্য হবুচন্দ্র আর গবুচন্দ্র জুটাটিকেও সঙ্গে লইতে ভুলিলেন না কিন্তু তাঁহার 'নসীব' নামক পদার্থটিই তাঁহার সহিত অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসিল। হালে পানি মিলিল না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষকদলও স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভারতের দ্বারা লঙ্ঘিত হয় নাই, হইয়াছে পাকিস্তানের দ্বারা।

এক্ষণে ইঁহাদের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপগুলির প্রচারিত মুখ্য উদ্দেশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং করে রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি। নিরপেক্ষতার আত্মপ্রবঞ্চনাকারী চীন নিরপেক্ষতার মন্ত্রোচ্চারণে রত, শান্তি-ধ্বংসকারী পাকিস্তানের মুখে শান্তির বুলি ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জ ভণ্ডামী আর কিছু হইতে পারে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ভূতের মুখে রামনাম অপেক্ষাও ইহা অবাস্তব।

হিন্দুর সর্বস্ব লুণ্ঠন, ধর্মান্তরকরণ, হিন্দু নারীর সম্ভ্রম নাশ, অন্যায় ভাবে আটকীকরণ, সীমান্তে গুলীবর্ষণ, অতর্কিতে অসহায় ভারতীয়দের অপহরণ, দেশে দেশে ভারতের নামে কুৎসা প্রচার, ভারতের শান্তি-নীতির অভিসন্ধিমূলক বিকৃত ব্যাখ্যা যে পাকিস্তানের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য তিনি চান শান্তি? চীন দোহাই পাড়ে নিরপেক্ষতার? সুখের বিষয় ইহাদের প্রতারণায় জগৎ বিভ্রান্ত হয় নাই। শান্তির জন্য জগতকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হইতেছে, শান্তির দুশ্চর তপস্যায় জগৎ এখনও পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই। এই অবস্থায় শান্তির মুখোস পরিয়া যে ছদ্মবেশী দস্যু তাহার উৎখাতে ব্যস্ত সে বা তাহারা শুধুমাত্র যে আমাদেরই শত্রু তাহা নয়, সমগ্র মানবসমাজের তাহারা এক বিষাক্ত ক্ষত।

পররাজ্যগ্রাসে যাহাদের লোলুপ হস্ত সর্বদা প্রসারিত, ন্যায়নীতির সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, বিবেক যাহাদের মধ্যে চির অনুপস্থিত, শান্তিকামী পার্শ্বরাজ্যের সর্বনাশসাধন যাহাদের লক্ষ্য, সমগ্র বিশ্বকে প্রতারিত করিয়া অভীষ্ট সাধনে যাহারা বদ্ধপরিকর তাহারা যে কোন লজ্জায় শান্তি ও নিরপেক্ষতার বুলি আওড়ায় তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

॥ শোক-সংবাদ ॥

কমলিনী দেবী

ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লিথ্যাজীবনীকার শ্রীম—স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাস্টারমশায়ের পুত্র স্বর্গত প্রভাসচন্দ্র গুপ্তের সহধর্মিণী কমলিনী দেবী গত ২৬এ অঘ্রাণ জাতির পুণ্যতীর্থ কথামৃত ভবনে ৭১ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক পরিবারের স্বর্গত প্রিয়মাধব মল্লিকের ইনি কন্যা ছিলেন। বিচারপতি শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক এঁর ভ্রাতা। পরমপূজ্যা মাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর নিকট ইনি দীক্ষা ও বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত হন। ইনি অতিশয় ভক্তিমতী এবং দানশীলা ছিলেন। এঁর চার পুত্র, এক কন্যা এবং নাতি-নাতনী বর্তমান।

হুসেন শহীদ সুরাবর্দী

অবিভক্ত বঙ্গের শেষ ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং কলকাতার প্রথম ডেপুটি মেয়র হুসেন শহীদ সুরাবর্দী গত ১৮ই অঘ্রাণ ৭১ বছর বয়সে লেবাননে পরলোকগমন করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ ও বি, সি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনান্তে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। হক মন্ত্রিসভায় ইনি অর্থ, জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভায় ইনি খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৪৬-এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় ইনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ইনি গ্রেপ্তার হন ও কিছুকাল পরে মুক্তিলাভ করেন। বাগ্মী হিসাবেও ইনি খ্যাতিমান ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ দে

কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে গত ১৫ই অঘ্রাণ ৭২ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি ডি. এস. সি (ইঞ্জিনিয়ারিং) উপাধিলাভ করেন। দেশবন্ধুর আহ্বানে ইনি পৌরপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। মৃত্যুর পূর্বে পৌরপ্রতিষ্ঠানের কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার এবং রাজ্যসরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার চেয়ারম্যানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বঙ্গীয় কারিগরি বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটির সভাপতির আসনও তাঁর দ্বারা অলংকৃত।

যোগমায়া দেবী

বাগবাজারের স্বর্গত আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র স্বর্গত যোগনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী গত ২৫এ অঘ্রাণ ৭৫ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি কামারপুকুরের স্বর্গীয় পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। ইনি অতিশয় ধর্মপ্রাণা, পরহিতব্রতী এবং মধুর স্বভাবা ছিলেন। মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী ও অগণিত আত্মীয়পরিজন রেখে গেছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[শ্রী সরস্বতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১০০নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত]

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, পত্রের আরম্ভেই আপনি আমার বিনীত নমস্কার গ্রহণ করুন। আশা করি, ৺ভগবৎ কৃপায় কুশলেই আছেন। 'মাসিক বসুমতী' সম্বন্ধে দুই-একটা কথা লিখছি—ব্যাপারটা কতখানি গ্রহণসাপেক্ষ, তার বিচার আপনার মত বিচারকের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি। 'মাসিক বসুমতী'র আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠক ও গ্রাহক, তা আপনার অজানা নেই। এই পত্রিকা পাঠ ক'রে আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত। উপকৃত কি ভাবে তা যদি জিজ্ঞেস করেন তাহ'লে বলবো কতখানি যে বাইরের জ্ঞান লাভ করেছি, করছি বা করব এই পত্রিকাটির মাধ্যমে, তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হ'তে হয়। আচ্ছা সম্পাদক মশাই, একটা কথা আপনাকে লিখছি—আপনি আমার প্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে তা ছেপে পাঠক সমীপে উপস্থিত করবেন। আমি আপনার পত্রিকার একজন বিশেষ ভক্ত, এ ছাড়াও আমি অন্যান্য বেশ কয়েকটি পত্রিকার গ্রাহক। বসুমতীর কিসে ভালো হয় বা মন্দ হয়, কতখানি উন্নতি হ'ল বা কতখানি অবনতি হল, যা দেখি তা আপনার পত্রিকায় লিখি। আপনিও তা ছেপে সমগ্র ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে ক'রে তুলেছেন আমার পরিচিত। কেন বিশ্ব কথাটা লিখলাম, যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো যে, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছে আমার প্রিয় পত্রিকার গ্রাহক। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে কেউ আমার কাছে চাকরীর জন্য লেখে, কেউ বা আমার কাছ থেকে ব্যক্তিগত উদ্ধারের জন্য চিঠি লেখে। আমি এই চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে জানাতে চাই যে আমি সাধারণ একজন 'বসুমতী'র পৃষ্ঠপোষক। আমি বাংলা ভাষাকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসি, কাজেই কতগুলি বাংলা পত্রিকার গ্রাহক হ'য়ে আমি দেখতে চাই বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে আজ কতখানি? কতগুলি বিষয় যখন আপনাকে কিছু জানান দরকার মনে করি, তখনই জানাই। আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক। এখন আমার প্রাণাধিক প্রিয় 'মাসিক বসুমতী' সম্বন্ধে দুই-একটা কথা লিখি। যা হঠাৎ আপনাকে জানান উচিত মনে হ'ল। কতখানি গ্রহণসাপেক্ষ তা আপনিই বিচার ক'রে দেখাবেন। 'মাসিক বসুমতী'র কথামৃত বিভাগে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। অনুবাদ সত্যিই সাধুবাদের দাবী রাখে। আপনার সম্পাদনা নির্ভীক ও বলিষ্ঠ। আচ্ছা সম্পাদক মশাই, মাসিক বসুমতীর এক-পাতা মহাপুরুষদের ছবি ছাপালে কি পত্রিকাটির অঙ্গসৌষ্ঠব একটু বৃদ্ধি হ'ত না? 'আলোকচিত্র' বিভাগটি সুন্দর লাগে। 'চয়ন' বিভাগের কথা মনে আসতেই আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়ে আসে। উঃ, কি সুন্দর বিভাগটি। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্য কোন পত্রিকায় এত সুন্দর ভাবে বাঙালীকে চেনার পথ নেই। নারায়ণবাবু ও প্রাণতোষবাবুর (আপনার) জীবনী জানতে চাই। তাঁরা যে বাংলা দেশের উজ্জ্বল ভাস্করস্বরূপ। মাসিক বসুমতীতে শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হুইটম্যানের কবিতার বঙ্গানুবাদ দেখতে ইচ্ছুক। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্ষণস্মৃতি' নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথম সারির মধ্যে একটি। এত স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবগণকে আমাদিগের সাথেও পরিচয়ের বন্ধনে বাঁধিয়েছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। 'বার্ধক্যে বারাণসী' খুব ভাল লাগছে আপনার লেখা চাই। নমস্কারান্তে—তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, মজুলিয়াগড়-টি এস্টেট পোঃ—মুড়িয়া, দরং, আসাম।

মহাশয়, আমাদের সুপরিচিত, বহুল প্রচারিত 'মাসিক বসুমতী'র অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মধ্যে আমি একেবারেই নূতন। মাসিক বসুমতীর আমি গুণমুগ্ধ। মাত্র দু' মাস হলো আমি বাঙলার সারগর্ভ ঐ পত্রিকাটির গ্রাহক হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। বইটি হস্তগত হবার সাথে সাথেই পরম আগ্রহে পড়তে শুরু করি এবং পত্রিকাটির অমূল্য রচনাসম্ভার আমাকে প্রচুর আনন্দ দান করে। এমন একটি পুঁথি পাঠ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। মহাশয়, আপনার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ জানাবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাসিক বসুমতীর সামান্য একজন পাঠক হিসেবে আমার অনুরোধ রাখবেন। মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনীনিঃসৃত রচনাবলীর সাথে পরিচয় করার দুর্নিবার এক ইচ্ছা পোষণ করছি এবং তা আমার প্রিয় ঐ পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যার মাধ্যমে। আমাদের মতো কলমপেষা কেরাণীকুলের পক্ষে ঐসব গ্রন্থ ক্রয় করে পড়ার সামর্থ্য নাই। নিশ্চয়ই আমি আশা করতে পারি আমার আর্জি মঞ্জুর করবেন। মাসিক বসুমতী বাঙলা তথা বিশ্বের সম্মানিত মহামনীষীদের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির কুসুমিত বিজয়বৈজয়ন্তীর মাল্যে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে পল্লবিত বিকশিত করে বিস্তার করুক, আমরা তার বুক থেকে মনোমুগ্ধকর পুষ্পরাজি চয়ন করবো। উৎসাহী পাঠক পাঠিকাবৃন্দকে আনন্দে এমনি মুখরিত করে তুলুক 'মাসিক বসুমতী' এই আমার কামনা। নমস্কার। ইতি—শ্রীরাকেশরঞ্জন মালাকার (সর্টার) রাঙ্গিয়া আর· এম· এস, কামরূপ। আসাম।

মহাশয়, 'কবি সেখ সাদী'-খ্যাত 'সাহিত্যে'র শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের 'শ্রদ্ধাবৃত্তি' পাঠ করে পরম প্রীতি লাভ করলাম—আরো পাবার আশায় রইলাম। ৪০।৪৫ বছর পিছিয়ে গিয়ে যে চাইছে এই শ্রদ্ধেয় গুরুজনকে প্রণাম নিবেদন করতে। টিকা

দেওয়া সম্ভব হলে দেবেন ; নতুবা এই পত্রখানি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হবো। বিনীত—শ্রীবিবেকানন্দ পাল, ২১-ডি কার্ণ রোড, কলিকাতা-১১

বেচতে চাই

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,—আমি ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৬৯ সালের মাসিক বসুমতীগুলি অক্ষত অবস্থায় অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিতে চাই। কেহ কিনিতে ইচ্ছুক থাকিলে নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি—শ্রীচুনীলাল সরকার, ৺কালীচরণ পালের বাড়ি, সেন্ট্রাল রোড, পোঃ—শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,—আমরা নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতী অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিতে চাই। কেহ কিনিতে ইচ্ছুক থাকিলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ স্থাপন (যত শীঘ্র সম্ভব) করিতে অনুরোধ করি। এই বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর আগামী সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত হইলে বাধিত থাকিব। নমস্কার জানিবেন। ১৩৬৭—বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৬৮—বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৬৯—বৈশাখ-চৈত্র। ইতি—মিস স্বপ্না মুখার্জী, দেবব্রত মুখার্জী ও সুব্রত মুখার্জী, ১, ক্রীক রো, কলিকাতা—১৪।

ভ্রম সংশোধন

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় আশা করি কুশলে আছেন। আশ্বিন মাসের মাসিক বসুমতীতে আপনি আমার যে চিঠিটি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে একটু ত্রুটি রহিয়াছে। খোদিত মূর্তিটি এলিফ্যান্টা নয়—মাদ্রাজের নিকট মহাবলিপুরমের। ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন। শীঘ্র আমি একটি কভার পাঠাইতেছি। নমস্কার জানিবেন। ইতি—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত, ১৬০ জবাহর নগর, গোরেগাঁও, বোম্বাই—৬২।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

সচিব, পি এণ্ড টি রিক্রিয়েশান ক্লাব, গ্যাংটক, সিকিম • • • শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বরগণ্ডা, ডাক—গিরিডি, গিরিডি • • • শ্রীহরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৪এ/৮০ ডব্লিউ. ই. এ, নয়াদিল্লী-৫ • • • শ্রীমতী শান্তিলতা পাল, টি২৩সি ইউনিট নং ৪, ট্র্যাফিক সেটেলমেন্ট, খড়্গপুর • • • সচিব, রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট, ডি. বি. কে, রেলওয়ে প্রোজেক্টস, কোরাপুট উড়িষ্যা • • • Sri S. C. Mazumder, A. D. E. Ministry of Irrigation H. E. P. Wad-Medani, SUDAN (Africa) • • • শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ—রবীন্দ্র পাঠাগার, জেলা ও গ্রাম—গঙ্গাধরপুর (কাটনা হয়ে), জেলা—বর্দ্ধমান • • • ডাঃ টি. কে. রায়, ভেটেরিনারী অফিসার, ডাক ও জেলা—গোণ্ডা, উত্তরপ্রদেশ • • • শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, গ্রাম—নন্দবাড়ি, ডাক—লোয়াড়া (মেদিনীপুর) ভেবরা হয়ে • • • শ্রী এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ—শ্রী আর, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস, ইউ, মিশন্ পাল্লী, মাড়োয়ার, রাজস্থান • • • শ্রীমতী অর্পণা ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ—ডাঃ কি ভট্টাচার্য, এম, ও আই, সি, পাবলি ডিসপেন্সারী, ডাক—পায়রী, জেলা—বানসওয়ারা, রাজস্থান • • • শ্রী এ, সি, দত্ত, ম্যানেজার, অধ্যক্ষ—সি, এফ, সিণ্ডিকেট লিমিটেড, ডাক—বরাহুর, জেলা—বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ • • • তত্ত্বাবধায়ক, নর্মাল স্কুল, ডাক—শিলচর, জেলা—কাছাড়।

Remitting herewith Rs. 15/- towards my yearly subscription. Please acknowledge receipt. A. K. Sengupta.

Annual sul scription of Masik Basumati from Kartik'70 to Aswin 1371 B. S. Principal. Berhampore Girls' College.

One year subscription for 'Basumati' Bengali Monthly is sent herewith kindly acknowledge and arange to supply the above journal commencing from Dec' 63 and oblige. Thanking you, Secretary Railway Institute. Koraput.

আজ ৭.৫০ নঃ পঃ ডাকযোগে পাঠালাম কার্তিক সংখ্যা থেকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাতে অনুরোধ করি। অর্পণা ভট্টাচার্য রাজস্থান।

Sending herewith Rs. 15/- for yearly subscription please accept it and oblige me by sending a receipt. Kalyani Roychowdhuri. Kanpore.

১৩৭০ সনের কার্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যার মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৭.৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী লীলা রায়।

Remitting subscription for one year (Rs. 15/-). Address remaining same. Mamata Ghosh. Patna.

আগামী ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে বাধিত করিবেন। রেবা দে, কলিকাতা।

মাসিক বসুমতীর জন্য আগামী ছয় মাসের চাঁদা বাবদ সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া সুখী করিবেন। অপর্ণা সান্যাল। শিলচর।

কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত ছয় মাসের চাঁদা টাঃ ৭.৫০ পাঠাইলাম। আশা করি যথা সময়ে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া আনন্দ দান করিবেন। বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার কামনা করি। বীণা দত্ত। বালুরঘাট।

Remitting herewith Rs. 15/- being the yearly subscription which commenced from last Kartik. Hony. Secretary. Rly Institute. Assam.

This is towards the annual subscription of Monthly Basumati. Secretary, Burdwan.

আমাদের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। আমাদের গ্রাহিকাভুক্ত করে বাধিত করবেন। সেক্রেটারী, শান্তিময়ী বালিকা বিদ্যালয়।

Rs. 15/- is sent herewith being the price of Monthly Basumati for the year 1371 B. S. Amiya Debi.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

(তৈলচিত্র)

ফুলের বাহার

—শ্রীমতী গৌরী কাঞ্জিলাল অঙ্কিত

৪২শ বর্ষ | দ্বিতীয় খণ্ড
পৌষ ১৩৭০ | তৃতীয় সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

অপর কাহাকেও অনুসরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজে পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন।

তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর—আমি যে তোমাদের স্বদেশীয় ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া বরং তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর, আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না।

সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে। সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন। সে চারিদিক হইতে কতকগুলো এলোমেলো ভাব লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই। সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। এরূপ ভাব আমি চাহি না, বরং নিজের যাহা আছে তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও।

লোকে বলিয়া থাকে বাঙালী জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে, কিন্তু বন্ধুগণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিস হইতে পারে, কিন্তু উহা বেশিদূর যাইতে পারে না। অতএব বাঙালীর দ্বারাই—ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই—ঐ কার্য সাধিত হইবে।

এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানে 'অভীঃ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ' নির্ভীক হইতে

হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ আমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। যুবা আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী—তাহাদিগের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দখিয়াছে—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।

জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে। আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে সেই মুহূর্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুখ্য কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার, নির্ভীক হইলে এক মুহূর্তেই স্বর্গ পর্যন্ত আবির্ভূত হয়! অতএব উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

যে মনুষ্যত্বহারী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতাপূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীনকালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগেই আবার ভারত জয় করিবে।

● স্বামী বিবেকানন্দর একটি অপ্রচলিত চিত্র

কোন জাতির কিংবা ব্যক্তির পক্ষে বড় হইতে হইলে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—

(১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব
(৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎকাজ করিতে সচেষ্ট তাহাদিগকে সহায়তা করা।

পবিত্রতা সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটি গুণ—আবার সর্বোপরি প্রেম—সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক।

জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার নষ্ট হইলে আর উঠে না। একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।

আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজ সকল আমাদিগকে জোর করিয়া যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কার্য করিতে চেষ্টা করা বৃথা। উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অপর জাতির ন্যায় গড়িতে পারা অসম্ভব, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অপর জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। অপরবিধ বিজ্ঞান, অন্তবিধ পরম্পরাগত সংস্কার এবং সহস্র সহস্র বর্ষের কর্ম রহিয়াছে, সুতরাং আমরা স্বভাবতই আমাদের সংস্কারানুযায়ী চলিতে পারি—আর আমাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে।

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য সাধনের ভিন্ন ভিন্ন কার্যপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজ-সংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান অবলম্বন করিয়া কার্য করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া নহিলে কার্য করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির সহায়ক ধর্ম বুঝেন, বোধ হয় মার্কিন সমাজ-সংস্কারের সহায়তায় সহজে ধর্ম বুঝিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু রাজনীতি সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু সবই ধর্মের ভিতর দিয়া নহিলে বুঝিতে পারেন না। জাতীয় জীবনসঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু উল্টাপাল্টা করা মাত্র।

'ভারত উদ্ধার' সম্বন্ধে যাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারা জীবন কার্য করিতেছি, অন্তত কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃত ধার্মিক হইতেছ ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। ইহার উপর শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

ভারতে ধর্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবন-রূপ সঙ্গীতের প্রধান সুর।

সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তি-স্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীসমূহ তোমাদের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া তাহাদের সুর বাজাইতে থাকুক। —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

জে, এফ, কেনেডির

দুই ভাই

বব ও টেডি

'জ্ঞানপিপাসু'

মার্কিন দেশে বর্তমান সময়ে কেনেডি-পরিবারের যে জয়জয়কার, তা শুধু জ্যাকের (প্রেসিডেন্ট কেনেডির) মহান আত্মবিসর্জনের জন্তই নয়—জ্যাকের অন্তান্ত ভাইদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানবার সুযোগ যাঁদেরই হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করবেন।

কেনেডি-পরিবারের বর্তমান পুরুষের যে চারটি ছেলে তাঁদের প্রত্যেককেই নানা কারণে অসাধারণ মনে হয়। বড় ভাই ছিলেন জোসেফ। জোসেফ লেখাপড়ায় যেমন ভালো ছিলেন, তেমনি ছিলেন খেলাধূলোয় এবং রাজনীতিতে। টেনিস, বেসবল এবং ফুটবল—তিন রকমের খেলাতেই হাজার হাজার দর্শকের উত্তেজিত প্রশংসা তিনি পেয়েছিলেন। কলেজের পড়াশুনো শেষ করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন জোসেফ। বন্ধুবান্ধবেরা সবাই বলতো: রাজনীতিতে জোসেফ নিশ্চয়ই একদিন খুব নাম করবে।

আর জোসেফ নিজে বলতেন: নাম করবো মানে? বলিস কি তোরা? শুধুই নাম করবো? না-না, প্রেসিডেন্ট আমি হবোই।

কিন্তু বিধি বাধ সাধলো। মার্কিন দেশের প্রেসিডেন্ট হবার দৃঢ়বাসনা নিয়ে ডেমোক্র্যাট পার্টির তরুণকর্মী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্বদেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের সঙ্গে 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' খুলবার জন্তে সেই যে ইয়োরোপ গেলো—দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হলো বটে, হিটলারও নিপাত হলো, কিন্তু জোসেফ আর ফিরলেন না। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে স্বদেশের হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

দ্বিতীয় ভাই জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির নাম আজকের পৃথিবীর মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। ডালাসে আততায়ীর গুলি এঁকে অমরত্ব দান করেছে। এ পরিবারের আর যে দু'টি ভাই এখনো জীবিত রয়েছেন তাঁরা হলেন: তৃতীয় রবার্ট (বব) এবং চতুর্থ ফ্রান্সিস (টেডি)।

রবার্ট বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাটর্নী জেনারেল। স্বর্গত প্রেসিডেন্টের চাইতে বয়সে দু'বছরের ছোট। বর্তমান বয়স চুয়াল্লিশ।

থিয়োডোর হোয়াইট নামে একজন বিখ্যাত সাংবাদিকের একখানা বই বেরিয়েছে কিছুদিন আগে—'The Making of the President 1960.' কেনেডির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নানা ঘটনা, তার উদ্যোগপর্ব, ভোটাভুটির সংখ্যানুপাত—ইত্যাদি সব কিছু সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এ বইতে। ছোট ভাই রবার্ট ছিলেন জ্যাকের 'ক্যাম্পেন ম্যানেজার'। থিয়োডোর হোয়াইট বলছেন: 'রবার্টের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সংগঠন শক্তি দেখে আমেরিকার সমস্ত ঝানু ঝানু রাজনীতির পাণ্ডারাও অবাক হয়ে গেছে। কোনো বাঁধাধরা থিয়োরীর মধ্যে রবার্টকে ফেলা চলবে না। তিনি নিজেই একটা নতুন থিয়োরী এবং নতুন ধরণের প্র্যাকটিসের মূর্তপ্রকাশ।

জ্যাক নির্বাচনে জয়ী হবার পরে রবার্টকে সরকারের এ্যাটর্নী জেনারেল পদে নিয়োগ করলেন। অনেকে এ নিয়ে চাপা গুঞ্জন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। এমন কথাও শোনা গেছে যে, জ্যাক 'কেনেডি ডাইনাসটি' স্থাপন করছেন। তরুণ প্রেসিডেন্ট এ সমস্ত চোরা-চাপা কথায় কান না দিয়ে একাধিকবার স্পষ্টই বলেছেন: রবার্টের চাইতে লোক আমি কাউকে ব্যক্তিগত-ভাবে জানি না যাকে যোগ্যতর এ্যাটর্নী জেনারেলের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো চলে।

জ্যাক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত রবার্ট ছিলেন মার্কিন সরকারের অন্যতম এ্যাটর্নী। দীর্ঘ বারো বছর রবার্ট এই কাজ যোগ্যতার সঙ্গেই করেছেন। এ্যাটর্নী জেনারেল হয়ে বসবার পরে একদিন একজন প্রবীণ কর্মচারী রবার্টের চেম্বারে উঁকি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। রবার্ট নিজেই তাঁকে ধরে ফেলেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার। আপনি অমনধারা উঁকি দিচ্ছেলেন কেন?

● রবার্ট কেনেডি

—আজ্ঞে, আমাদের নতুন এ্যাটর্নী জেনারেলকে একটু দেখতে ইচ্ছে হলো। আমরা তো দেখতে পাই না কখনো।

—তার মানে, রবার্ট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—মানে আর কি, এ্যাটর্নী জেনারেলরা তো আর সাধারণত অফিসে আসেন না, তাঁরা বাড়িতে বসেই কাজ করেন। কাজেই ডিপার্টমেন্ট থেকে যে দু'চারজনের কাজকর্ম উপলক্ষে তাঁদের বাড়িতে যাবার সৌভাগ্য হয় তাঁরা ছাড়া আর কেউই এ্যাটর্নী জেনারেলদের দেখতে পায় না।

ব্যস। এই একটি অভিজ্ঞতাই রবার্টকে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিলো। তার পরদিন থেকে দেখা যেতে লাগলো রবার্ট নিজে তাঁর নির্দিষ্ট চেম্বার থেকে বেরিয়ে ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন সেকশন ঘুরে ঘুরে প্রত্যহ কিছু কিছু নতুন কর্মচারীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। এই ব্যক্তিগত মেলামেশা এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগে, কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেলো এর সুফল ফলতে আরম্ভ করছে। শত শত মোকদ্দমা যা বছরের পর বছর ধরে চলছে (একটি বিশেষ মোকদ্দমা বিশ বছর ধরে চলছিল) তা একটা কি দু'টো তারিখেই ফয়সালা হয়ে যেতে লাগলো এবং বছর ঘুরে আসবার আগেই বিরোধীরাও বলতে আরম্ভ করলো: হ্যাঁ নতুন এ্যাটর্নী জেনারেল বয়সে ছোকরা হলে কি হয়, সত্যি কাজের লোক।

জোসেফের মতো রবার্টও একজন পাকা ফুটবল খেলোয়াড়। এখনো তাঁর ন' বছরের ছেলের যদিন খেলা থাকে মাঠে, হাজার কাজের মধ্যে পাঁচমিনিটের জন্যে হলেও দেখা যায় রবার্ট নিজে একবার উপস্থিত হয়ে ছেলেকে খেলায় উৎসাহিত করছেন। অনেকে মনে করেন যে, এই রবার্ট কেনেডিই অদূরভবিষ্যতে কখনো মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন।

চতুর্থ এবং সর্ব কনিষ্ঠ ভাই ফ্রান্সিসও একজন এ্যাটর্নী। বোস্টনে একজন উদীয়মান এ্যাটর্নী হিসেবে সকলেরই বিশ্বাস ফ্রান্সিসও একদিন তাঁর পূর্ববর্তী দু' ভাইয়ের মতো বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠবেন। এ বিষয়ে যতটুকু লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তা' হলো ফ্রান্সিসের অত্যাশ্চর্য বক্তৃতার শক্তি। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা—মোট এই চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে ঘণ্টা দুই বাদ দিয়ে বারো ঘণ্টায় চল্লিশটা বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়োতে পারা নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার নয়। বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন যে হাততালি দিতে মানুষ বাধ্য হয় এ রকম শোনবার মতো বক্তৃতা একটি কি দু'টি দেওয়াই কতো কঠিন। কিন্তু ঠিক এই কঠিন কাজটাই ফ্রান্সিস অন্তত কয়েকমাস ধরে নিরলসভাবে করতে পেরেছিলেন জ্যাকের নির্বাচনী আসর জমিয়ে রাখতে।

● এডোয়ার্ড কেনেডি

কোথাও শ্রোতা ইহুদীরা, ব্যবসাগত স্বার্থই যাদের প্রধান চিন্তা, কোথাও শ্রোতা কৃষ্ণকায়গণ, সমানাধিকারের স্বপ্নে যারা বিভোর, কোথাও শ্রোতা গোঁড়া শ্বেতকায়গণ, কৃষ্ণকায়দের পায়ে পিষে মারা যাদের অনেকেরই মনের বাসনা, কোথাও শ্রোতা হালফিল যারা ইয়োরোপ থেকে এসেছে মাকিন মুলুকের নাগরিকত্ব অর্জনের আশায়, এরা চায় তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু প্রতিশ্রুতি, কোথাও বা হাজার হাজার শ্রমিকের সমাবেশ হয়েছে, তাদের স্বার্থের কথাও বলা দরকার, কোথাও বা দেখা গেছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সমবেত হয়েছে বৃহৎ এবং অতি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের চাপে যাতে শেষ হয়ে যেতে না হয় সে সম্বন্ধে জ্যাকের কি পরিকল্পনা আছে সে সম্বন্ধে কিছু শুনতে। অনেক সভাতে এ রকমও দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো রাজনীতি ছাত্র হয় তো হাজার লোকের মধ্যেই সোজা জিজ্ঞাসা করলো: মশাই, আপনার ভাই প্রেসিডেন্ট হলে বার্লিনের ব্যাপার, কিউবার ব্যাপার, ফরমোসার ব্যাপার, ইরাণের ব্যাপার, ভারত-পাকিস্তানের ব্যাপার—কোন্‌টা সম্বন্ধে কি কি করবেন ঠিক করেছেন আমাদের এখুনি বলতে হবে। আমরা সে সমস্ত বিবেচনা করবার পরেই ভোট দেবো, তার আগে নয়। এমনধারা শত-সহস্র অতি জটিল এবং মারাত্মক মারাত্মক প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফ্রান্সিসকে তাঁর অসংখ্য শ্রোতাকে খুশি করতে হয়েছে। কখনো কোথাও একটি বক্তৃতাতেও বেফাঁস কিছু তাঁর মুখ দিয়ে কেউ বের করতে পারে নি। ব্যাপারটা কতো গুরুত্বপূর্ণ একবার ভেবে দেখবেন।

সুখের বিষয় এবং আশার কথা যে, ফ্রান্সিসও বর্তমানে আমেরিকার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে কর্মরত আছেন।

বড়ো ভাইদের মতো ফ্রান্সিসও খেলাধূলো খুব ভালোবাসেন। এমন কি একটু বেশি ভাবেই উনি খেলায় মত্ত হয়ে যান বলা চলে। টেনিস, বেসবল, ফুটবল ছাড়া ফ্রান্সিস-এর আর একটি প্রিয় খেলা হলো স্কী। একবার এই স্কী খেলায় মেতে উঠে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভাবে বাজী ধরে ত্রিশ ফুট লাফ দিয়েছিলেন। এরপর থেকে ফ্রান্সিসের সঙ্গে আর কেউ বড়ো একটা বাজী ধরতে যায় না, কারণ, সবাই জানে বেপরোয়া ফ্রান্সিস কোনো বাজীতেই পিছু হটবার মানুষ নন।

...

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে তা' বোধ হয় পূর্ববর্তী কয়েক শ' বছরেও হয় নি। কিছুদিন ধরে গলস্টোনস সম্পর্কে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তা খুবই চিন্তার বিষয়।

সম্পর্কে সজাগ থাকুন!

বিখ্যাত আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ ওয়ালটার আলভারেজ কিছুদিন আগে বললেন যে: গলস্টোনস মাত্রেই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, অনেক সময় বিপজ্জনকও বটে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সত্তর কি আশী বছরে কেউ হয় তো মারা গেলেন যিনি, জীবনে কখনো গল-ব্লাডারের কোনো কষ্টে ভোগেন নি—কিন্তু মৃত্যুর পরে অপারেশন করে তাঁর গল-ব্লাডারে যে, পাথরের টুকরোগুলি পাওয়া গেলো, ডাঃ আলভারেজ মনে করেন যে, ঐ লোকটি কখনো হয় তো প্রত্যক্ষভাবে গল-ব্লাডারের কষ্টে ভোগেন নি, কিন্তু তাঁর অন্যান্য যে সমস্ত শারীরিক উদ্বেগ ছিলো তার প্রায় প্রত্যেকটিরই জন্যে দায়ী ঐ পাথরের টুকরোগুলি।

ডাঃ আলভারেজ মনে করেন যে, যাঁরা কখনো গল-ব্লাডারের কোনো কষ্টে ভোগেন না, কিন্তু অন্য কোনো ব্যারাম আছে শরীরে তাঁরাও যদি একবার গল-ব্লাডারটার এক্স-রে করে পরীক্ষা করে নেন, তা' হলে অনেক সময় অনেক অসুখ-বিসুখেরই প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। কাজেই ডাঃ আলভারেজ-এর মতে গলস্টোনস সব সময়ই ক্ষতিকর এবং অনেক সময় বিপজ্জনক।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, প্রত্যক্ষভাবে গলস্টোনস-এর শিকার যাঁরা হয়ে থাকেন তাঁদের তিনটি 'F' দিয়ে বর্ণনা করা যায়—Fat, Fair এবং Forty অর্থাৎ মোটা, সুদর্শন এবং চল্লিশবছর বয়স্ক।

বেশির ভাগই দেখা যায় গলস্টোনস-এর উদ্বেগের সূচনা হয় উইণ্ড একবার বেরিয়ে যাবার পরে প্রায় পরক্ষণেই আবার হঠাৎ এক-একসময়ে পেটে সামান্য চিন চিন করে ব্যথার মধ্যে দিয়ে। দিনের শেষভাগে বা রাতের শেষের দিকে এই ব্যথার প্রকোপ একটু বাড়ে কখনোবা পেটে অতি- মাত্রায় উইণ্ড হিসেবেও এর প্রকাশ ঘটে এবং এই বমনও দেখা দেয়। চিকিৎসক, যাঁরা প্রধানত বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করেই রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন, তাঁরা এই সমস্ত দেখে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে হজমের গোলমাল হচ্ছে মনে করে ওষুধ দিতে থাকেন। তাতে হজম হয় তো আরো একটু ভালো হয় কিন্তু আসল কষ্টের হাত থেকে রোগী মুক্ত হয় না।

গল-ব্লাডারের কোনো রকম ব্যারাম হলেই পিত্তের স্রোতে ভাঁটা পড়ে এবং তখন যা দু' একটি পাথর গল-ব্লাডারে জমা থাকে তারা গল-ব্লাডারের গায়ের সঙ্গে এঁটে যাবার সুযোগ পায়। ক্ষুদ্র পাথরকণাগুলির পক্ষে এই সুযোগ অচিরেই মানুষের পক্ষে বৃহৎ বিপদের সূচনা করে। এই সময়ে পাথরগুলি হয় তো এতই ছোটো থাকে যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখে পড়ে না। কিন্তু প্রায় চুম্বকের মতো এই ক্ষুদ্র পাথরকণাগুলি শরীরের সমস্ত আবর্জনা আকর্ষণ করতে থাকে। পিত্তের স্রোতে ভাঁটা পড়ে যাবার জন্যে যা কিছু একবার এসে পিত্তাশয়ে জমা হয় তা আর বেরুতে পারে না, ফলে পিত্তাশয়ের গায়ে এঁটে থাকা ছোটো ছোটো কণিকাগুলি ক্রমে বড়ো হতে থাকে।

গলস্টোনস-এর কবল থেকে দূরে থাকবার একমাত্র উপায় হলো কম চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণ করা, কিন্তু একবার পাথরের উৎপত্তি হয়ে গেলে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করেও কোনো ফললাভ হয় না। তখন একমাত্র করণীয় হচ্ছে অপারেশন। একেবারে সুরুতেই যদি একবার অপারেশন করে পাথরকণাগুলি বের করে ফেলা যায়, তা'হলে গলস্টোনস-এর আশঙ্কা তো আর রইলোই না, শরীরের আরো পাঁচরকম অসুখের হাত থেকেও আমরা রেহাই পেতে পারি।

মাউণ্ট এভারেস্ট কত উঁচু?

একশ' বছরেরও বেশি হয়ে গেলো মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতা প্রথম পরিমাপ করা হয়েছিলো। তখন বিশেষজ্ঞগণ মনে করতেন যে, এর উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। কিন্তু এ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই দেখা গেছে উচ্চতার ঐ পরিমাপটা অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না এবং পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়েই যে সমস্ত ভূগোলের বই এবং মানচিত্র বেরিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, তাতে মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতা দেখানো হয়েছে ২৯,১৪১ ফুট হিসেবে। প্রথমবার এভারেস্ট শৃঙ্গ মাপবার সময় মোটামুটিভাবে শৃঙ্গ থেকে একশ' মাইল দূরত্ব বজায় রেখে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে পরিমাপ করা হয়ে[illegible]।

এভারেস্ট বিজিত হলেও তার উচ্চতার প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসা এখনো হয় নি। আবার নতুন করে এভারেস্টকে পরিমাপের আয়োজন চলছে। এবার সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিরিশ থেকে চল্লিশ মাইল দূরত্ব বজায় রেখে চারটি কি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এই সুউচ্চ শৃঙ্গের পরিমাপ করা হবে। সবাই মেনে নিতে পারেন এ-রকম একটা পরিমাপ এবার হবে বলে আশা করা যায়।

●●●● আণবিক যুদ্ধে আত্মরক্ষা

তীরন্দাজ

উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ সালে হিরোসিমার ওপর আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হবার সংবাদ মানুষ যে-মুহূর্তে জানতে পারলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জগতের সর্বত্র একটা চিন্তাই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলো। সে হলো মানব সমাজের ভবিষ্যতের চিন্তা। আত্মসুখী, স্বার্থান্ধ মানুষ যেন প্রায় বিদ্যুৎ-পৃষ্ট হবার মতো অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠেছিলো—আর তো এককভাবে বেঁচে থাকবার উপায় রইলো না। প্রত্যেকেই বুঝলো মনে মনে যে, যুদ্ধবিগ্রহের ঝামেলা-ঝক্কি এড়িয়ে চললেও আত্মরক্ষার প্রশ্নে আর পূর্ববর্তী যে-কোনো যুগের মতো নিশ্চিন্ত থাকা চলবে না। কারণ, কোনো বিশেষ রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকলেও যুদ্ধ যদি পৃথিবীর কোথাও বাধে এবং সে যুদ্ধে যদি আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তা' হলে তার ফলভোগ যুদ্ধেলিপ্ত এবং নিরপেক্ষ সবাইকেই কম-বেশি ভুগতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে যেসব দেশ যুদ্ধে লিপ্ত তাদের ক্ষতিটা সরাসরি আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের ফলে কিছুটা বেশি হবে (কিছুটা মানে, আট, দশ কি পনেরো-বিশ মাইল ব্যাসের যে কোনো শহর বা বন্দর তার সমস্ত বাড়ি-ঘর-দোর এবং জনসমষ্টিসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। যুদ্ধলিপ্ত দেশের এই যে প্রাথমিক বিপর্যয় এর পরে শুরু হয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সর্বনাশের। দ্বিতীয়টি হলো তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণ। আণবিক বিস্ফোরণের ফলে সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় তেজস্ক্রিয়তার। সংক্ষেপে বলতে গেলে তেজস্ক্রিয়তা হলো একটা অদৃশ্যশক্তির ক্রিয়া। প্রত্যক্ষ বিস্ফোরণের দশ মাইল দূরে পর্যন্ত চার ইঞ্চি ইস্পাতের চাদর ভেদ করেও চলে যেতে পারে এই শক্তি।

এই তেজস্ক্রিয়তার পরিণাম মানুষের ক্ষেত্রে কি ভয়ানক যে হতে পারে হিরোসিমায় তা' কিছু কিছু দেখা গেছে। বিস্ফোরণ-সীমার চার মাইল দূরের মানুষেরা, যারা শুধু বিস্ফোরণ কালের আলোর বিকিরণ দেখেছে আর ঘর-বাড়ির কাঁপুনি দেখেছে; ভেবেছে আর কিছুই হলো না আমাদের, বেঁচে গেলাম। তাদের বেলাতেও দেখা গেছে কয়েক ঘণ্টা পর থেকে কারো হয় তো চুল উঠতে আরম্ভ করেছে, আঁচড়াতে আঁচড়াতে হয় তো মাথাটা একেবারেই সাফ হয়ে গেলো, কারো শরীরের চামড়া ঢিলে হয়ে যেতে আরম্ভ করলো; কেউ হয় তো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পড়ে গেলো। কি ব্যাপার, না শরীরের ভেতরের হাড়গুলি সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কেউ বা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো—পরীক্ষা করে দেখা গেলো শরীরে রক্তের লাল কণিকা সব নির্মূল হয়ে গেছে। এর যে-কোনো একটা বা আরো অনেক রকমের রোগ যা দেখা দিয়েছিলো হিরোসিমাতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবার দু'-এক দিনের মধ্যেই এই সমস্ত রোগজনিত মৃত্যু আরম্ভ হলো।

এ তো গেলো চার মাইল দূরের তেজস্ক্রিয়তার শিকারদের কথা। ছয় মাইল এমন কি আট মাইল দূরের মানুষদের মধ্যেও দেখা দিতে লাগলো ঐ সমস্ত রোগ—তবে কিছু পরে পরে। ছয় মাস এমন কি এক বছর বাদেও নতুন রোগীর আবির্ভাব ঘটেছিল হিরোসিমার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে। এক বছরের মাথায় হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, সরাসরি আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ষাট হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং তেজস্ক্রিয়তায় ভুগে অন্তত আরো ষাট হাজার মরেছে।

এবার তৃতীয় বিপদের কথাটা পাড়া যাক। তৃতীয় বিপদ হলো তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত। অর্থাৎ কিনা ব্যাপক ধ্বংসলীলার ফলে যে ভস্মের সৃষ্টি হয় বাতাসে ভেসে তার ভূমিতে পতন। এই ভস্মপাত বিস্ফোরণের বিশ, তিরিশ কি চল্লিশ মাইলের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, আবার দু'শ, পাঁচ-শ' কি হাজার মাইল দূরেও পড়তে পারে। এই ভস্ম সরাসরি কারো গায়ে পড়লে তো তার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া অবিলম্বেই শুরু হবে এমন কি অন্যভাবেও এ ভস্ম জীবের বিপদ ডেকে আনতে পারে। যেমন তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত হয়েছে এরকম জমির উৎপন্ন ফসলের মধ্যেও ঐ তেজস্ক্রিয় শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যে জীব ওই ফসল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে তার মধ্যেও তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এমন কি সরাসরি ওই ফসল গ্রহণ না করলেও বিপদ ঘটতে পারে। যেমন কোনো গরু যদি তেজস্ক্রিয় ঘাস খায়, তা হলে তার দুধ পান করলেও তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণ নিশ্চয়ই ঘটবে। মনে রাখবেন, যুদ্ধের যে জায়গা অর্থাৎ বিস্ফোরণ স্থলের হাজার মাইল দূরের নিরপেক্ষ দেশের মানুষও এই তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতজনিত বিপদের আওতার বাইরে নয়।

কারো কারো হয় তো মনে হতে পারে যে, শুধুমাত্র এইটুকুই যদি সর্বনাশ ঘটে তা হ'লে আর এ্যাটম বোমার অনিষ্টকারী শক্তিটা সর্বগ্রাসী কি করে বলা যায়? হাজার মাইল দূরে থাকলে তো বাঁচা যাবে —এই রকম কিছু একটা মনে করে অনেকে হয় তো নিরাপদ জায়গার সন্ধান করতে পারেন, যেমন ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় হাজার হাজার মানুষ আজ করছে বলে শোনা যায়। নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্যে আজ বহু লোকেই আগ্রহপ্রকাশ করছে। তাদের ধারণা যে ওই দু'টো দেশে (এবং ইয়োরোপের আয়ার্ল্যাণ্ডে) কখনো কেউ এ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা ফেলবে না। কারণ ওই সমস্ত দেশের বিশেষ কোনো শিল্পোন্নতি হয় নি বা সামরিক গুরুত্ব নেই। কিন্তু সে চেষ্টায় ফলেও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করা যাবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ ভস্মপাতজনিত সর্বশেষ বিপদের যে স্তর তার কথা এখনো বলা হয় নি। এটা হলো তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত। বিস্ফোরণের এক মাস কি দু'মাস পরে হয় তো দু'শো কি পাঁচশো মাইল দূরে ভস্মপাত হলো—কিন্তু একটা বিস্ফোরণের ফলে মোট যে ভস্মের উৎপত্তি হয় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এতো সূক্ষ্ম এবং হাল্কা কণা যে তারা নিজেরা কখনোই বাতাসের তাড়নায় ভূমিতে পড়ে না বরং ক্রমাগত শূন্যে ভেসে চলতেই থাকে। এক বছর,

দু' বছর এমন কি তিন বছর পরে হয় তো একদিন তাদের পতন ঘটে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ জলের ভারের ফলে জমিতে এসে পড়ছে। যে দীর্ঘ সময়টা এই সূক্ষ্ম এবং হাল্কা ভস্মকণিকাগুলি শূন্যে ভেসে বেড়িয়েছে তার মধ্যে হয় তো বেশ কিছু পরিমাণ ভস্মকণিকার একাধিকবার বিশ্ব-প্রদক্ষিণ হয়ে গেছে অনুকূল বায়ু-প্রবাহের জন্যে।

এতক্ষণে একটি এ্যাটম বোমার সর্বগ্রাসী সর্বনাশী শক্তির আমরা মোটামুটি একটা পরিচয় পেলাম।

সরাসরি কোথাও এ্যাটম বোমা পড়লে যে রক্ষা নাই তা তো সকলেই বোঝে। পরবর্তী বিপদগুলি সম্বন্ধেও আমাদের একটা ধারণা হলো। এবার দেখা যাক এর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবছেন।

হারমান ক্যান-এর On Thermonuclear War বইখানি কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। ক্যান আণবিক শক্তি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ তো বটেই; আণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে যাঁরা মনে করেন, তিনি তাঁদের অন্যতমও বটে। আণবিক যন্ত্র যদি গোটা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র বেআইনী বলে মেনে চলতে রাজী হয় তো ভালো কথা; কিন্তু সেটা যতদিন না হচ্ছে ততদিন হাত-পা ছেড়ে হতাশার কোলে ঢলে পড়ার চাইতে আণবিক অস্ত্র দিয়ে আণবিক আক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া এবং সম্ভবক্ষেত্রে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা উচিত বলেই ক্যান মনে করেন।

ক্যান অভয় দিয়ে বলছেন যে, আগামী আণবিক যুদ্ধে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে যা মানবজাতির সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যাবে—এটা অবাস্তব কথা। তবে হ্যাঁ, শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলবে। এই কথাটার মধ্যেই আত্মরক্ষার যেন একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। শিল্পসমৃদ্ধ দেশ বলতে যে সমস্ত দেশকে বোঝায় আজকের দিনে তার শতকরা নব্বুই ভাগ বা তারও বেশি বিষুবরেখার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই এটা ধরে নেওয়া যায় যে, আণবিক বোমা বিষুবরেখার উত্তরাঞ্চলেই নিক্ষিপ্ত হবে বেশি। তা যদি বাস্তবিকই হয় তা'হলে আবহাওয়া সম্বন্ধে আজকের বিজ্ঞানের যে ধারণা, তার ওপর ভিত্তি করে একথা অবশ্যই বলা চলে যে, বিষুবরেখার উত্তরাঞ্চলে যে সমস্ত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে তার ভস্মরাশির দক্ষিণাঞ্চলে আসবার ক্ষমতা খুবই কম। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বিষুবরেখার দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। এই দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে আবার কয়েকটা জায়গা, যেমন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ নগর, নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্টচার্চ নগর, আর্জেন্টিনার মেনডোজা শহর, চিলির সেন্ট্রাল ভ্যালী, ব্রেজিলের বেলো হরাইজন্টো শহর এবং মাদাগাসকার-এর ট্যানারাইভ—এই ছয়টি জায়গা বায়ুমণ্ডল বিশেষজ্ঞগণের মতে এমন একটা বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত যে, উত্তরাঞ্চলে সৃষ্ট ভস্মরাশির এই ক'টি জায়গাতে এসে পড়া প্রায় অসম্ভব। কাজেই এই জায়গা ক'টির আণবিক যুগে একটা গুরুত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

ঠিক একই কারণে উত্তরাঞ্চলেও তিনটি জায়গা আছে, যা এই অঞ্চলের অন্য যে কোনো জায়গার চাইতে কিছুটা নিরাপদ বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এ জায়গাগুলি হলো ক্যালিফোর্ণিয়ার ইউরেকা, মেক্সিকোর গুয়াদালাজারা এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্ক শহর। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা যে উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চল মিলিয়ে এই যে মোট নয়টি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, সরাসরি যদি কখনো এই সমস্ত শহরের ওপর আণবিক অস্ত্র নিক্ষিপ্ত না হয় তা'হলে তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে এ কয়টি জায়গা নিরাপদ থেকে যাবারই সম্ভাবনা অর্থাৎ কিনা বায়ুমণ্ডলের যে প্রকৃতি তাতে এই জায়গাগুলিতে তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত প্রায় অসম্ভব—অবশ্য যদি অতিমাত্রায় আণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়, অর্থাৎ বায়ু-প্রবাহের গতিতে অদল-বদল ঘটে যায়, তা'হলে আর মানুষের পালিয়ে বাঁচবারও কোনো পথ খোলা থাকবে না।

ঘোড়া নয় গাধা নয়

যাকে বলে খচ্চর। হ্যাঁ, খচ্চরের কথাই বলছি। দ্বিপদ খচ্চর নয়, একেবারে নির্ভেজাল চার পেয়ে আসল খচ্চর।

শান্ত, সৌম্য, রুচিবান, ভদ্রমানুষের অপরিসীম ঘৃণা আর অবজ্ঞার পাত্র এই খচ্চর যে অনেক সময়, বিশেষত উপযুক্ত শিক্ষা পেলে মানুষের একান্ত প্রিয় গৃহপালিত জন্তু, যেমন গরু, ঘোড়া বা কুকুরের চাইতে অনেক বেশি কাজে লাগাতে পারে এমন কথা অনেকেই মনে করেন। বিশেষ করে সামরিক বিভাগে দেখা যায় অভিজ্ঞ অফিসারদের এই অবহেলিত জীবগুলির প্রতি অসীম আস্থা এবং বেশ কিছুটা যেন স্নেহের ভাব।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে অনেক বড়ো বড়ো যুদ্ধজয়ের পেছনে এই খচ্চরগুলি কি পরিমাণে সাহায্য করেছে। বিখ্যাত সেনাপতি বা সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীকে অনেক সময়ই দেখা গেছে একান্ত অসহায়ভাবে খচ্চরদের কাছে সাহায্য চাইতে হয়েছে—এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে খচ্চররা তাদের প্রভুদের নিরাশ করে নি। কিন্তু তবু, ভুলেও কোনো সমর-দপ্তর কখনো কোনো খচ্চরকে খেতাব দেবার কথা ভাবে নি।

এবার একটি সত্যি ঘটনার কথা বলবো। এই শতকের প্রথম দিকের ঘটনা।

সে-সময়ে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারে গোলমাল লেগেই থাকতো। ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা নিরস্ত্র থাকলেও নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের মানুষকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা কখনো একেবারে নিরস্ত্র করতে পারে নি। রাইফেল বা পিস্তল সেখানে যে কোনো সাধারণ পরিবারেও সব সময়েই এক-আধটা থাকতো। বলাই বাহুল্য এর বেশির ভাগই লাইসেন্সবিহীন। এই অস্ত্রগুলি একদিকে যেমন নানা বিপদের সময়ে আত্মরক্ষায় সাহায্য করতো অন্যদিকে আবার ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক কারণে এই যন্ত্রগুলি আক্রমণাত্মক কাজও সমাধা করতো।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের কয়েকটি

অঞ্চলে ভয়ানক গোলমাল চলছিল। অসামরিক পুলিশবাহিনী নিরুপায় হয়ে চেয়েছিলো সামরিক বিভাগের সাহায্য। সামরিক বিভাগ থেকে একটা গোটা অঞ্চলের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়া হলো। 'রাজমাক'কে হেডকোয়ার্টার করে পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম থেকে গ্রামে। তিনশ' চারশ' সৈন্যের এক একটি দল বেআইনী অস্ত্রধারীদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। একদিন ভোর রাতের ব্যাপারে প্রায় তিনশ' সৈন্যের একটি দল আটকে পড়লো একটা জায়গায় এসে।

শীতকাল। বরফে চতুর্দিক ভরে গেছে। চলতে চলতে সৈন্যদলটি এসে থামলো একটা মাঠের মাঝখানে। মাঠের দু'দিকে উঁচু বরফে ঢাকা পাহাড় আর একদিকে একটা নদী, যার জল জমে গেছে। তিনশ' সৈন্যের উপযোগী কামান-বন্দুক-মেসিনগান গোলাগুলি-লটবহরও নেহাৎ কম নয়। হাল্কা যন্ত্র সব সৈন্যদের সঙ্গেই রয়েছে। আর ভারী যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জিনিষ রয়েছে খচ্চরগুলির পিঠে। প্রায় একশ' খচ্চরের একটা বাহিনী। তিনশ' সক্ষম সৈন্য ছাড়া আরো প্রায় একশ' জন সৈন্য রয়েছে সঙ্গে—তারা সকলেই অল্পবিস্তর আহত। নিকটবর্তী হাসপাতালে তাদের পৌঁছে দেবার জন্যেই এই দলটি কোনো একটা সহজপথের সন্ধান করছিলো। অথচ পথ বলে কোনোদিকেই কিছু চোখে পড়ছিলো না। সবই বরফে ঢাকা।

প্রথমে ঠিক হলো নদী পেরিয়েই এগুতে হবে। কিন্তু এ অঞ্চলের নদী সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞ তারা ব্রিগেডিয়ারকে বললো যে, তা হয় তো ঠিক হবে না। কারণ, এখানকার নদীতে থাকে বড়ো বড়ো পাথরের চাঙড়া। ভারী মাল নিয়ে চলতে চলতে যদি একবার কারুর পা ঢুকে যায় বরফের মধ্যে তা'হলে তার যেমন মৃত্যু অনিবার্য, তাকে উদ্ধার করবার জন্যে যারা এগিয়ে যাবে তাদেরও নিরাপত্তার কোনো বন্দোবস্ত করা যাবে না। কাজেই বরফে ঢাকা পাহাড় ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করা ছাড়া আর উপায় নেই। আর তা না হলে ফিরে যেতে হয়—যে পথে হাসপাতাল প্রায় বিশ মাইলের পথ। পথ-ঘাট সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞ তারা একটা পাহাড় দেখিয়ে বললো যে, ঐ পাহাড়টার ঠিক পাদদেশেই রাস্তা, যে রাস্তায় গিয়ে নামতে পারলে হাসপাতালের দূরত্ব অর্ধেক কমে যাবে। কিন্তু পাহাড়ের ও পিঠে যাওয়া যাবে কি করে? স্তূপীকৃত বরফ ভেঙে কে পথ করে দেবে?

ব্রিগেডিয়ার ডেকে পাঠালেন একজন গোলন্দাজকে। এই গোলন্দাজ আবার খচ্চর সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ। ব্রিগেডিয়ার ভাবছিলেন যে সৈন্যদের বরফ ভেঙে পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা করে এগুবার হুকুম যদি দেওয়া হয়, তা' হলেও ভারী যন্ত্রপাতি বোঝাই খচ্চরদের ঐ পথে হাঁটিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে কি না—এই কথাটা গোলন্দাজের কাছ থেকে বুঝে নেবেন।

গোলন্দাজ শুনলো ব্রিগেডিয়ারের কথা। তারপর বললো—একটু অপেক্ষা করুন, আমি খচ্চরদের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

ব্যাপারটা দেখবার জন্যে অনেকেই গেলো গোলন্দাজ সৈন্যটির পিছুপিছু। গিয়ে যা দেখলো তাতে তাদের সবার চক্ষুস্থির। গোলন্দাজ সৈন্যটি আদর করে সবার সামনের খচ্চরটির গলা জড়িয়ে ধরলো। খচ্চরটির পিঠের দু'পাশে ঝুলানো একটা কামানের সমস্ত অংশগুলি। খচ্চরটি তার মুখ ঘষতে লাগলো গোলন্দাজের গায়ের সঙ্গে। তারপর গোলন্দাজটি খচ্চরটার মাথাটা পাহাড়ের দিকে ফিরিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কয়েকটা উদ্ভট আওয়াজ করলো। খচ্চরটা বেশ কয়েকবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো, তারপর উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে আরম্ভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে আর সব খচ্চরও ডাকতে আরম্ভ করলো।

গোলন্দাজ সৈন্যটি চীৎকার করে উঠলো—সাহেব, আপনারা সবাই দু'পাশে সরে যান, খচ্চরদের আগে যেতে দিন, ওরা আমাদের পথ করে দিতে রাজী হয়েছে।

ভারী ভারী বোঝা নিয়ে একশ'টি খচ্চর চললো এগিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে; পেছনে পেছনে চললো তিনশ' সক্ষম আর একশ' আহত সৈন্যের দলটি। প্রায় একঘণ্টা বাদে সমগ্র দলটি যখন পাহাড় ডিঙিয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছুলো, দেখা গেলো—সৈন্য বা খচ্চর কোনোদিকেই আহতের সংখ্যা একটিও বাড়ে নি এবং একশ' জন আহত সৈন্য ত্বরান্বিত চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে অনিবার্য মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচলো।—অনুসন্ধানী

পান দোষ না পান গুণ?

কল্পনা করুন: ভার্জিলের ভাবগম্ভীর মহাকাব্যের কয়েকটি ছত্রকে আলতো করে দু'পাশে সরিয়ে রেখে ভেসে উঠলেন কার্থেজের রাণী তন্বী দিদো। 'চোখে তাঁর আবিষ্ট দৃষ্টি, ঠোঁট দু'টি যেন কোন রাজকীয় অভিপ্রায়ে ঈষৎ কম্পমান। সিংহাসনের একপাশে একটু হেলান দিয়ে বসে আছেন রাণী। ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিলেন ডান হাতখানা। আঙুল ক'টি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিচারিকা তুলে দিলো ক্ষুদ্র একটি সুরাপাত্র। সুরাপাত্রটি একবার ঠোঁটে স্পর্শ করলেন রাণী। তারপরেই পরিচারিকা সুরাপাত্রটি সরিয়ে নিয়ে রাণীর ক্লেশ লাঘব করলো। রাজসভায় এবার পড়ে গেলো ছড়োছড়ি। কে কার সুরাপাত্র রাণীর পাত্রটির সঙ্গে আগে ছোঁয়াতে পারে, তারই জন্যে এতো ব্যস্ততা।

এ একটা রীতিমতো উৎসব। যাকে বলে টোস্ট। অর্থাৎ রাণীর অটুট স্বাস্থ্যকামনায় পান করা চচ্ছে। এ পান করা রীতিমতো পানগুণ বলতে হবে। কারণ এ পানের সঙ্গে নেশার কোনো সম্বন্ধ নেই। নেশার লেশমাত্র সম্ভাবনাতেই এ উৎসব পণ্ড হতে পারে। মনের অন্তস্তলের প্রার্থনায় ভাবটি যেতে পারে মাটি হয়ে। পানগুণ নিমেষের মধ্যে পানদোষের কুখ্যাতি করতে পারে।

বাস্তবিক, যে সব দেশে সুরাপান কম-বেশি প্রচলিত, সে-রকম প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় সুরাপানের সঙ্গে যুক্ত থাকে (অর্থাৎ ছিলো) এক

পবিত্র মানসিকতা। মনে হয় কালস্রোতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেই পবিত্র ভাবটির কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। এই বুভুক্ষু কঙ্কালের ক্ষিদেটা গিয়েছে অসম্ভব রকম বেড়ে। তাই তো পানের সময় যেমন থাকে না ভব্যতাবোধ, তেমনি দেখা যায় না পরিবেশের প্রতি কোন বিচারবোধ। আমাদের ফেলে-আসা যুগের সেই মুনির মতো শুধু চোঁ চোঁ করে মেরে দেওয়ার জন্যে একটা উৎকট ব্যগ্রতা। পানগুণের তখন আর লেশমাত্র থাকে না। অকস্মাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে একটা দৈত্য—যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি ভয়ঙ্কর—পানদোষ!

পানগুণটা যে কি পরিমাণ পানদোষের কবলে পড়ে গেছে তার সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় আধারে। সেকালে সুরাপাত্র ছিলো, যেন শুক্লাপ্রতিপদের সন্ধ্যায় রচিত একটি ছয় লাইনের ছোট্ট লিরিক। উচ্চতায় দেড় থেকে দু' ইঞ্চি আর তেমনি সরু। দু'টি আঙুল দিয়ে ছাড়া এ সুরাপাত্র ধরা যেতো না। আর আজকের দিনে? পুরনো অনেক বস্তুর মতোই সে যুগের সুরাপাত্রের জায়গা দখল করেছে যাকে বলে মদের গেলাস। তাতে পোয়া দেড়েক মাল ঢেলে কে কতো শীগগির সাবাড় করতে পারে, এ যুগে চলে তারই দানবীয় কম্পিটিশন। স্বাস্থ্যের প্রার্থনা অচিরেই স্বাস্থ্যের ঘুণ-কীটের আগমনী সঙ্গীতের মেঠো-উল্লাসে রূপান্তর লাভ করে। রূপের দেবতায় দেখা দেয় নারকীয় ভ্রূকুটি।

তবে আশার কথা পানদোষেদুষ্ট জীবের মধ্যেও কচিৎ কখনো পানগুণাবিষ্ট হয়ে পড়বার লক্ষণ দেখা যায়। বেশ কিছুকাল আগের কথা। ইয়োরোপে তখন পোর্ট ওয়াইনের (অর্থাৎ পর্তুগালের তৈরি মদ) যাকে বলে জয়জয়কার। ইংলণ্ডের মিত্র দেশ হিসেবে পর্তুগালের এই মদ প্রবল-প্রতাপ ইংলণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ধন্য। ইংলণ্ডের রাজপরিবারে কারো পোর্ট ওয়াইন ছাড়া রোচে না। এমন কি ফরাসী দেশের বোর্দোর বিখ্যাত শ্যাম্পেনও নয় (আহা, শ্যাম্পেনের তখন কি দুর্দিনই না গিয়েছে।)। ঠিক এই রকম একটা সময়ে দেখা গেলো আরো দু'টো দেশ বহু মেহনত করে বানালো দু'রকমের মদ পোর্ট ওয়াইনকে কাত করবার জন্যে। হল্যাণ্ড বানালো 'কুমেল' নামে হাল্কা খয়েরী রঙের একটা হুইস্কি আর প্রুশিয়া বানালো 'ক্রডারব্যাকুট' নামে গাঢ় হলুদ রঙের আর এক রকমের।

বলাই বাহুল্য, লিখিত-পড়িত ভাবে না হলেও ইয়োরোপের রাষ্ট্র-নীতিতেও যেন তিনটি ধারা বইতে লাগলো: পোর্ট, কুমেল আর ক্রডারব্যাকুট। রুশের ভদকা অবশ্য বহুপূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু সে নেহাৎ আটপৌরে পানীয়। বিগত যুগের এক শ্রেণীর ভারতীয় শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণেরই মতো সে-সময়কার রুশিয়ার শাসক-পালক পিটার দি গ্রেটও মনে করতেন দেশের সবকিছুই খারাপ—সবকিছুই বিদেশ থেকে আমদানী করা চাই (কারণ, বিদেশী হলেই যে ভালো!!!)। সুতরাং রাজদরবার থেকে ভদকা উবে গেলো। কিন্তু ভদকার জায়গা কে নেবে? কেউ বললো—কেন, পোর্ট? আরে ছ্যা, ছ্যা। পোর্ট আবার একটা পানীয়! বুঝতে পারো না, কতো বাজে জিনিষ, তা না হলে আর কি ইংরেজরা পান করতো? ক্রডারব্যাকটও পরিত্যজ্য। কারণ ও যে প্রুশিয়ার শ্যাম্পেন? হ্যাঁ, ও বস্তুটা মন্দ নয়। তবে একটা নতুন স্বাদের জন্যে মনটা যেন কেমন করছিল কিছুকাল ধরে। পিটার দি গ্রেট আদেশ করলেন—অবিলম্বে একটা কারখানা তৈরি করা হবে 'কুমেল' তৈরির জন্যে। কুমেল নতুনও বটে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির এক্তিয়ারের জিনিষও নয়। তাই কুমেলকে বেছে নেওয়া হলো।

স্থান নির্বাচিত হলো বালটিক সাগরের উপকূলে রিগাতে। এক শতাব্দীর ওপর রিগায়ে এই কুমেল ফ্যাক্টরীর তৈরির কুমেল পানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট শ্বেত ভালুকের থপথপানিতে নৃত্যের ছন্দ এনে দিয়েছিলো। তারপর একসময় আইন করে কুমেল বন্ধ করে আবার ভদকাকে তার পুরনো জায়গায় বসানো হলো।

যাই হ'ক, যা বলছিলাম। পানদোষেদুষ্ট হতভাগ্যের মধ্যেও মাঝে মাঝে পানগুণের স্পর্শ দেয়। তার প্রমাণ এই রিগাতেই পাওয়া গিয়েছিলো কিছুকাল আগে। বেশ কিছুকাল ধরে অতিমাত্রায় পান করতে করতে একটি লোকের লিভারে কিছু গোলমাল হয়েছিলো। ডাক্তারের নির্দেশে কোনোপ্রকার পানীয় স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। এই রকম একটি লোক একবার ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হোলো একটা মাঠের ধারে। মাঠের মধ্যে কয়েকটা পোড়ো বাড়ি। অন্য একজন পথচারীর কাছে অনুসন্ধান করে যেই লোকটি জানলো যে ওই পরিত্যক্ত জায়গাটিতেই একসময় বিখ্যাত 'কুমেল ফ্যাক্টরী' ছিলো—ব্যস্, আর দেখতে নেই। মুখে ফুটে উঠলো তার এক অপূর্ব হাসি। নাক-মুখ বিস্ফারিত করে তো বটেই, যেন সমস্ত শরীর দিয়ে সে পান করতে লাগলো কুমেল-এর সুবাসের যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো আবেষ্টনীতে। তার স্মৃতির গহ্বরে যে সেদিন কি বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো তা কেউই জানে না। কিছুকাল পরে ডাক্তার যখন তাকে রোগমুক্ত বলে ঘোষণা করলো, বললো যে আবার তুমি মদ খেতে পারো, তারপরও কিন্তু সে আর কোনোদিন মদ খায় নি: বলতো—কি খাবো যতো সব আজেবাজে জিনিষ, আমি যে কুমেলের স্বাদ পেয়েছি।—সুরসিক।

"Scotchmen seem to think its a credit to them to be Scotch."

"Three duties of woman. The first is to be pretty, the second is to be well-dressed, and the third is never to contradict"

"Sentimentality is only sentiment that rubs you up the wrong way." —*Somerset Maugham*

সাধু শয়তান কথা

সাধন তপাদার

অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আর তুকতাকের কারিগরিতে আমার যেমন বিশ্বাস ছিল না, তেমনি কানও পাতি নি এখনও। কিন্তু উড়িষ্যার ভদ্রক ও কটকের মাঝামাঝি ধানমণ্ডলের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এমন এক ঘটনা ঘটল যার প্রভাবে আমার আবাল্য কুসংস্কারমুক্ত মনে একটা ফাটল ধরে গেল। ফলে আজ আমি সেসব কথায় কান তো নিশ্চয়ই পাতি, বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায়ও দুলি। মাঝে মাঝে ঘটনাটি মনে পড়ে আমাকে কেমন অশান্ত করে তোলে। নানাভাবে বিশ্লেষণ করেও আমি কোন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছুতে পারি নি। সে কথাই আজ বলব—যদি কেউ এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারেন। ধানমণ্ডলের কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল আর পাহাড়ের পটভূমিকায় জনৈক সাধু ও একটি কুখ্যাত চিতাবাঘকে নিয়েই আমার এ কথা।

ইংরেজী '৫৬ সালের জুন মাসে কটক থেকে ময়ূরভঞ্জ লাইট রেলওয়ের সুদূর বাঙ্‌রিপোসি পর্যন্ত রেলের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়ে আমি উড়িষ্যায় বদলী হয়ে গেলাম। প্রথমদিন ধানমণ্ডল পরিদর্শনে গিয়েই আমি সেই চিতাবাঘটির দৌরাত্ম্যের কথা শুনলাম। শুনলাম গত দু'মাসে চিতাবাঘটি আঠারোটি গরু ও দুটো মোষ মেরেছে। মোষ মারার কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম। সন্দেহ হল বাঘ নয় ত! কিম্বা প্যান্থারও হতে পারে। লেপার্ডের বড় জাতটাকেই আমি প্যান্থার বলছি। ওরা সাড়ে আটফুট পর্যন্ত বড় হতে পারে। কিন্তু লেপার্ড দু' ফুটের বড় হয় না। সে যা হোক, আমি বুঝলাম কথিত শ্বাপদটা আকারে খুব বড়।

আর একটা কথা বলে রাখি, প্রকৃত চিতাবাঘ বলতে যা বোঝায় সেই চিতা বা হান্টিং লেপার্ড আজ ভারতে লুপ্ত। ছোটদের পাঠ্যপুস্তকে আজও দেখতে পাই লেখা আছে—চিতাবাঘের ঠ্যাং সরু। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী জন্তু সেই চিতাবাঘ—ঘণ্টায় ষাট মাইল দৌড়ায়। সহজ বাঙলায় যার নাম টিকেপোড়া বাঘ। সেই চিতা, লেপার্ড ও প্যান্থার বিভিন্ন। সে আলোচনা এখানে নয়। কিন্তু যেহেতু সাধারণে এ সবকেই চিতাবাঘ বলে আমিও এ কাহিনীতে শ্বাপদটাকে চিতাবাঘ বলেই উল্লেখ করব—উড়িষ্যায় যাকে বলে কল্লাফুলিয়া।

স্টেশনমাস্টার মোহান্তিবাবুকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাস্টার-মশাই, বাঘটাকে আপনারা কেউ দেখেছেন কি?

মোহান্তিবাবু চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, কেউ কি মশাই, আমি নিজে দেখেছি! আমার গরু মারল আর আমি দেখব না।

মোহান্তিবাবুকে বললাম, বাঘটা মালিকের সামনেই তার গরু মারে বুঝি?

মোহান্তিবাবু আমার ঠাট্টায় একটু চটে গেলেন। বললেন, তা কেন মশাই, আমার গোয়ালঘরে ঢুকে মারল যে।

বললাম, তাই বলুন। কেন গোয়ালে দরজা ছিল না?

বললেন, থাকলে কি হবে, শালা গোয়ালের চালে উঠে খাপরা সরিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়েছিল। গরু বাছুরের চিৎকার আর বাঘের ডাকের শব্দে অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমাদের। ভয়ে বেরুতে পারি না—ঘর থেকেই চিৎকার করে লোকজনদের ডাকতে লাগলাম, আর একনাগাড়ে থালাবাসন বাজিয়ে চললাম। তাতেই কাজ হল। লোকজনেরা লাঠি সোঁটা বল্লম নিয়ে হল্লা করে গোয়াল ঘরের কাছে ছুটে আসতেই বাঘটা লাফিয়ে ফোকর গলে গোয়ালের চালে উঠে একটা প্রচণ্ড ভেংচি কাটল। তারপর লোকগুলোর মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল কুয়োর পাড়ে, সেখান থেকে আর একলাফে লাইন পেরিয়ে একেবারে বরুণা পাহাড়ে।

মোহান্তিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, কি বাঘ ওটা?

বললেন, কল্লাফুলিয়া।

কত বড়?

মোহান্তিবাবু তাঁর একটি পোর্টারকে জিজ্ঞেস করলেন, দুর্যোধন'অ, বাঘ'অটা কেত্তে বড় থিলা—দশ'অ হাত'অ!

দুর্যোধন বলল, ওরে বাপ্প'অ! বাঘ'অ দেখি কিরি থরি গলা সব্ব'অ। হ-দশ'অ হাত'অ না হেলে নিচ্চয়'অ ন হাত'অ হব।

মোহান্তিবাবুকে আর চটাবার ইচ্ছে ছিল না, আমি মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে ফেললাম।

এর দুদিন পরেই একটা সরজমিন তদন্তের উদ্দেশ্যে রাইফেল বন্দুক নিয়ে খুব ভোরে ধানমণ্ডলে নামলাম। স্টেশনের পশ্চিমে মাইলখানেক দূর উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে বরুণা পাহাড়। আমি লাইন

পেরিয়ে সেদিকে এগুতে লাগলাম। খানিকটা গিয়েই বুঝলাম যে এখানকার জঙ্গল কতকগুলো কাঁটা ঝোপঝাড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কি পাহাড়ের নীচে কি পাহাড়ের গায়ে-সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট নিকৃষ্ট কঞ্চিবাঁশের ঝাড়, খেজুর আর বনকুলের ঝোপ। মাঝে মাঝে ফণীমনসা নয়ত বাবলা গাছ। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম যে কয়টা বড় গাছ আছে হাতে গোনা যায়।

পাহাড়ের দিকে আর খানিকটা গিয়েই আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার সামনে কণ্টকাকীর্ণ বাঁশঝাড়ের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীর। খর্বকায়, শীর্ণ, অসরল বাঁশগুলো গিঠে গিঠে এঁকে বেঁকে জড়িয়ে আছে। অদ্ভুত আকৃতির সেই কঞ্চিবাঁশগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার বাল্যের পাঠ্যপুস্তকের ডন কুইকজোটের ছবিটি মনে পড়ে গেল। যেন শত শত ডন কুইকজোট গলা জড়াজড়ি করে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। দুস্তর সে বাধা। অভেদ্য সে কাঁটাবাঁশের প্রাচীর। যে পথে গিয়েছিলাম সে পথেই খানিকটা ফিরে এসে আর একটা পথ খুঁজতে লাগলাম।

এক শবর শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বুড়ো সেই ভোরে কাঁদে একটা খরগোশ ধরে নিয়ে ফিরছিল। তাকে পাহাড়ে ওঠার রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করতে সে বলল, পাহাড়ে ওঠবার রাস্তা এখন খুঁজে পাবেন না বাবুজী। আগাছা আর কাঁটা ঝোপে সব ঢেকে গেছে। বর্ষার পর কাঠুরিয়া আর রাখালদের চলাচল সুরু হলে আবার রাস্তা বেরুবে। আর এখন যেতে চান তো কাটারিতে ঝোপঝাড় কেটে কেটে এগুতে হবে। তবে খুব সাবধান বাবুজী, এখানে বড় সাপের ভয়।

সাপের কথায় চমকে উঠলাম আমি। বড় ভয় আমার এ জীবটিকে। এদিক ওদিক দেখে দু'পা সরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম তোমার ?

বলল, ছান্দা।

বললাম, আচ্ছা ভাই ছান্দা, একটা বাঘ যে খুব গরুটরু মারছে সে তুমি নিশ্চয় জান—কি বাঘ ওটা ?

ছান্দা বলল, কল্লাফুলিয়া। খুব বড় কল্লাফুলিয়া বাবুজী।

বললাম, দেখেছ কখনও ওকে ?

বলল, দেখেছি। একদিন সন্ধ্যায় লাইন পেরিয়ে শুঠুনিয়া পাহাড়ের দিকে যেতে দেখেছি।

বললাম, বাঘটার আড্ডা কোথায় বলতে পার ?

ছান্দা বলল, সে বলা বড় কঠিন। কখন কোথায় থাকে বোঝা যায় না। তবে তেলিগড়ার দিকেই মাঝে মাঝে ওর পাঞ্জা দেখা যায়। জঙ্গলও সেদিকে বেশি, শিকারও খুব মেলে।

জিজ্ঞেস করলাম, তেলিগড়া কোথায় ?

পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে আঙুল তুলে দেখাল ছান্দা। বলল, ঐদিকে। যেতে যেতে দেখবেন খুব বড় একটা জলা। জলার পাড়েই তেলিগড়ার আশ্রম।(১) সেখানে খোঁজ খবর পেতে পারেন।

আশ্রম !

হ্যাঁ, এক সাধুবাবা থাকেন সেখানে, দুর্গামন্দির আছে।

অগত্যা তেলিগড়ার দিকেই রওনা হলাম আমি। সাবধানে গা বাঁচিয়ে সেই কাঁটা বনের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলা পথে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললাম। বনের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে ফিরে ঘণ্টা দেড়েক পর ঝোপঝাড় ঠেলে অবশেষে যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেইটাই তেলিগড়া আশ্রমের আঙিনা। সামনেই পাশাপাশি চৌকো চৌকো পাথর বসিয়ে তৈরী পৃথক দু'খানা ঘর। দেখলাম একটায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আর একটায় সাধুবাবা থাকেন। পিছনেই ছান্দা বর্ণিত সেই জলাভূমিটা। বরুণা পাহাড় অর্ধ চন্দ্রাকারে ঢেউ খেলে খেলে জলাভূমিটার তিন দিক ঘিরে রেখেছে। বর্ষায় তিন পাহাড়ের জলধারায় পুষ্টিলাভ করে এখন জল থৈ থৈ করছে। চারদিকের সবুজ গাছপালা আর যৌবনোচ্ছল জলাভূমিটা আশ্রমটিকে শান্ত সমাহিত করে রেখেছে।

আমি সাধুবাবার খোঁজে ইতস্তত দেখছি এমন সময় আঠারো-উনিশ বছরের গৌরবর্ণ একটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাছে গিয়ে দেখলাম তার দেহে মুখে সর্বত্র কুষ্ঠরোগের আক্রমণ পরিস্ফুট। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি সুন্দর চেহারা কি অবস্থা ! ছেলেটির ব্যবহার ও কথাবার্তা ভারি মিষ্টি। আমাকে বসতে বলে সে জানাল যে সাধুবাবা তাঁর ধানক্ষেত পরিদর্শনে গেছেন কাছেই। এখনি আসবেন।

ছেলেটির নাম ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানলাম সে সাধুবাবার আশ্রিত। চেলা বা শিষ্য ওই রকম কিছু। একথা সে কথার পর জানলাম যে এদিকটায় জানোয়ারের চলা ফেরা আছে। সাধুবাবার ধানক্ষেতে বুনো শুয়োর আর কোটরা হরিণ বিস্তর আসে। ধানক্ষেতে মাচানে বসে ভরদ্বাজ রাত জেগে পাহারা দেয়, কানেস্তারা বাজিয়ে বুনোশুয়োর, হরিণ তাড়ায়। জলার পাড়ে রাতে সম্বর, চিতল হরিণ চরে বেড়ায়। বাঘও আছে। কল্লাফুলিয়া, পাটাগড়িয়া (ডোরা বাঘ) দুই-ই আছে। মাঝে মাঝে ডাক শোনা যায়। সে জানাল যে এ বিষয়ে সাধুবাবাই বেশি জানেন। কিন্তু এরপরই যে কথাটি জানাল শুনে থ মেরে রইলাম। উৎসাহ-উদ্দীপনা সব চুপ্‌সে গেল। ভরদ্বাজ বলল, আশ্রম'অ চারি আড়ে জন্তু মারিবাক বন্দ। সাধুবাবার নিষেধ'অ অছি।

ভ্যালা বিপদ ! যা হোক, এ হেন সাধুবাবার সম্মুখীন হবার জন্যে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সাধুবাবা দৃশ্য হলেন তপোবনপ্রান্তে। একটি পাঁচন হাতে এগিয়ে আসছেন—দৃষ্টিটা আমারই উপর নিবদ্ধ। কাছে এলে জোড়হাত করে বললাম, নমস্কার সাধুবাবা !

সাধুবাবা শুধু একটি হাত তুলে আশীর্বাদিক ইঙ্গিত করলেন। থম থম করছে মুখটি। বছর চল্লিশেক বয়েস, খর্বকায় শীর্ণ, কালো দেহ—কোমরে একটি নেংটি জড়ানো। মাথায় জটা, দাড়ি-গোঁফের বাহুল্য নেই—তবে রয়েছে কিছু কিছু দেখলাম। সাধুবাবা বারান্দায় উঠে ধুনির পাশে একটি হরিণের চামড়ার আসনে বসলেন। বসেই ঘোষণা করলেন, ইধার শিকার-ফিকার নেহি হোগা ! আপ কৌন হ্যায় ?

সাধুবাবা উড়িয়া হলেও হিন্দীতেই কথা বলা পছন্দ করেন

১। পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে হরিদাসপুর স্টেশনের কাছে চণ্ডীখোল আশ্রমের প্রসিদ্ধিই বেশি। চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিত সেখানে। জাগ্রত বলে প্রবাদ আছে। দূর দুরান্তের লোক চণ্ডীদেবীর দর্শনে আসে, পুজো দেয়।

হিন্দুস্থানের অনেক তীর্থস্থান উনি পর্যটন করে এসেছেন। আমিও করেছি, তবে সবই তীর্থস্থান নয়। তাই আমাদের ছ'জনেরই হিন্দী ভাষার দখল বেশ প্রতিযোগমূলক। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ অনেকটা এ ধরণের। সে যা হোক, সাধুবাবাকে আমার পরিচয় দিলাম।

সাধুবাবা শুনে বললেন, মালুম হুয়া, আপ ম্যালেরিয়াকা ডাক্তার হ্যায়।

সাধুবাবাকে এইখানেই চেপে ধরলাম, আর এগোতে দিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, আপকো আশ্রম কি সীমানা বাতাইয়েতো?

সাধুবাবা বললেন, ইয়ে তালাওকা উস্ পাড়সে একদম ঘু-উমকে—এইসা। বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কেন্দ্র করে সেই বহুদূর বিস্তৃত জলাভূমিটার অপর পাড় ব্যাসার্ধ ধরে মাথার উপর দিয়ে চক্রাকারে হাতটি ঘুরিয়ে আনলেন।

আতান্তরে পড়লাম আমি। দেখলাম এক বর্গমাইলের ব্যাপার। জিজ্ঞেস করলাম, তব্ ইয়ে সব আপ্‌কো জমিন হ্যায়?

বললেন, হামারা কিয়া! সব ভগ্‌ওয়ান কো হ্যায়।

ভাবলাম, দেবোত্তর-টেবোত্তর হবে। আবার বিশ্বাসও হল না। বললাম, কাগজ দেখাইয়ে তো।

কৌন কাগজ?

দলিল-পর্‌মান।

সাধুবাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, ভগ্‌ওয়ান কো লিয়ে দলিল! পরমুহূর্তে চোখ বুজে তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন, হুঁ-হুঁ-হুঁ! বললেন, আপ কৌন জাত হ্যায়?

বললাম, বাঙালী ব্রাহ্মণ।

সাধুবাবা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমাকে বিস্মিত করে বিশুদ্ধ বাঙলায় বললেন, ও, আপনি বাঙালী! তবে আর আপনাকে কি বোঝাব, জানেন তো সবই বিশেষ যখন হিন্দু।

বিস্মিত হলেও আমি প্রকাশ করলাম না সেটা। বরং একটু রাগতভাবে বললাম, জানি তো সবই, কিন্তু এই মরজগতে ভগবানের সম্পত্তির জন্যেও দলিল চাই। আমি বুঝেছি, আপনি বে-আইনীভাবে এ সমস্ত জায়গা দখল করে মন্দির বানিয়ে বসেছেন। চাষ-আবাদ করে এখন দিব্যি ভগবানের নামে সব ভোগ করছেন। আমি সরকারকে এ বিষয়ে লিখব। এ কথাও লিখব যে, আপনি সরকারী কর্মচারীদের নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিতে চান না—শিকার-টিকার করতে বাধা দেন। বলেই একটা 'চারমিনার সিগারেট বের করে ঠুক-ঠুক করে ছ'বার দেশলাইয়ে ঠুকে ধরিয়ে ফেললাম।

ততক্ষণে তেলিগড়ার সাধুবাবা নেতিয়ে গেছেন। বললেন, আচ্ছা, আপ্ সর্‌কারী অফ্‌সর হ্যায়! তব্ তো ঠিক হ্যায়। খেলিয়ে না কেত্‌না শিকার খেলেঙ্গে—লিখ্‌না পড়্‌নাকা ক্যেয়া জরুরত। তার পর আবার বাঙলায় বললেন, কিন্তু ডাক্তারবাবু, বন্দুক তো আপনার চলবে না। আর বন্দুক চললেও জানোয়ার মারা খাবে না।—বলে মুচকে হেসে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

বললাম, কেন?

বললেন, মন্ত্রপূত কি না।

বললাম, কি মন্ত্রপূত?

বললেন, এ সমস্ত এলাকা। বনদেবী রয়েছেন যে এখানে। যিনি দুর্গা তিনিই বনদেবী। তবে শুনুন এক ঘটনা। বলে সাধুবাবা আরম্ভ করলেন—বছর তিনেক আগে গরমের সময়ে দুটি ইংরেজ শিকার করতে এসেছিল এখানে। দেখতে একদম লাল! খুব ভাল ভাল রাইফেল নিয়ে এসেছিল তারা। আমি এখানে বসে বসে দেখলাম, মজুরেরা জলার পারে গর্ত খুঁড়ছে। আমি তো বুঝলাম যে সাহেবরা ঐ গর্তে বসে রাতে শিকার করবে। কিচ্ছু বললাম না ওদের। কি বলব ডাক্তারবাবু! বনদেবীর মহিমা ওসব ম্লেচ্ছরা কি বুঝবে। কিন্তু হ্যাঁ, মজুরেরা বলেছিল—সাহাব, ইধার বন্‌দেভী হ্যায়, জান্‌বর মার নেহি খায়েগা। সাহেবরা ডেম-মেন-বেলাডি বলে তো মজুরদের ভাগিয়ে দিল। ব্যস্, তারপর সন্ধ্যাবেলায় সেই গর্তে বসল। রাত তখন এগারোটা কি বারোটা, আমি শুনলাম ঠা, ঠা, ঠা—তিনবার গুলী চলল। এই বারান্দায় বসে আমি ধ্যান করছিলাম, ধ্যান ভেঙ্গে গেল। উঠে বাইরে গিয়ে দেখলাম তিনটি সম্বর দাঁড়িয়ে আছে, একদম সাহেবদের কাছে—যেমন আমি আর আপনি। ইয়া ইয়া শিং সব! ফিরভি গোলি চালায়া—ঠা, ঠা! লাগে না! যেমন এসেছিল তিন সম্বর জল খেয়ে আবার তেমন চলে গেল।

ভোরবেলা তো সাহেবরা আমার কাছে এসে হাজির। ক্যেয়া সমাচার! না—ক্ষমা কর্ দিজিয়ে সাধুবাবা! ইধার আওর কভি নেহি আয়েগা। হামলোক আপকো বন্‌দেভী কি মানতেহে।

আমি বললাম, ঠিক হ্যায়, চলা যাও। তো চলে গেল।

আর একবার কি হয়েছিল শুনুন। বলে সাধুবাবা আবার আরম্ভ করলেন—এই বরুণা পাহাড়ের ওপারে দর্পণা গাঁয়ের কয়েকটি লোক হরিণ শিকারে এসে এই জলার পাড়ে চুপচাপ এক গর্ত খুঁড়ে বসে রইল। রাত যখন অনেক তারা দেখল ধীরে ধীরে সমস্ত বনভূমি সবুজ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল—একদম হা-রা! ওরা তখন ভাবতে লাগল এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন চারিদিক। কৃষ্ণপক্ষ—চাঁদও নেই আকাশে! তারা এদিক দেখে—ওদিক দেখে—কিছু না! হ্যাঁ—শেষে দেখল যে বরুণা পাহাড়ের মাথায় তিনটি বাতি জ্বলছে—একটি উপরে আর দু'টি একটু নীচে দু'পাশে। স্থানীয় লোক কি না, বনদেবীর মহিমা জানত ওরা। যেমনি মনে পড়ল সেকথা, ব্যস, জোরে চেঁচাতে লাগল—সাধুবাবা বাঁচাও। ধ্যান করছিলাম আমি, ধ্যান ভেঙ্গে গেল। অমনি বাইরে এসে ওদের চিৎকার করে ডেকে বলে দিলাম, যা, আজ বাঁচ্ গিয়া, আওর কভি নেই আনা। তো পালাল।

সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বাতি তিনটি কিসের ছিল?

সাধুবাবা বললেন, দুর্গামায়ের তিন চোখ কি না?

বললাম, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

বললেন, যিনি দুর্গা তিনিই বনদেবী। সেই বনদেবীর তিন চোখের জ্যোতিতে রাত দিন হয়ে গিয়েছিল। মানে পাহাড়ের উপর থেকে দেবী সেই লোকগুলোকে দেখছিলেন।

বুঝলাম সাধুবাবা যেন-তেন-প্রকারেণ আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চায়। একটু ভেবে নিয়ে বললাম, আচ্ছা সাধুবাবা,—যার কাছে মহামন্ত্র আছে?

বললেন, কিসের মহামন্ত্র ?

বললাম, যিনি দুর্গা তিনি কালী আবার তিনিই মহাদেবী—তাঁর মন্ত্র। সাধুবাবার যেন সব গোল পাকিয়ে গেল। বললেন, জেরা সমঝা দিজিয়ে তো।

বললাম, বিষে বিষক্রিয়া নষ্ট করে কি না ?

করে তো।

ওই রকম মন্ত্রে মন্ত্রের ক্রিয়া নষ্ট করে। তাকে বলে মহামন্ত্র।

সে তো আছে।

আছে তো ? সেই মহামন্ত্র আমার কাছে আছে। বলেই সিগারেটের শেষ অংশটুকু দু' আঙুলের কারচুপিতে ছুড়ে ফেললাম।

সাধুবাবা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিলম্বিত স্বরে হুঁ-উ বলে ধীরে মুণ্ডটি পাশে ঘুরিয়ে নিলেন। অদূরে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটা থেকে শীর্ণ একটা ধোঁয়ার রেখা শূন্যে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল, সাধুবাবা একাগ্রদৃষ্টিতে সেটা দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে মহামন্ত্রের কথা বললেন, সে মহামন্ত্র কোথায় পেলেন—কি করে পেলেন ?

বললাম, বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে এক তান্ত্রিক সাধুর কাছ থেকে পেয়েছি।

মির্জাপুর বিন্ধ্যাচল ?

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু সেদিকে নয়। সাসারাম থেকে যেতে হয়। একবার সেখানে শিকার করতে গিয়ে ধূম্রকুণ্ড প্রপাতের কাছে সেই তান্ত্রিক বাবার সাক্ষাৎ পেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, তু মোতিকুণ্ড প্রপাত তরফ চলা যা, উধার হরণ্ মিলে গা। মিলনেসে হামকো হরণ্‌কা গোস্ খিলানা, তেরেকো আচ্ছা হোগা। যেমনি আমি মোতিকুণ্ড গিয়ে পৌঁছেছি একটা কোট্‌রা হরিণ দেখলাম যেন মরবার জন্যে বুক চিতিয়ে আছে। অমনি রাইফেল উঠিয়ে তো দুম্! মেরে দিলাম। ব্যস্, হরিণটাকে আমার চাকরের কাঁধে চাপিয়ে একেবারে তান্ত্রিক বাবার পায়ের কাছে এনে নামিয়ে দিলাম। তান্ত্রিক বাবা সে মাংস দিয়ে সারারাত কি সব যজ্ঞ করলেন, তারপর সে মাংস খেলেন। ভোরবেলা তাঁর এক চেলা পাঠিয়ে আমাকে তাঁবু থেকে ডেকে নিয়ে গেলেন। গুহায় বসেছিলেন—কি সেই জ্যোতি! বললেন, বেটা, তেরা উপর হাম বহুত খুস্ হুয়া। তেরেকো আজ হাম মহামন্তর দেগা। বলেই একটা বেলপাতায়—হরিণের রক্ত পড়েছিল, সেই রক্তে একটা কাঠি ডুবিয়ে সংস্কৃতে লিখলেন। তারপর বেলপাতাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, ইয়ে মন্তর কো ইয়াদ রাখ না। কুচভি মন্তর ইস্‌সে কাট যায়গী। সেই সব মন্ত্রনাশক মহামন্ত্র আমার কাছে আছে। স্বরচিত গল্পটি শেষ করেই তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে সাধুবাবার দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম।

সাধুবাবা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হুঁ-উ-উ বলে মাথাটি বার তিনেক নাড়লেন। তারপরই বললেন, তবে তো ঠিক আছে, আপনার হাতে জানোয়ার মার খাবে।

আমি বললাম, আপনি আমাকে জানোয়ার দেখান, দেখবেন এক এক গুলিতে তিনটি করে মরবে।

সাধুবাবা এবারে আমাকে এক হাত নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তবে তো আপনি খুব বড় শিকারী, মশাও মারেন জানোয়ারও মারেন। বলে হা হা করে হেসে উঠলেন।

হাসলাম আমিও। সাধুবাবার অন্তরঙ্গ হতে আমি হাসিতে যোগ দিলাম। তারপরই জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সাধুবাবা, আজ মাস দুই যাবৎ একটা চিতাবাঘ যে গরু-মোষ মারছে শুনেছেন কি ?

সাধুবাবা বললেন, ও, সেই শয়তানটা—হ্যাঁ, জানি।

বললাম, দেখেছেন ওকে ?

সাধুবাবা আমাকে বিস্মিত করে বললেন, রোজই তো দেখি। বলেই ভরদ্বাজকে নির্দেশ দিলেন, এই, ডাব্বা লাও! তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, বরাবর এ রাস্তায় চলে। পরশু রাতে ওই দিকে গেছে আজও ফেরে নি। গরুর মতো উঁচু, এত্ত বড় পাঞ্জা সামনেই নালার পাড়ে দেখতে পাবেন।

ডাব্বা এসে গেল। সাধুবাবা বড় কাজে মন দিলেন। ডালা খুলে একটি সরু কলকে বের করে দেখে নিলেন পরিষ্কার আছে কি না। তারপর কলকেটি সামনে রেখে একটি গাঁজার ডাঁটা তুলে নিয়ে ছোট্ট একখণ্ড চৌকো কাঠের উপর রেখে ছুরি দিয়ে বেশ কুচিয়ে কুচিয়ে কাটলেন। কুচিগুলো হাতের তেলোয় নিয়ে কমণ্ডলু থেকে একফোঁটা জল ছিটিয়ে বুড়ো আঙুল ঘষে ঘষে একটি সুগোল বড়ি তৈরি করে ফেললেন। কলকেয় একটি ছোট্ট পাথর ফেলে তার উপর বড়িটি রেখে আমার দিকে মনোযোগ দিলেন।

হাঁটুতে হাত বুলিয়ে পা নাচাতে নাচাতে বললেন, এক জোড়া বাঘ বাঘিনী ছিল। বাঘটা মরেছে আর বাঘিনীটা কোথায় পালিয়েছে। আমি বলে দিয়েছিলাম, যেদিন আমার আশ্রমের গরু মারল সেদিনই বলে দিয়েছিলাম—সালা, তেরেকো মওত্ আগিয়া! ঠিক তিনদিন পর কোথেকে গুলি খেয়ে দুর্গা মন্দিরের পিছনে এসে পড়ে মরল। এরপর বাঘিনীটা যাতায়াত সুরু করল। একদিন অনেক রাতে আমি ধ্যান করছি, চোখ খুলে দেখি বেটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, কেয়ারে বেওয়া হুয়া তবভি লাজ নেহি! আজ নেহি ভাগেগী তব

উস্‌কো ভি মওত আযায়গী। ব্যস সেই যে পালাল আর দেখা নেই। বলে চট করে ধুনি থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে কলকেয় রাখলেন। পরিপাটি করে ভাঁজকরা একটি ন্যাকড়ায় কলকের তলদেশ জড়িয়ে দু'হাতের অপূর্ব কায়দায় ধরে একবার শিবনেত্র হয়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে কি বললেন, তারপর খুব দ্রুত পর পর কয়েকবার টেনে আড়চোখে একবার কলকেটা দেখে নিয়েই মরি কি বাঁচি করে একটান মারলেন। সে কি টান! পেটে পিঠে এক হয়ে গেল, চোখ দু'টো কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে, সাধুবাবার টান আর বন্ধ হয় না। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি মুখটি সরিয়ে আনলেন। মুখ বন্ধ। একটুও ধোঁয়া অপচয় করলেন না, সব গিলে ফেললেন। তারপর ভারী গলায় বললেন, কি শিকার করতে চান আপনি?

বললাম, ঐ চিতাবাঘটাকেই মারতে চাই।

সাধুবাবা বললেন, মারতে পারেন মারুন, কিন্তু শয়তানটা এখন মরবে না।

বললাম, কেন?

সাধুবাবা বললেন, উস্‌কো মওত নেহি আয়া—মৃত্যুযোগ নেই এখন।

সাধুবাবা কলকেটি তুলে আবার গাঁজায় দম দেবার উদ্যোগ করতেই আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম। একথা না বললেও চলে যে তেলিগড়ার সাধুবাবার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি নি, বিশেষ, তাঁর ভাবভঙ্গি ভড়ং ভাড়ং আমার ভাল লাগে নি। সব কিছু গাঁজাখোরি বলে মনে করলাম। তবে একথা সত্য যে একটা চিতবাঘ মাঝে মাঝে আশ্রম-আঙিনা পারাপার হয়, কেন না আশ্রম-আঙিনা ছাড়াতেই একটা নালার পাড়ে সাধুবাবা বর্ণিত সে পাঞ্জা দেখলাম—অবিশ্বাস্যরকম বড়। পুরনো ও নতুন অনেকগুলো পাঞ্জা কাদা মাটিতে ছেপে আছে, আর সেগুলো একটা চিতাবাঘেরই পাঞ্জা।

সেদিন সন্ধ্যা অবধি ধানমণ্ডল জঙ্গলের অনেকটা দেখে আমি স্টেশনে ফিরে এলাম। ট্রেনে ওঠবার আগে স্টেশন মাস্টার মোহান্তিবাবুকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন বাঘের মারির খবর পেলেই আমাকে কণ্ট্রোল ফোনে ভদ্রকে জানান।

ঠিক একদিন পর, সকালবেলা, মোহান্তিবাবু কণ্ট্রোল ফোনে ডেকে বললেন, কাল সন্ধ্যায় বাঘে একটা গরু মেরেছে শুনেছিলাম, এখন দেখছি পাহাড়ের নীচে বনের মাথায় শকুন উড়ছে। সম্ভবত মারিটা দেখেছে ওরা, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।

বেলা তিনটেয় আমি ধানমণ্ডল এসে নামলাম। শকুনটকুন কিছু দেখলাম না।

মোহান্তিবাবু বললেন, বোধ হয় ভোজে বসে গেছে। কুছপরোয়া নেই—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, উ-ই যে বড়গাছ একটা দেখছেন—ওখানে চলে যান। ওখানেই শকুন উড়তে দেখেছি।

আমার সন্দেহ হল কাঁটাবন ভেদ করে শেষ পর্যন্ত ঐ গাছের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারব কি না। যা হোক চা-টা খেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মোহান্তিবাবুর কাছ থেকে একটা টাঙ্গি চেয়ে নিয়ে আমি সেদিকে রওনা হয়ে গেলাম।

এ পর্যন্ত আকাশের অবস্থা ভালই ছিল। কখনও রোদ কখনও ছায়ায় দিনটা কেটে যাচ্ছিল। আকাশে আবার একটু একটু করে মেঘ ঘনাতে লাগল। ঝড়জলের জন্যে আমি তেমন চিন্তিত হলাম না, আমি চিন্তিত হলাম সূর্যাস্তের কথা ভেবে। সন্ধ্যার আগে যদি সেই মারিটা—যদি সত্যি সেটা বাঘের মারি হয়, খুঁজে বের করে বসতে না পারি তাহলে আর বসা হবে না। কেন না অন্ধকারে এই কাঁটাবনে মারি খুঁজে বের করা অসম্ভব?

কাঁটাবনের গোলকধাঁধায় প্রায় মাইল দুই চলার পর সেই বড়গাছটার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। সেটা একটা আমগাছ, অনেক আম পেকে আছে তাতে। প্রায় একশ' গজ দূরে আমগাছটা দুর্ভেদ্য বনফুল আর কাঁটাবাঁশের ঝোপে ঘিরে রেখেছে। কোথায়ই বা মারিটা আর কোথায়ই বা শকুনগুলো কিছুই হদিশ করতে পারলাম না। ওদিকে বরুণা পাহাড়ের মাথায় ঘনঘটা, বেলাও বুঝি যায় যায়। অন্য কোনপথে আমগাছটার দিকে এগনো যায় কি না ভেবে আমি ঝোপঝাড়ের মধ্যে পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলাম—উদ্দেশ্য, আমগাছের ওপর থেকে মারিটার খোঁজ করব।

হঠাৎ আমার নাকে একটা দুর্গন্ধ এল। যে গন্ধে মানুষ নাকে মুখে কাপড় চেপে পালায় সেই গন্ধ শোঁকবার জন্যে আমি উতলা হয়ে উঠলাম। আমি হায়নার মতো নাক উঁচিয়ে উঁচিয়ে চারদিকে বাতাস শুঁকে দুর্গন্ধের মূল সেই মারিটা খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু বর্ষাকাল, এলোমেলো বাতাস—দুর্গন্ধটা যে কোনদিক থেকে এল বুঝতে পারলাম না। আমগাছটার কাছে যাবার কোন পথও পেলাম না। অগত্যা টাঙ্গিতে ঝোপঝাড় কেটে, সরিয়ে আমি বরাবর আমগাছটার দিকে এগোতে লাগলাম। তিরিশ ফুট এগোতে আমার প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগল। দেখলাম এ রকম হলে অর্ধেক পথ যেতেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। সহসা আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ভাবলাম পাথর ছুড়ে দেখি না কেন শকুনগুলো কোথায় আছে।

আমি একপো-দেড়পো ওজনের গোটা বারো পাথর এদিক ওদিক থেকে কুড়িয়ে জড়ো করলাম। প্রথমেই উত্তরমুখো হয়ে আমগাছটার দিকে পরপর তিনটে পাথর ছুড়লাম—প্রথমটা কাছে, পরেরটা একটু দূরে, তার পরেরটা আরও দূরে। সব চুপ। কোথাও একটু ডানা ঝাপটানোও শুনলাম না। তারপর দক্ষিণমুখো হয়ে একটা পাথর ছুড়লাম। পাথরটা ফুট চল্লিশেক দূরে গিয়ে পড়তেই ঘ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে চিতাবাঘটা গর্জে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক শকুন ডানা ঝাপটে শূন্যে উঠল।

ভয়ে আমি কাঠ। আমার দাঁত কপাটি লেগে যাবার যোগাড়। কি সর্বনাশ, শকুন খুঁজতে গিয়ে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র জানোয়ারটিকে বুঝি আঘাত করলাম! আমি বন্দুক হাতে নিশ্চল হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। চিতাবাঘটা সেখানেই রয়ে গেল কি চলে গেল বুঝলাম না। একবার ভাবলাম ফিরে যাই, আবার ভাবলাম এ সুযোগ আর না-ও আসতে পারে। কি মারাত্মক নেশা, ভয় করছে তবু ফিরে যেতে মন চায় না! একটা বন্দুকের আওয়াজ, আর মরণোন্মুখ একটা জানোয়ারের মরণযন্ত্রণা শোনবার ও দেখবার উগ্র ইচ্ছা আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখল।

বুকের ধড়ফড়ানিটা একটু কমলে আমি নিঃশব্দে সেখান থেকে ফিরে এসে আগের জায়গায় দাঁড়ালাম। ভাবলাম মারিটার কাছে যাবার একটা পথ নিশ্চয় আছে, তা না'হলে গরুটা সেখানে যেত না, অথবা গরুটাকে আর এক জায়গায় মেরে থাকলে বাঘ মারিটা সেখানে টেনে নিয়ে যেত না—নিতে পারত না। ধূর্ততা আর নির্লজ্জতায় চিতাবাঘের সমকক্ষ আর কেউ নয়, তেমনি দুঃসাহসী—কখন কোথা থেকে লাফিয়ে পড়বে বোঝা মুস্কিল, তাই আমি বন্দুক বাগিয়ে ট্রিগারে আঙুল রেখে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে খুব সাবধানে পা ফেলে পথটা খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

শকুনগুলো চক্কোর মেরে উড়ছিল, হঠাৎ নীচে নেমে আবার ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। পরক্ষণেই শুনলাম তারা মারিটা নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি সুরু করল। বুঝলাম চিতাবাঘটা সেখানে নেই। মনে অসীম বল পেলাম। একটু পা চালিয়ে দিলাম, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

যা ভেবেছিলাম তাই, রাস্তাটা পেলাম। দেখলাম বাঘ মারিটা যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভেজা মাটিতে সে দাগ স্পষ্ট ছেপে গেছে। দু'দিকে খেজুরের চারা গাছ, মাঝখানে একটা সরু পথে এঁকে-বেঁকে চলে আমি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। আড়ে দিঘে জায়গাটা পনেরো ফুট আর কুড়ি ফুটের মতো হবে, চারদিক ঘিরে খেজুর, বনকুল, আর বাঁশঝোপ। মারিটা একপ্রান্তে ঝোপ ঘেঁষে পড়ে আছে। বেশ বড় একটা সাদা গরু। বুকে পিঠের প্রায় সের পনেরো হাড় মাংস খেয়ে চিতাবাঘটা বুঝি মারি আগলে বসেছিল, তাই শকুনগুলো তেমন সুবিধে করতে পারে নি, পেটটা ফাঁসিয়ে নাড়িভুঁড়িগুলো খেয়েছে মাত্র।

শকুনগুলো আমাকে দেখেই ঝোপঝাড়ের অমুচে উঠে অপেক্ষা করছিল, সেগুলোকে তাড়িয়ে দিলাম। তারা আমগাছটায় গিয়ে আশ্রয় নিল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি মারিটা থেকে ফুট পনেরো দূরে বসবার জন্যে একটা বড় বাঁশঝোপ বেছে নিলাম। ঝোপরির মতো বাঁশঝোপটা, ভিতরে ফাঁকা। দাঁড়িয়ে চলাফেরা করা যায়। সামনে থেকে কয়েকটা কঞ্চি কেটে রাস্তা করে আমি ভিতরে ঢুকলাম। দেখবার ও বন্দুক ছুড়বার জন্যে একটা ফোকর রেখে আবার ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিলাম। হ্যাভারসেক থেকে তিন সেলের টর্চটি বের করে ঝোপের ভিতরটা একবার দেখে বাঁশপাতার পুরু গালিচার উপর বর্ষাতিটা ভাঁজ করে পাতলাম। তারপর টর্চটি বন্দুকের নলের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে বাঘের অপেক্ষায় বর্ষাতিটার উপর বসলাম।

বসতেই আমার দেহের নীচে বর্ষাতির তলায় কি একটা নড়ে চড়ে উঠল। পরক্ষণেই বুঝলাম সাপ! সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। বুঝলাম আমি একটা সাপের উপর বসে পড়েছি।

সাপটা বেরুবার জন্যে আঁকুপাঁকু করতে লাগল। ভয়ে আমি আরও চেপে বসলাম, আর পরমুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। টর্চটা জ্বালিয়ে, বন্দুকের সেফ্‌টি ঠেলে আমি বন্দুক হাতে একপাশে লাফিয়ে পড়েই ঘুরে দাঁড়ালাম। আন্দোলিত বর্ষাতিটা বন্দুকের নলে উলটে ফেলতেই হিস্‌-স করে একটা কালো কেউটে সাপ ফণা তুলে আমার দিকে স্থির হয়ে রইল। কি ক্রূর দু'টো চোখ! আমি বন্দুকটা একটু ডান দিকে সরিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিলাম। গ্রাম করে বাঁদিকের নল দিয়ে এলজির ছররা বেরিয়ে গেল। সাপটা যেমন সোজা উঠেছিল তেমন সোজা নেমে গেল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ফণাটা।

কতক্ষণ ঐভাবে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, বৃষ্টির শব্দে চমক ভাঙল। বুঝলাম মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে আমি ভিজছি। নামুক বৃষ্টি, কিন্তু আমি আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালাম না। আমার সমস্ত সাহস কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল, বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম। চুলোয় যাক বাঘ শিকার—টর্চের আলোয় যে পথটা আমি প্রথমে দেখলাম সে পথ ধরেই আমি পালাতে লাগলাম। নিদারুণ সর্পাতঙ্ক সেই বৃষ্টিতে আমাকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য করে তাড়িয়ে নিয়ে এল তেলিগড়ার জলাভূমিটার পাড়ে। ওপারে সেই আশ্রম। দুর্গামন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে।

আমি জলাভূমিটার পাড়ে পাড়ে আশ্রমে এসে উঠলাম। দেখলাম মন্দিরের বারান্দায় ভরদ্বাজ কাঁসর বাজাচ্ছে, আর সাধুবাবা ঘণ্টা বাজিয়ে পঞ্চপ্রদীপে দেবীর আরতি করছেন। আমি দুর্গা মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে ধুনির কাছে গিয়ে বসলাম।

সাধুবাবা আরতি শেষ করে বারান্দায় পা দিয়েই চমকে উঠলেন। বললেন, কৌন হ্যায় ?

বললাম, আমি।

সাধুবাবা কাছে এসে ঝুঁকে দেখে বললেন, আরে—ডাক্তারবাবু! বড়ি তাজ্জব কি বাত! আপনি এ সময়ে কোত্থেকে? শিকারে বেরিয়েছিলেন বুঝি ?

বললাম, হ্যাঁ।

মিলল কিছু ?

বললাম, না। তারপর আমার দুর্দৈবের কথা বললাম।

সাধুবাবা শুনে বললেন, তবে তো খুব বেঁচে গেছেন আপনি! কি জানেন, সব দুর্গামায়ের ইচ্ছে। বলে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, তবে মিছিমিছি আপনি বাঘটার পিছনে ঘুরে মরছেন, শয়তানটা এখন মরবে না। সময় হলে আমিই আপনাকে বলব। যাক গে, আপনার খাওয়া দাওয়ার কি হবে ?

বললাম, আমার সঙ্গে রুটি-মাখন আছে। একটু চা হলে ভাল হত।

সাধুবাবা উল্লসিত হয়ে বললেন, জরুর-জরুর! আমিও খুব চা খাই। এখুনি হচ্ছে। বলে উঠে গেলেন। খানিকপরেই একবাটি পায়েস আর কিছু ফল আমার সামনে রেখে বললেন, মায়ের প্রসাদ।

পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছিলাম, ভরপেট খেয়ে ধুনি ঘেঁষে শুয়ে পড়লাম। সে-রাতে বার বার সাপের স্বপ্ন দেখে চমকে চমকে জাগলাম। যতবার আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গেছে দেখেছি অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে, আর ধুনির আর একপাশে অকাতরে সাধুবাবা ঘুমুচ্ছেন। মাঝে মাঝে শুনেছি, ভরদ্বাজ ধানক্ষেতে মাচানে বসে সজাগ পাহারা দিচ্ছে—সে কানেস্তারার শব্দ।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি রোদ উঠেছে। পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টি-ধোয়া গাছ-গাছড়া রোদে হাসছে। একটা অনির্বচনীয় আনন্দে আমার মন ভরে উঠল, উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সাধুবাবা কোন্ ভোরে উঠে পুজোপাঠ শেষ করে গোয়ালে গরুর দুধ দুইছেন। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী গরুটি।

দুধ দুইয়ে সাধুবাবা গরুটিকে চরবার জন্যে ছেড়ে দিলেন।

আবাকে দেখে বললেন, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন ডাক্তারবাবু, চা হয়ে গেল বলে। তারপর আজ দুপুরে আপনি মায়ের প্রসাদ নেবেন এখানে।

চা খেতে খেতে সাধুবাবাকে বললাম, এভাবে গরুটা যে ছেড়ে দেন দেখবেন বাঘে না খায় আবার।

সাধুবাবা বললেন, সে-লোভেই তো আশ্রমের উপর দিয়ে শয়তানটা যাতায়াত করে, কিন্তু সাহস পায় না। যাঁর জিনিস তিনিই রক্ষা করছেন, আমি আপান কে!

সারাটা দুপুর ঝাঁকে ঝাঁকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে বিকেলের দিকে আবার রোদ উঠল। সে সুযোগে আমি স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। বনের মধ্যে এক জায়গায় আমার গত রাতের জুতোর ছাপ দেখে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, মারিটা তেমনি পড়ে রইল না বাঘে খেয়ে গেল একবার দেখে গেলে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে-জায়গাটা আমাকে আকর্ষণ করল। স্টেশনের পথ ধরতে আর ডানদিকে বাঁক ঘুরলাম না—একটা অদম্য ইচ্ছা আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল যেখানে মারিটা পড়ে আছে সেদিকে। জুতোর ছাপ দেখে দেখে আমি এসে উপস্থিত হলাম সেখানে। কিন্তু মারিটা দেখলাম না। কাছে গিয়ে দেখলাম বাঘ মারিটা উপর দিকে টেনে-নিয়ে গেছে—সে চিহ্ন। আমি ধীরে ধীরে সে চিহ্ন বরাবর পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। প্রায় শ' খানেক ফুট উঠে মারিটা পেলাম। মারিটার মাথা, ঘাড়ের কিছুটা, আর সামনের দু'পা তখনও অবশিষ্ট আছে। দেখে আশান্বিত হলাম যে বাঘ আবার আসবে। একটা বাঁশঝোপের কিনারায় কয়েকটা কঞ্চি হেলে পড়ে আড়াল করে আছে মারিটাকে। বুঝলাম শকুনের হাত থেকে মারিটা রক্ষা করতে বাঘেরই এ ব্যবস্থা। আমি একটা গাছের পাতায় মারিটা ধরে একটু টেনে ফাঁকা জায়গায় রাখলাম। ঠিক করলাম আজও আমি চিতাবাঘটার অপেক্ষায় বসব। জায়গাটা তেমন প্রশস্ত নয়, ফুট দশেক দূরে আর একটিমাত্র বাঁশঝোপ রয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে সেটাতেই ঢুকলাম। এবারে ভাল করে দেখে-শুনে জায়গাটা পরিষ্কার করে বসলাম।

তারপর সন্ধ্যা নামল, সন্ধ্যা উত্‌রে গেল। বাঘের দেখা নেই। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ কখনও মেঘের আড়ালে কখনও বাইরে। ঝোপের মধ্যে বসে আমি সেই আলোছায়ার খেলা দেখছি, হঠাৎ কি একটা জানোয়ার ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল। বুঝলাম বাঘ নয়, অন্য কিছু। আমি বন্দুক তুলে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

একটা দুর্দান্ত দাঁতাল বুনোশুয়োর মারিটার কাছে এসে দাঁড়াল। মারিটায় মুখ দিল। এতদিন শুনেছিলাম, আজ দেখলাম বুনোশুয়োরও গলিত হাড় মাংস খায়। পরম তৃপ্তিতে সে মারিটা থেকে হাড় মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। বুঝলাম চিতাবাঘটা এখন আশে পাশে কোথাও নেই। থাকলে দু'জনে তুলকালাম হত। আমি সেই প্রায়ান্ধকারে শুয়োরটার খাওয়া দেখতে লাগলাম।

সহসা মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল। সে আলোয় বিশালদেহী শুয়োরটাকে দেখে আমার প্রচণ্ড লোভ হল। আমার মনের আয়নায় একতাড়া নোট ফর ফর করে পাতা উল্টে গেল। আমি বন্দুক তাক করে শুয়োরটার পাঁজর ঘেঁষে গুলি চালালাম। শুয়োরটা একটা নারকীয় চিৎকারে একপাক ঘুরে দু'পা গিয়েই পড়ে গেল। পড়ল—প্রথমে যেখানে মারিটাছিল সেই ঝোপের মধ্যে।

আমি উঠে গিয়ে টর্চের আলোয় শুয়োরটাকে দেখলাম, প্রায় চারমণ ওজন হবে। মানে খুব কম করেও গায়ের লোমসুদ্ধ তিন শ' টাকায় বিক্রি হয়ে যাবে। অভাবিত প্রাপ্তিযোগের আশায় আমি আবার ঝোপে ফিরে ভোরের অপেক্ষায় বসে রইলাম। বাঘ আর এল না। শেষ রাত থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আমি গায়ে মাথায় বর্ষাতিটা জড়িয়ে কখন ঘুমে কখন জাগরণে রাত কাটালাম।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই শশব্যস্তে ঝোপ থেকে বেরুলাম তাড়াতাড়ি লোকজন ডেকে এনে শুয়োরটাকে নিয়ে যাব বলে। রওনা হবার মুহূর্তে শুয়োরটাকে একবার দেখতে গেলাম।

নেই! শুয়োরটা সেখানে নেই!

আমি হামা দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখলাম চিতাবাঘ আমার উপর টেক্কা মেরে কখন শুয়োরটাকে টেনে নিয়ে গেছে। হতাশায় রাগে আমার নিজের শরীর নিজে কামড়াতে ইচ্ছে হল। আমার একটুখানি পোড়া ঘুমের জন্য বাঘ, শুয়োর দু-ই গেল! আমি মরিয়া হয়ে শুয়োরটার খোঁজ করতে গেলাম।

আমি ঝোপের আর একপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে চিহ্ন দেখে দেখে ক্রমশ পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। ঝোপের মধ্য দিয়ে কখন হেঁটে কখন হামা দিয়ে এগুতে লাগলাম। আমার চলার শব্দ ছাপিয়ে সশব্দে বৃষ্টি হচ্ছে তখন, বাঘ শোনে সাধ্য কি! তাই ভাবলাম যদি চিতাবাঘটা মারির কাছে থাকে আর আমি তাকে আগে দেখি তো গুলি করব।

কিন্তু চিতাবাঘই আমাকে আগে দেখল। প্রায় ফুট পঞ্চাশেক উঠেছি অকস্মাৎ চিতাবাঘটা আমার পাশের ঝোপ থেকে গর্জে উঠল। খুব চাপা, বিলম্বিত একটা ক্রুদ্ধ গর্জন—খ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আমি কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। বুঝলাম শ্বাপদটার খুব কাছে এসে পড়েছি। এত ঘনঝোপ—যে আমি বুঝতে পারছি, শুনছি চিতাবাঘটা আমার খুব কাছে, দেখে যে গুলি চালাব তার উপায় নেই। অথচ সে আমাকে দেখছে!

উত্তরোত্তর চিতাবাঘটার গর্জন বাড়তে লাগল। মনে হল এরপরই হয়ত সে ঝাঁপাবে। আমার আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়াবার সাহস হল না। আমি বন্দুক বাগিয়ে ধীরে ধীরে আরও কয়েক পা পিছন হেঁটে তারপর দ্রুত পাহাড় থেকে নেমে গেলাম। সেখান থেকে স্টেশন, স্টেশন থেকে পরের ট্রেনে বাড়ি।

এর পরেও আমি অনেকবার ধানমণ্ডলে গেলাম, অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু চিতাবাঘটাকে মারতে পারলাম না। কখন মারির সামনে বসলাম, কখন ওর যাতায়াতের পথে ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে রাত কাটালাম, একবার চোখের দেখাও দেখলাম না। লোকজন দিয়ে তন্নতন্ন করে জঙ্গল ঘেঁটিয়ে চিতাবাঘটাকে বের করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে ঝোপে ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে কোথায় যে চলে যায় টের পাওয়া যায় না। অবশেষে একদিন তাকে দেখলাম।

সেদিন শেষ রাত্তে বন থেকে আমি স্টেশনে ফিরছি, বরুণা পাহাড়ের নীচে একটা পরিত্যক্ত খাদানের উপর অন্ধকারে অন্ধকারের চেয়েও কালো একটা জানোয়ার দেখে দাঁড়ালাম। টর্চের আলো ফেলতেই বিরাট একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে পাশের ঝোপে পড়ল। চকিতে জলজলে চোখ দু'টো 'একবার জেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। আর দেখলাম না। [আগামীবারে সমাপ্য।

বাঙলার কারুশিল্প

বড় শিল্প একটি দেশের সমৃদ্ধির পরিচয় আর ছোট শিল্প বিশেষ করে চারু ও কারুশিল্প একটি দেশের কৃষ্টি আর সংস্কৃতির নিদর্শন। লোহার আর ইস্পাতের কারখানা, কাপড়ের আর চটের কল বলে সে দেশ কত টাকা রোজগার করে তার ইতিহাস কিন্তু কারুশিল্পের গবেষণায় প্রমাণিত হয় সে দেশের সভ্যতা কতো পুরানো।

আজ পশ্চিম বাঙলার যে কারুশিল্পগুলি আমরা চোখের সামনে দেখছি তার সঙ্গে পূর্ব বাঙলার ফেলে আসা শিল্পগুলি যোগ করলে অবিভক্ত বাঙলার যে বিরাট কারুশিল্পের কথা আমাদের চোখের সামনে ভাসে তা যে কোনও দেশের গর্বের সামগ্রী।

মোটামুটিভাবে আজকের পশ্চিম বাঙলার কারুশিল্পগুলি পশ্চিম বাঙলার নিজস্ব কারুশিল্প এবং পূর্ব বাঙলা থেকে আগত শিল্পগুলির একটা সমন্বয়।

অনেকদিন আগে থেকেই বাঙলার কারুশিল্প বিশেষ করে তার সূতীবস্ত্র, রেশম, হাতীর দাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, শোলার কাজ, পট, চালচিত্র, কাঁথা ইত্যাদির নাম ছিল সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে।

বিখ্যাত পর্যটক বার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন বাঙলা নামক—এই দেশে যে সুন্দর রেশম ও সূতীবস্ত্র তৈরি হয় তা আমি সারা ভারতে এমন কি এশিয়া এবং ইউরোপের অনেক দেশেও দেখি নি। টাভার্নিয়ের লিখেছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলায় ২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড রেশমসূতো প্রস্তুত হয়। এর ৭৫০,০০০ পাউণ্ড ওলন্দাজ কোম্পানীরা বিদেশে পাঠায় আর বাকী যায় ভারতের নানাস্থানে। ইতিহাস বলে, রোমের রাজা জুলিয়াস সিজার ক্যালিগুলা প্রভৃতি বাঙলার রেশম ব্যবহার করতেন। যদি বলি একমাত্র মুর্শিদাবাদেই আজ থেকে আড়াই-তিনশ' বছর আগেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফতেই ২২লক্ষ পাউণ্ড রেশম রপ্তানী হয়েছে তবু বাড়িয়ে বলা হবে না।

কারুশিল্পের জন্ম হয়েছে মূলত গ্রামেরই প্রয়োজনে। গ্রামকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য গ্রামেই আছে তন্তুবায়, কর্মকার, কংসকার, মালাকার ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়। গ্রামের প্রয়োজন মিটিয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের গ্রামে। আশেপাশের গ্রাম থেকে রাজার বা জমিদারের কাছে। রাজা বা জমিদার, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে সেই শিল্পী পরিবারকে ডেকে এনেছেন গ্রাম থেকে নিজের কাছে, জমি-জায়গার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন এবং অকৃত্রিম সাহায্য করেছেন শিল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এমনি করে তৈরি হয়েছে একটি একটি শিল্পের ইতিহাস এবং উৎকর্ষতা লাভ করে সেই শিল্পটি পরিপূর্ণ হয়েছে সার্থক শিল্পীর হাতে।
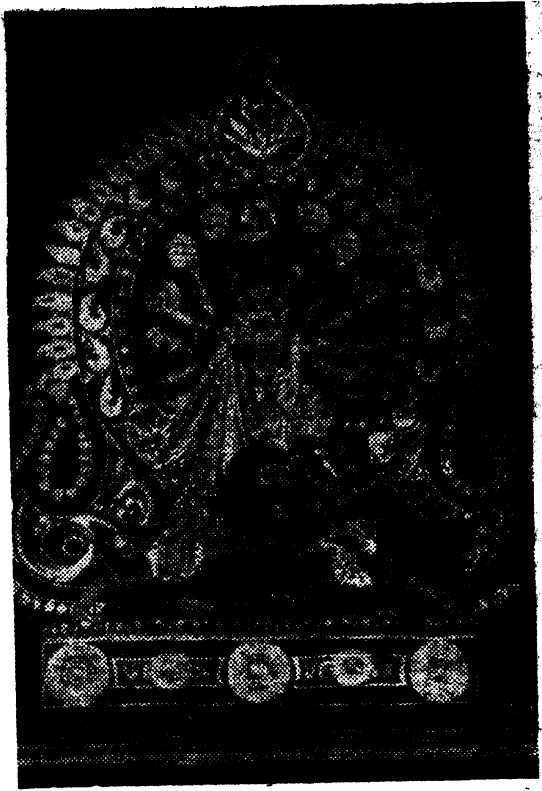
শোলার সাজ (কুমোরটুলী)

যে কোনও একটি শিল্পের কথাই ধরা যাক মুর্শিদাবাদের রেশম বা হাতীর দাঁতের কাজের কথাই বলি। কথিত আছে, জয়পুর থেকে একজন কারিগরকে মুর্শিদাবাদের কোনও এক নবাব নিয়ে আসেন হাতীর দাঁতের কাজ করাবার জন্য। গল্প আছে—নবাব একবার
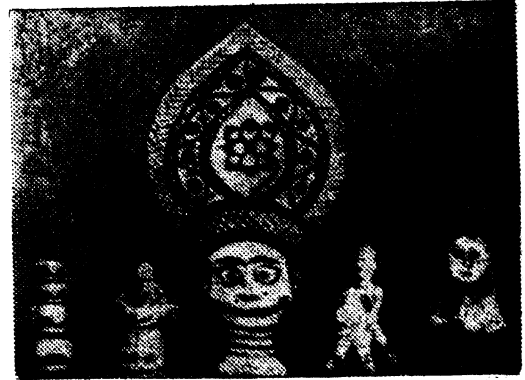
চাল মাথার কুনকে (লোকপুর) মাটিরপুতুল ও দক্ষিণরায় (মেদিনীপুর, বীরভূম ও ২৪ পরগনা) মনসাঘট (পূর্ববাঙলা)

একখানি দুষ্প্রাপ্য বালুচর। বামপাশের ছবিতে বালুচরের বিস্তারিত শিল্প-কৌশল (মুর্শিদাবাদ)

কানে কাঠি দিচ্ছেন, জনৈক পারিষদ তাঁকে বলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের কানে সামান্ত কাঠি, হাতীর দাঁতের কাজ করা কিছু পাওয়া যাবে না। সেই থেকেই পত্তন হোল মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজের।

ভাজা রসগোল্লার পরীক্ষা করতে গিয়ে তৈরি হল লেডিকেনী। এ তো সেদিনের কথা।

কুমোরটুলির বস্তি বসলো সে আর কতো কালের কথা। কলকাতায় এলেন জব চার্ণক, এলো কোম্পানী। বসলো আদালত, কাছারী। রাজা-মহারাজা, জমিদারেরা দেশের ভদ্রাসন ছেড়ে বাস করতে এলেন কলকাতায়। বড় বড় বাড়ি উঠলো, ঘোড়ায়-টানা ট্রাম, বিজলী বাতি এলো বৌবাজারে, গুড়ি-গাড়ির আওয়াজে রাস্তা মুখরিত হোল, ওয়ারেন হেষ্টিংস খুললেন কলকাতা মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু স্কুল, বেথুন সাহেবের স্কুল। কুমোরটুলি ছিল ফাঁকা জমি। কৃষ্ণনগর থেকে পুজোর মরশুমে পটুয়ারা আসতেন কলকাতায় জমিদারবাড়ির বায়না নিয়ে। গঙ্গার ধারেই পাওয়া যায় মাটি। আস্তে আস্তে তৈরি হল বস্তি। শেষে কৃষ্ণনগরের পাট চুকিয়ে পাকাপাকি বাসিন্দা হলেন কলকাতার।
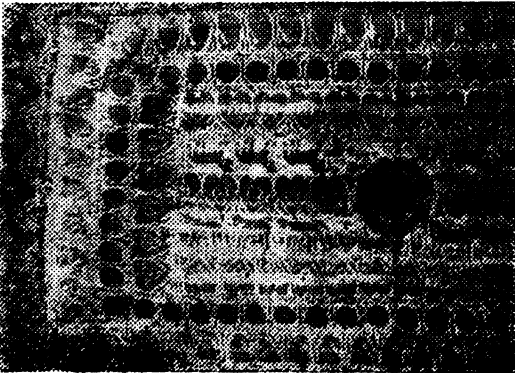
একটি পুরানো কাঁথা (যশোহর-খুলনা)

প্রত্যেকটি শিল্পের আর শিল্পকেন্দ্রের এমনি নানা ইতিহাস। পশ্চিম বাঙলায় বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি প্রায় সব জেলাতেই এই কারুশিল্পের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

বাঁকুড়ায় রয়েছে পোড়ামাটির ঘোড়া, মনসা, শোলার কাজ, নক্সী তাঁতের আর রেশমের কাজ, কাঁসা-পিতলের কাজ, গালার কাজ, কাঠের আর পাথরের কাজ, শোলার কাজ, নক্সী তাস ইত্যাদি নানা শিল্প। বিষ্ণুপুর, পাঁচমুড়া, সোনামুখী, হাপানিয়া, গুগুনিয়া, খাতড়া বহু জায়গাতেই এই শিল্পগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। তেমনি বীরভূমে রয়েছে রেশমবস্ত্র, সুতীবস্ত্র, কাঠ খোদাই, গালার কাজ, নক্সী কুনকের কাজ, কাঁসা পিতলের কাজ, মাটির পুতুল তৈরি আরও কত কি। উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র হিসাবে নাম করতে পারি করিধ্যা, তাঁতিপাড়া, ইলামবাজার, লোকপুর প্রভৃতি। বর্ধমানে তেমনি আছে দাঁইহাট, নতুনগ্রাম, দরিয়াপুর প্রভৃতি। সেখানে তৈরি হচ্ছে পাথরের আর কাঠের খোদাই কাজ, পেতলের ঢালাই, ডোকরা কাজ, কাঠের পুতুল, মেদিনীপুরে রয়েছে মাদুর, সবংয়ে, এগরায়, রামনগরে আরও নানা জায়গায়। রয়েছে শিংয়ের কাজ দাসপুরে, ঘাটালে, মাটির পুতুল হচ্ছে নাড়াজোলে। হাওড়ার বাঁটুলে রয়েছে শঙ্খকার। পোলো বল তৈরির কারিগর থেকে তালা তৈরির কারিগর অবধির দেখা মিলবে এখানে। তাঁতের কাপড়, শোলার কাজ বিখ্যাত। হুগলীর রয়েছে তাঁতের কাপড় যার চাহিদা সারা ভারতে, এমব্রয়ডারী কাজ, মাটির পুতুল, শোলার কাজ। চন্দননগর, ধনেখালির কথা কে না জানে। নদীয়ার আছে কৃষ্ণনগরের পুতুল, শান্তিপুরের কাপড়, নবদ্বীপের মাটির আর কাঠের খেলনা, কালীগঞ্জের শোলার টুপী আরও কত কি! মুর্শিদাবাদের আছে রেশম, কাঁসা-পিতল, হাতীর দাঁতের কাজ, বালাপোষ তৈরি, নক্সী হুঁকোর কাজ আরও নানা জিনিস।

উত্তরবঙ্গের মালদহ শুধু আম নয় রেশমগুটি তৈরির জন্যও বিখ্যাত। পশ্চিম বাঙলায় আজ যা রেশম তৈরি হয় তার অধিকাংশই মালদহ থেকে আসে একথা অনস্বীকার্য। কেশবপুর, সুজাপুর, জালালপুর ইত্যাদি তার বড়ো মোকাম। জলপাইগুড়ির আছে বেতের কাজ, নক্সী অলঙ্কার রূপোর তৈরি, দার্জিলিঙের কাঠ আর তামার কাজ, পশমী কাপড়, পুঁথির কাজ ইত্যাদি। কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলের আছে এমনি নানা কাজ।

বাকী রইলো কলকাতা। কলকাতায় আছে রূপোর নক্সী কাজ ভবানীপুরে, শাঁখার কারখানা বাগবাজারে, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে। চিৎপুরে আছে বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজ, আতরের কাজ। সোনার কাজ বৌবাজারে, হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে আরও নানা জায়গায়। থিয়েটারের গয়না পাবেন চিৎপুরে, সন্দেশের ছাঁচ কি বুবকাষ্ঠ আছে নতুনবাজারে। কি নেই।

২৪ পরগণায় আছে কাঁথা, পূর্ব বাঙলা থেকে এসে বারাসাতের কাছে ঘর বেঁধেছেন চিত্রকর, বানাচ্ছেন নক্সী সরা, চালচিত্র, কুলো। পোড়ামাটির পুতুল বানাচ্ছেন মেয়েরা। শঙ্খকারের বসতি বারাকপুরে। জয়নগর মজিলপুরে গড়া হচ্ছে মাটির পুতুল। বহুযুগ পারের দক্ষিণ-রায় কে জানে কি বর এসে শিল্পীর প্রেরণা জুগিয়েছে তবে তাই এখানকার শিল্পী আজও মাটির দক্ষিণ-রায় পুতুল।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, পশ্চিম বাঙলা এবং পূর্ব বাঙলার এই শিল্পগুলির মধ্যে প্রভাব পড়েছে নানা দেশের। উত্তরের নাগাদের ডিজাইন, দক্ষিণের নীলগিরি অঞ্চলের টোডা সম্প্রদায়ের ডিজাইন আজ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। পারস্যের সঙ্গে বাঙলার ছিল বহু ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই আজ যদি কেউ বর্ধমানের নতুনগ্রামে করা কালীঘাটের পুতুল দেখিয়ে বলেন যে ওর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে মিশরের 'মমির' তো অবাক হবার কিছু নেই। দক্ষিণ-দ্বারও আমাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে এই ভাবেই। ঢাকার পানবাটা মুখ ডিবা নাগাদের ঢংয়ে তৈরি বললেও তেমনি আপত্তি করবার কিছু নেই।

বাঙলার শিল্পী-সম্প্রদায় কংসকার, স্বর্ণকার, শঙ্খকার, চিত্রকর, সূত্রধর, মালাকার, কর্মকার প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সর্বত্রই। ইসলামপুরের কাঁসার কথা কেই বা ভুলতে পারবে। কে ভুলবে যশোহর-খুলনার নক্সী-কাঁথার কথা। বরিশাল-উজিরপুরের কি ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার রাম-দা'র কথা, লোহারজঙ্গ (ঢাকা) আর পালং (ফরিদপুর) এর ধাতু শিল্পের নানা কাজ সকলেরই মনে পড়বে। রাজবাড়ি ফরিদপুরের পোড়ামাটির পুতুল, টাঙ্গাইলের কাঠের কাজ আজ মিউজিয়মে গিয়ে দেখতে হয়। টাঙ্গাইল শাড়ীর কথা নাই বললাম আর ঢাকার মসলিন, কসিদা, জামদানী।

বাঙলার কারুশিল্পের প্রসঙ্গে আর একটি দিকের কথা প্রতি অবশ্যই বলতে হবে। সেটি হচ্ছে এর আদিবাসী শিল্প। ডোকরা কামারের কাজের কথাই ধরি—যাদের দেখা পাওয়া যাবে বাঁকুড়ায় নতুনচটিতে আর গুসকরার কাছে বর্ধমানের দরিয়াপুরে। গবেষকদের মতে ডোকরা বা চেপো নামের এই আদিবাসী সম্প্রদায়টি যাযাবর এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক স্থানেও এদের দেখা মিলবে। এরা কাজ করে পেতলে মাটির তৈরি ছাঁচে মোম গলিয়ে নক্সা তুলে।

এমন সময় বাঙলায় ছিল যখন গ্রামে গ্রামে এক শ্রেণীর ফকিরকে দেখা যেতো বড় বড় লাঠির মাথায় নানা ছবির বাণ্ডিল নিয়ে স্বদেশী গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে। এই ফকির সম্প্রদায় কথকতার ছলে দেশের চেতনাকে জাগ্রত করেছে। সেই ছবি আঁকতো যে চিত্রকর সে কতো বড় শিল্পী ভাবুন। পরলোকগত আত্মীয়ের ছবি আঁকার বায়না নিয়ে কাজ করতো যে চিত্রকর সম্প্রদায় তারা মৃত ব্যক্তির ছবি আঁকার পর সেই ছবিতে চোখ বসাতো না আর যে বায়না দিতো তার কাছে গিয়ে বলতো টাকা দাও তবে দেবো চোখ—সেই থেকেই তৈরি হল বাঙলার বিখ্যাত পারলৌকিক চিত্রাবলী। বাঙলার চিত্রকরেরা গড়েছে মনসার পট, গাজীর পট, রামায়ণ-মহাভারতের পট, কালীঘাট পটগুলির জন্মও এদেরই হাতে।

ধর্মের আশ্রয়, রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা, অফুরন্ত অবসর প্রতিভা সব মিলে বাঙলার কারুশিল্পকে দিকে দিকে দিয়ে দিয়েছে ছড়িয়ে, আজ তার স্মৃতিমাত্র পড়ে আছে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে। যে কাঠের নৌকায় রাজা প্রতাপাদিত্য একদিন দিগ্বিজয় করতে বেরুতে পারতেন সে নৌকা বাঙলায় আর হয় না। এই রচনার আলোকচিত্র শ্রীসুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত।—আশীষ বসু

● নেদারল্যাণ্ডের গণসংযোগ মাধ্যম ●

বেতার এবং টেলিভিসনের মতো দু'টি গণসংযোগের মাধ্যম, নেদারল্যাণ্ডে যে রকমভাবে পরিচালিত হয়, বিশ্বের আর কোন দেশে তেমনভাবে হয় না। সরকার বা বেতার ও টেলিভিসন শিল্প এগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন না। পাঁচটি সমিতি এগুলি পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেকটি সমিতির এই সম্পর্কে নিজস্ব পরিচালক বোর্ড, আইন-কানুন ও সদস্যবৃন্দ রয়েছে। এঁরা শ্রোতা ও দর্শকদের জন্য দু'টি বেতার অনুষ্ঠান এবং একটি টেলিভিসন অনুষ্ঠান প্রচার করেন। ১৯২০ সাল থেকে যখন বেতার প্রচার শুরু হয় তখন থেকেই এই রকম ব্যবস্থা চলে আসছে এবং তাতেও এর উন্নতি কোন রকমভাবে ব্যাহত হয় নি। একটি রোমান ক্যাথলিক, একটি সমাজতন্ত্রী সমিতি, দু'টি প্রটেস্ট্যাণ্ট সমিতি এবং আর একটি সাধারণ রেডিও ব্রডকাস্টিং সমিতি এই পাঁচটি বড় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ দেশের পাঁচটি প্রধান দলের আদর্শ বেতার ও টেলিভিসনে প্রচারিত হয়। এই পাঁচটি বড় বড় সমিতি বেতার প্রচারের সময়গুলি পূর্ণ রাখে এবং গত ১২ বছর যাবৎ এরাই টেলিভিসন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করছে। সরকার বেতার ও টেলিভিসন প্রচারের অনুমতি দেন, বেতার ও টেলিভিসনের বাস্তবিক লাইসেন্স দেন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বেতার প্রচারের সময় বণ্টন করেন। সদস্যগণের এবং শুভানুধ্যায়িগণের চাঁদা ও দান এবং এঁদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান পত্রিকাগুলির আয়ে এই সমিতিগুলির ব্যয় নির্বাহ হয়। বেতারে বিজ্ঞাপন প্রচার করা নিষিদ্ধ। এই অপূর্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে নানারকম সমালোচনা করা হচ্ছে। কেউ অভিযোগ করেন, 'আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি সব যথোচিত ভাবে প্রচার করা হয় না। অন্যান্য আদর্শগুলি প্রচার করার জন্যও সময় দেওয়া হোক।' অন্যরা বলেন, 'এতোগুলি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের পেছনে কেন এতোগুলি টাকার অপচয় করা হচ্ছে? একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাতে সকলের প্রতিনিধি নেওয়া হোক।' আর একদল বলেন, 'বেতারে বিজ্ঞাপন প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হোক। কারণ, একমাত্র টেলিভিসনেই এতো বেশি টাকা খাটাতে হয় যে, বেতার প্রচার সমিতিগুলি হয় তো শেষ পর্যন্ত সেই টাকা জোগাতে পারবে না।' বর্তমান বছরে বেতারে বিজ্ঞাপন প্রচার করার ব্যবস্থা প্রায় গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু রোমান ক্যাথলিক, সমাজতন্ত্রী এবং প্রটেস্ট্যাণ্ট সমিতিগুলি এতো বেশি শক্তিশালী যে তাঁরা এই ব্যবস্থা বানচাল করে দেন। কাজেই বর্তমান বেতার প্রচার ব্যবস্থাই আপাতত চালু থাকবে। এই ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও চলবে কি না অথবা নতুন একটা প্রচারের মাধ্যমের জন্য শিল্প জগৎ যে রকমভাবে চেষ্টা করছে তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে কি না তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। শিল্পগুলি ইতিমধ্যেই অন্য একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ তাঁরা নেদারল্যাণ্ডের উপকূল এলাকার বাইরে একটি জাহাজ থেকে, হালকা গানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়মূলক বিজ্ঞাপন সারাদিন ধরে প্রচার করেন।

৬৪

'সর্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার।' নিস্তার কী? মায়ামোহের বন্ধন মোচন। সংসারসাগর থেকে পার করে দেওয়া।

তিন উপায়ে এই জীবোদ্ধার। সাক্ষাৎ-দর্শন, আবেশ আর আবির্ভাব।

সাক্ষাৎ-দর্শন মানে প্রভুকে যারা দেখেছে স্বচক্ষে। কখনো কেউ সামনে এসে দেখেছে, কখনো কেউ, প্রভু যখন যাচ্ছেন পথ দিয়ে, দেখেছে দূরে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্রই মায়ামুক্তি। দেখামাত্রই হৃদয়গ্রন্থির ছেদ, সর্বসংশয়ের শান্তি, সমস্ত কর্মের নিরসন।

আর আবেশ? আবেশ মানে প্রভুর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা। প্রভু ছাড়া আর সমস্ত কিছুর বিস্মৃতি। এমন কি নিজে যে বদ্ধজীব তারও বিস্মৃতি। লোহা আগুনে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে, ভুলে যাচ্ছে সে লোহা, ভাবছে সেও আগুন ছাড়া কিছু নয়।

আবেশ সকলের হয় না। যে যোগ্য তার হয়। যোগ্য কে? যে শুদ্ধসত্ত্ব যে সাধু তার হয়। সাধু কে? যে তিতিক্ষু, কারুণিক, সর্বদেহীর সুহৃদ, অজাতশত্রু, শান্ত, অক্রোধ ও সমচিত্ত সেই সাধু।

আর আবির্ভাব? সমস্ত লোকনিয়ম অগ্রাহ্য করে আত্মপ্রকাশের নামই আবির্ভাব। লৌকিক উপায় ছাড়াই হঠাৎ এসে উপস্থিত।

'লোক নিস্তারিব—এই ঈশ্বরস্বভাব।'

কৃপাই ঈশ্বরধর্ম। তবে জীবের কেন এত দুর্দশা? দুর্দশার জন্যে দায়ী ঈশ্বর নয়, দায়ী জীব নিজে। ভগবান তো লীলানন্দেই সৃষ্টি করেছিলেন, কাউকে শাস্তি দেবার জন্যে নয়। জীবই নিজ কর্মদোষে যন্ত্রণা ভোগ করছে।

বাঙলা দেশের লোক প্রতি বছর এসে দেখে যাচ্ছে প্রভুকে। কুড়ি বছর এইরকম যাতায়াত করেছে। নীলাচলে প্রভুর চব্বিশবছরের মধ্যে কুড়িবছর। চারবছর তারা আসে নি। চারবছরের মধ্যে দু' বছর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, একবছর এসেছিলেন গৌড়ে আর একবছর তিনি নিজেই বারণ করে দিয়েছিলেন আসতে। এই চারবছর। বাকি কুড়িবছর তারা এসে গেছে।

'বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥'

অন্যান্য দেশ থেকেও আসছে জনপ্রবাহ। এমন কি মনুষ্যবেশ ধরে গন্ধর্ব কিন্নররাও আসছে। দেবতারাও সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। আর যেই দেখছে সেই 'বৈষ্ণব' হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যারা আসতে পারছে না, যারা সংসারাবদ্ধ, যারা বিত্তে-বৃত্তে আসক্ত, তাদের কী হবে? তারা উদ্ধার পাবে না। তাদের জন্যে প্রভু যোগ্য দেহে আবেশ এনে দিচ্ছেন। সেই আবেশেই নিজ শক্তি প্রকাশ করেছেন। আর সেই আবিষ্ট ভক্তকে দেখে সেই দেশের লোক উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে।

কালনার কাছে অম্বিকায় নকুল ব্রহ্মচারীর বাড়ি। উত্তম অধিকারী, পরম বৈষ্ণব। তার দেহে প্রভুর আবেশ হল। গ্রহগ্রস্তের মত হয়ে গেল নকুল। প্রেমাবেশে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। সাত্ত্বিক বিকার, অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সমস্ত ফুটে উঠেছে। হুঙ্কার ছাড়ছে সঘনে। ঠিক প্রভুর মত।

মতই গৌরকান্তি, প্রভুর মতই প্রেমানন্দ। সমস্ত গৌড়দেশ ভেঙ্গে পড়ল নকুলকে দেখতে। যাকে দেখে তাকেই বলে, কৃষ্ণনাম বলো। যে দেখে সেই প্রেমোদ্দাম হয়ে ওঠে। লোকাপেক্ষা মানে না।

শিবানন্দ সেনের সন্দেহ হল। দেখি পরীক্ষা করে। দেখি কেমন প্রভুর আবেশ হয়েছে।

নকুলের বাড়ি গেল শিবানন্দ। ভিতরে ঢুকল না, বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। কী ভাবে পরীক্ষা করবে ভাবতে লাগল।

বেশ, আমি যে এসেছি তা নকুল জানে না, দেখে নি। আমাকে নাম ধরে ডাকুক তো দেখি। না, শুধু ওটুকু হবে না। গুরু আমাকে যে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছিলেন তাও প্রকাশ করুক। সে যদি এখন সত্যিই প্রভু হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই তার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হবে, যেহেতু প্রভু সর্বজ্ঞের শিরোমণি। আমার ইষ্টমন্ত্র যদি প্রভুর অজানা না হয়, আবেশধারী নকুলেরও অজানা থাকবে না।

এই বিচার করে শিবানন্দ দূরে রইল প্রচ্ছন্ন হয়ে।

বহু লোকের ভিড় হয়েছে নকুলকে দেখতে, কে শিবানন্দের খোঁজ নেয়।

হঠাৎ নকুল বলে উঠল: 'শিবানন্দ এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

কোথায় শিবানন্দ? চারদিকে লোক ছোটাছুটি করতে লাগল।

শিবানন্দ কে? কারু কারু মুখে বা এই জিজ্ঞাসা।

আরে, এই তো শিবানন্দ। যারা চিনতো ধরে ফেলল।

নকুলকে নমস্কার করে কাছে গিয়ে বসল শিবানন্দ। নকুল বললে, 'আমার সম্পর্কে তোমার সন্দেহ হয়েছে, তাই না? বেশ, আমি তোমার সন্দেহ দূর করে দিচ্ছি। তোমার ইষ্টমন্ত্র কী, তাই আমার মুখে শুনতে চাও তো? গৌর-গোপালই তোমার ইষ্টমন্ত্র। কী, ঠিক নয়?'

শিবানন্দ মেনে নিল। ঠিক বলেছ। আর সন্দেহ নেই, তোমাতেই প্রভুর আবেশ হয়েছে। শিবানন্দ তখন অনেক সম্মান-ভক্তি দেখাল নকুলকে।

আবির্ভাব দু'রকম। নিত্য আর সামরিক। প্রভুর নিত্য আবির্ভাব চার জায়গায়। শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্তনে, শ্রীবাস কীর্তনে আর রাঘব-ভবনে। প্রেমাকৃষ্ট হওয়াই প্রভুর সহজ স্বভাব। শচীমাতা নিত্যানন্দ শ্রীবাস আর রাঘব প্রভুর সহজ প্রেমস্থল, তাঁর নিত্যনিকেতন।

আর সামরিক?

শিবানন্দের ভাগ্নে শ্রীকান্ত। একবার রথযাত্রার আগে একাকী নীলাচলে গিয়েছিল। প্রভু তাকে বললেন, 'এবার যেন রথযাত্রার আগে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে না আসে, গৌড়ে ফিরে গিয়ে এ-কথা বোলো সবাইকে। আমিই এবার গৌড়ে গিয়ে সকলকে দেখা দিয়ে আসব। আর তোমার মামা শিবানন্দকে বোলো এই পৌষে হঠাৎ একদিন তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব, আর জগদানন্দ সেখানে আছে, সে আমার জন্যে রান্না করবে।'

গৌড়ে ফিরে এসে খবর দিল শ্রীকান্ত। সকলে যাত্রার আয়োজন বন্ধ করল। পৌষ মাস এলে শিবানন্দ আর জগদানন্দ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল কবে না জানি প্রভু উদয় হন। দিনের পর দিন যায়, মাসও বুঝি ফুরিয়ে গেল, প্রভুর দেখা নেই। দুঃখে-শোকে ম্লান হয়ে গেল দু'জনে। এমন সময় হঠাৎ একদিন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—প্রভু তার নাম রেখেছেন নৃসিংহানন্দ—শিবানন্দের বাড়িতে এসে হাজির। কী ব্যাপার, বিমর্ষমুখে বসে আছ কেন?

শুনল সব নৃসিংহ। বললে, 'বেশ, ঠিক আছে, তিন দিনের মধ্যে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসব।'

প্রদ্যুম্ন ধ্যানস্থ হল। দু'দিন পরে বললে, 'প্রভু পানিহাটি পর্যন্ত এসেছেন। কাল মধ্যাহ্নে এখানে চলে আসবেন। রান্নার জোগাড় করো।'

পরদিন ভোর থেকে রাঁধতে শুরু করল প্রদ্যুম্ন। রান্না শেষ করে মধ্যাহ্নে ভোগ বাড়ল—তিন থালায় তিন ভোগ। এক ভোগ জগন্নাথের, আরেক ভোগ চৈতন্যপ্রভুর আর তৃতীয় ভোগ প্রদ্যুম্নের ইষ্টদেব নৃসিংহের। তিন জনকে তিন থালা সমর্পণ করে প্রদ্যুম্ন আবার ধ্যানে বসল। প্রদ্যুম্ন দেখল প্রভু এসেছেন। এসে শুধু তাঁর নিজের থালারই নয়, আরো দুই থালার ভোগও নিঃশেষে খেয়ে ফেললেন।

'কী করো কী করো!' চোখে অশ্রু, কণ্ঠে আনন্দ, চেঁচিয়ে উঠল প্রদ্যুম্ন। 'জগন্নাথের ভোগ খাচ্ছ তো খাও, তোমাতে জগন্নাথে ভেদ নেই, কিন্তু তুমি আমার নৃসিংহ ঠাকুরের ভোগ খাও কী বলে? হায়

হায়, আমার ঠাকুর আজ উপোসী রইল। ঠাকুরকে উপবাসী রেখে আমি বাঁচব কী করে?'

মুখে এ কথা বললে বটে কিন্তু প্রভু নৃসিংহের ভোগও গ্রহণ করেছেন দেখে মনে অগাধ শান্তি পেল প্রদ্যুম্ন। তা'হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে জগন্নাথের যেমন নেই তেমনি নৃসিংহেরও কোনো ভেদ নেই। এ-সম্পর্কে প্রদ্যুম্নের মনে বুঝি কোনো সন্দেহ ছিল, প্রভু নিজে এসে তা খণ্ডন করে দিলেন।

পরিপাটি ভোজন করে প্রভু পানিহাটি চলে গেলেন।

'এ কি, তুমি তখন চেঁচিয়ে উঠলে কেন?' শিবানন্দ তো কিছু দেখতে পায় নি, তাই সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল প্রদ্যুম্নকে।

'বা, প্রভু যে একাই তিন ভোগ খেয়ে গেলেন।' বললে প্রদ্যুম্ন, 'আমার নৃসিংহ যে অনাহারে রইল।'

এ কী বলছে অসম্ভব কথা। দেখলাম না শুনলাম না, অথচ খেয়ে গেল? এ কি স্বপ্ন না আবেশ না সত্য?

প্রদ্যুম্নের আদেশে শিবানন্দ আবার রান্নার জোগাড় করল। আমার উপাস্যকে এবার খাওয়াই, একলা খাওয়াই। সেবার নিয়মনিষ্ঠা বজায় রাখি।

পরের বছর শিবানন্দ এসেছে নীলাচল। প্রভু নৃসিংহানন্দের কথা তুললেন, তার গুণের কথা বললেন, গত পৌষ মাসে শিবানন্দের বাড়িতে কী চমৎকার রান্না করে আমাকে খাওয়ালে! এমন অন্নব্যঞ্জন খাই নি কোনো দিন।'

তবে শিবানন্দের বিশ্বাস হল।

ভগবান আচার্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সরল বৈষ্ণব। বাবা শতানন্দ খান ঘোর বিষয়ী কিন্তু ভগবান আচার্য বিষয়-বিমুখ, বৈরাগ্যপ্রধান। সখ্যভাবে সমাসীন। 'সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত।' ছোট ভাই গোপাল কাশীতে বেদান্ত পড়ে তার কাছে 'এসেছেন নীলাচলে, ভগবান তাকে প্রভুর কাছে নিয়ে গেল। গোপালকে দেখে প্রভু অন্তরে খুশি হলেন না। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া কিছুতেই প্রভুর উল্লাস নেই, কিন্তু শঙ্কর ভাষ্য পড়ে গোপাল তো জীবে-ব্রহ্মে এক করেছে, কৃষ্ণভক্তির বাষ্প পর্যন্ত তাতে নেই। তবু ভগবানের ভাই সেই খাতিরে বাইরে প্রীতির ভাবটুকু বজায় রাখলেন।

ভগবান স্বরূপ গোঁসাইকে বললে, 'গোপাল বেদান্ত শিখে এসেছে। এস একদিন আমরা সবাই ওর ব্যাখ্যা শুনি।'

'তার মানে? তোমারও শঙ্কর-ভাষ্যে প্রীতি জন্মেছে নাকি? শঙ্কর-ভাষ্য তো ভক্তির প্রতিকূল, তবে তোমার ওতে আগ্রহ কেন?' স্বরূপদামোদর রেগে উঠল: 'গোপালের সঙ্গে-সঙ্গে তোমারও বুদ্ধিভ্রংশ হল নাকি? বৈষ্ণব যদি শঙ্কর-ভাষ্য শোনে তা হলে তার সেব্য-সেবক ভাব দূর হয়ে যেতে পারে, নিজেকেই ভাবতে পারে ঈশ্বর বলে। তখন তার সমস্ত বৈষ্ণবত্বই মাটি।'

ভগবান বললে, 'আমরা কৃষ্ণনিষ্ঠ। কোনো ভাষ্যের সাধ্য নেই আমাদের মন ফেরায়।'

'তবু মায়াবাদ শুনে কোনো লাভ নেই।' বললে স্বরূপদামোদর, 'ঐ ভাষ্যে একবারও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎ ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এইসব শব্দ। শঙ্কর-ভাষ্য বলছে যারা সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের কল্পনা করেছে তারা অজ্ঞ ও অজ্ঞান। এইসব কথা শুনলে ভক্তের বুক ফেটে যায়।'

ঘোরতর লজ্জা পেল ভগবান। হয় তো বা প্রভুর কৃপা হতে বঞ্চিত হবে সেই ভয়ও ঢুকল। গোপালকে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিল দেশে।

একদিন ভগবান প্রভুকে নিজ গৃহে খাওয়াবে বলে নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ঘরে ভালো চাল নেই। প্রভুর কীর্তনিয়া ছোট হরিদাসকে ডেকে বললে, 'শিখি মাহাতীর বোন মাধবী দেবীকে চেন? প্রভুর মতে রাধিকা সেবার সাড়ে তিনজন মাত্র অধিকারী আছেন জগতে—এক স্বরূপ দামোদর, দুই রায় রামানন্দ, তিন শিখি মাহাতী আর আধ মাধবী। মাধবী স্ত্রীলোক বলে অর্ধ। চেন তো সেই মাধবীকে?'

'সেই বৃদ্ধাতপস্বিনী বৈষ্ণবীকে চিনি না? খুব চিনি।' বললে ছোট হরিদাস, 'কী করতে হবে তাই বলুন।'

'তার বাড়ি থেকে কিছু ভালো চাল নিয়ে এস।'

মাধবী দেবীর কাছ থেকে ভালো চাল নিয়ে এল ছোট হরিদাস।

মধ্যাহ্নে প্রভু খেতে এলেন। সরু শালি ধানের চাল দেখে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন ভালো চাল তুমি কোথায় পেলে?'

ভগবান বললে, 'মাধবী দেবীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

'কে গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসেছে?'

'ছোট হরিদাস।'

ভোজনান্তে নিজের ঘরে ফিরে প্রভু সেবক গোবিন্দকে বললে, 'তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, আজ থেকে ছোট হরিদাসকে আমার এখানে আসতে দেবে না।'

ছোট হরিদাসের দ্বার-মানা হয়ে গেল। কেন হল কে জানে। ছোট হরিদাস তো পথে বসল। কী অপরাধ করলাম তা কে জানে। আহার ত্যাগ করে কাঁদতে লাগল নির্জনে।

স্বরূপদামোদর জানতে চাইল কী কারণ। তিনদিন ধরে উপবাসী রয়েছে। কী অপরাধে তার এমন গুরুদণ্ড হল?

'ও বৈরাগী হয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেছে,' বললেন প্রভু, 'তাই ওর এই শাস্তি। যে বৈরাগী হয়ে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করে আমি তার মুখদর্শন করি না। ইন্দ্রিয় দুর্বার, কাঠের স্ত্রীমূর্তি দেখেও মুনিদের মন টলে। বাহ্য বৈরাগ্যে, মর্কট বৈরাগ্যে কোনো ফল নেই। স্ত্রীসম্ভাষণের অপরাধের জন্য আমাকে কঠোর শাসন রাখতেই হবে।'

আর কিছু বলতে কারু সাহস হল না, সবাই চুপ করে গেল।

কিন্তু আবার একদিন গেল প্রভুর কাছে। মিনতি করে বললে, 'এবারের মত মার্জনা করুন। ওর অপরাধ সামান্য।'

'না, প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর মুখ আমি দেখি না।' প্রভু বললেন, 'বৃথা কথা ছাড়ো, নিজ-নিজ কাজ করো গে। আর যদি এ বিষয়ে কিছু বলো, আমি অন্যত্র চলে যাব।'

তখন সবাই গিয়ে পরমানন্দ পুরীকে ধরল।

'প্রভুকে প্রসন্ন করুন।'

পরমানন্দ একা-একা প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

'কী চাই? কেন এসেছ?' জিগগেস করলেন প্রভু।

'ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হোন।'

'তোমরা বৈষ্ণবেরা সব এখানে থাকো, আমি আলালনাথে চললাম।' বলে ডাকলেন গোবিন্দকে। 'চলো, এখানকার পাট তুলে ফেল।'

অনেক অনুনয় করে পরমানন্দ প্রভুকে ঘরে এনে বসাল। বললে, 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমার কথার উপরে আর কারু কথা চলে না। তোমার যা কিছু করা সমস্তই লোকহিতের জন্যে, তোমার গূঢ় অভিপ্রায় আমরা কী করে বুঝব বলো। তুমি এখানেই থাকো, আমরা আর কিছু বলতে আসব না।'

তখন তারা সকলে ছোট হরিদাসের কাছে গেল।

বললে, 'দয়াময় প্রভু নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। এখন ক্রুদ্ধ আছেন কিন্তু এই ক্রোধ তাঁর চলে যাবে। তুমি যদি জেদ করে উপবাস চালাও প্রভুরও জেদ বাড়বে। তুমি স্নানাহার করো, তা হলেই প্রভু শান্ত হবেন।'

ছোট হরিদাস আশ্বস্ত হয়ে স্নানাহার করল। কিন্তু কই প্রভু তাকে ডাকছেন কোথায়?

প্রভু যখন জগন্নাথ দর্শনে যান তখন ছোট হরিদাস দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে কত কাছাকাছি বিচরণ করত, কত গান শোনাত, নাচত পায়ে-পায়ে। কত চরণস্পর্শ পেত কত নেত্রামৃতস্পর্শ। আজ সে পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত।

উপায় নেই। লোক-শিক্ষার জন্যেই প্রভুর এই ভক্তবর্জন। এক ভক্তকে শাসন করে বহু ভক্তকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

'প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝাইতে।'

সকলেরই ত্রাস উপস্থিত হল। স্বপ্নেও আর কেউ স্ত্রী-সম্ভাষণ করে না।

এক বছর কেটে গেল তবু ছোট হরিদাস পেল না প্রভুর করুণা। একটিবারও তিনি ডেকে পাঠালেন না, পথে যদি পড়ে যায় তবুও তিনি তাকে এড়িয়ে চলে যান ভ্রূক্ষেপও করেন না।

ছোট হরিদাসের জীবনে ধিক্কার এসে গেল। প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করে একদিন রাত্রিশেষে একা-একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চলল প্রয়াগের দিকে। প্রভুপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্প করে ত্রিবেণীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

মর্ত্যদেহ ছেড়ে দিল। ধরল দিব্যদেহ। দিব্যদেহে

চলে এল প্রভুর কাছে। কোথায় আর দ্বার-মানা? কে আর পথরোধ করে?

সে কী, কে গান গাইছে? কৃষ্ণগান না? হ্যাঁ, কৃষ্ণগানই তো! প্রভুকে শোনাবার জন্যেই এই গান। দেহ ছেড়ে দিলেও তোমার সেবা করা ছাড়ি নি।

প্রভু বলে উঠলেন, 'ছোট হরিদাস কোথায়?' করুণার্দ্র তাঁর কণ্ঠ: 'তাকে এখানে কেউ ডেকে আনো।'

সবাই বললে, 'কোথায় চলে গিয়েছে কেউ বলতে পারে না।'

শুনে প্রভু ঈষৎ হাসলেন। তাকে যে আমার কাছেই ডেকে এনেছি, সে যে আমাকে কীর্তন গেয়ে শোনাচ্ছে এ তোমরা কী ক'রে জানবে? চলে গিয়েছে বৈ কি। কোথায় চলে যাবে?

একদিন সবাই সমুদ্রে স্নান করতে গেছে, জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর আর মুকুন্দ—শুনতে পেল দূরে ছোট হরিদাস গান করছে। হুবহু সেই গলা, সেই পদ! কী আশ্চর্য, লোক নেই, শূন্যে গান হচ্ছে!

গোবিন্দ বললে, 'ছোট হরিদাস নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই সে এখন ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছে। নিরাকারে গান ধরেছে।'

'এ হতে পারে না।' বললে স্বরূপ, 'আজীবন কৃষ্ণকীর্তন করেছে, প্রভুর সেবা করেছে। যে প্রভুর কৃপাপাত্র তার এমন দুর্গতি সম্ভব নয়।'

প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এসে ছোট হরিদাসের কথা বললে সবাইকে। শ্রীবাস ও অন্যান্য সকলেই বিমূঢ় হয়ে গেল। যথারীতি সবাই যখন গিয়েছে নীলাচলে শ্রীবাস জিগগেস করলে প্রভুকে, 'আমাদের ছোট হরিদাস কই?'

প্রভু বললেন, 'স্বকর্মফলভুক পুমান। যে যেমন কর্ম করে সে তেমনি ফলভোগ করে।'

'শুনেছি সে ত্রিবেণীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।'

'প্রকৃতি দর্শন করলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' বললেন প্রভু, 'কিন্তু দিব্যদেহে এখন সে আমাকে কীর্তন শোনাচ্ছে।'

ত্রিবেণী প্রভাবেই ছোট হরিদাস প্রভুপদ লাভ করল।

এক লীলায় কত কাজ করলেন প্রভু। দেখালেন কারুণ্য, প্রকট করলেন ভক্তের গাঢ়ানুরাগ, প্রতিষ্ঠিত করলেন তীর্থের মহিমা। দিলেন বৈরাগ্য শিক্ষা। সর্বোপরি দেহত্যাগের পরেও ভক্তকে আপনার বলে অঙ্গীকার করলেন। তাকে দিলেন দিব্যদেহে সেবাধিকার। তুমি আমাকে বিরতিবিহীন কৃষ্ণকীর্তন শোনাও।

সাধু ভক্তির অনুষ্ঠান করবে তাতে বাহাদুরি কী, যে সুদুরাচার সে-ও যদি অনন্যভাক হয়ে আমাকে ভজনা করে, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, তা'হলে তাকেও সাধু বলে মনে করবে। কারণ সে আমাকেই শ্রেষ্ঠনিশ্চয় বলে আশ্রয় করেছে। আর চিত্রকেতু তো স্বর্গগত অবস্থায় ভজন করেছিল। ছোট হরিদাস করবে অশরীরী অবস্থায়। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র আমি কীর্তন শুনব।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকদের বলছেন, প্রাণ অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দিয়ে জীবের যে মঙ্গলাচরণ তাই এ জগতে মনুষ্যজন্মের সফলতা। যা ইহকালে ও পরকালে প্রাণীদের উপকারের নিমিত্তভূত হয়, কর্ম, মন ও বাক্য দিয়ে তাই করবে। সর্বপ্রাণীর উপজীব্য বৃক্ষের জন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুজনের কাছে প্রার্থী কখনো ব্যর্থ হয় না, বৃক্ষের কাছেও বিমুখ হয় না যাচক। ফল না পায় ছায়া তো অন্তত পাবে।

'মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাও এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥'

আর এ বৃক্ষের ফল তো অবধারিত। এ ফলের নাম প্রেমফল। এ মহামাদক। এত মাদক যে একা খাওয়া যায় না, সবাইকে ডেকে এনে খেতে হয়, খাওয়াতে হয়। এ ফল খেলেই অজর-অমর।

'একলা মালাকার আমি কত ফল খাব?
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥'

[ক্রমশ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে এই চিঠিটা লিখছি, প্রধানত আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে। শুধু আমার তরফ থেকে নয়, ওঁর তরফ থেকেও। আশা করি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ ক'রে নিতে আপনার অসুবিধে হবে না।

জানেনই ত' অসুখে ভুগে ভুগে ওঁর মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। তাই আপনি যখন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ওঁর সম্বন্ধে কতকগুলো নির্দেশ দিচ্ছিলেন, উনি মনে করলেন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এত ব্যস্ত যে গায়ের চাদরটা যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে তা লক্ষ্য করবার সময়ও আমার নেই। তাই উনি অমন করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন এবং আমাকে ছুটে যেতে হয়েছিল ওঁর কাছে; চাদরটা তুলে দিয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখি আপনি চলে গেছেন। তারপর টেলিফোনে আপনাকে পেতে দু'তিনবার চেষ্টা করেছি, সবসময়ই হয় লাইন এন্‌গেজড্‌ পেয়েছি অথবা আপনার বেয়ারা বলেছে যে আপনি কল-এ বেরিয়ে গেছেন। তবু ফ্ল্যাটের টেলিফোন, ঘনঘন সেখানে যাওয়াসম্ভব নয়, গেলে উনিও বিরক্ত হন। তাই চাকর মারফৎ এই চিঠিটা পাঠাচ্ছি।

আপনি কিন্তু আগের মত প্রতিদিন সকাল-বেলা একবার ওঁকে দেখতে আসবেন আপনারই চিকিৎসায় উনি এতখানি সেরে উঠেছেন। এখন ত' ডাক্তার বদল করা সম্ভব নয়।

আগামী কাল আপনার জন্য বসে থাকব।

আবার বলছি, আমাদের অভদ্রতা এবং অসৌজন্য নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

বিনীতা—
সুষমা রায়

(২)

১৪ই চৈত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বারবার আপনাকে বিরক্ত করছি। অপরাধ নেবেন না।

সেদিন আমার চাকর চিঠি নিয়ে আপনার কাছে গিয়েছিল, আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। আপনার জন্য ঘণ্টাখানেক অপেক্ষাও করেছিল, তারপর চিঠিটা আপনার বেয়ারার হাতে দিয়ে সে চলে এসেছিল।

আপনি কি আমা'র চিঠিটা পান নি? কাল সারাদিন আপনার জন্য অপেক্ষ করেছিলাম। বিকেলের দিকে টেলিফোনে আপনাকে পেলাম, আপনি বললেন, চিঠিটা পেয়েছিলেন, কিন্তু অনেক জরুরী কল ছিল বলে আমাদের এখানে আসতে পারেন নি। আজ আসবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানালাম, আপনি কি বললেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরমুহূর্তেই কানেক্‌সনটা কেটে গেল। একবার মনে হ'ল, আপনিই বোধ হয় ইচ্ছে করে রিসিভারটা রেখে দিলেন, কিন্তু সত্যি কি তাই?

সে যাই হোক, আজ দয়া করে একবারটি আসবেন। আপনার ওষুধও আজ ফুরিয়ে যাবে, কাজেই আপনি এসে ব্যবস্থা না করলে আমি অকূল পাথারে পড়ব। আর ওঁকেই বা কি জবাবদিহি করব?

আসবেন কিন্তু।

বিনীতা—
সুষমা রায়

প্রিয়তমেষু

ডাঃ নবগোপাল দাস

(৩)

১৫ই চৈত্র

প্রিয় ডাঃ বসু,

কি করে যে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্ছি না। আপনি আমার মুখ বাঁচিয়েছেন। উনি ত' আপনার দু'দিন-না-আসা দেখে প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাকে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন। আমি যতই বলি আপনি কতকগুলো জরুরী কল-এ আটকে পড়ে গেছেন, ততই উনি জবাব দেন, কিন্তু এর আগে ত' শঙ্কর কখনও আসতে কামাই করে নি। দ্বিতীয় চিঠিটা ওঁর নির্দেশেই আমি লিখেছিলাম, ভাষাটা অবশ্য আমার ছিল।

কিন্তু আপনাকে দেখেই উনি আবার গুম্ হয়ে গেলেন। ওঁর হাবভাব আমি আজকাল চোখের পলকে বুঝতে পারি, আবার কি একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবেন সেই ভয়ে আপনাকে তখন মুখে আমার সামান্য কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারি নি। এখন চিঠিতে জানাচ্ছি।

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি অন্তত আর এক হপ্তাহ রোজ সকালবেলায় আসবেন। এরপর হয়ত এত ঘন ঘন আসবার দরকার হবে না।

আপনার উপর বড্ড জুলুম করছি, না? আমার অবস্থাটা বিবেচনা ক'রে এই অত্যাচার আরও কয়েকটা দিন আপনাকে সহ্য করতে হবে।

ইতি—

সুষমা রায়

(৪)

২২শে চৈত্র

প্রিয় ডাঃ বসু,

আচ্ছা, গতকাল আপনি এত রাগ করলেন কেন? আমি শুধু বলেছিলাম, উনি ত' এবার প্রায় সেরে উঠেছেন, আর আপনাকে জরুরী কল কামাই করে বিনিপয়সার রুগীকে দেখতে আসতে হবে না।—তার জবাবে আপনি ব'লে বসলেন, পয়সা নিচ্ছি না বলে যদি আপনার সঙ্কোচ হয়, তাহলে না হয় পয়সাই দেবেন।···আপনাকে ফি দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি কি জানি না যে আপনি এসেছেন নিতান্ত আপনার বন্ধুর টানে? কিন্তু আমাদের জুলুমেরও ত' একটা সীমা থাকা দরকার।

সে যাই হোক, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি যেদিন এবং যখন খুশি ওঁকে দেখতে আসবেন, আপনাদের মাঝখানে আমি প্রতিবন্ধক হতে যাব এমন আস্পর্ধা আমার নেই।

একটা কথা। কাল আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আপনাকে আসতে বারণ করার এটাও একটা কারণ। যতদিন আমাদের প্রয়োজন ছিল আপনি ত' নিজের সময় বা শরীরের দিকে একবারও তাকান নি। ভগবানের আশীর্বাদে এবং আপনার চিকিৎসার গুণে উনি যখন ভাল হয়ে উঠেছেন তখন আমাদের অত্যাচারের হাত থেকে আপনাকে খানিকটা অব্যাহতি দেওয়া' কি আমাদের—আপনার বন্ধুস্থানীয় যারা তাদের—কর্তব্য নয়?

কাল আসবেন কিন্তু।

ইতি—

সুষমা রায়

(৫)

২৪শে চৈত্র

প্রিয় ডাঃ বসু,

আপনার চিঠিটা গতকাল সন্ধ্যায় পেয়েছি। এ কি চিঠি আপনি লিখেছেন? লিখেছেন, আপনি আমাদের বাড়িতে গত এক মাস এসেছেন, ওঁর চিকিৎসা করতে নয়, আমাকে দেখতে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি ইঙ্গিত করছেন। আর কখনও এমন কথা লিখবেন না।

তা'ছাড়া আপনার কাণ্ডজ্ঞান কি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? এই চিঠি যদি ওঁর হাতে পড়ত, তা'হলে উনি কি ভাবতেন বলুন ত'? আপনাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের বনিয়াদে যে ধাক্কা লাগত তা সামলাত কে?

আমি দেখছি আপনার সঙ্গে চিঠি-বিনিময় করাটা বন্ধ করে দিতে হবে, নইলে কখন কি অনর্থ ঘটে যাবে! আপনি আমার এই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন কিন্তু।

আপনার শরীর ভাল আছে ত'?

ইতি—

সুষমা

(৬)

২৬শে চৈত্র।

প্রিয় ডাঃ বসু,

ভেবেছিলাম চিঠি লিখব না। কিন্তু লিখতে বাধ্য হলাম। আপনি এখন কিছুদিনের মত এ বাড়িতে আসবেন না—এলে কোন দিক দিয়েই মঙ্গল হবে না।

কারণটা খুলে বলছি। গত কয়েকদিন ধরেই উনি কেমন যেন আমাকে সন্দেহ করছেন, মনে করছেন আপনার সঙ্গে আমার একটা ভাবের আদান-প্রদান চলেছে। এই উপলক্ষ করে একটু আগেই ওঁর সঙ্গে বেশ খানিকটা কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। আমাকে উনি যা' খুশি বলুন তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু আপনাকে—এতদিনের বন্ধুকে—উল্লেখ করে এমন কতকগুলো কদর্য ইঙ্গিত করলেন যে আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমিও জবাবে দু' একটা কথা না বলে পারি নি। যে বন্ধু মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে তাঁর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করা, তাঁর সম্বন্ধে বলা যে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল এবং রয়েছে আমি, এ যে কতখানি নীচু মনের পরিচায়ক তা' প্রথম উপলব্ধি করলাম আজ।

আমার এ চিঠিটাও পুড়িয়ে ফেলবেন।

ইতি—

সুষমা

(৭)

২রা বৈশাখ

প্রিয়বরেষু,

এই নতুন সম্বোধন দেখে কিছু মনে করবেন না যেন। ইংরেজি কায়দায় 'প্রিয় ডাঃ বসু' লিখতে ভাল লাগছে না, তাই নতুন সম্বোধনের অবতারণা।

উনি ত' কাল চেন্নে চলে গেলেন। শেষমুহূর্তে আমার যাওয়া হ'ল না। কারণ মায়ের, অর্থাৎ আমার শাশুড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ। পরশুদিন মায়ের হার্টের আবার একটা অ্যাটাক্ হয়েছিল. যে নতুন ডাক্তার আমাদের বাড়ির চিকিৎসার ভার নিয়েছেন তিনি বললেন যে, মাকে শুধু চাকরের ভরসায় রেখে আমাদের দু'জনের চলে যাওয়াটা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তাই আমি কলকাতায়ই রয়ে গেলাম।

আচ্ছা, চলে যাবার আগে আপনার বন্ধু কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন? আমাকে একবার বলেছিলেন, শঙ্করের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। কি বোঝাপড়া আমি এখনও বুঝতে পারছি না। ওঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে একটা তুমুল কাণ্ড বেধে যেত, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। যদি আপত্তি না থাকে, আমাকে জানাবেন। আশা করি ভাল আছেন।

ইতি—

সুষমা

(৮)

৫ই বৈশাখ

প্রিয়বরেষু,

উনি তাহ'লে শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে দেখা করেন নি? সাহসে কুলোয় নি বোধ হয়।

গতকাল ওঁর চিঠি পেয়েছি। দার্জিলিং-এ নাকি খুব ভাল মৌসুম চলেছে, খুশিতেই আছেন বলে মনে হচ্ছে। উনি খুশি থাকলে আমিও খুশি।

মা এখন একটু ভাল আছেন।

ইতি—

সুষমা

পুনশ্চ: আপনি একদিন আসুন না? আমি ত' দিনরাত বাড়িতেই থাকি, যে সময় আপনার সুবিধে চলে আসবেন।

—সুষমা

(৯)

৮ই বৈশাখ

প্রিয়বরেষু,

দশ মিনিটের বেশি আপনি ছিলেন না, কিন্তু এ কি বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন আপনি? আপনার এ মূর্তি ত' এর আগে আমি কখনও দেখি নি!

আপনি বললেন, আমাকে ছাড়া আপনার জীবন চলছে না, নিজের সঙ্গে আপনি অনেক যুদ্ধ করেছেন, অবশেষে আপনার উপলব্ধি জন্মেছে যে আমাকে আপনার চাইই।...তারপর আমাকে কোন জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই আপনি চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন, আবার আসবেন।

আপনার ভালবাসার গভীরতায় আমি সন্দেহপ্রকাশ করছি না, কিন্তু আপনাকে দেবার মত আমার যে কিছুই নেই! বয়সও ত' কম হয় নি—দশবছর বিবাহিত জীবন কাটাবার পর কোন বাঙালী মেয়ের নতুন করে প্রেমে পড়বার মত অবস্থা থাকে কি?

তাছাড়া আমার জীবন এখন অন্য দু'টি জীবনের সঙ্গে গেঁথে রয়েছে—আমার শাশুড়ী এবং আমার স্বামী। চাইলেও এঁদের বন্ধন থেকে আমি মুক্তি পাব কি করে?

আমার মনে হয় সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশীভূত হয়ে আপনি ঐ কথাগুলো বলেছেন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই আপনার মনে হয়েছে। কি ছেলেমানুষি করে এসেছি।

যাই হোক, আমার মিনতি, আপনি আমাদের এখানে আর আসবেন না। দশ বছরের বিবাহিত জীবনের ধারা পরিবর্তন করা আমার পক্ষে যে সম্ভব নয় আশা করি বুঝতে আপনার কষ্ট হবে না।

আবার বলছি, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার গভীর স্নেহের প্রতিদান দেবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য বা সাহস আমার নেই।

ইতি—

সুষমা

(১০)

১১ই বৈশাখ

শঙ্কর,

তোমার সাতপাতার চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়েছি, একবার নয়, দু'বার নয়, অন্তত সাতবার।

তুমি লিখেছ যে, সংস্কারের চেয়েও মনকে যেন আমি বেশি প্রাধান্য দিই। সম্বোধন থেকেই আশা করি বুঝতে পারছ যে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে আমি চাই না। তোমার ভালবাসাকে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি।

কিন্তু কতকগুলো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এবং আলোচনা করা দরকার। প্রথম, তোমার এবং তোমার বন্ধু অর্থাৎ আমার স্বামীর মধ্যে যে সম্পর্ক এতদিন ছিল তার কি পরিণতি হবে? আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবার অনেক আগে থেকেই তুমি ওঁর বন্ধুর আসন অধিকার করে রয়েছ, বন্ধুত্বের কোন দাবীই কি তুমি স্বীকার করো না?

দ্বিতীয়, আমি যদি বা তোমার কাছে চলে আসতে রাজী হই, তোমার সংসারে, তোমার আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আমার কি স্থান তুমি দেবে? আমি জানি, তোমার একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, বাবা-মা অনেকদিনই স্বর্গত, কাজেই সাধারণ সংসারে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারত তোমার ক্ষেত্রে সে সব হয় ত' আসবে না। তবু, সমাজের বুকে আমাদের থাকতে হ'বে ত'! সোজা ক'রে প্রশ্ন করছি, আমাকে কি তুমি বিয়ে করতে চাও, না শুধু নর্মসহচরীর আসন আমার জন্য পাতা রয়েছে?

তৃতীয়, স্ত্রী হিসেবে যদি আমাকে পেতে চাও তাহ'লে তার আনুষঙ্গিক যা' যা' করা দরকার তা' করতে পারবে কি? আমার স্বামী যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনতে রাজী না হন তাহ'লে আমরা কি করব? আমি ত' ওঁর বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারব না যাতে আদালত আমার পক্ষে ডিক্রি দেবে।

তোমার উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠির জবাবে এতগুলো প্রশ্ন করা বোধ হয় শোভন হ'ল না, কিন্তু আমার দিকটাও একটু ভেবে দেখো।

ইতি—

সুষমা

পুনশ্চ: লক্ষ্মীটি, রাগ ক'রো না। কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি যদি একটু সাহস দাও তাহ'লে বোধ হয় আমি অনেকখানি এগিয়ে আসতে পারি।

—সু

(১১)

১৪ই বৈশাখ

শঙ্কর,

তুমি লিখেছ চিঠিপত্রে এসব আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমাকে তুমি তোমার ফ্ল্যাটে আসতে বলেছ, যাতে শান্তভাবে এবং নিরিবিলি আমরা কথা বলতে পারি। আমার কিন্তু ভয় লাগছে। চিঠির মাধ্যমে অনেক কথাই আমি বলতে সাহস পাই, কিন্তু তোমার কাছে গেলে সব বোধ হয় গুলিয়ে যাবে।

আমাকে একটু ভাববার সময় দাও শঙ্কর।

ইতি—তোমার সু।

পুনশ্চ : এইমাত্র ওঁর চিঠি এল। উনি পরশু দিন কলকাতায় ফিরছেন। এত শীগগির ফিরবেন ভাবি নি। তোমার সঙ্গে কথা বলা নিতান্ত দরকার। আমি আজই সন্ধ্যার পর তোমার ওখানে যাব, তুমি কিন্তু আমাকে সাহস দিও। —সু

(১২)

১৮ই বৈশাখ

প্রিয়তমেষু,

যা' চেয়েছিলে তাই পেয়েছ, তবে কেন এই অভিযোগ ? কেন তুমি বলছ যে আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না ? বারবার নতুন ক'রে তোমার কাছে ধরা না দিলে বুঝি আমার ভালবাসায় তোমার প্রত্যয় জন্মাবে না ?

তোমার ওখানে যখন-তখন আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝতে পারো না ? কোথায় যাচ্ছি, এই প্রশ্ন যখন উনি করবেন, তার কি জবাব দেব আমি ? উনি নির্বোধ নন, আমার হাবভাব থেকে খানিকটা সন্দেহ করতে সুরু করেছেন, প্রতিটি পদক্ষেপ আমাকে করতে হয় খবই সাবধানে। তোমাকেও সাবধানে থাকতে হবে।

জানি, এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বেশিদিন থাকা চলবে না। কিন্তু সমস্যার একটা সুষ্ঠ সমাধানও যে খুঁজে পাচ্ছি না! তুমি ত' বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, তুমিই ব'লো না আমার কি করা উচিত ? লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার কাছে আসাটা সমাধান বলতে পারি না, তাতে বরং নতুন সমস্যার সৃষ্টি হ'বে। অন্য কোন উপায় ভাবতে পারো কি ?

এখানে কোন চিঠি পাঠিয়ো না, ওঁর হাতে পড়তে পারে। সুযোগ পেলেই আমি তোমার কাছে চলে আসব। —তোমার সু।

(১৩)

প্রিয়তমেষু,

২৪শে বৈশাখ

আমার দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভাবতে সুরু করেছ। এতদিন যে চিঠি লিখি নি', তার প্রধান কারণ, রোজই ভাবতাম তোমার কাছে আসতে পারব, কিন্তু একটা-না-একটা বাধা এসে পড়ায় সব গোলমাল করে দিয়েছে তা'ছাড়া বুঝতেই ত' পারছ, ওঁর চোখ এড়িয়ে বেশিক্ষণের জন্য বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ওদিকে শাশুড়ীও রয়েছেন। যদিও তিনি শয্যাশায়ী, তবু কখন তাঁর ঘরে ডাক পড়ে বলা ত' যায় না! তাই দুপুরবেলাতেও বেরুতে সাহস হয় না।

কিন্তু এভাবে আর চলবে না। তুমি কোন চিঠিপত্র লিখতে পারছ না, একতরফা আলাপে কোন বিষয়েই সুরাহা হচ্ছে না। তাই আমি স্থির করেছি, আগামীকাল দুপুরবেলা—আন্দাজ একটা-দু'টো নাগাদ—আমি তোমার ওখানে যাব। উনি অফিসে থাকবেন। শাশুড়ীকে ব'লে যাব আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তুমি বাড়িতে থেকো কিন্তু। ইতি—তোমার সু।

(১৪)

প্রিয়তমেষু,

২৭শে বৈশাখ

এ দিকে একটা বিষম কাণ্ড ঘটে গেছে।

সেদিন তোমার ওখান থেকে ফিরে বাড়িতে পা' দিয়েই দেখি উনি বসে রয়েছেন। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। তবু মুখে হাসি টেনে এনে প্রশ্ন করলাম, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে ? উনি জবাব দিলেন, আমাদের দপ্তরের প্রাক্তন সেক্রেটারী মারা গেছেন, তাই টিফিনের পর অফিস বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর প্রশ্ন করলেন, কোথায় গিয়েছিলে ?

ঢোক গিলে জবাব দিলাম, আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে।

পাল্টা প্রশ্ন এল, বান্ধবীর ঠিকানাটা জানতে পারি কি ?

ততক্ষণে আমি নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছি। জবাব দিলাম, ঠিকানা জানতে চাইছ কেন ? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

উনি গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, না।

আমি লঘুস্বরে বললাম, তাহ'লে বলব না।

উনি তখন আমার কাছে এসে আমার হাত দু'টোয় অত্যন্ত রূঢ় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তুমি না বললেও আমার জানতে বাকা নেই তুমি কোথায় যাও। আমি সেই স্কাউণ্ড্রেলটাকে দেখে নেব।

বলে উনি সোজা বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন সন্ধ্যার একটু পরে। মুখখানা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

আমি জানি, যদি তোমার কাছে গিয়েও থাকেন, তোমাকে পান নি। কারণ, তুমি ত' বিকেলের প্লেনেই দিল্লী চলে গিয়েছ।

কিন্তু ব্যাপারটার নিষ্পত্তি যে এখানেই হবে না তা ওঁর হাবভাব থেকে বেশ আঁচ করতে পারছি। এ কয়দিন আমার সঙ্গে বিশেষ কোন বাক্যবিনিময় হয় নি। বোধ হয় তোমার কলকাতায় ফেরার অপেক্ষা করছেন। আমার ভয়ানক ভয় করছে। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থেকো। কিছুদিন কলকাতার বাইরে চলে যাও না ?

তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু কি ক'রে যে তা' সম্ভব হ'বে বুঝতে পারছি না। আমার চিঠি আমি না হয় নিজে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি বা মেসেজ পাওয়া যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি করি ব'লো ত' ? —তোমার সু।

(১৫)

প্রিয়তমেষু,

২৯শে বৈশাখ

অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা' থেকে মুক্তি পাবার একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে।

অনেক বিপদ মাথায় নিয়ে গতকাল ঘণ্টাখানেকের জন্য তোমার কাছে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু যে সব বিষয় আলোচনা করার দরকার ছিল তার কিছুই করা হ'ল না মাঝখান থেকে অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটা সীন হয়ে গেল। আমাকে উপভোগ করবার

আকাঙ্ক্ষা তোমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, আমার আপত্তি বা অপ্রস্তুতি কিছুই তুমি মানলে না। অবশেষে তুমি যখন অনুতাপ প্রকাশ করলে তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম যে তোমরা অর্থাৎ পুরুষজাতটা ভালবাসা বলতে বোঝ মেয়েদের শরীরটা, তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির দিকে তাকাবার অবসর তোমাদের নেই। এর জবাবে তুমি যে সব কথা বললে তা নিয়ে নতুন করে তর্ক আলোচনা করতে আমি বসি নি, তবে এটা উপলব্ধি করেছি এবং করছি যে আমার জীবন তোমার সঙ্গে এক সুতোয় গাঁথা চলবে না।

অথচ ওঁর কাছে ফিরে যাবার পথও বন্ধ। আমার জীবনের এই খণ্ডপরিচ্ছেদটা ওঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাছাড়া ওঁর মনের ধারা যেভাবে চলেছে তাতে আমি গোপন করে রাখলেও উনি সর্বদা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। জীবন তখন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। তাই পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়াই আমার মুক্তির একমাত্র পথ

তোমাকে আমি সত্যি ভালবেসেছিলাম, শঙ্কর। তুমিই আমাকে ভালবাসো নি। জানি তুমি প্রতিবাদ করবে, কিন্তু···

(১৬)

৩০শে বৈশাখের যুগবাণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত :

'গতকাল রাত্রিবেলায় শ্যামবাজার অঞ্চলে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর একটা খুন হইয়াছে।—সওদাগরের শ্রীপঙ্কজকুমার রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী সুষমা রায় টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন, এমন সময় পিছন হইতে কে একজন তাঁহার গলায় ফাঁস টানিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। পাড়া-প্রতিবেশী বা বাড়ির কেহ কোন চীৎকার শুনিতে পায় নাই। শ্রীমতী রায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন, কে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাও তিনি বলিয়া যাইতে পারেন নাই। সন্দেহক্রমে পুলিশ শ্রীযুত রায়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে, শ্রীমতী রায়ের অসমাপ্ত চিঠিখানা পুলিশ কয়লার ঘরের এককোণ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।'

সেণ্ট জনের দু'টি কবিতা

মহা-আবির্ভাব

বহুদিনের আশা
আবির্ভাবের পালারম্ভ তবে
কক্ষ ছেড়ে বর
দেখা দিলেন দেখা দিলেন ভবে
কাছেই আপন জন
যাত্রী যারা : ক্ষমাময়ী মেরি
স্যাঁৎসেঁতে এক দোলায়
অন্ধকারে রেখে গেলেন তাদেরি

হাত নাড়াবার কালে
পরিবৃত পশুস্তূপে মানব
সুখের গান গায়
এবং দেবদূতেরা গায় স্তব

বিবাহ-উৎসবে
বায় বাঁধনে দোঁহার রাখি বাঁধা
কিন্তু শিশু একার
নির্বন্ধেই গোঙানি আর কাঁদা
চক্ষে আনে বধূ
যৌতুক তার হীরক-বন্যায়
তাদের দেখে মা যে
দৃশ্যে অসাড় মূর্চ্ছা যায় যায়
তাঁর আনন্দ মানবে
এবং তাঁতেই মানবাশ্রু লোনা
এরা কি ছিলো ভিনদেশী
কিংবা খিধি কোনো কালেই ছিলো না।

(Del Nacimiento (Romance IX))

একটি ছিলো নাম

গ্যাব্রিয়েল সাধু
দেবদূতের বহেন মনস্কাম
আহ্বানে তাঁর
কোথায় নারী মেরি যে তার নাম

সম্মতির প্রেমে
কুয়াসা মানে আচ্ছাদনে যায়
মানবদেহে ত্রয়ী
লুকিয়ে রাখে আদি বাক্যহায়

সৃজন সে তো একেই
যদিও ধ্বজা কীর্তি তিনজনায়
তেমনি লেখে লিপি
মায়ের কোলে কিশোর অবতায়

তাঁর তো ছিলোই পিতা
এবং ছিলো মাতা অপাপিনী
নয় সামান্যা নারী
গর্ভে শিশু ধ'রেছিলেন যিনি

রক্তে মাংসে ঢাকা
আপনাস্তি—ঈশ্বর সন্তান
এবং মানবশিশু
মিলিয়ে মোটে একটি ছিলো নাম।

(Prosigue (Romance VII))

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

বাঙালী বৌদ্ধদের পূজাপার্বণ ও উৎসব

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

পূজাপার্বণ ও উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিভিন্নজাতির ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক রীতিনীতির একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম, সমাজ ও ভৌগোলিক অবস্থানভেদে এই উৎসব অনুষ্ঠান নানারকম হয়ে থাকে। বাংলা দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, বাঙালী হিন্দুর বারমাসে তের পার্বণ। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলে বাঙালী হিন্দুর এ সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, এই উৎসব অনুষ্ঠানের অনেকখানিই বাঙালী জাতির নিজস্ব প্রাণরসে সঞ্জীবিত। বাঙালী বৌদ্ধদের পূজাপার্বণ উৎসবের মধ্যেও বাঙলার বৌদ্ধসমাজের স্বকীয়তা পরিস্ফুট।

পাল-চন্দ্রযুগে বাংলা দেশে মহাযান বৌদ্ধমতেরই প্রাধান্য ছিল। সেযুগে বাঙলার বৌদ্ধসমাজে বুদ্ধদেবের পূজা ব্যতীত মহাযানমতের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত ছিল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে বাঙালী বৌদ্ধেরা সিংহল, ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের মত থেরবাদী বা স্থবিরবাদী। বুদ্ধদেবই এখানে প্রধান উপাস্য। সেজন্য বাঙালী বৌদ্ধদের পূজাপার্বণ ও উৎসব প্রধানত বুদ্ধদেবের জীবনের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত তিথিগুলি নিয়েই অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক বাঙালী বৌদ্ধদের সমাজজীবনে মহাযানমতের কল্পিত দেবদেবীগণের কোন অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র ইতিহাসের জীর্ণপত্রের মধ্যেই এঁরা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছেন।

বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী বিভিন্ন পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছিল। সেজন্য বৌদ্ধসমাজের পূজাপার্বণ ও উৎসব সাধারণত পূর্ণিমাতিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এসব পূর্ণিমা ব্যতীত আরও কতগুলি পার্বণ ও উৎসব বাঙালী বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত আছে। বাঙালী বৌদ্ধদের সমাজজীবনে এর মূল্যও কম নয়।

১। বিভিন্নপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত পূজাপার্বণ ও উৎসব :—

বৈশাখীপূর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমা—বৈশাখীপূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্রতিথি। এই বৈশাখীপূর্ণিমা ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত; তাই এই তিথিটি বুদ্ধপূর্ণিমা নামে খ্যাত। বুদ্ধদেব হিমালয়ের পাদদেশে লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধত্বলাভ করেন নিরঞ্জনা তীরবর্তী বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমতলে এবং কুশীনগরে মল্লদের শালবনে মহাপরিনির্বাণলাভ করেন। বুদ্ধদেবের স্পর্শপূত এই স্থানসমূহে জগতের শ্রেষ্ঠসম্রাট অশোক 'তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।' বস্তুত বুদ্ধদেবের স্পর্শপূত প্রত্যেকটি স্থানকেই দেবপ্রিয় অশোক কলাসৌন্দর্যের সৃষ্টির দ্বারা চিহ্নিত করে রেখেছেন। এই স্থানসমূহ বৌদ্ধদের নিকট পরম তীর্থ। বাঙালী বৌদ্ধেরা বিশেষ সমারোহে বৈশাখীপূর্ণিমাতিথি পালন করেন। বর্তমানে হিন্দু সমাজেও বুদ্ধপূর্ণিমা উদযাপনের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা—জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমায় সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এই স্মরণতিথিতে সিংহলবাসী বৌদ্ধেরা বিশেষ আনন্দ উৎসব করেন। বাঙালী বৌদ্ধেরাও এই পূর্ণিমা পালন করেন।

আষাঢ়ীপূর্ণিমা—আষাঢ়ীপূর্ণিমা **ধর্মচক্রপ্রবর্তনতিথি** নামেও পরিচিত। বৈশাখীপূর্ণিমার মত আষাঢ়ীপূর্ণিমাও বৌদ্ধসমাজের নিকট বিশেষ পবিত্র দিন। শুধুমাত্র বৌদ্ধসমাজের কেন, এক হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই তিথিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধত্বলাভের পর ভগবান বুদ্ধ জগতের কল্যাণের জন্য সর্বপ্রথম এই আষাঢ়ীপূর্ণিমাতিথিতে সারনাথের ঋষিপত্তন মৃগদাবে ধর্মদেশনা করেন। ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র নামেই এর প্রসিদ্ধি। পরবর্তীকালে মৌর্যসম্রাট অশোক সারনাথের এই পুণ্য অঙ্গনে যে ধর্মচক্র প্রতীক নির্মাণ করে দেন অধুনা তা **অশোকচক্র** নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে অশোকচক্র শুধুমাত্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রতীক নয়, অশোকচক্র চিরন্তন ভারতীয় সাধনা ও আদর্শেরই প্রতীক—এই আদর্শত্যাগ বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার বাণীতে চিরভাস্বর।

আষাঢ়ীপূর্ণিমা আরো একদিক থেকে স্মরণীয়। এই আষাঢ়ীপূর্ণিমা-তিথিতে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রোগ-শোকতপ্ত মানবের কাতর আহ্বানে রাজসুখ ত্যাগ করে নিখিলমানবের মুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছিলেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের এই গৃহত্যাগকে **মহাভিনিষ্ক্রমণ** (The Great Renunciation) নামে অভিহিত করা হয়।

আষাঢ়ীপূর্ণিমার পরদিবস প্রতিপদতিথি থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের **বর্ষাবাসব্রত** আরম্ভ হয়। এই প্রতিপদ থেকে তিন মাসকাল পর্যন্ত ভিক্ষুরা স্ব স্ব বিহারে ধর্মসাধনায় রত থাকেন। কোন অপরিহার্য কারণ ব্যতীত এই সময়ে ভিক্ষুগণের অন্যত্র গমনাগমন নিষিদ্ধ।

বাঙালী বৌদ্ধেরা বিশেষ সমারোহ সহকারে আষাঢ়ীপূর্ণিমাতিথি উদযাপন করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় জীবনে বুদ্ধপূর্ণিমা ও আষাঢ়ীপূর্ণিমার বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসরই আষাঢ়ীপূর্ণিমাতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শ্রাবণীপূর্ণিমা—বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই শ্রাবণীপূর্ণিমায় মগধরাজ অজাতশত্রুর উদ্যোগে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় **প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি** (The First Buddhist Council) আহূত হয়। এই মহাসঙ্গীতির নায়ক ছিলেন ভিক্ষু মহাকাশ্যপ। এই মহাসঙ্গীতিতে আয়ুষ্মান উপালি, ভিক্ষু আনন্দ ও ভিক্ষু অনুরুদ্ধ যথাক্রমে বিনয়সূত্র ও অভিধর্ম আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম মহাসঙ্গীতির স্মরণোৎসব হিসাবে বাঙালী বৌদ্ধেরা শ্রাবণীপূর্ণিমা পালন করেন।

ভাদ্রপূর্ণিমা বা মধুপূর্ণিমা—একসময়ে ভগবান বুদ্ধের পারিলেয্যর বনে বাসকালে বনের এক হস্তী নানাভাবে তাঁর সেবা করে এবং বানর ভগবানকে মধুদানে তৃপ্ত করে। এই সুকৃতির ফলে মৃত্যুর পর উভয়ের দেবলোকে উৎপত্তি হয়। ভাদ্রপূর্ণিমাতিথিতে মধুদান করা হয়েছিল বলে এই পূর্ণিমা মধুপূর্ণিমা নামে খ্যাত। বাঙালী বৌদ্ধেরা এই পূর্ণিমায় মধুদান করেন।

আশ্বিনীপূর্ণিমা—এই পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট প্রবারণা-পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। এই প্রবারণাকে ভিক্ষুদের **আত্মনিবেদন** বা Confession নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ভিক্ষুগণ পরস্পর নৈতিক স্খলন কিংবা ত্রুটি নির্দেশ করার জন্য এভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, 'বন্ধুগণ! আপনারা যদি আমার কোন অপরাধ দেখে থাকেন কিংবা কোন সন্দেহ করে থাকেন তা'হলে অনুকম্পা করে আমাকে বলুন, আমি তার প্রতিকার করব।' অন্যের নিকট অপরাধ স্বীকার করলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তার থেকে অনেকটা মুক্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধসংঘের নিকট হতে পরবর্তীকালে খৃষ্টীয়যাজক সম্প্রদায় Confession বা দোষ স্বীকার রীতি গ্রহণ করেছেন।

কার্তিকীপূর্ণিমা—এই পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের অন্যতম অগ্রশ্রাবক মহামোগ্গল্লানের পরিনির্বাণলাভ হয়। এর পূর্ববর্তী অমাবস্যায় আয়ুষ্মান শারিপুত্র পরিনির্বাণলাভ করেন। এই পূর্ণিমাও বাঙালী বৌদ্ধেরা শ্রদ্ধাসহকারে পালন করেন।

অগ্রহায়ণ, পৌষ ও চৈত্র—এই তিনটি পূর্ণিমা তিথি ভগবান বুদ্ধের জীবনের কোন প্রধান ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নহে। তবে সিংহলের প্রসিদ্ধ মহাবংশ ও দীপবংশ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে যে পৌষপূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধ লঙ্কায় গমন করেছিলেন। পূর্ণিমা মাত্রেই বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র তিথি। তাই এই পূর্ণিমা তিনটিও বৌদ্ধেরা পালন করেন।

মাঘী পূর্ণিমা—মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে অশীতিবর্ষ বয়সে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর চাপালচৈত্যে আপনার পরিনির্বাণ দিন ব্যক্ত করেন। বৌদ্ধ-পরিভাষায় এই দিনটি **আয়ু-সংস্কার বিসর্জন দিন** নামে পরিচিত। এইদিনে অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে ভগবান তথাগত উদাত্ত গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ! সৃষ্টি ভঙ্গুর, অনিত্য। তোমরা অপ্রমাদের সহিত নির্বাণসাধনায় প্রবৃত্ত হও। তথাগতের নির্বাণ আসন্ন, তিন মাস পরেই তথাগত নির্বাণলাভ করবেন।' ভগবানের পরিনির্বাণের কথা শুনে প্রিয় শিষ্যবর্গের মুখে নেমে আসে গভীর বেদনার ছায়া। শান্তকণ্ঠে ভগবান বললেন, 'আমার বয়সের সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে, এবার বিদায়ের পালা। তোমরা অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান, সুশীল ও সমাহিত সংকল্প হও। এবং স্বীয় চিত্ত সুসংযত কর। যে এই ধর্মবিনয়ে অপ্রমত্ত থাকবে, সে সংসারভ্রমণ পরিত্যাগ করে দুঃখের অবসান করবে।' করুণাঘন ভগবান বুদ্ধ এভাবে প্রিয় শিষ্যবর্গকে দুঃখজয়ের পথনির্দেশ করেন। বিশেষ আনন্দ-উৎসব সহকারে বাঙালী বৌদ্ধেরা মাঘী পূর্ণিমা উৎসব পালন করেন।

ফাল্গুনীপূর্ণিমা—বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম কপিলাবাস্তু গমনের স্মরণোৎসব হিসাবে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি প্রতিপালিত হয়। বুদ্ধত্ব লাভের পর ভগবান বুদ্ধ তাঁর নির্বাণরসের অমৃতধারা সিঞ্চনে সমগ্র জম্বুদ্বীপ প্লাবিত করে দিয়েছেন। কিন্তু নিজের জন্মভূমি কপিলাবাস্তু, জন্মদাতা পিতামাতা এবং আত্মীয় পরিজন কি তার থেকে বঞ্চিত থাকবেন? অবশেষে ভগবান বুদ্ধ একদিন শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে আসেন কপিলাবাস্তুর স্নেহনীড়ে। বুদ্ধদেবের আগমনে কপিলাবাস্তুতে যেন আনন্দের বান ডেকেছে। এই সময়ে কুমার রাহুল জননী যশোধারার নির্দেশে ভগবানের নিকট পিতৃধন প্রার্থনা করলে বুদ্ধদেব রাহুলকে দীক্ষাদান করেন। বুদ্ধদেবের বাল্যসাথী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দও এই সময়ে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেবের কপিলাবাস্তু গমনের স্মরণতিথি হিসাবে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট বিশেষ পবিত্র।

২। অন্যান্য পার্বণ ও উৎসব—

(ক) নববর্ষ ও চৈত্রসংক্রান্তি—বাংলা দেশের হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় সমারোহ সহকারে পয়লা বৈশাখ নববর্ষের দিন পালন করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই নববর্ষ পালন করা হয়। কিন্তু বৈশাখের এই তিথিটি বিশেষভাবে বুদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। বুদ্ধের সময়ে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে অগ্রহায়ণ মাস ছিল বৎসরের প্রথম মাস। অগ্র + হায়ণ (¯মাস) =অগ্রহায়ণ বা বৎসরের প্রথম মাস। পরে বুদ্ধের জন্মকাল হিসাবে বৈশাখ মাস বৎসরের প্রথম মাসের গৌরবলাভ করে।(১) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিংহল, ব্রহ্ম, থাইলাণ্ড প্রভৃতি এশিয়ার, অন্যান্য বৌদ্ধপ্রধান দেশেও বিশেষ সমারোহেএই নববর্ষ প্রতিপালিত হয়। নববর্ষের দিন বাঙালী বৌদ্ধেরা বুদ্ধ মন্দিরে ফুল, প্রদীপ ও অন্নদান করেন। সেদিন পত্রপুষ্প দিয়ে গৃহসজ্জা করা হয়। এই দিনটিতে আত্মীয় পরিজন এবং ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো একটি সাধারণ রীতি।

নববর্ষের দিন বাঙালী বৌদ্ধেরা **'বুড়াবুড়ি পূজা' (ancestor worship)** বা পরলোকগত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন। সাধারণত কোন উচ্চ মঞ্চে অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ ফল প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। মঞ্চের পাশে মোমবাতিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বিষুবসংক্রান্তির রাত্রি থেকে তিনবার **'জাক'**<জাক (জাগ<জাগরণী?) দেওয়ার রীতি চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়। 'জাক' মানে কেয়াফল, বিষকাঠালি, নিমপাতা প্রভৃতি খড়ের সঙ্গে স্তূপাকারে পোড়ানো। এই সময়ে ছোট ছেলেমেয়েরা ছড়ার সুরে বলে,—

> ধনসম্পদ টাকাকড়ি আমার ঘরে জাক।
> রোগশোকতাপ সমুদ্র পার হয়ে যাক।

এই 'জাক' দেওয়ার মধ্যে তান্ত্রিক মহাযান মতেরই একটা অবশেষ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

(খ) ফানুস উড়ানো এবং আকাশপ্রদীপ দেওয়া—আশ্বিনী পূর্ণিমাতে রঙিন ফানুস উড়ানো বাঙালী বৌদ্ধদের একটি প্রধান উৎসব। প্রবাদ আছে যে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের পর সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশে তাঁর মস্তকের কুঞ্চিত কেশদাম কর্তন করে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন; সেই কেশরাজি দেবলোকে উত্তীর্ণ হলে তা দিয়ে দেবতারা চূলামুনি চৈত্য নির্মাণ করেন। বৌদ্ধেরা দেবলোকের

(১) অধিমাস বিনিশ্চয় পৃ· ১১-১২, ধর্মাধার মহাস্থবির।

এই চৈত্যের উদ্দেশে ফানুস উড়িয়ে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আকাশপ্রদীপ তোলার মূলেও রয়েছে এই ধারণা।

(গ) কল্পতরু উৎসব—কল্পতরু উৎসবকে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের উৎসব না বলে লৌকিক উৎসব বলাই অধিকতর সংগত। কল্পতরু নাকি মানুষের অভীষ্টফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ; এর কাছে কিছু চাইলেই পাওয়া যায়। এই কল্পতরু কল্পনার মধ্যে মানুষের আদিম চাওয়া-পাওয়ার বাসনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণত আশ্বিন—কার্তিকমাসের মধ্যে বাঙালী বৌদ্ধেরা কল্পতরু উৎসব করেন। মঞ্চের মধ্যে একটি সজ্জিত চারাগাছ স্থাপন করে তার ডালে নানাবিধ ব্যবহারিক সামগ্রী ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যেমন—কাপড়, খাতা, পেন্সিল, সাবান প্রভৃতি। তাছাড়া কল্পতরু নামধেয় চারাগাছটিকে আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। কলকাতার ধর্মাঙ্কুর বিহার প্রাঙ্গণে প্রায় প্রতি বৎসর মহাসমারোহে কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কীর্তন প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঘ) কঠিন চীবর দান—কঠিন চীবর দান বাঙালী বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান উৎসব। বৌদ্ধ-বিনয়মতে আশ্বিনীপূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকপূর্ণিমার মধ্যে কঠিন চীবর দানের নিয়ম। বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাসও সঙ্ঘটিকে (চাদর বিশেষ) চীবর বলা হয়। ভিক্ষু-জীবনের কঠিন ব্রতের সহায়ক হিসাবে এগুলি কঠিন চীবর। প্রতি বৎসর বৌদ্ধ-উপাসক-উপাসিকা-গণ মহাসমারোহে অন্তত পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে এই কঠিন চীবর দান করেন। বস্ত্রদানের মধ্যে কঠিন চীবর দান মহাফলপ্রদ বলে গণ্য করা হয়। কথিত আছে এখন থেকে ত্রিশকল্প পূর্বে শিখীবুদ্ধের সময়ে গৌতমবুদ্ধ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; সেই জন্মে গৌতম-বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে কঠিন চীবর দান করে জন্মজন্মান্তরে অশেষ সুখ-সম্পদ ও গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন।

(ঙ) বূ্যহচক্র মেলা—সংসার একটি গোলকধাঁধা বিশেষ। এই সংসার অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে বের হবার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভক্ত রামপ্রসাদ সংসারচক্রে উদভ্রান্ত হয়ে গভীর বেদনায় গেয়েছিলেন,—

মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখবাঁধা বলদের মত।

বৌদ্ধদের এই ব্যূহচক্রও মনে হয় সংসারচক্রের রূপক হিসাবেই কল্পিত হয়েছে। তা'ছাড়া এর সঙ্গে আর একটি জাতকের কাহিনী জড়িত আছে। বুদ্ধত্বলাভের পূর্বজন্মে গৌতমবুদ্ধ দানপারমী পূর্ণ করার জন্য বেস্‌সান্তর রাজকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষকে অনাহার ও মড়কের হাত থেকে ত্রাণ করবার জন্য তিনি অকাতরে রাজকোষ উজাড় করে দেন। এর ফলে পাত্রমিত্রগণের পরামর্শে তিনি পিতা কর্তৃক বঙ্কগিরি পর্বতে নির্বাসিত হন। এই নির্বাসনে দুই পুত্রকন্যা ও পত্নী মাদ্রীদেবী তাঁর সহগমন করেন। বঙ্কগিরি যাত্রার পথে তিনি রথ, অশ্ব এবং বহুমূল্য বস্ত্রাদি ভিক্ষার্থীকে দিয়ে দেন। অবশেষে একদিন বঙ্কগিরিতে অবস্থানকালে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেবার জন্য নিজের পুত্রকন্যাকে পর্যন্ত দান করেন। এই দানের ফলে বসুন্ধরা সপ্তবার কম্পিত হয়। কিন্তু আরেকদিক ভেবে দেবরাজ ইন্দ্র এতে প্রমাদ গণলেন। রাজকুমার বেস্‌সান্তর এভাবে নিজের পত্নীকে পর্যন্ত দান করতে পারেন! তাহলে একাকী অসহায় অবস্থায় এই নির্জন বনে তাঁর ধর্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই ভেবে তিনি একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বঙ্কগিরিতে গিয়ে বেস্‌সান্তরের নিকট আপন পরিচর্যার জন্য মাদ্রীদেবীকে প্রার্থনা করলেন। দাতাশ্রেষ্ঠ বেস্‌সান্তর প্রার্থীকে স্বীয় পত্নীদান করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। তখন ছদ্মবেশী ইন্দ্র বললেন, 'হে মহাত্মন্! আপনি আমার নিকট যাঁকে দান করেছেন তাঁকে আমি আপনার নিকটেই গচ্ছিত রাখলাম। এঁকে অন্য কারো নিকট দান করতে পারবেন না।' প্রত্যাবর্তনের সময় দেবরাজ ইন্দ্র বঙ্কগিরির পথ জটিল করে দিয়ে আসেন যাতে অন্য কেউ সেই বনে প্রবেশ করে বেস্‌সান্তরের ধর্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।

জটিল ঘূর্ণপাক বাঁশের ঘেরা দিয়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই ব্যূহচক্র রচনা করা হয়। দর্শকেরা এই জটিল পথ পরিক্রমা করেন এবং কেন্দ্রস্থলে গিয়ে প্রদীপ জ্বালান। সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসেই এই ব্যূহচক্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। বৌদ্ধদের পূজাপার্বণ ও উৎসবের সাধারণ বিশেষত্ব—

(ক) পঞ্চশীল গ্রহণ—বৌদ্ধদের যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রথমে পঞ্চশীল গ্রহণ করাই রীতি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনায় পঞ্চশীল বা পাঁচটি শিক্ষাপদ মেনে চলার জন্য ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। বুদ্ধধর্ম ও সংঘের শরণ নিয়ে নিম্নলিখিত পাঁচটি শিক্ষাপদ গ্রহণ করা হয়:—

প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা,
অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা,
ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা,
মিথ্যা কথা না বলা,
মাদকদ্রব্য সেবন না করা।

পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ উপোসথ বা অষ্টশীল পালন করেন। এই শীলের দ্বারা চিত্ত কুশলকর্মে নিবিষ্ট হয়। ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধগণ অন্তত পূর্ণিমা তিথিতে নিকটবর্তী বিহারে গমন করে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। বাড়িতেও পঞ্চশীল গ্রহণ করা যায়।

(খ) প্রদীপ ও ফুলপূজা—প্রত্যেক বৌদ্ধ উৎসবকে সাধারণভাবে 'আলোর উৎসব' নামে অভিহিত করা যায়। পূর্ণিমা তিথিতে কিংবা অন্য যে কোন সময়ে বুদ্ধমন্দিরে গেলে বৌদ্ধেরা প্রদীপ জ্বালান। প্রদীপ জ্বালানো যেন একটি বৌদ্ধ সংস্কার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রহ্মদেশের একটি বৌদ্ধ উৎসবের নামও 'আলোর উৎসব' (Festival of Light) বা থাডিন্‌ যে (Thadinjay)। বৌদ্ধমতে প্রদীপকে অনিত্যতার প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। বৌদ্ধ উৎসবে প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে এই ইংগিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রদীপ পূজার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে কিংবা মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে ফুল, ধূপ ও অন্ন দান উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতি পূর্ণিমায় বিশেষ সমারোহে নানা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বুদ্ধপূজা করা হয়।

(গ) পূর্ণিমা অভিবাদন—পূর্ণিমার সময় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করা এবং কনিষ্ঠদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা একটি সাধারণ বিধি। এর সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের বিজয়া দশমীর তুলনা করা যায়।

(ঘ) দান—পূর্ণিমা কিংবা যে কোন পুণ্যানুষ্ঠানে বৌদ্ধেরা যথা শক্তি দরিদ্রদের দান করেন। পূর্ণিমাতে প্রতিবেশীদের পায়সাদি বিতরণ করা হয়। তা ছাড়া ভিক্ষু সংঘকে অন্ন বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী দান করা হয়। ভিক্ষু সংঘকে যে দান করা হয় তাকে সংঘদান বলে।

(ঙ) নিরামিষ আহার - পূর্ণিমাতিথিতে অধিকাংশ বৌদ্ধেরা নিরামিষ আহার করেন। এই নিরামিষ আহারের মূলে রয়েছে জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা। মৈত্রী—করুণার আদর্শকে বৌদ্ধেরা অতি উচ্চস্থান দেন।

৪। মানত দেওয়া

(ক) পশু-পাখি-মৎস্য মুক্ত করে দেওয়া—মানত ও বলিদানের প্রথা সকল দেশেই অল্পবিস্তর আছে। আমাদের দেশে হিন্দুরা সাধারণত কোন পশু বা পাখি দেবতার উদ্দেশে বলি দেন; মুসলমান সমাজে গরু কোরবানীর রীতি আছে। পশু-পাখি বলি দেওয়ার রীতি বৌদ্ধ সমাজে নেই এবং প্রাণিহত্যা বৌদ্ধধর্মে নিতান্ত গর্হিত বলেই বিবেচিত। বৌদ্ধেরা মানত করে পশু-পাখিকে মুক্ত করে দেন কিংবা জীবিত মৎস্য জলে ছেড়ে দেন। সাধারণত সন্তান বা অন্য প্রিয়জনের ব্যাধির জন্য কিংবা দূরদেশস্থিত সন্তানের কল্যাণ কামনায় এরকম মানত করা হয়। শ্রাদ্ধাদি পুণ্যানুষ্ঠানকালেও এরকম মানত করা হয়। শ্রাদ্ধাদি পুণ্যানুষ্ঠানকালেও এরকম মানত দেওয়া হয়।

(খ) হাজার প্রদীপ জ্বালানো—সন্তানাদি প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় কিংবা কোন কার্যে সফলতার আশা করে হাজার প্রদীপ মানত করা হয়। যে কোন বুদ্ধমন্দিরে বা বৌদ্ধতীর্থে এই প্রদীপ জ্বালানো যেতে পারে। পূর্ণিমা, অষ্টমী প্রভৃতি যে কোন তিথিতে এইরূপ মানত দেওয়া যায়।

(গ) 'গা-সমান' বাতি—বিশেষত কোনরকমের বিপদমুক্তির জন্য এই মানত করা হয়। যার জন্য মানত করা হয় তার শরীরের উচ্চতা অনুযায়ী মোমবাতি তৈরি করানো হয়। যে কোন একটি দিনে বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে এই বাতি জ্বালানো রীতি। সেই সঙ্গে বুদ্ধপূজাও করা হয়।

উপসম্পদা দান—উপসম্পদা গ্রহণ অর্থ শ্রমণ হওয়া বা স্বল্পকালের জন্য বৌদ্ধসন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করা। বৌদ্ধদের মতে জীবনে একবার অন্তত সপ্তাহকালের জন্য শ্রমণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারো পুত্রসন্তান না থাকলে অন্য কারো ছেলেকে শ্রমণ করাবার মানত করে। শ্রমণ হওয়া কিংবা অন্যকে শ্রমণ করাবার ব্যবস্থা বহন করা বৌদ্ধদের মধ্যে পুণ্যকাজ বলে পরিগণিত। আবার কারো সন্তানাদির বারবার অল্পবয়সে মৃত্যু হলে কিংবা একেবারে সন্তানহীন পিতা-মাতা মানত করে যে ভবিষ্যতে সন্তান হলে শ্রমণ করানো হবে। শ্রমণ হলে সপ্তাহ কিংবা পক্ষকাল বৌদ্ধভিক্ষুর জীবন পালন করতে হয়। এই সময়ে দশটি শীল অবশ্য পালনীয়। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আবার গৃহাশ্রমে ফিরে আসে। পুত্রের শ্রমণ হবার সময় পিতা-মাতা ভিক্ষুসংঘ এবং পরিজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করেন।

অবেলায়

কবিতা দেবী

আকাশ নীল নীল। বাতাস শির শির
সোনালি আশ্বিন। বৃষ্টি ঝির ঝির।
মনটা এলোমেলো। ভরা এ অবেলায়
রূপালি রোদ্দুর। বুকটা চমকায়।

বাহির বিশ্বেতে উঠছে কালোঝড়
হয়ত বাজভারা পড়বে কড় কড়।
জানলা খোলা খোলা। চোখটা উঁকি মারে
কেউ কি বসে আছে আজকে মোর তরে?

ভাবছি কি যে ছাই, মিছে এ ভাবনা
আমারে শুধু সেবে, করেছে ছলনা।
আজ এ অবেলায়, কেন যে তারে চাই
বসি এ নিরালায়, শুধু যে ভাবি তাই!

আসছে মনে কত হারানো কবিতা
কোথা সে নীল চোখ, কোথা সে নমিতা
কথা তো ছিল তার আসবে সাঁঝাসাঁঝি
নূপুর নিক্কণ শুনবে বনরাজি

আসবে এলোচুলে। কপালে কুমকুম।
সহসা সুরু হ'বে ফুলের মরশুম।
খোঁপাতে গন্ধ। বুকেতে ভালবাসা
মনের কথাগুলো সোহাগে ভাষা ভাষা।

আকাশে ছায়া হেনে সূর্য ডুবে যায়
নেমেছে কালোরাত নিবিড় বনছায়।
জোনাক পথে জ্বেলে, ঝিল্লি-সুর তুলে
এল কি প্রিয়া ঘরে সজল এলোচুলে।

অপেক্ষানুরাগ

শ্রীগঙ্গাধর দাস, সরস্বতী

বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রেম প্রকটিত, অমিয়া মথিত চিরন্তনী সত্তায় 'শ্রীরাগ' অনুরঞ্জিত ও বিরাজিত। উদয়ভানুর সহস্র আলোক-জ্বালায় ধরিত্রীর নবসঞ্জীবিত সত্তা যেরূপ প্রাণচঞ্চল, কর্মচঞ্চল ধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে—শ্রীরাধার বহুবাঞ্ছিত কৃষ্ণানুরাগেও তেমনি নীলাকাশের কোলে জলদের দর্শনে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়;—তখন মনে পড়ে সেই চারুচন্দ্রবদন নবঘনশ্যামের প্রথম দর্শনের বিমোহন রূপ, কালো,—অনন্ত আলোর কাছে কোটি কাঞ্চন জিনি বিচিত্রমধুর স্বপ্নসত্তার সম শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।—শ্রীরাধার চঞ্চল মনে তখন হয় বিভ্রমের সঞ্চার। সে রূপ বিভ্রমে ও নাম বিভ্রমে আকুল হয়ে পড়ে, আর মনের অগোচরে প্রেমের প্রীত্যঙ্কুর জাগে তার সুকোমল হৃদয়-বেলাতে। সে নামে সে আকুল-ব্যাকুল হয়ে সখীকে জানায়,—

'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

এই নাম-বিভ্রমেই শ্রীরাধার অজ্ঞাত প্রেম উঁকি দিয়ে উঠে তার প্রাণ-মন্দিরে। কিন্তু তখনও সে প্রেম-মন্দির শূন্য। আর এই শূন্যতার সুযোগে শ্রীরাধার হয় স্বপ্নদর্শন। সে স্বপ্ন যেন সৃষ্টির ইতিহাসে অভিনব, প্রেমের ইতিহাসে পরন্তপ, শ্রীরাধা হেন নারীজীবনে অবিস্মরণীয়, ভক্ত হেন মানব জীবনে অকল্পনীয়, অভাবনীয়, অনাস্বাদনীয়।—সেই অপরূপ রূপ মোহন মুরলীধারী, পীতপরিহিত বসন, বনমালা শোভিত, মণিময় ফুলমালা-কুণ্ডল দোলিত, কুঞ্চিত চিকুর-বিলম্বিত ঘনশ্যাম যমুনা পুলিনে যেন কার অন্বেষণে স্তব্ধ প্রকৃতির নিরালা কুঞ্জে পরিদর্শিত হল—শ্রীরাধার স্বপ্ন দর্শনের মত।

সহসা চলন্ত পদযুগল স্তব্ধ হল, বিকিরিত নেত্রবলয় দ্বিগুণ বিস্ফারিত হল, কিন্তু রূপাকর্ষণে যেন অবনমিত হল, নৃত্যপরা অঙ্গগতি যেন শিথিল হল—এ যেন শ্রীরাধার দিবাস্বপ্ন,—এ কি! সেই কানু, সেই স্বপ্নের অবাস্তবতার সাক্ষাৎরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই মরম আকুল করা শ্যাম নামের—সাক্ষাৎ শ্যাম, এ দর্শন কি স্বপ্নদর্শন, না দেবদর্শন, না জীবনদর্শন?—বিকম্পিত হয়ে অন্তস্তলের উত্তর বেরিয়ে এল,—এ হল আত্মদর্শন।

কিন্তু এ কি হল? শ্রীরাধার এ কি হল,—

'কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ
কানু হেরইতে ভেল পরমাদ।'

—বিদ্যাপতি

এ হল আত্মদর্শনের প্রথম সোপান।—রূপ, আলো, আকর্ষণ কিংবা আনন্দ ও অমৃতের একত্র আমন্ত্রণ।—সে আমন্ত্রণকে পূর্ণতা জানাতে হলে চাই মিলন। সেই আকাঙ্ক্ষিত মিলনের অনান্ধকারের পথে বিচ্ছুরিত প্রেমবর্তিকা শ্রীরাধার অন্তর-মন্দিরে প্রজ্বলিত হল। মিলনাশী প্রেমিকা প্রেমিকের কাছে বিকিয়ে দিল তার মন-প্রাণ, জীবন-যৌবন, কুল-লাজ-ভয়, সমাজচেতনা। ফলে গোকুলের হাটে শ্রীরাধা হল কৃষ্ণ কলঙ্কিনী—

'কত আছে যুবতী গোকুলে
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে।'

—চণ্ডীদাস

—কিন্তু সব থেকে জ্বালায় ঐ দুর্মুখ ননদিনী। তার বিষদিগ্ধ জ্বলন্ত কথাগুলো যেন শ্রীরাধার অন্তরপিঞ্জরকে তপ্ত লোহার আঘাতে চুরমার করে দেয়। তার অশ্লীলতায় শ্রীরাধার মন বিষিয়ে উঠে ক্ষণে ক্ষণে, মনে হয়—মরণ এর চেয়ে ঢের ভাল;—কেন না,—

'ননদী দেখয়ে চৌখের বালি
শ্যামনাগর তোলাই সদাই পাড়ে গালি,
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল।'

—চণ্ডীদাস

কিন্তু ননদিনীরই বা কি দোষ, দোষ আমারই—সখি, আমারই মতিভ্রম, আমারই দুঃস্বপ্ন—আমিই ননদিনীর পাশে রাত্রে শুয়ে শুয়ে শ্যামবন্ধু বলে ননদিনীকেই আঁকড়ে ধরি,—

'নিন্দের আলসে বন্ধুর বাধসে
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া রুষিয়া বলিছে
বন্ধুয়া পাইলি কারে।'

—চণ্ডীদাস

হায়! হায়! এ আমার পোড়া কপাল। সখি, তোরা আমায় মরতে দে।—না; না—এখনি কি! এই তো সবে সন্ধ্যে। যখন নেমেছিস জলে তখন সাঁতার দিয়ে তোকে যমুনা পার হতেই হবে।—প্রেম যমুনা, এ যমুনার উত্তাল ঢেউ, আর তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে উদ্বেলিত প্রাণের অনুভূতি, জীবনের পরম শান্তি।

কিন্তু এই প্রেম মিলনের উপায়?—উপায় অতীব সূক্ষ্ম, সুন্দর, সহজ, সরল!—অভিসার, অভিসার! তাই শুরু হল অভিসার, দিবাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, বর্ষাভিসার। অবশেষে বিভিন্ন অভিসারের মিলনলগ্নে শ্রীরাধা ধরা পড়ল—গোকুলের পথে, আর বৈষ্ণব কবির অন্তরে। তাই কবি গাইলেন,—

'ঐ ছলে মিলল নাগর পাশ
গোবিন্দ দাস কহে পূরল আশ।'

কিন্তু বিস্ময় প্রেমের আতঙ্ক আবার সহসা যেন জটিলতায় সৃষ্টি করে শ্রীরাধা অন্তরে বিরহের সঞ্চার হল। সঞ্চিত হল বেদনা, অনুতাপ, জ্বালা, বিরহ। আর সে বিরহের কারণ তার প্রেমাস্পদ নিজেই, কৃষ্ণ হতে কুঞ্জান্তরে গমন, রজনী যাপন, শ্রীরাধাবদনকে, তার প্রেমকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করল। তার স্বতঃনিঃসারিত কৃষ্ণপ্রেমকে বিমুখ করল, আর সেই অবসরে কুঞ্জান্তরে অন্য সখীর প্রেমাস্বাদনরত শ্রীকৃষ্ণ 'শ্রীরাধানামে' চিরজনমের সাধা বাঁশীর সুরকে, প্রেমকে ভুলে থাকার কারণেই কৃষ্ণ-গরবিনী শ্রীরাধা তনুতাপে বিরহানলে জর-জর। জীবনের প্রথম প্রেমলগ্নে পূর্ণচন্দ্রের রাহুগ্রাস যেন শ্রীরাধা-জীবনে আত্যন্তিক বেদনাবিধুর করে তুলেছে,·····সেই নিঠুর কালিয়ার এই অমার্জনীয় কপটতায়।

······নিশি আসন্ন প্রভাতের অপেক্ষায় উন্মুখ, রজনী-জাগরণে শ্রীরাধাঅঙ্গ অবশ-বিবশ, প্রেম-মিলনের উৎকণ্ঠায় বিস্ফারিত নেত্র রক্তরাগে বিনমিত, সর্বাঙ্গে উত্তাপ, কণ্ঠে শুধু হা-হুতাশের জ্বালাময়ী সুর,—

'প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধা-নিধিরপি তনুতে তনুদাহম্।

—গীতগোবিন্দ

শ্রীরাধা তাঁর প্রেমাস্পদকে প্রণাম করিতেছেন, আর বারবার বলিতেছেন,—'হে মাধব, এই আমি তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম। তুমি বিমুখ হইলে এখনি সুধানিধি (চন্দ্র) আমাকে দগ্ধ করিবে।'—অবিরত অশ্রু-বিলোচনা রাধা আক্ষেপ-কাতর, প্রেমবঞ্চিত শ্রীরাধার কাছে প্রিয়বিরহে প্রিয়-মিলনের [illegible]সজ্জা, বেশভূষা, ফুলমালা কণ্টকস্বরূপ হয়ে উঠেছে, আর ঐ আ[illegible]ঙ্ক্ষিত প্রেমমিলনের আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি শ্রীকৃষ্ণ বিনে তুচ্ছ, মূল্যহীন, অব্যবহারের পর্যায়ে এখন সেগুলি জঞ্জালসদৃশ মনে হচ্ছে। সখি এ-সব নিয়ে হবেই বা কি!

'নিশি প্রভাত হৈল, পিয়া না আইল ভবনে
মালতীর মালা কেনে গাঁথিলাম যতনে।
অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়
জয়-জয় হৈল তনু নিশি না পোহায়।'

—চণ্ডীদাস

ইত্যবসরে সখীও তাকে ছাড়বে কেন!—কি-রে সই; সেদিন যে বড় বড়াই করেছিলি,—আমি কৃষ্ণ-সোহাগিনী, কৃষ্ণ আমার গলার হার, অন্তরের অন্তরময়, তুই বলেছিলি না?—

'আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই
যে হই তাহার চিতে স্বতন্তরী নই।
তাহার গলায় ফুলের মালা
আমার গলায় দিল
তাহার মত মনে করি—সে মোর মত হইল।

—চণ্ডীদাস

আর আজ সে চটুলতা, কপটতা, প্রেমের অতি মুখরতা কোথায়? তুই বড় অবোধ, তুই বুঝিস নে, সেই চঞ্চল কৃষ্ণের প্রেমের ছলেই তুই মুগ্ধ হয়ে আছিস। তোর মত তার অনেক সখী আছে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে। তুই ছেড়ে দে, ফিরে আয়, চলে আয়, ও প্রেম নয়; ও শুধু মোহিনীমায়া।

না, না। সে যাই হোক সখী, তাকে শুধু তুই একটিবার আমার এই দুর্দশার কথা বলে আয়,—

'পর্বত সমান কুলশীল তেয়াগিয়া
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া।'

—চণ্ডীদাস

—এখন হে নাগর, তুমি যদি বিমুখ হও তবে আমার এই দুর্বিষহ, কুল-কলঙ্কিনী হয়ে জীবন ধারণ করায় কি লাভ!

তাই, শ্রীরাধার বিরহবেদনার সংবাদ নিয়ে সখী চলেছে শ্রীকৃষ্ণের গোচরে। শ্রীরাধার বিরহবেদনা শুনে শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তর ব্যথায় আকুল হয়ে উঠেছে। তার এ-হেন অকরুণার কথা মনে উদয় হতেই নিজে লজ্জিত হয়ে উঠেছে। আজ শ্রীরাধা মিলনে উপেক্ষা করে যে অন্যায় যে নির্মমতার পরিচয় দিয়েছে—সেই মর্মপীড়া তাকে বেদনাতুর করে তুলেছে। অন্যদিকে চিরজনমের সাধা 'রাধা' নাম শুনে প্রেম-বিভোর হয়ে বিরহানলে নিপতিত হয়েছে। সখী, দূতী শ্রীরাধার মত শ্রীকৃষ্ণকে তদ্রূপ অবস্থান্তর দেখে আবার ছুটে গিয়েছেন শ্রীরাধা সকাশে; আর যে সংবাদ সে শ্রীরাধাসমীপে নিয়ে গেছে—তা হল,—

'বসতি বিপিন বিতানে ত্যজতি ললিত ধাম
লুঠতি ধরণী শয়নে বহু বিলপতি নব নাম।'

—গীতগোবিন্দ

সখি! শ্রীকৃষ্ণ তোর এ-হেন বিরহদশার কথা শুনে তিনিও বিরহে নিপতিত হয়েছেন। 'মনোহর বাসভবন ত্যাগ করে তোমার জন্য তিনি বনবাসী হয়েছেন এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন।'—সখী, সত্যিই তোর প্রেম ধন্য, তুই সত্যিই কৃষ্ণ-গরবিনী! চল, আর সেই করুণাবিগলিত ঘনশ্যামকে আঘাত দিয়ে লাভ নেই, চল, ত্বরা চল তার কাছে,—সে তোর অদর্শনে বিরহব্যাকুলিত, যেন তোর মতই তার জীবনের সংশয়ক্ষণ সমুপস্থিত।

অতএব,—

'রতি সুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।
ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।
পীন পয়োধর পরিসর মর্দন চঞ্চল করযুগশালী।
নাম সমেতং কৃতশঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননুতে তনু সঙ্গত পবন চলিতমপি রেণুম্।'

—গীতগোবিন্দ

আত্মকেন্দ্রিক

মধু গোস্বামী

এখন কি পাখা গুটোবার সময়—ক্লান্তি পোহাবার। দেখছ না
ঝড় উঠছে! ডালে ডালে গুমরে মরছে বাসা ভাঙবার ভয়।
একটা ভীষণ কালো মেঘের তলায় আস্তে আস্তে কেমন
তলিয়ে যাচ্ছে আকাশটা। ছোট ছোট কান্না নিয়ে এখন কি
খেলা করবার সময়!

তোমার মুগ্ধ মুহূর্তগুলোকে এখন স্মৃতির হাতে
তুলে দাও। সময় এলে, ফের ফিরিয়ে নিও। সেদিন,
সব ব্যাকুলতাকে বিছিয়ে দিও ওদের বুকে।
এখন আমাদের যেতে হবে ব্যস্ত ডানার দাঁড় বেয়ে বেয়ে
সময়কে বয়ে নিয়ে যেতে এই ঝড়-ঝঞ্ঝার ওপারে।

ভবিষ্যৎবাণী

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অষ্টম হেনরি ছিলেন বলদৃপ্ত রাজা। তাঁর সঙ্গে বিবাদ করে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু মৃত্যু। মৃত্যুর কাছে সবাই সমান।

আইলওয়ার্থে সিওনের মঠ। শান্ত, সুন্দর, নিরিবিলি পরিবেশ। অতি রমণীয় জায়গা। মঠের দেওয়ালের 'পরে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ ঢালু হয়ে চলে গেছে টেমস নদীর তীরে। দলে দলে গরু চরে বেড়াচ্ছে সেই মাঠে। বলাকার দল সারাদিন নদীতে মাছ ধরছে—শ্রান্ত হলে বসছে গিয়ে উইলো গাছের ডালে। কিন্তু মঠ শান্ত হলে কি হবে, মঠে শান্তি নেই। মঠের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের আশপাশের গ্রামের লোকেরা ভালবাসত, কিন্তু রাজরোষে পড়ে সেই সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের মঠ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। রাজরোষের কারণ তারা রাজার ইচ্ছে মেনে নেয় নি।

মঠে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু মঠের ঘরগুলি থেকে রুদ্ধকান্না ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ এখনো নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। মাত্র পাঁচ বছর আগে হেনরির 'কণ্টকহীন গোলাপ' ক্যাথেরিন হাওয়ার্ড এই মঠে তাঁর শীতের মাসগুলি কাটিয়ে গেছেন, কাটিয়েছেন মরণাধিক যন্ত্রণায়। এখান থেকে গেছেন তিনি টাওয়ারে, তারপরে বধ্যভূমিতে। এইখানেই কেন্টের হোলি-মেড, স্যর টমাস মোরের সঙ্গে দেখা করতেন ও কথাবার্তা বলতেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অ্যান বোলিনকে বিয়ে করলে রাজা বিধাতার রুদ্ররোষে পড়বেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী করায় তাঁকেও যেতে হয়েছিল বধ্যভূমিতে।

রিচার্ড রেনল্ডস্ ছিলেন একজন নামকরা বিদ্বান ও সিওনের যাজক। ধর্মীয় ব্যাপারে রাজাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই শপথ নিতে অস্বীকার করায় টাইবার্ণে তাঁকে ভয়াবহ মৃত্যু বরণ করতে হয়।

ব্রিজেটিন অর্থাৎ মঠের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর দল একশ' বছর ধরে সিওনের মঠে বাস করছিল। রাজার অসন্তোষবহ্নি তাদের শান্তিরনীড় দগ্ধ করলে। তাদের বিরুদ্ধে নৈতিক অধঃপতনের অভিযোগ আনা হল, কেড়ে নেওয়া হল তাদের যা কিছু সব, ফলে তারা তাদের অতদিনের বাসস্থান ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

এই মঠবাড়িতেই একদিন মৃত রাজার দেহ এনে রাখা হল, কিন্তু তখন কে জানত যে চোদ্দবছর আগের এই ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে?

'এখনো সাবধান হও যাতে আহবের শাস্তি তোমারও না হয়,—কুকুরে তার রক্ত চেটে খেয়েছিল।'

রাজাকে এই সতর্কবাণী যিনি শুনিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন একজন ফ্রায়ার, নাম পেটো। এঁর দলের নাম ছিল, অবজারভেন্ট ফ্রায়ারস্।

রাজা এঁদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং গ্রীনউইচে যখন রাজসভা বসত তখন তিনি এঁদের গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা শুনতেন। তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নের নিষ্পত্তি যখন হয় নি এবং যখন অ্যান বোলিনের সঙ্গে তাঁর গোপন বিবাহ হয়ে গেছে তখনো তিনি নিয়মিত গির্জায় যেতেন এবং নিজেকে একজন গোঁড়া ক্যাথলিক মনে করতেন।

কিন্তু বিয়ে বেশিদিন গোপন রাখা গেল না, অভজারভেন্ট ফ্রায়ারদের কানে গিয়ে পৌঁছে গেল সে খবর। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসের এক রবিবারে রাজা গির্জার প্রার্থনা সভায় উপস্থিত। ফাদার পেটো তাঁর সারমনে রাজাকে তিরস্কার করে বললেন, 'আমি জানি আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হবেন, কেন না আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই বিবাহ আইনসঙ্গত নয়। এ কথা বলার জন্যে আমাকে অশেষ লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ভোগ করতে হবে এও আমি জানি, তবু একথা আমাকে বলতেই হচ্ছে কারণ ঈশ্বর আমার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। আপনার শ চারেক চাটুকার আছে যারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়। তবুও বলি আপনি সাবধান হোন, তাদের কথায় ভুলে নিজের ওপর আহবের শাস্তি ডেকে আনবেন না। আহবের রক্ত কুকুরে চেটে খেয়েছিল।'

পেটোর সাহস দেখে উপস্থিত সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু রাজা অবিচলিত রইলেন। তিনি বোধ হয় মনে

করলেন ভিক্ষুকশ্রেণীর সামান্য এক যাজকের কথায় অধীর হয়ে ফল কি? তাঁর মনে তখনো আশা ছিল যে, পোপ তাঁর এই বিবাহ সমর্থন করবেন।

অতএব মনে মনে রুষ্ট হলেও রাজা পেটোর ওপর কোনো প্রতিশোধ নিলেন না। তিনি শুধু পরের রবিবারের বক্তা নিজেই নির্বাচিত করলেন। নির্বাচিত হলেন ফাদার কুরুইন।

ফাদার কুরুইন প্রথমেই পেটোকে কুকুর, বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, নিন্দুক ইত্যাদি বলে তাঁর বক্তৃতা সুরু করলেন। তিনি বিদ্রূপ করে বললেন, 'আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারবে না বলেই তুমি ভয়ে ও লজ্জায় পালিয়ে গেছ পেটো।'

পেটোকে কোথাও দেখা গেল না। কুরুইন জয়ের গর্বে ফুলে উঠলেন।

তিনি আরো বলতে যাচ্ছেন এমন সময় তাঁর বক্তৃতায় বাধা পড়ল। কে যেন বলে উঠল—'আপনি ভাল করেই জানেন যে, ফাদার পেটো একটি সভায় যোগ দিতে ক্যান্টারবারি গেছেন—আপনার ভয়ে তিনি পালান নি। তিনি কাল ফিরে আসবেন।'

এই বক্তাটি হলেন ফাদার এল্‌স্টো। তিনিও ছিলেন পেটোর মতই নির্ভীক ও দৃঢ়-সংকল্প। কুরুইন যখন উত্তর দেবার জন্যে কথা খুঁজছেন এল্‌স্টো তখন বলে চললেন—'ফাদার পেটো ধর্ম পুস্তক থেকে যে সব কথা বলেছেন, তার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত। ঈশ্বরের সামনে আমি তোমাকে এই যুদ্ধে আহ্বান করছি। তুমিও সেই চারশ' জনের মধ্যে একজন যারা রাজাকে ভুল পথে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অনন্ত নরকের মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করছে।'

এল্‌স্টো নির্দয়ভাবে কুরুইনকে আক্রমণ করে চললেন—আর পরাজিত, লাঞ্ছিত কুরুইন সকলের সামনে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলেন। ভীষণ হট্টগোল সুরু হয়ে গেল গির্জায়। সেই গোলমালের ভেতর রাজার বজ্রগম্ভীর স্বর শোনা গেল। তিনি আদেশ দিলেন এই দুই ফ্রায়ারকে এমন জায়গায় পাঠাতে হবে যেখানে আমি আর তাদের দেখতে পাব না।

পেটো ও এল্‌স্টোকে রাজদরবারে হাজির করা হল। তাদের বলা হল, বস্তার ভেতর সেলাই করে তাদের নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। এল্‌স্টো উত্তর দিলেন—'স্থলপথে যেমন, জলপথেও তেমনি তাঁরা স্বর্গে পৌঁছতে পারবেন।' কিন্তু তাঁদের এই ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও দণ্ড হল তাঁদের মৃদু—দেওয়া হল তাঁদের নির্বাসন।

কিন্তু এর পরেই সুরু হল মঠগুলির ওপর অত্যাচার। হেনরি নিজেকে ইংলণ্ডের চার্চের সর্বময় কর্তা বলে ঘোষণা করলেন এবং রোমের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

গ্রীনউইচ অবজারভেন্টরা, কার্থুজিয়ানরা ও সিওনের ব্রিজেটিনরা কিন্তু রাজাকে চার্চের সর্বময় কর্তা বলে স্বীকার করলেন না। সিওন মঠের উৎপীড়িত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা শেষ পর্যন্ত স্বদেশ ত্যাগ করে বেলজিয়ামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু জানুয়ারীর যে রাত্তিরে, উইণ্ডসোরের সেন্ট জর্জের চ্যাপেলে শেষ যাত্রার পথে রাজার মৃতদেহ এই মঠে রাখা হয়েছিল, অনেক প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই এই মঠে সেই রাত্তিরে উপস্থিত ছিল।

রাত্তিরে সেখানে কি লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছিল তার সাক্ষী অবশ্য কেউ নেই, কিন্তু সকাল যখন হল তখন রাজার ভীত, সন্ত্রস্ত চাকরের দল দেখলে—রাজার কফিন খোলা, আর তাঁর রক্ত চেটে খাচ্ছে কয়েকটা কুকুর।

ফ্রায়ার পেটোর ভবিষ্যদ্বাণী ভয়াবহভাবে ফলে গেল।

বাসনার রঙ

সুধীরকুমার গংগোপাধ্যায়

এখনো দিনের প্রান্তে এতটুকু রঙ
লেগে থাকে বাসনার মত।
তুমিও বরং
সেই রঙে মুগ্ধ হও। যে দুঃখ নিয়ত
অন্তঃশীলা—তারে নিয়ে করো না বিলাপ।
কিছু রঙ ঢালো অভিলাষে;
করো না সত্যের অপলাপ
শোকের সৌন্দর্যে মগ্ন এ ভ্রান্তিবিলাসে।

দিবস বিষণ্ণ হয় মেঘেদের ভীড়ে,—
তথাপি স্বর্ণের আভা থাকে তার কিনারে কিনারে।
দুঃখ থাক চিত্তের গভীরে;
আলোক অংগুলি দিয়ে বাজাও এ প্রাণের বীণারে।

ক্ষতি নেই বেদনা ভুলিলে;
মলিন দুঃখের মুষ্টি শিথিল কর গো প্রাণপণে।
যে-বীজ আঁধারে ঢেকে দিলে—
আপন প্রাণের বেগে সে তো আসে আলোর প্রাঙ্গণে।

চরম রমণীয়া

বাক্যনবাব

অর্থনৈতিক প্রয়োজন ঘরছাড়া করেছে মেয়েদের সব দেশে। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান চাহিদা দাবী জানিয়েছে, উপার্জনের দায়িত্বে পুরুষের সংগে সমান অংশ নিতে। গৃহের লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখতে ঘর ছেড়ে পথে বেরোতে হয়েছে গৃহলক্ষ্মীদের। সুখে থাকার আশায় একদা যে নীড় বাঁধা হয়েছিল, আরও সুখের আশা নাড়া দিয়েছে সেই সুখনীড়ে।

মানব সভ্যতার প্রথম ধাপে মানুষ চেয়েছিল অসন-বসন। আজ সভ্যতার শীর্ষে মানবজাতি, প্রয়োজনের তালিকাও সুদীর্ঘ। পর্ণ-কুটীরে আমাদের আর কুলোয় না—চাই আকাশচুম্বী স্কাইস্ক্র্যাপার। ব্যয়ের তাগিদে বৃদ্ধি করতে হয়েছে আয়। একক উপার্জনে, আর সম্ভব হয় না সুনির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা। পরিবারের আরাম যোগাতে বিরাম বিশ্রাম ভুলেছি সপরিবারে।

বহুক্ষেত্রে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে এই কর্মব্যস্ততা। সভ্যতার আধিক্যে বেড়েছে কর্মপ্রাচুর্য। যে ছিল মা, মেয়ে, গৃহিণী মাত্র, তার ভূমিকার পটপরিবর্তন হয়েছে। বাহির-বিশ্বে ডাক পড়েছে—জীবনযাপনের নয়, জীবনধারণের। ধনীর দুলালীকেও বাছাই করতে হয়েছে তার কর্মক্ষেত্র। ঘুচেছে গৃহকোণের সীমিত বন্ধন। বন্দিনী ছাড়া পেয়েছে মুক্তির প্রাংগণে।

বলা বাহুল্য এ মুক্তি মেলে নি হঠাৎ। এর পিছনে আছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। একনিষ্ঠ প্রস্তুতি। ভূমিকা পরিবর্তনের জন্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে নারীর অন্তরে-বাহিরে। পরিবর্তন এসেছে তার পরিবেশে আর পরিধানে। বদলেছে তার চোখের চাওয়া আর পায়ের চল। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতেই সম্ভব হয় নি এই আমূল পরিবর্তন। অনেক দেখে আর অনেক ঠেকে শিখতে হয়েছে বাইরে চলার রীতিনীতি। সমান অধিকারের দাবী জানাতে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক বন্ধুর পথ। কেবলমাত্র ট্রামে-বাসে দাঁড়িয়ে থেকেই প্রমাণ করা যায় নি স্বাবলম্বন। জেনে নিতে হয়েছে নিজের অধিকার—জানিয়ে দিতে হয়েছে নিজের দাবী। পুরুষের দৃষ্টিতে যাচাই হয়েছে নারীর মূল্য। দেখেছে তার মোহিনী শক্তির, সজ্জিত মূর্তির আবেদন দিকে দিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দশগজী গাউন শুধু আর্থিক কারণেই অবলুপ্ত হয় নি, বিংশ শতাব্দীর জৈবিক প্রয়োজন জনপ্রিয়তা দিয়েছে 'পেনসিল্ স্কার্টকে।

অনেক দেরীতে হলেও এই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে বাংলার কূলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বা পঞ্চাশের দুর্যোগে না হোক, দেশের বিভক্তি পাল্টে দিয়েছে বংগললনার জীবনধারা। অন্ন প্রস্তুত করাতেই আর সার্থকতা নেই অন্নপূর্ণাদের। অন্ন সংস্থানের দায়িত্বেও হাত লাগাতে হয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালীর ঘরে-বাইরের দায়ভার বহন করছে বাংলার কন্যারা।

অন্যদের মতই পরিবর্তন ঘটেছে তার ধীরে ধীরে। খুলছে তার অবগুণ্ঠন আর ক্রম হচ্ছে অন্তরাল। সীতা-সাবিত্রী আর এখন আদর্শস্থানীয়া হতে পারছেন না। কাল বদলের সংগে সংগে পালাও বদলেছে। সীতার [illegible]

পুনরুজ্জীবিত করার চেয়ে নতুনের আবাহনে থ্রীল আছে অনেক বেশি।

অবশ্য এ কথাও অস্বীকার্য এখনও এই পরিবর্তিত আদর্শ স্থায়ী আসন নিতে পারে নি বাংলার ঘরে ঘরে। অনেকদিনের মজ্জাগত কুসংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজও বাংলার বধূ বৈধব্যকে ভয় করে, পুত্র-কন্যা কামনা করে, সুগৃহিণী হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

তবে আশার কথা, কিছু সংখ্যক অতি-আধুনিকা খুলতে পেরেছেন এই কুসংস্কারের গ্রন্থি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুস্বাগত জানাচ্ছেন কন্দর্পকে।···

নৃত্যের আসরে অবতীর্ণা হতে অবগুণ্ঠন কি ভাবে অবলুণ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন জানিয়ে দিচ্ছেন বিভক্ত বাংলাকে।···

পুরাকাল অভিসারে নীলাম্বরীর কদর ছিল। এখন সন্তাই সার, সুতরাং অভিসারের আদর আর নীলাম্বরীর কদর দুই হতমান। ম্যাচিংয়ের খাতিরে সবুজ বসন ও সবুজ ভূষণে সুসজ্জিতা প্রিয়ার সবুজ টিপ, সবুজ নখ ও সবুজ ওষ্ঠ দেখে বিষক্রিয়ার ভয় জাগলে নায়কের অচিরাৎ নায়কত্ব ঘচে যাবারই সম্ভাবনা। মঙ্গলের প্রতিভূ লাল রং আজ নখরে-প্রখরে রক্তলিপ্ত করে তুলেছে মেয়েদের।

> 'বলে দে আমায় কি করিব সাজ,
> কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
> পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরণের বাস॥'

এ প্রশ্ন নারীর চিরকালের। তবে কাব্যে আর বাস্তবে কিছু তফাৎ আছে। কোন তরুণী এ হেন অবস্থায় এমত সমস্যায় মাকে এই প্রশ্ন করে নি বা করবে না। এ প্রশ্ন সে করে নিজেকে, অথবা কোন সমসাময়িকাকে করলেও করতে পারে—কিন্তু ভুলেও কোন পূর্ব বা পরবর্তী তরুণীর কাছে সে মেলে ধরবে না এই জিজ্ঞাসা। প্রীতি দিনটাই আজ এই 'আজ' দিয়েই গাঁথা আধুনিককাল। এ প্রস্থনায় অচল কালের গত বা আগামী রূপ। তাই কোন কালেই আধুনিকার সাজসজ্জায় উপদেষ্টামণ্ডলীতে ডাক পড়বে না কোন বিগত বা অনাগত কালের তরুণীর।

ইতিহাস আছে সাম্রাজ্যের, দেশের, জাতির। কিন্তু মানুষের কথায় ইতি টেনেছে ইতিহাস। সুদক্ষ হাতে লিখে চলেছে সে সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার, দেশের ক্রমোন্নয়ন আর জাতির ক্রমবিবর্তনের কথা। উৎসাহী পাঠক তারই ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে ফেরে নিজের সমগোত্রীয় মানুষকে। সত্যের ধারাবিবরণীতে মিলিয়ে দিতে চায় কল্পনার ফল্গুধারা। ঐতিহাসিকেরা প্রতিবাদ করেন ওই সব ভিত্তিহীন কল্পনায়। কিন্তু মানুষ বুঝে নেয় এই সত্য—ইতিহাসের চেয়ে বেশি সত্য।

সেই সত্যের অনুরোধে, ইতিহাসের নজীর ছাড়াই বলা যায়—আদিম যুগে, যখন কেবলমাত্র বৃক্ষ-বল্কল আর পশুচর্মই ছিল রমণী দেহের আবরণী, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সকল মা তাঁদের মেয়েকে আধুনিকা নামে দোষারোপ করেছেন। মেয়েরাও মাকে পুরানো জেনে চেয়েছেন আধেক আঁখির কোণে। আজকের যে অতি-আধুনিক। উন্মুক্তকটি আর আকাশমুখী কবরীতে সুসজ্জিতা তিনিও সুদূর ভবিষ্যতে মিলবেন প্রাচীনাদের দলে। কুঞ্চিত নাসিকায় সমালোচনায়

মেতে উঠবেন তদানীন্তন আধুনিকাদের নিরাবরণতার আর প্রসাধন-প্রিয়তায়।

কিন্তু এ আজকের কথা—নয় অতীত বা ভবিষ্যতের। আজকের নায়িকা ঐ উন্মুক্ত কটি, অনাবৃত বাহু, আবদ্ধ কর্ণভূষণশোভিতা সুন্দরী। অনভিজ্ঞজন যাঁর মাথার খোঁপার মধ্যে ঘটি-বাটি, ঝুড়ি-চুপড়ির অন্বেষণ করেন, যাঁর পাখীর বাসাসদৃশ কেশে আর তির্যক ভঙ্গিমায় আঁকা ভ্রূযুগলে হলিউডের ছোঁয়াচ, টলিউড ছায়া ফেলেছে যাঁর অকলে-অঙ্গনে। বিখ্যাত চিত্রতারকাকে চিত্রিত করেছেন যিনি চলনে আর বলনে—যাঁকে বাঙালী বলে হঠাৎ প্রত্যয় হয় না।

আমাদের লক্ষ্মীরা এবার আপনাদেরও লক্ষ্যগোচর হয়েছেন আশা করি। তালিকার দৈর্ঘ্য আরও দীর্ঘতর না করলেও আজকের নায়িকাকে চিনতে আপনার অসুবিধা হবে না।

বর্তমান কাল যে কিসের যুগ তা দিয়ে নানা জনের নানা মত। তা সে বিজ্ঞানেরই হোক্ আর বিজ্ঞাপনেরই হোক্, রকেটের হোক্ আর রক্‌ফেলোদের হোক্, মানুষ বা মনুষ্যত্বের যে নয় তা প্রায় অবিসংবাদী সত্য। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল বিজ্ঞানের। লাগিয়েছিল তাকে নিজের নানান কাজে নানান সেবায়। সেই বিজ্ঞানেরই সেবক আজ মানুষ—তারই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সে বাঁচে-মরে, হাসে-কাঁদে। মানুষের ভোগের জন্যই যা রূপ পেয়েছিল, তারই ভোগ্য সে আজ। বিরাট এই পৃথিবীর জল-স্থল-নভস্থল যে দিল সীমিত গণ্ডির বাঁধনে বেঁধে, যে নিয়ে গেল গ্রহগ্রহান্তে—সেই ধ্বংস করল কত জনবহুল জনপদ, উড়িয়ে দিল কত সভ্যতার নিশানা, পুড়িয়ে দিল কত তার নিজেরই সমৃদ্ধির নিদর্শন।

নারীও তেমনি একদিন নিজেকে সাজাবার জন্যে শরণ নিয়েছিল প্রসাধন কলার। মনোনিবেশ করেছিল রূপচর্চায়। আজ নারীকে ছাড়িয়ে গেছে তার সাজসজ্জা—তার ফ্যাশান। নিজেকে মোহিনী করবার তাগিদে একদা রমণী মেখেছিল যে রূপটান, সেই রূপটানের মোহ টান ধরিয়েছে তার রূপে। নয়নকে দীর্ঘতর দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হত যে কাজল—তা আজ চোখ ছাড়িয়ে আরও খানিক বিস্তার করেছে তার রাজত্ব। সুউচ্চ খোঁপার নীচে অর্ধেক ঢাকা যে মুখখানি, তা আজ দর্শকের নজর এড়িয়ে গেলে দোষ দেওয়া চলে না দর্শকের দৃষ্টিশক্তির। বিবর্ণ লিপষ্টিকে, সুতীক্ষ্ণ রূপালী নখে, স্খলিত আঁচলের আড়ালে হারিয়ে গেছে বাংলার কালো মেয়ে।

সব দেশেরই রঙিন আকর্ষণ মেয়েরা। তাদের পরিধেয়ের রং রাঙিয়ে তোলে অনুরাগীর অন্তর। তবে সাবেক কালে রংগুলো ছিল স্ব স্ব প্রধান। লাল ছিল লাল আর নীল ছিল নীল। অনেকদিন ধরে রং নিয়েও চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাই আজ আর হঠাৎ বলে ফেলা সম্ভব নয়—গোলাপী, সবুজ, হলুদ। বিশেষণের ভাঁড়ার উজাড় করে যোগান দিতে হবে কি গোলাপী, কেমন সবুজ, কি রকম হলুদ। বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে কি রংয়েতে কোন রং মিলিয়ে কিসের একটু ছোঁয়া লাগালে হতে পারে ওই আধুনিক 'কালার'। আধুনিকতম সাংবাদিকের ভাষায় 'কালার'।

গত শতকের গোড়ার দিকে, যখন বাংলার যুবসমাজ চলনে-বলনে, আচারে-আচরণে অনুকরণ করতেন তৎকালীন রাজার জাতের, তখনও পিছিয়ে ছিলেন না বঙ্গললনারা। শোনা যায়, কলকাতার কত উঁচু গোড়ালীর পাদুকা পায়ে নিয়মিত অনুশীলন করতেন 'ওয়াকিং'। আজও বোধ করি ব্যাহত হয় নি বাংলার মেয়েদের ওই নিয়মিত চলন-চর্চা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে। তবে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে। লক্ষ্য এখন অধে নয়, উর্ধ্বে। গোড়ার দিকে গোড়ালীর (ছিল) উচ্চতা ছিল দু' ইঞ্চি, তারপর আড়াই তিন। সাড়ে তিনে অভ্যস্ত হলে খুলে ফেলতেন তাঁরা বদ্ধ দুয়ার। এখন নাকি অভ্যাস করতে হয় স্কন্ধচ্যুত আঁচল কেমন করে বাহুলগ্ন হয়ে ঝুলবে—প্রথমে দু'ইঞ্চি, তারপর আড়াই, তিন, সাড়ে তিন।···মন্থরাগমনা ও গজেন্দ্রগামিনীদের ভাঁজ করা বামবাহু অনুভব করবে না কোন ব্যথা-বেদনা।

মহাকবির কালে বিশ্বকবির কালের স্বাদগন্ধের অভাব ঘটেছে বলে দুঃখ করেছেন বিশ্বকবি। নিজের কালের জুতামোজা পরা, সোজা সোজা চলা, অন্তদেশী চালে কথাবার্তা বলা আধুনিকাদের নিয়ে গর্বে নেচে বেড়াবার কথাও ঘোষণা করেছেন সানন্দে। বলেছেন—

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।
দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি এই আধুনিক বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তাঁর ছবি।

কিন্তু বিশ্বকবিই কি কল্পনা করেছিলেন আজকের 'এই আধুনিক বিনোদিনী'দের? যাঁরা রূপকথার সেই জেলের মেয়ের মতই 'আছে কিন্তু নেই' আবরণে ঢেকেছেন নিজেদের দেহ। হাসছেন সলজ্জ সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে। পথে চলতে ধাক্কা দিচ্ছেন দু'চারজন ভালো মানুষ পথচারীকে। হোটেলে বসছেন কোল্ড, সফ্‌ট আর লেডিস ড্রিঙ্ক ছাড়াও হুইস্কি আর জিন নিয়ে। বিশেষ দ্বিপ্রহর কাটাচ্ছেন ঘোড়দৌড়ের উত্তেজনায়। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত খেলছেন 'হাউসি' কিম্বা 'রানিং ফ্লাস' নিমীলিত নেত্রে। যামিনী অতিক্রান্ত করছেন ক্যাবারেতে। অবশেষে হয়ে চলেছেন পানশালার ভাল্গি স্রোতে জোড়ায় জোড়ায় যুগলনৃত্যে যোগদান করতে।···

আমরা অকবিজন, বংগবালার এরূপ কবিগুরুকে দেখতে হয় নি ভেবে স্বস্তি পাই। কবি অবলাকে নিজের ভাগ্য জয় করবার কথাই বলেছিলেন—তবে জয়যাত্রার পথটা যে এই হবে সেটা বোধ হয় কল্পনাও করেন নি। যদিও না ভেবে, তবু বাংলার অবলাকুলই নির্দেশ করেছেন এই পথের। অনভ্যাসে ভুলেছেন নিজেদের মৌলিকত্ব। সাড়ম্বরে মেতেছেন অনুকরণ প্রতিযোগিতায়। ভিনদেশী বলে কে কত পটু প্রমাণ করতে বিস্মৃত হয়েছেন স্বদেশ আর স্বজাতির ঐতিহ্য।

দুর্ভাগ্য, সকলের মত হতে গিয়ে নিজের মত হওয়া আর হয়ে উঠল না বাংলার কমনীয়া রমণীদের।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

প্রথম শীক্ষাবল্যধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় অনুবাক

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্।

গুরু ও শিষ্য আমাদের যশ,
একসাথে যাক্ বিস্তারি।
সমগৌরবে জ্বলুক ব্রহ্মতেজ।
'সংহিতা', এই শব্দে নিহিত উপনিষদের তত্ত্ব
বলব এখন —(শোন !)
পঞ্চবিষয়ে নিবদ্ধ এর জ্ঞান।
ধরণীতে আর অন্তরীক্ষে, বিদ্যায় আর সন্তানে,
আপন দেহের অন্তরে আছে, এই উপাসনা দর্শন।
নাম এর 'মহাসংহিতা'।

তৃতীয় অনুবাকের প্রথম দিকে গুরু ও শিষ্য উভয়ের জন্যেই তুল্য যশ, তুল্য ব্রহ্মতেজ প্রার্থনা করেছেন ঋষি,—'সহ নৌ যশঃ,—সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্।'

উপনিষদের মধ্যে গুরু ও শিষ্যের সমপ্রাধান্য বারবার ফুটে উঠেছে। শিক্ষার বিস্তারের জন্যে, জ্ঞানের বিকাশের জন্যে গুরু ও শিষ্যের সমান প্রয়োজন :—উভয়ের একাগ্র সাধনায়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পূর্ণ সহযোগিতায় জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হয়।

অনেকের ধারণা আছে প্রাচীন ভারতে শিষ্যের স্থান অনেক নীচে। কিন্তু উপনিষদ বারবার বলেছেন, গুরু ও শিষ্যের সমান দায়িত্ব, সমান অধিকার। শিষ্য পণ্ডিত হলে গুরুর দায়িত্ব বাড়ে। আবার গুরুদত্ত বিদ্যাকে শিষ্য পরম্পরাক্রমে বহন করে নিয়ে ভাবীকালের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, শিষ্যেরও এমন শক্তি থাকা চাই। না হলে নিষ্ফলা হবে গুরুর বিদ্যা। তাই গুরু ও শিষ্য উভয়ে-উভয়ের পরিপুরক। তাই হে প্রভু,—আমাকে রক্ষা কর, আমার গুরুকে রক্ষা কর,—'তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু'। তাই 'মা বিদ্বিষাবহৈ' আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট না হই। আমরা বিদ্বিষ্ট হলে তমসা ও জড়তার মধ্যে জ্ঞান বিলুপ্ত হবে,—মনুষ্যত্ব ধ্বংস হবে।

উপনিষদের আত্মিক দিকটার দিকেই সাধারণত নজর দেওয়া হয়ে থাকে,—কিন্তু উপনিষদের মধ্যে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সে যুগের সমাজ স্বাস্থ্য ও চলচ্ছক্তি প্রদান করেছিলো,—তা আমাদের তেমন করে নজরে পড়তে চায় না।

শিষ্যের উপরে গুরুর কর্তৃত্ব ছিলো, শাসন ছিলো,—আধুনিক ভাষায় যার নাম 'ডিসিপ্লিন,' কিন্তু শিষ্য গুরুর চেয়ে হীন ছিল না। গুরু শিষ্যকে বিকশিত করেন,—শিষ্যও গুরুকে প্রকাশিত করেন। দু'য়ের বিরোধ ঘটলে, অবরুদ্ধ হয় জ্ঞান।

শিক্ষাবিধির পরে উপাসনার কথা বলছেন ঋষি। শুধু পঠন-পাঠনের দ্বারাই মন্ত্রের সত্য অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তার জন্যে প্রয়োজন উপাসনার। কিন্তু উপাসনা বলতে' ঠিক কি বুঝায় আমরা হয়ত তা ভালো করে বুঝতেই পারব না। চিত্তের একাগ্র অভিনিবেশকেই বোধ হয় উপাসনা বলা হয়।

ঋষি বললেন,—ধর, 'সংহিতা,' এই শব্দকে উপাসনা করবে। ওই নামকে অবলম্বন করে পাঁচ রকম ভাবে উপাসনা করতে হবে। প্রথমে অধিলোক অর্থাৎ এই পার্থিব (পৃথিবীর) দর্শন বলা হচ্ছে ;—তা'হলে সংহিতা এই পদ ব প্রথম ভাগকে পৃথিবী ও উত্তর ভাগকে অন্তরীক্ষ কল্পনা করে ধ্যান করতে হবে।

এর মাঝখানে, যেখা ন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের মিলন হয়েছে, তাকে আকাশ বা সন্ধিরূপে ধ্যান করতে হবে ;—এবং উভয়ের মিলন-ঘটক যে বায়ু, অথবা নিঃশ্বাস তাকে সন্ধানরূপে কল্পনা করবে।

এইরকম ভাবে অধিজ্যোতিষ, অধিপ্রজ, অধিবিদ্য ও অধ্যাত্ম এই পাঁচ রকম উপাসনা বিধিকে মহাসংহিতা বলে।

'অধিঃজ্যোতিষম্' উপাসনায়—অগ্নিকে পূর্বরূপ আদিত্যকে উত্তররূপ ও জলকে সন্ধিরূপে ভাবতে হবে। এ দু'য়ের মিলন-ঘটক সন্ধান হোল বিদ্যুৎ। অধিবিদ্যায়—আচার্য পূর্বরূপ,—শিষ্য উত্তররূপ ; বিদ্যা হোল সন্ধি আর আচার্যের দ্বারা কথিত বাক্যরাশি হোল সন্ধান। অধিপ্রজ—মাতা পূর্বরূপ,—পিতা উত্তররূপ ; সন্তান সন্ধি, —এবং জননক্রিয়া সন্ধান। অধ্যাত্ম—অর্থাৎ দেহসম্বন্ধীয় উপাসনা।

নিম্নহনু পূর্বরূপ ও উর্ধ্বহনু উত্তররূপ, বাক্ হোল সন্ধি, আর জিহ্বা সন্ধান। এই পঞ্চধা মহাসংহিতার উপাসনা ফলকামীর ফললাভে ও মুক্তিকামীর জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। কিন্তু কি করে করে ? আধুনিক মানুষের প্রশ্ন থামতে চায় না। উত্তর কোনদিন পাওয়া যাবে কি না কে জানে ?—তবে উপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বাড়ে ; আর তারই ফলে হয়ত কর্মে অধিক মনোযোগ ও জ্ঞানে অধিক সাধনাযোগ করা সম্ভব হয়।

চতুর্থোঽনুবাক

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। সমেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু ; অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মধয়া পিহিতঃ শ্রুতং মে গোপায়।" ১।৪।১

সর্ববেদের প্রধান সর্বশব্দে ব্যপ্তরূপ, অমৃত স্বরূপ বেদছন্দের অন্তর হতে জাত, মর্মনিহিত সার ;—

ইন্দ্রস্বরূপ সেই ওঙ্কার মেধাশক্তিতে সফল করুন আমারে।
দেহ যেন মম হয় সক্ষম অমৃত ধারণ করিতে
রসনা আমার হোক মধুময়ী,
কানে শুনি যেন আমি,
ব্রহ্মের বহু বাণী।
কোষে ঢাকা অসি যেমন, তেমনি তব আবরণে,
ব্রহ্ম রয়েছে ঢাকা।

তুমিও আবার আবৃত রয়েছ।
সাধারণ মেধাবুদ্ধিতে।
হে প্রণব, তুমি স্মরণে আমার।
রক্ষা করিও শ্রবণলব্ধ জ্ঞান ॥

চতুর্থোঽনুবাকে প্রণবের স্তুতিগান করছেন ঋষি। ওঙ্কারধ্বনি সকল শব্দেরই মূলে। তাই ওঙ্কারকে বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বশব্দরূপ বলেছেন। বেদের জ্ঞান ছন্দ তথা শব্দের মাধ্যমেই প্রকাশিত। বেদের শব্দরাশির মূলে আছে এই ওঙ্কার! তাই ওঁ অথবা প্রণব বেদের সারভূত এবং সর্ববেদের প্রধান। শব্দের সার তাই জ্ঞানের তথা বেদের প্রতীক। চিন্তা ও মেধার মূলেও প্রণব।

তাই হে প্রণব, আমাকে মেধা ও বুদ্ধি দান কর! প্রজ্ঞাই সবচেয়ে বড় শক্তি। আমি যেন প্রজ্ঞাবলে বলীয়ান হতে পারি। আর সেই বলশালী চিত্তের যোগ্য হয় যেন আমার দেহ। অর্থাৎ আমার দেহ যেন সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে, সেই চিরজ্যোতির্ময়কে চিত্তে ধারণ করতে সক্ষম হয়।

'আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ে প্রদীপ কর।'

আমার রসনা মধুরভাষিণী হোক। কানেও যেন আমি বহু জ্ঞানের কথা—ব্রহ্মের কথা শুনতে পাই।

খাপে ঢাকা তরোয়ালের মত জ্ঞানাবরণে ঢাকা আছেন ব্রহ্ম। কোষে ঢাকা অসিকে লোকে অসিই বলে। তাই ব্রহ্মাবরণরূপী জ্ঞানকেও ব্রহ্ম বলা চলে। তাই 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম।' তাই জ্ঞান প্রতীক ওঁকার ব্রহ্ম প্রতীকও বটে।

বুদ্ধিগুহার মর্মে, উপলব্ধির নিগূঢ় কেন্দ্রে, যে প্রজ্ঞা, যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে ওঙ্কারস্বরূপ সেই জ্ঞান আবার সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের (শব্দার্থের উপরতলায় যাদের বাস) দ্বারা আবৃত।

অর্থাৎ নিগূঢ় গভীর প্রজ্ঞালোক এবং সাধারণ সব বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্তই সেই এক প্রণবের মধ্যে বিধৃত। তাই ওগো প্রণব, তুমি আমার মেধায়, স্মৃতিশক্তিতে কানে শোনা' সব জ্ঞান রক্ষা কোর।

অর্থাৎ গুরুর কাছ থেকে যে বিদ্যা গ্রহণ করেছি শ্রবণে, (সমগ্র বেদ কানে শুনেই শিখতে হোত। তাই বেদের নাম শ্রুতি। লিখন ছিল একটা বিশিষ্ট শিল্পমাত্র।) তা যেন আমার মনে থাকে; অর্থাৎ শ্রুতি যেন স্মৃতিতে থাকে।

এর পরের দুই অধ্যায়ে ওঁকারোপাসনার দ্বারা শ্রীসম্পদ প্রার্থনা করেছেন ঋষি।

১।৪।২ আবহন্তী বিতন্বানা কুর্বাণাঽচীরমাত্মনঃ বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। ১।৪২।

১।৪।৩ যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ানবস্য সোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। তস্মিন সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়িমৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশিতোঽসি প্র মা ভাহি প্র মাপদ্যস্ব। ১।৪।৩

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ

জ্ঞান দান করে, হে প্রণব, তুমি শ্রী দাও, আমাকে শ্রী দাও। যে শ্রী চিরদিন আমারি জন্যে পশুপরিবৃতা হয়ে আনবেন বহু ধন;—
অন্ন, পানীয়, বস্ত্র এবং বিবিধ বস্তু যত।
চিরকাল ঐ সব দিয়ে সম্পদবান করে সুখে রাখবেন আমাকে।
বিদ্বান আর ব্রহ্মচারীরা ঘিরে থাকে যেন আমাকে।
আমি যেন হই চিরযশস্বী, ধনীদেরও মাঝে শ্রেষ্ঠ।
হে ব্রহ্মকোশ, প্রণব, তোমার স্বরূপে যেন গো আমি
বিলীন হইয়া যাই।
তোমা মাঝে হোক আমার প্রবেশ।
তুমি এস ঢুকে আমাতে।
তোমাতে আমাতে মহা আনন্দে একসাথে মিলে যাই।
বহুশাখাময়ী, নদীর মতন, বিচিত্র তব ধারা,—
তোমার মাঝারে ডুবাব আমার যত আছে পাপ তাপ।
জলরাশি যথা নীচে বয়ে যায়,
মাস ধেয়ে আসে বছরে,—
ব্রহ্মচারীরা তেমনি করেই
আসুন আমার কাছে।
আমার ক্ষুদ্র বদ্ধ প্রাণের যত ক্ষোভ যত গ্লানি,
তোমার মাঝারে, হে শুদ্ধজ্ঞান,
হোক নিমজ্জমান।

* * *

এই অধ্যায়গুলি থেকে এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তখনকার যুগে আকাঙ্ক্ষার তেজ খুব তীব্র এবং স্পষ্ট ছিল। ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট অভিলাষ এবং দ্বিধার স্থান এতে নেই। যা চাই, তা আমি খুব ভালো করেই জানি, আর তা চাইতে আমার লেশমাত্র সঙ্কোচ নেই।

আমি তো অন্যায় কিছু চাই না—আমার প্রার্থনার মধ্যে ক্লেদাক্ত কামনার স্থান নেই। আমি সত্যপথেই বিশ্বের সমস্ত আনন্দভোগ করতে চাই।

এই বিরাট চাওয়ার সঙ্গে পরবর্তী যুগের দৈন্যের সাধনাকে যেন ঠিকমত মেলানো যায় না,—যে সাধনায় বলেছিল,—

'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'

যারা বলেছিল,—'ভূমৈবসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'—এ তাদের চাওয়া, সর্বপ্লাবী। আমি কিছুই ছাড়ি না—ধন, জন, মান, খ্যাতি, নাম, যশ—চারিদিক থেকে বিদ্যার্থীরা আমার কাছে ছুটে আসুক। আমি সকল ঐশ্বর্য ভোগ করব।

'আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন
আকুল,—
এমন সকল বাড়া এমন বিপুল,—
এমন প্রবল বিশ্বে, কিছু নাহি আর।'

কিন্তু এইটুকুই সব নয়। এই সমস্তকে পরিব্যাপ্ত করে জ্বলে উঠুক আমার জ্ঞান। সকল লৌকিক বিষয়ে আমার জ্ঞান নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হোক। আর আমার অন্তরের গুহায়, বুদ্ধির নিগূঢ় গভীরে প্রতিষ্ঠিত যে প্রজ্ঞা, তা আমার চেতনায় মধ্যে প্রবুদ্ধ হোক। আমি

জ্ঞানালোকে উদ্বুদ্ধ হতে চাই ;—প্রজ্ঞার মধ্যে বাঁচতে চাই। প্রজ্ঞাই আমার ব্রহ্ম।

চতুর্থোঽনুবাকের ঋষি কবি প্রণবের ভক্ত, হিরণ্যগর্ভের সাধক। য অজস্র অপরিমিত প্রাণপ্রাচুর্য অথবা যে নিগূঢ় গভীর প্রাণতত্ত্ব, সৃষ্টিকে বিচিত্ররূপে লীলায়িত করেছে, ইনি তারই উপাসক। ঈশ্বর-সাধক ইনি সকল ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান, সকল বিভূতিতে বিভূতিবান হতে চান।

আমাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ এই কবির উত্তরসাধক—হিরণ্যগর্ভের উপাসক। তিনি বারবার মুক্তকণ্ঠে বলেছেন,—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি,
সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

বলেছেন,—

'যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে।
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,—
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।'

পঞ্চম হতে অষ্টম অনুবাক পর্যন্ত উপাসনার আরো নানারকম বিধির কথা বলা হয়েছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (স্বর্গ) ও মহঃ এই চারিটি ব্যাহৃত মন্ত্রের বিচিত্র উপাসনা।

উপাসনার দ্বারা ফললাভ হয় এই কথা শুনে যদি কেউ মনে করে যে কর্মের আর প্রয়োজন নেই—তাই নবম অনুবাকে শিষ্যকে আদেশ করা হচ্ছে।

নবম অনুবাক

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ সত্যঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। শমশ্চ···চ। অগ্নয়শ্চ···চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ···চ। অতিথয়শ্চ···চ। প্রজাতিশ্চ···চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপো ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদগল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥

ঋতকে জানবে ও স্বাধ্যায় প্রবচনে যুক্ত থাকবে। সত্যকে জানবে ও স্বাধ্যায় প্রবচনে যুক্ত থাকবে। তপ, দম ও শমের সাধনা করবে এবং স্বাধ্যায় প্রবচনে যুক্ত থাকবে। অগ্নি আধান করবে, ও, স্বাধ্যায় প্রবচনে যুক্ত থাকবে। অগ্নিহোত্র সম্পাদন করবে, অতিথির পূজা করবে, মানুষের যা যা করণীয় সমস্ত করবে এবং স্বাধ্যায় প্রবচনে যুক্ত থাকবে। পত্নী সহবাস করবে ও পৌত্রের জন্যে আপন পুত্রকে গার্হস্থ্যে নিবেশিত করবে এবং স্বাধ্যায় প্রবচনে যুক্ত থাকবে।

সত্যবচা ঋষি বলেন,—সত্যই একমাত্র অনুষ্ঠেয়। পুরুশিষ্টিপুত্র তপোনিত্য বলেন,—তপস্যাই কর্তব্য। মুদগলপুত্র 'নাকে'র মত,—স্বাধ্যায় প্রবচনই একমাত্র কর্তব্য। কারণ সেই তো একমাত্র তপস্যা।

* * *

স্বাধ্যায় প্রবচন—শাস্ত্রপাঠ ও অধ্যাপনা।

স্বাধ্যায়—বেদ অধ্যয়ন।

প্রবচন—শাস্ত্র কথন।

অর্থাৎ নিত্য পাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, নিত্য জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানানুশীলন।

এই বিষয়টির উপরেই সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ উপনিষদের ঋষিরা বারবার বলেছেন, অজ্ঞানই সব পাপের মূল। অজ্ঞাত পাপকর্মের ফলও আমাদের সমান ভাবেই ভোগ করতে হয়। জ্ঞাত হলেই তার মধ্যে অনেকখানি আলো এসে পৌছায়। সেই জ্ঞানশলাকা দিয়ে তাকে হয়ত খানিকটা পরাহত করা যায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলে বিস্মৃত তথা অজ্ঞাত পাপবোধ মনের তলায় নিম্ন চেতনায় নিমজ্জিত থাকে। তাকে যদি চেতনার উপরতলায় অর্থাৎ জ্ঞানের সীমানায় নিয়ে আসা যায়, তবে সেই প্রকাশনাই তাকে মুক্তি দেয়।

সে যুগের ঋষিরা মনে করতেন, জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই জ্ঞানানুশীলন প্রয়োজন। জীবনকে সুন্দর করে তোলবার জন্যে ঋত চাই,—সত্য চাই, শ্রম চাই, সংযম চাই ও শান্তি চাই। বাস্তব এই সংসারের জন্যে যা যা প্রয়োজন, মানুষের যা যা কর্তব্য, সমস্ত করবে ;—কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রত্যহ শুধু জ্ঞানানুশীলন নয়,—জ্ঞানালোচনাও করবে। নিজের জ্ঞানকে মার্জিত করবে এবং অপরের সঙ্গে তার ব্যবহার প্রচলিত রাখবে।

দশম অনুবাক

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্ব পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম সুমেধা অমৃতোঽক্ষিতঃ ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥

মহাসংসার বৃক্ষের আমি মর্মনিহিত প্রেরণা।
গিরিশৃঙ্গের মত উন্নত আমার খ্যাতি ও কীর্তি।
ব্রহ্ম আমার দ্বিতীয়বিহীন অনাদি কারণ সত্তা।
আমারো মধ্যে অমৃত উৎস আছে সূর্যের মত।
ধনের মতন দীপ্ত আমার দীপ্তি।
আমি পেয়েছি ব্রহ্মধন।
আমার চেতনে (বুদ্ধি) ও মেধা নিত্য প্রকাশমান।
অমৃত সমান আনন্দ রসে চিরনিষিক্ত আমি।
বেদলাভ করে ত্রিশঙ্কু ঋষি বলেছিলো এই কথা।

* * *

জৈনগ্রন্থে এক ত্রিশঙ্কু ঋষির নাম পাওয়া যায়। তিনি আর ইনি কি অভিন্ন, এখানে বেদ কথাটি জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই বেদজ্ঞান, বোধিজ্ঞান ও কৈবল্য কি একই অর্থের তিনটি অভিব্যক্তি? তিন মানসযুগের সাধনযশ?

পরমজ্ঞান বা ঈশ্বরোপলব্ধি হলে সব দেশের সব কালের মহামানবের মধ্যে একই ধরণের তেজ, দীপ্তি ও নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা যায়।

এমনি আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত হয়ে, একদিন জেরুজালেমের তরুণ সন্ন্যাসী দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'তোমরা সবাই আমাকে অনুসরণ কর—আমি তোমাদের মুক্তি দেব।'

মৃগদাবের কাননে এসে বুদ্ধ পঞ্চশিষ্যকে ডেকে বললেন,—'তোমরা আমাকে নিঃসঙ্কোচে প্রণাম করে গুরুপদে বরণ কর! আমি তোমাদের নির্বাণের পথ বলে দেব।'

ত্রিশঙ্কু ঋষি বললেন,—'আমার দীপ্তি সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান,—আমি ব্রহ্মধনের অধিকারী।'

এই বিশ্বাস বলে গরীয়সী হয়ে একদা ঋগ্বেদের নারী ঋষি অম্ভৃণকন্যা বাক্‌ একদা নিজের মধ্যে বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে প্রত্যক্ষ করে প্রসিদ্ধ দেবীসূক্ত উচ্চারণ করেছিলেন। এই ধরণের যত কথা এ পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যে উক্ত হয়েছে তার মধ্যে বোধ হয় এই নারীকণ্ঠই প্রথম স্থান নিতে পারে! এই প্রসঙ্গে সেই মহীয়সীর নাম স্মরণ না করে পারা গেল না।

উপনিষদেরও বহু আগে এই নারী আপনার মধ্যে পরম সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন, আত্মার মধ্যে ব্রহ্মকে আর সে কথা প্রবলকণ্ঠে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি।

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহং
আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ'

অনুবাদিকা—চিত্রিতা দেবী

গতি

ভক্তি দেবী

কেরোসিন চিমনির আলো
বাতাসেতে কেঁপে কেঁপে জলে,
পোকাগুলো উড়ে উড়ে আসে
কথা কিছু কানে কানে বলে?
আলোর শিখাটা যেন মন,
পোকাগুলো টুকরো ভাবনা—
চলে যায় ফের ঘুরে আসে,
জ্বলে মরে তবুও ছাড়ে না।

বাতাসটা মিছে দেয় দোলা
মন আর দোলনায় দোলে না।
অকারণে কেঁপে ওঠে শুধু
হাসিভরা চোখ বুঝি খোলে না।

চিমনিটা ভুসো কালি পড়া,
কালো কালো ছায়া সারা দেয়ালে,
অদ্ভুত! এ মিছিল চলেছে—
আপনার অপরূপ খেয়ালে।
দেয়ালটা যদি হয় এ জীবন,
পরিচিত সমাবেশ ছায়াতে—
যে যাহার স্থান কালে চলেছে,
ফেলে আসা ভালবাসা মায়াতে।

চিমনিটা চারপাশে বাধা,
জ্বালা পোড়া মন রাখে বাঁচিয়ে,—
বাতাসটা জীবনের ছন্দ—
মন চায় কাছে যেতে পালিয়ে।

তাই বলি, মন তুই শোন
চিমনিটা ফাটিয়ে দে চুরমার
বাতাসের দাপটেতে আলোটা
নিভে যাক্‌, হয়ে যাক্‌ আঁধিয়ার।

মৃত্যু যে আসবেই নিশ্চিত
এঁদো পড়া বেঁচে থাকা মিথ্যে
মনে রেখো জীবনের ছন্দে
পৃথিবীটা ঘুরে চলে বৃত্তে।

● ● ●

মায়া-মরীচিকা

সুধীর বেরা

জীবন দুর্ভোগে ভরা
নিত্য নিত্য পীড়ার যন্ত্রণা
ক্ষয়ক্ষতি পুঞ্জীভূত
দুর্বিষহ বেদনার ভারে।
বারে বারে
বৃথা ফিরেছিনু আলোর সন্ধানে—
সে আলো জ্বলে নি আর,
অন্ধকার হয় শুধু গাঢ় হ'তে গাঢ়।

জীবনের বঞ্চনার দায়
বেড়ে চলে দিনে দিনে।
বেঁধেছিনু একখানি ঘর
মায়া দিয়ে গড়া—
বারে বারে ঝোড়ো হাওয়া
উন্মত্ত আক্রোশে
চেয়েছে তা ধূলাতে লুটাতে॥

এখন বয়স গেছে বেড়ে,
ক্ষত আর সহজে সারে না।
এখন উদাসী হাওয়া—
বিষণ্ণতার জাগায় মর্মর।
অর্থহীন জীবনের বোঝা
জীবন মরুর পথে
অকারণে
ধুঁকে ধুঁকে টেনে টেনে চলা।
পথেই পথের শেষ—
ঘর শুধু মায়া-মরীচিকা॥

পত্র সাহিত্যে বিবেকানন্দ

আমেরিকার মেয়েদের কথা ভেবে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'এদেশের বরফ যেমনি সাদা তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন তেমনি পবিত্র।' সভ্যতায় এশিয়া উচ্চাসন অধিকার করেছিল। ইউরোপ করেছিল পুরুষের উন্নতি বিধান। আর আমেরিকা করল নারী ও জনসাধারণের মুক্তি সাধন। বাস্তবিক আমেরিকার নারীর ন্যায় নারী পৃথিবীতে বিরল। তারা আকাশের পাখীর মতো স্বচ্ছ, স্বাধীন। সমগ্র সমাজ নারীদের নির্ভর করে কেমন সুন্দর চালিত হচ্ছে বিশ্বাস করা ভার। এখানকার নারী, পুরুষদের তুলনায় শিক্ষিতা ও উন্নতা। তাই যে কোন সভায় শতকরা নব্বই জনেরও বেশি মেয়েদের দেখা যাবে। পুরুষরা অর্থের দাসত্ব করে। নারীরা সময় পেলেই উন্নতি চিন্তায় চিন্তিত ও সেই সাথে কর্মে ব্রতী। তবে উচ্চ প্রতিভাবানদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ।

পাশ্চাত্যের সমাজ উচ্চাদর্শের হলেও ধর্মে এরা পবিত্র হতে পারে নি। ধর্মের সার অংশ হৃদয়গ্রাহী করতে এদের বহু বহু সময়ের প্রয়োজন। যদি কোন ধর্মে অর্থ রূপ ও সেই সাথে দীর্ঘজীবন লাভের আশা থাকে তবেই তারা সেই ধর্মের পিছনে ছুটতে রাজি আছে। এরা ধর্ম বলতে এর বেশি কিছু বোঝে না। তাই ওদের ধর্মটা ছ্যাকড়া গাড়িরও অধম হয়ে পড়েছে। সমাজের এই পঙ্গু অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে এরা ভারতের ঐ অধ্যাত্মবোধকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। 'ইহারা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ আধুনিক বিজ্ঞানধর্মের উপর যে পুন: পুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছে, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে।' কিন্তু এ কথা অন্তর দিয়ে বোঝবার সে শক্তি তাদের কোথায়? তবু আনন্দের কথা সেই অধ্যাত্মবোধকে তারা ভাল লাগার পরম পাত্রটিতে উৎসর্গ করেছে। জাতিভেদ প্রথা এদের মধ্যে খুবই প্রবল। সে হল অর্থের ভেদাভেদ। এ ভেদ সত্যই করুণ ও জঘন্যতম। দক্ষিণের নিগ্রোদের ওপর এদের ব্যবহার অত্যন্ত পৈশাচিক, বেদনাদায়ক। সামান্য অপরাধে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিতেও এরা কসুর করে না।

এ দেশের মতো আইন-কানুন অন্য কোন দেশে নেই, আবার এরা যত কম আইনের মর্যাদা রেখে চলে অন্য কোন দেশ তত নয়। আবার মানুষের মধ্যে যা কিছু সুন্দর তাকে ফুটিয়ে তোলার আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র এই আমেরিকা। এখানের বায়ু কি সহানুভূতিপূর্ণ! ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মূল তফাৎ এই যে, পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ থাকায় সকলেই সকলের উন্নতির পথে প্রাণপণ সহায়তা করে। তাই সেখানে কৃতী পুরুষের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। সেখানে উৎসবের ক্ষেত্র বিস্তৃত। ওদের ধর্মটাও দাঁড়িয়ে আছে ঐ জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে। আর এই ভাগ্যাহত ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের অভাবে ফল দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্বামী বিবেকানন্দ

দার্শনিক জগতে হিন্দুরাই সকলের পথপ্রদর্শক। আমেরিকার ধর্মপ্রচারকদের অনেকেই সেই পুরনো মান্ধাতা আমলের যুক্তি দিয়ে সকলকে বোঝাতে চান যে, যেহেতু খৃষ্টানরা হিন্দুদের অপেক্ষা ধনবান ও শক্তিশালী সেহেতু খৃষ্টধর্ম হিন্দুধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তার উত্তরে হিন্দুরা বলেন যে, তাই তো হিন্দুধর্মটা হল ধর্ম, আর খৃষ্টধর্ম তো ধর্মই নয়। তোমাদের পশুত্বপূর্ণ রাজ্যে কেবল পাপের স্থান, আর পুণ্যের অমানুষিক নির্যাতন। জড়বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যবাসী প্রভূত উন্নতি করলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অতি শিশু। জড়বিজ্ঞান কেবলমাত্র ঐহিক উন্নতি এনে দেয়, আর অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এনে দেয় জীবনভোর চিন্তাপ্রসূত আনন্দের স্বাদ।

জড়বাদ প্রসূত নিবু'দ্ধিতার পরিণাম প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও পরিবেশে জাতিগত মৃত্যু।

এ থেকে বুঝতে পারছি যে আমাদের সমাজকে পূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হতে হলে পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থার সাথে আমাদের সেই সনাতন অধ্যাত্মবোধকে অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে লালন করতে হবে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই আদর্শ মানব সমাজ। সংযোগের সূত্র ছিন্ন হলেই সমাজ অর্ধ পঙ্গু হয়ে পড়বে। 'নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish Colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসীরা) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রাবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ' মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishmanকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট্ (Pat), তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনতে শুনতে Pat-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপনটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—'প্যাট্, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই ত' সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!' Pat ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই ত'; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।' এই হল আমেরিকার সমাজ। সেখানের মাটিতে পা পড়ামাত্র কাপুরুষও তার সেই জন্মগত ভীরুতাকে প্রিয় ভেবে কাছে টানে না, সাহসী হয়ে উঠে। এই হল এদের মাটির গুণ, আবহাওয়ার সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয়তা।

আর আমাদের ভালটা হল ঐ ধর্ম। হিন্দুধর্মের ন্যায় এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা অন্য কোন ধর্মে প্রচারিত হয় না। আবার এই হিন্দুধর্মের জন্য পতিত ও গরীবকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয় অন্য কোন দেশের ধর্মে তা নয়। তবু হিন্দু যেন তার ধর্ম ত্যাগ না করে। বুদ্ধ থেকে রামমোহন সকলেই সেই একই ভুল করেছেন যে জাতিভেদ একটি ধর্মের বিধান। তাই তাঁরা ধর্ম এবং জাতি উভয়কে একসঙ্গে ভাঙতে চেয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হন নি। জাতি একটি সামাজিক বিধান ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এ হল পুরোহিতদের এক মনগড়া শাস্ত্রবিধান। 'আমাদের বিশ্বাস—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও একথা নাই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম বা জাতিভেদ আছে।' প্রকৃত জাতি হচ্ছে—যে মানুষ যত উচ্চাদর্শের চিন্তাধারায় চালিত সে তত বড় জাত।

পত্রাবলীর পাতা উল্টে উল্টে কখন এসে দাঁড়িয়েছিলেম শেষ পাতায় খেয়াল ছিল না। খেয়াল শেষে মনে হলো আমি যেন সব খুইয়ে কোন এক সর্বহারার দলে ভিড়ে গেছি। আজ এই প্রথম প্রাণের দুয়ারে কে যেন সংবাদ পৌঁছে দিলে যা কিছু চিরন্তন সত্য তা কালির আঁচড়েও প্রাণবন্তই থাকে। তাই বিবেকানন্দের পত্রাবলী কথা বলে। মনে হয় যেন বিদায়ী অতিথি গল্প শেষ করে সবেমাত্র যাত্রা করেছেন কোন এক দূর প্রবাসের পরবাসী সেজে। কেউ বা সিকিটা কেউ বা আধখানা কথা শেষ করার আগেই জীবনের সেই একটি মাত্র আধখানি নিঃশ্বাসের দেখা পায়। বোধ করি বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন ষোল আনা কথা চুকিয়ে দেবার পর। তবু তাঁর অনুপস্থিতি চিন্তা করে মনে সেই এক প্রশ্ন গেঁথে বসেছে যে, বিবেকানন্দ তুমি তো বলেছিলে, আত্মার ক্ষয় নেই, ক্ষতি নেই, মৃত্যু তার কাছ হতে সুদূর পরাহত। তবে আজ তোমার আমার অস্তিত্ব কোথায়? সে আজ কোন উজানের উজানী? আমি ভাবি, শুধু ভাবি…।*

—জর্জ বিশ্বাস

দ্রষ্টব্য: * আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী নিজেকে 'সচ্চিদানন্দ' নামে পরিচিত করেছিলেন।

স্বীকৃতি: এই প্রবন্ধের সকল উক্তিই বিবেকানন্দের পত্রাবলীর অংশবিশেষ।

কাজী নজরুল ইসলামের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

আদাব হাজার হাজার জানবেন!

বাদ আরজ, আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের 'সাহিত্য পত্রিকায়' স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশি। আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারী লেখা 'কোরকের' কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি 'কোরক' ব্যতীত প্রস্ফুটিত ফুল নই, আর যদিই সেরকম হয়ে থাকি কারো চক্ষে, তবে সে বেমালুম ধুতুরো ফুল। যা' হোক, আমি তার জন্যে আপনার নিকট যে কত বেশি কৃতজ্ঞ, তা' প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছি নে। আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটা মস্ত জবর কবি ও লেখক তা' হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাত সত্যি কথা। কারণ, এবারেই পাঠালুম একটি লম্বা চওড়া 'গাথা' আর একটি 'প্রায় দীর্ঘ' গল্প, আপনাদের পরবর্তী সংখ্যা কাগজে

ছাপাবার জন্যে, যদিও কার্ত্তিক মাস এখনও অনেক দূরে। আগে থেকেই পাঠালুম, কেন না এখন হোতে এটা ভালো কোরে পড়ে' রাখবেন এবং চাই কি আগে হ'তে ছাপিয়েও রাখতে পারেন। তা' ছাড়া আর একটি কথা। শেষে হয়ত অনেক ভাল ভাল লেখা জমে' আমার লেখাকে বিলকুল 'রদ্দি' করে দেবে আর তখন এত বেশি লেখা হয়ত না প'ড়তেও পারেন। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, সম্পাদক বেচারাদের গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যি রোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। যাক, অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামকা টুঁটি চেপে রেখেছিলুম। এখন বাকী কথা ক'টি মেহরবানি কোরে শুনুন।

যদি কোন লেখা পসন্দ না হয়, তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরীবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনের পাথেয় পাঠিয়ে দেব। কারণ সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আর তার চেয়েও হাজার গুণ পরিশ্রম ক'রে এই একটু আধটু লিখি। আর কারুর কাছেও একেবারে worthless হোলেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক! আর ওটা বোধ হয় সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পসন্দ হ'ল কি না জানাবার জন্যে আমার নাম-ঠিকানা লেখা একখানা stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে। প'ড়ে মতামত জানাবেন।

আর যদি এত বেশি লেখা ছাপাবার মত জায়গা না থাকে আপনার

কাজী নজরুল ইসলাম

কাগজে, তা' হলে যে কোন একটা লেখা 'সওগাতের' সম্পাদককে hand over ক'রলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব'। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু' একটি ক'রে।৭ যা ভালো বুঝেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিব, কারণ এখনও অনেক সময় রয়েছে। আমাদের এখানে সময়ের money-value; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হ'তেই পারে না। Undisturbed time মোটেই পাই না। আমি কোন-কিছুরই কপি বা duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by, আপনারা যে 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির 'মুক্তি' নাম দিয়েছেন তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন ক'রে নেবেন। বড্ড ছাপার ভুল থাকে। একটু সাবধান হওয়া যায় না কি? আমি ভাল। আপনাদের কুশল সংবাদ দিবেন। নিবেদন ইতি—

খাদেম

নজরুল ইস্‌লাম

(২)

[আবদুল কাদিরকে লিখিত]

৮।১, পানবাগান লেন,
ইণ্টালি, কলিকাতা।
২।১।২৯।

কল্যাণীয়েষু,—

তোমার চিঠি লিখছি দেখে তোমার চেয়ে বিস্মিত আমিই বেশি হচ্ছি। চিঠি না লেখাটাই মুখস্থ হ'য়ে গেছে, কাজেই ওটাকে যখন প'ড়ে হৃতস্থ করতে হয়, তখন হাতের চেয়ে মনটাই বেশি বিব্রত হ'য়ে পড়ে।

আমি চিঠিপত্তর দিই নে ব'লে তোমাদের অভিমান যদি কখনো হয়, তা' হ'লে অন্তত এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা লাভ ক'রো যে, আমার চিঠি পায় ব'লে কেউ আমার সুনাম ঘোষণা করে নি কোনদিন। রবিবাবু চিঠি পেয়েই তার উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন, তিনি মস্ত বড় কবি। আমি চিঠি পেয়ে তার উত্তর না দিয়েই আমার অভদ্রতার প্রিন্সিপল্ রক্ষা করি। আমি মুসাফির কবি। ভদ্রতা, সৌজন্য, স্নেহ, প্রীতির খাতির কোনদিনই করি নি, এই যা সান্ত্বনা। রবিবাবুকে চিঠি দিয়ে লোকে ভাবে, উত্তর এলো ব'লে। আমাকে চিঠি দিয়ে কারুর ও অশোয়াস্তির আশঙ্কা নেই, সে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে, তার চিঠির উত্তর কোনদিনই পাবে না।

ব্যবসাদারীর কাজের কথাটা আগে ব'লে নিই, তারপর কবির অকাজের কথা হবে।

এতদিন আমার পাবলিশাররাই আমায় ঠকিয়ে এসেছে। আমার বোধোদয় হ'য়েছে, তাই মনে করেছি—এবার তার শোধ নেব। এবার থেকে বইগুলো নিজেই প্রকাশ করব। 'চক্রবাক' নাম দিয়ে আমার একখানা কবিতার বই ছাপতে দিয়েছি। তারই বিজ্ঞাপন পাঠালাম পাঁচখানা তোমার কাছে। তুমি (১) জাগরণে (২) সওয়ে (৩) আলফারুকে (৪) আমানে ও (৫) আজাদে গিয়ে দিয়ে এস। যেন তাঁরা তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেন। আমি আমার সাধ্যমত তাঁদের কবিতা দিয়ে সাহায্য করব—যদি তাঁরা সাহায্য করেন। ওই কাগজের সম্পাদকদের আলাদা চিঠি দিতে পারলাম না সময়ের ও ধৈর্যের অভাবে। তোমার মারফতেই আমার অনুরোধ জানাচ্ছি সম্পাদক সাহেবানদের।

তুমি তো ফেল করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ জসীমের সাথে, কাজেই এই হাটাহাটি করিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। আশা করি এবারও তুমি পাশ'না করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করছ না।

ডিগ্রী যদি না-ই পাও, অন্তত তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। ডিগ্রীটা থাকে শেষের দিকে, অর্থাৎ ওটা ল্যাজের সামিল। আর ও জিনিসটা অর্জন করার জন্য গর্ব যাঁরাই করুন আমি পাই নি ব'লে

বিধাতাকে তার জন্য ধন্যবাদ দিই। তাজ নিয়ে গর্ব করবার মত বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় নি আমার। আমি মানুষের স্তরে উঠে গেছি' আমি নির্লজ্জ।

তোমার কাব্য-সাধনা তোমায় যে ডিগ্রী দান কোরেছে বা দেবে, তা' হবে তোমার মাথার অলঙ্কার-শিরোপা। ওইটাই তোমার সত্যিকার গর্ব করবার জিনিস।

তুমি আর জসীম যেন একই নদীর জোয়ার ভাঁটা। একই স্রোতের রকমফের।

একটু উপদেশের ঢিল ছুড়ব তুমি আজকের মানুষকে খুশি কোরতে গিয়ে কালকের অনাগতদের অসম্মান অর্জন ক'রো না যেন। ওই রোগে আমার যে সর্বনাশ কোরেছে, তার ক্ষতিপূরণ বুঝি সারা জীবনেও হবে না। বহুদিন আনন্দলোকের দ্বারে ব'সে কনসার্টই বাজিয়েছি। হাতের বাঁশী ফেলে। তাতে বুকের ব্যথা বেড়েছে বই কমে নি। আজ সেই ব্যথার কথাই যখন সুরের সুতোয় গাঁথলাম, তখন ব্যথাও যেমন কমেছে, ক্ষতটাও তেমনি মালায় ঢাকা প'ড়েছে। আমার চোখের জলে সকলের চোখের জল এসে মিশেছে। আমার বেদনালোক তীর্থলোকে পরিণত হয়েছে। সরব হাততালির লোভের চেয়ে নীরব চোখের জলের অর্ঘ্য তোমার কাম্য হোক—এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তোমাদের দেখে কত আশাই না পোষণ করি। আমার গান থামলেও গানের পাখীর অভাব হবে না এই নূতন বুলবুলিস্তানে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের সাথে আলাপ হোলো—অনেক কথা। তার মনটিই বড় রত্ন। আশির মত স্বচ্ছ। আর আর খবর দিও। ইতি—

শুভার্থী

নজরুল ইসলাম

P. S. কংগ্রেসে আস নি, ভালই করেছ। কংগ্রেসে চৌত্রিশ ঘোড়ার রাজাকে এনে পেয়েছে চৌত্রিশ ঘোড়ার ডিম। দেখা যাক, স্বরাজের কেমন বাচ্চা বেরোয়।

(৩)

[আজিজুল হাকিমকে লিখিত]

Saogat
11, Wellesley Street
Calcutta
5. 10. 29

কল্যাণীয়েষু—

এইমাত্র তোমার কবিতা ও চিঠি পেলাম। কবিতাটি 'সওগাতে' দিলাম। আমি চিঠির উত্তর দেই নি বারোয়, এ বদনামটা কায়েম হ'য়ে গেছে। সময়ের অভাব বলেই দিতে পারি নে। পলিটিক্স, কাব্য, গান, আড্ডা ইত্যাদির চাপে আমার ভদ্রতার ভাদ্র-বধূ বহুদিন হ'ল ঘোমটা টেনে ঘরের কোণ নিয়েছে।

তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দেখেছি মোহাম্মদীতে। দু' একটা খুবই ভালো লেগেছে। ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকে তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ। ভাবের নীহারিকা-লোক তোমায় উজ্জ্বল গ্রহ হ'য়ে দেখা দেয় নি বলে অধৈর্য হয়ো না। ও দানা বাঁধতে একটু সময় লাগবে বৈ কি।

তোমার সামনে আজো বিপুল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, অসীম শূন্য তোমার চারপাশে, তোমার স্বপন-লোকের নীহারিকাপুঞ্জ আজো বাষ্পাকুল—ওই ভালো। আমি হ'য়ে ওঠার চেয়ে সম্ভাবনাকে বেশি ভালবাসি।

আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত, হয়ত চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশি দিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে, তেমনি সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক, গ্রহপুঞ্জ। তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল ক'রে থাকার কোন প্রয়োজন হবে না এ ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখায়, কামনায় শুধু এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে—তোমরা এস অনাগত কবির দল, আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা ভোরের পাখী, তাদের গান শুনোও।

জসীম, কাদির প্রভৃতিকে আমি ভালবাসি আমারও চেয়ে। আজ হ'তে তুমি তাদেরই একজন হ'লে যাদের আমি ভালবাসি। সব সময় খবর যদি না-ই নিতে পারি মনে রাখব। আমার আন্তরিক শুভাশীষ ও স্নেহ গ্রহণ করো। ইতি—

শুভার্থী

নজরুল ইসলাম

(৪)

[ইজাবউদ্দীন আহমদকে লিখিত]

কলিকাতা
১২।৩।৪০

কল্যাণীয়েষু—

'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরীর' দ্বার উদ্‌ঘাটনে আমায় আমন্ত্রণ করেছ। এর জন্য যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিরাজী সাহেব আমার পিতৃতুল্য ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে আজীবন ভালবেসেছেন তা বোধ হয় তোমরা অনেকে জানো না। তাঁর ভালবাসা ও প্রেম আমার ঊর্ধ্বলোকে যাত্রার পথে চিরদিন সহায় স্বরূপ ছিল—আজো আছে। আমার আর কোন কর্মে স্পৃহা নেই—তবু তোমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম—পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য-স্বরূপ। শিরাজী সাহেব সম্বন্ধে যা বলবার সভাতেই বলব।

ইতি

নজরুল ইসলাম

(৫)

['জেহাদ' সম্পাদককে লিখিত]

কলিকাতা
১২।১২।৪০

প্রীতিভাজনেষু—

আমার মন্ত্র—'ইয়াকানা' বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন।' কেবল এক আল্লাহ্‌র আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব আমি স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি। আমি ফকির, আল্লাহ্‌র দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষু যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই, ইন্‌শা আল্লাহ, শুধু ভারত কেন, সারা দুনিয়ায় সত্যের জন্য যেজে

উঠবে—তৌহীদের পরম অদ্বৈতবাদের অমৃতবন্যা বয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদেই সারা বিশ্বের মানব এসে মিলিত হবে। আমায় আপনারা ভাব-বিলাসী স্বপ্নচারী কবি মনে করতে পারেন, কিন্তু যুগে যুগে স্বপ্নচারীরাই উর্ধ্বতম জগৎ থেকে আল্লাহ্‌র আরশকুর্শী, লওহ-কলম থেকে শক্তি, সাহস, বাণী, অমৃত, শক্তি আনয়ন করেছে। এই সত্যদ্রষ্টা স্বপ্নপথের পথিকরাই দারিদ্র্য-দুঃখ-শোক-ব্যাধি-উৎপীড়ন-জর্জরিত মানুষকে আনন্দের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন ইমাম হ'য়ে—অগ্রপথিক হ'য়ে।

আপনাদের মধ্যে যে মহাশক্তি আজ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল আবেগে সকল বন্ধ দুয়ার ভাঙতে যাচ্ছে, আমি নকীব হ'য়ে সেই শক্তিকেই আবাহন করেছি। ঐ শক্তিরই খাদেম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। কত কামাল আপনাদের মাঝে লুকিয়ে আছে, তা আপনারা জানেন না, কিন্তু আল্লাহ্‌ আমায় তাদের স্বরূপ দেখিয়েছেন। সর্বশক্তিদাতা আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন যেন আমার প্রতীক্ষার অন্ধকার রাত্রি নবযুগের সুবহ-সাদেকের অরুণালোকে আশু রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এই প্রতীক্ষার শেষ মুহূর্ত আমরা কলরব করলেই শেষ হবে না। কৃষক বীজ বপন করে জমিতে গাছ উদ্‌গত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। জমিতে লাঠি মেরে গাছ উদ্‌গত করার চেষ্টা করে না। তবে আপনাদের এই উৎসাহ ও আগ্রহ যদি ঈদ-মুবারকে শুভদিনের শেষ রাত্রির আনন্দ-কলরব হয়, তবে তাকে আমি অভিনন্দিত করি—আমার সালাম জানাই।

আল্লাহ্‌ আপনাদের 'সেরাতল মুস্তাকিম' সুদৃঢ় সরল পথে পরিচালিত করুন। যে অনাগত, মুজাহেদীনের জন্য আল্লাহ্‌র ফেরদৌস-আলা আজও শূন্য রয়েছে, তার পবিত্রবক্ষ পূর্ণ করার জন্য আল্লার আহ্বান নেমে আসুক আপনাদের অন্তরে-দেহে-আত্মায়। আল্লাহ্‌ আকবর।

আপনাদের ভাই—

নজরুল ইসলাম

[নিম্নোক্ত চিঠিখানা নজরুল লিখেছিলেন তাঁর স্ব-গ্রামবাসী দূর সম্পর্কের এক চাচার কাছে। তাঁর নাম ডাক্তার কাজী কাসেম হোসেন। তাঁরই পুত্র কাজী আনোয়ার-উল্‌-ইসলাম। বাড়ি এঁদের চুরুলিয়াতেই। গ্রামে ডাক্তার হোসেনের খুবই প্রভাব প্রতিপত্তি। সেইজন্য নজরুলের ভ্রাতারা যখন জ্ঞাতিশত্রুদের দ্বারা উৎপীড়িত হোয়ে নজরুলের সাহায্য প্রার্থনা করেন তখন তিনি এই চিঠিখানা লেখেন। চিঠিখানা তিনি ইংরিজীতে লিখেছিলেন।' চিঠিখানার ফটোব্লক 'মাহে নও' পত্রিকায় কবি মঈনুদ্দিনের বাংলা অনুবাদ সহ বাংলা ১৩৬৫ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেই অনুবাদটিই হুবহু দেওয়া গেল]

(৬)

৩৯, সীতানাথ রোড,
কলিকাতা
১৭. ১. ৩৫

প্রিয় চাচাজী!

তস্‌লীম। এক যুগ পরে আপনাকে আমি চিঠি লিখছি। আমি আমার ভাইদের কাছ থেকে শুনলাম, আপনি তাদের উপর যথেষ্ট দয়া এবং সহানুভূতি দেখিয়ে থাকেন। আমার নসীব খারাপ। আমি তাদের কোনো সাহায্য করতে পারি না, বরং তাদের যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি। আমার নিজেকেও (আর্থিক) সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নাই।

আমি আমার দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি নতুবা আমি হয় তো সহজেই বেশ ধনীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারতাম।

ছোটবেলা থেকেই আমরা আপনার মহানুভব পরিবারের সাহায্য পেয়ে আসছি। আমার প্রতি রক্ত-বিন্দুতে রয়েছে আপনার স্বর্গীয় করুণা ও মহানুভবতার স্বাক্ষর। নির্যাতিতদের প্রতি আপনার এই সহানুভূতির জন্যই আল্লাহ্‌ আপনাকে দিয়েছেন বিত্ত, খ্যাতি ও শান্তি। আমি জানি না, আপনার কদমবুসি করার জন্য কখন আল্লাহ্‌ আমাকে আমার গ্রামে যাওয়ার সুযোগ দেবেন।

আমি যেখানেই থাকি না কেন গভীর শ্রদ্ধার সাথে আপনার কথা সব সময় স্মরণ করি।

আমার বড় ভাই কোন এক রোগে ভুগ্‌ছেন। কি রোগ, তা' আপনিই ভালো বুঝ্‌তে পারবেন। আপনি কি মেহেরবানি ক'রে আপনার রোগী হিসেবে তাঁর সকল দায়িত্ব গ্রহণ কোরতে পারেন? আপনি সরাসরি অথবা আমার ভ্রাতার মাধ্যমে আপনার ওযুধ-পত্রাদির বিল পাঠিয়ে দেবেন। যদিও আমি একজন গরীব, তবু আপনার টাকা আমি অবিলম্বে পাঠিয়ে দেব। আশা করি, ওর জন্য যা কিছু করণীয় তা' আপনি ক'রবেন।

আর একটি কথা—আমার ভাইয়ের কাছে শুনলাম আমাদের গ্রামবাসী এবং জ্ঞাতিরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছে।

আমি আমার ভ্রাতাদের সাথে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রছি। আপনি মেহেরবানি ক'রে ওদের উপর স্নেহদৃষ্টি রাখবেন এবং এরা যাতে কারো দ্বারা কোনো কষ্ট না পায়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

শুধু একজন বিচারক এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসেবেই নয়, আমাদের উপর চির-স্নেহশীল মুরুব্বি এবং আশ্রয়দাতা হিসেবেই আপনার কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। লাখ সালাম।

আপনার স্নেহভাজন—
নজরুল ইসলাম।

তোমার আসন
শূন্য আজি
(নেতাজীর কক্ষ)

—সূর্যনারায়ণ দত্ত

মাসিক বসুমতী
॥ পৌষ, ১৩৭০ ॥

কান্তার মরু
লঙ্ঘিতে হবে—

—সত্যরঞ্জন ঘোষ

—আশুতোষ সিংহ

কৃষাণী

কিশোরী

—ডি, কে পাল

শিশু

—জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত

গাদা-বোট

—সমর দাস

ভবিষ্যৎ

—গোবিন্দ সেন

মৃগশাবক

—শান্তিময় সান্যাল

অলৌকিকতা প্রসঙ্গে অল্ডাস হাক্সলি

তীরন্দাজ

অলৌকিকতার প্রতি মানুষের যে ঝোঁক এটা সহজাত না কি শিক্ষালব্ধ, এ কথার সঠিক উত্তর আজও পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানীরা কিছু দিতে পারেন নি—অন্তত মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন 'স্কুল'-এর দিক্‌পালগণ এ বিষয়ে একমত নন।

একেবারে কিশোর বয়স থেকে সুরু করে অল্ডাস হাক্সলি সারা জীবন ধরে নানা বিষয়েই ভেবেছেন। একবার একটা অলৌকিক ব্যাপার (?) প্রত্যক্ষ করবার পরে উনি অলৌকিকতার প্রতি মানুষের যে ঝোঁক সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু ভাববার মতো কথা বলেছিলেন।

আগে ঘটনাটা বলে নিই। ব্যাপারটা ঘটেছিল লেবাননের বেইরুট সহরে। একদিন সকালবেলা রটে গেল যে, সহরের একটি বিখ্যাত গির্জার মেঝেতে 'দিব্যজ্যোতি' দেখা যাচ্ছে। ব্যস্! আর যাবে কোথায়! সহর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো গির্জার মেঝের সেই 'দিব্যজ্যোতি' দেখবার জন্যে। একেবারে সাধারণ ধার্মিক প্রকৃতির লোক থেকে আরম্ভ করে সহরের আচ্ছা-আচ্ছা সব জ্ঞানী-গুণীরাও আসতে লাগলেন পাথরের তৈরি মেঝের সেই 'দিব্যজ্যোতি দেখবার জন্যে। সবাই দেখলো মেঝের খানিকটা জায়গায় সাদা ফুলের মতো স্নিগ্ধ খানিকটা আলোর উদ্ভাস। অথচ ওপরে কোথাও ফাটাফুটো নেই। পাথরের ওপরেও যে ফ্লোরেসেণ্ট বা ফসফরেসেণ্ট কোন পদার্থ নেই, তাও পরীক্ষা করে সবাই দেখলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দেখা যেতে লাগলো আলোটা। তারপর ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে লাগলো।

আমাদের দেশে 'নেপাল বাবা' কিম্বা 'মদনপুরের কলস' এক সময় যে ভিড় জমাতো বেইরুট গির্জার মেঝের এই 'দিব্যজ্যোতি' তার চাইতে বহুগুণে বেশি আকর্ষণ করতে লাগলো সাধারণ মানুষকে। বিজ্ঞরা যদিও দিন তিনেক পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এবং প্রকাশ্যে সেকথা বলতেও লাগলেন, কিন্তু বলাই বাহুল্য সাধারণ মানুষ সেদিকে কর্ণপাত করলো না—বেশ কিছুকাল ধরে চলতে লাগলো লোক সমাগম।

ব্যাপারটা কি হয়েছিলো এবার শুনুন। গির্জার ভেতর উঁচু সিলিং থেকে ঝোলানো ছিলো বহুকালের পুরনো লণ্ঠনের ঝাড়। কয়েকটা আধপোড়া মোমবাতি তখনো ছিল সেখানে। কয়েকদিন আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। যে শিকলের সঙ্গে এই ঝাড় ঝুলানো ছিলো তা বেয়ে সিলিং থেকে জল গড়িয়ে মোমের ওপর থেকে এসে মেঝেয় পড়েছিল। নেভানো মোমের ওপর থেকে ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে এসেছে কাজেই অন্ধকারে জিনিষটার মধ্যে কিছুই বৈচিত্র্য নেই কিন্তু সূর্যালোকের মধ্যে জায়গাটায় একটা বিশেষত্ব দেখা যাচ্ছে—ঈষৎ সাদাটে একটু আভা। ব্যস। তারই মধ্যে হাজার হাজার মানুষ 'দিব্যজ্যোতি' দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরলো।

কেন এমনটা হলো। কি করে হলো? সাধারণ মানুষ—স্বার্থ এবং বৈষয়িক ব্যাপারে যারা প্রচুর বুদ্ধি রাখে দেখা যায় তারা এই ভুয়ো 'অলৌকিক' ব্যাপারটা কেন এবং কি করে বিশ্বাস করতে পারলো? এমন কি 'দিব্যজ্যোতির উৎস যারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতেও তারা পিছপা হলো না। হাক্সলি প্রশ্ন করছেন—কেন এমনটা হয়? অলৌকিকতার প্রতি ঝোঁকটা তা'হলে মানুষের সহজাত? হাক্সলি তা মনে করেন না। হাক্সলির ধারণা যে কি হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান—সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই অধ্যাত্ম সাধনার চরমোৎকর্ষ হিসেবে অলৌকিকতার প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয় তার ফলেই সাধারণ বা গতানুগতিকের বাইরে কিছু একটার প্রতি দৃষ্টি গেলেই মানুষ সেইদিকে ঝুঁকে পড়ে। আসলে মনে মনে মানুষ এতো তীব্রতার সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সন্ধানী যে কিছু একটা আশ্রয় পেলেই হলো—যা হ'ক একটা উপলক্ষ পেলেই তার মন ঐ তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে ঢেলে দেয়।

সভ্য এবং শিক্ষিত আধুনিক মানুষের মনেরও যে এই অবস্থা এটা দেখে হাক্সলি বলছেন যে, মনোবিজ্ঞানের চর্চা আরও ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার। এবং তা হবেও বলে উনি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।

হাক্সলি বলছেন যে একশ' কি দেড়শ' বছর আগে এমন কি পেশাদার বৈজ্ঞানিকেরও মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলেই স্বীকার করতেন; এর ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের তো কথাই উঠতো না। কিন্তু আজকের দিনে প্রত্যেক সভ্য দেশের সরকারের একটি বিভাগ আছে, যাকে বলে 'পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট'। মানুষের মন সম্বন্ধে

অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন সূত্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়োগ হচ্ছে এই 'পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের' একমাত্র কাজ।

হ্যান্সলি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের সরকার মনোবিজ্ঞানী এবং হঠযোগীদের ব্যাপকভাবে কাজে নিয়োগ করছেন। আজকের দিনে কেমিস্ট, ফিজিসিস্ট, মেট্যালারজিস্ট বা এঞ্জিনীয়ার না হলে যেমন চলে না, আগামী যুগে তেমনি মনোবিজ্ঞানী এবং হঠযোগী না হলেও চলবে না—এবং এঁরা যতদিন পরিপূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করছেন ততদিন অলৌকিকতার প্রতি মানুষের যে ঝোঁক তারও সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না।

ছুটি

ছুটির নামে আমরা সকলেই মনে মনে বেশ আরাম অনুভব করি। কাল-পরশু অফিসে যেতে হবে না, প্রতিদিনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এই কথা ভেবে আমরা বেশ আরাম পাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন সত্যি সত্যি এই ছুটি উপভোগ করতে পারি? শুয়ে-বসে বা আড্ডা দিয়ে ছুটির দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারলে অনেকে বেশ খুশি হন। কিন্তু বাড়ির সবাইকে নিয়ে কাছাকাছি কোথাও বেড়িয়ে এলে অথবা বেশি ছুটি থাকলে বাইরে কোথাও বেড়িয়ে এলে তা কি বেশি উপভোগ্য হয় না? ইয়োরোপ, আমেরিকায় কিন্তু ছুটি পেলেই কোথাও গিয়ে ঘুরে আসাটা যেন একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। ইয়োরোপের ছোট্ট দেশ নেদারল্যাণ্ডেও এই প্রথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত। আগামী ছুটির মরশুমে নেদারল্যাণ্ডের সকলেই যেন কোথাও-না-কোথাও যাওয়ার জন্য এখন থেকেই তৈরি হতে সুরু করেছেন গত কয়েক বছরের মতো এবারেও, সকলেই শহরের বাইরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছুটি-সম্পর্কিত ব্যাপারে গত কয়েক বছরে হল্যাণ্ডে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেতনের হার বেড়ে যাওয়ায় সকলের অবস্থাই বেশ স্বচ্ছল হয়ে উঠেছে, এ ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে আড়াই সপ্তাহের জন্য বেতনসহ টাকা বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয় এবং বেতন বা মজুরীর শতকরা ৪ ভাগ টাকা ছুটির বোনাস দেওয়া হয়। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে প্রতিটি দোকান তা সেই দোকানের মালিকানা কোন পরিবারেরই হোক বা সাধারণ দোকানই হোক, আইন অনুসারে প্রত্যেকটি দোকান গ্রীষ্মাবকাশে ১০ দিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। এমন কি দুধ, রুটি যা প্রত্যেকের বাড়িতে প্রতিদিন সরবরাহ করা হয়, গ্রীষ্মকালে এই সব জিনিস সরবরাহকারীরা যাতে ছুটি উপভোগ করতে পারেন সেজন্য গ্রীষ্মে ৬ সপ্তাহের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে দুধ রুটির স্টল খোলা হয় এবং প্রত্যেককে সেই সব স্টল থেকে নিজের নিজের দুধ রুটি নিয়ে আসতে হয়। এই ব্যবস্থাকে একেবারে বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হ'ল জুলাই মাস থেকে, বিশেষভাবে আগস্ট মাস থেকে সমগ্র হল্যাণ্ড যেন বাইরে, চলতে থাকে। হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সব সময়েই বাড়ির বাইরে গিয়ে রৌদ্র উপভোগ করতে ভালোবাসেন এবং এখন তাঁরা ছুটির বিশেষ সুবিধেগুলি পেয়ে তাঁদের অবকাশ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন। ছুটির সময়ে গত কয়েক বছর যাবৎ যে রকম অবিরাম গতিতে বিভিন্ন রকমের যানবাহন শহরের বাইরে যেতে থাকে তা দেখলে ছুটির জনপ্রিয়তা সহজেই বুঝতে পারা যায় হল্যাণ্ডে সাইকেল অত্যন্ত জনপ্রিয় যান বলে বেশিরভাগ লোকই তাদের সাইকেল সঙ্গে নিয়ে ছুটি উপভোগ করতে চান। হল্যাণ্ডে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বিদেশে গিয়ে ছুটি উপভোগ করেন সাইকেল নিয়ে। কাজেই ছুটি উপভোগকারীদের এই সাইকেল নিয়ে যাওয়ার জন্যই শুধু রেলবিভাগকে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হয়। ওলন্দাজ ছুটি উপভোগকারাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৬ লক্ষ লোক বিদেশে গিয়ে ছুটি উপভোগ করেন। ১২ বছর আগেও এই অনুপাত ছিলো শতকরা মাত্র ৪ জন। বেশির ভাগ লোক জার্মানীতে (৫ লক্ষেরও বেশি), ফ্রান্সে, ইটালী, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গে, অস্ট্রিয়া ও সুইটজারল্যাণ্ডে যান। নিজেদের দেশে ঘরকুনো হয়ে থাকতে ভালো লাগে না বলেই যে এতো বেশি সংখ্যক ওলন্দাজ বিদেশে বেড়াতে যান তা নয়। বেশির ভাগ ওলন্দাজ নাগরিক ইয়োরোপের ৩।৪টি ভাষা জানেন বলে নানা দেশে গিয়ে বেড়াতে এঁদের একটুও অসুবিধে হয় না। অনেকগুলি ভাষা জানেন বলে এঁদের বিদেশে গিয়ে জিনিসপত্রের দামে বা অন্য ব্যাপারে ঠকবার সম্ভাবনাও অনেক কম। তাছাড়া ইটালী ও সুইটজারল্যাণ্ডে ওলন্দাজ হোটেলওয়ালাগণ ওলন্দাজগণের প্রয়োজন মেটাবার মতো হোটেল ও ক্যাম্প খোলবারও ব্যবস্থা করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা কয়েকটি পর্যটক নিবাস স্থাপন করেছেন। ছুটির সময়ে যাঁরা বাড়িতে থাকেন তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্যও আজকাল নানারকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক পার্ক, বন, ক্যাম্প করায় জায়গা এমন কি পল্লী ধরণের পিকনিকের জায়গাগুলি উন্নত করার জন্য ক্রমশ বেশি পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। একমাত্র শিক্ষামন্ত্রকেই বর্তমানে ১৯৫৪ সালের তুলনায় শত শত গুণ বেশি টাকা খোলা হাওয়ার আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় করছেন। ছুটি উপভোগকারীদের সুখ-সুবিধের জন্য জল ও জলপথ দপ্তরও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করছেন। এইজন্য গত ৫ বছরে দলে দলে ঘুরে বেড়ানো এবং ক্যাম্প করে বাইরে কিছুদিন বেড়িয়ে আসা হল্যাণ্ডে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান বছরে ক্যাম্প করার জিনিসপত্রের যে প্রদর্শনী হয় তাতে তাঁবুসহ সব জিনিসপত্র যে শুধু বিক্রী হয়ে গেছে তাই নয়, এগুলির জন্য এতো বেশি অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে সেগুলি তৈরি করতে আরও ১৮ মাস সময় লাগবে। হল্যাণ্ডে যেমন সাইকেল ও মোটর চালাবার মতো হাজার হাজার মাইল খুব ভালো রাস্তা রয়েছে তেমনি প্রতি বছর নতুন নতুন রাস্তাও তৈরি হচ্ছে। ফলে ছুটি পেলেই যুবক-যুবতীরা দলে দলে তাঁদের সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরোন; ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জলপথগুলিও সব সময়েই উন্নত ও প্রসারিত করা হয়েছে। বর্তমানে হল্যাণ্ডের জনগণ কেবলমাত্র ভ্রমণের আনন্দের জন্য নিজেদের এবং পরিবারের সকলের জন্য যত ব্যয় করছেন এর আগে তাঁরা আর কখনও তেমন করেন নি। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে হল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ তাঁদের এক মাসের বেতন প্রতি বছরে কেবলমাত্র বেড়ানোর জন্য খরচ করেন। কিন্তু এর জন্য তাঁরা অনুতপ্ত বলে মনে হয় না। তাঁরা বরং ক্রমেই এতে অভিজ্ঞ হচ্ছেন, নিজের দেশ এবং অন্যান্য দেশ ভালো করে চিনছেন এবং বেশি আনন্দ উপভোগ করছেন।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী
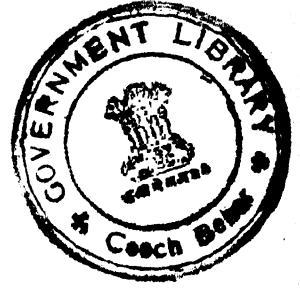
একুশ

না, আজ থাক। আজ দময়ন্তী সে কথা ভাববে না। জগদীশ আজ তার নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ফলাফলের কথা যখন জানা নেই, তখন তার শেষ ক্রটির কথা দময়ন্তী নাই বা ভাবল।

বাঁচবার জন্য জগদীশ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। অজ্ঞান অচেতন একটা মানুষকে কাঠুরে চৌধুরী তার বাড়িতে তুলে এনেছিল। ডাক্তার সেনকে বলে ব্যবস্থার কোন ক্রটি রাখে নি। জগদীশ চোখ মেলে তাকিয়েছিল, নিঃশ্বাসের জন্যে আকুলি বিকুলি করেছিল খানিকক্ষণ। বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা। সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে, দময়ন্তী সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল।

মরফিয়া দিয়ে জগদীশকে অজ্ঞান করে ডাক্তার সেন বেরিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন: আজ রাতের মতো নিশ্চিন্ত থাকুন, কাল সকালে এসে দেখব।

কিছু বলবার ক্ষমতা দময়ন্তী হারিয়ে ফেলেছিল। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার বললেন: আপনারা এবারে বিশ্রাম করুন, আমি যাই।

কাঠুরে চৌধুরী তাঁর হাত চেপে ধরে বলেছিল: একটু বসুন ডাক্তার সেন।

আর কিছু বাকি আছে?

না।

তবে?

আজ রাতে আপনাকে এখানে থাকতে হবে। আপনি কথা দিয়ে যান।

কথা দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন ডাক্তার সেন। আর সেই থেকে দু'জনে বারান্দার দুই প্রান্তে বসে ডাক্তারেরই অপেক্ষা করছে।

জগদীশের কাছে থাকার প্রয়োজন এখন নেই, কাছে না থাকলেও চলবে। অজ্ঞান মানুষকে পাহারা দেবার দরকার আছে। কিন্তু মরফিয়া দিয়ে যখন অচেতন করে রাখা হয়, তখন তার পাহারার দরকার থাকে না। জ্বালা যন্ত্রণা ভুলোবার জন্যেই তো এই ব্যবস্থা। কাজেই দময়ন্তী বাইরে বসেই সময় কাটাতে পারছে!

কাঠুরে চৌধুরীর নির্দেশে তার স্বামীর শয্যার পাশে একখানা ক্যাম্প খাট পাতা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে লবাট এসে খাট পেতে দিয়ে গেছে। এখানে ডাক্তার শোবেন না অন্য কেউ, দময়ন্তী তা জানে না। তার শোবার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে, সেকথাও সে জানতে চায় নি। কাঠুরে চৌধুরীকে কিছু জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়। লবাট নামে সেই লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। কাজেই দময়ন্তী এখন ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছে। সে ভদ্রলোক এসে পড়লেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ওধারে কাঠুরে চৌধুরীর চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টি পড়তেই সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে হাতের ঘড়িটা দেখল। অনেক রাত হয়েছে। ডাক্তার সেনের এতক্ষণ ফিরে আসা উচিত ছিল। কেন দেরি হচ্ছে বুঝতে না পেরে সে উঠে দাঁড়াল। দময়ন্তীর কাছে এসে বলল: এবারে আপনি শুয়ে পড়ুন। আপনার স্বামীর পাশে আপনার বিছানা পাতা হয়েছে।

দময়ন্তী কাঠুরে চৌধুরীর দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল: ধন্যবাদ। কিন্তু উঠল না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আপনারও বিশ্রামের প্রয়োজন। অকারণে নিজেকে কষ্ট দেবেন না।

দময়ন্তী হয়তো এবারেও বলত, ধন্যবাদ। কিন্তু দূরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। জীপ ফিরছে। ডাক্তার সেন তো ফিরছেনই, ড্রাইভারের কাছে হয়তো নরোত্তমবাবুরও খবর পাওয়া যাবে। তিনি এসে পড়লে কাঠুরে চৌধুরী অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হতে পারে। মেয়ে জামাই-এর দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন।

কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হয়ে দেখল যে নরোত্তমবাবু আসেন নি। গাড়ি থেকে নেমেই ডাক্তার বললেন: এ কি, আপনারা এখনও শুয়ে পড়েন নি?

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আমরা আপনারই অপেক্ষা করছি।

আই সী। বলে ডাক্তার জগদীশ মেহতার পাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে কোন মন্তব্য করলেন না। দময়ন্তীকে বললেন: আপনি এইখানেই শুচ্ছেন তো?

দময়ন্তী কোন উত্তর দিল না।

ডাক্তার বললেন: আপনি এইখানেই থাকুন। ভোর হবার আগে ওঁর ঘুম ভাঙবে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারেন। আসুন মিস্টার চৌধুরী। বলে তিনি বেরিয়ে এলেন। কাঠুরে চৌধুরীও তাঁকে অনুসরণ করে বাইরে এলেন।

বারান্দায় ড্রাইভার ওঝা অপেক্ষা করছিল। কাঠুরে চৌধুরী তাকে জিজ্ঞাসা করল: খবর দিয়েছ।

আজ্ঞে।

কি বললেন তিনি ?

ওঝা মাথা চুলকোতে লাগল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : তোমার ভাবনা কি, তুমি নির্ভয়ে বল।

বললেন, তাঁর কোন মেয়ে নেই।

আচ্ছা যাও।

ডাক্তার সেন বললেন : কার কথা বলছেন ?

নরোত্তম খেমলানির কথা।

তিনি এই কথা বললেন ?

আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। ডাক্তার খানিকক্ষণ ভাবলেন, তারপরে বললেন : তাঁর উপযুক্ত কথাই বলেছেন। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কাঠুরে চৌধুরী দেখল যে দময়ন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নি, কিন্তু ঘরের ভিতরে আছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কি দেখছে বোঝা যাচ্ছে না, কিছু শুনছে কি না তাও না।

নিজের ঘরের দিকে চলতে চলতে কাঠুরে চৌধুরী বলল : আমারও কিছু সন্দেহ ছিল।

ছিল তো! থাকবেই। তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলে এটুকু সন্দেহ অন্তত করা উচিত।

শোবার ঘরে এসে ডাক্তার সেন বললেন : আপনার চুরুট একটা বার করুন।

একটা চামড়ার খাপে চুরুট কাঠুরে চৌধুরীর পকেটেই থাকে। একটা চুরুট তখুনি বের করে দিল। ডাক্তার সেন দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন : এইটে শেষ করে শোয়া যাবে। কি বলেন ?

কাঠুরে চৌধুরীও তার চুরুটটা কিছুক্ষণ আগে ফেলে দিয়েছিল। সেও একটা বার করতে করতে বলল : ভাল প্রস্তাব।

ডাক্তার সেন একখানা ক্যাম্প চেয়ারে বসে চারিধারটা চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন : এদিকে বাঘ ভালুক বেরোয় না তো ?

কাঠুরে চৌধুরী উদ্দামভাবে হেসে উঠতে যাচ্ছিল। সহসা নিজেকে সংযত করে বলল : ভয় পাচ্ছেন নাকি ?

লজ্জিত ভাবে ডাক্তার সেন বললেন : আমরাই বা এমন কোন্ রাজধানীতে থাকি যে বনের ভেতর ভয় পাব!

কাঠুরে চৌধুরী বলল : ভয় নেই। বাঘ মাঝে মাঝে বেরোয়, তা সে আমাদের পোষা বাঘ।

বলেন কি!

তারা আমাদের চেনে। আমরাও তাদের চিনি।

ডাক্তার সেন একটু চিন্তা করে বললেন : খেমলানিবাবুর মেয়ের ভয় করবে না তো ?

তা করতে পারে।

তবে ?

মিসেস আলবার্টকে ওদের ঘরে থাকতে বলেছি।

মিসেস আলবার্ট!

চিনলেন না মেম সাহেবকে ?

না তো।

আরে আমাদের আলবার্টের বৌ।

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে বললেন : আপনার চাকর লবার্টের কথা বলছেন !

খুড়ি খুড়ি, লবাট বলবেন না, বলুন আলবার্ট। একটা গালভরা নামের জন্য হতভাগা ক্রিশ্চান হয়েছিল, লবাট বলে আপনি তার অপমান করলেন।

ডাক্তার সেন প্রথমটায় হেসে উঠেছিলেন। তারপরে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন : আপনি সত্যিই সুখী লোক মিষ্টার চৌধুরী।

কেন ?

এইরকম একটা বিপজ্জনক সময়েও আপনি সহজভাবে রসিকতা করতে পারছেন।

আর কি করতে পারি বলুন।

সত্যিই আজ আর কিছু করবার নেই।

একটু থেমে বললেন : খেমলানিবাবু নিজের মেয়েকে অস্বীকার করলেন। কিন্তু কেন করলেন ঠিক বুঝতে পারি নে।

অনুমান করতে পারি।

পারেন ?

শুনেছি যে মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

বেশ ?

সেইটেই তো সন্দেহজনক। এ নিয়ে অনেক কানাঘুষো হয়েছিল।

ডাক্তার সেন একটু ভেবে বললেন : আমিও কিছু শুনেছিলুম। ডাক্তার প্রসাদ ওঁদের বাড়িতে চিকিৎসা করেন। ব্যাপারটা তিনি চেপে গেলেন।

চেপে গিয়ে ভালই করেছেন। সে সব কথা প্রকাশ হলে পৃথিবীর ক্ষতি হত।

বলেন কি!

পাঁচ জনের কথাতেই মনে হচ্ছে যে মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। হত্যা ও আত্মহত্যা দুইই তো সমান পাপের। পাপের আলোচনাই পাপকে প্রশ্রয় দেয়। তাই বলি, এ সব আলোচনা না হলেই পৃথিবীর মঙ্গল।

পাপের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক লোভ আছে। সেই লোভেই আমরা কৌতূহলী হই। খেমলানিবাবুর স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন, না তাঁকে কেউ হত্যা করল, সে কথা ছেড়েই দিন। এই ঘটনার পর মেয়ে পালিয়ে গেল শুনলেই মনে হয় যে সে ভয় পেয়েছিল, বাড়িতে থাকলে তারও ঐ দশা হবে। লোকে আত্মহত্যার ভয় পায় না, ভয় পায় খুন হবার। কাজেই—

কাঠুরে চৌধুরী বলল : আপনার যুক্তি ভাল, কিন্তু ঘটনাটা অন্য রকম। দময়ন্তী তখন বাড়ি ছিল না, কলকাতার হোস্টেলে যে কেন ভয় পেল আর কেন পালিয়ে গেল তা জানা যায় নি।

ও।

দেখতে পাচ্ছি, দময়ন্তী পালিয়ে গিয়ে এই ভদ্রলোককে বিয়ে করেছে। মনে হয়, এই বিয়েতে নরোত্তমবাবুর মত ছিল না। কাজেই তিনি মেয়েকে ত্যাগ করেছেন। তাঁকে দোষ দেওয়া উচিত কি না বুঝতে পারি না।

ডাক্তার সেন একসঙ্গে মুখে অনেকটা ধোঁয়া নিয়ে বললেন : ব্যাপারটা গোলমেলে থেকেই যাচ্ছে।

কেন ?

লক্ষ্মীবিলাস আপনার
সকল সমস্যার
সমাধান করবে।

লক্ষ্মীবিলাস
তেল

এম. এল. বসু এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস :: কলিকাতা—৯

মায়ের মৃত্যু আর মেয়ের বিয়ের একটা সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: তা থাক। আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।

ডাক্তার সেন তার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি ভাবছি, এদের এখন কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নরোত্তমবাবু মেয়ে-জামাইয়ের ভার নেবেন না। এদের আর কোন আত্মীয়কে আমি চিনি না। দময়ন্তীর স্বামীর সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই।

ডাক্তার বললেন: খুবই মুস্কিলের কথা।

আঘাত যদি সাময়িক হয়, তাহলে তেমন মুস্কিল নয়। আপনি আছেন, কোন রকমে সামলে নেওয়া যাবে।

কিন্তু আপনার পক্ষে—

আমার কিছু অসুবিধা হবে না, আমার জন্যে কোন চিন্তা করবেন না।

ডাক্তার সেন গভীর দৃষ্টিতে কাঠুরে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকালেন। তার কথা যেন এ-যুগের উপযোগী হয় নি। তাই তিনি দেখে নিতে চাইছেন যে এ কথায় আন্তরিকতা আছে কি না। ডাক্তার দেখে বিস্মিত হলেন যে, সেই কঠিন মুখ এখন বিষণ্ণ-উদ্বিগ্ন, অসহায় কি না বোঝা যাচ্ছে না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আমার ভয় কি জানেন? দময়ন্তী আমার সাহায্য নেবে না। আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন ডাক্তারবাবু?

এবারে তাকে সত্যিই অসহায় দেখাল। এত বড় চেহারার এই মানুষটিকে ডাক্তার আজ যেন নূতন রূপে দেখলেন। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে নির্বাক চেয়ে রইলেন।

কাঠুরে চৌধুরী সহসা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: ওর স্বামীর আঘাতটা কি রকম বলতে পারেন?

বলা মুস্কিল। তবে একবার চোখ মেলা দেখে মনে হয়, আবার চোখ মেলবেন। মাথার আঘাতের চেয়ে শরীরের আঘাতটাই বেশি বলে মনে হচ্ছে।

সামলে উঠতে কতদিন লাগবে?

মেরুদণ্ড ভেঙ্গে থাকলে বিপদের কথা। ওটা জখম হয়ে থাকলে তার নিচের অংশ অসাড় হয়ে যাবে।

প্যারালিসিস?

হ্যাঁ, কিছুদিন ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাবাদি করাবেন, তারপর—

কাঠুরে চৌধুরী ভয়ার্ত স্বরে বলল: তারপর আর বাঁচবেন না?

আশ্বাস দিয়ে ডাক্তার বললেন: তেমন জখম না হতেও পারে। হাড় এক-আধটা চিড় খেলে প্লাস্টার করে কয়েক মাস শুইয়ে রাখা হয়।

তারপরে উঠে দাঁড়াবেন তো?

সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকে, এমন আঘাত ত' আছে।

ডাক্তার সেন বার কয়েক চুরুটে টান দিয়ে দেখলেন যে সেটা নিভে গেছে। আর জ্বালালেন না। জানালা দিয়ে সেটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে শোবার জন্যে উঠে পড়লেন।

কাঠুরে চৌধুরী বুঝতে পেরেছে যে, দময়ন্তীর ভবিষ্যতটা একেবারেই অনিশ্চিত। তার স্বামী কাল চোখ মেলে তাকালেও বাঁচবে কি না জানা নেই। যদি বাঁচেও, তাহলে স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচবে কি।

কাঠুরে চৌধুরী তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে সেটা বাইরে ফেলে দিল। উঠে দাঁড়িয়েই সে চমকে গেল। মনে হয়, দরজার পাশ থেকে একটা ছায়া সরে গেল অকস্মাৎ। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। কার ছায়া তা দেখবার জন্য বাইরে আর গেল না।

বাইশ

কাঠুরে চৌধুরীর ঘরের সামনে দময়ন্তী কান পেতে তাদের কথোপকথন শুনতে আসে নি। এসেছিল অন্য কারণে। একটা আদিবাসী মেয়ে এসে বলেছিল যে, সে তার ঘরে থাকবে, তার ওপর গৃহকর্তার এই আদেশ আছে। দময়ন্তী এই প্রস্তাবকে চূড়ান্ত নির্লজ্জতা মনে করেছিল। এ ঘরে আজ কাঠুরে চৌধুরী শোবে না। শোবে তারা। এ কথা জেনেও মেয়েটা তার কাছে এসেছে। যদি ঐ বুনো লোকটার আদেশেই এসে থাকে তো তার একমাত্র কারণ তাকে অপমান করা। সে আজ অসহায় বলেই লোকটা এই সাহস পেল। দময়ন্তী সেই মেয়েটাকে কোন উত্তর দেয় নি, এসেছিল কাঠুরে চৌধুরীকে তার প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু দরজার কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভিতরে সে তারই কথা শুনল ডাক্তার সেনের মুখে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: খেমলানিবাবুর মেয়ের ভয় করবে না তো?

তা করতে পারে।

তবে?

মিসেস আলবার্টকে ওদের ঘরে থাকতে বলেছি।

দময়ন্তী আর ঘরে ঢোকে নি, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঠুরে চৌধুরীর সব কথা শুনেছে। প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিল তার বুদ্ধি ও আন্তরিকতা দেখে, তারপর তাকে একজন পাকা অভিনেতা বলে মনে করেছিল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের অভিমত শুনে সে আর দাঁড়াতে পারে নি। নিজের ঘরে পালিয়ে এসেছিল। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল।

ঘরের মেঝেয় সেই আদিবাসী মেয়েটি তার বিছানা বিছিয়েছিল। সে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এল। বাতি নিভিয়ে শোবে কি না বুঝতে পারলো না। দময়ন্তীর মেজাজ সম্বন্ধে তার কি ধারণা হয়েছিল সেই জানে, তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেল না। সেও শুয়ে পড়ল।

দময়ন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর খানিকটা সুস্থ হল। সত্যিই তার ভবিষ্যৎ এখন একেবারেই অনিশ্চিত। সে কথা ভাবতে এখন ভয় করছে। এই দুঃসময়ে সে কার সাহায্য প্রার্থনা করবে, তাও ভেবে পেল না। জগদীশের কোন আত্মীয়-স্বজন এ দিকে নেই। দেশে যাঁরা আছেন, তাঁরা জগদীশের এ বিবাহ সমর্থন করে নি। সে কি কারণে, দময়ন্তী তা সঠিক জানে না। এইটুকু শুধু জানে যে, তাঁদের কারও কাছে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। সাহায্য চাইতেই তাদের লজ্জা করবে।

দময়ন্তীর নিজের আত্মীয়দের কথাও মনে পড়ল। তার বাবা কি তাকে গ্রহণ করবেন? বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তাকে আশ্রয় দেবেন

না। দময়ন্তী তার কাছে বিবাহের অনুমতি চায় নি। সে জানত যে অনুমতি কিছুতেই পাবে না। এ বিশ্বাস তার মায়ের কথাতেই হয়েছিল, কিন্তু তার বাবার বাসনার কথা সে জানতে পারে নি। মায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর কাছে ফিরে গেলে তিনি হয় তো বলতেন। হয় তো তাঁর নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গেই তার বিবাহ দিয়ে দিতেন। মা এই কথা জানতেন বলেই তাকে অন্য উপদেশ আগে থেকেই দিয়ে রেখেছিলেন। দময়ন্তী তার মায়ের ইচ্ছাই পূরণ করেছিল।

জগদীশ মেহতা তাকে অন্য উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল: বাবার মত চাইলে ক্ষতি কি?

দময়ন্তী বলেছিল: তিনি তো মত দেবেন না।

যদি দেন, তাহলে তো আমাদেরই লাভ।

যদি না দেন?

তাহলেই বা ক্ষতি কি? আমরা যা করছি, তাই করব?

দময়ন্তী আপত্তি জানিয়ে বলেছিল: ক্ষতি আছে। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করলে তিনি আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মত না নিয়ে কিছু করলে ক্ষমা প্রার্থনা করা চলে।

জগদীশও চিন্তা করে এই কথা মেনে নিয়েছিল। বলেছিল: তোমাদের বাড়িতে গিয়ে আমারও এই সন্দেহ হয়েছে।

কি সন্দেহ?

সন্দেহ হয়েছে যে তোমার বাবা আমাকে খুব ভাল চোখে দেখছেন না, কেন তা বুঝতে পারি নি। তোমার মা শুধু সন্দেহ করেন নি, তাঁর বিশ্বাস খুব দৃঢ় ছিল।

শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী তাদের বিবাহের পরেই তার পিতাকে জানিয়েছিল। তিনি কোন উত্তর দেন নি। নরোত্তমবাবু সে চিঠি পান নি, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। মেয়ে হোস্টেলে নেই। অথচ কোথায় গেল, কি করল, কিছুই খবর নিলেন না, এমন হতে পারে না। জগদীশ ছাড়া যে আর কারও কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, তা তিনি জানতেন। ইচ্ছা থাকলে একবার খোঁজ নিতে পারতেন। তা যখন নেন নি, তখন তাঁর মনের কথা বুঝতে দময়ন্তীর কষ্ট হয় নি।

মামার কথা দমন্তীর মনে পড়ল। স্নেহপ্রবণ মাটিরমানুষ তিনি। সেবারে এসে আদর করে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে। জগদীশের খবর তিনিই তার মাকে দিয়েছিলেন, রাঁচির ঠিকানাও পাঠিয়েছিলেন যথাসময়ে। জগদীশের যে রূপ গুণের কল্পনা সে মনে মনে করেছিল, তার প্রায় সবটুকুই শোনা। মামাই তার মাকে বলেছিলেন। দময়ন্তীর খুব আশা ছিল যে, আর কেউ তাকে সমর্থন না করুক, মামা করবেন। তিনি খুশি হবেন। কিন্তু তা হল না। মামা তার চিঠির জবাব দিলেন না, দিলেন মামীমা। সে তো চিঠি নয়, দময়ন্তী তাকে কি বলবে ভেবে পায় নি। মানুষ এত কঠিন নিষ্ঠুর বাধ্য হতে পারে তা তার জানা ছিল না।

এই চিঠি পেয়ে দময়ন্তী কয়েকদিন কেঁদেছিল, তারপর দেখিয়েছিল জগদীশকে। জগদীশ দুঃখ পায় নি, সে হিংস্র হয়ে উঠেছিল। তার আগে সে লজ্জা পেয়েছিল কি না দময়ন্তী লক্ষ্য করে নি। দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল: আমি কি দোষ করেছি বলতে পার?

সে তো তুমি আমার চেয়ে বেশি জান।

তমি কি মনে কর, আমি কোন দোষ করেছি?

না।

তবে কার দোষে আমাকে এত কটুকথা শুনতে হল।

সে কথা ভেবে আমাদের লাভ নেই।

জগদীশের এ উত্তর দময়ন্তীর পছন্দ হয় নি। বলেছিল: উত্তরটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।

এ কথার পরেও জগদীশ সত্যকথা স্বীকার করে নি। বলেছিল: তোমার মায়ের মৃত্যু আর আমাদের বিয়ে নিয়ে অনেক মুখরোচক গল্প তৈরি হচ্ছে।

কোন মুখরোচক গল্প শোনবার আগ্রহ দময়ন্তীর হয় নি। কিন্তু জগদীশের ইচ্ছা ছিল শোনাবার। বলেছিল: লোকে বলছে—

দোহাই তোমার: দময়ন্তী বাধা দিয়েছিল: লোকের কথা আর আমাকে শুনিয়ো না। তোমার নিজের কথা কিছু থাকলে তাই বল। জগদীশ নিজের কথা বলবার সাহস কোনদিন পায় নি। নিজের কথা সে গোপন করেই রাখত, দময়ন্তীর কাছে ছোট হবার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু সহসা একদিন সব প্রকাশ হয়ে গেল। ললিতা সব প্রকাশ করে দিল।

সেই ললিতা। তার মামাতো বোন। জুনাগড় থেকে ফিরে আসবার পর দময়ন্তী ভাবে নি যে আবার কোথাও তার সঙ্গে দেখা হবে। আর দেখা হলে যে সেই সাক্ষাৎ এমন ভয়ঙ্কর হবে, এ তার কল্পনার অতীত ছিল। জীবনে এত বড় আঘাত সে কখনও পায় নি। তার মায়ের মৃত্যুও তার কাছে কম বেদনার বলে মনে হয়েছিল।

রেজেষ্ট্রি করে তাদের বিবাহ হয়েছিল। তার অনেক দিন পরের ঘটনা। কলকাতার নিউ মার্কেটের একটা কাপড়ের দোকানে দেখা হয়েছিল ললিতার সঙ্গে। ললিতা জগদীশকে দেখে ছিল প্রথমে, তারপরে তাকিয়েছিল দময়ন্তীর দিকে। দু' চোখ তার জ্বলে উঠেই নিবে গিয়েছিল। হাসবার চেষ্টা করে বলেছিল: দময়ন্তী যে! কোথায় আছিস আজকাল?

ললিতাকে দেখে দময়ন্তী সত্যিই খুশি হয়েছিল। তার হাত দু'টো চেপে ধরে বলেছিল: এখানে আমাদের দেখা হবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!

তা কি করে ভাববে!

ললিতার উত্তর শুনে দময়ন্তী আশ্চর্য হয়েছিল। তার কণ্ঠে তো আনন্দের সুর নেই, বরং বিদ্রূপের মতো তীক্ষ্ণ মনে হয়েছিল তার কথা।

জগদীশ আর দাঁড়াতে চায় নি। দময়ন্তীকে বলেছিল: চল।

এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে ললিতা থেমে গিয়েছিল। দোকানের ভিতর থেকে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছিল। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোমার পরিচিত বুঝি?

সংক্ষেপে ললিতা বলল: হ্যাঁ।

দময়ন্তী বলল: ললিতা আমার মামাতো বোন।

সত্যি! তবে তো তোমার সঙ্গেই আমার সবচেয়ে মধুর সম্বন্ধ। কই আমাদের বিয়ের সময় তো তোমাকে দেখি নি!

ললিতা খবর পায় নি বলল না, বলল: এত দূর থেকে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

তা সত্যি। বলে ভদ্রলোক জগদীশের দিকে তাকালেন।

দময়ন্তী হেসে বলল: আমার স্বামী জগদীশ মেহতা।

ভদ্রলোক তার হাত ধরে প্রবল ভাবে ঝাঁকালেন। বললেন: আমার নাম কানাইয়ালাল। এ দোকান আপনাদেরই।

জগদীশ এ কথার উত্তর দিতে পারে নি। উত্তর দিয়েছিল দময়ন্তী, বলেছিল: আপনি তো দেখছি রাজা মানুষ।

আর উনি ?

উনি কুলির সর্দার। সারাদিনই কুলি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজত্বটা তাহলে ওঁরই বলুন। বলে কানাইয়ালাল হেসে উঠলেন।

জগদীশ আর একবার তাড়া দিল, বলল: আর দেরি নয় দময়ন্তী, আমাদের আবার ফিরতে হবে।

কানাইয়ালাল বাধা দিয়ে বললেন: সে কি কথা। আমাদের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবেন না! তুমি এদের বাড়ি নিয়ে যাও ললিতা, আমি এখুনি আসছি।

ললিতা কোন উত্তর না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

দময়ন্তী তখনও জানত না যে তার মনে এত আগুন ছিল। কানাইয়ালাল মানুষটিকে তার মন্দ লাগে নি। ললিতার তুলনায় বয়স একটু বেশি, এই যা। কিন্তু সোজা সরল মানুষ। সংসার করবার জন্যে এই রকম মানুষই তো ভাল। কিন্তু—

ললিতা যেন আর একটি মানুষের গল্প তাকে শুনিয়েছিল। জুনাগড়ের উপরকোটে ললিতা তার সঙ্গে বেড়াতে যেত। জলের ধারে বাঁধানো চত্বরের উপর বসত পাশাপাশি। তারপর সারাবেলা গল্প করত। আরও কত জায়গায় তারা বেড়াতে যেত, কত গল্প করত। সে কি এই কানাইয়ালালজীর সঙ্গে!

এ কথা ভাবতেই দময়ন্তী একটা ধাক্কা খেল। এই প্রৌঢ় মানুষটার সঙ্গে ললিতা নিশ্চয়ই ভাব করে নি। এঁর সঙ্গে সংসার করা হয় তো মানায়। কিন্তু কাঁচা বয়সে পূর্বরাগের কথা বড়ই বেমানান। তবে কি ললিতার জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে! তার প্রিয়পাত্রকে ছেড়ে বিয়ে করতে হয়েছে এই মাঝবয়সী মানুষটিকে!

কানাইয়ালালজীকে দময়ন্তীর একজন সুখী মানুষ বলে মনে হল। কিন্তু ললিতার আচরণে কিছু ক্ষোভ ছিল, কিছু উত্তাপ। দময়ন্তীর মনে হচ্ছিল যে মনে সেই উত্তাপ চেপে ললিতা আগে আগে চলেছে। জগদীশের সঙ্গে সে চলেছে পিছনে। ললিতা কথা বলছে না। তার মুখ বড় গম্ভীর, চলায় এমন একটা দৃপ্তভঙ্গি যে দময়ন্তীর কোন কথা বলার সাহস হল না।

নিউ মার্কেটের সামনেই একটা তেতলার ফ্ল্যাটে ললিতারা থাকে। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছবার আর দরকার হল না। সিঁড়ির নিচে পৌঁছেই ললিতা দময়ন্তীকে আক্রমণ করল। সে এক বীভৎস বন্য আক্রমণ। দময়ন্তীর মনে হল, ললিতা তার দুহাতের নখ দিয়ে তাকে চিরে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। দময়ন্তী পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন অভিযোগের উত্তর দিতে পারল না।

জগদীশ তাকে হাত ধরে বাহিরে টেনে এনেছিল। ট্যাক্সি করে ফিরিয়ে এনেছিল হাওড়া স্টেশনে। তারপর রাঁচিতে। বাড়ি পৌঁছবার আগে দময়ন্তী এককোঁটা চোখের জল ফেলে নি।

জগদীশের অনেক কথা দময়ন্তীর মনে পড়ে। অনেক কৈফিয়তের কথা। বলেছিল: তুমি আমাকে বিশ্বাস কর দময়ন্তী, ললিতাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করতে পারত, তবে কি খেলা করেছিলে ওর সঙ্গে? কিন্তু সে কথা বলতে তার ঘৃণা হয়েছিল।

জগদীশ নিজেই এ অভিযোগের জবাব দিয়েছিল, বলেছিল: আমি ওর সঙ্গে খেলাও করি নি। সে তার মায়ের কাছে কি শুনেছিল জানি নে, কখনও বাড়ি গেলে আমাকে সে টেনে বার করত। একা আসত আমার কাছে, একা আমার সঙ্গে বেড়াতে যেত। সে তার মায়ের কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু আমি তাকে কোন আশ্বাস দিই নি। আমার একমাত্র দোষ যে আমি তাকে শক্ত কথা কোনদিন বলি নি।

জগদীশ এ কথাও বলেছে: তোমার মামাকে তুমি চিঠি লিখে জেনে নাও, ললিতার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাঁর কোন কথা হয়েছে কি না। সব জেনে নিয়ে আমাকে তুমি দোষ দিও।

তার মামার কথা দময়ন্তী জানে, তাই বিশ্বাস করেছিল জগদীশের কথা। শুধু ললিতাকে ফাঁকি দেবার কথা সে সমর্থন করতে পারে নি। আরও একটা খটকা তার মনে ছিল। জগদীশের নিজের পরিবার কেন তার উপর বিমুখ হল। এ কথা সে একদিন জগদীশকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

জগদীশ হেসে বলেছিল: খুব স্বাভাবিক কারণে।

দময়ন্তী আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি, শুধু আরও কিছু শোনবার জন্যে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

জগদীশ বলেছিল: আমার বাবা নেই তুমি জানো। আমার পড়ার খরচ জুগিয়েছিলেন আমার বড় ভাই। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কোন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে তিনি সেই খরচ তুলবেন। তাঁর সে আশায় আমি ছাই দিয়েছি।

এ কথা শোনবার পর দময়ন্তী তাঁকে সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। বলেছিল: অকারণে তোমাকে আমি অপরাধী ভেবেছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তারপর তারা সংসার সাজাতে শুরু করেছিল মনোযোগ দিয়ে। জগদীশ বলেছিল নাই বা আমাদের কেউ রইল, আমরা তো আছি। দময়ন্তী মুগ্ধ হয়েছিল এই কথা শুনে। উপযুক্ত কোন উত্তর দিতে পারে নি। [ক্রমশ।

We meet in grief, but let us also meet in renwed dedication and renewed vigour. Let us meet in action, in tolerance, and in mutual understanding. John Kennedy's death commands what his life conveyed—that America must move forward. The time has come for Americans of all races and creeds and political beliefs to understand and to respect one another. So let us put an end to the teaching and the preaching of hate and evil and violence. Let us turn away from the fanatics of the far left and the far right, from the apostles of bitterness and bigotry, from those defiant of law, and those who pour venom into our nation's bloodstream.

—Lyndon B. Johnson.

কিংশুক রাগিণী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

মামা উপায়ের কথা শুনেই অভ্যাসবশত বাঁ হাত এগিয়ে দিয়েছিল কিংশুকের কথায় হাত টেনে নিয়ে লজ্জিত হয়ে বললে—না না ও কিছু নয়। ও কথার মাত্রা।—দাঁড়া। দেখি আর এক খেপ চা বানাতে পারি কি না, নাহলে মাথা খুলবে না। রুটি খাবি ?

কিছুক্ষণ বাদে দু'টো রেকাবীতে করে রুটি গুড় নিয়ে এসে বললে—খা।····দেখ বাপু, আমার বিদ্যে-বুদ্ধি যাই হোক জজ কোর্টে কাজ করি। আইন-টাইন কিছু কিছু জানি। যাকে বলে 'না বিইয়ে কানাই-এর মা।' কাজেই আইনের দিকটা আমার ওপর ছেড়ে দে। দরকার হলে তুলসীবাবুর ওপিনিয়নও নিতে পারবো। না রে বাপু, কারুর নাম করবো না, সে জ্ঞান আমার আছে। তুই এ দিকটা সামলা।

—কোন দিক ?

—ভেতরের দিক। কথায় বলে মামলা সাক্ষীর মুখে। এ মামলার আসামী তুই, ফরেদা ঐ ছুঁড়িটা। আর প্রধান সাক্ষী হচ্ছে রাগিণী। কারণ বীথি বলেছে শুধু তাকে নয় রাগিণীকেও তুই বিয়ের কথাটা বলেছিস। মনে হচ্ছে দরকার হলে রাগিণীকেও সে সাক্ষী মানতে পারে। এখন এই রাগিণীকে আগে থেকেই ফুসলে বাগে আনতে হবে। দেখিস যেন সত্যি সত্যি ফুসলে আনিস নি। তোকে কিছু বলাও বিপদ, লেখাপড়া করছিস এক কথায় একশোটা মানে করিস। সোজা কথা হচ্ছে সিধে গিয়ে রাগিণীকে সব কথা খুলে বল। উপায় নেই।

—দেখ দেখি সেই যা বলেছিলুম তাই হল। বলেছিলুম চা খেতে যাব না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে। তখন তো বড্ড বলেছিলি রাস্তার জল ঠিক নর্দমায় পড়বে। এখন ?

—নর্দমাতেই পড়ত। কিন্তু তুমি ফট করে নর্দমা বুজিয়ে সেখানে নহবতখানা বানালে জল দাঁড়াবে না তো কি ওর পড়বে ?

কিংশুক ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, এখন বিপদে পড়েছি যা ইচ্ছে তাই তো বলবিই।

মামা লজ্জিত হয়ে বললে—না রে কিং তুই ওকথা কেন ভাবছিস ? তোর বিপদে আমি, শুধু আমি কেন দলের কেউ যা ইচ্ছে তাই বলবে, ভাববে, এ কথা ভাবতে পারলি। বলছি আলটপকা একটা কথা বলে কি ফ্যাচাকলে ফেঁসে গেলি বলত। হিসেব মত দেখতে গেলে এ জন্যে আমিও দায়ী। আমিই তোকে রাগিণীর কাছে পাঠিয়েছি, বীথির বাড়িতে আমার কথাতেই গেছিস।

কিংশুক মামার কথায় মনে মনে খুশী হয়ে বললে, না তুমি [illegible] হবি কেন ? আমি রাগিণীদের বাড়ি যাচ্ছিলুমই।

—তা যাচ্ছিলি ঠিকই, তবে আমার সঙ্গে দেখা না হলে তোর প্রাণে যা চাইত তাই বলতিস। ঐখানেই [illegible] [illegible] গড়াতো না। আমিও দায়ী হতুম না। [illegible] বেশিদূর গড়াবে না। শেষকালে [illegible] যাবে। [illegible] যতই তড়পাক কেউ তাকে খায় না, [illegible] পোঁতে। কিন্তু আমি ভাবছি ছুঁড়ি। এত [illegible] মনে হয় না। ঠিক আছে। [illegible] মাত [illegible]। রাগিণীকে গিয়ে সব কিছু খুলে বল সব—ঠিক হো যায়গা।

সেদিন থেকেই মনটা ও বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কতবার যে রাগিণীর সঙ্গে কথা বলেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তবুও ওপথ দিয়ে যখন এসেছে তখন সশরীরে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে ইতস্তত বোধ করেছে। কি নিয়ে হাজির হয়। একটা কিছু নিয়ে ত' উঠতে হবে যাকে ঘিরে কথা সুরু হবে। দীর্ঘদিন বাদে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গেলে লোকে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে যায়। সবাই হাঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। খারাপ জিনিষ হলেও বলে বা বেশ সুন্দর সন্দেশ তো। দেশের আর পাঁচটা কথা ঐ থেকে ওঠে কথাবার্তা চালু হয়, আগন্তুক জামা খুলে দাওয়ায় জমিয়ে বসে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হ'বার উপায় নেই। কিংশুক মনে মনে হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা কিছু পাওয়া যায় না যা নিয়ে রাগিণীর কাছে হাজির হওয়া যায় আর দীর্ঘ সময় ওর সঙ্গে কাটান যায়। এক বাবা থাকিয়া তাও সেদিন তাঁকে আগের দিন সন্ধ্যেবেলাকার মত বাঁখালো কণ্ঠে সম্বোধন করতে শোনা গেল না। শুধু তাই নয়, না যাবার [illegible] সত্যিই দুঃখিত মনে হল। মামা যেন ওর হাতে সুযোগ তুলে দিলেন বিপদে পড়েছ, এই বিপদ ধরেই বিপত্তারিণীর কাছে যাও। অবশ্য একথাটা নিজেরই আগে মনে আসা উচিত ছিল। ওর সন্দেহ জাগতে লাগল লেখাপড়া শিখে কি লাভ হচ্ছে ? প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি ও মামার মত খোলতাই হচ্ছে না।

মামা বললে—কি রে চুপ করে রইলি যে ?

—না তাই যাব।

—ওসব লাজলজ্জা শিকেয় তুলে রাখ। বেশ ভালো করে নরম দিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলবি। দরকার হলে দেখি পাদপল্লব বলে জড়িয়ে পড়বি। আরে বাবা আমাদের ত' কাজ হাসিল করা নিয়ে কথা তা সে পাদপল্লব বলেই হোক কি টিঁচকপালী বলেই হোক। গোড়া থেকে সব খুলে বলবি। বলবি, তুমি যদি মার কাছে সেদিন ঐ কথাগুলো না বলতে তা হলে এমনটি আজ হোত না। তোমার কথা শুনে ভারি রাগ হয়েছিল তাই ডাঁট দেখাবার জন্তে বীথির সঙ্গে বিয়ের কথাটা তোমাকে বলেছিলুম। তাতেও যদি দেখিস নরম না হয়, তাহলে বলে দিবি কিছু হলে আমি তোমাকেও না জড়িয়ে ছাড়ব না। আমি তো ডুবিছি তোমাকেও ছাড়বো না। কি রে বলতে পারবি তো ? কি বলবি বল দেখি শুনি। তোকে কিছু বলাও—থাকগে শুনলে তো আবার ফোঁস করে উঠবি।

—ঠিক আছে সব মনে আছে আমার। ওকে ছাড়বো না।

—ব্যস্ তাহলেই হল। বস, আসছি। তারপর চ' খানিকটা ঘুরে আসি দেখি আর কিছু মাথায় উঁকি ঝুঁকি মারে কি না।

মামা ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে বললে—আড়াল থেকে শুনেছ ত'সব।

—ওমা এ জিনিষ না শুনে থাকা যায়।

—যা ভাবে গিয়ে ভারি সুবিধে হয়েছে তোমার। বৈঠকখানায় আর কথা কইবার জো নেই, অমনি কান পাতবে।

—কান পাতবার দরকার হয় না একজন শোনাবার জন্তে যা চাক পেটাচ্ছিল সদর দরজা বন্ধ না থাকলে বোধ হয় বীথি শুনতে পেয়ে ছুটে আসত।

—তাই নাকি। তাহলে তোমার দোষ নেই। শোন একবার বেলাবেলি গিনীর কাছে গিয়ে সব বলে এসো। আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। নেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যাবে। কিং এমনিতে মেনীমুখো কিন্তু গোঁ আছে। রেগে গেলে কি করে বসে তার ঠিক নেই এ সব ব্যাপারে আইন আদালত অবধি ছোটা যায়। বীথি ছুঁড়ি সোজা পাত্রী নয় ওর বোনগুলোকে জানো ত। রাগিণীকে যদি বীথি জিজ্ঞেস করে তবে শুধু না-ই বলবে না, গালাগালি দিয়ে যেন ভূত ভাগিয়ে দেয়।

—তা বলব, আর এও বলব সত্যিকারের পাদপল্লব বুনারস্ তোমার বন্ধুকে দিয়ে বলিয়ে তবে যেন ছাড়ে।

—প্রিয়ে, বিয়ে হলে পর সারা জীবনই আমার মত গরুড় পক্ষী হয়ে থাকবে, এখন দিনকতক একটু হাত-পা খেলিয়ে ঘুরতে দাও না।

সন্ধ্যে পার করে কিংশুক বাড়ি ঢুকলো—সঙ্গে মামাও আছে। ছেলেকে দেখে তরুবালা বললেন—কি রে, কলেজ থেকে কোথায় গিয়েছিলি ?

—আমাদের বাড়িতে ছিল খুড়িমা।

—এতখানি রাত হল ভেবে মরি।

মামা মাথা চুলকে বললে—অন্যায় হয়ে গেছে। কলেজ থেকে বাড়িতেই আসছিল, আমার সঙ্গে দেখা—বললুম চ' এক কাপ চা খেয়ে যাবি। তারপর ব্যস্ কথায় কথায় সন্ধ্যে—

তরুবালা হেসে বললেন—কি যে তোমাদের এত কথা, জানি না।

—তুই বস, আমি আসছি।—বলে কিংশুক ওপরে উঠে গেল।

কিংশুক যাবার পর মামা বললে—একখানা চিঠি আজ পেয়েছে।

—দেখলুম সকালে এলো।

—আপনাকে বলতুম না। কিন্তু সেদিন যখন এই অধম সন্তানের ওপর কিং-এর দেখাশোনার ভার দিয়েছেন তখন আপনাকে বলা আমার কর্তব্য মনে করলুম। কিং অবশ্য বলেছিল, না কি হবে মাকে বলে। আমায় আপনি যা বলেছেন তা আমি ওর কাছে ভাঙ্গি নি। আমি মনে মনে বললুম সে তুমি যাই বল আমি খুড়িমাকে না বলে ছাড়ছি নে। আপনি যেন ওকে কিছু বলবেন না তাহলে আমায় খুন করে ফেলবে। চিঠিটা পড়বেন ? এই যে—বলে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বললে—কোথায় ফেললুম আবার।

—ও আমি কি পড়ব ?

—তা ঠিক পড়বার মত কিছু নেই। রাগিণী এসে বীথির কথা যা বলেছিল কিং কথায় কথায় মহাবীরকে বলেছে। রোগা মানুষরা একটুতেই টং হয়। মহাবীর আবার বাইরে যেমন রোগা ভেতরেও তেমনি পেটরোগা যাকে বলে আগাপাস্তলা রোগা। আর যাবে কোথায় শুনে লাফিয়ে উঠলো। সে কি ইংরেজি বুলি। গোরা-পল্টনকে বলে ওদিকে থাক। হাতে পায়ে ইংরেজি ছুটছে। সটান চলে গেছে মণ্ডলদের বাড়ি। গিয়ে বীথিকে এই মারে তো সেই মারে। তোমার এতদূর আস্পর্ধা তুমি কিং-এর নামে যা তা বল সেই কথা আবার খুড়িমার কানে যায়। জান খুড়িমাকে আমরা মার মত শ্রদ্ধাভক্তি করি। নো মার মত নয় তার চেয়েও বড় ঠাকুমাদাদের মত শ্রদ্ধাভক্তি, ওর যেমন সব কথা তাই বলে এসেছে।

—তা ও মেয়েটার কি দোষ।

—দেখুন দিকি। জানেন খুড়িমা মেয়েটা ওর বোনেদের মত নয়। না না মিথ্যে বলে ত লাভ নেই। তবে ওরা বেজাত বেঘরের লোক ওর চালচলনই আলাদা আমাদের কেমন উড়নচণ্ডে উড়নচণ্ডে বলে মনে হয়। সে মরুক গে যাক্। তাই বীথি লিখেছে এসব কথা কে রটাচ্ছে জানি না আপনি আমার বড়-ভাই-এর মত আপনার মাকে আমার নিজের মার মত—এই সব আমি বললুম তা ওসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করিস্ নি। তোরা তো ঠিক আছিস্ তা হলেই হোল। আপ সাচ্চা তো জগৎ আচ্ছা। তাই ভাবলুম আপনাকে বলে যাই। কিং বললে কি না খেতে বসেছি কাণ্ডটা মার সামনেই চিঠি এনে দিলে। মা না জানি কি ভাবছে। ঠিক কথা এই রকম একটা কথা আপনার কানে এসেছে তার ওপর চিঠি, মা'র ভাবনা হবে এ আর বিচিত্তির কি।

কিংশুক এল। দুইবন্ধু পড়ার-ঘরে ঢুকলো।

—মার সঙ্গে আবার কি কথা হচ্ছিল।

—বললুম সব।

—কি বললি।

মামা যা বলেছিল বললে।

—এত মিথ্যেও তুই বলতে পারিস।

—না মিথ্যে বলবে না। খুড়িমাকে বলি বীথি লিখেছে তাকে

আপনার পুত্রের বৌ না করলে সে কোর্টে যাবে। কিং তাকে বিয়ে করবে বলে নিজের মুখে কথা দিয়ে এখন পেছিয়ে আসছে। বললে ভাল হত ?

—এখন যা বলে এলি এটা গোপে টিকবে তো।

—খোপা বাড়ি যাবেই না তো টৈকটেকি কি ? কাল তুই গিন্নীকে ফুসলে যাগে—দেখিস্ বাবা সতীকারের ফোসলান যেন না হয়, হ্যাঁ। আর আমারও হয়েছে এমন যে মুখ দিয়ে আর ভাল কথা বেরুতে চায় না। এদিকে মহাবীর এসেই তাকে ক্যাঁক করে চেপে ধরবো। বলব তোমার ভেইজী এমন চিঠি লেখ কেন ? তুমি তার সঙ্গে পিরীতির ঝগড়া করবে আর তার চোট পড়বে অন্ত লোকের ওপরে, তা হবে না।

হেঁসেলপাট গুছিয়ে অনুপমা ঘরে ঢুকলে মামা বললে—বাবাঃ এতক্ষণে দেবীর আগমন হল, কখন থেকে হা পিত্যেস করে বসে আছি। বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে জিভে কড়া পড়ে গেল।

—আর বিড়ি খেও না, গন্ধে কাছে এগোয় কার সাধ্যি, পান খাও দেখি গন্ধ মরুক।

—পান খেয়ে কি হবে, তার চেয়ে কাছে এসো মুখ-মধু পান করি তাতে গন্ধ মরবে, মনে ফুর্তি আনবে, দেহে অযুত হস্তীর বল পাব। ও তো মুখ না মধুর খনি।

—আঃ হা হা ! খনির কথা ত' দেখি কেবল রাত্তির বেলাতেই মনে পড়ে, দিনমানে তো বাবুর ছায়া দেখাও যায় না।

—বেশ এবার থেকে দিনের বেলাতেও মধু-পান করতে চাইব বঞ্চিত করতে পারবে না কিন্তু। জেঠাইমা রয়েছে—কি জেঠাইমা আসছে বললেও রেহাই পাবে না আগে থেকে বলে দিলুম।

—খুব হয়েছে।

মধুপান করে মামা বললে—এবার বল রাগিণীর সঙ্গে দেখা হল ?

—হয়েছে। খবর ভাল নয়। কাল ওরা কলকাতায় যাবে। মামাতো বোনের বিয়ে হঠাৎ ঠিক হয়েছে। রাগিণীর ছোটমামা ওদের নিতে এসেছে।

—এ একরকম ভালই হল। প্রধান সাক্ষী যখন থাকবে না তখন মামলাও মুলতুবী থাকবে।

—না মশাই মামলা শেষ, ফয়সালা হয়ে গেছে !

—বল কি ?

অনুপমা এরপর যা বললে তা শুনে মামাকে উঠে বসতে হল। বললে—এ যে কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরুল দেখছি। এখন উপায় ?

—উপায় একটা বার করতেই হবে। তুমি যেন একথা কারুকে বল না। আসুক ও রাগিণী কলকাতা থেকে।

—তার আগেই যদি কিছু ঘটে বসে ?

—ঘটবে বলে তো মনে হয় না। তোমরাও তো আনন্দ ঠাকুরপোর বিয়েতে যাচ্ছ। এক তরফা বীথি আর কি ঘটাবে ?

পরদিন সকালে কিংশুক পড়ছিল মামা এল।

—কি রে তুই সকালবেলা।

—[illegible] যাচ্ছি। ভাবলুম একবার ঢুঁ-মেরে যাই।··· রাগিণী আজ কলকাতায় যাচ্ছে শুনলুম।

—হ্যাঁ বাড়িতে কে যেন বলছিল কাল। কার যেন বিয়ে।

—চিঠির কি করবি?

—জবাব দেব।

—কাকে?

—বীথিকে। কাগজে কলমে নয় মুখে। ভাবছি আজ বিকেলে ওদের বাড়িতে যাব।

—কি বলবি?

—যা মুখে আসে। অকেল ইজ দি বেষ্ট ডিফেন্স। মানে···।

—বুঝেছি বুঝেছি। ইংরেজী জ্ঞান যাই হোক জজকোর্টে কাজ করি ডিফেন্স অফেন্স কাকে বলে ভাল করেই বুঝি। তা বলছিলুম কি গিয়ে কাজ নেই।

—না না গরম গরম হয়ে যাওয়াই ভালো। চিঠি লেখা বার করছি। কিছু না করলে পেয়ে বসবে। ভাববে ভয় পেয়েছে। হয়ত নিজেই বাড়িতে এসে হাজির হবে। ও-মেয়ে সব পারে।

—ধর যদি রাগিণীকে সাক্ষী মেনে বসে। তুই তো বলতে গেলে রাগিণীকে নিজের মুখেই বিয়ের কথাটা বলেছিস। তাই বলছিলুম রাগিণীকে আগে সব জানিয়ে মানে আটঘাঁট বেঁধে এগোনই ভালো। মেয়েমানুষের মন রাগিণী যদি বলে বসে যে, হ্যাঁ শুকদেবদা' আমার কাছে সে কথা বলেছে।

কিংশুক গম্ভীরভাবে বললে—রাগিণী যে এ-কথা বলবে না এ বিশ্বাস তার ওপর আমার আছে।

মামা ভ্রূ কুঁচকে বললে—বিশ্বাস আবার কবে থেকে হল?

—হয়েছে কিছুদিন হয়।

—তা মনে কর হয়—এর পরেতে যদি অন্ত হয় হয়ে থাকে। মেয়েমানুষের মন কোথায় সর্ট সার্কিট হয়ে আছে কে জানে। সুইচ মারলি আগুন ধরলো, তখন?

—মহাবীররা কবে ফিরবে?

মামা বুঝতে পারলো কিংশুক কথা ঘোরাচ্ছে। উঠে বললে—চলি। মহাবীররা বোধ হয় আজকালের ভেতরেই ফিরবে। বরযাত্রী যাচ্ছিস তো।

—সবাই গেলে নিশ্চয়ই যাব। তুই ছুটি পেলি?

—দিইছি তো দরখাস্ত, পাব বোধ হয়, চলি।

[illegible] এ সময় বাড়িতে থাকেন না জেনেই কিংশুক বীথিদের বাড়ি [illegible] হল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ড্রয়িংরুমে আলো জ্বললেও কেউ সেখানে নেই দেখে কিংশুক ভেতরের দিককার দরজার কাছে গিয়ে জোর গলায় ডাকলে—[illegible]।

বীথি [illegible] ছিল গলায় আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এসে কিংশুককে [illegible] বললে চিঠিতে কাজ হয়েছে তাহলে। দাঁড়াও [illegible] মুখে বললে—[illegible] বাড়ি নেই, ড্যাডীর [illegible]

[illegible] নয়, তাদের দরকার। আমি ড্রইংরুমে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব। আমার কাছে কারুর বসে থাকবার দরকার নেই।

ড্যাডীর সঙ্গে দরকার শুনে বীথি ঘাবড়ে গেল, বললে—ড্যাডীর সঙ্গে কি দরকার?

পকেট থেকে খামটা বার করে কিংশুক বললে—সে কথা ড্যাডীকেই বলব। চিঠি লেখা বার করছি। এই রকম জঘন্য চিঠি যে কোনও মেয়ে লিখতে পারে তা আমার ধারণাও ছিল না। আবার বলে কি না আমরা কালচার্ড। আমাদের হাই সোসাইটি।

—ঐ চিঠিতে যা আছে তা কি মিথ্যে?

—শুধু মিথ্যে নয় নির্জলা মিথ্যে।

—তুমি নিজের মুখে রাগিণীর কাছে বিয়ের কথা বল নি, এই ঘরে বসে আমাকে সে কথা শোনাও নি?

—না।

—তুমি বল নি?

—না।

—বেশ ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল তো—।

—এই সব নোংরা জিনিষের সঙ্গে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা হয়।

—ওঃ! মহাত্মা! সেন্ট! বেশ বল না ড্যাডীকে আমিও রাগিণীকে ডেকে আনবো। সে নিজে আমায় বলে গেছে যা সত্যি তাই সে বলবে। দেখি তখন তুমি কেমন করে অস্বীকার কর।

—মিথ্যে কথা, রাগিণী বলতে পারে না। তোমার এই মিথ্যে ভয় দেখানোতে কিংশুক দত্ত কাবু হবে না।

—বিশ্বাস না হয় রাগিণীকে জিজ্ঞেস করে এসো।

—সে আজ কলকাতায় যাচ্ছে।

—এলে পর জিজ্ঞেস করো।

বীথির কথা শুনে কিংশুকের মনে কেমন সন্দেহ জাগলো। মামার কথা মনে পড়ল। রাগিণীকে সব না জানিয়ে এগোনটা কি ভাল হল? একটু সময় নিয়ে বললে—বেশ তো তাতেই বা কি। আমার ফাঁসী হবে না। বলব আমার বাপের অগাধ টাকা দেখে এরা আমাকে মিথ্যে কেলেঙ্কারীতে জড়াতে চাইছে। আমার কোনও চিঠি নেই জিনিষ নেই। তাছাড়া দত্তবাড়ির সঙ্গে রায়বাড়ির যে ভেতরে ভেতরে রেষারেষি আছে তা সবাই না জানলেও অনেকেই জানে। রাগিণী সেই জন্যেই মিথ্যে কথা বলছে। সুতরাং আমার পক্ষে এ জিনিষ যে সাজানো তা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। তা ছাড়া এবাড়ির এরকম প্যাঁচে ফেলার ইতিহাস এই নতুন নয়। আমার স্বজাতি নয় স্বধর্ম নয় এমন কিছু আহা মরি রূপ নয় যে তাকে না পেলে কিংশুক দত্ত ত্রিভুবন অন্ধকার দেখবে। কে বিশ্বাস করবে এ চিঠির কথা? তারপর হবে মানহানির মামলা। তখন বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল। যার তার সঙ্গে আমি এ আলোচনা করতে চাই না। স্যর আসুন তাঁকেই সব বলব। তিনি আমার শিক্ষক, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁকে আগে সব বলা কর্তব্য বলেই আমি আজ এসেছি।

কিংশুকের কথায় বীথি ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল। কিংশুককে দেখে মনে হচ্ছে ড্যাডীকে না বলে ও উঠবে না।

কি করা যায় ? যা ভেবেছিল তা তো হল না, এ তো নীচু হলই না উল্টে কুলোপানা চক্কর নিয়ে কোঁস করে উঠছে।

কিংশুক ভাবছে যা বলেছি একেবারে মোক্ষম। এখন স্যর আসবার আগেই পালানো যায় কি করে? স্যারেরও তো আসবার সময় হল। যদি এসে পড়েন তাহলে এতক্ষণ ধরে যা তড়পালুম তা যদি চেপে যাই তাহলে এই রাক্ষুসী এরপরে এ সহরে টিকতে দেবে না। উঠি কি বলে? সিগারেট টানবার নাম করে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবো? তারপর এক ফাঁকে না হয় কেটে পড়ব'খন।

দুজনে যখন দুদিকে মুখ করে ভাবছে কি করি ম্যাও কি নষ্ট করি তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকল কাজল। দুজনকে দেখে নিয়ে কৌচে বসে হাত পা ছড়িয়ে বলল—টায়ার্ড, ট্যু টায়ার্ড। স্টেশনে গিয়েছিলাম রাণুদের তুলে দিতে। ঘুরতে ঘুরতে আপনার কথা মনে পড়ল চলে এলাম। আপনাদের অসুবিধে ঘটালাম না তো।

বীথি বললে। না না, উনি বাবার কাছে পড়তে এসেছেন। বাবা বাড়িতে নেই। উনি একলা থাকবেন তাই বসেছিলুম আপনি এলেন ভালই হোল। ড্যাডির সঙ্গে আলাপ করে যাবেন। আজ আপনাকে ছাড়ছি না। কোডিতা শোনাতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয়ই শোনাব। তবে তার আগে ইনস্‌পিরেশন জোগান।

—এ কাপ অফ টি প্লীজ, মিস্‌ ইজি।

—নিশ্চয়।—বলে ভেতরে চলে গেল।

বীথি চলে যেতে কিংশুকও উঠে দাঁড়াল দেখে কাজল বললে—এ কি উঠলেন যে?—

—হ্যাঁ, যাই। স্যরের দেখছি আসতে দেরি হবে।

—বসুন না, মিস্‌ ইজির হাতের চা খান, অধমের কোডিতা শুনুন।

—অধমের কোডিতা, অধমার জন্যে—বলে দ্রুতপায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ল।

১৪

রবিবার। মাসকেলের বিয়ের আগে শেষ ছুটির দিন, টাটি প্রায় ভর্তি, মাসকেল ও মহাবীর এলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে। সাড়ে দশটা বাজতে চলল অথচ ও দুটোর কারুরই দেখা নেই। টাটের গোপালেরা উসখুস করতে লাগল। অবশেষে মহাবীর এল। সকলে হেসে উঠল। মামা বললে—সেই কখন থেকে ধুনো গঙ্গাজল ছিটিয়ে বসে আছি তোদের পাত্তাই নেই। আসল মাল গেল কোথায়?

—বাড়িতে।

কিংশুক বললে—বাড়িতে কি করছে?

তিনকড়ি বললে—বাড়িতে থাকা রিহার্সাল দিচ্ছে। এ্যাদ্দিন তো কাক ডাকলে ঘর ছাড়তো আর চৌকিদার হাঁকতে শুরু করলে বাড়ি ঢুকতো, এখন আর তা চলবে না, কলেজ যাবে আর ছুটি হলেই ফিরে এসে খোঁপে ঢুকতে হবে।

মৃগাঙ্ক বললে—সব কেনাকেটা হয়েছে? মাসকেলরা কি কি গয়না দেবে নতুন বৌকে?

মহাবীর ঠোঁট উল্টে বললে—দেখে যা দেবার। ভাল লাগে না, আই ডোণ্ট লাইক দিস বিয়ে বিজনেস।

মামা বললে—তা তুই অমন করছিস কেন? বিয়ে ত' আর তুই করবি না। নিজেই তো ওপরপড়া হয়ে মাসকেলের সঙ্গে কলকাতায় গেলি।

—গেলুম কি আর সাধে। ছেলেটা একটা কম্পেনিয়ন পায় না। তোদের সবাইয়ের একটা না একটা কাজ কেউ যেতে পারবি নি তাই গেলুম। অমন করছি কি আর অমনি অমনি! বিয়ে হবে না:

দুলাল চোখ কপালে তুলে বললে—হবে না মানে আমি যে আদ্দির পাঞ্জাবী করালুম।

মহাবীর চটে গিয়ে বললে—নিজের ছেলের বিয়েতে পরে যাবি। কালজিরে আর ন্যাপথলিন দিয়ে পোটম্যাণ্টে তুলে রাখ।

তিনকড়ি বললে—কাল বৌ বললে মেয়ের কাকা এসে বরপণের অর্ধেক হাজার টাকা আর বরযাত্রীদের খরচা বাবদ তিনশ' টাকা দিয়ে গেছে, আর তুই বলছিস বিয়ে হবে না। কি হল আবার? মাসকেলের বাবা বুঝি লাস্ট মিনিটে-এ আর একটা জিনিষ চাপিয়েছেন।

—না মাসকেল বেঁকে বসেছে। বিয়ে করবে না।

মামা বিড়ি ধরিয়ে বললে—কি ব্যাপার বল দেখি। গোড়া থেকে উপড়ে ফেল।

স্থান: কলকাতা। তিন জনে খেতে বসেছে। মাসকেল, মহাবীর ও মাসকেলের বড় ভগ্নীপতি পাঁচুগোপালবাবু, মাসকেলের বড়দি এসে বললেন—পিসীমা আসছেন।

পাঁচুবাবু আঁতকে উঠলেন—এই মরেছে।

পিসীমা এলেন, বয়েস হলেও আঁটসাট পেটা চেহারা। মাথায় কাঁচা-পাকা ছোট ছোট চুল। দুই ভ্রূর মাঝখানে উল্কি দিয়ে ফোটা কাটা, চোখের দৃষ্টি সর্বদাই খুঁত ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখের ধার প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের লোক জানে। এরই নাতনীর সঙ্গে মাসকেলের বিয়ের কথা উঠেছিল।

—কই-রে পাঁচুগোপাল তোর শালা কই! এইটে বুঝি?—মহাবীরের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে পিসী বললেন।

—ও আমাদের মহাবীর চন্দর। আমার শ্যালক হচ্ছেন এইটি। বলে বাঁ-হাত দিয়ে মাসকেলের পিঠ চাপড়ালেন।

পিসী মহাবীরকে পাঁচুবাবুর শালা ভেবে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। এই ঘাটের মড়ার সঙ্গে নাতনীর বিয়ে ঠিক না হয়ে ভালোই হয়েছে। এ ছোঁড়া বিয়ের ধকল সইবার আগেই পটল তুলবে। মনে-মনে পিসী মা সিদ্ধেশ্বরীর উদ্দেশ্যে প্রণামও করেছিলেন। কিন্তু পাঁচুবাবু যখন মাসকেলকে দেখিয়ে দিলেন তখন তাঁর চক্ষুস্থির—এই ছেলে! এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। যখন শুনেছিলেন ছেলের বাবা নিজে দেখে সত্যপালের মেয়ে কালিদাসীকে পছন্দ করেছে তখন তিনি স্থির ধরে নিয়েছিলেন ছেলেও কালীর মত কাঠকয়লা। তা না হলে কোনও বাপ কালীর মত মেয়েকে ছেলের বৌ করতে চাইবে না। এখন মাসকেলকে দেখে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হায়, হায়, এমন ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল মোটে ক'টা টাকার জন্যে তাও আবার বাগালে কিনা সত্যপাল যার মেয়েকে দেখলে ভূত পালায়। পিসীর মাথায় খুন চেপে গেল জিভ লকলকিয়ে উঠল।

—বলি, এ কাজটা কি ভাল হল পাঁচুগোপাল। যেও না বৌমা তুমিও শোন।

—কোন কাজটা?—পাঁচুগোপালবাবুর গলায় ভাত আটকে গেল।

—আমি না হয় তোর দূর সম্পর্কের পিসী আমার নাতনীও দূর সম্পর্কের ভাইঝি গন্ধের গন্ধ মরলে কান্না নেই তা সে না থাকুক কিন্তু তোর এই চাঁদের মত শালা এতো আর দূর সম্পর্কের নয়। পরিবারের আপন ভাই এর গলায় ঐ হিড়িম্বা ঝুলিয়ে দিচ্ছিস্ কোন আক্কেলে? ধর্মে সইবে। আহা এমন সোনার চাঁদ ছেলে। কি চেহারা। আমার গীতার সঙ্গে কি মানানটাই মানাতো। তার কপালে এই।

—আমি কিচ্ছু জানি না পিসী। জিজ্ঞেস কর তোমার বৌমাকে। শ্বশুর মশায় দেখেশুনে তবে কথা দিয়েছেন।

—তোর শ্বশুর'—এই অবধি বলেই পিসীর খেয়াল হল শ্বশুরের ছেলেমেয়ে দুটিই সামনে আছে সুতরাং বাকীটুকু উহ্য রেখে ঘুরিয়ে বললেন—শ্বশুর না হয় বুড়ো মানুষ কি দেখতে কি দেখেছে আর সত্যপাল যা লোক কি ভুজুং ভাজুং দিয়েছে তা কে জানে। বলি তুই না করতে পারলি নি। তোর চোখে তো আর চালশে পড়ে নি। টাকা দেখে সব ভুলে গেলি। আমিও তো বলেছিলুম যে দোব নগদ বারশ' টাকা তারপর গয়না গাটি তো আছেই। তা যদি জানতুম যে তোদের এত টাকার খাঁই না হয় আর কিছু ধরে দিতুম তবু এমন ছেলেকে ভাসিয়ে দিতুম না'—তারপর মাসকেলকে বললেন—হ্যাঁ ধন কি নাম তোমার!

মাসকেল মুখ গোঁজ করে বললে—আনন্দ।

—আহা হা, যেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা তেমনি প্রাণজুড়ানো নাম, আমার গীতার সঙ্গে কি মানানটাই না মানাতো, তা হাঁ বাবা তুমি মেয়ে দেখেছ।

মাসকেল মাথা নেড়ে জানাল, না।

মহাবীর বললে,—না আমরা কেউ দেখি নি। ওর বাবা বলেছিলেন দেখতে ও রাজি হয় নি। বললে উনি যখন দেখেছেন তখন আর দেখবে না।

—আহা কি ভক্তি বাপের ওপর। অথচ বাপের কি রকম ধারা ব্যাভার? এ বাপের মত কাজ হল? টাকা পেয়ে ছেলেকে ভাসিয়ে দেয় যে বাপ, আমি হলে সাতজন্মে তার মুখ দেখতুম না। তা বাছা আমার ওপর রাগই কর আর যাই কর।

মহাবীর ফোঁস করে উঠল—ভাসাবে কেন। স্পষ্ট তো বলেইছেন মেয়ে একটু কালো।

—শান ছোঁড়ার কথা। বলে কিনা একটু কালো। একটু কালো কি রে? ভরদুপুরে চোখ-মুখ বন্ধ করে কয়লার চুপড়িতে বসিয়ে রাখলে চেনা যাবে না। নামে কালিদাসী, চেহারায় কালিরাণী! বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস কর ওর ভগ্নীপতিকে, ঐ তো পাশে বসে গিলছে। কি রে, পাঁচুগোপাল, মুখে যে রা' নেই। ছি! ছি! তুমি বাপ

পয়সাটাই তোমার কাছে বড় হল, ছেলের মুখের দিকে একবারও তাকালে না। খ্যাংড়া মারি অমন পয়সার মুখে, এরা আবার সব লেখাপড়া জানা লোক। খ্যাংড়া মারি অমন লেখাপড়ার মুখে।—পিসী বকতে বকতে চলে গেলেন। মাসকেল ভাত ফেলে উঠে পড়ল। বাড়িতে ফিরে মাসকেল মাকে ডেকে বললে,—আমি বিয়ে করব না, বাবাকে বলে দিও।

—ও মা, সে কি কথা! কি হল আবার?

—একটা হিড়িম্বাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

—হিড়িম্বা কি রে?

—যা বললুম তাই। বড়দির পিসশাশুড়ি ঠিক এই কথাই বললে। বিশ্বাস না হয় মহাবীরকে ডেকে জিজ্ঞেস কর।

মহাবীরের মুখে কাহিনী শুনে মাসকেলের বাপ প্রতুলবাবু প্রথমটা জামাই-এর পিসীর সপিণ্ডকরণ করলেন। তারপর ক্রোধ ক্রন্দন অনুনয় তূণে যে ক'টি বাণ ছিল, সব 'ছেলের' ওপর প্রয়োগ করলেন। শেষটা বাড়িশুদ্ধ লোক মিলে যখন চেপে ধরল তখন মহাবীর পালিয়ে এল।

মহাবীর বললে,—সে দিন দেখাতে পারলুম না, কেটে পড়লুম। হাড়িকাঠে ফেললে পাঁঠাগুলো যেমন পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে মাসকেলকে দেখে আমার তাই মনে হল। গুষ্টিশুদ্ধ ওকে বলি দেবার জন্যে চেপে ধরেছে আর ও তা থেকে উদ্ধারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অনলি ডিফারেন্স পাঁঠাগুলো চেঁচায় ও চেঁচাতে পারছে না। পাঁঠার চাইতেও ট্র্যাজিক ফিগার। থ্যাঙ্ক গড আমার বাপ-মা নেই। থাকলে হয়ত এমনি বলি দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন। মাসকেলের রিলেটিভরা ধর্ম দেখাচ্ছে, বাপের কথায় কে কি করেছিল তার ফিরিস্তি দিচ্ছে। বলে কি না রামচন্দ্র বুড়ো বাপের কথায় চোদ্দ বছর বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভুলেও একবার বলে না যে লক্ষ্মণচন্দ্র সেই বুড়ো বাপকে খুন করতে চেয়েছিলেন, 'হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়ী হ্যাসক্ত মানসম্।' স্ত্রৈণ বুড়োটাকে খুন করবো। হিপোক্রিটস্: দরকার হলেই ধর্ম টেনে আনে একবারও বাপকে বলছে না কেন এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলে।

মামা বললে—কিন্তু আগে থেকে পরের কথায় এমন বেঁকে বসাটা কি ঠিক হচ্ছে। পিসশাশুড়ি দেখলে তার নাতনীর সঙ্গে হোল না, সে ভাংচি দিলে। লাগে তুক্ না লাগে তাক্।

দুলাল উৎসাহিত হয়ে বললে—ঠিক বলেছিস্। বিয়েতে অমন ভাংচি আকছার হচ্ছে। আগে বিয়ে কর দেখ, তারপরের কথা তারপর। আমরা বলে যাবার জন্যে পাঞ্জাবী টাঞ্জাবী তৈরি করে রেডি হয়ে আছি।

দরজায় টোকা পড়ল। তিনকড়ি উঠে দরজা খুলে দিলে, শ্রীকান্ত

ঘরে ঢুকে বললে—প্রতুলবাবু বৈঠকখানায় বসে আছেন। আপনাদের ডাকছেন।

মামা বললেন—প্রতুলবাবু। মাসকেলের বাপ? দেখ দিকি কি জ্বালা। এইখানে ডেকে নিয়ে আয় না।

মহাবীর বাধা দিয়ে বললে—না না ওসব জিনিষ এখানে ডিসকাস করলে টাটের প্রেষ্টিজ থাকবে না। বৈঠকখানায় যা তোরা। দুলাল বললে—তুই যাবি নি?

—নোও। সার্টেনলি নট।

প্রতুলবাবু ছেলের বন্ধুদের কাছে কেঁদে ফেললেন।

—তোমরাই বল বাবা, কি আমার অপরাধ। বুড়ো মানুষ দেখে পছন্দ করেছি, রং কালো তাও এসে বলেছি। তোকে তো পই পই করে বললুম দেখে আয়। গেলি না। বললি, বাবা যখন দেখেছে তখনই হবে। তবে? এখন পেছুচ্ছিস কেন? আমি যে বড়মুখ করে ছেলের কথা পাঁচজনকে বলে বেড়িয়েছি। দেখ কি ছেলে আমার কি ভক্তি ছেলের বাপের ওপর। এখন আমার সে মুখ রইল কোথায়? তারপর পণের অর্ধেক টাকা নিয়ে ভেঙ্গে বসে আছি সে টাকাটাই বা ফেরত দেব কোত্থেকে। কালো। আমি তো নিজেই বলেছি যে মেয়ে কালো। কিছু রাখি ঢাকি নি তো। বাঙ্গালার ঘরে কটা মেয়ে ফর্সা হয় তোমরাই বল তো বাবা। সে বুড়ি মাগী যে মিছে কথা বলে নি তা বুঝলি কি করে? হিড়িম্বার মত মানুষ হয়? বল, তোমরাই বল। এ বিয়ে না হলে আমায় গলায় দাড়ি দিতে হবে। তোমরা একটু বুঝিয়ে বল বাবা সব। বেশ ত এ বৌ যদি সত্যিই হিড়িম্বার মত হয়, তুই আর একটা বিয়ে করিস। এ বৌ নিয়ে তোকে ঘর করতে হবে না। তোর পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে থেকে বে' দেব। তোমরা একটু বুঝিয়ে বল বাবা।

দুলাল বললে—নিশ্চয়ই বলব, আপনি কিছু ভাববেন না, সব ঠিক আমরাও জামাটামা বানিয়ে তৈরি হয়ে আছি এখন বলে কিনা বিয়ে করবে না। চল সব, কিংশুক, হিনকড়ে, মামা কোথায় গেলি? চলুন, বিয়ে করবে না মানে। আদ্দির পাঞ্জাবী করালুম এখন বলে কিনা, হুঁ—।

দুলালই সবাইকে টেনে মাসকেলদের বাড়ি নিয়ে গেল।

বন্ধুদের কথায় মাসকেল শান্তস্বরে বললে—তোরাও কেউ আমার দুঃখের দিকে তাকাবি না?

কথাটায় এমন বিষাদ মাখানো ছিল যে বন্ধুরা ভেতরে ভেতরে সবাই তা অনুভব করলো। মামা আমতা আমতা করে বললে—সবই বুঝি রে সবই বুঝি। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তোর বাবা তো বলছেনই মেয়ে কালো তবে হিঁড়িম্বার মত দেখতে নয়। তিনি কি আর দেখেশুনে অমন মেয়েকে বৌ করবেন। আর করলেই বা উপায় কি?—বলে উদাস সুরে বললে—মানুষ হয়ে জন্মেছ কর্তব্য করে যাও পরকালের কাজ হবে। বাপের মুখ রাখ।

—বেশ তাই রাখবো। এরপর কিছু হলে আমায় দু'বিসনি যেন। মহাবীর ঠিকই বলে। কিং পারিস তো বিয়ে করিস নি আর করলেও—থাক গে। তোদের সবাইকে যেতে হবে। ফাঁসীতে যখন লটকাচ্ছিস্ তখন দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে কেমন করে জিভ বার-হয় আমার।

চাঁদের হাট ষ্টেশনে যখন বরযাত্রীর দল নামল তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। জন তিরিশের একটি দল। দলে মাসকেলের বাবা, মামা ও দু'টি ভাই বোন, টাটের গোপালেরা ত' আছেই তার ওপরে আখড়ার পালোয়ানরাও এসেছে। পালোয়ানেরা মাসকেলকে গুরুর মত শ্রদ্ধাভক্তি করে এবং গুরুর বন্ধুদের গুরুবৎ দেখে। মালপত্তর ওঠানামা করান কুলীদের ঝামেলা পোয়ান সবই তারা করেছে ফলে বন্ধুর দল বেশ স্ফূর্তিতে এসেছে। মাসকেলের মুখেও দু'চারটে কথা শোনা গেছে।

ষ্টেশনে সত্যবাবুর ভাই নিত্যহরি এসেছেন বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করতে। ষ্টেশন থেকে পলাশডাঙ্গা গ্রাম প্রায় ক্রোশদেড়েকের পথ। মৃগাঙ্কদের ইচ্ছে ছিল হেঁটেই যায় বেশ দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। কিন্তু নিত্যহরিবাবু বাধ সাধলেন।

—না না পথে একহাঁটু জল কাদা, জামা কাপড় নষ্ট হবে। পড়ে-ফড়ে গেলে আবার—।

জামা কাপড় নষ্ট হবে শুনে দুলাল বলে উঠল—না না হেঁটে কাজ নেই। জল-কাদা মেখে ভূত হতে হবে। তার ওপর আছাড়-টাছাড় খেলেই তো হয়েছে।

দুর্গা দুর্গা বলে আটখানা গরুর গাড়ি ছাড়ল। ষ্টেশন এলাকা ছাড়াবার পরই রাস্তার দুপাশে আর বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র রইল না, ফাঁকা মাঠ জলে ভর্তি। গাড়িগুলো এতক্ষণ পরপর যাচ্ছিল, হঠাৎ বরযাত্রীবাবুদের মাথায় 'রেস' এর বাই ঢুকলো। গাড়োয়ানরা পরম উৎসাহে নিজেদের কেরামতি দেখবার জন্যে বলদের লেজ মুচড়ে দিলে। সুরু হল রেস। বরের গাড়ির বলদদুটো তাজা ছিল সেটা সবার আগে এগিয়ে যেতে লাগল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কয়েকমিনিট ছুটল দুলালদের গাড়ি। তারপরেই দেখা গেল দুলালদের গাড়িটা রাস্তা থেকে নেমে খানায় গিয়ে পড়েছে। আরোহীদের আঘাত লাগে নি তবে তারা জল কাদায় ভূতের মূর্তি ধারণ করেছে আর দুলালের সাধের পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে গেছে।

অবশেষে সন্ধ্যে সন্ধ্যে নাগাদ পলাশডাঙ্গা গ্রামে এসে 'গো-ভ্যান' ঢুকলো। সত্যপাল হাতজোড় করে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর চেহারা দেখেই মামার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মনে হল, পাঁচুবাবুর পিসী বোধ হয় ঠিক কথাই বলেছে। পাঁচুবাবু বুদ্ধিমান লোক—স্ত্রীক পাঠিয়েছেন, নিজে আসেন নি, পাছে বরযাত্রী আসতে হয়। বৌভাতের দিন আসবেন বলে শ্বশুরকে জানিয়েছেন।

বরের আসর হয়েছিল বাড়ি থেকে কিছুদূরে হুল্লোড় মহলে। পালেদের অবস্থা যখন আরও ভাল ছিল তখন এইখানে ছিল বাগান-বাড়ি, হুল্লোড় হত। তাই থেকে গাঁয়ের লোকেরা নাম দিয়েছিল হুল্লোড় মহল। হুল্লোড় মহল দোতলা বাড়ি, ওপরে চারখানা ঘর, চারদিকে ঘোরান বারান্দা। একতলায় দু'পাশে টানা দু'খানা বড় ঘর, মাঝখানে পলাশ-ঘাট জনের আসরের জায়গা। দু'দিক খোলা আসরের উপযুক্ত স্থান। এখন এখানে স্কুল বসে। বরের চেহারা দেখে সকলে একবাক্যে স্বীকার করল, এমন বর এ অঞ্চলে কেউ আনতে পারে নি। এমন কি সত্যবাবুর অন্ত সরিকেরাও নয়। নানা রকম মন্তব্য শোনা গেল।

—নাঃ, মেয়েটার বরাত ভাল। তবে কি না জান, যাকে বলে কাকে-বকে মিলন, তাই হবে।

—আস্তে আস্তে; কে কোথায় শুনে ফেলবে। চল চল, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নাও, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বিয়ে ত' তোমার সাড়ে দশটার পর। থাকবে নাকি?

—ক্ষেপেছ!

—ও মিশ্চিন্তে ইদিকে শোন সে···বরের শালা জবর চেহারা, মেইয়ে বাঁচলে হয়।

নিশ্চিন্তে বললে—ভীমের পাটটা দিলে কেমন হয় বল দিকি? বড় করে সুরকির কলের দারোয়ানের মত মোচ লাগিয়ে হাতে গদা দিয়ে আসরে নামিয়ে দাও। মুখে আর পদভরে কাঁপিবে মেদিনী বলবার দরকার হবেক নি, আসরে নামলেই সব কম্পমান, একবার দেখ না যেয়ে ছেয়ে যদি লামাতে পারো।

চা এল, সঙ্গে একথালা জিবে গজা। সত্যবাবু হাতজোড় করে বললেন—একটু চা খেয়ে নিন। আমার আয়োজনও সামান্য দয়া করে ক্ষেমা-ঘেন্না করে মানিয়ে নেবেন। বেইমশাই আপনাদের থাকবার জায়গা দোতলায় হয়েছে। এখানে সব ছেলে-ছোকরারা থাকবেন, হৈ-হৈ আমোদ ফুর্তি হবে, আপনি ওপরে নিরিবিলিতে থাকবেন'খন। এই ছিদাম—।

—এই যে কত্তা।

—কোথায় ছিলি? এইখান থেকে নড়বিনি বাবুরা যা বলে তাই করবি। যদি শুনি যে গাঁজা খেয়ে ব্যোম্ হয়ে আছ, কুপিয়ে মারব। একে যা দরকার হয় সব বলবেন।

বরযাত্রীরা হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে লাগলো। কিংশুক বড়লোকের ছেলে তাই তার স্পেশ্যাল খাতির। সত্যবাবু বললেন—আপনি দত্তবাড়ির ছেলে, জামাইয়ের বন্ধু এই আমার সৌভাগ্য। ত্রুটিবিচ্যুতি সব ক্ষমা করবেন।

কিংশুকের গলায় জিবেগজা আটকে গেল, মাথা নীচু করে লজ্জায় লাল হয়ে বললে—না না ত্রুটি কি·····।

—বেইমশাই আর একটু দয়া করতে হবে যে।

—বলুন।

একবার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে। সাধ্যমত আয়োজন করিছি বটে কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য। যদি একবার চোখ বুলিয়ে দেখে আসেন তাহলে মনে বল পাই। তারপর এসে বিশ্রাম করুন। বিয়ের লগ্ন তো আপনার সাড়ে দশটার পর। বরকে দশটা নাগাদ তুলে নিয়ে যাবো। চলুন বেইমশাই।···নিত্য তুমি তাহলে থাক এখানে সিগারেট-ঠিগারেট দাও বাবুদের। ওঃ বাবা এ আবার বিদ্যুৎ চমকায় দেখছি। ভালয় ভালয় কাজ উদ্ধার হলে বাঁচি।

বলাই বললে—আমিও এই তালে একবার কাকাবাবুর পেছুতে পেছুতে ভেতরের হালচাল দেখে আসি। থ্যাটের কি রকম বন্দোবস্ত হয়েছে আগে থেকে জানা থাকলে টানতে সুবিধে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে সবাই ফিরে এলেন। প্রতুলবাবু শ্যালক ও ছেলেপুলে সহ ওপরে ওঠবার মুখে মামাকে বললেন—সব মানিয়ে গুছিয়ে নিও। আমি তো ওপরেই রইলুম, দরকার হলে ডেকো। শুকদেব বাবাজী বন্ধুর বিয়েতে যখন এসেছ তখন একটু কষ্ট সইতে হবে।

প্রতুলবাবু দলবল সহ ওপরে উঠে গেলে পর বলাইকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে মামা বললে—কি রকম দেখলি?

—কজিভোর ব্যবস্থা। সবার জন্যে লুচি হয়েছে, বরযাত্রীদের জন্যে স্পেশ্যাল ছাড়ছে পোলাও আর চপ, মাছ মাংস মিষ্টিফিষ্টি তো আছেই।

মামা খেঁকিয়ে উঠল,—ধ্যার তোর খাওয়ার নিকুচি করেচে।

বলাই বললে—কেন খাওয়ার নিকুচি হবে? এ্যাদ্দুরে ঠেঙিয়ে এলুম কি অমনি অমনি।

—আরে বাবা খাওয়ার কথা হবে না। বলি কনে দেখেছিস্?

—না।

—তা দেখবি কেন? শুধু খাওয়ার তালেই আছিস্।

—বলে দিবি তো। ঐ এসে গেছে, কই হে নিয়ে এসো।

—কি আনবে?

—সিদ্ধির সরবত মালাই ফালাই দিয়ে কড়া বানিয়েছে। আমি ওখানে একটু চেখে এলুম যে। তাই বলে বেশি খাচ্ছি নি। বড় জোর এক কাপ। অল্প অল্প ফুর ফুরে নেশা হবে। গো-গাড়ির ব্যথা মরবে খিদেটাও বাড়িয়ে দেবে। বেশি খাস্‌নি মামা। বড় পাজী জিনিষ চড়াং করে কখন যে মাথায় চড়ে বসে বোঝবার উপায় নেই। কই হে দাও একটু, ও বাবা সঙ্গে আবার রসগোল্লা এনেছ দেখছি।

সিদ্ধির সরবত পেয়ে বরযাত্রীর দল হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মামার সিদ্ধিতে বেজায় ভয় সে একটুখানি খেল। কিংশুকের কোনদিন এসব জিনিষ ভাল লাগে না, তবুও পাল্লায় পড়ে ঠোঁট ভেজাতে হল। মহাবীরকে দিতেই সে সরিয়ে দিয়ে বলল—টেক্ ইট এওয়ে ফ্রম মী। যতসব রাসটিক্ কাণ্ডকারখানা। চাপরাশী দরোয়ানের নেশা—।

দু' জগ সিদ্ধি ও এক গামলা মিষ্টি দেখতে দেখতে শেষ হল। তারপরেই শুরু হল দুলাল ঘোষের স্পেশ্যাল শো।

পেট্রোম্যাক্সটার চারদিকে পোকা উড়ছিল। মামা চুপি চুপি কিংশুককে বললে—রগড় দেখবি; হাসিয়ে দি ব্যাটাদের। তারপর দেখ মজা।—বলে দুলালকে উদ্দেশ করে বললে—দুলাল ঐ দেখ পোকাগুলো আলো খেতে এসেছে। এক কাপ করে আলো দে ওদের।

তিনকড়ি ফিক করে হেসে বললে—সাজ চাট হিসেবে একটুকরো বাতাস।

কিশোরী খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললে—দুই-এ মিলে বুড়ির মাথার পাকা চুল তৈরী হবে।

মৃগাঙ্ক হেসে উঠল। বলাই হাসি চাপতে চাপতে বললে—যা মাইরী হাসাস নি, গা গুলোচ্ছে।

দুলালের হাতে তখনও এক কাপ মাল। চটে গিয়ে বললে—তবে খাস্ কেন, পেটে পড়তে না পড়তেই যদি গা গুলোয় তবে এসবের ধারে কাছে থাকিস্ কেন।

মৃগাঙ্ক কোনও কথা না বলে হেসে চলেছে আর বলতে চেষ্টা করছে বুড়ির মাথায়···ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ···।

দুলাল বললে—দেখ না মৃগাঙ্কের অবস্থা, কেমন নেশা হয়েছে।

মামা বললে—তুমি হাতের মালটুকু গিলো না। চারকাপ তো হয়েছে আর কেন? আমি হেন লোক এক কাপ খেয়েই বুঝতে পারছি।

—তোরা হচ্ছিস্ ছিঁচকে নেশাখোর পেটে পড়তে না পড়তেই ভ্যাওড়াতে থাকিস্। বলে এক ঢোকে কাপ শেষ করে বললে—দুলাল ঘোষ ঐ হুজ্জত থানেওলা। এই মৃগাঙ্ক চুপ করলি, আবার হাসে।

কে কার কথা শোনে: মৃগাঙ্ক দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে হেসে চলেছে। দুলাল কাছে গিয়ে মৃগাঙ্ককে বার দুই নাড়া দিয়ে 'চুপ করলি' বলেই অকস্মাৎ তীরবেগে ও পাশের বারান্দায় ছুটে গিয়ে একটা খুঁটি জড়িয়ে উবু হয়ে বসে মুখ নীচু করে, 'ওয়াক্' দিতে শুরু করল।

মৃগাঙ্ক 'ওয়াক' শুনে একবার মুখ তুলে দুলালকে দেখে বললে—মামা দুলালের গলায় জগ আটকেছে। ব্যাটাকে এক কাপ আলো আর একটু বাতাস দে। থুঃ—থুঃ।

নিত্যহরিবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে এদের নেশা ধরেছে। তাড়াতাড়ি রাস্তার ওপাশের গাছ থেকে লেবু ছিঁড়ে নিয়ে এসে কেটে বড় একটুকরো মৃগাঙ্কর হাতে দিয়ে বললেন, এটা চুষতে থাকুন, সেরে যাবে'খন।

এরপর নিত্যহরিবাবু দুলালের কাছে গেলেন, সে তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। নিত্যহরিবাবু তাকে লেবু দিতেই সে বললে—না, মশাই, ওয়াক্ এল মিষ্টিটা একটু বেশি হয়ে গেছে বলে। সিদ্ধিতে কি করবে? লেবু খেয়ে এমন ফাইন নেশাটা মাটি করি আর কি। ওদের দেখুন, তিনকড়ে, বলাই, কিশোরী। যত সব ছিচকে নেশাখোর।

ধীরে ধীরে আসরের চেহারা পাল্টাতে লাগলো। চারু, নিরঞ্জন, ভূপেশ, হরেন আখড়ার সব পালোয়ানেরা একে একে ভাল লাগছে না বলে ফরাসের এখানে ওখানে ধরা শয্যা নিতে লাগলো। যাদের ওরই মধ্যে বুদ্ধি সজাগ ছিল তারা ঘরের মধ্যে গিয়ে জমি নিলে। লেবুর রস পেটে যাওয়াতে মৃগাঙ্কর নেশাটা বোধ হয় একটু কমেছিল সে চোখ চেয়ে ভালো করে সব দেখে নিয়ে বললে—মামা একটুকরো লেবু দে তো।

মাসকেল বললে—কি হল সব বলতো, আমার ভাল ঠেকছে না।

দুলালের করুণকণ্ঠ শোনা গেল—মামা, মামা, কিং···।

মামা বললে—কি হল?

—আমার বুকের মধ্যে মাইরী কেমন করছে, মাথাটা···ও বাবাগো।

মাসকেল আঁৎকে উঠে বললে—কি হল রে?

সবাই মানে যারা সজাগ ছিল দুলালের কাছে গেল। দুলালের সাড়া নেই। বার দুই ডাকাডাকি করেও কোনও ফল হল না। রাস্তার গ্রামবাসীরা কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে বরযাত্রীবাবুদের রস খেয়ে বেলেল্লাগিরি করা উপভোগ করছিল। নিত্যহরিবাবু তাদের কয়েকজনকে দিয়ে রাস্তার ওপাশের টিউবওয়েল থেকে দুবালতি জল আনিয়ে পাঁজাকোলা করে, দুলালকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে মামাকে বললেন—মাথায় জল ঢালুন।

মেঘ ডাকছে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। গ্রামবাসীরা গতিক সুবিধের নয় দেখে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সব সরে পড়ল।

পেট্রোমাক্স জ্বলছে, রাজ্যের পোকা এসে আসর ছেয়ে ফেলেছে সে কি ছোটখাট পোকা। এক একটা ইয়া বড় বড়। যারা বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে—তাদের কোনও জ্বালা নেই কিন্তু জেগে যারা আছে তাদেরই হয়েছে বিপদ। পোকার জ্বালায় অস্থির। পোকা তাড়াতে তাড়াতে কিংশুক বললে—এই বিপদে পড়তে হবে জানলে ওদের মত সিদ্ধি খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতুম।

দু'বালতি জলেতেও কিছু হল না। নিত্যহরিবাবু বললেন—ধরুন ওকে জল আনি। পালোয়ানদের মধ্যে মাসকেলের পরই সমীরের স্থান, দেখবার মত চেহারা। সে বেচারার নেশা হলেও জ্ঞান ছিল তবে ভাল করে চোখ খুলতে পারছিল না বলে এতক্ষণ একধারে চুপ করে বসেছিল। নিত্যহরিবাবুর কথা শুনে গায়ের পাঞ্জাবী খুলে কাপড় হাঁটুর ওপর গুটিয়ে বললে, আপনি আনবেন কি, আমি আনছি। আমার কাঁধে তুলে দিন।

মামা বললে—জলের বালতি কাঁধে নিবি কি করে?

—ঠিক আছে মামাদা, বালতিটা হাতে তুলে দিন। আর আমি চোখ চাইতে পারছি না আমার হাত ধরে নিয়ে চলুন। আপনাদের কিছু করতে হবে না।

মহাবীর মুখ বিকৃত করে বললে—আর ঐ সঙ্গে গান ধরিস্ মামা, আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি তো টিউবওয়েল চিনি নে। এল আরও বালতি কয়েক জল। ঢালা হল দুলালের মাথায়। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং।

নিত্যহরিবাবু দুলালের চোখ দু'টো টেনে একবার দেখে বললেন—আরও জল ঢালতে হবে।

সমীর বললে—কাঁহাতক আর জল টানা যায়, তার চেয়ে এককাজ করুন, আমি ওকে নিয়ে গিয়ে টিউবওয়েলের তলায় বসছি। আপনারা হ্যাণ্ডেল মারুন। মামাদা আমায় ধর।

নিত্যহরিবাবু বললেন—সেই ভাল। নিয়ে চলুন, আমি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

সমীর দুলালকে কাঁধে ফেলে নিয়ে চললো, মামা তার হাত ধরে পথ দেখাচ্ছে। পেছনে লণ্ঠন হাতে মহাবীর। মাসকেল ও কিংশুককে ওরা নামতে দেয় নি। কিশোরী বললে—আমি আসব রে?

—কোন কম্মে।

—হাতল মারতে। তোরা একলাই খেটে মরবি। আমার নেশা কেটে গেছে। তিনকড়িও উঠে বসেছে।

—চলে আয়।

কিশোরী হাতল ঠেলতে লাগল, মামা দুলালের তালুতে জল থাবড়াতে লাগল। মহাবীর ওদের সামনে দিয়ে একহাঁটু কাদার মধ্যে থিড় থিড় করতে করতে রাস্তায় পায়চারী করতে লাগল।

মাসকেলই এক সময় বললে—মহাবীর উঠে আয় কি কাদায় মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

মহাবীর কাদা পায়েই উঠে এসে ফরাসের ওপর বসে পড়ল।

ফরাস অবশ্য তার আগেই বরযাত্রীদের পদচিহ্ন নামাবলীর আকার ধারণ করেছে।

কিংশুক বললে—কি বিড়বিড় করছিস।

মাসকেল শুকনো মুখে বললে—আমার গাল দিচ্ছিস না রে ?

—নো, সার্টেনলি নট্।

—তবে ?

—ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলুম। থ্যাঙ্ক গড্, মাই পেরেন্টস্ আর ডেড এণ্ড গন্। বেঁচে থাকলে তোমারই মত জোর করে বিয়ে দিত। আর এরা সব বরযাত্রী আসত। ঠিক এই কাণ্ড হত। তুই এর পর শান্ত মনে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে পারবি ?

কিংশুক বললে—পারতেই হবে। উপায় কি।

—সে আট উপায় কি ? একবার তাকিয়ে দেখ দেখি, ইট্স এ ব্যাটল ফীল্ড নট এ বরের আসর। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখ, সব ডেড সোলজারস্ পড়ে আছে। এদের নিয়ে কোথাও বেরুতে আছে। সব হা-ঘরের দল। সিদ্ধি তাই পাঁচ-ছ'কাপ করে গিলে বসলো। ননসেন্স।

লোকজন নিয়ে সত্যবাবু এলেন। সত্যবাবু দুলালের কাছে গিয়ে দেখে বললেন—এখন কেমন আছ বাবাজী ? নিতার মুখে শুনলুম সব কি কাণ্ড, এমন তো হয় না। কেমন লাগছে এখন।

দুলাল ক্ষীণস্বরে বললে—ভাল।

—বেশ, বেশ।

কিছুক্ষণ পরেই প্রতুলবাবু ও ওপরের সবাই নেমে এলেন। সত্যবাবু হাত জোড় করে বললেন—তা'হলে বেইমশাই অনুমতি দিন, বর তুলে নিয়ে যাই।

—বেশ, এদেরও একবার—।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—বলে হাত জোড় করে সত্যবাবু বললেন—তা'হলে সভাস্থ পাঁচ জনের অনুমতি নিয়ে বর তুলছি। ও-ঘরটা একবার দেখি।

মহাবীর বললে—দেখবেন আর কি, সব ঘুমুচ্ছে।

—তা হোক। তবুও অনুমতি নিতে হবে বৈ কি।—বলে দরজার গোড়ায় গিয়ে হাত জোড় করে ঘরের ভেতরে যারা ঘুমিয়েছিল তাদের উদ্দেশে বললেন—তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে বর তুলছি। দুর্গা দুর্গা।

সমীর বললে—মামারা সবাই যাবেন না, এক-আধজন থাকুন।

মামা বললে—মহাবীর থাক তাহলে।

মহাবীর বললে—না কিংশুক থাকুক, আমি বরং পৌঁছেই চলে আসবো'খন।

কিংশুকের এই কাদা ভেঙ্গে যাবার ইচ্ছে ছিল না, সে বললে—তাই যা।

সবাই চলে গেল। কাদামাখা পায়ের দাগ, চা-এর দাগ, পানের পিক, পোড়ার দাগ ও আরও পাঁচটা লাঞ্ছন ধারণ করে ফরাসের চেহারা ঠিক যেন একখানা মডার্ণ ছবি। তারই ওপর কয়েকজন শুয়ে আছে। একপাশে স্যুটকেশ ও দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে ডান হাতে দেবু ধরে মৃগাঙ্ক একভাবে ঘুমুচ্ছে। যারা শুয়ে ছিল পোকায় তাদের (উঠিয়ে) ফেলেছে।

কিংশুক বসে ছিল—পোকার উপদ্রবে আর না থাকতে পেরে একধার থেকে ফরাসের চাদর তুলে তাই দিয়ে সর্বাঙ্গ ঘিরে উবু হয়ে বসে সিগারেট ধরাল।

মহাবীর ফিরে এল। কিংশুক বললে—কি রে এরই মধ্যে চলে এলি ?

—না এসে থাকতে পারলুম না।

—কেন ?

—হরিবল্। ওরাও আসছে।—বলে কিংশুকের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললে—এই নাক কান মুলছি। বরযাত্রী আর নয়। কি অবস্থা ভাব দেখি। নিজেকে দিয়েই ভাব। সন্ অফ এ মিলিওনিয়ার নো মালটিমিলিওনিয়ার তার এই হাল। পাল চাপা দিয়ে বসে আছিস্। কেন এই অবস্থা ? না বন্ধুর বিয়েতে এসেছিস্। থ্যাঙ্ক গড্, ব্রাদার যে আমার—।

কথা কেড়ে নিয়ে কিংশুক বললে—শুনেছি, শুনেছি। ক'নে কেমন দেখলি বল, কালো না ?

—কালো মানে ড্যাম্ কালো। হাঁ করে রইলি যে, ঐ তো ওরা আসছে জিজ্ঞেস কর।

মামা, কিশোরী ও তিনকড়ি এল।

কিশোরী বললে—কি কালো! মনে হবে যেন কোবরা ব্ল্যাকটান বুট পালিশ দিয়ে তৈরি। কি দেখে যে মাসকেলের বাপ মেয়ে পছন্দ করলে—।

কিংশুক বললে—মুখ চোখের কাটিং কি রকম।

মহাবীর মুখ বিকৃত করে বললে। র‍্যানকিনের বাড়ির হেডকাটার কেটেছে।

কিংশুক বিরক্ত হয়ে বললে—আঃ চুপ কর না, শুনতে দে।

মামা বিষাদক্লিষ্ট স্বরে বললে। ঠিকই বলেছে রে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

তিনকড়ি বললে—ঐ রং দেখলে কি আর কাটিং সেলাই এর দিকে নজর যায়। তাও চেষ্টা করেছিলুম। বুঝতে পারলুম না কালোর কালোয় ধুল পরিমাণ।

মামা উদাস স্বরে বললে: শতছিন্ন নোংরা কাপড় তার সুতো বাট নম্বর হলেও যা আর একশ বিশ নম্বর হলেও তাই।

কিশোরী বললে—এই মরেছে। মাসকেল আসছে না? দেখ তো, আমার নেশার চোখ কি দেখতে কি দেখছি না তো।

মাসকেলই। বন্ধুরা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। মাসকেল জুতো পায়েই ফরাসের ওপর উঠে কিংশুককে ডেকে নিয়ে ওপাশের বারান্দার চলে গেল।

মামা কিছুক্ষণ বাদে কি ব্যাপার দেখবার জন্যে ওপাশে গিয়ে দেখে কিংশুকের কাঁধে মাথা রেখে মাসকেল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মামাকে দেখে কিংশুক বললে, দেখ দেখি কি হয়েছে, বলছেও না, শুধু শুধু কাঁদছে।

তিনকড়ি, কিশোরী ও সমীর এল। সবাই মিলে কারণ জিজ্ঞেস করাতে মাসকেল কান্না থামিয়ে বললে—ভূতের মত চেহারা মাইরী।

—কার? সমীরের আধবোজা চোখ খুলে গেল।

—বৌ-এর।

—কে বললে?—সমীরই জিজ্ঞেস করলে।

—তোরা তো সব চলে এলি। কে যেন মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলি তোর বৌদিকে? বললে ভূতের মত। বাবা এক চড় কষালো।

মেয়েটা কাঁদতে লাগল। বুঝলুম, সত্যি কথাই বলেছে, নইলে তোরা ক'নে দেখে গম্ভীরভাবে চলে আসতিস্ না। বাবা দেখে শুনে টাকার লোভে আমার এমন সর্বনাশ করলে!

বাইরে সত্যবাবুর গলা শোনা গেল—আনন্দবাবাজী। এরা সব গেল কোথায়। দত্তবাবু।

তিনকড়ি বললে—এই যে আমরা এখানে।

—তাই ভাল। আমি ভাবলুম, গেল কোথায়? বুকটা ধড়ফড় করছে। তা বাবাজী হঠাৎ উঠে এলে যে, এ কি কাঁদছ? কি হয়েছে আনন্দ? কেউ কিছু বলেছে? বন্ধু-বান্ধবদের কেউ অসম্মান করেছে? নাম বল, শালাকে কুপিয়ে মারব।

মামা তাড়াতাড়ি বললে—আজ্ঞে, কাঁদছি আমরা সবাই, তবে ভেতরে ভেতরে। ওর মনটা নরম, তাই চাপতে পারছে না। আমাদের একটি বন্ধু ছিল, আনন্দের সঙ্গে তার ভাবটা আরও মাখো মাখো ছিল। এ বিয়েতে তার অনেক রকম প্ল্যান ছিল। কিন্তু কি বলব বলুন, ফট্ করে মরে গেল। তাই বলছে শিবুটার কথা বার বার মনে আসছে রে।···কেঁদে আর কি করবি। সব ভগবানের ইচ্ছে। যা, আসরে গিয়ে বস। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। আমরাও মুখ-হাত ধুয়ে এগুলোকে ঠেলেঠুলে তুলে নিয়ে আসছি।

বর নিয়ে সত্যবাবু চলে গেলেন তারপরেই শুরু হল বৃষ্টি, আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি।

কিংশুকদের অবস্থা শোচনীয়। পেট্রোমাক্স নিভে গেছে। এলোপাতাড়ি বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট এসে ফরাস্ ভিজে সপ্ সপ্ করছে। যে ক'জন ফরাসে শুয়েছিল সবাই মিলে তাদের ধরাধরি করে টেনে ঘরে নিয়ে ফেলল। ঘরেও এক জ্বালা, জানলা-দরজা বন্ধ না করলে বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢোকে। আবার জানলা-দরজা বন্ধ করলেও কিছুক্ষণের মধ্যে গরমে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তার ওপর মনের জ্বালা জুড়োবার জন্যে প্রত্যেকের মুখেই সিগারেট জ্বলছে, এমন কি যে খায় না সেও টানছে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই, খালি মহাবীর মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে হাতঘড়িটা দেখছে আর বিড় বিড় করে বলছে,—সোটা। সাঁইত্রিশ নো আটত্রিশ।···একটু ধরে এসেছে···। ওঃ থ্যাঙ্ক গড্, মাই পেরেন্টস্ আর··।

যখন বৃষ্টি থামল তখন হুল্লোড় মহলের সামনে স্রোত বইছে। বৃষ্টি থামবারও ঘণ্টাখানেক বাদে লোকজন নিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে সত্যবাবু এলেন। ভদ্রলোকের অবস্থাও শোচনীয়। ভিজে ঝোড়ো কাকের মত অবস্থা, গোঁপ-জোড়া ঝুলে পড়েছে, ফুক ফুক বিড়ি ফুঁকছেন, বোধহয় ভেতরে ভেতরে শীত করছিল।

কিংশুকদের ঘরের সামনে এসে সত্যবাবু বললে—দত্তবাবু জেগে আছেন নাকি।

—হ্যাঁ, আছি।

—ছিঃ ছিঃ আপনাদের কি কষ্টটাই না দিলুম।

—না না আপনি কোথায় কষ্ট দিলেন, এই রকম বিষ্টি হলে মানুষ কি করবে।

—আর বলবেন না। বাড়িতে গিয়ে দেখুন দক্ষযজ্ঞের অবস্থা। ছাঁদনাতলা-টলা তচ্‌নচ্ হয়ে গেছে। আপনাদের জন্যে ঘি-ভাত চাপান হয়েছিল, উনুন-ফুনুন নিভে একাকার। যা ছিল তাই দিয়ে বৌ আর ছেলে-মেয়ে কটাকে কোনও রকমে খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছি।

মামা বললে—বিয়ে হয়েছে।

—হ্যাঁ সাত পাক ঘুরেছে কোনও রকমে। কি বলব সবই আমার অদৃষ্ট। আনন্দবাবাজীও ঠায় ভিজেছে তবুও বিরক্ত হয় নি। এখন দয়া ক'রে চলুন যা হয় একটু কিছু দাঁতে কাটবেন।

সমীর বললে—থাক না, এই তো দুটো বাজে, আর ঘণ্টা তিনেক বাদেই ভোর হবে। সকাল-বেলা যা হোক হবে'খন। আবার এত রাত্তির করে হাঙ্গামা করা কেন?

সত্যবাবু হাত জোড় করে কিংশুকের দিকে চেয়ে বললেন—জোর করতে পারি সে মুখ আমার নেই। তবু আজ এই শুভকর্মের দিন আপনারা উপোস দিয়ে থাকবেন তাই বা দাঁড়িয়ে দেখি কি করে?

কিংশুক বললে—না যাব, আপনি চলুন। মহাবীর, মামা, তিনকড়ি সব চল। তোল ওদের।

কিশোরী প্রথমেই গেল বলাই-এর কাছে তাকে ঠেলে তুলে বসিয়ে বললে—চল ওঠ। খেতে যাবি নি?

বলাই খানিকক্ষণ বসে রইল তারপর যেই আবার কিশোরী তাড়া দিলে অমনি শুয়ে পড়ে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললে—না, আমি খাব না। ঘুম পাচ্ছে ভয়ানক। উঁহুঁ, যাব না বলছি না, ছাড় না। ভাল্লাগে না সব সময়।

রাত পোহাল। মাসকেল বন্ধুদের দেখতে এল। ওর শরীরটা ভাল নয়, মাথাটা বেজায় ধরেছে। অল্প অল্প জ্বরও হয়েছে। প্রতুলবাবু শুনে বললেন—জ্বরের আর অপরাধ কি। সারা বিষ্টিটা গায়ের ওপর দিয়ে গেছে। এখন ভালয় ভালয় পৌঁছতে পারলে বাঁচি। উঃ কি দুর্যোগই গেছে কাল। তোমাদের ত সব কাল খাওয়াই হয় নি শুনলাম। এখন নিরাপদে বাপমায়ের জিনিষ বাপমায়ের কোলে পৌঁছে দিতে পারি তবেই হয়।

আর বিশেষ কিছু ঘটলো না। সত্যবাবু সাধ্যমত আদর

আপ্যায়নের ত্রুটি করলেন না। তিনটের ট্রেনে বরযাত্রীর দল বৌ নিয়ে রওনা হল। ট্রেন একেবারে খালি। পাশাপাশি দুটো কামরায় দু'দলে ভাগ হয়ে সব উঠে পড়ল। ট্রেনে উঠেই মাসকেল বললে—আমি শোব, আমার একটা সতরঞ্চি আর বালিশ দে। মাথাটা বেজায় ধরেছে, জ্বরও বেড়েছে মনে হচ্ছে।

মামা বললে—শুয়ে পড় আমি মাথা টিপে দিচ্ছি। যা ধকল গেল, মাথা ধরবে এ আর বেশি কথা কি। মাথা যে ধড়ে আছে তাই ঢের।

মাসকেলের মাথা ধরা বেড়েই চলল আর সেই সঙ্গে উঃ! আঃ! কাতর ধ্বনিও শোনা যেতে লাগল। মামা গায়ে হাত দিয়ে দেখলে জ্বর তেমন হয় নি। ঝুঁকে পড়ে বললে—কি রে খুব কষ্ট হচ্ছে?

—উঃ মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে।

—ঘুমুতে চেষ্টা কর দেখি। তাহলে মাথা ছেড়ে যাবে।

কিসের ঘুম! ক্রমাগত উঃ! আঃ! আর সেই সঙ্গে বলতে লাগল—বীনু কোথায় গেলে! বীস্তি বড্ড মাথা ধরেছে আমার। বীনু, বীস্তি মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। মাথাটা টিপে দাও না বীনু উঃ! উঃ!

বন্ধুরা বীনু বা বীস্তি কারুকেই চেনে না, জিজ্ঞেস করলেও মাসকেল তাদের পরিচয় দেয় না। চুপ করে থাকে। বন্ধুরা প্রমাদ গুনল। রাণাঘাটে গাড়ি এল। কিংশুক বললে—মামা একবার আয় তো প্রতুলবাবুকে জিজ্ঞেস করি যদি বীনুর হদিস কিছু পাই।

—ঠিক বলেছিস্।

মামা প্রতুলবাবুকে বললে—ও তো বেজায় ছটফট করছে। জ্বর বেশি হয় নি বোধহয় মাথা খুব ধরেছে।

প্রতুলবাবু বললেন—ও একটুতেই অমন কাতর হয়ে পড়ে।

—আর কি জানেন ছটফট করছে আর বলছে বীনু রে, বীস্তি রে কোথায় গেলে, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, টিপে দাও। বীনু বীস্তি এরা কারা বলুন দেখি?

প্রতুলবাবু বললেন—বীনু! বীস্তি! এরা আবার কে? কই বীনু বীস্তি বলে ত কারুকে জানি না।

ক'নের সঙ্গে তার এগার বারো বছরের ছোটভাই রতন যাচ্ছিল। সে বললে—বীস্তি তো ছোড়দির ডাক নাম। এই ছোড়দি তোকে জামাইবাবু ডাকছে যা না।

ছোড়দি ভাই-এর কথা শুনে ঘোমটার ভেতরেই জিভ কাটলেন মামাদের মা কালী দর্শন হল।

মামা প্রতুলবাবুদের কামরা থেকে বন্ধুদের সরিয়ে এনে বললে—দেখ কারবার দেখ। কালরাত্তিরে ভূতের মত চেহারা—বাবা আমার সর্বনাশ করলে, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ভাসিয়েছে, তারপর যেই ঘণ্টাখানেক দোরে খিল এঁটে একসঙ্গে কাটিয়েছে অমনি বাপ মা ভাইবোন বন্ধুবান্ধব সব উবে গেল, বলে কি না বীনু রে, বীস্তি রে! অ্যাঁ! বোঝ, মেয়েমানুষ কি জিনিষ বোঝ! মাসকেলের মত ছেলে সে—।

মহাবীর শান্তকণ্ঠে বললে—তাই হয় ব্রাদার তাই হয়। ইট'স কোয়াইট ন্যাচারাল।

এ আর এক বন্ শেল! কিংশুক বললে—ন্যাচারাল?

—ইয়েস ব্রাদার, দ্যাট ইস্ লাভ। ভালোবাসার চেহারা ইনসিগনিফিকেন্ট। কিং লেটস হ্যাভএ ওয়াক।

চুপচাপ দুই বন্ধুতে হাঁটতে হাঁটতে ইঞ্জিনের কাছ বরাবর গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে সিগারেট বার করে কিংশুককে দিয়ে নিজেও ধরিয়ে মহাবীর বললে—কিং ওল্ড এগ, য়্যাম ইন লাভ।

কিংশুক মাথা নেড়ে বললে—জানি, বীথি।

—নো নো। ডোণ্ট আটার দ্যাট নেম।···সী ইজ এ বিউটি লিটল গার্ল। ইন ফ্যাক্ট দি মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন টাউন।

—রাগিণী?—বলার পর কিংশুকের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

—না না, তার বন্ধু তনু।

—তনু, তনুকা? আমাদের কবরেজ—।

—ইয়েস।—বলে কিংশুককে আদ্যোপান্ত সব শুনিয়ে বললে—রাগিণী তোকে ভালবাসে সী ইজ ম্যাডলি ইন লাভ উইথ ইউ, তনু আমায় বলেছে। আমি জানি তুইও তাকে ভালবাসিস। কিং ইটস এ ওয়াণ্ডারফুল থীং দীস লাভ। কি মনে হয় এখন জানিস? তনু পাশে থাকলে কোন কাজই আমার অসাধ্য নয়।··যে মানুষ জীবনে ভালবাসে নি আর ভালবাসা পায় নি তার জীবনই বৃথা। টু লাভ য়্যাণ্ড টু লাভড্, দ্যাট ইস্ লাইফ।'—তারপর আপন মনেই কিংশুককে শুনিয়ে কিছুক্ষণ বক্ বক্ করে হঠাৎ এক সময় বললে—ভাল কথা, তুই প্রফেসারের বাড়ি গিয়েছিল, না রে?

—কবে?

—আমি যখন মাসকেলের সঙ্গে কলকাতায় ছিলুম।

—তুই জানলি কি করে?

—তনু বললে। ও আর রাগিণী তোকে বীথিদের বৈঠকখানায় দেখেছে তুই তখন প্রফেসারের সঙ্গে কথা বলছিলি।

—রাগিণীও দেখেছে?

—হ্যাঁ। তনুকা কিছু বলেছে, মানে রাগিণী—।

—না ঠিক কিছু বলে নি তবে একটু স্লাইট্ রেগে গিয়েছিল। আমি বীথিকে বলেছিলুম কি না যে তুই আর ওবাড়িতে যাবি নি অথচ তারপরেই—।

—আমি কি করে জানব বল যে তুই ওকথা বলেছিস্। ওখানে গিয়ে ওর মুখে ওকথা জানতে পারি। আগে জানলে—।

বাধা দিয়ে মহাবীর বললে: আমিও সে কথা বললুম তনুকে কিং এসব কিছুই জানে না। জানলে—চল চল ঘণ্টা দিয়েছে। কাম অন্ লেটস্ হ্যাভ এ রান।

[ক্রমশ।

হাতীর আচরণ

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ)

হস্তীর মস্তি (৫)

অনেকেই প্রশ্ন করেন, সকল হস্তীরই কি মস্তি হয়? আমার ধারণা, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষ হস্তীর মস্তি হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক জোয়ান হস্তীর মস্তি প্রথমবার স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী হয়। স্থানীয় মাহুতেরা এই প্রকার মস্তিকে 'কাঠমস্তি' আখ্যা দিত। মস্তির সময় তাহারা কামাসক্ত হয় এবং সাধারণত হস্তিনীর সঙ্গ কামনায় বন্য হস্তী ও পোষা হস্তীর পিল্‌খানায় আসিয়া যে কোনও সময় উপস্থিত হইত। অভিজ্ঞ 'দাইদারকে' এই অবস্থায় অল্পবয়স্ক হস্তীকে খুব সহজেই 'পরতালা' প্রথায় বন্দী করিতে দেখিয়াছি। প্রবীণ 'গুণ্ডা'কে, 'ঘোর মস্তি' না হইলে ধরিতে কখনই সাহস পাইত না। বন্যহস্তীর মস্তি, আমার যতদূর মনে হয় December-এর মাঝামাঝি হইতে May মাসের প্রথম পর্যন্ত থাকিতে দেখিয়াছি। এই সময়ে ইহাদের স্বভাবের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কামোন্মত্ততাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মদস্রাবী হস্তীর মদগন্ধ পাইলে অধিকাংশ পোষা মাদ্দা-হস্তীকে ভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়াছি। কয়েকটি 'কুনকী' হস্তীকেও এভাবে পালাইতে দেখিয়াছি। মদস্রাবী পুংহস্তী সাধারণত অন্য পুরুষ-হস্তীকে দেখামাত্র আক্রমণ করে। ইহার অনুরূপ ঘটনাও দুই-এক ক্ষেত্রে হইত।

পোষা, প্রাপ্তবয়স্ক হস্তীরও মস্তি হয়, যদি তার স্বাস্থ্য এবং শরীর উপযুক্ত থাকে। অনেকে পোষা মদ্দা হস্তীকে শীতকালের আরম্ভ হইতে বর্ষার শুরু পর্যন্ত অতিরিক্ত খাটুনীর মধ্যে রাখেন এবং নানারকম ঠাণ্ডা খাদ্য দেন এবং পুষ্টিকর দানা এই সময় বন্ধ রাখেন। আমি একটি গৃহপালিত বিশালকায় দন্তীর কথা জানি যার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও মস্তি হয় নাই; শুনিয়াছি মাহুত কৃতিত্ব লইবার উদ্দেশ্যে কোনও বিশেষ ঔষধ খাওয়াইয়া তাহার মস্তি চিরতরে বন্ধ করিয়া দেয়। এই বয়সের অপর একটি দন্তীর প্রথম 'কাঠমস্তি' হইতে দেখিয়াছি। তাহার পর বৎসর পুরা মস্তি হইয়াছিল। এই সময় কয়েকটি হস্তিনীর সহিত সঙ্গম করে কিন্তু কোনটির সন্তান প্রসূত হয় নাই। মস্তির সময় সেই হস্তী অন্যভাবে শান্ত থাকিলেও কামার্ত হইয়া হস্তিনীর ল্যাজ কাটিয়া দিত। মস্তির সময় বিভিন্ন পোষা হস্তী ভিন্ন রূপ ধারণ করিত। কোন কোনোটা শুরু হইতেই ভীষণ উগ্ররূপ ধারণ করিত এবং কোনও কারণে মুক্ত হইলে ত্রাসের সঞ্চার করিত। এই সময়ে কাহারও কথা শুনিত না। ইহাদিগকে শুরু হইতে সারা পর্যন্ত চার মাস কিম্বা ততোধিককাল বাঁধিয়া রাখিতে হইত—এবং দূর হইতে জল ও আহারাদি দিতে হইত। কোনোটা এরূপ না হইলেও নিকটে কোনও জন্তু-জানোয়ার আসিলে মারিয়া ফেলিত। কোনোটা মানুষকে বধ না করিলেও বাড়িঘর ভাঙ্গিত—কোনোটা মানুষকে কিছু করিত না কিন্তু হস্তীকে বধ করিয়া কিম্বা বিকলাঙ্গ করিয়া আরাম পাইত।

পোষা হস্তীর পরপর অন্তত তিন বৎসর, মস্তির সময়ে আচরণ খুব নিবিষ্ট ভাবে না দেখিলে এই সময়ে কোন হস্তী কি করিবে তাহা নির্দিষ্ট ভাবে বলা চলে না। সুতরাং মস্তি হইবার উপক্রম হইলেই হস্তীকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখা উচিত। মস্তির সম্পূর্ণ উপশম না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অসতর্কতার জন্য বহু অনিষ্টের কথা শুনিয়াছি এবং জানি। কোনও কোনও হস্তীর মস্তি একবার থামিয়া পুনরায় আট-দশ দিন পরেও দেখা দিতে পারে। লোকালয়ে পোষা মস্তির হস্তী যত অনিষ্ট করে জঙ্গলের ধারে পিলখানায় তাহা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং লোকালয়ের হস্তী সম্বন্ধে অসতর্কতা অমার্জনীয়।

বন্যহস্তী মস্তির অবস্থায় অদ্ভুত আচরণ করিলেও মানুষকে বধ করিতে কদাচিৎ শোনা যায়। একবার একটা ১০´ ৬´´ উচ্চ বন্য মোকনা হস্তী সুসঙ্গের পিল্‌খানায় আট-দশ দিন ছিল। দাইদারের ত্রুটিতে হস্তীটা পরতালায় ধরা যায় নাই। তখন হাটের দিনে বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেও মানুষ যেন তার চোখে পড়িত না—কোনও মানুষের অনিষ্ট সে করে নাই। কিন্তু ধৃত এক মোকনাকে সে প্রচণ্ড আঘাতে বধ করিয়াছে। অনেকগুলি হস্তিনীকে (পোষা ও নূতন ধৃত বন্য)—সে সম্ভোগ করে—ফলে তিন-চারিটি হস্তিনীর বাচ্চা হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এই অবস্থায় বহু লোক দেখিয়াছে। হস্তীর সম্ভোগের যে সব অস্বাভাবিক গল্প প্রচলিত আছে তাহার অসারবত্তা ইহা হইতে বহুলোকের কাছেই সপ্রমাণিত হইয়াছে।

রাজা জগৎকিশোর আচার্য বাহাদুরের অভিজ্ঞ নয়াসং দারোগার নিকট শুনিয়াছি শম্ভু নামক, বহু খুনী, রাজা বাহাদুরের প্রিয় হস্তী মদমত্ত অবস্থায় যখন কাহারও বশে আসিত না তখন রাজা বাহাদুর রূপা বাঁধান 'জাঠা' হাতে যখন অনুযোগের তিরস্কার দিয়া তাহার নিকট যাইতেন তখন শম্ভু একেবারে শান্ত হইয়া দাঁড়াইত, আর মাহুত আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া নিত।

এখানে একটা মন্তব্য করার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহা লিখিতেছি। সাধারণ মানুষে হস্তীর যে পরিচয় নিয়ত পায় তাহাতে ভয় পাইয়া চলিবার কারণ থাকে না। বস্তুত লোকালয়ের পরিচিত হস্তীর অভ্যস্ত স্বভাবকেই তাহাদের মানিয়া চলা অভ্যাস। সুতরাং মস্তির সময় হঠাৎ ইহার বিপর্যয়ের সময়, রক্ষক, স্থান-কালের উপযোগী সতর্কতা অবলম্বন না করিলে মারাত্মক ফল হয়। দুর্ঘটনা প্রায়ই জনসমাকীর্ণ মত্তহস্তী হইতেই শোনা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন হস্তিনীর মদস্রাব হয় কি না। এই সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভরযোগ্য নহে। আমি একটি মাত্র হস্তিনীর 'কাঠমস্তি' হইতে দেখিয়াছি। হস্তিনীটা খেদায় ধরা হয়। ধরা হইবার প্রায় ছয় মাস কাল পরে শিক্ষানবিশী অবস্থায় তাহাকে দেখাইতে আনিলে লক্ষ্য করিলাম তাহার বাম গণ্ডের ছিদ্র একটু ফুলিয়া আছে এবং তাহা ভিজা-ভিজা হইয়া আছে। মাহুতকে জিজ্ঞাসায় সদুত্তর পাইলাম না। হস্তিনীর মেজাজ কিছু উগ্র হইয়াছে—তবে ইহা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। আমার কিন্তু সব শুনিয়া এবং দেখিয়া মনে হইল ইহা মদস্রাব। মাহুতকে সতর্ক হইয়া চলিতে নির্দেশ দিলাম এবং ইহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিলাম। আহারাদি ব্যাপার ঠাণ্ডা জিনিসের আধিক্যের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলাম। দুই দিন পরও ক্ষীণধারায় মদস্রাব হইতেছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন পরই ইহার এক বাচ্চা হয়? মাহুতের অযত্নে বাচ্চাটা অল্পদিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। ইহার কিছুদিন বাদেই মাহুতের শিথিলতার জন্য এক মেট (assistant মাহুত) এই অর্ধ-শিক্ষিত উত্তেজিত হস্তিনীকে দিয়া দুইটি কুকুর বধ করাইয়াছে। ইহার পর কোনও অজ্ঞাত অবস্থায় একদিন ঐ মেটকে হস্তিনীটা মারিয়া ফেলে। শাসনের ভয়ে মাহুত হস্তিনীকে 'থামে' বাঁধিয়া রাখিয়াই রাতারাতি সীলেটে পলাইয়া যায়। হস্তিনীর অপর মেটকে দিয়া ইত্যবসরে হস্তিনীকে জল খাওয়ান এবং চড়াই করার কার্যভার দেয়া হয়। তারপর এক খুনী হস্তীর মাহুতকে এই হস্তিনীর ভার দেয়া হয়। এই মাহুত যেদিন হস্তিনীর ভারগ্রহণ করিবার কথা সেইদিন আমি নাজিরপুর পিলখানায় উপস্থিত ছিলাম। আমার ৫০।৬০ গজ ব্যবধানেই নূতন মাহুত মেটের স্থান অধিকার করিতে যাইবার সময় নিয়ম ভঙ্গ করিয়া উঠিবার প্রয়াসের ফলে মেট যেই হস্তিনীর সম্মুখ দিয়া অসতর্কভাবে নামিতে গিয়াছে, মাহুত তাহার আসনে বসিবার পূর্বেই হস্তিনী হঠাৎ মাহুতকে আক্রমণ করে। আমি মেটের চীৎকার শুনিয়া ঘাড় ফিরাইতেই দেখি তাহার এক ঠ্যাং ভাজিয়া মাথার দিকে উঠিয়া গিয়াছে—অপর পায়ের উপর খাড়া থাকিতেই হস্তিনী উপুড় হইয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। ইত্যবসরে মাহুত আসনে বসিয়া অঙ্কুশ দিয়া হস্তিনীকে অন্য দিকে সরাইয়া নিয়াছে পিলখানায় আরও কয়েকটা হস্তী তখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিল—চতুর্দিক হইতে অনেক লোক জাঠা হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি যখন মৃত ব্যক্তির নিকট দাঁড়াইলাম তখন শেষবারের মত একবার নড়িয়া উঠিতেই এক ঝলক রক্ত ও জিহ্বা এবং চক্ষু বাহির হইয়া আসিল! পঞ্জরে এমন ভাবে কামড়াইয়াছে যে সমস্ত হাড় গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। খুব বিস্ময়কর এই যে কয়দিন হইল হস্তিনীর বাম গণ্ড দিয়া আবারও দুই তিনদিন মদস্রাব হইতে দেখা গিয়াছে।

হস্তিনীর প্রথমবার মদস্রাব হইতে দেখিয়া আমি কয়েকটি বই পড়ি। যতদূর মনে হইতেছে Dr. Evans-এর বইয়ে হস্তিনীরও কচিৎ মদস্রাব হইতে দেখা যায় ইহার উল্লেখ মাত্র আছে। এই সময়ে তাহাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার মত অবসর তাঁহারও হয় নাই। গরু, হরিণী, মহিষী প্রভৃতির যেমন ঋতু লক্ষণ দেখা যায় হস্তীর তেমন হয় বলিয়া জানি না। হস্তিনীর শারীরিক প্রস্তুতি হইলেই কখনও কখনও গলায় অর্ধোচ্চারিত এক প্রকার শব্দ করিয়া হস্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই মাত্র। যাহাই হৌক এই বিষয়ে অধিক কিছু লিখিবার আমার অধিকার নাই।

(৬) হস্তীর বিভিন্ন আচরণ

মানুষের মধ্যে যেমন আকার ও প্রকারগত অসংখ্য ভেদ দেখা যায়, হস্তীর মধ্যেও নানা রকমের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকের চোখে হস্তীর আকারগত পার্থক্য ধরাই পড়ে না। আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় আত্মীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—আমি যেমন সাহেবের চেহারা দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য ধরিতে পারি না তেমনই হস্তীর মধ্যেও কোন চেহারায় পার্থক্য বুঝি না! এঁরা বিশ্বাসই করিতে চাহেন না যে হস্তীর স্বভাবের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিতে পারে। এই প্রবন্ধে হস্তীর চারিত্রিক বিভিন্নতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। আরও কিছু সংক্ষেপে এই বিষয়ে লিখিতেছি।

এক হস্তীকে দেখিয়াছি সে বাছিয়া বাছিয়া সুস্বাদ আহার্য মাত্র খাইত। ফলে তার দেহ কোনোও দিন পুষ্ট হইতে দেখি নাই। সে যে এমনিতে রুগ্ন ছিল তাহা নহে। মিতাহার তাহার বৈশিষ্ট্য। অপরটি ঠিক তার বিপরীত দেখিয়াছি। যাহা সম্মুখে পাওয়া যাইত শুঁড় দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া মুখে পুরিয়া দেয়াই তাহার স্বভাব। ফলে তাহাকে কোনোও দিন দুর্বল হইতে দেখি নাই। চমৎকার মেজাজ আর পুষ্ট চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দূরপাল্লার পথে যাইবার সময় হঠাৎ পথ হইতে নামিয়া ধানক্ষেত হইতে একবোঝা উঠাইয়া মুখে পুরিত আর শুঁড়ে একবোঝা নিয়া নিত এবং পথ চলিতে চলিতে খাইতে থাকিত। যত শান্তই হৌক এভাবে আহার সংগ্রহের সময় মাহুত তাহার মাথায় গজবাগের আঘাতেও থামাইতে পারিত না।

একটা হস্তী শিকারের সময় আরোহী জন্তু দেখিয়া যেই বন্দুক তুলিয়া নিশানা করিতেন তৎক্ষণাৎ পিছু হটিতে থাকিত। অন্যথায় আনারকলি সর্বরকমে আদর্শস্থানীয়া। বসন্তবাহার ও তার কন্যা জয়ন্তীমালা এর বিপরীত। সম্মুখে রয়েল টাইগার দেখিলেও মাথা উঁচাইয়া, কান মেলিয়া, শুঁড় গুটাইয়া সদম্ভে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত। কতকগুলি হস্তী জঙ্গলে ছাড়িলে বনে-জঙ্গলে যে আহার্য পাওয়া যাইত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু কয়েকটি হস্তী ধান

খাওয়ায় ওস্তাদ ছিল। সতর্ক প্রহরীকে ফাঁকি দিয়াও ধানের গোলা ভাঙ্গিয়া ধান খাইত। অধিকাংশ হস্তী মানুষ আসিতেছে দেখিলে দ্রুত পলায়ন করিত। কিন্তু বসন্তবাহারকে কেহ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিলে আর রক্ষা নাই। সে তার ধান, বাগান ত' নষ্ট করিবেই ঘর পর্যন্ত না ভাঙ্গিয়া ছাড়িবে না, কিন্তু বসন্তবাহার ক্ষেতের দিকে আসিতেছে দেখিয়া গৃহস্থ কিছু ধান, কলা ইত্যাদি দিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলে, তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার কোনও অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যাইত।

কালীপুরের জমিদার শ্রীবীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের চঞ্চলকুমারী নাম্নী সুবিশাল হস্তিনীর এক অদ্ভুত আচরণ দেখিয়াছি। গদি কসিয়া হস্তী সব শ্রেণিবদ্ধ হইয়া তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। শিকারীরা সব হস্তীতে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় ঐ হস্তিনী এমন ভাবে গা ঝাড়িতে আরম্ভ করিল যে মাহুতের মাথাটা বুঝি তাহার শরীর হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এই অবস্থায় মাহুত তার পাঁচসের ওজনের লোহার ডাঙ্গস ('পাঁচু') দিয়া সমানে পিটাইয়া চলিল। ইহাও একটা ভোজবাজীর খেলার মত মনে হইল। আমাদের ত' এ ভাবে হস্তীতে বসিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব আর যদিই বা বসিয়া থাকিতাম মাথার রগ ছিঁড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতাম। এই খেলায় মাহুতের প্রায় দুই মিনিট পরে জয় হইল। এই সময়ের পর হস্তিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাহুত বলিল যদি এখনই এই লীলা হইয়া না যাইত তাহা হইলে শিকারে যে কোনও সময় হস্তিনী এরূপ করিত। তাহার মতে সেই দিনের মত এই হস্তিনী কিছু করিবে না। তখন শিকারী তাহার উপর উঠিয়া যথারীতি শিকার করিলেন। হস্তিনী আর কিছু করে নাই।

এক পিলখানায় অনেকগুলি বেয়াড়া হস্তিনী ছিল—যখন-তখন লাদ ফেলাইয়া, মাহুতকে ঝাড়িয়া-ফেলিয়া পলায়ন করিত। সেই পিল্‌খানায় এক দন্তী ছিল। সবগুলি হস্তী তাহাকে দেখিলে একেবারে পোষা গাধার মত আচরণ করিত। এই দন্তী উপস্থিত না থাকিলেই পিলখানা গুরুমহাশয়হীন পাঠশালার ছাত্রের রূপ ধারণ করিত।

কোনও হস্তী এত শান্ত স্বভাবের দেখিয়াছি যে, শিশুও তাহার পেটের নীচ দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিত। কতকগুলি আবার মাহুতকেও পেটের নীচে যাইতে দিত না। শিক্ষা দিবার সময় যে ত্রুটি থাকিয়া যাইত, পরবর্তীকালে প্রায় কখনই তাহা সংশোধিত হইতে দেখি নাই। শিক্ষার তারতম্যে হস্তীর আচরণের বহু পার্থক্য থাকিতে দেখিয়াছি। দেশে থাকার শেষের দিকটায় দেখিয়াছি উপযুক্ত শিক্ষা-দাতা মাহুতের ক্রমশ অভাব ঘটিয়া আসিতেছে।

একটা হস্তিনী ঘুমাইলে নাকের ভীষণ শব্দ করিত। অপর একটা এতই নিদ্রাকাতর ছিল যে, রৌদ্র উঠিয়া সব তপ্ত হইয়া উঠিলেও মাহুত যতক্ষণ তাহাকে ডাকিয়া ঘুম না ভাঙ্গাইত সে ঘুমাইতে থাকিত। আতরভরীর এক কাহিনী লিখিয়া এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিতেছি।

স্বচ্ছন্দভাবে বনে বিচরণ করাই আতরভরীর অভ্যাস। তাহাকে শিকার ও খেদার কাজ ছাড়া কদাচিৎ অন্য কার্য করিতে হইত। সে প্রায়ই সন্তান উপহার দিত, ইহার জন্যই তাহার এই সুবিধা ছিল। শিকারে যতক্ষণ থাকিত, ততক্ষণ তার মেজাজ বেশ থাকিত কিন্তু জঙ্গল হইতে পিল্‌খানার দিকে যাইতে আরম্ভ করিলে হঠাৎ অন্যান্য হস্তী হইতে অন্যদিকে গিয়া মাহুতকে মৃদু নাড়া দিত। এই অবস্থায় মাহুত তার দড়িদড়া খুলিয়া ছাড়িয়া দিলে ভালই, তাহা না হইলে যত রকম উপায় সম্ভব তাহা চালাইয়া মাহুতকে নিশ্চয়ই ফেলিয়া দিত। কিন্তু নেটুয়া মাহুতকে ফেলিতে তার শেষ উপায় হইত গভীর জলে গিয়া ডুবিয়া থাকা। তখন নিরুপায় নেটুয়া ভাসিয়া সাঁতার কাটিয়া ফিরিয়া আসিত। আতরভরী মানুষকে কখনও কোনও আঘাত করিত না। এই অবস্থায় যদি তার বোনঝি মঙ্গলপিয়ারীকে আসিতে দেখিত তাহা হইলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইত আর কোনও দুষ্টামি করিত না। আতরভরীর বাচ্চা সজাগ থাকিলেই খেলা জমিত ভাল। বাচ্চাকে মা এমন ভাবেই শিখাইত যে ফিরিবার সময় বাচ্চাকে শুঁড় দিয়া একটু ইঙ্গিত করিতেই সে দূরে চলিয়া যাইত। সেখানে গিয়া হঠাৎ যেন কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছে এইভাবে চীৎকার করিয়া উঠিত। তখন আতরভরী আর কি করে, বাচ্চার মায়ায় দৌড়াইয়া তাহার নিকট যাইয়াই উল্লিখিত প্রক্রিয়া সব চালাইত। হস্তীরও চক্ষুলজ্জা আছে! অন্যায় কর্মেরও একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চাই এমনভাবে, যাতে লোক-নিন্দা এড়ান যায়।

(৬) হস্তীর উচ্চতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন সময় সময় করা হয়।

উচ্চতা মাপিবার প্রণালীভেদে ইহার বিভিন্নতার কথা প্রায় সময়ই নানা বাদ-প্রতিবাদের কারণ হয়। হস্তী স্থির হইয়া দাঁড়াইলে সম্মুখের দুই পায়ের উপর সমানভাবে ভর করিয়া বাঁ পায়ের পাশে একটা সোজা বাঁশ মাটির উপর দাঁড় করাইয়া দুই পায়ের শেষ যেখানে কাঁধের উপর মিলিয়াছে সেইখানে মাটির সমান্তরালভাবে একটা সোজা লাঠি বাঁশের সহিত যেখানে মিলিত হয় তাহার পরিমাপ নিলে যাহা হয় আজকাল তাহাই হস্তীর উচ্চতা গণ্য করা হয়। তা ছাড়া হস্তী সম্মুখের বাঁ পায়ের উপর সম্পূর্ণ ভার স্থাপন করে তখন সেই পায়ের বেড় একটা ফিতার সাহায্যে মাপিয়া তাহার দ্বিগুণ করিলেই পূর্ব লিখিত উচ্চতা প্রায় ঠিকমত পাওয়া যায়। মৃত হস্তীর পায়ের বেড় নিয়া এইভাবে মাপ নিলে প্রায়ই কিছু ছোট হইতে দেখা যায়।

আজকাল নানা কারণে হস্তীর আকার কিছু খর্ব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসরের পূর্বেকার গারো পাহাড়ে ধৃত হস্তীর অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতে পারি, তখন প্রাপ্তবয়স্ক দশ ফিটের ঊর্ধ্বে পুরুষ হস্তী এবং আট ফিটের হস্তিনী প্রায়ই দেখা সম্ভবপর হইত। এক খেদায় একটা এগার ফিট তিন ইঞ্চি দন্তীকে মারিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছি। এমন বিশালকায় হস্তী আমি আর দেখি নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় যূথপতিরূপে যখন এই হস্তী দলের সংগে ঘুরিতেছিল তখনই ইহার প্রকাণ্ড আকার বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে।

Sanderson সাহেবের মতামত প্রায় অকাট্য প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। তিনি বিংশতি খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বেও ভারতীয় হস্তী দশ ফিটের ঊর্ধ্বে হয় বলিলে অবিশ্বাস করিতেন। ভারতবাসীর কথা তিনি এবং তাঁহার মত ইংরাজগণ আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে করিতেন না। অবশ্য আমরাও ইংরাজের কথা প্রায় সময়ই বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিতে অনেক সময়ে দ্বিধা করি না। স্থানে স্থিত মহামূর্খ ও

নির্বিচারে যাহা খুশি বলিলেও তাহা গৃহীত হয়। 'স্থানে স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ'। ইহা সনাতন সত্য।

কিছুকাল হইল আসামে, দলের বাহিরে প্রাপ্তবয়স্ক হস্তীর দাঁত, যে অপর একটি প্রাপ্তবয়স্ক মোকনীকে মারিতে পারিবে সে পাইবে এই নিয়মে শিকারের অনুমতি দেওয়ার ফলে বড় বড় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষহস্তী এখন প্রায় দেখা যায় না। তা ছাড়া, পরতালা প্রথায় আসামীরা হস্তী ধরায় পটু না হওয়ায় এই শ্রেণীর বৃহদাকার হস্তীর পক্ষে মৃত্যুর দ্বারই উন্মুক্ত। সুতরাং বড় হস্তী পাওয়া অদূর ভবিষ্যতে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিবে।

(৭) হস্তীর চেহারা দেখিয়া স্বভাব বুঝিতে পারা যায় কি না—

ভারতবর্ষে এই সম্বন্ধে বহু প্রাচীনকাল হইতে বহু গবেষণামূলক তথ্য নানা পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। সেইগুলি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ আলোচনা হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু পূর্ণিয়া জিলার সওদাগরদের মুখে প্রাচীন উক্তি প্রায়ই শুনিতাম। তাঁহারা নূতন হস্তী কিনিবার সময় পরম্পরালব্ধ মতানুযায়ী চলিতেন। যেমন গোলাপী তালু, আঠার নখ, উঁচু পিতোয়ান মাথার গড়ন, ল্যাজ মাঝারী, লম্বা ইত্যাদি বিষয় বিশেষ দেখিয়া হস্তী পছন্দ করিতেন। ষোল নখ, কটা চোখ, ঝাড়ু দুম, সরু মাথা, কালো তালু, চাপা পিতোয়ান ইত্যাদি বর্জন করিতেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে পরম্পরালব্ধ এইসব জ্ঞানের যথাযথ মূল্য নির্ণয় করা আজিকার দিনে ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

যেমন বহুমানুষের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক আকৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হস্তীর মধ্যেও তাহা হইতে দেখিয়াছি। এক একটা হস্তীকে দেখিলে মনে হয় এই ত' সর্বগুণের আধার এবং যূথপতির ইহারই সাজে। তথাপি বলিব অতি সুলক্ষণ হস্তীকে ঠিকভাবে শিক্ষা না দিতে পারিলে তাহার পক্ষে সম্মানিত স্থান অধিকার করা সম্ভবপর হয় না।

ঘোড়া, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু কোনো কোনোটি যেমন গৃহস্থের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ সাধন করে হস্তীর বেলাতেও তাহা হয় ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 'ফুল' নাম্নী দুয়ারার একটি হস্তিনী যেমন বুদ্ধিমতি তেমনই সুশ্রী ছিল—কিন্তু সে যে গৃহে গিয়াছে সেই গৃহেরই সর্বরকমে অনিষ্ট হইয়াছে। আমি হস্তিনীটিকে খেদার কার্যে কয়েকবার ভাড়া করিয়া আনাইয়া তাহার কার্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছি।

সাধারণভাবে দুইটি মন্তব্য করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব: হস্তীর সম্বন্ধে তথ্যবহুল বিশেষ জ্ঞান লোক সমাজে তাঁহারাই দিতে পারেন যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষিত মন লইয়া দরদী হৃদয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় হস্তীর সম্বন্ধে বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ভাবে ইঁহারা গবেষণার কার্য করিতে পারেন।

(ক) প্রাচীন এবং অর্বাচীন হস্তী সম্বন্ধে সম্ভবপর সব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখা হইতে আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করা।

(খ) হস্তী ব্যবসায়ী এবং বহু হস্তী পালকের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করা।

(গ) বন্য হস্তীর যথাস্থানে, সুদীর্ঘকাল সমস্ত ঋতুতে, সমস্ত অবস্থায় বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফল ধারাবাহিক ভাবে সংগ্রহ করা। এই কার্য অতি কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য সাপেক্ষ। কেবলমাত্র রাষ্ট্র অথবা কোনও উপযুক্ত অর্থবান সুযোগ্য-বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যে হয়ত এই কার্য এখনও করা সম্ভবপর।

অনির্বচনীয়

দিব্যেন্দু লাহা

বিস্মৃতির তীর ঘেঁষা আসন্ন সন্ধ্যায়, মনে হয়
পারি না ভুলিতে স্মৃতি, জাগে যে পরম বিস্ময়!
মধুমাখা দুই বাহু প্রসারিয়া রেখেছে জড়ায়ে
রঞ্জিত করেছে সে পথ বর্ণালী কুসুম ছড়ায়ে।
মুগ্ধ দু'টি নেত্রে মোর পরায়েছে অঞ্জন অক্ষয়
ভেঙেছে ঘুমের ঘোর ঘুচেছে সকল সংশয়।
হেরেছি তাহারে আমি চাঁদ গলা পূর্ণিমার রাতে
নিবিড় আঁধারে হাসে, দাঁড়ায়ে সে প্রীতি দীপ হাতে।
বুলায় পরশ তার মন্দ মৃদু বসন্ত সমীরে
স্পন্দিত নূতন সুর শুনায় সে মন্দাকিনী তীরে।
জীবনে জোয়ার আসে উষ্ণ স্পর্শে ছন্দে লাগে দোল,
অঙ্গে অঙ্গে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, খেলে যায় তড়িত হিল্লোল।
মদালসে মত্ত হৃদি, পেয়েছি যে অমৃত আস্বাদ,
ঢেলেছে লাবণ্য প্রাণে, সুধামাখা সুদূরের চাঁদ।
পারিনি বুঝিতে আজো, বিপুলের রহস্য গভীর
আছ তুমি, সমীর মদির তাই স্নিগ্ধ সুরভির।
আত্মার সত্তার ঘিরে সুষমায় আজ স্মরণীয়
মধু হতে মধুময় প্রেম, সে যে অনির্বচনীয়।

বৃত্ত-সংজ্ঞা

দেবী ভট্টাচার্য

বৃত্ত হতে আর কোন পূর্ণতর সংজ্ঞা
বলো: কি হতে পারে আর আমৃত্যু
প্রতীক্ষা: জীবন। অনিয়ন্ত্রিত ব্যর্থ
উপাদানে ভোগ। সম্ভোগ সুকৃতি
বিহ্বলা সুখ।
তবু কোন জৈব-উপচারে, হে বিধাতা
এ জীবন নৈবেদ্য।
বৃত্ত হতে আর কোন পূর্ণতর সংজ্ঞা।
কোন মৌসুমী দক্ষিণ দুয়ার হতে,
যদি আনে অকৃপণ ঐশ্বর্য,
বিলাস সম্ভোগ সুখ,
ঈশ্বর আরও দূর।
মৌসুমী বিষাক্ত হয় বিলাস বাতাসে।
কোন মন ফুল হয়, সুগন্ধ বাতাসে
এ পৃথিবী পূর্ণতরা আনন্দ উপবনে।
তবু এ জীবন নৈবেদ্য:
বৃত্ত হতে পূর্ণতর আর কোন সংজ্ঞায়।

বিবাহে বৈচিত্র্য

এম, আব্‌দুর রহমান

বাড়াবাড়ি কোন ক্ষেত্রেই ভালো নয়। বিবাহের বেলায় তো নয়ই। যেখানে দু'টি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হবে সেখানে ছেলেকে পণ্যের পর্যায়ে ফেলা অনুচিত সঙ্গতি অনুসারে খুশির মধ্য দিয়ে দান-প্রতিদান নেওয়া-দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'পণপ্রথা-নিরোধ আইন' প্রণীত হলেও তা' সঠিকভাবে কার্যকরী হবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'সার্দা-আইনের' (Child Marriage Restraint Act) মত সে আইনও হয়ত অকেজো হয়ে থাকবে। সমাজের মধ্যে নৈতিক চেতনা সঞ্চার দ্বারা মানুষের মনের পরিবর্তন ^না হলে এ পাপ দূর হবে না।

পণপ্রথা নিরোধ আইন

সার্বিকভাবে নারী সমাজের পক্ষে পণপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো হয়ত সম্ভব নয়। মায়ের জাত ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কেন, অধিক ক্ষেত্রে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে বাপ-মা থাকতে পারেন না। তবে প্রত্যেকটি পিতা-মাতার উচিত, ছেলেদের মত মেয়েদেরকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা। সমাজের ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষা পেলে পণপ্রথা স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি কমে যাবে। ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিক্ষিতদের সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে ঢের ঢের বেশি। সে সব দেশে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীরাও কাজ করছে। পণপ্রথার বালাই নেই। সেখানে মাত্র কয়েক টাকা খরচে তাদের বিয়ে হয়। রুশিয়া দেশে একসময় পণপ্রথা প্রবল ছিল। জারের আইনও ছিল পণপ্রথার স্বপক্ষে। সোভিয়েট রাশিয়া গঠিত হবার পর তাদের পণপ্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।(৬)

ছেলেদের মত মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিতে হবে

অনেক স্থানে অনুন্নত সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পণপ্রথা আছে। তবে সে পণ ছেলেরা পায় না, পায় মেয়েরা, কনের বাপ-মা। আমরা সে বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করব।

আমাদের দেশে, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাপ-মা, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে থাকতে পারবে না।' মেয়ের বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন অধিক বয়সে না দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে (তাই বলে নিতান্ত ছোটতে নয়) বিয়ে দেওয়াই বোধ হয় ভালো। আমরা কম বয়স বলতে, মেয়েদের যুবতী অবস্থায় মধ্য বয়সের কথা বলছি। এ-বিষয়ে মনীষী বার্নার্ড শ' বলেছেন : It is woman's business to get married as soon as possible and a man*s to keep unmarried as long as he can.

মেয়েদের বিয়ের বয়স

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুবিজ্ঞ পণ্ডিত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জ্ঞান ও কর্ম' পুস্তকে, কিশোর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ভালো বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন ভারতে গৌরীদানের কথা উল্লিখিত থাকলেও, সেকালের ইতিহাসে মেয়েদের স্বেচ্ছায় পতি-নির্বাচনের নজির পাওয়া যায়। কাজেই প্রাচীন ভারতে সবসময়ে মেয়েদের অল্পবয়সে যে বিয়ে দেওয়া হতো না, ইহা অনস্বীকার্য।

যুগ-জামানার পরিবর্তন হয়েছে এবং রোজই হচ্ছে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগের সঙ্গে এ যুগের ঢের ফারাক। সে সময়ে মেয়েদেরকে রুজি-রোজকারের কথা ভাবতে হতো না। এখন নারীদেরকেও বাহির-বিশ্বে ছুটতে হচ্ছে অর্থ উপার্জনের জন্য। এখন মেয়েদেরকে যুগের উপযোগী ক'রে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গ'ড়ে না তুললে উপায় নেই। কাজেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার পরই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া উচিত।

বিবাহে 'ভালোর' চেয়ে 'মন্দর' পরিমাণ কম হলেও বিবাহের মধ্যে যে সব অসুবিধা আছে, সে অসুবিধা নিয়ে অনেকেই অনেক দিন ধ'রে চিন্তা করছেন। মিঃ বেন-বি লিণ্ডসে (Mr. Ben-B-Lindsay) কয়েক বৎসর পূর্বে পরীক্ষামূলক-বিবাহের বা সাহচর্য-পরিণয়ের (Trial Marriage or Companionate marriage-এর) এক পরিকল্পনা প্রণয়ন ক'রেছিলেন।

পরীক্ষামূলক বিবাহ অথবা সাহচর্য পরিণয়

লিণ্ডসে সাহেব ছিলেন ডেনভারের জুভেনাইল আদালতের (Juvenile Court of Denver) একজন ঝুনো জজ। তাঁর পরিকল্পিত এই নয়া কিসিমের বিবাহের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ছিল মোটামোটি এই :—

ক। দম্পতির মনে সন্তান-প্রজননের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না।

খ। সন্তান না থাকায় তারা যে কোন সময়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন করতে পারবে।

গ। তালাকের (Divorce) সময়ে স্ত্রী খোরপোষ এবং ক্ষতি খেসারতের কোন দাবী-দাওয়া করতে পারবে না।

'ইউরো-মেরিকার'(৭) মনীষীসমাজ লিণ্ডসে সাহেবের পরিকল্পিত এই বিবাহ-বিধির প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন : এবম্বিধ-

---

৬। বিবাহে পণপ্রথা—ই-ৎসেরকোডেরক—ভারত-হায়দ্রাবাদের শ্রীরাম রেড্ডির প্রশ্নের জবাবে লিখিত প্রবন্ধ। পয়গাম, ২৬।১০।৬৩

৭। আমাদের দেশের জাহাজী কর্মীরা ইউরোপ আমেরিকাকে কথ্য ভাষায় সংক্ষেপে 'ইউরো-মেরিকা' বলে। কথাটি আমাদের ভালো লেগেছে বলে আমরা আমাদের প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এ শব্দ ব্যবহার করেছি।—লেখক

বিবাহের প্রচলন হলে মানবজাতির পারিবারিক সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হবে (would deminish human happiness) এবং আদম গোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস পাবে। তৎকালে প্রগতিবাদী কয়েকজন তরুণ তরুণী ছাড়া অপর কেহ এই পরীক্ষামূলক বিবাহ-বিধানকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। এজন্য ইহা সমাজ ও আইন-গ্রাহ্য হয় নি।(৮) আর হওয়াও উচিত নয় আদৌ। এইরূপ বিয়ে করা বৌ,—

—যে নেবে না সন্তানের দায়-দায়িত্ব, স্থায়িভাবে ঘর সংসার করবার প্রতিশ্রুতি দেবে না যে নারী, সে স্ত্রী পত্নীত্বের পবিত্র মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারিণী হতে পারে না। বাংলা পরিভাষায় যাকে 'উপপত্নী' বলে, এই পরীক্ষামূলক বিবাহের পত্নী তার একটা নয়া সংস্করণ মাত্র। এজন্য ইহাকে বিবাহ না বলে 'উপ-বিবাহ' বললে খুব সম্ভব ভুল হবে না। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এরূপ বিবাহ যে পৃথিবীর সকল ধর্মমতের বিরোধী, সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। তথাপি যুগ-জামানার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে কালের অনাদৃত এবং সর্বকালের অবাঞ্ছিত এই সাহচর্য পরিণয়ের অমঙ্গল ছায়া যেন বিভিন্ন দেশ ও সমাজের কোন কোন স্থানে ইদানীং দেখা যাচ্ছে দু' একটি ক'রে। মানব-সমাজের পক্ষে ইহা আশঙ্কার কথা। বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে শল্য পদ্ধতি ও ঔষধের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণের অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকায়—এই শ্রেণীর বিবাহের প্রতি কিছু সংখ্যক নওযোয়ান ও নওযোয়ানীদের আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজের চিন্তানায়কদের এ দিকে দৃষ্টিদান বাঞ্ছনীয়। চরিত্রভ্রষ্ট, উচ্ছৃঙ্খল ও যাযাবর সমাজ কোন দিনই শক্তিশালী, উন্নত ও সুসভ্য হতে পারে না। সুন্দর-সমাজ-গঠনের লক্ষ্য যদি ভাবী সমাজ পরিচালকদের মধ্য হতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়, বিবাহের পবিত্রতা যদি হয়ে যায় বিনষ্ট, তাহলে মানুষ এবং পশুতে খুব বেশি তফাৎ থাকবে না।

যতদূর জানা যায় 'লিণ্ডসে' সাহেবের 'পরীক্ষামূলক-বিবাহের' পরিকল্পনা প্রকাশের কিছু পূর্বে আমেরিকার 'অনিতা সঙ্ঘ' (Anita Company) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সুস্থ, সবল ও সুন্দর সন্তান (?) প্রজননের (Stripiculture) জন্য গঠিত হয়েছিল। কোন পুরুষ, সঙ্ঘের কোন নারীকে পেতে ইচ্ছা করলে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করতে হ'তো। ডাক্তার দিয়ে সেই আবেদনকারী পুরুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার পর কর্তারা যদি বিবেচনা করতেন যে, সেই পুরুষের সংসর্গে প্রার্থিত নারীর গর্ভে সুস্থ ও সবল শিশু জন্মানো সম্ভব, তাহ'লে সঙ্ঘ-কর্তারা তার আবেদন মঞ্জুর করতেন, অন্যথায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হতো সেই পুরুষ-পুঙ্গবকে।(৯) বলাবাহুল্য উক্ত সঙ্ঘের সমাধি হতে খুব বেশি দেরি হয় নি। কিন্তু মানুষের এবম্বিধ চিন্তার স্রোত একেবারে শুষ্ক হয় নি। এখনও চলছে এবম্বিধ অভিমতের পুনরাবৃত্তি। কিছুদিন আগে লণ্ডনের মেয়েদের মুখপত্র 'Sunday Miror'এ জনৈকা আমেরিকান মহিলা 'বীর্য-সংরক্ষণ ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব ক'রে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।—প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বীর্য নিয়ে উন্নত প্রতিভাসম্পন্ন সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা করা উত্তম ব'লে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।(১০)

সন্তান-প্রজনন প্রতিষ্ঠান

হালফিল আবার বিজ্ঞানীরা এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পুরুষের শুক্র শুক্রকীট বা প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) ছাড়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সন্তানের-প্রজনন সম্ভব। সাধারণ মানুষ আজও এ মতকে মেনে নিতে পারে নি। বিজ্ঞান আজ অসম্ভবকে সম্ভব করছে। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়ায় সন্তান-প্রজনন করিয়ে নিতে হয়ত মানুষ অগ্রসর হবে। কিন্তু সে মানুষ কেমন হবে এখনও জানা যায় নি। বিজ্ঞান এখনও ক্রমবিকাশের পথে। তার অনেক কিছুর মধ্যে ভুল-ত্রুটি আছে। এখনও বিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হয় নি। সকল দিক দিয়ে হয় নি নিখুঁত সুন্দর।

সাফ্রেজিষ্ট আন্দোলনের প্রবর্তনকর্ত্রী মিসেস প্যাংক হার্স্ট। তাঁর আন্দোলনের আসল কথা হচ্ছে, নারীর পক্ষে কোন আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রয়োজন নেই। সে যে কোন পছন্দ মত পুরুষদ্বারা সন্তান-প্রজনন করিয়ে নিতে পারে। তিনি নিজে কন্যা সন্তানের জননী। তাঁর কন্যার গর্ভেও কন্যার জন্ম হয়েছে। তাঁরা সন্তানদের পিতৃ-পরিচয় দিতে নারাজ, বলেন মাতৃ-পরিচয়ই যথেষ্ট।(১১)

সাফ্রেজিষ্ট আন্দোলন

পৌরাণিক যুগে ভারতে 'নিয়োগ' প্রথায় 'ক্ষেত্রজ সন্তান' উৎপাদন নিন্দনীয় ছিল না। সন্তান কামনায় পর-পুরুষে উপগতা হয়ে যে সন্তানের জন্ম হতো, সেই সন্তানকে 'ক্ষেত্রজ সন্তান' বলা হতো। বিধবাগণও ইচ্ছা করলে এই প্রথায় সন্তান প্রজনন করতে পারত। তাদের পক্ষে দেবরদ্বারা সন্তান উৎপাদন ছিল প্রশস্ততর। ঋগ্বেদে দেখা যায় সেকালের বিধবা তার দেবরকে পর্যাঙ্কে আকর্ষণ করছে।(১২)

ক্ষেত্রজ সন্তান

এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব লিখেছেন : যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে [২ (৫৩)] এই ভাবের কথা আছে, মৃতের ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য দুইজন—

(ক) রিকনগ্রাহ অর্থাৎ যে তাহার ধন-সম্পত্তি পাইয়াছে।

(খ) যোষিদ্‌গ্রাহ অর্থাৎ যে তাহার (মৃতের) স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে পাইয়াছে।···

···স্মৃতিচন্দ্রিকা (ঘারপুর সংস্করণ) আহ্নিক-প্রকরণ··বিরুদ্ধাস্ত প্রদৃশ্যতে দাক্ষিণাত্যেষু সম্প্রতি। স্বমাতুল সুতোদ্বাহ মাতৃবন্ধুত্ব দূষিতঃ! অভর্তৃভ্রাতৃ-ভার্য্যা গ্রহণং চাতে দূষিতম্। কুলে কন্যা প্রদানং দেশেষন্যেষু দৃশ্যতে। তথা মাতৃবিবাহোপি পারসীকেষু দৃশ্যতে।···এখানে উক্ত শ্লোকগুলির আকর নির্দেশ নাই। ইহাতে অন্য কথা বাদ দিয়া তিনটি বিষয় পাইতেছি।···

৮। অধুনালুপ্ত মাসিক 'সহচর' (সম্ভবত ফাল্গুন) ১৩২৮।

৯। 'নারী' প্রবন্ধ, মাসিক সহচর, ফাল্গুন ১৩২৮

১০। দৈনিক যুগান্তর—১৫।১০।৫৭

১১। আনন্দবাজার ৮।১২।৬১

১২। কোবাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং,
মর্যং ন যোষা কৃনুতে সধস্থতা। (অশ্বিনী সূক্ত ১০।৪০।২)
বিধবা যেমন দেবরকে, নারী যেমন পুরুষকে শয্যায় আকর্ষণ করে।
—দুর্নীতির ইতিহাস—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু, পৃঃ ৭

(ক) স্বমাতুল সুতোদ্বাহ।
(খ) অভর্তৃক ভার্যাগ্রহণ।
(গ) কুলে কন্যাপ্রদান।...

...কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার স্বামীর ভ্রাতা তাহাকে গ্রহণ করা। স্বপুত্রই হউক আর অপুত্রই হউক। গ্রহণ অর্থে বিবাহ হইতে পারে অথবা উড়িয়ার ঘঁইতো। গ্রহণ অর্থে নিয়োগও অন্যায় হইবে না। উর্ধ্ব সংখ্যায় দুইটি পুত্র উৎপাদনের জন্য দেবর তদভাবে সপিণ্ড, তদভাবে স্বগোত্র নিয়োগ হইতে পারে।(১৩)

সন্তানহীন সধবাগণ স্বামীর অনুমতিক্রমে এবং কোন কোন সময়ে স্বামীর নির্দেশক্রমে পরপুরুষের সংসর্গে যে সন্তান লাভ করতো, সে সন্তান স্বামীর বৈধ সন্তানরূপে গণ্য হতো এবং সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে এবং ব্যাসদেবের ঔরসে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়েছিল। উতথ্য পত্নী মমতার গর্ভে এবং বৃহস্পতি ঋষির ঔরসে ভরদ্বাজ মুনির জন্ম হয়েছিল। বৃহস্পতি ঋষি ছিলেন উতথ্য মুনির ভাই। বলিরাজা তাঁর স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমাকে দিয়ে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র এই পাঁচটি ছেলে পয়দা করিয়ে নিয়েছিলেন।(১৪)

১৩। 'ব্যষ্টি ও সমষ্টি' প্রবন্ধ—প্রবাসী, ১৩৫০, পৌষ, পৃঃ ২১৭-২২২

১৪। বিভিন্ন মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণ।

মহর্ষি উদ্দালক তাঁর শিষ্য দ্বারা নিজ পত্নীতে শ্বেতকেতুকে প্রজনন করিয়ে নিয়েছিলেন(১৫) কুন্তীর গর্ভে সূর্যের ঔরসে কর্ণ, ইন্দ্র ও পবনের ঔরসে যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জুনের জন্ম হয়েছিল। কুন্তীর স্বামী মহাভারতখ্যাত পাণ্ডু, পিতা যদুবংশীয় শূরসেন। কুন্তী দেবীর প্রকৃত নাম পৃথা। কর্ণ তাঁর কুমারী অবস্থার সন্তান। সেকালে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কুমারী অবস্থায় সন্তানের জননী হওয়া দোষাবহ ছিল না। যেমন দোষণীয় ছিল না 'ক্ষেত্রজ সন্তানের জননী হওয়া।(১৬) এসব প্রথা যেকালের, সেকালের সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, পরিশুদ্ধ মন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। নিখিল বিশ্বের যে কোন জাতি ধর্মের ইতিহাস ঘাঁটলে এই শ্রেণীর নজির পাওয়া যাবে, যা' আজকের দিনে প্রশংসনীয় নয়। সেকালের সমাজ-ব্যবস্থা যে এ কালে চলবে, এমন যুক্তি অচল। যুগ-বিবর্তনে অনেক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। বিশ্ববিবাহ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আত্মীয় বা স্বজনা-বিবাহ কাহিনীতে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

[ক্রমশ।

১৫। প্রবাসী ১৩৫০, পৌষ, পৃঃ ২২১-২২২

১৬। (ক) মহাভারত, (খ) A Treatise on Hindu Law and Usage by John. D. Mayne. 8th Edition 1914.

মিলন তৃষা

শ্রীমতী ধরা দেবী

ঘরে যে যায় মিলন লগন
আর কোর না দেরী।
যাবার আমার সময় হ'ল
তাই বাজে ঐ ভেরী।

চোখের জলে পথটি আমার
কোরো না পিছল।
এমন করে পিছন হতে
টেন না অঞ্চল।

বাঁশিতে আজ বাজাও সবে
বিদায় বেলার সুরে।
রাগিণী তার করুণ সুরে
বাজুক সুমধুরে।

আপন হাতে যাত্রা পথে
প্রদীপ জ্বেলে দিও।
সেই আলোতে পথটি আমার
হবে যে রমণীয়।

আজকে আমায় দাও সাজায়ে
নববধূর বেশে।
কণ্ঠে আমার পরাও মালিকা
কুন্দ জড়াও কেশে।

শুভ্র বসনে ঢেকে দাও মোর
সুন্দর দেহখানি।
শ্বেতচন্দন পরাও ললাটে
চাঁদের কিরণ হানি।

প্রিয়তম মোর দেখিয়া যেন গো
মনে মানে বিস্ময়।
মিলনের লাগি পথ চাওয়া
তার সার্থক যেন হয়।

এক্টু থেমে নিমাই মিস্তির বললেন, 'এই যে বাতাসী মঞ্জিলের ভেতরে বসে আজ আমরা বাতাসী বিবির কথা বলছি, এই বাতাসী মঞ্জিলের জন্মের বীজ লুকিয়ে ছিল বাবার সেই ভোরের কুস্তিতে। অথচ এ কথাটা সেই ভোরে বিধাতাই শুধু জানতেন আর কেউ নয়। বাবা তো নয়ই, বাতাসী বিবিও নয়। মধ্যবয়সী বাবা, পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিস্তির, বাদশা পালোয়ানের সেরা উঠতি জোয়ান সাগরেদের সঙ্গে কুস্তি লড়ছিলেন খোলা আকাশের নীচে, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নরম করে কোপানো মাটির ওপর। কুস্তিটা দোস্তির বটে, যাকে বলা যায় ফ্রেণ্ডলি কম্ব্যাট, কিন্তু তাই বলে প্যাঁচ আর তাকতের দাপট তাতে কিছু কম ছিল না। মানুষে আর মানুষে আপোষে কুস্তি তো নয়, সে যেন বাঘে আর সিংহে জীবন-মরণের লড়াই—একে অন্যকে যেন বধ করবার জন্যে পাঁয়তারা করছে, এদিকে বাবা আর ওদিকে মল্লগুরু বাদশা পালোয়ানের পেয়ারের নওজোয়ান সাগরেদ স্যামসন।'

'স্যামসন?' আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, স্যামসন।' হেসে বললেন নিমাই মিস্তির। 'স্যামসন বাদশা পালোয়ানের সাগরেদ হবে কি করে অথবা বাদশা পালোয়ানের সাগরেদ স্যামসন হবে কি করে, তাই ভাবছেন? আসলে স্যামসন ওর নাম নয়, মানে পিতৃদত্ত নাম নয়। ওর আশ্চর্য শরীর আর অবিশ্বাস্য গায়ের জোর দেখে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ওর নাম দিয়েছিলেন স্যামসন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ইউ আর এ স্যামসন। টুমি স্যামসন আছে। আমি টুমার নাম ডিলাম স্যামসন।' তারপর তাকে বলেছিলেন বাইবেল কাহিনীর ভীম পালোয়ান স্যামসনের কথা। সেই থেকে ছোকরার পিতৃদত্ত নাম চাপা পড়ে গেল ইংরেজ সাহেবের দেওয়া নামের তলায়।'

'আশ্চর্য স্লেভ মেণ্টালিটি, যাকে বলে দাস-মনোবৃত্তি।' বললাম আমি।

নিমাই মিস্তির বললেন, 'খানিকটা হতে পারে, কিন্তু ওটা গৌণ, মুখ্য নয়। বাইবেলে আর মিলটনের কাব্যনাট্যে পড়েছেন নিশ্চয় ইজরায়েলী মহাবলী স্যামসন আর ফিলিস্টাইন রূপসী ডিলাইলার নাটকীয় রোমাণ্টিক কাহিনী। সেই সাহেব যখন ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো বাংলায় অদ্ভুত করে সেই কাহিনী শুনিয়েছিলেন পালোয়ানের সেই উঠতি জোয়ান সাগরেদকে, তখন সেই রোমাণ্টিক কাহিনীর রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল সেই ছোকরা পালোয়ানের মন। মনে মনে সেই বাইবেলী মহাবলীর সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে দেরি হয় নি তার। তাই সাহেব যখন ঐ মহাবলীর নামটাও তাকে দিয়ে দিলেন, তখন ছোকরা লুফে নিলে ঐ নাম, ওর মনে হলো হাতে চাঁদ পেয়েছে যেন। বাদশা পালোয়ানও মহা খুশি; রাজার জাতের একজন সম্মানী মানুষ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, এতে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই পালোয়ানের। তিনিও ঠিক করলেন এই সহৃদয় সাহেবের স্নেহের দান 'স্যামসন' নামেই তিনিও ডাকবেন তাঁর এই প্রিয় সাগরেদকে। এই হল সংক্ষেপে ঐ ছোকরার স্যামসন নামের ইতিহাস।'

'এবারে তাহলে বলুন সেই ভোরের কুস্তির কথা।'

'জোর কুস্তি চলেছিল বাবার আর এই শ্যামসনের।' বলতে লাগলেন নিমাই মিত্তির। 'আমি নিজের চোখে দেখি নি সেই কুস্তি, কিন্তু পরে ছানু জ্যাঠার মুখে তার এমন বর্ণনা শুনেছিলাম, যাকে এক রকম নিজের চোখে দেখার মতোই বলা চলে। ছানু জ্যাঠা নিজেও সেদিন লড়েছিলেন, আর ভালোই লড়েছিলেন তাও নিশ্চয়, কারণ 'কাঠ-পালোয়ান' নামে যে বিখ্যাত ছিলেন তিনি, সেটা কিছু বিনা কারণে নয়। ছানু জ্যাঠা আর বাদশা পালোয়ান জানতেন, কিন্তু বাবা জানতেন না নেপথ্যের আড়াল থেকে সেই কুস্তি দেখছে বিখ্যাত—অথবা কুখ্যাত, যাই বলুন—বাতাসী বিবি। জানলে বাবা কুস্তি লড়তেন না, আর কোনো রকমে একবার টের পেয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতেন কুস্তির মাটি থেকে। যে মাটিতে কুস্তি হচ্ছিল তারই কিছু দূরে একটি বাড়ির জানালার আড়াল থেকে কুস্তি দেখছিল বাতাসী বিবি।'

'দু' চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে?'

'না। বাতাসী বিবির চোখ দু'টিই ছিল যথেষ্ট; দরকার হয় নি বাইনোকুলারের।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ছিল বাতাসী বিবির। অবিশ্বাস্য রকম আশ্চর্য। তাছাড়া সেই জানালার আড়াল থেকে বাদশা পালোয়ানের আখড়ায় সেই কুস্তির মাটির দূরত্বও খুব বেশি ছিল না। কি চমৎকার নাটকীয়—অথবা ঔপন্যাসিক—পরিস্থিতি, ভেবে দেখুন একবার ধনপতিবাবু।'

ভেবে দেখলাম। ঠিক একরকম না হলেও মনে পড়ে গেল সেক্সপীয়ারের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের বিখ্যাত কুস্তি দৃশ্যের ছবিটি। ডিউক ফ্রেডারিকের প্রাসাদের সামনের মাঠে পেশাদার বাঘা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে নাটকের নায়ক ওর্লাণ্ডো, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে কুস্তি যার পেশা নয়, আর সেই কুস্তি অদূর থেকে দেখছে সুন্দরী নায়িকা রোজালিণ্ড। কুস্তিতে জয়ী হলো ওর্লাণ্ডো, আর সেই সঙ্গে তার নিজের অজানিতেই জয় করে নিল মুগ্ধ রোজালিণ্ডের নারী-হৃদয়। ওর্লাণ্ডো আর রোজালিণ্ডের জীবন-নাটকে ঐ কুস্তি শুধু কুস্তিমাত্র নয়, এক পরম পরিণতির প্রথম পদক্ষেপ বা সূচনার উৎস। সেই অতীতে চলে গিয়ে—অথবা সেই অতীতকে বর্তমানে টেনে এনে—কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম কুস্তি যার পেশা, অথবা কুস্তিকে পেশা বানাবার জন্যেই যে ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে সাধনা করছে, সেই শ্যামসন পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়ছেন সম্ভ্রান্ত এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির, কুস্তি যার পেশাও নয়, একান্ত বা একাগ্র সাধনার লক্ষ্যও নয়; আর সেই কুস্তি কিছু দূর থেকে তন্ময়দৃষ্টিতে দেখছে সুন্দরী রহস্যময়ী বাতাসী বিবি। আর, এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির এবং বাতাসী বিবির জীবন নাটকে (অথবা উপন্যাসে) এই কুস্তির যে অসাধারণ গুরুত্ব, তার একটু ইঙ্গিত তো ঈষৎ আভাসে জানিয়েই রেখেছেন নিমাই মিত্তির।

বললাম, 'ভেবে দেখেছি। আশ্চর্য পরিস্থিতি। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মন। কিন্তু বাতাসী বিবির কুস্তি দেখবার অত উৎসাহ কেন, বাদশা পালোয়ানেরই বা বাতাসী বিবিকে বিশেষ করে আপনার বাবার কুস্তি দেখাবার আগ্রহ কেন? কুস্তি জিনিষটা তো ঠিক মেয়েলী ব্যাপার নয়।'

নিমাই মিত্তির বললেন 'বাতাসী বিবিও তো পুরোপুরি মেয়েলী মেয়ে, অর্থাৎ অবলা ছিল না ধনপতিবাবু। একাধারে মোহিনী আর বাঘিনী ছিল বাতাসী বিবি। তার দেহে মনে যেমন ছিল রমণীয় আকর্ষণ যা পুরুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, তেমনি ছিল তার মর্দানা গায়ের জোর আর বেপরোয়া দুরন্ত সাহস। তাছাড়া নিজেও কুস্তিতে আর জুজুৎসুতে অসাধারণ দক্ষ ছিল বাতাসী বিবি, অনেক শক্তিমান পুরুষও নাজেহাল হয়েছে বাতাসী বিবির হাতে। তাছাড়া বাতাসী বিবিকে যেমন ভয়, তেমনি শ্রদ্ধা আর তেমনি খাতির করতেন বাদশা পালোয়ান; পালোয়ানের কুস্তি আখড়ার মস্ত বড় ভরসা আর পৃষ্ঠপোষিকা ছিল বাতাসী বিবি। ছানু জ্যাঠার কুস্তির আখড়ায় এক বাঙালী এ্যাটর্নীবাবু আশ্চর্য ভালো কুস্তি লড়েন, এ খবর কেমন করে মুখে মুখে পৌঁচেছিল বাতাসী বিবির কানে, জাগিয়েছিল তার মনে বিরাট কৌতূহল। একে বাঙালী, তায় বাবু, তায় পসারওয়ালা এ্যাটর্নী হয়েও ভালো কুস্তিগীর, এমন মানুষকে চোখে দেখতে আর তাঁর কুস্তি দেখবে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল বাতাসী বিবি। আর বাদশা পালোয়ানের কাছে বাতাসী বিবির অনুরোধ, এমন কি সামান্য একটু ইঙ্গিতও আদেশের চাইতে বড়ো। কিন্তু যাক সে সব প্রায়—অবান্তর কথা। কুস্তির কথা শুনুন। শ্যামসন প্রায় তাচ্ছিল্যভরেই কুস্তি শুরু করেছিল বাবার সঙ্গে, ভেবেছিল এ হচ্ছে অসম লড়াই, বাবুর সঙ্গে একটু কম জোর দিয়ে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে লড়তে হবে, পুরোর জোর লাগালে বা পুরো দাপটে লড়লে ভদ্রলোক বাবু সে চোট সামলাতে পারবেন না। কিন্তু শ্যামসনের সেই ভুল ভাঙতে বেশি দেরি হলো না, মিনিট দুই না যেতেই এই অপ্রিয় সত্যটি তার বোধগম্য হলো যে এ্যাটর্নীবাবু কুস্তির মাটিতে পা দিলে আর এ্যাটর্নী থাকেন না, বাবুও থাকেন না, হয়ে যান দুর্ধর্ষ কুস্তিগীর। গায়ের জোর বা প্যাঁচ, কোনোটাই কাজে লাগিয়ে বাবাকে, মানে পালোয়ান এ্যাটর্নীকে কায়দায় আনতে না পেরে ভারি বেকায়দায় পড়ে গেল শ্যামসন।'

প্রিয় শিষ্যকে অমন বিব্রত দেখে বিব্রতবোধ করলেন একটু বাদশা পালোয়ান। আক্রমণাত্মক কুস্তির কয়েকটি অসাধারণ প্যাঁচ তিনি খুব ভালো করে তালিম দিয়ে এবং অভ্যাস করিয়ে দিয়েছিলেন শ্যামসনকে; সেই এক একটি প্যাঁচ এক একটি ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ, তার চোট সামলানো পাকা পেশাদার মল্লের পক্ষেও খুব সহজ নয়। কিন্তু শ্যামসনের প্রযুক্ত প্রতিটি প্যাঁচ পাল্টা প্যাঁচ প্রয়োগ করে নাকচ করে দিতে লাগলেন পালোয়ান এ্যাটর্নী। নওজোয়ান পালোয়ান শ্যামসনের মতো ক্ষিপ্রতা তাঁর নেই, কারণ তাঁর পূর্ণ যৌবন বিগত হয়ে মধ্যবয়স শুরু হয়েছে, কিন্তু ক্ষিপ্রতার বদলে তাঁর আছে অসাধারণ সতর্কতা, অসাধারণ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অসাধারণ স্থৈর্য আর অসাধারণ ভারসাম্য এবং বাহুবল। শ্যামসন ভেবেছিল, মোলায়েম ভাবেই কুস্তি লড়ে বাবুকে কিছুক্ষণ খেলিয়ে খেলিয়ে তারপর চকিত আক্রমণে বিবশ করে তাঁকে পরাজিত করবে। কিন্তু মনের সে বাসনা পূর্ণ করা সহজ হবে না বুঝতে পেরে ক্ষিপ্ত আর হিংস্র হয়ে উঠল শ্যামসন। তার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে ওস্তাদের সামনে, এ আর তার সইছে না; যেমন করেই হোক বাবুকে কাবু করতেই হবে। দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে সঙ্গরোষে পালোয়ান এ্যাটর্নীকে একবার মরিয়া হয়ে আক্রমণ করলে শ্যামসন, বাদশা পালোয়ান অনেক কুস্তি দেখেছেন, বহু কুস্তি-অভিজ্ঞ তাঁর চোখে। তাঁর মনে হলো এবার এ্যাটর্নীবাবুর আর রক্ষা নেই।

কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল! ভূপাতিত হবার কথা এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরের। কিন্তু দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছেন এ্যাটর্নী কুস্তিগীর, মাটি নিয়েছে স্যামসন। স্যামসন প্রচণ্ড আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুদ্বেগে একটু সরে গিয়ে একটি প্যাঁচের কৌশলে নিজের পিঠের ওপর দিয়ে স্যামসনকে উল্টে ছিটকে ফেলে দিয়েছেন পালোয়ান এ্যাটর্নী।

প্যাঁচ এবং শক্তির এই অপরূপ যুগ্ম প্রয়োগ দেখে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বাদশা পালোয়ান। জব্দ হয়েছে তাঁর প্রিয় শিষ্য, সে কথাটা মনেই রইল না কুস্তি-শিল্পী বাদশা পালোয়ানের। তিনি আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'সাবাস বাবুজি, সাবাস!'

অমন অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক পতনে অল্প কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে সামনে গিয়ে উঠে দাঁড়াল স্যামসন। ওস্তাদের সামনে, গুরু-ভ্রাতাদের সামনে, অন্য আখড়া থেকে আগত আগন্তুকদের সামনে একজন সৌখীন বাবু কুস্তিগীরের হাতে এমনভাবে নাকাল হয়ে রাগে, দুঃখে, অপমানে সে আরো অধীর হয়ে উঠল। মোটের ওপর সুশ্রীই ছিল স্যামসনের মুখখানা, সেই মুখ এবার যেন গভীর আক্রোশে কুশ্রী হয়ে উঠল। স্যামসন আরো ক্ষেপে উঠল যখন প্রশান্ত হাসিতে মুখ রাঙিয়ে পালোয়ান এ্যাটর্নী বললেন, 'কুস্তি লড়বার সময় মাথা ঠিক রাখাটা সব চেয়ে বেশি দরকার, স্যামসন। মেজাজ হারালেই জব্দ হবার ভয় থাকে।'

উপদেশ! অযাচিত উপদেশ! কুস্তির এত বড় ওস্তাদের প্রিয় শিষ্যকে কুস্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসেন, এই বাবুর ধৃষ্টতা তো কম নয়! পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরের মুখের দিকে কি এক অদ্ভুত রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল স্যামসন। কুস্তিদর্শনরত প্রতিজোড়া চোখ যেন কিছুক্ষণের জন্য পলক ফেলতে ভুলে রইল অসীম কৌতূহলে—দেখা যাক এইবার কি করে স্যামসন। নিশ্চয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার কিছু একটা গভীর মতলব এঁটেছে স্যামসন। ছ'নুবাবু ভাবলেন হুঁশিয়ার করে দেবেন নটবর মিত্তিরকে, কিন্তু পরে ভাবলেন সেটা অশোভন, দৃষ্টিকটু হবে; তাছাড়া তার প্রয়োজনও নেই, কুস্তি বিদ্যায় শিশু নয় নটবর, দেহে শক্তিও কিছু কম নয় তার। তিনি দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করে রইলেন কি নতুন প্যাঁচ লাগায় স্যামসন, আক্রমণ করে কি নতুন পদ্ধতিতে।

ধীরে ধীরে নটবর মিত্তিরের সামনে এগিয়ে এসে প্রণামের ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মাটিতে হাত লাগাল স্যামসন। ব্যাপার কি? এত বিনয়! এত নম্রতা! শ্রেষ্ঠতর কুস্তিগীরের কাছে দক্ষতায় এবং শক্তিতে পরাজিত হয়ে সবিনয়ে প্রণাম জানাচ্ছে?

এই বিনয়ের ভঙ্গি অপ্রত্যাশিত। থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির। থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন স্যামসনের ওস্তাদ বাদশা পালোয়ান।

হঠাৎ খানিকটা গুঁড়ো মাটি ডান হাতে তুলে নিয়েই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেই মাটি স্যামসন ছুঁড়ে দিল অপ্রস্তুত পালোয়ান এ্যাটর্নীর দুই চোখে। নটবর মিত্তির চোখ বন্ধ করবার আগেই খানিকটা গুঁড়ো মাটি ঢুকে গেল তাঁর দুই চোখে। ক্রুদ্ধ স্যামসনের হস্ত নিক্ষিপ্ত মাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি, সেই মাটি প্রচণ্ড বেগে ছুটে গিয়ে আঘাত হেনেছিল নটবর মিত্তিরের দুই চোখে।

চোখে অন্ধকার দেখলেন এ্যাটর্নী কুস্তিগীর। দু' চোখ পরিষ্কার করতে গেলেন দু' হাত দিয়ে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভুলে গেলেন আর সব কিছু; ব্যস্ত রইলেন চোখের অস্বস্তি দূর করতে। সেই অন্যায় সুযোগে, তাঁকে অসতর্ক পেয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে বসল অপমানক্ষিপ্ত স্যামসন। তার অন্যায়, অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক এবং নির্মম আক্রমণে ভূপতিত হলেন নটবর মিত্তির। সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তিনি তাঁর দুই চোখ নিয়ে ব্যস্ত, তাঁর সেই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগে স্যামসন তাঁর ঘাড়ে একটি মর্মস্থানে সজোরে আঘাত করেছিল; সেই আঘাতের ফলেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির।

এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরকে কুস্তির মাটিতে ঐ রকম অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে গড়গড়ার নলে মুখ লাগিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন নটবর পুত্র নিমাই মিত্তির।

আমি শুধালাম, 'তার পর?'

মুখ থেকে তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে নিমাই মিত্তির বললেন, 'ঘাড়ে আঘাতটা আরেকটু বিশ্রীভাবে লাগলেই বাবার সেদিন না হোক, দু' চার দিন বাদে মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু বিধাতার সে ইচ্ছে নয়, তাছাড়া বাবা ঐ তে মারা গেলে এই বাতাসী মঞ্জিলের জন্ম হতো না, আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হতো না। আপনি কি স্যামসনের ওপর চটেছেন ধনপতিবাবু?

বললাম, 'চটেছি।'

নিমাই মিত্তির বললেন, 'চটাই স্বাভাবিক। ওভাবে চোখে মাটি ঢুকিয়ে দিয়ে অমন অন্যায় কাপুরুষোচিত আক্রমণ, কুস্তির জগতেও এক মহা লজ্জা, মহা ঘৃণা, মহা বেইমানির ব্যাপার। বাদশা পালোয়ানও ভয়ংকর চটেছিলেন। বাবা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যেতেই লাফিয়ে কুস্তির মাটিতে পড়ে ক্রোধে আর ঘৃণায় বাদশা পালোয়ান বাঁ হাতে স্যামসনের মাথায় এমন চাঁটি মেরেছিলেন যে, ঐ চাঁটিতে স্যামসনের মতো জোয়ান পালোয়ান আধঘণ্টা বেহুঁশের মতো বসেছিল। আমি কিন্তু স্যামসনের ওপর চটি নি ধনপতিবাবু।'

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'কারণ ঐ রকম স্যামসনের বেইমানির ফলে বাবা ওভাবে জ্ঞান না হারালে হয় তো বাবার সঙ্গে বাতাসী বিবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটত না। সেজন্য স্যামসনের কাছে বাবা ঋণী, আমি ঋণী। এই ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে কি ভাবে বাবা আর বাতাসী বিবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল, সেটা শোনার আগে আপনার একবার বাতাসী বিবিকে দেখা দরকার—আসুন আমার সঙ্গে।' বলে উঠে পড়লেন নিমাই মিত্তির।

[ক্রমশ।

বিজ্ঞান বার্তা

ক্যান্সার ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বস্তু

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

রেডিয়াম ও অন্য তেজস্ক্রিয় বস্তুর আবিষ্কারের রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা বিষয়ে যুগান্তর ঘটে। এদের ব্যবহারের প্রধান সুবিধা এই যে, শরীরের গহ্বরগুলিতে (যেমন পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, মূত্রাশয়, ফুসফুস ইত্যাদিতে) রেডিয়াম বা রেডিয়াম থেকে জাত রেডন গ্যাস সরু নলের আকারে প্রবেশ করিয়ে এই সকল স্থানে তেজস্ক্রিয়ার উপকারগুলি পাওয়া যায়, অথচ আক্রান্ত অঙ্গের বাইরে অবস্থিত চর্ম, মাংসপেশী ইত্যাদির উপরে এই সব বস্তুর ক্ষতিকর ক্রিয়া ঘটতে পারে না। জরায়ুমুখের টিউমার চিকিৎসায় এই বস্তুগুলির উপকারিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

১৯০৬ সালে প্যারিসে সর্বপ্রথমে জরায়ুতে রেডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। ১৯০৮ সালে ডমিনিচি এবং ১৯১০ সালে চেরঁা এবং রুবেন্স ডুক্কেল অনেকগুলি জরায়ুর ক্যান্সার এইভাবে চিকিৎসা করে এর উপকার প্রমাণ করেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত (প্রায় ৫০ বৎসরে) ৩৬০,০০০ রুগ্ন জরায়ুতে এইভাবে রেডিয়াম থেকে নিঃসৃত রশ্মি ব্যবহার করা হয়েছে।

যদি তেজস্ক্রিয় বস্তুটি ক্যান্সার তন্তু বা কোষে অন্য পোষক বস্তুর তুলনায় সহজে আকৃষ্ট বা শোষিত হোত তাহলে এই রোগে উপকার বেশি হোত সন্দেহ নেই, কিন্তু রেডিয়াম সাধারণত দ্রাবণের আকারে রুগ্নতন্তুতে প্রয়োগ করা হয় না, শুষ্ক গুঁড়ার আকারে নলের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রেডিয়ামের অস্থিতন্তুর প্রতি আকর্ষণই বেশি। অল্পমাত্রায় সূক্ষ্ম পরিমাণ রেডিয়াম-সম্বলিত পানীয়জল ৫ বৎসর ধরে ব্যবহারের পরে এক রোগীর শরীরে ৭৪ মাইক্রোগ্রাম রেডিয়াম পাওয়া যায়। তার মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই তার হাড়েই পাওয়া যায়। রেডন গ্যাসও রক্তে মিশে সকল তন্তুতে ছড়িয়ে পড়ে, ক্যান্সার তন্তুতেই বিশেষভাবে আটকা পড়ে না।

১৯৩৬ সালে ফ্রান্সে জোলিও এবং জোলিও কুরী (মাদাম কুরীর কন্যা) যখন কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয় বস্তুর আবিষ্কার করলেন, তখন অনেকের মনে আশা হোল যে, ক্যান্সার তন্তুতে এই বস্তুগুলি বিশেষভাবে শোষিত হ'য়ে চিকিৎসা কাজকে সহজ করে দেবে। আবার যুক্তরাষ্ট্রে লরেন্স যখন সাইক্লোট্রন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন ও পরে যখন হান 'এটমিক পাইল' যন্ত্রে তেজস্ক্রিয় বস্তুর প্রচুর উৎপাদনের উপায় করলেন তখন এই আশা আরও প্রবল হোল।

এই দুই যন্ত্রে প্রায় প্রত্যেক স্বাভাবিক পরমাণুর একাধিক তেজস্ক্রিয় জীবন, এদের থেকে নিঃসৃত তেজোরশ্মিগুলির বিদারণ-শক্তি ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যও এখন জানা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সব বস্তুকে ক্যান্সারের স্থানে জমা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র এইরূপ ঘটে। তা সত্ত্বেও এইসব আইসোটোপের ব্যবহারে অনেক উপকার হয়েছে সন্দেহ নেই।

এগুলির সম্বন্ধে এই কথাগুলি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে—

১। এরা বহুমূল্য রেডিয়ামের মতই (গ্যামা) রশ্মি নিঃসরণ করতে পারে ;

২। শরীরের উপরিভাগে (যেমন চর্মে বা শ্লেষ্মাঝিল্লীতে) ব্যবহারের জন্য বিশেষ জাতীয় রেজিনের সঙ্গে মিশিয়ে কয়েকটি আইসোটোপ মলমের আকারে তৈরি হয়েছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু (soft) রশ্মি নিঃসরণ করে ;
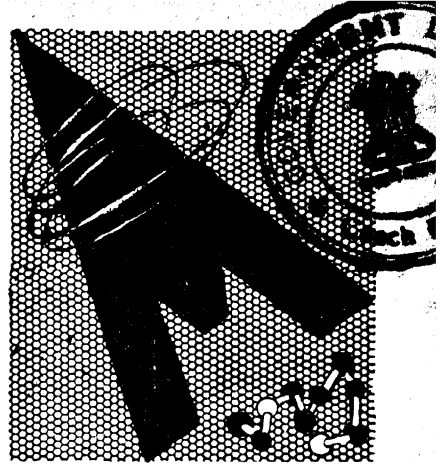
৩। সমস্ত শরীরে তেজস্ক্রিয়া উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত দ্রাবণ রক্তে সূচিপ্রয়োগ করা যায়, যাদের বেশির ভাগই দেহকোষগুলির মধ্যে প্রবেশ না করলেও কোষগুলির বাইরের ফাঁকে (extracellular space) জমা হয়। আবার স্থানীয় গহ্বরে (যেমন মূত্রাশয়ে) দ্রাবণের আকারে প্রবেশ করান যায় ;

৪। সূচিপ্রয়োগের সাহায্যে colloid-এর আকারে এদের রোগের স্থানে পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করা কঠিন নয় ;

৫। কোন কোন ক্ষেত্রে এই আইসোটোপগুলি নির্দিষ্ট রোগস্থানে জমা হয়ে সুফলের পরিমাণ বাড়ায়। 'এটমিক পাইল' যন্ত্রে নিউট্রন-স্রোতে বিভিন্ন ধাতুর তার রেখে দিলে তারা তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। এইভাবে ইরিডিয়াম ও কোবাল্টকে প্রথমে তেজস্ক্রিয় করা হয়। প্রথমটি থেকে নিঃসৃত রশ্মি দ্বিতীয়টির রশ্মির তুলনায় মৃদুতর। এই তারগুলি শরীরের কিছু দূরে রেখে বা শরীর গহ্বরে ঢুকিয়ে ব্যবহার করা যায় এবং যে কোন আকারে তৈরি করা যায়। ১৯৫৩ সালে মায়ার্স প্রথম কোবাল্ট তার এইভাবে ব্যবহার করেন। আবার নিকেল ও কোবাল্টের মিশ্রধাতু কোবানিক (cobanic) এই কাজের আরও উপযোগী।

রেডিয়াম, রেডিও থোরিয়াম ইত্যাদি স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় ধাতুর একটি অসুবিধা এই যে, তাদের থেকে তেজস্ক্রিয় গ্যাস (রেডন ও থোরন) বেরিয়ে আসে। এজন্য এদের কোন ধাতুর নলে বন্ধ অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। নইলে সেই গ্যাস এলোমেলো ভাবে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কোবাল্ট ৬০ ব্যবহারের সুবিধা এই যে, এ রেডিয়ামের চেয়ে মৃদুরশ্মি নিঃসরণ করলেও এর দাম অনেক কম। শরীরের গভীর অংশে রশ্মি প্রয়োগ করতে এর ব্যবহারই সুবিধাজনক। তাছাড়া শরীর থেকে কিছুদূরে রেখে একে ব্যবহার করা যায়। অথচ ৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট X রশ্মি যন্ত্রে বা ২.২ মিলিয়ন ভোল্ট

রশ্মির C থেকে যে উপকার পাওয়া যায়, এর ব্যবহারেও একই উপকার হ'তে পারে। তেজস্ক্রিয় স্বর্ণকে সাধারণ স্বর্ণের তৈরি নলে ভরে তাকে রেডন সূচির (radon needle) মত ভাবে দীর্ঘকাল শরীরে রাখা যায়। এই স্বর্ণ শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায় না আবশ্যকমত কাল রাখার পরে নাইলন সূতার বন্ধনী ধরে তাকে আবার বার ক'রে আনা যায়। স্বর্ণের নিঃসৃত রশ্মিও রেডনের তুলনায় মৃদু।

আগেই বলা হয়েছে যে, চর্মের নানা রোগে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় বস্তুর মত কৃত্রিম আইসোটোপের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। 'বেসালসেল কার্সিনোমা' নামক চর্মরোগে সোডিয়াম ফসফেট দ্রাবণে ভিজা ব্লটিং কাগজ ক্ষতের উপরে লাগিয়ে ফসফরাস ৩২ থেকে নিঃসৃত B রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। আবার লাল ফস্‌ফরাসকে কৃত্রিম রবারের সঙ্গে মিলিত করে এটমিক পাইল থেকে নিঃসৃত নিউট্রন স্রোতে রাখলে ফসফরাসটি তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই রবারের পাতলা পর্দা দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে চিকিৎসা করা হয়। তেজস্ক্রিয়া কমে গেলে এই পর্দাগুলিকে আবার নিউট্রন স্রোতে ধরে তেজস্ক্রিয়া ফিরিয়ে আনা যায়।

ষ্ট্রনসিয়াম ৯০ সেলুলয়েড পাতের সঙ্গে মিলিত করে চোখের পাতার উপরে প্রয়োগ করা চলে। এর তেজস্ক্রিয়া ফসফরাস ৩২-এর চেয়ে উগ্রতর।

মূত্রাশয়ে প্রয়োগের জন্য সোডিয়াম ২৪ ক্লোরাইড (তেজস্ক্রিয় লবণ) দ্রাবণের আকারে ব্যবহার করা যায়।

১৯০১ সালে ডোমিনিচি প্রথম জলে অদ্রাব্য রেডিয়াম সালফেট ক্যান্সার তন্তুতে সূচিপ্রয়োগ করেন। অদ্রাব্য বলে এই বস্তু দীর্ঘকাল তন্তুতে আবদ্ধ থেকে যায় ও স্থানীয় তেজস্ক্রিয়া উৎপাদন করতে থাকে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় জিঙ্ক সালফাইড (Zn63s) এইভাবে প্রথম ব্যবহার হয়। কলয়েড আকারে তেজস্ক্রিয় স্বর্ণও এইভাবে মূত্রগ্রন্থির রোগে ব্যবহার হয়েছে। রেডিও ফসফরাস ব্যবহারকালে দেখা গেছে যে, স্ত্রীলোকের স্তনের ক্যান্সার তন্তুতে প্রয়োগের পাঁচদিন পরে সুস্থ তন্তুর তুলনায় পাঁচগুণ বেশি ফস্‌ফরাস জমা হয়েছে। তেমনি মস্তিষ্কের ক্যান্সার তন্তুতে সুস্থ তন্তুর তুলনায় একশো দশ গুণ বেশি ফসফরাস জমা হয়। সূচিপ্রয়োগের দুই-তিনদিন পরেই এই প্রভেদ দেখা যায়। সম্প্রতি জানা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় ম্যাঙ্গানিজ, তামা এবং আর্সেনিকও এইভাবে রুগ্ন মস্তিষ্কে জমা হয়।

আবার রুগ্ন মজ্জাতন্তুতেও এই তেজস্ক্রিয় অণুটি কিছু বেশি পরিমাণে জমে। তবে রক্তের সাহায্যে অন্য তন্তুতেও এর সঞ্চরণ বন্ধ হয় না। এই দুই কারণে পলিসাইথিমিয়া রোগে (যাতে রক্তে লোহিতকণার সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ে) এই চিকিৎসায় উপকার হয়। রক্তে বাহিত আয়োডিনের অণু যে থাইরয়েড গ্রন্থিতে স্বভাবতই আটকা পড়ে তা আগেই জানা ছিল। তেজস্ক্রিয় আয়োডিনও সেইভাবে আকৃষ্ট হয়। তবে কিছু কিছু অংশ মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এর প্রয়োগে থাইরয়েড ক্যান্সারের চিকিৎসায় কতক উপকার হয়েছে। থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধিরোগে (hyper thyroidism) এই চিকিৎসায় শতকরা ৯০ জনের উপকার দেখা গেছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থেকে তৈরি ডাই-আয়োডো-ফ্লুয়োরেসিন নামক রঞ্জক বস্তু মস্তিষ্কের টিউমারের অবস্থান জানবার জন্য এবং তার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার হয়েছে, তবে এর বিষক্রিয়া যথেষ্ট বলে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা নিরাপদ নয়।

১৯৪৫ সালে এটমিক পাইল বা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টার যন্ত্রে আবিষ্কারের আগে প্রধানত সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সহায়তায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হোত। এই যন্ত্রের দাম যেমন বেশি এর উৎপাদন শক্তি তেমন বেশি ছিল না। এটমিক পাইল বা রিয়্যাক্টারে একই পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তু তৈরি করতে সাইক্লোট্রনের তুলনায় [illegible] ভাগ খরচ পড়ে।

বর্তমানে নানা রোগ চিকিৎসায় প্রায় ২৭টি আইসোটোপের ব্যবহার চলছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫২ সালে জীবতাত্ত্বিক চিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্যে আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য ২.৩ কোটি ডলার খরচ হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় আয়োডিন প্রধানত থাইরয়েড, মস্তিষ্ক এবং যকৃতের ক্যান্সার নির্ধারণ এবং থাইরয়েড বৃদ্ধি এবং কোন কোন হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হচ্ছে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস নানা তন্তুতে ক্যান্সারের অবস্থান জানার জন্য, রক্তের মোট পরিমাণ মাপার জন্য এবং পলিসাইথিমিয়া ও লিউকিমিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহার হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় স্বর্ণ প্রস্টেট গ্রন্থির ও জরায়ুমুখের ক্যান্সারে এবং ফুসফুস, পাকস্থলী ও মূত্রাশয়ের ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট সূচি রেডিয়াম সূচির মত শরীরের নানাস্থানে ক্যান্সার বিনাশের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনসিয়াম চর্ম বা চোখের রোগে ব্যবহার হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, এই সব তেজস্ক্রিয় বস্তু দিয়ে চিকিৎসা যে কোন জায়গায় বা রোগীর বাড়িতে করা সম্ভব নয়। কারণ এর জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের দরকার। আর শুধু রোগীর নয়, চিকিৎসক, নার্স বা অন্য পরিচারকদের নিরাপত্তার জন্যে নানা বিশেষ বর্মের ব্যবহারের দরকার হয়। প্রধানত সীসা দিয়া এই সব বর্ম জাতীয় রক্ষা-যন্ত্র তৈরি হয়। স্টেনলেস স্টীলও কোন কোন জায়গায় ব্যবহার হয়। এমন কি রোগীর মলমূত্রে তেজস্ক্রিয় বস্তু বার হয় বলে সেগুলি যেখানে সেখানে পড়তে দেওয়া হয় না।

শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আধুনিক যুগের একটা প্রধান অসুবিধে হোল প্রগতির পথে আমরা যত এগিয়ে চলেছি, আমাদের সমস্যাও তত বাড়ছে। গতি, শক্তি, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি একদিক থেকে খুবই ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলি থেকে বিপুল শব্দ উৎপাদিত হয়, সেগুলি অনেক সময়ে আমাদের শান্তি নষ্ট করে।

কাজেই যাঁদের সব সময়ে এই রকম শব্দের মধ্যে বাস করতে হয় তাঁদের তরফ থেকে সমগ্র বিশ্বেই যে শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষিত হবে তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। হল্যাণ্ডেও নানা ধরণের ইলেক্ট্রনিক ও টেলি কমিউনিকেসনের এমন এক বিপুল শিল্প গড়ে উঠেছে যে, ওলন্দাজগণও ঠিক একই কারণে শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। তবে ওলন্দাজগণ তাঁদের নিজস্ব ধরণে এই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। শব্দের উৎসগুলিতে শব্দের প্রখরতা নিয়ন্ত্রিত না করে, শব্দকে সহ্যের সীমার মধ্যে রেখে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন।

হল্যাণ্ডে যাঁরা এই সংগ্রাম চালাচ্ছেন, সম্প্রতি তাঁদের সঙ্গে

আলোচনা করে দেখা গেছে যে শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যত রকম কৌশল ও নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে তা খানিকটা মনস্তাত্ত্বিক। কারণ সাধারণ লোক শব্দ নিয়ে একটুও মাথা ঘামান না। তবে যাঁরা কোন আধুনিক বড় বিমান বন্দরের কাছে বাস করুন অথবা বিদ্যুৎ চালিত কোন ড্রিলের শব্দ যাঁদের কানে এসে অনবরত ঘা মারে তাঁরা অবশ্য শব্দের বিরুদ্ধে এক ডাকে সাড়া দেবেন। এ ছাড়া শব্দটা আমাদের স্মৃতিতে বেশিক্ষণ থাকে না বলে জনসাধারণ সাধারণত শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বেশি উৎসাহ দেখান না।

হল্যাণ্ডের ইলেকট্রোনিক রেডিও ও শব্দ উৎপাদক যন্ত্রপাতির একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটীর প্রধান, এই বিষয়টি সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এমন কতকগুলি শব্দ আছে যা এড়ানো যায় না। তবে অজ্ঞাত কোন জায়গা থেকে অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যখন তখন যদি কোন শব্দ হয় তাহলে সেই রকম শব্দই সব চাইতে বিরক্তিকর মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে বেশির ভাগ লোকই কিছুটা শব্দ ভালোবাসেন—বিশেষ করে নিজের কৃত শব্দ। কাঠের মধ্যে পেরেক ঠোকার সময় যদি কোন শব্দ না হ'ত তাহলে পেরেক ঠোকার অর্ধেক মজাই চলে যেতো, তবে অন্য কেউ যদি পেরেক ঠোকে তাহলে কিন্তু সেই শব্দ আমাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়। কাজেই শব্দটা সমস্যা নয়, শব্দের উৎপত্তিস্থলই হ'ল প্রধান সমস্যা—আরও সহজ করে বললে বলতে হয় শব্দটা কে করছে, আমি নিজে না অন্য কেউ।

কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকগণ সব সময়েই শব্দ দূর করার পন্থা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলেন যে, যখন কোন অবাঞ্ছনীয় শব্দ আবিষ্কার করে তা দূর করা হয় তখনই আবার নতুন শব্দের আবির্ভাব হয় এবং নিজেকে জাহির করার জন্য তা ক্রমশ উচ্চতর গ্রামে পৌছুতে থাকে। কারণ যে শব্দটা শ্রুতিগোচর ছিল না, একটা উচ্চগ্রামের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেইটে আবার শ্রুতিকটু শব্দে পরিণত হয়। শব্দের উচ্চতা বা গুণ আমাদের মনে থাকে না বলে, কি ধরণের কতখানি শব্দ হয়েছিল তা একট পরেই আমরা ভুলে যাই। একমাত্র যন্ত্রই শব্দ মাপতে পারে এবং তা রেকর্ড করতে পারে। এর অর্থ হ'ল গতকাল, গত পরশু অথবা দুই বছর আগে কতখানি শব্দ হত তা আমরা স্মরণ করতে পারি না কিন্তু আজকের বা বর্তমানের শব্দ নিয়েই অভিযোগ করি।

বিশেষজ্ঞগণের মত হ'ল, শব্দের উচ্চতার চাইতে কি ধরণের শব্দ, সেইটাই শেষ পর্যন্ত বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই রেডিও বা গ্রামোফোন নির্মাতারা যদি শব্দের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করতে রাজি না হন তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ শব্দের গুণ তাঁদের পরীক্ষা করতে হয়।

শব্দটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ভালো করে ভেবে দেখলে মনে হবে যে নিজের সঙ্গে চারিদিকের সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে শব্দটাই হ'ল সব চাইতে ভাল যন্ত্র। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এমন কথাও বলেন অন্ধ হওয়ার তুলনায় বধির হওয়ার অভিজ্ঞতাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনও বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে থাকলে চোখ বুজে তা দেখা থেকে বিরত হওয়া যায়, কিন্তু শব্দতরঙ্গ সমস্ত রকম পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজে প্রবাহিত হতে পারে এবং আলোক তরঙ্গের চাইতে মন্দ সহজে বাধার পাশ কাটিয়ে যেতে পারে।

কাজেই শব্দ যখন গণ্ডগোলে পরিণত হয় তখনই প্রকৃত সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ গণ্ডগোলকে অবাঞ্ছিত শব্দ বলা যায়।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের মতো সাধারণ লোকের কাছে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হয়। সহজ বুদ্ধিতে আমরা যা বুঝি তা হল অবাঞ্ছিত শব্দ আমাদের মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে এমন কি আমাদের পরিপাকক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বিপুল একটা ট্রাক যথেষ্ট শব্দ করে চলে গেলেও আমরা যতটুকু বিরক্ত না হই, পাশের বাড়ির সামান্য গোলমালেও আমরা তার চাইতে বেশি বিরক্ত হই। রাস্তার যানবাহনের শব্দে আমরা এত বেশি অভ্যস্ত যে সেই শব্দে আমরা বিশেষ বিরক্তবোধ করি না।

তবে এইদিকে হল্যাণ্ড কিছুটা কাজ করছে।

দেওয়ালের ছবি

বরুণ মজুমদার

পুষ্পিত কাননের মাঝে বাজাও বাঁশরী তব
তুমি এক অজানা পথিক।
করাল কালের চিহ্ন পড়বে না তোমার উপর,
আঁকবে না পদচিহ্ন তার—
হিরন্ময় যৌবন নিয়ে
জেগে রবে চিরকাল পৃথিবীর বুকে।

এ দেখি সাঁঝের বেলা,
তবু আজ ক্লান্ত বিহঙ্গের মত পাখিহীন বনে
কেন কবি বসে আছো বিষণ্ণ বদনে ?
সে ফুল তো ঝরে গেছে, ফুটবে না আর,—
বাতাস গন্ধ আর বইবে না তার

এইটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পাই তবু
সারাদিন জেগে আছে সমুখে তোমার—
যারে নিয়ে রচেছিলে মজার বাগান।
মানুষের হাহাকারে
করুণার্দ্র হবে নাকো তোমার হৃদয়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

—বরফের দেওয়াল ? ভ্রূ কোঁচকায় রত্না। প্রতিমাকে দেখে কখন ওর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিলো। দাঁড়িয়েই ছিল। বসবার কথা একবারও মনে হয় নি। বরফের দেওয়ালের মধ্যে-ই ছিল, তুমি—নির্লিপ্ত, সুদূর—দেবী প্রতিমার মতো। কোনদিন ভাবতে পারি নি সেই দেওয়াল—বারবার মাথা নীচু করতে হয়েছে—আর আজ !—আজও তুমি।

ছায়াচিত্রের ফ্লাশ ব্যাকের মতো অতীতের সেই দৃশ্যগুলি একের পর এক রত্নার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

তার বাবা অনাদিনাথ প্রথমে কিছু-ই জানান নি। হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলেন, গ্রামে তিনি একটি বাড়ি করছেন সেখানে গিয়ে থাকতে হবে। সবাই হতবাক। প্রতিবাদের ঝড় বইতে থাকে। সবাই তাতে যোগ দেয় শুধু রত্না বাদে। গ্রামে যাবার প্রস্তাবে সেও বিরক্ত হয়েছিল—কিন্তু পিতার কথার প্রতিবাদ সে করে নি।

তার বাবা অনাদিনাথ ছিলেন তার আদর্শ পুরুষ। খুব অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল অনাদিনাথের। ওর বয়স যখন মাত্র উনিশ তখন রত্নার জন্ম হয়। সে অনাদিনাথের জীবন-যুদ্ধ দেখেছে। দেখেছে সেই জীবন বস্তি-বাড়িতে যখন থাকতো, পাশের ঘরেই থাকতো একটা দিন-মজুর। জল নিয়ে, কল নিয়ে প্রত্যহের সেই কলহ। একদিন অনাদিনাথের সঙ্গে মজুরটির হাতাহাতি হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে একটা বিশ্রী কটাক্ষ করেছিল মা'র প্রতি। অবশ্য সেই দ্বন্দ্বে অনাদিনাথই জিতেছিলেন, কিন্তু অনেকটা যেন নীচে নেমে গিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে যখন শতাধিক মজুর অনাদিনাথের ইঙ্গিতে চলেছে তখন অনেকদিন এই দৃশ্যটির কথা মনে হয়েছে রত্নার। ও ভাবতো যদি সেই মজুরটিও এখানে এদের মধ্যে থাকতো—

কি করে যে অনাদিনাথ বস্তি-বাড়ির একখানা ঘরের ভাড়াটে থেকে বিরাট বাড়ির মালিক হলেন তা জানে না রত্না। শুধু এর মনে আছে 'যুদ্ধ' নামে একটা কথা যেন চারিদিকে ভেসে বেড়াতো—আতঙ্ক আর উত্তেজনা—দলে দলে লোক কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—ম্লান মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা আর তারি মধ্যে ওর বাবা যেন একটু উৎফুল্ল—দিনে ঠিক বোঝা যায় না—কিন্তু রাত্রে মা'র সঙ্গে গুজগুজ ফিসফিস—বড় বড় গাড়ি এসে বস্তির সামনে দাঁড়ায়—রাত্রে একদিন ঘুম চোখে রত্না দেখতে পায় বাবা অনেকগুলি টাকা গুনছে—বস্তা ভর্তি তাড়া তাড়া নোট—

তারপরে একদিন রত্না শুনলো বাড়ি তৈরি হচ্ছে তাদের—একদিন ওরা সবাই মিলে গিয়ে দেখেও এলো—ওদের বাসা থেকে অনেক দূরে বেশ খানিকটা জমির ওপরে বাড়িটা উঠছে—অনাদিনাথ ঘরগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—একতলা, দোতলা ভাড়া দেওয়া হবে—তিন তলায় ওঁরা থাকবেন।

তখন রত্না বড় হয়েছে—ছোট ছোট অনেক ভাই বোন তার। সেই সময়ে সে কিছুটা জানতেও পেরেছিল অনাদিনাথের অর্থ প্রাপ্তির ইতিহাস।

অনাদিনাথ ছিলেন—যুদ্ধের রসদ জোগানদার। সেই রসদে গরু, ভেড়া, ছাগল, মানুষ সব-ই ছিল। আনাদিনাথ একদিন হাসতে হাসতে বন্ধুকে বলছিলেন, মেয়েমানুষ জোগানদার হলেই সব চেয়ে লাভ—বিশেষত মেয়ে মানুষ !

আশ্চর্য। এ সব কথা শুনে রত্নার রাগ হয় নি সে ভেবেছিল অনাদিনাথের কৃতিত্বের কথা। বিনা মূলধনে তিনি এত বড় বাড়ি করেছেন, জমিয়েছেন এতো টাকা—পথের প্রশ্ন অবান্তর—প্রাপ্তিটাই মূল কথা।

এমন কি অনাদিনাথের মদ্যপান—যে জন্য রত্নার মা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতেন তাতেও রত্নার আন্তরিক সম্মতি ছিল। ওর মনে হোত—মদ খেয়ে চোখ লাল হলে বাবাকে বেশ দেখায়—মনে হয় যেন প্রকৃত পুরুষ।

তাই অনাদিনাথের গ্রামে গিয়ে বসবাসের প্রস্তাবে বাড়ির সবাই বিরক্ত হয়েছিল—প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু রত্না অস্বস্তি বোধ করলেও বিরক্ত হয় নি বা প্রতিবাদ করে নি।

পরে সে ওখানে যাবার কারণটা জানতে পেরেছিল।

গ্রামে গিয়ে সবাই খুশি হয়েছিল। বিরাট বাড়ি বাঁধানো পুকুর।

যা এদের প্রধান ভয় ছিল—অন্ধকার রাত্রি—সেদিক দিয়েও কোন অসুবিধে নেই, ডায়নামো দিয়ে অনাদিনাথ বাড়ি আলোতে ঝকঝকে করে তুলেছিলেন।

মাঝে মাঝে রত্নাকে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন অনাদিনাথ। তেমনি একদিন গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রায় ভস্মস্তূপ একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এখানে এক অহংকারী জমিদারের কপর্দকহীন বংশধর বাস করে।

—এখানে কেউ থাকে? ভ্রূ কুঁচকে অবাক হয়ে বলে রত্না।

—না থেকে কি করবে? হেসে বলেছিলেন অনাদিনাথ, যাবে কোথায়? এখানেও থাকতে দিতে ইচ্ছে অবশ্য আমার ছিল না নিতান্ত সেই বউটা—নিজের মনেই ভ্রূ কুঁচকে অনাদিনাথ বলেছিলেন।

—তুমি চেন এদের?

—চিনি? হঠাৎ হাসতে থাকেন অনাদিনাথ, আয় ঐ মাঠে বসি। মাঠে বসে সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন অনাদিনাথ।

ছেলেবেলা থেকে ওরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছিল, অনাদিনাথ ও ত্রিপুরাশঙ্কর। একই বাড়িতে, এক বয়সের দু'টি ছেলে—একই ভাবে থাকতো—কারণ ও বাড়িতে আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার মধ্যে খাওয়া পরার বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। কিন্তু তবু যেন ত্রিপুরাশঙ্কর বিশিষ্ট—একক।

কর্ণের যেমন সহজাত কবচকুণ্ডল তেমনি জন্মগত আভিজাত্যের বর্ম ঘিরে থাকতো ওকে, অনাদিনাথ বলেন, কিছুতেই নাগাল পেতাম না ওর। ইচ্ছে হলেও ওর গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে পারতাম না—এমন কি মনে হোত খুব সহজ একটা সাধারণ কথাও বলা যেন কঠিন—কিন্তু ও যখন আমার সঙ্গে নিজে থেকে কথা বলতো তখন সবই সহজ হয়ে উঠতো।

প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমি এই যন্ত্রণা সহ্য করতাম—তারপরে একদিন আর পারলাম না—একদিন বেরিয়ে পড়লাম। যেভাবেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে—তারপরে খোলস কেটে ঐ লোকটাকে বের করে আনব আমি।

গোধূলির লাল আলো তখন মিশে গেছে—সন্ধ্যার ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সেই ধূসর কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে অনাদিনাথ।

—টাকা আমি অনেক উপার্জন করেছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কিন্তু তার খোলস কাটতে পারি নি। শেষ দিন পর্যন্ত সে আমার মুখে জুতো মেরেই চলে গেল।

প্লাবনের মতো যখন অনাদিনাথের চারিদিকে টাকা ফুঁসে উঠলো—কলকাতার বাড়ি করবার আগেই গাড়িটা কেনবার পর অনাদিনাথ গাড়ি চালিয়ে সোজা এসেছিলেন ত্রিপুরাশঙ্করের কাছে—বরাবরই তাঁর খবর রেখেছেন অনাদিনাথ—খবর পেয়েছেন ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়েছেন ত্রিপুরাশঙ্কর। কোন নির্দিষ্ট আয় নেই, ঋণ করে করে খরচ চালাচ্ছেন—এমন কি তাঁর নেশা—আশ্রিত প্রতিপালনের নেশার সেই খরচ—

খুব চালের মাথায় নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন অনাদিনাথ। বার বার তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল কিভাবে ঠোঁটটা একটু মুরুব্বীয়ানা চালে ত্রিপুরাশঙ্করকে উপদেশ দিচ্ছেন তিনি। ত্রিপুরাশঙ্করকে উপদেশ ভাবতেই গাড়ির স্পীড বেড়ে যাচ্ছিল তাঁর।

কিন্তু প্রথমেই বাধা। গেটে দারোয়ান—এর কথা ভাবেন নি তিনি।

ভ্রূ কোঁচকান অনাদিনাথ। পাথরের সিংহ দু'টি ওঁর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে।

রাগে গা জ্বলতে থাকে তাঁর। ইচ্ছে হয় দু'হাতে ঐ পাথরের সিংহ দু'টি ও দারোয়ানটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেট ভেঙ্গে গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে যান।

কিন্তু, কিছুই করা সম্ভব নয়। সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা চেপে চুপ করে দাঁড়াতে হয়—দারোয়ান কার্ড নিয়ে যায়—প্রায় আধঘণ্টা পরে ফেরে।

তারপরে ধীরে ধীরে দারোয়ানের পেছনে পেছনে যান অনাদিনাথ। উৎসাহ, উত্তেজনা তখন একফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না।

সব ঠিক একই রকম আছে। কুড়ি বৎসর আগে কিশোর একটি ছেলে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। তারপরে তার জীবনে কত ঘটনাই না ঘটে গেল—দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য সে পরের দাসত্ব করেছে এক কলসী জলের জন্য করেছে কুৎসিত কলহ—তিলে তিলে বিবেককে করেছে নিঃশেষিত। যুদ্ধের সেই নরকের মতো কালো অন্ধকারে নরকের জীবের মতোই—না, সে সব কথা ভাবতেও পারে না অনাদিনাথ।

কিন্তু এই বাড়িটা রয়েছে একই রকম—অপরিবর্তিত। সেই পাথরের সিংহ, জল প্রদানকারিণী মৎস্য-নারী, উৎফুল্ল পরীরাণী পার হয়ে বারান্দার কোণের প্রকাণ্ড হল ঘরটি—অনাদিনাথের মনে হচ্ছিল যেন সবেমাত্র কাল তিনি এই বাড়ি ছেড়ে গেছেন। সেই হলে আগের কার্পেটই পাতা—যা কোনদিন পুরাণ হবে না—যার দাম কখনও কমবে না। সেই হাঙ্গরমুখো পাল্কীর আকারের পালঙ্ক সমগ্র বিশ্ব চকিত হয়ে উঠেছে সেই যুদ্ধের রেশ কি এখানে পৌঁছয় নি? ভাবেন অনাদিনাথ। যখন তিনি এ বাড়ি ছেড়ে যান তখন এই ঘরে থাকতেন ত্রিপুরাশঙ্করের পিতা শিবশঙ্কর। এখন সেখানে রয়েছেন ত্রিপুরাশঙ্কর। কিন্তু ঠিক মনে হচ্ছে যেন শিবশঙ্কর। দুজনের চেহারাতে কি আশ্চর্য মিল। সে ঘরে ঢোকবার আগেই নিজের কাছে যেন অনেকে ছোট হয়ে গিয়েছিল অনাদিনাথ।

—এসো, প্রশ্রয়ের কণ্ঠে ডেকেছিলেন ত্রিপুরাশঙ্কর—ঘরে ঢুকেছিলেন অনাদিনাথ।

—কেমন আছো? আবার সেই মুরুব্বী চালের প্রশ্রয়ের সুর। মুহূর্তের মধ্যে যেন মাথায় আগুন জ্বলে যায় অনাদিনাথের। পাইপ হাতে যে কথাগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে বলবার ইচ্ছে ছিল তা যেন আচমকা একটা বিশ্রী চীৎকারের মতো বেরিয়ে পড়ে, ভালো আছি—খুব ভালো আছি। পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছি—বাড়ি করছি লাখ টাকায়।···

বলতে বলতে থেমে যান অনাদিনাথ থামতে বাধ্য হন। ত্রিপুরাশঙ্কর হাসছেন। শুধু ত্রিপুরা নন,—সমস্ত ঘরটাই হাসছে।

হঠাৎ তার নিজেরই মনে হয় সত্য সত্যই কথাটা হাস্যকর। অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে যান। মুখটা কালো হয়ে যায়।

—বেশ। বেশ। ত্রিপুরাশঙ্কর হাসিমুখে বলেন।

—তুমি কি করে চালাচ্চ? যেন মরীয়া হয়ে প্রশ্ন করেন তিনি।

—ধার করে, ত্রিপুরাশঙ্করের মুখে নির্বিকার নির্লিপ্ত হাসি।

—ধার করে? অনাদি চমকে ওঠেন। তাঁর জীবন-দর্শনের ঠিক বিপরীত। তিনি নিজে বরাবর মেনে চলেছেন এবং এখনও মানছেন যে ধার করবেন না। যার যেমন সঙ্গতি সেইভাবে চলবে। তিনি বিশ্বাস করেন শুধুমাত্র এই কারণেই তিনি আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। আর এ যে একদম বিপরীত কথা। কই এ কথা তো তিনি কি দিকে কোন উপদেশ দিতে পারছেন না।

—কোথায় ধার পাও?

—লোকে দেয়।

—তা দেবে। অনাদি মাথা নাড়েন। চড়া সুদে ধার লোকে পায়ে পড়ে এসে দিয়ে যাবে। অনাদি নিজেই তো দিতে ইচ্ছুক।

পলকের মধ্যে কয়েকটা কথা যেন বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো ওঁর মনকে নাড়া দেয়। এই সুযোগ—ঐরাবতের গলায় দড়ি পরাবার এই একমাত্র সুযোগ।

—আমিই ধার দেবো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কণ্ঠে ফুটে ওঠে ব্যগ্রতা।

—বেশ। এমন ভাবে কথা বললেন ত্রিপুরাশঙ্কর যেন কোন প্রজার কাছ থেকে নজরানা নিচ্ছেন।

ঠিক এই ভাবেই শেষ দিন পর্যন্ত টাকা নিয়ে এসেছেন ত্রিপুরাশঙ্কর। ভাবখানা এমন যেন তিনি দয়া করে গ্রহণ করে সবাইকে কৃতার্থ করে দিচ্ছেন। দেবতার পূজা গ্রহণের মতো শান্ত, স্নিগ্ধ অভিব্যক্তি।

—সবই লেখা রইলো আমার হিসেবের পাতায়, একদিন হিসেব-নিকেশ হবে। তোমার ঐ হাসি আমি বন্ধ করবো, রুদ্ধ আক্রোশে ফিসফিসিয়ে বলতেন অনাদি।

কিন্তু ঐ হাসি তিনি বন্ধ করতে পারেন নি। শেষ কিস্তির টাকা যেদিন নিয়ে গেলেন···

বাড়ির সামনে গিয়েই বুঝেছিলেন, কিছু একটা ঘটেছে। গেটে দারোয়ান নেই। সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ত্রিপুরার ঘরের সামনে অনেক লোক। কিন্তু অনাদির চোখে শুধু পড়লো একটি মৃত্যুশীল হাসি।

সমগ্র জীবনভোর যে হাসি হেসেছেন ত্রিপুরা—শুধু তা যেন আরও একটু নীল হয়েছে—আকাশের নীলের সঙ্গে মিশে গেছে।

সেই হাসির দিকে তাকিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন অনাদি। যে ভাবেই হোক ঐ হাসি মুছে ফেলতে হবে।

কিন্তু তা তিনি পারেন নি। রত্না অবাক হয়ে দেখে দু' হাতে মুখ ঢেকে চোখের জল ফেলছেন অনাদিনাথ। তার বাবা যাঁর দুর্দান্ত প্রতাপে বাড়ির প্রতিটি লোক এমন কি ইট, কাঠ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। দূর থেকে যাঁর পায়ের শব্দে সামাল সামাল পড়ে যায়, তিনি শিশুর মতো কাঁদছেন। গভীরভাবে এই দৃশ্য রত্নার মনে দাগ কেটে যায়।

তারপরেও যখন স্কুলে (যে স্কুল বলতে গেলে অনাদির টাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) গিয়ে সেই মেয়েটিকে দেখলো সেই মেয়ে যার নাম প্রতিমা রায়চৌধুরী···

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রত্না। ঠিক যেভাবে দেবী প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকে বিমুগ্ধ ভক্ত। তাকিয়ে দেখে ওর সাদা রং, আর মুখের সাদা সুদূর আভা।

—প্রতিমা রায়চৌধুরী? বড় বাড়ির মেয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে সেই বিহ্বল-বিস্মিত মন বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

—বড় বাড়ির মেয়ে, কোন বড় বাড়ি! তাদের বাড়িই তো এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় বাড়ি।

—বড় বাড়ি কোনটা? ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে রত্না। তাদের বাড়িই তো এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা বড় বাড়ি।

—ও:। তুমি জানো না। ঐ যে সেই সিংহ বসানো বাড়িটা।

—সে তো একটা ভাঙ্গা বাড়ি। বিদ্রূপের সঙ্গে এবারে অন্তরের জ্বালার উগ্রতা মেশে।

আর সেই জ্বালার প্রবাহ মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে উগ্রতর হয়ে ওঠে। ভাঙ্গা বাড়ি। কথাটা যেন ওদের মর্মমূলে আঘাত করেছে। ওদের মুখ দেখে মনে হয় কথাটা উচ্চারণ করে ও যেন সাংঘাতিক কোন অন্যায় করেছে। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ ওদের মনে গজ-গজ করছে কিন্তু সাহস করে প্রকাশ করতে পারছে না।

তারপরে প্রতিনিয়ত চলতে থাকে সেই অদৃশ্য মনোভাবের খেলা। ক্লাশের সব মেয়েই তার অনুগৃহীত—অনুচর—কিন্তু যে শ্রদ্ধা মিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে তারা এই একান্ত নীরব মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে তার রেশ সে কখনও খুঁজে পায় নি।

অথচ একমাত্র তাই চায় রত্না।

টিফিনের সময়ে রূপার মোটা মোটা গয়না ও ছাপা শাড়ী পরা কালো, মোটা পশ্চিমা ঝি সোনার মতো ঝকঝকে টিফিন কেরিয়ারে খাবার নিয়ে আসে। বিরাট টিফিন কেরিয়ার। অনেক খাবার। ক্লাশের সব মেয়েই রত্নার খাবারের অংশীদার।

রত্না এক মিনিট চুপ করে ভাবে। তারপরে ঠোঁট টিপে এগিয়ে যায়—এস না ভাই। আমার সঙ্গে খাবে এস।

মেয়েটি তার সেই সুদূর দিগন্তের কুহেলিকার চোখে তাকায়। তারপরে একটি কথাও না বলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

রত্না ফিরে আসতেই মেয়েরা ফিসফিসিয়ে বলে, ওকে ডাকছ কেন। ও খাবে তোমার খাবার।

আগুনের মতো জ্বলে ওঠে রত্না। কি ভেবেছে এরা? কিন্তু হায়, মানুষের ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না।

রত্না হতে চেয়েছিল প্রতিমা রায়চৌধুরী। সমগ্র স্কুলজীবন রত্না প্রতিমাকে ঘৃণা করেছে—যত ঘৃণা করেছে তত আকর্ষিত হয়েছে—ওর দেহ, মন প্রাণে ও চেয়েছে ঐ পিঙ্গল চোখের সুদূর আভা:

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

সেজন্যই আজ আমার এই অবস্থা। রত্নার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

আমার সোনার হলুদ প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল ঐ নীলের আভা। কিন্তু প্রত্যক্ষের অগোচরে, নিজের মনকেও লুকিয়ে ও চেয়েছিল দেহে নীলের আভা আনতে।

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

পাহাড় যদি মেঘ হয় তবে কি অবস্থা হয় তার। ঠিক সেই অবস্থা হোল আমার।

কত চেষ্টা করেছি ঐ সাদা, ফ্যাকাশে চেহারাটিকে অপমানিত করবার আর···একটু থামে রত্না ফিসফিসিয়ে বলে, আর আপন করবার, কিন্তু কিছুতেই করতে পারি নি। ওর পাশে বসেছি, গায়ে হাত দিয়েছি, প্রগলভের মতো অনেক কথা বলেছি কিন্তু···

ছবিকে কি অপমান করা যায়?

ছবিকে কি ভালোবাসা যায়?

প্রবীর বস্থ চোখে জল ভরে ওঠে। শিল্পপতি প্রবীর বস্থ যার ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র লোক চালিত হয়। আয়নার জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই একটু হাসে প্রবীর।

শৌর্যের অহঙ্কার, বীর্যের অহঙ্কার, বিত্তের অহঙ্কার। সর্বোপরি আত্ম-অহঙ্কার আমি কাউকে দেখে মুগ্ধ হই না। ফুলগুলি রূপসীর মতো পায়ে এসে পড়ে না—রূপসীরাই ফুলের মত স্তবকে স্তবকে পায়ে এসে পড়বে।

রূপসী কি রূপহীনা—কোন মেয়েকেই সে কখনও চায় নি।

আর, তাই এত বড় শাস্তি পেল সে।

হঠাৎ নিতান্ত খেয়ালবশত পুতুলের ওখানে গিয়েছিল সে। পুতুল তার দূর সম্পর্কীয় বোন। সেখানেও সেই একই তর্ক। নারীর রূপ যে কিছুই নয় তাই ছিল ওর বক্তব্যের প্রতিপাদ্য।

—কি বলছ তুমি সোনাদা' পুতুল হাসিমুখে চেঁচিয়ে উঠেছিল, রূপসীর রূপের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, ট্রয়ের যুদ্ধ আর···

বলতে বলতে [illegible] একটা ছায়া [illegible] পিঙ্গল চুল আর পিঙ্গল চোখ।

শুধু একবার দেখা আর সব শেষ।

তখন অবশ্য মনে হয়েছিল, শেষ নয় এই শুরু। এতদিনে গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে হৃদয়—এইবার তার যাত্রা আরম্ভ হবে।

পুতুল বুঝতে পেরেছিল—ঠোঁট টিপে হেসে বলে, সোনাদা', এই প্রতিমা।

অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা।

নাম কি প্রতিমা। নিজের মনে বলে উঠেছিল প্রবীর। তখন, সেই মুহূর্তে, ঠিক তাই মনে হয়েছিল বটে।

তারপর।

হ্যাঁ, তারপরেও অনেক আশা। কত আশা নিয়েই না সে অপেক্ষা করেছিল ফুলশয্যার রাত্রে। মনে হয়েছিল আকাশে, বাতাসে মধু ভাসছে।

সন্ধ্যা থেকেই অনেক লোকজন দেখতে এসেছিল প্রতিমাকে। লাল ভেলভেট বসানো সিংহাসনের মতো উঁচু চেয়ারে রাণীর মতই সেছিল প্রতিমা। পৃথিবীর কোন রাণীই বোধ হয় অত সুন্দরী নয়। সন্ধ্যা থেকে বারবার এসে এসে তাকে দেখছিল প্রবীর—আর যত খছিল ততই—

রাত্রে ঘরে ঢুকে সেই শিরশিরাণি যেন আরও বেড়ে যায়। ঘরটার চেহারাই যেন বদলে গেছে। আকাশের পরী মাটিতে নেমে এসেছে।

বাইরে মিষ্টি আওয়াজ আর হাসির ঝঙ্কার। তারপরে, ওরা ওকে নিয়ে আসে।

লাল শাড়ি আর ফুলের মালা। শেষ—সব শেষ।

কিন্তু, যে মুহূর্তে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসলো প্রতিমা, যে মুহূর্তে তার ঋজু, কঠিন উদাস মুখ দেখতে পেল প্রবীর, সেই মুহূর্তেই নামহীন একটা ক্রোধ, অসূয়া, বিদ্বেষ আর পাবার ও ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা যেন একসঙ্গে মাতামাতি করে মাথা তোলে। পায়ের পাতা থেকে মাথার শিরা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা সমস্ত মন ফুঁসে উঠেছে—ওকে নিতে হবে, ওকে পেতে হবে, শেষ করতে হবে।

উঠে বসে প্রবীর। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে প্রতিমাকে। অধিকারের আবেগ ও নির্দয়তায় ওকে পেষণ করে—ঐ নরম শরীরটা থেকে নিংড়ে বার করে নিতে চায় মুখের ঐ ঋজু, কঠিন ঔদাস্য।

কিন্তু না। অসম্ভব।

হিংস্র রাগে প্রবীরের দু'চোখ জ্বলতে থাকে। যে ভাবেই হোক ও নিজের অধিকার মুদ্রিত করে দেবে ঐ উদাস দেহে।

তীব্র বিদ্বেষ ও উত্তেজনায় ও তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় ওর কণ্ঠ, হাত, গলা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে,—প্রতিমা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার—আমার!

ক্লান্ত, উত্তেজিত প্রবীর থেমে যায়। প্রতিমাকে শুইয়ে দেয় বিছানায়।

উত্তেজনার অবসাদে আর এক গোপন অপরাধবোধ। যন্ত্রণার জ্বালায় মধুরাত তার কাছে কালো হয়ে ওঠে।

শুধু প্রথমবার নয়—যতবার যতরাত্রি—ততবারই এই ক্লান্তি, ক্লিষ্টতা আর অপরাধবোধের গ্লানি।

প্রতিমার অপরূপ রূপের উদাসীন রিক্ততা—নীরব আত্মকেন্দ্রিকতা বারবার তাকে বিমুখ করেছে আবার তখনই সেই সুন্দর দেহের অবদানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে সে।

যখন ঐ সুন্দর দেহটাকে টুঁটি চেপে শেষ করে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে তখনই ওই দেহের ছলনায় মুগ্ধ হয়েছে।

ছলনা? ছলনা ভিন্ন আর কি বলা যায়। কয়েকদিন পরেই যে প্রবীর জানতে পেরেছিল—

সাবানের বাক্সটা স্যুটকেসে ভরতে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রবীর।

এক নিস্তব্ধ, নিরালা অপরূপ সন্ধ্যায় প্রতিমার দু'হাত ধরে প্রবীর বলেছিল তুমি কথা বল না কেন প্রতিমা?

পিঙ্গল দু'টি চোখ।

প্রতিমাকে কাছে টেনে আবার বলেছিল প্রবীর, তুমি কেন হাস না প্রতিমা!

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল পিঙ্গল তারা দু'টি।

—তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না? ভিখারীর দীনতা প্রবীরের কণ্ঠে।

প্রতিমা নিরুত্তরে দুহাত বাড়িয়ে ধরেছিল স্বামীকে।

—ভালবাস—তবু কেন কথা বল না? আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিল প্রবীর।

—বলব, কয়েকটা কথা তোমাকে বলব। প্রতিমা বলেছিল।

—কি? কি? উৎসাহে আবেগে গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রবীরের।

—কাল বলব।

পরদিন সমস্তক্ষণ প্রবীরের কেটেছিল এক অদ্ভুত নেশায়। নিজের অধীরতা ও পাগলামী দেখে নিজেকেই বিদ্রূপ করেছিল প্রবীর। এ যেন বয়ঃসন্ধির মধুর আবেগ, প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেম। দেহের দাবীর চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছিল মনোরাগ।

পরদিনও সেই নিরালা, নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। কোন গোপন আবেগে সেই সন্ধ্যা যেন আরও মধুরতর হয়ে উঠেছে। একটু দূরে বসেছিল প্রবীর। অনেকক্ষণ কেটে যায়, কোন কথা বলে না প্রতিমা।

—কি বলবে বলেছিলে? ধৈর্য্যহারা হয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রবীর।

তেমনি ভাবেই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে প্রতিমা। শান্ত উদাস স্বরে বলে, তুমি এত অলস কেন?

কথা শেষ করেও ফিরে তাকায় না। যেন পাথরের মূর্তি কথা কইছে দেয়ালের সঙ্গে।

—কি বললে? প্রবীরের মনের তারে কথাটা ঠিক মত বাজে না।

—তুমি এত অলস কেন?

—অলস? আমি? কিসে?

—সমস্ত দিন কিছু না করাটাই অলসতার লক্ষণ।

—আমার কোন কাজ প্রয়োজন নেই তাই করি না আমি, এতে অলসতার কি হলো?—অনেকটা আত্মস্থ হয়ে উঠেছে প্রবীর।

—দুনিয়ার প্রত্যেকেরই কাজ আছে—ঠিক তেমনি ভাবে পাথরের মূর্তি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—হ্যাঁ কাজ সকলেরই আছে। তবে কাজের রূপ ভিন্ন ভিন্ন। কারো কাজ অভাব মেটান, কেউ কাজ করে চিরন্তন চির অতৃপ্ত অসন্তোষ শান্তির জন্য, কারো কাজ অলসতা নিয়ে খেলা।—প্রবীর বলে।

—প্রতিদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভাব মেটানোর জন্য কাজ করে দিন মজুর, অলসতা নিয়ে খেলা করে যারা দেহ ও মনে পঙ্গু, অতৃপ্ত অসন্তোষের জন্য যারা কাজ করে তারাই জীবনে বড় হয়।

—অসন্তোষকে তুমি এত উঁচুতে স্থান দিচ্ছ কেন?

—অসন্তোষই মানুষকে বড় করে জাতিকেও।

—ধ্বংসও করে।

হঠাৎ প্রতিমা মাথা নাড়ে। পিঙ্গল চুলগুলি নেচে ওঠে মুখের চারি পাশে—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, বড় হওয়া, ধ্বংস হওয়া, উন্নতি-অবনতি, জয়-পরাজয়—চলার পথে এ তো আছেই। তাই বলে মানুষ চলবে না, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে না তার? জড়ভরতের মত

স্থাণু হয়ে বসে থাকবে? তাহলে কি তফাৎ একটা পাথরের টুকরোর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের?

প্রবীর অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। বক্তব্যের চেয়ে বক্তার উত্তেজনায়, বলার ভঙ্গীতেই বেশি বিস্মিত হয় ও। কথাগুলি যেন প্রতিমার কণ্ঠে লেগেছিল। কত দিন, কত রাত্রে, কত মুহূর্তে এই কথাগুলি বার বার উচ্চারিত করেছে। নিজেকেই শুনিয়েছে, বিশ্বাসের ছাপে প্রতিটি অক্ষর সিক্ত হয়ে উঠেছে।

—প্রতিমা, স্থির গম্ভীরকণ্ঠে প্রবীর বলে—মানব স্থাণু নয়, সে চলমান। তার পথ এক নয়, বহু। প্রত্যেক মানবকে স্থির করে নিতে হবে, সে কি চায়?

—কি চাও তুমি? তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে প্রতিমা।

—তোমাকে? উত্তর দেয় প্রবীর—কালো চোখ দু'টি প্রতিমার দিকে ফেরায় কিন্তু তার মুখ অন্যদিকে। একবার যদি এদিকে মুখ ফেরাত প্রতিমা।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ মুখ ফেরায় প্রতিমা। পিঙ্গল দু'টি চোখের তারা অন্ধকারে জোনাকীর মত জ্বলে ওঠে। বলে, আমি চাই টাকা। প্রচুর টাকা। বিরাট প্রাসাদ, বিরাট গাড়ি আর অর্থের প্রভুত্ব। আমি বাঁচার মত বাঁচতে চাই।

—শুধু অর্থ হলেই কি বাঁচার মত বাঁচা যায় প্রতিমা?

—স্বামী, সন্তান, সংসার এই সব অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবেই আসে জীবনে যেমন ভাবে নদী, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে নীচে। প্রবীরের কথায় খেয়াল না করেই বলতে থাকে প্রতিমা, কিন্তু অর্থ আহরণ করতে হয়। তার জন্য চাই পরিশ্রম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা। ধনদার কৃপা অমনি হয় না।

প্রবীর আর কোন কথা বলে নি। একটি প্রশ্ন বারবার তার কণ্ঠের নিকট এসে ফিরে গিয়েছে। সে শুধু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল, প্রতিমা প্রেমও কি খুবই সহজলভ্য। তার জন্য কি কোন তপস্যার প্রয়োজন নেই—তার প্রাপ্তিতে কি নেই কোন আনন্দ? প্রেম-দেবীর প্রসাদ কি অমনি হয়?

কোন লাভ নেই। ব্যক্তির মূল্য যে দেয় না সে দেবে কথার মূল্য। মনে পড়ে, কতদিন দুরন্ত আবেগে প্রতিমাকে চুম্বন করেছে সে। কিন্তু প্রতিমার গালে পড়ে নি লজ্জা-লালিমা রেখা। চোখ দু'টি ওঠে নি ভারি হয়ে। খুব সহজে নিজেকে সমর্পণ করেছে সে।

আজ প্রতিমা বলছে, আমাকে ছেড়ে যেও না।

কি ভেবেছে তাকে প্রতিমা। সে কি পাথর? পশু? দেবতা? দানব? প্রতিমাকে দেখে সে তাকে ভালোবেসেছিল সম্পূর্ণ সত্তায় আর আজ তাকে পাবার পরে আবার ঠিক তেমনি ভাবে ঘৃণা করছে। এই ঘৃণা।

প্রতিমার মনটাকে ঘৃনা করেছিল সে অনেকদিন আগেই। সে রাত্রির কথা মনে পড়ায় একলা ঘরেই শিউরে ওঠে প্রবীর।

কিন্তু সে রাত্রির আগে তো আরও রাত্রি ছিল।

সেদিন রাত্রে আর থাকতে পারে নি প্রবীর। প্রতিমার দু'হাত সজোরে ধরে সে বলে, কি ভাব তুমি? বল, বল, উত্তর দাও।

—কেন কথা কইছ না। কেন চুপ করে আছ? কেন? কেন?

—কি চাও তুমি আমার কাছে? কি চাও? কি করতে বল তুমি আমাকে?

পিঙ্গল চোখ দু'টি খুলে যায়। পিঙ্গল দু'টি তারা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে একটু হাসে প্রতিমা। লাল ঠোঁটের আড়ালে সাদা দাঁতগুলি।—

—প্রতিমা আমার প্রতিমা, প্রবীর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে। প্রতিমা আমি তোমাকে ভালবাসি। শুধু তুমি···শুধু তোমাকেই চাই আমি।

মিলিয়ে যায় দাঁত। লাল···কঠিন লাল দু'টি শক্ত ঠোঁট কঠিনভাবে চেপে ধরে সেই অম্লান শুভ্রতাকে। স্থির হয়ে জ্বলতে থাকে দু'টি··মণি।

প্রবীর অনুভব করে আলিঙ্গনে বাঁধা প্রতিমার শরীরটা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে। রক্তমাংস শুকিয়ে পরিণত হচ্ছে পাথরে।

—কি চাও তুমি? পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠে প্রবীর, শুধু অর্থ, প্রতিপত্তি, অহমিকা। কুড়াতে চাও অজানা-অচেনা লোকের ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, স্তুতি। শুধু বহিরঙ্গ সবই—বাইরের আর কিছুই নয়—

[ক্রমশ।

নীল চিঠি

গোবিন্দ হালদার

উধাও সহসা আজ ঘননীল আকাশের পারে
সে আমার পাখী-মন। যেইখানে মেঘেদের ঘর
সেথায় কিসের আশে ঘোরে ফেরে ওড়ে চারিধারে
কে জানে সেখানে তার আছে কি না হারানো দোসর।

কোনদিন হয়ত' সে পাখী ছিল। ডানা মেলে দিয়ে
ইচ্ছেমত উড়ে যেত দূর দূর···আরো কত দূর—
আকাশ সাগর আর মেঘছোঁয়া পাহাড় ডিঙিয়ে
সারাদিন গান গেয়ে ঝরাত বাঁশীর মত সুর।

আজ তার কিছু নেই। মাটির পৃথিবী বড় ছোট;
এখানে ধরে না আর আকাশের পাখী পাখী মন;
শক্ত লোহার শিক ভাঙবে না, যত মাথা কোটো—
আকাশ থাকবে দূরে—নীলছায়া মিলাবে কখন।

তবুও বাঁচার ফাঁকে মাঝে মাঝে নীল চিঠি পাই;
তখন সহসা আমি সব ভুলে পাখী হয়ে যাই।

দার্জিলিঙয়ের পথে পথে

সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

ভোরের আলো জানলার মধ্য দিয়ে মুখে এসে পড়তেই ঘুম গেল ভেঙ্গে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। কাচের জানলা দিয়ে দৃষ্টি বাইরে গিয়েই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। দাঁড়ালাম এসে বাইরে। ঘুমের ঘোর বোধ হয় না কাটতেই মনে হোল এ স্বপ্ন না সত্য? তারপর ধীরে ধীরে সেই মোহাচ্ছন্ন আস্তরণ মনের উপর থেকে অপসারিত হতে লাগলো। তখন মনে হোল, না এ যে দেখছি এ সবই সত্যি। মনে পড়লো কাল এসে আমরা পৌঁচেছি এই হিমালয়ের পাদদেশে শৈলমালা-বেষ্টিত-নয়নাভিরাম মনোমুগ্ধকর স্থানে—দার্জিলিঙয়ে।

আর অপেক্ষায় থাকতে মন কিছুতেই সায় দিল না। তক্ষুনি বেরোলাম পথে সেই আকর্ষিত সৌন্দর্যের পিছু-পিছু। সৌন্দর্য-পিপাসিত মন আমার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। তখন সবে রাত্রির তমসাজাল ছিন্ন করে পর্বতমালার পিছন থেকে আলোর লুকোচুরি খেলা সুরু হয়েছে। পর্বতের মাথায় মাথায় তারই বিচ্ছুরিত আলোর রেশ রক্তিমাভায় মণ্ডিত। দূরে যেদিকে দৃষ্টি যায় কেবল অসংখ্য পর্বতমালা দৃষ্টিকে প্রতিরোধ করে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ তরঙ্গে তাদের দেহ সুসজ্জিত। পরণে শ্যামল আচ্ছাদন, মাথায় রূপালী শিরস্ত্রাণ। সূর্যের সেই শুভ্র আলো পর্বতের শীর্ষদেশে এক অতি উজ্জ্বল সোনালী রঙের সৃষ্টি করেছে। সে কি অপরূপ শোভা। চোখের পলক পড়ে না, মনের স্পন্দন জাগে না। নির্বাক মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলাম দু'চোখ মেলে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় দৃষ্টি আরও স্থির নিশ্চল হয়ে গেল, যখন চোখ পড়লো শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর—এইরূপ নির্মেঘ আকাশে ভোরের পরিচ্ছন্ন আলোতে খুব কমই দেখবার সৌভাগ্য ঘটে থাকে।

শ্বেতশুভ্র তুষারে মণ্ডিত রাজবেশ পরিহিত কাঞ্চনজঙ্ঘা অল্প সময়ের জন্য আত্মপ্রকাশ করে লোকচক্ষুর সমক্ষে। চারিদিকের শুভ্রতা চোখের দৃষ্টিকে স্বভাবত আকর্ষণ করে। সকল পর্বতমালার মাথাকে অতিক্রম করে অম্লান বদনে সৌন্দর্য সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গিরিরাজ কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেই তুষারশুভ্র পর্বতগাত্রে সোনালী রৌদ্রের আলোকপাতে এক মহিমময় রূপের সৃষ্টি করেছে। মনে হয় মণিমুক্তার আবরণে উজ্জ্বল তার শীর্ষদেশ। সূর্যের আলোয় তুষাররাজি আরও উজ্জ্বল হয়ে চারিদিকের সৌন্দর্যকে আরও প্রজ্বলিত করে তোলে। কখনও মনে হয় যে পাল তোলা নৌকা সবুজ জলে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার মাঝে মাঝে গলে যাওয়াতে সেই স্থানে বেশ সবুজের আস্তরণ দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার নদী সঙ্কীর্ণ ধারায় নিজের মনে বয়ে চলেছে কোন অতল গহ্বরের তলদেশে। পরমুহূর্তেই কুয়াশার কঠিন আবরণের আলিঙ্গনে কোথায় হারিয়ে যায় সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যরাশি। চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে ফেলে তার আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু তারও বুঝি রূপ আছে। এই Fog জাতীয় মেঘ দার্জিলিঙয়ের এক অপূর্ব শোভার নিদর্শন। বহু নীচু থেকে ক্রমশ কুণ্ডলীর আকারে এই Fog উপরে উঠতে থাকে। উপরে তখন থাকে আলো ঝলমল করা রৌদ্র, আর নীচে ছায়ায় ঢাকা কুয়াশায় পরিবৃত পাহাড় ও সহরতলী। ধীরে ধীরে শান্তপায়ে উপরে

উঠে এসে চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছাদিত করে তোলে। তারই মাঝে মাঝে পাইন গাছগুলি সেই আবছা আলো-আঁধারিতে তাদের অস্তিত্বকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সত্যি সে রূপের বুঝি তুলনা নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট ছোট পাহাড়ী রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে কখনও উপরে কখনও নীচের দিকে। রাস্তাগুলিও দেখতে অপূর্ব। এর দু'ধারে বন্য গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়। এই রাস্তাগুলি সাপের মত পাহাড়ের গা ঘেঁসেই চলেছে। আর একদিকে এর অতল গভীর খাদ। একদিকে জীবন, অপর দিকে মৃত্যু। কোথাও বা পাহাড়ী ঝরণা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে। কোথাও বা এই প্রাণোচ্ছলা চঞ্চলমুখী ঝরণা পথরোধ করে বলছে 'যেতে নাহি দিব'। কি এক অপূর্ব শান্ত পরিবেশ। আর স্তব্ধতা দিয়ে ঘিরে রেখেছে চারিদিক। সারা দার্জিলিঙ সহরকে পাইন বৃক্ষ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে তাদের অস্ফুট মর্মরধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সে ধ্বনি প্রাণে যেন কোন এক অজানার সংবাদ বহন করে আনে। দার্জিলিঙয়ের পথে পথে কত সৌন্দর্য ছড়ানো আছে। যে দেখতে জানে সেই দেখতে পায় এই দৃষ্টিবিজয়ী রূপ।

কখনও উপরে কখনও নীচে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা এঁকেবেঁকে 'ম্যালের' দিকে চলেছে। এই 'ম্যাল' হোল দার্জিলিঙ সহরে পাহাড়োপবিষ্ট সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রমোদোদ্যান। বিরাট একটি পাহাড়কে বেষ্টন করে কতকগুলি রাস্তা চলে গিয়েছে নানান্ দিকে। আর সেই পাহাড়ের বুকের উপর সমতল জায়গায় এই মনোরম উদ্যানটি অবস্থিত। এর উপর থেকে সারা দার্জিলিঙ সহর নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও নিরাবরণরূপে ধরা দেয় এর সম্মুখভাগ থেকে। এর পাশ দিয়ে আর একটি সরু রাস্তা মিশেছে একেবারে দেশবন্ধুর স্মৃতি মন্দির Step aside এ। সঙ্কীর্ণ নদীর সঙ্কীর্ণ জলধারার মত অজস্র রাস্তা বঙ্কিমরেখায় বেষ্টন করে আছে দার্জিলিঙ সহরটিকে। তারই একটি দিয়ে নেমে এলাম অজানার পথে। কিন্তু এই অজানায়

পুণ্য জানার সন্ধানও মিললো। পেলাম একটি মন্দির। নাম তার রামধাম। নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের অনুকরণে তৈরি মহাদেবের মন্দির। পাশেই তার শ্রীমন্দির। বেশ লাগলো তাদের কারুকার্য-মণ্ডিত রূপটি। এখানে সব কিছুই যেন এক শান্তির প্রতীকধর্মী। এই মন্দিরের অদূরেই রয়েছে কাকঝোরা পাহাড়ী ঝরণা। ঝিরঝির করে অসংখ্য নূপুর নিক্কণে চলেছে, কত বাধা বন্ধন ছিন্ন করে মহাসাগরে মিলিত হতে। এই সব পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক আশ্চর্য কৌশলে বাড়িগুলি যেন বসানো হয়েছে। বেশির ভাগই কাঠের। তবে স্থানে স্থানে ইটের গাঁথুনিযুক্ত বাড়িও দেখা যায়। দূর থেকে ভারী সুন্দর লাগে এইগুলিকে।

দার্জিলিঙয়ের সান্ধ্য সৌন্দর্য বিস্ময়ের আরও একটি দ্বার উদ্ঘাটন করলো। ধীরে ধীরে দিনের আলো যখন নিবে আসছে সন্ধ্যার আঁধারে যখন মুখটি ঘোমটায় ঢেকে পাহাড়ের গা বেয়ে সহরের বুকে নেমে আসছে তখন সেই আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলা পাহাড়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সবকিছুকে যেন বিপর্যস্ত করে তুলছে। কোথাও মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের শেষ একটুকরো রক্তিম আভা পাহাড়ের এককোণে পড়েছে। অন্যত্র সব আঁধারাচ্ছন্ন। সে দৃশ্য ভোলবার নয়। ভাষায় বর্ণনার জন্য নয়, কেবল প্রাণমনভরে আস্বাদনের জন্য। আবার রাত্রির আলোয় যখন ঝলমল করে উঠে সারা পর্বতশ্রেণী, সে শোভা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। মনে হয় যেন বিরাট পর্বতশ্রেণীর বুকে আলোর মালা দোদুল্যমান। আবার কোথাও কোথাও পাহাড়ের বুকে আলোর এ সংখ্যাধিক্য নেই। সেখানে আলোর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং আলোও ক্ষীণ। পাহাড়ের গায়ে বহু দূরে দূরে একটি ক্ষীণ আলো যেন প্রাণপণে সেই স্থানটিকে আলোকিত করতে সচেষ্ট। আলোর বাহুল্য না থাকায় স্থানটির আঁধারত্ব ঘোচে নি অথচ মৃদু আলোর রেখায় এবং নিস্তব্ধতায় মনে এক প্রশান্তি এনে দেয়। দৃষ্টিকে করে স্নিগ্ধ। মনে হয় যেন এক শান্ত কোমলপ্রাণ দিগ্‌বধূ প্রদীপ হাতে যুগযুগ ধরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে এই হিমালয়ের পাদদেশে। রাত্রির সৌন্দর্যও যে চিত্তজয়ী এমনভাবে তা আর কোনদিন অনুভব করি নি। এরপর কয়েকদিন ধরে দার্জিলিঙয়ের পথে-বিপথে প্রাণের আকর্ষণে কৌতূহলী মনে ঘুরে বেড়ালাম। কোথায় ভিক্টোরিয়া ফলস্, আবার দার্জিলিঙ ষ্টেশন থেকে প্রায় ১১০০ ফিট্ উঁচুতে জলাপাহাড়, কোটাপাহাড় প্রভৃতি এই সব বিভিন্ন সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সৌন্দর্য সম্ভার নিয়ে দার্জিলিঙয়ের নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। সত্যি সেখানে দাঁড়িয়ে একবারও মনে হয় না যে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই প্রকৃতির এই অকৃপণ হস্তের প্রদত্ত সৌন্দর্য-লীলাতরঙ্গে অবগাহন করছি।

এর আরও কয়েকদিন পরে একটি ল্যাণ্ড রোভার (জীপের মত) নিয়ে রওনা দিলাম 'ঘুমের' পথে। 'ঘুম' হোল এরই মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ পাহাড়স্থিত ষ্টেশন। যাওয়ার পথ বেশ দুর্গম। সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী রাস্তা খাদের গা ঘেঁসে এঁকেবেঁকে উপর দিয়ে কখনও বা সামান্য নীচু দিয়ে চলে গেছে একেবারে 'ঘুম'। অনেকস্থানে পাহাড়ী ঝরণার ঢল্ নেমে পথঘাট অতিরিক্ত অসমতল করে তুলেছে। সে সব তুচ্ছ করে তখন এই অনাস্বাদিত নব সৌন্দর্যকে আস্বাদনের উদ্দেশ্যে যেন চলেছে। বাধা-বন্ধন [illegible] মানায়। অবশেষে পৌঁছলাম সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত 'ঘুমে'। যদিও দার্জিলিঙয়ে আসবার পথে এই 'ঘুম' ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিপথে এসে আবার অন্তরালে সরে যায়। এখানে এসে দেখলাম 'ঘুম' নামের সত্যই সার্থকতা আছে। চারিদিক যেন কেমন থম্‌থমে তন্দ্রালু নয়নে চেয়ে আছে। চারিদিক এক অবিচ্ছিন্ন কুয়াশায় আঁধার হয়ে আছে। অবশ্য সেই কুয়াশার জাল ছিন্ন করে মাঝে মাঝে কৃপালু সূর্যের যে ক্ষণিকের জন্য দেখা মিলেছে না তা নয়। কিন্তু সে আলো পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায় মেঘের দৌরাত্ম্যে আর কুয়াশায় লুকোচুরি খেলায়। বেশ লাগলো প্রকৃতির এই নিরাবরণ মূর্তি অনুভব করতে।

সেখান থেকে আরও একটু ভিতরে রয়েছে বৌদ্ধ মন্দির। অতি প্রাচীন ও সুবৃহৎ এই মন্দিরটি। নানা কারুকার্যে শোভিত এর ভিতর এবং বাহির। ভিতরে রয়েছে বিরাট বৌদ্ধমূর্তি। মাথায় তার বেশ বড় আকারের একটি হীরক। তার দ্যুতিতে সারা মন্দির আলোকিত। সেই মূর্তির দিকে চাইলে মনে হয় আজও জীবন্ত অবস্থায় বুদ্ধ শান্তির বাণী প্রচারে মগ্ন। বহু বৌদ্ধসন্ন্যাসী সেই প্রাচীন রীতিতে নানা প্রক্রিয়ায় পূজার্চনায় মগ্ন। দেওয়ালে বুদ্ধের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনচিত্র খোদিত। এই পরিবেশে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। সেখান থেকে আরও কয়েকটি ছোটখাট দর্শনীয় স্থান দেখে ফিরলাম আবার দার্জিলিঙয়ে।

তারপরেই ফেরবার পালা স্বদেশে। মনটা কেমন যেন অজান্তেই বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। এতদিন যেন কেমন এক মোহাবেশে চলেছিলাম। যে সৌন্দর্যের স্বর্গসুধা পান করেছি তার অনুরণন তখনও মনকে ভরিয়ে রেখেছে। তার ফেরবার তোড়জোড় হতেই মনটা বিদায়-ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তারপর নির্দিষ্ট দিনে উঠে বসলাম সেই ছোট্ট মিটারগেজ ট্রেনে। এও এক অপূর্ব চাঞ্চল্যকর অনুভূতি। সাপের মত এঁকেবেঁকে ধীরপদে এগিয়ে চলে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে। ট্রেন ছাড়তে কে একজন যাত্রী আমার উদ্দেশ্যেই বললেন যে, আপনার তো 'Tiger Hills' দেখা হোল না। তার সৌন্দর্য আরও রমণীয়। সেখান থেকে সূর্য ওঠা না দেখলে দার্জিলিঙয়ে আসাই বৃথা।' তাঁর কথা শুনে এতক্ষণে মনে পড়লো যে সত্যিই রাজনৈতিক কারণে সরকার অনির্দিষ্ট কালের জন্য Tiger Hills দর্শনার্থীর কাছে অবরুদ্ধ রেখেছেন। সেইজন্য ঐ কথায় নিমেষের জন্যও মনটা না দেখায় ব্যথিত হয়ে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার নিজের অন্তরের ভাষা শুনতে পেলাম যে, যা দেখলাম তাই আমার অনুভূতির ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। যা বাকী রয়ে গেল তার জন্য দুঃখও রইল না। সেই সঙ্গে মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই দু'টি লাইন :—

'যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাই নি বড় সেই নয়।'

বম্বে দেখছি

শ্রীনন্দা কর

কিছুকাল হল বাংলা দেশের মায়া কাটিয়ে ভারতের আর এক প্রান্তে অবস্থিত এই সুন্দরী সুসজ্জিতা সহরে এসে জো[illegible] বেঁধেছি। আটশপর কেটেছে কলকাতার বুকে। ভাগ্যের এই

মহানগরীটি, সেখানে নাকি পশ্চিমী সভ্যতা তথা পশ্চিমী ঠাম-ঠমক জাঁক-জমক অত্যন্ত কায়েম হয়ে এসেছে—তার সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই বড় কৌতূহল ছিল মনে। শুনতাম সেখানে নাকি চিত্রতারকা আর আকাশের তারকা দিনে রাতে এক হয়ে জুহু বীচে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে নাকি রাস্তার ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে ইংরাজীতে কথা বলে। আরো কত কিছু। তখন কি জানতাম উত্তরকালে বাসা বাঁধবো সেই বোম্বাই সহরে? জানি না হয় তো বা সেই কৌতূহলের সঙ্গে কিছু পরিমাণে কৌতুকেরও মিশেল ছিল। তার একটা কারণ হতে পারে এই যে, ধূলি-ধূম-ধূসরিত সাংস্কৃতিক কলকোলাহল মুখরিত কলকাতা সম্বন্ধে কলকাতার বাসিন্দাদের যেন একটা কারুণ্যমিশ্রিত অহংকার আছে। ভাবটা এই যে, হতে পারে কলকাতা নোংরা অপরিচ্ছন্ন। তবুও কলকাতার এমন একটা জিনিষ আছে সেটা আর কোন সহরের নেই—তা হচ্ছে কৃষ্টি বা কালচার।

এই কালচার গরিমা কলকাতার লোকেদের একেবারে অস্থি-মজ্জায় ঢুকে গেছে। অস্বীকার করবো না আমারও ছিল। এই অহমিকাবোধ যে আমাদের চোখের দৃষ্টি কতখানি অস্বচ্ছ করে রাখে তা বলে বোঝান যায় না।

আত্মসম্মানবোধ ভাল। কিন্তু কূপমণ্ডুকতা ভাল না। এদের কয়টা জিনিষ আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। যেমন বম্বেওয়ালাদের শৃংখলাবোধ। সত্যি বম্বেওয়ালারা কত যাত্রী সংযম ও শৃংখলার সংগে বাসের লাইনের জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তা দেখে তো আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। এতটুকু ঠেলাঠেলি নেই। নেই চেঁচামেচি হট্টগোল আর কথায় কথায় সরকারী ব্যবস্থাপনার আদ্যশ্রাদ্ধ। আমরা কলকাতা থেকে নবাগত, আমাদের কাছে খুব আশ্চর্য লাগবে বৈ কি। আরো আশ্চর্য লাগে যখন দেখি সেই অপেক্ষমান সুদীর্ঘ কিউয়ের সামনে দিয়ে একটি বাস মাত্র একজন কি দুইজন যাত্রী তুলে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল। কারণ বম্বেতে কলকাতার মত বাসে যথেচ্ছ যাত্রী নেওয়া হয় না। বাসে কয়জন যাত্রী দাঁড়িয়ে যেতে পারে তার নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে। তার বেশি একটিও নেওয়া হয় না। এইজন্য যদিও ট্রামে-বাসে মেয়েদের জন্যে কোন সংরক্ষিত আসন নেই তবুও ঠেলাঠেলি কম বলে দাঁড়িয়ে যেতেও মেয়েদের কোন অসুবিধা হয় না।

বাসে গোণাগুণতি যাত্রী নেওয়া সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি শুনুন। ঘটনাটি হাস্যরস কি বীররস কি করুণরস সে বিচার আপনারাই করবেন।

সেদিন ছুটি। বিকেলবেলা প্যারেলে এক পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ি যাব বলে বেরিয়েছি। বুঝতেই পারছেন বাসের সিস্টেম যেখানে এই রকম সেখানে পনেরো-কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করা

কিছুই নয়। কিন্তু আগেই বলেছি ছুটির দিন। ভিড় বেশি। আমরা রয়েছি কিউয়ের মাঝামাঝি জায়গায়। এক একটি বাস আসছে আর আমরা শম্বুকগতিতে এক-আধ পা এগুচ্ছি।

আমার মেজাজের ব্যারোমিটারে তাপমাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ আমি নবাগত। কিন্তু সংগের ভদ্রলোক কি বম্বের পুরনো বাসিন্দা। তিনি নির্বিকারচিত্তে একটির পর একটি সিগারেট ধ্বংস করে চলেছেন। তারপর তাপমাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধির দিকে দেখে দু' একটা ট্যাক্সি করবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়ে আবার লাইনে ফিরে এলেন। এবার অবশ্য আবার লাইনের পিছন দিকে স্থান নিতে হল।

যাই হোক, অবশেষে লাইনে আমাদের পালা এল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কণ্ডাক্টর মহাশয় আঙুল উঁচিয়ে বলে বসলেন—এক আদমী।

কি করি? সঙ্গের ভদ্রলোক কি বললেন—

আমার পিছন পিছন হাতল ধরে চট্ করে উঠে পড়বে। তাই করলাম। ব্যাগ আঁচল সামলে মনে মনে মা-তারার নাম স্মরণ করে ঝুলে পড়লাম হাতল ধরে।

কিন্তু কলকাতার ট্যাকটিক্স কি বম্বেতে চলে? হাতল ধরে পাদানীতে পা দেবার আগেই বাস চলতে সুরু করলো। কাজেই এক-দুই সেকেণ্ড শূন্যে ঝুলবার পর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই প্রবল হল। মুয়ে পড়লাম মাটিতে।

বাস থামল। কিউয়ে একটু বিশৃংখলা হল। বাস কণ্ডাক্টর বাস থেকে নেমে এসে সঙ্গের ভদ্রলোককে ভর্ৎসনা করলো—বলেছিলাম এক আদমী। কেন দুইজনে উঠতে গিয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। তিনি লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটুক্ষণ পরে বাস ফের চলতে সুরু করলো। জনতা স্বস্থানে ফিরে গেল। আমরা ঈষৎ বিক্ষত দেহে ও মনে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

আর কলকাতা হলে?

পরদিন কাগজে খবর বেরুত, চলন্ত বাস হইতে তরুণীর পতন। উন্মত্ত জনতার আক্রমণে বাস বিধ্বস্ত। যানবাহন চলাচল ব্যাহত।—নয় কি?

এখানে সাধারণ হিসাবেই হুজুগ কম। সবাই যে যার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আর বাঙালীদের দেখুন। নিজের কাজ থেকে অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাতেই বোধ হয় ভালবাসে বেশি। এখানে বেকারসমস্যাও বাংলা দেশের মত অত প্রবল নয়। সেই কারণে তাদের সময়ও তো কম অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর। বম্বেতে সাধারণ শিক্ষিত ছেলে বা মেয়ে কেউই চুপচাপ নিষ্কর্মা বাড়িতে বসে থাকে না। ছেলেরা তো বটেই, মেয়েরাও দেখেছি হয় তো স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিল। তারপর রেজাল্ট না বেরোন পর্যন্ত যে সময়টুকু পেল, সেটুকুও নষ্ট করে না। হয় সর্টহ্যাণ্ড টাইপ শিখল, না হয় সেলাই ছুঁচের কাজ শিখলো। এখানে আবার সূচীশিল্পের প্রচলন ভয়ানক বেশি। সব জিনিষই সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরিয়ে তোলে।

উচ্চশিক্ষার হার বাংলা দেশে বেশি কি বম্বেতে বেশি—সেটা জানতে হলে বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার হার এখানে খুব বেশি। আর ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলতে অনেকেই সক্ষম। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও অনেক সময় দেখা যায়, নিজেদের মধ্যে ও বাবা-মা'র সংগে কথাবার্তা বলতেও ইংরাজীতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তার একটা কারণ অবশ্য বোধ হয় এই যে, এখানকার ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পড়াশোনা করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সব চাইতে ভাল লাগে আমার এখানকার ছেলে-মেয়েদের সহজ সপ্রতিভ আচরণ দেখে। অনেক সময় আবার এই সহজ সপ্রতিভতা সময় সময় এমন উগ্র পশ্চিমীগন্ধি হয়ে দাঁড়ায় সেটা আমাদের অনভ্যস্ত চোখে খুবই দৃষ্টিকটু লাগে। আরো খারাপ লাগে যখন দেখি বাঙালী মহিলারাও তাঁদের জাতীয় নম্রতা কমনীয়তা বিসর্জন দিয়ে বুক-পিঠ-পেট হাতাবিহীন চোলি স্বচ্ছ নাইলন ও সোফিয়া লরেন ব্রিজিৎ বার্দং মার্কা কেশ প্রসাধনে সজ্জিতা হয়ে কারুকার্য খচিত মুখে সগর্বে ঘুরে বেড়ান।

পূজা প্যাণ্ডেলে এই রকম রং-চঙে পুতুলের মেলার মাঝে দৈবাৎ দু' একটি ঢাকাই বা দেশী তাঁতের শাড়ি পরিহিতা বাঙালী মহিলাকে দেখলাম। তাঁদের দেখে যেন কলমস হলিহকের ভিড়ে হঠাৎ ছিটকে আসা পদ্ম বা রজনীগন্ধার কথা মনে পড়ে গেল।

আধুনিকতা ও আভিজাত্য দুইটিরই প্রয়োজন আছে। একটিকে বিসর্জন দিয়ে আর একটির অস্তিত্ব নয়। এ দিক দিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় মহিলাদের আমার খুব ভাল লাগে। সেদিন গিয়েছিলাম লিট্ল ব্যালে ট্রুপি-এর রামায়ণ পাপেট ড্যান্স ড্রামা দেখতে। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল একটি দক্ষিণ ভারতীয় বিদ্যায়তনের সাহায্যকল্পে। স্বভাবতই দক্ষিণীদের ভিড় সেখানে বেশি ছিল এবং সমবেত দক্ষিণীদের দেখে এই সত্যটি আবার আমার কাছে নতুন করে প্রতিভাত হল যে, দক্ষিণীরা তাঁদের বেশবাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের মত এত সহজে ত্যাগ করেন না। আমি তো অবাক হয়ে যাই যখনি দেখি বাঙালী teen aged মেয়েরা শিখদের মতন টাইট কামিজ আর পাঞ্জাবী পরে মাথার চূড়া করা চুল উড়ো উড়ো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে তাদের ইংরাজীতে কথার ফুলঝুরী কিন্তু একটা বাংলা কথা বলতে বলুন তাদের সেই আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বুলি শুনে লজ্জায় আপনার মাথা কাটা যাবে। ভাববেন এরা কোন দেশের খিচুড়ি পদার্থ। আরো মজা কি জানেন? কোন কোন বাবা মাকে সময় সময় যেন কতকটা গর্বের সঙ্গেই বলতে শুনি আমার ছেলেমেয়েরা ভাই একটুও বাংলা জানে না। তখন আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছা করে আপনারা কোন দেশে জন্মেছিলেন ভাই, বিলেতে বুঝি?

বম্বে আসার পথেই একটা বড় মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। বম্বের কাছাকাছি এসে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামামাত্র সঙ্গের ভদ্রলোকটি কম্পার্টমেণ্টের জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর উচ্চারণ যেন কতকটা অদ্ভুত গোছের। যাই হোক আমি তো খুব অবাক। ব্যাপার কি? তারপরে দেখি জন তিন-চার কলওয়ালা এসে হাজির। তখন বুঝলাম কাউকে ডাকতে গেলে মুখ দিয়ে এই রকম আওয়াজ করাই বিধিসঙ্গত। যস্মিন দেশে যদাচার। বিলেতে শুনেছি ট্যাক্সি ডাকতে হলে একটা আঙুল উঁচু করে রাখতে হয়। আর একটা

বেশ মজার জিনিষ দেখেছি সেটা হচ্ছে এনাক্ষ জাইয়া বা তাজিওয়ালা বা চানাওয়ালা যাকেই হোক কিছু একটা বললেই তারা সামনে পিছনে বেশ কয়বার মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে ঘাড় নাড়বে। সেই ঘাড় নাড়া হ্যাঁ বাচক বা না বাচক সেটা বুঝতে পারা বেশ সময় ও অভ্যাস সাপেক্ষ।

বাংলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে কলকাটি যেমন অবাঙালীদের হাতে বম্বেতেও তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্তৃত্ব আধিপত্য সিন্ধী পাঞ্জাবীদের হাতেই বেশি। মহারাষ্ট্রীয়রা বাঙালীদের মতনই নিজদেশে পরবাসী।

এখানে বাসগৃহের সমস্যা কিন্তু প্রবল। কোলকাতা থেকে অনেক বেশি। আর তা ছাড়া সহরটাই বা কতটুকু? লোকসংখ্যা তো তার তুলনায় কিছু কম নয়। তবুও বম্বে সহর কোলকাতার মতন অতটা ঘিঞ্জি নয়। কিছুদূর পর পরই আপনার চোখ পড়বে সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটুখানি পার্ক, সেখানে কর্মক্লান্ত মানুষ তার স্নায়ু মন ও দেহকে বিশ্রাম দিতে পারে। সকাল সন্ধ্যায় পদচারণা করতে পারে। এমন কি নিরালায় ঘাসের উপরে বসে প্রেমালাপও করতে পারে। তবে তার জন্যে জুহু সমুদ্র তীর, মালাবার হিলের ঝোলান বাগান, মেরিন ড্রাইভ, পওয়াই লেক, বিহার লেক ইত্যাদি অনেক জায়গা আছে। সেখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বসে আছে, মহোল্লাসে 'ভেলপুরী' খাচ্ছে, হাত ধরাধরি করে প্রেম করছে চারপাশে কিলবিল করে। দেখতে দেখতে এক সময় চোখে ধাঁধা লাগবে। সন্দেহ হবে শেষকালে double vision হয়ে গেল নাকি।

বম্বে দেখছি। এখনো ধূলি-ধূম-ধূসরিত কোলকাতা মন টানে। এত অল্পসময় নতুন কিছু চেনা বা জানা যায় না। কাজেই তেমনি করে ভালবাসাও যায় না। ছেড়ে আসা তীরের দিকেই মন বারবার চলে যেতে চায়। তবে এ অবস্থা হয় তো খুব বেশি থাকবেও না। মানুষের স্বভাবই পরকে আপন করা আর আপনকে পর করা। অনেক বাঙালীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি এখানে। এখন তাঁরা কোলকাতায় গিয়ে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। প্রতি পদে পদে বাধ বাধ ঠেকে। যদিও মেয়ের বিয়ে ছেলের বিয়ে দিতে সেই কোলকাতায় দৌড়তে হয় আবার।

পুনরাবৃত্তি

অচিতা রায়চৌধুরী

দু'বার সশব্দ আর্তনাদ করে ট্রেনটা থেমে গেল। সুরমা আস্তে নামল। চশমার ঘষা কাচের আড়াল থেকে আর একবার পড়ে নিল বড় বড় হিন্দী হরফে লেখা স্টেশনের নামটি—আর তার গায়ে গায়ে খুদে খুদে ইংরাজীতে লেখা অস্পষ্ট আর একটি শব্দ—আর একটি নাম। বুকটা ছলাৎ করে উঠল হঠাৎ—বহুদিন পর আবার মহুয়ার নেশায় একটু যেন বিভোর হল মন—নরম একটি স্মৃতির একটুখানি মাদক-নেশা—ভুলে যাওয়া একটি গানের কলিকে মনে পড়িয়ে দিল আচমকা।

—'কুলী কুলী কুলী' চাই মাইজী?

—'আপুনার পাণ্ডা কে বা?'

পরিচিত সেই এক প্রশ্ন। সুরমা আলতো একটু হাসি ছড়িয়ে এড়িয়ে এল ওদের। একটু এগিয়েই হুইলারের দোকান—সুরমা মাসিক পত্রিকার সামনের দু' একটি পাতা উল্টে দেখল। আগের মতই অহেতুক একটি প্রশ্ন তুলে ধরল একসময়—'রূপাঞ্জলি আছে?'

—'সে ত' বহুযুগ আগে উঠে গেছে।'

দোকানদার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। এবারও হাসল সুরমা। উত্তরটা ওর জানাই ছিল। তবু আগের দিনগুলোর সাথে আজকের এ দিনটির মিলটুকু খুঁজতেই যেন এই প্রশ্ন—উত্তরের দাবীতে নয়। আর একটু এগিয়েই প্ল্যাটফর্মের গেট। টিকিটটা চেকারের হাতে তুলে দিতে দিতে একবার আলগোছে দেখে নিল ভদ্রলোকের মুখখানা। নাঃ, পরিচয়ের কোন ছাপ নেই তাতে।

—'শুনুন'—তবুও চলে যেতে যেতে একটু থমকে দাঁড়াল আবার সুরমা।

—'আমাকে বলছেন?' বাংলাতেই উত্তর এল।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা, এই গেটেই চেকার ছিলেন মিঃ দাশগুপ্ত তিনি এখন কোথায় আছেন বলতে পারেন? তাঁর পরিবার?' থেমে থেমে প্রশ্ন করল সুরমা।

—'মাফ করবেন, আমি ঠিক বলতে পারছি না। আমি এ লাইনে একেবারেই নতুন।'

বিনীত সপ্রতিভ উত্তরে সুরমার ঠোঁটটি একটু কাঁপল শুধু। কি যেন শোনাতে চাইল কিন্তু সবটুক বোঝাতে পারল না।

—'আচ্ছা, ধন্যবাদ'—দু'টি কথায় যতি টেনে বেরিয়ে এল প্ল্যাটফর্মের বাইরে। সত্যিই ত' এরা কি করে জানবে সে ঠিকানা? কি করে জানবে মিঃ দাশগুপ্ত ছিলেন সুরমার বাল্যাদ্বিব স্বামী? সে বাংলাদি স্মৃতি আজ আবার তাকে টেনে নিয়ে এল এই এখানে—সাঁওতাল পরগণার এই ছোট্ট শহরটাতে এক যুগ পেরিয়ে।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়ে আগের মতই চোখে পড়ল রঞ্জনবাবু হোটেলের সেই রাশভারী নামটি—তার নীচে ইডিও, মিষ্টির দোকান বুক স্টল—সব সেই এক। শুধু এক নয়, সেদিনের কিশোরী সুরমা আর আজকের এই প্রৌঢ়া মিস্‌ট্রেস—দু'য়ের মাঝখানে আরও পঁচিশ বছরের বিরাট ফাঁক—দৈত্যের মত মুখব্যাদন করে হিংস্র-কটাক্ষে হাসছে তিক্তহাসি।

সাইকেল-রিক্সা আর টাঙ্গার ঠেলাঠেলি ভিড়ে সুরমার দৃষ্টি আবা খুঁজে ফিরল পুরনো দিনের দু'টি চেনা মুখ—গফুর গাড়োয়ান আ বাহাদুরকে।

স্কুলের পথে গাড়ি চালাতে চালাতে গফুর তার পুরু ঠোঁটটাকে বিকৃত ভঙ্গীতে কুঁচকে বলত—'হেই দিদিমণি, তুই কবে বড়া হবি? ভারী নোকরী করবি? তবে ত' হামার পরেশানী খতম হবে।'

আর সুরমাও তার বিনুনীশুদ্ধ ছোট্ট মাথাটাকে দুলিয়ে আশ্বাস দিত—'তুমি কিচ্ছু ভেবো না গফুর চাচা; আর মাত্র পাঁচ-ছ'টা বছর। পাশ একটা করে নিই, তারপরই দেখবে তোমাকে আমি কিছুতেই চাকরী করতে দেব না। তখন কিন্তু তোমার সব ভার আমার।'

পথ চলতে চলতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সুরমা—একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, রিক্সার চাকার দিকে, চাকাটা কেবলই উঠছে আর নামছে—থেমে থাকছে না কোথাও। সুরমার জীবনেও সে দিনগুলো

এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই—জীবনের টানা-পোড়েনে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। গফুরের অসহায়, সরল মুখটা আবছা ভেসে ওঠে—একটুখানি ব্যথার স্পর্শ জানিয়ে যায় মনের সংবেদনশীল কোণটার একধারে। গফুর কি আজও গাড়ি টানছে?

আর বাহাদুর? ছোট্ট পুষ্ট শরীরের নেপালী জোয়ান বাহাদুর রিক্সা টানতো। আর রিক্সায় যাতায়াতের মাঝে দিয়েই ওর সাথে অন্তরঙ্গ আলাপ। সুরমাকে সে ডাকত খোঁকীদিদি। বাহাদুরের জীবনে তখনও আশার সঞ্চয় নিঃশেষ হ'য়ে ফুরিয়ে যায় নি। গফুরের মত তার কোন ক্লান্তির কারণ ছিল না—ছিল না কোন নৈরাশ্যের ছায়া। তাই তার কথা-বার্তায়, চাল-চলনে জীবনের খুশিটাই উপচে উঠত—ক্লান্তির জলানি নয়। পাহাড়ীপথের খাড়াই উৎরাইয়ে সবলে পাড়ি দিতে দিতে সে শোনাত তার আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙিন স্বপ্ন-কথা।—'হামি নেপালী আছি। ই সব কাজ হাম নেই করবে। কলকাত্তা যাব, ড্রাইভারী শিখব। তব মোটর গাড়ি দৌড়াইব। তুফান মেল কে মাফিক। খোঁকীদিদি তব তোকে চড়াব।

কে জানে বাহাদুর শেষপর্যন্ত কলকাতায় গিয়েছিল কি না। কলকাতার বৃহৎ জনারণ্যে এমনি কত বাহাদুরের স্বপ্ন মিশে গেছে, কে রেখে তার হিসেব?

একটুক্ষণের জন্য সুরমা আবার ভাবনার অতলে ডুব দেয়—হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে রিক্সাটা বাঁক নেয়। সুরমা ভাবনা থেকে জেগে ওঠে আবার। টাওয়ার দেখা যাচ্ছে সামনে—টাওয়ারের গায়ে লাগানো ঘড়িটা আজও চলছে কোন অনির্দিষ্ট সঙ্কেতে। সুরমা চেয়ে থাকে। তেমনি ভিড়, কোলাহল, চীৎকার, রোরুদ্যমান, বাস, মোটর—যাত্রীদের হাঁক-ডাক আর এ সবের মাঝে অটল গাম্ভীর্যে স্থির হয়ে থাকা গান্ধীমূর্তি। তারপর মন্দির—বৈদ্যনাথের স্বর্ণশীর্ষ অপ্রতিহত মহিমায় আজও সমুন্নত—স্থির-গম্ভীর। হাত তুলে প্রণাম জানায় সুরমা—মহাকালের উদ্দেশ্যে নত করে নিজেকে। আর তখনই মনে পড়ে যায় ছোট বেলায় স্কুলে শেখা প্রার্থনার দু'টি শব্দ—'আমেন'—এতদিন পর আজ নম্র-আন্তরিকতায় বলতে পারে সুরমা—'জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছাই সার্থক হোক, পূর্ণ হোক—।'

মনে পড়ে যায় বাংলাদিকে, মিস্ ব্রাউনকে। ঐ একটি কথাকে ঘিরে অনেক মনের অনুরণন। সুরমা কান পেতে শোনে—গির্জার ঘন্টা বাজছে। সারি সারি মেয়েরা বেরিয়ে আসছে বাইবেল হাতে নিয়ে—একে একে দাঁড়াচ্ছে এসে প্রভু যীশুর পায়ের নীচে। সুরমা আকুল হয়ে দেখে আজ তাদের মাঝখানে কোথাও বাংলাদি নেই—নেই মিস্ ব্রাউন। বাংলাদির বন্ধু, সুন্দর দেহটি মিস্টার দাশগুপ্তের পাশে পাশে ছায়ার মত আস্তে মিলিয়ে গেল স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে কোন্ দূর-দিগন্তে। আর মিস্ ব্রাউনের দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে চাপা পড়ল ছোট্ট, সাদা এক কবরের নীচে। সুরমা আস্তে সন্তর্পণে কিছু ফুল বিছিয়ে দিল তার ওপর। তারপর ফিরে চলল পেছন ফিরে···। এ চলার শেষ কবে? নিজেকেই প্রশ্ন করল সুরমা। কিন্তু উত্তর পেল না। রিক্সার চাকার চাকার শব্দ আয়াল শুধু ক্যাচ ক্যাচ··· একঘেয়ে অসহায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশটা লাল—আবীরের মত রক্তাক্ত বেদনায় পাণ্ডুর ম্লান। একঝাঁক পাখী উড়ে গেল দূর বনে—কলরব করতে করতে চলে গেল একদল বুনো সাঁওতাল পাশ দিয়ে। পথের বাঁকে এসে থেমে গেল রিক্সার একটানা ছন্দ—চাকার শব্দ। সুরমা নামল। দাঁড়াল মুখোমুখি। অতীতের দিকে চাইল মুগ্ধ চোখে।

ছোট্ট একটি নাম—ছোট্ট একটি বাড়ি—বয়সের ভারে ক্রমেই নুয়ে পড়ছে মাটির দিকে। অথচ এরই মাঝে কত দিনের—কত স্মৃতির অফুরন্ত সঞ্চয়—কত হাসি-কান্নার আলোছায়া—কত স্বপ্নের রঙ—মোহের আবেশ!

সন্ধ্যার অন্ধকারকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে কার যেন কান্না গুমরে উঠল হঠাৎ 'হা মেরা বেটা, মেরা জান···।' সুরমা শুনল। এ বাড়িতে মুখ গুঁজে এখনও কাঁদছে পুত্রহারা দুঃখী। তার ছেলের বুকের ওপর দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল নাথমলের দুরন্ত মোটর—টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইল একটি দেহের কিছু মাংসপিণ্ড।

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল ঝরণা। লাল চেলি আর গয়নায় মোড়া বধূর বেশে।' দরজার কাছে এসে একমুহূর্ত থামল—'এই আমি যাচ্ছি।'

—'কোথায়? বড় বড় কালো চোখ তুলে সরল-প্রশ্নে চেয়ে থাকল ছোট্ট মনুয়া।

—'শ্বশুরবাড়ি।'

—'কেন?'

—'দূর তুই বড় বোকা।'

—'তোর কষ্ট হবে না? আমি কিন্তু খুব কাঁদব। বলতে বলতেই চোখ ছাপিয়ে বন্যার ঢল নামে। সেইদিকে চেয়ে ঝরণাও সজল হয়—'কাঁদিস্ না। আমি ঠিক পালিয়ে চলে আসব চুপি চুপি। তুই গুমটিতে দাঁড়িয়ে থাকিস্।

পথের দিকে তাকিয়ে উদাস হয় সুরমা। সেই ঝরণা কি আর ফিরে এসেছিল?

মহুয়ার গন্ধ আসছে নাকে—হাল্কা মিঠে বাতাস মনকে ছুঁয়ে যায়। দূরে পাহাড়ে আগুন জ্বলছে—সারি সারি জ্বলছে সন্ধ্যা-দীপের মত। সাঁওতাল পল্লীতে ডিমিডিমি মাদলের আওয়াজ—বাঁশীর মিঠি সুর। সারি সারি ইউকিলিপটাস্ গাছের ফাঁকে আধখানা চাঁদ উঁকি দিচ্ছে—একটু ঢেউ, একটু আবেশ। সুরমা নিঃশব্দে উঠে এল বারান্দায়। আগের মতই দাঁড়াল থামে হেলান দিয়ে। সামনের রাস্তাটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। সেদিকে চেয়ে আরও একজনকে মনে পড়ল—বুলুন'—এপথ দিয়ে যাতায়াতে যে একবার ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে যেত শুধু।

সুরমার চলে যাবার দিন শুধু কথা বলেছিল। পথের মোড়ে থমকে হেসে জিজ্ঞেস করেছিল—'ক'টার ট্রেন?'

—'পাঁচটায়।' সুরমা গম্ভীর হয়েই উত্তর দিয়েছিল।

—'আবার কবে ফিরে আসবে?' প্রশ্ন করেই উত্তরের অপেক্ষা রাখে নি। আপন মনেই চলে গিয়েছিল পথের বাঁকে পেছনে না চেয়ে।

আজ সুরমা ফিরে এসেছে। কিন্তু বুলুন' কি আজও আছে তার উত্তরের প্রতীক্ষায়? উত্তর খুঁজতে সুরমা চোখ তুলল নীল আকাশে।

কিন্তু আচমকা অন্ধকারে সব ঢেকে গেল—ঝড় উঠল ধুলো উড়িয়ে। সে ঝড়ে গাছ হতে শুধু শুকনো পাতা ঝরে পড়ল মাটিতে—আর তার সাথে টিপটিপ দু'ফোঁটা বৃষ্টি।

উৎসর্গ

সুলতা সেনগুপ্ত

আপন খেয়ালে যদি তুলে নেবে নাও,
ফেলে দেবে? দিতে পারো তাও।
রেণু-রেণু প্রেম দিয়ে গেঁথেছিনু যে মায়াবী হার
প্রীতি উপহার—
কোনো স্মরণীয় ক্ষণে দিতে দু'টি শুভ্র পদতলে।
আজ সে রক্তিম ঊষা গেছে অস্তাচলে।
কত ধ্যান, অভিমান, কত রাত্রি প্রতীক্ষা-বিহ্বল,
কত আঁখিজল—
বাঁধা ছিল এই অর্ঘ্য সনে
ঘুমে জাগরণে।
স্বপ্নাকুল তারুণ্যের শেষে—
অচলা শান্তির বুকে পৌঁছিনু এসে।
সেদিনের সেই জ্বালা; সেই লজ্জা, সেই চঞ্চলতা—
কোন পথিকের মুখে শোনা উপকথা
নাই রাজা, নাই রাণী, আছে তবু রত্ন-সিংহাসন
জরাজীর্ণ দেহ তলে যক্ষসম তাই জাগে মন
ভালবাসা জেগে থাকে মঞ্জুষায় মণিটির মত
অনুভব করি অবিরত।
ওগো প্রিয়, আজো সে দাবিতে
এ দেওয়ার কথাটুকু পেরেছি ভাবিতে।
তুলে নেবে নাও,—ফেলে দেবে? দিতে পারো তাও।

মানসী

শ্রীমতী ডলি মুখোপাধ্যায়

যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন সুরেশ গাঙ্গুলী, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এইভাবে বললেন—তুমি ঠিক বলছ তো বিজয়, মানে ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়েছ তো?

শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন বিজয় শেঠ—আপনি যদি দেখতে চান আমি আড়াল থেকে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখাতে পারি। আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি খুব ভাল করে খোঁজ নিয়ে সব জেনেছি। এমন কি ওরা যে শীগ্‌গির রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করবে তাও খবর পেয়েছি। আর চুপ করে থাকা ঠিক নয়। আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য তাই জানালাম।

—এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না। যে কোন উপায়ে হোক বন্ধ করতে হবে; প্রশান্তর সঙ্গে বোঝাপড়া একটা করবো। প্রশান্ত যদি আমার অমতে ভিন্ন জাতের একটা মেয়েকে বিয়ে করে আনে তবে ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব। এ কথা জেনে রাখ বিজয়। উত্তেজিত ভাবে বললেন সুরেশ গাঙ্গুলী।

—আপনি অতো উত্তেজিত হবেন না। পূর্ববৎ শান্তকণ্ঠে বললেন বস্তুবালের প্রবীণ ও বিশ্বস্ত ম্যানেজার বিজয় শেঠ।—এসব কাজ মাথা ঠাণ্ডা করে কৌশলে সিদ্ধ করতে হয়। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, সেইমত যদি কাজ করা যায়, মনে হয় ওকে ফেরান যাবে। জোর করে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না। সাবালক, শিক্ষিত ছেলে যা হোক একটা চাকুরী-বাকুরী জুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে হয় তো। এসব ক্ষেত্রে বাধা দিলে বিপরীত ফল হয়। নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন বিজয় শেঠ। কণ্ঠে অসীম আত্মবিশ্বাসের সুর।

—তবে কি করা উচিত তুমিই বল। তোমার প্ল্যানটা কি শুনি? সেই মুহূর্তে বড় অসহায় দেখাল সুরেশ গাঙ্গুলীর মুখটা। সাড়ে সাত লাখ টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর টাইগার প্রেসের মালিক যে সুরেশ গাঙ্গুলী, যাঁর এলগিন রোডে মস্ত বাড়ি আর দু'খানা নতুন মডেলের দামী গাড়ি এ যেন সে সুরেশ গাঙ্গুলী নন, এ যেন অন্য ব্যক্তি।

—চোখে লাগতে পারে এমন একটি সুন্দরী মেয়ে চাই। প্রশান্তবাবাজীর সঙ্গে যাতে কিছুদিন মেলামেশা করতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে।

—বলেন তো একটি মেয়ে আপনাকে দেখাতে পারি। আমার বন্ধুর মেয়ে। আপনাদের পাল্টি ঘর, বংশ-মর্যাদায় আপনাদের থেকে কোন অংশে হীন নয়। দেখলেই বুঝবেন মেয়েটি কত সুন্দরী। গত বছর প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করেছে।

অতঃপর সুরেশ গাঙ্গুলীর খাস-কামরায় প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ম্যানেজার বিজয় শেঠের কি সব গোপন আলোচনা হলো।

বিজয় শেঠের বন্ধু, জগদীশ চাটুজ্জের কন্যা পত্রলেখাকে একদিন দেখে এলেন সুরেশ গাঙ্গুলী—গৃহিণী সুধাময়ীকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা উভয়েই স্বীকার করলেন মেয়েটি সত্যই সুন্দরী। বিজয় শেঠ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করেন নি। সুতরাং অপছন্দের কোন প্রশ্নই উঠল না।

জগদীশ চাটুজ্জে হাত জোড় করে বললেন—আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু—নীরব হলেন তিনি।

—কিন্তুটা কি বলুন? আমার কাছে সংকোচ করবেন না, ওঁকে ইতস্তত করতে দেখে মনে মনে অধীর হয়ে বললেন সুরেশ গাঙ্গুলী।

উত্তর দিলেন পাশে দণ্ডায়মান বিজয় শেঠ,—আপনার যোগ্য খরচপত্র উনি করতে অক্ষম।

—কিছু না, কিছু না। আপনি শুধু মেয়েটিকে ভিক্ষে দিন।

—ছিঃ ছিঃ। ভিক্ষে কি বলছেন, একথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আমার সাধ্যমত নিশ্চয় দেব। বললেন ভাবী বৈবাহিক জগদীশ চাটুজ্জে।

—মনে মনে হাসলেন বিজয় শেঠ। যাঁর ডিম্যাণ্ড শুনে মেয়ের বাপেরা চমকে উঠত, পালাতে পথ পেত না, সেই সুরেশ গাঙ্গুলী মেয়ে ভিক্ষে চাইছেন।

বাড়ি ফিরে আবার সেই খাস-কামরায় পরামর্শ সভা। এবার

সুরেশ-গৃহিণী সুধাময়ীও যোগ দিলেন। যদিও কর্তার এই খাস-কামরায় অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ তথাপি একবার চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে বিজয় শেঠ বললেন—প্রশান্ত বাবাজী যেন কিছু জানতে না পারে। তাহলে সব ভেস্তে যাবে। সকলে জানবে আপনার বন্ধুর মেয়ে পত্রলেখা আপনাদের সঙ্গে মধুপুর বেড়াতে যাচ্ছে। তারপর যা যা বলেছি—ওখানে গিয়ে কিছুদিন পরে আপনি অসুস্থ এই মর্মে তার পাঠাবেন। প্রশান্ত সেখানে পৌছলে কিছুদিন অসুস্থতার ভাণ করে ওকে আটকে রাখবেন। তারপর দেখা যাক কতদূর কি হয়।

সুধাময়ী বললেন—জগদীশবাবু পত্রলেখাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাতে রাজী হবেন তো ?

—যদিও প্রস্তাবটা অসামাজিক, সে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। বললেন ম্যানেজার বিজয় শেঠ।

এর পর প্রায় সাত সপ্তাহ গত হয়েছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও এগিয়েছে। একমাস হলো প্রশান্ত পিতার অসুস্থ সংবাদে মধুপুরে এসেছে। এখানে এসে পিতাকে খুব একটা অসুস্থ না দেখে মায়ের কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। এই সামান্য অসুখে তার করে কলকাতা থেকে টেনে আনার কোন মানে হয় না। তারপরই প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা মা, বাবার এই বন্ধুটি মানে জগদীশবাবুর নাম তো এর আগে কোনদিন শুনি নি? আর ঐ তোমাদের পত্রলেখা না চিত্রলেখা কি যেন নাম, হঠাৎ তোমাদের সঙ্গে কেন এলো তা-ও বুঝতে পারলাম না। প্রশান্তর গলায় সন্দেহের দোলা। একটু থেমে অনুযোগ করেছিল—বাড়িতে এতোগুলো চাকর-বামুন থাকতে, তুমি থাকতে—আমার চা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ঘরের কাজ পর্যন্ত সবকিছু ঐ মেয়েটিই যা করে কেন, কি ব্যাপার বল তো ?

মা সেদিন দেখেছিলেন ছেলের চোখে সন্দেহের ছায়া।

সেদিন ছেলের জেরায় অনেক মিথ্যার জাল বুনতে হয়েছিল সুধাময়ীকে, মনে মনে স্বীকার করেছিলেন একটা মিথ্যা ঢাকতে অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু উপায়ই বা কি, ছেলে একটা অসামাজিক কাজ করে চিরদিনের মত পর হয়ে যাবে এই বা সহ্য করবেন কি করে। প্রশান্ত তাঁর একমাত্র সন্তান। চারিদিকে যা অসবর্ণ বিয়ের হিড়িক, ভয় তিনি কাঁটা হয়েই ছিলেন। যা ভয় পেয়েছিলেন তাই হতে চলেছিল—তিনি তো কিছুই জানতে পারেন নি। বিজয়বাবু আগে থেকে সাবধান করলেন তাই আর কিছুদিন হলেই তো·····ভাবতেও কান্না আসে। সুধাময়ী যে ঠিক পত্রলেখার মত সুন্দরী একটি পুত্রবধূ মনে মনে কামনা করেছিলেন—সে সাধে ছাই ঢেলে দিচ্ছিল আর একটু হলেই কে এক অশোকা নন্দী।

সুধাময়ীর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল—পত্রলেখা এখন বিজয়িনী, অশোকা নন্দী হেরে গেছে। সেদিন তিনি চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছিলেন, এখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত।

অতি সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে তিনি প্রশান্তর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন কেমন আলাপ পরিচয় হল। দেখলেন পত্রলেখা চা তৈরি করে প্রশান্তর টেবিলে রেখে বলছে—আপনার চা।

হাত বাড়িয়ে কাপটা নিয়ে চুমুক দিল প্রশান্ত। এক চুমুক চা খেয়েই কাপ নামিয়ে ঠেলে রাখল।

—কি হলো, খেলেন না যে ? প্রশ্ন করল পত্রলেখা।

—মোটেই মিষ্টি হয় নি চা। খাই কি করে।

অপ্রতিভ পত্রলেখা নতুন করে চা করে দিল।

চা খেতে খেতে পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এলো প্রশান্ত, বলল—প্রশ্ন করবো একটা ?

—করুন।

—এমন একটি মিষ্টি নামের আর ততোধিক মিষ্টি চেহারার অধিকারিণী পত্রলেখার হাতে চা কেন মিষ্টি হলো না। নাই বা দেওয়া হলো চিনি।

এবার কিন্তু পত্রলেখা মোটেই অপ্রতিভ হলো না। দুষ্টুমী হাসি হেসে বলল—আমার ধারণা ছিল চিনি বিনা চা পুরুষদের স্ত্রী ছাড়া যে কোন মেয়েই পরিবেশন করুক না কেন তা আপনিই মিষ্টি লাগে। তাই পরীক্ষা করে দেখলাম।

—ও-তো পুরোন থিওরী। যাই হোক তুমি তা হলে স্বীকার করলে যে, তুমি আর আমার পর স্ত্রী নও। যেহেতু চিনি না দিলে চা আপনি মিষ্টি হচ্ছে না। অর্থাৎ তুমি·····

বাধা দিল পত্রলেখা। বলল—আর যদি একটাও শব্দ উচ্চারণ করেন আমি কিন্তু পালাব এখান থেকে। ওর চোখে কৃত্রিম কোপকটাক্ষ।

—বাঃবা।

মুখ টিপে হাসল পত্রলেখা।

—তাই নাকি ? তর্জনী আর মধ্যমা সংযুক্ত করে পত্রলেখার গালে ছোট্ট করে আঘাত করল প্রশান্ত।

এরপর আর দেখবার বা শোনবার সাহস সুধাময়ীর হয় নি। নীচে নেমে এসেছিলেন। মনে মনে মহাজন বাক্য স্মরণ করেছিলেন 'ঘি আর আগুন।' মাত্র এই ক'টাদিনে তিনিও এতোটা আশা করেন নি তবে সেই দিন থেকে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

এই তো দিন আষ্টেক আগে দু'জনে গিরিডি গিয়ে উশ্রী জলপ্রপাত দেখে এলো। তাঁকেও অবশ্য সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। নিতে চাইলেই তিনি যাবেন! শরীর খারাপ হবে—এই বলে কাটালেন।

কাল তো একেবারে সামনা সামনি প্রায়। ভাগ্যিস মন্দিরাকৃতি ঝাউ গাছটা ছিল। ওটার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেও লজ্জার হাত থেকে বাঁচলেন ওদেরও বাঁচালেন।

যথারীতি বেড়িয়ে কাল সবে গেট পার হয়ে কাঁকর ঢালা পথে পা বাড়িয়েছেন, নজরে পড়ল পত্রলেখা আর প্রশান্ত দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণতলার পাশে হলদে গোলাপের ঝাড়টার কাছে। প্রশান্ত নিজের কোটের ফ্লাওয়ার বাটন থেকে রক্ত গোলাপটা খুলে পত্রলেখার খোঁপায় পরিয়ে দিল।

পত্রলেখা মৃদু আপত্তির সুরে বলল—বাঃ! মা দেখে কি ভাববেন বলুন তো ? আপনাকে মা বিকেলে ফুলটা দিলেন কোটে লাগাবার জন্য—এসে দেখবেন আমার খোঁপায়। মার সামনে যাব কি করে বলুন তো। ও ভারী অন্যায়।

মার চোখে অর্থাৎ বাবার কানে কলকুমারী পত্রলেখা চ্যাটার্জী—শ্রীমতী পত্রলেখা গাঙ্গুলীতে রূপান্তরিত·····

—বয়ে গেছে গাঙ্গুলী হতে। লঘু পায়ে প্রায় ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গেল পত্রলেখা। ওর পিছনে হাসতে হাসতে প্রশান্তও চলে গেল। ভাগ্যিস ঝাউ গাছটা ছিল।

এরপর দুই আর দুইয়ে চার যোগফলের মত সোজা। গৃহিণী সুধাময়ীর নির্দেশমত চিঠি গেল কলকাতায় বিজয় শেঠের কাছে। চারদিন পরে সে চিঠির জবাব এলো। বিজয় শেঠ অন্যান্য কথার পর লিখেছেন—শুভবিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে আগামী বারই মাঘ। জগদীশবাবুকেও জানান হইয়াছে। আপনারা দোসরা মাঘ চলিয়া আসুন। দিনটি যাত্রার পক্ষে শুভ। আপনার আদেশ অনুযায়ী সকল কাজ শুরু করিয়াছি। শাড়ি-গহনা আপনারা আসিলে ক্রয় করা হইবে।

আবার সেই সুরেশ গাঙ্গুলীর খাস্-কামরা। আজ প্রশান্তর বিয়ের প্রীতিভোজ। অতিথি-অভ্যাগতের দল বিদায় নিয়েছেন। ক্রমাগত কয়দিন বেজে বেজে সানাইয়ের মিলন রাগিণীতে এসেছে মৃদু মন্থরতা। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা।

বিজয় শেঠের হাতদু'টো ধরে সুরেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমি আমার যে উপকার করলে তা কোনদিন ভুলবো না। তোমার বুদ্ধির কৌশলে আজ আমার কুল, মান সব রক্ষে হলো।

হাসলেন বিজয় শেঠ, হাসিটি বড় অর্থপূর্ণ।

ঠিক মিনিট পনের আগেই না এই কথাগুলো নতুন বৈবাহিক জগদীশ চাটুজ্জে বলেছিলেন বাড়ি ফিরে যাবার আগে।

তারও আগে আর একজন বলেছিল। বলেছিল আজকের নায়ক প্রশান্ত গাঙ্গুলী। কথাগুলোর অবশ্য রকমফের ছিল। কিন্তু সুর তিনজনেরই এক।

পট-পরিবর্তন হলো।

আকাশে নক্ষত্রের সভা। নীচে বিয়েবাড়ির কোলাহল স্তিমিত। ফুলসজ্জার ঘরে হাল্কা নীল আলোয় আর ফুলের সমারোহে স্বর্গের অমরাবতী যেন মর্ত্যলোকে নেমে এসেছে। ফুলসজ্জায় সজ্জিতা ব্রীড়াবনতা সলজ্জ নববধূর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল প্রশান্ত—দীর্ঘ তিন বছরের প্রতীক্ষার শেষ আজ। তবে এ কৃতিত্বের সবটুকু পাওনা বিজয়কাকার। চমৎকার এক অশোকা নন্দীর কাহিনী বলে বাবাকে ঘায়েল করলেন। বাবা মোটে বুঝতেই পারলেন না যে, অশোকা নন্দী স্রেফ্‌ কাল্পনিক।

পত্রলেখা নীরব।

—কি হলো চুপচাপ যে? আনতমুখী পত্রলেখাকে বলল প্রশান্ত—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ষড়যন্ত্র।

—ছিঃ—ভাবলেই লজ্জা করে!

—না করে উপায় কি ছিল বল? এইটুকু না করলে আমার মানসীকে পেতাম কি করে শুনি। বাবাকে যদি সত্যি কথা বলতাম যে আমি পত্রলেখা নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাই তাহলে বাবা কখনই মত দিতেন না। বাবার মনোনয়ন করা একটি মেয়েকে বিয়ে করে সারাজীবন একটি নিরপরাধ মেয়েকে প্রবঞ্চনা করতে হতো। সত্যি এসব কথা থাক আজ, যেন বড় আজেবাজে লাগছে।

পত্রলেখার মুখে তখন আবীরের রং। আকাশে নক্ষত্রের সভা তখন জমজমাট।

সংঘাত

শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত

এ কুরুক্ষেত্রে হে রথ-সারথি কোথায় শঙ্খ তব,
এঘোর আহবে হয়ে যায় বুঝি পার্থের পরাভব!
মর্মকোষের স্বর্ণ-কমল, নয়ন অশ্রুজলে
মত্ত মাদলে ঘটায় বাদল অন্তর ওঠে দুলে,
ঝঞ্ঝার রোলে ঝঙ্কার তোলে বিপক্ষ সেনাদল,
শিথিল মৌর্বি গাণ্ডীবে প্রিয় শক্তি যে টলমল,
বাজাও বন্ধু অভয়শঙ্খ সাজাও এ অনীকিনী,
তোমার প্রসাদ এ ঘোর প্রমাদে দেহ এ সমর জিনি।

দুর্যোধনের দুর্জয় মান জুড়ি অবাধ্য হিয়া,
অসূয়ার বশে ফোঁসে আক্রোশে সূচ্যগ্র ভূমি নিয়া,
বিবেকের দ্বারে শকুনি গৃধিনী শ্মশান যাকিয়া ফিরে,
কালো মেঘছায়া আকাশ জুড়িয়া কালিন্দী তীরে তীরে।
এ রাজ্য ধৃত করতলে যার ধৃতরাষ্ট্র সে পিতা,
অন্ধ নয়ন রিপুর তাড়নে, সংহত কর মিতা।
চারু কেশদাম এলায়ে কৃষ্ণা প্রেমে প্রতিষ্ঠা চায়,
দুঃশাসনের রুধিরের ধারে শান্ত কবহ তায়।
রক্তোৎপলে ধর্মরাজ্য অভিষেক যদি মিতা—
বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য শুনাও তোমার গীতা।

কালো চোখের মেয়ে

শ্রীরীণা ঘোষ

সুরঞ্জনা,

তোমার কালো চোখের অতলজলে তলিয়ে আমি গেলাম,
হারিয়ে গেছে পথ যে আমার কুল কোথা সে পাব?
কালো চোখের আলোর টানে আবার ফিরে এলাম,
ইচ্ছে করি কালো জলেই আবার ডুবে যাব।

তোমার চোখের কাজল আজি লাগল মেঘের গায়—
তাই তো আজি আকাশেতে মেঘ ঘনিয়ে এলো।
সন্ধ্যা নামে থরো থরো লাজুক আঁখির পাতায়,
অভিমানীর চোখের জলে শিশির ছলো ছলো।

তোমার চোখে মাতাল হাওয়ায় আলোর ঝিলিক লাগে,
পদ্ম ফোটে কালো জলে খুশির ছোঁয়া পেয়ে;
তোমার চোখের কলংকতে প্রাণে আবেশ জাগে,
সুরঞ্জনা! তুমি যে এক কালো চোখের মেয়ে।।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

মনটা খারাপ হয়ে গেল ললিতার ইন্দ্রনাথের ওখান থেকে এ ভাবে চলে এসে। ব্যাপারটা সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এমন বিশ্রীসলা ও চলল কি করে! বাড়ির চাকর-বাকরগুলি কি ভাবলে! তার সঙ্গে সাহেবের সম্পর্কটা ওরা জানে। আর আগের দিনের ভাসুর ভাদ্র বৌ-এর মতো যে ওরা চলে না তাও জানে। আর তা জানে বলেই শিবানীর অপেক্ষায় ও বসবে শুনে আবদুল ওকে সাহেবের ঘরে থাকার সংবাদটা দিয়েছে—অর্থাৎ সাহেব ঘরে আছেন। আপনি ও ঘরে গিয়ে বসুন। আর তা শোনামাত্র কি না ও আবদুলের চোখের উপর দিয়ে পালিয়ে এলো চটির শব্দ পায়ের তলায় চেপে! এ আসার অর্থ বুঝতে কি ওদের এতটুকু অসুবিধে হবে। হঠাৎ যেন ললিতা আবদুল জাতীয় বেয়ারাগুলির উপরই ক্ষেপে গেল—এমন মিশরের মামির মতো মুখের চেহারা করে রাখবে, যেন—ফসিল। মানুষকে ওদের সম্বন্ধে সচেতন থাকতে ভুলিয়ে দেবে একেবারে। এদিকে ধূর্তমীতে নাড়ী টনটনে। হ্যাঁ, ধূর্তমী নয়ত কি! তোর কি দরকার ছিল বলবার, সাহেব ঘরে আছেন। জানিস না সাহেব এখন মদের গেলাস নিয়ে বসে—রয়েছেন। আমি তো তোর মত বেয়ারা নই যে, 'সাব' বলে বার্তা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। ইন্দ্রনাথ যত বড় সাহেবই হোক, 'নক' করে না ডাকা পর্যন্ত বেডরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—এমন দাবী কোনদিন করে নি ওদের কাছে। আমাকে তো নিতান্ত ভদ্রতাসূচক একটা জানান দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে পড়তে হবে। আর ওটা ঘর তো নয়, যেন মায়াপুরী। প্রভাবের জগতে একটা ঘরের প্রভাবও যে কত ভীষণ হতে পারে ইন্দ্রনাথের এই শোবার ঘরটা না দেখলে ললিতা জানত না। ঘন ভাঁজের সাদা ভেলভেটের পর্দার উপর পাতলা সবুজ আলোর ঢেউ-এ ভরা ঘরটা যেন ডাকে—

'যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো হেথা গহনতলে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দেও সলিল মাঝে।'

ঘরটাকে ওর ভয় করে, ঘরটা নেশার ঘোর লাগিয়ে দিতে পারে মনের ভেতর।

আচ্ছা—ওর এই চলে আসাটা যে ইন্দ্রনাথ দেখে নি তাই বা কে বলতে পারে? সাহেব যে ঘরে রয়েছে সে কথাটা যত আস্তেই আবদুল বলে থাক একটা শব্দ তো উঠেছেই মধ্যাহ্নের স্তব্ধ বাড়িটার বুকে। ইন্দ্রনাথ তা শুনে যদি বের হয়ে এসে থাকে—নিজে না বের হয়ে এসে থাকলেও, যদি আবদুলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে থাকে কে এসেছিল? নিজের ওপর বিরক্তবোধ করতে লাগল ললিতা। সকালটা খুব ভাল লেগেছিল তার। শিবানীর অন্য কোথাও নেমন্তন্ন থাকবে না এটা খুব আশা করছিল না-ও সে। তাই শিবানী নেমন্তন্ন নিতেই খুশি হয়ে হৈ হৈ করে মার্কেটে বেরিয়ে পড়েছিল কেনাকাটা করতে। এই বেলা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে কত যে সওদা করেছে তার ঠিক নেই। ফুল কিনেছে এক ঝুড়ি। সব শিবানীর প্রিয় ফুল। এখন এসব দিয়ে করবে কি সে। ছাই করবে। গাড়ির গদীতে পিঠ ছেড়ে দিল ললিতা।

গাড়ি থেকে নেমে ঝপ করে সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে এসে বাড়ি ঢুকল। বৌদি বললেন, সব সওদাপাতি নামিয়ে রেখেই কোথায় ছুটেছিলে? মার্কেটে কিছু ফেলে এসেছিলে?

সংক্ষিপ্ত জবাবে 'না' বলে গায়ের ঘামে ভেজা জামা-কাপড় টেনে টেনে খুলতে লাগল ললিতা।

বৌদি ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলল না। ঝুড়ির ফুলগুলি তুলে নিয়ে বলল, ইস! এ ভাবে জানালার কাছে ফুলগুলি রেখে গিয়েছিলে! রোদ পড়ে শুকিয়ে উঠেছে—

তোমরা রয়েছ কি করতে?

তা আমরা যে জন্য রয়েছি তা তো করছি। কিন্তু জানতে তো হবে।

এখন জানলে কি করে?

তোমার ঘরে এলাম বলে।

আরো আগে আসো নি কেন?

ভাসে ফুল সাজাচ্ছিল ললিতার বৌদি মঞ্জুলা। ফুল থেকে চোখ তুলে হেসে বলল, এখন গলা চুলকিয়ে ঝগড়া করছ? কোথাও থেকে রেগে এলে নাকি? ফুল মেলাতে মেলাতে চোখ তুলে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল খাটের উপর গুম্ হয়ে বসে থাকা ললিতার দিকে। তারপর আহ্লাদি ঢং-এ মাথা কাত করে বলল, হ্যাঁ, যা বলেছি ঠিক তাই। তুমি যখন অন্যমনস্কভাবে বসে বাঁকা ভাবে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করতে থাকো, তখনই আমি বুঝতে পারি তুমি কি যেন ভাবছ।

তোমার বুদ্ধির কি আমি এমনিই প্রশংসা করি। চিন্তার লক্ষণ মুখে দেখলেই তুমি বুঝে ফেল লোকটা চিন্তা করছে।

মেঝের উপর বসে ঘরের দেয়ালে পিঠ রেখে বই পড়ছিল ললিতার ছোট বোন সুজাতা। শিবানী যার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। দিদির মুখে মঞ্জুলার বুদ্ধির প্রশংসার নমুনা শুনে হেসে উঠল কিটকিট করে।

ললিতা বলল, শুধু কি এই! কেউ নাক ডাকতে থাকলে তুমি বুঝে ফেল সে ঘুমিয়েছে। কেউ জল খেতে চাইলে তুমি বুঝে ফেল তার তেষ্টা পেয়েছে—

কিশোরী সুজাতা হাসিতে গড়িয়ে পড়ল।

মঞ্জুলা ফুলদানীর ভেতর একগুচ্ছ ফুল ঢুকিয়ে ঝুড়ি থেকে আরো ফুল তুলে তুলে ফুলদানীর এদিক-ওদিক গুঁজে দিতে দিতে বলল, হাঁা, নাক ডাকলে আমি ঠিকই বুঝতে পারি লোকটি ঘুমিয়েছে। কিন্তু জল খেতে চাইলেই আমি বুঝব তার তেষ্টা পেয়েছিল—এ কিন্তু নয়। চোখ বাঁকিয়ে সুজাতার দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলা বলল, কি বল সুজাতা, সব সময় কি কেবল জলের তেষ্টার জন্যই সবাই এসে জল খেতে চায়?

হাসি থেমে গেল। চোখের পাতা দু'টো ভয়ে যেন কেঁপে উঠল সুজাতার। বৌদির দিকে তাকাল সে।

মঞ্জুলা বলল, আজ রবিবারের রাস্তার গ্রাউণ্ডের জমাট ক্রিকেট খেলা ফেলে বারবার যে অরুণের কেবল তেষ্টা পাচ্ছিল আর জল খেতে আসছিল—সে তেষ্টা কি তার জলের?

যদিও গরম রক্তের ঝলক লাফ দিয়ে উঠে এসে সুজাতার দু' গালের কচি চামড়া আগুন বর্ণের করে ফেলল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর ছড়ানো দু'পা নিদারুণ বিক্ষোভের ভঙ্গিতে ছুড়তে ছুড়তে নাকিসুরে বলতে লাগল সে,—এ্যা ম্যা—বৌদিটা কি অসভ্য কথা বলছে দেখো দিদি।

ললিতা বলল, খেলতে খেলতে যা পায় তা জলের তেষ্টাই।

মুখ টিপে হাসল মঞ্জুলা—কই, আর কারু তো তেষ্টা পায় নি এমন। জল খেতেও আসে নি তারা।

—সবাই কি এক বাড়িতে আসবে।

হেসে উঠল মঞ্জুলা। ঠিক বলেছো। দিলীপ গেছে নমিতাদের বাড়ি। অলক রাণীদের—

এ্যা মা গো—এ্যা মা গো বলে নাকিসুরে চেঁচাতে লাগল সুজাতা। কি অসভ্য বৌদিটা। দাঁড়াও বলে দেব সবাইকে। কেউ আমরা আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। রাণী, নমিতা, গোপা, আমি কেউ না—কেউ না—দেখ—

তোমাদের থিয়েটারের ড্রেস তৈরি করে দেবে কে?

অনেক বৌদি আছে আরো—

পারবে আমার মতো?

বোধ হয় মঞ্জুলা থিয়েটারের পোষাক তৈরিতে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারিণী। দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সুজাতা—কেন তুমি যা-তা বলবে।

মঞ্জুলা হাতের ফুল ফেলে ছুটে এসে ননদের সামনে মেঝের উপর বসে পড়ল। সুজাতার মুখ ঢাকা হাত টেনে নিতে নিতে বলল, ঠাট্টা বোঝে না কি মেয়ে গো? বৌদি বলে তুমি আর ডেকো না আমায় তবে—

ললিতা তাকিয়ে রইল সুজাতার লালচে ক্রন্দনরত মুখটার দিকে। কৈশোর কি যৌবনকে ডরায়? যৌবনের দরজা কেঁপে কেঁপে খুলে পড়তে চায়, কৈশোর কি দু'হাতে টেনে বন্ধ করে রাখতে চায় সে দরজা? শুধু ডরায়? না কৈশোর যৌবনকে ঘৃণাও করে? যৌবনধর্মের কোন ইঙ্গিতও যে সে সইতে পারে না, কেঁদে কেটে হাট বাধায় এ কি ভয় না ঘৃণা?

ক্রিকেট খেলোয়াড় কেউ বোধ হয় বাউণ্ডারী হিট করলো। আনন্দের হুল্লোড় উঠল রাস্তায়।

মা এসে ঢুকলেন ঘরে। রান্নাঘরে খাবার তৈরি করছিলেন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকছে না দেখে দু'বার চাকর দিয়ে তাড়া লাগিয়েছেন তবু কারু সাড়াশব্দ না পেয়ে সুজি-ময়দা মাখা হাত ধুয়ে উঠে এসেছেন। বললেন, ব্যাপার কি? আজ তোমা

খাবিটাবি নে নাকি? বেলা কোথায় গড়িয়েছে দেখেছিস। বিকেলে আবার বাড়িতে লোকজন আসবে না?

ললিতা খাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। সত্যি ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। মার্কেটে সওদা করতে করতেই ক্ষিধে চাড়া দিয়ে উঠেছিল। গোটা দুই প্যাটিজও সে খেয়েছে অবশ্য কিন্তু তাতে কি পেট ভরে। এখন ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। মঞ্জুলাকে নিজেই তাড়া লাগাল, চলো চলো বৌদি। তারপর মাকে বলল, কিন্তু রাতের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। কেউ আসছে না।

মা আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি—কেন তোর জা আসবে না?

না। সুজাতা বলে নি তোমাদের?

সুজাতা খনখনে গলায় প্রতিবাদ জানাল, বারে, তুমি যে গেলে শিবানীদির ওখানে নিয়ে আসবে বলে—

এতক্ষণে মঞ্জুলা ললিতার মেজাজ খারাপের হদিস পেলো। ওর মনও খারাপ হয়ে গেল। অনুনাসিক সুরে গাঁইগুঁই করে বলতে লাগল, ওমা, আমি অত খেটে দিনভোর বসে নানা রং-এর ফুল লতা-পাতার নক্সা কেটে সব্জির স্যালাট বানালাম শিবানীদির জন্য—

মা নিজেও এর ভেতর কয়েক রকমের মিষ্টি তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু তা নিয়ে মঞ্জুলার মত ব্যাকুল হলেন না। নানা নক্সার কাটা সব্জির স্যালাট হলো বেশিটাই খাবার টেবিলের সজ্জা। সজ্জাটা নিমন্ত্রিতের জন্য। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি না এলে তা বৃথা হয়ে যায়। তিনি তৈরি করেছেন খাবার। বাড়িতে খাবার লোক আছে এবং তিনি মেয়ের জা'র জন্য ব্যস্ত নন। তিনি তাঁর জামাই এলেই খুশি। বললেন, তা কালীনাথ আসছে তো?

সাজান টেবিলে গিয়ে বসে মা, মেয়ে, বৌ উপুড় করা প্লেট তুলে নিল। ঝি পরিবেশন করতে লাগল। সুজাতার দিকে তাকিয়ে ললিতা বলল, তুইও খাস নি এখনও?

মা বললেন, তোর সঙ্গে খাবার জন্যই তো বসে রয়েছে। নইলে বাপ ডেকেছিল, দাদারা ডেকেছিল—

আর আমরা একসঙ্গে খাই। সুজাতার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ললিতা চেয়ারশুদ্ধ টেনে সুজাতাকে নিজের কাছে নিয়ে এলো সাদরে। ওর ঘাড়ের উপর বাঁ হাত রেখে বলল, দাও সুশীলা আমাদের দু'বোনকে এক প্লেটে দাও।

মা বললেন, কই বললি না তো কালীনাথ আসবে কি না।

তোমার কালীনাথকে বলিছি নাকি যে আসবে।

কেন, বলিস নি কেন?

আজকে আমার জা'কে খাওয়াব ভেবেছিলাম। তা দাদা আসতেন তো ওকেও বলতাম। দাদা আসবেন না জেনে তোমার জামাইকেও আর বলি নি। ভেবেছিলাম, আমরা দু'জনাতেই খুব গল্প করব।

তোর জা' আসবে বলেও এলো না কেন?

তাই তো ভাবছি আমিও। সে তো এমনটা করার মেয়ে নয়। বাড়ি গিয়েও পেলাম না!

সুজাতা চাখুম চুখুম করে মাছভাজা খেতে-খেতে বলল, শিবানীদিকে আমার ভীষণ ভালো লাগে—ভীষণ। নিয়ে যেও না একদিন আমাকে শিবানীদির বাড়ি।

যাবো।

ঐ তো কবে থেকে বলছ যাবো—যাবো। কই নিয়ে তো যাচ্ছ না। এবার একদিন না নিয়ে গেলে আমি ছাড়বই না—হ্যাঁ, কিছুতেই ছাড়ব না দেখো তুমি। শিবানীদিও রাগ করেছেন তোমার উপর আমায় নিয়ে যাও নি বলে।

তাই নাকি।

হ্যাঁ, বলেছেন সেইজন্যই আজ এলেন না।

হেসে উঠল সবাই।

অপ্রস্তুত ভাবে সুজাতা বলল, এটা সত্য আমি ভাবছি বুঝি! তা মোটেই না গো। কথাটা ঐ ভাবে বলেছেন সেটাই বললাম তো। তোমরা যে ফোনে ইনিয়ে বিনিয়ে বল, 'ও, আপনি আসছেন আমাদের বাড়ি? এখন? নিশ্চয় নিশ্চয়। খুব খুশি হবো এলে।' তারপর ফোন রেখেই বল, 'কি জ্বালাতন বাবা।' আবার কখনো, 'ও আসতে পারছেন না? ভীষণ খারাপ লাগছে।' তারপরই ফোন রেখে বল, 'বাঁচা গেল'—শিবানীদি অত মিথ্যে করে বলেন না। আমায় নিয়ে যাচ্ছ না বলে তিনি ঠিক রাগ করেছেন তোমার উপর।

সুজাতার মুখটা গালের উপর টেনে নিয়ে ললিতা হাসতে হাসতে বলল কত কথা শিখেছে চোদ্দ বছরের মেয়ে দেখ না।

বোনকে চোদ্দ বছরে ক'বছর রাখবে? মাছ চচ্চড়ি দিয়ে মস্ত এক মাখা দিতে দিতে মা বললেন।

কেন? ওর বয়স চোদ্দ পুরো হয়ে গেছে?

পনেরো পুরো হয়ে গেছে।

ললিতা বলল,—এক বছর তো মাত্র খাড়া করিয়ে রেখেছি। তাও ভুলে।

মঞ্জুলা বলল, মোটেই কিন্তু আমাদের সুজাতাকে দেখলে তা মনে হয় না। মনে হয় বারো-তেরো।

তোমরা তো বাইশ বছরের মেয়েদেরও গাউন পরিয়ে আজকাল বাচ্চা করে রাখো। বেশি ঝাল মাথায় মার হেঁচকি উঠে গিয়েছিল। ঢকঢক করে জল খেলেন তিনি।

পনেরো পুরো হয়ে গেছে শুনে ললিতা বার দুই তাকাল সুজাতার দিকে।

শরীরটা নিয়ে আড়মোড় খেতে খেতে সুজাতা বলল, তুমি অমন বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন দিদি?

তোর লজ্জা করছে?

হ্যাঁ তো—করছে তো। হাত তুলে চুল সরাবার ছলে চোখ ঢাকল, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত চুলকোবার ছলে বুক ঢাকল—টেবিলের তলায় শরীর আড়াল করে বললে, অন্যদিকে তাকাও তুমি।

ললিতা সত্যি ওকে নতুন দেখছিল যেন। এতদিন এই তেরো চোদ্দ বছরের ধারণাটাই ললিতার দৃষ্টিটাকেও সুজাতার ওপর তেরো চোদ্দ বছরের মতোই করে রেখেছিল। এখন দেখল সুজাতার খাড়া নাকে, বড় বড় দু'চোখের কোলে, ঠোঁটে, শরীরের কাণায় কাণায় জোয়ার এসে গেছে।

অদ্ভুত সুন্দর একটা উজ্জ্বল তামাটে রং সুজাতার। সচরাচর এ জাতীয় রং একেবারেই চোখে পড়ে না। একবার একটা হোস্টেলে খেতে গিয়ে ললিতা একটি ইটালীয়ান তরুণীর এমনি রং দেখেছিল।

সেদিন মেয়েটির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না সে মেয়ে হয়েও। আজ দেখল সুজাতার গায়ের রং যেন কখন ওই ইটালীয়ান তরুণীটির মতো হয়ে গেছে। ওই ইটালীয়ান মেয়েটির মতোই খাড়াখাড়া টানটান চুল মুখের দু'পাশে উড়ছে।

হঠাৎ ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ল ললিতার।

ললিতা অবাক হয়ে গেল, ললিতা হতভম্ব হয়ে গেল, ললিতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—সুজাতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ল কেন!

ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর বিরাট ছ'তলা দালানের উপরতলার এক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে শিবানী কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিল হাত ঘুরিয়ে। টাইপিস্ট মিস জেনি টাইপ মেশিনের কি-বোর্ডের উপর দ্রুত নৃত্যের ভঙ্গিতে আঙুল চালাতে চালাতে সেটা লক্ষ্য করে লিপস্টিক-রাঙা ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল। কিছু প্রয়োজনীয় চিঠি টাইপ করে সেগুলো বড়সাহেবের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল জেনি। হাইহিলের খট্ খট্ শব্দ তুলে শিবানীর কাছ দিয়ে যেতে যেতে বলল, হামি দেখছে তুমি খুব ছুটির ঘণ্টার জোন্য ব্যস্ত আছে—তাই না? মুচকি হাসল জেনি।

এই ঘরে শিবানী আর মিস জেনি দু'জনই শুধু বসে। শিবানী কিছুতেই ইংরেজীতে কথা বলবে না। সে বলে, জীবনটা তো বাংলা দেশেই কাটাবে—দেশের জল-বাতাস, ভাত-মাছ খাচ্ছ। আজকাল শাড়ি পরেও মাঝে মাঝে আসছ দেখছি। দেশের ভাষাটা দোষ করলে কি? তোমার ভাষাটা কাজ চালাবার মতো আমি শিখে নিয়েছি। তুমি আমার ভাষাটা কথা চালাবার মতো শিখে নাও। নইলে কাজটা চলবে আমার-তোমার সঙ্গে ঠিকই কিন্তু কথা চলবে না একটিও মিস জেনি।

মিস জেনি মাথা নেড়ে বলেছে, হামি বাংলা জানে থোড়া থোড়া।

শিবানী বলেছে, থোড়া থোড়া নয়, বল একটু একটু।

মিস জেনি পুনরাবৃত্তি করেছে ইংরেজী সুরে বাংলা শব্দ—এ-ক-টু এ-ক-টু।

শিবানী খুশি হয়ে বলেছে, ঠিক আছে। এই ভাবেই তোমায় আমি বাংলা শিখিয়ে ফেলব।

শিবানীর উপর-অফিসার কমল বোস এক একদিন এসে শুনে ফেলেছে মিস জেনির বাংলা শিক্ষা। সহানুভূতির চুকচুক শব্দ করে মিঃ বোস বলেছে, পুওর গার্ল। ভালো মানুষ পেয়ে তোমার উপর মিসেস সেন কি বাংলার হামলাই না চালাচ্ছেন।

মিস জেনি গর্বিতভাবে বলেছে, জানেন মিঃ বোস, হামি অনেক শিখে ফেলেছে।

শিবানী অমনি সংশোধন করে দিয়েছে—হামি নয় আমি। শিখে ফেলেছে নয়, শিখে ফেলেছি।

মিস জেনি হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছে, হামি নয় আমি। শিখে ফেলেছে নয়, শিখে ফেলেছি—

মিঃ বোস বলেছে, ধন্যবাদ আপনাকে মিসেস সেন। কি অসীম ধৈর্য আপনার। কিন্তু কোন সার্থক কাজের পেছনে ধৈর্যটা চালালে

আমি অবশ্যই প্রশংসা করতাম। এ তো শুধু সময় আর শ্রম নষ্ট করছেন।

শিবানী জবাব দিয়েছিল, যদি আজ এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হয় তবে ঈশ্বরের কাছে মনুষ্যজীবন ধারণ করে কি কাজ আমি করেছি বাকরতে চেষ্টা করেছি জিজ্ঞাসিত হলে, এই একটি কাজই আমিবলতে পারব।

মিঃ বোস শিবানীর কথাগুলি হাসির না গম্ভীর হবার বুঝে উঠতে না পেরে মুখটা দুই অবস্থার মাঝামাঝি এক রকম করে সিগারেট টেনেছে। তারপর হাতের সিগারেটের ছাই ছাইদানে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছে, আপনি বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল মিসেস সেন—আই মিন ভাবপ্রবণ। সেণ্টিমেণ্ট কথাটার বাংলা করলে কিছুটা শিবানী খুশি করবার জন্য, কিছুটা বাংলাটা যে সে জানে তা বোঝাতে।

মিস জেনি যতই ভাবুক বাংলা শিখে গেছে কিন্তু ওদের দুজনার কথার একবর্ণও সে ধরতে পারে নি। টাইপ মেশিনের কি-বোর্ডের উপর নৃত্যের ভঙ্গিতে দ্রুত হাত চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে কেবল চোখ তুলে তাকিয়েছে।

হাতের লাল-নীল পেন্সিলটা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে শিবানী বলেছে, মিঃ বোস, অনেক মূল্যবান বস্তু আমরা হেলাফেলায় হারিয়েছি। ভাষাটাকে আর হেলাফেলা করবেন না। কোন্ রন্ধ্র দিয়ে যে সর্বনাশের শনি প্রবেশ করে কেউ বলতে পারে না। কুলি, বয়, বাবুর্চি, বেয়ারা, আয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই তো করেছেন, করছেনও কিন্তু ওরাই না হিন্দীকে রাজাসনে বসাচ্ছে আজ।

হোয়াট্? ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছে বোস। শিবানীর সঙ্গে বাংলা বলার ইচ্ছে থাকলেও বিস্ময়ে ইংরেজীই বেরিয়ে গেছে মিঃ বোসের মুখ দিয়ে।

শিবানী বলেছে, স্টেশনে কুলি-মজুর, অফিস-আদালতে দারোয়ান-বেয়ারা; হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, রান্নাঘরে বয়-বাবুর্চি, শোবার ঘরে শিশু-কোলে আয়া—মুখে মুখে সমস্ত ভারতময় যদি হিন্দী না ছড়াত তবে আজও হিন্দীকে তার ঘরেই বসে থাকতে হতো। সিংহাসনে বসবার জন্য তাকে পাঁয়তারা কষতে হতো না। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যা পারেন নি ওরা তা পেরেছে—বুঝছেন তো ছাপাখানার চাইতে মুখের জোর বেশি? তাই মাতৃভাষাটাকে মুখ থেকে বিদায় দেবেন না মিঃ বোস। বরং অন্য মুখে তা দিতে চেষ্টা করুন। অন্তত এখনও আদা-নুণ খেয়ে লাগলে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে—

—আপনি বড় সেণ্টিমেণ্টাল—আবারও বলল মিঃ বোস।

শিবানী বলল, সেণ্টিমেণ্টাল নয়, বলুন জাত্যাভিমানী।

মিস জেনি এক তাড়া চিঠি হাতে বড়সাহেবের ঘর থেকে তেমনি হাইহিলের খট্ খট্ শব্দ তুলে ফিরে এসে তার টাইপরাইটার মেশিনের সামনে গুছিয়ে বসল। মেশিনে কাগজ ঢুকিয়ে চিঠির ওপর চোখ রেখে কি-বোর্ডের ওপর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, একেবারে তৈরি যাবার জোন্য?

শিবানী কাগজপত্র গুছিয়ে কাজ শেষ করে বসেছিল। আজ তার কাজে মন লাগছিল না। ইন্দ্রনাথ কালকে ওকে একটা অপূর্ব রাত উপহার দিয়েছে। সেই রাতটার চারপাশেই শিবানীর মনটা ঘুরছিল কেবল। বার বার ভুল করে কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বসেছিল সে। বেয়ারাকে দু' কাপ গরম কফি আনতে বলেছে। ওর জন্য আর মিস জেনির জন্য। বেয়ারা এখনও কফি নিয়ে আসে নি। এলে কফি খেয়েই উঠে পড়বে শিবানী। ইন্দ্রনাথ যে ওকে কালই শুধু একটা অপূর্ব রাত উপহার দিয়েছে তাই নয়, আজ বলে গিয়েছে সে পাঁচটার ভেতর বাড়ি চলে আসবে। তারও আগে গিয়ে ইন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে দেবে এই শিবানীর ইচ্ছে। কিন্তু তারও বহু সময় আছে। সবে তিনটেমাত্র। বেয়ারা গরম ধোঁয়াওঠা কফির পেয়ালা দু'জনের কাছে নামিয়ে রেখে গেল। শিবানী পেয়ালা সামনে টেনে নিল। মিস জেনি টাইপ থামিয়ে কফির পেয়ালা হাতের তালুর ওপর তুলে নিয়ে শিবানীকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে পেয়ালায় চুমুক দিল। জিজ্ঞাসা করল, তুমি বাড়ি যাচ্ছো?

হ্যা।

তোমার বাড়িতে কে আছেন?

বলত কে কে আছেন?

তা বোলতে পারব না। তুমি বোলনি ত'।

স্বামী আছেন—দুষ্টু চোখে তাকাল শিবানী মিস জেনির দিকে।

মাই গড্—জেনির হাতের কফির পেয়ালা জেনির শরীরের চমকে ঠক ঠক শব্দ তুলল।

হেসে উঠল শিবানী। শিবানী জেনির কাছে বলেছে, সে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। কিন্তু অতিকষ্টে রয়েছে। তার ওখানে থাকতে একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু উপায়ও নেই না থেকে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তার কাছে না থাকলে নিন্দে হবে। শিবানী মিসেস যখন, তখন ওর একটা স্বামী অবশ্যই আছে। কিন্তু শিবানী না বলা পর্যন্ত জেনি তা জিজ্ঞাসা করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করাটা ওদের ভদ্রতাবিরুদ্ধ। বিধবাও হতে পারে কিন্তু জেনি জানে বাঙালী বিধবারা এত রঙিন পোষাক পরে না।

কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে জেনি বলল, মিসেস সেন, তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করেছ এতো দিন? আমি বুঝতাম তুমি খুব বড়লোক আছ। তোমার গয়নাগুলি সব সাচ্চা পথর আছে।

শিবানী হাসি থামিয়ে বলল, না মিস জেনি, আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করি নি। সত্য কথাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্যভাবে বলেছি—ঘরের দরজা খোলার শব্দ হতে সে দিকে তাকিয়ে শিবানী আশ্চর্যকণ্ঠে বলে উঠল, আরে ললিতা?

মিস জেনি কাজে মন দিল।

ললিতা ওর হাতের ব্যাগ শিবানীর টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, হ্যা আমি ললিতা।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দাঁড়াও তোমার জন্য কফি আনতে বলে দিই। বেল বাজাল শিবানী। বেয়ারা এলে তাকে কফি আনতে আদেশ করল। তারপর—ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ অফিসে?

তোমাকে ধরতে।

মার লাগাবে বলে?

না। কিন্তু তাও অফিস থেকে তো উঠছিলে দেখতে পাচ্ছি। আর একটু হলে বোধ হয় তাও পেতাম না তোমাকে?

তা পেতে না সত্যি। বলল, কিন্তু মুখ অমন থমথমে কেন? রাগ?

রাগ? শুধু রাগ নয়। তোমার সঙ্গে কথাও বন্ধ।

আচ্ছা। হাসল শিবানী। বলল, সে কথাই বলতে এসেছ অফিসে?

বসুমতী : পৌষ

শিগগীর চুল আঁচড়ে দাও খেলতে যাব
–এখন হবেনা, দেখছ না ব্যস্ত আছি!
ছোট্ট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে চুল আঁচড়ে দিতে অনুরোধ করে কিন্তু
মায়ের সময় হয় না কারণ সংসারের নানান খুঁটিনাটী আর পর্বতপ্রমাণ
কাজ। চুল সময়মত আঁচড়ানো হয় না তার ফলে চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনই
ম্লান হ'তে সুরু করে। ধুলো ময়লা আর খুস্কী জমে চুলের
গোড়াগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। মেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে কিন্তু তার
মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অযত্নে বর্দ্ধিত চুলের রুক্ষ প্রকাশে
অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। এমনি ঘটনা প্রতিদিন প্রতি
ঘরেই ঘটছে। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ
তাই তার যত্ন সর্বপ্রযত্নে নেওয়া উচিত। ছোট মেয়েদের
চুল দিনে অন্ততঃ দু'বার ভাল করে আঁচড়ে পরিষ্কার করা
উচিত। স্নানের আগে কয়েক ফোঁটা জবাকুসুম বেশ করে
চুলের গোড়াগুলিতে ঘসে দিন। জবাকুসুম চুলের খাদ্য
জুগিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
১, টাকার্স লেন, ব্রডওয়ে, মাদ্রাজ - ১

নইলে তুমি জানবে কি করে যে আমি রাগ করেছি। তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছি। দেখা তো হবে তোমার সঙ্গে ছ' মাস বাদ। অতদিনে রাগের কথা ভুলে যাব না। তাই মেজাজ গরম থাকতে থাকতে—দেখাতে এলাম।

জোরে হেসে উঠল শিবানী। বলল, 'না না, ছ' মাস বাদে দেখা হবে, আমি কি বোকা না কি? আমার জন্মদিনের শাড়ি রয়েছে না তোমার কাছে—সেই তোমার সাত বাজার ঘোরা—কারুর দাম বলতে না পারা শাড়ি। ওটা দেখবার জন্ম আমার ভেতরটা কি আকুলি-ব্যাকুলি খাচ্ছে তা মেয়ে হয়ে তোমার বোঝা উচিত।

মিস জেনি টাইপ করতে করতে লক্ষ্য করে ললিতাকে দেখছিল। শিবানী পরিচয় দিল, আমার সিষ্টার-ইন-ল ললিতা—মিস জেনি।

স্মিত মুখে মাথাটা ঈষৎ মুইয়ে পরিচয় গ্রহণ করল মিস জেনি। নামটা ছ' ঠোঁট চোখা করে আবৃত্তি করল, লোলিটা। তারপর ললিতার দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিপাত করতে করতে বলল, তোমার সিষ্টার-ইন-ল' খুব সুন্দর—

বিস্ময়ে খুশিতে ছু' চোখ বড় হয়ে উঠল ললিতার—কি'সুন্দর বাংলা বলছে!

এতক্ষণ শিবানীর দুই চোখের কোলে আবেশ খেলেছিল। একটা সুন্দর রাতের স্বপ্নাবেশে ঢাকা ছিল তার দু' চোখের তারা।

ললিতা মিস জেনির বাংলা বলার প্রশংসা করে উঠতেই সে স্বপ্নছায়া সরে গিয়ে ঝলমল করে উঠল চোখ। যেন ছায়া ঢাকা তালপুকুরে রোদ পড়ল। জাত অহঙ্কারে দুই ভুরু বাঁকিয়ে শিবানী বলল, এই একটি কাজ আমি করেছি। মিস জেনিকে বাংলা বলতে শিখিয়েছি। এখনও ইংরেজী সুর আর উচ্চারণের টানটা রয়ে গেছে—এরপর তাও থাকবে না। কিন্তু মিস্ জেনি এখনই এতো প্রশংসা শুনছে যে, উৎসাহ তো ওর বেড়ে গেছেই, ওর বন্ধু-বান্ধবদেরও লোভ এসে গেছে বাংলা শিখে প্রশংসা পাওয়ার জন্য—ইস্, বাংলা বলতে পারার অহঙ্কারের নেশাটা যদি একবার ওদের মধ্যে ধরিয়ে দিতে পারি।

কফি নিয়ে এলো বেয়ারা।

শিবানী বলল, এত দেরী হলো কেন?

বেয়ারা বলল, জী হুজুর!

শিবানী বলল, আচ্ছা যাও।

'যাও' শব্দটা বেয়ারা বুঝল। চলে গেল সে।

ললিতা বলল, ওর জবাবটার মানে কি হল?

কিছুই হলো না। নতুন এসেছে, আমার কথা একটাও বুঝতে পারে নি, জবাব দেবে কি।

তবে বাংলা বললে কেন?

ও আমার ভাষা বোঝে না বলে আমি যদি আগেই ওর ভাষা বলতে আরম্ভ করি, তবে ও আমার ভাষা শিখবে কোন গরজে? তা যাক্—অনেক কথা তো বলা হয়ে গেল। এখন নিশ্চয়ই কথা না বলার প্রতিজ্ঞা তুলে ফেলা যায়। অফিসে যখন এসেছ নিশ্চয়ই কোন দরকারী কথা আছে। ঘড়ি দেখল একবার শিবানী।

সেটা লক্ষ্য করল ললিতা। ললিতা বলল, না, কোন প্রয়োজনের তাড়ায় তোমার অফিসে আসি নি। তোমাকে পাওয়ার জন্ম এসেছি।

কেন বাড়িতে?

বাড়িতে তোমাকে পাওয়া যায়?

যায় না?

না। কফিতে চুমুক দিল ললিতা।

শিবানী বলল, না?

আজ্ঞে না। কালকে তোমার ওখানে আমি গিয়েছিলাম।

পাও নি আমাকে?

বা, পেয়েছি কি না পেয়েছি তুমি জান না?

পাও নি কেন?

কি আশ্চর্য! বাড়ি ছিলে না তাই পাই নি।

বাড়িতে না থাকলে না পাওয়াটা নিশ্চয়ই আশ্চর্য না কিন্তু আমি বাড়িতে ছিলাম—

বাড়ি ছিলে? না:—কখনো নয়। কোথায় ছিলে? আমি তো তোমাকে কোথাও দেখলাম না।

কোথায় কোথায় খুঁজেছিলে?

খুঁজতে যাবো কেন—তুমি কি লুকিয়ে থাকবে।

তবে পেলে যে না বুঝলে কি করে?

তোমার ঘরে তুমি ছিলে?

আরো ঘর আছে বাড়িতে।

কিছুটা আবদারের ভঙ্গিতে ললিতা বলল, না বল না—কখনো তুমি বাড়িছিলে না। মিথ্যে কথা বলছ।

ছিলাম।

ললিতার চোখে ভয় থর থর করতে লাগল। কোথায় ছিল শিবানী? তার সেই পালিয়ে আসার চলাটা শিবানীদি' দেখেছে! ভীরু কণ্ঠে বলল, তোমার ঘরে অবশ্যই ছিলে না?

বললাম যে আমার বাড়িতে আরো ঘর আছে।

অনেকটা নিরুদ্বেগ বোধ করল ললিতা। অন্য কোথাও থাকলে শিবানীদি' নিশ্চয়ই ওর চলে আসাটা দেখে নি—চলে আসবার কারণটাও জানে না। বিস্মিতভাবে বলল, তুমি আমাকে দেখেছিলে?

দেখি নি। চটির শব্দ শুনেছি। ডেকেছ তা শুনেছি—

তুমি এলে না কেন!

লজ্জায়।

লজ্জায়!

হ্যাঁ। হেসে উঠল শিবানী। বলল, হায় ভগবান! এমনই অবস্থা হয়েছে আমারনা যে, স্বামীর ঘরে থাকলে লজ্জায় মুখ বের করতে পারি নে। পাছে কেউ দেখে ফেলে!

তুমি ও ঘরে ছিলে? আর আমি ফিরে এলাম তোমায় না পেয়ে। কি কাণ্ড।

ঐ দেখ, তুমিও ঐ ঘরে আমি রয়েছি ভাবতেও পার না বলেই ওখানে খোঁজ কর নি—তোমার সঙ্গে তো কালকের ব্যাপারের মিটমাট যা হোক একটা হয়ে গেল। কিন্তু দিনটাকে যে কি বলি! বলেছিলাম একেবারে তৈরি হয়ে থেকো। তোমায় নিয়ে ছবি দেখতে যাবো আজ।

যেতে পারছ না?

না। বলে উঠে দাঁড়াল শিবানী। বলল, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই। [ক্রমশ।

সৈনিক

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটি রাত্রির মধ্যেই গোটা পৃথিবীটা বদলে গেছে।

অন্তত তাই মনে হ'লো দলবীরের। মনে হবার সঙ্গত কারণও আছে। বাড়ির সামনে তাঁবু, পেছনে সশস্ত্র সৈনিক, পথের ওপর দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে চলেছে সারি সারি সাঁজোয়া গাড়ি। আশপাশের লোকজন কোথায় পালিয়েছে। এমন কি, পশু-পাখিগুলো পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। কেমন করে সম্ভব হ'লো এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন! এর কারণই বা কি?

কাল সন্ধ্যায় একটু বেশি নেশা করেছিল দলবীর। তার স্ত্রী কাঞ্চী রাগ করেছিল তার ওপর, তিরস্কার করেছিল তাকে। ব্যস্, তারপর আর কিছু মনে নেই। হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছিল দলবীর। এখন ঘুম নেই চোখে। জেগে সে দেখছে তার সামনের এই নতুন পৃথিবী। সে কি তবে স্বপ্ন দেখছে? নাকি এখনো কাটে নি ঘুমের ঘোর?

পূব আকাশে সূর্য উঠছে। চেনা আকাশে প্রভাতের সূর্য! তিরিশ বছরের পরিচিত। ঠিক একই যায়গায় সূর্য উঠলো। ধীরে ধীরে উপরে উঠলো, আলো ছড়ালো, অজস্র উষ্ণ আলো তারপর কোথায় লুকিয়ে গেল। প্রখর আলোয় ঝলমল করতে লাগলো চারদিক।

সামনের ঐ তালগাছটি কিন্তু ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। সেই বুড়ো বটগাছটি না? ঐখানে কারা বসে হৈ-হল্লা করছে। একটি লাল বলদ মাটিতে ছটফট করছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তার গলা থেকে। ইস্। ওরাই বুঝি গলা কেটে দিয়ে তামাসা দেখছে! বর্বরের দল!

কোথাকার লোক এরা? এদের তো সে কখনও দেখে নি এর আগে। লাল বলদটি যে তুখিয়ার বলদ। চাষী তুখিয়া। চাষের সময় নয় এখন। তাই বলদটিকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল। এ সময় পশু বেঁধে রাখার রেওয়াজ নেই এ অঞ্চলে। নিরীহ পশুটিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ঐ লোকগুলো। খবর পায় নি তুখিয়া। খবর পেলে সে ছুটে আসবে ডাণ্ডা হাতে। সে কি কাউকে ভয় করে?

উঠোন পেরিয়ে এলো দলবীর।

হল্ট!

থামলো দলবীর। দু'টি সশস্ত্র সৈনিক এলো এগিয়ে। দলবীরের হাত বাঁধলো দড়ি দিয়ে। বলল, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

: কেন—ঘরে।

: তুমি কি জান না,—আমাদের সরকারের আদেশ?

: কোন সরকার? কি আদেশ?

: চীন সরকারের আদেশ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখানকার নাগরিকদের চলে যেতে হবে এখান থেকে।

: কম্যুনিস্ট চীন সরকার! ওঃ! কিন্তু আমি তো জানতাম না। তা ছাড়া নিজের দেশ ছেড়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাবোই বা কেন?

: বটে! চল—তোমার বিচার হবে; তোমার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তোমাকে মরতে হবে।

: কিন্তু—আমার স্ত্রী, আর আমার বাচ্চাটি—মান্না?—ওরা কোথায় গেল?

: তোমার স্ত্রী সুন্দরী নিশ্চয়?—বলল সৈনিকদের একজন।

: হ্যাঁ, ওর মতো রূপসী এ পাড়ায় আর নেই। তাই তো আমি ভালবাসি ওকে।

: ও ভালোই থাকবে। আমাদের 'কম্যাণ্ডার' সাহেব রূপসীদের সুনজরে দেখেন।

তার কথার মানে বুঝলো না দলবীর। বুঝলো না হানাদার সৈনিকের ইংগিত। বলল, আমি ভারতীয়; আমি বীরের সন্তান। মরতে ভয় নেই আমার। তবে আমায় একবার আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে চল।

উত্তর দিল না সৈনিকেরা। দলবীরকে নিয়ে চললো। কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা? কিছুক্ষণ হাঁটার পর দলবীরকে নিয়ে সৈনিকেরা এলো একটি প্রাসাদে। প্রাসাদটি তার চেনা। এখানে বাস করতো তাদের নায়েব। তবে নায়েবকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। একটি ছোট ঘরে তাকে আনলো সৈনিকেরা। তাকে ফেলে চলে গেল কোথায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে তাকে বলল, এবার চল।

চারজন লোক বসে আছে একটি ঘরে। ওদের দেখে মনে হয়, নেশা করেছে। তাদের সঙ্গে কয়েকজন রূপসী। ওদের চেনা চেনা মনে হচ্ছে দলবীরের। ঐ—ঐ যে তার স্ত্রী কাঞ্চী। ও কাঁদছে—যেন কি বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। ওকে কি তবে বোবা বানিয়ে দিয়েছে ওরা? তা ছাড়া মান্না—তার ছেলে মান্না তো নেই মার কোলে। কোথায় গেল ছেলেটি? ছেলের শোকে উন্মাদিনী হয়েছে কাঞ্চী। হবে না? দেবতার পায়ে মানত রেখে পেয়েছে ছেলেটিকে। এমন সোনার চাঁদ ছেলে। মান্না! দলবীরের দু' চোখেও অশ্রু দেখা দিল।

নেশাখোর একটি লোক বলল, ওকে ছেড়ে দাও। যদি এখানে থাকতে চায় থাকুক। ওকে দেখে চালাক বলে মনে হচ্ছে না। তবে হাঁ, ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

দলবীরের বাঁধন খুলে দিল সৈনিক। বলল, কম্যাণ্ডার সাহেব তোমার মুক্তি দিয়েছেন। তুমি তোমার বাড়ি ফিরে যেতে পার।

: কিন্তু আমার স্ত্রী—কাঞ্চী?

বিদ্রূপের হাসি হাসলো সৈনিক। বলল, ওকে কম্যাণ্ডার সাহেবের পছন্দ হয়েছে। তাই তো মুক্তি পেলে তুমি। নইলে মরতে হতো এখানেই।

নিজের সুন্দরী স্ত্রী বিনিময়ে মুক্তি! এ মুক্তি তো সে চায় না। এ তো তার চরম অসম্মান। অগৌরব। তাছাড়া, যারা অতর্কিতে হানা দিয়ে তার সর্বস্ব কেড়ে নিল, তাদের সে তো ক্ষমা করতে পারে না। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নিতে হবে। বুঝলো প্রতিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

নীরবে ঘরে ফিরলো দলবীর। গাদা-বন্দুকটি নিয়ে পরিষ্কার করলো। গুলি ভরে রাখলো।...

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে হানাদারেরা সুরার আসর জমিয়েছে। নারী ও সুরা উপভোগের আয়োজন সম্পূর্ণ। প্রেতনৃত্য সুরু হয়েছে সাহেবের বুকের উপর।...

এই সৈনিক-নগরীতে দলবীর একা। তার স্ত্রী হানাদারের কবলে। খোঁজ নেই তার ছেলেটির। এদের উদ্ধার করতে হবে যেমন করে হোক। এমন কি জীবনের বিনিময়েও।

দলবীর দেখলো—একটি সৈনিক পানোন্মত্ত অবস্থায় চলেছে। টলতে টলতে অগ্রসর হচ্ছে সে।

গাদা-বন্দুকটি তুলে নিয়ে তাকে লক্ষ্য করলো দলবীর। তারপর ঘোড়া টিপলো গুড়ম। একটি শব্দ। সৈনিকের বুক গুলিবিদ্ধ হলো। তার প্রাণহীন দেহ ধুলায় গড়ালো।

এগিয়ে এলো দলবীর। পোশাক খুলে নিল বিদেশী সৈনিকের। নিজের পোশাক ওকে পরালো। তারপর তাকে সেখানে ফেলে ঘরে ফিরলো সৈনিকের পোশাক পরে। ভাবলো, এবার তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে, উদ্ধার করতে পারবে তার অপহৃতা স্ত্রী কাকীকে, তার ছেলে মান্নাকে।

সকালে এ বেশে সে বেরুবে। তাকে চিনতে পারবে না হানাদারেরা। ভাববে, সে তাদেরই একজন। অব্যাহত থাকবে তার অবাধগতি।

ভেবে খুশি হলো দলবীর। ঘুমোতে পারলো না সারারাত্রি। সকালে উঠে সে রাস্তায় নেমে এলো। মৃত সৈনিকটির সামনে দিয়েই চললো। শত্রু মরেছে—ভাবলো হানাদারেরা।

দলবীরকে বলল, ভালোই হয়েছে। তুমি ভাই ওর সংকারটা করে ফেল।

পরম উৎসাহে অগ্রসর হলো দলবীর। একটি গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখলো লাসটি।.....

দলবীর এখন হানাদারদেরই একজন। কেউ সন্দেহ করবে না তাকে। এগিয়ে চলেছে হানাদারেরা। একটির পর একটি ভূখণ্ড দখল করে অগ্রসর হচ্ছে সামনের দিকে। তাদের জয়যাত্রা যেন থামবে না। তারা এগিয়ে চলবে শুধু অপ্রতিহত গতিতে।...

দলবীরের মনে শান্তি নেই। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে কাকীকে। তার স্ত্রী কাকী। তাকে যে সে ভালবাসে। কাকী—কাকী! কোথায় গেল কাকী?

সেদিন সে কাকীর দেখা পেলো। চেনাই যায় না তাকে। কিন্তু কাকী চিনলো দলবীরকে। বলল, তুমি এখনও এদের সঙ্গে রয়েছ? এরা আমাদের শত্রু। শত্রুর সঙ্গে বাস করা পাপ।

দলবীর বলল, আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি কাকী, শুধু তোমারই জন্য—

তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো কাকী। বলল, আমার কথা ভুলে যাও তুমি। তুমি পালাও—পালাও—এখান থেকে। আমি আর কোন মুখে ফিরে যাবো তোমার কাছে? মনে করো, তোমার কাকী মরেছে।

দলবীর বলল, দুঃখ করো না কাকী। আমি তোমায় উদ্ধার করবো। রামচন্দ্র কি সীতাকে দুরন্ত রাবণের হাত থেকে মুক্ত করেন নি? ধৈর্য ধর—ধৈর্য ধর কাকী। সাহস হারিয়ো না। আমি আজ সৈনিক সেজেছি শুধু তোমারই জন্য। আমি এ অপমানের প্রতিশোধ নেবোই নেবো।

চুপ করলো কাকী, দীর্ঘশ্বাস ফেললো নীরবে।...

গভীর রাত্রি। হানাদারেরা কোলাহল কলরব করছে। দলবীর বললো, কি হলো?

: শত্রু—শত্রুরা এগিয়ে আসছে। এবার আমাদের পিছু হটতে হবে। কিন্তু যাবার আগে সব ছারখার করে দিতে হবে। একটি জনপ্রাণীও থাকবে না এখানে। আমরা এখানে মরুভূমি করে দিয়ে যাবো। ওরা যদি আসে, এখানকার বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস দেখে যেন পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

: আমাকে কি করতে হবে?

: এই স্ত্রীলোকগুলোর দেখাশোনা করতে হবে। ওদের বিশ্বাস নেই, ওরা স্ত্রী-জাতি, শত্রুদের সঙ্গে যেন ওরা যোগাযোগ রাখতে না পারে।

: বেশ তাই হবে।.....

এলো প্রার্থিত সুযোগ। এবার দলবীর শুধু কাকীকে উদ্ধার করতে পারবে না, শত্রুদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।

গভীর অন্ধকার চারদিকে। কুয়াশায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।...

গুড়ুম-গুড়ুম-গুম!

এগিয়ে আসছে মুক্তি সেনাবাহিনী। তারা দুর্জয় দুর্বার, অমিতবিক্রম।

কাকীকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গম গিরিপথের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দলবীর। মুক্তিফৌজ বাধা দিল তাকে। হানাদারের পোশাক-পরিহিত দলবীরকে মনে করলো তাদের শত্রু। দলবীর জানালো তার পরিচয়, সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা—যে রাত্রিতে শত্রুরা তার মাতৃভূমি দখল করেছিল, অত্যাচার করেছিল নারীজাতির ওপর, নৃশংসতার চরম পরিচয় দিয়েছিল সেই অমানিশার কাহিনী, আর কাকীর অপমানের ইতিহাস শোনাল। বলল, এ অপমানের প্রতিশোধ সে নিতে চায়।

মুক্তিফৌজ বুঝলো দলবীর হানাদার নয়। সে তাদেরই মতো একজন মুক্তি-সৈনিক।

: চল, এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, পিছু হটতে হবে না তোমাকে। মহা উল্লাসে এগিয়ে চললো বীর সেনাবাহিনী। অভয় দিল সকলকে।

প্রতিশোধ নেবে দলবীর। সৈনিক সেজে হানাদার তাড়াবে দেশ থেকে। কিন্তু এ কাজ কি সহজ? না, তবু করতে হবে।

কাকী বলল, দেশের মুক্তিযজ্ঞে যোগ দাও তুমি। আমার কথা ভেবো না আর।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই হানাদারদের দলে যোগ দিল দলবীর। বলল, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাদের।

বিশ্বাস করলো হানাদারেরা। সে যে তাদেরই একজন। একদল হানাদারকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো দলবীর। বলল, তোমাদের গুপ্তঘাঁটির সন্ধান দেবো আমি। শত্রুকে খতম করে তোমরা হতে পারবে অমর।

দুর্গম গিরিপথের মাঝখানে এসে ফিরে দাঁড়ালো দলবীর। অদূরে মুক্তি-বাহিনী।

: ফায়ার!

চারদিক থেকে গুলিবর্ষণ হতে লাগলো।

: ট্রেটার—বিশ্বাসঘাতক!

: ফায়ার!

গুড়ুম। গুড়ুম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব চুপচাপ।

মুক্তি-বাহিনী এগিয়ে এলো। শত্রুরা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। দলবীরের বুক গুলিবিদ্ধ। তবু তার মুখে হাসির রেখা সুস্পষ্ট।

ওরা তাকে চিনলো। বললো, তুমি এমনি করে এদের সঙ্গে প্রাণ দিলে কেন?

মুমূর্ষু দলবীর বলল, একশ'টি প্রাণ নিয়ে একটি প্রাণ দিলাম, তাতে ক্ষতি কি? আজ আমার মনে শুধু এতটুকু ক্ষোভ—আমার মান্নাকে দেখতে পেলাম না···কাঞ্চীকে বলো, সে যেন তার ছেলেকে সৈনিকের কাজে ভর্তি করিয়ে দেয়।···

আমি জানি, আমার ছেলে—কাঞ্চীর ছেলে হানাদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে।···আমাদের দেশ চায় বীর সন্তান, কাঞ্চীর ছেলে হবে বীর আর সে হবে বীর-জননী। দেশরক্ষার সৈনিক। নিজের দেশের মান রাখতে, নারীজাতির মর্যাদা রক্ষা করতে সে এগিয়ে আসবে। প্রাণ দেবে প্রয়োজন হলে। তার মৃত্যু মহামৃত্যু—চির বরণীয়।···

নীরব হলো দলবীরের কণ্ঠ।

মুক্তি-সৈনিকরা সযত্নে রচনা করলো তার সমাধি, প্রকৃতির দেওয়া সদ্যফোটা ফুল বিছিয়ে রাখলো সমাধির ওপর।···

হানাদারেরা বিদায় নিয়েছে বাধ্য হয়ে। মুক্তি-সৈনিকের কাছে আক্রমণকারীরা হার মেনেছে। ফিরে এসেছে যে-যার ঘরে। কিন্তু দলবীর আসে নি, আর আসে নি কাঞ্চী। না, একদিন এসেছিল, আবার কোথায় চলে গেছে সে। দলবীরের চার বছরের ছেলে মান্নার কোন খবর নেই।

প্রায় স্বাভাবিক হয়েছে সীমান্তের জীবনযাত্রা।···

ঐ—কাঞ্চী আসছে—দলবীরের স্ত্রী কাঞ্চী। উন্মাদিনী কাঞ্চী। শোকবিহ্বলা, উদাসীনা। প্রতিবেশীরা কানাঘুষা করলো। কাঞ্চীর ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্বামী নেই, পুত্র নেই,—সে একা। বিনা দোষে সে সব হারিয়েছে। কি নিয়ে সে বাঁচবে—কেমন করে বাঁচবে?

মুক্তি-সৈনিক! কোথায় যাচ্ছে এদিকে? তার সঙ্গে ওই ছেলেটি কে? ওর হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে সকলে।

কোথা থেকে ছুটে এলো কাঞ্চী। জড়িয়ে ধরলো ছেলেটিকে। মান্না। কোথায় ছিলি তুই এতদিন? কার কাছে ছিলি? কাঞ্চী জানে না—সরকার শিশু ও নারীদের স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন হানাদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যে। আজ সে তাই ফিরে পেয়েছে তার মান্নাকে।

কিছু বলল না মান্না। চুপ করে রইলো। বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে যেন খুঁজলো তার বাবা দলবীরকে। দেখতে পেলো না। হতাশায় মলিন হলো রক্তিম গণ্ডদ্বয়।

মুক্তি-সৈনিক কাঞ্চীকে বলল, আপনার ছেলেকে বুঝে নিন। আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে গেলাম তাকে। যখন দরকার হবে, নিয়ে যাবো আবার। ওর বাবার অন্তিম সাধ—তাঁর ছেলে সৈনিক হবে।

: কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সে যদি মারা যায়?

: তাতে কি? সে যে সৈনিকের ছেলে, আর আপনি সৈনিকের স্ত্রী। আপনার এ গৌরবের যে তুলনা নেই।

একবার কি যেন ভাবলো কাঞ্চী। উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার মলিন মুখমণ্ডল। বলল, সৈনিক—সত্যিই তো, মান্না আমার সৈনিক হবে।

অননুভূতপূর্ব মমতায় সে মান্নাকে বুকে চেপে ধরলো।

চম্পূ ঃ [নিরুপমাকে]

নীলকণ্ঠ

॥ এক ॥

আষাঢ়ের কালো চোখে
জানো। জল আনে ওকে?
কার ব্যথা নভলোকে
কাঁপিছে ঝড়ে?

জানো কোন্ বন থেকে
নাকি কারু মন থেকে
আজ বহুক্ষণ থেকে
সুবাস ঝরে!

॥ দুই ॥

জীবন মরু শুধু
কেবল করে ধূ ধূ
কোথাও নেই মধু
একথা ঠিক নয়।

তোমার চলা দিয়ে
তোমার বলা দিয়ে
মরুর তলা দিয়ে
আবার নদী বয়॥

॥ তিন ॥

কী হবে লিখে কবিতা আর?
লেখে না চিঠি সবিতা আর।
কেন যে মেঘ আকাশে জমা?
যদি না। রোদ করে তা ক্ষমা?
অজানা তা কি সে নিরুপমার।

৮

প্রথম দিন থেকে ছু'জন রোগিণী বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছে সিস্টার লুককে। এ্যাবেস আর আর্কেঞ্জেল। মানসিক বিকার তাদের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এ্যাবেসের একটিমাত্র বাতিক, নিবিরোধী হলেও অদ্ভুত। আর আর্কেঞ্জেলের কেস্‌টা ডিমেনসিয়া প্রিকক্সের সিজোফ্রেনিক ফর্ম।

এ্যাবেসের অস্বাভাবিক ঝোঁক দারিদ্র্যের ওপর। এককালে ধর্মীয় সংঘের উচ্চপদে ছিলেন, দারিদ্র্য-ব্রতে সেখানকার কঠোর নিয়ম তাঁর মনোমত কঠোর ছিল না। সবাই সন্দেহ করত তিনি বোধ হয় গোপনে নানা আত্মনিগ্রহ করেন, তাঁর নানরা তাঁকে সেণ্ট মনে করত। শেষে একদিন দেখা গেল কন্‌ভেণ্ট লাইব্রেরীতে বসে তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ইঞ্চি পরিমাণ চৌকো করে কেটে ফেলেছেন। স্তম্ভিত নানদের বললেন, ঐ উজ্জ্বল সুশোভিত পাণ্ডুলিপিগুলো আঘাত করছিল তাঁর বিবেকে। যা কিছুই সোনার মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে তাতেই দরিদ্রতার অভাবের চিহ্ন সুস্পষ্ট, এগুলো তাই ধ্বংস করে ফেলাই উচিত বিবেচনা করেছেন তিনি।

এখনও ঐ দারিদ্র্যের দায়ে নিজের ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর তিনি শোন। বিছানার তোষক অনেকদিন আগেই ছোট ছোট চৌকো টুকরো করে কেটে ফেলেছেন। পরেও যেসব চাদর আর কম্বল পেয়েছেন সেগুলোও প্রত্যেকটা। তোষকের তুলো আর কম্বলের নরম স্তূপটাকে বলেন আবর্জনাস্তূপ। তাঁর একমাত্র বাসনা জোবের মত নিজের আবর্জনাস্তূপের ওপর মারা যান। ম্যানিয়া ছাড়া চার্টে দেখা যায় হার্টের অসুখ আছে তাঁর এবং তা থেকে শোথ হয়েছে। তাঁর বয়সের অন্য আর যে কোন স্ত্রীলোক হলে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়তেন, এ্যাবেস কিন্তু নান হিসেবে যে সময় রোজ ধীর পদক্ষেপে নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুরে আসতেন মঠের মধ্যে এখনও সে সময় প্রত্যহ পদচারণা করে আসেন একপ্রস্থ।

বৃদ্ধা এই নানটির উন্মাদ রূপ সিস্টার লুক কোনদিন দেখে নি। কারণ সে কোনদিন প্রতিবাদ করে নি তাঁর কথায় কিংবা ঐ ছেঁড়াখোঁড়া তোষক-কম্বলের স্তূপ থেকে তুলে বিছানায় শোয়াবারও চেষ্টা করে নি। এ্যাবেস তাকে ডাকেন 'মাই চাইল্ড' বলে, সে যেন তাঁরই একজন নান। রোজ অপেক্ষা করে থাকেন কখন সে আসবে। এলে তাঁর শেষ কবিতাটা দেখান, অথবা রাত্তিরে যে গানটা বেঁধেছেন সাধা চড়া গলায় সেটা গেয়ে শোনান। মাঝে মাঝে কন্‌ভেণ্ট-জীবনের কথা বলেন···ধর্ম···আত্মনিগ্রহ···জগৎ তার সামান্যই জানে। পাল্টাপাল্টি ওর আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা জিজ্ঞাসা করেন—সুপিরিয়রের দায়িত্বে আছেন যেন।

একদিন আবেগের মুখে সিস্টার লুক বলে ফেলল তার কংগোয় কাজ করতে যাবার আকাঙ্ক্ষার কথা।

শুনে এ্যাবেস বললেন, অবশ্য ঈশ্বরের যা ইচ্ছে তাই হবে, তুমি কিন্তু এর জন্যে প্রার্থনা করে যেও নিয়মিত। এখন থেকে আমিও প্রার্থনা করব তোমার জন্যে।

এরপর থেকে যখনই চ্যাপেলে এ্যাবেসকে দেখেছে নিবিড় প্রার্থনায় মগ্ন, ভারি একটা সান্ত্বনা পেয়েছে মনে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক একবার হার্ট এ্যাটাকের মুখেও ধর্মীয় কর্তব্য যা কিছু তিনি সুষ্ঠুভাবে এবং পরম শুদ্ধাচারে পালন করে থাকেন।

অন্যদিকে আর্কেঞ্জেল গ্যাব্রিয়েলকে তার প্যাডেড সেলের ভিতরে আর তক্তা দিয়ে আধা আটকানো টবের মধ্যে ছাড়া কোনমতেই বিশ্বাস করা চলে না। তার চার্টে যে বর্ণনা আছে সে ঠিক তাই—সিজোফ্রেনিক কেস্‌—চেতনাহীনতা, অসংবদ্ধতা ঝোঁকের মাথায় কাজ করা···সব কটা চেনা লক্ষণ এখানে সহজেই দেখা যায়। বস্তার মত একরকম পোশাক আছে, তাকে বলে মেইলট। গরম জলের টবে শোয়ানোর আগে সেটা পরাতে হয়—আর্কেঞ্জেলকে সেটা পরাতে জনা তিনেক প্র্যাক্‌টিক্যাল নার্স লাগে গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সমস্ত দেহটাই ঢুকে যায় মেইলটের মধ্যে। পা ছু'টো খোলা থাকে কেবল। জোড়া পায়ে ছোট ছোট লাফ দিয়ে দিয়ে করিডর পেরিয়ে বাথরুমে

যায় সে। সিস্টার লুক যে ডেস্কে বসে কাজ করে তার পাশ দিয়ে অমনি লাফিয়ে যেতে যেতে ও সব সময় এক লহমা থেমে উচ্ছল পরিচিত ভংগীতে চেঁচিয়ে ওঠে, হ্যালো, চেরি!

সিস্টার লুকের স্থির ধারণা একদিন না একদিন আর্কেঞ্জেলের অমানুষিক অন্তর্জগৎটাকে ভেদ করতে সে পারবে। যতদূর আন্দাজ করা যায় সে জগৎ প্রধানত দেবদূত আর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় সমাকীর্ণ। বেশ সংযত থাকে যখন স্বাভাবিক মানুষের মত নিজের খামারের গল্প করে আর্কেঞ্জেল। ম্যালিয়ার পক্ষীরাজ ঘোড়া তখন পারচরণ ঘোড়া হয়ে দাঁড়ায়, ঐ ঘোড়া সে লালন-পালন করত। সগর্বে বলে এ জন্তুটা ভিন্ন একেবারে—ক্লাইডেসডেল আর শয়ারদের চেয়ে ঢের উঁচু দরের জীব, তা সে ইংরেজরা ওদের নিয়ে যতই বড়াই করুক! পায়ে লোমওয়ালা এই ঘোড়াগুলোকে ওরা নিজেরা উৎপাদন করে কিনা!···লাঙল-চষার ব্যাপারে কিন্তু পায়ের ঐ বাড়তি লোমগুলো একটুও সুবিধের নয়।

রিক্রিয়েশনে নানরা বলাবলি করে, সিস্টার লুক এসে আর্কেঞ্জেলের বেশ একটি বন্ধু হয়েছে।

আর্কেঞ্জেল এখানকার সবচেয়ে শক্ত একটা কেস্ এবং ওরা সবাই বিশ্বাস করে সে তার আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। এমনিতে হয় তো একটু লজ্জিতই হ'ত সিস্টার লুক। হয় না, ওদের কথায় একটা সাবধান-বাণী শুনতে পায় বলে। অন্তরের অন্তস্তলে তার একটা দম্ভ জেগে আছে গোপনে। পাগলদের ও চালিয়ে নিতে পারে।

দম্ভ কন্‌ভেণ্ট কখনও বেশিদিন টেকে না। তবে সাধারণত এমনই ঘোরা-পথে পতনটা আসে যে পরে অনেক জোড়াতালি লাগিয়ে অপরাধী তার অপরাধ আর পতনের মধ্যে সংযোগটা দেখতে পায়।

মাদার ক্রিস্টোফির নাম-দিন অনুষ্ঠান-তিথির সন্ধ্যায় সিস্টার লুক আবেদন জানাল সিস্টার মরির রাতের পাহারার ভারটা সে নেবে। আবেদন করল যখন তখন তার ধারণা সংঘের ভারবাহী নিরহংকার গাধাটি হতে চলেছে সে!

আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষে রিক্রিয়েশনের সময় পার্টি হবে একটা। কেক আর চকোলেটের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে তাতে।

অনুরোধ শুনে মাদার ক্রিস্টোফি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। যাচাই করে নিতে চান এই অস্বাভাবিক প্রার্থনার কারণ কোন ব্যক্তিগত আসক্তি কি না—তাহলে তো আবেদন নাকচ হয়ে যাবে তখনই।

—ও উইংয়ে তো সব সাংঘাতিক রোগী—তুমি ছেলেমানুষ, ও ডেস্কে একা থাকবে কি করে! আর ওটা সিস্টার মেরির ডিউটি বলে প্র্যাকটিক্যাল নার্স দু'জনকে পার্টিতে যাবার অনুমতি দিয়েছি আমি।

—রোগীরা তো আমার চেনে মাই মাদার।

মুহূর্তখানেক বিবেচনা করলেন মাদার ক্রিস্টোফি।

—আচ্ছা, ভাল কথা। কিন্তু আজ রাতে কেবল আটটা থেকে ন'টা, তারপর আবার সিস্টার মেরি ভার নেবেন।

প্যাডেড সেলের করিডরটা নিস্তব্ধ একেবারে। ভারি ভারি জানলাগুলোর পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে একবার ঘুরে এল সিস্টার লুক, প্রত্যেক রোগীটিকে তাকিয়ে দেখল। স্নানপর্বের পরে শান্ত হয়ে তারা অধিকাংশই বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আর্কেঞ্জেলের চোখ দু'টো খোলা একেবারে, কিন্তু ওকে চিনতে পারল না বোধ হয়।

নিজের ডেস্কে ফিরে এসে বসল।

মনের মধ্যে কেবলই সিস্টার মেরির কথাগুলো ঘুরছে, কথা রাখ সিস্টার, ওরা কোন দরকারে তোমাকে ডাকলে ঘণ্টা বাজাবে?

সিস্টার মেরির কণ্ঠস্বরে প্রায় ব্যক্তিগত উদ্বেগের আঁচ লেগেছিল।

···চিন্তাটাকে জোর করে সরিয়ে দিল সিস্টার লুক।

একা হয়ে ভারি ভাল লাগছে। কন্‌ভেণ্ট-জীবনে এ সুখ দুর্লভ। রিক্রিয়েশন-রুমে কেক-চকোলেট খাওয়ার মতই।

স্ক্যাপুলারের নীচে থেকে পিসিমার শেষ চিঠিখানা বার করল ক'টা লাইন পড়ে কৌতুক বোধ করেছিল, আবার ও সেই লাইনগুলো পড়ল: তোমার বাবা রাগ করছিলেন ঐ কঠিন কোর্সের পাঠ নেবার পর এই পাগলদের এ্যাসাইলামটায় তোমাকে পুরে দেবার কোন মানে হয় না! ওরা অযথা নষ্ট করছে তোমায়···এমন একটা জায়গা কি বা তোমার শেখার থাকতে পারে!

শেখবার আছে বাধ্যতা। পরের বার বাড়িতে চিঠি লেখার অনুমতি পেলে এই কথাটাই বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতে হবে।

সেলের জানলায় টোকা দেবার মৃদু শব্দ হ'ল।

সাদা লম্বা নাইট-গাউন পরে আর্কেঞ্জেল নিজের জানলায় দাঁড়িয়ে।

সেই ডাকছে। দেহটা বড় মানুষের, ভাব-ভঙ্গীটা শিশুর মত—করুণ ভাবে এক গেলাস জল চাইছে।

দরজার ওপর দিকের ছোট ফাঁকটুকুর দিকে চেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে গো আমার!—চারপাশে ঘরে ঘরে যারা ঘুমুচ্ছে তাদের কোন অসুবিধে না হয়, ভাবে সেই বোধই প্রকাশ পেল।

নীল চোখ দু'টো নিরীক্ষণ করে দেখল সিস্টার লুক—গ্রীষ্মাকাশের চেয়ে বেশি বক্রতা তাতে নেই···স্নিগ্ধ, সুনীল।

—ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে আমার—সব ক'টা শয়তানের তেষ্টা আমার ওপর এসে ভর করেছে।

চলিত প্রবাদটায় বিশ্বাস-জন্মানো পরিচিতি।

কলের কাছে গিয়ে কাগজের কাপে জল ভরল সিস্টার লুক। এত তুচ্ছ একটা ব্যাপারে ঘণ্টা বাজিয়ে সিস্টার মেরি আর নার্স দু'জনকে পার্টি থেকে এনে ফেলাটা হাস্যকর মনে হ'ল। এ পার্টি তো বছরে একবারই আসে। দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করেই কাগজের কাপটা দিয়ে দিতে পারবে, তারপর আর্কেঞ্জেল জল খেতে খেতে চট করে বন্ধ করে দেবে দরজাটা। কাপটা ওর কাছেই থাকতে পারে। কাচের তো নয় যে ভেঙে তার টুকরোয় নিজের শিরা-টিরা কেটে ফেলবে! খুব খারাপ কিছু করলে হয় তো পরে কাপটাই খেয়ে ফেলতে পারে, এই পর্যন্ত।

দীর্ঘ দু'বছরের সাধনায় যে বাধ্যতা আয়ত্তে এসেছিল, মুহূর্তে তার প্রভাব শূন্যে মিলালো।

একা সেলের দিকে এগিয়ে গেল সিস্টার লুক।

বাঁ হাতে চাবি, কাপটা ডান হাতে। আধ-ঘুমন্ত শিশুর মত শিথিল ভংগীতে অপেক্ষা করছে আর্কেঞ্জেল। নীল চোখ দু'টো একাগ্র হয়ে আছে কাপটার দিকে, দরজার বাইরে যে কেবল একজন দাঁড়িয়ে আছে তাও লক্ষ্য করেছে বলে মনে হয় না। তালায় চাবিটা ঢোকাল ছিটকিনিটা খুলে আর্কেঞ্জেলের চোখের দিকে তাকিয়ে সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে কাপটা ঢুকিয়ে দিল।···পলকের মধ্যে তার সমস্ত দেহটা অনুসরণ করল কাপটাকে।

লোহার মত শক্ত আঙুলগুলো চেপে ধরেছে কব্জিটা। হ্যাঁচকা টানে মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল···ঈষৎ উন্মুক্ত দরজাটা তারই ধাক্কায় সম্পূর্ণ খুলে গেছে। মেঝের ওপর আছড়ে পড়ার আগেই ভেলটা টেনে খুলে দিল আর্কেঞ্জেল এবং সে উঠতে পারার আগেই মাড়-দেওয়া কয়ফ আর মাথার বন্ধনীগুলো পাতলা কাগজের মত টেনে ছিঁড়ে দিল। শ্বাসরোধ করে গুইম্পটাকে চেপে ধরে খুলে ফেলল টেনে। সিস্টার লুক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে জোর করে ওপর দিকে ঠেলে উঠ বক্ষ একটা হাত জোরে চেপে ধরল···অন্য হাতখানা ততক্ষণ এগিয়ে এসে স্ক্যাপুলারটা ধরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

—চেরি! চেরি!

উন্মত্ত একটা ফিস্‌ফিসানি ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। একবার শুধু তার বেল্ট, চাবির রিং আর ক্রুসিফিক্সটা একসংগে মেঝের ওপর আছড়ে পড়তে যা সামান্য একটু শব্দ হ'ল।

চাবিটা দরজাতেই আছে। ভগবানের দয়া বেল্টে আটকানো ছিল না। ধস্তাধস্তি করতে করতে এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে সিস্টার লুক। তবু তারই মধ্যে দু'বার পায়ের ধাক্কায় দরজাটা আরও বেশি খুলে দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে ও নিরন্তর প্রার্থনা করছে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে করুণা ভিক্ষা করছে। এ যুদ্ধ তার নিজের জীবনের জন্য নয়, এই করিডরের আর পনেরোটা জীবনের জন্য, বৃদ্ধা এ্যাবেসের জন্য—ঠিক পিছনের ঘরে কম্বলের স্তূপে শুয়ে আছেন তিনি।···স্কার্টটা খুলে ফেলতে বেশ একটু সময় লাগল আর্কেঞ্জেলের। সার্জকাটটার ওপরটা আঁট খুব, পেটিকোট আছে তার নীচে। ভারি হ্যাবিটটা টেনে খুলে দেওয়ায় অনেক হাল্কা হয়ে গেছে সিস্টার লুক নিজে, তার থেকে প্রায় দ্বিগুণ লম্বা-চওড়া পাগল মেয়েটির চেয়ে অনেকটা বেশি জোরে ছুটতেও পারছে।···নানা কৌশলে অনেক আঘাত এড়ালো, ধাক্কা দিল পা দিয়ে, জড়িয়ে ধরা হাত দু'টোর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল।

—চেরি! চেরি! আর্কেঞ্জেল তখনও ফিস্‌ফিস্ করছে।

—ভগবান···হে ভগবান···

পবিত্র নামটুকুই কেবল···তার বেশি বলবার সময়ও নেই, শক্তিও নেই।

—হে ঈশ্বর···হে প্রভু···

আর্কেঞ্জেল একটা মোজা খুলতে নীচু হয়েছে···যে শক্তির জন্য প্রার্থনা করছিল এবার তারই সুযোগ এসেছে। উন্মাদ মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে··· এক লহমার জন্য সেই কঠিন হাত দু'টোর আক্রমণ থেকে মুক্তি পেল সিস্টার লুক। তার মধ্যেই দরজার বাইরে এসে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

লম্বা লোহার চাবিটা চেপে ধরে অসাড় হয়ে গেছে হাতখানা, কোনমতেই টেনে নিতে পারছে না। কতক্ষণ ছিল এমন ভাবে ধারণা নেই কোন। শুধু দেখতে পাচ্ছে আর্কেঞ্জেল বেদনাবিকৃত মুখখানা কাচের ওপর চেপে ধরে আছে···তার মুখের এক ইঞ্চি তফাতে।

ক্রমে দৃষ্টি স্থির করে সিস্টার লুক তাকিয়ে দেখল তার ছিন্নভিন্ন হ্যাবিটটা মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে···এককোণে স্তূপ করা আছে তার বেল্ট, চাবির রিং আর ক্রুসিফিক্স। চামড়ার বেল্টটা চোখে পড়তে নড়বার শক্তি পেল প্রথম—বাতিকগ্রস্তা মেয়েটি তার ইচ্ছেয় বাধা পেয়েছে, এখনই হয় তো ওটা দিয়ে নিজের শ্বাসরোধ করবে।

কোনমতে টলতে টলতে করিডরটা পেরিয়ে এসে সিস্টার লুক বেল বাজালো।

নার্স দু'টিকে নিয়ে সিস্টার মেরি এত তাড়াতাড়ি এলেন মনে হবে যেন বোতামটা সে টেপে যখন, তাঁরা নিশ্চয় সেখানেই ছিলেন। সিস্টার মেরির দৃষ্টিতে বিস্ময় নেই, বিচার নেই, আহত অভিযোগ নেই ···প্রথমেই একটা বড় চাদর নিয়ে এলেন তাকে ঢেকে দেবেন বলে। প্র্যাক্‌টিক্যাল নার্স দু'টি হাত যুড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে···না আছে কোন কৌতূহল, না আছে কোন উত্তেজনা। সামনে খালি মাথায় নান বসে আছে একজন, তার হ্যাবিট টেনে খুলে দিয়েছে কেউ···চোখের ওপর কালশিরার দাগ পড়েছে···গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না—তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা কনভেন্টে খুব সাধারণ ঘটনা যেন।

—আর্কেঞ্জেল, কোনমতে শ্বাস নিতে পেরেই সিস্টার লুক জানাল। নার্স দু'জন তখনই চলে গেল করিডর ধরে।

প্রাচীন যুগের রোমান পোশাকের মত করে বিছানার চাদরটা দিয়ে তাকে ঢেকে দিয়েছেন সিস্টার মেরি। মমতাভরা চোখে কালশিরা আর আঁচড়ানোর আঘাতগুলো পরীক্ষা করলেন। কিন্তু বাধ্যতার ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের অন্তরে যে গভীর ক্ষত সিস্টার লুক নিজে সৃষ্টি করেছে তার উল্লেখমাত্রও করলেন না। ক্ষমাসুন্দর নীরবতা।

অস্ফুটকণ্ঠে সিস্টার লুক বলল, নষ্ট আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল···প্রার্থনার জোরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।

চাদরের একটা কোণ টেনে তুলে খালি মাথায় জড়িয়ে দিলেন সিস্টার মেরি।—কথা বলবার চেষ্টা কোর না।

চিবুকটা কাঁপছে দেখে মাথায় জড়ানো চাদরের কোণটা টেনে দিয়ে চিবুকের নীচে আঁট করে গিঁট বেঁধে দিলেন।

—আমি হলেও বোধ হয় ঠিক এই করতাম।

টেলিফোন তুলে নিয়ে হাসপাতালে বললেন একটা ষ্ট্রেচার আনতে।

সিস্টার লুক আর দমন করতে পারল না নিজেকে, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিজের লজ্জাকর অবস্থার জন্ত নয়, কালশিরার যন্ত্রণার জন্ত নয়—দীর্ঘাঙ্গী এই শান্ত সিস্টারটির কাছ থেকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বদান্যতা পেয়ে। তার লজ্জা ভাগ করে নিতে নিজের সম্বন্ধে যা বলছেন তিনি তার অর্থ এই দাঁড়ায় তিনিও দাম্ভিক, তিনিও অবাধ্য।

নার্সরা তার ছিন্নভিন্ন হ্যাবিটের টুকরোগুলো নিয়ে করিডর দিয়ে ফিরে আসছে দেখে চোখের জল ফুলে ওঠা চোখের পাতায় হুল ফোটাল। এই দু'বছর ধরে পরিপূর্ণ বাধ্যতায় ঈশ্বরকে সব করার চেষ্টায় সব জলাঞ্জলি ওদের ওই বড় বড় কালচে হাতে স্তূপীকৃত। এই সাদা-কালো টুকরোগুলো শেষ পর্যন্ত সিস্টার ইউডোক্সির কাছে পৌঁছোবে···চকিত ভাবনাটা কাঁপিয়ে দিল। টুকরোগুলো দিয়ে সেলাইয়ের থলি করাও যাবে না, এত ছোট। সম্ভবত রান্নাঘরের নানদের রান্নার পাত্র ধরার কাজেই লাগতে পারবে কেবল।

কোনক্রমে বলতে পারল, এ রকম আপনার কখনও ঘটত না।

যে আবেগে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল তীক্ষ্ণ দু'টি চোখের দ্যুতি পথরোধ করে দাঁড়াল তার। তাকে সংযত করল। ব্যক্তিগত আসক্তি প্রকাশ বা ভবিষ্যদ্বাণী করে অপরাধের বোঝা বাড়ানোর দায় থেকে বাঁচলে।

—একমাত্র সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জানতে পারেন তা, হাত দু'টি বাড়িয়ে নার্সদের হাত থেকে ছেঁড়া হ্যাবিটটি নিলেন, সেটা পোশাকই আছে যেন। ভঙ্গী দেখে মনে পড়ে গেল মাদার হাউসের লিভিং রুলদের—ব্রত নেবার আগে তার জন্ত নতুন কালো ভেল আর স্ক্যাপুলার ঠিক এমনি করে নিয়ে এগিয়ে আসছেন তার দিকে।

···দু' চোখ ছাপিয়ে জল এল আবার···এবার আর কোন শব্দ নেই

··

কনভেন্টের অসাধারণ সুবিবেচনায় ব্যাপারটা চাপা পড়ল। মনে হ'ল যেন কিছুই ঘটে নি। মনে হতে পারত এটাও একটা দুঃস্বপ্ন কেবল···যে দুঃস্বপ্ন দেখে মানরা তাদের খড়ের বিছানায় বিচলিত হয়ে ওঠে, গোঙায়···তেমনই একটা দুঃস্বপ্ন···মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করতে না হ'ত যদি।

মাদার ক্রিস্টোফি আলাদা কুলপা শুনলেন তার, অসাধারণ অপরাধের জন্ত এই নিয়ম। তিনদিন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে যে সত্য সে আবিষ্কার করেছে নিজের সম্বন্ধে তার মুখেই তা শুনলেন, কোন মন্তব্য না করে শুনলেন। এতদিন যেগুলো ওর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আজ সেগুলোর আসল কুরূপ ধরা পড়েছে নিজের কাছেই—দম্ভ, ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা, অতি-সাহস। ভাবলেশহীন একঘেয়ে স্বরে তাদের তালিকা দাখিল করে যাচ্ছে···তাদের আবিষ্কার করে কণ্ঠস্বরটাই সরেছে যেন তার। উপযুক্ত কথায় বক্তব্যটা পেশ করে দিতে দিতে অনুভব করেছে সে নিজেই ঘটনাটার রিপোর্ট দিচ্ছে···যদিও মাদার ক্রিস্টোফি নোটও নেন নি, কিছুই না—তবু তারই ভাষায় এ রিপোর্ট সোজা মাদার হাউসে যাবে, রেভারেণ্ড মাদার ইমাকুলেট স্বয়ং পড়ে এর গুরুত্ব বিচার করবেন। দীর্ঘ কুলপার এক সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল এই মাত্র ক'মাস আগে একজন সুপিরিয়রকে সে নিজেই অনুরোধ করেছিল আর একটা স্বপ্নের কথা মাদার হাউসকে জানাতে।

মনে পড়তে প্রায় প্রকাশ্যেই বলে ফেলেছিল মাদার ক্রিস্টোফিকে, আচ্ছা, সেদিন যদি ঈশ্বরের নামে নম্রতা প্রকাশে সফল হতাম আজ কি এমন কিছু ঘটত আমার?

হাসপাতাল থেকে ফিরে আটদিন ক্রমান্বয়ে স্যুপ ভিক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত করল। এত দীর্ঘদিন ধরে এই কঠোর কৃচ্ছসাধন করার কথা শোনা যায় না। অথচ দিনের পর দিন খাবারঘরে
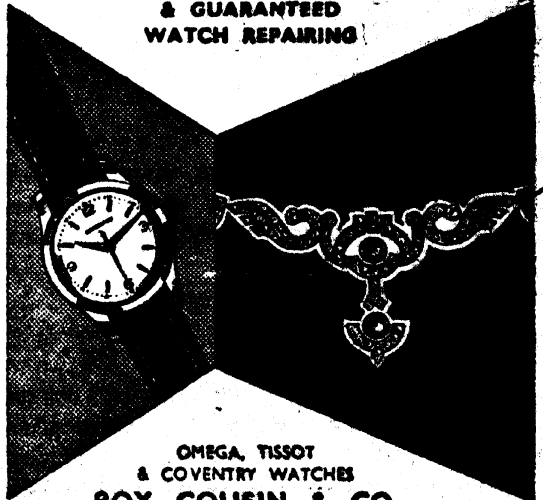
জিজ্ঞাসার হাতে নতজানু হওয়া যখন মনে হ'ল না যেমন কিছু একটা ঘটছে।...সিস্টারের গরম করুণায় তার চোখের পাতায় নীলচে-সবুজ কালশিরা, প্লেটে, পাত্র ধরা হাত দু'টোর ফোলা কব্জি, এমন কি আনকোরা নতুন হ্যাবিটটাও উপেক্ষা করলেন। কালশিরা কিংবা মচকানির আঘাত দেখতে ওঁরা বরং অভ্যস্ত এই সংঘে, কিন্তু নতুন হ্যাবিটটা তাঁদের মেয়েলি চোখে আরও বেশি পড়ার কথা। অথচ একটা চোখও কৌতূহল-তির্যক দৃষ্টিতে তাকায় নি।...নিজেকে নিজের প্রেতাত্মা মনে হচ্ছে তাই।

ডিউটিতেও তাই। সুপিরিয়র অন্য উইংয়ে বদলি করেন নি তাকে, হুকুমের মত সেইখানেই তাকে রেখেছেন। যে শিক্ষা এখানে সে পেয়েছে তার ওপর আর শোধরাবার কিছু নেই।

এখনও প্রত্যহ তার ডেস্কের পাশ দিয়ে লাফাতে লাফাতে বাথরুমে যাবার পথে আর্কেঞ্জেল তেমনি চেঁচিয়ে ওঠে.. হ্যালো চেরি।

যেন তার এই পছন্দসই সিস্টারটির সংগে এইটুকুইমাত্র ঘনিষ্ঠতা করা সম্ভব।

প্র্যাক্টিক্যাল নার্সরাও তার শক্তি বা সাহসের কথা তুলে কোন মন্তব্য করে নি। এই সহানুভূতির ষড়যন্ত্রে ওরাও যেন যোগ দিয়েছে। ফলে সমস্ত সংঘটা নীরবতার আবরণে ঢাকা—সে শুধু একা বাইরে পড়ে।...সে আর এই স্মৃতি।

পুরো তা নয় অবশ্য, এ্যাবেস আছেন। চোখের ওপর কালশিরার কালো দাগটুকুও মিলিয়ে না যাওয়া অবধি সিস্টার লুক এই বৃদ্ধা নানটিকে দেখাশুনা করতে সহকারিণীকে পাঠিয়েছে—আর নিজে রোজ দোয়াতদানির চকচকে পেতলের ঢাকনিতে দেখছে কতদিনে কালশিরার শেষ দাগটুকুও মিলিয়ে যায়। আগামী সপ্তাহের কুলপার স্মরণী হিসেবে এই ঘটনের কথা লিখে রেখেছে বিবেক পরীক্ষার নোট-খাতায়, পাশে অসংকোচ মন্তব্য: বদান্যতার জন্যে, একটি রোগীকে অযথা বেদনা না দিতে হয় যাতে।...এমনিই লিখতে লিখতে একদিন ভাবল কে জানে কোনদিনে ভগবানের দয়ায় লিখতে পারব কোথায় নিয়মের শাসন শেষ হয়ে বদান্যতার রাজত্ব শুরু হয়...আর এসব আবোল-তাবোল লিখে খাতা ভরাতে হবে না তখন।

এ্যাবেস তারই অপেক্ষায় ছিলেন ছেঁড়া স্তূপে পিঠের দিকটা উঁচু করে দিয়ে সোজা হয়ে বসে আছেন আরামকেদারায় বসার ভংগিমায়। সিস্টার লুক বুঝতে পারছে হার্ট ট্রাবলটা আবার তাঁর বেড়েছে নিশ্চয়...ড্রপসিগ্রস্ত মোটা ভারি পা দু'টো সামনে ছড়ানো, তার ওপর ক্ষীণ দেহটা দণ্ডের মত।

স্নেহশীল মুখে তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট হ'ল।

—তোমার অভাব খুব বেশি মনে হ'ত মাই চাইল্ড—সে কি তোমায় আঘাত করেছে?

স্নিগ্ধকণ্ঠের প্রশ্নটা শুনে সিস্টার লুক তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল নাড়ী দেখতে।...ইনি কি করে জানলেন? একাধিক করিডর এবং একটি সোস্যাল-হলের ব্যবধান সত্ত্বেও? তার ওপর আবার সেলের পার্টিশনগুলো অস্বচ্ছ কাচের...পত্তার্থস্তর শব্দ কানে কি করে গেল ওঁর এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে কেবল যে তাঁর সুদীর্ঘ নান-জীবনের সাধনাজিত বিশেষ ক্ষমতা আজও এই রোগজীর্ণ শরীরে অক্ষুণ্ণ আছে—অদ্ভুতভাবে পারিপার্শ্বিককে জানতে পারেন তিনি।

—না সিস্টার না...আমি নিজেকেই নিজে আঘাত করেছি শুধু।

আর কোনদিন এ্যাবেস এ প্রসংগ তোলেন নি। কিন্তু দিনের পর দিন অন্তর্বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, এমন প্রাঞ্জল আলোচনা নিভৃত ধর্মচিন্তায় বা রিক্রিয়েশনেও শোনার সুযোগ ঘটে না। তা ওপর তাঁর নিজের রচিত নিখুঁত গান এবং সনেট এখানে উপরি-পাওনা। সিস্টার লুকের ধারণা তিনি সচেতনভাবেই চেষ্টা করছেন তাকে আত্মগ্লানি আর নীরবতার গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আনতে...মুখের স্মিতহাসিটুকু আবারও সে ফিরে পায় যাতে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মনের গাত-প্রকৃতি ভাল করেই জানেন এই বৃদ্ধা নানটি।

ডে-ডিউটির মাসটার শেষদিন সন্ধ্যায় একেবারে ছেলেবেলার মত সোজা সরল ভাষায় এ্যাবেসের সংগে কথা বলতে বলতে সে সত্যিই আবার হাসল। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে যেন ভারমুক্ত বিবেকটাকে ফিরে পেয়েছে...সন্ন্যাসিনীর সহনশীলতা একমাত্র মালিন্যমুক্ত এমনি বিবেকের জোরেই সম্ভব।

পরবর্তীকালে তিক্ত মনে স্মরণ করত সেদিন এ্যাবেসের সংগে কথা বলতে বলতে বলেছিল এক সময়, আজ রাতে চাকাব ঘুরলে ঘুরে যাবে সবকিছু। বলেছিল যখন তখন ভাবছিল সিস্টার মেরিকে এক মাস নাইট-ডিউটির পর রেহাই দিতে পারায় আনন্দের কথা, ভাবছিল ঠিক নির্দিষ্ট সময়টিতে সে গিয়ে উপস্থিত হবে যখন তাঁর চোখ দু'টো কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে কেমন।

ওর দিনের ডিউটি শেষ হয়ে যাবার আগে এ্যাবেসের একটা বিশেষ অনুরোধ ছিল। একবার তাঁকে চিলে-কোঠায় নিয়ে চলুক সিস্টার লুক, তাঁর যে পোশাকগুলো জমা আছে, তিনি একবার দেখবেন।

—তোমার এই নাইট ডিউটির মাসটায় সম্ভবত দেখতেই পাব না তোমায়...আর কে জানে...

এ্যাবেসের পিছন পিছন চিলে-কোঠায় এল। জানলা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে বালি-ঘষা মেঝের ওপর...পাইন কাঠের সাদা তাকে বুঝি তারই প্রতিফলন। হাসপাতালে ঢোকার সময় যে পোশাক থাকে রোগীদের পরণে সেগুলো এই তাকে পরিচ্ছন্ন ভাবে গুছিয়ে রাখা আছে। প্রত্যেকটা পোশাকের থাকে নম্বর দেওয়া এবং থাকটায় কি কি জিনিস রইল তার তালিকা আঁটা। এক একটা থাকের ওপর এক একটা জিনিস রাখা আছে—যার পোশাকের থাক পাগল হবার মুহূর্তে যে জিনিসটা সে আঁকড়ে ধরেছিল... খাটে বাঁকা ফলার আইস স্কেট্স্, কোট, ছাতা, পুরোনো ধাঁচের বক্স-ক্যামেরা, হিল দেওয়া সাটিনের স্লিপার, রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি—বাবা-মার, বাগান-বাড়ির, ঘোড়ার কুকুরের, বাচ খেলার নৌকোর। এখানে ওখানে মস্ত বড় বড় সেলের টুপী, যার থেকে অদ্ভুত পাখীর পালকের গোছা ঝুঁকে পড়েছে।...সিস্টাররা কি সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছেন জিনিসগুলো চিলে-কোঠায়, আগে আগে তাই নিয়ে মনে মনে শুধু প্রশংসা করত সিস্টার লুক, আর কিছু কোনদিন ভাবে নি। আজ এখানে এসে মৃত্যুর কথা মনে এল। এ যেন এক বিচিত্র সমাধিক্ষেত্র...কোন দেহ সমাহিত করা হয় নি, শুধু কর্পূরের মৃদু মিষ্টি গন্ধে সুরভিত কাপড়-চোপড়গুলো রাখা আছে সযত্নে, পোকা না হয় যাতে।

সারি সারি তাকের লম্বা লাইন ধরে এ্যাবেস এগিয়ে চলেছেন

নিজের নম্বরটি খুঁজতে খুঁজতে। আগন্তিক পোশাকগুলোর দিকে দৃষ্টি গেই, যেন কোন সুপিরিয়র পরিদর্শনে এসেছেন—চোখের দৃষ্টি তাঁর সিল্ক-ভেলভেটের চকচকে ভাঁজে না থেমে পিছনের দেওয়ালে গিয়ে পড়ছে, ওপরের কড়িকাঠেও। মাকড়সার জাল কিংবা এককোঁটাও ধুলো কোথাও আছে কি না দেখছেন। একটু পরেই এক'গোছা অতি অনাড়ম্বর সাধাসিধে অনুজ্জ্বল কালো পোশাকের কাছে এসে থামলেন, তাঁর সংঘের পোশাক। এক এক করে ভাঁজগুলো খুলতে লাগলেন। খুব সরু পশমে বোনা কালো স্ক্যাপুলার, রেশমী গুইম্প, ছাই রংয়ের লম্বা পোশাকটা আর তার তলায় পরবার খসখসে মোটা জামা। ঝেড়ে-ঝুড়ে সস্নেহে দেখলেন, সিস্টার লুককে দেখাতে উঁচু করে তুললেন তারপর।

অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, স্বর্গের প্রভুর সংগে মিলিত হতে যাব যখন, এই পোশাক তুমি পরিয়ে দেবে আমায়।

সিস্টার লুক নির্বাক, মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো শুধু। দেখছে সরু সরু আঙুলগুলো পোশাকগুলোয় হাত বুলোচ্ছে। এই একটিমাত্রই জিনিসকে কোনদিনও ইঞ্চি পরিমাণ চৌকো ক'রে কেটে ফেলবার চেষ্টা করে নি ওরা।

ঞ্যাবেস অভ্যস্ত হাতে অতি সহজে পোশাকগুলো আবার ভাঁজে ভাঁজে পাট করে রেখে দিলেন।—তোমার নাইট ডিউটি শুরু হবার আগেই এগুলো তোমায় দেখাতে চেয়েছিলাম আমি। তখন তো আর আমরা আসতে পারব না এখানে।

চিলে-কোঠার সিঁড়ি দিয়ে সিস্টার লুক ঞ্যাবেসের পিছন পিছন নামল। উন্মাদাশ্রমের চিরাচরিত নীতি: কখনও কোন রোগীর দিকে পিছন ফির না, তা সে যত বিশ্বস্ত হোক। তবু আজ মুহূর্তের জন্য ভারি লজ্জা করল তার এই শান্ত বৃদ্ধা নানটির পিছন পিছন যেতে যেতে। যে কোন একজন সুপিরিয়রের চেয়ে কোন অংশে অস্বাভাবিক নন তিনি। ফোলা ফোলা পায়ের গোড়ালি দু'টো স্বাভাবিক গঠন খুইয়ে বসেছে। [illegible] পা দু'টো টেনে টেনে চলছেন বলে বোধ হয় আরও ভারি লাগছে গোড়ালি দু'টো।

নিজের ঘরের দরজায় এসে ঘুরে চাইলেন, মধুর হেসে [illegible] জানালেন।

—আজ থেকে তোমার নাইট ডিউটি শুরু, আমি প্রার্থনা করব যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

—ভয় পাবেন না সিস্টার। চাকার তালে সবকিছু ঘুরে যাবে আজ।

চাকার তালে ঘুরে যাবে সব'কিছু। চাঁদের আলোয় বেগনিয়া ফুলের কেয়ারির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নিজের মনেই আবারও বলেছিল। সিস্টার মেরির মত কর্তব্য-সচেতন সিস্টারের 'পর ডিউটির ভার দিলে কোন সমস্যা থাকে না—সবকিছু সুশৃংখল, সুসংবদ্ধ। সুন্দর হস্তাক্ষরে নোট করে রাখবেন তিনি কোন কোন রোগীকে ডরমিটোরিতে বেঁধে রাখতে হয়েছে সে রাত্রে আর আটকে রাখতে হয় নি তাদের। যারা বাথরুমে ঘুরে এসেছে তাদের তালিকা করা থাকবে, যারা জল চেয়েছিল তাদেরও। অন্য কেউ হলে ডিউটি বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগে গ্র্যাণ্ড সাইলেন্সের সময় কথা বলত, সিস্টার মেরির মত পূর্ণাঙ্গ নান তা করতে পারেন না কখনও।

অশ্বক্ষুরাকৃতি প্যাভেলিয়নটা দ্বিমুখী, ওপরে কার্নিশ দেওয়া ছাদ। তারের বেড়া ঘেরা বাগানের মধ্যে এই জ্যোৎস্নালোকে সব মিলিয়ে যেন একটা খেলনার বাড়ির মত দেখাচ্ছে এখন। বেশ ক'মিনিট আগে এসে গেছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই চাঁদের আলোয় বাড়িটার দিকে চেয়েছিল। বহিরাংশের আবরণ ভেদ করে মানস-দৃষ্টি একেবারে ভিতর অবধি পৌঁচেছে··নীচেরতলায় রোগীদের বড় সোস্যাল হলঘর, ঞ্যাবেস ও কাউন্টেসের মত বিশেষ কেসের প্রাইভেট ঘরগুলো, প্যাডেড সেলের করিডর, পিছন দিকে চিকিৎসা-স্থানের টবগুলো। নিস্তব্ধ

কাচের দরজা ও পার্টিশনে এতিটির অগ্রভাগ পৃথক করা। কিন্তু মাঝখানের ডেস্কে বসেই দরজা ও পার্টিশনের মধ্যে দিয়েই এপাশ-ওপাশের সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। দু'জন সাহায্যকারিণী ডিউটিতে আছে—একজন জেগে, অন্যজন ঘুমচ্ছে। আর কেবল একজন নান অফিসে ডিউটি দিচ্ছেন, তিনি কখনও ঘুমোন না। এ্যালার্ম বেলটা সেইখানেই। আজ রাত্রে সিস্টার হেন্‌রি আছেন অফিসের ডিউটিতে। হলের শেষপ্রান্তে একটা হাতলহীন অভংগুর কাচের দরজার পর ক'ধাপ সিঁড়ি উঠে বরা ডরমিটোরি—বাড়ির সমস্ত প্রস্থটা জুড়ে। সেখানে যারা ঘুমোয়, আত্মহত্যা মনোভাব তাদের মধ্যে নেই—বছরে একবার কি দু'বার আটকে রাখার মত অবস্থা হয় ওদের। নানদের তারা খুবই পরিচিত। কাচের দরজার দিকে পিছন ফিরে সেই ডরমিটোরিতে সিস্টার মেরি বসে, ঘরের তিন দিক জুড়ে পাতা কুড়িটি বেডে নিবদ্ধ দৃষ্টি। পিছনে তাঁর ঘরের চতুর্থ দেওয়ালে হাত ধোবার বেসিনগুলো। এ সব কিছুর পিছনে ছোট একটা ঘরে একটি প্র্যাকটিক্যাল নার্স ঘুমোচ্ছে। কোন কারণে যদি ডরমিটোরি ছাড়বার দরকার হয় তো সিস্টার মেরি জাগাবেন তাকে

ডিউটিতে যে পাঁচজন আছেন সিস্টার লুক কল্পনায় তাঁদের স্তব্ধ মূর্তিগুলোকে সচল করল—নীচেরতলায় সিস্টার হেনরি প্র্যাকটিক্যাল নার্সটিকে ইংগিত করলেন, ডেস্ক ছেড়ে উঠছেন তিনি। নার্সটি অমনি ঘুমন্ত সংগিনীটিকে ডেকে তুলল, নিজের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে সিস্টারের জায়গাটা নিজে নিল। ততক্ষণে সিস্টার হেনরি ওপরে উঠে গিয়ে কাচের মধ্যে দিয়ে দেখছেন—ফ্লোর-চীফ প্রতিদিন রাত্রে দু'বার এই রকম দেখতে আসেন। ডরমিটোরিতে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখে যান। তাঁর কল্পনায় মূর্তিগুলো দাবা খেলোয়াড়ের হাতের ঘুঁটির মত সামনে-পিছনে সরছে···প্রত্যেকের যাবার স্থানটি পর্যন্ত নির্দিষ্ট, এমন জায়গা কোথাও নেই যে একমুহূর্তের চেয়ে বেশি খালি থাকবে। সদরদরজার লকে নিজের খাঁজ-কাটা চাবিটা ঢোকাতে ঢোকাতে সিস্টার লুক স্মিত হাসল। ঐ সুষম পূর্ণাংগ পরিচালনায় সে নিজেও এবার অংশ নিতে ঐ নিস্তব্ধ বাড়িটায় ঢুকেছে।

সিস্টার হেনরিও প্রত্যুত্তরে স্মিত হাসলেন। ঘড়ি দেখে লগ বুকে ওর প্রবেশ সময়টা লিখলেন—একটা বাজতে এক মিনিট বাকি। কাচের পার্টিশনের অন্তরালবর্তী প্র্যাকটিক্যাল নার্সটি তার দিকে তাকিয়ে দেখল। একটা মানুষের দিকে যে তাকাচ্ছে দৃষ্টিতে তার কোন অভিব্যক্তি নেই। শুধু যেন একটা চলন্ত পদার্থের গতিবিধিটা দেখে নিচ্ছে তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে পড়েছে বলে···পরক্ষণেই আবার তীক্ষ্ণ চোখ দু'টি প্যাডেড সেলগুলোর দিকে ফেরালো সোজা। হলের পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে পিছনে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করল সিস্টার লুক। সিঁড়ির ধাপ ক'টা উঠে আসতে আপনা হতেই লম্বা স্কার্টের সামনেটা তুলে ধরল।

সিঁড়ির মাথার দরজাটায় নিজের চাবিটা লাগাতে লাগাতে ভিতরে তাকিয়ে সমস্ত ঘরটা এক নজরে দেখে নিল···কুড়িটি বেডের প্রত্যেকটিতে এক একটি নিশ্চল মূর্তি···দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা আবছা আলো···সিস্টার মেরি। ডেস্কের ওপর ঢাকা দেওয়া আলোটার জন্য পিছন থেকে তাঁকে কালো কাগজ থেকে কেটে নেওয়া ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে···পাতলা একটুকরো ছায়া শুধু—ঘনত্বহীন···সামনের দিকে হেলে আছে মূর্তিটা···হেলে আছে···কিন্তু মাথাটা সোজা নেই তো! সামনে দু'টি হাতের ওপর মাথাটি রাখা।

পলকের জন্য হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল যেন! ঘরে ঢোকার আগে চাবির শব্দ করল, সিস্টার মেরি সেই শব্দে মাথা তুলে উঠে বসেন যাতে, ডিউটির সময় নিদ্রিতাবস্থায় ধরা পড়ে যাওয়ার বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পান।

মনটা উত্তেজিত···

···প্রতিদান—দিতেই হবে আমার···যে বদান্যতা আমাকে তিনি দেখিয়েছিলেন তার প্রতিদান দিতেই হবে···প্রতিদান দিতেই হবে এই সময় প্রবেশ দিয়ে···ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করতে হবে···

চাবির রিংটা জোরে নাড়তে নাড়তে প্রার্থনা করছে, ওঁকে নিজে হতে জেগে উঠতে দাও প্রভু।

আলোর সুইচের কাছে গিয়ে গড়িমসি করল খানিকক্ষণ। বেশ শব্দ করে সুইচটা হাতড়াল···কালো ছায়ামূর্তিটার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে—মূর্তিটা অনড়, অচল।

উজ্জ্বল আলোগুলো এবার জ্বালিয়ে দিল সে। আর জ্বালিয়েই দেখতে পেল সিস্টার মেরির কালো স্ক্যাপুলারের পিছন দিকে আটকে আছে আবলুস কাঠের ছুরির একটা হাতল।

ভয়ার্ত চোখ দু'টো প্রথমেই সারা ডরমিটোরিটা ঘুরে এল। আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে কাদার তালের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে ডরমিটোরির বাসিন্দারা। তবু এখানে-ওখানে চোখে পড়ছে এক একখানি ভ্রুকুটি-কুটিল মুখ, বংকিম কটাক্ষ, এক একজোড়া চকচকে খোলা চোখ···দেখতে চায় সে কি করে।

তাই দেখেই বোধ হয় সবটাকে আরও বেশি দৃঢ় করবার প্রেরণা পেল।···সিস্টার মেরি হলে যা করতেন আমিও ঠিক তাই করব। ভেবে আবার সিস্টার মেরির মতই যোগ করল, সর্বশক্তিময় ঈশ্বরের সহায়তায়।

শান্তভাবে এগিয়ে এসে কম্পিত আঙুলে সিস্টারের নাড়ীটা ধরল। ভাণ করছে যেন নোটের পাতাটা পড়ছে। মৃত হাতখানা তারই ওপর পড়ে।

এ্যালার্ম বেলটা টিপল, ডরমিটোরিতে শোনা যাবে না সেটা।

সিস্টার হেন্‌রি আর একজন সহকারিণী উঠে এলেন নীচে থেকে। ডরমিটোরিতে ঢুকে এমনই ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন যে তাঁদের গতিটাই বড় শ্লথ মনে হ'ল। প্র্যাকটিক্যাল নার্সটি চলে গেল বেসিনগুলোর পিছনের ছোট ঘরটা থেকে ঘুমন্ত নার্সটিকে ডেকে আনতে। লম্বা ঘরখানা পার হয়ে দু'জন পাশাপাশি ফিরে আসছে দেখা গেল তারপর···চলার ভংগীতে তাড়াহুড়ো নেই কোথাও, নিদ্রালু দৈত্য যেন দু'টো।

সিস্টার হেনরির ইংগিতে সিস্টার মেরিকে শুদ্ধ চেয়ারটা তুলতে নীচু হয়েও তারা একবারও ছুরির হাতলটার দিকে তাকাল না। তুলে নেবার সময় চেয়ারটা পিছনে সামান্য টেনে নিতেই স্বাভাবিক ভাবে হাত দু'টো এসে পড়ল তাঁর কোলে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলে পড়ার মত মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সিস্টার হেনরি এক হাতে

নিজের বুকের ক্রুশিফিক্সটা মুঠো করে ধরেছেন, অন্য হাতে ওদের যাবার জন্য দরজা খুলে দিলেন। ওরা চেয়ারটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে বন্ধ করে দিলেন আবার। উজ্জ্বল আলোয় চোখে পড়ছে ক্রুশিফিক্স ধরা শীর্ণ হাতের আঙুলের গাঁটগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে···অথচ অন্য হাতে দরজাটা বন্ধ করতে সামান্য শব্দও হ'ল কি হ'ল না।

সিস্টার লুকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সে যে তখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে শুধু ঐ হ্যাবিটের জোরে, না হলে কখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।

—কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমার জন্যে আর একখানা চেয়ার এনে দিচ্ছি। যে গলায় কথাটা বললেন তার উদ্দেশ্যই ডেস্কের সীমানা পার করে দেওয়া তাকে।

গলা নামিয়ে যোগ করলেন তার সঙ্গে, অবশ্য আজ রাতের মত ছুটি যদি না চাও···তা চাইতে পার তুমি।

দেহ-মনের শক্তি মিলিয়ে গলাটাকে জোরালো করল সিস্টার লুক, ধন্যবাদ সিস্টার, আমি থাকতেই চাই। চেয়ার আর আমার লাগবে না আজ রাতে।

সিস্টার হেনরি বেরিয়ে গেলেন নিঃশব্দে। ও ঘরটার দিকে যাবার জন্য পা বাড়াল।

দু'জনেই জানেন এর বেশি আর কিছু ঘটতে পারত না। একটা ছুরি শুধু—ভাঁড়ার থেকে চুরি করে আনা, বে-আইনি ভাবে ফাঁকি দিয়ে ঢোকানো একটা ছুরি—তাই ব্যবহার করা হয়েছে। ছুরিটা এখন আর ডরমিটোরিতে নেই, কিন্তু এখানকার কুড়িটি বিকৃত মস্তিষ্কের একটি থেকে এই ভয়ংকর অপরাধ করে ফেলার স্মৃতি, আর যে ক'জন এই বীভৎস কাণ্ডটা ঘটতে দেখেছে তাদের চেতনা থেকে সেই ছবি মুছে দিতে হবে। শান্ত আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন সেজন্য···যেন কিছুই ঘটে নি।

সে রাত্রে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস শুধু খাড়া রেখেছিল তাকে। রুল এখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে যেন একটা পৃথক যন্ত্রের মত। সে কেবল আদেশগুলো পালন করে যাচ্ছে···মন বা অনুভূতির সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই।

আলোগুলো কমিয়ে দিয়েছে।

ডেস্কের কাছে এগিয়ে এসে সিস্টার মেরির নোটগুলো তুলে নিল। দু'টো স্তম্ভে বেড নম্বর নিয়ে নোট লেখা··· একটার ওপর শিরোনাম দেওয়া 'ডবলিউ সি' অন্যটার ওপর 'এইচ টু ও গিভন্'—বেড নম্বর দেখে দেখে সেগুলো মিলিয়ে নিল। মনে পড়ে গেল যে হাতখানি এগুলো লিখেছে নাড়ী দেখতে সে যখন স্পর্শ করেছিল, তখনও সে হাত উষ্ণ ছিল।

অন্তরটা হাহাকার করে উঠলেও সংযমের আইন একটি শব্দকেও বাইরে প্রকাশ পেতে দেয় নি।

চিন্তাধারাটা অবধি মাঝপথে হঠাৎ এসে থেমেছে—আমি যদি ঠিক ডিউটির ঘড়িধরা সময়ে পৌঁছোনোর লোভে চাঁদের আলোর বাগানে দাঁড়িয়ে না থাকতাম, তো ··· অবশিষ্টাংশ নিয়মের শাসনে চাপা পড়েছে।

অকম্পিত দৃঢ় হাতে খাতা ধরে চোখ বুলিয়ে গেল···চোখ তুলে ক'টা বেডের দিকে তাকাল···সাবধানতার জন্য যাদের বেঁধে রাখা হয়েছে—তিনটি কেবল। তারপর সারা ডরমিটোরিতে পায়চারি শুরু করল এধার থেকে ওধার। ধীরে ধীরে পা ফেলছে যেমন জপমালার রুদ্রাক্ষগুলো বাজছে ঠোকাঠুকি হয়ে। ঘরের সব দেওয়ালে এক একখানা আয়না ঝুলছে, একেবারে ছাদ থেকে ঝোলানো আয়নাগুলো সামনের দিকে একটু হেলে আছে···সামনের আয়নার দৃষ্টি স্থির রেখে পায়চারি করতে হবে। তার পিছন দিকের দেওয়ালের তিনটি বেডের ছায়া পড়েছে তাতে, আর দু'পাশের লম্বা দেওয়ালে লাগানো বেডগুলোকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে যেমন এক এক করে তাদের ছায়াও ফুটছে।

সম্মুখবর্তী আয়নাটার মাঝখানে তার নিজের ছায়াটা তিন দিকের সাদা বেডগুলোর বিপরীতে ভারি স্পষ্ট। তার মনে কিন্তু এমন কোন অনুভূতি নেই যে এ ছায়া তারই। ওটা যেন যে কোন একজন নানের ছায়া···ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কে, সেটা কোন প্রশ্ন নয়···এমনি নিস্তব্ধ রাতে এই ডরমিটে স্থির একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত পদচারণারই প্রতিবিম্ব যেন এটা। পদচারণা করা ছাড়া আর একটা কাজ করছে প্রতিবিম্বটা, জপ করছে। মন তো অলস থাকতে পারে না। পদচারণা যে করছে তার নাম রুল···নিয়ম—আর কোন নাম নেই তার, সে আর কেউ নয়।

সেদিন সারা রাত ধরে নিয়মকে সে পায়চারি করতে দেখল। পরবর্তী আরও তিরিশটা রাত্রি ধরেও। সে সব ক'টা রাত আজকের রাতের সংগে মিশে একাকার হয়ে গেছে। স্তিমিত আলোয় ডরমিটোরিতে পায়চারি করতে করতে দেখেছে নিয়ম কেমন করে তাকে চকিতে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় কোন বেডের কাউকে আয়নায় নড়াচড়া করতে দেখলে, কেমন করে তাকে স্থির হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে যখন কেউ বিছানা থেকে নেমে মুখভঙ্গী করতে করতে থপ্ থপ্ শব্দে বাথরুমের দিকে চলে যায়।···দেখেছে আবার কেমন করে তাকে ঘুরিয়ে হাঁটা শুরু করায় নিয়ম রোগীটি যখন আয়নার ছায়ার আওতায় এসে পড়ে। সে তখনও ভেল-ঢাকা মূর্তিটির পিছন পিছন আসে

বেড়ালের মত. তারপর নিজের ... র বেডটির কাছে এসে পড়লে নিজে থেকেই বেড়ে উঠে পড়ে, তাকিয়ে ... পরও দরকার হয় না। বলতেও হয় না।

••বাইরের আকাশে দিনের আলোর আভাস।

সুদীর্ঘ রাতের পাহারা শেষ হ'ল। ওই মন্ত্রমুগ্ধকর আয়নাগুলোর আওতা থেকে রেহাই মিলবে এবার. চোখ দু'টো বিশ্রাম পাবে। তার রিলিফ সিস্টার রোজ সকালে সাতটার একটু আগেই আসে, তাতে যাত্রীদের সংগে বিলম্বিত ম্যাসে যোগ দেবার আগে সে স্নান করে টাটকা একটা গুইম্প পরে নেবার সময় পায়। এরপর বিকেল তিনটে পর্যন্ত ঘুম, তারপর একা খাবারঘরে খাবার খেয়ে নেওয়া। পরবর্তী কাজ চ্যাপেলে দু' ঘন্টা প্রাত্যাহিক উপাসনা ও ধর্মীয় পাঠ—সোজা একেবারে ম্যা...ন থেকে ভেস্পার্স পর্যন্ত। সব কিছু এমন একযোগে সেরে ফেলার কারণ অপ্রকৃতিস্থ রোগীদের মধ্যে ডিউটির সময় উপাসনা নিষিদ্ধ. অবশ্য সেগুলো মুখে বলা বারণ নয়।

এই সঙ্গীহীন মাসটায় সম্প্রদায়ের জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েও একবারও মনে হয় নি যে সম্প্রদায় থেকে সরে এসেছে অথবা সম্প্রদায়টাই আর নেই। সম্প্রদায়-জীবনে কি ঘটছে না ঘটছে জানতে এখন আর তাকে কিছু দেখতে হয় না বা শুনতে হয় না। অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেয়।

চাপটারহলে পরদিন সকালে সিস্টাররা সবাই যখন শাস্ত্রীয় পাঠের জন্য সমবেত হয়েছে সে ঠিক জানে মাদার সুপিরিয়র কেমন করে যেন সেই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা জানিয়েছেন তাদের ; সিস্টার মেরি ছি জিসাস ঈশ্বরের চরণে প্রত্যর্পণ করেছেন তাঁর আত্মা। জানে সিস্টাররা চমকে উঠেছে কেমন করে—মুহূর্তের জন্য তাদের মনের বেদনাটুকু প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওখানেই শেষ। কোন প্রশ্ন কেউ করে নি, তখনও নয়, পরেও নয়। গতরাত্রে যে সব সিস্টারদের হাসপাতালে ডাক পড়েছিল সবাই জানে, তবু তাদের দিকেও কেউ ফিরে চায় নি। ব্যাপারটা কি অনুমান করার চেষ্টা করেও ভগবানের সময় নষ্ট করে নি কেউ। ভাবপ্রবণতা নয়, আত্মকেন্দ্রিকতা নয়··· একটি নিষ্কিঞ্চন ইহলোক ত্যাগ করে যাবার অনুমতি পেলেন, ইহলোকে বাস করবারও পেয়েছিলেন যেমন। সমাহিত আত্মবিলুপ্তি। সেই আত্মবিলুপ্তির পথে কোথাও যেন বাধা না পান সিস্টার মেরি সেটুকু ওরা দেখবে কেবল। যে সিস্টাররা মৃত্যুর পরবর্তী শেষ অনুষ্ঠানের জন্য দেহটিকে তাঁর প্রস্তুত করে দিয়েছে তারাও, আবলুস কাঠের হাতলওয়ালা ছুরিটা যে বার করে নিয়েছে, সে-ও। তবু প্রাণহীন তাচ্ছিল্য এ নয়। মৃত্যুর পরবর্তী তিরিশ দিন খাবার ঘরে সিস্টার মেরির স্থানটিতে প্রতিটি খাবার সময় ছোট কুশটি শয়ান থাকবে তাঁর ন্যাপকিন, কাঠের তক্তা আর জলের গেলাসের সংগে। এই তিরিশ দিন সিস্টার মেরি তাদের চিন্তায় থাকবেনই। শূন্য জায়গাটার দু'পাশে যে দু'জন সিস্টারের আসন তারা কখনও স্যুপের পাত্রটা বা রুটির ঝুড়িটা মাঝের জায়গাটাকে টপকে দিয়ে দেবে না। পাত্রগুলো টেবিলে হাত থেকে হাতে ঘুরতে ঘুরতে শূন্য জায়গাটার এক পাশে এসে থেমে থাকবে। পরিবেশনের দায়িত্বে যে সিস্টার থাকবেন তিনি এগিয়ে এসে পিছন থেকে পাত্রগুলো তুলে নিয়ে তার ওদিকে যে নান বসেছেন তাঁর কাছে দিয়ে দেবেন।

খাবারঘর থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত এই এক দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। রান্নাঘরে এই তিরিশ দিন সিস্টার মেরির নির্দিষ্ট রেশন রেখে বার করা হবে নিয়মিত এবং গরীব কাউকে দিয়ে দেওয়া হবে।

এই দীর্ঘ রাত্রি-জাগরণের শেষের দিকে একদিন। বেডগুলো নিস্তব্ধ।···স্তিমিত আলোর কালো জেল-ঢাকা ছায় মূর্তির প্রতিবিম্ব।•• চোখের দৃষ্টি আর চিন্তার ধারা সেই প্রতিবিম্বে কেন্দ্রীভূত হ'ল।

অপ্রকৃতিস্থ স্বপ্নরাজ্য ভরা সাম্ভাব্য বিভীষিকা· তারই মধ্যে নিঃসঙ্গ।। তটায় অবিরাম আনাগোনা চলেছে—ক্লান্তি বা দম্ভের প্রকাশ কোথাও নেই।··ভাবতে গিয়ে একটা সপ্রশংস শিহরণ অনুভব করল।

উত্তেজনাটা ইলেকট্রিক শকের মত তার ক্লান্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে।

মন বলছে যে নিয়ম এমনি করে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সে বড় সুন্দর গতির মধ্যে এ যেন ঈশ্বরের সংগে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসা।

পরক্ষণেই দৃষ্টিটা আয়নার মধ্যে দিয়ে একটা বেডের ওপর গিয়ে পড়ল—একটা হাত সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঢাকাগুলো। পাঁচ নম্বর বেড··সেন্সের সময় হয়ে গেছে···সম্ভবত ঈষৎ যন্ত্রণায় ঘুমের ঘোরে অস্থির হয়েছিল।···সদা সতর্ক দু'টি চোখ চারপাশের এমনিতর আরও সব খবরই পৌছে দিচ্ছে মস্তিষ্কে, শুধু সচেতন করে দেয় নি এইমাত্র সে যে আবছা প্রতিবিম্বটার দিকে চেয়েছিল সেটা ও নিজেই। সে চেতনাটা ব্যতিক্রম হয়েই রইল।

বোঝে নি এই এক মাসব্যাপী সুদীর্ঘ বিনিদ্র রজনীতে কংগোকে সে জয় করছে তিলে তিলে··মিশনে যেতে হলে সম্প্রদায়ের ছাঁচে গড়ে উঠতেই হবে সর্বতোভাবে। বরং ইতোমধ্যে কংগো যাবার আশাটাকেই সে বাতিল করে দিয়েছে।

এই কমিউনিটিতে তার বাকি সময়টা একই ভাবে কেটে গেল। কোন বিশেষ ঘটনাও ঘটে নি, কোন নতুন আকর্ষণও আসে নি। তেমনি আভ্যন্তরীণ বা বাহিক বিশেষ কোন পীড়নও ছিল না। বহু পরে, জীবনে এই পর্যায়ের ঘাত-প্রতিঘাতহীনতায় অভিজ্ঞতা আরও কয়েক বার হল যখন, মাঝে মাঝে তাদের ওপর আলো ফেলে দেখত, বিশ্লেষণী আলো। দেখত তার ঘটনাবহুল, প্রশ্ন-কণ্টকিত জীবনে এই সময়গুলো মূর্তিমান অনিয়মের মত। এই বিশেষ সময়গুলোয়, তার প্রতিটি পদক্ষেপ, তার প্রতিটি চিন্তাধারা প্রতিমুহূর্তে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় নি তাকে।

১৯৩২ সালের বসন্তে তাদের দলটার ডাক পড়ল মাদার হাউসে চিরব্রত নিতে। মাথা উঁচু করে নীল দু'টি আয়ত চোখের সদা সচেতন দৃষ্টি মেলে হেসে কনভেন্টে ঢুকল সে এবং সেই প্রায় নিঃশব্দ স্থানের সামান্য একটু শব্দেও সতর্ক হয়ে উঠতে লাগল। উন্মাদ-হাসপাতালের অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে।

মাদার হাউসে এবার যে আবহাওয়াটাকে অনুভব করতে পারছে তীক্ষ পসচুল্যান্ট বা নভিস ছিল যখন তার আভাসমাত্রও বোঝে নি। এ আবহাওয়াকে ঠিক বিশ্লেষণ করা চলে না, অনুভবনেই—শুধু বোঝা যায় শান্তি আর পূর্ণতার সংগে তার যোগ। অন্যোত্তর কারণে যে

সিস্টাররা এসেছেন তাঁদের ওপরও এর প্রভাব দেখতে পাচ্ছে···অন্ত মানদের ওপর—হয় তো তাঁরা সবে জেনেছেন সুপিরিয়রের পদে উন্নীত হবেন তাঁরা···ম নানরা খুব শীগগিরই পৃথিবীর অন্তপ্রান্তে বদলি হবেন তাঁদের ওপর···সাধারণ নানদের ওপরও—যাঁরা অনেক কষ্টে ও অনেক অধ্যবসায়ে কাজ করেন।

মাদার হাউসের বাতাসে প্রথম নেওয়া নিঃশ্বাসটাই পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তাভা এনে দেয়।

আসা-যাওয়ার সহস্র দৃশ্যের মধ্যে রেভারেণ্ড মাদার ইমাম্যুয়েলের শক্তিময় উপস্থিতি অনুভব করা যাবে। ছোট্ট অফিস ঘরটিতে বসে বহিরাগত সিস্টারদের সংগে একে একে দেখা করছেন। সেখান থেকে যে সিস্টারই বেরিয়ে আসেন তাঁর মুখে মেঘ-রৌদ্রের খেলা চাপা থাকে না।···দু'চোখ ভরা জল···ওষ্ঠপ্রান্তে একটুকরো হাসি ক্লান্তির সব রেখা মুছে নিয়েছেন—এর ব্যতিক্রম নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

তিন বছর আগে যা ছিল ওদের দলটা তার চেয়ে ছোট লাগছে। তাহলে গুণে দেখবার চেষ্টা করে নি কেউ, সেও না, অন্য কেউ না। নভিসদের মিসট্রেসের সংগে বৃত্তাকারে বসল যখন তখনও পরস্পরের দিকে ওরা তাকিয়ে দেখল না একবারও। কৌতূহলে অপাংগে চাওয়া নয়, অস্ফুটকণ্ঠের জিজ্ঞাসাবাদ নয়···কেমন কাটল এতদিন?···মনের মত সুপিরিয়র পেয়েছিল? বরং মনে হচ্ছে যেন মিসট্রেসদের সংগে প্রত্যেকেই একা বসে আছে।

মিসট্রেস বললেন, সবাই তোমরা এসেছ, কেবল সিস্টার মনিক, সিস্টার রোজ, সিস্টার বার্ণাডেট, সিস্টার ভিটালি আর সিস্টার গডফ্রিডা ছাড়া। সিস্টার মনিক আর নেই—মৃত্যুশয্যায় সে চিরব্রতের মন্ত্র উচ্চারণ করে গেছে। সিস্টার রোজ আর সিস্টার বার্ণাডেটের নিজেদেরই অনুরোধে তাদের ব্রতগ্রহণ তিন মাস স্থগিত রইল। সিস্টার ভিটালিকে আমাদের রেভারেণ্ড মাদার ইমাম্যুয়েল অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন আর সিস্টার গডফ্রিডা ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে গেছে।

যাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হ'ল তাদের পরমুহূর্তের চিন্তাটা এমনই প্রকট, মনে হবে যরব বুঝি।···আমি কি প্রস্তুত···আমি কি উপযুক্ত···এখনই ব্রত নেবে না বলে যারা নিজে থেকে অনুমতি চেয়েছে তাদের মত সাহস কি আমারও থাকা উচিত ছিল?··· এ তো আর তিন বছরের জন্য নয়, এ ব্রত চিরদিনের।

এ ব্রত অনন্তকালের···

সিস্টার লুকের মনেও সেই একই চিন্তার আলোড়ন। মনে হচ্ছে যেন একটা দ্বিধাবিভক্ত রাস্তার নির্দেশনামা পড়ছে···কিন্তু বড় যেন তাড়াতাড়ি এসে গেছে জায়গাটায়, এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে ভাবে নি।

মনের উত্তেজনায় হাতখানা কখন পূর্ণব্রতার ভঙ্গীতে নিজের ক্রুশিফিক্সটা চেপে ধরেছে। সন্ধ্যায় মিসট্রেসের কাছে গেল।

—আমার মনে হয় সিস্টার, আমি যদি অপেক্ষা করি তো ভাল হবে। এখনও মনে অনেক দ্বন্দ্ব—মনে হচ্ছে বড় বেশি।

শুনে মিসট্রেস অপলক চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। চোখে চিন্তার ছায়া।

—না সিস্টার লুক, অপেক্ষা করার পরামর্শ তোমাকে দেব না। ব্রত স্থগিত রাখার দরকার নেই। সংগ্রাম তোমাকে করতেই হবে, আমরা সবাই তাই করি। এই শেষ বছরটায় যেভাবে যাচাই হয়েছ তাও জানি, পথের অসুবিধেগুলোকে কাটিয়ে উঠতে যা করেছ তাও জানি। তোমার মনটাই সংগ্রামী, কাজেই এই রকমই চলবে তোমার···তা ব'লে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

ডেস্কের ওধারে একটু ঝুঁকে বসেছেন। কোন নিভিস্ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করছেন সচরাচর এমন ঘটে না।

—সংগ্রামী মনই আমরা চাই সিস্টার লুক। বিনা প্রশ্নে যে নিস্তেজ মন সব কিছু মেনে নেয় সে মন চাই না। তোমার মন যুক্তি খোঁজে, বিশ্লেষণ করে দেখতে চায় আর সেই জন্যেই ঈশ্বর তোমায় পরীক্ষায় ফেলেন বার বার। তাঁর করুণায় আস্থা রাখ শুধু···ভুলো না যাদের সংগে তাঁর অন্তরের যোগ তাদেরই জন্যে তাঁর কঠিনতর পরীক্ষার বিধান।

সিস্টার লুক স্খলিত কণ্ঠে বলল, আরও পরীক্ষার মুখে পড়ার ভয়ে আমি থামতে চাই নি···

এত দীর্ঘদিন নিজের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করে নি আজ মনে হচ্ছে যেন বিদেশী ভাষায় ভাব প্রকাশের চেষ্টা করছে।

···আমার কাছে···আমার মত কারো কাছে সিস্টার···নিয়মের শাসন বড় বেশি বাধা সৃষ্টি করে। সাধারণ জীবনের বহদূরে এ এক অনন্ত সংগ্রাম। অতি-প্রাকৃত জীবন···

আর কথা যোগাচ্ছে না, নিজের স্পর্ধা দেখে নিজে আহতও কিছুটা।

থেমে গেল।

মিসট্রেস কিন্তু স্মিত মুখে তাকিয়েছিলেন। অপ্রকাশিত চিন্তাধারাটা তাঁর জানা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

—অতি-প্রাকৃত জীবন···সত্যি এ বিশেষণটা লাগালে নিজের কাছে ধৃষ্টতার মতই লাগে—পার্থিব জীবনে কথাটা এমনই ম্যাজিকের সংগে জড়ানো। অতিপ্রাকৃত জীবন কোন মানব যে লাভ করতে পারে কেউ ভাবতেও পারে না, এ জীবন এক হয় তো স্বর্গে সম্ভব। কিন্তু এ জীবন আমরাও বেছে নিয়েছি আমাদের কুলের জোরে, প্রভুর কাছে পৌছাতে পাবা যায় এ পথে। এ পথ কঠোর, ধীরগম্য, কিন্তু নিশ্চিত। তাঁর অপার করুণায় এ পথ আমরা অতিক্রম করতে পারব আমরা জানি।

দু'টি কালো চোখের প্রত্যয়ী দৃষ্টি টানছে তাকে···হঠাৎ সিস্টার মেরির চোখ দু'টো মনে পড়ে গেল।

মিসট্রেস খুব কোমল কণ্ঠে বলছেন, মনে রেখ সিস্টার, এখানে তোমার ডাক না পড়লে তুমি আসতে না। সুপিরিয়র জেনারেল যখন তোমাকে ব্রত নিতে ডেকেছেন; তার মানেই প্রভুর মনোনয়ন পেয়েছ তুমি।

অতিপরিচিত কথাটা, নভিস ছিল যখন বহুবার শুনেছে। তবু আজ হঠাৎ শুনে কেমন চমকে উঠল, কেমন একটা অপরিচিত অনুভূতি!

—এই মুহূর্তে হয় তো তোমার মনে হচ্ছে, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার পক্ষে তুমি অযোগ্য, অসম্পূর্ণ। সম্ভবত বহুবার প্রার্থনায় তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, কি তিনি চান তোমার কাছে—আমরা যেমন সবাই করি···কতবার করি।

হাত দু'টো দৃঢ় সংবদ্ধ, কণ্ঠস্বরটা এত খাদে নেমেছে যেন নিজের মনে কথা বলছেন।

—কখনও কখনও আমরা জানবার সুযোগ পাই কেন আমাদের ডাকাহল, কখনও পাই না। সে ভগবানের ইচ্ছা। তবে যে অবস্থাতেই হোক আমাদের ব্রত ঈপ্সিত স্থানে স্থির করে রাখে আমাদের—দারিদ্র্য, বদান্যতা আর বাধ্যতার সাধনায় তাঁর কাছাকাছি রাখে।

দশদিন নিভৃত-বাসের পর সিস্টার লুক পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় চিরব্রত নিল।

কার্পেটের ওপর মুখ রেখে অন্তরের কথাটা নতুন করে আর একবার শুধুমাত্র ঈশ্বরের কানে-কানে বলল চুপি-চুপি, আমৃত্যু তোমার চরণে সঁপে দিতে পারছি না···তবে আমি চেষ্টা করব···

পরদিন সকালে সুপিরিয়র জেনারেলের ঘরে তার ডাক পড়ল। সেখানে শুনল এ্যাসাইলাম-কমিউনিটিতে সে আর ফিরে যাচ্ছে না। কংগো যানদের সাদা সুতোর হ্যাবিটের মাপ দিতে সিস্টার ইউডোক্সির কাছে যেতে হবে তাকে।

যা বলবার অল্পকথায় বলে গেলেন রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল।

প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল সিস্টার লুক, তারপর যেই তিনি বললেন, ছবি-তোলা, ভ্যাকসিনেসন ইত্যাদির জন্যে যতদিন অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে, আমি বলি তার মধ্যে আমাদের লাইব্রেরী থেকে কিসোয়াহিলি ব্যাকরণ একখানা নিয়ে ভাষাটা শিখতে শুরু কর।—অমনি ঘরের মধ্যে যেন দু'টো কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল।

···যে কথাটা এতদিন অন্তরের অন্তস্তলে লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।···

···সিম্বা, সিম্বা, সিম্বা···আর্তস্বরটা চীৎকার করে উঠছে বারেবারে।

রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল বলে চলেছেন, এ চেতনা কোন সময় হারিও না যে নিজে তুমি কিছুই না, একটা যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রটা যখন বিনা কাজে স্থাণুর মত পড়ে থাকে সেটা নেহাৎ মূল্যহীন, কিন্তু কে যে তাকে চালু করল তা জানবার উপায় নেই। হতে পারে এর মূলে আছে কোন অসুস্থ শয্যাশায়ী সিস্টারের প্রার্থনা—হয় তো ধর্মপ্রচারের স্বপ্ন ছিল তার···মিশনে যেতে চেয়েছিল—তার বদলে বিনা প্রতিবাদে সব দুঃখ-যন্ত্রণা মেনে নিয়েছে···হয় তো তারই প্রার্থনার জোরে তুমি যাচ্ছ··· [ক্রমশ।

অনুবাদিকা: প্রণতি মুখোপাধ্যায়।

সেই চোখ

সুনন্দা দাস

সেই চোখ,
অনেক হারানো স্নেহ, দুঃখ ও সুখের ছবি
বিধৃত শতাব্দীর শোক—
না ডাকা ডাকার মত কত মন্ত্র আহ্বান
[illegible] হয় বিদ্যুলোক।

সেই চোখ,
অসবর্ণ চপলতা সমন্বয়ী সরলতা
অর্ধ ফুট কুসুমে কোরক,
কখনও সে কবিপ্রিয়া উজ্জয়িনীর হৃদে
[illegible] জ্বালো অশোক।

সেই চোখ,
[illegible] বিরহ ঢেউ সপ্ত সাগরে জলে
[illegible] উজ্জ্বল দ্যুলোক,
[illegible] মনে হয় পুরবার
যদি [illegible] পরশ হোক।

মাসিক

বসুমতী

পৌষ / '৭০

পূর্বরাগ

—রামকিঙ্কর সিংহ

মানুষ
ও
বনমানুষ
—চিত্ত নন্দী

হালুম !!!
—বৈদ্যনাথ ভড়

মাসিক বসুমতী
পৌষ / '৭০

পৃথিবী কাদের ?

—শফীউল হাসান

আমরা বাঘ মারবো !

—নির্মল রায়

—বিভূতিভূষণ রায়

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

বিংশ স্তবক

রাস-বিলাস

নাচতে নাচতে তিনি ক্ষীণতর করে ফেললেন উদরভাগ, অতিস্ফার হয়ে উঠল তাঁর বক্ষোজ-ভার, বঙ্কিম হল পৃষ্ঠদেশ, মিলিত পার্ষ্ণিদ্বয়ের উপর লুটিয়ে পড়ল বেণী, লুপ্ত হল ত্রিবলীর রেখা। এই সৌষ্ঠবের মধ্যে আবার যখন তিনি প্রত্যেক তাল-মোক্ষে প্রকাশ করতে লাগলেন তাঁর হস্ত-প্রান্তের কর-কম্পন, তখন জয়ধ্বনি করে উঠলেন সকলে। তাঁদের ঘনীভূত বিস্ময় যেন বলে উঠল,—

'আপনারা কামদেবের চম্পক-শরাসনের সাজানো নাচ দেখছেন।'

তারপরেই তিনি তাঁর দুই জানু দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরলেন ভূমিতল। এবং ধরেই বাহু দু'টি বিস্ফারিত করে, অলঙ্কারের ঝংকার তুলে, নৃত্যচ্ছন্দে বিঘূর্ণন করতে লাগলেন গাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল···গলার হার, কানের দুল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল গন্ধমাতাল ভ্রমরকুল। কান্তির পরিধি রচনা করে বসল···গাত্রের গৌরিমা, বক্ষোহারের শ্বেতিমা, অধরের অরুণিমা, আর ভ্রমরদের শ্যামলিমা। ছবির মত যেন এক পুষ্পধনুর সোনার চর্কী ঘুরছে।

তারপরেই তিনি পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, পার্ষ্ণিদ্বয়ের উপর স্থাপন করলেন তাঁর শ্রোণিদেশ। পূরক-শ্বাসের কৃপায় বিস্তীর্ণ হল বক্ষ, শান্ত হল ত্রিবলী, শিথিল হল নীবি। স্তনদ্বয় ও জানু-দুটিকে কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করতে করতে এবং বদ্ধমুষ্টি কর দু'টির অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে স্তনক্ষেত্রে তালে তালে আঘাত দিতে দিতে, আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, তিনি যুগপৎ রসনায় বোল তুললেন,—'ত থ তথৈ থৈ তথৈ থৈ···'

সেই বোলের ছন্দে ছন্দে সুর তুলল কণ্ঠ, বাজল বেণু, বাজল বীণ মৃদঙ্গ মন্দিরা···তথৈ থৈ তথৈ থৈ। এই ভাবে যখন উচ্ছল হয়ে উঠেছে নাট্য, হঠাৎ তখন রাধাসখীর চরণ থেকে খসে পড়ে গেল মঞ্জীরবন্ধ এবং গীতসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বীণাবাদিনী ও বেণুবাদিনীদের পশ্চাতে নিমেষে তিনিও হলেন অন্তর্ধান। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উঠতে পড়তে লাগল বক্ষের কঞ্চুলিকা। সখীর কাঁধে হাত রেখে তিনি বিশ্রাম করতে বসে পড়লেন নেপথ্যে। সখীদের অঞ্চলের বাতাস জুড়িয়ে এবং প্রণয়ভরে তাঁদের-দেওয়া এক খিলি পান মুখে পুরে, তিনি বিশ্রাম করলেন ক্ষণকাল।

৩০। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর, গায়নীরা যেই পুনর্বার গেয়ে উঠলেন অন্য গান এবং সঙ্গতকারিণীরা সম্পাদনা করতে লাগলেন সেই গানের মেলনের আলাপ-লালিত্য, রাস-লাস্যমঞ্চে ললিত-কর-শাখার মধুরিমা দেখাতে দেখাতে পুনর্বার প্রবেশ করলেন রাধাসখী। দু'টি কর দিয়ে গীতের পদার্থ বিস্তার করতে করতে তিনি এমন বিচিত্র ভাবে নৃত্য দেখালেন,···অভিরূপ-জ্যেষ্ঠা জ্যেষ্ঠার, মদনগর্ব-তর্জনী তর্জনীর, ভুবন-সৌন্দর্যসার-মধ্যমা মধ্যমার, রতি-মদ-নামিকা অনামিকার এবং বৈচিত্র্য-কনিষ্ঠা কনিষ্ঠার,···যে চমকে উঠলেন মনসিজ এবং নাচি-নাচি করে উঠল শিবেরও মন।

নাচতে লাগলেন রাধাসখী।
উঠতে লাগল, পড়তে লাগল
বাঁকতে লাগল, কাঁপতে লাগল,
যুগল বুক যুগল স্ফিক্।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার তুলল কনক বলয়,
কাঁপতে লাগল এ-কর ও-কর,···
যেন ফুল ঝরছে, পূজার ফুল।

আর
'তত্তা তত্ থৈ তিকিড় তিকিথৈ,'···
তালে তালে দুলতে লাগল জানু,
তালে তালে বাড়তে লাগল বোল,
তাদের মুখে নাচল দাঁতের হাসি।

তারপরেই সেই গৌর-বরণী ধনী এত ঊর্ধ্বাধঃ-গতিতে উপর্যুপরি ঘোরাতে লাগলেন নিজের দেহ···সৃষ্টি করে গৌরিমার অসংখ্য পরিধি, যে মনে হল, ঝড় উঠেছে গায়নীদের কদলীবনে, আর সেই ঝড় যেন উড়িয়ে নিয়ে ছুটেছে পদ্মফুলের পরাগ।

তারপরে তিনি আকাশচারী নৃত্যের মধ্য দিয়ে এত বিস্তার করতে লাগলেন অত্যন্ত দুরূহ সব নৃত্যছন্দ, যে মনে হল তাঁর তনুলতা বুঝি আকাশেই স্থায়ী হয়ে রয়েছে···কাঁপছে···কাঁপছে···জ্যোতির্বল্লরীর মত কাঁপছে। শিক্ষার কোনো গর্ব-প্রকাশ নেই। কেবল মনে হতে লাগল, লাবণ্যদেবীর দু'খানি চরণ যেন অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল হেলাভরেই পৃথিবীর উপর পড়ছে না।

কি সুন্দর নাচ! এর কি যে উপমা হতে পারে ভেবে পাওয়া যায় না।···

বিদ্যুৎবল্লী যদি সুচির-স্থায়িনী হতেন নির্মেঘ গগনে, আলগোছে মুঠির ভিতর কাঁপতেন যদি মৃদুল-মৃদুপবনে, দৈবযোগে যদি মুখ ফুটে বোল তুলতেন,—

'তত্তা তত্ থৈ তিকিড় তিকি থৈ থাঃ'··

তাহলে তাঁর উপমা দেওয়া চলতো এই নটনবিদুষীটির বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে

লঘু-লঘু চরণে এইভাবে নর্তন-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে করতে, সমের মাথায়, স্তনভার-দুর্বহ নিজের পূর্বকায়টিকে এমন প্রচণ্ড বেগে তিনি দোলায়িত করতে লাগলেন, যে মনে হল,···ঝঞ্ঝার ঘূর্ণীতে গেল-গেল···এ বুঝি উড়ে গেল···কমলিনী!

আহা ঐ কোমর ভেঙে গেল···ভেবে ব্যথায় শিঁটিয়ে উঠলেন পরিজনেরা।

৩১। এইভাবে লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-দ্রুতার্ধ-দ্রুতপাদ-ভেদে তালের সঙ্গে সঙ্গে চরণকমল চালনা করতে করতে, তিনি···সেই অতুলনীয়া রাধাসখী,···এমন অপূর্ব সব নর্তনকৌতুক আবিষ্কার করতে লাগলেন যে, সাধু সাধু বলে অভিনন্দন করতে করতে ছুটে এসে তাঁকে

আলিঙ্গন না করে থাকতে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ, বুকে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীরাধা, আকাশে আকাশে গর্ব দূর হয়ে গেল অপ্সরাদের, আর বিস্ময়ের হাসি হেসে ফেললেন দেবতারা। এমন কাণ্ড হবে নাই বা কেন? তাঁরা যে চোখের সামনে দেখলেন, লক্ষ কানে শুনলেন,··· ঘুঙুর বাজছে,···ঘুঙুরের দানার ভিতর সোনার মটর ঠুন্ ঠুন্ ঝম্ ঝম্ করে বাজছে,···লঘু-আদিক্রমে কখনও দু'শো দানা একসঙ্গে ঝম্‌ঝম্ করে বাজছে, কখনও একশো দানা বাজছে রুম্‌ঝুম, আবার কখনও দু'টি দানা বাজছে কিন্ কিন্, কখনও একটি দানা বাজছে··· ঝিন্··ঝিন্··ঝিন্! আর সঙ্গে সঙ্গে, ঘুঙুরের সোনার মটরের ঝিল্লির সঙ্গে, তালসম চলেছে তাঁর অদ্ভুত নাচ!

৩২। চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার আনুকূল্যে, অনিন্দ্যসুন্দর এই প্রত্যেকটি নৃত্য অবলোকন করতে করতে কৃষ্ণও আর কেবল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। নিখিল কলাপণ্ডিতাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আরম্ভ করে দিলেন প্রকীর্ণ-নটন-ক্রম। সকলের হৃদয় সাগরে ঢেউ দিয়ে উঠল নাচ। তিনি নাচতে লাগলেন নাচাতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন গাওয়াতে লাগলেন, আযামিনী যামিনীকে যেন নিমেষের মত খরচ করে দিয়ে তিনি খেলতে লাগলেন বিরামহীন এই খেলা। নৃত্যন্তী ও গায়ন্তীদের ব্যূহ থেকে তখন বেরিয়ে এলেন একটি সুন্দরী। প্রকীর্ণক-নৃত্যে কখনও একীভূত, কখনও মণ্ডলীভূত, কখনও নিঃসঙ্গ, কখনও যুগলে, তিনি নাচতে লাগলেন, তিনি গাইতে লাগলেন,···কৃষ্ণের নাচের তালে তাল রেখে, কৃষ্ণের গানের সুরে সুর মিলিয়ে।

সহগান আর সহনাচ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তালে তাল রেখে চলা কি সহজ কথা। স্বেদসিক্ত পরিশ্রমের অলসতায় ক্লিষ্ট হল তাঁর অঙ্গ, শ্লথ হয়ে গেল স্তনাংশুক, হাত বাড়িয়ে তিনি ধরে ফেললেন বিশাল স্কন্ধ শ্রীহরির।

ভারী সুন্দর দেখতে হল তাঁর ঐ··তমাল স্কন্ধে শিথিল শাখাটির মত, বাতাসে-খসা হৈমীবল্লরীর মত ঢলে পড়াটি। আর শ্রীকৃষ্ণকে মনে হতে লাগল··তিনি যেন মূর্তিমান আদিরস শৃঙ্গার, যাঁকে এক লীলাবধূর অলসতায় অভিভূতা হয়ে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁরি স্থায়িভাব-স্বরূপিণী রতি।

দেখতে দেখতে আর একটি সুন্দরী হঠাৎ মণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। গাইতে আরম্ভ করে দিলেন, নাচতে আরম্ভ করে দিলেন কৃষ্ণগীত কৃষ্ণতাণ্ডব। কিন্‌কিন্ করে বেজে উঠল তাঁর কাঞ্চীর কিঙ্কিণী, রুণ্‌রুণ্ করে বেজে উঠল পদ্মপায়ের পাঁয়জোর, ধীর্‌ধীর্ দুলতে লাগল চীনাঞ্চল, কর্ণকমল আর কণ্ঠহার। পুরুষ-লীলায় তিনি বালার মত বাম বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ। হরি হরি, শ্রীকৃষ্ণও তখন নাচতে লাগলেন গাইতে লাগলেন তাঁরি নাচ তাঁরি গান।

আর একটি সুন্দরী এবার নাচতে নাচতে এগিয়ে এলেন। কি তার জলভরা পদ্মের মত ঢলঢল দুটি আঁখি। এসেই আহা যেন বাম করে পদ্মের লালিত্য ছড়িয়েই তিনি টপ করে ধরে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণের পীতবরণ বসনের অঞ্চল। তারপরে প্রসর্পণ ও অপসর্পণের খেলা দেখাতে দেখাতে কি তাঁর অপূর্ব নৃত্য, কি তাঁর ঘনশ্যামকেও নাচানো।

কৃষ্ণাধরে বেজে উঠল মুরলী। মুরলীরব-মাধুরীতে আকৃষ্টা হয়ে এবার নাচতে নাচতে এগিয়ে এলেন আর একটি নটন্তী। মুরলীর ঐ লয়ের সঙ্গে ঐ তালের সঙ্গে লয় মিলিয়ে তাল মিলিয়ে কি অনিন্দ্য তাঁর হেলায় ফেলায় ভালবাসার রসের নাচ। কিন্তু লীলাকিশোরের দুষ্টুমিরও অন্ত নেই। তাই যেই তিনি ইচ্ছে করেই তাল কেটেছেন মুরলীতে, অমনি তাঁর দিকে চোখ মটকিয়ে, তালভঙ্গ সামলিয়ে নিয়ে, নটন্তীর সে কি বিজয়নৃত্য পুনর্বার।

অস্ফুট-মধুর-বোল বাজতে থাকে মুরলী, নাচতে থাকেন শ্রীহরি। অতি মৃদু অতি মধর বীণায় ঝংকার তুলে গাইতে গাইতে হাসতে হাসতে, কৃষ্ণকে নাচাচ্ছিলেন এক রসিকা। নাচাচ্ছিলেন কৃষ্ণ। নাচতে নাচতে কি যে হয়ে গেল তাঁর। যে চালে কেউ চলে না কেউ নাচে না, সেই চালে হঠাৎ ডগমগ-তনু সকৌতুক নাচতে লাগলেন কৃষ্ণ। নাচ, সে কি নাচ। রসিকার ভুল হয়ে গেল কাজ। আকুল হয়ে তিনি শোধরাতে গেলেন ভুল।

কিন্তু কে থামায় তখন কৃষ্ণের নাচ। কৃষ্ণ তৎক্ষণে নাচতে নাচতেই আলিঙ্গন করছেন কাউকে, চুম্বন করছেন কাউকে, কারোর ব পান করছেন সুধাধর। সে কী তাঁর নৃত্য-রমণ অখিল বধূজনের সঙ্গে। কোথায় সেই বধূ যিনি মাতাল হলেন না নৃত্যে? কোথায় সেই নাচ যেখানে দেখা গেল না কৃষ্ণকে? আর কোথায় বা সেই বধূ··যিনি কেবল একলাই, শুধু একলাই, সোহাগ পেলেন না কৃষ্ণের কটাক্ষের, আশ্লেষের আর চুম্বনের? [ক্রমশ।

তারপর

সন্তোষকুমার অধিকারী

কেন তবু ভাবো,—তারপর! দেখ নি দিগন্ত মেঘে
নতুন পূর্বাশা, দীপ্ত জীবনের সুচারু প্রস্তুনা?
আবার দিনান্তে ম্লান অবরোধ? মৃত্যুর আবেগে
বিশীর্ণ আঁধার, ছায়া, বিলুপ্তির ঈষৎ চেতনা···
দেখ না সময় দ্রুত ব'য়ে যায়? জান না হৃদয়
নিত্য পরিবর্তনের যবনিকা? স্রোতস্বতী যায়
ঢেউ ভেঙ্গে, দু'পাড়ের কি আকুল অনন্ত বিস্ময়!
জীবন স্রোতের ঢেউ স্মৃতি তার পলকে মিলায়।

চেয়ো না আশায় দীপ্ত, রেখো না দূরের পরে ভর;
তুমি যে সামান্যতম, আঁধারের উৎক্ষিপ্ত আলোক;
এ' আলোকে ভুল হ'বে—শোন নি তিমিরে বিভ স্বর?
দেখনি দুরন্ত মৃত্যু ক্ষণিকের মায়ার নির্মোক
পলকে বিচ্ছিন্ন করে? জান না এ' জীবন নশ্বর,
এ চেতনা মুহূর্তের? কেন বলো তবু—তারপর?

ডাকটিকিট সংগ্রহ

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

তোমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কিছু-না-কিছু নতুন জিনিষ সংগ্রহ করতে ভালবাস। এই রকম কোন-কিছু ভাল জিনিষ সংগ্রহ করা তোমাদের অনেকেরই অভ্যাসে পরিণত হয়। তাই নতুন কোন কিছু সংগ্রহ না ক'রলেই তোমাদের ভাল লাগে না। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন সংগ্রহের এক কথায় কোনই দাম নেই। এই জন্য একে সংগ্রহের বাতিক বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূর্ণ সংগ্রহের দাম অনেক বেশি। একটি বিশেষ জিনিষ সংগ্রহের ভিতর দিয়ে সংগ্রহকারীর একটি বিশেষ রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

তোমরা যত রকম জিনিষ সংগ্রহ কর না কেন, আমার মতে পুরোনো ডাকটিকিট সংগ্রহই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। প্রথমত এতে তোমাদের পয়সা খরচ না করলেও চলে। দ্বিতীয়ত এই সংগ্রহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক মূল্য অনেক বেশি। একটি ডাকটিকিটে কোন দেশের ঐতিহাসিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অনেক পরিচয়ই পাওয়া যেতে পারে। সামান্য একখানা ব্যবহৃত ডাকটিকিট থেকে এমন কিছু শিখতে এবং বুঝতে পারা যায় না। ইতিহাস, ভূগোল বা ভ্রমণকাহিনী পড়েও অমন ক'রে বুঝতে পারা যায় না।

সকল স্বাধীন দেশেরই ডাকবিভাগে কয়েকটি প্রামাণিক ডাকটিকিট প্রচলিত থাকে। এগুলির প্রায়ই রূপান্তর বা পরিবর্তন হয় না। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১০, ১৫, ২৫, ৫০, ৭৫ বা তদূর্ধ্ব নয়া পয়সা মূল্যের প্রামাণিক ডাকটিকিটগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রত্যেক ডাকটিকিটেই কোন না কোন ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সর্বদা প্রচলিত ডাকটিকিটগুলিতেও ছবি থাকে। সেগুলি থেকে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষণীয় বিশেষ কিছুই থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক স্বাধীন দেশে বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জন্মদিনে অথবা বিশেষ কোন অবস্থায় ডাকবিভাগ কর্তৃক কতকগুলি বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ ডাকটিকিটগুলি থেকেই কোন দেশের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিকে স্মারক-ডাকটিকিট বলা হয়।

তোমরা তোমাদের বাবা-কাকা বা গুরুজনদের পুরোনো চিঠির ফাইলে পরাধীন ভারতবর্ষের ডাকটিকিটগুলির চেহারা দেখে থাকবে হয়ত। স্বাধীন ভারতবর্ষের ডাকটিকিটগুলির রূপ সম্পূর্ণ বদলে যায় ইংরাজী ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। ঐ তারিখে প্রকাশিত ডাকটিকিটগুলির মোটামুটি একটা পরিচয় দিচ্ছি।

১। ১ পয়সা মূল্যের—অজন্তা প্যানেল।
২। ২ " " —কোণারকের ঘোড়া।
৩। ৩ " " —ত্রিমূর্তি।
৪। ১ আনা মূল্যের—বোধিসত্ত্ব।
৫। ২ " " —নটরাজ।
৬। ৩ " " —সাঁচিস্তূপ (পূর্বদ্বার)।
৭। ৩½ " " —বুদ্ধগয়ার মন্দির।
৮। ৪ আনা মূল্যের—ভুবনেশ্বরের মন্দির।
৯। ৬ " " —বিজাপুরের গোল গম্বুজ।
১০। ৮ " " —বুন্দেলখণ্ডের মহাদেবের মন্দির।
১১। ১২ " " —অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির।
১২। ১৲ টাকা মূল্যের—চিতোরগড়ের বিজয়স্তম্ভ।
১৩। ২৲ " " —লালকেল্লা।
১৪। ৫৲ " " —আগ্রার তাজমহল।
১৫। ১০৲ " " —দিল্লীর কুতুব মিনার।
১৬। ১৫৲ " " —শত্রুঞ্জয়ের মন্দির।

এরপর প্রতিবছরই আমাদের স্বাধীন ভারতে কিছু না কিছু নতুন স্মারক ডাকটিকিট আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটগুলির মধ্যে কয়েকটি ডাকটিকিটের নাম উল্লেখ করছি :—

১। ১৯৫৭ সালে—
(১) লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের প্রতিকৃতিযুক্ত স্মারক-ডাকটিকিট
ঐ (২) আন্তর্জাতিক উনবিংশ রেডক্রস সম্মেলনের স্মারক-ডাকটিকিট

২। ১৯৫৮ সালে—
(১) স্যার বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিকৃতিযুক্ত স্মারক-ডাকটিকিট
ঐ (২) স্যার জামশেদজী টাটার প্রতিকৃতিসহ ভারতীয় ইস্পাত উদ্যোগের স্মারক-ডাকটিকিট

৩। ১৯৫৯ সালে—স্যার জামশেদজী টাটার প্রতিকৃতিযুক্ত স্মারক-ডাকটিকিট

৪। ১৯৬১ সালে—
(১) পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রতিকৃতিযুক্ত
ঐ (২) ভারতীয় বিমানের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসবের
ঐ (৩) সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার শতবার্ষিকী

১৯৬১ সালে—

(৪) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক-ডাকটিকিট

৫। ১৯৬২ সালে—

(১) স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিকৃতিযুক্ত স্মারক-ডাকটিকিট

(২) ঊনবিংশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের „

(৩) কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি হাইকোর্টের জন্মশতবার্ষিকীর „

(৪) গণ্ডারের প্রতিকৃতিযুক্ত পশু সংরক্ষণের „

(৫) রমাভাই রানডের প্রতিকৃতিযুক্ত „

(৬) পঞ্চায়েৎ রাজ প্রতিষ্ঠার „

(৭) নিখিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া নিবারণীর

৬। ১৯৬৩ সালে—

(১) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক-ডাকটিকিট

এ ছাড়া প্রতি বছর ১৪ই নভেম্বর শিশুদিবস ও আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিনে ১৫ নয়া পয়সা মূল্যের একটি নতুন ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

আজ থেকে ১০১ বৎসর পূর্বে ইংরেজী ১৮৬২ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে পেক্ কর্তৃক নীলনদের উৎস-মুখ আবিষ্কৃত হয়। ঐ নীলনদ-উৎস-মুখ আবিষ্কারের শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ইংরাজী ১৯৬২ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে উগাণ্ডায় (দঃ আফ্রিকা) ৫০ সেন্ট মূল্যের একটি স্মারক-ডাকটিকিট প্রকাশিত হ'য়েছিল। এইরূপ একটি ডাকটিকিট থেকে নীলনদের উৎস-মুখ আবিষ্কর্তার নাম ও আবিষ্কারের সাল, তারিখ ইত্যাদি নির্ভুলভাবে জানতে পারা যায়। এ'জাতীয় ডাকটিকিটের ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি।

যে সকল সুসন্তানের জন্ম দিয়ে আমাদের মাতৃভূমি—এই বিশাল ভারতবর্ষ গৌরব অনুভব করছে সেইসব সুসন্তানদের স্মৃতিপূজার জন্য আমাদের জাতীয় সরকার প্রায় প্রতিবছর একে একে তাঁদের প্রতিকৃতিসহ জন্ম সাল তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ ক'রে ১৫ নয়া পয়সা মূল্যের স্মারক-ডাকটিকিট প্রচলনের এক সুন্দর ব্যবস্থা ক'রেছেন। এ'জাতীয় ডাকটিকিট ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যে উন্নত।

আবার কোন দেশের স্মারক ডাকটিকিটে সেই দেশের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের ছবি ছাপা থাকে। এইরূপ টিকিট দেখলে বুঝতে পারা যায় যে সেই দেশ ঐ বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী ক'রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। জাতীয় ডাকটিকিটে কোন দেশের অর্থনৈতিক পটভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও কোন কোন দেশের ডাকটিকিটে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন দ্রষ্টব্য স্থান, মন্দির অথবা শিল্প-কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়

ডাকটিকিট সংগ্রহে মন থাকলে নানা উপায়ে তা' সংগ্রহ ক'রে সুন্দর একখানা এ্যালবামের মালিক হওয়া যেতে পারে। বাবা, মা, কাকা ইত্যাদি গুরুজনদের কাছে যেসব চিঠিপত্র আসে, সেগুলি থেকে অনায়াসেই টিকিট তুলে নেওয়া যায়। একজাতীয় টিকিট তোমার কাছে দুখানা থাকলে অন্য কারুর সাথে বিনিময় ক'রেও নতুন একখানা ডাকটিকিট পাওয়া যেতে পারে।

সুখের বিষয়, আজকাল দেশে-বিদেশে ডাকটিকিট সংগ্রাহকের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে; এজন্য টিকিট সংগ্রহকারিগণ দেশে-বিদেশের নানা লোকের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ক'রে ভাবের আদান-প্রদান তথা ডাকটিকিট বিনিময় করছে।

অন্তত ভারতীয় স্মারক-ডাকটিকিট সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ কোন বেগ পেতে হয় না। মাঝে মাঝে আমাদের দেশে ডাকটিকিট প্রদর্শনী হয়। গুণানুসারে ডাকটিকিট এ্যালবামের মালিকদের পুরস্কৃত করা হয়।

ছেলেবেলা থেকে কোন কিছু ভাল জিনিষ সঞ্চয়ের অভ্যাস থাকলে পরিণত বয়সে তার অসীম উপকারিতা অনুভব করা যায়।

গল্প হলেও সত্যি

যতীন্দ্রনাথ পাল

অনেকদিন আগেকার কথা।

দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল একটি ছাপাখানায়। একজন প্রেসের মালিক আর অন্যজন দু'খানি মাসিকপত্রের সম্পাদক।

সম্পাদকমশাই একটি ৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা, পাঁচ হাজার কপি ছাপাতে দিয়েছেন এই প্রেসে। সেটি ছাপা, সেলাই ও ছাঁটা হয়ে গেছে। তারই এক কপি হাতে নিয়ে পাতাগুলো দেখে মালিকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: দেখুন, এই পাতাটায় একটা ভুল থেকে গেছে। অর্থাৎ একখানি পাতায় দু'টো লাইন উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে।

মালিক পুস্তিকাটি নিলেন হাত বাড়িয়ে এবং দেখলেন ভুলটা গম্ভীরভাবে।

পরে বললেন: এই পুস্তিকাগুলি কি আজই আপনার চাই?

সম্পাদকমশাই বললেন: না।

মালিক তখন তলব করলেন ম্যানেজারকে। আবার নির্ভুল করে পাঁচ হাজার পুস্তিকা ছেপে দেবার হুকুম দিলেন তাঁকে। আর আগে ছাপা পাঁচ হাজার কপির সমস্ত নষ্ট করে ফেলতেও বললেন।

সম্পাদকমশাই তখন বললেন: দেখুন, পুস্তিকাগুলি বিজ্ঞাপন মাত্র। এগুলি তো বিলি করা হবে, এর জন্যে এত লোকসান করার দরকার নেই।

মালিক বললেন: না মশাই, এ পুস্তিকাগুলো বিলি করা হলে লোকে ভুলটা দেখতে পাবে, আর তাতে বদনাম হবে আমার প্রেসের। পুরাপুরি নির্ভুল কাজ করতে চেষ্টা করি আমি বরাবর।

সুতরাং ভাল কাগজে ছাপা পাঁচ হাজার পুস্তিকা নষ্ট করে, ঐ রকম উত্তম কাগজে আবার পাঁচ হাজার কপি ছেপে দেওয়া হল পরদিন। নতুন করে ছাপাবার সব খরচটাই বহন করলেন মালিক।

এই প্রেসের স্বত্বাধিকারীর নাম চিন্তামণি ঘোষ। এলাহাবাদের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের ইনি প্রতিষ্ঠাতা। নিজের প্রখর ব্যবসা-বুদ্ধি, শ্রমশীলতা এবং কার্যপটুতা দ্বারা তিনি একটি প্রকাণ্ড প্রেস গড়ে তুলেছিলেন।

বালক বীর

মানসী বসু

মাগো আমরা স্বাধীন জাতি।
বহু বছর দুঃখ সয়ে,
বহু জীবন বলি দিয়ে,
লভেছি আজ স্বাধীনতার খ্যাতি।
স্বাধীনতা নয়'ক মাগো রঙিন খেলা,
যারে নিয়ে করতে পারি হেলা ফেলা,
এ যে মাথার মুকুটমণি,
প্রাণ তুলনায় তুচ্ছ গণি,
রাখতে আমার স্বাধীনতার মান,
হাসিমুখে এগিয়ে যাব কবুল করে জান।
যদি কোথাও শত্রু আসে,
সীমান্তের ওই আশে-পাশে,
করব চ্যালেঞ্জ ভয় পাব না কিছু;
লড়ব মাগো বীরের মত,
দেখব ওদের সাহস কত,
শেষে ওরা যাবেই হটে পিছু।
তোমার আশীষ মাথায় নিয়ে,
দেশের মাটি শিরে ছুঁয়ে
করতে পারি অসাধ্যেরই সাধন;
জীবনের সব সুখের ভাগ,
অবহেলে করব ত্যাগ,
শপথ নিলাম রাখতে আমার পণ।

ছোট্ট দেশ হল্যাণ্ড

ফরাসী দেশের কোন কাফেতে, ইংলণ্ডের কোন রেষ্টুরেন্টে, জার্মানীর কোন ডাক্তারখানায় যেখানেই আমি গিয়ে বলেছি যে বল তো দেখি আমি কোন্ দেশের লোক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওরা আমার দেশ অনুমান করতে পারে নি এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতে হয়েছে যে আমি ওলন্দাজ। অমনি ওদের সুর যেন কোমল হয়ে এসেছে আর বলে উঠেছে, 'আহা হল্যাণ্ড, সত্যিই? কি চমৎকার। সেই ছোট্ট দেশ যেখানে সবাই কাঠের জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়। যাদের রাণী, জুলিয়ানা রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যে, আজকের মতো যেন সমুদ্রের বাঁধটা না ভাঙে। আচ্ছা সেবারের সেই বন্যা, সেই বন্যার কথা বল তো? এই বারে আমাকে একটু সাবধান হতে হয়। প্রথম প্রথম আমি সত্যি কথাই বলতাম এবং বলতাম যে সেই বন্যায় আমার কোন আত্মীয়-স্বজন মারা যান নি। কিন্তু আজকাল আমি একটু বুদ্ধিমানের মতো বলি যে, আমার একজন কাকা আর দুই সম্পর্কের দুই-তিনজন ভাইপো-ভাইঝি সেই বন্যায় মারা গেছেন। এই ক্ষেত্রেই আমার কোন নিকট আত্মীয়-স্বজনের কথা উল্লেখ করি না কারণ তাতে সন্ধ্যার আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই কল্পিত আত্মীয়-আত্মীয়া যাঁরা সাঁতার জানেন না, তাঁদেরই বন্যার জলে ডুবিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় কোমল হয়ে ওঠে। এই স্নেহ কেবল আমার ওপরেই বর্ষিত হয় না, তাঁদের কথায় মনে হয় যেন হল্যাণ্ডের সবাই এখন পর্যন্ত কোন রকমে মুখটা জলের ওপর ভাসিয়ে সীমাহীন সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।

অন্তত পক্ষে আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলতে পারি যে, আমাদের দেশকে সকলেই ভালোবাসে কাজেই আমাদের মনে স্বভাবতই একটা গর্বের ভাব আসতে পারে এবং ভাবতে পারি যে, আমরা সবাই খু ভাল। আমরা যে খুব ভালো তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু বিদেশের লোকেরা তা জানেন না। এই একদেশ দর্শিতার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, তার কারণ হ'ল আমাদে কেউ প্রাপ্তবয়স্ক বলেই মনে করেন না। শিশুদের যেম সবাই স্নেহ করেন ভালোবাসেন আমাদের সম্পর্কে তাঁদের সেই রকম একটা স্নেহের ভাব রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভালোবাসতে হলে তার জন্য সব সময়েই একটা মূল্য দিতে হয়, কিন্তু শিশুদের ভালোবাসতে কোন মূল্য দিতে হয় না। বর্তমানে যে কথাটা বলা একট ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমাদের দেশের প্রতি সকলেরই সেই শুভেচ্ছা আছে। সমুদ্রের উপকূলে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের জলরেখা থেকেও নীচু জায়গায় আমাদের যে বাস করতে হয় এবং এই অবস্থাতেও আমরা যে বেঁচে আছি সেজন্য সকলেরই আমাদের ওপর একটা যেন সহানুভূতি ও স্নেহ রয়েছে।

সকলেই ভাবেন হল্যাণ্ড একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নিরপরাধী দেশ, সেইজন্যই এই সহানুভূতি। জার্মান লেখক জোসেফ রথ এক সময়ে আমাদের 'নীচু দেশের নিরপরাধ শিশু' বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আমরা শিল্পে-বাণিজ্যে যতই উন্নতি করি না কেন, ইয়োরোপের যে কোন দেশের মতো আধুনিক হলেও আমাদের উইণ্ড মিল, কাঠের জুতো মাথার টুপির ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়, বলা হয় আমাদের রাণী সাইকেল চড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।

প্রাপ্তবয়স্ক শক্তিগুলির একটা বিশেষ প্রয়োজন আমরা মেটাই বলে মনে হয় তা হ'ল পরিবারের শিশুর প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা সব সময়ে হয় তো একে অন্যকে পছন্দ করেন না কাজেই কোঁকড়ানো চুলে ভরা হল্যাণ্ডের ছোট্ট মাথায় হাত বুলিয়ে আরাম অনুভব করেন। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নেই

করুন হল্যাণ্ড নাকি কেবল দুধ, পনীর ও ডিম উৎপাদন করে। এতো ছোট্ট দেশ—কিন্তু এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সত্যি কথা বলতে গেলে বিদেশীরা আমাদের সম্পর্কে এর চাইতে বেশি কিছু জানেন না। এই অজ্ঞানতাও একদিক থেকে মন্দ নয় কারণ তাতে আমাদের সম্পর্কে একটা কৌতূহল থাকে। কাজেই আমাদের দেশে পর্যটক আকর্ষণ করা সম্পর্কে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ যে চেষ্টা করেন সেটা আমার কাছে বিশেষ বিজ্ঞোচিত মনে হয় না। আমাদের সম্পর্কে বিদেশিগণের যে কৌতূহল রয়েছে এতে তা নষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তব কখনও কল্পনার ছবির সঙ্গে এক হতে পারে না। সেই জন্যেই বিদেশী পর্যটকগণ হল্যাণ্ডে এসেই সোজা মার্কেন ও ভলেণ্ডামের দিকে রওনা হন। বিদেশিগণ কল্পনায় হল্যাণ্ডের যে রূপ ভেবে রাখেন এ'খানে গিয়ে তা এখনও বাস্তবে দেখতে পান। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি শুধু এ' জায়গা দু'টি খোলা রেখে বাকি দেশটা পর্যটকগণের জন্য বন্ধ রাখতাম। বিদেশিগণের জন্য। নিষিদ্ধ দেশ করে দিলে খুব বেশি অন্যায় হবে না।

একটি ছোট ওলন্দাজ ছেলে এই গল্পটিতেও হল্যাণ্ড সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। বিদেশিগণ বিশেষ করে আমেরিকানগণ আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন তা গল্পটিতে বিশেষভাবে বুঝতে পারা যায়। শ্রীমতী মেরী মেইপ ডজ নাম্নী একজন মার্কিন ভদ্রমহিলাই প্রকৃতপক্ষে গল্পটির রচয়িত্রী। তাঁর হান্স ব্রিঙ্কার নামক বইটিতে একটি নাম গোত্রহীন কিন্তু অমর ওলন্দাজ বালক বাঁধের একটি ছিদ্রে শুধুমাত্র যে তার একটি আঙুল দিয়ে সমুদ্রের এক বিপুল বন্যা প্রতিরোধ করছে। কাজেই বিদেশে আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি যা বললাম, তা হল্যাণ্ডকেই ছোট করেছে। ছোট ওলন্দাজ ছেলের গল্পটিতে কিন্তু আমাদের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত সমুদ্রকেও ছোট করা হয়েছে। এতো ছোট করা হয়েছে যে, এক বাটি জলের মাঝখানে যেন একটি কর্ক।

নিজেদের স্বপ্ন সার্থক করার কল্পনা নিয়েই শুধু একটা দেশ সম্পর্কে এই রকম ছবি আঁকা যায়। এই স্বপ্নে প্রথমেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটি জাতি অধ্যুষিত, নিরপরাধ একটি দেশ সম্পর্কে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে এবং এই কল্পনার মূলে রয়েছে ভয়। সাধারণভাবে বিশ্বের নরনারী বিশেষ করে বড় বড় দেশের জনগণ, যে ক্রমবর্ধমান আতঙ্কের মধ্যে বাস করেছেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁরা একটা উপায় খোঁজেন এবং সেই উপায় হলাম আমরা। এইটেই হ'ল আমাদের কাজ, আমাদের এমন একটা জায়গায় থাকতে হবে যে, জায়গায় কোন কিছু সম্পর্কে কারুরই কিছু জানা নেই, এটা হ'ল ইয়োরোপের পাঠশালা, বিশ্বের মধ্যে একমাত্র দেশ যেখানে পারমাণবিক বোমা তৈরি হয় না, এমন কি তৈরি করার কোন পরিকল্পনাও নেই, কারণ এখানে শিশুর ছোট একটি আঙুল যে কোন আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারে। ইয়োরোপের সমস্তায় আমরা হলাম সেই ছোট্ট আঙুল। *

---

* (বিখ্যাত ওলন্দাজ লেখক গডফ্রিড বোমান্সের একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে)

যাদুকরের মৃত্যু

শ্রীবিশু দাস

[বিংশ শতাব্দীতে এমন অনেক যাদুকর আছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাঁদের এক-একটি প্রদর্শনীর পারিশ্রমিক স্থির হয় হাজারের অঙ্কে। যাদুকররূপে লাফায়েৎ (Lafayette)-এর আত্মপ্রকাশের আগে এত টাকার কথা কোন যাদুকর কল্পনাও করতে পারতেন না। তাঁর রহস্যময় মৃত্যু মানুষের মনে জাগায় সন্দেহ। সত্যিই কি এটা দুর্ঘটনা, না-কি আত্মহত্যা !!]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ডে এক মহান যাদুশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিলো। তাঁর সাপ্তাহিক পারিশ্রমিকের পরিমাণ ছিলো ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ টাকা। ইউরোপের যাদুকরদের মধ্যে সে সময় ডি, কোল্টা (De Kolta) উপার্জন করতেন সপ্তাহে ৬০ পাউণ্ড (৮৪০ টাকা)। অন্যান্য যাদুকরদের কল্পনাতীত ছিলো এ ঘটনা। যাদু-শিল্পীদের পারিশ্রমিক তিনিই প্রথম বাড়ান যার ফলে পরবর্তী কালের যাদুকরেরা সহজেই উপার্জন করতে থাকেন অনেক টাকা। এর জন্যে যাদুকর সমাজ তাঁর কাছে ঋণী থাকবে, স্বীকার না করলেও।

সেকালের জনপ্রিয় যাদুশিল্পী লাফায়েৎ (Lafayette)-এর খেলা আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের যে সব দর্শক দেখেছিলেন তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণ করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে যাদুকর হিসেবে, উন্নত শ্রেণীর যাদু শিল্পীর পর্যায়ে তাঁকে কোন রকমেই ফেলা যায় না। এমন কি সামান্যতম হস্তকৌশলটিও তাঁর রপ্ত ছিলো না! কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁর মত এত প্রচুর অর্থ অত কোন যাদুকর উপার্জন করতে পেরেছিলেন কি-না সন্দেহ। অনেকে বলেন যে হুডিনীর আগে লাফায়েৎ যদি পৃথিবীতে না আসতেন তাহলে হুডিনীর পক্ষে, যত টাকা তিনি রোজগার করেছিলেন, তত টাকা রোজগার করা সম্ভব হতো কি-না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে তাঁর পার্টিকে, ম্যাজিক পার্টি না বলে ম্যাজিক-সার্কাস বলাই ঠিক। কারণ নানা রকম জন্তু-জানোয়ার নিয়েই ছিলো তাঁর খেলা। ঘোড়া, ছাগল, কুকুর, পাখী কোনটাই বাদ ছিলো না।

তাঁর কথাবার্তা এবং কাজকর্ম লক্ষ্য করে অনেকেই বলতেন যে তিনি ছিটগ্রস্ত Eccentric ছিলেন।

প্রথম জীবনে লাফায়েৎ ছিলেন একজন চিত্রকর। থিয়েটারের পর্দা, দেওয়াল-চিত্র এসবই আঁকতেন। সেই সময়ে কি করে যে তাঁর মনে যাতুকর হবার খেয়াল জাগে সে কথা আজ আর জানবার উপায় নেই। পৃথিবী বিখ্যাত যাতুকর হোরেস গোলডিন্ তাঁর প্রথম খেলাগুলো তৈরী করিয়ে দেন নিজের তত্ত্বাবধানে। সেই সময়ে একমাত্র লাফায়েৎ ছাড়া সারা আমেরিকা বা ইংলণ্ডে খালি একটা চোঙা থেকে দুটি ছেলে মেয়ে বার করার খেলা আর কেউ দেখাতে পারতেন না। আজানুলম্বিত একটি আলখাল্লার মত পোষাক পরে যাতুকর লাফায়েৎ মঞ্চে আসতেন খালি একটা বড় চোঙা নিয়ে। তারপর সেই খালি চোঙা থেকে পর পর দুটি ছেলে মেয়ে বার করে দেখাতেন।

প্রথম শ্রেণীর যাতুকর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁর পাগলামো যেন আরও বাড়তে আরম্ভ করে। প্রচুর অর্থ উপার্জনের আনন্দে নাকি ওরকম ঘটেছিলো, অনেকে অনুমান করেন। তাঁর পকেটে সবসময় কাগজের একটা বাণ্ডিল থাকতে দেখা যেতো। সেই কাগজগুলোতে ছাপানো থাকতো: লাফায়েৎ এর ম্যাজিক অবশ্যই দেখুন। তিনি নিজের হাতে লোকের বাড়ির দরজায় দরজায় সেই কাগজ লাগিয়ে বেড়াতেন। নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) ছিলো তাঁর বড় কঠিন। সহকারীদের সব সময় সৈনিকের মতো পোষাক পরে থাকতে হোতো এবং তাঁর সাথে দেখা হলেই সেলাম করতে হোতো—না হলেই চাকরি খতম।

এই সব পাগলামোর ব্যতিক্রম দেখা যেতো কেবল বিউটি নামের কুকুরটির বেলাতে। যাতুকর হুডিনী ঐ কুকুরটি লাফায়েৎকে উপহার দিয়েছিলেন। ওটা পাবার কয়েক মাসের মধ্যে কুকুরটার প্রতি তিনি এত আসক্ত হয়ে পড়েন যে ডিনার টেবিলে বসিয়ে বিউটিকে খাওয়াতেন বাছা বাছা খাবার। খাবার আগে চাকর কুকুরের গলায় ন্যাপকিন বেঁধে দিয়ে যেতো। এমনকি লাফায়েৎ তাঁর লণ্ডনের টাভিস্টক স্কোয়ারের (Tavistock Square) বাড়িতে ১৫০ পাউণ্ড খরচা করে বিউটির জন্যে আলাদা স্নানের ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি ঘরে অন্তত আট-দশটি করে বিউটির ছবি টাঙ্গানো থাকতো। এমন কি তাঁর চুক্তি-পত্র (Contract form) এবং চেক বইতে পর্যন্ত শোভা পেতো ঐ সারমেয়টির প্রতিকৃতি। তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেতো:

Without beauty life would be empty. I should be a failure; I could not carry on; I believe I should die... তাঁর এই উক্তি যে কতখানি সত্যি এবং আন্তরিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিউটির মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে লাফায়েৎ-এর মৃত্যুতে। এডিনবার্গে প্রভু ও তাঁর প্রিয় কুকুর বিউটি শুয়ে আছে একই কবরের তলায় পরম নিশ্চিন্তে, সে ঘুম আর ভাঙবে না কোনদিন।

নিজের ওপর লাফায়েৎ-এর ছিল অগাধ বিশ্বাস। দর্শকরা কি চায়, কিসে তারা সন্তুষ্ট হবে, সে সব তিনি জানতেন ভালো ভাবেই এবং ঠিক সেই জিনিষটিই পরিবেশন করতেন। সারা জীবনে একবারের জন্যেও অকৃতকার্য হন নি তিনি। একবার হলবোর্ণের এম্পায়ার থিয়েটারে পনেরো দিনের খেলা দেখানোর পারিশ্রমিক হিসেবে পনেরশ' পাউণ্ড দাবী করেন। কর্তৃপক্ষ এক হাজার পাউণ্ডের বেশি দিতে রাজী হন না কিছুতেই। ফলে ঐ হলটি ভাড়া নিয়ে লাফায়েৎ নিজেই খেলা আরম্ভ করেন এবং পনেরো দিনের পর তাঁর লাভের অঙ্ক দাঁড়ায় ১৬৪০ পাউণ্ড।

যাতুকরমহলে অত্যন্ত অপ্রিয় অন্যদের সাথে মেলামেশা না করার জন্যে। অনেকে বলেন যে সুদক্ষ যাতুকরদের মাঝে পাছে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে নাকি তিনি কারও সাথে মেলামেশা করতেন না একেবারেই। বাছা-বাছা কয়েকজন বন্ধু ছিল তাঁর; যেমন হুডিনী, গোলডিন, মাস্কেলীন, গোল্ডষ্টোন ইত্যাদি।

লাফায়েৎ-এর মৃত্যুর আসল রহস্যটা অনেকের কাছেই অজানা। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে এডিনবার্গের এম্পায়ার থিয়েটারে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় যাতুকর লাফায়েৎ-এর। আসল কারণ যতদূর জানা যায় যে, লর্ড চেম্বারলেন প্রণীত নাট্যমঞ্চ সংক্রান্ত আইন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে মঞ্চের পেছনের দরজা তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন যাতে কেউ না ভেতরে আসতে পারে। বিরাট বিরাট ভেলভেটের পর্দার কোনটাতে আগুন লেগে জ্বলতে শুরু করেছে, সেটা কেউ লক্ষ্যই করেন নি। আগুন যে কি করে লেগেছিল কেউ বলতে পারেন নি, সে-ঘটনা রয়ে গেছে রহস্যের অন্ধকারে ঢাকা। পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখেন তালা বন্ধ। চাবি কোথায় রেখেছেন সে খেয়ালও নেই। দৌড়ে আবার মঞ্চে ফিরে আসেন, কিন্তু ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে সেখানেই পড়ে যান অজ্ঞান হয়ে, বাকি কাজটুকু শেষ করে আগুনের লেলিহান শিখা।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় শেষ হয়ে গেল একটি দরদী যাতু-প্রতিভা, কিন্তু কেমন করে যে দুর্ঘটনা ঘটলো, তা রয়ে গেল অন্ধকারেই। সে খোঁজ কোনদিন পাওয়া যাবে কি না জানি না—আমরা অপেক্ষা করে থাকবো সেইদিনের আশায়।

কুরুক্ষেত্রের কথা

সাধনা কর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাসুদেব বললেন—অর্জুন তবে শোন—আমিই হচ্ছি সেই কাল,—ভয়ঙ্কর মৃত্যু। সব কিছুকে বিনাশ করি আমি—এ আমার সেই সংহাররূপ। কৌরব-পক্ষের সকলকে হরণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমি কাল মহাকাল,
জাগিয়াছে রুদ্র তাল,
লোকক্ষয় হেতু মোর আসা,
দুর্যোধন আদি যত
জয়োল্লাসে যুদ্ধরত,
—শিয়রে শমন সর্বনাশা।
তুমি না মারিলে, তবু
জীবিত না রবে কভু,
এক তিল নেই আশা আর,
ওঠ পার্থ, যশোলভো
শত্রু-সৈন্য পরাভবো,—
তুমি মাত্র নিমিত্ত হত্যার।

কৃষ্ণের কথা শুনে কিরীটী বিস্ময়ে হাতজোড় করে অবিরাম নমস্কার করতে লাগলেন, বিহ্বল হয়ে বলতে লাগলেন—

হে অব্যক্ত হে অশেষ হে মহাত্মা পরমেশ
জগতের পুরুষ পুরাণ
জীবের পরমাশ্রয় বিশ্বের পরম লয়
জ্ঞেয় জ্ঞাতা রূপে বিদ্যমান।
পুরোভাগে নমো নম হে কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম
পশ্চাতে তোমারে নমস্কার,
সর্বরূপে সর্ব কাজে বাহিরে, অন্তর-মাঝে
চতুষ্পার্শে নমি বারংবার।

হে কৃষ্ণ, শিশু যেমন পিতার অনুগত, সখা যেমন সখার অন্তরঙ্গ, আমিও তেমনি তোমারই,—একান্তই তোমার। তোমাকে ভিন্ন কাউকে আমি জানি নে। তুমি আমারই, —এ কথা বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই। কারণ, আমার মতো অনেক ভক্ত তোমার আছে, কিন্তু তোমার মতো আমার তো আর কেউ নেই। প্রসন্ন হও, সখা, আমাকে ক্ষমা করো—কতো চপলতা, কতো বাদ-পরিবাদ, কতো না অপরাধ করেছি তোমার কাছে। ক্ষমা করো, পিতা যেমন করে পুত্রের, মিত্র যেমন করে মিত্রের, প্রিয় যেমন করে প্রিয়জনের সকল অপরাধ ক্ষমা করে, তেমনি ভাবে ক্ষমা করো আমার সকল ত্রুটি।

হে কৃষ্ণ, তোমার এ রূপ আমাকে অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত করে তুলেছে। তোমার প্রকৃত রূপ, যাই হোক না কেন, আমি সে রূপ কামনা করি না। তুমি আমার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী সখা রূপেই বিরাজ কর। আমি সুখী হই, শান্তি পাই। যেরূপে তুমি ভক্তের মন মোহিত কর, প্রেমিককে উন্মত্ত কর, অনুগত আর শরণাগতকে তৃপ্ত কর, সেই মোহন সুন্দরকেই আমি ভালবাসি। দেখাও সে রূপ, আবার সখা বলে তোমাকে চিনবো, পাবো আপন করে। সব ভয় আমার দূর হবে।

নিমেষে পার্থ-সখা'র মূর্তি গ্রহণ করলেন কৃষ্ণ। বললেন—আমার বিশ্বরূপ দেখে ভয় পেয়েছ তুমি? এ রূপ সকলে দেখতে পায় না, তোমাকেই মাত্র দেখালাম। বল বুদ্ধি যোগ তপস্যা মন্ত্র-তন্ত্র কোন কিছুর দ্বারাই নয়, কেবল গভীর ভক্তি দ্বারাই এ-মূর্তি দেখা সম্ভব। তাই বলি—

সর্ব ধর্ম ত্যাগ করি, আমার শরণ নিয়ো,
আমি সব পাপ হরি, শোক বৃথা, হে সুপ্রিয়।

এ-ভাবে সব তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন—অর্জুন, তুমি আমার কথা শুনলে, দেখলে আমার বিশ্বরূপ, শোক-দুঃখ মোহজাল কি তোমার দূর হল? মন হল স্থির?

উজ্জ্বল মুখে অর্জুন বললেন—সমস্ত মোহজাল, সব সংশয় ঘুচে গেছে সখা, আমি আত্মজ্ঞান লাভ করেছি। এবার যা উপদেশ তুমি দেবে তাই পালন করব। সফল হলো কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, অর্জুনকে যুদ্ধে লিপ্ত করালেন। আবার অর্জুন গাণ্ডীব তুলে নিলেন।

অনেকের মতে তাই—কৃষ্ণ হলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান কর্মকর্তা, তাঁরই জন্য তো এ যুদ্ধ হলো, নয় তো যেত এখানেই থেমে। তাই না গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—এমনি ভাবেই ভায়ে-ভায়ে, আত্মীয়ে-আত্মীয়ে দ্বন্দ্ব করে ধ্বংস হবে যদুবংশ।

শাস্ত্রকারগণ বলেন অন্যরূপ, উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ কেবল অর্জুনের সাময়িক সংশয় দূর করেছেন। সে কি রকম? —না, এ যেন কেউ খিদেয় অত্যন্ত কাতর হয়ে বহু প্রয়াসে খাবার জুটিয়ে এনে পরম আগ্রহে খেতে বসেছেন। খাবার মুখে তুলতে গিয়ে হাত নিলেন গুটিয়ে,—এ অখাদ্য তিনি খাবেন না।

এমন অবস্থায় আরেকজন এসে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন —ওগুলো তো লবঙ্গ-কিসমিস্ পেস্তা-বাদাম—খাবার জিনিস। আপনি না খেলে অন্য কেউ খাবে। আপনাকে যখন খেতে দেওয়া হয়েছে, খেয়ে ফেলুন।

এইভাবে খেতে-বসা ব্যক্তিটির সব সংশয় দূর করে তাঁকে আহারে প্রবৃত্ত করানো গেল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করে ক্ষাত্রধর্মে নিযুক্ত করালেন। 'ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন, তিনি যা করাচ্ছেন তাই আমি করে চলেছি; আমি নিমিত্তমাত্র'—এই কামনা-বাসনাহীন উক্তি উপদেশই গীতার মূল কথা।

শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রলয়ের মুখে যুদ্ধ থামিয়ে রেখে আঠারো-পর্ব গীতা আলোচনা করলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুন শুনলেন, পুণ্যব্রত সঞ্জয় শুনলেন। আনন্দে আপ্লুত হলেন অর্জুন।

ভক্তিতে সঞ্জয় বলে উঠলেন—মহারাজ, যেখানে অধর্ম, সেখানে নেই কৃষ্ণ, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সে-পক্ষের জয় সুনিশ্চিত। রাজশ্রী অবশ্যই বরণ করবেন পাণ্ডবপক্ষকে —এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

যে যুদ্ধ ছিল থেমে, কৌরবপক্ষের সংকেত ধ্বনিতে এবারে তা শুরু হয়ে গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও অশ্বত্থামা এই সেনাপতিদের অধীনে আঠারো দিন যুদ্ধ হলো। রচিত হলো তাই নিয়ে আঠারো-পর্ব মহাভারত আর তার আঠারো অধ্যায়ের গীতা। যতখানি মূল্য মহাভারতের ততখানি মূল্য গীতার। সমস্ত উপনিষদ যেন গোমাতা, গীতা দুগ্ধ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপাল, অর্জুন গোবৎস, সুধীজন ভোক্তা। গোপাল যেমন গোবৎস সামনে রেখে দুগ্ধ দোহন করে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি অর্জুনকে সামনে রেখে দোহন করলেন উপনিষদ এবং তার থেকেই ক্ষরিত হল গীতা—দুগ্ধামৃত, মিটল মানুষের পিপাসা। [ক্রমশ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ

[সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী]

সাধারণ্যে শিক্ষাদানের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত যে সকল শিক্ষাব্রতী ছাত্র-সমাজে এক বিরাট শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এমিরিটাস' অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ তাঁদের অন্যতম।

অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অধ্যাপক গুহ শিক্ষকতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন।

অধ্যাপক গুহ ১৮৯০ সালে শ্রীহট্ট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রাজকুমার গুহ তথায় সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া আদি পিতৃভূমি ফরিদপুর জেলার ইসপপুর গ্রামের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি অল্প। তিনি ১৯০৬ সালে শ্রীহট্ট সরকারী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৯০৮ সালে ঢাকা কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর অধ্যাপক গুহ ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

১৯১০ সালে উক্ত কলেজ হইতে অনার্সসহ বি-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯১২ সালে ঐ একই কলেজ হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষা সমাপনান্তে অধ্যাপক গুহ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯১২ সালে রিপণ কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজে) ইংরেজী সাহিত্যের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা লইয়া লেকচারারের পদ গ্রহণ করেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ

রিপণ কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করিবার পর তিনি ময়মনসিংহ এ-এম কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া তথায় ৮ বৎসর কাল অবস্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীর লেকচারারের পদ গ্রহণ করিয়া তথায় চলিয়া যান এবং একাদিক্রমে ২৩ বৎসর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ১৯৪৪ সালে পুনরায় কলিকাতায় পুরাতন কর্মকেন্দ্র রিপন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫০ সালে তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৫ বৎসর কাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯৫৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রিপন কলেজে সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন অধ্যাপক গুহ কলেজের বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করেন। এই কলেজটির সহিত সংশ্লিষ্ট মহিলা বিভাগটি তাঁহারই সৃষ্টি।

অধ্যাপক গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগেও লেকচারার নিযুক্ত ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিণ্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন।

সুবক্তা, লেখক হিসাবে অধ্যাপক গুহের নাম সবিশেষ খ্যাত। তাঁহার রচিত বহু পাঠ্যপুস্তক সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপাঠ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। অবসর গ্রহণ করিবার পরও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার কর্মপ্রেরণা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৯৬১ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে 'এমিরিটাস অধ্যাপকের' সম্মানে ভূষিত করেন। অধ্যাপক গুহ আই-এ-এস পরীক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। বর্ধমান এবং রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার শিক্ষকতার ছাপ বর্তমান। ৭৩ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক গুহ আজও কর্মচঞ্চল এবং মহানগরীর উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহে তাঁহার উপস্থিতি ঘটে সর্বাগ্রে। ১৯৫৯ সালে বরোদায় 'ইংরেজী শিক্ষক সম্মেলনে' তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

[বিশ্বের দরবারে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক দূত]

পুণ্য ভারতভূমির শাশ্বতবাণী পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়ে ভারতের সঙ্গে বিশ্বের সুপ্রাচীন যোগসূত্রকে আরও সুদৃঢ় করার পবিত্র দায়িত্ব সগৌরবে পালন করে স্বজাতির এবং বিদেশের বুকে স্বদেশের মুখ যাঁরা উজ্জ্বল করেছেন বাঙলার বিদগ্ধ কবি ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী সেই তালিকায় একটি স্মরণীয় নাম।
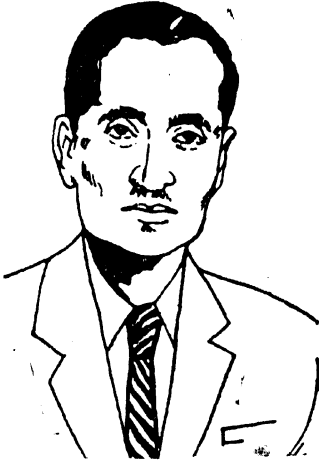
ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পরিপুষ্ট এবং তাঁর ভাবধারার সুযোগ্য ধারক ও বাহক ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের গুরুত্ব এবং মূল্য আজ সর্বজনস্বীকৃত এবং সুধীজন সমাদৃত। আজকের দিনের কবিকুলের তিনি অন্যতম নেতা প্রাবন্ধিক হিসাবে অফুরন্ত শক্তি ও মননশীলতার অধিকারী। বিপুল পাণ্ডিত্যের সুগভীর অনুভূতির এবং তীব্র জীবনবোধের তাঁর মধ্যে এক অভাবনীয় ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটায় বাঙলার রসপিপাসুচিত্ত যে কতখানি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার তুলনা মেলা ভার।

বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক জাগরণে (বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) শ্রীরামপুরের অবদানের অন্ত নেই। অমিয় চক্রবর্তীর জন্মস্থানও সংস্কৃতির ও জাতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম পীঠস্থল এই শ্রীরামপুর। ১৯০১ সালের ১০ই এপ্রিল তাঁর জন্ম। ১৯০১ সালটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। বাঙলা দেশের বহু বিখ্যাত সন্তান ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবি মনীষী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কথাসাহিত্য জগতের অন্যতম দিকপাল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই মধ্যে কয়েকজন। এ কারণে ১৯০১ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। জন্ম বাঙলা দেশে, শিক্ষা বাঙলার বাইরে পাটনায়। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হন এম-এ পরীক্ষায়। অক্সফোর্ডে অর্জন করেন দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট। লাহোরে গবেষণা করেন অক্সফোর্ডের সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসাবে!

শান্তিনিকেতনের গৌরব ও সমৃদ্ধির ইতিহাসে যাঁদের অফুরন্ত অবদান বিশেষভাবে স্মর্তব্য অমিয়চন্দ্র তাঁদেরই একজন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তার পরম গর্ব ও গৌরব অমিয়চন্দ্রের যোগসূত্র স্থাপিত হয় ১৯২৬ সালে। অতি অল্পসময়ের ব্যবধানে উপনীত হলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন তাঁর সার্থক উত্তরসূরী অমিয়চন্দ্র। লাভ করলেন তাঁর একান্ত সচিবের সম্মান! কবিগুরুর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে তাঁরই নামে। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অফুরান আশীর্বাদের এও এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ১৯২৬ থেকে '৩৩ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ যেদিন গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন তাঁর পাশে ছিলেন অমিয়চন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া, বার্মিংহাম, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ ভ্রমণে অমিয়চন্দ্র ছিলেন তাঁর ভ্রমণসঙ্গী। গত পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দ্বারা সম্মানিত করলেন।

১৯৪০ থেকে '৪৮ পর্যন্ত অমিয়চন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে। তারপর শুরু হল প্রবাসজীবন। দু'বছরের জন্য বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন হাওয়ার্ড। কিন্তু কার্যত দেশে ফেরা আর হল না। প্রিন্সটন, ইয়েল ও ক্যানসাস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপনা করার পর ১৯৫৩ সালে যোগ দিলেন বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক প্রাচ্যধর্ম ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে।

তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'চলো যাই' সরকারী পুরস্কারে সম্মানিত। 'সাম্প্রতিক' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন ছাড়া খসড়া, একমুঠো পারাপার, পালাবদল, ঘরে ফেরার দিন প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির জন্ম দিয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সহচর অমিয়চন্দ্রের রচনা 'দ্য সেন্ট এ্যাট ওয়ার্ক' এবং তাঁর সম্পাদিত 'টেগোর রীডার' (১৯৬১) রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সম্পর্কিত সাহিত্য-ভাণ্ডারের দুটি বিশিষ্ট রত্নবিশেষ। এই গ্রন্থ দুটির মাধ্যমে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আকাশে রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর এক অভিনব আলেখ্য অভূতপূর্ব দীপ্তি সমৃদ্ধ হয়ে অঙ্কিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ড. এ্যালবার্ট সোয়াইটজারের সঙ্গে ও ১৯৫৯ সালে বোরিস পাস্টারনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার জন্যে যথাক্রমে আফ্রিকা ও মস্কো পরিভ্রমণ করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারততত্ত্ববিদ এবং বর্তমান বিশ্বের দরবারে ভারতের সাংস্কৃতিক দূত ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী।

অল্পকালের জন্য মাদ্রাজে এসেছেন ছুটি নিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর অধ্যাপকরূপে। ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। ঘরের ছেলেকে ঘর ফেলে আবার পাড়ি দিতে হবে বিদেশে। আবার ঘরছাড়ার প্রহর ঘনিয়ে আসছে। বিদায় বাঁশরীর সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠছে চারদিকের আকাশ-বাতাস।

ডাঃ অরুণকুমার নন্দী

[জনহিতব্রতী বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ]

জনসেবা যাঁহাদের জীবনের আদর্শ এবং জনগণের কল্যাণসাধন যাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা ডাঃ অরুণকুমার নন্দী তাঁহাদেরই একজন। শুধু রোগীর সেবাই নয় জনসেবার বহু ক্ষেত্রেই যে তাঁহার সেবক-হস্ত প্রসারিত, পার্কসার্কাস শিশু বিদ্যাপীঠের উন্নয়নকল্পে ৬০,০০০৲ টাকা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নততর গবেষণার উদ্দেশ্যে ৫০,০০০৲ টাকা দান তারই অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

ডাঃ অরুণকুমার নন্দী ১৯০৩ সালে ঢাকা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীপ্রাণকুমার নন্দী স্থায়িভাবে ঢাকা সহরে বাস করিতেন

ডাঃ অরুণকুমার নন্দী

বলিয়া ডাঃ নন্দীর উক্ত সহরেই বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। ১৯১১ সালে ঢাকা পাকোজা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ হইতে আই, এস-সি পাশ করিয়া ঐ বৎসরই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তিনি ১৯২৭ সালে এম, বি, ডিগ্রি লাভ করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করেন এবং তথায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, আর, সি, পি ডিগ্রি লাভ করিয়া ডাঃ নন্দী স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তদানীন্তন সরকারের অধীনে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে' যোগদান করেন। ২৫ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া সুনামের সহিত বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল এবং কলেজ হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং সুনামের সহিত কাজ করিয়া ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণকালে ডাঃ নন্দী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর গ্রহণ করিবার পরও সরকারী অনুরোধে ডাঃ নন্দী পুনরায় উক্ত পদে নীলরতন সরকার হাসপাতালে যোগদান করেন এবং আজ পর্যন্ত ঐ পদেই বহাল রহিয়াছেন। ৮৬ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা এবং সহধর্মিণী শ্রীমতী জহর দেবী তাঁহার কর্মময় জীবনের একমাত্র প্রেরণা। স্বীয় পেশার প্রতি আন্তরিকতার প্রমাণ রাখিয়াও বিভিন্ন এসোসিয়েশনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন তিনি। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশান 'ইণ্ডিয়ান হার্ট স্পেশালিষ্ট এসোসিয়েশান' এবং অল ইণ্ডিয়া ফিজিসিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন ডাঃ নন্দী। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, বি; এম, ডি পরীক্ষার পরীক্ষক রূপেও নিযুক্ত আছেন তিনি। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার আরব্ধ জ্ঞানে আজও উপকৃত হচ্ছে বহু ছাত্রছাত্রী।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালেক্টর অফ এক্সাইজ]

সদাই হাসি এবং মিষ্টভাষী শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে সেদিন কালেক্টর অফ এক্সাইজ (পশ্চিমবঙ্গ) রূপে দেখে এলাম। কয়েকটি ঘণ্টা কাটিয়েছিলুম তাঁর সাথে। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় পরিপুষ্ট শ্রীচক্রবর্তী আজ সবার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে বিরাট ভাবগম্ভীর পরিবেশে তন্ময়। সরকারী অহঙ্কার বা অহমিকা কোথাও নেই। নিতান্ত সাধারণ এই মানুষটির জন্ম হয় ১১শে মার্চ ১৯১৫ সালে কুচবিহারের অন্তর্গত দিনহাটা গ্রামে। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী বিশেষ দক্ষতা নিয়েই ১৯৩১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং সারা কুচবিহারের মধ্যে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এই পরীক্ষায় বেশ কয়েকটি স্টার (Star) এবং লেটারও পান। এর পরেই কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে পাঁচটি লেটারসহ চতুর্থ স্থান অধিকার করে আই-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। অধ্যয়নে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়েই তিনি এর পর বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হন এবং তৎকালীন 'লণ্ডন কবডেন ক্লাব' পদক পান।

১৯৩৮ সালে 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা দিয়ে তিনি এক্সাইজ সার্ভিসে নির্বাচিত হন। এর পরই শ্রীচক্রবর্তীর কর্মময় জীবনের আরম্ভ। ১৯৩৯ সাল হতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই তিনি 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ এক্সাইজ' পদে কাজ করে ডেপুটি কমিশনার অফ এক্সাইজ পদে উন্নীত হন।

১৯৫৭ সালে তাঁর সুনিপুণ কর্মকুশলতা তাঁকে 'কালেক্টর অফ এক্সাইজ'-এর আসনে অধিষ্ঠিত করল।
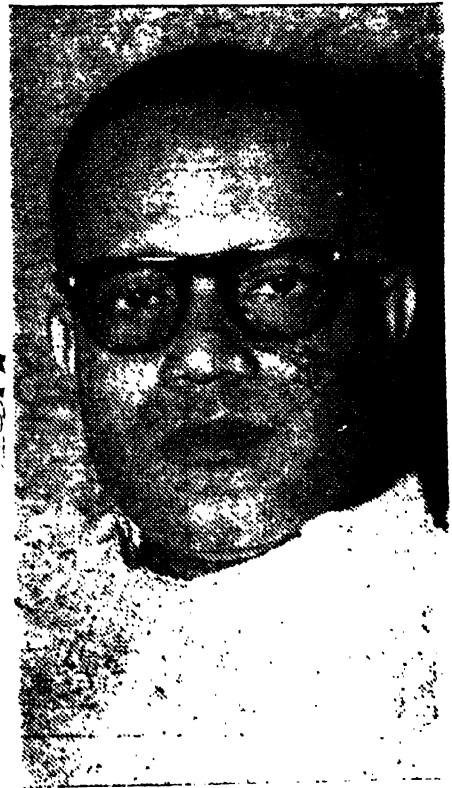
শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী

এর মধ্যে ১৯৩৮ সালে শ্রীচক্রবর্তী সংসারধর্মে প্রবেশ করেন। ৺যতীন্দ্রমোহন গোস্বামীর কন্যা শ্রীমতী শান্তিময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

পরিবেশের শুচিতায় তাঁর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁরা তাঁর সহপাঠী ছিলেন আজ তাঁদের অনেকেই তাঁর সমমর্যাদায় অলঙ্কৃত হয়েছেন। এঁরা সকলেই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্তাস্থানীয়। উল্লেখযোগ্য এঁদের মধ্যে শ্রীদুর্গা ভট্টাচার্য (মালদহ কলেজের অধ্যক্ষ), শ্রীশৈলজানন্দ ভট্টাচার্য (ডেপুটি সেক্রেটারী, ক্যালকাটা কর্পোরেশন), চিত্তরঞ্জন কোনার, (অর্থ-উপদেষ্টা রাউরকেল্লা ষ্টীল প্ল্যাণ্ট), শ্রীকালিদাস লাহিড়ী, (ডেপুটি সেক্রেটারী এডুকেশন) এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (টেগর প্রফেসর, ভারতীয় ভাষা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)।

বর্তমানে শ্রীচক্রবর্তীর দুই পুত্র ও একটি কন্যা অধ্যয়নে রত। কন্যা কুমারী স্বাতী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মডার্ণ হিষ্ট্রী' বিষয় নিয়ে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। পুত্র বাসব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও সুস্বদ স্কুলে অধ্যয়ন করছে। মোটের ওপর এক কথায় এই নিরহঙ্কার মানুষটি প্রত্যেককেই নিজের আপনজন হিসাবে গ্রহণ করে নেন। সাধ্যমত সুযোগ ও সাহায্য করতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজে একজন রসজ্ঞ ও কবি। কিন্তু স্বরচিত কবিতাগুলি লিখেই আনন্দ পান—প্রকাশ করার কোন চেষ্টাই নেই—এত আনন্দময় ব্যক্তিটিকে সরকারী বেড়াজালের তকমা আঁটা সিন্দুকে দেখতে সত্যই মনটা যেন কেমন করে ওঠে। তাই সাধারণ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটলে শ্রীচক্রবর্তীর সরকারী পরিচয় স্তিমিত হয়ে কাব্য-সাহিত্যের আকাশে একটি নতুন আবির্ভাব হিসাবে তাঁর পরিচিতি জনসাধারণের দরবারে আরও সুবিস্তৃত হয়ে উঠবে। আমরা সেদিনটির প্রতীক্ষা করে রইলুম।

আনমনে — শিল্পী—অরুন্ধতী ঘোষ

মাতৃবন্দনা

দেশকে বড় করে তুলতে হলে বা সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ বা patriotism জাগানো দরকার, সংগীত এর এক কার্যকরী মাধ্যম। আলোচ্য গ্রন্থে এই ধরণের বহু সংগীত একত্র সংকলিত হয়েছে। এই সংগীতমালার অধিকাংশই রচিত হয়েছে জাতীয় আন্দোলন বা বৃটিশ শাসনপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামের সূচনাকাল থেকে, এর মধ্যে এমন অনেকগুলি গান আছে যা এক সময় শত শত প্রাণে এনেছে উৎসাহের জোয়ার—যার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেছে আবাল-বৃদ্ধবনিতা রাজশক্তির উদ্যত কৃপাণের সামনে। এই ধরণের গানগুলি জাতীয় সম্পদ বলেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য এবং সেজন্যই আলোচ্য সংকলনটিকে মূল্যবান বলে অভিহিত করাটাও অসঙ্গত নয়। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে এতাবৎকাল পর্যন্ত জাতীয়তামূলক যতগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গান রচিত হয়েছে তার প্রায় সমস্তই বর্তমান গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। পরিশিষ্টে রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয় সন্নিবেশিত হওয়ায় সংগ্রহটির আকর্ষণ আরও বেড়ে গিয়েছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। সংকলয়িতা—শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-ব্যাকরণ, পুরাণ-কৃত্যতীর্থ। প্রকাশক—এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বেদমূর্তি—শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে। রচয়িতা স্বয়ং পরমহংসদেবের ভক্ত অনুগামী সন্ন্যাসী, মনে হয় স্বীয় আন্তরিকতায় গুরুর ধ্যানরূপটি যথাযথ ভাবেই তাঁর মানসে প্রতিফলিত। বর্তমান রচনায় তিনি হিন্দুধর্মের সনাতনরূপ বেদের সঙ্গে পরমহংসদেবের যে একাত্মতা বর্তমান, সেই সম্পর্কেই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার এই উপলক্ষে যে জ্ঞানগম্ভীর ও মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন ভক্ত ও বোদ্ধা উভয়বিধ পাঠকই তা পাঠে আনন্দলাভ করবেন। বাংলা ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বহুবিধ পুস্তকাদি এযাবৎ রচিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকলেও হিন্দীতে এ ধরণের রচনার বিশেষ অভাব আছে; সেদিক থেকে দেখতে গেলে গ্রন্থকার একটা বিশেষ অভাব মোচন করলেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বামী অপূর্বানন্দ। প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম—

আয়না

স্মৃতিচারণমূলক কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত রচনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন লেখক এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই গ্রন্থের 'আয়না' নামটি সার্থক। মোট চারটি বিশ্লেষণমূলক গল্প সংকলিত হয়েছে একত্র, প্রথম রচনাটি সম্পূর্ণতই আত্মবিশ্লেষণমূলক, স্মৃতিচারণের কোন আভাসই এর মধ্যে নেই, পড়তে পড়তে মনে হওয়াটা অসঙ্গত নয় যে ব্যক্তিগত দিনপঞ্জীর এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করাটাই বুঝি বা লেখকের মৌল উদ্দেশ্য, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই পাঠকের মনে সত্য ধরা পড়ে; জীবনের আদালতে দাঁড়িয়ে যেন নিজেকেই বিচার করে দেখতে চাইছেন লেখক, এ রচনা তারই জবানবন্দী মাত্র। পরের তিনটি রচনায় স্মৃতিচারণের আভাস রয়েছে লেখকের স্বচ্ছ আন্তরিকতায় যা মনোরম ও উজ্জ্বল। আজকের যুগের এক কীর্তিমান সাহিত্যকারের ভাবনার আঁকাবাঁকা রেখায় চিহ্নিত আলোচ্য গ্রন্থটিকে তাঁর পাঠক-সমাজ আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি, কারণ স্বভাবতই সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হলে পর স্রষ্টার সম্বন্ধেও আমাদের একটা কৌতূহল জেগে ওঠে। তারাশঙ্করের পরিণত লেখনী আত্মসমীক্ষার আয়নায় যেন এক নতুন মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে, আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে মননশীল পাঠকমাত্রই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবেন। বইটির আঙ্গিক শোভন ও পরিচ্ছন্ন। লেখক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা।

ভাসো আমার ভেলা

কল্লোল যুগের অন্যতম সাহিত্যকার 'বুদ্ধদেব বসু'কে যেন নতুন করে আবিষ্কার করা যায় আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর তিরিশটি গল্প একত্র সংকলিত হয়েছে, এদের জন্ম ও কর্ম অর্থাৎ রচনাকাল ও মেজাজ আলাদা আলাদা এবং বোধ হয় সেজন্যই লেখকের সত্তা এদের মাধ্যমে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছে। মননশীল সাহিত্যকার হিসাবেই 'বুদ্ধদেব বসু' প্রধানত পরিচিত, আলোচ্য গল্পগুলি পড়লেও এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হওয়া যায়, কমল-হীরের দ্যুতির মতই মার্জিত এক মননের ছাপে এরা সমুজ্জ্বল, লেখকের অতি স্পর্শকাতর ও তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ব্যক্তিসত্তার একটি রূপও ধরা পড়ে এদের মাঝে। বিষয়বস্তু ও রচনারীতির বৈচিত্র্য এই সংকলনের আর এক সম্পদ। বহু বিষয় নিয়ে ভেবেছেন লেখক আর সেই ভাবনাগুলিই যেন বাণীরূপ পরিগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের সামনে। বুদ্ধদেব বসুর অনন্য শৈলী এ গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে, তীক্ষ্ণ অথচ মর্মস্পর্শী তাঁর বাচনভঙ্গী, তার দীপ্তি তার ঔজ্জ্বল্য সত্যই অনন্য। তাঁর বক্তব্য সোজা গিয়ে স্পর্শ করে পাঠকের মননকে 'ইনটেলেকচুয়াল' লেখক বলতে সাহিত্যের পরিসরে যে ক'জনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়, 'বুদ্ধদেব বসু' যে তাঁদের মধ্যেও বিশিষ্ট, আলোচ্য সংকলনটি হাতে নিলে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। এই মূল্যবান ও আকর্ষণীয় গ্রন্থটি প্রকাশ করে প্রকাশক পাঠক-সমাজের আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জন করলেন। লেখক—বুদ্ধদেব বসু। প্রকাশনায়—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—বারো টাকা।

ছোটদের কেনেডি

জন. এফ. কেনেডি. অসহায় আর্ত মানবতা একদিন মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিল এই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কি ছিল এই নামে ? জানতে হলে এ নামের পটভূমিকে জানা দরকার সর্বাগ্রে। আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থের মাধ্যমে সেই প্রয়োজনই সুষ্ঠ ভাবে সাধিত হয়েছে। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান পরলোকগত আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট কেনেডির জীবন ও কর্মের এক পূর্ণাঙ্গ ও সরল রূপায়ণ করা হয়েছে এই রচনায়। কেনেডির আদর্শবাদ ও কর্মধারার মূল উৎস যে তাঁর পারিবারিক পটভূমিতেই নিহিত ছিল এ সত্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর জীবনচিত্রের আলোচ্য নিদর্শনটির মাধ্যমে. সেই সঙ্গে তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বকেও যেন কিছুটা ধরা ছোঁয়া যায়। লেখকের শৈলী অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং অনুবাদকের দক্ষতাও উল্লেখ্য। মূলত কিশোর পাঠ্য হলেও বয়স্ক পাঠকের কাছেও গ্রন্থটির আবেদন কম নয়। আমরা বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কামনা করি। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই শোভন। লেখক—ব্রুস্ লী. অনুবাদক—পরীক্ষিৎ. প্রকাশনায়—আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪. চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা।

মার্ক্সবাদ

বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে সহজেই অবহিত হতে পারেন পাঠক বর্তমান সংক্ষিপ্ত রচনাটির মাধ্যমে। কার্ল মার্ক্স সাম্যবাদের জনক বলেই কথিত. মানব সমাজের গতি ও প্রকৃতি ও তার চরম কল্যাণের জন্য তিনি যে পথ অনুসন্ধান করেন তাই মার্ক্সবাদ, অর্থাৎ তাঁর এই নীতি অনুসারেই তিনি আমাদের এই জগৎ মানবসমাজ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব পরিবেশন করেন সেটাকেই সংক্ষেপে মার্ক্সবাদ বলা হয়ে থাকে। মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে আজকের দিনে ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসার অভাব নেই এবং আলোচ্য গ্রন্থে সেটাই কিছুটা মেটাবার মত উপাদান আছে। বর্তমান যুগের এক বিশিষ্ট ভাবধারাকে এই গ্রন্থে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে দেখানোর একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়েছে। মূল গ্রন্থটি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার কাজটি অনুবাদক যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গেই সমাধা করেছেন। আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—এমিল বার্ণস। অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, প্রকাশনায়—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—১২। দাম—দেড় টাকা।

অনিমিত্তা

অসামান্য এক যাদুভরা লেখনীতে লেখা কাহিনী গতির বলিষ্ঠতার প্রাণের দ্যুতিতে সহজেই স্পর্শ করে মননকে। বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে প্রাণচঞ্চলা একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে, নাম তার রুচিরা। যৌবনের ক্ষণিক উন্মাদনার ভুলকে ফুল করে তোলার জন্য সাময়িক ভাবে এক বন্ধনকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো রুচিরা, অনেক দ্বিধা অনেক দ্বন্দ্বের পর বন্ধনমুক্তি ঘটলো তার কিন্তু সেখানেই কি শেষ হল সব ? উপন্যাসের পরিণতি এর জবাব দেয়, পরিণত সাহিত্যকারের সার্থক কলম পাঠকচিত্তকে যেন আবিষ্ট করে তোলে ; সংলাপের ঔজ্জ্বল্যে, সম্ভাবনার দীপ্তিতে তাঁর রচনা সত্যই রম্য। মননশী লেখক হিসাবে অচিন্ত্যকুমারের দাবী যে সামান্য নয় বর্তমান রচনা যে নতুন করে সে কথাটাই ঘোষণা করে। সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকমাত্র আলোচ্য গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রকাশক—এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—সাড়ে চার টাকা।

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বর্তমান, কারণ সাহিত্যের মাধ্যমেই সংস্কৃতি বিকশিত হয় ও এই সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের মাধ্যম হল গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী। আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয়েরই প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের প্রারম্ভিক জন্মকথা থেকে তার বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসরণ করে লেখক তার গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেছেন, সেই সঙ্গে বর্তমানে অগ্রসর দেশগুলিতে গ্রন্থাগারের কতটা উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে এবং সামাজিক মানোন্নয়নে তার অবদান কতটা একথাও বিশদভাবে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন। সামগ্রিক ভাবে দেশের জনজীবনে গ্রন্থাগারের কল্যাণমূলক অবদান যে কতটা প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা যায় বর্তমান গ্রন্থটি পড়লে। আলোচ্য গ্রন্থটিকে তাই বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের পরিসরে এক প্রামাণ্য সংযোজন বলে উল্লেখ করাটাও অসঙ্গত নয়। আঙ্গিক শোভন. ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। দাম—পাঁচ টাকা।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংগ্রহ, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম বহুল প্রচারিত না হলেও কাব্যরসিক জনের অজানা নয়। রবীন্দ্র প্রভাবিত যুগে জন্মগ্রহণ করেও যে ক'জন প্রতিভাধর, কাব্যের আঙ্গিকে ও মানসে নিজস্ব স্বকীয়তা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনিও তাঁদের একজন। মূলত—যতীন্দ্রপ্রসাদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সার্থকতম উত্তরসাধক এবং এজন্যও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বাঙালী কাব্যরসিক মহলে যথোচিত ঔৎসুক্যের সঞ্চার হওয়া প্রয়োজনীয়। আলোচ্য সংকলনে তাঁর প্রায় একশতটি কবিতা স্থান পেয়েছে এবং একথা অনস্বীকার্য যে, স্বাদে ও গন্ধে তারা মনোরম। ভারি একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায় এই কবিতাগুলির মাঝে, সে সৌন্দর্য হিমস্নাত শেফালীর মতই মধুর ও উজ্জ্বল। এমন একটি সুন্দর কাব্য সংকলন প্রকাশ করে প্রকাশক ও সংকলক উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ হলেন। প্রচ্ছদ রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। সম্পাদক—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, পরিবেশক—কলিকাতা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

পাহাড়তলির দুই কন্যা

আলোচ্য উপন্যাসে এক বিপ্লবী যুবকের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে, সুদূর ভুটানের চা বাগান এলাকায় একদিন আত্মগোপন করে

কয়েকটা দিন কাটাবার উদ্দেশে এসেছিল বিপ্লবী রজত, মিথ্যা পরিচয়ে লুকিয়ে অজ্ঞাতবাস করার দিনগুলিতে কঠোর বিপ্লবী মনেও দোলা দিয়ে গেল দু' একটি মমতাময়ী মেয়ের সহৃদয়তা, যাওয়ার লগ্নে বেদনায় বিধুর হয়ে উঠল রজতের মন। বেশ একটা সহজ নৈপুণ্যের সঙ্গে কাহিনী বয়ন করে গিয়েছেন লেখক, চরিত্র-চিত্রণেও তাঁর মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীবীরু সরকার, প্রকাশক—লোক সাহিত্য সংসদ, বারাসত, দাম—দু' টাকা।

প্রতিবেশিনী

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, অনুবাদের মাধ্যমেই বিদেশীয় ও বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের রস আস্বাদন করে তৃপ্ত হন সাহিত্য-পাঠকের একটা বৃহৎ অংশ। বাংলা সাহিত্যের আসরেও অনুবাদ-সাহিত্য একটা চিহ্নিত স্থানের অধিকারী, তবে এ যাবৎ শুধু পশ্চিমী সাহিত্যই এ বাবদে অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে, অর্থাৎ ইংরাজী, ফরাসী বা রুশীয় সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করতে যতজন উদ্যোগী হয়েছেন আমাদের প্রতিবেশী বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তার শতাংশের একাংশও উৎসাহিত বোধ করেন নি। বর্তমানে যে এই ত্রুটি মার্জনা করবার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা চলেছে, এটা খুবই সুখের বিষয়। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহটি সেই প্রচেষ্টারই এক সফল রূপায়ণ। আমাদেরই প্রতিবেশী তামিল, তেলেগু, মারাঠী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী সাহিত্য যে বর্তমানে কতটা বিকশিত কয়েকটি সুনির্বাচিত গল্প অনুবাদের মাধ্যমে তাই সপ্রমাণিত করেছেন অনুবাদক। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ তিনি সুপরিচিত, বস্তুত বহু জাতি ও বহু ভাষার পীঠস্থান ভারতকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে হলে সর্বাগ্রে চাই একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য, আর সেটা সাহিত্যের মাধ্যমেই সাধিত হওয়াটা সর্বাপেক্ষা সহজ কারণ মানুষের ভাবধারা এই পথেই স্বচ্ছন্দে আনাগোনা করতে পারে, এদিক দিয়ে দেখতে গেলে অনুবাদক যে তাঁর কর্মের দ্বারা শুধু সাহিত্যেই নতুন প্রাণ সঞ্চার করছেন তা নয়, সমগ্র দেশেরই কল্যাণ সাধন করছেন। তাঁর অনুবাদও সফলতায় মণ্ডিত, কারণ তা জড়িমামুক্ত ও সাবলীল, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য-সংযোজন। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদক—বোম্মানা বিশ্বনাথম্, প্রকাশনায়—ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—সাড়ে চার টাকা।

রায়বাড়ির রহস্য

রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর উপর বালক-বালিকার স্বভাবতই কিছুটা টান এবং এই ধরণের বই হাতে পেলে তারা খুশিই হয়ে ওঠে সচরাচর, বর্তমান গ্রন্থটিও ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেবে বলেই মনে হয়। বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে কাহিনীর জাল বুনে গিয়েছেন লেখক, তাঁর শৈলীও পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। প্রকাশনায়—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬। দাম—দেড় টাকা।

নিজে ব্যবসা করুন

আলোচ্য পুস্তকটি নানা ধরণের ৪৬টি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের এক সংকলন। কি করে স্বল্প মূলধন ও টুকিটাকি মালমশলা নিয়ে ছোটখাট ব্যবসা করা যেতে পারে, বর্তমান গ্রন্থে তারই আলোচনা করা হয়েছে এবং এই আলোচনা শুধুই তত্ত্বগত নয়। হাতে কলমে কাজ করে কি ভাবে দৈনন্দিন ব্যবহারের বহুবিধ জিনিষপত্র তৈরি করা যেতে পারে তাও এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এতে এমন অনেক কিছু প্রস্তুত করার প্রণালী শেখানো হয়েছে যা মোটেই ব্যয়সাধ্য নয় অথচ মোটামুটি লাভজনক ব্যবসা বিমুখ বাঙালী বেকার এই ধরণের ব্যবসা অবলম্বনে সহজে কিছু উপার্জন করতে পারেন, আশা করি এই বইটি পাঠে তাঁরা সে বিষয়ে উৎসাহিত হতে দ্বিধা করবেন না। নিজে ব্যবসা করুন—(হস্তশিল্প) শিল্পকুশলী, প্রকাশক—আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

সংগীতাগম

উচ্চাঙ্গ বা মার্গসংগীতের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগীতের বহুল আলোচনা, অনুষ্ঠান এবং নিত্যনূতন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ করে এবং এই বিষয়ক পুস্তক পত্র-পত্রিকারও বর্তমানে প্রচার যথেষ্ট। বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র 'আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট' সংস্থার মুখপত্র আলোচ্য সংগীত বিষয়ক পুস্তিকাটিও এই কারণেই উল্লেখ্য। সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রচনগুলি সংগীত রসিককে আনন্দ দান করবে বলেই আমরা আশা করি। কয়েকজন বিখ্যাত সংগীত সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হওয়ায়, পুস্তকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—শ্রীরঞ্জিত গুহঠাকুরতা, আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট, ১, অপূর্ব মিত্র রোড, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। দাম—তিন টাকা মাত্র।

অশ্রুত এক রাগিণী

আলোচ্য গ্রন্থখানি এক অনুবাদ; ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ঘটানোর গুরুদায়িত্ব পালনের ব্রতে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদক তাঁদের অন্যতম; বর্তমান অনুবাদ কর্মটির মূল রচনা সিন্ধী ভাষায়, শ্রীসুন্দরী আসসানদাস উত্তমচন্দানী সিন্ধী সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সামনের সারির একজন, তাঁরই এক বহুল প্রচারিত উপন্যাসের অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থটি। অনুবাদকের দক্ষতায় মূল গ্রন্থের রস অব্যাহত রয়ে গেছে, দেশ, কাল ও জাতির দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষে মানুষে যে মৌল পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই আলোচ্য অনুবাদের মাধ্যমে তা বোঝা যায় সহজেই; ঠিক যেন বাঙালী গৃহস্থ কোন পরিবারকেই উপস্থাপিত দেখি কাহিনীর পটভূমিতে। এ ধরণের অনুবাদ যে কোন সাহিত্যের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, অনুবাদকের ভাষাজ্ঞান ও আন্তরিকতা রীতিমত প্রশংসা দাবী করতে পারে। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা সুন্দরী আসসানদাস উত্তমচন্দানী, অনুবাদক—বোম্মানা বিশ্বনাথম, প্রকাশনায়—রেখা প্রকাশনী। ১০বি, জগন্নাথ সরকার লেন, কলিকাতা- ২৩। দাম—আড়াই টাকা।

সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান

আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকের শ্রেণিভুক্ত। ভারত শাসন পদ্ধতি বা পৌরবিজ্ঞান সম্পর্কে সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে এখানে, যাতে কিছুটা আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরাও বুঝতে পারে। স্বদেশের শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে অন্তত একটা ধারণাও জন্মাবে ছেলে-মেয়েদের এ গ্রন্থের মাধ্যমে। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লিপিমাধুর্য ও অমিয়বাণী

'প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের' নাম ভক্তিমার্গের পথিকগণের অজানা নয়, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর স্বহস্ত লিখিত কয়েকটি লিপি ও শিষ্যবৃন্দের উদ্দেশে বিতরিত তাঁর অমিয় উপদেশামৃত সংকলিত হয়েছে। উক্ত সাধুপুরুষের এক শিষ্য স্বয়ং সংকলনকর্তা, অতএব আশা করা অন্যায় নয় যে, সেগুলি যথাযথ ভাবেই প্রামাণ্য। মহাপুরুষের বাণী বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য রচিত হলেও তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দ যে এ থেকে সমধিক আনন্দলাভ করবেন, একথা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য সমভাবেই। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সমাজদার, ১২ নং, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

গল্প বলি শোন

ছোট ক'টি গল্পের সংগ্রহটি, ছোটরা হাতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়। লেখক যেন পাঠক-পাঠিকাদের সামনে রেখেই যেন গল্প বলে যাচ্ছেন এমনই সুন্দর সরল তাঁর শৈলী, ছোটরা তো বটেই বড়দের কাছেও তাই গল্পগুলি সমাদর পেয়ে যায়। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রসূন পাল, প্রকাশনায়—এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ/১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২ দাম—দেড় টাকা।

পদ্ম-পলাশ

একটি করুণ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। শম্পা, যৌবনবতী সুচরিতা শম্পা ভালবেসেছিল পার্থকে, কিন্তু ঘটন বৈচিত্র্যে সে প্রেম হল না সার্থক। সংস্কারের বেড়াজালে বন্দী দুটি প্রাণ মিলনের প্রতীক্ষার প্রহর না গুণে চির বিরহকে বরণ করে নিল অবশেষে। কেমন একটা নেতিবাচক সুর বাজতে থাকে, লেখকের বক্তব্যের মাঝে আদর্শবাদ দেখাতে গিয়ে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, ফলে কাহিনীর গতি হয়েছে দুর্বল ও শ্লথ। ভাষাভঙ্গী রোমান্টিক, লেখকের আন্তরিকতার আভাসও পাওয়া যায় রচনাটির মাঝে। প্রচ্ছদ আধুনিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুধাংশু সরকার, প্রকাশনায়—গ্রন্থলোক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

ডাকটিকেটে ও পোস্টকার্ডে মহাকাশ যাত্রা

নিকোলাই তাগ্রিন্

[লেনিনগ্রাদের নিকোলাই তাগ্রিন জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একজন সভ্য। তাঁর হাতে আছে পাঁচ লক্ষ পোস্টকার্ড। এই সংগ্রহ পৃথিবীর বৃহত্তম সংগ্রহগুলির অন্যতম। মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত ডাকটিকেট, বিশেষ করে পোস্টকার্ড সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এখানে দেওয়া গেল।]

সোভিয়েত দেশের মহাশূন্য অভিযানের সাফল্য নতুন একদল সংগ্রাহকের সৃষ্টি করেছে। দেখা দিয়েছে নানাবিধ চিত্তাকর্ষক সংগ্রহ : ডাকটিকেট, লেফাফা, ডাকঘরের স্পেশ্যাল ছাপ, ব্যাজ, মেডাল, দেশলাই-এর বাক্সের লেবেল, লজেন্স-চকোলেট ইত্যাদির মোড়কের কাগজ। এই সব স্মারকের একটি চমৎকার প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল লেনিনগ্রাদের কিরভ সংস্কৃতি-প্রাসাদে। এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিল লেনিনগ্রাদ কালেক্টর্স সোসাইটি। আমাদের, পোস্টকার্ড সংগ্রাহকদের, কাজটা বড় সহজ নয়। দেশ-বিদেশে এত অধিক সংখ্যায় 'মহাকাশ'—পোস্টকার্ড ছাড়া হয়েছে যে আমাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে। সোভিয়েত দেশের বিখ্যাত মহাকাশচারীদের প্রতিকৃতি (তাঁদের স্বাক্ষর সহ) বাজারে ছাড়া হচ্ছে লক্ষ লক্ষ। বহু সংখ্যক বৈদেশিক পোস্টকার্ডে সোভিয়েত মহাকাশ-বীরদের ছবি, বিভিন্ন দেশের জনসমাবেশে ও সম্বর্ধনা-সভায় তাঁদের নানা ভঙ্গির ছবি। মহাকাশ জয়ের অভিযানে পৃথিবীর প্রথম নারী নভশ্চারিণীর অংশগ্রহণের পরে স্মারক ডাকটিকেট ও পোস্টকার্ডের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য আরো বেড়ে গিয়েছে। অ্যালেক্সিয়া তেরেশকোভা আর্টিস্টদের কল্পনায় চাড়া দিয়েছেন, তাঁদের সৃজনাত্মক উদ্ভাবনের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। সংগ্রাহকের ভাণ্ডার সব রকমের বিস্ময় ভরা। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একখানি পোস্টকার্ড পেয়েছি। এই পোস্টকার্ডে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে। কার্ডের আর এক পিঠে মুদ্রিত স্বর্গীয় রাজ্য 'সেলেস্টিয়া' সম্পর্কে একটি টীকা।···ব্যাপারটা এই : ১৯৪৮ সালে ইলিনোইস-এর জেমস্ মেনগেন্ চন্দ্র থেকে সুদূর নীহারিকাগুলি পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের আয়তনের উপর তাঁর অধিকারের দাবি জানান। মেনগেন তাঁর এই তামাম স্বর্গরাজ্যের জন্য একটি সংবিধানও রচনা করেন। তাঁর স্বর্গ-রাজ্য-মার্কা একখানি পোস্টকার্ড আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে জেমস্ টমাস্ মেনগেন লিখে জানিয়েছেন : 'প্রিয় অধ্যাপক ! আপনার পাঁচ লক্ষ পোস্টকার্ড সংগ্রহের কথা আমি শুনেছি। আপনার সংগ্রহে আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে ঐ পোস্টকার্ডখানা পাঠাচ্ছি। এতে উল্লেখিত বিষয়ের উপর অনেকে গুরুত্ব দেয় না। আশা করি আপনি গুরুত্ব দেবেন। আপনার সংগ্রহে এই কার্ডখানি দীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষিত থাকলে ভবিষ্যতে একদিন দেখা যাবে আমার কথা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে।' মিঃ মেনগেনের উদ্ভট স্বপ্নসাধ সার্থক হোক বা না হোক, মানব জাতির যুগ-যুগান্তের মহাকাশ জয়ের স্বপ্ন সত্য হওয়ার দিন বুঝি আর বেশি দূরে নয়।
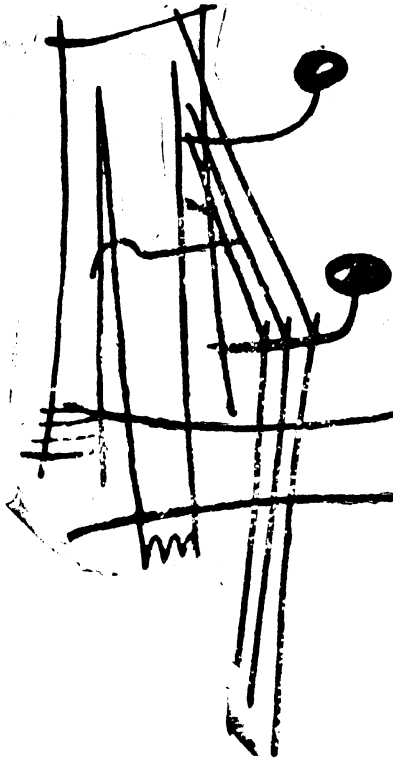
রবিশঙ্কর একটি নাম

সুজিত নাগ

হিমবাহের সঙ্গে তুলনা দিলে হয়ত কিছুটা উচ্ছ্বসিত শোনাবে, কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগীত নির্দেশক পণ্ডিত রবিশঙ্করের সমগ্র জীবনের বিস্ময়কর সাধনার আর দ্বিতীয় কোন উপমা নেই। তাই রবিশঙ্কর একটি সুরঝঙ্কৃত নাম।

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই রবিশঙ্করকে বিচিত্ররূপে—যেখানে তিনি একজন মাত্র নন, অন্যতম। রবিশঙ্করকে প্রথম পাদপ্রদীপের সামনে দেখা গেছে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত অগ্রজ উদয়শঙ্করের সঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে।

তখন রবিশঙ্কর মাত্র নৃত্যশিল্পী। বিশ্বপরিক্রমায় তাঁকে দেখা গেছে। রবিশঙ্করের নৃত্যের প্রতি ঝোঁক থাকার জন্যেই উদয়শঙ্কর তাঁকে শিখিয়ে ছিলেন মনের মত করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গুরুশঙ্কর নাম্বুদ্রির শিষ্য করে দিয়েছিলেন।

দশ বৎসর বয়সেই উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে প্যারিসে গেলেন রবিশঙ্কর। সেতার যন্ত্রের প্রতি তাঁর একটি ঝোঁক দেখা দিল, প্যারিস ও ইউরোপ-এর বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রতিভার যোগ্য সমাদর পেলেন, সেতার বাজালেন, নাচ দেখালেন।

রবিশঙ্কর ভাবলেন, নৃত্য ছেড়ে সঙ্গীতে কি করে আসবেন? আপন মনে রাগসাধনা শুরু করলেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রবল যন্ত্রণা এলো তাঁর, তবে কি বিফল হবে তাঁর এই নীরব সাধনা? ব্যর্থ হবে সুর ও যন্ত্র? সুযোগ এল অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত।

১৯৩৫ সালে উদয়শঙ্কর যখন তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ইউরোপ সফরে গেলেন, সেই সময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এই সফরে অর্কেষ্ট্রার পুরোধা। রবিশঙ্কর যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হলো যেন ঋষিকল্প সংস্পর্শে খুঁজে পেলেন উত্তরণের পথ। কিন্তু আলাউদ্দিনের মত ওস্তাদের কাছে শেখা এক পরম সৌভাগ্যের কথা। অনুরোধ করা হল। প্রথমে রাজী হলেন না, তারপর কি মনে ভেবে প্রতিশ্রুতি দিলেন, হয়ত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব দেখতে পেয়েছিলেন রবিশঙ্করের মধ্যে প্রাণের আকৃতি।

শুরু হল সেতার আর সংগীত সাধনা। গুরু ঋষি আলাউদ্দিন খাঁ। ইউরোপে থাকার সময় আলাউদ্দিনও ভালবাসলেন প্রাণ দিয়ে শিষ্যকে। শুরু হল নিরলস সাধনা।

তারপরের ইতিহাস আরও বিস্ময়কর। ১৯৩৮ সালে রবিশঙ্কর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে চলে এলেন সমস্ত লোভ জয় করে সংগীতের পথে—নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে।

রবিশঙ্কর আর আলাউদ্দিন। মাইহার রাজ্যে ওস্তাদের নিজের

গৃহে স্থান পেলেন। কঠিন, কঠোর সাধনা। এখানে রবিশঙ্কর নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, হারিয়ে গেলেন সেতারের সাধনায়, সংগীতের আরাধনায়। আর গুরুও উজাড় করে দিলেন তাঁর সাধনা-সম্পদ। এ সাধনার ইতিহাস—ত্যাগের আর ব্রহ্মচর্যের সাধনা।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেল।

১৩৪১ সাল। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে রবিশঙ্করের বিয়ে হয়ে গেল। ওস্তাদ তাঁর কন্যাকে সঁপে দিলেন শিষ্যের হাতে। এ মিলনে দেখা গেল শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর মিলন—সেখানে মানুষের জাত-ধর্ম সব মিথ্যে, সত্য শুধু সংস্কৃতির সঙ্গে মনের মিল, মানুষে মিল।

অন্নপূর্ণাও শিখেছিলেন তাঁর বাবার কাছে সেতার ও সুরবাহার। যাঁরা অন্নপূর্ণার সেতার শুনেছেন, তাঁরা স্বীকার করেছেন অন্নপূর্ণার ভারী মিষ্টি হাত। যেন রবিশঙ্করের বাজনারই একটি প্রতিচ্ছবি।

যাঁরা অন্নপূর্ণার বাজনা শুনেছেন, অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন 'আলাপের মধ্যে একটা ধ্যানগম্ভীর ভাব রয়েছে, রক্তের মধ্যে রয়েছে মিলনের পূর্ণতা।'

রবিশঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনে অন্নপূর্ণাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে খুশি হয়েছেন, ভাগ্যবান মনে করেছেন। তাঁর জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে আশ্চর্যভাবে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা যেন সুরের ভৈরবী। রবিশঙ্করের সুর হচ্ছে সাধনা, সেই তাঁর জীবনের সত্য, ধ্রুবতারার মত শাশ্বত। সুখের সংসার। আর পুত্র শুভশঙ্করও ভবিষ্যতের আশার আলো।

১৩৩৮ সাল থেকে ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা হল শেষ। এরপর রবিশঙ্কর এগিয়ে এলেন আর এক জগতে।

আজও অতীতে যেসে-আসা হারানো দিনের কথা তাঁর মনে পড়ে, হয়ত ছায়া-মিছিলের মত। ১৩২০ সালে বারাণসী ধামে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখতে পান রবিশঙ্কর, যাঁর আদিনিবাস যশোহরের কালিয়া গ্রামে।

উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে, রবিশঙ্কর আর তাঁর অগ্রজ পৃথিবীখ্যাত উদয়শঙ্কর এত প্রতিভা পেলেন কোথা থেকে। লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই রবিশঙ্করের পিতা শ্যামশঙ্করও ছিলেন সঙ্গীত নৃত্যের সুঅধিকারী। যদিও তাঁর পেশা ছিল রাজনীতি অনুশীলন। শ্যামশঙ্কর একদা বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেছিলেন। শুধু কি তাই। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় শ্যামশঙ্করকে ডক্টর অব পলিটিক্স উপাধি দিয়েছিলেন। রাজনীতি অনুশীলন করলেও তাঁর অন্তরে অন্তরে ছিল সুর আর নৃত্যচিন্তা। শ্যামশঙ্কর ছিলেন রাজস্থানের আলোয়ার স্টেটের দেওয়ান; পরে পলিটিক্যাল অ্যাডভাইসার হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে শ্যামশঙ্করের ব্যবস্থাপনায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়শঙ্কর লণ্ডনে নৃত্য প্রদর্শন করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। ছেলেরা সবাই কলাবিদ। শচীনশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর এঁরাও গুণী ও স্বনামে খ্যাত। নৃত্য ও সঙ্গীত তাঁদের পরিবারের সহজাত ধর্ম। সেই পরিবারের একটি উজ্জ্বল শিখা হচ্ছেন আজকের বিশ্ববরেণ্য রবিশঙ্কর।

ফিরে এলেন গুরুর অনুমতি নিয়ে কর্মজগতে। আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের সংগীত পরিচালকরূপে আমরা পেয়েছি তাঁকে। তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছে তাতে। দেশ-বিদেশের অগণিত শ্রোতা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু মনের চেতনায় আর পরিক্রমা আরও আরেক আলোয়, তাই বেতার কেন্দ্র তাঁকে ধরে রাখতে পারলে না। বেরিয়ে এলেন। গেলেন ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ্যতম প্রতিনিধি হয়ে রাশিয়ায়। সংস্কৃতি দলের অন্যতম সদস্যরূপে।

তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের সুর যোজনা ভারতে আলোড়ন এনেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বোম্বেতে 'নীচা নগর,' 'ধরতী কি লাল' ছবির সংগীত পরিচালনা করে জনসাধারণের কাছে অভিনন্দিত হলেন।

যদিও তিনি চিত্রে সংগীত পরিচালনার কাজে এগিয়ে এলেন, তবুও তাঁর আপন সাধনায় তিনি নিজেকে হারান নি। আমরা দেখিছি তাঁকে, উত্তর ভারতের সংগীতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সংগীতের মিলনে তাঁর নিজস্ব রাগ সৃষ্টি করতে—যা ভাবায় অবর্ণনীয়, কল্পনায় অভাবনীয়। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে সুরকার হিসেবে রবিশঙ্করকে আমরা নূতন করে দেখলাম, রবিশঙ্করের সংবেদনশীল মনের আবেগময় তন্ময়তাও দেখতে পেলাম 'পথের পাঁচালী'তে। যেমন, 'পথের পাঁচালী'তে যখন হরিহর তার স্ত্রী সর্বজয়ার হাতে শাড়িটি দিল, তখন সর্বজয়ার বুক ফাটা আর্তনাদে আমাদের দু' চোখ ভরে এলো জল। এই সংবেদন সময়েই দিলরুবা আর্তনাদ করে বেজে উঠেছিল সত্য, কিন্তু রবিশঙ্কর সুরটি এমন ভাবে সৃষ্টি করলেন, যা চলচ্চিত্র সংগীতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

রবিশঙ্করের চলচ্চিত্র সংগীত-পরিচালকরূপে শুরু হল জয়যাত্রা। তারপর পেলাম 'অপরাজিত' ছবিতে। সেখানেও তাঁর সৃষ্টি চল আরেক নতুন পথে, আর রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' ছবির পরিচালনা করে। তিনি প্রমাণ করলেন নিজেকে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক রূপে। শুধু তাই নয়, জার্মানীতে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র ভারতীয় যন্ত্রের ব্যবহারে যে সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার প্রমাণ করলেন তিনি। জার্মানীতে তাঁকে অভিনন্দিত করা হলো বিশ্ববরেণ্যরূপে। 'পরশ পাথর', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি ছবিতেও বিচিত্র স্বাদের পরিচয় পেয়েছি আমরা—'অপুর সংসারেও'। ভারতবর্ষের চিত্রজগৎ তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু আশা করবে এবং আমাদের বিশ্বাস, তাঁর অসামান্য প্রতিভার দান চিরন্তন ও মহান হয়ে দেখা দেবে নব নব রূপে। রবিশঙ্করের সুদীর্ঘ জীবন একটি নীহারিকা পথের মত। আজ আভাসে, ইঙ্গিতে, আনন্দে, ছন্দেতে বিচিত্র রাগিণীতে মিশে একটা আশ্চর্য নতুন ইতিহাসের ছবি দেখতে পেয়েছি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর জীবনের যে সত্য সাধনা, সেটা হচ্ছে নিজের সৃষ্টিতেই তিনি উজ্জ্বল। আমরা আশা করব, তাঁর প্রতিভার দান চিরন্তন ও শাশ্বত হয়ে থাকবে।

সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নারদার্থ রাগমালা নামক একটি গ্রন্থ থেকে মণিপুরী এক তালগ্রন্থে উদ্ধৃত—

মুখপ্রধানদেহস্থ নাসিকা মুখমধ্যকে।
তালহীনং তথা গীতং নাসাহীনং মুখং যথা॥

অর্থাৎ তালহীন সংগীত নাসাবিহীন মুখের মতই অসুন্দর। অধ্যাপক সম্বমূর্তি বলেছেন যে, তাল সংগীতের নিয়ন্ত্রণকারী (regulating factor) ইহা সংগীতকে স্থায়িত্ব (stability) ও সুগঠিত রূপ (form) দান করে। তাল নিবদ্ধ সংগীতকেই স্বরলিপি ইত্যাদি দ্বারা সংরক্ষণ করা যায়।

বাস্তবিক তাল রয়েছে বলেই গীত-বাদ্য-নৃত্য সময় পরিমাণে, উত্থানে-পতনে, বিরামে একীভূত হয়ে গায়ক, বাদক ও শ্রোতাকে আনন্দে উল্লসিত করে তুলতে পারে। আমেরিকার একখানি বিশ্বকোষে লেখা হয়েছে যে, (অনুবাদ) সংগীতের মধ্যে তাল বস্তুটি মানুষের প্রথম আবিষ্কার, সে মানুষ অসভ্য আদিম যুগেরই হোক বা উন্নত যুগেরই হোক। ইহা যেন অনৈচ্ছিক বা স্বতঃসঞ্জাত স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ (reflex action)। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে অধিকাংশ লোক গান শোনে তাদের পায়ের দ্বারা, অর্থাৎ গান শুনতে শুনতে পায়ে তাল দেয়; অনেকেই সে অবস্থার উপরে আর যায় না; অর্থাৎ সংগীতের মাধুর্য উপভোগ করে তারা তালের দিক থেকেই সুরের দিক থেকে নয়। (Encyclopoedia Americana, Vol. 13).

তালের কথা এতক্ষণ বলা হলেও তার সংজ্ঞা এখনও বলা হয় নি। তাল বলতে আমরা বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা (musical time unit) ও বিভাগে (bar) গঠিত সংগীতের বিশেষ বিশেষ ছন্দকে বুঝে থাকি। যেমন তিন মাত্রার একটি বিভাগের পর দু' মাত্রা করে দু'টি বিভাগ থাকলে হয় তেওড়া তাল। শার্ঙ্গদেব তালের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

কালো লঘ্বাদিমিতয়া ক্রিয়য়া সম্মিতো মিতিম্।
গীতাদের্বিদধৎ তালঃ স চ দ্বেধা বুধৈঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ লঘু, গুরু ইত্যাদি দ্বারা পরিমিত যে সশব্দ ও নিঃশব্দ ক্রিয়া (তাল ফাঁক ইত্যাদি), তাদের দ্বারা পরিমিত যে কাল গীত-বাদ্য-নৃত্যের সময় পরিমাপ করে তার নাম তাল। পণ্ডিতদের মতে তা আবার দু' রকম (মার্গ ও দেশী)। হরিভট্ট বলেছেন—তালঃ কাল ইতি খ্যাতো ধ্রুবাপাদি-ক্রিয়ামিতঃ। (ধ্রুবাপাদি=ধ্রু + আবাপাদি, আবাপ এক রকম নিঃশব্দ ক্রিয়া বা ফাঁক)।

রাগার্ণবে বলা হয়েছে—

হস্তদ্বয়স্য সংযোগে বিয়োগে বাপি বর্ততে।
ব্যাপ্যমানো দশপ্রাণৈঃ স কালস্তালসংজ্ঞিতঃ॥

হস্তদ্বয়ের সংযোগ বিয়োগ বলতে তাল ফাঁককে বুঝায়। দশ প্রাণ বলতে বুঝায় তালের কাল, অঙ্গ (বিভাগ), ক্রিয়া ইত্যাদি দশটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। সংগীত দর্পণে সংগীত সারামৃত থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

তালঃ কালক্রিয়াঃ প্রোক্তঃ সোঽবচ্ছিন্নো দ্রুতাদিভিঃ।
গীতাদিমানকর্তা স্যাৎ স দ্বেধা কথিতো বুধৈঃ॥

অর্থাৎ কাল (time) থেকে তাল উৎপন্ন, দ্রুত, লঘু ইত্যাদি দ্বারা সেই কাল বিভক্ত এবং গীত-বাদ্য-নৃত্যের পরিমাপকারীরূপে তার প্রয়োগ। আরও নানারূপ সংজ্ঞা রয়েছে, তবে অর্থ প্রায় একই।

তালকে সংগীতের অতীব অপরিহার্য অঙ্গ বললেও এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। অনিবদ্ধ সংগীত অর্থাৎ রাগের আলাপে বাঁধ ধরা ছন্দ বা তাল নেই। সেখানে তাল হয়ে উঠে রাগের প্রসার ও ভাবের গভীরতার ব্যাঘাতক কাজেই সৌন্দর্যের হানিকর। তালের বন্ধনের ভিতর দিয়ে যেন ভাব নিজেকে স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত করতে পারে না। স্বচ্ছন্দে সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে গিয়ে কবি ও শিল্পীরা বহু ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মানুগতার পথ ছেড়ে চলেছেন। তাল হোল সংগীতের অঙ্কুশ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী। কবিরা যেমন বহুস্থানে ভাবপ্রকাশের জন্য নিরঙ্কুশ হয়ে থাকেন, গায়কেরাও তেমনি রাগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ও ভাবরসের গাম্ভীর্যের জন্য তালরূপ অঙ্কুশকে মেনে চলেন না। দ্রুত তাল ও ছন্দের ভিতর দিয়ে সাধারণত লঘু ভাবেরই প্রকাশ হয়ে থাকে, ভাব যতই আবেগপূর্ণ ও গভীর হয় তালের গতিকে ততই মন্থর করে নিতে হয় নইলে রসের হানি হয়। স্বচ্ছন্দ ভাব যেন আকাশচারী বিহঙ্গের মত মুক্ত হয়ে যেতে চায়, তালের শৃঙ্খল পরে আর থাকতে চায় না। এই জন্যই আলাপে তাল নেই এবং বিস্তারে অনেক সময় তালের সীমার মধ্যে থেকেও তালমুক্ত হয়। এই একই কারণে বিশেষ বিশেষ পরিবেশে ভাটিয়ালী গান মুক্তছন্দে রাত্রিতে চারিদিকের কোলাহল থেমে গেলে নদীর মুক্ত বক্ষে ও উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে ছন্দের বন্ধন ভাল লাগে না, ছন্দহারা গানই যেন সেই পরিবেশের সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ভাবপ্রধান গান ছন্দমুক্ত। গজল গানে শেয়র আখ্যায় তাল ছাড়া অংশ গাওয়া হয়, অনেক বাংলা গানেও তার অনুকরণ দেখা যায়। উদ্দেশ্য একই। ছন্দে এনে

দেয় উল্লাস আর ছন্দ মুক্তিতে এনে দেয় ভাবের গভীরতা ও আবেগ। নৃত্য থেকে তালের উৎপত্তি আর ধ্যানে তার মুক্তি। বন্ধনে এক রকমের আনন্দ রয়েছে, মুক্তিতেও রয়েছে আর এক রকমের আনন্দ। অবশ্য নিপুণ শিল্পী দ্রুত ছন্দের ভিতর দিয়েও যে ভাবের গভীরতা প্রকাশ করতে পারেন তারও নিদর্শন মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

আমার কথা (১০৬)

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস

গানের স্পন্দন যাঁর শিরায় শিরায় নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করে ডাক্তারী করা অর্থাৎ ডাক্তারিকে পেশা হিসাবে অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে উঠল না। আজকের দিনের খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী অরবিন্দ বিশ্বাসের পক্ষে! তাই মেডিকেল স্কুল থেকে গানের স্কুল, রোগ নিরাময়ক নয়, গায়ক।

প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে ডাক্তারী শেখার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হলেন সঙ্গীতশিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস। গানের টানে ডাক্তারী বিদ্যায় মন বসে নি বলে শান্তিনিকেতনে এলেন তিনি। আপন দক্ষতায় সরকারী বৃত্তি লাভ করে শিখতে লাগলেন গান। চার বৎসর কাল শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ডিপ্লোমা পেলেন রবীন্দ্র সঙ্গীতে। রাঁচির ছেলে। শিক্ষালাভ বাঁকুড়ায়। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা শেষ করে শিক্ষকতা করছেন কলকাতায়। আজ তিনি বেঙ্গল মিউজিক কলেজের রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান শিক্ষক। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞান গোস্বামী, রবীন্দ্রলাল রায়, ভি ভি ওয়াজেলওয়ারের কাছে যে শিক্ষার সূচনা ইন্দিরা দেবী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বশেষ শান্তিদেব ঘোষের কাছে তার সমাপ্তি। সঙ্গীত জগতের দিকপালগণের শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস আজ সঙ্গীত জগতে আপন মহিমায় মহিমান্বিত। সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবেই শ্রীবিশ্বাসের নাম আজ সুপরিব্যাপ্ত নয় বেতার শিল্পী এবং রেকর্ড শিল্পী হিসাবেও তিনি সমভাবে সমাদৃত। তাঁর গাওয়া 'সুখিরে ভাবনা কাহারে বলে' গানের রেকর্ডখানি সঙ্গীত

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস

জগতের একটি নিখুঁত অবদান বাইরের জগৎ ছেড়ে চিত্র জগতেও তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা বর্তমান।

'কালামাটি' চিত্রে তাঁরই নির্দেশনায় সুগীত রবীন্দ্রসঙ্গীতখানি তাঁরই সঙ্গীত সাধনার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। স্কুল, কলেজে, বেতারে, চিত্রে কণ্ঠস্বর বিলিয়েও সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের বিমুখ করেন নি তিনি। তাই বাড়িতে ছাত্র আসে একবেলা নয় দু'বেলা। সুন্দর স্বভাব মিষ্টি ব্যবহারে সকলকেই করে নেয় আপনার। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নীলিমা এবং পুত্রদ্বয় গৌতম ও অনুত্তোম তাঁর জীবন ও গানের ত্রাণ এবং প্রেরণা।

টুনটুনিকে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আহা, টুনটুনি, নেচো না অমন করে?
ভোরের শান্ত করবীর ডালে নেচো না!
দেখছো না আহা, পাতায় পাতায়
মুক্তোর মতো স্বচ্ছ শিশির কণার।
করবীর ডাল আলো করে আছে!

নেচো না।
ঝরে যাবে ওরা ঝরে যাবে!
ঝরে যাবে অভিমানিনী প্রিয়ার
মৌন নীরব
বিরতকম্প কান্নার লঘু ছন্দে।
আহা, টুনটুনি, নেচো না অমন ক'রে!

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

খামাচ (দেশজ)—লতাবিশেষ, mucuna nivea corpopogon nivoves.

খাম্‌আলু—খাম আলু।

খিরী, খিরণী—[সং ক্ষীরী, রাজাদন, রাজাদনী, খীর্ণা, মং খিরণী, গু রায়ণ, তাং পল্ল, কং খেণে মাগিলে, ড ক্ষীরী, হিং ক্ষীরণী] বকুলাদিবর্গের ছায়াতরুবিং mimusops indica, m. hexandra. কাণ্ড সরল। পাতা লম্বা চওড়ায় বড় ও মসৃণ, প্রত্যেক শাখায় একটি করিয়া ফুল হয়। ফুল ছোট এবং বসন্তকালে ফোটে। জলপাইয়ের ন্যায় ফল। ফলে দুধ আছে। পানফল ভক্ষ্য। পূর্ব-বাংলায় খিরণী জন্মায় না, পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়।

খীর্ণা—খিরী দ্রং।

খুজলী (দেশজ)—ছুঁলে চুলকানি ধরে। hibiscuspistus.

খুদিওক্কা—crozophora plicata.

খুদিজাম—antidesma paniculatum.

খুবানী—খোবানী দ্রং।

খুর—ফুলের পাতা (?)।

খুচক—হিলবৃক্ষ।

খুর্মা—খর্জুর দ্রং।

খেওরা—একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিং, sonnertia acida.

খেজুর—খর্জুর দ্রং।

খেতপাপড়া—[সং ক্ষেত্রপর্পটি, উং ঘরপুরিয়া] আচ্ছুকাদি বর্গের আরণ্য শাক বিং oldenlandia corymbosa ফুল ছোট, শাদা, আষাঢ়-শ্রাবণে হয়।

খেজুর (দেশজ)—এক প্রকার ঘাস, Scirpus hysoor.

খেরমুগ—ছোট মুগ, খেরুয়া, phaseolus mungo.

খেসারী—[সং সুবৃত্তা খণ্ডকারি, খণ্ডিক, হিং খিসারী, উং চণা] খেঁসারি, lathyrus sativus. শিম্বাদিবর্গের কলাই বিং। কোথাও কোথাও ইহাকে খুঁড়িয়া, খেঁড়িয়া ছোট মটর বলে। উপপত্র বড় পাতার মত। শুঁটি চ্যাপ্টা।

খেঁড়ী কলাই—শিম্বাদিবর্গের সরু গাছ বিং phaseolus aconitifolius, বড় মুগ কলাই-এর মত। বিহার ও আসামে আবাদ হয়। লোমশ গাছ, শুঁটি লোমশ নহে।

খোটি—পালঙ্ক শাক। শব্দ চং।

খোবানী—[ফাং খুবানী, ইং apricot] বাদামের মত গাছ prunus armeniaca. পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে, গাছে শুকনো ফল।

গঙ্গাপালঙ্ক—বনপালঙ।

গজকটা (দেশজ)—লতানিয়া গাছ, wibera scandeus.

গজকণা—গজপিপুল।

গজকন্দ—হস্তিকন্দবৃক্ষ, হাতিকাঁদা।

গজকুসুম—নাগকেশর। চক্রদত্ত।

গজকৃষ্ণা—গজপিপুল।

গজচির্ভিটা, গজচির্ভিটি—গজপ্রিয় চির্ভিটা, ইন্দ্রবারুণী। রত্নমালা রাখাল শশা।

গজদন্তফলা—ডঙ্গরীলতা। রাজনিং।, চিচিঙ্গে।

গজপাদপ—স্থালীবৃক্ষ। ভাবপ্রং।, বেনিয়াপিপর।

গজপিপুল, গজপিপ্পলী—[সং ইভোষণা, বঙ্গীয় ইং fruit of peper-chaba] কচ্বাদিবর্গের অবরোহিণী, scindapsus officinalis. প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া গাছে চড়ে। পর্যায়—কবিপিপ্পলী, ইভকণা, কপিবল্লী, কপিল্লিব কবিবল্লিকা, শ্রেয়সী, গজাহ্বা, কোলবল্লী, চব্যফল, চব্য ছিদ্রবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী, বর্তুল, স্থূলবৈদেহী।

গজপুষ্পী—নাগপুষ্পালতা, শব্দার্থ চিন্তামণি।

গজপ্রিয়া—শল্লকীবৃক্ষ।

গজভক্ষক—অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজভক্ষা, গজভক্ষ্যা—শল্লকীবৃক্ষ। শব্দরত্না সমং।

গজবল্লভ—১ গিরিকদলী, পাহাড়ে কলা, দয়া কলা, ২ শল্লকীবৃক্ষ রাজনিং।

গজাখ্যা—চক্রমর্দ বৃক্ষ চাকুন্দে। রাজনিং।

গজাদন, গজাদনী—অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজাদিনামন্—গজপিপ্পলী।

গজারি--বৃক্ষবিং। ঢাকা অঞ্চলে গজাণ বৃক্ষকে গজারি বা গজী ও চারাকে গোচি বলে। ইহার পাতা বড়, ত্বক স্থূল।

গজাশন—অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজাশনা—শল্লকীবৃক্ষ। রত্নমাং।

গজাহ্ব—গজপিপ্পলী।

গজো—বৃক্ষবি° hedyotis scandens.

গজেষ্টা—ভুঁই কুমড়া।

গজোপকুল্যা—গজপিপ্পলী। ভৈষজ্য রত্না°।

গজোষণা—গজপিপ্পলী। রাজনি°।

গঞ্জা—[স° গঞ্জ ; ই° hemp] গাঁজা cannabis sativa, সিদ্ধি গাছের পাতার নাম সিদ্ধি, মঞ্জরীর নাম গাঁজা, আর নির্যাসের নাম চরস। [সিদ্ধিকে স° ভঙ্গা, বিজয়া, বা° ভাঙ্, সিদ্ধি, হি° ভাঙ্, সবজি, তা° গঞ্জাইলাই, তে° গঞ্জা অকু, উ° গঞ্জা, ম° ভাঙ্গ]

গড়গড়, গড়গড়া (দেশজ)—[স° গবেধুকা, ও° গরগড়, ই° Job's tears grass] ধান্যাদিবর্গের ঘাসবি°, coix barbata, c. lachryma-jobi. দীর্ঘায়ু, প্রায় ২।৩ হাত লম্বা। ফল গোলাকার, ক্ষুদ্র।

গড়গোয়ালিয়া—তৃণবি°, vitis glancas.

গড়সুন্দর—বৃক্ষবি°, mimosa arabica.

গণকর্ণিকা—ইন্দ্রবারুণী। রাজনি°।

গণরূপ—আকন্দ। রাজনি°।

গণরূপিন্—শ্বেতার্ক বৃক্ষ। রত্নমালা।

গণিকারিকা—[স° অগ্নিমন্থ, তর্কারী, বৈজয়ন্তী, কো° গয়েন্দারী, গঁয়দারী, হি° অরণী, অগেথু, ম° থোরঐরণ, ও° অরণী, ক° নরুবল, তৈ° নেল্লিচেট্টু, উ° অগিবথ, অগবথু, গণিয়রী] গণিয়ারী, অগলাস্ত, premna spinosa. বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষবি°। ১০।১২ হাত উচ্চ। নদীর নিকটে হয়। ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ—ভাণ্ডারাদিবর্গের ছোট গাছ, premna serratifolia, p. integrifolia. সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রদেশে জন্মে। কাঠ ও পাতা সুগন্ধ। ফুল ছোট, হলদে রঙের আমেজযুক্ত। পূর্বকালে ইহার পাতা ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। পাতা অভিমুখী মৎস্যাকার। পর্যায়—শ্রীপর্ণ, গণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, গিরিকর্ণিকা, অগ্নিমথন, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, কর্ণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা, নদীজা।

গণিকারী—পুষ্পবৃক্ষবি°। বসন্তকালে ফুল ফোটে। পর্যায়—কাকনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, বসন্তদূতী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বাসন্তী, মদনমাদনী।

গণিয়ারী—গণিকারিকা দ্র°।

গণেশকুসুম—রক্তকরবী। রাজনি°।

গণ্ডকারী—খদির বৃক্ষ। শব্দচ°।

গণ্ডকালী—খদিরী বৃক্ষ।

গণ্ডগাত্র—ফলবি° (?)। শব্দচিন্তা°। আতা [হি° সারিকা]

গণ্ডদূর্বা—[হি° দূবিপাং] গাঁটিয়া দূর্বা। পর্যায়—গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, বারুণী, মীনপর্ণী, সূচীনেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী, সূচীপত্রা, শ্যামকান্তা, জলাহ্বা, শকুলাক্ষী, কলায়া, চিত্রা।

গণ্ডমালিকা—লজ্জালুলতা। রত্নমা°।

গণ্ডারি—কোবিদার। ভাবপ্র°।

গণ্ডালী—১ শ্বেতদূর্বা, ২ সর্পাক্ষী বৃক্ষ।

গণ্ডীর—সমষ্ঠিলা (?), শসা (?)।

গণ্ডীরী—সেহুণ্ড বৃক্ষ। রাজনি°। সিজ।

গদগাছ—[স° অগদ, উ° বায়বর্ষী, ই° american aloe] বিদেশ হইতে আনীত ক্ষুপবি°, agave americana. পাতা বড় মোটা, শাঁসাল, ধারে ধারে কাঁটা আছে, প্রায় ১২ বৎসর পরে ফুল ধরে। ফুল শাদা। পাতার আঁশ হইতে দড়ি তৈয়ারি হয়।

গন্ধকন্দ—কেশুর।

গন্ধকাষ্ঠ—বৃক্ষবি° lignum alœs.

গন্ধকুসুমা—গণিয়ারী। রাজনি°।

গন্ধখেড় (?)—ভূতৃণ, গন্ধবেণ।

গন্ধগুণা—[ই° smoth grasf] তৃণ বি°, androphogon glaber.

গন্ধজটিলা—বচ (?)

গন্ধতণ্ডুল—শালিধান্যবি°।

গন্ধতৃণ—বেনা। পর্যায়—সুগন্ধি, ভূতৃণ, সুরম, সুরভি, মুখবাস।

গন্ধত্বক্—এলবালুক॥ রাজনি°॥

গন্ধদলা—বনযমানী।

গন্ধদারু—চন্দন।

গন্ধদ্রব্য—নাগকেশর॥ ত্রিকাণ্ড°॥

গন্ধন—গন্ধতৃণ। শব্দার্থচিন্তা°॥

গন্ধনকুলী, গন্ধনাকুলী—[স° সর্পাক্ষী, তা° কিরিপুরন্দন, তে° সর্পাক্ষীচেট্টু] গুল্মজাতীয় গাছ। রাস্নাবি° acamppe papillosa, ophiorrhiza mungos, opioxyton serpentina. পর্যায়—মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক, বিষমর্দনিকা, অহিমর্দনী, মহাহিগন্ধা, অহিলতা, ২ চই, ৩ রাস্নাবি°।

গন্ধনামন—লালতুলসী।

গন্ধনিলয়া—নবমল্লিকা (?)।

গন্ধনিশা—গন্ধপত্রা, শঠীবিশেষ।

গন্ধপত্র—১ শ্বেত তুলসী॥ রত্নমা°॥ ২ মরুবক বৃক্ষ, ৩ বিল্ব॥ রাজনি°॥

গন্ধপত্রা—শঠীবিশেষ। মালবদেশে চলিত কথায় পলাশ।

গন্ধপত্রিকা—অজমোদা॥ রাজনি°॥

গন্ধপত্রী—১ অশ্বগন্ধা, ২ বনযোয়ান।

গন্ধপলাশিকা—হরিদ্রা।

গন্ধপলাশী—শঠী॥ ভাবপ্র°॥

গন্ধপীতা—শঠী।

গন্ধপুষ্প—১ বেতসবৃক্ষ॥ শব্দরত্না°॥, ২ অঙ্কোটবৃক্ষ, ধলা আঁকড়া জটা°॥ ৩ চাপড়ে গাছ, ৪ অশোক গাছ॥ রাজনি°॥

গন্ধপুষ্পা—১ নীলীবৃক্ষ, ২ কেতকীবৃক্ষ, ৩ গণিকারীবৃক্ষ। রাজনি°।

গন্ধফণিজ্ঝক—রক্ততুলসী বৃক্ষ। রাজনি°।

গন্ধফল—১ কপিত্থবৃক্ষ, ২ বিল্ববৃক্ষ, ৩ তেজঃফলবৃক্ষ, তেজোবল। রাজনি°।

গন্ধফলা—১ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। শব্দরত্না°। ২ ভুঁইকুমড়া, ৩ শল্লকীবৃক্ষ। রাজনি°।

[ক্রমশ।

নীলকণ্ঠ

বিয়াল্লিশ

'A man who is not a good philosopher will make a poor astrologer.'

কাশীর গংগায় নৌকো করে জলবিহারে বেরিয়েছিলেন পল ব্রান্টন। সংগী হয়েছিলেন বোম্বায়ের এক বণিক। ভদ্রলোক যেমন সাধু তেমনই সচ্ছল। অর্থাৎ পরলোকের কথা চিন্তা করতে গিয়ে ইহলোকের কথা বিস্মৃত হন নি। তিনি নানাপ্রসংগ করতে করতে ব্রান্টনকে বললেন একসময়ে যে তার পরের বছরই বাণিজ্য গুটিয়ে ফেলবেন তিনি এবং সুধীরবাবুর কথা আরেকবার অকাট্য ফলবে। সুধীরবাবু তাঁকে বলে দিয়েছিলেন ঠিক এই বয়সে তিনি ব্যবসা থেকে সরে আসবেন।

সুধীরবাবু কে? ব্রান্টনের প্রশ্ন।

কাশীর সবচেয়ে সেরা এষ্ট্রলজার, নাম শোনেন নি?

ও? জ্যোতিষী? তাই বলুন—

ব্রান্টনের কাছে জ্যোতিষী মানেই হচ্ছে যে নিজে দুর্ভাগ্যের জ্যান্ত প্রতিমূর্তি অথচ অপরের ভাগ্য নিরূপণের দুঃসাহস করে।

না। আপত্তি করেন ব্রান্টনের ভারতীয় বণিকবন্ধু তৎক্ষণাৎ: না। সুধীরবাবু শুধুই একজন এষ্ট্রলজার নন। He is something more. একজন দুর্ধর্ষ বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষ নিয়ে পড়ে আছেন দীর্ঘকাল। এই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাঁকে আপনি ধাপ্পাবাজ তথাকথিত ভবিষ্যদ্বক্তাদের একজন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন?

পল ব্রান্টন সংযত হন। তাঁর স্মরণ হয় যে সুধীরবাবুর কথা এইমাত্র যিনি বললেন তাঁর সেই ভারতীয় বণিকবন্ধু বহু ব্যাপারেই ব্রান্টনের চেয়েও পাশ্চাত্যপন্থী। অথচ লোকটি জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। ব্যাপারটা কি,—বোঝা দরকার।

জেরা সুরু করেন ব্রান্টন: আপনি কি বলতে চান যে ওই লক্ষকোটি মাইল দূরের গ্রহরা প্রত্যেকটি মানুষের এবং পৃথিবীর যাবতীয় ঘটন-অঘটনের নিয়ন্তা?

হ্যাঁ। আমি তাই বিশ্বাস করি। কিন্তু ভদ্রলোক বলেন: আপনাকে তা বিশ্বাস করতে বলি না। তার চেয়ে চলুন না সুধীরবাবুর কাছে। আপনার সম্পর্কে তিনি কতখানি বলতে পারেন বাজিয়ে নিন না একবার। আপনার দেশই তো কথায় কথায় বলে: 'The proof of the pudding lies in the eating'।

পল ব্রান্টন পরের দিন সুধীরবাবুর কাছে যেতে স্বীকার করলেন।

সুধীরবাবুকে অসংকোচে ব্রান্টন বললেন যে, জ্যোতিষে তিনি বিশ্বাস করেন না; বন্ধুর কাছে শুনে তিনি জ্যোতিষীকে যাচাই করতে এসেছেন;

তথাস্তু জানালেন মাথা নেড়ে সুধীরবাবু।

ব্রান্টন এবারে বললেন যে তাঁর অতীত আগে সুধীরবাবু বলতে পারেন কি না তারই পরীক্ষা হোক। ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যতেই হবে।

আবার তথাস্তু জ্ঞাপন করলেন ইংগিতে সেই জ্যোতিষী। ব্রান্টনের জন্মতারিখ নিয়ে পড়লেন মিনিট দশেক। তারপর একটা কাগজের ওপর ছক কেটে সাহেবকে বললেন: আপনার জন্মের সময়ে গ্রহ সন্নিবেশ হয়েছিলো মহাকাশে এই রকম। এখন শুনুন তারা কি বলছে আপনার সম্পর্কে।

আপনি পাশ্চাত্যের একজন লেখক?

হ্যাঁ।

তারপর সুধীরবাবু সাহেবের যৌবনের এবং কৈশোরের কিছু ঘটনা বলে গেলেন দ্রুত। মোট, সাতটি বিশিষ্ট অতীত ঘটনা সাহেবের জীবনের বললেন জ্যোতিষী। পাঁচটি মোটামুটি মিললেও দু'টি একেবারেই মিললো না, সাহেবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

'The honesty of the man is transparent. I am already convinced that he is incapable of deleberate deception. A 75 percent success in an initial test is startling enough to show that Hindu astrology calls for investigation, but it also indicates that the latter is no precise, infallible science'. [A Search In Secret India. P. 209]

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুধীরবাবুর একটি উক্তি সাহেব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটি সাহেবের নিজের কথায়। 'has now received ample confirmation.'। দ্বিতীয় একটি ভবিষ্যবাণীর যে সময় দেওয়া হয়েছিলো সে সময়ে সেটি ঘটে নি। এবং 'The others still wait for times comment.'

তারপরও সাহেবের সন্দেহ যায় নি কিন্তু। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন সুধীরবাবুকে যে মংগল কি বৃহস্পতির কি এসে যায় আমার জ্যাতুমি হলে অথবা না হলে।

সুধীরবাবু এর যা উত্তর দেন ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র তারই ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতীয় জ্যোতিষ বলে, মংগল, বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র, শনি, রবি, চন্দ্র, রাহু, কেতু এরা আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফলের প্রতীক মাত্র। অর্থাৎ এরা আমাদের ভরাডুবি অথবা সাফল্যের নিয়ন্ত্রক নয়। আমরাই আমাদের পূর্বজন্মের কর্মকীর্তি দিয়ে এ জন্মের সুখদুঃখের ইতিবৃত্ত রচনা করি। গ্রহরা তারই সূচীপত্র মাত্র। কর্মচক্রের ফলে অনিবার্য জন্ম-মৃত্যুর চক্রান্ত থেকে মুক্তিই ভারতবর্ষের সাধনা। এমন কেউ নেই, মুক্তপুরুষ ছাড়া যে এই পূর্বজন্মের কৃতকর্মের পাপ-পুণ্যের বোঝা নামিয়ে পথ চলতে পারে। এজন্মে যদি কেউ পূর্বজন্মকৃত পাপের শাস্তি অথবা পুণ্যকর্মের পুরস্কার না পায়, তাহলে আগামী কোনও জন্মের জন্যে তা তোলা আছে; কিংবা সঞ্চয় রইলো জীবনের ব্যাংকে সেই মূলধন। যদি জাহাজডুবিতে কারুর সলিলসমাধির কথা নির্দেশ করে কোনও জন্মচক্র তাহলে তা অমুক গ্রহের যোগাযোগের জন্যে বটে, কিন্তু সেই যোগাযোগ যে করায় সে হচ্ছে ডুবন্ত মানুষের পূর্ব বা পূর্বের জন্মের কোনও অন্যায় কর্ম। গ্রহ কেবল মানুষের সেই ন্যায়-অন্যায়ের দলিল মাত্র।

সুধীরবাবুর মতে: 'The planets and their positions only act as a record of this destiny; Why they should do so I cannot say.' [Page 211]

সুধীরবাবুর বাড়িতে চোদ্দখানা ঘর পুঁথিতে ঠাসা। ব্রান্টন জিজ্ঞেস করলেন বইগুলির নানা ধরণ দেখে যে, আপনি কি দার্শনিকও?

এর উত্তরে সুধীরবাবু ভারতীয় জ্যোতিষের মহিমা অনবদ্য ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে, যে দার্শনিক নয়, সে হাতুড়ে জ্যোতিষী।

এই হচ্ছে ভারতের কথা। তার সব সাধনাই শব সাধনা যদি না তা শেষ পর্যন্ত অশেষের আভাস দেয়। সব বাসনা মুক্তির জন্যে শেষ পর্যন্ত তার শবাসনার পায়ে পড়া ছাড়া আর উপায় নেই। যে জ্যোতিষী জন্মচক্র দেখেই তৃপ্ত সে ব্যবসাদার। জন্মচক্রান্ত থেকে মুক্তির পথনির্দেশ যে না করতে পারে সে নয় ভগবান ভৃগু। গ্রহরা হচ্ছে ভৃত্য। ভগবান হচ্ছে প্রভু। ভৃত্যের সঙ্গে আলাপ করে যে খুশি সে ভাগ্যবান। ভগবানের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত যার সুখ নেই সেই ভক্ত। ভাগ্যবান হচ্ছে, পেতে উন্মুখ। ভক্ত সেই যে মূক। উন্মুখ যে সে পাবে ধনরত্নমুক্তা। মূক যে সে পাবে জ্ঞান-বৈরাগ্য-মুক্তি।

সত্য ভারত, শাশ্বত ভারত, মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী ভারত মুক্তোর সাধনা করে নি; মুক্তির সাধনা করেছে।

সুধীরবাবুকে সবিনয়ে পল ব্রান্টন বলেন: অতিরিক্ত পড়াশুনোয় আপনার চেহারা কি রকম খারাপ দেখাচ্ছে জানেন?

আমি আজ দু'দিন খাই নি।—সুধীরবাবু জানান?

কেন?

আমার রান্না করে দেয় যে সে আসে নি আজ দু'দিন—

অন্য কাউকে রাঁধবার জন্যে রাখলেই পারতেন এ ক'দিন—

তা হয় না, যে কোনও লোকের হাতে খাব কি করে?

এ কুসংস্কার থেকে আপনার স্বাস্থ্য কি বড় কথা নয়?

এ কুসংস্কার নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মনের প্রভাব তার কাজের ওপর পড়ে। নোংরা চরিত্রের মানুষের মনের প্রভাব তার অজান্তে তার রান্না খাবারের ওপর পড়বে; আমার ক্ষতি হবে।

পল ব্রান্টনের কাছে এ তত্ত্ব অবিশ্বাস্য। তিনি অন্য প্রশ্ন তোলেন এবার: আপনি কতদিন জ্যোতিষ চর্চা করছেন?

উনিশ বছর। বিয়ের আটদিন পর আমার স্ত্রী আমার গাড়ি চালাত যে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। সে আমাকে বলেছিলো, আমার সঙ্গে মানুষের ছদ্মবেশে বইয়ের বিয়ে হয়েছে। প্রথমে দারুণ দুঃখে অভিভূত হয়েছিলাম। সেই সময়েই জ্যোতিষ ও দর্শনচর্চার অতলে ডুব দিই এবং আমার জীবনের পবিত্রতম জ্ঞানচর্চা সুরু হয় যে পুঁথির মধ্যে দিয়ে, তার নাম ব্রহ্মচিন্তা। বহু হাজার পাতা ধরে লেখা এই বইয়ের রচয়িতা ভগবান ভৃগু। মূল বিষয় হচ্ছে, দর্শন, জ্যোতিষ, যোগ, মৃত্যুর পর জীবন এবং অন্যান্য গভীর তত্ত্বের আরও বক্তব্যাদি। তিব্বতে এই পুঁথি ছিলো। সেখানে খুব নির্বাচিত ক'জনই এ বই পড়তে পেয়েছেন। হাজার হাজার বছর আগে রচিত এই বইতে একটি যোগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ যোগ ভারতে যতরকম যোগচর্চা আছে তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এ পর্যন্ত বলবার পর সুধীরবাবু জিজ্ঞেস করেন ব্রান্টনকে: আপনি যোগ ত' জানেন?

কি করে বুঝলেন?

আপনার জন্মচক্র দেখে। য়ুরোপীয়ানের পক্ষে ত' বটেই খুব কম ভারতীয়রও পক্ষে এমন জন্মচক্র সুলভ নয়। এ জন্মচক্র বলছে আপনি যোগসাধনায় বহু সাধুর সাহায্য পাবেন। অন্যান্য অপ্রাকৃতিক রহস্যাতুরও হবে আপনার মন।

একটু থেমে আবার জ্যোতিষাচার্য বলেন: দু'ধরণের যোগী আছেন। একদল তাঁদের জ্ঞান কাউকে দেন না। আরেকদল নিজের সাধনার ফল অন্যকে দিতে দ্বিধা করেন না। আপনি জানবার জন্য উন্মুখ হয়েছেন। আমি আপনাকে ব্রহ্মচিন্তার বক্তব্য বলব। এ চিন্তায় যে যোগের কথা বলা হয়েছে তা শেখবার জন্যে গুরুর দরকার হয় না। আপনার অন্তর্নিহিত 'শক্তিই আপনাকে পথ দেখাবে।

ব্রহ্মচিন্তার যোগ কেবল ঈশ্বরের সংগে যুক্ত হওয়া। এ যোগে অন্য কোনও গুরুর দরকার হয় না। মানুষের ভেতরে যে আরেক মানুষ আছে, রূপের মধ্যে রয়েছে যে আরেক অপরূপ, দেহের মধ্যে যে দেহাতীতের সন্দেহাতীত বাস, তিনিই তমো থেকে মহত্তমে নিয়ে চলেন। দিনে দিনে ঘোমটা খুলে দেন মানস সরোবরের কূলে কূলে বাসনার তরীকে সোনার তরী করে দেবেন যিনি তাঁর মুখের। সম্মুখের অথবা পেছনের চিন্তা তখন ব্রহ্মচিন্তায় বিলীন হয়ে যায়। সুধীরবাবুর কথা শেষ না হতেই সাহেব প্রশ্ন করেন: তাহলে আপনি সেই অন্তরের পরমের চরম নির্দেশের বদলে, জ্যোতিষের আজ্ঞা শিরোধার্য করেন কেন?

সুধীরবাবুর অবিচলিত কণ্ঠ বলে গেল অনায়াসে: আমার নিজের জন্মচক্র আমি অনেক দিন ছিঁড়ে ফেলেছি। আত্মার আলোকিত পথনির্দেশ আমি পেয়েছি। যাদের এখনও অন্ধকার দূর হয় নি জ্যোতিষ

তাদেরই জন্যে। ঈশ্বরের পায়ে আমি নিজেকে নিবেদন করেছি তেমনই পূর্ণ করে ফুল যেমন করে নিজের সুবাস সম্পূর্ণ নিবেদন করে দেয় পথিক হাওয়ার হাতে। ভবিষ্যতের অথবা অতীতের ভাবনা আমার চলে গেছে। ঈশ্বর যা দেন তাই আমার শুধু প্রাপ্য। আমার শরীর, আমার মন, আমার কাজ, আমার বোধ, আমার সত্তা আমি বিলিয়ে দিয়েছি সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে।

পল ব্রাণ্টন তখনও জেরা করেন! যদি কেউ মারিতে উদ্যত হয় আপনাকে এই মুহূর্তে,—ভয় পাবেন না!

না। প্রার্থনা করব। প্রত্যেকবার সম্পদে-বিপদে প্রার্থনার উত্তরে তাঁর সাড়া আমি পেয়েছি। একদিন আপনিও পাবেন—

একথা এত জোর দিয়ে আপনি কি করে বলছেন?

আপনার জন্মচক্রই সে কথা বলছে এবং সে কখনও মিথ্যে বলে না। আজকে যা বিশ্বাস করতে আপনার মন চাইছে না, একদিন তাই হবে আপনার একমাত্র সম্বল, আপনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস; একদিন তাঁকে আঁকড়েই আপনি চলতে পারবেন, নাহলে এক পা-ও এগুতে পারবেন না। এবং আবার বলছি ব্রহ্মচিন্তার রহস্য আমি আপনাকে পরিজ্ঞাত করাতে পারি—

—আমি প্রস্তুত,—পল ব্রাণ্টন প্রত্যুত্তর করেন।

দিনের পর দিন গুরু-শিষ্যের মতো নয়, দুই সহমর্মীর মতো, সুধীরবাবু এবং ব্রাণ্টন বসেন তিব্বতী যোগক্রিয়ার মর্মোদ্ধারে। একদিন সন্ধ্যায় ব্রাণ্টন জিজ্ঞেস করেন: এই ব্রহ্মচিন্তার চরম তত্ত্ব কি? কোথায় পৌঁছে দেয় এই চিন্তা?

সুধীরবাবু তার উত্তর বলেন: এই চিন্তায় আমাদের অন্বেষণ হচ্ছে চৈতন্যযুক্ত সমাধি। এই অবস্থাতেই একমাত্র মানুষ উপলব্ধি করে সে চৈতন্য বই কিছু নয়। মানুষের মন মুহূর্তে বন্ধনমুক্ত হয়। পারিপার্শ্বিক মুছে যায়, বস্তুশূন্য হয় জগৎ, বাহ্যজগৎ শূন্য হয় মন। আত্মচৈতন্য যে কল্পনা নয়, আত্ম আছে এ অনুভূতির কি আনন্দ, কি পরমাশ্চর্য প্রশান্তি এর তা ব্যক্ত করা ব্যক্তির ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে। এইরকম একটি অভিজ্ঞতাই তাঁর অনুভূতির জন্যে প্রয়োজন। মৃত্যুহীন দীপ্ত দিব্য এক মানুষের নাগাল পায় তখন মৃত্যুভীত জড় মানুষ। এ অনুভূতি অবিস্মরণীয়; অফুরাণ।

সমস্ত ব্যাপারটা আত্মসম্মোহন নয়,—এ সম্পর্কে কি আপনি সুনিশ্চিত!—বিদেশী সুপারস্কেপটিক মাথা তোলে তবুও। ব্রাণ্টনের সন্দেহের ফণা কিছুতেই মাথা সম্পূর্ণ নোয়ায় না।

হাসেন সুধীরবাবু। সন্দেহের উত্তর নিঃসন্দেহের উত্তরীয় উড্ডীন হয়: মা যখন সন্তান জন্ম দেয় তখন কি একবারের জন্যেও তার ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে মনে হয়? এবং সেই তীব্র আনন্দ-বেদনার কথা যখন তার মনে পড়ে তখন তার কাছে তা কি আত্মসম্মোহনের অলীক উপাখ্যান বলে একবারও মনে হতে পারে। ঠিক ওই রকমই, ব্রহ্মচিন্তার পথে, মানুষের চেতনার রূপান্তর ঘটে যখন, তখন সেই বিপ্লবের সংগে জাগতিক কোনও পরিবর্তনের কোনও তুলনাই হয় না। এই দিব্য রূপান্তরের আনন্দ-বেদনাও অলীক নয়; অনির্বচনীয়। এই সচেতন সমাধির মধ্যে যখন প্রবেশ করে কেউ তখন তার বাহ্য অনুভূতিশূন্য মনের সিংহাসনে এসে বসেন স্বয়ং ঈশ্বর। সংগে সংগে আনন্দ উদ্বেল হয় সে; আচ্ছন্ন হয় অমৃতে। পৃথিবীর সকলের প্রতি ভালোবাসায় ভরে যায় তার সত্ত্বা। তখন কেউ তার দেহ পরীক্ষা করলে সে বলবে, লোকটি মৃত। কারণ এই সমাধির সবচেয়ে গভীরে প্রবেশ করে যখন বাহ্য চিন্তাশূন্য অন্তর, তখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তার কাজ বন্ধ করে দেয়!

তাহলে তো সাংঘাতিক কথা!—ব্রাণ্টন ভয় দেখান।

না। আশ্বস্ত করেন সুধীরবাবু: আমি এই সমাধি প্রাংগণে যখন খুশি প্রবেশ ও প্রস্থান করি। দু' তিন ঘণ্টার জন্য ঢুকি এবং সমাধিভংগের সময় আগে থেকেই ঠিক করে রাখি। এই বাইরের যে বিশ্বকে চর্মচক্ষে দেখে আপনি বিস্মিত, তাকেই নিজের মধ্যে দেখতে পেয়ে আমি বিহ্বল। তাই ব্রহ্মচিন্তা যোগের জন্যে কোনও বাইরের গুরু দরকার হয় না। আত্মাই পথ দেখায়—

আপনার কোনওদিন কোন গুরু ছিলো না?

না। ব্রহ্মচিন্তার রহস্য অবগত হবার পর থেকে কোনও গুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হই নি, প্রয়োজনও বোধ করি নি। যদিও মহাত্মারা এই সমাধির সময় কেউ কেউ আমার কাছে এসেছেন। আমার অন্তরচৈতন্য তখন পূর্ণ জাগ্রত। সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় শরীরে তাঁরা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তাই আপনাকে আবার বলছি, আত্মার নির্দেশ মেনে চলুন, মহাত্মা দিব্যাত্মা পুরুষরা আসবেন বিনা আহ্বানে অন্তরলোক আলোয় আলোকময় করে।

কিছুক্ষণের নীরবতা। চিন্তার মেঘে আচ্ছন্ন ব্রহ্মচিন্তজ্ঞ পুরুষ। তারপর স্তব্ধতার পাহাড় থেকে উচ্ছ্বসিত হয় আনন্দের নির্ঝরিণী। সুধীরবাবু বলেন: একবার যীশু এসেছিলেন সমাধির সময়—

আবার একটু থেমে আবার সুধীরবাবু বলেন: এই সমাধিতে মানুষের মৃত্যু হয় না। তিব্বতে এমন কয়েকজন যোগী আছেন যাঁরা এই ব্রহ্মচিন্তার যোগে পূর্ণ পুণ্যসিদ্ধ পুরুষ। পর্বতগুহায় সমাধিমগ্ন এই মহাত্মাদের নাড়ি পাওয়া যায় না, হৃৎপিণ্ড নিস্তব্ধ হয়ে যায়, রক্তচলাচল ব্যাহত হয়। যে কেউ বলবে যে, এঁরা সম্পূর্ণ মৃত। মনে করবেন না যে এঁরা তখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন। তখনও এঁরা আপনার-আমার মতোই সব কিছু সম্পর্কেই সচেতন থাকেন। আসলে তাঁরা উচ্চতর স্তরে ওঠেন যেখানে তাঁরা নিভৃত মহত্তর জীবনের অধীশ্বর হন। সীমার বাধা অতিক্রম করে অসীমলোকে উধাও হয় তাঁদের মন। সমস্ত বহির্বিশ্বকেই তাঁরা অন্তরের মধ্যে দেখতে পান। একদিন এই সমাধি ভংগ হবে তাঁদের,—এও ঠিক। কিন্তু সে কবে,—কে তা বলবে, তাঁদের দেহের বয়স তখন কয়েকশত শরৎ পার হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে! [ক্রমশ।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন
শিল্পী—শ্রীসুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় বক্তৃতামঞ্চে শ্রীনেহরু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীনেহরুকে বেশ অসুস্থ দেখা যাইতেছে।

লে: কর্ণেল বিজয়মোহন ভট্টাচার্য। নেফায় বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রীভট্টাচার্যকে মহাবীরচক্রে ভূষিত করা হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়া বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ডা: নিউম্যান সদলবলে নয়াদিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে উপনীত হইলে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানান।
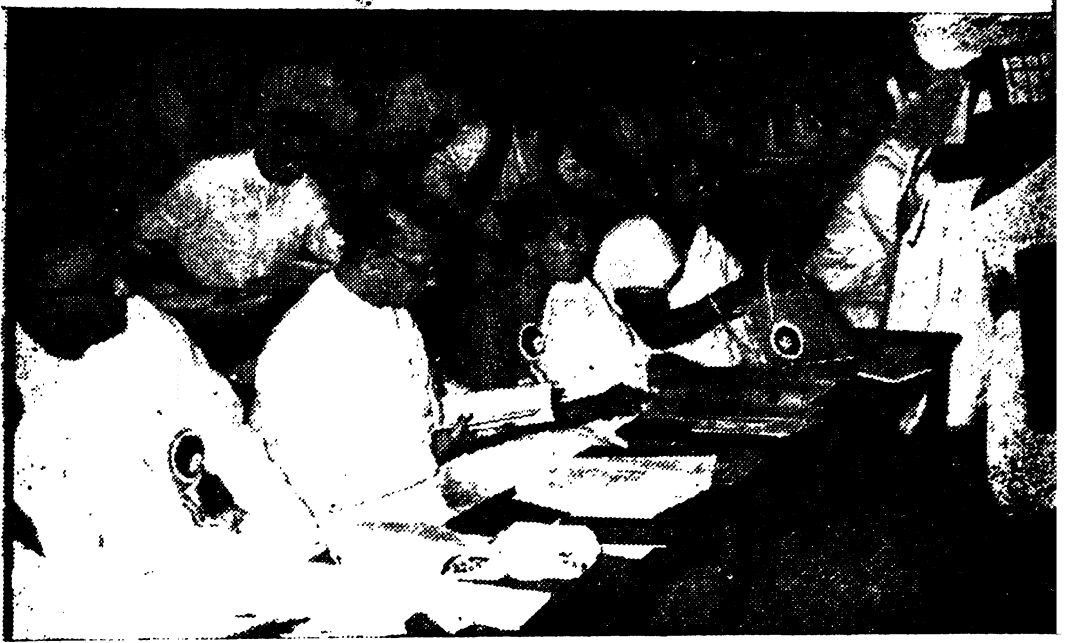
বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় প্রথম সারিতে (বাম দিক হইতে) শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীমতী রেণুকা রায় ও শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সর্বদলীয় শান্তি কমিটি গঠনের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রী জি. এল. নন্দ এবং কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

পদ্ম-কাঁটা

প্রাণতোষ ঘটক

বিয়ের পরের দিন থেকে সহ্য করতে হচ্ছে অতসীকে !

কথায় কথায় উঠতে-বসতে খোঁটা দেয় রজতেশ। গঞ্জনা শোনায় যখন-তখন, প্রায় বিনা অপরাধেই। কেমন যেন চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলে রজতেশ, ব্যঙ্গভরা তাচ্ছিল্যের সুরে। সময় নেই অসময় নেই, দিন নেই রাত নেই যখন খুশি দু-দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে মনে মনে যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কখনও ভর্ৎসনার মত শোনায় রজতেশের বাঁকা বাঁকা কথা। কখনও মনে হবে, সে যেন উপদেশ দিয়ে চলেছে। জ্যেষ্ঠ যেমন কনিষ্ঠকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। উপদেশের উপদ্রব থামতে না থামতে বকুনি শুরু হয়ে যায়। বেশ দস্তুরমত কড়া কড়া কথা। আগুনের ঝাঁজে উত্তপ্ত। শাণিয়ে নেওয়া। ধারালো।

ঝাঁক ঝাঁক তীর এসে গায়ে যেন বিঁধতে থাকে।

অতসী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে স্ট্যাচুর মত। ঘরের মেঝেয় চোখের আনত চাউনি থমকে আছে। প্রতিবাদ জানাবে কোথায় আজকালকার মেয়েদের মত, তা নয়। অতসীর মুখে কথা সরে না। চোখ দু'টি শুধু ছলছলিয়ে ওঠে। মৌনমুখে ফুটে ওঠে অপরিসীম লজ্জায় কাতরতা। নিজের প্রতি ঘৃণা আসে তখন যখন রজতেশ ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে টেরাবাঁকা কথা। মাঝে মাঝে তির্যক চোখে একেকবার দেখে নেয় অতসীর আপাদমস্তক। চোখের দৃষ্টি হেনে যেন চাবুক মারছে !

চোখ-ধাঁধানো রূপের জৌলুস, ফাটা ফানুসের মত যেন মিয়ে যায়। রূপের আগুন নিভে যায় কথার বৃষ্টিতে। অতসী যেন ঝড়ের রাতের রজনীগন্ধার ভেঙে-পড়া বৃন্ত।

কখনও কখনও কথা বলতে বলতে রাগের সুর শোনা যায় রজতেশের গমভারী কণ্ঠে। অতসীর এই অবিমিশ্র নীরবতায় রাগ ধরে তার। যেন খুন চেপে যায় থেকে থেকে। নেহাৎ অতসী নারী-জাতের তাই রক্ষা। নয় তো রজতেশ হয় তো অতসীর গায়ে হাত তুলতো। মুখে কথা নেই দেখে মারধোর করতো। এক-আধটা চড় কিম্বা কিল মাঝে-মিশেলে—

সত্যিই মনে মনে রজতেশ যেন আনন্দ পায় কথা শুনিয়ে। সুখের অনুভূতি আসে অবচেতন মনে। হয় তো তার হাতের সুখ হয়, ধীর নরম একটি দেহলতায় মনের সুখে আঘাত হানতে পারলে। তবে ততটা আর এগোয় না রজতেশ। আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দা আর প্রতিবেশীদের ভয়ে। যদি চেঁচিয়ে ওঠে অতসী, যদি কেঁদে ওঠে ককিয়ে !

একটা একটা অছিলা, খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করে রজতেশ। সামান্যতম ত্রুটি আর বিচ্যুতি দেখে বৃহদাকারে। খুঁত ধরে প্রতি পদে।

যাই রান্না করুক অতসী, আহারে বসলেই খাদ্যবস্তু মুখে তুলতে না তুলতে রজতেশ মুখ বিকৃত করবেই। বলবে,—সেই এক রান্না, রোজ রোজ কার আর ভাল লাগে !

উনানের আঁচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ব্যর্থ হয়ে যায় অতসীর কষ্টভোগ। কত যত্নের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। রজতেশের মুখে রোচে না। ব্যাজার হয় সে।

বিনম্র সুরে অতসী বলে,—রান্নার আইটেম ব'লে দিলে আর—

কথা শেষ হয় না। রজতেশ কথা ধরে। তার মুখে ভাতের গ্রাস তবুও বলে—আমি তো আর বাবুর্চি নই যে তোমাকে রান্নার মেনু তৈরি করে দেবো দু'বেলা। কৈ, আমাদের মা ঠাকুমাকে তো রান্না বাতলে দিতে হ'তো না কাউকে ! তাঁরা নিজেরাই কত রকমের ভ্যারাইটি রান্না করতেন। আজ এটা কাল সেটা।

বেলা ঠিক ছ'টা বাজলেই অফিস থেকে ফিরে আসে রজতেশ।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে চলে যেন। বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি বেজে ওঠে ঢং-ঢং। প্রাত্যহিক ধরাবাঁধা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। অফিসের পোষাক খুলতে খুলতে বিছানায় ধপাস করে ব'সে পড়ে রঞ্জতেশ। জামার পকেট থেকে রুমাল আর টাকার ব্যাগ বের ক'রে নিয়ে জামাটা ছুঁড়ে আলনায় ঝুলিয়ে দিতে সচেষ্ট হয় এবং বলতে বাধা নেই, প্রতিদিনই জামা আলনার পরিবর্তে ঘরের মেঝের আছড়ে পড়ে। পায়ের জুতোজোড়া খুলতে বসে শয়নঘরে। রাস্তার ধুলো আর ময়লা ছড়ায় ঘরে।

জামা আবার আলনায় তুলে রাখতে হয় অতসীকে। অপরিচ্ছন্ন জুতো, অতসীকেই রেখে আসতে হয় সেল্‌ফে।

রঞ্জতেশ ততক্ষণে গড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। দৈনিক কাগজখানি টেনে নেয় চোখের সামনে। সকালের বাসি খবর কাগজের পাতায়। চোখ বুলিয়ে যেতে হয় খানিক। বিস্তারিত সংবাদ পড়ে না রঞ্জতেশ। শীর্ষ সংবাদ পড়ে মাত্র। ঘুমের ওষুধের মতই যেন খবরের কাগজ। ঘুম আসে চোখে। রঞ্জতেশ ক্ষণেকের মধ্যে গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। একটা অনুনাসিক শব্দ ক্রমে ক্রমে জোরালো হ'তে থাকে ঘরে। ঘুমন্ত রঞ্জতেশের নাক ডাকছে সশব্দে। কেমন যেন শ্রুতিকটু ঠেকে অতসীর। ঈশ্বর যদি তাকে বধির সৃষ্টি করতেন!

সুস্বাদু সুখাদ্য। একলা খেতে পারে না অতসী। প্রাকৃতিক সুদৃশ্য। একা একা উপভোগ করতে পারে না সে। শ্রুতিমধুর গান। একা শুনলে যেন রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। রেডিওতে সান্ধ্যকালীন সঙ্গীতের প্রোগ্রামে আছে রবীন্দ্রনাথের গান।

অতসী রেডিওর চাবি ঘোরাতেই যন্ত্রসুরের মিষ্টি শব্দ ভেসে উঠলো। কনসার্ট বেজে চলেছে গানের আগে। নাটকের আগে যেমন নান্দীমুখ।

—আঃ! বিরক্তির সঙ্গে সজোরে বলে রঞ্জতেশ। ঘুম ঘুম চোখ মেলে বলে,—আচ্ছা ঝামেলা বটে! রেডিও বন্ধ করে দাও এখন।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় বাদ্যযন্ত্রের সুরেলা আওয়াজ। মোটরগাড়িতে হঠাৎ যেন ব্রেক কষলো কে। কণ্ঠরোধে নিস্পন্দ হয় রেডিও।

গান শুনতে না পাওয়ার দুঃখক্ষোভে অতসীকে দেখায় কেমন বিমর্ষ বিষণ্ণ।

আবার সেই বিকট শব্দ ভাসলো ঘরে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল রঞ্জতেশ। নাক ডাকতে শুরু করল যথাপূর্বম্‌।

সাঁঝের আকাশে তারা ফুটলে, আকাশ থেকে অন্ধকার নামলে, ঘরে ঘরে সোনালী বিজলী জ্বলতে দেখলেই অতসী যেন ডাক শুনতে পায় কানে কানে। বাহির তাকে ডাক দেয় চুপি চুপি। কানে গুঞ্জন শোনে ফিস ফিস। চোখে দেখতে পায় অস্পষ্ট বাহিরের সকাতর হাতছানি। আলো ঝলমল কলকাতা শহরের ইশারা। আকর্ষণ করতে থাকে অতসীকে। লোভনীয় ইঙ্গিত সেদিকে, চোখ যায় যেদিকে।

নিওন আলোর রঙিন লেখা ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। দোকানের নাম। পণ্যের বিজ্ঞাপন। সব মনিহারী দোকানে ফ্লোরেসেন্ট আলোর সূর্যশুভ্রতা। টুকরো টুকরো দিন যেন যাদুবিজ্ঞানে ধ'রে রেখেছে। ঐ যে ঐ দূরে বোলেভার্দ দেখা যায়। লম্বমান সরীসৃপ, কোথায় যে শেষ—কে জানে। প্রশস্ত রাজপথের বুকে একজোড়া ট্রাম লাইন। পথের আলোয় ইস্পাতের চিকন তুলছে হিলহিল সর্পিল।

পথ যেন ডাক দেয় অতসীকে। মনে মনে বাসনা হয়, খানিক অবধি ভ্রমণের। জনবিরল ফুটপাথ ধ'রে অনেক দূরে চলে যাবে দু'জনে গল্প করতে করতে। হাসতে হাসতে। তারপর ক্লান্তি এলে একটা কোন হোটেলে কিছুক্ষণ বসতে পারে। পথশ্রমের কষ্ট দূর করতে দুই গেলাস বরফ-ঠাণ্ডা কোকা-কোলা, কিম্বা আনারসের লেবুর সরবৎ। তার সঙ্গে দুই পাত্র ফলের আইসক্রীম।

কিন্তু বৃথাই লোভ। মিথ্যে আশা। রঞ্জতেশের ঘুম এখন ভাঙবে না। অতি আরামের সান্ধ্য-নিদ্রা ভাঙিয়ে তাকে ডাকাডাকি করবে তেমন সাহস হয় না অতসীর। বিনা প্রতিবাদে শুনে যেতে হবে রঞ্জতেশের নাসিক-গর্জন। কখনও দ্রুত, কখনও বিলম্বিত।

নিদ্রা আর মৃত্যুতে না কি খুব বেশি পার্থক্য নেই। ঘুমন্ত রঞ্জতেশের অস্তিত্ব কেমন যেন অর্থহীন ঠেকে অতসীর। রাস্তার ধারে জানলায় আশ্রয় নেয় সে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে আলোক-উজ্জ্বল রাস্তায়। সুন্দরী একটি বৌকে এমন আনন্দ-মুখর সন্ধ্যায় জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উৎসাহী আর রসিক পথিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। লাল রঙের শাড়ি পরণে। মাথায় ঈষৎ গুণ্ঠন। চোখে কালো কাজলের সুস্পষ্ট রেখা।

পাশের বাড়ির দেওয়াল-ঘড়ি ঢং ঢং বাজতে থাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। খেয়াল থাকে না অতসীর। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারও চোখে তন্দ্রা আসে। তখন অতসী চোখ দু'টি বন্ধ করে সাময়িক। এলিয়ে পড়ে জানলার গ্রীলে।

রাস্তার মোড়ের পানের দোকানের সামনের জটলা থেকে কে তামাসার ছলে শিস বাজিয়ে ওঠে সজোরে। অতসী যেন চমকে চমকে ওঠে। জানলা থেকে স'রে যায় নিমেষের মধ্যে। গাল পাড়তে থাকে বিড়বিড়। এই নির্লজ্জ বেয়াদপি অসহ্য লাগে। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয় অকস্মাৎ। আর দেখবে না অতসী, নিজেও দেখা দেবে না। জানলায় দাঁড়াবে না আর।

ডবল-ডেকার বাস ছুটছে মদমত্ত হাতীর মত। দুই পাশের ঘর-বাড়ি কেঁপে কেঁপে উঠছে দুরন্ত-গতি বাসের হুঙ্কারে। মাঝে মাঝে ডিজেলের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

আশপাশে কোথায় রেডিওতে এখন গানের শেষে যন্ত্রসঙ্গীত বেজে চলেছে মিষ্টি করুণ সুরে। বেহালা ককিয়ে ককিয়ে উঠছে সুরের যন্ত্রণায়।

ঢং ঢং ঢং ঢং—

আবার ঘড়ি বাজতে থাকে পাশের বাড়ির ঘরের দেওয়ালে। গুণে-গুণে আর শুনতে হয় না অতসীকে। সে জানে নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাসে, কটা বাজলো এখন।

ন'টা বাজতে শুরু হ'লেই অতসী তটস্থ হয়ে ওঠে আর একবার। কেমন যেন এক চাপা উৎকণ্ঠায় নীরব। আর দেরী নয়। গেরস্থালী কাজের পাট চুকিয়ে ফেলতে পারলে বেঁচে যায় অতসী। ইতি টেনে দিয়ে সেও শয্যায় আশ্রয় চায়।

—ওগো শুনছো! ডাকতে ডাকতে অতসী ঝুঁকে পড়ে রঞ্জতেশের মুখের কাছে। তাকে ধ'রে ঠেলা দেয় আচমকা।

—কি? কি শোনাবে তাই বল। দেখতে পাচ্ছো মানুষটা সারাদিন পরে তেতে পুড়ে এসে একটু জিরেন—

—না। কিছু শোনাতে চাই না। বীতরাগের সুরে কথা বলছে অতসী।

—তবে ডাকাডাকি করছো কেন অকৌতুক?

—খাওয়ার সময় উত্তরে যাচ্ছে তাই ডাকছি। আর কোন কারণ নেই। ওদিকে ন'টা বেজে গেছে ঘড়িতে।

—তাই না কি? রজতেশ শুধোয় এমন সুরে, যেন অতসী মিথ্যে কথা বলছে।

—হ্যাঁ।

—তবে তো উঠতেই হবে। ঘুমের জড়তায় জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে রজতেশ। পাশ ফিরে নেয় ঘুম ভাঙতেই। মাথার বালিশ ঠিকঠাক করে। বলে,—যাও, খাবার সাজাও গিয়ে টেবিলে। আমি উঠছি।

রজতেশ যে আরও অন্তত মিনিট দশেক ঘুমের আবেশ কাটিয়ে তুলতে বিছানায় শুয়ে থাকবে, জানে অতসী। রোজ দেখছে সে। স্বচক্ষে।

উনানের ধারে আগুনের তাতে ব'সে ব'সে রজতেশের জন্ম তার মনোমত এটা সেটা রান্না করতে যেন বাধ্য অতসী। তার কপালে লেখা আছে, সে প্রত্যহ মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করবে শুধু। একজনের রসনার তৃপ্তিসাধনে যেন ব্যর্থ হবে তার অন্য সকল কিছু খেয়াল খুশি। সাধ আহ্লাদ। মনোবাসনা। অতসী শুধু রান্না করবে দু'বেলা। আর অন্যান্য যতেক মেয়ে, তারা আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকবে। বেড়িয়ে বেড়াবে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে। হোটেলে খাবে ভাল মন্দ।

তবুও খেতে বসতে না বসতে রজতেশের মুখে অভিযোগের অন্ত থাকে না। বলে,—সেই এক রান্না! প্রকরণ প্রণালী সবই এক। খেতে খেতে খাওয়ায় অরুচি ধ'রে গেল!

অতসীকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরের দরজায় শব্দ তুলে কেমন যেন নাটকীয় ভঙ্গীতে হঠাৎ দেখা দেয় রজতেশ। খাওয়ার টেবিলে প্রলুব্ধ চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে সাগ্রহে। খাবারের আধার ক'টা দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কি কি বস্তু আছে, কতটা পরিমাণে। বেশ বোঝা যায়, রজতেশ শ্বাস টেনে টেনে রান্নার সুগন্ধ সেবন করছে। ঘ্রাণে অর্ধভোজন? ঠোঁট ওল্টায় রজতেশ। বলে,—ওটা কি পদার্থ? চিংড়ি মাছের মালাইকারী।

কথার শেষে ঘুমের ঘোরে হাই তুলতে থাকে রজতেশ। বিরাট মুখব্যাদন করে। হাঁ করে এমন, যেন অতসীকে বিশ্বরূপ দর্শন করাবে।

উত্তর দেয় না অতসী। নিশ্চুপ থাকে। মনে মনে হাসে থেকে থেকে। এই নিদারুণ দুঃসহ গরমে অতসী তবু দু'তিন রকমের ডিস তৈরি ক'রেছে অতি কষ্টে ঘামতে ঘামতে। ভাত, ডাল তো আছেই। তার ওপর গোটা দুই তিন ব্যঞ্জন। মিষ্টি মিষ্টি ছোলা কুমড়োর ডালনা। মালাইকারী। পুঁটি মাছের অম্বল। নেহাৎ আজ ইচ্ছাকে দমন করেছে অতসী। মনে মনে ভেবেছিল, আজ তরকারীতে নুন দেবে না সে। মালাইকারীতে দই দেবে না। অম্বলে তেঁতুল দেবে না। পরিবর্তে তরকারীতে দেবে কয়লার গুঁড়ো। কিম্বা এক মুঠো ধুলো। নিদেন পক্ষে অম্বলে গোটা কয় মরা-আরশুলা ছড়িয়ে দেবে। কেন না যতই ভাল হোক, যতই মন্দ হোক, খেতে বসে খাওয়ার সমালোচনা করবেই রজতেশ। শুনতে শুনতে খাওয়া হবে না অতসীর। খেতে ব'সে খাওয়ায় ভাগ বসাবে অতসী। নিজে একরকম অভুক্ত থাকবে।

—ডিমের ডালনা রাঁধলেই পারতে আজ। গোটা গোটা আলু দিয়ে ডিমের—কথা বলতে বলতে রজতেশ ভাতের স্তূপে হাত চালায়। কুমড়োর তরকারীর বাটি উল্টে দেয় পাতে। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে গ্রাস গ্রাস ভাত। আর যেন কখনও খেতে পাবে না সে। কাঁসির খাওয়া খেতে ব'সেছে যেন রজতেশ। অন্য কিছুতে দৃকপাত নেই তার।

—কাল ডিমের কিছু করবো। আজ আর পেরে উঠলাম না।

অতসী বললে কেমন যেন সঙ্কোচের সঙ্গে। মুখ ফুটে কেউ যদি কিছু খেতে চায় কোন মেয়ের কাছে, কে আর না রেঁধে দেয়। যদি অবশ্য শারীরিক সামর্থ্যে কুলিয়ে ওঠে।

বিয়ের সেই পরের দিন থেকে, যেদিন অতসী প্রথম স্বামী ঘরে আসে, রজতেশ যেন নতুন বৌকে দেখেই ধারণা ক'রেছে যে বৌ তেমন কাজের হবে না।

—খেয়ে যদি মুখ না বদলায় তবে আর কি খেলাম!

রজতেশ খেতে খেতে থামলো এক মুহূর্ত। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার মন দেয় আহারে।

খেলার সময় খেলা। লেখাপড়ার সময় লিখনপঠন ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের সময় ঘুম। খাওয়ার সময় খাওয়া।

কিন্তু রজতেশ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। খাওয়ার সময়ে কিন্তু কেবল খেয়েই যায়। খেতে খেতে হাসি আর গল্প চলবে—তাই চায় অতসী। পছন্দ করে হাসতে হাসতে খাওয়া। রজতেশ কথা বলে কথা শোনাতে। অতসীর কথা শুনতে নয়।

—ডিমের অমলেট বানিয়ে দেবো? তাড়াতাড়ি হবে।

অতসী বললে মিষ্টি সুরে। তার ইচ্ছা হয় টেবিল থেকে খাবারের পাত্রগুলি তুলে তুলে ঐ রাস্তার আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়।

—না। ঢের হয়েছে। থাক। আর অমলেটে কাজ নেই। খেয়ে খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে।

বাসিবিয়ের দিন নতুন-বৌ অতসী, হাত থেকে কি একটা কাচের বাসন ফেলে দেয় অসাবধানে—ঝন-ঝন শব্দ ওঠে। একটা পিরিচ পেয়ালা ভেঙে চুরমার। হাত ফসকে আছড়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়, মাথার তেলের শিশিটা রাখতে গিয়ে উল্টে যায়। অতসীর পরণের শাড়িখানা সুগন্ধি তেলে ভিজে গেল। ফুলশয্যার রাতে রজতেশ ব'সে ব'সে মশা মারতে থাকে চড়-চাপড় চালিয়ে। মশককুল এমনই বেরসিক যে ফুলশয্যা মানতে চায় না। দংশনের জ্বালা ধরিয়ে দেয়, সুখের শয্যা কণ্টকময় মনে হয়, নতুন-বৌ অতসী বিছানার একপাশে। মরে আছে না বেঁচে আছে কে জানে। ফুলশয্যায় মিলনের রাত্রে কোথায় রোমাঞ্চিত হবে, অজানা রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটনে কোথায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। অতসী চুপচাপ শুয়ে থাকে, ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে। কেমন উদাসিনী বৈরাগিণীর মত দেখায় নতুন-বৌকে তার কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই যেন। নেই কোন কামনা-বাসনা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, উত্তেজনা উন্মাদনা ঠাণ্ডা বরফ যেন অতসী। যেন হিমকুণ্ড। নিঃসাড়।

এক আধবার লজ্জার মাথা খেয়ে রজতেশ নতুন বৌয়ের একখানি হাত নিজের হাতে ধ'রে রাখতে চায়। একখণ্ড বরফ যেন অতসীর হাত। তালু ঘামছে হাতের। অজানা পরিবেশে এসে সে যেন বোবা মেরে গেছে। দেহ-উপচার অর্ঘ্য দেওয়ার মিলন রাত্রি। প্রথম স্মরণীয় রাত যুগল-মিলনের। প্রতিটি দম্পতির উদ্বেগ-আকুল মধুরাতি, যার শুভাগমন প্রত্যাশায় রাতের পর রাত প্রতীক্ষায় অধীর থাকতে হয়। জানে না অতসী? তার দেহলতা কি সাড়া দিয়ে দিয়ে জানান দেয় না। মৌন আবেদন, শুনতে পায় না সে। গোপন হৃদয়ের ভাষা, হয় তো দুর্বোধ্য লাগে। যতই সে হোক নারীসুলভ দৈহিক গঠনে, রজতেশ যেন খুঁজে পায় না একতিল নারীত্ব। হয় তো রজতেশের চোখে ধরা পড়ে না অতসীর দেহলক্ষ্মী। যৌবনের চক্ষু বিদারক ইঙ্গিত। রজতেশ জানতে পারে না, অতসীর বুকে আছে মধুক্ষরা।

সাদা আকাশ আর সবুজ প্রকৃতি অতসীর ঢলঢল মনকে দোলা দেয়। কবিতা, গান, সাহিত্য স্পর্শ করে তার সূক্ষ্মতন্ত্রী মন। শিল্পসৃষ্টি দেখে দর্শনসুখ পায়।

বিয়ের পর কয়েকটি দিন যেতে না যেতে অতসী আবিষ্কার করলো, রজতেশের শখ-খেয়াল অনেক। ছুটির দিনে বড় একটা বাসায় থাকে না সে। সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে কলকাতার বাইরে এখানে-সেখানে মাছ ধরতে যায়। সঙ্গে যায় হুইলছিপ। জলের মাছকে প্রলোভন দেখানোর নানান সস্তার সরঞ্জাম। নকল পোকা। পিঁপড়ের ডিম। কেঁচো। মসলা চার। সাদা ভাত।

অবশ্য মাছ ধরার ঋতু বছরে একাধিকবার আসে না। গ্রীষ্মের শেষাশেষি একটু বৃষ্টি নামলে তবেই মাছ ধ'রে আনন্দ।

আরও শখ আছে রজতেশের। ক্রিকেট খেলার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ তার। পাড়ার বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে খেলতে নামে রাস্তায়। দল বাঁধে। খেলোয়াড় নির্বাচন করে। নির্বিকারে ব্যাট ধরে। বল করে। লোকের বাড়ির ছাদে বল তুলে দিয়ে ওভার বাউণ্ডারী হাঁকায় যখন তখন। ছোট ছোট ছেলেদের বোল্‌ড্‌-আউট ক'রে দেয় গুগুলি বল চালিয়ে চালিয়ে। সিভেড রজতেশ নাম লেখায়—

রজতেশের ধারণা, সুযোগ এবং সুবিধা পাওয়া গেলে সে একদিন নিশ্চয়ই ব্র্যাডম্যানের না হোক জয়পুর কিম্বা পতৌদীর নবাবপুত্রদের স্থান দখল করতে পারতো।

মাঝে-মিশেলে অবরে-সবরে রজতেশ আবার শিকারে বেরিয়ে যায় বন্ধুদের সঙ্গে। চক্রধরপুর রেঞ্জ, নয় তো ডুয়ার্সের জঙ্গলে চ'লে যায়। পক্ষকাল আর দেখা পাওয়া যাবে না রজতেশের। নিজের বন্দুকের লাইসেন্স নেই তার। বন্ধুদের হয় তো আছে কারো কারো। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার সাজে রজতেশ! কখনও কখনও হরিণের শিং, সম্বরের চামড়া, মরা ময়ূর সঙ্গে আনে শিকার থেকে। যেমন পাওনা হয় রজতেশের।

কতদিন যখন একা থাকে অতসী, নিষ্প্রাণ ময়ূরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অঝোরে চোখের জল ফেলেছে। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। সম্বরের চামড়ায় হাত বুলিয়ে দুঃখের সহানুভূতি জানিয়েছে। হরিণের শিং দেখতে দেখতে শিউরে শিউরে উঠেছে মনের কষ্টে। কে জানে, হয় তো রজতেশের শখ মেটাতে আত্মবলি দিয়েছে কত নিরপরাধ হরিণ। চরম নিষ্ঠুরের মত দূর থেকে অলক্ষ্যে লুকিয়ে পরম কাপুরুষের মতই রজতেশ বন্দুকের ঘোড়া টিপেছে। বনের সাথীহারা জর্জর হরিণী বিরহবেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়। চোখের কোণ বেয়ে নামে হয় তো অশ্রুধারা। বিয়োগ-ব্যথার জ্বালায় শ্বাস ফেলে হয় তো।

একটা নির্দিষ্ট ঘর আছে রজতেশের। সিঁড়ির তলায় প্রায়ান্ধকার ছোট একটি কুঠরী। হঠাৎ একদিন নজরে পড়েছে অতসীর। দেখতে পায়, সেই ঘরের মধ্যে আছে ক্রিকেটের ব্যাট, ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট, লাল রঙের কর্কের বল। মাছ ধরার সরঞ্জাম। হুইল। ফাতনা। বঁড়শি! এক জোড়া কালো রবারের উইলিংডন বুট জুতো। ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে গুলতী। সেকেলে বর্শা। ক্ষেতের ফসল খেতে আসে বুনো শূয়োর। বর্শার আঘাতে জখম করতে হয় তাদের। কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রেছে রজতেশ। নীলামে কিনেছে হয় তো।

—আমাদের মা-ঠাকুমা কত কাজই না করতেন গেরস্থালীর। খেতে খেতে কথা বলে রজতেশ। খাওয়া থামিয়ে বলে,—তার ওপর দু'বেলা রান্না, জলখাবার নিজেরাই তৈরি করতেন। কত রকমের রান্না জানতেন তাঁরা। আমিষ আর নিরামিষ। মিষ্টি আর নোনতা।

—কি মিষ্টি খেতে চাইছো বললেই পারো। চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ধীরে ধীরে বললে অতসী শান্তকণ্ঠে। খেতে বসেছে সে, কিন্তু কিছুই মুখে তুলছে না। এটা সেটা নাড়াচাড়া করছে মাত্র। সেদিকে চোখ নেই রজতেশের।

—খেতে চাইলে যে কি খেতে পাবো জানা আছে আমার। রজতেশ বললে ঈষৎ আক্ষেপের সুরে। বললে,—সেদিন রসগোল্লা খেতে চেয়ে কি ফ্যাসাদ হ'ল মনে পড়ছে? সবই প্রায় ফেটে চৌচির। আর আমার পয়সা নষ্ট। তার আগে তুমি একদিন নারকেলের মেঠাই পুড়িয়ে ফেললে স্রেফ্‌।

চোখ নত করে অতসী। তার ভুল, তার অজ্ঞতার জন্য যেন লজ্জা পায় অপরিসীম। রজতেশের মা আর ঠাকুরমার তুলনায় নিজেকে মনে হয় তুচ্ছ, নগণ্য। মূল্যহীন অপদার্থ।

ক্ষণেকের নীরবতা। রজতেশ যেন কথা ব'লে সময় নষ্ট করছে ভাব দেখায় এমন। আবার খেতে শুরু করে দেয় নতুন উদ্যমে। ডালের বাটি উপুড় দেয় পাতে। ভাতের পাহাড় ভাঙে।

আপ্রাণ চেষ্টার পর যদি বিফল হয় সে—দোষ অতসীর নয়। প্রায় অনাড়ি বললেই হয়। ময়রার দোকানের, হোটেলের রন্ধনশালা দেখলো না কখনও অতসী। তবুও পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে দেখাতে হবে তাকে, তার হাত আছে না নেই। জানে কি জানে না। রান্না শিল্পে সকলেই এমন কিছু সিদ্ধহস্ত হ'তে পারে না। তবে কাজ চালিয়ে দেওয়ার, দিন চালিয়ে দেওয়ার মত রান্না ঠেকায় প'ড়ে শিখে নিতে হয়েছে অতসীকে। একে তাকে জিজ্ঞেস ক'রেছে, কত চালে কত ভাত হয়। ডালে কি কি দিতে হয়। মাছের কতটা ঝালে কতটা ঝাল দেবে। কোন তরকারীতে লবণ মেশাবে কি পরিমাণে।

—সেদিন মোহনভোগ খেতে চেয়েছিলাম কতকাল পরে।

ভাতের গ্রাস মুখে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলে রজতেশ। একটা গোটা চিংড়ি মাছ মুখে পুরে দিয়েছে। বললে,—এমন জল দিয়েছিলে

যে হালুয়া হয়ে গেল কালিয়ার সামিল। শেষ পর্যন্ত চুমুক দিয়ে খেতে হয়েছিল আমাকে।

আশ্চর্য হয় অতসী, কিছুই যেন ভুলতে পারে না রজতেশ। আবার ঠিক ঠিক সময়ে, যথা মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ে তার একটা একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা। অতসীর যত সব দোষ আর অপরাধের ইতিবৃত্ত।

—ভুল ক'রে একটু বেশি করে জল ঢেলে ফেলেছিলাম।

দোষ স্বীকার করলে অতসী। আনত চোখে তাকিয়ে থাকলো ভাতের থালায়। অপরাধীর মত।

—ভুল, ভুল আর ভুল! তোমার ভুলের ঠেলায় মারা গেলাম আমি।

রাগের সুরে বলে রজতেশ। কেমন যেন চাপা আক্রোশের সঙ্গে এক পলের জন্ত তার মুখের চোয়ালের হাড় কঠিন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। রাগের মাত্রা বৃদ্ধি হ'তে থাকলে মুখের এই কঠোরতার প্রকাশও ঘন ঘন দেখা যায়।

—শিখতে গেলে জানতে গেলে প্রথম প্রথম ভুল সকলেই করে। আমি জানতাম না রান্না করতে, খাবার তৈরি করতে। আমাকেও শিখতে হচ্ছে; জেনে নিতে হচ্ছে।

ম্লান মৃদু হাসি অতসীর মুখে। স্বভাব-নম্র সুর কথায়। মনে ব্যথা পাওয়ার করুণ চাউনি চোখে। দোষ কবুল করছে, নিজের অজ্ঞতা জানিয়ে দিচ্ছে সরাসরি, তবুও দয়ামায়া নেই।

অতসীর কাজের খুঁত ধরতে পারলে উদ্দীপনা আসে যেন রজতেশের। সে যেন কিছুতেই ভুলতে পারে না সামান্যতম ত্রুটি।

—ধোপার কাছে জামা-কাপড় পাঠালে সেদিন, অথচ লিখে রাখলে না খাতায়। মনে পড়ছে? রজতেশ বললে হাতের গ্রাস মুখ থেকে নামিয়ে।

নীরব অতসী। দুঃখের ম্লান হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

—জানি, এখন আর মনে পড়বে না; ব্যঙ্গের হাসি রজতেশের মুখে। বললে,—আমার সিল্ক-টুইলের একটা সার্ট কোথায় যে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল ধোপা তার কৈফিয়ৎ দিতে পারলে না। আমিও বোকা বনে গেলাম। খাতায় যখন লেখা নেই—

মনে পড়ছে বৈ কি অতসীর। যখন তার মনে পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বার বার। অনভিজ্ঞতার দোষে কত ভুলই না করে মানুষ। পৌরাণিক মুনি-ঋষিদেরও শোনা যায় মতিভ্রম হ'ত। স্বয়ং বিধাতাও না কি ভুল করেন কচিৎ কখনও। দেরাজ থেকে জামার দিস্তে টেনে টেনে বের ক'রে রজতেশের অনুপস্থিতিতে, ইচ্ছা হয় উনানের আগুনে ধরিয়ে দিতে। অতসীর মনের সঙ্গোপনে পরিকল্পনা দেখা দেয় একটা একটা। রজতেশের শখের আর ফ্যাশানের ইস্ত্রি করা জামার গোছা নিঃস্ব নিরাবরণ ভিখারীদের বিলিয়ে দেওয়াই সমীচীন মনে হয় অতসীর। রজতেশ জানতে পারবে না। সে যখন থাকবে অফিসে, দুপুরের সেই নিরালায়।

পুরুষের পোষাকে সদা-জাগ্রত সচেতনতা অপছন্দ করে অতসী। মন থেকে তার অশ্রদ্ধা এমন জনের প্রতি। তবে আর ছেলেতে মেয়েতে তফাৎ কোথায় থাকবে!

রজতেশের কাছে যা প্রয়োজন তা যেন এক প্রদর্শনী। কত সব রঙ-বেরঙের জামা পরে রজতেশ। দৃশ্য আঁকা বুশ-সার্ট। জামার ডিজাইন বেছে দেয় স্পেন আর দক্ষিণ আমেরিকার পোষাকের সচিত্র ক্যাটালগ থেকে।

হাসি পায় অতসীর। কত সময়ে নির্জনবাসে হেসে ফেলে সত্যি সত্যি। রজতেশের রুচি যেন বড় বেশি হাস্যকর।

—জামাটা এক ধোপের বেশি পরতে পেলাম না আমি।

মুখের গ্রাস গলাধঃকরণের পর কেমন কাতর সুরে বললে রজতেশ। রাজা যেন রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছে। পুঁজিবাদী যেন তার পুঁজি হারিয়ে ফেলেছে!

—বাবাকে চিঠিতে লিখে দিয়েছি। এবার যেন জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বে একটা সিল্ক-টুইলের সার্ট—

কথা শেষ হয় না অতসীর, সশব্দে হেসে ওঠে রজতেশ। তাচ্ছিল্যের ঘর-ফাটানো হাসি। টেবিলের কাচের বাসন, ঠুং ঠুং শব্দ তোলে গৃহস্বামীর হাসির চাঞ্চল্যে। হাসতে হাসতে বললে,—আর হাসিও না। তোমার বাবা একটা সার্ট দিতেই একশো কথা শোনাচ্ছেন। তাঁকে আবার একাধিক জামার কথা বললে হয় তো অজ্ঞান হয়ে যাবেন। আর জ্ঞান ফিরবে না।

—সামর্থ্য সকলের সমান হয় না। তিনি একজন সাধারণ গৃহস্থ ছাড়া কিছুই নন। মানুষের অক্ষমতাকে তুচ্ছচোখে দেখতে নেই।

—থাক আর ওকালতি করতে হবে না। আর শিক্ষা দিতে হবে না। উপদেশ আমি শুনতে চাই না। ঢের শুনেছি পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে।

কথার শেষে আবার ভাতের পাহাড় ভাঙে রজতেশ। খেতে খেতে ক্লান্তি, এতক্ষণের খাওয়ার জন্য লুপ্তশক্তি পুনরুদ্ধার ক'রে নেয় সে। মালাইকারীর রেকাবী উল্টে দেয় পাতে। একটা একটা চিংড়ি মাছের মুড়ো মুখে পুরে কেমন একটা মৌখিক শব্দ সহকারে খেতে থাকে। একেই আবার অতসীর কানে যেন বিষ ঢালে এই ধরণের অশালীন শব্দ, খাওয়ার টেবিলে। মুখের বিকৃতি খেতে খেতে। চোখে দেখতে পারে না অতসী। খেতে ব'সেছে না কালোয়াতী গান গাইতে বসেছে, কে বলবে!

সত্যিকার ভুল বা নির্বুদ্ধিতা নয়, অতসীর মন নেই সংসারের খুঁটিনাটিতে। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় চলতে চলতে তাই অজ্ঞাতে ভুল এক-আধটা হয় বৈ কি অতসীর। নতুন পথের যাত্রায় দিক-ভুল হবে, বিচিত্র কি! বিস্মরণ এসে যেন ভুলিয়ে দিয়ে যায়। অতসী চলতে পারে না কঠিন অনুযায়ী। বাঁধাধরা নিয়মকানুন, মেনে চলার গণ্ডী, মানতে পারে না আদপেই। মেলে না তার সূক্ষ্ম মানস-প্রকৃতির সঙ্গে। খাপ খায় না।

গণিত আর কবিতা পরস্পরবিরোধী। একে অন্যের সঙ্গে মেলে না। তেল আর জল যেমন মিশ খায় না। সাদা আর কালোর মেলা!

সাদা মন অতসীর। আর শুভ্রতা অর্থেই সাত্ত্বিকতা। এত ঘোরপ্যাঁচ জানে না সে। ভাবে না সাত-পাঁচ। কবিতা, গান, ছায়াছবি, সম্ভ্রান্ত হোটেলে খাওয়া—আর কিছু ভাল লাগে না অতসীর। কলহ বিবাদ-বিসম্বাদ যত এড়িয়ে চলতে চায়, তত যেন ঝগড়া বাঁধে

পরস্পর। রজতেশ কারণে-অকারণে রাগারাগি করে। চোখের জল পড়ে অতসীর। বৃষ্টির জলের মত বড় বড় ফোঁটা, চোখ থেকে গাল বেয়ে বুকে পড়তে থাকে টুপ টুপ।

আগামীকাল রান্নার সময়ে তরকারীতে ঠিক কাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দেবে অতসী। মনে মনে পণ করলে যেন একটা। রজতেশের খাওয়ার লোভ আর খাবার নিয়ে কথা কাটাকাটি—শেষ ক'রে দেবে এক গোপন কৌশলে। ভাতের থালায় দিয়ে দেবে উনানের ছাই। তরকারীতে আলুর পরিবর্তে দেবে মানকচু। দেখা যাক, রজতেশ কি করতে পারে।

যতই মন কষাকষি থাক, তবুও দিন কেটে যায় একটা একটা।

বাধ সাধলো একটি মেয়ে। কোথা থেকে এসে জুটেছে কে জানে। রজতেশের ভক্ত যেন সে। তাকে উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। নাম তার চিত্রিতা। প্রজাপতির মত সর্বক্ষণ যেন ফরফরিয়ে উড়ছে। বেশ কয়েকদিন রজতেশের সঙ্গে চিত্রিতাকে দেখতে পেয়েছে অতসী। লেকের ধারে বেড়াতে দেখেছে, দু'জনকে পাশাপাশি যেতে দেখেছে কতদিন। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে রজতেশ নাকি খেলার মাঠে যায় খেলা দেখতে। চিত্রিতাকে দেখলেই রজতেশের গম্ভীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটতে দেখা যায়। বলতে বাধা নেই, মেয়েটিকে দেখলেই অতসী যেন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। চিত্রিতাকে দেখলে পৃথিবীর কিছুই যেন তখন আর ভাল লাগে না। এমন কি নিজেকেও নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অতসী একেকবার নিজেকে দেখে খুঁটিয়ে। দাঁড়িপাল্লায় যেন ওজন দেখে নিজের। দাঁড়িপাল্লার একদিকে অতসী, আর এক পাল্লায় চিত্রিতা। স্বীকার করতেই হয় অতসীকে আপন মনের কাছে, চিত্রিতার চোখ দু'টি অনেক বেশি আকর্ষণীয়। যেন তার চোখে মদিরতা মাখানো। গজ-ফিতায় মাপলে হয় তো দেখা যাবে, চিত্রিতার চোখ দু'টি আয়তনে দীর্ঘতর। অতসী জানে মাত্র দু-তিন রকমের কেশরচনা। চিত্রিতার মাথায় একেকদিন একেক রীতির কবরী দেখতে পায় অতসী। চুল বাঁধার ধরণ দেখতে দেখতে বিস্ময় মানে অতসী। চিত্রিতা জানে ইদানীং কালের ফ্যাশন আর স্টাইল। অতসী আরও লক্ষ্য করেছে, চিত্রিতার কটিদেশ কত বেশি কৃশ। কখনও কখনও চিত্রিতাকে দেখায় যেন অজন্তার দেওয়ালচিত্রের বৌদ্ধ-কন্যার মত। বৈদেশিক কাঁচুলীর বন্ধনে তার যুবতী-লক্ষণ আরও যেন অদম্য অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

যদি একটা ভারী অসুখ ধ'রে চিত্রিতার। এমন অসুস্থতা যে, উত্থানশক্তি আর থাকবে না। এমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি ধরুক, যেন রূপের বালাই আর না থাকে এবং অসুখে ভুগতে ভুগতে যখন আর রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালানোর ক্ষমতা আর থাকবে না, তখন চিত্রিতা মরুক না কেন। অতসীর রাস্তা নিষ্কণ্টক হয় তবে। জ্বালা জুড়োয়। বেঁচে যায় সে সদাসর্বদার দুশ্চিন্তা থেকে।

—এর চেয়ে ছাড়াছাড়ি ভাল। খটাখটি অসহ্য লাগছে আমার!

রাতের বেলায় বিছানায় রজতেশ কথা বলে সিগারেট টানতে টানতে। ঘরের কড়িকাঠে চোখ তুলে। বলে,—সেপারেশন ছাড়া গতি নেই আর। মিথ্যে মিথ্যে অশান্তি পুষে রেখে লাভ কি! খেয়ে ঘুমিয়ে যখন সুখ নেই! খানিক থেমে আবার বললে,—আমি চাই বিচ্ছেদ। দরখাস্ত করবো আদালতে। সেপারেশনের এ্যাপ্লিকেশন করবো সব কথা জানিয়ে।

—আমি ছাড়াছাড়ি চাই না। বিচ্ছেদ চাই না।

অতসী কথা বলে, বেশ একটু সাহসের সঙ্গে। সে নিজেই যেন জানে না, তার বুকে আছে এতটা দুঃসাহস। জানতো না, সে এমন নির্ভয়ে কথা বলতে পারে। এমন স্পষ্টাস্পষ্টি। বললে,—আমি যে তোমাকে ভালবাসি রজত। আমিও চাই না ঝগড়া করতে। আমি চাই শান্তি।

আমি যে তোমাকে ভালবাসি রজত। আমি ত চাই না ঝগড়া করতে।

—আমি কিন্তু তোমাকে মোটেই ভালবাসি না, দুঃখের বিষয়। রজতেশ জানিয়ে দিলে সরাসরি। জানিয়ে দিলে মনের ভাব, সুস্পষ্ট।

—বিচ্ছেদের ভিত্তি দেখাতে হবে। আদালতের কাছে জানাতে হবে ছাড়াছাড়ি হ'তে যাওয়ার মূল কারণ। অতসীর মুখে দুঃখের নিষ্প্রাণ হাসি। কথার সুরে হতাশা। একটু থেমে থেকে আবার বললে,—তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি কখনও কোন অন্যায় করি নি।

—এমন কোন স্মরণ কাণ্ডও করলে না কখনও! এমন একটা কিছু উল্লেখযোগ্য। রজতেশ আবার সেই মত চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলতে থাকে। এখন যদিও অবশ্য তার মুখে কিছু খাদ্য নেই। রজতেশ যেন কথাগুলি চিবিয়ে খাচ্ছে। ছাইদানে সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে বললে,—তুমি ঘরের বৌ হওয়ার অযোগ্য। যার কর্তব্যজ্ঞান নেই, তার আবার বিয়ে করতে সখ হয় কেন! তোমার জন্যে আমাকে কি মরতে হবে?

চোখ তুলে তাকাল অতসী। ছল-ছল চোখ। পরণের ঘোর লাল রঙের শাড়ির আঁচলের একটি কোণ হাতে তুলে নেয়। আঙুলে জড়াতে থাকে অন্যমনে। অতসী এখন স্তব্ধ নির্বাক। তার মনে পড়েছে অতীতের দিন কটা। বিয়ের পরের বছরগুলো। এমন একটি দিনও গেল না যে দু'জনের ঠোকাঠুকি, মন কষাকষি বা কথা কাটাকাটি চললো না। অতসীর তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যথার আর দুঃখের। মুখ ফুটে বলা যায় না কারও কাছে।

—যারে দেখতে নারি—

কি একটা পুরাণো বাঙলা প্রবাদ, ক্রোধের সঙ্গে উচ্চারণ করতে গিয়ে থেমে যায় অতসী।

চেঁচিয়ে উঠলো রজতেশ। আশপাশের বাড়ির বাসিন্দাদের শুনিয়েই যেন বললে,—সাট্ আপ! ননসেন্স! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

চমকে চমকে ওঠে অতসী। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যা খুশি বল শুনতে রাজী আছে সে। পাড়ার লোককে জানিয়ে বৌকে শাসন,—তার চেয়ে মরণ মঙ্গলের। এক ফোঁটা জল পড়লো অতসীর বুকে। চোখ মুছে নেয় আঁচলে। আজ স্মরণে আসে অতসীর, একেকটি রাত সে কত কষ্টই না কাটিয়েছে রজতেশের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে। যেন প্রতিমুহূর্তে কষ্ট দিয়েছে রজতেশ। শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে যে এত অত্যাচার চলতে পারে, জানতো না অতসী।

—তোমার জন্যে আমাকে কি মরতে হবে?

রজতেশের কথাগুলি যেন কানে বেজে উঠছে অতসীর। মনে মনে হাসি পায় অতসীর। মনে মনে বলে, তুমি মরলে দেশের কোন ক্ষতিই হবে না। পৃথিবী থেকে বিদায় হবে একজন স্বৈরাচারী স্বার্থপর কলহপ্রিয় মানুষ। পৃথিবীর জল-হাওয়া যেন বিষমুক্ত হবে রজতেশের মৃত্যুতে।

সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে জেদ ধরেছিল রজতেশ, গড়ের মাঠের অক্টারলোনী মনুমেণ্টে উঠা বই উঠবে।

আপত্তি জানিয়েছিল অতসী অনেক। তার দৈহিক শক্তিতে কুলাবে না জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জোরজার করলে রজতেশ। অতসীর শরীর যে কত পটু আর শক্ত নানা কথায় প্রমাণ করলে রজতেশ। তার সকল আবেদন নিবেদন আর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করলে অতসী। স্বামী-দেবতার আদেশ মানতে পারলো না। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙতে পারবে না সে শরীরে শরীরে।

খেয়াল হয়েছিল রজতেশের, মনুমেণ্টের চূড়া থেকে কলকাতা শহর দেখবে। সেই চাঁদা থেকে টালিগঞ্জ দেখবে। পাখীর চোখে দেখবে দুঃস্বপ্নের কলকাতাকে।

বিদঘুটে প্রস্তাব রজতেশের, সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের পরমুহূর্তেই অতসীকে আক্ষেপ করতে হয়। যাকে বলে স্রেফ আপসোস।

মনুমেণ্টের ঐ সুউচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন একাগ্রচিত্তে কলকাতা, শহর দেখবে রজতেশ, সেই অসবধানে অতসী তাকে অতর্কিতে ঠেলে ফেলে দিতে পারতো। কলকাতা শহর দেখার সাধ আর পদে পদে অতসীকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার প্রবৃত্তি চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিতে পারতো অতসী। যেন একটা সুযোগ সে হারিয়েছে নিজের দোষে। এমন যোগাযোগ আবার কবে হবে কে জানে। আঙুল কামড়েছে অতসী। অনুতাপে।

আক্ষেপ অবশ্য খুব অধিক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারে না। অতসী যেন ভুলে গিয়েছিল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে প'ড়লো কলকাতা শহরে এখনও ডবলডেকার বাস চলছে সরকারী। যমদূতের সাক্ষাৎ বাহন যেন। যান্ত্রিক জল্লাদ! মূর্তিমান মৃত্যু।

দুরন্ত গতিতে যখন ছুটতে থাকে মদমত্ত হাতীর মত, ঠিক সেই অশুভক্ষণে বাসের সামনে রজতেশকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে, রাতের রাস্তায় আলো-অন্ধকারে। কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না। জানবে যে দুর্ঘটনায় মারা গেছে রজতেশ। কলকাতা শহরের নাগরিক হওয়ার দুর্ভাগ্যে। অতসীকে দুষবে না কেউ। গাল পাড়বে অদৃশ্য সরকারকে। মন্ত্রীদের অভিসম্পাত করবে জনতা। যত দোষ নন্দ ঘোষের। ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাসে অতসী। এমন সহজ সরল পন্থা থাকতে কেন যাবে দুর্গম অরণ্যে। অনতিক্রম্য পর্বতশিখরে উঠতে হবে কেন!

আজকাল অতসী পড়াশুনা করছে রীতিমত। রহস্য আর রোমাঞ্চের শ্বাসরোধকারী গল্প-উপন্যাস পড়ছে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের। ডিটেকটিভ গল্প, এ-দেশের সে-দেশের। পাড়ার পাঠাগার থেকে বই আনায় অতসী। দাসী আছে একজন, নড়বড়ে বুড়ী। ধনুকের আকার তার। দাসী যায় লাইব্রেরীতে। বই বদলে এনে দেয়।

তাও অনেক সাধ্যিসাধনা করতে হয় অতসীকে। দাসী কি যেতে চায় সহজে! বললে বিরক্ত হয় নিদারুণ। আজে-বাজে বকতে শুরু করে। অসম্মতি জানায়। সারাদিনের শেষে গেরস্থালীর কাজ মিটিয়ে দাসী নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কালঘুম ঘুমোয় যেন। অতসী ডেকে ডেকে সাড়া পায় না। অকাতরে ঘুম। ঠেলে ঠেলে ঘুম ভাঙাতে হয় দাসীর। গুরুতর আপত্তি যখন চরমে ওঠে তখন দাসীর কানের কাছে অতসী সশব্দে ফেলে দেয় কি একটা রেজকি পয়সা। হয় তো পাঁচ কিম্বা দশ নয়া পয়সা। একটা ধাতব-ঝঙ্কার শুনে উঠে পড়ে দাসী তখন।

মাইনের টাকা মাসে মাসে দেশে পাঠিয়ে দেয় দাসী। উপরি রোজগারে নেশার খরচা চালায়।

বাঁধাধরা নিয়মে, পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায়, একটা প্রলয় ঘটে যায়, দুনিয়া ওলট পালট হোক, দাসী দু'বেলা সকাল সন্ধ্যায় চিলে-কোঠায় উঠে যাবে সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে। হাতে থাকবে আধঘটি দুধ। নেশার সঙ্গে অনুপানের বরাদ্দ পরিমাণ।

আফিমের কৌটা আর দুধের ঘটি নিয়ে বসবে দাসী। তখন ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যাবে না তার। শত ডাকেও দেখা মিলবে না। চিলেকোঠায় একখানি শতচ্ছিন্ন মাদুর বিছিয়ে বেশ খানিক গড়িয়ে নেয় দাসী। আফিমের মৌতাতে ঝিমোয় কানা বেড়ালের মত।

ভয় করে অতসীর। না খেতে পেয়ে ম'রে যাওয়ার ভয় নয়, সামাজিক লোকলজ্জার ভয়। লোকে জানবে, অতসী স্বামী পরিত্যক্তা, অতসী ভাগ্যবিড়ম্বিতা। চেনা জানা আত্মজন বলবে, অতসী না-সধবা না-বিধবা। সিঁথির সিঁদুরের মূল্য থাকবে না আর। অথচ সিঁদুর মুছে ফেলতেও পারবে না পরিস্থিতির পরিবর্তনে। নয় তো রজতেশকে একবারের বেশি বলতে হ'ত না। অতসী এক বস্ত্রে বেরিয়ে যেতে পারতো, যেদিকে দু'চক্ষু যায়। সত্যিই আর পারছে না সে, বিষাদভরা ক্লান্তিময় দিনের জের টানতে। এমন একটি দিন গেল না যেদিন না বাক-বিতণ্ডা চলছে দু'জনে।

কথা বললেই কথার উত্তরে কথা বলতে হয়। কতক্ষণ নীরব নিশ্চুপ থাকবে অতসী। বোবার শত্রু নেই, তাই নির্বাক থাকতে চায় অতসী। কিন্তু রজতেশের একটা একটা টেরাবাঁকা কথা শুনলে মরা মানুষও জীইয়ে উঠে বসবে। শুনলে গা জ্বলতে থাকে। মাথা ধ'রে যায়। পায়ের রক্ত যেন মাথায় ওঠে।

দু'বেলা চায়ের জল ফুটিয়ে অতসী চায় গরম জল রজতেশের গায়ে ঢেলে দিতে। পারে না, নেহাত সামাজিক ভয়ে। ছড়িয়ে পড়বে বস্ত্র তন্ত্র, অতসী তার স্বামীকে অত্যাচার করে।

ফুটন্ত ভাতের ফ্যানও ঢেলে দিতে পারে আচমকা। তারপর রজতেশকে দেখলে আর চেনা যাবে না। চিত্রিতার আঁচল ধ'রে ঘোরাঘুরি আর কি তখন সম্ভব হবে। রজতেশের বিকৃত পোড়াকপাল, দগ্ধমুখ দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যাবে প্রেমের কাঙালিনী চিত্রিতা। তখন আবার একজনকে পাকড়াও করতে হবে চিত্রিতাকে। কোনও একজন মেয়ের স্বামীকে। ছেলেধরা ডাইনী বুড়ী দেখেছে অতসী। এমন স্বামীধরা মেয়ে সে আর দেখলো না।

—উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আমি পারবো না বেঁচে থ'রে থাকতে। তোমার মত মেয়ের পাল্লায় আর বেশিদিন থাকলে সুইসাইড করতে হবে আমাকে নির্ঘাত।

যেন শেষ-কথা জানিয়ে দিল রজতেশ। সিগারেটে শেষ টান দিতে থাকে কথার শেষে। ছাইদানি নে নেয় হাতে।

—তাই কর' তুমি।

বলতে ইচ্ছা হয় অতসীর, বলতে পারে না। বক্তব্য মুখে আটকে যায়। রজতেশের মত ঘোর'স্বার্থপর, চরমতম আত্মকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারী, যে কোনকালে আত্মহত্যা বা সুইসাইড করতে পারে, বিশ্বাস করে না অতসী। ভাবলেও হাসি আসে যেন। অবিশ্বাস্য!

—প্রয়োজন হবে না। তুমি আত্মহত্যা করতে যাবে কোন দুঃখে! চিত্রিতা ব্যাচারির কি গতি হবে তবে? তার চেয়ে বরং আমিই না হয় শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে—

—থাক থাক, ঢের হয়েছে! চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি শিখেছো শুধু! আর কিছু শিখতে পারলে না। নচ্ছার কোথাকার!

অতসীর মুখের কথা থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকে রজতেশ। মুখ ভেঙচে ওঠে থেকে থেকে। যেন এক নাবালক শিশুকে বকছে সে।

যেন এক নাবালক শিশুকে বকছে সে।

বেতনভুক ভৃত্যকে ভর্ৎসনা শোনাচ্ছে যেন। চিত্রিতার নাম অতসীর মুখে শুনে আরও যেন ক্ষিপ্ত হয় রজতেশ।

—আর কি শিখতে হবে তাই শুনি? বিনম্র সুরে প্রশ্ন করে অতসী। বলে,—চিত্রিতার মত ঢং দেখাতে পারবো না আমি। পাতলা শাড়ি আর খাটো জামা পরতে পারবো না। খেলার মাঠে গিয়ে পুরুষদের ভিড়ে—

—চিত্রিতার পায়ের ধুলো খাও তুমি দু'বেলা, যদি কিছু উন্নতি করতে চাও। তার মত মেয়ে লাখে একটা মেলে। কিন্তু তুমি শুধু কেবল পরের সমালোচনা করতে পারো। আর কিছু পারো না।

কথার শেষে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রজতেশ। চরম ঘৃণায়। পাপের প্রতিমূর্তি অতসী। তার মুখ আর যেন কখনও দেখবে না রজতেশ। এমনই বিতৃষ্ণা তার।

জানলার বাইরে চোখ পড়ে অতসীর। সেও চোখ ফিরিয়ে নেয় রজতেশের বিকৃত মুখভঙ্গী থেকে। চেয়ে থাকে বাইরের কালো আকাশে। মিশ কালো রঙের বেনারসী শাড়িতে অসংখ্য সোনালী তারাফুল। ঝিকি ঝিকি জ্বলছে। আকাশে তারার মেলা বসেছে যেন।

পাশের বাড়ির একটি ঘরে আলো বদল হয়। প্রায় রোজই দেখতে পায় অতসী নিজের ঘর থেকে সাদা হলুদ রঙ দপ ক'রে নিভে যায়। ফিকে নীল আলো জ্বলে সঙ্গে সঙ্গে। ডিম্ লাইট, লাইট ব্লু রঙের। যেন এক মুঠো জ্যোৎস্না এসে সেঁদিয়েছে ঐ ঘরে।

এক সদ্য-বিবাহিত সুখী দম্পতি থাকে ঐ ঘরে, অতসী জানে। তারা দু'জনেই সর্বদা খুশি খুশি। একে অন্যকে পেয়ে যেন বিভোর, আত্মহারা দু'জনে। যেন এক আত্মা।

এই ফিকে নীল আলো, কতক্ষণ জ্বলবে, তাও জানে অতসী। প্রায় রোজই দেখছে। অতসী লক্ষ্য ক'রেছে, একেক বিশেষ দিনে, আলো জ্বলতে জ্বলতে মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়। সপ্তাহের মধ্যে শনিবার, কোন ছুটির আগের রাতে, তাদের রঙিন আলো, ছুটি পায় না যেন। অবিরাম জ্বলবে, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর যতক্ষণ না উতরে যায়। তারপর ঘরের খোলা জানলার কাছে এসে একবার দাঁড়াবে ঘরের নতুন বৌটি। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢকিয়ে খাবে এক গেলাস। তারপর? নীল আলো আর দেখা যাবে না। নিভে যাবে হঠাৎ। অন্ধকারে মিশে যাবে ঘরের জানলা। সন্ধ্যাতনী উন্মাদনার পর নামবে প্রশান্তি। উত্তেজনার প্রদীপে যেন তেল ফুরিয়ে যাবে।

অতসীর ঘরে তখন চলবে?

বাঁকা বাঁকা কথার জাল বুনে চলবে রজতেশ। ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবে যত গা-জ্বালানো কথা। অতসীর দোষ ধরবে খুঁজে খুঁজে। রজতেশের মনে পড়বে যত সব পুরানো ঘটনা। অনভিজ্ঞ অতসীর ভুল-ভ্রান্তি, কি কি দোষ তার।

—বিবাহিত জীবনে সুখী হ'তে হ'লে দস্তুর মত পড়াশুনো করতে হয়। আবার কথা ধরলে রজতেশ। আবার একটা সিগারেট ধরালে সস্তাদামের। ঘরে নিকৃষ্ট তামাকের পোড়া পোড়া গন্ধ ভাসলো।

কি এক সেন্টের সুগন্ধ অতসীর বুকে। বৈকালিক প্রসাধনের একমাত্র উপচার অতসীর। স্নো-পাউডার বা ম্যাক্স ফ্যাক্টরের পণ্য

ডালিকার প্রতি কোন মোহ নেই তার। প্রসাধনে আধিক্য চায় না অতসী। থাকতে চায় স্বভাব-পরিচ্ছন্ন। অমলিন।

জেসমিন সেন্টের গন্ধ যেন ম্লান হ'তে থাকে সিগারেটের ধোঁয়ায়। মাথা ধ'রে ওঠে অতসীর। কপালে হাত রাখে সে। ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ দেয় কপালে।

বিবাহিত জীবন অর্থে কলা না বিজ্ঞান, কি বোঝাতে চায় রজতেশ, কে জানে। মনে মনে হাসে অতসী। বই প'ড়ে শিখতে হবে বিয়ের পাঠ। সংসার পালনের ইতিবৃত্ত। শিখতে হবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্ক গঠনের কায়দা।

—বই আছে বাজারে, কিনতে পাওয়া যায়।

কথা বলতে বলতে ফস ক'রে দিয়াশলাই জ্বালায় রজতেশ। একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে,—ওসব আজে-বাজে বই না প'ড়ে কিছু কাজের বই পড়লেই পারো।

—বেশ তো পড়বো, এনে দিও তুমি। অতসী ভাঙা গলায় বললে। কেমন যেন দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠ।

—আর এনে দিয়ে কি হবে তাই শুনি? বিরক্তির সুরে বললে রজতেশ। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললে,—অনেক দেরী হয়ে গেছে। বুড়ো হাড় কি জোড়া লাগবে আর? স্বভাব কি আর বদলাবে?

—না মরলে বদলাবে না হয় তো, বললে অতসী।

—হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছো। আমিও বেঁচে যাই।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে অতসীর। তার মৃত্যু কামনা করে নিষ্ঠুর রজতেশ, এই প্রথম জানতে পারলো যেন। রাগের মাথায় মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে রজতেশ। আর যেন একমুহূর্ত এই ঘরে থাকতে চায় না অতসী। কিন্তু এখন হয় তো মধ্যরাত। বাইরে গহন অন্ধকার। রাস্তায় হয় তো জনমানব নেই। এ হেন দুঃসময়ে সন্দেহজনক ঘোরাফেরা করতে দেখলে পুলিশেও রেহাই দেবে না। হাঙ্গামা বাধবে জটিল। অতসী জড়িয়ে পড়বে সরকারী হেফাজতে।

—একটু কিছু বিষ-টিষ এনে দাও না। সেই স্বাভাবিক ম্লান হাসির সঙ্গে বললে অতসী।

—হ্যাঁ, এনে দেবো। খেয়ে মর তুমি।

রজতেশ মনে মনে বললে কথাগুলি। নেহাত আর শুনিয়ে বললে না। বিড় বিড় করে বকতে থাকলো। বললে,—পারবো না আমি। তারপর মরি আর কি খুনের দায়ে।

—একটা কোন এ্যাসিড এনে দিতে পারবে না? সেঁকোবিষ একটা কিছু? কথায় মিনতি ফুটিয়ে বললে অতসী। কাঁপা কাঁপা সুরে।

রসায়নের ল্যাবরেটরী ভেসে ওঠে রজতেশের চোখের সম্মুখে। বুনসেন্ বার্ণার জ্বলছে নীলাভ শিখা কাঁপিয়ে। গ্যাসের স্টোভে আগুন জ্বলছে সর্পিল রেখায়। টেস্ট টিউবে বুদবুদ তুলছে ফিরোজা রঙের ফুটন্ত জল। কাঠের র‍্যাকে সাজানো সারি সারি শিশি। চূর্ণ, ভস্ম, জলীয়। শিশির পেটে লেখা POISON, আঁকা নরকপাল।

একটা শিশি থেকে সামান্য ভস্ম বা চূর্ণ সঞ্চয় করতে পারলেই কাজ সমাধা হয়। রজতেশের মত হৃদয়হীনের বুকেও কাঁপন শুরু হয়, যখন দেখতে পায় যেন চোখের দৃশ্যপটে, অতসী বিষ খেয়েছে। বিষের জ্বালায় কাতরে কাতরে উঠছে। অতসীর মুখ থেকে সাবানের ফেনার মত জলবিন্দু উপচে পড়ছে। অতসীর চোখ কপালে উঠেছে। হাতের মুঠি শক্ত। দাঁতে দাঁত—মুখের বর্ণ শেওলা-সবুজ।

প্রতিহিংসা জ্বলতে থাকে অতসীর বুকে। প্রতিশোধ গ্রহণের একটা উগ্র বাসনা জাগে মনে। রজতেশ স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছে তার মনস্কামনা। রজতেশ মৃত্যু কামনা করে অতসীর! কল্পনা করতে পারে না অতসী।

একদিন বেড়াতে যাওয়ার অছিলায় কলকাতার কাছাকাছি কোথাও যদি যেতে পারে, অতসী খুশি হয়। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনে যাবে দু'জনে। কাছাকাছি যেতে পারে বর্ধমানে। সারাদিন বর্ধমান শহর দেখে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরতি ট্রেন ধরলেই চলবে। রজতেশকে আর ফিরতে হবে না। ছুটন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে ঠেলে দেবে অতসী রজতেশকে। ইঞ্জিনের চাকার তলায় পড়লে আর কোন সঠিক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। রজতেশের তেজালো শরীর খণ্ডবিখণ্ড হবে।

তারপর অতসীও আর চিনতে পারবে না রজতেশকে। সে ফিরে আসবে ফিরতি ট্রেনে। পরের দিন খবরের কাগজে দেখা যাবে, এক অজ্ঞাতনামা যুবক চলন্ত ট্রেনের সম্মুখে ঝাঁপাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

ইচ্ছা ফলবতী হয় না সহজে। অদৃশ্য শক্তির মধ্যস্থতা ভিন্ন ফল ধরে না।

পরের দিন একটুকরো ভাঙা কাচ, কখন রেখে দেয় অতসী রজতেশের জুতোর মধ্যে। আক্রোশ যেন চেপে রাখতে পারে না আর। পায়ে কাচ ফুঁটিয়ে থাক না রজতেশ শয্যাশায়ী কিছুদিন। যখন-তখন চিত্রিতার কাছে আর যেতে পারবে না।

দুঃখের বিষয়, বুট জুতোটায় রজতেশ ক'দিন আর পা গলায় না। কাবলী জুতো পরে।

ফন্দী-ফিকির কাজে লাগছে না কোন মতে। ব্যর্থ হচ্ছে অতসীর জল্পনা-কল্পনা। অপপ্রয়াস। খাটের বিছানায় একবারে ব'সে অতসী ভাবতে থাকে—একটা কোন নিশ্চিত পন্থা। সহজ স্বাভাবিক। হত্যার পরিবর্তে আত্মহত্যা হিসাবে গণ্য করা যাবে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। ধরা পড়বে না অন্যের হস্তক্ষেপ।

সত্যিই ধরা পড়তে চায় না অতসী।

জেল-হাজত, জেনানা-ফটক—নামগুলি শুনলেই সে ভয়ে যেন শিউরে শিউরে ওঠে। একটা হত্যাকাণ্ডে ষড়যন্ত্র, অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারে। যাকে বলে ক্যাপিটাল পানিসমেন্ট। নিদেনপক্ষে অন্তরীণ বা নির্বাসন ভোগ কেউ এড়াতে পারবে না—ধরা পড়লে। আইন শাস্তি দেবে। কেউ বাধা দিতে পারে না ফৌজদারী আদালতকে। দায়রা সোপর্দ হলে আর রক্ষা নেই।

সুতরাং বিপদসঙ্কুল পথ এড়িয়ে চলাই মঙ্গলের। স্বেচ্ছায় কে চায় মৃত্যুফাঁস গলায় পরতে।

হত্যাকাণ্ডকে এমন রূপ দিতে হবে যে পুলিশের চোখে যেন আত্মহত্যার রূপ নেয়, অনাবিল। নির্মল, স্বচ্ছ, অকলুষিত আত্মহত্যা। মৃত্যুর চেহারা দেখলেই যেন বোঝা যায় যে, আপন ইচ্ছায় মরণ বরণ।

দ্বিতীয় জনের হাত নেই। কারও প্ররোচনা নেই। খুনের আয়োজন, হত্যার প্রস্তুতি নেই।

রজতেশের হৃদয়হীনতা, তিল তিলে কষ্ট দেওয়ার পাষাণ-প্রবৃত্তি, সহ-অবস্থানে অসহনীয় অনিচ্ছা—অতসী বিশ্লেষণে দেখে দেখে এক-মাত্র সিদ্ধান্তে নীত হয়।

হয় সে থাকবে। নয় রজতেশ থাকবে।

তিল তিল মৃত্যুকষ্ট ভোগের চেয়ে একবারের মত শেষ যন্ত্রণা, অনেক বেশি সুখকর।

তবে যদি মরতেই হয়, আগে রজতেশকে পাঠিয়ে তার পিছু পিছু যাবে অতসী। সহধর্মিণী, অনুগামিনী ছায়ার মত থাকবে পিছনে রজতেশের কথামত, ইচ্ছানুযায়ী অতসী একা একা মরতে পারবে না। চিত্রিতার পথ নিষ্কণ্টক করতে। তাকে দখল দিতে!

ভাবতে ভাবতে মুখে হাস্যরেখা, চোখে অশ্রু দেখা দেয়। অতসী কখনও হাসে কখনও কাঁদে।

মাঝে মাঝে স্থির করে সে আর কোন পরিকল্পনা করবে না। ত্যাগ করবে মন থেকে অসৎ চিন্তা। রজতেশের ক্ষতি হোক, এমন কিছু করবে না।

কিন্তু বিধি হ'ল বাম। রজতেশ যেমনকার তেমনি কথা শোনায় কড়া কড়া। দোষ ধরে প্রতিপদে। অতসীকে দেখলেই যেন দূর দূর করে। স্পষ্ট মরতে বলে যখন-তখন। সহ্য করতে হয় অতসীকে।

সেদিন ভোর থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হ'ল।

সারা রাত গুমোট গরম চলে। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। রাত্রির শেষে আকাশ সাদা হ'তে না হ'তে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভিড় জমতে থাকলো ঈশান কোণে। দূর থেকে দেখায় যেন বুনো হাতীর সমাবেশ হয়েছে। একে একে এসে জমায়েত হচ্ছে: কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত ঐ হস্তিযূথ আক্রমণ চালাবে উন্মত্ততায়। ধ্বংস করবে সৃষ্টি আর স্থিতি।

মেঘ ডাকছে ঘন ঘন। বিদ্যুতের ঝলক খেলিয়ে খেলিয়ে। কড় কড় বাজ পড়ছে যখন-তখন। পৃথিবীর বুকে আঁধার নামছে ধীরে ধীরে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে এলোমেলো। শীতের দিনের উত্তরের হাওয়া চলেছে যেন।

বিছানা ছেড়ে কখন উঠে গেছে অতসী, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রজতেশ জানতে পারলো না। পা টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অতসী। চিলেকোঠায় উঠে দাসীকে ডেকে ডেকে তুলে দেয়। বলে,—উনুনে আগুন ধরিয়ে দাও দাসী। তাড়াতাড়ি আছে আজ। আমাকে যেতে হবে এখনই।

—কোথায় যাবে বৌ? এই সাত সকালে?

ঘুম ঘুম চোখ মেলে শুধোয় দাসী। কথা বলতে বলতে উঠে বসলো আঁচল সামলে।

—তোমাদের দাদাবাবুর হুকুম হয়েছে আমি যেন নিজের পথ দেখি। তিনি আর আমার সঙ্গে ঘর করতে চাইছেন না। তাই আমাকে যেতে হবে একটা কোথাও বাসা খুঁজতে। কলকাতা শহরে কি সহজে পাওয়া যাবে মনের মত বাসা!

একটু যেন চেঁচিয়ে কথা বললে অতসী। কানে কম শোনে দাসী। চোখে কম দেখে। এক কথা বার বার বলতে হয় তাকে। হয় তো বুঝতে পারে না।

—দাদাবাবুর কথা বাদ দাও বৌ। তেনা এমন বলেন। তেনার মাথা ঠিক নয়। চল, আমি বুঝিয়ে বলবো তেনাকে।

ছিন্ন মাদুর গুটিয়ে রাখতে রাখতে দাসী বললে। ঘুমের জড়তায় কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে সে।

—না, তোমাকে আর বলতে হবে না। লোচাই দাসী।

—আমি কি ডরাই না কি? পষ্ট কথা বলতে বাধা কি?

—না, না। থাক।

—তোমার দাদাটা কি তাই বলি?

—কেটা-আধটা নয় দোষ নাকি আমার অনেক।

—কি, আমি তো দেখতে পাই না। দাদাবাবু বললেই শুনবো আমি? কক্ষণও নয়। আমি পাড়ার লোক ডেকে জড় করবো।

—না, দরকার নেই। তুমি যেমন মানুষ তেমন থাকো। আর কথা বাড়িও না, যাও উনুনে আঁচ দিয়ে দাও। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। তোমাদের দাদাবাবুর জলখাবার তৈরি করে দিয়ে যেতে হবে।

অগত্যা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয় দাসীকে। সিঁড়ির রেলিং ধ'রে ধ'রে নীচে নামতে থাকে।

আরও খানিক চিলেকোঠায় থাকে অতসী। কি করে কে জানে। এটা সেটা নাড়াচাড়া করতে থাকে। দাসীর ঢেরা-ঢাকনা, পুঁটলি-পাঁটরা।

মাথার ওপর টিনের ছাদের শিয়রে যেন মেঘ ডাকছে গুম গুম। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে ছাদের টালিতে। একটা সুরবাঁধা ছন্দের নাচ চলেছে যেন।

বীজ বীজ হাওয়ায় অতসীর চূর্ণকুন্তল নেচে নেচে উঠছে কপালে, চোখের কাছে। রুদ্ধশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে যায় অতসী। ত্বরিতপায়।

প্রলয়ঙ্কর ঘনঘটায় ঘনকালো মেঘাবৃত আকাশ সিংহনাদে গর্জন তুলছে থেকে থেকে। অতসীর বুকে যেন সেই ডাকের প্রতিধ্বনি উঠছে। দুরু দুরু দুরু করছে ভয় আর উদ্বেগে।

রান্নাঘর থেকে একটা গন্ধ ভেসে আসে, উনানে আগুন দেওয়ার সঙ্গে। ধোঁয়াটে কেরোসিনের ঘুঁটে-পোড়া গন্ধ। রান্নাঘরের জানলা থেকে পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া বেরোয় অনর্গল।

আর একবার অতসী শয়নঘরে আসে। দেখে যায় যেন শেষবারের মত। তখন রজতেশ অকাতরে ঘুমিয়ে আছে। ভোরের গভীর সুখনিদ্রা। রজতেশের নাক ডাকছে পূর্ববৎ। একটা হাপর চলছে যেন।

মেঘ ডাকছে ঘন ঘন। গুরু গুরু গর্জন শুনেও ঘুম ভাঙে না। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাসে আরও যেন গভীরতর ঘুমে ডুবে আছে রজতেশ।

অতসী সচকিত হয়ে দেখলো, ঘুমন্ত রজতেশের মুখে যেন বিরক্তি আর বিদ্রূপ মাখানো। রাগ আর বিদ্বেষ। যেন দাঁত পাকিয়ে আছে হাতের শক্ত মুঠোয়। কাকে হয় তো প্রহার করতে চাইছে মনে মনে।

জলখাবারের তোড়জোড় করতে হবে, অতসী রান্নাঘরের দিকে চললো নীরব চরণে।

একজনের রসনাকে শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিদান করতে অতসীকে প্রস্তুত

চারবেলা উনানের ধারে কাটাতে হবে আমরণ। বরাদ্দ লিখিত আছে কপালে।

একঘেয়ে মামুলী রান্না করলে চলবে না। মুখ বাঁকাবে রজতেশ। নিত্য নূতন খাদ্য তালিকা চাই। প্রতিদিন চাই নতুনের আস্বাদন।

ভেবে ভেবে স্থির করেছে অতসী, গরম গরম সিঙাড়া খাওয়াবে রজতেশকে।

আলু আর ছোলার পুর তৈরি করবে হিং-ফোড়ন মিশিয়ে। আদা, হলুদ, লঙ্কা, চিনি, গরমমশলা সহযোগে সেদ্ধ আলু আর ছোলা সাঁতলে নেবে।

বর্ষার সকালে তারিফ ক'রে খাবে হয় তো রজতেশ।

গরম গরম কড়া চা আর গরম সিঙাড়া।

ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম দৃষ্টি মেলে জলখাবারের রেকাবীতে। মনোমত কিছু না দেখলেই চটিতং। যাকে ইংরেজীতে বলে 'ফায়ার'।

দাসী জোগাড় এগিয়ে দেয়। মশলার পাত্র নামিয়ে দেয়। চাকি-বেলুন আর কড়াই। ডালদার টিন।

—ময়দা দুধ দিয়ে গেছে। ময়দা মাখতে মাখতে বললে অতসী।

—হ্যাঁ। ওই তো দুধের বাটিত।

—ঠিক আছে। বলে অতসী। খানিক থেমে আবার বললে, —দাসী, বাজারের থলি নিয়ে এসো। বাজার চলে যাও। এই নাও টাকা।

কথা বলতে বলতে শাড়ির আঁচলের গ্রন্থি খুলে ফেলে অতসী। দাঁতের আর হাতের সাহায্যে। বাজারের টাকা ধরিয়ে দেয় দাসীর হাতে।

দাসীর গতি মন্থর হ'য়ে এসেছে। ধীরে ধীরে চলাফেরা করে। ঢিমে তেতালায়। দাসী যখন চলে তখন সে বেঁকে যায় ধনুকের মত। যখন বসে তখন তিন মাথা এক থাকে।

অতসী জানে, দাসী বাজারে যেতে আর ফিরে আসতে সময় নেবে বহুক্ষণ। বেলা প্রায় পুইয়ে যায় তখন।

—যাও দাসী, বেরিয়ে পড়। বললে অতসী উনানে জল বসিয়ে। আলু আর ছোলা সেদ্ধ করতে দিলে। কাটা কাটা টুকরো টুকরো আলু।

—কি মাছ আনবো? দাসী শুধোয় রোজকার মত।

—জানি না বাছা এত শত। যা ভাল পাবে আনবে। পোনা, চিংড়ি, বাটা যা পাবে। আমি তোমাদের দাদাবাবুর জলখাবার তৈরি ক'রে দিয়ে বাসা খুঁজতে বেরিয়ে যাবো। ফিরতে দেরী হবে হয় তো। তুমি ভাত আর ডালটা চাপিয়ে দিও দাসী। মাছ সাঁতলে রেখো। দাদাবাবু আমাকে খুঁজলে বলো।

ময়দায় ময়ান দিতে দিতে বললে অতসী। বেশ বোঝা যায় সে যেন একটু বেশ ব্যস্ত। কেমন উৎকণ্ঠিত। হাতের কাজ একটা একটা সেরে ফেলেছে তাড়াতাড়ি রুদ্ধশ্বাসে। দম নেয় না যেন।

পিঁড়ি থেকে উঠে পড়লো অতসী। ঠাসা ময়দা রেখে দিলে তাল পাকিয়ে। এখুনি বেরুতে হবে তাকে, তাই চললো শাড়ি আর জামা বদল করতে। এসে সিঙাড়া ভাজতে বসবে অতসী। তার মুখে যেন মাঝে মাঝে চাপা হাসি ফুটে উঠছে। প্রতিহিংসার তির্যক হাসি। কি একটা ফন্দী আঁটছে মনে মনে।

বর্ষার দিন।

সেই ভোর থেকে বৃষ্টি হয়েছে ঝিরি ঝিরি। ছন্দবিহীন বর্ষণ চলছে এলোমেলো। কখনও দ্রুতলয়ে, কখনও মন্দগতি—মন্দাক্রান্তার; ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। আকাশের কালো মেঘের কালোছায়া প'ড়েছে শহর কলকাতায়। সূর্য যেন লুকিয়ে পড়েছেন কোথায়, বর্ষার আগমনে। মেঘ ডাকছে শহর কাঁপিয়ে।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যখন ঠিক সাতটা বাজে, প্রাত্যহিক অভ্যাসে ঘুম ভাঙে রজতেশের। আরও খানিক জেগে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। দণ্ডায়মান রজতেশ আলস্য ভাঙতে থাকে। শরীরের গ্রন্থি আর অস্থি মড়মড় শব্দ তোলে। ক'টা হাই তোলে পর পর।

মুখে চোখে জল ছিটিয়ে, দাঁতে খানিক ব্রাস চালিয়ে ঘুমের জড়তা কেটে যায় রজতেশের। জলখাবারের রেকাবী টেনে নেয় কোলে। চায়ের ঢাকা-দেওয়া পিরিচ সরিয়ে কয়েক চুমুক চা খেয়ে নেয় সর্বাগ্রে। নিদ্রা-আবেশের অলসমন্থরতা কাটিয়ে নেয় যেন। চটকা ভেঙে যায়।

হাতে-গরম সিঙাড়া, মুখে তোলে রজতেশ। বাইরে ঝরো ঝরো বৃষ্টি চলছে। শীতের দিনের বাতাস চলছে।

যাই হোক, বৌটার এতদিনে তবে কর্তব্যবোধ জন্মেছে। বাদল দিনের উপযোগী জলখাবার দিয়েছে। একটা শুষ্ক কুঞ্চিত হাসি দেখা দেয় রজতেশের মুখে। প্রশংসায় মন ওঠে না তবু। কর্তব্য হিসাবেই দেখে রজতেশ। অতসীর কাজই হ'ল রজতেশকে ভাল ভাল খাদ্য খাওয়ানো, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-সকল রাখা।

সিক্ত সকাল। বর্ষার জলে যেন ধুয়ে যায় পৃথিবীর যত কলুষ মালিন্য, ধূলিজঞ্জাল। পবিত্র পরিবেশে অনেকে আশা থাকে ঈশ্বর-চিন্তায় মন দেবে, তা নয়। রজতেশ খেতে শুরু ক'রে দেয় তারিয়ে তারিয়ে।

বেলা দ্বিপ্রহর তখন।

একফালি মেঘের আড়াল থেকে ম্লান সূর্য উঁকি দেয়। বৃষ্টি-ভেজা শহরে নিস্তেজ রৌদ্র ছড়িয়ে পড়ছে।

কলকাতার পথে পথে ঘোরাঘুরি করেছে অতসী। ট্রামে আর বাসে উঠে গেছে এখানে-সেখানে। উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় কত রকমের মানুষ দেখতে পেয়েছে। একা একা চলতে দেখে পিছু নেয় কোন কোন রসিক পথিক। অতসী অনুমানে বুঝতে পারে তাকে অনুসরণ করছে দুষ্ট প্রকৃতির কেউ। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। অনুগামীর আশা ব্যর্থ হয়। নাগাল পাওয়া যায় না অতসীর। ট্রাম আর বাসের যাত্রীদের কেউ কেউ কাছে ঘেঁষতে সচেষ্ট হয়। অতসী তাদের পাশ কাটিয়ে লেডীজ সীট দখল করে। এক আধবার কড়া দৃষ্টিতে তাকায়। ভীরু আর লোভী নাগরিক ভয় পায় সেই চাউনি দেখে। মুখ ফিরিয়ে নেয় সভয়ে। দু'চারজন চেনা মুখও নজরে পড়ে অতসীর। দূর থেকে দেখতে পেয়ে অন্য পথ ধরে সে। চোখাচোখি হলেই আসবে হয় তো কুশলসংবাদ জানতে। অতসীর গন্তব্য জানতে চাইবে।

বাসায় ফিরে অতসী যেন ভেতরে আর সিঁধোতে পারে না।

কি শুনবে সে কে জানে। হয় তো শুনবে কোন একটা দুঃসংবাদ।

দাসীর সঙ্গে দেখা হ'তেই অতসী বললে,—তোমার দাদাবাবু কোথায়? কি করছেন?

রান্নাঘরের দুয়োরে বসেছিল দাসী। বেড়ালের ভয়ে। মাছ চুরি করতে আসে বেড়াল নিঃশব্দে। দাসী তাই পাহারায় বসেছে। অতসীকে দেখে যেন স্বস্তির শ্বাস ফেললে। বলল,—দাদাবাবু জল-খাবার খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। কে যাবে ঘুম ভাঙাতে! আমি তো পারবো নি।

ওপরতলায় উঠে শয়নঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যাকুল আগ্রহে দেখতে থাকে অতসী। দেখলো, রজতেশের মুখখানা যেন নীলবর্ণ। চোখের তারা স্থির। গভীর এক প্রশান্তিতে আত্মমগ্ন যেন রজতেশ। সাড় নেই তার—বিদ্বেষ ব্যঙ্গ নেই মুখে। ওষ্ঠে বিষের গরল ফেনিল ধারা।

তরতরিয়ে নীচে নেমে যায় অতসী। দাসীকে বলে,—যাও, শীগ্গির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। দাদাবাবুর ঘুমটা ভাল লাগছে না আমার। ডাক্তারবাবুকে আমার নাম বলবে। শীগ্গির যেন আসেন।

ভূতের মত হাউমাউ করতে থাকে দাসী। কপাল চাপড়ায়। বলে,—সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোথায় যাবো গো।

—ডাক্তারকে ডাকো আগে। অতসী কথার শেষে আবার সিঁড়িতে উঠতে থাকে।

অনেক রকমের পরীক্ষা করলেন ডাক্তার এসে। রজতেশের চোখে সেই স্থিরদৃষ্টি। অচঞ্চল। বিদ্রূপ নেই মুখে। বরং যেন স্বর্গীয় হাসি ফুটেছে।

—কেন এমন হ'ল? ডাক্তার বললেন।

—কি জানি! সারা রাত ধ'রে কষ্ট পেয়েছেন। বলছিলেন বুকে বড় কষ্ট হচ্ছে। অতসী বললে ভয়ে ভয়ে।

—আমাকে ডাকলেই পারতেন।

—আমি ছিলাম না বাসায়।

—আপনার স্বামী হার্টফেল ক'রেছেন। হয় তো করোনারী থ্রম্বসিসের স্ট্রোক। সামলাতে প[..]লেন না।

চোখে আঁচল চাপলো অ[..]। বললে,—এখন আমাকে উদ্ধার করুন এই বিপদ থেকে। আমি কি করতে পারি বলুন! আমি অবলা মেয়ে।

—আত্মীয়স্বজনকে জানিয়ে দিন, সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

—আপনি সার্টিফিকেট লিখে দিন। আমাকে রক্ষা করুন। কথা বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে অতসীর। সত্যিই যেন তার মনে ব্যথা লেগেছে ভীষণ।

রজতেশের শবদেহের ভাগ্য ভাল যে কথা বলছে না। নয় তো রজতেশ বলতে পারতো, তার এই অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণ কি। কেন তার মৃত্যু হ'ল? কে মারলে তাকে?

• • •

সন্ধ্যার পরে নিয়মানুযায়ী দুধের বাটি নিয়ে বসে দাসী। আফিমের কৌটা পাড়ে। হাতের আন্দাজে দাসী ধরতে পারে, আফিমের পরিমাণ যেন কম ঠেকছে হাতে। কৌটা হাল্কা লাগছে যেন। শোকের বাড়ি, তাই প্রতিবাদ জানাতে পারে না।

দাসী ভাবলো, হয় তো হাতের ভুল। যেমন ছিল তেমনই আছে। দাসী রাতকানা। তার সন্দেহ স্থায়ী হয় না।

রজতেশের দেহ তখন জ্বলছে দাউ দাউ। চিতার আগুন যেন সহস্র সাপের ফণা। রজতেশ জানতো না, পদ্মে কাঁটা আছে। রূপসুধায় আছে বিষ। চাঁদে আছে কলঙ্ক—ফুলে আছে বিষধর কীট।

॥ আরো এক লগ্ন এলো ॥

কৃতী সোম

আরো এক লগ্ন এলো। এ-লগ্নেও আছে আহ্বান,
জয়ের দুর্বার নেশা। এখানেও মাতৃকার ডাকে
সহস্র বীরের দল রক্তের সমুদ্রে করে স্নান
শত্রুকে প্রহত করে আগ্নেয়গর্ভ সীমান্তের বাঁকে।

এ-লগ্ন নতুন নয়। ক্লান্তিময় ভারতের বুকে
এসেছে অনেকবার। অনেক অনেক মহাপ্রাণ
এমন অনেক ক্ষণে ঝাঁপ দিলো আগুনের মুখে
রক্তের ইতিহাসে লেখা হলো কত অবদান।

অতীত নির্বাক নয়। মুখর হয়েছে বর্তমান।
ভবিষ্যত দীপ্ত হবে। দুরন্ত দস্যুর উৎসাদনে
আসমুদ্র হিমাচলে জাগে আজ প্রস্তুতির বান
দুর্জয় শপথ দেখি মাতৃভক্ত সন্তানের মনে।

মহালগ্ন সমাগত। পরীক্ষায় এলো মহাক্ষণ।
স্বাধীন ভারতে তাই দুর্নিবার উত্তাল স্পন্দন।

ভুল

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

যার তরে তুমি কাঁদিয়া, ফিরিছ ভুবনে,
সে তো এলো নাকো মহালগনে,—
বৃথা চলে গেল, কত অনুক্ষণ
শেষ হয়ে এল রিক্ত জীবন,
তবু কেন আজো, ভাঙা পথ চেয়ে রয়েছ?
কেন ভুলের মালিকা গাঁথিছ?

যে ভুল করেছ তাহা ভুলে যাও,
অতীতের স্মৃতি ধুয়ে মুছে দাও,—
সে'ত' আসিবে না কোন ছন্দে,—
তুমি ভাসিছ নয়নজলে,—
সে প্রীতির কুসুম চয়নে,
চাবে না অবাক নয়নে।

রঙ্গপট
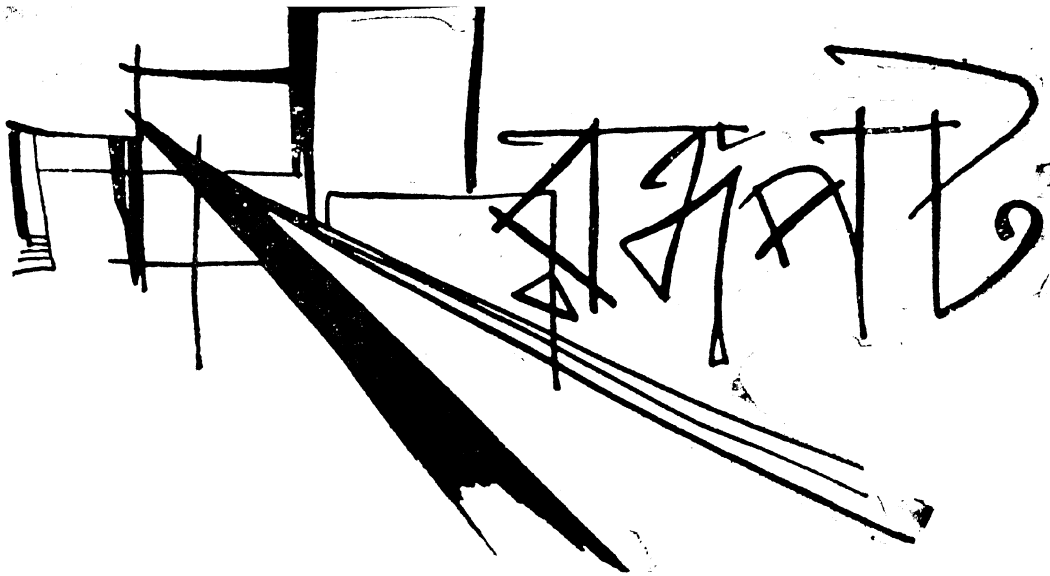
হিচকক প্রসঙ্গে

মেয়েটি রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। এমন সর্বনাশা কথা সে মুহূর্তকাল পূর্বে কল্পনাও করতে পারে নি। এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে একটি মানুষ ছুরিকাঘাতে হত্যা করার পরিকল্পনা প্রকাশ করতে পারে তা তার সমস্ত বুদ্ধিচিন্তার অগোচরেই ছিল, আগে জানলে বা অনুমান করতে পারলে মেয়েটি তো লিফটে উঠতই না। জানলে কি এই ভয়াবহ চক্রান্তের ফাঁদে স্বেচ্ছায় কেউ পা দেয়? মেয়েটি ভয়ে দিশাহারা হয়ে যায়। স্থূলকায় বাদামীচক্ষু ব্যক্তিটি অতি স্বাভাবিকভাবে বলে চলেছে আমি মেয়েটিকে ছুরিকাঘাতই করবো। প্রতিনিবৃত্ত করা তো দূরের কথা পাশের লোকটি উল্টে তাকে উপদেশ দিচ্ছে—বিষপ্রয়োগ করলে হয় না?

স্থূলদেহী উত্তর দেয়—ছুরিকাঘাতের চেয়ে উপযোগী এ ক্ষেত্রে আর কিছুই নেই—

—কেন—বুলেট?

—না—এবার দৃঢ়কণ্ঠে জানাল বিরলকেশ সেই বাদামীচক্ষু ব্যক্তিটি, ছুরিকাঘাতই করবো আর তা কণ্ঠদেশে।

আর সেখানে উপস্থিত থাকা সম্ভব! তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল ও ভয়ার্তকণ্ঠে লিফটকে থামিয়ে মেয়েটি পালিয়ে বাঁচল।

ঐ ধরণের সংলাপ মেয়েটিকে রীতিমত অভিভূতই করে তোলে—যার ফলে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিও ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, না হ'লে যে চেহারার সঙ্গে সারা বিশ্ব পরিচিত মেয়েটি একেবারে পাশে থেকেও সেক্ষেত্রে ঐ ধরণের ভুল করে বসে? সংলাপ শুনে সত্যি সত্যিই মানুষটিকে একজন দুর্ধর্ষ খুনী বলে ভাবতে পারে? বাদামী রঙের একজোড়া চোখ লালরঙের মুখমণ্ডলের অধিকারী সেই স্থূলকায় ব্যক্তিটি যে স্বয়ং এ্যালফ্রেড হিচকক তাঁকে চেনবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত তার হারিয়ে যায়?

কথা হচ্ছিল আগামী ছবি নিয়ে। বন্ধুর অথবা সহকর্মীর সঙ্গে। কর্মসাধক লোক হিচকক। বয়েস পঁয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই করছে তবু তাঁর কর্ম বিরতি নেই। নতুন সৃষ্টির জন্য অভিনব পটভূমির সন্ধানে তিনি বিরামবিহীন। বার্ধক্য তাঁর দেহকে স্পর্শ করতে পারলেও মনকে পারে নি। কাজের ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে তিনি আদৌ রাজী নন। তাঁর উদ্যম এবং উৎসাহ নিঃসন্দেহে এক দৃষ্টান্তের

কর্মরত পরিচালক সত্যজিৎ রায়

বন্ধ। লিফটে উঠেছিলেন, সেইখানেই আলোচনা চলছে, তার পরিণতি তো পাঠক পাঠিকা এই রচনার প্রারম্ভেই জেনেছেন।

হিচকক শুধু কর্মীপুরুষই নন। মজার মানুষও। গাম্ভীর্যে তিনি ধ্যানমৌন হিমালয়কল্প আবার রসিকতার দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে বাঁধনহারা স্রোতস্বিনী নদীর। ছায়াছবির রাজ্যে শিল্পের সঙ্গে কৌতূহল, রোমাঞ্চ, শিহরণের এমন অপূর্ব সমন্বয় সাধনে এমন অভূতপূর্ব দক্ষতা আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই দক্ষতাই তাঁকে এনে দিয়েছে আকাশচুম্বী খ্যাতি, অতুলনীয় জনপ্রিয়তা এবং বিশ্বব্যাপী সমাদর, তাঁর জীবনে এসেছে জয়লক্ষ্মীর বরমাল্যরূপে, দেখা দিয়েছে জীবন দেবতার অফুরন্ত আশীর্বাদের নিদর্শনরূপে।

শিল্পসৃষ্টি বা রসসৃষ্টি ছাড়া আরও একটি বিষয়ে হিচককের অসামান্য ক্ষমতা দেখা যায়। সেটি হচ্ছে ঘুম। যে কোন অবস্থায় যে কোন পরিবেশে যে কোন মুহূর্তে তিনি অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। আর নৈশভোজের পর তিনি তো কিছুতেই জেগে থাকতে পারেন না। রহস্যরাজের এই ঘুম নিয়ে একবার রীতিমত এক রহস্যের সৃষ্টি করে বসলেন শ্রীমতী হিচকক ও তাঁর বন্ধু চিত্রনাট্যকার স্যামসন র‍্যাফেলসন। হিচককের ককটেল গ্লাসে তাঁরা মিশিয়ে দিলেন ব্রোমোড্রাইন ট্যাবলেট এবং নিজেদের ও অন্যান্যের গ্লাসে মিশিয়ে দিলেন ঘুমের বড়ি। ফলও ফলল অবিলম্বে, দেখা গেল প্রত্যেকে ঘুমে ঢলে পড়ছেন হিচকক ছাড়া। প্রায় এক ঘণ্টাপর সকলকে অতি কষ্টে জাগালেন হিচকক, কিন্তু নিজে ঘুমোতে পারলেন না। জেগে তাঁকে থাকতে হ'ল সারারাত।

অসিতবরণ—ছায়াছবির বাইরে

রহস্যরাজকে রহস্যপরিহাসে একবার ঘায়েল করতে এলেন অভিনেতা পিটার লোর (দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ)। তিনি অনুযোগ করলেন যে, হিচককের অসাবধানতায় তাঁর মূল্যবান স্যুট নষ্ট হয়েছে। কি আর করেন হিচকক? ক্ষতিপূরণে সম্মত হলেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি মূল্যবান স্যুটই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন, তবে লক্ষ্য করার আছে, সে স্যুটটি একটি বাচ্চা ছেলের মাপের।

বিশ্ববিখ্যাত হিচককের নাম আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে খাস হলিউডেই একরকম প্রায় অজানাই ছিল অথচ তারও প্রায় পনেরো বছর আগে যুক্তরাজ্যের চিত্রামোদীদের দরবারে তাঁর কৃতিত্ব ও শক্তিমত্তা স্বীকৃতিলাভ করে। ১৯৩৮ সালে তিনি তো বৃটেনের চিত্ররাজ্যের একজন অবিসম্বাদী অধীশ্বর। লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়ে চলেছে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদাসহ।

তাঁর বৈচিত্র্যময়, ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী কিছুকাল পূর্বে মাসিক বসুমতীর রঙ্গপট বিভাগের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে তাই সে বিষয়ে আর পুনরাবৃত্তি করছি না। শুধু এই বিচিত্র এবং সন্ধানী মানুষটির চিন্তাধারা, মতামত এবং কয়েকটি কাহিনীই এই রচনায় আমাদের আলোচ্য। হিচককের পরিচালনায় একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, চিত্রগ্রহণ কালে তাঁর ছবিতে 'কাট' হয় না বললেই চলে এবং নির্ভরযোগ্য মহল থেকে জানা যায় যে, তিনিই একমাত্র পরিচালক যিনি কখনো চিত্রগ্রহণের পূর্বে লেন্সের সাহায্যে দৃশ্যটি দেখে নেন না। চিত্রকরকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে শুধু নির্দেশটুকু দিয়ে যান। এত প্রখর তাঁর ক্যামেরা জ্ঞান এবং জ্যামিতিক সচেতনতা। 'মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস স্মিথ'-এ ক্যারল লম্বার্ডের অভিনয়ের দৃশ্যগ্রহণ কালে একদিন লেনার্ড লিনস খোলাখুলি বলে ফেললেন—লোকের সামনে আপনি এইভাবে কাজ করেন তারপরে 'আমরা সবাই চলে গেলে তখন নিজের সুবিধা অনুযায়ী কাজ করবেন'। আক্রমণটা একেবারে সোজাসুজিই এল। তৎক্ষণাৎ হিচককের উত্তর এল—'ঠিক আছে, সেই ভেড ফেস' শুধু মুখের কথাই নয়, তাকে কাজেও পরিণত করলেন তিনি সেই মুহূর্তে

বহুমুখী প্রতিভা এই মানুষটির আয়ত্তে। তাঁর সেটে একদিন এলেন বিখ্যাত মার্কিন প্রযোজক ডেভিড সেলজনিক (পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা বিখ্যাত অভিনেত্রী জেনিফার জোনস যাঁকে দ্বিতীয় স্বামিরূপে বরণ করেছেন।) ডেভিড এসেই কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন পরিচালনা করছেন কে—তারপর আরও প্রশ্ন ছিল—শিল্পনির্দেশক কে? সম্পাদক কে? কাহিনীকার কে? কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নেরই একই উত্তর সেদিন পেয়েছিলেন সেলজনিক—হিচকক এই কটি গুণ ছাড়াও আলোকপাত, শিল্পনির্দেশ, মঞ্চালঙ্করণ, সঙ্গীত, স্থাপত্য, অভিনয় ও প্রচারবিদ্যা প্রভৃতিতেও তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী।

চলচ্চিত্রই হচ্ছে হিচককের জীবন। তাঁর কাছে চলচ্চিত্রই হচ্ছে বেঁচে থাকার রসদ। হিচককের কাছে সারা জীবনই হচ্ছে এক রহস্যচিত্র। আমরা নিজেরাই তার দর্শক। রহস্যচিত্রে কি ঘটছে তাই জানা যায়—কি ঘটবে তা জানা যায় না, (সেইখানেই রহস্যসম্ভারে সার্থকতা), জীবনের ক্ষেত্রেও বর্তমানকেই দেখা যায়, ভবিষ্যত কি মূর্তি নিয়ে দেখা দেবে সে রহস্য আজও অনুদঘাটিত নয় কি? চলচ্চিত্রের মধ্যে হিচককের সমগ্র সত্তা এমনভাবে মিশে গেছে যে কোন বই হাতে

এলে হিচকক তাকে শুধু পড়েই শান্তি পান না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্ররূপটিও মনে মনে ছ'কে ফেলেন।

অভিনেতা রূপেও তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। 'আই কনফেস' ছবিতে প্রথম অংশেই তাঁর অভিনয়ের অংশ শেষ হয়েছে। তাঁর মতে ছবির শেষ ভাগে যেন কখনও কোন বিখ্যাত পরিচালকের অভিনেতা হিসাবে আবির্ভাব না ঘটে। নিজের কথাই বলেন —আমি যদি শেষ দৃশ্যে দেখা দিতাম—লোকে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত 'দ্যাটস হিচকক' বাস, নব্বুই মিনিট ধরে যে আবহাওয়া পরিবেশ গড়ে তোলা হল ঐ এক 'দ্যাটস হিচকক' উক্তিতেই সমস্ত নষ্ট। আবহাওয়া সৃষ্টি। পরিবেশ গঠনকার্য (যার জন্যে বহু শ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ব্যয় করতে হয়) সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। হিচককের মতে রূপালীপর্দায় শুধু গল্পটিকেই তুলে ধরলে চলবে না, তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটিকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং সে কাজে যেন এতটুকু ফাঁক না থাকে। তাঁর মতে ছবিকে এমনভাবে রূপ দিতে হবে যাতে ছবি শেষ হয়ে গেলেও তার প্রভাব দীর্ঘকাল দর্শকের মন ভরে থাকে। ছবির পরিণতি, আঙ্গিক, বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন দর্শককেও রীতিমত চিন্তা করাতে হবে—দু'ঘন্টার জন্য চিত্রবিনোদনের জন্যই চলচ্চিত্র নয় তার সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাববার আছে, চিন্তা করবার আছে—সে দিক দিয়ে দর্শককে সচেতন করে তোলার একটা কর্তব্য চিত্রস্রষ্টারও আছে।

হত্যা, রক্তারক্তি জাতীয় ঘটনাগুলিই প্রধানত হিচককের ছবিগুলির পটভূমি অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষটি ব্যক্তি-জীবনে 'রক্ত' একেবারে সহ্য করতে পারেন না। একবার এক 'ষাঁড়ের লড়াই' দেখতে গেছেন হিচকক, কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই রক্ত ইত্যাদি দেখার আশঙ্কায় হিচকক ঘটনাস্থল ত্যাগ করে আসেন।

ছবির কাজ শুরু করার আগে গল্পগুলিকে গভীরভাবে খুঁটিয়ে মনে মনে বিশ্লেষণ করেন হিচকক; গল্পের প্রতি অংশ, প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বিচার চিন্তা করে তবে চূড়ান্তের এক ভ্রান্ত রূপ তিনি নির্ধারিত করে থাকেন।

শিল্পীদের সম্বন্ধে কখনও কখনও তিনি আদর করে মন্তব্য করেন 'এ্যাক্টার্স আর চিলড্রেন' ইত্যাদি, ছাপার অক্ষরে এই সব উক্তির নানারকম ভাষা প্রকাশিত হয়ে থাকে। তবে এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না যে, শিল্পীসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আস্থা যেমনই দৃঢ়, প্রীতি তেমনই প্রগাঢ়। আসলে, এই উক্তিগুলি তাঁর নিছক হাস্যপরিহাস ছাড়া কিছুই নয়! শিল্পীসম্প্রদায়ের মধ্যে ইনগ্রিড বার্গম্যান, ট্যালুলা ব্যাঙ্কহেড, এ্যানি ব্যাক্সটার, জোসেফ কটন, হেনরি হাল প্রভৃতির সঙ্গে হিচককের ব্যক্তিগত জীবনের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের কথা অনেকেই জানেন।

হিচককের প্রকৃতির আর একটি মুখ্য বিশেষত্ব—তিনি কখনো রেগে যান না। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁকে চড়া গলায় কথা বলতে কেউ কখনো শোনে নি। ছবির অন্তর্গত কোন কিছু সম্বন্ধে যে-কোন ব্যক্তির যে কোন অভিমত বা উপদেশে সকল সময়ে কর্ণপাত করতে তিনি প্রস্তুত। তাতে যদি কিছু ভুল থাকে বা তা যদি তাঁর পক্ষে কোন কারণে গ্রহণযোগ্য না হয়—তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ অভিমতদাতাকে অতি ধীরমস্তিষ্কে প্রাঞ্জলভাবে এবং এমন অকাট্য যুক্তি সহযোগে বুঝিয়ে দেবেন যার ফলে উপদেশদাতার কাছে তাঁর ধারণা এবং বক্তব্য সম্বন্ধে আর কোনপ্রকার অস্পষ্টতা বা সংশয় থাকে না।

উচ্চতায় যিনি পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি, মুখমণ্ডলের বর্ণ যাঁর লাল, ধর্মের দিক দিয়ে যিনি ক্যাথলিক দলভুক্ত—সেই এ্যালফ্রেড হিচককের দেহের ওজন এখন দু'শো চল্লিশ পাউণ্ড। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার আগে তাঁর দেহের ওজন ছিল আরও এক শ' পাউণ্ড বেশি। লে পাভিলিয়, ভইসিনস '২১' এবং ক্রাইস্ট সেলাস প্রভৃতি ভোজনাগারগুলি তাঁর প্রিয়। মধ্যাহ্নভোজনে তিনি শেরী অপেক্ষা কড়া কোন পানীয় গ্রহণ করেন না। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা অবধি এই দু'ঘন্টা সময় তাঁর পানের জন্য নির্ধারিত, তারপরই তাঁর নৈশভোজনের সময়।

দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ, আই কনফেস, ব্ল্যাকমেল, দ্য লেডী ভ্যানিসেস, উওম্যান টু উওম্যান, দ্য লজার, লাইফবোট, জামাইকা ইন, ষ্ট্রেঞ্জার্স ইন এ ট্রেন, নটোরিয়াস, শ্যাডো অফ এ ডাউট, কটিনাইন

রিঙ্গিং—ছায়াছবির বাইরে ক্রীড়াবিদের ভূমিকায়

স্টেপস, ডায়াল 'এম' ফর মার্ডার, রেয়ার উইণ্ডো প্রভৃতির বিস্ময়কর স্রষ্টা রহস্যরাজ হিচককের অসামান্য শক্তি এবং অকল্পনীয় চিন্তাধারার নবতম নিদর্শন 'বার্ডস'! 'বার্ডস'-এর মাধ্যমে হিচকক দেখা দিলেন এক নতুন মহিমায় নতুনরূপে নতুন আলোয়। তাঁর জীবনকাহিনীর পুনরাবৃত্তি আমরা করি নি তবে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের একটি উক্তির আমরা পুনরাবৃত্তি করে বলছি—পৃথিবীর সমস্ত দর্শক হিচককের মত শক্তিধরের কাছে এখনও অনেক—অনেক আশা করে।

ইংরেজি নাটকে গত দশ বছর

শ্রীনরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

John Osborne-এর Look Back in Anger ইংরেজি নাটকের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর থেকে এদেশের তরুণ নাট্যকারেরা অনেক নতুন নাটক লিখেছেন, যেগুলোর মূল সুর হচ্ছে পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! ইংরেজি নাটকের দেশে এই নতুন জোয়ারের কাহিনী নিয়ে Anger and After নামে বিখ্যাত বই লিখেছেন John Russell Taylor. (বইটির প্রকাশক হলেন Methuen & Co. Ltd. দাম—তিরিশ শিলিং অথবা কুড়ি টাকা)।

১৯৫০ সালের কাছাকাছি এলেই দেখা যায় ইংরেজি নাটকের জগতে নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। মোটামুটি এই সময়কে নব্য-নাট্যকারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ বলা যায়। নতুন নাটকের ধারা তখনো কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেয় নি, বক্তব্য তখনো ভালো করে দানা বাঁধে নি।

অনিল চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

১৯৫৬ সালে এসেই আমরা প্রথম English Stage Company-র নাম শুনলাম। তরুণ নাট্যকারদের নাটক এঁরা লণ্ডনের রয়াল কোর্ট থিয়েটারে অভিনয় করার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। Angus Wilson-এর The Mulberry Bush প্রথম অভিনীত হ'ল English Stage Company-র প্রচেষ্টায়। অভিনয় ভালোই হয়েছিল। এরপর Arthur Miller-এর The Crucible নামে দ্বিতীয় নাটকের অভিনয় খুবই সার্থক হ'ল। এমন কি আমেরিকাতেও বহুদিন চললো। English Stage Co-র প্রযোজনায় Royal Court Theatre-এ অভিনীত তৃতীয় নাটক হচ্ছে Look Back in Anger. যা'র পর থেকে ইংরেজি নাটকের রূপান্তর ঘটলো।

Look Back in Anger যখন প্রথম অভিনীত হ'ল, তখন কেউই একে ভাল বললেন না। প্রধান আপত্তি হ'ল এই যে, নায়ক ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলোকে প্রায় চোখেই পড়ে না—কারণ অধিকাংশ সময়টা নায়ক একাই কথা বলে যাচ্ছে। এ'নাটক প্রথম প্রশংসা পেলো উঁচুদরের রবিবারের কাগজ The Observer-এর নাট্য সমালোচক Kenneth Tynan-এর কাছ থেকে। এই অনুকূল সমালোচনার পর নাটকটি পয়সার দিক দিয়ে বেশ সাফল্য লাভ করলো এবং পরে চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হ'ল। এই নাটকটির সংগে আগের আধুনিক নাটকগুলোর প্রধান পার্থক্য হচ্ছে বিষয়বস্তুর। চরিত্র কল্পনা খুবই মৌলিক আর সংলাপের ভাষা সুতীক্ষ্ণ।

নায়ক Jimmy Porter উচ্চশিক্ষিত হয়েও শ্রমিকের মত জীবন যাপন করে আর স্ত্রীকে খুব ঠেস দিয়ে কথা বলে। স্ত্রীর অপরাধ তার বাবা উচ্চ মধ্যবিত্ত। পৃথিবীর প্রতি Jimmy বীতশ্রদ্ধ তাই শ্লেষ ছাড়া তার কথা নেই। কাহিনী বিশেষ জটিল নয়, স্ত্রী Alison বাপের বাড়ি গেলো কিন্তু সন্তান হারিয়ে ফিরে এলো। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার বন্ধু Helena কিছুদিন Jimmy-র কাছে রইলো। Alison আবার স্বামীর কাছে ফিরে এলো—Helena ও Jimmyকে ছেড়ে চলে গেলো। Jimmy ও Alison-এর সংসার আবার আগের মতই চলতে থাকলো।

নায়কের প্রতি সহানুভূতি থাকা Osborne এর রচনার বিশিষ্ট ধারা। আগের লেখা নাটক Epitaph for George Dillon (যদিও মঞ্চস্থ হয়েছে Look Back in Anger এর পরে), তার নায়ক George ও Jimmy-র মতই একজন বিক্ষুব্ধ তরুণ। সে লেখক ও অভিনেতা হিসেবে এখনো সার্থকতার অপেক্ষায় আছে। পরবর্তী নাটক The Entertainer-এর নায়কেরও বাইরের জগত ও নিজের মনের মিল খুঁজে পাওয়ার সমস্যা। Osborne-এর রচনায় এখান থেকেই ক্রমশ শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়।

The World of Paul Slickey নাটকের উদ্দেশ্য ছিল শ্লেষ দিয়ে সমাজকে তীব্র কশাঘাত করা। কিন্তু নাটক সে দিক দিয়ে সার্থক হয় নি। Look Back in Anger-এর পরবর্তী নাটকগুলোতে নায়কেরা যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

এই মারাত্মক অবস্থা থেকে Osborne রেহাই পেলেন

বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সুপ্রিয়া চৌধুরী। ফটো—মোনা চৌধুরী।

ঐতিহাসিক নাটক লিখে। কাঠামোর জন্যে ইতিহাসের সাহায্য নিয়ে তাঁর একেবারে আধুনিক নাটক Martin Luther-এ তিনি Luther-এর চরিত্রকে তেজস্বী সংলাপের দ্বারা খুবই সজীব করে তুলেছেন। মৌলিক সৃজনীশক্তির অভাবটা অবশ্য Look Back in Anger-এর সংগে তুলনা করলেই ধরা পড়ে।

ইনিই হলেন সেই বিখ্যাত ও বিতর্কমূলক John Osborne। রয়্যাল কোর্ট থিয়েটারে অন্য যে সব তরুণ নাট্যকারদের নাটক English Stage Company-র প্রচেষ্টায় মঞ্চস্থ হয়েছে তাঁদের ভেতর প্রধান হচ্ছেন N. F. Simpson, Ann Jellicoe এবং John Arden। Simpson-এর রচনায় নাটককে জনপ্রিয় করার চেষ্টা এত বেশি যে ব্যবসার দিক দিয়ে সেটা খুব সফল হয় না। তাছাড়া চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি নাটকীয় গুণও Simpson-এর নাটকে অনুপস্থিত।

Ann Jellicoe নাট্যকারের চেয়ে নাটক পরিচালিকা হিসেবেই বেশি কাজ করছেন। প্রথম নাটক The Sport of My Mad Mother, সিম্পসনের নাটকের মতই The Observer পত্রিকা পরিচালিত নাটক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবী হিসেবে আমাদের মা কালীর সংগে নায়িকার অনেক মিল আছে। নাটকের নামও তাই 'আমার পাগলিনী মায়ের লীলা।' এ নাটক উচ্ছৃঙ্খল একদল কিশোরদের নিয়ে লেখা, যাদের নেত্রী Greta হচ্ছে ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি এবং নাটকের নায়িকা। সে আবার সৃষ্টিরও দেবী—তাই নাটকের শেষে দেখা গেল সে সন্তানের জননী হয়েছে।

এই নাটকের সাফল্য দেখে এদেশের Girls Guide কর্তৃপক্ষ Ann Jellicoe-কে বললেন Girl Guide-দের বাৎসরিক সম্মেলনের উপযোগী করে একখানা নাটক লিখতে। লেখা হলো The Rising Generation. Mother হলেন মেয়েদের সর্বময় কর্ত্রী। ভগবান থেকে সুরু করে যে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা চরিত্র সবই মহিলা একথা মেয়েদের শেখানো হয় এবং পুরুষদের সংগে তাদের মিশতেও দেওয়া হয় না। শেষ পর্যন্ত একদিন মেয়েরা বিদ্রোহ করে সত্য আবিষ্কার করলো। Girl Guide কর্তৃপক্ষ দুর্ভাগ্যবশত ঐ নাটক গ্রহণ করলেন না। পরে Ark পত্রিকায় এই নাটক প্রকাশিত হলো এবং পাঠকেরা একবাক্যে এই নাটকের প্রশংসা করলেন। হাজারখানেক চরিত্রওলা এই নাটককে অনেকেই Girl Guide সম্মেলনে অভিনীত হওয়ার পক্ষে আদর্শ মনে করলেন।

Jellicoe-র পরবর্তী নাটক The Knack ইংলিশ স্টেজ

কোম্পানীর প্রযোজনায় ১৯৬১ সালে Cambridge-এর Arts Theatre-এ অভিনীত হলো। নাটকের বৈশিষ্ট্য প্রায় আগের মত রেখেও তিনি এবার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পাল্টে ফেললেন। তিনজন পুরুষ ও একজন রমণীর এক বাড়িতে থাকার ফলে যে জটিল সমস্যা দেখা দিল তারই রূপায়ণ হয়েছে এই নাটকে। Ann Jellicoe বলেন সব সময় নাটকের অর্থ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। মোটামুটি ঘটনাটা জানতে পারলেই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

English Stage Company না থাকলে John Arden হয় তো কখনও দর্শকদের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। সংবাদপত্র ও অন্যত্র বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও Stage Company আর্ডেনের নাটক অভিনয় করিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে আজ Arden-এর বেশ নামযশ হয়েছে। Arden-এর দোষ তাঁর অধিকাংশ চরিত্র নাটকে বিভিন্ন ধরণের ভাষা ও ভংগীতে কথা বলে। কখনও গদ্য, কখনও অমিত্রাক্ষর ছন্দে আবার কখনও হয় তো তারা গান গেয়ে উঠলো কথা বলতে বলতে। তাঁর নাটকের রূপ ও সংলাপ প্রথম প্রথম দর্শকদের একটু অদ্ভুত লাগবেই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দর্শক তাঁর শিল্পের সংগে ঘনিষ্ঠ হতে পারবেন এবং নাট্যকারকে শ্রদ্ধা করতেও পারবেন। Arden সম্ভাবনার স্বাক্ষর বহন করছেন।

Royal Court গোষ্ঠীর অন্যান্য নাট্যকারদের ভেতর Angus Wilson Nigel Dennis, Errol John, Christopher Logue এবং Michael Hastings-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে Stratford বলে একটা অঞ্চল আছে। এখানে শ্রীমতী জন লিটিলউডের প্রযোজনা ও পরিচালনায় অনেক তরুণ নাট্যকারের নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এখানকার নাট্যশালার নাম Theatre Workshop. নাম থেকেই বোঝা যায় এ থিয়েটার উন্নাসিকদের জন্যে নয়। উত্তরকালে বিখ্যাত হয়েছেন এ-রকম অনেক নাট্যকারের নাটক এখানে অভিনীত হওয়ার পর লণ্ডনের অভিজাত এলাকা West End-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। এ রকম নাট্যকার হচ্ছেন—Brendan Behan, Shelagh Delaney, Wolf Mankowitz, Frank Norman Barnard Kops এবং Henry Livings.

লণ্ডনের বাইরেও বহু প্রতিভাবান নাট্যকারের উদ্ভব হয়েছে। এঁদের ভেতর সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছেন Arnold Wesker। যে তিনখানা নাটককে Wesker Trilogy বলা হয় তাদের নাম: Chicken Soup with Barley, Roots এবং I'm talking about Jerusalem. এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন—The Kitchen ও Chips with Everything।

লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলের ইহুদী শ্রমিক পরিবার নিয়ে Wesker-এর

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে সন্ধানীর 'অমনাহ্ন' ছবির একটি দৃশ্যে সৌমিত্র ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

ত্রয়ী নাটক লেখা। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর বক্তব্যে বলিষ্ঠতা। আজকের দিনে তরুণ নাট্যকারের পক্ষে trilogy লেখার কল্পনা করাও সামান্য সাহসের কথা নয়। বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বিশেষ মত রয়েছে। তিনি বলেন 'বাস্তবধর্মী শিল্প' কথাটার কোন মানেই হয় না। শিল্পী নিজের অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দেবেন। বাস্তবের নকল না করে নাট্যকার বাস্তবকে নতুন করে সৃষ্টি করবেন। যাই হোক নবীন নাট্যকারদের ভেতর Wesker যে একটি বিশিষ্ট গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছেন একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

লণ্ডনের বাইরে অন্যান্য নাট্যকারদের ভেতর David Compton, James Saunders ও Doris Lessing বেশ নাম করেছেন।

রেডিও ও টেলিভিশনের মারফত অনেক নতুন নাট্যকারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। এঁদের ভেতর প্রধান হচ্ছেন Alun Owen ও John Mortimer। তাছাড়া Clive Exton এবং Peter Shaffer-এরও নাম করা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত যাঁদের কথা বলা গেছে তেমন কোনো শ্রেণীতেই ফেলা যায় না এরকম একজন নাট্যকারের নাম একটু পৃথকভাবে আলোচনা করাই সমীচীন বোধ করছি। এঁর নাম Harold Pinter। Eglish Stage Company অথবা Theatre Workshop কেউই এঁর নাটক প্রযোজনা করেন নি, অথচ রেডিও, টেলিভিশন ও মঞ্চে সমান খ্যাতির সঙ্গেই এঁর নাটক অভিনীত হয়েছে। অভিনেতা হিসেবেও Pinter-এর যথেষ্ট সুনাম আছে। Pinterই একমাত্র নাট্যকার যিনি সার্থকভাবে কবিতা ব্যবহার করতে পেরেছেন নাটকে। অনেকে এজন্যে তাঁর নাটক সঙ্গীত-প্রধান বলে ভুল করেন। তাঁর রচনার মৌলিকতা নিশ্চয়ই নাট্যকার হিসেবে তাঁকে আরও বিখ্যাত করবে।

একথা ভুললে চলবে না যে নাটক—নাটক হিসেবে ভালো হওয়া এক কথা আর নাট্যশালায় সার্থক হওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। John Arden-এর কথাই ধরা যাক না। ভদ্রলোকের নাটক দর্শকরা এখনও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছেন না। আবার কবিতাবহুল Pinter-এর নাটকের বেশ কদর। যেসব নাট্যকারের নাটক টেলিভিশনে খ্যাতিলাভ করেছে, মঞ্চে তাঁদের নাটকে ভিড় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ দর্শকরা সেই সব নাটকের অভিনয় দেখে প্রস্তুত হয়েই আছেন।

এতক্ষণ যে সব কথা আমরা আলোচনা করে এলাম সেগুলোই John Russell Taylor-এর প্রসিদ্ধ বই Anger and After-এর মোটামুটি বক্তব্য। আধুনিক ইংরেজি নাটকের এমন সুন্দর সমালোচনা এর আগে আর হয় নি। লেখক তাঁর নাট্যদরদী মন নিয়ে প্রত্যেক তরুণ নাট্যকারের লেখা নাটকের সমালোচনা করেছেন। অনেক যায়গায় পাঠকের নিজের অজ্ঞাতে নাট্যকারের প্রতি সহানুভূতি জন্মায়।

গত দশ বছরে এদেশে যে এত নাটক লেখা হয়েছে সে কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়। ইংরেজি নাট্যশালার খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্রই সুবিদিত। তাই আজ সিনেমা ও টেলিভিশনের প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও বহু নাট্যশালা এদেশে সম্মানের সংগে টিকে আছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এইসব নাট্যশালা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, তরুণ নাট্যকারদের নাটক প্রযোজনা করায় ঝুঁকি অনেকেই নিতে চান না। এ বছরই জাতীয় থিয়েটার বা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তার পরিচালক হয়েছেন স্বনামধন্য Sir Laurence Olivier, তরুণ নাট্যকাররা হয় তো আর সরকারী পৃষ্ঠপোষণা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

—লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।

উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহ

'দূরে বহুদূরে সিপ্রানদীপারে' উজ্জয়িনী নগরীতে ২৭শে নবেম্বর হইতে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত মহাকবি কালিদাসের স্মৃতির উদ্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের যৌথ আনুকূল্যে 'কালিদাস সমারোহ' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। মেঘদূতে যক্ষের শাপমুক্তির দিন রূপে যে কার্তিকীশুক্লা একাদশীতিথিটি উল্লিখিত হইয়াছে, সেইদিনটিকেই বর্তমানে 'কালিদাস-দিবস'রূপে গ্রহণ করিয়া রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি উদযাপিত করা হয়। এই বারের উৎসবেও অন্যান্য বারের ন্যায় নিখিল ভারতের কালিদাস-বিশেষজ্ঞ এবং কালিদাস-রসিকগণ সমবেত হন। এই উপলক্ষে কালিদাস বর্ণিত বিষয়গুলির একটি চিত্রকলা প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রত্যহ বিশিষ্ট
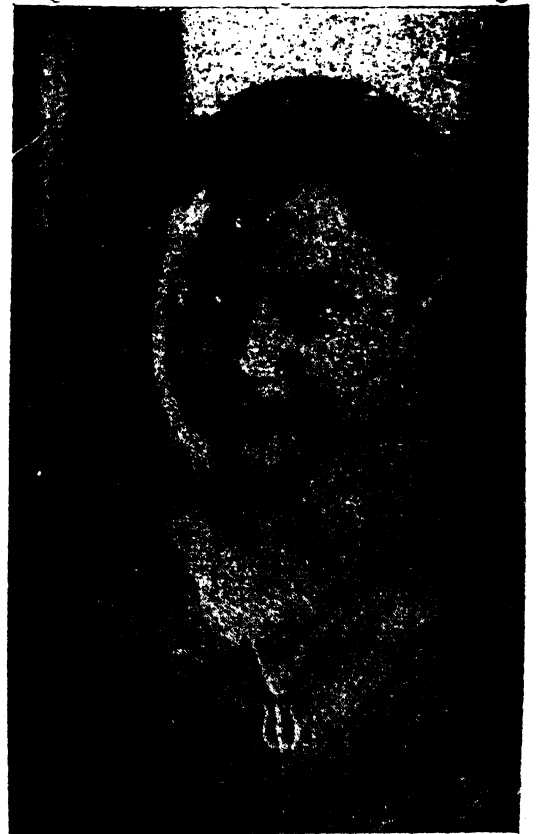
জয়শ্রী সেন—ছায়াছবির বাইরে

ব্যক্তিগণ কালিদাস সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া সারগর্ভ আলোচনা করেন। মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীহরিবিষ্ণু পটাশকর, মুখ্যমন্ত্রী দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শংকরদয়াল শর্মা, শ্রীশ্রীপ্রকাশ, বিত্তমন্ত্রী শ্রীশম্ভুনাথ শুক্ল, লোকসভা সদস্য পণ্ডিত অমরনাথ বিদ্যালংকার, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ সূর্যকান্ত, কেরলের এন্ পরমেশ্বরন্ উন্নি, তিরুপতির শ্রী ভি. এস. বেঙ্কটরাঘবাচার্য, লক্ষ্ণৌর ডাঃ সত্যব্রত সিংহ, জব্বলপুরের ডাঃ হীরালাল জৈন, উজ্জয়িনীর সর্বজনমান্য নেতা পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ ব্যাস এবং আরো বহু মনীষী ও খ্যাতনামা ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা দেশ হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, বিশ্বভারতীয় সংস্কৃতাধ্যক্ষ ডাঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসাহিত্য এবং সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রী সত্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির যোগদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই উৎসবে 'বোম্বের লিটল্ ব্যালে গ্রুপ্' মেঘদূত নৃত্যনাট্য, ভূপালের কলাপদ্ম বিক্রমোর্বশীয়ম—নৃত্যনাট্য, হায়দারাবাদের সংগীত নাটক আকাদেমী কুমারসম্ভব নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদের কুশলী শিল্পিবৃন্দ বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া 'রঘুবংশ' কাব্যের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন। মাধব মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দশ হাজার শ্রোতাকে এঁদের সমুন্নত অভিনয় মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। ইহার পূর্বে আরো চারবার ইঁহারা এই উৎসবে সংস্কৃত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিয়া বাংলার জন্য জয়মাল্য আনয়ন করিয়াছেন। প্রতিটি পাত্র-পাত্রীর সুনিপুণ অভিনয়, সংগীতের অপূর্ব সুরমাধুরী এবং মঞ্চকল্পনা ও আলোকসম্পাতের সূক্ষ্মকৌশল সকলকে বিস্মিত করে। নাট্যরূপ দান করেন পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। সুরদান করেন ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন পরিচালক স্বয়ং ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডাঃ ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালীকুমার দত্ত, ডাঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়, রজতবরণ দস্তিদার, শক্তিপ্রসাদ মুখার্জী, মিহির ভট্টাচার্য, ডাঃ দিলীপ কাঞ্জিলাল, মানব ব্যানার্জী, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর দে, মিনতি মল্লিক, রত্না গোস্বামী এবং আরো অনেকে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রচারে ইঁহাদের এই জয়যাত্রা অভিনন্দনীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কল্পলোকে মহাকবি কালিদাসের সহিত যে আত্মিক মিলন অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই এই সমারোহে বাঙলা এবং অবন্তীর অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক মিলনে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়া মহিমমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। মনীষী Stein Konow-এর ভাষায় বলা যায়—'The old spirit was still alive.'

'অরণ্যে' চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

সংবাদবিচিত্রা

গত ৬ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্ববিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক আচার্য জওহরলাল নেহরু চলচ্চিত্র সম্পর্কে অতি সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি ভারতীয় ছায়াছবির অগ্রগতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, এই অগ্রগতি অভিনন্দনযোগ্য কিন্তু রুচি ও শিল্প-সৌন্দর্যের দিকে আরও অনেক কিছু করবার আছে। তিনি বলেন তারকাবৃন্দ ছাড়াও চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা যুক্ত থাকেন সেই সব নেপথ্য কর্মীদের অবদানের গুরুত্ব স্মরণ করে তাঁদের প্রতি যথাযথ সুবিচার যেন করা হয়। শ্রীনেহরুর এই ভাষণে তাঁর চলচ্চিত্রের কল্যাণধর্মী যে সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া গেল, তা সমগ্র চিত্রজগতে গভীর আশার সঞ্চার করবে।

• • • •

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে কোন কোন চিত্রগৃহের আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটী গঠন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার কমিশনার শ্রী এস. আর. মুখোপাধ্যায় এবং লেবার অফিসার শ্রী ডি. এল. সান্যাল এই কমিটীর যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন।

• • • •

চলচ্চিত্রের উন্নয়নকল্পে এবং তার অগ্রগমনে সহায়তার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে যে, বর্তমান বর্ষে নির্মিত ভারতীয় ফিচার ফিল্মগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবিটিকে ভারত সরকার কর্তৃক কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে। জাতীয় ঐক্য সাধনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ছবিটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত করা হবে। তথ্য ও প্রচার-মন্ত্রিদপ্তর আয়োজিত পুরস্কার-বিতরণী সভায় ১৯৬৫ সালে এই পুরস্কারটিও প্রদান হবে।

• • • •

বোম্বাইয়ের চিত্ররাজ্যে অভিনয়কলার ক্ষেত্রে বাঙলার যে শিল্পিকুল প্রভূত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন শ্রীমতী অনিতা গুহ সেই তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর অসংখ্য হিন্দীচিত্রে অভিনয় হিন্দীচিত্রামোদী সমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে প্রযোজক বন্সী জঙ বাহাদুরের নবতম পরিকল্পনা ইতিহাসবিখ্যাত মহারাণী পদ্মিনীর জীবনীচিত্রে নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে শ্রীমতী অনিতা নির্বাচিতা হয়েছেন। ছবিটির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। মহারাণী পদ্মিনীর অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মহিমায় উদ্ভাসিত, গৌরবোজ্জ্বল চরিত্রটি বাঙালী শিল্পী নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলুন—এই কামনাই করি।

• • • •

নিউইয়র্কের 'মাদামোয়াসেল' পুরস্কার বিজয়িনী ভারতীয় শিল্পী শ্রীমতী লীলা নাইডু বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হলিউডের একটি টেলিভিশানচিত্রে এক প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। এই টেলিভিশান ছবিটির নাম 'এ ফেস ইন দ্য সান।' হলিউড জায়গাটি সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—'ক্রেজি প্লেস'। তিনি আরও বলেন যে 'সেখানে আর নো সাইড ওয়াকস, নো বাসেস এ্যাণ্ড ট্যাক্সিস আর ভেরি কস্টলি। সেখানকার দর্শনশাস্ত্র আলোচনাকারী ট্যাক্সিচালকেরা তাঁর মতে 'ইন্টারেস্টিং ফোক'। বিদেশের অভিনয় জগতে ভারতীয় শিল্পীর এই সাফল্য এবং সমাদর ভারতীয় অভিনয় জগতেরই গৌরব বহুগুণ বৃদ্ধি করবে। পূর্বোক্ত 'মাদামোয়াসেল' পুরস্কারটি লীলা নাইডুকে প্রদানের পূর্বে ১৯৬২ সালে মিরাক্যাল ওয়ার্কার-এ অনবদ্য অভিনয়ের জন্য এ্যানি ব্যানক্রফ্‌টকে প্রদান করা হয়েছিল।

• • • •

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 'ফিল্ম প্রিন্সেস' প্রতিযোগিতায় পনেরজন যোগদানকারিণীর মধ্যে কুমারী পার্সিস খাম্বাটা বিচারকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিতা হয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রিন্স জাবর আবদুল্লা সাবা এল জার কুমারী খাম্বাটার শিরোদেশে বিজয়িনীর মুকুট পরিয়ে দেন এবং ব্যক্তিগতভাবে এক হাজার এক টাকা উপহার দিয়ে অভিনন্দিত করেন। এই প্রতিযোগিতা বিচারকদের মধ্যে রাজকাপুর, জি পি সিপ্পি যশ চোপরা, হেলেন, আগা, আজরা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

• • • •

বর্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে মাদ্রাজে একটি বৃহত্তর চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন হচ্ছে। ফেডারেশান অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়ার সহযোগে এই উৎসবে উদ্যোগ করছেন ম্যাড্রাস ফিল্ম সোসাইটি। মাদ্রাজে অর্থাৎ ভারতবর্ষে যেমনই

'অশান্ত ঘূর্ণি' চিত্রের পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় নায়িকা জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে স্যুটিং-এর পূর্বে স্ক্রিপ্ট পড়াচ্ছেন

বুলগেরীয় ছায়াছবির উৎসব যে সময়ে শুরু হচ্ছে সেই সময়েই শোনা গেল যে, বুলগেরিয়াতেও ভারতীয় ছায়াছবির এক উৎসব আগামী বর্ষে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উৎসব ভারত ও বুলগেরীয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা রাখা যায়।

• • • •

হলিউড থেকে জানা গেছে যে, স্যাণ্টা মানিকা সিভিক অডিটোরিয়ামটির নাম পরিবর্তিত করে রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির নামানুসারে রাখা হয়েছে। এই নাম পরিবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানিতা অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কেনেডির অনুজা স্যাণ্টা মনিকার অধিবাসিনী শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া লফোর্ড (চিত্রনট পিটার লফোর্ডের সহধর্মিণী)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে, বিগত তিনটি এ্যাকাডেমী পুরস্কার প্রদান উৎসব এই মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

• • • •

চৌষট্টি বছর বয়স্ক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা স্পেন্সার ট্রেসি বর্তমানে অসুস্থ। অসুস্থতাবশত ওয়েস্টার্ণ ফিল্মের 'চেন অ্যাটম' ছবিটিতে অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠল না। তাঁর অভিনেয় চরিত্রটির রূপদানের জন্য একাত্তর বছর বয়স্ক প্রসিদ্ধ শিল্পী এডওয়ার্ড জি, রবিনসন নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গেল।

• • • •

হলিউডের নির্ভরযোগ্য মহল থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে 'মার্টি' খ্যাত আর্নেস্ট বর্গনিন (৪৭) এবং ব্রডওয়ের সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী এথেল মারম্যান (৫৫) অতি অল্পকালের মধ্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এথেল ইতিপূর্বে আরও তিনবার পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধা হয়েছেন এবং গত জুন মাসে আর্নেস্টের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় সহধর্মিণী চিত্রাভিনেত্রী ক্যাটি জুরাডোর (৩৮) বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে।

শৌখীন সমাচার

দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ

বাঙলার নাট্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ' নামক প্রহসনটি পাঠচক্র নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত হয়। চরিত্রগুলির রূপদান করেন বিনয় চক্রবর্তী নেপাল মিত্র সুপ্রিয় মিত্র, শ্যামা দাস, সর্বাণী চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক দীপু ভট্টাচার্য।

মানময়ী গার্লস স্কুল

চন্দননগরের 'মরুরূপ'-এর সভ্যবৃন্দ পরলোকগত রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের বিখ্যাত নাটক 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' মঞ্চস্থ করেন। ভুজেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায় কৃষ্ণচরণ মুখোপাধ্যায়, ফকির মণ্ডল, শিবচরণ মুখোপাধ্যায়, সমাট সুর, দুলাল দে, উষা রায়, বিন্দু দত্ত, সেবা দাস, দীপা বল, নিভা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরা চরিত্রগুলির রূপ দেন।

বন্ধু

কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু' মঞ্চস্থ করলেন বাঘা পাড়া উন্নয়ন সমিতি। রতন মিত্র, রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধু মিত্র, শিশির দে, হেমন্ত ঘোষ, রমাপদ বসু, তারাপদ ঘোষ, অমরী ভট্টাচার্য ও কনক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন।

মৌচোর

সলিল সেন রচিত 'মৌচোর' নাটকটি নিবেদন করলেন এস, লাহিড়ী এ্যাণ্ড কোম্পানী স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব। কালীবিলাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনিল বসু, অলক সান্যাল, মোহিনীমোহন দে, বাসুদেব পাঁজা, অমর সান্যাল, শিখা ভট্টাচার্য, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

সাজাহান

অবিস্মরণীয় নাট্যস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকটি অভিনয় করেন 'রূপ ও ছন্দ' সম্প্রদায়ের শিল্পীগোষ্ঠী। নাটকের চরিত্রগুলির প্রাণসঞ্চার করেন প্রশান্ত চক্রবর্তী, দেবী চক্রবর্তী, ধীমান বসু, সুনীল কুণ্ডু, শ্যামল মিত্র, অসিত মিত্র, অরুণ বসু, মোহনলাল ভাটিয়া, দিলীপ সিংহ, রাসবিহারী দাস, অশোক দে, প্রশান্ত বসু, অজিত দত্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট), গীতা নাগ, লতিকা দাশগুপ্ত, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, জয়শ্রী কুমারী প্রভৃতি।

'রূপ ও ছন্দ' নিবেদিত 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজীবের ভূমিকায় দেবী চক্রবর্তী

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

সুভা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' নামক গল্পটিকে ছায়াছবির রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তরুণ ও শক্তিমান পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। নভেম্বর থেকে এর চিত্রগ্রহণ কার্যও সুরু হয়ে গেছে। পরিচালক পার্থপ্রতিম এর চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। সুরকার বালসারা গ্রহণ করেছেন সুরারোপের দায়িত্ব। দিনেন গুপ্ত আলোকচিত্রী হিসাবে যুক্ত হয়েছেন এই প্রচেষ্টার সঙ্গে। চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, ভোলা দত্ত, অনুভা গুপ্ত, শর্মিলা ঠাকুর, লিলি চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীর দল।

কষ্টিপাথর

মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে 'কষ্টিপাথর' অন্যতম। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বনফুল অনুজ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবিটিতে সুর যোজনা করেছেন। কমল মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, প্রেমাংশু বসু, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, বীরেশ্বর সেন, জহর রায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, লিলি চক্রবর্তী, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি কৃতী শিল্পীদের সমাবেশে এক আকর্ষণীয় ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

অনুষ্টুপ ছন্দ

বি. কে. প্রোডাকসান্সের নিবেদন 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ছবিটি পরিচালিত হচ্ছে পীযূষ বসুর দ্বারা। এর কাহিনীকার প্রবীণ সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বসন্ত চৌধুরী, এন বিশ্বনাথন, আশীষ মুখোপাধ্যায়, সত্য ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর সেন, মলিনা দেবী, সুমিতা সান্যাল, আরতি ভৌমিক, গীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মধুমিতা

অগ্নিমিত্রের পরিচালনায় 'মধুমিতা' ছবিটির চিত্রগ্রহণ কার্য দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, অপর্ণা দেবী, লিলি চক্রবর্তী, চন্দনা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

নূতন তীর্থ

প্রোডাকসান সিণ্ডিকেটের নির্মীয়মাণ চিত্র 'নূতন তীর্থ' পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় রূপ নিচ্ছে। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য এর কাহিনী রচনা করেছেন। ছবিটির চরিত্রগুলির রূপায়ণের ভার পাড়ছে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, জীবেন বসু, শিশির মিত্র, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, সুলতা চৌধুরী, রেণুকা রায়, প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ তারকাদের প্রতি।

বর্তমান সংখ্যায় রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় সান্যাল, ধীরেন অধিকারী, চিত্ত নন্দী, মোনা চৌধুরী ও স্বদেশ ঘোষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

নাটক ?

নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানিনে তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু'রকমের হতে পারে;—এক হচ্ছে, প্রকাশ, অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত বিশ বছর আগে উইলসনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যায় অকাজ করত। আজ সে ধার্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্তন। হয়ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্তে পড়ে, পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি করে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হ'লে ত' হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে, লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি ক'রে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্তনের হেতু খুঁজে পেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দুই বা তিন অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয় ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কৈ? নাটকের ভিড়হীন সাজঘরে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি, একদিন বর্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাব ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয় ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয় ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে। ('নাচঘর', ২৫ আশ্বিন ১৩৪১) —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভুবনেশ্বর অধিবেশন

বর্তমান বর্ষ সূচিত হওয়ার সময়ে কংগ্রেস মহলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশন। নানা দিক দিয়া অধিবেশনটি গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক বৈশিষ্ট্যসহ এই সম্মেলনটি জনচিত্তে এক অভূতপূর্ব আবেদন জোগাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই অধিবেশনে প্রায় অশীতিবর্ষীয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল। তাহার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে ইহা নিঃসন্দেহে এক বিশেষ ঘটনা। তাহার অনাগতকালের বলিষ্ঠ ইতিহাসের রূপায়ণে ইহার অবদান অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুস্থ আলোকিত ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদের মাধ্যমেই দেশ সর্বপ্রকার অসাম্য, দুর্নীতি এবং অসংহতির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যথেষ্ট সমৃদ্ধির, মঙ্গলের ও কল্যাণের সিংহদ্বারে উপনীত হইবে। একচেটিয়া মালিকানা দেশের নানা প্রকার শ্রীবৃদ্ধির এবং উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে রীতিমত প্রতিবন্ধকতার পর্বত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। একচেটিয়া মালিকানায় দেশের ধনসম্পদ সামগ্রিকভাবে একশ্রেণীর ধনিক সমাজে চলিয়া যাইতেছে, ইহাদের কোষাগার কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছে, দেশের বহুসংখ্যক জনগণের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া দেশের ধনসম্পদ এইভাবে কুক্ষিগত করা দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়েরই নামান্তর মাত্র, ইহাতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, অন্যদিকে তেমনই দেশ ও জাতির কল্যাণকল্পে সরকারী পরিকল্পনাগুলিও বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বাধার সম্মুখীন হইবে। এমতাবস্থায় এই বাধার পাহাড় ধূলিসাৎ করাই কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য হওয়া উচিত এবং এ ক্ষেত্রে তাহা সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সম্ভব। অধুনা সমাজ ধনতান্ত্রিক রূপ লইয়াছে। এ রূপ মঙ্গলের নহে, জনকল্যাণের জন্য এই রূপের পরিবর্তনসাধনও প্রয়োজন। যে রূপ ভয়াবহ তাহাকে শুভপ্রদ করিয়া তুলিতে হইবে। জীবনকে সুন্দর করার সাধনায় আত্মনিয়োজিত করিবার সময় বহুক্ষণই আসিয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের সমাজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে সেক্ষেত্রে ঐ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, যথা—ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ, কৃষিপণ্যের কেনাবেচার ক্ষেত্রে দালালদের উচ্ছেদ, চালকলের আশু রাষ্ট্রীকরণ, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রভৃতি। এই ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে যাহাতে কার্যে পরিণত হয় এখন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক জওহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সার্থক সমাজ ও গণতন্ত্র গঠন করিবার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি দীর্ঘকাল পূর্বেই উপলব্ধি করিয়া যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় তাঁহার দীর্ঘকাল পূর্বের স্বপ্ন গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পরিকল্পনা আজ জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইল।

এই অধিবেশনের আর একটি বিশেষত্ব সভাপতি শ্রীকামরাজের তামিলভাষায় অভিভাষণ পাঠ। গত কয়েকমাসে তাঁহার খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি সর্বভারতীয় পটভূমিতে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। এক্ষণে কংগ্রেস মহলে শ্রীকামরাজ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এই বৎসর সভাপতির ভাষণে তিনি কংগ্রেসের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নজীর রাখিলেন। ইংরাজী ও হিন্দী ব্যতীত এই প্রথম অন্য একটি ভারতীয় ভাষায় কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ প্রদত্ত হইল। অতএব এখন এই আশা নিশ্চয়ই আমরা পোষণ করিতে পারি যে, পরবর্তীকালে কোন বঙ্গসন্তান কংগ্রেস সভাপতি হইলে তাঁহার ভাষণ বাঙলাভাষায় প্রদত্ত হইবে। এক্ষেত্রে আমাদের এই আশা অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। ক্রমে এই ভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় ভাষার এক মহামিলনের ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়া ভাষাগত ঐক্যসাধনে বিপুল সার্থকতায় বিমণ্ডিত হইবে।

এই ঐতিহাসিক অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হইল ভুবনেশ্বরের অন্তর্গত গোপবন্ধুনগরে। নব্য উৎকলের জনক গোপবন্ধু দাসের নামাঙ্কিত এই নগরে অধিবেশনের আয়োজন করিয়া ভারতের এক লব্ধকীর্তি মহান সন্তানের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে জাতীয় কংগ্রেস তথা জাতীয় সরকার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। সেদিনকার উড়িষ্যার সহিত আজকার উড়িষ্যায় প্রভেদ অনেক। সেদিন ভারতের মধ্যে উড়িষ্যা ছিল এক অতি অনুন্নত ও অবহেলিত রাষ্ট্র কিন্তু জাতীয় কল্যাণসাধনে তাহার ভূমিকাও আজ অসামান্য, যে ভাবে নানাবিধ শিল্পের ক্ষেত্রে, বাঁধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা তাহার বিপুল প্রগতির পরিচায়ক। বাঙলা দেশের সহিত উড়িষ্যার যোগাযোগও অল্পকালের নহে। এই সমৃদ্ধ সুদীর্ঘকালের তাহার প্রীতি ও সহযোগিতার পাত্রটি সে চিরদিনই বাঙলার উদ্দেশে তুলিয়া ধরিয়াছে। বিগত ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রেমের, করুণার ও মৈত্রীর অমৃতবাণী উড়িষ্যার ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া উড়িষ্যাবাসীকে এক দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়াছিলেন, উড়িষ্যা তাঁহার নশ্বরজীবনের শেষ ভাগের লীলাক্ষেত্র, তাঁহার কল্যাণে উড়িষ্যাবাসীর একত্রে বিগ্রহ জগন্নাথ ও জীবন্ত জগন্নাথ দর্শন করিবার

সৌভাগ্য হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান উড়িষ্যা।

এই সকল বিশেষত্বগুলি পর্যালোচনা করিলে এই অধিবেশনের গুরুত্ব স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। জনসাধারণের ব্যাপক ও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র হইতে সর্বপ্রকার অসাম্য ও অসঙ্গতি দূরীকরণের জন্য এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে আমরা পরম আনন্দে স্বাগত জানাইতেছি।

উন্মত্ত বর্বরতার এক সাম্প্রতিক নিদর্শন

গত চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে যে অকথ্য এবং অমানুষিক হিন্দু নির্যাতন চলিতেছে, তাহার তুলনা মেলা ভার। সভ্যজগতে এই প্রকার বর্বরতা এবং অসহায়দের প্রতি দানবীয় অত্যাচার সভ্যতারই চরম বিকৃতিসাধন মাত্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তা যে কতখানি বিপন্ন, সে সম্বন্ধে আজ শুধু ভারতবর্ষ কেন, সারা পৃথিবীই সম্পূর্ণরূপে অবগত।

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পাকিস্তানে যে ক্রমান্বয়ে হিন্দু বিতাড়ন, হিন্দুদের সর্বস্ব লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন প্রভৃতি পাশবিক আচরণসমূহ নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে তাহা সমগ্র মানবসমাজকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া দেয়। সর্বহারাদের আকুল ক্রন্দনে, বুকফাটা হাহাকারে সমগ্র দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন। আকাশে-বাতাসে চতুর্দিকে কেবল সর্বনাশের ইঙ্গিত, চতুর্দিকে মৃত্যুর ইশারা, পূর্ব-পাকিস্তানের লাঞ্ছিত হিন্দুদের বিধ্বস্ত আঙ্গিনায় বীভৎসতার সমারোহ।

পূর্ব-পাকিস্তানে এই ক্রম হিন্দু নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া সম্প্রতি কলিকাতার উপকণ্ঠসমূহে এবং মহানগরীর কোন কোন অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তাহা এক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণতিলাভ করে।

পাকিস্তানের হিন্দু নির্যাতন নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে নিন্দনীয় এবং চতুর্দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া উচিত এবং এই আচরণে মানবতার উপাসকমাত্রেই নিদারুণ ব্যথিত হইবেন তথাপি ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গুণ্ডামীর উত্তর গুণ্ডামী নয়, এক বর্বরতার অবসানকল্পে আর এক বর্বরতা অনুমোদন করা অনুচিত, অন্যায় দিয়া কখনো অন্যায়ের সংশোধন হয় না। কলিকাতায় বা তাহার উপকণ্ঠে যে সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়া গেল বিচক্ষণ এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই তাহার প্রতিবাদ করিবেন।

এই হাঙ্গামায় যে কত নিরপরাধ জীবন বিনষ্ট হইল, কত গৃহ ভস্মীভূত হইল, লুন্ঠিত হইল—তাহার ক্ষতিপূরণ কি ভাবে সম্ভব? অন্য রাষ্ট্রের বিবেকবিরোধী আচরণের দোহাই পাড়িয়া একশ্রেণীর সংখ্যালঘুদের প্রতি এই অত্যাচার কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। সকল সময় মনে রাখা আবশ্যক যে ভারত কল্যাণকামী এক মহান রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নয়, শুধু নেতৃবৃন্দেরই নয়, শুধু সরকারী মহলেরই নয় এই পুণ্যকর্তব্য প্রতিটি নাগরিকের, প্রতিটি পুরুষের, প্রতিটি নারীর, আবালবৃদ্ধবনিতার। গত কয়েক বৎসরে সারা পৃথিবীতে যে সর্বনাশের সমারোহ অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিলে শিহরিত হইতে হয়। প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক দুর্যোগ, বিপর্যয় সুন্দর পৃথিবীকে যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ শুধু দুঃসাধ্যই নয়, রীতিমত অসাধ্য। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ক্ষমতার জন্য হিংসা, হানাহানি, যুদ্ধ, রাজনৈতিক সজ্ঘর্ষ পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকেও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সারা পৃথিবী (চীন প্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত) আজ শান্তির মহান যজ্ঞে অংশগ্রহণ করিয়াছে। শান্তির তপস্যায় জগৎ আজ সমাহিত। শান্তি আন্দোলনের অন্যতম মহান নায়ক ভারতবর্ষ। সেই ভারতরাষ্ট্রেই যদি শান্তির তপস্যাকে এইভাবে বানচাল করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তদপেক্ষা বেদনার কারণ আর কিছু থাকিতে পারে না। পাকিস্তানের যে ক্রিয়াকলাপ এবং ঘৃণ্য আচরণ আমাদের স্তম্ভিত ও বেদনাহত করিয়া তুলিয়াছে সেই আচরণ যদি আমাদের দিক হইতে হয় তাহা হইলে পাকিস্তানের ঘৃণ্য নরপশুদের সহিত আমাদের পার্থক্য থাকে কোথায়। আমরাও যদি তাহাদেরই মত আচরণ করি তাহা হইলে কোন যুক্তিতে নিজেদের সভ্য, হৃদয়বান, অনুভূতিশীল, মানবতার ধ্বজাধারী বলিয়া দাবী করিব? গুণ্ডামী, সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার করিয়া সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া ঘরে ঘরে আতঙ্ক ও ত্রাসের সঞ্চার করিয়া কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো যায় না। অন্যায়ের, অত্যাচারের, অবিচারের প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করা উচিত, শুধু উচিতই নয় প্রয়োজনও। তবে তাহার ধারা পৃথক তাহার পথ ভিন্ন। মনুষ্যত্বের জয়গান গাহিয়া, বিবেকের পতাকা উড্ডীন রাখিয়া শান্তিপূর্ণভাবে, যথাযথ শৃঙ্খলা ও সংযমসহকারে এই অত্যাচার বন্ধের আন্দোলন চালানো শ্রেয় ও বিধেয়। আমরা সত্যশিব সুন্দরের পূজারী, আমরা জীবনপিয়াসী, আমরা প্রীতি ও মিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত, অসুন্দর অকল্যাণ অশিব যাহা তাহা আমাদের সীমানা হইতে শতহস্ত দূরে থাকুক।

এই হাঙ্গামা সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের আশেপাশে একশ্রেণীর সমাজবিরোধী আছে যাহারা কোনপ্রকার উত্তেজনা বা গোলযোগের আভাস পাইলেই আসরে অবতীর্ণ হইয়া পড়ে, নানাবিধ দুষ্কার্য করিয়া তাহারা আপন স্বার্থসিদ্ধ করিয়া থাকে এবং এই জাতীয় ঘটনাকে অজুহাত করিয়াই তাহারা কাজ শুরু করে। ইহারা যে সমাজের কত বড় শত্রু সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার দ্বিমতের অবকাশ নাই। সারা অঞ্চলে ইহারাই রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদির অজুহাতে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তোলে।

আনন্দের কথা, কলিকাতার এই হাঙ্গামা দুই-তিন দিনের বেশি স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, কেন্দ্রীয় আইন এবং ডাক ও তারবিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এই বিপর্যয়ের সংবাদে কলিকাতায় আসিয়া মহানগরীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সমভিব্যাহারে ইঁহারা স্বয়ং উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন ও উৎপীড়িত

সহলে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেন এবং নিরাপত্তা বিধান করেন। ইঁহাদের হস্তক্ষেপে সকল দুর্যোগের অবসান ঘটিল। ভারতের স্থলবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীও এই উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নেতৃবর্গের এই অপকর্ম বিরোধী সার্থক অভিযানে মহানগরী বিপদের ত্রিযাম রাত্রির অবসানে মেঘমুক্ত নির্মল প্রভাতের সম্মুখীন হইতেছে।

নাগরিক জীবনের সমস্যা প্রসঙ্গে

কলিকাতা মহানগরীতে এক জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে ভারতের আইন এবং ডাক ও তার বিভাগীয় মন্ত্রী, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনরথী শ্রীঅশোককুমার সেন নাগরিক জীবনের অভাব অভিযোগসম্বন্ধে এক সময়োপযোগী সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করিয়া নাগরিকবৃন্দের বিপুল অভিনন্দনে আরো একবার বিভূষিত হইলেন। সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা আজ বাঙলার মুখ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছেন শ্রীসেন তাঁহাদেরই মধ্যে এক বিশিষ্টজন। কলিকাতা মহানগরীর আভ্যন্তরীণ বহুবিধ সমস্যা আজ তাহার ব্যাপক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উন্নয়নের নানাবিধ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ এই সকল বাধাগুলির জন্যই সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। শ্রীসেন তাঁহার সুচিন্তিত এবং মননশীল ভাষণে বলিয়াছেন যে, সভা-সমিতির দ্বারা নাগরিক সমস্যা দূরীকরণ কখনও সম্ভবপর নয়। তাঁহার মতে কতকগুলি সাবকমিটী গঠন করিয়া একেকটি সমস্যা সমাধানের ভার একেকটি সাব কমিটীর হস্তে সমর্পণ করিলে তাহার ফল মঙ্গলজনক হইবে।

নাগরিক জীবন আজ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। রাষ্ট্রের একাধিক সমস্যার উপর এই নাগরিকদের সমস্যাসমূহ 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' শীর্ষক একটি বহু প্রচলিত বাঙলা প্রবাদবাক্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। পরিবহন সমস্যা, খাটাল সমস্যা, পানীয় জল সমস্যা—নাগরিক জীবনের সুস্থ জীবনযাত্রাকে ক্রমশই পীড়িত করিয়া তুলিতেছে। প্রতি মুহূর্ত যেখানে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা ভবিষ্যতের সকল উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির সেক্ষেত্রে অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

স্বাস্থ্য রত্নের সহিত তুলনীয়। তাহার অভাব যে কত বেদনাদায়ক এবং সকল দিক দিয়া কত হতাশাব্যঞ্জক সে বিষয়ে বুদ্ধিমান চিন্তাশীল মাত্রেই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সহিত একমত হইবেন।

জনগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শ্রীসেনের সচেতনতা তাঁহার সমাজ কল্যাণকামী মনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে গণ্য। নাগরিক জীবনের এই সকল সমস্যা দূরীকরণের জন্য তিনি যে সুচিন্তিত নির্দেশ দিয়াছেন তাহা যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে সুফল ফলিবে বলিয়া আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি।

এক একটি সাবকমিটিকে নির্দিষ্ট কর্মভার দিলে আপন আপন কর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি দায়ী থাকিবেন এবং কর্মভার পালন করিতে যথেষ্ট পরিমাণে যত্নবান হইবেন। কার্যভার বিভক্ত করিয়া দেওয়ার প্রধান সুবিধা ইহাই।

শ্রীসেনের এই ভাষণের বিশেষত্ব এই যে তিনি শুধু সমাজে কল্যাণকামনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু সমাজের তথা নাগরিক-জীবনের দুঃখ-দুর্দশাগুলি উল্লেখ করিয়া তাহার সমাধানের এক সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়াছেন। এই উন্নয়নধর্মী কল্যাণকামী ও সহানুভূতিশীল মনোভাবের জন্য শ্রীসেন নিঃসন্দেহে দেশবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

॥ শোক-সংবাদ ॥

মনোদা দেবী

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগাঁর জনপ্রিয় আইনজীবী স্বর্গীয় মদনমোহন দাশগুপ্তের সহধর্মিণী মনোদা দেবী গত ৫ই অগ্রাণ ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। পূর্ব-বাঙলায় ইনি সুদীর্ঘকাল যাবৎ গ্রামসেবা ও হরিজন উন্নয়ন কার্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর সহানুভূতিশীল ও দরদী মনোভাবের জন্য তিনি বহু কংগ্রেসসেবীর শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থা হয়েছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর রচিত গৃহবধূর ডায়েরি মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

ডাঃ বি এন ভাদুড়ী

বিখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও ডাঃ এম এন চ্যাটার্জী চক্ষু হাসপাতালের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ডাঃ বি এন ভাদুড়ী গত ১৮ই পৌষ ৭২ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। চক্ষুরোগের অস্ত্রোপচারে তিনি এক সুবিস্তৃত খ্যাতির অধিকারী ছিলেন এবং উক্ত বিষয়ে তাঁর রিসার্চ পেপারগুলি দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট স্বীকৃতি ও সম্মানে বিভূষিত হয়।

হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়

প্রাক্তন বিপ্লবী ও ইণ্ডিয়া লীগ অফ অ্যামেরিকার ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় গত ১৭ই ডিসেম্বর পুণায় ৭৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২০ সাল থেকে '৩২ সাল পর্যন্ত ইনি ছিলেন রকফেলার ইনস্টিটিউশানের সহকারী পরিচালক এবং সংযোজনবিভাগের প্রধান। ১৯৩৩-৩৪ সালে চীন, জাপান, কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারা ইনি বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর প্রবাসবাসের পর ১৯৬১ সালে ইনি পুণায় ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশানের কর্মভার গ্রহণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সর্দার কেবলম মাধব পাণিকর

প্রথিতযশা সুধীবর; চীন ও মিশরে ভূতপূর্ব ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সর্দার কেবলম মাধব পাণিকর গত ১০ই ডিসেম্বর ৭১ বছর বয়সে আকস্মিক অসুস্থতায় গতায়ু হয়েছেন। ঐতিহাসিক, লেখক এবং প্রশাসক হিসাবে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুষার ভবরঞ্জন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]
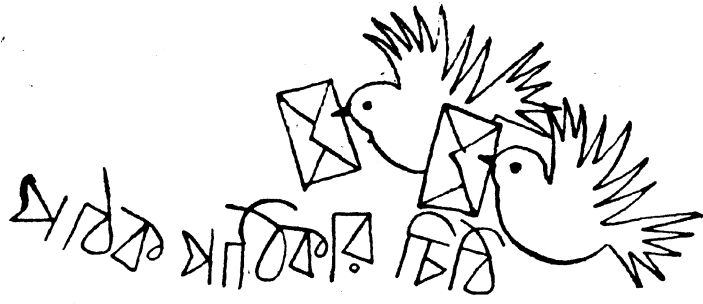
পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, আমি 'মাসিক বসুমতী'র সঙ্গে অনেক দিন হইল সংশ্লিষ্ট আছি, সত্যি সারা ভারত কেন সারা দুনিয়া আপনাদের জন্য উন্মুখ। গত মাসের মত যেন আমরা একটা করে সম্পূর্ণ উপন্যাস দেখতে পাই। সতীকান্ত গুহের 'কবিতা' পড়লাম। আধুনিক যুগে এইরকম উপন্যাস সত্যিই উপভোগ্য। গতমাসে কৃষ্ণা দাসের 'বৃত্ত' ও দিলীপ সেনগুপ্তের 'হীরের হার' গল্পগুলিও ভাল লাগল। আপনাদের প্রতি মাসে এক একটা প্রতিযোগিতার আহ্বান করা উচিত। আর বেশি লিখবো না। পাঠক-পাঠিকার চিঠির পাতায় চিঠিটা ছাপালে বাধিত হব। ইতি—জওহরলাল পাল, পারুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ পারুলিয়া, সিংভূম (বিহার)।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমি প্রায় সাত-আট বছর মাসিক বসুমতী পড়ে আসছি। মাসিক বসুমতী নিঃসন্দেহে টি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা। অধীর আগ্রহে আমি মাসিক বসুমতী কাগজের জন্য বসে থাকি। গল্প উপন্যাসে পত্রিকাটি খুবই সমৃদ্ধ। ১৩৭০ সালের বৈশাখ থেকে পত্রিকাটির একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। প্রকাশকাল আগের থেকে ত্বরান্বিত হয়েছে। আলোকচিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর সিংহের ছবিগুলির খুবই প্রশংসা করি। আপনার সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী খুবই উন্নত হচ্ছে। কার্তিক সংখ্যায় একটা উপন্যাস রয়েছে দেখলাম। উপন্যাস প্রতি সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব না হলে মাঝে মাঝে দেবার চেষ্টা করবেন। আঁকা প্রচ্ছদপট খুব ভাল হচ্ছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে ভাল ফটোগ্রাফ-এর (ঋতু বিষয়ক) প্রচ্ছদ করলে ভালই হবে মনে হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান বা মন্দিরের ফটোগ্রাফ এ বিষয়ে চলতে পারে। অবশ্য আপনার বা আপনাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজ হবে, এটা মানি। আর কি? সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।—শ্রীরমেশ বিশ্বাস। পোঃ—বেলেড়া, জেলা—বাঁকুড়া।

মহাশয়, অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বৈদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি ও 'চাঁদের চাঙড়ো' রহস্য পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বিদেশের বিচিত্র খবর এবং বিদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ অনেকেরই ভাল লাগে। ইহাতে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইয়া থাকে। আশা করি আপনারা ওই ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হইবেন। ইতি—সুভাষচন্দ্র সিংহ, ১০ সি, ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটুশন ষ্ট্রীট।

বেচতে চাই

মহাশয়, দয়া করিয়া মাসিক বসুমতী পত্রিকা মারফৎ আপনার অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে জানাইবেন যে, নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতী পত্রিকাগুলি আমি বিক্রয় করিতে চাই। পত্রিকাগুলি বেশ ভাল অবস্থায় আছে, যার প্রতিটি এক টাকা করিয়া বিক্রয় করিব। আমার শ্রদ্ধাযুক্ত নমস্কার জানিবেন। পত্রটি আপনার পত্রিকায় মুদ্রিত করিলে পরম বাধিত হইব। আপনার মূল্যবান উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

১। ১৩৬৪ সাল—জ্যৈষ্ঠ হইতে চৈত্র।
২। ১৩৬৫ সাল—ফাল্গুন বাদে বৈশাখ হইতে চৈত্র।
৩। ১৩৬৬ সাল—বৈশাখ হইতে চৈত্র।
৪। ১৩৬৭ সাল—ভাদ্র বাদে বৈশাখ হইতে চৈত্র।
৫। ১৩৬৮ সাল—বৈশাখ হইতে চৈত্র।
৬। ১৩৬৯ সাল—বৈশাখ হইতে চৈত্র।

বিনীত—শ্রীদিলীপকুমার দাশ। শ্রীকৃষ্ণ পল্লী, কাটাডাঙ্গা ষ্টেশন রোড, পোঃ—ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

মহাশয়, আমি ১৩৬৫, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৬৯ সালের মাসিক বসুমতী অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিতে চাই। কেহ কিনিতে ইচ্ছুক থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যথা শীঘ্র সম্ভব যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ করি, এই বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত হইলে বাধিত হইব। ইতি—উষা সেন। ৩৪।১, তারাপদ দত্ত লেন, কলিকাতা-৩৩

গ্রাহক গ্রাহিকা হইতে চাই

ডাঃ পি, এন, ব্যানার্জী সিভিল সার্জন, নং ৮ সি, আর, পি, লাইন, ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ) • • • শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় অবধায়ক—শ্রী জে, আর, বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ ডাঃ আর সি ব্যানার্জী লেন, আসানসোল, জেলা—বর্ধমান • • • শ্রীমতী শতদলবাসিনী দেবী, অবধায়ক—টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ রায়, গ্রাম—রামনগর, পোঃ জগদ্গুড়িয়া, জেলা—হুগলী • • • প্রধান শিক্ষক, কে বি হাই স্কুল, গ্রাম—গামারিয়া পোঃ [illegible], জেলা—সিংভূম • • • শ্রী নমাইচন্দ্র বসু, গ্রন্থাগারিক, নতুনহাট মিলন পাঠাগার, পোঃ—নতুনহাট, জেলা—বর্ধমান • • • শ্রী প্রভাতকুমার মহান্তি, গ্রাম—কুলতড়, কুয়ার বেইদ, জেলা—পুরুলিয়া • • • শ্রী আর এন ভট্টাচার্য, ষ্ট্রীট নং ১, হাউস নং—৩, নিউ পলাসিয়া, ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ) • • • শ্রী ডি, কে, ভট্টাচার্য, গজরাজ বাংলো, হাইকোর্ট বিল্ডিং-এর বিপরীত দিকে

মহম্মদাবাদ—১৪ • • • The Medical Superintendent, Hospital for Mental Diseases, Ranchi, P. O. Kanka Ranchi • • • শ্রীবৈদ্যনাথ রায় কালিকাপুর মৌখেরিয়া, ইলামবাজার, জেলা : বর্ধমান • • • গ্রন্থাগারিক, বিপদনাশিনী সমিতি পাঠাগার, পিডনি জেলা : মেদিনীপুর • • • গ্রন্থাগারিক, গৌহাটি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, গৌহাটী মালুকবাড়ী, আসাম • • • সচিব, বঙ্গীয় পরিষদ, মাতব্বর বিল্ডিং, আর, এম, রোড, বন্দ্মানী থানা, মহারাষ্ট্র।

গ্রাহক হিসাবে আমার যাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। কার্তিক ১৩৭০ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অনুভা ব্যানার্জী, উড়িষ্যা।

I am sending Rs. 15·00 for yearly subscription of M. Basumati. Please acknowledge and oblige. Kashinath Bagchi. Midnapur.

মাসিক বসুমতীর যাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া কার্তিক সংখ্যা হইতে বই পাঠাইবেন। মায়া দেবী, ডুয়ার্স।

Herewith sent Rs. 15/- for Monthly Basumati for one year from Kartick 1370 B. S. to Aswin 1371 B. S. Please acknowledge receipt and send the magazine regularly. Secretary, Murshidabad.

Renewal of subscription to Masik Basumati for one year from Kartic '70 B. S. Secretary. District Library, Purulia.

Herewith remitted Rs. 15·00 towards my subscription for one year. Sm. Kalyani Purkayastha, Allahabad.

I am sending herewith Rs. 15.00 only one year's advance subscription from the month of Kartic 1370 B. S.—Headmaster, Sukjora Senior B. School, Midnapore.

Herewith sending subscription of Monthly Basumati for the year 1964. Hony. Secretary, Pulgaon Mills Ganesh Club, Wardha.

Herewith sending half-yearly subscription for Monthly Basumati from Kartic 1370 B. S.—Kamala Roy, Gujrat.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়, অবধায়ক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জামালপুর, মুঙ্গের, বিহার।

Sending the annual subscription of Rs. 15/- for the period from Magh 1370 to Pous 1371 B. S. Secretary, District Library Association, Midnapur.

Remitting the sum of Rs. 15/- being the yearly subscription of the Monthly Basumati. Please continue despatch as before. Shyama Pada Mukherjee P.o. Sendajamuar, Via : Raghunathganj, Dt. Murshidabad.

Sending herewith Rs. 15/- for the Monthly Basumati. Please acknowledge receipt. Sm. Malina Sen. C/o J. B. Sen, Engineer. Tribeni, Hooghly.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। টাকা প্রাপ্তিমাত্র নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীবাদলচন্দ্র পাল, ডাকঘর, ভগ্নকালী, জেলা মেদিনীপুর।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। দয়া করিয়া গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত করিয়া প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডি এন চট্টোপাধ্যায়, তরুণের আসর, চাকরি এরোড্রোম।

Herewith I am Sending Rs. 15/—as the annual Subscription for Monthly Basumati. The Head Mistress. Kishanganj, Girls' High school, Po. Kishanganj, Dt. Purnea.

Sending Rs.15/- towards the annual subscription of the Monthly Basumati please send the magazine regularly. Sm. Rekha Mukherjee. C/o P. C. Mukherjee & Sons, Subhas Road. Aligarh,

Remitting the annual subscription of Rs. 15/- please send the magazine regularly. Sm. Indu Bala Maity. Basanta Niketan, Ashutosh Maity Road. Gopalpur. Po. Debrabazar. Midnapur.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। রেজেষ্ট্রী ডাকে প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইবেন। শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেক্রেটারি, উত্তর নারেকদি কলিয়ারী, নারেকদি ক্লাব, ডাকঘর—নিরশাকটি, ধানবাদ।

I am sending Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine regu'arly, Sm. Jayanti Chatterjee. C/o. G. C. Chatterjee, Calcutta-4.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য ১৫৲ মণিঅর্ডারযোগে পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—শ্রীকুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, মৃণাল ভবন, জলপাইগুড়ি।

I am remitting Rs. 15/- being the yearly subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine regularly.—Dr. B. Mukherjee, Po. Amta, Dt. Howrah.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সঠিক বৃত্তি বেছে নিতে
এগুলি আপনাকে
সাহায্য করবে

আপনার কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র থেকে এবং সরকারী পুস্তক বিক্রেতাগণের কাছ থেকে আপনার প্রয়োজনীয় পুস্তিকা (ইংরেজী বা হিন্দি) কিনে নিন

দি হর্টিকালচারিষ্ট
,, জুলজিষ্ট
,, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার
,, আর্কিটেক্ট
,, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার
,, ইলেকট্রিসিয়ান
,, ওয়্যারম্যান
,, লাইনম্যান
,, জেনারেল বেঞ্চ ফিটার
,, সীট মেটাল ওয়ার্কার
,, ওয়েল্ডার
,, মেসিন গ্রাইণ্ডার
,, টার্নার
,, মোল্ডার

দি প্যাটার্ণ মেকার
,, অক্সিলিয়ারি নার্স
,, স্যানিটারি ইন্সপেক্টার
,, টিচার (হাই স্কুল)
,, লাইব্রেরিয়ান
,, টিচার (বুনিয়াদি শিক্ষা)
,, গ্রাম সেবিকা
,, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি
,, রিসার্চ ওয়ার্কার
,, এয়ার হষ্টেস্
,, কমার্সিয়াল আর্টিষ্ট
,, সমষ্টি পরিকল্পনাগুলিতে বিভিন্ন জীবিকা

ডাইরেক্টোরেট জেনারেল অব
এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাণ্ড ট্রেইনিং
ভারত সরকার

DA—63/509

দ্বারকানাথ ঠাকুর

কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রণীত

দ্বারকানাথের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবনচরিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের Memoirs of Dwarkanath Tagore ; ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, অধুনা সুদুর্লভ এই বইটির সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। কবি-অধ্যাপক কল্যাণ-কুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত অজস্র তথ্য ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রসংবলিত এই বইয়ের দাম ৮·৫০ (সুলভ সংস্করণ) ও ১০·০০ (শোভন সংস্করণ)।

এ কালের কবিতা

বিষ্ণু দে সম্পাদিত

একাধারে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক পর্ব থেকে তরুণ কবির কবিতার সংকলন। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান প্রবক্তা বিষ্ণু দে সম্পাদিত অনন্য এই সংকলনে গত চল্লিশ বছরের বাংলা কবিতার নানামুখী বৈচিত্র্যময় প্রগতির সামগ্রিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। দাম ৮·০০

দূর মেদুর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের দুঃসহ উত্তাপ আর শান্ত সন্ধ্যায় গন্ধরাজের কোমল গন্ধ। রাত্রির তারায় তারায় দরবারী কানাড়ার সুর। তারপর দগ্ধ অর্জুন বনের বুকে নিবিড় নীল বর্ষণ, দূরের আকাশ আর মাটির পৃথিবীতে ধারাজলের রাখীবন্ধন।...নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক মধুর-গম্ভীর প্রেমের উপন্যাস। মনোজ্ঞ কাংড়া চিত্রের প্রচ্ছদ। দাম ৪·৫০

মালঞ্চের রঙ

বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু পর্যন্ত বাইশ জন কৃতী কথাশিল্পীর উৎকৃষ্ট গল্পের মনোজ্ঞ ও অভিনব সংকলন। দাম ৬·৫০

উত্তরপঞ্চাশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

যে-গীতসুধার জন্য মাঝে মাঝে চিত্ত পিপাসিত বোধ করে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের রচনায় তা আভস্ত বর্তমান। 'উত্তরপঞ্চাশ' কবির সাম্প্রতিক কবিতাসংগ্রহ (১৯৫৪-৬৩-র কবিতা)। দাম ৫·০০

স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত

বিষ্ণু দে

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ বিষ্ণু দের রচনা আজ আর নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচনা প্রথম থেকেই পাঠক ও সমালোচকসমাজে কাব্য বিষয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসা তুলেছিল। বর্তমান গ্রন্থে কবির ১৯৫৫-১৯৬১-র কবিতা সংকলিত হয়েছে। দাম ৫·০০

কাচ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সুরঞ্জন আর শমিতা। সুরঞ্জন ভালবাসে শমিতাকে, তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে শমিতা। শমিতাও জানে তার চেতনায় বাসা বেঁধে আছে সুরঞ্জন। সুরঞ্জনের মধ্যে সে নিঃশব্দে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। কিন্তু··· প্রেম কি হারিয়ে যায়, না, রূপান্তরে চিরজীবী? কাচ নতুন উপন্যাস নয়, নতুন জাতের উপন্যাস। রুচিবানদের জন্য নতুনতম উপন্যাস। দাম ৩·০০

সম্বোধি পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

২২, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি অসামান্য গ্রন্থ

'পথের পাঁচালী'র অমর স্রষ্টা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অশনি সংকেত	৪·৫০
অনুসন্ধান	৩·০০
ছায়াছবি	৩·০০
নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব	৩·৫০
আমার লেখা	২·৫০
প্রেমের গল্প	৩·০০
অলৌকিক	৩·০০
ঊর্মিমুখর	২·৭৫

'পদ্মা নদীর মাঝি'র যশস্বী লেখক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আদায়ের ইতিহাস	১·৭৫

আকাদমী পুরস্কার ভূষিত

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নবজন্ম	৩·৭৫

নবীনা লেখিকা

রেবা চট্টোপাধ্যায়ের

সুতনুকা	২·৫০

আমাদের দোকানে পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত "কিশলয়" "প্রকৃতি পরিচয়", "ইংরাজি", ও "ইতিহাস" বই পাওয়া যায়।

আমরা মফঃস্বলের সকল অর্ডার সযত্নে সরবরাহ করি।

বিভূতি প্রকাশন

২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা - ১২

বসুমতী : মাঘ '৭০

মাসিক বসুমতী

।। মাঘ, ১৩৭০ ।।

(প্যাস্টেল)

সাঁওতালী মেয়ে

—শ্রীপুলক বিশ্বাস অঙ্কিত

একমাত্র ভিক্স্ ভেপোরাব
দেহের সর্দি আক্রান্ত সব তিনটি অংশেই অবিলম্বে কাজ করে…

রাতারাতি সর্দি দূর করে

আপনার সর্দির যন্ত্রণায় আরামের জন্য ভিক্স্ ভেপোরাব সারারাত নাক, বুক ও গলার মধ্যে দুভাবে কাজ করে। আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে তোলে, সুনিদ্রার সহায়তা করে।

নাক দিয়ে জল পড়া, গলায় ব্যথা, কাশি, বুকে দমবন্ধ ভাব— সর্দির এইসব প্রাথমিক লক্ষণ দেখলেই ভিক্স্ ভেপোরাব ব্যবহার করবেন। একমাত্র ভিক্স্ ভেপোরাব দেহের সর্দি-আক্রান্ত সব তিনটি অংশেই অবিলম্বে কাজ করে—নাক, গলা ও বুকের মধ্যে, যাতে রাতারাতি সর্দির সব যন্ত্রণা উপশম হয়। শোবার সময় নাকের ওপর, গলা, বুক ও পিঠের ওপর ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ করুন। সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন ভিক্স্ ভেপোরাব আপনার ত্বক্ গরম করে তুলছে। ঐ একই সময়ে আপনার নিজের শরীরের তাপ ভেপোরাবকে দ্রুত ঔষধিযুক্ত ভাপে পরিণত করে যা নাক দিয়ে সারারাত আপনি প্রত্যেক শ্বাসের সঙ্গে টানতে থাকেন। যখন আপনি নিদ্রায় অভিভূত এই আশ্চর্য দু-ধারা ক্রিয়ার কাজ চলতে থাকে এবং যেখানে সর্দির আঘাত সবচেয়ে বেশী সেই নাক, গলা ও বুকের গভীর অংশে এক স্বস্তিদায়ক আরাম আনে। সকাল হতেই দেখা যায় আপনার সর্দির চরম জের কেটে গেছে ও আবার আপনার দিব্যি প্রফুল্ল ও সুস্থ লাগছে।

সর্দি আক্রান্ত দেহের এই সব অংশে ভিক্স্ ভেপোরাব সরাসরি ব্যবহার করবেন

নাকের ওপরে ও চারপাশে ভেপোরাব মালিশ করুন।	গলায় ও বুকে ভেপোরাব মালিশ করুন।	সারা পিঠে ভেপোরাব মালিশ করুন।

ফ্যামিলি সাইজ ইকনমি শিশি

চলতি নীল শিশি

অল্পদামী সবুজ টিন

ভিক্স্ ভেপোরাব

পরিবারের সকলের জন্যে ভালো—
পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু নির্বিশেষে

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪২শ বর্ষ

মাঘ ১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ-রাষ্ট্র হবে।

প্রভৃত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—উহা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যদেরই এক একদিন আরাম করে নিতে দাও—তবেই তারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগটুকু, এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয় সকল পরিহারপূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত' কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না' 'ছোঁব না' বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মত মানুষ; তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।'

প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে জাতির জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ এটি—দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।

আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজ সংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।

যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ব্যতীতও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি তদ্রূপ বুদ্ধিমান না হয়, তবে তাহাদিগকেই কেবল শিক্ষা দিতে থাক—তাহাদিগেরই জন্য শিক্ষকসমূহ নিযুক্ত করিতে থাক। আমার ত' ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই দরিদ্র ব্যক্তিগণকে, ভারতের এই পদদলিত সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবলতা দুর্বলতা না করিয়া প্রত্যেক নর-নারীকে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শুনাও ও শিখাও যে, সকল দুর্বল উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন—সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে।

৬৫

একটি ব্রাহ্মণকুমার প্রত্যহ আসে প্রভুর কাছে। প্রভুকে ভীষণ ভালোবাসে, প্রভুও তার প্রতি করুণ কোমল স্নেহশীল।

কিন্তু এই মেশামেশি দামোদরেব কাছে অসহ্য।

'তুমি রোজ আস কেন?' বালককে দামোদর শাসন করতে চায়।

'প্রভুকে যে আমার খুব ভালো লাগে।'

'তা লাগুক। তবু তুমি আসবে না।' কঠোরকণ্ঠে দামোদর বললে।

'বা, যাকে ভালো লাগে তার কাছে আসব না?' বালক গ্রাহ্য করল না: 'প্রভুও যে আমাকে খুব ভালোবাসেন, আসতে বলেন। না এসে তাই পারি না থাকতে।'

'না, আসবে না'। দামোদর রূঢ় হয়ে উঠল।

বয়ে গেছে। বালক তা পায়েও মাখে না। পরদিন আবার আসে। এসে বসে প্রভুর পাশটিতে।

'চমৎকার!' বালক চলে গেলে দামোদর প্রভুকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল। 'অন্যকে উপদেশ দিতে তুমি খুব ওস্তাদ, নিজের বেলায় খোঁজ নেই। বেশ, বেরোবে এবার গোঁসাইগিরি, নীলাচলে আর কান পাতা যাবে না।'

'কী হয়েছে? কী বলছ তুমি?' সরল মনে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

'তোমার কী! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমাকে কে বাধা দেবে?' দামোদর আহতকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু তুমি লোকের মুখ চাপা দেবে কী করে? তুমি তো পণ্ডিতের শিরোমণি, নিজেই বিচার করে দেখ না তোমার এ আচরণ ঠিক হচ্ছে?'

'কেন কী হল?,

'কেন, তুমি জানো না ঐ ব্রাহ্মণ বালকের মা বিধবা ও সুন্দরী?' দামোদরের স্বরে ঘোর বিরক্তি: 'হতে পারে, হ্যাঁ স্বীকার করি, সে সতীসাধ্বী তপস্বিনী। কিন্তু তার প্রধান দোষ সে যুবতী। আর তুমিও যুবক, পরমসুন্দর। এ নিয়ে কানাঘুষো শুরু হবে, এক কথা থেকে নানান কথা। লোককে তুমি কেন কথা বলার অবকাশ দেবে?'

কী শুদ্ধ প্রীতি দামোদরের। দামোদরের মত অন্তরঙ্গ আর হতে নেই: প্রেমে বাক্যদণ্ড দিতে পেছপা হল না। যে সত্যি-সত্যি ভক্ত সে যে তার প্রভুকেও শাসন করতে পারে তাই দেখাল দামোদর একেই বলে নিরপেক্ষতা।

অন্তরে প্রগাঢ় সন্তোষ, প্রভু হাসলেন।

একদিন নিভৃতে ডাকালেন দামোদরকে! বললেন 'দামোদর, তুমি নবদ্বীপে যাও। আমার মার কাছে গিয়ে থাকো। সেখানে থেকে সকলের অন্যায় আচরণ শাসন করো।'

দামোদর চুপ করে রইল।

'তুমি যখন আমার ত্রুটির জন্যে আমাকেই দণ্ড দিতে পারো, তুমি আর-সকল অপরাধীকেও সহজে শাসন করতে পারবে। তোমার মত উচিতবক্তা আর কাউকে দেখি না।' বললেন প্রভু, 'তুমিই নিরপেক্ষ আর কে না জানে, নিরপেক্ষ না হলে ধর্মরক্ষা অসম্ভব

দামোদর কথা বলল না।

'তুমি আমার মায়ের কাছে গিয়ে থাকো, আর তাঁকে বোলো আমি সুখে আছি। আমি সুখে আছি শুনলেই মা সুখী হবেন। আর তোমারই বা দুঃখ কী, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যাবে।'

'যা তুমি বলো, তাই হবে।' দামোদর বললে, 'তোমার মার কাছে গিয়েই থাকব।'

'হ্যাঁ, বলবে, নিমাই তার নিজের কথা শোনাবার জন্যেই তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে। আর সেই সঙ্গে তাঁকে মনে করিয়ে দেবে আমার গুহ্যকথা।'

কী গুহ্যকথা?

আমি বার-বার তাঁর ঘরে যাই, মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন সব খেয়ে আসি। আমি যে খাচ্ছি মা তা দেখছেন কিন্তু বাহ্যবিরহে তাকে স্বপ্ন বলে ভাবছেন। ভাবছেন আমার নিমাই তো নীলাচলে, সে বাস্তবে এ সব খায় কী করে? এ তবে আমার স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

মাঘী-সংক্রান্তিতে কী হল? বিচিত্র পিঠে-পায়েস ক্ষীর-ব্যঞ্জন রান্না করেছেন মা, কৃষ্ণে ভোগ লাগিয়ে বসেছেন ধ্যান করতে। আমার মূর্তিই তখন তাঁর কাছে স্ফূর্ত হল, অশ্রুজলে ভরে গেল দু'নয়ন। দেখলেন আমিই সব খাচ্ছি, দেখে মার সে কী অগাধ পরিতোষ! অশ্রু মুছে চোখ খুলে দেখলেন, পাত্র-শূন্য, নিমাইই তা হলে সব নিঃশেষ করেছে। কিন্তু ক্ষণপরে বাহ্যবিরহে আবার তাঁর ভ্রান্তি হল। নিমাই তো নীলাচলে, সে এখানে এসে খায় কী করে? তবে বুঝি আমি কৃষ্ণের ভোগই লাগাই নি। অথচ পাকপাত্র অন্নব্যঞ্জনে ভরে আছে। দেখেও দেখছেন না মা। আবার স্থান সংস্কার করে ভোগ লাগালেন।

'মাকে বোলো,' প্রভু আরো বললেন দামোদরকে, 'তাঁর আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি, আর তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমবলেই বারে বারে যাচ্ছি তাঁর কাছটিতে। আমার নাম করে তুমি তাঁকে দণ্ডবৎ কোরো আর বোলো, তাঁর নিমাই ভালো আছে।'

মাকে ও অন্যান্য বৈষ্ণবকে দেবার জন্যে জগন্নাথের প্রসাদ আনালেন আলাদা করে। দিয়ে দিলেন দামোদরের সঙ্গে। দামোদর নদীয়ায় ফিরে চলল।

নদীয়ায় ফিরে এসে শচীমাতাকে সব বললে দামোদর। প্রসাদ দিলে। প্রণাম দিলে। বললে, 'প্রভু আমাকে তোমার কাছে থাকতে বলেছেন, তোমাদের দেখাশোনা করতে—'

সন্ন্যেসী হয়েও নিমাই তাঁদের মঙ্গলচিন্তা করছে ভাবতে শচীমায়ের বুক স্নেহে-প্রেমে উথলে উঠল।

অদ্বৈত ও অন্যান্য বৈষ্ণবের সঙ্গেও দেখা করল দামোদর। প্রভুর পাঠানো প্রসাদ বিতরণ করল সকলের প্রতি প্রভুর কী অপার করুণা ও স্নেহ, অনুভব করে সবাই অভিভূত হয়ে গেল।

কোনো মর্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করতে পারে না দামোদর না কোনো স্বৈরাচার। যেখানে যেটুকু সে অবিধি দেখে, তিরস্কার করে, প্রয়োগ করে বাক্যদণ্ড। দামোদরের শাসনের ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত, কারুরই আর অসঙ্গত বা অন্যায় কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই।

একদিন হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হলেন প্রভু। বললেন, 'যারা গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে সেই সব দুরাচার যবনদের কী ভাবে নিস্তার হবে? আমি তো কোনো পথ দেখি না।'

'ওদের নামাভাসে মুক্তি হবে।'

'নামাভাসে?'

'হ্যাঁ, অন্য সঙ্কেতে।' বললে হরিদাস, 'ওরা কথায় কথায় ঘৃণাচ্ছলে হারাম বলে—হারামের যাই অর্থ হোক, উচ্চারণে তাই হা-রাম হয়ে যায়। অর্থে যার ঘৃণা উচ্চারণে তার মহাপ্রেম। অজামিলের সেই ছেলের উদ্দেশে নারায়ণ ডাকার মত। সঙ্কেত যাই হোক নামের তেজ নষ্ট হবার নয়।'

ভগবানের অসংখ্য নাম। তার প্রত্যেকটিরই অশেষ শক্তি। কথাপ্রসঙ্গে রসনায় যদি এসে পড়ে, তা হ'লেই হ'ল। উচ্চারণ নাই বা করলে, যদি কখনো মনে পড়ে বা শুনে ফেল আকস্মিক, তা হলেও যথেষ্ট। সে নাম শুদ্ধবর্ণই হোক বা অশুদ্ধবর্ণই হোক, কিছু আসে-যায় না। সেই নামের অক্ষর গুচ্ছীকৃতই থাক বা পরস্পরবিচ্ছিন্নই থাক ফল সমান। নামের শেষাংশও যদি অনুচ্চারিত থাকে, তাহলেও কাজ হবে। নাম অঙ্গহীন বলে ফল অঙ্গহীন হবে না। এমনি নামের মহিমা। দেহ-সুখ, বিষয় বা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে যদি কেউ নাম ব্যবহার করে তা'হলে সদ্য-সদ্য ফল পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু দেরিতে পাবে। নামাপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ফল করায়ত্ত নয়। দেহবিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্তন নামাপরাধ। সে ক্ষেত্রেও ফল একেবারে অলভ্য নয়, দেরিতে লভ্য।

ধৃতরাষ্ট্রকে কী বলছে বিদুর? বলছে: 'অকপটে

আসক্তচিত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করো। তিনি পাবনেরও পাবন, উত্তমশ্লোকদের শিরোভূষণ। তাঁর নামভানুর আভাসমাত্র যদি অন্তরকুহরে প্রবেশ করে তাহলে মহাপাতকের অন্ধকারও নিমেষে দূরীভূত হয়।'

নামাভাসেই পাপক্ষয়, সংসার ক্ষয়, সর্ববন্ধন-বিমোচন।

'কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের কী হবে ?'

'যদিও তারা বাকশক্তিহীন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, তারাও উদ্ধার পাবে।' বললে হরিদাস, 'তুমি সরবে উচ্চকণ্ঠে যখন কৃষ্ণকীর্তন করেছ তখন জঙ্গম তা শুনতে পেয়েছে আর তাতেই তাদের মুক্তি। আর স্থাবরে তোমার ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠেছে, এ ঠিক প্রতিধ্বনি নয় এ স্থাবরেরই নামকীর্তন। ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাবার সময় তুমি কী ভাবে সকলকে দিয়ে হরিনাম করিয়েছ তা আমাকে বলভদ্র বলেছে।'

'কিন্তু হরিদাস, সব জীবই যদি মুক্তি পায় তাহলে ব্রহ্মাণ্ড তো শূন্য হয়ে যাবে।'

'তুমি যতদিন মর্ত্যলোকে আছ ততদিন স্থাবরজঙ্গম সমস্ত জীব উদ্ধার পেয়ে বৈকুণ্ঠে যাবে।' বললে হরিদাস, 'কিন্তু যারা এখনো ভোগযোগ্য স্থূলদেহ পায় নি, সূক্ষ্মরূপে কারণসমুদ্রে অবস্থান করছে, তাদের কর্মফল উদ্বুদ্ধ হবে আর তারাই এসে নিজ-নিজ কর্মানুসারে স্থাবরজঙ্গম রূপে আবির্ভূত হবে। তারাই আবার ভরে তুলবে পৃথিবী।'

প্রভু যেন ধরা পড়ে গেছেন এমনি ভাবে নীরব রইলেন।

'আগে যেমন ব্রজে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড জীবের সংসার খণ্ডন করেছেন তেমনি তুমিও নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীবাসী সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের উদ্ধার সাধন করবে।'

হরিদাসকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তুমি এসব কথা যদি বিশ্বাসও করো, যেন বাইরে রাষ্ট্র করে বেড়িয়ো না।'

কিন্তু এ কী ? হরিদাসের দুয়ারে এ কে উপস্থিত ? সনাতন না ?

মথুরায় আর মন টিকছে না, প্রভুর জন্যে উতলা হয়ে যাত্রা করল পুরীর দিকে। গৌড়ের পথে গেল না, ঝারিখণ্ডের পথ নিলে। একেবারে একলা চলেছে সনাতন, একেবারে নিঃসহায়। অর্ধাশনে-অনশনে, চানা চিবিয়ে কখনো বা শুধু জল খেয়ে পথ ভাঙতে লাগল। ঝারিখণ্ডের জলের দোষে গায়ে চুলকুনি দেখা দিল। ভাবল, আমি অত্যন্ত অপদার্থ, আমি কৃষ্ণ-ভজনের অযোগ্য। তাই আমার দেহে এ কুৎসিত ব্যাধি উপস্থিত হয়েছে। এ অশুচি শরীর নিয়ে কী করে প্রভুর মুখোমুখি হব ? শুনেছি মন্দিরের নিকটেই তাঁর বাসা, সুতরাং মন্দিরে যেতেও আমার অধিকার নেই। যদি জগন্নাথের কোনো সেবকের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় তাহলে আমার পাপের বোঝা আরো ভারী হবে। সুতরাং এ দেহ আর রাখব না। আত্মহত্যা করব।

রথযাত্রার আর দেরি নেই। রথের দিনে প্রভুকে দেখব, জগন্নাথকে দেখব, আর তাঁদের চোখের সামনে রথের চাকার নিচে দেহ ছাড়ব। তাতেই আমার পরম পুরুষার্থ লাভ হবে।

সনাতন এসে হরিদাসকে প্রণাম করল।

'তুমি ? সনাতন ?'

'হ্যাঁ, আমি। প্রভু কোথায় ?' কতক্ষণে প্রভুকে একটু দেখবে তারই আশায় অস্থির সনাতন।

'প্রভু মন্দিরে গিয়েছেন উপলভোগ দেখতে।' বললে হরিদাস, 'এখুনি ফিরবেন।'

বলতে-বলতে প্রভু আবির্ভূত হলেন।

সেই চিরপ্রত্যাশিত প্রিয়মূর্তি। সেই গোবিন্দ-গৌরাঙ্গ।

দর্শনমাত্রই হরিদাস ভূতলে প্রণত হল। সঙ্গে-সঙ্গে সনাতন।

প্রভু হরিদাসকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। হরিদাস বললে, 'সনাতনও আমাকে প্রণাম করছে।'

'সনাতন ?' প্রভু চমকে উঠলেন। বাহু প্রসারিত করে অগ্রসর হলেন আলিঙ্গন করতে।

সনাতন পিছু হটল।

'না, না, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছুঁয়ো না। আমি নীচ অধম অস্পৃশ্য।' সনাতন কেঁদে উঠল। 'আমার সারা অঙ্গে খোসপাঁচড়া—

প্রভু নিষেধ শুনলেন না। জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের কণ্ডুক্লেদ তাঁর গায়ে লাগল।

সনাতন অপরাধীর মত ম্লান হয়ে রইল। কিন্তু প্রভুর প্রফুল্ল মুখে সর্ব-পবিত্র-করা বদান্য হাসি।

ভক্তরা সবাই এসে পড়ল। হরিদাসের ঘরের দাওয়ায় সবাইকে নিয়ে বসলেন প্রভু। সকলের সঙ্গে হরিদাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মথুরাবাসী বৈষ্ণবদের সব কুশল তো?'

'সমস্ত কুশল।' বললে হরিদাস, 'আর আমার পরমমঙ্গল তোমার ঐ শ্রীচরণে।'

'শ্রীরূপ এতদিন এখানে ছিলেন—প্রায় দশ মাস। দিন দশেক আগে গৌড়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখে শুনলাম তোমার ভাই অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।' বললেন প্রভু, 'রঘুনাথে অনুপমের দৃঢ় ভক্তি ছিল।'

অনুপমের দেহত্যাগের কথা এই প্রথম শুনতে পেল সনাতন। কিন্তু শোকে কাতর হল না। যেহেতু প্রভু পরমস্নেহে তার রামভক্তির কথা উল্লেখ করলেন।

'বাল্যকাল থেকেই অনুপমের রামাসক্তি।' বলতে লাগল সনাতন, 'রামনামেই তার পরমস্পৃহা, রামায়ণগান নিজেও যেমন শোনে অন্যকেও তেমনি শোনাতে বলে। রামের ধ্যানে আর কীর্তনেই তার গভীর আবেশ। কিন্তু আমাদের, রূপ আর আমার ইচ্ছে, ও আমাদেরই মত কৃষ্ণভজন করুক। ওকে নিয়ে যাই কৃষ্ণকথার সভায়, পরম কৃষ্ণকথা ভাগবত শোনাই। একদিন আমরা ওকে স্পষ্ট বললাম, 'দেখ কৃষ্ণনামই পরমমধুর। একমাত্র কৃষ্ণেই সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম আর বিলাস অসীম হয়ে আছে। আমাদের দু'ভায়ের মত তুমিও কৃষ্ণকেই আশ্রয় করো। আমরা তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে দিন কাটাই।'

বার-বার করে বলাতে অনুপমের বুঝি মন টলল। বড় দু' ভাই সমানে অনুরোধ করছে, কী করে প্রত্যাখ্যান করে? শেষ পর্যন্ত বললে, 'তোমাদের আদেশ কত আর লঙ্ঘন করব, দাও, দীক্ষামন্ত্র দাও, করব কৃষ্ণভজন।'

মুখে বলল বটে কিন্তু মন কিছুতেই রামের চিন্তা থেকে সরিয়ে নিতে পারল না। সারা রাত কেঁদে কাটাল, একবিন্দু ঘুম হল না। যার পায়ে একবার মাথা বেচেছি সে মাথা আর কোথাও রাখতে পারব না। বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

সকালে অনুপম দাদাদের কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আমাকে ক্ষমা করুন। কৃপা করে আপনারা আমাকে রঘুনাথেরই চরণসেবা করতে দিন। পারলাম না, কিছুতেই রঘুনাথের পাদপদ্ম পারলাম না ছাড়তে। আপনারা আশীর্বাদ করুন, শুধু এই জন্ম নয়, জন্ম-জন্ম যেন রামভজনেই আমার জীবন যায়।'

আমরা তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, নিজের উপাস্যে তার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা আছে কি না দেখবার জন্যেই আমরা এই প্রস্তাব করেছিলাম। তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রামসেবা করে যাও।

'আমিও মুরারি গুপ্তকে এমনি একবার পরীক্ষা করেছিলাম।' বললেন প্রভু, 'যে ভক্ত স্বরূপ-বিরূপ কোনো অবস্থাতেই তার প্রভুকে, তার উপাস্যকে ত্যাগ করে না সেই ধন্য। আর যে প্রভু সগুণ-বিগুণ কোনো অবস্থাতেই তার ভক্তকে ছাড়ে না, দৈবদুর্বিপাকে ভক্ত বিচলিত হলেও যে প্রভু জোর করে তাকে টেনে নিয়ে আসেন, ভক্ত বিচ্যুত হলেও যিনি নিজে অচ্যুত থাকেন, সে প্রভু সে উপাস্য ও ধন্য।'

'সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে।'

হরিদাসের ঘরেই থেকে গেল সনাতন। প্রভু বললেন, 'আর কথা কী! দু'জনে একসঙ্গে থাকো, কৃষ্ণনাম-আস্বাদ-সমুদ্রে স্নান করো সর্বক্ষণ।'

গোবিন্দই প্রসাদ নিয়ে আসে। সনাতন মন্দিরে যায় না, মন্দিরের চক্র দেখে দূর থেকে প্রণাম করে। হোক প্রসাদ, হোক প্রণাম, তবু দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করে নি সনাতন। যে দেহ কণ্ডুতে কলুষিত সে দেহ অযোগ্য, অসার। রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেলেই সে দেহের সদ্গতি।

সহসা সেদিন প্রভু চলে এলেন হরিদাসের বাসায়। ডাকলেন সনাতনকে। বললেন, 'শোনো দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।'

সনাতন চমকে উঠল। অন্তর্যামী মনের গূঢ় বাসনাটি পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন।

'কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে। দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যেত, তবে আর ভাবনা কী ছিল, কোটি-কোটি লোক এক মুহূর্তেই আত্মহত্যা করত। কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি। দেহত্যাগে তমোধর্ম, আর তমোরজোধর্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। ভক্তি ছাড়া কৃষ্ণে প্রেম হয় না, আর প্রেম ছাড়া কৃষ্ণ কোথায়?'

কিন্তু রুক্মিণী যে অনশনে দেহপাত করতে চেয়েছিল, গোপীরাও যে উন্মুখ হয়েছিল আত্মহত্যায়—তার কী ?

সে বাসনা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যে নয়, কৃষ্ণবিরহ যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে। এমনই সে গাঢ়ানুরাগ, মরণ হয় না, কৃষ্ণ আকৃষ্ট হয়ে নিজে এসে দেখা দেন।

'তুমি নীচ জাতি কে বললে ? শুধু যবনের সংস্রবে দীর্ঘকাল ছিলে বলে দৈন্যবশত নিজেকে নীচ বলছ। কিন্তু ভক্তের আবার জাতি কী ? যে কৃষ্ণ ভজন করে সেই উচ্চ, সেই বৃহৎ। ভক্তিতে সবাই সমজাতি। আর যদি সত্যি দৈন্য ধরো, অভিমান থেকে মুক্ত হও, দেখবে তোমার প্রতিই ভগবানের বেশি দয়া।'

'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥
দীনের অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥'

ভগবানের বেশি দয়া। সে কি এখুনি চোখের সামনে প্রতিমূর্ত নয়।

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি, আর সেই নয় অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।' বললেন প্রভু, 'নিরপরাধের নাম নিলেই প্রেমধন মিলে যাবে।'

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে সনাতনের দেহত্যাগ প্রভুর মনঃপূত নয়।

আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই।

যৈছে নাচাও তৈছে নাচি

কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার কী লাভ হবে ?

'যখন তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ করেছ তখন তোমার দেহে তোমার আর কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই।' বললেন প্রভু, যা এখন পরের দ্রব্য তা তুমি নষ্ট করবে কোন অধিকারে ? তোমার শরীর আমার ভীষণ দরকার, অনেক প্রয়োজন সাধন করব একে দিয়ে।'

সনাতন হতবাক।

'মায়ের আদেশে আমি নীলাচলবাসী, অন্যত্র গিয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার আমার সুযোগ নেই।' বললেন প্রভু, 'জানো তো আমার নিজ প্রিয়স্থান মথুরা আর বৃন্দাবন। আমার ইচ্ছে তোমরা দু'ভাই, রূপ আর তুমি, ব্রজভূমে থেকে সমস্ত লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো। ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম, সর্বতত্ত্বের নির্ধারণ করো, বৈষ্ণবের কৃত্য আর আচার শেখাও, শেখাও বৈরাগ্য, কৃষ্ণ-অনুরাগ। যে দেহ দিয়ে আমি এত সব কাজ করতে চাই তা তুমি ছাড়বে কোন হিসাবে ?' হরিদাসের দিকে তাকালেন: 'পরের কাছে যে ধন গচ্ছিত আছে তা সনাতন কী করে বিলিয়ে দেয়, কী করে খরচ করে ? তুমি ওকে সাবধান করে দিও, আমার ধন যেন ও চুরি করে না পালায়।

হরিদাস বললে, 'আমরাই সব করি এই অভিমান যে কত মিথ্যা, এই আবার বুঝলাম। সনাতন ঠাকুরও বুঝেছেন।'

সনাতন সহর্ষে বললে, 'কে নিয়ন্তা, কে তাকে নাচাচ্ছে কাঠের পুতুল তা জানে না। যেমন নাচাও তেমনি নাচে। যদি বলো বাঁচতে হবে, করতে হবে তোমার কাজ, রুগ্ন ভগ্ন দেহেও বেঁচে থাকব, পঙ্গু হাতেও তোমার কাজ সম্পূর্ণ করে যাব। তুমিই হৃদয়ে প্রেরণা দেবে, বাহুতে বহুবল, তুমি সৃষ্টি করবে সাধনের অনুকূল পরিবেশ।'

[ক্রমশ।

ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি—মহতী ইচ্ছা শক্তি সঞ্চিত থাকে। উহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি আর কিছুতেই হ'তে পারে না। যত মহা মহা মস্তিষ্কশালী পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্যবান ছিলেন। ইহা দ্বারা মানুষের উপর আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। মানবসমাজের নেতৃগণ সকলেই ব্রহ্মচর্যবান ছিলেন, তাঁহাদের সমুদয় শক্তি এই ব্রহ্মচর্য হইতেই হইয়াছিল। যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে, যাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজো ধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি।...সকল মনুষ্যের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ।...মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কামচিন্তা ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা দমিত হইলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পরিণত হইয়া যায়।... কামজয়ী নর-নারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই দেখিতে পায় যে, কামকে প্রশ্রয় দিলে সমুদয় ধর্মভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে যে ধর্ম সম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়াছেন।—স্বামী বিবেকানন্দ

[illegible] স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, অবিবাহিত তরুণ, বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশ, সুশিক্ষিত, উপার্জনক্ষম···ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রকম একটি যুবকের দাম কতো? কিছুদিন আগে, জিনিষপত্রের বাজার দর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এক ভদ্রলোক বললেন, এ রকম একটি যুবকের দাম নগদ দশ টাকারও কম। কারণ, তাঁর মতে এ হেন একটি যুবকও যা অন্য যে কোনো মানুষও ঠিক তাই অর্থাৎ কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের একটি ছোট্ট স্তূপ—যে রাসায়নিক পদার্থগুলি সব সময়ই খোলাবাজারে কিনতে পাওয়া যায়: যথা ফসফেট্‌স, সালফেট্‌স, ক্যালসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি। (অবশ্য যে কোনো বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাপের অভিমত অন্য রকম।)

এ ভাবে একজন মানুষের জীবনের মূল্যায়ন করলে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে খুবই রূঢ় লাগে। কিন্তু জীবনের কতটুকুই বা বাস্তবিক পক্ষে অরূঢ়? কার্যত অর্থহীন, শুনতে ভালো এবং ভব্যসভ্য কথাটা নিশ্চয়ই সকলেরই জানা আছে; অর্থাৎ কি না জীবন, যে কোনো এবং প্রত্যেকটি জীবনই অমূল্য (মূল্যহীন অর্থে নয়)। জীবনের এই যে 'অমূল্য' অবস্থা এটা নিশ্চয়ই মা-বাপের কোলের বাইরে নয়।

মাটিতে পা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমূল্য অর্থাৎ একটা অসীম জিনিষের সীমার রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে। সুরু হয় শিশুর লেখাপড়া, আচার-ব্যবহার শিক্ষা; ক্রমশ পরিণত জীবনের দিকে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে একটা অশান্ত সাধনা। যেখানে শিশু, বালক বা কিশোরের পেছনে উপযুক্ত অভিভাবকের সদাসতর্ক নজর থাকে সেখানে প্রত্যেকটি জীবনই আবার একবার অমূল্য (অর্থাৎ দুর্মূল্য) হয়ে ওঠে; আর যে মানবশিশুর ভাগ্যে তা জোটে না তাদের জীবন যথার্থই অমূল্য থেকে যায় (মূল্যহীন অর্থে)। কারণ রুজি-রোজগারের সুবন্দোবস্ত তারা সারাজীবনেও করতে পারে না—বিয়ে বা অন্য কোনো বাজারেই তাদের জীবন কখনই উপযুক্ত মূল্য পায় না।

বিয়ের ব্যাপারে যে দেনাপাওনা তা' নিয়ে সভ্য পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তর বিরুদ্ধ আলোচনা হয়ে হয়ে ইদানীং বেশ কিছুকাল হলো একেবারে সব চুপচাপ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কি না, সবারই ভাবটা এই যে: 'ওসব বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আলোচনার আর কি আছে? ও তো কনডেমন করা হয়েই গেছে।' কনডেমন করা অবশ্যই হয়েছে, আজো হ'চ্ছে। কিন্তু আসল কথা সকলেই জানেন—সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্রের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়ছে, মেয়ের অভিভাবকদের হাতেও তেমনি নগদ, ব্যাঙ্কের ব্যালান্স বা কোম্পানীর শেয়ারে বিত্তের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে এবং বিয়েতে যৌতুক হিসেবে সে সবের রূপান্তরলাভও পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগের চাইতে বেশিই হ'চ্ছে। যে সব ভদ্রলোকেরা 'চামার' তাদের মধ্যে এই লেনদেনটা হয় দর কষাকষি করে আর 'রুচিবান', 'মার্জিত' ভদ্রলোকদের মধ্যে এই দেনাপাওনাটা হয় তো আরো বেশি ভারী রকমেরই চলে মৃদু হাসি অন্তরালে, ঈষৎ নাটকীয় নিস্পৃহতার ভাণের মধ্য দিয়ে। মোট কথা, বিয়ের ব্যাপারে দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ চলছেই, চলছেই।

মেয়ে পার করতে হ'লেই যখন 'মালকড়ি'র প্রশ্ন এসে যায়—তখন আমরাই বা আমাদের দিকটা দেখবো না কেন? মেয়ে অভিভাবকদের মনেও আজ এই কথাটা জেঁকে বসেছে। আর বসবে না-ই বা কেন? মূল্য দিয়ে সকলেই মূল্যবান জিনিষ কিনতে চায়। মূল্যহীন জিনিষ নয়।

সব আমই যেমন মিষ্টি নয়, তেমনি সব যুবকই 'পাত্র' নয়। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, সুশিক্ষিত যুবক 'পাত্র' না-ও হতে পারে যদি তার উপার্জন না থাকে। উপার্জনের উপরেই দেখা যায় শেষপর্যন্ত পাত্রের শ্রেণী নির্ভর করে।

বাজারদর বিশেষজ্ঞ যে যুবকটির মূল্য দশ টাকা বলে সাব্যস্ত করেছেন, কোনো বিত্তবান মেয়ের বাপ তার মূল্য হয় তো প্রথম নজরেই পঞ্চাশ হাজার কি এক লক্ষ পর্যন্ত অবধারিত করতে পারেন—যদি পাত্র হিসেবে সে মেয়ের বাপের আস্থা অর্জন করতে পারে।

মেয়েপক্ষের আস্থা কোন পাত্রেরা বেশি লাভ করে বলে আপনি মনে করেন? এ-বিষয়ে মতভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। ব্যবসায়ী মেয়েপক্ষ ব্যবসায়ী ছেলেই পছন্দ করবেন; ঠিক তেমনি চাকুরিয়া মেয়ের বাপ চাইবেন চাকুরিয়া জামাতা। কারণ সকলেই নিজ-নিজ পরিচিত জীবন পছন্দ করেন।

কিন্তু তা' ছাড়াও কথা আছে। সাধারণভাবে কয়েক শ্রেণীর পাত্র আছে যারা প্রায় সবশ্রেণীর মেয়েপক্ষেরই আস্থালাভ করে থাকে। তারা হলো প্রথমত ডাক্তার, দ্বিতীয়ত আইনজীবী, তৃতীয়ত এঞ্জিনিয়র। আজকের সমাজ-ব্যবস্থায়, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখা যাচ্ছে এই তিন শ্রেণীর পাত্রেরই চাহিদা সব চাইতে

বেশি। কারণ এদের যেমন রোজগার তিন, চার, পাঁচ কি দশ-বিশ হাজার টাকা হতে পারে, তেমনি এদের বিশিষ্ট একটা মর্যাদাও আছে সমাজে। এদের পরে মনে আসে বড় বিশেষ করে বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বড় চাকুরিয়াদের কথা। এদের পদগুলি অধিকার করবার জন্যে বিজিনেস এ্যাডমিনিসট্রেশনের নানা 'সিক্রেট' বিদ্যার্জন করতে হয়—যেগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে একটা কিছু 'টেকনিক্যাল' পর্যায়ে ফেলবারও ঝোঁক দেখা যাচ্ছে আজকাল। মালিকপক্ষের বিশেষ আস্থাভাজন বলে মাইনের অঙ্কও এদের অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো মোটাই হয়ে থাকে। মোটা রোজগারের পাত্রও সর্বত্র মোটা যৌতুকই পেয়ে থাকে—কারণ তেলা মাথায়ই তেল পড়বার নিয়ম।

এই চারশ্রেণীর বাইরেও যে আরো বহুশ্রেণীর পাত্র রয়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য। সংখ্যায় তারাই বেশি। কিন্তু পাত্র হিসেবে তাদেরও যা হক কিছু একটা 'বাজার' আছে। কিন্তু এমন পাত্রও বাস্তবিকই কিছু কিছু রয়ে গেছে যাদের কোনোই 'বাজার' নেই। কোনো মেয়ের অভিভাবকই যাদের 'পাত্র' মনে করেন না এরা হলো শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক এবং গায়ককুল। আজ পর্যন্ত কদাচিৎ এরকম ঘটনা দেখা গেছে যে কোনো মেয়ের বাবা দেখে-শুনে অর্থাৎ জেনে-শুনে নিগোশিয়েট করে তাঁর মেয়েকে কোনো কবি বা গায়ক বা সাহিত্যিকের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই 'অভাগা' পাত্রদেরও যে পাত্রী জুটে যায় কখনো কখনো তার একমাত্র কারণ 'বোকা' মেয়ের দল। সব অভিভাবকই তাঁদের 'বোকা' মেয়েদের সম্বন্ধে সদা সন্ত্রস্ত থাকেন। অকস্মাৎ কোনো 'অভাগা' পাত্র তাঁর আদরের মেয়েটির মন জয় না করে বসে, সেই জন্যেই মেয়ের বাপকে দেখা যায় যৌবনে পা দেবার আগেই মেয়ের 'রুচি' যাতে গড়ে ওঠে, সামাজিক স্টাটাস সম্বন্ধে মেয়ে যাতে 'সিরিয়াস' হয়ে ওঠে সেজন্যে সুরু করেন শিক্ষানবিশী। কিন্তু মেয়েদের, বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েদের রোমান্স-প্রিয়তা অনেক সময়ই অভিভাবকদের সমস্ত 'শুষ্ক' পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়—করে দেয় তাই রক্ষে, তা না হলে বিয়ের মালাটা বোধ হয় দেনাপাওনার টানাহেঁচড়াতেই শতচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।—প্রজাপতি

আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটার মধ্যে কতো রকমের মেয়ে আছে বলে আপনার ধারণা? এক শ' কি দু'শো রকমের? পাঁচ হাজার কি দশ হাজার রকমের? না-না, তার চাইতে অনেক বেশি। তবে কি দশ বিশ লাখ রকমের? না না, তার চাইতেও ঢের ঢের বেশি। যদি একেবারে ঠিক ঠিক সংখ্যাটি আপনার জানা দরকার হয়ে থাকে তো জেনে রাখুন—পৃথিবীতে মেয়ে আছে প্রায় দেড় শ' কোটি রকমের; কারণ বর্তমান পৃথিবীর নারী-বাসিন্দার মোট সংখ্যাটা প্রায় ঐ রকম।

আমার প্রশ্নটা যদিও সরল ছিলো, কিন্তু তার উত্তরটা যে খুবই জটিল হয়ে পড়েছে, এ কথা আমি নিজেও অস্বীকার করছি না। তবে কি-না, নেহাৎ সত্যের খাতিরেই আমাকে দেড় শ' কোটির মতন একটা বেয়াড়া সংখ্যার উল্লেখ করতে হলো—একটি, আধটি, এমন কি সিকিটি নারীকে ম্যানেজ করতেই যেখানে অনেক নরের গলদঘর্ম অবস্থা, সেখানে দেড় শ' কোটি••থাক্ গে।

কথাটা আবার সরলভাবেই পাড়ছি। কতো রকমের মেয়ে আছে বলে আপনার ধারণা?—প্রশ্নটার সরলতম উত্তর হলো: দু'রকমের অর্থাৎ কি-না, ভালো আর মন্দ। কিন্তু সরলতম এই উত্তরটি যদি আপনি নিজেও একটু তলিয়ে দেখেন, তা হলেও বুঝতে পারবেন যে উত্তরটার মধ্যে কোথায় যেন একটু 'কিন্তু' রয়ে গেছে। ভালো মেয়ে তো আছেই, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে। (শুধু পুরুষেরাই পৃথিবীতে একমাত্র ভালো জীব এ কথা সভ্যতার খাতিরে মানা যাচ্ছে না)। আর খারাপ মেয়েও যে পৃথিবীতে আছে এ কথাটা তো আরো বেশি বুক ঠুকে বলা যায়। এতক্ষণে আমরা কিন্তু'তে এসে পৌঁছে গেছি—অর্থাৎ কি-না এমন এক ধরণের মেয়ে যাদের কোনোমতেই আপনি ভালো বলে স্বীকার করতে পারবেন না (পারিবারিক গঞ্জনা বা আরো হাজার রকমের শারীরিক আশঙ্কা সত্ত্বেও); আবার এরা যে খারাপ এ কথাটা বলতেও আপনার কলিজার তলে কোথায় যেন খুঁত করে একটু বাধবে। তা'হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—আমরা এমন এক ধরণের মেয়ের সন্ধান পেলাম যারা ভালোও নয়, খারাপও নয়; এদেরই আমি বলছি 'একটু কেমন যেন'। ভালো বা খারাপ মেয়ের যা মোট সংখ্যা, 'একটু কেমন যেন' ধরণের মেয়ের সংখ্যা তার চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশি।

যে-কোনো মেয়ে স্কুল, মেয়ে কলেজ, মেয়েদের হোস্টেল বা যে কোনো সভা বা সমিতি যা মেয়েদের জন্য মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হয়—অর্থাৎ কি না মেয়েরাই যেখানে সর্বেসর্বা (মেয়েরা যে কোথায় সর্বেসর্বা নয় সে একটা সাপ কথার এক কথা হলেও বর্তমানে আলোচ্য নয়) এ রকম যে কোনো জায়গা যেখানে তিন শ,' চার শ' কি পাঁচ শ' মেয়েকে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়—সেখানে অকস্মাৎ যদি কখনো কোনো কারণে আপনার আবির্ভূত হবার মতো ব্যাপার ঘটে, তা'হলেই আমার থিয়োরীটার মর্ম আপনি পুরোপুরি উপলব্ধি (!) করতে পারবেন। দেখতে পাবেন, মেয়েটা ভালোও নয় মন্দও নয়, বেশির ভাগ মেয়েই একটু কেমন যেন। তফাৎটা শুধু ডিগ্রির।

এবার প্র্যাকটিকাল কথায় আসা যাক। 'একটু কেমন যেন' ধরণের মেয়েদের চেনবার উপায় কি? তারা অবশ্যই গলায় কিছু একটা লেবেল এঁটে বেড়ায় না। অথচ এদের চিনতে হবে, চেনা

দস্যকার—একেবারে এদের পাল্লায় পড়ে চিনতে পেরে কোনই লাভ নেই, কারণ ততক্ষণে আপনার দফা রফা হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। কাজেই তার আগেই, দূর থেকে এদের চেনবার চেষ্টা করতে হবে।

শরীর এবং মন এ দু'টির প্রসঙ্গ আলাদা আলাদা করে অনেক সময় আলোচনা করা হয় যদিও, কিন্তু তাতে একটু ত্রুটি থেকে যায়—সমগ্র মানুষটি চেনবার পক্ষে। আমরা তাই, যে মেয়েটি 'একটু কেমন যেন' তার ভেতর এবং বাইরের দিকটা যুগপৎ বুঝবার চেষ্টা করবো।

'আমাকে নিশ্চয়ই খুব ভালো দেখাচ্ছে না, কেউ চায় না আমাকে, আমি অবাঞ্ছিত'—এই রকম একটা বোধ থেকেই মেয়েদের মধ্যে যতো সব জটিলতা দেখা দেয়। এই জটিলতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হলো সাজপোষাক। আমাকে চাইছে না? ঠিক আছে, আমি চাইয়ে ছাড়বো এবং এর জন্যে সহজতম উপায় হলো নিজেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা। এই সাজগোজের দিকে একবার একটা ঝোঁক দাঁড়িয়ে গেলেই যে কোনো মেয়ে অচিরেই হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। সাধারণ একটা শাড়ি পরলে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনেক সময়ে যতোটা আকর্ষণীয় হয় বা হতে পারে, সাজগোজের ফলে প্রায়ই দেখা যায় সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্যটা তো স্নো-পাউডার-ক্রীম-রুজ-লিপস্টিক নেল-পলিশ এবং অলঙ্কারে চাপা পড়লই, উপরন্তু তার মনেরও যথেষ্ট ক্ষতি করলো। কারণ এ রকম যার একবার ধারণা হয়ে গেছে ঐ সমস্ত ব্যবহার করলে তার সৌন্দর্য বাড়ে—ও সবের যখনই অভাব ঘটবে তখনই সে নিজেকে দুর্বল মনে করবে।

সাজগোজের পরেই এই ধরণের মেয়েদের দ্বিতীয় লক্ষণ হলো এদের অতিমাত্রায় স্বার্থ-সচেতনতা। (কোন্ মেয়েই বা এদিক দিয়ে কম যায়!) এরা মনে করে গোটা গ্রামটা বা শহরটা চাই কি গোটা দেশটাই বুঝি এদের সুবিধের জন্যে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন। সামান্যতম বিষয়ে অপরকে দোষারোপ করা প্রায় এদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। হঠাৎ হয় তো অকালে একদিন বর্ষা এসে বিকেলে লেকে বেড়াতে যাবার প্রোগ্রামটা মাটি হয়ে গেলো। ঠিক তখুনি যদি এ রকম মেয়ের সামনা সামনি গিয়ে পড়েন তো শুনবেন সে খেদের সঙ্গে বলছে: নেচার বিট্রে করলো। কিম্বা হয় তো হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা ইচ্ছে হলো কোনো সিনেমা দেখবার। অনেক আয়াসে সেজে পরে হাউস-এর কাছে এসে নজরে এলো 'হাউস ফুল'—ব্যস্! ঠিক সেই সময়ে যদি আপনি তার মনের গভীরে ডুব দিতে পারেন তো দেখবেন সে বলছে: সবাই আমার সুখের পথে কাঁটা পুঁতে রেখেছে।

আসলে কিন্তু এদের সুখের পথ কণ্টকময় করে এরা নিজেরাই রেখেছে। কথা উঠতে পারে তা কেমন করে হয়? কিন্তু তা হয়। তার কারণ, কিসে যে প্রকৃত সুখ, তার মন যে আসলে কি চায়, তা সে নিজেই জানে না! জানবার চেষ্টা হয় তো সে সজ্ঞানভাবে করতে পারে কখনো কখনো, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছুই ফল হয় না। একদিক থেকে এরা বড়োই অসহায়। এদের অবচেতন মন সদাই এদের এতোই ব্যতিব্যস্ত করে রাখে যে, কি যে আসলে মনটা চাইছে, তা ভেবে দেখবার অবসরটুকুও এরা পায় না। মন কি চায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা একবার হয়ে গেলে একটা বৃহৎ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং সেইটেই হলো একটা মস্ত গেরো। অর্থাৎ কি না, কোনো সমস্যার একটা কিছু সমাধান হ'ক এইটেই এই মেয়েরা আসলে চায় না। সমস্যা, বিশেষ করে তাকে ঘিরে সমস্যা যতো বেশি থাকে ততোই লাভ—কারণ ততোই অপরের নজরে আসবার সম্ভাবনা।

যে মেয়েটি একটু কেমন যেন তাকে কদাচিৎ দেখবেন সমবয়সী সাবালক বা সাবালিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে। এ কাজটা বাস্তবিকই সে পারে না। কারণ বয়স তার বিশ, পঁচিশ বা তিরিশ—যতোই হ'ক না কেন—মনটা তার একেবারেই অপরিণত। কাজেই শিশু বা বালক-বালিকার সঙ্গেই খাতিরটা তার সহসা জমে উঠবার সম্ভাবনা এবং হয়েও থাকে তাই!

যে কোনো সাবালিকা শৃঙ্খলা ভালোবাসে—পরিণত বয়সের একটা লক্ষণই হলো তাই। কিন্তু এরা তা চায় না। ঘর-সংসারই হোক বা অন্য যে কোনো ব্যাপারেই হোক বিশৃঙ্খলা-প্রিয়তা তাই এদের আর একটা লক্ষণ।

একটু কেমন যেন মেয়েরা প্রেমের ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে থাকে। কারণ ভালোবাসতে হলে যে জিনিসটির সব চাইতে বেশি প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ কি না অপরপক্ষকে দিতে পারার ক্ষমতা, বলাই বাহুল্য বেশ একটু বেহিসেবীভাবে দিতে পারার ক্ষমতা, তা সচরাচর এদের মধ্যে দেখা যায় না। এরা শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না। পেতে চায়, দিতে চায় না।

এদের অনেক গুণের মধ্যে আর একটি হলো ভুল এবং মিথ্যে বলা। কোথাও একটি ছোট্ট মিথ্যে কথা বলার পরে যদি দেখা যায়, কেউ কেউ তা বিশ্বাস করছে না, তাহলে তারপরেই দেখা যাবে সেই মিথ্যেটাই সে আরো ফেনিয়ে, আরো জোরের সঙ্গে বলছে। এটা যে সে করে তার একটা প্রধান কারণ অপরের মানসিকতা সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই অপরিণত; আর দ্বিতীয়ত, অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবার জন্যে একটা উৎকট বাসনা।

দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও এদের ব্যবহারে খুব লক্ষণীয়ভাবে দেখা যায়। এমন কি সাধারণ ব্যাপারেও দেখবেন এরা কতো দায়িত্ববোধহীন। ধরুন কোনো উপলক্ষে এ রকম একটি মেয়েকে আপনি নিমন্ত্রণ করলেন। উপলক্ষটা হয় তো তিনদিন কি চার দিন পরে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সময়ে নিশ্চয়ই জানবেন তার কথায় আন্তরিকতার কিছুমাত্র অভাব দেখা যাবে না। কিন্তু এও ঠিক যে ঐ উপলক্ষে যাতে যোগ না দিয়ে পারা যায়, সেজন্যে একটা কিছু কারণ উদ্ভাবনের কাজে তার মনটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

পুরুষ বন্ধু এদের বড়ো একটা থাকে না। কারণ, পুরুষমানুষের কাছে সহজেই ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। এদের সাধারণত একটি কি দু'টি মেয়ে বন্ধু থাকে। প্রেমে পড়তে সে বাস্তবিকই চায় না। কারণ, তার অবচেতন মন সবসময়ই তাকে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে: খবরদার, আর এগিয়ো না, গুমর ফাঁক হয়ে যাবে কিন্তু অর্থাৎ কি না নিজের ব্যক্তিত্বের নানা ত্রুটি সম্বন্ধে এরা একান্ত অতিমাত্রায় সচেতন। জীবনের যা পরমসম্পদ, সেই আনন্দ জিনিষটা এরা সাধারণত নানা নিষ্ঠুর কার্যকলাপের মধ্যে দিয়েই আহরণ করে থাকে। যে সব চাইতে কাছের মানুষ, তাকে দুঃখ দিয়ে, তাকে পীড়ন করে এরা পায় অসীম আনন্দ।

কিন্তু একটা কথা খুবই সত্যি। সচরাচর এরা যাকে বলে খুবই 'চার্মি' মেয়ে হয়ে থাকে। দেখলেই বেশিরভাগ পুরুষের এদের ভালো লেগে যায়। কারণ, ভালো লাগাবার জন্যে এরা সুপরিকল্পিত এবং নিয়মিতভাবে চেষ্টা করে থাকে।

তবে খুব বেশি দিন এরা কারো ভালোবাসাই পায় না; তা এরা পেতে পারে না। কারণ, নিজেরা এরা মোটেই ভালোবাসতে পারে না।

সমালোচনা, এমন কি ন্যায্য সমালোচনা সহ্য করার শক্তির অভাব এদের প্রায় সকলেরই দেখা যায়। এদের সবসময়ই দেখা যাবে কিছু না কিছু একটা 'প্ল্যান' করতে ব্যস্ত—যে প্ল্যান তার সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না—কারণ কোনো প্ল্যানকেই এরা এদের খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্যে একেবারে নিখুঁত মনে করতে পারে না।

জীবনে যখন একটা অচল অবস্থা দেখা দেয় নিজেরই নানা ত্রুটির ফলে, তখন দেখবেন এরা বলতে আরম্ভ করেছে: যা হয় হবে, কেয়ার করি না। কিন্তু আসলে কেয়ার এরা খুবই করে থাকে। আর সেই জন্যেই সবকিছু যখন ব্যর্থ বলে মনে হয় তখন এরা কিছু একটা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। কেবলই মনে হয়: আমাকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই একটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটবে, আর তার ফলে জীবনপথ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; কেউ আর চাপা গলায় বলবে না—মেয়েটি একটু কেমন যেন।—অনুসন্ধানী

আমাদের কাছে পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিচয় আজকের দিনে প্রায় নিখুঁত বললেই চলে। এ রকম ভূগোল-বিশেষজ্ঞের আজকের দিনে অভাব নেই, যাঁরা নিজ নিজ লাইব্রেরীতে বসে হাজার কি দু' হাজার মাইল দূরের কোনো মালভূমির আয়তন বা পাহাড়ের কোন গাছগুলির উচ্চতা কতখানি বা কি তার প্রকৃতি সবকিছু অনায়াসে বলে দিতে পারেন। তাঁর লাইব্রেরীর আলমারীতে সাজানো খান কয়েক বই ছাড়া আর কোনো কিছুরই সাহায্য এ জন্যে প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একটু একটু করে পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করে ঐ সমস্ত বইগুলি লিখতে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন বা লিখেছিলেন? তাঁদের কথা মনে হলে বিস্ময় জাগা খুবই স্বাভাবিক। যে কোনো বিজ্ঞানের বই পড়ে আনন্দ সকলেই পেয়ে থাকেন, কিন্তু যে কোনো বিজ্ঞানের সাফল্যের পেছনে যে পরিশ্রম, বেদনা আর হতাশার কাহিনী থাকে, তা সাধারণ মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

আজকের ভূগোলের যে অবস্থা তার মূলে রয়েছে একজন গ্রীক, এরাতোস্থেনিস নামে একজন পরিশ্রমী পুরুষের সাধনা। আজ থেকে ২২৪০ বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এরাতোস্থেনিস ছিলেন একাধারে কবি, খেলোয়াড়, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদ। যৌবনে পা দিয়েই এরাতোস্থেনিস একটা ব্যাপার দেখে যেমন আশ্চর্য হয়ে যেতেন তেমনি বিরক্তবোধ করতেন। ব্যাপারটা হলো খাস পৃথিবীকে নিয়ে। কেউ বলে পৃথিবীটা একখানা পাতলা থালার মতন, (ব্যাবিলনবাসীদের এই রকম ধারণা ছিলো) তবে আকারে অনেক—অনেক বড়ো। কেউ মনে করতো পৃথিবীর আকৃতি হলো অনেকটা যেন অষ্টমীর চাঁদের মতো; কেউ বা মনে করতো পৃথিবীটা একটা বিরাট গামলার মতো, চারটি হাতী ধারণ করে রয়েছে পৃথিবীরূপী এই গামলাটি ইত্যাদি। এই রকম বহু মত প্রচলিত ছিলো এরাতোস্থেনিস
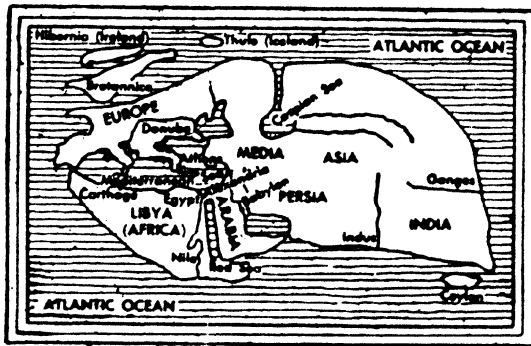
এরাতোস্থেনিস পরিকল্পিত প্রথম মানচিত্র

সবগুলি একে একে বুঝবার চেষ্টা করে দেখলেন এবং বুঝলেন প্রত্যেকটি মতেরই গোড়ার কথা হলো ধর্ম। অর্থাৎ কি না ধর্মগ্রন্থে পৃথিবীর আকৃতি বা তার গঠন সম্বন্ধে যে মত প্রচার করা হয়েছে সেইটেকেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সত্য বলে মনে করেন এবং তাই প্রচার করেন।

কিন্তু এরাতোস্থেনিসের সত্যানুসন্ধানী মন তাতে তৃপ্ত হলো না। উনি বললেন: পাঁচটা বিভিন্ন ধর্মে পৃথিবী সম্বন্ধে যখন পরস্পরবিরোধী কথা বলছে তখন কোনোটাই সম্পূর্ণ সত্য নয় মনে হচ্ছে এবং হাতে কলমে একটা মাপজোক না করা পর্যন্ত, একটা মানচিত্র তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলাও যায় না।

লোকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করলে এরাতোস্থেনিসকে, কেউ আড়ালে, কেউ বা প্রকাশ্যেই। ওঃ! মস্ত বড়ো জ্ঞানী এসেছেন একজন। সব ধর্মের কথাই কি না ভুল! কেউ কেউ আবার অবজ্ঞায় ওঁর উক্তির কোনো জবাবই দিলো না।

এরাতোস্থেনিস কারো নিন্দা বা প্রশংসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। মনে মনে উনি স্থির করে ফেলেছিলেন যে, পৃথিবীর একটা মানচিত্র উনি নিজেই তৈরি করবেন। কাজেই সে জন্যে পড়াশুনো দরকার প্রচুর। বাগ্‌বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করা নির্বুদ্ধিতা।

খৃষ্টপূর্ব ২৩৫ সালের কথা। এরাতোস্থেনিসের বয়স তখন ঠিক ৪১, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্রে ওঁর জ্ঞানের বিষয় দেশ বিদেশে এতই প্রচারিত হয়েছিল যে, সে সময়ের পশ্চিমের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়ার সরকারী পাঠাগারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার পরিচালনার দায়িত্ব নেবার জন্যে ওঁর কাছে আহ্বান এলো। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এ একটা মস্ত সুযোগ বলেই এরাতোস্থেনিসের মনে হলো। আলেকজান্দ্রিয়ার এই পাঠাগারটি টলেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কম করেও প্রায় সাত লক্ষ 'বই' ছিলো এ পাঠাগারে। সে যুগের 'বই' মানে শিলালিপি, ব্রোঞ্জলিপি, লৌহলিপি থেকে আরম্ভ করে পার্চমেণ্ট পেপারের রোল, প্যাপিরাসের রোল ইত্যাদি সব কিছুই বোঝাতো। এগুলির মধ্যে সহস্রাধিক ভ্রমণকাহিনীও ছিলো। ঐ সমস্তগুলিই পড়ে ফেলবার অপূর্ব সুযোগ এসে গেছে মনে করে এরাতোস্থেনিস চাকুরীটা নিলেন। এবার নতুন করে সুরু হলো গবেষণা। আর সেই সাথে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাঠাগার সাজাবার প্রথম প্রচেষ্টা। বিষয় এবং লেখকের নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে পাঠাগারের বইয়ের প্রথম ক্যাটলগও এরাতোস্থেনিসই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন।

খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালের কথা। এরাতোস্থেনিসের বয়স তখন ঠিক ৭৬। একদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবীর একটা মানচিত্র উনি তৈরি করেছেন। সে সময়কার শিক্ষিতসমাজ ওঁর এই মানচিত্রকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে ১০০০, ১৫০০ কি ২০০০ বছর পরে আজকের বিজ্ঞানী মাত্রেই এরাতোস্থেনিসের জ্ঞানের তারিফ করে থাকেন। সকলেই বলে থাকেন যে, ২২০০ বছর পূর্বে যে কোনো ব্যক্তির অতোখানি বাস্তব জ্ঞান থাকতে পারে এইটেই পরম বিস্ময়ের। তাঁর মানচিত্রে যে ভুলগুলি ছিলো সে কোনো উল্লেখনীয় বিষয়ই নয়, নিউটনের অনেক কথাও পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু তার ফলে তাঁর নিজের সময়ে যেমন তাঁর গুরুত্ব কিছু কমে নি, পরের যুগেও নয়; কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং যে কোনো বস্তু সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ করবার পক্ষে এগুলি একান্তই অপরিহার্য।

এরাতোস্থেনিস পৃথিবীর যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন তাতে মোট তিনটি মহাদেশ পাওয়া যায়। এশিয়া, ইয়োরোপ এবং আফ্রিকা। ইয়োরোপের উত্তরতম প্রান্ত হিসেবে আইসল্যাণ্ড, এশিয়ার পূর্ব এবং দক্ষিণ সীমানা হিসেবে ভারতবর্ষ এবং সিংহল, আজকের মধ্য এশিয়ার কিয়দংশ এবং আফ্রিকার শুধুমাত্র লিবিয়া এবং মিশর এই ছিলো এরাতোস্থেনিসের পৃথিবীর মানচিত্রের মোটামুটি পরিচয়।

পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করবার পরেই এরাতোস্থেনিস পৃথিবীর ব্যাস পরিমাপ করতে প্রয়াসী হন। কয়েক বছর নিতান্ত সাধারণ কিছু কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যেই উনি এ কাজ চালিয়েছিলেন। মানচিত্র তৈরির চাইতেও এ বিষয়ে এরাতোস্থেনিসের সাফল্য অনেক বেশি বলতে হবে। কারণ উনি বলেছিলেন যে, পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে ৭৮৫০ মাইল (প্রকৃত ব্যাস হলো ৮০০০ মাইল)।—ভৌগোলিক

ব্লাড-প্রেসার!

রক্তচাপের উচ্চতা ও নিম্নতা

এক-একটা যুগে দেখা যায় এক-একটা ব্যাধির প্রকোপ বাড়ে। কখনো বেরিবেরি, কখনো ইনফ্লুয়েঞ্জা, কখনো টাইফয়েড, কখনো বা আমাশয় কিম্বা মনের রোগ বা ব্লাড-প্রেসার। বর্তমান যুগটাকে যেমন মনের রোগের যুগ বলা যায়, তেমনি ব্লাড-প্রেসারের যুগও বলা চলে, কারণ এ দু'টো রোগই এ যুগে প্রচুর হচ্ছে। এ দু'টোর মধ্যে আবার ব্লাড-প্রেসারের প্রকোপটাই বেশি বলে মনে হয়। ব্লাড-প্রেসার যে মারক-ব্যাধি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা সাধারণত বলে থাকেন যে ব্লাড-প্রেসার বাড়বার জন্যে যতো লোক মরে, ব্লাড-প্রেসার হয়েছে এই আতঙ্কে মরে তার চাইতে অনেক বেশি। অর্থাৎ কি না শুধুমাত্র ব্লাড-প্রেসারকে এতোটা ভয় করবার কোনো হেতু নেই।

একজন পূর্ণবয়স্ক স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মানুষের ব্লাড-প্রেসার সাধারণত নিম্নরূপ হয়: সিস্টোলিক ১১০—১৪০; ডায়াস্টোলিক ৬৫—৯০। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে যাবার পরে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। পঞ্চাশের পরে স্বাভাবিক রক্তচাপ হলো: সিস্টোলিক ১৪০—১৫৫ এবং ডায়াস্টোলিক ৯০—৯৫।

'হাই' ব্লাড-প্রেসার হয়েছে বুঝতে হবে তখন যখন সিস্টোলিক হবে ১৬০ এবং ডায়াস্টোলিক হবে ১০০। 'লো' ব্লাড-প্রেসার হয়েছে বুঝতে হবে তখন, যখন দেখা যাবে সিস্টোলিক ১০০ বা তারও কম হয়ে পড়েছে। অবশ্য সামান্য কিছু কমবেশি ব্যক্তিবিশেষে হতে পারে—মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যের ওপরই তা নির্ভর করে এবং এ বিষয়ে যে চিকিৎসক রোগী পরীক্ষা করছেন তাঁর মতই সঠিক !

অনেক কারণেই 'হাই' ব্লাড-প্রেসার হয়ে থাকে বা হতে পারে। যেমন, কিডনীর ব্যারাম, শরীরে কোন বিষক্রিয়া, বাত, পিটুইটারী বা আড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডসমূহে কোনো গোলযোগ, ডায়বেটিস ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অনেক সময় দেখা যায় এই সমস্ত কোনো কারণ ব্যতীতও ব্লাড-প্রেসার 'হাই' হয়ে পড়ে; যেমন বয়ঃসন্ধির সময়ে। বিশেষ করে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণে কোনো বাহ্য কারণ ব্যতিরেকেই ব্লাড-প্রেসার 'হাই' হয়ে যায় দেখা গেছে এবং এটা বংশগত ব্যাধি বলেই বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। এটা রীতিমতো একটা ব্যাধি যদিও, কিন্তু তবু এতে ভয়ের বিশেষ কারণ নেই কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই বিনা ওষুধেই এ অবস্থাটা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

'হাই' ব্লাড-প্রেসার হয়েছে কানে এলেই আঁতকে উঠবেন না; কারণ, তাতে যে ভালোর চাইতে খারাপটাই বেশি হবার সম্ভাবনা সে কথা আমরা আগেই বলেছি। একটু বেশি বিশ্রাম, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ এবং খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা এবং পরিমিত ওষুধ এই ক'টি বিষয়ে সতর্ক হতে পারলে যে কোনো স্বাভাবিক কাজই 'হাই' ব্লাড-প্রেসার হয়েছে এ রকম যে কোনো ব্যক্তি চালিয়ে যেতে পারেন। অযথা আতঙ্কের কবলে চলে না পড়ে মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন হয় এরকম কাজ বরং আরো সাহায্য করে রোগমুক্তির ব্যাপারে।

শুধু শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিলেই চলবে না, রীতিমতো ঘুমোতে হবে 'হাই' প্রেসার রোগীকে। এমনিতে যদি ঘুম নাই আসে তা হলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো কিছু ঘুমের বড়ি খেয়েও ঘুমোতে হবে। খেলাধুলো যেমন টেনিস বা গলফ অনায়াসে খেলা যেতে পারে। বেশ কিছুটা হাঁটা অনেক সময়ই সুফল দিয়ে থাকে। কম স্টার্চ যুক্ত খাবার এবং খাবার পরেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম 'হাই' প্রেসার রোগীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। লবণ যতো কম খেয়ে পারা যায় ততোই ভালো।

'হাই' ব্লাড-প্রেসারকে কমাবার জন্যে আজকাল দেশ-বিদেশে রকমারী পেটেণ্ট ওষুধ বেরিয়েছে; কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত বিজ্ঞাপন দেখে ঐ সমস্ত ওষুধ খেলে ভালোর চাইতে খারাপ ফলই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। কারণ, এর ফলে, ওষুধের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে হঠাৎ প্রেসার অতিমাত্রায় কমে যেতে পারে। এ ভাবে ওষুধ দিয়ে প্রেসার বেশি কমিয়ে ফেললে তাকে পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে চিকিৎসকের খুবই বেগ পেতে হয়।

এমন কথাও অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে 'লো'-প্রেসারের চাইতে কিছু 'হাই'-প্রেসারই ভালো, কারণ তার ফলে লোকের কর্মশক্তি অব্যাহত থাকে। কিন্তু 'লো'-প্রেসার ব্যক্তির নানা অসুবিধে। একে ত' স্বাভাবিকভাবেই তার কর্মশক্তি কম, তারপরে দেখা গেছে পরিবার বা পরিবেশে আকস্মিক কোনো পরিবর্তনের ফলে, বিশেষত তার সঙ্গে যদি সংবেদনধর্মী কোনো ব্যাপার যুক্ত থাকে, তা'হলে 'লো'-প্রেসারের ব্যক্তি হঠাৎ যখন তখন অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এ সমস্ত সময়ে কোনো ওষুধ প্রয়োগ না করে রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে মাথাটা ঈষৎ নীচু করে রাখলে অল্পক্ষণেই তার জ্ঞান ফিরে আসে দেখা গেছে !

'লো'-প্রেসার-এর চিকিৎসার জন্যে আজকাল অনেক বিশেষজ্ঞকেই দেখা যায় ওষুধের চেয়ে রাতের বেলা রোগীর শোবার ব্যাপারে নজর দেন। এঁরা বলেন যে, বেশ একটু উঁচু বালিশে মাথা রেখে অন্তত আট ঘণ্টা ঘুমোতে হবে এবং কোমরে বেশ আঁটো সাঁটো করে একটা বেল্ট বেঁধে রাখতে হবে ঘুমোবার সময়। এ ভাবে কয়েক মাস চলবার পরে অনেকের 'লো'-প্রেসার সেরে গেছে।—ডাঃ নাগ

নেতাজী

বাসন্তী গোস্বামী

১৮৯৭'র ২৩শে জানুয়ারীতে
তুমি এলে
সবারি খুশিতে তুমি বরিত হলে
আসমুদ্র হিমাচল মেতে উঠেছিল
উচ্ছল আনন্দ প্লাবনে
সেই শুভ লগনে
তোমারি আগমনে।

তোমার আদর্শ মোদের যুগ যুগ ধরি
দেখাইবে পথ
তোমার আদর্শ নীতি অটুট করি
পুরাইতে হবে সৎমনোরথ,
চিত্তবলে বলীয়ান হয়ে
দ্বিধা না করি কোন সৎকর্মে অগ্রসর হতে
হৃদয়ে শক্তি রেখে পৌঁছাই স্থিরলক্ষ্যে
সত্যের আলোকে।

তোমার কঠিন ত্যাগের অটুট ব্রত
মোদের চঞ্চল করে উৎসাহে সতত
তুমি নাই হারিয়ে গেলে
কোথায় কাদের মাঝে
তোমার বাণীর উদাত্ত সুর
মোদের হৃদয়ে বাজে।

মোরা ভারতবাসী তোমায় সতত
করি যে নমস্কার
'ফিরে এসো তুমি' হৃদয়ে হৃদয়ে
মোরা বলি বার বার।

থার্মোমিটার

ছোট ভঙ্গুর একটা জিনিস—থার্মোমিটার। অনেক সময়েই দেখা যায় এই ছোট্ট জিনিসটি কতো পরিবারকে তোলপাড় করে তোলে। ধরুন একটি ছোট শিশু দুই কি আড়াই বছর বয়স, কোলে নেবার সময় এক একবার মনে হচ্ছে যেন গা-টা ছ্যাঁত ছ্যাঁত করছে, মাথার তালুতে হাত দিয়ে দেখলেন রীতিমতো গরম—গালের চাইতেও বেশি গরম বলেই মনে হচ্ছে আপনার। বাচ্চাটা ঘ্যান ঘ্যানও করছে, খাবার দিকে বিশেষ আগ্রহ নেই, চোখ দুটিতে যেন অকস্মাৎ দীপ্তি বেড়ে গেছে। এ রকম সময় খুব স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ইচ্ছে হতে পারে বাচ্চাটার জ্বর হয়েছে কি-না, তা নিশ্চিতভাবে বুঝবার জন্যে থার্মোমিটার-এর সাহায্য নেওয়া। থার্মোমিটার লাগাবার পরেই হয় তো বা আপনাকে আঁতকে উঠতে হবে। কারণ, জ্বরটা হয় তো একটু বেশিই হয়ে পড়েছে ১০২ কি ১০৩ ডিগ্রি। হয় তো ভাবতে পারেন চট করে এতো জ্বর হলো কি করে? এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাচ্চাদের জ্বর হলেই স্নায়ুকেন্দ্রের অপরিণত অবস্থার জন্যে চট করে জ্বর বেড়ে যায় এবং সাধারণত দেখা যায় গায়ে হাত দিয়ে হয় তো বাচ্চাদের জ্বর যে কতটা তা বড়ো একটা বোঝা যায় না। আর সব চাইতে যা অসুবিধে, বাচ্চারা কিছু ভাষায় প্রকাশ তার অসুবিধের কথা কিছুই আপনাকে জানাতে পারবে না। কাজেই গা গরম দেখলেই বাচ্চার ক্ষেত্রে বড়দের করণীয় হচ্ছে অবিলম্বে থার্মোমিটার দেওয়া এবং তারপর ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া।

কিন্তু বড়োদের কথা একটু স্বতন্ত্র। বড়োদের বেলায় থার্মোমিটারের ওপর আমাদের নির্ভরতা ঠিক শিশুদের মতো নয় বা থার্মোমিটারের রায়কেই চূড়ান্ত মনে করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বারও কোনো কারণ নেই। ধরুন অফিসে বসে কাজ করতে করতে শরীরটা আপনার খারাপ লাগছে, মনে করছেন জ্বর হয়েছে। ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এসে থার্মোমিটার লাগালেন। দেখলেন ৯৯° ডিগ্রি। এ-ক্ষেত্রে এ কথা কি নিশ্চয় করে বলা যায় যে আপনার জ্বর হয়েছেই? অনেকে হয় তো বলবেন যে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে, ৯৮°৪-এর ওপর দেহের তাপ উঠলেই তো জ্বর হয়েছে মনে করতে হবে। কিন্তু আজকের দিনের বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকগণ তা মনে করেন না। পৃথিবীর সব দেশের থার্মোমিটারেই যদিও ৯৮°৪-এর জায়গাটা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা থাকে। কিন্তু তবু, আজকের দিনের বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে এইটেই শেষ কথা নয়। ব্যক্তি-নির্বিশেষে এ কথা খাটে না।

কেন তা বলা দরকার। স্বাভাবিক অবস্থায় একজনের শরীরের তাপ কতো থাকে? সকলেরই এক রকম থাকে কি? ৯৭° কি ৯৮°? না তা থাকে না। কারো পক্ষে হয় তো ৯৭° স্বাভাবিক কারো বা ৯৮°। ৯৭° যার স্বাভাবিক তার যদি কখনো শরীরের তাপ ৯৯° হয়েছে দেখা যায় তা হলে অবশ্যই একটু জ্বর হয়েছে মনে করতে হবে। কিন্তু যার সব সময়ই ৯৮° থাকে তার ৯৯° হলেও জ্বর হয়েছে মনে করবার কোনই কারণ নেই। কারণ লক্ষ লক্ষ লোককে পরীক্ষা করবার পরে বিশেষজ্ঞগণ আজকের দিনে মনে করেন যে ৯৭° থেকে ৯৯° পর্যন্তই মানুষের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ; ৯৮°৪-এর সীমা তাঁরা মানেন না। কারণ বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, খুবই স্বাস্থ্যবান কোনো লোকের হয় তো প্রায় সবসময়েই ৯৮° থেকে ৯৯°-এর মধ্যে শরীরের উত্তাপ থাকছে। প্রচলিত থার্মোমিটারের মতে যখন সে রকম কোনো ব্যক্তির জ্বর হয়েছে বলে মনে করা চলে (অর্থাৎ ৯৮°৪-এর ওপর) তখনো বাস্তবিকপক্ষে সে ব্যক্তি মোটেই জ্বর হয়েছে বলে মনে করছে না, অর্থাৎ বোধ করছে না। কাজেই যে কোনো সাবালকের ক্ষেত্রে থার্মোমিটারের ওপর আমাদের নির্ভরতা অনেকটা কমে যায় বলা চলে।

এইখানে আরেকটা কথা বলা দরকার। তা হ'লো থার্মোমিটার রাখার বন্দোবস্ত সম্পর্কে। ঠিকভাবে যদি থার্মোমিটার রাখা না হয়, তা হলে অনেক সময়েই দেখা যায় হঠাৎ প্রয়োজন হলে যে উত্তাপ তাতে ওঠে তা নির্ভুল হয় না। কারো জ্বর পরীক্ষা করবার পরে থার্মোমিটারের পারদ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ৯৫° পর্যন্ত নামিয়ে, কি একটা এ্যান্টিসেপটিক সলিউশনে ধুয়ে তারপর শুকনো করে মুছে রাখার দরকার। অন্যভাবে রাখলে, যেমন ধরা যাক কারো জ্বর পরীক্ষা করা হয়েছে ১০২° তারপর সেইভাবেই থার্মোমিটারটা রেখে দেওয়া গেলো—তা' হলে অল্পদিনেই থার্মোমিটারটি খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

থার্মোমিটার প্রসঙ্গেই জ্বরের কথা মনে আসে। আজকাল অনেক চিকিৎসক মনে করেন যে, জ্বর হলেই আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। বরং জ্বর হলে তার একটা লাভের দিকও আছে। জ্বর হলো শরীরে কোনো জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে তার বিরুদ্ধে শারীরিক প্রতিক্রিয়া। জ্বর হলে একদিকে যেমন অনেক সময় চিকিৎসকের পক্ষে রোগের তীব্রতাটা বুঝবার পক্ষে সুবিধে হয়; অন্য দিকে তেমনি আবার রোগীর নিজের শক্তিকে আক্রমণকারী জীবাণুকুলকে প্রতি আক্রমণ করবার জন্যে সংগঠিত হতে সাহায্য করে।—বৈজ্ঞানিক

ধূমপান নিষেধ

শ্রীবিশু দাস

ট্রামে, বাসে, সিনেমায় সর্বত্র 'ধূমপান নিষেধের নোটিশ'—তবু মানুষ ধূমপান করে! কে, কবে, কোথায় প্রথম ধূমপান আরম্ভ করেছিলেন সে কথা আজ আর জানবার কোন উপায় নেই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সব নেশার মধ্যে ধূমপানের নেশাই প্রাচীনতম এবং বহুল প্রচারিত। আপনি যদি ধূমপান না করেন তবে কোন একদিন কারও মুখে নিশ্চয়ই শুনেছেন সেই বিস্মিত উক্তি: 'সিগারেট খান না কি মশায়!!' প্রবাদ আছে যাঁরা ধূমপান করেন তাঁরা নাকি স্বভাবতই ফূর্তিবাজ লোক হন্। কথাটা কতখানি সত্যি সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। শোনা যায়, জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হিটলার নাকি কোনদিন ধূমপান করেন নি। তাই বুঝি তিনি অতো উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন?

আমাদের আলোচনার বিষয় অবশ্য সেটা নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন আপনার ধূমপান করার ধরণ দেখে, মানে আপনি সিগারেট, সিগার বা পাইপ যা-ই খান্ না কেন, সেটা ধরাবার বা টানবার ধরণ দেখে আপনার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকখানি আভাস দেওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ লোক সিগারেট বা বিড়ি ধরেন তর্জনী এবং মধ্যমার ডগার দিকে। আঙুল দু'টো ভেতরের দিকে সামান্য বাঁকানো থাকে। এই জাতীয় লোকেরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির এবং আত্মনির্ভরশীল। এঁদের বিচারজ্ঞান খুব সূক্ষ্ম, ফলে বিয়ের ব্যাপারে আদর্শ স্বামী হতে পারেন এবং আদর্শ পিতা বলেও এঁরা খ্যাত। অযথা কল্পনাবিলাস ভালবাসেন না, যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেন।

বাঁ হাতে সিগারেট ধরা যাঁদের অভ্যাস এবং টান দেবার সময় বেশ জোরে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরেন মুখের মাঝখানে, মনোবিজ্ঞানীদের মতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রেণীর লোক। জীবনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা কৃতকার্যতা লাভ করেন। মানুষ চেনার ক্ষমতা এঁদের খুব বেশি। ব্যবসার ক্ষেত্রে বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। অনায়াসেই সাফল্য আসে এঁদের জীবনে ভগবানের আশীর্বাদের মত।

খুব ঘন ঘন এবং সংক্ষিপ্ত টান দেওয়া যাঁদের অভ্যাস এবং অর্ধেকটা খাবার পরই সেটা নিভিয়ে অন্য একটা ধরাতে যান; তাঁদের ব্যক্তিত্ব দুর্বল। কোন কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে এঁদের ঘোরা পথে যেতে হয়। জীবনে চলার পথে ভুল করেন অনেক। সত্যিকারের কয়েকটি বন্ধু লাভ করার চেয়ে অল্পপরিচিত অনেক বন্ধুবান্ধব লাভ করাই এঁদের কাম্য ফলে জীবনে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রতে হয় সুখী হবার জন্যে।

আবার এমন অনেক লোককেও দেখবেন যাঁরা সিগারেট জ্বালিয়ে ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে রাখেন এবং সমস্ত সিগারেটটা জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটি টানও দেন না। এরকম লোক দেখলে আপনি বিনা দ্বিধায় ব'লে দিতে পারেন যে তিনি সেই প্রকৃতির মানুষ যাঁরা অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসেন, কিন্তু কচিৎ এমন কিছু করেন বা বলেন যা লোকের মনকে আকর্ষণ করে। এঁদের কথার বা কাজের কোন স্থায়িত্ব নেই। কোন কথা দিলে এঁরা সে কথা যে রাখবেনই এরকম বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

পাইপে লাগিয়ে যাঁরা সিগারেট খান তাঁরা সাধারণত বুদ্ধিমান, উৎসাহী এবং দোষদর্শী (fastidious) অর্থাৎ অন্যের দোষ ধরা এঁদের একটা স্বভাব। এঁদের ভাব দেখে মনে হয় যেন হাত দিয়ে সিগারেট ছুঁয়ে নোংরা করতে চান না এবং চোখে ধোঁয়া লাগা মোটেই সহ্য ক'রতে পারেন না। এঁরা অল্পেতেই রেগে যান, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ঠাণ্ডাও হ'য়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নেন। এই শ্রেণীর লোকেদের একটা না একটা সূক্ষ্ম কলা বা শিল্পের প্রতি ঝোঁক থাকবেই। আর পোষাক-পরিচ্ছদ হয় খুব পরিপাটি এবং যতদূর সম্ভব নিখুঁত।

অনেকে সিগারেট ধরেন তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে। আঙুল দু'টো বৃত্তের মত হ'য়ে থাকে; এ রকম লোক অহংকারী হবেনই। এঁদের সিগারেট টানবার ধরণটা লক্ষ্য করলেই দেখবেন, মনে হবে যেন সিগারেট খেতে খুব খারাপ লাগছে! ধোঁয়া টেনেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেন। এই জাতীয় লোকেরা অমার্জিত রুচিসম্পন্ন। নূতন জিনিষকে গ্রহণ করতে পারেন না সহজে, পুরোণোটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। ঘরের টান এঁদের খুব বেশি, জীবনে কোন দুঃসাহসিক কাজ করেন না কোনদিন। ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করার একটা না একটা সূত্র এঁরা ঠিক খুঁজে বার করে নেন।

তর্জনী এবং মধ্যমার একেবারে গোড়ার দিকে (হাতের তালুর কাছে) যাঁরা সিগারেট ধরেন এবং টানবার সময় আঙুলের আড়ালে মুখ ঢাকা প'ড়ে যায়, তাঁরা হচ্ছেন গোপনকারী স্বভাবের। অপরাধ প্রবণতা দেখা যায় এঁদের মধ্যে। নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবেন এবং সেই রকম ব্যবহার করেন অন্যদের সাথে। হাস্যরসের ভক্ত এঁরা কিন্তু সে হাস্যরস নির্দোষ নয়—অন্যকে ঠাট্টা করা বা আঘাত দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য।

এ তো গেলো সিগারেট খাবার কথা। সিগারেট নেভাবার ধরণ দেখেও অনেক কিছুই বোঝা যায়।

অনেকে দেখবেন নেভাবার সময় সিগ্যারেটটা এত জোরে চেপে ধরেন যে কাগজ ছিঁড়ে দোক্তা বেরিয়ে আসে। এঁদের সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু হতাশা আর মনোবলের অভাবে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেন নি।

কথা বলবার সময় অনেকে আনমনে জ্বলন্ত সিগারেটটা নিয়ে খেলা করতে থাকেন। এই জাতীয় লোকেরা খুব কল্পনাপ্রবণ এবং সজীব। সময়ের মূল্যজ্ঞান এঁদের খুব বেশি। সামান্য সময়ও বৃথা নষ্ট করতে চান না। আঙুলগুলো অবচেতন মনের তাড়াতে চালিত হ'য়ে মনের অধৈর্যতা প্রকাশ করে।

ইচ্ছা ক'রে বা অন্যমনস্ক ভাবে যাঁরা ধোঁয়ার রিং ছাড়েন, তাঁদের কখনও বিশ্বাস ক'রবেন না। এরকম লোকদের চোখের দিকে লক্ষ্য করলেই দে'খবেন কেমন গর্বিতভাবে তাকিয়ে থাকেন ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে। এঁরা কেবল নিজের স্বার্থই চিন্তা করেন। এই রকম লোকের পাশে ব'সে কিছু ব'লে যান, মনে হবে সব কথা মন দিয়ে শুনছেন কিন্তু আসলে আপনার কথার একটি বর্ণও তাঁদের কানে ঢোকে নি। এঁরা স্বার্থপর প্রকৃতির ব'লেই নিজের কথা ছাড়া অন্যের কথা ভাবেনই না।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে তাঁরাই নাকি নারীদের কাছে আদর্শ পুরুষ যাঁরা পাইপে ধূমপান করেন। এঁদের ধূমপানের পদ্ধতিটি বেশ সুচিন্তিত। কত গভীর মনোযোগ যখন পাইপে দোক্তা ভর্তি করেন বা ধূমপানের পর পাইপ পরিষ্কার করেন। সত্যি কথা ব'লতে গেলে সিগারেটের চেয়ে পাইপ অনেক বেশি পুরুষত্ব ব্যঞ্জক।

আন্তর্জাতিক পানীয় 'চা' প্রসংগে

আজ চা-এর পরিচয় দিতে বসলে অনেকেই হয়ত বিরক্ত হবেন। কিন্তু আজ চা-এর এই প্রচারবহুল যুগকে এক কালের অনেক প্রতিকূলতার সংগে সংগ্রাম করে তবে আসন করে নিতে হয়েছে। চা-এর জনপ্রিয়তার পেছনে আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। অন্যান্য পানীয়গুলোর তুলনায় চা'র জনপ্রিয়তা খুব দ্রুতগতিতেই হয়েছে। অবশ্য এর পেছনে কতকগুলো কারণও আছে। এর গুণগত দিকটা ছাড়াও অর্থনৈতিক দিকটাও এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। ইংরেজ আমলে কেবল সাহেবী ভাবাপন্ন ভারতীয়েরাই চা-এর পক্ষপাতিত্ব করতেন ইংরেজ অনুকরণের অন্ধতার বশবর্তী হয়ে। বস্তুত চা বলতে তখন সাহেবী আনার একটা মুখ্য অঙ্গকে বোঝাত। কিন্তু কালক্রমে এই চা হয়ে দাঁড়াল সর্বভারতীয় পানীয়। অবশ্য এর পেছনে ইংরেজদের প্রচেষ্টার দিকটাও নগণ্য ছিল না। অর্থাৎ ইংরেজদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং দেশীয় পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় সেদিন চা ভারতবাসীর 'সখের পানীয়' হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। সমসাময়িক একটি গ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

'পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং ইংরাজদের অনুকরণ প্রবৃত্তি হেতু ও কালধর্মে আজকাল সহর ও মফস্বলের অনেক বাঙালী জল ব্যতীত' চা পান করিয়া থাকেন। চা পান আজকাল অনেক শিক্ষিত বাঙালীর নিত্যকর্ম।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, চা সবেমাত্র তখন বাঙলা ও বাঙালীর জীবনে প্রবেশ করেছে এবং ধীরে ধীরে তার আসন প্রতিষ্ঠা করে নিতে উদ্যত হচ্ছে। নীলকর সাহেবদের মত সেকালের চা শিল্পপতি সাহেবরা চা-এর প্রচলনের জন্যে নানা রকম প্রচারকার্য চালাতেন। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তাঁরা নানা প্রকার অপপ্রচার করে সত্যের অপলাপ করতেন। চা খেলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস পায়, এই ধরণের নানা রকম ভিত্তিহীন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁরা চায়ের প্রচার করেছিলেন। সরকার পর্যন্ত এ সম্পর্কে নেপথ্য প্রচেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সেকালের গ্রন্থাদিতে জানা যায় যে, কোন বিখ্যাত চা কোম্পানী কোলকাতার নানা জায়গায় চা পানের জন্যে চায়ের স্টলের ব্যবস্থা করেন সেখানে ভোরবেলা এক পয়সার তৈরি উষ্ণ চা'র মাধ্যমে শহরের সাধারণ মানুষ চায়ের আস্বাদ মিটিয়ে নিত।

ইংরেজদের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে চা একটু একটু করে আমাদের সভ্যতাতে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে। আজ ভোরে আর সন্ধ্যায় এক কাপ চা না পেলে সমস্ত দিনটা ব্যর্থ হয়ে যায় এমন মানুষ কলকাতা তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও প্রচুর। চা আজ বাঙালীর তথা ভারতবাসীর তথা সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক পানীয়। কি পল্লীর শান্তস্নিগ্ধ জীবনে, কি শহরের কলরোলে, কি সৈন্যদের সমাবেশে কোথাও আজ চা ছাড়া ভারতবাসী কর্মক্ষেত্রে আগুয়ান হতে পারবে না। ভারত আজ পৃথিবীর অন্যতম বহুল চা-পায়ীর দেশ। চায়ের প্রথম উৎপত্তি স্থান সম্পর্কে বোধ হয় আজও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সন্দেহের নিরসন হয় নি; কারও কারও ধারণা যে চা সর্বপ্রথমে ভারতেরই আসামে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু অপর দলের মতে চায়ের জন্মস্থান চীন দেশ। খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী আগেও নাকি চীনে চায়ের প্রচলন ছিল। কিন্তু সেখানে প্রচলিত একটি প্রাচীন কিংবদন্তী বলে যে 'বোধিধর্ম' নামে জনৈক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারত থেকে প্রথমে চা চীন দেশে নিয়ে যায়। সে যাই হোক না কেন এর থেকে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয় বা সঙ্গতও নয়। চীন থেকে চা জাপানে এবং জাপান থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ইংলণ্ডের চা-এর প্রসার ঘটে। পরে ইংলণ্ড থেকেই ইংলণ্ডের ভারত প্রবাসীরা এদেশে চা-এর ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। এঁরাই প্রথমে ব্যবসার খাতিরে—বাঙলা দেশের আসাম, দার্জিলিং অঞ্চলে চা বাগান ও চা শিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এই হ'ল বাঙলায় চা তৈরির প্রথম পদক্ষেপ।

এই চা কোম্পানী ও চা বাগানগুলো চা-কর সায়েব অর্থাৎ ইংরেজদেরই প্রথমে একচেটিয়া ছিল। চা চাষ সর্বত্র সম্ভবপর নয় এবং চা সব জায়গায় জন্মেও না, তাই চায়ের চাষ ব্যয়সাধ্য। প্রথমে চা আমদানী হত ওদেশ থেকে, পরে এখানে এসব টী ফ্যাক্টরীগুলো ইংরেজ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। আগেই বলেছি চা চাষ সর্বত্র সম্ভবপর নয়। চায়ের জন্যে প্রাকৃতিক পরিবেশও চাই স্বতন্ত্র। তা ছাড়া চা খুব ব্যয়সাধ্য কৃষি' বীজ থেকেই চা গাছের চারার জন্ম। চায়ের নার্শারীতে চারা তৈরি করা হয় বৈজ্ঞানিক যত্ন নিয়ে। তারপর সে চারা সেখানে বছর তিনেক সযত্নে পালন করবার পর ক্ষেতে রোপণ করা হয়। পার্বত্য পরিবেশেই চায়ের চাষ ভাল হয়। কারণ চায়ের ক্ষেতে স্বল্পতাপবিশিষ্ট পর্যাপ্ত আলো-হাওয়া ও প্রচুর বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বৃষ্টির জলও আবার চা গাছের গোড়ায় জমবে না তাই পার্বত্য প্রদেশ ছাড়া এ সুবিধেগুলো পাওয়া যায় না বলে সেখানেই চায়ের চাষ হয়ে থাকে। চার-পাঁচ ফুট অন্তর চায়ের চারা রোপণ করা হয়। পাঁচ থেকে আট, ন' বছরের মধ্যেই চা-গাছ বেশ ঘন ডালপালা নিয়ে বড় হয়ে উঠলেই এর নিয়মিত ছাটাই-এর ব্যবস্থা করতে হয়।

চা-গাছ খুব যত্নসাপেক্ষ, নিয়মিত যত্ন না নিলে এ-গাছ সহজেই মরে যায়। চা-গাছ পাঁচ থেকে সাত, আট ফুট উঁচু হয় এবং ঘন পত্রাবলীতে সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এর পাতা দেখতে অনেকটা তেজপাতার মত হলেও বেশ চওড়া আর বেশ বড় হয়ে থাকে। এর শিরা-উপশিরার সংখ্যাও বেশি। চায়ের ফুল সাদা রঙের, এতে মৃদু সুরভি থাকে। আর এর ফলগুলো হয় গোল, অনেকটা সুপারী বা ঐ জাতীয় গোলাকার বস্তুর মত এবং ভেতরে থাকে পদ্মবীজের মত একটি বীজ। পরিণত চা-গাছের আয়ু সুদীর্ঘ। এদের একশ' বছরের ওপরেও বাঁচতে দেখা গেছে। চা-গাছের পাতা এক হ'লেও গুণাগুণ অনুসারে এদের ভাগ

করা হয়ে থাকে, যেমন উৎকৃষ্ট 'অরেঞ্জপিকো'; নিকৃষ্ট 'সুচং'। চা-পাতা গাছ থেকে পাড়লেই হল না। এ পাতা পাড়বার ও চা তৈরি করবার অনেক নিয়ম বা যান্ত্রিক পদ্ধতি আছে। প্রথম যুগে চা-পাতা গাছ থেকে পাড়বার পরে এগুলো কাটাই হ'তো; তারপরে ওগুলো জ্বলন্ত অঙ্গারের তাপে শুকিয়ে নেওয়া হ'তো। এর নাম ছিল গ্রীণ চা বা গ্রাণ টী। আর এক শ্রেণীর চা ছিল এর নাম ব্ল্যাক টী। কাটাই-এর পর এই শ্রেণীর চা তৈরি করতে হলে ওগুলো রোদে শুকিয়ে নিয়ে তারপরে জ্বলন্ত অঙ্গারে সেগুলো কালচে করে নেওয়া হ'তো। এই শ্রেণীর চা'কে বলা হত ব্ল্যাক-টী।

আধুনিক যুগে অবশ্য এ প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। এখন চা-পাতা আহরণ থেকে শুরু করে চা তৈরি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংঘটিত হয়ে থাকে। চা-গাছের দু'টো পাতা এবং একটি কুঁড়ি নিয়ে ওগুলো শুকিয়ে রোলিং ও ফার্মেন্ট করে তবে চা ব্যবহারোপযোগী করা হয়। শুকনো চা-পাতা একযোগে বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে ট্যানিন নামক অংশ বেরিয়ে এসে চা-এর স্বাদ তেঁতো করে দেয়। এই চা পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। চায়ের মধ্যে য়্যলবুমেন, মিনারাল সল্টস্ এবং তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া গেছে। এছাড়া জল, থিন, এ্যসনসিয়াল সয়েল, ট্যানিন, নাইট্রোজেনাস পদার্থ, চর্বিময় পদার্থ, বর্ণের উপাদান, ডেক্সটিন ইত্যাদি হচ্ছে চায়ের উপাদান, তবে এগুলো ছাড়াও শুকনো চায়ে পাওয়া যাবে অন্যান্য নাইট্রোজেনাস পদার্থ ও কাষ্ঠতন্তু এবং পাংশুময় পদার্থ।

মোটামুটি ভাবে এই হল চায়ের উপাদানগত গঠন।

প্রত্যেক জিনিসেরই দু'টো দিক থাকে, একটি ভাল এবং অপরটি মন্দ। চায়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। চা'কে কখনও নিত্য ব্যবহার্য পানীয় মনে করে ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু আজ আর কেউ সে কথা বিচার করে চা পান করেন না। চা সাধারণত শীতপ্রধান দেশের উপযোগী পানীয় হলেও আজ পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদৃত। শীতের প্রাবল্যে এবং বর্ষার আধিক্যে চা-এর পরিমিত ব্যবহার মানসিক স্ফূর্তির আকর হলেও এর অত্যধিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। স্নায়বিক সাধারণ অবসাদে বা নিদ্রালুভাবে বা আলস্য দূর করতে চা-এর আশ্চর্য রকম পরিমিত উত্তেজক ক্ষমতা আছে। তবে চা-এর উত্তেজক ক্ষমতা পরিমিত বলে এটা শরীরে বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। তাই চা মাদকদ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। অথচ অপরপক্ষে এর কয়েকটি গুণও আছে। চার মধ্যে এমন একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে যার ফলে চা শ্রমনাশ, ঘাম ও মূত্রবৃদ্ধি এবং আলস্য দূর করে দেহ ও মন সজীব করতে সক্ষম। বোধ হয় এই কারণেই চা আজ নেশায় পরিণত হয়েছে। শিরঃপীড়ায় চা ঔষধস্বরূপ না হলেও এর অপরিমিত ব্যবহার কখনও সুফল বা হিতকারক নয়। এর ফলে অজীর্ণ বা কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে। মাত্রাহীনভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ কড়া চা পান করলে ক্ষুধা নাশ হয়ে পেটের গোলমাল বা দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষুণ্ণতা আনতে পারে। তাই অপরিমিতভাবে চা পান করলে চা-এর নারকটিক পয়জন শরীরে জমা হতে থাকে ও শরীরের বিশেষ ক্ষতি করে।

কিন্তু আজ চা-পায়ীদের কাছে লাভালাভের প্রশ্ন তুলতে যাওয়া বাতুলতা। লাভালাভের কথা চিন্তা করে আজ চা পান করাকে মানুষ হাস্যকর মনে করে। পল্লীর সরল জীবনে আর শহরের জটিলতায়, পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে আজ চা যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে, সে স্বীকৃতি অতুলনীয়। পার্টিতে টেবিলে, রেস্তোরাঁয়, রান্নাঘরে আর স্টেশনে, ট্রামে বাসে রাস্তায় কোন জায়গায় আজ চা দুষ্প্রাপ্য নয়। ছোট শিশুও আজ মায়ের দুধের সাথে সাথে চা'কেও চিনতে শেখে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একটি ছোট ধূমায়মান আন্দোলিত কাপে তৈরি চেতিন্য মতো তৃপ্তি পায় সে কাছে একটা গোটা রাজত্বসহ রাজকন্যে পাবার তৃপ্তি অতি নগণ্য।

চা বিন্দুতে সিন্ধু, কবির কল্পনা আর লেখকের গল্পের প্লট। যখন আপনার সাংসারিক অবের তিন মাসের বাকী ভাড়ার জন্য বাড়িওলার নোটিশ পাবেন কিংবা ছেলেদের মাইনে দেবার টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হবেন, অথবা কাবুলীওয়ালার তাড়া খেয়ে 'কাট' মারবার চেষ্টা করবেন, তখন যদি রেস্তোরাঁনিকাস নিয়েন রেশোয় যাবার মত খুচরো জোগাতে না পারেন, তবে ঢুকে পড়ুন সামনের দোকানে, এগিয়ে দেওয়া চা-এর পেয়ালায় ফুঁ দিয়ে সমুখে তুলুন, আর চুমুক দিয়ে রসনাকে তৃপ্ত করুন, হলফ করে বলছি; আপনার মনে হবে যে—হাঁ, একটা কিছু করেছি। —শ্রীঅমিত দাশগুপ্ত

বোধন

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

ব্যথ-বিদীর্ণ জড়তা-জীর্ণ কেরাণী-কীর্ণ এই
দেশের চিত্ত খণ্ডিত নিত্য যে মহা বিড়ম্বন,
লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রাণের অঙ্গনে আজি সেই
মহতো মহতী মহাশক্তির তরে যে উদ্বোধন।

পদে পদে পদস্খলিত যেখানে চলিতে বিঘ্নলাজ
সত্য যেখানে ক্লিষ্টমলিন মিথ্যার কালিমায়;
দুর্গত সেই দুর্গম-দেশে দুর্গা এসেছে আজ,
ভুলে বাস্তিবির ব্যথা দুর্বার আয় ছুটে সবে আয়।

শক্তি-পূজারী, মুক্তি-ভিখারী, কে তোরা ভাগ্যবান,
অর্পিত তাঁরে, জাগ্রত তাঁয় বল 'দুর্গা কি জয়';
পূত পদাব্জে ভকতি পুষ্প অঞ্জলি করে দান
চেয়ে দেখ ঐ দশহাতে ভরা আছে তার বরাভয়।

আছে চিরসুখ, শান্তি, সিদ্ধি, ধন, জন, যশ, জয়,
দুর্গা যখন এসেছে সকল দুর্গতি পাবে লয়।

একটি আদিম রোবট

জুলফিকার

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার—রোবট বা কলের মানুষ। যদিও এর বুদ্ধি বা হৃদয় বলে কিছু নেই এবং আবেগ বা মানসিক প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনেও এ অক্ষম, তবুও নবাবিষ্কৃত ইলেকট্রনিক ব্রেণের সমন্বয়ে, এই যান্ত্রিক মানব সত্যিকার মানুষের চেয়ে ঢের বেশি নিখুঁত ও অধিকতর ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করতে পারে।

দু'শো বছর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কলের পুতুল ছিল। স্প্রীংয়ের সাহায্যে তারা নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করতে পারত। টুপী খুলে, মাথা নীচু করে 'বাও' (bow) করত ; নর্তকী ঘুরে-ফিরে নাচ দেখাতো ; মাতাল সাহেব ডান হাতের বোতল থেকে বাঁ হাতে ধরা গেলাসে মদ ঢেলে, চুমুক দিত ; ঘড়িতে প্রহর বাজার সময়, জমকালো পোষাক-আঁটা সেপাই, ঘড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে, মুখে বিউগল্ তুলে তূর্যধ্বনি করত,—যতটা বাজে ততবার।

●

পিয়্যের ঝিলো (Pierre Gill'o) বলে জনৈক ফরাসী কারিগর, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এক অত্যাশ্চর্য যন্ত্রমানব তৈরি করেছিলেন,—যে একাধারে চিত্রশিল্পী ও সুরজ্ঞ। কোন লোককে সামনে এনে দাঁড় করালে, আশ্চর্য তৎপরতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে অবিকল তার ছবি এঁকে দিতে পারত। আবার হাতে বেটন নিয়ে, অর্কেষ্ট্রা পরিচালনাও করতে পারত, অভিজ্ঞ conductor-এর মত।

●

১৯১০ সালের কথা।

P. L. M. কোম্পানীর এক্সপ্রেস ট্রেন,—অত্যন্ত আরামপ্রদ গাড়ি, তুলোঁ (Toulon) স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। বেশির ভাগ যাত্রীই নীসের কার্নিভাল(১) দেখতে চলেছে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে, ছুটতে ছুটতে একজন লোক এসে গাড়ির পাদানির উপর লাফিয়ে উঠল। ফ্রেডরিক লীস্ (Lees) বলে একজন ইংরেজ সাংবাদিক করিডরে, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দরজা খুলে কামরায় ঢুকতে গিয়ে, আগন্তুক লীস সাহেবের গায়ে লাগালেন এক ধাক্কা।...আর একটু হলে লীস পড়ে যাচ্ছিলেন, কোন রকমে সামলে নিলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকের বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, ভারী দেহ। গাড়ির গদি-আঁটা বেঞ্চের ওপর ধপ করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। পকেট থেকে একখানা লাল রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বিনীত স্বরে মাপ চাইলেন,—

'Mille pardons, je vous en prie ...নীসের কার্নিভালে আজ রাতে আমার কৃত্রিম মানুষের (অম্ আর্তিফিসিয়েল) খেলা দেখানোর কথা। গাড়ি ধরতে না পারলে কি মুস্কিলই না হত,...Mon Dieu !'

লীস সাহেব লোকটার কথায় কান না দিয়ে হাতের খবরের কাগজ খুলে বসলেন। ছোট্ট কুপেতে এঁরা দু'জন ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না। 'Homme Artificiel' কথাটা শুনে, আর যে রকম পড়ি-মরি করে লোকটা এসে ঢুকলো গাড়িতে—তাতে, তাকে রক্ষীদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে আসা বাতুলাগারের বাসিন্দা বলেই মনে করাটাই স্বাভাবিক। লীসেরও তাই মনে হয়েছিল প্রথমটা।

ওর দিকে একটু ভাল করে নজর দিতেই তাঁর সে ভুল ভেঙে গেল। লোকটার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বরঞ্চ তাতে বেশ একটু কৌতুকের ঝিলিক। গোলগাল মুখখানিতে প্রশান্ত প্রসন্নতা। লীস বুঝলেন লোকটা মার্সেলের (ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা সচরাচর দিলদরিয়া ও কথাবার্তায় চটপটে হয়ে থাকে)। একটু আলাপ হতেই লোকটার জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস জেনে ফেললেন সাংবাদিক ফ্রেডরিক লীস।

রোন নদীর ধারে লিঁয় (Lyons) সহরে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলায় খুব অসুখে ভুগেছেন।

আমাদের দেশে যেমন পুতুল নাচ, বিলেতে যেমন পাঞ্চ এ্যাণ্ড জুডি শো, ফরাসী দেশে তেমনি মারিয়নেৎ (Marionette) থিয়েটার। শৈশব থেকেই এই পুতুল নাচের দিকে ভদ্রলোক আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কৌতূহলী মন নিয়ে, পুতুল নাচিয়েদের সংস্পর্শে এসে এইসব অভিনয়কারী মূর্তিগুলোর অনেক রহস্যই তিনি জেনে ফেলেছিলেন। এরপর একটু বড় হয়ে তিনি যন্ত্রবিদ্যায় চর্চা সুরু করলেন এবং কলকব্জার ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ খানিকটা পারদর্শিতা অর্জন করে ফেললেন। এরপর বিয়ে করলেন এমন একজন মহিলাকে, যিনি যন্ত্রবিজ্ঞানে বিশেষ অনুরাগিণী এ রকম যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে থাকে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে আর

১। নীসের এই কার্নিভালের মত এত প্রাচীন ও এত বড় প্রসিদ্ধ মেলা বর্তমানে সমগ্র ইউরোপে আর কোথাও নেই। রাশিয়ার নিঝনী নোভোগোরদের (Nijni Novogorod, বর্তমান নাম Gorki) মেলা অবশ্য এর চেয়ে বড় ছিল (নোভোগোরদের মেলা এখন বন্ধ হয়ে গেছে)। গ্রীকদের আমল থেকে নীসের এই উৎসব ও মেলা চলে আসছে। গ্রীকদের এটা ছিল ফুল উৎসব, অনেকটা আমাদের প্রাচীন বসন্তোৎসবের মত। যুবক-যুবতীর বাধাবন্ধহীন মিলনের দিন ছিল মেলার সময়। নীসের এই কার্নিভালে বহুদেশ থেকে লোক সমাগম হয়ে থাকে। কয়েকদিনব্যাপী একটানা ফুর্তি ও হৈ-হুল্লোড়ের ধুম পড়ে যায়,—বিশেষত মার্কিন দর্শকদের আগমনে। নীস হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের রিভিয়েরা উপকূলে। প্রমোদকামী ভ্রমণকারীদের পরম আকর্ষণীয় স্থান।

প্রায় বছর পনের ধরে একটা যান্ত্রিক মানুষ নির্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। অবশ্য অনেকটা সাফল্য লাভও করেছেন।

গল্প বলতে বলতে ফরাসী ভদ্রলোক পকেট থেকে একখানা কার্ড বার করে সহযাত্রীর হাতে তুলে দিলেন,—তাতে লেখা:

PIERRE GILL'O
Manager et Inventeur Brevete'
DE L'HOMME ARTIFICIEL
? Qui dessine ?(২)
VILLA GILL'O
Cros-de-Cagnes (Pre's Nice)

জিলোর সৃষ্ট এই কৃত্রিম মানুষটি তা হলে শিল্পী? লীসের মনে কৌতূহল জাগে। ওঁর প্রশ্ন শুনে মঁসিয়ে জিলো একটু উৎফুল্ল হলেন বলেই বোধ হল। লীসের দেওয়া চুরুটটা ধরাতে ধরাতে বললেন,—

'তা মশাই, আমার ক্ষুদে মানুষটি ছবি ভালই আঁকতে পারে। বছর পনের আগে কলের মানুষ তৈরি করবার খেয়ালটা যখন মাথায় চেপেছিল, তখন ভাবলুম, এমন একটা পুতুল বানাবো, যার অঙ্গ পরিচালনা মারিয়নেত্তের মত আড়ষ্টভাবে বা হঠাৎ ঝাঁকা দিয়ে না হয়ে, সহজ ও সাবলীলভাবে হয়, আর তার মুখে-চোখে ভাবের অভিব্যক্তিও যেন খানিকটা ফুটে ওঠে। সব কিছু না হোক, অন্তত সুখ, দুঃখ, হাসি বা বিরক্তির ভাবটা যেন প্রকাশ করতে পারে। আর ওকে চালনা করতে সুতো বা তার টানার দরকার যেন না হয়। কিছুটা থাকবে কলকব্জার কেরামতি, আর বাকীটা চলবে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায়।'

●

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে চললেন, 'আরে মশাই, কি ভাবে যে কাজ চালিয়েছি এ ক'বছর, একমাত্র ভগবানই জানেন! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, অবসর বিনোদনের বালাই নেই—শুধু কাজ আর কাজ। কতবার যে প্ল্যান পাল্টেছি, আর কতবার যে পুতুলের তৈরি কাঠামোটা হতাশায় দূরে ঠেলে ফেলেছি, কি বলব! যেই নৈরাশ্যের ভাবটা কেটে গেছে, অমনি আবার পুরানো কাঠামোটাকে নিয়ে নতুন করে রদ-বদলের কাজ আরম্ভ করেছি। কয়েকটা কাঠের টুকরো, কতকগুলো কাপড়ের ফালি আর লোহার চাকা আর স্প্রী—এই সব দিয়ে কি করে পুতুলটাকে একটা মঁমার্তর (Mont Martre) শিল্পীতে দাঁড় করাতে পারি—মাথায় খালি সেই চিন্তাটাই ঘুরছে।···বুঝলেন স্যর, আমি নিজেও একজন আর্টিষ্ট, ব্যুত্তের (Butte) ষ্টুডিওতে কাজ শিখেছি। মুল্যাঁ দ্য লা গালেতের ষ্টুডিওগুলোতে বোহেমিয়ান পটুয়ারা যেমন ছবি আঁকে, আমার পুতুলটাও যদি তেমনি পথ-চলতি লোকদের দাঁড় করিয়ে তাদের ছবি আঁকতে পারত, তবে সবাইকে ডেকে বলতে পারতুম, —'আজ কি জীবন্ত শিল্পীদের কাছে গিয়ে, চলে এসো আমার এই যান্ত্রিক শিল্পীর কাছে। অনেক কম সময়ে সে তোমাদের চমৎকার ছবি এঁকে দেবে।···'

●

'নিষ্ফলতার পর নিষ্ফলতা! কিছুতেই ঠিকমত হয়ে উঠছে না। —যেন একটা অসাধ্য—অসম্ভব কাজ হাতে নিয়েছি। উপর্যুপরি ব্যর্থতার আঘাত কিন্তু ভেঙে ফেলতে পারে নি আমার মনের দৃঢ়তাকে। শ্রম ও সময়ের ক্ষতিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ফের গোড়া থেকে আরম্ভ করি কাজ। সবাই আশঙ্কা করত শেষটায় বেচারী জিলোর মাথাটা খারাপই হয়ে যায় বুঝি! লিয়ঁর রাস্তায় আমার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখে সবাই বলত 'maboul' (মতিচ্ছন্ন)। অনুকম্পা ও বিদ্রূপ মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাতো আমার দিকে। আমাকে দেখিয়ে বলত ঐ পাগলা আবিষ্কারক চলেছে।···অবশ্য আমার স্ত্রীর যত্ন, সহানুভূতি ও উৎসাহ ছিল বলেই নৈরাশ্যের তীব্র আঘাত আমি সহজেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।'

●

'যা হোক, অনেক চেষ্টার পর শেষটায় একটা কৃত্রিম মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হলুম,—যার চলন-ফেরন অনেকটা তাজা মানুষের মত। তবে লোকচক্ষুর সামনে তাকে হাজির করবার ইচ্ছে তখনও জাগে নি।

আমার কেমন একটা জিদ চেপেছে যে যারা আমাকে loufoque (ক্ষ্যাপা) বলে তাদের হকচকিয়ে দিতে হবে। ঠাট্টা যেন শেষকালে প্রশংসায় পর্যবসিত হয়। এটা ছিল আমার পয়লা নম্বর মডেল।

আরও দু'বছর কাজ চালিয়ে বানালুম ওর চেয়ে উন্নত ধরণের দুই নম্বর মডেল, এটা সত্যিই দশজনকে দেখানোর মত।'

●

'দক্ষিণ আমেরিকার ব্যুয়েন এয়ারিস (Buenos Ayres) সহরে এসেছি। 'কোলিসিও আর্জেন্টিনো'তে আমার বেলুমানের প্রদর্শনী হবে। হল-ভর্তি কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত মঞ্চশিল্পী কোকেল্যাঁ (Coquelin)।(৩) ভাঁড়ারে দর্শকের মাঝে বক্সে উপবিষ্ট কোকেল্যাঁর ওপরই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। স্টেজের ওপর যখন মাদাম জিলো আমার ক্ষুদে মানুষটিকে (petit bonhomme) সবার কাছে পরিচিত করে দিচ্ছিলেন,—সেই থেকে প্রদর্শনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত, এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই নি। মনে হল, আমার সৃষ্টি তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

২। কি দেসিন্ (কে আঁকে?)

৩। বেনোয়া কঁস্তাঁ কোকেল্যাঁ (Benoi Constant Coquelin)—বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা। প্রথম অভিনয়ে নামেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে থেয়াতর ফ্রাঁসে এবং অল্পদিনের মধ্যেই যশস্বী হয়ে ওঠেন। কবিতা-আবৃত্তিতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। তিনি অনেকগুলো বইও লিখে গেছেন যেমন, ল্যার এ লে কমদিয়াঁ (L'Art et le comediun) মলিয়্যার এলে মিসানত্রপ, (Moliere et l'a misanttuope) ইত্যাদি।

আনন্দে আকুল হয়ে, এই স্মরণীয় মুহূর্তটিকে ধরে রাখবার জন্য কাগজ-পেনসিল হাতে নিলুম,—কোকের্ল্যার মুখে চোখের বিস্ময় ও কৌতূহলকে যথাযথ রূপায়িত করে তুলতে। ক্রো দ্যে কাঁইয়ে (Cros de Cagnes) আমার বৈঠকখানায় ছবিটা টাঙানো আছে। ওর নাম দিয়েছি 'ক্রোকি দাপ্রে নাতুর' (Croquis d' apres nature) অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি।'

●

'পরদিন ডাকে কোকের্ল্যার সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত পত্র পেলাম। পত্রটি আমার সাথে সাথেই থাকে। এই দেখুন, স্যার!' ভদ্রলোকটি লীসের হাতে একখানা পুরানো ভাঁজ করা কাগজ তুলে দেন। লীস এবার সত্যিই একটু কৌতূহলান্বিত হয়ে ওঠেন, মন দিয়ে পড়লেন চিঠিখানা।...নীচে চিঠিখানার তর্জমা দেওয়া গেল:

রয়েল হোটেল

মঁশিয়ে ফ্রিলো সমীপে— বুয়েনস এয়ারিস

মহাশয়, আপনার কৃত্রিম ক্ষুদ্র মানুষটি সত্যিই বিস্ময়কর, এত সজীব, এত কৌতুকপ্রদ, এত রহস্যময়! কি কৌশলে তাকে দিয়ে আপনি কাজ করাচ্ছেন, তার রহস্য ভেদ করবার আগ্রহ আমার নেই। আমি শুধু আমার হৃদয়ের অপার বিস্ময় জানাচ্ছি।...আর্জেন্টাইন সার্কাসের ম্যাটিনিতে এই যান্ত্রিক মানবটির কার্যকলাপ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। দেখলাম সে স্টেজে এসে সমবেত দর্শকদের প্রতি মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে আসন পরিগ্রহ করল, ছবি আঁকল, সঙ্গীত পরিচালনাও করল, সঙ্গতে ত্রুটি নেই। আপনার এই অপূর্ব সৃষ্টির মাধ্যমে আপনি দর্শকমাত্রকেই প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন বিশেষ আপনার বিশ্বস্ত—সিঃ কোকের্ল্যাকে।

লীসের চিঠি পড়া শেষ হলে ফ্রিলো বললেন, 'আহা! আমার ৩নং মডেলটিকে কোকের্ল্যাকে দেখাতে পারলুম না, এই কিছুদিন হল ওটা শেষ করেছি। এটা তৈরি করতে আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। যন্ত্রবিষয়ক জ্ঞান ওঁর সত্যিই নির্ভরযোগ্য।...'

●

নীস থেকে আট মাইল দূরে ক্রো দ্যে কাঁইয়ে পিয়েরে ফ্রিলোর সুন্দর একটা পল্লীনিবাস আছে। নীসের কার্নিভাল শেষ হলে ফ্রেডরিক লীস, মঁশিয়ে ফ্রিলোর আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তাঁর পেতি বঁ অমের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ স্বচক্ষে দেখে এলেন।

যান্ত্রিক মানুষটা উচ্চতায় চারফুট। খেলা দেখানোর সময় ছাড়া বাকী সময়টা সে গদী-আঁটা বাক্সের মধ্যে বিশ্রাম করে। বাক্সটা স্টেজে আনবার পর মাদাম ফ্রিলো তার ঢাকনাটা খুলে ফেলেন, তারপর তা থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষুদে পুতুলটি। বাইরে এসে মুখ ঘুরিয়ে চারদিকে তাকায়, তারপর সমবেত জনতার উদ্দেশে ঘাড় নীচু করে, টুপীধরা হাতটাকে কায়দামাফিক নেড়ে বাও (bow) করে। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা বেল বাজায়। জানাতে চায় যে অর্কেস্ট্রা বাদন সুরু করা যেতে পারে। তারপর একটা বেটন হাতে নিয়ে অভিজ্ঞ পরিচালকের মত ঐকতান পরিচালনায় রত হয়।...এত চমৎকার তার হাত নাড়াবার ভঙ্গী, এমন তালে তালে তার বেটনটি ওঠা-নামা করে যে সবাই ভুলে যায় সে সত্যকার মানুষ নয়। বিভ্রান্ত হবার কথাই বটে!...মধ্যে একবার গুজব রটেছিল যে, পুতুলটার ভিতরে একটা তালিম দেওয়া বানর লুকিয়ে আছে—সেই সব খেলা দেখায়। এইজন্যে প্রতিটি খেলা শেষ হবার পর, ফ্রিলো পুতুলটির মাথার ও হাতের প্যাঁচ খুলে সেটাকে আলগা করে দর্শকদের সন্দেহভঞ্জন করে দিতেন যে কলকব্জা ছাড়া ওর ভিতরে আর কিছুই লুকানো নেই।

●

বাজিয়েদের মধ্যে কেউ কখনও বেতালা বা বেসুরো হয়ে পড়লে স্টেজের ওপর যে কাঠের ইজেল দাঁড় করানো থাকতো, তারই গায়ে ঠক্ ঠক্ করে গোটা কত বেটনের ঘা মেরে বসত, তাদের সচেতন করে দেবার জন্য। আর যদি বাজনাটা সত্যিই বেশি রকম বেতালা বা বেসুরো হয়ে পড়ত, তবে সে তার বিরক্তি বা হতাশা প্রকাশ করত—দু'হাত দিয়ে কান দু'টো চেপে বা চোখ উল্টিয়ে, চুলের গোছা মুঠি করে ধরে। ভঙ্গীগুলো সত্যিই খুব মনোজ্ঞ। দর্শকদের কেউ যদি হঠাৎ কেসে বা হাঁচি দিয়ে রসভঙ্গ করতেন তবে আর রক্ষে নেই। কটমট করে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে অন্য সবার কাছে তাঁকে হাস্যাস্পদ করে তুলত।

●

ফ্রিলোর অম্ আর্টিফিসিয়েল সবচেয়ে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে চিত্রাঙ্কনে। এটা যে কি ভাবে সম্ভব হয় লীস তা বুঝে উঠতে পারেন নি। তাঁর বিশ্বাস বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এটা হয়ে থাকে।

ছবি আঁকার সময় পুতুলটা বেটন ফেলে দিয়ে ইজেলের সামনে পা ছড়িয়ে বসে। তারপর ডানধারে রাখা ক্রেয়নের বাক্স থেকে একটার পর একটা রঙিন চক তুলে নিয়ে ফরমাইস অনুসারে সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি এঁকে দিত ইজেলের গায়ে। কাইজার, জার, পঞ্চম জর্জ, টেনিসন, টলস্টয়, President Falliers...চটপট দু'চার মিনিটের মধ্যেই ছবি শেষ, নিখুঁত প্রতিকৃতি।

ইচ্ছে করলে ওর সামনে দর্শকদের কেউ সিটিং দিতে পারতেন। অতি দ্রুত তাঁর ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারত। কৃত্রিম মানুষটি লীসেরও একখানা ছবি এঁকেছিল। টুপী বা পোষাকে যে রঙ ছবিতেও অবিকল সেই রঙ। চুল ও চোখের রঙেরও আশ্চর্য মিল।

লীসের কথায়, 'Nothing is more curious than to see the little automaton glancing from his sitter to his work, measuring by aid of his penal; nothing the colour of the face and dress and unerringly selecting the right crayon'.

●

ওর সামনে বসে যাঁরা ছবি তোলাতে চাইতেন তাঁদের নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে হত, যতক্ষণ না ছবিটা শেষ হয়। একটু নড়াচড়া বা উসখুস্ করলেই, ও এমনি সব অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে উঠত যে, অন্য সব দর্শকেরা হেসেই আকুল হতেন।

ফ্রিলোর নাম আজ সবাই ভুলেছে।

সেদিনের যাঁরা আজও বেঁচে আছেন এবং যাঁরা তাঁর কৃত্রিম মানুষের অত্যাশ্চর্য কসরত দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের সেদিনের পরম বিস্ময়ের স্মৃতিটুকু হয়ত আজকালকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পটভূমিকায় ম্লান ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, পিয়েরে ফ্রিলোর মত প্রতিভার আবির্ভাব পৃথিবীতে কদাচিৎ হয়ে থাকে।

সাঁওতালদের বিবাহ পদ্ধতি

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

সাঁওতাল সমাজের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানগুলি অন্যান্য জাতির সঙ্গে মেলে না। এদের মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ কিংবা রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত আছে। সাঁওতাল জাতি বারোটি গোত্রে বিভক্ত—কিস্কু, মাণ্ডি, মুর্মু, হেমব্রম, হাঁসদা, সরেন, বাস্কে, বেশরা, টুডু, চঁড়ে, পাউরিয়া আর বেড়েয়া। কিন্তু এখন এগারোটি গোত্রের লোক তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তারা গোত্রগুলিকে 'পারিস' বলে। স্বগোত্রে তাদের বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, এর ব্যতিক্রম হয় রাক্ষস বিবাহে। আবার বহু বিভাগ দেখা যায় গোত্রের মধ্যে। সেগুলিকে 'খুট' বলে।

বাল্যবিবাহ সাঁওতাল-সমাজে নেই। সাধারণত অবস্থাপন্ন সাঁওতাল পরিবারের ছেলের জন্য পাত্রী দেখা হয় অবস্থাপন্ন পরিবার থেকেই। পাত্রপক্ষের লোকজন ঘটকের সঙ্গে দূরবর্তী গ্রামে পাত্রী দেখতে যায়। যাত্রাকালে কোন অশুভ ঘটনা দেখলে তারা সে বাড়িতে বিবাহ সম্বন্ধ করে না; যাবার সময় গরু বা বাঘের পদচিহ্ন পাওয়া শুভ-লক্ষণ এবং আগুন, সাপ বা স্ত্রীলোকের মাথায় জ্বালানি কাঠের বোঝা দেখা অশুভ-লক্ষণ। উভয়পক্ষের দেখাশুনার পর পাত্রপক্ষ পণের টাকা চুক্তি করে। সাঁওতালী সমাজে পাত্রপক্ষই পাত্রীপক্ষকে পণ দেয়। পণের টাকা ছাড়াও পাত্রপক্ষকে এ সকল দ্রব্য কিনতে হয়; যথা—বাবা ও ভাইয়ের জন্য কাপড়, মায়ের জন্য বারো হাত শাড়ি, ঠাকুরমার জন্য তেরো হাত ও দিদিমার জন্য দশ হাত শাড়ি। পাত্রপক্ষকে এ পাঁচটি কাপড় কিনতেই হয়। বিবাহের দিন ঠিক হলে নিমন্ত্রণপত্ররূপে হলদে সুতোয় গেরো বাঁধা হয়। যতদিন না বিবাহ হবে ঠিক ততগুলি গেরো দিয়ে সুতো বাঁধা হয়। প্রত্যহ একটি করে গেরো খুলে বিবাহের দিন হিসাব করা হয়। আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয় শালপাতার মধ্যে এই গেরো সুতো পাঠিয়ে। গাত্রহরিদ্রার দিন জগমাঝির (প্রধান মাঝির সহকারী) স্ত্রী তিনটি আইবুড়ো মেয়ে জোগাড় করে আনে। আইবুড়ো মেয়ে তিনটি পূর্বদিকে মুখ রেখে গান করতে করতে হলুদ পেষণ করে।

শালপাতার তিনটি বাটিতে পেষা হলুদ রাখা হয়: একটি মারাং বুরু ও জাহের এরার জন্য, নায়কে (পুরোহিত) পূজার কাজে তা লাগান। আর একটি শালপাতার বাটিতে নায়কে ও তার স্ত্রীর জন্য হলুদ থাকে এবং সেই সঙ্গে তেল মেশান হয়। আইবুড়ো মেয়েরা তিনজনে প্রথমে তাদের গায়ে তেলহলুদ মাখিয়ে দেয়। তবে গায়ে হলুদ মাখাবার পূর্বে নায়কে সেই হলুদ নিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করেন—'মারাং বুরু জাহের এরা আর মাড়ে কতুকই ক, তোমরা অলক্ষ্যে থাকলেও এ শুভকাজ সম্পন্ন কর; সোনার শিকল ছিঁড়ে যাক কিন্তু কথা এবং সুতোর বন্ধন না ছেঁড়ে।'

তেলহলুদ মাখা শেষ হলে বরের মা-বাবাকে তেলহলুদ মাখান হয়। এইরূপে তিনজোড়া বা পাঁচজোড়া পরিবারকে তেলহলুদ মাখান হয়। তারপর বরের গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। বরের বৌদিদি বরকে ঘরের ভেতর থেকে বার করে আনে। সে এক হাতে বরের হাত ধরে, অন্য হাতে জলের ঘটি নেয়; বরের পিছনে থাকে মিতবর, তার পিছনে থাকে একজন আইবুড়ো মেয়ে, তার হাতে থাকে থালায় সাজান আতপ চাল, দূর্বাঘাস, প্রদীপ, হলুদের বাটি এবং তেলের শিশি। কাজল, চিরুণী প্রভৃতিও থাকে। আরও দু'জন আইবুড়ো মেয়ে পিছনে থাকে, তাদের একজনের হাতে থাকে তালপাতার বোনা মাদুর। তারা লাইন করে আস্তে আস্তে উঠানে বার হয়ে আসে। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বরের বৌদিদি ঘটির জল একটু একটু করে ফেলে উঠানে তিনবার ঘোরে। সেই সময় গ্রামের মেয়েরা গান গাইতে থাকে। তিতি নামে একজাতীয় পাখির উপমা দিয়ে গান করা হয়; এ পাখিরা কখনও একা থাকে না। গানের পর মাদুর বিছান হয় এবং সকলে একসঙ্গে মাদুরের ওপর বসে। পরে সেই তিনজন মেয়ে একে একে বরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেই দ্রব্যপূর্ণ থালা তিনবার করে ঘুরিয়ে আতপ চাল ও দূর্বাঘাস দিয়ে বরকে স্পর্শ করে। মিতবরকে এইভাবে স্পর্শ করা হয়। গান গাইতে গাইতে তিনজন মেয়ে বরের হাতে, পায়ে, মুখে ও সমস্ত শরীরে তেল ও হলুদ মাখায়।

ওদিকে মেয়ের বাড়িতেও ঠিক এইভাবে কনেকে তেলহলুদ মাখান হয়। সেই তেলহলুদ বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে পূর্বেই পাঠান হয়ে থাকে। তিনদিন এই ভাবে তেলহলুদ মাখানোর পর গ্রামের লোকদের সঙ্গে বিয়ের জন্য কনের বাড়িতে যায়। যাবার সময় একটি ছাগল, চাল-ডাল, তেল, নুন ও মসলা সবকিছুই সঙ্গে নেয়। বরযাত্রীদের বলা হয় 'বারিয়াত'। তারা কনের গ্রামের সীমানায় পৌঁছে অপেক্ষা করে। সেখানকার নাচ-গান ও বাজনার শব্দ শুনে গ্রামের 'গোড়েৎ' (বার্তাবাহক) গ্রামের মেয়েদের নিয়ে বর বরণ করে। তারপর বরকে কনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে বরকে স্নান করান হয়, স্নানের পর বরের ভগ্নীপতি বরকে কাঁধে নেয়; সে সময় আরেকজন কনের ভাইকে কাঁধে তুলে নেয়। তারপর তারা মালাবদল করে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এদিকে কনে বরের দেওয়া হলদে শাড়ি পরে মারাং বুরুকে প্রণামী দিয়ে ডালায় বসে এবং যারা পণের টাকা পায় সেই তিনজন কনেকে ডালাসহ তুলে বের করে। বর আবার ভগ্নীপতির কাঁধে ওঠে। পরস্পর বর-কনের মধ্যে আতপচালের ছোড়াছুড়ি হয় এবং আমডালের পাতা দিয়ে শুভযাত্রার জল ছিটান হয়। বিবাহ মণ্ডপে তিনবার বৃত্তাকারে ঘুরবার পর বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেবার জন্য শালপাতায় মোড়া সিঁদুর বার করে। বর বসুন্ধরার উদ্দেশে তিনবার মাটিতে সিঁদুর ফেলে পূর্বদিকে মুখ

করে ও সূর্যদেবকে সাক্ষী করে কনের সিঁথিতে সিঁদুর লেপে দেয় তিনবার। সেই সঙ্গে সবাই চিৎকার করে ওঠে। পরে বর-কনের বাঁ হাতে পরিয়ে দেয় একটা লোহার চুড়ি। বর নিজেই পুরোহিত সেজে এইভাবে বিয়ের কাজ শেষ করে। সূর্যদেবই বিয়ের সাক্ষী। পরে বর নিজেই কনেকে কোলে তুলে নামিয়ে নিজের পাশে রাখে। সেই সময় বিয়ের বাজনা বাজান হয়। কনের মা মাঙ্গলিক থালা নিয়ে বর বরণ করে কোলে তুলে নিয়ে যান ঘরের ভিতর। সেদিন কনের বাড়িতে নাচগান হয়। নাচগান শেষ হলে পর শুভমুহূর্তে মা-বাবা মেয়েকে বিদায় দেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই চোখের জল মুছতে থাকে।

বিদায়ের পর বরযাত্রী ও কনেযাত্রী সবাই একসঙ্গে বরের বাড়ি যায়। বরের মা বউকে কোলে তুলে বরণ করেন। বর-কনেকে সাদাসিধে ভাবে সাজান একটি কামরায় আনা হয়। কনে এ কামরায় প্রবেশের পূর্বেই বরের বোনেরা কনের কাছ থেকে তাদের পাওনা 'ননদপিঁড়ি' আদায় করে নেয়। বর-কনে তাদের আসন গ্রহণ করলে 'পর বরের এক বোন তাদের পা ধুয়ে দেয় এবং ধুয়ে দেওয়ার দরুণ আবার কনের কাছ থেকে আরো কিছু আদায় করে। তারপর বরের মা, ছেলে ও বৌকে মিষ্টিমুখ করান। তারপর একে একে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরাও বর-কনেকে মিষ্টিমুখ করান। সেদিন বরের বাড়িতে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়। সেদিন অপূর্ব নাচগানের ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত গ্রাম উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠে। পরদিন কন্যাযাত্রীদের বিদায় দেওয়া হয়।

দু'টি কবিতা

অশোক মুখোপাধ্যায়

অমলিন করে রেখ

তোমাদের এত ভালবাসা
আমি কোথায় নিয়ে রাখি,
আমার জীর্ণ বক্ষপিঞ্জরে
কি আছে বল,
ওখানে তো ক্ষয়ের কতগুলো কৃষ্ণ আতঙ্ক
দিনরাত মৌমাছির মত
মাথা কুটে মরছে।

তার চাইতে
তোমাদের ভালবাসা
আমি তোমাদেরই হাতে তুলে দিই,
তোমরা তাকে
অমলিন করে রেখ।

● ● ●

তোমাকে ভালবাসব বলে

তোমাকে ভালবাসব বলে
কৈশোরকে আমি তেপান্তরের মাঠে রেখে এলাম,
যেখানে শঙ্খকড়ির প্রাসাদে
কুঁচবরণ রাজকন্যা মেঘবরণ চুল এলিয়ে
চড়ুইভাতি খেলত।

আহা, সেই সব মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্ররা
যারা কাঠের তলোয়ার হাতে
মেঘের ঘোড়ায় চড়ে
আলোর মত আমার সঙ্গে ভেসে বেড়াত
আমি তাদের সকালবেলার মাঠে রেখে এলাম।

তোমাকে ভালবাসব বলে
আমার রূপকথার দেশ
আমার রাজপুত্রের মুখ
সব পোষা কাকাতুয়ার সঙ্গে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে
আমি তোমার কাছে এসেছি,

এবার তুমি আমাকে ভালবাস।

✻ চার্লস ডিকেন্স ✻

বিপুল সরকার

অবশেষে কয়েকটা প্রহর পেরিয়ে গেলে নিশ্চুপ রাতের নির্জনতায় অন্ধকারের ঘ্রাণ নিতে নিতে লোম্বার্ড স্ট্রীটের বরফ-মৌসুমীর আবরণ পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতেন তের নম্বর ফিজরয় স্ট্রীটের বিশ বছরের মেজাজী ছোকরা চার্লি—চার্লস ডিকেন্স নৈশ অভিসারে। এগিয়ে যেতেন একেবারে শেষতম প্রান্তে। রাস্তার দু'ধারের কুয়াশা ঘেরা আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর ঈষৎ-উন্মুক্ত জানালা দিয়ে নিওন আলোর সাথে ভেসে আসা পিয়ানোর করুণ সুরও তখন সুরপিয়াসী এই তরুণটিকে স্তব্ধ করে দিতে পারতো না। অকস্মাৎ কখন চমকে উঠে সে দেখতো, স্মিথস ব্যাঙ্কের পাশের বাড়িটার সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সেখানে দাঁড়িয়েই সে তার মাথার টুপিটা খুলে ধরে বরফের গুঁড়োগুলো ঝেড়ে নিত। তারপর আবার সেটা মাথায় পরে গ্যাবার্ডিন স্প্যানিশ কোটের পকেটে হাতদুটো ঢুকিয়ে দিয়ে সামনের বাড়ির ঝুলবারান্দার পাশের ছোট ঘরটাকে সে যেন তার অতৃপ্ত দুটি চোখে নিঃশেষে গিলে ফেলতে চাইত।

ঐ ঘরে তার 'ছোট্ট ভেনাস' মেরিয়া বেডনেল তখন তার সোনালী চুলের রাশি বালিশের ওপর অলসভাবে ছড়িয়ে দিয়ে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার মতন অঘোর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে। তরুণটি নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতো—কখন নীল কার্পেট মোড়া মেঝের ওপর দিয়ে মেরিয়ার সোনার বরণ পা দু'টো নিঃশব্দে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু সে ভাগ্য তার কোন দিন হয়নি। অতৃপ্ত আবেগে তাই অনাঘ্রাত আবেশে তরুণটি ফিরে আসতো।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে উৎফুল্ল এই ভাবুক তরুণটিকে দেখা যেত হাউস অফ কমন্সের প্রেস গ্যালারীর নতুন একটা আসনে। আর দেখা যেত ফিজরয় স্ট্রীটের তের নম্বর বাড়িতে সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে। সে ডিকেন্স পরিবারের বড় আদুরে ছেলে চার্লি—চার্লস্ ডিকেন্স।

চার্লির বিশ বছরের বলিষ্ঠ তরুণ হৃদয়ের বেলাভূমিতে তখন যৌবনের উচ্ছল উচ্ছল জোয়ার-ভাঁটার নিত্যলীলা।

যার বাবা দেনার দায়ে জেল খেটেছে সেই চার্লস্ ডিকেন্স তখন স্টেনোগ্রাফারের পদ থেকে সদ্য প্রোমোশন পাওয়া পার্লামেন্টারী বিষয়ক সংবাদদাতা। আর মেরিয়া—লণ্ডনের প্রখ্যাত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দ্বিতীয়া কন্যা। আভিজাত্যের আভায় যার দেহ ও হৃদয়ের প্রোজ্জ্বল পুষ্টি।

১৮২৯-এ মাত্র সতেরো বছর বয়সে বন্ধু হেনরী কোলের সঙ্গে বেড়াতে এসে জীবনের বিস্মৃত বিস্ময়ের পরিভাষায় এক বছরের বড় মেরিয়াকে প্রথম চোখে পড়ল চার্লির। তিনি তাঁর স্বল্প আয়ের বৃহদাংশ প্রবন্ধ প্রসাধনে ব্যয় করে হৃদয় বিনিয়োগের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করলেন। আভিজাত্যের অহঙ্কারে স্ফীতহৃদয় মেরিয়া কিন্তু ভেবেই রেখেছিল—মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সাধারণ চাকুরিজীবী যুবকটিকে নিয়ে যত খেলাই খেলা যাক না কেন, যে কোন ভাবেই তাকে গ্রহণ করা যাক না কেন, তাকে হৃদয়ের দোসর করা চলে না, চলে না তাকে জীবনের অংশীদার করা।

তবুও ভিক্টোরীয় যুগের সুস্মিত বহিরঙ্গ প্রসাধন আর বাহ্যিক চাপল্যে বিমুগ্ধ ডিকেন্স রেশমী বুনুনিতে বাঁধা স্বপ্নজালের পরিসরে খাঁচার পাখীর মত ধরা পড়ে জীবনে প্রথম প্রণয়ের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে উঠলেও মেরিয়ার স্বরচিত পরিমিত ব্যবধান বারবার পীড়া দিতে লাগলো তাঁর অন্তরকে।

নিরুপায় ডিকেন্স তাঁর একুশতম জন্মবার্ষিকীতে মেরিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অন্তর্দাহী অস্ফুট প্রণয়াবেগের আগুনটাকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে চাইলেন। মেরিয়া কিন্তু তাঁর এই অন্তর-আবেগের আহ্বানকে, তার রেশমী বুনুনির আকাঙ্ক্ষাকে সদম্ভে দলিত করে চলে গেল। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেল—চার্লি তো একটা দুধের খোকা!

এই ঘটনার পরেও চার্লস তাঁর বন্ধু হেনরী কোল ও তাঁর প্রেয়সী মেরিয়ার বোন অ্যানের সহায়তায় পুনর্বার মেরিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। গোপনে দুই চিঠি লিখেও কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে চার্লস নিঃসীম শূন্যতার প্রলেপে আচ্ছন্ন হলেন। লোম্বার্ড স্ট্রীটের বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন চিরতরে। অথচ এই চার্লস তাঁর মেরিয়াকে খুশি করতে লোম্বার্ড স্ট্রীটের বাড়িটাকে সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় কাঁপিয়ে তুলেছেন বারবার। অভিনয়ের সুসজ্জিত আয়োজন করে বাড়িটার সর্বাঙ্গে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন—মেরিয়ার স্তুতিতে কবিতা রচনার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

মেরিয়া প্রত্যাখ্যাত বৈচিত্র্যের নির্মম্য লাঞ্ছিত হৃদয় চার্লস প্রায় বাইশ বছর পরে আইরেন্স' প্রণয় সঙ্গের এক বিশেষ প্রসঙ্গে আগত বহু চিঠির একটি বৃন্তে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির বিশেষ পরিচিত একটি হস্তাক্ষর লক্ষ্য করে পুনর্বার বুকের ব্যথাটার টান অনুভব করলেন। তাৎক্ষণিক অশান্তির বাড়িটার অলিন্দে বসে ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তাঁর কলম তুলে নিলেন হাতে। সমস্ত কাজ দূরে সরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে ফেললেন এক ব্যবসায়ীর অখ্যাত স্ত্রী, চার্লসের নবযৌবনের প্রথম দূতী মেরিয়া—আজকের মেরিয়া উইন্টারকে।

বন্যার উত্তাল তরঙ্গরাশির মত ফেলে আসা দিনের সব স্মৃতি এসে চার্লসের হৃদয় দখল করে বসল।

চার্লস তাঁর পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্যারিস যাওয়ার প্রাক্কালে মেরিয়াকে যোগাযোগ রক্ষা করতে লিখলেন। আর প্যারিস থেকে তিনি মেরিয়াকে যে চিঠিটা লেখেন আজও তা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমপত্র বলে পরিগণিত।

ইতিমধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের ফলে উভয়েই পরস্পরের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। মেরিয়া হয় তো চিঠিতে পুনর্বার আত্মসমর্পণের উল্লেখ পর্যন্ত করেছিলেন।

চার্লসের নির্দেশে কোন এক রবিবারে মিসেস ডিকেন্সের অনুপস্থিতির সুযোগে বহুদিন পরে আরেকবার এসে দাঁড়ালেন তাঁর দরজায়। এবার আর প্রত্যাখ্যান নয়, সাগ্রহ উৎকণ্ঠায় ডিকেন্সকে গ্রহণ করতে চাইলেন একান্ত আপনার করে। ইতিমধ্যে চার্লস সাত সন্তানের পিতা আর মেরিয়া দুই কন্যার জননী হয়েছিলেন।

চার্লসের স্বপ্নঘোর, কল্পনার আয়ত আবেশ বিবাহিতা মেরিয়াকে দর্শনমাত্রই কাচের স্বর্গের মত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আহত হৃদয় চার্লস এরপর আর কোনদিনও মেরিয়ার ইচ্ছার ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অদ্ভুতদর্শনা স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া মেরিয়ার সাথে দেখা করেন নি।

অবশ্য পত্রালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। স্বামীর ব্যবসার অসাফল্যে মেরিয়া একবার ডিকেন্সের কাছে অর্থপ্রার্থী হয়েছিলেন।

মেরিয়ার সাথে প্রেমসম্পর্ক চার্লসের হৃদয়ে কি গভীর রেখাপাত করেছিল তার প্রমাণ 'ডেভিড কপারফিল্ডে'র ডোরা। ডোরা যেন মেরিয়ারই প্রতিরূপা।

আবার ফিরে যাওয়া যাক বাইশ বছরের চার্লসের তরুণ জীবনে। প্রেমসৌধের গরিমা যার মেরিয়ার নিষ্করুণ প্রত্যাখ্যানেও ম্লান হয় নি।

আঠারোশো চৌত্রিশ সালের চার্লস ডিকেন্স সাংবাদিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। 'মর্নিং ক্রনিকল'-এর স্টাফ-রিপোর্টার, 'মান্থলী ম্যাগাজিনে'র নিয়মিত লেখক ডিকেন্স প্রধান সাংবাদিক বন্ধু স্কচ জর্জ হগার্থের পরিবারের নিবিড় সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে প্রেমচর্যার নিরবধি অবকাশ পেলেন।

হগার্থ পরিবারের চারটি মেয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা পূর্ণযৌবনা, পুষ্ট হৃদয় ক্যাথারিনের উত্তপ্ত হৃদয়ের আঁচ; চোদ্দ বছরের মেরির সুমিষ্ট হাসিভরা ললিত-লাবণ্য সাংবাদিক চার্লসের বক্ষনিষ্ঠ হৃদয়কে জ্যোৎস্নার পূর্ণ যৌবন কলার প্রলেপে ঘরের পথ চিনিয়ে দিল।

অত্যুগ্র আবেগতপ্ত চার্লস পুনর্বার নারীপ্রেমের পূর্ণসলিলে গা ভাসালেন।

এই সময়ে চার্লসের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতাও এসেছিল 'স্কেচেস্ বাই বজ' এবং 'পিক্‌উইক্ পেপারসে'র সফল বিক্রয়লব্ধ অর্থে। চার্লস বিয়ে করবার ঝুঁকি নিলেন সহজভাবে।

প্রমত্ত যৌবনা বুদ্ধিমতী বড় বোন ক্যাথারিনকে বিয়ে করে চার্লস্ পনেরো নম্বর 'ফার্নিভাল হলে' উঠে গেলেন। বিয়ের অত্যল্পকাল পরেই ক্যাথারিন অর্থাৎ কেটের ছোট বোন মেরী চার্লসের বাসায় এল।

কেটের মতো বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণতা মেরীর ছিল না বটে, কিন্তু হৃদয়ানুভূতির নির্বিকল্প ঐশ্বর্যে সে ছিল মহীয়সী। চার্লসের রচনায় ছিল তার দুর্নিবার আকর্ষণ। দুর্বল হৃদয় স্পর্শকাতর চার্লস্ স্বভাবতই মেরীর সান্নিধ্যে অধিক প্রীত হতেন।

এই সময় কেট সন্তানসম্ভবা হলে যাবতীয় গৃহকার্যে এবং চার্লসের সঙ্গে বেড়ানোয়, দোকানে কেনাকাটায় মেরীই একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠল। চার্লস্ প্রথমাবধিই মেরীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করতেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা হিসাবে কেটকেই বিয়ে করেছিলেন।

মেরীর সরস সান্নিধ্যে উজ্জীবিত চার্লসের অন্তরাসনে মেরী পূর্বতন মেরিয়ার মতোই একচ্ছত্র আসনে অধিষ্ঠিতা হল ধীরে ধীরে। চার্লসের প্রেমজীবনের এই বিবর্তন হয় তো কেটের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। কিন্তু কেট তাতে কোন বাধা দেয় নি।

মেরীর মুখপদ্মের স্বর্গীয় সুষমার আবেশ চার্লসের হৃদয়ভাবনাও অনুচিন্তার বিচ্ছিন্নতাকে এক সংহত মালায় গ্রথিত করেছিল।

কিন্তু চার্লসের দ্বন্দ্বকুটিল জীবনে বিচ্ছেদ-মিলনের আর দশটা আবর্তের মতোই এবারও ঘূর্ণিবাত্যা নেমে এল।

আঠারোশ' সাঁইত্রিশ সালের এক নিঝুম রাত। সমস্ত স্তব্ধতাকে ছেড়ে এক সুতীব্র আর্তনাদ ভেসে এল চার্লস্‌-কেটের ঘরের ঠিক বিপরীত দিকে মেরীর ঘর থেকে।

চার্লস্‌-কেট ছুটলেন। ডাক্তার এল। কিন্তু যন্ত্রণা কমল না। দেহ-মনের অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে অবশেষে চার্লসের দিকেই অপরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, চার্লসেরই কোলের ওপর নিজের পরিতৃপ্ত দুটি হাত আর ম্লান মুখখানি রেখে চিরতরে চোখ বুজলো মেরী।

চার্লসের হৃদয়াকাশ ধ্বসে পুড়ে খাঁক হয়ে গেল। মেরী সম্পর্কে চার্লস্ পরে লিখেছেন,—

'I don't think there ever was love like I bear her.'

চার্লসের জীবনে আরেকটা শূন্যতা এসে ভিড় করল। বোধ হয়, ভালবাসার এই আকস্মিক নিপাতে আহত চার্লসের অতৃপ্ত অন্তর বারবার বিভিন্ন জনে আকৃষ্ট হয়েছে, ভালবাসতে চেয়েছে। কিন্তু ব্যর্থতা সর্বত্রই তাঁকে আপাত-সফলতার নির্মম ছদ্মবেশে প্রতারিত করে শূন্যতার যোগফলকেই বৃহত্তর করেছে।

মেরীর মৃত্যুতে চার্লস্ প্রায় একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। চিঠিপত্র লেখাও কয়েকমাস বন্ধ ছিল। বিভিন্ন সাময়িকীতে রচনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রোজ রাতেই যেন বিদেহী মেরীর আত্মা এসে পাড়ি জমাত ডিকেন্সের বুকে।

চার্লসের জীবনে মেরীর ভূমিকা সবচেয়ে বেদনাদায়ক। বেদনাদীর্ণ চার্লস্ উত্তরজীবনে কোনদিনই মেরীকে ভুলতে পারেন নি। নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে সমাধিস্থ মেরীর কল্পিত সাহচর্যে মুখর করতে চেয়েছেন।

আরো প্রায় বছর সাতেক পরে ডিকেন্স যখন গৌরবের শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত 'অলিভার টুইস্ট,' 'এ ক্রিস্টমাস ক্যারল' প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়ে যাবার পর বিখ্যাত ব্যক্তিদের তালিকায় যখন তিনি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছেন···এমনি সময়ে ১৮৪৪ সালে লিভারপুলের এক সভায় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তিনি। ডিকেন্স অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণার সময় একটি অনুষ্ঠান দেখে খুব ঔৎসুক্য বোধ করলেন—'পিয়ানো বাজাবেন—মিস্ ওয়েলার।' পুরো নামটা না থাকায় ঔৎসুক্য আরো বেড়ে গেল।

ঘোষণা অনুযায়ী উজ্জ্বল সবুজ ফারকোট-পরিহিতা অষ্টাদশী

সুন্দরী ক্রিশ্চিয়ানা ওয়েলার মঞ্চে এসে দাঁড়ালো। ক্রিশ্চিয়ানার রূপসৌন্দর্যে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় ও হতবাক হয়ে পড়লেন ডিকেন্স। পরে তাকে পিয়ানো সেটটার দিকে এগিয়ে দিয়ে আশা প্রকাশ করলেন,—সে নিশ্চয়ই তার নামটা পরিবর্তন করে একদিন সুখী হবে।

ইতিমধ্যেই সবুজ পোষাকে পরিমণ্ডিতা অপরূপা ক্রিশ্চিয়ানার চিন্তা ডিকেন্সের মনে দোলা দিতে শুরু করেছে। উৎসব শেষে ডিকেন্স ক্রিশ্চিয়ানার বাবার সঙ্গে সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে পরদিন সকন্যা তাঁকে নিজের টেবিলে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন।

ক্রিশ্চিয়ানা আর তার বাবাকে লাঞ্চে আপ্যায়িত করে ঐদিনই ডিকেন্স ক্রিশ্চিয়ানাকে আবেগপূর্ণ ভাষায় কবিতাসমৃদ্ধ এক চিঠি লেখেন। ক্রিশ্চিয়ানার মধ্যে চার্লস্ একটা শিল্পীসুলভ কবিমনের যেন সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। আর তাই বন্ধু টেনিসনের লেখা কাব্যগ্রন্থের এককপি উপহারস্বরূপ তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি যেন অফুরান তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন।

কিন্তু তার পরদিনই কার্যোপলক্ষে ডিকেন্সকে লিভারপুল ছাড়তে হল। তবুও মন তাঁর লিভারপুলের এক স্নিগ্ধপ্রান্তে বাঁধা পড়ে রইল।

এরপর বহু পত্রালাপ হয়েছে এবং ওয়েলার পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে ডিকেন্স ক্রিশ্চিয়ানা সম্পর্কে বহু সুপরামর্শও দিয়েছেন। ইতি মধ্যে ডিকেন্সের বন্ধু টম্পসনের সাথে ক্রিশ্চিয়ানার হৃদ্যতা জন্মালে তিনি ক্রিশ্চিয়ানাকে লেখেন,—'আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু যেহেতু আমি বিবাহিত, আমি আশা করি তুমি আমার বন্ধু টম্পসনকে গ্রহণ করবে।'

কিছুদিনের মধ্যেই টম্পসন ওয়েলারের বিয়ের আসরে বিশেষ অতিথি ডিকেন্স ব্যর্থ প্রণয়ীর মতো উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে জেনোয়ায় আর একবার ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে ডিকেন্সের দেখা হয়েছিল। কিন্তু তার ব্যবহার নিঃসন্দেহে সেদিন ডিকেন্সকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি।

ডিকেন্সের জীবনে আরো অনেকে এসেছেন। মিসেস ডিকেন্স প্রায় ১৫০০০ স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের সঙ্গে নাকি ডিকেন্সের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কেট ডিকেন্সের এই উক্তি ক্রোধের বশবর্তী বা আতিশয্যদোষে দুষ্ট হতে পারে কিন্তু বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য, সঙ্গ, সাহচর্য ও ভালবাসা যে তিনি কায়মনে কামনা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয় তো প্রথম জীবনের ভালবাসার ব্যর্থতা ও বিচ্ছেদ কাতরতাই পরবর্তীকালে নারী লিপ্সায় পরিণত হয়েছিল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিংবা বহুসংখ্যক (দশটি) সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হৃদয়ের প্রেমবৈচিত্র্য এতটুকু উত্তাপ হারায় নি বা ম্লান হয় নি।

কখনো কিছুদিন নিঃসঙ্গ কাটে—আবার শীতার্ত মেরুর আকাশে নতুন তারার সন্ধান পেয়ে 'পথের প্রেমে' মেতে ওঠেন ডিকেন্স। এমনি অনেক আগমন-নির্গমনের পদচিহ্নে মুখর ডিকেন্সের স্বল্পায়ত জীবন।

কিছুটা স্থায়িত্ব পেল মঁসিয়ে এমিলি ডি লা-রিউ-এর তন্বী রূপসী স্ত্রী মাদমোয়াজেল এমিলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। ত্রিগনন্দ রোসোতে এই ডি-লা-রিউ পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে ডিকেন্সের। এমিলি ডি-লা-রিউর রূপ সৌন্দর্যসুধা বারবার দেখে আকণ্ঠ পান করবার দুরন্ত তৃষ্ণা জাগলো তাঁর।

এমিলির স্নায়বিক দুর্বলতায় উদ্বিগ্ন হয়ে তা সারানোর চেষ্টায় ডিকেন্স ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বহু যত্নে তিনি ডাক্তার এলিয়োটেনের কাছ থেকে 'মেস্‌মেরিজম্' বা 'এনিমেলম্যাগনাটিসম্' প্রয়োগ পদ্ধতি শিখে নিয়ে নিজের স্ত্রীর মাথাধরায় তা প্রথম প্রয়োগ করলেন। অভীষ্ট সাফল্যে আশান্বিত হয়ে মঁসিয়ে ডি-লা-রিউর অনুমোদনে এমিলির চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন।

এই নতুনতর চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগে প্রতি রাত্রেই ম্যাডাম ডি-লা-রিউ বহু আধিভৌতিক আত্মার দেখা পেতে লাগলেন। ফলে তার মঙ্গলের জন্যই ডিকেন্সকে সর্বদা তার কাছেই থাকতে হত। এই অভিনব চিকিৎসায় এমিলি কিছুটা আরোগ্য লাভও করল।

কেট ডিকেন্স কিন্তু স্বামীর এই নতুন 'উপসর্গে' বিচলিত ও বিরক্ত হলেন। কেন না তাঁর নিজের ওপরে এই মেস্‌মেরিজমের প্রয়োগে তিনি এমনিভাবে আধিভৌতিক আত্মার সাক্ষাৎলাভ করতেন কদাচিৎ মাত্র। কেটের স্বামী সংশয় সন্দেহে পরিণত হল। তিনি ঈর্ষান্বিত হৃদয়ে ডিকেন্সকে সতর্ক করে দিলেন।

ডিকেন্স কেটের তাড়নায় ও কিছুটা কর্মব্যপদেশে রোম যাত্রা করলেন। এখানে তিনি এমিলির একটি চিঠি পেয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। শয়তান হয় তো এমিলির ওপর পুনরাক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় ডিকেন্স তাঁকে রোমে চলে আসতে লিখলেন।

ডি-লা-রিউ দম্পতী রোমে এলে এমিলির ওপর আবার মেস্‌মেরিজম্ বিদ্যার প্রয়োগ করতে লাগলেন তিনি। এই সময়ে ভ্রমণে, গল্প-গুজবে এমিলি ডিকেন্সের মনের খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন যদিও অন্য কোন সম্পর্ক স্থাপন পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায় একরকম অসম্ভব ছিল।

ডিকেন্সের মনের আসরে এমিলির আসন এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, ১৮৪৫-এর নানারঙা দিনগুলির বহু পরে ১৮৫৩ তেও ডিকেন্স কেটের অজ্ঞাতে আবার একবার প্রিয়তমা সন্দর্শনে এসেছিলেন।

ইতিমধ্যে আবার হগার্থ পরিবারে তৃতীয়া কন্যা কেটের ছোট বোন জর্জিনার উচ্ছল তারুণ্য চঞ্চলতায় ডিকেন্স গৃহ নতুন আবেশে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। জর্জিনার মধ্যে ডিকেন্স রাফায়েলের 'ম্যাডোনা'র প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে উঠতে অনুভব করলেন।

পঞ্চদশী কিশোরীর সঙ্গে বিগত যৌবন ডিকেন্সের মূক প্রণয় সমস্ত পরিবারের চোখে বেখাপ্পা ঠেকছিল। কেট মাথায় হাত দিলেন। বয়স্ক পুত্রকন্যারা পিতার অনৌচিত্যে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কিন্তু ক্ষীণতটি দীর্ঘাঙ্গী জর্জিনার পেলব লাবণ্যের নিভৃত ইশারা ডিকেন্সের চুপসে যাওয়া হৃদয়ে এক নতুন দিনের দিশারীর ভূমিকায় নেমে এল।

জর্জিনার সংসার পরিচালনে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নিপুণতা তাকে ক্রমশ সমস্ত পরিবারের হৃদয়ে প্রশস্ত স্থান করে দিল। ডিকেন্স স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। বাইরে বেড়াতে, থিয়েটার দেখতে জর্জিনা হলো ডিকেন্সের একমাত্র সঙ্গী। পরিবারের ঝি-চাকর, ছেলেমেয়ে সবার কাছেই মিস জর্জিনা হগার্থ 'আর্লগ্রেণরী'র মতো একাধিপত্য বিস্তার করে বসলো।

লণ্ডনের উঁচুতলার সমাজেও মিস হগার্থ অনুপমা উল্লেখযোগ্য মেয়ে বলে গণ্য হলো। অভিনয়ে একই সঙ্গে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ডিকেন্স-হগার্থ।

কেট কিন্তু বোনের আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করত। কেটের সঙ্গে ডিকেন্সের বিবাহবিচ্ছেদও হয় তো জর্জিনা উপাখ্যানেরই প্রত্যক্ষ ফল।

কেটের বিবাহবিচ্ছেদ ও সংসার পরিত্যাগের পর জর্জিনা সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল। ডিকেন্সের অব্যবহিত পরবর্তী জীবনে আবির্ভূতা সর্বশেষ প্রিয়তমা এলেনা টার্নেনের আবির্ভাবে কিছুটা ক্ষুণ্ণ, কিছুটা দুঃখিত হলেও জর্জিনা আজীবন অবিবাহিতভাবে ডিকেন্স-পরিবারের হিতার্থে কাজ করে গেছেন। ডিকেন্সের জীবনের বিরুদ্ধবিধুর শেষতম অধ্যায়ে বাস্তব পৃথিবীর অনেক দুঃখ ও আঘাতের বেদনা জর্জিনা তার কুমারীমনের সেবা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে অনেকটা লাঘব করে দিতে পেরেছিলেন।

জর্জিনা অগার্থ ডিকেন্সের লেখা চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলে এক অজানা জগতকে রহস্যময় ও চির অজ্ঞাত করে রেখে গেছেন। সেগুলিতে হয় তো ডিকেন্সের জীবনেতিহাসের এক নগ্ন অধ্যায় পড়ে আছে। সেগুলি ধ্বংস করা জর্জিনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরই পরিচায়ক।

উনিশ শতকের চারের দশকে ডিকেন্সের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা যখন প্রায় সমগ্র ইওরোপ ও আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে, তখন তিনি ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজের অন্যতম ওয়াটসনের আমন্ত্রণ পেলেন কিছুদিন তাঁর ওখানে বাকিংহাম প্যালেসে কাটাতে।

ডিকেন্সের আগমনপথে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে ওয়াটসন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী অনারেবল মেরী বয়েলের ওপর ভার অর্পণ করলেন।

মেরী বয়েল নেলসনের সমসাময়িক ইংলণ্ডের প্রখ্যাত ভাইস অ্যাডমিরাল স্যার কাউন্টার জে বয়েলের কন্যা। তাঁদের পরিবার ছিল আভিজাত্য ও বংশগৌরবে ইংলণ্ডের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। মেরী বয়েল নিজেও কবি-লেখিকা ও সমালোচক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। ডিকেন্সের সান্নিধ্যের সম্ভাবনায় স্বভাবতই মেরীর মননশীল মন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ধন্য হতে প্রয়াসী হয়েছিল।

ডিকেন্স যে ট্রেনে আসছিলেন সেই ট্রেনের গার্ডের সহায়তায় মাঝপথের কোন এক স্টেশনে ডিকেন্সের সাথে পরিচিত হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন মেরী বয়েল। ডিকেন্সও তাঁর লেখকজীবনের নিঃসঙ্গ প্রাঙ্গণে এক চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী সুন্দরী মহিলার বন্ধুত্ব অর্জন করে তাঁকে হৃদয়ের শতকামনায় আলিঙ্গন জানালেন।

ডিকেন্স মেরী বয়েলের অভিনয়প্রিয় থিয়েটাররসিক জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের সাযুজ্য লক্ষ্য করে সেই যোগাযোগকে আরো নিবিড় করে তুলতে চাইলেন। একাত্ম হতে চাইলেন তাঁর সঙ্গে। একসঙ্গে অভিনয় করে, মাইলের পর মাইল একসাথে বেড়িয়ে, দু'জনের হৃদয়েই তারুণ্যের অভিসারপিপাসা তীব্রতর হলো।

মেরীর কাছে ডিকেন্স হলো 'জো' আর ডিকেন্সের কাছে মেরী হলো 'প্রিয়তমা মেরী'।

লণ্ডনে প্রত্যাগমন করে ডিকেন্স একবার মেরীকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে। কিন্তু জনৈক আত্মীয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে লণ্ডনে এসে ডিকেন্সের বিপরীতে নায়িকা হওয়ার সুযোগ মেরীর হয় নি। ডিকেন্স এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে উভয়ের হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার পালায় ফাটল ধরে নি বহুকাল। মেরী ডিকেন্সের বাটন হোলের জন্য প্রায়ই একগুচ্ছ করে ফুল পাঠাতেন।

মেরীর জীবনে 'জো'র স্মৃতি চিরদিন অম্লান থাকলেও ডিকেন্সের জীবনে আরো একজন বসেছে প্রেমের অংশীদারত্ব নিয়ে। সে এলেন টার্নেন।

বন্ধু টম্ টার্নেন-এর আকস্মিক আত্মহত্যায় ডিকেন্স এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, টার্নেন পরিবারের সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করেন।

টার্নেন পরিবারের প্রত্যেকেই, মিস্টার টার্নেন, মিসেস টার্নেন এবং প্রত্যেকটি কন্যাই পেশাদারী অভিনয়জীবনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বন্ধুত্বের সূত্রে এবং টম টার্নেনের আকস্মিক মৃত্যুতে এই পরিবারের সাথে ডিকেন্সের বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর গাঢ়তর হতে থাকল।

সম্ভবত চার্লসের উত্তরজীবনের এই সর্বশেষ নায়িকা। টার্নেন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা এলেন টার্নেনকে চার্লস প্রথম দেখেন তার মাত্র সাত বছর বয়সে। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই টার্নেনের জীবনে এই প্রভূত খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের দুরপনেয় প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু যে বৈচিত্র্য বা আকস্মিক মুহূর্তে প্রেমের জন্ম, সম্ভবত ডিকেন্স-এলেনের জীবনে তা ঘটেছিল হেগমার্কেট থিয়েটারে গ্রীনরুমে ব্যস্ততার উপকূলে কোন এক নিরালা সন্ধ্যায়।

পুরুষের পোষাক পরতে হওয়ায় লজ্জারুণা ক্রন্দনরতা অষ্টাদশী এলেনের দুর্দশায় সহানুভূতি জানাতে গিয়েছিলেন ডিকেন্স। ডিকেন্সের আকাঙ্ক্ষা জাগলো, তিনি এলেনের চোখের জল মুছিয়ে দেন। আর তখনই বৃদ্ধ ডিকেন্সের দুর্বলতর হৃদয় বিদায়বেলার শেষ রশ্মিপাতে শেষবারের মতো বুঝি বুঝে নিয়েছিল যে, তিনি এলেনকে ভালোবেসে ফেলেছেন।

অনুসন্ধান

কার্ল সাণ্ডবার্গ

অনেক জায়গা আছে
আমি সুস্থ থাকলে সে সব জায়গায় যাই।
একটা জলাভূমি, যেখানে আমি প্রায়ই যেতাম—
সঙ্গে থাকতো কান লম্বা হাউণ্ড কুকুর।

একটা বুনো আপেলের গাছ,
রাত্রে চাঁদের আলোয় সেখানে যখন যেতাম
সঙ্গে থাকতো একটা মেয়ে।
কুকুরটা চলে গিয়েছে, মেয়েটাও।

তবু আমি সেই জায়গাগুলোয় যাই,
যখন যাবার আর কোন জায়গা থাকে না।

অনুবাদক : পৃথ্বীশ সরকার

গুরুদেবের নারী সমাদর

লীলা বিদ্যান্ত

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পৌরুষের প্রথম চিহ্ন ছিল স্ত্রীলোকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব : ঐ কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন :

'The first sign of a coward is that the more he gets from people, even without asking for it, the more he becomes ungrateful. Are there many such wretched men who have been deprived of the affection, kindness and courtesy of women ? But they do not think that they also have to do something for women in return. So, in our country, the happiness and comfort of women are the main topic for comics.'

কবির নিজের নারী-সম্পর্কীয় বিবরণ থেকে তাঁর নিজেরও পুরুষোচিত গুণবত্তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অসংখ্য নারী-চরিত্রের মিলন ঘটেছে।

তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর স্বামী দারুণ দারিদ্র্য-দশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন দেখতে পাই। তখন চতুষ্পার্শ্বস্থিত সমস্ত লোকই তার কাছে হীন। তার ধারণা টাকার দ্বারা সমস্ত কিছু লাভ করা যায়। কুমুকে বিয়ে করে সে তার ওপর অন্যায় অধিকার দাবি করতে চায়। সে তার হৃদয়কে জয় করে তাকে পাবার অপেক্ষা করে না।

আমাদের দেশে নারীর জীবনযাপন কবিকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছে। নারী এখানে শুধুমাত্র তার গৃহস্থালী ও স্বামীরই প্রয়োজনীয়। নারীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা সুবিধাজনক। তার জীবন শুধু রান্না করা ও খাওয়ান। সংসারের অন্যলোকের চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণ করতেই দিন যায়। একমাত্র পরপারের ডাক যখন তার কাছে এসে পৌঁছে তখনই সে তার আনন্দময়ী সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। সে তখন বলে :

'I am a woman
I am sacred.
The sleepless moon
Of the moonlit night is in tune with me.
If I were not here.
In vain would rise the evening star.
In vain would flowers blossom
In the garden.'

সে আরও বলে :

'One who has called me to his bed chamber of death is not only my master. He will not neglect me.'

নারীপ্রেমের মহানুভবতা :

কবি নারীপ্রেমের মহানুভবতা, মাধুর্য এবং গভীরতার কথা বহু বর্ণনা করেছেন। উচ্চমন-সম্পন্ন এমন অনেক নারী আছেন যাঁরা তাঁদের প্রেম ও মাতৃত্ব অপর একটি অসহায় শিশুকে দান করতে কার্পণ্য করেন না। তিনি সমস্ত সংস্কার, কু-সংস্কার ভুলে যান। তাঁর মাতৃস্নেহ জাতি-ধর্ম বিচার করে না। 'গোরা' উপন্যাসে 'আনন্দময়ীর' চরিত্রটি এইরূপ। তিনি গোরাকে বলেছেন,—

'তোকে যখন আমি কোলে নেই, তখন বুঝতে পারি জাতি-ধর্ম-বংশ নিয়ে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে না। শিশুর কোনো বংশ নেই। কারুরও বংশের প্রশ্ন তুলে যদি তাকে ঘৃণা করি, তবে ভগবান তোকে আমা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।'

যে সকল পবিত্র নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের প্রতি তাঁর আরাধনার পবিত্র প্রদীপকে তিনি নিজের অন্তরে প্রজ্বলিত করে রেখেছিলেন। তাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

'Sometimes such a bright picture of a woman flashed upon my eyes who cannot be termed as modern but who belonged to all times. Whenever we committed a fault in our conduct we saw light of forgiveness in their eyes. They lighted the lamp of love from the fire of virtue.'

এই-ই নারীর চিরকালের স্বভাব। মানুষের সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হাসিমুখে ক্ষমা করাই তার স্বভাব। এর মধ্য দিয়েই আমরা তার মহানুভবতাকে উপলব্ধি করতে পারি। কবি বলেছেন যে, দেহ-ই তার সব সম্পত্তি নয়, মনই আসল। তাই তিনি বলেছেন :

'Oh beautiful one, what are you looking at in your mirror ? Are you trying to find if there is any blemish in the offering of love which you are going to give to the dear one ?'

নারী চরিত্রের সম্পূর্ণতা আত্মাকে অর্পণ করতে সক্ষম হওয়া। নববিবাহিতা কনে মনে অসংখ্য শংকা নিয়ে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ঘরের দিকে যাত্রা করে। ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে যাহা-ই ঘটুক না কেন সে বলতে সক্ষম হয় :

'I kindled a light from my life. I loved with all I had.'

নারীর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ জীবনে যে অমূল্য সম্পদ উপহার পেয়েছেন তা আমরা তাঁর 'Remembrance' পুস্তক পড়ে জানতে পারি। এর এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

'Since, one day, you came into my life, the harvest of songs has grown in my mind. Even to-day, they are still growing.'

যে নারী কবির জীবনের সঙ্গীতকে প্রাণ দিতে সক্ষম হয়েছিল সে যৌবনেই বিদায় নেয়, কিন্তু তার সেই মধুময় স্পর্শের আশীর্বাদ কবির সমস্ত জীবনকে সুখদায়ক করে তোলে। সে নারীই ছিল কবির অসংখ্য সঙ্গীত রচনার প্রধান উৎস।

নারীর মধ্যে যে ভগবানের অসীম আশীর্বাদ আছে তা একজন সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। সেজন্যেই ভগবান নারীর মধ্যে নিজের মধুরতাকে উপলব্ধি করার জন্য নিজেকে দ্বি-ভাগে বিভক্ত করেছেন।

তাই কবি বলেছেন :

'Oh woman, coming to me for a while
You filled my mind with hints
Towards that secret of bliss of
Union with God.'

অনুবাদ—বিমান দত্ত

ভক্ত বশ ভগবান

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

একদিন জয়দেব রচিছেন নিজ মনে বসি
'শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য' সহসা লেখনী পড়ে খসি
হস্ত হ'তে, নীরবেতে আনমনা বসি কতক্ষণ
'স্নানে যাব পদ্মা আমি' পত্নী পদ্মাবতী প্রতি কন।

রাধামাধবের ভোগ গৃহমধ্যে রাঁধেন যতনে
নীরবেতে তৈলপাত্র হাতে তাঁর দেন সেইক্ষণে।
অসমাপ্ত লেখা রাখি অজয়েতে গেলেন চলিয়া
একটু বিস্ময়ে তাই ক্ষণকাল রহিলা চাহিয়া।

পাক অন্তে 'মাধবেরে' করিলেন ভোগ নিবেদন
হেন কালে জয়দেব গৃহ মাঝে করি আগমন
লেখনী ও গ্রন্থটিরে স্মিত মুখে হাতে করি নিয়া
এক ছত্র লিখি কন আমারে প্রসাদ দাও প্রিয়া।

স্থান সম্মাজন করি ভোগপাত্র দিলেন সমুখে
'আহার করিয়া কন' প্রসাদ পাইনু বড় সুখে।
ঘুরে আসি পদ্মা আমি অন্তর্ধান তিনি অকস্মাৎ
তার কিছুক্ষণ পরে জয়দেব ফিরিয়া হঠাৎ
দেখিলেন পদ্মা বসি পাইছেন প্রসাদ নীরবে।

এ কি পদ্মা মোর আগে প্রসাদ পাইলে তুমি এবে।
না, না, প্রভু এইমাত্র প্রসাদ পাইলেন যে আগে
সে মহা প্রসাদ আমি পাইতেছি অতি অনুরাগে।
অসমাপ্ত লেখা শেষ করিলে যে স্নান শেষে তব
বিস্ময় বিমূঢ় কবি শুনিয়া সে বাক্য অভিনব।

দেখিলেন গ্রন্থ খুলি অসমাপ্ত লেখা শেষ তাঁর
মুক্তা নিন্দে হস্তাক্ষর পড়িলেন আনন্দে অপার-সুন্দরি
ত্বমসি মম ভূষণম ত্বমসি মম জীবনম
ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নম
স্মর গরল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম্
'দেহি পদ পল্লব মুদারম্'

কাঁদি কন জয়দেব পদ্মা নিজে এসে নারায়ণ
অসমাপ্ত লেখা মম দয়া করে করিলা পূরণ।
আহার করিলা ভোগ ভাগ্য সীমা নাহি ত' তোমার
আমি না পাইনু দেখা প্রসাদে নাহল অধিকার।

'এলে প্রভু মোর রূপে' শুনিয়া নীরব কবি প্রিয়া
আনন্দেতে বার বার সেই ছত্র দেখেন পড়িয়া।
'দেহি পদ পল্লব মুদারম্'
'যে কথা লিখিতে প্রিয়ে কোনমতে করি নি সাহস

দয়া করে লিখেছেন নিজে এসে আজি ভক্তবেশে
ধন্য তুমি পদ্মা আর ধন্য প্রিয়ে আমি তব পতি
বাক্যহারা কবি প্রিয়া বার বার করেন প্রণতি।
ত্রস্তে পুনরায় তবে পতি তরে করেন রন্ধন
ইষ্টে নিবেদিয়া কবি সাশ্রুনেত্রে করেন গ্রহণ।

হুগলী মহসীন কলেজ

শ্রীআরতি ঘোষ

যে কালো পীচঢালা রাস্তাটা 'সারকিট হাউসে'র পাশ দিয়ে এসে থামওলা বিরাট গেটের সামনে থমকে গেছে, তারই দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। গেটের ওপর বড় বড় অক্ষরে ঘন কালো রঙ দিয়ে লেখা 'হুগলী মহসীন কলেজ'। হুগলী-চুঁচুড়ার প্রাচীনতম এই কলেজটি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরাণো মফস্বল কলেজ। ফাল্গুনের প্রথম দিকে যখন গেটের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় থোকা থোকা লাল ফুল ফুটে বিরাট উজ্জ্বল হাল্কা হরিদ্রাভ রঙের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় লজ্জা-রঙিন রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ে, তখন অপূর্ব এক পুলকানুভূতিতে মনটা চলে যায় দূরের সেই অতীত ইতিহাসের ছিন্ন পাতায় গহ্বরে তখন শুধু কান পেতে শুনতে পাওয়া যায় কলেজের প্রতিটি ইটের রোমাঞ্চিত কলগুঞ্জন।

এই যুগ-জীর্ণ প্রাসাদটি আজ অতীত ইতিহাসের একমাত্র অনুগত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হুগলী-চুঁচুড়ার বুকে। আমরা জানি 'হুগলী কলেজ'। ইতিহাসে এর নাম 'পেরনস্ হাউস'! পেরন ছিলেন একজন সাফল্যবান, বলিষ্ঠ, দুঃসাহসিক ফরাসী নাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতবর্ষে ভাগ্য, যশ অর্জন করতে এসেছিলেন। এঁর আসল নাম—পেইরী কুইলিয়ার (Pierre Cuillier)। প্রথমে রাণা গোহোড় এবং সিন্ধিয়ার অধীনে কাজ করেন। পরে চীফ ইউরোপীয়ান অফিসার হয়েছিলেন এবং গঙ্গা, যমুনা, কুমায়ন হিলে শাসক হিসাবে পরিচিত হন। ১৮০৩ সালে যখন বৃটিশ-সিন্ধিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠে, তখন পেরন ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। অবসর গ্রহণ করে ফিরে আসেন কলকাতায়। ১৮০৩ সালের শেষার্ধে নিজ মনোনীত এই বিরাট বাড়িটি তৈরি করেন। চুঁচুড়া তখন ডাচদের অধীনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশিদিন এই জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদটিতে বসবাস করতে পারেন না! ১৮০৬ সালের জানুয়ারীতে ফ্রান্সে ফিরে যান। এই বাড়িতেই তাঁর প্রথম সন্তান যোশেফ কাঁরন কুইন-বেনি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি পরে নেপোলিয়নের বিখ্যাত মার্শাল 'অডিনট' ডিউক অফ রিজিজিও'র কন্যা ক্যারালাইনকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু পেরনের জীবনে সমস্ত আনন্দ, সুখ এসে ধরা দেয় নাই, তাই ফ্রান্সে ফিরে যাবার পূর্বেই তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে চোখের জলে চির জীবনের মত বাংলা দেশে চন্দননগরের কবরে শায়িত রেখে বিদায় নিয়েছিলেন।

তারপর এই বাড়িটি চুঁচুড়ার নামকরা জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার কিনেছিলেন। এই বাড়ি রাতের গভীরে, আলোর রোশনাই আর ঘুঙুরের বোলে—গান্ধর্ব সুর-লহরীতে সমস্ত নিস্তব্ধতা যখন খান্ খান করে ভেঙে দিত। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম বক্র হাসি তাঁর সমস্ত সঞ্চিত সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। তিনি আইনের চোখে জালিয়াত বলে পরিচিত হন। এই সময় তাঁর দিনগুলো অভাব-অনটনে তাঁকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে প্রাণকৃষ্ণ শীলের কাছে ৩৭,০০০ টাকা ধার করেন এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে বাড়িটা বন্ধকও দেন এবং আর ফিরিয়ে নিতে পারেন নি। অবশেষে ১৮৩৪ সালে ডিক্রি জারী হয় বাড়িটার উপর। 'শীল পরিবার' ১৬,৫০০ টাকায় 'সিভিল কোর্ট' হতে কিনে নিয়েছিলেন। পরে 'হুগলী কলেজের, পূর্বসূরী (জেনারেল কমিটী) প্রায় ২৫,৫০০ টাকায় কলেজ করার উদ্দেশ্যে কিনে নেন।

এই কলেজ করার উদ্দেশ্য লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিকের সময় অঙ্কুরিত হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় এবং মেকলে সরকারের শিক্ষানীতিকে জোরদার করতে চেয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত দয়ালু হাজি মহম্মদ মহসীনের 'ট্রাস্ট-প্রপার্টি'র উদ্বৃত্ত অর্থ এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যদান করে। যদিও 'ট্রাষ্ট ফাণ্ডে' কোন শিক্ষাগত 'ধারা' ছিল না। কিন্তু জেনারেল কমিটির 'পাবলিক ইনস্ট্রাক্টররা' উদার দৃষ্টি নিয়েছিলেন। স্থির হয় যে, মাত্র ষাটটি ছাত্র নিয়ে তাঁরা শুধু ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

সুতরাং এই কমিটিতে 'ডক্টর ওয়াইজ সিভিল সার্জন'—১৮৩২ সালের মার্চ মাসে 'ট্রাস্টের ফাণ্ড' হতে উদ্বৃত্ত টাকা ৮,৬৩,৫৪৩-১৩-৮ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। তার সঙ্গে গভর্নরের নিকট একটি আবেদন পাঠান ইমামবাড়া স্কুলের প্রসার ও উন্নতি প্রয়োজন। কিন্তু ট্রাস্ট 'প্রপার্টি'র একটু জটিলতা থাকায় স্বল্পকালের জন্য ব্যাহত হয়েছিল। ১৮৩৪ সালে লর্ড বেণ্টিক মত প্রকাশ করেন যে এই প্রতিষ্ঠানটিতে 'মহামেডান সেমিনারী' শিক্ষা হওয়া উচিত। তৎকালীন এ্যাংলিসিস্ট এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের বাগবিতণ্ডার উপর গভর্নমেন্টের প্রস্তাব হয়, ৭ই মার্চ ১৮৩৫ সালে যে সমস্ত 'ফাণ্ডের' অর্থ ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যবহার হবে। তারপর ১৮৩৬ সালে মার্চ মাসে জেনারেল কমিটী সরকারের নিকট লিখে পাঠান দু'টো ডিপার্টমেন্টের জন্য—ইংরাজী আর ওরিয়েন্টাল ব্যবস্থা। ছাত্ররা যে শুধু 'ষ্টাইপেণ্ড' পাবে তা নয়, তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা জেনারেল কমিটী করবে এটাও জানিয়ে দেন।

যাই হোক ১৮৩৬ সালের ১লা আগস্টের এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে পেরনস হাউসে প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। 'হুগলী মহসীন কলেজ' নামে পরিচিত হলো। ডক্টর ওয়াইজ প্রথম অধ্যক্ষ হুগলী কলেজে এবং জেনারেল কমিটিও এই কলেজ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ডক্টর ওয়াইজ ছিলেন একজন সিভিল সার্জন। ১৮১৪ সালে এম, ডি ডিগ্রী নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৮২৭ সালে এ্যাসিস্টেন্ট সার্জন হন। পরে তিনি ইংলণ্ড এবং এডিনবরা হতে এফ, আর সি এস পাশ করে ফিরে আসেন ভারতবর্ষে। ডক্টর ওয়াইজ এবং তাঁর পরে একজন পোস্ট-মাস্টার অধ্যক্ষ হন। কিন্তু ডক্টর ওয়াইজ একজন সত্যি উপযুক্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মেকলে বলেন যে—'হিজ কোয়ালিফিকেশন এনটাইটল হিম টু দি হায়েস্ট রেসপেক্ট।'

আজ হুগলী কলেজের কম্পাউণ্ডের প্রবেশ পথে দেখা যায়, বাঁ দিকে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, একটা মঞ্চে পাড়া জলহীন 'ফোয়ারা' আর একটা ঝাঁকড়া নাম না জানা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকে ছেলেদের 'কমনরুম।' সারা কলেজ জুড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছ্বাস গুঞ্জন অথবা কাক-ডাকা দুপুরে গাছের তলায় বসে এলোমেলো গল্প করা। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনটি চিন্তা করলে দেখা যায় মাত্র ৬৮৬টি ছাত্র ইংরাজী ডিপার্টমেণ্টে—১৩০টি ওরিয়েণ্টাল ডিপার্টমেণ্টে ভর্তি হয়েছিল। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনেক অনেক বেড়ে গেছে। প্রথম দিনের সেই নিস্তব্ধতা আজ মুখর হয়ে উঠেছে। কলেজের প্রথম বাৎসরিক আয় হয়—৫০,০০০ টাকা। কারণ পরে ছাত্রসংখ্যা ২,২০০ জন হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভাব ছিল অধ্যাপকের। সেইজন্য মেকলে বলেন—'উই ক্যান হার্ডলি ভেনচার টু রিজেক্ট এনি ম্যান, হু ক্যান রীড, রাইট, এণ্ড ওয়ার্ক আউট এ সাম'।

তারপর অধ্যক্ষ হন সুদারল্যাণ্ড এবং পরে একজন 'সিভিল সার্জন' ডক্টর ইসডাইল আরো পরে থিওবাটাম, গিরফথ। তা ছাড়া অনেকেই এগিয়ে আসেন সেই সময়।

সবচেয়ে কলেজের শিক্ষাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ১৮৫৭ সালের ২রা মে। এই বছরটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সঙ্গে মফস্বলের 'হুগলী কলেজ'কে দিয়েছিল পূর্ণতার স্বীকৃতি—অর্থাৎ 'হুগলী কলেজ' এ্যাফিলিটেড হলো। সুদূর কটক, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, পূর্ণিয়া এবং ত্রিবেণীর স্কুলগুলো 'এ্যাফিলিটেড' হয়। এই সময় কলেজের অধ্যক্ষ দ্বারা স্কুলগুলোর পরিদর্শন করার ব্যবস্থা হয়। আশ্চর্য ছুটি বলতে তখন ছিল না বেশি। দুর্গাপুজা, মহরমে মাত্র পাঁচদিন ছুটি থাকতো। ১৮৪৭ সালে নূতন করে ছুটির তালিকায় দেখা যায়, দুর্গাপুজা উপলক্ষে ৩৫দিন ছুটি। তারপর ১৮৫২ সালে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়।

এই সময় কলেজের প্রফেসরের অভাব প্রকট হয়েছিল। কি করে শিশু মহাবিদ্যালয়কে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যায় সেই চিন্তাই বেশি পীড়া দেয়। ১৮৬১ সালে কলেজে প্রথম এফ. এ এবং বি. এ ছাত্র পরীক্ষা দেয়। তা ছাড়া ল' ক্লাস উদ্বোধন হয়। ছাত্রসংখ্যা কয়েক বছরে বেড়ে যায়, তার জন্যে নূতন করে দু'টো ক্লাস রুম এবং দু'টো হোস্টেল তৈরি হয়।

'হুগলী কলেজ' কোনদিন খেলাধূলায় পিছনে ছিল না। বর্তমানে আরো উন্নত হয়েছে। তাছাড়া সাহিত্য পরিষদ, কলেজ-পত্রিকা, স্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আরো কত ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ কৈশোর হ'তে হুগলী কলেজ পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছে তবু বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়ে নি এর ঐতিহ্য।

আজ সব পুরাণো স্মৃতি এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে। তবুও এই 'গথিক' আর্টে গড়া অভ্রভেদী অট্টালিকার পাশে গড়ে উঠেছে অধুনা 'বিজ্ঞান-ভবন'। যেখানে বৈশাখের শুভ্র উজ্জ্বল প্রভাতে নাগেশ্বরী ফুলের মাদকতা ছড়িয়ে থাকতো তা আর সেই গাছ খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তাকেই নিঃশেষ করে গড়ে উঠেছে আধুনিক প্ল্যানে তৈরি 'বিজ্ঞান-ভবন'।

ভারতের বহু যুগের ঐতিহ্যমণ্ডিত সভ্যতার শিক্ষার কেন্দ্রস্থল 'হুগলী মহসীন কলেজ'। এরই পাশে 'ঘণ্টা ঘাট'—একটু দূরে 'ডাচ-চ্যাপেল'। কিন্তু সেই 'ঘণ্টা ঘাট' আজ জীর্ণ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত-সীমায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটের প্রতিটি ইট ইতস্তত ছড়ানো—গঙ্গানদী অনেক দূরে চলে গেছে অব্যক্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অশ্বত্থের শিকড় মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে অতীতের সাক্ষী হয়ে আর একমুঠো অনুশোচনা ছড়িয়ে দিয়েছে এর মাটিতে। আজ সময়ের অলিন্দ বহে মনে চলে যায় সেই হারানো দিনগুলোকে ফিরে পাবার ব্যাকুলতায়। কত ছাত্র এসেছে আর চলে গেছে তবু তাদের নাম না করলে অসমাপ্ত থেকে যাবে।

......জাস্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীনরোত্তম মল্লিক (সাব্ জজ) গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চারুচন্দ্র ঘোষ (অক্ল্যাণ্ড পুরস্কারপ্রাপ্ত), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন।

কিন্তু সংস্কৃতি, কৃষ্টির প্রবল প্রভাব 'হুগলী কলেজকে' মহিমান্বিত করেছিল—যাঁদের সাহচর্যে সমৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁরা আজ হয় তো অনেকেই নেই, তবু তাঁদের পর্যাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতিটি কণা সংস্কৃতি-মহীরুহের শিকড় সময় মৃত্তিকার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে যাত্রা পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।*

ঋণ স্বীকার :—

(ক) হিষ্ট্রি অফ হুগলী কলেজ—কে, জ্যাকেরিয়া।

(খ) চুঁচুড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুল ম্যাগাজিন—ডিসেম্বর ১৯৩৬। প্রবন্ধ :—শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়।

(গ) হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার।

নারিকেল বৃক্ষকে

অমিত বোস

যখন চাঁদ ওঠে
হাওয়ায় উতলা হয় সরু সরু সবুজ পালক
মনে হয় তুমি কবি দার্শনিক কিশোর বালক,
অবুঝ পথিক মন উদাসীন আহারে নিদ্রায়
ধ্যানমগ্ন ঋষিপুত্র তুমি সৌম্য কোন সাধনায়
নির্লিপ্ত হ'য়েছো বলো ঘুঘু-ডাকা শেষ বৈকালে
নির্জন নদীর ঘাটে রাত্রি এসে তোমায় জাগালে,
কাঁপে নীল অন্ধকার কুয়াশায় প্রথম অঘ্রাণে
অকস্মাৎ ধ্যান ভাঙে সমুদ্রের সঙ্গীতের স্নানে
রাজকন্যা রাত নামে দূরের পরীর দেশ থেকে
শরীরের ঘ্রাণে তার নেশা লাগে তোমার দুচোখে
সিন্দুর পাখির মত উদ্বেল তোমার পাখায়
কোজাগর নিশীথের নিমন্ত্রণ শাখায় শাখায়।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

প্রথম শীক্ষাবল্যধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একাদশ অনুবাক

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি :—সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। ১।১১।১

বেদপাঠের পরে শিষ্যের কাছে আচার্য 'বেদে'র (অন্তর্নিহিত মূল অর্থ ব্যাখ্যা করছেন ; শিক্ষা সমাপ্তির পরে) স্নাতক শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন গুরু।

সত্য কহিও ! করিও ধর্ম আচরণ ;
এতদিন ধরে শিখিলে যে পাঠ, ভুলিয়া যেও না তাহা।
গুরুর জন্যে আনো তাঁর প্রিয় ধন ;
(সংসার কর সুখে)।
ছিন্ন কোর না পুত্রবাহিত সৃষ্টির চিরধারা।
ভুলো না সত্য ;—ভুলো না ধর্ম ;
ভুলো না তোমার শুভ।
ভুলো না আত্মরক্ষা।(১)
লাভের লোভের আশায় কখনো,
ভুলো না শ্রেষ্ঠ পথ।
(খুশির খেয়ালে) পঠন পাঠনে,—
কোর না মিথ্যা ভুল।১।১১।১

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি,—নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়ো পাস্যানি।১।১১।২

পূর্ব পুরুষে স্মরণে রাখিও,—দিও তাঁহাদের শ্রদ্ধা।
ভুলো না দেবার্চনা।
মাতারে জানিও দেবতা তোমার ;—
পিতাও দেবতাতুল্য।
গুরুকেও মেনো দেবতার মতো।
সেবিও অতিথি দেবতা !
শুচিসুন্দর, অনিন্দনীয় কর্ম করিও তুমি।
নহেকো অন্য কিছু।
আমাদের মাঝে যাহা আছে ভালো,—
তাহাই তোমার উপাস্য।১।১১।২

যে বো চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ।১।১১।৩

১। আত্মরক্ষা কথাটা অনুধাবন করার যোগ্য। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এ সমস্যা তখনো ছিল। স্বচ্ছন্দ সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে মানুষ আজকের মতই আত্মরক্ষা শিক্ষা করতে ভুলে যেত। গার্হস্থ্যে প্রবেশ করার আগে গুরু শিষ্যকে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

নহেকো অন্য কিছু,
পূজনীয় যাঁরা, শ্রেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁদের
আসন দিও ; শ্রান্তি করিও দূর।
অবহেলা ভরে,—দিও না কিছুই।
শ্রদ্ধায় কোর দান।—
যতটুকু পারো তাই দিও তুমি (রুচিসঙ্গত)
শোভাতে।
(সুহৃদের মত প্রেম নিয়ে প্রাণে)
দিও বিনম্র চিত্তে।
(শ্রদ্ধা যদি বা না থাকে চিত্তে,) যদি
দাও শুধু ভয়ে,—তবু জেনো দান,—
না দেওয়ার চেয়ে ভালো।
কর্ম অথবা বৃত্তে কখনো যদি আসে সংশয়॥ ১।১১।৩

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥ ১।১১।৪

চাহিয়া দেখিও তোমার দেশের, তোমার
কালের দিকে ;(২)
দেশে আর কালে বিরচিত যত নূতন
নূতন বিধি,
জ্ঞানী ও কর্মী ব্রাহ্মণ যাঁরা স্বতই যুক্ত
নিত্য নিত্য কর্মে।
যাঁরা অকুটিল ধর্ম আশয়ী—তাঁদের
কর্ম(৩) বর্তন,
কোর তুমি আচরণ।

২। এইখানে একটা আশ্চর্য নতুন কথা শোনা গেল। আমরা জানি ভারতবর্ষ সনাতন পন্থী। সে অতীতের আচার-বিচারের অনুগামী। বেদে যা বলা হয়েছে, আর গুরু যা বলেছেন, তার অন্যথা হতে পারে না। নতুন কিছু করার কথা ভাবাও পাপ। যা চিরকাল হয়ে এসেছে, তাই চিরকাল হবে, এরপরে আর কথা নেই।

৩। কর্ম—চার প্রকার—উৎপাদ্য, বিকার্য, সংস্কার্য ও প্রাপ্য। যে জিনিষ নেই, কর্মের দ্বারা তাকে সম্ভাবিত করে তোলা, অর্থাৎ

তাঁদের কাহারো কর্ম কখনো যদি।
সংশয়ে ঢাকে,
তবে সে দিনের সত্য ধর্মী, স্নিগ্ধ আচার
অন্য প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণের,
কোর তুমি অনুসরণ।
এই উপদেশ, এই তো আদেশ!
বেদরহস্য এই তো উপনিষৎ। এই বিধাতার
নির্দেশ আর এই তোমাদের উপাস্য॥ ১।১১।৪

কিন্তু এখানে দেখছি গুরু নিজেই শিষ্যকে নতুন পথের আহ্বান শোনাচ্ছেন। এতদিন ধরে বেদ-বেদান্ত শিক্ষা দিয়েছেন শিষ্যকে,—শিখিয়েছেন যজ্ঞবিধির নানা বিচিত্র কর্ম; তারপরে বলছেন,—কিন্তু এই চিরাচরিত কর্ম সম্বন্ধে যদি তোমার সংশয় জাগে তাহলে তোমার বর্তমান কালের দিকে তাকিয়ে দেখো,—তোমার আশেপাশে যে সব প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন তাঁদের নীতিই অনুসরণ কর। অবশ্য একথার অর্থ অন্যভাবেও করা যেতে পারে, যেমন,—তোমার কর্ম ও বৃত্ত যদি সংশয় আসে—হঠাৎ যদি কিছু ভুলে-টুলে যাও—তাহলে সেদিনের অন্য প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শ নিও।

কিন্তু আমাদের মনে হয়,—আগের অর্থই বেশি প্রযোজ্য। গুরুকে দেবতা বলে মেনো, কিন্তু তাই বলে নিজের বিচারবুদ্ধিকে পঙ্গু করে রেখো না। সংশয় এলে তোমার দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তার নতুন মূল্যায়ন করতে দ্বিধা কোর না।

দ্বাদশ অনুবাক।

শন্নোমিত্রঃ শং বরুণঃ··(শান্তিপাঠ)

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী।

ওঁ (এতক্ষণ কাম্যফলদায়ক কর্ম ও উপাসনার কথা বলা হয়েছে। ওঙ্কার সাধনাও ফলপ্রদ সোপাধিক ব্রহ্মের সাধনা। এইভাবে সর্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হবে। উপাধিবর্জিত আত্মদর্শনের ফল অজ্ঞানের,—তথা কামনার নিবৃত্তি:—)

প্রথম অনুবাক।

ওঁ শন্নোমিত্রঃ··(শান্তিপাঠ) ২।১।১

ওঁম্ সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনীবধীতমস্তু;—মা বিদ্বিষাবহৈ। ২।১।২

গুরু ও শিষ্য আমাদের দোঁহে,
একসাথে কর রক্ষা।
বিদ্যার ফল যেন ভোগ করি দু'জনে।
অধীত শাস্ত্র হোক তেজস্বী,
আসুক চিত্তে বল।
বিদ্বেষ ভরে,—দোঁহারে দু'জনে,
কখনো না যেন দেখি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম। তদেষাঽভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন। সোঽশ্নুতে সর্বান কামান সহ ব্রহ্মণাধিপতিচৈতোতি।

ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই করেন ব্রহ্মলাভ।
এ বিষয়ে আছে এই মন্ত্র;—
চির শাশ্বত অনন্ত জ্ঞান,—ব্রহ্মই চিরসত্য।
পরম আকাশে, শূন্যে শূন্যে, যে দেখেছে,—তার লীলা;
যে তারে জেনেছে, আপন মর্মে,—
বুদ্ধির গুহা মাঝে:
সব বিশ্বের কামনার ভোগ,—তার চিরজ্ঞানে,
নিত্যই আছে পূর্ণ॥
তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ;—শ্লোকো ভবতি।
সেই আত্মা হতেই হয়েছিল এই (নীল) আকাশের সৃষ্টি।
আকাশ হতে এল বায়ু;
বায়ু হতে অগ্নি;—অগ্নি হতে জল।
জল হতে পৃথিবী—আর পৃথিবী হতে ওষধি।
ওষধি হতে অন্ন;—আর অন্ন হতে,
এই পুরুষের প্রকাশ?
এ পুরুষ অন্নরসময়—অন্নরসায়নের পরিণাম।
এই তার শির;—এই দক্ষিণপক্ষ! এই উত্তরপক্ষ।
এই দেহস্কন্ধই তার দেহমধ্যভাগ;
আর এই নিম্নে তার প্রতিষ্ঠা:
এ বিষয়ে আর একটি শ্লোক আছে। ২।১।৩

* * * *

সেই যে সত্য, অনন্ত ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অথবা আত্মা, তিনিই নিজেকে আকাশ, বাতাস, তেজ, দীপ্তি, জল ও পৃথিবী, বনরাজী এবং অন্ন ও তার পরিণাম এই মানুষরূপে সৃষ্টি করলেন। অনন্তজ্ঞান স্বরূপ সত্য এইভাবে নিজেকে নানারূপে অন্তবান করে মানুষে এসে ঠেকলেন? এইখান থেকে খুঁজে পেলেন আবার ফিরে যাবার পথ। এই সৃষ্টির মজার খেলায় অনন্ত থেকে অন্তে, জ্ঞান থেকে অজ্ঞানে, সত্য থেকে মায়ায় ছুটতে ছুটতে মানুষে এসে পৌঁছে গেলেন; সেখান থেকে আবার তেমনি করেই মিথ্যা থেকে সত্যে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, সীমা থেকে অসীমের আনন্দরূপাভিমুখে অভিযান চালানো যায়।

যদিও এই স্থূল অন্নেই মানবদেহ এবং মনের সৃষ্টি, তবু সে ক্ষমতা রাখে, এই স্থূলতা ভেদ করে আপন সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর অস্তিত্বগুলি পার হয়ে সেই চিরসত্যের মধ্যে ফিরে যেতে।

অবর্তকে বর্তমান করে তোলার নাম উৎপাদ্য কর্ম,—যথা মাটি দিয়ে হাঁড়ি গড়ানো হোল, কিম্বা সোনা দিয়ে হার।

এক জিনিষকে অন্য জিনিষে পরিণত করা হোল বিকার্য কর্ম,—যেমন কাঠ দগ্ধ করে ভস্মে পরিণত করা।

দোষ দূর অথবা গুণবিধান করা অর্থাৎ সংস্কার করাকেই সংস্কার্য কর্ম বলে,—যেমন মলিন বাসনকে মেজে-ঘসে পরিষ্কার করে তোলা, কিম্বা জীর্ণগৃহের সংস্কার করা।

অপ্রাপ্য বস্তুকে পাওয়া হোল প্রাপ্য কর্ম। যেমন একগ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া। যে গ্রামটা দূরে ছিল, গমন ক্রিয়ার দ্বারা তাকে কাছে পেয়ে গেলাম। এই চার রকম কর্ম ছাড়া আর কর্ম নাই।

যেমন ধানের ভিতর থেকে একটার পর একটা খোসা ছাড়িয়ে চাল বার করতে হয়,—যেমন খাপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তীক্ষ্ণধার তরোয়াল! তেমনি একটার পর একটা আবরণ খুলে খুলে এই মানুষই পারে সেই অনন্ত সত্তার মধ্যে তার বিশেষ সত্তাকে বিলীন করে দিতে। পথে অনেক শ্রম, অনেক অপস্থা,—অনেক সাধনার পরীক্ষা দিয়ে আর উত্তীর্ণ হবে; মানুষ ফিরে চলেছে শেষ খেলার বুড়ি ছুঁতে।

তাই উপনিষদের ঋষি মানুষের দিকে চেয়ে বার বার মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন। মনুষ্যদেহের রূপকল্পনা দিয়ে বিচিত্র ধ্যানের সৃষ্টি করেছেন। 'অন্বয়ং পুরুষবিধ।—তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্‌, দক্ষিণ পক্ষঃ। সামোত্তর পক্ষ'···এই মনও পুরুষাকৃতি। যজুর্বেদ তার শির, ঋগ্বেদ ডান এবং সামবেদ বাঁ হাত ইত্যাদি।

মানুষের দেহ, প্রাণ, মন এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দোপলব্ধির মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তাঁরা জানেন, এই দেহ স্থূল—অন্নরসময়। কিন্তু এই দেহেই নিঃশ্বসিত হচ্ছে প্রাণ, জীবন বাঁচছে, আনন্দরস পান করবে বলে। এই মানুষের প্রাণের তরঙ্গ-হিল্লোলে, জেগে উঠছে এই অদ্ভুত আশ্চর্য মন—এই বাইরের মনটা—যে মনটা বিশ্বপৃথিবী জুড়ে মহা সোরগোল তুলে, হাঁকডাক বাধিয়ে, মহাসমারোহে রথ হাঁকিয়েছে—তার ভিত্তি হচ্ছে, প্রজ্ঞা অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞান।

এই জ্ঞানের অব্যবহিত অন্তরে আছে সেই আনন্দস্বরূপ। বস্তুত জ্ঞানস্বরূপ আর আনন্দস্বরূপে ভেদ নেই বললেই হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া মাত্রই ব্রহ্মলাভ হয়। জানা আর পাওয়ায় এখানে ভেদ নেই। তাই 'ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি পরম্'—যে ব্রহ্মকে জানে সে পরম পাওয়াই পায়। সেই পাওয়ার মধ্যেই সকল কামনার শেষ, চাওয়া-পাওয়ার পরম নিবৃত্তি।

দ্বিতীয়োঽনুবাক

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ···সর্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি।—তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ইতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তর পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকোভবতি। ১।২।১

এই ধরণীর যত জীবকুল অন্নে জন্ম লভেছে
এই অন্নেই সবার জীবন,—জীবনের শেষে,
সবাই আবার অন্নে রয়েছে লীন।
সকলের আগে জন্ম তাই তো সকল প্রাণীর
সব ঔষধ অন্ন।
অন্ন হতেই সবার জন্ম,—
অন্নের দ্বারা সকল জীবন চিরবিবর্ধমান
অন্ন সবার আহার, আবার অন্ন সবার ভোক্তা।

এই অন্নরসময় দেহের আড়ালে,—আছেন সেই প্রাণময় আত্মা (বায়ুরূপ) সেই প্রাণাত্মায় পূর্ণ এই দেহ।

এই অন্নরসময় দেহের আড়ালে,—
আছেন সেই প্রাণময় আত্মা (বায়ুরূপ)
সেই প্রাণাত্মায় পূর্ণ এই দেহ।
সেই প্রাণময়ের রূপ এই অন্নময় মানব দেহেরই অনুরূপ।
সেই (প্রাণময় পুরুষের) শির হচ্ছে প্রাণবায়ু।
ব্যানবায়ু এর ডান হাত।
আর বাম বাহু অপান।
আকাশ এর দেহমধ্যভাগ।
আর ধরণীতে এর প্রতিষ্ঠা।—
এ-বিষয়ে অন্য একটি শ্লোক আছে।

● ● ● ●

যে প্রাণ আকাশে-আকাশে বায়ুরূপে কাঁপছে, সেই প্রাণই মানব দেহের মধ্যে এসে জীবনরূপে বাঁচছে। তাকে পুরুষাকারে কল্পনা করতে চেয়েছেন উপনিষৎ। উপনিষদের ঋষি কবির কাছে কল্পনা বাস্তবের চেয়ে কম নয়। কল্পনা ও বস্তুতে মিশিয়েই তাঁদের চারিদিকে বাস্তব সংসার গড়ে উঠত। তাঁদের জীবনে এবং ধ্যানে কল্পনার কোন সীমা ছিল না। তাই এই অনন্ত আকাশকে হৃদয়াকাশের সঙ্গে যুক্ত দেখতে তাঁদের কোথাও বাধে নি। দেহমধ্যে যে ফাঁকে বা অবকাশে অন্ন বস্তু ও প্রাণশক্তিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সে যে সেই আকাশেরই অন্তর্গত। এই সত্য ধরা পড়তে দেরী হয় নি তাঁদের ধ্যানে।

তারা

কিশোরী মজুমদার

আউশের ভরা ক্ষেতে অন্ধকার কান পেতে রয়;
পেঁচার ডানায় শব্দ বুনো হাঁস আগাছায় ভিড়ে।
তারা জ্বলে একে একে কত তারা সারা রাতময়,
শিশিরের ঘ্রাণ নিয়ে ভোর আসে স্তব্ধতায় ধীরে।

সব তারা নিভে গেছে, কার্তিকের হিমেল বাতাসে,
এক তারা তবু জ্বলে অনির্বাণ মনের আকাশে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দশ

গ

ভায়লার সময় শেষ হয়ে এসেছিল। সে টেনে টেনে শ্বাস নিতে থাকে। বোঝা যায় কষ্ট হচ্ছে তার শ্বাস নিতে। পৃথিবীর এত হাওয়ায়ও যেন আজ তার ছোট বুকখানাকে হাওয়ায় ভরিয়ে দিতে পারছে না। নেই। পৃথিবীতে যেন হাওয়া নেই।

এমনিই হয়। শেষ মুহূর্তে এমনি করেই যেন হাওয়া ফুরিয়ে যায়।

মা। মাগো—সুন্দরম মায়ের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায়। ভায়লার দু'চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা তখন গড়িয়ে পড়ছে।

মা। মাগো—সযত্নে ভায়লার চোখের কোল থেকে অশ্রু মুছিয়ে দেয় সুন্দরম, কাঁদছো কেন মা? কি বলতে চাও বল!

কোন মতে টেনে টেনে ভায়লা ভগ্নকণ্ঠে বলে, কোনদিনই বলব না ভেবেছিলাম তোকে কথাটা সুন্দর কিন্তু—

বল মা, বল—থামলে কেন? বল কি বলছিলে? উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙ্গে পড়ে সুন্দরম। সত্যি কথা বলতে কি তার বুকের ভিতরটা তখন সত্যি সত্যিই কাঁপতে শুরু করেছে। অজ্ঞাত একটা আশঙ্কা যেন তাকে তখন ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করেছে।

মৃত্যুপথযাত্রিনী মার মুখের দিকে উদগ্রীব ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। কি বলতে চায় তার মা তাকে।

কি এমন বলতে চায় মা তাকে, যা এতদিন বলতে পারে নি—এতদিন তার কাছ থেকে গোপন রেখেছে।

বল মা, বল—বলছো না কেন। কি বলতে চাও বল?

বলছি বাবা, বলছি—একটু জল।

তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে সরাইতে জল ছিল একটা বেলোয়ারীপাত্রে করেই জল এনে মার মুখের সামনে ধরল, মা—জল।

ভায়লা হাঁ করে।

সুন্দরম একটু একটু করে তৃষিত জননীর গলায় জল ঢেলে দেয়।

গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল ভায়লার, জল পান করে অনেকটা সুস্থ বোধ করে।

সুন্দর—

মা।

তুই—তুই আমার সন্তান নোস—

কি। কি বললে? একটা আর্ত চিৎকার করে উঠে সুন্দরম। তার হাত থেকে জলের বেলোয়ারী পাত্রটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় শব্দ করে।

হ্যাঁ বাবা! তুই আমার ছেলে নোস।

যেন বোবা হয়ে গিয়েছে তখন সুন্দরম। একেবারে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। কি বলছে তার মা ভায়লা। সে তার সন্তান নয়। ভায়লা তার মা নয়।

স্তব্ধ বোবা চোখে ভায়লার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সুন্দরম। মৃত্যুপথযাত্রিনী ভায়লাও তখন তাকিয়ে পার্শ্বে উপবিষ্ট সুন্দরমের দিকে।

দু'চোখের দৃষ্টি তার জলে ঝাপসা।

সুন্দরম—

সাড়া দেয় না সুন্দরম সে ডাকে। যেমন পাথর হয়ে বসেছিল তেমনিই বসে থাকে।

কাঁপতে কাঁপতে সুন্দরমের একখানা হাত ধরে ভায়লা, সুন্দরম—

তবু সাড়া নেই সুন্দরমের।

ক্ষণপূর্বে মার মুখে শোনা কথাটা তখনো যেন তার দু' কানের মধ্যে হাতুড়ির ঘা দিয়ে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়াচ্ছে— ঝাম পিটছে। ঝুম ঝুম ঝুম।

সত্যিই তুই আমাদের—আমার আর রোজারিওর সন্তান নোস।

আমি। আমি—তোমাদের ছেলে নই? একটা করুণ কান্নার মতই যেন কথাটা উচ্চারিত হয় সুন্দরমের ভগ্ন স্তব্ধপ্রায় কণ্ঠ হতে।

না আমাদের কোন সন্তান হয় নি।

তবে, তবে আমি কে। আমি যদি তোমাদের সন্তান নই ত' তবে আমি কে? কোথা থেকে আমি এলাম। কে আমার মা, কে আমার বাবা—

জানি না।

কোন মতে ফিসফিস করে যেন জবাব দেয় ভায়লা। জানি না। জানি না আমি কে। কে আমার বাপ। কে আমার মা।

না জানি না।

তবে। তবে—তোমাদের কাছে কোথা থেকে আমি এলাম।

দরিয়ার পানি থেকে—

কি। কি বললে?

দরিয়ার পানি থেকে রোজারিও একদিন তোকে তুলে এনে আমাকে দিয়েছিল। আমারি মত এক মেয়েছেলে তোকে পিঠে বেঁধে নিয়ে দরিয়ার পানিতে ভাসছিল—তারই বুক থেকে তুলে এনে রোজারিও তোকে আমার বুকে একদিন তুলে দিয়েছিল—ছোট্ট বছরখানেকের শিশুটি তুই তখন।

আর সেই—সেই মেয়েছেলে যার পিঠের সঙ্গে বাঁধা হয়ে আমি পানিতে ভাসছিলাম সে, তার—তার কি হলো?

সে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বল, বল— সে কোথায়?

সে। সে মারা গিয়েছে—

মারা গিয়েছে?

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে সুন্দরম। নেই। তাহলে যার কাছ থেকে তার পরিচয়টা হয়ত জানা যেত সেও বেঁচে নেই।

আশার একটা ক্ষীণ আলোর শিখা যেন মনের কোণে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। অন্ধকার। আবার গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

কিন্তু দরিয়ার পানির মধ্যে আমাকে নিয়ে সে ভাসছিল কেন? তবে কি কোন নৌকাডুবি—না।

সম্ভবত তা নয়—

তবে! তবে কি?

অনেকে সাগরে মানত করে ছেলে বিসর্জন দেয় মনে হয় সেই রকমই কিছু—কিন্তু তোমরা। তোমরাও কি খোঁজ কর নি আমার মা-বাবার।

না—

কেন!

জানতে পারলে যদি তারা তোকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এই ভয়ে।

কিন্তু তাই যদি হবে ত' আজই বা সে কথা বললে কেন! কেন বললে তোমরা আমার কেউ নয়। আমি তোমাদের কেউ নই।

সুন্দর—

নাই বা বলতে কথাটা। নাই বা জানতাম কথাটা আমি—

ভেবেছিলাম বলব না—কোনদিনই তোকে জানাব না কিন্তু—একটা কাশির ধমক ওঠে ভায়লার। কাসতে কাসতে ভায়লার দম বন্ধ হয়ে আসে প্রায়।

অনেক কষ্টে সুন্দরম ভায়লাকে সুস্থ করে। সুস্থ হয়ে ভায়লা বলে, কিন্তু বিশ্বাস কর সুন্দর—গর্ভে না ধরলেও তোকে আমি আমার গর্ভের সন্তানের মতই চিরকাল মনে করে এসেছি, ভালবেসেছি। জানতে দিই নি কোনদিন যে তুই আমার আপন-পেটের সন্তান নোস—সুন্দর—

বল?

একটা কথা তোকে আজ বলি—

কি কথা?

যার বুক থেকে তোকে সেদিন ছিনিয়ে নিয়েছিলাম সে তখনো মরে নি—প্রাণ ছিল তার তখন।

সত্যি। সত্যি—বলছো?

ভায়লার বুকের 'পরে আবার ঝুঁকে পড়ে সুন্দরম গভীর উৎকণ্ঠায়—গভীর আগ্রহে।

হ্যাঁ—রোজারিওর কাছেই পরে শুনেছি তাকে তারা সাগরের চড়ায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—

তারপর—বল তারপর?

তারপর আর কিছু জানি না—

আবার একটা কাসির ধমক শুরু হয় ভায়লার। কাসতে কাসতে আবার ভায়লা হাঁপিয়ে পড়ে।

ভায়লার সময় শেষ হয়ে এসেছিল।

পৃথিবীতে তার গণা দিন ফুরিয়ে এসেছিল। পরের দিন দ্বিপ্রহরের দিকে সজ্ঞানেই কথা বলতে বলতে সুন্দরমের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভায়লার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

সব যোগাড় যন্ত্র করে বুড়িকে কবর দিতে দিতে মধ্যরাত্রি হয়ে গেল।

নদীর ধারে গীর্জারই আঙিনায় ভায়লাকে কবর দিল সুন্দরম। কফিনের উপর মাটি চাপা দিতে দিতে সুন্দরমের মনে হয়, এই ত' জীবন।

এই ত' মানুষের জীবন।

চলে যাবার দিনটি চিহ্নিত করে নিয়েই তারা জন্মায়। এবং জন্মাবার পরমুহূর্ত থেকেই পায়ে পায়ে সেই চলে যাবার মুহূর্তটির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। সেই মুহূর্তে পৌঁছে থামে। ভায়লাও তেমনি থেমে গেল। সেও একদিন এমনি করে থেমে যাবে। সবাই যাবে। সবাই থেমে যাবে।

আকাশে কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদ।

তারই আলোয় প্রকৃতি জুড়ে যেন একটা আলোছায়ার লুকোচুরি চলেছে। সঙ্গের লোকজনদের বিদায় দিয়ে একসময় এসে সুন্দরম নদীর ধারে বসল।

কিছুক্ষণ আগে জোয়ার শুরু হয়েছে। ক্রমশ জল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভায়লা যাকে সে এতকাল মা বলে জেনে এসেছে সে তাহলে তার মা নয়। কেউ নয়। কোন সম্পর্কই নেই তার সঙ্গে তার।

লুণ্ঠন করে এনেছিল রোজারিও আর ভায়লা তাকে। ফিরিঙ্গি সে এতকাল রোজারিও আর ভায়লার সন্তান—পর্তুগীজ ক্রিশ্চান বলে জেনে এসেছে তাও সে নয়।

গঙ্গা সাগরের কাছে যখন তাকে দরিয়ার বুক থেকে পাওয়া গিয়েছে হয়ত তখন সে কোন হিন্দুর সন্তান।

হিন্দুর রক্তই হয়ত তার শরীরে প্রবাহিত।

ক্রিশ্চান নয় সে হিন্দু।

বিধর্মী—নয় সে—হিন্দু।

কিন্তু তাতেই বা কি, ক্রিশ্চানের ঘরে পালিত—ক্রিশ্চানের অন্নে পুষ্ট—অস্পৃশ্য ত' সে অনেক দিনই। ধর্মে পতিত—কোন ধর্মেরই নয় সে। না হিন্দু না ক্রিশ্চান।
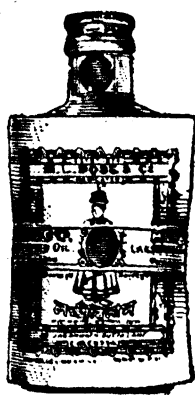
তাছাড়া কি ক্রিশ্চান ধর্মের দীক্ষাও ত' তার হয় নি। তবু ক্রিশ্চানদের ঘরে লালিত ও তাদের অন্নে পুষ্ট।

বাঃ চমৎকার। জাত নেই—ধর্ম নেই—বাপ নেই—মা নেই—কোন পরিচয়, কোন কিছুই নেই এ জগতে তার।

বেওয়ারিশ একটা মানুষ।

আকাশের দিকে তাকাল সুন্দরম।

আধখানা চাঁদ—তার পাশে পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক অনেক তারা। ঐ তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই কেন যেন মনে হয়, তার সত্যিকারের গর্ভধারিণী মা সে কি আজও বেঁচে আছে!

বেঁচে আছে কি মা তার এই পৃথিবীরই কোনখানে। যদি বেঁচে থাকে ত' কোথায়। কোথায় আছে সে।

কেমন দেখতে সে!

তাকে পিঠে বেঁধে দরিয়ার বুকে ভেসে যাচ্ছিল অসহায় শিশু সে—রোজারিও তাকে তুলে এনে ভারসার বুকে তুলে দিয়েছিল।

হয়ত নৌকাডুবি হয়েছিল এবং নৌকাডুবির পর তার মা তাকে অনন্যোপায় হয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে দরিয়ার বুকে ভেসেছিল।

রোজারিও তাকে বাঁচিয়েছে।

হয়ত মা তার আজও বেঁচে আছে। কিন্তু সে জানে তার সন্তান কোন এক সময় বাঁধন খুলে হয়ত দরিয়ায় ডুবে গিয়েছে চিরদিনের মত।

না, না—ডুবি নি মা। ডুবি নি—আজও আমি বেঁচে আছি। তোমার অভাগা সন্তান তোমার ক্রোড়চ্যুত হয়ে আজও বেঁচে আছে।

যদি দেখা পেত। একটিবার যদি মায়ের তার দেখা পেত। ঝাঁপিয়ে পড়ত গিয়ে মার বুকের 'পরে।

বলত, মা, মাগো—দেখত—দেখত আমায় চিনতে পার কি না?

সুন্দরমের দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তার গণ্ড ও চিবুক ভাসিয়ে দেয়।

মা। মা—মাগো—

আশ্চর্য! ঠিক সেই রাত্রেই বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখে সুলোচনার ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। সুলোচনা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—তার সেই অনেকদিন আগেকার গোপাল। কালো কষ্টিপাথরের গোপাল যেন বিশাল সমুদ্রের ঢেউয়ের বুকের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে—

পাড়ে দাঁড়িয়ে সুলোচনা।

চিৎকার করে ওঠে সুলোচনা, গোপাল। গোপাল—

দুহাত বাড়িয়ে দেয় সুলোচনা, গোপাল, আয়—আয়—

কিন্তু আসতে পারে না গোপাল ঢেউ অতিক্রম করে। বিরাট বিরাট ঢেউ একটার পর একটা গড়াচ্ছে আর ভাঙছে আর গোপালকে দূর দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

তার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে গোপাল।

চিৎকার করে ডাকে সুলোচনা স্বামীকে, কোথায়, তুমি—গোপালকে ধর—ধর। ও যে ডুবে গেল।

কিন্তু হরনাথ তার স্বামী তার পাশে প্রস্তরমূর্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকে কোন সাড়াই দেয় না। কোন প্রচেষ্টাই নেই তাঁর।

তারপরই যেন সহসা সব অন্ধকার করে দেয় একটা বিরাট ঢেউ এসে।

কাঁদতে থাকে সুলোচনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ক্রমে এক সময় আবার অন্ধকার তরল হয়ে আসে। সামনের অশান্ত বিক্ষুব্ধ সাগর শান্ত হয়ে আসে।

ফিকে একটা আলোয় চারিদিক মৃদু আলোকিত হয়ে ওঠে আর তারপরই—তারপরই সুলোচনার নজরে পড়ে; সেই কালো কষ্টিপাথরের শিশু গোপাল যেন মস্ত বড় জোয়ান হয়েছে। বিশাল বক্ষ, বিশাল দুই বাহু। এবং সেই বাহুতে গাদা বন্দুক।

বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে সামনের দিকে।

চিৎকার করে ওঠে সুলোচনা, গোপাল, গোপাল—আমি—আমি তোর মা। বন্দুক নামা—বন্দুক নামা—

বন্দুক নামায় সেই বিরাট কালোপুরুষ। তারপরই হো হো করে হেসে ওঠে সে।

কিন্তু ও কি। এতক্ষণে ভাল করে দৃষ্টি পড়ে সুলোচনার লোকটার মুখের প্রতি; কে। কে ও। ও যে সেই পর্তুগীজ দস্যু।...যে দস্যু মৃন্ময়ীকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

সেই দস্যুটা তখনো হাসছে।

হাঃ হাঃ করে অট্টরবে হাসছে।

ঘুমটা ভেঙে গেল সুলোচনার। চোখ মেলে ধড়ফড় করে শয্যার উপর উঠে বসে সুলোচনা। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে।

এ কি। এ কি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলো সুলোচনা।

আর কেনই বা এ স্বপ্ন দেখল।

বাইরে খড়মের খট্ খট্ আওয়াজ শোনা যায়। কান পেতে শোনে সুলোচনা। তার স্বামী হরনাথ ঘরের সামনে বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

আজকাল বেশির ভাগই ঘুমায় না হরনাথ রাত্রে। প্রথম রাত্রে একটু ঘুমায় তারপরই ঘুম ভেঙে যায়।

মধ্যরাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত এমনি করে পায়চারি করে হরনাথ।

সেদিন শুধিয়েছিল সুলোচনা, রাত্রে অমন করে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াও কেন?

ঘুম আসে না—

কেন?

জানি না। অথচ নিদ্রাহীন শয্যায় পড়ে থাকতেও অসহ্য লাগে তাই—

ধীরে ধীরে সুলোচনা শয্যায় উঠে বসল। গায়ের কাপড় ঠিক করে নেয়। পাশেই মেয়েটা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

মেয়েটার গায়ের কাপড় সরে গিয়েছে। হাত দিয়ে টেনে-টুনে মেয়েটার গায়ের কাপড় ঠিক করে দেয় সুলোচনা তারপর শয্যা থেকে উঠে পড়ে।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিল হরনাথ সুলোচনার ঘরের দরজা খোলার শব্দে ফিরে দাঁড়ায়।

কে!

আমি—

সুলোচনা।

হ্যাঁ—এগিয়ে এলো সুলোচনা স্বামীর কাছে, এমনি করে রাতের পর রাত জাগলে শরীর ক'দিন টিকবে—

আর টিকিয়েই বা কি হবে—

কি কথা—

হ্যাঁ—সুলোচনা—সত্যি কথাই বলছি। দিবারাত্র এই আগুন বুকের মধ্যে নিয়ে আর পারছি না।

আস্তে কথা বল—মেয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে বটে তবে ওর ঘুম বড় পাতলা।

ওর কি কিছু আর জানতে বাকী আছে সুলোচনা। দুর্বৃত্ত বাপের কোন কথাটাই বা ও আর না জানে। সেই লজ্জাটাই ত' আরো আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে একটা কথা তোমাকে এখনো বলি নি।

কি কথা

পরশু গঙ্গার ঘাটে—থেমে যায় হরনাথ

কি! থামলে কেন?

দেখলাম ক্ষীরোদা গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে বসে ভিক্ষা করছে—

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কথাটা শুনে স্বামীর মুখের দিকে সুলোচনা। যে কথাটা বলবার জন্য সে উন্মত্ত হয়েছিল সে কথাটা আর বলা হয় না।

কিন্তু ভিক্ষা করার চাইতেও কি মর্মান্তিক দেখলাম জান সুলোচনা?

কি!

ক্ষীরোদার আজ সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে—

সে কি।

হ্যাঁ, সে আজ একেবারে উন্মাদিনী। পৃথিবীর কাউকেই সে আজ আর চেনে না, আমাকেও সে চিনতে পারে নি। কিন্তু এমনটা কেন হলো বলতে পার সুলোচনা!

সুলোচনা স্বামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। ক্ষীণ ঝাপসা মধ্যরাত্রির জ্যোৎস্না সামনের আঙ্গিনার 'পরে এসে যেন গা এলিয়ে ঝিমুচ্ছে।

তারই ক্ষীণ আলোয় বারান্দাটায় আলোছায়ার খেলা। সেই আলোছায়ায় স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন সুলোচনার, এ স্বামী তার পরিচিত স্বামী নয়। এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানুষ।

এককালে ঐ মানুষটাকে সুলোচনা জীবনে নিবিড় করে পেয়েছিল—একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিল তারপর নিষ্ঠুর ভাগ্যের বিপাকে তার কাছ থেকে দূরে চলে গেল মানুষটা। কিন্তু দূরে চলে গেলেও মানুষটার যে ছবি বুকের নিভৃতে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল সে দৃষ্টিতে কোনদিন ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে যায় নি।

অবিশ্যি এখানে আসার পর মনের মধ্যে যে তার স্বামীর রূপটি খোদিত হয়েছিল সেই রূপটিতেই স্বামীকে সে গ্রহণ করেছিল মনে মনে, বাইরে যাচাই করে দেখি নি—দেখবার প্রয়োজনও বোধ করে নি।

কিন্তু আজ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ তো সে নয়। সুলোচনার স্বামী হরনাথও নয় এ।

তবে কে? কে এই মানুষটা। নয়নতারার স্বামী—দাক্ষায়ণীর স্বামী।

সব যেন কেমন গুলিয়ে যায় সুলোচনার। সব যেন কেমন জট পাকিয়ে যায়।

আবার হরনাথের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সুলোচনা।

হরনাথ তখন বলছে, কিন্তু পাগল ক্ষীরোদা হলো কেন সুলোচনা। কার পাপে ওর এমনটা হলো। পাপ যদি কেউ করে থাকে সে ত' আমি। ক্ষীরোদা ত' নয়। ক্ষীরোদাকে তবে কেন এ আঘাত সইতে হচ্ছে—

সুলোচনা যে কথাটা জীবনে কোনদিনই হয়ত বলতে পারত না সেই কথাটাই হঠাৎ যেন তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো।

সুলোচনা বললে, তাকে এখানে নিয়ে এলে না কেন?

কি বলছো তুমি সুলোচনা—চমকে তাকায় হরনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—সে হয়ত এখনো গঙ্গার ঘাটেই আছে। চল তাকে গিয়ে নিয়ে আসি—

তাকে আনতে যাবে তুমি।

বিস্ময়ের যেন অবধি নেই হরনাথের। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে চেয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে।

কেন যাবে না—একদিন ত' তুমি তাকে গ্রহণ করেছিলে—

সুলোচনা—

সেই গ্রহণের দাবীতেই ত' সে এ গৃহে আসতে পারে।

তার মানে—তুমি—তুমি আমাকে আবার ত্যাগ করে যাবে বলে স্থির করেছো সুলোচনা?

ত্যাগ। না—ও কথা আর বলো না। স্ত্রী হয়ে অনেক অপরাধ করেছি তোমার পায়ে—এবং যে অপরাধের মূল্য এতদিন ধরে দিচ্ছি এবং বাকী জীবনটা ধরেও দিতে হবে—আর নতুন কোন অপরাধের বোঝা যেন কাঁধে এসে না চাপে এই আশীর্বাদই কর—বলতে বলতে কান্নায় সুলোচনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, সে নীচু হয়ে গলবস্ত্রে স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখে।

হরনাথ তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে পরম স্নেহে স্ত্রীকে তুলে ধরতে ধরতে বলে, ওঠো সুলোচনা অপরাধ তোমারও নয়। আমার। আর লজ্জা দিও না এই হতভাগাকে।

হরনাথের গলার স্বর বুজে আসে!

অশ্রুতে দু' চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

হরনাথের বলিষ্ঠ দু' বাহুর মধ্যে কোনমতে নিজেকে সমর্পণ করে কাঁপতে থাকে সুলোচনা। আর বার বার মনে মনে বলতে থাকে, আমার সকল অহঙ্কার গিয়েছে। সমস্ত অহঙ্কার আমার ধুলোয় মিশিয়ে গিয়েছে—ক্ষমা করো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

[ক্রমশ।

একটি অবিস্মরনীয় বিচার কাহিনী

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

কলকাতা স্থপ্রীম কোর্ট।

বিচার হচ্ছে। রায় দিচ্ছেন বিচারপতি, ইংরেজ বিচারপতি, নাম সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস।

বিচারের রায় শোনার জন্ত বিচারালয়ে তিলধারণের স্থান নেই। লোকে লোকারণ্য।

বিচার হবে একজন সাহেবের। ইংরেজ পাদরীর নাম রেভারেণ্ড জেমস লঙ্।

সাহেবের অপরাধ, তিনি একখানি নাটক প্রকাশ করেছেন। নাটকটি ইংরেজী ভাষায় লেখা নাম 'নীলদর্পণ'।

নীলদর্পণই বটে।

আজ থেকে একশো' বছর আগে এই বাঙলা দেশের বুকের উপর নিরীহ গরিব বাঙালী চাষী প্রজাদের উপর দিনের পর দিন যে অন্যায় অত্যাচারের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তারই জলন্ত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'নীলদর্পণে'।

নীল! যে নীল ধোপারা কাপড়ে দেয় যার ফলে কাপড় বকের পালকের মত ধব্‌ধবে সাদা উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সেই নীল। সেই নীল আজকাল যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে, সে সময়ে তেমন হত না। তখনও তার উদ্ভব হয় নি। তখন হত একরকম গাছের পাতা থেকে যাকে বলে নীলগাছ।

সেই নীলের চাহিদা ছিল প্রচুর। আন্তর্জাতিক বাজারে তার মূল্যও অনেক। অথচ ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্ত কোথাও সেই গাছ জন্মাত না। আর সবচেয়ে বেশি জন্মাত এই বাঙলা দেশে।

নীলকর বণিকেরা তাই দলে দলে এসে উপস্থিত হল এই বাঙলা দেশে। বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় নীলকুঠি স্থাপিত হ'ল। আর কুঠিয়াল নীলকরেরা নানা কৌশলে চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করিয়ে নিত। আর সেই নীল বিদেশে রপ্তানী করে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভবান হত।

এদিকে চাষীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। তাদের লাভ হওয়া দূরের কথা—সারা বছরের অন্ন থেকে বঞ্চিত হল। সারা বছর নীল চাষ করলে ধান চাষ করবে কখন! আর ধান চাষের উপযুক্ত জমিই বা তখন পাবে কোথায়। সব জমিতেই তো নীল বুনেছে। আর নীল চাষ করে যা মজুরী মিলত তা দিয়ে তাদের সংসার চলত না। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হত না। সারা বছরই তাদের হয় অনাহারে না হয় অর্ধাহারে থাকতে হত।

অনাহারে থেকে মানুষ কতদিন কাজ করতে পারে। স্ত্রী-পুত্র কন্যার মুখে দু'বেলা দু-মুঠো অন্ন যদি নাই দিতে পারে তবে অমন করে নীল চাষ করার দরকার কি? তাই তারা আর নীল চাষ করতে চাইত না। এদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখে নীলকর বণিক সম্প্রদায় মাথায় হাত দিয়ে বসল কিন্তু সহজে তারা হাল ছেড়ে দিলে না। প্রথমে তারা চাষীদের প্রলোভন দেখিয়ে, অগ্রিম টাকা দাদন দিয়ে—তারপর নানা কৌশলে নীল চাষ করিয়ে নিত। শেষে তাতেও না পেরে চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার স্থরু করল। চাবুক মেরে নীল চাষ করাতে বাধ্য করত। নীল চাষীদের উপর সেই হৃদয়হীন নির্মম পাশব অত্যাচারের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে 'নীলদর্পণ' নাটকের পাতায় পাতায়। সে এক মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনী। মানুষ যে মানুষের উপর এতখানি হৃদয়হীন, পাশব হয়ে উঠতে পারে ইতিহাসে বুঝি বা এর অন্ত কোন নজীর নেই।

পাদরী লঙ্ সাহেব ছিলেন সহৃদয় ব্যক্তি। যেমন উদার তেমনি দয়ালু। তিনি এদেশে এসে ছিলেন খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। ধর্ম প্রচার' উপলক্ষে তাঁকে বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে—আর ঘুরে ঘুরে দেখেছেন নিরীহ অসহায় গরীব চাষীদের উপর তারই স্বজাতি নীলকর বণিকদের অমানুষিক নির্যাতন। এই অন্যায় অত্যাচার দেখে তাঁর মন বারবার বিদ্রোহ করে উঠেছে। চাষী প্রজাদের দুঃখ-বেদনায় তাঁর কোমল প্রাণ কেঁদে উঠেছে। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্ত তাঁর মন উতলা হয়ে উঠল। তিনি প্রতিকারের পথ খুঁজতে লাগলেন।

লঙ্ সাহেবের মত নীলচাষীদের দুঃখ-যন্ত্রণায় আর একজনের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তিনি দীনের বন্ধু নাট্যগুরু দীনবন্ধু মিত্র। 'নীলদর্পণ' নাটকের মূল রচয়িতা। তিনি ছিলেন ডাকবিভাগের সরকারী কর্মচারী। কর্ম উপলক্ষে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে নীলকরদের নৃশংস পাশব নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেন। তা ছাড়া জন্মভূমি নদীয়াতেও তিনি দেখেছেন চাষীদের উপর নীলকর বণিকদের অনুরূপ অমানুষিক অত্যাচার। যেমন দেখেছেন তেমনি চিত্রিত করেছেন নীলদর্পণ নাটকে। তাঁর দরদী মনের স্পর্শে ভাষা পেল প্রাণ—কাহিনী গ্রহণ করল অপূর্ব রূপ। রচিত হলো এক মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনী।

নীলদর্পণ নাটকখানি পেয়ে লঙ্ সাহেব যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্র ব্যক্তি হঠাৎ একটা অস্ত্র পেয়ে যেমন নতুন জীবন ফিরে পায় ঠিক তেমনি হলো লঙ্ সাহেবের। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন—স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এত দিনে খুঁজে পেলেন প্রতিবিধানের একটা পথ, তিনি এই নাটকটিকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করলেন। তিনি ঠিক করলেন নাটকটিকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করবেন। জনসমাজে নীলকরদের মুখোস খুলে দেবেন। তাদের হেয় প্রতিপন্ন করবেন যুগপৎ দেশীয় ও বিদেশীয়দের কাছে।

কিন্তু অনুবাদ করবে কে? কার উপর ভার দেবেন অনুবাদের। কে পারবে এমন গ্রাম্য ভাষাকে ইংরাজী ভাষায় রূপ দিতে। তিনি নিজে বাঙলা জানেন বটে! কিন্তু সে বাঙলা তো এমন নয়। সরল সহজবোধ্য মার্জিত সাধুভাষা কিন্তু এ যে দুর্বোধ্য জটিল গ্রাম্য চাষীর ভাষা। এর অনুবাদ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

তবে! তবে কি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল একজন বাঙালী-খৃষ্টান ভদ্রলোকের কথা। যাঁর উপর অনুবাদ কর্মের ভার দেওয়া যেতে পারে নিশ্চিন্ত হয়ে। ভদ্রলোক ইংরেজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই পারদর্শী। সমান দখল তাঁর দুই ভাষাতেই। দুই ভাষাতেই তাঁর সমান কলম চলে। এই তো সে দিন দু'-দু'খানি নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করে ইংরেজ সুধী সমাজে প্রশংসা অর্জন করেন। খ্যাতির যশোমাল্যে ভূষিত করেন স্বদেশী ও বিদেশী গুণীর দল। এই লোকটির উপর প্রচুর বিশ্বাস আছে তাঁর। এঁর উপর নাটকটির অনুবাদের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন লঙ্ সাহেব।

এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ভাষাশিল্পীটি আর কেউ নন, 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন তখন সরকারী কর্মচারী। কলকাতা হাইকোর্টের দোভাষী। সরকারী কর্মচারী মধুসূদন প্রথমে এই আইনবিরুদ্ধ অনুবাদ কর্মে রাজী হলেন না। কিন্তু লঙ্ সাহেবও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি মধুসূদনকে ভালোভাবেই চিনতেন। এর আগেই পেয়েছেন তাঁর কোমল প্রাণের পরিচয়। তাই তিনি গরিব অসহায় চাষীদের উপর নীলকর বণিকদের নির্মম নির্যাতনের কথা বললেন। সবিস্তারে শোনালেন তাদের দুঃখ-বেদনার করুণ কাহিনী। অবশেষে নীলদর্পণ নাটকটি হাতে গুঁজে দিয়ে চলে এলেন।

সেই দিনই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ নাটকখানি পড়ে ফেললেন মধুসূদন। একদিকে যেমন অসহায় চাষীদের দুঃখ-বেদনায় তাঁর কোমল প্রাণ করুণায় ভরে উঠল তেমনি অন্যদিকে দুরাত্মা নীলকর বণিকদের পৈশাচিক নির্যাতনের কাহিনী পাঠ করে তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠল। ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তের স্রোত বইতে লাগল। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন. এক রাত্রির মধ্যে সম্পূর্ণ 'নীলদর্পণ' নাটকখানি অনুবাদ করে ফেললেন। একজন উদাত্তকণ্ঠে নাটক আবৃত্তি করে যায় আর মধুসূদন অবিরত কলম চালিয়ে যান। নাটক এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় রূপায়িত হয়। বাঙলা থেকে ইংরেজী ভাষায়।

অনতিবিলম্বে ইংরেজী অনূদিত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হলো (১৮৬১)। ইংরেজ সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরা হলো তাদের সুশিক্ষিত স্বজাতির কুকীর্তির কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া সুরু হলো, ইংরেজ শিক্ষিত মহলে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করল। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল, নীলকরদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করে তাদের গা শিউরে উঠলো, স্বজাতির এই হীন পাশব কার্যকলাপ তারা কিছুতেই সমর্থন করতে পারল না। লজ্জা ঘৃণায় অধোবদন হলো।

বাঙলা দেশ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সুদূর ইংলণ্ডে পর্যন্ত এর ঢেউ গিয়ে পৌঁছাল—আঘাত হানলো, বিদেশে স্বজাতির এই কলঙ্কের কাহিনী পাঠ করে আর লজ্জা আর ঘৃণায় মুখ ঢাকলো। সেখানে নাটকটি এমনি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল যে, তার পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হলো। মধুসূদনকৃত অনুবাদের পুনঃপ্রকাশ করলেন লণ্ডনের সিমপকিন মার্শাল এণ্ড কোম্পানী। শোনা যায় বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স নাটকটি পাঠ করে অর্থলোলুপ নীলকরদের হৃদয়হীন কার্যকলাপে লজ্জিত হলেন, কিন্তু যেমন মুগ্ধ হলেন অপূর্ব ইংরেজী রচনা রীতিতে তেমনি বিস্মিত হলেন মূল নাটকের নাট্যকারের সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি নাটকখানির একটি প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশ করেন তাঁর সম্পাদিত অল্ দি ইয়ার রাউণ্ড সাময়িক পত্রে।

এদিকে নিজেদের সব কুকীর্তির কথা ফাঁস হয়ে পড়ায় নীলকর বণিকেরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তারা প্রথমে গভর্নমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করলো এ রকম বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী ও শান্তিভঙ্গকারী নাটক প্রকাশের হেতু কি? শুধু তাই নয়, অপরাধীকে কঠোর শাস্তিদানের জন্য আবেদন জানালো। কিন্তু গভর্নমেণ্টের দিক থেকে তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না—তারা তেমন আমল দিলে না তাদের। এতে নীলকর বণিক সম্প্রদায় ভীষণ ক্ষেপে উঠল। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে নাট্যকার, অনুবাদক কিংবা প্রকাশক কারুকে না পেয়ে মুদ্রাকর ম্যাসুয়েলের নামে আদালতে মোকদ্দমা করলে।

ইংরেজী নীলদর্পণ নাটকে একমাত্র সি এইচ ম্যানুয়েলের নাম মুদ্রাকর হিসাবে মুদ্রিত ছিল। নাটকে না ছাপা হয়েছিল নাট্যকারের নাম না প্রকাশিত হয়েছিল অনুবাদকের নাম। দুইই গোপন রেখেছিলেন লঙ সাহেব। দু'জনেই যে সরকারী বেতনভোগী কর্মচারী! ভবিষ্যতে হয় তো কোন রকমে বিপদগ্রস্ত হতে হয় সেই আশঙ্কায় তিনি তাঁদের নাম অপ্রকাশিত রাখেন। এমন কি অপ্রকাশিত রাখেন নিজের নাম—আসল প্রকাশকের নাম। কারণ তিনিও যে একজন পাদরী ধর্মপ্রচারক।

নিরপরাধী ম্যানুয়েলের বিপদ হলে—মামলায় জড়িয়ে পড়লে লঙ সাহেব তখন নিজেই ধরা দিলেন। তিনি একটি প্রচারপত্রে বিজ্ঞাপিত করলেন যে, তিনিই ইংরেজী 'নীলদর্পণে'র আসল প্রকাশক। তাঁরই অর্থে নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মূল বাঙলা নাটককে কোন এক দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছেন। মূলের অশ্লীল অংশসমূহ যতখানি সম্ভব পরিত্যক্ত হয়েছে। তবুও কয়েক জায়গায় অনিচ্ছাকৃত আপত্তিকর কিছু রয়ে গিয়েছে, এজন্য তিনি দুঃখিত।

প্রতিহিংসাপরায়ণ নীলকর বণিকরা এত সহজে সন্তুষ্ট হলো না। কিছুমাত্র নির্বাপিত হলো না তাদের ক্রোধাগ্নি। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। পাদরী ডফ সাহেব থেকে আরম্ভ করে প্রায় সমস্ত পাদরী সম্প্রদায়ই তাদের কার্যের বিরূপ সমালোচনা করে এসেছে একদিন। চাষীপ্রজাদের সহায় হয়ে প্রতিপদে তাদের কার্যে বাধার সৃষ্টি করে এসেছে। এতদিন পরে সেই পাদরী সম্প্রদায়ের একজনকে নাগালে পেয়ে তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারা লঙ্ সাহেবের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ নিয়ে এলো। প্রথম অভিযোগ করলেন নীলকর সমর্থক 'ইংলিশম্যান' পত্রের মালিক সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট্। তিনি ইংরেজী 'নীলদর্পণে'র ভূমিকায় তাঁর বিরুদ্ধে যে মানহানিকর উক্তি করা হয়েছে তার জন্য তিনি আদালতে লঙ্ সাহেবের নামে মানহানির মোকদ্দমা করেন। আর দ্বিতীয় অভিযোগ আনলেন নীলকর বণিক সভার সম্পাদক ডব্লু. এফ. ফারগুসন। ইংরেজী 'নীলদর্পণ'

প্রকাশ করে লঙ সাহেব প্রকারান্তে সমগ্র নীলকর সম্প্রদায়ের মানহানি করেছেন এই মর্মে তিনি তাঁর নামে মানহানির মামলা রুজু করেন।

১৮৬১ সাল ১৯শে জুলাই, সুপ্রীম কোর্টে বিচার আরম্ভ হলো। বিচারক খোঁজ করলেন নাটকটির মূল লেখক কে? আর কেই বা এর অনুবাদক? লঙ্ সাহেবকে জেরা করা হলো; অনেক প্রলোভন দেখান হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। না কেবল নাট্যকারের নাম, না পাওয়া গেল অনুবাদকের ঠিকানা। এখানে লঙ্ সাহেব সম্পূর্ণ নীরব. নিজে সকল দণ্ডভোগ করবেন, তবু মধুসূদন বা দীনবন্ধুর নাম প্রকাশ করবেন না। তাদের কারুকে তিনি বিপদগ্রস্ত করবেন না, এই তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। তিনি তাঁর সংকল্প থেকে একচুল নড়লেন না—অটল রইলেন।

এরপর আইনের অনেক বাদানুবাদ হলো—অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো। অবশেষে বিচারপতি লঙ্ সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার মালিক—সম্পাদক ও নীলকর বণিক সম্প্রদায়ের মানহানি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। বিচারে তাঁর একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হলো।

দণ্ড লঘু করার জন্য লঙ্ সাহেবকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হলো। লঙ্ সাহেব একটি সুদীর্ঘ বক্তব্য পাঠ করেন। তার এক জায়গায় তিনি বলেন, কারুর বিরুদ্ধে কোন রকম বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এই নাটক প্রকাশের উদ্দেশ্য নয়। তিনি এদেশে প্রায় বিশ বছর অবস্থান করছেন। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করে এতদিন গভর্নমেণ্টের গোচরীভূত করে আসছেন। বলা বাহুল্য, 'নীলদর্পণ' প্রকাশও সেই কার্যেরই একটি অংশ বিশেষ। যে নীলকররা এদেশে অরাজকতা, গৃহদাহ ও নরহত্যা প্রভৃতি অশান্তিকর ঘটনার সৃষ্টি করেছে সেই নীলকর সম্বন্ধে দেশীয় লোকেদের মনোভাব যুগপৎ গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের গোচরীভূত করা কি মানহানিকর? তাই যদি হয় তবে সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি এমন অনেক সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় কুপ্রথার দোষ প্রদর্শন করাও মানহানিকর। এ ছাড়া সামাজিক ধর্মীয় কোন কুপ্রথার সংস্কার অসম্ভব।

বিচারপতি সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ নীলকর সমর্থক ছিলেন; তিনি লঙ্ সাহেবের এ-কথায় কর্ণপাত করলেন না। লঙ্ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা ঠিকই রইল। তার কিছুই পরিবর্তন হলো না।

সে দিন বিচারালয়ে ভীষণ ভিড়। বিচারের রায় শোনার জন্য বুঝিবা দেশশুদ্ধ লোকই বিচারালয়ে উপস্থিত। সেই অগণিত উৎকণ্ঠিত জনগণের ভিড় ঠেলে একজন প্রিয়দর্শন যুবক এগিয়ে এলেন, হাতে তাঁর এক হাজার টাকার একটি তোড়া। তাঁর স্বদেশবাসীর হিতের জন্য এই বিদেশী বিভাষী মানুষটির দরদী হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তিনি হৃদয়বৃত্তির এক অপূর্ব আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। মুগ্ধ হলেন তাঁর মহানুভবতায়, বিস্মিত হলেন অটুট মানসিক দৃঢ়তায়। নিজে সকল দণ্ড মাথা পেতে নিলেন। কারুর উপর এতটুকু দোষারোপ করলেন না। কি উদার! কি মহান হৃদয়! তিনি তৎক্ষণাৎ সেই টাকা বিচারপতির হাতে দিলেন লঙ সাহেবের জরিমানা-স্বরূপ।

এই স্বদেশ প্রাণ উদারচেতা মুক্তহস্ত যুবকটি আর কেউ নন, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। যাঁর নাম বাঙলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার সুপরিচিত। 'মহাভারতের' অনুবাদ তাঁর অমর সাহিত্য-কীর্তি। সে যুগের ব্যঙ্গ চিত্র 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তাঁরই অমর লেখনী প্রসূত।

লঙ সাহেবের জরিমানা মকুব হলো। কিন্তু কারাদণ্ডের হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। মুক্তি পেলেন না রাজরোষের কবল থেকে। এদিকে লঙ্ সাহেবের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। শোনা যায় সে সময়ে লাটসাহেবের দর্শনপ্রার্থীর চেয়ে কারাগারে লঙ্ সাহেবের দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যায়।

১৮৭২ সালে লঙ্ সাহেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এদেশবাসীর পক্ষ থেকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা একটি বিদায় অভিনন্দন সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় তাঁকে যে বিদায় অভিনন্দন পত্রখানি দেওয়া হয়, তাতে তাঁর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পরিস্ফুট।

বেদনা আমার বেদনাকে

রবীন্দ্র অধিকারী

বেদনা আমার বেদনাকে ফিরে দাও
আর তো কিছুই চাহি নে তোমার কাছে
চৈত্র হাওয়ার বাঁশিতে কান্না ঝরা
যতটুকু সুখ তুমি বুকে করে নাও।
প্রবাসী প্রাণের অলক্ষ্য ঘর বাঁধা
অন্তর্লীনা তোমার ছায়ার তলে
আসন্ন বেলা গোধূলি লগ্নে কাঁপা
বুকের তিমিরে একটি মানিক জ্বলে।

চৈত্রকের মাটিতে তোমার ছাপ
তাই তো বাঁধি না আকুল কান্না দিয়ে
আকাশে উঠেছে প্রসন্ন ধ্রুবতারা
না বলা বাণীর শেষ গান বুকে নিয়ে।
তোমাকে হারিয়ে বেদনাকে ফিরে পাই
সেই তো আমার জীবনের সংক্রান্তি
যতটুকু সুখ তুমি বুকে করে নাও
তত রাতের বাতাস ঘন শান্তি॥

ষ্টিবান

—জিত দাস

ড়ালের হাসি —গৌর দত্ত

অবাক

—দেবু দাস
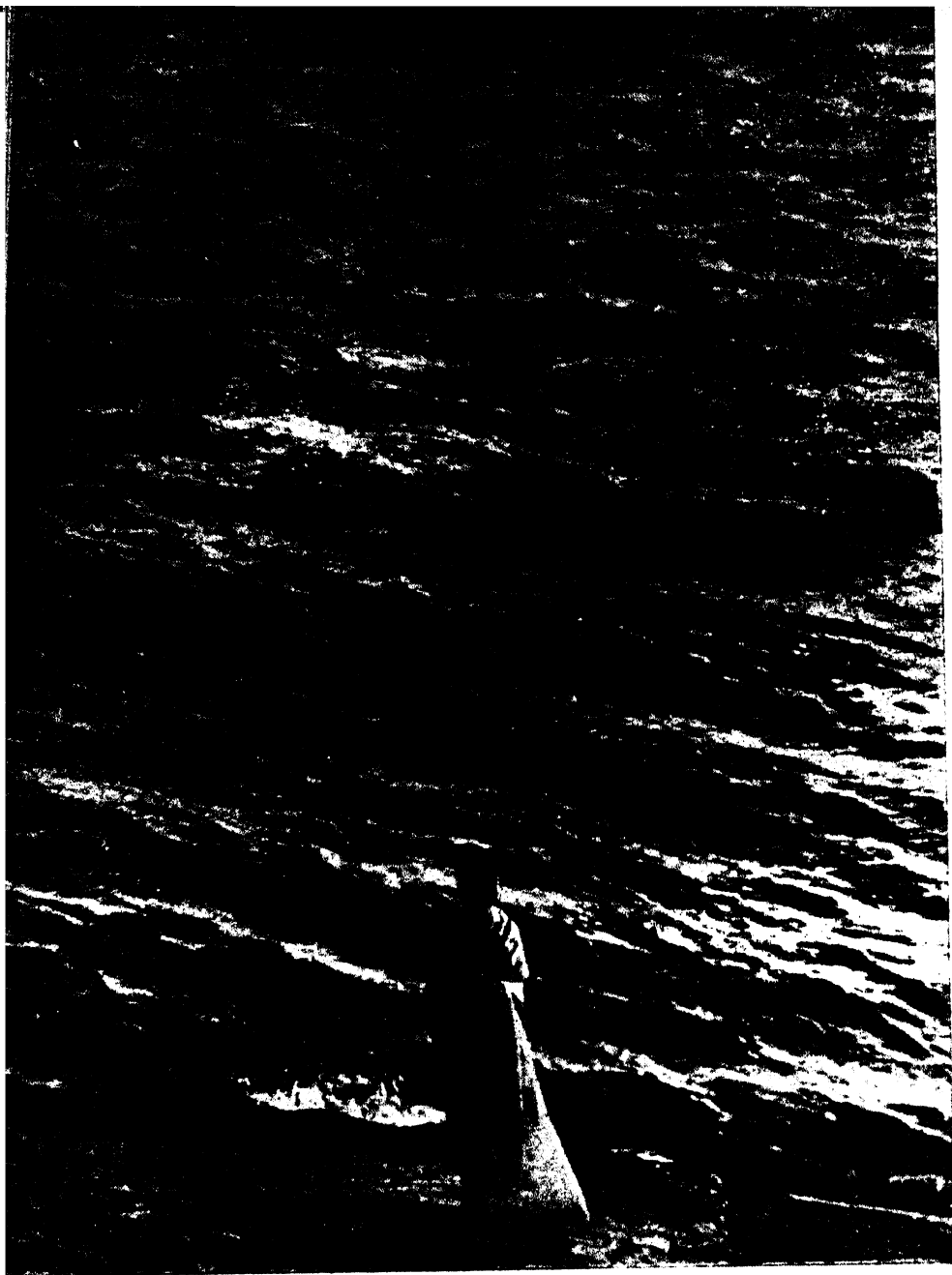
সাগরিকা

—রঞ্জিৎ সেনগুপ্ত

—শান্তিময় সান্যাল

প্রা কৃ তি ক

মাসিক বসুমতী । মাঘ / '৭০

(জব্বলপুর)

—আশু ভট্টাচার্য

—রথীন মালাকার
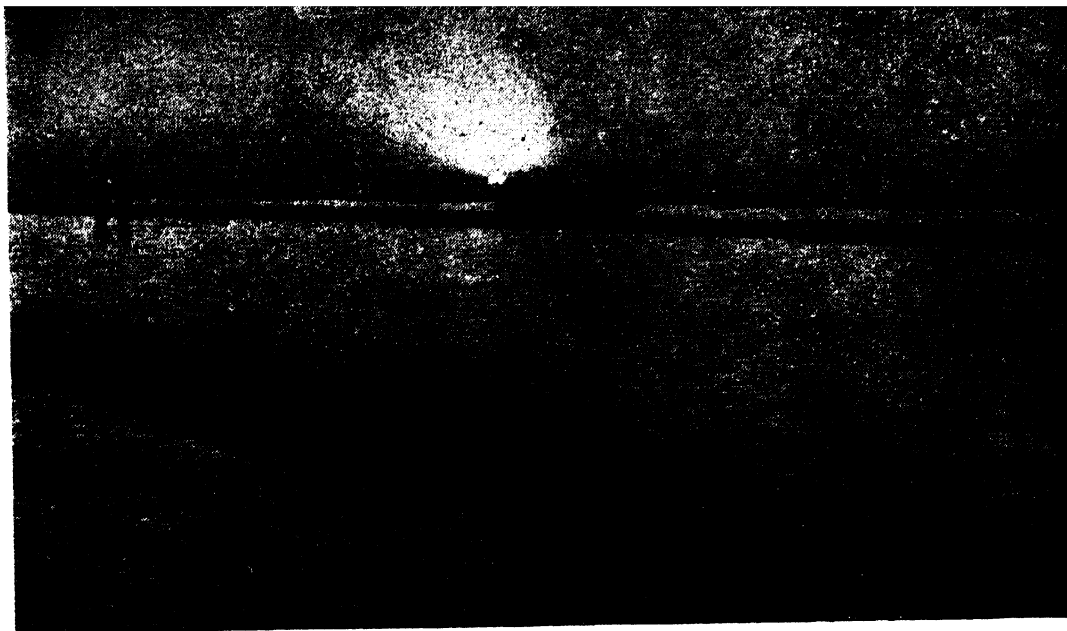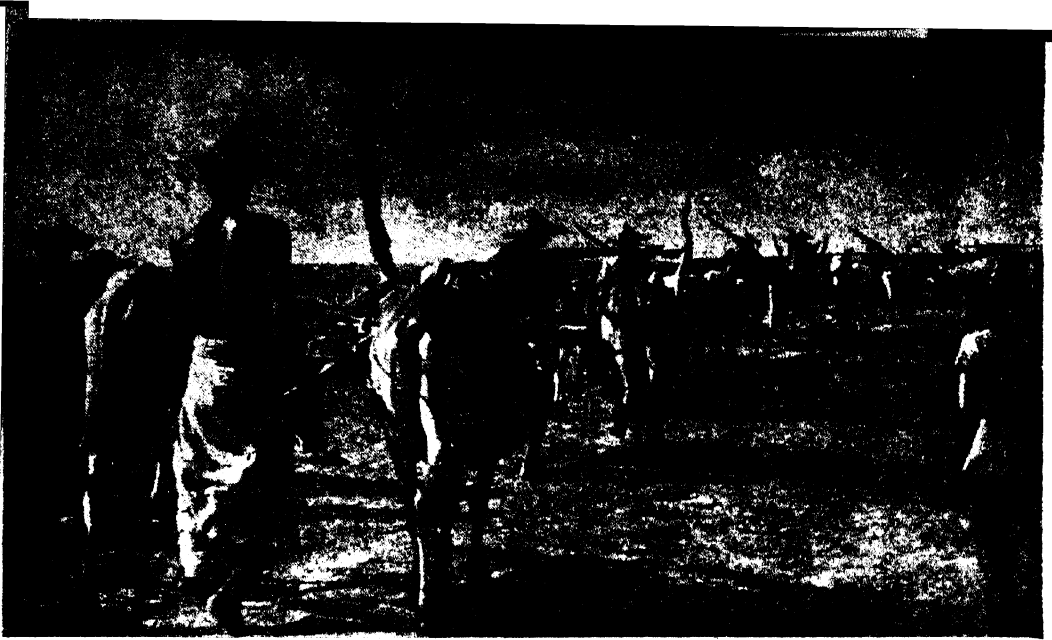
ওরা কাজ করে

—গোপাল রায়
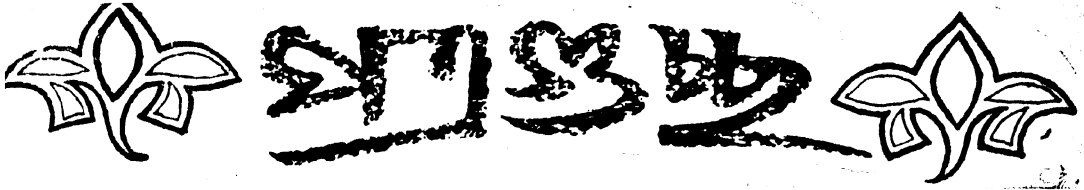
বিগত যুগের কয়েকটি আমন্ত্রণলিপি

[মাসিক বসুমতীর 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে অসংখ্য তথ্যবহুল, আকর্ষণীয় এবং রসসমৃদ্ধ পত্র প্রকাশিত হয়েছে। বহু দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক অপ্রকাশিত পত্রও এই বিভাগে প্রকাশিত হয়ে পাঠক সাধারণ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। স্বদেশের এবং বিদেশের বহু বরেণ্য সন্তান, দিকপাল মনীষিবৃন্দ, বিদগ্ধ সাহিত্যরথী খ্যাতনামা ব্যক্তিদের লিখিত ও সম্বন্ধীয় বহু পত্র প্রকাশিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজ ও যুগের প্রতি এক নতুন আলোকপাত করেছে। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি সামাজিক এবং একটি সাংস্কৃতিক আমন্ত্রণলিপি প্রকাশ করা হ'ল। পত্রগুলির মাধ্যমে বিগত যুগের সামাজিক জীবনের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য প্রকট হয়ে ওঠে। পত্রগুলি স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তৎপুত্র স্বর্গীয় মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের পারিবারিক সংগ্রহ হ'তে প্রাপ্ত। আমরা বিশ্বাস রাখি, ভাবীকালের গবেষকদের সাধনার ক্ষেত্রে এই পত্রগুলি যথেষ্ট সহায়ক বলে বিবেচিত হবে।—স]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক জগদীশচন্দ্রের সম্বর্ধনার আমন্ত্রণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩২১, ৫ই মাঘ।

সবিনয় নিবেদন—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য পরম-শ্রদ্ধাভাজন, স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সি এস্ আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি, পি এচ্ ডি, এফ্ আর এস, মহাশয় নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার দ্বারা দেশ-বিদেশের সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ পূর্বক বাঙলা দেশের ও বাঙালী জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আগামী ১২ই মাঘ, ২৫-এ জানুয়ারী, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৫।০টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎমন্দিরে তাঁহাকে সংবর্ধনা করা হইবে! আপনি অনুগ্রহপূর্বক যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সুখী হইব। ইতি—

বশংবদ
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

দ্রষ্টব্য —অনুগ্রহপূর্বক এই পত্রখানি সঙ্গে আনিবেন।

রাষ্ট্রনায়ক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণীর আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

সবিনয় নিবেদন—

আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রত্নকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ৺রজনীনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী অমিয়া দেবীর শুভ-বিবাহ উপলক্ষে আগামী রবিবার, ৬ই অক্টোবর, আমার সিমলাস্থ ভবনে (৬৯ নং বলরাম ঘোষ স্ট্রীট) আপনি সপরিবারে ও সবান্ধবে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় উপস্থিত হইয়া প্রীতিভোজনে যোগদান করিলে পরম প্রীত হইব। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

কলিকাতা, ৬নং পার্ক স্ট্রীট। নিবেদিকা
১লা অক্টোবর, ১৯০৭। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী।

Mrs. W. C. Bonnerjee.
requests the pleasure of
Sir Jotindro Mohun Tagore
Maharajah Bahadoor K. C. S. I.'s
company at the Marriage of
her daughter
Pramila(১)
with
Amiya Nath Chaudhuri
at 6, Pa.k Street, Calcutta,
on Tuesday, August 13th, 1907,
at 9 P. M.

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

উত্তরপাড়া,

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার আমার পৌত্র শ্রীমান্ লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৫২ নং হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর নিবাসী রায় বাহাদুর রামসদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর সহিত শুভ-বিবাহ হইবে। মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সবান্ধবে মদীয় উত্তরপাড়ার ১০ নং লরেন্স রোডস্থ ভবনে নিম্নলিখিত দিবসদ্বয়

১। ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর জননী

শুভাগমন পূর্ব্বক শুভকার্য্যাদি সম্পন্ন করাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ইতি—১৪ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩২৬ সাল।

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৩।॰ ঘটিকায় বরানুগমন।
(গোধূলি লগ্নে বিবাহ)
২৭শে অগ্রহায়ণ শনিবার মধ্যাহ্নে পাকস্পর্শ ও প্রীতিভোজন।
কোন প্রকার লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

সবিনয় নিবেদন—

আগামী ১৩ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল) শুক্রবার মুক্তাগাছা নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীর সহিত আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর শুভ পরিণয় হইবে। তদুপলক্ষে মহাশয় সবান্ধবে আমাদিগের শ্রীরামপুরস্থ ভবনে নিম্নলিখিত দিবসসমূহে আগমন করিয়া শুভকার্য সম্পাদন ও উৎসবাদিকার্যে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীরামপুর, নিবেদক—
৩রা বৈশাখ, ১৩২৫। শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী

লৌকিকতার পরিবর্তে সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

১৩ই বৈশাখ—(২৬শে এপ্রিল) শুক্রবার অপরাহ্ণ ১টার সময় শ্রীরামপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে বরের সহিত কলিকাতা গমন, পরে অপরাহ্ণ ৫টার সময় শ্যামবাজারের ২নং বৃন্দাবন বসু লেন স্ট্রীট হইতে ১নং রামবাগানলেনস্থ ভবনে বরানুগমন।

১৭ই বৈশাখ—(৩০শে এপ্রিল) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় চিত্তরঞ্জনের[২] কৌতুকাভিনয় পরে সান্ধ্য প্রীতিভোজন। রাত্রি ১০টার সময় মিনার্ভা থিয়েটার।

২৮শে বৈশাখ—(১১ই মে) শনিবার রাত্রি ১০টার সময় যাত্রাগান।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের আমন্ত্রণ

ওঁ

সবিনয় নিবেদন—

আগামী ১৯শে মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) বৃহস্পতিবার লোয়ার সার্কুলার রোড ২৩১নং বাটীতে আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান শিশিরকুমারের সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা পৌত্রী শ্রীমতী শান্তিলতার শুভ বিবাহ হইবে। মহাশয় তদুপলক্ষে মদীয় ভবনে সপরিবারে শুভাগমন করতঃ শুভকার্য সম্পন্ন করাইবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

১৭নং ইলিসিয়ম রো, বিনীত—
কলিকাতা, ৬ই মাঘ, ১৩২৩। শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

স্মারক-লিপি

১৯ মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী)
বৃহস্পতিবার ৬।॰ ঘটিকার সময় বরানুগমন।
২২শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী)—
রবিবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় লোয়ার সার্কুলার রোড, ২৩১নং বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে বান্ধবভোজন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ
জয়তি।

শুভ অন্নপ্রাশন কাশিমবাজার রাজবাড়ি।
২৫শে পৌষ, ১৩২১ সাল।

সম্মান প্রণামান্তে নিবেদন মিদং—

আগামী ৬ই মাঘ, ইংরাজী ২১শে জানুয়ারী বুধবার, আমার পৌত্রী, শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাবাজীবনের প্রথমা কন্যার শুভ অন্নপ্রাশন হইবে। তদুপলক্ষে মহাশয় সবান্ধবে মদালয়ে উপস্থিত হইয়া শুভকার্যে যোগদান করতঃ শুভকার্য সম্পাদন করাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

নিবেদন ইতি— বিনয়াবনত—
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ।

প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

আগামী ১২ই বৈশাখ বুধবার আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী [illegible] সহিত ফরিদপুর জেলার [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বিজয়কুমার রায়ের শুভ বিবাহ ও তদুপলক্ষে ৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার পাকস্পর্শ ও বধূভাত হইবে। উক্ত উভয় দিবসে মহাশয় সবান্ধবে আমার কাশিমবাজার রাজবাটীতে শুভাগমন পুরঃসর শুভকার্য সম্পাদন ও আহারাদি করিয়া সুখী করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

নিবেদনমিতি—

কাশিমবাজার রাজবাটী, বিনীত
২৯শে চৈত্র, ১৩২৩ সাল। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

রাজা প্রমোদানাথ রায়ের আমন্ত্রণ

163, Lower Circular Road.
February 27th, 1917.

My dear Friend,

I shall be greatly delighted if you will kindly accompany me to Cossimbazar Rajbaree on the occasion of the Barasirbad Ceremony on Saturday, the 10th March next.

Our train leaves Sealdah at 2 p. m. (Calcutta time) and arrives at Cossimbazar at 8 the same evening. We leave Cossimbazar after dinner

---

২। কৌতুকশিল্পী চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

and sleep in our carriage, returning here at 8-30 next morning.

An early reply will highly oblige.

Yours V. sincerely,
Sd. P. N. Roy.
of DIGHAPATIA.

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ।

সবিনয় নিবেদন—

আগামী ১৬ই আষাঢ়, ইংরাজী ১লা জুলাই, মঙ্গলবার ফরক্কাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পুরুষোত্তম নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের সহিত আমার সর্বকনিষ্ঠা ভগিনীর শুভ-বিবাহ হইবে। মহাশয়, উক্ত দিবস সবান্ধবে আমার নশীপুরস্থ ভবনে পদার্পণ করতঃ শুভকার্য নির্বাহিত করাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি—

নশীপুর রাজবাটী — নিঃ—
১লা আষাঢ়, সন ১৩২৬। — শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ।

সবিনয় নিবেদন—

আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ ইংরাজী ১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আরা নিবাসী ৺... কুমারের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ চক্রেশ্বর কুমারের সহিত আমার কল্যাণীয়া কন্যার শুভ-বিবাহ হইবে। মহাশয়, উক্ত দিবস সবান্ধবে আমার নশীপুরস্থ ভবনে পদার্পণ করতঃ শুভকার্য নির্বাহিত করাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি—

নশীপুর রাজবাটী, — নিঃ—
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। — শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) শনিবার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুষমার সহিত শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্রের শুভ পরিণয় হইবে। তদুপলক্ষে মহাশয় সবান্ধবে উক্ত দিবস মদীয় ভবনে আগমন করতঃ শুভকার্য সম্পন্ন করাইলে বাধিত হইব। ইতি—

বিনীত—
১৪নং বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, — শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু
শ্যামবাজার, কলিকাতা,
১২ই ফাল্গুন ১৩২৩।

কোনরূপ লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের আমন্ত্রণ

ওঁ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

আগামী ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার লাহোর নিবাসী শ্রীযুক্ত লালা সন্তরাম খান্নার পুত্র শ্রীমান নন্দলাল খান্নার সহিত মদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাজ-কুমারী শ্রীমতী সুধারাণী দেবীর শুভ-বিবাহ হইবে। তদুপলক্ষে আপনি উক্ত দিবসে মদীয় বর্ধমানস্থ ভবনে শুভাগমন করতঃ শুভকার্যে যোগদান করিলে পরম প্রীতিলাভ করিব। ইতি—

রাজবাটী, বর্ধমান, — বশম্বদ
সন ১৩২৫ । ১৫ই মাঘ — শ্রীবিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ রায়বর্মা।

ওঁ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৯ই বৈশাখ সোমবার মদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-কুমার উদয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ রায়বর্মা বাবাজীবনের শুভ-উপনয়ন কার্য সম্পন্ন হইবে; তদুপলক্ষে আপনি উক্ত দিবসে মদীয় বর্ধমানস্থ ভবনে শুভাগমন করতঃ শুভকার্য সুসম্পন্ন করাইবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি—

বশম্বদ
রাজবাটী, বর্ধমান, — শ্রীবিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ রায়বর্মা।
সন ১৩২৫ । শুভ বৈশাখ।

রাজা হৃষিকেশ লাহার আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ

স্মারক-লিপি

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমার মণ্ডলের সহিত আমার পৌত্রীর শুভ পরিণয় হইবেক। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া মদীয় ভবনে আগমন পূর্বক শুভকর্মাদি সম্পন্ন করাইবেন।

২রা মাঘ, সোমবার .. আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন।
৬ই মাঘ, শুক্রবার ... অধিবাস ও শুভ-বিবাহ।

৯৬ নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা, — ভবদীয় বশম্বদ
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। — শ্রীহৃষীকেশ লাহা

লৌকিকতা লইতে অক্ষম

স্যার কৈলাশচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীজয়দুর্গা

সুপবিত্র পরিণয় — জয়তি।

বিনয়পূর্বক নিবেদনমিদং—

আগামী ২৬শে ফাল্গুন, ইংরাজি ১০ই মার্চ, শনিবার আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিভাবতীর সহিত গরাণহাটা নিবাসী ৺যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ

হইবে। মহাশয় সবান্ধবে মদীয় 'মধুর ভবনে' শুভাগমনপূর্বক শুভ কার্যাদি সুসম্পন্ন করাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ইতি—

মধুর ভবন, বশংবদ—
১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।
১৭ই ফাল্গুন, ১৩২৩।

পুঃ—সবিনয় প্রার্থনা কোনরূপ উপঢৌকনাদি পাঠাইবেন না, আপনাদের স্নেহাশীর্বাদই যথেষ্ট।

শ্রীসুরজিতচন্দ্র লাহিড়ীর বিবাহের আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

বর্তমান মাসের ২৭শে তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় পাবনা তাঁতিবন্দ নিবাসী শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুরজিৎচন্দ্রের সহিত আমার পৌত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুপ্রভা দেবীর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইবে। মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সবান্ধবে মদীয়ভবনে যথা সময়ে আগমন করতঃ কার্য সৌষ্ঠব করিবেন এবং তৎপরে দিবসদ্বয় গীতবাদ্যাদি শ্রবণ ও বায়স্কোপ দর্শনে বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ত্রুটি মার্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি।

'রায় হাউস' ঢাকা, শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্মা রায়।
১১ই বৈশাখ, ১৩২৮ সন।

লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ।

মুরলীধর রায়ের আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণার সহিত আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনারায়ণের শুভ বিবাহ হইবে। মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সবান্ধবে মদীয় ভবনে শুভাগমন করতঃ শুভকার্যে যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনীয়। ইতি—

২৬নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, বিনীত—
কলিকাতা। শ্রীমুরলীধর রায়।
৩রা বৈশাখ, ১৩২৫ সন।

স্মারকলিপি

১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার—বরানুগমন (প্রাতে ৯ ঘটিকা)।
১৪ই বৈশাখ শনিবার—সান্ধ্য সম্মিলন নৃত্যগীতাদি (রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে)।
১৫ই বৈশাখ রবিবার—প্রীতি-ভোজন।

শিয়ালদহ হইতে স্পেশিয়াল ট্রেন প্রাতে ১০টায় (কলিকাতার সময়) কাশিমবাজার যাইবে।

ভাগ্যকুলের তড়িৎভূষণ রায়ের আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

বিহিত সম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

আগামী ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রমোদ কুমারের সহিত দিঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহোদয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাপ্রভার শুভ-পরিণয় হইবে। তদুপলক্ষে মহাশয় সবান্ধবে মদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া শুভকার্যে যোগদানে অনুগৃহীত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—২৮শে মাঘ, ১৩২৩।

৬নং অভয়চরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বিনীত—
কুমারটুলী, কলিকাতা। শ্রীতড়িৎভূষণ রায়

বরানুগমন—১১ই ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা।
সান্ধ্য-সম্মিলন—১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রি ৯-১৫ ঘটিকা।

লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।

রসিকলাল দত্তের আমন্ত্রণ

ওঁ তৎসৎ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ১৯শে মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকার সময় আমার প্রিয়তমা পৌত্রী কুমারী শান্তিলতার সহিত মাননীয় স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ শিশিরকুমারের শুভ-বিবাহ হইবে। মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ২৩১ লোয়ার সার্কুলার রোড ভবনে সপরিবারে শুভাগমন করতঃ শুভকার্য সুসম্পন্ন করাইবেন এবং বিবাহান্তে আহারাদি করতঃ আমাকে আপ্যায়িত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ-ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

৪নং মদন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিবেদক—
৫ই মাঘ ১৩২৩। শ্রীরসিকলাল দত্ত।

দীঘাপতিয়ার বসন্তকুমার রায়ের আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

সসম্মান নিবেদনমিদং—

আগামী ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার ভাগ্যকুল নিবাসী শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রমোদকুমার রায়ের সহিত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাপ্রভার শুভ-বিবাহ হইবে। মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সবান্ধবে ২২৭-২ নং লোয়ার সার্কুলার রোড ভবনে শুভাগমন করতঃ বিবাহের সৌষ্ঠব বর্ধন ও শুভকার্য সম্পাদন করাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত—
কলিকাতা, শ্রীবসন্তকুমার রায়
৩০শে মাঘ, ১৩২৩। (দিঘাপতিয়া)

লৌকিকতার পরিবর্তে আপনাদের আশীর্বাদই প্রার্থনীয়।
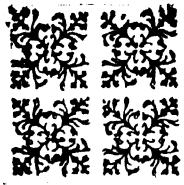
সুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

[দিকপাল ক্রীড়াবিদ ও প্রবীণ ব্যারিস্টার]

বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যে সকল পরিবারের অবদান অগ্রগণ্য সর্বাধিকারী পরিবারের নামও সেই তালিকায় উল্লেখনীয়। বাঙলার সর্বাধিকারী পরিবারের সন্তানরা প্রায় সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও সুনাম অর্জন করে পরিবারের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বিবর্ধিত করেছেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় ডীন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর আট পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সুশীলপ্রসাদ এই বংশের এক স্মরণীয় সন্তান। পরিবারের গৌরববর্ধনে তাঁর ভূমিকাও অসামান্য। স্যার দেবপ্রসাদ, কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ, আই-এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ, কবি মুণীন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁর অগ্রজ। ১৮৭১ সালে সুশীলপ্রসাদের জন্ম। কলকাতার বহুবাজার হাই স্কুল ও হেয়ার স্কুলে তিনি পাঠগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন—পরে বিশেষ বৃত্তি লাভ করে তিনি সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজে যোগদান করেন। ১৯০৮ সালে সুশীলপ্রসাদ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ও লিঙ্কনস ইন-এ যোগদান করেন, এখানে শিক্ষাগ্রহণকালে তিনি দুইটি বিষয়ে অনার্স লাভ করেন। তাঁর ইংল্যাণ্ডে বসবাসকালে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা তাঁর উদ্যোগে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। লিঙ্কনস ইন-এর কৃতী সভ্যদের মধ্যে বর্তমানে তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ।

সফলতা অর্জন করে দেশে ফিরে এলেন সুশীলপ্রসাদ। হাইকোর্টে যোগ দিলেন ১৯১০ সালে। অল্পকালের মধ্যে একজন কৃতী ব্যারিস্টার রূপে যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি তিনি অর্জন করেন, তাঁর যশ দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, দক্ষ ব্যারিস্টারদের মহলে একটি বিশেষ আসন তাঁর জন্যেও নির্ধারিত হয়। হাইকোর্টে এবং বিভিন্ন আদালতে এগারোটি খুনের মামলার পরিচালনায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন ও আসামীরা তাঁর কুশলতায় মুক্তি পান। তদানীন্তন ল'মেম্বার বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে ছোট আদালতের বিচারপতির কর্মভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করা সুশীলপ্রসাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁকে স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের কর্মভার গ্রহণের আহ্বান জানান। এই আহ্বানে তিনি সাড়া দেন কিন্তু অকস্মাৎ একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঐ দায়িত্বগ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠল না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় তিনি বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোরের প্রচারসচিবের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। বেঙ্গল রেজিমেণ্ট তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয়। পরিচালনার ভার অর্পিত হয় ডাঃ এস কে মল্লিকের প্রতি। এই সময়ে কলকাতা এবং বাঙলার অন্যত্র স্থানসমূহে তাঁর নেতৃত্বে মহাসমারোহে বাঙলার নববর্ষ উৎসব উদযাপিত হয়। পূর্ববঙ্গের মন্দির সংস্কার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন সুশীলপ্রসাদ।

দেশের ক্রীড়াজগতের ইতিহাসে তাঁর নাম এক বিশেষ মর্যাদা সহকারে লিপিবদ্ধ। ক্রীড়াজগতের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিচ্ছেদ্য। এদেশের ক্রীড়াবিদ্যা যে তাঁর দ্বারা কতখানি সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক ইতিহাসই তার প্রধান সাক্ষ্য। সে যুগে শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিলেন। কলকাতার স্কুল কলেজের বাৎসরিক খেলাধূলার তিনি প্রবর্তক জামতাড়ার সর্বাধিকারী প্যাভিলিয়ান তাঁরই নামানুসারে গঠিত হয়েছে। তাঁর ক্রীড়াদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ পঁয়তাল্লিশটি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক তিনি লাভ করেন। আই এফ এ শীল্ডের দ্বিতীয় বৎসরে ডেভিড হেয়ার ক্লাবের নেতারূপে ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় [illegible] বৎসর বয়স্ক সুশীলপ্রসাদ অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেন। প্রতিপক্ষ ছিলেন

সুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

ক্যালকাটা ক্লাব। সাতজন বিলাতী তাঁর যুক্ত খেলোয়াড় ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। ১৯০৮ সালে শেষ শীল্ড খেলায় তিনি অবতরণ করেন। ডালহাউসির বিরুদ্ধে সেমিফাইন্যালে।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। ইংরাজী ও বাঙলা বহু বিখ্যাত পত্র পত্রিকার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খেলাধূলা বিষয়ক বাঙলা রচনাদির তিনি প্রবর্তক। খেলাধূলার বাঙলা পরিভাষার রূপদাতা তিনি। কয়েকটির গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। গীতকার, প্রবন্ধকার, জীবনীকার হিসাবেও তিনি পরিচিত।

সুপ্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ স্বর্গত ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গতা সতীরাণী দেবীর সঙ্গে ইনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের পুত্রগণও কৃতী ও স্বনামধন্য। প্রথম পুত্র খ্যাতনামা বক্ষ চিকিৎসক ডাঃ বিমানচন্দ্র সর্বাধিকারী। দ্বিতীয় পুত্র কলকাতার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রথম বাঙালী চীফ এজেন্ট বিকাশচন্দ্র সর্বাধিকারী এবং তৃতীয় পুত্র বিজয়চন্দ্র ক্রীড়ারসিক সমাজে প্রখ্যাত ক্রীড়াসমালোচক ও ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ বেরী সর্বাধিকারী নামে সুপরিচিত এবং অশেষ জনপ্রিয়।

শ্রীমতী রমলা নন্দী

[মগধ মহিলা কলেজের (পাটনা) অধ্যক্ষা]

বাঙলার বাইরে বাঙলার মেয়েদের মধ্যে যাঁরা আপন কৃতিত্বে ও নৈপুণ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন শ্রীমতী রমলা নন্দী তাঁদেরই একজন। বিহারের রাজধানী পাটনা। মগধ মহিলা কলেজ সেখানকার নারীদের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। সেই মহৎ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষার পদে সমাসীনা বাঙলার মেয়ে শ্রীমতী নন্দী। পাটনার তথা বিহারের শিক্ষাজগতে শ্রীমতী নন্দী আজ একটি মুখ্য নাম।

পিতৃভূমি হুগলী। পিতৃদেব স্বর্গত শ্যামাচরণ দে সরকারী কর্মসূত্রে পাটনায় আসেন, কালে পাটনাই তাঁদের কর্মস্থল থেকে বাসভূমিতে পরিণত হয়। শ্যামাচরণ দের কন্যা রমলা নন্দী ১৯১৭ সালের ২০-এ ফেব্রুয়ারি পাটনাতেই জন্মগ্রহণ করেন। মা শ্রীযুক্তা নবকুলতা দের বয়স বর্তমানে ৭৬।

১৯৩২ সালে বাঁকিপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আই. এ. পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণা হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসাবে। পাটনা কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষায় (অর্থনীতিতে অনার্স সহ) লাভ করলেন দ্বিতীয় স্থান। ১৯৪৩ সালে উত্তীর্ণা হলেন এম, এ, পরীক্ষায়।

পাটনা উইমেন্স কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপিকারূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হ'ল। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ অবধি তাঁর অধ্যাপিকা জীবনের স্থায়িত্ব। ১৯৪৭ সালে তিনি মগধ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন; আজও সগৌরবে তিনি সেই আসনে অধিষ্ঠিতা।

১৯৫২ সালে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে অর্থনীতিতে এম, এস, সি পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণা হন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশসমূহ এই সময়ে তিনি পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

লণ্ডনের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটির তিনি অন্যতমা সদস্যা। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক এ্যাসোসিয়েশানের তিনি সভ্যা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের তিনি ভাইস চেয়ারম্যান এবং ভারত সেবক সমাজের রেজিন্যাল ক্যাম্প কমিটির তিনি চেয়ারম্যান।

বাগান চর্চা ও ভ্রমণ তাঁর প্রধান শখ। জনকল্যাণকর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাসমূহে শ্রীমতী নন্দী সর্বদাই অগ্রণী এবং এক বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারিণী। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচয়ে তাঁদের জীবন সম্বন্ধে জানায় তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে থাকেন।

ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[বিখ্যাত সাহিত্যিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক]

সাহিত্যিক দক্ষতা ও বিদগ্ধ প্রতিভার সঙ্গে অমায়িকতা, বিনয়-গুণ ও সৌজন্যবোধ যাঁদের মধ্যে মিলিত হয়ে মানুষটিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম। যুগপৎ সাহিত্যক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামটি আজ নানাদিক দিয়ে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের আদিনিবাস বরিশাল। স্বর্গত প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলেন দিনাজপুরের অন্তর্গত বালিয়াডিঙ্গিতে ১৩২৪ সালের শ্রীপঞ্চমীর পরবর্তী দিনটিতে (ফেব্রুয়ারী ১৯১৮)। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই আজকের দিনের বাঙলার অগণিত সাহিত্যসমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাধুবাদের অধিকারী হয়েছেন 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' নামের অন্তরালে।

পারিবারিক ডাকনাম ছিল 'নারায়ণ'। পরিণামে সেই নাম তাঁকে এনে দিল খ্যাতি, যশ, প্রতিষ্ঠা। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় বাঙলা দেশের সাহিত্যজগতে 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' নামটিও কোন ক্রমেই বিস্মৃত হওয়ার নয়। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই নামটি চিরদিন দীপ্তিসমৃদ্ধ হয়ে অমর হয়ে থাকবে। গত শতাব্দীর অন্যতম উজ্জ্বল অবদান সেই স্বর্গত সাহিত্যনায়ক বাঙলা সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনার আলেখ্য সর্বপ্রথম তুলে ধরেছিলেন।

পৌর বিদ্যালয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষারম্ভ। তারপর দিনাজপুর জেলা স্কুল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফরিদপুরে আসেন অধ্যয়নমানসে। এখানে সহপাঠীদের মধ্যে একজন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বন্ধুত্বের প্রীতির প্রগাঢ় বন্ধনে দুই বন্ধু আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। সে বন্ধন আজও শৈথিল্যমুক্ত। বাঙলার পাঠক সমাজে এই বন্ধুও আজ যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী। তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ফরিদপুরের কলেজ জীবনে

ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সেজন্যে ফরিদপুর ত্যাগ তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে ওঠে। বরিশালে গিয়ে ভর্তি হন ব্রজমোহন কলেজে। সেখান থেকে উত্তীর্ণ হন আই, এ এবং বি, এ পরীক্ষায়। সে সময়ে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে একটি নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে নামটি বাংলার দিকপাল কবি জীবনানন্দ দাস। ১৯৪১ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে এম-এ পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। এম-এ অধ্যয়নকালে তাঁর সতীর্থ ছিলেন খ্যাতনামা কবি ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, সুলেখক অধ্যাপক সুশীল জানা এবং প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ও নাট্যবিদ ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর জলপাইগুড়ি কলেজে তাঁর অধ্যাপক-জীবনের সূচনা (১৯৪২)। ১৯৪৫ সালে অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন সিটি কলেজে। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তালিকায় তাঁর নামটিও হল যুক্ত। ১৯৬০ সালে ডি. ফিল উপাধি লাভ করলেন তিনি। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'সাহিত্যে ছোটগল্প।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার মূলে ছিল বাড়ির আবহাওয়া। পিতৃদেব এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সকলেই ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। ছাত্র হিসাবেও প্রমথনাথের পুত্রগণ যেমনই ছিলেন মেধাবী ও কৃতী, সাহিত্য পাঠক হিসাবেও অন্যান্যের তুলনায় বয়সের অনুপাতে তাঁরা অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন। সাহিত্যের হাওয়ায় সারা বাড়ি ভরপুর। সেই পরিবেশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। কবিতা লেখা শুরু হয় ন'দশ বছর বয়সে। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'মাস পয়লা' পত্রিকায় এবং পুরস্কার লাভ করে। কবিতার নাম 'আষাঢ়ে' তারপর কবি হিসাবে তাঁর নাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধিসহ সাধারণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইনি কলেজ জীবনেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন—সেই জন্যেই তাঁর সেই সময়ে লেখা কবিতাগুলিও বিপ্লবধর্মী। তাঁর বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় কবিতার মধ্যে ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে। কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির প্রভাব তাঁর কবিতায় যথেষ্ট ছায়াপাত করেছে। গল্প ও উপন্যাস লেখার প্রথম অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ পান যথাক্রমে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। বিচিত্রার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নানা কারণে তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তরুণ সাহিত্যব্রতী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা যে সময়ে বিচিত্রায় প্রকাশিত হচ্ছে সেই সময়ে বিচিত্রা ধন্য হয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির রচনায়। গল্প লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে গল্প লেখার তিনি নেপথ্য গুরু। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সদিন তাঁর পিপাসু চিত্তকে গভীর ভাবে দোলা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দিকপাল সাহিত্যরথীদের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। উপনিবেশ, শিলালিপি, পদসঞ্চার, লালমাটি, তিনপ্রহর, নীল দিগন্ত, বৈতালিক, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, মেঘের উপর প্রাসাদ প্রমুখ গ্রন্থগুলি তাঁর অভিনন্দনীয় সাহিত্য সৃষ্টির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মাত্র। তাঁর শ্রেষ্ঠ ও স্বনির্বাচিত গল্পের কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট অবদান। ১৯৪৫ সালে চলচ্চিত্র রাজ্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। স্বর্ণসীতা, সম্পদ, সঙ্কেত, অঙ্কুশ, রূপান্তর সঞ্চারিণী প্রভৃতি চিত্রগুলির তিনি কাহিনীকার। এ ছাড়া বহু চিত্রের সঙ্গে চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার ও গীতিকার হিসাবে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী অধ্যাপিকা ডক্টর আশা গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যজগতেও যুগপৎ খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারিণী। শ্রীমান অরিজিৎ তাঁদের একমাত্র পুত্র।

রথীন মৈত্র

[প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় চিত্রকলায় যে নবজাগরণ সূচিত হ'ল তার ব্যাপক নবরূপায়ণের ইতিহাসে ক্যালকাটা গ্রুপ শিল্পীগোষ্ঠীর অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশ শতকের চতুর্থ দশকে এই শিল্পীগোষ্ঠীর বিস্ময়কর আবির্ভাব রসিকমহলে এক অসাধারণ সাড়া জাগিয়ে তুলে শিল্পলোকে নতুনত্বের সূচনা করল। যে তরুণ সম্ভাবনাময় শক্তিমান শিল্পীদের সমন্বয়ে এই গোষ্ঠীটি রূপ নিয়েছিল তাঁদের মধ্যে সুভো ঠাকুর, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তালিকায় আরও একটি নাম নিঃসন্দেহে উল্লিখিত হওয়ার দাবীদার। সে নাম রথীন মৈত্রের।

পাবনার এক বিখ্যাত জমিদারবংশের সন্তান যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। দেশ ও জাতিসেবার এক উল্লেখযোগ্য পরিচয় তিনি রেখে গেছেন। ললিত-কলার ক্ষেত্রে তাঁর দুই পুত্র আজ এক বিশেষ প্রসিদ্ধি, যশ ও সুনামের অধিকারী। একজন বিশিষ্ট কবি, সুরকার ও গণ-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অন্যজন শিল্পী রথীন মৈত্র। সাধারণ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা ফুটে উঠছে একজনের লেখনীতে, ছন্দে আর একজনের তুলিকায়, রঙে। রথীন মৈত্রের জননী শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী পরিবারের স্বর্গত রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর কন্যা ও স্বনামধন্য বাগ্মী ও জননায়ক স্বর্গত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর ভগিনী। সুসঙ্গের বর্তমান মহারাণী রথীন মৈত্রের অন্যতমা ভগিনী।

১৯১৩ সালের ১০ই জুলাই শিল্পী রথীন মৈত্রের জন্ম। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর যথারীতি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে ভর্তি হলেন মহাবিদ্যালয়ে। এদিকে বাল্যকাল থেকে চিত্রকলা তাঁর মনপ্রাণ অধিকার করে আছে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার স্বপ্ন তাঁকে বিভোর করে রেখেছিল, তাই কলেজে পড়া বেশিদিন তাঁর হ'ল না। অন্তরের দুর্বার প্রেরণায় শিল্পকলার মাধ্যমেই জীবনের প্রকৃত চলার পথের তিনি সন্ধান পেলেন। যোগ দিলেন আর্ট স্কুলে। তারপর যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন ফাইন্যাল ডিপ্লোমা পরীক্ষায়।

তারপর শিল্পীর দুর্বার সাধনার ব্যাপক অগ্রগতি। ছবি এঁকে চলেন, সাধনায় বিরাম নেই, তবু মন যেন তৃপ্তি পায় না। প্রাণে যেন স্বস্তির চিহ্ন নেই দুর্দান্ত সমাহিত তপস্যার প্রশান্তির মধ্যে যেন বেদনার প্রতিমূর্তি। কোথায় যেন একটা শূন্যতা কোথায় যেন একটা ব্যর্থতা।

রথীন মৈত্র

এই বেদনা, শূন্যতা, ব্যর্থতা বিহ্বল করে শিল্পীর রসপিপাসু মন। সেই জ্বালা নিবারণের রসদ খুঁজে বেড়ান শিল্পসম্পর্কিত আধুনিক ও অনাধুনিক গ্রন্থাদির পাতায় পাতায় দেশ বিদেশের প্রাচীন ও নবীন কবিদের কাব্যের ছত্রে ছত্রে। অন্তরে অনুভব করেন ঘর ছাড়ার আহ্বান। পা বাড়ান বাইরের উন্মুক্ত বিশাল পৃথিবীর অন্তহীন পথে। প্রকৃতির অফুরন্ত অবদান, নিসর্গের সমারোহ, রূপ রঙের সীমাহীন শোভা ভরিয়ে তোলে শিল্পীর দুরন্ত পিপাসা। তাঁর দৃষ্টি খুঁজে পায় সমকালীন মানুষের শ্রমধর্মী প্রতিমূর্তি, সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা পেল তাঁর সূক্ষ্ম তুলিকায়।

১৯৪৩ সালের সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনে বহন করে আনে এক সর্বৈব বিপর্যয়, এক মুঠো অন্নের জন্য অগণিত নরনারীর বুকফাটা হাহাকার সমগ্র আকাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে দিঙমণ্ডলকে ভয়াবহ করে তুলেছে, দিকে দিকে শুধু কান্নার রোল, ঘরে ঘরে সর্বনাশের সমারোহ, মৃত্যুর ইশারা, আর ভয়ঙ্করের স্বাক্ষর। শিল্পীর চোখে মানুষের এক পৃথক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়, এক নতুন চেতনার তিনি সম্মুখীন হন, নরনারীর সেই বেদনার্ত ব্যথাজর্জর, সর্বহারা মূর্তিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মহৎ শিল্পের দরবারে তাঁর তুলিকার মাধ্যমে এক অভিনব শিল্পসৌন্দর্যের আচ্ছাদনে। দুঃখনিপীড়িত বেদনাপ্রপীড়িত জনগণের হৃদয়ের সব হারানোর কান্নাকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাঁর আদর্শ, এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন সমকালীন আরও কয়েকজন শক্তিমান শিল্পী! এইভাবে জন্ম হল ক্যালকাটা গ্রুপের।

অগ্রগমনের প্রথম পর্বে সেদিন তাঁরা পাথেয়রূপে সমালোচকদের শুভকামনায় ভরপুর হন নি। অজস্র কঠোর সমালোচনা, প্রচুর ব্যঙ্গবিদ্রূপ সেদিন ছিল তাঁদের সম্বল। এই ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভিতর দিয়েই তাঁদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। করে নিতে হয়েছে পথ, অর্জন করতে হয়েছে সাফল্য। তারপর এসেছে প্রশংসা, এসেছে স্বীকৃতি, এসেছে জয়লক্ষ্মীর মুঠো মুঠো আশীর্বাদ।

রথীন মৈত্র প্রভৃতি শিল্পীদের ছবির মধ্যে শুধু রঙের সমারোহ কল্পনার বিস্তার, রেখার বিন্যাসই পাওয়া যায় না। পাওয়া যাচ্ছে একটি যুগের বেদনা, হতাশার ক্লেশকর বিবরণ, কাহিনী ও ইতিহাস। পাওয়া যায় তাঁদের এই সর্বহারাদের উদ্দেশে সীমাহীন সহানুভূতি ও দরদ, পাওয়া যায় সুগভীর সমাজচেতনা। সেদিক দিয়ে সর্বসাধারণের এঁদের কাছে ঋণের সীমা নেই।

রথীন মৈত্রের ছবি আঁকার বিষয়বস্তু প্রধানত সর্বহারা মানুষের হাহাকার হলেও তাতেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য জাতের ছবিও তাঁর তুলি থেকে জন্ম নিয়েছে কিন্তু তাও মানুষকেই কেন্দ্র করে। মানুষকে বাদ দিয়ে নয়।

তাঁর অঙ্কিত বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে জীবনযুদ্ধে পরাজিত, বহুরূপী, মিলন, শীতের সন্ধ্যায়, শহরের প্রহরী, জীবনছন্দ, ঘাটে, দিনের সংগ্রহ, পল্লীবধূ প্রভৃতি কয়েকটি ছবি বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে। বর্তমানে তিনি সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁর ব্যক্তিগতজীবনের বন্ধুবাৎসল্য, সদালাপিতা এবং অমায়িক আচরণও এক দৃষ্টান্তের বস্তু।

শক্তির গৌরব

শ্রীজ্যোতির্ময় সেন

যেদিন হইতে মানুষ আপনার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে সেইদিন হইতে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের শক্তি গণনা করিবার দিন আসিয়াছে ও এই শক্তি পরে আশ্চর্যশক্তিরূপে ও আশ্চর্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে প্রতিক্ষণে ও প্রতিমুহূর্তে এক বিরাটত্বের প্রতি সম্মোহিনী শক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য—আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানী জ্ঞানের কোন দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গমতার প্রতি ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের দ্বারা কোন এক গৌরবান্বিত স্থানে গিয়া উপনীত হইয়াছে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে আমরা তাহাকে শক্তির গৌরব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি।

নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যে এই শক্তি যদি সার্থকতা লাভ করিত তাহা হইলেও জগতে সমস্ত জীবের উপর আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। মানুষের সমস্ত আবশ্যক প্রয়োজনীয়তা যেখানটা সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি আপনাকে সতত‍ই স্বাধীন আনন্দে স্ফুরিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। অভাবের উপর এই শক্তি জয়ী হইয়াছে, মৃত্যুর উপরে ও শোকের উপর এই শক্তির প্রভাব ও আধিপত্য আছে।

নিজের দলকে অতিক্রম করিয়া সার্বজাতিক ভিত্তিতে মানুষের কর্ম যেখানে আপনার পরিবারকে অতিক্রম করিয়া এক পরম মঙ্গলময়ত্বে উপনীত হইয়াছে সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্ব শক্তি বিকাশের পরম সুযোগ অর্জন করিয়া পরম গৌরব লাভ করিয়াছি।

এই ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের রাজশক্তি ধর্মবিস্তার কার্যে ও মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল। সেই রাজশক্তির মাদকতায় সুতীব্রতা আছে। এই শক্তি গৃহ হইতে গৃহান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহা যুদ্ধসজ্জা নয়, দেশজয় নয়, বাণিজ্য-বিস্তার নয়—ইহা মঙ্গলশক্তির প্রাচুর্য। এই শক্তি সম্রাট অশোকের সমস্ত রাজাড়ম্বরকে হীনপ্রভ করিয়া তাঁহার মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। কত বিধ্বস্ত বিস্মৃত ঐতিহাসিক কাহিনী আমাদের স্মরণ-নিকষে দাগ কাটিয়া গিয়াছে তবুও আমরা মহাসম্রাট অশোকের রাজশক্তির পশ্চাতে যে মঙ্গলশক্তি আছে তাহা ভুলিতে পারি না। কত বিধ্বস্ত, বিস্মৃত স্মৃতিতে চিরলুপ্ত ধূলিজীর্ণ সাম্রাজ্য আজ পর্যন্ত প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করিয়া আনিতেছে তথাপি মহাসম্রাট অশোকের মধ্যে এই যে বিরাট মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব ইহা চিরন্তন যুগের আদরের ধন ও সামগ্রীরূপে আমাদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিতেছে।

প্রভাতের জ্যোতি-উন্মেষের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে দেখিয়াছি বসন্ত-সমারোহের মাঝখানে পুষ্প পর্যাপ্তির মধ্যে কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে পাইব সেইদিন আমাদের পক্ষে শক্তিবিকাশের ও মহামিলনের দিন।

যাহারা শক্তিতে ও ভক্তিতে দুর্বল তাহারা কেবলই দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি তাহা অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে উপেক্ষা করে। তাহারাই কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শোভা-সম্পদের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করে। তাহারা বলে ধন-মানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরেরই মূর্তি, সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এই সকল দুর্বলচিত্ত মনুষ্যগণ ঈশ্বরের দয়াকে লোভের মোহের ভীরুতার সহায় বলিয়া জানে!

এবং ভয়ানং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাং সমগ্র লোককে জ্বলদ্বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছে। সমগ্র জগৎকে উগ্র জ্যোতি দ্বারা প্রতপ্ত করিতেছে!

কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, জীবনের আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যায়?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখ করিতেছি 'কিন্তু হে ভীষণ তোমার দয়াকে, তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব। কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে তাহা নহে। হে পিতা তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ; হে মাতা তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।'

'সমগ্র লোককে জ্বলদ্বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ—সমস্ত জগৎ তোমার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া হে বিষ্ণু তোমার উগ্র জ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।'

—রবীন্দ্রনাথ।

'হে প্রচণ্ড! আমি তোমার কাছে সেই শক্তিই প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে তোমার দুর্বলতাকে নিজের আরামের নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি। তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে প্রবোচিত না করি। তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ। সেই যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে, সে যে পরম দুঃখের পথ।'

—রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ এক ভয়ঙ্করতা রুদ্র মূর্তিতে জলজ্জটা কলাপ হইয়া দেখা দেয়। তখন কত সুখমিলনের প্রত্যাশা, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া মিলনের জালকে সম্পূর্ণরূপে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। রুদ্রের যে ধক্‌ধক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ মাত্রেই গৃহের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় আবার সেই শিখাতেই লোকালয়ের সহস্র হা-হা ধ্বনিতে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। রুদ্রের নৃত্যে ও প্রতি পদক্ষেপে সংসারের মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। রুদ্রের প্রচণ্ড শক্তি প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতরূপে উত্তেজনার নব নব লীলায় ও সৃষ্টির মাধুর্যে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন: সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইয়া থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্র

সঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমার জয় হউক।'

—রবীন্দ্রনাথ ('পাগল' প্রবন্ধ।)

ক্ষ্যাপা দেবতার আবির্ভাব আমাদের সংসারধর্মে অহরহ লাগিয়াই আছে। জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে ও তুচ্ছতার প্রতি অভাবনীয় মূল্য আরোপ করিতেছে। যখন আমরা এই ক্ষ্যাপা দেবতার পরিচয় পাই তখন রূপের মধ্যে অপরূপ ও বন্ধনের মধ্যে মুক্তি ফুটিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে পিতা তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয় হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে, সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছো, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমোতে দেবে না, তুমি আঘাত করছো প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাতে।'

আমাদের ক্ষ্যাপা দেবতা মহেশ্বর। সুখ ও ব্যবস্থা বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে তিনি যেমন সতর্কভাবে রক্ষা করিয়া চলেন তেমনি সংহারের তাণ্ডব নৃত্যে তিনি প্রতিভার ক্ষ্যাপামি দেখাইয়া থাকেন।

এক অবিচলিত শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে। তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে জ্বলিতেছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে। স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে।

নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত আয়াসসিদ্ধির পথগুলিকে পরিপূর্ণ চক্রপথরূপে প্রকটিত করিয়া তুলিতেছেন আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—'ভোলানাথ আমি জানি তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছ। তোমার নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে এককোঁটা আমাকে দেয় নাই তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।'

—রবীন্দ্রনাথ ('পাগল' প্রবন্ধ।)

ভারতবর্ষীয় ঋষি সাধনা করিয়াছিলেন জ্ঞানের বাধা দূর করিতে ও জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্ত করিতে। এই ভারতবর্ষীয় ঋষি আমাদের আপন। তাঁহাকে লইয়া প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষীয় চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই। তিনি দেশ ও কালকে এক সনাতন ভারতবর্ষের সরল নিষ্ঠার পথে দাঁড় করাইয়াছিলেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস ও ক্ষুদ্র অহঙ্কারবশত প্রলয়-সলিলে ভাসমান ভারত-তরী নিমজ্জিত করেন নাই। এই কারণে ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই ভারতবর্ষীয় সনাতন ঋষি।

'আমাদের প্রকৃতির নিভৃততমকক্ষে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছে। ফললোলুপ কর্মের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন এবং প্রতিযোগিতায় নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে।'

—রবীন্দ্রনাথ (নববর্ষ প্রবন্ধ)

পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতবর্ষের এক সনাতন আদর্শ আছে। এই আদর্শটি হইল ঐক্য বিস্তার ও শৃঙ্খলা স্থাপন। ইহা কেবলমাত্র সমাজব্যবস্থায় নয়—ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করা ও বহুতর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা—আমাদের ভারতবর্ষীয় আদর্শ ও সনাতন প্রথা। সেই প্রাচীনত্বের প্রতি মহান অনুপ্রেরণা লাভ করিতে শিখিলেই আমরা মননশীলতায় পতির গৌরব লাভ করিয়াছি বলিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিব।

একটি বিশেষ স্থান হইতে আত্মশক্তি সর্বদা সঞ্চয় করা ও সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা ও বিশেষ স্থান হইতে প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা আমাদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

আমাদের দেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইবার পর হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ অহরহ বাধিয়া উঠিতেছে। সেই বিবাদ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যস্থাপন করার কর্তৃত্ব সমাজের কোন স্থানে যদি না থাকে তবে সমাজ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর ভ্রষ্টশোভ হইয়া পড়িবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সংগঠনী প্রতিভা চিরদিন বিরাজ করিতেছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া বরাবর একটি ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে সে আজ রক্ষা পাইতেছে।

বহুতর পরদেশীয়ের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে মিলনের সংস্রব আরও গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার জন্য সকলেই সচেষ্ট থাকে। মিলনের অসতর্ক অবস্থায় সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।

প্রত্যেক জাতিই বিশ্ব-মানবের অঙ্গ। বিশ্ব-মানবকে দান করিবার যে সামগ্রী তাহা সে নব নব প্রতিভায় উন্মেষিত করিতেছে। ইহাই প্রত্যেক জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। ইহাতে সে শক্তির গৌরব বোধ করে।

বস্তুত টিকিয়া থাকাতেই সে কেবলমাত্র শক্তির গৌরব বোধ করে না, জ্ঞানের বাণিজ্যে ভারতবর্ষ যাহা কিছু আরম্ভ করিয়াছিল তাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়াছে।

নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করা ও তাহা চালনা করিয়া আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায় খুঁজিয়া বাহির করাই হইল শক্তির গৌরব ও ইহাকেই বিধাতৃ বিহিত সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে। ইহা কোন কুহক মন্ত্রবল নয়—ইহা সামর্থ্য ধীশক্তিতে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠায় প্রোজ্জ্বল।

আপনার যাহা কিছু আছে তাহাকে আটে-ঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পর-সংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য ও নিজেকে শিক্ষার আবেষ্টনী দ্বারা ঘিরিয়া রাখিলে মহৎ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ ঘটিতে পারে। ইহাতেই শক্তির গৌরব কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিহিত আছে।

এষণা শব্দটির অর্থ হইল অন্বেষণ অথবা ইচ্ছা। এই পৃথিবীতে

সর্বত্রই এষণা সর্বপ্রথম মূল হইতে শেষ পর্যন্ত সীমায়িত ও সকল বস্তুর প্রাপ্তিসাধনে যাহাতে সমৃদ্ধি তাহারই সহায়ক ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সীমাবদ্ধ সীমায় তাহা নিয়ন্ত্রিত।

একজন অন্যজনকে খুঁজিতেছে অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য, কালের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য। এই দিকেই মত ও পথ অবলম্বন করিতেছে ও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আলো আঁধারের যবনিকার মাঝখানে সমান্তরালবর্তী কালান্তর টানিয়া আনিতেছে।

মৃত্যু মানুষকে গ্রাস করিবে ঠিকই। সেইজন্য বলিতেছি স্থিতি না হইলে স্থাপকতা হইবে না। বিশ্বসংসারে স্থায়ী আসন পাতিতে হইলে স্থিতির একান্ত আবশ্যক।

সৌন্দর্যের মাঝখানে এক ভয়ঙ্করতা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া আসে, কেন না সৌন্দর্যের সারবত্তা বিশ্বসংসারে নিবিড় লীন হইয়া অন্তর্গূঢ় সত্তার তাহার প্রাপ্তিসাধন চিরতরে অসাধ্য করিয়া তোলে। স্থিতি সেই অবলম্বন স্বরূপে বিধাতৃবিধায়িনী শক্তি।

সমাজ-জীবনে শক্তিভূয়িষ্ঠ গরীয়ান মহীয়ান অনেকানেক দৃষ্টান্তে স্থিতির আবশ্যকতা তেমন নাই কারণ অনাগত যুগের সৃষ্টি পাথেয় যাহাতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে তাহার আবশ্যকতা কি ?

সৃষ্টির সাহায্যে স্রষ্টাকে জানিতে হইবে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিপুরুষ সত্য-সংগ্রহে স্রষ্টার উপর যেমন বৈচিত্র্য আরোপ করিয়াছেন 'তেমনি সত্যকে সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাদের যাহা কিছু নির্দেশ তাহারই অন্তর্নিহিত মূল সত্তা হইল এই স্থিতি।

আমাদের সমাজ-জীবনে কোন-কোন সময়ে অনেক বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। সেই সকল বৈচিত্র্যের মাঝখানে আমাদের জানিতে হইবে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ভোগ-বিলাসের সাধনা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে এক অখণ্ড সত্তার অভ্যন্তরে। এই অখণ্ড সত্তাটি কি তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

এই অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এক বাঙ্ময় পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনিই বলিয়াছিলেন সমাজ-জীবন কেমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। তিনিই প্রচণ্ড এষণা দ্বারা পূষণকে সংযমিত হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাই পূষণ এক অগ্নিময় দীপ্তিতে নভোমণ্ডলে ভাস্বর হইয়া চির-বিরাজিত রহিল। সমুদ্রবক্ষে চির-চঞ্চল নীলোর্মি কোথাও অশনিপাতের পর চির-বিক্ষোভ সমাজের উপর নিক্ষেপ করে নাই। সমাজের বাহিরেই তাহার স্থিতি, সমাজের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্য সমুদ্র আগাইয়া আসে নাই ; তাহার উদ্বেলিত উৎক্ষোভিত চলমান সহিষ্ণুতা আছে বলিয়াই মানুষ তাহাকে সহ্য করিয়া আছে।

জাগতিক বিধানাবলীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাহার উপর অর্পিত হইবে তাহাকে ধ্বংসশীল পুরুষ যেমন বলা চলে ঠিক সেইরূপ নব অঙ্কুরে উদ্গত প্রতিভায় তিনিই আবার সৃষ্টিশীল পরম সহায়ক রূপে আবির্ভূত হইতে পারেন। সৃষ্টির সাহায্যে কেমন তিনি স্রষ্ট তখনই তাহার পরিচিতি সম্যকরূপ লাভ করিবে আমাদের সমাজ জীবনের উপরে।

কৃষক কৃষিকার্য করে, ডাক্তার রোগীর রোগ নিরাময় করে, উকিল মুহুরী কেরাণী প্রত্যেকটি চলমান জীবনযাত্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। আইন-আদালত, সাহিত্য-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব-কিছুরই উপর স্থিতির প্রভাব বেশ ভালরকম করিয়া আছে বলিয়া আমরা শক্তির গৌরব অনুভব করি।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাজ-রাজড়াদের ... মৌলিক মূল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কারণ এক অখণ্ড সত্তার সহিত চির-পরিচিতি না জন্মালে বিবিধ কারণে প্রজ্ঞার অনুশাসনে স্বকপোলকল্পিত উদ্ভাবনী প্রতিভায় বিকাশ লাভ ঘটিতে পারে না। আমরা জানিয়াছি ইতিহাসকে কারণ-পরম্পরায় অনুসৃত এক পারিবারিক ঘটনার আধাররূপে যে আধারে আমরা আমাদের সমাজ জীবনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লই। কারণ ষড়ঋতুর মাঝখানে আমাদের যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে ঠিক তদনুরূপই পারিবারিক কাহিনীগুলিই জীবনযাত্রায় দীপ্তি নিক্ষেপ করিয়া উহাকে অচলায়তনের দিকে লইয়া যায়। ইহাতেই আমরা শক্তির গৌরব অনুভব করি। কারণ আমাদের ইতিহাস-পাঠের জ্ঞান ফলবতী হইয়াছে।

শক্তির গৌরব ইতিহাসের কেন্দ্রাতিগ মূল। এই শক্তির গৌরবের পশ্চাতে রহিয়াছে কত রক্তপাত কত বাদ-বিসম্বাদের কাহিনী। কোন রাজার রাজত্বকালে কি ঘটিয়াছিল, কোন সেনাপতি কোনও যুদ্ধবিগ্রহে কি প্রকার সৈনাপত্য ভার গ্রহণ করিয়াছিল, কোন প্রাচীন শতাব্দীকাল হইতে বর্তমান শতাব্দীর উৎপত্তি, কত প্রকার নিয়ন্ত্রী এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। যিনি এই সকল ঘটনাগুলি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান শক্তির গৌরব হইতেই উদ্ভূত। এই শক্তির গৌরবই হইল প্রাচীনত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

সূর্যের প্রাকবৈদগ্ধ্যতা, প্রতিভাভেরী যেমনভাবে নিনাদিত হয়, সেইরূপই অচল আবেশের মধ্যে অচলায়তনের জীর্ণ সংস্কারকে গতায়াত মনীষায় প্রবুদ্ধ করিয়া এক উত্তাল তরঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। নবীনতার প্রান্তবর্তী যে প্রকাণ্ড সূর্য কালের আবর্তন-বিবর্তনের ধারায় সংশয় জর্জর হিংসালোভে উন্মত্ত পৃথিবীকে এতাবৎকাল পর্যন্ত শাসন করিয়া আসিয়াছে, কত নূতনকে পুরাতন করিয়াছে, কত ছোটোকে বড় করিয়াছে, কত ফলে-ফুলে-পুষ্পে ভরা এই বসুন্ধরার বক্ষে মহামারী বন্যা, কত দুর্ভিক্ষ অভাব-অনটন আনিয়াছে আবার তাহার পর মাধুর্যময়ী বাহ্বাস্ফোটনের আড়ম্বর করিয়াছে তাহারই দিকে আমরা শূন্যপ্রেক্ষণে চাহিয়া আছি।

শূন্যতার প্রেক্ষণে অসীমকে সীমায় পর্যবসিত করিতেছি। অপরূপকে অপরূপ রূপতায় নিরীক্ষণ করিতেছি। জনতার ক্ষুধার্ত তৃষিত নয়নে ও প্রত্যেকটি ইঙ্গিতে দেশবাসীর ভাববৈদগ্ধ্যতা প্রস্ফুটিত হইতেছে।

দেশবাসী আগে ভাবিয়াছিল যে, প্রেম সংযত চিত্তে ধ্রুব তারকার লক্ষ্যপথ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আলিঙ্গন করা শান্তির পথ, মুক্তির পথ, খুঁজিয়া লয় সেই পথ হইতে আজ সে বিচ্যুত হইয়াছে। তাহার পক্ষে ধ্রুবসত্য কোনদিনই উপলব্ধি করা কঠিন ব্যাপার নয় কারণ সে সত্যের সমগ্রতাকে জানিয়া ফেলিয়াছে। তাহার দুর্বলতা যাহা লইয়া তাহার একাগ্র একক অধিষ্ঠান তাহা সম্পূর্ণরূপে কামনা সাধনার বেদীমূলে আত্মিক সত্তায় ও শক্তিগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কারণ সমাজ জীবনে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি মূঢ়তারই পরিচায়ক। ইহা তাহার অশিক্ষা হইতে উৎপন্ন। তাহার বিচারবিমূঢ়তা দূরীভূত হইলে সে অবশ্যই শক্তির গৌরব বোধ করিবে।

সংশয়সঙ্কুল বিশ্বে যে শক্তি-সংঘাত নিরন্তর চলিতেছে তাহারই নিষ্পেষণে ভাঙ্গন ও গড়ন এক লীলার অপূর্ব অভিনয় বৈশিষ্ট্যে ভালো-মন্দের, পাপ-পুণ্যের অপাপবিদ্ধ অবিনশ্বরতা জ্ঞানের দিকে আলোকের দিকে নিয়তই আমাদিগকে প্রধাবিত করিতেছে। মর্যাদাভ্রষ্ট ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্ব সততই দৌর্বল্যে, মূঢ়তায় পরিপূর্ণ তাহা কেবলই বাধা ও অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে আপন গৌরবে বিকশিত হইতে। ভেদবৈষম্য দলাদলি রাজনীতির কুটিল-কূটচক্রের আবর্তে তাহার ক্ষুদ্রতায় সে নিজেকে বলি দিতে বসিয়াছে, কারণ প্রকাণ্ড যে এক সত্তা এই জগতকে শাসন করিতেছে তাহার আওতার মধ্যে সে আসিতে চায় না বলিয়া তাহার এই দুর্দশা। সে অনেক কিছুকে অবমাননা করিতেছে, অনেক বড়কে ছোটো করিতেছে ; অনেক ছোটোকে বড় করিতেছে। তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না। কারণ প্রকাণ্ড সূর্য চিরন্তন কাল হইতে উহারই পর্যবেক্ষক। প্রাক ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষক এই যে সূর্য তাহা সে প্রবল 'এষণা' দ্বারা খুঁজিয়া লয়।

গগনের প্রখর তপন-তাপ ও নৈশ-দীপাবলীর ঔজ্জ্বল্য, তরুশাখাচরে দীর্ঘদেহী বাঁদর সেও পর্যবেক্ষক বাঁদরের ভাবভঙ্গিমায় চপলতা আছে, তাহার বুদ্ধি আছে, সে বিচারবিমূঢ় বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করে না। তাহাকে ক্ষিপ্ত করিলে সে কামড় লাগাইয়া দেয়। মূঢ় মানুষ সবলের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে কদাপি সক্ষম হয় না ; তাহার যত জয়-পরাজয়, গ্লানি-অপমান সমাজের গুটিকতক ভালো মানুষের সহিত।

গাছের ডালে যে পাখী নীড় বাঁধিয়া বাস করে সেও মনুষ্যভয়ে ভীত হইয়া উড্ডীয়মান হয়; অরণ্যে ব্যাঘ্র শার্দূল প্রভৃতি নিজেদের সম্মানে সচকিত হইয়া গগনভেদী হুঙ্কার ও গর্জন করিতে থাকে।

সরলতার পথ ঐকান্তিক নিষ্ঠার পথ, মানুষ আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া লইতে পারে নাই বলিয়া তাপনাশিনী তৃষাহরা নদীমাতৃক দেশের সৌন্দর্য সে উপভোগ করিতে পারে নাই।

বিচার-বিমূঢ় মানুষ শক্তির গৌরব কোনদিনই উপলব্ধি করিতে পারে না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের বসবাসের জন্য শান্তি যাহাতে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সে সচেতন। কিন্তু তাই বলিয়া সচেতনধর্মী তাহার জীবনযাত্রা নয়। তাহার সমস্ত গোছালো জিনিষ এক নিমেষেই ভণ্ডুল হইয়া যাইতে পারে তখনই যখনই সেই ভালো মানুষ শাসকের বেশে তাহাকে ভীত, ত্রস্ত ও রাজদণ্ড বিচারের প্রহারে মৃত্যু ঘনাইয়া তোলে। সেই অজ্ঞবিচার বিমূঢ় ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দ জানিতে পারে যে, প্রকাণ্ড এক অজ্ঞতার বশে ও ঈর্ষার পথে সে বড়কে ছোটো করিয়াছে ও তৎপরে জীবনযাত্রায় পরিচালিত হইয়াছে।

শক্তির গৌরব উপলব্ধি করাইবার জন্য অজ্ঞ, বিচার বিমূঢ় ও ঈর্ষা জর্জর ব্যক্তিবৃন্দকে সমাজ শাসন দ্বারা নতুবা ধ্বংসলীলার কবলে পতিত করাইয়া সম্বিত ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কারণ দেশের মঙ্গল অজ্ঞতা ও বিচার বিমূঢ়তার উপর নির্ভর করে না। তাহা নির্ভর করে তাহাদেরই উপর যাহারা এই পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্যে এমন ভাবে পূর্ণ হইয়াছে যে তাহাদিগকে ভূমা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শক্তির গৌরব সেই ভূমার—যাহারা অধিকারী তাহারাই উপলব্ধি করিতে পারে ও সেই গৌরবে এই জগৎ আজি পর্যন্ত বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

ছায়ানীল

অনিল সাধু

আকাশ কি নীল, কি ঝিলমিল, নীল, নীল···
ছায়া রোদ্দুর, ঝিলের দুপুর
সুরের পাখীরা—তরংগ উর্মিল···
ছায়া নীল নীল, আকাশ কি নীল···

হলি হক্ আর কল্ক কোম্বের নীল আকাশের তলাতে
ধোঁয়াটে রঙের দূরের আকাশ
কি ধূসর—
কি মায়াময় তোমার হাসির ঝড়ের মত
একরাশ ফোটা সিজন ফ্লাওয়ার !

আকাশ কি নীল···
রূপালী নদীর পূর্ণিমাতে
কাটে সাঁতার
চাঁদের আলোরা,
টলটলে নীল নীলাভ দিন···সেই সব দিন
মেঘ বলাকায় উধাও হয়েছে, কি নীল, নীল···

মিষ্টি চোখের মিষ্টি ভাষার কত সন্ধ্যা
নীল আস্তর দিয়ে যে জড়ানো
মন ভরানো
বন-হরিণীর ইসারাতে
একরাশ স্মৃতি—সুর নির্জন···
সৌরভে দোলে সিজন ফ্লাওয়ার।

ছায়া রোদ্দুর ঝিলের দুপুর
আকাশ কি নীল, কি ঝিলমিল, নীল···নীল···

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের বীরেনদা'

কথায় বলে,—মহাশয় ব্যক্তি,—সেই কথাটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য শান্তিনিকেতনের বি এম সেনের প্রতি। নাম বীরেন্দ্রমোহন সেন, কিন্তু এখানে তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 'বীরেনদা'। আছে একটি জীপ গাড়ি—চালান নিজে। সকাল বিকাল যে কোন সময়ে শান্তিনিকেতনের শান্ত রাস্তায় দেখা যায় বীরেনদা'র গাড়িভরা শিশুর দল মনের আনন্দে গেয়ে চলেছে—

'তোরা যে যা বলিস্ ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই,।'

অথবা

'আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।'

এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বীরেনদা'ও একটি শিশু,—দলবল নিয়ে যান কোথায়? যেখানে আর্ত, যেখানে পীড়িত, বীরেনদা'র দল সেখানে উপস্থিত। দু'এক ঘণ্টা পীড়িত মানুষকে কচিকণ্ঠের অমৃতোপম রবীন্দ্রসঙ্গীত সিঞ্চিত করে বীরেনদা তৃপ্ত! পকেটে সুগন্ধী ধূপকাঠিটি আনতে ভুল হয় না। জ্বালিয়ে দেন ধূপ, নিরানন্দ রোগীর ঘরে মুহূর্তে সৃষ্ট হয় এক পবিত্র আনন্দময় মধুর পরিবেশ!

আবার শান্তিনিকেতনের শিশুদের মধ্যে তাঁর পেয়ারা বিতরণের রূপটি আরও সুন্দর! তাঁর বিশাল বাগানের পেয়ারা না খেয়েছে এমন শিশু এখানে বিরল। জীপে থাকে কুড়িভর্তি পেয়ারা,—দু'হাতে বিলিয়ে বিলিয়ে অগ্রসর হন।—এ থেকে পরিচিত, অপরিচিত, সাঁওতাল ছেলে, মাঠের গোচারণরত রাখাল বালক কেউ বাদ যায় না। আবার কোন ছেলেমেয়ে যদি তাঁকে গুরুদেবের দু'টো গান শুনিয়ে দিতে পারে,—তবে ত' তার কপাল খুলে যায়!

সদানন্দ, হাসিখুশি, অসীম প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষটির মুখে রবীন্দ্রকাব্য শুনে হতে হয় বিস্মিত! যেখানে যেমন দরকার,—বীরেনদা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক কবিতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা! স্মরণশক্তির বিস্তৃতি দেখে সাধারণ মানুষ হয় বিস্ময়ে অবাক! বয়স যদিও এখন ষাটের ঊর্ধ্বে,—মন কিন্তু ষাটের শূন্যটি বাদ দিয়ে,—এখনও তরুণ, সতেজ!

বীরেনদা'র সদাশয়তার আরও একটি রূপ তাঁর ঔষধ-বিতরণে। পকেটে সব সময় থাকে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত শিকড়,—উপযুক্ত প্রার্থীর দর্শনমাত্র মুক্তহস্তে বিতরণ করেন সে ঔষধ। কি কলকাতায়,—কি শান্তিনিকেতনে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত রোগী-রোগিণীর তদারক করা এক বীরেনদা'তেই সম্ভব। সারাদিন ঠিকেদারীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত অসুস্থদের খোঁজখবর নেওয়া সত্যই বিস্ময়কর! বীরেনদা বলেন,—রোগীরা আমাকে সবাই ডাকে,—দূরে থেকেও কানে যেন স্পষ্ট সে ডাক শুনতে পাই,—যত রাত্রিই হোক একবার দেখে না এলে শান্তিতে ঘুমুতে পারি না।

তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িখানা সদাই উন্মুক্ত—আশ্রয়-প্রার্থীর আশ্রয়ের জন্য। সেটি যেন একটি প্রকাণ্ড অতিথিশালা,—পরিচিত অপরিচিত কত লোকই না পায় সেখানে আহার ও বাসস্থান। তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণীর নাম কমলা—কিন্তু অন্নপূর্ণা নামটিই তাঁকে বেশি মানায়। স্বল্পবাক, পাঁচটি সন্তানের জননী কমলা, অন্নপূর্ণার মতই দু' হাতে অন্ন বিলান ও অতিথিদের পরিচর্যা করেন। আধুনিক আত্মকেন্দ্রিক জগতে এটি একটি পরমাশ্চর্য দৃশ্য!
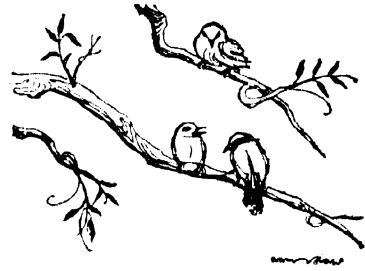
একদিন বীরেনদা'র মুখে শুনি তাঁর প্রিয় বাহনটির কাহিনী। তিনি বলেন,—এই জীপে শিশুদের চড়িয়ে তাদের যেমন আনন্দ দিই,—তেমনি আনন্দ পাই নিজে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে ৩০।৪০টি শিশুকে এতে ঢুকিয়ে দিই,—কারণ কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখি? পথে, অপথে, বিপথে আমার এই জীপের অবারিত গতি। এ পাঁচঢালা রাস্তায়ও যেমন ছোটে তেমনি ছোটে মাঠে-ঘাটে—ছোট ছোট নদী-নালা পেরোতে এর জুড়ি নেই!

সত্যই তার পরিচয় পাই একদিন এই জীপে বোলপুরের লাগোয়া তাঁর বিস্তৃত জমি-জমা ও বিশাল ফলের বাগান দেখতে গিয়ে। বীরেনদা বলেন, এই জীপটি আমার কি না করেছে? মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার মানুষের অভাব? আছে আমার জীপ! পোড়াবার জন্য কাঠ আনতে হবে? তারও বাহন এই জীপ! এই জীপে চেষ্টা করলে বোধ হয় তালগাছে উঠে তালও পেড়ে আনতে পারি! আবার দুর্গম পাড়াগাঁয়ের মেঠো রাস্তায় বরযাত্রী বহনের আনন্দ-অভিযানেও এ অদ্বিতীয়!

আজীবন শান্তিনিকেতনে প্রতিপালিত, শৈশব থেকে গুরুদেবের স্নেহপ্রাপ্ত বীরেনদা'র জীবনটা এক আশ্চর্য বিস্ময়! কোথা থেকে কোথায় উঠেছেন, অতি শৈশবে পিতৃহীন অবস্থায় কাকার বাড়িতে প্রতিপালিত হয়ে আজ কি ভাবে কেতাবী পরীক্ষায় পাশ না

করেও, নিজের কর্মজগতে সর্বোচ্চ আসনে উন্নীত হয়েছেন তা সত্যই অদ্ভুত। অর্থ, খ্যাতি, মানের সুউচ্চ শিখরে উঠেও তিনি কিন্তু আর পাঁচজনের মত ধরাকে সরা মনে করেন নি, বরঞ্চ ফলভারে নত বৃক্ষের ন্যায় হয়েছেন আরও নম্র, আরও বিনয়ী। সেবার ভাবে বিভোর সর্বক্ষণ, আর শিশুর মত সরল, তাই ত' সমস্তক্ষণ শিশুরাই তাঁর সঙ্গী।

শুনি তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী। জন্ম বিক্রমপুরে সোনারং গ্রামে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। পিতা ৺অবনীমোহন সেন,—শান্তিনিকেতনের ৺ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অবনীমোহন মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে যখন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অকালে ধরাধাম ত্যাগ করেন, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্রমোহনের বয়স সাড়ে তিন ও কনিষ্ঠ পুত্র, অধুনা শিক্ষা-দপ্তরের শীর্ষে অবস্থিত ধীরেন্দ্রমোহন মাত্র দেড় বৎসরের শিশু।

বীরেনদা'র আজও পরিষ্কার মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ-পূর্তির উৎসবমুখর বৎসরে,—শিক্ষালাভের জন্য কাকা ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট আসেন নিজের এগারো বৎসর বয়সে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সংযোগ। আপন মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের মাটি-মাও তাঁর নিকট হয়ে গেছে একাকার! গুরুদেব এই ডানপিটে, খেলোয়াড়, অকুতোভয়, দৃঢ়চিত্ত, সেবাব্রতী বালকটিকে এত ভালোবাসতেন যে, বলতেন,—

'বীরেন তুই কখনও শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাস না—কাজকর্ম যেখানেই করিস না কেন,—থাকবি এখানেই।'

বীরেনদা'ও গুরুদেবের বাক্য পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে; উত্তরজীবনে কঠিন পরিশ্রমে ঠিকেদারীর কাজে সফলকাম হয়ে বালীগঞ্জে অসংখ্য বাড়ি তৈরি করলেও,—নিজের জন্য একখানা বাড়িও করেন নি। তাঁর বাড়িঘর, বিষয়সম্পত্তি সবই গুরুদেব-নির্দেশিত তাঁর প্রিয় স্থানটিতে। গুরুদেবের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বীরেনদা' সেবা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁকে। মহামানবের সান্নিধ্যলাভেই তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছে এমন পরিপূর্ণরূপে—তাই আজ জীবনের ৬৪ বৎসর বয়সেও তিনি এত সজীব, প্রাণবন্ত, এত পরোপকারী।

তাঁর পাঠ্যজীবনের কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সেদিনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শেষ পরীক্ষা,—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা দিতে হত হুগলীতে গিয়ে। কাকার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে, ভালো ছেলেটির মত পরীক্ষা দিতে গেলেন হুগলীতে,—তখন বয়স তাঁর ১৭ বৎসর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরম প্রিয় পুত্রস্থানীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র মেধানাথ ছিলেন বীরেনদা'র সহপাঠী। দু'জনেরই দারুণ আকাঙ্ক্ষা—যাবেন সাগরপারে। দু' বন্ধুতে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা, আয়োজন-উদ্যোগ—ক্ষিতিমোহনবাবুর অগোচরে চলে বহুদিন যাবত। মেধানাথ তরুণবয়সে যাবেনই বিলেতে—সঙ্গী চাই একজন শক্ত মানুষ। বীরেনদা'কেই তাঁর উপযুক্ত বিবেচনায় মেধানাথের জননী এ বিষয়ে বীরেনদা'কে দেন উৎসাহ এবং খরচপত্রের সমস্ত ভার আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন।

স্যুট তৈরি কার্গোশিপে সিট রিজার্ভ, ফটো তোলা, পাসপোর্টের দরখাস্ত সব প্রস্তুত—এবার পাসপোর্টটি এলেই চেপে বসা যায় জাহাজে। এদিকে এসে পড়ে পরীক্ষা। চঞ্চলমনে হুগলীতে যান পরীক্ষা দিতে। বিধাতার এমনি কারসাজি, পরীক্ষার মাঝেই খবর পেলেন, অবিলম্বে নিজের হাতে এসে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে। আর তাঁকে পায় কে? অর্ধসমাপ্ত পরীক্ষা রইলো মাথায়,—ছুটলেন তিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ পাসপোর্ট পাবার আশায়। এখানে তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি দেখে কর্তৃপক্ষ বয়স সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার পর বলেন,—ভ্রমক্রমে এদিকটা দেখা হয় নি। সতেরো বৎসরের নাবালককে বিলাতের পাসপোর্ট দেওয়া হয় অভিভাবকের মাধ্যমে, সরাসরি সে তা পেতে পারে না বলে কর্তৃপক্ষ দুঃখিত। তারপর চিঠি গেল অভিভাবক কাকা ক্ষিতিমোহন বাবুর নিকট,—তিনি একটি ছোট্ট 'না' দিয়ে বানচাল করে দিলেন তাঁর সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা। জীবনের গতি গেল ফিরে! মেধানাথ শেষ মুহূর্তে অন্য এক সাথীর সঙ্গে চড়লেন জাহাজে,—বীরেনদা' ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে বন্ধুকে দিলেন বিদায়।

তাঁর পাঠ্যজীবনের সমাপ্তি এখানেই। তিনি বলেন,—তিনি আজন্ম বৈরাগী অর্থাৎ বৈ-রাগী! কাকা বলেন,—যা করেছ বেশ করেছ, আর তোমার পড়ে কাজ নেই,—এবার ব্যবসা করে খাও। তিনিও কোমর বেঁধে নামলেন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে। শান্তিনিকেতনের রৌদ্রে জলে পেটা ও ফুটবল খেলার কল্যাণে লৌহ-কঠিন দেহ, অসাধারণ কর্মক্ষমতা এবং মেধা ছিল যাঁর সহায়,—কপর্দকহীন সেই বালক কলকাতার লোহালক্কড় প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ে হাত পাকিয়ে, আসেন ক্ষিতিবাবুর শ্বশুর, তদানীন্তন সরকারের পি, ডব্লু, ডি-র সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের নজরে। তিনি এই পরিশ্রমী বালকটিকে নিজের পাশে রেখে,—দেন পূর্ত বিভাগের শিক্ষা হাতে কলমে ও কেতাব-পুঁথিতে। তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেই পরের জীবনে বি, এম, সেন গৃহনির্মাণ কাজে উঠেছিলেন, সাফল্যের চরম শিখরে।

শান্তিনিকেতনের 'উত্তরায়ণ' ও ছোট বড় অনেক বাড়িই বীরেনদা'র হাতে তৈরি। তারপরের কর্মজীবন কলকাতায়। দক্ষিণ কলকাতার গোটা বালীগঞ্জের বহু সৌধতেই অক্লান্ত কর্মী বীরেনদা'র হাতের ছাপ রয়েছে। এ কাজে নিজ স্বভাব-গুণে যথেষ্ট দয়াদাক্ষিণ্য দেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে বেশ বিপদে পড়তে হলেও মোটের উপর সুনাম ও যোগ্যতার সঙ্গে বিস্তৃত ঠিকেদারীর কাজ আজ তাঁর সাফল্যে জয়যুক্ত!

চাওলা পরিবার

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানলে পৃথিবী বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। যুদ্ধ ইউরোপে বাঁধলেও,—আমাদের গায়েও তার আঁচ কম লাগে নি! জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য, বিদেশাগত বহু সৈন্য-সামন্তের আগমনের দরুণ বাড়ি-ঘরের দারুণ অভাব, সরকারী দপ্তরগুলির কর্মভার বেড়ে চতুর্গুণ।

এ হেন সময়ে আমাদের দিল্লী যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হল। রাজধানী দিল্লীর তখন,—ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ক্ষুদ্র এ তরণীর, অবস্থা! শুনি দিল্লীর দুরন্ত 'সিংহ গরম' ও 'বাঘা শীতে', সরকারী নবাগত কর্মচারিগণ খোলা মাঠে তাঁবু ফেলে তাতেই পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করেন। শুনে হয় হৃৎকম্প। কোমলা বঙ্গ-বালা—আমরা কি ভাবতে পারি, মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর জিপ্সি—যাযাবরের মত বস্ত্রাবাসে জীবন-যাপন?

অনেক খুঁজে নূতন দিল্লীর কেন্দ্রস্থল 'কনট-প্লেসে' পাওয়া গেল,

তেতলার উপরে সুন্দর একটি ছোট ফ্ল্যাট। করুণাময় ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এসে উঠি ঐ ফ্ল্যাটখানায়। হল—শাপে বর। সহর থেকে বিচ্ছিন্ন নির্জন স্থানে সরকারী বড় বড় বাড়িগুলির চেয়ে, লোকালয়-দোকান-বাজারের মাঝখানে এ-বাড়ি বাসের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক।

নূতন দিল্লী সুপরিকল্পিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অতি সুন্দর আধুনিক সহর। তার কেন্দ্র স্থানে 'কনট প্লেস' ও 'কনট-সার্কাস' আরও মনোরম! মাইলখানেক ব্যাপী একটি গোল বৃত্তের ধারে, গোল হয়ে ঘুরে গেছে প্রশস্ত বারান্দা-সম্বলিত এক বিশাল অট্টালিকাশ্রেণী। মাঝের সবুজ শষ্পাচ্ছাদিত খোলা গোল মাঠের মাঝে মাঝে বর্ণ-সমারোহে উজ্জ্বল মরশুমী ফুলের বাহার। বারান্দার কোলে বড় বড় দেশী-বিলাতী দোকানগুলি চাকচিক্যে, কায়দা করে সাজানো শ্রেষ্ঠ পণ্য-সম্ভারে ও বিজলী বাতির রং-বেরং-এর আলোর বাহারে চোখ ধাঁধায়।

এই বৃত্তের বহির্বৃত্তের নাম 'কনট-সার্কাস।' বহু বিস্তৃত এই গোলাকার ইমারতের এক তলায় কিছু দোকান পাট থাকলেও, দোতলা-তেতলায় প্রায় সবই বসবাসের উপযুক্ত ফ্ল্যাটবাড়ি। গায়ে গায়ে লাগানো এমন থাকার ব্যবস্থা জন্মেও দেখা ছিল না; ছাদে উঠলে দেখা যায় বিশাল ছাদটি অর্ধ বৃত্তাকারে চলে গেছে ধারের চওড়া রাস্তা পর্যন্ত। বিকেলে ছাদে ছাদে বেড়ালেই প্রায় কলকাতার গড়ের মাঠে বেড়ানোর সুখ অনুভব করা যায়। আরও মজা,—এখানে বেড়ায় শুধু মেয়েরাই; এ পাড়ার বাসিন্দারা প্রায় সবই পাঞ্জাবী,—একটা ছাদে বেড়ালে পঞ্চাশ ঘর পাঞ্জাবী পরিবারের হাঁড়ির খবর জানা যায়!

মহা আনন্দে ছাদে ছাদে ঘুরে বেড়াই আর পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে সখীত্ব করি। তাদের আচার-আচরণ, ভাষা, রন্ধন-প্রণালী থাকা খাওয়ার বৈষম্যে আকৃষ্ট হই প্রচুর। ঠিক পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন একটি আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত পাঞ্জাবী পরিবার, গৃহকর্তা মিঃ চাওলা অতি অমায়িক ভদ্র, মিশুক প্রকৃতির মানুষ। প্রথম দিন থেকেই আমাদের গ্রহণ করেন পরমাত্মীয়ের মত। ক্রমে ক্রমে সমস্ত পরিবারটির সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ হই, ততই তাঁদের মধুর ব্যবহারে হই মুগ্ধ!

মিঃ চাওলার বিংশবর্ষীয়া সুন্দরী সুশিক্ষিতা কুমারী কন্যাটি রূপে-গুণে-স্বভাবে এত আকৃষ্ট করেছিল যে তাকে সর্বান্তঃকরণে কন্যারূপে গ্রহণ করি। তার মুখের মিষ্টি মাতৃ-সম্বোধন এখনও মনে দোলা দেয়! নাম তার শকুন্তলা।

শকুন্তলারা আর্য সমাজ-ভুক্ত; বাংলা দেশে যেমন হিন্দু ধর্মের ভিতর থেকে কুসংস্কারমুক্ত হয়ে জন্ম নেয় ব্রাহ্মধর্ম,—পাঞ্জাবেও তেমনি গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের আবর্জনা পরিষ্কার করে সাধু, পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তন করেন। আর্য-সমাজ নামে এক নতন ধর্মসমাজ। শিক্ষিত, চিন্তাশীল, প্রগতিবাদী পাঞ্জাবী দলে দলে এসে যোগ দেন এই নবস্থাপিত আর্য-সমাজে। তাঁরা দলবদ্ধ হন, সংস্কার মুক্ত, উদার, সব ধর্মের প্রতি আস্থাশীল পান দোষ বিবর্জিত এক উন্নত হিন্দুসমাজ রূপে। তাঁরা বিশ্বাস করেন প্রাচীন আর্য প্রবর্তিত যজ্ঞে, বলেন,—হাভন। চাওলাদের বাড়িতে দেখি আধুনিক হাভন প্রক্রিয়া।

আর্যসমাজী পণ্ডিত-পুরোহিতগণ সঙ্গে নিয়ে আসেন একটি চতুষ্কোণ লৌহপাত্র। তার ভিতরে কাঠ ও ঘৃত সংযোগে আগুন জ্বালিয়ে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে দেন আহুতি। যিনি চান,—তিনি অতি সহজেই নিজ বাড়িতে এই হাভন ক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

তাঁদের বিবাহ-সংস্কারও অতি সহজে হাভন প্রক্রিয়ার পর সেই যজ্ঞাগ্নি সাক্ষী রেখে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়। আর্য সমাজী ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে পনের-ষোল বৎসর বয়স হবার পর, একটি উৎসব করে দেওয়া হয় গায়ত্রীমন্ত্র,—এবং প্রতিদিন তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ মন্ত্রপাঠের বিধি।

আমাদের বাংলা দেশে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ কুমারদেরই উপনয়ন-সংস্কার হয়; ব্রাহ্মণ কুমারীগণ তা থেকে বঞ্চিত হন সম্পূর্ণভাবে,—এমন কি আমরা ছোটবেলায় প্রাচীনাদের নিকট শুনেছি, মেয়েদের গায়ত্রী উচ্চারণে অধিকার নেই—তারা এ মন্ত্র উচ্চারণ করলে পুণ্যের বদলে পাপই হয়। কি করে যে আমাদের দেশে এ ধারণা এলো, তা কে জানে!

বম্বে বাসকালে পার্শীদের ভিতরেও পুত্র-কন্যা-নির্বিশেষে ঠিক এই প্রকার অনুষ্ঠান হয় দেখেছি। অগ্নি উপাসক পার্শীরা অগ্নি সাক্ষী রেখে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের মন্ত্র দীক্ষা দেন। হিন্দুর যজ্ঞোপবীতের মত তাঁদেরও একটি পবিত্র মন্ত্রপুত সূত্র কটিতে ধারণ করার বিধি। এই উৎসবের নাম তাঁরা বলেন 'নওজোত' অর্থাৎ—নবজন্ম।

আর্য সমাজিগণ জাতিভেদ মানেন না—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই হাভন-ক্রিয়া ও উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী ওঁরা নিরামিষাশী; পুরুষরা কচিৎ কখনও বাহিরে মাছ-মাংস গ্রহণ করলেও মেয়েরা অধিকাংশই আমিষ ভক্ষণ করেন না।

তাঁদের মহিলাদের হাতেগড়া মাখনের মত নরম ফুলকা (রুটি ঘৃত-পক্ব সব্জির স্বাদ অপূর্ব। আর পুষ্টির দিক থেকে বলা যায়,—আমরা ব্যয়বহুল ও হাঙ্গাম-বহুল খাদ্য, মাছ-মাংস-ডিম থেকে যেটুকু শক্তি সংগ্রহ করি,—ওঁরা দুবেলার প্রধান খাদ্য, সহজ লাল আটার রুটি ও ঘি, দুধ, শাক, সব্জি থেকে পান তার চেয়ে অনেক বেশি,—কারণ সাধারণত দেখা যায় ওঁদের স্বাস্থ্যের মান আমাদের অনেক উপরে।

ওঁদের খাদ্য-তালিকার স্বাস্থ্যকর উপাদান,—ওঁদের রন্ধন ও আহারপ্রণালী সবই আমাদের অনুকরণযোগ্য। আমাদের বাংলা রন্ধন-প্রণালী দেখে পাঞ্জাবী প্রতিবেশিনীগণ হেসে আকুল! বলতেন,—রান্না করতে তোমরা এত ঘট্ঘট্ করে নাড় কেন? ও ভাবে নেড়ে নেড়ে তরকারী ভেজে আবার জল দিয়ে তাকে সিদ্ধ করে নিলে কি আর ওতে কিছু পদার্থ থাকে? হয়ত ওঁদের কথাই ঠিক!

ওঁদের রান্নার বিশেষত্ব দেখি,—ছোট ছোট উনুনে অল্প কাঠকয়লার নরম আঁচে, ঘি ও সামান্য মশলা ও নুনের সহযোগে ঢাকা অবস্থায় তরকারী বিনা জলে অনেকক্ষণ ধরে নিজের জলেই সুসিদ্ধ হয়; মাঝে মধ্যে ঝাঁকিয়ে দেওয়া ভিন্ন নাড়বার কোন প্রয়োজন হয় না। আলু, পটল, সিম, বেগুন, গাজর, ঢেঁড়স প্রভৃতি তরকারী রান্না হয় আলাদা ভাবে,—সবেরই রান্নার মাধ্যম ঘি,—তেল শুধু গায়ে মাখা ভিন্ন ব্যবহৃত হয় না।

প্রাচীনকাল থেকেই পাঞ্জাব ছিল প্রাচুর্যের দেশ,—দুধ-ঘি-ফলমূল-গম, সবই ছিল অসম্ভব সস্তা,-তাই বোধ হয় ওদের রন্ধন ও ভোজন-প্রণালী আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ওদের পোষাকও শীতপ্রধান দেশের উপযুক্ত। শালোয়ার-কামিজ-দোপাট্টা-শোভিতা পাঞ্জাবী সুশ্রী গৌরী মেয়েদের দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যেত। এখন অবশ্য ক্রমেই তাদের পূর্ব পোষাক লুপ্ত হয়ে, সর্ব ভারতীয় মহিলা-পরিচ্ছদ,—শাড়ির প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবী রমণীগণ বিশেষ গহনা প্রিয় না হলেও, মহার্ঘ বসনের, ঝলমলে পোষাকের বড়ই পক্ষপাতিনী। সিল্ক-সাটিন-কিংখাব-ব্রোকেড তাঁদের দৈনন্দিন সজ্জার তালিকাভুক্ত! প্রাচীনাগণ পর্দা প্রথায় অভ্যস্তা হলেও আধুনিকাগণ ঘুঙট (ঘোমটা) বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণে অধিক আগ্রহান্বিতা!

শকুন্তলার সঙ্গে মনের আনন্দে পাঞ্জাবীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। ওদের নানা সদগুণের মধ্যে আতিথেয়তাই মুগ্ধ করে সমধিক। বেশির ভাগ শিখ ও পাঞ্জাবী বড়ই অতিথিবৎসল,—আর শিষ্টাচার সম্পন্ন মিষ্টি কথার তুবড়ি।

ওদের খাটিয়াপ্রীতি একটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য। দড়ির খাটিয়া ছোট বড় নানা আকারের অনেকগুলো প্রায় সকলের বাড়িতেই থাকে। প্রথমে বড়, তার নীচে একটু ছোট, তার নীচে আরও ছোট, এভাবে পর পর অনেক খাটিয়া অল্পস্থানে গুছিয়ে রাখে। দরকার মত টেনে বার করে,—বসার, খাবার, শোবার, সব রকম প্রয়োজন মেটায়। দারুণ গ্রীষ্মে উন্মুক্তস্থানে শোবার সঙ্গীও ঐ খাটিয়া; রাত দুপুরে 'লু' এলো কি 'আঁধি' এলো, হাল্কা খাটিয়া বগল-দাবা করে মুহূর্তে তারা চলে আসে ঘরের মধ্যে।

দিল্লীর চাওলা-পরিবারের সহৃদয়তা, মধুর ব্যবহার, বিনম্র আচরণ, মনের মধ্যে এমনই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে যে, চিরদিনের জন্য তাঁরা নিজগুণে সেখানে পরমাত্মীয়ের আসনে স্থান নিয়েছেন।

ডাক্তার জে কে সেন ও তাঁর সহধর্মিণী

দিল্লীর নামকরা প্রবীণ চিকিৎসাবিদ ও ধার্মিক,—ডাক্তার জে কে সেন। বহুদিন যাবৎ তাঁরা দিল্লীবাসী। কনট-প্লেসের সন্নিকটে 'হনুমান রোডে' তাঁর নিজস্ব প্রকাণ্ড বাগান-সমন্বিত বাড়ি। সেন গৃহিণীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পটভূমিকায় একটু পূর্বস্মৃতি।

জীবনের প্রায় সিকি-শতাব্দী কেটে যায় বাঙ্গালী বিরল দাক্ষিণাত্যে। সে দেশের ভাষা, ভূষা, খাওয়া-পরা, আচার-আচরণ, সবই আমাদের বিপরীত! আমরা চাই,—দশ অথবা এগার হাত সাড়ি,—মারাঠিদের দেশে পাওয়া যায় ১৮হাত সাড়ি,—যা আমাদের অঙ্গ ও পকেট দুইএর পক্ষেই বেসামাল! আমরা যাকে কচু বলি, ওরা তাকে বলে আলু। আমাদের আহার্য তার সবুজ ডাঁটাগুলি ফেলে দিয়ে, বাঙ্গালী রসনায় অখাদ্য তার পাতাগুলি অতিযত্নে ভিজে কাপড়ে মুড়ে বিক্রি করে যেন কি মহার্ঘ জিনিষ। আমরা রাঁধি সর্ষের তেলে,—ওদেশে তা অপ্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য,—তার বদলে ওরা রাঁধে আমাদের পক্ষে অসহনীয় তিলের তেলে। ভাষা আমাদের নিকট অতি দুর্বোধ্য

এ হেন দক্ষিণ দেশ ছেড়ে বহুদিন পর এলাম উত্তরের নগরী শ্রেষ্ঠা দিল্লী নগরীতে। আনন্দে মন পরিপূর্ণ। এখানে কত বাঙ্গালী রাস্তাঘাট দোকান বাজার, সর্বত্র শুনবো প্রিয় বাংলা ভাষা, পাবো বাঙ্গালীর প্রিয় সব রকম জিনিষ। পাবো,—মিঠে জলের মাছ, যা বাঙ্গালী মাত্রেরই সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য। তা রাঁধার জন্য সর্ষের তেল, তেজপাতা, কালোজিরে ইত্যাদি পাওয়া যাবে অপর্যাপ্ত,—যার অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেছি অর্ধ জীবন! আমাদের প্রিয় ছানার খাবার, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া ইচ্ছামাত্র বাজার থেকে কিনে আনা যাবে, এ যেন আশাতীত আনন্দ! তাছাড়া বাঙ্গালীর পছন্দ মত কাপড়-জামা, শাড়ি-গহনার ত এখানে নেই প্রাচুর্যের অবধি!

দিল্লীতে এসেই পাওয়া গেল একটি পূর্ব পরিচিতা বাঙ্গালী বান্ধবী। তিনি পরামর্শ দিলেন, এখানকার মহিলা সমিতির সদস্যা হয়ে যান, দেখবেন সেখানে কত বাঙ্গালী মহিলা দিল্লীতে আছেন! সানন্দে সম্মত হয়ে একদিন গেলাম এখানকার 'প্রবাসী বঙ্গ মহিলা সমিতি'তে যোগ দিতে।

নির্দিষ্ট দিনে টাঙ্গা ভাড়া করে বান্ধবীসহ এলাম সমিতির অধিবেশন স্থল লেডি আরউইন স্কুলে। দেখি, লেডি প্রতিমা মিত্র সেখানে সভানেত্রীর আসনে ঘর আলো করে বসে আছেন,—চতুর্দিকে প্রায় শতাধিক বঙ্গবালা। একসঙ্গে এত অধিক বাঙ্গালী মহিলার দর্শনে হই আনন্দে আত্মহারা! এই আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে যখন সমিতির কার্যশেষে বান্ধবী ঘুরে ঘুরে সব দেখান। তিনি বলেন,—ঐ যে একপাশে বেঞ্চাসীনা আলাদা ভাবে বসা কয়েকটি বিশিষ্ট মহিলা দেখছেন, ওঁরা সব আই-সি-এসের স্ত্রী। ওঁরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই গল্পগুজব করেন। নীচে ঢালা ফরাসের একপাশে কেরাণীদের স্ত্রী, অন্য পাশে অফিসারদের স্ত্রী—সকলেই নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। এখানে গল্পগুজব, মেলামেশা সবই নিয়মমাফিক!

বিস্ময়ে দু' চক্ষু ছানাবড়া! আবার শুনি, বাসস্থানের নাম শুনে তাঁকে পদমর্যাদা দেওয়া হয়। আপনি সরকারী চাকুরের স্ত্রী হলে, 'বি টাইপ বাংলো' না 'সি টাইপ বাংলো'তে থাকেন, তা জেনে নিলেই দিল্লীবাসিনীরা বুঝতে পারবেন আপনার স্বামী কত মাইনে পান,—তা থেকে অনায়াসেই আপনার শ্রেণী-বিভাগ হয়ে যাবে।

আমি কনট-প্লেসবাসিনী শোনায় কেউ বিশেষ আমল দিলেন না। বাড়ি এসে বান্ধবী বলেন কেন আপনি বললেন না 'বি টাইপ বাংলো' খালি না থাকায় নবাগতা আমি 'কনট প্লেসে' থাকতে বাধ্য হয়েছি। বাংলো পাওয়া গেলেই চলে যাব, তাহলে দেখতেন আপনার কত খাতির হত!

অবাক কাণ্ড! এও কি মনুষ্য-জগতে, বিশেষত স্ত্রী-জাতির নিকট সম্ভব? তবে রাজধানী দিল্লীতে সবই সম্ভব! দিল্লী যেন সত্যই একটি প্রকাণ্ড লাড্ডু,—'যো খায়া ও ভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া ও ভি পস্তায়া'!

তবে সবেরই আছে ব্যতিক্রম, দিল্লীর মানুষেরও আছে। সব দেখে-শুনে একদিনে অনেক অভিজ্ঞতা, রাজধানী সম্বন্ধে অনেক তিক্ততা সংগ্রহ করে, বাড়ি ফেরার সময় প্রায় উৎরে গেল। বেশ রাত হয়েছে, টাঙ্গা পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়ি অনেক দূর—দুই বান্ধবী পড়েছি বেশ

একটু বেকায়দায়। চিন্তান্বিত হয়ে চতুর্দিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি, এ হেন সময়ে এক পরিণতবয়স্কা মাতৃসমা মহিলা কোনো পরিচয় না নিয়েই বলেন, কোথায় যাবে তোমরা ?

আমাদের গন্তব্যস্থান 'কনট প্লেস' শুনে তিনি বলেন, আমার গাড়িতে আমার বাড়ি পর্যন্ত চলো—তারপর তোমাদের বাড়ি ত' খুবই কাছে হবে !

দুশ্চিন্তার নিরসনে আরামের নিশ্বাস ফেলে কৃতজ্ঞচিত্তে উঠে বসি অজানা মহিলার গাড়িতে। প্রথম দর্শনেই তাঁর দরদী কণ্ঠস্বর ও কোমল ব্যবহারে তাঁর প্রতি হই আকৃষ্ট। দিল্লীর সে সময়ের বিখ্যাত ডাক্তার জে কে সেনের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে বসেই হয় প্রথম পরিচয়। যাবার সময় বলেন,—কাছেই থাকো, আবার এসো।

তাঁর হৃদ্যতায় মুগ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে যাই তাঁর বাড়ি। অতি ধার্মিক মহিলা, তাঁর স্বামীও তাই। পাঁচ পুত্রের মধ্যে একটি আই সি এস, দু'টি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, দু'টি প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার। স্বর্ণ-গর্ভা জননীর প্রত্যেকটি পুত্র জাতির গৌরব, বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী কুল-প্রদীপ !

সন্তানভাগ্যে অসীম সৌভাগ্যবতী পাঁচটি শীর্ষস্থানীয় কৃতী পুত্রের জননীর নেই কোন অহঙ্কার। শিশুর মত সরল মনে মেশেন সকলের সঙ্গে। তাঁর স্বামী ডাঃ জে কে সেন দিল্লীর নাম করা প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী। ধার্মিক, পরোপকারী ডাক্তারবাবু দিল্লীর কালীবাড়ি, বেঙ্গলী হাই স্কুল প্রভৃতি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাঁদের বাড়িটি প্রায় সব সময়ই থাকত সাধু সজ্জনের পদধূলিতে পবিত্র !

একদিন বর্ষীয়সী সেন মাসীমা তাঁর স্থূলদেহ নিয়ে তিনতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আসেন আমাদের 'কনট প্লেসের' ফ্ল্যাটে। হাতে পাতায় মোড়া অতি লোভনীয় এবং বিদেশে দুষ্প্রাপ্য খানিকটা কুলের আচার। বলেন,—বহুকাল বাংলা দেশ ছেড়ে এসেছ, নিশ্চয়ই কুলের আচার পাও না মনে করে নিয়ে এলাম তোমার জন্ত। বিদেশে টোপা কুল পাওয়া যায় না বলে, আমি দেশ থেকে চারা এনে বাগানে গাছ লাগিয়েছিলাম। সে গাছ এখন প্রকাণ্ড বড় হয়ে অজস্র ফল দিচ্ছে।

সত্যই এ জিনিযটি শিশুকাল থেকেই ছিল অতি প্রিয়, আর বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে এর স্বাদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। স্বল্প দিনের পরিচিতা মাসীমার দরদী মনের বাক্যে ও ব্যবহারে বহুদূর বাসিনী আপন মায়ের স্নেহস্পর্শে চক্ষু হয়ে ওঠে অশ্রু-সজল !

দিল্লীপ্রবাসে এই দু'টি মানুষের মত মানুষ দেখে ধন্য হই ; সেন মাসীমার মত জ্ঞানবতী, ধর্মপ্রাণা, নিরহঙ্কার মহিলা এ যুগে বিরল। কিছুদিন পূর্বে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অল্পদিনের ব্যবধানে সাধনোচিত-ধামে প্রয়াণ করেন।

সতী-সাধ্বী, পুণ্যবতী সেন মাসীমার মৃত্যু,—সে এক অদ্ভুত অভাবনীয় কাণ্ড। ডাক্তার সেনের বয়স সত্তরের সন্নিকট হবার পর হঠাৎ হয় পক্ষাঘাতের আক্রমণ। তাঁকে দোতলার শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভবপর না হওয়ায় একতলার একটি ঘরে রাখা হয়। বর্ষীয়সী মাসীমা প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠে শয্যাশায়ী স্বামীকে দেখার জন্ম নিজ দোতলার শয়নকক্ষ থেকে নীচে আসেন এবং সমস্ত দিন তাঁকে দেখা শোনা করেন। রোগী বাক্যহীন, চলচ্ছক্তিহীন, নড়াচড়াতেও অক্ষম। অনেক দিন এ ভাবে কাটার পর হঠাৎ একদিন সুস্থ মাসীমার অর্ধমৃত দেহ দেখা গেল সিঁড়ির নীচে, রোগীর ঘরের সম্মুখের একতলার উন্মুক্ত বারান্দায় !

বাগানের মালী ওঠে শেষ রাত্রে,—সে এসে ভোরের আবছা অন্ধকারে এ ভাবে ভূলুণ্ঠিতা গৃহকর্ত্রীর দেহ দেখে চীৎকার শব্দে বাড়ির সকলকে জাগায়। বাড়ির মানুষ এসে তাঁকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধিকিধিকি প্রাণবায়ুটুকু নির্গত হয়ে যায়।

সকলের অনুমান—শেষ রাত্রেই ভোর হয়েছে মনে করে বর্ষীয়সী গৃহিণী তাঁর বার্ধক্য-পীড়িত স্থূলদেহ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কোন প্রকারে পড়ে যান,—অথবা সিঁড়ির মাঝেই মধ্যপথে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্তা হন। মরণাপন্ন স্বামীকে জীবিত রেখে, সুস্থ স্ত্রী অদ্ভুত ভাবে শাঁখা সিঁদুর নিয়ে করলেন দেহত্যাগ,—এর অল্প কয়েক দিন পরেই পুণ্যাত্মা ডাক্তারবাবুও ফেলেন শেষ নিঃশ্বাস।

[ক্রমশ।

মধ্যরাত্রি

পরেশ মণ্ডল

মধ্যরাত্রে শয্যা ঘিরে উপস্থিতি সঞ্চারিত কার ;
স্বপ্ন যদি নয় তবে অলীক কল্পনা কিংবা ছায়া—
চাঁদের দেহের থেকে যে ছায়া জ্যোৎস্নার দীপাধার
অথবা কেবল এক বিকৃতি, বিকার, ঘৃণ্য মায়া !

শুধু ওই মধ্যরাত্রে ? সারাদিন, সর্বক্ষণ চারু
হাসির জমাট আলো ঘরটাকে ভরপুর রাখে,
মিলিত দৃষ্টির রেখা এঁকে বেঁকে হয় দেবদারু ;
তবে কি আমার বাঁশি ভেঙ্গে যাবে মৃত্যুল বৈশাখে ?

উড়ন্ত বকের মতো আমি আর যাবো না আকাশে
কেন না ওখানে ম্লান গতিপথ, নিবিড় ক্রন্দন।
শ্রান্ত হয়ে শুয়ে আছি ঝর্ণার আশ্রয়ে অভিলাষে :
আমার ভিতরে পথ জলাশয় অরণ্য বন্ধন

এবং উৎসব মঞ্চ। দর্পণে সংগীত থেমে গেলে
সন্ধ্যা হবে, তারপর মধ্যরাত্রি আসবে ডানা মেলে।

প্রতিভা গুপ্ত

সেদিন ভোরবেলা টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল। বড় মেয়ে বীথি ফোন ধরে বলল, 'মা বাপী দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল করছেন।' ছুটে গিয়ে ফোন ধরলাম, 'কি ব্যাপার?'

উনি বললেন, 'নূতন খবর আছে। আমাকে Principal Engineer করে আন্দামানে বদলী করেছে।'

'আন্দামানে? কি সর্বনাশ। যাবে নাকি সেখানে?'

'দিল্লীতে সবাই বলছে আন্দামান খুব সুন্দর যায়গা। নিজে পয়সা খরচ করে কোন দিন তো আন্দামান যাওয়া হবে না, চলই না। সরকারী পয়সায় ঘুরে আসি। তুমি তৈরি হতে থাক, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ফিরছি।'

কোথায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আন্দামানে যেতে হবে ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। মেয়েদের পড়াশোনার কি হবে, ইস্কুল কলেজ আছে কি না কিছুই তো জানি না। কয়েকদিন পরে উনি দিল্লী থেকে ফিরে এলে আরম্ভ হল আমাদের জল্পনা-কল্পনা। অনেক আলাপ-আলোচনার পর সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ সব দিক ভেবে দেখার পর আমাদের আন্দামানে যাবার কথা যখন একেবারে ঠিক হল, তখন দিন-কয়েক খুবই উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। অজানা অচেনা দ্বীপান্তরের দেশ—মনে ভয় কৌতূহল সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক ভাবের সৃষ্টি হল। যাই হোক, আমরা যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। ঝঞ্ঝাটও কম নয়। টিকা নাও, ইনজেকসান্‌ নাও। হেলথ সার্টিফিকেট তৈরি কর, পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে যাবার অনুমতি আনো, মালপত্র জাহাজে তোলার জন্য মাপজোক কর, ইত্যাদি নানা ঝামেলা। কয়দিন এর পেছনেই ছুটাছুটি করতে হল।

বাঁধাছাদা করে আমরা তৈরি, জাহাজ আর ছাড়ে না। রোজই শুনি আজ নয়, কাল। আজ নয়, কাল করতে করতে প্রায় মাসখানেক কাটবার পর অবশেষে আমাদের যাবার দিন ঠিক হল। ২রা জানুয়ারী, ১৯৬১ সনে আমরা আন্দামানের উদ্দেশে জাহাজে চড়লাম। জাহাজটির নাম M. V. Andaman। আমরা যখন বিশাখাপত্তনে ছিলাম তখন এই জাহাজটি তৈরি হচ্ছিল। প্রথম যেদিন সমুদ্রে জাহাজ ট্রায়াল দিতে গেল, তখন এই জাহাজে অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে উনিও ছিলেন। এতদিন পরে সেই জাহাজে চড়ে সমুদ্রপাড়ি দিতে হবে ভেবে খুব অদ্ভুত লাগছিল। বন্ধুরা যাঁরা 'সি-অফ' করতে এসেছিলেন তাঁরা আমাদের জাহাজ দেখে বললেন 'এ আবার জাহাজ নাকি? এ তো গোয়ালন্দ ষ্টীমার।' গোয়ালন্দ ষ্টীমার অবশ্য নয়, তবে জাহাজটি খুব বড়ও নয়। আমাদের তো বেশ ভালই লাগল। কেবিনগুলি বেশ সুন্দর, ডেকের গায়ে লাগান, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে।

আমরা জাহাজে চড়লাম সন্ধ্যাবেলা, শুনলাম জোয়ার না এলে জাহাজ ছাড়বে না, কাজেই রাত্রিটা ডকেই থাকতে হবে। সকলে
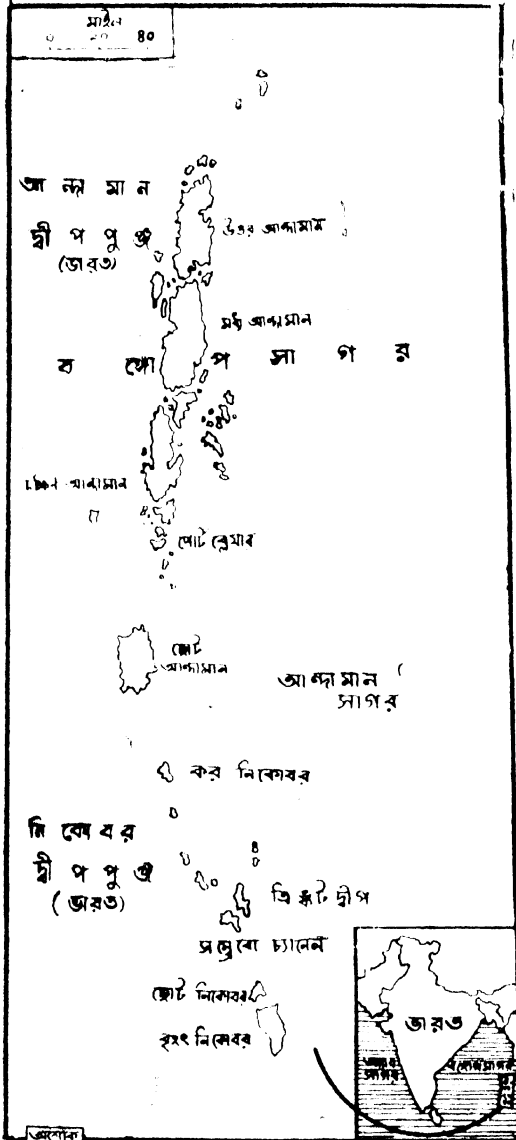
বিদায় নিয়ে চলে গেলে, খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা যে যার কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম।

সকালে উঠে সকলে গিয়ে ডেকে বসলাম। রাত্রিবেলা কখন খিদিরপুর ছাড়িয়ে চলে এসেছি টেরই পাই নি। ঘণ্টা তিনেক পর হুগলী নদী পার হয়ে, ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে এবার আমাদের জাহাজ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর জলের রংও ধীরে ধীরে বদ্‌লাতে লাগল। গেরুয়া থেকে নীলচে-সবুজ, নীলচে-সবুজ থেকে ঘন নীল এবং তারপরে গভীর কালো রং-এ পরিণত হল। অদ্ভুত কালো জল! দোয়াতের কালির রংও বুঝি এমনই কালো। অবাক হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সমুদ্র নাকি যত গভীর হয় তার রংও তত কালো হয়। বঙ্গোপসাগর কি এতই গভীর? না মেঘে ঢাকা কালো আকাশের ছায়ায় সে এত কালো? মনে হলো আন্দামানে যেতে হলে এই সীমাহীন নিবিড় কালো জলরাশি পাড়ি দিতে হয় বলেই বোধ হয়, তার আর এক নাম 'কালাপানি'।

জাহাজ যখন মাঝসমুদ্রে গিয়ে পড়ল, তখন দেখলাম সমুদ্রের আর এক রূপ। সাগরের সঙ্গে পরিচয় আমার নূতন নয়। বিশাখাপত্তম, পুরী, গোপালপুরের সমুদ্রের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। কিন্তু সে শুধু তীরে বসে ঢেউ দেখা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে সমুদ্রের বুকে বসে তার রূপ দেখা আগে কখনও সম্ভব হয় নি। এ সমুদ্রের রূপ আলাদা। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে তীরের চিহ্ন মাত্র নেই। জল—শুধু জল। অশান্ত ঢেউগুলি অনবরত একটার পর একটা এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে, বিরামহীন, সংখ্যাহীন। যতদূর দৃষ্টি যায়, খালি ঢেউ-এর পরে ঢেউ মাথায় শুভ্রমুকুট পরে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। আদি-অন্তহীন বিশাল সমুদ্র।

'আদি-অন্ত তাহার কোথা রে?
কোথা তার তল, কোথা কূল?'

জাহাজে অনেক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হল, কেউ বা আমাদের মত নূতন কেউ বা ছুটীর পর ফিরে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছে পোর্টব্লেয়ার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ছবি পেলাম, যেমন সেখানে অসম্ভব বৃষ্টি হয়, খাওয়া দাওয়ার খুব কষ্ট, স্কুল ভালো নেই, বাড়িগুলি খুব সুন্দর ইত্যাদি। যে কৌতূহল, যে উৎসাহ নিয়ে সমুদ্রযাত্রা সুরু করেছিলাম, ধীরে ধীরে তা কমে আসতে লাগল। তিনদিন ধরে একটানা সমুদ্র দেখে দেখে যেন ক্লান্তি আসতে লাগল। এই দীর্ঘযাত্রার পথে জাহাজ কোথাও নোঙর করে না। এই পথে অন্য কোন জাহাজও চলতে দেখা যায় না। সারাদিন শুয়ে-বসে, গল্প করে কত আর ভাল লাগে? জল, শুধু জল, দেখে দেখে আমারও চিত্ত বিকল হবার উপক্রম। একমাত্র বৈচিত্র্য সমুদ্রের জলে উড়ুক্কু-মাছের ঝাঁক। কতদিনে পৌঁছাব কতদিনে মাটিতে পা দেব এই চিন্তাই মন জুড়ে রইল।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা ডেকে গিয়ে দেখি—অপরূপ দৃশ্য! সমুদ্রের বুকে যেন পাহাড়ের মেলা বসে গিয়েছে। সারি সারি একটার পর একটা। কোনটা বেশ বড়, কোনটা খুব ছোট। প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা দ্বীপের মত। সামনে এক লাইন আবার তার পিছনে এক লাইন। কখনও কখনও মনে হচ্ছে—বুঝি সমস্ত দ্বীপগুলি একসঙ্গেই লাগানো। সহযাত্রীরা বললেন—এইখান থেকেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সুরু এবং একেবারে শেষে সেই দক্ষিণ সীমান্তে পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত আমাদের জাহাজ এই দ্বীপগুলির পাশ দিয়ে চলবে।

এই তবে আন্দামান। আজও যার নাম শুনলে বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। মনে হয় কেমন সে দেশ, যেখানে শুধু চোর-ডাকাত আর খুনী-আসামীরা থাকত, কেমন সে দেশ যেখানে চরম শাস্তি দেবার জন্য রাজবন্দীদের দ্বীপান্তরে পাঠাত, কেমন সে দেশের আদিম অসভ্য জাত, যারা নাকি আজও সভ্য-মানুষকে তাদের পরম-শত্রু বলে মনে করে। এই আন্দামান সম্বন্ধে আজও মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই।

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুললে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের পূর্ব দিকে একসারি মুক্তোর মত ছোট ছোট কয়েকটি চিহ্ন। এই হল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অস্তিত্ব, কলকাতা থেকে যার দূরত্ব ৭৮০ মাইল আর মাদ্রাজ থেকে ৭৪০ মাইল। আয়তনে মাত্র ২৫৮০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৬৩ হাজারের উপর। বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে গভীর-জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপগুলি দেখে মনে হল, কবির ভাষায় আমিও বলি—

'হায়! ছায়াবৃতা, কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

পাহাড়ী দ্বীপগুলি দেখে ভাবছিলাম সত্যিই কি এই দ্বীপগুলি আরাকান পর্বতমালার শাখা? কারণ ভৌগোলিকরা বলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্মাদেশের Cape Negrais থেকে সুরু করে সুমাত্রার Achin Head পর্যন্ত সমগ্র আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অর্ধচক্রাকারে বর্মা ও সুমাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে হয়ত কোন প্রবল ভূমিকম্পে বা অন্য কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড়গুলির

পোর্টব্লেয়ার

কিছু সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে কিছু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে প্রকৃতির খেয়ালে হাজার বছর পর কোনদিন হয়ত আবার বর্তমান দ্বীপগুলি তলিয়ে যাবে কিংবা নূতন নূতন দ্বীপের সৃষ্টি হবে।

জাহাজে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের একটি মানচিত্র ছিল। তাতে দেখলাম উত্তর সীমান্তে Landfall Island আর দক্ষিণ সীমান্তে Rutland Island, মাঝখানে ২০৪টি দ্বীপ নিয়ে Great Andaman. লম্বায় প্রায় ২০০ মাইল। এর ৪০ মাইল দক্ষিণে Little Andaman. তারও ৮০ মাইল দূরে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

সেকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দেবার সময় আন্দামানের পাশ দিয়েই সব জাহাজের আনাগোনা ছিল। পৃথিবীর নানা দিক থেকে, গ্রীস, রোম, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয় সব দেশের জাহাজগুলি আন্দামানের পাশ দিয়েই যাতায়াত করত। এই পথে যাবার সময় কখনও বা সাইক্লোনে পড়ে, কখন বা পথ হারিয়ে কখন বা জলের সন্ধানে জাহাজগুলি এখানে এসে পড়ত। এখানকার জংলীদের হাতে তাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। কিছু না কিছু লোকজন তাদের হাতে মারা পড়তই। সেই সব নাবিকরা এ জায়গাটা সম্বন্ধে এমন সব ভীতিপ্রদ গল্প প্রচার করে বেড়াত যে, সাধ্যমত সকলে আন্দামানকে এড়িয়ে চলত।

বহু শতাব্দী পর্যন্ত আন্দামান দ্বীপগুলি সভ্যজগতের কাছে এক রহস্যময় ভয়ঙ্কর দেশ বলে গণ্য হত। এখানকার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে সকলের ধারণা ছিল তারা নরখাদক—Cannibals. এই অপপ্রচারের ফলে সকলেই দেশটা সম্বন্ধে দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত ছিল।

বঙ্গোপসাগরের এক কোণে এই দ্বীপগুলির খবর বহুদিন পর্যন্ত পৃথিবীর লোকদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে যখন আন্দামানের অস্তিত্ব ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে লোকে নানা কাহিনী প্রচার করে বেড়াতে লাগল, তার বেশির ভাগই অলীক ও কাল্পনিক।

আন্দামান সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া যায় দ্বিতীয় দশকে ক্লডিয়াস টলেমির লেখা একটি ভ্রমণকাহিনী থেকে। টলেমি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ করেছেন, নাম বলেছেন Agmatae বা Island of Good Fortune. এর পরে নবম দশকে আরবদেশীয় পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী থেকে আবার আন্দামানের খবর পাওয়া যায়। দুইজন মুসলমান পরিব্রাজক যখন ভারতবর্ষ ও চীন দেশের মধ্যে যাতায়াত করছিলেন। জলের সন্ধানে তাঁরা একসময়ে এখানে এসে পড়েন এবং জংলীদের হাতে তাঁদের বহু লোকজন মারা যায়। তাঁরা বলেছেন—'আন্দামানের অধিবাসীরা দেখতে অতি ভয়ংকর। গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ঘন কোঁকড়ান চুল কুৎসিত ভয়াবহ মুখাকৃতি। মানুষগুলি সম্পূর্ণ নগ্নকায় এবং বন্যজন্তুর মত তারা কাঁচামাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।'
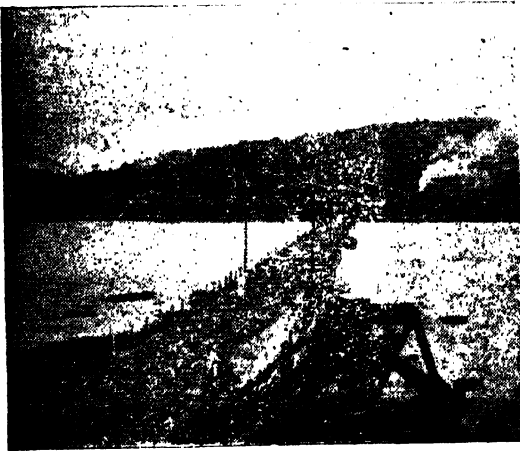
এরও চারশ' বছর পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলোর লেখা থেকে আন্দামানের আরও খবর পাওয়া যায়। মার্কোপোলো বলেছেন, 'বঙ্গোপসাগরে Angaman নামে বিরাট লম্বা এক দ্বীপ আছে। এর অধিবাসীরা অত্যন্ত বন্য ও অসভ্য জাত। তাদের দেখতেও অনেকটা জানোয়ারের মত। স্বভাব অতি ক্রূর। নিজের জাত ছাড়া অন্য মানুষ পেলে তাদের হত্যা করে ভক্ষণ করে।'

১৫৬৩ সনে Master Caesar Frederick মালাক্কা থেকে গোয়া যাবার পথে নিকোবরে এসে পড়েন। তিনি বলেছেন, 'নিকোবর থেকে পেগু পর্যন্ত অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে তাদের বলে Land of Andameons. কতকগুলি দ্বীপের মধ্যে একদল মানুষ বাস করে তারা অত্যন্ত আদিম অসভ্য জাত। তারা পরস্পরকে হত্যা করে ভক্ষণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জাহাজ যদি সেখানে গিয়ে পড়ে তবে প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরে আসতে পারে না।'

নানা রকম লোকের কাহিনী থেকে নানারকম অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত কাহিনী প্রচার হতে থাকল। এই সব কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কেউ মাথা ঘামায় নি। সকলে আন্দামানকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

পাহাড়ের পর পাহাড় দ্বীপের পর দ্বীপ পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোন লোকালয় চোখে পড়ছে না। দু'শ চারটি দ্বীপের মধ্যে কয়েকটি মাত্র দ্বীপে লোকের বসতি হয়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছিলাম ঘন-জঙ্গলের মাঝখান থেকে আন্দামানের আদিম জাতটি তীর ধনুক হাতে বেরিয়ে আসে কি না। বৃথা আশা। কোন জনমানবের চিহ্নও দেখা গেল না।

ভাবতে অবাক লাগে এতদূরে, এই বিচ্ছিন্ন সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপগুলিতে প্রথমে মানুষের পদার্পণ কি করে হল? তার সম্বন্ধেও নানা কিম্বদন্তী আছে। অনেকে বলেন বহু শতাব্দী পূর্বে এক পর্তুগীজ জাহাজ তিনশ কাফ্রী ক্রীতদাস (স্ত্রী-পুরুষ) নিয়ে মোজাম্বিক থেকে রওনা হয়ে পর্তুগীজ সেটলমেণ্ট পেগু যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড সাইক্লোনে দিগভ্রষ্ট হয়ে জাহাজটি এসে ধাক্কা খেল আন্দামানের গায়ে এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। ফলে সেই তিনশ কাফ্রী স্ত্রী-পুরুষ এখানেই রয়ে গেল। মনে অবশ্য প্রশ্ন জাগে সেই জাহাজে পর্তুগীজ নাবিক ও খালাসী যারা ছিল তাদের কি হল? তাদের কি একজনও বেঁচে ছিল না? কিম্বদন্তী অবশ্য বলে কাফ্রীরা তাদের হত্যা করেছিল! আবার অন্য গল্পও আছে। মিঃ ম্যান বলেছেন, 'সেকালে মালয় ও

চ্যাথাম দ্বীপ ও causeway

চীনা জলদস্যুরা আন্দামানে তাদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল। তারাই সব ভাষণদর্শন কাফ্রীদের ধরে এনে এখানে ছেড়ে দিয়েছিল যাতে তাদের ভয়ে বাইরের কোন জাহাজ এখানে ভিড়তে সাহস না করে। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা যাচাই করা বড় কঠিন।।

আন্দামান দ্বীপগুলির দিকে আবার চেয়ে দেখলাম। কি নয়নাভিরাম দৃশ্য। কি সবুজের সমারোহ। কতরকমের যে সবুজ তার ঠিক নেই। কেমন সব বিরাট বিরাট গাছগুলি নিজস্ব মহিমায় সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর শ্যামগম্ভীর। মনে হচ্ছিল সত্যিই যেন কেউ নিজের হাতে দ্বীপগুলিকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

অবশেষে পঞ্চম দিনে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর আমাদের জাহাজ এসে পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছাল। ছোট্ট জেটি, লোকে লোকারণ্য। জাহাজ আসা আর জাহাজ ছাড়ার দিনটিতে জেটিতে খুব ভিড় হয়। সহরের বহু লোক গিয়ে জাহাজঘাটে জড় হয়. এ ছাড়া উনি অর্থাৎ গুপ্তসাহেব পি ডব্লিউ ডি'র প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আসায় জাহাজ-ঘাটে বোধ হয় পি ডব্লিউ ডি'র সব অফিসার ও স্টাফরাই গিয়েছিলেন। সকলের সঙ্গে পরিচয় শেষ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। আমরা এরকম একটা অভ্যর্থনা পেয়ে খুব খুশি হলাম। ভারতবর্ষের কত জায়গায় গিয়েছি, কে কার জন্য মাথা ঘামায়। এখানে জাহাজ এলে সকলেই খুব খুশি হয়। আন্দামানে আরও কিছু লোক এল, কিছু খাবার দাবার এল। চিঠিপত্র এল, বাইরের জগতের খবর এল। সবাই খুব খুশি। গল্প শুনেছি আট-দশ বছর আগে পোর্টব্লেয়ারে জাহাজ এলে শঙ্খ বাজিয়ে সকলে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাত।

পোর্টব্লেয়ারের জেটিটি Chatham Island বলে ছোট্ট একটি দ্বীপের গায়ে। একটি ছোট Causeway দিয়ে পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে যুক্ত। জেটি থেকে মাটিতে পা দিতেই প্রথম যে কথাটা আমার মুখ দিয়ে বের হল তা হল 'আমরা দ্বীপান্তরের দেশে পা দিলাম।' মনে হল এই সেই দেশ ছোটবেলা থেকে যার সম্বন্ধে আবছা একটা ধারণা ছিল এই সেই দেশ যেখানে আমাদের দেশের কত দোষী-নির্দোষী মানুষ—স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে চিরজীবন কাটিয়ে গিয়েছে। কত মানুষ এখানকার মাটিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

সহরটি পাহাড়ী, কাজেই ঢোকার মুখে বেশ বড় একটা চড়াই পেরিয়ে এসে আমরা পোর্টব্লেয়ারে ঢুকলাম। পথের দুই ধারে কিছু দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর এবং হর্টিকালচার গার্ডেন পড়ল।

পোর্টব্লেয়ার। Captain Blain-এর প্রতিষ্ঠিত প্রথম কয়েদী উপনিবেশ। যার আকাশে, বাতাসে মিশে রয়েছে কত লোকের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল যার মাটিতে মিশে রয়েছে কত অত্যাচারিত, নিপীড়িত হতভাগ্যের মৃতদেহ।

সাইক্লোনে পড়ে অথবা পথ হারিয়ে যে সব জাহাজ আন্দামানে এসে পড়ত, সেই সব জাহাজের নাবিকরা এখানকার জংলীদের হাতে তাদের দুর্দশার গল্প নানা ভাবে প্রচার করতে লাগল। তার ওপর বঙ্গোপসাগরে মালয় ও চীনা জলদস্যুদের অত্যাচারের মাত্রাও অত্যন্ত বেড়ে চলল। এ ছাড়া এই দ্বীপগুলিতে একটা নিরাপদ পোতাশ্রয় না থাকাতে সাইক্লোনের সময় জাহাজগুলি অত্যন্ত বিপদে পড়তে লাগল। এই সব কারণে East India Company এর একটা ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

১৭৮৯ সন। Lord Cornwallis তখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। সে সময় East India Company-র Hydrographer ছিলেন Captain Archibald Blair এবং Surveyor General ছিলেন Colonel Colebrook.

কোম্পানী ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার ও কর্নেল কোলব্রুককে আন্দামানে পাঠালেন সমস্ত দ্বীপগুলি জরিপ করার জন্য তিনটি কারণে।

(১) মনোমত একটি কয়েদী উপনিবেশের জন্য স্থান নির্বাচন।

(২) নিরাপদ পোতাশ্রয়ের জন্য বন্দরগুলি পরিদর্শন।

(৩) আন্দামানের জংলীদের বশ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন।

ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার ও কর্নেল কোলব্রুক সমস্ত দ্বীপগুলি মোটামুটি জরিপ করে কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন। তাঁরা লিখলেন আন্দামানে এত সুন্দর সুন্দর ন্যাচারাল হারবার আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। জলহাওয়া ভাল। দ্বীপগুলির মধ্যে ছোট বড় বহু ঝর্ণা আছে। কোন কোন বন্দর এত প্রশস্ত যে, সেখানে হয়ত বৃটিশ নেভির অর্ধেকই প্রায় ভিড়ানো যায়।

এখানকার জংলীদের সম্বন্ধে কর্ণেল কোলব্রুক লিখলেন, 'আন্দামানীরা হয়ত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আদিম অসভ্য জাত। তাদের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকৃতি, মাথায় কোঁকড়ান চুল। এরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকে। মানুষগুলি অত্যন্ত ধূর্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ।'

পেনাল সেটলমেন্টের জন্য তাঁরা উভয়েই বর্তমান চ্যাথাম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন পোর্টব্লেয়ার পছন্দ করলেন।

রিপোর্ট পেয়ে কোম্পানী ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারকে সেট্লমেন্টের দায়িত্ব দিয়ে আন্দামানে পাঠালেন। বাংলা দেশ থেকে অল্পসংখ্যক কর্মচারী, মিস্ত্রী, মজুর এবং ছয় মাসের রসদ নিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৭৮৯ সনে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার আন্দামানে এসে উপস্থিত হলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য বর্মা থেকে কিছু বর্মী কয়েদী ও বর্মী কুলি নিয়ে এলেন। গভীর জঙ্গল কেটে বসতিস্থাপন করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অসংখ্য বিরাট বিরাট গাছ, তার নীচে দুর্ভেদ্য ঘন ঝোপঝাড়। তার ওপরে আছে জংলীদের বার বার আক্রমণ। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার চ্যাথাম দ্বীপে একটি ছোট্ট কলোনী গড়ে তুললেন। স্থানীয় জঙ্গল থেকে বাঁশ ও কাঠ কেটে ছোট ছোট ঘর তুললেন। রসদ রাখার জন্য একটি স্টোরহাউস এবং পানীয় জল রাখার জন্য একটি 'রিজারভার' তৈরি করলেন। চ্যাথামের গায়েই বড় প্রধান দ্বীপটি। এর পর এই দ্বীপের (বর্তমান পোর্টব্লেয়ার) জঙ্গল পরিষ্কার করা ও বাড়িঘর করা আরম্ভ হল। এখানে কিন্তু কাজটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল। জংলীরা বেশির ভাগই পোর্টব্লেয়ারে থাকত, তারা প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল।

মোটামুটি ভাবে কিছু বাড়ি-ঘর তৈরি হলে কলকাতা থেকে কয়েদীরা আসতে লাগল। জন্ম হল প্রথম কয়েদী উপনিবেশের।

সমস্ত চ্যাথাম জুড়ে নানা রকম তরি-তরকারী ও ফলের গাছ লাগান হল এবং ফল পাওয়া গেল আশাতীত ভাবে। আন্দামানীরা প্রথম দিকে যত আক্রমণ চালিয়েছিল ধীরে ধীরে তা কমে আসতে

লাগল। কারণ তারা বিদেশীদের আওতা থেকে সরে দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। এই সময় কলকাতা থেকে অনেকে স্বাধীন ভাবেও এখানে বসবাস করতে এলেন। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ছোট্ট কলোনীটি সব দিক দিয়েই উন্নতি লাভ করল। এখানকার রসদ আসত পেনাঙ ও কলকাতা থেকে।

Lord Cornwallis-এর ভাই Commodore Cornwallis উপনিবেশটি পরিদর্শন করতে আসেন এবং দেখে খুব খুশি হন। গভর্নর জেনারেলের নামে উপনিবেশটির নাম রাখা হয় Port Cornwallis.

কমোডোরের সঙ্গে নূতন করে দ্বীপগুলি আরেকবার জরিপ করার সময় দেখা গেল নর্থ আন্দামানে যে হারবারটি আছে, পোতাশ্রয়ের পক্ষে সেটি অনেক বেশি উপযোগী এবং খুব চওড়া থাকায় অনেক জাহাজ একসঙ্গে সেখানে নোঙর করতে পারবে। নর্থ আন্দামানের দ্বীপটিও সেটলমেন্টের পক্ষে উপযোগী তা ছাড়া কলকাতা থেকেও অনেক কাছে হবে। Naval Arsenal খোলার পক্ষে হারবারটি আদর্শ-স্থানীয়। কোম্পানীর কাছে আবার রিপোর্ট গেল।

এদিকে উপনিবেশটি যখন অনেকখানি তৈরি East Inda Co. আদেশ পাঠাল সমস্ত উপনিবেশ উঠিয়ে নিয়ে নর্থ আন্দামানে যাবার জন্য।

আবার ভাঙো সব। নিয়ে চল নূতন দ্বীপে, একেবারে দক্ষিণ সীমান্ত থেকে উত্তর সীমান্তে। আবার নূতন করে নূতন উদ্যমে শুরু হল উপনিবেশ গঠনের কাজ। জলেরও কোন অসুবিধা হল না। পাহাড়ের গায়ে প্রচুর ঝর্ণা আছে, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল। নূতন করে এই উপনিবেশটির নাম রাখা হল Port Cornwallis আর ছেড়ে আসা সেটলমেন্টটির নাম রাখা হল Old Harbour.

নূতন উপনিবেশটি সব দিক দিয়েই আশাতীত ভাবে উন্নতি লাভ করল। কয়েদীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। এই সময় বম্বে গভর্নমেণ্ট এখানে পাঁচজন ইয়োরোপীয় কয়েদী পাঠাতে চাইলেন। এখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার লিখে পাঠালেন ইয়োরোপীয়দের পক্ষে এ বায়গা মোটেও উপযোগী নয়। সেই থেকে এই নিয়ম হয়ে গেল কোনদিন কোন ইয়োরোপীয় কয়েদীকে আন্দামানে পাঠানো হবে না।

বেশ কাজকর্ম এগোচ্ছিল। বছরখানেক পর পোর্ট কর্নওয়ালিসের বাসিন্দারা ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিল। অসংখ্য লোক মারা যেতে লাগল। এই খবর যখন কলকাতায় পৌঁছাল কোম্পানী সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন সেটলমেন্ট একেবারে উঠিয়ে দেবার জন্য। এই সময় এখানে প্রায় আড়াইশ' কয়েদী, পাঁচশ' স্বাধীন বাসিন্দা এবং প্রচুরসংখ্যক সৈন্য ছিল। আবার জাহাজ ভরে ভরে সবাইকে ফেরৎ পাঠানো হল। কয়েদীদের সব পেনাঙে আর অন্যান্য লোকজনদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৭৯৬ সনে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের রক্তজল করা পরিশ্রমের ফলে আন্দামানের প্রথম পেনাল সেটেলমেণ্ট পরিণত হল এক পরিত্যক্ত জনহীন দ্বীপে।

এরপর ৬০ বছর পর্যন্ত কেউ আর আন্দামানের খবর রাখে নি। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরাও চেষ্টায় ছিল আন্দামানে উপনিবেশ গঠনের কিন্তু কি কারণে জানি না তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। এদিকে আন্দামানের কাছে মাঝে মাঝে দু'একটি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যেতে লাগল।

১৮২৪ সনে First Burmese War-এর সময় বৃটিশ ফ্লীট আন্দামানে পোর্ট কর্নওয়ালিসে এসে নোঙর করেছিল। সেই সময় আন্দামানীদের হাতে তাদের নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল।

১৮৩৯ সনে রাশিয়ান জিওলোজিষ্ট মিঃ হেলফার আন্দামানীদের হাতে নিহত হন।

১৮৪৪ সন। দুইটি ইংরেজ সৈন্যবাহী জাহাজ একই সময়ে সাইক্লোনে পথ হারিয়ে আন্দামানে বর্তমান Haveloch Island-এ এসে ভেঙে পড়েছিল। আন্দামানীদের হাতে সেই যাত্রীদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটময় হয়ে পড়েছিল।

'১২ই অগাষ্ট, ১৮৪৪ সন। ইংরেজ জাহাজ 'বৃটন' দুই হাজার সৈন্য নিয়ে রওনা হল সিডনি থেকে কলকাতার উদ্দেশে। পথে সাইক্লোন শুরু হল। বঙ্গোপসাগরের জলরাশি উত্তাল হয়ে উঠল। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় চতুর্দিক অন্ধকার—এমন অন্ধকার যে নিজের হাতটাও দেখা যায় না। কোনদিকে যে জাহাজ যাচ্ছে জানবার কোন উপায়ই নেই। নাবিকরা প্রমাদ গণল। জাহাজ যদি আন্দামানের দিকে যায় তবে আর রক্ষা নেই। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল আন্দামানকে এড়িয়ে যাবার। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দুর্দান্ত ঝড়ের বেগে জাহাজ মোচার খোলার মত ভাসতে ভাসতে আন্দামানের দিকে এগিয়ে চলল। সৈন্যরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যাওয়ায় ক্যাপ্টেন আদেশ দিলেন সকলকে নিজের নিজের বায়গায় গিয়ে ভগবানের নাম করতে। সবাই যে যার বায়গায় চলে গেল। অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, জাহাজেও কোন আলো নেই। সকলে মরণের প্রতীক্ষা করতে লাগল, হঠাৎ এক প্রবল ধাক্কায় জাহাজটি টলে উঠল। এইবার নিশ্চিত সলিল সমাধি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও জাহাজ কিন্তু ডুবল না। কোথায় এল তা দেখবারও উপায় নেই। সবাই ভোরের অপেক্ষা করতে লাগল। ভোর হল। সকলে বাইরে এসে দেখল একটি অতি সুন্দর দ্বীপের গায়ে Mangrove-এর জঙ্গলে জাহাজটি আটকে রয়েছে। তীরের গাছগুলি তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দিয়ে যেন পরম যত্নে জাহাজটিকে আগলে রয়েছে।

নাবিক ও সৈন্যরা তীরে নামবার জন্য তৈরি এমন সময় দেখা গেল গাছের আড়াল থেকে ভীষণদর্শন উলঙ্গ কতকগুলি লোক তীর ধনুক হাতে সন্তর্পণে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। চীৎকার করে, রুমাল নেড়ে সৈন্যরা বোঝাতে চেষ্টা করল তারা শত্রু নয় বন্ধু। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। নিরাশ হয়ে সকলে তীরে নামবার আশা ত্যাগ করল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সৈন্যরা দেখে কিছুদূরে প্রায় তাদেরই মত অবস্থায় আরেকটি জাহাজও সেই দ্বীপে আটকে রয়েছে। দেখেই তারা চিনতে পারল। জাহাজটি ছিল আর একটি ইংরেজ সৈন্যবাহী জাহাজ Runnymede যাচ্ছিল Gravesend থেকে কলকাতায়। একই সময়ে দুইটি জাহাজ রওনা দিয়েছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে। ভাগ্যচক্রে একই সময়ে সাইক্লোনে পড়ে একই জায়গায় এসে আটকে পড়েছে। এই অদ্ভুত পরিবেশে দুই জাহাজের যাত্রীরা পরস্পরকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল। জাহাজ দু'টির কলকব্জা খারাপ হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছুদিন সেখানে থাকতে হয়ে

ছিল। এই যাত্রীদের ওপর আন্দামানীরা বারবার আক্রমণ করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

এই সব দুর্ঘটনার কথা বাদ দিলেও জলদস্যুর হাতে বহু নাবিক ও লোকজন মারা যেতে লাগল। কাজেই ভারত গভর্নমেন্ট কিছুদিন থেকেই আন্দামানে নূতন করে আবার একটি সেটলমেন্ট ও anchorage করার কথা ভাবছিলেন। এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা কার্যকরী হবার পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল।

১৮৫৭ সন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। East India Co.র অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সিপাহীদের ভয়ে ইংরেজরা ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ইংরেজের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়বার উপক্রম। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য। সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়ে গেল। ভাগ্যদেবীর সহায়তায় সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ আবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। এখন চিন্তা হল এই সব বিদ্রোহীদের নিয়ে। এই বিপজ্জনক লোকগুলিকে কোথায় পাঠানো যায়? এমন জায়গায় পাঠানো প্রয়োজন, জীবনে যাতে সেখান থেকে ফিরে আসতে না পারে। কাজেই এর উপযুক্ত স্থান হিসাবে আন্দামানের কথাই তাদের মনে এল।

East India Company অনেক ভেবে-চিন্তে Dr. F. J. Mouat-এর নেতৃত্বে এক কমিশন পাঠালেন আন্দামানে। কমিশনে ছিলেন Dr. G. Playfair, Lt. Heathcote এবং Dr. Mouat নিজে।

নূতন করে কয়েদী উপনিবেশের জন্য স্থান নির্বাচন করতে ডাঃ মট্ ও তাঁর সঙ্গীরা ১৮৫৭ সনে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে মৌলমেন হয়ে আন্দামানের দিকে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে বর্মা থেকে কিছু বর্মী কয়েদী ও বর্মী প্রহরী নিলেন। ২৩শে নভেম্বর কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ১১ই ডিসেম্বর পোর্ট কর্নওয়ালিশের কাছে এসে পৌছলেন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর স্থল দেখে সবাই খুব উৎফুল্ল হল কিন্তু তীরে নামতে কারুর সাহস হল না। জাহাজ থেকে দ্বীপগুলি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। বড় বড় গাছগুলি ঘিরে রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর সব বুনো লতাপাতা। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। চতুর্দিকে শুধু সবুজের ছড়াছড়ি। তীর ঘেঁসে চওড়া রুপোলি বালির চড়া, তার পরেই নীল সমুদ্রের জল। এই অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে কিছুক্ষণের জন্য সকলে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু জাহাজের সাধারণ নাবিক ও খালাসীদের কাছে এই সৌন্দর্যের দাম কতটুকু? দ্বীপগুলির অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় তারা ভয় পেয়ে গেল। কোথাও জীবনের এতটুকু সাড়া নেই, একটা জন্তু-জানোয়ার বা পাখীও দেখা যাচ্ছে না। এ কোন্ ভৌতিক দেশে তারা এসে পড়ল? কিছুতেই নাবিকরা তীরে নামতে রাজী হল না। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করিয়ে জংলীদের ভয়ে সকলে সশস্ত্র হয়ে তীরে নামলেন।

ডাঃ মটের প্রথম চেষ্টা হল পূর্বের উপনিবেশটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করা। খুঁজতে খুঁজতে চ্যাথাম দ্বীপে পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মধ্যে কিছু ভাঙা বাড়িঘরের চিহ্ন দেখতে পেলেন। চারিদিক ঘুরে দেখে কমিটির মেম্বাররা সবাই একমত হলেন যে উপনিবেশের পক্ষে জায়গাটি অতুলনীয়। কিন্তু এমন সুন্দর জায়গাটি এত অস্বাস্থ্যকর হবার কি কারণ থাকতে পারে যার জন্য সেটলমেন্ট তুলে দিতে হল তাই তাঁরা ভেবে পেলেন না। অনেক ঘোরাঘুরি করে, সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে অনেক চিন্তার পর তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন। সমস্ত দ্বীপটির দুই-তৃতীয়াংশ তীরই ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে ঘেরা। এত ঘন জঙ্গল যে সেখানে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। জোয়ারের সময় ম্যানগ্রোভের গাছগুলি অর্ধেকই জলের নীচে চলে যায় কিন্তু ভাঁটার সময় এই জলা জায়গাগুলি থেকে একটা বিষাক্ত গ্যাস বার হয়। আর সেখানে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে মশকবাহিনী নির্বিচারে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে।

মেম্বাররা সবাই বুঝতে পারলেন এই বিষাক্ত গ্যাস ও অসংখ্য মশা এই দুই কারণে তখনকার লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই সিদ্ধান্তে স্থিরনিশ্চয় হয়ে ডাঃ মট্ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অন্য দ্বীপগুলি দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বর্তমান Stewart Sound, Long Island, Interview Island, Barren Island, Port Mouat, Middle Strait এবং আরও অন্যান্য দ্বীপ দেখে Old Harbour-এ এসে উপস্থিত হলেন। পথে অনেকবার তাঁদের সঙ্গে আন্দামানীদের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং ছোটখাট সংঘর্ষও বেঁধেছিল। অনেক চেষ্টা করেও জংলীদের বোঝান সম্ভব হয় নি যে তাঁরা শত্রু নয়। যতবারই স্টিমার তীরের কাছে পৌচেছে ততবারই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়ে মেরেছে। আশ্চর্যের কথা তীরগুলিতে লোহার ফলা লাগানো। বোধ হয় বহুকাল আগে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে লোহা জোগাড় করে এরা তীর বানাতে শিখেছিল।

East India Co. আন্দামানীদের ওপর গোলাগুলি চালাতে বিশেষভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া কেউ বন্দুক ব্যবহার করতেন না।

একবার এক সংঘর্ষে একটি আন্দামানী ছেলে ধরা পড়ল। ডাঃ মট্ এই ছেলেটিকে পরে কলকাতা নিয়ে যান। উদ্দেশ্য ছিল তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার মাধ্যমে তাদের দেশের আদিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। কলকাতায় গিয়ে ছেলেটি কারও সঙ্গে কথা বলতে না পেরে

মেরিন ড্রাইভ, পোর্টব্লেয়ার

কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাঃ মট্‌ তখন গভর্নমেণ্ট থেকে অনুমতি নিয়ে আবার ছেলেটিকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেন।

ওল্ড হারবারে এসে মেম্বাররা সকলে পুরোনো উপনিবেশটি পরীক্ষা করেন এবং সব ঘুরে দেখে এই জায়গাটিই আবার মনোনীত করেন। তাঁরা তাঁদের মতামত গভর্নমেণ্টকে লিখে পাঠালেন এবং প্রস্তাব করলেন ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের সম্মানার্থে ওল্ড হারবারের নাম দেওয়া হোক পোর্টব্লেয়ার।

গভর্নমেণ্ট এ রিপোর্ট পেয়ে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে Captain H. Man, Superintendent of Convicts at Moulmein-কে আদেশ পাঠালেন তিনি যেন অবিলম্বে আন্দামান রওনা হন এবং পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে বৃটিশ পতাকা উত্তোলন করেন।

ক্যাপ্টেন ম্যান পোর্টব্লেয়ারে এসেই উপনিবেশের প্রাথমিক বন্দোবস্তের কাজে ব্যস্ত হলেন। প্রথমেই জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাড়ি ও ইয়োরোপীয় প্রহরীদের জন্য ব্যারাক তৈরির কাজ সুরু হল। এখানকার জলবায়ু বর্মাদেশের অনুরূপ হওয়ায় কোম্পানী আদেশ দিলেন বাড়িগুলি যেন বর্মাদেশের ধরণে উঁচু মাচানের ওপর তৈরি হয়। ঠিক হল, প্রথম দিকে বর্মী কয়েদীরা জঙ্গল পরিষ্কার করে দেবে কিন্তু পরে ভারতীয় কয়েদীরাই সব কাজ করবে।

১৯৫৮ সনের ১০ই মার্চ দু'শো জন কয়েদী, চার জন ওভারসিয়ার, দুইজন ডাক্তার ও পঞ্চাশ জন নৌ-সেনা নিয়ে Dr. Walker পোর্টব্লেয়ারে এসে পৌঁছলেন। কয়েদী উপনিবেশের পত্তন হল দ্বিতীয়বার।

বর্তমানে ফিরে আসা যাক। আমরা পোর্টব্লেয়ার দেখে কিন্তু ভারী খুশি হলাম। কি সুন্দর দ্বীপটা। পাহাড় ও সমুদ্রের অপরূপ সমন্বয় তার উপর একেবারে সবুজের রাজ্য। আমরা গিয়ে গভর্নমেণ্ট গেস্ট-হাউসে উঠলাম। গেস্ট-হাউসটি হ্যাডো অঞ্চলে। সহরে ঢোকার আগেই হ্যাডো। খুব কম বাড়ি-ঘর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম জায়গাটি। গেস্ট-হাউসের পেছনের বারান্দা থেকে সমুদ্র ও পাহাড় দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া যতজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল সবাইকেই খুব ভালো লাগল। হ্যাডো থেকে বেশ খানিকটা দূরে সহর। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার যখন প্রথম উপনিবেশ গঠন করতে এই হ্যাডো অঞ্চলেই নাকি আন্দামানী ও জারোয়ারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল। তারা তাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য বিদেশীদের সাধ্যমত বাধা দিয়েছিল। তারও অনেক পরে গভর্নমেণ্ট আন্দামানীদের বশ করার জন্য যে 'Andaman Homes'-এর সৃষ্টি করেন, হ্যাডোতেই সব চেয়ে বড় শাখাটি ছিল। এখন অবশ্য সে হোমে'র কোন চিহ্নও নেই। গেস্ট-হাউসটি আমাদের খুব পছন্দ হল। উঁচু মাচানের ওপর কাঠের বাড়ি, ঠিক বড় রাস্তার ধার ঘেঁসেই। বিরাট বিরাট ঘর, পিছনে ঢাকা কাচের বারান্দা আর সামনের দিকে ছোটখাট ফুলের বাগান।

আমরা যে সময় পোর্টব্লেয়ারে এলাম সেই সময় এখানকার চীফ কমিশনার শ্রীরাজোয়াদে বদলি হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। চীফ কমিশনারই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বময় কর্তা, সর্বপ্রকার দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। চীফ কমিশনারের অপ্রতিহত ক্ষমতা, একচ্ছত্র আধিপত্য। এ হেন প্রবল প্রতাপান্বিত চীফ কমিশনারের বিদায় উপলক্ষে সে সময় এখানে ফেয়ারওয়েল পার্টির প্রতিযোগিতা চলছিল। লাঞ্চ, টি, ডিনার, ব্রেকফাস্ট কোনটাই বাদ নেই। আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগেই শেষের দিকটায় এসে আমরাও সেই পার্টির বন্যায় ভেসে চললাম। পোর্টব্লেয়ারে আমাদের জাহাজ ভিড়ল বিকেল চারটায়। পাঁচটা থেকেই শুরু হল পার্টি অ্যাটেণ্ড করা। এক নাগাড়ে নয়দিন পর্যন্ত এর মধ্যে আর ফাঁক ছিল না। মেয়েরা অভিযোগ করে তারা একলা গেস্ট হাউসে পড়ে থাকে আর আমরা খালি ঘুরে বেড়াই। কিন্তু উপায় কি নূতন জায়গা, নূতন লোকের নিমন্ত্রণ, না গেলে তারাই বা কি মনে করবে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত চীফ কমিশনার বিদায় নিলেন এবং আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এর কয়েকদিন পরেই আমাদের বাংলোতে চলে এলাম। নূতন বাড়ি, সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে বেশ সময় লাগল। চমৎকার এখানকার বাড়িগুলি। কাঠের বাড়ি, টিনের চালা। এ দেশের মাটিতে ইট তৈরি হয় না তা ছাড়া আন্দামানের জঙ্গলে অফুরন্ত কাঠ পাওয়া যায় কাজেই বসতবাটি থেকে অফিস আদালত পর্যন্ত সবই কাঠের তৈরি। আরও একটি কারণ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ Sismic Zone এর মধ্যে পড়ে। ভূমিকম্পের জন্য কাঠের বাড়ি অনেক বেশি নিরাপদ। বাংলোগুলি সবই বেশ বড় বড় এবং সঙ্গে বিরাট বাগান। ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশ থেকে এখানে বদলি হয়ে এলে সবচেয়ে আনন্দ হয় এত বড় বাড়ি ও বাগান পেয়ে। তার উপর 'Accomodation Free' একেবারে সোনায় সোহাগা। আমাদের বাড়িটি হ্যাডোতে, নাম 'হ্যাডো ভিলা।'

গেস্ট হাউসে থাকার সময় সেখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নাম শ্রীপ্রকাশ রাও। ইনি ছিলেন Anthropological Officer. বেশ কয়েক বছর আন্দামানে ছিলেন। আমার মেয়েরা দেখতাম প্রায়ই ভদ্রলোকের কাছে বসে গল্প শুনত। একদিন আমিও গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি আন্দামানের জংলীদের সম্বন্ধে খুব গল্প হচ্ছে, বিশেষ করে জারোয়াদের বিষয়ে কত রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণী দিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোকটি। জারোয়াদের বিষয় যা শুনলাম তাতে রীতিমত হৃৎকম্প উপস্থিত হল। এখানে মানুষের প্রধান বিভীষিকা হল জারোয়া। এমন কি ওঙ্গি বা আন্দামানীরাও জারোয়াদের ভয় করে। জারোয়াদের এত কাছাকাছি থাকতে হবে ভেবে মনে বেশ ভয় ঢুকে গেল। নানারকম প্রশ্ন করায় প্রকাশ রাও আমাকে আন্দামান সম্বন্ধে কয়েকটি বই দিলেন।

এখানকার আদিবাসীদের 'ওরিজিন' নিয়ে নানা জনের নানা মত আছে। Anthropologistরা কেউ কেউ বলেন এরা আফ্রিকার নিগ্রোদের বংশধর, কেউ বলেন মালয় দেশের Semang জাতির বংশধর, কেউ বা বলেন এরা Phillipine Island-এর Aeta জাতির বংশধর। আবার এমন কথাও অনেকে বলেন এরা ভারতবর্ষের কিরাত জাতির বংশধর। এরা এখানে এলো কি করে? যখন দ্বীপগুলি বর্মা থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত যুক্ত ছিল এই মানুষগুলি স্থলপথেই হোক বা জলপথেই হোক কোনরকমে এখানে এসে পড়েছিল। অ্যানথোপোলোজিষ্টদের চুলচেরা গবেষণায় এরা যে জাতির বংশধর

বললেই মনে হোক না কেন আমাদের মত আনাড়ীদের চোখে এদের আফ্রিকার নিগ্রো ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় না। তেমনি কুচকুচে কালো রং, তেমনি অদ্ভুত কোঁকড়ান চুল।

এই আদিবাসীরা এত হিংস্র হল কেন? কেন এরা সভ্যমানুষকে সহ্য করতে পারত না—যার জন্য অতীতকাল থেকে শুরু করে উপনিবেশ গঠনের পরও বার বার বাধা দিয়েছে? তারও কারণ আছে বৈ কি। বহুযুগ থেকে মালয়বাসীরা edible birds nest এবং trepang-এর খোঁজে আন্দামানে আসত। মালয়বাসীদের স্বভাবে অদ্ভুত একটা ক্রুরতা ছিল। তারা এখানে এলেই আন্দামানীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। নিরীহ লোকেদের যন্ত্রণা দেওয়া, তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করা মালয়বাসীদের মস্ত একটা আনন্দ ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানাপ্রকার উপহারের প্রলোভন দেখিয়ে জাহাজে নিয়ে গিয়ে তারা তুলত—তারপর তাদের নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে শ্যাম, কাম্বোডিয়া, বর্মা, ইন্দোচীন সব দেশে বিক্রী করত। সে সময় ক্রীতদাসদের বাজার দর ছিল অত্যন্ত চড়া। মালয়বাসীদের বাণিজ্যের মস্ত বড় একটা মূলধন ছিল আন্দামানের আদিবাসীরা। একে তো নিজেদের ক্রীতদাস জীবনের পূর্বস্মৃতি, তার ওপর সভ্যমানুষদের বিশ্বাসঘাতকতা, সব মিলিয়ে এরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির হয়ে পড়ল। আর তারা বিদেশী মানুষকে বিশ্বাস করে না। তাদের রাজ্যে পা দিলেই তীর ছুঁড়ে বা বর্শা দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়।

নরখাদক বলে যে অপবাদ আন্দামানীদের সম্বন্ধে বহুকাল ধরে চলে আসছিল, পরে দেখা গেল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লেখকরা, নাবিকরা এবং পরিব্রাজকরা নানা ভাবে নানা গল্পে এদের সম্বন্ধে বলেছেন। তাঁদের বেশির ভাগ লোকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। সম্পূর্ণ জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে সে সব গল্প তাঁরা প্রচার করেছিলেন।

স্মরণাতীত কাল থেকে এই মানুষগুলি বঙ্গোপসাগরের এক কোণে এই দ্বীপগুলিতে বাস করে এসেছে। সভ্যজগতের কোন সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছায় নি। নিজেদের রাজ্যে নিজেদের নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। কল্পনাও করে নি তাদের রাজ্যে কোনদিন বিদেশী সভ্য মানুষদের নজর পড়বে। বিদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বারবার তাদের হয়েছে লোকক্ষয়। বিদেশীদের ভয়ে নিজেদের রাজ্যে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাদের মনের দিকে কেউ কি চেয়েছিল।

'তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে
বাষ্পাকুল অরণ্য পথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে।'

ক্রমে ক্রমে পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকল। আশে-পাশে যায়গাগুলি অনেক দেখে নিলাম। প্রত্যেকদিন বিকেল হলেই গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম সহরের বাইরের জায়গাগুলি দেখতে। এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। অন্ধ্রদেশে বিশাখাপত্তনেও সমুদ্র ও পাহাড়ের সমাবেশ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আন্দামানের তুলনা হয় না। বিশাখাপত্তনের পাহাড়গুলি প্রায় ন্যাড়া আর আন্দামানের পাহাড় গভীর জঙ্গলে ঢাকা। এখানকার পাহাড়গুলি অনেক বেশি উঁচু আর তাদের ঘিরে আছে অসংখ্য খাড়ি বা ক্রীক। খাড়ির ভেতর মোটর বোটে করে ঘোরার সময় মনে হয় সুন্দর বনের খাড়িতে ঘুরছি। দুই পাশে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল জলের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় এঁকে-বেঁকে খাড়িগুলি চলে গিয়েছে। যতই ভেতরে ঢোকা যায় ততই চারিদিক নিস্তব্ধ মনে হয়। সুন্দরবনের খাড়ির সঙ্গে আন্দামানের খাড়ির তফাতের মধ্যে আন্দামানের জলের রং সুন্দরবনের থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

আবার পাহাড়ি পথে যাবার সময় মনে হয় রাঁচী, হাজারিবাগের ঘাট রোড দিয়ে চলেছি। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ।

নূতন দেশ নামহীন তার সব অঞ্চল। কাজেই উপনিবেশ গঠনের প্রথম থেকে কর্তাব্যক্তিরা যাঁরাই এখানে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের পছন্দমত নামেই এক একটা অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। তা ছাড়া নিজেদের দেশের থেকেও অনেক জায়গায় নাম রেখেছেন ইয়োরোপীয় শাসনকর্তারা।

Aberdeen Bazar পোর্টব্লেয়ারের চৌরঙ্গী। সবচেয়ে জনবহুল ও যানবহুল জায়গা। নামটি কিন্তু ভারী অভিজাত। স্কটল্যাণ্ডের একটি বড় সহর Aberdeen, তার থেকে এই সহরের কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ heart of the town-এর নাম রাখা হল অ্যাবারডিন। তার পাশেই অ্যাবারডিন বস্তি বা বসতি। অ্যাবারডিনের কথায় মনে হল এইখানেই সেটলমেন্টের সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ বেধেছিল আন্দামানীদের সঙ্গে বিদেশীদের।

Battle of Aberdeen—Dr. James Pattison Walker এলেন পোর্টব্লেয়ারে কয়েদী উপনিবেশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে। তিনি

অ্যাবারডিন বাজার

এসেই কয়েদীদের লাগিয়ে দিলেন জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে। প্রথমে চ্যাথাম, পোর্টব্লেয়ার ও রস আয়ল্যাণ্ডের কাজ আরম্ভ হল। আন্দামানের জঙ্গল যাঁরা দেখেন নি তাঁরা ধারণা করতে পারবেন না কত গভীর এখানকার অরণ্য। কয়েদীরা জঙ্গল পরিষ্কা সুরু করল। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? হাজার হাজার বছর ধরে যে অরণ্য এখানে রাজত্ব করছে যার বনস্পতির মূল-উপমূল আন্দামানের মাটির তলায় শিরা-উপশিরার মত জড়িয়ে রয়েছে সামান্য কয়েকটি কুড়ুলের ঘায়ে তাকে কাবু করা কি এতই সহজ? অসংখ্য গাছ তাতে অসংখ্য লতাপাতা, ঝোপঝাড় যার ভেতর সূর্যের আলোও ঢুকতে ভয় পায় সেখানে মানুষ কি করে ঢুকবে? বিরাট বিরাট গাছগুলি অতি কষ্টে যাও বা কাটা হল, মাটিতে না পড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য গাছের গায়ে। সেই কাটা গাছ বাইরে টেনে আনা অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। উপায় নেই। নিষ্ঠুর কশাঘাতে মরণপণ করে কয়েদীরা কাজে লেগে রইল। জঙ্গলের জোঁক মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে কিলবিল করে তাদের ছেঁকে ধরল। তারপর আছে আন্দামানের জঙ্গলের বিখ্যাত পোকা—**ticks.** গাছ থেকে ঝুর ঝুর করে পড়ে মানুষের গায়ে ঢুকে গেল। তারপর তার যন্ত্রণায় কয়েদীরা যখন পাগলের মত ছটফট করত, তার বদলে পেত তারা ব্যঙ্গ ও উপেক্ষার হাসি। মরণাধিক পরিশ্রম করে জঙ্গল পরিষ্কার করা, রাস্তা-ঘাট তৈরি করা, বাড়ি-ঘর করা ইত্যাদি নানা কাজে তারা ব্যস্ত রইল। নূতন করে উপনিবেশ স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের মৃত্যুর হার খুব বেড়ে গেল। এবার কিন্তু অন্য কারণে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অমানুষিক পরিশ্রম, সমুদ্র ও অরণ্যবেষ্টিত দ্বীপটির বিভীষিকা, আন্দামানীদের আতঙ্ক, সব মিলিয়ে কয়েদীরা পাগলের মত হয়ে পড়ল। সিপাহী বিদ্রোহের আসামী ছাড়া অন্যান্য গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত আসামীও বহু আসতে আরম্ভ করল। কয়েদীদের একমাত্র চিন্তা কেমন করে পালানো যায়? এদের কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল মাইল দশেক সমুদ্র পাড়ি দিলেই দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারবে নয়ত হাঁটাপথে রওনা দিলে এক দিন না একদিন বর্মা দেশে গিয়ে পৌঁছবে। নানা রকম চেষ্টা চলতে লাগল এখান থেকে পালাবার। কিন্তু পালাবে কোথায়? জঙ্গলের পথে ওৎ পেতে আছে আদিবাসীর দল, সাগরের জলে আছে হাঙরের পাল। কোন দিকে কোন পথ নেই। তা'ছাড়া চারদিকে কড়া পাহারা, কোন সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না।

তবুও কিছুদিন যেতে-না-যেতে দলে দলে কয়েদী পালাতে লাগল। প্রায় কুড়ি-বাইশ জন কয়েদী বাঁশ কেটে ভেলা তৈরি করে পালাল। কিছুদূর যেতে না যেতেই ডুবে মরল। আরেক দল পালাল ছোট ডিঙি করে। তাদের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। জঙ্গলের পথে একদল পালাল, তারা আন্দামানীদের হাতে মারা পড়ল। এ ছাড়া ছুটকো ছাটকা দুই চারজন করে যারাই পালায়, ধরা পড়ে ফিরে আসে। নয়ত অনশনে, পথশ্রমে আবার এসে ফাঁসিকাঠে মাথা গলায়। কেউ জলপথে পালায় সমুদ্রে ডুবে মরে, কেউ স্থলপথে পালায়—জংলীদের হাতে মরে। কিন্তু পালানো কিছুতেই বন্ধ হয় না।

ডাঃ ওয়াকারের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কয়েদীরা পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে তাদের শাস্তি হোত প্রাণদণ্ড। প্রত্যেক কয়েদীর দৈনিক কাজের একটা নির্দিষ্ট তালিকা ছিল, যদি কোন কারণে তারা সে কাজ শেষ না করতে পারত তবে তাদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া হত। ক্ষমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নে তারা পাগল হয়ে উঠত। বহু কয়েদী সেই শাস্তির আতঙ্কে ফাঁসী দিয়েও মারা যেত। তখন গাছের ডালে প্রায়ই কয়েদীদের মৃতদেহ ঝুলতে দেখা যেত। সব মিলিয়ে তাদের এমন একটা মানসিক অবস্থা হল যে—মরণ তো সব রকমেই, কাজেই পালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি মরণের বেশি কিছু তো আর হবে না।

এদিকে প্রাণদণ্ডের ভয়েও কয়েদীদের পালান যখন বন্ধ করা গেল না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আদেশ পাঠালেন কোন কয়েদীকে পালানোর অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না।

ডাঃ ওয়াকারের নির্দেশে কয়েদীদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করা হত। জোড়ায় জোড়ায় হাত কড়া লাগিয়ে সারাদিন কাজে লাগিয়ে দিত। তার মধ্যে যারা দুর্দান্ত প্রকৃতির কয়েদী তাদের দশ-বারো জনকে একসঙ্গে পায়ে বেড়ি দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিত।

কিছুদিন পর ডাঃ ওয়াকার কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন পোর্টব্লেয়ারে ঢোকার মুখে যে রস আয়ল্যাণ্ড আছে সেখানে হেডকোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক এবং কলকাতার সঙ্গে মাসে একবার করে আন্দামানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হোক।

একে তো কয়েদীদের পালান লেগেই রয়েছে তার ওপর আছে বুনোদের হামলা। হয়ত কয়েদীরা জঙ্গল পরিষ্কার করছে, কোথা থেকে দেড়শো-দু'শো জন জংলী এসে তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ করল এবং তাদের মেরে-ধরে যা যন্ত্রপাতি পেল সব নিয়ে গেল। আবার হয়ত কোথাও অনেকে মিলে বাইরে রান্না করছে, হঠাৎ জংলীরা এসে বাসনপত্র সব কেড়ে নিয়ে গেল। লোহা বা অন্য যে কোন ধাতুর ওপর জংলীদের দারুণ লোভ। কিছুতেই তাদের সঙ্গে আপোষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আন্দামানীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যাচ্ছে না, কোন রকমেই তারা বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজী হচ্ছে না। এই সময় একটা ঘটনা ঘটল।

দুধনাথ তেওয়ারী সিপাহী বিদ্রোহের একজন আসামী। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড নিয়ে আন্দামানে এল। তাকে রাখা হয়েছিল রস্ আয়ল্যাণ্ডে। এসে পৌঁছবার পনেরো কুড়ি দিন পরেই দুধনাথ তেওয়ারী রস থেকে পালাল। ভেলায় করে এপারে পোর্টব্লেয়ারে এসে আট-দশ জন সঙ্গী জোগাড় করে জঙ্গলের পথে যাত্রা করল। কিছুদূর যাবার পর জঙ্গলের মধ্যে আরও কয়েকটি 'ভাগোড়া' দলের সঙ্গে দেখা হল। সব মিলিয়ে প্রায় আশি-নব্বুই জন কয়েদী এবার বর্মার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। লুকিয়ে সঙ্গে করে যা সামান্য খাবার এনেছিল কয়েকদিন বাদেই তা ফুরিয়ে গেল। এদিকে রাস্তা ভুল হচ্ছে বার বার। জঙ্গলের মধ্যে সরু পায়ে চলা পথগুলি তারা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে কারণ সেগুলি হচ্ছে আন্দামানীদের যাতায়াতের রাস্তা। কোনদিকে যে যাচ্ছে বোঝবার কোন উপায় নেই। এমনও হচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে পাঁচ-ছয় দিন আগের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় আবার এসে উপস্থিত হয়েছে। জলের অভাবে জঙ্গলের মধ্যে বিশেষ ধরণের বেত গাছের ডগা কেটে জল বার করে খাচ্ছে, জঙ্গলে কোন ফলের গাছ পেলে ফল পেড়ে খাচ্ছে। [ক্রমশ।

সাধু শয়তান কথা

সাধন তপাদার

(শেষাংশ)

যতবার আমি ধানমণ্ডলে শিকার করতে গেছি ততবারই সাধুবাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রতিবারেই তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—শয়তানটা এখন মরবে না—উস্‌কো মওত নেহি আয়া। এমনি মাসের পর মাস কাটল। চিতাবাঘটাও গরু-মোষ মারা অব্যাহত রাখল।

তারপর ঘটনাবৈচিত্র্যে যে বিশাল অরণ্যের সন্ধান পেলাম সেই বিস্তীর্ণ অরণ্য সমুদ্রের তুঙ্গতর পাহাড়, আর সীমাহীন উপত্যকা ধানমণ্ডলের কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের আকর্ষণ বিকর্ষণে পরিণত করল। শুধু মাঝে মাঝে আমার মানসপটে ভেসে উঠত রাতশেষে ক্ষণিকের দেখা পলায়মান সেই চিতাবাঘটা আর তার চোখ দুটো।

অবশেষে ধানমণ্ডলের যবনিকা উঠল দেড় মাস পর। নভেম্বরের শেষাশেষি সেটা। ধানমণ্ডল থেকে খবর আসছিল চিতাবাঘটা বেপরোয়া গরু-মোষ মারছে। আজ হরিদাসপুর, কাল দর্পণা, পরশু গুঠুনিয়া কখনও ডাউন সিগ্‌নালের কাছে, কখন আপ লেভেল-ক্রসিং-এর পাশে। সন্ধ্যার আগেই জঙ্গলের রাস্তায় লোকচলাচল বন্ধ হয়ে যায়, চিতাবাঘটা নাকি পথিকের ঘাড়ে লাফাবার সুযোগে থাকে। কখনও সে রাস্তা আগলে দাঁড়ায়, কখনও নিঃশব্দে অনুসরণ করে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার ইচ্ছে থাকলেও সেদিকে যাওয়া হয়ে উঠছিল না। শেষে দু'টি চমকপ্রদ সংবাদ শুনে আর না গিয়ে থাকতে পারলাম না। প্রথম সংবাদ—তেলিগড়ার সাধুবাবার গরুটি ব্যাঘ্রকবলিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংবাদ ভীতিপ্রদ—চিতাবাঘটির আক্রমণে একটি রাখাল মরেছে।

দু'দিনের ছুটি নিয়ে একদিন দুপুরের পর আমি ধানমণ্ডলে এসে নামলাম। সঙ্গে আমার চাকর মনিয়া, আর একটি নধর কুচকুচে কালো ছাগলের বাচ্চা। ঘণ্টাখানেক পরেই তেলিগড়া আশ্রমে এসে উপস্থিত হলাম।

সাধুবাবা ধুনির কাছেই বসেছিলেন, মনিয়ার কাঁধে ছাগলের বাচ্চাটা দেখে বললেন, আরে আরে, ওটা নিয়ে এসেছেন কেন!

বললাম, ওটাকে একটু ফুল বেলপাতা ছুঁইয়ে দিন, ওকে বেঁধে আজ শয়তানটার জন্যে বসব।

সাধুবাবা বললেন, মিছেমিছি ও বেচারাকে কষ্ট দেবেন কেন, ও-সব কিছু দরকার হবে না। কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন? আমি আপনার আসার পথ চেয়ে ছিলাম।

বললাম, এদিকে আর আসা হয়ে ওঠে নি, কাজকর্ম করে সুযোগ- সুবিধে 'মতো ঐদিকেই এক বড় জঙ্গলে শিকার করতে যেতাম।

কিছু মারলেন টারলেন?

হ্যাঁ, একটা বাঘ মেরেছি।

সাধুবাবা বললেন, সা-ব্বা-স! আজ ভি আপ [illegible]য়েঙ্গে। সালেকো মওত আগিয়া।

সাধুবাবা রামযাত্রা অভিনয়ের ভঙ্গিতে আশ্রমের [illegible]টির সংবাদ দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার গরুটা নাকি [illegible] দিয়েছে?

সাধুবাবা বললেন, সেই তো বলছি—শয়তানটা এবার মরবে। ওর চলা বলা সব বদলে গেছে—আমি ওর মৃত্যুযোগ দেখেছি। শালা আমার আশ্রমের গরু মারল! বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সাধুবাবা। আমার দিকে স্থির তাকিয়ে বলতে লাগলেন, শুনুন ডাক্তারবাবু, আপনি যার জন্যে এতদিন ঘুরেছেন, যার জন্যে আজ এসেছেন—সে-কে শত্রু! এরই জন্যে আপনি এতদিন আহার নিদ্রা ভুলে দিন রাত ঘুরেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন—সেটা কি? সা-ধ-না! শত্রুকে জয় করবার সাধনা। সে সাধনা আজ আপনার পূর্ণ হবে, আজ আপনি সিদ্ধিলাভ করবেন। আপনার চোখ দেখে আমি বলে দিচ্ছি—আপনার হাতে শয়তানটা আজ মরবে। সিরফ এক গোলি—বনদেবী সহায় হোগী!

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু বুঝলাম সাধুবাবা একটি ঘুচ্চু লোক। শিকারের অনেক অন্ধিসন্ধি জানেন। আমার ছাগলের বাচ্চাটি দেখে ঐ রামযাত্রা আর জবরদস্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি করলেন। এটা তিনি জানেন যে জন্তুটি দেখতে ছোট হলেও তার ডাক অন্তত মাইল দুই দূর থেকে শোনা যাবে। তারপর পাহাড় তো রয়েইছে—সাউণ্ড-স্পীকারের কাজ করবে। চিতাবাঘ অধ্যুষিত এলাকা, একটা না একটা পড়বেই। আবার বলেন—ওটা নিয়ে এসেছেন কেন! ভাবলাম আর এক পালা শুনব কাল বাগ-ফাগ না এলে। যা'হোক, সাধুবাবাকে সে-সব কিছু বুঝতে দিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বসি বলুন তো সাধুবাবা?

আমি ও শয়তান

[মাপ (দৈর্ঘ্য)—নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত—৮ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি]

ফটো—লেখক
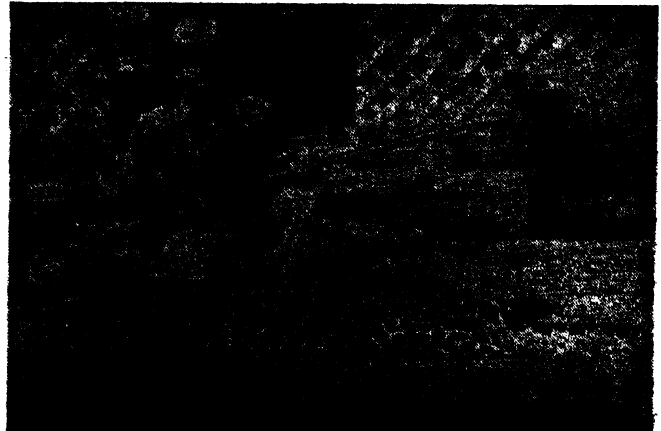
সাধুবাবা বললেন, যেখানে খুশি-বসুন, শয়তানটা আপনার কাছে আসবে।

জায়গা একটা অবশ্য আমি মনে মনে ঠিক করেই এসেছিলাম। বরুণা পাহাড় ঢেউ খেলে জলাভূমিটা ঘিরে যে তিনটে পাহাড় সৃষ্টি করেছে তার নাম তিনভাই। সে তিনভাই আর বরুণা পাহাড়ের মাঝে মালভূমিটায় একটা বন্যজন্তু চলাচলের পথ আছে। সে পথে প্রায়ই চিতাবাঘটার পাঞ্জা দেখতাম। আমি সেখানেই বসব বলে আর দেরী না করে জলাভূমিটার উত্তর পাড় ধরে এগিয়ে চললাম।

বেলা পড়ে গিয়েছিল, আমরা জলার অপর পাড়ে মালভূমিটার নীচে এসেই রাতের খাওয়া খেতে বসলাম।

একদল গেঁয়ো লোক তীর ধনুক, টাঙ্গি হাতে হল্লা করতে করতে তিনভাই পাহাড় থেকে নেমে এল। একজনের হাতে একটা একনলা বন্দুক। আমাদের দেখেই তারা কাছে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করে জানলাম এরা সব বাঘুয়া গাঁয়ের লোক। হাঁকা-শিকারে গিয়েছিল, কিছু পায় নি। বাঘ দেখে নাকি পালিয়ে এসেছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলাম, কে দেখেছে বাঘ?

কুড়ি-বাইশ বছরের এক যুবক এগিয়ে এসে বলল, মুই দেখুচি।

যুবকের নাম পরিয়া। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে দেখলি?

হাঁকা করিবাকু সময়ে টিক্কে মথা বাহিরি করিথিল—এত্ত বড় মথা! সাঙ্গে সাঙ্গে সমস্ত লোককু ডাকিলি।

কি বাঘ দেখলি? লোকে দেখে নি?

পরিয়া বলল, বাঘ'অ-পাট্টাগড়িয়া হব। মত্তে সে দেখুনি।

বুঝলাম ভয়ে বিচারশক্তি লোপ পেয়েছিল। আবার ভাবলাম মিথ্যে কথা বলছে। তাই বললাম, ঠিকই ওসব কিছু দেখেছিস না গল্প করছিস?

পরিয়া বলল, ভগবানের'অ রান'অ(১)—আঁখি খারাপ হই যিব!

দেখলাম আমি বাঘ মারব বা মারতে পারি এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে এরা। কয়েকজন হাবে ভাবে বুঝিয়েও দিল সে কথা।

মধ্যবয়েসী সাঁতাল একজন দু'গালে দু'টো পান চিবুতে চিবুতে বলল, কেত্তে শিকারী আসিলা খালি গ্যাগুলিয়া(২) মারিকি চলি যায়।

আর একজন বলল, নিতাই জানা বসিথিলা না—কালি গলা শুক্রবার'অ তার'অ আগর'অ শুক্রবার'অ। সাঙ্গে থিলা দর্পণার'অ পরাণ'অ। বাঘ'অ যিমিতি গরু খাইবাকু আসিলা তিমিতি আঁখি বুজিলা—আর খুলে নাহি। যেত্তেবেরে পরাণ'অ কহিলা—নিতাই, বাঘ'অ চলিগলা, আঁখি খুল'অ—সেত্তেবেরে আঁখি খুলিলা।

অতিকষ্টে হাসি চেপে আমি বললাম, বন্দুক তো রয়েছে। তোমরাও তো মারতে পার।

পরিয়া বন্দুকধারীকে দেখিয়ে বলল, হুঁঃ, গুট্টে শশা মারিবাকু পারিল না বাবু, এমারিব—বাঘ'অ! কেত্তে বার'অ কইছন্তি—মানু, বন্দুক'অটা মতে দাও—দিলানি!

বন্দুকধারী রেগে বলল, ধক্কা মারিদিবত কন হব?

ধক্কা মারিব! বলেই বন্দুকধারীর হাত থেকে বন্দুকটি ছিনিয়ে নিল পরিয়া। তারপর পা ফাঁক করে বন্দুক তুলে নিশানার ভঙ্গি করে বলল, এমত্তে বন্দুক'অ ধরিঠিয়া হবত ধক্কা মারিব!

ছোকরা এইসান পা ফাঁক করেছিল যে বন্দুকধারী না ধরলে পড়েই যেত। বন্দুকধারী বলল, দেখখিবু গোড়'অ চিরি যিবু!

আমি বললাম, যাও যাও, এবার ঘরে যাও।

পরিয়া বলল, বাবু, বাঘ'অ মারিবাকু সে আয়ে ভল'অ হব। গুটে ছকি অছি, সেঠু রোজ'অ বাঘ'অ পাউসা(৩) পড়ুচি।

আর সকলেও পরিয়ার কথায় সায় দিল। তারাও বলল যে তিনভাই পাহাড়ের ওপারে তাদের গাঁয়ে যেতে বনের মধ্যে একটা চৌরাস্তায় তারা রোজই বাঘের পাঞ্জা দেখে। ভেবে দেখলাম যে মালভূমির উপরে যে পথটার পাশে আমি বসব বলে ঠিক করেছি সে পথটাও তিনভাই পাহাড় পেরিয়ে সেদিকেই নেমে গেছে। সুতরাং দেখাই যাক না চৌরাস্তাটা একবার, পছন্দ না হলে আবার ফিরে আসা যাবে না হয় একটু দেরী হবে।

তিনভাই পাহাড়ের কোলে কোলে ঘুরে আমরা তেলিগড়া-বাবুয়ার বনপথে নামলাম। খানিকটা গিয়েই সে চৌরাস্তাটা দেখলাম। দেখলাম আর একটা বনপথ পাহাড়ের উপর থেকে নেমে তেলিগড়া বাবুয়ার পথটা কেটে দক্ষিণে সমতলের বনভূমিতে হারিয়ে গেছে। পরিয়া বর্ণিত ছকিটা আমার পছন্দ হল।

আমি একটা বাঁশঝোপ বেছে বসবার জন্যে ঠিকঠাক করে নিলাম। তারপর ফুট কুড়ি দূরে একটা খুঁটি পুঁতে ছাগলের বাচ্চাটাকে শক্ত করে বাঁধলাম। সন্ধ্যা তখন হয় হয়, আমি মনিয়াকে নিয়ে ঝোপে বসে লোকগুলোকে চলে যেতে বললাম।

লোকজন চলে যেতেই ছাগলের বাচ্চাটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বারবার এদিক-ওদিক ঘুরে ছোট ছোট ধ্বনিতে ডাকতে লাগল। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের রাত বাড়ে আর একটু একটু করে সে অদৃশ্য হতে থাকে। অবশেষে আর তাকে দেখা যায় না। শুধু তার অশান্ত ভয়ব্যাকুল ডাক রাতের অন্ধকার ভেদ করে পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি করে বেড়ায়। আমরা ফোঁকরে চোখ রেখে সেই শ্বাপদটার অপেক্ষায় অন্ধকারে চেয়ে উদগ্রীব হয়ে বসে রইলাম।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ বহুদূর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যেন কেউ কাউকে ডাকছে। ডাকটা অস্পষ্ট, বুঝলাম না। আমরা তেমনি চুপচাপ বসে রইলাম। তারপরই ডাকটা আরও কাছে থেকে ভেসে এল। এবারে স্পষ্ট শুনলাম ডাকছে—ও-ও-বা-মুয়া! আমি ভাবলাম লোকটা বামুয়া নামধারী আর একটা লোকের খোঁজ করছে।

মনিয়া বলল, আপনাকে ডাকছে।

বললাম, তাহলে বামুয়া কে?

মনিয়া বলল, বামুয়া মানে শিকারী।

আমাকে আবার ডাকে কে! ভাবলাম হয়ত পুলিস কিম্বা বনবিভাগের লোক খোঁজ করছে। কয়েকবার হয়েছেও এমন। গাঁয়ে, গঞ্জের কাছাকাছি অপরিচিত বন্দুকধারীর সংবাদ পেয়ে তারা খোঁজখবর করে গেছে। আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে টর্চের আলোয় বারকয়েক সংকেত করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

১। শপথ।

২। শামুকখোল—বকজাতীয় পাখী।

৩। পাঞ্জা।

লাঠি সোঁটা বাতি হাতে একদল লোক এসে দাঁড়াল। সঙ্গে বাঘুয়া গাঁয়ের সে লোকগুলোরও কেউ কেউ আছে। সকলে সমস্বরে বলল, বাবু, বাঘ'অ গরু মারি দেইছন্তি!

বললাম, কোথায়, কখন?

এক বুড়ো বলল, অধাঘণ্টা হব নি বাবু-পাখেরে (৪)।

বলে কি! স্তম্ভিত আমি। শুধু শুনছি—ভিতরে আমার একটা বিপ্লব হচ্ছে।

চাল'অ বাবু দেখিবা কেত্তে বড় দুধিয়ালী গরুটা আমর ছুয়া (৫) অছি!—বলে কেঁদে ফেলল বুড়ো।

হায় রে দুনিয়া! বুড়ো কার কাছে কাঁদছে। কথায় বলে কারো চৈত্র মাস, কারো পৌষ মাস। গরীব বুড়ো তার গরুর শোকে কাঁদে, আর আমার ভিতরে আদি মানবটা আনন্দে তাথৈ তাথৈ নাচে। বাঘের সদ্য মারিটার কথা ভেবে আমি আশান্বিত হয়ে উঠলাম। বুড়োকে শুধু বললাম, আর কেঁদে কি হবে, চল দেখি গে।

পথে যেতে যেতে শুনলাম যে সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের রাখাল গরুর পাল নিয়ে ফিরলে পর দেখা গেল যে বুড়োর কালো গরুটা আসে নি। বুড়ো সে সংবাদ শুনেই লোকজন ডেকে রাখালটিকে নিয়ে গরুর খোঁজে বেরোয়। খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, কেন না গরুটা জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের রাস্তায়ই পড়েছিল। তারপর তারা সেখান থেকেই আমাকে ডাকতে ডাকতে এসেছে।

মারিটার কাছে এসেই লোকগুলো একসঙ্গে হল্লা করে উঠল। কি ব্যাপার, না এইমাত্র তারা দেখে গেছে মারিটা ঝোপের বাইরে, এখন দেখছে পিছনটা ঝোপের মধ্যে সরে গেছে। বিস্ময়ের পালা শেষ হল যখন দেখল মারিটার পিছন থেকে সের দুই মাংস উবে গেছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে।

আমি বুঝলাম, শয়তানটা কাছে পিঠে আছে, সুযোগ পেলেই আসবে। মারিটার মাথা বরাবর ফুট চল্লিশেক দূরে একটা বাঁশঝোপ দেখে নিয়ে দু'য়ের মাঝে খেজুরের চারাগুলো দু'পাশে দুইয়ে পা দিয়ে দাবিয়ে দিলাম, যেন আলো ফেললে মারিটা পরিষ্কার দেখতে পারি। মনিয়াটা খুক্-খুক্ করে কাশছিল, ভেবে দেখলাম তাকে নিয়ে বসা ঠিক হবে না। তাকে বললাম ছাগলের বাচ্চাটা নিয়ে লোকগুলোর সঙ্গে বাঘুয়া গাঁয়ে চলে যেতে।

দুঃসাহসী পরিয়া এগিয়ে এসে বলল, বাবু, মুই আপনার 'অ সঙ্গে বসিবি।

বললাম, কাশবি-টাশবি না-তো?

বলল, না।

বললাম, বাঘের উপর বাতি ফেলতে পারবি?

বলল, হ, পারিবি।

পরিয়ার হাতে তিন সেলের টর্চটা দিয়ে আমি শুধু বন্দুকের মাছিটা দেখবার জন্যে একটা এক সেলের ছোট টর্চ ক্ল্যাম্প করে ওকে নিয়ে ঝোপে বসলাম। তারপর সবাইকে চলে যেতে বললাম। বিশেষ করে বলে দিলাম তারা যেন এখান থেকেই পরস্পরে কথাবার্তা বলতে বলতে বাঘুয়া গাঁয়ের সীমা পর্যন্ত যায়। উদ্দেশ্য, চিতাবাঘটা আশে-পাশে থাকলে বুঝতে পারবে যে, যে-লোকগুলো এতক্ষণ তার মারির কাছে ছিল তারা চলে গেল। বাঘুয়া গাঁ সেখান থেকে আধ মাইল দূরে।

জনরব ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয় আর ঝিঁঝিঁর একটানা সুরটা স্পষ্টতর হতে থাকে।

অন্ধকার বনভূমি শুধু ঝিম-ঝিম করতে থাকে। আকাশে অজস্র তারা, সে আলোয় সাদাটে রাস্তার উপর মারিটার মাথার আভাস পাওয়া যায়। চিতাবাঘটার অপেক্ষায় আমরা চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরেই মারিটার কাছে খুট খুট করে শব্দ হল। মনে হল কোন একটা জন্তু এসে মারিটায় মুখ দিয়েছে। বড় ভয়ে ভয়ে যেন খাচ্ছে। ভাবলাম শেয়াল টেয়াল হবে।

পরিয়া আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, বাঘ'অ।

বললাম, না, অন্য কিছু।

সে বলল, নিচ্চয় 'অ বাঘঅ—বাত্তি মারিবি?

বললাম, মার বাতি।

টর্চের আলো পড়তেই একজোড়া বড় বড় চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল বটে, কিন্তু বড় ভীরু দৃষ্টি। শেয়াল নয় হায়না কি নেকড়ে হবে। পরিয়াকে বললাম, বাতি নেভা, বাঘ নয়।

পরিয়া বলল, বাঘ'অ! কেত্তে বড় আঁখি দেখুচ! মার'অ!

আমি বললাম দূর, হেটা কি হুণ্ডা হবে। তুই বাতি নেভা।

পরিয়া আপসোস করে বলল, হায় হায়! বাঘ'অ! কন'অ করুচ বাবু মারর'অ। চালি যিব।

পরিয়ার ব্যস্ততায় আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি আত্মবিশ্বাস হারালাম। বন্দুকটা তুলে জানোয়ারটার চোখ দু'টোর মাঝখানে গুলি করলাম। একটা হায়না বাঁদিকে ঘুরেই ছুটে পাশের ঝোপে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। ঘুরেই পরিয়াকে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসলাম। বললাম, বদমায়েস, শিকার নষ্ট করতে বসেছ এখানে! বাঘ বলে! আবার বলে মারর'অ—হায়, হায়।

মনটা খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু একেবারে হতাশ হলাম না। কেন না আগেই বলেছি চিতাবাঘ নির্লজ্জ ও দুঃসাহসী। যতক্ষণ না মারিটার কাছে মানুষের উপস্থিতি সে জানতে পারছে, সে মারির লোভ ছাড়তে পারে না। চিতাবাঘটা কাছে-পিঠে থাকলেও আমরা টর্চের আলো ফেলা ও বন্দুকের শব্দ করা ছাড়া এমন কিছু করি নি যাতে সে আমাদের উপস্থিতি টের পায়। পরিয়াকে চড় মেরেছিলাম শব্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু বকেছি ফিসফিসিয়ে, সেটা ধর্তব্য নয়। ও রকম শব্দ বনে অহরহ হয়—গাছ থেকে শুকনো ডাল পড়েও হতে পারে। তা ছাড়া গাঁয়ের কাছে বন্যজন্তু অধ্যুষিত জঙ্গলে টর্চের আলো আর বন্দুকের আওয়াজ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এসবে চিতাবাঘটা অভ্যস্ত। সর্বোপরি চিতাবাঘটা আমাদের কাছে-পিঠে ছিল না, তাহলে হায়নাটা আসত না। অতএব বন্দুকের আওয়াজ শুনেও সে আসতে পারে, তবে খুব সতর্ক হয়ে চারদিক জরীপ করে আসবে।

৪। কাছে।

৫। বাচ্চা-বাছুর।

আমি উঠে গিয়ে হায়নাটার পা ধরে টেনে এনে আমার ঝোপের পাশে ডাল-পাতায় ঢেকে রাখলাম। তারপর পরিয়াকে বললাম, বসে বসে এখন পাহারা দে, আমি ঘুমুব। কিন্তু খবরদার ঘুমুবি নে যে কোন মুহূর্তে বাঘ আসতে পারে। সন্দেহ হলেই আমাকে ঠেলে জাগাবি। ঘুমুবার যখন একটা সুযোগ পাওয়া গেল ছাড়ি কেন। আমি হাত পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে উঠে বসলাম। পরিয়াকে দেখলাম অন্ধকারে আঙুল তুলে কান পেতে কি শুনছে। আমিও কান পাতলাম, আমিও শুনলাম। জানোয়ার মাংস খাচ্ছে। এ খুটখুটে পুটপুটে খাওয়া নয়। হাড়-মাংস একসঙ্গে ছিঁড়ছে পট্ পট্ পটাস্! তারপরই নাকে-মুখে শব্দ করে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে খাওয়া—গপ্ গপ্!

এবার পরিয়া ফিস্ ফিস্ করে বলল, বাবু?

বন্দুক তুলে বললাম, বাঘ রে বাঘ! কল্লাফুলিয়া। বাতি মার।

টর্চের আলো পড়তেই চিতাবাঘটাকে দেখলাম। তার গায়ের চক্রাকার চিহ্নগুলো স্পষ্ট দেখা গেল। সে মারিটার পিছনে লম্বালম্বি শুয়ে দু' পায়ের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে একমনে খাচ্ছে। তার ঘাড় আর মাথা যুগপৎ উঠছে আর নামছে। দেখলাম এ অবস্থায় গুলি ছোঁড়া ঠিক হবে না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে।

আমি টর্চশুদ্ধ পরিয়ার হাতটা বাঁ হাতে ধরে শ্বাপদটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে আলোটা পর্যায়ক্রমে তার ডান বাম দিকে ফেলতে লাগলাম।

কাজ হল। চিতাবাঘটাও ডান-বাম ভুলে দু'দিকে মাথা ছুঁড়ে সামনে তাকাল। সেই চোখ, একদিন রাতে খাদানের উপর দেখেছিলাম। শ্বাপদটার সমস্ত মুখ রক্তে মাখামাখি হয়ে কালো দেখাচ্ছে। আমার টর্চের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার চোখ দু'টো জ্বলছে।

আমি পরিয়ার হাত ছেড়ে বন্দুকে নিশানা ঠিক করতে গেলাম, আর ভয়েই হোক কি অসাবধানেই হোক পরিয়ার হাত কেঁপে টর্চটা আমার বন্দুকের নলের সঙ্গে ঠুকে গেল—টুং!

অমনি শ্বাপদটার চোখ আরও দীপ্ত হয়ে উঠে রক্তমাখা চোয়াল দু'টো একটা চাপা গর্জনে দু'দিকে সরে গেল—খ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ···

সর্বনাশ!

আমি আর একমুহূর্ত দেরী না করে বন্দুকের মাছিটা চিতাবাঘের দু' চোখের মাঝখানে রেখেই ট্রিগার টানলাম—গ্রাম্!

আর ইওম করে চিতাবাঘটা আলোর রেখা পেরিয়ে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল। তারপর ধপাস করে মাটিতে পড়ে একবার উঠতে চেষ্টা করেই শেষে ঘাড় গুঁজে পড়ে রইল।

আমি অনেকক্ষণ বন্দুক হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে পরখ করবার জন্যে চিতাবাঘটার গায়ে একটা ঢিল ছুঁড়লাম। কিন্তু না, শয়তানটা তেমনি পড়ে রইল।

পরিয়ার বুঝি এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এল। সে হঠাৎ বলে উঠল, বাবু, বাঘ'অ মরিগলা!—বলেই একলাফে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আনন্দাবেগে চিৎকার করতে করতে গাঁয়ের দিকে ছুটল, তম্মে সব'অ আস'অ—বাঘ'অ মরিগলা! ও কপিল'অ! ও দুঃশাসন'অ···

ঠিক তখনি পরিয়ার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে কলকাতাগামী মাদ্রাজ মেলের ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনটা সামুদ্রিক জাহাজের ডাক তুলে উদ্দামবেগে ধানমণ্ডল পেরুল। বুঝলাম, ভোর হতে আর দেরী নেই। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চিতাবাঘটার পাশে এসে বসলাম।

হঠাৎ দূর থেকে ছাগলের বাচ্চাটার ডাক কানে এল—ম্যা-অ্যা-অ্যা!

অমনি অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো সাধুবাবার কথা মনে পড়ল—মিছেমিছি ও বেচারাকে কষ্ট দেন কেন, ওসব কিছু দরকার হবে না! তারপর একের পর এক তাঁর কথাগুলো আমার মনের অন্ধকারে চমকে চমকে উঠতে লাগল—সালেকো মণ্ডত্ আগিয়া। আজ আপনি সিদ্ধিলাভ করবেন। আপনার চোখ দেখে আমি বলে দিচ্ছি—আপনার হাতে শয়তানটা আজ মরবে। সিরুক এক গোলি—বনদেবী সহায় হোগী।

কি আশ্চর্য! সাধুবাবার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এ কি হয়! কি করে হয়! ভাবতে ভাবতে নিজের অস্তিত্ব ভুলে আমি ভাবনার অতলে তলিয়ে গেলাম।

ছাগলের বাচ্চাটার ডাকেই আমার চমক ভাঙল। দেখলাম গাঁয়ের লোক সব ভেঙ্গে পড়েছে, মনিয়ার কোলে ছাগলের বাচ্চাটা। আমি আর অপেক্ষা না করে তখুনি কয়েকটি লোক সংগ্রহ করে স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। লোকগুলো চিতাবাঘটিকে বাঁকে ঝুলিয়ে আমার পিছন পিছন চলল।

আশ্রমের কাছাকাছি আসতেই আমার বুকে শঙ্কার পদধ্বনি হল—সাধুবাবা না আবার চামড়াটি চেয়ে বসেন।

কিন্তু না। ভোরের আলো তখনও ফোটে নি—দূর থেকে শুনলাম সাধুবাবা দুর্গামন্দিরে চণ্ডীপাঠ করছেন। আমরা দুর্গামন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, সাধুবাবা একবার পিছন ফিরে পর্যন্ত দেখলেন না, তন্ময় হয়ে চণ্ডীপাঠ করতে লাগলেন।

ভরদ্বাজ এসে বলল, সাধুবাবা এখন উঠবেন না, আজ পুজোপাঠ শেষ হতে দেরী হবে।

আমারও গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছিল, আমিও আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। আমি আবার স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম। যেতে যেতে শুনলাম সাধুবাবা উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করছেন—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহিনোদেবি দুর্গেদেবি! নমোঽস্তুতে।
এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি! নমোঽস্তুতে।

কিংশুক রাগিণী

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৫

চাঁদের হাটের ঘটনায় যে সংস্করণ এখানে ছড়িয়ে পড়ল 'তো পিলে ফাটানো' সিরিজের 'লালকরোটি'র কাণ্ডকারখানার মতই লোমহর্ষক। জানা গেল যে, পাছে বরযাত্রীর দল মেয়ে দেখে বেঁকে বসে এই জন্যে তারা পৌঁছানমাত্রই কনেপক্ষের লোকেরা ঘুমের ওষুধ মেশানো সরবৎ খাইয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে ফেলে। কেবল বর, বরের বাবা ও মামা এবং কিংশুককে তারা ঘুম পাড়ায় নি। কিংশুক বড়লোকের ছেলে পাছে শেষকালে ঘুম পাড়িয়ে কোনও হাঙ্গামায় পড়তে হয় এই জন্যেই কিংশুক রেহাই পেয়েছিল। আর রেহাই পেয়েছিল মামা ও মহাবীর বুদ্ধির জোরে। সরবৎ একঢোক খেয়েই মামার কেমন সন্দেহ হয় সে টিপে দেয় মহাবীরকে। তারপর তু'জনে সবার অলক্ষ্যে পেছনের বারন্দায় গিয়ে সরবৎ ফেলে দেয়। কেউ বুঝতে পারে নি। তারপর সবাই যখন ঘুমে ঢলে পড়ে ওরাও একটা কোণে অন্ধকার দেখে চোখ-কান খুলে রেখে শুয়ে পড়ে। বর এই সব দেখে বাধা দিতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছে।

খবরটা রাহা বাড়িতেও পৌঁছেছিল কিন্তু খেপী আর ঠানদিদির দল ওরই মধ্যে আবার এমন রং লাগাল যে তা আর বলবার নয়। লালকরোটির দলও সে সব কাণ্ড করতে ইতস্তত করবে।

ঘটনা অষ্টপ্রহর কানে এলেও এইমাত্র রাগিণী তন্নুকার কাছে আসল ঘটনা শুনল।

তুলালের অবস্থা শুনে রাগিণীর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। যদি কিংশুকের ঐ অবস্থা হত ? মাগো! পরক্ষণেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল বীথিদের ড্রয়িংরুমে বসে কিংশুক হাসছে। তন্নুকা বলছে, ছি: ছি:। লজ্জা-সরম তো বিসর্জন দিয়েছে বন্ধুর মুখে অবধি চুণ-কালি দিলে। বীথি চিঠিতে লিখেছে···তুইই বল এর পর কোন মেয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারে ?···নিঃশেষে ওর কাছে উৎসর্গ করেছি।···

ছি: ছি:! রাগিণী মনে মনে ধিক্কার দিয়ে উঠল। ওর জন্যে আবার বুক কাঁপে। ও আমার কে ? কেউ না, কেউ না, কেউ না। ছি:। ছি:। তুলালের বদলে ওরই ঐ রকম অবস্থা হলে ঠিক হত।

তন্নুকা চোখ বড় বড় করে বললে—বীরু ঐ জন্যেই কোথায়ও যেতে চায় না, নেহাৎ সবাই গেল তাই। কি কাণ্ড বল দেখি!

—তবু ভাল যে মহাবীরবাবু ওসব খায় নি।

—সে কথা বলতে। ভাবতেও আমার বুক কাঁপে! কি ভাগ্যি যে শুকদেবদাও খায় নি।

রাগিণী তীব্রস্বরে বললে—খেলেই বা। তাতে তোরই বা কি আমারই বা কি ?

তন্নুকা অপ্রস্তুত হয়ে বললে—না, তাই বলছি। চলি।

—বস যাবি'খন।

—না রে, কাজ আছে। বীরু ছুটির পরই আসবে। মা ওকে খেতে বলেছে।

—তবে আর তোকে আটকে রেখে শাপমন্যি কুড়োব না। হ্যাঁ রে মাসিমা জানেন ?

—কিছু কিছু জানতে পেরেছেন। আমি কিছু বলি নি। নেমন্তন্নটা অবশ্য অন্য কারণে।

—তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি ?

—না।

—যদি বাধা দেন, তাহলে ?

—দিলেই বা। আর পাঁচজনের মত বিয়ে ত' আমাদের হবে না। সেদিন তবে শুনলি কি ?

রাগিণী একটু চুপ করে থেকে বললে—তনু ছেলেখেলা করিস নি। বাঁধন না থাকলে ধরে রাখবি কি দিয়ে ?

—ভালবাসা দিয়ে। ভালবেসে একটা জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভালবাসার মধ্যে বাঁধন আনলে সেটা চোখে লাগে। বাঁধনই তখন বড় হয়ে বার বার আঙুল উঁচিয়ে এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেবে যে, সে আছে বলেই আমরা আছি।

—বইয়ের জীবনের সঙ্গে পৃথিবীর জীবনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। তুই না শেষে ফাঁকিতে পড়িস।

—সে ভয় আমার নেই। অনেক ফাঁকি হজম করে ওটাকে জয় করে ফেলেছি।

—বুঝলুম। এ কিন্তু তোর কথা নয়।

তন্নুকা হেসে বললে—ঠিক বলেছিস এ আমার কথা নয়, আমাদের কথা। একদিন মেঘ কেটে গিয়ে যখন রোদ উঠবে তখন তোর কথা শুনেও মনে হ'বে যে সেটা শুধু তোর কথা নয় তোদের কথা। চলি।

তন্নুকা দাঁড়াল না পাল-তোলা নৌকোর মত ভর ভর করে চলে

গেল, কিন্তু যাবার সময় জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে গেল। ও ভাবে কি! নিজের মতই সবাইকে হাল্কা ভাবে।

সন্ধ্যা হয়ে এল, ঘরের মধ্যে অন্ধকার নেমেছে। রাগিণী চুপ করে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে শুয়ে আছে। কেমন একটা অবসাদ নেমেছে দেহে-মনে। নিজের ওপর ভারী রাগ হল। কেন মরতে এখানকার কলেজে ভর্তি হলুম। কলকাতা অনেক ভাল ছিল। সেখানে আঘাত পেলেও আঘাত ভুলিয়ে দেবার হাজার উপকরণ আছে। এক জায়গা থেকে একটু সরে গেলেই আবার নতুন করে জীবন শুরু করা যায়। সবাই তাই করে। কিন্তু এখানে?

—দিদিমণি। ওমা! অন্ধকারে শুয়ে আছ যে, জ্বর হল নাকি। খেপী ঘরে ঢুকে বললে।

—না, তুই বক্ বক্ করিস নি, নীচে যা।

—বক্ বক্ করি নি গো, শুকদেব দাদাবাবু এসেচে।

—তা আমি কি করবো? কেন এসেছে?

—ও মা! মা ঠাকরুণ যে পশুর মাকে কাল বললে দাদাবাবুকে আসবার জন্যে।

—বল গে যা মা বাড়িতে নেই।

—বলেছি গো। তা শুনে বললে, তাই নাকি! তাহলে, তোমাদের দিদিমণিকেই ডাকো।

—বল গে যা দিদিমণিও বাড়ি নেই।··দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কথা কানে গেল না?

—বলতু ওপরে রয়েছে এখন মিছেকথা বলি কি করে?

রাগিণী রেগে বললে—তবে বল গে যা যে দিদিমণি আসতে পারবে না।

··না থাক··তোকে কিছু বলতে হবে না, যা বলবার আমিই বলব। তুই ডাক।

—সেই ভাল।—খেপী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

কিংশুক ঘরে ঢুকে দেখে রাগিণী বই পড়ছে। বললে—এত কম লাইট-এ পড়ছ কি করে? চোখ খারাপ হবে যে।

খেপী চলে যাবার পর সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে সামনে খুলে মনে মনে আসন্ন যুদ্ধের জন্য রাগিণী প্রস্তুত হচ্ছিল। তাড়াতাড়িতে যে আলোটা জ্বালিয়েছে সেটা যে কম 'পাওয়ার-এর' এবং তাতে যে পড়া চলে না এ খেয়াল তার হয় নি। কিংশুকের কথায় সেটা বুঝতে পেরে কেবল অপ্রস্তুতই হল না সঙ্গে সঙ্গে রাগের মাত্রাও বেড়ে গেল। ঘরে ঢুকেই লোকটা আমায় হারিয়ে দিলে।

কিংশুকের কথার জবাব না দিয়ে হাতের বইটা রেখে সুইচ্‌বোর্ডের দিকে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে গিয়ে ছোট আলোটা নিবিয়ে বড় একটা আলো জ্বালিয়ে আবার চেয়ারে এসে রাগিণী বসল। রকম-সকম দেখে কিংশুক বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে।

কিংশুক বললে—একলা একলা বসে যে। তনুকা আজকাল আসে না বুঝি?

রাগিণী নিরুত্তর।

—খুড়ীমা গেলেন কোথায়? কালীবাড়িতে?

রাগিণী প্রস্তরবৎ।

—নতুন-বৌ দেখেছ।

—না।

কিংশুক ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠল। কি ঘটল রে বাবা? রকম-সকম দেখছি ছেলেবেলাকার সেই অভিমানী মেয়েটার মত।

পকেট থেকে বীথির চিঠিটা বার করে কিংশুক বললে—ভাল কথা, বীথির কাণ্ড দেখেছ। কি সাংঘাতিক মেয়ে! এই দেখ, কি যা-তা এক চিঠি লিখেছে।

—যা' তা'!—রাগিণী গর্জে উঠল।

কিংশুক মনে বল পেল। যা' তা' শুনেই যখন এই মেজাজ তখন চিঠিটা পড়লে বীথির মৃত্যু অবধারিত। উৎসাহিত হয়ে খাম থেকে চিঠি বার করতে করতে বললে,—হ্যাঁ, এই দেখ না।

—দেখতে হবে না।—গম্ভীর স্বরে রাগিণী বললে—আমার দেখা আছে।

চিঠি খোলা আর হল না। ভ্যাবাচাকা খেয়ে কিংশুক বললে—অ্যাঁ!

—যা লিখেছে তা কি মিথ্যে?

—কি লিখেছে তুমি জান?

রাগিণী উঠে গিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা চিঠি এনে কিংশুকের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, পড়ুন।

পড়ুন! কথাটা কিংশুকের কানে বাজল। মনে হল কথাটায় যেন পৃথিবীর সবটুকু ঘৃণা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ কি হল? কি অপরাধ করেছি?

চিঠিটা তুলে নিয়েই কিংশুক চমকে উঠল। বীথি লিখেছে রাগিণীর কাছে।

—পড়ুন!—রাগিণী আবার বললে।

কিংশুক জবাব না দিয়ে মুখ তুলে একবার রাগিণীকে দেখে নিয়ে পড়তে সুরু করলে। বীথি লিখছে—গিনী, আমি জানি তুই আমাকে দেখতে পারিস না। আমি কিন্তু সব সময় প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে তোর মঙ্গল কামনা করি। যা হোক নিতান্ত বিপদে পড়ে এই চিঠি তোকে লিখছি, আশা করি সবটা পড়বি, চিঠিটা না পড়ে ছিঁড়ে ফেলবি না।

রূপে-গুণে সবদিক দিয়েই কিংশুক যে কোনও মেয়ের স্বপ্নের জিনিস, কামনার বস্তু। আমার মনের মধ্যে যাই থাক আজ অবধি বাইরে আমি কোনও দিন কোনও রকম ভাবেই ওর ওপর আমার আসক্তি প্রকাশ করি নি। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করতে থাকি যে, পথে-ঘাটে এখানে-সেখানে ওর সঙ্গে দেখা হলে ও স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে নীরবে আমার পানে চেয়ে থাকে। সেই হাসি, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রশংসা ও প্রার্থনা দুই-ই জড়ান থাকত, তা যে কোনও মেয়ের চোখেই ধরা পড়বে। আমার চোখেও ধরা পড়েছিল কিন্তু মনে মনে ধরা পড়লেও বাইরে আমি ধরা দিই নি।

তারপর একদিন ওদের বাড়ির ঝি এল। বুঝতে পারলুম না কেন সে এল, বড় একটা ত' আসে না। এসে নানা কথা জিজ্ঞেস করলে। তারপর ও নিজে এল। আমায় জয় করে নিলে। এমন ভাবে যে আমাকে ও স্বীকার করবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

হরলিক্স-এর একটি বিশিষ্ট নজির ঃ

রাজু আমাদের একমাত্র ছেলে। আর পাঁচটা ছেলের মতই দুরন্ত, তবে সমস্যায় ফেলেনি কখনো। কিন্তু ইদানীং আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল...কেবল মুখভার ক'রে বসে থাকে, খিদে নেই আর বাড়ি থেকে বেরুতেই চায় না। একদিন তো বাইরের কয়েকজন অতিথির সামনে এমন ব্যবহার করল যে ওর বাবা তো প্রায় মারতেই উঠেছিলেন। দিদি ছিলেন কাছে। তাড়াতাড়ি রাজুর বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আঃ ব্যস্ত হচ্ছো কেন—একবার ওকে দেখতে দাও"। দিদি হলেন গিয়ে লেডী ডাক্তার।

দেখেটেখে দিদি বললেন, "উঁহু, গোলমালতো কিছু নেই। তবে বাড়ন্ত বয়সে ছেলেদের প্রচুর শক্তি খরচ হয়, তা পুরণ না হলে ওরা অমনোযোগী আর খিটখিটে হয়ে পড়ে। রাজুকে রোজ হরলিক্স খেতে দাও। তাতে ওর খুব উপকার হবে।"

দিদির কথাই ঠিক। রাজুকে আমরা রোজ হরলিক্স খাওয়াতে লাগলাম। হপ্তা কয়েক হরলিক্স খাওয়ার পরই রাজু আবার আগের রাজু হয়ে উঠল। আর গোঁজ হয়ে বসে থাকে না, মেজাজ দেখায় না—সারাদিন হেসেখেলে বেড়ায়। ভাগ্যিস দিদি ছিলেন আর ছিল হরলিক্স!

হরলিক্স *অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!*

JWT/BL 4821A

নিজের মুখে হঠাৎ বললে বিয়ের কথা! ভাবতে পারিস্, কিংশুক বিয়ের কথা বলছে! শুধু আমাকেই বলা নয়। তোকেও যে এই কথা বলেছে সেটা আমাকে জানিয়ে এইটেই প্রমাণ করে দিলে যে কতখানি ও আমায় ভালবাসে। তুই-ই বল রাগিণী, এরপর কোনও মেয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারে? তুই পারতিস্? আমি পারি নি, আমার অস্তিত্ব আমি ওর কাছে নিঃশেষে উৎসর্গ করলুম। এর কয়েক দিন পরেই ওর স্বরূপ দেখতে পেলুম। আসে না, দেখা করতে বললে করে না। পথে-ঘাটে দেখা হলেও ফিরে তাকায় না। কিছু বললে সবকিছু অস্বীকার করে, ভয় দেখায়, ওঃ! এ যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা তা তোকে কি বলব। আজ যদি কাজলবাবু তোকে এমনিভাবে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তুই কি করবি! বেশ জানি আমার মত চুপচাপ বসে থাকবি না। সেদিন আবার করলে কি জানিস, ওর বন্ধু মহাবীরকে দিয়ে অপমান করালে। মহাবীর যা নয় তাই মুখে এনে আমায় গাল দিয়ে বললে যে, কিংশুক ইজ নট সো চীপ, সে আর আমাদের বাড়ি আসবে না। অথচ কিংশুক তারপর এল। মহাবীর আমায় অপমান করে গেছে শুনে কি গালাগালটাই না মহাবীরকে দিলে। আমার কাছে ক্ষমা চাইলে। আর কি বলব তোকে, আমি, আমিও সব ভুলে গিয়ে আবার গলে গেলুম। ওকে দেখলে ওর কথা শুনলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না, নিজেকে নিঃশেষে ওর পায়ে নিবেদন করি।"

ও যে কি তা'র আরও একটা ছোট্ট উদাহরণ দি'। তোদের বাড়িতে বসে তোর সামনেই বলেছিল যে, আনন্দবাবুর বিয়ের হৈ চৈ থেমে গেলে পর ও আমাদের বাড়িতে যাবে। এখনও বিয়ের এক সপ্তাহ বাকী অথচ তার আগেই অসংখ্যবার ওর প্রয়োজনের সময় ও বাড়িতে এসেছে। একবার ত' তুই আর তনুকা স্বচক্ষেই দেখেছিস। কেন সেদিন ওকথা বলেছিল জানিস শুধু তোদের চোখে ধূলো দিয়ে ভাল মানুষ সাজবার জন্যে। পরশু দিন তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে। সামান্য একটা কথা নিয়ে চটে উঠে যা মুখে এল তাই বলে চলে গেল। যা বললে সে কথা লিখেও জানান যায় না। এ ধরনের কথা যে কেউ মুখে আনতে পারে তা' আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। ভাগ্যে ড্যাডী বাড়ি ছিল না আর চাকরটাও বাজারে গিয়েছিল।

তুই বল গিনী, আমি এখন কি করি? আমার সর্বনাশের কথা বাড়ির কারুকে এখনও বলি নি কিন্তু বলতে হবে, না বলে আমার উপায় নেই। তোকে জানালুম এইজন্যে যে আমার ওপর যতই রাগ বা বিতৃষ্ণা পোষণ করিস যা—শুনেছিস বা সত্য বলে জানিস দরকার হলে আশা করি ধর্মের মুখের দিকে চেয়ে তা বলতে দ্বিধা করবি না।

ইতি—নিপীড়িতা বীথি

চিঠি পড়া শেষ করে কিংশুক বললে—এ চিঠিটা আমার কাছে থাক। চিলের মত ছোঁ মেরে চিঠিটা কিংশুকের হাত থেকে নিয়ে রাগিণী বললে—না, এ চিঠি আমি দেব না।

রকম দেখে হেসে কিংশুক বললে—ওঃ! এটা বুঝি আমার মৃত্যুবাণ।

—হাসতে লজ্জা করছে না—

কিংশুক চোখ বড় বড় করে বললে—হাসির ব্যাপারে হাসতে না পারাটাই ত' লজ্জার কথা।

—একটি মেয়ের চরম সর্বনাশ করাটা হাসির ব্যাপার? চমৎকার।

—সর্বনাশ, তা সে যে রকমই হোক আর যারই হোক কোনও সময়েই হাসির ব্যাপার নয়, কিন্তু মিথ্যে, তা প্রচার করতে গিয়ে কেউ যদি হাস্যকরভাবে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলে তাহলে হাসিই পায়। অবশ্য বলতে পার শুধু হাসিই নয় করুণাও হয়।

—মিথ্যে প্রচার করা? কোনও মেয়ে মিথ্যে নিজের চরম সর্বনাশের কথা প্রচার করে?

—সব মেয়ে না পারলেও কোনও কোন মেয়ে যে পারে এই চিঠিটাই তার প্রমাণ।

—আপনি বলতে চান যে এই চিঠিতে যা আছে তা মিথ্যে।

কিংশুক একদৃষ্টিতে রাগিণীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—যদি বলি হ্যাঁ, তা হলে কি তুমি বিশ্বাস করবে! করবে না।

—আপনি আমায় বলেন নি যে আপনি বীথিকে বিয়ে করবেন।

—হ্যাঁ বলেছি। কিন্তু কেন বলেছি তা যদি।—

বাধা দিয়ে রাগিণী বললে—সে কথা ওঠে না। আর উঠলেই প্রমাণ হয় না যে বলেন নি।

—ওঃ।

—আপনি নিজে বীথিকে বলেন নি যে তাকে বিয়ে করবেন?

—না।

—বলেন নি?

—না, ঠিক বিয়ে করব বলি নি—

—ওঃ, ঘুরিয়ে বলেছেন। যাতে ভবিষ্যতে কথার ফাঁকে বেরিয়ে আসতে পারেন।

—তুমি কি বলছ গিনী!—

—চুপ করুন। আমি যা বলছি তা যে কতখানি সত্যি তা আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন। আগাগোড়া পাকা খেলোয়াড়ের মত মেপে মেপে আপনি এগিয়েছেন। ভেবেছিলেন কাজ গুছিয়ে সরে পড়বেন, কোথায়ও কোন চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন যে পাপ কখনও গোপন থাকে না।

কিংশুক বজ্রাহতের মত বসে রইল। রাগিণী বলে চলল,—নিচের ঘরে বসে আমাদের সবার সামনে বলেছিলেন যে, আনন্দদা'র বিয়ের পর হৈ চৈ থামলে প্রফেসারের কাছে পড়তে যাবেন। বীথি ঠিকই বলেছে, বলেছিলেন শুধু আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। আমি নিজে আপনার ও বাড়িতে আনন্দদা'র বিয়ের আগেই গলা ফাটিয়ে হাসতে শুনেছি। কি, বলুন না মিথ্যে।

কিংশুক ধীরে ধীরে বললে—না মিথ্যে নয়। খেলা দেখতে যাচ্ছিলাম বীথির ডাকে তাকিয়ে দেখি স্যরও দাঁড়িয়ে আছেন তাই বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল।

—আমি যেদিন কলকাতায় যাই সেদিন কেন গিয়েছিলেন, কে ডেকেছিল? গোটা বাড়িটায় তখন বীথি আর তার রুগ্ন মা ছিল—তা তিনিও ওপরে, সেই জন্যেই গিয়েছিলেন। কেমন কি না?

—তুমি কি করে জানলে?

—তা দিয়ে কি দরকার? কেন গিয়েছিলেন? বলুন, না যাই নি।

—গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন গিয়েছিলাম তা বলব না, বলে লাভ নেই। গিনী, ও বাড়িতে আমি গেছি বীথিকে বিয়ে করবার কথাও বলেছি তা সে যে ভাবেই বলে থাক। কিন্তু, বিশ্বাস কর তা সত্যি নয়।

—ওঃ! আপনি যা করেন যা বলেন তা সত্যি নয় আর যা করেন না যা বলেন না সেইটাই সত্যি।

—হ্যাঁ, তাই। অনেক সময়ই আমরা যা' করি বা যা' বলি তা করতে চাই না, বলতে চাই না তবু তা করতে হয় বলতে হয়। এটা শুধু আমিই করি না তুমিও কর।

—আমিও করি? কক্‌খনো না।

—হ্যাঁ কর। এই যে কাজল সবার সামনে তোমায় রাণু বলে ডাকে, গায়ে হাত দেয়, অন্তরঙ্গভাবে মেশে, তুমি বাধা দাও না, লোকে ধরে নেয় তোমাদের এ সম্বন্ধটা বুঝি ঠিক। কিন্তু আমি জানি যে এটা ঠিক নয় সত্যি নয়। নিতান্ত দায়ে পড়েই তোমাকে সব সহ্য করতে হয়।

রাগিণী গর্জে উঠল—মিথ্যে কথা। কে বললে আপনাকে যে ওকে দায়ে পড়ে আমি সহ্য করি, আমাদের এ মেলামেশা অন্তরের জিনিষ নয়। আপনি নিজে নোংরা অভিনয় করেন তাই সবাইকেই নিজের মত ভাবেন। রাণু বলে ডাকবার, আমার গায়ে হাত দেবার, অন্তরঙ্গ ভাবে মেশবার অধিকার ও নিজগুণে অর্জন করেছে। আমি ওকে সে অধিকার নিজের হাতে তুলে দিয়েছি।—বলে একটু থেমে কণ্ঠে আরও শ্লেষ মিশিয়ে বললে—আপনি কি ভাবছেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি? কাজলের কাছে কিংশুক দত্ত!···আপনার সামনে বসে থাকতে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

কিংশুকের দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল, বললে—তবে আর তোমার সামনে বসে থেকে ঘৃণার মাত্রা বাড়াব না! তা' এক কাজ কর না কেন, তোমার যখন পাপীর দর্শনে ঘৃণার উদ্রেক হয় তখন বোঝা যাচ্ছে যে তুমি একজন ধর্মপ্রাণা মহিলা। পাপীর দণ্ডবিধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে দুইই সমান পাপী!···বীথিকে বল না কেন আমার নামে আদালতে নালিশ করতে। যেমন খবরের কাগজে দেখে তেমনি কেচ্ছাটা খবরের কাগজে বেরু হবে'খন।···তোমার বাবার ত' অনেক টাকা আছে কিছু টাকা সৎকাজে ব্যয় কর।···তারপর দেখা যাবে আদালত কাকে কি বলে।—বলে ঠিক রাগিণীর অনুকরণে কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বললে—এখানে আসবার সময় আপনার সর্বগুণাধার প্রাণেশ্বর কাজল কে—।

—কিংশুকবাবু, ভদ্রভাবে যদি কথা বলতে—।

কিংশুক টিপয়-এর ওপর চাপড় মেরে বললে—সাইলেন্স, আমার কথা আগে শেষ হোক্ তারপর কথা বলবে।

রাগিণী চুপ করে গেল। কিংশুককে দেখে ওর ভয় করতে লাগল

—তোমার প্রাণেশ্বরকে দেখলাম একটি মেয়ের সঙ্গে হাসতে হাসতে চৌরাস্তার কাফে ভ মাউণ্ট ভেনী'তে ঢুকছে। মেয়েটি বিপন্না বীথি যার চরম সর্বনাশ এই পাপাত্মার হাতে ঘটেছে! এখনও গেলে বোধ হয় তাদের সেখানে দেখা যাবে। ধর্মপ্রাণা মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করি চরম সর্বনাশ যার ঘটতে চলেছে সেই নিপীড়িতার পক্ষে অমন ভাবে হাসতে হাসতে আর একটি তরুণের হাত ধরে প্রকাশ্য দিবালোকে রেস্তোরাঁয় ঢোকা কি সম্ভব? বলুন···। ঠাকরুণ চুপ করে রইলেন যে। তাহলে উত্তরটা আমিই দি, না, ঢোকা দূরের কথা সাধারণ মেয়ে হলে চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখত না। তবে সর্বনাশ ঘটিয়ে যারা নিজের কাজ গুছোয় সেই সব মেয়েরা পারে, আর পারে ঐ বীথির মত মেয়েরা। ব্ল্যাকমেল করা যাদের পেশা। শোন, এই চিঠিটা।—বলে ওর কাছে লেখা বীথির চিঠিটা পড়ে বলল—এই আমার কাছে লেখা চিঠিতে তো সর্বনাশের নাম গন্ধও নেই, বরং আছে কুমারী হৃদয়ের অধীশ্বর হয়ে বসলে।···কি শুনছেন তো। কানে কিছু যাচ্ছে কি?

রাগিণী চুপ করে রইল।

—সর্বনাশটা যখন আমার দ্বারা হ'ল সে তখন সেটা আমাকে না জানিয়ে তোমাকে জানাতে গেল কোন ভরসায়। তুমি কি আমার গার্জেন, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা?···আমায় দেখলে তোমার ঘেন্না করে, এত বড় একটা কথা বলতে তোমার মুখে একবারও আটকালো' না। একবারও কি আমায় ডেকে চিঠিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারতে না যে এসব কি। ঘেন্না হয়! ঘেন্না তোমার হওয়া উচিত নয়। আমার হওয়া উচিত। তোমায় দেখে আমার এখন ঘেন্নাই পাচ্ছে। আজ যদি সত্যিই আমি একাজ করে থাকি তবে তার জন্যে তুমিই দায়ী। তুমিই আমায় একাজ করতে বাধ্য করেছ।

রাগিণী অস্ফুট স্বরে বললে—আমি দায়ী?

—হাঁ, তুমিই দায়ী। আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলুম যে আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার মা পিসীমাকে বলে এলে আমি বীথিকে বিয়ে করব। কেন? উত্তর দাও। কোনও দিন কোনও ক্ষতি আমি তোমার করেছি? তবে? কেন মিথ্যে আমার নামে কুৎসা প্রচার করে আমার মাকে আঘাত দিয়েছিলে? আমার মা তোমাকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসেন। পিসীমা তোমায় গাল দিয়েছিল যা বলবার তাঁকে বললেই পারতে। কেন আমাকে জড়ালে? আমার মাকে কষ্ট দিলে? বড়লোকের একমাত্র সুন্দরী মেয়ে বিলিতী কায়দায় মানুষ হচ্ছ সেই দেমাকে যাকে যা মুখে এল তাই বলে এলে। কোনওদিন বীথির সঙ্গে আমায় দেখেছ? বীথি ত' দূরের কথা কোনওদিন কোনও মেয়ের সঙ্গে আমায় ঘুরতে দেখেছ? ফট্ করে আমার নামে এতবড় একটা কথা বলতে তোমার মুখে একটুও আটকাল না।···ঘেন্না হয়। মনে পড়ে কি বীথির সঙ্গে বিয়ের কথা বলবার পরই সন্ধ্যার সময় ঐ কোণের ঘরে এই পাপাত্মার মুখে শুধুমাত্র 'আমি ভালবাসি' কথা শুনেই প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে এই ঘৃণার পাত্রটির বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলে আবার একটু পরেই কাজল ঘরে ঢুকলে কচি খুকীর মত ছুটে গিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে তার হাত ধরে বেড়াতে আসবার জন্যে অভিমান জানিয়েছিলে। আমি সেদিন বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখেছিলুম। আমি ত' ছেলেমানুষ সে রকম অভিনয় হলিউডের সেরা এ্যাকট্রেসও পারবে না। তবুও আমি সেদিন তা দেখেও বিশ্বাস করি নি, অভিনয় বলেই ধরেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি আমারই ভুল। ঘেন্না হয়। আমায় দেখলে তোমার ঘেন্না হয়। ওঃ! এও শুনতে হল···

কান্নায় ভেঙে পড়ে রাগিণী বললে—শুকদেবদা', আমার···।

—চুপ কর। আমায় বলতে দাও।···

'বলল বটে আমায় বলতে দাও কিন্তু কি বলবে কি ভাবে বলবে তা ঠিক করতে না পেরে কিংশুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দেখা গেল ওর চোখে জল এসেছে। চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে মুখে ভাষাও এল! বললে—ভালবাসার অভিনয় করি। আমি মফস্বল সহরের ছেলে, সহুরে মেয়ে যাকে বলে রাসটিক্, ব্রুট। অভিনয় আমরা করি না বা করতে জানি না। যাকে ভালবাসি তাকে পাব না জেনেও আমরণ ভালবাসি। আমার ছেলেবেলার সাথী গিনী বলে মেয়েটিকে আমি ভালবাসতুম, আমার ধারণা ছিল সেও আমাকে ভালবাসে, তাই তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু চিঠির জবাবে সে তার বন্ধুদের ছবি দেখিয়ে বলেছিল যে তাদের ধারে কাছে—বাকীটুকু সে বলে নি কিন্তু আমি জানি কি বলতে সে চেয়েছিল। তারপর এখন শুনলাম কাজলের কথা। তারও ধারে কাছে যাবার যোগ্যতা আমার নেই। ওঃ! কি লজ্জা! কি অপমান! জীবনে এমন অপমান আর কেউ করে নি।—বলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ রাগিণীর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকানী দিয়ে বললে—বল, ছবি দেখবার পর কোনওদিন তুমি আমাকে তোমার সামনে পড়তে দেখেছ। বল, চুপ করে রইলে কেন! সেই থেকে আমি তোমার চোখের আড়ালে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। পাছে আমার মত অযোগ্যকে দেখে তোমার বিতৃষ্ণা জাগে। তোমাকে বিরক্ত না করার পুরস্কার তুমি দিলে বীথিকে বিয়ে করব এই মিথ্যে কথাটা প্রচার করে।···আমায় দেখলে তোমায় ঘেন্না হয়!—বলে ম্লান হেসে বললে—মামা বললে, বলে আয় বীথিকে বিয়ে করব না ত' কি তোমায় বিয়ে করব। তারপর দু'একদিন বীথিদের বাড়ি যা, গিনী দেখুক তা হলেই জব্দ হবে। মিথ্যে বদনাম দেওয়া বেরিয়ে যাবে। কথাটা মনে ধরেছিল। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে এতদূর গড়াবে। আমায় দেখলে লোকের ঘেন্না হবে।···তাই হোক, ঘেন্নাই হোক্; বীথিকে বলো সে যেন আমার বাড়িতে সব বলে, আমি সব সত্যি বলে মাথা পেতে স্বীকার করে নেব। ঘেন্না হয়! ঘেন্নাই করুক সবাই আমায়।—বলে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

পাথরের মূর্ত্তির মত রাগিণী বসে রইল।

১৬

রাগিণীকে দেখে তনুকা বুঝতে পারল যে কিছু একটা ঘটেছে। রাগিণীকে জিজ্ঞেস করাতে সে যেভাবে 'কিছু না' বললে তাতে সন্দেহটা পাকা হল বটে কিন্তু ব্যাপারটা জানা গেল না আর রাগিণীর চেহারা দেখে তাকে চাপ দিতেও তনুকার ভরসা হল না। নিত্যকার মত জুবিলী ট্যাঙ্কে মহাবীরের সঙ্গে দেখা হলে পর বললে—দেখ গিনীর হাবভাব আমার ভাল ঠেকছে না। অসম্ভব গম্ভীর আর মনমরা ভাব। জিজ্ঞেস করলুম তা এমনভাবে জবাব দিলে যে ভয় হল, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে। শুকদেবদা'র কি খবর বল দেখি।

মহাবীর বললে—তা তো বলতে পারব না। ক'দিন দেখা হয় নি। সময়ই পাই না। আচ্ছা এই সামনের রবিবার দিন যাব।

—রবিবার নয় আজই যাও।

মহাবীরও কিংশুকের সঙ্গে দেখা করলো বটে কিন্তু সুবিধে করতে পারলো না। সেখানেও একই জবাব মিলল। 'কি আবার হবে কিছু না।' মহাবীর অবশ্য তনুকার মত কিছু না শুনে চলে এলো না, মাথা নেড়ে বললে—উঁহু দেয়ার মাস্ট বী সামথিং, আউট ইট, ওল্ড এগ, মন হাল্কা হবে। আমার মন বলছে—।

—তবে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন তোর মনকেই জিজ্ঞেস কর সব জানতে পারবি। বলে বইতে মুখ দিলে।

পরদিন তনুকাকে মহাবীর বললে—ইয়েস ইউ আর রাইট। সামথিং হ্যাজ হ্যাপনড।

তনুকা ঠিক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব রাগিণীর কাছ থেকে বার করলো। তনুকা কথার কথা হিসেবেই মহাবীরকে বলেছিল যে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা যে এই ধরণের সাংঘাতিক তা স্বপ্নেও ভাবে নি। সব শুনেও যেন ওর বিশ্বাস হল না, বার বার রাগিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল বানিয়ে বলছে না ত'। অনেক সময় মানুষ রাজ্যের দুঃখ-দৈন্য কল্পনায় নিজের ওপর টেনে আনে তারপর মনে করে তার মত ট্র্যাজিক ফিগার পৃথিবীতে নেই। এও একরকমের বিলাস—রাগিণীও তাই করছে না তো?

—কি দেখছিস অমন করে? রাগিণী বললে।

—না কিছু না। চিঠিটা একবার দেখাবি?

—আনছি।

চিঠিটা নিয়ে এসে তনুকার হাতে দিয়ে রাগিণী বললে—বিশ্বাস হ'ল না বুঝি।

—না-না তা নয়।

চিঠি পড়ে তনুকা বললে—এ তুই কি করলি গিনী? সব কথা আমায় বলেছিস আর এত বড় একটা চিঠি পেয়েও আমার কাছে চেপে গেলি। বীরুকে তো শুকদেবদা' ওকে অপমান করতে পাঠায় নি। ও যেদিন বীথিকে বলে আসে যে শুকদেবদা' ও-বাড়িতে আর আসবে না, হি হিজ্ নট সো চীপ, সেদিন সে-কথা আমি নিজে বাইরে থেকে শুনেছি।

রাগিণী মাথা নেড়ে বললে—জানি।

—তবে? তুই কি বীথিকে চিনিস না? অন্তত আমায় তো সব বলতে পারতিস। বীথির এ চিঠি মিথ্যে; শুকদেবদা'কে কি তুই চিনিস্ না? সে এ-কাজ করবে বলে তোর বিশ্বাস হল আর তা-ও বীথির কথায়?

রাগিণী শান্তভাবে বললে—জানিস তো কি ভীষণ অহঙ্কারী আমি, না বুঝেই যা শুনি তাই বিশ্বাস করে বসি। কত অল্পেই আমি রেগে উঠি তা-ও তোর অজানা নয়। সেদিন ওকে ও-বাড়িতে ওদের সঙ্গে হাসতে দেখলুম, তুই রাস্তায় আসতে আসতে ছিঃ ছিঃ করলি। মনে পড়ে গেল বীথি বললে ও কেন কথা দিয়েও যায় নি তাদের বাড়ি। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল, তারপরই পেলুম এই চিঠি।

তনুকা ভেবে বললে—আমি শুকদেবদা'র কাছে যাই, কেমন?

—না-না, তনু না। কি হবে গিয়ে, কোনও দরকার নেই।

—তা'হলে বীরুকে পাঠাই।

—না, না, কিছু করতে হবে না। এ ভালই হয়েছে যে সব

ঢুকে-বুকে গেছে—নিশ্চিন্তে এখন পড়ায় মন দিতে পারব।—বলে নজরে পড়ল চিঠিটা তনুকার হাতে রয়েছে, বললে—চিঠিটা দে।

চিঠিটা তনুকার হাত থেকে নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বললে—বস, জঞ্জালগুলো আগুনে ফেলে আসি।

রাগিণী ফিরে এলে তনুকা বললে—চল ঘুরে আসি, এখনও সন্ধ্যের দেরী আছে।

—না রে আমি যাব না। আজ বাদে কাল পুজোর ছুটি তারপরেই দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে যাবে। কলেজে ঢুকে অবধি বই-এর পাতা উল্টে দেখি নি। পাশ করতে হবে না?

—খুব হয়েছে, পরীক্ষা আমাদেরও আছে, বলি এতই যদি পড়ার চাড় তবে ক'দিন ধরে কলেজ যাচ্ছিস না কেন? ওসব শুনছি না, ওঠ।

তনুকা ছাড়ল না, সঙ্গে ক'রে নিয়ে বের হল।

কিছুটা চুপচাপ হাঁটবার পর রাগিণী বললে—তনু।

—বল।

—বলছিলুম কি,······

—বল, থামলি কেন?

—দেখা হলে বলিস···চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেছি।

তনুকার মুখে সব শুনে মহাবীর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, বললে, মামা! রুট অব অল ইভিল্‌স্‌, সাধে কি আমি কিংকে বলেছি যে এই ফড়েগুলোই তোকে ডোবাবে। হলও তাই। তাই তো ভাবতুম যে হঠাৎ কিং বীথিদের বাড়ি যাচ্ছে কেন? হোয়াই? নো রিপ্লাই। এখন বুঝলাম মামার কাজ। জান তনু, মেসোমশাই যখন বললেন, মহাবীর জজকোর্টে চাকরী করবি তো বল আমি মিঃ সিন্‌হাকে বলি। আমি আউট রাইট বললুম, নো, সার্টেনলি নট, না খেয়ে মরব তবু ঢ'জায়গায় চাকরী করব না। ওয়ান ইজ আইন-আদালত এনাদার ওয়ান ইজ লুনাটিক অ্যাসাইলাম, গ্রেভ ডিগার-এর চাকরী দাও, ইয়েস, শ্মশানের ডোমের চাকরী দাও—উইথ প্লেজার, তবু কোর্ট কি অ্যাসাইলাম, নো।

—কেন?

—অ্যাসাইলামে চাকরী করলে মাথায় ছিট অনিবার্য। অ্যাজ সার্টেন অ্যাজ ডেথ আর কোর্টে কাজ করলে মনটি তোমার ক্লীন্ শ্লেট থাকবে না।

—কেন?

—কেন? অলওয়েজ তো উকাল-মোক্তারের টাচ-এ আসছ, মন ভাল থাকবে কি করে? খালি প্যাঁচ ঘুরছে মাথায়, ল-ইয়ার মানেই এক একটি প্যাঁচানন্দ দি গ্রেট। এই তো হাতে-হাতে প্রমাণ পেলে। কিং যাচ্ছিল রাগিণীকে বলতে কেন ও-কথা বললে সে, মামা প্যাঁচ কষে দিলে, বল গে যা বীথিকে বিয়ে করবো···না তো কি তোমায় বিয়ে করবো। হোয়াট ডাজ ইট মীন্?···ওঠ।

—এখনও ভাল করে সন্ধ্যে হয় নি উঠবো কি?

—না হোক, ওঠ। বুঝতে পারছ না, কিং-এর কাছে যেতে হবে। তার অবস্থা ভাব দেখি। তারপর মামা তাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছ?

—না, না রাগারাগি মারামারি করতে পারবে না। ছেলেরা

একটুতেই হাতাহাতি শুরু করে। মামার গায়ে তোমার চেয়ে ঢের বেশি জোর।

মহাবীর অবজ্ঞাভরে বললে—ছোঃ। তুমি কি' ভাব আমি আর পাঁচজনের মত হাতাহাতি মারামারি করি। নো, নেভার। আই অলওয়েজ ফাইট লাইক য়্যান অর্থডক্স পার্লামেন্টারীয়ান। মাউথ ইজ মাই ক্যানন য়্যাণ্ড ওয়ার্ডস য়্যামুনিশনস্। নাও ওঠ।

মামার দেখা না পেয়ে মহাবীর কিংশুকের কাছে গেল। কিংশুক পড়ার ঘরে ছিল। মহাবীরকে দেখে ভেতরে ভেতরে অপ্রসন্ন হলেও মুখে কিছু না বলে যেমন পড়ছিল তেমনি পড়তে লাগল। মহাবীর কিংশুকের পাশের চেয়ারটায় বসে টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ওল্টাতে লাগল।

যে লোকটা এসেই বকবক্ করবে বলে জানি সে যদি একটা কথাও না বলে চুপচাপ বসে থাকে নিজেরই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। কি হল এর? কথা বলছে না যে। কিংশুকেরও হল তাই, মনে মনে বললে কি ব্যাপার? চ্যাটার বক্স যে বড় চুপচাপ, হাতের বইটা মুড়ে রেখে বললে,—কি রে?

মহাবীর বললে—এমনিই।

—এমনিই চুপচাপ করে থাকবার পাত্র তো তুমি নও, কি হয়েছে?

—কিছু না, কিছু না, কি আবার হবে।

কিংশুক বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে, বললে—তনুকার সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে নাকি।

মহাবীর একটু চুপ করে থেকে বললে—কিং আই য়্যাম সরি, ভেরি সরি। ঝগড়াই করেছে।

একটু বিরক্ত হয়ে কিংশুক বললে—কেন অল্পেতেই মাথাগরম করিস্। কি হয়েছিল?

—কিছু হয় নি, কিছু হয় নি। আই য়্যাম সরি ফর ইউ। সব শুনলুম। রাগিণী ওকে বলেছে।

—ও, এই ব্যাপার। এতে তোর সরি হবার কি আছে।

—আছে বৈ কি, আই য়্যাম ইওর ফ্রেণ্ড।···মামাটাই রুট অব অল ইভিলস্। ওকে পেলে হয়।

—ওর কি দোষ?

—ঐ তো তোকে বীথিদের বাড়িতে পাঠিয়েছিল।

—মাইরি আর কি, আমার ইচ্ছে না থাকলে ও আমাকে পাঠাতে পারে। আমি কি কচি খোকা। তুই এই নিয়ে কিছু বলিস্ নি ওকে। ওর কোন দোষ নেই।

—বেশ।···বলছিলুম কি যা হবার হয়ে গেছে, ফরগিভ এণ্ড ফরগেট। তনু বলছিল, গিনী ওয়াজ ইন্ টিয়ারস্। সী রিয়ালী লাভস্ ইউ।

—বাট আই ডোণ্ট।

—আচ্ছা বেশ, ভালবাসার কথা ছেড়েই দিলুম, ঝগড়াঝাটি মিস-আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং মানুষের মধ্যেই হয় আবার তা মিটে যায়, অন্তত মিটিয়ে ফেলা উচিত। তোর সঙ্গেই ত' আমার কতদিন তা হয়েছে। ও সত্যিই খুব রিপেনটেন্ট, তা'ছাড়া এ বোনাফাইড মিস্‌টেক এটা ক্ষমা করা উচিত—।

—উচিত! আমার বাড়িতে এসে আমার মা-পিসীকে মিথ্যে অপমান করবে আর আমি তা ক্ষমা করব?

মহাবীর একটু চুপ করে বললে—রাগিণীর কোন দোষ নেই। তাকে বীথির কথাটা তনু বলেছিল।

কিংশুক বিস্মিত হয়ে বললে—তনু বলেছিল—তনু রাগিণীকে ও-কথা বলেছিল?

মহাবীর মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ।

—তনু মিথ্যে ও-কথা বললে কেন?

—তা জানি না। নিশ্চয়ই কারুর কাছে শুনেছে। সে যাই হোক। আমি তনুর হয়ে মাপ চাইছি।

কিংশুক ব্যঙ্গভরে বললে—আচ্ছা! তুই দেখছি মেয়েদের ক্ষমা চাইবার সোল এজেন্ট। আশ্চর্য! কি ছিলি আর কি হয়েছিস। হোয়াট এ ফল!

—সে তুই আমায় যা ইচ্ছে তাই বল। আমি গ্ল্যাডলি মাথা পেতে নেব। তুই রাগিণীর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল, অনর্থক নিজেরা ভুল করে কষ্ট ভোগ করিস না।

কিংশুক তীব্রস্বরে বললে—কিসের কষ্ট! আই হেট হার। আমি তাকে ঘৃণা করি। শুধু ওকে নয় সমস্ত মেয়ে জাতটাকেই ঘৃণা করি। তুই যদি এই দৌত্য নিয়েই এসে থাকিস তাহলে আমি বলব এখানে আর আসিস না।

পুজোর পর বাধ্য হয়েই মা-এর পীড়াপীড়িতে কিংশুককে বিজয়ার প্রণাম করবার জন্য রাহা-বাড়িতে যেতে হল। বাড়িতে ঢোকবার মুখেই কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা। কুঞ্জবাবু কিংশুককে দেখেই বললেন—এস, এস, শুকদেব চন্দর, তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না। তবু ভাল যে বিজয়ার পর কাকার বাড়িতে এলে।

হেঁট হয়ে প্রণাম করে কিংশুক বললে—কেন আসি তো, আপনিই বাড়িতে থাকেন না।

—তা হবে। যাও ভেতরে যাও। দীনুদা' বাড়িতে আছেন?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছি। কই গো···আমাদের শুকদেব এসেছে। তুমি যাও, তোমার কাকীমা ভেতরে আছেন।

একথালা খাবার কিংশুকের সামনে ধরে দিয়েই শৈলজা বললেন—খাও বাবা।

—এত! এত খেতে পারব না খুড়ীমা, পেট বোঝাই।

—এত কোথায়, এই ক'টা জিনিষ আর খেতে পারবে না, খুব পারবে। ওরে খেপী, গিনীকে ডেকে নিয়ে আয় তো। নাও বাবা শুকদেব খাও। তরুদিদিকে বল কাল বিকেলের দিকে যাব।

রাগিণী এল। শৈলজা বললেন—তোর শুকদেবদা'কে প্রণাম কর।

—না খুড়ীমা, না।

—না কেন শুকদেব। তুমি ওর বড়, তোমায় বিজয়ার পর প্রণাম করবে না?

—আমি প্রণামের যোগ্য নই খুড়ীমা। উঠি···।

ওদিকে কুঞ্জবাবুও পেটটি বোঝাই করে বললেন—চলি দীনুদা'। এলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু বসে থাকবার কি আর জো আছে। ওদিকে আবার সব এসে বসে থাকবে।

—হ্যাঁ, বিজয়ার জের এখন চলল।

—না ঠিক বিজয়ার জের নয়। সামনেই ইলেকশ্যন আসছে তাই বিছেবাবুদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করব। ভবতারণও সেখানে বসেছিলেন, তিনি বললেন—ইলেকশ্যন! কিসের ইলেকশ্যন।

—ম্যাসেম্বলীর ইলেকশ্যন ফেব্রুয়ারীতে।

—কে দাঁড়াচ্ছে?

—কে আবার দাঁড়াবে? আমিই দাঁড়াবো, আর তো দাঁড়াবার মত কারুকে দেখছি না। মিউনিসিপ্যালিটি আর ভাল লাগে না। দীনুদা'কে কত বললুম তখন, দাদা মিউনিসিপ্যালিটিতে দাঁড়াও। তুমি তো আর ম্যাসেম্বলীতে দাঁড়াবে না, তবু এইটে নিয়ে থাক নিশ্চিন্ত হই, তা দাদা আমার ছোট ভাই-এর কথাটা কানেই তুললে না। তবু ভাল যে বিছে উকীল ওখানে থাকবে। আরও দু'চারজন দাঁড়াবে বলে শুনছি, তাই বিছেবাবুদের ডেকেছি একটা সলা পরামর্শের জন্তে।

—আর কে দাঁড়াচ্ছে?—ভ্রূ কুঁচকে ভবতারণ জিজ্ঞেস্ করলেন।

—ঠিক বলতে পারব না। দু'চারদিনের মধ্যেই জানতে পারবো। তা সে সব চুনোপুঁটি, ভয় খাই না, তবে কিছু খরচা হবে এই যা। এই হাঙ্গামাটা চুকলে পর বিয়ের কথাবার্তা কওয়া যাবে।

দীনু দত্ত বললেন—বিয়ে? কার বিয়ে?

—ছেলেমেয়ে দু'টোর বিয়ে দিতে হবে না। শুকদেব আর গিনীর কথা বলছি।—বলে হাসতে হাসতে বললেন—দাদার আমার ব্যবসার কথা ছাড়া আর কোন কথাই মনে থাকে না। সাধে কি আর লক্ষ্মী এ বাড়িতে অচলা। ব্যবসা ত' আমরাও করি, কিন্তু দাদার আমার একেবারে তপস্যা, না কি বলেন ভট্‌চাজ মশাই।

ভবতারণ দেঁতো হাসি হেসে বললেন—তা যা বলেছ।

—চলি, দাদা। দেরী হয়ে গেল। আর এত ঝক্কি বইতে পারি না, বয়েস হচ্ছে ত'।

কুঞ্জ বাহা চলে গেলে ভবতারণ বললেন—কুঞ্জর কথাটা একবার শুনলে দীনু। বলে কিনা ইলেকশ্যন-এ আমি ছাড়া দাঁড়াবার মত আর কেউ নেই। এত বড় জেলায় তুই একলাই মানুষ, আর সব পাঁঠা। কথাটা শুনলে?

—হুঁ।

—বলে কিনা হাঙ্গামা চুকলে পর বিয়ের কথাবার্তা কওয়া যাবে। যেন এ বাড়িতে মেয়ে দিয়ে দত্তবাড়িকে উনি উদ্ধার করবেন। এ বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ উত্থাপন করতে পারলে লোকে বর্তে যায় আর ওর কিনা এমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। দু'টো পয়সা করে ও ভেবেছে কি? তুই মেয়ের বাপ কোথায় গলবস্ত্র হয়ে কথাটা বলবি তা না••• কি বলব রাগে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। বলে গরম গরম আরও কিছু উগরে গেলেন।

দীনু দত্ত সব শুনে গম্ভীরভাবে বললেন—হুঁ।

—তুমি কিছু করবে না? শুধু হুঁ বললেই হবে।

—এরপর মেয়ের বিয়ের কথা তুললে দরজা দেখিয়ে দেব।

—ও তো হল দু' নম্বরের ওষুধ। পয়লা নম্বরটা কি হবে।

—পয়লা নম্বর।

—ঐ যে বললে ও-ছাড়া আর তামাম বাংলা দেশে ইলেকশ্যনে দাঁড়াবার লোক নেই। চুপ করে একথাটা মেনে নেবে?

—ইলেকশ্যন?

—ভূত দেখলে বলে মনে হচ্ছে।

—তুমি তো জান ভবতারণ, তোমার সামনেই রাইমোহনের মৃত্যুর পর প্রতিজ্ঞা করেছি ও ইলেকশ্যনে-টনে নেই। খুব কাঁড়া গেছে। ভাবলেও এখন আমার বুক কাঁপে।

—আরে সে তো হল তোমার বাই ইলেকশ্যনের ব্যাপার। তুমি প্রতিজ্ঞা করবে কি, আমি বেঁচে থাকতে তোমায় দাঁড়াতে দিতুম ভেবেছ। কিন্তু এ তো বাই ইলেকশ্যন্ নয়। আমি তোমার কুল-পুরোহিত—আমি বিধান দিচ্ছি এ প্রতিজ্ঞা এখানে খাটে না। তুমি ইলেকশ্যনে দাঁড়াও।

—না ভাই আমার মন সায় দিচ্ছে না।

—বলি এরপর এ সহরে বাস করতে পারবে? রাই-এর ব্যাপার নিয়েই যা বলে তা ত' শুনেছ?

—হুঁ।

—তবে? ও যদি এম এল এ হয় তখন? তার ওপর যা বলে গেল, বিয়ের কথা, মেয়েকে দিয়ে খেলিয়ে যদি শুকদেবকে হাত করে।

—সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব ছেলেকে।

—তা তো করবে কিন্তু ছেলে পাবে কি। এই বলে রাখছি দীনু, আরও যদি বাড়তে দাও তাহলে এর পর হরিনামের ঝোলা নিয়ে তোমায় লছমন ঝোলা যেতে হবে। বলে কি না··কি বলব, হতুম আমি—লোক আছে কিনা দেখিয়ে দিতুম। কি হবে টাকা পয়সায় যদি না মান-সম্মানই বজায় রইল। দীনু, গরীব ব্রাহ্মণের কথাটা ভেবে দেখ। যাক প্রাণ থাক মান। দীনু গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন—হুঁ, আমিও ইলেকশ্যনে দাঁড়াব। তুমি ব্যবস্থা কর।

কথাটা চাউর হতে দেরী হল না। কুঞ্জ রাহার কানে গিয়ে কথাটা পৌছোতে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

—দাদা কি শুনছি।

—কই আমি তো কিছু শুনছি না। কি শুনছ?

—তুমি নাকি য়্যাসেম্বলী ইলেকশ্যনে দাঁড়াচ্ছ?

—ও, এই কথা! তা সে তো এখনও ঢের দেরী।

—তা দেরী আছে। কথাটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ দাঁড়াব মনে করছি।

—এটা কি ঠিক হচ্ছে।

ভবতারণ কাছেই ছিলেন, দীনুবাবু তাঁকে সাক্ষী মেনে বললেন—ঐ শোন ভব, কুঞ্জর কথা।

ভবতারণ বললে—বেঠিক কি হল?

—মানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'জনের আকচা-আকচি এটা কি ঠিক হবে?

ভবতারণ বললেন—ও, এই কথা?

—কি দীনুদা', বল।

—না, তা ঠিক হবে না।

—তবে?

—তবে আর দাঁড়িয়ো না, যেমন মিউনিসিপ্যালিটি করছ তাই কর। আমি য়্যাসেম্বলীতে দাঁড়াই। না কি বল ভবতারণ।

ভবতারণ হাত উল্টে বললেন—এর চেয়ে ন্যায্য কথা আর কি হতে পারে।

কুঞ্জ রাহা গম্ভীরমুখে বললেন—না তা হয় না।

কথাটা পাণ্ডাদের কানেও গিয়েছিল, তাঁরাও পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন। প্রথমে এলেন জেলা স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি ঘনশ্যাম রজক। বেঁটে-খাটো কৃষ্ণবর্ণের মানুষটি। আগে ঘরে ঢুকলে ফরাসের অদূরে বেঞ্চিতে বসতেন এবং ধূমপানের বাঞ্ছা জাগলে হুঁকোর মাথা থেকে নিঃশব্দে কল্কেটা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দুই হাতের মধ্যে ধরে 'প্রাক্ প্রাক্' করে গোটা কতক টান দিয়ে আবার ঘরে ঢুকতেন। দেশ স্বাধীন হলে পর পদোন্নতি হল। জেলার সভাপতি হলেন। এম এল এ হলেন। খড়ের ঘর দালান হল। পৈত্রিক চার বিঘে জমি চারশো একরে দাঁড়াল। রজকিনী পরিবারকে ছুতোনাতায় ত্যাগ করে এক ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। স্বভাবতই তখন যে কোনও বাড়ির ফরাসেই স্থান হতে লাগল। সর্বসমক্ষেই চুরুট সেবনও সুরু হল।

এ হেন ঘনশ্যামবাবু এসে মোটা একটা চুরুট ধরিয়ে জাঁকিয়ে বসে বললেন—দীনুবাবু নাকি য়্যাসেম্বলীতে দাঁড়াবেন ঠিক করেছেন। ভাল কথা, একটা দুর্ভাবনা গেল।

ভবতারণ ইদানীং প্রায় সব সময়ই দীনু দত্তর কাছাকাছি আছেন। তিনি বললেন—দুর্ভাবনা!

—তা নয়ত কি? সঙ্ঘ থেকে কাকে নমিনেশ্যন দেওয়া যায় এ নিয়ে রীতিমত চিন্তায় পড়েছেন কলকাতার ওঁরা। দু'তিনজন দরবার করছে তার মধ্যে প্রাণবল্লভেরই পাবার সম্ভাবনা বেশি ছিল, কিন্তু জানেন ত' লোকটাকে। একে মদের ব্যবসা করে, তার ওপরে আবার ধানচালের কারবারী, তা-ও তিন চার বার কাঁকর-এ, পাকিস্থানে মাল পাচার-এ—এইসবে ধরা পড়েছে। ওয়াগন ভাঙা মালের কারবারেও জড়িয়ে পড়েছিল। এখন ধরেছে আমায় নমিনেশ্যন দাও, এম এল এ হয়ে দেশের ও দশের সেবা ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক। লোকটার পয়সাও আছে মতিগতিও পাল্টেছে। আর কেউ নেই বলে ওকেই নমিনেশ্যন দেব বলে ঠিক করেছিলুম, ক্যাণ্ডিডেট তো দাঁড় করাতে হবে। মনে একটু দুর্ভাবনা ছিল লোকটাকে নিয়ে, দীনুবাবু দাঁড়ালেন ভালই হল, আপনাকেই—।

ভবতারণ বললেন—তুমি ওকে স্বাধীনতা সঙ্ঘের হয়ে দাঁড়াতে বলছ?

—হ্যাঁ। সঙ্ঘই দেশের স্বাধীনতা এনেছে। সঙ্ঘই দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আজ ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেশ্যন তা সম্ভব হয়েছে এই সঙ্ঘের জন্যেই। আপনাদের আর কি বলব, সবই জানেন।

দীনু দত্ত বললেন—দেখ আমার বাবা বলে গেছেন কোনও চক্রে মাথা গলিও না। দেশ স্বাধীন হয়েছে আমিও স্বাধীন দাঁড়াব। ও

সজ্ঘে-টজ্ঘে নেই বাপু, বড্ড হুজ্জুত পোয়াতে হয়। ও তোমরা প্রাণবল্লভকেই নমিনেশ্যন দাও। তা'ছাড়া বুঝছো না কুঞ্জ যখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দাঁড়াচ্ছে তখন আমি তো কারুর ডিপেনডেণ্ড হতে পারি না, হারলে মুখে চুনকালি পড়বে জিতলে বলবে নিজের মুরোদে ত' আর হল না। অমন জেতার চেয়ে হারা ঢের ভাল। ও-সবের ভেতরে নেই। কি বল ভবতারণ?

ভবতারণ হাত উল্টে বললেন—কি আর বলব বল।

—আমার কথাটা ভেবে দেখুন দীনুবাবু। আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না সিওর উইন। ভোটাভুটির ব্যাপারে কত ওয়ার্কারের দরকার বলুন দেখি। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দাঁড়ান অত সোজা নয়; তা'ছাড়া এসব ব্যাপারে আপনার মোটেই এক্সপিরিয়েন্স নেই। সজ্ঘের এম এল এ হোন, পাঁচটা বিদেশীর সঙ্গে জানাশোনার সুযোগ পাবেন, বিজনেস আপনার হু হু করে বেড়ে যাবে। ঘাতঘোৎ কারুকে বলে দিতে হবে না সবই আপসে জানতে পারবেন, চাই কি উপমন্ত্রী-টন্ত্রীও হতে পারেন, এ জেলারও তো একটা কোটা আছে। আমি দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতায় যাচ্ছি। আপনার কথাই তা হলে বলি। ফরম পাঠিয়ে দিচ্ছি আগে চার আনা দিয়ে মেম্বার হয়ে নিন।—

ঘনশ্যাম আরও লোভ দেখালেন কিন্তু দীনুবাবর সেই এক কথা পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করতে পারব না, চক্রে মাথা গলাব না।

তারপর এলেন কিরণবাবু, ইনি বর্তমানে পিক্ বা পিপলস ইন কমাণ্ড দলের পাণ্ডা। পিক্ ভারী উগ্র দল, এদের চোখে এ দেশের কিছুই ভাল নয়, না দেশের মানুষ, না দেশের মাটি। অবশ্য নিজেদের দলের মানুষদের বাদ দিয়ে, সব কিছু ঝুটা, সাচ্চা কেবল ওরা আর ওদের মতবাদ। এদের স্লোগান হচ্ছে আমাদের দাবী, তা সেটা যত অন্যায় হোক, অপরের যত ক্ষতিকারক হোক, মানতে হবে। নইলে পটকা ফাটবে, ইট-পাটকেল বৃষ্টি হবে, ছোরা চলবে।

কিরণবাবু বললেন—ঠিক করেছেন ঘনশ্যামকে ভাগিয়ে। যাবেন না মশাই যাবেন না যত সব চোর-বদমাইস আর ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের আড্ডা। সাধে কি সরে এসেছি। বুকের রক্ত দিয়ে জেল খেটে দেশের স্বাধীনতা আনলুম আর আমরা এখন কেউ নই। যত সব বড়লোক ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদার আর চোরাকারবারী বদমাইস তারা হল মাথা। বললুম এম এল এ হলুম, মন্ত্রী উপমন্ত্রী হতে চাইছি না ভাল একটা জায়গায় দিন যাতে কাজ করতে পারি। যেমন রিলিফ কি সিভিল সাপ্লাই। তা দিলে? না দিলে তো ভাবী বয়েই গেল আমার। পিকপার্টিতে চলে এলুম, এরা আমায় ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারী করে দিয়েছে। আমি ওদের কার চেয়ে খাটো? আমি খেপে খেপে আট বছর সাত মাস ন'দিন জেল খাটি নি, কিন্তু কি পেয়েছি।

ভবতারণ ঠাট্টা করে বললেন—ঘানি!

—তাই। যত আত্মীয়স্বজন পোষণ আর মুখ শোঁকাশুঁকি। এরা আবার কৃষাণ-মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠা করবে। এরা আবার বলে এদেশে শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করবে। ঘোড়ার ডিম, যদি করতে হয় আমরা করব। সারা দুনিয়ার নিপীড়িত নিগৃহীত জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই পিক পার্টি তা করবে। আমাদের চোখে জাত নেই, সমাজ নেই—সব এক। সবার ওপরে মানুষ সত্য। এই দেখুন না ঘনশ্যাম বেটা ধোপার কুপুত্তুর, বাপ-ঠাকুর্দা সেদিন অবধি কাপড় কেচে মরেছে আর উনি আজ লীডার হয়ে মুখে চুরুট দিয়ে এক আসনে বসে লীডারী ফলাচ্ছেন, কি জানিস্ তুই, কি তোর বিদ্যে বুদ্ধি। বেটা কত বড় পাজা। উত্তর নসিবপুরে বন্যা হয়েছে জানেন ত'?

দীনুবাবু বললেন—হ্যাঁ আমার আড়তের লোক এসেছিল, তারা বললে।

—বললুম, কই তোমাদের সঙ্ঘ থেকে রিলিফ পাঠাচ্ছ না যে। তা ও বললে ও কিছু না, সামান্য একটু বিষ্টির জল দাঁড়িয়েছে দু'দিনেই নেমে যাবে। শুনুন কথা। দেবে, সবই দেবে ঠিক ভোটের আগে, যখন সব মরে-হেজে যাবে তখন দেখবেন বাবুরা হেলিকপ্টারে করে টুর দিচ্ছেন; কম্বল ফেলছেন গুঁড়ো দুধ বিলোচ্ছেন। এদের নির্মূল না করলে দেশের উন্নতি নেই; যত সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী জাতের সঙ্গে আঁতাত। এরা দাঁত বার করে বেড়ায় কি করে তাই ভাবি।

ভবতারণ বললেন—ওরাও তো ঠিক একই কথাই বলে আপনাদের সম্বন্ধে। বলে, যত চোর-বদমাইসের আড্ডা, বিদেশীর দালাল।

কিরণবাবু চোখ কটমট করে বললেন—এইবার বলাব। কাগজ তো পড়েন, দুনিয়ার হালচাল অজানা নয়। দেখুন না আস্তে আস্তে। যাক্ কাজের কথায় আসি। দীনুবাবু নাকি ইলেকশ্যনে দাঁড়াবেন শুনলুম।

—ইচ্ছে ত' করছি।

—ভাল কথা। পিক্‌পার্টির হয়ে দাঁড়ান, দেশে কৃষাণ-মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন করতে কণিক ধরুন।

ভবতারণ বললেন—কিন্তু উনি তো বড়লোক মানুষ, নিপীড়িত নিগৃহীত নেতার মধ্যে ত' উনি পড়েন না।

—উনি শুধু বড়লোক নন, বড় মানুষও বটেন। তাছাড়া আমাদের দলে যখন আসছেন তখন বড়লোকই হোন কি গরীব লোকই হোন কিছু যায় আসে না। আগে ফরম-এ সই করে মেম্বার হোন তারপর নমিনেশ্যন আদায়ের ব্যাপারে যা করতে হয় আমি করব'খন। —বলে পকেট থেকে পার্টির ছাপান ফরম বার করে দীনু দত্তের সামনে ধরলেন।

দত্তমশাই মনে মনে প্রমাদ গণলেন। এ যে দেখছি ভারী করিৎকর্মা লীডার, জেলার চাঁই তবুও সাধারণ ওয়ার্কার-এর মত মেম্বারশীপ ফরম পকেটে নিয়ে ঘোরেন। এর চেয়ে ঘনশ্যামের দল অনেক ভাল, ওদের চালটি বেশ নবাবী। বলে গেল ফরম পাঠিয়ে দিচ্ছি, হাঙ্গামা চুকে গেল। আর এ? দীনুবাবু ভবতারণের মুখের দিকে তাকালেন। ভবতারণ যেন মনের কথাটি বুঝতে পারলেন, বললেন,—কিরণবাবু আমি একটা কথা বলি। বলছি বটে আমি, কিন্তু জানবেন কথাটা আমার নয় দীনুবাবুর কথা। জানেন ত' ওঁকে কতদিকে মাথা দিতে হয়। তাই এই ভোটের ব্যাপারটা উনি আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

—তা আর জানি না। আমরা তো বলাবলি করি। দত্তমশাই একলা লোক যে ভাবে এত বড় কারবার চালাচ্ছেন তাতে করে একটা প্রভিন্স ম্যানেজ করবার ক্ষমতা উনি রাখেন। এই সব লোক যদি দলে আসেন সোনা ফলবে।

—ইলেকশনের ব্যাপারে আমায় বলেছে একটু সাহায্য করতে, তাই বলছি। ফরম আপনি তুলে রাখুন, দীনু ইনডিপেণ্ডেণ্ট দাঁড়াবে এটা ওর স্বর্গীয় পিতাঠাকুরের আদেশ—অমান্য করতে বলবেন না। তবে এটা জানাবেন আপনাদের মত আমরাও স্বাধীনতা সঙ্ঘকে আর চাই না। তবে আপনাদের ক্ষমতা বেশি তাই জোর গলায় সেটা প্রচার করেন, আমরা সাধারণ লোক ক্ষমতা নেই, ভয়ে ভয় আধপেটা খেয়ে পেয়ে কোনরকমে বেঁচে আছি। তাই জোর গলায় বলতে সাহস পাই না।

কিরণবাবু ফরাসে ঘুঁসি মেরে বললেন—সাহস আনতে হবে। পিকপার্টি আপনাদের পার্টি তার পতাকাতল সবাই এসে দাঁড়ান সাহস আপসে এসে যাবে। তাই তো দীনুবাবুকে বলছি।

—আমার কথাটা শুনুন। দীনু ইনডিপেণ্ডেণ্টই দাঁড়াক। তারপর যদি ইলেকশান জেতে য়্যাসেম্বলীতে আপনাদেরই একজন হবে, তবে পাকাপাকিভাবে আপনাদের দলে যাবে না। এমন ত' য়্যাসেম্বলীতে জনা কয়েক আছেন? না কি বলুন।

—তা আছেন।

—দীনুবাবুও সেইভাবে থাকবেন, দরকারের সময় ওঁর সাহায্য পিকপার্টি পাবে। এখন কথা হচ্ছে আপনারা যদি কারুকে নমিনেশন না দেন তাহলে এঁকে ওয়ার্কার দিয়ে ইলেকশন ওয়ার্কে সাহায্য করবেন কি না। খরচাপাতি যা লাগে তার কথা বলাই বাহুল্যমাত্র। আপনাদের ইলেকশন ফণ্ডেও কিছু চাঁদা দীনুবাবু দেবেন।

—দেখুন চট করে আমি কোনও কথা এখন দিতে পারি না। পার্টিকে জানাতে হবে।

—বেশ তাহলে জানান। দেখুন আপনাদের পার্টি কি বলেন। না কি বল, দীনু।

দীনুবাবু ভবতারণের চালটা বুঝতে না পেরে ভেতরে ভেতরে ঘামছিলেন, এ আবার কি বলে। ভবতারণের কথায় থতমত খেয়ে কি উত্তর দেবেন ঠিক করতে না পেরে বার দুই খালি গলা পরিষ্কার করলেন।

ভবতারণই বললেন—বুঝতেই ত' পারছেন যদ্দিন না পিকপার্টি পাওয়ার-এ আসছে তদ্দিন এই স্বাধীনতা সঙ্ঘই দেশ শাসন করবে। এখনই ব্যবসা-বাণিজ্যের যা হাল তা আর বলবার নয়। সবই অবাঙালীর হাতে চলে গেছে। সব পারমিট তারাই পাচ্ছে, সব টাকা বাঙলার বাইরে চলে যাচ্ছে। দীনুবাবু ব্যবসায়ী লোক, কোনও রকমে যাহোক ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছেন পিক পার্টিতে নাম লেখালে তাও যাবে। আপনারাই ত' য়্যাসেম্বলীতে এ ধরণের হাজারগণ্ডা প্রশ্ন করেছেন। ওর দিকটাও ভেবে দেখন। তাই বলছিলুম—ওপরে ওপরে ইনডিপেণ্ডেণ্ট কিন্তু ভেতরে ভেতরে ডিপেণ্ডেণ্ট, আপনাদেরই ডিপেণ্ডেণ্ট।

কিরণবাবু বিদায় নিলেন, যাবার সময় বলে গেলেন, দীনুবাবুর কথাটা তিনি পার্টি মিটিং-এ তুলবেন।

কিরণবাবু চলে গেলে দীনুবাবু বললেন—এ তুমি কি করলে হে ভবতারণ?

—পলিটিক্স!

—পলিটিক্স?

—হ্যাঁ পলিটিক্স। কথা শুনলে? দুনিয়াশুদ্ধ সব চোর বদমাইসের দল, কেবল ওরাই হলেন সাধুপুরুষ। দেশের একমাত্র মঙ্গল করবার ক্ষমতা ওদেরই হাতে। অতএব ঐ সব মঙ্গলময়দের তাঁবেদার হও।

—তুমিও ত' আমায় ঐ দিকেই ঠেলে দিচ্ছ।

—বলি কার্যোদ্ধার করতে হবে ত'। এক-আধটা দল হাতে থাকা ভাল। ভোটে দাঁড়ালেই ভোট পাওয়া যায় না, তাই যদি যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল না। আচ্ছা আচ্ছা ভাল ভাল লোক মহা মহারথী সব তাঁরা তাহলে ঐ সব যদু-মধু সমাজের যত ওঁচা মাল তাদের কাছে কাৎ হতেন না। দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে ভোট আদায় করে নিতে হবে। আর এই আদায় করতে গেলে দলবল চাই। হকের জিনিষ খাজনা যেখানে কোন অপনেণ্ট নেই তাই পাইক পেয়াদা না পাঠিয়ে আদায় হয় না আর এ তোমার ভোট, অন্যপক্ষ হাঁ করে আছে। এখানে অত সহজেই কাজ হাসিল হবে? তা আর হচ্ছে না, সভা-সমিতি করতে হবে, বোমা-পটকা ছুড়তে হবে, ইট-পাটকেল সোডার বোতল বৃষ্টি হবে। তুমি এসব পারবে করতে?

—আমাকেও ওয়ার্কার জোটাতে হবে।

—যে সে ওয়ার্কার-এর কম্ম নয়। এ কি তোমার দুর্ভিক্ষে খিচুড়ী বিলোবার জন্যে ভলেণ্টিয়ার করা ভেবেছ। তারা পারবে বোমা বানাতে ছোরা চালাতে? পারবে না। কিন্তু যদি পার্টিতে থাক তাহলে পারবে। ধর তোমার মিটিং হচ্ছে, পাশাপাশি প্রাণবল্লভের মিটিং হচ্ছে ও স্বাধীনতা সঙ্ঘের ক্যাণ্ডিডেট তোমার মিটিং-এ ওর দলের লোকেরা বোমা-ইট ছুড়তে লাগল। তোমাকেও তার উত্তর দিতে হবে। আর দিতে গেলে ট্রেণ্ড লোক দরকার। সে কাজ পার্টির লোকেরাই পারে। তুমি ভাবছ টাকা খরচ করে লোক আনাব তারাই সব করবে, মোটেই না। তাতে টাকাই যাবে কিছুই করা হবে না। যদিও বা করে ধরা পড়লে থানা পুলিশের হাঙ্গামা আছে। তখন তোমাকেই ছুটতে হবে, তোমার ওয়ার্কারকে তো আর হাজতে পচতে দিতে পার না। তখন কোনদিক সামলাবে ভোটের মিটিং করবে না উকীল বাড়ি দৌড়বে। ওরা যদি ধরা পড়ে তাহলে তোমার কলাটি, ওদের দলই বুঝবে। পিকপার্টির ছোকরাদের ভারী এক্সেম বোমা পটকা ছোড়ায়। ওদিকটা আর তোমায় দেখতে হবে না। মিটিং ভাঙতে দাঙ্গা বাধাতে ওরা এক নম্বরের ওস্তাদ। তুমি স্রেফ টাকা দিয়ে খালাস।

ভবতারণের বুদ্ধির মনে মনে তারিফ করলেও দীনুবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—যা ভাল বোঝ কর। আমার অবস্থা দেখছই ত'। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। নেহাৎ না দাঁড়ালে ছাড়বে না তাই দাঁড়াচ্ছি নইলে এসব আমার ভাল লাগে না। ভাল কথা কুষ্টিটা একবার দেখ দিকি।

দামামা বেজে উঠল।

[ক্রমশ

এদেশে বিজ্ঞানচর্চার সূচনায় শ্রীরামপুর মিশনের দান

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে শ্রীরামপুরের স্থান অনন্যসাধারণ। ইংরেজ কোম্পানীর শাসনের প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারত তখন অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত, সমস্যা-জর্জরিত সমাজে তখন বদ্ধ জলাশয়ের গতিহীনতা। সেই সময় এই মৃতপ্রায় জাতিকে নতুন জীবন দান করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সোনার কাঠির পরশ। আর তার বাহক যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষী তাঁদের অনেকেই সাত-সমুদ্দুর-তেরো নদী পার হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এই মনীষীদের পুরোভাগে আছেন উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহাত্মা উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে আগত ধর্মযাজকবৃন্দ। পাশ্চাত্যধারায় সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তন হয় প্রকৃতপক্ষে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোন্সের চেষ্টায় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু এর মধ্যে সূচনাই ছিল, এদেশীয়দের শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার প্রয়াস ছিল না। সে কাজের ভার গ্রহণ করে প্রধানত তিনটি বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান, হিন্দু কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটি।

পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষা প্রবর্তনের সংগে সংগেই এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত। এর পূর্ববর্তী সময়ে অধ্যাত্ম সর্বস্বতায় আমাদের বাস্তবদৃষ্টি ঘেরা ছিল। শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার কাজে হিন্দু কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ প্রায় একযোগেই আরম্ভ করে। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার ও বিজ্ঞান অনুশীলনে এদেশীয়দের উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজে সর্বতোমুখ পরিকল্পনা ও সফল প্রয়াসের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে শ্রীরামপুর কলেজের। পরবর্তী যুগে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্যে এই কলেজের প্রভাব সুপরিস্ফুটভাবে দেখা গেছে।

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়দের অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূর করা। শিক্ষাব্রতীর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই মিশনারীত্রয়ী কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় শ্রীরামপুর ডেনিসদের অধিকারে ছিল এবং এই মিশনারীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও ডেনিস সরকারের আনুকূল্যে ইহা এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। সেই মর্যাদা আজও এই কলেজ গৌরবের সহিত বহন করে চলেছে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হতে এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান শুরু হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রথম হতেই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই সময় এই বিষয়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত অধ্যাপক না থাকায় রেভারেণ্ড ওয়ার্ড ইংলণ্ডে গিয়ে বিজ্ঞান অধ্যাপনার জন্য রেভারেণ্ড জন ম্যাককে নিয়ে আসেন। বিজ্ঞান-শিক্ষার কিরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সমাচার দর্পণে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদ হতেই জানা যাবে—
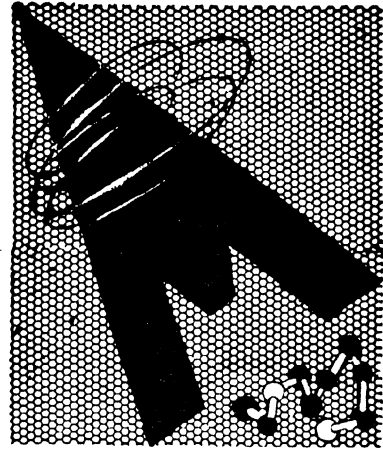
বিজ্ঞান বার্তা

'শ্রীরামপুর কলেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরা বাসনা করিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু কিংবা মুসলমানের সন্তানেরদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগ্যবান লোকের সন্তানেরা ইংরাজী শিক্ষার্থে আসিবেন, তাঁহারা অত্যল্প ব্যয়েতে বিদ্যা পাইবেন। ঐ বিদ্যার্থীরা অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিবেন কিন্তু কলেজের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ সময়ানুসারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে যে ২ ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কলেজের শিক্ষাদাতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কলেজের ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের কোন স্থানে হয় না। যেহেতুক এই কলেজে কেবল সাধারণ ইংরাজীবিদ্যা যে পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ ২ যন্ত্রদর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোলবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা ও পুরাবৃত্তান্তবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এ বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শ্রীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীযুত রিবরেণ্ড কেরী সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন।'

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম আদি পীঠস্থান যে শ্রীরামপুর কলেজ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। রেভারেণ্ড জন ম্যাক বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে সেই সময় এদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং কলকাতার বিভিন্ন স্থানে তিনি রসায়নবিদ্যা শিক্ষা দিবার আহ্বান পেতেন। রেভারেণ্ড জশুয়া মার্শম্যান ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি হানা মার্শম্যানের চেষ্টায় শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই মিশন কয়েকটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করে। হানা মার্শম্যান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলা দেশের প্রাচীনতম বালিকা বিদ্যালয়টি আজও সগৌরবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য কেরী সাহেবের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি টোল এই সময় স্থাপিত হয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে

পারদর্শী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্যকে ইহার প্রধানরূপে নিযুক্ত করা হয়। এখানে হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে বিশদ শিক্ষাদানের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। পাশ্চাত্যধারায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্র বিষয় অনুশীলনের যথোপযুক্ত আয়োজনে এই মিশন যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, এর মধ্য হতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাদি সমন্বিত বীক্ষণাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। রেভারেণ্ড ম্যাক এর অভাব অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা ও নিষ্ঠা যেখানে প্রবল সৌভাগ্য সেখানে আপনা হতেই দেখা দেয়। তাই শ্রীরামপুর কলেজের এই অভাব দূর করার জন্য এগিয়ে এলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী মিঃ জেম্‌স্‌ ডগলাস্‌। তিনি রসায়নের বীক্ষণাগার নির্মাণের জন্য এই মিশনকে ৫০০ পাউণ্ড দান করেন। ঐ অর্থে শ্রীরামপুর কলেজে রসায়নের বীক্ষণাগার নির্মিত হয়, বাংলা দেশে এবং সম্ভবত ভারতবর্ষে এইটাই রসায়নের সর্বপ্রথম বীক্ষণাগার। কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষাদান কার্যে ও গবেষণার কার্যে এই বীক্ষণাগার রেভারেণ্ড ম্যাককে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

মিশনের প্রধান। মহাত্মা উইলিয়াম কেরী নিজে ছিলেন যশস্বী উদ্ভিদ বিজ্ঞান সাধক এবং শ্রীরামপুরে একটি মনোরম উদ্ভিদ উদ্যান তিনি স্থাপন করেন। এই উদ্যানটি শিবপুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদ উদ্যানের প্রায় সমসাময়িক ছিল এবং সেই সময় উভয়ই প্রায় সমান প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতে ও ভারতের বাহিরে অগণিত বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে রেভারেণ্ড কেরী বিভিন্ন শ্রেণীর বহু বৃক্ষলতাদি আনাতেন এবং বিনিময়ে তাঁদেরও দিতেন এখানকার গাছ-গাছড়া ও বীজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রুল বলেছেন,—

'Many plants to be found in Bengal to-day came of seeds first bird borne or wind sown from Carey's garden.'

এই উদ্যানটি দুষ্প্রাপ্য বীজ ও চারা সরবরাহের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। বহু উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদবিদ্যাশিক্ষার্থী এবং পরিদর্শক এখানে আসতেন দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতাদির পরিচয় লাভ করতে এবং ব্র্যাণ্ডিস, ক্লেগহর্ণ প্রভৃতি বনরক্ষকগণ আসতেন গাছ-পালার বৃদ্ধির পরিমাপ দেখবার জন্য। ভারতে উদ্ভিদ বিজ্ঞান অনুশীলন ও গবেষণার সূচনায় এই উদ্যানটির দান অতুলনীয় ও অপরিমেয়। এই উদ্যানের সংগে মহাত্মা কেরী জীববিদ্যা অনুশীলনের উপযোগী একটি ছোট্ট সংগ্রহশালাও গঠন করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের প্রথম সূত্রপাতও হয় শ্রীরামপুর মিশন হতে। নিজস্ব ছাপাখানা ছিল এই মিশনের আর তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল এই মিশন সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশে। এদেশীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষাদান করতে হলে প্রথমে যে এদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রয়োজন এটা খুব ভালভাবেই বুঝেছিলেন এই মিশনারীরা। তাই এঁরা সর্বাগ্রে উদ্যোগী হন বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশে এবং বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ে প্রথম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই মিশন হতে। বাংলা ভাষায় জ্যোতিষ ও ভূগোল সম্বন্ধীয় প্রথম গ্রন্থ 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' রচনা করেন রেভারেণ্ড জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ইহা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। সম্পূর্ণ এদেশীয় ছাঁচে মার্শম্যান গ্রন্থটি রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। যাতে সহজে বোঝবার পক্ষে এদেশীয়দের সুবিধা হয়; সেজন্য সময় ও দূরত্ব বোঝাতে তিনি এদেশীয় একক দণ্ড ও ক্রোশ ব্যবহার করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসরণেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। যাঁরা এই বিষয় শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন এবং পরবর্তী যুগে যাঁরা এই বিষয় গ্রন্থ রচনা করেন তাঁরা সকলেই উপকৃত হয়েছিলেন এই গ্রন্থটি হতে, বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশের কৃতিত্বও এই মিশনের। গ্রন্থটির নাম 'বিদ্যাহারাবলী', যার রচয়িতা, রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায় ফেলিক্স যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে 'বিদ্যাহারাবলী' রচনার মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন তা বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিদ্যাহারাবলীর মাত্র দুই খণ্ড প্রকাশ করেই ফেলিক্স কেরীর বিরাট সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল অবসান হয়। ফলে উহা আর সম্পূর্ণ হতে পায় নি! বিদ্যাহারাবলীর প্রথম খণ্ডে ছিল ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শরীর তত্ত্ব। এই খণ্ডটি প্রতি মাসে একটি একটি করে ১৪টি অংশে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার মোট পৃষ্ঠা ছিল ৬৭২। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডটিতে ছিল স্মৃতিশাস্ত্র। বিদ্যাহারাবলীর মধ্য দিয়া ফেলিক্স কেরী বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগের গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং গ্রন্থরচনায় Encyclopedia Britanica-র ৫ম সংস্করণের অনুকরণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম রসায়নের গ্রন্থরচয়িতা রেভারেণ্ড জন ম্যাক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে দান রেখে গেছেন তার পরিমাপ করা যায় না।

ম্যাকের গ্রন্থটির নাম 'কিমিয়া বিদ্যার সার।' রসায়নের ওপর তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিতেন তারই সারাংশ দিয়ে ইংরাজীতে ও বাংলায় গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ম্যাকের গ্রন্থের অনুবাদ সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে মনে করেন ম্যাকই বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। Friend of India, Bengal Obituary, Life and times of Carey, Marshman and Ward প্রভৃতিতে ফেলিক্স কেরী উহা অনুবাদ করেছেন বলে উল্লেখ আছে। রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরী তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই সময়ের অধ্যক্ষ রক্সবার্গের 'Hortas Bengalensis' এবং 'Flora Indica' নামক দুইটি উদ্ভিদ বিষয়ক মহা মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ও প্রসারে এই গ্রন্থগুলির অতুলনীয় অবদান শিক্ষার্থী ও জনসাধারণকে বিজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল করে তুলেছিল এবং পরবর্তী যুগের বিজ্ঞান সাধনার পথে জুগিয়েছিল অনেকখানি পাথেয়। ইহা ছাড়া প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য বিজ্ঞানের

কপিবুক রচিত হয়েছিল এইখানে এবং পরে অন্যান্য জায়গায় ইহার অনুকরণে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কপিবুক প্রবর্তিত হয়। সেই সময় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন আরও দু'জন ব্যক্তির নাম এই সংগে উল্লেখ করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। এঁদের নাম হল হপকিন্স পিয়ার্স ও উইলিয়াম ইয়েটস্। এঁরা দু'জনেই কর্মজীবনের প্রথমে শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করেন এবং মহাত্মা কেরীর সাহচর্যে এসে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরে তাঁরা স্কুলবুক সোসাইটিতে যোগদান করেন এবং এখান হতে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা স্কুলবুক সোসাইটিকে উন্নততর করে গড়ে তোলেন। পিয়ার্সের রচিত বিজ্ঞানের গ্রন্থ 'ভূগোল বৃত্তান্ত' সে যুগে খুব জনপ্রিয় হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যে তাঁর আরও স্মরণীয় দান হল 'পশ্বাবলীর' প্রথম পর্যায়ের সংখ্যাগুলির বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীরামপুর কলেজের অনুকরণে বিজ্ঞান বিষয়ক কপিবুক রচনা। সে যুগের বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য সাধকদের মধ্যে উইলিয়াম ইয়েটস্ অন্যতম প্রধান। তাঁর 'পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) সম্ভবত বাংলা ভাষায় পদার্থ বিদ্যার প্রথম গ্রন্থ। ইহা ছাড়া তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের একখানি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন।

বিজ্ঞান চর্চাকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশে এই মিশন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্বলিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ করে। 'দিগ্‌দর্শনে' প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি সে সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও ক্রমবিকাশের পথে এই পত্রিকার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় পদার্থ-বিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ক বিবিধ রচনা প্রকাশিত হোত। ইহাতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য :— চুম্বকপাথর ও কম্পাস, বাংলা দেশের বৃক্ষলতাদি, হিন্দুস্থানের ভৌগোলিক বিবরণ, বাষ্পীয় পোতের বিবরণ, পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ, পদার্থের অসংখ্যভাগ, প্রতিধ্বনি, বেলুনে সাদলার সাহেবের আকাশ গমন, বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালন, বিদ্যুৎ ও বজ্র, পৃথিবীর বিভাগের কথা, ভারতের স্বাভাবিক ক্ষ, হস্তীর বিবরণ, তারা, ধাতু প্রভৃতি। উইলিয়াম কেরী, ফেলিক্স কেরী, জন ম্যাক, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ মনিষিবৃন্দ এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। বাংলায় প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র তৈরি করে এই মিশন রেভারেণ্ড ম্যাক ও তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায়।

গ্রন্থাগার শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাই কলেজ স্থাপনের সংগে সংগে ইহার উপযোগী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায়ও এই মিশনারীবৃন্দ উদ্যোগী হয়েছিলেন। গ্রন্থাগারের অতীত ইতিহাসে দেখা যায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার সংগ্রহ অধ্যক্ষ ট্র্যাফোর্ডের ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সূচনায় এই গ্রন্থাগার অনেক সহায়তা করেছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হয়েছিল। সুসংরক্ষিত কেরী গ্রন্থাগারে আজও যেগুলি রক্ষিত আছে তার মধ্যে নিউটন, বয়েল, ফ্যারাডে, ল্যাপল্যাস প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীর লেখা এবং প্ল্যান্ট এসিয়াটিকে রেয়রাস, ফ্লোরা ইণ্ডিকা, হর্টাস বেঙ্গলেনসীস মহামূল্যবান উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

জনপ্রিয় বক্তৃতার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের সূচনাতেও এই মিশনের দান অতুলনীয়। মহাত্মা কেরী ও জন ম্যাক শ্রীরামপুর ও কলিকাতার বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান ও সম্মেলনে উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়ন বিষয়ে আকর্ষণীয় বক্তৃতা দিতেন। বিদ্যোৎসাহী বহু ইউরোপীয় ও এদেশীয় ব্যক্তি এই সমস্ত বক্তৃতা সভায় উপস্থিত থাকতেন। রেভারেণ্ড ম্যাকের এসিয়াটিক সোসাইটিতে বক্তৃতা সম্পর্কে লিখিত আছে—

'Mr. Mack was also encouraged to give a course of chemical lectures in Calcutta by the gentlemen who were attached to science; and Lord Hestings on the last occasion of presiding at the meetings of the Asiatic Society, proposed that its room should be placed at his disposal..'

মহানুভব ম্যাক তাঁর বক্তৃতা দ্বারা অর্জিত সমুদয় অর্থ মিশনকে দান করে দিয়েছিলেন।

দিও বিজ্ঞান চচা প্রচলনে এই মিশন ছিল সম্পূর্ণ আত্ম শীল, তবু সেই যুগে এই বিষয়ে উদ্যোগী সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সহিত ইহার সংযোগ ও সহযোগিতা ছিল। প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ যাদের সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে স্কুল বুক সোসাইটি, এসিয়াটিক সোসাইটি, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতির নাম উলেখযোগ্য। শ্রীরামপুর মিশনের বিশেষ করে সকলকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিল।

তবে মিশনের স কার্যকে কয়েকজন শিক্ষাব্রতী, মহাপ্রাণ মিশনারীর ব্যক্তিগত বলে বর্ণনা করা যায়। এই মিশন প্রতিষ্ঠা করে ইহাকে গৌরবজনক আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করার সমস্ত কৃতিত্বটাই তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফল। পর পৃষ্ঠায় তালিকায় তাঁদের কয়েকজনের বিজ্ঞান চর্চার সূচনাকার্যে ব্যক্তিগত সাফল্য লিপিবদ্ধ করা হোল :—

শিক্ষার যে আলোকব সেই নবযুগের সন্ধিক্ষণে শ্রীরামপুর কলেজ প্রজ্বলিত করেছিল, তা সারা ভারতে বিস্তৃত হয়ে দীপ্ত শিখায় সমুজ্জ্বল এবং যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি আজ উপেক্ষণীয় নয়, সেই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ম ও শৈশব লালন হয়েছে শ্রীরামপুর কলেজে, তা এই ঐতিহ্যময় কলেজের পক্ষে কম গৌরবজনক নয়। বাংলা ভাষাও সাহিত্যে বিজ্ঞান প্রকাশের যে সূচনা হয়েছিল এই কলেজে, আজ তার অগ্রগমন হয়েছে অনেকদূর। বহু শক্তিমান লেখকের বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে আবির্ভাব বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে যে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু শ্রীরামপুর কলেজের কর্মক্ষেত্র আজ অনেক সঙ্কুচিত, তবু আজও বিজ্ঞান শিক্ষাদানে বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর কলেজের মধ্যে অন্যতম এবং বীক্ষণাগার সংগঠনে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

ব্যক্তির নাম	কার্যকালের সময় (খৃষ্টাব্দ)	বিদ্যালয়, বীক্ষণাগার, উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা	গ্রন্থরচনা ও সম্পাদনা	পত্রিকা প্রকাশ	জনপ্রিয় বক্তৃতা দান	অধ্যাপনা	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী
রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরী	১৮০০ হইতে ১৮৩৪	(১) শ্রীরামপুর কলেজ (২) অনেকগুলি বিদ্যালয় (৩) উদ্ভিদ উদ্যান	সকলের গ্রন্থ রচনায় সাহায্য এবং রক্সবার্গের ফ্লোরা ইণ্ডিকা ও হর্টাস বেঙ্গলেনসীস এর সম্পাদনা	দিগ্‌দর্শন প্রকাশে সাহায্য	এসিয়াটিক সোসাইটিতে উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্ক	শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ	(১) শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অস্থায়ী অধ্যক্ষ (২) বনরক্ষণ সম্পর্কে ভারত-সরকারকে উপদেশ (৩ ইংলণ্ডের লিনিয়ান সোসাইটি, জিওলজিক্যাল সোসাইটি, হর্টিকালচারাল সোসাইটির সভ্য, (৪) এসিয়াটিক রিসার্চ দিগ্‌দর্শন প্রভৃতিতে প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি (৫) এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা
মিঃ ফেলিক্স কেরী	১৮০০ হইতে ১৮০৭ এবং ১৮১৮-১৮২২	—	( ) বিদ্যা হারাবলী (দুই খণ্ড) ২) জন ম্যাকের রসায়ন পুস্তকের অনুবাদ	—	—	—	(১) দিগ্‌দর্শনে প্রবন্ধ রচনা (২) চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ
রেভারেণ্ড জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮০০ হইতে ১৮৭৭	—	জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়	দিগ্‌দর্শন	—	—	দিগ্‌দর্শনের প্রবন্ধ রচনা
রেভারেণ্ড জন ম্যাক	১৮২১ হইতে ১৮৪৫	রসায়নের বীক্ষণাগার স্থাপন	কিমিয়া বিদ্যাসার	—	এসিয়াটিক সোসাইটিতে রসায়নের বক্তৃতা	শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ	(১) দিগ্‌দর্শনে প্রবন্ধ রচনা (২) ভারতবর্ষের একটি সুন্দর বাংলায় মানচিত্র তৈরি করান

রকেট বিজ্ঞানের প্রথম যুগ

আজকের দিনে দশ টন বারো টন রকেট ওড়ানো হচ্ছে মহাকাশে, যার কোনোটার গতি ঘণ্টায় বারো হাজার মাইল, কোনোটার পনেরো হাজার মাইল, কোনোটার বা আঠারো হাজার মাইল। এই ব্যাপারগুলি খবরের কাগজে দিনের পর দিন গত কয়েক বছর ধরে পড়তে পড়তে আজকের দিনে এমনই হয়ে গেছে আমাদের যে চেষ্টা করেও আর যেন বিস্মিত হতে পারি না। যাকে বলে গা-সওয়া হয়ে গেছে খবরগুলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জার্মানী 'ফ্লাইং বোমা' এবং 'ভি-২' ছুড়তে আরম্ভ করেছিল বৃটেনের দিকে, তখন থেকে রকেট সম্বন্ধে, সাধারণের জানবার আগ্রহ দেখা দেয়, যদিও বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে তারও অন্তত তিরিশ বছর আগে থেকেই নানা গবেষণা করে আসছিলেন। আজকের আঠারো হাজার মাইল ঘণ্টায় গতিবেগসম্পন্ন রকেটের প্রথম যুগের কথা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর।

পৃথিবীতে রকেট বিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী। নাম ছিলো তাঁর ডাঃ রবার্ট হাচিন্স গডার্ড (১৮৮২—১৯৪৫)। ডাঃ গডার্ডই প্রথম তরল-জ্বালানীর সাহায্যে মহাশূন্য লক্ষ্য করে একটি রকেট ছুঁড়েছিলেন। এটা ১৯০৮ সালের কথা, পরীক্ষা কার্য চালাবার সময় কিছুটা আকস্মিকভাবে এই প্রথম রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে গডার্ড নিজে এ সম্বন্ধে

কোনো কৃতিত্ব দাবী করতেন না। কারণ ঠিক কি করে যে রকেটটা উৎক্ষিপ্ত হলো, কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তাঁর সেই ক্ষুদ্র রকেটটির তরল জ্বালানীতে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল গডার্ডের নিজের পক্ষেই তা বুঝে উঠতে আরো চার বছর সময় লেগেছিল। ১৯১২—১৩ সালের কথা। সে সময়ে উনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার একজন অধ্যাপক। এই সময়ই প্রথম রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হবার রহস্য পুরোপুরি উনি বুঝতে পারেন। এই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই ডাঃ গডার্ড অধ্যাপক হিসেবে নিজের সামান্য রোজগার থেকে কিছু কিছু টাকা বাঁচিয়ে আরো চার বছর সম্পূর্ণ একভাবেই গবেষণা চালাতে থাকেন। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত দেখা যায় ডাঃ গডার্ড মোট প্রায় চার হাজার টাকা খরচ করেছেন রকেট সম্পর্কে গবেষণার জন্য।

এরপর ডাঃ গডার্ড বুঝতে পারলেন যে এবার গবেষণা চালাতে হলে যে খরচ হবে তা আর নিজের পক্ষে যোগাড় করা অসম্ভব। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পত্রালাপ সুরু করলেন এ সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহী করে তোলবার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান ওঁকে প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো। দু' এক জায়গা থেকে ব্যাপারটাকে 'আজগুবি' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও হলো। কিন্তু ডাঃ গডার্ড দমবার পাত্র নন এবং শেষ পর্যন্ত স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশন রাজী হলো রকেট সম্পর্কে গবেষণার জন্যে ডাঃ গডার্ডকে খরচ জুগিয়ে যাবার জন্যে।

রকেট ওড়াবার থিয়োরী সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও ঘরোয়া পরিবেশে ক্ষুদ্র রকেট নিয়ে পরীক্ষা চালাবার পরে এবার যে বৃহৎ আকারের রকেট নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন ডাঃ গডার্ড তার প্রথম সাফল্য দেখা গেলো প্রায় দশ বছর বাদে। ১৯২৬ সালের ১৬ই মার্চ ডাঃ গডার্ড নিজের তৈরি রকেট সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছে মতো মহাশূন্যে লক্ষ্য করে ছুড়লেন। ওঁকে বাদ দিয়ে আরো তিনজন মানুষ নবযুগের এই কীর্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁরা হলেন হেনরী স্যাকস নামে একজন মেকানিক, ডাঃ আর পি কুপ নামে একজন সহকারী অধ্যাপক এবং মিসেস গডার্ড।

এই রকেটটির দৈর্ঘ্য ছিল দশ ফুট। দু'পাশে ইস্পাতের শিক দিয়ে এর ফ্রেম তৈরি করা হয়েছিল। যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা ছিল কিছু একেবারে গোড়ার দিকে, আর কিছু একেবারে আগার দিকে। ঘণ্টায় যাট মাইল বেগে মোট আড়াই সেকেণ্ড এ রকেটটি শূন্যে ভ্রমণ করেছিল—প্রায় ১৮৪ ফুট।

প্রকাশ্যভাবে এই প্রাথমিক সাফল্যের পরে ডাঃ গডার্ড আরো তিন বছর স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশনের সাহায্যেই গবেষণা চালাতে লাগলেন এবং আরো কয়েকটি রকেট সাফল্যের সঙ্গেই ওড়ালেন। এরপর গবেষণা চালানোর জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়লো স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষ তা মঞ্জুর করতে সাহসী হলেন না। ডাঃ গডার্ড স্পষ্টই জানালেন যে এবার গবেষণাকে যে স্তরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তার জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার প্রয়োজন।

ধনীর দেশ আমেরিকাতে ভালো কাজের জন্যে অর্থের অভাব আগেও কখনো হয় নি, এ ক্ষেত্রেও হলো না। ডানিয়েল গাগেনহাইম নামে এক কোটিপতি এগিয়ে এলেন ডাঃ গডার্ডের গবেষণায় সাহায্যের জন্যে। নিউ মেকসিকোর ম্যাসকালেরোতে কয়েক শত একর জায়গার বন্দোবস্ত হলো রকেট বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে এবং ১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যে রকেটটি ছোড়া হলো, তার সাফল্যের সংবাদ পৃথিবীর অনেক সংবাদপত্রেই ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। যারা এর গুরুত্ব বুঝতে পারে নি তখন তারাও সংবাদটা ছেপেছিল, তবে ব্যঙ্গাত্মক টিপ্পনীর সঙ্গে। খাস আমেরিকারই একটি কাগজ মন্তব্য করেছিল : বৃথাই ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ভদ্রলোককে ডক্টরেট দিয়েছে। আসলে উনি একজন লুনাটিক, তা না হলে লুনারস্ফিয়ারের দিকে কারো আগ্রহ থাকে।

এই রকেটটি দৈর্ঘ্যে ছিলো ১১ ফুট, ওজন ৩৩ পাউণ্ড, ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে ঊর্ধ্বে ২০০০ ফুট পর্যন্ত এ রকেটটি পৌঁছেছিল।

এর চার বছর পরে ডাঃ গডার্ড যে রকেটটি ছুড়লেন তা ঊর্ধ্বে উঠলো প্রায় হাজার ফুট, কিন্তু দূরত্ব অতিক্রম করলো প্রায় ১১,০০০ ফুট, এবার গতিবেগ পৌঁছলো ৭০০ মাইলে।

গাগেনহাইম ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে ডাঃ গডার্ড তাঁর তৃতীয় রকেটটি ছুড়লেন ১৯৩৫ সালের, ৮ই মার্চ। এ রকেটটি ঊর্ধ্বে ৪৮০০ ফুট উঠলো এবং ঘণ্টায় ৫৫০ মাইল বেগে প্রায় ১৩,০০০ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করলো।

ডাঃ গডার্ড তাঁর শেষ রকেট পরীক্ষা করেন ১৯৩৫ সালের ১৪ই অক্টোবর। এ রকেটের গতিবেগ প্রায় ৮০০ মাইলে পৌঁছেছিল। এই রকেটটির ওজন ছিলো ৮৫ পাউণ্ড এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। এর কিছুদিন পরই, ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে কিছুটা আকস্মিকভাবে একদিন ডাঃ গডার্ড ঘোষণা করলেন যে রকেট নিয়ে উনি আর গবেষণা করবেন না। কেন, সে সম্পর্কে উনি নিজে কখনো কিছু কারণ দেখান নি। তবে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে যাঁরা জানতেন তাঁরা বলতেন যে মহাশূন্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানলাভের বাহন হবার চাইতে সমর নায়কদের হাতিয়ার হয়ে উঠবার আশঙ্কা দেখেই নিবিরোধী এবং শান্তিপ্রিয় বিজ্ঞান সাধক ডাঃ গডার্ড ঐরকম আকস্মিকভাবে তাঁর সারা জীবনের সাধনা রকেট গবেষণায় ইস্তফা দেন।

সবার কথা

শ্রীশান্তিময় ঘোষাল

হে কবি, সবার কথা লিখবো কবে বল ?—
জীবন ভরে গাইব সবার গান !
মিথ্যা কথার জাল বোনা, সাঙ্গ হবে কবে ?
জীবন-বেদে রইবে তোমার দান !

আজকে যারা ব্যথায় ভরা প্রাণে,
ব্যস্ত সদা নানান কাজে কবি,
আগামী দিন আসবে কবে বলতে পার তুমি ?
সবার সাথে আঁকব সবার ছবি।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

তাই···তাই দেব আমি। হ্যাঁ, আমি তাই দেব। তবু তুমি একটু···একটু ভালবাস আমাকে। একটুখানি তাকাও আমার দিকে—আমি প্রতিজ্ঞা করছি তুমি যা চাও তাই তোমাকে দেব। তুমি যা বল তাই করব।

দু'হাতে প্রবীরকে জড়িয়ে ধরেছিল প্রতিমা।

এইভাবে ধীরে ধীরে প্রতিমার আকাঙ্ক্ষার রূপ প্রবীরকে জড়িয়ে ধরে। প্রতিমার হৃদয় খুঁজতে গিয়ে যে গহন অরণ্যের মধ্যে সে প্রবেশ করে সেখান থেকে ফেরবার পথ নেই। যে-ভাবেই হোক ওর হারানো হৃদয় খুঁজে বের করতেই হবে। সেই হৃদয় খুঁজে পেলেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। ভালবাসতে পারবে প্রতিমা—পাথরের মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার হবে।

—কি চাও তুমি? হেসে প্রতিমাকে বলো বর, বড় বাড়ি প্রকাণ্ড গাড়ি···

—আর অনেক টাকা।

—অনেক—ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল প্রবীর, মানে কত? নির্দিষ্ট সংখ্যা বল যেন সেইটুকু সংগ্রহ করেই মুক্তি পাই।

—যেন আমি যা বলবো তাই তুমি আনতে পারবে? হেসেছিল প্রতিমা।

—পারি না পারি চেষ্টা তো করতে দোষ নেই।

সেই চেষ্টাতেই নেমেছিল প্রবীর। ওর পৈত্রিক ব্যবসা খুবই লাভজনক। এতদিন সেদিকে কোন নজর দেয় নি প্রবীর। ম্যানেজার যা খুশি তাই করতো। পুরোদমে কাজ সুরু করে সে। আরো পার্টনার—আরো মূলধন, টাকা লাগানো টাকা বাড়ানো।

প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ শরীর-মন দুই-ই বিকল হয়ে ওঠে। কা থাকে প্রবীর—মনে আশা, একদিন সে নিশ্চয়ই পাবে প্রতি —খুঁজে বের করতে পারবে তার হৃদয়···

যেদিন সে প্রথম জানলো হৃদয় নেই সেদিনের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার···

সেদিন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল প্রবীর। মাতাল হয় নি—কিন্তু মাথাটা একটু ঝিমঝিম—আর মন যেন আরও উদগ্র।

ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডেকেছিল: প্রতিমা···প্রতিমা···

এগিয়ে এল নীল শাড়ী পরা অপরূপ মূর্তি।

রাত্রে নীল রং এত সুন্দর দেখায়? কি অনুপম। কি পবিত্র। কি সুন্দর।

কয়েক হাত পিছিয়ে এসেছিল প্রবীর। প্রতিমা, আমি আজ মদ খেয়েছি—থমকে থমকে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিল প্রবীর।

এক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল প্রতিমা। চোখে কিন্তু আলো জ্বলে নি। শান্ত স্থিরকণ্ঠে বলেছিল, ব্যবসা করতে গেলে ও-সব একআধটু খেতেই হবে—এতদিনে এই একটি কথা থেকেই প্রতিমাকে চিনতে পেরেছিল প্রবীর। বুঝেছিল, প্রতিমার হৃদয় নেই।

হৃদয় নেই। সেই শূন্য গহ্বরে শুধুমাত্র একটি জিনিস আছে দুর্দান্ত দুর্দম আকাঙ্ক্ষা—তার মনে ভাবের আবেগ নেই, রমণীর মিষ্টতা নেই, নেই পুরুষোচিত উদারতা—শুধু তীব্র তীক্ষ্ণ তীরের মত ঋজু শৈশবলালিত আকাঙ্ক্ষা।

সেই আকাঙ্ক্ষা নিজে সে পূরণ করতে পারে নি—তাই সে বিয়ে করেছে—ভালবেসে নয়—নিজের খুশিমত কাজ করিয়ে নেবার জন্য প্রবীরকে দান করেছে দেহ। স্বামীকে ব্যবহার করেছে উপায়রূপে।

—তুমি কি? তুমি একটা বেশ্যা—দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল প্রবীর। জোরে বলতে সে পারে নি। মনে পড়েছিল, অনেকদিন আগে একটি পতিতালয়ে গিয়েছিল সে। প্রথম শ্রেণীর বারবনিতা। রেট তাদের বাঁধা। তবুও, মেয়েটি বারবার বলেছিল—টাকা দিন, টাকা দিন। মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছিল তার।

—টাকা তো নিশ্চয়ই পাবে। বিরসকণ্ঠে বলেছিল প্রবীর।

—না, না, দিন আগে দিন। কথাটা খুবই সাধারণ কিন্তু এমন একটা অদ্ভুতকণ্ঠে মেয়েটি বলে যে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় প্রবীরের। টাকাগুলি বের করে ছুড়ে দেয়—

কি রকম ভঙ্গিতে যেন টাকাগুলি তুলে নেয় মেয়েটি—কি রকম একটা অদ্ভুত তৎপরতা—আর চোখ দু'টি জ্বলে ওঠে বেড়ালের মত।

আরো অনেকক্ষণ পরে প্রবীর ওর হাতদু'টো দুমড়ে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কত টাকা দিলে এরকমভাবে হাত মোচড়াতে দেবে এক দণ্টা? আর যদি তোমার বুক থেকে কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নিই তবে কত টাকা লাগবে?···

যন্ত্রণায় ও বিস্ময়ে চেঁচিয়েছিল মেয়েটি—পাগল···পাগল···বদ্ধ পাগল···

পাশের ঘরের মেয়েরা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। আজ প্রতিমাকে ঠিক তেমনি নিষ্পেষিত করতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রবীরের, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে, কত···কত টাকা তুমি চাও? সম্পদ? অট্টালিকা? গাড়ি? দাস দাসী? কি পেলে তুমি সুখী হবে? কি মূল্যে তুমি নিংড়ে নিতে দেবে তোমার বুকের রস।

দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায় প্রবীর। খোলা চোখ—তবু যেন কিছুই দেখতে পায় না সে। অন্ধের মত, নিয়তির মত এগিয়ে যায় সে।

—পড়ে যাবে যে? ধমকে ওঠে প্রতিমা।

—পড়ে যাব?···পড়ে···। ভ্রূটা একটু কুঁচকে ওঠে প্রবীরের। প্রতিমা ওর কাছে—খুবই কাছে দাঁড়িয়ে আছে···নীলশাড়ি পরা প্রতিমা—আরও কাছে আসে প্রতিমা—বিগলিত আত্মসমর্পণ—

তবু, তবু সহজ হতে পারে না প্রবীর। এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমা, তবু যেন কত দূরে সরে গেছে। নরম নমনীয়তার মধ্যে কি যেন কঠিন স্পর্শ—একপাত্র মাখনের মধ্যে একটুকরো পাথর—তীক্ষ্ণ ছুঁচালো পাথর—ঐ পাথরের টুকরোটা খুঁজে বের করবে প্রবীর দূরে ফেলে দেবে আর এই মাখনটুকু দু'হাতে চটকে মেখে নেবে গায়ে পায়ে—

কিন্তু···আত্মস্থ গভীর গম্ভীর পদক্ষেপ প্রবীরের একমুহূর্তেই অপ্রতিভ অবশ—প্রবীর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে প্রতিমাকে—আমার স্ত্রী···আমার···আমার···আমার···তবু বারবার প্রতিমা যেন গলে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কি করে? একটুও তো বাধা দিচ্ছে না সে—তবু কেন তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে রাখতে পারছে না প্রবীর—কেন তাকে পারছে না মিশিয়ে গলিয়ে দিতে—কি অদ্ভুত এ আত্মসমর্পণের ভঙ্গী! শান্ত গম্ভীর সুচিন্তিত। কি আশ্চর্য দুর্বোধ্য ওর মুখভাব? চুম্বন দেবার জন্য নামিয়ে আনা মুখ কি এমন হয়? এমন উগ্রতাহীন অহমিকায় ভরা—

কি ভাবছে এই মুহূর্তে? কেন এগিয়ে এসেছে প্রতিমা? কেন ধরা দিয়েছে আলিঙ্গনে? ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়।

শিশির ধোয়া গোলাপের মুখ, পিঙ্গল দু'টি চোখ আর কঠিন একটুকরো পাথুরে হৃদয়—কে এ। কোনদিন কি একে চিনতে পারবে প্রবীর? কোনদিন কি পারবে একে জয় করতে? দিন দিন প্রতিদিন মিশে, সমস্ত অধিকার সত্ত্বেও একে এত অপরিচিত মনে হয় কেন? চিরকালই কি প্রতিমা তার নিকট হয়ে থাকবে প্রহেলিকারূপিণী? চিরকালই কি?

কি আশ্চর্য এই নারী? এত নিকট অথচ এত সুদূর? সহজ সরল অথচ রহস্যময়। ভীষণ মধুর। দিবস-রজনীর সঙ্গিনী অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কি অদ্ভুত চোখ ওর? একবার মাত্র তাকিয়ে ও ঐ পিঙ্গল ছায়ায় প্রবীরের বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা সমস্ত মিশিয়ে দিতে পারে ধূলায়।

পারে নি। প্রতিমাকে জয় করতে পারে নি সে কখনও। প্রেম দিয়ে নয়, শক্তি দিয়ে নয়, সম্পদ দিয়ে নয়, ঘৃণা দিয়ে নয় কোন কিছু দিয়েই প্রতিমাকে জয় করতে পারে নি প্রবীর। কিন্তু, ধীরে ধীরে আঘাতে আঘাতে ওর মনটা পরিণত হয়েছে আর একটুকরো পাথরে।···

তাই আজ সে সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে প্রবীর।

আর্তনাদ করে ওঠে প্রতিমা। কেন শুনেছিলে আমার কথা? কেন চল নি নিজের মতে? কেন বাধা দাও নি আমাকে?

দু'টো কথা যদি আগে জানতে পারতাম, কার্পেটের গোলাপের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ভাবে রত্না, দু'টি কথা যদি আগে জানতে পারতাম তাহলে···স্বামীর বিদ্রূপভরা মন্তব্যই মনে পড়ে, হাতী দশা হোত না।

নিজের শ্রীহীন, আভরণহীন হাতদু'টির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রত্না ভাবে, এ রকম মন্তব্য করা ওর মতো লোকের পক্ষেই সম্ভব। যদি এই কথাটা আগে জানা থাকতো—অভিজাত হলেই তার রক্ত নীল হয় না—চোখে পিঙ্গল ছায়া পড়ে না। অভিজাত দেহেও আছে নোংরা, কালো রক্ত—আর পচা গন্ধ।

কপর্দকহীন, বয়স্ক সুপ্রিয় রায়কে বিয়ে করবার মূলে ছিল এই কথাটা—সুপ্রিয় রায় অভিজাত।

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।'

পর্বত নিজে মেঘ না হতে পেরে মেঘের ছায়ায় আকাশে উড়তে চেয়েছিল। তখন যদি একটা কথা জানতে পারতো রত্না—যদি জানতো অভিজাত বংশে জন্ম হলেই তার রক্ত নীল হয় না—চোখে পিঙ্গল ছায়া ভাসে না আর, যদি সে জানতো যে অনাদিনাথ ঐ একচক্ষু সিংহ প্রহরীর বাড়িটার জন্যই শুধু আসেন নি তাঁর আগমনের পেছনের ইতিহাস গভীর ও কালো। কালোবাজারের কালোছায়ার হাত এড়াবার জন্যই তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পালিয়ে এসেও রক্ষা পান নি। তাঁর কলকাতার বাড়ি, নগদ টাকা সব শেষ করে তবে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন ঐ কালোছায়ার হাত থেকে।

শেষটা শুধু গ্রামের এই বাড়িটাই ছিল অনাদিনাথের। সংস্কার অভাবে জীর্ণ। তবু, যা হোক জীবনের একটা অবলম্বন। পুকুরে মাছ রাখা হয়। যে জায়গাটা খেলবার জন্য 'লন' করা হয়েছিল সেখানে হয়েছে সব্জিবাগান। কিছু জমি কেনা হয়েছিল তাই এখন চাষ করে খাচ্ছে রত্নার ভাইরা।

আর রত্নার অবস্থা···

রত্নার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে—সে না তাকিয়েও অনুভব করে স্বামীর নীরব ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি। সে দেরী করছে দেখে রেগে যাচ্ছে সুপ্রিয় রায় এবং বাড়ি ফিরে এই অবাধ্যতার ফল ভুগতে হবে রত্নাকে।

হাতের পোড়া জায়গাটা যেন নতুন করে কুঁচকে ওঠে। মানুষ অকারণে কি নিষ্ঠুর-ই না হতে পারে।

—মানুষ অকারণে কি নিষ্ঠুরই না হতে পারে, ভাবে প্রতিমা। পায়ের নীচের কার্পেটের ফুল কখন সরে গেছে—সেখানে দেখা যাচ্ছে কালো একটা ফাটল। সেই কালো ফাটলে পা দিয়ে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিমা। নিজের বাড়ির বারান্দায় একটি ভাস্ত' মর্মরমূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছিল সেখানে··সেখানেই···

সেই কিশোরী দেখতে পেল তাদের বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামলো। দু'টো তেজী কালো ঘোড়া—আর চকচকে কালো একটা গাড়ি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে সেদিকে। নিজের অজ্ঞাতসারে চোখ জলে ভরে ওঠে। গাড়ি—ঘোড়া।

তখন ফুলবাগানে ফুল ফুটতো। ও স্পষ্ট দেখতে পায়—কুড়চি আর টগর গাছের আড়ালে থেকে একটি ছোট মুখ উঁকি দিচ্ছে। হাসি, হাসি দুষ্টুমিভরা অপূর্ব একটি মুখ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে যেন নিঃশ্বাস ফেললেই লোক জানতে পারবে তার লুকিয়ে থাকবার কথা। সামনেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। চকচকে কালো ঘোড়া দু'টি যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে।

তারপরে, সুরকিঢালা পথে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঁকি দিয়ে মুখটা একটু বের করে আবার টেনে নেয়। পায়ের শব্দ এই গাছদু'টির কাছে এসে একবার থামে। অন্তত তাই মনে হয় সেই মেয়েটির। তখনই সে হাসতে হাসতে ছুটতে ছুটতে, লাফাতে লাফাতে এসে জড়িয়ে ধরতো তাঁর হাত।

—আজও তুমি। হাসতে হাসতে উনি বলতেন।

— হ্যাঁ, আজও আমি। মেয়েটি উত্তর দিতো।

এক দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠতো সে। তারপরে জোর কদমে ঘোড়াদু'টি এগিয়ে যেতো। মাটির বাঁধানো পথের দু'দিকে ঝাউগাছ —মাথা হেলিয়ে গা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে দেখা যায় একের পর এক গাছের সারি। খুব ভালো লাগতো তার।

গাড়ি থেকে কালো মোটা একটি মেয়ে নামে। তার পেছনে পেছনে আরও কয়েকটি মেয়ে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে প্রতিমা—রত্না—রত্না গুহ আর তার পেছনে তাদের ক্লাশেরই মেয়ে। কেন এখানে এসেছে? কি চায় ওরা?

ততক্ষণে ওরা এগিয়ে এসেছে। রত্নার দামী, সোনালী জুতো জোড়া যেন শুকনো ঘাসের ওপরে বড় বেশি শব্দ করছে।

—ভাই, আমার বিয়ে—তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে। দূর থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে আসে রত্না। কাছে এসে আবার বলে, তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কিশোরী প্রাণপণে একটি কথাই ভাবছিল, ও যেন আমার গায়ে হাত না দেয়, কিন্তু ঠিক তাই ঘটলো।

রত্না ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, যাবে তো ভাই।

—না।

অকস্মাৎ রূঢ় হয়ে ওঠে কিশোরীর কণ্ঠ।

সঙ্গে সঙ্গে সাপিনীর মত ফোঁস করে ওঠে রত্না, কেন? সবাই যাবে তুমি যাবে না কেন?

—না, সবাই গেলেও আমি যাব না।

—তোমাকে যেতেই হবে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়েছিল রত্না, তুমি একজন সাধারণ মেয়ে প্রতিমা রায়চৌধুরী অত অহংকার তোমার সাজে না।

—হ্যাঁ, ওকে আমি বলেছিলাম, মাথা নাড়ে রত্না, ওকে অপমান করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে অপমান করেছিলাম। ত্রিপুরাশঙ্করের কালো গাড়িটা চেপে আমি গিয়েছিলাম নিমন্ত্রণ করতে—সঙ্গে ছিল আমারই কয়েকটি একান্ত অনুগত মেয়ে। ওরা সব কথাতেই হিঃ! হিঃ! করে হাসছিল! আমি বললাম যে কথাটা অনেকদিন থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো আমার মনে জমেছিল সেই কথাটাই। আমি বললাম—তুমি সাধারণ মেয়ে প্রতিমা রায়চৌধুরী অত অহংকার তোমার সাজে না—ওর মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল—অন্য মেয়েগুলি হেসে হেসে একজন অপরের গায়ে ঢলে পড়ে। আমি কিন্তু হাসি নি আর অনেকদিন সেই মুখটাকে ভুলতে পারি নি!

তারপরে—এই আবার দেখলাম। সেদিনের পরে ও আর স্কুলে আসে নি। শুনেছিলাম, মফস্বল শহরে চলে গেছে আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়বার জন্য।

—প্রতিমা রায়চৌধুরী, তুমি সত্যি অসাধারণ, বারবার নিজের মনে বলতে থাকে রত্না, তুমি সত্যই অসাধারণ। কোন পারিপার্শ্বিক তোমাকে আটকাতে পারবে না। তোমাকে সবাই পথ ছেড়ে দেবে। রাজেন্দ্রাণী হবার জন্যই তোমার জন্ম, তুমি চিরবন্দিতা ইন্দ্রাণী।

এই ক'টি কথা যদি জোরে বলতে পারতাম, চাপা রাগে ভরা সুপ্রিয়ের মুখটা দেখতে দেখতে রত্না ভাবে, তাহলেই আমার স্বামী খুশি
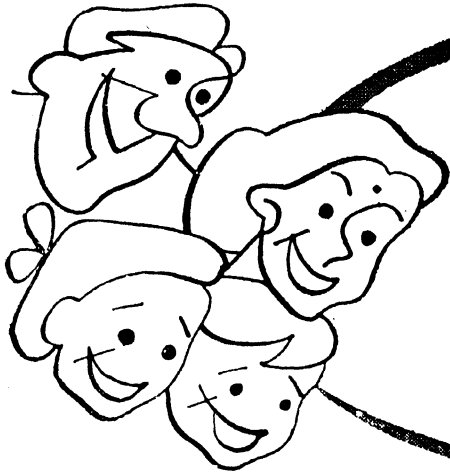
হোত। কিন্তু তা আমি বলতে পারব না। কিছুতেই নয়। যাকে ভালোবেসেছিলাম, যাকে ঘৃণা করেছি তার কাছে নীচু হতে পারব না। তার চেয়ে আমি মরে যাব।

ও দেখতে পায় সুপ্রিয় ওর দিকে দু'টো হাত মুঠো করে ছুটে আসছে আমি ভয় পাই না—আমি ভয় পাই না। ও চেঁচিয়ে বলে ওঠে, কি করবে তুমি? আমাকে মেরে ফেলবে তো। মরতেই আমি চাই। মৃত্যু চাই—মৃত্যু—মৃত্যু···দু' হাতে মুখ ঢেকে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি হয়েছে ওর? ও শুনতে পায় কোমল মিষ্টি গলায় কেউ প্রশ্ন করছে।

—মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। সুপ্রিয়ের কণ্ঠস্বর। আর মাথা খারাপ হলেও কোন দোষ দেওয়া যায় না যা কষ্ট পেয়েছে।

—কি কষ্ট?

—তাহলে আপনাকে সব কথা খুলে বলি। বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি সাহায্য না করলে আমরা ভেসে যাব। আমার চারটি ছেলেমেয়ে পথের ভিখারী হবে। আমি আপনার কর্মচারী আমাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আমি দোষ করেছি আমাকে শাস্তি দিন নিজে হাতে শাস্তি দিন কিন্তু আমাকে শেষ করে দেবেন না দোহাই আপনার, পায়ে পড়ছি মা······

—আমি মরে গেছি তাই নরকের আগুনে এসে এসব কথা শুনছি, রত্না মনে মনে ভাবে।

—আমি কিছু জানি না।

—না, আপনি জানেন না, এমন কি সাহেবও জানেন না। এতো তুচ্ছ ব্যাপার আপনাদের জানবার কথা নয়, আমি এক তুচ্ছ কর্মচারী। নগণ্য অত্যন্ত সামান্য মা।

—অসহ্য। নরকের এই যন্ত্রণা অসহ্য। রত্না মনে মনে ভাবে।

—আমি দায়ে পড়ে, বিপদে পড়ে অফিসের টাকা ভেঙ্গেছি। ম্যানেজারবাবু থানায় খবর দিয়েছেন? আমাকে বাঁচান মা বাঁচান। এখনই যদি টাকাটা দিয়ে দিতে পারি তাহলে সব মিটে যায়। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা আমি কোথায় পাব?

তাকিয়েই ছিল রত্না কিন্তু এতক্ষণ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ ওর চোখে পড়ে দেবীর মত একটি মূর্তি এগিয়ে আসছে। তার চোখে জল। সেই অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে চারিদিকের নরকের আগুন নিভে যায়।

সেই অপরূপ মূর্তি এগিয়ে আসে রত্নার হাত ধরে কান্নাভরা কণ্ঠে বলে, ভাই তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিলেই স্বামীকে ফিরিয়ে পাবে। কিন্তু আমি কি দিলে আমার স্বামীকে পাব তা বলতে পারো। যা চেয়েছিলাম, যা পেয়েছি সব-ই আমি তাঁকে পাবার জন্য ত্যাগ করতে রাজী কিন্তু তিনি কোথায়?

লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। একবারমাত্র তাকিয়েই জানালা সজোরে বন্ধ করে দেয় প্রিয়া। লাল রং সে দু'চোখে দেখতে পারে না। বিশেষত আকাশের এই রংয়ের খেলা তার কাছে প্রকৃতির অসহ্য ন্যাকামী বলে মনে হচ্ছে। যেন কোন বুড়ো খোকা আধো আধো হাসি হাসবার চেষ্টা করছে।

একতলা নীচু ছাদের ঘর। এমনিতেই স্যাঁৎস্যেঁতে আর অন্ধকার। দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়ায় একফোঁটা বাতাস ঢোকে না সেখানে। ছোট টেবিলল্যাম্পটা জালিয়ে দেয় প্রিয়া। কালো ঢাকা দেওয়া টেবিলল্যাম্প। বেশ লাগে কালো আভাসে ঘেরা এই আলোর মুখোমুখী বসে থাকতে।

মেটে কালো অন্ধকারে প্রিয়ার রং মিশে গেছে। শুধু উজ্জ্বল কালো চোখের তারা দু'টি উজ্জ্বলতর হয়েছে—পাশাপাশি, কাছাকাছি, আরও এগিয়ে এসেছে তারা।

বর্ণণক্লান্ত কালো আকাশের এই লাল আভা হঠাৎ মনে পড়িয়ে দেয় বহুদিন পূর্বের ভুলে যাওয়া একটি দৃশ্য। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল চারটি মেয়ে। পুতুল, পাপড়ি, প্রতিমা আর 'প'।

হঠাৎ হেসে ওঠে পাপড়ি। সেই হাসিতে চমকে উঠেছিল সে। পরস্পর সংলগ্ন দু'টি চোখ তার আরও নিকটতর হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জীবনে সে এমনি হাসির শব্দ শোনে নি। তাকিয়ে আরও অবাক হলো। এ হাসি শুধু শোনবার নয় দেখবারও। পাপড়ির সমস্ত শরীর হাসছে—যেন একটা সুন্দর ফুল আন্দোলিত হচ্ছে ছন্দে ছন্দে।

ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল প্রিয়া। তবু পাপড়ির হাসি থামে না! আর আশ্চর্য! জীবনে এই প্রথম অনর্থক, অকারণ হাসি দেখে গা-জ্বালা করে না প্রিয়ার। বিষের ধোঁয়ায় হাসিকে প্রতিহত করে না সে। একটু পরে অবাক হয়ে দেখে সে নিজেও হাসছে।

আশ্চর্য! মেয়েটার ঐ রকম ন্যাকা-ন্যাকা হাসিতে কোথায় জ্বলে উঠে কতকগুলি কথা শুনিয়ে দেবে—না, সে হাসছে। প্রিয়া চ্যাটার্জী অকারণে পথে দাঁড়িয়ে হেসে চলেছে।

হেসে ফেলেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। এগিয়ে যায় দ্রুতপদে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এদের সঙ্গে আর কথা বলবে না।

পারে না এদের এড়াতে পারে না সে। প্রতিমার নির্দোষ সৌন্দর্য, পাপড়ির অকারণ উল্লাস, পুতুলের অপরূপ চরিত্র তাকে বেঁধে ফেলে। ভাল লাগে এদের।

ভাল লাগে—তবু কখনও কখনও দম বন্ধ হয়ে আসে। ও বুঝতে পারে এই ভাল লাগাটা তার মনের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, মন বিরক্ত হয়ে উঠছে। কোন একটা উপলক্ষে নিজের জ্বালা মেটাতে চাইছে সে।

তারপর সেই ঘটনা ঘটলো। এখন যেমনি আছে—নিজের অন্ধকার ঘরটায় নিতান্ত একাকী—এভাবে থাকলে হয় তো বাইরের কোন ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করতে না সে। ছিন্নমস্তার মত মন নিজেই নিজের রুধিরে তৃপ্ত হত কিন্তু, তখন তাকে থাকতে হয়েছিল মেয়েদের বোর্ডিং-এ। চারিদিকে খোলা হাওয়া, আলো আর তরুণ জীবন স্পন্দন।

অসহ্য লাগতো। পথেই দেখা হত ওদের সঙ্গে—পুতুলের মিষ্ট কণ্ঠ, পাপড়ির উজ্জ্বল হাসি, প্রতিমার অপরূপ রূপ। কোথাও নোংরামী নেই, কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই। কি করে বাঁচবে প্রিয়ার মন? কোন তারক রসে সঞ্জীবিত হয়ে থাকবে সে।

অস্থির হয়ে উঠেছিল তার মন। অকারণে সে চাইতো পার্শ্ববর্তিনীকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিতে। কালি ছিটিয়ে দিতে চাইতো অপরের গায়ে, নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করতো।

তখনই একদিন মনে হল কথাটা। ছেলেদের সঙ্গে পড়ছি অথচ

পাঁচায় বসছি কেন? প্রথমে সাধারণভাবেই ভেবেছিল। ক্রমনক্রমে কথাটা বলতে গিয়ে দেখলো—সকলেই বিরুদ্ধবাদী। অনেকের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। আনন্দে ভরে ওঠে মন। এতদিনে সে খোরাক পেয়েছে।

পরদিন ওধারে গিয়ে বসবে স্থির করলো। পাপড়িও সঙ্গী হলো। ভালোই হল ভাবলো সে! সহজে ছাড়বে না প্রতিপক্ষ। অনেক কাঠ খড় পোড়াবে। যদি এই আগুনে পাপড়ির হাসি বন্ধ হয় তবে সুখীই হবে সে। মাঝে মাঝে সে যেন পাপড়ির হাসি সহ্য করতে পারে না।

অপমানিত পাপড়ির মুখটা, হাসির তরঙ্গহীন স্থির পাপড়ির দেহ সে যেন চোখের সামনে ভাসতে দেখে। তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে মুখে। ভাল লাগে তার।

পরদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে সে। ছেলেদের বিস্ময় ও বিরক্তি, মেয়েদের বিদ্বেষ ও ক্রোধের হাওয়া ভাল লাগে তার।

ক্রমনক্রমে সেদিন মেয়েরা ওর সঙ্গে কথা বলে না। স্পষ্টতই এড়িয়ে চলে ওকে। যেন ও একটা অস্পৃশ্য জীব। স্বল্পভাষিণী প্রতিমা পিঙ্গল চোখ তুলে একবার হাসে। পুতুল অনুপস্থিত ছিল।

রাত্রে শুয়ে প্রিয়া ভাবে, কাল কলেজে এই বিদ্বেষ ও বিরক্তি কি রূপ নেবে। ভাবতে ভাল লাগে যে, সবাই মিলে উৎপীড়ন করতে চেষ্টা করছে তাকে।

সকালেই অধ্যক্ষ ওকে ডেকে পাঠান তাঁর বাড়িতে। ও বাইরের ঘরে গিয়ে বসতেই অধ্যক্ষের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অসীম কৌতূহলে উঁকি দিয়ে দেখে যায়। প্রথমে একটু অবাক হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারে প্রিয়া। কলেজের খবর এদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

অধ্যক্ষ ঘরে ঢোকেন। ও উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করবার আগেই বলেন, কাল তুমি ছেলেদের দিকে গিয়ে বসেছিলে।

—হাঁ। উত্তর দেয় প্রিয়া। অধ্যক্ষকে অভিবাদন জানায় না।

—কাল কয়েকটি ছাত্র এবং অধ্যাপক এসেছিলেন—ওঁরা তোমাকে expel করতে বলেন।

—ওঁদের বলবার কি অধিকার? ভ্রূকুটি কুটিল চোখে প্রিয়া বলে।

অধ্যক্ষ এবারে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। বিস্ময়ের রেশ ফুটে ওঠে তাঁর চোখে। বলেন, expel হবার দুঃখের চাইতে কার সেই হুকুম দেবার 'ন্যায্য অধিকার তাই নিয়েই তুমি দেখি বেশি মাথা ঘামাচ্ছ।

তারপরে একটু হেসে আবার বলেন আশ্চর্য মেয়ে তুমি। যাক, expel তোমাকে আমি করব না। তাহলে আজ সকালে ডেকে পাঠাতুম না। তুমি ভালভাবে পড়াশুনো করো। ধীর স্থির গম্ভীরভাবে কলেজে যাবে আসবে। এই সব দুষ্টুমী করতে যেয়ো না। আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

প্রিয়া কোন উত্তর দেয় না। শুধু দুঃসহ ক্রোধে জ্বলতে থাকে ওর চোখের তারা।

অধ্যক্ষ আবার বলেন, তোমাকে ডেকে এতগুলি কথা বললাম কারণ আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী। আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে চিনি।

সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে প্রিয়ার। এখনই যেন চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়বে ওঁর ওপর। শুধু পরবর্তী আর একটি কথা উচ্চারিত হবার অপেক্ষা। যে কথাটা খুব ভালভাবেই জানে প্রিয়া।

প্রিয়ার এই কৃতজ্ঞতাহীন নীরবতায় অধ্যক্ষ বোধহয় একটু বিরক্ত হন। সংক্ষেপে বলেন, আচ্ছা, তাহলে এখন এস।

এতক্ষণে প্রিয়া বাকশক্তি ফিরে পায়।

কলেজের নিয়ম বইতে কি লেখা আছে যে মেয়েরা ছেলেদের দিকে বসতে পারবে না? তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ওর।

—না। কিন্তু এটা কনভেনসন্। বিরক্ত বোধ করলেও অধ্যক্ষকণ্ঠের প্রসন্নতা বজায় রাখেন।

—কোন 'কনভেনসন্' আমি মানি না। অতীতে মানি নি, বর্তমানে মানি না, ভবিষ্যতেও মানব না।

অধ্যক্ষ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন। কথা বলবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

—তবে expel করা অনেক ঝামেলা—বিশেষত আপনি আমাকে চেনেন কাজেই আপনার মনে হয়তো কষ্ট হবে, কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপ মেশায় প্রিয়া, সেই সব হাঙ্গামা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি আজই চলে যাচ্ছি।

যেতে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আবার বলে, ভাববেন না যে, expel হলে নামে একটা দাগ পড়বে সেজন্যই এসব কথা বুঝিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি আমি। expel ছাড়া রাষ্টিকেট করলেও আমার কোন আপত্তি নেই। আমি আর কলেজে পড়বো না।

অভিবাদন কিংবা সম্ভাষণ না জানিয়ে গেট দিয়ে বের হতে হতে দেখতে পেল অধ্যক্ষ অভিভূতের মত বসে আছেন।

সেদিন বড় আনন্দ হয়েছিল প্রিয়ার। হঠাৎ কি বললেন উনি। 'তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে চিনি।' উঃ কতদিন—আর কতদিন ক'জনের মুখে এই কথাগুলি শুনবে প্রিয়া। কত লোকের চোখে দেখবে এই উক্তির স্বাক্ষর।

প্রিয়া ভাবে, সে যদি আরও একটু কম বুঝতে পারতো, সে যদি আরও অনেক বোকা হত তবে হয় তো এত কষ্ট সে পেত না।

নির্বুদ্ধিতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এইজন্যই আদম ও ইভকে তিনি জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। জীবনে সেই কয়টা দিনই সে প্রকৃত সুখী ছিল, যখন সে কিছুই বুঝতে পারে নি, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায় নি।

বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। জ্ঞান হওয়া থেকে বাবাকে সে দেখে নি। সেজন্য কোন দুঃখ ছিল না। মায়ের কাছ থেকেই দু'জনের স্নেহ সে পেয়েছিল।

একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে যেত সে। সন্ধ্যেবেলা ও মায়ের ঘরে ঘুমুতো। কিন্তু ভোরে উঠে দেখতো পাশের ঘরে শুয়ে আছে। বিন্দু ঝি নীচে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মা নেই।

ওর সাড়া পেলেই বিন্দু তাড়াতাড়ি ওকে কোলে নিয়ে মুখ-হাত ধুইয়ে দিত। ও দেখতো মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ।

—বিন্দুদি', মা কোথায়?

—মা ঘুমুচ্ছে। শরীর খারাপ কি না? রোজই উত্তর দিত বিন্দু।

বিন্দুই ওকে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিত। স্কুল থেকে ফিরে প্রিয়া কিন্তু অসুস্থতার কোন লক্ষণই খুঁজে পেত না মায়ের মধ্যে। স্নান সেরে সাদা থান আর সেমিজ পরে তিনি তখন রান্নাঘরে। প্রিয়াকে সাদরে কাছে ডেকে খাবার খাইয়ে নিজে তেল মাখিয়ে দিতেন তিনি। তারপরে এক সঙ্গে খাওয়া, দুপুরবেলা মায়ের কাছে বসে স্কুলের পড়া তৈরি করা। বিকেলে খাবার খাওয়া, খেলতে যাওয়া—সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুম। দিনেরবেলা ঘুমুতো না প্রিয়া—তাই সন্ধ্যে লাগামাত্রই ঘুমিয়ে পড়তো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতো প্রিয়া—মিষ্টিমধুর স্বপ্ন। সমস্ত দিন আর রাত কেটে যেত একই তালে, একই ছন্দে। ভোরবেলা উঠেই একটু ছন্দপতন। দরজাটা বন্ধ।

প্রথমে প্রথমে এতে বিশেষ কিছু মনে করে নি প্রিয়া। শুধু একটু বিস্ময় ও বিরক্তি। কিন্তু প্রত্যেকদিন একইরকম ব্যাপার দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। স্বাভাবিকত্বের পর্যায়ে এসে গিয়েছিল ব্যাপারটা।

তারপর একদিন···

সেদিন সেই রাত্রে ঘুম ভেঙে হঠাৎ জেগে ওঠে প্রিয়া। পাশে হাত বাড়িয়ে মাকে স্পর্শ করতে চায়—কাউকে পায় না। এই বিস্ময়ের ধাক্কায় সচকিত হয়ে জেগে ওঠে সে। স্পষ্ট ওর মনে আছে মায়ের কাছে শুয়েছিল ও। তাকিয়ে দেখে যে ঘরে ও শুয়েছিল তার পাশের ঘরে শুয়ে আছে ও। মা ও সে একসঙ্গে যে বিছানাটায় শুতে পারে সেই বড় বিছানাটাও নয়। ছোট একটি খাট—ওর একার উপযুক্ত। নীচে শুয়ে আছে বিন্দুঝি।

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে থাকবার পর উঠে বসে সে। আর তখনই কানে ভেসে আসে অস্পষ্ট একটি শব্দ। অন্ধকারে কে যেন হেসে উঠলো। চাপা-হাসির ধ্বনিতে গমগমিয়ে ওঠে রাত্রি, ভয়ে শিউরে ওঠে প্রিয়া। কিন্তু সে চেঁচায় না। দাঁতে দাঁত চেপে অসীম কৌতূহলে ভেদ করতে চায় রাত্রির এই রহস্য। আর কোন শব্দ শোনা যায় না। নিস্তব্ধ রাত্রি ঘুমের ভার চাপিয়ে দেয় প্রিয়ার কচি চোখে। ঘুমিয়ে পড়ে সে।

পরদিন প্রভাতে কিন্তু সে ভুলে যায় সব কথা—যেমনিভাবে লোক ভুলে যায় স্বপ্নকে। বিন্দুকে কিংবা মাকে জিজ্ঞাসা করে না কিছুই। অন্যান্য দিনের মতই কেটে যায় এ দিনটা।

শুধু এইদিন নয় কেটে যায় বহুদিন নিঃশব্দে নীরবে। আবার একদিন রাতে জেগে যায় প্রিয়া। বড় গরম। ঘুমের মধ্যেই বারকয়েক ছটফটিয়ে উঠে বসে সে। নীচে বিন্দু শুয়ে আছে মা পাশে নেই। তৎক্ষণাৎ অনেকদিন আগের সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। পাশের ঘর···ছোট খাট···আর সেই হাসি। আজও ঠিক তেমনি ভাবেই শুয়ে আছে সে। তবে কি এখনই রাত্রির বুক চিরে বেজে উঠবে সেই হাসি। উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করে প্রিয়া।

হাসির শব্দ বেজে ওঠে না। অন্ধকার রাত্রি একান্তই নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে কি যেন একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। ভ্রূ কুঁচকে বুঝতে চেষ্টা করে প্রিয়া—পারে না। সে এই প্রথম এরকম শব্দ শুনলো।

বারবার জোরে জোরে জেগে ওঠে সেই শব্দ। একটু ভয় পেয়ে প্রিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, বিন্দুদি'···বিন্দুদি'।

চমকে জেগে ওঠে বিন্দু।

—মা কোথায়? তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রিয়া।

—মা···এই···তোতলাতে থাকে বিন্দু। তারপরে হঠাৎ যেন সমস্ত কিছু বুঝে নিয়ে বলে, ওঃ? মা। মা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছেন।

—কেন?

—মায়ের শরীরটা একটু খারাপ লাগছে কি না তাই একা শুয়েছেন। তুমি ঘুমিয়ে পড়।

ওর খাটে উঠে আসে বিন্দু। হাত বুলিয়ে দেয় ওর গায়ে। কিছু সময় কেটে যায়।

তারপর প্রিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে বিন্দু যখন নিঃশব্দে নেমে উঠবার উপক্রম করে তখনই প্রিয়া বিন্দুর হাত ধরে চাপা কণ্ঠে বলে, শোন বিন্দুদি', মা কি রোজই ওঘরে একা থাকেন?

--না। সজোরে প্রতিবাদ জানায় বিন্দু। কোনদিনই নয়। আজই এই প্রথম।

—এই প্রথম। ধীরে ধীরে আবার প্রশ্ন করে প্রিয়া।

—হ্যাঁ। এই প্রথম।

প্রিয়া আর কোন কথা বলে না। শুধু একবার তাকায় দু' চোখ মেলে। কেন বিন্দু মিছে কথা বলছে? ওকে কি মা শিখিয়ে দিয়েছেন?

স্কুলে যাবার সময় মায়ের বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকিয়ে চলে যায় প্রিয়া। ভ্রূ-দু'টি কুঁচকে ওঠে। রাত্রি, প্রভাত, বিন্দুর মিথ্যাভাষণের মধ্যে মন খুঁজে বেড়ায় সংযোগসূত্র। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করে না। সে শুধু ভাবতে চায়, বুঝতে চায়, বিচার করতে চায়।

ও ভাবে, প্রতিরাত্রেই জাগব আমি। দেখব, কখন ওরা আমাকে সরিয়ে দেয় পাশের ঘরে এবং কেন? শুনব রাত্রির সেই অস্পষ্ট ধ্বনি। এ রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।

কিন্তু রাত্রিতে জাগতে পারে না সে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পরে

চুলের সৌন্দর্য
তেলের অপচয়ে নয়
— যত্নে
চুলের যৌবনে ভাটা পড়লে অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই
কারণ চুল সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেরই একটা প্রচ্ছন্ন ঔদাসীন্য আছে।
কোন রকমে একটু তেল মাথায় দিয়ে চট্ করে স্নানের পাট চোকাবার
দিকেই আগ্রহটা বেশী। এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুলের
যত্নের চেয়ে তেলের অপচয়টাই বেশী হয়।
তেল চুলের প্রধান
খাদ্য তাই অন্ততঃ দশ মিনিট
চুলের গোড়াগুলিতে তেল বেশ ভাল
করে মালিশ করা উচিত। সামান্য
একটু যত্নে চুলের সৌন্দর্য যে
কত বর্দ্ধিত হতে পারে তা কিছুদিন
যত্ন নিয়ে জবাকুসুম তেল ব্যবহার
করলেই বুঝতে পারবেন।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
১, টাকার্স লেন, ব্রডওয়ে মাদ্রাজ-১

গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দুপুরবেলা ওর মা কিছুতেই ঘুমুতে দেন না ওকে।

জাগরণ-তন্দ্রার মাঝামাঝিতে অনেকবার জেগেছে সে। বন্ধ-দরজা খুলে ঢুকে গিয়েছে পাশের ঘরে। মাকে দেখতে পেয়েছে সেখানে। কিন্তু মায়ের মূর্তিটাই কি রকম যেন অস্পষ্ট, মাকে সেখানে ঠিক চিনতে পারে না। ভোরবেলা স্বপ্নের কথা কিছু মনে থাকে না শুধু রেশটুকু।

একরাতে স্বপ্নে পাশের ঘরে ঢুকতে গিয়েই বাধা পায়। চমকে দাঁড়িয়ে যায় সে। আর তখনই জেগে ওঠে। নিজের খাটে শুয়ে আছে সে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

সেই নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে কান পেতে কি যেন শুনতে চায় প্রিয়া। কোন শব্দই শোনা যায় না। একটানা ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমুচ্ছে বিন্দু।

পা টিপে টিপে উঠে পড়ে প্রিয়া। ধীরে দরজা খুলে বিন্দুর দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করে বারান্দায় যায় সে। পাশের বন্ধ-দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। ঘুমে চোখ ভরে ওঠে প্রিয়ার। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া আর একটু ভয়ের আবেশে শরীর কাঁপতে থাকে। নিঃশব্দ পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে সে।

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন কৌতূহলও বাড়ছে তার। সমস্তক্ষণই কি ভাবে সেই রহস্যের কথা। একটুখানি আভাস পেয়ে পুরোপুরি জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে।

মেয়ের স্বাস্থ্য দেখে মা ব্যাকুল। আদর-যত্ন, খাওয়ার ত্রুটি নেই। তবু ও অমন হয়ে যাচ্ছে কেন?

—তুই এত রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন? একদিন প্রশ্ন করেন মা।

—রোগা? কোথায়? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রিয়া—প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

—কি রকম বিশ্রী হয়ে গেছে চেহারা? মা নিজের মনেই বলতে থাকেন, চোয়ালের হাড় উঁচু, মুখটা শীর্ণ। চোখ দু'টি ছোট হয়ে যাচ্ছে।

আয়নায় তাকায় প্রিয়া। চেহারা তার খারাপ খুবই খারাপ-হয় তো এখন আরও একটু খারাপ হয়েছে। কিন্তু চোখ দু'টোকে তার ভাল লাগে! তীক্ষ্ণ, সজাগ, স্থির। পরস্পরের কাছে নিকটতর হয়ে এসেছে এরা। যেন কোন বিষয়ে চুপিচুপি পরামর্শ করছে। এই জুর মধ্যে অদৃশ্য একটি কুঞ্চন।

মায়ের দিকে ফিরে হাসিমুখে বলে, আমি তো কোনকালেই দেখতে ভাল নই। কথা শেষ করে খুব হাসতে থাকে ও।

মা রেগে বলেন, আঃ, অত হাসছিস কেন?

—আচ্ছা মা, আমি কি তোমার মেয়ে? আচমকা প্রশ্ন ওর।

—আমার নয় তো কার? প্রিয়ার উপহাসের প্রত্যুত্তরে রেগে ওঠেন মা।

—কেউ কিন্তু বিশ্বাস করবে না। হাসতে হাসতেই বলে প্রিয়া।

প্রিয়ার মা অপূর্ব সুন্দরী নন। সত্য তাঁর চেহারায় একটা মিষ্ট মাদকতা আছে। প্রথম দর্শনেই আকর্ষণীয়। প্রিয়ার মুখ ও চোখের গড়ন অনেকটা মায়ের মত। কিন্তু মিষ্টত্বের পরিবর্তে রুক্ষ কঠিন ভাব। দৃষ্টিমাত্রেই মন বিরূপ হয়ে ওঠে।

—মনে হয় তুমি বোধ হয় আমাকে দয়া করে মানুষ করছ?

—দয়া করে কি কেউ এত ভালবাসে? মার চোখ জলে ভরে ওঠে।

প্রিয়া দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে। মায়ের ভালবাসায় কোন খাদ নেই। মায়ের প্রতি তার ভালবাসাও অত্যন্ত গভীর। সমস্ত দিন ভরে মা অপূর্ব-অতুলনীয়। কিন্তু রাত্রি·····

রাত্রির মাকে সে চেনে না। চেনে না নয় জানে না। যেই ও ঘুমিয়ে পড়ে অমনি বদলে যান মা! এক অজ্ঞাত রহস্যের আবরণে ঢাকা আবৃত হয়ে দূরে বহুদূরে সরে যান প্রিয়ার নাগালের বাইরে। হাত বাড়িয়ে সেই রহস্যময়ীকেই স্পর্শ করতে চায় প্রিয়া।

রাত্রিতে সে কিছুতেই জাগতে পারে না। অনেকদিন অনেকভাবে চেষ্টা করেছে প্রিয়া—জাগতে সে পারে নি। মনে হয় যেন কোন ইন্দ্রজালের স্পর্শে ওর মা ঘুম পাড়িয়ে দেন ওকে।

একদিন রাত্রে ও জাগলো। স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে জাগে ও। যেমনি ভাবে জাগে দিনে—তেমনি ভাবে সম্পূর্ণ চোখ খুলে তাকাল ও। রাত্রির অন্ধকার স্বচ্ছ লাগছে। মনে হচ্ছে ও যেন এইমুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই দেখতে পায়। কোন বাধাই আড়াল করতে পারে না তার চোখকে। আরব্য উপন্যাসের গল্প মনে পড়ে—দরবেশের কাছ থেকে ধনী-ব্যবসায়ী চোখ পেয়েছিল একটি—সেই চোখ লাগিয়ে সে দেখতে পেত পৃথিবীর সমস্ত মণিমুক্তা।—তেমনি ক্ষমতাশালী হয়েছে আজ ওর চোখ।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বের হয় সে। সেদিনের মতই পাশের বন্ধ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ নিশ্চয়ই খুলবে এই দরজা। খুলবেই—খুলবেই। ভেতরে দেখতে পাব রাতের রহস্যময়ী মাকে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরব তাকে।

দরজা খুললো। বেরিয়ে এলেন মা। একমুহূর্তের জন্য যেন তিনি চিনতে পারলেন না প্রিয়াকে। অপরিচিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রিয়াও মাকে চিনতে পারে না। এ মাকে সে কখনও দেখে নি।

লাল টকটকে শাড়ি মায়ের পরণে। মুখে পাউডারের ঘন প্রলেপ। কপালে চকচক করছে টিপ। কানে দুল।

ওকে দেখে অবাক বিস্ময়ে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, এ কি?

ছুটে ঘরে ঢুকে যান। কোন কথা নয়। এক মিনিট থমকে দাঁড়ান নয় আরও কি এক উগ্র বিপদ এগিয়ে আসছে তাই সামলাতে ছুটে চলে যান তিনি।

ঘরে ফিরে আসে প্রিয়া। এই মুহূর্তে মা তাকে চিনতে পারে নি। অস্বীকার করেছেন স্বীয় কন্যাকে। কিছুক্ষণের জন্য মাতৃত্বের চেয়েও বড় কোন জালে তাঁর মুখ আবৃত।

কি সেই জাল? কি সেই মোহ? যে মোহ মেয়ের অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেয়—যে মোহের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে মেয়েকে অস্বীকার করতে এমন কি ধ্বংস করতেও পশ্চাৎপদ হবেন না তিনি।

দেখে নিয়েছে একমুহূর্তেই প্রিয়া—দেখে নিয়েছে মায়ের চোখের ঝকঝকে আগুনের রেখা। ধরা পড়বার লজ্জার চেয়ে বেশি প্রকট সাবধানতার চেষ্টা। কিন্তু··

কিন্তু কি সাবধান করতে চেয়েছিলেন তিনি ?

ভাবতে থাকে প্রিয়া। যে মা লুকোচুরি করতে গিয়ে মেয়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছেন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল থমকে দাঁড়ান, লজ্জায় অপমানে মুখটা লাল হয়ে উঠে ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাওয়া, দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তো চোখের দুই কোণে, সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাকে ক্ষমা করতো প্রিয়া—

তা হলো না। মেয়েকে উপেক্ষা করে ছুটে গেলেন তিনি মেয়ের চেয়েও বড় কিছু সামলাতে।

কি সেই 'কিছু'।

সে-রাতে শুধু নয়, তারপর বহুদিন বহুরাতে প্রিয়া এই রহস্যের মীমাংসা করতে চেয়েছে, কিন্তু অসম্ভব !

সে-রাতের পরদিন ভোরে উঠেই স্কুলে চলে গিয়েছিল প্রিয়া। ফিরে এসে প্রতিদিনের মতই দেখতে পেয়েছিল রন্ধনরতা মাকে। সাদা থান পবিত্রতার দীপ্তি ছড়িয়ে ঢেকে রেখেছে মাকে। তাঁর সেই শুভ্রসুন্দর মূর্তির দিকে তাকিয়ে রাতের মাকে ভুলে গিয়েছিল প্রিয়া।

মা নিজেও যেন সে কথা ভুলে গিয়েছেন। তাঁর হাবভাবে, আহ্বানে রাত্রের রেশমাত্রও নেই। এ মা প্রতিদিনের মা, উজ্জ্বল আলোতে যাঁকে দেখা যায়, যিনি সূর্যের এই আলোর মতই প্রাণদ, সেই কল্যাণময়ী জননী মূর্তিকেই দেখতে পায় প্রিয়া।

আর কখনও সে রাত্রিতে ওঠে নি। অনুসন্ধান করতে চায় নি রাতের মায়ের রহস্য।

এইভাবে কেটে গেল বহুদিন। তারপরে একদিন প্রকাশিত হল সেই রহস্য—যে রহস্য দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছিল মায়ের দিনরাত্রি। যে রহস্যের চিন্তায় শৈশবে প্রিয়ার ঘুম হয় নি—যৌবনে যে রহস্যকে সে ভুলতে চেয়েছে প্রাণপণে।

তখন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে প্রিয়া। একদিন ক্লাশ শেষে ফিরে দেখল মা শুয়ে আছেন। যন্ত্রণায় মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ছটফট করছেন তিনি। নীচে বিন্দু ঝি ম্লানমুখে বসে আছে।

—কি হয়েছে মা ? কলেজের কাপড় না ছেড়েই ঐ ঘরে ঢোকে প্রিয়া।

—কিছু নয়। হাসতে চেষ্টা করেন মা।

—তবে ? তোমার মুখ এত লাল কেন ?

কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে প্রিয়া, এ কি গা এত গরম কেন, আমি এখনই ডাক্তার ডেকে আনছি।

—না। ক্ষীণকণ্ঠে নিষেধ করেন মা।

—না কেন ?

—না কোন দরকার নেই।

—দরকার আছে কি না আমি বুঝবো। মায়ের নিষেধাজ্ঞাকে মেয়েদের চিরন্তন ডাক্তার ভীতি ভেবে হেসে উড়িয়ে দেয় প্রিয়া।

ঘর থেকে বেরুবামাত্রই বিন্দু সামনে এসে দাঁড়ায়। বিন্দুর এরকম চেহারা আগে কখন দেখে নি প্রিয়া। শান্ত-বিষণ্ণ দৃঢ়তার ছাপ ওর মুখে।

—ডাক্তার ডাকতে তুমি যেও না খুকুমণি—

বিন্দুর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে প্রিয়া—ওর দিকে তাকিয়েই যেন সে বুঝে নেয় সব কথা। সেই রহস্য···

রাতের মা গ্রাস করেছে আজ দিনের মাকে। অনেকগুলি ছবি যে সে দেখতে পায়—রাত্রির আঁধারে প্রসাধনরতা মা, লালশাড়ি পরা গোপনচারিণী মা, অসহায় অসুস্থ পৃথিবীর কাছে মুখ লুকিয়ে থাকা মা।

বিন্দুকে পাশের ঘরে ডেকে শান্তকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, ডাক্তার ডাকতে বারণ করছ কেন বিন্দুদি'।

বিন্দু অন্য কথা বলতে যায়। ঘুরিয়ে দিতে চায় কথাটা। কিন্তু কোঁচকান ভ্রূদু'টির দিকে তাকিয়ে আর কোন কথাই বলতে পারে না। স্থির-নিশ্চল দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকে।

—কেন ? আবার কঠিন ধাতব কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রিয়া।

—মানে···এই—একটু তোতলামি করে হঠাৎ মনস্থির করে বিন্দু। বলে, ডাক্তার ডাকতে গেলে হাতে দড়ি পড়বে যে।

হাতে দড়ি পড়বে···একটু চমকে ওঠে প্রিয়ার কুটি বন্ধ দু'টি চোখ। হাতে দড়ি পড়বে···কেন ? কি হতে পারে ··তবে কি···

—মায়ের শরীরের কোথায় যন্ত্রণা···। কালো ভ্রূকুটি ভরা মুখেই প্রশ্ন করে প্রিয়া।

—পেটে।

—বুঝেছি। সমগ্র অন্তর এবং আত্মা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে প্রিয়ার।

বুঝেছি। মুখে কিছুই বলে না সে। বারবার বলতে থাকে সে—সমস্তই বুঝেছি আমি।

ওর কথা শুনতে পায় না বিন্দু। তবু সে বুঝতে পারে প্রিয়ার মনোভাব। সমস্তই জেনেছে প্রিয়া। প্রিয়ার স্থির গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয় ও। সেদিনের সেই এতটুকু মেয়ে। 'খুকুমণি' সে আজ এত বড় হয়েছে ইঙ্গিতেই বুঝতে শিখেছে—শিখেছে ব্যবস্থা করতে।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে প্রিয়া। কোন কথাই ভাবতে পারছে না সে। মনের চিন্তাধারাগুলো যেন জমাট হয়ে গেছে। শক্ত একটা ইটের মত বারবার তা আঘাত করছে মাথাকে। দু'হাতে মাথা ধরে চুপ করে বসে থাকে প্রিয়া। নড়তে গেলেই নূতনভাবে সুরু হয় যন্ত্রণা।

কতক্ষণ এভাবে বসেছিল ঠিক নেই—চমকে ওঠে মায়ের কাতর আর্তনাদে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন মা এত তীব্রকষ্ট যে চাপতে গিয়েও চাপতে পারছেন না তিনি। চাপতে গিয়ে এত অদ্ভুত শোনাচ্ছে। মুমূর্ষ পশুর যন্ত্রণার মত।

সেই যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি প্রিয়ার অন্তরের অন্তরতম কোণে প্রবেশ করে। মুহূর্তের মধ্যে সে ভুলে যায় মায়ের প্রতি এতক্ষণ ধরে গড়ে ওঠা বিরক্তি ও বিরাগ। ধীরে ধীরে পাশের ঘরে ঢোকে সে।

কিছুই করবার নেই। খাট থেকে অনেকটা দূরে চেয়ারে বসে ভাবে সে। কিছুই করবার নেই। শুধু চুপ করে বসে থাকা। শুধু দেখে যাওয়া।

এই যে নারী আজ শয্যায় শুয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন একদিন তিনি তারই মত ছিলেন। হয় তো এই চেয়ারটায় বসে কত আজে বাজে কথা ভেবেছেন, কিন্তু আজ তাঁর সঙ্গে প্রিয়ার যোজন ব্যবধান।

রোগ তাঁর মুখে-চোখে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে পাণ্ডুর মৃত্যু-আভা। শুধু ঐ যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি ভিন্ন আর সমস্তই ওঁর মরে গেছে।

এই মুহূর্তে প্রিয়া কত কিছুই না ভাবছে। ভাবছে পৃথিবীর তিক্ত, আশ্চর্য অলৌকিকত্বের কথা। সমগ্র পৃথিবী ঢেকে আছে বেদনা ও আনন্দময় মাকড়সার জালে। হাওয়ায় দুলে ওঠে, সেই জাল কখন বেরিয়ে আসে বেদনা, কখন আনন্দ, একই জিনিষ। শুধু একটু ডিগ্রীর প্রভেদ।

তার মাকেও ঢেকেছিল এই মাকড়সার জাল। আনন্দ অন্বেষণ করতে গিয়েই তিনি বরণ করেছেন এই অসীম বেদনাকে। হয় তো এই চেয়ারে এইভাবে বসে তিনি দিনের পর দিন প্রিয়ার মতই ভেবেছেন—ভাবগতভাবে জগতকে বিচার করতে চেয়েছেন কিন্তু যখন সময় হলো তখন কোন কিছুই কাজে লাগলো না—লাঞ্ছিত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

এই তো মানবের শেষ। তার আশা, আনন্দ, রাগ, চিত্তক্ষোভ, গৌরব, তার জীবনের অদ্ভুত এবং তিক্ত অঘটন, তার ইতিহাস, ভাগ্য এবং নিয়তির সব কিছুরই শেষ এইখানে। একটি রুগ্না নারী তার কৈশোর-স্বপ্ন, যৌবন-কামনা-ঘেরা ঘরে শুয়ে আছে। শুয়ে আছে সেই শয্যায় যেখানে কতবার কামপরিতৃপ্তির আনন্দ পেয়েছে। আজ…

দেহের এই তো ঘৃণার্হ পরিণতি। যে দেহ একদিন জৈবিক ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল আজ সে সেই সব কথা ভাবতেই পারে না। তার জীবন থেকে মুছে গেছে অরুণ প্রভাত আর রক্তরাঙা রাতগুলি। এই অসুস্থতা তার অতীতকে বিষিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতকে করে দিয়েছে অন্ধকার। এখন এর জীবনে একমাত্র সত্য বর্তমান—যন্ত্রণাময় অসুস্থ বর্তমান।

সব ফুরিয়ে যায়—ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত জমাট বাঁধে আর শেষ হয়ে যায়—চলতি পথের মূর্তির মত এই জীবনে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় মূর্তিগুলি—হাসিভরা চঞ্চল চোখদু'টি সরে যায়, এগিয়ে আসে শীতল অসুখী চোখ—তারপর তাও যায় মিলিয়ে। অন্ধকার… সব অন্ধকার।

একটি, দু'টি নয়—লক্ষ কোটি…জীবনের এই ইতিহাস। আজের নয়, কালের নয়, চিরন্তন জীবনের এই নিয়ম।

তবু মানুষ হাসে, কাঁদে, ভালবাসে। জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে। আরও নীচে নেমে যায় মানুষ। দুর্গন্ধ পাঁক মেখে ওপরে ওঠে। নিজের জীবন নষ্ট করে এবং ধূলিমলিন পৃথিবীর বুকে রেখে যায় গভীরতর পঙ্কের ছাপ।

যন্ত্রণাধ্বনিতে চিন্তার রেশ কেটে যায় তার। মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় প্রিয়া। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন মা। হিম হয়ে আসছে হাত-পা। তবে কি…তবে কি শেষ হয়ে গেল সব।

না, না, চেঁচিয়ে ওঠে প্রিয়া। যেভাবেই হোক মাকে বাঁচাবে সে। কত টাকা দিলে ডাক্তার মুখ বন্ধ রেখে চিকিৎসা করবে? তার হাতের চুড়ি, গলার হার বিক্রি করে চিকিৎসা করাবে সে…

অকস্মাৎ বিন্দু ঘরে ঢোকে। রোগিণীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিরকম এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় প্রিয়ার দিকে। চকিত হয়ে প্রিয়া দেখে ঘোলাটে দু'টি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিহীন সেই চোখে কি অসীম কাতরতা! অসহায় অবলম্বনহীন মন খুঁজছে একটু আশ্রয়।

এতক্ষণের বিচার-বিবেচনা বুদ্ধিসম্মত আলোচনা ভেসে যায় সেই দৃষ্টির আঘাতে—শিশুর মত চেঁচিয়ে ওঠে প্রিয়া—মা, মা,…

আজ অন্ধকার ঘরেও প্রিয়ার মন ঠিক তেমনি ভাবে কেঁদে ওঠে—হঠাৎ যেন ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে ওঠে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় প্রিয়ার—একটা জানালা খুলে দেয় সে। ঘোলাটে লাল আকাশ।

[ক্রমশ।

রবীন্দ্রনাথ, দাদু ও কবীর

শিপ্রা দত্ত

যুগে যুগে দার্শনিক, সাধক, কবি সবাই এসেছেন—যুগের উত্তরীয় পরিধান করে। তাই প্রকাশভঙ্গীর বিচিত্রতা থাকলেও সবার অন্তর্নিহিত কথা সেই এক সনাতন শাশ্বত সত্য। তাই অনাদিকাল হ'তে শুনে আসছি 'সোঽহং।' যীশু বলেছেন—

'I and my father are one.'

মুসলিম ধর্মে মনসুর বলেছেন—'আনাল্ হক।' আমার পরিচয়ের মধ্যেই তো সুপ্ত রয়েছে সেই পরমাত্মার পরিচয়।

'বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশ স্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেছে যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। তাঁর মহদ্‌যশই তাঁর নাম; তাঁর মহৎ কীর্তিতেই তিনি সত্য। মানুষেরও ভাবও তাই—আত্মাকে প্রকাশ।'

আপন সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দু'টি নাম আছে। একটি অহং আর একটি আত্মা। প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায়, আর একটিকে শিখার সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজারদর, কোনটার দর সোনার কোনটার মাটির শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে এবং তারই প্রকাশে আর সমস্ত প্রকাশিত। প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।'

উপনিষদ বলেছে তত্ত্বমসি—তৎ, ত্বম, অসি এই তিন শব্দের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্রহ্মের পরিচয়। আত্মাই সত্য, আত্মাই ব্রহ্ম, তুমিই আত্মা, তুমিই ব্রহ্ম—এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন নয়—এই পরম সত্য নির্দেশ দিয়েছেন ঋষিরা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে 'অহম্' ভাবটা লুকিয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মা একীভূত হতে পারে না। তাই দাদু বলেছেন—

'মোর আগে মৈঁ খড়া তাথৈঁ রহ্যা লুকাই।
দাদু পরগট পীর হৈ জে যহু আপা জাই॥'

(আমার সম্মুখে 'আমি' আছে খাড়া হয়ে, তাতেই তিনি আছেন লুকিয়ে। যদি এই 'অহম্' যায়—তবে প্রিয়তম তো প্রত্যক্ষ বিরাজমান)।

বাউল কবি বলেছেন—

'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সব ঠাঁই।'

রবীন্দ্রনাথও সেই পরমাত্মাকে নিভৃত মনের কন্দরে খুঁজে পেয়েছেন—

'আপনার চিতে নিবিড় নিভৃতে
যেথায় তোমারে পেয়েছি জানিতে…'

আর এক জায়গায় তিনি পরমাত্মাকে জানবার জ্ঞানচক্ষু প্রার্থনা করে বলেছেন—

'আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহ দীপখানি জ্বালো।
সব দুখশোক সার্থক হোক
লভিয়া তোমারি আলো।'

কবি বলেছেন—'অহংকারকে দূর করতে হ'বে, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছাতে পারি।' সেই আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলেই পরমাত্মার স্বরূপ জানা যাবে—

'কে সে, জানি না কে, চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি—অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে,
ঝড় ঝঞ্ঝা—বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর—প্রদীপখানি।'

সাধক বাহ্যজগতে পরম পুরুষকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু যাঁর জন্য সে ব্যাকুল—তিনি যে তার অন্তরেই বিরাজমান। দাদু তাই বলেছেন—

'ঘটি কস্তুরী মিরিগকে ভরমত ফিরৈ উদাস।
অংতরগতি জানৈ নহীঁ তাতৈঁ সূঁথৈ ঘাস।
জা কারণি জগ ঢূংঢিয়া সে তো ঘট্‌হী মাঁহিঁ।
ভূবত নাহিঁ অংতরমেঁ তাতৈঁ জানত নাহিঁ।
দূরি কহৈ তে দূরি হৈঁ রাম রহ্যা ভরপূরি।
নৈনহুঁ বিন সূঝৈ নহীঁ তাতৈঁ রবি কত দূরি।
সদা সমীপ মঁজি সনমুখ রহৈ দাদু লখৈ ন গুঝ।
সুপিনৈঁ হী সমঝৈ নহীঁ ক্যোঁ করি লহৈ অবুঝ।'

(কস্তুরী রহিল মৃগের ঘটে বা দেহে, অথচ তারই খোঁজে সে উদাস হয়ে বেড়ায়। অন্তরের মর্ম জানে না, তাতেই বেড়াচ্ছে ঘাস শুঁকিয়া শুঁকিয়া।

যাকে জগতময় খুঁজে বেড়াচ্ছে সে তো রয়েছে দেহেরই মধ্যে! অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখলো না তাই তে জানে না তার মর্ম।

ভগবান তো সর্বত্র বিরাজমান। 'দূরে আছেন' যাঁরা বলেন তাঁরাই আছেন দূরে। নয়নের অভাবে দেখতে পায় না, তাই মনে হয় সূর্য কোথায় দূরে।

তিনি সর্বদাই আমাদের নিকটে, সঙ্গে সঙ্গে, সম্মুখে আছেন। হে দাদু, এই রহস্যটি বুঝে দেখল না, স্বপ্নেও এটা বুঝল না, কেমন করে তবে অবুঝ তাঁকে পাবে?)

কবির মত দাদুও 'অহং'কে বিসর্জন দিতে বলেছে—

দাদু তৌ তূঁ পাবৈ পীবকোঁ, মৈঁ মেরা সব খোই।
মৈঁ মেরা সহাজৈঁ গয়া, তব নির্মল দর্শন হোই।

(আমার 'আমি'টি সম্পূর্ণ খোয়াইলে তবে পাইবি দাদু প্রিয়তমকে। আমার 'আমি'টি যখন গেল সহজে তখন হইল নির্মল দর্শন।)

বাহ্যদৃষ্টিতে তোমার স্বরূপ নির্ণয় করে কবি দাদু বলেছেন—

'পূরণ ব্রহ্ম বিচারিয়ে সকল আত্মা এক।
কায়াকে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক।

(পূর্ণব্রহ্মের দিক দিয়ে দেখলে, সকল আত্মাই এক, কায়ার গুণের দিক দিয়ে দেখলে অনেক বর্ণ, অনেক ভেদ।)

কবীরও বলেছেন—

'কবির এক সমানা মে, সকল সমানা তাহি।
কবির সমানা বুঝি মে, জাহা দোসরো নাহি।'

(কবীর বলছেন এদের সমান এই সকলের মধ্যে, আর সকলের সমানও সেই এক, কবীর সেই সমান বুঝতে গিয়ে দেখলেন সেখানে আর দুই নাই—সবাই এক।)

সেই বিশ্বাত্মা হ'তে জীবাত্মার উদ্ভবের কথাও কবিগুরু বলেছেন—

এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই
কেমনে যে হোতে পারে জানি না কিছুই।
কেমনে যে কিছু হয় কেহ হয় কেহ,
কিছু থাকে কোনোরূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে
চিরকাল নিরখিব বিশ্ব জগতেরে
নিস্তব্ধ নির্বাক চিত্তে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিশ্লেষণ কবীর সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

'কবির বিছ্‌ যো ঢুঁড়ে বীজকোঁ, বীজ বিছ্‌কে পাহি।
নিওজো ঢুঁড়ে বহ্ম কো, ব্রহ্ম জিওকে মাহি।'

(কবীর বলেছেন বৃক্ষ বীজকে খুঁজিতেছে, কিন্তু বীজ বৃক্ষেতেই রয়েছে। এইরূপ সকলে ব্রহ্মকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু ব্রহ্ম যিনি তিনি জীবের মধ্যেই রয়েছেন।)

বিভিন্ন সময়ে এই তিন সাধক পুরুষের আবির্ভাব হলেও—প্রত্যেকেরই দার্শনিক মনোভাব একই ছিল। মূলত যেন তাঁরা এক। বিভিন্ন নাম নিয়ে—বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকের আবির্ভাব।'

দেশে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়,—দুষ্কৃতবৃন্দ দর্পিত ও সাধুগণ ভীত হয়,—তখনই ভগবান অবতার পুরুষকে পাঠান দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনের জন্য ও নতুনের ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। তাই রবীন্দ্রনাথ—দাদু—কবীর—এই তিন মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে যদিও এসেছেন—কিন্তু সবার দর্শনের মূল কথা এক।

মনে পড়ল একটি রাত

মীরা রায়

বাসা বদল করতে হবে, কদিন ধরেই তার প্রস্তুতি চলছে। বাক্স-প্যাঁটরা, বিছানা, বাসন ইত্যাদি সব একটু একটু করে গোছ করে নতুন বাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আলমারীটা খালি করছি সমস্ত জিনিষগুলি পুঁটলী বেঁধে রাখতে হবে তবে খালি আলমারীটা পাঠান সম্ভব হবে। আলমারী থেকে অ্যালবামটা নামাতে গিয়ে তার ভেতর থেকে খসে পড়ল একটা ফটো, সেটা উল্টে পড়েছিল, তুলে নিয়ে দেখলাম পেছনে লেখা রয়েছে—'আমার প্রিয়তমা বন্ধু মায়াকে দিলাম—একটি স্মরণিকা'। চট করে উল্টে নিয়ে দেখলাম হ্যাঁ সাইদারই ফটো আমার বাল্য-সহচরী, আমার জীবনদাত্রী, আমার জীবনের সবকিছু ও। মুখে তার স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি ফটোয় যেন লেগে রয়েছে, চোখ দু'টিতে যেন কত নীরব ভাষা উজাড় হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চারদিকে বহু কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু ছবিখানা হাতে পেয়ে সবকিছুর অস্তিত্ব ভুলে গেলাম। বহু স্মৃতি বিজড়িত ঐ ছবিখানা আমায় একাকী আমার ভাবরাজ্যে বসিয়ে দিয়ে গেল। বিদ্যুদ্বেগে মন পনের বছরের অতীতের পাতাগুলো উল্টে দিয়ে চলে গেল। স্মৃতির একটির পর একটি অবরুদ্ধ দরজা খুলে যে মনের অন্তরতম মণিকোঠায় এসে দাঁড়ালাম সেখানে সঞ্চিত ছিল আমার বাল্য ও কৈশোর জীবনের এক বেদনাময় রক্তাক্ষরে লেখা ইতিহাস—যে ইতিহাসের নায়িকা ছিল এই সাইদা।

পদ্মাপারের রাজশাহী জেলার এক ছোট গ্রাম বীরপাড়া। এই-খানেই আমি জন্মেছিলাম, এরই শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে ও বাবা-মার একমাত্র সন্তান হওয়ায় স্নেহের প্রাবল্যে আমার বাল্য কেটেছিল এক নিশ্ছিদ্র নিরলস আনন্দের মধ্য দিয়ে। আমাদের দু'খানা বাড়ির পাশে সাইদারা থাকত। শীঘ্রই আমার মন ওর মধ্যে ভাগীদার খুঁজে পেয়েছিল, জাতিধর্মের কোন রক্তচক্ষুর শাসন আমাদের দু'টি তরুণ মনের ভাব-সঙ্গমের প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। সেদিন অবিভক্ত বাংলার এক গণ্ডগ্রামে যে দু'টি অবিভক্ত হৃদয়ের ঐক্যভাব মন্থনে নিরন্তর সুধা আহরণ করে ছোট দু'টি জীবনপাত্র ভরে উঠেছিল তার আবেগে আমরা পরস্পর দু'জনে বিভোর হয়েছিলাম। বাইরের জগৎ আমাদের কাছে রুদ্ধ ছিল। এরই ফাঁকে যে কখন কৈশোর আমাদের দেহে মনে ভীরু পদসঞ্চারে এগিয়ে এল তাও আমাদের খেয়াল হয় নি। বাল্যের অবারিত মুক্তি খানিকটা ব্যাহত হলেও আমাদের দেহ-মনের এই নতুন অতিথি উভয়ের বাবা-মার কাছে আমাদের দু'জনেরই স্নেহের ও আকিঞ্চনের একটুও শৈথিল্য ঘটাতে পারে নি। আমার বাবা-মার কাছ থেকে সাইদা যে আদর ও স্নেহ পেয়ে এসেছে আমি ততোধিক পেয়ে এসেছি ওর বাবা-মার কাছ থেকে। রাজনীতির গূঢ় ভেদাভেদ তত্ত্ব আমাদের এই সহজ সরল সম্পর্ককে জটিলতর করে তোলে নি, এই স্বচ্ছন্দময় গ্রামীণ জীবনের স্বল্প গণ্ডীতে আমরা মুগ্ধ ও বদ্ধ হয়ে বাস করছিলাম।

এরপর একদিন আমাদের বহু সাধনার ধন স্বাধীনতা আমরা

লাভ করলাম—কিন্তু এ যে আমাদের জীবনে কতখানি ক্রূর অভিশাপ হয়ে দেখা দিল তা পরে বুঝলাম। বাংলা দেশ বহু রক্ত ঝরিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। পূর্ব-পাকিস্তান আমাদের মত সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য রচনা করল এক নিষ্ঠুর রক্তাক্ত ইতিহাস। পরদেশবাসী হয়ে আমরা পড়ে রইলাম সদা-শঙ্কিতচিত্তে। কিন্তু সাইদা রইল আমার ক্ষতস্থানের প্রলেপ হয়ে, উৎকণ্ঠার প্রশান্তি হয়ে। ও আমাকে বরাবর সান্ত্বনা দিয়েছে তোর কোন ভয় নেই, আমরা থাকতে তোদের কোন ক্ষতি হতে দেব না। ওর অভয়বাক্যে কিছুটা বলও মনে পেতাম। কিন্তু চারিদিকে হিন্দুনির্যাতন

অবাধে চলতে লাগল এবং স্থানীয় মুসলমানরা ক্রমশঃই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠতে লাগল। কিছুদিন আগেও যারা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল এখন যেন বিনা অপরাধে আমরা সদাই অপরাধী হয়ে দাঁড়ালাম তাদের কাছে। লক্ষ্য করলাম সাইদার বাবাও যেন আগেকার ব্যতিক্রম পথে চলেছেন। শুধু সাইদা ও তার মা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে পূর্ববৎ মেলামেশা করতে লাগল। ওদের ভরসাতেই কোনক্রমে টিকে রইলাম আমরা, নইলে আমাদের আশে-পাশের বহু হিন্দু উৎখাত হয়ে ভারত ইউনিয়নে চলে গেল। এরপর থেকে প্রায়ই শোনা যেতে লাগল বিজয় স্যাকরার দোকান লুঠ হয়ে গেছে। নয়ত শোনা গেল মুকুন্দ হালদারের বয়স্থা মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, আবার শোনা গেল হারান মোড়লের গোলাঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সকলেই যেন সন্ত্রস্ত, যেন কার কপালে কখন কি ঘটে! সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামটাকে যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ নিঝুম লাগছিল, আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনেই একটা সরু নদী—পদ্মারই একটা শাখা বেরিয়ে এসেছে। ওরই জলে পা ডুবিয়ে বসে ভাবছিলাম এইসব হতভাগ্য হিন্দু গ্রামবাসীদের কথা, যে বিদ্বেষবহ্নিতে আজ পাকিস্তান জ্বলে উঠেছে তার ইন্ধনস্বরূপ আমাদেরও হয়ত হতে হবে, বেশিদিন আর থাকা নিরাপদ মনে হচ্ছিল না অথচ পিতৃপুরুষের ভিটের মায়া কাটিয়ে কোন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ঝাঁপিয়ে পড়ব, জন্মভূমির মায়া কাটান বড় সহজ কথা নয়।

হঠাৎ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে একটা মূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখের ঢাকা খুলতেই চিনতে পারলাম সে সাইদা। অবাক হয়ে বললাম, সাইদা তুমি এমন সময়ে এখানে?

সে আমার কাছে সরে এসে বলল, আস্তে, তোর সঙ্গে ভীষণ জরুরী কথা আছে। বাবার বাইরে ঘরে আজ দরজা-জানলা বন্ধ করে গাঁয়ের কয়েকটি বিশিষ্ট লোকেদের বোধ হয় কোন গোপন বৈঠক বসেছিল। আমার কৌতূহল হওয়ায় মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখলাম মার মুখে-চোখে বেশ ভয়ের ছাপ। সন্ত্রস্তভাবে উনি বললেন, সাইদা, তোর বন্ধু মায়াকে আমি ছোটবেলা থেকে বড় স্নেহ করে এসেছি, কিন্তু আজ তার বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে, কি করে ওকে রক্ষে করি বলত? গ্রামের ঐ লোকগুলো স্থির করেছে আগামীকাল

রাত্রে মায়াকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, ওর বাবা-মা যদি বাধা দেয় তাদের প্রাণে মারতেও ওরা দ্বিধা করবে না। তোমার বাবার কাছে ওরা এ বিষয়ে সাহায্য চাইছে আমি আড়াল থেকে এইটুকুমাত্র শুনেছি। শুনে আমি স্থির থাকতে পারলাম না, তোকে বলতে এলাম তুই যেমন করে পারিস ওদের সাবধান করে দিয়ে আয় ওরা যেন অনতিবিলম্বে এ গ্রাম ছেড়ে পালায়। তিনি খানিকটা চিন্তা করে বললেন, আমার মনে হয় এ গ্রাম ছেড়ে ওদের এখুনি পালাতে গেলে পদ্মার ওপারে হিন্দুস্থানে ওদের গিয়ে পড়তে হয় রাতের অন্ধকারের মধ্যে, এ ছাড়া ওদের এখানে কোথাও নিরাপত্তা নেই। আমি দেখি চেষ্টা করে আমাদের পুরানো কলিমুদ্দি মাঝিকে বলে সে যদি লুকিয়ে ওদের পার করে দিতে পারে। তুই ততক্ষণ সব বৃত্তান্ত ওদের খুলে বলে আয়।

উত্তেজনায় এতগুলো কথা বলে ফেলে সাইদা হাঁফাতে লাগল। যথার্থই সে আমার নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে! আমি ওর মনের ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেখানে হিন্দু-মুসলমান কিছুই লেখা নেই, একটি আবাল্য-প্রীতির স্নিগ্ধ দীপশিখায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে সেখানটি। আতঙ্কে, বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম তারপরে ওর হাতদু'টো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। কি উপায় হবে ভাই, কি করে পদ্মা পার হয়ে ওপারে যাব, কে পার করে দেবে?

সাইদা বলল, ভাই জন্মাবধি তোর সঙ্গে আমার কোন ভিন্ন সত্তা নেই, আমরা একাত্ম হয়ে এত বড় হয়েছি আজ তোকে বিপদের মুখে আমি কিছুতেই ঠেলে দিতে পারব না, মাও চেষ্টা করছেন, যেমন করে হোক তোদের বাঁচাব, আমরা কেউ কারুকে ছেড়ে কখনও থাকি নি কিন্তু আজ তোরই মঙ্গলের জন্য তোকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি দেখি মা কি ব্যবস্থা করছেন তোদের যাবার। যা হয় তোকে এসে আমি সমস্ত জানিয়ে দিয়ে যাব। তুই শীঘ্রি বাড়ি গিয়ে মাসীকে সব খুলে বল কিন্তু খুব সাবধান কেউ যেন না টের পায় তাহলে আমরাও রক্ষে পাব না। বলেই সে দ্রুত মুখটা ঢাকা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অবশ পা দু'টোকে কোনমতে টেনে নিয়ে আমিও বাড়ি ফিরলাম। মা ও বাবা সব শুনলেন। যতশীঘ্র সম্ভব এ গ্রাম পরিত্যাগ করাই শ্রেয় একথা তাঁরা বুঝতে পারলেন, কিন্তু সাইদার মা কি ব্যবস্থা করছেন জানবার জন্য আমরা তিনটি প্রাণী উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম। শুধু আমাদের নিরুপায় যন্ত্রণাময় প্রহরগুলো কেটে যেতে লাগল। রাত্রি প্রায় বারোটা নাগাদ অন্ধকারে গা মিশিয়ে সাইদা এলো, মাকে বলল মাসীমা আমার মা অনেক কষ্টে তোমাদের যাবার একটা ব্যবস্থা করেছেন। আমার ভাই হাফিজ কলিমুদ্দিকে ডেকে নিয়ে আসে এবং নগদ টাকাকড়ি দিয়ে অতিকষ্টে তাকে রাজী করানো হয়েছে এই রাত্রির অন্ধকারে সে লুকিয়ে তোমাদের ওপারে গিয়ে ছেড়ে দেবে। তোমরা যতশীঘ্র পার বেরিয়ে পড়, দেরী করলে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে। জিনিষপত্র পড়ে থাক সব, তোমরা শুধু কোনরকমে ওপারে চলে যাও। প্রাণে বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। এই তিনটে বোরখা এনেছি এগুলো পরে তোমরা সোজা বাবুরঘাটে চলে যাও। সেখানে হাফিজ অপেক্ষা করবে, সেই কলিমুদ্দির নৌকোয় তোমাদের তুলে দেবে। আলো টালো কিছু জেলো না অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে যাও, মা ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আমারও চোখ শুষ্ক ছিল না, এমন দরদী বন্ধু কোথা পাব এত মায়া ছেড়ে কি করে থাকব।

বেশি কথা বলার সুযোগ ছিল না কিন্তু সাইদাকে শেষ বিদায় না জানিয়ে পারলাম না। গভীর আলিঙ্গনে ওকে কাছে টেনে বললাম, তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকব আবার কবে দেখা হবে কেমন করে ছেড়ে যাব এই আজন্ম পরিচিত আমাদের দেশ, বাড়ি-ঘর? চোখের জল আর বাধা মানল না।

সাইদা একটু মলিন হাসল, বলল—তুই আমি যেমন জানি এটা আমাদের দেশ সেরকম যদি সমস্ত জাতটা জানত তাহলে এ দেশটা আমাদেরই থাকত, ভাগ হয়ে আমার দেশ তোমার দেশ হত না। বিধাতা আমাদের জাতের কপালে বিভেদের ছাপ মেরে সৃষ্টি করেছেন। কোনদিনই বোধ হয় আমরা এক হব না তাই নিজের ঘর আমাদের পরবাস হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তোকে কোনদিনই ভুলব না, এ ছবিটা তোকে দিলাম, এটাই তোকে আমায় মনে করিয়ে দেবে, বলে তার ফটোটা আমার হাতে গুঁজে দিল। ওর পেছনে লেখাছিল—'আমার প্রিয়তমা বন্ধু মায়াকে দিলাম—একটি স্মরণিকা।'

বোরখা তিনটে আমাদের হাতে দিয়ে আর একবার আমায় জড়িয়ে ধরল, তারপর বোধ হয় চোখের জলটা চাপবার জন্যই ছুটে বেরিয়ে গেল।

এরপর ভয়াবহ আগামীকালকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়লাম অনির্দেশের পথে। ছিন্নমূল শৈবাল কাহিনীর সঙ্গে আমাদের জীবনেতিহাসের কোন পার্থক্য ছিল না তবে সাইদার শেষচিহ্ন সেই ফটোখানা বরাবরই সযত্নে কাছে রেখেছিলাম। ওটা নিরন্তর আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছে জাতিধর্মের বহু ঊর্ধ্বে দু'টি হৃদয়ের একটি নিবিড় যোগসূত্রের কথা, একটি মহৎ স্মৃতি, একটি পবিত্র প্রেম যার শাশ্বত আসন পাতা আছে ভেদাভেদ সঙ্কীর্ণতার অনেক ওপরে, যা কালজয়ী ধর্মজয়ী হয়ে মানুষকে মানুষের কাছে অমরত্ব দান করেছে।

অযোধ্যা

(বাল্মীকি রামায়ণ—আদিকাণ্ড)

কোশল নামেতে দেশ সরযূর তীরে অবস্থিত।
সমৃদ্ধ, আনন্দময়, ধনধান্য পশু-সমন্বিত।
অযোধ্যা নামেতে পুরী দেশে সেই, ভুবন বিদিত।
পুরী সেই পুরাকালে মানবেন্দ্র মনু বিনির্মিত।
দ্বাদশ যোজন দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে তিন যোজন বিস্তৃত।
সৌন্দর্যে মণ্ডিত পুরী, নব নব গৃহে বিমণ্ডিত।
পুরদ্বারে সুবিভক্ত, সুবিস্তীর্ণ পথ সমন্বিত।
ধূলি যাহে জলসিক্ত হেন রাজপথে সুশোভিত।
নানা বণিকের বাস, নানারত্নরাজি বিভূষিত।
বিশাল উদ্যান আর বিশাল ভবনে পরিবৃত।
সুদুর্গম, সুগভীর পরিখাতে পুরী সে বেষ্টিত।
কপাট তোরণময়, ধনুর্ধারী বীরে সুরক্ষিত।

রাষ্ট্রের কল্যাণকামী দশরথ নৃপ মহাত্মন।
অমরায় ইন্দ্রসম করিতেন সে পুরী পালন॥
দৃঢ় পুরদ্বার যুক্ত মহাপথে, বহু বিপণিতে।
নানা যন্ত্রে, নানা অস্ত্রে, সুবিচিত্র শিল্প সম্ভারেতে॥
শতঘ্নী পরিঘে বহু ধ্বজশীর্ষ বহু তোরণেতে।
সমাকুল নানা যানে, বহু হস্তী বহু অশ্বে রথে॥
পথিক বণিক দূতে, সুবিশাল দেবালয়ে আর।
ছিল সে অযোধ্যাপুরী মনোরম শোভার আধার॥
মহা অট্টালিকা পূর্ণ পানীয় ভবনে সুশোভিত।
ইন্দ্রের অমরা সম, বহু নর-নারী সমন্বিত॥
পুরী সেই, ছিল পূর্ণ বিদ্বান পুরুষ শ্রেষ্ঠে যত।
সুরম্য আলেখ্য সম গৃহ তার, সুবর্ণে চিত্রিত॥
সমভূমি মাঝে স্থিত ঘন গৃহশ্রেণী বিমণ্ডিত।
বেণু, বীণা, মৃদঙ্গের মধুর নিক্কণে নিনাদিত॥
উৎসবে মগন যত পৌর জনগণেতে পূরিত।
ধনুর্নিস্বনেতে পূর্ণ, নিত্য বেদধ্বনি সমন্বিত॥
শালি তণ্ডুলের অন্নে, সুপেয় পানীয়ে পূর্ণ আর।
মনোরম ছবি গন্ধে, ধূপে মাল্যে সৌরভ আধার॥
অযোধ্যা নগরী সেই লোকপাল সমতুল্য যত।
শাস্ত্রবিদ্ বীরকুল করিতেন রক্ষা অবিরত॥
বিদ্যাহীন অশাস্ত্রজ্ঞ সেথা নাহি ছিল কোন জন।
গর্হিত পন্থায় কেহ করিত না জীবিকা অর্জন॥
স্বপত্নীতে অনুরক্ত ছিল নর, নারী পতিব্রতা।
ধৈর্যশীল ব্রতচারী ছিল সদা স্ত্রী-পুরুষ সেথা
কুণ্ডল, মুকুট, মাল্য, প্রসাধনহীন কলেবর
দারিদ্র্য কদর্য বেশ নাহি ছিল নারী কিংবা নর॥
সৌন্দর্য মাধুর্যময়ী নারী যত অযোধ্যা ভবনে।
রহিতেন আহ্লাদিত, অম্লান বস্ত্র ও আভরণে॥
কুরূপ, অজিতেন্দ্রিয়, অলস, ঐশ্বর্যহীন আর।
নীচমনা নাহি ছিল নর কেহ পুরী অযোধ্যার॥
রক্ষা করে গিরিগুহা যথা সিংহ, অযোধ্যা তেমন।
করিতেন রক্ষা সদা যুদ্ধেতে অজেয় বীরগণ॥
কাম্বোজ, বহ্লিক আর সিন্ধুদেশ-জাত অশ্বে যত।
পূর্ণ ছিল সে অযোধ্যা, ছিল আর পূরিত সতত॥
বলবান হস্তিযূথে, বিন্ধ্য আর হিমগিরি-জাত।
বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষিশ্রেষ্ঠ সর্ব বেদবিৎ॥
দশরথ নৃপতির ছিলেন মন্ত্রী ও পুরোহিত।
অমাত্য ছিলেন তাঁর শুদ্ধাচারী আর অষ্টজন॥
কল্যাণ কর্মেতে রত সদা রাজ অনুরক্ত মন।
জয়ন্ত, অর্থসাধক, ধর্মপাল, সিদ্ধার্থ, বিজয়,
অশোক, সুমন্ত্র, ধৃষ্ট, এই অষ্ট নামে পরিচয়॥
বিনয়ী, বিজিতেন্দ্রিয়, রাজ্যাদেশ পালন তৎপর
নীতিবিদ জ্ঞানবান, বর্ষীয়ান নির্লোভ অন্তর॥
তেজ, ক্ষমা, ধৃতিবান, সহাস্যে সম্ভাষশীল আর,
সত্যনিষ্ঠ, সুবিবেকী, সর্বলোকে সমব্যবহার।
স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে মিত্র আর শত্রুদল যত
কোন কার্যে আছে রত সব তাঁরা ছিলেন বিদিত॥
ধর্মশীল সদাচারী, সুবিবেক সম্পন্ন সতত,
অর্থ সংগ্রহেতে আর সৈন্যদল সংগ্রহেতে রত,
সর্বজনে সমদর্শী ছিলেন সে মন্ত্রিগণ যত॥
পুত্রেরও পাইলে দোষ করিতেন দণ্ডের বিধান,
নির্দোষে শত্রুরও নাহি করিতেন কভু অকল্যাণ॥
রাজ্যবাসী চতুর্বর্ণে করিতেন রক্ষার বিধান,
পিতৃ-পিতামহ ক্রমে ছিলা জ্ঞাত জ্ঞান ও বিজ্ঞান॥
পরস্পরে প্রীতিযুক্ত, প্রিয়ভাষী গুণী অগর্বিত,
সুবেশ প্রশান্তমনা, পরনিন্দা প্রচারে বিরত॥
প্রভাবে তাঁদের ছিল সর্বলোক স্বকর্ম তৎপর
না ছিল তস্কর সেথা, নাহি ছিল অশুদ্ধাত্মা নর
দুষ্ট পরদারস্পর্শী। এ হেন অমাত্য সমন্বিত
দশরথ এ পৃথিবী করিতেন পালন সতত॥
অম্বরে আপন তেজে দীপ্তিমান ভাস্করের প্রায়,
ছিলেন পৃথিবীপতি দশরথ বিখ্যাত ধরায়॥

অনুবাদ—আশালতা সেন

গোপবন্ধুনগরে কিছুক্ষণ

মণিকা পালিত

অতীতকাল থেকেই ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানে রক্তাক্ত কলিঙ্গ রণাঙ্গনে সম্রাট অশোকের মনে অনুশোচনা জাগে। এরপর তিনি গ্রহণ করেন বৌদ্ধধর্ম। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহাগুলিতে রয়েছে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের কত নিদর্শন। ধৌলী পর্বতের বুকে সম্রাট অশোকের অনুশাসন এখনও প্রচার করছে সাম্য মৈত্রীর বাণী। ভুবনেশ্বরের অন্য একটি আকর্ষণ হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেব লিঙ্গরাজের মন্দির। এছাড়া মুক্তেশ্বর মন্দির, রাজারাণী মন্দির ইত্যাদি মন্দিরের কারুকার্যগুলিও প্রাচীন উড়িষ্যার স্থাপত্যশিল্পের এক একটি অপূর্ব নিদর্শন। পুরাতন ভুবনেশ্বর সহরটির পাশেই গড়ে উঠেছে উড়িষ্যার রাজধানী নূতন ভুবনেশ্বর। এখানে রবীন্দ্রভবন, সেক্রেটারিয়েট ভবন, বিধান সভা ভবন, রাজভবন ও উৎকল-বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দর্শকের মন আকৃষ্ট করে।

এবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৮তম অধিবেশন ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হল। উড়িষ্যার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা শ্রীগোপবন্ধু দাসের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কংগ্রেস নগরের নামকরণ হল গোপবন্ধুনগর। প্রধান প্রবেশ পথের সামনেই স্থাপিত হয়েছে শ্রীগোপবন্ধুর একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি।

৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলায় আমরা গোপবন্ধুনগরের আলোকসজ্জা ও কংগ্রেস প্রদর্শনীটি দেখার উদ্দেশ্যে কটক থেকে যাত্রা করলাম। সমস্ত গোপবন্ধুনগর তখন আলোয় ঝলমল করছে। প্রধান পথগুলির

ওপর তৈরি হয়েছে কতকগুলি তোরণ। আর এই তোরণগুলির নামকরণ করা হয়েছে উড়িষ্যার বীর শহীদ ও সন্তানদের উদ্দেশ্যে। উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পকলার অনুকরণে তৈরি হয়েছে তোরণগুলি। আমরা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের বক্তৃতা মঞ্চটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। শত শত কংগ্রেসের পতাকার দ্বারা শোভিত হয়েছে নগরটি। যেখানে বিষয় নির্বাচনী কমিটির অধিবেশন হবে সেটিও দেখলাম ভাল করে। এই মণ্ডপটির সাজসজ্জা বেশ আকর্ষণীয়। তখন সেবাদলের মেয়েরা সেখানে আলপনা দিতে ব্যস্ত। দূর থেকেই দেখলাম নূতন সভাপতি শ্রীকামরাজের জন্য যে বাড়িটি তৈরি হয়েছে সেটি।

এরপর আমরা গেলাম প্রদর্শনী দেখতে।

সেদিন বিকেলবেলায় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন এবং খাদী ও গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো। প্রদর্শনীটি বেশ ভাল করে আমরা দেখলাম। পশ্চিমবাংলার স্টল ও আনন্দবাজারের স্টল আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ইণ্ডাষ্ট্রীব স্টল ও উড়িষ্যার মৎস-বিভাগের স্টল দু'টিও বেশ ভাল লাগল। ইণ্ডাষ্ট্রীর তৈরি সোফাসেট ও তাঁদের জাপানী সহায়তায় তৈরি ট্রানজিস্টারগুলিও বেশ সুদৃশ্য।

পারাদ্বীপে উড়িষ্যার আধুনিক বন্দর নির্মিত হচ্ছে; প্রদর্শনী মণ্ডপে একটি বিরাট জাহাজ নির্মিত হয়েছে এবং জাহাজটির সামনেই স্থাপিত হয়েছে প্রাচীন উড়িষ্যার একটি নৌকা। এছাড়া উড়িষ্যার নানা শিল্পও স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। একটি চিড়িয়াখানাও রয়েছে প্রদর্শনীতে। এখানে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সিংহ, কুমীর, কোনারকের কালো হরিণ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

৫ই জানুয়ারী শ্রীকামরাজ ভুবনেশ্বরে বেলা তিনটের সময় এসে পৌঁছবেন। সেদিন কটকের বাসগুলিতে অসম্ভব ভিড়। যদিও কোনরকমে একটায় উঠে পড়লাম আমরা তবু ভুবনেশ্বর পর্যন্ত দাঁড়িয়েই যেতে হল। ভুবনেশ্বর সহরে ঢোকার মুখেই শুনতে পেলাম তোপের শব্দ। আটষট্টিবার তোপধ্বনি হল। বাস থেকে নেমেই পথের একপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় শ্রীকামরাজকে দেখার জন্য। বিরাট শোভাযাত্রাসহ এগিয়ে আসছে শ্রীকামরাজের গাড়ি। সেবাদল বাহিনী ও যুব-কংগ্রেস বাহিনী চলেছে। আদিবাসী নাচের দল চলেছে। ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে অন্য একটি দল। একটি লোক চলেছে আগুনের লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে। সবশেষে রয়েছে সভাপতির গাড়ি। একটি খোলা জীপের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীকামরাজ সমবেত জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন হাসিমুখে। তাঁর দু'দিকে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র ও শ্রীবিজু পট্টনায়েক। আস্তে আস্তে সভাপতির গাড়িটি এগিয়ে চলল শোভাযাত্রাসহ গোপবন্ধু নগরের দিকে।

আমার দেখা কাশ্মীর

স্মৃতি দত্ত

সৌন্দর্যের মক্ষীরাণী কাশ্মীর। নানা মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে বিবিধ সম্ভার নিয়ে, কত যুগ আগে থেকে কে জানে—দিশী, বিদেশী—জানা, অজানা কত মানুষ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এই ছোট্ট উপত্যকাকে কেন্দ্র করে। অফুরন্ত সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে এ দেশ ডাকছে সৌন্দর্য পিপাসুকে, সুনিপুণ শিল্পকলা অবাক চোখে দেখেছে শিল্পরসিক। গানে, কাব্যে, আবেগে মূর্ত হয়ে উঠেছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর। শুনেছি মোগল বাদশাদের বিহ্বল করেছে, দীঘল-নয়না কাশ্মীর নন্দিনী, তাঁদের নিদ্রা টুটেছে, ফিকে হয়ে গেছে তাঁদের সাম্রাজ্যলিপ্সা। অবসর বিনোদনের লীলাক্ষেত্র কাশ্মীরকে তাই তাঁরা নানা রঙে, নানা ঢঙে রূপায়িত করেছেন। ইতিহাসের চাকা চলে মন্থরগতিতে, তাকে সেই মুহূর্তে অনুভব করা যায় না। সেই একই চাকার ঘূর্ণনে আজ কাশ্মীর বিশ্বরাজনীতির পাশাখেলায় আহ্বান জানিয়েছে দেশী-বিদেশীকে। পরিণত হয়েছে রাজনীতির হটবেড।

বিচিত্রভাবে যাকে দেখেছি অনুভবে, সেই কাশ্মীর যাত্রার দিন এল এগিয়ে, পথের ডাক এসে পৌঁছেছে, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। ২৭শে এপ্রিল, জানা, অজানা অভাবিত ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের প্রস্তুতি শেষে আমাদের যাত্রা শুরু হল ভূস্বর্গের পথে, কল্পনা ত' কৃপণ নয়। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যাকে দেখেছি অনুভবে, তাকে পাব ত' কেমন করে। এ ভয় ছিল মনে। পাঠানকোট এক্সপ্রেস ছুটেছে লক্ষ্যপথে। আমার চোখের চাওয়ায় শুনছি আকাশে-বাতাসের আনন্দের সুর। কে যেন ডাকে সুন্দরের বেশে। কোথা থেকে এল সেই আহ্বান! বাংলা দেশের সবুজ ছাড়িয়ে, কালো লাল মাটি পেরিয়ে, চলেছি আমরা শুকনো খটখটে পাথর বালির দেশে। পাঞ্জাবে এসে কঠোর তপনতাপে মধুর প্রকৃতিকে দেখতে পেলাম পেলবতাশূন্য—শুধু নিদারুণ নিঠুর জ্বালাদায়িনী বেশে সীমাহীন প্রান্তর। এ মাঠে ধেনু চরে না, নেই তাল-তমালে ছায়াচ্ছন্ন বনানী—কেউ বাজায় না এখানে আপন মনে ব্যাকুল করা সুরে বাঁশরী, খাঁ খাঁ করছে—বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত ক্লান্তিবিহীন বৈশাখী দিন। বন্ধ হ'ল জানালা। গরম হয়ে উঠেছে নিশ্বাসের বাতাস। দিন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর বোধ হচ্ছে। সন্ধ্যা এল পায়ে-পায়ে। হাওয়ায় লাগে তার স্নিগ্ধতা, আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। স্বীকার না করে উপায় নেই—পাঞ্জাবের নিদাঘ তুমি বড় ভয়ঙ্করী, রাত্রি ঘন কালো পর্দা টেনে দিল দৃষ্টিলোকের সামনে, ট্রেনের ঝাঁকুনি, পথের ক্লান্তিতে যাত্রীদল নিশ্চুপ, নিথর। ঊষাকালে আমরা পৌঁছেছি পাঠানকোট, গ্রীষ্মের দাহ নেই, নেই শীতের প্রকোপ, ভূস্বর্গের পথে—মধুর কোমল প্রথম ধাপটি সাদরে আমাদের আমন্ত্রণ জানাল; অনুভূতিকে উপলব্ধি করবার ফুরসুৎ নেই—লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, কাশ্মীরগামী বাসে মাল তোলাবার জন্যে নইলে দেরী হয়ে যাবে অনেক, আবার চলা হল শুরু, জানালার পাশে বসে আছি সতৃষ্ণনয়নে কিছু হারিয়ে গেলে চলবে না, পরিপূর্ণ রূপে দেখব বলেই ত' আমাদের এই প্রয়াস।

'চক্ষে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।'

বাঁধান পথে বাস চলেছে দ্রুতগতিতে, সাথে রাবি নদী তারই পাশে-পাশে; প্রশস্ত নদী—প্রকৃতির অফুরন্ত জলরাশি আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে, পাথর বাঁধান বেড়ি পরে শীর্ণ হয়ে গেছে; তবু তার গতির চঞ্চলতা স্তব্ধ হয়ে যায় নি; তর্-তর্ করে এগিয়ে চলেছে সুদূরের পানে; পথের ধারের আকাশ লাল হয়ে আছে, শিমুল, পলাশের আগুন রঙে; বেলা বারোটায় আমরা এসে পৌঁছলাম

জম্মুতে; দুপুরে খাবার আশায় হোটেল খুঁজছি, নানা স্তরের খাবারের ব্যবস্থা, আমরা এলাম হোটেল প্রিমিয়ারে। বেশ গরম হচ্ছিল; বাইরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দেখে সেখানে ঢোকা গেল; হা! হতোস্মি! ওটা অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষরমাত্র, বর্তমান অভাবজনিত ক্লিষ্টতায় জীর্ণ, খাদ্য, অখাদ্যের বিচার তখন ঘুলিয়ে গেছে খিদের তাগিদে; বাসের হর্ণ বেজে উঠল,—ছুটে চললাম; এবার কুঁদের পথে, ক্রমে বাস উঠছে পাহাড়ের কোল বেয়ে, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে; বিকেলে এসে পৌছেছি কুঁদে, চাটির ঘন চা মনে করিয়ে দিলে আধুনিক সভ্যতার অবদান চা এক অনবদ্য আবিষ্কার, হিমালয়ের বুক বেয়ে চলেছি এঁকে বেঁকে, পাইনের ঘন সবুজ গভীর গম্ভীর করে তুলেছে চারপাশের জগতটা দুই পাহাড়ের মাঝে খরস্রোতা চেনাব, কাঠ ভেসে চলেছে। পাহাড়ের দেহ কেটে কেটে চলেছে আমাদের কালো রাস্তা; দূরের পাহাড়, পাশের পাহাড় লাল নীল হলুদ ফুলে অপরূপ হয়ে উঠেছে, এত রঙ এত রূপ—শিল্পী প্রকৃতি যেন মিলিয়ে মিশিয়ে নানা আভরণে সেজেছে; প্রকৃতির এই অপূর্ব ঐশ্বর্যরাশিই বুঝি কাশ্মীরের শিল্পকে এত সুন্দর করে তুলেছে, কল কল করে বয়ে চলেছে পাহাড়ী ঝরণা; যে যার আপন চলার আনন্দে পরিপূর্ণ। মধুর প্রকৃতি, মধুর ভুবন—আলোয় ছায়ায় রঙে রসে কি মনোহরণ সাজেই না সেজেছে। কখন গগনস্পর্শী শৃঙ্গ, কখন বা গভীর খাদে নদীতে—নীলিমায় দৃষ্টি ছুটে চলেছে। কাকে দেখব, নিজেকে হারিয়ে ফেলছি বার বার, এ এক ভাষাহীন অনুভূতি, পৃথিবীর কাদামাটির অনুভূতি ফিকে হয়ে আসছে—কোথায় যেন উদাস হয়ে পাখা মেলেছে মন পাইনের সারি পেরিয়ে।

বাটোট ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় বাস চলা বন্ধ হবে। নির্ধারিত সময়ে কোন উপযুক্ত বিশ্রামের স্থান পাওয়া গেল না, আমাদের চালকের হিসেবে ভুল হয়েছে। এক ফুঁয়ে যেন সব আলো নিভে গেল, ঘোর কালো অন্ধকার ঘিরে ধরেছে আমাদের, গাড়ির হেড লাইট শুধু রাস্তা দেখিয়ে চলেছে। এক পাশে অনুভব করছি নীরেট পাহাড় অন্যপাশে চেনাবের গভীর খাত, কি অদ্ভুত আমাদের অনুভূতি। পৃথিবীর আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর পিয়াসী বাঁধনহারা মন খাঁচা বন্দী হল। ভয় এল মনে, চোখে পড়ছে কেবল দক্ষ চালকের হাতের ষ্টিয়ারিং আর সামনের কয়েক হাত রাস্তা, শংকাকুল অস্বোয়াস্তির মাঝে কেটে গেল দীর্ঘ একঘণ্টা, পৌছুলাম বেনিহাল—রাত্রির আশ্রয়, হোটেলের সামনেই বাস থেমেছে, ঘর ও পেলাম একখানা, তাকে বাসযোগ্য করবার প্রচুর চেষ্টা করলেন ম্যানেজার সাহেব, তবু অন্ধকার না করে ও আশ্রয়ে ঢুকতে পারলেম না;

ক্লান্ত দেহ অবসন্ন, ঘুমিয়ে পড়েছি একসময়ে; সকালের বেনিহাল পুলকে ভরে দিলে। আমাদের হোটেলের পাহাড়ের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদীর স্বচ্ছ জলধারা—ছুটে গেলাম সেখানে। ঠাণ্ডা বরফ গলা জল হাত মুখ অবশ করে দিল। জানতে পারলাম, এ স্রোতের উৎস খুব কাছের জমাট বাঁধা বরফ থেকে। এগিয়ে চলেছি—কাছে হলেও খুব কাছে নয়, বরফ দেখতে পাচ্ছি, সরু ধারাও চোখে পড়ছে, দেরি করতে পারলাম না, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে শ্রীনগরের পথে; নামতে শুরু করেছি পাহাড়ের গা বেয়ে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে। দুই মাইল ঘুরে গিয়ে নীচে ভেরীনাগ;—ঝিলাম নদীর উৎস, জল উঠছে মাটির তলা থেকে; মনোরম করে তুলেছেন শিল্পী বাদশা। বাঁধিয়ে দিয়েছেন ঘন সবুজ জলরাশি; তারই পাশে বসে আছেন ভোলানাথ ফুল, বেলপাতা মাথায় নিয়ে, দুই ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা একাত্ম হয়ে গেছে সুন্দরের মাঝে, নালা হয়ে উৎস থেকে নেবে গেছে ঝিলাম, দুই পাশে ফুলের কেয়ারী, শ্যামল, শোভন প্রান্তর ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ বিদেশিনী চিনার, অধুনাকালে তারই পাশে তৈরি হয়েছে বিশ্রামের জন্যে ডাক-বাংলো। চার পাশের দৃশ্য নয়ন ভুলানো।

আবার পাহাড় বেয়ে দীর্ঘ টানেলের অন্ধকার দিয়ে চলেছি দীর্ঘযাত্রাকে ছোট করবার প্রয়াস এই টানেল, সমতল দেশে এসে পড়েছি, মাঝে মাঝে জলা আর মাঠ, পথে পড়ছে সাধারণ কাশ্মীরবাসীদের কুঁড়েঘর, হলদে ফুল ঢেকে দিয়েছে সে-ঘরের চালা, দূর থেকে মনে হয় কোনো সৌখীন বাবুর বাগিচা। সারা দেশটাতে কে যেন নানা রঙের গালিচা পেতে রেখেছে, এই দেশের মানুষও পেয়েছে প্রকৃতির এই আশীর্বাদ, ঝরণা নদীর সরসতা, সজলতা, পর্বতশৃঙ্গের ঋজুতা তাদের মেয়েদের দিয়েছে বিহ্বল করা রূপ, আপন স্বরূপে তারা আপনি ধন্যা, মেয়েরা, কিশোররা কোথাও বা ছেলেরা মাটি ভাঙছে ভবিষ্যৎ ফল ফলাবার আশায়, হলদে সরষে ফুলে ভরে আছে মাঠ, মাঝে মাঝে নাম না জানা লাল ফুল দুলে দুলে উঠছে হাওয়ার পরশ পেয়ে, চোখে পড়ছে আপেল চেরীর বাগান—সাদা ফুলে ঢেকে গেছে সেখানকার আকাশটা, এত ফুল সম্ভার কোথাও দেখা যায় এ কথা আগে কখন ভাবি নি, রাজধানীর পথ। আকাশচুম্বী পাইনের সারি পাশে চলেছে ঝিলামের বাঁকা স্রোতখানি।

ট্যুরিস্ট আস্তানায় এসে পৌছুলাম। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে; পথ ঘাট ভেজা, শুনতে পেলাম—তিনদিন ছাড়বে না এ বৃষ্টি নতুন জায়গা—একটু বিব্রত ভাবে লক্ষ্য করছি টাঙ্গা চালকদের উত্তেজনা, যাই হোক, হোটেল চিনারে এলাম। উইলো আর চিনারে ভরে গেছে শ্রীনগর। কতকাল আগে কে জানে, ইতিহাস তার সঠিক হিসাব দেয় নি, কাশ্মীররাজ এনেছিলেন শিশু চিনার বৃক্ষকে সুদূর ইরান থেকে, উইলো গাছের সোঁ সোঁ শব্দ বাংলা দেশের নদীর ধারের ঝাউগাছের কথা মনে করিয়ে দেয়, ঐ শব্দে অকারণ বিষাদে ব্যথিয়ে ওঠে মন, ক্রন্দসী হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে কোন এক অধরার আভাস পেয়ে, আমাদের আবাসের সামনে শুভ্র রবীন্দ্রভবন, ভারি ভাল লাগল, গর্ব হল, নতুন করে অনুভব করলুম আমি কবির দেশের মানুষ তারই পেছনে ভ্রমণার্থীদের আবাসগৃহ, যে কবির কাছে দেশ বিদেশ একাকার হয়ে গেছে—সেই পৃথিবীর কবির পায়ের তলায় এসে জুটবে সবাই বছরের পর বছর।

ঝিলাম বুকে নিয়ে রেখেছে ছোট নৌকো আর বড় বড় হাউসবোটকে, বড় বড় হোটেল, দোকান গড়ে উঠেছে তাকে ঘিরে। ট্যুরিস্ট অফিসই ব্যবস্থা করে দিলে দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করবার, ডাল লেকের পাশ দিয়ে চলেছি মোগল গার্ডেনস, নৌকো করে ফুল নিয়ে চলেছে সুন্দরী কিশোরী, অন্যপাশে স্বচ্ছ জলধারা ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। চশমাশাহীর জল পান করেছি পেটভরে,

সম্রাট সাজাহান তৃপ্ত হয়েছিলেন এই জল পানে। আমরা আজ তার উত্তরাধিকারী, এর পর বিখ্যাত শালিমার বাগ। এখানকার কত প্রভাত, সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে উঠেছে—সম্রাট জাহাঙ্গীর আর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নুরজাহানের উপস্থিতিতে, গোলাপের বাগান, আপেলের বাগিচা, চেরীর সারি সবাই মিলে সানন্দ অভিবাদন জানিয়েছে তাঁদের।

স্মৃতিঘেরা এই আনন্দ নিকেতন আজও আমাদের অবাক করে দেয়, ফেরার পথে এলাম নিসাদবাগ, এ বাগান ধাপে ধাপে সেজে উঠেছে ফুল আর ঝরণা ধারায়, দূরে চোখে পড়ছে প্রশস্ত ডাল লেক, প্রশস্ত আকাশ। ইতিহাস বলে নূরজাহান ভ্রাতা ছিলেন সৌন্দর্যরসিক, বাগান ছিল তাঁর প্রাণ হতে প্রিয়। তাই হয় তো সবার চেয়ে বেশি মনোহরণ করছে নিস্যাদবাগ, কত লেক কত ঝরণা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, একদিন বেরিয়ে পড়লাম পহেলগামের উদ্দেশ্যে, পাইনের সারিতে ঘেরা পাহাড়ের উপর পহেলগাম। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর কাশ্মীরভূমির খরস্রোতা নদী পাহাড়ের নীচে, দূরে দেখতে পাচ্ছি কোথাও কোথাও বরফগলা জলের সরু ধারা নেমে গেছে চারপাশের পাহাড় থেকে, ভাল লেগেছে খুব, আশা রইল মনে—ভবিষ্যতে আবার যাব পহেলগাম, একদিন মাত্র সময় কিছুই দেখতে পেলাম না চোখ ভরে, ফিরে আসতে হল।

এর পরের যাত্রা গুলমার্গ। সকাল বেলা বেরিয়ে পড়েছি, চারপাশের বনানীর সৌন্দর্য আর হিমালয় শ্রেণী দেখতে দেখতে এসে পৌছেচি গুলমার্গে, শুনেছি, ঘোড়া ছাড়া গুলমার্গে যাবার আর কোন উপায় নেই, আমার মা ৬৫ বছরের মহিলা। হেঁটে চললেন আমাদের সাথে, একসময়ে পৌছে গেলাম গুলমার্গ, মাকে দেখে সেখানকার লোকেরা অবাক, পথে পথে চোখে পড়ল বরফের ওপর আলোছায়ার সমাবেশ, খুশির আবেগে চলেছি, বরফে ঢেকে আছে তখনও গুলমার্গের কোনো কোনো খাত, পাইনের গোড়ায় জমে আছে কুঁচো বরফ, এত কাছের বরফ দেখেছি শৈশবের বিস্ময় নিয়ে, চা খেতে খেতে দেখতে পেলাম আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলেছে, বৃষ্টি নামবে এখুনি, মন্দ কি। এও এক অভিজ্ঞতা। নামতে নামতেই বৃষ্টি নামল, বরফের বৃষ্টি, আমরা পথ ছেড়ে পাহাড় বেয়ে নামছি তাড়াতাড়ি নামবার আশায় পা পিছলে যাচ্ছে। পায়ে বরফ বিঁধছে। ফিরে এলাম। শ্রীনগর শহরের পাশেই শঙ্করাচার্যের মঠ, ধর্মার্থী শুধু নয়—ভ্রমণকারীরও তা এক আকর্ষণীয় স্থান, শ্রীনগর শহর, কাশ্মীর উপত্যকা চোখে পড়ে তার উপর থেকে, ঋষিবর স্থান নিয়েছিলেন সুন্দরের আশ্রয়ে, মোটামুটি দেখা হল।

ফেরার দিন এল, কিছুই দেখা হোল না, আভাস পেলাম শুধু আরো—আরো অনেক ভাবে দেখবার আশা রইল মনে, রাত্রি শেষের অন্ধকারে আমাদের বাস যাত্রা করল কলকাতাগামী ট্রেনের উদ্দেশ্যে, কাশ্মীর ছেড়ে চলেছি, সামনে চোখে পড়ছে চারপাশে বরফ ঢাকা পাহাড়, মন্দ মধুর হাওয়া, আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে তাকে বলা হোল না, বলা হোল না, বলা গেল না, কল্পনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাস্তব আমায় আপন সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছে, বহুদিনের আনন্দের খোরাক নিয়ে ক্রমে ফিরে এলাম কর্মজগতে।

প্রত্যয়

শ্রীমতী বসু

সমুদ্রে অসংখ্য ঢেউ—
উত্তাল তরঙ্গ লহরী।
দুর্বার বেগে ছুটে আসে যেন দুরন্ত সর্পিণী
লক্ষ লক্ষ ফণা তুলে ধরি।
আবার কখনও স্তব্ধতায় স্থির,
সমাহিত। কোন মন্ত্রবলে?
হয়ত বা হেতালের-ই হবে।
উন্মত্ত নাগিনী মাথা নোয়ায় নীরবে।
এমনি অস্থির অনিত্য তরঙ্গের বুকে
নির্ভরতার একবিন্দু জেগে ওঠে।
স্পষ্ট হ'তে হয় স্পষ্টতর।
ছোট্টতরী এক—ঢেউয়ের দোলায় কাঁপে থর থর।
আমার মনেও অসংখ্য ভাবনার
বিচিত্র ঢেউয়ের খেলা চলে।
উদ্বেল আবেগে ছুটে আসে বার বার
মনের কিনারায়। আছড়ায়।
তারপর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে, মিশে যায়।
ধোঁয়ারা যেমন সুদূর আকাশে
মেঘ হয়ে মেশে।
বৃষ্টি হয়ে ঝড়ে পুনর্বার
তেমনি আমার
ভাবনার কুয়াশা জমে জমে
অশ্রুর ধারায় গলে নামে।
সরে যায়—
সরে যায় সব অন্ধকার।
দূরে বহুদূরে স্মৃতির দোলায়
আবছা ধূমল এক মুখ ভেসে আসে।
স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হয়
একি অবাক বিস্ময়!
চেয়ে দেখি সে মুখ তোমার।

দুলালী

ঝরণা সেনগুপ্ত

মুনিয়া যখন মারা যায় তখন সে ডাক্তার-গৃহিণী অপর্ণার হাত ধরে বলে যায়—মা আমি আর বাঁচবো না, আমার দুলালীকে তুমি দেখো।

অপর্ণা বলল,—অমন কথা বলিস নে মুনিয়া, দুলালীর জন্য তোর কোন চিন্তা নেই তুই ভাল হয়ে উঠবি।

না মা, এই আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমি আর বাঁচবো না।

অপর্ণা নীরবে মুনিয়ার মাথার কাছে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে একটু জল মুনিয়ার মুখে দিতে লাগলেন। ঘণ্টাখানেক এইভাবে থাকার পর মুনিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। অপর্ণা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দুলালীকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরলেন। দুলালী দুই বছরের মেয়ে। নিজে স্নান করলেন, দুলালীকে স্নান করিয়ে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন।

মুনিয়া এবং তার স্বামী রামধানী ১৩৪০ সনের বছর—কোথা থেকে এসে ডাক্তার সুব্রত সেনের বাড়ির কাছে এক চালাঘরে আশ্রয় নেয়। রামধানী বাঁশী, নলুবে, খেলনা প্রভৃতি বিক্রি করে এবং মুনিয়া ঘুঁটে বিক্রি করে সংসার চালাতে থাকে। মুনিয়া ঘুঁটে বিক্রি করতে ডাক্তার সেনের বাড়িতেও যেত। সেই উপলক্ষে তার অপর্ণার সঙ্গে পরিচয়। কয়েক বছর মুনিয়াদের সংসার বেশ ভাল-ভাবেই চলতে থাকে। এই সময় দুলালীর জন্ম হয়। দুলালীর জন্মের পর একবছর যেতে না যেতেই হঠাৎ রামধানী জ্বরে ভুগে অল্প ক'দিনের ভেতরই ইহধাম পরিত্যাগ করে। মুনিয়া তার ঘুঁটে বিক্রির পয়সা দিয়েই সংসার চালাতে থাকে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে মুনিয়াকেও সংসারের মায়া পরিত্যাগ করতে হ'ল।

ডাক্তার সেনের বয়স ত্রিশের বেশি নয়। বছর দুই হ'ল বিয়ে করে এই বাড়িতে আছেন। ছেলেমেয়ে এখনও হয় নি। ডাক্তার কল থেকে এসে দুলালীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে বললেন—এ কে অপর্ণা, কার ছেলে কুড়িয়ে আনলে?

—ছেলে নয় মেয়ে, জান মুনিয়া মারা গেছে। যাওয়ার সময় মেয়েটিকে আমার কাছে দিয়ে গেছে।—বললে অপর্ণা।

—ভাল কর নি। ও-সব নীচ জাতের সন্তান, ওকে কি পোষ মানিয়ে রাখতে পারবে?

—তুমি মানুষে মানুষে এত তফাৎ দেখে থাক। ও-তো শিশু, নিষ্কলঙ্ক। ওর দোষ কি?

—রক্তের ধারা যাবে কোথায়? তবে ভালও হ'তে পারে। তবুও এনে ভাল কর নি।

—উপায় ছিল না, আমি না আনলে না খেয়ে মারা যেত।

—মারা যেত তাতে তোমারা কি?

—ঐটেই সহ্য করতে পারি না।

—তোমরা নারী জাতি বড় দুর্বল।

—মানবতার দিক থেকেও এটা কর্তব্য বলে মনে করি।

—বাস্তবিক অপর্ণা, তোমার কথায় আমি খুশি হ'লাম।

এখন ডাক্তার-দম্পতি উভয়েই শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শিশুটিও সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল। কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল, ডাগর ডাগর দু'টি চোখ। রংও বেশ ফরসা। অপর্ণা অপত্য নির্বিশেষে দুলালীকে পালন করতে লাগলেন।

২

তারপর তের বছর কেটে গেছে। দুলালী এখন পনের বছরে পা দিয়েছে। এর মাঝে অপর্ণারও একটি ছেলে হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে অঞ্জন। সেও সাত বছরের হয়েছে। দুলালী এখন বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। অতি পল্লবিত লতার মত তার দেহ, বয়সের তুলনায় কিছু বর্ধিত। একটু বলিষ্ঠ গড়ন। কিন্তু বাঙালী মেয়ের মত কমনীয়তার কিছু অভাব দেখতে পাওয়া যায়। যদিও পোষাকে এবং ভাষায় সে সম্পূর্ণ বাঙালী। চলা ফেরার মধ্যে একটা স্বাধীন ভাব। তার চেহারায় একটা আকর্ষণীয় বিশেষত্ব আছে। সেটা যে তার অজ্ঞাত তা নয়। সে যেখানেই যায় সকলেই তার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক। সেও সকলের সঙ্গেই মেশে এবং সকলের সঙ্গেই হাসি গল্প করে। কিন্তু অপর্ণা দুলালীকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। প্রথমত পড়াশুনায় তার একেবারেই মন নেই। স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। ক্লাশ 'থ্রী'র বেশি আর এগোতে পারে নি। পাঁচ বছর পর্যন্ত দুলালী অঞ্জনের সঙ্গে খেলাধূলো করেছে। কিন্তু তারপরে যখন অঞ্জনের পড়াশুনোর দিকে তার মা-বাবা বিশেষ দৃষ্টি দিলেন তখন থেকেই দুলালী একটা প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। দুলালী অপর্ণার কথার বেশি বাধ্য থাকত না! সুতরাং দুলালীর প্রভাব থেকে অঞ্জনকে মুক্ত রাখা অপর্ণার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। অঞ্জনের জন্য মাষ্টার রাখা হ'ল। তখন থেকেই দুলালীর মনে হ'তে লাগল যে অপর্ণা আর তাকে আগের মত স্নেহ করেন না। সুতরাং তার মনেও অঞ্জনের প্রতি একটা হিংসার ভাব জেগে উঠল। এজন্য সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে অঞ্জনের সঙ্গে দুলালীর ঝগড়া হ'তে লাগল এবং দুলালী ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে বেশি কাটাতে লাগল।

এদিকে ডাক্তার সেনেরও পসার বেশ জমে উঠেছে। প্রায়ই কল উপলক্ষে তাঁকে বাইরে বাইরে থাকতে হয়। একখানা গাড়ি কিনেছেন। হরকিসেন সিং নামে এক যুবককে ড্রাইভার নিযুক্ত করেছেন। দুলালী অনেক সময় হরকিসেন সিং-এর সঙ্গে গল্প গুজবে কাটায়। মাঝে মাঝে হরকিষেনের সাথে মোটরে বেড়াতেও যায়। এ ব্যাপারে অপর্ণার নিষেধ দুলালী বড় একটা গ্রাহ্য করে না। সুতরাং অপর্ণা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। এখন কি করে দুলালীকে সৎপাত্রস্থ করা যাবে এই ভাবনায় দিন কাটাতে লাগলেন।

একদিন দুলালী হরকিষেনের সাথে বেড়াতে গিয়ে একটু বেশি রাত্রে ফিরেছে। তখন অপর্ণা দুলালীকে বললেন, দ্যাখ দুলালী, তুমি এখন বড় হয়েছ তোমার তো এখন যার তার সাথে এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা শোভা পায় না।

দুলালী বললে, মা, হরকিসেন আমাকে নিয়ে পার্কে গিয়েছিল। আমি অনেক বলা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি ফিরল না। তাই দেরী হয়ে গেল।

—যাক্‌ আর যেন এমনটি না হয়।

তার পরদিন হরকিষেন দুলালীকে নিয়ে বেড়াতে গেল আর ফিরল না। অনেক রাত হয়ে গেল—তবুও হরকিসেন বা দুলালীর দেখা মিলল না।

রাত বারোটা বাজল। তবু তাদের দেখা নেই। সুব্রত অপর্ণাকে বললেন, দেখলে তো, আমি তো আগেই বলেছিলাম কাককে কোকিলের বাসায় রাখলে কোকিল হয় না। এখন কি করা যাবে? কোলকাতা শহরে কোথায় খুঁজবো।

অপর্ণা বলল,—আমার বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে; চৌদ্দ বছর যাকে লালন পালন করলাম সে এমনি করে সব বন্ধন ছিন্ন করে পালাল। আমি যে ভাবতেও পারি নে।

অঞ্জন বলল, মা তুলালী কি আসবে না ?

—কি করে বলব বাবা।

—তবে আমি কার সাথে খেলব ?

—আসবে রে আসবে। তুই ঘুমো।

সে রাত্রে অপর্ণা ও সুব্রত্তর আর ঘুম হ'ল না। পরদিন থানায় খবর দেওয়া হ'ল এবং নানা জায়গায় খোঁজ করা হ'ল। কিন্তু তাদের সন্ধান মিলল না।

৩

ডাঃ সেনের বাড়ি থেকে চলে এসে হরকিষেন সিং এবং তুলালী বৌবাজারে একটি খোলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। তারা স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে থাকে। হরকিষেন একজন মাড়োয়ারীর কাছে ড্রাইভারের চাকরী নেয়। তাতে যা পায় তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে যায়। এভাবে কিছুদিন চলল। এক বছর পর তুলালীর একটি মেয়ে হল। নতুন ব্যক্তির আগমনে সংসারে ঘোর অভাব অনটন দেখা দিল। শিশুর দুধ, জামা, কাপড় প্রভৃতির জন্য অনেক খরচ বেড়ে গেল। এখন হরকিষেন যা পায় তাতে মাসের কুড়ি দিনের বেশি চলে না। বাকি দিনগুলি অর্ধাশনে, অনশনে, বাকি কিংবা ধার কর্জ করে চলে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ লেগেই আছে। একদিন সকালবেলা হরকিষেন বলল, সাতটা বাজতে চলল, তুলালী চা দিলি নে।

—তুলালী উত্তর করল, চিনি নেই।

—চিনি নেই তা আগে বলিস নে কেন ?

—তুই জানিসই তো আবার বলব কি ? চাল, ডালও তো নেই। মুরোদ নেই, তার ঘর বাঁধবার সাধ আছে।

—কি বললি হারামজাদী···

—ত্যাখ মুখপোড়া বকাবকি করিস নি।

—দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি। এই বলে হরকিষেন উঠে গিয়ে তুলালীর চুল ধরে কয়েকটা কিল ঘুঁষি দিয়ে জামা জুতো পরে বেরিয়ে গেল। তুলালী বসে বসে কাঁদতে লাগল।

১২টা বেজে যায়। হরকিষেনের আর দেখা নেই। বাচ্চাটা দুধ খেতে না পেয়ে কাঁদছে। তখন তুলালীর হুঁস হ'ল। এখন কি করবে! মহা চিন্তায় পড়ল। শেষে তাদের বাড়ির কাছে হরদয়াল সিং-এর মুদির দোকানে গেল, হরদয়ালকে বলল, ত্যাখ সিংজী, মিন্সে যে সেই সাতটায় বেরিয়েছে এ পর্যন্ত আর ফেরে নাই, ঘরে চাল ডাল কিছুই নাই। বাচ্চাটা দুধ না পেয়ে চেঁচাচ্ছে।

হরদয়াল বললে,—বলিস্ কিরে? তাজ্জব ব্যাপার, হরকিষেন এখনও ফেরে নি ? ভাবনার কথা। যাক্ তুই চাল-ডাল নিয়ে যা। আর এই টাকাটা নিয়ে যা দুধ কিনে বাচ্চাটাকে খেতে দিস।

—বাঁচালে সিংজী—বলে তুলালী জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেল।

একদিন যায়, দু' দিন যায়, হরকিষেন আর ফিরল না। এদিকে তুলালীর খরচা হরদয়াল চালাতে লাগল। সেই সূত্রে তুলালীর সঙ্গে হরদয়ালের বেশ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হ'ল।

৪

আলিপুরের এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট, বেলা ১২টা। হাকিম উঁচু বেদীর উপর বসে আছেন। পাশে পেস্কার নথিপত্র নাড়ছে। হাকিমের ডানদিকে আসামীর দাঁড়াবার কাঠগড়া। বামদিকে সাক্ষীর দাঁড়াবার কাঠগড়া। উকিল, মোক্তার, মুহুরী মক্কেলে আদালত ঘর ভরে গেছে। পেস্কার কোর্টের পিয়নকে বললেন, আসামী হরকিষেন সিং আসামীকে ডাক।

পিয়ন উচ্চৈঃস্বরে ডাকল, হরকিষেন সিং আসামী হাজির ?

হরকিষেন উপস্থিত হতেই পিয়ন তাকে আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে।

হাকিম বললেন, হরকিষেন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে গত ৮ই আগষ্ট তারিখে তুমি শ্রীহরেকৃষ্ণ তরফদার নামে এক ব্যক্তির পকেট মেরে ১৫০৲ টাকার একটা ব্যাগ নিতে চেষ্টা করেছিলে। এ-বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে ?

হরকিষেন বললে, আমি অপরাধ স্বীকার করছি। আমি স্ত্রী-কন্যাকে খেতে দিতে না পেরে এই বৃত্তি অবলম্বন করেছিলাম। আমি মাফ চাই।

হাকিম তখন গভর্ণমেন্ট পক্ষের উকিলকে বললেন, আপনার কিছু বলবার আছে ?

হ্যাঁ, হুজুর, কলকাতা শহর এই সমস্ত গুণ্ডা প্রকৃতির পিক্-পকেট দ্বারা ছেয়ে গেছে। কোন নিরীহ লোকের নিরাপদে ভ্রমণ করার সাধ্য নেই। প্রায়ই পকেটমার ধরা পড়ে না। আমার নিবেদন এই সমস্ত গুণ্ডাদের দমন করতে হ'লে তাদের exemplary punishment দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে আমার প্রার্থনা হচ্ছে একে exemplary punishment দেওয়া হোক।

হাকিম রায় দিলেন, আসামীর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০৲ জরিমানা, অন্যথায় তিন মাস অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ড।

হরকিষেনকে কনেষ্টবল ধরে নিয়ে গেল।

আজ এক বছর তিনমাস অতীত হয়ে গেছে। হরকিষেন বেলা ৩টার সময় মুক্তি পেল। রাস্তায় বার হয়ে তার মনে হ'তে লাগল—এই বিশাল পৃথিবীতে সে একা। কোথায় যায়। সে পকেটমার, সে দাগী। কে তাকে স্থান দেবে? অনেকক্ষণ গড়ের মাঠে বসে রইল। লোক চলাচল করছে, ট্রাম-মোটর বাস সব চলছে। তার মানসপটে পাতলা মেঘের মত সব যেন ভেসে যাচ্ছে। কোন গভীর চিন্তা করার তার ক্ষমতা নেই। জানে না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ জেগে উঠে দেখে চারিদিকে আলো জ্বলছে। বেশ রাত হয়েছে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় উঠে দাঁড়াল। ধীর পদক্ষেপে তার সেই বৌবাজারের গলির বাসার দিকে চলল। তার মনে হ'তে লাগল—তুলালী কি আর সে বাসায় আছে ? হয় তো না খেতে পেয়ে সে অন্য জায়গায় চলে গেছে। যদি থাকেও—সেখানে কি আর তাকে স্থান দেবে ? ভাবতে ভাবতে সেই গলিতে এসে উপস্থিত হল। সেই গলির ঘরগুলি, মানুষগুলি সবই একই অবস্থায় আছে। সেই আলো, সেই টিউবওয়েল, সেই শিশুদের কলরব। তার কত স্মৃতি মনে হতে লাগল। শেষে রাত প্রায় ৮টার সময় তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখল হরদয়াল একখানা খাটের ওপর বসে তার সেই মেয়েকে আদর করছে। তুলালী হরদয়ালকে পান দিচ্ছে এবং দু'জনে মিলে হাসি গল্প করছে।

হরকিষেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে গলি থেকে বের হয়ে চলে গেল।

হরকিষেনকে তারপর আর দেখা যায় নি।

সিস্টার অগস্টিন ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা। দ্বিতীয়বারের যাত্রা এটা তাঁর, ঈষদুষ্ণ সহজ অভিব্যক্তিতে তারই প্রকাশ।

জাহাজের রেলিংয়ের ধারে সিস্টার লুক যখন দাঁড়িয়েছিল তাঁর পাশে, একজন পেশাদার ফোটোগ্রাফার কাগো-যাত্রার ছবি তুলল।

ক'মাস পরে কমিউনিটির ছোট একটা পত্রিকায় ছবিটা দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিল সেই ছবি তোলার সময়ই সে জানতে পেরেছিল সেই সাদা জাহাজখানায় কি ঘটবে না ঘটবে।

ছবিতে তার মুখখানা ছোট একটা সাদা পাথরের ত্রিভুজের মত লাগছে···স্থির দু'টি চোখ যেন খোদাই করা···দৃঢ় সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর।··সেই যখন ব্যাণ্ডে জাতীয় সংগীতের সুর বাজানো শুরু হ'ল এ নিশ্চয় তখন তোলা। পরবর্তী দৃশ্যগুলো ছবির মত মনে পড়ছে।···উপনিবেশ-যাত্রীদের বিদায় জানাচ্ছে বেলজিয়াম সাড়ম্বরে,··· ব্যাণ্ড বাজছে··নিশান নাড়ছে সবাই···রঙিন কাগজের গোলা পাকিয়ে ছুড়ছে।

···সেই মুহূর্তে পৃথিবী যেন তাকেও তুলে ধরে বলেছিল, তুমিও! বাইরে থেকে একটা দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা তোমাকেও বেঁধেছে।···

চারদিকের সেই অপরিচিত-প্রায় উন্মাদনার ঢেউ বেষ্টন করে ধরেছিল, নিমজ্জিত করে ফেলেছিল প্রায়। এমন সময় নীচের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল জনাকীর্ণ জেটিতে রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের গথিক ধাঁচের আকৃতিটা।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলও বুঝি অন্যদের মতই হাত নাড়ছেন। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি বলে দেবে ও হাত-নাড়া নিষ্ফলা নয়, বৃত্তাকারে আবর্তিত ঐ দীর্ঘ হাতখানির নিরলস ভংগী তাদের জন্য অবিরত আশীর্বাদ পাঠাচ্ছে। কব্জি থেকে পোশাকের সাদা হাতাগুলো ঝুলছে নিশানের মতই।

জাহাজ ছেড়েছে···তীরের সংগে ব্যবধান বাড়ছে ক্রমেই: অজ নিশানগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে,···রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের আশীর্বাদী হাতখানি কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি দৃষ্টিগোচর রইল।

ব্যবধান সত্ত্বেও জেটি থেকে নানা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে,···বড়লোক হয়ে ফির কিন্তু, ভুল না হয়,···ফিরে এস, ভুলো না আমাদের···

আর ঐ সাদা আস্তিন ইংগিতে বলছে, ভুলো না তুমি যন্ত্রমাত্র। খেয়াল থাকে যেন তুমি কিছুই নও। যে অদৃশ্য প্রার্থনার জোরে তুমি কাজ কর তাকে তুমি চেনও না। তুমি কেবল যন্ত্র একটা, মনে রেখ।···

সমুদ্র তীরের হোটেল আর রেস্টুরেন্টগুলোর বাধা পেরিয়ে ক্যাথিড্রালের চূড়াগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। আরও পিছনে হাসপাতালের ছাদটা দেখা যাচ্ছে।

বাবা এখন রাউণ্ড দিচ্ছেন সেখানে।

চোখ বুজে বলা চলে জনে জনে ডেকে ডেকে বলছে তাঁর মেয়ে কলোনিতে যাচ্ছে,···আজ সকালেই জাহাজ ছাড়ছে।

নিজের মনে ও বলছে, আমায় নিয়ে গর্ব কোর না। সত্যি কথা বলতে কি পালিয়ে যাচ্ছি আমি, আর যেতে পারছি বলে বড় খুশি হয়েছি। বাইরে এ কথা মনে রাখা অনেক সহজ হবে আমি কিছু নই।

সোজা সেই ছাদটার দিকেই তাকিয়েছিল দৃষ্টির অন্তরালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত।

তারপরই সিস্টার অগস্টিন জামার আস্তিন ধরে আকর্ষণ করলেন। রেলিং থেকে সরে এল।

নীরব আহ্বান ফিরিয়ে নিয়ে এল মাদার হাউসের গণ্ডীর মধ্যে।

সিনিয়র সিস্টারের পিছন পিছন ঐ কেবিনে এসে একসঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসল।

পথনির্দেশ করতে এমন অভিজ্ঞ সংগিনী কেউ থাকেন যখন ঈশ্বর-সান্নিধ্যেই থাকা সহজসাধ্য হয়—এই জাহাজের জীবনেও।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম্
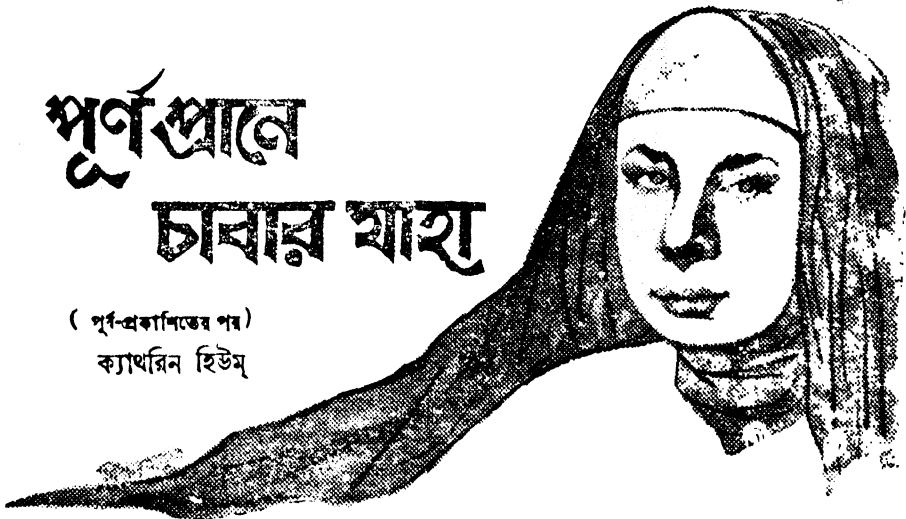
পর্দাঢাকা কেবিনের নির্জন পরিবেশে অন্য চিন্তার খোরাক কিছু নেই, অস্ফুট কণ্ঠে প্রার্থনার যোগ দিয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগটা সেই দিকেই দেওয়া চলে। তবুও একটা খেয়ালী ভাবনা মনের কোণে বারবার উঁকি দিচ্ছে : সিস্টার অগস্টিনের ল্যাটিন উচ্চারণগুলো কি অপূর্ব সুন্দর।

দৈনন্দিন ভাষার মত সাবলীল স্বচ্ছন্দ ল্যাটিন শুনতে শুনতে বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীটাকে অনেক দূরবর্তী মনে হয়।

কিন্তু ঠিক তার কেবিন-দ্বারের বাইরে আধুনিক পৃথিবী সহস্র উজ্জ্বলতার ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে। সে আর সিস্টার অগস্টিন নীরবতা-পালন শুরু কেবিনের বাইরে লাউঞ্জে আসতেই বাজনায় ওয়াল্‌স্‌ সুর ধরল।

জনাকীর্ণ লাউঞ্জ···যাত্রীরা সব পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছে, ডিনার আর ব্রিজখেলার জুটি ঠিক করছে। এই দীর্ঘ যাত্রায় আর কিছু করবার নেই, কেবল আনন্দ···কেবল আনন্দ। সেই আশায় মুখগুলো সব হাস্যোদ্ভাসিত, সজীব।···

ওয়াল্‌স্‌টা সিস্টার লুক জানে। সাড়ে-চার বছর শোনে নি, তবু তারই কথাগুলো মনের মধ্যে গান গেয়ে উঠছে।···

লাউঞ্জের মধ্যে দিয়ে বেড়াবার ডেকের দিকে যাচ্ছেন সিস্টার অগস্টিন আগে আগে···কোন কিছুর দিকে লক্ষ্যই নেই, মূক-বধির যেন। অল্প একটু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ডেকে চেয়ারে বসে অফিস পড়তে শুরু করার আগে তাঁদের এই নতুন মঠটা একবার ঘুরে দেখবেন তাঁরা। বহু বছরের স্বতন্ত্র জীবনাভ্যাসে পার্থিব সব সংঘাতই ভুলেছেন সিস্টার অগস্টিন। ব্রত নেবার পর পার্থিব জীবনের মধ্যে দিয়ে এই প্রথম যাত্রায় সিস্টার লুক একেবারে একা।

পার্থিব জীবনের মধ্যে দিয়ে···সংগিনী প্রশান্ত চলনভংগীর সঙ্গে মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতে করতে কথাগুলো প্রকট হয়ে উঠছে চিন্তায়। কন্‌ভেণ্টে কতবার শুনেছে এই কথাগুলো? বোধ হয় সহস্রবার পার্থিব জীবনের মধ্যে—কথাগুলো পৃথকত্বের নিশানা। মানে হ'ল, বাইরে, এই দেওয়ালগুলোর ওধারে। এখান ছাড়া আর সবকিছু, আমরা ছাড়া আর যে কেউ।

···এখন বোঝাচ্ছে এই জাহাজটাকে।

পরিচ্ছন্ন ধোয়া ডেকের অর্ধেকটা ও ঘুরে আসার আগেই উপলব্ধি করেছে যা কিছু সে ছেড়ে এসেছে এখানে নতুন করে দেখতে হবে, শুনতে হবে এবং সম্ভব হলে আবারও সরিয়ে দিতে হবে। চেনা বাজনার সুরটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে···অতীত আলোড়িত হয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে নাচের জুটিদের।···যাত্রীদের স্মিতমুখে আলাপের আমন্ত্রণ। বুলেটিন বোর্ডে এমন সব চলচ্চিত্রের নাম, চোখে পড়ে গেলে দেখতে ইচ্ছে করে।

আঠারোটা দিন এই সবের মধ্যে কাটাতে হবে! ত্যাগের যত পরীক্ষা দিয়েছে এটাই তার মধ্যে কঠোরতম।

এই জাহাজের মধ্যেই তুমি এমন করে থাকবে যেন দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যেই আছ, এই আশা করা হয়। চোখ তুললেই কঙ্গোর সোনালী একটি তারা দেওয়া নীল পতাকাটা দেখা যাচ্ছে বলে ধ্যান-ধারণা যা কিছু সব তার উত্তেজনায় রঙিন হয়ে না যায়। আর তা যদি—যায়ও, এ কথা বলবার শক্তি তোমার থাকে যেন, আমি কিছুই না, যন্ত্রমাত্র।

···জঙ্গলের নির্জন ঝোপ, নিগ্রোরা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তোমায়··· মুছে দাও, মুছে দাও এ ছবি তোমার কল্পনা থেকে···চেয়ে দেখ তোমার একটি সিস্টারের ফ্যাকাশে হাতখানির দিকে···যে হাতখানি তুলে ধরেছে তোমায়—এই মুহূর্তে হয় তো মাদার হাউসের হাসপাতালে কাশতে কাশতে রক্ত উঠছে তার···তবু তার মধ্যেও মিশনের জন্য প্রার্থনা করছে সে।···তোমার মনের একাংশও যদি কল্পনায় নাচিয়েদের মধ্যে পালায়···ডেকের টেনিস-খেলোয়াড়দের স্কোরের হিসেব রাখে··· স্পেনের সীমা ছাড়িয়ে অবধি সূর্যকরোজ্জ্বল ডেকে যে মেয়েরা আসছে তাদের অনাবৃত পিঠের পরে ঔপনিবেশিকদের গোপন অস্থির দৃষ্টি লক্ষ্য করে···তুমি জান প্রতিক্ষেত্রেই সেটা সেই সিস্টারটির আত্মোৎসর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে।

জাহাজে চ্যাপেল নেই। কেবল প্রত্যহ সকালে দু'জন যেসুইট যাত্রী লাইব্রেরীতে ম্যাসের উপাসনা করেন যখন সেইখানটাই স্বল্পক্ষণের জন্য চ্যাপেলের রূপ নেয়। সেইটুকুই, তারপরই সেটা একটা বিশেষ প্রলোভনের জায়গা হয়ে যাবে। বড় বড় চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার সাজানো চারপাশে···কত বই···সাবধান! তোমার মনে যেন ওসব বই সম্বন্ধে কৌতূহলের আভাসমাত্র না থাকে।

একদিন রিক্রিয়েশানে সিস্টার অগস্টিনকে বলেছিল জাহাজে চ্যাপেল নেই বলে ফাঁকা লাগে।

আরও বলতে যাচ্ছিল চ্যাপেলহীন নান ডাঙায় তোলা মাছের মত। সিস্টারের মুখে হাল্কা বিস্ময়ের হাসি দেখে আর বলা হ'ল না।

—কিন্তু আমরা যে হৃদয়ের মধ্যে আমাদের চ্যাপেল বয়ে নিয়ে বেড়াই সিস্টার লুক।

প্রথম সপ্তাহটায় এত অজস্রবার ডেকে এসে ঘুরেছে পায়ে হেঁটে কংগো পৌঁছোনো যেত তাতে। কখনও কখনও অফিসখানা খোলা রাখত সামনে, পড়বার চেষ্টা করত। শান্ত সমুদ্রে পথ কেটে জাহাজ চলেছে···ওঠানামার তালে তালে দেহটা দোলে, স্ক্যাপুলারের নীচে রাখা হাত দু'টোও···আর তারই মধ্যে মাঝে মাঝে পরস্পরকে নিষ্পেষিত করে—মল্লযুদ্ধরত দু'টো মূর্তি যেন পরস্পরের আলিংগন থেকে ছাড়াতে চাইছে নিজেদের।

টেনেরিফ পেরিয়ে এসে সিস্টার অগস্টিন আর সে গ্রীষ্মমণ্ডলের উপযোগী সাদা পোশাক পরল যখন মনে হ'ল সব কিছুই সহজতর লাগবে এবার। এখন এই সাদা পোশাকে খোলা ডেকে বসে ধ্যান করা সহজ হবে অনেক, সূর্যের উত্তাপ সাদা পোশাকে বাধা পাবে, কালো পোশাকের মত উত্তাপটাকে ভিতরে টেনে নিয়ে শরীরটাকে অস্বস্তিকর তাপে ভরিয়ে তুলবে না।

ডেকে পা দেওয়ামাত্র অনুভব করল কিছুই সহজ হয় নি হ্যাবিটের পরিবর্তনে, মনের গতির ওপর কোন প্রভাব পড়ে নি। লঘুতার অনুভূতিটাই বরং চিন্তাকে ঘিরে আছে। এমন ভারহীন সুতোর পোশাকে ঘূর্ণি হাওয়ার বেগে টেনিস খেলতে পারত! যতবার টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে যায় তির্যক দৃষ্টিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস ফুটে ওঠে। স্ক্যাপুলারের তলা থেকে একটা প্রেত যেন বেরিয়ে এসে নেটের কাছে দৌড়ে যায় সব খেলোয়াড়দের চোখে পড়বার আগ্রহ নিয়ে···সমুদ্রের হাওয়ায় ভেল আর স্কার্ট উড়তে থাকে।

সিস্টার অগস্টিন তাঁর চারদিকের পার্থিবতা সম্বন্ধে যেমন অচেতন

সিস্টার লুকের এই দ্বিধাবিভক্ত মনের কথাও তেমন তাঁর জানা নেই। তাঁর জীবনের পথ বাঁধা মাদার হাউসের ঘড়ির কাঁটার সংগে। হাতের বোনা নামিয়ে রেখে তিনি ইংগিত করেন—রিক্রিয়েশন শেষ হ'ল ধ্যান ও প্রার্থনার সময় অফিসখানি তুলে নেন। তাঁর আবিষ্টতা দেখে বুঝতে পারা যায় ধ্যানমগ্না আছেন তিনি, যদিও খোলা চোখ দু'টি তাঁর সমুদ্রের জলে স্থির। এলোমেলো বাতাসের ধাক্কায় বয়ে আসা এক এক ঝলক মৃদু হাওয়ায় কোন প্রিয়জনের মুখ ভেসে ওঠে নি।

মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে রাত্রিগুলোর হাতে অস্ত্র হাতিয়ার।

সাড়ে-আটটায় নিজেদের কেবিনে ঢোকে ওরা, কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে পোশাক বদলে নেয়, যেন দু'টো বার্থের মধ্যে সেলের দেওয়াল রয়েছে। সান্ধ্য-প্রার্থনা আর সালভে রেজিনা বলে এ'টায় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

জাহাজের রাতের জীবন শুরু হয় তারও পর।

প্রথম ভেসে আসে বল-রুমের বাজনার সুর—ওয়াল্‌স্‌, পোলকা, ফক্স-ট্রট—ভিন্ন ভিন্ন সুর আর সেই সংগে পরিবর্তিত লয়···একটা থামলেই 'সাবাশ সাবাশ' ধ্বনি, হাত তালির ঝড়।

···শ্যাম্পেন বাকেটের বরফগুলোর খচ্‌খচ্‌ শব্দে বিরামের ইংগিত —কেবিন-দ্বারের বাইরেটাতেই ঠিক, লাউঞ্জে।

গান-বাজনা থেমে যাবার অনেক পরে বেড়াবার ডেকে খস্‌ খস্‌ শব্দ, ফিস্‌ফিস্‌ কথার আওয়াজ শোনা যায়। মাঝে মাঝে চাঁদের আলোয় পোর্ট হোলের পর্দায় দু'টো মুখের ছায়াছবি ফুটে ওঠে।·

অন্তস্থিত নান অমনি বলে ওঠে, ও ছায়ার খেলা দেখ না ···তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নাও তুমি।··রেখাচিত্র দু'টির মধ্যে তখনও একফালি জ্যোৎস্নার ব্যবধান ছিল।

···তার চেয়ে চাও সাদা গুইম্প আর স্ক্যাপুলারটার দিকে, ঐ যে অন্ধকারে প্যানেল-দরজার পিছন দিকের হ্যাংগারে ঝুলছে। পেণ্ডুলামের মত দুলে দুলে জাহাজের দোলার হিসেব রাখার ভার নিয়েছে ওরা। একদৃষ্টে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চিন্তাটাকে ঐ পথে মোড় ফেরানো যাবে। তা হলে শেষকালে যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন আর স্বপ্ন দেখবে না তুমি এখনও পার্থিব জগতের যৌবন-প্রাচুর্যে ভরা একটা মেয়ে···উদ্দাম বাতাসে চুল উড়ছে তোমার, বন্ধনহীন আবেগে চঞ্চল তোমার মন।

একটা কল্পনার ছবি সিস্টার লুক সর্বদাই নিজের এবং বিক্ষুব্ধতার মধ্যে বসাতে পারে—ভাগ্য তাকে যে কাজে নিয়োগ করেছে তার ছবি। কংগো মিশনের ছবি। যে মেডিক্যাল বইগুলো পড়ে তার লাইনগুলোর ফাঁকে প্রায়ই বুস স্টেশন দেখতে পায়। সে এমন এক জায়গা যা জাগতিক কোন সংশ্রবের কথা মনে পড়িয়ে দেবে না।—সেখানকার সবকিছু তার অভিজ্ঞতায় নতুন যে। মানুষগুলি কৃষ্ণকায়, বাজনা বলতে মাদল। এমন কি কাঁটা গাছগুলো দেখেও এমন কোন গাছের কথা মনে পড়বে না যার তলায় আগে কোনদিন বসেছে।

কনভেণ্ট পত্রিকায় কংগো মিশনের এত ছবি দেখেছে যে বিনা আয়াসেই নিজেরটা কল্পনা করে নিতে পারে। অজানা বিদেশী গাছের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিজের মিশনটা পরিচ্ছন্ন জায়গাটা, মাথার
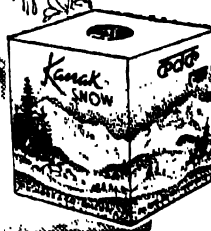
ওপর খড়ের চাল, চারদিক ঘিরে বারান্দা। সিঁড়ির গায়ে হেলানো দু'টো সাইকেল, একটা তার নিজের। মেন বিল্ডিংয়ের পিছনে দেশীয় ছেলেদের কুঠির, পুরুষ নার্স তৈরি করে নেওয়ার জন্যে ও তাদের ট্রেনিং দিচ্ছে। সেই অরণ্য ক্লিনিকে তার সঙ্গে আর একটি মাত্র নান আছেন, মুখে তাঁর সিস্টার মেরির ছায়া। যতবার কল্পনায় এই ছবি দেখে, ততবারই ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়। পরম সৌভাগ্য তার যে এখানেই যেতে পাবে, কংগোর কোন কর্মব্যস্ত শহরের শ্বেতাংগ হাসপাতালে নয়। অধিকাংশ নার্সিং সিস্টারকে তো সেইখানেই যেতে হয়।

উত্তরকালে অবাক হয়ে ভেবেছে বুস স্টেশনের আবরণে এই যে কল্পনার জাল বোনা শুরু করেছিল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কেন বাধা দেয় নি। অতীতকে বিশ্লেষণ করে করে তখন উপলব্ধি করেছিল পার্থিব জীবন যতদিন বিক্ষুব্ধ করবে ততদিন সে জীবন থেকে মুক্তি নেই, সে জীবন সম্বন্ধে পুরোপুরি বীতস্পৃহ হতে পারলে তবেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়।

ডেকার ছাড়িয়ে গিয়ে সিস্টার অগস্টিনের নামে জাহাজে একটা রেডিওগ্রাম এসে পৌছোল, ডাইনিং সেলুনে তাঁর হাতে এল সেটা। স্টুয়ার্টকে মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে কাগজটা স্ক্যাপুলারের ভিতর ঢুকিয়ে রেখে দিলেন তিনি, তারপর ন্যাপকিনটা চিবুকের তলায় আটকে নিলেন।

সপ্রশংস দৃষ্টিটা সিস্টার লুক গোপন করতে পারল না।

রেডিওগ্রামটা হয় মাদার হাউস থেকে এসেছে, না হয় বাড়ি থেকে। কেবল মৃত্যু সংবাদই এভাবে বেতার যোগে পাঠানোর মত দরকারি মনে করা হয়। আর যা কিছুই হোক, ডাকে পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করা চলে।

মুখোমুখি বসে মূর্তিমতী নিস্পৃহতাকে দেখছে সিস্টার লুক। মদের গেলাসটা তুলে নিয়ে কয়েক ঢোক খেয়ে ভারি মিষ্টি একটু হাসলেন তার দিকে চেয়ে, মাথাটা একটু নড়ল।

বললেন যেন, এমনই কোর মাই সিস্টার। রেডিওগ্রামটা এসেছে বলেই কি বিচলিত হতে পারি, খেতে বসেছি—এটা আমাদের আনন্দ করবার সময় যে!

যতদিন মাদার হাউসে ছিল খাবারঘরে হাসির আবরণে, অনেক বেদনা, অনেক ক্লান্তি, অনেক ব্যাহত উৎসাহ ঢাকা পড়তে দেখেছে। খাবার সময় নিরানন্দময় কোথাও কিছু থাকবে না—টেবিলের ওপর খাবার দেওয়া সে ভগবানের দয়ারই প্রকাশ মাত্র।

অবহেলা করা চলবে না তাকে, অচঞ্চল নীরবতায় বরণ করে নিতে হবে সবাই মিলে।

মদের গেলাস ধীরে ধীরে মুখে তুলতে তুলতে সিস্টার অগস্টিনের হাসির প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল সিস্টার লুক।

যেন বলতে চাইল, মদটা বেশ ভাল। ভগবানের দয়া যে এটা সহজ ভাবে খাচ্ছি আমরা, জল খেয়ে অন্য যাত্রীদের চোখে নিজেদের স্বতন্ত্র করে তুলছি না। চিরাচরিত প্রথায় নীরবে খেয়ে চলেছে। নুনটা, রুটি বা অন্য কিছু পরস্পরের যেমন-যেমন দরকার হতে পারে আন্দাজ করে নিয়ে সেগুলো একটু মাথা নেড়ে এগিয়ে-পিছিয়ে দিচ্ছে অভ্যস্ত মাধুর্যে। দেখেছে কাছাকাছি টেবিলের লোকেরা বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তাদের। ভাবে নিশ্চয় এই সিস্টার দু'টি পরস্পরের চিন্তার ভাষা পড়ে নিতে পারে।

ঈর্ষা বোধ করছে সিস্টার লুক সংগিনীর মুখের দিকে চেয়ে। নিস্পৃহ মুখ, বহিরাগত কোন কিছুই দাগ কাটে না মনে তাঁর—স্ক্যাপুলারের নীচে রাখা রেডিওগ্রামটাও না। ডিনার-মিউজিকের সুরেলা উন্মাদনা···হাসির হুল্লোড়···অন্য টেবিলের প্রাণোচ্ছল আলাপের টুকরো—কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। কনভেন্ট খাবারঘরের সুরক্ষিত পরিবেশে বসে যেন পুলপিট-পড়ুয়ার কণ্ঠস্বরই শুনছেন কেবল।

ন্যাপকিনটি ভাঁজ করে রেখে রিক্রিয়েশনের সময় ঘোষণা করলেন। প্রভু যীশুর জয় হোক।

রেডিওগ্রামটি বার করবার আগে একমুহূর্ত ভাবলেন। কোন সিস্টারের সামনে ব্যক্তিগত কোন খবর পড়া কতটা অমার্জিত বিচার করছেন, সিস্টার লুক আন্দাজ করতে পারছে। কনভেন্টের সূক্ষ্ম ভদ্রতায় হাসি পেল তার।

বললেন, তুমি বল তো এখানেই এটা পড়ি, বেশ আলো আছে।

খামটা ফল-কাটা ছুরি দিয়ে খুলে টেবিলের ওপর কাগজটা বিছিয়ে দিলেন। সিস্টার লুক দেখল ঠোঁট নেড়ে প্রতি কথাটি মনে মনে উচ্চারণ করে পড়ছেন। নানদের মন দিয়ে পড়বার যা নীতি, কোন কথাটা যাতে না ছেড়ে যায়।

চোখ তুলে চাইলেন যেই, সিস্টার লুক দেখল তাঁর সদা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে একঝলক সমবেদনার আলো। নিমেষে বুঝল খবরটা তাকে নিয়ে।

—সামান্য একটু আশা-ভংগের বেদনা সইতে হবে সিস্টার লুক, কাজের জায়গাটা বদল হয়েছে তোমার। ইওরোপীয়ানদের হাসপাতালে কাজ করতে হবে, জায়গাটা হ'ল—

একটা সহর। বাঁধানো রাস্তা···সাজানো দোকান···খবরের কাগজ আর টেলিফোনের আধুনিকতায় ভরা একটা সহর।

কাতাংগার তামার খনিগুলোর কাছে গড়ে-ওঠা বেলজিয়ামেরই একটা কর্মচঞ্চল টুকরো।

নৈরাশ্যটা ছুরির ফলার মত কেটে বসেছে।

চীৎকার করে যে কেঁদে ওঠ নি সে কেবল সংযমের শিক্ষা বাধা দিয়েছে বলে।

তার কল্পনার বুস স্টেশন আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল, শেষ বারের মত দেখল চেয়ে-চেয়ে। তার জায়গা নেবে খনি-অঞ্চলের সহর··· স্বপ্নে দেখা নীল পাহাড় আর সবুজ গাছের সারি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সারি সারি চিমনি আর ধাতুর আবর্জনাস্তূপে···আর সিস্টার অগস্টিন সযত্নে কোণে কোণে মিলিয়ে ভাঁজ করছেন রেডিওগ্রামখানা।

—যতদূর মনে হয় একজন সিস্টারের ফুসফুসের দোষ হয়েছে, কংগোয় কাজ করার এইখানেই শেষ তার ফলে সরকারী মাইনে-করা কাজের যে জায়গাটা খালি হয়ে গেছে রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল সেই জায়গায় দিচ্ছেন তোমাকে।

সিস্টার লুক চুপ করেই ছিল, তাই রইল যতক্ষণ না অনুভব করল এবার সে শান্তভাবে কথা বলতে পারবে।

শেষে বলল, আদেশ যিনি দিয়েছেন, সে আদেশ পালন করার শক্তিও তিনিই যোগাবেন।

আশ্চর্য ! বলার সংগে সংগে অনেকখানি তিক্ততা, অনেকখানি বেদনা, ঝলসে-ওঠা একটুকরো বিদ্রোহী মনোভাব নির্বাপিত হয়ে এল। এমনই হয় এ উক্তির মাহাত্ম্যই এমনি। ছাত্রী-জীবনে অল্ কর্ ভিসাস্ বলার মতই। প্রাধান্যের বিষয়টাই বদলে দেয়।

মাইনে পাবার কথাটাও ভাবছে এবার। তার কাজের মূল্য বাবদ তার উপার্জিত অর্থ মঠের হবে। অবাক লাগছে ভাবতে সে-ও টাকা রোজগার করার যোগ্য ! অন্যান্য যে সব সিস্টারদের বাইরের জগতে টাকার বিনিময়ে কাজ করেন বলে এতদিন জেনে এসেছে, এবার সে-ও তাঁদের একজন হবে ভেবেও ! আরও আশ্চর্য, তবুও সাধারণ জগতের তারা কেউ নয়। মঠে চাকুরে সিস্টার যাঁরা থাকেন যদিও কখনও উল্লেখ করা হয় না সে-কথা, কিংবা কোন বিশেষত্ব দেওয়া হয় না, তবু যাঁরা চাকরি করেন জানত অনেক সময় তাঁদের লক্ষ্য করত সে। লক্ষ্য করত আর ভাবত এই যে সংঘের ব্যাপক দাতব্য কাজে তাঁদের উপার্জনের অর্থও লাগছে, এতে গর্ব হয় না তাঁদের ? অনাথ, শিশু, অক্ষম বৃদ্ধা, অবিবাহিতা, মা, এমন কি তাদেরই বার্ধক্যগ্রস্তা, পীড়িতা সিস্টাররা—প্রাত্যহিক রুটির জন্য সবাই কিন্তু কিছুটা অন্তত তার ওপর নির্ভর করছে চেতনা সত্ত্বেও দম্ভকে অমায়িক ধন্যবাদ জ্ঞাপনে রূপান্তরিত করা কি সম্ভব ? গর্ববোধ করা যেখানে স্বাভাবিক, সেখানেই অনর্থ বোধ করা ?

ডাইনিং সেলুনের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। হঠাৎ মনে হ'ল নতুন ভবিষ্যতের যে ছবিটার খুঁটিনাটি নিয়ে মনটা সদাই ব্যাপৃত হয়ে আছে তাতে এই সাদা মানুষগুলোকে ঢোকাতে ভুল হয়ে গেছে তার। কে জানে একদিন না একদিন এরা হয় তো সবাই তার রোগী হবে সেখানে। কিন্তু এখনই যেন ওরা কতদিনের চেনা, এমনই সাধারণ ওরা, এমনই বিশেষত্বহীন। সবাইকে যেন আগেই কতবার দেখেছে বারবার বসবার ঘরে। ওদের মুখের দিকে তাকালে ভাবনায় পার্থিবতার প্রভাব বেড়ে যায় মুহূর্তে···ওদের গোপন কুটিলতা, ওদের প্রণয়কাহিনী ওর জানা। ও বলে দিতে পারে এই উত্তেজনাপ্রবণ উপনিবেশিকদের মধ্যে ঠিক কোন জন একটি দোঁ-আঁশলার জন্মদাতা। জাহাজে যে মেয়েরা স্বামীকে প্রতারণা করে তাদের বক্ষবাসের ওপর হলদে ফুল রেখে দিতে পারে ও।

হলদে। অসতীদের রং।

ভগবান ! এখনও কি করে এ কথা মনে রইল ! কি করে ? এই এতগুলো রংহীন বছর কাটাবার পরেও ? সাদা কালো ভিন্ন কোন রঙের সংগে তো সম্পর্ক ছিল না এতগুলো দিন !

আমার মনে হয় প্রথমে কেবিনে গিয়ে ঈশ্বরের করুণাভিক্ষা করে প্রার্থনা করা উচিত আমাদের—তুমি যাতে আশাভংগের বেদনাটুকু সইতে পারো।

সিস্টার অগস্টিনের পিছন পিছন যেতে গিয়ে একজন—আর্মি অফিসারের সংগে চোখোচোখি হয়ে গেল তাঁর টেবিলটা পেরিয়ে যেতে যেতে উচিত মত চোখ নীচু করে চলত যদি তো লোকটির সপ্রশংস স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখতে হত না। দেখে বহির্জগতে কাজ করার আর একটা বিপদের কথা মনে পড়ে গেল। আগে পরে যখনই হোক সব যুবতী নানকেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।···নানদের প্রেমে পড়বার অদ্ভুত একটা প্রবণতা আছে পুরুষের।

এ সত্যের সারবত্তা উপলব্ধি করে রুল ও কঠোর আদেশ দিয়ে রেখেছে : পুরুষের সামনে সিস্টাররা সর্বদা দু'জন একত্রে থাকবেন।

কেবিনে পৌঁছবার আগে থেকেই প্রার্থনা করছিল। স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা—জাহাজে ওঠবার আগে অবধি যেমন প্রার্থনা সর্বদাই করতে পারত।

সোজাসুজি ঈশ্বরের সংগে কথা কইতে পারছে, প্যাসেজের পথ দিয়ে তিনিই যেন সংগে সংগে চলেছেন, সিস্টার অগস্টিন নয়।

—তুমি তো আমার মন জান প্রভু, জাগতিক নান হতে দিতে পার না তুমি আমায়। যদি বুঝি পার্থিবতার প্রেত আমায় মুক্তি দেবে না কোনমতেই কালই আমি কন্‌ভেণ্ট ছেড়ে পালাব ! তোমার সেবায় এসে যারা নিজেদের সম্পূর্ণ দিতে পারে না, অর্ধেক দেয় আর অর্ধেক বাকি রাখে তারাই সবচেয়ে অসুখী, আমি যেন তেমন না হই প্রভু—তুমি সহায় থেক। বিনয়, বদান্যতা কোন কিছুর দায়েই বিনা হওয়ার অসম্মান সইবে না, তুমি আমায় সে অপমান থেকে রক্ষা কোর। বুস-স্টেশন কেড়ে নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে ফিরিয়ে আনলে দেখা-কার প্রলোভনগুলো উপেক্ষা করবার শক্তিটুকু তাহলে তুমি দিও। আদেশ যখন করেছ, তাকে পালন করার শক্তিও তো তুমিই দেবে এখন···

পার্সারের অফিসের বাইরে টাংগানো বুলেটিন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে নি কি ছবি দেখানো হবে রাত্রে। সতৃষ্ণ চোখ দু'টো চকিতে একবার বোর্ডটার দিকে চেয়ে দেখল এ ঘটনা এই প্রথম।

ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়িয়ে গিনি উপসাগরে তারা বিষুব রেখা পার হ'ল।

জাহাজের জীবন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।···

সবুজ রঙে রাঙানো দাড়ি···ঔপনিবেশিক একজন···তাঁর সাজ-পোশাক দেখে মনে হবে বুঝি রাজা নেপচুনের আবির্ভাব ঘটল।···

তিনি একাই নন, সব যাত্রীই হয় স্নানের পোশাক পরে আছে, না হয় সং সেজে। এই যাদের প্রথম পাড়ি তারা প্রত্যেকেই কোনক্রমে সুইমিং পুলে ডুব থেকে বিষুব রেখা পার হচ্ছে।

দু'টি নান শুধু এ সব কিছুরই ব্যতিক্রম। তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সুইমিং পুলের সংগে তার অনেকখানি ব্যবধান।

এই সব হৈ-চৈ খেলাধুলার দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে সিস্টার লুক চোখ সরিয়ে নেয়ই বেশি। রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে পরপারে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে, জলময় দিগন্ত ভেদ করে সেখানে আফ্রিকার তীর দেখা দিতে আর দেরী নেই খুব। সিস্টার অগস্টিন বলছিলেন প্রথম দেখা যায় একসার বাদামি রঙের ঢিপির মত, নবাগতরা দেখে ভারি নিরাশ হয়। কিন্তু ভিতর দিকে একটু যেই এগোবে···

পর্তুগীজ কংগোয় লোবিটোতে তারা জাহাজ থেকে নামবে, সেখান থেকে রেলে কাতাংগায় তাদের নিজেদের কলোনিতে যাবে। বেলজিয়ম থেকে অন্তত সেটা আশি গুণ বড়। রেলে একটানা তিনদিনের পথ, কয়েকটা মাত্র স্টেশন পড়বে কেবল। সেসব স্টেশনেও দেখবার কিছু নেই—এক দেশীয় লোকরা ছাড়া আর মাঝে মাঝে এক একটা পোষমানা সিংহ ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, ছাড়া আছে।

রেলের কামরায় যত গরম, তত ধুলো। এই সেপ্টেম্বরেই শুকনো আবহাওয়া প্রায় শেষ হয়ে যায়, এ সময় এই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান তৃণভূমি শুকিয়ে ধূ ধূ করে।

—কিন্তু ওঃ সিস্টার, তারপর বৃষ্টি যখন শুরু হয়···

সিস্টার অগস্টিনের বলা শেষ হয় নি। তার আগেই তাঁর মনের ঘড়ি বলেছিল রিক্রিয়েশনের আলাপচারির সময় শেষ হয়েছে।

···আকাশ-ভরা কাজল-কালো মেঘ, তাই থমকে থেমেছিল, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিটা শুরু হতে পারে নি।

আফ্রিকা এগিয়ে আসছে যত, পৃথিবীটা তত সংকুচিত হয়ে আসছে সিস্টার লুকের চারদিকে। যাত্রা শেষ হয়ে এল। রেলিংয়ের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে সিস্টার লুক, বাদামি টিপিগুলোর প্রথম আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করে আছে।···আফ্রিকার ঐ উজ্জ্বল দিগন্ত যত কাছে আসছে ওর বিবেক তত সজীব হয়ে উঠছে। নিজের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে দেখছে, দেখছে সেগুলো ঈশ্বরের অভিপ্রেত হওয়ার যোগ্য কি না।

আদিহীন অন্তহীন—নানের আত্মবিশ্লেষণ অহরহ চলবে। নীতি তাই বলে। প্রাণ যতটা নির্ভরশীল অবিরত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উপর আত্মবিশ্লেষণের ওপর নানও ততটাই। উজ্জ্বল দিগন্তটাকে ছন্দায়িত করে তুলেছে যখন থেকে তখন থেকে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি কাজ[illegible] বিশ্লেষণার্থ পৃথক করে তুলে ধরা মনের বিচার-সভায়—যে চিন্তা [illegible] মনে, যে কাজ করল, ঈশ্বর প্রীত হলেন কি না তাতে। সমুদ্রর পরপারে যে অরণ্যরাজ্যকে সে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে শুধু ইচ্ছার জোরে—সময় হবার অনেক আগেই—তারই মত চঞ্চল তারই মত আন্দোলিত হয়ে আছে তার অন্তর্জগতটা।

শেষদিন রাত্রে দু'জনের নিমন্ত্রণ এল ক্যাপ্টেনের ডিনারে। সেই উপলক্ষে নিজেদের জুতো পালিস করল ওরা, মাড় দেওয়া টাটকা গুইম্প পরল।

আনন্দোৎসব ডিনার, ওদের কথা বলা অবধি অনুমোদিত সেখানে।···সিস্টার লুকের মুখে প্রত্যাশার রক্তোচ্ছ্বাস। সিণ্ডারেলার মত সেও যেন একটা বিশেষ জীবনযাপন করবে—ঘড়িতে যতক্ষণ না শেষের সংকেত বাজে। তফাৎ শুধু এই মধ্যরাত্রির তিনঘণ্টা আগেই তার ঘড়ি বাজতে শুরু করবে, নিঃশব্দে অবশ্য। সিস্টার অগস্টিন একটা ইংগিত করবেন কেবল, গ্র্যাণ্ড সাইলেন্সের সময় সমাগত।

ক্যাপ্টেন তাদের সম্মানীয় আসনে বসালেন, অন্য অতিথিদের বলতে শুরু করলেন মিশনারীদের কাছে উপনিবেশের ঋণ কতখানি। তিনি নিজে জাহাজের অফিসার হিসেবে আঠারো বছর ধরে নিয়ে চলেছেন মিশনারীদের আফ্রিকায়। তারও আগে কংগোর মাটিতে প্রথম যে নানরা পা দিয়েছিলেন তাঁদের সংগে এক জাহাজে কেবিন-বয় হিসেবে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রথমই অনেক দেশীয় লোক সাদা চামড়ার কোন স্ত্রীলোক দেখল।

—সে সব আঠারো শ' নব্বই সালের কথা··রেভারেণ্ড সিস্টাররা হাতে কালো সূতোর কাপড়ের ছাতা নিয়ে সবার সঙ্গে কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে নেমে এলেন··ঘুণাক্ষরেও জানেন না তীরে এদেশের কালো মানুষের দল সমুদ্রের দিকে বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সব অভ্যর্থনা কমিটির সভ্য, দেশের অভ্যন্তরে মিশনের যে ফাদাররা কাজ করছেন তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দাড়িটা তুলে ধরে বিকৃত মুখে হাসছেন ক্যাপ্টেন সেই প্রথমবার চারজন ছিলেন দলে—আমার এখনও মনে আছে নামগুলো··সিস্টার ক্লারেলা, সিস্টার জোয়ানিটা, সিস্টার পলিডোর আর সিস্টার ব্রিজিটা।

সিস্টার লুক ভুলে গেছে ভোজসভায় বসে আছে। ভুলে গেছে এই একবারই সুযোগ এসেছে চারপাশের কংগো বিশেষজ্ঞদের সংগে সহজ হয়ে কথা বলার—ডাক্তার, আর্মির লোক, ইঞ্জিনিয়ার তাঁদের স্ত্রীরা, যত প্রশ্ন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে মনের মধ্যে তার অনেকগুলোরই উত্তর ওঁদের জানা। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করা হ'ল না, শুধু জ্বলজ্বল চোখ মেলে শুনল বসে এক কেবিন-বয়ের স্মৃতিকথা,··· প্রথম দলের সিস্টারদের টিনের ট্রাংকগুলো জাহাজ থেকে নামাতে হাত লাগিয়েছিল সে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সিস্টাররা নিজের নিজের ছাতাটি ধরে দু'জন-দু'জন করে এগিয়েচলেছেন জংলী মানুষগুলোর দিকে।···এবার যে দীর্ঘ চড়াই পথটা পার হতে হবে তাতে এরাই তাঁদের গার্ড অব অনার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ডাক্তারের স্ত্রী হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা, আপনার মনে হয় নি ক্যাপ্টেন, একজন ফাদার অন্তত বন্দরে আসবেন নিশ্চয়।

কথার সুরেই অনুক্ত বক্তব্যটুকু প্রকট। এই সব ফাদার টাদাররা স্বার্থপর বড়!

হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু এ্যান্টওয়ার্প থেকে বন্দর তখন পঁয়তিরিশ দিনের পথ, তার ওপর জাহাজ কবে পৌঁছাবে কোন স্থিরতা ছিল না। আর এই বানানা বন্দর তখন লোনা জলাভূমির মধ্যে একটা বালির টিপি ছিল। এ রকম অনিশ্চিত সময় সেখানে অপেক্ষা করতে হয়, যদি তো একটা তাঁবুও তো খাটানো দরকার, সেটুকু জায়গাও তো ছিল না!

প্রথম চারজন সিস্টার বালির টিপি হেঁটে পেরিয়ে এসে দোলনার মত ডুলিতে চড়লেন, বাহক দেশীয় লোকেরা। স্পষ্ট দেখছে সিস্টার লুক ডুলিগুলো ম্যানগ্রোভ লতাগুল্মে ভরা জলা দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা, যেখানে গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি ক্যানুগুলো নোঙর করা আছে সেখান পর্যন্ত।

ক্যাপ্টেন আবার ফিরে গেছেন কেবিন-বয়ের স্মৃতিচারণে, এই তো পথ আর এই তো যানবাহন,···তবু তাঁরা এমনই শান্ত, স্থির, কেউ দেখলে ভাববে বুঝি ফ্রান্সের ছায়া-ঢাকা রাজপথে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন।

তাঁদের অনুসরণ করে দলে দলে সিস্টাররা এলেন—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তখন। মাটাডি-লিওপোল্ডভিলে রেলপথ তৈরি হচ্ছে, পনেরো হাজার কালো মানুষ কাজ করছে তাতে আর দলে দলে মরছে। রেল-কোম্পানী ক্রমেই বিব্রত হয়ে পড়ছেন, আতংকিতও। এই অবস্থায় নানরা ক্লিনিক গড়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।··· তারপর দিন কেটেছে, ফাদারদের নির্দেশমত ক্রমেই তাঁরা এগিয়ে গেছেন ভিতরে, আরও ভিতরে।

শুনছে যত, মিছিলটা তার মনের মধ্যে এগিয়ে চলেছে···কখনও

বা থামছে কোন বহির্দৃশ্যের আকর্ষণে। রেভারেণ্ড মাদার ইমাম্যুয়েলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। একটা চিঠি পড়ে শোনাচ্ছেন বয়সের ভারে কাগজখানা হলদে। এই সিস্টার ক্লারেলা, সিস্টার মেরি জোয়ানিটা, সিস্টার পলিডোর বা সিস্টার ব্রিজিটা—এঁদেরই কারো লেখা চিঠি।

···'নিজেদের ক্রুশচিহ্নের বর্মে ঢেকে রাখবার, আত্মার ভার অভিভাবক দেবদূতের ওপর দিয়ে রাখবার সব রকম চেষ্টা করছি আমরা।···ট্রেনটা যখন ভয়ংকর এবং সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে যায় আর মনে হয় যেন এখনই পাথুরে পাহাড়ের পায়ে ছিটকে গিয়ে পড়বে, খুব শক্ত মনের লোক না হলে এদিক-ওদিক না তাকানোই বুদ্ধিমানের কাজ।···এই এখনই ডিনামাইট দিয়ে পথ করা পাহাড়ের চুড়োয় পাক খেয়ে খেয়ে চলেছি, পরমুহূর্তে পাহাড়ের গায়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছি সবেগে···ঢালটা সোজা নেমে এসেছে কংগো নদীর ঘোলাটে ঢেউয়ে।'

মিছিলটা কখনও দাঁড়িয়ে মন্তব্য করছে দেশীয় শিশুদের বিষয়, প্রথমাগতা সিস্টারদের পিছন পিছন মাছির মত অনুসরণ করে চলেছে তারা।

পাঠরতা সুপিরিয়রের কণ্ঠস্বর আবার শোনা যাচ্ছে, 'এরা অধিকাংশ উত্তর কাতাংগার বন্য উপজাতিদের ছেলেমেয়ে। আমরা এসে প্রথম প্রথম ওদের বালি খেতে দেখে, মরা ইঁদুর, কেঁচো বা শামুকে মুখ দিতে দেখে ভারি অবাক হয়েছিলাম! ওদের সবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভীষণ-দর্শন উল্কি আঁকা। নীতির দিকটা শোচনীয়—মিথ্যা কথা বলা, আর চুরি করা এমনই ওদের স্বভাবে জড়িয়ে গেছে যে সেগুলোকে ওদের বিশেষ দক্ষতার পর্যায়ে ফেলতে হয়, সদগুণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম দিকে প্রত্যেক দিন লুকিয়ে এসে ওরা আমাদের শস্যক্ষেত তছনছ করে দিত···'

বছরের পর বছর ধরে এই মিছিল চলেছে—চলেছে আর স্ফীত হয়েছে আয়তনে। কাজ চালানো কাঠের বেড়া দেওয়া তাঁবুর জায়গায় ইট-পাথরের ইমারত উঠেছে। কিছুকাল পরে—বোধ হয় নানরা যখন প্রমাণ করতে পারলেন তাঁরা টিকে থাকতে পারবেন ঠিক তাঁদের গ্রীষ্মোপযোগী সাদা পোশাক দেওয়া হ'ল। খৃষ্টধর্ম প্রচারের এই নতুন ক্ষেত্রটার বিচিত্র দৃশ্যাবলীর রেকর্ড রাখা সহজ হবে এবার—আগের মত আর ঘামতে হবে না, আগের মত আর লেখার জন্য নীচু হতে গেলে খাতার ওপর ঝরে পড়বে না ফোঁটা-ফোঁটা।

ক্যাপ্টেনের স্মৃতিকথা শুনতে শুনতে হঠাৎ এক সময় সিস্টার লুক ঐ মিছিলের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই একটা গর্বের শিহরণ বয়ে গেল দেহে। কংগোয় সিস্টারদের বিশাল মিছিলটা সাদা সুতোর মত বোনা হয়ে গেছে···হঠাৎ দেখল বজ্র-কঠিন সিস্টারদের সেই দীর্ঘ মিছিলের শেষপ্রান্তে সেও এগিয়ে চলেছে।

···একঝলক রক্ত ছুটে এসেছে মুখে, সেটাই ঢাকতে সিস্টার লুক মুখ নীচু করল।

বহু সুতোর মধ্যে এটি একটি, কিন্তু এর মধ্যে আর কোন খণ্ডাংশ নেই—সুদৃঢ়, একটানা। সে যেমন এল, তাকে অনুসরণ করে আসবে তেমনি অন্য সিস্টাররা। তার মত তারাও এমনি টিনের ট্রাংক নিয়ে আসবে, যেমন প্রথম দল এসেছিলেন—এ বাক্সে ঘুণ ধরার ভয় নেই। গুইম্প, সেমিজ আর অন্তর্বাসের সংখ্যাও একই থাকবে তাদেরও। একই সেলাইয়ের থলি, চেন-স্টিচ, দিয়ে নম্বর লেখা, জুতো পরিষ্কারের সরঞ্জাম আর দু'টো পাঠ্য বই—মাদার হাউসে সিস্টার ইউডোক্সি ট্রাংক গুছিয়ে দেবার সময় পরীক্ষা করে দেন বইগুলো—নার্সদের জন্য মেডিক্যাল-সংক্রান্ত এবং শিক্ষয়িত্রীদের জন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত হতে হবে সেগুলো। আর সবারই অন্তর থেকে একই অনাড়ম্বর প্রার্থনা স্বাভাবিক ভংগীতে উৎসারিত···'হে প্রভু, ভাল কিছু কাজ যেন আমি করতে পারি তুমি দেখো···'

ক্যাপ্টেন বলে চলেছেন।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি তখন সিস্টার অগস্টিনের সঙ্গে কেবিনে ফিরছিল সে। মনে নেই সিনিয়র তার আস্তিন আকর্ষণ করে ডেকেছিলেন অথবা চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন তার দিকে। চলে আসার সময় কি বলেছেন নিমন্ত্রণকর্তাকে, অতিথিদের—তাও মনে নেই।

একটা অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে বারবার, সিস্টার ক্লারেলা, সিস্টার মেরি-জোয়ানিটা, সিস্টার পলিডোর বা সিস্টার ব্রিজিটা যেন ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন···পরণের কালো হ্যাবিটগুলো ঝলসে বিবর্ণ সবজেটে হয়ে গেছে, সুতোর কাপড়ের ফ্যাকাশে ছাতাগুলো চেয়ারের পিছনে ঝোলানো ছিল।

সিস্টার অগস্টিন বললেন, কাল খুব ভোরে আমরা লোবিটো পৌঁছাব। [ক্রমশ।

অনুবাদ :—প্রণতি মুখোপাধ্যায়।

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাতাসী মঞ্জিল

গেলাম নিমাই মিস্ত্রিরের সঙ্গে।

নিওন-আলোকিত সিঁড়ি বেয়ে তাঁর পিছু পিছু উঠে গেলাম তাঁর দোতলার ঘরে। এ ঘরের স্বরূপ অনেক শব্দ ব্যবহার করেও বোঝানো সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু এর একটি বিশেষত্ব যেন আমার গায়ে ধাক্কা মেরে নিজেকে জাহির করল: বিরাটত্ব। ঘরটি লম্বায়, চওড়ায় আর উচ্চতায় বিরাট, বিরাট এর দরজা আর জানালাগুলো।

ঘরটির ওপাশে পূর্বদিকে গাড়িবারান্দার চতুষ্কোণ ছাদ; তার অনতিদূরেই শ্বেতপাথরে বাঁধানো সেই পুকুরের ঘাট, যেখান থেকে এইমাত্র চলে এলাম নিমাই মিস্ত্রিরের সঙ্গে। ঘরের আসবাব বর্ণনার প্রয়োজন নেই, আসবাবের বাহুল্যও ছিল না ঘরে। আমার সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পড়ল জানলার ধারে একটি বৃহদাকৃতন ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কের ওপর, যার দু'দিকে দু'টি লম্বা গলার ডগায় দু'টি ময়ূরের মুখ। সারা পালঙ্ক জুড়ে পুরু, নয়নাভিরাম, লোভনীয় শয্যা, যেন দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছে!

নিমাই মিস্ত্রির বললেন, 'ঐ পালঙ্ক ছিল বাতাসী বিবির। আগাগোড়া চন্দনকাঠের তৈরি।'

'চন্দনগন্ধ ময়ূরপঙ্খী এই পালঙ্কটি শখ করে তৈরি করিয়েছিলেন বাতাসী বিবি এই বাতাসী মঞ্জিলে এসে।' বললেন নিমাই মিস্ত্রির। তখন অবশ্য বিছানা নরম করবার জন্য ফাঁপানো রবারের ডানলোপিলো ছিল না। এখন একরকম জোর করেই ডানলোপিলো চাপিয়েছে আমার পিতৃভক্ত পুত্র কানাই। বুড়ো বাপ আর যে ক'টা দিন বাঁচে, নরম ডানলোপিলোর বিছানায় শুয়ে আরাম করে যাক, এই বোধ হয় তার মনের বাসনা।'

তাকালাম আবার ঐ পালঙ্কের দিকে। এককালে ওর ওপর থাকত বাতাসী বিবির শয্যা। সেই শয্যার বদলে এখন নিমাই মিস্ত্রিরের জন্যে ডানলোপিলো বিছানা। পালঙ্ক সেই আছে; বদলেছে বিছানা, বদলেছে মানুষ। পালঙ্কের ওপাশে দেয়ালের বুকে বিচিত্র দেয়াল-ঘড়ির বিরাট পেণ্ডুলামটা পরম আলস্যভরে দুলতে দুলতে মৃদু টিক্‌-টিক্‌ আওয়াজ করছে।

আমার ভাবনার আওয়াজ নিমাই মিস্ত্রিরের কানে পৌঁছেছিল কি না জানি না। তিনি বললেন, অতীতের সঙ্গে বর্তমান মিলিয়েছে কানাই। আমি অতীত নিয়ে সেকেলে থাকতে চাই, কিন্তু বাপকে খানিকটা একেলে না দেখলে বোধ হয় কানাইয়ের মনটা খুশি হয় না। ওপরে তাকিয়ে দেখুন, সেকেলে ঝাড় লণ্ঠনের পুরোনো ব্যবস্থাগুলো ছাদ থেকে ঝুলছে, ওগুলো সব বাতাসী বিবির আমলের। কিন্তু এখন ওতে অগ্নিশিখার আলো জ্বলছে না। যেমন জ্বলত বাতাসী বিবির আমলে। তার বদলে ঘর-জোড়া নিওন আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে কানাই। কবি টেনিসনের পরম ভক্ত সে, বলে 'ওল্ড অর্ডার চেঞ্জেথ ঈল্ডিং প্লেস টু নিউ' (old order changeth, yie'ding place to new) পুরোনো ধারা বদলে যায়, আসে নতুন ধারা। এরই নাম নাকি প্রগতি।'

কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম বাতাসী বিবিকে দেখবার কৌতূহলে। বাতাসী বিবির ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ক দেখে সে কৌতূহল তৃপ্ত হবার নয়।

সবিনয়ে বললাম, 'বাতাসী বিবিকে একবার আমায় দেখা দরকার, বলেছিলেন আপনি।'

নিমাই মিস্ত্রির বললেন, 'সেই জন্যেই তো নিয়ে এলাম। আসুন।'

বড় ঘরটির দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে আমাকে আরেকটি ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। এ ঘরটি বিরাট নয়, মাঝারি। নিমাই মিস্ত্রির বললেন, 'এই ঘরটি ছিল বাতাসী বিবির বেশ পরিবর্তন আর প্রসাধনের কক্ষ। এই যে দেয়ালের পাশে বড় আয়নাটি দেখছেন, এর যদি মন বলে কিছু থাকে, তাহলে বাতাসী বিবির অনেক দিন আর অনেক রাত্রির সাজসজ্জা আর প্রসাধনের স্মৃতি আজো জেগে আছে এর বুকে।'

একজন লম্বা চওড়া মানুষের মতো লম্বা চওড়া আয়নাটি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখলাম আয়নার সেই বুকে, যে বুকে বহুদিন আর বহু রাত প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাতাসী বিবি।

কতক্ষণ ঐ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাতাসী বিবির চেহারা কল্পনায় মশগুল ছিলাম জানি না। হয় তো আমার সেই কল্পনা মশগুল বা ধ্যানমগ্ন অবস্থা লক্ষ্য করেই কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন নিমাই মিস্ত্রির। অবশেষে আমার ধ্যানভঙ্গ করে তিনি বলে উঠলেন, 'এদিকে তাকান ধনপতিবাবু।'

তাকালাম নিমাই মিস্ত্রির দিকে। আয়নাটা যে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, তারই বিপরীত দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি সবুজ পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে নিমাই মিস্ত্রির, পর্দাটি এইবার আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে পর্দার আড়ালের আকর্ষণীয় দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন, এমনি ভঙ্গিতে। দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন যেন একটি চোর-কুঠরি, তাকে আড়াল করে রেখেছে এই পর্দা। কি আছে পর্দার আড়ালে ঐ চোর কুঠরিতে?

আস্তে আস্তে, যেন এইবার অভিনয় শুরু হবে, যবনিকা সরে যাচ্ছে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখ থেকে, পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিলেন নিমাই মিস্ত্রির।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন: 'বাতাসী বিবি।'

তাকিয়ে দেখলাম আশ্চর্য একটি জীবনায়তন তৈলচিত্র। আরাম-কেদারায় সহজ বিশ্রামের ভঙ্গিতে বসে আছেন বাতাসী বিবি, দু'পায়ে নাগরা, ডান হাতে ধরা গড়গড়ার নল, সেই নলে মুখ লাগাবার আগে কি যেন ভাবছেন অথবা কি যেন শুনছেন। যেন সত্যি একজন জীবন্ত মানবী বসে আছেন, মৃদু হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। দৃষ্টির বিভ্রমে মনে হল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বুঝি ওঠা-নামা করল তাঁর বুক, নাগরা পরা পা দু'টিও ঈষৎ দুলে উঠল যেন। বুঝলাম এ দৃষ্টি-বিভ্রম—তবু সত্যি বলে মনে হলো।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একবার ইয়ারো নদী দেখতে যেতে চান নি পাছে নদী দেখতে গিয়ে স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা পেতে হয়, অর্থাৎ কল্পনায় সেই নদীর যে অপরূপ ছবিটি এঁকে রেখেছেন, আসল নদীটি তার সেই কল্পনার রূপের কাছে হার মেনে যায়।

বাতাসী বিবি সম্বন্ধেও আমার মনে এই ধরণেরই একটা ভয় ছিল, যদিও কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। কিন্তু এই ছবি দেখে আমি স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা পেলাম বললে একটু ভুল বলা হবে; বরং রূপ, রহস্য, পৌরুষ আর রমণীয়তার এমন অদ্ভুত সমন্বয় আমি কোনো নারীর চেহারায় দেখতে পাব বলে কখনো আশা করি নি।

'বাতাসী বিবির এই ছবিতে যে গড়গড়া দেখছেন, তার আসলটি অর্থাৎ মডেলটি একটু আগেই দেখেছিলেন আমার হাতে?' বললেন নিমাই মিস্ত্রির।

জনৈক সম্রাটের একটি ছবি দেখেছিলাম, সেই ছবিতে সম্রাটের হাতে বোঁটাওয়ালা একটি ফুল।

তুলনাটা হয় তো ঠিক জুৎসই হল না, কিন্তু জানি না কেন, বাতাসী বিবির হাতের গড়গড়ার নলটি দেখে আমার ঐ ফুলের বোঁটার কথা মনে পড়ে গেল।

'বাতাসী বিবির এই ছবি এই বাতাসী মঞ্জিলেই আঁকা।' বললেন নিমাই মিস্ত্রির। 'এঁকেছিলেন এক সাগর পারের দেশের শিল্পী—মানুষের ছবি বা পোর্ট্রেট আঁকাতেই যাঁর ছিল বিশেষ ওস্তাদি। দেশে তেমন ভালো পশার জমাতে পারেন নি বলেই হোক বা রহস্য আর ঐশ্বর্যের দেশ হিসেবে ভারতের খ্যাতি শুনেই হোক, এই শিল্পী ভারতে এসেছিলেন কৌতূহল মেটাতে, অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে, বরাত ফেরাতে। কাচাড়ুরিয়ান বা ঐ ধরণেরই কি একটা নাম তাঁর।

হুবহু মনে নেই—ধরে নিন কাচাডুরিয়ান। গ্রীক, না ইটালিয়ান, না স্প্যানিশ, না কি তা জানি নে, জানবার দরকারও মনে করি নি। শিল্পী শিল্পীই, তার আবার জাত আর দেশের হিসেব করতে যাওয়া কেন? কেমন লাগছে কাচাডুরিয়ান সাহেবের আঁকা এই তেল-ছবি?'

বললাম, 'শিল্প সম্বন্ধে আমার পাণ্ডিত্য নেই, জানি নে শিল্পের জগতে এ ছবির স্থান কোথায় বা দাম কতো, কিন্তু আশ্চর্য জীবন্ত এই ছবি। শিল্পী তাঁর মডেলের বাস্তব রূপ এতে ফোটাতে পেরেছেন কতখানি তা জানি নে, কিন্তু—'

'আমি জানি, ধনপতিবাবু।' বললেন নিমাই মিস্ত্রির। 'বাতাসী বিবিকে শেষ যেদিন দেখেছিলাম, খুবই অল্পক্ষণ, সে আজ অনেকদিনের কথা। কিন্তু ভুলতে পারি নি। আমি আপনাকে বলতে পারি, নিখুঁতের এত কাছাকাছি এই পোর্ট্রেটের মতো পৃথিবীতে আর দু'চারখানার বেশি আঁকা হয়েছে কি না সন্দেহ। এ ছবির সামনে যখন এসে দাঁড়াই, তখন ভাবতে পারি নে বাতাসী বিবি বেঁচে নেই, মনে হয় এই তো বাতাসী বিবি, বসে আছেন আরাম কেদারায় আরামে দেহ

এলিয়ে দিয়ে, হাতের ঐ নলের মুখটি মুখে লাগিয়ে এখনই পান করবেন অম্বুরী তামাকের সুরভিস্নিগ্ধ ধোঁয়া।'

আমার মুখে বোধ করি একটু অস্বস্তির বা অতৃপ্তির ভাব লক্ষ্য করলেন নিমাই মিত্তির। শুধালেন, 'কি ভাবছেন ধনপতিবাবু? মনে হচ্ছে এ ছবি আশ্চর্য লাগলেও আপনাকে পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারে নি, কোথায় যেন আপনার বাধছে। কোথায় বাধছে বলুন তো?'

বললাম, 'ঐ গড়গড়ার । ওটি যেন একটি সুন্দর কবিতার ছন্দপতন ঘটিয়েছে।'

নিমাই মিত্তির বললেন, ' তার বিপরীত ধনপতিবাবু। ওটিতেই ফুটে উঠেছে বাতাসী বিবির জীবনের বিশেষ ছন্দ। বাতাসী বিবি যে 'এ লেডি উইথ এ ডিফারেন্স' (a lady with a difference), এক আলাদা জগতের নারী, আমাদের পরিচিত গণ্ডীর বাইরে, ধূমপানের ঐ সরঞ্জাম ছবিতে যুক্ত করে শিল্পী এই সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমটা হয় তো একটু 'শক' (shock) লেগেছে আপনার, ঐ প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিলেই অনুভব করতে পারবেন আপনি যাকে খুঁত বলে ভেবেছিলেন সেটাই এ ছবির আসল সুরের নিশানা।'

আবার তাকালাম বাতাসী বিবির তৈলচিত্রের দিকে। মনে হলো খুব সম্ভব সত্যি কথাই বলেছেন নিমাই মিত্তির।

'পোর্ট্রেট আঁকিয়ে কাচাতুরিয়ান সাহেবের এখানে এসে বেশ পসার হয়েছিল।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'এই বিদেশী শিল্পীকে ভালো দক্ষিণা দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকানো আমাদের পয়সাওয়ালা অভিজাত মহলে একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেল। মওকা পেয়ে পরমানন্দে পোর্ট্রেটের পর পোর্ট্রেট এঁকে এঁকে প্রচুর পয়সা কামাতে লাগলেন শিল্পী কাচাতুরিয়ান। তারপর···'

'তারপর···???'

'বাবার পরিচয় হ'ল শিল্পী কাচাতুরিয়ানের সঙ্গে, অথবা বলতে পারেন কাচাতুরিয়ানের পরিচয় হল বাবার সঙ্গে।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'সে সব খুঁটিনাটিতে মাথা গলিয়ে দরকার নেই, সংক্ষেপে বলি কাচাতুরিয়ানের এই ছবি আঁকবার যে সুযোগ হয়েছিল, সেই সুযোগের মূলে ছিলেন বাবা। তখনকার নামকরা পালোয়ান-এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির। বাতাসী বিবি তখন যাঁর অন্যতম প্রধান মক্কেল। এই বাতাসী মঞ্জিলেই বাতাসী বিবিকে মডেল করে এই আশ্চর্য তেল-ছবি এঁকেছিলেন কাচাতুরিয়ান। যাবার আগে এ ছবি বাবাকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন মক্কেল বাতাসী বিবি।'

পাশের ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। পর্দাটা আবার টেনে ছড়িয়ে দিলেন নিমাই মিত্তির, পর্দার আড়ালে চলে গেলেন বাতাসী বিবি।

'কথায় কথায় যে আপনাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছি, সে কথা খেয়ালই করি নি, ধনপতিবাবু।' বললেন, নিমাই মিত্তির। 'দেখতে দেখতে ন'টা বেজে গেল। এক্ষুণি ডেকে পাঠাবেন বৌমা। বুড়ো ছেলেকে নৈশভোজন করাবার সময় হলো তাঁর।'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'ছি ছি, আমারই অন্যায় হয়েছে গল্প শুনবার লোভে আপনাকে এতক্ষণ আটকে রাখা।'

'আপনার শুনবার লোভ যত, আমার শোনাবার লোভ তার চাইতে কম নয়, ধনপতিবাবু।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'আপনার মতো খাঁটি শ্রোতা পেয়েছি, সেজন্যে ধন্যবাদ ভগবানকে। আর ধন্যবাদ সুলতান মিয়াকে, সেই তো আপনার সন্ধান দিয়েছে আমাকে।'

'আর আমাকে দিয়েছে আপনার সন্ধান। এজন্য আমিও সুলতান মিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ।' বললাম আমি। 'এখন পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির আর রহস্যময়ী বাতাসী বিবির প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী শুনবার জন্যে মনটা ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, আপনার বৌমা অপেক্ষা করছেন, আমার কৌতূহলটা না হয় পরেই মিটবে। আপনি আমায় ক্ষমা করে খেতে যান, আমি চলি। যদি অনুমতি করেন তো কাল সন্ধ্যায় আবার আসব।'

'শুধু কাল সন্ধ্যায় নয়, ধনপতিবাব, আরো অনেক সন্ধ্যায় আসবেন আপনি।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'অনেক, অনে—ক কথা বলবার বাকি এখনো, সব আপনাকে বলে যেতে পারব কি না তাও জানি নে। কাল বরং একটু আগেই চলে আসবেন, রোদটা ঝিমিয়ে পড়লেই। কেমন?'

'আসব।'

বলে নামবার রওনা হতেই তিনি বললেন, 'দাঁড়ান ধনপতিবাবু। কালই যখন আবার আসছেন, তখন একটা জিনিষ আপনাকে দিতে বাধা নেই, কাল যখন আসবেন ফেরৎ নিয়ে আসবেন।'

'কি সেই জিনিষ?' মনে মনে এই প্রশ্নটি ভাবলাম, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করলাম না অপ্রয়োজন বোধে।

নিমাই মিত্তির বললেন, 'বাবার দিনপঞ্জীর খাতাগুলো থেকে অনেক স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ বেছে বেছে বিচ্ছিন্নভাবে নকল করে রাখছি নিজের হাতে—আমার একটা বিশেষ মতলব আছে বলে। কি সেই মতলব। সে কথা এখন নাই বা শুনলেন আপনি। ঠিক যে কাহিনীটি আপনি চান—বাতাসী বিবির সঙ্গে পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরের প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী—সেটি আমার মুখে না শুনে স্বয়ং পালোয়ান এ্যাটর্নীর লেখা দিনপঞ্জী থেকেই শুনুন।'

উৎসাহিত হলাম। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি, জল না চাইতেই সরবৎ। একটি দেরাজের ভেতর থেকে হাতে লেখা অনেক পৃষ্ঠা কাগজ বার করে তাই থেকে বেছে কতকগুলো পৃষ্ঠা ক্লিপ দিয়ে আটকে তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নিয়ে যান। পড়ে নিয়ে কাল আসবার সময় নিয়ে আসতে ভুলবেন না।'

'ভুলব না।' বললাম আমি। পৃষ্ঠাগুলো সযত্নে জামার পকেটে পুরে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। [ক্রমশ।

শ্রীবদ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য

মফস্বল শহরের পীচঢালা একনাগাড়ে রাস্তা। প্যাক-প্যাক-প্যাক-পাতিহাসের মতো রিক্সাগুলো সার দিয়ে চলে। 'বাইস্কোপের টাইম হয়েছে রে, খ্যাঁদা, নে জোরে চালা!'—

'একটু জোরে চালাও বাপু, ওদিকে শো যে আরম্ভ হয়ে যাবে বাছা, 'এই রিক্সা কবে যে উঠবে—'আমাদের কোলকাতায় অনেকদিন হোলো উঠে গেছে, জানো মাসীমা—

একরাশ কলতানে মুখর হয়ে ওঠে পাঁচটা তিরিশের মফস্বলের টাউনের পথ। অশ্বত্থ-বট, শিমূল-নিমগাছের মাথায় মাথায় জটলা-করা হরেক রঙ—সবুজ-সবুজে-খয়েরীতে কোনটা-কোনটা লালচে সবুজ—কালো কাকগুলোও ওদের ডানার দু'পাশে দু'রকমের রঙ মেখে নিয়ে কা-কা করে উড়ে চলে, ওই একই সারিতে, ওদেরও টাইম হয়েছে।

টাউনহলের মাথার পেটা ঘড়িটায় টেরচা চোখে চেয়ে নিয়ে অপরেশ রাস্তার একপাশে সরে গেলো। সাইকেলে ঘণ্টি মারলেও অবাধ্য গরুটা গোঁয়ারের মতো গা ঠেলে, 'আপনার তো একদিন বাবু, আমাদের রোজ অমনি রিক্সার সামনে পড়ে, ধর্মধ্বজদের খেয়ালই নেই'—রিক্সাওয়ালাদেরই কেউ কথাটা ছুড়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো, হাসি পায় অপরেশের, মনে মনেই বলে ওঠে, তোমরাও তো কম যাও না বাপু, রাস্তার ধার দিয়ে, কখনও কখনও মাঝখানটা দিয়ে দল বেঁধে চলেছো, তোমাদেরই বা কি ঠিক আছে। কিছু ঠিক নেই এই মফস্বল টাউনের। টাউনের উঁচু জলের ট্যাঙ্কটা দেখা যায় শহরের মাঝখান থেকে একপাশে দাঁড়ালেও। টাউনের জীবনে সমস্ত মন্দাক্রান্তা ছন্দের যেন ঐ এক কবি। আর এই গোধূলির ছবি, ছবির রঙ গায়ে মাখতে মাখতে অপরেশের সামনের রাস্তায় এপাশ-ওপাশ বাড়ির নালাভ কালো ছায়া একসময় যখন খয়েরী হয়ে ওঠে, সেটা চোখের ভুল, না সত্যিকার, ঠাওর করার আগেই সাত-পাঁচ অন্য দশটা কথা পাক খেয়ে খেয়ে সুতোর মতো জড়িয়ে যায় মনে মনে। মফস্বল টাউনের এ জীবন-যৌবনের প্রাসাদের অলিন্দ যেন—সারি সারি রংয়ের ফাঁক কি জাল বুনে বুনে সময়কে চুরি করে নিয়ে যায়, একদম খেয়াল হারিয়ে ফেলে সেই প্রেমেপড়া অপরিণত বয়স। ওই বয়সের অপরেশ কৃশানু-মিলন সবাই।

তারপর সেই ওল্ডফুলস্ রেস্টুরেন্ট—গণেশের দোকান, 'ও গণেশ' গণেশের পিঠ জড়িয়ে কেউ বা, কেউ বা ওর গেঞ্জিতে নাকটা একটু ঘষে নিয়ে 'বাঃ, আজ যে বেড়ে জিনিস হয়েছে চিংড়ীর মালাইকারী তোফা তোফা 'আরে গেঞ্জিতেই গন্ধ লেগে রয়েছে মাইরি', বলতে বলতে পর্দা দেওয়া ঘেরাটোপের মধ্যে ঢোকে। গণেশ ইঙ্গিতে বলে কড়ায় তেল চাপানো হয়েছে, একটু বাকি, সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় ওদের চোখের আলোগুলো 'তবে যা আছে ঐ দে, হাতে বেশি সময় নেই কিন্তু।' এই হাতে বেশি সময় নেই। কথাটা শুনে শুনে মামুলী হয়ে উঠেছে গণেশের কাছে, ও জানে, ওদের দল পুরো একটি ঘণ্টার আগে যাবে না। তেল চাপানো, চিংড়ীর খোলা ছাড়ানো থেকে কড়া নামানো এস্তেক বসে থাকবে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে-পুটে তারিফ করে করে বলে উঠবে, গণেশ এ যাবং যা মালাইকারী করেছিস না, এটা মাইরি বেস্ট।' গণেশ যেন ওদের সেই তারেক সাগরেদ, ওরা চলে যাবার মুখে চেঁচিয়ে উঠবে, 'এবার থেকে কিন্তু বলে দিলাম, সব জিনিষের দাম বেড়েছে, আমিও তাই দশ পার্সেণ্ট বাড়াবো

যায়। আর শুনছি নে অপরেশের দলের কারও চোখ কারও বা হাতের তালু উল্টানো, কারও বা জিভ চুক চুক করা থেকেই ধরা পড়ে যায়, 'বাঃ গণেশ, ইয়ার্কী করবি তুই আমাদের সঙ্গেও?' ওদের মুখের শেষ হাসিটা দেখে নিয়েই হঠাৎ গণেশের মনে পড়ে যায়, এ কিছুই নয়, ওদের কাছে ওর কথাটাও সেই পুরনো ঠাট্টাগুলোর মধ্যে একটা। পুরনো মালিক বুঝি অনেক ভেবে চিন্তেই দোকানের নামটা রেখেছিলো, গণেশ ওই ওল্ডফুল্‌স দলেরই তো একজন,—বুদ্ধু, গ্রেপ বুদ্ধু আরেকটি।

গণেশই চুপি চুপি একদিন মুখ নিয়ে গেলো কৃশানুর কানে। কৃশানুর মুখটা ভরে উঠলো হাসিতে। বাকী ক'জন সোরগোল তুললো, গণেশ ভালো হচ্ছে না কিন্তু। আমাদেরও বলতে হবে। কৃশানু চেঁচিয়ে উঠলো ঠাট্টা করে, 'আমাদের দাবী,'– গণেশ আরও জোরে বাকীটা পূরণ করলো, 'মানতে হবে।' এর পরেই ওদের মধ্যে শলা-পরামর্শ বসে যায়। যেন এক বিরাট পরিকল্পনা, যার সঙ্গে অনেক যুক্তি, অনেক তর্ক জড়িয়ে আছে। কৃশানু সিগারেটের অ্যাশট্রেটা হাতে নিয়ে টেবিলে ঠুকে বলে উঠলো, 'পারতেই হবে, এ আমাদের করতেই হবে। কিন্তু'—পাঁচটা ঠোঁটে কামড়িয়ে নিলে যেন সময় নেওয়ার আছে এ ব্যাপারে। মিলন একটু হ্যাবা-চাকা খেয়েছে, বাকী অনেরা বোঝে। কিন্তু পেছিয়ে যাওয়া চলবে না, কৃশানু স্থির। 'না চলতে পারে না।' এর জন্য কলেজ ইউনিয়নকে হাত করতে হয়, তাও রাজী। অপরেশ ওর হাতের সোনার আংটিটা খুলে খুলে ফের পরতে লাগলো হাতে।

'কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে'—কথাটাকে গাম্ভীর্য দিয়ে বলতে চাইলো অপরেশ—'কলেজ ইউনিয়নের সুমন্তকে আমরা সবাই চিনি, ও যে বড় একটা রাজী হবে'।

ওকে থামিয়ে দিলো জোর করে মিলন, 'রাজী হবে না মানে? সে ব্যবস্থা আমি কোরবো।'

'আমার কিন্তু সন্দেহ আছে যা একরোখা আর আইডিয়ালিস্ট, ওর সঙ্গে তো পড়েছি এককালে ফার্স্ট ইয়ারে।' অপরেশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথাটা বলেছিলো। ওর মানে বুঝে নিয়ে মিলন বলেছিলো।

'আরে রাখ, দলে আসবে না এই তো? ও কিছু না আমি রাস্তা চিনি।'

পর্দা আরও টেনে দিয়ে মিলন একান্ত চুপিসাড় বলেছিলো পরে তার কথাটা আরও গোপনীয় বলে; সুমন্ত সহজে রাজী না হয় কলেজের বাইরে সোস্যাল ফাংশান করতে, ইউনিয়নের জয়েন্ট সেক্রেটারী সুচিত্রার নামে চিঠি পাঠাবো মিত্রার হাতে দিয়ে, অবশ্য জাল চিঠি আর কি।—

ফন্দিটা কিন্তু বেশ, জোর আছে—আছে মনে হচ্ছে। দলটা ঘিরে বসলো যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে আরো কাছাকাছি।

—'মিত্রা বলতে তোরা জানিসই, আমার বৌদির সূত্রে কি জানি কি সম্পর্ক হয়। সে যাক গে। সুচিত্রা যেন লিখবে, ইউনিয়নের হাতে এবার বেশি টাকা না এলে মেয়েরা একমাস বাদেই যে রবীন্দ্রজয়ন্তীটা আসচে ওরা আলাদাই করবে। ছোট-স্কেলে, তা হোক। ছেলেদের ইউনিয়ন নিয়েই ছেলেরা থাকুক, সুচিত্রা যুগ্ম সম্পাদিকার পদ ছেড়ে দেবে। কেন না তা নইলে মেয়েরা ওর ওপরে খাপ্পা হয়ে আছে। বলেচে একটা সোস্যাল, তা আগে বাইরে যে কোনো হলে করলেই তো একটা মোটা টাকা উঠে আসে।'

এখেনে আমার এক বক্তব্য আছে। কৃশানু যেন চিবিয়ে কথাটা বললো। ও যখন ওরকম করে বলে, সকলেই বোঝে, বেশ ভেবে চিন্তেই কথাগুলো বলে ও, ছ্যাবলা হয় না মোটেই এখন।—

'প্রিন্সিপ্যাল তো কলেজ হল ছাড়া বাইরে করতে দিতে রাজী না হতেও পারে?' মিলন দমবে না। ও যেন গোড়া থেকেই ঠিক করে এসেচে। তাই সেই একসুরেই বলে চললো।

'একটা বড় ফাংশান। বাইরের দু-দশজন জ্ঞানীগুণীও আসচে এ মফস্বল শহরে, লোক ভেঙ্গে পড়বে, কার্ড দিয়ে করলেও জায়গায় কুলোনো যাবে না। অগত্যা 'অপরূপা' সিনেমা হল ভাড়া করতেই হবে। সুমন্তকে বোঝালে বুঝতে বাধ্য।'

'দি আইডিয়া' বাকি সবাই সায় দিয়ে উঠলো সেই সঙ্গে।

'তারপরে সিনেমা হলের আশেপাশে পেশাদার গুণ্ডা আছে, সে সুমন্ত জানে, আমাদের ওই ফাংশানের টাকার একটা শেয়ার দিতে রাজী না হয়, একটা গোলমাল হবেই, তা আভাসে সে সময়ে ওকে বলে দেওয়া যাবে। আর যেখানে মেয়েরা আসছে, বিশেষ করে ওর কলেজেরই ছাত্রী সব, সুমন্ত গোলমালের ভয়েও এ ব্যাপারে অন্তত গররাজি হবে না।'

যুক্তিটাকে নিজে তলিয়ে তলিয়ে দেখছে প্রথমে যেন, মিলনের প্রতিটা কথায় জোর দেওয়া দেখে কারোর বুঝতে বাকি রইলো না তা। সুতরাং ওর এই কথার ওপরে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে।

রাস্তায় নেমে অপরেশ রাস্তার টিমটিমে ইলেকট্রিক আলোর দিকে চেয়ে দেখেছে এরপর। সব রহস্য যেন লাইটপোস্টের তলার ছায়াটায়, গাছের ছায়ায় মিলে কেমন একটা মেয়েলী হাতের আল্পনায়, যেন কতো মায়াবী করে তুলেছে। 'উর্বসী' নামটা ছ্যাং করে উঠলো এই সঙ্গে। উর্বসী, যার মুখ ঠিক ওই থার্ড ইয়ারের ছাত্রী সুচিত্রার মতো—অবিকল অমনি আধোআধো স্বরে কথা বলে।

'জানেন অপরেশদা'। আমি এবার কলেজে পড়বো। আপনি তো আর এদিকে আসেনও না। মা কতো নাম করে আপনার।' অপরেশের মনে হলো, এই মুহূর্তে আবার উর্বসী বলে উঠবে। 'আপনি এককালে আমাদের যা উপকারটা করেছিলেন। মা তো রোজই বলে তাই আপনার কথা। 'রোজই' 'উপকার' কথাগুলো অনাবশ্যক বাহুল্য মনে হয়েছে অপরেশের কাছে, সেই তবে থেকে যবে উর্বসী ওর ভারী ভারী কলেজের বইগুলোকে যেন অপরেশের চোখে ব্যঙ্গের নিশানার মত তুলে দিয়ে নিজেকে গোপন কি দামী করে তুলেছে, আর হয় তো বলতে চেয়েছে, 'তুমি কি আমার সেই জন। তোমার আর আমার চেয়ে কি বেশি বিদ্যে? তোমার বন্ধুগুলোই বা কি? কোনটা আকাট, কোনটা গুণ্ডা।' আমার সময়ে তবু ওর ওই কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, যেন ও কতো দূর থেকে কথা বলছে, দূরে থেকেও ঠিক সেই স্বরটাই কানে ছুঁইয়ে দেবে বলে, তেমনি আস্তে, ওর মুখটাকে হেলিয়ে দিয়েছে চোখের দু'টো পাতা কেঁপে কেঁপে উঠেছে বলবার ছলে। তবু সেই উর্বসীই যে প্রশ্নটা করেছে এরপর, তা যে কতো মারাত্মক কতো দুরূহ।

'আপনি কি এখনও সেই উইভিং-এর চাকরিই করছেন ? না, অন্য কিছু—'

'না, সেইখানেই আছি—', তারপরেই আমার একটু দরকার আছে এখন উবসী, চলি, কেমন ?'—বাঁচতে চেয়েছে অপরেশ যেন সামনে দেখা এক ভয়ঙ্কর আগুনের কিম্বা মহামারীর ছায়া থেকে— সাইকেলে ঘণ্টি মেরে উধাও হয়েছে অনেক, অনেক দূরে, উবসীর নাগালের অনেক বাইরে, ওর প্রশ্নকে এড়িয়ে অন্ধকার ছায়াতে গিয়ে নিঃশ্বাস নিয়েছে, কপালের ঘাম মুছে। কিম্বা কখনো ঐ স্বল্প আলোর রেস্টুরেন্টে—ওর পর্দার আড়ালে। এ ঘাম ক্লান্তির না ভয়ের কিম্বা লজ্জার, স্পষ্ট আজও হয় নি ওর কাছে। শুধুই মনে হয়েছে, হায় মফস্বল শহরটা এত ছোট। ভয়ঙ্কর রকমে ছোট, যেখানে একজন আরেকজনের চাকরির খবরও বলে দিতে পারে স্বচ্ছন্দে, আর তাই যদি দেয়, বেকার জীবনের সম্বল থাকে কি ? তবু, তবু আসার সময়ের উবসীর মুখ, ওর চোখ, ওর চেহারাই ভেসে ওঠে কেবল—কেবল অপরেশের চোখে, আর কারও নয়, অন্যকিছু নয়।

পেশাদার গুণ্ডারা গোলমাল করতেই চেয়েছিলো, করলোও। অপরেশরা জানতো না, টাউনের কোনও কোনও ছাত্রীর ওপরে ওদের কারো কারো নজর ছিলো আগে থেকে। এ খেয়ালটা এড়িয়ে গেছিলো অপরেশদের দলের মন থেকে। অপরেশ মা গো, বাবা গো, প্রথম একটা হতচকিত গলা শুনেই তৎপর হয়েছিলো। মিলন বা কৃশানুকে দেখতে পায় নি কাছাকাছি। হয়তো বা ডায়েস-এর দিকে গেছে, সুমন্তের দলের সঙ্গে অতিথি অভ্যাগতের দলকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে গেছে। কিন্তু অপরেশের মন থেকে কে যেন বলে উঠলো, সাবধান, এদিকে দ্যাখো, এই ছাত্রীদের দিকটায়। এ দিকের আলোগুলোর সবগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। গুণ্ডারাই যেন গোলমালটাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে চেঁচামেচি করে। আর তখনই অপরেশের মন তোলাপাড়া করেছে, উবসী, উবসী ঠিক আছে তো ? ও যে আসবে বলেছিলো, যদি এসে থাকে, বিপদে পড়ে যদি ? পাগলের মতো সেই গোলমালের মধ্যে ও খুঁজেছে উবসীকে। চেয়ার-টেবিল ছোড়াছুড়িতে, কখনো বা নিজেরই ব্যস্ততায় ওর কপাল কেটে গিয়েচে।

'অপরেশদা', অপরেশদা' আমি এদিকে—'

'উষা'—অপরেশ উষাকে ভীড় ঠেলে উদ্ধার করে এনেছে, বেরোনোর মুখে দরজার কাছে পুলিশ, পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। উবসী সাহস পেলেও অবাক হয়ে গেলো।—কোত্থেকে বা এতো পুলিশ এলো অপরেশদা' ?'

অপরেশ ততক্ষণে ওর মুখটাকে, কপালটাকে ঢেকে নিয়েছে। উবসী জানবে কি করে, অপরেশ তখন ওর আঘাতের স্থানের চেয়ে পুলিশের সামনে নিজের মুখটাই ঢাকা দিতে চেয়েছে বেশি করে।

'ওমা, ওকি নতুন শাড়ি ছিঁড়লে ?' অপরেশের বলার আগেই উবসী ওর শাড়ির পাড় দাঁত দিয়ে ফালা-ফালা করে কেটে নিলে। 'ইস্‌ দেখি' বলে অপরেশের চেপে-ধরা ক্ষতের মুখটা ওর শাড়ির ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে বেঁধে ফেললো। পুলিশ পথ ছেড়ে দিলো প্রশ্নটি না করে। একটি মেয়ে ওর আহত অপরেশদা'র সেবার ভার নিয়ে রিক্সায় তুলছে, পুলিশ কি-ই-বা করতে পারে ? সিনেমা হল নাগালের বাইরে চলে গেলে অপরেশ মুখ তুলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে উবসী ওর সমস্ত অনুভূতি ঢেলে দিয়েছে কথায়, 'অপরেশদা' কষ্ট হচ্ছে ?' বলতে বলতে অপরেশের কপালে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, ঘেঁবাঘেঁষি বসেছে আরও, 'অপরেশদা' এবারে কেমন লাগছে, একটু ভালো তো ?'

যেন ওর সব জোর হারিয়ে ফেলেছে, তাই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলেছে অপরেশ।

'এবার আমি নেমে যাই ?'

'বা-রে, নামতে দিচ্ছে কে ?' উবসীর গলায় এ জোর, এ যেন অন্য উবসীর। তাই, যখন পরের কথাটাও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলেছিলো অপরেশ মুখ তেমনি নীচু করে।

'উবসী, আজ আমার যে উপকারটা করলে—'

কিন্তু এ কি ! উবসী ডুকরে কেঁদে উঠলো অপরেশের বুকে।

'আমি জানি, জানি আমি, তুমি এমনটা কেন বলছ অপরেশদা'। যে কথা মা বলে আমি কোনদিন বলেছি নিজের থেকে, যে তুমি ফের তার শোধ দেবে ঐ কথা বলে ? তুমি চুপ করো অপরেশদা', আমি তোমায় ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না অপরেশদা', সে যে যাই বলুক আমায়। বলো, বলো তুমি আর বলবে না ও কথা' অপরেশের কোলে মাথা গুঁজে দিয়ে ওর চুল এলিয়ে দিয়েছিলো উবসী—'উবসী, উষা, উষা বলতে তোমার মুখে বাধে অপরেশদা', কেন ? কেন ? তুমি আমার কে, তা কি আমি জানি না অপরেশদা', যে দু' দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, একবার ছোটবেলায় জলে ডোবার হাত থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে আর আজ। আমি, আমি কি পাষাণ অপরেশদা', আমি সব ভুলে যাব ? বলো, বলো তুমি ?' টপটপ করে চোখের জলের ফোঁটায় ফোঁটায় অপরেশকে ভিজিয়ে দিয়েছে ওর উষা।

'উষা কাঁদছ ?' এই সঙ্গে অপরেশ রিক্সার সামনের পর্দাটা টেনে দিয়েছে। মফস্বল শহরে রাত ন'টা হয়তো বা এখন। পর্দার ওধারে আলো-মাখা ছায়া, এ পাশে ঘন নিঃসীম অন্ধকার, শান্ত শহরের বুকে কখনো-সখনো শব্দের একটা-আধটা ঢেউ, আর রিক্সাটা যেন দাঁড় ফেলতে ফেলতে তাই কাটিয়ে কাটিয়ে চলেছে। মনে হয়েছে অপরেশের। হ্যাঁ, আরও অন্ধকার নামুক। মফস্বল শহরটা ছোট, আরও ছোট, শান্ত আরও শান্ত হয়ে আসুক—সমস্ত জগতটাকে, ওর সেই চেনা-চেনা অন্ধকারটাকে পর্দার এপারে ছড়িয়ে দিক।

উষার ছেঁড়া শাড়ির বাকী টুকরোতে ঢেকে নিয়েছে আঁটসাঁট করে ওর শরীরটা, ওর সেই দূর-থেকে ভেসে-আসা গলাটার মতো হাল্কা করে নেবে বলে।

কিম্বা এই ঘুম-ঘুম পৃথিবীতে স্বপ্নটাকেই জড়িয়ে নেবে, ছড়িয়ে দেবে বলে।

আর রিক্সার চাকায় যে শব্দটা তখন থেকে একটানা বেজে চলেছে। ওটা রিক্সারই না, সেই এক নামের জপ।

উষা-উষা-উষা-উষা, যেন ওই সঙ্গে হেঁয়ালী করে তুলেছে অপরেশের সমস্ত পৃথিবীটাকে।

কি একটা কথা বলবে বলবে করে ফের তা হারিয়ে গেলো মনে মনেই, অপরেশ পৃথিবীর সমস্ত গন্ধ, সকল শব্দকেই যেন ছুঁয়ে ফেললো একমুহূর্তে। রিক্সার পর্দার এপারে। উবসী ওর কোলে মাথা রেখে তখন ঘুমুচ্ছে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গন্ধফলী—১ চম্পক কণিকা, কাঁটালে চাঁপা । বিশ্বকো° । ২ প্রিয়ঙ্গ ।

গন্ধবন্ধু—আম্রবৃক্ষ । শব্দরত্না° ।

গন্ধবহুল—গন্ধশালি ।

গন্ধবহুলা—গোরক্ষীবৃক্ষ । রাজনি° ।

গন্ধবিরজা—[সং সরলদ্রং, শ্রীবাসসার, গন্ধরস, তা° সরল দেবাদ্রু, তে° দেবদারুচেট্টু, ইং long lived pine] গন্ধবিরেজা, pinus longifolia. সচরাচর ধূপের জন্য ও প্রলেপের জন্য ব্যবহৃত হয়। সরল বৃক্ষ বি°। হিমালয় প্রদেশে জন্মে।

গন্ধবেনা—[সং গঙ্গতৃণ, ভূস্তৃণ ইং lemon grass] andropogon ধান্যাদিবর্গের তৃণ বশেষ shoe-nanthus. বেণাগাছের মত। পাতা হইতে সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত হয়।

গন্ধভদ্রা—গন্ধভাদলী ।

গন্ধভাদালী, গন্ধভাতুলী—[সং প্রসারিণী, গন্ধভদ্রা, গন্ধালি, উ° পসারুণি, ইং dog's bane] গন্ধভাদালিয়া, গাঁদাল, গাঁধাল, hedystis villosa, poederia foetida, আচ্ছুকাদিবর্গের লতাবি° পাতায়, ডাঁটায়, ফুলে সুগন্ধি। ফুল ভাদ্র-আশ্বিনে ফোটে।

গন্ধভাণ্ড—গাঁধি ভাঁট পর্যায়—নন্দিবৃক, তাম্রপাকী, ফলপাকী, গীতক, গন্ধমুণ্ড, ক্ষিপ্রপাকী । বিল্বক রত্নমালা ।

গন্ধমাংসী—জটামাংসী (?) ।

গন্ধমালতী—বৃহৎ লতানে গাছ—aganosma caryophyllata. মালতী দ্র° ।

গন্ধমুণ্ড—লতা বি°, গন্ধভাতুলিয়া । গন্ধভাণ্ড দ্র° ।

গন্ধমূল—কুলঞ্জন বৃক্ষ ।

গন্ধমূলক—শঠী । শব্দরত্না° ।

গন্ধমূলা—১ শল্লকী, ২ শঠী । রাজনি° ।

গন্ধমোদিনী—১ চম্পককলিকা, কাঁঠালে চাঁপা, ২ চম্পকপুষ্প কলিকা ।

গন্ধমোহিনী—চম্পক কলিকা । রাজনি° ।

গন্ধরস—[সং শল্লকী] শলাই। রসা, gendarussa vulgaris. শালাই গাছের রসকে গন্ধবিরজা বলে।

গন্ধরাজ—[সং মুদ্গর, ইং capejasmine] আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবি°, gardenia florida. চীন দেশ থেকে আনীত। ফুল বড়, সাদা ও সুগন্ধযুক্ত। গাছ প্রায় ৪ হাত উঁচু হয়।

গন্ধরুহা—কাঠমল্লিকা। পর্যায় মদয়ন্তী, মোদয়ন্তি, সরস্রবা । রাজনি° ।

গন্ধর্ববধূ—শঠী ।

গন্ধর্বহস্ত, গন্ধর্বহস্তক—এরণ্ড বৃক্ষ ।

গন্ধলতা—প্রিয়ঙ্গু । শব্দার্থচিন্তামণি ।

গন্ধবধূ—শঠী ।

গন্ধবন্ধু—আম্রবৃক্ষ ।

গন্ধবল্লরী—লতা বি° ।

গন্ধবহল—১ সিভার্জক বৃক্ষ, ২ শ্বেত তুলসী ।

গন্ধবহুল—গন্ধশালি ।

গন্ধবহুলা—গোরক্ষী । মালব দেশে পাওয়া যায় ।

গন্ধবাকুচী—লতা কস্তূরী ।

গন্ধবীজা—মেথী । রাজনি° ।।

গন্ধবৃক্ষক—সালবৃক্ষ । রাজনি° ।

গন্ধশঠী—শঠী ।

গন্ধশালী—ধান বিশেষ। পর্যায়—কল্মাষ, গন্ধালু, উত্তমোত্তম, সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতণ্ডুল, সুগন্ধশালি ।

গন্ধসার—১ চন্দনবৃক্ষ । অমর° ।, ২ মুদ্গরবৃক্ষ । রাজনি° ।

গন্ধসারণ—মুসরবৃক্ষ । রাজনি° ।

গন্ধা—১ চম্পক কণিকা । শব্দরত্না° । ২ শঠী । রাজনি° । ৩ শালপর্ণী । অমরটীকা ।

গন্ধাঢ্য—নারঙ্গকবৃক্ষ ।

গন্ধাঢ্যা—১ স্বর্ণযূথী, হলদে যুঁই ফুল, ২ তরুণীপুষ্প, ৩ গন্ধভাদলী, ৪ শতপত্রী, গোলাপ ।

গন্ধালা—জীয়ন্তী গাছ ।

গন্ধালী—গাঁধাল, গাঁধালী। পর্যায়—প্রসারণী, ভদ্রপর্ণী, কটম্ভরা, গন্ধাঢ্যা, সরণা, রাজবালা, ভদ্রবলা, সারণী ।

গন্ধালিগর্ভ—ছোট এলাচি ।। রাজনি° ।।

গন্ধাহ্বা— রক্ত তুলসী ।

গন্ধী—তৃণ কুঙ্কুম ।। রাজনি ।।

গন্ধিপর্ণ—সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিম ।

গন্ধোৎকটা—দমনক বৃক্ষ ।

গভীকা—গাম্ভার ।

গম—[সং গোধূম, মহাগোধূম, হি গেহুঁ, ম গহুঁ, ও° গহুঁ, ক° গোদী, তৈ গেন্দুলু, কা° গন্দুম্, অ° হিন্তে, পা° খানক্, ইং wheat] গম triticum vulgare, ভারতবর্ষের মধ্যে মুলতান, পাঞ্জাব,

সিন্ধু, রাজপুতানা, সম্বলপুর, জব্বলপুর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, প্রেসিডেন্সীতে সর্ব প্রকারের গম জন্মে। ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও চীন দেশেও প্রচুর জন্মে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক প্রকার সাদা গম জন্মে—নাম দাদখানি। পাঞ্জাবে নানা জাতীয় গম জন্মে তাহার মধ্যে দুই প্রকার গমের শুঁয়া আছে একের রুটি কাল ও অন্যের হলুদ রংয়ের হয়। অযোধ্যায় চার প্রকার গম জন্মে—(১) সফেদ, (২) মেরিলবা (শুঁয়া নাই), (৩) রসোদবা, (৪) লানিয়া। কাঠিয়াবাড়ে গমের ময়দা কিছু কালো হয়। বাংলা দেশে চার প্রকারের গম আছে—(১) দুধিয়া, (২) গামালী, (৩) গঙ্গাজুলী, (৪) খেড়ী।

গম্ভারিক—গাম্ভারী বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গম্ভারা—[স° শ্রীপর্ণী, গাম্ভারী, হি° খম্ভারি, ম° শিবণগম্ভারী, আ° গমারি, গুজ° শবণ্য, ক° সীবনী, তে° সাল্লাগুমুটিবেট্টু, কো° গামারি] গামীর, গম্ভার, যুগনিচক্র, গামার, গামারী gmelina arborea. বহু শাখা বিশিষ্ট সুউচ্চ বিশাল ছায়াতরু। বাঙলা দেশে খুব কম দেখা যায়। কাণ্ড দীর্ঘ, কাণ্ডের ছাল মোটা ও সাদা। ফুল বড় পীতবর্ণ, ফল বকুল ফলের মত বড়, আকৃতি লাউয়ের মত। স্বাদ অম্লমধুর। পাতা বড় পানের মত। পর্যায়—সর্বতোভদ্রা, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, ভদ্রপর্ণী, কাশ্মর্য, কাশ্মরী, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কটফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, সর্বতোভদ্রিকা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী, বিদারিণী, ক্ষীরিণী, মহাভদ্রা, মধুপর্ণী, স্বরুভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বেতা, রোহিণী, সৃষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মহাকুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা ॥ শব্দক°, শব্দরত্না° ॥]

গয়াশ্বত্থ—অশ্বত্থ বৃক্ষবি° ।

গরঘ্ন—কৃষ্ণার্জক ।

গরনাশিনী—পীতবর্ণ দেবদালী লতা ।

গরা—দেবদালীলতা ॥ রাজনি°

গরাগরী—দেবতাড় বৃক্ষ ।

গরাণ, গরান—[ই° mangrove] ছোট গাছ বি°, ceriops condolleana, c, roxburghiana. সিন্ধু প্রদেশে ও সুন্দরবনে জন্মে। প্রায়ই সমুদ্রের ধারে হয়। ইহার ডাল থেকে ঝুরি নামে।

গরাম্বক—শোভাঞ্জন বীজ ।

গরিকলাই—[হি° ভাটকলাই, ই° The soy bean] শিম্বাদিবর্গের কলাইবি°, glycine soja. জাপান ও চীন দেশ হইতে আনীত। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে ইহার আবাদ হয়। জাপানীদের ইহা একটি প্রধান খাদ্য। পাতা রোঁয়াযুক্ত, প্রত্যেক শুঁটিতে ৩।৪টি কলাই থাকে।

গরী—দেবতাড় বৃক্ষ ।

গরুড়—আরণ্যশাক, গুরুর polypodium quercifolium. ফুল হয় না। রাস্নাজাতীয়, সুন্দরবনে ও পূর্ববঙ্গে দেখা যায়। অন্য বৃক্ষে জন্মে। পাতা শক্ত ও পাতার শিরার ওপর রেণুস্থলী জন্মে।

গরুড়বেগা—সতাবি° ॥ বৃহৎস° ৫৪, ৮৭ ॥

গর্জন—উচ্চতরুবি° dipterocarpus turbinatus. চট্টগ্রামে হয়। ইহা হইতে তেল হয়। বর্ষাকালে ফুল ও ফল জন্মে।

গর্জাফল—বিকণ্টক বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গর্দভ—১ শ্বেতকুমুদ ॥ রত্নমালা ॥ ২ বিড়ঙ্গ ॥ রত্নমালা ॥

গর্দভশাকা—বামনহাটী ॥ জটাধর ॥

গর্দভশাখী—ভার্গী ॥ রাজনি° ॥

গর্দভা—শ্বেতকণ্টকারী ॥ ভাবপ্র° ॥

গর্দভাণ্ড—পাকুড় গাছ। ইহার পাতা, কাণ্ড ও ফল অশ্বত্থের ন্যায়। পর্যায়—কন্দরাল, কপীতন, সুপার্শ্বক, প্লক্ষশৃঙ্গী, প্লব, কমণ্ডলু, প্লক্ষেশ, কন্দরালক।

গর্দভাণ্ডক—পাকুড় গাছ ।

গর্দভাহ্বয়—কুমুদবি° ।

গর্দভী—১ অপরাজিতা, ২ শ্বেতকণ্টকারী, ৩ কটভী ॥ রাজনি° ॥

গর্ধ—গর্দভাণ্ডবৃক্ষ ॥ শব্দর° ॥

গর্ভকর—পুত্রজীববৃক্ষ ।

গর্ভঘাতিনী—লাঙ্গলিকাবৃক্ষ ॥ রত্নমালা° ॥

গর্ভদ—পুত্রজীব, জীয়াপুতা ॥ রাজনি° ॥

গর্ভদা—শ্বেতকণ্টকারী ।

গর্ভদাত্রী—ক্ষুপবি°। পর্যায়—পুত্রদা, প্রজাদা, অপত্যদা, সৃষ্টিপ্রদা, প্রাণিমাতা, তাপসদ্রুমসন্নিভা।

গর্ভনুদ—কলিকারী, ঈশলাঙ্গুলে ॥ ভাবপ্র° ॥

গর্ভপাতন—রীঠাকরঞ্জ ।

গর্ভপাতিনী—কালিকারীবৃক্ষ, ঈশলাঙ্গুলে রাজনি° ॥

গর্ভস্রাবিন—হেঁতাল গাছ ॥ রাজনি° ॥

গর্ভিণী—ক্ষীরই গাছ। শব্দচন্দ্রিকা ॥

গর্মুচ্ছদ, গর্মুটিকা—মেড়ুয়াধান ॥ রত্নমালা ॥

গর্মুটি—মেড়ুয়াধান ॥ চরক° ॥

গর্মুৎ—তৃণধান্য বি° ॥ অম° ॥

গর্বোটিকা—জরড়ীতৃণ ॥ রাজনি° ॥

গলা—লজ্জালুলতা ।

গবত্র—খড় ॥

গবাক্ষী—১ রাখালশশা। পর্যায়—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গজচির্ভিটা, মৃগের্বারু, পিটকোটি, বিশালা, মৃগাদনী ॥ রত্নমা° । ২ শেওড়া ॥ রাজনি° ॥ ৩ অপরাজিতা ।

গবাদন—ঘাস ।

গবাদনী—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ নীল অপরাজিতা। গবীধুকা, গবেড়ু, গবেড়ুকা, গবেধু গবেধুকা, গবেধু—গড়গড়ে ধান।

গবেশকা—গোরক্ষা চাকুলে ।

গাংবেণা—নদীতীরস্থ বেণাতৃণ বিশেষ ।

গাঁজ—[স° গঞ্জ, গঞ্জা, উ° চুঙ্গুড়িয়াদল, হি° গাজ, ই° chara] জলজ শাক বি°। ফুল হয় না। পুষ্করিণী ও স্থির জলে জন্মায়। ডাঁটা সরু সরু সবুজ রং-এর। পাতা নাই। [ক্রমশ।

হৃদয় পাতো

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

যদিও অফিস বাড়িগুলির ভিড় ভাঙতে আরম্ভ করেছিল। কিছু কিছু লোকজন ফাইলপত্র হাতে বেরিয়ে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়াচ্ছিল, ট্যাক্সি ধরছিল তবু পাঁচটা বাজতে বিলম্ব ছিল বলে শিবানীদের ট্যাক্সি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

ট্যাক্সিওলাকে বালিগঞ্জ যেতে বলে জুত করে বসে ফের ঘড়ি দেখল শিবানী।

ললিতা লক্ষ্য করল তা।

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে ঘাড় কপাল মুছল শিবানী। আজ ইন্দ্রনাথের আগে বাড়ি ফিরবে এই তার ইচ্ছে।···একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামলে বেশ হয়।

ললিতা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে, না তুমিও একটু নামবে?

কোলের ব্যাগের ওপর দৃষ্টি ছিল শিবানীর। হাতের রুমাল ব্যাগে ভরতে ভরতে বললো, কি বললে? বোঝা গেল সে কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল। ললিতা কিছু বলেছে, কিন্তু কি বলেছে বুঝতে পারে নি।

ললিতা বলল, জিজ্ঞাসা করছিলাম আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবে না তুমিও একটু নামবে?

জবাব দিতে যেটুকু সময় নিল শিবানী তাতেই অভিমানাহত কণ্ঠে ললিতা বললো, তোমাকে নিয়ে যাবো বলে এসেছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার কোথাও যাবার বিশেষ তাড়া রয়েছে।

কোথাও যাবার বিশেষ তাড়া—বলে থেমে হাসল শিবানী।

কোথাও যাচ্ছ তুমি?

না তো।

বাড়ি যাচ্ছ?

বাড়ি যাচ্ছি।

বাড়ি যাচ্ছ! তবে অত ঘন ঘন ঘড়ি দেখছ কেন? বলে এবার হাসল ললিতাও। বললো, ভয় নেই কোথায় যাচ্ছ জানতে চাইব' না, সঙ্গে যেতেও না—

ঘরে ফেরার জন্য ঘন ঘন ঘড়ি দেখা যায় না?

তা যায়—

তবে? আমার পক্ষে তেমন কারণ কিছু থাকতে পারে না।

ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করল ললিতা।

শিবানী বললো, তোমার নিশ্চয় ধারণা আমি এমন কোথাও যাচ্ছি যা তোমার পক্ষে জিজ্ঞাসা করা চলে না, আমার পক্ষেও বলা চলে না।

অপ্রস্তুত ভাবটাকে উল্টেপাল্টে ফেলে দেবার জন্যই যেন ঘাড় মাথা এদিক-ওদিক নাড়তে নাড়তে ললিতা হেসে বললো, নিশ্চয় ধারণা। অন্ধকার বাড়ি না হয় নাই হলো, হলো না হয় নিওন আলোর ঝলমলে বাড়ি—কে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা একা একা মরতে বসে থাকবে। তেমন ঘড়ির কাঁটা মেলানো তাড়া যদি তোমার না থাকে তবে বাপু একটিবার নামো। সুজাতা লক্ষ্মীছাড়ির কাছে নইলে মুখ আমার একেবারেই যাবে। কালকে তোমাকে আনতে পারি নি। আজ ভেবেছিলাম নিশ্চয় পারব। তা আজও যদি তোমায় নিয়ে যেতে না পারি তবে সুজাতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে, তুমি একবার বাড়ি, একবার অফিস দৌড়োদৌড়ি করে মরলে কি হবে—তোমাকে শিবানীদি ভালোই বাসেন না। এ কথা আমার পক্ষে কানে শোনাও যন্ত্রণাদায়ক।

হেসে উঠল শিবানী। বললো, চলো। তাড়া আমার একটু রয়েছে বটে—কিন্তু তোমাদের তো আমি বিশ্বাস করাতে পারবো না যে, সেরেস্তার কাজ সেরে ক্লান্ত স্বামী ঘরে প্রত্যাবর্তন করবেন। আমাকে এক্ষুণি গিয়ে ক্ষুধার্ত স্বামীর জন্য আহার্য প্রস্তুত করতে হবে। হাতমুখ প্রক্ষালনের গাড় গামছা জল ঠিক করে রাখতে হবে। তামাকু সেজে দু'ঠোঁট চোখা করে টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে বিশ্রামরত

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০
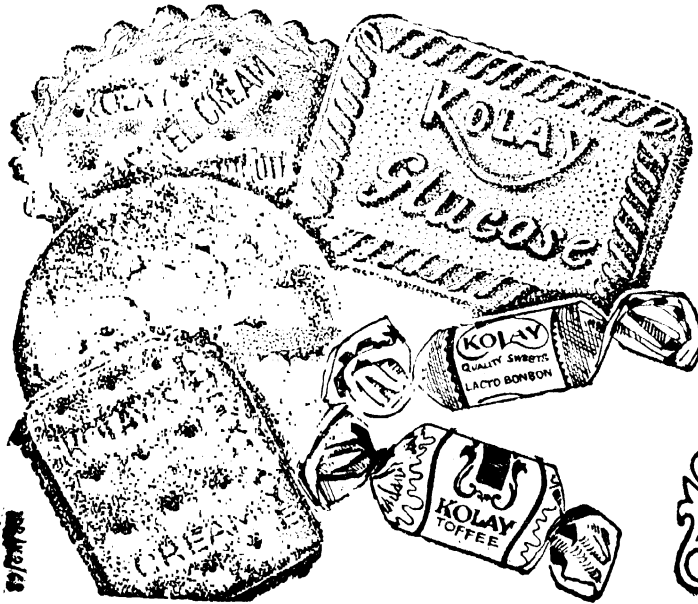
ব্রাহ্মণের হাতে হুঁকো তুলে দিয়ে পাখা হাতে ব্যজন করতে হবে! কাজের প্রয়োজন নেই। ভাবের প্রয়োজন? সে তো আরো অবিশ্বাস্য—

ললিতা শিবানীর দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা, তুমি সত্যি বাড়ি যাচ্ছিলে? কালকেও বললে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন তুমি বাড়ি ছিলে। তবে চলো, আমাকে তোমার পৌঁছে দিতে হবে না; নামাতেও হবে না। আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি বাড়ি। এই ড্রাইভার—

গাড়িকে জর্জকোর্ট রোডের দিকে ঘোরাতে বলতে যাচ্ছিল ললিতা। ধমক দিল শিবানী! ড্রাইভারকে যে পথে যাচ্ছিল সে পথে যেতে নির্দেশ দিয়ে ললিতার দিকে দু'চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললো, করুণা প্রকাশ হয়ে গেল না ললিতা?

করুণা প্রকাশ? কার প্রতি—তোমার? ছিঃ ছিঃ, এ ধৃষ্টতা আমার হবে না। সজোরে প্রতিবাদ করল ললিতা।

আমার প্রতি না হোক আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কটার প্রতি?

তা বলতে পারো; তবে তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বলে নয়, এই সম্পর্কটার প্রতিই আমার করুণা। এ সম্পর্কটা না জানে দিতে, না জানে নিতে। কিছুই মেলে না এ সম্পর্কটার কাছে শেষ পর্যন্ত এক ভাত-কাপড় ছাড়া—

শিবানী বললো, তা এই বাজারে নিরুদ্বেগে ভাত-কাপড় মেলা তাই বা কম কি!

কম! কে বলে কম? সম্পর্কটা যতই খাবি খাক বেঁচে যে থাকে তা তো শেষ পর্যন্ত ঐ পেটে ভাত-জলটুকু পড়ে বলেই।

শিবানীর হাসি দেখে মুখ আরো গম্ভীর করে ললিতা বললো, হাসির কথা একটুও বলছি নে শিবানীদি। আগের দিনের মেয়েরা আমাদের চাইতে অনেক বেশি এ্যাকটিবেল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য দিয়ে মাথা তো ঠাসা থাকত না। বাস্তব বুদ্ধি ঢোকবার সহজ রাস্তা সহজেই মিলে যেত। তাঁরা মান-অভিমান-রাগের পালায় স্বামীদের কাছে এক একখানা অলঙ্কার আদায় করে ছাড়তেন। সবাই ভাবে এটা তাঁদের অলঙ্কার-প্রীতি ছিল। কিন্তু তা একেবারেই নয়। ওঁরা বুঝতেন এটুকুও বাক্সে না তুললে পাওয়ার ঘর একেবারেই শূন্য থেকে যাবে। বুঝতেন সূক্ষ্মবুদ্ধি দিয়ে সূক্ষ্ম রাস্তায় ঘোরাফেরার চাইতে মোটা বুদ্ধিতে মোটা রাস্তায় চলা অনেক বেশি বাঁচার পথ। ঠাকুমা-দিদিমাদের পথটাই আমারও পছন্দ। এ মাসে সাত জোড়া শাড়ি কিনেছি। দু'সেট জড়োয়া গয়না আদায় করেছি। আর খাওয়ার? বাড়ির ডাল ভাত ঝোল খাওয়া নিয়ে নাক কোঁচকাই। বড় বড় রেঁস্তোরায় যাই। ক্র্যাব চপ, মুরগীর গ্রেভি, চিকেনফ্রাই, ফ্রাইড রাইস খেয়ে বাড়ি ফিরে ভরপেটে নাক ডেকে ঘুম লাগাই। কর্তা আজ ফোন করেছিলেন দুপুরে। বললেন, রাতে আসছেন। শুনেই দরাজ গলায় অর্ডার দিলাম, চারটা মুরগীর রোস্ট, দু' ডজন ক্র্যাবচপ আসবার সময় ওয়ালডফ থেকে নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। ও পক্ষেরও সহজ হলো, আমারও ভগ্নমন হবার শঙ্কা রইল না। কিন্তু যদি দক্ষিণ হাওয়া সঙ্গে করে আনবার অর্ডার দিতাম—তবেই হয়েছিল! পেটও ভরত না মনও না।

আরে—চমকে গেল যেন শিবানী। কিছুক্ষণ আগেই না ও আষাঢ়ের আকাশের কাছে কিছু ঝির ঝির বৃষ্টি চেয়েছিল রাতটা রমণীয় করে তোলার জন্য।

আরে থামো থামো। সামনে ড্রাইভারের আসনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ললিতা। কোথায়—চলে এসেছ তুমি এ্যাঁ। গাড়ি ঘোরাও। এ রাস্তাই নয়।

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ড্রাইভার বললো। আপনারা বলে দেবেন তবে তো আমি ঠিক রাস্তায় যাবো।

এই বলে দিচ্ছি—

কিছু ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে বাড়ির দরজায় গাড়ি থামল। ললিতা দরজা খুলে নেমে পড়ে শিবানীকে নামালো। ছোট একটুকরো সবুজ ঘাসের জমি বাড়িটার সামনে। জমিটুকু পার হয়েই বসবার ঘর। ওরা দু'জন ঢুকছে—দু'টি মেয়ে গীটার হাতে প্রবেশ করল। ললিতা বলল, সুজাতারা নাটক করছে। তার রিহার্সেল হয় আমাদের বাড়ি। তারই বাদকদল ওরা।

তাই নাকি। কি নাটক করছে ওরা?

লক্ষ্মীর পরীক্ষা করছে ওরা।

আচ্ছা! এ নাটকটা আমার এতো ভালো লাগে। চলো ওদের মহলা দেওয়া দেখে আসা যাক।

বসবার ঘরের পর্দা ঠেলে শিবানীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো ললিতা। বললো, বোস, আগে এখানে বসে একটু চা খেয়ে নি। তারপর ওপরে নিয়ে যাবো ওদের রিহার্সেল দেখতে। শিবানীকে বসিয়ে ললিতা ভেতরে চলে গেল শিবানীর আসবার সংবাদটা দিতে আর চায়ের ফরমাস করতে। ফিরে এসে বসে বললো, তুমি কোনোদিন নাটক করেছ শিবানীদি'?

করেছি।

কি নাটক?

বাঁশরী।

বাঁশরী? বলেই গরগর করে মুখস্থ বলে চললো ললিতা। 'শ্রীমতী বাঁশরী সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য—' আরে কান্ত! তোমার সঙ্গে আকৃতি-প্রকৃতিতে মিলিয়ে নাটক নির্বাচন করে তার নায়িকা করেছিল তোমায় কে গো? যে করেছিল সে নিশ্চয় তোমাকে ভালোবাসত।

ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠল শিবানী।

ললিতা মাথা নেড়ে বললো, যা বলেছি। তোমার ঐ হাসিই বলে দিচ্ছে আমি ঠিক বলেছি। কে গো সে? তুমি কি! যে তোমাকে চিনে ভালোবেসেছিল তাকে বরণ করলে না কেন?

ঈষৎ জলে চোখের কোণটা ভিজে উঠেছিল। পাশে রাখা ব্যাগটা টেনে কোলে তুলে নিয়ে রুমাল বের করে শিবানী চোখের কোণ মুছলো।

ললিতা বললো, এই হাসির চোখের জলের সঙ্গে কিছুটা কান্নার জলও মিশে যায় নি তো শিবানীদি?

আরো বারকয়েক চোখের কোণ দু'টো রগড়ে রগড়ে মুছলো শিবানী। তারপর সোফায় পিঠ রেখে কিছুটা আয়েস করে বসে বললো, বোধহয় গেল।

তবে তো তুমি ধনী ! তোমাকে করুণা করবে কে ।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোনদিন অভিনয় করো নি ললিতা ? আমার মনে হয় তোমার ভেতর অভিনয় ক্ষমতাটা বেশ রয়েছে !

কপালে টোকা মেরে ললিতা বললো, এই কপাল । রূপ কিছু ছিল, এই মাত্র তোমার মিস জেনির মুখে প্রশংসা শুনেও এলাম । তুমি বলছ, মনে হচ্ছে তোমার আমার ভেতর অভিনয় ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে খ্যাতি কি মিলবে । দাও না তুমি সুযোগ করে । একটু বিখ্যাত হই । তুমি ছবি প্রডিউস করো আমি হই নায়িকা । টাকা মারা যাবে না । আমি তোমাকে অভিনয়ের প্রশংসা পত্র দেখাতে পারি । কলেজে 'গান্ধারীর আবেদন' হয়েছিল । তাতে গান্ধারীর পার্ট করে হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিলাম । চাও তো প্রশংসা-পত্র দেখাতে পারি । কলেজ ম্যাগাজিনে দু' কলম লিখেছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদিকা । একটা ছবি প্রডিউস করো না শিবানীদি জীবনের একটা সাধও অন্তত মেটা —

শিবানী সোজা হয়ে বসে বললো, 'গান্ধারীর আবেদন' তোমার মনে আছে ললিতা ? শোনাতে পারো ?

পারি । বলো আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবে ? আগে পরীক্ষায় পাশ করো ।

আচ্ছা । কোন জায়গাটা শুনবে ?

এর কি আর জায়গা বাছাই করার উপায় আছে । যেখান থেকে শোনাবে তাই অপূর্ব অদ্ভুত লাগবে ।

তোমার দেরি হয়ে যাবে না তো ?

তুমি আরম্ভ করো না—শিবানী আবৃত্তি শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসল এক নজরে ঘড়ি অবশ্যি দেখে নিল । ভেবেছিল ইন্দ্রনাথের আগে যাবে । তা যখন হলো না : এখন একটু এদিক-ওদিক সময়ের জন্য কিছু আসে যায় না । শিবানীর ভালো লাগছিল । 'গান্ধারীর আবেদন' যদি কেউ ভালো আবৃত্তি করতে পারে তবে কি তা না শুনে পারা যায় ।

ললিতা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা একটু মুছে নিয়ে বললো, আচ্ছা এখান থেকে শোনাই ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দু'টো পার্টই এক সঙ্গে করে যাবো দু'রকম গলা করে ।

গান্ধারী । এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি—
হে কৌরব ? কুরুকুল পিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ,
নরনাথ । ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে—
কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন ।

ধৃতরাষ্ট্র । ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে—আমি পিতা—

গান্ধারী । মাতা আমি নহি ? গর্ভভার জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তাই সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেই মতো করি
বহুবর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে—লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ !

ধৃতরাষ্ট্র । কি রাখিব তারে ত্যাগ করি ?

গান্ধারী । ধর্ম তব ।

ধৃতরাষ্ট্র । কি দিবে তোমারে ধর্ম ?

গান্ধারী । দুঃখ নব নব ।
পুত্রমুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিবে কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?···
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইও না ; ন্যায়ধর্মে করো না বিমুখ—
ত্যাগ করো পাপী দুর্যোধনে ।

ধৃতরাষ্ট্র । প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী । ছিঁড়িতে পারি নে মোহ ডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর,
ব্যর্থব্যথা । পাপী পুত্র ত্যজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি—

শিবানী আবিষ্ট হয়ে শুনছিল । ললিতার কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন ওর বুকের রক্তে ঢেউ তুলছিল । এবার ললিতার স্বর সুর পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠে—লোমকূপের তলা দিয়ে যেন শিরশির করে রক্তস্রোত বয়ে চলল শিবানীর—

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও । নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি । যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-'পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন ।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে তারে সভয়ে অকাল কহে সবে ।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে ; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায় । তোর আর্ত-জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পথ-তলে ।
ছিন্নসিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্তশতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন । তার পরে যবে

গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁদিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা-রমণী হায়-রে অনাথা,
হায় হায় বীর-বধূ, হায় বীর মাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস লুটি অবনত-শিরে
মুদিয়া নয়ন। তারপরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি: নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্তি, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নিবৃত্তি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

ললিতা থামল। আঁচল দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে নিল। জিজ্ঞাসা করল, পাশ? আমি কিন্তু অনেক বাদ দিয়ে দিয়ে বলেছি। পুরোটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগত। মনেও নেই সব।

শিবানী কথা বলল না। ওর মনে হচ্ছিল ঘরের মধ্যে যেন তখনও এই কথাগুলি আবর্তিত হচ্ছিল।

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি 'পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখ দিন—

ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ললিতার মা বৌদিও। ললিতার আবৃত্তি শেষ হয়ে যাবার পর তাঁরাও ঘরে ঢুকে এসে বসতে পারছিলেন না। ঘরে যেন এতটুকু স্থান নেই প্রবেশ করবার। সুরে-শব্দে-ধ্বনিতে-অর্থে ঘরটা ঠাসা।

ললিতা ডাকলে তবে ওঁরা এসে বসলেন।

মা স্মিত মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। মঞ্জুলা অভিযোগ জানালো তার অত কষ্টের তৈরি স্যালাড নষ্ট হলো বলে। শিবানী মার কুশল প্রশ্নের উত্তর দিল। মঞ্জুলার অভিযোগের উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করল, না আসতে পারার জন্য। একথা সে কথায় একটুক্ষণ বসে মা বৌদি উঠে গেলেন চা খাবার নিয়ে আসবার জন্য; ওঁরা চলে গেলে ললিতা বললো, তোমার তাড়া ছিল। জোর করে টেনে এনে দেরি করে দিলাম অনেক। যদিও দেরি করে দেওয়ার দোষটা আমার নয়। তুমি কবিতা শুনতে না চাইলে এত দেরি হতো না। আমি বলি কি, চা খাবার পর আমরা চলো পালাই। আজ আর সুজাতাদের রিহার্সেল শুনতে যাবার দরকার নেই। তবে আরো দেরি হয়ে যাবে। রিহার্সেল তো রোজই হচ্ছে। আর একদিন বেশ সময় হাতে নিয়ে গিয়ে বসব ওদের মাঝে—কি বল?

শিবানী আপত্তি জানিয়ে বললো, বলো কি আমাদের নায়িকাকে না দেখেই যাবো কি।

নায়িকা! হঠাৎ যেন শিবানীর মুখের নায়িকা সম্ভাষণটা ভীষণভাবে আঘাত করলো ললিতার কানে। সে বুঝতে পারলো সুজাতাকে শিবানী দেখেছে বলেই না জেনেও ধরে নিয়েছে সে-ই নায়িকা হবে। কিন্তু কালকে খাবার টেবিলে সুজাতার যৌবন সমাগত ইতালিয়ান রূপটার দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ যেমন ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যাওয়ায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল; আজও শিবানী সুজাতাকে নায়িকা বলা মাত্র ঠিক কালকের মতো ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ে গেল বলে আবারও স্তম্ভিত হলো সে। মনের এই অসংগত ক্রিয়াটার উৎপত্তিস্থল কোথায় দিশে করে উঠতে পারলো না ললিতা। হয়ত ওর রূপটার প্রতি ইন্দ্রনাথের যে লোভটা আছে তারই প্রতিফলনে সুজাতার দিকে তাকিয়ে ওর মনে এই কাণ্ডটা ঘটছে। সুজাতা ওর বোন—ওরই চেহারার প্রতিচ্ছায়া—

তাই হবে।

হ্যাঁ তাই। শান্তিবোধ করতে লাগল ললিতা।

মনের এই সংকেতটা দৈবঘটিত কিছু ইশারা কি না—ভীত করে তুলেছিল ওকে। মনস্তত্ত্বের সূত্র হাতে পেয়ে স্বস্তিবোধ করলো। বললো, তুমি শিবানীদি' লক্ষ্মীর পরীক্ষার কাহিনী ভুলে গেছ। সুজাতা রাণী কল্যাণী সেজেছে। কিন্তু, রাণী এ নাটকের নায়িকা নয়। নায়িকা ক্ষীরোঝি।

নায়িকা রাণীকল্যাণীই। ক্ষীরোঝি মুখ্য চরিত্র। কিন্তু আমি সেদিক থেকে বলি নি। আজকে সুজাতার জন্যই আসা তাই ওকে নায়িকা বলেছি।

ও তা চলো। তোমার যদি দেরি সয় আমি তো তোমায় যতক্ষণ পাবো ততক্ষণই খুশি।

কিন্তু চা খাওয়া হয়ে গেলে শিবানী নিজেই মতটা পাল্টে ফেললো। বললো তোমার কথাই ঠিক। আজ থাক। ওদের জমাট রিহার্সেল নষ্ট করে দেবো গিয়ে কিন্তু বসব না থাকব না। তার চাইতে আর একদিন এসে বেশ জাঁকিয়ে বসা যাবে ওদের মধ্যে।

শিবানী ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে শুনতে পেলো দোতলার ঘরে জোর মহড়া চলছে। শোনা যাচ্ছে রাণীকল্যাণীর ডাক, ক্ষীরো, ক্ষীরো, ক্ষীরো।

আর ক্ষীরোর তীক্ষ্ণকণ্ঠের উত্তর—কেন ডাকাডাকি, নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব না কি?

যদিও সময়টা বেশ কেটেছে। অন্য যে কোনো দিন হলে সন্ধ্যা রাতটা ললিতাদের বাড়িতেই কাটিয়ে দিত শিবানী, কিন্তু আজ বিলম্ব করবার মাত্রও ইচ্ছে ছিল না। দুরন্ত বাসনা ছিল ইন্দ্রনাথের আগে বাড়ি ফিরবে। মনটা গাঁটছড়া বাঁধা ছিল ওর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। কিন্তু হলো না। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ইন্দ্রনাথ এসে গেছে। তা এসে গিয়ে থাকলেও খুব বেশিক্ষণ হবে না যে এসেছে। এই তো সবে সাড়ে ছ'টা। ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুতপায়ে লন বাগান অতিক্রম করে টপ টপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে এলো শিবানী। আশার সঙ্গে একটা নিরাশা অর্থাৎ সন্দেহের কাঁটাও ছিল শিবানীর মনে। কে জানে হয়ত দেখবে ইন্দ্রনাথ আসে নি এবং শেষ পর্যন্ত আসবেও না। কিন্তু বারান্দায় পা দিয়েই দেখতে পেলো ইন্দ্রনাথ নিয়ন উদ্ভাসিত বারান্দায় পায়চারি করছে। তার পরিধানে কালকের সেই দুধগরদের ঢিলে পাজামা আর পাঞ্জাবী। পায় ভেলভেটের চটি। হাতে পাইপ। সমস্ত বারান্দার বাতাস ইন্দ্রনাথের শরীরের স্প্রে করা আতরের মৃদু সৌরভে আমোদিত। ওকে দেখেই স্মিত মুখে এগিয়ে এসে ওর হাত বাড়িয়ে দিলো ইন্দ্রনাথ—

শিবানীর মনে হলো বিশ্বে এটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠতম দেওয়া—হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

ক্রমশ।

দিলওয়ারার শীর্ষে

—বিশ্বনাথ বিশ্বাস

টা-টা

—সন্দীপ সেন

জীবিকা

—দিলীপ বসাক

নিত্ কনে
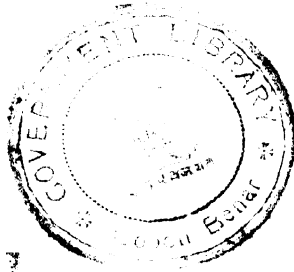
—দেবু দাশ

চন্দ্রমল্লিকা

—শ্রীমতী অদিতি রায়

পদ্মা প্রমত্তা নদী— পীযূষ দাশগুপ্ত

পুতুল খেলা —এস কে ঘোষ

প্যাগোডা —নীহাররঞ্জন ঘোষ

রাণীর স্মৃতি —বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

জাতির প্রতীক

মৎস্তকুমারী

যীশুখ্রীষ্ট

—শিল্পী শ্রীবাসব ঠাকুর নির্মিত

শান্তির দুত

রাজা সলোমনের উপদেশ

মাধব পাল

খৃষ্টপূর্ব ৯৭৪—৯৩৭ অব্দে ইস্রাইলে সলোমন নামে ইহুদিদের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। কথিত আছে তৎকালে তাঁর মত প্রভূত ধনশালী ও জ্ঞানীব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ ছিলেন না। রাজার ধনরত্ন কোনও এক পাহাড়ের একটি গোপন গুহায় সঞ্চিত থাকতো। কেউ তার সন্ধান ও পরিমাণ জানতো না। তাই 'রাজা সলোমনের ধনাগার' সম্বন্ধে আজও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

রাজা সলোমনের অগাধ জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির অলৌকিক প্রতিভা ছিল। প্রত্যহ দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক রাজদরবারে উপস্থিত হতো—নিজেদের কলহের বিচারপ্রার্থী হয়ে অথবা বহু জটিল সমস্যার মীমাংসার আশায়। তাঁর উপদেশে সকলেই ঈপ্সিত ফল লাভ করতো।

একদিন লিয়াজো নগরের মেলিশো নামক এক ধনী যুবক চললো সলোমনের রাজসভায় এক সমস্যা সমাধানের আশায়। মেলিশো—লিয়াজো নগরের অনেককেই অর্থ সাহায্য করতো এবং এজন্য তার মনে বেশ একটা গর্ব বোধ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কাছে উপকৃত হয়েও কেউ তাকে দেখতে পারতো না। লোকের এই অকৃতজ্ঞতার কারণ জানতেই মেলিশো রাজসভায় চললো।

ঐদিন এণ্টিওক সহরের জোসেফ নামক এক যুবকও রাজসভায় এসেছিল। সে এসেছিল তার এক ভীষণ পারিবারিক অশান্তি দূর করবার জন্য উপদেশ চাইতে।

জোসেফ ছিল বেশ স্বচ্ছল গৃহস্থ। সর্বদাই সে তার সুন্দরী স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিল। তবু তার স্ত্রী তাকে সব সময় তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করতো। জোসেফের যে কোনও অনুরোধই উপেক্ষা করা তার স্বভাব ছিল। ফলে সংসারে নানারকম অশান্তির সৃষ্টি হতে লাগলো। এই অশান্তি দূর করার কি উপায় —তাই জানতেই জোসেফ রাজা সলোমনের রাজসভায় এসেছিল।

রাজসভায় নিয়ম ছিল দর্শনার্থীদের একে একে রাজা সলোমনের সামনে গিয়ে তার সমস্যাটি বলতো আর রাজা ছোট্ট একটি কথা উচ্চারণ করে তাকে বিদায় দিতেন। ঐ কথার মধ্যেই থাকতো তাঁর উপদেশ বা সমস্যার সমাধান।

মেলিশো রাজার সামনে এসে তার মনের কথা খুলে বলতেই তিনি শুধু বলে উঠলেন—'ভালবাসা'।

তারপর জোসেফ যখন তার সমস্যাটি জানালো তখন বলে উঠলেন—'গীজ নদীর সেতুর দিকে যাও।'

দু'জনেই অবাক হয়ে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল। তাদের সমস্যার সমাধান কোথায়! রাজা সলোমন তো কোনও উপায়েরই নির্দেশ দিলেন না। আর তো দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার কোনও নিয়ম নেই।

উভয়ে পরস্পর দুঃখের কথা আলোচনা করতে করতে বাড়ির দিকে ফিরে চললো। পরের দিন তারা এক নদীর ধারে উপস্থিত হলো। নদীর ওপর কাঠের একটি সরু পোল ছিল। একজন লোক একদল খচ্চর নিয়ে পোলের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। খচ্চরগুলির মধ্যে একটি কিছুতেই পোলের উপর উঠতে নারাজ। লোকটি যতই তাকে

পোলের ওপর নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করে সে ততই ঘুরে দাঁড়ায়। বেগতিক দেখে লোকটি একটি লাঠি দিয়ে খচ্চরটিকে এলোপাথারি পিটুতে লাগলো।

খচ্চরটিকে নির্দয়ভাবে মারতে দেখে জোসেফ ও মেলিশো লোকটিকে বাধা দিল। তাতে লোকটি রেগে গিয়ে তাদের এই কথাই বোঝালো যে তার খচ্চরকে কি ভাবে বাগে আনতে হয় সে তা জানে। আর সত্যি, পিটুনির চোটে খচ্চরটি শেষে সুড়সুড় করে পোলটি পেরিয়ে নদীর ওপার চলে গেল।

দু'জনেই লোকটির কাণ্ডকারখানা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। শেষে লোকটির কথায় যখন জানতে পারলো যে, এই নদীটির নাম 'গীজ' নদী, তখন জোসেফ যেন তার প্রতি রাজা সলোমনের উপদেশের একটা অর্থ খুঁজে পেলো।

কয়েকদিন পর দু'জন এণ্টিওক সহরে জোসেফের বাড়িতে এসে পৌঁছালো। জোসেফ মেলিশোকে দু'একদিন থেকে যেতে অনুরোধ করলো। মেলিশো রাজি হলো, কিন্তু জোসেফের স্ত্রী এতে ভীষণ বিরক্ত হ'ল। কিছুতেই সে ঠিকমত রান্না করা বা সুখাদ্য পরিবেশন করতে রাজি হলো না। সংসারে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করলো।

জোসেফ নানাভাবে বুঝিয়েও যখন স্ত্রীকে শান্ত করতে পারলো না, তখন তার গীজ নদীর সেতুর ওপরের খচ্চরটির কথা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রাজা সলোমনের উপদেশের কথাও তার মনে হ'লো।

সে তখন একটি লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাথারি মারতে শুরু করলো। তার স্ত্রী এতে প্রথমটা খুবই অশান্ত হয়ে বাড়াবাড়ি করতে লাগলো। কিন্তু জোসেফের লাঠি যখন তাকে দুর্বল করে ফেললো, তখন সে শান্ত হয়ে সুগৃহিণীর ন্যায় গৃহকাজে মন দিল।

জোসেফ ও মেলিশো দু'জনেই বুঝতে পারলো যে রাজা সলোমনের উপদেশে জোসেফের সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে। দু'তিনদিন পর মেলিশো সেখান থেকে বিদায় নিয়ে লিয়াজোতে নিজের বাড়ি গিয়ে পৌঁছালো।

'ভালবাসা'—'ভালবাসা'—রাজা সলোমনের সেই কথাটি তার মনে কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। কি অর্থ হতে পারে এই কথার? তবে কি সকলকে ভালবাসতে উপদেশ দিয়েছেন রাজা সলোমন?

সে তখন নগরের প্রত্যেকের সাথে খুব প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে লাগলো। আগে অনেকের উপকার করলেও সে সকলের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করতো। এখন সকলেই মেলিশোর বিনীত ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তার একান্ত অনুগত হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

মেলিশোও সকলের ভালবাসা পেয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করতে লাগলো। এতদিনে সে বুঝতে পারলো যে ভালবাসার দ্বারাই লোকের ভালবাসা পাওয়া যায়।*

---

* ইতালীয় দেকামেরুনের গল্প অবলম্বনে।

বাদলা দিনে

অঞ্জনা মুখোপাধ্যায়

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ আজকে দিনে বৃষ্টি পড়ে ঝরে,
আকাশটা আজ মেঘের ঢাকা হাওয়ায় পাতা নড়ে।
গুম্ গুম্ গুম্ মেঘের আওয়াজ হচ্ছে থেকে থেকে,
সূর্যিমামা মেঘের তলায় গেছেন পুরো ঢেকে।
রাস্তা ঘাট আজ কাদায় ভরা শকট চলে ধীরে,
মাঝে মাঝে বিজলী হানে ঝিল্লী ডাকে জোরে।
যদু, মধু, শ্যামের আজি মজার নাহি শেষ,
পাঠশালা আজ বসবে নাকো জমবে খেলা বেশ।
কাগজেরই নৌকা গড়ে ভাসিয়ে দেবে জলে,
পুকুর মাঝে সাঁতার কেটে ভাসবে জলে তলে।
দুপুর হলেই পালিয়ে যাবে আম কুড়োতে মাঠে,
ফিরবে তখন থাকবে না কেউ সাঁঝের পুকুর ঘাটে।
সন্ধ্যাবেলায় ওরা সবাই রবে দাদুকে ঘিরে,
বলবে, 'কখন রাজার কুমার আসবে ঘোড়ায় চড়ে'?
বলবে দাদু, শুনবে ওরা সারাটি রাত ধরে,
কোন দেশে কোন রাজার কুমার পক্ষীরাজে ওড়ে।
হঠাৎ কখন চাঁদামামা আসবে নীচে নেমে,
দেখবে সবাই অনেক রাতে বৃষ্টি গেছে থেমে।

সাঁওতাল কাহিনী

শ্রীস্বরূপ সিংহ

কোঁকড়ানো চুলে মাথাটি ভরা, সুন্দর সুগঠিত দেহ, পিঠে তীর-ধনুক দু' কানে কুণ্ডল, এ ধরণের লোক প্রায়ই তোমরা দেখে থাকো। কালো কুচকুচে চেহারা এই সব মানুষই সাঁওতাল। বহু অতীতে আমাদের দেশে অনার্য জাতির বাস ছিল। তারা সকলেই বর্বর ও অসভ্য ছিল। শোনা যায়, সাঁওতালরা এদেরই উত্তর পুরুষ। অর্থাৎ এদের বংশ থেকে সাঁওতালদের উৎপত্তি? তোমরা সাঁওতাল পরগনার নাম জান নিশ্চয়। ঐ জায়গায় বহু সংখ্যক সাঁওতালের বাস। এই স্থান ছাড়াও আমাদের দেশে মানভূম, বীরভূম, সিংভূম প্রভৃতি জেলাসমূহে সাঁওতাল বেশই দেখা যায়।

শাল মহুয়ায় ঘেরা জঙ্গল। পাহাড়ে পর্বতে সাঁওতালরা নির্ভয়ে বসবাস করে। সাঁওতালেরা নির্ভীক ও পরিশ্রমী। তারা সকলেই একতাবদ্ধ হয়ে বাস করে। ওরা শিকারী, জঙ্গলে জঙ্গলে প্রায় সব সময়েই শিকারে মগ্ন থাকে। শুধু শিকার নয় এরা চাষ করে, কুলী মজুরের কাজও করে। অনেক সাঁওতালকেই শ্রমিকের কাজ করতে দেখা যায়। কয়লা কুঠির দেশগুলোতে সাঁওতালরাই বেশির ভাগ দৈহিকশ্রমের কাজ করে। নির্ভয়ে তারা মাটির নীচে কয়লা কাটে।

অতীত যুগের অসভ্য জাতির গুণাগুণ সাঁওতালদের চরিত্রে বেশই দেখা যায়। একটু লোভ বা মোহের আকর্ষণেই ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। একদিকে ওরা শিশুর মত সরল, অপরদিকে বাঘের মতই হিংস্র। প্রতিশোধ স্পৃহা ওদের খুবই প্রবল। প্রতিহিংসার প্রয়োজনে ওরা অবহেলে জীবন দিতেও পারে আবার জীবন নিতেও পারে।

সাঁওতালদের সমাজ ব্যবস্থা খুবই ভাল। তাদের পুরোভাগে একজন মোড়ল বা মাতব্বর থাকে। সেই মোড়লই একমাত্র কর্তা। তার আদেশ প্রত্যেক সাঁওতাল পালন করতে বাধ্য থাকে। মোড়লের বিচার সকলেই মাথা পেতে গ্রহণ করে। সেই আদেশ অমান্যের অপরাধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সেজন্য সাঁওতাল সমাজে প্রত্যেকেই মোড়লের আদেশ পালন করাকে কর্তব্য বলে মেনে থাকে।

সাঁওতালদের বিবাহ উৎসব, সে একটা মজার ব্যাপার। বরপক্ষের লোকেরা প্রথমে এসে ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করতে লাগল। ঢাল, তলোয়ার হাতে সবাই তৈরি। কন্যাপক্ষের লোকেরাও পেছপা নয়। তারাও প্রস্তুত। দু'দলে ভীষণ যুদ্ধ সুরু হল। বরপক্ষ বিপক্ষ দলকে পরাজিত করে কন্যাকে গ্রহণ করল। কন্যাপক্ষের লোকজনেরা কিছু ক্ষতিপূরণ পেল। তারপরেই সুরু হয় বিজয়ীপক্ষের আনন্দোৎসব।

কার্তিক অগ্রহায়ণ থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত সাঁওতালরা কতকগুলি উৎসব পালন করে। এই সব উৎসবের মধ্যে সোহরায় পরব খুবই উল্লেখযোগ্য। আষাঢ় মাসে তাদের বীজ বোনার উৎসব হয়। বীজ বোনা শেষ করে শ্রাবণ মাসে পূজো করে। সবুজ রঙের মুর্গী দিতে হয়। এর অর্থ কি জান? সবুজ ধানে মাঠ ভরে যাওয়ার প্রতীক এটা। পূজোর সময় তারা মন্ত্রোচ্চারণ করে। 'এই যে আমরা বীজ বোনার নামে দিচ্ছি, যেন আমরা এক জায়গায় ধান বুনলে দশ জায়গায় ধান পাই; অঝোর ধারায় যেন বৃষ্টি হয়, গ্রামের যত দুঃখ-দারিদ্র্য, অসুখ-বিসুখ আছে সব যেন ঐ জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' ধান কাটার সময় জান থাড় পূজো হয়। গ্রামের লোক শুওর কিংবা ভেড়া বলি দিয়ে থাকে। তারা একসঙ্গে প্রার্থনা করে, 'হে ঠাকুর ধান-চালের শোধ যেন বাড়ে; খামারগুলো যেন ভরে যায়; ইঁদুর ও অন্য সব পোকা যারা ধান নষ্ট করবে, তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে ঠাকুর।' প্রতিটি উৎসবের সময় সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ আনন্দে মেতে ওঠে। নাচ গান এদের উৎসবের প্রধান একটি অঙ্গ। মাদলের তালে তালে এদের নৃত্যগীতাদির ধ্বনি দূর পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়।'

ছোট পাখী

কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

ওরে পাখী বনের পাখী
দল বেঁধে কর ডাকাডাকি,
তোদের ডাকে উঠবে জেগে
গাছের যত ফুল,
কিচিমিচি ডাক্ রে তোরা
ছোট পাখীর দল।
ছোট ছোট পাখা মেলে,
এগাছ ওগাছ বেড়াস খেলে,
ভোরের বেলা জাগিস তোরা
গাছের শাখার 'পরে,
চারিটি দিক মাতিয়ে তুলিস
কিচির মিচির স্বরে।
উড়িস তোরা নীলাকাশে,
মেঘের সাথে ভেসে ভেসে,
সারাটি দিন এমনি করে
বেড়াস তোরা খেলে,
সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরিস
ছোট পাখা মেলে।

একে প্রাকৃতিক আঁশ না বলে বলা হয় যে মানুষের সৃষ্ট আঁশ। এ রকম আঁশ বা সিনথেটিক থাইবার অনেক কিছু থেকে তৈরি হয়; যেমন পেট্রোলিয়াম থেকে তৈ[illegible] হচ্ছে এই বহুখ্যাত 'টেরিলিন'। ১৯৪১ সনে মিঃ জে আর হুইনফিল্ড, [illegible] টি. ডিকসন লণ্ডনে প্রথম টেরিলিন তৈরি করেন এবং প্রথম সূতো [illegible]াং টেরিলিন তৈরি হয় ১৯৪৪ সনে। এখন কিন্তু বহু দেশে বিভিন্ন না[illegible] এ জিনিস তৈরি হচ্ছে। এর নাম এক এক দেশে এক এক রকম। [illegible] আমেরিকাতে একে বলে 'ডেক্রন' এও তোমরা জানো। একে [illegible] টারগল, ইটালীতে টেরিলিন, জাপানে টেরাটন ইত্যাদি। আমা[illegible] দেশে টেরিলিন প্রথমে আসে ১৯৫৫ সনে। টেরিলিন সূতো দিয়ে কি কি হয় জানো? আমাদের সর্বপ্রকার জামা-কাপড় ছাড়াও কলকারখানায়ও এর তৈরি রকমারী জিনিস ব্যবহৃত হচ্ছে। টেরিলিনের বহু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। সাধারণ কাপড়-চোপড়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি টেকসই। আরো মজার গুণ আছে। এর পোশাক ধোবাবাড়ি না দিলেও চলে। বাড়িতে সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকুতে দিলে আধঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে যায়, আর ভাঁজও ভাঙ্গে না, অর্থাৎ ইস্ত্রি না করলেও চলে। ভারি মজার নয় কি? তোমরা যারা টেরিলিনের জামাকাপড় বেশি দামের জন্য কিনতে পারছো না, তারা কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকো। শীঘ্রই আমাদের দেশে তৈরি হবে এবং এর দাম সাধ্যের মধ্যে আসবে। একটা নূতন কিছু তৈরি করতে সব কিছুতেই তো ব্যয়টা একটু বেশি পড়ে। শেষে সবই সহজ হয়ে যায়। দুর্লভ সুলভ হয়।

তুলো ছাড়াই সুতো

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

যে যুগে মহিলাও শূন্যে উড়ে চাঁদের দেশে বসত করতে চায় সে যুগে তুলো ছাড়া সূতো আর কাপড় হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তোমরা সবাই জানো তুলো থেকে সূতো, তারপর কাপড়-চোপড়, কিন্তু এখন আর সে কথা বলা চলে না। তুলো ছাড়াও সূতো হয়। বস্ত্রাদি হয়। সে সম্বন্ধেই কিছু বলবো তোমাদের। তোমরা জানো টেরিলিনে বাজার ছেয়ে গেছে। তোমরা—যাদের সাধ্য আছে, অন্য সময় না হোক পূজোর সময় একটি টেরিলিনের জামার জন্য বায়না ধরে থাকো—নয় কি? এই টেরিলিন তুলো ছাড়াই তৈরি হয়। সে কথাই বলছি। শুনে অবাকই হবে খনিজ তেল পেট্রোলিয়াম থেকে টেরিলিন প্রস্তুত হয়। এই পেট্রোলিয়াম থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 'ইথিলিন লাইকল' আর 'টেরাপথেলিক এসিড' নামে দু' রকম পদার্থ বার করে নেওয়া হয়। এ দু'টো জিনিস আবার মিশিয়ে ফেলা হয়। যেমন ধরো আলুর ভেতরকার মত একটি শক্ত জিনিসে পরিণত করা হয়। আবার একে গালানো হয়। এরও বহু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে, ভিন্ন ধরণের যন্ত্র আছে। এ গালানো জিনিস ঝাঁজরার ভেতর দিয়ে জলের মতো যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে যে শক্ত হয়ে সূতো রূপে পাকিয়ে আসে। এই হল এর সূতো রূপের মোটামুটি কথা। বড় হলে এ সম্বন্ধে আরো জানতে পারবে।

শালিখ শালিখ শালিখটি

শৈলেনকুমার দত্ত

শালিখ শালিখ শালিখটি
কোথায় তোমার মালিকটি—
এই দুপুরে করছো কি
পোকা-মাকড় ধরছো কি?
কিংবা বুঝি খুকুর কাছে জানাও তোমার নালিশ কি?

ময়না ময়না ময়না রে
গলায় কিসের গয়না রে—
মিষ্টি সুরে গাস কি গান
একটি মিঠে খাস কি পান?
তাই কি খুকু আমার সঙ্গে একটি কথাও কয় না রে?

চড়াই চড়াই চড়াই রে
কিসের যে তোর বড়াই র—
ওই তো ছোট ঠোঁট দু'টো
খুঁজিস তো তুই খড়কুটো
তোর মত কি পুষি এলেই আমি অমন ডরাই রে?

কুরুক্ষেত্রের কথা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সাধনা কর

অমৃত পান করে মৃত হয় সঞ্জীব, ক্লীব হয় বলশালী, জিজ্ঞাসু হয় পরিতৃপ্ত। গীতা নির্মল জলাশয়—শ্রদ্ধাভরে স্নান করলে সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট, মোহ-পাপ বিনষ্ট হয়, পরমা শান্তিলাভ হয়। তবে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পক্ষে গীতা-পাঠ হাতীর স্নানের মতো—হাতী স্নান করে উঠেই আবার শুঁড় দিয়ে মাথে ধুলোবালি, ক্ষণকালও থাকে না তার স্নানের শুচিতা। গীতার উপর যার নেই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি,—গীতা—শোনার আগ্রহ যার ক্ষীণ, তার পক্ষে গীতা শোনায় কোনো ফল হয় না। সে যেমন আছে, তেমনি থাকে। আর ভগবদ্-ভক্তের কাছে গীতা অপার আনন্দ-সমুদ্র; গীতা-রহস্য শুনে-শুনে তাঁর সাধ মেটে না, তিলে তিলে ওঠে নূতন হয়ে এবং তাঁর কাছে গীতা কৃষ্ণ, কৃষ্ণই গীতা।

যুদ্ধ শুরু হয়-হয়, হঠাৎ যুধিষ্ঠির সব অস্ত্র ত্যাগ করলেন, রথ থেকে নেমে পড়লেন, দ্রুতপায়ে চললেন কৌরব পক্ষের দিকে। পাণ্ডবগণ ভীতচকিত হলেন, ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন বাধা দিতে—যুধিষ্ঠির কি যুদ্ধ করতে চান না।

যুধিষ্ঠির নিরুত্তর, নির্বিকার। সর্ববেত্তা কৃষ্ণ হাসলেন। বললেন—বাধা দিয়ো না। যুদ্ধ বন্ধ করতে নয়, সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যেও নয়, যুধিষ্ঠির চলেছেন কর্তব্য করতে।

ভয়হীন হয়ে অবাধগতিতে যুধিষ্ঠির গিয়ে ভীষ্মের কাছে চরণবন্দনা করে বিনীতকণ্ঠে বললেন—পিতামহ, অনুমতি করুন আমরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ভীষ্ম অত্যন্ত প্রীত হলেন। দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন—বৎস, তুমি আসবে, অনুমতি নেবে, এইটেই আমি আশা করেছিলাম। তুমি না এলে ক্ষুণ্ণ হতাম, দিতাম অভিশাপ। এখন সমস্ত অন্তর ভ'রে তোমাকে আশীর্বাদ করছি—সব কাজে সিদ্ধিলাভ করো। দুর্যোধনের বিপক্ষে আমি যুদ্ধ করব না।

মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়। আমি কৌরবদের অর্থের দ্বারা বদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধ ব্যাপার ভিন্ন আর অন্য বিষয়ে কি বর চাও বলো।

যুধিষ্ঠির বললেন—দুর্যোধনের পক্ষে থেকেও আমার হিত কামনা করে যুদ্ধ করবেন—এই প্রার্থনা।

ভীষ্ম হাসলেন।

যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় প্রার্থনা—তাঁর পরাভব কি উপায়ে ঘটবে সে কথা জানা।

ভীষ্ম বললেন—ধর্মরাজ, কার সাধ্য আমাকে পরাজিত করে? মৃত্যু আমি একদিন স্বেচ্ছায় বরণ করব। কয়েকদিন পরে তুমি আবার এসো, সে উপায় বলে দেব।

যুধিষ্ঠির প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন, উপস্থিত হলেন গিয়ে দ্রোণাচার্যের সমক্ষে। আচার্যও পরম তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি না এলে ক্ষোভ থেকে যেত, শাপ দিতাম। এবার বলছি—যুদ্ধ কর, জয় হোক তোমাদেরই—আমি অর্থের দাস, ঋণে কৌরবদের কাছে আবদ্ধ কিন্তু অন্তরে তোমাদের হিতৈষী। দুর্যোধনের হয়ে আমাকে যুদ্ধ করতেই হবে—সে প্রার্থনা ব্যতীত আর কোন প্রার্থনা থাকে তো বল।

যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন তাঁর বধের উপায়।

দ্রোণ বললেন—হাতে অস্ত্র থাকা পর্যন্ত কেউ আমাকে বধ করতে পারবে না। একটি মাত্র উপায় আছে—আমাকে অস্ত্র ত্যাগ করাতে পারলেই তোমরা জয়ের আশা করতে পারবে।

যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম ক'রে গেলেন কৃপ-শল্যাদি গুরুজনদের নিকট। প্রত্যেকের আশীর্বাদ ও মঙ্গল কামনা নিয়ে ফিরে এলেন শিবিরে। ফিরে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালেন, দু'পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—কেউ যদি থাকো কৌরবপক্ষে যে আমাদের পক্ষে যোগ দিতে ইচ্ছুক, আমি সাদরে তাকে গ্রহণ করব।

শুনে দুর্যোধনের ভাই যুযুৎসু কৌরবপক্ষ ত্যাগ করে চলে এলেন—পাণ্ডবপক্ষে। কৃষ্ণও ইতিমধ্যে গিয়ে পরীক্ষা করে এলেন কর্ণকে। শুনেছেন, ভীষ্মের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে তাঁর। প্রতিজ্ঞা করেছেন ভীষ্ম জীবিত থাকতে তিনি অস্ত্রগ্রহণ করবেন না। যুদ্ধে যোগ দেবেন না।

কৃষ্ণ এসে বললেন—অন্ততঃ ভীষ্ম সেনাপতি থাকাকালীন তুমি এসে যোগ দাও পাণ্ডবপক্ষে। তারপরে ইচ্ছে হয় ফের কৌরবপক্ষে যেয়ো।

কর্ণ মাথা নাড়লেন—দুর্যোধনের অপ্রিয় কাজ আমার দ্বারা হবে না। সে কখনোই সম্ভব নয়।

কৃষ্ণ ফিরে এলেন, ফিরে এলেন যুধিষ্ঠির, আর সেই মুহূর্তে কৌরব দল থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রথম যুদ্ধ সংকেত, আরম্ভ হয়ে গেল প্রাচীন ভারতের বৃহত্তম সংগ্রাম। কৌরব সেনাপতি ভীষ্ম—প্রথম দিনেই এত শত্রু ক্ষয় করলেন, পাণ্ডবপক্ষে হায় হায় জেগে উঠল, ত্রাসে বিহ্বল হলেন সবাই। সূর্য অস্ত না গেলে বুঝি ভীষ্মের শরাঘাতে সেদিন কেউ বাঁচতেই পারত না।

রাত্রিকালে নিহত সংখ্যা হিসাব করে আর. বৃদ্ধ ভীষ্মের পরাক্রম দেখে পাণ্ডবদল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটুও রইল না বিজয়ের আশা। কে সহ্য করবে যুদ্ধের সে তেজ। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন। কিন্তু পিতামহের কাছে তিনি একান্ত বিনীত, শক্তি পান না অস্ত্র নিক্ষেপ করতে। যুধিষ্ঠির হতাশ হলেন।

সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন—ভয় নেই বৎস, ভীষ্মের মৃত্যু শিখণ্ডীর হাতে—যথাসময়ে সে মৃত্যু নিশ্চয় ঘটবে।

ধৃষ্টদ্যুম্নও বহু রকমে আশ্বাস দিলেন। পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি তিনি, যুধিষ্ঠিরকে ধৈর্য ধরতে বললেন।

ভোর হতে না হতেই আবার যুদ্ধ শুরু হল। সেদিনকার যুদ্ধে প্রতিশোধ নিলেন অর্জুন। অজস্র কৌরব সৈন্য ক্ষয় হতে লাগল যেন মাটির ঢেলা চুর চুর করে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ক্ষোভে দুর্যোধন ছুটে এলেন পিতামহের কাছে—এ কি আর্য, আপনি আর দ্রোণ জীবিত থাকতে অর্জুন নিঃশেষ করে ফেলছে আমাদের সৈন্য! বধ করুন, আগে বধ করুন অর্জুনকে!

অপমানিত হয়ে ভীষ্ম অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। শরজালে আচ্ছন্ন হলো আকাশ, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝলসাতে লাগল বিদ্যুৎ—মনে হতে লাগল প্রলয়কাল সমাগত। দেবতা, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগল ভীষ্মার্জুনের রণ-সংঘাত। যুদ্ধ শেষ হল। কেউ কারুর এতটুকু ক্ষতি করতে পারলেন না।

দিনের পর দিন যুদ্ধ চলতে লাগল—কত রকম ব্যূহ সজ্জিত হল, সৈন্যক্ষয় হল, একদিন এ পক্ষ যায়-যায়, পরদিন অপর পক্ষ। কোনো পক্ষেরই জয়-পরাজয় স্থির হয় না। ভীষ্ম বার বার দুর্যোধনকে বললেন—পাণ্ডবপক্ষে স্বয়ং আছেন বাসুদেব। তাঁদের পরাজয় হতেই পারে না। এখনো সন্ধি কর মূঢ়, পরিণাম অত্যন্ত শোকাবহ।

চিন্তিত হন দুর্যোধন, কিন্তু সন্ধি করার কথা ভাবতে পারেন না। দু'পক্ষে ঘোর রণ চলতে থাকে। পাণ্ডবগণ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করেন তো কৌরবগণ সাজান গরুড়; এ-পক্ষে হয় মকর ব্যূহ, ও-পক্ষে শ্যেন। মণ্ডলব্যূহ, বজ্রব্যূহ, ঘোরব্যূহ, শৃঙ্গাটকব্যূহ, সর্বতোভদ্রব্যূহ, সুদুর্জয়ব্যূহ—ব্যূহের পর ব্যূহ রচিত হয়, বৃষ্টিধারার মতো সৈন্যপাত হয়, রক্তের নদী যায় বয়ে।

ভীষ্মের শক্তি দেখে কৃষ্ণ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তীব্রভাবে তিরস্কার করলেন অর্জুনকে—এ কি পার্থ, পিতামহের প্রতি দুর্বলতায় রোধ করতে পারছ না তাঁকে? বধ করতে ভীত হচ্ছ! পরাজয় যে সুনিশ্চিত।

মাথা নত করে রইলেন অর্জুন। হায় সখা, পিতামহকে বধ করে লাভ করব রাজ্য—সে রাজ্য কি হবে না নরকতুল্য।

কৃষ্ণ দেখলেন অর্জুনের মধ্যে আবার জেগেছে সেই মোহ। কেমন করে দূর করা যায়। উপদেশে তো ফল হবে না। একেবারে রথ এনে হাজির করলেন ভীষ্মের সামনে। সেদিন যুদ্ধের নবম দিন। ভীষ্ম অমিতপরাক্রমে সৈন্য সংহারে রত। আগের রাত্রে দুর্যোধন তাঁকে নিষ্ঠুরতম অপমান করে বলেছেন—নয় দিনেও পারলেন না পাণ্ডবদের হার মানাতে! এমনি অক্ষম আপনি। এ তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে আপনি স্নেহ করেন ওদের, দ্বেষ করেন আমাদের। ত্যাগ করুন অস্ত্র, কর্ণ হোক সেনাপতি, দেখুন একদিনে আমরা জয়ী হই কি না।

অতিশয় মর্মাহত হলেন পরশুরামের শিষ্য, চেষ্টার ত্রুটি নেই তাঁর, তবু এই দোষারোপ? দুর্যোধনের কাছে পরাধীনতা স্বীকারের ধিক্কার তাঁর অন্তর দগ্ধ করলে। এর চাইতে বরং ভালো এবার পৃথিবী ত্যাগ করা। মনঃক্ষোভে নবম দিনে ভীষ্ম যে যুদ্ধ করলেন সে ইতিহাস কেউ ভুলতে পারে না। ভয়ে, ত্রাসে পাণ্ডব দল পালিয়ে গেল। জ্বলন্ত কালাগ্নির মতো ভীষ্ম, অক্লেশে ধ্বংস করে চললেন অপর পক্ষ। এমনি সময় অর্জুনের রথ এসে থামল তাঁর সামনে। দেখা মাত্র পরমোৎসাহে যৌবনবেগে শক্তিমান হলেন গাঙ্গেয়। বাধা দিতে পারলেন না অর্জুন, কৃষ্ণের কঠিন ভর্ৎসনাতেও পিতামহকে আঘাত দিতে তাঁর বাজে, কেবল প্রতিরোধ করে চলেন তাঁর শরগুলি।

দেখে শুনে মহা ক্রোধে জ্ঞান হারালেন বাসুদেব—এ কি যুদ্ধ? এমন করে কি হয় বিজয় লাভ। সক্রোধে রথ হতে নেমে পড়লেন, তুলে নিলেন চক্র। সিংহনাদ করে ধেয়ে গেলেন ভীষ্মের প্রতি।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করে হাত জোড় করে বসে গেলেন স্তব করতে—হে পুণ্ডরীকাক্ষ, পরমপুরুষ হৃষীকেশ, কি সৌভাগ্য আমার। তোমার হাতে নিপাতিত হবো আমি—এ যে স্বপ্নাতীত। হানো তোমার চক্র, আমি পরমানন্দে গ্রহণ করি।

লজ্জায় অর্জুন মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইলেন। যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না—এই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা, তাঁর নিশ্চেষ্টতায় কি না ভঙ্গ হতে চলল সেই শপথ। অর্জুন রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে ধরে ফেললেন কৃষ্ণকে। পায়ে ধরে কাতর হয়ে বললেন—বিরত হও সখা, লজ্জা দিয়ো না, আমি আজ প্রতিজ্ঞা করছি কালকের মধ্যে পরাজিত করব পিতামহকে।

কৃষ্ণ ফিরে এলেন, হাসলেন মনে মনে। কোন আদেশ-উপদেশের দ্বারা এই রুদ্রতেজ জাগানো সম্ভব হত না। তাঁর যুদ্ধের ভাণকে সত্য বলে ভুল করে এবার পার্থ যথার্থ শক্তি প্রকাশ করবে।

সেদিনকার মতো দিন শেষ হল। যুদ্ধ বিরতি ধ্বনিত হল। যে যার শিবিরে গেলেন ফিরে। রাত্রে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরদের কাছে বললেন—জেনে রেখো তোমরা, কাল অর্জুন আপন শপথ না রক্ষা করলে আমিই করব ভীষ্ম বধ।

শশব্যস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন—না, না, যে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছিলে সে সত্য ভঙ্গ করতে পারবে না। আমাদের জন্যে হবে মিথ্যাবাদী। ভীষ্ম আমাকে আরেকবার যেতে বলেছিলেন তাঁর কাছে—চলো তাঁকেই মৃত্যুর কৌশল জিজ্ঞাসা করে আসি।

বলতে বলতে ধিক্কারে বেদনায় অর্জুন শিশুর মতো আকুল হলেন—পিতৃহীন হয়ে শৈশবে এই পিতামহের কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছি আমরা, তাঁকেই পিতা বলে জানতেম বহুদিন, সেই পিতামহের মৃত্যুর জন্য তাঁরই কাছে জানতে যাব মৃত্যুবাণ।

তবু যেতে হল—বাস্তব সত্য হৃদয় ব্যথার ভ্রূক্ষেপ করে না। শৈশবের দুর্বলতা পরিণত কালের প্রয়োজনের কাছে হয়ে গেল তুচ্ছ। নিশীথ রাত্রে পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ভীষ্মের শিবিরে। দুর্যোধনের রূঢ় ব্যবহারে ভীষ্ম তখন আর বাঁচতে অভিলাষী নন, বলে দিলেন আপন মৃত্যুবাণ—শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন যেন তাঁকে ধরাশায়ী করেন। জয়ের আশা আনন্দ জাগাল না, বরং ক্ষুব্ধ করলে মন—যাঁর নির্মল গভীর স্নেহ নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে তাঁদের উপর, পিতার চেয়েও যিনি গরীয়ান, রাজ্য যাঁর কাছে তুচ্ছ হয়েছে মুহূর্তে, তাঁকেই হত্যা করতে হবে রাজ্যলাভের জন্য। শিখণ্ডী তো উপলক্ষ, প্রকৃত হন্তা অর্জুন। দুঃখে ক্ষোভে মৃতকল্প হলো পাণ্ডুতনয়গণ।

ভীষ্ম দশম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

জীবনের স্পৃহা গেছে, শক্তি সংহত হয়েছে, এবার খেলা শেষ! দুর্যোধনের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—প্রতিদিন অন্তত দশ হাজার পাণ্ডবসৈন্য নিধন করবেন। সে সত্য সেদিনও তিনি পালন করেছেন। তথাপি যুদ্ধ তিনি সমান বেগে করেই চললেন। অর্জুন ধেয়ে এলেন—শিখণ্ডী তাঁর সামনে। ভীষ্ম অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন—একমাত্র স্পর্শ করলেন না শিখণ্ডীকে—শিখণ্ডী যে নারী। ভীষ্মকে বিনাশ করবার কামনা নিয়েই গ্রহণ করেছেন পুরুষবীর্য। অর্জুনের শরাঘাতে কাতর হয়ে ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন ভীষ্ম। বললেন—পাণ্ডবগণ, তোমাদের স্বয়ং রক্ষা করেছেন বাসুদেব, উপরন্তু

শিখণ্ডী আমার অবধ্য। আমার ইচ্ছামৃত্যু পিতৃদত্ত বর, আজ সে মৃত্যু গ্রহণের সময় হয়েছে।

আকাশ থেকে বসুগণ ও দেবগণ বলে উঠলেন—তাই হোক বৎস, তোমার মর্ত্যের কাজ শেষ হোক।

দ্যুলোকে বেজে উঠল দুন্দুভি, অজস্রধারে হতে লাগল পুষ্পবৃষ্টি, সুরভি পবন গেল বয়ে। শিখণ্ডী সামনে এসে দাঁড়াতেই ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলেন। শিখণ্ডী আর অর্জুন মিলে অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। ভীষ্ম হাসিমুখে তুলে নিলেন স্বর্ণমণ্ডিত চর্ম আর খড়্গ—হয় বিজয় নয় স্বর্গে গমন। মুহূর্তে অর্জুন আশ্চর্য এক বাণ নিক্ষেপে চর্ম ও খড়্গ দিলেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে। ভীষ্ম নির্বিকার, প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে লাগলেন অর্জুনের দিব্যাস্ত্র—আর কারুর বাণে তাঁর তেজোময় শরীর স্পর্শমাত্র করতে পারলে না। ধীরে ধীরে ভাস্বর জ্যোতি নক্ষত্রের মতো রণক্ষেত্রে পতিত হলেন ভীষ্ম। পাণ্ডবপক্ষের বিজয়ধ্বনি গ্রহ-গ্রহান্তরে গিয়ে পৌঁছল। বিমূঢ় হয়ে রইল কৌরবদল। যুদ্ধ থামল। শত সহস্র আত্মীয়স্বজন সৈন্যসামন্ত এসে ঘিরে দাঁড়াল পিতামহকে। দশ দিনের যুদ্ধ শেষ করে বিদায় নিলেন কুরুবৃদ্ধ শান্তনুনন্দন।

কুরুক্ষেত্রের প্রথম কৌরব সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম পরশুরামের কাছে পেয়েছেন অস্ত্র দীক্ষা, ব্রহ্মচর্যে লাভ করেছেন দিব্যশক্তি। দেহে এত শর বিদ্ধ হয়েছিল যে, সে শরই তাঁকে শূন্যে তুলে রেখে দিল। মাথা কেবল ঝুলে রইল নীচের দিকে। আকাশ থেকে খসে পড়ল যেন মহামহিম মার্তণ্ড, ধরাতল থেকে সরে গেল যেন দেবতাত্মা হিমাচল নগাধিরাজ। স্বর্গে-মর্ত্যে, যক্ষ-রক্ষ, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, মানব হায় হায় করে উঠল। ঋষিগণ বলে উঠলেন—কেন পুণ্যব্রত ভীষ্ম দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করলেন।

যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব কিন্নর যম যমদূত সকলে বলে উঠলেন—এ তো ভীষ্মের স্বর্গ গমনের প্রশস্ত সময় নয়।

ভীষ্ম প্রথমে মরণান্তিক যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ধরাশায়ী ছিলেন, চেতনা ফিরে এলে বহু কষ্টে মাথা তুলে উত্তর দিলেন—না, আমার প্রাণত্যাগ হয় নি। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে সূর্য উত্তরায়ণে আসবে, তখন আমার মৃত্যুর প্রশস্ত সময়। ততদিন আমি এই রণক্ষেত্রেই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হল দেবলোক থেকে, হর্ষধ্বনি উত্থিত হল নরলোকে, কুরুপাণ্ডব সকলে দ্রুত গিয়ে পিতামহের কাছে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম বললেন—এভাবে মাথা ঝুলে থাকাতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, কেউ আমাকে একটু আরাম দিতে পার।

দুর্যোধন দুঃশাসন ত্বরিতে উত্তম শয্যা ও উপাধানের ব্যবস্থা করলেন। ভীষ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। ডাকলেন—অর্জুন।

অর্জুন এসে প্রণাম করলেন।

—বৎস, উপযুক্ত ব্যবস্থা কর। বড় কষ্ট হচ্ছে। উঠে দাঁড়ালেন অর্জুন। ধনুঃশর তুলে নিয়ে মারতে লাগলেন একটির পর একটি শর। মাথার এপাশে ওপাশে তীরবিদ্ধ হয়ে মাথা শক্ত হয়ে গেল। দু'হাত তুলে ভীষ্ম আশীর্বাদ করলেন—আমাকে যথার্থ শয্যা দিলে তুমি, তোমার যশ পৃথিবীতে অক্ষয় হোক।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বললেন—আমি বড় তৃষ্ণার্ত।

বলার সঙ্গে সঙ্গে কৌরবপক্ষ থেকে উপাদেয় সব ভোজ্যদ্রব্য ও সুস্বাদু পেয় এনে সাজানো হল। বারণ করলেন ভীষ্ম—এ আমার খাদ্য নয়। আমি এখন মর-জগতের ঊর্ধ্বে। অর্জুন—

এগিয়ে এলেন অর্জুন। অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। বরুণাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন মাটিতে। নির্মল পবিত্র জলধারা নির্গত হতে লাগল। সুগন্ধে সুরভিত চারিদিক। স্বাদে স্বর্গের পানীয় পরাজিত। ভীষ্ম সানন্দে গ্রহণ করলেন। আর কোনো পার্থিব আহারের প্রয়োজনই তাঁর হল না। কুরুক্ষেত্রের এক অংশে পরিখার পারে ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে রইলেন।

লোক সমাগম কমে গেলে ভীষ্ম দুর্যোধনকে একান্তে ডেকে বললেন,—দুর্যোধন, কথা রাখো। আমার বিনাশেই শেষ হোক যুদ্ধের এ মহাপাপ। কৃষ্ণ যাদের সহায় তাদের কেউ জয় করতে পারবে না। কেন তবে ধ্বংস করবে লক্ষ লক্ষ প্রাণী।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। দুর্যোধন পিতামহের বাক্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে এলেন আপন শিবিরে। ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের একাংশে পরিখা ঘেরা অবস্থায় শরশয্যায় শুয়ে নারায়ণের ধ্যানে মগ্ন রইলেন। সকলে যখন চলে গেছে, নির্জন হয়েছে চারিদিক, তখন সূতপুত্র কর্ণ এসে উপস্থিত হলেন। পাদবন্দনা করলেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে বললেন—কুরুশ্রেষ্ঠ, রাধাতনয় কর্ণ আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

ভীষ্ম তাকালেন। এদিক দেখলেন, ওদিক দেখলেন, চারদিক বিজন দেখে তিনি কর্ণকে অতি নিকটে আহ্বান করলেন। হাত বাড়িয়ে স্নেহভরে করলেন আলিঙ্গন, বললেন—এসো, আমার কাছে এসে বসো। বড়ো খুশি হয়েছি তোমার আসাতে। বৎস, জীবনের সত্য তুমি জান না। রাধাতনয় তুমি নও, তুমি কুন্তীনন্দন। এ সত্য ব্যাসের জানা। নারদেরও জানা—তাঁদেরই কাছ থেকে আমি শুনেছি। তোমার সঙ্গে আমার কখনও মিল হত না, তার কারণও এই। তুমি পাণ্ডবদের দ্বেষ করতে, নিন্দা করতে। আমি সে সহ্য করতে পারতাম না। তোমার প্রতি মন হত বিরূপ। নয় তো তোমার গুণাবলী আমি প্রশংসা করি। তোমার মত দাতা ও বীর্যবান ব্যক্তি বিরল। আমার কথা রাখো বৎস, পাণ্ডবগণ তোমার ভাই, তাদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রো না।

কর্ণ বিষণ্ণস্বরে বললেন—মহাবাহো, আমি জানি আমি কুন্তীপুত্র। অধিরথ ও রাধা আমাকে পালন করেছেন মাত্র। কিন্তু রাজৈশ্বর্য রাজসম্মান দিয়েছেন মহারাজ দুর্যোধন—তাঁর ঋণ শোধ দেবার নয়। দুর্যোধনের জন্য যদি আমাকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারও ত্যাগ করতে হয়, তাতেও আমি রাজী। বিনাশের ভয় ক্ষত্রিয়ের নেই, যা হচ্ছে হোক, পাণ্ডবপক্ষে যোগদানে আমি অক্ষম আমায় ক্ষমা করুন, আর্য, ক্ষমা করুন আমার অবাধ্যতা। আপনাকে দুঃখ দিয়ে আমি দুঃখিত।

নীরব হয়ে রইলেন ভীষ্ম। জন্মলগ্নের অভিশাপে পাণ্ডবগণ কর্ণের বিদ্বেষের পাত্র কে খণ্ডাবে সে শত্রুতা। ভীষ্ম বললেন—তবে তাই হোক বৎস, আমি অনুমতি দিলাম তুমি যুদ্ধ করো। নিরহঙ্কার হয়ে যুদ্ধ করো—তাতেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব।

কর্ণ ভীষ্মকে অভিবাদন করে ফিরে গেলেন আপন শিবিরে।

সাহিত্যে উপেক্ষিত

একথা অনস্বীকার্য যে কোন অনুবাদের সাহিত্য-গুণ অনেকাংশেই অনুবাদকের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। একটি কবিতা যখন অনূদিত হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়, তখন তার রস, তার ভাবমাধুর্যের জন্য যা কিছু প্রশংসনীয় তাতে মূল লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের কৃতিত্ব প্রায় সমান সমান। নাট্যানুবাদের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে খাটে, কারণ নাটকের আবেদন প্রধানত ধ্বনি নির্ভর, মনে মনে পড়ার চেয়ে কানে শোনাতেই নাট্যরস উপলব্ধি করা যায় বেশি। এজন্যই এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ পাঠক কিন্তু এত তলিয়ে দেখেন না সব সময়, লেখকই তাঁদের কাছে মৌল, অনুবাদক নেহাতই নগণ্য ; কাব্যের উপেক্ষিতার মতই অনুবাদক সাহিত্যে উপেক্ষিত। ট্রানস্লেটিং মেসিন বা অনুবাদযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকের দাম যেন আরও কমে গেছে। যদিও এই যন্ত্রের মাধ্যমে অনুবাদকর্মে সাহিত্যরস খুঁজে পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন যে, অনুবাদকে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে হলে শুধু যে যথোপযুক্ত শিক্ষারই প্রয়োজন আছে তা নয়, অত্যন্ত মার্জিত ও পরিশীলিত বুদ্ধির অধিকারী হওয়াও আবশ্যক। কেবল ভাষান্তরিত করলেই হবে না, তার আগে সাহিত্যকর্মের মর্মকেন্দ্রকে বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যে কোন রচনার ভাবরূপটি যদি অনুবাদক সামগ্রিক অখণ্ডতায় কল্পনা করে নিতে সক্ষম না হন তাহলে তাঁর অনুবাদকর্ম কখনই শিল্পোত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। একথা মনে রেখেই বহু রচয়িতা তাঁদের রচনার অনুবাদক নির্বাচন করে থাকেন অত্যন্ত সতর্ক ভাবে। তাঁরা জানেন যে অনুবাদকের ব্যক্তিগত দক্ষতা, অনুবাদ কর্মের সাফল্য বা অসাফল্যের জন্য প্রধানত দায়ী। লেখকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসাটাও এজন্যই অনুবাদকের পক্ষে একটা বড় রকমের লাভ, যদিও সব সময় সেটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। মূল রচনা যে যে ভাষায় অনূদিত হয়, লেখক যদি সেগুলি অনুধাবন করতে সমর্থ হন, তাহলেও অনুবাদকের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়, কারণ সে সব ক্ষেত্রে লেখক স্বয়ংই অনুবাদ কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেকটা দূর করতে পারেন, অনুবাদ কর্মটি যথাযথ ভাবে তাঁর রচনার অনুসারী কি না সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তখন তিনি নিজেই। অপরিসীম শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদকের আজও কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই ; শ্রমমূল্যও তাঁরা যা পান তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। অধিকাংশ প্রকাশকই অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের বেলা নানা টালবাহানা করে থাকেন ; ফলে বিশ্বখ্যাত সাহিত্য কর্মের অনুবাদ ও তৃতীয় শ্রেণীর মৌল রচনার চেয়ে কম দর পেয়ে থাকে। অনুবাদক তাঁর কর্মের জন্য কখনই একটা নিশ্চিত বাজার পান না এবং প্রকাশকদের মর্জির উপরই সর্বদা নির্ভর করে তাঁর মজুরী। অথচ সাহিত্যের এই শাখাটি আজ ক্রমবর্ধনশীল, পাঠকের কাছেও যে অনুবাদ কর্ম উপেক্ষিত নয় তাও বোঝা কঠিন নয়, মোঁপাসাঁ, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ম্যাক্সিম গর্কী ইত্যাদি নামের সঙ্গে আজ কার। পৃথিবীর মৈত্রীবন্ধন কি এই শাখাটির মাধ্যমেই ঘটে নি ? তবে কেন এই উপেক্ষা, আর কতদিন অপেক্ষা করবেন অনুবাদক স্বক্ষেত্রে একটি চিহ্নিত স্থান পাওয়ার জন্য ?

জগতের ধর্মগুরু

আলোচ্য গ্রন্থে পনেরো জন সাধকের জীবন ও বাণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিধৃত হয়েছে। লোকোত্তর বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা সকলেই আছেন এর মধ্যে, যথা যীশু, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত পৌরাণিক ও আধুনিক সব মহাপুরুষ, দুনিয়ার অশান্ত ও পর্যুদস্ত মানবতা যাঁদের কাছে গভীর ঋণে আবদ্ধ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এঁদের জীবন ও কর্মকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন লেখক, ধর্ম জিজ্ঞাসুর অন্তর যাতে পরিতৃপ্ত হয় সে সম্বন্ধে তাঁর প্রচেষ্টা সত্যই আন্তরিক, বোদ্ধা পাঠকমাত্রই এই রচনাকে মূল্যবান সম্পদ বলেই গণ্য করবেন। আকর্ষণীয় অথচ প্রামাণ্য কয়েকটি ছবি সন্নিবেশিত হওয়ায় বইটির মূল্য আরও বেড়ে গিয়েছে। আমরা এই রচনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই অত্যন্ত শোভন। সম্পাদনা:—ব্রহ্মচারী বিভুচৈতন্য ও প্রসূন পাল। প্রকাশক—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পো:—নরেন্দ্রপুর, চব্বিশ পরগণা। দাম—তিন টাকা।

যুগর্ষি বিবেকানন্দ

শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে বর্তমান গ্রন্থ তারই অন্যতম। স্বামীজীর জীবন ও চরিত্র এমনই যে সে সম্বন্ধে যত বেশি জানা যায় ততটাই সামগ্রিকভাবে মানব জাতির উপকারে আসে এবং তাঁর স্বদেশবাসীর পক্ষে তো এ কথা আরও বেশি করে খাটে। বাঙলার ছেলেমেয়ের কাছে তাই বর্তমান রচনার মূল্য বড় কম নয়। সুন্দরভাবে স্বামীজীর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক, মূলত শিশুপাঠ্য হলেও বয়স্কজনেরাও বইটি পড়ে তৃপ্তি পাবেন। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপার কাজ ভাল। লেখক—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রকাশনায়—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—দুই টাকা পঁচাত্তর ন: প:।

সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়

বাংলার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমানায় চন্দননগরের চিরদিনই এক নিজস্ব ভূমিকা আছে। বৃটিশ আমলে চন্দননগর বিচ্ছিন্ন থেকেছে,

কারণ এই ছোট্ট শহরটি তখন ছিল ফরাসী সরকারের শাসনাধীন এবং হয়ত সেই কারণেই জাতীয়তাবাদ সেখানে ভিৎ গড়েছিল প্রবলভাবেই, বৈপ্লবিক সংগ্রামের বহু শহীদেরই জন্মভূমি এই চন্দননগর আজ অবশ্য স্বাধীন ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তার এক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার গুরুত্বও তাই আজই সর্বাধিক। চন্দননগরের অন্যতম প্রধান নাগরিক, সুসাহিত্যিক শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় সে কাজে এগিয়ে এসে সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন; তাঁর রচনায় চন্দননগর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সকল তথ্যাদিই সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে। আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক সাধারণ, লেখক—হরিহর শেঠ, প্রকাশনায়—চন্দননগর পুস্তকাগার, চন্দননগর, দাম—দুই টাকা।

হানাবাড়ির কারখানা

বৈঠকী গল্পের আসরে আজও ৺অবনীন্দ্রনাথের দোসর কেউ নেই, তাঁর ছেলে ও বুড়ো এ দুয়ের ক্ষেত্রেই যে তিনি সমান পারঙ্গম, একথাও অনস্বীকার্য। আলোচ্য গ্রন্থটিও তার স্বাক্ষরবাহী। হানাবাড়ির রূপকথা শুনিয়েছেন তিনি অনমুকরণীয় যাদুকরী ভাষার মাধ্যমে, ঠিক যেন সোনালি তবকদার বেনারসী খিলি, যেমন তার রূপ তেমনই তার স্বাদ। ছেলেরা তো বটেই বুড়োরাও সে বই হাতে পেলে সহজে ছাড়েন তা তো বোধ হয় না। বাংলা শিশু সাহিত্যের অঙ্গনে আলোচ্য রচনা তাই নিঃসন্দেহে এক চিহ্নিত স্থানের অধিকারী। প্রচ্ছদ শিল্প সুন্দর, অপরাপর আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। কয়েকটি শিশু মন লোভন ছবি, বইটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। লেখক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশনায়—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাঃ, লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

আমেরিকার ডায়েরী

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি; আমেরিকা যে শুধু নিজেই শক্তিমান তা নয় বিপন্ন মানবতারও সে শ্রেষ্ঠতম বন্ধু; স্বভাবতই যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগে মনে, আলোচ্য গ্রন্থ সে বিষয়ে সবিশেষ সহায়তা করবে। সাংবাদিক লেখক আমাদের অপরিচিত নন, বৈদগ্ধ্যের খ্যাতিও তাঁর সমধিক, সুতরাং বইটি হাতে পেয়ে সহজেই আগ্রহী হয়ে ওঠে পাঠকের মন এবং একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে পাঠক মনের সে প্রত্যাশাকে সার্থকও করে তুলেছেন লেখক। আমেরিকার রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতিকে যথাযথ ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এবং দেখাতে চেয়েছেন তার রূপকে। ধনতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হলেও মূলত যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যে সাম্যবাদেরই অনুরূপ অর্থাৎ সমাজের সর্বশ্রেণীর উন্নতি বিধানই যে তার রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র একথা জোর দিয়েই বলেছেন লেখক, আর বিধিবদ্ধ যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বীয় বক্তব্যকে শুধু বিশ্বাসযোগ্য নয় প্রামাণ্যও করে তুলেছেন। আমেরিকার দেশে-দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি, সাংবাদিকের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখেছেন তাকে, তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করেছেনও সেই দৃষ্টি কোণ থেকে, কাজেই বর্তমান রচনাকে বিচারও করতে হবে সেদিক থেকেই; রচনাটিকে সাহিত্যগুণসম্পন্ন বলার চেয়ে তাই সত্যসন্ধী বলাটাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। গ্রন্থকারের শৈলী আধুনিক নয় কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য। বোদ্ধা পাঠকমাত্রই গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করবেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—দেবজ্যোতি বর্মণ, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা, ৯। দাম—সাড়ে সাত টাকা।

মস্কোর চিঠি

সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে। সাংবাদিক লেখক আজ আর ইহলোকে বর্তমান নেই, কিন্তু এই রচনার মধ্য দিয়েই তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। রাশিয়ার ব্যালেনৃত্য জগদ্বিখ্যাত, বর্তমান গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করে লেখক পাঠকের অনুসন্ধিৎসা মিটিয়েছেন। সাম্প্রতিক যুগের শ্রেষ্ঠতমা ব্যালেরিনা 'গালিনা উলানোভা'র যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যের পীঠস্থান 'বলশাই' থিয়েটারের সমগ্র পরিবেশটিও তাঁর বর্ণনাগুণে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় পাঠকমনে। সাম্প্রতিক রাশিয়ার সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিশেষ ধারাটিকেও তিনি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন; বস্তুত সামগ্রিকভাবে সাম্প্রতিক রাশিয়ার সংস্কৃতির মূল কথাটাই যেন সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। মননশীল পাঠকের কাছে তাই এ গ্রন্থের মূল্য অসীম। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই রুচিপূর্ণ। লেখক—শুভময় ঘোষ। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

আবার ঘনাদা

সেই বিখ্যাত ঘনাদার আবার আবির্ভাবে সাহিত্যামোদী পাঠকমাত্রই খুশি হবেন। ছোটদের জন্য লেখা হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই চরিত্রটি সকলেরই প্রিয়। গুল্ তো সকলেই দেয়, কিন্তু তাহলেই কি 'ঘনাদা' হওয়া যায়? এ যেন কল্পনার পক্ষীরাজে চড়িয়ে মনকে টেনে নেওয়া এক অদ্ভুত পরিবেশে—তাই তো বলতে হয় সাবাস 'ঘনাদা'। বর্তমান গ্রন্থে এই অদ্বিতীয় 'ঘনাদা'কেই নতুন করে উপহার দিয়েছেন লেখক তিনটি গল্পের মোড়কের মধ্য দিয়ে। অনিন্দ্যশৈলী ও অপরূপ কল্পনার এ যেন এক অনবদ্য সমন্বয়। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—আড়াই টাকা।

বরণীয় মানুষ, স্মরণীয় বিচার

আইন আদালত বিচার একথাগুলিতে মালিন্যের স্পর্শ পাওয়াটাই আমাদের সাধারণ অভ্যাস, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে যে সব বিচার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তার আসামীর তালিকায় রয়েছে এমন সব নাম, যুগ যুগান্ত ধরে যাঁরা শুধু স্মরণীয়ই নন বরণীয়ও। মানুষের ইতিহাস রোজই বদলাচ্ছে, তাই একদিন যাঁরা সম সাময়িক আইনের হাতে দণ্ডযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়েছেন, পরে তাঁদেরই উদ্দেশে মানুষ তুলে ধরেছে বরণমালা; ছবির আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হতে দেখা যায় তাই প্রায় প্রত্যেক নতুন পথের দিশারীকেই। বর্তমান গ্রন্থে এই ধরণের বারোটি বিচার

কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য মাত্র এর প্রত্যেকটিরই নায়ক আজকের মানুষের চোখে মহৎ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিচার কাহিনীগুলিকে, গ্রন্থকার বিভিন্ন রাগের মাধ্যমে যেন এক শাশ্বত সঙ্গীতেরই রূপ দেখাতে চেয়েছেন, এক সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা হল মহৎ মানুষের জীবন ট্রাজেডি। পরমত অসহিষ্ণু ও সঙ্কীর্ণ হৃদয় মানুষের দরবারে বড় হওয়াটাই যে একটা অপরাধ একথা বেদনাদায়ক হলেও চিরন্তন সত্য, আর বর্তমান গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে রয়েছে তারই স্বাক্ষর। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা।

তোতা পাখির পাকামি

বইয়ের ওপর যাঁর নাম দেখলে ছেলের দল নেচে ওঠে, আর বুড়োরাও মুচকি হাসেন, তাঁরই নাম 'শিবরাম চক্রবর্তী,' ওরফে 'শিব্রাম চক্করবরত্তী'। আলোচ্য গ্রন্থটি অতএব অনেকেরই মনে প্রত্যাশা জাগাবে। ছোট, ছোট কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই গ্রন্থে, যার সবক'টিই উপভোগ্যতায় রমণীয়। লেখকের যা সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য সেই পানের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায় রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর অসামান্য সরস শৈলী, অতি সাধারণ ঘটনাই যেন তাঁর হাতে হয়ে ওঠে অসাধারণ, একটি সরস কৌতুকপূর্ণ সূক্ষ্মতার আভাসে সমুজ্জ্বল হয়ে। বইটি পড়ে এর ক্ষুদে ক্ষুদে সমজদাররা খুশি হবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনায়—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—দুই টাকা।

বর্ণালী

অনবদ্য এক প্রেমের উপাখ্যানকে রেখার আঁচড়ে বেঁধেছেন লেখক এই গ্রন্থে, কাহিনীর প্রতিছত্রে খুঁজে পাওয়া যায় এর নামের সার্থকতা। খণ্ডিত এক প্রেম কেমন করে উত্তরণ করল সার্থকতার চরম শিখরে, নিপুণ হাতে তারই ছবি এঁকেছেন লেখক। অলকা গরীব কম্পাউণ্ডারের সুরূপা শিক্ষিতা মেয়ে স্বপ্ন দেখেছিল একদা মহৎ প্রেমের, সে জানত না, বুঝত না যে সেই স্বপ্ন ছিল নেহাৎ ফাঁকির, চোরাবালির ভিত নির্ভর; কিন্তু আরেকজন জেনেছিল তা তার নাম অশেষ; জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কৃতবিদ্য ডাক্তার অশেষের মনটা ছলছল করে উঠেছিল এই জানার বেদনায়। সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত বাড়ালো সে অলকাকে সাহায্য করতে, আর সেই প্রসারিত করের দাক্ষিণ্যেই ঝরে পড়ল প্রেমের আশীর্বাদ ওদের দু'জনেরই যুগ্ম জীবনের উপর—বর্ণালীর মতই অজস্র রঙের ফুলঝুরি ছড়িয়ে। আলোচ্য রচনাতে রোমাণ্টিসিজমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন লেখক, আর সে রোমাণ্টিসিজম যে বর্তমান হতাশাখিন্ন মানুষের মনেও আবেশ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, এ রচনা পাঠ করলে সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হতে পারেন পাঠক। গোধূলির মায়াভরা রঙিন আলোই যেন বর্ণাঢ্য করে দিয়েছে কাহিনীকে অপরূপ দক্ষতায়। গল্পের সঙ্গে তাল দিয়েছে লেখকের শিল্পোত্তীর্ণ শৈলী সর্বত্র। বইটির প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুবোধ ঘোষ, প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা মাত্র।

সমকালের কথা

বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে লেখকের নাম শুধু সুপরিচিতই নয় সুপ্রতিষ্ঠিতও, আলোচ্য রচনায় নিজের কর্মধারারই শুধু এক বিস্তৃত বিবরণ দেন নি তিনি, তার মাধ্যমে বাংলা রাজনীতির এক বিশেষ ভূমিকাকেও পর্যালোচনা করেছেন। সাম্যবাদ আজকের দিনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে শক্ত জমি আঁকড়ে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র, কিন্তু বাঙলা দেশে এর রীতিনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা আজও সহজ নয়, বর্তমান রচনা এ বিষয়ে সহায়ক হবে। মত ও পথে যতই পার্থক্য থাক না কেন আন্তরিকতার অভাব যে কোন পথেই নেই, আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের এই স্মৃতিচারণ থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক প্রামাণ্য দলিল বলেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য এই রচনা। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—মুজফ্ফর আমেদ, প্রকাশনায়—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, (প্রাঃ) লিমিটেড: ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দু' টাকা।

স্ত্রী মানেই ইস্ত্রী

সরস রচনা যাঁদের ভালো লাগে, তাঁরা আলোচ্য বইটিকে খুশি হয়েই গ্রহণ করবেন। গ্রন্থ লেখক এই ধরণের রচনার জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁর রচনার প্রধান প্রসাদ গুণ তাঁর অননুকরণীয় শৈলী, বস্তুত নাম না দেখলেও তাঁকে রেখার আঁচড় থেকে গ্রেপ্তার করা যায় শুধু ভাষার প্রসাদাৎ। আলোচ্য গ্রন্থও বলা বাহুল্য তাঁর এই স্বকীয়তা, স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল: মোট তেরটি ছোট ছোট গল্প একত্র সংগৃহীত হয়েছে এই গ্রন্থে। পড়তে পড়তে নিজের অজানাতেই রসসিক্ত হয়ে ওঠে মন, ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে একটুকরো হাসি; মন ভারী থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও হাসতে পারাটাই বোধ হয় জীবনকে সুসহ করবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আর বর্তমান রচনায় লেখক সে কারণেও আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—শিবরাম চক্রবর্তী, প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

বাজীকর

সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সফল উপন্যাসের আবির্ভাব হয় কমই, কাজেই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে, ঝলমল করে চিত্ত'-র মত সাহিত্য রসপিপাসু পাঠকের হৃদয় ঐ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমন কোন উপন্যাস হাতে পেলে। আলোচ্য উপন্যাসটিও সেই প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। 'যাদুকর এই চার অক্ষর বিশিষ্ট বাক্যটির মধ্যে যেন নিহিত রয়েছে কত বিস্ময়, কত ব্যঞ্জনা। আলোচ্য কাহিনীর বিষয়বস্তুও একে কেন্দ্র করেই।

এক অসাধারণ যাদুকরের জীবন ও কর্ম অসামান্য নিপুণতার সঙ্গে রেখায়িত করেছেন লেখক। এ কাহিনী যাদুর নয়, যাদুকরের, কিন্তু ঘটনা বৈচিত্র্যে, শিল্প সৌকর্যে যেন যাদু কাহিনীর মতই মায়াময়; যশস্বী বাজীকর গুণী দত্তকে যেন চোখের সামনে দেখতে পান পাঠক, তার সাফল্যে হাসেন, বেদনায় কাঁদেন, আর এইভাবে কখন নিজের অজ্ঞাতেই একাত্ম হয়ে যান চরিত্রটির সঙ্গে। বলা বাহুল্য উপন্যাসোক্ত চরিত্রকে এমনভাবে জীবন্ত করে তোলা সহজসাধ্য নয়, কিন্তু এ উপন্যাসের রচয়িতা সেই অসাধ্য সাধনেই সক্ষম হয়েছেন, বাজীকর গুণী দত্তকে ভোলা সম্ভব নয় পাঠকের পক্ষে। মূল নারীচরিত্রগুলিও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ নানাভাবে ধরা দিয়েছে তাদের মাধ্যমে, মনের গহনে লুকিয়ে থাকা রঙ যেন নানা রঙে রঙিন হয়ে ঝলসে উঠে বারবার পাঠকের অন্তরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরেছে। মনের অতি সুকুমারতন্ত্রীগুলিও অনুরণিত হতে থাকে যেন এই রসোত্তীর্ণ প্রেম কাহিনীর দুর্বার ব্যঞ্জনায়। লেখকের অপরূপ শৈলী তাঁর বিষয়বস্তুকে যেন এক নতুন মহিমা দিয়েছে, ভাবগম্ভীর সঙ্গীতের সঙ্গে উপযুক্ত সঙ্গতের মতই প্রাণসঞ্চারী তার ভূমিকা। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ইঙ্গিতময়, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। দাম—আট টাকা।

দ্বিতীয় অন্তর

মননশীল সাহিত্যের পর্যায়ে রচনাকে ওঠাবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় যাঁরা ব্রতী, বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য রচনায়ও তাঁর সে প্রচেষ্টা আন্তরিকভাবেই ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচটি কন্যাকে ঘিরে, যদিও জ্যেষ্ঠা কৃষ্ণাই নায়িকা। তবু অন্যান্য নারী চরিত্রগুলিরও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে আত্মপ্রকাশের, ব্যক্তিত্বে তারা অনন্যা, আবেদনে মুখর। বিষয়বস্তু অবশ্য সেই ইটার্নাল ট্রায়েঙ্গেল বা ত্রিভুজ প্রেম। কৃষ্ণার জীবনে আবির্ভাব ঘটল দু'জন পুরুষের আর আশ্চর্য যে, দু'জনই তাকে টানল সমানভাবে; কিন্তু তবু সার্থক হল না সে, প্রতিবারই তার উদ্ধত অন্তরের গহন কোণ থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল তার দ্বিতীয় সত্তা বা দ্বিতীয় অন্তর। চেতন ও অবচেতন মনের সংঘাতে বিপর্যস্ত কৃষ্ণা অবশেষে পাঠকের মন কেড়ে নিতে সক্ষম হয় সম্পূর্ণভাবেই; আনন্দের দীপ্ত রাগিণীর মাঝে অশ্রুত বিষাদের ক্ষীণ সুরটি পাঠক যেন তার সঙ্গে একাত্ম হয়েই শুনতে পান। আর আনন্দ-বিষাদে জড়ানো এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে উদ্বেলিত হয় তাঁর হৃদয় বারবার। প্রচ্ছদ শিল্প-সুষম, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—ন' টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

ওঁ আত্মদর্শন

আত্মদর্শন মানুষের জীবনে কখন কোন সময়ে এবং কি ভাবে যে ঘটে তা বলা যায় না এবং তা বলাও কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। লেখক যে ভগবানের কৃপায় চৈতন্য সমাধির রসাস্বাদন ও আত্মোপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে তিনি তারই বিস্তারিত জ্ঞানগম্ভীর ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। লেখক সত্যাশ্রয়ী ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ও ভালবাসা গ্রন্থটিতে পরিলক্ষিত হয়। লেখক তাঁর জীবনের যে অভিজ্ঞতার বিবরণটুকুই লিপিবদ্ধ করেছেন তা সত্যই মনোরম। ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। বর্তমান যুগে এই ধরণের গ্রন্থ বিরল। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ বিধান সরণী কলিকাতা-৬। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিপ্লবী (নাটক)

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি নাটক। বিগত ইংরাজ রাজত্বের সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে বাঙলা দেশে যে গোপন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তারই পটভূমিতে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। তখনকার দিনে এই ধরণের নাটক প্রচার ও অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। তাই প্রচারের বা অভিনয়ের কোন সুযোগও ছিল না। গ্রন্থটিতে লেখক তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে কয়েকটি বলিষ্ঠ চরিত্রের সংযোজনা করা হয়েছে। তাতে গ্রন্থটির মান উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে চন্দ্রা ও শংকরজী চরিত্র দু'টি পাঠকের মনে দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। নাটকটি সত্যই অভিনয় উপযোগী। বর্তমানে এই ধরণের নাটকের বহুলপ্রচার ও অভিনয় বাঞ্ছনীয়। লেখকের বাচনভঙ্গী প্রশংসনীয়। ভাষা সহজ ও সাবলীল। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ছাপা, বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

হাতের লেখা

শিশু সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত 'হাতের লেখার' চারটি খণ্ড পেয়ে আমরা সুখী হয়েছি। শিশুকাল থেকে যত্ন না করলে মানুষের হাতের লেখা প্রায়শ সুষ্ঠু হয় না, এ বিষয়ে আলোচ্য পুস্তিকাগুলি প্রথম শিক্ষার্থীকে বিশেষ সহায়তা করবে। অ, আ, ক, খ, থেকে যুক্তাক্ষর লেখার রীতিনীতি পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়েছে এই চারটি খণ্ডে, সেই সঙ্গে আছে হাতের লেখা সম্বন্ধে সরল আলোচনা, শিশু এবং তার অভিভাবক উভয়কেই খুশি করবে মনে হয় এই হস্তলিপিগুলি। লেখক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রকাশক—শিশু-সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা—৯। দাম—প্রতি খণ্ডের পঞ্চাশ নঃ পঃ করে।

তারার আলো

প্রাচীন ভারতের মোহময় পটভূমিতে গড়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী। প্রধানত ধর্মবিদ্বেষই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, বৌদ্ধ ও হিন্দুর প্রচ্ছন্ন সংঘাতের কুটিল ধারাই শুধু নয়, অন্ধ ধর্মবিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণামও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে কাহিনীর ছত্রে ছত্রে। চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখক নিপুণ—আচার্য চন্দ্রগোমীর চরিত্রটি সত্যই অতি উজ্জ্বল। লেখকের রচনাশৈলীও প্রশংসার দাবী রাখে। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

তেইশ

রাতে দময়ন্তী ঘুমিয়েছিল কি না বলতে পারে না। সারারাত্রি তার দুঃস্বপ্ন দেখে কেটেছে। জগদীশ তার পাশের খাটে শুয়ে আছে। প্রাণ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। সকালবেলায় ডাক্তার যদি পরীক্ষা করে বলেন যে তার প্রাণ নেই, দময়ন্তী নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে। যদি অন্য কথা বলেন? যদি বলেন যে প্রাণ আছে, কিন্তু দেহটা পঙ্গু হয়ে গেছে, তাহলে? তাহলেও কি দময়ন্তী পাগল হয়ে যাবে না! কোন্‌টা ভাল সে-কথা ভাবতে গিয়ে দময়ন্তী শিউরে উঠল। প্রাণ থাকার চেয়ে না থাকাটা কি কখনও ভাল হতে পারে! কখনও না। পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে দময়ন্তী বাঁচতে পারবে, কিন্তু—

দময়ন্তী আর শুয়ে থাকতে পারল না। খাটের উপরেই উঠে বসল। ঘরের বাতি সারারাত্রি জ্বলেছে। আর সারারাত্রি ঘুমিয়েছে আদিবাসী মেয়েটা। জগদীশও চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার ঘুমও নিশ্চয়ই ভাঙবে।

দময়ন্তী উঠে গিয়ে জানলার ধারে তাকাল। চারিদিকের ঘন অন্ধকার অনেক তরল হয়ে গেছে। দিগন্ত দেখা যাচ্ছে না। আকাশ ঢাকা পড়েছে বড় বড় গাছে। এ পুব দিক না পশ্চিম, দময়ন্তী ভাবতে লাগল। পুব দিক হলে আর একটু পরেই চেনা যাবে। দেখতে পাবে আলোর বিজ্ঞাপন।

জীবনেরও কি বিজ্ঞাপন আছে?

আছে বৈ কি।

উত্তর দিল নিদ্রোত্থিত পাখি। দময়ন্তী পাখির কলকাকলি শুনতে পেয়েছে। এক একটা করে অনেক পাখি জেগে উঠল। মোরগ কখন জেগেছে, দময়ন্তী জানতে পারে নি। এবারে মোরগের ডাকও শুনতে পেল। পৃথিবী জাগছে। জগদীশ কি এবারে জাগবে না?

ঐ যে, সামনের গাছটার মাঝখানে একটু ফাঁক দেখা যাচ্ছে। ও কি আকাশ! কিন্তু অন্ধকার আকাশ তো নয়। ঐ ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছে। আলোকে অন্ধকার যে বড় ভয় পায়। পালিয়ে যায়। অন্ধকার এবারে পালাবে। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও যাবে দূর হয়ে। দময়ন্তীর আর ভয় করবে না। অন্ধকার বলেই তো তার ভয় করছিল।

দরজা খুলে দময়ন্তী এবারে বাইরে এল। বেরিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারই দরজার সামনে একটা ডেক চেয়ারে কাঠুরে চৌধুরী শুয়ে আছে। তার মুখ আছে সামনের অরণ্যের দিকে। সে যে জেগে ছিল। তা তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল। অত্যন্ত মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে: কে রে মেম সাহেব?

সহসা এই সম্বোধন শুনে দময়ন্তীর মন ঘৃণায় ভরে গেল। কোন উত্তর দিল না।

ফিরে না তাকিয়েই কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল: কেমন দেখছিস?

দময়ন্তী এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

উত্তর না পেয়ে কাঠুরে চৌধুরী সোজা হয়ে বসল। ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল: আপনি!

দময়ন্তীও এই কথা জিজ্ঞাসা করতে পারত, কিন্তু করল না। জবাবও দিল না কোন।

কাঠুরে চৌধুরী আর দেরি করল না, ঘরের ভেতরে গিয়ে জগদীশকে দেখতে লাগল নানা ভাবে। মনে হল, সেই যেন ডাক্তার, রোগীর জীবন নির্ভর করছে তারই চিকিৎসার ওপর।

দরজায় দাঁড়িয়ে দময়ন্তী এই দৃশ্য দেখল। আর আশ্চর্য হল। এমন ভাল অভিনয় করে কাঠুরে চৌধুরী!

কাঠুরে চৌধুরী কিন্তু জগদীশের দেহ স্পর্শ করল না। দূর থেকেই তাকে দেখল, নাকের কাছে হাত এনে দেখল নিঃশ্বাস পড়ছে কি না, বুকের দিকে তাকিয়ে দেখল তার বুক ওঠা-নামা করছে কি না, জীবনের স্পন্দন আছে কি না তাই দেখল ভাল করে। তারপর বেরিয়ে এল।

দময়ন্তী তাকে জিজ্ঞাসা করল না, কেমন দেখলেন। ডাক্তারবাবু জেগেছেন কি না তাও জিজ্ঞাসা করল না। বারান্দার রেলিঙ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাঠুরে চৌধরী বারান্দার অপর প্রান্তে গেল নিজের ঘরের দিকে। ডাক্তারকে ডেকে তুলল। ডাকল লবাটকেও। তারপর ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

লবাটের বৌ তখন উঠে বসেছিল। তাকে বলল: মেম সাহেবের ঘুম ভাঙল?

মেয়েটা লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল।

ডাক্তার যখন পরীক্ষা করছিলেন, দময়ন্তী এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। নিঃশব্দে সবকিছু দেখে উঠে দাঁড়াবার পর দময়ন্তী প্রশ্ন করল: কেমন দেখলেন?

তার গলার স্বর কেঁপে গেল। ডাক্তারের দৃষ্টিতে সে কোন ভাবান্তর দেখতে পায় নি। রোগী ভাল আছে, না মন্দ, তাঁর মুখ দেখে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। দময়ন্তীর উদ্বেগ বেড়েছে এই জন্যেই।

ডাক্তার এইবারে হাসলেন, বললেন : ঘুমুচ্ছেন।

কাঠুরে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে মনে হল যে সেই যেন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে। ভোরবেলায় এর চেয়ে ভাল সংবাদ আর সে আশা করতে পারে না। পিছনের দরজা দিয়েই দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। তারপর শোনা গেল তার হাঁকডাক : একেবারে হতভাগা। একটু জল গরম করতে কত সময় লাগে!

লবাটের সাড়া পাওয়া গেল না, শোনা গেল সেই মেয়েটার গলা : যেমন লোক রেখেছ, তেমন তো কাজ পাবে।

আজ থেকে তোকেও রাখব ভাবছি।

বলতে বলতেই কাঠুরে চৌধুরী ফিরে এল। বলল : মুখ হাত ধুয়ে নিন ডাক্তার সেন, চায়ের জল গরম হচ্ছে।

জগদীশ সত্যিই সারারাত মরফিয়ার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিল। চারিদিক আলো হবার পর তারও ঘুম ভাঙল। রাতে ডাক্তার গ্লুকোজ ইনজেকসন দিয়েছিলেন, এবারে দিলেন গরম দুধ। দেহের যন্ত্রণায় সে কথা কইতে পারছিল না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় বেশি কষ্ট হচ্ছে?

কোথায়!

জগদীশ তার যন্ত্রণার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগল। একটি করে সমস্ত অঙ্গের কথা ভাবল। তার মনে হল, সমস্ত অঙ্গেই সমান যন্ত্রণা।

ডাক্তার বললেন : বুঝতে পারছেন না, তাই না?

জগদীশের ঠোঁট একটু কাঁপল।

ডাক্তার বললেন : ঠিক কথা। প্রথম অবস্থায় যন্ত্রণার স্থান ঠিক বোঝা যায় না।

বাইরে এসে ডাক্তার সেন বললেন : এইবার সমস্ত দেহের ছবি তোলা দরকার।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : রোগীকে তো নড়ানো যাবে না, বাড়িতেই আপনি ছবি তোলার ব্যবস্থা করুন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার সেন বললেন : জঙ্গলের ভেতর এ বড় কঠিন কাজ।

যত কঠিনই হোক, এ ভার আপনাকে নিতেই হবে। আপনার পরিশ্রমের—

বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন : বারে বারে ও কথা বলবেন না। আমাকে ক্ষমা করবেন।

যাবার আগে ডাক্তার সেন জগদীশকে আর একবার দেখলেন : এবারে শুধু পাল্‌স্‌ দেখেই নিশ্চিন্ত হলেন না, সারা দেহে হাত বুলিয়ে দেখলেন, টিপে টিপে দেখলেন। একদিকে পাশ ফিরতে বললেন সাহায্যও করলেন তাকে। কিন্তু জগদীশ যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, পাশ ফিরতে পারল না। ডাক্তার সেন অন্য ধার দিয়ে তাকে উপুড় হতে সাহায্য করলেন। তারপর ডান হাতের দু'টো আঙুল দিয়ে জগদীশের শিরদাঁড়াটা টিপে টিপে অনুভব করলেন একেবারে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল : কোন আঘাত লাগে নি তো?

গুরুতর কিছু নয় বলেই মনে হচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে বললেন : প্রাণের আশঙ্কা বোধ হয় নেই।

চা খেয়ে ডাক্তার সেন জীপে উঠলেন। কাঠুরে চৌধুরী একখানা চেক তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।

ডাক্তার টাকার অঙ্কটা দেখে বিস্মিত হলেন, বললেন: এত কেন?

বেশি আর কি, এখন তো আপনাকে—

বুঝেছি।

চেকটা পকেটে পুরে ডাক্তার জীপে উঠলেন। বলে গেলেন: যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ফিরে আসছি।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় কাঠুরে চৌধুরী দেখল যে বারান্দায় রেলিঙ ধরে দময়ন্তী দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকাতেই বলল: শুনুন।

কাঠুরে চৌধুরী এগিয়ে গেল।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল: কত টাকা ওঁকে দিলেন?

সামান্য।

আমি টাকার অঙ্ক জানতে চাইছি।

এখন এ কথা থাক।

কেন থাকবে! আমি এখুনি জানতে চাই।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: এক হাজার।

ওঁর একরাতের ফী!

না। রোগীর যাতে অবহেলা না করেন তার জন্যেই দিয়ে রাখলাম।

কিন্তু—

কিন্তু কি?

বলবার কথা দময়ন্তীর কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

বলুন না কি বলতে চান।

এত টাকা তো আমার কাছে নেই।

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল। সেই উন্মত্ত বন্য হাসি।

ভয়ে দময়ন্তী শিহরে উঠল। বলল: আপনি হাসছেন?

হাসির কথাই যে বললেন।

কেন?

অতিথির কাছে কেউ খরচ নেয়? আপনি নেন?

দময়ন্তী কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আপনার স্বামী সেরে উঠুন, তারপর একদিন খাইয়ে দেবেন। আমি খুব খেতে পারি, রান্নার তারিফ করতেও জানি।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতেও সে ফিরে এল। বলল: একটা কথা জেনে নেওয়া হয় নি।

বলুন।

আপনার স্বামীর নাম কি?

আপনি জানেন না?

না।

শোনেন নি বাবার কাছে?

তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয় না।

তিনি তো আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

কাঠুরে চৌধুরী আর একবার হেসে উঠল। এই হাসি শুনলে দময়ন্তীর ভয় করে। বলল: এতে হাসবার কি হল?
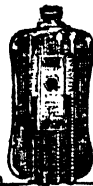
আপনার বাবা বুঝি এই কথা বলেছেন ?

ঠিক কথা নয় ?

এ সব কথা আজ নাই বা শুনলেন।

শুনলামই বা।

আমার কাছে তাঁর টাকার দরকার ছিল। আমি সেকথা জানতাম না বলেই কয়েক দিন মেলামেশা করেছিলাম।

তারপর ?

তারপর তিনি যখন আমার কথা বুঝলেন, তখন বন্ধুতা ঘুচে গেল।

সহসা দময়ন্তীর একথা বিশ্বাস হল না। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কাঠুরে চৌধুরী বলল : এবারে আপনার স্বামীর নাম বলুন।

দময়ন্তী আর আপত্তি করল না, বলল : জগদীশ মেহতা।

খুব ভাল।

কেন ?

আপনার দেশের লোক বিয়ে করেছেন।

তা না হলে কি ভুল হত ?

নিশ্চয়ই হত। শিক্ষা সংস্কারের মিল হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। আপনার বাবাকেও আমি এই কথা বলেছিলাম।

তিনি কি আপনাকে—

আপনার জন্যে পাত্র দেখতে বলেছিলেন।

কি বলেছিলেন আপনি ?

সত্যি কথাই বলেছিলাম। আপনার দেশের লোক আমার চেনা নেই, আর বাঙালীর সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে দেবেন না। বিশেষত ব্যবসাদার বাঙালীর সঙ্গে। তাদের বাইরের চাল দেখে ভুল করে ফেলবেন।

হঠাৎ প্রশ্ন করল : আপনার স্বামী নিশ্চয়ই ব্যবসাদার নন ?

কেন এ সন্দেহ করছেন ?

আপনার গাড়ি দেখে।

গাড়ির কথায় দময়ন্তীর চোখে জল এল। তারই সখে এই গাড়ি কেনা হয়েছে। সরকারের কাছে তারা টাকা ধার নিয়েছে অনেক, সে টাকা শোধ হতে অনেক বছর লাগবে।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : আপনি কিছু ভাববেন না। আমার ট্রাকে টেনে তাকে কারখানায় এনে ফেলেছি। ইনসিওর করা আছে তো, সব টাকা আদায় করে দেব।

দময়ন্তী জানে যে, সব টাকা পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেকথা আর বলল না। তার মনে তখন অন্য কথা এসেছে। ভাবছে কাঠুরে চৌধুরীর কথা। লোকটা এত ছল জানে, না তাকেই আগে ছলনা করেছে।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : আসুন, জগদীশবাবুর কাছে গিয়ে আমরা বসি।

নিঃশব্দে দময়ন্তী তাকে অনুসরণ করল।

চব্বিশ

অনেক দূর থেকে ডাক্তার সেন রেডিওলজিস্ট ধরে আনলেন, সঙ্গে আনলেন পোর্টেবল্ যন্ত্রপাতি। জগদীশের প্রত্যেকটি অঙ্গের ছবি নিলেন উল্টে-পাল্টে। বললেন : এ রকম অ্যাক্সিডেন্টের পর দেহের কোন অংশ বাদ দেওয়া উচিত নয়।

একটা ঘটনারও উল্লেখ করলেন। এক ভদ্রলোকের এক পায়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। সেই পায়ের ছবি তুলে দেখা গেল, হাড় ভেঙেছে। সে পায়ের ভাল ব্যবস্থা হল। সেরে উঠবার পরও ভদ্রলোক দাঁড়াতে পারলেন না। তখন অপর পায়ের ছবি নিয়ে দেখা গেল যে সেটাও ভেঙেছিল এবং বেয়াড়া ভাবে জুড়েছে। সেই পা আবার ভেঙে জুড়তে হল।

এরকম ঘটনা নাকি হামেশাই ঘটছে। কাজেই প্রথম থেকেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

রেডিওলজিস্টকে কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল : কি রকম দেখলেন ?

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন : ভাল।

ভাল মানে ?

বেশি জায়গায় আঘাত নেই।

ডাক্তার সেন বললেন : প্লেট না দেখে কিছুই বোঝা যাবে না।

বড় বড় চোখে দময়ন্তী সব দেখছিল। তার দিকে চেয়ে বললেন : প্লেট দেখবার পর আমি নিজেই এসে খবর দেব।

সমস্ত রকম সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ডাক্তার সেন বিকেল বেলাতেই চলে এলেন। সঙ্গে ডাক্তার ও ড্রেসার আনলেন দু-তিন জন। কাঠুরে চৌধুরী বাইরে বসেই অপেক্ষা করছিল। ব্যস্তসমস্তভাবে এগিয়ে গেল।

ডাক্তার সেনের মুখে প্রসন্নতার অভাব দেখে জিজ্ঞাসা করল : খবর ভাল তো ?

ডাক্তার বললেন : পেলভিস ভেঙেছে।

কাঠুরে চৌধুরী ঠিক বুঝল কি না বোঝা গেল না। ডাক্তার সেন বললেন : পেছনের হাড়।

তাহলে মারাত্মক কিছুই নয় ?

না।

দময়ন্তীও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেও শুনল যে মারাত্মক কিছুই নয়। কিন্তু তবু তার মুখে নিশ্চিন্ত হবার লক্ষণ দেখা গেল না। সংবাদ যে নিশ্চিন্ত হবার মতো নয়, সে কথা তারা পরে জেনেছিল। জগদীশ কতদিন পরে উঠে দাঁড়াতে পারবে বলা যায় না, কোন দিন উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না তাও নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে সে পঙ্গু হয়েও বেঁচে থাকবে, তার প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই।

এ কথা জানতে পেরে দময়ন্তী সকলের সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের সামনে কাঁদে নি। কাঠুরে চৌধুরীর সামনেও নয়। সে কেঁদেছিল জগদীশের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল।

সমস্ত কাজকর্ম সেরে ডাক্তার সেন চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সকলেই ফিরে গেছে। আজ রাতে তিনি থাকবেন না। অন্য কেউও থাকবে না। থাকবার দরকার নেই। জগদীশের জন্যে ওষুধপত্র দিয়ে গেছেন। ঘুমের ওষুধও দিয়েছেন। রাতে ব্যথা বেশি হলে সে সব দিতে হবে। দময়ন্তীই দিতে পারবে। লখাটের বৌ আছে। সেও সাহায্য করতে পারবে।

বারান্দায় বসে কাঠুরে চৌধুরী চুরুট টানছিল। আর এই সব

কথাই ভাবছিল। এ সবই অদৃষ্টের পরিহাস। তা না হলে এই অরণ্যের ভেতর এমন দুর্ঘটনা কেন ঘটবে! আর ঘটবেই যদি তো কাঠুরে চৌধুরীর সামনে কেন ঘটবে! দময়ন্তী না হয়ে অন্য কোন মেয়েও তো হতে পারত, অচেনা অজানা জায়গার মেয়ে! তাতে আর কিছু না হোক, নিজেকে এমন অপরাধী বলে ভাবতে হত না।

দময়ন্তী কেন তাকে সন্দেহ করল! কেন ভাবল যে সে তার স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। দময়ন্তীর সঙ্গে তার কোন শত্রুতা তো নেই, শত্রুতা নেই তার স্বামীর সঙ্গেও। জগদীশকে সে চেনে না, দেখে নি কোনদিন, তার নামও সে জানত না। দময়ন্তীর যে বিয়ে হয়ে গেছে, সে খবরই সে পায় নি, দময়ন্তীর খবর রাখবারই তার কোন প্রয়োজন হয় নি। তবে কেন দময়ন্তী এমন সাংঘাতিক অভিযোগ করল!

কাঠুরে চৌধুরী এটিকে সাধারণ ঘটনা বলে ভাবতে পারল না। এর আড়ালে কোন রহস্য আছে বলে তার মনে হল। নরোত্তম খেমলানি কি দময়ন্তীকে কিছু বলেছেন। কি এমন বলতে পারেন যে তাকে এমন ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে হবে। তবে কি দময়ন্তী তাকে তার পাণিপ্রার্থী বলে সন্দেহ করেছিল! ছি-ছি। সে কি নিজেকে চেনে না যে এমন ফুলের মতো মেয়ের দিকে সে তার কর্কশ হাত বাড়াতে যাবে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একদিন যে সে তার হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু সে তো তাকে অপমান করতে নয়, তাকে খানিকক্ষণ ধরে রাখবার জন্যে। তার সামনে মদও খেয়েছিল অনেকটা। মদ তো অনেকেই খায়, মদ খাওয়া কি দোষের! দোষ হয় মাতলামি করলে। কাঠুরে চৌধুরী নিজেও মাতালকে ঘৃণা করে। তবে?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। দময়ন্তী নিজে না বললেই কাঠুরে চৌধুরী কোনদিনই এর কারণ খুঁজে পাবে না। আর কারণ না জানা পর্যন্ত তার মনে কোন শান্তি থাকবে না। অজ্ঞানে মানুষ অনেক দোষ করে. কিন্তু শাস্তি পেলেই তার অপরাধের কথা জানতে চায়। রাম যখন শম্বুককে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন সে-ও জানতে চেয়েছিল তার অপরাধের কথা। অপরাধ না জেনে কে শাস্তি নিতে রাজি হয়।

কাঠুরে চৌধুরীর হঠাৎ চোখ পড়ল যে দময়ন্তী এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার রাত, ঘনকৃষ্ণ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই, তারার আলোয় পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয় না। বারান্দায় যে বাতি জ্বলছে তাতে একটুখানি স্থান আলোকিত হয়েছে। দময়ন্তীকে চেনা যাচ্ছে। কাঠুরে চৌধুরী কি করবে, ভাবল অল্পক্ষণ। তারপর ডাকল: এদিকে আসুন।

দময়ন্তী কোন উত্তর দিল না, কিন্তু ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল।

গলার স্বর যথাসম্ভব সংযত করে কাঠুরে চৌধুরী বলল: বসুন।

সামনে আর একখানা ডেক চেয়ার ছিল। নিঃশব্দে দময়ন্তী বসে পড়ল।

কাঠুরে চৌধুরী এবারে কি বলবে ভাবতে লাগল। যে কথা সে ভাবছিল তা বলা যায় না। সে কথার উত্তর পেতে হলে আরও ধৈর্য ধরা উচিত। সবুরে মেওয়া ফলে। দময়ন্তী হয় তো নিজেই তার ভুল একদিন বুঝবে। আজ সে তাই অন্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করবে।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল: কিছু বলবেন?

একা দাঁড়িয়ে আছেন। তাই ডাকলাম।

ও।

একা থাকলে মন বড় ভার হয়। ভাল কথা তো মনে আসে না, যত দুর্ভাবনার কথা মনকে চেপে ধরে।

হ্যাঁ।

জগদীশবাবু এখন ঘুমুচ্ছেন?

দময়ন্তী মাথা নেড়ে সমর্থন করল।

কাঠুরে চৌধুরী খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর জিজ্ঞাসা করল: রাতে আপনারা কি খান?

রুটি।

এরকম শক্ত রুটি নিশ্চয়ই নয়। লবাট একেবারেই রুটি করতে পারে না।

আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অসুবিধা হলেই কি আর বলবেন! কাল একটা ভাল রাঁধবার লোকের ব্যবস্থা করব।

দময়ন্তী প্রবল ভাবে বাধা দিয়ে উঠল, বলল: না, না. তার কোন দরকার নেই, আপনি অকারণে এমন ব্যস্ত হবেন না।

কাঠুরে চৌধুরী থেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দময়ন্তীই আবার বলল: এমনিতেই তো আপনাকে পাগল করে দিচ্ছি।

আমাকে বলছেন?

আপনাকেই তো।

কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠল। বলল: আপনি দেখছি সত্যিই পাগল।

কেন?

আমার কথা ভেবে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন।

আপনাকে কি রকম বিপদে ফেলেছি বলুন তো।

আপনি বাঘ না ভালুক যে আমাকে বিপদে ফেলবেন! হাতে বন্দুক থাকলে ওদেরও আমি বিপদ ভাবি না।

একটু থেমে বলল: আমার বিপদ কি জানেন?

না।

আশেপাশে একটা ভদ্রলোক নেই, যার সঙ্গে গল্প করে দু'দণ্ড কাটাতে পারি। এই বনের ভিতর আমি একেবারে একা।

দময়ন্তীর সহসা ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে, এতদিন বিয়ে করেন নি কেন। কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যে শালীনতার অভাব আছে বলে তার মনে হল। মেয়ে হয়ে একজন পুরুষ মানুষকে বুঝি একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। তাই চুপ করে রইল।

কাঠুরে চৌধুরী সহাস্যে বলল: আপনি আমার সমবয়সী বন্ধু হলে কি বলতেন জানেন?

কি?

বলতেন, এতদিন বিয়ে করিস নি কেন।

দময়ন্তীর আর সঙ্কোচ রইল না, বলল: ঠিক কথা।

কাঠুরে চৌধুরী আবার হেসে উঠল হা-হা করে। বলল: ঠিক কথা। তাহলে সেই মেয়েটার অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। বলে-

জঙ্গলে সারাদিন আমি টো-টো করে ঘুরে বেড়াই, সকালে বেরিয়ে ফিরি সন্ধ্যাবেলায়। সারাদিন একা থেকে সে-ই প্রথমে পাগল হবে, তারপর পাগল করবে আমাকে। তার চেয়ে এ বেশ আছি।

দময়ন্তী বলল: সবারই তো এই অবস্থা। পুরুষেরা সকালবেলায় বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যাবেলায়। যত বড় লোক, তত বেশি সময় বাইরে থাকে। কেরাণীরাও বাড়ি থাকে না দশটা-পাঁচটা। তাই বলে কি তারা সংসার করে না!

কাঠুরে চৌধুরী এ কথার উত্তর দিল না। বলল: আমার অনেক দোষ, জানেন! সেসব দেখলে যে কেউ আমাকে ঘেন্না করবে।

দোষের কথা দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল না। হয় তো এমন উত্তর পাবে যে লজ্জা রাখবার তার সীমা থাকবে না। তাই এ প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্রশ্ন করল: ভাল বই পড়েন না কেন?

অসহ্য।

কেন?

তার চেয়ে ছারপোকা মারলে ভাল সময় কাটবে।

উত্তর শুনে দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল: ছারপোকা মারা বুঝি আপনি সবচেয়ে বিরক্তির কাজ মনে করেন?

মাছ ধরার মতো। ওসব পুরুষের কাজ নয়।

পুরুষরাই তো মাছ ধরে, মেয়েদের আমি মাছ ধরতে দেখি নি।

সে এক অন্য জাতের পুরুষ। মুখোমুখি যুদ্ধ করার সাহস নেই বলে বঁড়শি দিয়ে মাছ গাঁথে। তার চেয়ে জাল ফেলে মাছ ধরা ভাল। সে অনেক ভদ্রলোকের কাজ।

আসল পুরুষেরা বুঝি বন্দুক হাতে নিয়ে বাঘ শিকার করে বেড়ায়?

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল। আদিম মানুষের মতো অবাধ আনন্দের হাসি। বলল: দু'দিনেই আমাকে চিনে ফেলেছেন দেখছি।

এই মন্তব্যে দময়ন্তী লজ্জা পেল। কোন উত্তর দিল না।

শহরের লোকেরা আমাকে কি বলে জানেন?

জানি নে।

কাঠুরে চৌধুরী বললে, বলে বুনো চৌধুরী। আমার হাবভাব নাকি একেবারে বুনো।

দময়ন্তী হাসল।

শহরের লোক বনে এসে আমার নাম রেখেছিল কাঠুরে চৌধুরী। আর শহরে গেলে আমার নাম হয় বুনো চৌধুরী।

আপনার আসল নাম কি?

সে নাম লোকে ভুলে গেছে। আমারও সব সময় মনে থাকে না। আপনিও আমাকে কাঠুরে বলে ডাকতে পারেন।

ছি ছি, ও নামে কাউকে আবার ডাকা যায় নাকি!

কেন যাবে না! আমার যদি অন্য নাম না থাকত!

দময়ন্তী আর জোর করল না। সভ্য জগতে নামের চেয়ে পদবীর দরকারই বেশি। মিস্টার এক্স বললে আন্তরিকতার প্রকাশ পায় না।

তাতে মেলামেশার সুবিধা হয়। অপরপক্ষ ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ টারায়। মিস ওয়াই বলে কোন কুমারী মেয়ের হাত ধরা যায় না। মিসেস জেড তো একটা ভয়াবহ নাম। এ যুগের সভ্য জগৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ বাঁচিয়ে রাখতে চায়। পুরুষের সঙ্গে নারীর। এই প্রভেদটা বেঁচে থাকলেই সমাজের সমস্ত সমস্যা বেঁচে থাকবে। সমস্যা না থাকলে দুনিয়া চলবে কি করে?

কাঠুরে চৌধুরী যখন দেখল যে দময়ন্তী আর কিছু বলল না, তখন নিজের কথাই বলল: মাঝে মাঝে যখন এই জঙ্গলের ভেতর হাঁপিয়ে উঠি তখন শহরে পালিয়ে যাই। কখনও রাঁচি। কখনও হাজারিবাগ। কখনও বা ধানবাদে। কয়েকটা দিন খুব হুল্লোড় করি। বন্ধুরা তামাসা করে বুনো চৌধুরী বলে। মেয়েরা বলে বুনো বাঘ।

আপনি এ সব কথা সহ্য করেন?

কাঠুরে চৌধুরী হেসে বলল: সামনে কি আর বাঘ বলে। বলে আড়ালে, আমি চলে অসবার পর।

তবে আপনি জানলেন কি করে?

মানুষের কোন কথা কি গোপন থাকে! লোকে বলে দেওয়ালেরও কান আছে। কিন্তু দেওয়াল যেখানে নেই? সত্যি বলতে কি, কান আছে বাতাসের। একজনের কথা হাওয়ায় ভেসে আর একজনের কানে যায়। তাই না?

বোধ হয় তাই।

বোধ হয় কেন বলছেন, নিশ্চয়ই তাই। আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন। আমাদের মনেরও কান আছে, সেই কান দিয়ে না-বলা কথাও শোনা যায়।

দময়ন্তী হেসে বলল: আপনি কি কবি?

হা-হা করে কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল, বলল: বেশ বলেছেন। এই বদনাম আমার প্রথম শুনলাম।

এ কি বদনাম?

বদনাম নয়। জীবনের ধর্মের কথা যে ভুলে গেছে, সেই তো বসে বসে ভাবে। আর লেখে। আমাদের যে রক্ত-মাংসের জীবন। শুকনো পাতা আর কালির আঁচড় নিয়ে আমরা বাঁচব কি করে?

কাঠুরে চৌধুরীর কথাগুলো দময়ন্তীর ভারি অদ্ভুত লাগছে। এ রকম কথা এর আগে সে কোনদিন শোনে নি। বলল: বেশ বলেছেন।

কেন, ঠিক বলি নি?

ঠিক বলেছেন কি না, তা কি আমি বলতে পারি!

একটু ভেবে দেখলেই বলতে পারবেন। এই ধরুন না, আপনি ঐ অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলেন, কত আজগুবি কথা আপনার মনে আসছিল। আমি ডেকে আপনাকে এইখানে বসালাম, আর আমিও নানা আজগুবি কথা আপনাকে বললাম। কোনটা আপনার ভাল লাগল?

দময়ন্তী হাসল।

উৎসাহিত হয়ে কাঠুরে চৌধুরী বলল: গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরা গিয়ে হিমালয়ে তপস্যা করুক, আমরা বাধা দেব না। কবিতা লিখে কেউ সুখ পায় লিখুক। বই কিনে বন্ধুর বিয়েতে আমরা উপহার দেব। এখানে আমরা কেন বারান্দার দু'প্রান্তে বসে আকাশ-পাতাল ভেবে মন খারাপ করব! যা হবার তাই তো হবে, আমাদের দুর্ভাবনা দিয়ে তো অদৃষ্টের মোড় ফেরানো যাবে না?

এ যে সত্য কথা, দময়ন্তীর তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ করেও লাভ নেই কোনও। তবু সে তাকে সমর্থন করতে পারল না। ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল কাঠুরে চৌধুরীর চোখের দিকে।

আপনার ঘুম পেয়েছে।

না তো।

খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে। এবারে শুয়ে পড়ুন।

উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ও মেম সাহেব, তোরা মরে গেলি নাকি।

বসবার ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বার করে মেয়েটা হাসল। লবাটিকেও দেখা গেল তার পাশে।

কাঠুরে চৌধুরী একটা ভেংচি কেটে বলল: দেখছেন সাহেব আর তার মেমকে! এরাই ভাল আছে।

দময়ন্তী আজ এই মেয়েটাকে দেখে রাগ করল না। নিজের সঙ্গে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী ফিরল একা।

[ক্রমশ।
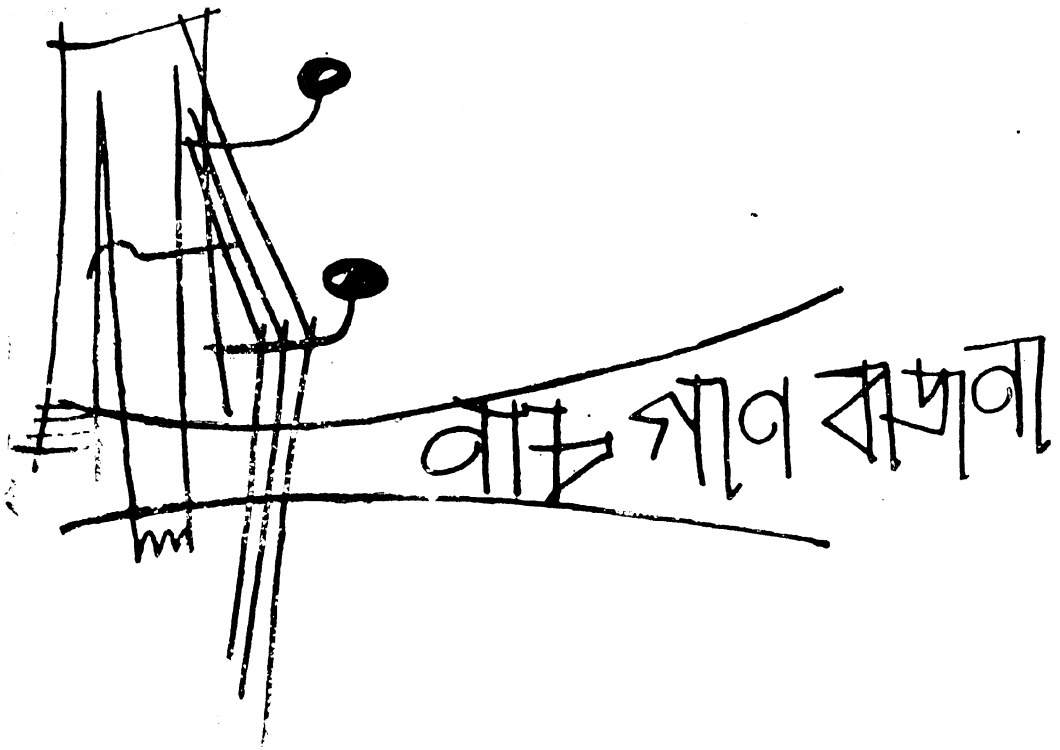
স্বামীজীর উপর সঙ্গীতের প্রভাব

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে খেতড়ির মহারাজের আলাপ-পরিচয় হয়। স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী শ্রবণে মহারাজ তৎপ্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে আহ্বান করেন। তিনি সম্মতি দান করিলে স্বামীজী মহারাজও পাত্র-মিত্রাদি সহ ট্রেনে জয়পুর পৌছেন। তৎপর রথারোহণে ৯০ মাইল দূরস্থিত খেতড়ি রাজ্যে আগমন করেন।

তৎকালে মহারাজ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একান্ত বিশ্বাস স্বামীজী আশীর্বাণী উচ্চারণ করিলে তিনি পুত্রমুখ দর্শন করিবেন। স্বামীজীও মহারাজের একান্ত বিশ্বাস ও আগ্রহাতিশয্য-দর্শনে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদ করিলেন। অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন স্বামীজীর এই আশীর্বাণী নিষ্ফল হয় নাই।

একদা গ্রীষ্মসন্ধ্যায় মহারাজ বয়স্যদের সহিত প্রমোদ-উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া সুশীতল সমীরণ সেবন করিতেছেন আর বিরাট পুরীমধ্যে কতিপয় নর্তকী বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে মধুর সঙ্গীতধ্বনি করিতেছে। উদাসমন। মহারাজের ঐকান্তিক বাসনা হইল স্বামীজীকে সেখানে আনাইয়া মনের শূন্যতার বিলোপ সাধন করেন। মহারাজ তাঁহার একান্ত সচিবকে স্বামীজীর নিকট প্রেরণ করিয়া অনুরোধ জানাইলে তিনি মহারাজ সমীপে আগমন করেন। অল্পক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ হইলে মহারাজ জনৈক নর্তকীকে একটি গান গাহিতে আজ্ঞা করিলেন। রমণীর কোমল কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র স্বামীজী সন্ন্যাসীর পক্ষে তথায় অবস্থান অনুচিত জ্ঞান করিয়া গাত্রোত্থান করেন। বিশেষত সঙ্গীতাদি ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক সাধারণত সচ্চরিত্রা নহে বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। স্বামীজী উত্থান করিবামাত্র মহারাজ তাঁহাকে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া কহিলেন,

'স্বামীজী এই গায়িকার সঙ্গীত শ্রবণে সাধারণ লোকের মনেও উচ্চভাবের সঞ্চার হয়; সুতরাং আপনি অবশ্যই উহার উচ্চভাবপূর্ণ সঙ্গীতে আনন্দ লাভ করিবেন। অতএব দয়া করিয়া একটি সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যান।'

মহারাজের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ আসন গ্রহণ করিলেন। মনে করিলেন একটি গান শুনিয়াই তিনি প্রস্থান করিবেন। রমণীর সঙ্গীত চলিতে লাগিল। রাত্রি তমসাচ্ছন্না, স্থির-প্রশান্ত, নীল নভোমণ্ডল নক্ষত্রখচিত। এমতকালের বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সুরদাসের অভিনব পদাবলী নারীকণ্ঠে অপূর্ব ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল :—

প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।

পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়,
দু'হু এক কাঞ্চন করো।
এক নদী, এক লহর, বহত মিলি নীর ভরো।
যব মিলিহে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো।
এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাঁহে ভেদ করো।'

অনুবাদ—

প্রভু, আমি অধম, আমার গুণহীনতার দোষ ধরো না,
নামটি সমদর্শী তব ওরাও দিয়ে প্রেমকরুণা।
যে লোহা রয় পূজার ঘরে
তাহাই থাকে ব্যাধের শরে ;
পরশ পাথর উভয়েরে পরশ করে বানায় সোনা।
একই সলিল নদীর বুকে বহিলে যা শুদ্ধ অতি,
নালার মাঝে থাকলে তাহাই ময়লা ভরা রুদ্ধগতি।
দুইটি যবে এক হয়ে যায়
ভেদ থাকে না আর কিছু তা'র
সুরধুনি নাম ধরে দোঁহার এক রূপ হয় পরিণতি।
জীবে এবং ব্রহ্মে অভেদ, অজ্ঞ কেবল বুঝে না সে ;
হে জ্ঞানবান্, তুমি কেন ভেদ কর কও সুরদাসে।

এই সঙ্গীতটি শ্রবণে স্বামীজী পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই সঙ্গীতকারিণী সাধারণ মহিলা হইলেও অন্ত 'নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়' এই পরম সত্যটি সে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। স্বামীজী নিজেও কহিয়াছিলেন গানটি শুনিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এই ত' আমার সন্ন্যাসধর্ম! আমি সন্ন্যাসী আর এই রমণী পতিত', এই ভেদবুদ্ধি এখনও আমার দূর হইল না! সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধি বস্তুতই কঠিন ব্যাপার।' সঙ্গীতকারিণীর ভাবাদীপ্ত কণ্ঠের প্রতিটি শব্দ যেন প্রদীপ্ত লৌহ-শলাকার ন্যায় স্বামীজীর বিভেদ জ্ঞানকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিল, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' স্বামীজী ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন, 'মা, আমিও অপরাধী, আপনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আমি গাত্রোত্থানপূর্বক প্রস্থানে উদ্যত হইয়াছিলাম। এখন আপনার অপূর্ব সঙ্গীতে আমার চৈতন্যোদয় হইল।'

বেহালা

প্রভাকর সেন

ইওরোপ এবং পশ্চিম মহাদেশে যে কতক সঙ্গীত যন্ত্রের ব্যবহার আছে তন্মধ্যে বেহালা হল অন্যতম এবং জনপ্রিয় ; বিশেষ করে পশ্চিমী Orchestra (ঐকতান) বাদনের ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্যে বেহালা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে বহুকাল যাবৎ। তাই, খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা অনুমান করি যে বেহালা পশ্চিমী যন্ত্র। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে আসল কথাটি যথেষ্ট প্রমাণ সহকারে। Encyclopaedia Britannica গ্রন্থে বলা আছে যে বেহালা ভারতীয় যন্ত্রের অন্যতম। বেলজিয়াম দেশের ব্রুসেলস (Brussels) শহরের সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রী F. J. Fetis মহাশয় তাঁর গ্রন্থেও বলেছেন যে বেহালার উৎপত্তি স্থান হল ভারতবর্ষ। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষ মর্মজ্ঞ শ্রী Arthur Wheaton ভারতীয় যন্ত্রসমূহের এক তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তার মধ্যে বেহালা যন্ত্রের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন।

খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে অর্থাৎ রামায়ণের যুগে লঙ্কাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ রাবণ এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এরনাম ধনুঃযন্ত্র (bow instrument) এতে থাকত মাত্র দু'টি তার। ভারতবাসীরা একে রাবণাস্ত্রম্ বলতেন। পরে 'রাবাণা' নামে রাবণাস্ত্রমের অনুকরণে আরও একরকম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। তাতেও তারের সংখ্যা ছিল দুই।

কিছুকাল পরে রাবণাস্ত্রম্ এবং রাবাণা যন্ত্রের অনুকরণে আরও এক ধরণের যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এর নাম 'অমৃতি।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে, এই সময় ভারতে 'তত যন্ত্র' (তারের যন্ত্র—String Instrument দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যথা—

১। ধনুঃযন্ত্র
২। অঙ্গুলিত্র তত যন্ত্র

আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তুটি উক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই ধরণের মন্তব্য আবার অনেকে করে থাকেন যে সারেঙ্গী যন্ত্র থেকে বেহালার সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, আমরা আপাতত 'অমৃতি' যন্ত্রকেই অনুসরণ করব।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে, 'অমৃতি' যখন আবিষ্কৃত হয় তখন নাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে পারস্য দেশের বিলক্ষণ সংস্রব ছিল। তা'হলে বুঝতে হবে যে এই দুই দেশের মধ্যে বিস্তর পারস্পরিক আদান-প্রদানও ছিল। এখন, এই যন্ত্রটি ক্রমে ক্রমে পারস্য দেশে প্রচলিত হয়। পারসীয়ানরা এর অনুশীলনও করতেন যথেষ্ট। তারপর, কিছুকাল পরে অমৃতি পারস্য থেকে আরব দেশে উপস্থিত হয়। প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে, ঐ সময়ে ঐ দেশে ধনুঃযন্ত্র, (bow instrument) ছিল না অর্থাৎ অমৃতিই প্রথম ধনুঃযন্ত্র হিসাবে আরব দেশে প্রচলিত হয়। এর থেকেই পরিস্ফুট হয় যে ইতিপূর্বে আরবে ধনুঃযন্ত্র বা (bow instrument) ছিল না। আরবীয়ানরা এর নামকরণ করেন 'কেমানজে-জৌজ' (Kemangeh-a-gouz)। নূতন নামধারণ করা সত্ত্বেও অমৃতি অবয়বে কোন পরিবর্তন লাভ করে নি ; শুধু দেশভেদে নামের পরিবর্তন হয়েছে। অমৃতি আর কেমানজে-জৌজ যন্ত্রের দিক থেকে অভিন্ন।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে।

এরপর অষ্টশতাব্দীর (800 A. D.) কথা—আরবীয়ানরা বা মুরজাতি স্পেন (Spain) আক্রমণ করে।

এই সময় কেমানজে-জৌজ থেকে আবার আরও এক যন্ত্র তৈরি হয়, এর নাম হল 'রিবেক্'। 'রিবেক্' যন্ত্রটি আরবীয়ানদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বলাবাহুল্য অমৃতিরই নবসংস্করণ হল রিবেক্। সঙ্গীতজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে সৈনিক, ধনী, দরিদ্র প্রায় সকল মহলেই এর প্রভূত সমাদর ছিল।

স্পেন্ অধিকৃত হওয়ার পর আরবীয়ানরা তাঁদের সভ্যতা সেখানে প্রচার করেন—তার চিহ্ন আজও সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে স্প্যানীশ সমাজে। এই সঙ্গে রিবেক্ যন্ত্রটিও সেখানে প্রচলিত হয়। সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, রিবেক্ ইউরোপে প্রথম ধনুঃযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, ইতিপূর্বে আরব দেশের মত ধনুঃযন্ত্রের (bow instrument) ইওরোপ মহাদেশে প্রচলন ছিল না। রিবেক্ থেকেই ইওরোপে ধনুঃযন্ত্রের সূচনা হয়। এরপর, এই যন্ত্র কালক্রমে ফ্রান্সে গিয়ে পড়ে। ফ্রেঞ্চরা রিবেক্‌কে 'ভায়োলিন্' বলতেন। কিন্তু আখেরে রিবেকের রূপ অপরিবর্তিতই থাকল।

ওদিকে জার্মানীতেও রিবেকের চলন হল। জার্মানরা রিবেক্‌কে রিবেকের বদলে কেমান্‌জে-গৌজ শব্দ থেকে শুধু 'জেজ' (geige) বলতেন।

খৃষ্টীয় ১১০০ শতাব্দীতে (1100 A. D.) ইটালী দেশে রিবেক্ যন্ত্রের অনুকরণে তিনতার বিশিষ্ট এক নব যন্ত্রের আবিষ্কার হয়—এর নাম তাঁরা রাখলেন 'ভিয়ালো'। এই ভিয়ালো শব্দের অপভ্রংশে আমরা 'বেহালা' শব্দ প্রয়োগ করি। ভিয়ালো ঐ সময়ে ইওরোপের প্রায় সব দেশেই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তারপর, প্রায় ১৬০০ শতাব্দীতে (1600 A. D.) ইটালী দেশের লম্বাডি প্রদেশের 'সাল' (Sal) নগরে গাস্‌পর্ড (Gaspard) নামে এক শিল্পী ভিয়ালোর রূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন। তিনিই প্রথম ভিয়ালোতে চারটি তার সংযোগ করেন। এই প্রকার ভিয়ালো বর্তমানে 'বেহালা' নামে খ্যাত। গাস্‌পর্ড (Gaspaid)-কে তাই বলা হয়—বর্তমান বেহালার রূপদাতা। অথবা আবিষ্কারক।

তা' হলে বেহালা থেকে আমরা ক্রমানুসারে এই রকম ধারণা করতে পারি :—
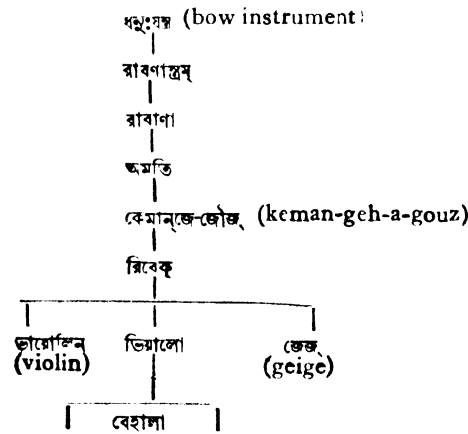
Encyclopaedia Britannica গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীরীড্ বলেছেন যে, ফ্রান্স দেশে রাজা নবম লুইয়ের (Louis IX) (1600 A.D.—১৬০০ শতাব্দী) সময়ে ক্রিমোনা (Krimonna) প্রদেশের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীআমিটী আরও এক প্রকার বেহালা নির্মাণ করেন। অবশ্য এর সঙ্গে আধুনিক কালের বেহালার অনেক পার্থক্য আছে। শোনা যায়, ঐ বেহালাটি নাকি শুধু ফ্রান্স দেশেই প্রবর্তিত বা প্রচলিত আছে। এ রকমও মতবাদ আছে যে, রিবেক্ যন্ত্র থেকে আমিটী তাঁর নিজস্ব বেহালাটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু আসলে, ইটালীতে ভিয়ালো যন্ত্র থেকে গাস্‌পর্ড যে বেহালা সৃষ্টি করেন তাই-ই সমগ্র ইওরোপে এবং উত্তরকালে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ও অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম দিকে বলা হয়েছে যে, কোন কোন মতে সারেঙ্গী যন্ত্র থেকে বেহালার জন্ম। এমন মত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের অভিমত যুক্তিযুক্ত। কারণ ধনুঃযন্ত্র থেকে সারেঙ্গীর উৎপত্তি, আবার সারেঙ্গী থেকে বেহালার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ; তবে, বাস্তবিকপক্ষে আগের প্রমাণটি আরও উজ্জ্বল।

এত সব যুক্তিযুক্ত তথ্য থেকে আমরা এখন এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, 'বেহালা বিশুদ্ধ ভারতীয় যন্ত্র'।

আমার কথা (১০৭)

গীতিকার অনল চট্টোপাধ্যায়

হাওড়ায় আমার জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আট ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আমি বড়। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই গল্প লেখার দিকেই আমার আগ্রহ ছিল। সম-সাময়িক পত্রিকায় গল্প ছাড়াও রেডিওতে গল্পদাদুর আসরে গল্প পাঠ করতাম। স্কুল ছেড়ে কলেজে যখন পড়ি তখনও এ-সব করেছি। ১৯৪৮ সালে গান গাইবার বাসনা জাগে এবং সে সময় সলিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বহু অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি তখন। গানের গলা ভাল থাকলেও নানা কারণে আমার তাও ছাড়তে হয়। সে ১৯৫২ সালের কথা বলছি। ১৯৫৩ সালে আমি গীতিকার হিসেবে H M V-তে যোগদান করি এবং সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে আমার রচিত গান গীত হয়। ১৯৫৬ সালে 'রাত ভোর' ছবির সঙ্গীতাংশ আমি পরিচালনা কার।

অনল চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৭ সালে রেডিওতে শ্যামল মিত্র আমার রচনায় একটি গান পরিবেশন করেন। গানটি ছিল 'ট্যাম কুড়াকুড় বাদ্যি বাজে।' রম্যগীতি বিভাগের জন্যও আমি বহু গান রচনা করেছি এবং সুর-সংযোজনা করেছি। ১৯৫৮ সালে 'যাত্রী' ছবিতে আমি সঙ্গীত পরিচালনা করি, অবশ্য তার আগে ভোর হয়ে এলো, পাশের বাড়ি, বাড়ি থেকে পালিয়ে, গঙ্গা ইত্যাদি ছবির সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর সহকারী হিসেবে যুক্ত ছিলাম। আমার রচিত ও সুরারোপিত বহু গানের আজ পর্যন্ত রেকর্ড হয়েছে। তবে তার মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে চলকে পড়ে কলকে ফুলে (প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়), এত সুন্দর এ জীবন (সুপ্রীতি ঘোষ), বলেছিলো কি যেন নাম (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য), প্রজাপতি প্রজাপতি (প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়), নিজেই যেতে চাই (বাসবী নন্দী), পাখীদের এককলি গান (উৎপলা সেন), রথের মেলা নাগর দোলা (সনৎ সিংহ), ওগো কৃষ্ণচূড়া (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়) ক্লান্ত চাঁদের নয়নে ঘুম (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়), নীল প্রজাপতি নীল (গায়ত্রী দেবী), ওই সুর ভরা দূর (গীতা দত্ত), তুমি নেই তাই (ইলা বসু), আনার কলি (তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি। বর্তমানে 'মনে মনে' 'দ্বিচারিণী' ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার ভার আমার উপর ন্যস্ত। গীতিকার বা সুরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার আগে বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে স্বভাবতই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এই লাইনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যাঁদের দান সর্বাগ্রে স্বীকার করতে হয় তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী জ্ঞান ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅনল চট্টোপাধ্যায় বয়সে তরুণ না হলেও যৌবন এখনও তাঁর অতিক্রান্ত হয় নি। সঙ্গীতের মান ও তার উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য তিনি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় বিবাহিত ও তিন সন্তানের পিতা।

আলপনা রায় (মিত্র)

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত আকাদামীর সর্বোচ্চ সংখ্যা লাভ করে যে ছাত্রী সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হন, আজ আপন প্রতিভা ও দক্ষতায় রসিকসমাজে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও স্বীকৃতির অধিকারিণী হ'তে সমর্থা হয়েছেন তাঁর নাম আলপনা রায় (মিত্র)। কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও বধূ। আইনজীবী শ্রীদীনেশচন্দ্র রায় তাঁর পিতৃদেব। সুকবি, শিল্পী ও গায়ক শ্রীদিলীপ রায়ের তিনি ভগ্নী। সঙ্গীতের প্রতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর আসক্তি এবং অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৫ সালে আশুতোষ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী আলপনা বেঙ্গল মিউজিক কলেজ থেকে 'সঙ্গীত-বিশারদ' উপাধি লাভ করেন। শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতেই নয়, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত এবং নৃত্যেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিনী। বেঙ্গল মিউজিক কলেজে ইনি নৃত্য সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে আত্মপরিজনের অকৃত্রিম উৎসাহ এবং আগ্রহ তাঁকে প্রেরণা জোগায়। বাবা, মামা এবং দাদার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত যত্নসহকারে এঁকে বাল্যকালে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে থাকেন এবং এঁর বয়স যখন নয় বা দশের

আলপনা রায়

ঊর্ধ্ব নয় সেই সময়ই বহু গানের আসরে এঁকে নিয়ে যান গান গাইবার জন্যে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে 'বৈতানিক'-এ প্রসাদ সেনের কাছে ইনি বেশ কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। সঙ্গীতশিক্ষায় সফলতার জন্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তানসেন পাণ্ডে, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ সেন ও সুচিত্রা মিত্রের আন্তরিকতা ও যত্নকেই দায়ী করেন। এঁর অনেক গানেরই রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি উৎসাহলাভ করেন গ্রামোফোন কোম্পানীর শ্রী পি কে সেন ও শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র-বিষয়ক বহু গ্রন্থ হিন্দীতে রচিত বলে তার পাঠোদ্ধারে অনেককেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির 'কোবিদ' পরীক্ষায় ইনি সাফল্য অর্জন করেছেন। হিন্দীভাষায় রচিত কিছু সঙ্গীতগ্রন্থের তিনি বাঙলায় অনুবাদ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। বর্তমানে ইনি কমলা গার্লস স্কুল ও গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সঙ্গীত শিক্ষকতায় নিযুক্তা আছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্রভারতী, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র জন্মোৎসব প্রমুখ মহানগরীর বৈশিষ্ট্যসমন্বিত এবং গাম্ভীর্যবিমণ্ডিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে প্রভূত সাধুবাদে বিভূষিতা হয়ে চলেছেন।

১৯৬২ সালে শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রের সঙ্গে ইনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধা হন।

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ
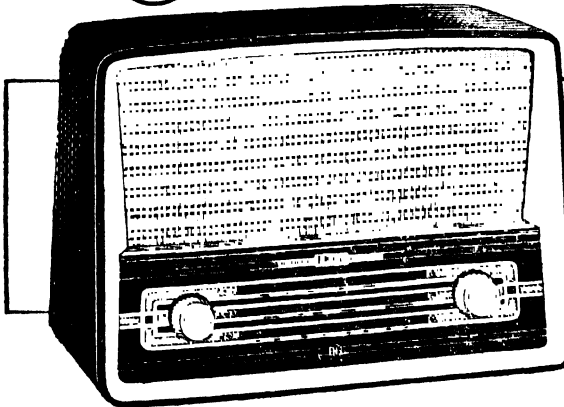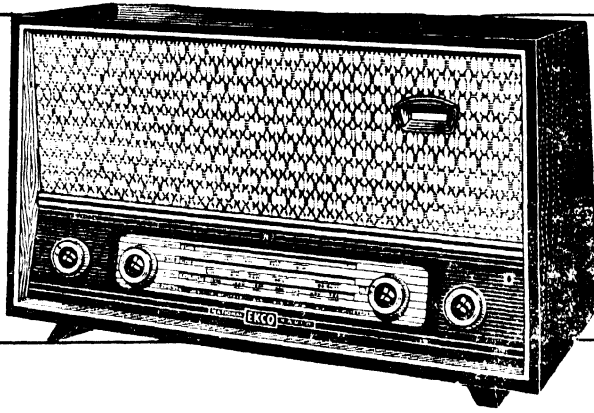
সুধীরবাবুকে সংগে নিয়ে পল ব্রান্টন বেরুলেন কাশীর রাস্তায়। গংগার তীরে পৌছন তাঁরা। জ্যোতিষী গংগাতীরের একটি ছায়ায় বসে বলেন ব্রান্টনকে : এই দরিদ্র ভারতকে নৈষ্কর্মে ধরেছে। একদিন কর্মের উদ্দীপনায়, নবতর উত্তেজনায় উঠে বসবে সে। আর ইয়োরোপ এখন বল্গা-ছেঁড়া অশ্বের পিঠে বাসনার মূর্তিমতী সওয়ার। এই অশ্বক্ষুরধ্বনি থেমে যাবে, বাসনার সওয়ার তার তৃপ্তিহীন তৃষার মরীচিকা থেকে পিছু ফিরবে। তৃষ্ণার শান্তি বাইরে নেই ;—যেই বুঝবে সেই জ্বলবে আলো-অন্ধকারে'। ম্যারিকারও একদিন এই একই অবস্থা হবে।

ভারতের বহু সাধকের ধারা প্লাবিত করবে পাশ্চাত্যকে। নেপাল আর তিব্বতে রক্ষিত জীবন-মৃত্যুর রহস্যোন্মোচনের সূত্র অবারিত হবে পশ্চিমের কাছে। আসল ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তার সংগে পশ্চিমের বিজ্ঞানের মাল্যবদল হবে। পৃথিবীতে জ্বলে উঠবে স্বর্গের সংগে মর্তের মাল্যবদলের মিলনরাত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনির্বাণ শিখা!

ব্যক্তি মানুষের মতো প্রত্যেক জাতিরও কর্মফল আছে এবং তা এড়ানো অসম্ভব। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে ব্যক্তি মানুষের মতোই সমগ্র জাতিকেও প্রার্থনা করতে হয়। সেই প্রার্থনার উত্তরে যুগে যুগে আসেন ভগবানের দূতেরা। তাঁরা বলেন,—

'ভালোবাসো ; অন্তর থেকে বিদ্বেষ বিষ নাশো।'

ঈশ্বর তাহলে পৃথিবীতেই আছেন ?

নিশ্চয়। ফুল ফোটে মানে যিনি সুন্দর তিনি আবির্ভূত হন। নদী বয় মানে তাঁর করুণাধারা অবতরণ করে। এরা ঈশ্বরের প্রতীক। মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতীক। জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসাই,—ঈশ্বরের সবচেয়ে ভালোবাসা।

তেতাল্লিশ

'অবশ্য জ্ঞানীর পক্ষে সর্বত্রই কাশী—ইহা সত্য,'.....

—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ।

বিদ্যার যিনি অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানের যিনি মূল, তিনি সরস্বতী। তিনিই সকল স্বরের ঈশ্বর। তিনি সকল সৎ-এরও মূল ; তিনি সতী। তাঁর বর তিনিই স্বয়ং। তাই অন্য সকলের ক্ষেত্রে শুধু পুত্র। কিন্তু সরস্বতীর সন্তান মাত্রই বরপুত্র। সরস্বতীর বরপুত্র বিশ্বনাথের বারাণসীতে ভারতের শেষ অশেষ বিস্ময় ডক্টর গোপীনাথ পদ্মবিভূষণ উপাধিত হয়েছেন। ভাবি, ওই উপাধি তাঁর ভূষণ, না তিনিই পদ্মের ভূষণ। পদ্মর আরেক নাম শতদল। গোপীনাথ ভারতের মানসসরোবরের শ্রেষ্ঠ শতদল। তর্ক-বিতর্ক, সম্প্রদায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলায়িত এক শতদল এই দেশে ; তার মধ্যে এক শতদল ওই পাণ্ডিত্যের অহংকারশূন্য ভক্তির অলংকারপূর্ণ কুম্ভ।

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের লেখা, সাধুদর্শন ও সৎ প্রসঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে সবে। এ অদ্বিতীয় গ্রন্থ গোপীনাথ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কলমে উচ্চারিত হবার কথা নয়। প্রকাশক তাঁর নিবেদনে বলেছেন, ডক্টর গোপীনাথের বুদ্ধি বেদোজ্জ্বলা। আমি বলি, ডক্টর গোপীনাথের কথা বেদনোজ্জ্বলা। পরমের জন্য চরম আকূতি ব্যতীত, শত শত সাধনার ধারা যে আধারে আনন্দাশ্রু ধারা বইয়ে দিয়েছে, সেই সারস্বত সাধনা গোপীনাথের গভীর আনন্দের সুগভীর বেদনার অপার্থিব সংগম, সাধুদর্শন ও সৎ প্রসঙ্গ রচনা অসম্ভব হতো। গোপীনাথের এই সৎ প্রসঙ্গর চেয়ে সৎ অবশ্যই গোপীনাথের সংগ ; গোপীনাথের চেয়ে বড় সাধু আর ভারতবর্ষে আছেন কেউ বলে জানি না। কালীপদ গুহরায় বলতে পাবেন ; আমি পারি নে।

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ-ও মূলত কাশীর কথাই। কাশী মানেই ভারত। মহাভারতের কথা যেমন কাশীরামের, কাশীর কথাও তেমনই গোপীনাথের কাছে যে শোনে সে ভাগ্যবান !

এই গ্রন্থে, গোপীনাথ এবারে এমন একটি আশ্চর্য কাশীবাসীর কথা বলছেন যাঁর বৃত্তান্ত আমাকে আশ্বাসে আনন্দে বিহ্বল করেছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের এমন বিচিত্র উজ্জ্বল চিত্র বিরল। যাঁর কথা তিনি বলেছেন সেই সর্বত্যাগী গৃহস্থের নাম, স্বর্গত শশিভূষণ সান্যাল। এই সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে তাঁর নিজের লোক ছাড়াও ছাত্র এবং আর্তরা থাকতেন। অবশ্য, এরকম মানুষের কাছে কে নিজের আর কে বাইরের লোক তা বলা একটু অর্বাচীনতা বটে। সে যাই হোক, সান্যাল মশায়ের সংসারযাত্রা নির্বাহ হতো কি করে, তার উত্তর দেওয়া আরও শক্ত। সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে, গোপীনাথ বলছেন, তাঁকে যে যা দিত তাই নিয়েই কোনও রকমে গড়িয়ে চলত সংসারের চাকা। সে চাকা হঠাৎ একদিন থেমে আসার উপক্রম হলো।

একদিন এমন হল যে কোথাও থেকে কিছুই এসে জুটল না। বিল্বপত্রের রস মাত্র খেয়ে গোটা দিন কাটল সকলের।

পরের দিনও তাই। তৃতীয় দিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অন্নপূর্ণা কাশীতে অন্ন জোটে নি সান্যাল মশায় এবং তাঁর বাড়ির কারুর। ক্ষুধায় কাতর সকলে; শুধু সুধায় অকাতর বিলিয়েও অক্লান্ত সান্যাল মশায় কাজ করে চলেছেন ঘড়ির কাঁটার মতো। আর্তকে চিকিৎসা, জিজ্ঞাসুকে উপদেশ,—কোথাও 'না' নেই সেই নাভুক্ত মহৎ মানুষটির।

দিবাকরদীপ্ত দ্বিপ্রহর পায়ে পায়ে গড়িয়ে এল অপরাহ্ণের আলয়ে; অপরাহ্ণের নরম আলোয়। সান্যাল মশায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গোপীনাথ বলছেন, ঐ আলোচনা সভায় সম্ভবত স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল কালী মহারাজ। তিন দিন ধরে যে খাওয়া জোটে নি যে কারুর, সান্যাল মশায়ের মুখে তার আভাস নেই কোথাও; তার বদলে ছড়িয়ে পড়েছে দর্শনালোকের আভা। কাউকে জানানও নি অন্নাভাবের কথা, কারণ,—'তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যিনি জানিবার তিনি সবই জানেন, অন্যকে জানাইবার প্রয়োজন কি? দিবার মালিকও তিনি, দিতে হইলে কোনও না কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনিই দিবেন। তাহার জন্য বৃথা অভিযোগ করিবার কি আছে?'

অন্নর জন্য না কেঁদে অন্নপূর্ণার জন্যে কাঁদো। অন্ন-মনা না হয়ে হও অনন্যমনা। যিনি ক্ষুধার কারণ, তিনিই অবারণ সুধার উৎস। তিনি যদি দুঃখ দিতে চান তাহলে তাঁর হাত থেকে রেহাই আছে কার? আবার, দুঃখের সমস্ত কারণ বজায় থাকতেও যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে দুঃখ মুহূর্তে সুখ হয়ে দেখা দিতে পারেন। শত দুঃখের মধ্যে তিনি কাউকে সুখে রাখেন; আবার সুখের মধ্যে সতত দুঃখে ম্রিয়মাণ রাখেন কারুর চিত্ত। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিবেকদংশনে কেউ ছটফট করছে,—আর কেউ, তৃণশয্যায় শুয়ে আনন্দ-রোমাঞ্চিত হয়ে আছে অকারণেই।

সান্যাল মশায়ের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

একটি রেজিস্টার্ড পার্শেল এলো সান্যাল মশায়ের নামে। একটু বাদে,—দেখা গেলো সান্যাল মশায়ের চোখে জল। নিজের শিশু সন্তানকে মৃত্যুর পর নিজের হাতে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে যাঁর চোখ দিয়ে জল বেরোয় নি একফোঁটা আজ তিনিও কি দুঃখে অভিভূত হলেন। ভীষ্মের চোখে জল দেখে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। আজ সান্যাল মশায়কে কাঁদতে দেখে কালী মহারাজ নাকি প্রশ্ন করেন: বাবা, ব্যাপারটা কি?

সান্যাল মশায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করলেন: শোকে অভিভূত হই নি; ঈশ্বর-করুণায় অভিভূত হয়েছি।

পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন চৌখাম্বার বিশিষ্ট ভদ্রলোক একজন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে, স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন যে অবিলম্বে সান্যাল মশায়কে টাকা পাঠাতে। সান্যাল মশায়ের সঙ্গে স্বয়ং বিশ্বনাথ উপবাসী আছেন। অন্নজল কিছুই
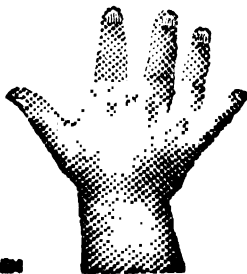
গ্রহণ করেন নি। স্বপ্নোক্ত ঠিকানায় তাই তিনি ৫০০৲ টাকা পাঠিয়েছেন এই অবিচল উজ্জ্বল বিশ্বাসে যে এ টাকা ঠিক ঠিকানাতেই পৌঁছবে।

বিশ্বাসে যে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায়, এটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

যাঁরা বলেন, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের ওপর নির্ভর করলেই কি খাওয়া-দাওয়া চলবে। না। সকলের চলা একরকম নয়। কারুর চলা নিজের পায়; কারুর উপায় নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেওয়া অচলার দু'পায়ে। দ্রৌপদী যতক্ষণ নিজের হাতে কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে আছে ততক্ষণ চুপ করে আছেন চতুর্ভুজ। যে মুহূর্তে দ্রৌপদী নিজের দু'হাত সরিয়ে নিয়ে সমর্পণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে, তখনই চারহাতে কাপড় জুগিয়ে চলেছেন পীতাম্বর। কিন্তু দ্রৌপদীকে যা সাজে, সকল মানুষকে তা সাজে না।

ভক্তকে যিনি পরীক্ষা করেন ভক্তকে উত্তীর্ণ করেনও তিনি। তিনিই ভগবান। তাঁর পতাকা যাঁকে দেন তিনি বহন করবার ক্ষমতাও তাঁকে দেন।

হরিশ্চন্দ্রকে শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যান, কারণ হরিশ্চন্দ্র কোটিকে গোটিক।

অর্থের ব্যাপারেও যেমন পরমার্থের ব্যাপারেও তেমনই সান্যাল মশায় জীবনে বারংবার অহৈতুকী কৃপার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। প্রথম বয়সে একবার পতঞ্জলিকৃত পাণিনির মহাভাষ্য পড়বার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন তিনি। বাংলা দেশে পাণিনি-ব্যাকরণের মর্মোদ্ধারী পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি ছাড়া আর বিশেষ কেউ ছিলেন না সেকালে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে কাশীর লোক একজন পাণিনি পড়াতেন। তাঁর কাছে গেলেন সান্যাল মশায়।

শাস্ত্রী মশায় বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ছাড়া আর কারুকে পড়াবার সময় নেই বলে জানালেন। তবুও সান্যাল মশাই অনুরোধ করায় বিরক্ত অধ্যাপক কটু ভাষায় তাঁকে বিদায় দেন। সান্যাল মশায় বাড়ি ফিরে প্রতিজ্ঞা করেন, অর্থ বা পরমার্থের জন্যে জীবনে কারুর দরজায় হাত পেতে তিনি আর কখনও দাঁড়াবেন না। অহোরাত্রের মধ্যে মনোভঙ্গে সান্যাল মশায় অন্নজল স্পর্শ করেন নি।

সেই রাত্রে পতঞ্জলি স্বয় সান্যাল মশায়ের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন:

'বৎস এত ক্ষুব্ধ হইয়াছ কেন? জান না কি শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপ। তুমি সমস্ত দিন অন্নজল গ্রহণ কর নাই কেন? কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমার জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সম্মত হয় নাই, তাই কি তোমার এই অভিমান? তুমি কি জান না, শ্রদ্ধাভিমান জিজ্ঞাসু ভক্ত একমাত্র ভগবৎ সান্নিধ্য হইতেই তাহার সকল প্রকার জ্ঞানের অভাব মোচন করিতে পারে? আজ আমি তোমাকে ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য শিক্ষা দিব। আমি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, আমি কি শিক্ষা দিতে জানি না?…'।

[সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ। ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭]

মহাপুরুষ তাঁর মহান বিশাল রচনার জটিল জটা থেকে অবগাহকে মুক্ত করে মেটালেন ভক্তের অভাব। তারপর অন্তর্হিত হলেন তিনি। আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অসামান্য নয়। তাহলে এত বিপুল ব্যাখ্যা কি করে এত অল্পসময়ে সম্ভব হলো?

সান্যাল মশায় বলেছেন ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁর মতে, স্থূল দেহাভিমানী অহং কোন জ্ঞানকে ধারণ করিতে বেগ ও বাধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মাভিমানী অহং তাহা অতি সহজেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

তারপর তাঁর গতরাত্রির ঘটনা সত্য কি না বোঝবার জন্যে তিনি ভাষ্যগ্রন্থ খুলে ধরামাত্র তার ব্যাখ্যা 'প্রাক্তন জন্মবিদ্যা'র মতো পূর্বস্মৃতিরূপে অপরূপ ফুটে উঠতে লাগল। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে:

'আমি বাবাজীর মুখ হইতে ভগবান পতঞ্জলির ব্যাখ্যার কোন কোন অংশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। 'স্থানে অন্তরতম্' এবং 'ত্রিয়াম্' প্রভৃতি সূত্রের আর্য ব্যাখ্যা এখনও আমার স্মৃতিফলকে যথাশ্রুতভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।'

গোপীনাথের স্মৃতিতে যা উজ্জ্বল হয়েছে তা যে বিস্মৃতির অযোগ্য একথা গোপীনাথ না হয়েও বোঝা যায় সহজেই।

সান্যাল মশায়ের কথা ছিলো সোজা, স্পষ্ট, নিঃশংক। তিনি বলতেন:

'যাহাকে দেখিলেই আমার সহানুভূতি হয়, তাহাকে আমি ভাল করিতে পারিব এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু অনেক সময়ে কোন লোককে দেখিয়া একটা বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। অবশ্য বিনা কারণেই ইহা হয়। তখন বুঝিতে পারি, আমার দ্বারা ইহার কোন উপকার হইবে না। কেন যে কাহাকেও ভাল লাগে না তাহা বাহির হইতে কোন লক্ষণের দ্বারা বুঝান সহজ নহে। অনেক সময় মনের অবস্থা এমন থাকে যে, যে-লোককে অন্য সময় দেখিলে ভাল লাগিত না, তখন তাহাকে খুবই ভাল লাগে। একজনের লেখা দেখিলেই যেন কোন কারণে মনে হয়, লোকটি বড় ভাল। শক্তির খেলা অনির্বচনীয়। যাহাকে খুব ভালবাসা যায়, তাহাকেও কোন কোন সময় ভাল লাগে না। ভাল না লাগিবার লৌকিক কোন কারণই থাকে না। তবু এইরূপ হয়। সময়ের অভাবে চিত্তবৃত্তির এইরূপ পরিবর্তন ঘটে, মূলে কিন্তু একটি অচিন্ত্য শক্তির ব্যাপার রহিয়াছে। সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে চাহিলেও পারা যায় না। অবশ্য এ-কথা আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি। আমি লোকের নিকট হইতে দীনতা চাই না, আমাকে কেহ খুব প্রণতি দেখাইলেই যে আমি খুব সন্তুষ্ট থাকি তাহাও নহে। আমি চাই লোকটি বেশ হাসিয়া কথা বলুক, বেশ সদানন্দ ও প্রফুল্ল থাকুক। তাহা হইলেই আমার ভাল লাগে। তবে দীনতা যে একেবারে ভালবাসি না তাহাও নহে। যে আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে তাহাকে আমারও ভাল লাগে। এইরূপ কেন হয় তাহা জানি না, তবে সময় সময় মনে হয়—ভগবান তো ইহাই চান। দীনতা বা প্রপত্তি ভাল জিনিষ—ইহা না হইলে সত্যের সংগে যোগ স্থাপনই হয় না।'

[সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ: ২য় খণ্ড: পৃঃ ৮৩—৮৪]

এই হচ্ছে আর্যশাস্ত্র প্রদীপ-কার শশিভূষণ সান্যালের প্রতিকৃতি এঁর কাছেই একবার এক ভদ্রলোকের হৃদ্রোগে কাতর বৃদ্ধা জননী

কেঁদে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শনের প্রার্থনা জানিয়েই। তাঁর শরীরের ওই অবস্থাতেই সান্যাল মশায় কথা দেন: বেশ, আপনাকে তীর্থদর্শন করাব। কিন্তু যে যে তীর্থস্থানে যা-যা দেখতে বলব, কেবল তাই-তাই দেখবেন। তার বেশি কিছু দেখতে গেলেই বিপদে পড়বেন।

তীর্থদর্শনে বহির্গতা বৃদ্ধা গিরনায় পাহাড়ে ওঠবার ইচ্ছায় সান্যাল মশায়ের নির্দেশ মানলেন না। হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হল। এমন অবস্থা হল যে, না পারেন আর উঠতে, না নামতে। মৃত্যু অনিবার্য অবস্থায় সান্যাল মশায়কে স্মরণ করলেন বৃদ্ধা। সান্যাল মশায় কথা দিয়েছিলেন তিনি বৃদ্ধাকে কাশীতেই যাতে তাঁর মৃত্যু হয় তা দেখবেন। কিন্তু এখন মনে হল তাঁর সে সম্ভাবনাও নেই। সান্যাল মশায়কে স্মরণ করতে করতেই, সেখানে একজন লোক হঠাৎ উপস্থিত হয়।

সে লোকটিকে দেখতে সান্যাল মশায়েরই অনুরূপ। তিনি কোলে তুলে নেন বুড়িকে এবং সব দেখান। বুকের কাঁপুনি কমে যায় এবং বুড়ি নীচে নেমে আসেন নিরাপদে।

তারপর বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ কাশী আসতে চান। ডাক্তাররা বলেন, উপর তলা থেকে নীচের তলায় নামলেই বুড়ির মৃত্যু হবে। সান্যাল মশায়ের কাছে অনুমতি চাইলে, তিনি লেখেন: 'যে যাহা বলুক, ... ভয় নাই, চলিয়া আইস।' বৃদ্ধা অন্নজল স্পর্শ না করে কা... সান্যাল মশায়ের সংগে সাক্ষাতের জন্যে নৌকাযোগে কে... যেতে গংগাতেই বরুণা সংগমে স্নানে বহির্গত সান্যা... পান।

সান্যাল মশায়ের কথায় এর মধ্যে রহস্য কিছু নে... ঈশ্বরজ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তাহাই কারি... আমি তো পাষাণ; কিন্তু পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।'

যার বিশ্বাস আছে সে কলকাতায় থেকে কাশীবাসী। যার বিশ্বাস নেই, সে কাশীতে মরলেও, আসলে মরে সটিকালিতে। তার মুক্তি নেই। গংগায় ডুব দিলে সর্ব পাপ থেকে মুক্তি হয়। একথা সত্য। কিন্তু সে কার হয়? যার বিশ্বাস আছে তারই হয় কেবল। তার একার। যে ভক্ত বিশ্বাসে ভগবানের সংগে একাকার।

[ক্রমশ।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যায় মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন
শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত।

মাসিক বসুমতী

॥ মাঘ, ১৩৭০ ॥

নয়াদিল্লীতে ব্রহ্ম-বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেঃ নে উইনের সহিত আলোচনারত শ্রীনেহরু।

'ইণ্ডিয়ান নেভিগেটার' জাহাজটিকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া ইণ্ডিয়া স্টীমশিপ কোম্পানীর দ্বিতীয় অফিসার সমীরণ কুমার রায় মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে গত ২রা জানুয়ারী ১৯৬১, প্রাণ হারান। তাঁহার বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার জন্য এ বৎসর রাষ্ট্রপতি তাঁহার উদ্দেশে অশোকচক্র (দ্বিতীয় শ্রেণী) প্রদান করিয়াছেন।

সার্ভিসেস হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ভারতীয় বিমানবাহিনী দলের অধিনায়ক সার্জেন্ট জোগরা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেঃ জে এন চৌধুরীর নিকট হইতে ট্রফি গ্রহণ করিতেছেন।

চিত্রে-সংবাদ

মাসিক বসুমতী
।। মাঘ, ১৩৭০ ।।

কৃষি উৎপাদনে কৃতিত্ব প্রদর্শনে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রকলস লাভ।
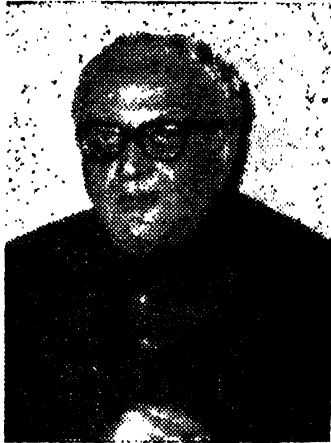
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা।
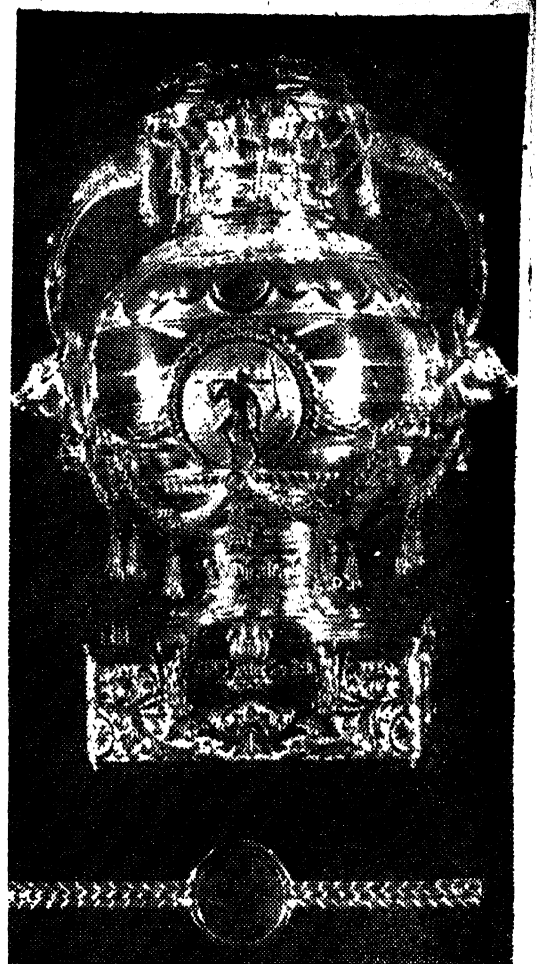
নয়াদিল্লীতে কমনওয়েলথ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণের সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন।

রঙ্গপট
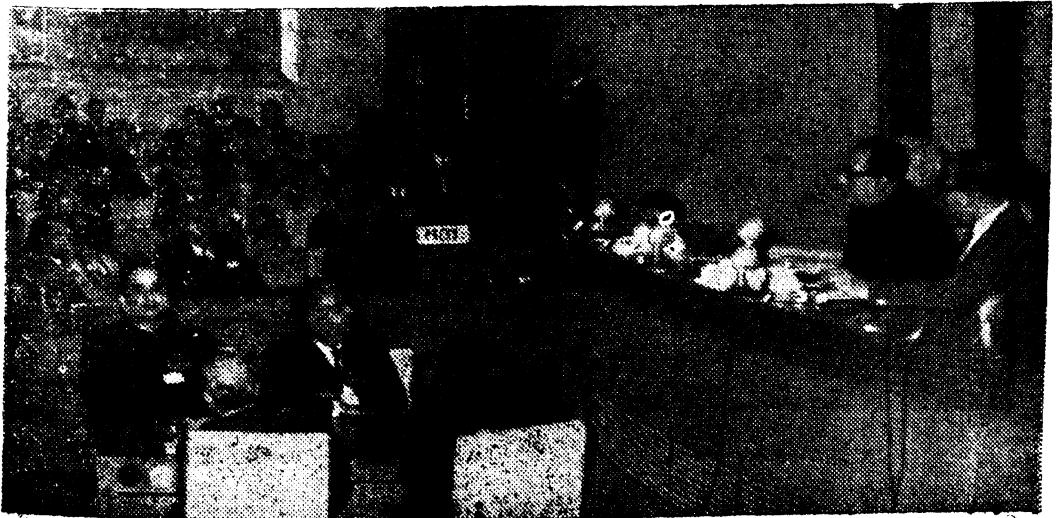
(মেরিলিন মনরো ও আর্থার মিলারের সঙ্গে কথোপকথন)

[সাংবাদিক হেনরী ব্রাগুন লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা 'সানডে টাইমস্'-এর পক্ষ থেকে আর্থার মিলার ও মেরিলিন মনরোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং তারই প্রকৃত বঙ্গানুবাদ এখানে বিবৃত হয়েছে।—স]

যখন আর্থার মিলারের কাছে ইঙ্গিত পেলাম যে, তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে একসঙ্গে পেতে হলে অবিলম্বে হলিউডে পৌছানো প্রয়োজন তখন আমি পরবর্তী প্লেনেই লস এঞ্জেলসে পৌছলাম। সেই বিখ্যাত দম্পতীকে আমি একখানি কুঁড়ে ঘর সমন্বিত ভিলা বা ত্রিভুজাকৃতি উষ্ণ সুইমিং পুল অথবা তাঁদের সেই স্নানের ঘরে—যার নল সোনা দিয়ে তৈরি, দেখাতে পাই নি। তাঁরা বেভারলি হিলস্ হোটেলের পাম-নিকুঞ্জের ছায়ায় ঘেরা বাংলো বাড়িগুলির একটির দোতলা সম্পূর্ণ অধিকার করে ছিলেন। প্রশস্ত শোবার ঘরটি তার বিরাটত্ব ও শীতল অগ্নিকুণ্ড সমেত অত্যন্ত আরামদায়ক এবং আসবাবগুলিও পুরাণো, তবুও এতে ঘরোয়া ভাব নেই। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটা মিলারদের একটা সাময়িক আবাসস্থল। ডবল বেডরুম ও রান্নাঘর দেখেও এ ধারণা বদলায় না। মিলাররা ন্যু ইয়র্কে অথবা কনেটিকাটের গ্রাম্য-আবাসে থাকতেই ভালোবাসেন। সেখানেই আর্থার মিলার তাঁর সমস্ত

মেরিলিন মনরোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আর্থার মিলার

সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। শোবার ঘরের ব্যক্তিগত দু-চারটে আসবাব—একটা ফোনোগ্রাফ ও দেয়াল দু-চারখানা বই···দ্য তকৃভিলের আমেরিকার গণতন্ত্র, ষ্টাঙ্ক ও হোয়াটের দি এলিমেণ্টস্ অব স্টাইল, ডি, এইচ, লরেন্সের সন্স এ্যাণ্ড লাভার্স, মস হর্টাস-এর এ্যাক্ট ওয়ান।

আর্থার মিলারকে যেমনটি কল্পনা করেছিলাম তিনি ঠিক তেমনি—তবে চমকে দেবার মতো লম্বা। মেরিলিন মনরো একদম উল্টোরকম। আর্থার মিলার তাঁর বুক-খোলা পোলো সার্টের মতই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে বেপরোয়া এবং উঁচু কপালের মতই শক্তিমান বুদ্ধিজীবী, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ চিবুক দেখে মনে শঙ্কা জাগে। তাঁর আপাত-শান্তভাব কিন্তু অপ্রকৃত। এর অন্তরালেই অগ্নিময় তীব্রতা ও স্নায়ুপীড়িত শ্রান্ত। তিনি গভীর চিন্তাশীল আলোচনা-কালে সেই ভাবটা ফুটে ওঠে আর তখন হঠাৎ তাঁর বাদামী-কালো চোখের তারা আবেগে বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্ত্রীর দিকে তাকানো মাত্র কিন্তু তাঁদের প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখায়। তাঁকে চেনা খুবই সহজ এবং অল্প অল্প সময়ের মধ্যেই কথাবার্তায় একটা অন্তরঙ্গতা অনুভব করা যায়। কিন্তু তিনি সেই ধরণের আমেরিকাবাসী নন যাঁরা আগন্তুককে সহজেই নাম ধরে ডাকেন।

ডিনারের পরে মেরিলিন মনরো বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। ওঁর পরণে সুন্দর চকমকে রক্ত-লাল ভেলভেটের আজানুলম্বিত স্কন্ধবিহীন পোষাক। ওঁর উজ্জ্বল স্বর্ণাভ কেশ মাথার ওপরে কাটার

লাস্যময়ী চিত্রতারকা মেরিলিন

আবদ্ধ, মুখে হাল্কা প্রসাধন। নাটকীয় অনুশীলন সত্ত্বেও ওঁর প্রবেশের উচ্চ প্রশংসা করতে পারলাম না। আর ঘরটাও ওঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যৌন-আবেগে দীপ্ত হয়ে উঠলো না। এ শুধুমাত্র একটি অনুপমা রূপসী বালিকা যে তার ছোট নরম হাত এগিয়ে দিতে দিতে লাজুক মনোহারিণীর মতো তাকাচ্ছিল; একটা নির্লজ্জা পুরুষগ্রাসী রাক্ষসী নয় বরং যেন একটা ছোট্ট বেড়াল ছানা যার পিঠ চাপড়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। ওর কণ্ঠস্বর বাচ্চা মেয়ের মতো খুব চড়া মাঝে মাঝে অকারণে কেঁপে ওঠে।

আমরা শূন্য অগ্নিকুণ্ডের পাশে বৃত্তাকারে বসেছিলাম। আর্থার মিলার দীর্ঘ সোফার এককোণে আরামে বসেছিলেন আর বাকী অংশটুকু মেরিলিন মনরো তাঁর কাঁধে মাথা সামান্য হেলিয়ে গা ঢেলে দিয়েছিল। টেপ রেকর্ডটির দিকে ও অস্বস্তিভরে তাকাচ্ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করতে প্রথমে দু'একবার ওর গলা ভেঙ্গে যায় কিন্তু তখনই মিলার স্নেহ ও প্রশ্রয়ভরে ওর হাত স্পর্শ করলেই ও শান্ত হয়।

সময় কেটে যাবার পরে আমি বুঝতে পারি যে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ পৌরুষ ওর মনে নিরাপত্তা ও গর্বের ভাব জাগিয়ে তুলেছে। অনুপম সৌন্দর্যরাণীকে জয় করে যে বুদ্ধিজীবী আশ্রয় দিয়েছেন তাতে তাঁর মনেও অনুরূপ নিরাপত্তা, গর্ব ও সন্তোষ। ওর শোচনীয় অতীত জীবন সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সচেতন।

মেরিলিন মনরো ছিল অনাথ, অপ্রার্থিত। একটুও স্নেহস্পর্শ না পেয়েই ও বড় হয়েছে এবং কোন এক সময়ে ও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। নিজের কথা বলতে গিয়ে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কখনও ওর কণ্ঠ থেকে মিলিয়ে যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন ওর গাম্ভীর্য কমে যায় এবং স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথোপকথনের সঙ্কোচ দূরে চলে যায় তখন ওর সাধারণ জ্ঞান, জীবন সম্বন্ধে সুখী দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপরকে সঞ্জীবিত করবার ক্ষমতা অত্যন্ত সহজভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ওর বালিকাসুলভ দায়িত্বহীনতায় ওর স্বামীর মুখে প্রায় অদৃশ্য ভ্রূ-কুঞ্চন দেখা দেয়।

ব্যক্তিগত গুরুতর দুর্ঘটনায় আর্থার মিল খুব বেশি ভোগেন নাই—যদিও ১৯২৯ সালের মন্দা এবং ম্যাকার্থিজমের যৌথ আঘাতের ফল তাঁকেও যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে! আমেরিকা জাতিগতভাবে যে আঘাত পেয়েছিল তাই তাঁর মনে গভীর ভাবাবেগময় উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছিল। এই মন্দাতে তাঁর পরিবারের অনেক ক্ষতি হয়েছিল যা তাঁর মনে অনশনের ছাপ রেখেছিল কিন্তু তিনি নিজেই ম্যাকারথিজমের ঝড়ে ভুগেছিলেন।

আমেরিকা-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য হাউস কমিটির সামনে তাঁকে ডাকা হলে তিনি প্রমাণ করেন যে তিনি সাম্যবাদী নন, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে কতগুলি তথাকথিত সাম্যবাদী ফ্রন্টের দলীয় সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁকে উপস্থিত ব্যক্তি-গণের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি অস্বীকার করেন। কমিটিকে তিনি বলেন, কারো নাম প্রকাশ করে বিপদে ফেলতে আমার বিবেকে বাধবে। যদিও তিনি আইনের পঞ্চম নয় প্রথম ধারা অনুসারে নিজের পথ সমর্থন করছিলেন তবুও কংগ্রেসকে অপমান করবার অপরাধে তাঁর বিচার হয়। তাঁর দক্ষ সামরিক এ্যাটর্নী জোসেফ এল রুথ জুনিয়ার কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় নি, অবশেষে ১৯৫৭ সালে কোর্ট অব এপিলের সর্বসম্মতিক্রমে এই শাস্তি নাকচ করে দেওয়া হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মিলারের ব্যক্তিত্বে জ্বলন্ত বিশ্বাস, আবেগময় সহানুভূতি এবং তীব্র দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততার সমন্বয় নাট্যকার হিসেবে গড়ে ওঠবার পক্ষে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মালমসলা। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম নাটক লেখেন এবং তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর রচিত 'একটি সেলস্‌-ম্যানের মৃত্যু' পুলিট্জার পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। মিলার অত্যন্ত উৎসুক পাঠক এবং স্ত্রীকেও তিনি পড়ান। দেখে মনে হয়, তিনি একে শিক্ষিতা করে তুলতে চাইছেন। তিনি একজন বুদ্ধিজীবী কিন্তু তা ঠিক ইউরোপীয় অর্থে নয়। সে তুলনায় তাঁর প্যাশন অত্যন্ত বেশি তীব্র। মতবাদের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ—আবার বিকর্ষণও অনুরূপ। তিনি চিন্তাবিদ কিন্তু মাঝে মাঝে চিন্তার কথা ভাবতে যেন অস্ত্র গুলিয়ে ওঠে। ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তি থেকে তিনি পালিয়ে বেড়ান কিন্তু আমেরিকার ব্যবসায়িক মনোভাবও তাঁকে বিচলিত করে তোলে। কিন্তু এই গুণগুলি তাঁর সৃজনীশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে এবং সমাজের প্রতি স্তরের দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের—যা গভীর রাত্রি পর্যন্ত গড়িয়েছিল—পরবর্তী প্রভাতে মেরিলিন মনরো আমাকে ষ্টুডিওতে আমন্ত্রণ করেন। মিলার নিজে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীর পোষাক পরিধান ও মেক-আপের দীর্ঘকালব্যাপী সময়ে ষ্টুডিওর চমকপ্রদ বহির্দৃশ্যাবলীর সেট দেখালেন। আধঘণ্টার মধ্যেই তুমি মণ্টমার্টির একটি পার্ক থেকে পারস্যদেশীয় রাজপ্রাসাদে উপনীত হতে পারবে কিংবা জার্মান দুর্গ থেকে পশ্চিম অরণ্যানীতে। ফিরে এসে দেখলাম মেরিলিন মনরোর সাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে—ওর পরণে দড়া, বাজিকরের মতো পোষাক—মাথা থেকে পা পর্যন্ত গায়ের চামড়ার সঙ্গে আটকে আছে। তবুও ওর অবয়বে একটা বালিকাসুলভ সরলতা। কিন্তু ওর

প্রখ্যাত গ্রন্থকার টম্যান ক্যাপোটের সঙ্গে নৃত্যরতা মনরো

বয়ঃসন্ধিজনিত ইন্দ্রিয়পরতা নয় ওর অদ্ভুত আমুদে ভাবই সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিল। এটাই ওর প্রকৃত গুণ—ও বিরক্তি-ভরা ক্লান্তিকে শান্তিতে, দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে পারে। স্টুডিও জুড়ে একটা হাল্কা হাওয়া বইতে থাকে। এমন কি গোমরামুখো স্টেজের কর্মচারীরাও না হেসে পারে না। ও সবাইকে চালাচ্ছে—সব কিছুকে। নিজের সত্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আর্থার মিলার ওর নাটক-শিক্ষিকা মিসেস স্ট্রাসবার্গ ও আমাকে নিয়ে আলোর পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলেন। উনি যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন—একটু সঙ্কোচ ও অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এখন মেরিলিনের দেখাবার পালা।

আমি মিসেস স্ট্রাসবার্গকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কত শীঘ্র তাঁর ছাত্রী উপযুক্ত শিক্ষিতা হবে।

ইচ্ছে করলে ও সবই করতে পারে, মিসেস স্ট্রাসবার্গ উত্তর দিলেন, তাছাড়া আমার স্বামী লী (যিনি ন্যু-ইয়র্কে অভিনেতা-স্টুডিও চালান) বলেছেন যে এখন অভিনয় হচ্ছে। জনতার সামনে ব্যক্তিগত কাজ করা এবং মেরিলিন মূলত তাই করে···কিন্তু ঠিক মতো করতে হলে ওকে আরও অনেক কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

আমরা এখন ক্যামেরার সামনে মেরিলিনকে দেখছিলাম। এখন শুধুমাত্র মেক-আপের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ছবি তুলছিল—ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ওর খুব ভালো লাগছে—যেন উষ্ণ সূর্যালোকে গা গরম করছে। হঠাৎ এক অবসর মুহূর্তে আমার চোখে ওর চোখ পড়লো। ও ছুটে সামনে এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ক্যামেরার সামনে নিয়ে এলো। সরলা কিশোরীর চাপল্যে ও উচ্ছ্বসিত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ও ক্যামেরাম্যানকে আমাদের ছবি নিতে বাধ্য করলো এবং আমি কোন প্রতিবাদ করবার আগেই একটা প্রেমের দৃশ্যের গোড়ার দিকটা অভিনয় করতে থাকে। বড় বড় ধূসর চোখের পাতা দুটি ভারী হয়ে আসে এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

'সেভেন ইয়ার ইচ'-এর একটি দৃশ্যে টম ইউয়েল ও মেরিলিন

ওর দেহ এগিয়ে আসে—মুখ স্পর্শ করে আহ্বান জানায়। বিস্ময় ও অস্বস্তিতে আমি দৃশ্যটাকে একদম নষ্ট করে দিই।

ব্রাউন। গত গ্রীষ্মকালে আমি এথেন্স থেকে ডেলফি গমনকারী একটা নড়বড়ে বাসে যাচ্ছিলাম—চালকের সীটের ওপরে একটি মহাপুরুষের ছবি ঝুলছিল এবং মিসেস মিলার তার পাশেই আপনার একটি ছবি ঝকঝক করছিল। নিজের মনেই আমি বললাম—দেবতা ও দেবী। ভাবতে চমৎকার লাগে যে রুচি ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে আপনি আন্তর্জাতিক প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন—এমন কি এফ্রোদাইতের জন্মভূমি গ্রীসদেশেও।

মিলার। আমি ওকে প্রতীক ভাবি না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ও নিজেও নিজেকে সেভাবে দেখে না। আমার পরিচিত নর-নারীর মধ্যে ও বোধ হয় সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক মানবিকতার আবেদনে পূর্ণ। আমি জানি না কি ভাবে বোঝাব—শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিপদের মাঝে অরক্ষিত অনাথা মেয়েটির জীবন এমন ছিল যা সুরক্ষিত পরিবারের অধিবাসীরা কখনও ধারণাই করতে পারবে না। বহুদিন থেকে কঠিনতম বাস্তবের পটভূমিকায় ওকে জীবনের পথে চলতে হয়েছে এবং চিরাচরিত নিরাশাঘন ভাবপ্রবণতা বা পারিবারিক অনুভূতি ওকে ভুল পথে চালাতে পারে নি। ফলে ও ওর কাছাকাছি যারা এসেছে তাদের আদিমতম ভাকে সাড়া দিয়েছে—অর্থাৎ তার আঘাত অথচ সাহায্য করবার ক্ষমতাকে—এবং সেই লোকটিও তৎক্ষণাৎ এই সত্য উপলব্ধি করেছে যে তাকে যত্ন করা হচ্ছে।

ব্রাউন। আপনার কি মনে হয় না যে এটা ওর সর্বাপেক্ষা মৌলিক অংশেরই প্রতিক্রিয়া·····

মিলার। নিশ্চয়ই। ওর সৌন্দর্য—সেজন্যই লোকে আরও আশ্চর্যান্বিত হয়। কেউ ওর মধ্যে এতটা প্রতিক্রিয়া আশা করে না। জীবনের প্রতিটি ঘটনাই ওর কাছে তার নিজস্ব এবং পরস্পর সংঘটিত প্রয়োজনীয়তাও পূর্ণ হয়ে আসে। ওর বাকচাতুর্যের মূলে সরলতা—এবং প্রায়ই লোকেরা ওর কথাগুলির ভণ্ডামিহীন ইঙ্গিত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য হাসে। মানসিক উন্নতির জন্য ও অত্যন্ত বেশি তৎপর—নইলে শুধুমাত্র সৌন্দর্য দ্বারাই ছোট চরিত্রে ও সকলের মনে এতটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারতো না।

ও সেই স্বল্প [illegible]রিকা'টির অন্যতম যার নিজের ক্যামেরাম্যান, আলো দেবার লো[illegible] এবং আরও অনেক কলাকৌশল—যা জনসাধারণের জন্য এইসব উজ্[illegible] রত্ন প্যাক করতে গিয়ে জোগাড় করতে হয়—দরকার হয় না, তারা ওর ওপরে নির্ভর করে—অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার জন্য—আর প্রকৃতপক্ষে তাই হয়। ও হচ্ছে ওরা যাকে বলে প্রদীপ্ত হোমানল শিখা।

ব্রাউন। আপনি আমেরিকাতে যৌবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কি ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশে এরকম প্রতীক-বাদ নেই। ফ্রান্সে ব্রিজিত বার্দোকে বোধ হয় আমেরিকাতে রপ্তানী করবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। কেন আপনি আগের আরও কয়েকজনের মতো যৌবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মিলার। কারণ, ও হচ্ছে প্রতিভা।
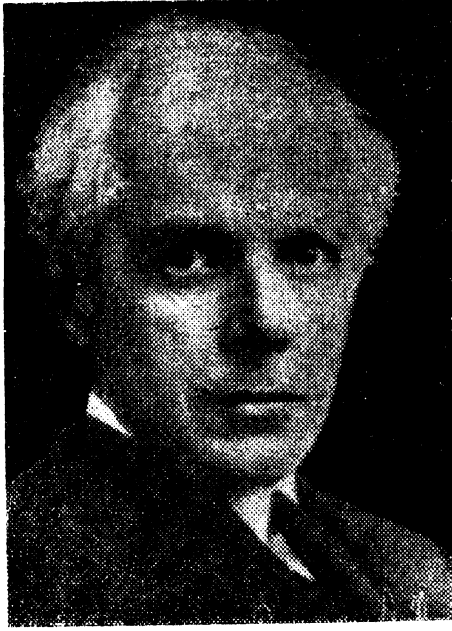
ব্রাউন। পাগল।

[ক্রমশ।

হাঙ্গেরীয় অপেরায়

[সুধাংশু দে কর্তৃক জার্মাণী হইতে প্রেরিত]

বেলা বার্তক

বুদাপেস্ত : গত শনিবার (২৮।১।৬৪) আমরা এখানকার স্টেট অপেরায় বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় সঙ্গীতস্রষ্টা বেলা বার্তকের Opera বা সঙ্গীত-নাটক Prince Bluebeard's Castle এবং Pantomime বা বিদ্রূপাত্মক ব্যালে নৃত্য The Wooden Prince ও The Miraculous Mandarin দেখলাম।

ইউরোপের আধুনিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত স্রষ্টাদের মধ্যে বেলা বার্তক অন্যতম। একাধারে তিনি সঙ্গীত স্রষ্টা, নাট্যকার ও বেহালাবাদক। গত বৎসর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এডিনবরার নাট্য উৎসবে এ তিনটি নাটক ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। গত নভেম্বরে প্যারীতে যে আন্তর্জাতিক ব্যালে নাটক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে The Wooden Prince ও The Miraculous Mandarin প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

Prince Bluebeard's Castle-এর বিষয়বস্তু একটি বহুল প্রচলিত উপকথাকে কেন্দ্র করে। একদা এক রাজকন্যার সঙ্গে প্রিন্সটির সাক্ষাৎ ঘটল। রাজকন্যা প্রিন্সটির প্রেমে পড়ল! প্রিন্সটি বলতে গেলে একটি professional lover; সেও রাজকন্যার প্রেমে হাবুডুবু। রাজকন্যা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করল। সে রাজকন্যাকে বলল, তাকে বিয়ে করার অনেক বিপদ আছে। রাজকন্যা তা মানবে না। সে বলল, প্রেমের কাছে সব তুচ্ছ। যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল। প্রিন্স তাকে তার নিজন দুর্গপ্রাসাদে এনে তুলল। রাজকন্যার নজরে পড়ল, অনেকগুলো ঘরই তালাবন্ধ। ঘরগুলো খুলে দেখার জন্যে তার দারুণ এক কৌতূহল হলো। সে প্রিন্সের কাছে চাবি চাইল। প্রিন্স অনেক মানা করল। কিন্তু সে তা কিছুতেই কর্ণপাত করবে না। প্রিন্স বিপদের কথাও বলল: সে তা মোটেই গ্রাহ্য করল না। রাজকন্যা রোজ বায়না ধরে একটি করে চাবি নেয়, আর ঘর খোলে। প্রত্যেকটি ঘরই বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন জিনিস দিয়ে অদ্ভুত সুন্দর করে সাজান। কিন্তু রাজকন্যা যাতে হাত দেয়, তা থেকেই তাজা রক্ত তার হাতে লাগে। সর্বশেষ ঘরটি খুলে দেখে, মূল্যবান সব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত তিনটি নারী-কঙ্কাল। তারা রাজকন্যাকে বলল: 'আমাদেরও এ-প্রিন্স একদিন প্রেম করে বিয়ে করেছিল। তবে তুমিই আমাদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দরী। তবু তোমারও স্থান এখানেই। আর দেরী না করে তুমি আমাদের দলে চলে এসো।' রাজকন্যা রাগে, দুঃখে, অভিমানে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে প্রিন্সকে জেরা করতে লাগল! এদিকে সেই নারী-কঙ্কাল তিনটি অবিকল তাদের পোষাক ও গহনার এক সেট নিয়ে এসে পিছন দিক থেকে রাজকন্যাকে তা পরিয়ে দিল। রাজকন্যা আস্তে আস্তে তাদের সঙ্গে চলে গিয়ে সেই ঘরটির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। (উল্লেখযোগ্য যে, পত্নীহন্তা বা স্ত্রীঘাতকের প্রতীক হিসাবে bluebeard কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।)

The Wooden Prince-এর কাহিনী: এক রাজপুত্র এক

প্রিন্স ব্লু বিয়ার্ড-এর একটি দৃশ্য

রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। সে খবর নিয়ে জানল, রাজকন্যাও নাকি তার প্রেমে পড়েছে। তখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটে নি। রাজপুত্র স্থির করল, রাজকন্যা তার প্রেমে পড়েছে, না, তার রাজমুকুটের প্রেমে পড়েছে—তা সে পরীক্ষা ক'রে দেখবে। রাজপুত্র একদিন অদূরে বনের মধ্যে রাজমুকুট ও রাজপোষাক লুকিয়ে রেখে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করল। রাজকন্যা তাকে যে শুধু আমলই দিল না তা নয়। রীতিমত অপমান ক'রে বিদায় দিল। রাজপুত্র চলে এলো। পরে সে একটি কাঠের রাজপুত্র তৈরি করল; রাজমুকুট ও রাজপোষাক দিয়ে তাকে সাজাল। এই কাঠের রাজপুত্রটি রাজকন্যাকে গিয়ে আহ্বান জানাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে তার সঙ্গে চলে এলো। উদ্যানে দু'জনে খুব নৃত্য করল। রাজকন্যা আনন্দে উছলে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর কাঠের রাজকুমার ল্যাগব্যাগাতে-ব্যাগাতে ধরাশায়ী হলো। এবার রাজকন্যার হুঁশ হলো। লজ্জা ও দুঃখে সে মরমে মরে গেল। এমন সময় আসল রাজকুমার রাজপোষাক ও রাজমুকুট প'রে তার সামনে এসে হাজির হলো। রাজকন্যা লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারে না। সে তার অপরাধ স্বীকার করল। রাজপুত্র তাকে ক্ষমা করল।

The Miraculous Mandarin: তিন বাউণ্ডুলে বন্ধু। ছিন্‌তাই তাদের পেশা। একদিন একটি ঘরছাড়া মেয়ে এসে তাদের পাল্লায় পড়ে। তাকে প্রেমে ফেলবার জন্যে তিন বন্ধুই যুগপৎ চেষ্টা সুরু করল। মেয়েটি কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিল। অবশেষে তিন বন্ধুর মধ্য রফা হলো। মেয়েটির প্রলোভন দেখিয়ে তারা লোক পাকড়াও করবে। টাকার ভাগ সমান-সমান! কিন্তু মেয়েটি যা'কে বেছে নিয়েছে, শুধুমাত্র তার সঙ্গে থাকবে—এদিক থেকে তারা professional honesty জোড় রেখে চলবে। করতেও লাগল তা-ই। মেয়েটি রাস্তায় কোন মালদার মক্কেল দেখলে পর যৌন অঙ্গভঙ্গী ক'রে তা'কে তাদের ডেনের মধ্যে নিয়ে আসে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ নাচে। তারপর চারদিক থেকে ছিন্‌তাই তিনজন এসে তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে

দি উডেন প্রিন্স-এর একটি দৃশ্য

দি মিরাকিউলাস মান্দারিনের একটি দৃশ্য

মেরে একটা গর্তে ফেলে দেয়। এরকম ভাবে বেশ তাদের চলছে। একদিন এক Mandarin (চীনা সাধু)-কে মেয়েটি তাদের ডেনের মধ্যে ডেকে আনে। মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে তার সামনে যৌন অঙ্গভঙ্গী ক'রে নাচার পর সে-ও তার সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পর ছিন্‌তাই তিনজন এসে হাজির। কিন্তু তার সঙ্গে তারা তিনজন কিছুতেই পেরে ওঠে না। সে মেয়েটিকে আলিঙ্গন করে। কিছুক্ষণ পর কোন রকমে তারা এই মান্দারিনকে কাবু করে। মারতে-মারতে যখন দেখল যে সে মরে গেছে, তখন তাকে তারা সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেয়। অবাক কাণ্ড। কিছুক্ষণ বাদেই সে উঠে আসে এবং মেয়েটির সঙ্গে যৌন সংযোগে উদ্যত হয়। ছিন্‌তাই তিনজন কিছুতেই আর তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। মান্দারিন তাদের সামনেই মেয়েটিকে আবার আলিঙ্গন করে। অবশেষে আবার তারা কোনও মতে মান্দারিনকে কাবু করে ফেলে। এবার তারা তার গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সে আবার বেঁচে ওঠে। এবার মেয়েটি মান্দারিনের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে।

ছিনতাই তিনজন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে রুখতে পারে না। মেয়েটি গিয়ে মান্দারিনের গলার ফাঁস খুলে দেয়। ছিনতাইরা ইত্যবসরে হতাশ হয়ে স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেছে। মান্দারিন ও মেয়েটি প্রাণভরে নৃত্য করে। নৃত্য করতে-করতে মান্দারিন মারা যায়।

নাটক তিনটিতে রূপকের মাধ্যমে প্রেমের বিভিন্ন বিকৃত দিকের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। এর বিশ্লেষণের দ্বারা রসভঙ্গ হবে বলে এ-পর্যন্তই থাক।
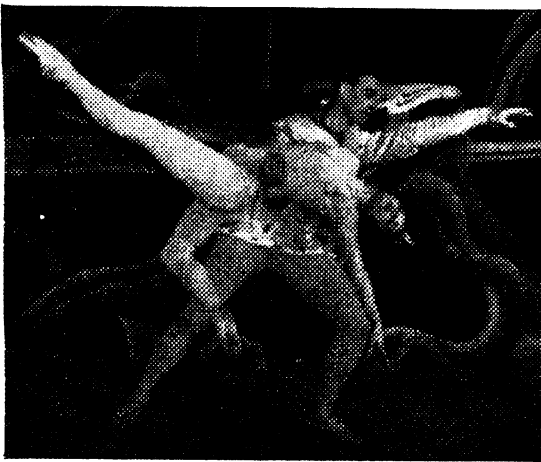
এখানে বেলা বার্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বেলা বার্তক ১৮৮১ সালে হাঙ্গেরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সংযোগ-সময়ে হাঙ্গেরীতে জার্মান ও ভিয়েনিজ প্রভাবমুক্ত নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সংগীত-ধারা প্রবর্তনের আন্দোলন সুরু হয়। বেলা বার্তক এ আন্দোলনকে বাস্তবে রূপদান করেন। তিনি হাঙ্গেরীর প্রাচীন লোক-সংগীত থেকে অনেক জিনিস নিয়ে তার সঙ্গে ফরাসী impressionism মিশিয়ে নূতন এক উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারা প্রবর্তন করেন। তা' ছাড়া, তিনি লোক-সংগীতের ওপর গবেষণার জন্য হাঙ্গেরীর পার্শ্ববর্তী দেশগুলো, এমন কি তুরস্ক ও আফ্রিকায় লোক-সংগীত সংগ্রহের জন্যে যান।

তিনি তাঁর সংগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে লোক-সংগীতকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের গণ্ডি থেকে মুক্তি দেন এবং বিভিন্ন দেশের প্রাচীন লোক-সংগীতের মধ্যে যে একটা সুরলহরীর একাত্মতা বিদ্যমান, তা প্রমাণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের ডঃ ভূপেন হাজারিকা কয়েক বৎসর পূর্বে পল রোবসনের অধীনে সম্ভবত এ বিষয়টির ওপর গবেষণা ক'রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

তৎকালীন হাঙ্গেরীর শাসকমণ্ডলী তাঁর এই প্রগতিশীল অভিমতের বিরোধিতা করে এবং তাঁকে দেশদ্রোহী ব'লে আখ্যা দেয়। ১৯৪০ সালে তিনি ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমেরিকায় চলে যান। ১৯৪৫ সালে সেখানেই তিনি মারা যান

এই নাটক তিনটি তিনি আমেরিকাতেই রচনা করেন। The Miraculous Mandarin দীর্ঘদিন পর্যন্ত হাঙ্গেরীতে বে-আইনী ছিল। কিছুকাল যাবং এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

হাঙ্গেরীতে দু'টি অপেরা হাউস—স্টেট অপেরা ও এরকেল থিয়েটার। এদের আসন-সংখ্যা যথাক্রমে ১৪১৬ ও ২৩৫০। অপেরায় টিকিটের দাম স্বাভাবিকভাবেই বেশি। তৎসত্ত্বেও দেখলাম, দর্শকদের বেশ ভিড় হয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি একদল লোকের যে খুবই আগ্রহ, তার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

অবান্তর মনে হলেও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হাঙ্গেরীর খাঁটি লোক-সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় খাঁটি লোক-সংগীতের খুবই মিল রয়েছে। এখানকার বেতারে যে-সব লোক-সংগীত পরিবেশিত হয় তা শুনলেই এ-জিনিসটি ধরা যায়। হাঙ্গেরীর পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে এখানকার একদল ঐতিহাসিকের মতে—তাঁরা উরাল পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করার আগে (একদলের মতে উরাল পার্বত্য অঞ্চলই তাঁদের আদি বাসস্থান) মধ্য এশিয়ায় ছিলেন। হাঙ্গেরী ও অন্যান্য যে-সব দেশের পূর্বপুরুষগণের আদি বাসস্থান মধ্য এশিয়া, তাদের লোক- সংগীতের সহিত ভারতীয় লোক-সংগীতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কালস্রোত

রিক্তা, ভাঙাগড়া প্রভৃতি অবিস্মরণীয় চিত্রসমূহের স্রষ্টা সুশীল মজুমদারের ছায়াচিত্রে সাম্প্রতিক অবদান 'কালস্রোত।' জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত হচ্ছে এক অমোঘ অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তার বিধান আজও মানুষের কাছে অনতিক্রম্য, এক দুর্বার ধারায় জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায়—এর উপর মানুষের কোন কথা থাকতে পারে না। সেই নিয়ন্তার নির্দেশেই তাকে পথ চলতে হয়, পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়, সুখ, দুঃখ, বেদনা,

'জতুগৃহ'র নায়ক উত্তমকুমার
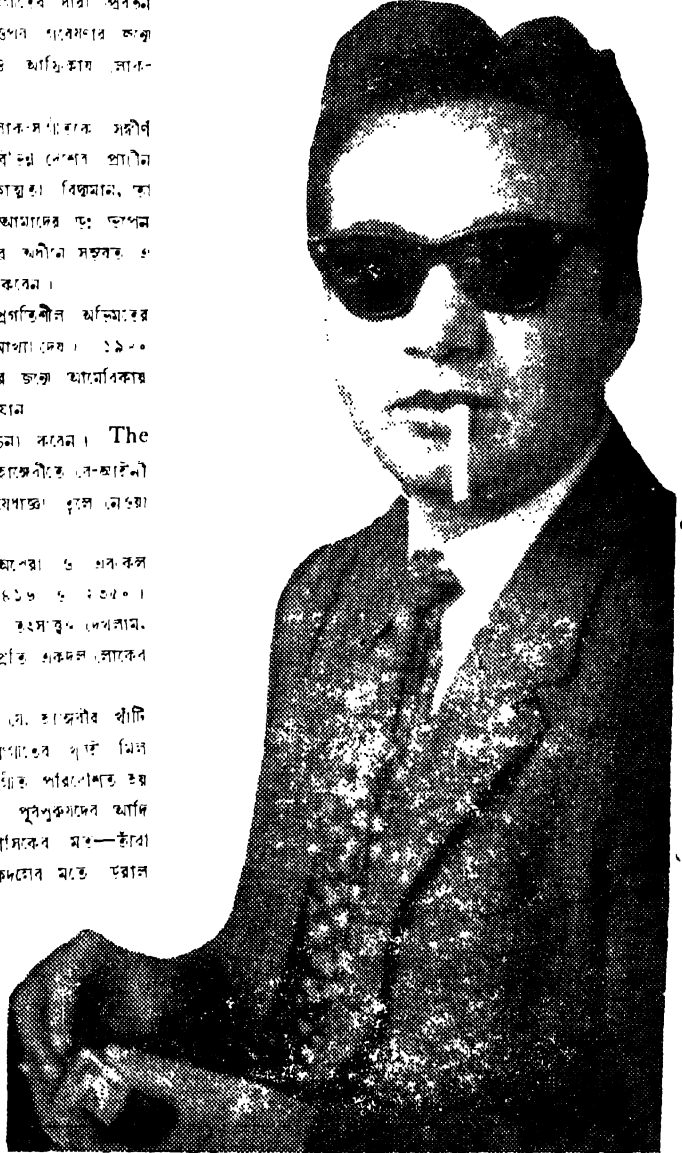
জ্বালা, আনন্দ, হাসির সম্মুখীন হতে হয়—এ নির্দেশ অমান্য করার কোন শক্তি পার্থিব মানুষের অধিকারে আজও আসে নি। এক কথায় ভবিতব্য ছাড়া মানুষের গতি নেই। জীবনের এই পরম সত্যটিকে 'কালস্রোত' ছবির মাধ্যমে প্রচারিত করা হয়েছে। আজকের দিনের মানুষ যেখানে ক্ষমতার মদগর্বে জর্জরিত, শক্তির অহমিকায় আচ্ছন্ন, এক প্রচণ্ডতায় সে আত্মহারা—সেখানে জীবনের এই বিরাট সত্যের প্রচার নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক। নাস্তিবাদ ও শক্তির অহমিকা মানুষকে পথভ্রান্ত করেছে, বিশ্বাসের ও নির্ভরতার স্বর্গরাজ্যের ঠিকানা আজ হারিয়ে গেছে, সেই ঠিকানার পুনরুদ্ধারই সমাজের কাছে এক বিরাট কল্যাণ সৃষ্টির সহায়ক।

কাহিনীর নায়ক জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছে, বৈচিত্র্যের স্পর্শে তার জীবন ভরপুর। ধাপে ধাপে সে সাফল্যের সোপান অতিক্রম করতে থাকে, তারপরই অকস্মাৎ তার জীবনে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ (অকল্পিত, অভাবিত, অতএব এখানেই দৈবশক্তির প্রাধান্য অস্বীকার করার উপায় নেই) তারপর ঘটনার স্রোত কাহিনীকে নিয়ে যায় পরিণতির দিকে। কাহিনীটিকে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের স্পর্শে ভরিয়ে তোলা হয়েছে। কয়েকটি দৃশ্যের কল্পনা যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচায়ক। ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন সুশীল মজুমদার তাঁর নির্দেশনায়। ঘটনাবৈচিত্র্য, কাহিনীর মনোরম গতি, জীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছবিটিকে রসসমৃদ্ধ করে তুলেছে! সঙ্গীতাংশও সুপরিচালিত এবং রসিকজনকে তৃপ্তিদান করে।

অভিনয়ে নবাগতা ললিতা চট্টোপাধ্যায় প্রথম আবির্ভাবেই যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল। সন্ধ্যারাণী দেবীর অভিনয় অনুভূতিসম্পন্ন দর্শকচিত্তে আবেদন সৃষ্টি করে। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রায়ণ তাঁর শক্তি ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, মিহির ভট্টাচার্য, নবীন মজুমদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী, শিপ্রা মিত্র এবং প্রবীণ শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি-জি) প্রভৃতি কৃতী শিল্পীরা তাঁদের সারগর্ভ অভিনয়ে ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রীমান বাসুদেব অবিস্মরণীয় অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রতিনিধি

একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সেই দিনটি থেকে যেদিন বিধবা-বিবাহ আইনের অনুমোদন লাভ করলো। কিন্তু আজও বিধবা বিবাহ যেন একটি 'বিশেষ সংবাদ'। প্রগতির ব্যাপক অগ্রগতি সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বীকৃতি থেকে আজও বঞ্চিত (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য)। বিধবা-বিবাহ তাই আজও সমাজের যেন এক সমস্যা। এই সমস্যাকেই পটভূমি করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে 'প্রতিনিধি' ছবিটির কাহিনী।

কাহিনীর নায়িকা রমা। নীরেনের জীবনের সঙ্গে যখন সে নিজের জীবন একেবারে জড়িয়ে দেয়, তখনই উদ্ভব হয় সমস্যার [illegible] (রমা) শিশুপুত্রকে নিয়ে। একদিকে তাঁর জীবনতৃষ্ণা, নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন, আর একদিকে সন্তানের আকর্ষণ, সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক মমতা, বাৎসল্যরসের প্রাবল্য—এই দোটানার মধ্যে আবদ্ধ রমা মুক্তির পথ যেন খুঁজে পায় না। রমার সন্তানের প্রতি নীরেনের স্নেহের অভাব নেই। কিন্তু সে পিছনের দরজা দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরোধী, সে চায় সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়ে তাকে আইনের কাছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা। শেষে ঘটনার স্রোতে কাহিনী এক বিয়োগান্তক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। রমার আত্মত্যাগে [illegible] প্রকৃত সমাপ্তি।

যথাযথ পরিচালনার গুণে ছবিটি যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকে, গঠনে, বিন্যাসে পরিচালক মৃণাল সেন প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। ছবিটির মধ্যে যে সমাজ সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ছবিটির সারবত্তা ও অন্তর্নিহিত বক্তব্য দর্শকচিত্তে রেখাপাত করে।

নায়িকার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই প্রাণবন্ত। নায়কের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও একাধারে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ও হৃদয়স্পর্শী। অনুপকুমারের অভিনয় বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] প্রসেনজিৎ প্রভৃতি শিল্পীরাও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সংবাদ বিচিত্রা

অধুনা উদ্ভাবিত কৃষি-যন্ত্রপাতির সঙ্গে চাষীদের পরিচয় ঘটানোর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্রকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রে নবাগতা সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই)

ফটো
নৃপেন দত্ত

উক্ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগারোটি তথ্যচিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে নির্মিত এই চিত্রগুলির দ্বারা কৃষিজীবী সম্প্রদায় আধুনিক কৃষিযন্ত্রসমূহের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

* * * *

কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষ কয়েকখানি ভারতীয় ছায়াছবি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধি আবাসগুলিতে অব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ছায়াছবির জনপ্রিয়তা ও প্রসার-এর দ্বারা আরও বর্ধিত হবে আশা করে সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশানের উদ্দেশে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরিত হয়েছে।

* * * *

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে যখন 'ইয়ে রাস্তে হ্যয় পিয়ারকে' ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছিল সেই সময় সাময়িকভাবে প্রদর্শন স্থগিত রেখে শ্রীনেহরুর রোগমুক্তি ও ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লী প্রত্যাগমনের সংবাদটি ঘোষণা করা হয়। সমবেত দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান হয়ে হর্ষধ্বনির দ্বারা উল্লাস প্রকাশ করেন। প্রেক্ষাগৃহে লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার ডাঃ জীবরাজ মেটা, তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী হংস মেটা, এশীয় ও আফ্রিক রাষ্ট্রগুলির দূতাবাস সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দও প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন।

* * * *

বাগদাদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে কয়েকটি উচ্চাঙ্গের ভারতীয় ছবি সেখানে পাঠাবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ এসেছে। ইরাকেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায়ই ভারতীয় ছবির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা বিদ্যমান। এই জনপ্রিয়তা বর্ধিত করার সম্ভাবনাও অনুপস্থিত নয়। সেখানে

সিলি চক্রবর্তী—ছায়াছবির বাইরে

টেলিভিসানে পুরোনো ভারতীয় ছবিগুলি দেখানো হয়, সেইজন্যেই ভাল আমলের ছবিগুলির একান্ত প্রয়োজন। টেলিভিসান ছাড়াও বাগদাদের একটি মুক্ত অঙ্গনে শুধু ভারতীয় ছবিই দেখানো হয়। নিউজিল্যাণ্ড থেকেও টেলিভিসানে প্রদর্শনের জন্যে ভারতের প্রামাণ্যচিত্র, সংবাদচিত্র প্রভৃতি চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

* * *
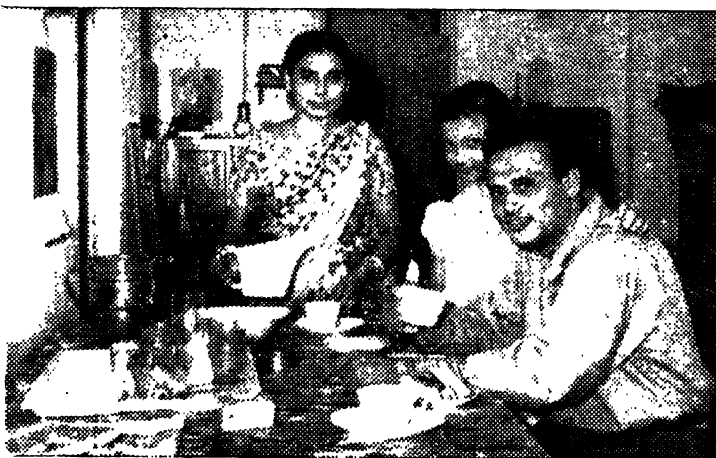
সপরিবারে শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'মনোরম' ভারতের প্রথিতযশা চিত্রতারকা এবং বিদগ্ধ নৃত্যপটীয়সী বৈজয়ন্তীমালাকে ভারতনাট্যমের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে 'নৃত্যকলারত্নম' উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত করলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়েক। ভারতনাট্যমে অভূতপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে শক্তিময়ী অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা রসিকসমাজে আজ এক বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারিণী।

* *

জনপ্রিয় চিত্রতারকা এবং বাংলা ছবি 'দেওয়া-নেওয়া'র নায়িকা কুমারী তনুজা সমর্থ সংসার জীবনে প্রবেশ করতে চলেছেন।

বোম্বাইয়ের শ্রীকান্ত ভগতের সঙ্গে তাঁর পরিণয় স্থির হয়েছে। শিল্পীর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্যজীবন মধুময় হোক, শান্তি ও সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সহানুভূতিতে ভরে উঠুক আমরা এই কামনাই করি।

* * * *

মাদ্রাজে ইংরাজী ভাষায় গৃহীত সাত হাজার ফুট দীর্ঘ একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ফিচার ফিল্ম গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেল। মাত্র আঠারো দিনে ছবিটির নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে। 'এপিস্টল' নামক এই ছবিটির কাহিনী একটি ভারতীয় পরিবারের জীবনধারাকে পটভূমি করে রূপ নিয়েছে। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন কেরলের রাজ্যপাল শ্রী ভি ভি গিরির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশঙ্কর ভি গিরি এবং তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী যমুনা এস গিরি। শ্রীশঙ্কর গিরি একাধারে ছবিটির প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার ও সংলাপ রচয়িতা।

* * * *

স্বনামধন্য অভিনেতা এ্যালান ল্যাড ৫১ বছর বয়সে অকালে লোকান্তরিত হলেন। চলচ্চিত্র জগৎ যে কুশলী শিল্পীদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে এ্যালান ল্যাড নিঃসন্দেহে তাঁদেরই অন্যতম। গত ২৯এ জানুয়ারী তাঁর বাটলারই সর্বপ্রথম তাঁকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। চলচ্চিত্রে যোগদানের পূর্বে সাংবাদিক, বিজ্ঞাপনসচিব ও সেলসম্যানের কাজ জীবিকা হিসাবে, তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বহুচিত্রে তাঁর সার্থক অভিনয় তাঁকে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

* * *

বিখ্যাত গায়ক অভিনেতা ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা শোনা যাচ্ছে তাঁর শিল্পী-জীবন সমাপ্ত করে চিত্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে চিত্রপ্রতিষ্ঠান ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের সঙ্গে 'বিশেষ উপদেষ্টারূপে' তিনি যুক্ত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের আসনে তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

* * *

ফরাসী, ইতালীয় ও স্পেনীয় চিত্র-নির্মাতাদের সমবেত প্রচেষ্টায় নির্মীয়মাণ 'থ্রি বেঙ্গল ল্যান্সার্স'-এ অভিনয়ের আহ্বান গ্রহণ করেছেন দিকপাল অভিনেতা স্বর্গত এরল ফ্লিনের পুত্র সিন ফ্লিন। প্রসঙ্গত, উল্লেখনীয় গত দু'বছরে ছ'টি প্রথম শ্রেণীর চিত্রে এই তরুণ সুদর্শন শিল্পী তাঁর কাজ শেষ করেছেন। সিন তাঁর স্বর্গত পিতার পথেই পদক্ষেপ করেছেন, পিতার সাধনাকেই আপন সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে পিতার মতই উত্তরকালে তিনি যশস্বী ও জনপ্রিয় হোন এই আমাদের কাম্য।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

দেনাপাওনা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর ছোট গল্পগুলির মধ্যে 'দেনাপাওনা' অন্যতম। রসিকসাধারণ জেনে আনন্দলাভ করবেন যে, এই বিখ্যাত ছোট গল্পটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। প্রযোজনা, চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা করবেন বীরেন শীল। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, ছায়া দেবী, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, যূথিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি। সুরযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রসিদ্ধ সুরকার রাইচাঁদ বড়াল।

শ্রীগৌরাঙ্গ

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনী অবলম্বনে বাঙলা ভাষায় একাধিক চিত্র নির্মিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনীচিত্রগুলির সংখ্যা-

অরুন্ধতী দেবী—ছায়াছবির বাইরে

বৃদ্ধি করবে ওম চিত্র প্রযোজিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ'। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। নবাগত অমরনাথ নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিপিন গুপ্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, প্রশান্তকুমার, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, জয়শ্রী সেন, গৌরী মজুমদার প্রভৃতি। রথীন ঘোষ সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন।

দেবতার দীপ

চিত্তরঞ্জন ফিল্মসের প্রথম নিবেদন 'দেবতার দীপ' ছবিটি প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রূপ নিচ্ছে। বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীর দল বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে সঙ্গীতাংশ গৃহীত হচ্ছে।

স্মৃচরিতা সান্যাল—ছায়াছবির বাইরে

শর্মিষ্ঠা, সীতা দেবী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

শৌখীন সমাচার

স্বামী বিবেকানন্দ

বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি পাকসার্কাস ময়দানে স্বামী বিবেকানন্দ নাটকটি সমারোহে অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন সুবোধ পাঁজা, প্রবোধ সরকার, নারায়ণ চন্দ্র, মদন পাল, অসীমা চৌধুরী এবং নাট্যকার সুবোধ মুখোপাধ্যায়।

মৌচোর

শক্তিমান শিল্পী কালীপদ চক্রবর্তীর পরিচালনায় ন্যাশানাল কোল রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যরা রঙমহলে মঞ্চস্থ করেন সলিল সেনের নাটক মৌচোর। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন সঞ্জয় চৌধুরী, গোপাল দাস, নির্মল ভট্টাচার্য, এন আর মজুমদার, প্রণব ঘোষ, সৌমেন চক্রবর্তী, মাখন দাস, অমলেন্দু ঘোষ, অজিত দত্ত, অরুণময় দাশগুপ্ত, সুহৃদ রায়, নিতাই মণ্ডল, শীলা পাল ও স্বপ্না দেবী।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ভট্টাচার্য, মোনা চৌধুরী, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্ত নন্দী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনা 'তৈত্তিরীয়োপনিষদ'-এর অনুবাদিকা শ্রীমতী চিত্রিতা দেবীর নাম ভ্রমবশত মুদ্রিত হয় নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য

'শ্রীমতী'

বর্তমান যুগে একটি সমস্যা প্রায় সকলকেই ভাবিয়ে তুলছে, তা হল নরনারীর দাম্পত্য বা যৌথ-জীবনের ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতা।

আমাদের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে বা ঘটছে তা থেকেও উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দাম্পত্য জীবন আজ সত্যই যেন তাসের প্রাসাদের মতই ক্ষণভঙ্গুর, আজকের ছেলেমেয়েরা কি তবে সত্যই ঘর গড়তে চায় না? এ প্রশ্নও আজ দিকে দিকেই সোচ্চার। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তা নয় অন্তত মেয়েদের পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য নয়; যতই প্রগতিবাদিনী হোক না কেন মেয়েরা আজও ঘর চায়; স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখনীড় রচনার স্বপ্ন আজও তারা দেখে থাকে।

তবে এই ভাঙনের কারণ কি? কারণ আজকের পুরুষ নারীকে বুঝতে চায় না; যৌন জীবনে সে শুধু নিজের তৃপ্তিটুকুই খুঁজে থাকে, নারীমনের সকল চাহিদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে।

চিকিৎসকের গোপন কক্ষে এ-ধরণের বহু রোগিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যৌন-জীবনের ব্যর্থতাই যাঁদের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। এই সব মেয়েদের অধিকাংশই বিবাহিতা এবং এঁরা প্রত্যেকেই স্বামীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

পুরুষ মনে করে বিবাহসূত্রে নারীর উপর যে অধিকার তার হস্তগত হয় তা যেন বিধিদত্ত. স্ত্রীকেও যে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন আছে. স্বামী হওয়াটাই যে শুধু যথেষ্ট নয়—প্রেমিক হওয়াটাও সমান ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ. একথা যেন তারা বিস্মৃতই হয় আর তারই পরিণামে দিনের পর দিন নিজেদের চাহিদাটুকু মিটিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে অপরপক্ষের চাহিদাকে উপেক্ষা করে। এ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে. তাঁর কাছে এমন বহু নারীর বা মানসিক রোগগ্রস্তা রমণী চিকিৎসার জন্য এসে থাকেন, যাঁদের রোগের মূল কারণ প্রায় একই।

যৌন-জীবন এই সব মেয়েদের কাছে আনন্দদায়ক না হয়ে বিভীষিকাময় হয় আর তার জন্য দায়ী তাদের স্বামীরাই। এই সব স্বামী নামধেয় পুরুষদের সঙ্গে কার্যত নারী ধর্ষকের কোন পার্থক্যই নেই আদর-সোহাগে নারীমন ও দেহকে উজ্জীবিত করে নেওয়ার কোন প্রয়োজনই এরা স্বীকার করে না। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনক্রিয়া একটা জান্তব প্রক্রিয়ামাত্রতে পর্যবসিত হয় ও স্ত্রীরা শুধু অতৃপ্তই থাকে না, আত্মাবমাননার দাহেও দগ্ধ হতে থাকে। এই ধরণের পুরুষই আবার স্ত্রীকে ফ্রিজিড বা নিরুত্তাপ বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে খুব পটু. তার নিজের মূর্খতাই যে স্ত্রীর শীতলতার মূল কারণ, এ কথা বোঝবার ক্ষমতাও প্রায়শ তার থাকে না।

জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে কোন নারীই সম্পূর্ণভাবে ফ্রিজিড বা কামবির্হিতা নয়, অভিজ্ঞ যন্ত্রীর হাতে যেমন নীরব যন্ত্র মুখর হয়ে ওঠার অপেক্ষায় থাকে নারী দেহ-মনও সেইভাবেই প্রাণময় হয়ে ওঠে কুশলী প্রেমিকের স্পর্শে. আনাড়ীর হাতে আবার সেই যন্ত্রেই বেসুরো আওয়াজ বার হতে থাকে এমন কি সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

এ কথা ভোলা স্বামীমাত্রেরই পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় যে, মেয়েরা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ বা রোমান্টিক, দৈনন্দিন জীবনেও তাই মানসিক সন্তুষ্টিকেই তারা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে. দিনের বেলা সহস্র কাজের বোঝা তারা হাসিমুখে বইতে পারে দিনের শেষে যদি একটা স্নেহ-কোমল আশ্রয় তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

পাঁচ ছেলের প্রৌঢ় জননীও তাই স্বামীর কাছে শুধুই কিশোরী বধূ হয়ে থাকতে চায়, চায় কানের কাছে সোহাগভরা কূজন শুনতে নীরব অবসরে। এইটুকুর অভাবেই মেয়েরা হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, যার পরিণাম শুধু অসুখী গৃহকোণেই সব সময় আবদ্ধ থাকে না।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পেছনেও আছে এটাই, অসুখী-অতৃপ্ত নারীমন যখন বিদ্রোহ করে তখন এটাই হয় তার আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন।

কাজেই ঘর ভাঙছে বলে আপশোষ না করে, কেন ভাঙছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে পুরুষের স্বৈরাচারই সেজন্য ষোল আনা না হোক অন্ততঃ চৌদ্দ আনা দায়ী; পুরুষ যদি স্বামী হয়েই সন্তুষ্ট না থেকে প্রেমিক হওয়াটাও আবশ্যক কর্তব্য বলেই গ্রহণ করত, তা হলে হয়ত আজকের দাম্পত্য বা যৌথ-জীবনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারত শক্ত ভিতের উপর, যা স্থায়ী ও অক্ষয়।

বন্ধনের মূল আলগা হয়ে গেলে সামাজিক সংস্কার যে ভাঙন ঠেকাতে সক্ষম হয় না, হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাগুলি তারই সাক্ষ্যবাহী।

পুরাতন সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল বলে যাঁরা তারস্বরে চীৎকার করেন, সমস্যার বাস্তব দিকটি সম্বন্ধে অবহিত হলে তাঁরা বোধ হয় অধিকতর উপকৃত হবেন?

ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য

'শ্রীমতী'

বর্তমান যুগে একটি সমস্যা প্রায় সকলকেই ভাবিয়ে তুলছে, তা হল নর-নারীর দাম্পত্য বা যৌথ-জীবনের ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতা।

আমাদের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে বা ঘটছে তা থেকেও উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দাম্পত্য জীবন আজ সত্যই যেন তাসের প্রাসাদের মতই ক্ষণ-ভঙ্গুর, আজকের ছেলেমেয়েরা কি তবে সত্যই ঘর গড়তে চায় না? এ প্রশ্নও আজ দিকে দিকেই সোচ্চার। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তা নয় অন্তত মেয়েদের পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য নয়; যতই প্রগতিবাদিনী হোক না কেন মেয়েরা আজও ঘর চায়; স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখনীড় রচনার স্বপ্ন আজও তারা দেখে থাকে।

তবে এই ভাঙনের কারণ কি? কারণ আজকের পুরুষ নারীকে বুঝতে চায় না; যৌন জীবনে সে শুধু নিজের তৃপ্তিটুকুই খুঁজে থাকে, নারীমনের সকল চাহিদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে।

চিকিৎসকের গোপন কক্ষে এ-ধরণের বহু রোগিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যৌন-জীবনের ব্যর্থতাই যাঁদের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। এই সব মেয়েদের অধিকাংশই বিবাহিতা এবং এঁরা প্রত্যেকেই স্বামীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

পুরুষ মনে করে বিবাহসূত্রে নারীর উপর যে অধিকার তার হস্তগত হয় তা যেন বিধিদত্ত, স্ত্রীকেও যে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন আছে, স্বামী হওয়াটাই যে শুধু যথেষ্ট নয়—প্রেমিক হওয়াটাও সমান ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, একথা যেন তারা বিস্মৃতই হয় আর তারই পরিণামে দিনের পর দিন নিজেদের চাহিদাটুকু মিটিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে অপরপক্ষের চাহিদাকে উপেক্ষা করে। এ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, তাঁর কাছে এমন বহু নারীর বা মানসিক রোগগ্রস্তা রমণী চিকিৎসার জন্য এসে থাকেন, যাঁদের রোগের মূল কারণ প্রায় একই।

যৌন-জীবন এই সব মেয়েদের কাছে আনন্দদায়ক না হয়ে বিভীষিকাময় হয় আর তার জন্য দায়ী তাদের স্বামীরাই। এই সব স্বামী নামধেয় পুরুষদের সঙ্গে কার্যত নারী ধর্ষকের কোন পার্থক্যই নেই আদর-সোহাগে মনকে ও দেহকে উজ্জীবিত করে নেওয়ার কোন প্রয়োজনই এরা স্বীকার করে না। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনক্রিয়া একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্রতে পর্যবসিত হয় ও স্ত্রীরা শুধু অতৃপ্তই থাকে না, আত্মাবমাননার দাহেও দগ্ধ হতে থাকে। এই ধরণের পুরুষই আবার স্ত্রীকে ফ্রিজিড বা নিরুত্তাপ বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে খুব পটু, তার নিজের মূর্খতাই যে স্ত্রীর শীতলতার মূল কারণ, এ কথা বোঝবার ক্ষমতাও প্রায়শ তার থাকে না।

জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে কোন নারীই সম্পূর্ণভাবে ফ্রিজিড বা কামরহিতা নয়, অভিজ্ঞ যন্ত্রীর হাতে যেমন নীরব যন্ত্র মুখর হয়ে ওঠার অপেক্ষায় থাকে নারী দেহ-মন সেইভাবেই প্রাণময় হয়ে ওঠে কুশলী প্রেমিকের স্পর্শে, আনাড়ীর হাতে আবার সেই যন্ত্রই বেসুরো আওয়াজ বার হতে থাকে এমন কি সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

এ কথা ভোলা স্বামীমাত্রেরই পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় যে, মেয়েরা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ বা রোমান্টিক, দৈনন্দিন জীবনেও তাই মানসিক সন্তুষ্টিকেই তারা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে, দিনের বেলা সহস্র কাজের বোঝা তারা হাসিমুখে বইতে পারে দিনের শেষে যদি একটা স্নেহ-কোমল আশ্রয় তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

পাঁচ ছেলের প্রৌঢ়া জননীও তাই স্বামীর কাছে শুধুই কিশোরী বধূ হয়ে থাকতে চায়, চায় কানের কাছে সোহাগভরা কূজন শুনতে নীরব অবসরে। এইটুকুর অভাবেই মেয়েরা হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, যার পরিণাম শুধু অসুখী গৃহকোণেই সব সময় আবদ্ধ থাকে না।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পেছনেও আছে এটাই, অসুখী-অতৃপ্ত নারীমন যখন বিদ্রোহ করে তখন এটাই হয় তার আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন।

কাজেই ঘর ভাঙছে বলে আপশোষ না করে, কেন ভাঙছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে পুরুষের স্বৈরাচারই সেজন্য ষোল আনা না হোক অন্তত: চৌদ্দ আনা দায়ী; পুরুষ যদি স্বামী হয়েই সন্তুষ্ট না থেকে প্রেমিক হওয়াটাও আবশ্যিক কর্তব্য বলেই গ্রহণ করত, তা হলে হয়ত আজকের দাম্পত্য বা যৌথ-জীবনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারত শক্ত ভিতের উপর, যা স্থায়ী ও অক্ষয়।

বন্ধনের মূল আলগা হয়ে গেলে সামাজিক সংস্কার যে ভাঙন ঠেকাতে সক্ষম হয় না, হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাগুলি তারই সাক্ষ্যবাহী।

পুরাতন সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল বলে যাঁরা তারস্বরে চীৎকার করেন, সমস্যার বাস্তব দিকটি সম্বন্ধে অবহিত হলে তাঁরা বোধ হয় অধিকতর উপকৃত হবেন?

দিল্লীর দৃষ্টিতে বাঙলা ও বাঙালী

প্রগতির জয়যাত্রায় ও বিজ্ঞানের কৃপায় আজ বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের প্রায় মধ্যভাগে উপনীত হইয়া আমরা দেখিতেছি যে দূর বলিয়া কিছুই নাই। ভৌগোলিক দূরত্ব বৈজ্ঞানিক প্রগতি সর্বতোভাবে খর্ব করিয়া দিয়াছে। পূর্বে যেখানে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ যাত্রা রীতিমত বিরাট ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত সেক্ষেত্রে আজ বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন বা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপারে রূপলাভ করিয়াছে। সকল দূর্ত্বকে দূরত্বকে বিজ্ঞান খর্ব করিয়াছে কিন্তু দেখা যাইতেছে একটি ক্ষেত্রে বোধ হয় বিজ্ঞান আজও পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। বাঙলা ও দিল্লীর দূরত্ব কমা তো দূরের কথা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বলিতে বাধা নাই তাহা আরও বাড়িয়াছে। দিল্লী-বাঙলার পারস্পরিক যোগাযোগ নিঃসন্দেহে দৃঢ়, তাহা কখনই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না তবে এই প্রসঙ্গে যাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সেই যোগাযোগের আওতায় বাঙলার দুর্গতি, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা, অভাব অভিযোগ পড়ে না। সেদিক দিয়া দেখিলে আজও তো বলিতে হয় দিল্লী বহুৎ দূর।

ভারতবর্ষ শত শত বৎসরের পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তিস্নান করিল যাহার নেতৃত্বে কি অপূর্ব উপায়ে রাজধানী দিল্লী যে তাহার দুর্গতিতে কানে তালা আঁটিল, মুখে কুলুপ আঁটিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের ও বেদনার অন্ত থাকে না। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের বাঙলা চিরকালই সারা ভারতের পূর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে স্বাধীনতার ও মুক্তির বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে। সারা ভারতকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ঘরে ঘরে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে এবং মুক্তিযজ্ঞে শত শত বঙ্গসন্তান দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের সাধনায় আত্মাহুতির দ্বারা যে অভাবনীয় আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শই সারা ভারতকে চিরদিন পথ দেখাইয়াছে। ইতিহাসের মাধ্যমেও এই সত্য চিরদিন প্রকাশিত যে, বিগত যুগে বিদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ মানেই বিদেশের সহিত বাঙলার যোগাযোগ। ভারতবর্ষকে বিদেশের সম্মুখে গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পুণ্যকর্মে বাঙলাই চিরদিন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। নিশ্চিন্ত আরামের জীবন, গৃহকোণের দুগ্ধফেননিভ সুখশয্যা, কল্যাণকামী পরিজনদের মধুসান্নিধ্য বিসর্জন দিয়া দেশের মুক্তির জন্য শঙ্কাকুল দুশ্চর দুর্গম পথে পদক্ষেপণ করিয়াছে বাঙালী অজস্র লাঞ্ছনা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন ও মৃত্যুবরণ করিয়াছে বাঙালী, ত্যাগ ও তিতিক্ষার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে বাঙালী—সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে মাত্র।

দেশ স্বাধীন হইল, বাঙলার একটি বিরাট অংশ শুনিল যে—যে দেশের জন্য এই যুগের পর যুগব্যাপী আত্মত্যাগ যাহার স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলচিত্তে প্রহরগণনা, যাহার স্বাধীনতার স্বপ্নে সর্ববিধ জ্বালা যন্ত্রণার বিস্মরণ—সেই দেশ আর তাহাদের দেশ নয়—সেই চিরকালের পুরুষানুক্রমিক লীলাভূমি জননী-জন্মভূমি ধাত্রী-ধরিত্রীর নিকট আজ তাহারা ভিন্ন রাষ্ট্রের বাসিন্দা।

ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হয় এক চরম যুগসন্ধিতে জাতীয় জীবনের ইতিহাস হয় উপনীত। স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় দরবার হইতে বাঙলা সম্বর্ধিত হয় অবিচারে, উপেক্ষায় এবং অনাদরে।

আজ চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান যে নিদারুণ অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছে পূর্ববঙ্গবাসী অসহায় হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর তাহা সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া মানবসভ্যতাকে কালিমাযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু, এই অবস্থা যদি ভারতের অন্য কোন প্রদেশে ঘটিত তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভারত-সরকারের এই সম্বন্ধীয় মনোভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিত।

বাঙলায় অবস্থিত শিল্প এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যালয় স্থানান্তরিত করিবার যুক্তিগ্রাহ্য কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে আমরা বুঝিলাম না।

শুধু বাঙলা বা ভারত নয় আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রবীন্দ্রনাথের দেহান্তরের কুড়ি বৎসর পর ভারত-সরকারের চৈতন্য হইল তাঁহার জন্মদিবসে সর্বভারতীয় ছুটি ঘোষণা করা। ভারত সরকার কি কাহারও জন্মদিবসে ছুটি ঘোষণা করেন না? স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস স্বাধীন সরকার সর্বভারতীয় ছুটি ঘোষণা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস হইতে অপসারণের কুৎসিত চক্রান্তের যাঁহারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক জগতের প্রধান নায়কের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সুতরাং সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়।

দিল্লী দরবার দেশের ও জাতির কল্যাণার্থে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু, আমাদের প্রশ্ন তাহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাঙলার জন্য কতটুকু বরাদ্দ হইয়াছে?

দেশ বিভাগ হইবার পর সাম্প্রদায়িক অশান্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই উভয় পাঞ্জাবের মধ্যে লোক-বিনিময় হইল। কিন্তু বাঙলার বেলায় তাহা হইল না। হইলে পূর্ব-পাকিস্তানের এই নারকীয় বর্বরতা প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হইতে পারিত না।

বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের দুর্গতদের ভারতের বিভিন্ন অংশে যে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে তাহার পিছনে কি গূঢ় উদ্দেশ্য কিছুই নাই? কলিকাতাবাসীদের সম্মুখে অসহায় নিপীড়িতদের মর্মন্তুদ বাস্তবচিত্র উপস্থিত না করাই যে গূঢ় উদ্দেশ্য নয় তাহাই বা নিশ্চয়তা সহকারে কে বলিতে পারে? অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার আছে। দুঃখজনক হইলেও সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ যে চীনপন্থী কম্যুনিষ্টগণের ভাবধারা এবং মতবাদের সহিত হাত মিলাইতেছেন তাহাও ভ্রান্ত নয়—এই কারণেই তাঁহাদের প্রতি ভারত সরকার যথাযথ সহৃদয় মনোভাব অবলম্বন নাও করিতে পারেন।

পূর্ববঙ্গের ব্যাপক হিন্দুনিধনের তাণ্ডবনৃত্যের যে প্রতিক্রিয়া কলিকাতায় সম্প্রতি দেখা গিয়াছিল সে সম্বন্ধে আমরা মাসিক বসুমতীর গত সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি যে অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের দ্বারা হয় না। দুর্বৃত্তদের আচরণের প্রত্যুত্তরে আমাদের দ্বারাও যদি তাহাদেরই আচরণের পুনরভিনয় ঘটে তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত আমাদিগের পার্থক্য কোথায়?

কলিকাতায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিবর্গের ও প্রধান সেনাধ্যক্ষের কলিকাতা উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। প্রশ্ন এই যে, আসামে যখন বাঙালী নির্যাতন চরমে উঠিয়াছিল তখন সেখানে দুর্গত বাঙালীদের সাহায্যকল্পে এই ব্যবস্থার শতকরা দশভাগও কি অবলম্বিত হইয়াছিল—শুধু তাহাই নহে, আসামী জল্লাদদের দ্বারা বাঙালী নিপীড়নের পর ভারতরাষ্ট্রের এক প্রধান শ্রদ্ধেয় নেতা—আসামীদের 'fine gentleman' বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাঙালী মহিলাদের মত অনুরূপ বিড়ম্বনা যদি অবাঙালী কোন মহিলার ভাগ্যে ঘটিত তাহা হইলে কি ঠিক ঐ উক্তিই ঐ নেতা করিতে পারিতেন?

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে দেখা যাইতেছে বাঙালী প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায়শই পরাভূত হইতেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙলার এই অবনতি কি ভারত সরকারের দৃষ্টিগোচর হয় নাই? বাঙলার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন? রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া আলাপ আলোচনার অন্ত নাই অথচ সেখানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুনির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতেছে না কেন?

আজ বাঙলা চতুর্দিক দিয়া নিষ্পেষিত হইতেছে যদি তাহার চরম মুহূর্তই ঘনাইয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের অবশিষ্ট অংশ কি অবলুপ্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? ভারতের সমগ্র শক্তির উৎস বাঙলা সেই বাঙলার ধ্বংসসাধন কি দিল্লীর মূঢ়তা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ও নির্লজ্জতার পরিচায়ক নয়? বাঙলা ব্যতীত ভারত সরকারকে প্রায় সর্বদিক দিয়া রসদ জোগাইবে কে? অবিবেচক, পক্ষপাতদুষ্ট, আচ্ছন্ন দিল্লী দরবার কি তাহা ব্যারেকের তরেও ভাবিয়া দেখেন না? রোমের আগুন দেখিয়া নীরো বেহালার বুকে সুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু সেই ধ্বংসের আগুন নীরোকেও অব্যাহতি দিল কি? বাঙলার অবলুপ্ত মানে এক কথায় ভারতের দাঁড়াইবার মাটির অপসারণ। মহামতি গোখলের অমর উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া এই নিবন্ধের আমরা উপসংহার টানি—

'What Bengal thinks to-day, India will think to-morrow.'

মাতুলালয়ের আবদার

হাতে চাঁদ ধরিয়া দেওয়ার বায়না যে নিছক একটি শিশুজন সম্বন্ধীয় প্রবচন মাত্র নয় যে রাষ্ট্রটি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করার প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহার নাম পাকিস্তান। উদ্ভব হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের বিবিধ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রবচনটি এক সুস্পষ্ট সত্যে পরিণত করিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির বায়নার অন্ত নাই, ভারতরাষ্ট্র যেন তাহাদের আজ্ঞাবহ, তাহারা মর্জি মেজাজ মাফিক যখন যাহা ফরমায়েস করিবে ভারত তৎক্ষণাৎ তাহা জোগাইয়া যাইবে এই ধারণা কেমন করিয়া জানি না তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। তাহাদের মন জোগাইয়া চলাই যেন ভারতের ধ্যান জ্ঞান-কর্তব্য। তাহার পর মধ্যে মধ্যে আহারে অরুচি আসিলে মুখ বদল করিবার জন্য হিন্দু রক্তের প্রয়োজন হয়। অতীব তৃপ্তি সহকারে আরাম করিয়া হিন্দু রক্তের দ্বারা তাহারা মুখ বদল করিয়া থাকে! হিন্দু শিশুর হাড় দিয়া নরম নধর মাংসের কাটলেট, হিন্দু রমণীর তাজা টাটকা লাল রঙের রক্তের এক গ্লাস পানীয় তাহাদের আহারে বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়। আরামদায়ক সুখকর ভোজনবাসরে হিন্দুরক্ত তাহাদের মনে এক অভিনব আমেজ আনিয়া দেয়।

এই অভিনব রাষ্ট্রটি রক্ত পান করে বটে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার মধ্যে প্রকৃতি প্রেমের অভাব নাই, হিন্দুশোণিত পান করিয়া নিরন্তর নিসর্গ শোভা উপভোগ করার জন্য অর্থাৎ প্রকৃতির অফুরন্ত অবদান প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কাশ্মীর চাই। অতএব দাও কাশ্মীর। হবুচন্দ্র আয়ুব এবং গবুচন্দ্র ভুট্টোর আজ কাশ্মীর না হইলে চলিতেছে না। আইন-সংবিধান-নীতি—ঔচিত্য সে সব আবার কি? তাহাদের প্রয়োজন অতএব সেখানে আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দুটি একটি রাষ্ট্র বাদে সমগ্র বিশ্ববাসী বোধ হয় অরসিক তা না হইলে পাকিস্তানের এই মামার বাড়ির আবদার সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিল না, তাহার হিন্দু সম্পর্কিত মনোভাবে ধিক্কার দিয়া বসিল। একমাত্র সাচ্চা বন্ধু তাহার চীন ছাড়া আজ আর কে আছে?

আসল কথায় আসা যাক, এত বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান কেন কাশ্মীরকে লাভ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে? কি গূঢ় উদ্দেশ্য তাহাকে সমানে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগাইয়া যাইতেছে? তাহাও ভাবিয়া দেখিবার মত।

রাশিয়া ভারতের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। অতএব পাকিস্তানের 'দুষমন'। তাহাকে শায়েস্তা করিতেই হইবে। সহায়কও পার্শ্বে রহিয়াছে, চীন পাশে থাকায় পাকিস্তান একরকম নিশ্চিন্তই হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার সহায়তায় সে জগৎ জয় করিবে। কাশ্মীরের

অতি নিকটে রাশিয়া। কাশ্মীর অধিকার করিয়া চীনের কম্যুনিষ্টদের সাহায্যে পাকিস্তান যে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিবে না—এই ধারণা পোষণ করিবার স্বপক্ষে আমরা কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

স্বস্তি পরিষদে বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীন পাকিস্তানকে সমর্থন করিয়াছেন ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হই নাই, সমর্থন না করিলেই বরং আশ্চর্য হইতাম, কারণ তাঁহাদেরও প্রকৃতি এবং মনোভাব আমাদের অজানা নয়—ইংরাজশক্তি চিরদিনই খণ্ডিত শাসনের সমর্থক। ভারতের অখণ্ড শক্তিকে বিভক্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা তাঁহাদের চিরদিনের, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বিদায়ের প্রাক্কালে যে শেষ কামড়টি দিয়া গিয়াছে, সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বীজ বপন করিয়া হানাহানি দাঙ্গায় ইন্ধন জোগাইয়া সে মজা দেখিয়াছে এবং ভারতের সঙ্ঘবদ্ধতাকে দুর্বল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। চিরদিন বিবাদ-বিসম্বাদ বাধাইয়া আপন জঠর পূরণ করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে ডীন যে পাকিস্তানের পিঠ চাপড়াইবেন তাহাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

ভারতের তো আর দুর্নামের অন্ত নাই, পাকিস্তানের বেতার তো সমানে ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে যে, ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় বিপন্ন। হিন্দুদের বর্বর অত্যাচারে তাহারা জর্জরিত, বহু স্থানে কারফিউ। ১৪৪ ধারা ইত্যাদি। হ্যাঁ, ইহাদের উদ্ভাবনীশক্তি অস্বীকার করার উপায় নাই। ভারত সম্বন্ধে কত কল্পিত গল্প যে ইহারা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহার তো সীমাসংখ্যা নাই। অথচ বিরানব্বই বৎসর পূর্ব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই কাশ্মীরেই যখন মুসলমানদের মধ্যে মসজিদের প্রাচীরকে কেন্দ্র করিয়া শিয়া-সুন্নির বিরোধে সুন্নিরা শিয়াদের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে এবং রমণীর সম্ভ্রম নষ্ট করে তখন হিন্দুরাজশক্তির হস্তক্ষেপের ফলেই ঐ বিপর্যয়ের অবসান ঘটে। মুসলমানে-মুসলমানে বিরোধ মিটাইবার আবশ্যকতা হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিত না যদি তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ না থাকিত।

কাশ্মীর আর্যজাতির লীলাক্ষেত্র, বৈদিক ঋষিদের সাধনাস্থল। মহাসতীর পবিত্র অঙ্গের একটি অংশ কাশ্মীরে পড়ে। সে যুগে ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল কাশ্মীর—সেইজন্যই তাহার অপর নাম সরস্বতী বা সারদাদেশ। কশ্যপপুর হইতে কাশ্মীর নামটির সৃষ্টি। ইতিহাসে ২৪৪৮ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে কাশ্মীরে হিন্দু শাসনের নজীর মেলে। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্বের সূচনা। বর্তমান রাজবংশ হিন্দুকুলোদ্ভব, তথাকার অজস্র মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্বরূপ। অতএব ইতিহাসের আলোয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যায় কাশ্মীরের সহিত আমাদের সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের এবং হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থল কাশ্মীরে আমাদের অধিকার সেইজন্যই সম্পূর্ণ ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। পাকিস্তানের আস্ফালন এবং যুক্তিহীন উক্তিগুলি নিছক প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান! সাবধান!

পাকিস্তানের নৃশংস হিন্দুমেধের কুৎসিত কাহিনী সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলার আর কিছুই নাই। এই পশুসুলভ ব্যাপক নরহত্যা শুধু ভারতকেই নহে সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে জনগণের নিকট যে বাস্তব করুণ চিত্রের উন্মোচন করিতেছে তাহা সমগ্র মানবসমাজকে শিহরিত করিয়া তোলে। পূর্ববঙ্গ হইতে যে বুকফাটা আর্তনাদ হাহাকার ও কান্নার বর্তমানে প্রতিমুহূর্তে জন্ম হইতেছে তাহা শুধু পূর্ববঙ্গই নহে সারা বিশ্বে নরনারীর হৃদয়ে যে অনুভূতির সৃষ্টি করিতেছে তাহা অবর্ণনীয়।

এই ব্যাপক হত্যালীলার পরিণতি কোথায়? সেই প্রশ্ন আজ আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। হাহাকারের মধ্যে এই প্রশ্নটিও যে অপাংক্তেয় নহে বরং রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আশা করি কেহই দ্বিমত হইবেন না।

পাকিস্তান সরকারই যে এই হত্যালীলার পৃষ্ঠপোষক এ বিষয়ে বুদ্ধিমান এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তির মতভেদ থাকিতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ব-পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করার উদ্দেশ্যে এক জঘন্য কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতি নীচ অন্তঃকরণের পরিচয় দিলেন। সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে এই ঘৃণ্য দাঙ্গা বাধাইতে এবং তাহাতে ইন্ধন জোগাইতে তাঁহাদের বিবেকে বাধিল না। পাকিস্তান অবশ্যই হিন্দুশূন্য হইতেছে কিন্তু শুধু সেই উদ্দেশ্যেই কি পাকিস্তান সরকারের আসরে অবতরণ? ভূমিকা শেষ হইলেই কি কাহিনী শেষ হয়। কাহিনীর সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই কি নাটকে যবনিকাপাত হয়? তেমনই হিন্দুশূন্য করিয়াই কি পাকিস্তান সরকারের পূর্ব-পাকিস্তান সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত পূর্ণতা লাভ করিবে?

এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার সময় আজ উপস্থিত। যে সম্প্রদায়ভুক্ত নরপশুগণ আমাদের শত শত জননী-ভগিনীর চরম সম্ভ্রম ধূলিসাৎ করিতেছে, শত শত হিন্দুকে যাহারা নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে বাস্তুচ্যুত করিতেছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববিধ সর্বনাশসাধনে যাহারা বদ্ধপরিকর—সেই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণকে অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারিত করিবার সময় আজ সমুপস্থিত।

ঈষৎ চিন্তা করিলেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃত মনোভাব জলের মত স্বচ্ছ ও আলোর মত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে হিন্দুগণের উৎখাত ঘটিলে তখন সেখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা কি ঘটিবে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি এবং মনে হয় যে এই অনুমান নিতান্ত অলীক বা স্বপ্নবিলাস নহে, জাজ্বল্য সত্যে তাহা রূপান্তরিত হইতে পারে। পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু নিধনের অর্থই সেখানকার জনসংখ্যা হ্রাস। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবও আমাদের অবিদিত নাই।

পূর্ব পাকিস্তান নানাভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সহায়তা করিয়া থাকে কিন্তু প্রতিদানে সে লাভ করে বিমাতৃসুলভ আচরণ। দুর্ভাগ্য বাঙলার যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্বন্ধের দিক দিয়া উভয় বাঙলার ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ রাজনীতির ছুরিকাঘাতে পৃথক হইলেও ভাগ্যের দিক দিয়া যে পৃথক নহে—বোধ করি সেই সত্যই এখানে প্রমাণিত হইতেছে।

অতএব, আজ যে আচরণ হিন্দুদের ভাগ্যে জুটিতেছে হিন্দু নিধন ও হিন্দু উৎখাত সমাপ্ত হইবার পর অনুরূপ লাঞ্ছনা যে তত্রস্থ মুসলমান

সম্প্রদায়ের ভাগ্যেও জুটিবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন আশ্বাস দেওয়া চলে কি? ক্ষমতালিপ্সু লোভ ও অন্যায়ের প্রতিমূর্তি আয়ুব এবং তাঁহার সুপ্রাবসম অনুগত বন্ধুর ভুট্টোর চিপ্র অত্যাচার হইতে মুসলমান বলিয়া তাঁহারা অব্যাহতি পাইবেন কি? সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্ঘবদ্ধ মুসলিমশক্তি এখন পূর্ববঙ্গের মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর কি ঝাঁপাইয়া পড়িবে না? তাহাদের বীভৎস আক্রমণে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান সমাজকে কি তাহারা ক্ষতবিক্ষত করিবে না? পূর্ব-পাকিস্তান কি ইহাদের জন্য শ্মশানে পরিণত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারিবে? সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এক্ষণে হিন্দুনিপীড়নের দ্বারা পথপ্রস্তুত করা হইতেছে।

অতএব, হিন্দুনিধনযজ্ঞে পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল মুসলমান উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন এবং যাঁহারা আজ এ ব্যাপারে পশ্চিমা মুসলমানদের সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদিগকে নিজের ভবিতব্য সম্বন্ধে একবার দৃষ্টিপাত করিতে বলি। পশ্চিমা মুসলমানরা আজ আপন কার্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের যে কণ্ঠ বেষ্টন করিতেছেন কাল কার্যসিদ্ধির পর সেই কণ্ঠ নিষ্পেষিত করিবেন। তখন তাঁহাদের জন্য অশ্রুপাত করিবার নিমিত্ত অবশিষ্ট কে থাকিবেন তাঁহাদের এখন সেই চিন্তারই সময় আসিয়াছে।

অসিতকুমার হালদার

অসিতকুমার হালদারের তিরোধানে বাঙলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক গগন হইতে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হইল। ললিতকলার ক্ষেত্রে যাঁহাদের অসামান্য অবদান দেশকে সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া দিয়াছে শিল্পাচার্য অসিতকুমারের স্থান নিঃসন্দেহে তাঁহাদের পুরোভাগে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতের চিত্রকলার যে নবজন্ম ঘোষিত হয় তাহার পরিচর্যা ও অনুশীলনের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে তাঁহার পদপ্রান্তে যে সম্ভাবনাময় শক্তিমান তরুণের দল সমবেত হইলেন অসিতকুমারের আসন তাঁহাদের প্রথম সারিতে। শুধু তুলিকাই নয়, গুরুর ন্যায় লেখনীতেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় বিদ্যমান। শিল্পকলায় যে অভিনব স্বকীয়তা ও নৈপুণ্যের তিনি পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। বর্তমান শতকের সংস্কৃতির ইতিহাসের রূপায়ণে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ও সার্থকতাবিমণ্ডিত অবদানের অন্ত মেলে না। অসিতকুমার যেদিন যাত্রা শুরু করেন সেদিন তাঁহাদের দুর্গম যাত্রাপথে পাথেয় ছিল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, অনাদর। কিন্তু অটুট মনোবল ও অন্তরের দুর্বার প্রেরণায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আপন আপন স্বাক্ষর তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিলেন। সে ইতিহাসে তাঁহাদের স্বাক্ষর মালিন্য হইতে বিমুক্ত। দেশ ও জাতির মানসিক গঠনের পুণ্যব্রতব্রতী এই রূপসাধক, রসের পূজারীদের অনবদ্য সাধনা ভবিষ্যতের যাত্রীদের ধ্রুবতারার ন্যায় পথ দেখাইবে, আলোক দান করিবে। এই দিকপাল-পতনের সংবাদ সুধীসমাজকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। আমরা শিল্পাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রসঙ্গতঃ পাঠক-পাঠিকাদের জানাই যে তাঁহার একটি অপ্রকাশিত রচনা আমাদের দপ্তরে আছে এবং উহা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইবে।

॥ শোক-সংবাদ ॥

অসিতকুমার হালদার

ভারতবন্দিত চিত্রশিল্পী ও ভারতে অবস্থিত সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় স্থায়ী অধ্যক্ষ শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদার ৭৪ বছর বয়সে গত ৩০এ মাঘ লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রায় ষাট বছর আগে অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতের শিল্পকলার যে নবজন্ম সূচিত হয়েছিল সেই মহৎ সৃষ্টির অভিসারে যে তরুণসম্প্রদায়কে তিনি অনুগামী হিসাবে লাভ করেছিলেন অসিতকুমার তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। শিল্পাচার্য নন্দলাল তাঁর সতীর্থ। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সৃষ্টি থেকে বিলাতযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক যুগ অসিতকুমার ছিলেন তার অধ্যক্ষ। জয়পুরের, শিল্পবিদ্যালয়ের এবং লক্ষ্ণৌর সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে, কবিতা ও মূল্যবান প্রবন্ধাদি রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অল্পকালপূর্বে প্রদেশ কংগ্রেস তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাতুলাল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক রাখালদাস হালদার, বিদগ্ধ গ্রন্থকার সুকুমার হালদার এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীমতী অতসী বড়ুয়া যথাক্রমে তাঁর পিতামহ, পিতৃদেব এবং কন্যা।

ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ সমাজকর্মী ডাঃ ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ১০৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। হোমিওপ্যাথ হিসাবে ইনি খ্যাতি ও যশের অধিকারী ছিলেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁরা অর্জন করেছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। পরিণত বয়সে তাঁর এই লোকান্তর দুটি যুগের যোগসূত্রকে ছিন্ন করে দিল।

শৈলবালা দেবী

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিধান পরিষদের সদস্য ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শৈলবালা দেবী ৬৪ বছর বয়সে গত ২৬এ মাঘ পরলোকগমন করেছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুষারকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]
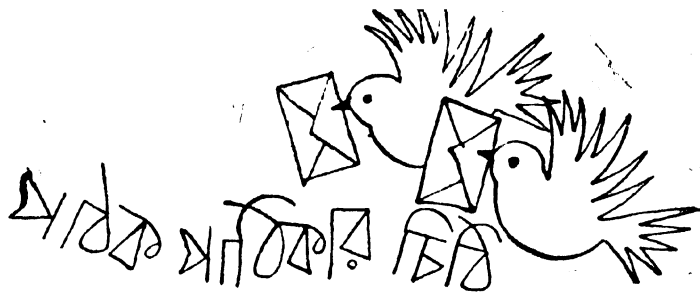
পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, বহুজনবন্দিত ও আমাদের অতি প্রিয় 'মাসিক বসুমতী'র প্রশংসা নতুন করে আর নাই বা করলাম। এই সুন্দর পত্রিকাটির শুভকামনা যে আমরা সব সময়ই করে থাকি, তাও নিশ্চয়ই নতুন করে আর আপনাকে জানাবার প্রয়োজন নাই। 'মাসিক বসুমতী'র শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক এই আমাদের প্রার্থনা। এই মাসিক পত্রিকাটির পাতায় একটি করে সম্পূর্ণ উপন্যাস পেয়ে আমরা যে কতখানি আনন্দিত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অনেক ধন্যবাদ জানবেন আপনি আমাদের। আশা করি এখন থেকে প্রতিটি বসুমতীর পাতায় এইরকম একটি করে সম্পূর্ণ উপন্যাস আমরা পাব। আপনার এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস পেলে আমাদের সঙ্গে আপনাদের আরও অগণিত পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। আপনার লেখা 'পদ্মকাঁটা' গল্পটি ভাল লাগল। আর একটি কথা, 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় অনেক প্রতিভাশালী লেখক-লেখিকার সমাবেশ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিন্তু এ ছাড়াও আমরা এমন কয়েকজনের নাম করতে পারি যাঁদের লেখা এই পত্রিকাটিতে আমরা পাই না। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। এঁদের লেখা পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। সবশেষে আর একটি কথা না বললে অন্যায় করা হবে, তা'হল এর অঙ্গসজ্জা। সত্যি কথা বলতে কি বসুমতী নিয়ে বসলেই বেশ কিছুক্ষণের জন্য চোখ আটকে থাকে এর প্রচ্ছদচিত্রের ওপর। আর বেশ কিছু লিখব না। আপনি আমাদের নমস্কার জানবেন। ইতি—গৌরী, শ্যামলী ও বীণা দে, (গ্রাঃ নং ৪৯৯৯৯)। জামার স্বাস্থ্যকেন্দ্র পোঃ—কোয়ার, জেলা—বর্ধমান।

সবিনয় নিবেদন, মাসিক বসুমতীর অগণিত পাঠক-পাঠিকার মধ্যে আমি অন্যতমা। মাসিক বসুমতী বর্তমান যুগে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার মূলে আপনার অসামান্য অবদান সর্বজনস্বীকৃত। পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে আকর্ষণকারী এবং সারগর্ভ রচনাদি তুলিয়া ধরিতে আপনার সমকক্ষ আর তো কাহাকেও বর্তমানে দেখিতে পাই না। মাসিক বসুমতীর গত কয়েকটি সংখ্যার আমাকে এই পত্রটি লিখিতে উদবুদ্ধা করিল। রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির লোকান্তরে আপনি যে অভিনব সাংবাদিক বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। কেনেডির এই প্রকার জীবন্তচিত্র বাংলা সাংবাদিক-জগতে দুর্লভ বলিলেই চলে। কেনেডিকে কেন্দ্র করিয়া যে দুর্লভ তথ্যসমূহ এবং বহুবিধ জ্ঞাতব্য বস্তু আপনি উপস্থাপিত করিয়াছেন তজ্জন্য সকল দিক দিয়া আপনি সাধুবাদার্হ। আপনার নিকট সর্বসাধারণ অনেক পাইয়াছে কিন্তু তাহার পাওয়া শেষ হইবারও নহে এই কথাটি স্মরণ করিয়া পত্র শেষ করিলাম। ইতি—বিনীতা—অমলেখা চক্রবর্তী, লক্ষ্ণৌ।

সবিনয় নিবেদন, গত কয়েকটি সংখ্যায় লক্ষ্য করিতেছি, মাসিক বসুমতীর এক রূপান্তর ঘটিতেছে—এই রূপান্তরকে স্বাগত জানাই। আমি বহুদিন ধরিয়া মাসিক বসুমতী ক্রয় করি এবং প্রতিটি সংখ্যা যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ সহকারে পাঠ করি। মাসিক বসুমতীতে যে প্রতি সংখ্যায় একটি করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা দিতেছেন এজন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আরও যে সকল বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য মাসিক বসুমতীর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, তজ্জন্যও আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। আমাদের বিবিধবিষয়ক অনুসন্ধিৎসা নিবারণের ক্ষেত্রে মাসিক বসুমতীর সহায়তা অপরিহার্য। চিত্রে-সংবাদ বিভাগটিও আমাদের ভাল লাগিতেছে। মাসিক বসুমতীতে আপনি আলোকচিত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছেন ইহাও আমাদের আনন্দ দিয়াছে। সর্বতোভাবে মাসিক বসুমতীর উন্নয়ন সাধনে আপনার অভূতপূর্ব প্রতিভা এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়া মাসিক বসুমতীর অন্যান্য রচনাদিও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হয়। সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে মাসিক বসুমতী এক সম্পদবিশেষ এবং তাহার এই ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগমনের ক্ষেত্রে আপনার অবদান অনস্বীকার্য—ইহা শুধু হৃদয়ের আবেগপুষ্ট উচ্ছ্বাস নয়—ইহা এক অকাট্য সত্য। —বিনীত, নিবেদক-শুভময় চৌধুরী, মাদ্রাজ।

মহাশয়, আমি গত কয়েক বৎসর ধরে মাসিক বসুমতীর গ্রাহক। মাসিক বসুমতী ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ পত্রিকার গ্রাহক আমি। তবুও আমি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করি মাসিক বসুমতীই বিশিষ্টতম পত্রিকা যার প্রতিটি বিভাগই সুন্দর এবং সুসংবদ্ধভাবে সাজানো থেকে পাঠকবর্গকে খুশি করে! এত প্রশংসার মধ্যেও একটি আক্ষেপের কথা, পাঠকগণকে ধারাবাহিকতা থেকে বঞ্চিত করা গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রম্যরচনা যাহাই হোক প্রতি মাসেই তার প্রকাশ একান্ত-ভাবেই বাঞ্ছনীয়, নতুবা লেখনীর বিষয়বস্তু যতই মূল্যবান, সরস ও সুন্দর হোক না কেন দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক প্রকাশে তার কোন মর্যাদা থাকে না বা পাঠক চিত্তে তার কোন আলোড়ন আনে না। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করি গত বৈশাখ মাসে (১৩৭০) প্রকাশিত শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) লিখিত বড় গল্প 'নেপথ্য চারিণী' অদ্যাপিও পুনঃ প্রকাশ হয় নাই, কারণ কি জানি ॥

মাঝে মাঝে বহু লেখনীরই আমরা ধারাবাহিকতা পাই না এটা ঠিকই একটি পত্রিকায় মাসিক প্রকাশনায় যথেষ্ট দায়িত্ব এবং হুঁশিয়ারী আছে। নূতন লেখনী সুরু করার বা প্রকাশের পূর্ব আরব্ধ লেখনীর সমাপ্তি বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হয় এতে পত্রিকার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায় ও পাঠকবর্গ খুশি হয়। পরিশেষে এই আশা রেখে লেখা শেষ করতে চাই যে, যে কোন লেখনীই আমরা মাসিক বসুমতীর ধারাবাহিকতা থেকে যাতে বঞ্চিত না হই সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। ইতি—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)।

বেচিতে চাই

মহাশয়, দয়া করিয়া মাসিক বসুমতী পত্রিকা মারফত আপনার অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে জানাইবেন যে, নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতী পত্রিকাগুলি আমি বিক্রয় করিতে চাই। পত্রিকাগুলি বেশ ভাল অবস্থায় আছে। আমার শ্রদ্ধাযুক্ত নমস্কার জানিবেন। পত্রটি আপনার পত্রিকায় মুদ্রিত করিলে পরম বাধিত হইব। আপনার মূল্যবান উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

১। ১৩৬১ সাল বৈশাখ—চৈত্র
২। ১৩৬২ " " "
৩। ১৩৬৩ " " "
৪। ১৩৬৪ " " "
৫। ১৩৬৫ " " "
৬। ১৩৬৬ " " আশ্বিন
৭। ১৩৬৬ " কার্তিক—চৈত্র
৮। ১৩৬৭ সাল বৈশাখ—চৈত্র
৯। ১৩৬৮ " " "
১০। ১৩৬৯ " " "
১১। ১৩৭০ " " কার্তিক

নিবেদন ইতি, বিনীত—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।
৩১।৩ সাউথ সিঁথি রোড, কলি-৫০।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীবনধর বর্মন, গ্রাম—শওড়ারতাল, ডাক—নগরাজার, জেলা—কাছাড় * * * শ্রীদেবচরণ বর্মন, গ্রাম ও ডাক—জীবনগ্রাম, জেলা—কাছাড় * * * শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্তী, অবধায়ক—শ্রী বি. চক্রবর্তী এ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, রমপুরা, ডানামকোণ্ড, জেলা—ওয়ারাঙ্গাল, ডেকান, * * * সচিব, এভারেষ্ট ক্লাব, অবধায়ক—এ্যাসবেসটাস সিমেন্ট লিঃ, ডাক—কিমোর, (এম. পি.) (জুকেহী সি রেলওয়ে হয়ে) * * * সচিব, টাইকল স্টাফ ক্লাব, টাইকল টি এস্টেট, ডাক—ঘাড়কাটিলা, জেলা—আসাম * * * শ্রী এম. কে. নিয়োগী, প্রাইম ওয়াটার হাউস, পীট এ্যাণ্ড কোং, ১২২।২, মাউণ্ট রোড মাদ্রাজ—৬, * * * সচিব, নেতাজী স্মৃতি পল্লী পাঠাগার (গ্রাম্য গ্রন্থাগার) নাজিরহাট, কুচবিহার * * * ইন্দু টকিজ, ডাক—কৃষাণগঞ্জবাজার, পূর্ণিয়া * * * শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ১০ বি এন, আসাম রাইফেলস্, অবধায়ক—৫৬ এ, পি, ও * * * শ্রী এম, কে, ভট্টাচার্য, ১৮।১৪৬, কুরগাতন, কানপুর—১ (ইউ, পি)।

The yearly subscription of Rs. 15/- is sent herewith in favour of our Asautosh Granthagar. Please send the magazine regularly. Secretary, Bally Ashutosh Granthagar, P. O. Bally, Dt. Howrah.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী উমা রায়, অবধায়ক—ডাক্তার পি, সি, রায়। বাণী পার্ক, জয়পুর।

I am remitting herewith Rs. 15/- as my annual subscription of the 'Monthly Basumati.' Please send the magazine every month. Mrs. Ashima Ghose Dastidar, C/o. R. N. Ghose Dastidar, Lucknow—5.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীনীলিমা মুখোপাধ্যায়, অবধায়ক—শ্রীভবানন্দ মুখোপাধ্যায়, পাটনা।

My annual subscription of Rs. 15/- is remitted herewith. Please send the magazine regularly. Principal, Burdwan Raj College, Burdwan.

An amount of Rs 15/- is sent herewith for the 'Monthly Basumati' against your bill—Please acknowledge receipt. Librarian, Utkal University Library Bhubaneswar.

I am sending herewith Rs. 15/- being the annual subscription of the 'Monthly Basumati'. Please send the Monthly Basumati regularly. The Secretary, Lohat Club, P. O. Lohat, Dt. Darbhanga.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। প্রতি সংখ্যা রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠাইবেন। ডাক্তার অরুণচন্দ্র দে, ডাকঘর—নাকাচারি, শিবসাগর, আসাম।

১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীরণজিৎকুমার সিংহ, গ্রাম—বৈদ্যনাথপুর, ডাকঘর—লাঙ্গুলিয়া, জেলা—বীরভূম।

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মহন্ত অচ্যুতানন্দ দাস, ডাকঘর—রঘুনাথবাড়ি জেলা—মেদিনীপুর।

Remitting Rs. 15/ being my yearly subscription. Please send the magazine regularly.—Sm. Ramala Rani Ghose. C/o. Dr. D. N. Ghose, Kamtani, Darbhanga.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ টাকা পাঠাইলাম। পূর্ববৎ নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী নীলিমা বসু, ১।এ আজমল খাঁ রোড, কলিকাতা-২৬।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫'০০ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি স্বীকারে বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অরুণা বসু, অবধায়ক—শ্রীভূপালচন্দ্র বসু, উকিল, পুরুলিয়া।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক-লেখিকা		

ফর্ম—৪ (বিধি—৮)

বিজ্ঞপ্তি : মাসিক বসুমতী

প্রকাশের স্থান—কলিকাতা।

প্রকাশের কাল—মাসিক।

মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম—সুকুমার গুহমজুমদার, **জাতি**—ভারতীয়, **ঠিকানা**—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি:-১২

সম্পাদকের নাম—প্রাণতোষ ঘটক। জাতি—ভারতীয়। ঠিকানা—১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯।

শতকরা ১ ভাগের অধিক মূলধনের মালিক :— দিলীপ সেনগুপ্ত---৮৯, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। ডি পি চক্রবর্তী---২০এ, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বীরেন দে---৮৯, মনোহর পুকুর রোড। কৃষ্ণকিশোর কর---১৯এ, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৫। মুরারিমোহন দত্ত---১১এ, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩। পঙ্কজ চোংদার---গুস্করা, বর্ধমান। নলিনীমোহন ব্যানার্জী, ধীমানকুমার বসু---২০এ, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্যামল মিত্র, শম্ভু চক্রবর্তী, সুনীলকুমার কুণ্ডু---২, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা। শ্যামা চক্রবর্তী---৮৯, মনোহরপুকর রোড, কলিকাতা। সুজিতমোহন ব্যানার্জী, এস পি চক্রবর্তী, রমা ভট্টাচার্য---২/১, রায়বাগানলেন, কলিকাতা। অজিতকুমার দত্ত, অজয়কুমার সিংহ, অরুণকুমার বসু---১৪, শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা। অজিতকুমার দাস, তুষার বাগচী, শৈলেশচন্দ্র বর্মণ---৮৫।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সরোজকুমার সোম, কানাই ভট্টাচার্য, ডি এন শ্রীমানী---২১৩, কিম্বার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। হৃষিকেশ ঘোষ---৬১।৬এ, মুর এভিনিউ, কলিকাতা। লতিকা সান্যাল---৯৬।১এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। অমরনাথ মৈত্র, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য---৪২, ঠাকুরদাসবাবু লেন, শ্রীরামপুর। শম্ভুনাথ মুখার্জী, শশাঙ্কশেখর মুখার্জী, করুণেন্দু ভট্টাচার্য---৫০এ, রি লেন, কলিকাতা। এস জি মজুমদার, সুধাংশু রায়---৪৫এ, কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মাধুরী সেন,---১৬২।২১।১, লেক গার্ডেনস, কলিকাতা। বিভূতিভূষণ সরকার, জয়শ্রী রায়চৌধুরী---১৫৪ সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। আমি, শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর :

১লা মার্চ, ১৯৬৪ **সুকুমার গুহমজুমদার**

(তেল-রঙ)

ষ্টীল-লাইফ
—শ্রীমতী গৌরী কাঞ্জিলাল

কি শৃঙ্খলা!

নিশ্চয়ই! ইচ্ছে করলে আরও
বেশী শৃঙ্খলাপরায়ণ আমরা
হ'তে পারি।

এক দিনে, এক মাসে বা এক
বছরে কোন অভ্যাস হয়ত
গড়ে না'ও উঠতে পারে। কিন্তু
আজই সুরু করতে দোষ কী!

আপনাদের সাহায্য করতে
আমাদের সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪২শ বর্ষ — দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন ১৩৭০ — পঞ্চম সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কর্মযোগের অর্থ কি ? উহার অর্থ,—সম্মুখে মৃত্যু আসিলেও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষবার লোকে তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তুমি একটি কথাও কহিও না, আর তুমি যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, এ বিষয়ও ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথচ তাহাদের কৃতজ্ঞতার আশাও রাখিও না, বরং তাহারা যে তোমায় তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য, পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর আমাদের দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই—কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিবোধ জাগাইয়া তোলা। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে। যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। তাহাদিগকে এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে কতকগুলি ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে।

আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া। বাকি যা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ধর্মোন্মত্ততা জগতে মহা উপদ্রবরাশি উৎপাদন করিয়াছে কতবার ইহাকে নরশোণিতে পঙ্কিল করিয়াছে, সভ্যতার নিধন সাধন করিয়াছে ও যাবতীয় জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশার সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে। এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা কতদূর উন্নত হইত ?

শক্তি মানে মদভাঙ, নয়। শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ (৩।৫৬)—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। পাশ্চাত্যবাসীরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

মনে করুন একটা আটতলা বাড়ির ছাদে উঠেছেন। দিব্যি চারিদিক দেখছিলেন। দেখছিলেন ওপর থেকে সবকিছু কতো ছোটো দেখায় এবং হয় তো কিছুটা অদ্ভুতও দেখায়। কতো বিচিত্র রকমের বাড়িঘর, মানুষজন, রঙের মেলা। দেখতে দেখতে আপনি নিশ্চয়ই কিছুটা তন্ময় হয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ আপনার এ ভাবটায় একটা বাধা পড়লো। হঠাৎ মনে পড়লো একটা খুবই জরুরী কাজের কথা। সে কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়টা উৎরে যায় আর কি। এ রকম একটা মুহূর্তে আটতলার ঐ ছাদ থেকে এক লাফে নীচে নেমে আসতে পারলে খুবই ভালো হয়। অনেকের সে রকম ইচ্ছে জাগাও হয় তো একেবারে অস্বাভাবিক হয় না। যদিও সে জানে তা সম্ভব নয় এবং তাকে সে ইচ্ছে দমন করে ধৈর্য ধরে একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙেই নামতে হয় নীচে।

কিম্বা ধরুন—কোনোদিন আপনার অফিস 'বস' অকারণে আপনাকে কতকগুলি কড়া কথা শোনালেন। তখন কি আপনার ইচ্ছে হয় না কর্তাকে দু'টো উচিত কথা শোনাতে? হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময়ই এ ইচ্ছেটাও ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনি টুঁটি টিপে মারেন।

খুব বেশি না হোক অন্তত দু'একটি এ রকম লোক নিশ্চয়ই আছে যাদের আপনার মোটেই পছন্দ হয় না। যাদের কোনোমতেই আপনি

সহ্য করতে পারেন না। চাই কি হয় তো ঘৃণাই করেন। আন্তরিক ঘৃণা। তারা পৃথিবী থেকে সরে গেলে আপনার তো সুবিধে হয়ই, এমন কি আপনার ধারণায় হয় তো গোটা পৃথিবীরই অল্পবিস্তর মঙ্গল হয়। কিন্তু এ হেন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকেও আপনি কি পারেন এই মুহূর্তে গুলি করে শেষ করতে? না, পারেন না। আপনার হাতে পিস্তল থাকলেও আপনি তা পারেন না। চতুঃসীমানায় সাক্ষীপ্রমাণের জন্যে কোনো কাকপক্ষী যদি না থাকে, তা হলেও পারবেন না। আপনার বিবেকই আপনার হাত চেপে ধরবে। আবার আপনার স্বাধীন ইচ্ছের ওপর একটা বিশটনী রোলার চলে যাবে।

আজকের সভ্য পৃথিবীর জীবনযাত্রা এই 'না—না—না—শত লক্ষ কারণে ঢাকা পড়েছে। ইস্কুল-কলেজে নিশ্চয়ই আপনাকে উচ্চাভিলাষী হতে শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু সে অভিলাষের বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা হয় তো একটানা ব্যর্থতার মধ্যেই শেষ হবে। জীবনের এই দুঃসহ অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর ব্যাপারটাকে দূর থেকে দেখলে যতোটা ভয়ের বলে মনে হবে, কাছের থেকে কিন্তু তা মনে হবে না। কারণ কাছে এসে পড়লে আমাদের নিজেদের মধ্যেও যে ঐ ব্যর্থতার ছোঁয়াচ লেগে যায়। সত্যি তাই। তখন মনে হয় দুঃখ না বয়ে ফ্রাস্ট্রেশনকে মেনে নিয়ে অর্থাৎ কিনা তার সঙ্গে আপোষ

করে চলাই ভালো। এই সিদ্ধান্তে আসবার মধ্যে অবশ্য কোনোই বাহাদুরি নেই। কারণ এই একটি কাজ ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছুই নেই। হতাশার সঙ্গে আপোষ করে চলতে না পারার একমাত্র পরিণতি হলো ক্রমশ অস্বাভাবিকতার গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া—অর্থাৎ পাগল হিসেবে গণ্য হওয়া।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, আজকের দুনিয়ায় মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যদিও প্রচুর 'অ-মিল' দেখা যায়, কিন্তু যাকে একেবারে পাগলের অবস্থা বলে সে রকমের সংখ্যা আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব বেশি নয় (অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রকমারি পাগলের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে)।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বাস্তব জীবনের যা অবস্থা তাতে বেশির ভাগ লোক পাগল হয়ে গেলেই হয় তো সেটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হতো। তা যে হয় নি তার কৃতিত্ব প্রাপ্য হলো নেশার সামগ্রীগুলির। যথা পান, বিড়ি, সিগরেট, চুরুট, আফিং, গাঁজা, সিদ্ধি, রকমারি মদ, চা, কোকো, কফি ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, নেশার দ্রব্যের মধ্যে আরো অনেক জিনিষই আছে বা থাকতে পারে। অনেকের পক্ষে বিশেষ কোনো একটা কাজও হয় তো নেশার কাজ করে। যেমন একবার দেখা গিয়েছিলো একটা কারখানায় একজন নতুন শ্রমিক, একজন নেপালী যুবক দারুণ মাথার যন্ত্রণায় ভুগছে। কারখানার ডাক্তারবাবু রকমারি ওষুধ দিয়েও যখন তার যন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব করতে পারলেন না, তখন তার জীবনযাত্রার অতীত ইতিহাস শোনবার পরে প্রেসক্রিপশন করলেন: সকালে কিছুক্ষণ উল বোনা, দুপুরে টিফিনের সময় কিছুক্ষণ উল বোনা এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ উল বোনা। ব্যস আর কোনো ওষুধ লাগে নি তার। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গিয়েছিলো এতেই যুবকটি ক্রমশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।

ব্যাপার কিছুই নয়। যুবকটির অতীত জীবনযাত্রার কথা শুনে ডাক্তারবাবু জানতে পেরেছিলেন যে, আগে ও এক সাহেবের বাড়িতে দারোয়ানের কাজ করতো। প্রায় চার বছর করেছিল সে কাজ। সাহেব অধিকাংশ দিনই ভোর আটটায় বেরিয়ে যেতেন আর রাত আটটায় ফিরতেন। কাজেই বেচারা সারাদিন গেটটা টেনে দিয়ে বসে বসে উল বুনতো এবং ক্রমশ এইটেই ওর পক্ষে একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যাই হোক, যা বলছিলাম। আজকের দিনে রকমারি নেশা আমাদের পুরো পাগল হয়ে উঠবার পথে বাধা সৃষ্টি করে যখন আমাদের উপকারই করছে বলতে হবে তখন পাঠ্যপুস্তকের অনেক অকেজো কথার মতো 'নেশা করিবেন না' এ রকম জলো পরামর্শ আমরা নিশ্চয়ই পরস্পরকে দেবো না।

সুপরামর্শ বেশিরভাগ মানুষই নেন না, তাই যা রক্ষে, তা' না হলে আজকের দিনের বেশিরভাগ মানুষই নেশা বঞ্চিত হয়ে বিশেষ বিশেষ চিকিৎসালয়ের ভিড় বাড়াতেন।

তাই আমরা বলি, নেশা করা অর্থাৎ কি না পরিমিতভাবে নেশা করা ভালো। কথাটা শুনতে খুব ভালো না লাগলেও বাস্তব জীবনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এমন কি অপরিহার্য বলা চলে। এর ফলে আমাদের হতাশ, বিক্ষুব্ধ এবং বিক্ষিপ্ত মনটা অল্পবিস্তর শান্তি পায়। নিয়ন্ত্রণের প্রায় বাইরে চলে যাবার মতো স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর আবার মানুষের কর্তৃত্ব ফিরে আসে। নিজেকে সে শান্ত করতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে।

আজকের দিনের রকমারি নেশার জিনিষের তালিকায় কতকগুলি একেবারে নতুন জিনিসও দেখা যাচ্ছে। এ হচ্ছে কতকগুলি ওষুধ। যার একমাত্র কাজই হচ্ছে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া, মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনা, গরম মাথাকে ঠাণ্ডা করা। এই জাতীয় ওষুধের চাহিদা আজকের সভ্য জগতে হু-হু করে বেড়ে চলেছে। ইয়োরোপ-আমেরিকায় তো আজকের দিনে প্রতি পাঁচজনে একজন এই সমস্ত ওষুধের নিয়মিত ব্যবহারকারী। আমাদের দেশেও এই সমস্ত ওষুধের বিক্রি ক্রমশ বাড়তির দিকে বলেই ওষুধ ব্যবসায়ী মহলের ধারণা।

সিগারেট, গাঁজা, মদ প্রভৃতি বহু প্রচলিত নেশার দ্রব্যগুলি যেমন পর পর বারকয়েক বা কিছুদিন ব্যবহার করার পরে রীতিমতো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ কি না না হলে আর কোনমতেই চলে না, 'ঘুমের ওষুধ' বা 'মন ঠাণ্ডা' করার ওষুধ হিসেবে পরিচিত এই সমস্ত ওষুধগুলিও ঠিক তাই। কয়েকদিন পর পর ব্যবহার করলেই অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবার উপক্রম দেখা দেয়। একদিন শুতে যাবার আগে 'বড়িটা' না খেলেই আশঙ্কা হয় যে হয় তো আজ আর ঘুমই হবে না। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ যদি কেউ 'না: আজ আর ঘুম হবে না'—এই রকম একটা চিন্তার কবলে পড়ে যান তা হলে একটুক্ষণেই তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীতে আলোড়ন ঘটে যাবে বা গরম হয়ে উঠবে। যার ফলে ঘুমটা হয় তো সে রাতে আর বাস্তবিকই হবে না। ব্যস্ আর দেখতে নেই, তার পরদিন থেকে দেখা যাবে সে ব্যক্তি শুতে যাবার আগে রাতের খাবারটা খেতে ভুলে গেলেও ঘুমের বড়িটা খেতে কিছুতেই ভুলবে না। এই ভাবেই একটি অভ্যাস গড়ে ওঠে।

আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রবল অতিপ্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী দু'চারজন ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে যা হোক কিছু একটা নেশার সাহায্য নেওয়া ছাড়া বাধা-বন্ধ হতাশায়পূর্ণ জীবনের সঙ্গে লড়াই করে মানসিক স্বাভাবিকতা রক্ষা করা কার্যত অসম্ভব। এই যখন অবস্থা, তখন জেনেশুনে যতোটা সম্ভব কম অনিষ্টকর বা একেবারেই অনিষ্টকর নয় এই রকম কিছু একটা নেশার আশ্রয় নেওয়াই ভালো।

এই প্রসঙ্গে আবার বলা দরকার যে, অনেক সময় কোনো দ্রব্য নয়, বিশেষ কোনো অভ্যাসও নেশার কাজ করতে পারে; এমন কি, দেখা গেছে 'আমার কোনো নেশা নেই' এই রকম একটা গর্ববোধও অনেকের পক্ষে নেশার কাজ করে থাকে। —সুরসিক

লুইগি গ্যালভানি

গ্যালভানাইজ, গ্যালভানোমিটার এবং এইরকম আরো অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গে যাঁর নাম যুক্ত করেছে তাঁর পুরো নাম ছিলো লুইগি গ্যালভানি (১৭৩৭-১৭৯৮)। ইতালীর বলোগ্‌না সহরে গ্যালভানির জন্ম। ছেলেবেলা ওঁর এই সহরেই কেটেছিলো, লেখাপড়াও করেছিলেন এখানেই। কলেজীয় পড়াশুনোর সময় অভিভাবকের চাপে প্রথমে ওঁকে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আরম্ভ করতে হয়েছিলো কিন্তু কয়েক মাস পরেই উনি বললেন যে: ধর্মতত্ত্ব ভালো লাগছে না, ডাক্তারী পড়বো। এ কথায় সে যুগের অভিভাবকদের রুষ্ট হবারই কথা। রুষ্ট তাঁরা হয়েছিলেনও, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত তরুণ গ্যালভানির কাছে তাঁদের হার মানতে হয়েছিলো। ধর্মতত্ত্ব ত্যাগ করে ডাক্তারী পড়তে যাবার ফলে কিছু পাপ-টাপ না হয়ে যায়—এ রকম আশঙ্কাও বুড়ো-বুড়িদের যে না হয়েছিলো তা নয়।

পঁচিশ বছর বয়সে গ্যালভানি যখন ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তখন অবশ্য বয়স্করা অনেকই খুশি হয়েছিলেন এই দেখে যে, বিভিন্ন গির্জার সমস্ত ঝানু-ঝানু ধর্মতত্ত্ববিশারদগণের চাইতে যুবক ডাক্তার গ্যালভানির রোগনির্ণয়ের যেমন ক্ষমতা অনেক বেশি, মানুষকে রোগমুক্ত করার ক্ষমতাও তাঁর তেমনি চমৎকার। চেষ্টা করে চোখে-মুখে আবেগের ছাপ মাখিয়ে পাদ্রীদের লম্বা চওড়া গুরুগম্ভীর বক্তৃতা না শুনে শুধুমাত্র এক আধটা দাগ ওষুধ খেলেও অনেকের ব্যারাম সেরে যায়। যাঁরা খুবই প্রাচীন এবং গ্রাম্য তাঁরা তো বলেই ফেললেন: এও সম্ভব তা হলে? কালে কালে কতোই দেখবো।

তাঁদের মধ্যে যাঁরা আরো বিশ কি তিরিশ বছর বেঁচেছিলেন তাঁদের সত্যি আরো অনেক জিনিসই দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। তার মধ্যে একটির কথা আমরা আপাতত বলবো। সে হলো বিদ্যুতের প্রবাহ আবিষ্কার—যা এই ডাক্তার গ্যালভানিই সর্বপ্রথম জেনেছিলেন এবং অপরকে জানিয়েছিলেন।

ডাক্তারীর ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তার গ্যালভানি বিদ্যুৎ সম্পর্কেও অল্পবিস্তর গবেষণা করতেন। তাঁর নিজস্ব ছোট্ট একটি ল্যাবরেটরীও ছিলো এ জন্যে। বলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারীশাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন উনি। কাজেই বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণাটা চলতো ফাঁকে ফাঁকে। ওঁর গবেষণার বিষয় ছিলো জীবিত প্রাণীর ওপর

বিদ্যুতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। সাধারণত পাখি বা ব্যাঙের ওপর এই পরীক্ষা চালাতেন। তবে কখনো কখনো মানুষের ওপরেও বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে তার প্রতিক্রিয়া বুঝবার চেষ্টা করতেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। সে সময়ে যে রকম 'বিদ্যুৎ-যন্ত্র' পাওয়া যেত তার একটা ওঁর ল্যাবরেটরীতেও ছিলো। এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেত—কিন্তু তা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেত নষ্ট হয়ে। এ বিদ্যুতের প্রকৃতিই ছিলো শুধু 'স্পার্ক' দেওয়া।

সেদিন ডাক্তার গ্যালভানি তাঁর ল্যাবরেটরীতে বসে একটি ব্যাঙকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ওঁর স্ত্রী এবং কয়েকজন সহকারীও ছিলো সে সময় ল্যাবরেটরীতে। একটি ব্যাঙের পেছনের পা' দু'খানা শরীর থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ডাক্তার গ্যালভানি মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। বিদ্যুৎযন্ত্রটা পাশেই ছিলো। একজন অন্য কি একটা কাজের প্রয়োজনে যন্ত্রটা চালু করে দেয়। যন্ত্রটা মাঝে মাঝে স্পার্ক দিতে লাগলো এবং প্রতিটি স্পার্কের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙের কাটা পা দু'খানিও প্রায় দু' ফুট দূরে হওয়া সত্ত্বেও লাফিয়ে উঠতে লাগলো।

ডাক্তার গ্যালভানির স্ত্রী বারকয়েক ব্যাপারটা লক্ষ্য করে স্বামীর নজর আকৃষ্ট করলেন এদিকে। কি ব্যাপার? কাটা ব্যাঙের পা লাফাচ্ছে তাই কি কখনো হয়! ডাক্তার গ্যালভানির কয়েকজন ছাত্র যাঁরা সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন সেদিন সবাই হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন ব্যাপারটা। মিসেস গ্যালভানিও একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন কারণ সবাই যখন ব্যাঙটা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে তার কাটা পা দু'খানির লাফ দেখবার জন্যে, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে গেছে তা বন্ধ হয়ে। কাটা পা আর লাফাচ্ছে না। কিন্তু একটু পরেই যেই

● বলোগনা মেডিক্যাল কলেজের প্রাচীন এ্যানাটমিক্যাল বিল্ডিং-এর সামনে অবস্থিত গ্যালভানির মূর্তি। তাঁর হাতে যে ব্যবচ্ছেদ পাত্রটি ধরা আছে তাতে একজোড়া ব্যাঙের পাও লক্ষণীয়

আবার ওরা ছুরি-কাঁচি নিয়ে কাটা পা দু'খানি নিয়ে ব্যবচ্ছেদ করতে সুরু করলেন, অমনি বিদ্যুৎযন্ত্রের প্রতিটি স্পার্কের সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাগলো ব্যাঙের কাটা পা। এবার ডাক্তার গ্যালভানি স্বচক্ষেই দেখলেন ব্যাপারটা। সাহায্যকারী ছাত্ররাও দেখলো কেউ কেউ। কিন্তু সবাই যেই ব্যাঙের কাটা পায়ের কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে লাগলো অমনি থেমে যেতে লাগলো কাটা পায়ের লাফানো। এবার সব কাজ ফেলে এই ব্যাপারটার ফয়সালা করবার জন্যে ডাক্তার গ্যালভানি উঠে পড়ে লাগলেন। সেইদিনই কয়েকঘণ্টা ধরে নানাভাবে পরীক্ষা করে তারপর বোঝা গেলো যে, বিদ্যুৎযন্ত্রটির স্পার্ক দেবার সময় একখানা ছুরি দিয়ে যদি ব্যাঙের কাটা পা স্পর্শ করা যায়, তবেই পা দু'খানি লাফিয়ে ওঠে, তা' না হলে নয়।

এই ঘটনার পর থেকে বৎসরাধিক কাল চললো আরো কয়েকটি পরীক্ষা। তারপর ডাক্তার গ্যালভানি তাঁর নোট বইতে লিখলেন: বিদ্যুৎ আর জীবন, এরমধ্যে কিছু একটা যোগাযোগ আছে বলেই মনে হচ্ছে। মনে হয় বিদ্যুতের একটা কিছু প্রবাহ আছে, প্রবাহরূপে চলাই এর ধর্ম এবং এই প্রবাহরূপ শক্তি জীবের স্নায়ু এবং পেশীকে সঞ্চালিত করতে পারে।

কথাটা দু'তিন লাইনেই বলা শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের এক ইতিহাসকার আমাদের বর্তমান যুগে লিখছিলেন যে: গ্যালভানির মৌলিক গবেষণা এবং পরীক্ষাকার্যগুলি যদি সংঘটিত না হতো তা' হলে বিদ্যুতের যুগের আবির্ভাব নিশ্চয়ই অনেককাল পরে সম্ভব হতো।

ব্যক্তিগত জীবনে গ্যালভানি যেমন তেজস্বীপুরুষ ছিলেন তেমনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। ওঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ইতালী জয় করে নিলেন। ফরাসীরা নিয়ম করেছিলো যে, শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের ফরাসী শাসকদের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। কিন্তু গ্যালভানি তাতে রাজি হলেন না। উনি প্রকাশ্যেই বললেন যে তাতে শুধু পিতৃভূমিরই অবমাননা করা হবে না—জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষেও কাজটা হবে চরম মর্যাদা হানিকর। কাজেই কাজটা আমি পারবো না। এ কথা বলার পরেই গ্যালভানিকে অধ্যাপনার কাজ থেকে বরখাস্ত করলো ফরাসীরা। নিজের খরচে বিদ্যুতের গবেষণার জন্যে যথেষ্ট ব্যয় করতে হতো বলেই গ্যালভানির কোনও সঞ্চিত টাকাপয়সা ছিলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীটা হঠাৎ চলে যাবার ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের কবলে পড়তে হলো ওঁকে। স্বামী-স্ত্রী মিলে অর্ধাশন-অনশনে দিন কাটাতে লাগলেন। কয়েক মাস পরে মিসেস গ্যালভানি মারা গেলেন। এদিকে ডাক্তার গ্যালভানি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র বিভাগের পড়াশুনা-কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত, প্রায় বছরখানেক বাদে ফরাসীরা রাজি হলো তাদের কাছে আনুগত্যের শপথ না নিয়েই ডাক্তার গ্যালভানিকে চাকুরীতে বহাল করতে। ডাক্তার গ্যালভানি এলেনও আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু এক বছরের দুঃখকষ্টে ওঁর শরীর এতোই ভেঙ্গে পড়েছিলো যে, আগের মতো গবেষণায় আর ওঁর উদ্যম দেখা গেলো না এবং মাস কয়েক পরেই মারা গেলেন। —বৈজ্ঞানিক

I never think of the future. It comes soon enough

—*Albert Einstein*

সব দেশের ঠাকুরমা-দিদিমাদেরই দেখা যায় তাঁদের নাতি-নাতনীদের আশীর্বাদ করেন 'চিরজীবী হও' বলে। আশীর্বাদ করবার সেই আবেগপূর্ণ মুহূর্তে না হ'লেও তার আগে বা পরে তাঁরা নিজেরাও জানেন যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেও তাঁদের ঐ আশীর্বাদটা পূরণ করতে পারেন না। কাজেই আশীর্বাদের ঐ কথাটা একজনের হৃদয় নিঙড়ে বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও অপরের কাছে তা' হয় তো হাসির খোরাকই জোগায়।

কিন্তু ধরুন, কোনো বুদ্ধিমতী ঠাকুরমা বা দিদিমা তাঁর প্রিয় নাতি-নাতনীর জন্য যদি এই বলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যে, 'কচ্ছপের মতো' দীর্ঘায়ু হও বাছা—তা হলে কেমন শোনাবে? আমাদের সংস্কারে অযাত্রার শিরোমণি (এমন কি চোরের পক্ষেও) এই কচ্ছপের আয়ু কিন্তু জীবজগতের মধ্যে সত্যি অতুলনীয়। কাজেই সংস্কারের বাধাটা সরিয়ে ফেলতে পারলে কচ্ছপের মতো দীর্ঘায়ু হবার আশীর্বাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কিছুটা বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। আর তা' ছাড়া সৃষ্টিকর্তা করুণা করলে ঠাকুরমা-দিদিমাদের উদার আশীর্বাদের পুরো'টা না হ'লেও অন্তত অর্ধেকটা বা তার কিছু বেশি সত্যে পরিণত হতেও পারে।

দু'শো বছর বেঁচে আছে এ রকম অনেক কচ্ছপ বর্তমানে পৃথিবীর বহু চিড়িয়াখানায় রয়েছে। এক শ' বছর বেঁচে রয়েছে এ রকম কচ্ছপ তো বর্তমানে পৃথিবীতে বেশ কিছু পরিমাণেই র'য়েছে। আমাদের কাছে এই জীবটি অযাত্রার নামান্তর হলেও পৃথিবীর অনেক দেশে কচ্ছপকে রীতিমতো পোষ মানানো হয়। যত্নআত্তি করে তাদের বাগানে রাখবার সুবন্দোবস্ত করা হয় ছোটো ছেলেমেয়েদের দর্শনীয় জীব হিসেবে। বড়োরাও যে এদের বিস্তুকিমাকার চেহারা দেখে মন ঠান্ডা করেন সে কথা বলাই বাহুল্য। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে মাঝে মাঝেই এ রকম অনেক অতিকায় কচ্ছপ শিকারী জেলেদের কাছে ধরা পড়ে বিশেষজ্ঞদের মতে যার বেশির ভাগই মধ্যবয়সী, অর্থাৎ কি-না বয়স এক শ'র কোঠা পরিয়ে গেছে।

গাছ-পাথরেরও যেখানে জরা-মৃত্যু আছে সেখানে একটা সচল জীব যে কি ভাবে এতো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে বা থাকতে পারে তা দেখে অনেকেই বিস্ময়বোধ করে থাকেন। মনে করুন কেউ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেখেছে, আবার সিপাহী বিদ্রোহও দেখেছে, চাই কি পলাসীর যুদ্ধ দেখেছে এবং আজকের দিনের আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ঘটনারও সাক্ষী। এ রকম জীব নিশ্চয়ই বিস্ময়কর না হয়েই পারে না।

কচ্ছপের দীর্ঘায়ুর প্রধান কারণস্বরূপ দীর্ঘকাল তার শরীরের বিশেষ বহির্গঠনকেই মনে করা হতো। কিন্তু কমারি কচ্ছপ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করবার পরে আজকের দিনে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, শরীরের মজবুত বহির্গঠন অপেক্ষাও কচ্ছপের প্রকৃতিটিই তার দীর্ঘায়ুর জন্যে প্রধানত দায়ী। একে ত' কচ্ছপ হ'লো নিরামিষভোজী জীব, তারপরে প্রকৃতিগতভাবেই চলাফেরা করে কম কাজেই শক্তি তার ব্যয় হয় খুবই কম। তার ওপর সুদীর্ঘ বিশ্রামের অভ্যাসও তার জীবনীশক্তিতে বলতে গেলে বছরের পর বছর নূতন প্রাণসঞ্চার করে।

বিশেষ দেহের গঠন অর্থাৎ হাড়ের পিঠ এবং মজবুত বক্ষদেশ নিশ্চয়ই কচ্ছপের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বাইরের প্রতিকূল আবহাওয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। তা' ছাড়া আরো একটা কাজও করে। সে হ'লো অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির অতিরিক্ত সঞ্চালনের পথরোধ করা। যেমন ফুসফুসের কথাই ধরা যাক। কচ্ছপের ফুসফুস বেশ বড়। অথচ দেহের বহিরাবরণ শক্ত এবং আঁটোসাঁটো হওয়ার জন্যে কচ্ছপ কখনো ইচ্ছে করলেও তার ফুসফুস বেশি ফোলাতে পারে না। এমন কি কোনো কোনো জাতের কচ্ছপ তার ফুসফুসে যতোটা হাওয়া ধরে কখনোই তার চার ভাগের এক ভাগের বেশি হাওয়া নেয় না। ফলে একদিকে যেমন তার বেশি পরিশ্রমের শক্তি থাকে না, অন্যদিকে তেমনি ফুসফুসের ক্ষয়ও হয় খুব ধীরে ধীরে।

কচ্ছপের পক্ষে সব চাইতে ভালো সময় হলো গ্রীষ্মকাল। খুব বেশি না হলেও অল্প রোদ কচ্ছপের খুবই প্রিয়। অল্প বৃষ্টিও কচ্ছপ ভালোবাসে। কিন্তু বেশি বৃষ্টি বা বড়ো বড়ো ফোঁটার বৃষ্টি কচ্ছপ এড়িয়ে চলতে চায়। কচ্ছপের পক্ষে সব চাইতে খারাপ সময় হলো শীতকাল। সেই জন্যেই দেখা যায় যে সমস্ত অঞ্চলে কচ্ছপ হামেশাই দু' একটা দেখা যায়, এমন কি সেখানেও অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে বড়ো আর চোখে পড়ে না। সেই সময় সাধারণত গর্ত খোঁজে ওরা। তৈরি গর্ত না পেলে নিজেরাই গর্ত খুঁড়ে নেয়। পাঁচ থেকে পনেরো কি বিশ ফুট পর্যন্ত গভীর গর্ত করে মাটির উত্তাপে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে ওরা। ঠাণ্ডা যদি খুব বেশি পড়ে বা যদি তুষারপাত হয় তবেই মুস্কিল হয় কচ্ছপদের। কারণ গর্তের মুখে ঐ তুষার যে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সৃষ্টি করে তা' যদি খুব বেশিমাত্রায় গর্তের গভীরে প্রবেশ করে তা হলে অনেক সময় দেখা যায় তার ফলে ওদের মৃত্যু ঘটে।

অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের প্রথম দিকে গর্তে ঢোকে কচ্ছপ আর বেরোয় সেই এপ্রিলের প্রথম দিকে। কাজেই এই পাঁচটা মাস চলে একটানা বিশ্রাম। এই প্রায় অসাড় অবস্থায় বলাই বাহুল্য কচ্ছপের কোনো খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কারণ, তার কোন পরিশ্রমও করতে হয় না। এপ্রিলের গোড়ার দিকে কচ্ছপ যখন তার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে থাকে চরম দুর্বল অবস্থায়—যে দুর্বলতা কাটাতে অনেক ক্ষেত্রে তার প্রায় দু'মাস সময় লাগে। তারপর কচ্ছপকে আমরা যে ভাবে দেখতে পাই সে প্রায় তার 'পুনর্জন্ম'ই বলতে হয়। এই দীর্ঘকাল অনশনেও যে কচ্ছপ বেঁচে থাকে বা থাকতে পারে তা দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়েছেন। তবে প্রকৃতিও এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে বলতে হবে। কারণ এই যে একটানা পাঁচ মাস অনশন চলে, এর প্রায় একমাস আগে থেকেই অর্থাৎ গর্তে ঢুকবার আগে থেকেই দেখা যায় কচ্ছপ তার খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। কাজেই প্রতি বছর অনশনের জন্য প্রকৃতি তাকে আগে থেকেই তৈরি করে দেয় বলতে হবে। —অনুসন্ধানী

দেশে দেশে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে একটি সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে, সে হলো উপযুক্ত জ্বালানীর প্রশ্ন। কলকারখানা শুধু প্রতিষ্ঠা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। সে সবকে চালু রাখবার জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানীর সরবরাহ দিয়ে যেতে হবে, তা' না হলে কারখানাগুলি যাবে বন্ধ হয়ে। শিল্পব্যবস্থাকে চালু রাখবার জন্যে এই যে জ্বালানীর একটা স্থায়ী সমস্যা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনায়কগণের, শিল্পপতিগণের এবং বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হয়। কয়লা, নানাপ্রকার খনিজ তেল এবং বিদ্যুৎ এ সমস্তের যা উৎপাদন তা দিয়ে বর্তমানের প্রয়োজন কোনো মতে মিটলেও মিটতে পারে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই মিটবে না—দু'শো বা পাঁচশো বছর পরের তো কথাই নাই। জল-বিদ্যুতের উৎপাদন ক্রমশ প্রসারলাভ করছে দেখে অনেকের বিশ্বাস যে, বিদ্যুতের উৎপাদন এবং সরবরাহ পৃথিবীতে সবসময়েই কমবেশি থাকবে, কিন্তু কয়লা এবং খনিজ তেলের সরবরাহ যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ ভূগর্ভের মজুত জ্বালানী যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন পৃথিবীর যাবতীয় জ্বালানীর প্রয়োজন শুধুমাত্র বিদ্যুৎ মেটাতে পারবে না। অবশ্য জ্বালানী হিসেবে গ্যাসের সন্ধান মানুষ কয়েক যুগ আগেই পেয়েছে, কিন্তু গ্যাস উৎপাদনের যে খরচ তাতে কলকারখানায় জ্বালানী হিসেবে গ্যাসের ব্যবহারে লাভের চাইতে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশি। তাই এমন কিছু একটা জ্বালানীর সন্ধান বেশ কিছুকাল ধরেই চলছে যার সরবরাহ সহসা বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা নেই, আর দ্বিতীয়ত আর্থিক দিক দিয়ে বিচার করলেও যা পেতে খরচ পড়বে কম।

সৌর শক্তি

জ্বালানী সম্পর্কে মানুষের অনুসন্ধানী প্রচেষ্টার প্রথম ফলই হলো সৌরশক্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে গবেষণা। যে শক্তি কয়েকটা গ্রহ-উপগ্রহের বিরাট একটা জগতকে ধারণ করে আছে এবং হয় তো একাধিক গ্রহেই প্রাণের সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের পৃথিবীগ্রহের যাবতীয় জ্বালানীর জন্যে যে শক্তি প্রত্যক্ষ দায়ী, তার কাছ থেকে কি-না আশা করা যায়। পৃথিবীতে সূর্যের তাপ যে পরিমাণে আসে তার বেশি এলে যেমন জীবন সম্ভব হত না, তার কম এলেও নয়। অথচ এইটুকুমাত্র তাপ দিয়ে ভারী ভারী কলকারখানা চালানোও সম্ভব নয়। তাই বিগত তিন-চার দশক থেকে সূর্যের উত্তাপকে জ্বালানী হিসাবে মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এক একর জায়গাতে যে পরিমাণ সৌরশক্তি প্রত্যহ পড়ে থাকে, তা যদি কয়লার সাহায্যে পেতে হয় তাহলে অন্তত চার টন কয়লা পোড়াবার প্রয়োজন। কাজেই উৎপাদন ব্যয় হিসেবে সৌরশক্তি যে সব চাইতে সস্তা হবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে সব দেশের বিজ্ঞানীরাই একমত। সমস্যাটা হলো উপযোগী যন্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে।

বড়ো বড়ো কলকারখানার জন্যে স্থায়ী কাঠামোতে বৃহৎ আকারে প্ল্যান্ট তৈরির নানা পরীক্ষা কার্যই চলছে। আর সেই সঙ্গে পোর্টেবল ছোট প্ল্যান্টও কতটা কার্যকরী হতে পারে তা' নিয়েও গবেষণা চলেছে। আপাতত আমরা এই রকম একটি প্ল্যান্ট-এর কথাই বলবো।

কিছুদিন পূর্বে সোভিয়েত রুশিয়ার হেলিওটেকনিক্যাল ল্যাবরেটরীর কর্মকর্তা অধ্যাপক এ ভি বম প্রকাশ করেছেন কি ভাবে রুশ বিজ্ঞানীরা তাসখন্দে একটি 'প্ল্যান্ট'-এর সাহায্যে সৌরশক্তি থেকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তি উৎপাদন করছেন। তেত্রিশ ফুট ব্যাসের বহু অবতলবিশিষ্ট একখানা আয়না হচ্ছে এই প্ল্যান্টের প্রধান 'যন্ত্র'। এই আয়নাতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে বহু অবতলের জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই তাপের বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাপকে সামগ্রিকভাবে কি উপায়ে একই পথে পরিচালিত করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা অবশ্য অধ্যাপক বম প্রকাশ করেন নি।

পৃথিবীর সর্বত্রই অবশ্য সৌরশক্তিকে আহরণ করবার প্রধান 'যন্ত্র' আয়না। কেউ কাচের আয়না ব্যবহার করেন, কেউ বা অ্যালুমিনিয়ামের। অধ্যাপক বম-এর প্ল্যান্ট-এর সাহায্যে নাকি ইতিমধ্যেই একাধিক জ্যাম-জেলির কারখানা চলছে। অন্য কোনো উপায়েই এই সমস্ত কারখানায় কোনো জ্বালানী বা শক্তি সরবরাহ করা হয় না। অধ্যাপক বম্ একেবারে হালফিলে যে প্ল্যান্টটি তৈরি করেছেন তার সাহায্যে ১৮ টন জল একঘণ্টার মধ্যে বাষ্পে পরিণত করা যায়। অধ্যাপক বম্ আরো প্রকাশ করেছেন যে বর্তমানে উজবেকিস্থানে কয়েকটি প্ল্যান্টের সাহায্যে বছরে প্রায় ১৫,০০০ টন জল ফিল্টার করা হয়।

সৌরশক্তির সাহায্যে নোনা জলকে ফিল্টার করে পানের উপযোগী করার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব অবশ্য আমেরিকার ডাঃ টেলকেস-এরই প্রাপ্য। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শত শত আমেরিকান জাহাজের পানীয় জলের সমস্যা উনিই প্রথম সমাধান করেছিলেন। অর্থাৎ মহাসমুদ্রে চলমান জাহাজ সমুদ্রের নোনা জল তুলে নিয়ে সৌরশক্তির সাহায্যে ফিল্টার করে তাকে পানের উপযোগী করে তুলেছিলো।

অষ্ট্রেলিয়ার বি ডবলু উইলসনও সৌরশক্তির ব্যবহার এবং তার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গবেষণার অধ্যাপক বম্ এবং ডাঃ টেলকেস-এর সমকক্ষ বলেই গবেষক-মহলের বিশ্বাস।

ডাঃ টেলকেস, অধ্যাপক বম, উইলসন এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন সেক্রেটারী ডাঃ সি জি এ্যাবট—এঁরা চারজনেই বর্তমানে সৌরশক্তিকে বড়ো বড়ো কলকারখানার কাজে কি ভাবে লাগানো চলতে পারে—তার চাইতে বেশি ভাবছেন সাংসারিক কাজকর্মের প্রয়োজনে অর্থাৎ রান্নাবান্না প্রভৃতির জন্যে যে তাপশক্তির প্রয়োজন

বা আরো একটু দূর এগিয়ে হোস্টেলের রান্নাবান্না, ধোবীখানার জন্যে বা ছোটোখাটো ডেয়ারী ফার্ম এবং কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীর তাপশক্তির প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী ছোটো ছোটো প্ল্যান্ট-এর কথা। সাধারণ স্টোভ বা তার চাইতে সামান্য কিছু বড়ো, যাতে সহজেই একজনে হাতে করে এখান থেকে সেখানে আনা-নেওয়া করতে পারে, অর্থাৎ কিনা অনেকটা আমাদের দেশের তোলা-উনুনের মতো আর কি।

সৌরচুল্লিতে হাল্কা রান্নাবান্না, যেমন রুটি বা পরোটা ভাজা, চায়ের জল গরম করা বা এই রকমেরই সাধারণ হাল্কা কাজের নিদর্শন অবশ্য বহুকাল থেকেই মানুষের জানা। আমাদের ভারতবর্ষেও একাধিক তরুণ-বিজ্ঞানী জনসমক্ষে তা হাতে-কলমে করেও দেখিয়েছেন। কিন্তু সে রান্না আর আজকের ডাঃ টেলকেস বা অধ্যাপক বম যা ভাবছেন, সে হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। স্টোভের যেমন উত্তাপ বাড়ানো-কমানো চলে, এ হবে অনেকটা তেমনি। পুরনো সৌর-চুল্লিতে চার কাপ চায়ের জল গরম করতে সময় লাগতো আধঘণ্টারও বেশি, কিন্তু যে সৌরচুল্লি (সান পাওয়ার প্ল্যান্ট) বর্তমান দশকেই দেখা দেবার সম্ভাবনা তাতে সে কাজের জন্যে দু'তিন মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। অবতলবিশিষ্ট আয়নার সাহায্যে সূর্যের আলোকে ক্রমাগত প্রতিফলিত করে এই তাপের তীব্রতা বাড়ানো যায় কি করে সেইটেই হলো গবেষণার প্রধান বিষয়। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো এই তাপকে 'স্টোর' করে রাখা সম্পর্কে। দিনের আলো যখন থাকছে না অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরে এই সৌরচুল্লি হয়ে পড়ছে একেবারেই অকেজো। তাই যেমন বিদ্যুৎ 'স্টোর' করে রাখবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি আজকের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন সূর্যের তাপকে 'স্টোর' করে রাখবার কোনো উপায় বের করবার জন্যে। এটা যখন সম্ভব হবে তখন মেঘলা দিনে বা রাতের বেলাতেও সৌরচুল্লির সাহায্যে রান্নাবান্না বা অন্য সমস্ত কাজই চলতে পারবে এবং এই সৌরচুল্লির খরচও কয়লা, কাঠ, এমন কি ঘুঁটের চাইতেও যা'তে কম হয় সেদিকেও বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি রাখছেন। —আকাশচারী

ধ্বংসের শক্তি প্রকৃতি ও মানুষ

ছোটো বড়ো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা আমরা সকলেই কমবেশি জানি। এই তো সেদিন যুগোশ্লাভিয়ায় ভূমিকম্পে একটি সহর ধ্বংস হলো। বছর দুই আগে আফ্রিকাতেও তেমনি ঘটেছে। আরো আগে বেলুচিস্থানের ভূমিকম্প, আসামে বা বিহারের ভূমিকম্প—এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সম্বন্ধে এ যুগে সবাই জানে। মানুষের ইতিহাস সুরু হবার পর থেকে সব-চাইতে যে বড়ো প্রাকৃতিক বিপর্যয় তা কিন্তু এর একটাও নয়। ভূমিকম্পের দেশ জাপানেও ঘটে নি সে দুর্ঘটনা। তা ঘটেছিল জাভার নিকটে একটা দ্বীপে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে।

একটি দ্বীপ, নাম ছিলো তার ক্র্যাকাতোয়া। আয়তনে ১৮ বর্গ মাইল। অকস্মাৎ একদিন সাগরতলের বিস্ফোরণে এই গোটা দ্বীপটি সাগর থেকে প্রায় চার শ' ফুট ওপরে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। তারপর শত লক্ষ খণ্ডে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল কেউ জানে না। দ্বীপের তলার দিকে অর্থাৎ সাগরের তলায় মেপে দেখা গিয়েছিল প্রায় হাজার ফুটের বিরাট এক গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল এই বিস্ফোরণের ফলে। উত্তাল সাগরে এই বিস্ফোরণের কালে যে অতিরিক্ত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা এমন কি ১১০০০ মাইল দূরের ইংলিশ চ্যানেলের জাহাজে বসেও অনুভব করা গিয়েছিলো। সব মিলিয়ে মোট প্রায় ৩৬,০০০ মানুষের প্রাণ হরণ করেছিল এই বিস্ফোরণ এবং তার পরের সামুদ্রিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

এই তো গেলো ধ্বংসের ব্যাপারে প্রাকৃতিক শক্তির সর্ব বৃহৎ পরিচয় যার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। এইবার আসুন মানুষের শক্তি কতখানি একবার দেখা যাক।

মার্কিন নৌবিভাগের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পারসনস বলছেন: 'প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো বিশ হাজার ফুট ওপর পর্যন্ত ফুটন্ত ধূলোর ঝড় বইছে। মিনিট চারেক চললো এই ঝড়। তারপর দেখলাম প্রায় ৪০,০০০ ফুট ওপর পর্যন্ত জমি থেকে সোজা একটি সাদা মেঘের স্তম্ভ। খুব শক্তিশালী ক্যামেরায় তোলা ছবি যা পরে দেখেছি, তাতে দেখা গেলো এখানে যে একটি শহর ছিলো বেশির ভাগ জায়গাতেই তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই।' যে প্লেন থেকে যে সময় হিরোশিমার ওপর প্রথম এ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ক্যাপ্টেন পারসনস সেই সময় সেই প্লেনেই ছিলেন।

তা'হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? বাহ্যত মনে হচ্ছে প্রকৃতির জ্ঞাত ধ্বংসের শক্তির তুলনায় মানুষের শক্তি কিছুই নয়। কারণ সহরের মাটিটা তো আর গুঁড়িয়ে যায় নি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা একটু ভিন্ন রকমের।

ক্র্যাকাতোয়া শুধু ধ্বংসই হয়েছিল। এই বিস্ফোরণের ফলে সাগরের শেষ ঢেউটি কোনো দেশের মাটি ছোঁবার পরে এর সর্বনাশের শক্তিও লোপ পেয়েছিলো। মানুষের তৈরি এ্যাটম বোমার তেজস্ক্রিয় শক্তির মতো কোনো ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করে নি ক্র্যাকাতোয়ার বিস্ফোরণ; তাই বলবো, একদিক থেকে মানুষের আজকের দিনে নিজের অনিষ্ট করবার যে শক্তি, তা প্রকৃতিকেও হার মানিয়েছে।

কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রসংঘের এক বিবরণীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের নজর আকর্ষণ করা হয়েছিলো খাদ্যের উৎপাদন সুপরিকল্পিতভাবে বাড়াবার জন্যে। 'কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ শ' কোটি, অর্থাৎ আজকের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু বিগত পনেরো-ষোলো বছরে যে পরিমাণ এ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তাতে খাদ্যের উৎপাদন যে পৃথিবীতে এরই মধ্যে কমতে আরম্ভ করেছে, তা তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খাদ্য উৎপাদনের তুলনামূলক

চার্ট দেখলেই বোঝা যায়। চাষের জমির পরিমাণ যে দেশে না বেড়েছে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণও সে দেশে বাড়ে নি। রকমারি রাসায়নিক সার প্রয়োগ করবার পরেও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে আসছে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি যে আণবিক বিস্ফোরণের ফলে নষ্ট হয় সে বিষয়ে আজকের বিজ্ঞানীরা সবদেশেই একমত। এই ক্ষতিটা হয় তেজস্ক্রিয় ভস্ম জমিতে এসে পড়বার ফলে। বিস্ফোরণের জায়গার ১০০০ কি ২০০০ মাইল দূরেও এই ভস্ম হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়তে পারে ; বিস্ফোরণের সময়ের এক বছর বা দু'তিন বছর পরেও যে কখনো কখনো এই ভস্ম পড়েছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। জমিতে পড়ে এই ভস্ম জমিতে যে কীটাণু থাকে সর্বপ্রথমে তাদের ধ্বংস করতে আরম্ভ করে। এই কীটাণুই বীজ থেকে গাছ এবং গাছ থেকে ফসল ফলাতে অনেকখানি সাহায্য করে। কাজেই এই কীটাণুগুলি যদি সব মরে যায় তা' হলে তো সে জমিতে আদৌ কোনো গাছ জন্মাবে না ! যদি তারা একেবারে ধ্বংস না হয় শুধু সংখ্যায় কমে যায়, তা হলে গাছ হয় তো হবে, কিন্তু ফসল ফলবে না। আর ক্ষতির পরিমাণ যদি খুব সামান্যই হয় (যেমন অনেক বিজ্ঞানীকে বলতে শোনা যায়) অর্থাৎ খুব সামান্য সংখ্যক কীটাণু মারা পড়ে—তা হ'লে ফসল হয় তো ফলবে, কিন্তু সে ফসলও কমবেশি তেজস্ক্রিয়-দোষে দুষ্ট হবে নিশ্চয়ই এবং এই তেজস্ক্রিয় খাদ্য যে আজকের দিনের পৃথিবীতে অনেক নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি করছে, সে বিষয়েও বিজ্ঞানীদের দ্বিমত নেই।

তেজস্ক্রিয়তার আর একটি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া যা এরই মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কমবেশি দেখা যাচ্ছে সে হলো অসময়ে বর্ষণ এবং অতিমাত্রায় শীত। গত পনেরো বছর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শীতের প্রচণ্ডতা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। এ দু'টো বেড়ে যাওয়ার অর্থই হলো পৃথিবীর আবহাওয়াতে পরিবর্তন ঘটানো। মানুষের সৃষ্ট এ্যাটম বোমা ঠিক এই কাজটাই করতে চলেছে। জাপানের অধ্যাপক আরাকোয়া হিদেতোচি মনে করেন যে, মানবজাতির ধ্বংসের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এ্যাটম বোমা ফেলবার প্রয়োজন নেই। একই জায়গায় যদি বেশ কয়েক শ' বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তা হলে তার ফলে যে তেজস্ক্রিয় শক্তি উৎপন্ন হবে প্রকৃতির আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটিয়ে তার ফলেও মানবজাতি নির্মূল হয়ে যেতে পারবে।

তাই বলছিলাম, ধ্বংসের পাল্লায় প্রকৃতি বুঝি হারই মানলো মানুষের কাছে। —জ্ঞানান্বেষক

প্রায়ই মাথাধরার যন্ত্রণায় কষ্ট পান এইরকম একজন ভদ্রলোক একবার এক ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি করলে মাথাধরার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বলতে পারেন ডাক্তারবাবু ?

হ্যাঁ, পারি, ডাক্তারবাবু সহজভাবেই বললেন, মাথাধরার হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পাবার একমাত্র নিশ্চিত উপায় হলো, মাথাটা বাদ দিয়ে বেঁচে থাকবার কোনো কৌশল আবিষ্কার করা।

মাথাধরার রুগীর পক্ষে এমনধারা রসিকতা আর যাই হোক রসের সৃষ্টি করে না। বরং সে মনে করতে পারে যে তার যন্ত্রণাকাতর অবস্থাটা আর সবাই বেশ উপভোগ করছে এবং ডাক্তারবাবু বিদ্রূপ করছেন।

কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। অনেক ব্যারাম নিয়ে ডাক্তারবাবুরা অনেক সময় তাঁদের রুগীদের সঙ্গে হাল্কাভাবে কথা বললেও মাথা-ধরা নিয়ে নিতান্ত অর্বাচীন ছাড়া কোনো ডাক্তারবাবুকে কখনো রসিকতা করতে দেখা যায় না। তার কারণ এই সার্বজনীন ব্যাধিটার কষ্ট থেকে সাময়িকভাবে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে যদিও পাঁচ কি দশ নয়া পয়সার রকমারি ট্যাবলেট পাওয়া যায় যে-কোনো ওষুধের দোকানে, কিন্তু যাকে বলে একেবারে সারিয়ে দেওয়া তা মোটেই সহজ নয়।—এ-কথা অভিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেই জানেন। অবশ্য তার মানে এ নয় যে মাথাধরা রোগ সারে না—সারে, তবে সেজন্য অনেক বড়ো ব্যাধি সারানোর মতোই উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মাথাধরা অনেক রকমের আছে বা হ'তে পারে। বর্তমানে আমরা এক রকমের মাথাধরার কথা বলবো—সাধারণত এই রকমের আক্রমণেই মানুষ বেশি কষ্ট পেয়ে থাকে।

'একপেশে' মাথাধরা অনেকে 'আধকপালে মাথা ব্যথাও' বলে থাকেন।

এক বিশেষজ্ঞের মতে সভ্য পৃথিবীর শতকরা প্রায় নব্বুই জন মানুষ মাথাধরায় ভুগে থাকেন, এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভুগে থাকেন একপেশে মাথাধরায়। অনেককে দেখা যায় চট করে মন্তব্য করে বসেন যে, বিশেষ কিছু একটা খাদ্য খাবার জন্যেই একপেশে মাথা ধরে'; কেউ বা বলেন শোবার দোষে, কেউ বলেন নিয়মিত স্নানের অভাবের জন্যে, কেউ বলেন উপযুক্ত ঘুমের অভাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এর কোনো একটাই একপেশে মাথাধরার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী নয় ; বা এর সব ক'টা একযোগেও নয়। শারীরিক নানা কারণের সঙ্গে মানসিক কারণও যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী একপেশে মাথাধরার জন্যে।

সাধারণত দেখা যায় বুদ্ধিমান, চাই কি অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল, রুচিবান এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই একপেশে মাথাধরার শিকার হয়ে থাকেন। যে কোনো বিষয়ে খুঁৎ-খুঁৎ করা যাদের স্বভাব—এ রোগের সহজতম শিকার হলেন তাঁরা, বিশেষ করে মেয়েরা। শারীরিক অবস্থার চাইতে মানসিক অবস্থাই একপেশে

মাথাধরার প্রধান কারণ। সে জন্যই দেখা যায়, প্রায়ই একপেশে মাথাধরায় কষ্ট পান এ রকম লোকের ছেলেমেয়েরাও ভবিষ্যতে ঐ রোগের শিকার হয়ে থাকে। মাথায় যন্ত্রণা একটা অবশ্যই থাকে, তবে তার অনেকখানিই ব্যক্তির একটা বিশেষ মানসিকতার ফলে, তার নিজের কাছে খুবই মারাত্মক মনে হয়। কর্মস্থলে উত্তেজনা, কোনও সমস্যার মনোমত সমাধানে অক্ষমতা, উপযুক্ত বিশ্রামের অভাব, প্রাক-বিবাহ বা বিবাহ-জনিত অসন্তুষ্টি—এই ধরণের ব্যাপারগুলি যখন পর পর কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে তখন দেখা যায় সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষেরও একপেশে মাথাধরা দেখা দেয়। হয় তো খুবই তুচ্ছ কোনো ব্যাপারেই দেখা গেলো কেউ একেবারে দপ করে জ্বলে উঠলেন, হয় তো কোনো বাচ্চা তার স্বভাবমতো দুষ্টুমি করেছে বা কেউ একটু বেশি জোরে সদর দরজার কড়াটা নেড়েছে বা রেস্টুরেন্টের চায়ে চিনি কম হয়েছে, ব্যস্‌! নিতান্ত শান্ত এবং শিষ্ট প্রকৃতির অনেক লোককেও দেখা যায় এমনিধারা তুচ্ছ কারণে এমন বিগড়ে যান যে, পরে হয় তো তিনি নিজেই নিজের কাছে লজ্জাবোধ করেন। এ সমস্তেরই আসল কারণ কিন্তু একপেশে মাথাধরা। এই সমস্ত হলো সূচনা। এরপর যন্ত্রণার শারীরিক কারণগুলি কায়েমী হয়ে বসে! স্নায়ুকেন্দ্রে অকস্মাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তচলাচলের জন্য সুরু হয় ব্যথার। এ ব্যথা আধ ঘণ্টাতেই কমে যেতে পারে, আবার চার কি পাঁচ ঘণ্টাতেও না কমতে পারে; অনেক সময় এমন কি দু'তিন দিন পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি কপালের আধখানা ছিঁড়ে পড়লো। একপেশে মাথাধরার একেবারে প্রথম অবস্থায় প্রায় সকলেরই একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায় সাধারণ আচার-ব্যবহারে। খুবই মিশুক-প্রকৃতির কোন লোককে হঠাৎ হয় তো দেখা যায় নিতান্ত অসামাজিক হয়ে পড়তে। বড়ো বড়ো বক্তা—বক্তৃতা দেওয়া যাঁদের পেশা এরকম ব্যক্তিকেও হয়তো অকস্মাৎ এক সময় দেখা যায় তিনি একা একা থাকতে চাইছেন এবং কথা একদম বলছেন না। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, তিনি সে সময় নিশ্চয়ই একপেশে মাথাধরায় কষ্ট পাচ্ছিলেন।

যখন যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করে, তখন তো সে কষ্ট সকলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু তার আগেও বোঝা যায় অনেক সময় একটু যদি আত্মসচেতন হওয়া যায়। এর অনেক লক্ষণই আছে। তবে প্রধান কয়েকটি লক্ষণ হলো অকস্মাৎ কিছুক্ষণ থেকে দৃষ্টি ঝাপসা বোধ হওয়া, দৃষ্টি পথে কেউ কেউ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইট ফ্ল্যাসের মতো বা আঁকাবাকা সুতোর মতো লাইন দেখতে পান এবং মনে হয় যেন মাথায় কিছু আর ঢুকছে না, অর্থাৎ মস্তিষ্ক ঠিক কাজ করছে না। যন্ত্রণা আরম্ভ হবার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট আগে সাধারণত এই লক্ষণগুলি সচেতন ব্যক্তির নিজের কাছে দেখা দিতে থাকে। এ অবস্থায় ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়-প্রয়োগের ফলে এবং সাময়িকভাবে হাল্কা কথাবার্তা বলা বা গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করলে, কিম্বা অনেক সময় দেখা যায় খোলা হাওয়াতে পায়চারি করলেও একপেশে মাথাধরার কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায়! অনেক চিকিৎসকই মনে করেন যে, যে কোনো খাওয়ার ওষুধের চাইতে এর কোনো একটা উপায় অবলম্বন করলে শরীরের অনিষ্ট তো কিছু হয়ই না, উপরন্তু এর ফলে নিজের দেহমনের ওপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে—শুধু একপেশেই নয়, সমস্ত রকমের মাথাধরার হাত থেকে বাঁচবার যেটা নিশ্চিত উপায়।

—ডাঃ নাগ

পরিচয়ের যে আনন্দ তা বোধ হয় আর কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়! পরিচয় অনেক রকমের হতে পারে। আঙ্কিক পদ্ধতিতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব জানা যেতে পারে, আর ঘ্রাণে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব অনুভূত হয়ে থাকে, স্পর্শ করে তো পরিচয় লাভ হয়েই থাকে। কিন্তু এ সমস্তের অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায় স্পর্শ না করেও ঘ্রাণ না নিয়েও, শুধু দেখে। দেখতে পাওয়ার যে আনন্দ তা পরিচয়ের আনন্দের মধ্যে সবচাইতে সেরা বলা যেতে পারে।

দেখতে পাওয়ার আনন্দ শুধু যে গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ তাই নয়—অন্য সমস্ত আনন্দের পরিপূরকও বটে!

কিন্তু দেখতে আমরা কে কতটুকু পেয়ে থাকি? দুই কি তিন মাইল চওড়া নদীর এপার-ওপার দেখা যায় বটে, কিন্তু সে কি আর সত্যি দেখা বলা চলে? ওপারের ঘন সবুজ নারকেল-সুপারীর বনকে মনে হবে ধূ-ধূ করা একটা ফ্যাকাশে-নীলাভ রেখার মতো। দেখা গেলেও মনে হয় অনেক কিছুই বাকী রয়ে গেলো। ইচ্ছে হয় আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানবার।

কতদূর আর আমরা দেখতে পারি? কিছুকাল আগে এক বন্ধু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে ফিরেছেন। বললেন—আমরা যেখান থেকে দেখেছি সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা অন্তত চার শ' মাইল দূরে। অর্থাৎ কি না চার শ' মাইল দূরের জিনিস তিনি দেখেছেন।

কথাটা শুনে আর এক বন্ধু বললেন—তা'হলে তোমার চাইতে আমি আরো অনেক বেশি দূরের জিনিস দেখেছি বলতে হবে। কি রকম? রকম আর কি কাল সন্ধ্যার সময় দোতলা বাসে যেতে যেতে জানলা দিয়ে হঠাৎ মাঠের ওপারে চোখ গেলো। দেখলাম চাঁদটাকে—পূর্ণিমার চাঁদটা শহরবাসীকে দেখছিলো ফ্যাল ফ্যাল করে। বুঝতেই পারছো চাঁদ কতো দূরের জিনিস প্রায় ২,৩৯,০০০ মাইল।

মনে হলো সূর্যের কথা। সূর্য তো আরো দূরে রয়েছে। প্রায় ৯,৩০,০০০০০ মাইল দূরে—অতো দূরের বস্তুও তো আমরা সত্যি দেখতে পাচ্ছি।

এক বন্ধু বললেন—আরে শনি যে রয়েছেন আরো অনেক অনেক দূরে, প্রায় ৯০,০,০০০,০০০ কোটি মাইল দূরে। শনিগ্রহকেও খালি চোখেই দেখা যায়—শুধু বছরে কখন কোথায় তার অবস্থান সেইটে জানা থাকা চাই। এর পরে একখানা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইয়ের সাহায্য নিয়ে আর একজন বললেন—আলফা তারকা যার ঠিকানা হাজার কোটি কোটি মাইল দূরে তাকেও তো দেখা যায়।

এমনি ভাবেই মানুষের দূরের বস্তুকে দেখার আগ্রহ একটা নেশার মতো পেয়ে বসে। যতো দূরেই চোখ থাক না কেন, খানিক পরে বা দু'দিন পরে কি দু' বছর পরে দেখা যায় আরো আছে—দূরের বস্তু দেখার কাজ শেষ হয়ে যায় নি। দূরত্ব বিজিত হয় নি।

এর পরে স্বাভাবিক ভাবেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

'হাজার কোটি কোটি' করতে যে সংখ্যাটা বোঝায় তা' লিখে বা পড়ে আমরা যা বুঝতে পারি, তাতে আনন্দের চাইতে বিরক্তিই উদ্রেক করে বেশি। সেইজন্যেই শূন্যগুলির বিরক্তিকর প্রভাবের উর্ধ্বে উঠবার জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আলোর গতি দিয়ে দূরত্ব প্রকাশ করাকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা বলেন আলোক বৎসর। অর্থাৎ কিনা সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল যার গতি, এ হেন আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে ততোটা দূরত্ব! সে হিসেবে আলফা তারকার দূরত্ব ৪.৩ আলোক বৎসর। অর্থাৎ কি-না আলফা তারকাকে আমরা এখন যা দেখছি তা তার এখনকার চেহারা নয়—৪.৩ আলোক বছর আগেকার চেহারা।

'ওমেগা' তারকার দূরত্ব হলো ২',০০০ আলোক বৎসর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ওমেগা নেহাৎ সৌরজগতের প্রতিবেশী বললেই হয়। এই ওমেগার আলোক আমাদের সূর্যের চাইতে কয়েক কোটি গুণ বেশি।

অ্যাণ্ড্রোমেডা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে এ রকম অনেক নক্ষত্র আছে, যার দীপ্তি আমাদের সূর্যের চাইতে অন্তত পাঁচ শ' কোটি গুণ বেশি। পৃথিবী থেকে অ্যাণ্ড্রোমেডার দূরত্ব প্রায় পনের লক্ষ আলোক বৎসর।

আজকের দিনে সবচাইতে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যেটি অর্থাৎ মাউণ্ট পালোমার অবজারভেটোরীর ২০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপ তার সাহায্যে ২০০ কোটি আলোক বৎসরের দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডটা দেখে ফেলবার জন্যে যে জাতীয় দূরবীণ দরকার পালোমারের দূরবীণ তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ প্রয়োজন হয় তো মেটাতে পারবে। তবে আপাতত এটেই যথেষ্ট, কারণ মানুষের এখন পর্যন্ত বীজগণিতে যা দখল তাতে ওর বেশি দূরের বস্তু দেখতে পারলেও তাকে কোনো অঙ্কের ফরমূলায় ফেলা যাবে না।

—জিজ্ঞাসু

কীটের কৃপায়

কুকুর, গরু, ঘোড়া, ভেড়া, মোষ বা উট প্রভৃতি জানোয়ারগুলিকে যদি একদিন অকস্মাৎ কোনো কৌশলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা যায়, তা'হলেই দেখা যাবে মানুষের জীবনে কতো দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে।

খুব ছোটো, চোখে দেখা যায় না, এমনিধারা কীটের কথাই ধরা যাক না কেন। তাদের কাছেই কি আমাদের ঋণ কম? মাটিতে উৎপন্ন শস্য, ফলমূল—এক কথায় আমরা যা কিছুই খেতে পাচ্ছি সে যে তাদেরই কৃপায়।

পাথরের ওপর গাছপালা জন্মায় না। মরুভূমিতে ফসল ফলে না। কিন্তু কেন? পাথর শক্ত বলে না কি মরুভূমি উত্তপ্ত বলে? মরূদ্যানেই বা সম্ভব কি করে হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলির একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হলো—কীট। যেখানে কীট নেই বা কীট বাঁচতে পারে না, সেখানে কোনো উদ্ভিদই জন্মাতে পারে না। আর যদি কীটদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়, তা'হলে মরুভূমিতেও উদ্ভিদ জন্মাতে পারে—যেমন মরূদ্যানে হচ্ছে।

নীল নদের দু'পাশের জমিকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উর্বরা জমি বলে কৃষিবিদগণ মনে করেন। এর কারণস্বরূপ তাঁরা বলেন যে, এখানে প্রতি একরে অন্তত বিশ লক্ষ রকমারি জাতের ছোট বড়ো কীট সর্বদাই থাকে—বর্ষাকালে এই সংখ্যাটা আরো বেড়ে যায়।

এখন দেখা যাক কি ভাবে কীট ফসল ফলাতে সাহায্য করে।

কীটের খাদ্য প্রধানত ঘাস-পাতা। কিন্তু এই ঘাস বা পাতা খেতে গিয়ে ধূলিকণার মতো কিছু কিছু মাটি, বালি এমন কি পাথর-কণাও ওরা খেয়ে ফেলে। এই খাদ্য খাবার পর ওরা যে মলত্যাগ করে তাই হলো পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক সার। ওদের দেহরসের সঙ্গে মিশ্রণের ফলেই এ জিনিসটি সম্ভব হয়। মল হিসেবে যা বেরিয়ে আসে তা' হয় অতিমিহি—ঠিক যেরকমটি মানুষের তৈরি কোনো কলে হতে পারে না। এ জিনিসটাকে একরকম মাটি বলেই ভুল হতে পারে। কিন্তু নিছক মাটি এ নয়। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কীট এইভাবে যে মাটির স্তর সৃষ্টি করে 'আসল' মাটির ওপর, উদ্ভিদের জন্ম সম্ভব হয় তারই সাহায্যে।

কীট তার নিজের প্রকৃতির তাগিদে যে 'সার মাটি' উৎপন্ন করে থাকে—এর পরিমাণ আর কতোই বা হতে পারে?—এ রকম কথা মনে আসা অস্বাভাবিক নয়, কারণ এতটুকু তো কীট। কীট নিজে খুবই ক্ষুদ্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সংখ্যায় তারা অগণ্য, এটা মনে রাখা দরকার। তাই তাদের মোট পরিশ্রমের ফলটা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হবে। যদি বলা যায় যে, ঐ কীটবাহিনী এক লক্ষ বর্গমাইলেরও কম কোনো দেশে বত্রিশ কোটি টন 'সার মাটি' দিয়ে জমিকে ফসল ফলাতে সাহায্য করেছে মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যে—তা' হলে খুব একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেছে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকই এটা ঘটেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই প্রতি বছর ব্যাপারটা ঘটে চলেছে। এটা হচ্ছে গ্রেট বৃটেনের ব্যাপার, জমির উর্বরাশক্তি যেখানে প্রথম শ্রেণীর তো নয়ই, বোধ হয় দ্বিতীয় শ্রেণীরও নয়।

ফসল ফলানোর জন্যে কীটের এই যে অপরিহার্যতা এটা আজকের দিনের কৃষিবিদমাত্রেই স্বীকার করে থাকেন। সেইজন্যে রাসায়নিক সারের চাইতেও এই কীটের দেওয়া 'সার মাটি'র চাহিদা বেশি দেখে অনেক দেশেই কীটের ব্যবসায় সুরু হয়ে গেছে। কীটপূর্ণ মাটি সোনা না হোক, রূপোর দামে বিকোতে সুরু হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে বিখ্যাত কৃষিবিদ স্যার আলবার্ট হোয়ার্ড বলেছেন যে, কীটের পূর্ণ সহযোগিতা ভিন্ন মাটিকে আমরা উর্বরা রাখতে পারবো না। কীটের শক্তিকে সুসংবদ্ধ করে আমাদের কাজে লাগাতেই হবে।

সুসভ্য এবং বুদ্ধিমান মানুষের যে কৃপার পাত্র হতে বাধে, তাই দয়ার দানকে জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেবার উদ্যম। —তথ্যান্বেষী

৬৬

'তোমার ভাগ্য অপরিসীম।' সনাতনকে বললে হরিদাস, 'তোমার দেহকে প্রভু তাঁর নিজধন বলেছেন। নিজদেহে মথুরা-মণ্ডলে যে কাজ করতে পারছেন না তাই তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন। বরং আমার দেহই বৃথা গেল। ভারতবর্ষে জন্ম নিলাম অথচ কারু উপকার করতে পারলাম না।'

পরোপকারই ভারতবর্ষের ধর্ম। কী বলছেন প্রভু?

'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥'

শ্রীকৃষ্ণও বলছেন ব্রজবালকদের, 'প্রাণ অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরহিতাচরণই দেহীদের জন্মের সাফল্য। সর্বপ্রাণীর উপজীব্যস্বরূপ বৃক্ষের দিকে চেয়ে দেখ। যাচক কখনো এর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না। পত্র পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল অস্থি গন্ধ নির্যাস ভস্ম সমস্ত কিছু দিয়ে সে প্রাণীর উপকার করে।'

'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই।' বললে সনাতন, 'তুমি যে পরোপকার করছ তা অতুলনীয়। প্রভুর অবতারের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে নাম প্রচার। তুমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নামকীর্তন করছ, যে শুনছে তারই সংসার-বীজ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ভারতভূমিতে তোমার জন্মই সার্থকতম। তুমি তো শুধু প্রচার কর না তুমি আচরণ কর, তাই তুমিই সকলের গুরু।'

'আচার-প্রচার-নামের কর দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু সর্বজগতের আচার্য॥'

প্রভু যমেশ্বরটোটায় আছেন, পুরীতে খবর পাঠালেন সনাতন যেন মধ্যাহ্ন-ভিক্ষার সময় আসে।

সনাতন আছে হরিদাসের সঙ্গে, সিদ্ধবকুলের স্থানে। প্রভুর ডাক পেয়ে তক্ষুনি সে বেরিয়ে পড়ল।

সিদ্ধবকুল হতে যমেশ্বর যাবার দু'টো রাস্তা। একটি মন্দিরের সিংহদ্বার পেরিয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে, অন্যটি সমুদ্রতীর ধরে। প্রথম পথটাই অপেক্ষাকৃত সহজ ও অকষ্টসাধ্য।

দ্বিতীয় পথটা দীর্ঘ, নির্জন, বালুকাপূর্ণ। জ্যৈষ্ঠের বেলা, তবু সনাতন দ্বিতীয় পথই নির্বাচন করল। গাছ-গাছালি নেই, প্রাচীরের অন্তরাল নেই, ছায়ার তন্মাত্র সম্ভাবনা নেই, তবু এই রুক্ষ তপ্ত পথেই যাত্রা করল সনাতন। কিন্তু প্রভু ডেকেছেন এই আনন্দে সে এত ভরপুর যে তপ্ত বালিতে তার পা পুড়ছে এ তার খেয়াল নেই। প্রভু তন্ময়তায় তপ্ত বালিও সুখস্পর্শ হয়ে উঠেছে। দু'পায়ে ফোস্কা পড়েছে—তা পড়ুক।

ভিক্ষাশেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন, সনাতন এসে পৌছুল। ভিক্ষাবশেষ গোবিন্দ নিয়ে এল তার জন্যে। সনাতন প্রসাদ পেল।

প্রসাদান্তে প্রভুর কাছে এলে প্রভু জিগগেস করলেন, 'সনাতন, কোন্ পথে এলে?'

'সমুদ্রতীরের পথ দিয়ে এসেছি।'

'সে কি, সিংহদ্বারের পথ দিয়ে এলে না কেন? সিংহদ্বারের পথ ঠাণ্ডা, আর সমুদ্রতীরের পথ তপ্তবালিতে দুঃসহ।' প্রভু কাতরমুখে বললেন, 'তোমার পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে, তুমি হাঁটলে কী করে?'

'পায়ের ফোস্কা টের পাই নি। তা'ছাড়া, সনাতন অপরাধীর মত বললে, 'তা'ছাড়া সিংহদ্বারের পথে

যাবার আমার অধিকার নেই। সে পথে জগন্নাথের কত সেবক যাতায়াত করছে, যদি অতর্কিতে কারু সঙ্গে আমার গাত্রস্পর্শ হয়ে যায় তা'হলে আমার অপরাধের শেষ থাকবে না। আমার স্পর্শে দেবসেবার কাজ অপবিত্র হবে এ আমার কাছে অসহ্য।'

সনাতনের দৈন্য ও মর্যাদাবোধ দেখে প্রভু তুষ্ট হলেন। বললেন, 'তুমি অপবিত্র এ তোমাকে কে বলল? তুমি জগৎ-পাবন, তোমার স্পর্শে মুনি-ঋষিরা পবিত্র হয়। তবু সম্মানীকে উপযুক্ত মর্যাদা করাই ভক্তের স্বভাব। এই মর্যাদা-পালনই সাধুর অলঙ্কার। অভিমানীরাই অন্যের মর্যাদারক্ষণে অনিচ্ছুক। তোমার অন্তরে অভিমানের লেশ নেই, তাই তোমার ঐ ভক্তের ব্যবহার—তোমার মত এমনটি আর কোথায়?'

সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। তার কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগল।

কত নিষেধ করছে, তবু প্রভু শোনেন না। ক্ষোভে লজ্জায় শীর্ণ ও মলিন হল সনাতন।

পরে একদিন জগদানন্দকে সে তার দুঃখের কথা জানাল। বললে, 'প্রভুকে দর্শন করে নিজের দুঃখ খণ্ডাতে এলাম নীলাচলে, কিন্তু যা মনে বাসনা ছিল তা প্রভু পূর্ণ করতে দিলেন না। দিলেন না রথের চাকায় দেহত্যাগ করতে। অথচ তাঁর অঙ্গস্পর্শ করে কত যে অপরাধ হচ্ছে তার কূলকিনারা নেই। হিতের জন্যে এলাম, বিপরীত হয়ে গেল। কী করি বলতে পারো?'

জগদানন্দ বললে, 'তুমি নীলাচল ত্যাগ করো। বৃন্দাবনই তোমার উপযুক্ত বাসস্থান, রথযাত্রার পর তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও।'

সনাতন আশ্বস্ত হল। 'ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনই আমার প্রভুদত্ত দেশ, আমি নীলাচল ছেড়ে সেখানে গিয়েই বাস করব।'

হরিদাসের স্থানে প্রভুকে দেখে স্পর্শভয়ে সনাতন পিছু হটে যাচ্ছিল প্রভু জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করে ধরলেন।

সনাতন বললে, 'প্রভু, আমার দোষ আর বাড়িও না। আমি এমনিতেই নীচ তাই এখন এই বীভৎস রোগে ভুগছি। তোমার অবশ্য ঘৃণালেশ নেই কিন্তু আমি তো বুঝি কণ্ডুর রসে-রক্তে তোমার পবিত্র গাত্র কলুষিত করে আমি কী ঘোর অপরাধ করছি। তাই, আজ্ঞা করুন, রথ দেখে আমি বৃন্দাবনে চলে যাই। জগদানন্দ পণ্ডিতকে জিগগেস করেছিলাম, তারও সেই মত।'

'কালকের ছাত্র জগা, তার কি-না এত অহঙ্কার তোমাকে উপদেশ করে!' রুষ্ট হলেন প্রভু, বললেন, 'সর্বব্যাপারে তুমি তার গুরুতুল্য, ওর নিজের দৌড় কতদূর তা বুঝি ওর খেয়াল নেই? তুমি আমার উপদেষ্টা, তুমি প্রামাণিক, তুমি মাননীয় জন, তোমার মূল্য ও কী বুঝবে? ও নিতান্ত অর্বাচীন।'

'জগদানন্দের কী ভাগ্য!' সনাতন বললে, 'আপনি তাকে তিরস্কার করছেন। যে আপনার জন তাকেই তো লোকে তর্জন-তাড়ন করে। আর আমি আপনার অনাত্মীয়। তাই তো আমাকে আপনি গৌরবস্তুতি করছেন। আপনার ভর্ৎসনা মধুর আর প্রশংসা তিক্তের চেয়েও তিক্ত। আমার মত হতভাগা আর কে আছে? আমি আপনার আত্মীয়তা পেলাম না।'

প্রভু বুঝি একটু লজ্জিত হলেন। বললেন, 'তোমার চেয়ে জগদানন্দ আমার কাছে বেশি প্রিয় নয়, তবে জানো তো আমি মর্যাদা লঙ্ঘন সহ্য করতে পারি না, সে কেন তোমাকে উপদেশ করতে যাবে? তোমাকে যে আমি প্রশংসা করি তা বহিরঙ্গবুদ্ধিতে নয়, তোমাকে বাইরের লোক মনে করে নয়, তোমার এত গুণ, তোমাকে স্তুতি না করে থাকা যায় না। বহু লোকের প্রতি প্রীতি থাকলেও প্রীতি সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। রূপে ও প্রকৃতিতে ও মাত্রায় তাতে তারতম্য থাকা সম্ভব। তোমার দেহ তোমার কাছে বীভৎস কিন্তু আমার কাছে অমৃততুল্য। তোমার দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, অথচ বুদ্ধিদোষে তুমি তা প্রাকৃত মনে করছ। আর, যদি তা প্রাকৃতও হয়, তা'হলেও তাকে উপেক্ষা করা চলে না। জ্ঞানযোগীর কাছে আবার ভালো-মন্দ কী, ভদ্রাভদ্র কী। তার কাছে সমস্তই ব্রহ্ম।'

'ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে।'

ভক্তিযোগের চোখে দেখতে গেলে তোমার দেহ চিন্ময়, জ্ঞানযোগের চোখে দেখতে গেলেও তা পবিত্র-অপবিত্রের বাইরে এবং সেই অর্থে অপ্রাকৃত। সুতরাং যে দিক থেকেই দেখ, তোমার দেহ অস্পৃশ্য নয়, কদর্য নয়, বর্জনীয় নয়।

জ্ঞানযোগের কথা বলছেন প্রভু।

অবস্তুর আবার দ্বৈত কী? ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু আর সমস্তই অসার। পদার্থই যখন মিথ্যে তখন তার সম্বন্ধে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানও মিথ্যে। যে জ্ঞানবাদী সে তো সমদর্শী, সে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক দেখে, গরু হাতি কুকুরেও কোনো বৈষম্য নেই। লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনও তার কাছে সমান। সমদর্শীই জ্ঞান বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা।

'শোনো সনাতন, আমি তো সন্ন্যাসী,' বললেন প্রভু, 'আমার ধর্মও সমদর্শন। চন্দনে ও পঙ্কে আমার সমবুদ্ধি। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে ত্যাগ করলে আমার নিজ ধর্ম, সন্ন্যাসধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়।'

হরিদাস বললে, 'প্রভু, এ তোমার পরিহাস। তোমার প্রতারণা। জ্ঞানযোগের কথা বাজে কথা। আমি আসল কথাটি জানি।'

'সে আবার কোন কথা?' প্রভু হরিদাসের দিকে তাকালেন।

'আসল কথা হচ্ছে, আমরা অধম আমরা পতিত আর তুমি দীনের প্রতি পতিতের প্রতি স্বভাবদয়ালু।' বললে হরিদাস, 'তুমি তোমার দীনদয়ালগুণে আমাদের অঙ্গীকার করে নিয়েছ। ঘৃণ্য জেনেও স্থান দিয়েছ পাদপদ্মে।'

'না, তা নয়।' বললেন প্রভু, 'তোমাদের আমি লাল্য মনে করি, আর নিজেকে মনে করি লালনকর্তা। মা যেমন সন্তানের ক্লেদমালিন্য ধুয়ে-মুছে দেন, তেমনি। মার মধ্যে কি ঘৃণা থাকে না দোষজ্ঞান থাকে? মার মধ্যে যে ভাব তাকে তুমি শুদ্ধ দয়াও বলতে পারো না। মার মধ্যে শুধু স্নেহসুখ, শুধু প্রীতিময়ী পরিচর্যা। সনাতনের প্রতিও আমার সেই মাতৃস্নেহ। শিশু সন্তানের গায়ে যদি কণ্ডুরস থাকে মা কি তাকে কোলে নেয় না, না কি কোলে নিতে তার ঘৃণা হয়? আমার তো মনে হয় ক্লিন্ন বলেই মার সন্তানকে কোলে নিতে বেশি আনন্দ।'

> 'তোমাকে 'লাল্য' মানি আপনাকে 'লালক' অভিমান।
> লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥
> মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
> ঘৃণা নাহি উপজয়, আরো সুখ পায় ॥
> লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়।
> সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায় ॥'

'সে তো একবার বাসুদেবের বেলায় দেখেছি।' বললে, 'তার গলিতকুষ্ঠে কীট পর্যন্ত জন্মেছিল। তোমার আলিঙ্গনে সে কীটমুক্ত কুষ্ঠমুক্ত হয়ে গেল। কন্দর্পের কান্তি জাগল শরীরে। কৃপার তরঙ্গ, তোমার সে আলিঙ্গনের মহিমা কে বুঝতে পারে?'

'বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত নয়।' বললেন প্রভু, 'বৈষ্ণব-দেহ চিদানন্দময়। দীক্ষাকালে ভক্ত যেই কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করল, অমনি সে কৃষ্ণের আত্মসম হয়ে উঠল। ভগবানে সমর্পিত ভক্তদেহ তাই চিন্ময়ত্ব অর্জন করল। তাই সনাতন, তোমার দেহ নিত্যপবিত্র, তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি নিত্যতৃপ্ত নিত্যসুখী।'

বলে আরেকবার আলিঙ্গন করলেন। আর তখুনি সকলে দেখল, সনাতনের শরীরে আর কণ্ডু নেই, সর্ব-অঙ্গ মসৃণ সোনার মত ঝলমল করে উঠেছে।

'এই তোমার ভঙ্গি!' উল্লসিত হয়ে উঠল হরিদাস: 'ঝাড়িখণ্ডের জল খাইয়ে সনাতনের দেহে কণ্ডু করালে, তারপর তাকে পরীক্ষা করলে যন্ত্রণায় পড়ে ভগবানে দোষ দেয় কি-না, কর্তব্যে বিমুখ হয় কি-না, পরে নিজেই আবার ব্যাধির নিরাকরণ করলে। তোমার এ লীলারহস্য কে দেখে কে বোঝে।'

'এ বৎসরের শেষে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাব।' সনাতনকে আশ্বস্ত করে বিদায় হলেন প্রভু।

রথযাত্রা হয়ে গেল। গৌড়ীয় ভক্ত যারা এসেছিল বেণু-শিঙা খোল করতাল নিয়ে, ফিরে গেল বাঙলায়। দোলযাত্রার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করল সনাতন। তারপর যাত্রা করল।

প্রভু যে পথে গেছেন সনাতন সেই পথ ধরল। কোন গ্রামে কোন নদীতে কোন পাহাড়ে প্রভুর কী কী লীলা হয়েছে বলভদ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সব জেনে নিল। সেই সব দেখতে দেখতে প্রেমাবেশে পৌঁছুল বৃন্দাবন।

ওদিকে রূপও নিশ্চিন্ত হল। যা বিষয়-সম্পত্তি ছিল কুটুম্ব ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে বণ্টন করে দিল। মনের যত-কিছু গোপন কথা বা ইচ্ছা ছিল তা-ও উগরে দিয়ে এল। কিছুই আর লুকোবার নেই, চিন্তিত করবার নেই। অন্তরে-বাহিরে ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেল।

সে-ও এসে মিলল সনাতনের সঙ্গে।

লুপ্ত তীর্থ প্রকট করবার কাজে লেগে গেল

দু'জনে। লেগে গেল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায়। কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণনাম-প্রচারে।

তাদের ভাইপো, বল্লভের ছেলে শ্রীজীবও গৌড় থেকে চলে এল বৃন্দাবন।

রাসকেলিতে প্রভুকে প্রথম দেখে শ্রীজীব। তার অনেক দিন পর একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখে কৃষ্ণ-বলরাম এসেছে। আবার কতক্ষণ পরে দেখে, কৃষ্ণ-বলরাম কোথায়, এ যে গৌর-নিতাই। যুগলমূর্তির পায়ে শ্রীজীব লুটিয়ে পড়ল। দু'জনেই তার মাথায় পা রাখলেন। প্রভু বললেন, তোমাকে নিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করে দিচ্ছি। নিত্যানন্দ বললেন, আমার প্রভুকে দেখ। প্রভুই তোমার সর্বস্ব হোক।

ঘুম ভাঙতেই শ্রীজীব দেখল রাত্রি আর নেই। অধ্যয়নের ছলে সে নবদ্বীপ ছুটল। শ্রীবাস-অঙ্গনে দেখা পেল নিত্যানন্দের। নিত্যানন্দ বললে, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতেই খড়দহ থেকে এখানে এসেছি। বলতে এসেছি, তুমিও বৃন্দাবনে যাও। তোমাদের বংশের সকলেরই বৃন্দাবন-বাস নির্ধারিত হয়েছে।'

'আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া ব্রজবাসের ফল মিলবে না। নিত্যানন্দই মূল ভক্ত-তত্ত্ব, তার কৃপা হলেই ভক্তির কৃপা হবে। আর ভক্তির কৃপা না হলে কিসের রাধাকৃষ্ণের—

তাই 'নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।'

আবার ঐ তিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঘুনাথ দাস।

অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হলেও কিছু নয় যদি না হরিকথায় রতি হয়! যদি নামানন্দের পথই না উন্মুক্ত হয় তা'হলে ধর্মানুষ্ঠানও বৃথাশ্রম।

দৈন্যার্ণবে শ্রীচৈতন্য আমার মহাবৈদ্য। আমি বৈগুণ্যকীটকলিত, আমি পৈশুন্যব্রণপীড়িত, আমি ভক্তিহীন দীন-দরিদ্র, আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? আমি শুধু দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্যে শরণ নিলাম।

প্রভুর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে এসেছে প্রদ্যুম্ন মিশ্র, নীলাচলের এক ব্রাহ্মণ। প্রভু বললেন, 'রামানন্দ রায়ের কাছ থেকেই আমার কৃষ্ণকথা শোনা। তুমি তার কাছে যাও। সেই তোমাকে তৃপ্ত করবে।'

রামানন্দের বাড়ি গিয়ে রামানন্দের দেখা পেল না প্রদ্যুম্ন। চাকর বললে, নিভৃত উদ্যানে দু'জন সুন্দরী যুবতী দেবদাসীকে রামানন্দ অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছে। নিজের হাতেই স্নান-মার্জন করে সাজসজ্জা পরিয়ে দিচ্ছে। নিজের লেখা নাটক, নাম জগন্নাথবল্লভ, তাই এত সূক্ষ্ম মনোযোগ। তাই নিজের হাতে সমস্ত নিখুঁত করার চেষ্টা।

'স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গ-মণ্ডন।
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন॥'

প্রদ্যুম্ন বিরক্ত হয়ে ফিরে এল প্রভুর কাছে। রামানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করল। এই আপনার রামানন্দ? এমন লোক কৃষ্ণকথার অধিকারী?

'হ্যাঁ, সেই প্রকৃত অধিকারী।' বললেন প্রভু, 'চিত্তচাঞ্চল্যে এত কারণ থাকা সত্ত্বেও রামানন্দ বিকারশূন্য।'

'নির্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥'

ব্রজেন্দ্রনন্দনকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করছেন। যে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সেই লীলাকথা শোনে ও বর্ণনা করে তার মধ্যে সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের বিকার আর থাকে না। চিত্তের যত দুর্বাসনা সব ঐ তিনগুণের বিকার থেকে। গুণবিকার লোপ পেলে দুর্বাসনারও নিরসন হয়। দুর্বাসনা গেলেই ভক্তি জাগে। শ্রবণে কীর্তনে সে ভক্তি প্রেম-মাধুর্যে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

'ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বলমধুর প্রেম ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্যে বিহরে সদায়॥'

'রামানন্দের ভজন রাগমার্গে।' বললেন প্রভু, 'তার দেহ সিদ্ধদেহ, তার মন অপ্রাকৃত। সেই তো ঠিক-ঠিক বলবে কৃষ্ণকথা। যাও, তার কাছেই ফিরে যাও। বোলো আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।'

প্রদ্যুম্ন ফিরে গেল রামানন্দের কাছে। বললে, 'আপনার কাছে কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন।'

শুনে রামানন্দের প্রেমাবেশ হল। সুরু করল কৃষ্ণকথা। রসামৃতসিন্ধুতে মিত্রকে নিয়ে ডুবল রামানন্দ। দিনের অন্ত হয়ে যায় কিন্তু কথার অন্ত হয় না।

'শোনো, তোমাকে আসল রহস্যটা বলি।'

'কী ?'

'আমার মুখে যত কৃষ্ণকথা শুনছ তার বক্তা কিন্তু আমি নই, তার বক্তা গৌরচন্দ্র। যেমন বলাচ্ছেন তেমনি বলছি।'

সেই কথাই প্রভুর কাছে নিবেদন করল মিশ্র।

'কেমন দেখলে রামানন্দকে ?'

'মূর্তিমান কৃষ্ণপ্রেম।'

'কেমন শুনলে ?'

'অপূর্ব। কিন্তু উনি বললেন, সবই আপনার কথা। উনি বীণা, আপনিই বীণকার।'

'রামানন্দ বিনয়ের খনি।' বললেন প্রভু, 'মহানুভবদের রীতিই এই, নিজের গুণলেশও তারা প্রচার করে না।'

রামানন্দ শূদ্র আর প্রদ্যুম্ন মিশ্র ব্রাহ্মণ। শূদ্রদ্বারে পাঠালেন ব্রাহ্মণকে, তার বর্ণাভিমান চূর্ণ করতে। ভক্তি-সম্পত্তি ব্রাহ্মণেরই একচেটে নয়, শূদ্র যদি ভক্ত হয় তা হলে তার থেকে পাঠ নিতে ব্রাহ্মণের কেন অভিমান থাকবে ? গৃহস্থ যদি ভক্ত হয় তবে সন্ন্যাসী-পণ্ডিতও বা কেন কৃষ্ণকথার জন্যে তার শরণ নেবে না ? কৃষ্ণকথাবেত্তা যবন হরিদাস কার না গুরু হবার যোগ্য ?

'সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ।
নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্মের প্রকাশ॥'

বাঙলা দেশ থেকে এক পণ্ডিত এসেছে প্রভুকে স্বরচিত কবিতা শোনাতে। কবিতায় কী আছে ? গৌরচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা আছে। তবে পড়ো শুনি। ভক্তরা শুনে প্রশংসা করল চমৎকার হয়েছে। কিন্তু এ প্রশংসায় কবির মন উঠল না। স্বয়ং প্রভু যদি প্রশংসা করতেন।

ভগবান আচার্যের সঙ্গে চেনা ছিল, কবি তাকে গিয়ে ধরল।

ভগবান বললে, 'দাঁড়াও আগে স্বরূপ দামোদরকে শোনাও। সে যদি অনুমতি করে তবেই প্রভু শুনতে সম্মত হবেন। রসাভাব বা শাস্ত্রবিরোধ সহ্য করতে পারে না প্রভু, তাই পূর্বাহ্নেই রচনা যাচাই করে নেওয়া দরকার। স্বরূপের মত রসদক্ষ আর কে আছে ? তাকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, প্রভু চান না সে মর্যাদার ব্যতিক্রম হয়।'

স্বরূপের কাছে গিয়ে সুপারিশ করল ভগবান।

'আমি শুনেছি। খুব সুন্দর হয়েছে।'

'তুমি তো সারল্যের অবতার, যা শোনো তাই তোমার কাছে সুন্দর। কিন্তু ব্যাকরণ জানে না, অলঙ্কার বোঝে না, রসবিচারে যার নৈপুণ্য নেই সে কৃষ্ণলীলা লিখবে কী ?' স্বরূপ বিরক্ত হল: চৈতন্য লীলা তো আরো দুরূহ। আর শুধু শাস্ত্রে-ব্যাকরণে অভিজ্ঞতা থাকলেই চলে না, ভগবৎ কৃপার প্রয়োজন। যে গৌরগতচিত্ত, গৌরপাদপদ্ম যার প্রিয়ধন শুধু সেই কৃষ্ণলীলাবর্ণনে সমর্থ।'

'কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥'

'সবই ঠিক। তবু তুমি একবার শুনে দেখ না—'

আরো অনেকে অনুরোধ করতে স্বরূপ রাজি হল।

বঙ্গকবি পড়তে সুরু করল। প্রথমে নান্দীশ্লোক :

'বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥'

'অর্থ বলো।'

কবি অর্থ বললে। 'স্বভাবজড় অসংখ্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করবার জন্যে যে স্বর্ণবর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রফুল্লকমলনয়ন জগন্নাথের দেহে ইহলোকে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করুন।'

'তার মানে জগন্নাথ দেহ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আত্মা ? স্বরূপ দামোদর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল: 'তার মানে জগন্নাথ থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথক ? ঈশ্বরে তুমি দেহ-দেহী ভেদ করলে ? ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেহ দুই-ই চিদ্‌ঘন বস্তু। স্বরূপ বা আত্মাও চিদানন্দময়, দেহ বা বিগ্রহও চিদানন্দময়। যিনি পূর্ণানন্দ ষড়ৈশ্বর্য স্বয়ং ভগবান সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তুমি ক্ষুদ্র এক দেহধারী জীব বানালে ?'

দামোদরের বিচারে সকলে চমৎকৃত হল। কী করে যে তারা কবির প্রশংসা করেছিল, তাই ভেবে লজ্জায় মিশে গেল মাটির সঙ্গে। আর বঙ্গকবি

অধোমুখে কাঁদতে বসল। ছি ছি, কী পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিয়ে কৃষ্ণকথা বলতে বসেছি।

দামোদরের দয়া হল। বললে, 'কোনো বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়ো। চৈতন্যচরণে শরণ নাও। ভক্ত সঙ্গ করো। তা'হলেই কৃষ্ণলীলা নির্মল করে বর্ণনা করতে পারবে। তবে অন্য ভাবে তোমার শ্লোকের একটা নির্দোষ ব্যাখ্যা হতে পারে।'

'কী?' বঙ্গকবি উৎসুক হল।

'কৃষ্ণ এক অদ্বয় তত্ত্ব—স্থাবর-ব্রহ্ম জগন্নাথ আর জঙ্গম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই দুই রূপে সংসারাসক্ত জড়বুদ্ধি জীবকে ত্রাণ করছেন।' বিশদ হল দামোদর ঃ 'শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে এক তত্ত্ব, কিন্তু রূপে দুই। এক গতিশীল গৌরাঙ্গ আর এক স্থিতিশীল বিগ্রহ বা জগন্নাথ। গৌরাঙ্গ নীলাচলের বাইরে দেশে-দেশে গিয়ে বাইরে জঙ্গম-ব্রহ্ম হয়ে ত্রাণ করল আর যারা নীলাচলে এল তারা উদ্ধার পেল জগন্নাথদর্শনে। যাই হোক, নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণনাম করলেই যেখানে ভবক্ষয়, সেখানে তোমার অর্থও তোমাকে মুক্তি এনে দেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

'কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥'

[ক্রমশ।

মানবতা যখন বিপন্ন

প্রায় দু'শো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, আজ আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক বলে সমস্ত বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এই গর্ব যেন আমাদের আত্মবিস্মৃত না ক'রে তোলে, আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এই স্বাধীনতা এসেছে বহু বছরে বহুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আত্ম-বিসর্জনের ফলে। স্বাধীনতার আগুনে তিলে তিলে সমিধ জুগিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল যারা, তাদের বিস্মৃত হয়ে আনন্দ করার অধিকার নেই কারুরই। সতেরো বছর আগে দেশভাগের বেদনাদায়ক প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়ে আমাদের নেতারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, ভুললে চলবে না যে, সে সিদ্ধান্তের ফলে সেদিন দুর্যোগ নেমে এসেছিল আমাদেরই বৃহৎ এক অংশের জীবন জুড়ে; স্বাধীনতার সংগ্রামে যারা একদিন আমাদেরই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমানভাবে যুদ্ধ করেছে, ত্যাগ ও দুঃখ বরণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছে অবিচলিত হৃদয়ে। ভুললে চলবে না যে পূর্ব-পাকিস্তানের সেই অগণ্য হিন্দু অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকার দায়িত্ব আমাদেরই। কিন্তু সে দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা অর্থাৎ আমাদের সরকার কি সত্যই সচেতন? আজ এ প্রশ্ন সর্বত্র সোচ্চার হয়ে উঠেছে আর এ প্রশ্নের জবাবদিহি করতেও আমরা বাধ্য, না হলে অন্তত স্বাধীন ভারতের নাগরিক বলে গর্ব করার মত অবকাশ থাকে না। স্বাধীনতা অর্থাৎ বাঁচার স্বাধীনতা ও মুক্তি, ব্যাপক অর্থে মানুষের—মানুষের মত বাঁচার অধিকার, কিন্তু একথা আজ অনস্বীকার্য রূপেই সত্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা এ অধিকারে মনেপ্রাণে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েও তাদের জীবন আজ বিধ্বস্ত, তাদের সামগ্রিক অস্তিত্বও বিপন্ন, এ সময়ে মুখে মানবতার বড় বড় বুলি আওড়ালেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না, স্থির ও সুদৃঢ় কর্মপন্থার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে হবে। বর্তমানে এ সমস্যা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় মাইগ্রেসন ব্যবস্থার সমস্ত কড়াকড়ি অবিলম্বে শিথিল করা প্রয়োজন; যাতে যারা চলে আসতে চায় তারা নির্বিঘ্নে চলে আসতে পারে। এবার প্রশ্ন ওঠে পুনর্বাসনের। সে সম্বন্ধেও আমাদের মনে কোন দ্বিধা থাকলে চলবে না, যে কোন উপায়ে হোক আশ্রয়প্রার্থীকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার দায়িত্বও আমাদেরই। কারণ, ভুললে চলবে না যে, সুখের খাতিরে লক্ষ লক্ষ মানুষ কখনও নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অপরের কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াবার জন্য ছুটে আসে না। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে সমস্যার বাস্তব দিকটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকার অধিকার আজ আর আমাদের নেই। প্রয়োজন হলে এর জন্য আমাদের সংবিধানেরও পরিবর্তন করতে হবে, লোক বিনিময়ই যদি এর একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি হয়—তবে সেটাকেই মেনে নিতে হবে অসঙ্কোচে। মানবতা যখন বিপন্ন তখন যে কোন উপায়েই হোক তাকে রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম এবং সমষ্টিগতভাবে আমরা স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিকেরা আজ সে ধর্ম পালনে যেন তৎপর হতে পারি, না হলে মানুষ বলে পরিচয় দেওয়ার মত আমাদের যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

॥ প্রথম পর্ব ॥

সকাল থেকেই বড়বাড়িতে জিনিসপত্র আসতে সুরু হয়েছে।

সেই কোন ভোর থেকে সরীতে এসেছে খাট, চেয়ার, টেবিল আরও কত কি, তারপর ঠেলার সঙ্গে চাকর এনেছে সংসারের টুকিটাকি।

দুপুর একটার সময় ভাড়াটেরা এসে পৌঁছাল একটা ট্যাক্সি করে।

গাড়ি থেকে নামলেন একটি রোগা বেঁটে ভদ্রলোক, একটি বিধবা, বয়স যাঁর সত্তর পেরিয়েছে আর বছর সাতের একটি ছোট ছেলে।

সকলে যেন কলের পুতুলের মত নীরবে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। কোন দিকে তারা তাকিয়ে দেখল না। কোথায় এল, আশেপাশে কেউ আছে কি না, কিছুই যেন তাদের জানবার দরকার নেই। নির্দিষ্ট জায়গায় যেন তারা পৌঁছে গেছে। কোন দিকে লক্ষ্য না করেই তারা ভেতরে ঢুকে গেল। যেন বহুদিনের চেনাজানা কোন গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছেচে তারা।

এতদিন বাদে বড়বাড়ির ভাড়াটে এল। বড়বাড়ির এক-তলাতে যে ভাড়াটে বসবে, এ কথা সমস্ত পাড়াতেও কেউ কল্পনা করতে পারে নি।

কত পুরুষ ধরে বড়বাড়ির বাসিন্দারা তাদের আভিজাত্য আর ঐশ্বর্য নিয়ে মাথা উঁচু করে গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন বোধ হয় তলায় এসে ঠেকেছে সে ঐশ্বর্য, না হলে আর ভাড়া দেয়!

এই বড়বাড়ির ইতিহাস সম্বন্ধে জানা না-জানা কত কাহিনী জড়িয়ে আছে, পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলের মুখে। কত রকমের কল্পনা এসে মিশেছে, এদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসে, তাতে যেমন সাঁচে তেমনি আপন মনের মাধুরীও কম মিশে নেই। তার পর বড়বাড়ির বাসিন্দাদের স্বাতন্ত্র্যবোধও, যাকে পাড়াপড়শীরা নাম দিয়েছে দেমাক। তারই মাঝে এই হঠাৎ গড়ে ওঠা লোকালয়ে এই বড়বাড়ির লোকেরা যেন মিশেও এক হয়ে নেই।

কথায় বলে কবে ঘি খেয়েছিল, আজও হাত শুঁকছে। পাড়ার লোকেদের মতে এদেরও হয়েছে তাই। তবু নিষ্ফল আলোচনা ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারে না। দেমাকি হলেও ভদ্র এরা। আভিজাত্যর সঙ্গে মিশে আছে হৃদয়ের উত্তাপ, সে পরিচয়ও পেয়েছে পাড়ার লোকেরা, তাই আক্রোশটা জন্মাবার অবকাশ পায় নি, কিন্তু হিংসে, সেটুকু পুরোদস্তুর আছে।

তাই যখন তাদের চোখের সামনেই বড়কর্তার মৃত্যুর সঙ্গ সঙ্গে এই কর্তার আমলে বড়বাড়ির ক্রমশ ভাঙ্গন ধরতে আরম্ভ করল তখনই উৎসুক মন নিয়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগল, আরও অবনতির। কোন ক্ষতি করে নি এরা এ পাড়ার, বরং উপকারই পেয়েছে বড়কর্তার আমলে, কিন্তু আপন স্বভাবে এরা অনেকেই হিংসে না করে পারে নি, কৌতূহল তারও বেশি। ওদের রহস্যের বোরখা খোলবার নিষ্ফল চেষ্টায় তারা বরাবরই সমান আগ্রহ বোধ করেছে।

আজ যখন ভাড়াটেদের গাড়ি এসে জিনিসপত্র নামাতে সুরু করল, তখন নিশ্চিন্ত হল তারা।

তাহলে সত্যিই ভাঙ্গন ধরেছে, না হলে আর ভাড়া দেয়। কৌতূহলের সঙ্গে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসও বোধ হয় মেশান রইল প্রতিবেশীদের মনে।

অবশেষে বড়বাড়িতেও ভাড়াটে বসল। আর ভাড়া নিলেন কে? নতুন উঠতি পরিচালক সত্যব্রত সেন।

এ পাড়ায় সবই মধ্যবিত্তের বাস।

কোন কালে নাকি বড়বাড়ির আদিপুরুষ স্বপ্নে নির্দিষ্ট জায়গায় লক্ষ টাকার সন্ধান পেয়ে বড়লোক হয়ে আস্তে আস্তে সহর ছাড়িয়ে এই জায়গায় বিরাট বাড়িখানা তুলেছিলেন প্রায় তিরিশ বিঘে জমির

উপরে। তখন এ অঞ্চলের প্রায় সব জমিটাই ছিল জমিদার রাঘবনারায়ণ রায়ের। সে আজ কতকালের কথা।

তারপর একে একে আশপাশের জমিই শুধু বিক্রি হোল না, বিরাট পাঁচিল ভেঙ্গে মূল বসতবাড়ির লাগাও তিরিশ বিঘের ফল বাগানও বিক্রি হোল, ছোট ছোট প্লট ভাগ করে। সেও আজকের কথা নয়। বড়কর্তার ছোট বয়সে।

এখন বিঘে দু'য়েক বাদে সবটাই বিক্রি হয়ে গেছে। সে বিঘে দুয়েক জমি বাড়ির পেছন দিকে। মস্ত এক পুকুরশুদ্ধ কিছুটা ফলবাগান। তাও নাকি বিক্রি হয়ে গেছে, এমনিই শোনা যাচ্ছে।

বাড়ির সামনের জমিতেই রাস্তা রেখে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন বড়কর্তার মেজছেলে। বড়কর্তার নাকি বিশেষ আপত্তি ছিল বাড়িটাকে এভাবে বেআব্রু করার? কিন্তু দক্ষিণের এই জমির দাম লোভনীয় ভাবে প্রাপ্তির আশায় বড়কর্তার সে আপত্তি টেকে নি। অবশ্য জমি বিক্রির পরই বড়কর্তার সেই একগুঁয়ে মেজছেলে মারা যান এ্যাক্সিডেন্টে। বড়কর্তাও বাঁচেন নি বেশিদিন। কিন্তু তার মধ্যেই সম্পত্তি তলায় এসে ঠেকেছে।

আইন করে জমিদারী বাজেয়াপ্তর বহু আগেই রায় বংশের জমিদারী প্রায় লোপ পেয়েছে। বাকী ছিল প্রাসাদতুল্য এই বাড়িটা।

এই বিরাট বাড়ির আশেপাশের জমিগুলো কিনে নিয়ে নানান শ্রেণীর লোক এসে বাড়ি তুলেছে সেখানে। বেশির ভাগে পূর্ববঙ্গ থেকে।

সস্তায় পাওয়া জমিতে যার যেটুকু সম্বল দিয়ে তোলা বাড়িগুলো বিচিত্রতার স্বাক্ষর দিচ্ছে, তাই বড়বাড়ির বিরাট পাঁচিলের প্রায় গা থেকেই উঠেছে পূর্ণ ঘোষের একতলা বাড়ি।

পূর্ণ ঘোষের স্ত্রী নাকি চিনতেন এই সত্যব্রত সেনকে ঢাকায় থাকতে।

তখন সেনেরা নিতান্তই গরীব। ঘোষগিন্নী জানতে পারা মাত্র পাড়ায় সত্যব্রত সেনের প্রকৃত পরিচয়, তার প্রথম জীবনের দারিদ্র্য-পীড়িত দিনগুলোর কথা ফলাও করে প্রচার করতে ছাড়েন নি। এখন না'হয় বিখ্যাত পরিচালক, অনেক টাকা। কিন্তু এককালে তাঁদেরই দয়ায় প্রায় দিন চলত সত্যব্রতদের।

তাই বর্তমানের সত্যব্রতকে দেখবার জন্য বিশেষ উৎসুকভাবে অপেক্ষা না করে পারেন না ঘোষগিন্নী।

আরও অনেকে।

দু'-তিন দিন আগেই তারা জানতে পেরেছে বিখ্যাত পরিচালক সত্যব্রত সেন আসছেন এ বাড়ির ভাড়াটে হ'য়ে। বাড়ি হঠাৎ চুণকাম হতে দেখেই তারা সন্দেহ করেছিল। বাড়ির লোকেদের পেটে তো বোমা মারলেও কথা বেরোবে না তাই সম্ভাব্য উৎস থেকেই তারা আসল খবর নিতে চেষ্টা করেছিল।

বাড়ির ঝির কাছ থেকেই জানা গেল ব্যাপারটা। তা'হলে ঠিকই আঁচ করা গেছে। ভাড়াটে আসবে বলেই শুধু একতলাটার সামনের অংশ চুণকাম করা হচ্ছে, ভালই।

ভাড়াটে কে?

সত্যব্রত সেন।

বলে কি? এই নিম্ন-মধ্যবিত্তদের পাড়ায় সত্যব্রত সেন? অবাক হবার কথা বটে এদের পক্ষে। তাই অবাক না হয়েও তারা পারে নি।

প্রথম বইখানাতেই সত্যব্রত বেশ নাম কিনেছেন, বইটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য তাঁরই।

কাহিনী ও সংলাপের নতুনত্বে বেশ সাড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। চিত্র জগতের একঘেয়ে আবহাওয়ায় যেন ভূমিকম্প আনলেন তিনি। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল তীব্রবেগে। আর এ হেন নামকরা লোককে পড়শী হিসেবে পেয়ে এরা অনেকেই কৌতূহলী হল।

সন্ধ্যাবেলায় সদ্যগুছান বাইরের ঘরে বসে সত্যব্রত খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

একমুখ হাসি নিয়ে ঘোষগিন্নী ঘরে ঢুকলেন, কি খবর? চিনতে পার?

আপনি?

সত্যব্রত দাঁড়িয়ে উঠলেন।

চিনতে পারছ না।

ঠিক মনে করতে পারছি না।······

মাথার চুলে অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন সত্যব্রত।

ঢাকার পরিমল ঘোষদের মনে নেই?

কোন কথা না বলে শুধু কাষ্ঠহাসি হাসলেন সত্যব্রত। কোন আহ্বান নেই সে হাসিতে। তবু মরিয়া হ'য়ে বললেন ঘোষগিন্নী।

আমি পরিমলেরই বৌদি! মনে নেই? খুব ভাল লাগল তোমরা আবার প্রতিবেশী হয়ে এলে ব'লে। মাসীমা এসেছেন? বিয়ে করেছ।

এবার কাষ্ঠ হাসিটুকুও যেন মুছে গেল সত্যব্রতর মুখ থেকে। এক ভাষাহীন দৃষ্টি মেলে তিনি সোজা তাকিয়ে রইলেন ঘোষগিন্নীর দিকে।

বেশ একটু দমে গেলেন ঘোষগিন্নী। যাই ভেতরে। মাসীমা আছেন তো?

সংক্ষিপ্ত একটি হ্যাঁ বলে আবার খবরের কাগজে মন দিলেন সত্যব্রত।

সেদিনের পরই পাড়ার সকলে জেনে গেল, সত্যব্রত সেন মহা দাম্ভিক, অকৃতজ্ঞ, শুধু উপকার নয়, দয়া নয়, পূর্বপরিচয়ের অঙ্কুরটুকুও অবধি নাকি সত্যব্রত মুছে ফেলতে চান।

দুদিনবাদে বর্ষা নেমেছে দেখে সামনের বাড়ির ত্রিভঙ্গবাবু কাপড়টা হাঁটু অবধি উঠিয়ে বাজার করে ফিরছিলেন।

সত্যব্রত তাঁর নামের প্লেটটা লাগাবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন চাকরকে।

আলাপ করবার এহেন সুযোগ ত্রিভঙ্গবাবু ছাড়তে পারলেন না। বাজারের থলি হাতেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন।
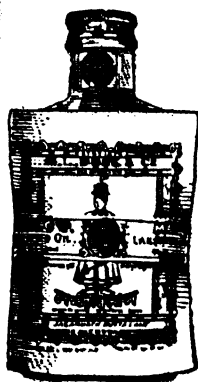
নমস্কার।

চুল সম্বন্ধে
কি খুব
চিন্তিত?

থলিশুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকালেন ত্রিভঙ্গবাবু। ওর দিকে তাকালেন সত্যব্রত।

আপনিই বুঝি এ বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এলেন?

হাসিটাকে কান পর্যন্ত টেনে প্রশ্ন করলেন ত্রিভঙ্গবাবু। তাঁর জলখাবার চেষ্টায় হাঁটু পর্যন্ত তোলা কাপড়টার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই আবার চোখ ফেরালেন সত্যব্রত নেমপ্লেটটার দিকে, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, মনে হয়।···

এরপর আবার কি সূত্র ধরে আলাপটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ভেবে পেলেন না ত্রিভঙ্গবাবু, তবু আলাপ জমাবার চেষ্টায় আবার বললেন উপেক্ষাটুকু গায়ে না মেখেই, আপনি আমাদের প্রতিবেশী হলেন তো। কিছু অসুবিধে হলে আমাদের বলবেন।

কিসের অসুবিধে?

সত্যব্রত এমন ভাবে ত্রিভঙ্গবাবুর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, যেন সংসারে তাঁর অসুবিধের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব।

ঢোক গিলে বাড়ির মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলেন ত্রিভঙ্গবাবু।

একটু পরেই বর্ষার জল ছিটিয়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বড় বাড়ির সামনে।

একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে গেলেন সত্যব্রত। চিত্র পরিবেশক মহাদেব সাহা এসেছেন তাঁর কাছে, কি সৌভাগ্য! আসুন! আসুন!

এবার কানটানা হাসি হাসেন সত্যব্রত।

হেলতে-দুলতে মোটা শরীরটাকে গাড়ি থেকে নামাতে নামাতে বললেন মহাদেব সাহা, নতুন বাড়িতে এখন তো নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে।

তা একটু তো হয়ই।

ওর দিকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন সত্যব্রত।

বাড়িটা একটু সহর থেকে দূরে।

মহাদেব সাহা গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্যব্রতর হাসি মোছেই নি মুখ থেকে।

বাড়িটা ভালই পেয়েছেন।

চারদিক তাকিয়ে দেখে বললেন মহাদেব সাহা।

হবে না! বাড়িওলা খুব অভিজাত শ্রেণীর।

অভিজাত কথাটার ওপর বেশ একটু জোর দিলেন সত্যব্রত। বহু খুঁজে তবে এই বাড়িটা পেয়েছি। আমার আবার···বসুন। না না, এই বড় চেয়ারটাতে বসুন, বেশ আরাম পাবেন। এই সবের জন্যই তো কেনা।

এর মধ্যেই সব সাজান হয়ে গেছে দেখছি।

বড় সোফাটার নরম গদিতে নিজের মোটা থলথলে দেহটা ছেড়ে দিতে দিতে বললেন সাহা।

এখনও সব হয় নি। তবে দু'চারদিনের ভেতরই বেশ গুছিয়ে বসতে পারব আশা করছি।

হুঁ। আপনার লেখার কতদূর।

হ্যাঁ, সেটাই তো প্রধান চিন্তা আমার।

অপেক্ষাকৃত একটি নীচু গদিতে বসলেন সত্যব্রত। এ ঘরে ওটাই তাঁর বসবার নিজস্ব আসন।

বসবার ঘরটিতে দেশী ও বিলেতী আসবাবের সমাবেশ করা হয়েছে।

একদিকে নীচু ছোট তক্তপোষে সুজনিঢাকা বসবার ব্যবস্থা। পাতলা নরম লেপের গদি দিয়ে তক্তপোষকে অপেক্ষাকৃত সহনীয় ও অধিকতর আরামপ্রদ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফুলতোলা কাপড়ে মোড়া সোফা সেটি। তারই মাঝে মাঝে ছড়ান রয়েছে দু'চারটি মোড়া ও টিউব চেয়ার। ঘরখানা সত্যিই বড় বলে নানা শ্রেণীর এই সব ফার্নিচারেও খুব বেশি ভিড় জমানোর মত চেহারা হয় নি ঘরটার।

বোঝা যায় ঘরটিকে রুচিসম্মতভাবে সাজাবার বেশ প্রয়াস করেছেন সত্যব্রত। তবে রুচিটা নিজস্ব নয় বলেও বটে আর রুচি সম্বন্ধে নিজের মতামতটি এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট না হওয়ার জন্যও বটে, পুরোপুরি রুচির মানদণ্ড সম্বন্ধেই যেন সত্যব্রত মনস্থির করতে পারেন নি।

নিজের বসার আসনটার ঠিক ওপরেই একটা বড় ফ্রেমে-বাঁধান সার্টিফিকেট।

সত্যব্রত তাঁর প্রথম বই-এর সাফল্যে কোন এক মফস্বলের ছাত্রদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। হৃদয়ের আনন্দ ছাড়াও এতে মিশেছিল তাঁর গর্ব। তারই স্বীকৃতি—ঘরের সব থেকে প্রকাশ্য স্থানেই সার্টিফিকেটটির স্থান হয়েছে।

দেয়াল প্রায় ভর্তি হয়েছে নানা রকমের ছবিতে। উত্তরের দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড ছবি সোনালী ফ্রেমে বাঁধান। পাশ্চাত্যের কোন এক বিখ্যাত শিকারীর আঁকা ছবির কপি। যামিনী রায়ের ছবি শুধু নয় সুনীলমাধবের ছবিও স্থান পেয়েছে অন্যদিকের দেয়ালে। তা ছাড়া আছে কোণাকুণি ক'রে টাঙ্গান বিরাট একটি ফুলের তোড়ার ছবি। চিত্র সমাবেশের এ হেন বৈষম্য লোকের চোখকে যেন পীড়া না দিয়ে পারে না। অবশ্যই রসিকজনের।

ঘরের পশ্চিম কোণে একটি আবক্ষ মূর্তি। সত্যব্রতর ভাই রবীনের শিল্পপ্রয়াস।

বাঃ, আপনার ঘরটি তো বেশ সাজিয়েছেন দেখছি!

আসবাব ও ছবির এ হেন সমাবেশের প্রশংসা করেন সাহা।

বিগলিত হয়ে যেন হাত কচ্‌লাতে থাকেন সত্যব্রত।

মূর্তিটি কার?

আমার বাবার। প্রফাইলটা দেখেছেন? একটা দেখবার মত চেহারা ছিল তাঁর।

বিশেষ কিছুই পেলেন না সাহা ভাল করে তাকিয়ে দেখে। তবু বললেন, আপনার এসব শিল্পেরও টেস্ট আছে দেখছি।

হ্যাঁ, বহু অর্থব্যয় করে নিজের রুচিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এই যে দেখছেন অয়েল পেন্টিংটা···বিলেতী সেই ছবির দিকে আঙুল দেখালেন সত্যব্রত।

ভেড়ার পালের সঙ্গে মেঘের খেলা কেমন মিলিয়েছে দেখছেন। এটারই দাম হল আপনার বাট টাকা।

মাত্র?

অপ্রস্তুত হয়ে একটা ঢোক গিললেন সত্যব্রত। হ্যাঁ··মানে

সস্তায় পেলাম কি না। কপি···না হলে অরিজিন্যাল হ'লে পাঁচশো বললেও কিছু বলার ছিল না।

ওঃ কপি!

যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেলেন সত্যব্রত। কিন্তু দমবার ছেলে তিনি নন। তাই সমান উৎসাহেই বলে চললেন, হ্যাঁ···আর এই যে দেখছেন ওপাশের চেয়ারটা, ওটার তো জোড়াই পেলাম না, তবু সত্তর টাকা দিয়ে কিনে নিলাম। মানে, ভাল জিনিস পেলে ছাড়ব না এই কথা।

বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন মহাদেব সাহা, এঁকে না থামালে বোধ হয় ইনি থামেন না। তাই আলোচনায় ছেদ টানতে চেয়েই যেন বললেন, ভাল···আচ্ছা কাজের কথায় আসা যাক। দেখুন আপনাদের প্রডিউসার তো সুচরিতা দেবীকে বইয়ে হিরোইন করতে মোটে রাজি নন। কিন্তু আমার মনে হয় ওর বেশ মার্কেট আছে, আপনি কি বলেন?

তা বটে! তবে আমি বলবো, বাজারে দাম আছে বলেই তাকে তুলে আনতে হ'বে, এমন কোন কথা নেই।

হাঁ হয়ে গেলেন মহাদেব সাহা। বলে কি লোকটা?

সে কি মশাই? ফিল্ম লাইনে আবার বাজার দর ছাড়া অভিনেত্রার মূল্য কি? পাবলিক না চাইলে···

তা ঠিকই···

ওর কথা শেষ না হতেই বললেন সত্যব্রত তবে অন্য কথাটাও তুচ্ছ নয়, সেটিও ভেবে দেখতে হবে।

কি কথা?

অর্থাৎ আমার মনে হয় যদি আপনার মতই মেনে নিই তা'হলেও সুচরিতাকে নেওয়ার অন্য বাধাও তো আছে।

কি বাধা?

ওকে পাওয়ার জন্য যে হাঙ্গামা আর বাধ্য-বাধকতার ভেতর যেতে হবে, তার জন্যই বোধ হয় রাজি হচ্ছেন না বোস সাহেব।

কেন হাঙ্গামা কিসের?

জানেন-ই তো। ঐ সুচরিতা দেবীকে নিতে হ'লে সঙ্গে তাঁর ঐ বন্ধু মিত্তির মশাইয়েরও দাবী মেটাতে হবে। সুচরিতা নাকি মিত্তির মশাই ছাড়া কারও সুর দেওয়া গান গাইবেন না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এ-তো উনি স্পষ্টই বলেন। অথচ মিত্তির মশাইয়ের মিউজিক বাজারে একদম কাটে না। আর তা ছাড়া ওঁর রেট জানেন তো।

রেটের জন্য ভাবি না। পয়সা পেতে হলে পয়সা ইনভেস্ট করতে হবে।

তা তো ঠিকই।

আচ্ছা মিঃ সেন, যদি সে ব্যবস্থা হয় তো অন্য কোন আপত্তি নেই তো? আমার তো মশাই মনে হয় সুচরিতা দেবী হিরোইন না নামলে বই ফ্লপ করবে। বাজার দেখছেন তো, যে বই-এ উনি হিরোইন, ছাই পাঁশ হলেও তা চলে যাচ্ছে।

তা তো বটেই! তবে ব্যাপারটা লজ্জাজনক।

ওসব·এসব লাইনে ভুলে যান।

সজোরে হেসে ওঠেন সাহা।

আর তাতে যোগ দেন সত্যব্রত।

অমায়িক হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলেন, তা তো বটেই।···যা হোক তা হলে প্রডিউসারের সঙ্গে আমি কথা বলবো, ওঁকেই নেওয়া যাক। আপনার যখন এই ইচ্ছে।

হ্যাঁ আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছেও আছে।

চোখের একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করলেন সাহা। সত্যব্রত চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

তবে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে আমার মতামতেরও একটা দাম আছে তো।

নিশ্চয়ই! আপনার কি মত একেবারে নেই?

না তা নয়। তবে শুধু বলে রাখলাম এইসব ব্যবস্থায় আমার একটু মৃদু প্রতিবাদ রইল।

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সাহা।

নিন্। একটু চা খান, গরম সিঙ্গাড়ার সঙ্গে।

চাকরের হাত থেকে ট্রে নামাতে নামাতে বললেন সত্যব্রত।

বাড়িতে তৈরি না কি? বেশ গরম তো!

সিঙ্গাড়া হাতে নিয়ে প্রশ্ন করলেন সাহা।

প্রায় তাই। দোকানে আমার বলা আছে, তারা আমার লোক গেলেই গরম ভেজে দেয়।

ভারী ভাল ব্যবস্থা তো!

হ্যাঁ·····

চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন সত্যব্রত। আসলে একজন গুণীর মর্যাদা দিতে সকলেই চায় মহাদেববাবু।

তা ব'লে খাবারের দোকানদারও? এমন তো বিশেষ দেখা যায় না মশাই। চার্জ বেশি দেন বোধ হয়।

একটু নিক না। ক্ষতি কি? কিন্তু গুণীর পরিচয় সে আপনিই পাবে।

কথাটা বুঝতে না পেরে—আহারে মন দিলেন মহাদেব।

সত্যব্রত সত্যিই বহু খুঁজে ছিলেন বাড়ির জন্য। শুধু তো বাড়ি নয়, পাড়ার কথাও যে তাঁকে চিন্তা করতে হয়েছে। পাড়া—অর্থাৎ রীতিমত অভিজাত পাড়া। যার শুধু নামে নয় আশপাশের বাসিন্দাতেও থাকবে আভিজাত্যের গন্ধ।

অথচ মুস্কিল অন্য জায়গায়।

অভিজাত পাড়ার আকাশছোঁয়া ভাড়া। সদ্য উঠতি-পরিচালকের পক্ষে সব খরচ মিটিয়ে ঐ অনিশ্চিত আয়ে মোটা অঙ্কের টাকা শুধুমাত্র বাড়ির পেছনেই ব্যয় করা সম্ভব নয়।

সাহেবী পাড়ার কথা চিন্তার মধ্যেও তিনি আনেন নি। সেখানে শুধু টাকাটাই বড় কথা নয়, কেউ কারও খোঁজ রাখে না, বড় বড় হোমরা-চোমরাদের মনে তাঁর মত লোকের স্থান কোথায়? তিনি যে সেখানে বিশেষ আমল পাবেন না বেশ বোঝেন বলে সে পাড়ায় বাড়ির খোঁজ করেন নি তিনি।

অবশেষে বেছে নিলেন মধ্যবিত্ত পাড়ায় এই অভিজাত পরিবারের বসত বাড়িরই একাংশ।

পাড়া মধ্যবিত্ত বটে, কিন্তু বাড়িটা তার মধ্যেই বেশ মাথা উঁচু করা।—ভাড়াও বেশি নয়। ঠিক এটাই চাইছিলেন সত্যব্রত।

কেন না এমন গৃহস্থ পাড়ায় তাঁর বনেদী হালচালে রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে রীতিমত প্রতিষ্ঠা পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হবে। অবশ্যই অত্যধিক ঘনিষ্ঠতায় তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাতে তিনি রাজি নন। তাই প্রথম থেকেই গাম্ভীর্যের মুখোসে মুখ ঢাকলেন তিনি।

বাড়ি ভাড়া নেবার জন্য কথা বলতে এসে এদের বনেদী-আনায় একদিকে যেমন নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, তেমনি যুগপৎ খুশি ও গর্বিতও হয়েছিলেন। অবশ্যই কর্তার দেখা না পাওয়ায় ও তাঁরই প্রতিনিধি হিসাবে নেহাৎই অফিসে কাজকরা তাঁর একমাত্র ছেলে বিনয়বাবুর সঙ্গেই তাঁকে কথাবার্তা চালাতে হয়েছিল। এজন্যও মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি। আর কারও সঙ্গে না হোক অন্তত তাঁর মত নামকরা প্রতিভাবান ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা বাড়ির কর্তারই উচিত ছিল।

কিন্তু কর্তা নাকি সচরাচর বলেন না কথা কারও সঙ্গে, বৃথা গালগল্পের মেজাজ বা সময় কোনটাই তাঁর নেই। সত্যব্রত এতে অবশ্য খানিকটা খুশি, হ্যাঁ সত্যিই অভিজাত সন্দেহ নেই।

সত্যব্রতর খোঁজখবরে জানা অংশ ছাড়াও বড়বাড়ির ইতিহাসটুকু সত্যিই নাটকীয় তাতে সন্দেহ নেই।

এ বাড়ির বর্তমান কর্তা অবিনাশবাবু—এখানে বাস করছেন তাঁর পাঁচবছর বয়স থেকে।

তার আগে তাঁর কেটেছে সেরপুরে।

কিন্তু শুধু এটুকুই নয় এই বড়বাড়ির ইতিহাস বলতে অবিনাশের বাপের এ জনবিরল অঞ্চলে জঙ্গল কেটে বসত করার কথাটাই সব নয়। তারও আগে ফিরে যেতে হয় যখন প্রায় দেড়শ বছর আগে এঁদের পূর্বপুরুষ আদিবাস সেরপুর-এ এসে প্রথম পত্তনি করলেন।

সে তো অনেকদিনেরই কথা।

তখন সেরপুরের জমিদার জগদানন্দ রায়। কি করে যে রায়চৌধুরী বংশ সেরপুরের জমিদারী পেলেন সে বিষয়ে নানা কিংবদন্তী, তবে সব থেকে প্রচলিত মত যে, জগদানন্দের বাবা জমিদার সুশীলানন্দ স্বপ্নে মোহর ভর্তি কয়েকটা সোনার ঘড়ার ঠিকানা পেয়ে রাতারাতি কোটিপতি হলেন। যার ফলে এই জমিদারী লাভ।

জগদানন্দ মারা গেলেন নিঃসন্তান অবস্থায়। মারা যাবার আগে স্ত্রী বিরজাসুন্দরীকে অনুমতি দিলেন দত্তক নেবার।

স্বামীর অন্তিমকালে কান্নাকাটি ছেড়ে শক্ত হয়ে উঠে বসলেন বিরজাসুন্দরী। মৃত্যুর আগের দিন আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে হাজিমনগরের শ্যামকান্ত ভট্টাচার্যের তিন বছরের ছেলেকে দত্তক নিলেন।

সেই ছেলেই সেরপুরের সেরা জমিদার প্রমীলানন্দ রায়। যাঁর নামে নাকি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত।

দোর্দণ্ড প্রতাপেই জমিদারী করছিলেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ বত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস রোগে তিনি যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর স্ত্রী মোহিনী দেবীর বয়স মাত্র একুশ আর একমাত্র মেয়ে রাজরাজেশ্বরীর বয়স পাঁচ। ছেলে ছিল না বলে প্রমীলাবাবু মেয়েকেই ছেলের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নামও রেখেছিলেন রাজরাজেশ্বরী।

যে জমিদারীকে নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধিতে প্রমীলানন্দ প্রায় দ্বিগুণ করেছিলেন, তাঁর অকাল আর আকস্মিক মৃত্যুতে আশপাশের জমিদারদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল অতি সহজেই সে সম্পত্তিতে।

কিন্তু সকলকে নিরাশ করে মোহিনী দেবী নিজের হাতে সব দায়িত্ব তুলে নিলেন।

নাম সার্থককরা রূপ ছিল মোহিনী দেবীর। আর সেই সঙ্গে ছিল একটি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সংবেদনশীল মন। সেই অপূর্ব লাবণ্য-মণ্ডিত দেহের আড়ালে ততোধিক লাবণ্যময় সুকুমার মনটি তিনি যেন ইস্পাতের বর্ম দিয়ে ঘিরে দিলেন। স্বামীর সোহাগে আদরিণী মোহিনী দেবী বধূবেশ ছেড়ে একমুহূর্তে যেন গৃহিণীর দায়িত্ব হাতে তুলে নিলেন।

প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের মৃত্যুতে তাঁকে যেন নতুন করে পেল প্রজারা।

এতে তারা খুশিই হল। প্রমীলানন্দের উগ্র স্বভাবের জন্য প্রজারা তাঁকে ভয় করলেও ভালবাসত বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু নতুন রাণীর আমলে, তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে তারা যেন প্রাণ পেল। দারুণ গ্রীষ্মের অগ্নিবর্ষণের পর তারা যেন বর্ষার স্নিগ্ধ জলধারায় স্নাত হল। তাই প্রাণভরে আশীর্বাদ করে প্রজারা অন্তরে গ্রহণ করলে তাদের নতুন জমিদারণীকে—যাকে তারা রাণীমা বলে সম্মান দেখালে।

বারান্দার আড়াল থেকে নিজের কানে সব শুনে, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা জেনে প্রজাদের সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন মোহিনী দেবী! মাফ হয়ে গেল কত প্রজার খাজনা—যাদের ঘরে আশামত ফসল ওঠে নি। কত গৃহচ্যুত প্রজা আবার নতুন করে ঘর বাঁধল। আমলা তন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হল সেরপুরের প্রজারা।

কিন্তু এত সহজে সবকিছু হ'তে দিলেন না প্রমীলানন্দের আমলের চতুর দেওয়ান বৃদ্ধ রামকিঙ্করবাবু। তাঁর চতুরতা আর অর্থ-লালুপতা প্রজাদের সর্বনাশের শেষ সীমানায় নিয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে হয়ত খানিকটা জমিদারীরও। সেটি মোহিনী দেবীর নজর এড়াল না।

প্রমীলানন্দ বুদ্ধিমান পুরুষ হয়েও যা ধরতে পারেন নি, স্ত্রীবুদ্ধির স্বভাবধর্মে আর মোহিনী দেবীর নিজস্ব প্রখরতায় ও হৃদয়ের বিচারে সহজেই তা ধরা পড়ল তাঁর চোখে।

তিনি বুঝলেন, এভাবে চললে জমিদারী রক্ষা করা কঠিন হবে। আজ প্রমীলানন্দ নেই। ব্যক্তিত্ব আর কঠোরতা দিয়ে আর প্রজাদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না এবং তা তাঁর ইচ্ছেও নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে যা অবশ্যকর্তব্য সে পথ বেছে নিতে তিনি দ্বিধা করলেন না। কৌশলে তাকে সরালেন তিনি। অবশ্য খেসারত দিলেন পাশের তালুক বীরগঞ্জ, সেজন্য মাথা ঘামালেন না তিনি। বীরগঞ্জের মত ছোট তালুক দিয়ে তাঁকে সমস্ত জমিদারী বাঁধতে হবে। রামকিঙ্করকে দেওয়ান পদ থেকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি, আর সে জায়গায় বসালেন তাঁরই ভাগ্নে সুদর্শন যুবক রাজারাম মৈত্রকে।

প্রমীলানন্দের আমলে রাজারাম ছিলেন অতিথিশালা আর

কাছারীর ভার নিয়ে, এখন তাঁর কাঁধে সারা জমিদারী চালনারই ভার পড়ল।

সোৎসাহে এগিয়ে এলেন রাজারাম: অবশ্যই একটি অসহায়া স্ত্রীলোককে বিপদে সাহায্য করবার মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল, কিন্তু সেই অসহায়া স্ত্রীলোকেরই হৃদয়ের বিরাটত্ব আর বুদ্ধির প্রখরতা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। সে মুগ্ধতা ক্রমশ একটি গোপন আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

মায়ের মত অত সুন্দরী না হলেও সুন্দরী হয়েছে রাজেশ্বরী খুবই। তার পরলোকগত বাবার ইচ্ছামত তাকে তেমনিভাবেই গড়ে তুলতে লাগলেন মোহিনী দেবী।

পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট অনেক শিক্ষাই সে পেতে লাগল। গ্রামে যা সম্ভব নয়, অন্য কোন মেয়ের পক্ষে তখনকার কালে যা ভাবাও যেত না, সে রকম ব্যবস্থাও হোল রাজেশ্বরীর জন্য। আর জমিদারণীর এই খেয়াল যেন গল্প কথা হয়ে প্রচারিত হল গ্রামে গ্রামে।

নতুন দেওয়ান রাজারামের সঙ্গে রোজ সকালে বহুদূর বেড়িয়ে আসত সেই মেয়ে, প্রজারা যাকে বলত 'খুকিবাবা'। অসীম বিশ্বাসে মোহিনী দেবী তুলে দিয়েছিলেন নিজের মেয়ের আর সেই সঙ্গে তাঁর অতি প্রিয় জমিদারীর ভার রাজারামের হাতে। সে বিশ্বাস রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন রাজারাম।

খুকিবাবা বড় হতে লাগল। প্রথম প্রথম যতটা আগ্রহ নিয়ে নিজেই সব কাজকর্ম করতেন মোহিনী দেবী, ক্রমশ যেন সে উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। তা ছাড়া উপযুক্ত লোক পেয়ে নির্ভর করবার আনন্দটুকুকে উপেক্ষা করতে পারলেন না মোহিনী দেবী। তাই ক্রমশ রাজারামই প্রায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন।

রাজেশ্বরী বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্বন্ধ আসতে লাগল নানা জায়গা থেকে। রাজারাম শুধু জমিদারী নয় সংসারেরও প্রধান পরামর্শদাতা। এক্ষেত্রেও তাঁরই পরামর্শে প্রায় সব সম্বন্ধই বাতিল হয়ে যেতে লাগল। যত ভালই পাত্র হোক না কেন, তার কোন না কোন খুঁৎ চোখে পড়বেই রাজারামের আর সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যাবে, সে সব লোভনীয় সম্বন্ধ।

এদিকে রাজেশ্বরীর বয়স যে বেড়ে চলেছে, সেদিকে যেন খেয়াল নেই রাজারামের। গ্রাম বলে নয়, এমনিতেই তখনকার দিনে চোদ্দ বছরের মেয়েরও বিয়ে না হওয়াটা অবাক হবার মত বৈ কি।

মোহিনী দেবীর সব ভাবনা আর অনুযোগ রাজারাম যুক্তিতর্ক দিয়ে যেন কাটিয়ে দেন। এমনি করেই চলছিল দিনগুলো।

রাজেশ্বরী তাতে খুশিই ছিল। নানা রকমের শিক্ষা, হাসিখেলা, পুজোআর্চা আর গালগল্পে দিনগুলো হাল্কা মেঘের মত উড়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু মাঝে-মাঝে ঐ দোকানের সাজান পশরার মত তাকে বরপক্ষের দেখতে আসাটাকে সে রীতিমত অপছন্দ করত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গা-ধোওয়ার সময় বাল্যসখী উমাশশীর একটি কথায় চমক ভাঙল রাজেশ্বরীর। উমাশশী রাজেশ্বরীরই সমবয়সী। কিন্তু তার বিয়ে হয়েছে আজ তিন বছর। গত পাঁচ দিন সে বাপের বাড়িতে এসেছে, এসেই শুনেছে অনেক খবর। সেটুকুই সে প্রকাশ করল।

গা ধুতে-ধুতে দু'জনে গল্প করছিল।

রাজেশ্বরীকে সত্যিই ভালবাসে উমাশশী। তার কথায় রাজেশ্বরী আঘাত পেয়েছে—জেনে সে মনে মনে ভারী কষ্ট পেল।

কিছু মনে করিস নি ঈশ্বরী। তোকে ব্যথা দেবার জন্য বলি নি।

তা জানি। কিন্তু তা'হলে এ-কথা বলার অর্থ কি?

কি করব বল। আমি তো মাত্র ক'দিন এসেছি, এর ভেতরই শুনেছি ও-কথা।

তোকে কে বললে?

ভিজে গা মুছতে-মুছতে রাজেশ্বরী প্রশ্ন করল।

কেউ কি সোজাসুজি বলেছে নাকি যে তার নাম বলব? ভাবে ভঙ্গিতে নানা কথায়—যা বুঝলাম তাতে মনে হয় গ্রামে প্রায় সকলেরই এই মনোভাব।

ভাবলেও ঘেন্নায় মরে যাই উমা, উনি আমার পিতৃতুল্য।

সে কি আমি জানি না রে, কিন্তু গ্রামে ঘরে লোকে এ-রকম ভেবেই থাকে, বিশেষ করে তোর বয়স তো হয়েছে।

দু'জনেরই তখন পনের চলেছে।

হুঁ:।

চুপ করে ভাবতে লাগল রাজেশ্বরী, তুই জমিদারের মেয়ে বলে তোর কানে পৌছয় না। আমাদের মত কোন গেরস্থর মেয়ে হলে তার অবস্থা অন্যরকম হোত।

আমার সঙ্গে অন্য মেয়ের এ বিষয়ে তফাৎ হবার তো কথা নয় উমা। দুর্নাম দুর্নামই—এরই বিহিত দরকার। এখনই! ছিঃ—

সত্যিই এর বিহিত করবার জন্য রাজেশ্বরী দৃঢ়পণ করল।

তাই সেবার যখন রামনগর থেকে তাকে দেখতে আসার সময় বাড়ির পুরোন ঝি নিস্তারিণী তাকে ডাকতে এল বাগান থেকে, তখন প্রবল অনিচ্ছায় সে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

ঈশ্বরী—মোহিনী দেবী ওর অপেক্ষায় বসেছিলেন। আয় মা। চুলটা ভাল করে বেঁধে দিক নিস্তার।

কেন? চুল তো বাঁধাই আছে।

না বোঝার ভাণ করল রাজেশ্বরী, আর মেয়ের বলার ভঙ্গি দেখে রীতিমত অবাক হলেন মোহিনী দেবী।

কেন আবার কি? রামনগর থেকে দেখতে এসেছে, অমন চুল, বাঁধায় চলবে?

আমি আর দেখা দেব না!

সে আবার কি? এত বড় বংশের নাম ডোবাবি?

তা জানি না। আমি পুতুল নই, মানুষ। বারবার সং সেজে লোকের সামনে বিক্রি হবার জন্য গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না মোহিনী দেবীর, মেয়ে বলে কি? এসব কথা কে শেখাল?

কেউ শেখায় নি মা! সহ্যেরও একটা সীমা আছে, তোমাদের তো বিয়ে দেবার মন নেই, মিছিমিছি আমাকে সং সাজাবার কি মানে?

মেয়েমানুষের যদ্দিন বিয়ে না হয় তাকে দেখতে আসবেই। এর ভেতর সং সাজার কি হল?

ওর কথা যেন গায়ে মাখতে চাইলেন না মোহিনী দেবী। তা ছাড়া তুমি ছেলেমানুষ তাই জান না, আমরাও অনেক এমন সহ্য করেছি। বিয়ে এক কথায় হয় না।

কিন্তু আমার বিয়ে লাখ কথাতেও হবে না। এও আমি জানি। এ পর্যন্ত পঞ্চাশবার বোধ হয় আমাকে দেখেই গেছে—বলতো কি জন্য ভেঙ্গে গেছে?

মোহিনী দেবী কোন কথার উত্তর দিলেন না।

আমি জানি কারণ। তারা যে আমাকে অপছন্দ করেছে তাও নয়। আসলে···

কি আসলে? রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন মোহিনী দেবী।

আসলে তোমাদেরই দু'জনের পছন্দ হয় না কোন সম্বন্ধ, তা হলে আমাকে শুধু শুধু দেখাও কেন? নিজেরা আগে মনস্থির কর। রাজা কাকার আগে মত হোক। না হলে মিছিমিছি আমাকে নিয়ে আর খেলা করো না।

খেলা? সমস্ত মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল মোহিনী দেবীর অপমানে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর হঠাৎ জোর দিয়ে বললেন, মনস্থির করেছি, কানা হোক, খোঁড়া হোক, এখানেই তোর বিয়ে দেব। তুই তৈরি হয়ে নে, নিস্তার ওর চুলটা বেঁধে দে, বেশি সময় নেই।

মায়ের এই মূর্তিকে সত্যিই ভয় করে রাজেশ্বরী।

আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে এসে মার মুখের দিকে তাকাল একবার। সে নিজেই বুঝতে পারছে না কি করে এত কথা মায়ের মুখের ওপর বলতে পারল। রাজা কাকার পছন্দই যে সব একথা মাকে বলতে গেল কেন? কিন্তু···উপায় কি, উমাশশীর কথাটা এখনও তাকে জ্বালা দিচ্ছে। ভয় আর ভাবনা মেশান একটা অনুভূতি তাকে ঘিরে ধরল।

অপেক্ষমানা নিস্তারিণীর সামনে বসে পড়ল রাজেশ্বরী।

বিরাট আলমারির পাল্লা খুলে রাজেশ্বরীর জন্য কাপড় আর গয়না বার করতে থাকেন মোহিনী দেবী। তাঁর ফর্সা মুখ টুকটুক করছে, মাথার থান কাপড়টা খসে গিয়ে দীর্ঘ কালো চুলের বোঝা ভেঙ্গে পড়েছে পিঠের ওপর। মোহিনী দেবী চুল কখনও বাঁধেন না।

ঘণ্টাখানেক বাদে নিখুঁত করে সাজিয়ে দিলেন মেয়েকে মোহিনী দেবী।

মুখখানা তুলে ধরে ডান হাতে চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেলেন। তারপর হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। কতক্ষণ বাদে তাঁর বড় বড় চোখ দু'টি জলে ভরে এল।

দরজার কাছে কাশির শব্দ এল।

রাজারাম নিজে তাড়া দিতে এসেছেন। পাত্রপক্ষ এখনই ফিরে যাবেন। তাঁরা দরিদ্র বটে, কিন্তু তাঁদের ব্রাহ্মণত্বের উগ্র সাত্ত্বিকতার অভিমানে তাঁরা নাকি বাইরে কোথাও জলগ্রহণ করতে পারেন না। তা ছাড়া এক্ষেত্রে তো কথা উঠতেই পারে না। আগে সম্বন্ধ হোক তখন দেখা যাবে।

অপছন্দ হবার মেয়ে রাজেশ্বরী নয়। তাঁরা দেখামাত্রই পছন্দ করে ফেললেন।

তা ছাড়া শুধু তো সুন্দরী রাজকন্যা নয়, আর অর্ধেক নয় পুরো রাজত্বই আছে সেই সঙ্গে। এর আগেও তাই কখনও অপছন্দের প্রশ্ন পাত্রপক্ষ থেকে আসে নি, সত্যিই এ পক্ষের খুঁৎখুঁতুনিতেই ভেঙ্গে গেছে।

কোন ছেলের বয়স বেশি, কারও কুলের দোষ, কারও রং কালো এমনি শত সহস্র অছিলা। অনেক আলোচনা করেছেন মোহিনী দেবী রাজারামেরও সঙ্গে। শেষে বুঝেছেন মনের মত ছেলে কেউ নয়; যাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, যার ওপর নির্ভর করতে পারবেন, ছেলের অভাব ভুলবেন।

রাজারাম প্রতিটি সম্বন্ধ খুঁটিয়ে দেখেছেন, অবশেষে তাঁর বিরূপতা মতে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। তিনি তো আর শুধু দেওয়ান নন। জমিদারীর সর্বেসর্বা, প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু জমিদারী নয় সংসারেরও আর সে কথারই ইঙ্গিত দিয়েছে সেদিন উমাশশী।

রাজারাম এই বিস্তীর্ণ জমিদারীর সর্বেসর্বা হয়েছেন আর সেই সঙ্গে···

কিন্তু সে কথা প্রকাশ করেন নি কোনদিন। শুধু সেরপুরের প্রত্যেকে জেনে গেছে, রাজারামের অমতে সেরপুরে কিছু হয় না, হতে পারে না। তাই রাজারামের অমতে 'খুকিবাবার' বিয়েও হচ্ছে না। অবশ্যই তাদের বিশ্বাস খুকিবাবার মঙ্গলের জন্যই রাজারাম এ ব্যবস্থা করছেন। শুধু খুকিবাবা কেন? রাজারামের দ্বারা কারও অমঙ্গল হ'তে পারে না। আর খুকিবাবার তো নয়ই। কে না জানে খুকিবাবার জন্যই রাজারামের দুর্বলতা, না হলে পাষাণের মত শক্ত মানুষ সুদর্শন দেওয়ান রাজারাম।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

রাজেশ্বরীকে পছন্দ করে পাত্রপক্ষ পাকা কথা বলবার পরই নিয়মমত যেন রাজারাম হাসলেন। তাঁরা যে অপছন্দ করবেন না, রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভ সামলান যে সোজা নয়, তা রাজারামের অজানা নয়। কিন্তু···

সন্ধ্যার পর মোহিনী দেবীর পুজোর ঘরের দালানে দেখা করলেন রাজারাম।

অন্দরমহলে তাঁর যাতায়াত আছে। না হলে কাজের অসুবিধে হয়। তবে বসার ঘর পর্যন্ত। আজ পুজোর দালান অবধি চলে এসেছেন।

প্রদীপের আলোটিকে কাঠি দিয়ে উস্কে দিচ্ছিলেন মোহিনী দেবী। প্রদীপের ম্লান আলোয় তাঁর আনত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন রাজারাম। এত রাত অবধি পুজোর ঘরে? সন্ধ্যা-আহ্নিক সারা কি এখনও হল না। বড় দরকারী কথা আছে যে। পাত্রপক্ষকে উত্তর দিতে হবে তো। তাঁর নিজের কাছেই উত্তর জমা হয়েই আছে। কিন্তু নিয়ম রক্ষার জন্য মোহিনী দেবীকে বলা নিতান্তই দরকার।

অবশ্য অন্যবারের মত এবারেও তিনি নিশ্চিত হয়েই এসেছিলেন যে জিজ্ঞাসা নিমিত্তমাত্র। তিনি জানেন এ বিয়েও হবে না, তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে তো কথা উঠতেই পারে না, পাত্র সত্যিই শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বলও নয়, নেহাৎই কালো ছেলে।

মোহিনী দেবী দেখতে পান নি রাজারামকে, রাজেশ্বরী কাছে ফুল গোছাচ্ছিল, দেখতে পেয়ে ডাকল, মা। রাজা কাকা।

চমকে উঠলেন মোহিনী দেবী। প্রদীপের তেল খানিকটা দুধের মত সাদা গরদের কাপড়ে পড়ে গেল। এ ঘরে যে?—

নীচু গলায় বললেন মোহিনী দেবী।

এ জন্য দুঃখিত।

রাজারাম মাথা নীচু করে বললেন। কিন্তু না এসে উপায় ছিল না। পাত্রেরা এখনও অপেক্ষা করছেন। মতামত জেনে যাবেন। না হ'লে পাশের গ্রামে আর একটি মেয়ে তাঁদের ফিরতি পথে দেখতে হবে।

ছেলেটি কেমন?

দেখতে?

হাঁ অন্য সব তো জানিই।

শুনছি বেশ কালো। অবশ্য এঁরা বলছেন শ্যামবর্ণ, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি সত্যিই বেশ কালো। তবে আপত্তিটা সেখানে নয়, ছেলেটির সম্বন্ধে অন্য খোঁজ পেয়েছি।

মা মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়ে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে রাজারামের মুখের দিকে।

সন্ধ্যাবেলা মা-মেয়ের কথাবার্তার খবর রাজারাম জানেন না, না হলে রাজেশ্বরীর সামনে এ কথা পাড়তেন না। তবু জিজ্ঞেস করলেন, কি খোঁজ পেয়েছেন?

ছেলেটি নাকি ভয়ানক জেদী। তা ছাড়া ওর কাকার কথাবার্তা শুনে মনে হল দরিদ্র বংশ হলেও তেজী।

মনস্থির করে ফেললেন মোহিনী দেবী। জোর গলায় হঠাৎ বললেন, জেদী আর তেজী ছেলেই তো চাই। ভগবানের দয়ায় অর্থের অভাব আমার মেয়ের হবে না। কিন্তু পুরুষমানুষের তেজ থাকা দরকার।

রাজারামের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। তাঁর কথার ইঙ্গিত কি মোহিনী দেবী বুঝতে পারেন নি? তাই ভাল করে বোঝাবার জন্য স্পষ্টই বললেন, তেজী আমিও চাই, কিন্তু এক্ষেত্রে একটু···আর··· আমার মনে হয়, এখানে বিয়ে না দেওয়াই ভাল। কেন না···

মোহিনী দেবী তাকালেন রাজেশ্বরীর মুখের দিকে। সে মুখে যে অভিব্যক্তি সেটা যেন এই কথাই বলে দিচ্ছে যে, এ সব পরিণতি সে আগে থেকেই বুঝতে পেরেছে। তার ঠোঁটের কোণে যেন একটা বাঁকা হাসি। কেন না, রাজারামের মত নেই।

অপমানিত মাতৃত্বের বোঝা বহন করা অসহ্য মনে হল মোহিনী দেবীর, এই মুহূর্তে। ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে চেপে নিজেকে সংযত করলেন তিনি।

তা হলে ওদের বলে দিই। রাজারাম প্রায় ফিরে যাচ্ছিলেন।

কি বলবেন? আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

যে আমাদের মত নেই, ঈশ্বরী-মার বিয়ে এখানে হবে না।

রাজারাম পেছন ফিরলেন।

কার মত নেই? রাজেশ্বরী ভ্রূ কুঞ্চিত করল। তার নামের সঙ্গে মাতৃসম্বোধনের যোগ করে এভাবে কন্যা স্নেহের অপমান করা কেন? ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে তাই রাজারামকে কিছু বলা কঠিন, কিন্তু আজ আবার সেই পুরান খেলা নতুন করে দেখা তার পক্ষে অসম্ভব।

মা! প্রায় আর্তনাদ করে উঠল রাজেশ্বরী।

নিস্তার! জোরে ডাক দিলেন মোহিনী দেবী। দেওয়ানবাবুকে ডেকে দে। বল আমি ডাকছি।

আমায় ডেকেছেন?

রাজারামের প্রশ্নে যেন সম্বিত ফিরল মোহিনী দেবীর।

হাঁ, শুনুন। আপনি আগে যা খোঁজ এনেছিলেন অর্থাৎ ছেলেটির চরিত্র আর কুলশীল সম্পর্কে তা যদি সত্যি হয় তা হলে এখানেই বিয়ে স্থির করুন।

কিন্তু ছেলেটি যে বড় কালো। আপনি এতদিন···

হোক। বাঙ্গালী মাত্রই শ্যামবর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

নিজের শাঁখের মত চিকণ গৌর হাতের মধ্যে কাঠিটা নাড়তে নাড়তে বললেন মোহিনী দেবী। আর তা ছাড়া··

কি বলুন?

বলছি, হীরের আংটি আবার বাঁকাচোরা। আপনি ওদের দিনস্থির করতে বলুন।

একটু ইতস্তত করলেন রাজারাম। এত ভাল ভাল পাত্র ছেড়ে হঠাৎ এই পাত্রর ওপরই ঝুঁকে পড়লেন কেন মোহিনী দেবী? কিন্তু রাজেশ্বরীর সামনে তো একথা আলোচনা করা যায় না।

সে কি মশাই ফিল্ম লাইনে আবার·····

এতক্ষণে যেন রাজেশ্বরীর উপস্থিতিকে তিনি বাধা মনে করলেন, রাজেশ্বরী ঘরে না থাকলে এ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা জেনে নিতে পারতেন। একবার রাজেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে আস্তে বললেন ? আপনি যখন বলছেন তখন তো কোন কথাই উঠতে পারে না. তবে ··

আবার তাকালেন তিনি রাজেশ্বরীর দিকে। কিন্তু রাজেশ্বরী আজ পণ করেছে, সে আজ আর কোনমতেই উঠবে না।

অন্যদিন সে বিয়ের প্রসঙ্গমাত্রে উঠে ঘর ছেড়ে চলে যায়। সেটাই নিয়ম, কিন্তু আজ সব কিছুরই ব্যতিক্রম। একমনে ঠাকুরের শয়নের ব্যবস্থা করে চলেছে। শেষ হ'ল তো সুরু করল পরদিনের যোগাড়।

হঠাৎ চোখ তুলে দেখল, রাজারাম কখন চ'লে গিয়েছেন।

প্রদীপের বুক অবধি পলতে জ্বলছে। তাড়াতাড়ি পলতে টেনে সেটা নিভিয়ে দিয়ে দেখল, মা চোখবুজে তখনও নিঃশব্দে জপের মালা ঘুরিয়ে যাচ্ছেন।

জমিদার প্রমীলানন্দের মেয়ে, তার আদরের খুকিবাবার বিয়ে যেভাবে হওয়ার কথা তেমন যথাযোগ্য আড়ম্বরেই শেষ হ'ল অনুষ্ঠান ?

জামাই সূর্যনারায়ণকে পেয়ে বহুদিনের সাধ যেন পূর্ণ হোল মোহিনী দেবীর। শুধু নিজে নয়, মেয়ের মুখ দেখে বুঝলেন, রাজেশ্বরীও খুশি হয়েছে নিঃসন্দেহে।

গ্রামের আর পাঁচটা মেয়ের মত মানুষ হয় নি রাজেশ্বরী।

ছোটবেলা থেকে অন্যরকম শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ হয়েছে সে। তার রুচি, যদিও তা চৌধুরীবাড়ির আদর্শেই গড়া, তবু সেটাই ব্যক্তিগত প্রাধান্য পেয়েছে এ বাড়িতে চিরকাল। ভবিষ্যতে যাতে রাজেশ্বরীও এ বংশের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারে, যে বংশের জামাই-ই আসুক না কেন, অর্থের দাবীতে, সম্মানের দাবীতে, সেখানেও এই চৌধুরীবাড়ির শ্রেষ্ঠত্ব যাতে বজায় থাকে সেদিকে চিরদিন দৃষ্টি রেখেছেন মোহিনী দেবী। কেন না তিনি জানতেন প্রমীলানন্দের এটাই ছিল মনোগত বাসনা।

প্রমীলানন্দের মৃত্যুর পরও তাই মোহিনী দেবী সে ইচ্ছার সম্মান রেখে রাজেশ্বরীকে মানুষ করেছিলেন অন্যভাবে। কিন্তু রাজেশ্বরীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তিনি সব শিক্ষা দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতে জমিদার হিসেবেই গড়ে উঠেছিল রাজেশ্বরী।

তাই এদিক দিয়ে রাজেশ্বরীকে একটু ভয়ও ছিল মোহিনী দেবীর। মেয়েমানুষের এই অতিস্বাতন্ত্র্য বোধ যদি রাজেশ্বরীর ভবিষ্যত জীবনে কোন ক্ষতি করে, সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্টই আশঙ্কা ছিল।

তাই জামাই তেজী শুনেও যখন সেখানেই তাঁকে বিয়ে দিতে হোল মেয়ের, তখন যথেষ্ট চিন্তা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। মেয়ের ছেলেমানুষিতে তারই কোন সর্বনাশ না ক'রে বসে থাকেন এ আশঙ্কাও তাঁর ছিল।

কিন্তু বিয়ের পর নিঃসংশয় হলেন তিনি। জামাই সূর্যনারায়ণ তাঁর মেয়েকে সুখী করেছে। বড় হৃদয়বান ছেলে সে। রাজেশ্বরী সত্যিই সুখী হয়েছে আর মেয়ের সুখে সুখী হলেন মোহিনী দেবী।

বাড়ির চাকর-বাকর এই পরিতৃপ্তির ফলে প্রসাদ লাভ করল যথেষ্ট।

নিস্তারই শুধু সোনার হার আর গরদ পেল না, যথাযোগ্য স্থান অনুসারে আমলা-গোমস্তা থেকে চাকর-বাকর সকলেই প্রচুর জিনিস পেয়ে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করল, খুকিবাবা আর তাদের জামাই রাজাকে।

রাজারামও তৃপ্তি পেলেন।

মোহিনী দেবীর পরিতৃপ্তিতেই যেন সব কিছুর আস্বাদন পেলেন তিনি।

সূর্যনারায়ণকে দেখেও তাঁর আগেকার অমূলক ভয়কে মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিলেন তিনি। নাঃ, এ ছেলের মধ্যে কোথায় একটা নিস্পৃহতা আছে, জমিদারী বা অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার ছেলে এ নয়।

নিশ্চিন্ত হলেন রাজারাম।

বেশ চলছিল।

রাজেশ্বরীকে নিয়ে যেন নতুন ক'রে সংসার পাতা আরম্ভ করলেন মোহিনী দেবী। বহুদিন পরে যেন আবার তিনি হাসতে পারলেন।

কিন্তু এ হাসি যে এত ক্ষণস্থায়ী তা কে জানত ?

এমনি ভাবেই চলছিল।

হঠাৎ গোলমাল বাঁধল রাজেশ্বরীর বিয়ের দেড় বছর পর।

রাজেশ্বরী তখন অন্তঃসত্ত্বা।

খবর পেয়ে তাকে সেরপুরে নিয়ে এলেন মোহিনী দেবী। তাকে রাখতে সূর্যনারায়ণও সঙ্গে এসেছিল, কিন্তু পরদিনই চলে যেতে চাইল।

মোহিনী দেবী সত্যিই ব্যথিত হলেন। তাঁর শূন্য প্রাসাদ এতদিন বাদে ভরেছে আর আজই যাবে জামাই ? সে কি করে হয়, তাই শেষ চেষ্টার মত অনুরোধ করলেন, তোমার যাবার এত তাড়া কিসের বাবা ?

রূপোর গেলাসে ঠাণ্ডা সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি জামাইকে।

এখানে থাকারও তো কোন দরকার দেখছি না।

আহত হলেন তিনি রীতিমত। তাঁর বাড়ির আদর-আপ্যায়ন যা যে কোন লোকের কামনার বস্তু সে সবের কোন দামই যেন এই দরিদ্র সন্তানের কাছে নেই। তবু মনে মনে এজন্য নির্লোভ জামাইকে একটু যেন বেশি করেই ভালবাসলেন তিনি। কিন্তু কথাটার থেকেও সূর্যনারায়ণের বলার নিষ্প্রাণ ভঙ্গিটাই বুঝি আঘাত করল তাঁকে। শ্বশুরবাড়িতে কি জামাই দরকারের জন্যই আসে ?

হ্যাঁ বাবা ! তুমি আমাদের কত আদরের, কত আরাধনার তা তুমি কি জানবে। তোমাকে দু'দিন কাছে পেতে বুঝি আমাদের ইচ্ছে হয় না।

কথার কোন উত্তর না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সূর্যনারায়ণ। সামনে রাখা শ্বেতপাথরের টেবিলটা একটু ঠেলে দিল যেন।

ও কি বাবা উঠলে কেন ? আর দু'দিন থাক, বুঝলে ! আমার এ শূন্য পুরী।

আমার ভাল লাগে না।······

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল সূর্যনারায়ণ।

···আর তা ছাড়া আপনাদের মেয়ে তো থাকলেন, শূন্যপুরী কিসের ?

সে তো মেয়ে, তুমি তো আমাদের ছেলে !

হাল ছাড়তে চাইলেন না মোহিনী দেবী, তাঁর বড় আদরের জামাই, তাকে তিনি একান্ত আপনার করে পান না, এ দুঃখ কাকে জানাবেন তিনি।

সত্যিই তুমি আমার ছেলের মত।

এবার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল সূর্যনারায়ণের, সুন্দরী তরুণী বধূকে সে ভালবাসে কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির এই সর্বগ্রাসী ভালবাসা তাকে রীতিমত পীড়া দেয়। অথচ কাকা তো রোজই···

তার মুখভাব মোহিনী দেবীর নজর এড়াল না। তিনি ভুলতে পারেন নি যে, বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি জামাইয়ের মুখে মা ডাক শোনেন নি। অসম্মান করে নি সে সত্যিই, কিন্তু 'মা' বলে সম্মানও করে নি। কাঁটার মত বুকে বিঁধে আছে ব্যথাটা। বুভুক্ষিত অন্তর আজও তৃপ্তি পায় নি।

রাজারামের আপত্তি সত্ত্বেও কত আশা করে রাজেশ্বরীর বিয়ে দিয়েছিলেন মোহিনী দেবী। অবশ্য জামাইয়ের যে কোন দোষ আছে স্বভাব বা চরিত্রের, এ কথা অতিবড় শত্রুও বলতে পারবে না। মেয়েকে সে ভালবাসে, যা অনেক ঘরেই নেই, তাই তাঁর দুঃখ লোককে বোঝাবার নয়। তাদের কাছে এটা দুঃখ-বিলাস মনে হ'তে পারে। কিন্তু তিনি জানেন তাঁর ব্যথা কোথায়।

জামাই বড় আত্মকেন্দ্রিক ; একটা নীরব উপেক্ষার ভাব আছে তার ব্যবহারে। শুধু মোহিনী দেবীকে নয়, এ বাড়ির সকলের ওপর বিশেষ করে—রাজারামের ওপর। সর্বদাই এক কাঠিন্যের আবরণে সে যেন নিজেকে ঢেকে রাখে। অথচ মেয়ের মুখ দেখে তিনি বুঝেছেন, জামাই হৃদয়হীন নয়। রাজেশ্বরীর বিন্দুমাত্র ইচ্ছাপূরণের জন্য সে হৃদয়ের সব প্রচেষ্টা তীব্রবেগে ধাবিত হতে পারে।

বিশেষ করে রাজারামের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশে দ্বিধাও করে না সূর্যনারায়ণ। আর সেখানেই ব্যথা পান মোহিনী দেবী। ও কি জানে কত করেছেন তাদের জন্য, রাজেশ্বরীর জন্য। রাজারামের বুকের পাঁজরা ছিল রাজেশ্বরী, নিজের হাতে সব শিখিয়েছেন রাজারাম তাকে।

কিন্তু কি হবে এসব ভেবে। কাকেই বা বলবেন এ কথা। এমন কি রাজারামকেও বলা সম্ভব নয়। অথচ রাজারাম যে অশ্রদ্ধাটুকু বুঝতে পারেন, তাও তাঁর ব্যথাহত মুখ দেখে বুঝতে দেরী হয় না।

অথচ দরিদ্র বংশের ছেলে সূর্যনারায়ণ।

পাঁচজনে জানে আজ দরিদ্র হলেও একদিন সে-ই এই অতুল সম্পত্তির মালিক হবে।

তবু যে বুদ্ধিমান হবে সে অন্তত এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণীকে বিমুখ করতে চাইবে না। কে আবার বর্তমানের ভুলের জন্য ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেয় ?

নাকি সূর্যনারায়ণের মনে আসল সম্পত্তির ওপরই কোন লোভ নেই। তা হলে ? বিয়ের আগে তার কাকা অত খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলেন কেন ? বারবার উত্তর পেয়েও তাঁর সংশয় ঘোচে নি কেন, যে রাজেশ্বরী ছাড়া এ সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই ?

তবে সূর্যনারায়ণ কি জানে না এ কথা ? বুঝতে পারেন না মোহিনী দেবী। আর ততই এই অদ্ভুত জামাইকে ভাল করে বুঝে নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন তিনি।

কতবার চেষ্টা করেছেন তিনি জামাই-এর মন জানতে রাজেশ্বরীকে দিয়ে। হয়ত দরিদ্র বলেই ধনিগৃহে তেমন সহজ হ'তে পারে না, অনাবশ্যক কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে সঙ্কোচটুকুকে বুঝি সে জয় করতে চায়।

কিন্তু ক্রমশ যেন নিরাশ হচ্ছেন তিনি। তাঁদের বাড়ি পরিবার সকলের প্রতি একটা উপেক্ষা সূর্যনারায়ণের আচরণে দিন দিন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সূর্যনারায়ণকে ভয় করেন তিনি আজকাল। আঘাত দেওয়ার ব্যাপারে তার সচেতনতার অভাব তাই মোহিনী দেবীকে আরও স্পর্শকাতর করে তোলে।

আজও ভয় পেলেন তিনি।

আর কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

তার পরদিনই সত্যিই চলে গেল সূর্যনারায়ণ।

কিন্তু এ তো শুধু আরম্ভ, সূর্যনারায়ণ যে কত বড় জেদী ছেলে তার তেজ যে কত তা বোঝা গেল রাজেশ্বরীর ছেলে জন্মাবার পর।

ছেলের জন্মের পরই মোহিনী দেবী মিষ্টি আর কাপড় যা বিলিয়ে পাঠালেন ঘরে ঘরে তাতে প্রজারা বুঝল তাদের ভবিষ্যত জমিদারের জন্ম হয়েছে বটে।

সূর্যনারায়ণ আসতে পারল না। তার কাজ আছে।

মোহিনী দেবী অপমানিত বোধ করলেও মুখে কিছু বললেন না। এ দু'বছরে তাঁর অভ্যাস হয়েছে কতকটা।

বুঝতে পারেন না তিনি জামাইকে। দরিদ্রের ছেলে সে জানা কথা, এত বড় সম্পত্তির মালিক তো সে-ই বিশেষ করে যখন উত্তরাধিকারীও জন্মে গেছে। কিন্তু কোথায় কি ?

প্রথম প্রথম মোহিনী দেবী ভাবতেন দরিদ্র ব'লেই হয়ত লাজুক, চাপা ছেলে সূর্যনারায়ণ তাই মিশতে সঙ্কোচ বোধ করে। রাজেশ্বরীকে দিয়ে প্রথম প্রথম তার মন জানতে চেষ্টা করেছেন। কি তার পছন্দ, কি তার ইচ্ছে সব। একবার শুধু মুখ ফুটে জানাবার অপেক্ষা।

কিন্তু ফল হয় নি। বহু চেষ্টার পর রাজেশ্বরীও হাল ছেড়েছে। অল্প কথার মানুষ সূর্যনারায়ণ, কিন্তু সে অল্প কথার ভার অনেক বেশি। তার গাম্ভীর্য আর কঠিন নীরবতা কোন কথা এগোতে দেয় নি। তা ছাড়া রাজেশ্বরীর স্বভাবেও আসে না এসব নিয়ে বারবার সাধাসাধি করা। ভেবেছে থাক নাই বা চাইল, মা আছেন ওর কিসের অভাব।

মোহিনী দেবীও ভেবেছেন, থাক, আজ না হোক, কাল চাইবে। আর সবই তো তার, একদিন বুঝে নেবে।

কিন্তু সূর্যনারায়ণ সে ধার দিয়েও গেল না। বরং দিনে দিনে ব্যবধানটুকুকে সে বাড়িয়েই চলল।

চরম আঘাত হানল সে ছেলের জন্মের পরই।

রাজেশ্বরীকে নিয়ে যাবার জন্য লোক এল ষষ্ঠী পুজোর পরদিনই ? অবাক হলেন মোহিনী দেবী, আর সকলেই।

সে কি কথা ? এই দুধের ছেলেকে নিয়ে যাবে কি ? হ'তে পারে না।

সূর্যনারায়ণের প্রেরিত লোককে বিদায় দিলেন মোহিনী দেবী।

কিন্তু ফল হল পরদিনই নিজে এল সূর্যনারায়ণ। তাকে দেখে খুশিই হলেন মোহিনী দেবী। যাক তবু ছেলেকে দেখতে এসেছে

জামাই। কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন যখন শুনলেন সে নিজেই নিয়ে যেতে এসেছে—ছেলে-বৌকে, আর আজই।

সে হয় না বাবা। জোর দিলেন মোহিনী দেবী। মেয়ের শরীর সারুক তারপর যাবে, কতবড় ধকল গেল ওর ওপর দিয়ে, সোজা কথা।

যাচ্ছে তো নিজেরই বাড়িতে সেখানে শরীর সারানোতে বাধা কি?

মোহিনী দেবীর মুখে এল বলেন যে, তিনি তো জানেন সেই দরিদ্রের সংসারে মেয়ের শরীর সারার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি, কিন্তু মুখে বললেন অন্য কথা।

নিজের বাড়িতে তো যাবেই বাবা। এখানে তো চিরদিন থাকবার জন্য আসে নি, কিন্তু আজ নয়।

হ্যাঁ আজই।

জামাইয়ের দৃঢ়স্বরে চমকে উঠলেন মোহিনী দেবী। তাঁর মুখের ওপর এভাবে কথা বলছে কি করে? শুধু রাজেশ্বরীর স্বামী বলে? একবার দেখে নিলেন কেউ আশেপাশে আছে কি না তারপর সরে এলেন জামাইয়ের একেবারে কাছে, তারপর প্রায় মায়ের দাবীর সঙ্গে ওকে বললেন, সূর্যনারায়ণ!

বলুন!

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

নিশ্চয়ই।

অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল সূর্যনারায়ণ।

তোমার একটুও ভাল লাগে না এ বাড়িতে? কাউকে নয়?

আমি তো বলি নি সেকথা?

বল নি। কিন্তু ভাবে তাই প্রকাশ কর।

তা হলে তো আমি অপারগ।

কঠিন হয়ে গেলেন মোহিনী দেবী। তারপর স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেন। যদি জিজ্ঞেস করি, কিসে তুমি অপারগ?

উত্তরটা কি সত্যিই শুনতে চান?

চাই বৈ কি? না হলে প্রশ্ন করবো কেন?

তাহলে অপ্রিয় সত্যটিই কি আমাকে বলতে হবে?

অপ্রিয় সত্য? কি সে?

আবেগে মুখটা টসটস করছে মোহিনী দেবীর।

অপ্রিয় বৈ কি? আপনারা কি ঘৃণাক্ষরেও আমাদের জানিয়েছিলেন যে, এখানকার কর্তা মৃত হলেও কর্তার স্থান শূন্য হয় নি।

সূর্যনারায়ণ।

চীৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলেন মোহিনী দেবী।

না, আপনি যখন শুনতে প্রস্তুত তখন আমায় বলতে দিন।

হ্যাঁ বল, শুনতে সত্যিই আমি প্রস্তুত

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজের আবেগকে সংযত করলেন তিনি।

আমায় মাফ করবেন, কিন্তু দেওয়ান সম্বন্ধে আমরা যা শুনেছি, তারপর কাকা আর এ বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চান না। শুধু আপনার মেয়ে দুঃখ পাবেন ভেবে কিছু করতে পারা যায় নি।

আর বোল না, আর বোল না। চুপ কর।

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মোহিনী দেবী।

না, যখন আরম্ভ করেছি তখন শেষ করেই যাব। আমার ছেলে জন্মাবার পর এমনও শোনা গেছে, দেওয়ান সম্পত্তি লোভে তাকে বিষও খাওয়াতে পারে। অন্তত কাকা তাই আশঙ্কা করেন আর সে আশঙ্কার বীজ ঢুকিয়েছে আপনাদেরই প্রজারা।

আর নয় বাবা! আর নয়!

লুটিয়ে পড়লেন মোহিনী দেবী মেঝের ওপর।

সেই সময়ই ঘরে ঢুকলেন রাজারাম।

সত্যিই যেদিন জানা গেল প্রমীলানন্দের বিধবা স্ত্রী এতদিন বাদে দত্তক নিচ্ছেন তখন গ্রামের সবাই শুধু অবাকই হল না। হতবুদ্ধি হল!

দত্তক নেবেন মোহিনী দেবী। মেয়ে রাজরাজেশ্বরী আর প্রকৃত উত্তরাধিকারী নাতিকে বঞ্চিত করে? রাজরাজেশ্বরী মোহিনী দেবীর যে প্রাণ? কি করে সম্ভব? তাছাড়া আইন? দত্তক নেবার অনুমতি আছে কি তাঁর?

জানা গেল তাও আছে। প্রমীলানন্দ নাকি শেষ সময়ে অনুমতি দিয়ে গেছেন তাঁকে দত্তক নেবার।

খুশি হল কেউ কেউ। এত বড় জমিদারীর প্রভু, তাদের কর্তা হ'য়ে বাইরের লোক সূর্যনারায়ণ এল না বলে। হাজার হোক মেয়ে জামাই আবার কি আপন হয়?

আবার অনেকে সত্যিই দুঃখ পেল। তাদের অত আদরের খুকিবাবাকে চিরদিনের মত পর করে দিল রাণীমা। এ কেমন বিচার।

কিন্তু কারও মতামতেই কিছু এসে গেল না।

মহা ধুমধামে দত্তক নিলেন মোহিনী দেবী।

পাশের গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ হারাণ ভট্টাচার্যের ছেলেকে দত্তক নিয়ে তার নাম রাখলেন আদর করে হৃদয়ানন্দ। নতুন জমিদার হল সাতবছরের ছেলে হৃদয়ানন্দ রায়চৌধুরী।

সত্যিই হৃদয়ানন্দই হ'ল ছেলে মোহিনী দেবীর। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

রাজারামের ভাল লাগল না ছেলের হালচাল। রাজেশ্বরীকে তিনি সত্যিই ভাল বেসেছিলেন তা ছাড়া প্রথম থেকেই ছেলেটির হাবভাব তাঁর ভাল লাগে নি। কিন্তু সে কথা মোহিনী দেবীকেও বলেন নি তিনি। থাক না নিজেই বুঝবেন একদিন, যেমন বুঝেছিলেন সূর্যনারায়ণের স্বরূপ একদিন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে।

কত বদলে গেছেন মোহিনী দেবী ঐ প্রথম আঘাতের পর থেকে। পুজোর ঘরকে আশ্রয় করেই দিন কাটে তাঁর। অত ঘটা করে দত্তক নিলেন, কিন্তু কোথায়? ছেলেকে আদর করেন, যত্ন করেন, কিন্তু মোহিনী দেবীর মুখের সে দীপ্তি গেল কোথায়?

রাজারাম লক্ষ্য করেন আর ব্যথা পান।

তাঁর সব কথা, সব অব্যক্ত বেদনা তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু উপায় কি? শুধু সহ্য করা ছাড়া। তাই তিনি সহ্যই করেন।

হৃদয়ানন্দকে নিয়ে আবার নতুন করে শুরু হ'ল এ বাড়ির জীবন। আবার সেই নানা রকম শিক্ষার ব্যবস্থা, সেই পড়াশোনার পাঠ। মোহিনী দেবী খুশি হ'ন হৃদয়ানন্দের বুদ্ধি দেখে। মাঝে মাঝে

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে। কে জানে কোথায় সে মানুষ হচ্ছে, কি ভাবে। কতদিন কোন খবর পান নি তিনি। খবর পাবার কোন উপায় নেই। তবু আশা করেন রোজ, হয়ত আজ বদলে যাবে সবকিছু, আবার আগের মত হবে।

কিন্তু না। তা হলে হৃদয়ানন্দ, তাঁর খোকার—তার কি হবে? তাকে তো তিনি ছেলে বলে স্বীকার করেই তার মার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। তা হলে? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে কি?

দিনে দিনে এই একই চিন্তা তাঁকে পীড়িত করতে লাগল।

রাজারামের চোখ এড়াল না।

ততই তিনি হৃদয়ানন্দের সব বিষয়ে তাঁকে টানতে চেষ্টা করতে লাগলেন, যাতে অন্তত আবার আগের মত তিনি মেতে ওঠেন বিষয় সম্পত্তির তদারকে, আবার এই পৃথিবীতেই আনন্দ পান তাঁর নিজেরই সংসারে।

কিন্তু মোহিনী দেবী যেন পণ করে বসেছেন, দিনে দিনে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন আর রাজারামের কাছ থেকেও যেন সরে গেলেন অনেক দূরে।

সেটাই রাজারামের কাছে অসহ্য হল! শুধু সম্পত্তি নয়, যে মোহিনী দেবীর নিষ্ঠুর আকর্ষণ তাঁকে অহরহ টেনেছিল, যার জন্য সারা জীবন তিনি নিজের বলতে কিছুই রাখেন নি, তাকে আজ এমনভাবে হারাতে যে কিছুতেই তাঁর মন চাইল না।

কিন্তু কি-ই বা করতে পারেন তিনি। শুধু অসহায়ের মত বসে বসে দেখা ছাড়া? দারুণ হিংসে হয় তাঁর সূর্যনারায়ণকে। সেই দরিদ্রের ছেলে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে, নির্মমভাবে হারিয়ে দিয়েছে। রাজারামের মাথার ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে।

শীত পড়তে না পড়তেই মোহিনী দেবী জ্বরে পড়লেন।

সে জ্বর আর ছাড়ে না। চিকিৎসার ত্রুটি হোল না, কিন্তু চিকিৎসকের সাধ্য কি? মোহিনী দেবী যে প্রচণ্ড রোগের বীজ নিজে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, যা তাঁকে দিবারাত্র কুরে কুরে খাচ্ছে তার প্রতিকার কি? সে রোগের ওষুধ ডাক্তার পাবে কোথায়?

দিন দিন বাড়তে লাগল তাঁর অসুখ। হৃদয়ানন্দ এখন যুবক।

নিজের বাল্যজীবনের কথা মাঝে মাঝে তার মনে আসে, নিজের মা, বাবা, ভাই, বোন তাদের কাছে ফিরে যেতে মন চাইত প্রথম প্রথম, কিন্তু মোহিনী দেবীর স্নেহ-যত্নে সব ভুলেছে সে। আজ তার জগৎ বলতে তার মা মোহিনী দেবী।

তাই তাঁর এই অসুখে সেই যেন ভেঙ্গে পড়ল বেশি। জলের মত টাকা খরচ হ'তে লাগল। এখন আর রাজারামেরও দৃষ্টি নেই জমিদারীর তহবিল বাড়লো কি কমলো। শুধু দিবারাত্র সেবা-যত্ন দিয়ে ভরিয়ে রাখল তাঁকে ছ'টি পুরুষ, যারা তাঁর কেউই নয়, অথচ আজ তারাই শুধু তাঁর আপন।

রোগশয্যায় শুয়ে হৃদয়ানন্দকে তিনি আরও বেশি করে বলতেন তার দিদি রাজরাজেশ্বরীর কথা।

সমস্ত আগ্রহ নিয়ে শুনত সব কথা হৃদয়ানন্দ। রাজেশ্বরী সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বলে নয়, তার মা মোহিনী দেবী খুশি হবেন ব'লে।

আর রাজারাম চেয়ে চেয়ে দেখতেন কেমন করে সেই উন্নত গর্বিত সুন্দর দেহ আস্তে আস্তে অকাল বার্ধক্যে শেষ হয়ে আসছে। মাথার দীর্ঘ কালো চুলের রাশিতে কি ভাবে সাদার আভাস এসে তাঁর বয়সকে যেন আরও একটু এগিয়ে দিচ্ছে।

বর্ষাকালে মোহিনী দেবীর অবস্থা চরমে উঠল। সে রাত্রির মত রাত্রি বোধ হয় জীবনে আর আসবে না।

অমাবস্যার ঘন কালো রাত্রে মেঘ আর বৃষ্টির গর্জনে চারিদিকে একটা ভীষণ ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। নিষ্ঠুরা প্রকৃতি যেন তাণ্ডব নৃত্যে আজ সবকিছু ছারখার করে দেবে। অন্ধকার রাতের একটি ক্ষীণালোকিত ঘরে ছ'টিমাত্র পুরুষ মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর পাশে বসে সেই ভয়ঙ্কর সময়ের প্রতীক্ষা করছে।

হৃদয়ানন্দ ভাবতে পারছে না কি হবে তার। এই অতুল সম্পত্তি তার, কিন্তু মা না থাকলে? ভিখারীর আসন থেকে তুলে এনে মা-ই তো তাকে এই রাজার সিংহাসনে বসিয়েছে। কিন্তু মাকে ছাড়া, মায়ের সদাজাগ্রত স্নেহ ছাড়া, কি মূল্য থাকতে পারে এর? সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে, এতবড় সম্পত্তির মালিক ব'লে নয়, মোহিনী দেবীর সবটুকু ভালবাসা সে আদায় করেছে বলে।

অনেকবার সগর্বে বলেছেও সে একথা, রাজারাম শুনে শুধু একটু হাসেন। এই ভাল। নিজের সবকিছু ছেড়ে যে আজ পরকেই আপন বলে আঁকড়ে ধরেছে, তার ভুল ভাঙ্গাতে রাজারাম চান না।

যে রাজারাম একদিন হৃদয়ানন্দকেও হিংসে করেছিলেন, তার গর্বিত ভাব দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন, তিনি আজ তাকে শুধু অনুকম্পাই করেন না, কখন তার সঙ্গে স্নেহ এসে মিশে গেছে, তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নি।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের কোণে রাখা বড় বাতিটা নিভে গেল। আর সেই সময়ই মোহিনী দেবী কাছে ডাকলেন হৃদয়ানন্দকে। মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে যে কথা হৃদয়ানন্দ শুনল, তাতে তার বুক ভেঙ্গে গেলেও কোন ভাবান্তর সে দেখল না।

তার সব স্বপ্ন যেন টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল। কিন্তু সমস্ত আবেগকে কষ্টে সংযত করে সে এই মৃত্যুপথ-যাত্রিণীকে আশ্বাস দিল, তাই হবে।

ওর হাতটা নিজের বুকের ওপর টেনে নিলেন মোহিনী দেবী। একটা শান্তির হাসি এই প্রথম তাঁর মুখে দেখা দিল। মনে হল তিনি বুঝি এবার ঘুমোবেন। বহুদিন পর যেন বড় নিশ্চিন্ত আরামে তিনি ঘুমোবেন।

রাজারাম বুঝতে পেরে এই প্রথম খাটের অতি কাছে এসে বসলেন। একবার তাকালেন অতিপ্রিয় এই মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর মুখের দিকে, তারপর হৃদয়ানন্দের কাছে চোখের জল গোপন করবার জন্য ওদিকে মুখ ফিরিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের প্রচণ্ড ঝড়ের গতির থেকেও তীব্রবেগে তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে।

ঠিক ভোর চারটের সময় মোহিনী দেবী মারা গেলেন।

চেঁচিয়ে কাঁদবার কেউ নেই। ঝি-চাকরদের কথা বাদ দিলে যার আজ শোকে ভেঙ্গে পড়বার কথা, সে বোধ হয় জানতেও পারবে না খবরটা।

রাজারামের প্রধান চিন্তা হল সেটাই। কিন্তু কি ভাবে খবর দেওয়া যায়। মোহিনী দেবীকে তিনি জানতেন, আজ রাজরাজেশ্বরীকে এ খবর না দেওয়ার মত হৃদয়হীন কাজ তিনি কি করে করবেন ?

ভয় তাঁর হৃদয়ানন্দকে। খবর দেওয়ার জন্য নয়, রাজেশ্বরীকে সে কি ভাবে গ্রহণ করবে ? রাজেশ্বরীর ছেলেকে ?

কিন্তু হৃদয়ানন্দের কথা শুনে তিনি চমকে গেলেন।

কি করে সম্ভব তা ? এ হয় না। আর সে কথাটাই স্পষ্ট করে বললেন তিনি।

শোনো বাবা, ধর্মত আইনত তুমি তাঁর ছেলে। সুতরাং শ্রাদ্ধাধিকার তোমারই।

তা হয় না রাজাকাকা।

কেন ?

মায়ের শেষ ইচ্ছের আমি অপমান করতে পারব না।

তাঁর শেষ ইচ্ছে, এ হ'তেই পারে না।

আমি নিজে শুনেছি যে কাকা।

কই ? আমি তো শুনি নি।

হয়ত সে সময় ঝড়ের শব্দে শুনতে পান নি, কিন্তু আমি শুনেছি আর শপথও করেছি।

শপথ করেছ ?

রাজারাম এবার সত্যিই বিস্মিত হন।

ও সময়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি, তাকেই শপথ করা বলে।

তা তো ঠিকই।

আপনি আমাকে মায়ের কাছে মিথ্যেবাদী হ'তে বলবেন না রাজাকাকা।

রাজারাম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে গেলেন। কি বলবেন তিনি এই যুবককে। কতটুকু জানে এ। মোহিনী দেবীর শেষ ইচ্ছা পালনের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষেও যে কোনমতে সম্ভব নয় এ কথা তিনি কি করে বোঝাবেন।

সূর্যনারায়ণকে আবার একবার হিংসে করলেন তিনি। বরাবর জিতে গেল লোকটা। তাই হোক, তাঁর কপাল। না হলে মোহিনী দেবীর জামাই হবে কেন—রাজেশ্বরীর স্বামী ?

হৃদয়ানন্দকে গভীরভাবে ভালবাসলেন তিনি।

শ্রাদ্ধের আয়োজন ও আড়ম্বর লোকের কল্পনাকে ছাড়াল।

খবর পেয়ে রাজেশ্বরী এল তার ছেলে রাঘবনারায়ণকে নিয়ে। মায়ের ঘরে ঢুকে সেই যে মুখ বুজে পড়ল রাজেশ্বরী মায়ের খাটের ওপর মাথা তুলল না তিনদিন।

সূর্যনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে তারই এক বৎসর আগে।

রাঘবনারায়ণকে শ্রাদ্ধ করতে দেখে অবাক হল সকলে। আর হৃদয়ানন্দের মহত্বে হোল মুগ্ধ। কিন্তু কোন পক্ষের কোন উচ্ছ্বাসকেই আমল দিল না হৃদয়ানন্দ। তবে যতটা সহজ হবে বলে ভেবেছিল, ততটা হ'ল না। প্রস্তাবটা শোনামাত্র রাজেশ্বরী বেঁকে বসল।

হোতে পারে না। আজ সূর্যনারায়ণ বেঁচে নেই, কাকা তো করেই গত হয়েছেন কিন্তু তাঁদেরই ভুল বোঝাবুঝির জন্য সে মায়ের মৃত্যু সময়েও আসতে পারল না, অথচ তাঁরই মৃত্যুর পর হৃদয়ানন্দের দয়ায় দেওয়া সম্পত্তি সে নিতে যাবে কেন ? সে হোতে পারে না। জোর গলায় বলল সে।

কিন্তু দিদি ! আমার কথা শুনবে ?

মুণ্ডিত মস্তক হৃদয়ানন্দের চোখ ছলছল করতে লাগল।

ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ বুকটা কেমন করে উঠল রাজেশ্বরীর। ধর্মত তার ভাই। আর বিশেষ করে মা তাকে ভালবাসতেন।

নাঃ, সেটাই সত্যি নয় ! হৃদয়ানন্দ জানলার বাইরে তাকিয়ে বলল।

কি সত্যি নয় ? মা তোমায় ভালবাসতেন না ?

না ?

তা হ'তে পারে না। জান তোমার জন্য মা আমাদের পর করেছিলেন।

না দিদি, তোমরা ভুল জান। আমিও জানতাম মা আমাকে তোমাদের থেকেও বেশি ভালবাসেন, নিজের ছেলের মতই, কিন্তু···

সে ধারণা বদলালো কি করে ?

মায়ের মৃত্যুকালে।

কেন ?

মা শেষমুহূর্তে আমার হাত ধরে একটিমাত্র ভিক্ষা চেয়েছিলেন, সেটা কি জান ?

কি ?

তোমার ছেলে যাতে তাঁর শ্রাদ্ধ করে।

মাগো ! প্রায় চীৎকার করে উঠল রাজেশ্বরী।

হ্যাঁ দিদি ! আর তখনই··· কি তখনই ?

তখনই মায়ের মন, মায়ের সব দুঃখ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। বিশ্বাস কর দিদি, আমি মাকে নিজের মার মতই ভালবেসেছিলাম।

তা জানি ভাই।

কতটুকু জান দিদি তুমি, মার ভালবাসায় আমার গর্ব ছিল, আজ মা নেই, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করব না, কিন্তু সত্যি বলছি দিদি, যেদিন থেকে বুঝেছি তোমাকে মা একমুহূর্তের জন্যও ভোলেন নি, হাজার হলেও তোমার ছেলেকেই তিনি নিজের ভাবেন, তাঁর দত্তক ছেলেকে নয়, সেদিন থেকেই মনস্থির করেছি এ ছাই সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নেই।

না না, ও কথা বোল না ভাই। মা নিজে তোমায় দিয়ে গেছেন এ সম্পত্তি। এ তোমারই।

না ! মায়ের মনোগত ইচ্ছে আজ আমার অজানা নয়, তাই মা বেঁচে থাকলে যাতে সব থেকে খুশি হ'তেন তাই করেছি আমি। উইল করে সব সম্পত্তি তোমার ছেলেকে দিয়ে দিলাম। আমার কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা রাখলাম।

পাথরের মত বসে রইল রাজেশ্বরী। তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

রাজেশ্বরীর সমস্ত দর্প যেন মাটিতে গুঁড়িয়ে দিল ঐ পথ থেকে তুলে আনা ছেলে।

শ্বশুরবাড়িতে তাকে কতবার শুনতে হয়েছে আজ সেরপুরের মত জমিদারীর মালিক কি না এক নিঃসম্বল পুরুতের ছেলে, টাকার লোভ যার ষোল আনা।

রাজেশ্বরীর ছেলেকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেছে বলে নয়, মায়ের ভালবাসায় ভাগ বসিয়েছে বলেই রাগ ছিল হৃদয়ানন্দর ওপর তার।

কিন্তু এখন যেন একনিমেষে সব তুচ্ছ আবরণ খসে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেল তার হার হয়েছে। মা তাকে শেষ পর্যন্ত জব্দ করে গেল। কি দরকার ছিল এভাবে তাকে অপমান করবার। তার স্বামীর সব অপমানের শোধ বুঝি-বা মা এমনি করেই তুলল।

সেও কম মেয়ে নয়।

সেরপুরেই বাস করল বটে, কিন্তু অতুল সম্পত্তির অংশও ছুঁলো না।

রাজারাম চলে গেছেন কাশী হৃদয়ানন্দকে নিয়েই, মোহিনী দেবীর মৃত্যুর পরেই।

আজ যেন রাজারামকেও নতুন করে ভালবাসল রাজেশ্বরী। মায়ের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে সে শ্রদ্ধা না ক'রে পারল না। শূন্য পুরীতে ছেলে আর নিজেকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগল সে, আর নিদারুণ কৃচ্ছ্রতার ভেতর দিয়ে সে হৃদয়ানন্দর মহত্বকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু তার ছেলে রাঘবনারায়ণ শুধু যে চেহারাতেই দুর্দান্ত হ'য়ে উঠল তা নয়, তার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, সবতেই যেন সে বুঝিয়ে দিল মায়ের বোকামীকে প্রশ্রয় দেওয়ার পাত্র সে নয়। তাই রাজেশ্বরীর নাটকীয় জীবন, বাল্যের প্রচুর বিলাসিতায় আর প্রায় সারাজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে ইতিহাস হয়ে এল, তখন সে জানতে পারল, রাঘবনারায়ণ ইতিমধ্যেই সম্পত্তি শুধু ভোগ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, উড়িয়েও দিয়েছে তার অনেক অংশ।

তারপর টানাটানি চলল মায়ে-ছেলেতে। সম্পত্তিকে প্রায় প্রান্ত সীমায় পৌছে দিয়ে রাঘবনারায়ণ অনুভব করল আর অজ পাড়াগাঁয়ে থাকা নয়, ছেলেদের জন্য যেতে হবে তাকে সহর কলকাতায়।

তার জিদই জয়ী হল।

এই অঞ্চল যার নাম আগে ছিল গোবিন্দপুর, তারই প্রায় সমস্ত অংশটা কিনে শুধু প্রাসাদই তুলল না রাঘবনারায়ণ, বাকী টাকার সবটাই লাগাল ব্যবসায়ে।

প্রথম প্রথম লাভ হলেও শেষের দিকে ঋণের বোঝা ভারী হয়ে রাঘবনারায়ণকেও চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। আরম্ভ হল জমি বেচা।

নির্জন জনবিরল লোকালয় জনবসতিতে পঙ্গু হ'তে লাগল আর ততই বাড়তে লাগল, রোগে পঙ্গু রাজেশ্বরীর খেদ আর বিলাপ। অন্যের সম্পত্তি ভোগের নিদারুণ অভিশাপ থেকে যে এ বংশের মুক্তি নেই, সেটুকু তিনি মনে করিয়ে দিতে ছাড়েন না নাতিকে—তাঁর একমাত্র আদরের নাতি অবিনাশকে।

ছোটবেলা থেকে অবিনাশ শুনেছেন—এ ইতিহাস শুধু তাঁকে পীড়াই দেয় নি, মনের সেই জড়িয়ে আনা, বংশের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোথায় একটা সম্ভ্রমবোধ উঁকি মেরেছে আর সেই নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়া লোকের বংশধরের জন্য বৃথা খোঁজ করেছেন তিনি।

ক্রমে সবই সহ্য হয়ে এসেছে যেন। বর্তমান কর্তা অবিনাশ যুবা থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন, খোঁজার পালাও শেষ হয়েছে।

ভুলতে দেয় নি তাঁর পুত্র বিনয়কে। শুধু রাজেশ্বরী নয়, অবিনাশের স্ত্রী বিনয়ের মারও আকাঙ্ক্ষাটুকু যুবক বিনয়ের অজানা থাকে নি।

আজ না হোক একদিন তারা খুঁজে পাবে হৃদয়ানন্দের বংশধরদের।

কলসীর জল গড়াতে গড়াতে শেষ হয়ে এসেছে আর সেই শূন্য কলসীটুকু নিয়েই ফেরৎ দেবার বাসনায় অপেক্ষা করেছেন বুড়োকর্তা অবিনাশ আর তাঁর মনের মত করে মানুষ করা নেহাৎই মধ্যবিত্তের মত অফিসে খেটে খাওয়া ছেলে বিনয়।

তারা এখানেই বসবাস করেছে দিনের পর দিন। প্রতিবেশীদের সুখে-দুঃখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই পর্যন্ত। নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে মাথা না ঘামিয়েও কেমন একটা আড়াল থেকে গেছে তাদের সঙ্গে অন্যদের।

বাড়িভাড়া নেবার সময় এ সত্যটুকু সত্যব্রতর দৃষ্টি এড়ায় নি। আর তাতেই খুশি হয়েছেন তিনি।

এ বাড়ির ঐতিহ্য যে তাঁর মত ভাড়াটে পেয়ে নষ্ট হবে না, এটুকু গর্বের সঙ্গে মনে মনে অনুভব করেছেন তিনি।

তিনিও ধনী। অভিজাত পরিবারে জন্ম না হ'লেও, অভিজাত পরিবার সৃষ্টি করবেন তিনি। পরম তৃপ্তির সঙ্গে নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন সত্যব্রত।

কয়েকদিন বাদে একটা চায়ের আসরে সত্যব্রতর বাড়িতে ছ' সাতখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যার একটু পরেই একখানা বিরাট কালো গাড়ি থেকে নামলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী সুচরিতা ঘোষ, আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু খোকা মিত্তির।

পাড়ার বিস্ময় ও কৌতূহল জাগিয়ে গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে রাস্তাটি প্রায় ভরে গেল। শুধু গাড়ি নয় মিহি মোটা গলার নানারকমের হাসি আর কথা ভেসে আসতে লাগল। ঘরের আলোও উজ্জ্বলতর হল, আর তীব্রতম হল পাড়-পড়শীর কৌতূহল।

ওপরের বাড়ির ছোট মেয়ে ইলার সারা সন্ধ্যা কাটল তাদের ঘেরা বারান্দার ঝিলমিলিতে চোখ রেখে। নীচের বাড়ির ওপর সে সমানে নজর রেখে চলেছে। সুচরিতাকে নামতে দেখে সে আনন্দে যেন অধীর হয়ে উঠল। মেয়েরা কেউ নিমন্ত্রিত হয় নি, না কি? অন্তত ইলা তো একজনকেই দেখল, তবে তাতেই খুশি সে। স্বপ্ন বুঝি রূপ ধরে এল তার কাছে।

কিছুক্ষণ বাদে সুচরিতার গলার গান শোনা যেতে লাগল।

ভারী পর্দা ভেদ করে শব্দ, কথা আর গান, হাসি ভেসে আসতে লাগল। শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি সম্ভব। তাতেই খুশি ইলা। তবু এতদিনে এত মৃত গোমরা মুখ বাড়িটার জীবনহীন অবস্থা যেন শেষ হল। জীর্ণ সাজ খুলে ফেলে নতুন সাজে যেন সাজতে আরম্ভ করেছে বাড়িটা। শুধু এ বাড়িটা নয়, ইলার মনে হল সমস্ত আশ-

পাশের আবহাওয়া, সারা জগতই যেন গান গেয়ে উঠল। সবকিছু যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

শুধু সেদিন নয়।

এরপর থেকে প্রায় সন্ধ্যায়ই ভেসে আসতে লাগল গানের সুর। প্রাণের জোয়ারে যেন ভেসে চলল দিনগুলো। সন্ধ্যাগুলো মুখরিত হোল গল্পে-গানে আর টুকরো হাসিতে।

সেদিনও সকাল থেকে বর্ষা নেমেছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা যেন বাড়ল। অঝোরধারায় বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তাঘাটে লোকজন প্রায়ই নেই। শুধু গয়লাদের কতগুলো গরু নীরবে দাঁড়িয়ে ভিজছে। আর কতগুলো বেওয়ারিশ কুকুর পাড়ার কারও কারও বাড়ির রকে আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বাঁচতে পারছে না, বৃষ্টির হাত থেকে।

একটা ছোট হাল্কা নীল রংয়ের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নামল সুচরিতা। কিন্তু তাকে দেখে বেশ চমকে যেতে হয়। বেশে তার সে নিখুঁত পারিপাট্য নেই। ছোট ছোট চুলগুলো কাঁধ অবধি ছড়ান। গাড়ি থেকে নেমে ধীর পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল সুচরিতা।

বৃষ্টিতে কেউ আসে নি। আসবার সম্ভাবনাও নেই। একটা লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরে বসে বেশ অলসভঙ্গীতে সিগারেট খাচ্ছিলেন সত্যব্রত।

হঠাৎ সুচরিতাকে দেখে চম্‌কে গেলেন তিনি। ওকে বসতে বলে ত্বরিতে তিনি বাড়ির ভেতরে অন্তর্হিত হলেন।

একটু পরেই সিল্কের লুঙ্গির ওপর একটা ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী চড়িয়ে এসে বসলেন তাঁর নিজস্ব বেদীতে।

সুচরিতা তখনও দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার হঠাৎ? বসুন।

কাছের চেয়ারটাতেই বসে পড়ল সুচরিতা।

দাঁড়ান একটু চায়ের কথা বলে আসি।

থাক···আপনি বসুন।

হ্যাঁ বসছি। হরিপদ।

সত্যব্রত বসে বসেই অগত্যা হাঁক দিলেন। কিছু খাবার আর চা নিয়ে এসো।

চাকরকে গম্ভীরভাবে নির্দেশ দিয়ে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তিনি তাকালেন সুচরিতার দিকে।

সুচরিতা চোখ নামাল।

দেখুন! আমি···

বলুন!

সস্নেহে বললেন সত্যব্রত।

আমি···আমি একটু বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে। আপনি আমায় এ বিষয়ে··

অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? কি বলুন?

সাগ্রহে প্রশ্ন করেন সত্যব্রত। আমায় দ্বারা যদি কোন সাহায্য হয়।

আপনার দ্বারাই হবে। আপনি···

কিছুতেই যেন দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সুচরিতা।

আপনি কোন সঙ্কোচ করবেন না আমার কাছে।

সত্যব্রত সাহস দিলেন।

বিষয়টা কি নিতান্তই ব্যক্তিগত?

ব্যক্তিগত বৈ কি!

তা হলে আমাকে?

হ্যাঁ আপনাকেই। আমারই ব্যক্তিগত বিষয় বটে, কিন্তু আপনাকেই বলা দরকার, বিশেষ প্রয়োজন।

সুচরিতার মুখে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত এসে গেছে। ফর্সা মুখটা টুকটুকে লাল হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারলেন না সত্যব্রত।

আমাকে আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, যদি সত্যিই আমাকে আপনার প্রয়োজনই হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সুচরিতা। ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সত্যব্রত। জোর করে সাহস আনল সুচরিতা, তারপর তার আবেগ দীপ্ত চোখ তুলে প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠল. মিঃ সেন।

বলুন।

আমাকে আপনি বাঁচান।

কি হোল আপনার?

বলছি। সবই বলবো। আপনাকেই বলবো ব'লেই এসেছি। মিঃ সেন, আমি আর পারি না, আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, আমি আর পারি না।

এক নিঃশ্বাসে যেন বলে গেল সুচরিতা। ওর দিকে সমান ঔৎসুক্যে তাকিয়ে আছেন সত্যব্রত। তাঁর যেন এ সুচরিতাকে বিশ্বাস হচ্ছে না।

আজ সুচরিতা চুল বাঁধে নি। বেশে কোন পরিপাট্য নেই, চুলটা ভাল করে আঁচড়ায়ও নি। মুখে সেই অতি পরিচিত প্রসাধনের কোন চিহ্ন নেই। তবু তাকে এই একান্ত ঘরোয়া সাজে কি ভালই লাগছে যে! একটি বড় নিঃশ্বাস ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন সত্যব্রত।

মিঃ সেন।

মুখটা আরও নীচু করে আস্তে আস্তে শুরু করল সুচরিতা।

আপনি তো জানেন। মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা!

সে তো জানি। অমন গুণী লোক ক'টা হয়?

গুণী!

একটু হাসল সুচরিতা।

নিশ্চয়ই গুণী।

আবার ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল সে। কিন্তু আমার জীবনটাকে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আমি যে আর চলতে পারছি না মিঃ সেন!

সত্যব্রত আরও বিব্রত বোধ করেন। এতে তাঁর কি করবার থাকতে পারে, তা তিনি বুঝে পান না।

আগে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি এর থেকে আলাদা কোন জীবন আমার থাকতে পারে। গাড়ি, সাজ, পার্টি, আনন্দ, প্রচুর উৎসব

এসব ছাড়া জীবনে আর কিছু কাম্য আছে বলে মনে করি নি কোনদিন। কিন্তু···

কি ?

সত্যব্রতর স্বরে স্নেহের আভাস। বেশ ভাল লাগছে এই পরিবেশে এমন ঘরোয়াভাবে সুচরিতার মুখে তার নিজের কথা শুনতে।

কিন্তু···আজ আমার সে ধারণা নেই, অনেক বদলেছে। তার কারণ,··· তার কারণ আপনি।

কথাটা নিঃশ্বাস বন্ধ করেই বলে ফেলে সুচরিতা আর রীতিমত চমকে যান সত্যব্রত।

আমি ?

হ্যাঁ আপনিই। আর কেউ নয়। আপনি !

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন সত্যব্রত।

মিঃ সেন। আপনি জানেন না আপনার লেখা বইয়ের নায়ক-নায়িকা তাদের আমি কত ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি দিনের পর দিন। যখন অভিনয় করেছি কেন অত ভাল হয়েছে সে সব অভিনয়—আমি যে সেসব চরিত্রের সঙ্গে একান্তভাবেই মিশে গেছি। তার ভেতর দিয়েই আমি যেন নিজেকে আবার নতুন করেই খুঁজে পেয়েছি।

কিছু না বলে লজ্জিতভাবে হাসেন সত্যব্রত।

সুচরিতাকে যেন নেশায় পেয়েছে। সব কথা আজ সে বলবেই, তাকে বলতেই হবে। তাই লাল হয়ে ওঠা মুখে উড়ে আসা চুলগুলো সরিয়ে আবার বলে চলল সে, বাধ্য হয়েই এই বিষাক্ত জীবন আমাকে বেছে নিতে হয়েছিল আপনি জানেন না। ভাইবোনেদের দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচাতে তাদের সুখে রাখতে আমাকে এই অবলম্বন করতে হয়েছিল। বাবা অবশ্য ছিলেন, দাদাও, কিন্তু তারা তো···। থাক সে সব কথা। তখন আমিও কম সুখী হয় নি। ভেবেছিলাম ভাগ্যে আমার রূপ ছিল।

মিঃ সেন অবাক হবেন না নিজের মুখে রূপের কথা বললাম বলে। আমি জানি রূপ আমার আছে। প্রয়োজনের অতিরিক্তই আছে! কিন্তু কি হোল রূপ নিয়ে। ছাই রূপ। হয়ত এত রূপ না থাকলে আজ এ দশা ঘটবার সুযোগ আসতো না আমার জীবনে।

সত্যব্রত বুঝতে পারছেন সুচরিতা আবেগে জ্ঞান হারিয়েছে। তার মুখ-চোখ অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে যেন। চোখের দৃষ্টিতে আর সে কুণ্ঠা নেই। নিজের মধ্যে কোথা থেকে জোর পেয়েছে যেন সে।

মিঃ সেন।

বলুন!

আপনি আমায় কি ভাবছেন।

এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পায় যেন সে।

না না ? মৃদু প্রতিবাদ করেন সত্যব্রত !

আপনি ভাবুন। তাতে আমার লজ্জা নেই। আচ্ছা, মিঃ সেন। একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

বলুন !

আমি শিল্পী। আমি অভিনেত্রী। কিন্তু আমি তো মানুষ। আজকের যুগেও কি প্রাণভরে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারব না ? সে অধিকার কি আমার নেই।

কেন থাকবে না ?

ধীরে ধীরে বললেন সত্যব্রত। শুধু আপনার কেন ? প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার—শুধু বেঁচে কেন বলবো, ভাল করে মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর সে কথাই তো সর্বক্ষণ আমি বলি। এই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার।

বক্তা সত্যব্রত উপস্থিত হন যেন। আর তত বেশি মুগ্ধ হয় যেন সুচরিতা। সত্যব্রতর এই রূপ তাকে বিমুগ্ধ করে রাখে।

উৎসুক আশায় তাকিয়ে থাকে সে সত্যব্রতর দিকে। এমন লোকের পায়েই কি সব কিছু লুটিয়ে দেওয়া যায় না ? বাইশ বছর বয়সে পঞ্চান্ন বছরের খোকা মিত্তিরের সঙ্গে সুখের অভিনয় করার নরকবাস থেকে এমন স্বর্গে সে কি কোনদিনই পৌঁছুতে পারবে না ?

কিন্তু তাও তো সম্ভব। এই তো, ইনি তো সে কথাই বলছেন।

আশায় ভরে উঠল সুচরিতার বুক। তা হলে আমাকেও সে ভাবে বাঁচতে সাহায্য করুন মিঃ সেন। আপনি···

মিস ঘোষ।

গম্ভীর গলায় ডাক দিলেন সত্যব্রত। আমার সাহায্যের হাত সর্বদাই আপনার জন্য প্রসারিত রইল জানবেন।

সত্যি !

একেবারে সত্যি। এটুকু জানবেন।

সুচরিতার চোখে জল এসে গেছে। তা হলে আপনি পারবেন আমায় বিয়ে করে এ নরক থেকে উদ্ধার করতে ?

প্রায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুচরিতা। আর সমস্ত হাত-পা প্রায় কাঁপতে থাকে সত্যব্রতর।

মাত্র তিন বছর আগেও সেই গলির নোংরা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে তক্তপোষের ওপর শুয়ে দিনের পর দিন তিনি যখন টাকার ভাবনায় বিনিদ্র রাতগুলো কাটিয়েছেন তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছেন সুচরিতার মত মেয়ে সমস্ত বাংলা যার জন্য পাগল···নিজে উপযাচিকা হয়ে সে আসবে তার কাছে ? তাকে অনুরোধ করবে, বিয়ে করে তাকে উদ্ধার করতে কৃতার্থ করতে।

সব যেন কি রকম গুলিয়ে যেতে লাগল সত্যব্রতর। তিনি কিছু ভাবতে পারছেন না। সমানে কেঁদে চলেছে সুচরিতা তখনও।

আপনি বসুন, আমি আসছি।···এখনও চা কেন দিল না।

না আপনি বসুন। আমি এবার যাব।

ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে সুচরিতা চোখ মুছল। রুমালের সুগন্ধ সারা ঘরে একটা মৃদু সৌরভ ছড়াল। ফ্রেঞ্চ পারফিউম ছাড়া সুচরিতা মাখে না। দামী পারফিউমের গন্ধ আবার আবিষ্ট করল সত্যব্রতকে। উনি কিছু না বলে শুধু স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলেন।

উঠে দাঁড়াল সুচরিতা। সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতও।

আলগা ভাবে তার ম্যানিকিওর করা ফর্সা আঙুলগুলো দিয়ে উড়ে আসা চুলগুলো একবার সরিয়ে দিল সুচরিতা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে ওঠবার সময় এগিয়ে এসে সত্যব্রত গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

ড্রাইভার বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওদের দেখে সোজা হয়ে বসে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রাখল প্রস্তুতির ভঙ্গিতে।

বৃষ্টি অনেক থেমে এসেছে। রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। অন্ধকারে রাস্তার বাতিগুলো অল্প আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়ির কাছে সরে দাঁড়ালেন সত্যব্রত। তারপর সুচরিতার জলভরা চোখের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে দরজায় রাখা তার কম্পিত হাতের ওপর নিজেরও কম্পিত হাত দিয়ে ইষৎ চাপ দিলেন তিনি।

সে স্পর্শে কি ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু সুচরিতা বোধ হয় একটু আশ্বস্ত হল।

পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যেই, স্টুডিও মহলে সকলে জেনে গেল বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যব্রত সেন সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী সুচরিতা ঘোষকে বিয়ে করছেন সামনের ৭ই শ্রাবণ।

কিন্তু সত্যব্রতর বাড়িতে এজন্য কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

যেমন নীরবে যন্ত্রের মত নীচের বাড়ির দিন কাটে তেমনি কাটতে লাগল। শুধু ছোট সাতবছরের ছেলেটা মাঝে মাঝে অকারণে লাফিয়ে বেড়াল আর ধমক খেয়ে পরক্ষণেই মুখ চুণ করে ঝিম মেরে বসে থাকল।

অবশ্য গাড়ি আসার বিরাম হোল না।

শুধু সুচরিতাকে ক'দিন এ বাড়ির সান্ধ্য আসরে দেখা গেল না। শোনা গেল না তার গলার গান, আর কখনও কখনও হাল্কা গলায় হাসি।

ওপরের ইলা বৃথাই তাদের ঘরা বারান্দায় ঝিলিমিলিতে চোখ রেখে রেখে নীরস সন্ধ্যাবেলাগুলো কাটাল। তার আকাঙ্ক্ষিত নায়িকার অদর্শনে তার প্রাণটাই শুধু হাঁফিয়ে উঠল।

সেদিন সকালবেলা দু'টি মেয়েলি গলার উচ্ছ্বসিত চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল সত্যব্রতর।

ব্যাপার কি ?—ড্রেসিং-গাউনটা গায়ের ওপর জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

পিসিমার ঘরে এসে যাকে দেখতে পেলেন, তাকে দেখে চম্‌কে গেলেন তিনি। চমকাবারই কথা, ও যে আবার কোনদিন তাঁর বাড়িতে পা দেবে, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

দাদা!—ছুটে এসে পায়ের ধূলো নিয়ে সত্যব্রতর বুকে মাথা রাখল সবিতা, তাঁর ছোট বোন।

কি খবর ?

নিজের মনোভাব গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন সত্যব্রত। সত্যিই খুশি হয়েছেন তিনি—বহুদিন বাদে সবিতাকে দেখে অবাকও কম নন।

আর পারলাম না দাদা, তোমার কাছে আমায় আসতেই হোল।

আসবিই তো মা।—পিসিমা চোখ মুছতে মুছতে বললেন।

তোরা এক বোঁটায় দু'টি ফুল ছিলি আলাদা থাকা আর কতদিন সম্ভব বল মা।

কোন কথা বলল না সবিতা, পিসিমার কথায় আরও ফোঁপাতে লাগল। আর ওর মাথায় সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন সত্যব্রত।

আয় আমার ঘরে আয়। কথা আছে।

আমারও কথা আছে দাদা—অনেক কথা। তাই তো তোমার কাছে এসেছি দাদা।

আয়।

ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা সুচরিতার বড় ছাবটার দিকে একবার তাকাল সবিতা, তারপর প্রথমেই বলল, দাদা।

কি বল।

দাদা গো!

বল না!

বল, রাগ করবে না।

রাগ করবার কথা না হলে রাগ করবো কেন ?

হয়ত তোমার কাছে কথাটা রাগ করবারই মনে হবে। কিন্তু আমায় তো বলতেই হবে দাদা!

বল না,...বলছি তো।

দাদা! তুমি নাকি অভিনেত্রী সুচরিতাকে বিয়ে করছ ? এ কি সত্যি ?

সত্যি না হওয়ার বাধা কি ?

কি বলছ দাদা!

ঠিকই বলছি।

না দাদা।

কেন ?

এ কি করে সম্ভব ?

সম্ভব নয় কেন ? সত্যব্রত গম্ভীর হলেন।

উচিত নয় বলে। চোখ মুছে সোজা হয়ে গেল সবিতা।

যা উচিত সকলেই কি তাই করে ?

চেষ্টা করে অন্তত।

সকলে নয়।

কেন ?

তুই করেছিলি ?

আমি তো অনুচিত কোন কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না!

তাই হয় সবিতা!

তার মানে ?

মানে আর কিছুই নয়। যখন যে যা করে তা যদি তার স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে সেটাকেই সে ঔচিত্যের মাপকাঠি বলে মেনে নেয় নিজের সুবিধার জন্য।

কিন্তু দাদা! সুচরিতার কথা কে না জানে?

অভিনেত্রী বলে ? সেটা তো শিল্প!

শুধু অভিনেত্রী নয় দাদা তা তুমি ভালই জান

জানি! জানি বলেই তো এটাও বিশ্বাস করি যে সেটুকু সুচরিতার অতীত।

হোক অতীত তা তো সুচরিতারই এ জীবনের। সব লোক জানে দাদা। সকলে জানে!

জানুক না। সবই তো অতীত! সবিতা আমি ভালবাসি বর্তমানকে। মৃত অতীত নিয়ে আঁকড়ে থাকার লোক আমি নই।

কোন কথা বলল না সবিতা কিছুক্ষণ। সে তার দাদাকে জানে। একবার মনস্থির করলে তার আর নড়চড় হবে না।

আজ এখানেই থাকবি তো? পিসিমাকে বলে দে।

হঠাৎ চোখে জল এসে গেল সবিতার। দাদা তাকে সত্যিই ভালবাসে তা হলে। এখনও কি দাদা তাকে চায়? আজও? একেবারে জন্মের মত দূরে ঠেলে ফেলে নি?

কিন্তু পরক্ষণেই বুকভরা অভিমান নিয়ে মনকে আবার শক্ত করল সে।

কই দাদা তো তাকে একবারও কুশল প্রশ্ন করল না। এতদিন বাদে দেখা কিন্তু এমন সহজভাবে কথা বলছে দাদা যেন রোজকার নিয়মিত ব্যাপারই ঘটছে। কোন ভাবান্তর হয় নি তো দাদার। সে তো পারে নি। কতখানি আবেগ নিয়ে সে ছুটে এসেছে, কত কষ্টে সে নিজের হৃদয়াবেগকে সংযমিত করছে তার কি জানে দাদা?

চোখের জলটা মুছে ফেলবার চেষ্টা করল সবিতা।

দাদা!

বল! সত্যব্রত আলমারি খুলে কি একটা বার করবার চেষ্টা করলেন।

দাদা! তুমি কত বদলে গেছ—

তাই নাকি? নিস্পৃহ গলায় উত্তর এল।

হঠাৎ সবিতার মনে হল বদলায় নি। তার এমনি নিষ্ঠুর দাদাকেই সে চেনে, তাকে যে দাদা সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসত ঠিকই, কিন্তু তার ভেতরও কোথায় একটা সীমারেখা ছিল। চিরদিন থাকবে সে রেখা। কোনদিন তাকে মোছা যাবে না। সবিতার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সে সরু রেখা বিরাট প্রাচীরের মত হয়ে দু'জনের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করেছিল। সে প্রাচীর ভেদ করবে ভেবেই আজ সবিতা নিজে থেকে অযাচিত হ'য়েও এসে দাঁড়িয়েছে।

কি রে? হঠাৎ ওর দিকে ফিরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন সত্যব্রত। কি ভাবছিস?

কিছু না।

শোন্, তোকে দেব বলে একটা জিনিষ বহুদিন ধরে রেখে দিয়েছি।

একটা ছোট বাক্স আলমারি থেকে নিয়ে সত্যব্রত এগিয়ে এলেন।

দাদা, তুমি কি ভাল!

বাক্সটা খুলে তার মধ্যে জড়োয়া দুলটা দেখে খুশিতে দু' চোখ ভরে উঠল সবিতার।

জান দাদা! আমার সঙ্গে অনেকের এই নিয়ে ঝগড়া হয়েছে।

কি নিয়ে?

সকলে হাজার বললেও আমি জানি আমার কথা তুমি ঠেলতে পারবে না। যদি জানতে দাদা কত আশা নিয়ে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম। আমি শুনেই ভেবেছি অন্তত যদি আমি···

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গম্ভীরভাবে সত্যব্রত বললেন, নিজের মূল্যটা একটু বেশি দিয়ে ফেলেছিস তুই।

দাদা! প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সবিতা। আমি যাই। আজ জানলাম রাগ করে শুধু বলেই ক্ষান্ত হও নি আমাকে তুমি, তোমার মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলে দিয়েছ চিরদিনের জন্য, চিরকালের জন্য!···

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বাক্সটা ছুড়ে দিয়ে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল সবিতা।

সত্যব্রত লক্ষ্য করলেন, সবিতা একটা সাধারণ শাড়ি পরে এসেছিল।

বাক্সটার দিকে এক লহমা তাকিয়ে ওটা উঠিয়ে ফের আলমারিতে রেখে দিলেন তিনি।

ওপরের ইলার পক্ষে আর পারা সম্ভব হল না।

অজস্র সিনেমা-পত্রিকা, কাগজে দেখছে, খবর পাচ্ছে সত্যব্রত সেনের সঙ্গে সুচরিতার বিয়ের, অথচ ব্যাপার কি? নীচের বাড়িতে তো কোন আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম একটা উৎকণ্ঠায় থাকা সম্ভব নাকি? বিশেষ করে এমন একজনের বিয়ে যখন। যে সে নয়, সারা বাংলার বিস্ময় শ্রীমতী সুচরিতা ঘোষের।

অবশেষে মরিয়া হয়ে ডেকেই ফেলল একদিন সে ছোট ছেলেটাকে, এই খোকা শোন!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ওদের বাড়ির দরজার কাছে এসে ডাকল ইলা।

কাকে ডাকছ? আমাকে?

তা নয় তো কাকে?

আমার নাম কি খোকা?

কি তা হলে?

শ্রীমান টুলটুল।

আচ্ছা শ্রীমান টুলটুল, এস না; চল না আমাদের ওপরে। অনেক ভাল খেলনা আছে জান?

মামা যে বকবে!

কেন?

বাঃ রে, তাও জান না। মামা যে কোথাও যেতে বারণ করেছে, কারও সঙ্গে কথা বলতেও বারণ করেছে।

ওঃ, উনি বুঝি তোমার মামা হন?

হ্যাঁ, তাও জান না? কি গো তুমি?

কি করবো বল? কেউ তো বলে দেয় নি। আজ জানলাম তোমার কাছে। তোমার মামা এখন কোথায়?

মামা যে গেছে নতুন মামীর বাড়ি! মামার যে বিয়ে।

প্রায় ফিসফিস করে মুখের কাছে সরে এসে বলল টুলটুল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ জান না? মামার তো পরশুই বিয়ে।

পরশু?

হ্যাঁ, আর···

কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল টুলটুল। হঠাৎ মুখটা ম্লান করে চুপ করে গেল। আর আগ্রহে জ্বলজ্বল করে উঠল ইলার মুখ।

কার সঙ্গে বিয়ে টুলটুল?

জান না?

ইলার এ হেন অজ্ঞতায় আবার অবাক হল টুলটুল। আবার সে

ভাল জিনিস—দেখতে ভাল—চলে নিখুঁত

ন্যাশনাল একো রেডিও

ন্যাশনাল-একো কেবল একটা বাজার-চলতি নাম নয়—বরাবর যা শুনে তৃপ্তি পাবেন ন্যাশনাল-একো তার গ্যারান্টি। দাম বেশী নয়। দেখতেও চমৎকার। কাছাকাছি কোনো ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বললে বিনা খরচে আজই আপনি বাজিয়ে দেখে শুনে নিতে পারেন।

মডেল এ-৭৭৯

৬ ভাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড। এ সি কারেন্টে চলে। সুন্দর ভেনীয়ার ক্যাবিনেট।
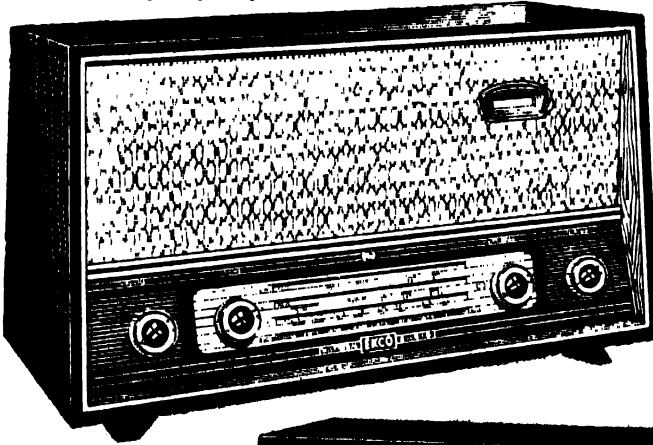
মডেল বি-৭৭৯

৪ ভাল্ভ, সঙ্গে ড্রাই ব্যাটারিতে চালানোর ৩ ট্রানজিষ্টার।

দাম: ৩৯৫৲ টাকা

মডেল ইউ-৭৫৫

৬ ভাল্ভ, ৩ ব্যাণ্ড, এসি/ডিসি

দাম: ৩৭৫৲ টাকা

নতুন 'হাই-ফাই' মডেল এ-৭৮৯

৬ ভাল্ভ, ৮ ব্যাণ্ড, এ সি রিসিভার, স্বচ্ছ স্বরবিস্তারের জন্যে ২ টি হাই-ফাইডেলিটি স্পীকার। নিখুঁত টিউনিং-এর জন্যে ইলেক্ট্রন বীম ইণ্ডিকেটার এবং সহজে শর্ট ওয়েভ ধরার জন্যে 'ম্যাগনিব্যাণ্ড' টিউনিং, কাঠের সুন্দর চকচকে ক্যাবিনেট।

দাম: ৬৬৭৲ টাকা
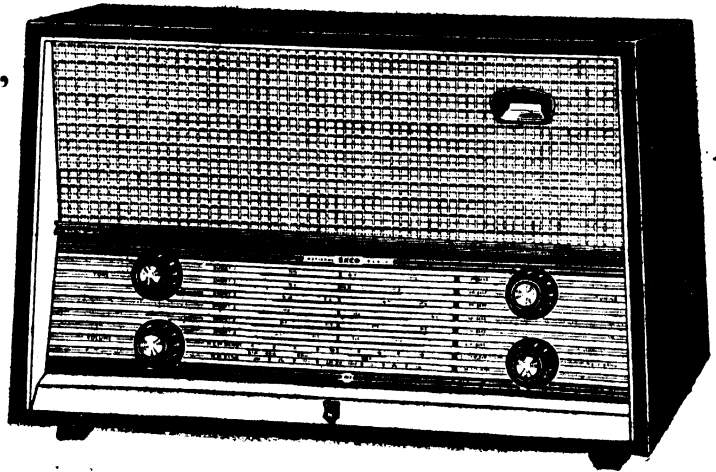
সব মুল্য উৎপাদন শুল্ক সমেত; অন্যান্য কর আলাদা

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ লিমিটেড

কলিকাতা . বোম্বাই . মাদ্রাজ . দিল্লী . বাঙ্গালোর . সেকেন্দ্রাবাদ . পাটনা

১২ রকমের মনোমুগ্ধকর ন্যাশনাল একো রেডিও ১২৫৲ টাকা ও তদুর্ধ্ব দামে পাবেন

ভুলে গেল মামার নিষেধ। কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলবার ভঙ্গিতে বলল টুলটুল।

তুমি কাউকে বলে দেবে না তো?

না না পাগল।

দেখ। দিদিমা বলেছে মামা তা হলে ভারী রাগ করবে।

না না আমি কাউকে বলব না তুমি আমায় বল না।

ঐ যে সুন্দর করে ফর্সা করে,—কেমন পরীর মত একজন আসে না? তার সঙ্গেই তো!

কে আবার পরীর মত?

কেন তুমি দেখ নি? আমি তো রোজ রোজ দেখি!

এখনও রোজ আসে? কই আমি তো দেখি না।

আসে তো। রোজই আসে।

আমাকে দেখাও না, টুলটুল লক্ষ্মীটি।

রোজ বিকেলেই তো আসে, মামার সঙ্গে বেড়াতে যায়।

ভাবতে চেষ্টা করল ইলা কখন আসে। তাহলে কি অন্য গাড়িতে? সে তো বুঝতেও পারে না কোনদিন।

আচ্ছা টুলটুল।

বল না!

আমায় দেখাবে?

হুঁ—লম্বা করে ঘাড় নাড়ল টুলটুল।

কি করে ডাকবে আমায়?

কেন নতুন মামী এলেই আমি তোমায় 'কু' ক'রে শব্দ করবো, তখন অমনি তুমি চলে এস। কেমন?

নিশ্চয়ই। ও মা তোমার তো খব বুদ্ধি। আচ্ছা, তুমি শব্দ করতে ভুলে যাবে না তো?

আমি অত ভুলি না। জান, আমার দিদিমা কি বলে আমায়?

কি বলেন?

দিদিমা বলে টুলটুল তোর এত সব মনে থাকে কি করে? আমি কি বলি জান?

কি বল?

আমি বলি আমি সেসব মনে রাখি, তাই মনে থাকে। আর দিদিমা খালি হাসে।

ইলাও হেসে উঠল। টুলটুলের নরম তুলতুলে ফোলা ফোলা গাল দু'টো টিপে দিয়ে বলল, আচ্ছা, আজ যাই। তুমি ঠিক ডেকো কিন্তু। দেখব, আজ তোমার কেমন মনে থাকে।

বিকেল পাঁচটার আগেই গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ইলা অপেক্ষা করতে লাগল।

খবরটা শোনা অবধি সে ছটফট করছে। টুলটুল ছোট ছেলে ও যদি ভুলে যায়। তাকে তবু দেখতেই হবে, সব গাড়িগুলোই লক্ষ্য করবে সে।

অসম্ভব উত্তেজনা লাগছে। সুচরিতা আসবে, তাকে ইলা দেখতে পাবে। সুচরিতা।

সন্ধ্যার কিছু পরেই সুচরিতা এল। আজ সুচরিতা আশ্চর্যসুন্দর সেজেছে। অবশ্য বরাবরই বেশি জমকালো পোষাক-পরা তার অভ্যাস। সিনেমার পর্দায় ছাড়া ইলা তাকে কখনও দেখে নি। সেজন্য অবাক হয়ে গেল সে।

কি সাংঘাতিক দামী বেনারসী শাড়ি পরেছে। আর কি অজস্র আভরণ। পর্দার শ্রেষ্ঠতমা নায়িকা সুচরিতা আজ তার চোখের সামনে। গাড়ি থেকে নামবার সময় অল্প সময়ের জন্য তাকে দেখা গেল। ফর্সা পায়ে সবুজ ভেলভেটের চটি সবুজ বেনারসীর সঙ্গে ম্যাচ করে।

আলগা পা ফেলে গাড়ি থেকে নেমে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল সুচরিতা। তার গাঢ় সবুজ বেনারসীর বিরাট জরিদার আঁচল হাওয়ায় উড়ছিল। মাথায় সযত্নরচিত খোঁপা ঘিরে মোটা বেলফুলের গোড়ে মালা; ইলার মনে হল সব মিলিয়ে সুচরিতাকে যেন ঠিক থিয়েটারের রাণীর মত দেখাচ্ছিল।

চট করে একবার নিজের চেহারাটাও আয়নায় দেখে নিল ইলা।

ঘরের মধ্যে এসে সোফার ওপর হাল্কাভাবে গা ঢেলে বসল সুচরিতা। যেন সে কত ক্লান্ত। তারপর মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সত্যব্রতকে বলল, কি দেখছেন অমন করে?

তোমাকে?

যান···

লজ্জা পেল সুচরিতা। তারপর সে ভাবটা কাটাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, জানেন, আমার একটা বিপদ হয়েছে।

কি বিপদ?

ওর পাশে ঘন হয়ে বসতে বসতে বললেন সত্যব্রত।

আপনি তো জানেন গত চারমাস ধরে আমি গোল্ডেন ডিস্ট্রিবিউটার্সদের 'মায়াকানন' ছবিতে আছি।

তা তো জানি। কবে শেষ হবে সেটা?

এতদিনে তো শেষ হবার কথা, কিন্তু বই শেষ হবার তো কোন আশা দেখছি না।

কেন?

যা মনে হয় এখনও ওদের মাস তিনেকের কাজ বাকী আছে। অবশ্য আমার অসুখের জন্যই দেরী হয়েছিল লেখাপড়া করা আছে তো?

তবে আর কি? ওদের উকিলের চিঠি দাও।

গম্ভীর গলায় কথাটা বলে ওর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিলেন সত্যব্রত। ইতিমধ্যেই ওঁর গলায় অধিকারের জোর যেন এসে গিয়েছে।

তা হলে তো কথাই ছিল না।

কেন তাতে অসুবিধে কি?

একটা মুস্কিল আছে যে?

কিসের মুস্কিল?

ওদের সঙ্গে কনট্র্যাক্ট করবার সময় সর্ত ছিল ছ'মাসের। পেমেণ্টও সে ভাবে হয়েছিল। অর্থাৎ বই শেষ হলে বাকী অর্ধেক। তখন তো একবারও ভাবি নি যে···

মুখ নীচু করল সুচরিতা।

সে রকম সর্তে রাজি হওয়া অন্যায় হ'য়েছিল নিশ্চয়ই।

টাকার অঙ্কটা লোভনীয় ছিল তাই!

কত ?

পঞ্চাশ হাজার।

চমকে উঠলেন সত্যব্রত। সামনে শুধু সুন্দরী মহিলা নয়, তাঁর ভাবী পত্নী। তবু এ কথাটা তিনি মুহূর্তের মধ্যে না ভেবে পারলেন না, হয় তো সে টাকার সবটাই খরচ হয়ে যায় নি, হয় তো বাকী পঁচিশ হাজারও রক্ষা করা যায়। কথার পিঠে কথা বলাই তাঁর অভ্যাস তবু যেন কেমন আনমনা হ'য়ে গেলেন তিনি।

তাঁকে নিরুত্তর দেখে সুচরিতা একটু হেসে ওঁর হাতে চাপ দিয়ে বলল, আমার কিন্তু এখন ওসব টাকার কথা ভাবতে ভাল লাগছে না। কি হবে ও সবে ?

না না বোকামি ক'রে টাকাটা হাতছাড়া করা উচিত নয়।

বারে, তাই বলে···

ওর কথা শেষ হ'তে না দিয়ে সত্যব্রত একটু গম্ভীর হয়ে বললেন।

কতদিন আর লাগবে স্যুটিং শেষ হ'তে ?

ওঁরা তো বলছেন রেগুলার স্যুটিং করলে ছ'মাসের কমে হয়ে যাবে।

তা···

কথাটা শেষ করতে দ্বিধা করলেন সত্যব্রত। কিন্তু না।···বিয়ের পর আর ওসবে ইচ্ছে নেই আমার। ওসব আর নয়। জানেন তো সকাল থেকে রাত অবধি স্যুটিং, কোনদিন রাতেও স্যুটিং করবার মত মনের অবস্থা আমার নয়।

তা হলে দরকার নেই।

ওর হাতটা গভীরভাবে নিজের দিকে টেনে নিলেন সত্যব্রত।

ঘনকাল চোখ তুলে সত্যব্রতর দিকে তাকাল সুচরিতা। সে দৃষ্টিতে যেন রাজপুত ছবির আয়ত আঁখির বিহ্বলতা। সত্যব্রতর মনে এক দুরন্ত ক্ষুধাকে যেন জাগিয়ে তুলল সে দৃষ্টি। কিন্তু কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করলেন তিনি। কোথাও তাঁর অসংযম নেই। সব মাপা।

সত্যব্রতর দিকে তাকিয়ে দেখল সুচরিতা। চাপা ঠোঁটে দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। সত্যব্রতর বয়স হয়েছে। কিন্তু তা হোক, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির ছাপে সে মুখ জলজ্বল করছে। সুচরিতা আশ্বস্ত হল। কিন্তু·· কিন্তু একটা কথা।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে দিলেন সত্যব্রত।

কি বলুন !

আচ্ছা। ওরা যদি ছেড়ে দেয় তাহলে ওদের তো একটা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তা তো হবেই ?

সেটা তো অসম্ভব বলেই মনে হয় আমার। আচ্ছা কত টাকা আছে তোমার এ্যাকাউন্টে ?

প্রশ্নটা অত্যন্ত খারাপ লাগলেও ধীরে ধীরে সুচরিতা বলল, পঁচাত্তর হাজারের কিছু বেশি।

তবে এক লাখও নয়।

মনে মনে কি যেন ভাবলেন সত্যব্রত। তার থেকে অন্তত চল্লিশ হাজার তো দিতেই হবে কি বল ?

ভাবনার ছাপ পড়ল তাঁর কপালে

তা তো বটেই। বেশিও হ'তে পারে।

হঠাৎ নজরে পড়ল টুলটুল কখন যেন ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। একটু সরে বসে হঠাৎ সজোরে ধমকে উঠলেন, তুমি এ ঘরে কেন টুলটুল ? তোমাকে বলেছি না বাইরের ঘরে থাকবে না ?

বারে আমি তো জামা পরে আছি। আমি তো খালি গায়ে নেই ?

হোক্, তুমি ভেতরে যাও, যাও ··

থাক না ও।

টুলটুলকে কাছে টানল সুচরিতা। অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে সত্যব্রতকে। ওর ব্যক্তিত্বে আরও বেশি মুগ্ধ হল সুচরিতা। কি প্রখর ব্যক্তিত্ব এঁর, কি দৃঢ়তা !

ওকে ছেড়ে দাও, ওর এখন খাবার সময়।

যদিও এখন খাবে না, তবু টুলটুল মামার অভিপ্রায় বুঝে ধীরে ধীরে নিজেকে সুচরিতার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ ধরেই ঘরে একটা বিরাট স্তব্ধতা জমাট বেঁধে রইল যেন। বার বার টুলটুলের ম্লান মুখখানা সুচরিতার মনে পড়তে লাগল।

এ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গা দরকার।

কি বলবে সে ? কত প্রিয় সম্ভাষণের আশায় সারা দিনটিই তার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু যা ভেবেছিল তা যেন হ'ল না। বাজে টাকাকড়ির কথায় কি বাজে সময় নষ্ট করল। না তুললেই হোত কথাটা। কেন যে ও নিজে থেকেই আরম্ভ করল অমন একটা বিদঘুটে প্রসঙ্গ, সমস্ত মাধুর্য যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগল।

হাওয়ায় উড়ছে ঘরের টেবিলক্লথ আর নেটের ছোট ছোট পর্দাগুলো। সুচরিতার রুক্ষ চুলে চোখে-মুখে-কপালে উড়ে এসে পড়ছে।

কোণে রাখা ধূপদানিতে প্রায় শেষ হয়ে আসা ধূপকাঠির সৌরভ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে মিশে গেছে সুচরিতার ব্যবহৃত দামী ফ্রেঞ্চ পারফিউমের সুগন্ধ।

ধূপের কুণ্ডলী পাকান ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন হয়ে গেল মনটা সুচরিতার। একবার তাকাল সত্যব্রতর দিকে। তেমনি বসে কি ভাবছেন। মোটা মোটা বলিষ্ঠ দু'হাত পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। বুকের কাছটায় পাঞ্জাবীর খোলা জায়গাটা দিয়ে লোমশ বলিষ্ঠ বুকের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ যেন সুচরিতার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার ইচ্ছে হল। কিন্তু দাঁতে ঠোঁট চেপে একটা দুরন্ত আবেগকে সংযত করবার প্রয়াস করল সুচরিতা।

ওর দিকে সোজা তাকালেন সত্যব্রত।

ভারী গলায় ডাকলেন, রীতা !

বুক কেঁপে উঠল সুচরিতার। সে বহু প্রেমের অভিনয় করেছে-বহুকাল বহু লোককে প্রিয়তম ডেকে নকল প্রেমের আস্বাদনে তৃপ্ত থেকে আসল প্রেম বলে নিজের মনকে ভুলিয়েছে, কিন্তু একান্ত প্রিয়জনের এ আহ্বান কি আগে সে শুনেছে ? এর জন্য সে যেন বহু কাল থেকে নিজেকে প্রস্তুত করছে।

এ আহ্বান আপন জনের। দু'দিন বাদে যার থেকে বেশি

আপন আর কেউ হবে না। তার রিক্ত জীবনে সব পূর্ণতার আস্বাদন এনে দেবে যে প্রিয়জন। এ তারই ডাক।

কোন কথা নয়, কেবল ডাকটি প্রাণের ভেতর উপলব্ধি করা। কেবল হৃদয়ানুভূতির উত্তাপটুকুকে পরস্পরের ভেতর সঞ্চারিত করা। কেবল চুপ করে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করা। এই তো সে চেয়েছিল। 'এতদিন যে বসেছিলেম।'·····মনে মনে ভাবল সুচরিতা।

ওর ঘন কালো চোখ তুলে নিবিড় ভাবে সে তাকাল সত্যব্রতর দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত সোজা হয়ে বসে ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন।

শোন রীতা।

বলুন।

শোন ভেবে দেখলাম, তোমাকে ঐ ক্ষতিপূরণ বিষয়ে একটা কাজ করতে হবে। এতক্ষণ ভেবে ভেবে আমি একটা উপায় স্থির করেছি।

সেতারের সব তারগুলো বাজতে বাজতে বিশ্রী একটা শব্দ করে যেন ছিঁড়ে গেল। কাজ. উপায়।

তা হলে নেহাৎই বৈষয়িক বিষয় ভাবছিলেন সত্যব্রত?

পরক্ষণেই মনে হ'ল ঠিকই তো সুচরিতার সব মঙ্গল চিন্তা যে এখন থেকে সত্যব্রতরই। নিজের কাছেই লজ্জা পেল সুচরিতা।

আচ্ছা রীতা। বইয়ের প্রডিউসারদের মধ্যে তো মিত্তিরমশাইও একজন না?

হ্যাঁ সেই জন্যই তো ভয়।

কেন?

তিনি এত লজ্জাকর ভাবে ভেঙে পড়ে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন যে বলতে পারি না। অথচ এই সব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়েই আমার জীবনে এত বড় অশান্তি আর অপমান আমি টেনে এনেছি।

কিন্তু রীতা। বি প্র্যাক্‌টিক্যাল।

কি ভাবে?

এই খোকা মিত্তিরকেই তোমায় কাজে লাগাতে হবে, তোমাকে—

না না—প্লিজ—ওঁর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুচরিতা।

সম্পর্ক রাখ, তবে তা নেহাৎই কাজের ও স্বার্থের জন্যে।

তা হয় না, প্লিজ।···আপনি জানেন না···

আমি জানি, তবু··

না আপনি জানেন না এই সব লোকগুলো কি জাতের। কখনও শুধু হাতে কিছু দেবে না, হাতে হাতে প্রতিদান চায়···

এত ভাবনা কেন রীতা? আমি তো আছি।

ওর একান্ত কাছে সরে এসে ওর দুটো হাত নিজের হাতে তুলে নেন সত্যব্রত। তারপর একহাত দিয়ে ওকে আলিঙ্গভাবে কাছে টানেন তিনি। ওঁর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে কেমন যেন ভীরু পাখির মত অসহায় লাগে সুচরিতাকে।

ওঁর বুকে মাথা রেখে সত্যই মনে জোর পেল সুচরিতা।

সত্যিই তো তার কিসের ভয়? আজ তো একা নয়। তার ভাবী স্বামীই তো তার পাশে।

ওর মাথাটায় একটু সস্নেহ চাপ দেন সত্যব্রত, তারপর বলেন, আচ্ছা আজ আর সে সব কথা নয়, পরে হবে। কি বল? চল বেড়িয়ে আসি।

[আগামী সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্ব]

বেঁচে থাকা

সুধীর বেরা

আমৃত্যু বাঁচার চেষ্টাই
বেঁচে থাকা।
তার বিরতিই মৃত্যু।
মৃত্যু দেহান্তর—বলে শাস্ত্র,
মৃত্যু রূপান্তর—বলে বিজ্ঞান,
মৃত্যু জন্মান্তরের দ্বার—
বিশ্বাসীরা ভাবে।
জীবনের অভাবই কিন্তু মৃত্যু—
বাঁচার চেষ্টার অবসান।

চলমান জীবনের
গতির সঙ্গে
গতি মিলিয়ে চলা।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলে—
সূর্য তারা লক্ষ কোটি,
চলে অণু, চলে পরমাণু—
জীবন চলার ছন্দে বাঁধা—
সে চলার শেষই মৃত্যু।
স্থিতিই মৃত্যু—
গতিই জীবন।

ক্ষণ থেকে ক্ষণে
যুগ থেকে যুগে
স্থিতি থেকে স্থিতিতে
এই গতিই জীবন।
এই বেঁচে থাকা।

ফতেপুর সিক্রী

—নীরদ রায়

মাসিক বসুমতী

ফাল্গুন / '৭০

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প
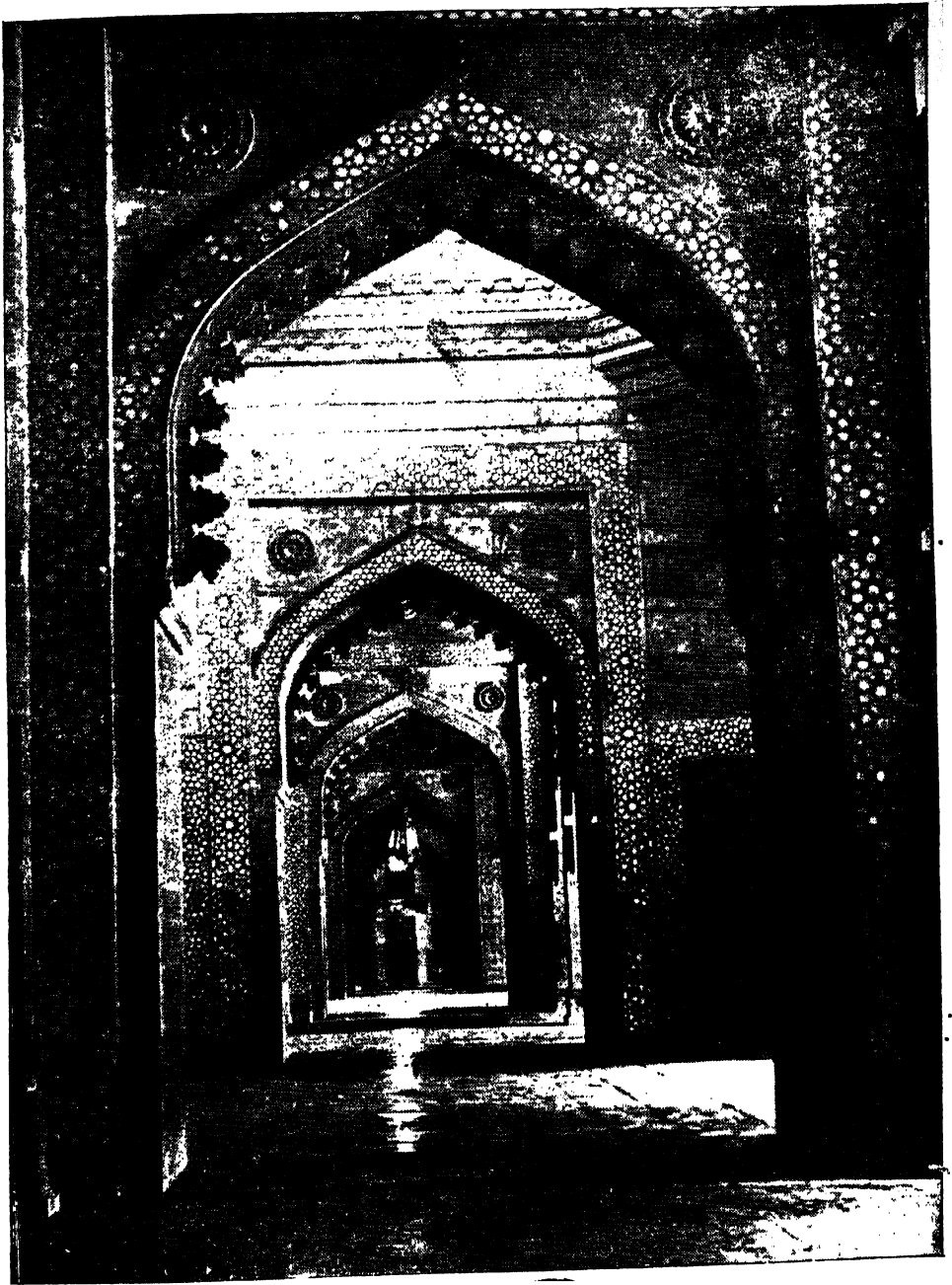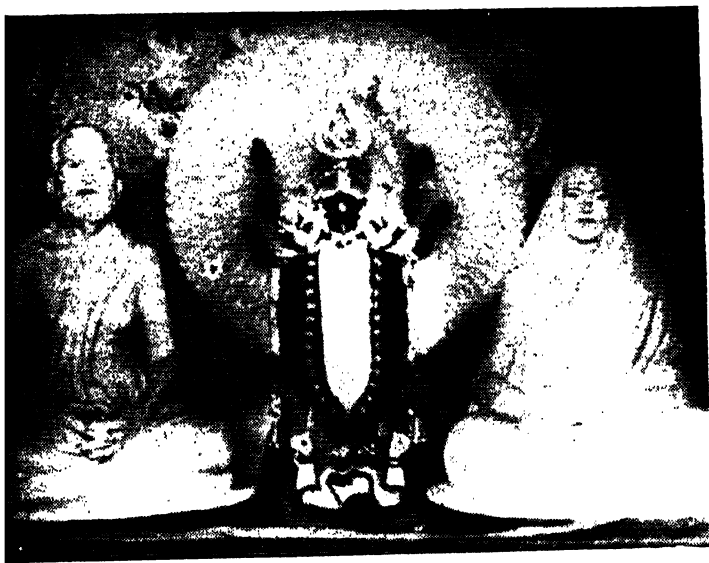
—সতীশচন্দ্র সেন

মাসিক বসুমতী
ফাল্গুন / '৭০
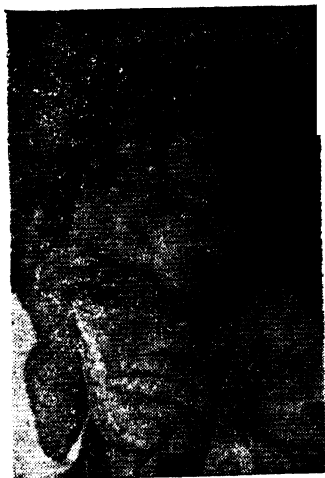
—সুধীর চট্টোপাধ্যায়

॥ শিশু-দুনিয়া ॥

—বিশ্বজিৎ সেন

—পরিতোষ বিশ্বাস

—দেবু দাস

সহর থেকে দূরে

—সত্যরঞ্জন ঘোষ

নিতকনে

—চন্দনা বক্সী

শার্দূল

—জয়া মিত্র
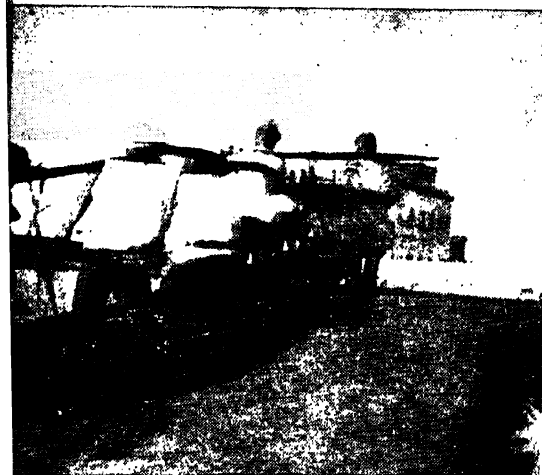
আলোছায়া

—কান্টু ভট্টাচার্য

ও

—পি জি দাস

খুকুমণি

—জয়শ্রী সরকার

মাসিক বসুমতী
ফাল্গুন / '৭০

যোগাযোগ

—কুমার ঘোষ

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

জননী প্রভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক,
বৃহস্পতিবার।

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। ন'দাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহার কি এবার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না?

ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতি-মুহূর্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া? দুঃখে পড়িলে তাঁহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম। এই জন্যেই ত' কুন্তী দেবী বলিয়াছিলেন, 'হে ভগবান! আমাকে সর্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও; তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব; সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখের প্রয়োজন নাই।'

জন্ম-মৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিষ—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে, পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল। জ্ঞান বড়, বড় জিনিষ—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবে না,—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাই না। তর্ক করিতে চাই না—কারণ আমি অজ্ঞ ও অন্ধ। সুতরাং এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস—শুধু 'হরি আছেন' এই বিশ্বাস; আর কিছু চাহি না। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—'ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে'—ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য—বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত করা এবং সদসৎ বিবেচনা শক্তি দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্য সফল হইলে লেখাপড়া সার্থক হইবে। লেখাপড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান। আমি বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাহি না। ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণু বক্ষে ধারণ করিতে চাহি। আর একবার 'দুর্গা' বা একবার 'হরি' বলিলে যাহার ঘর্ম, অশ্রুত্যাগ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার ত' কথাই নাই—সে স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আমরা ত' অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিষ।

আমরা বৃথা 'ধন'-'ধন' বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবি না, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ-প্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত' ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধিরাজরাও দীন

সুভাষচন্দ্র বসু

ভিখারী। এরূপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়।

আমরা 'পরীক্ষা আসিতেছে' বলিয়া ব্যস্ত হই, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, জীবনের প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্মের নিকট। লেখাপড়ার পরীক্ষা কি সামান্য পরীক্ষা—তাহা দুই দিনের জন্য। কিন্তু সেসব পরীক্ষা অন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে(১) ভোগ করিতে হইবে।

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানব-জন্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা এ মহাসত্য বুঝিয়াও বঝি না। আমরা এরূপ অন্ধ, এরূপ অবিশ্বাসী ও এরূপ মূর্খ যে, কিছুতেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। আমরা মানুষ নহি কলিযুগের রাক্ষস।

তবে আমাদের আশা আছে—ভগবান দয়াময়—তিনি চিরকালই দয়াময়। ভীষণ পাপের তাণ্ডবনৃত্যের ভিতরেও তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়ার আদিও নাই অন্তও নাই।

বৈষ্ণবধর্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণবধর্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, 'হে ভগবান রক্ষা কর, এ কলিযুগে আর ধর্ম থাকে না, তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।' তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করেন। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে মাঝে সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় য, এখনও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃপুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।

আপনি কলকাতায় আর কতদিন থাকিবেন! আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি। বাবা ভাল আছেন।

ইতি—
আপনারই সেবক
সুভাষ

কটক,
রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোন পত্র দিই নাই তাই আজ অবসর পাইয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া হস্ত ও লেখনী উভয়কে পবিত্র করিতেছি।

আমার হৃদয়কাননে সময়ে সময়ে যে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহার সহিত চোখের অশ্রুজল মিশাইয়া আপনার চরণকমলে উপহার দিই। কিন্তু সে কুসুমের গন্ধে আপনার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয় না তাহার তীব্রতায় আপনাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা না জানিতে পারায় আমি কতকটা অশান্ত হইয়াছি।

আমার হৃদয়ে সময়ে সময়ে অকালীন মেঘের ন্যায় যে ভাব উদয় হয় তাহা নিকটে কাহাকে বলিব তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দূর দেশে আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি কিরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা জানিলে বড় আনন্দিত হই। কিন্তু আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রীতিকর হউক বা না হউক হৃদয়ের একমাত্র উপহার ভাবিয়া আমি তাহা প্রেরণ করিতে সাহসী হই!

মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের জন্য এত খরচ করিতেছেন—দুইবেলা গাড়ি করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ি ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে চার-পাঁচ বার করিয়া আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন—বস্ত্র পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত রাখিতেছেন—দাসদাসী নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ছাত্রজীবন শেষ করিলে আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রবেশ করিয়া সারাজীবন গাধার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিতে হইবে এবং তৎপরে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রের কোন বিভাগে দেখিলে আপনি সর্বাপেক্ষা সুখী হইবেন? বড় হইলে আমাদিগকে কোন কার্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন—জানি না আপনার মনের ইচ্ছা কি। মা, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যারিষ্টার কিংবা অন্য কোনও বড় হাকিমের গদীতে বসিলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—প্রচুর ধনশালী, গাড়ি, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাসদাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা 'প্রকৃত মানুষ' বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানি না। আপনার পুত্রকে কিরূপ দেখিলে আপনার সর্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। দয়াময় ভগবান আমাদিগকে মানবজন্ম—সুস্থ দেহ-বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ দিয়াছেন—কেন? তাঁহার পূজা এবং তাঁহার সেবারই জন্য অবশ্য তিনি এত দিয়াছেন—কিন্তু মা—আমরা কার্য করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি না। মা, ভাবিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়, ভাবিলে মর্মাহত হইতে হয়—যিনি আমাদের জন্য এত করিতেছেন, যিনি কি সম্পদে বিপদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্বদাই আমাদের বন্ধু, যিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া আছেন—যিনি আমাদের এত নিকটে আছেন—যিনি আমাদের খুব আপনারই জিনিস, আমরা তাঁহাকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকি না। আমরা সংসারের ছার বস্তু লইয়া কত অশ্রু ত্যাগ করি কিন্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশ্যে একবিন্দু অশ্রুও ফেলি না—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিন হৃদয়। ঠিক সেই শিক্ষা যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই—নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না! লোকে তৃষ্ণার্ত হইলে পুষ্করিণী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মিটে? কখনই না—মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—

১। সুধীরচন্দ্র বসু (১৮৯২—১৯৫০)।

'ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।'

ভগবান কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনও যুগে ছিল না। সেই নূতন—'বাবু'-সৃষ্টি। আমরাই সেই 'বাবু' সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযান আছে কিন্তু আমরা কুড়ি বাইশ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারি না—কারণ আমরা বাবু। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হই—আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করি না—কারণ আমরা 'বাবু।' আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে 'ছোটলোকের কাজ' বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা 'বাবুলোক।' আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে 'বাবু।' গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না কারণ আমরা 'বাবু।' আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা 'বাবু' আমরা সর্বত্র 'বাবু' বলিয়া পরিচয় দিই কারণ আমরা 'বাবু' কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য রূপধারী পশু। পশু অপেক্ষাও আমরা অধম—কারণ আমাদের জ্ঞান ও বিবেক আছে—পশুদিগের তাহাও নাই। জন্মাবধি সুখের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে আমরা তিল মাত্র কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারি না—এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে আমরা জয় করিতে পারি না—সারাজীবন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আমরা এক দুর্বহ জীবনভার বহন করি।

আমি প্রায় ভাবি—বাঙালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে 'মানুষ' বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙালীদিগের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্মী হইয়া যায়—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠকায় লোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়। এবং সর্বোপরি বাঙালীদিগের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে এরূপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। বাঙালীরা আজকাল হইয়াছে—বিলাসিতাপ্রিয়—পরচর্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পরসুখদ্বেষী এবং মনুষ্যত্ববিহীন—মা, ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আমরা পড়িতেছি—সম্মুখে যদি চাকরীর এবং অর্থের লোভ থাকে—তাহা হইলে কি লেখাপড়া—তাহা হইলে কি মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারা যায়? মা, বাঙালী কি কখনও মানুষ হইতে পারিবে? আপনার কি মত? মা, আমরা এবং আমাদের দেশ দিন দিন অধঃপতনে যাইতেছে। কে উদ্ধার করিবে? একমাত্র উদ্ধার কর্তা বঙ্গজননী—বঙ্গমাতা যদি বঙ্গ সন্তানকে নূতনভাবে প্রস্তুত করিতে পারেন—তাহা হইলে পুনরায় বাঙালী মানুষ হইবে।

আমরা ভাল আছি। ছোটদাদাকে(২) পত্র দিলাম। বাবা সোমবার গোপনীপালান যাত্রা করিবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানিবেন। এবার পাগলের মত অনেক লিখিয়াছি। পড়িতে কষ্ট হয় ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। ক্ষমা করিবেন।

ইতি—
আপনার সেবক
সুভাষ

২। ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু (১৮৯৫—১৯৫৩) জননীকে লিখিত এই পত্র দুটি রচনাকালে সুভাষচন্দ্রের বয়ঃক্রম ষোল কিংবা সতেরো।

[এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ও শিশিরকুমার বসু কর্তৃক সঙ্কলিত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী হইতে গৃহীত

সন্ধ্যার আলো

সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শোন কথা, এখানেই চলে এসো তুমি—
যেখানে সন্ধ্যার আলো পড়ে,
তোমার আমার আর সকলের মনের উপরে।
ওখানে সূর্যের দীপ্তি, কর্মের প্রবাহ,
জটিল জীবনবহ্নি দাহ,—
ঐখানে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ো নাকো;
এখানে সন্ধ্যার মাঝে হৃদয়কে রাখ।

জীবন বিক্ষুব্ধ যদি হয় হোক সারাদিন ভরে:
তুমি তারে শান্ত করো যখন সন্ধ্যার আলো পড়ে।
দিবসের উদ্‌ভ্রান্ত সংশয়—
আপন শক্তিতে করো ক্ষয়;
গভীর বিশ্বাসে মন একবার পরিপূর্ণ হোক—
নামে যবে সন্ধ্যার আলোক।

শোন কথা,
শেষ হোক সেইক্ষণে সব চঞ্চলতা।
সমাহিত মন
বিধাতার একান্ত আপন।
তাই তুমি, চলে এসো যেখানে সন্ধ্যায় শান্তি ঝরে,
তোমার আমার আর সকলের মনের উপরে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

দ্বিতীয় ব্রহ্মনাদবলী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব তে আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যত ইতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য।
তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোহন্তর আত্মা
মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।
তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ।
ঋগদক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তর পক্ষঃ। আদেশ আত্মা অথর্বাদিরসঃ।
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১।৩।

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং যত ইন্দ্রিয় দল,—
প্রাণেরই অধীনে রয়েছে সবাই, ক্রিয়াশীল চঞ্চল।
পশু ও মানব প্রাণেরই অধীনে চলে।
প্রাণই জীবন সর্বভূতের, তাই তাকে বলে
সকলের আয়ু—প্রাণ।
ব্রহ্মস্বরূপে এই প্রাণ যারা উপাসনা করে নিত্য,
পূর্ণ জীবনে তাহাদের অধিকার।
এ প্রাণময়ের আড়ালে রয়েছে সেই মনোময় আত্মা।
সে মন আবার প্রাণকে পূর্ণ করেছে।
এ মনোময়কে (কল্পনা কর) মানুষের অনুকল্পে।
যজুর্মন্ত্র তার শির,
ঋক্ দক্ষিণ আর সাম তার বাম বাহু;
ব্রাহ্মণ তার দেহমধ্য,
অথর্বাঙ্গিরসে তার পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা।
এ বিষয়ে আর একটি শ্লোক আছে।

* * *

প্রাণকে যদি সর্বভূতান্তর্গত বায়ুরূপে ধরা যায়, তাহলে দেব অর্থে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা মনে করা যেতে পারে। অগ্নি, ইন্দ্র (বৃষ্টি বিদ্যুৎ) প্রভৃতি দেবতারা বায়ুর সাহায্যেই আপন কর্তব্য করে। কিন্তু এটা অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহসম্বন্ধী), উপাসনা। তাই শঙ্করাচার্য বলেছেন,—মনে হয় 'দেব' অর্থে এখানে ইন্দ্রিয় দলই বুঝিয়েছে। ইন্দ্রিয়েরা সকলে প্রাণের দ্বারাই বেঁচে থাকে ॥

চতুর্থোঽনুবাদ

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ···
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥

যারে নাহি পেয়ে ফিরে আসে মন।
প্রকাশিতে যারে পারে না বচন,—
ব্রহ্মের সেই পরমানন্দ যে জেনেছে,—
তার কিছুতেই নেই ভয় ॥
এই মন সেই প্রাণের আত্মা।—
মনের গহনে আছে বিজ্ঞানময়।
সেই জ্ঞানময়ে পূর্ণ এ মনোময়।
সে মহাজ্ঞান তেমনি পুরুষাকার।
শ্রদ্ধা এর শির,
শাস্ত্রজ্ঞান (ন্যায়বোধ) এবং দক্ষিণ বাহু।
সত্য এর বাম বাহু।
যোগসমাধি এর দেহমধ্যভাগ।
মহত্তত্ত্ব এর পুচ্ছ অথবা প্রতিষ্ঠা।
এ বিষয়ে আর একটি শ্লোক আছে ॥

* * *

সেই যে 'বেদে' রূপায়িত মনোময় আত্মা,—তারো অন্তরে রয়েছেন জ্ঞানময়। অর্থাৎ মনের গভীর গহনে রয়েছে বিশুদ্ধ জ্ঞান,—যার আর এক নাম প্রজ্ঞা।—প্রজ্ঞানের অভিব্যক্তিতেই মনের বিচিত্র প্রকাশ। সেই জ্ঞানকেই মানবদেহ রূপে কল্পনা করেছেন ঋষি। সেই কল্পদেহের বিবিধ অঙ্গের রূপকটি বড় চমৎকার।

জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞানলাভ হয় না। তাই শ্রদ্ধাই এর শির। ঋত অথবা শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান এর দক্ষিণ ও সত্য এর বাম বাহু। যোগ অথবা ধ্যান এর দেহমধ্য এবং মহত্তত্ত্বই এর প্রতিষ্ঠা। মহত্তত্ত্বই তো সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি, অথবা মূল কারণ।

মহঃ বা মহত্তত্ত্ব—সাংখ্যমতে সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই মহঃ অথবা বুদ্ধি। প্রথমে এক অখণ্ড মহাবুদ্ধির মধ্যে সৃষ্টির সম্ভাবনা নিহিত হয়েছিল। অরূপ ব্রহ্মসত্তা হতে আবির্ভূত প্রথমজ বা প্রথম প্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি বলেও একে বলা হয়। পরে এই অখণ্ড বুদ্ধিতত্ত্ব প্রতি দেহে খণ্ডিত হয়ে সেই আধারের উপযুক্ত হয়ে বাস্তব ব্যবহারে নিযুক্ত হয়।

সমাধি ও সাধনার দ্বারা আপন সীমা লঙ্ঘন করে মানুষ বুদ্ধিকে ক্রমশ উন্নততর করতে করতে এক সময়ে সেই প্রথমজ ব্রহ্মের বা হিরণ্যগর্ভের মহত্তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের 'supramental' এর দিকে—সাধকের যাত্রাপথের তত্ত্বও বোধ হয় মানবের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা এই মহত্তত্ত্বের দিকে সাধনার যাত্রাপথের কাহিনীর মধ্যে সূচিত।

মনোময়ের অন্তরে আছেন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম' সেই জ্ঞানের অন্তর্বর্তী পরমানন্দকে যে জেনেছে সে কখনো ভয় পায় না। বিজ্ঞানং যজ্ঞ তনুতে। কর্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মানো হিত্বা। সর্বান্ কামান্ সমাপ্নুত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ-আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।

অনুবাদিকা—চিত্রিতা দেবী

আলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, লেখক]

নব্য ভারতের রূপকার হিসাবে পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রামমোহনের পরেই যে নামটি উল্লেখনীয়, সেই নাম অমরকীর্তি যুবরাজ দ্বারকানাথের। বাঙলার জাতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে দ্বারকানাথের অবদানের অন্ত মেলে না। দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধিসাধনে তাঁর ভূমিকা যে কত বিরাট এবং কত গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাস তার প্রধান সাক্ষ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যে মহৎ সৃষ্টির পুণ্যসাধনা শুরু হ'ল, রবীন্দ্রনাথ সেই সাধনার পূর্ণতম সিদ্ধি। অবনীন্দ্রনাথ সেই সাধনার মহত্তম সিদ্ধি। কিন্তু সেই সাধনার এখনও বিরাম নেই। দ্বারকানাথের বংশধরদের মধ্যে আজও অনেকেই পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ললিতকলা, শিক্ষাজগতের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তাঁদের নিত্য পদক্ষেপ ঘটছে। সেই সব জগতের অমৃত ভাণ্ডার থেকে তাঁরা কত অমূল্য সম্পদ আহরণ করে, সেগুলি সাধারণ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণের সঞ্চয় বিপুল থেকে বিপুলতর করে চলেছেন। এই তালিকায় আলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

ভারতের নব্যচিত্রকলার জনক ও সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার পথিকৃৎ আচার্য অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ও চতুর্থ সন্তান আলোকেন্দ্রনাথের জন্ম হয় জোড়াসাঁকোর অমৃতলোকে। সে আজ আটষট্টি বছর আগের কথা। তারিখ হচ্ছে ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬। মা সুহাসিনী দেবী ছিলেন ভারতীয় আইন ও সংবিধানের জনক দানবীর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র আইনজীবী ও সাহিত্যপ্রেমী ভুজগেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে আলোকেন্দ্রনাথের জন্ম। পুণ্যকল্প মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখনও জোড়াসাঁকোর আদিত্যপুরীতে দিব্য মহিমায় বিরাজমান। যুবক রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ অবনীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, সুনয়নী দেবী প্রমুখ জোড়াসাঁকোর কালজয়ী সন্তানেরা সেদিন নব নব সৃষ্টির মন্ত্রপাঠ করে চলেছেন। জ্ঞানের আলোকরশ্মি অকৃপণ হাতে করে চলেছেন বিতরণ। সংস্কৃতির উর্বরক্ষেত্রে নিত্য ফলিয়ে চলেছেন কত মূল্যবান ফসল।

এই আবহাওয়ায়, এই পরিবেশে, এই আবেষ্টনীতে আলোকেন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে। এই পুণ্য পরিবেশের মধ্যেই তিনি জীবনের প্রকাশের পথ খুঁজে পান, চলার পথের পান অমূল্য নির্দেশ। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির এই ব্যাপক অনুশীলনের মধ্যে আলোকেন্দ্রনাথ জীবনের রসদ খুঁজে পান।

১৯১৪ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হিসাবে আলোকেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেদিন অন্যতম ছাত্র ছিলেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র। অবিস্মরণীয় অধ্যাপকদের এক অভাবনীয় সমাবেশ ঘটেছে সেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তখন সবে যোগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে।

ছবি আঁকার হাতেখড়ি ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে তারপর পূজ্যপিতার শিষ্যত্বলাভ। পিতা সেদিন গুরুরূপে পুত্রকে শিল্পলোকের গহন লোকের পথ দেখিয়ে দিলেন, পুত্রকে কলালক্ষ্মীর সাধনার মন্ত্র দীক্ষায় করলেন দীক্ষিত। এক নেপালী শিল্পীর কাছে প্রাচীরচিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা অর্জন করেছেন আলোকেন্দ্রনাথ, গিরিধারী মহাপাত্র তাঁকে ভাস্কর্যবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করলেন।

আজ প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় আলোকেন্দ্রনাথের শিল্পকীর্তিগুলির আলোকচিত্র এবং অঙ্কিত চিত্রাদি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে তাঁর অঙ্কিত চিত্রের একটি একক প্রদর্শনী রসিকসমাজে যথেষ্ট স্বীকৃতি ও সাধুবাদ অর্জন করে। মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে কিছুকাল পূর্বে তাঁর লেখা 'ছবির রাজা রবিন ঠাকুর' প্রকাশিত হয়। 'এ্যারাবিয়ান নাইটসের গল্প' নামক একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর লেখা বহু তথ্যসমৃদ্ধ আকর্ষণীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত
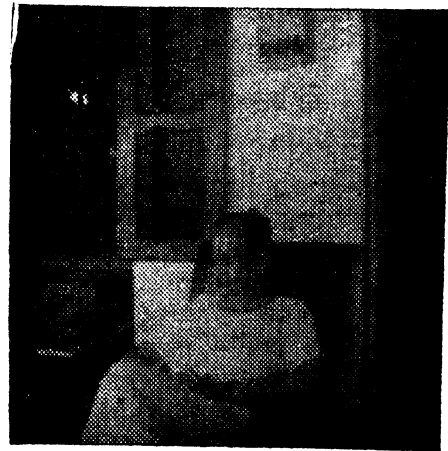
আলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হয়ে থাকে। তাঁর রবিদাদা—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কতায় যখন 'তপতী' অভিনীত হয় তখন সেই বিখ্যাত অনুষ্ঠানে কুমারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অলোকেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অবতীর্ণ হন বিক্রমের ভূমিকায়। দেবদত্তের ভূমিকায় আবির্ভূত হন সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ। ঠাকুর পরিবারের পারিবারিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'মিলনী'র একাধিক নাট্যানুষ্ঠানে অলোকেন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছেন।

শিল্প, সংস্কৃতি ও লেখনীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করলেও বিজ্ঞানের প্রতি অলোকেন্দ্রনাথের আকর্ষণ আবাল্য। বিশেষত, ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনপ্রাণ অধিকার করে বসে। কলেজজীবনেও বিজ্ঞান ছিল তাঁর পঠিতব্য। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক কর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বাণিজ্যক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সফলতার অধিকারী। স্টার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস তাঁর বাণিজ্যিক প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

১৯১৫ সালে উনিশ বছর বয়সে স্বনামধন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পৌত্রী শ্রীযুক্তা পারুল দেবীর সঙ্গে অলোকেন্দ্রনাথ পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার ডক্টর অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র (জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সন্তানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের পর অমিতেন্দ্রনাথ তৃতীয়জন যিনি 'ডক্টরেট' লাভ করলেন এবং থিসিস লিখে ডক্টরেট ঐ পরিবারের মধ্যে অমিতেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম লাভ করলেন)। তাঁদের কনিষ্ঠপুত্র সুমিতেন্দ্রনাথ (বাদসা) পিতার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করে তার গৌরব খ্যাতি ও কার্যাবলীর বহুগুণ বিবর্ধন করে আপন দক্ষতা ও কুশলতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

১৯৫২ সালের প্রদর্শনী ছাড়া অন্যান্য প্রদর্শনীতেও অলোকেন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। জীবনের প্রথমপর্ব থেকেই দেশ-বিদেশের অফুরন্ত সাহিত্যসম্পদের অমৃত সমুদ্রে তাঁকে অবগাহন করিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। আজ অবসরজীবনে অলোকেন্দ্রনাথ পুরোপুরিভাবে সাহিত্যচর্চায় এবং শিল্পসাধনায় মগ্নচিত্ত। তাঁর সদালাপিতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং অমায়িকতাও তাঁর জীবনালোচনার প্রসঙ্গেই স্বভাবতই উল্লেখিত হওয়ার দাবী রাখে। সংগ্রন্থ এবং উল্লেখযোগ্য চিত্রপ্রদর্শনী তিনি নিয়মিতভাবে পড়েন ও দেখে থাকেন।

শ্রীঅরুণকুমার রায়

[কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া]

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিভা শুধু শিল্পে, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির মধ্যেই যে নিবদ্ধ নয় এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও যে সেই প্রতিভা সমভাবে বিকশিত ভারত সরকারের অডিটর জেনারেল শ্রীঅরুণকুমার রায় তাহার অন্যতম প্রমাণ।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ আর দ্বিতীয়টি নাই বললেই চলে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে খুব অল্পসংখ্যক কর্মচারীর ভাগ্যেই এই লোভনীয় উচ্চপদ লাভের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত এই উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারী সমগ্র ভারতের 'অডিট এণ্ড একাউণ্ট' বিভাগের সর্বময় কর্তা। ভারতীয় প্রশাসনিক ইতিহাসে শ্রীঅরুণকুমার রায় এই পদে দ্বিতীয় বঙ্গসন্তান।

শ্রীরায় ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বর্গত পিতা ডাঃ

অরুণকুমার রায়

বিনয়ভূষণ রায়ের কর্মজীবন উত্তর-প্রদেশে কাটে বলিয়া বালক অরুণকুমারকে উক্ত প্রদেশেই শিক্ষা আরম্ভ এবং শেষ করিতে হয়। শ্রীরায়ের আদি পিতৃভূমি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কিন্তু তথায় তাঁহার পদার্পণ খুবই কম ঘটে। শ্রীরায় ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশস্থ গাজিপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯২৪ সালে বেনারস কুইনস্ কলেজ হইতে আই এস সি পাশ করেন। ১৯২৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এস সি পাশ করিয়া ১৯২৮ সালে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এস সি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯২৯ সালে শ্রীরায় ভারতীয় অডিট এণ্ড একাউণ্টস সার্ভি[illegible] প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতিত্বের সহিত উ[illegible] প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়া সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি অডিট এ[illegible] একাউণ্টস বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। ১৯৩৫ হইতে ১৯৩[illegible] সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৩৮ সা[illegible] হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত শ্রীরায় ভারত সরকারের কমার্স বিভা[illegible] সহকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন ১৯৪৬ সা[illegible] পর্যন্ত ভারতসরকারের বিভিন্ন বিভাগে সহকারী অর্থনৈতি[illegible] উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন এবং পরে আয়কর বিভাগের কমিশনা[illegible] নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের (ভারত সরকার জয়েণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে সেণ্ট্রাল বো[illegible] অব রেভিনিউর সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে সেণ্ট্রাল বোর্ড [illegible] রেভিনিউর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে রেভিনি[illegible] বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে সেক্রেটারী [illegible] এ্যাফায়ার্স এণ্ড রেভিনিউ বিভাগ, ১৯৬০ সালে C. A. G. হন এ[illegible] অদ্যাবধি ঐ পদেই বহাল রহিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী শোভনা রায় রমে[illegible] মিত্র পরিবারের কন্যা। তাঁহাদের তিনটি মেয়ে ও দুই ছেলে বর্তমান।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

[বিদগ্ধ শিল্পী বাণিজ্যিক চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ]

ব্যবসায়িক চিত্রকলার আজকের দিনে সমৃদ্ধির অন্ত নেই আমাদের জাতীয় জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা এবং গুর[illegible] আজ পরিপূর্ণ স্বীকৃতিলাভ করেছে। শিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে

আজ সে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু, বিশ শতকের তৃতীয় দশকের একেবারে গোড়ার দিকে এ সবের কিছুই তার অধিকারে ছিল না। সেদিন যে সম্ভাবনাময়, স্বপ্নে ভরপুর উদ্যমী তরুণবৃন্দ তার ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রসারের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন এবং যাঁদের অক্লান্ত সাধনা ও দুশ্চর তপস্যা সেই শিল্পকে আজ পরিপূর্ণ সফলতার স্বর্ণরাজ্যে উপনীত করেছে পূর্ণ চক্রবর্তী সেই তালিকায় একটি অপরিহার্য নাম। ব্যবসায়িক চিত্রকলার আজকের এই দুর্বার অগ্রগতির ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক বাণিজ্যিক চিত্রকলার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯০৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফরিদপুরে স্বর্গত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের জন্ম। ১৯২১ সালে শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। পার্সি ব্রাউন তখন অধ্যক্ষ। সহাধ্যক্ষের আসনে তখন অধিষ্ঠিত শিল্পাচার্য যামিনীপ্রকাশ। ১৯২৮ সালে সেখানকার চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন পূর্ণচন্দ্র। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর শিল্পপ্রতিভার বিকাশ শুরু হয়েছে এবং গ্রন্থ অলঙ্করণ ও বাণিজ্যিক চিত্রঅঙ্কন তাঁর পেশায় পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ্যে তাঁর শিল্পিখ্যাতি যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে।

শিক্ষাজীবনেই যাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন আজও তাঁর সেই বৃত্তি। তার উন্নয়নের সাধনায় আজও তাঁর এতটুকু ক্লান্তি নেই। এই দীর্ঘ সময়ে স্বাধীনভাবে এই জীবিকাই তিনি অবলম্বন করে গেছেন।

আজকের দিনে বিজ্ঞাপনশিল্পের যে প্রভূত উন্নতি সেদিন তার চিহ্নমাত্রও ছিল না, তার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে আজ যে উৎকর্ষের স্পর্শ মিশে আছে তা পূর্ণ চক্রবর্তী, ফণি গুপ্ত, যতীন সেন, চারু রায় প্রভৃতি শিল্পীদেরই সাধনার ফল। সে যুগে গ্রন্থ অলঙ্করণের কাজগুলি সাধারণত করে থাকতেন গণেশ চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, যতী বাগচী, নরেন সরকার, নরেন বসু। রেখা অলঙ্করণে বলতে গেলে সর্বপ্রথম সাড়া জাগালেন স্বর্গত শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। স্বর্গত শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে পূর্ণ চক্রবর্তী সেই সময় লক্ষ্মীবিলাস ও জবাকুসুমের প্রচারচিত্র অঙ্কনে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। বিগত দিনের কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে পূর্ণ চক্রবর্তী বললেন—'সেদিন গ্রন্থ আলঙ্কারিকদের বেছে বেছে অতীব পরিশ্রমসাপেক্ষ ছবিগুলি দেওয়া হোত, অন্তত যাতে পনেরো কুড়িটি ফিগার থাকত, প্রতিটি ফিগার নিখুঁত ভাবে আঁকতে হোত, মুখগুলি খুঁটিয়ে দেখতেন কর্তারা, মনোমত না হলে ফেরং দিতেন; হয় তো চতুর্থ এ্যাটেম্পটের কাজ তাঁদের পছন্দ হোত।' আমি প্রশ্ন করি—'পারিশ্রমিক কি রকম পেতেন?' হাসলেন শিল্পী—বললেন, 'কি মনে হয়?' আমি নির্বাক। তখন বললেন—'কত আর, এক টাকা বা দু'টাকা, তা-ও আদায় করতে ছ'মাস পেরিয়ে যেত, কিস্তিতেও দেওয়া হোত।'

বাঙলা দেশের পাঠক সমাজে এমন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির সন্ধান মিলবে না যিনি পূর্ণ চক্রবর্তীর শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত নন। আজ যাবৎ কত অসংখ্য গ্রন্থ যে তাঁর শিল্প-প্রতিভার স্পর্শসমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তার লেখাজোখা নেই। সেদিন বাঙলা দেশের প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় তাঁর চিত্র শোভা পেত এবং পত্রিকার সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি করত। মাসিক বসুমতীর উদ্ভব থেকে এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আজও তিনি মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠ করে থাকেন। পূর্ণ চক্রবর্তীর অঙ্কিত চিত্রগুলির বিষয়বস্তু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী সামাজিক জীবনধারা ইত্যাদি তাঁর প্রতিটি ছবির মধ্যে এক অদ্ভুত বর্ণসচেতনতার পরিচয় মেলে, তাঁর ছবিগুলির মধ্যে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি সাদরে প্রদর্শিত হয়েছে এবং বহু পদক সম্মান তিনি অর্জন করেছেন। ভারতীয় নব্য চিত্রকলার জনক অবনীন্দ্রনাথের তিনি প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও জীবনে তাঁর কাছে অসংখ্য অমূল্য উপদেশ এবং অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর স্নেহসান্নিধ্য লাভ করেছেন, যা তাঁর শিল্পিজীবনের এক মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে আছে। তাঁর 'চড়ুইভাতি' ছবিটি অবনীন্দ্রনাথ কিনে নেন। তদানীন্তন ভারতসম্রাজ্ঞী ইংল্যাণ্ডেশ্বরী মেরীও তাঁর একটি ছবি ক্রয় করেন (১৯৩৪) বরোদার গায়েকবাড়, কাশ্মীর, পাতিয়ালা, কুচবিহার, ত্রিপুরার মহারাজগণ, স্যার আববর হায়দারী (জ্যেষ্ঠ) ও তাঁর ছবির ক্রেতাদের অন্যতম।

সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান রবিবাসর, এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতির সঙ্গে তিনি যুক্ত। শিল্পিচক্রের তিনি সচিব।

রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, ওমরখৈয়াম, ঋতুসংহার, হংসদূত, এ্যারাবিয়ান নাইটস প্রভৃতি গ্রন্থগুলির অলঙ্করণ তাঁর দ্বারা হয়েছে।

লেখক হিসাবেও তিনি কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। ওরিয়েণ্ট লঙম্যানস তাঁর একাধিক গ্রন্থের প্রকাশক। ছবিতে রামায়ণ, ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত, ছবিতে মহাভারত, ছোটদের মহাভারত,

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা এবং অলঙ্করণের গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

১৩২৭ সালে তিনি বিবাহিতজীবনে প্রবেশ করেন। তিন পুত্র ও এক বিবাহিতা কন্যার জনক তিনি। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ইঞ্জিনীয়ার।

আগামী দোলপূর্ণিমায় তিনি চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের অলঙ্করণকার্য শুরু করবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানালেন—'এই হবে আমার শেষ কাজ'। কিন্তু রসিকসমাজের তাঁর কাছে চাওয়ার কি শেষ আছে?

শ্রীশম্ভু সাহা

[প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী]

যে বিশ্ববরেণ্য কবির কিছুমাত্র সান্নিধ্যলাভের আশায় বিশ্বের নানা দেশ হতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে পাড়ি জমাত, সেই কবির সান্নিধ্য একাদিক্রমে কয়েক বৎসর যাঁরা লাভ করেছেন প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীশম্ভু সাহা হচ্ছেন তাঁদেরই মধ্যে একজন।

১৩০৫ সালে মেদিনীপুর জেলায় শ্রীসাহা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺মাণিকলাল সাহা ও মাতা ৺নুটুরাণী সাহার দুই কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে তিনিই বড়। স্থানীয় স্কুল ও কলেজ হতে যথাক্রমে তিনি ম্যাট্রিক ও ১৩২৫ সালে বি এস্ সি পাশ করেন। এই সময়ে তাঁর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তৎকালীন বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর সংস্পর্শে আসা। প্রায় চল্লিশ বছর আগে আলোকচিত্রশিল্পী হিসাবে শ্রীসাহার জীবন শুরু হয় একটা ভাঙ্গা হাফ সাইজ প্লেট ক্যামেরা দিয়ে। প্রসেসিং করার ঘরখানিও তখন তাঁর একটা দেখবার মত জিনিষ ছিল। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারের মত হাওয়া-বাতাস নেই, আলো নেই, চটে মোড়া একটা ছোট্ট ঘর, লালরঙ-করা চিমনি-লাগানো একটি হ্যারিকেন জ্বেলে কোন রকমে কাজ করতেন পরবর্তীকালের স্বনামধন্য শিল্পী। এইভাবেই পরবর্তী পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৩২৫ সালে তিনি কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন। এরপর ১৩২৭ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল, ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চিয়ানে চাকুরি গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর কাজ ছিল যীশুখৃষ্টের প্রচারমূলক ছবি নির্মাণ করা। পাঁচ বৎসর পর তিনি ঐ চাকুরি হইতে ইস্তফা দেন।

১৩৩২ সালে তিনি রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা ক্রয় করেন এবং ফ্রি লান্স ফটোগ্রাফার হিসাবে কাজ শুরু করেন। ক্রমে তিনি ফটোগ্রাফার হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন এবং মিনিয়েচার ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড-এর কয়েকটি প্রতিযোগিতায় পর পর তিন বার পুরস্কার লাভ করেন, তার মধ্যে তিনবার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। এর কিছুকাল পরে ১৩৩৬ সালে বর্ষামঙ্গলের ছবি তুলে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। কবিগুরু মুগ্ধ হয়ে শ্রীসাহাকে শান্তিনিকেতনে দেখা করতে বললেন। এই ভাবেই তিনি বিশ্ববরেণ্য কবির অতি নিকট সান্নিধ্যে এলেন এবং ১৩৩৬ সাল থেকে '৪১ সাল
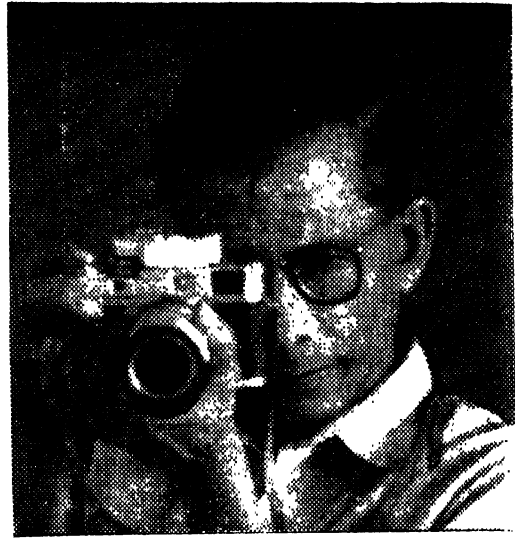
শ্রীশম্ভু সাহা

পর্যন্ত এই দীর্ঘ পাঁচ বছর কবির কাছাকাছি থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের তাঁর বহু ছবি তুললেন। শ্রীসাহার আলোকচিত্রে কবি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, কবি নিজে মুখেই স্বীকার করেছিলেন যে বিশ্বের নানা দেশে তাঁর যে ছবি তোলা হয়েছে শ্রীসাহার ছবি তাঁদের সকলের উপরে। কবির কাছ থেকে পাওয়া এতবড় একটা আশীর্বাদ যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই গৌরবের। কবিগুরু ছাড়া এই সময়ে তিনি সি এফ এ্যাণ্ড্রুজ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৩৩৮—৩৯ সালে Zeiss Ikon কোং চিকাগো ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে ভারতবর্ষ থেকে যে সব ছবি পাঠায় তার মধ্যে বেশিরভাগই শ্রীসাহার তোলা। ১৯৬০ সালে ইণ্ডিয়ান টিউব-এর কর্তৃপক্ষ এবং টাটা আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল কোং-এর প্রচার বিভাগ কর্তৃক কলিকাতার এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে শ্রীসাহার ১৩০৬ সাল থেকে '৪১ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে তোলা রবীন্দ্রনাথের বড় বড় প্রতিকৃতি এবং তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের শেষ অধ্যায়ের কয়েকটি আলোকচিত্রের (সংখ্যায় তা প্রায় ১৫০ খানি) প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এবং ঐ অপূর্ব প্রদর্শনী বহু গুণিজনের প্রশংসা লাভ করে। শ্রীসাহার মতে রবীন্দ্রনাথের মত এত নিখুঁত ফটোগ্রাফের উপযোগী মডেল তিনি সারাজীবনে আর পান নি।

১৩৪১ সাল থেকে তিনি ফটোগ্রাফিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। অনেকে বলেন আলোকচিত্র যে শিল্পকলার একটা বিশেষ অঙ্গ শম্ভুবাবুর স্টুডিওই নাকি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শ্রীসাহার পত্নী শ্রীমতী করুণা সাহা একজন প্রখ্যাতা চিত্রশিল্পী। বর্তমানে তাঁদের একটিমাত্র কন্যা। মিষ্টভাষী, সদালাপী, বন্ধুবৎসল এই মানুষটির সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন তিনিই মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রতিভা গুপ্ত

এইভাবে চলতে চলতে দলের কুড়ি-বাইশ জন লোক শুয়ে পড়ল, তাদের পক্ষে পথ চলা আর সম্ভব হল না। তাদের পেছনে রেখে বাকী দলটি এগিয়ে চলল। সকলের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, মনের বল-ভরসা সব কমে গিয়েছে কিন্তু পিছিয়ে যাবার পথ নেই। অতিকষ্টে ধুঁকতে ধুঁকতে সকলে পথ চলছে। প্রায় চোদ্দ-পনের দিন এভাবে পথ চলার পর একদিন সকালবেলা হঠাৎ একদল আন্দামানী তাদের ঘিরে ধরল। প্রাণের ভয়ে কয়েদীরা তাদের হাতে-পায়ে ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করল কিন্তু তাদের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। দলের সবাইকে একদিক থেকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে চলল। দুধনাথ এবং আরও দুইজন কয়েদী পালিয়ে গিয়ে একটা জলার মধ্যে লুকিয়ে রইল। আন্দামানীরা তাদের দেখতে না পেয়ে চলে গেল। সারারাত সেই জলার মধ্যে লুকিয়ে থেকে ভোরবেলা যেই বাইরে এসেছে অমনি আর একদল আন্দামানীর সঙ্গে দেখা। সঙ্গী দু'জন তক্ষুণি মারা পড়ল। দুধনাথ মড়ার ভাণ করে পড়ে রইল। আন্দামানীরা চলে যাবার উপক্রম করতে দুধনাথ উঠে তাদের কাছে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করল। কি মনে করে জংলীরা দুধনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

এর প্রায় একবছর পর পোর্টব্লেয়ারে 'অ্যাবারডিন কন্‌ভিক্ট স্টেশনে' দুধনাথ নিজে থেকে ফিরে এসে ধরা দিল। সকলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল যে, এই একবছর জংলাদের সঙ্গে থেকে সে বহুদ্বীপ ঘুরেছে, আজ এ দ্বীপে কাল সে দ্বীপে। আন্দামানীদের মতই উলঙ্গ হয়ে থেকেছে এবং তাদের রীতিনীতি মেনে চলেছে। এমন কি বিয়েও সে এর মধ্যে তিন-চারটি আন্দামানী মেয়েকে করেছে এই জংলীরা সম্পূর্ণ যাযাবর জাত কিন্তু মানুষ খায় এমন কোন প্রমাণ সে পায় নি, এমন কি কাঁচা মাছ-মাংসও সে কোন দিন খেতে দেখে নি। ভগবানের কোন অস্তিত্ব এদের কাছে নেই তবে 'স্পিরিট'-এ প্রবল বিশ্বাসী। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মাথা কামিয়ে ফেলে এবং লাল ও সাদামাটি দিয়ে শরীর চিত্রিত করতে ভালবাসে।

ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দুধনাথ ধরা দিল কেন? সে বলল, আন্দামানীরা বিরাট এক ষড়যন্ত্র করেছে, একযোগে চারদিক থেকে তারা অ্যাবারডিনের কন্‌ভিক্ট স্টেশন আক্রমণ করবে।

এই খবর পেয়ে ডাঃ ওয়াকার খুব সাবধান হয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর আন্দামানীরা ব্যাপকভাবে অ্যাবারডিন আক্রমণ করে কিন্তু প্রথম থেকে সাবধান হয়ে যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। এই আক্রমণের কাহিনী পোর্টব্লেয়ারের ইতিহাস 'Battle of Aberdeen' বলে পরিচিত। দুধনাথ তেওয়ারীকে তার কাজের পুরস্কার স্বরূপ একেবারে মুক্তি দেওয়া হল।

আগেই বলেছি আব্যারডিন বাজার পোর্টব্লেয়ারের চৌরঙ্গী। বাজারের মাঝখানে Farzan Jali Market এখানকার নিউ মার্কেট। মাছ-তরকারী থেকে বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় সবই পাওয়া যায়। সোনা-দানাটা অবশ্য পোর্টব্লেয়ারের বাজারে পাওয়া কঠিন অ্যাবারডিন বাজারের ঠিক মাঝখানে একটি ক্লক টাওয়ার বা ঘড়িঘর আছে তার চারপাশে টিনের চাল দেওয়া সব দোকানপাট। বেশিরভাগ দোকানই দক্ষিণ ভারতীয়দের। পোর্টব্লেয়ারে একটা মজার কথার চল আছে clock tower news অর্থাৎ গুজব। ভারতবর্ষের অনেক ছোটবড় যায়গায় ঘুরেছি। ছোটছোট যায়গার লোকেরা একটু গুজবপ্রিয় হয় কিন্তু এখানে এই জিনিসটি যাকে বলে একেবারে 'ক্লাইম্যাক্স'. একজনের ঘরের মধ্যে বসে কি কথা হল, সত্যি মিথ্যে রং চড়িয়ে দেখা গেল পরদিনই সহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

এখানকার লোকেদের এত গুজবপ্রিয় হবার, এত পরের বিষয়ে উৎসাহী হবার একটা মাত্র কারণ এখানকার লোকেদের মনের কোন diversion নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ অত্যন্ত কম। বাইরের কোন খবর নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই কাজেই কত আর বিষয় থাকতে পারে যা মানুষ দিনের পর দিন আলোচনা করতে পারে অগত্যা একমাত্র recreation পরনিন্দা ও পরচর্চা। বিশেষ করে মহিলারা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা মেনল্যাণ্ডে পড়াশুনা করে, স্বামীরা অফিসে থাকেন, হাতে অফুরন্ত সময়। সে সময় একটু নিন্দাচর্চা, একটু পরের বাড়ির হাঁড়ির খবর না জানলে চলে কি করে?

যা বলছিলাম বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ। এই বিংশ শতাব্দীতে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের এখানে কোন দৈনিক খবরের কাগজ আসে না। প্রতি সপ্তাহে প্লেনে করে সাতখানা কাগজ একসঙ্গে আসে, সেই সঙ্গে চিঠিপত্রও। ঘুম থেকে উঠে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়া যে কি আনন্দের জিনিস তা এখানকার লোক ভুলে যায়।

কলকাতা,—পোর্টব্লেয়ার—মাদ্রাজ। তিনটি সহরের মধ্যে যোগসূত্র দুইটি Cargo-cum—Passenger Ship—M. V. Andaman ও M. V. Nicobar. যদিও দূরত্ব সাড়ে সাতশ' মাইল তবু কলকাতা থেকেও আসতে চারদিন, মাদ্রাজ থেকেও আসতে চারদিন। গড়পড়তা তিন সপ্তাহ পরে পরে জাহাজ মেনল্যাণ্ড থেকে পোর্টব্লেয়ারে আসে। তার উপর একটি জাহাজ যদি dry dock-এ গেল তবে তো কথাই নেই, তখন মাস কি দেড় মাসে একবার করে জাহাজ আসবে। কাগজ যদি কেউ

আনান কলকাতা থেকে তবে একসঙ্গে গোটা মাসের কাগজ আসবে। তবে administration থেকে ছোট একটি কাগজ, ফুলস্কেপ কাগজের আকারের, বার করে। তাতে 'রেডিও নিউজ'-এর মত সংক্ষেপে মোটামুটি খবরগুলি দেওয়া থাকে। কাগজটির নাম Daily Telegraph.

প্রথম যখন আমরা গেস্ট হাউসে ছিলাম সকালে একদিন খবরের কাগজের খোঁজ করাতে বেয়ারাটি চিঠির মত ভাঁজ করা ব্রাউন রং-এর একটি কাগজ এনে দিল। এখানকার খবরের কাগজ দেখে আমরা তো অবাক্। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না সে কাগজ পড়া শেষ করতে।

জাপানীরা পোর্টব্লেয়ারে ছোট একটি air strip তৈরি করেছিল। সেটি পি ডব্লিউ ডি মেরামত করে এয়ার সার্ভিসের উপযোগী করে দিয়েছে। আমরা এলাম জানুয়ারী মাসে, সেই বছরই নভেম্বর মাস থেকে রেগুলার এয়ার সার্ভিস শুরু হল। পোর্টব্লেয়ারে দারুণ উত্তেজনা। সারা এয়ারপোর্টে লোকে লোকারণ্য। বিশেষ করে লোক্যাল লোকেদের কাছে দারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রতি শুক্রবার ভোর ৬।০টার সময় কলকাতা থেকে ডেকোটা প্লেন রওনা হয়। পথে রেঙ্গুন হয়ে বেলা ২।০টার সময় পোর্টব্লেয়ারে পৌছে। পরদিন শনিবার আবার ৬।০টার সময় কলকাতা ফিরে যায়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্লেন সার্ভিস খোলা থাকে। মে মাসে বর্ষা নামলে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আন্দামানের লোকেরা বাইরের জগৎ থেকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

All weather air service-এর উপযুক্ত এরোড্রোম এখানে ছিল না, সম্প্রতি ছোট এয়ার পোর্টটি অনেক বড় করা হয়েছে, আশা করা যায় আগামী বছর থেকে সারা বছর প্লেন চলবে। যতদিন প্লেন চলে এখানকার আবহাওয়াই বদলে যায়। সপ্তাহে সপ্তাহে লোকজন আসছে যাচ্ছে, চিঠিপত্র আসছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কাজে লোকজন যাওয়া আসা করছে। মনেই হয় না আমরা কত দূরে পড়ে আছি।

এখানকার স্থানীয় লোকেরা আন্দামানকে বলেন 'আণ্ডেমান।' এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম আচ্ছা আন্দামান নাম কি করে হল?

তিনি বললেন 'হণুমান' থেকে।

আন্দামানের নাম নিয়েও অনেক মজার গল্প আছে। টলেমি নাম বলেছেন Agmatae, মার্কোপোলো বলেছেন Angaman, Caesar Frederick বলেছেন Andameen.

আবার অনেকে বলেন মালয়দস্যুরা বহুদিন থেকে আন্দামানের অস্তিত্ব জানত, তারা বলত Yeng-to-Mang. একজন বিখ্যাত মালয়বাসী পণ্ডিত বলেছেন মালয়বাসীরা বহুকাল ধরেই আন্দামানীদের ক্রীতদাস হিসাবে ধরে এনে তাদের ব্যবসা চালাচ্ছিল। তারা বলত আন্দামানীরা রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের মত দেখতে তাই তাদের উচ্চারণে বলত 'হণ্ডুমান।' তার থেকে আণ্ডেমান তথা আন্দামান। এমন গল্পও আছে সীতা উদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র নাকি প্রথমে এখান থেকেই সেতু বাঁধতে চেয়েছিলেন পরে দূরত্ব বেশি হওয়ার জন্য বা কোন technical অসুবিধার জন্য মত বদলে দক্ষিণ ভারতে চলে গিয়েছিলেন।

সেতুবন্ধন নিয়ে অন্য গল্পও আছে। আন্দামানের আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ তাদের পাপের শাস্তি দেবার জন্য গোটা দ্বীপটার বেশির ভাগ জলে ডুবিয়ে দেন ফলে মানুষগুলি ভারতের মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক স্তবস্তুতি করে শ্রীরামচন্দ্রের মন জয় করে আদিবাসীরা। বিপন্ন ভক্তদের উদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষ থেকে আন্দামান পর্যন্ত বিরাট এক সেতু নির্মানের পরিকল্পনা করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সেতু নির্মাণ আর হয়ে ওঠে নি। হয়ত সে সময় বানর সৈন্যের সাহায্য না পেয়ে শ্রীরামচন্দ্র অসহায় হয়ে পড়েছিলেন।
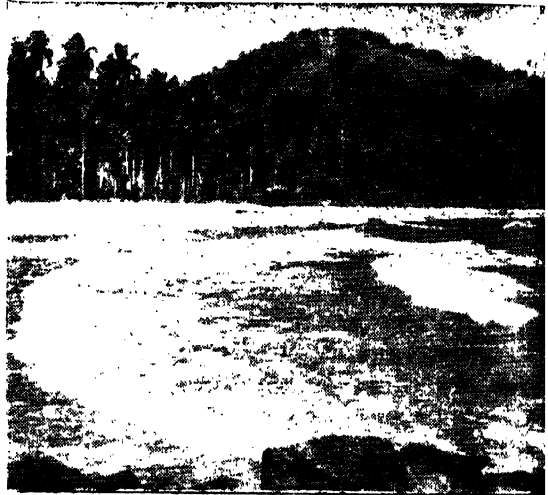
করবাইন্‌স্‌ কোভ

পোর্টব্লেয়ারে পিকনিক্ স্পট আছে অনেক। ভারী সুন্দর সুন্দর মনোরম সব জায়গা। এই রকম একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পিকনিক্ স্পট হল Corbyn's Cove. একমাত্র সমুদ্র স্নানের জায়গা। সহর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পাশ দিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল গিয়ে তবে করবাইন্‌স্‌ কোভ। ভারী সুন্দর জায়গা। পুরীর বীচের মত বড় না হলেও দেখতে অপরূপ। তিন দিক ঘিরে পাহাড় তার নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে অর্ধচক্রাকারে ঘুরে গিয়েছে সমুদ্রের তীর। মাঝখানে ছোট একটি কাঠের তৈরি বিশ্রামাগার। বীচের গায়েই সরকারী নারিকেল বাগিচা। হাজার হাজার নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এলে ডাব না খেয়ে কেউ যেতে পারে না। দামে কিন্তু সস্তা নয় একটুও। প্রতি রবিবার এখানে দল বেঁধে অনেকে সমুদ্রে স্নান করতে আসেন।

বর্ষাকালে সমুদ্র হয়ে ওঠে অশান্ত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। ঢেউগুলি দুর্বার আক্রোশে ক্রমাগত তীরের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে। ফলে প্রতি বছর করবাইন্‌স্‌ কোভের খানিকটা করে জায়গা তার নারকেল গাছের সারির সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে চলে যায়। অনেকখানি জায়গা বাঁধ দেওয়া, কিন্তু প্রতি বর্ষায় সে বাঁধ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। সমুদ্র তার আপন খেয়ালে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রকৃতির কাছে মানুষের হার হয় বার বার।

রেভারেণ্ড করবাইন ছিলেন পোর্টব্লেয়ারের গির্জার পাদ্রী সাহেব। তাঁর সম্মানার্থে এখানকার নাম হয়েছে করবাইনস্ কোভ।

ডাঃ ওয়াকারের পর উপনিবেশের কর্তা হয়ে আছেন Captain Haughton. ক্যাপ্টেন হটন ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু স্বভাবের। তাঁর সদয় ব্যবহারে কয়েদীরা অনেকটা বশ মানল এবং পালানোর সংখ্যাও অনেক কমে গেল। তিনি নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি না দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন সদয় ব্যবহার করে কয়েদীদের স্বভাব সংশোধন করা যায় কি না। এ ছাড়া জংলীদের সঙ্গেও ক্যাপ্টেন হটন খানিকটা আপোস করতে সক্ষম হয়েছিলেন অবশ্য সামান্য পরিমাণে।

ক্যাপ্টেন হটনের পর এলেন কর্ণেল টাইট্লার (১৮৬২)। আন্দামানীদের সঙ্গে একটা রফা না করলে আর চলছে না। বার বার সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষেই বহু লোকক্ষয় হচ্ছিল। কোম্পানী প্রস্তাব করে পাঠালেন যদি কোন রকমে জংলীদের নিজেদের আওতায় এনে শিখিয়ে-পড়িয়ে সভ্য করে তোলা যায়, তা হলেই হয়ত তাদের সঙ্গে একটা সদ্ভাব স্থাপন করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে রস্ দ্বীপে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর নিয়ে 'Andaman Homes' খোলা হল। রেভারেণ্ড এইচ্ করবাইন 'আন্দামান হোমের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বশ করে প্রথমে সাতাশ-আটাশটি আন্দামানী নিয়ে কাজ সুরু হল।

মিঃ করবাইনের উদ্দেশ্য ছিল আন্দামানীদের লেখাপড়া শিখিয়ে সভ্যজাতির সংস্পর্শে রেখে সভ্য করে তোলা। কাজটা কিন্তু খুব সহজ হোল না। একটা আদিম বন্য যাযাবর জাত এ রকম বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে থাকতে রাজী হল না। ফলে অনেকে আবার পালিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। দলে দলে তারা আন্দামান হোমে আসত, দলে দলে পালিয়ে যেত। মিঃ করবাইনই প্রথম ব্যক্তি যিনি আন্দামানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন এবং সত্যি করেই এই বুনো জাতটাকে ভালবাসেন। বহু বছর আন্দামানে থাকায় তিনি এদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। তিনি এদের ভাষাও খুব ভাল করে শিখেছিলেন।

গভর্নমেণ্ট থেকে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করল 'হোমের' উন্নতির জন্য। জংলীদের 'হোমে' রেখে তাদের প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের বশ করা হল। অনেকে লেখাপড়া শিখতে সুরু করল। ইংরেজী শিখল, হিন্দী শিখল সভ্যজাতির মত কাপড় পরতে শিখল। মিঃ করবাইনের চেষ্টায় ধীরে ধীরে তারা গভর্নমেণ্টের কাজে সাহায্য করতে আরম্ভ করল। কয়েদীদের সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট তৈরি করা, 'ভাগোড়া' কয়েদী জঙ্গল থেকে ধরে আনা, নানা কাজে সাহায্য করতে লাগল। 'আন্দামান হোমস্'-এর উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হল। 'আন্দামান হোমস' যতদিন রসে ছিল ততদিন খুব কম আন্দামানী সেখানে ছিল। রসটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বলে তারা সেখানে যেতে চাইত না। পরে যখন 'হোম' পোর্টব্লেয়ারে হ্যাডো অঞ্চলে নিয়ে আসা হল তখন দেখা গেল বহু আন্দামানী সেখানে ভর্তি হচ্ছে।

Rev. Corbyn-এর পর Mr. J. N. Homfrey, Mr. Man, Mr. Tuson এবং Mr. Portman পর পর 'আন্দামান হোমের' দায়িত্ব নেন। ক্রমশ এর অনেক উন্নতি হতে লাগল। আন্দামানীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল।

দুঃখের বিষয় 'আন্দামান হোমস'-এর অনেক কুফলও দেখা গেল। যে বন্য জাতটা এত কষ্টসহিষ্ণু এত শিকারপ্রিয় ছিল 'হোমস' থাকার ফলে তারা দিন দিন অলস হয়ে পড়ল। পরিশ্রম না করে, না চাইতে যদি সব জিনিস পাওয়া যায় তবে শুধু শুধু পরিশ্রম আর কে করে? দিন দিন তারা নিষ্কর্মা হয়ে পড়ল। তা ছাড়া প্রকৃতির কোলে যারা মানুষ হয়েছে, গভীর অরণ্যে থাকা যাদের অভ্যাস, হঠাৎ আবহাওয়া তাদের সহ্য হোল না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অতিরিক্ত ধূমপানের ফলেও তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। সর্বক্ষণ কয়েদীদের সংস্পর্শে থাকায় তাদের রোগগুলিও অতি সহজে এদের মধ্যে সংক্রামিত হতে থাকল। ১৮৭৭ সনে 'হামজ্বর' মহামারী রূপে দেখা দেওয়ায় অসংখ্য আন্দামানী তাতে মারা গেল। জ্বর, ব্রঙ্কাইটিশ রোগে তারা সহজেই কাবু হয়ে পড়ত। সবচেয়ে দুঃখের কথা অরণ্যের এই আদিম জাতটা সভ্যজাতির এক ঘৃণ্য রোগ 'সিফিলিস'-এ আক্রান্ত হল এবং দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। 'সিফিলিস' রোগটা আন্দামানের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। খুব কম আন্দামানীই এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বংশবৃদ্ধি না হওয়ায় বছরের পর বছর এদের সংখ্যা কমতে কমতে আজ এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২।২৪ জনে। সিফিলিস রোগে এ জাতটার যে সর্বনাশ হল তা দেখলে দুঃখ লাগে। ভগবানের অভিশাপে তাদের বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম। আশঙ্কা হয় অদূর ভবিষ্যতে এই জাতটা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে। মিঃ পোর্টম্যান বলেছেন,—

'It is sad to see the ravages which syphillis is working among them and their number becoming less year by year....The extinction of this branch of race cannot be far off.'

Mr. B. C. Bouningtonও বলেছেন, 'Andaman Home was the door of dea'h to the Andamanese.' চীফ কমিশনার C. L. Douglas 'আন্দামান হোম' উঠিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য! একটা আদিম জাত সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল? সভ্য জাতের ছোঁয়ায় এত বিষ? মিঃ হমফ্রে যখন 'আন্দামান হোমে'র দায়িত্ব নেন, তখন সেখানে আন্দামানীর সংখ্যা ছিল চার হাজারের ওপর। আর জঙ্গলেও প্রায় হাজার ছয়েক ছিল। একশ' বছরে এই দশ হাজার আন্দামানী ধ্বংস হতে হতে ২২।২৪ জনে পৌঁছেচে। এই আন্দামানী কয়টিকে গভর্নমেণ্ট নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। কয়েকজন সরকারী কাজও করে। অনেক Anthropologist-দের মতে আন্দামানীরা হচ্ছে 'One of the most ancient and purest tribal race.'

রেভারেণ্ড করবাইন হয়তো ভুলই করেছিলেন কয়েদীদের সঙ্গে এদের একসঙ্গে রেখে। তিনি নিশ্চয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি তাঁর সৎ প্রচেষ্টার ফলে একটা জাত এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পোর্টব্লেয়ারে একদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তিনটি আন্দামানীকে দেখলাম। এদের বড় একটা দেখা যায় না কোথাও। গুপ্তসাহেব ওদের কাছে ডাকলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ওরা বলল, 'বুশ পুলিশে কাজ করি।' কি অসম্ভব কালো রং আর কি অদ্ভুত কোঁকড়ান চুল। সার্ট প্যাণ্ট-পরা দিব্যি ভদ্রলোক সেজে রয়েছে। আমি ওদের

দিকে চেয়ে ভাবছিলাম কি নিরীহ লোকগুলি অথচ এককালে এরা গোটা আন্দামানে রাজত্ব করেছে, বাইরের লোকের কাছে এরা ছিল বিভীষিকা।

সম্রাট অশোকের সময় পাটলিপুত্র্রে কয়েকজন ভারতীয় বণিক সিংহল থেকে রিক্ত নিঃসম্বল হয়ে ফিরে এল। তারা বলল সমুদ্রপথে যাবার সময় দিক হারিয়ে তারা বঙ্গোপসাগরের একটা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানকার আদিবাসীরা তাদের আক্রমণ করে সর্বস্বান্ত করে। অতি কষ্টে কয়েকজন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে।

আমার ইচ্ছে করছিল এই আন্দামানীরা যদি জামাকাপড় না পরে তীর ধনুক হাতে নিয়ে একবার দাঁড়াত তবে এদের আদিম রূপটা একবার দেখে নিতাম।

পোর্টব্লেয়ারে আসার পর যা আমাদের সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছিল তা হল এখানকার আবহাওয়া, না শীত, না গ্রীষ্ম। দ্বীপগুলি যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। জানুয়ারী মাসে কলকাতা থেকে এলাম, তখন সেখানে বেশ শীত। এখানে আসার পর প্রথম দিনই রাত্রিবেলা ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি ডিনার ছিল। শীত না করলেও অভ্যাস-বশত শাল গায়ে দিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি কোন ভদ্রমহিলার গায়ে গরম কাপড় নেই, তা ছাড়া বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। গৃহস্বামীর বাচ্চাগুলিও ফিনফিনে পাতলা জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার শাল জড়ানো চেহারাটা নিজের কাছেই কেমন বোকা বোকা লাগছিল। যাতে কেউ বুঝতে না পারে তাই আস্তে আস্তে শালটি খুলে পাট করে পাশে রেখে দিলাম। আমার পাশে বসেছিলেন ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচারের স্ত্রী মিসেস আনন্দ। তিনি হেসে বললেন 'তোমার গায়ে শাল দেখেই বুঝেছি তুমি নতুন মেনল্যাণ্ড থেকে এসেছ।'

Mainland? সে আবার কোথায়? কোনদিন তো নামও শুনি নি। আমি বললাম 'মেনল্যাণ্ড নয় আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা আরও জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, 'ভারতবর্ষকে এখানকার লোকেরা বলে মেনল্যাণ্ড। তা সে কলকাতাই হোক বা দিল্লীই হোক সবই এদের কাছে মেনল্যাণ্ড। অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ইংল্যাণ্ড যেমন মেনল্যাণ্ড আন্দামানের কাছেও ভারতবর্ষ তেমনই মেনল্যাণ্ড।'

সারা শীতকালে এখানে লেপ-কম্বলের দরকার হয় না, আবার সারা গ্রীষ্মকালে পাতলা চাদর গায়ে দিতে হয়। কখন শীত যায় গ্রীষ্ম আসে টেরও পাওয়া যায় না। তবে বর্ষা? বর্ষার আধিপত্য এখানে বছরে আট মাস। এখানে বর্ষা নামে তার রণভেরী বাজিয়ে দুর্বার গতিতে। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের ঝলকানি আর অবিরাম বর্ষণ চলতে থাকে মাসের পর মাস। সে কি বর্ষা! নামল তো থামতেই চায় না। সাত আট দিন অবিরাম বৃষ্টির পর দুই তিন দিনের বিরতি, আবার চলে পুর্ণোদ্যমে বর্ষণ। বৃষ্টি কখনও সোজাসুজি পড়ে না, প্রবল বাতাসের সঙ্গে সব সময় ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় চলা অসম্ভব ব্যাপার।

বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোনগুলি আন্দামানের আশপাশের সমুদ্র থেকে উৎপত্তি হয় কিন্তু কি কারণে জানি না অদ্ভূত ভাবে আন্দামানের ওপর দিয়ে না বয়ে গিয়ে পাশ কাটিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আঘাত করে। পাশ কাটিয়ে গেলেও সে সব সাইক্লোনের ছোটখাট ঝাপটা যা আন্দামানের ওপর এসে পড়ে তাতেই এখানকার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। গাছপালা ভেঙে, রাস্তাঘাট ধ্বসে, বাড়িঘর উড়ে গিয়ে, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এত বাতাসের বেগ যে প্রতিমুহূর্তে আমাদেরও মনে হয়—

'মাগো। গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি'।

'দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যত বাহু করে হাহাকার
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ে মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।'

কবির বর্ণনায় এমন জীবন্ত চিত্র আর কোথাও দেখা যাবে কি না সন্দেহ।

বেশ কিছুদিন হল এখানে এসেছি, কিন্তু সব চেয়ে যা দ্রষ্টব্য, আশৈশব যার কত গল্প শুনেছি সেই Cellular Jailই এখন পর্যন্ত দেখা হল না। আজ দেখব, কাল দেখব করে দিন কেটে যাচ্ছে।

এলো ১৫ই আগষ্ট। জিমখানা গ্রাউণ্ডে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিরাট আয়োজন। অবশ্য এখানকার তুলনায় ২৬শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগষ্ট জিমখানা গ্রাউণ্ডে বোধহয় সমস্ত পোর্টব্লেয়ার ঘিরে জড়ো হয়। প্যারেড, চীফ কমিশনারের স্যালুট গ্রহণ, বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর আমরা রওনা দিলাম সেলুলার জেলের দিকে। সেলুলার জেলের একটা উইং-এ কয়েদীরা থাকে। চীফ কমিশনার শ্রীভোলানাথ মহেশ্বরী নিজের হাতে কয়েদীদের মিষ্টি বিতরণ করলেন এবং ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। দলের সবাই চলে গেলে পর আমরা জেলখানাটি দেখবার জন্য রয়ে গেলাম। বিরাট
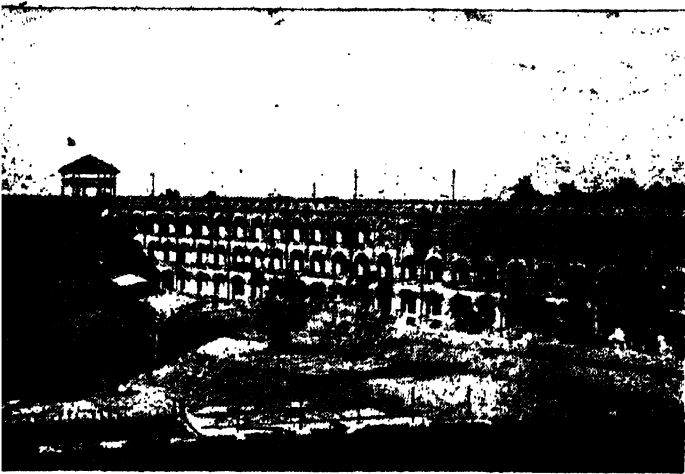
সেলুলার জেল

জেলখানাটি অবাক হয়ে দেখছিলাম। এই হল কুখ্যাত সেলুলার জেল, যার প্রত্যেকটি সেলে গুমরে মরেছে কত নিপীড়িত আত্মা। চারদিক ঘুরে ঘুরে বিশাল অট্টালিকাটি দেখলাম। কি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা সেই ইঞ্জিনীয়ারের যিনি এই জেলখানাটির প্ল্যান তৈরি করেছিলেন। কেন্দ্রস্থলে একটি watch tower তার সাতদিকে সাতটা উইংগস্ যেন সপ্তরথীর মত সপ্তব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে, তার চারদিক ঘিরে উঁচু প্রাচীর। প্রত্যেকটি উইংগ তিনতলা। এক এক সারিতে ছোট ছোট বদ্ধ সেল। সামনে টানা ঢাকা বারান্দা তাতে মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো। অসংখ্য সেলের জন্য জেলখানাটির নাম হয়েছিল সেলুলার জেল সেকালে যার নাম শুনলে অতি বড় দুর্দান্ত প্রকৃতির কয়েদীরও বুক কেঁপে উঠত।

General Cadell যখন চীফ কমিশনার হয়ে আসেন তখনই এই কুখ্যাত সেলুলার জেলের ভিত্তিস্থাপন করা হয়। বর্মা থেকে ইটের বোঝা জাহাজে করে এনে আন্দামানের একমাত্র পাকা ইমারত এই বিরাট জেলখানাটি তৈরি হয়।

তার আগে পর্যন্ত পোর্টব্লেয়ারের ওপারে Viper Island-এ কয়েদীদের জেলখানা ছিল। সাংঘাতিক খারাপ চরিত্রের কয়েদীদের সেখানে রাখা হত। সে সময় যাঁরা আন্দামানে এসেছিলেন তাঁদের লেখা থেকে ভাইপারের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। Mr. Boden Klor বলেছেন, 'ভাইপারকে একমাত্র নরককুণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংসারে যত রকম ঘৃণ্য অপরাধী ও পাপী আছে তার বোধহয় সব রকমের নমুনাই ভাইপারে থাকে। হরেক রকমের কয়েদী আর মেয়ে কয়েদীও এখানে আছে। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি লাগানো লোকগুলি ঘুরে বেড়ায় সারাদিন, তাদের শৃংখলের ঝন্‌ঝন্ শব্দে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। ভাইপারে একটি ফাঁসী কাঠও আছে।

দুর্ধর্ষ প্রকৃতির কয়েদীদের প্রথমে প্রত্যেককে সেলুলার জেলে ছয় মাস আটকে রেখে দিত। তারপরে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের অন্যান্য কাজকর্মে লাগিয়ে দিত। সে সময় সাত বছরের বেশি কারাদণ্ড হলেই নাকি দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিত।

আমরা যখন ঘুরে ঘুরে জেলখানাটি দেখছিলাম আমাদের সঙ্গের গার্ডটি অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল জেল সম্বন্ধে, ঠিক যেন ফতেপুর সিক্রীর গাইড, ইতিহাসের কাহিনী বলে যাচ্ছে সত্যি-মিথ্যের মিশিয়ে।

সেলুলার জেলের সাতটা উইংগস্-এর তিনটিই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বাকী কয়টিও ভাঙা হবে। একটি উইংগস্ রাখা হবে ব্রিটিশ রাজত্বের অনুপম কীর্তির স্মারক হিসাবে। সেলগুলির ভিতর ঢুকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কি ছোট্ট ঘরগুলি জানালা বলতে ছাদের কাছে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি। সেলের দরজার গায়ে লাগানো তালাগুলি এখনো ঝুলছে। কি বিরাট তালা। এত বড় তালাচাবি আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম। সেলুলার জেলটি ঠিক সমুদ্রের ধারে হলেও কোন কয়েদীর তা চোখে পড়বার উপায় ছিল না। আসবাবপত্র হিসাবে সাধারণ কয়েদীদের দেওয়া হতো দুইখানা করে কম্বল, কলাইকরা একটি থালা ও একটি মগ।

প্রথম দুই তিন মাস কয়েদীদের নিয়োগ করা হত তেলের ঘানিতে। বলদের বদলে ঘানি টানতে হত মানুষকে। অসম্ভব পরিশ্রমে কয়েদীরা অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত, কিন্তু তাতেও তারা মুক্তি পেত না। মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার তাদের ঘানিতে জুড়ে দিত। শাসনের কশাঘাতে বার-বার কাজে লাগত বার-বার অজ্ঞান হত। প্রত্যেকের কোটা ছিল ১৫ সের সর্ষের তেল বার করা একদিনে, কাজেই যতক্ষণ তা না হচ্ছে সমানে তাদের ঘানি টানতে হত। তিন মাস পর ঘানি থেকে সরিয়ে নিয়ে দেওয়া হত নারকেলের ছোবড়া পরিষ্কার করার কাজে। সারাদিন ধরে ছোবড়া পিটিয়ে তাদের হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে আসত। হাত অসাড় হয়ে পড়ত।

ছয় মাস পর কয়েদীরা প্রথম বাইরে আসার সুযোগ পেত। সেলুলার জেলের বাইরে হ্যাডো, ডিলানিপুর, জংলীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে সব কয়েদীদের ব্যারাক ছিল। ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে এবার কয়েদীদের অন্য ধরণের কাজ দেওয়া হত। রাস্তা তৈরি করা, নালা কাটা, জলা জায়গা পরিষ্কার করা—এই সব নানারকম কাজে সারাদিন ব্যস্ত থেকে সন্ধ্যাবেলা সকলে ব্যারাকে ফিরে আসত। কাজে সামান্য ত্রুটি হ'লে উপরওয়ালার কাছে শাস্তি পেতে হত।

এই সব কয়েদীরাও পালাবার সুযোগ খুঁজতো বারবার। সেই ১৮৫৮ সালে কয়েদী উপনিবেশ পত্তনের সময় থেকে সুরু করে কয়েদী উপনিবেশের শেষ পর্যন্ত কয়েদীরা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে কিন্তু কোনবারই তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। ইংরেজের এমনই কড়া নজর ছিল যে, এই হাজার হাজার কয়েদীর মধ্যে একটি কয়েদীও পালালে জাল দিয়ে যেমন মাছ ধরে তেমনি করে আন্দামানের জঙ্গল ও সমুদ্র ছেঁকে বের করে আনত। তারপর চলত তার উপর অমানুষিক অত্যাচার। ইংরেজের সে নৃশংসতার কোন তুলনা নেই। আমরা ঘুরতে ঘুরতে আর একটি wing-এ গেলাম। লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে একটি সেল দেখিয়ে গার্ডটি বলল, 'এখানে বীর সাভারকর থাকতেন।' তাকিয়ে দেখি দরজার উপরে সাভারকরের নাম লেখা রয়েছে।

মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ঠিক জানো এই সেলটিতেই সাভারকর থাকতেন?'

গার্ডটি জবাব দিল, 'জী সাব, এই তো এখানে লোকনাথ বল ছিলেন, ঐ দিকে বারীন ঘোষ ছিলেন।'

পর পর আরও অনেকের নাম বলে গেল যেন নিজের চোখে গার্ডটি তাদের থাকতে দেখেছে।

ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে মাতৃভূমির দাসত্ব মোচনের জন্য যে সব বিপ্লবীরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন, ইংরেজ সরকার নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের বন্দী করে পাঠিয়ে দিলেন আন্দামানে। সেই সব রাজবন্দীদের এখানে বলত 'স্বদেশী বাবু'। সাধারণ কয়েদীদের থেকে তাদের আলাদা ভাবে রাখা হত। শোবার জন্য খাট, পড়বার জন্য টেবিল, ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে দেবার জন্য কয়েদীভৃত্য সব দেওয়া হত। রাজবন্দীদের জন্য একটি লাইব্রেরী ছিল এবং খেলাধূলা করার বন্দোবস্তও ছিল। রাজবন্দীদের জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট থেকে সুরু করে চিঃফেল, পেটি অফিসার পর্যন্ত সকলেই খুব সমীহ করে চলত।

সমস্ত জেলখানাটি দেখা শেষ করে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলাম।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে মেয়েদের পড়ার কিছু সুবিধা করে উঠতে পারছি না। বড় মেয়ে বীথি Senior Cambridge পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল ওর জন্তে চিন্তা ছিল না। বাচ্চা মেয়ে দোলন তার জন্যও ভাবছিলাম না, কারণ এখানে একটি প্রাইমারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। মেজ মেয়ে মীনা ও সেজ মেয়ে বাবি তারা উঁচু ক্লাসের ছাত্রী তাদের নিয়েই বিপদে পড়লাম। পোর্টব্লেয়ারে আসার আগে যতজনকে জিজ্ঞেস করেছি সবাই বলেছেন আন্দামানে নিশ্চয়ই ভাল স্কুল আছে। অথচ নিশ্চয় করে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। যাই হোক মেয়েদের স্কুল থেকে নাম না কাটিয়ে ছুটি নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। Higher Secondary School এখানে আছে ঠিকই, কিন্তু তা হিন্দী ও উর্দু মাধ্যমে। মেয়েরা পড়ছিল ইংলিশ মিডিয়ামে কাজেই তারা বেঁকে বসল হিন্দী মিডিয়ামে পড়বে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে আবার তাদের কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম। এখানে এই একটি বিষয়ে সকলেরই এক অবস্থা। হিন্দী স্কুল হওয়ায় বেশির ভাগ অফিসার ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে mainland-এ পড়াশোনা করে। স্কুলের স্ট্যাণ্ডার্ডও আশানুরূপ না হওয়ায় এবং লোকাল বর্ন বেশি থাকায় কেউ ছেলেমেয়ে এখানে রাখতে চান না। বেশির ভাগ লোকই যাঁরা ডেপুটেশনে আসেন, তিন বছরের জন্যে তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের mainland-এ রেখে আসেন।

এক রবিবার আমরা ভোরবেলা রওনা হলাম পোর্টব্লেয়ারের বাইরে Bamboo Flat যাবার জন্য। জলপথে ফেরীতে গেলে মিনিট দশেক লাগে, স্থলপথে গাড়িতে করে গেলে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। গাড়ি করে গেলে রাস্তাও দেখা হবে বলে আমরা গাড়ি করেই রওনা দিলাম। এই সুদীর্ঘ রাস্তাটি ভারি চমৎকার। রাস্তার দুই ধারে বিরাট বিরাট গাছে ঠিক যেন একটি avenue, কোথাও পাহাড়, কোথাও গভীর জঙ্গল, কোথাও ধানী জমি ও উদ্বাস্তু কলোনী। রাস্তার ধারে ধারে গাছগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কতরকমের অর্কিড তাদের শাখায়-শাখায়। কত বেতঝোপ আর সুদৃশ্য পাম। আর কত রকমের ফার্ণ যে পাহাড়ের গায়ে হয়ে রয়েছে তার ঠিক নেই। আমি খালি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম জঙ্গলের মধ্যে বড় গাছের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগাছা আর বুনো লতার জন্ম হয়েছে। লতাগুলি এক গাছ থেকে অন্য গাছে জড়িয়ে জড়িয়ে জঙ্গলের পথ আরও অগম্য করে তুলেছে। আন্দামানের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ জায়গা এখনও অরণ্যময়। মুগ্ধ হয়ে আমরা রাস্তার দুই পাশের শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। প্রায় ২৬ মাইল এসে আমরা উপস্থিত হলাম Wimberley-গঞ্জ।

পোর্টব্লেয়ার থেকে ২৬ মাইল দূরে Wimberley গঞ্জ। দেশী বিদেশীর জগাখিচুড়ীতে অদ্ভুত নাম। এমনি আরও অনেক আছে। Homfrey গঞ্জ, Ferral গঞ্জ, Beadon আবাদ, Austin আবাদ, Anne ক্ষেত ইত্যাদি।

উইম্বারলি গঞ্জে বেশির ভাগই কেরালার লোক। ১৯২১ সনে 'Malabar Rebellion' এর পর ১৪০০ মপলা কয়েদী হয়ে আন্দামানে এল। এরা দক্ষিণ ভারতের লোক, জাতে মুসলমান। আন্দামানের সঙ্গে কেরালার সাদৃশ্য খুব বেশি। জলবায়ুর দিক থেকেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকেও। কাজেই মপলাদের এখানে বিশেষ অসুবিধা হল না। অল্পদিনেই এখানকার আবহাওয়ায় তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। মালাবারের মতই এরা মাছ ধরা ও চাষবাসের কাজে ব্যস্ত রইল। মপলারা তাদের আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। আজও এখানকার মপলা মেয়েদের সাজপোষাকে বিন্দুমাত্র আধুনিকতার ছোঁয়াচ লাগে নি। মপলারা নিজেদের সমাজ নিয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাস করে। আন্দামানের কয়েদী সমাজের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই।

তা বলে উইম্বারলি গঞ্জের সমস্ত লোকই যে মপলা এমন মনে করার কোন কারণ নেই। মপলারা সংখ্যায় বেশি হলেও জীবিকার জন্য বহু কেরালাবাসী এখানে এসে সেটল করেছে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মত বহু কেরালার লোকও এখানে পাকাপাকিভাবে বাস করতে এসেছে। উইম্বারলি গঞ্জে শতকরা নব্বইজনই কেরালাবাসী। কেউ যদি কেরালা থেকে এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁর মনে হবে নিজেদের দেশের এক অংশে তিনি এসে পড়েছেন।

উইম্বারলি গঞ্জ থেকে গেলাম Bamboo Flat-এ। প্রচুর বাঁশঝাড় আছে বলে বোধ হয় এ জায়গাটার নাম ব্যাম্বু ফ্ল্যাট। এখানে একটি ছোট টি বি হাসপাতাল আছে। জায়গাটা খুবই ছোট, তবে ব্যাম্বু ফ্ল্যাটের জেটী থেকেই এপার থেকে পোর্টব্লেয়ারে লোকজন যাতায়াত করে।

Bamboo Flat থেকে গেলাম দক্ষিণ আন্দামানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় Mount Harriet-এ। গোষ্পদকে যদি সমুদ্র বলা যায়, তবে Mount Harrietকেও Mount বলা যায় যার উচ্চতা মাত্র ১২০০ ফিট। জীপ গাড়ি যাবার মত একটি রাস্তা ওপরে উঠবার জন্য আছে, তবে অব্যবহারে অনেক জায়গা ভেঙে গিয়েছে। তা ছাড়া ঝোপঝাড়ে রাস্তা একেবারে ভর্তি। দুই পাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। মাথার ওপর দুই পাশের গাছগুলি হেলে পড়েছে—বুনো লতাগুলি এপাশের গাছ থেকে ওপাশের গাছে গিয়ে জড়িয়েছে, সাপের মত মোটা মোটা লতাগুলি এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। সমস্ত রাস্তাটিই এরকম জঙ্গলে ঢাকা। যতক্ষণ চড়াইয়ে উঠলাম বেশ অন্ধকার লাগছিল, ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার রোদের দেখা পেলাম। মাউণ্ট হ্যারিয়েটের ওপর চীফ কমিশনারের বাংলোর ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। এখানে চীফ কমিশনারের ও পুলিশ সাহেবের 'সামার রেসিডেন্স' ছিল। সে-সময় রাস্তা-ঘাট ঝক্ ঝক্ করত, ফুলের বাগানে চারিদিক আলো হয়ে থাকত। স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল উপযুক্ত জায়গায়। এখান থেকে এমন সুন্দর চারিদিকের দৃশ্য দেখা যায়, যার তুলনা হয় না। সামনে ধূ-ধূ করে উন্মুক্ত সমুদ্র। প্রায় ৪০ মাইল দূরে ডানদিক থেকে দেখা যায় পর পর Hugh Rose Island, Neil Island, Havelock Island এবং তার পাশে Baratang Island. ঠিক মাউণ্ট হ্যারিয়েটের নীচেই ছবির মত দেখা যায় রস আইল্যাণ্ড। ঠিক যেন এক চাপড়া ঘাস জলে ভাসছে। ডানদিকে দেখা যায় নীচে উইম্বারলি গঞ্জ। ঠিক যেমন মুসৌরী থেকে দেরাদুনকে দেখায়। পিছন দিকে গভীর জঙ্গলে ঢাকা West Coast, সম্পূর্ণ জারোয়া অধিকৃত এলাকা। আন্দামানের East Coast এই সব সহর ও বন্দরগুলি

West Coast একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে একমাত্র জারোয়াদের আবাসভূমি হয়ে।

মাউন্ট হ্যারিয়েট থেকে নেমে গেলাম Hope town জেটীতে।

১৮৭১ সন। General Steward এলেন পোর্টব্লেয়ারে শাসনকর্তা হয়ে। Lord Mayo তখন ভাইসরয় অফ্ ইণ্ডিয়া। আন্দামানের উন্নতি সম্বন্ধে লর্ড মেয়োর খুব আগ্রহ ছিল। তিনিই প্রস্তাব পাঠালেন দ্বীপান্তরের আসামীরা যদি ভাল স্বভাব ও ভাল ব্যবহারের পরিচয় দেয় তবে কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে তাদের একেবারে মুক্তি দেওয়া হবে। তাঁর অনুমোদনে আন্দামানের শাসনকর্তা হিসাবে চীফ কমিশনারের পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ সনে লর্ড মেয়ো নিজে এলেন আন্দামান পরিদর্শন করতে।

মাউন্ট হ্যারিয়েটের ওপর একটি স্যানাটোরিয়াম করা যায় কি না তাই দেখবার জন্য তিনি দলবল নিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠলেন। সন্ধ্যাবেলা দেখাশোনা শেষ করে তিনি নীচে নেমে এলেন। কাছেই হোপ টাউনের জেটীতে তাঁর মোটর বোট অপেক্ষা করছিল। সমস্ত দলটি লর্ড মেয়োর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে জেটীর দিকে যাচ্ছিল। সবে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। জেটীতে মোটর বোট থেকে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ আসছে, সারেঙরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। লর্ড মেয়ো একটু আগে আগে হাঁটছিলেন। ঠিক যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন হঠাৎ পিছন থেকে দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। চকিতে পেছন ফিরে মশালের আলোয় সবাই দেখে, উন্মুক্ত ছোরা হাতে এক ব্যক্তি উল্কার মত বেগে দৌড়ে গিয়ে লর্ড মেয়োর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে তিনি জলের মধ্যে পড়ে গেলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী ও অন্যান্য সকলে দৌড় গিয়ে লর্ড মেয়োকে তুলে আনলে দেখা গেল, পিঠের জামাকাপড় সব রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাকী লোকেরা আক্রমণকারীকে ধরে ফেলল। লোকটি হাতের ছোরা ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি বদলা (প্রতিশোধ) নিয়েছি, আর আমার দুঃখ নেই'। এদিকে প্রচুর রক্তপাতে লর্ড মেয়ো অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। তাঁকে ধরে সকলে রাস্তার ওপর একটি গরুর গাড়ীতে বসিয়ে দিল। তিনি শুধু একবার শেষ কথা বললেন, 'আমার বেশি লাগে নি, তোমরা চিন্তা কোরো না।' বলতে বলতেই ঢলে পড়লেন আর উঠলেন না। যে লোকটি লর্ড মেয়োকে খুন করেছিল, সে ছিল একজন পাঠান কয়েদী। কি কারণে সে খুন করল বোঝাই গেল না। আন্দামানের গল্প অবশ্য অন্যরকম। কয়েদীর মা নাকি চিঠি দিয়েছিল, 'যে লোক তোমাকে শাস্তি দিয়েছে সে আন্দামানে যাচ্ছে, তুমি প্রতিশোধ নিও।' এই গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ কয়েদীদের চিঠিপত্র নিশ্চয়ই সেন্সর করা হত আর সামান্য কয়েদীকে দ্বীপান্তরে পাঠানোতে ভাইসরয়ের কি হাত থাকতে পারে?

হোপ টাউনের জেটীতে দাঁড়িয়ে সমস্ত ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কোথাকার মানুষ কোথায় এসে মরল। কোথায় England আর কোথায় আন্দামানের Hope town.

ভারত সরকারের তরফ থেকে Geologistদের এক পার্টি এল আন্দামানে। তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম আন্দামানের জঙ্গলে তাঁরা খনিজ সম্পদের কোন সন্ধান পেয়েছেন কি না। তাঁরা জবাব দিলেন প্রচুর সম্ভাবনা আছে, তবে আশানুরূপ অনুসন্ধান তাঁরা এখনও করে উঠতে পারেন নি। অনাবিষ্কৃত দেশগুলিতে মানুষের যখন পদার্পণ হয়, কত সময় কত খনিজ সম্পদ সে সব দেশ থেকে বার হয়, যার ফলে অল্পদিনের মধ্যে সে দেশটার চেহারাই বদলে যায়। আন্দামানের ভাগ্যই আলাদা। তার বুকে আজ পর্যন্ত কোন খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেল না। অথচ সেই অতীত কালে সোনার দেশ (Land of Gold) বলে আন্দামানের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৩৯ সনে রাশিয়ান জিওলোজিষ্ট ডাঃ হেলফার সোনার খনির সন্ধানে আন্দামানে এসেছিলেন। জাহাজ থেকে কয়েকটি লস্কর নিয়ে তিনি রোজ তীরে নামতেন। যতটা সাবধান হবার প্রয়োজন ছিল তিনি তা হন নি, ফলে পোর্ট কর্ণওয়ালিসের কাছে ডাঃ হেলফার যখন জমি পরীক্ষা করতে ব্যস্ত, একদল আন্দামানী নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করে।

এরও বহু আগে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ঠিক এমনি একটি গল্প রটেছিল আন্দামান সম্বন্ধে 'সোনার দেশ' বলে। একটি বৃটিশ জাহাজ পথ হারিয়ে আন্দামানে এসে পড়েছিল। জাহাজটি তীরে নোঙর করা ছিল। নাবিক ও খালাসীরা ডেকে বসে গল্পগুজব করছে এমন সময় একটি আন্দামানী একটি শঙ্খের পাত্র করে সেখান দিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছিল। কি মনে করে সে খানিকটা জল নিয়ে জাহাজের লোহার শিকলটির ওপর ছিটিয়ে দিল। যে যে জায়গায় জল লাগল, দেখতে দেখতে সে সব জায়গা সোনার মত ঝক্-ঝক্ করে উঠল। দারুণ উত্তেজনায় আর লোভে খালাসীরা আন্দামানীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হাতের জল তক্ষুনি মাটিতে পড়ে গেল আর নিরুপায় ক্রোধে খালাসীরা তাকে হত্যা করল। কাজেই সেই জল বা জলের উৎসের সন্ধান তাদের কাছে অজানাই রয়ে গেল।

এদিকে সেই নাবিকরা নানা দেশে বলে বেড়াতে লাগল, আন্দামানের জঙ্গলে এক আশ্চর্য কূপ আছে, যার জলের ছোঁয়ায় পরশমণির মত লোহা সোনা হয়ে যায়। ওলন্দাজদের বহুকাল থেকেই আন্দামানের ওপর লোভ ছিল, এবার তারা এগিয়ে এল আন্দামান অধিকার করার আশায়। প্রায় ৮০০ সৈন্য ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওলন্দাজ জাহাজ এল এই দ্বীপ জয় করতে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এখানকার জংলীদের সঙ্গে তারা পেরে উঠল না। আকাশ অন্ধকার করে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে আন্দামানীরা জাহাজের লোকেদের অতিষ্ঠ করে তুলল। ব্যর্থ হয়ে ওলন্দাজরা ফিরে গেল।

এই গল্পও রূপকথা বলেই মনে হয়, তা না হলে আজ পর্যন্ত আন্দামান দ্বীপের কত ওলোট-পালোট হল, কত বন-জঙ্গল পরিষ্কার হল, কত বসতি স্থাপন হল, কত মানুষ এল-গেল কিন্তু সেই আশ্চর্য কূপের সন্ধান কেউ পেল না কেন?

আরও একটি গল্প—বহুকাল আগের কথা। আন্দামানীরা বছরে একবার করে ছোট ছোট ডিঙ্গি করে নিকোবরে যেত। সেখানে গিয়ে নিকোবরীদের মেরে-ধরে, লুঠপাট করে ফিরে আসত। প্রতি বছর এ রকম অত্যাচার নিকোবরীদের আর সহ্য হল না। একবার তারা দল বেঁধে আন্দামানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং তাদের পশ্চাদ্ধা

করল। এই সংঘর্ষে একটি আন্দামানী ছেলে ধরা পড়ল। নিকোবরীরা তাকে সুমাত্রার এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কাছে দিয়ে দিল। এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ছিলেন মুসলমান। তিনি আন্দামানী ছেলেটিকে ইসলামধর্মে দীক্ষা দিলেন, লেখাপড়া শেখালেন, তারপর তাকে ব্যক্তিগত পরিচারক করে রেখে দিলেন। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছেলেটিকে মুক্তি দিয়ে দিল। এতদিনে সে বেশ বড় হয়েছে, দেশের জন্য মন কেমন করায় সে একটি ডিঙি নৌকা করে সুমাত্রা থেকে আন্দামানে ফিরে এল। তার আত্মীয় স্বজন প্রথমে তাকে চিনতে পারে নি, পরে চিনতে পেরে খুব খুশি। ছেলেটি মহোৎসাহে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, ভগবানের অস্তিত্বের কথা বলে, তাদের প্রার্থনা করতে শেখায়। কিন্তু আন্দামানীদের পক্ষে ভগবানের কল্পনা করা অসম্ভব ব্যাপার। কিছুতেই তাদের প্রার্থনা করতে শেখানো গেল না।

দিন যায়। সভ্যজীবনে অভ্যস্ত হয়ে বন্য জীবন ছেলেটির আর ভাল লাগে না। পালাবার পথ খোঁজে, কিন্তু তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে তার উপর যাতে সে পালাতে না পারে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ফিরে আসবার প্রতিজ্ঞা করে সঙ্গে প্রচুর quick silver (পারদ) নিয়ে ছেলেটি আবার সুমাত্রা ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে সে গল্প করেছে আন্দামানে প্রচুর পারদ পাওয়া যায়। এরপর আরও কয়েকবার ছেলেটি আন্দামানে এসে পারদ নিয়ে গিয়েছে। সুমাত্রার মুসলমান ব্যবসায়ীরা তাকে অনুরোধ করেছিল সঙ্গে করে আন্দামানে নিয়ে যেতে, কিন্তু ছেলেটি তাদের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন আশ্বাস দিতে না পারায় শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবসায়ী পারদের খোঁজে আন্দামানে আসতে সাহস করে নি।

জিওলোজিষ্টরা oil and minerals এর আভাস দিয়েছেন, কিন্তু প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। এখনও কিন্তু আন্দামানের লোকেদের ধারণা ওয়েস্ট কোস্টে জারোয়া অধিকৃত গভীর জঙ্গলে সোনার খনি আছে। কোনদিন যদি জারোয়াদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে হয়ত এই সোনার খনির সন্ধান তাদের এলাকায় পাওয়া যেতেও পারে।

আন্দামানের আদিবাসী বা নেটিভ বলতে সাধারণত চারিটি জাতকে বোঝায়।

(১) আন্দামানী, (২) ওঙ্গি, (৩) জারোয়া, (৪) সেন্টিনেলিজ।

সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, গ্রেট আন্দামান ও লিট্‌ল্ আন্দামান। গ্রেট আন্দামানের আদিবাসীদের বলে 'আন্দামানী', আর লিট্‌ল্ আন্দামানের আদিবাসীদের বলে 'ওঙ্গি'। ওঙ্গি জাতেরই আর একটা শাখা গ্রেট আন্দামানের গভীর জঙ্গলে বাস করে, তাদের বলে 'জারোয়া' এবং সেন্টিনেল বলে একটি ছোট দ্বীপ আছে সেখানকার লোকেদের বলে 'সেন্টিনেলিজ'।

যদিও এখানকার আদিবাসীদের 'ওরিজিন' নিয়ে নানা মতভেদ আছে, Dr.Lidio Cipriani, (Professor of Anthropology, University of Florence) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এরা মালয় পেনিনসুলার সেমাঙ জাতির বংশধর। এই জংলীদের সঙ্গে সেমাঙদের চেহারায় ও আচার ব্যবহারের সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি।

সেমাঙদের মতই এরা শিকার করতে, মাছ ধরতে ও ফলমূল খেতে ভালবাসে। আরাকান পর্বতমালা থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেই থেকে প্রায় হাজার বছর ধরে এরা এই দ্বীপগুলিতে বাস করে আসছে।

সমস্ত আদিবাসীদের দুই ভাগে ভাগ করলে দেখা যায় এক দল হল (a) Erientaga বা forest dwellers, অন্য দল হল (b) Aryoto বা coastal tribes. প্রথম দলের মধ্যে পড়ে আন্দামানী ও ওঙ্গি, দ্বিতীয় দলের মধ্যে পড়ে জারোয়া ও সেন্টিনেলিজ। আন্দামানী—অতীত কালে আন্দামানীর সংখ্যাই ছিল সব চেয়ে বেশি। এদের মধ্যেও অনেকগুলি ছোট ছোট শাখা আছে তাদের মধ্যে প্রধান হল (১) Aka-Bea (২) Aka-Kora (৩) Aka-Jeru (৪) Aka-Boa.

১৮৫৮ সনে যখন কয়েদী উপনিবেশের পত্তন হয় তখন সব মিলিয়ে আন্দাজ করা হয় গ্রেট আন্দামানে প্রায় হাজার দশেক আন্দামানী ছিল। আন্দামানে বিভিন্ন দ্বীপের বাসিন্দাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার ভিন্ন ছিল। আন্দামানী পুরুষরা শিকার করত, মেয়েরা ফলমূল আহরণ করত। এককালে এরা খুব নাচগান প্রিয় ছিল এখন অবশ্য সে সব তারা ভুলে যেতে বসেছে। যে সামান্য কয়েকটি আন্দামানী অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে আন্দামানীদের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সভ্য মানুষের মত তারা জামা কাপড় পরে, কাজকর্ম করে, সহরে বাস করে। আন্দামানীদের যে প্রধান ব্যক্তি তার নাম 'লোকা' (Loka) সে বুশ পুলিশে কাজ করে। তাকেই

ওঙ্গি স্বামীস্ত্রী

একদিন কয়েকটি সঙ্গীর সঙ্গে পোর্টব্লেয়ারের রাস্তায় পেয়ে আলাপ করেছিলাম। সভ্যজাতির সংসর্গে এসে ধীরে ধীরে আন্দামানীরাই সর্বপ্রথম বশ্যতা স্বীকার করে। 'আন্দামান হোমের' কল্যাণে অনেকে লেখাপড়া শিখে সভ্য হয়ে সরকারকে সাহায্য করে। সভ্য জাতের সঙ্গে মেশার ফলে কেমন করে একটা জাত ধ্বংস হয়ে গেল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আন্দামানীরা।

ওঙ্গি—পোর্টব্লেয়ার থেকে ৪০ মাইল দূরে লিট্‌ল আন্দামান। সরকারী কাজে চীফ কমিশনার এবং আরও কয়েকজন অফিসার লিটল আন্দামান যাচ্ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে আমি ও চীফ কমিশনারের স্ত্রী মিসেস মহেশ্বরী সেই দলে ছিলাম। পথে Cinque island, Brother and Sister island পড়ল। এই দ্বীপগুলিও পাহাড়ী এবং অজস্র গাছে ঢাকা। লিট্‌ল্ আন্দামানে পৌঁছে বড় মোটর বোটটি দূরে রেখে ছোট আউট বোটে করে তীরে গিয়ে নামলাম। বছরের প্রায় সব সময়েই এখানকার সমুদ্র অশান্ত থাকে, তাই ছোট বোটে করে আসতে বেশ ভয় করে। গিয়ে দেখি প্রায় একশ' জন ওঙ্গি ছেলে বুড়ো ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

চীফ কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের তো এখানে আসা হঠাৎ ঠিক হয়েছে, তোমরা জানলে কি করে যে আমরা আসব?'

একজন বুড়ো ওঙ্গি বলল, 'আজ সকালে একটা বিশেষ পাখী দেখেছি তাইতেই জেনেছি যে এখানে আজ বড় বোট আসবে।'

আমরা তো শুনে অবাক, এ ধরণের অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করি কি করে?

ওঙ্গিরা নিজেদের দ্বীপে প্রায় উলঙ্গ হয়ে থাকে, সামান্য একটি নেংটী ছাড়া। মেয়েরা কোমরের নীচে শুধু একটি ঘাসের গুচ্ছ ঝুলিয়ে রাখে। কি অসম্ভব নোংরা জাত। সামনে দাঁড়ালে গায়ের গন্ধে ভূত পালায়। কি কারণে জানি না প্রত্যেকেরই প্রায় চর্মরোগ আছে। দেখলে কেমন গা ঝিম ঝিম করে, দেখতে ঠিক আন্দামানীদের মতই তবে এদের মাথার চুলগুলি ভারী মজার এক এক জায়গায় থোকা থোকা করা। ঠিক মনে হয় যেন কেউ সারা মাথায় আঠা দিয়ে জায়গায় জায়গায় চুলগুলি লাগিয়ে দিয়েছে।

আমরা তারপর গেলাম ওঙ্গিদের গ্রামের দিকে। গ্রাম বলতে এখানে বোঝায় বিরাট বিরাট এক একটি communal hut একসঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক এক ঘরে বাস করে। শোবার জন্য প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মাচান আছে, শোবার ঘরেই রান্না করে, আবার কেউ মরে গেলে শোবার ঘরেই মাচানের নীচে কবর দেয়। দিনের বেলা বেশির ভাগই ওঙ্গিরা বাইরে থাকে, রাত্রিবেলা ঘরে যায়। আমার দেখে অনেকটা উদ্বাস্তুদের transit camp-এর মত লাগছিল। ওঙ্গিরা গাছের ফলমূল, মাছ, মধু, কচ্ছপ এই সব খেতে ভালবাসে। লিট্‌ল আন্দামানে কোন গরু নেই। ওঙ্গিরা কোনদিন দুধ খেয়েছে কি না সন্দেহ। লিট্‌ল আন্দামানে একটি anthropological hut এদের আছে। এখানে প্রায়ই এই বিভাগের অফিসার এদের সুখ-সুবিধা দেখে যান। আন্দামান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখন ওঙ্গিদের চাষবাস শেখানোর কথা ভাবছেন, তা না হলে ভবিষ্যতে এদের না খেয়ে মরতে হবে।

ওঙ্গি মেয়েদের মাথাগুলি ন্যাড়া। মজার কথা, মাথার চুল কেন এখানকার আদিবাসী মেয়েরা পছন্দ করে না জানি না। উলঙ্গ ওঙ্গি মেয়েদের চেহারায় যেটা সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল এদের নিতম্বদেশ বা পাছা। এমন অদ্ভুত পাছা কখনও আমাদের চোখে পড়ে নি। কেউ যেন মনে করবেন না এরা 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' এদের পিছন দিকটা অদ্ভুতভাবে বাইরের দিকে বের করা অর্থাৎ bulging out। দেখা গিয়েছে যে, একটি তিন-চার বছরের শিশু তার মায়ের পাছার উপর পা রেখে অবলীলাক্রমে দাঁড়াতে পারে। আমরা গল্প আগেই শুনেছিলাম বলে অবাক হয়ে ওঙ্গি মেয়েদের পাছার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পরিবেশের জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, এই নগ্নকায় স্ত্রী-পুরুষগুলির সামনে আমরাও কিন্তু বিশেষ সঙ্কোচবোধ করছিলাম না। বাচ্চাগুলি দেখতে কিন্তু ভারী মিষ্টি, কষ্টিপাথরে গড়া একপাল ন্যাড়া ন্যাড়া শিশু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ওঙ্গিরাও খুব নাচগান প্রিয়। আন্দামানীদের মত এরাও সাদা ও লাল গিরিমাটি দিয়ে সারা শরীর আঁকতে ভালবাসে। আমাদের কাছে ওঙ্গিদের চিত্রিত করা চেহারাগুলি ঠিক ভূতের মত লাগছিল, অন্ধকারে দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। এমনিতে এরা বেশ শান্ত স্বভাবের, তবে অল্পতেই রেগে ওঠে। কয়েকবছর আগে এক বর্মী শেলপোচার একটি ওঙ্গি মেয়ের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করাতে ওঙ্গিরা তাকে হত্যা করে। এই শেলপোচাররা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির হয়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা কি না করতে পারে। ওঙ্গিদের নানারকম বদ অভ্যাস শেখানোতে তাদের দারুণ উৎসাহ। এমন কি আফিমও এদের খাওয়াতে শেখাচ্ছে।

সভ্য ওঙ্গি (পুরুষ) আদিম ওঙ্গি (স্ত্রী)

ওঙ্গিদের দেখলে বিশ্বাস হয় না যে এরাও একসময় আন্দামানীদের মত বিদেশী দেখলেই তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করত।

কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের পর East India Co. পোর্টব্লেয়ার ও তার আশপাশের দ্বীপগুলি নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ৪০ মাইল দূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ লিট্‌ল আন্দামানের দিকে কেউ নজর দেয় নি।

১৮৬৭ সনে ইংরেজ জাহাজ 'Assam valley' এ পথ দিয়ে যাবার সময় লিটল আন্দামান-এর দক্ষিণে থেমেছিল। খাবার জল ফুরিয়ে যাওয়ায়—ইংরেজ খালাসী ও নাবিকরা তীরে নেমেছিল ওঙ্গিরা তাদের হত্যা করে। পোর্টব্লেয়ারে যখন এ খবর পৌঁছাল চীফ কমিশনার অনেক লোকজন দিয়ে এক ষ্টীমার পাঠিয়ে দেন লিটল আন্দামানের নাবিকদের খোঁজ করবার জন্য। পর পর দুবার এই দলটি ওঙ্গিদের আক্রমণে উত্যক্ত হয়ে বন্দুক ছোঁড়ে তাতেও বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ১৮৭১ সনে General Steward যখন পোর্টব্লেয়ারে আসেন তিনি ওঙ্গিদের বশ করার উদ্দেশ্যে নিজে লিটল আন্দামানের রওনা দিলেন। তীরে নেমে কিন্তু একটি ওঙ্গিকেও দেখতে পেলেন না। এবার বোধ হয় গোলাবারুদের ভয়ে ষ্টীমার দেখেই ওঙ্গিরা উধাও হয়েছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে General Steward তাদের ঘরে প্রচুর উপহার সামগ্রী রেখে চলে এলেন। কয়েকবার এরকম জিনিসপত্র রেখে আসার পর মনে হল ওঙ্গিরা ধীরে ধীরে বিদেশীদের বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

Mr. M. V. Portmanই প্রথম ব্যক্তি যিনি ওঙ্গিদের সঙ্গে সত্যকারের বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন। একবার অনেক কষ্টে অনেক কায়দা করে কয়েকটি ওঙ্গিকে মিঃ পোর্টম্যান বন্দী করেন। কিছুদিন ধরে নানাভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করে অনেক জিনিসপত্র দিয়ে আবার তাদের লিট্‌ল আন্দামানে পাঠিয়ে দেন। মিঃ পোর্টম্যানের সদয় ব্যবহারে ওঙ্গিরা খুব খুশি হয় এবং তাঁর কথা মানে। এর পর আর তারা কোন বিদেশী জাহাজ আক্রমণ করে নি। ওঙ্গিরা অপদেবতায় খুব বিশ্বাসী। ওঙ্গিদের ভাষা, আচার ব্যবহার, তীর ধনুক, আন্দামানীদের থেকে আলাদা।

ওঙ্গিদের মধ্যেও সিফিলিশ রোগ আছে। তার ফলে বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ এদের মধ্যেও লেগেছে। প্রতি দশটি ওঙ্গি মেয়ের মধ্যে চারটিই বন্ধ্যা। এদের সংখ্যাও অনেক কমে এসেছে। সভ্যজাতির প্রভাব থেকে এদের দূরে রাখার জন্য সরকারের তীক্ষ্ণ নজর আছে। সরকারী কর্মচারী ছাড়া সাধারণ লোকের লিটল আন্দামানে প্রবেশ নিষেধ। কেউ যেতে চাইলে অনুমতি নিতে হয়। ওঙ্গিদের জীবন-যাপনের প্রণালী আজও সেই প্রস্তর-যুগের মত; সমস্ত ওঙ্গি জাতটাই লিট্‌ল আন্দামানে বাস করে। সভ্য জগতের কোন প্রভাব সেখানে পড়ে নি। নিজেদের রাজ্যে নিজেদের রীতিনীতি নিয়ে মনের আনন্দে তারা বাস করছে। ছোট ছোট ডিঙ্গি নিয়ে ওঙ্গিরা মাঝে মাঝে পোর্টব্লেয়ারে আসে তামাক, চিনি, দা, কুড়ুল, পেরেক এবং অন্যান্য জিনিষের জন্য। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একদিন চার পাঁচটি ওঙ্গি যাচ্ছিল, আমরা অবাক হয়ে তাদের দেখছিলাম, লোকগুলি আমাদের দেখে বলল 'রূপাইয়া' 'রূপাইয়া' অর্থাৎ তাদের দর্শনী চাইল। আমি একটা পাঁচ টাকার নোট কি মনে করে দিয়ে দিলাম। সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, ওরা পাঁচ টাকার নোট দোকানে দিয়ে বিড়ি বা চুটা নিয়ে চলে যাবে, এরা টাকার মূল্য এখনও শেখে নি।

ওঙ্গিদের ঘন ঘন পোর্টব্লেয়ারে আসা সরকার খুব পছন্দ করেন না, কারণ আশঙ্কা করেন এভাবে সভ্য সমাজের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ করলে ওঙ্গিদের অবস্থাও আন্দামানীদের মত হয়ে পড়বে। Dr. Cipriani তিন মাস লিট্‌ল আন্দামানের ওঙ্গিদের সঙ্গে বাস করেছেন। তিনি বলেছেন ওঙ্গিরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুখী জাত।

ওঙ্গি ও তাদের নৌকা

সেণ্টিনেলিজ—আর একটা হিংস্র জাত সেণ্টিনেলিজ। এদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোন যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারায় এদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যতবার Sentinel Islandএ নামবার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই এরা বাধা দিয়েছে।

কয়েকমাস আগের কথা। দিল্লী, মাদ্রাজ কলকাতা থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন সরকারী কাজে পোর্টব্লেয়ারে। তাঁদের নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন অফিসার লিট্‌ল আন্দামানে গেলেন। সেখান থেকে এঁরা গেলেন 'Sentinal Island'-এ। এঁর উদ্দেশ্য সেণ্টিনেলিজদের দেখা। দূর থেকে দেখা গেল তীরে পাঁচ ছয় জন সেণ্টিনেলিজ ঘোরাফেরা করছে। বোট দেখেই তারা উধাও হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট পরেই দেখা গেল প্রায় ৫০।৬০ জন সেণ্টি-নেলিজ তীর ধনুক হাতে তীরে এসে দাঁড়িয়েছে। অগত্যা সেণ্টিনেলিজদের ভাল করে দেখার আশা ত্যাগ করে সকলকে সেখান থেকেই ফিরতে হল। সেণ্টিনেল দ্বীপটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোন দিন তারা সেটল্‌মেণ্টের উপর হামলা করে নি। আশ্চর্যের কথা ভেলা করে বা ডিঙ্গি করেও কোনদিন সেণ্টিনেলিজরা অন্য কোন দ্বীপে যায় নি।

জারোয়া—পোর্টব্লেয়ারে আসবার পর যে শব্দটা শুনলে হৃৎকম্প
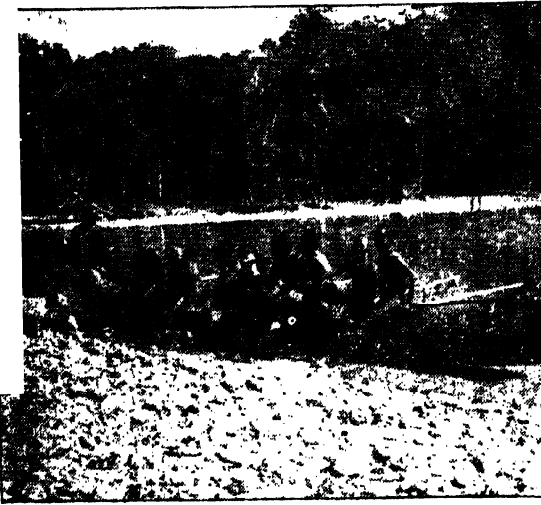
হত তা হল 'জারোয়া'। চোখে কেউ জারোয়াদের দেখতে পায় না, কিন্তু তাদের ভয়ে আন্দামানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাঁপে। অদ্ভুত হিংস্র এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ জাত। পেনাল সেটল্‌মেণ্টের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত এদের স্বভাব একই রকমের রয়ে গিয়েছে। এরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাস করে।

বিভিন্ন দ্বীপের আন্দামানীদের বন্ধুত্ব সূত্রে মেলাবার উদ্দেশ্যে রেভারেণ্ড করবাইন নানা জায়গায় অভিযানে যেতেন। এই রকম একটি অভিযানে গিয়ে তিনি প্রথম জানতে পারলেন যে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে আরও একটা হিংস্র জাত আছে। মিঃ বনিংটন যদিও বলেছেন জারোয়ারা ওঙ্গি জাতেরই একটি শাখা। এ বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। কারণ মূলগত দুইটি ভিন্ন স্বভাবের মানুষ ওঙ্গি ও জারোয়া। জারোয়ারা সম্পূর্ণ অরণ্যচারী, ওঙ্গিরা সমুদ্রতীরবাসী। বর্তমানে জারোয়াদের মত হিংস্র জাত আন্দামানে আর নেই। আগে এরা পোর্টব্লেয়ারের কাছাকাছি ছিল। এখনও তারা লোকালয় থেকে দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে গিয়েছে। স্বভাবে যাযাবর। আজ এখানে কাল সেখানে। সভ্য মানুষকে তারা আজও শত্রু বলে এড়িয়ে চলে, ১৮৫৮ সন থেকে আজ পর্যন্ত বহুবার বহু ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে জারোয়াদের সঙ্গে একটা আপোষ করবার কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হয় নি। সভ্য মানুষের উপর তাদের প্রচণ্ড আক্রোশ। জঙ্গলে বাস করলেও সুযোগ পেলেই লোকালয়ে এসে আক্রমণ করে। জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে বহু লোক জারোয়াদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। জারোয়া এলাকার কাছাকাছি 'Bush Police'এর বন্দোবস্ত আছে। বুশ পুলিশের কাজ হল জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে জারোয়াদের গতিবিধি লক্ষ্য করা। অনেকবার অনেক বুশ পুলিশও এদের হাতে মারা পড়েছে।

যে সব উদ্বাস্তু কলোনীগুলি জঙ্গলের ভেতর জারোয়া এলাকার কাছাকাছি, সে সব অঞ্চলে জারোয়ারা প্রায়ই আক্রমণ করে।

এই রকম একটি উদ্বাস্তু কলোনী তিরুর। তিরুরের গল্প হাটাটাবাদের এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোকের কাছে শুনেছি। দুইটি পাহাড়ের মাঝে ছোট একটি উপত্যকা তিরুর। পাহাড়গুলি গভীর জঙ্গলে ঢাকা, জারোয়াদের এলাকা। উপত্যকার মধ্যে যা ধানী জমি পাওয়া গিয়েছে, তা কয়েকজন উদ্বাস্তুকে দিয়ে তাদের সেখানে বসানো হয়েছে। জারোয়ারা এই উদ্বাস্তুদের বহুবার আক্রমণ করেছে। পাহাড় থেকে নেমে এসে তারা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে, ভোর হলেই আক্রমণ করে।

মণিলাল চক্রবর্তী একজন উদ্বাস্তু ভদ্রলোক। থাকেন তিরুরে। ব্যক্তিগত কোন কাজ উপলক্ষে তিনি পোর্টব্লেয়ারে এসেছিলেন, ঘরে ছিল তাঁর স্ত্রী একা। একদিন ভোরবেলা মেয়েটি দরজা খুলে বের হতেই জারোয়ারা তাকে আক্রমণ করে। মেয়েটি চীৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালায়, কিন্তু তার আগেই তীর এসে তার গায়ে লাগে। মেয়েটির চীৎকার শুনে অন্যান্য উদ্বাস্তুরা উল্টোদিকে পালাতে শুরু করল। জারোয়ারা তাদের পেছন পেছন ধাওয়া না করে উদ্বাস্তুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। জারোয়াদের হাত থেকে উদ্বাস্তুদের রক্ষা করার জন্য সেখানে বুশ পুলিশের বন্দোবস্ত হয়েছে।

সাউথ আন্দামান ও মিডল্‌ আন্দামানের জঙ্গলে ঢুকতে সকলেরই প্রাণ কাঁপে। জঙ্গলে কোন হিংস্র জন্তুর ভয় নেই কিন্তু জারোয়াদের আতঙ্ক বোধ হয় তার থেকে বেশি। বাঘ ভালুক সামনে পড়লে তো চোখে দেখতে পাওয়া যায় এবং সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু এখানে কখন যে কোথা দিয়ে জঙ্গল ভেদ করে বিষাক্ত তীর উড়ে এসে পড়বে, তা কেউ বলতে পারে না। সভ্যজাতির বিরুদ্ধে দারুণ বিতৃষ্ণা ও প্রতিহিংসা নিয়ে এরা শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করে কখন কি ভাবে মানুষকে আক্রমণ করবে। অনেক সময় ফরেস্টের কাজে লোকজন গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। জারোয়ারা যদি টের পায় তাদের এলাকায় মানুষ ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে তারা অদ্ভুত একটা আওয়াজ (cooing) বার করে সবাইকে সাবধান করে দেয় এবং গাছের গুঁড়িতে ঢাকের মত ডুম ডুম আওয়াজ (buttress beating) করে সবাইকে প্রস্তুত হতে সংকেত পাঠায়।

অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে জারোয়াদের ধরবার জন্য, গভর্নমেণ্টের নিয়ম অনুযায়ী বন্দুক ব্যবহার না করে। একবার একটি পুলিশবোট ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল। দূর থেকে দেখা গেল দুইজন জারোয়া সাঁতার দিচ্ছে তীরের কাছে। ধীরে ধীরে ইঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে ছোট বোট নিয়ে খানিক দূর গিয়ে জারোয়া দুইটিকে বন্দী করা হল। পোর্টব্লেয়ারে নিয়ে আসার পর anthropologistরা চেষ্টা করতে লাগলেন তাদের ভাষা শিখতে। জারোয়াদের ভাষা শিখে তবে তাদের বোঝান হবে যে, 'আমরা তোমাদের শত্রু নই, বন্ধু।' ভাষা শেখবার আগেই এক রাত্রিতে কিন্তু তারা উধাও হল। দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কি করে যে তারা পালাল কেউ জানে না।

[ক্রমশ।

যুগে যুগে

রেখা দত্ত

স্বধর্ম স্থাপন-লগ্নে পেয়েছি তোমার পরিচয় ;
যুগে-যুগে, বারে-বারে আপনার প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে অমৃত-রসে, সোনালী আশায় রাঙা টিপ
সৃষ্টির ললাটে তুমি এঁকেছো—যা একান্ত বিস্ময়।

তোমার হৃদয়-আর্শি যখনই খুলেছি অবহেলে,
দেখেছি, ঐশ্বর্যময় ঋষিরা সেখানে আছে বসে—
নির্দয় এ-পৃথিবীর দুঃখ-ভয় ভোলার মানসে ;
তুমি জানো—কতটুকু অমৃতত্ব কোন্‌ স্বর্গে মেলে ?

তোমার সৃষ্টিকে তুমি চিরদিন খুবই ভালোবাসো—
দুর্দিনের অন্ধকারে প্রয়োজন বোধে ছুটে আসো ॥

কিংশুকরাগিনী

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৭

তারপরের ইতিহাস মহাভারততুল্য ; সব বলতে গেলে ইহজীবনে শেষ হবে না, সংক্ষেপে সারতে হবে।

বার কয়েক মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন্ কনটেস্ট করেছেন এবং জিততেও তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, তাই কুঞ্জ রাহার মনে মনে একটু গর্ব ছিল যে য়্যাসেম্বলী ইলেকৃশনও তুড়ি মেরে জিতে যাবেন। সহরের লোক শিক্ষিত, তাঁদের বিচার করবার ক্ষমতা আছে, নিজস্ব মতবাদ আছে। তাদেরই যখন তিনি বাগিয়ে এনে ভোট আদায় করতে পেরেছেন, তাও একবার নয় বেশ কয়েকবার, তখন মফঃস্বলের চাষাভূষোগুলোকে আর বাগাতে পারবেন না, খুব পারবেন। কয়েকজন পাকা লোককে দিয়ে একবার নামটা ও বাক্সের গায়ে যে ছবিটা থাকবে, সেটার কথা লোকগুলোর মাথায় ভাল করে ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে হবে। এই কর্মটি ভালভাবে করতে হবে নইলে ব্যালট পেপার হাতে নিয়ে বাক্সের কাছে গিয়ে চেঁচাবে, 'ও মাতুল কোন্ খোপে ফেলতে বললে গো। এ শালা এক আচ্ছা ফ্যাচাং রে বাপু, এক চিল্‌তে কাগজ আর এক গণ্ডা বাস্‌কো, কার গব্বে ফেলি এখন।' তা রাহামশায় নিজের চিহ্নটি বেছেছেন ভাল, বিড়ির বাণ্ডিল, গাঁয়ের লোকদের মনে রাখতে কষ্ট হবে না। ব্যবসার কল্যাণে জেলার জায়গায় জায়গায় আড়ত ছিল, সারা জেলাতেই লোক ঘুরে ঘুরে মাল কিনতো, তাদের চিঠি দিয়ে সহরে ডেকে পাঠান হল। কাদা ঘোষালের ওপর হুকুম জারী হল, যত পার ছেলে-ছোক্‌রা জোটাও, তা সেও মন্দ লোক জোটাচ্ছে না। রয়েল কিন্নরী অপেরার গোটা সখীর দলকে ভাড়া করা হয়েছে, এরা ছোট ছোট দলে সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে নেচে-গেয়ে ভোট দিতে বলবে। স্কুলের হেড পণ্ডিতমশাই তিনটে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা লিখে দিয়েছেন, সময় পেলে সেগুলোর ওপর রাহামশায় চোখ বুলোচ্ছেন। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কিছুতেই সেগুলো মনে থাকছে না। কাজল চমৎকার একটা কোডিতা লিখেছে। প্রথমটা কেউই তা বুঝতে পারেন নি কিন্তু কাজল যখন বুঝিয়ে দিলে, তখন ধন্য ধন্য পড়ে গেল। কুঞ্জ রাহা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চেয়ে মনে মনে বললেন—না, ছোক্‌রার গুণ আছে। রাগিণীর সঙ্গে একেবারে বেমানান হবে না। একটু বাঁদর বা। তা বয়েসকালে অমন বাঁদরামী সকলেরই থাকে। কাজলের কোডিতা ছাপা হচ্ছে, একদিকে কোডিতা উল্টোদিকে তার মানে।

ইলেকৃশনে দাঁড়াবেন এই কথাটি প্রচার হওয়াতে সন্ধ্যের দিকে দু'-একজন লোক আসা সুরু হয়েছিল, এখন নীচেটা লোকজনে গিজ গিজ করতে লাগল। ফলে চা-তৈরির জন্যে তোলা উনুনের পরিবর্তে রীতিমত ভিয়েন বসাতে হল ; বিছেবাবুও সহরের পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রোজ সন্ধ্যেয় আসতে সুরু করলেন, গুঁই চাটুয্যের উত্তেজিত কণ্ঠ সারা বাড়ি মাতিয়ে তুললো। দেখে শুনে কুঞ্জ রাহা মনে মনে ভারী বল পেলেন। বক্তৃতা করছেন, বোধ হয় য়্যাসেম্বলীতে এমন স্বপ্নও দু' একদিন রাতে দেখলেন।

কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙতেও বেশি দেরী হল না।

কুঞ্জ রাহা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সত্য, কিন্তু ওয়াটার ওয়ার্কারস্ ইউনিয়নটি পিক্ পার্টির খপ্পরে। পিক্ পার্টি কাউকে দাঁড় করায় নি বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দীনু দত্তকেই তারা সাহায্য করবে। কাজেই একদিন সকালবেলা বলা নেই কওয়া নেই 'ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের' অজুহাতে কলের জল বন্ধ হয়ে গেল। সহর এবং তার তিন চার মাইলের বাসিন্দেরা ঘড়া বালতি নিয়ে অকেজো টিউবওয়েলগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে জল না পেয়ে যখন পরস্পরকে আক্রমণ করতে সুরু করলে, তখন দেখা গেল ভগীরথরূপী দীনু দত্ত ডজন দুই লরী-রথে মা ভাগীরথীকে আর্তত্রাণের জন্যে বয়ে আনছেন। লোকে ধন্য ধন্য করল। পরদিন সারা সহরে এই নবভগীরথের গুণকীর্তন করে পোস্টার ছড়িয়ে পড়ল। জল পিক্ পার্টির খপ্পরে থাকলেও বিজলীবাতি ইউনিয়ন ছিল স্বাধীনতা সঙ্ঘের মুঠোয়। সুতরাং বদলা হিসাবে একদিন সারা সহরের বিজলী বাতি হঠাৎ জ্বলেই নিভে গেল। তার পরেই দেখা গেল ডজন ডজন হ্যাজাক্ লণ্ঠন জ্বালিয়ে স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রার্থী প্রাণবল্লভের কর্মীরা সহরবাসীর অন্ধকার মোচনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। এবারও ধন্য ধন্য পড়ল।

পরদিন এই নব আলোক দূতের পোস্টারে সারা সহরের একটি বাড়ির দেওয়ালও খালি রইল না। অবশ্য দীনু দত্তের তরফ উল্টো পোস্টারও বের হল। শাসক সম্প্রদায়ের ঘৃণিত রূপ। কার্যসিদ্ধির জন্য বিজলী সরবরাহ বন্ধ। কুঞ্জ রাহার দল কিছু করতে না পেরে রাতারাতি দুদলের পোস্টারগুলোই ছিঁড়ে ফেললে। ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধও হয়ে গেল। কুঞ্জ রাহা ছিলেন না। বাইরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি

ফিরে এলেন। মন্ত্রণা পরিষদ বসল। পোস্টার ইনচার্জ কাদা ঘোষাল বললে—এতে স্যার কাজ হবে না; ফাটাফাটি করার ঢাপাও হুকুম দিয়ে যান। আপনি কেন যে ভয় পাচ্ছেন বুঝি না। ঐ তো পানবল্লভের দলের ছোঁড়াটাকে পিকেদের রাধু এই সান্ সাইকেলের চেন দিয়ে এইসা ঝাড়লে যে বাপের নাম ভুলে গেছে। কি হয়েছে কিছুই না। আবার পানবল্লভের ওরাও বদলা নেবে, মিটে যাবে। এ না করলে কিস্যু হবে না। ছুটো পটকা ফাটিয়েই বা কি হবে! কাঁহাতক আর পোস্টার ছিঁড়ি বলুন তো। আর আমরা যেমন ছিঁড়বো ওরাও তেমনি আমাদেরগুলো ছিঁড়বে। এতে কি হবে? তার চেয়ে দানাঘ্ন লেগে যাই। এই তো জল-লাইট এখানকার বন্ধ করে রুস্তমি দেখালে। আপনি মালঝাল খাইয়ে নসীবপুরের কি আবদুল্লাবাদের ইউনিয়নের পাণ্ডাদের হাত করে জল আলো বন্ধ করে দিন, আমরা রমজানি দেখিয়ে আসি।

বিছে উকীল বললে—এটা কাদা মন্দ বলে নি। নসীবপুর আর আবদুল্লাবাদ ও দু'জায়গায় ত' লাইট আর কলের জল আছে। আবদুল্লাবাদের এ ইউনিয়নের ভেতরে ছত্রিশটা দল, ওখানে চেষ্টা করলে কাজ হতে পারে।

কুঞ্জ রাহা বললে—তা হলে করুন যা করবার।

কাদা ঘোষাল বললে—আর একটা কথা স্যর। আপনার সঙ্গে যখন থাকি তখন তো কথাই নেই বুকে দশটা হাতীর হিম্মং আসে. কোনও শালাকে মানুষের মধ্যেই ধরি না: কিন্তু যেখানে নিজেরা যাই সেখানে ভারী লজ্জা করে। লোকে বলে কুঞ্জ রাহার ভোলোনটিয়ার এয়েচে। অথচ দেখুন ওদের ছোঁড়াদের সঙ্গে শুকদেব থাকে। লোকে বলে অমুক দত্তের ছেলে এয়েচে। আর ওর পেছু পেছু যত কলেজের ছোঁড়া সব দীনু দত্তের হয়ে খাটছে। খাটবে না? বন্ধুর বাপ? লোকে নীচু হয়ে কথা শোনে তড়পাতে ভয় পায়। পানবল্লভকে দেখুন মেয়েগুলোকে ইস্কুলে অবধি যেতে দিত না, কাল থেকে রাস্তায় ছেড়েছে। মেয়েরা শুনলুম লোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে মেয়েদের পটাচ্ছে। সবই তো মাসী পিসী। পিকপার্টিও একপাল ধিঙ্গী মাল এনে ছেড়েছেন। আমাদের দিকটা একবার ভাবুন তো। মেয়ে ভোটারদের কাছে যেতে হবে ত'। আমার বাড়ির বৌঝি কি কেতোর বোন সেগুলো কি জানে ক' অক্ষর গো-মাংস! অবিশ্যি উকিলবাবুর, ডাক্তারবাবুর বাড়ির মেয়েরা থাকবেন, তবুও আপনার বাড়ির ছেলেমেয়ে থাকলে ভাল হয়। না কি বলুন জোশীদা।

কুঞ্জ রাহার ইলেকশন ক্যাম্পেনের জি-ও-সি হচ্ছে হেমেন ডাক্তারের ছোট ভাই গজেন, ছেলেরা তাকে জি-ও-সি'র বদলে জোশীদা বলে ডাকে।

গজেন বললে—কথাটা কিন্তু একদিক দিয়ে ঠিক।

প্রাণবল্লভবাবুর সবই ছেলেমেয়েরা নেমেছে তার ওপর স্বাধীনতা পার্টির লেডি ওয়ার্কাররা ত' আছেই। পিকপার্টিরও ঐ অবস্থা লেডি ওয়ার্কারের অভাব হবে না'। তার ওপর দীনুবাবু শুনলুম সহরের ভাল ভাল ঘরের স্কুল-কলেজে পড়া দু'চারজন মেয়েকেও দলে এনেছেন, ওঁর বোন দামিনী দেবীর ওপরে তাদের দেখাশোনার ভার। তাঁর

যে মুখ জানেন তো। সে মুখের জবাব একমাত্র আপনার বাড়ির লোকেরাই দিতে পারে, আমরা ঠিক পারি না। তা ছাড়া উনি আবার কথায় কথায় জাত তুলে—।

কাদা ঘোষাল মাঝখানেই বললে—তবে বলুন স্যর। বেটাছেলে হয় কিছু বললে দিলুম দুই ঝাপ্পড়, ব্যস ঠাণ্ডা। কিন্তু এ মেয়েছেলে তার ওপর দামিনী পিসী। তাই বলছিলুম আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদেরও ভেড়ান।

—কিন্তু আমি এখন ছেলেমেয়ে পাই কোথায় বলত। আমার সংসার ত' জান।

—তা জানি। তা ধরুন উকীলবাবুর ভাইপো গেল আমাদের সঙ্গে। লোকে জিজ্ঞেস করলে বুক ফুলিয়ে বললুম, হাকিম সাহেবের ছেলে আমাদের রাহা মশাই-এর হবু জামাই। হ্যাঁ সবাই তাই জানে। আমাকে ত' সেদিনে একজন জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ হে কুঞ্জবাবুর মেয়ের সঙ্গে হাকিমের ছেলের বে' হবে না? আমি বললুম, কে বললে হবে না?—না, এখন দেখি কি না খৃষ্টান মোড়লদের বাড়ি যাতায়াত করছে তাই বলছি। লোকের ভুলটাও ভেঙ্গে যাবে। তারপরে ধরুন আপনার মেয়ে রইল সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা কলেজের মেয়ে তার সঙ্গে এল। শুকদেব যেমন ভাবে ছোঁড়াদের জুটিয়েছে। এইভাবেই লোক জড় করতে হবে, না কি বল জোশীদা।

বাড়ির ভেতরে এসে কুঞ্জ রাহা স্ত্রীর কাছে কথাটা তুললেন।

—আমি পারবো না?

—কেন পারবে না?

—আমি ঘরের বউ লোকের দোয়ে দোরে ভোট দাও, ভোট দাও বলে ঘুরে বেড়াব কি।

—আমি ঘুরছি কি করে? আমি পারলে তুমি পারবে না কেন? জান সব বড় বড় ঘরের বৌ-ঝিরাই এ কাজ করে। বিশ্বাস না হয় তোমার হাকিমদিদিকে জিজ্ঞেস কর।

শৈলজার এই ধরণের কথা হাকিমদিদির মুখে শোনা ছিল বললেন—তা করে, কিন্তু তারা সব লেখা পড়া জানা মেয়ে। বলতে কইতে পারে, কিন্তু আমি!

—কম কিসে। সবই তো জানা শোনা যায়, তা ছাড়া তুমি একা যাচ্ছ না সঙ্গে মেয়ে ভলেন্‌টিয়ার থাকছে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, বিছেবাবুর স্ত্রীও থাকবেন, চাই কি বললে হয়ত তোমার হাকিমদিদিও থাকতে পারেন।

—সবাই আসবে?

বিছেবাবু, ডাক্তারবাবু ত' বলে গেলেন তাই। দায় তো তোমার, পরের বাড়ির বৌঝি এসে খাটবে, আর তুমি ঘরে দোর এঁটে থাকবে নাকি?

শৈলজা মনে মনে পুলকিত হলেন, এইখানে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন তিনি। তাঁরই কর্তার হয়ে সবাই খাটতে আসছে।

—কি গো চুপ করে রইলে যে।

—যখন বলছ তখন আর বসে থাকি কি করে, করতেই হবে।

রাগিণী কিন্তু কথাটা শুনেই বেঁকে বসল, বললে—আমি পারবো না।

—কেন পারবি না, তোর মা পারবে আর তুই লেখা পড়া জানা মেয়ে হয়ে পারবি না কেন?

—কেন আবার কি, আমার সামনে এগজামিন, তা ছাড়া এসব হৈ হৈ আমার ভাল লাগে না।

কুঞ্জ রাহা চটে গেলেন—এগজামিন! তুই একলাই এগজামিন দিবি আর কারু এগজামিন নেই, না। মেয়ে ছেলে তার আবার এগজামিন! শুকদেবের এগজামিন নেই, সে কি ভাবে উদয়-অস্ত আহার নেই নিদ্রা নেই খাটছে, একবার দেখে আয়। সে যে ছেলে, বাপের অপমান তারও অপমান। আর আমার যে মেয়ে, জানে দু'দিন বাদে পরের ঘরে যাব, কাজেই বাপের বাড়ির মান অপমানে তার ভারী বয়েই গেল। কই গো কোথায় গেলে।

—এই যে ··।

—শোন তোমার বিদুষী মেয়ে কি বলে?

—কি হল আবার?

—মেয়েকেই জিজ্ঞেস কর। ওঃ থাকতো একটা ছেলে বাপের দুঃখ বুঝতো!—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শৈলজা মেয়েকে বোঝাতে বসলেন।

কথাটা দত্তবাড়িতে পৌঁছতে দেরী হল না। দীনু দত্ত তরুবালার কাছে কথাটা বললেন। তরুবালা শুনে কোনও জবাব দিলেন না।

দীনু দত্ত বললেন—কি হল চুপ করে রইলে যে।

—ঘরের বৌকে রাস্তায় বার করার যদি এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে আর একটা বিয়ে কর, ছেলেরও বিয়ে দাও।

—কেন বিয়ে করার কি হল? ঐ তো শুনলে কুঞ্জর পরিবার, বিছে উকীল, হেমেন ডাক্তার, হাকিম সাহেবের বাড়ির ওঁরাও ক্যানভাস করতে বেরুচ্ছেন। এতে দোষের কি? তাছাড়া দামিনী বাড়ির মেয়ে সেও তো বেরুচ্ছে। সে বেরুবে আর তুমি ঘরে থাকবে এটা কি ভাল দেখায়? লোকে কি বলবে?

—বললাম তো দরকার হয় আর একটা বিয়ে করে নাও।

দীনু দত্ত আর স্ত্রীকে ঘাঁটাতে সাহস করলেন না। বোনের কাছে কথাটা পাড়লেন।

—তুই বল দামু, তুই বাড়ির মেয়ে হয়ে যখন ভোটের জন্যে বেরুচ্ছিস তখন তোর বৌদি পারবে না কেন?

দামিনী চোখ কপাল তুলে বললেন—তোমার কি ভোট ভোট করে মাথা খারাপ হয়েছে। বাড়ির বউ সে রাস্তায় রাস্তায় ভোট ভোট করে ঘুরবে কি? মান সম্মান নেই।

—তুই যাচ্ছিস কি করে? তোর মান সম্মান নেই।

—আমার আবার মান সম্মান! যা ছিল তা বিয়ের সাত বছরের মধ্যেই খেয়ে বসে আছি। আমার কথা ছেড়ে দাও।

দীনু দত্ত অপ্রস্তুত হলেন, কথা ঘুরিয়ে বললেন। কুঞ্জর স্ত্রী বেরুচ্ছে, বিছে উকীল, হেমেন—।

—কুঞ্জর স্ত্রী বেরুবে না কেন। পাঁঠা বেচা ঘর ওদের তার আবার মানই কি অপমানই কি। তুমি আর এসব কথা মনেও এনো না। ভোট ভোট করে মাথাটা তোমার গরম হয়ে উঠেছে, তাই এই সব মাথায় আসছে। সকালে চান করার সময় ছাইপাঁশ তেল না মেখে শশী কবরেজের বায়ুসংহার তেল মেখো।

তারপর একদিন নগরবাসীরা দেখলেন যে, সকন্যা শৈলজা ভোট ক্যানভাসিং-এ বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছেন বিছে উকীলের স্ত্রী

কুমুদিনী, হাকিম গিন্নী, হেমেন ডাক্তারের বৌ, কাজল ও জনকয়েক ভলেনটিয়ার, কথায় আছে শতপুত্র সমকন্যা যদি পাত্রে পড়ে। কিন্তু পাত্রে না পড়েও যে এককন্যা শতপুত্র না হোক, একটি পুত্রের ওপরে যেতে পারে, তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল।

পিঙ্ক পার্টির সমর্থক ছাত্ররা ছাড়াও আরও অনেকে কেবলমাত্র কিংশুকের খাতিরেই দীনু দত্তের হয়ে খাটছিল। ফলে টহলদারী লরীগুলোতে লোক ধরত না, উপচে পড়ত। অন্যদিকে কুঞ্জ রাহার যে লরী বের হত তাতে বেশ জায়গা থাকত। এখন ফল উল্টো হতে সুরু করলো। দত্তদের লরীতে লোকের টান পড়তে লাগল আর কুঞ্জ রাহার লরীতে ভলেনটিয়াররা বাদুড় ঝোলার মত ঝুলে রাগিণীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'ভোট ফর' বলে চেঁচিয়ে সারা জেলা চষে ফেলতে লাগল। শুধু কি তাই দীনু দত্ত সাধ্য সাধনা করেও যে সব বাড়ির মেয়েদের নিজের দলে টানতে পারে নি, সেইসব মেয়েদের রাগিণীর সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেল। কিংশুক দলত্যাগী বন্ধুদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে অনেক করে বোঝালে তারা তার কথায় কান দিলে বটে, কিন্তু মন দিলে না। মন তারা মিস্ রাহাকে দিয়ে বসে আছে। দু' একজন স্পষ্ট মুখের ওপর বললে—মিস রাহাকে কথা দিয়েছি যে, কুঞ্জবাবুর হয়ে খাটবো। কথার খেলাপ করতে পারব না, সরি! টাটের গোপালদের মধ্যে এক মহাবীর ছাড়া আর সবাই আসতো এবং যথাসাধ্য খাটাখাটনী করত। কিন্তু মহাবীর ভোটের তাণ্ডব সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে আসা বন্ধ করেছে, আর তার পাত্তাই নেই।

মামাই বললে—এক কাজ কর দেখি কিং, মহাবীরকে ধরে নিয়ে আয়। কান টানলেই মাথা আসবে। তখন তনুকাকে দিয়ে কিছু স্কুল-কলেজের মেয়েও আমাদের দিকে টানা যাবে, তা হলেই দেখবি'খন তোর ঐ কলেজের ছোঁড়ারা যারা এ্যাদ্দিন আমাদের চা সিগারেট সেঁদিয়ে রাগিণীকে দেখে ওদিকে কেল্লোৎ মেরেছে, তাদের কিছুটা আবার এদিকে ফিরে আসবে। টক্করটা তাহলে আবার একটু টাইট হবে বড্ড ঝুলে পড়েছে।

কথাটা ফেলবার নয়। কিংশুক মহাবীরের কাছে গেল।

মহাবীর ভাল করে কথাই শুনলে না, হাত জোড় করে বললে—মাপ করো ব্রাদার, আমি ঐ ডার্টি য়্যাফেয়ারে নেই। কথাটা একটু রাফ হয়ে গেল, কিন্তু কানট হেলফ। দীনুকাকাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি তবুও বলব এ ডার্টি য়্যাফেয়ারে নেই।

—তোকে কিছু করতে হবে না, বলতে হবে না। যাবি বসে থাকবি পাঁচটা লোক আসে ভাল লাগলো কথা বললি, নইলে চা-সিগারেট খেলি, আমাদের সঙ্গে গল্প করলি, তারপর বাড়ি চলে এলি, আগে যেমন করতিস।

মহাবীর ভ্রূ কুঁচকে বললে—তাতে ক্যাম্পেনের কি সুবিধে হবে।

কিংশুক বিব্রত বোধ করলে, বললে—না সুবিধে আর কি। তুই আস্তে আস্তে য়্যালুফ হয়ে যাচ্ছিস। এ্যাদ্দিনের ফ্রেণ্ডশিপ তাই বলছি। বিকেলে কি করিস?

—জুবিলীট্যাঙ্কে দু'জনে গিয়ে বসে থাকি। আমরা প্রতিজ্ঞা

য়েছি এসবে ভিড়বো না। পরন্তু রাগিণী তনুকে ডাকতে এসেছিল হু যায় নি।

—বেশ ত' তনুকে ও বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছিল সে ওবাড়ি ওটা তো তার বন্ধুর বাড়ি। ও ওর বন্ধুর দিকে থাক তুই তোর ুর দিকে আয়, এতো ফেয়ার ডিল। দেখি এই প্যাচে মহাবীরকে ত করা যায় কি না, ও এলেই সে আসবে।

—ননসেন্স। ইউ আর টকিং লাইক এ চাইল্ড। দুজনে দিকে! এ পারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে ভোট?···মাপ করো দার, ভোট যদ্দিন হচ্ছে তদ্দিন ওমুখো হচ্ছি না।

কলেজের ছেলেরা যে একে একে এইভাবে কেটে পড়বে তা কিংশুক নাও করতে পারে নি। যেসব ছেলেরা ডিক্লেয়ার্ড ষ্যাণ্টি গিণী-ষ্ট ছিল। রাতারাতি রাগিণী তাদের ইষ্টদেবী হয় কি করে? গিণী—রাগিণীই যত অনিষ্টের মূল। মনে হল, এতদিন সে সরে ইচ্ছে করেই নামে নি। যেন কিংশুককে সময় ও সুযোগ বার জন্যেই অন্তরালে ছিল। তা না হলে এতদিন বাদে খাটতে মবে কেন? শুধু ঐ জন্যে। বসে বসে কিংশুকের রগড় দেখছিল র মনে মনে হাসছিল। টান, কত ছেলে দলে টানবে, যত পার গারেট চা-বিস্কুট গেলাও, ঘোরাও চরকীর মতন লরীতে করে। ব, মনে মনে যে সবাই তোমাদের দলে, তারপর দেখাব আমার রামতি। একটি চাহনিতে তোমার ঐ দলের ছাউনিতে আগুন যাবে, সব সুড় সুড় করে এপারে চলে আসবে। হলও তাই। র দুদিনের মধ্যে পিক পার্টির ছেলেরা ছাড়া আর সব কলেজের লরা হাওয়া। বলে কি না মিস রাহাকে কথা দিয়েছি, সরি। স্কলরা অবলীলাক্রমে কথাগুলো বললে। মিস্ রাহার পেছনে ছনে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে এতটুকুও লজ্জা করছে না।

কিংশুকের মাথায় আগুন জ্বলতে লাগল। হাতড়ে বেড়াতে লাগল কোন্‌দিক দিয়ে কিভাবে মেয়েটাকে জব্দ করা যায়! কোনও দিক দিয়ে কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে শেষে ভলেনটিয়ারদের পাণ্ডা মানব পালকে বললে—মানববাবু যেমন করে পারেন রাহাদের ক্যাম্পেনিং বন্ধ করুন। আমাদেরই দলের ছেলেদের ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আমাদেরই চোখের সামনে পাড়া কাঁপিয়ে ক্যাম্পেনিং চলবে, এ অসহ্য। বাবা! এ অপমানের চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে বলুন।

মানবদের শাস্ত্রে ব্যবস্থাপত্র হল 'মার অরি পারি যে কৌশলে'। আর সে কৌশল হল স্রেফ 'দানাগুান'। এখন একপক্ষ 'দানাগুান' চালাবে আর অপরপক্ষ সমান ঝাঁজালো হলে বিনা প্রতিবাদে তা পিঠ পেতে গ্রহণ করবে না। ফলে হল ভোট গেল চুলোয়, মারামারিটাই মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

দু' দলই প্রমাদ গুনলেন; বেশ বুঝতে পারলেন যে এতে কেবলমাত্র প্রাণবল্লভেরই সুবিধে হচ্ছে। দীনু দত্ত বা কুঞ্জ রাহার কারুর কোনও পোস্টারের চিহ্ন কোথায়ও নেই, অথচ প্রাণবল্লভের পোস্টার সর্বত্র বিরাজ করছে। রাস্তার এদিক থেকে ওদিক অবধি ঝুলছে। মাঝে মাঝে বাতাসে জিলিপী রেসের জিলিপীর মত দুলে যেন ভোটারদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দত্ত বা রাহা যাঁরই মিটিং যেখানে হোক, দুমদাম করে কোথা থেকে যে ইটপাটকেল পড়ে তা কেউ বলতে পারে না। পটকা ফাটে, কিন্তু যাঁর শ্রীহস্ত সেটিকে বিকশিত করে আজ অবধি চর্মচক্ষে কেউ তাঁকে দেখে নি। ফলে দত্ত বা রাহাদের সভা করা উঠে গেছে। প্রাণবল্লভের সভার ভিড় সামলাতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। অথচ লোকে প্রাণবল্লভকে পছন্দ করে না, স্বাধীনতা সঙ্ঘ যে তাদের দু'চক্ষের বিষ, একথাও তাদের মুখে শোনা যায়।

দত্তদের বাড়ি'মিটিং বসেছে। মফস্বল থেকেও কর্মীরা এসেছে। তাদের মুখেও সেখানকার কথা শোনা গেল। একই অবস্থা, সব কিছু বানচাল হয়ে যেতে বসেছে। প্রাণবল্লভের সর্বত্র জয় জয়াকার। এ ভাবে কিছুদিন চললে তাকে আর ঠেকান যাবে না। ভোটাররা ইতিমধ্যেই বলাবলি সুরু করেছে। দলছাড়া মানুষ আর গোয়াল ছাড়া গরু কোনও কর্মের নয়। প্রাণবল্লভ লোকটা যাই হোক স্বাধীনতা সঙ্ঘের লোক। বাঁধুনী আছে। কিন্তু এঁরা? স্বভাবতই কর্মীদের মুখ চুন হয়ে পড়ে তাদের প্রার্থী সম্বন্ধে একথা শুনলে। এরা আবেদন জানালে, এমন কিছু করুন, যাতে লোকের মন আবার আমরা ফিরে পাই। এ ভাবে যদি চলে তাহলে আমাদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব যে কি ভাবে সম্ভব হবে তার কোনই পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে ঘণ্টা দুই তর্কাতর্কির পর পাণ্ডারা যখন মনে মনে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তখন মামা ধীরে ধীরে বললে—দীনুকাকা, ভবখুড়ো এবং সভাস্থ আর পাঁচজন যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি একটা কথা বলি।

দীনু দত্ত বললেন—বল কি বলবে।

—সবাই ত' বলছে যে দলছাড়া মানুষ আর গোয়ালছাড়া গরু কোন কর্মের নয়, বেশ ঐ গরু দিয়েই আমাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে।

দীনু দত্ত বললেন—কি রকম?

—আমাদের গরু পুজো করতে হবে। কাল ঢ্যাঁচরা।

মানব পাল তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দেখুন দীনবাবু আমরা এ পুজোটুজোর ভেতরে নেই।

মামাও গলা চড়িয়ে বললে—তবে কিসে আছেন, বোমা ছুঁড়তে? বোমা ছুঁড়ে ত' ভোট লাটে তুলে দিয়েছেন। জামানতের টাকা না হাপিস হয়ে যায়। যা বলি আগে শুনুন সবটা, তারপর বলবেন। আপনার এলেম ত' দেখলুম।

ভবতারণ বললেন—যাকৃগে যাকৃগে কি বলবে বল। রাত অনেক হল। শুনুন না পালবাবু, মামার কথাটা শুনুন। আমরা সবাই ত' অনেক কথাই বললুম, কোনটাই ধোপে টিকল না। এখন শুনুন না ও কি বলে। বল।

—ঢ্যাঁচরা পিটিয়ে দিন সামনের রবিবার গরুপুজো হবে। বুড়ো শিবতলার মাঠটা দীনুকাকার। চারদিক মানুষ সমান উঁচু করে বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলুন আর বেড়ার ভেতর দুটো আলাদা খুপরী করুন। একটাতে ছাড়া গরু যত আছে সহরে ও আশেপাশে লোক দিয়ে সব তাড়িয়ে নিয়ে আসুন, খড়ভুষি গেলান—আর একটা বাড়ির গরু যেগুলোকে রাখালেরা লক্ষ্মীর মাঠে চরাতে নিয়ে যায় সেগুলোর জন্যে খালি রাখুন। ব্যস তাহলেই হবে। দীনুকাকার ভোটের বাক্সটি

হচ্ছে গরু মার্কা ; হিন্দুধর্মে গরু পুজোর বিধান আছে ; নাকি বলেন ভবখুড়ো ?

—তা আছে। কিন্তু এতে কাজ কি করে উদ্ধার হবে তা তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভাল করে খোলসা করে বল।

মামা কিছুট' বলতেই মানব পাল নাক বেঁকিয়ে বললে—গরুর গায়ে ভোট ফর লেখা কি নতুন কথা ? ওটা এতো পুরোন হয়েছে যে লোকে আর ওপথ মাড়ায় না। অন্য কথা বলুন।

—আরে মশাই পুরোন প্যাঁচ তা আমার জানা আছে। কিন্তু লেখা হয় কোন গরুর গায়ে ? যেগুলো ছাড়া গরু রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় সেগুলোর গায়ে। কিন্তু বাড়ির গরুর গায়ে ? ভোট ফর দীনু দত্ত একবার লিখে দিতে পারলে আর দেখতে হবে না। এ ইলেকশন তো বটেই সামনের ইলেকশন অবধি কাজ চলবে। যা বলি শুনুন, ভলেনটিয়াররা সব চলে যাক। নসীবপুর, আবদুল্লাবাদ আর এখানে গরু পুজো হবে বলে চোঙ্গাবাজী করে আসুক। এখন কথা হচ্ছে ঘড়ি ধরে কাজ করতে হবে। রাস্তায় ছাড়া গরু যেগুলো বেড়ার মধ্যে আটকা রইল তাদের জন্যে ভাবি না, যতক্ষণ খুশি আটকা থাক, কিছু খোল-ভূষি বেশি খরচা হবে। তেমনি রাখালেরা যে গরু নিয়ে আসবে তারা সারাদিন মাঠে চরে ভর-পেট আসবে, খরচা নেই, শুধু একটু মেটে সিঁদুর দিয়ে কপালে টিপ দেওয়া শিং দুটোয় তেলের হাত বুলিয়ে দেওয়া ব্যস, আর ওদিকে দু'জন দু'দিক থেকে পেটের ওপর সাঁটাসাঁট মারতে থাকবে। কালিটা হবে কিন্তু ছাপাখানার কালি, ছাল-চামড়া উঠে যাবে, তবু কালি উঠবে না। দীনুকাকা আর সময় নেই, কাজে লাগতে হবে। মিস্ত্রীকে ডাকুন ইংরেজী বাংলা দু'রকমই চাই, এক পাশে ইংরেজীতে আর এক পাশে বাংলায় বেশ ছোটর ওপরে হবে ; আর দু'রকমের রবার স্ট্যাম্পও কিছু করতে হবে, একটা বাংলায় আর একটা ইংরেজীতে, তা দশ ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি করলেই হবে, না কি বলেন মানববাবু।

—হ্যাঁ তাতেই হবে।

টাঁড়া শুনে লোকে তাজ্জব, গরুপুজো করবে কি ! সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। লোকটা পাগল হল নাকি। প্রাচীনেরা মাথা নেড়ে বললেন—খাঁটি হিন্দু। দেখলে না এত জিনিস থাকতে ঠিক বেছে বেছে নিজের ভোট বাক্সের মার্কাটি নিয়েছে। সাধে কি আর মা-লক্ষ্মী ও-বাড়িতে অচলা। ব্যবসা তো এই সহরে আরও অনেকে করছে কিন্তু ওদের বংশের মত অমন গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি কারুর নেই। অত পয়সাও কারুর নেই। রাখালকে দিয়ে পুজো খেতে গাইটাকে পাঠাব। গো-মাতা, খালি দুধই গিলছি···পুজো করতে পারি না।

রাজ্যের লোক রবিবার সকাল থেকে রগড় দেখবার জন্যে বুড়ো শিবতলার মাঠে ভেঙ্গে পড়েছে। দীনু দত্তের ভলেনটিয়াররা বুকে গরু মার্কা ব্যাজ এঁটে সব ম্যানেজ করছে। মাঠটার চারদিক মানুষ সমান উঁচু করে ঘেরা, ওপরে ত্রিপল, ভেতরে বেড়া দিয়ে দুটো ভাগ করা হয়েছে। এক দিকটা ফাঁকা আর এক দিকে রাজ্যের গরু ষাঁড় খেদিয়ে এনে ঢোকান হয়েছে। ফাঁকা জায়গার পুব দিকটার অনেকখানি লম্বালম্বি ভাবে চারদিক ঢাকা হয়েছে, ভেতরে কি আছে বা কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। অনেক সাধ্যসাধনা করাতে মানব পাল জানিয়েছে ও-দিকটা বাড়ির গরুর জন্যে রিজার্ভ করা। তাদের জন্যে একটু আলাদা বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যেমন বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীদের আলাদা খাতির করা হয়, হাজার হোক এরা সব গেরস্ত-গরু। একপাশে পর্বতপ্রমাণ খড়। পাঁচ সাত জন মিলে 'খড় 'কাটছে জনাকয়েক লোক বড় বড় চৌবাচ্চার মত মাটির গামলায় জাব মেখে গরুগুলোকে খেতে দিচ্ছে। ওরই মধ্যে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই হচ্ছে। কচি গরুগুলো লেজখাড়া করে সার্কাসের ঘোড়ার মত বেড়ার চারধারে মাঝে মাঝে দৌড়চ্ছে, গোবর ও চোনায় সমস্ত জায়গাটা থক্ থক্ করছে। একপাশে একটু উঁচু মতন জায়গায় সবৎসা একটি ধেনুকে স্নান করিয়ে কপালে সিঁদুর, শিং-এ ফুলেল তেল ও গলায় মোটা একগাছা গাঁদা ফুলের মালা পরান হয়েছে, একটু পরেই একে পুজো করা হবে। ইনি হচ্ছেন সমস্ত গো-জাতির রিপ্রেজেনটেটিভ।

মহাধূমধামে পুজো হয়ে গেল, পট্টবস্ত্রপরিহিত দীনু দত্ত গরুর চার খুরে উবু হয়ে প্রণাম করলেন। উপস্থিত গো-ভক্তগণকে বাতাসা ও গুঁজিয়া প্রসাদ বিতরণ করা হল। ভবতারণ গরুর পাঁচালী ও অষ্টোত্তর শতনাম সুর করে মাইকের সামনে পড়লেন। এই করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল। তিন দল রাখাল গেরস্ত-গরু নিয়ে হাজির হল। বেড়ার ভেতরের গরুগুলো আত্মীয়স্বজনদের দেখে ডেকে উঠলো। শাখ ঘণ্টা বেজে উঠলো। 'গো-মাতা কি জয়' ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হল।

দীনু দত্ত গেরস্ত-গরুর একটির কপালে সিঁদুর, শিং-এ তেল ও গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। বাকীগুলোর ভার ভলেনটিয়াররা গ্রহণ করল। অঙ্গরাগ হয়ে গেলে গরুগুলোকে ঘেরা জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। রাখালদের এক এক চুপড়ী বাতাসা, গুঁজিয়া দিয়ে ওপাশের বেরুবার গেটের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঘেরা জায়গাটার ভেতরে বাঁশ দিয়ে চারটে সারি বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেকটার ভেতর দিয়ে একটি করে গরু হেঁটে যেতে পারে। দুই সারির মাঝখানে ও দুই পাশে সব ভলেনটিয়াররা দাঁড়িয়ে, তাদের কারুর হাতে টিনের একটা পাত ও ছোট বুরুশ। কারুর হাতে বড় বড় রবার স্ট্যাম্প, কারুর হাতে জাবের বালতি, খড় ইত্যাদি। গরুগুলো ঢুকতেই দেখা গেল একজন তার মুখের গোড়ায় খড় বা জাবের বালতি ধরেছে আর দুজন দু'পাশ থেকে পেটের ওপর টিনের পাত রেখে কালিমাখা বুরুশ টেনে দিচ্ছে। কোন কোন গরুর পেটের ওপর আবার দু'পাশ থেকেই রবার স্ট্যাম্পের ছাপ পড়ছে। গেরস্ত গরুগুলো যখন একে একে ওপাশ দিয়ে রাস্তায় বেরুতে লাগল, তখন দেখা গেল প্রত্যেক গরুর পেটের দু'দিকে ছাপ মারা 'দীনু দত্তকে' ভোট দিন ; 'ভোট ফর দীনু দত্ত'। যারা উপস্থিত ছিল তারা প্রথমটা থ' হয়ে গেল, তারপর হেসে আর বাঁচে না। দীনু দত্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে যাকে পারলো ডেকে ডেকে এনে রগড় দেখাতে লাগল। দেখে যাও দত্ত মশাই-এর গো-পূজা। কেউ কেউ চটে গেল। কি আমাদের গরুকে ভোটের কাজে লাগান, কেউ ভোট দিও না দীনু দত্তকে।

গুই চাটুজ্জ্যে হুঁকোয় গোটা কয়েক টান মেরে বললেন—এর ফল ভোগ হবে না কুঞ্জবাবাজী তুমি দেখে নিও। গোমাতার পূজোর ছল করে তাদের কি না শেষকালে নিজের ভোটের কাজে লাগান। এ ধর্মে সইবে না, এ তোমায় বলে দিচ্ছি। গরু সাক্ষাৎ দেবী, তার গায়ে কালি, এ কিছুতেই ধর্মে সইবে না।

হেমেন ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন—থামুন দেখি। এ কালি গরুর গায়ে দেয় নি, আমাদের মুখে দিয়েছে। গরু দেবী না হলে আর আমাদের এই অবস্থা হয়। দেবীরও ভারী যত্ন করেন আপনারা।

কুঞ্জ রাহা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—ঠিক বলেছেন গজেন গেল কোথায় ?

কে একজন বললে—জোশীদা, কদা, গণেশ আর কেতোকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখলুম। হাতে বুরুশ আর বালতি রয়েছে।

হেমেন ডাক্তার বললেন—জানতুম, আমরা বসে বসে ধর্ম ধর্ম করলে কি হয়, ভাইটি আমার বসে থাকবার পাত্র নয়। ঠিক একটা ফন্দি বার করেছে। নিজের ভাই বলে বলছি না। অমন রেসপন্সিবিলিটি জ্ঞান বড় একটা দেখা যায় না। কি করা যায়, ছেলেগুলো এখনও ফিরছে না, কেন। রাত হল—এই সব যখন আলোচনা করছেন তখন হাঁপাতে হাঁপাতে কাদা ঘোষাল এসে হাজির।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যর। জোশীদা আর কেতো কাৎ। বকুলের দোকানে তাদের শুইয়ে রেখে এয়েছি, গণশা আছে।

—কাৎ !—হেমেন ডাক্তার চোখ কপালে তুলে বললেন—শুইয়ে রেখে এসেছ কি ?

—তাই তো এলুম ডাক্তারবাবু।

—কেন, কি হয়েছে !

—আর কি হয়েছে। দীনু দত্তের কারবার শুনে জোশীদা বললে, তাড়াতাড়ি একটা বালতি করে কেরোসিন তেল আর বুরুশ নিয়ে চল, এখনও কালি শুকোয় নি। তুমি আর গণেশ তেলমাখা বুরুশ দিয়ে লেখাটা ভিজিয়ে দেবে আমি আর কাত্তিক ঘষে তুলে দোব। বাজারের ঐ দিকটা চল, ফাঁকা আছে আর যত গরুর ভিড় ওদিকে। গেলুম স্যর। ওঃ—

কাদা বসে হাঁপাতে লাগল।

—তারপর। কুঞ্জ রাহা বললেন।

—বলছি স্যর। নৃসিংহ এক গেলাস জল নিয়ে আয়। নৃসিংহ জল এনে দিলে ঢক ঢক করে সবটুক জল খেয়ে কাদা বললে—আমি আর গণশা স্যর তেলে বুরুশ চুবিয়ে বুলিয়ে যাচ্ছি কেতো আর জোশীদা ঘষে যাচ্ছে। এক জায়গায় অনেকগুলো গরু বসে বসে জাবর কাটছে তেল বুলিয়ে গেছি। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হয় নি যে এক শালার পেটের ওপর দগ দগে ঘা। জোশীদা উবু হয়ে যেই একটি ঘষ্টান লাগিয়েছে আর যায় কোথা চপাং করে মেরেছে ল্যাজের ঝাপটা। জোশীদা টাল সামলাতে না পেরে ওপাশে পেট ঘষছিল কেতো তাকে যাতা ধরেছে, অমনি কেতোর গেছে পা হড়কে। দু' শালা হুমড়ি খেয়ে গাইটার পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। জোশীদার ঐ লাশ, তার ওপর কেতোও কম যায় না, গাইটা কোঁৎকা খেয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াতেই ওরা পাশের গাইগুলোর ওপর পড়তে

সেগুলোও শিং নেড়ে উঠে পড়ল। গণশা শালা বালতি, ফালতি ফেলে দে রড়, ভাই-এর দিকে ফিরেও তাকালে না. এত বড় হারামী। —বলে একটু থেমে বললে —আমি আর একলা কি করব স্যর একটা গরু তেড়ে আসতে আমিও হাওয়া হলুম।

গুঁই চাটুয্যে উত্তেজিত হয়ে বললে—হাওয়া হলি। তুই ব্রাহ্মণ হয়ে দু'জনকে অসহায় অবস্থায় রেখে হাওয়া হলি।

—না হবে না। খুব তো বসে বসে কপচাচ্ছেন. হাওয়া হলি-হাওয়া হলি। সেখানে থাকলে বুঝতুম হিম্মৎ। বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিত। হাওয়া হয়েছি সাধে না। এই দেখুন—বলে হাঁটুর কাপড় তুলে দেখাল।

কুঞ্জ রাহা বললেন—ইস্ অনেকখানি কেটে গেছে দেখছি।

কুঞ্জ রাহা. হেমেন ডাক্তার ও কয়েকজন কাদাকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

নসীবপুর, আবদুল্লাবাদ ও মফস্বল সহর থেকে ভাল সংবাদই এল। গো-পূজা ও ছাপ মারা বেশ নির্বিঘ্নেই হয়েছে। লোক হাসাহাসি করছে আর দীনু দত্তের কেরামতি গাইছে। কিছু কিছু লোক অবশ্য তাদের গরুর গায়ে ছাপমারার জন্য চটে গেছে, তবে তাদের সংখ্যা অল্প। দীনু দত্তের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে. একদিন ভোজ দিলেন এবং ভোজসভায় মামাকে একশো এক টাকা ও একটা রুপোর মেডেল দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে দু' একটা পোস্টার দেয়ালে পড়তে লাগল. সেগুলো সব গরু-মার্কা বাক্সের। সভা-সমিতিও নির্বিঘ্নে এখানে সেখানে হতে লাগল। কুঞ্জ রাহা গরুর কাছে হেরেছেন যাকে বলে গোবেধরণ খাওয়া তাই. মাথা তোলবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। কিন্তু পুত্রশোকও মানুষ ভোলে. আবার ওঠে. হাসে খায়। কুঞ্জ রাহাকে আবার উঠতে হল বেশি দিন হাতে নেই মাঝে মোটে দুটি সপ্তাহ। 'বিড়ির বাণ্ডিল' মার্কা পোস্টারও পড়তে লাগল. দীনু দত্তের দল দেখেও ছিঁড়লো না। এখানে সেখানে মীটিং এ আবার কুঞ্জ রাহাকে বক্তৃতা করতে দেখা গেল।

প্রথমটা গরু দিয়ে গুঁতিয়ে কুঞ্জ রাহাকে চিৎ করে ফেলে দিতে পেরেছেন বলে দী দত্ত খুশি হলেও যেই শুনতে পেলেন যে কেউ কেউ আবার নিন্দেও করছে. অমনি মেজাজটা বিগড়ে গেল। নিজেই মনে মনে বিচার করে দেখলেন যে কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। ছলছুতো যেটাকে কেউ কেউ জোচ্চোরীও বলছে, তা যে তিনি করেন নি তা নয়। সত্যিই তো পূজো করবার ছল করে গরু এনে তাদের লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, পূজো যে কত করেছেন. তা সবাই না জানুক তিনি ত' জানেন। কাজটা যে অন্যায় হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। কেউ কেউ শাপমন্যি দিচ্ছে. দিতে পারার মত কাজ বটে। শাপমন্যি! কথাটা ভেবে সে রাতে ভাল ঘুম হল না। পরদিন সকালে ভবতারণকে মনের কথাটি বললেন।

ভবতারণ উড়িয়ে দিয়ে বললেন—খেপেছ দীনু! অন্যায়? অন্যায় কোথায়? শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, শাস্ত্রের কথা। আপৎকালে বাঁচবার জন্যে সব কিছু করা যায়। বলি এর আগে তো হার করে আসছিলে, একখানা পোস্টার আস্ত ছিল? না. একটা মীটিং বিনা বজ্রপাতে করতে পেরেছ? আর এখন? পোস্টারও ঝুলছে নির্বিবাদে—মীটিং করছ, লোকে জয়জয়কার দিচ্ছে। অন্যায় হলে হ'ত। ও নিয়ে ভেব না। তবে নেহাৎ মনে খুঁতখুঁত থাকে একটা বকনা এনে কোন বামুনকে দিয়ে দাও. গো-দান পুণ্যিও হবে প্রায়শ্চিত্তও হবে। তা বলে আমি নিচ্ছি নি। কেন মিথ্যে ভেবে মরছ বল দেখি।

দীনু দত্ত বললেন—তা না হয় না ভাবলুম কিন্তু এই যে বলছে 'জানোয়ার নইলে কি আর জানোয়ারকে কাজে লাগায়। যে কথা বলতে পারে না, যার কোনও বুদ্ধি নেই তার পেটে ছাপ মেরে ক্যাম্পানি দেখাতে সবাই পারে. কর ত' মানুষকে দিয়ে ঐ কাজ বুঝতুম।' কথাটা তো মিথ্যে নয়। ধর তুমি কি খেতু দত্ত নেমন্তন্ন খেয়ে বুকে পিঠে ভোট ফর দীনু দত্ত ছাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে তাহলে কথা ছিল। গরুরা জানোয়ার তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই তাদের দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানোটা আর এমন কি বাহাদুরীর কাজ।

—তাহলে বলছ এবার মানুষকে দিয়ে খেল দেখাতে চাও। তা বেশ। রাতের মীটিং-এ তো সবাই থাকবে সেখানে কথাটা বলে দেখ কেউ যদি কিছু বাৎলাতে পারে।

—মানে বুঝছ না। বেশ নতুন কিছু একটা ভাল দেখে করতে পারলে গরুর ব্যাপারটা চাপা পড়ত, মাথাটাও উঁচু হত।

আর কেউ নয় মামাই দিন দুই বাদে বললে—এসেছে তো প্ল্যান মাথায় এখন খোপে টিকলে হয়

ভবতারণ বললেন—জানোয়ার ফানোয়ার নেই তো।

—না না। এবার আর জানোয়ার নয় মানুষ. তাও আবার যে সে মানুষ নয় সেরা মানুষ।

—সেরা মানুষ!

—আজ্ঞে হাঁ, পরামাণিক।

দত্ত মশাই দমে গেলেন—পরামাণিক! মানে নাপিত? তবে যে বললে সেরা মানুষ।

—আজ্ঞে নাপিতই তো সেরা মানুষ। আমরা বামুনরা যতই নিজেদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বলি আর অং বং করি, বুদ্ধিতে নাপিতের কড়ে আঙুলের যুগ্যি নয়।

ভবতারণ মাথা নেড়ে বললেন—ঠিক। খাঁটি কথা। ওদের মত বুদ্ধি কারুর নেই। ওদের ঐ সুন্দর বুদ্ধির জন্যেই ওদের আর এক নাম নরসুন্দর। বুদ্ধির চেয়ে সুন্দর আর কি জিনিষ আছে দীনু।

দীনু দত্ত এবার সমর্থন জানিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সেকথা একবার কেন একশ'বার। তা তোমার প্ল্যানটা কি শুনি।

মামা বললে—অখিলকে আনতে লোক পাঠান। আপনার নাম করে ডেকে আনুক।

অখিল জেলা নরসুন্দর সমিতির প্রেসিডেণ্ট, বয়েস ত্রিশ কি বত্রিশ। একসময় কলকাতায় সাহেবপাড়ার কোন এক সেলুনে কাজ করত। সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বছর কয়েক আগে দোকান খোলে, প্যারিস সেলুন। হেড কাটার অখিল প্রামাণিক। এক্স এক্সপার্ট অব হেড বিউটিফায়ার ইউরোপীয়ান সেলুন। নরসুন্দর সমাজ এমন রত্ন পেয়ে লুফে নিলে। সহরের কাপ্তেনেরা প্যারিস সেলুনে মাথা পাতবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা

করতে লাগল। অচিরেই আরও দু'টো ব্রাঞ্চ সেলুন খোলা হল এবং কাকা ও ছোট ভাইটাকে গঙ্গার ধার থেকে তুলে এনে ক্যালকাটা ট্রেন্ড বলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ক'রে দেওয়া হল। কোনও সমিতি ছিল না, অখিলের স্বজাতিরা কেবলমাত্র ওকে সভাপতি করবার জন্যেই সমিতি তৈরি করলো। সভাপতির একটা সম্মান আছে, এর পর সে আর পাঁচজনের মত সব মাথায় কাঁচি চালাতে পারে না, তার উপযুক্ত মাথা চাই, কামাবার উপযুক্ত গাল চাই। অতএব জেলা হাকিম, জজ সাহেব, পুলিশ সাহেব, সিভিল সার্জেন, উকীল, প্রবীণ অধ্যাপক, দীনু দত্ত, কুঞ্জ রাহা ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাকা চুল ও কড়া দাড়ি ছাড়া আর সকলের চুল-দাড়িই এক্সপার্ট হ্যাণ্ডের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হল। প্রেসিডেণ্টের অঙ্গে লাল পাড় ধুতীর বদলে প্যাণ্ট, হাফসার্টের বদলে হাওয়াই সার্ট এবং মুখে বিড়ির বদলে সিগারেট শোভা পেতে লাগল।

অখিল এসে দীনু দত্তকে নমস্কার করে বললে—আমায় ডেকেছেন স্যার।

—হ্যাঁ তোমায় একটি কাজ করতে হবে।

—আজ্ঞে হুকুম করুন।

—আগে আমায় কথা দাও, যা বলব তা করতে পার আর নাই পার বাইরের কাককে বলবে না।

—আজ্ঞে তা আর বলতে। যা শুনব তা খালি শুনেই যাব স্যার, মুখ দিয়ে তা বের হবে না, এই আপনাদের পাঁচ জনের সামনে বলছি।

—বেশ, কথাটি হচ্ছে; আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি আমার হয়ে তোমায় খাটতে হবে।

অখিল ভাবনায় পড়ে গেল। গরুগুলোর মত বুকে-পিঠে ছাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না-কি?

—কি চুপ করে রইলে যে।

—আজ্ঞে স্যার। আমি খাটবো?

মামা বললে—ভয় নেই হে, তোমার বুকে-পিঠে ছাপ পড়বে না।

অখিল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। মুখে বললে—তা পড়লেই বা। স্যারের জন্যে ছাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবো, এ-তো আমার ভাগ্যি। তা কি করতে হবে স্যার।

দীনু দত্ত মামাকে বললেন—কই হে বুঝিয়ে দাও।

—তোমার সেলুনে তো লোকে চুল-দাড়ী কামাতে আসে, কিছু না খালি তাদের কানে টুক্ করে বলতে হবে, দীনু দত্তকে ভোটটা দেবেন, ব্যস্। তোমার তিনটে সেলুনের সবাইকে আর তোমার সমিতির যত মেম্বার যারা বাইরে বাইরে কামিয়ে বেড়ায় তাদেরও বলে দিতে হবে। কোনও হাঙ্গামা নেই, বুকে পিঠে ছাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না। হ্যাণ্ডবিল বিলোতে হবে না, গলাবাজি করতে হবে না, শুধু আস্তে আস্তে বলতে হবে দীনু দত্তকে ভোটটা দেবেন, ব্যস্।

অখিল বললে—কিন্তু ধরুন যাকে বললুম, সে যদি ওদিককার লোক হয়, চিনব কি করে, তাকে বললুম সে অমনি তেরিয়া হয়ে উঠল, সেলুনের ভেতরেই মারামারি ধরাধরি হয়ে গেল।

মামা মৃদু হেসে বললে—তেরিয়া হবে না। বলবার টাইম আছে। হয় ঘাড়ে ক্ষুর ঠেকিয়ে, কি দাড়ী কামাবার সময় রগের কাছে বা থুতনীর তলায় গলার ওপর ক্ষুরটি ধরে বললে, তেরিয়া মোটেই হবে না, প্রাণের ভয় সবাই-এর আছে। আর তেরিয়া হলেই বা, তুমি এমন একটা কিছু অন্যায় কাজ করছ না।

অখিল শুনে চুপ করে রইল।

দীনু দত্ত বললেন—কি পারবে না?

অখিল আমতা আমতা করে বললে—আজ্ঞে আমি পারব না কেন স্যার নিশ্চয় পারব। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার দোকানের কর্মচারীরা কি সমিতির মেম্বাররা তারা কি রাজী হবে? তা ছাড়া আজ আপনাকে ভোট দেবার কথা বললুম, কাল যখন কুঞ্জবাবু কি প্রিয়বাবু এসে বলবে—ওহে অখিল আমাকে ভোট দেবার কথাটা সকলকে বলে দিও। আমি না হয় বললুম যে আমি স্যারের নাম বলব বলে কথা দিয়েছি, জিভ কেটে ফেললেও অন্য নাম আর এ মুখ দিয়ে বেরুবে না। কিন্তু আর সবাই। তার ওপর যদি হাতে একটা আধুলি কি সিকি গুঁজে দেয় তো হয়েই গেল। বাপের নাম ফেলে কুঞ্জবাবুর নাম বলবে।

ভবতারণ বললেন—আহা সে তো এখান থেকেও গোঁজা হচ্ছে। সিকি আধুলি নয় পুরো একটা কড়কড়ে টাকা। অমনি অমনি তোমাদের দিয়ে খাটিয়েই বা আমরা নেব কেন?

অখিল মুখ ভার করে বললে—একটা টাকায় কি রাজী হবে ভোটের ব্যাপার?

দীনু দত্ত বললেন—বেশ ত' যাতে রাজী হয়, তার ব্যবস্থা করে দাও। তোমাকে আলাদা কিছু ধরে দেব। তোমাদের মেম্বার ক'জন?

—একশ' পঁয়ষট্টি জন।

মামা বললে—এতো! কই, দরকারের সময় তো মাথা খুঁড়লেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কারুর টিকি দেখা যায় না, তখন দেখি সব দলে দলে ঘুরি যাচ্ছে।

—আজ্ঞে, শুধু তো আর এ সহরের কথা হচ্ছে না, সমস্ত জেলায় আমাদের মেম্বার একশ' পঁয়ষট্টি জন। তবে সব তো আমাদের দরকার নেই। ধরুন, এখানকার নসীবপুর, আবদুল্লাবাদ আর সোনা গাঁয়ের নাপিতদেরও ধরতে হবে, বন্দর জায়গা অনেক লোকের যাতায়াত অনেক ভোটার ওখানে। এ ক' জায়গাতেই ত' নাপিত, গাঁয়ে-ঘরে যা আছে, সে এক গাঁয়ে একজন কি দু'জন, সবাইকে এখন খবর দেওয়া কি সম্ভব হবে?

ভবতারণ বললে—ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে এই ক' জায়গার নাপিতদের বলে পাঠাও। ঐ থোক পঞ্চাশটি টাকা তোমায় দেওয়া হবে তুমি যা দিয়ে যা করে পার। না না, আর গাঁইগুঁই করো না অখিল। কই দীনু, আগাম গোটা পনের টাকা দিয়ে দাও।

টাকাটা হাতে নিয়ে অখিল বললে—আজ্ঞে, বড্ড কম হয়ে গেল।

দীনু দত্ত বললেন—বেশ ত' কাজ কর। কাজকর্ম চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে'খন। ওর জন্যে আটকাবে না।

মামা বললে—এখন আসল কথায় এসো দিকি, বলি কথার খেলাপ হবে না ত'।

—জান্ যায় সেও ভি আচ্ছা, বাবু তবু কথার খেলাপ অখিল প্রামাণিক করবে না। এই টাকা হাতে নিয়ে বলছি। বেশ ত' আপনারাও পরীক্ষা করতে সেলুনে লোক পাঠান কি রাস্তা থেকে

নাপিত ডেকে কামাতে বসে দেখুন, বীজমন্তর দেয় কি না। তবে একটা কথা বাবু, খোট্টা নাপিত কিন্তু আমাদের দলে নয়। তাদের দিয়ে বলাতে পারব না।

ভবতারণ বললেন—তাই তো, এ কথাটা তো আগে ভাবি নি ওগুলোও তো একপাল আছে। খোট্টা ভোটারও আছে।

মামা বললেন—তা থাক খুড়ো মশায় খোট্টা নাপিতের কাছে কুলী কামিনরাই কামায়। কুঞ্জ রাহা যদি তাদের হাত করে, বাঙালী অবাঙালীর কথা তুললেই টাইট্ হয়ে যাবে।

অখিল বললে—ঠিক বলেছেন মামাবাবু, তেমন তেমন দেখি আমরাও বলতে থাকবো, দেখুন বাঙালী হয়ে অবাঙালী নিয়ে ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটা নিজের জাতকে ভাল বাসে না। দীনু দত্ত খুশী হয়ে বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাজে লেগে যাও পরে তোমায় খুসী করে দেব'খন। আর দেখ, ওকে কামাতে পারবে না।

ভবতারণ বললেন—হ্যাঁ, এটা দীনু ঠিক বলেছ।

অখিলের মুখ শুকিয়ে গেল—আজ্ঞে তা কি করে হবে। আপনার ও উনিও যে আমার বাঁধা খদ্দের। মাস মাইনের কাজ, এখন কামাব না বললে—

মামা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না কামাতে যাবে। খবরদার কামাই করবে না। যেমন যাও ঠিক তেমনি যাবে। বুঝছেন না খুড়োকাকা, নাপিত আপনারও তারও, কিন্তু তারই বিরুদ্ধে আপনার হয়ে খাটছে। কুঞ্জ রাহা নির্ঘাৎ ওকে বলবে তার হয়ে খাটতে, বেশি টাকার লোভ দেখাবে। আর ওকে বাগাতে না পেরে ভেতরে ভেতরে জ্বলে খাক্ হয়ে যাবে। যাকে বলে হাত পা বেঁধে ধোলাই, এ ঠিক তাই। না কি বলেন ভবখুড়ো?

ভবতারণ বললেন—ওঃ তোকে কি বলব। ষষ্ঠীদা' অকালে মরে গেলেন বলে তোর লেখাপড়া হল না, হলে তুই হাইকোর্টের জজ হতিস।

দীনু দত্ত বললে—ঠিক বলেছ।

মামা বললে—আর পার ত' বুঝলে অখিল, কামাতে কামাতে গলার ওপরে ক্ষুরটা ধরে কুঞ্জ রাহাকে দীনুকাকাকে ভোট দেবার কথাটা শুনিয়ে দিও।

উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন। অখিল বললে—আমি বলতে পারি, বলাটা আমার ডিউটি, কিন্তু মারধোর করেন যদি।

মামা বললে—আরে তাই তো চাই। মারধোরই করবে, মেরে তো ফেলবে না। থানা পুলিশ ডাক্তার বদ্যি যা লাগে তার জন্যে দীনুকাকা আছে। দু' মাস বিছানায় পড়ে থাক, সংসারের ভাবনা তাঁর। পার ত' বীজমন্তরটা কুঞ্জ রাহার কানে দিও।

অখিল যে তার ডিউটি ভালভাবে করছে তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল। লোকে আর একদফা দীনু দত্তর পাবলিসিটি বিভাগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। যারা সেবার গরুকে ছাপ মারায় রেগে লাল হয়েছিল, তারাই এবার মাথা নাড়তে নাড়তে বলাবলি করতে লাগল, ভ' ভ' বাবা এ আর গরু নয় যে বলবে জানোয়ার, বুদ্ধি নেই, বাধা দিতে পারে নি, তাই খাটিয়ে নিতে পেরেছে। এ হচ্ছে নাপিত,

ঘোল চোঙ্গা বুদ্ধি কেমন তাকে নিজের ভোটে লাগিয়েছে। এবার কিছু বলবে.

কুঞ্জ রাহার দল গরুর বেলায় খুব গলাবাজি করেছিল এবার আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। বহু সাধ্য সাধনা করা হল অখিলকে ভাঙ্গিয়ে নিজের কাজে লাগাবার জন্যে, কিন্তু সুবিধে হল না। অবশেষে যখন সেদিন সকালবেলা অখিল কামাতে এলো, কুঞ্জ রাহা রেগে গিয়ে তাকে গলা ধাক্কা দিলেন। কপালে রক্ত নিয়ে অখিল সোজা দীনু দত্তর কাছে গেল। দত্ত মশাই যা চাইছিলেন, তাই হল। অখিলকে নিয়ে থানায় গিয়ে ডায়েরী করিয়ে এলেন।

কথাটা রাষ্ট্র হতে দেরী হল না। নরসুন্দরকুল তাদের 'প্রেসিডেন'-এর অপমানে জ্বলে উঠল। রাগে তাদের হাতের কাঁচি কচ্‌কচ করতে লাগল। ক্ষুর খাপের ভেতর থেকে ঘন ঘন বেরিয়ে আসতে লাগল। নরসুন্দর সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির জরুরী মীটিং ডাকা হল। মীটিং-এ ঠিক হল কুঞ্জ রাহাকেই শুধু নয়, ওর দোকানের কর্মচারী, দলের লোক তো তিনি ডাক্তার, উকীল যেই হোন না কেন, সমিতির মেম্বাররা তাঁদের কামাবে না। প্রস্তাবের একটা নকল কুঞ্জ রাহার হাতে পৌঁছল। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়ে গেল। কামিয়ে পয়সা দেয় না কে? কুঞ্জ রাহা। পাওনা পয়সা চাইলে মার ধোর করে কে? কুঞ্জ রাহা। নাপিত বন্ধ কার? কুঞ্জ রাহার। সমাজের শত্রু কে? কুঞ্জ রাহা। একে ভোট দেবেন? না—না—না।

দামিনীও ভারী খুসী। আগের বারে মা ভগবতীকে নিয়ে ঐ রকম ধারা করায় তাঁর মন বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। এতে কি ভোটের ফল ভাল হবে। কিন্তু অখিলের ব্যাপারে তাঁর মুখে আর হাসি ধরে না।

—ঠিক হয়েছে। এবার যা জব্দ হয়েছে না, তা আর বলবার নয় দাদা। ঐ সঙ্গে পাঠাবেচা ঘর একথাটাও ছেপে দিও। আর দেখ নাপিত তো বন্ধ করেছ, এবার ধোপা বন্ধ কর। তারপর সমাজে একঘরে কর দাও। আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে! পাঠাবেচা ঘর দু'টো পয়সা করে ধরাকে সরা জ্ঞান। এবার বোঝ ঠেলা। যাকে বলে ধোপা-নাপিত বন্ধ তাই।

পত্তর মা'র মারফৎ খবর এল; ওপক্ষের শিবিরে সবাই মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে। বিছে উকীল, হেমেন ডাক্তার সব মহামহারথীরা কুঞ্জ রাহাকেই গাল মন্দ করছে। ভেতরে ভেতরে জোর চেষ্টা চলছে যাতে যেমন করে হোক অখিলের সঙ্গে আজকালের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যায়। কুঞ্জ রাহা নাকি বলেছে ভোটেই হারি তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু অখিলের ব্যাপারে হেরে গেলে গলায় দড়ি দিতে হবে।

দীনু দত্ত সব শুনে বোনকে বললেন—অখিলকে নিতে পারবে না। সে নিজে গিয়ে কুঞ্জ রাহা মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে বলে থানায় ডায়রী করেছে। আর মিটমাট করলেই বা, কাজ যা গুছোবার গুছিয়ে নিয়েছি।

দামিনী হেসে বললেন—জান দাদা আমি ওদের ঝি খেপীকে বললুম যে তোর পাঠাবেচা বাবুকে বলিস, অখিলকে জামাই করুক তাহলে আর মিটমাট করবার জন্যে হাঁপিয়ে মরতে হবে না, আর মিটমাট না হলে গলায় দড়িও দিতে হবে না। হাকিমের বাঁদর ছোঁড়াটার চেয়ে অখিল ঢের ভাল পাত্তর।

—বলেছিস নাকি! ঠিক করেছিস।

দামিনী হাসতে হাসতে বললেন—বলেছি তো। দেখ আবার তোমাকে জব্দ করবার জন্যে তাই না করে বসে। পাঁঠা ঘর ওদের অসাধ্যি কম্ম আছে।

কথাটা দীনু দত্তের ভারী ভাল লাগলো। কুঞ্জ রাহা অখিলকে জামাই করেছে। ভাবতেই দীনু দত্ত হি হি করে হেসে উঠলেন। বোনকে বললেন—দাব নাকি ঐ নিয়ে একখানা পোস্টার ছেড়ে।

—দাও দাদা তাই দাও, লোকটাকে আর ভাবনায় রেখো না। বাঁচবার পথ দেখিয়ে দাও। হাজার হোক বয়েসে ছোট তো।

—সেই সঙ্গে ছোট্ট দু'লাইন পদ্য—

পাঁঠা-বেচা ঘর
নাপিত জামাই কর।

—কেমন হল বল দেখি, ভাল হয় নি?

—হয় নি আবার! ফাশকেলাশ হয়েছে। তাই কর দাদা, তাই কর। কাগজে লিখে দ্যালে টাঙিয়ে দাও।

কিন্তু কাগজে লিখলেও শেষ পর্যন্ত 'দ্যালে টাঙিয়ে' দেওয়া আর হল না। বাদ সাধল কিংশুক। পোস্টার দেখেই সে ক্ষেপে লাল। বললে—এই যদি টাঙান হয়, তা'হলে এক দণ্ডও এ-বাড়িতে থাকবো না।

পোস্টার পড়ল না বটে, কিন্তু কথাটা ও তরফে পৌঁছতে দেরী হল না। কাদা ঘোষাল কথাটা তুললো: আর তো শুর রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। আপনারা শোনেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা চুনোপুটি আমাদের কানের গোড়ায় এসে বলে অখিলের সঙ্গে—

দেখা গেল শুধু চুনোপুটিরা নয় রাঘব-বোয়ালদের অনেকেরই কানে কথাটা গেছে। কুঞ্জ রাহা আগেই বাড়িতে বসে এ কথাটা শুনেছিলেন, ভেবেছিলেন কথাটা বুঝি বাইরের কেউ জানে না। এখন সকলেরই কথাটা জানা দেখে গুম মেরে গেলেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল। বিনা আলোচনায় থামবার মত কথা এটা নয়। ঐ নিয়ে কথা শুরু হয়ে গেল। কুঞ্জ রাহা কিছুক্ষণ পরে আলোচনা শুনলেন, তারপর ফরাসে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন—তাই হবে।

হেমেন ডাক্তার বললেন—কি হবে।

—বিয়ে। কি ভেবেছে দীনু দত্ত। পারি না। ঠাটা। দেখিয়ে দিচ্ছি পারি কি না।—বলে রাগে গর-গর করতে লাগলেন।

বিছে উকীল বললেন—কি দেখাবেন?

বিছে উকীলের মুখের গোড়ায় হাত নেড়ে কুঞ্জ রাহা বললেন—বিয়ে দেখাব।

—কার?

—আমার মেয়ের, অখিলের সঙ্গে।

গুঁই চাটুয্যে চোখ বড় বড় করে বললেন—বল কি। রাধামাধব।

কুঞ্জ রাহা ভেংচি কেটে বললেন—রা-ধা মা-ধ-ব। রাধামাধব কেন? বলি এতে দোষটা কিসের। অখিল মানুষ নয়? এটা সেক্যুলার স্টেট, জাত-টাত এখানে নেই, নেহি মাংতা। সবাই মানুষ।

সবাই ভগবানের জীব, সব সমান। আজই আমি অখিলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব, দেখি তারপর কেমন করে দীনু দত্ত তাকে ভাড়িয়ে নেয়। ওরে—

বিছে উকীল বললেন—শুনুন কুঞ্জবাবু, ভুলে যাবেন না মেয়ে আপনার সাবালিকা হয়েছে, তার অমতে বিয়ে আইনে টিকবে না।

—রেখে দিন মশাই সাবালিকা আর নাবালিকা। যাই হোক না কেন, বালিকা তো। আগে বিয়ে তো হয়ে যাক, তারপর আইন দেখা যাবে। কাদা, কার্তিক চল আমার সঙ্গে প্যারিস সেলুনে।

কাদাদের নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর গুঁই চাটুয্যে উত্তেজিত হয়ে বললেন—এ যে সর্বনাশ হতে চলল। ডাক্তারবাবু, উকীলবাবু একটা ব্যবস্থা করুন। কুঞ্জ পাগল হয়ে গেছে বলে আমরা তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।

হেমেন ডাক্তার বললেন—কি করতে পারি বলুন। শুনলেন তো সব।

গুঁই চাটুয্যে বললেন—উকীলবাবু একটা ব্যবস্থা করুন।

বিছে উকীল বললেন—ব্যবস্থা আর কি, এক মেয়েটাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া।

—তাই দিন।

বিছে উকীল বললেন—কিন্তু সরে যে যাবে, সে সময়ই বা কোথায় এখন তো কোনও ট্রেনও নেই।

হেমেন ডাক্তার বললেন—ট্রেন নেই কিন্তু মোটর তো আছে। মোটরে করে না হয় কলকাতায় চলে যাক। সেখানে তো মামারবাড়ি।

—তারপরে যদি আমাদেরই বিরুদ্ধে নালিশ-টালিশ করে বসেন। হাজার হোক আইনত আমাদের কোন অধিকার নেই।

গুঁই চাটুয্যে খাপ্পা হয়ে বললেন—দূর মশাই! শকুনদের যেমন ভাগাড় ছাড়া অন্য কিছু নজরে আসে না উকীলদেরও তেমনি আইন ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। শিরে সংক্রান্তি, একটা বংশ লোপ পেতে বসেছে আর আপনি আইন কপচাচ্ছেন। রাধামাধব—।

বিছে উকীল লজ্জিত হলেন, বললেন, না না তাই বললুম। ভেতরে গিয়ে বৌদিকে বলি।

গুঁই চাটুয্যে হাত নেড়ে বললেন—তাই গিয়ে বলুন, আর দেরী করবেন না। নাপিত নিয়ে কুঞ্জবাবাজী ফিরে এল বলে।

শৈলজা নীচেই ছিলেন বিছে উকীলকে অমন ভাবে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে শঙ্কিত হয়ে এগিয়ে এলেন।

বিছে উকীল শৈলজাকে বললেন—সর্বনাশ হতে চলেছে বৌদি। শীগগির পালান।

—কেন? কি হয়েছে?

—কুঞ্জবাবু অখিল নাপিতকে ধরে আনতে গেছেন।

—কেন?

—রাগিণীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন বলে।

—সে কি!—শৈলজা চোখে অন্ধকার দেখলেন।

—হাঁ। দত্তদের বাড়ি থেকে ঠাট্টা করে বলেছে বুঝি অখিলকে জামাই করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কুঞ্জবাবু গোঁ ধরেছেন তাই করবেন। দলবল নিয়ে তিনি অখিলকে আনতে বেরিয়েছেন রাগিণীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। এসে পড়লেন বলে। আমাদের কারুর কথা শুনলেন না। আর দেরী করবেন না। শীগগির রাগিণীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান, নইলে সর্বনাশ হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

—কোথায় যাব?—থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শৈলজা জিজ্ঞেস করলেন।

—মোটরে করে কলকাতায় চলে যান।

রাগিণী ওপরে ছিল। বিছেবাবুর গলা শুনতে পেয়ে নীচে নেমে এসে শৈলজাকে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মা?

শৈলজা সে কথার জবাব না দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

রাগিণী বিছে উকীলকে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে?

—সর্বনাশ হয়েছে মা, শীগগির পালাও।

—পালাব কেন? বাবা কোথায়?

—তিনিই এই সর্বনাশের মূল। আমি চললুম; বাইরে যতক্ষণ পারি তাঁকে আটকে রাখব। তোমরা আর দেরী করো না, চাকরবাকর কারুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে করে কলকাতায় চলে যাও।

বিছে উকীল বৈঠকখানার দিকে চলে গেলেন।

শৈলজা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বিছে উকীল চলে যাবার পর তিনি চোখের জল মুছে মেয়ের হাত ধরে বললেন—চল আমার সঙ্গে।—বলে খিড়কীর দোরের দিকে মেয়েকে নিয়ে এগোলেন।

খেপী ও রামগতি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল রাস্তায় নেমে দৃঢ়স্বরে বললেন—না, তোদের আসতে হবে না। খিড়কীর দোর দে। খেপী রামগতি ভেতরে ঢুকে খিড়কীর দোর বন্ধ করে দিল।

[ক্রমশঃ।

আমাকে আপন করে নাও

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

শান্ত নদীর কাছে বিচ্ছুরিত দিনান্তের আলো
স্নিগ্ধ তপস্যারতা মৌন এ মায়াবী সন্ধ্যায়
সুপ্ত মনের বুকে চেতনার আবীর মাখালো—
সৌন্দর্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করালো আমায়।

আমি ক্লান্ত হে প্রকৃতি, পরিশ্রান্ত সময় ঘর্ষণে—
ব্যথিত হৃদয় জুড়ে শান্তি প্রলেপ এঁকে দাও:
তৃপ্ত করো তারাদের স্নেহক্ষরা সুধার বর্ষণে,
প্রত্যেক সন্ধ্যার কোলে আমাকে আপন করে নাও।

বাতাসী আবার কি নাম? বিয়ের পরেও নামটা ত' বদলে আসতে হয়, বিশেষ যখন এই সহরে আসছো—এই রকম খিঞ্জি জায়গায় শ্বশুরবাড়ি, তার ওপর এই ফ্ল্যাটবাড়ি! ওগো, হ্যাঁগো-র যুগ গেছে, একটা নাম ধরে ত' ডাকতে হবে। কি বাতাসী-বাতাসী বলবো বলো ত'? লোকে শুনে হাসবে যে—

ব্রজদুলালের কথাগুলো শুনে বাতাসীর মুখে কোনো জবাব জোগায় না। সত্যি, তার নামটা বড্ড সেকেলে। না, সেকেলে ঠিক নয়, বড্ড পাড়াগেঁয়ে-পাড়াগেঁয়ে। সহরে এমন নাম চলে না। তা শোনা যায়, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে অনেক গেঁয়ো মেয়ের নতুন নামকরণও হয়ে থাকে! ব্রজদুলালও কোন্ ছাই একটা নতুন নাম রাখতেও ত' পারতো!

ভজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? তা বাপ-মা আদর করে বাতাসী নাম রেখেছে—তুমি আর করবে কি? ছেলেবেলায় বুঝি বাতাসা খেতে খুব ভালবাসতে?—একটু প্রীতি আর একটু সোহাগের ফোড়ন কেটেই ব্রজদুলাল জিজ্ঞাসা করলে!

—বাতাসীর লজ্জাও লাগে, ভালোও লাগে। এই ত' ক'দিন বিয়ে হয়েছে তাদের, হয় তো স্বামীর সোহাগ করার রীতিই বুঝি এই! ফ্ল্যাটবাড়ির ঘর, ঘরের গায়েই বারান্দা, বোধ হয় ফুট আষ্টেক তফাৎ হবে; সেখানে জনতা-স্টোভে চা তৈরি করছিল ব্রজদুলালের বিধবা দিদি ললিতা, সে-ই বললে—তুই দেখছি বৌটাকে না রাগিয়ে ছাড়বি না ব্রজ! বাপ-মা যা নাম রেখেছে, রেখেছে—তা ও করবে কি!

এবার সত্যি সত্যি লজ্জায় লাল হয়ে বাতাসী সেখান থেকে পালালো! পালাবে আর কোথায়? তার পাশের ঘরে, সেখানে রুগ্না শাশুড়ি বাতের রোগে আর কিডনী সংক্রান্ত জটিল ব্যামোয় ভুগছেন। বুড়ো শ্বশুর একটা ইজি-চেয়ারে বসে বসে 'পত্নীর' সংগে সুখ-দুঃখের কথা বলছিলেন।

বাতাসী সেখানে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে—গরম জলের ব্যাগটা ভরে আনবো মা? দিদি চা বসিয়েছেন—

আনবে? তা আনো। যে ক'টা দিন আছি—তোমাদের কষ্ট দিয়ে যাই মা—নইলে মনে থাকবে কেন!—শাশুড়ি বললেন!

বাতাসী চলে এল বারান্দায়!

ব্রজদুলালের বাবা হরকালীবাবু স্কুলমাস্টারি করতেন, সেকালের গ্র্যাজুয়েট, সেকালেই মাস্টারিতে ঢুকেছিলেন দেশের গ্রামে। গ্রামের স্কুলটা হয় তো আছে আজো, কিন্তু গ্রাম ছেড়ে আসায় চাকরীটা নেই। এখানে এসে প্রথমে এ-স্কুল সে-স্কুল করে করে শেষে সরকারী সাহায্যের একটা ভালো স্কুলে কাজ জুটলো বটে, কিন্তু ষাট বছরের আগেই সেখান থেকে রিটায়ার করতে হয়েছে। এখন ভরসা টিউশনী। সিজন ফ্লাওয়ারের মতো, ফুটলে আলো—নইলে তা জঙ্গলের সামিল। জুটলে টাকা, না থাকলে অদৃষ্টের অভিশাপ। তিনটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। বড়টি ব্রজদুলাল, গভর্ণমেণ্ট অফিসের ক্লার্ক। বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। মেজটি বার তিনেক আই-এস-সি দিয়েছে, এবারও দেবে শেষ বারের মতো। ছোটটি স্কুল ফাইনাল পাশ করে চাকরীর চেষ্টায় ঘুরছে। চাকরী হলে রাত্রে কমার্স পড়বে। মেয়ে তিনটির মধ্যে বড়টি বিধবা, পাকিস্তানে তার যথাসর্বস্ব খোয়া গেছে। দু'টি ছোট্ট মেয়ে নিয়ে সে এসে উঠেছে বাপের বাড়িতে। ব্রজদুলালেরই আস্কারা বেশি—আমাদের একমুঠো জুটলে দিদিরও জুটবে একমুঠো, বাচ্চা দু'টোর একটা ব্যবস্থা হবে।

মেজ মেয়েটির বিয়ে হয়েছে হরকালীবাবুরই সহকর্মী এক মাস্টারের ছেলের সঙ্গে। ছেলেটির বই-এর দোকান আছে। কোন রকমে চলে যায়। ছোট মেয়েটি আই-এ পাশ করে বসে আছে, বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। গরীবের ঘর, শরীরে লাবণ্য নেই বলে চট করে বিকোচ্ছে না!

বয়স পার হয়ে যাচ্ছে ব্রজদুলালের, বিয়ে না দিলে বড্ড খারাপ দেখায়! মা ধমক দেয় বাবাকে,—ছেলের বৌ দেখে যাই—সে তুমি চাও না। আমি মরলে সংসারে একটা জায়গা খালি হবে, তখন এনো ব্যাটার বৌ!

হরকালীর অভিমান নেই। মেয়েদের সংসার চালাতে হয় না,

অন্তত তরিতরকারী কিনতে বাজার-দোকানে বেরোতে হয় না। ঢ্যাড়সের সের পাঁচসিকে আর বেগুনের সের বারো আনা শুনলে মেজাজটা কেমন হয়—সে উপলব্ধি যাদের নেই—তাদের এবম্বিধ অভিমান শোভা পায়। উপায় বলতে ত' ওই ব্রজদুলালের ক'টা টাকা, তা বাড়ি ভাড়া পঁয়ষট্টি টাকা দিয়ে হাতে কোনো মাসে দু'শো টাকাও থাকে না। নিজের টিউশনীতে আর কি মেলে, কোনো মাসে তিরিশ, কোনো মাসে ষাট; শীতের সময় হয়তো শ'খানেক। এতগুলো লোকের খাওয়া পরা, খাওয়া তবু যেমন তেমন হ'লে চলে, কিন্তু পরতে ত' হবে। এ ছাড়া ডাক্তারেও খায় কিছু। তার ওপর প্রতিদিন জিনিস পত্তরের দাম বাড়ছে—হু হু করে বাড়ছে···এর মধ্যে ব্রজদুলালের বিয়ের কথা ভাবতেও হরকালীবাবুর কাঁপুনি লাগে মনে!

কিন্তু গিন্নী বোঝে না, রোগে ভুগে বুঝি ছেলেমানুষেরও অধম হয়ে গেছে,—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, বড় খোকার বিয়ে দাও, বৌ এলে, বৌ-এর মুখ দেখার পর—আমি জায়গা ছেড়ে দেব। ঠিক বলছি—

হরকালীর যখন চোদ্দ বছর বয়স, তখন সে দু' বছরের বিধুমুখীকে বিয়ে করে। সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা, এই পঞ্চাশ বছর তাদের কখনো ছাড়াছাড়ি হয় নি! ইদানীং প্রায়ই বিধুমুখীর মুখে অনুমোদন না থাকলেও তিনি তলে তলে ছেলের বিয়ের চেষ্টা করছিলেন।

ব্রজদুলালের মত ছিল না বিয়েতে। মার রাগ, দুঃখ, অভিমান পীড়াপীড়ি—ব্রজদুলাল তবুও রাজি ছিল না। ভাই দু'টোর একটা হিল্লে হলে, বোনটার বিয়ের পর না হয় নিজের সংসার রচনার কথা ভাবা যাবে!

কিন্তু অনিচ্ছা থাকলে কি হবে, মার ইচ্ছায় এবং বাপের চেষ্টাতেই বিয়ে করতে হলো ব্রজদুলালকে। বাতাসীরা মধ্যবিত্ত ঘর, মোটা ধরনের টাকা দিতে পারে নি বটে, কিন্তু মন্দও পায় নি ব্রজদুলাল, নগদ হাজার টাকা আদায় করেছিলেন হরকালীবাবু!

বিধুমুখী খুব খুশি। বাতাসীর মুখখানা যেমন কচি, তেমনই মিষ্টি। স্বভাবটাও বেশ নম্র। পাড়াগাঁর মেয়ে, হাবভাবে, চলনে-বলনে কোথাও কিন্তু গ্রাম্যতা নেই।

শুধু ব্রজদুলাল খুশি হয় নি। অভাবের সংসার এখান আর একজনের প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষ করে তার বৌয়ের। তার প্রতি মনোযোগ দেবার তার উপায় নেই। না আছে আলাদা ঘর-দোর, না কোনো সুযোগ-সুবিধে! পাঁচজনের সংসারে একজনের পেট চলার মতো আহার যা হয় জুটবে, কাপড় কোনো রকমে যোগাড় হবে, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে সেইটুকুই ত' সব নয়। দু'টো ঘর—আর ওই একচিলতে বারান্দা—সেখানে রান্না খাওয়া হবে—না, লোকজন শোবে রাত্রে!

ললিতা ব্রজকে বোঝাতে লাগলো—বাতাসীর দোষটা কি বল। এই অভাবের সংসারে এসে পড়েছে, ও ত' তোর মুখের দিকে চেয়েই বাঁচবে! তুই যদি উড়ু-উড়ু ভাব দেখাস—ও কোথায় যায় বল। বিয়ে যখন হয়েই গেছে—

ব্রজদুলালও ভেবেছে—সত্যি, বাতাসীর কি দোষ।

বাতাসী বৌভাতের দিন প্রথম বুঝতে পারলো যে সে একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে এসে পড়েছে। কোলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ি ওই রকমই হয়, বিশেষ করে সস্তাভাড়ার ফ্ল্যাট। সে জন্যে দুঃখ নয়। কিন্তু রাত্রে স্বামীর হাতের সুতো খোলার অনুষ্ঠান যখন হলো, তখন সে প্রথম বুঝতে পারলো—অন্য ঘরে আর ঘেরা ওইটুকু বারান্দায় বাড়ির বাকী ক'জন শুয়ে থাকবে! অসম্ভব! শোয়া ত' দূরস্থান, গাদাগাদি হয়ে বসে থাকারই জায়গা হয় না। তারপরের দিন থেকেই সে নিজে ব্যবস্থা পাল্টে দিলে—বারান্দায় সে আর ললিতা আর তার ছোট বোন শোবে, বাকী সবাই শোবে ঘরে।

ব্রজদুলাল দুঃখ পেল না, বাতাসীর ত্যাগ করার শক্তি দেখে তার ভালই লাগলো।

ললিতা বলতো—মেয়েরা হচ্ছে জলের জাত। যেমন পাত্রে ঢালবি, তেমনি তার চেহারা। বাতাসী কেমন মানিয়ে নিয়েছে দেখ।

মা বলতো—ব্রজ, কি লক্ষ্মী মা এসেছে সংসারে। তোর বাবার নতুন দু'টো টিউশনী হয়েছে বৌমা আসার পর থেকে!

ব্রজদুলালের সৌভাগ্যে যে একটু রোশনাই জ্বলে নি এমন নয়, তবে সেটা তেমন কিছু নয়। তার অফিসেরও বড় বিরক্তিকর বড়বাবু বস্তুটি অন্যত্র বদলি হয়েছেন, সে জায়গায় ব্রজদুলালেরই এক বন্ধুর কাকা এসেছেন! সুতরাং একটু-আধটু লেট, কি দু' দশ মিনিট আগে

ছলে আসার ছিটেফোঁটা সৌভাগ্য জুটেছে বৈ কি! ব্রজদুলাল অবশ্য বলতে পারে যে পাঁচ বছর অন্তর ত' বড়বাবু বদল হয়েই থাকে—এতে আর বৌয়ের বাহাদুরি কি!

তা ঠিক।

তবুও একটু একটু করে বাতাসী ব্রজদুলালের মন দখল করে নিলে। পান খাওয়ার অভ্যেস ছিল না কোনো কালেও; কিন্তু এখন অফিস যাবার সময়টিতে একখিলি পান সেজে হাতে দেওয়া, পানের বৌটায় করে একটু চূণ যতক্ষণ পানটি মুখে থাকে, বাতাসীর কথাও মনে লোটে; গ্রীষ্মতপ্ত পিচের পথে হাঁটতে কষ্ট হয় না তার, বাসে ঝুলে অফিস যেতেও ক্লেদ জমে না, কৃষ্ণচূড়া গাছে ফোটা ফুলে অক্ষয় স্বর্গ রচিত হয়।

অফিস থেকে একটু আগেই বেরোয় ব্রজদুলাল। বন্ধুরা ফুট কাটে—কোয়ায়েট ন্যাচারাল! আমরাও অফিস পালিয়েছি কতদিন! ঠিক আছে! এ একটা স্টেজ রে ভাই—লজ্জার কিছু নেই, লুকোবারও না।

অথচ অফিসের সকলে জানে না—বাতাসীর সংগে ব্রজদুলালের সম্পর্কটা যতই নিবিড় হোক, যতই আত্মীক হোক, অভিশাপের একটা চোখ রাঙানিতে কেমন যেন রুক্ষ। শুধু একটুকু ছোঁয়া—শুধু একটুকু কথা শোনা—ব্যস্—এর মধ্যেই সুষমা আর সুরভির ফাল্গুনী! রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন!

পাশের ঘরে হয় তো হরকালীবাবু বিধুমুখীকে বলেন—তোমার শরীরটা একটু সারলে ক'দিনের জন্যে আমরা সবাই টুনির বাড়িতে যেতাম, বড় খোকা থাকতো বউ নিয়ে ক'টা দিন একা—টুনি ব্রজদুলালের সেই বিবাহিতা বোন।

ব্রজদুলালের কানেও কথাটা ভেসে আসে। ফ্ল্যাটবাড়ির পার্টিশন শুধু দেখতে—অনুচ্চ কণ্ঠের কথা শোনা তাতে আটকায় না।

ফাঁক পেলেই ব্রজদুলাল বৌ-এর সংগে একটু-আধটু রসিকতা করে; বোঝাতে চেষ্টা করে যে সে একেবারে জলে পড়ে নি। দেখতে চারিদিক জলময় বটে, তবে পায়ের তলায় ডুব জলের আগেই ডাঙ্গা আছে। বাতাসীর চোখ চলে, চোখের ইসারায় স্বামীর রসিকতার জবাব দেয়, ব্রজ বেচাল হয়ে চোখেই ধমক দিতে চেষ্টা করে মায়া ছড়ায়।

ললিতা বলে—এই ব্রজ, বৌ নিয়ে ত' এক আধ দিন বেরোতে পারিস। লেকের দিকে কি গড়ের মাঠে, না হয় কোনো সিনেমায়—

সিনেমায়?

কথাটা দিদি মন্দ বলে নি। ব্রজদুলালের মনে ধরে যায়। তবু অনেকক্ষণ কাছাকাছি থাকা যাবে বাতাসীর সংগে, এক সংগে, একেবারে একা। মাঝখানে কেউ থাকবে না, পরস্পরের কোনো কথা অন্যের অবাঞ্ছিত কানে গিয়ে ধাক্কা খাবে না! দিদিটার বুদ্ধি আছে! কিন্তু সিনেমা মানে ত' দু' টাকা আশি নয়া পয়সা; এক টাকা চল্লিশ নয়া পয়সার কম ত' যাওয়া যাবে না—প্রায় দু'দিনের বাজার খরচ। ছোট বোনটা সিনেমায় যেতে চায়, কোনো দিন তাকে একটা ছবি দেখার পয়সা দিতে পারে নি, তাকে ফেলে বৌ নিয়ে সিনেমায় সে যায় কি করে? তার চেয়ে বরং লেকের দিকে যাওয়া যেতে পারে—সন্ধ্যের পর, দিব্বি ফুরফুরে হাওয়া!

যাবে বাতাসী, একটু বেড়িয়ে আসবে আমার সংগে?

তার মানে? তুমি আমার অনুমতি চাইছো নাকি? জোর করে হুকুম করতে পারো না?

অফিসের এক বন্ধু ব্রজদুলালকে হঠাৎ একদিন থিয়েটার দেখার একটা পাশ এনে দিলে। রোববারের পাশ বৌদিকে নিয়ে যাবার জন্যে—ট্যাক্স লাগবে না। আর একেবারে স্টেজের কাছাকাছি সীট। ব্রজদুলালের হাতে যেন স্বর্গ এসে হাজির। বাতাসীকে ভালো কোথাও সে নিয়ে যেতে পারে না, এবার প্রথমেই একেবারে পেশাদারী থিয়েটারে নিয়ে যাবে—সবচেয়ে দামী সিটে বসবে! বাতাসীর হাসি-হাসি মুখখানা কল্পনা করে নিলে ব্রজদুলাল।

সত্যি, বাতাসী খুব খুশি হয়ে উঠলো। বিয়ের পর স্বামীর সংগে কোথাও যায় নি সে, একেবারে থিয়েটার দেখতে যাবে। সিনেমায় দু'চার বার গেছে বাতাসী, আইবুড়ো বেলায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে যখন কালীঘাটে এসেছিল সে দু'একবার মা-পিসিমাদের সংগে, তখন সিনেমা দেখে ফিরতো; তাদের গ্রামের পাশে ফকিরগঞ্জের হাটে যে টকি হয়—সেখানেও গেছে কয়েকবার। কিন্তু কোলকাতার থিয়েটার কখনো দেখে নি। কোন শাড়ি পরে সে যাবে—মনে মনে ভাঁজতে লাগলে। তার সংগে কোন ব্লাউজ মানাবে। ফুলশয্যার রাতে একটা বিলিতি সেন্ট পাওয়া গেছে, কোনোদিন সে এককোঁটা ঢালে নি, এবার সে সুযোগও জুটে যাবে। খুশিতে বাতাসী ঝলমল করে উঠলো।

রবিবার সন্ধ্যায় যাওয়া, সেই সাড়ে ছ'টায় শো আরম্ভ। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ব্রজদুলাল বাতাসীকে ডেকে হঠাৎ বললে—পাশ ত' আমাদের চারজনের, খুকিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়? ও বেচারীও ত' কোথাও যেতে পায় না; সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে এত আলোচনা করে মরে। আর সেই সংগে দিদির বড় মেয়েটাকে—

বাতাসী শুধু স্বামীর চোখের দিকে তাকালে; বাড়িতে এমন একটু জায়গা নেই যেখানে দাঁড়িয়ে নিভৃতে স্বামীর সংগে দু'টো কথা বলা যায়; ঘরোয়া সংসারের কথাও যদি আড়ালে পতিদেবতার কাছে নিবেদন করার থাকে, সেখানেও নিজেকে একান্ত করে তুলে ধরতে হয়! সে রকম জায়গা এ বাড়িতে মিলবে না; তাই বাতাসীর মনে হয়েছিল নির্লিপ্ত ভিড়ের মাঝখানে স্বামী-সান্নিধ্যে বসলে মন দিয়ে স্বামীর মনকে হয় তো ছোঁয়া যেত।

ব্রজদুলাল বুঝি তেমন করেই ভেবেছে! বাতাসীর দেহ-সৌরভ তাকে মাতাল করে। চুলের গন্ধ বুঝি হৃদয় জড়িয়ে ধরে কিন্তু অভাব-দেবতার নিষ্ঠুর মুখ নাড়ার জ্বালায় কাব্য ঘুচে যায়। তাই বৌকে থিয়েটারে নিয়ে যাবার আনন্দে ব্রজদুলালও মাতাল হয়ে উঠেছিল।

তবু চক্ষুলজ্জা আছে। বোনটা থিয়েটার-বায়স্কোপের আলোচনায় মরে—পাশে নিয়ে যাওয়া যায়—তাই একবার বাতাসীর অনুমতি চাওয়া, আর অন্য আরেকজন যখন যেতে পারে—পাশ ত' হামেশা পাওয়া যায় না; পয়সা দিয়ে দেখবার ক্ষমতা নেই যখন—

বাতাসীও ভাবলে—ঠাকুরঝিকে ফেলে কি করেই বা সে যায়—পাশ যখন চারজনের জন্যে, আর ঠাকুরঝি ওই থিয়েটারটা দেখবার জন্যে প্রায় পাগল হয়ে বসে আছে আর ললিতাদি'র মেয়েটাকে নিয়ে গেলেও মন্দ হয় না।

ব্যবস্থা তাই হলো। তবু মন্দের ভালো, একসংগে বাড়ির বাইরে ত' পা বাড়ানো গেল। বাসে কি ভিড়, মেয়েদের তবু যা হোক করে একটু বসার জায়গা মেলে, পুরুষ মানুষটাকে রড ধরে বাদুড় ঝোলা হয়ে যেতে হলো! ফর্সা পাটভাঙা জামা পরে যে বেরোলো লোকটা, এখন এই হাল দেখে সে কথা আর কে বলবে?

থিয়েটার-হল কিন্তু সুন্দর। কত চেয়ার পাতা, কি রকম আলোয় আলো। বাতাসী এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলো। চারটে সীট একেবারে সামনের দিকে। আগে খুকি, তারপর ললিতার মেয়ে, তারপরে বাতাসী আর ব্রজদুলাল। কিন্তু ছোট মেয়েটা ওখানে বসবে না, মামীমাকে সরিয়ে সে মামার পাশে বসবে, বায়না ধরে বসলো। এদিকে থিয়েটার সুরু হয়ে গেছে—তাকে কে সব বুঝিয়ে দেবে মামা ছাড়া! মুহুর্মুহুঃ প্রশ্ন করবে সে। বাতাসীকে অগত্যা খুকির পাশে যেতে হলো! ছোট্ট মেয়ে—কিছু যদি বোঝে! সত্যি, তার জিজ্ঞাসার জবাব দেবার ক্ষমতা নেই বাতাসীর। ওই চাপদাড়ি লোকটা কেন থান কাপড় পরা মেয়ে-লোকটাকে ধমকাচ্ছে? ছোট ছেলেটাকে কোলে করে ওই বৌটা বসে বসে কাঁদছে কেন? ও-বুঝি শুধু কাঁদে। কোট-প্যাণ্টপরা লোকটা কে এল, ওই বৌটা ছেলেটাকে ওর কোলে দিলে কেন? খুব নীচু গলায় যতটা পারলো ব্রজদুলাল বুঝিয়ে দিতে লাগলো খুকিকে। বাচ্ছা মেয়ে—তার কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক!

চার আনার কাজুবাদাম কিনে খাওয়ালে সকলকে। এ বাদাম ত' কখনো খায় নি বাতাসী। সত্যি, কোলকাতায় কত রকমের আনন্দ যে ছিটোনো রয়েছে!

থিয়েটার ভাঙতে ব্রজদুলাল জিজ্ঞাসা করলে বাতাসীকে—কেমন লাগলো?

সত্যি, কি সুন্দর। রেলগাড়ি করে বিদেশে যাচ্ছে বেড়াতে, একেবারে স্পষ্ট দেখলুম। আচ্ছা কি করে অমন হয়? রেলগাড়ি, সমুদ্দ—সমুদ্র বুঝি অমন? রাতদিন শুধু জলের ঢেউ আসছে—একবারও থামে না? আর অত বালি পড়ে আছে—তা'হলে সমুদ্রের ধারে যারা থাকে, তাদের বাড়ি করতে বালি কিনতে হয় না বলো?

থিয়েটার তোমার কেমন লাগলো—তার কি এই উত্তর হলো?

—আচ্ছা, ওরা রোজ এই এক রকম ভাবে করে? কি করে করে? এক রকমের শাড়ি পরে? এক রকম করে কথা বলে? আমি একবার বাবার সংগে পূজোর সময় আমার এক পিসিমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে যাই, সেখানে একবার থিয়েটার দেখেছিলাম—সে ত' এ-রকম নয়। হ্যাজাক জ্বেলে থিয়েটার—পাশ থেকে আবার বলে বলে দেয়—

তবে ব্রজদুলাল বুঝতে পারলো—বাতাসী খুশি হয়েছে খুব। একটা ট্যাক্সী করে বাড়ি ফিরবে কি-না ভাবতে লাগলো ব্রজদুলাল। না, কাজ নেই—মার অসুখ, অভাবের সংসার। বাবা-ই বা মনে করবেন কি!

সেদিন রাত্রে খেতে দেবার সময় বাতাসী খুব নীচু গলায় বললে—যদিও বা গেলাম থিয়েটারে সবাইকে নিয়ে, তোমার পাশেই বসতে পেলুম না। চলো একদিন আমরা একা একা—একটু বেড়িয়ে আসি।

আমরা আবার একা কি করে হই?

শুধু তুমি আর আমি। আর কেউ থাকবে না, একটা গাড়ি করে না, গাড়ি নয়, একটা রিক্সা করে দু'জনে পাশাপাশি—

এই আর্তি শুধু বাতাসীর নয়, ব্রজদুলালেরও। সে দেখেছে বাতাসীর বরাত বটে। বাড়িশুদ্ধ সবায়ের নেমন্তন্ন, মা শুধু যান নি, ও ঘরে রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ছেন, বাতাসীও গেল না শরীর খারাপের অজুহাতে, ব্রজদুলাল যায় নি বলেই বাতাসীর এই ছুতো, তবু কিছুক্ষণের জন্যে স্বামীকে এ ঘরে একেবারে কাছাকাছি পাওয়া যাবে।

ব্রজদুলালও খুশি হলো। নিবিড় সান্নিধ্যে, স্নিগ্ধ নির্জনতায় পত্নীকে পায় নি কখনো! কিন্তু বরাত বটে বাতাসীর। বাড়ির সকলে নেমন্তন্নে বের হতে না হতেই হরকালীবাবুর এক ছাত্রের বাড়ির সকলে এসে হাজির। ধনী মানুষ তাঁরা, একরাশ খাবার নিয়ে মাস্টার মশায়ের রুগ্না স্ত্রীকে দেখতে এসেছেন। মজা এই যে ছাত্র আসে নি, কিন্তু ছাত্রের মা, বৌদি, দিদি এসেছেন, আর এসেছেন এঁদের কুলগুরু বিধুমুখীকে সারিয়ে তোলার একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে।

খুশি না হয়ে বাতাসীর আর উপায় কি,—বিশেষ করে শাশুড়ির রোগটা যদি সারে। ব্রজদুলালকে আড়ালে ডেকে বললে—একটু মিষ্টি আনো; দালদা আছে, আমি স্টোভ ধরিয়ে দেখি দু'টো পরোটা করতে পারি কি না—তারপর চা করবো!

মিষ্টি আনার দরকার কি—ওঁরা যে প্রচুর মিষ্টি এনেছেন।

তা হোক, ওই মিষ্টির সংগে অন্য মিষ্টিও একটু দিতে হয়। কিছু যেন বোঝ না তুমি!

নেমন্তন্নে না গিয়ে তুমি যে খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ—তার তারিফ না করে পারছি না।

যাও, লক্ষ্মীটি, তুমি আর অমন করে খোঁচা দিও না।

ওদিকে শাশুড়ি ডাক পাড়লেন—আয় মা, এদিকে আয়। এদের দিকে একটু যত্ন দে—

গুরুদেব ব্যাধি-বালাইয়ের কথা শুনে বিধান দিলেন—বাড়িতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে ; আর অসুখের জন্যে আপাতত একটা মাদুলি ধারণ করতে হবে—পরে মন্ত্রপূত কবচ ধারণ করলেই বিধুমুখী উঠে বসবে, হাঁটবে, কাজ করবে। সংসার সুখের হবে।

বিধুমুখী বলেন—ভাগ্যিস তুমি নেমন্তন্নে যাও নি বৌমা, তা নইলে কে ওদের যত্ন করতো। কত বড়লোকের বৌ-ঝি ওরা—দেমাক নেই এইটুকু, গরীবের বাড়িতে তবু মনে করে এসেছে ত' আমাকে দেখতে। আজকালকার দিনে কে বলো বাড়ির মাস্টারের জন্যে এতটা করে—

সামান্য সুযোগের ফাঁকটুকু বাইরের অতিথি এসে পূর্ণ করে দিয়েছে বলে বাতাসীর মনে যে বিক্ষোভের মেঘ জমেছিল, অতিথিদের সংগে কথা বলে সেটুকু উড়ে গেছে। আবার লঘু হতে পেরেছে সে। শুধু ব্রজদুলাল ভাবতে লাগলো মেয়েটা কি বরাত করেই না পৃথিবীতে এসেছে! মেয়েটার বরাতের দোষ, না ব্রজদুলালের অক্ষমতা? কত লোকের কত বড় বাড়ি অকারণে পড়ে রয়েছে—অথচ ব্রজদুলালের সংসারে এতটুকু ঠাঁই নেই। অতি প্রয়োজনীয় এতটুকুও ঠাঁই নেই!

তবু শীতের পর বসন্তকাল যখন এই পোড়া কোলকাতাতেও আসে, একটু উন্মন হাওয়া দোলে, দু'-চারটে কাঠকলকে ফুলও ফোটে ইতস্তত—ব্রজদুলালের মনটা কেমন করে ওঠে। একদিন বিকেলে সে ঝোঁকের মাথায় বাতাসীকে নিয়ে বেড়াতেই বেরিয়ে পড়ে।

বাতাসীর সেই যে কতদিনকার সখ—দু'জনে একা একা একটা রিক্সা চেপে বেড়াতে যাবে, ভিড়ের কোলকাতায় তবু নিরিবিলি একটা অস্থায়ী জায়গা জুটবে—যেখানে বসে দু'জনে পরস্পরকে আরো নিবিড় আরো সন্নিধি হয়ে পড়বে ;—অফিস থেকে দু'ঘণ্টা আগে বের হতে পেরেছে বলেই ব্রজদুলালের মনে পড়ে গেল—বাতাসীর সেই সাধটা পূর্ণ করে ফেলতে। বাতাসীও রাজী—বাড়িরও সবাই, মা বাবা বরং খুশিই হলো ; বড় খোকা আর বড়-বৌয়ের জন্যে বেদনায় তাদেরও মনটা টন টন করে।

পথে বেরিয়ে বাতাসী বললে, চলো না আজ হাওড়ার পোলের দিকে বেড়াতে যাই রিক্সা করে। আমি কখনো হাওড়া পোল দেখি নি।

বিকেল গড়িয়ে গেছে, সন্ধ্যে চারদিকে রোদ মরে যাচ্ছে, তারই নিস্তেজ আভায় চারিদিক পীতাভ। এ সময় গংগার দৃশ্য মন্দ হবে না। তাই বরং যাওয়া যাক—একটা রিক্সায় বসে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে হাওড়ার পোল পেরিয়ে, হাওড়া স্টেশন ঘুরে, স্টেশনের রেষ্টুরেণ্টে বসে কিছু খেয়ে বাসে করে ফেরা যাবে। ক' টাকাই বা আর খরচ, না হয় দশ টাকা! তবু ত' বাতাসীর সখ মিটবে, নিশ্চিন্ত নির্জন একটু ঠাঁই মিলবে ওদের দু'জনের।

রিক্সায় দু'জনে বসতে একটু কষ্টই হয়। বাতাসীর দেহ তত ভারী নয়, কিন্তু ব্রজদুলাল একটু মুটিয়েছে। বিয়ের পর নয়, বিয়ের অনেক আগে থেকেই বপুতে তার মেদ সঞ্চয় ঘটছিল, তবু কষ্ট করে জায়গা হলো। বরং ভালই হলো, এমন একান্ত এমন নিবিড় করে কাছাকাছি তারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে পারে কই?

হাওড়া স্টেশন যেতে হবে শুনে রিক্সাওয়ালা প্রথমে রাজী হয় নি, বাস কিম্বা ট্রামে চেপে যাবার জন্যে সাধু পরামর্শ পর্যন্ত দিয়েছিল, কিন্তু বেশি পয়সার লোভে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়েছে।

রিক্সা চলছে টুং টুং। আশেপাশে শুধু ট্রাম, বাস, প্রাইভেট মোটর—পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পথচারীদের খোলা চোখের চাহনির জন্যে বাতাসী কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়লো। উন্মুক্ত সূর্যালোকে শামুক যেমন করে তার দেহটা খোলসে গুটিয়ে নেয়, বাতাসীও যেন কতকটা সেই রকমে তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে।

কিন্তু রিক্সা আর চলছে না, গাড়ি জাম হয়ে গেছে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে। আগে পেছনে—সর্বত্র গাড়ি জমে গেছে। শুধু গাড়ি, আর গাড়ি। থই থই করছে গাড়ি—যেন গাড়ির সমুদ্র। সামনে পেছনে এ পাশে ও পাশে শুধু গাড়ি। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে একবার যদি জট পাকিয়ে যায় গাড়ির—দু-এক ঘণ্টা কেন, চার ঘণ্টাতেও সে বিপত্তি কাটে কিনা সন্দেহ!

ওদের রিক্সাটা এসে দাঁড়িয়েছে হুডখোলা একটা প্রাইভেট মোটরের ঠিক পাশে। রিক্সাটা সেখানে এসে দাঁড়ালো, না মোটরটা রিক্সার পাশে এসে থামলো—ব্রজদুলালের তা মনে নেই। মোটরে জন ছয়েক উত্তীর্ণ তারুণ্য যুবক, চঞ্চল, উন্মুখর। বোধ হয় ওরা কোথাও প্লেজারট্রিপ করতে যাচ্ছে। রিক্সার পাশে থামতে হয়েছে তাদের বাতাসীকে দেখছে সকলে। দেখতে বাতাসী মন্দ নয়—তাদের দৃষ্টিতে তারিফের ইংগিত ব্রজদুলাল লক্ষ্য করেছে। ঠিক রিক্সার পাশে আটকাপড়া মোটরে বসেই যুবকগুলি ভ্যাজরাম ভ্যাজরাম সুরু করেছে। দেশের কথা, জাতির কথা, বাঙালীর অধঃপতনের কথা, ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের দুর্দশার কথা, রিক্সায় কেউ যদি ট্রেন ধরতে যায়—তার অসহায় অবস্থার কথা, কোলকাতার লোকসংখ্যা—বাংলা দেশের স্থানাভাব—

হ্যাঁ স্থানাভাবের কথাও তারা আলোচনা করছিল। বাতাসী অতি নীচু গলায়ও বলতে পারলো না স্বামীকে, যে ওরা কি তাদের সংসারের স্থানাভাবের খবরটুকুও জেনে ফেলেছে নাকি! ব্রজদুলালেরও মনে হলো—এর চেয়ে ঘরই বুঝি ভালো ছিল, তবু সংসারের আর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাতাসীকে দেখা যেত। বাড়ির বাইরেও যে এত ভিড়—এত লোকজন! নিশ্চিন্ত নির্জন ঠাঁই কই?

এক একবার দু'পাঁচ মিনিট অন্তর রিক্সা দু-এক পা এগোয় পাশের মোটরটাও সঙ্গে সঙ্গে যায় ততটুকু। চারপাশের লোক জনতা। তারওপর ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। বাতাসী-ব্রজদুলালের জন্যে ঠাঁই নেই। রিক্সার স্বল্প আরামের জায়গাটুকুতেও মনে হচ্ছে যেন কিসের প্রদাহ সুরু হয়েছে!

জড়ের সাধনায় আচার্য জগদীশচন্দ্র

জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে বহু জড় পদার্থ বিদ্যমান। কিন্তু মাটির পৃথিবী মানুষের পৃথিবীতে পরিণত হওয়ার পরেও বহুকাল জড় পদার্থের জীবন-রহস্য সম্বন্ধে কোনো রকম চিন্তাশক্তিই সাধারণ মানব মনে স্থান লাভ করতে পারে নি। যখন মানবজীবনে শুভ-মুহূর্ত আসে তখন এই পদার্থগুলির সবগুলিকেই মানুষ মৃত বলে ধারণা করে রয়েছিল, কারণ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানুষের চিন্তার মধ্যেই তখন ধরা দেয় নি। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে-সব জড় স্পন্দনহীন পদার্থ লক্ষ্য করি, সেগুলির মধ্যে প্রাণ আছে কি না, এ সম্বন্ধে জনসাধারণ বহুকাল অজ্ঞাত ছিল। জনসাধারণের ধারণা এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে নি যে, জড় পদার্থের মধ্যেও অব্যক্ত-জীবন লুক্কায়িত আছে। তাই আমাদের বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একান্ত অনুশীলন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এই কঠিন রহস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন। সমগ্র পৃথিবী তখন অবাক-বিস্ময়ে তাঁকে অনুসরণ করলো এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

বহুকাল আগের কথা—তিরাশি-চুরাশি বছর হতে চললো—জনৈক প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক একটি পুস্তকে প্রকাশ করেছিলেন যে জীব জগতের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের বহু সাদৃশ্য আছে। তিনি তাতে লিখেছিলেন যে, সবুজ-পত্রী গাছ আমাদের মতোই রাত্রিকালে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। প্রকৃতই গাছের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তি আছে। কিন্তু এসব গবেষণার মূলে গভীর অনুশীলনের ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাই আচার্য জগদীশচন্দ্রের পূর্বে কেউ গভীর অনুশীলনের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খক্রমে গবেষণা করে প্রমাণ করতে সক্ষম হন নি—'গাছের হৃদয় আছে'—আচার্য জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই গবেষণাকে প্রমাণ করে বিশ্ববিজ্ঞানের একটি অন্যতম রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। বাস্তবিকই, বিশ্ববিজ্ঞানে এটি একটি মহত্তম অধ্যায়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দ। অক্সফোর্ডের 'বৃটিশ এসোসিয়েশন'-এ স্যার জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিতে গেছেন। স্বয়ং আইনস্টাইন সেখানে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যখন আচার্যদেবের বক্তৃতা শেষ হলো তখন আইনস্টাইন ভক্তি ও শ্রদ্ধামিশ্রিত বাক্যে ঘোষণা করলেন—

'Bose ought to have a statue erected in his honour in the capital of the League of Nations.'

তাঁর নাম আর তাঁর গবেষণাগারেই সীমিত হয়ে রইলো না, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো, কারণ তিনিই প্রমাণ করতে পেরেছেন যে প্রত্যেক জীবনই এক। প্রকৃত পরীক্ষা দ্বারা তিনি দেখালেন—লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থের অনুভূতি-শক্তি আছে, গাছের চাঞ্চল্য আছে; ভগবৎ-সৃষ্ট প্রতিটি জীব এবং বস্তুর জীবন ও মৃত্যু আছে। এসব পরীক্ষা তিনি কেবলমাত্র ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দ্বারাই চালাতেন না, গাছের অনুভূতি পরীক্ষা করবার জন্য বহু প্রকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রও তিনি নিজে আবিষ্কার করেছিলেন। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মূলেই যে জীবন ও মৃত্যু আছে তা সবার কাছেই অবিদিত ছিল। তাই আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার প্রথম পদক্ষেপেই সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—
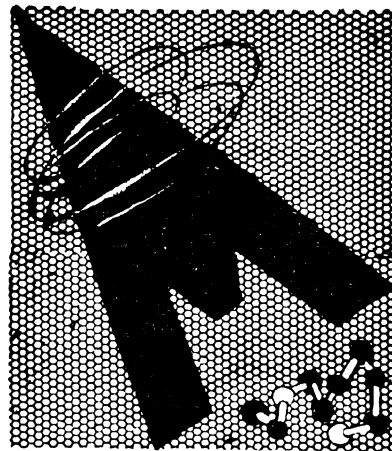
বিজ্ঞান বার্তা

It is not unlikely that plants have a **sixth sense.** In certain of my experiments **I have** noticed—I say it with caution, because I **do not** want to appear to magnify the truth; that **truth** exists and we intend to find it—that white a plant was recording a throbbing the pulsing was affected by the approach of certain people, but **became** normal again when they went away. **Generally** a plant took twelve minutes to recover from **the** blow.'

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

গাছের স্পন্দন নিরূপণ করবার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র যেসব যন্ত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন সে-গুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল এবং এইগুলির সাহায্যেই তিনি তাঁর গবেষণা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। গাছের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির (অগ্রগতির) হার এত কম যে এমন কি একটি শামুকের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির হার গাছের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির হারের চেয়ে ছ-হাজার গুণ বেশি। একটা গড়-পড়তা হিসেব করলে দেখা যায়, এক-মিলিয়ন সেকেণ্ডে গাছের বৃদ্ধি হয় মাত্র এক ইঞ্চি। কিন্তু বাঁশ-জাতীয় কোনো কোনো গাছের বৃদ্ধি খুব দ্রুত—চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় ন-ইঞ্চি থেকে আরম্ভ করে বারো ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় আরও জটিলতর সমস্যা সমাধানকল্পে আচার্য জগদীশচন্দ্র একটি বড়ো যন্ত্র আবিষ্কার করেন,—এটি আমাদের কাছে Crescograph বা Growth-recording machine নামে পরিচিত। এই বড়ো যন্ত্রে পরীক্ষা করার পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি সঠিক প্রমাণ করতে পেরেছে, তখন তিনি জানালেন,—

'Plants have hearts. Long before I invented the crescograph I was already certain that sap-pressure rising in the stem worked in almost exactly the same way as blood driven by the human heart. In other words the pressure was not constant, but came in beats. The crescograph gave definite proof that every surmise was correct. The actual rate of the pulsation of sap in a cyclamen (a kind of plant) proved to be the one hundred-thousandth part of an inch per second.'

তিনি একটি বিদ্যুৎ-চালিত শলাকাযন্ত্রকে গাছের কাণ্ডের সংস্পর্শে এনে প্রতি মিলিমিটারের এক-দশমাংশ করে অগ্রভাগে পরিচালিত করতে লাগলেন, যতক্ষণ না রাসায়নিক তড়িৎ-প্রবাহ মানযন্ত্রে প্রদর্শিত (নিরূপিত) হয়। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে রড্‌টিকে তার স্বাভাবিক চাপ-প্রয়োগের সাহায্যে কাণ্ডের সংস্পর্শে এনে বৃক্ষটিকে গতিহীন করে রাখা, তাহলে সহজেই প্রতিটি স্পন্দন আবিষ্কার করা যাবে। কিন্তু প্রকৃত কার্যকরী রডের অভাবে তাঁকে প্রথম প্রথম ব্যর্থ হতে হয়েছে। ইত্যবসরে আচার্যদেব একদিন পশুশালা পরিদর্শন করতে গিয়ে সজারুপক্ষীর একটি বিরাট পালক সংগ্রহ করলেন। তাঁর গবেষণা-পরীক্ষার জন্য এইটিকেই তিনি প্রকৃত কার্যকরী রড্‌ বলে গ্রহণ করে নিলেন।

তাঁর যন্ত্রগুলি এত সূক্ষ্মবিচারী ছিল যে, সেগুলির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে গাছ তারবার্তার উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে, যা অনেককাল মানুষের ধারণার অতীত ছিল। এর স্বরূপ নির্ণয় করবার জন্য একদিন তিনি একটি মটরগাছের চারা নিয়ে সেটিকে একটি গ্লাসে জলমগ্ন করে সমস্ত উত্তেজনা থেকে আড়ালে রেখে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। পরে দেখলেন, মটরচারাটি সতেজে বেড়ে মোটা হতে লাগলো এবং আরও পরীক্ষা চালানোর পর তিনি দেখলেন—গাছের বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে মন্থর হয়ে আসছে। এটাই হচ্ছে গাছের বৈশিষ্ট্য যে প্রথমে যে গতিতে এর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় শেষের দিকে তা আর লক্ষ্য করা যায় না। এর পরেও তিনি আর একটি চারা গাছকে 'ব্রোমাইড'-এ ডুবিয়ে রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং বিষক্রিয়ার ফলে ('ব্রোমাইড'-এ ডুবিয়ে রাখার জন্যে) গাছের দ্রুত স্পন্দন লক্ষ্য করলেন। এই পরীক্ষার দ্বারা তিনি লোকসমক্ষে প্রমাণ করলেন যে, গাছের অনুভূতি আছে বলেই বিষক্রিয়ার ফলে গাছের এই দ্রুত স্পন্দন দৃষ্ট হচ্ছে।

মানুষের জিহ্বার অনুভূতি বৈদ্যুতিক গতির নিকট অত্যন্ত প্রখর এবং এই ব্যাপারে একজন ভারতীয়ের অনুভূতি-শক্তি একজন ইউরোপীয়ের অনুভূতি-শক্তির চেয়ে দ্বিগুণ বেশি প্রখর। গবেষণা-পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, বৈদ্যুতিক গতির নিকট মানুষের অনুভূতি-শক্তিও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঋতুতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই রকম গাছের অনুভূতি-শক্তিও স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আচার্যদেব বলেছেন যে, গাছের সংস্পর্শে মেঘ এলে গাছের অনুভূতি-শক্তি বাস্তবিকই লক্ষণীয়। সূর্যালোক গ্রহণের ব্যাপারেও গাছের অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আচার্যদেব আমাদের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তির নিকট গাছের অনুভূতি-শক্তি মানুষের অনুভূতি-শক্তির চেয়ে অনেক বেশি প্রখর। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে গাছের অনুভূতি-শক্তি মানুষের অনুভূতি-শক্তি অপেক্ষা প্রখর হলেও গাছ এইসব শক্তির প্রভাবে সাড়া দিতে বিশেষ বিলম্ব করে, কিন্তু মানুষ কিংবা অন্য কোনও জীব অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এইসব শক্তির প্রভাবে সাড়া দিয়ে থাকে।

উদ্ভিদের ন্যায় জড়পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা করেই বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ক্ষান্ত হন নি, বিজ্ঞানসাধনায় তিনি আমাদের জন্য আরও অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য আবিষ্কার করে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে গেছেন। তিনি ধাতব উপাদান নিয়ে কাজ করতে করতে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সত্যে উপনীত হলেন যে, ধাতু নামক জড় পদার্থেরও একটা স্বকীয় জীবনীশক্তি আছে। যাঁরা ধাতব পদার্থ দিয়ে জিনিসপত্র নির্মাণ করেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ধাতব পদার্থের মধ্যেও কি রকম ক্লান্তি বা অবসন্নতা অনুভূত হয়। একটি (Blade) দিনের পর দিন ব্যবহার করলে কিংবা সেটিকে এক জায়গায় অনেক দিন ফেলে রাখলে সেটির কি অবস্থা হয় তা আমরা সকলেই প্রায় প্রত্যক্ষ করে থাকি।

ধাতব পদার্থের শ্রান্তি বা অবসন্নতা পরীক্ষা করবার জন্য আচার্যদেব 'গ্যালভানোমিটার' নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করতেন। বৈদ্যুতিক শক্তির উপস্থিতি বা বিদ্যমানতা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এটি একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র। এই যন্ত্রটির ওপর একটি নীডিল (Needle) লাগানো থাকে; সামান্য বৈদ্যুতিক প্রভাবে এই নীডিলটি এক দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে যায়। ক্রমান্বয়ে বৈদ্যুতিক সংঘর্ষের ফলে ধাতব পদার্থের অনুভূতি-শক্তি লোপ পেতে থাকে।

জীব-জগতের ন্যায় ধাতব পদার্থেরও ঋতুভেদে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মানুষ এবং ধাতব-পদার্থের মধ্যে যেমন প্রচুর বৈসাদৃশ্য আছে, তেমনি আবার কিছু-কিছু সাদৃশ্যও আছে। প্রচুর পরিমাণে অহিফেন সেবন করলে যেমন মানুষের অনু-

ভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কম করে সেবন করলে তেমনি আবার শক্তিবৃদ্ধি ঘটে থাকে। অনুরূপ ভাবে ধাতব পদার্থও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। পশু-পক্ষীর ন্যায় ধাতব পদার্থকেও বিষক্রিয়ার দ্বারা নষ্ট করে দেওয়া যায়। নতুন অবস্থায় একটি ধাতব পদার্থকে গ্যাল্‌ভানোমিটারে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ধাতব-পদার্থটি সম্পূর্ণ সতেজ। এরপর এটিকে সামান্য অক্স্যালিক অ্যাসিডে নাড়াচাড়া করলে সংগে সংগে একটা দ্রুত সঞ্চালন লক্ষ্য করা যাবে। গ্যালভানোমিটারের সাঙ্কেতিক নির্দেশ সম্পূর্ণ না থামা পর্যন্ত তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। অতঃপর একটি বিষম প্রতিষেধক প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে, ধাতব-পদার্থটি পুনর্জীবিত হতে আরম্ভ করেছে এবং তার প্রমাণও গ্যাল্‌ভানোমিটারে নির্ণীত হচ্ছে। এখন ধাতব-পদার্থটিকে বিশ্রাম করতে দিলে এটি এর সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। দ্বিতীয়বার ধাতব-পদার্থটিকে সাঙ্কেতিক লক্ষণ থেকে বিরত হওয়া পর্যন্ত বিষপাত্রে নিমজ্জিত করে রাখা হলো। কিন্তু এর বহুক্ষণ পরে যখন সেই বিষম প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হলো তখন দেখা গেল পদার্থটি মৃত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই লক্ষ্যে উপনীত হলেন যে, সকল ধাতব-পদার্থের ব্যাপারেই এই একই ফল লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করি যে, বিষক্রিয়ার ফলে যদিও ধাতব-পদার্থের উপরিভাগ মরচের দ্বারা পরিপূরিত হয় তথাপি সম্পূর্ণ ধাতব-পদার্থটিই এর প্রভাবে অচল হয়ে পড়ে। আমরা ধাতব-পদার্থ নির্মিত নানা সামগ্রী ব্যবহার করি। সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই মৃত—কারণ, উত্তাপ প্রয়োগ এবং হাতুড়ি পেটার ফলে প্রত্যেকটি পদার্থই মৃত হয়ে পড়ে।

জড়ের সাধনায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের গভীর অনুশীলনের ফলে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জড় পদার্থের অব্যক্ত জীবনের আসল স্বরূপ যেদিন তিনি উদ্‌ঘাটিত করলেন, সেদিন সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে অভিনন্দিত হলেন। আজকের জনজীবন তাই তাঁর আদর্শটাকে গ্রহণ করে নিয়ে বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করছে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করছে। বিশ্ববিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক যিনি, যাঁর নাম-কীর্তি-যশ চিরকাল স্মরণীয় থাকবে, যিনি বিশ্ববিজ্ঞান অনুশীলনে মৌলিক গবেষণার পথ-প্রদর্শন করে সারা বিশ্বে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাই আজ দেশের শত শত নরনারী বিজ্ঞান চর্চায় ও মৌলিক গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করতে অগ্রসর।

ইনস্থুলিন

সুব্রত পাল

একজন শ্রুতকীর্তি বাঙালী সাহিত্যিক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—'আজকাল চিনি বাজারে দুর্লভ, বাথরুমে সস্তা।' তথাকথিত অভিজাত সমাজে ডায়াবেটিসের ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাবের কথা ভেবেই তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। চিনি-নামক মধুর বস্তুটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকলেও মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগটি কিন্তু রোগীর কাছে খুব সুখপ্রদ নয় এবং যদিও রোগীরা ডায়াবেটিস-এর কৌলীন্য নিয়ে কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন, তবু এই ব্যাধির বিপদ অনেক। তবে সাম্প্রতিককালে ইনস্থুলিনের আবিষ্কার এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে এর ব্যাপক এবং সার্থক ব্যবহার মধুমেহগ্রস্ত রোগীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

ইনস্থুলিন একটি হর্মোন। প্যাংক্রিয়াস্ বা অগ্ন্যাশয় নামক গ্রন্থি থেকে এর উৎপত্তি। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, প্যানক্রিয়াস একটি যৌগিক গ্রন্থি অর্থাৎ এর বহিঃক্ষরী এবং অন্তঃক্ষরী দু'টি অংশ আছে। বহিঃক্ষরী অংশ থেকে নিঃসৃত হয় অগ্ন্যাশয়রস-বিভিন্ন খাদ্য-উপাদানের পরিপাক কার্যে যার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বহিঃক্ষরী কোষসমূহের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে অন্তর্নিঃস্রাবী কোষরাশি যাদের বলা হয় ল্যাঙগারহান্স-এর দ্বীপপুঞ্জ বা দ্বৈপিক অংশ। এই অংশ থেকেই ইনস্থুলিন ক্ষরিত হয়।

ইনস্থুলিন আবিষ্কারের ইতিহাসও বড় বিচিত্র। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভন্ মেরিং এবং মিনকোর্ডস্কি নামক দু'জন শারীরবিদ ডায়াবেটিস্ এবং প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথা ঘোষণা করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মেয়ার প্যানক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত একটি হর্মোনের কথা কল্পনা করেন এবং এই কপোল-কল্পিত হর্মোনটির নাম দেন ইনস্থুলিন। শরীরবিজ্ঞানী মেআরের এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন বান্টিং ও বেস্ট নামক দু'জন তরুণ বিজ্ঞানী। প্যানক্রিয়াসের দ্বৈপিক অংশ থেকে একটি স্বতন্ত্র এবং অমিতক্রিয়াশীল হর্মোন নিষ্কাশিত ক'রে। এই হর্মোনটি মেআরের কল্পিত নামানুসারেই প্রচলিত হয়েছে।

ইনস্থুলিন হর্মোনটি প্রোটিনজাতীয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এতে প্রায় বারোটি অ্যামিনো-অ্যাসিড আছে। এতে সালফার ও জিঙ্কও রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। ইনস্থুলিনের যথাযথ ক্রিয়ার জন্য এর রাসায়নিক কাঠামোর অখণ্ডতা অপরিহার্য। অন্ত্রনালীর বিভিন্ন পাচকরস এই রাসায়নিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে ইনস্থুলিনকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, সেজন্য ইনস্থুলিনের মৌখিক প্রয়োগ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হয় না। এতদ্ভিন্ন, ডাইমার কাপ্রেল, আরগাইনেজ প্রভৃতি এনজাইম এবং রাসায়নিক পদার্থ ইনস্থুলিনকে নিষ্ক্রিয় করবার ক্ষমতা রাখে।

শরীরে গ্লুকোজের বিপাকক্রিয়া এবং যথাযথ পরিমাণ নিয়ন্ত্রণই ইনস্থুলিনের মৌল কর্ম। ইনস্থুলিনের প্রভাবে দেহকোষে গ্লুকোজের যথাযথ ব্যবহার হয়, গ্লাইকোজেনরূপে যথা স্থানে এবং উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হয়, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মানের সমতা রক্ষিত হতে পারে। ইনস্থুলিন রক্তের গ্লুকোজ মাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করে এবং এই কাজ সে করে আরও অনেক শক্তিশালী হর্মোনের সঙ্গে লড়াই ক'রে। অ্যাড্রিনালকর্টেক্স, পিটুইটারী প্রভৃতি গ্রন্থির স্বাভাবিক প্রবণতা হ'ল রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া এবং ইনস্থুলিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। কোন কারণে ইনস্থুলিনের অভাব বা স্বল্পতা ঘটলে রক্তে শর্করার মাত্রা অনভিপ্রেতরূপে বেড়ে যায় এবং ডায়াবেটিস রোগের সৃষ্টিমূলে রয়েছে ইনস্থুলিনের অভাব অথবা অপরিমিত ক্ষরণ।

ডায়াবেটিস রোগের মহৌষধরূপে ইনস্থুলের খ্যাতি জগৎ জোড়া

১১—১১

এবং এ ক্ষেত্রে এই হর্মোনটি অপরাজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও এর দ্বারা রোগকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা যায় না, তবু এর যথাযথ প্রয়োগ এই রোগের অবাঞ্ছিত কুফলগুলি থেকে রোগীকে বহুলাংশে মুক্ত রাখা সম্ভব।

ডায়াবেটিসগ্রস্ত রোগীদের ওপর অস্ত্র প্রয়োগ বহুকাল সার্জেনদের দুর্ভাবনার বস্তু ছিল। কারণ এই সব ক্ষেত্রে অ্যানেস্থিসিয়া প্রয়োগ অনেককে এই রক্তের শর্করামান অস্বাভাবিক রূপে বাড়িয়ে দেয় এবং রোগীর জীবনসংশয়ও দেখা দিতে পারে। কিন্তু আজকাল অপারেশনের আগে ও পরে যথার্থমাত্রায় ইনসুলিন প্রয়োগ করে এই বিপদের হাত থেকে অনেকাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, (ক) সরল ইনসুলিন বা দ্রুতক্রিয়াশীল ইনসুলিন (খ) মন্থরগতি দীর্ঘ-ক্রিয়াশীল ইনসুলিন।

সরল ইনসুলিন অতিদ্রুত ক্রিয়াশীল কিন্তু আট ঘণ্টার মধ্যেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সেজন্য রক্তে গ্লুকোজের মানের সমতা রক্ষা করতে হলে দিনে একাধিকবার ইনসুলিন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাই আধুনিক চিকিৎসকগণ দীর্ঘক্রিয়াশীল ইনসুলিনের পক্ষপাতী। তবে জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে এখনও সরল ইনসুলিনের প্রভূত প্রয়োগ হয়ে থাকে।

দীর্ঘক্রিয়াশীল ইনসুলিন সক্রিয় হতে কিছু সময় নেয়, ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে এবং কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। দীর্ঘস্থায়ী ইনসুলিন হরেক রকম হতে পারে—যথা প্রোটামিন-ইনসুলিন, প্রোটামিনজিঙ্ক-ইনসুলিন, জিঙ্ক গ্লোবিন ইনসুলিন ইত্যাদি। এগুলিকে চলিতকথায় Retard Insulin বা মন্থরীভূত ইনসুলিন বলা হয়ে থাকে। ইনসুলিন-মাত্রেই ইঞ্জেকশন দ্বারা প্রয়োগ করা হয়।

সম্প্রতি মৌখিক প্রয়োগের উপযোগী—কয়েকটি ডায়াবেটিস-ঘাতী ভেষজ সাংশ্লেষিক উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে টলবুটামাইড, ক্লোরপ্রোপামাইড প্রভৃতি প্রধান। তথাপি ইনসুলিনের গৌরব আজও অপরাজিত।

[বিঃ দ্রঃ—হর্মোনকাহিনী সমাপ্তি পথে। আর একটি প্রবন্ধ দিয়ে এর উপসংহার ঘটাবো। হর্মোনঘটিত বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে লেখকের ঠিকানায় (পি. ৬৪, টালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি-৩৩) জানাতে পারেন। পাঠকপাঠিকাদের প্রশ্নের ভিত্তিতেই রচিত হবে আমার এই ধারাবাহিক রচনামালার শেষ প্রবন্ধটি।—লেখক।]

দুশ্চিন্তা পরিহার করুন

নার্ভাস ব্রেক ডাউন বা মনোবিকলনের কেস পরীক্ষা করলে জানা যায় যে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে অন্তত চারজনের ক্ষেত্রেই রোগের আবির্ভাব ঘটেছে দুশ্চিন্তার মাধ্যমে। একজন কর্মব্যস্ত চিকিৎসক হিসাবে, আমি এ ধরণের বহু রোগীর সংস্পর্শে এসেছি দুশ্চিন্তার প্রকোপে যাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর এও লক্ষণীয় যে, দুশ্চিন্তার অবসান হওয়া মাত্র এসব ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে আশ্চর্য সুফল, সুতরাং একথা অনস্বীকার্য রূপেই সত্য যে কোন কঠিন ব্যাধির মতই দুশ্চিন্তাও মানুষের দেহে এনে দিতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই ধরণের একটি কেস একবার আমার কাছে এসেছিল, বিখ্যাত মনঃসমীক্ষকগণের মতে যা নাকি ছিল প্রায় দুরারোগ্য। রোগী ক্লিফোর্ড আর একজন সাধারণ কেরাণী, সর্বদাই অবসন্ন থাকতো; অত্যন্ত সামান্য কোন ব্যাপারেও কোন অভিমত প্রকাশ করতে, বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তো। অফিসে পৌঁছতে দেরি হওয়ার ভয়ে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত আধঘণ্টা আগে অফিসে গিয়ে হাজির হত ক্লিফোর্ড, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কাজ তার কখনই শেষ হতে চাইতো না, মোটা মোটা ফাইলের স্তূপে মুখ গুঁজে খেটে যাওয়া—ক্লিফোর্ডকে দেখলে যে উপমাটার কথা চট করে মনে এসে যেত যে কোন দর্শকের, তা হল ভারবাহী গাধার। সহকর্মীদের সামনে অকারণেই হয়ে পড়তো সঙ্কুচিত, কাজ করতো দ্বিধাগ্রস্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, অর্থাৎ এককথায় নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্বটাকে নিয়েই যেন সর্বদা বিব্রত বোধ করতো ও। তাকে ভাল করে পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে দুশ্চিন্তাই তার সমস্ত রোগের মূল কারণ। দুশ্চিন্তা পরিহার করে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে উপদেশ দিলাম তাকে, উৎসাহিত করলাম বারবার নানান উদাহরণ দেখিয়ে, আস্তে আস্তে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিল, আর মাস ছয়ের মধ্যেই ব্যাধিমুক্ত হয়ে গেল সে। আজ ক্লিফোর্ড তার কর্মক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত জীবনে একজন সফল ও সুখী মানুষ। অসুবিধা বা বাধাবিঘ্ন জীবনের পথে পথে ছড়িয়ে আছে, তার সম্মুখীন হতে হবে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে, তা না করে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থেকে শুধু দুশ্চিন্তা করলে তা কখনও সুফলপ্রসূ হতে পারে না বরং তাতে মানুষ ক্রমেই আরো অসহায় হয়ে পড়ে। আশে-পাশে কি এ ধরণের অসংখ্য মানুষের দেখা আমরা পাই না, দুশ্চিন্তার কবলে যারা নিয়তই দেহ-মনের আয়ুক্ষয় করে চলেছে? মনকে সবল করে তুলতে পারলেই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে সকলের পক্ষেই তা সম্ভব। মূলত ধৈর্যের অভাবই মানুষের মনে দুশ্চিন্তার বীজ বুনে দেয়, আমরা আর্থিক দুশ্চিন্তা করি, কারণ নিজেদের আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে একটা স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না, সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করতে পারি না। কারণ বিধিবদ্ধ প্রণালীতে এক এক করে কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করি না। এই Indecision বা অস্থিরমতার ফলে নিজেদের উপর আমরা নিজেরাই ভরসা হারিয়ে ফেলি, আর তা থেকেই অঙ্কুরিত হয় দুশ্চিন্তা। চলমান জীবনের স্রোতে বাধাবিঘ্ন ঘাত-প্রতিঘাত ভেসে আসছে প্রতিমুহূর্তে, সজাগ হাতে সে সবকে প্রতিরোধ করাতেই নিহিত মনুষ্যত্ব, আর সেই প্রচেষ্টাকেই বলে জীবন-সংগ্রাম, প্রকৃত মানুষ কখনই এই সংগ্রামকে এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে গিয়ে দুশ্চিন্তা করে মানসিক বিলাস করে না, বরং দৃঢ়ভাবে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়। অভীমন্ত্রের অনির্বাণ শিখাটি অন্তরে জ্বেলে নিয়ে যে মানুষ থাকে আপন কর্তব্যে অবিচল, তার জীবনাকাশের আঁধার ভেদ করে একদিন না একদিন উষার অরুণাভা দেখা দেবেই।—'শ্রীমতী'

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

সুনীল কুমার নাগ

বেঁচে থাকতেই কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু হতে পারা নিশ্চয়ই একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। কোনো রাষ্ট্রনেতা বা ধর্মনেতা বা এ যুগে চিত্রতারকাদের বেলাতেই সাধারনত দেখা যায় ঐ রকম সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় একজন লেখকের ভাগ্যেও অমনি একটা সুযোগ ঘটেছে তা' হলে আমরা নিশ্চয়ই যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হবো। এ যুগে অবশ্য এই ব্যতিক্রমটা সত্যি কয়েকজন লেখকের বেলায় ঘটেছে, কিন্তু আমাদের বর্তমানে আলোচ্য হেমিংওয়ের তুলনায় সে-সব কিছুই নয়। তার কারণ হেমিংওয়ের স্বভাবগত দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা।

আমাদের দেশের না হ'ক, ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু লেখককেই জীবনে কখনো না কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেছে; কাউকে যোদ্ধারূপে, কাউকে রিপোর্টাররূপে, কাউকে বা নিছক দর্শকরূপে। যুদ্ধক্ষেত্রের দর্শক বলতে আমরা তাঁদেরই বোঝাচ্ছি, দেশে যুদ্ধের সময় 'কনস্ক্রিপশন'-এর জন্যে যাঁরা বাধ্য হয়েছেন সৈন্যবাহিনীতে ঢুকতে—স্বেচ্ছায় নয়। যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত বিরাট কোনো আন্দোলনের এ রকম অনেক দর্শক-অংশগ্রহণকারীর কথা আমরা জানি—সংখ্যায় এঁরাই বেশি। কিন্তু আবার এ রকম লেখক-যোদ্ধা দেখা গেছে সাহসিকতায় যাঁরা যে কোনো পেশাদার সৈনিকের চাইতে কখনো পেছনে পড়ে থাকেন নি। এদিক থেকে রাশিয়ার টলস্টয়, শোলোকভ এরেনবুর্গ; ইতালীর গ্যাব্রিয়েল দ আন্নুনংসিও, ফ্রান্সের মিলরোও সার্ত্র, বৃটেনের মম্ ও কডওয়েল এবং মার্কিন দেশের ফকনার, স্টাইনবেক এবং হেমিংওয়ের নাম অগ্রগণ্য। এঁদের মধ্য থেকেও যদিও আবার বাছাই করতে হয় তাহ'লে দেখা যাবে তিনজনকে—আন্নুনংসিও, শোলোকভ এবং হেমিংওয়েকে। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে ব্যক্তিগত সাহসের প্রশ্নে বা অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তার প্রশ্নে যে হেমিংওয়েই শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এক সময় ইতালীতে 'ত্রিস্তি' নিয়ে দারুণ গোলমাল বেধে গিয়েছিল। নামজাদা লোক রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক থাকা সত্ত্বেও একদিন দেখা গেলো বিমানবাহিনীর একজন ভূতপূর্ব অফিসার লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক দান্নুনংসিও একটি সশস্ত্র বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে। এই বাহিনীটি অল্প যুদ্ধের পরই 'দখল' করে ফেললো ত্রিস্তি বন্দর এবং মাসকয়েক ধরে চললো এই গোলমাল। তারপরে আবার অবশ্য দান্নুনংসিও স্বাভাবিক শান্ত জীবনযাপন করতে লাগলেন। শোলোকভের জীবনে দেখা গেছে যৌবনে পা দেবার আগেই, একেবারে কিশোর বয়স থেকেই বলশেভিকদের সাথে কি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন এবং অন্তত একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে গুণ্ডা-বদমায়েস তথা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে হাতে-কলমে লড়াই করে সোভিয়েত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে সহায়তা করেছেন। কিন্তু প্রথম জীবনের এই দুঃসাহসীর জীবন তাঁকে খুব বেশিদিন যাপন করতে হয় নি। এইখানেই হেমিংওয়ের সঙ্গে দান্নুনংসিও বা শোলোকভের পার্থক্য। হেমিংওয়ে হলেন সংক্ষেপে বলতে গেলে এমন একজন ব্যক্তি বিপদকে যিনি ভালোবাসেন। প্রকৃতই এতো গভীরভাবে ভালোবাসেন যে, সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে

পড়েন তার মধ্যে। ১৯১৭ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে হেমিংওয়ের মধ্যে প্রকট হয়েছে এই লক্ষণটা এবং একটানা প্রায় ছ'চল্লিশ বছর ধরে কেটেছে একইভাবে—যখনই সুযোগ পেয়েছেন বা সুযোগ যখন না আসতো নিজেই সুযোগ সৃষ্টি করে নিতেন একটু মৃত্যু-প্রদক্ষিণ করে আসবার জন্যে। সাহিত্যিক হলেই শান্ত, শিষ্ট, অসহায়, নিরীহ এবং গোবেচারা হতে হবে বলে যাঁরা মনে করে থাকেন, হেমিংওয়ে তাঁদের সামনে একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। সাহিত্যিক হবার আগেও যেমন বিপদ-প্রিয় এবং দুঃসাহসী ছিলেন হেমিংওয়ে, সাহিত্যিক হবার পরে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করবার পরেও ঠিক তেমনিই ছিলেন। কাজেই জীবদ্দশাতেই যে কিংবদন্তীর রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলেন হেমিংওয়ে সে তাঁর নিজেরই অনন্যসাধারণ দুঃসাহসী জীবনযাত্রার জন্য।

ইলিনয়েস-এর ওক পার্কে হেমিংওয়ের জন্ম (২১শে জুলাই, ১৮৯৯), ওঁর বাবা ছিলেন ডাক্তার। মাছ ধরা, শিকার করা এবং প্রায় সমস্ত রকম খেলাধূলোর ভক্ত ছিলেন তিনি। হেমিংওয়ের মা ছিলেন কিছুটা কোমল স্বভাবের এবং সঙ্গীতপ্রিয়। হেমিংওয়ের মা চাইতেন যে ছেলে তাঁর ভবিষ্যতে যাতে গায়ক হতে পারে সেইভাবে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করতে। কিন্তু ওঁর বাবা চাইতেন ছেলেকে ডাক্তার করতে। হেমিংওয়ে যদিও দু'টোর কোনোটাই হন নি, কিন্তু তবু ভবিষ্যৎ জীবন দেখলে মনে হয় যে বাবার প্রভাবই ওঁর ওপর বেশি কাজ করেছে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে হেমিংওয়ের বাবা প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন গ্রামাঞ্চলে। কখনো পাখি শিকার করতে, কখনো বা মাছ ধরতে। হেমিংওয়ে তাঁর দু'বছর বয়স থেকেই বাবার মাছ ধরার সঙ্গী। দু' বছরের শিশু হেমিংওয়ে তাঁর বাবার পাশে ছিপ ধরে বসে আছেন—এমন দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। মাছধরার প্রতি আমরণ হেমিংওয়ে যে একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন তার মূলটা এইখানে। এর পরে বলতে হয় শিকারের কথা। ডাক্তার হেমিংওয়ে তাঁর ছেলেকে সাত বছর বয়সের সময় থেকেই বন্দুক ছোড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং দশ বছর বয়সের সময় দেখা গেছে বালক হেমিংওয়ের অদ্ভুত পাকা হাত হয়ে গেছে।

স্কুল-পালানো ছেলে বলতে যে বেয়াড়া টাইপটার কথা মনে আসে বাল্যবয়সে হেমিংওয়ে তা' সত্যি ছিলেন না, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে স্কুলে আসবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে আসতেন না এ কথা সত্যি। নির্দিষ্ট সময়ে ছেলে বাড়ি ফিরে না এলে মায়ের মনে স্বভাবতই অমঙ্গলের আশঙ্কা উঁকিঝুঁকি দিতো, কিন্তু ডাক্তার হেমিং-ওয়ে ছেলের জন্যে মোটেই দুশ্চিন্তা করতেন না। আগে দেখতেন ছিপ ক'টা ঠিক আছে কি না, তারপর দেখতেন বন্দুকটা যথাস্থানে আছে কি না। বালকের মা হাসপাতাল এবং থানা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতেন বাড়িতে, কিন্তু বাবা একটু ভেবেচিন্তে কাছাকাছি কোনো জলাশয় বা জঙ্গলে খুঁজতে বেরোতেন ছেলেকে। সঙ্গে নিতেন একটা টর্চ আর পোষা কুকুরটি এবং বলাই বাহুল্য, প্রত্যেক বারই ছেলেকে খুঁজে আনতেন তিনি। শুধু একবার পারেন নি সেবার হেমিংওয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তখন ওঁর বয়স পনেরোর কম। কয়েক সপ্তাহ বাদে অবশ্য নিজেই আবার ফিরে এসেছিলেন তিনি।

এমনি ধারা টানা-হেঁচড়ার মধ্যেই হেমিংওয়ে তাঁর আঠারো বছর বয়সে স্কুলের পড়াশুনো শেষ করলেন। এবার উচ্চশিক্ষা সুরু করবার প্রাথমিক বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়ে গেলো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাগজপত্র এসে পৌঁছতে লাগলো ডাকযোগে। পড়াশুনোয় খুব ভালো না থাকলেও এবং রীতিমতো 'দুরন্ত ছেলে' হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের এক মাস্টারমশাই বরাবরই হেমিংওয়েকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি নিজে ছিলেন সাহিত্যানুরাগী, কাজেই ওঁর খুবই ইচ্ছে হতো তাঁর ছাত্রকে সাহিত্যিক হিসেবে দেখতে। কিন্তু হেমিংওয়ে যে সেদিকে মোটেই অনুরাগী নয় এবং ঐ অল্পবয়সেই অতি মাত্রায় পুরুষালী স্বভাবের এটা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি একবার প্রকাশ্যে বলেও ছিলেন যে, হেমিংওয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে আর যাই হোক সাহিত্যিক তো হ'তে পারবে না। কাজেই ওর সম্বন্ধে আমি আর কোনো বিশেষ উৎসাহবোধ করি নি।

একজন (তিনিও ঐ স্কুলেরই একজন সহকারী শিক্ষক) বলেছিলেন : সবে তো জীবনের সুরু, এখনই কেন আপনার মনে হলো ও কোনোদিন সাহিত্যিক হতে পারবে না?

উত্তর হলো : ও হচ্ছে এক্সট্রোভার্ট (বহির্মুখী) টাইপ। এরা কখনো শিল্পী বা সাহিত্যিক হতে পারে না। তা'ছাড়া দেখছো না কি ভীষণ অস্থির ছেলে ও, তার ওপর শরীরটাও বা হোক খুবই ভালো (কাজেই অস্থিরতা ক্রমশই বাড়বে) কাজেই ও ভাববেই বা কখন আর না ভাবতে পারলে লিখবেই বা কি করে?

মাস্টারমশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর সব কথাগুলি কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয় নি, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বালক হেমিংওয়ের যেমন শরীর উত্তরোত্তর ভালো হতে লাগলো মনটাও ওর ঠিক সেই পরিমাণে শক্ত এবং সাহসে ভরে উঠতে লাগলো। তবে মাস্টারমশায়ের একটি কথা ভুল প্রমাণিত করে হেমিংওয়ে যে কি করে সত্যি সত্যি সাহিত্যিক হয়ে উঠলেন সেইটেই বিস্ময়ের ব্যাপার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার (ডাক্তারী পড়বার জন্যে) সব আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ, ঠিক এমনি সময় হেমিংওয়ে বাড়িতে ঘোষণা করলেন যে, ডাক্তারী উনি পড়বেন না চাকুরী করবেন, এবং সে চাকুরীও জোগাড় হয়ে গেছে। কি চাকুরী? না, একটা কাগজের রিপোর্টার। কানসাস সহরের 'স্টার' সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজটা হেমিংওয়ে নিজেই জোগাড় করে বসলেন। বাবা জানতেন তাঁর ছেলের প্রকৃতি, বাধা দিতে যাওয়া মানে ওকে নিরুদ্দিষ্ট হতে বাধ্য করা। তাই বাধা উনি দিলেন না। বিষণ্ণভাবে সম্মতিই দিলেন। মাস্টারমশায়ের কানেও গেলো কথাটা। মন্তব্য করলেন : হুঁ! রিপোর্টার হওয়া মানে তো আর সাহিত্যিক হওয়া নয়। তা ছাড়া দেখো না তোমরা শেষ অবধি। হেমিংওয়ের বন্ধুবান্ধবেরা তো মহা খুশি। পর পর কয়েকদিন চললো ভোজের পালা। কাজে যোগ দিলেন হেমিংওয়ে। মাস কয়েক কেটে গেলো। অকস্মাৎ একদিন হেমিংওয়েকে আবার বাড়িতে দেখা গেলো। কি ব্যাপার?

সকলের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে হেমিংওয়ে বললেন যে, বিদেশে যাবার আগে একবার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। রিপোর্টারের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছি, একটা ভালো চাকুরী

পেয়ে গেছি। কি সে চাকুরীটা? কোনো এডিটরের পোস্ট নিশ্চয়ই। আরে না-না, হেমিংওয়ে বার কয়েক শূন্যে ঘুঁষি ছুড়ে, বুকের ছাতিটায় পেশী সঞ্চালন করে সগর্বে বললেন, ওয়ারফিল্ডে এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার। অ্যাঁ, হ্যাঁ। কেউ বিস্মিত হলো, কেউ ওঁর মানসিক স্বাভাবিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করলো। মাস্টারমশাই ঈষৎ হাসলেন। ভাবটা যেন, এ যে হবে তা জানতুম। মা-বাবার গমথমে মুখের চেহারাও রুখতে পারলো না হেমিংওয়েকে। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সোজা চলে এসে ইয়োরোপে ওঁর কর্মস্থল ঠিক হ'লো ইতালীয় রণাঙ্গন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকের কথা। ইতালী সেবার ছিলো মিত্রপক্ষে। ইতালীয় রণাঙ্গনে বিপরীত দিকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্কের বিরাট বাহিনী। হেমিংওয়ে কয়েক সপ্তাহ এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হিসেবে আহত সৈন্যদের আনা-নেওয়া করবার পরে নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ নিজের কাজের ওপরে। আরে দোঃ, এ সব কাজ তো মেয়েরাও করতে পারে। কাজের মতো কাজ করা চাই। সুতরাং এরপর সোজা সরাসরি ইতালীয় পদাতিক বাহিনীতে নাম লেখালেন। ওঁর তখন উনিশ বছর বয়সের কথা। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর শত্রুব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাবার গুরুদায়িত্ব ছিলো পদাতিক বাহিনীর ওপর ন্যস্ত। সামরিক ট্যাঙ্ক প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে বৃটেন আবিষ্কার করেছিল। সংখ্যায় সেগুলির উৎপাদন এতই কম হতো যে প্রধান রণাঙ্গন অর্থাৎ বেলজিয়ান-ফরাসী সীমান্তেই প্রয়োজনানুরূপ পাঠানো যেতো না। অন্য ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই নেই। কাজেই ইতালীয় পদাতিক বাহিনীকে একমাত্র 'হেলমেট'-এর ওপর নির্ভর করেই এগিয়ে চলতে হতো। কাজেই শত্রুপক্ষের গোলাগুলিতে অগুন্তির হতাহতের সংখ্যা হতো ভয়াবহ। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, হেমিংওয়ের সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষত। একটি হাঁটুতে বড়ো রকমের অপারেশন করতে হয়েছিলো হাউইটজারের গোলার টুকরো বের করবার জন্যে। মালাই-চাকিখানা হয়ে গিয়েছিলো একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো। সার্জেনরা একখানা প্ল্যাটিনামের মালাই-চাকি ফিট করে দিয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই, অর্থাৎ প্রায় পঙ্গু অবস্থায় এক বছর পরে ১৯১৯ সালে হেমিংওয়ে দেশে ফিরে এলেন। যুদ্ধের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই দশ বছর পরে ইতালীর এই পটভূমিকায় হেমিংওয়ে তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' রচনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করছি।

দেশে ফেরবার পরে, চলবার শক্তি নেই বলেই কয়েক মাস হেমিংওয়েকে সর্বক্ষণ বাড়ি দেখা যেতে লাগলো। ওঁর প্রথম বিয়েটাও এই সময় হয়েছিলো।

মাস কয়েক বিশ্রামের পরে দেখা গেল, প্ল্যাটিনাম খণ্ডটি হাঁটুর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে। কাজেই পরে আর হাঁটুর জন্যে বেগ পেতে হয় নি হেমিংওয়েকে, তবে খুব জোরে দৌড়ানো ওঁর পক্ষে বারণ ছিলো। সুস্থ হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে হেমিংওয়ে আবার একটা রিপোর্টারের চাকুরী জোগাড় করলেন, কানাডার টরেন্টো সহরের একটা কাগজে। এ কাগজটার নামও 'স্টার'। টরেন্টোতে কয়েক সপ্তাহ কাটাবার পরেই কর্তৃপক্ষ ওঁকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের নিজস্ব রিপোর্টার হিসেবে তুরস্কে। তুরস্কে তখন চলছিল জনগণের মুক্তির সংগ্রাম কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে। বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে মেলামেশার এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হেমিংওয়ে করেছিলেন। প্রায় আটমাস বাদে প্যারিসের একটা হোটেলে 'হেড কোয়ার্টার' করলেন হেমিংওয়ে। তবে মাঝে মাঝে কনস্টান্টিনেপল বা আঙ্কারায় ঘুরে আসতে হতো। এ সময়ে হেমিংওয়ের বয়স ঠিক বাইশ।

ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে, যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে তাঁর সাতাশ বছর বয়সে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে দিকপাল সাহিত্যরথীদের স্বীকৃতিলাভ করবেন, তিনি তাঁর এই বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সাহিত্য পদবাচ্য একটি ছত্রও কিছু লেখেন নি বা লেখবার চেষ্টাও করেন নি। না পদ্য, না গদ্য। এই সময় পর্যন্ত হেমিংওয়ে অনেক কিছুই করেছেন—বিস্তর মাছ ধরেছেন ছিপ ফেলে, অনেক পাখি শিকার করেছেন, এক-আধটা বুনো শুয়োরকে গুলিবিদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, বেশ কয়েকটা দেশ ঘুরেছেন, পাহাড়ের ঝরণা আর নদ-নদীর জলকল্লোলে কান পেতেছেন, আল্পসের ধোঁয়াটে শৃঙ্গের ওপর কি রহস্য রয়েছে সে সম্বন্ধে মেলাই কিংবদন্তীমূলক কাহিনী শুনেছেন মনোযোগ দিয়ে, মোট কথা বলতে গেলে প্রায় সবই করেছেন লেখবার চেষ্টা ছাড়া। প্যারিসে এসে এবার মোড় ফিরলো যুবক হেমিংওয়ের জীবনে। হেমিংওয়ের কল্পনার সলতেটি জীবনের বিভিন্ন রূপ দেখে দেখে ক্রমশঃই অধিকতর দহনীয় হয়ে উঠছিল। এবার তাতে অগ্নিসংযোগ ঘটলো।

হেমিংওয়ের সাহিত্যসেবার প্রথম দিনগুলি সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। কেউ বলেন যে, আরে প্রথম অন্তত একটা বছর হেমিংওয়ের নামে যে লেখা বেরিয়েছে তা আসলে গারট্রুড স্টাইনের লেখা, কেউ বা বলেন শেরউড এণ্ডারসনের, কেউ বা বলেন এজরা পাউণ্ডের আবার অন্য একদল যেন কিছুটা চাপা গলাতেই বলেন যে, আরে না না, অতোটা নয়, লিখতো হেমিংওয়েই তবে এঁরা সব ঘষে মেজে সে সব ছাপাবার উপযুক্ত করে দিতেন। কিন্তু এটাও সত্যি নয়। গারট্রুড স্টাইন নিজে বলেছেন যে, কনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদের তিনি সব সময়েই নানাভাবে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছেন, তাদের সঙ্গও তিনি সর্বদা চাইতেন কিন্তু হাতে-কলমে কশ্মিনকালেও তিনি কারো লেখা সংশোধন করেন নি। এমন ধারা প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করলেও তিনি বলতেন:

'ছিঃ ছিঃ! বলেন কি তাই কি কখনো হয়, অপরের লেখার ওপর আমি কেন কলম ধরবো, তাতে লেখকের তো অসম্মান করা হয়ই, সাহিত্যের পক্ষেও সেটা খুব সম্মানের নয়, বাঞ্ছিতও নয়, বাগানে যতো বিভিন্ন ধরণের ফুল ফোটে ততোই ভালো, সব ফুল একরকমের হয়ে পড়লে বাগানের শোভা নষ্ট হয়।'

এঁরা পাউণ্ড এবং শেরউড এণ্ডারসনও ঠিক এই ধরণেরই কথা একাধিক জায়গায় বলেছেন।

এ সম্পর্কে যেটুকু সত্যি তা হলো এজরা পাউণ্ড, স্টাইন এবং এণ্ডারসনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটবার পর থেকেই বিদেশে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যেমন অল্পদিনের মধ্যেই একটা হৃদ্যতা জন্মে ঠিক তেমনি হলো। ওঁরা তিনজনেই তখন সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, বয়সেও ওঁরা প্রত্যেকেই হেমিংওয়ের চাইতে অনেক বড়ো। তিনজনেই যাকে বলে ভাববিলাসীর একেবারে শিখরদেশে

অধিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে যখন স্বভাব-দুরন্ত সদাহাস্যময় সরলপ্রকৃতি পরোপকারী এবং বাস্তবজীবনের দুঃসাহসী যুবক হেমিংওয়ে গিয়ে পড়লেন, তখন দেখা গেলো খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি তিনজনেরই নজরে পড়ে গিয়েছেন। বয়সে অনেক ছোট বলে ওঁরা প্রত্যেকে হেমিংওয়েকে বিশেষ স্নেহও করতেন। ব্যস এই পর্যন্ত। এর বেশি আর কিছু নয়। হেমিংওয়ের নামে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতো লেখা বেরিয়েছে তার প্রতিটি ছত্র হেমিংওয়ের নিজেরই লেখা, অন্য কারো হাতের সংশোধিতও নয়। যদিও এ কথা সত্যি যে, প্রথম অন্তত দু'টো বছর হেমিংওয়ে কিছু রচনা করলেই ছাপাবার চেষ্টা করবার আগে এঁদের কাউকে না কাউকে শোনাতেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। তা' হলো এই যে, প্রত্যেকটি বস্তুই বিপরীত জিনিসকে আকর্ষণ করে। ধীর, স্থির, বয়স্ক, ভাবুক তিনজন যেমন ছটফটে 'একট্রোভার্ট' হেমিংওয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, হেমিংওয়ের নিজেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। পরে এক সময়ে উনি নিজে বলেও ছিলেন :

'কি ভীষণ গেঁয়ো, গোঁয়ারগোবিন্দ আর অভব্যই না ছিলাম আমি, ওঁদের সামনে গিয়ে পড়লেই ভেতরে ভেতরে লজ্জায় যেন মরে যেতাম অথচ না গিয়েও পারতাম না।'

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সাহিত্যিকেরা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং অচিরেই এই আকর্ষণ সাহিত্যিকদের ত্যাগ করে সাহিত্যের প্রতি বদ্ধমূল হয়ে পড়লো। সাহিত্যিকদের মতো ধীরস্থির এবং 'ভব্য' নিজেকে সারাজীবনেও করে তুলতে পারেন নি হেমিংওয়ে, যদিও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য তাঁর কলম থেকে অল্পদিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসতে লাগলো।

ছয় বৎসর বাদে ১৯২৭ সালে হেমিংওয়ে যখন দেশে ফিরে এলেন তখন মার্কিন সাহিত্যের উদীয়মান লেখকদের তালিকায় প্রথম সারির নাম হেমিংওয়ের। কারণ এরই মধ্যে ওঁর পাঁচখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল—থ্রি স্টোরিজ এণ্ড টেন পোয়েমস (২৩); ইন আওয়ার টাইম্‌স (২৪); দি টোরেন্টস অব স্প্রিং (২৬); দি সান অলসো রাইসেস (২৬) এবং মেন উইদাউট উইমেন (২৭)। এর মধ্যে শেষোক্ত বই দু'খানি, অর্থাৎ মেন উইদাউট উইমেন (গল্প) এবং সান অলসো রাইসেস (উপন্যাস) এই দু'খানা বইয়ের এতই জনপ্রিয়তা হলো যে প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হেমিংওয়ের এই আকস্মিক খ্যাতিকে বায়রনের রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

দেশে ফেরবার কিছুদিন আগেই হেমিংওয়ের পারিবারিক জীবনে একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। কিছুদিন আগে হলো ওঁর প্রথম ছেলের জন্ম আর প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ। দেশে ফিরে বিয়ে করলেন দ্বিতীয়বার। এ বিয়ের ফলে দু'টি ছেলের জন্ম হলো, কিন্তু বিয়ের প্রায় তের বছর বাদে ১৯২০ সালে—এ ক্ষেত্রেও বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো এবং তার কিছুদিন বাদেই ওঁর তৃতীয় বিয়ে হলো একজন লেখিকা মার্থা গেলহর্নের সঙ্গে। কিন্তু মার্থাও হেমিংওয়েকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন বলা যায় না, কারণ এ বিয়েরও বিচ্ছেদ হলো ছয় বছর বাদে। ১৯৪৬ সালে হেমিংওয়ের চতুর্থ বিয়ে হয় মেরী ওয়েলস্-এর সঙ্গে।

১৯২৭ থেকে ১৯৪০ এই তেরো বছরে হেমিংওয়ের গল্প, উপন্যাস, নাটক মিলিয়ে মোট আটখানা বই প্রকাশিত হলো। এ বইগুলি হলো : এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস (১৯২৯); ডেথ ইন দি আফটারনুন (১৯৩২); উইনার টেক নাথিং (গল্প, ১৯৩২); গ্রীণ হিলস্ অব আফ্রিকা (১৯৩৫); টু হ্যাভ এণ্ড হ্যাভ নট (১৯৩৭); দি ফিফথ কলম (নাটক, ১৯০৮); ফার্স্ট ফর্টি নাইন স্টোরিজ (১৯৩৮) এবং ফর হুম দি বেল টোলস (১৯৪০)। আমাদের বর্তমানের আলোচনার সুবিধের জন্যে ১৯২৭ পর্যন্ত আমরা হেমিংওয়ের জীবনের প্রথম পর্ব ধরে নেবো এবং তারপর থেকে ৪০ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব।

হেমিংওয়ের জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে রিপোর্টার হিসেবে তাঁর কাজ। বলাই বাহুল্য, রিপোর্টার হয়ে গেলেই যে রিপোর্টার হয়েই সময় কাটাতে হবে অন্তত হেমিংওয়ের 'কোর্ডে' তা কোথাও লেখা নেই। স্পেনের গৃহযুদ্ধ সুরু হলো ১৯৩৬ সালে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো হেমিংওয়ে স্পেনে আসবার জন্যে ব্যস্ত; চলে এলেনও। কিন্তু পারিবারিক কারণে কয়েক সপ্তাহের জন্যেই তাঁকে আবার দেশে ফিরে যেতে হলো। কিন্তু এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হেমিংওয়ে স্পেনের এতটা দেখে ফেললেন যে, একখানা আধা ডকুমেন্টারী পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'দি স্প্যানিশ আর্থ'-এর কমেন্টারী লিখে দিতে পারলেন। দেশে ফিরে মাস দুয়েকের জন্যে আটকা পড়ে গেলেন হেমিংওয়ে। তারপরেই আবার স্পেনে চলে এলেন কয়েকটি কাগজের রিপোর্টের দায়িত্ব নিয়ে হেমিংওয়ে স্পেনে এলেন বটে কিন্তু মাসে একটার বেশি রিপোর্ট তিনি কখনো পাঠান নি। সেইগুলিই বিভিন্ন কাগজে একই সময় ছাপা হতো।

গৃহযুদ্ধে লিপ্ত স্পেনকে দেখে হেমিংওয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। জীবন এবং সংসারের যতটুকু এ যাবৎকাল পর্যন্ত শেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, ওঁর মনে হলো যেন সে সমস্তই আর একবার এক জায়গাতে বেশ গুছিয়ে দেখবার সুযোগ এসে গেছে। রক্ত—রক্ত—শুধুই রক্ত। রক্তের স্রোত—রক্তের নদী—রক্তের সমুদ্র। কেউ এখানে নিরপেক্ষ নয়। কেউ রাজতন্ত্রী—কেউ প্রজাতন্ত্রী—কেউ সমাজতন্ত্রী—কেউ ফ্যাসিস্তপন্থী ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, বাপ-ছেলের বিরুদ্ধে—কে কার বিরুদ্ধে নয়। এক বছরেরও বেশি হেমিংওয়ে নির্ভয়ে সমস্ত দলে মেলামেশা করে বেড়ালেন। প্রখ্যাত সমালোচক লিও গারকো তাঁর দি এ্যাংগ্রি ডিকেড-এ লিখেছেন এই গৃহযুদ্ধটা যেন হেমিংওয়ের ভাব ধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে সংঘটিত হয়েছিলো। বিগত পনেরো বছর ধরে হেমিংওয়ে যে ধরণের লেখা লিখছিলেন অর্থাৎ কিনা সর্বদাই দু'টি পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, সমস্ত জ্ঞাত রকমের দুঃসাহস আর ভীরুতার যুগপৎ পাশাপাশি নিদর্শন—এ সমস্তই এবার চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ ঘটলো হেমিংওয়ের। এ সমস্ত দেখবার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ হেমিংওয়ে রচনা করেছিলেন একখানি নাটক 'দি ফিফ্‌থ কলম' এবং একখানি যুগান্তকারী উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টোলস।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতেই দেখা যায় মার্কিন কথা-সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী স্রষ্টা হিসেবে হেমিংওয়ে দেশের সর্বত্র

স্বীকৃতিলাভ করেছেন এবং কয়েকখানা বই, যেমন দি সান অলসো রাইসেস, মেন উইদাউট উইমেন, এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস এবং টু হ্যাভ এণ্ড হ্যাভ নট লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এবং এই লেখার উপার্জন থেকেই ফ্লোরিডাতে নিজে একখানা বাড়ি করেছেন। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পরেই হেমিংওয়ে কিউবাতে এসে আর একখানা বাড়ি কিনলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কারণ হিসেবে বলতেন যে কিউবার উপকূলে মাছ ধরার খুব সুবিধে। কিউবাতে বাড়ি কেনবার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো হেমিংওয়ে মাছ ধরার একখানা ছোট লঞ্চও কিনে ফেলেছেন। কয়েকটা মাস চললো উদয়াস্ত মাছ ধরার প্রচেষ্টা। ধরলেনও প্রচুর। চলছিলো এই রকমই। এমন সময় একদিন ছেদ পড়লো এ আনন্দে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরকারীভাবে যুদ্ধে নেমে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হেমিংওয়ে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। নিজের মাছ ধরা লঞ্চখানা, নাম দিয়েছিলেন তার 'পিলার'—তার একখানি ছবি তুলে নিয়ে কিউবাতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করলেন এবং স্বেচ্ছায় কিউবার উপকূলভাগের শতাধিক মাইলের দায়িত্ব নিতে চাইলেন জার্মান সাবমেরিনের আকস্মিক আবির্ভাবের প্রতি নজর রাখবার জন্যে। রাষ্ট্রদূত মিঃ ব্র্যাডেন জানতেন হেমিংওয়ের প্রকৃতি; তাই বাধা দিলেন না তাঁকে, রাজী হলেন তাঁর প্রস্তাবে। এরপর দেখা যায় দু'টো বছর হেমিংওয়ে নিরলসভাবে এই কাজই করলেন। হেমিংওয়ে জার্মান সাবমেরিনের অবস্থান সম্পর্কে নৌবিভাগকে যে সমস্ত সংবাদ পাঠিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে সেই অনুসারে আক্রমণ চালিয়ে মার্কিন নৌবিভাগের রক্ষী জাহাজগুলি অনেক সময়ই জার্মান সাবমেরিন ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

একটানা চার বছরেরও বেশি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাবার পরে এবার ক্রমশ যুদ্ধের মোড় ফিরতে লাগলো। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলবার আলোচনা যেমন একদিকে শোনা যেতে লাগলো অন্যদিকে তেমনি বৃটিশ এবং মার্কিন বোমারুবাহিনী রাতের পর রাত জার্মানীর অভ্যন্তরে চালাতে লাগলো প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। হেমিংওয়ে এতো সব আকর্ষণের ব্যাপার ফেলে শত্রু সাবমেরিনের প্রত্যাশায় সহস্রাধিক মাইল দূরে বসে থাকবেন তাও কি সম্ভব? 'কোলিয়ার্স'-এর রিপোর্টার হিসেবে চলে এলেন লণ্ডনে। ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে মিত্রবাহিনীর অবতরণের পূর্বেই দেখা গেছে হেমিংওয়ে বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর বোমারু বিমানে চড়ে শতাধিকবার জার্মানীর অভ্যন্তরে বোমাবর্ষণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে ফেলেছেন।

কথা ছিলো যে, ফ্রান্সে অবতরণের পরে হেমিংওয়ে 'কোলিয়ার্সের' প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল প্যাটনের থার্ড আর্মির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক জেনারেল প্যাটনকে উনি পছন্দ করতেন না এবং ঘটনাচক্রে দেখা গেলো নরম্যাণ্ডি অবতরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্যাটনের বাহিনীর সঙ্গে হেমিংওয়ে যোগাযোগ হারিয়ে ফেললেন এবং সেণ্ট লো-তে (নরম্যাণ্ডির একটি ছোটো শহর) জার্মানদের সঙ্গে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চললো তাতে একসময় হেমিংওয়ে আবিষ্কার করলেন যে আশেপাশে সব নতুন লোক। সকলেই স্বদেশীয় অর্থাৎ আমেরিকান সৈন্য বা অফিসার, এরা থার্ড আর্মির কেউ নয়, এরা ফার্স্ট আর্মির লোকজন। একটু পরেই জানা গেলো ফার্স্ট আর্মির ফোর্থ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে মিশে গেছেন হেমিংওয়ে। এঁদের মধ্যে একজন অফিসার ছিলেন, নাম তাঁর কর্নেল ল্যানহাম, হেমিংওয়ে যে শুধুই একজন যোদ্ধা সাংবাদিক বা সাংবাদিক যোদ্ধা নন, তিনি যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়েও বটে সে কথা সৈন্যবাহিনীর বেশিরভাগ লোকজন বুঝতে না পারলেও কর্নেল ল্যানহাম পারলেন, শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীর সঙ্গেই যে হেমিংওয়ে থেকে গিয়েছিলেন তা ল্যানহামেরই আগ্রহের ফলে।

এই বাহিনীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে শুধু যে সাহিত্যের বা সংবাদপত্রের কলমের মালমশলা সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, কয়েকমাস বলতে গেলে অবিশ্রান্ত যুদ্ধও করতে হয়েছে হেমিংওয়েকে। হার্টজেন ফরেস্টের যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। ল্যানহামের রেজিমেণ্ট আঠারো দিন একটানা লড়াই করেছে এখানে ৩২০০ যোদ্ধার একটি বাহিনী নিয়ে, অন্তত দ্বিগুণ সংখ্যক জার্মানের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে ৩২০০ জনের মধ্যে ২৬০০ জন হতাহত হয়েছিল। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে চারজন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার নিহত হয়েছিল। হেমিংওয়ে নিজেও একাধিকবার আহত হয়েছিলেন। এখানকার যুদ্ধ যখন শেষ হলো অর্থাৎ জয়লাভ হলো তখন দেখা গেলো বাহিনীটির অবশিষ্ট কয়েকশ' সৈন্যের মতো হেমিংওয়েও এগিয়ে চলবার জন্যে উন্মুখ। এই সময় সর্বক্ষণের জন্যে রিপোর্টারের কাগজ-পেন্সিল থাকতো হেমিংওয়ের জামার ভেতরের পকেটে। হাতে থাকতো একটা টমিগান। কোমরে গুলির বেল্টের সঙ্গে আর একটি জিনিষও দেখা যেতো হেমিংওয়ের, দু'টি বড়ো মদের বোতল সহ একজন জার্মান সৈনিকের একটা বেল্ট। একজন প্রশ্ন করলো: এ জিনিষ কোথায় পেলেন মিস্টার পাপা?

একটি বোতলের ছিপি খুলে লোকটির শুকনো গলায় কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিয়ে হেমিংওয়ে ঈষৎ হেসে বললেন: এগিয়ে চলবার পথে দেখলাম একটা হতভাগা জার্মান মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে, নির্ঘাৎ আমাদেরই কারো গুলিতে মরেছে লোকটা; মনে হলো এ জিনিষগুলি শুধু শুধু নষ্ট হতে দিয়ে লাভ নেই, তাই তার কোমর থেকে খুলে নিজের কোমরে পরে নিয়েছি। তা' বাছা, তোমরা সবাই এদিকে তাকিয়ে অতো ঘন ঘন ঢোক গিলো না বলে দিচ্ছি। যুদ্ধক্ষেত্রে মদ একটা এমন জিনিস যা ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকেও কেউ অনেক সময় ধার দেয় না দেখা যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেছে এমন জিনিসটা অনেক সময় গ্যালনে-গ্যালনে চাই কি পিপে-পিপে হেমিংওয়ের দখলে এসে গেছে।

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। ফার্স্ট আর্মি এগিয়ে চলেছে। হেমিংওয়ে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়েই ফরাসী গরিলাদের সঙ্গে মিশে গেলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে তাদের কয়েক শ'য়ের ছোটো খাটো একটি বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। একদিন ফার্স্ট আর্মির মেজর জেনারেল বারটন একটি সাংবাদিক বৈঠকে বললেন: হেমিংওয়ে কখন কোথায় আছেন তা বুঝবার জন্যে আমার ম্যাপ-এ সব সময়েই একটা আলপিন ফোঁড়া থাকে। বর্তমানে আমাদের প্রধান বাহিনী থেকে হেমিংওয়ে প্রায় ষাট মাইল এগিয়ে আছেন এবং সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বাহিনী নিয়ে লড়াই তো করছেনই, উপরন্তু প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় শত্রুসৈন্যের গতিবিধি সম্পর্কে খবরও পাঠাচ্ছেন।

প্যারিস অধিকার করবার সময় ঠিক হয়েছিল যে একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে একটি ফরাসী সৈন্যদলই প্রথম রাজধানীতে ঢুকবে, তার পেছনে পেছনে যাবে অন্য সব মিত্রবাহিনীগুলি। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাড়াহুড়ো করে প্রবীণ ফরাসী সেনাপতি জেনারেল লেকলের্ককে একটি সাঁজোয়া বাহিনী গঠন করে দেন। প্যারিস অভিযানের আগে জেনারেল লেকলের্কের অফিসাররা হেমিংওয়ের কাছ থেকে প্যারিসের পথে জার্মান সৈন্যের অবস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করেন, কর্নেল ব্রুস-এর মতে সেই সংবাদ অনুসারে সৈন্যদল পরিচালনা করেই জেনারেল লেকলের্ক অতো অনায়াসে প্যারিস দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জাতিতে ফরাসী হলেও জেনারেল লেকলের্ক ছিলেন কিছুটা কাঠখোট্টা প্রকৃতির। তাঁর ওপর যে অঞ্চলের ভার ন্যস্ত থাকতো সে অঞ্চলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোনও সাংবাদিক এক পাও নড়তে পারতো না। প্যারিসের দক্ষিণ সীমায় জেনারেল লেকলের্ক পৌঁছবার পরে কয়েকজনকে অনুমতি দিলেন নগরীতে প্রবেশ করবার জন্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রবার্ট কাপা। নগরীতে ঢুকে প্রথমেই যে হোটেল পেলেন ওঁরা ভেবেছিলেন তাতেই ঢুকবেন। কিন্তু হোটেলের প্রবেশপথে রক্ষীকে দেখেই চিনতে পারলেন কাপা, এ ব্যক্তি মিঃ পেলকে, হেমিংওয়ের বিখ্যাত ড্রাইভার।

পেলকেও চিনতে পারলেন কাপাকে। বললেন: এসে পড়েছেন, আসুন, আসুন পাপা বেশ ভালো হোটেলই পেয়ে গেছেন। অনেক মদই ছিলো, তাড়াতাড়ি যান, হয় তো এখনো এক-আধটু পেতে পারেন। অর্থাৎ কিনা, এ ক্ষেত্রেও সবার আগে হেমিংওয়ে। সাহসিকতার জন্যে ব্রোঞ্জ স্টার পুরস্কার পেয়েছিলেন হেমিংওয়ে।

এরকম কাহিনী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বললেও ফুরোবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেকেণ্ড ফ্রন্টে হেমিংওয়ে যে পরিমাণ ব্যক্তিগত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার ওপর শত শত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে দেশ-বিদেশে। এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই মানুষ হেমিংওয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি; তাই এ কাহিনী আর না বাড়ালেও চলে। ১৯৪০ সাল থেকে হেমিংওয়ের জীবনের যে তৃতীয় পর্বের সুরু, পরের একুশ-বাইশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্তও ছোটো বড়ো অসংখ্য দুঃসাহসিক কাজকর্মে ভরা। এ গুলির মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হলো আফ্রিকায় অরণ্যের শোভা দেখতে গিয়ে প্লেন ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার ঘটনা। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারিত হয়েছিল যে হেমিংওয়ে মারা গিয়েছেন, সে কথা মনে করবার সঙ্গত কারণও হয় তো ছিলো, কিন্তু একাধিক কাগজে শোকসংবাদ ছাপা হয়ে বেরিয়ে যাবার পরে জানা গিয়েছিল যে উনি বাস্তবিকই মরেন নি, তবে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনাটি কিন্তু হেমিংওয়েকে বেশ কিছুদিন কাবু করে ফেলেছিলো। ১৯৫৪ সালে যখন ওঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'লো তখন উনি অসুস্থতার জন্যেই স্টকহলমে যেতে পারেন নি। তার আগের বছর হেমিংওয়ে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার পুলিৎজার প্রাইজও পেয়েছিলেন।

অতি-নাটকীয়তার প্রতি যাঁর এতটা প্রবণতা তাঁর মৃত্যুটাও হয় তো অতি-নাটকীয়ভাবেই আসার প্রয়োজন ছিলো। তাই দেখা যায় হেমিংওয়ে জার্মান-ইতালীয়-অস্ট্রিয়ান, স্প্যানিশ বা তুর্কী গোলাগুলি, স্পেনের বুনোষাঁড়, আফ্রিকার গহন অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদকুল—সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিজের বন্দুককে ফাঁকি দিতে পারেন নি। একদিন নিজের বন্দুকের গুলিতেই প্রাণত্যাগ করেন হেমিংওয়ে; কেউ বলে এটা নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা, কেউ বলে আত্মহত্যা।

সাহিত্য—জীবনটা যাঁর এতো রোমাঞ্চ আর দুঃসাহসিকতায় ভরা, তাঁর সৃষ্টিও যে অনেক দিক দিয়েই অভিনব হবে, এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা আগেই জেনেছি হেমিংওয়ে একটু বিলম্বে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। ওঁর প্রথম বই তিনটি গল্প এবং দশটি কবিতার একটি ছোট্ট পুস্তিকা বলতে গেলে সাধারণের নজরেই আসে নি, এ সময়ে ওঁর বয়স হয়েছিলো ঠিক চব্বিশ। অথচ তিন বছর বাদে এই ব্যক্তিকেই দেখা গেছে সাহিত্যের আসরে সুপরিচিত, লেখক হিসেবে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে হেমিংওয়ে এমন কি লিখলেন এই তিন বছরের মধ্যে। এই তিন বছরে দেখা যায় ওঁর তিনখানা বই বেরুলো: ইন আওয়ার টাইম, দি টোরেণ্টস অব স্প্রিং এবং দি সান অলসো রাইসেস। এর মধ্যে প্রথম দু'খানা বই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো বটে, তবে অনেক পরে! দি সান অলসো রাইসেস দিয়েই হেমিংওয়ে যাকে বলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপীয় গণমানসে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো, বিশেষ করে যুবসমাজে তারই একখানি খণ্ডচিত্র হেমিংওয়ে এ কাহিনীতে আঁকতে চেয়েছেন। মাইক, ব্রেট, কন, জেক, রোমেরো এবং মাইকেল এরা হলো কাহিনীর প্রধান চরিত্র। মাইক একজন সর্বস্বান্ত ইংরেজ, জেক একজন আমেরিকান সাংবাদিক লেখক, কন একটি দুরন্ত প্রকৃতি ইহুদী। এরা সকলেই লেডী ব্রেট সম্বন্ধে আগ্রহশীল। অন্য সকলের আগ্রহটা কিছুটা স্বাভাবিক: কারণ যুদ্ধের ফলে তারা সকলেই কমবেশি পীড়িত যদিও কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে তারা সকলেই এবং রোমেরো বা মাইকেল স্বাভাবিক পুরুষ মানুষ। কিন্তু জেক-এর জীবনে একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণভাবে আহত হবার ফলে ও একেবারেই পুরুষত্বহীন। কাজেই ওর শারীরিক তথা মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা ভিন্ন ধরণের। লেডী ব্রেট অতিমাত্রায় যৌনবোধের জন্যে কখনো একে, কখনো বা ওকে চাইলেও আসলে তার মনটা পড়ে থাকে জেক-এরই কাছে। কিন্তু জেক যে একেবারেই অক্ষম। এই ঘটনাস্রোতে আঘাত করেই হেমিংওয়ে একটি যুগযন্ত্রণাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যে সমাজ যুদ্ধ বাধিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়, দেহকে করে অক্ষম, মনকে টেনে নামায় নোংরার মাঝে, জেকের মুখ দিয়ে হেমিংওয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন সে সমাজব্যবস্থাকে।

সাহিত্য হিসেবে রসোত্তীর্ণ এবং অনেকের মতে হেমিংওয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে বিবেচিত হলেও এ বইটির একটা বিশেষ ত্রুটিও আছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জেমস টি ফ্যারেল-এর কথা: এ বইয়ের ইয়োরোপ যেন ট্যুরিস্টদের ইয়োরোপ। কাফে, রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলেই বেশিরভাগ সময় চরিত্রগুলিকে দেখা যাচ্ছে। তারা জীবন্ত কিন্তু বাস্তব নয়, মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রহিত।

এরপরে 'মেন উইদাউট উইমেন' গল্পসংগ্রহ এবং উপন্যাস 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' দু'খানা বই-ই হেমিংওয়ের জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়ে দিলো। 'দি সান অলসো রাইসেস'-এর পটভূমিকা যেমন ফ্রান্স এবং কিছুটা স্পেন 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস-এর পটভূমিকা তেমনি ইতালী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইতালীর রণাঙ্গনে হেমিংওয়ে যে নিজেই যুদ্ধ করেছিলেন সে কথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই জন্যেই হেমিংওয়ের চিন্তাধারা বুঝবার জন্যে এ বইখানার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দি সান অলসো রাইসেস-এ আমরা দেখেছি প্রথম মহাযুদ্ধ থেমে যাবার কয়েক বছর পরের অবস্থাটা। আমরা দেখেছি মাইক, জেক, ব্রেট সকলেই যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, কেউ স্বামী হারিয়েছে, কেউ আশ্রয় হারিয়েছে—কেউ বা অঙ্গহীন হয়েছে। এ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস-এ সেই আসল যুদ্ধটারই একটা খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই যদিও তিন বছর পরের লেখা, কিন্তু তবু অবস্থাটা ঠিক ঠিক বুঝবার জন্যে দি সান অলসো রাইসেস-এর আগে এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস পড়লেই ভালো হয় বলে অনেকে মনে করেন (যেমন ফিলিপ ইয়ং)।

এ উপন্যাসের নায়ক লেফটেন্যান্ট ফ্রেডারিক হেনরী একবার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে মিলানের একটা হাসপাতালে আরোগ্যের পথে। যুদ্ধ, সমাজ, জগৎ, সংসার সবকিছু সম্পর্কেই হেনরীর বিরক্তি চরমে এসে পৌঁছেছে—বিশেষ করে এই জন্যে যে ক্যাথারিন বাকলে যাকে ও ভালোবাসে তার কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে দিতে যেন সবাই বদ্ধপরিকর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এরই মধ্যে ডাক এসেছে, এখুনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সংগ্রামের মধ্যে। ক্যাথারিনের সেবা বুঝি আর ভাগ্যে নেই! একটা দ্বন্দ্বপূর্ণ মানসিক অবস্থায় হেনরী আবার যদিও যুদ্ধে যোগদানের জন্যে তৈরি হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর পারলো না। ওর সেনাদল সে সময়ে পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত, এমনি একটা সময়ে ও গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লো। ক্যাথারিনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক্রমে গভীর ভালবাসার রূপ নিলো, সন্তানসম্ভবা হলো ক্যাথারিন কিন্তু তবু হেনরীর জীবন শেষ পর্যন্ত শূন্যতায় ভরে গেলো, কারণ প্রসবের সময়েই ক্যাথারিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

ফর হুম দি বেল টোলস-এর পটভূমিকা গৃহযুদ্ধে প্রজ্জ্বলন্ত স্পেন। মৃত্যু আর যুদ্ধ—খণ্ডযুদ্ধের এবার একেবারে ছড়াছড়ি। মৃত্যু-বিলাসী হেমিংওয়ে মৃত্যুকে আগেই নানাভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সুযোগ করে নিয়ে ছিলেন। তাঁর রোমেরোকে স্পেনের মাটিতে এনে বুল-ফাইটিং দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন; ক্যাথারিনের জীবনে যখন মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছিলো তখন আমরা দেখেছি ব্যথা যা পাবার হেনরী একাই পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার গৃহযুদ্ধের সময় স্পেনে এসে হেমিংওয়ে যা দেখলেন সে এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ। এবার আদর্শের জন্যে মানুষ মরছে এখানে। বুল-ফাইটিং-এর এনজয়মেন্ট, স্পোর্ট বা প্লেজার নয়; কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারও নয়—এ একটা এ্যাবস্‌ট্রাক্ট জিনিষের জন্যে মৃত্যু।

হেমিংওয়ের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই উপন্যাসের নায়ক রবার্ট জর্ডান একজন আমেরিকান কলেজ ইনস্ট্রাক্টর। স্পেনে এসেছে ও একজন লয়্যালিস্ট গরিলা হিসেবে যুদ্ধ করতে। ওর প্রণয়িনী জিজ্ঞাসা করছে—তুমি কি কমিউনিষ্ট?

জর্ডান বলে—না, 'আমি কমিউনিষ্ট নই, আমি ফ্যাস্‌-বিরোধী হেমিংওয়ের নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যেই আমরা পেতে পারি। জর্ডন বলছে—আমাদের জিততে হবেই, এখানে যদি আমরা জিততে পারি, তা'হলে সর্বত্রই আমরা জিতবো। পৃথিবীটা সত্যি বড়ো সুন্দর, এর জন্যে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করা যায়, এ পৃথিবী আমি ছেড়ে যেতে চাই না।

জর্ডানের অভিজ্ঞতার মারফত স্পেনের লোকজন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয় তা সত্যি আমাদের অবাক করে দেয়: স্পেনের কাউকে কখনো বিশ্বাস করো না। তারা তোমার বিরুদ্ধেও শত্রুতা করতে পারে। শুধু তোমার বিরুদ্ধেই নয়, যে কোনো লোকের বিরুদ্ধেই তারা লাগতে পারে; আর অন্য কাউকে না পেলে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই লাগে। স্পেনের তিনজন মানুষ এক জায়গায় জড়ো হলে দেখবে কালবিলম্ব না করে দু'জন মিলে তৃতীয় জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; তারপর দেখা যাবে তারা দু'জনে পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে।

চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা আর নিদারুণ কাপুরুষতা, মানুষের মনের স্বর্গীয় পরশ আর নারকীয়তা—এ সবকিছুই এ উপন্যাসে পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে।

'স্পেনের মানুষের চাইতে অধিকতর সুন্দর মানুষ পৃথিবীর আর কোন দেশেই নাই, এদের মতো হীন মানুষও আর হতে পারে না। যেমনি অপরিসীম এদের দয়া-মায়া তেমনি সীমাহীন এদের নিষ্ঠুরতা।'

এই রকম কঠোর ভাষাতেই হেমিংওয়ে এ উপন্যাসের বহু জায়গাতে স্পেনদেশবাসীদের সমালোচনা করেছেন। এই রকম একটি জনসমষ্টির জন্যে প্রাণ দিতে এসে তবে কি জর্ডান অনুতপ্ত? না, তাও নয়। কারণ এই গৃহযুদ্ধে সে বলতে গেলে না এসে পারে নি বলেই এসেছে। কারণ, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তার নিজের ঠাকুরদাও যে লড়াই করেছিল।

যাই হোক নানা ভালোমন্দ দিক থাকা সত্ত্বেও ফর হুম দি বেল টোলস যে হেমিংওয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এ বিষয়ে সকলেই একমত। গরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে এ বইখানাতে যে চিত্রগুলি এঁকেছেন লেখক তা সাহিত্যে অতুলনীয় বলে সর্বত্র স্বীকৃত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেছে বৃটিশ এবং মার্কিন বাহিনী ছাড়া ফরাসী এবং রুশ সৈন্যবাহিনীও এ বইয়ের অনুবাদ গরিলা যুদ্ধের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করছে।

এর পরেই যে উপন্যাসের কথা বলতে হয় তা আকারে খুবই ছোটো কিন্তু গুরুত্বে হেমিংওয়ের সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এ হলো 'দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী'—এক বুড়ো জেলের কাহিনী।

১৯৩৬ সালের এপ্রিল সংখ্যা Esquire পত্রিকায় হেমিংওয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'অন দি ব্লু ওয়াটার' (এ গাল্ফ ষ্ট্রীম লেটার')। বুড়ো জেলের কাহিনীর আভাস পাওয়া গিয়েছিল এই প্রবন্ধেই। গভীর সমুদ্রে যারা দিনের পর দিন মাছ ধরতে যায় তারা কি শুধু মাছের লোভেই অতোটা বিপদের ঝুঁকি নেয়? এই বিপদের মধ্যে গিয়ে যে আর্থিক লাভ হয় তার চাইতে অনেক কম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কি স্থলে থেকে উপার্জন করা যায় না? নিশ্চয়ই

যায়। তবু কেন এক শ্রেণীর মানুষ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এবং বংশ-পরম্পরা করে চলেছে ঐ কাজ? হেমিংওয়ে বলেন, যে গভীর সমুদ্রের একটা আকর্ষণ আছে—সাগরের সেই মায়া যে একবার অনুভব করতে পেরেছে তার হৃদয়গ্রন্থীতে তাকে যে সাগরে যেতে হবেই। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। সীমাহীন অতল বারিধির নীলিমা তাকে যে আচ্ছন্ন করে রাখে সর্বক্ষণ।

এ উপন্যাসের নায়ক বুড়ো জেলে সান্টিয়াগো কিউবার লোক। ছবির মধ্যে বলতে গেলে একটাই, সে হলো কিছু কাগজপত্র পেলেই বেসবল সম্বন্ধে কিছু পড়ে ফেলা। মাঝে মাঝে অতীত জীবনের কথাও মনে পড়ে তার। মনে পড়ে কবে এক সময় সেই প্রথম যৌবনে আফ্রিকার উপকূলে দলে দলে সিংহদের খেলে বেড়াতে দেখেছিলো। জেলে হিসেবে সান্টিয়াগোর এককালে প্রচুর নামডাক ছিলো। এখনো সে দক্ষতার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে অনেকের ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। সীমাহীন সাগরের মতোই সীমাহীন তার সাহস আর ধৈর্য। কারণ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পর পর চুরাশী দিন সে তার ছোট্ট মাছধরা নৌকোখানি নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার আশায় আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দিনের পর দিন বঁড়শি ফেলে অপেক্ষা করছে ও। এতদিন স্থানীয় একটি জেলে-পরিবারের কিশোর ম্যানোলিনও ভেসে বেড়িয়েছে সান্টিয়াগোর সঙ্গে ওকে সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু আজ পঁচাশী দিনের দিন সেও ত্যাগ করলো ওকে, চলে গেছে অন্য একটা নৌকোতে—যে নৌকোতে মাঝে মাঝেই ধরা পড়ছে দু'-একটা মাছ। কাজেই আজ বিশাল সমুদ্রে সান্টিয়াগো একাই বেরিয়ে পড়েছে। কোন্ জায়গায় মাছ সব সময়েই কিছু না কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকে তা সান্টিয়াগোর জানা আছে। একাই সে এসে পড়লো গভীর সমুদ্রের সেই রকম একটা জায়গাতে। অল্প কিছুক্ষণ সময় কেটে যাবার পরেই মনে হলো যেন সুতোটা ভারী হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, সত্যি তাই, খুবই ভারী। মনে হয় একটা গোটা পাহাড়ের গায়ে বঁড়শিটা গেঁথে গেছে। সে পাহাড়কে নড়াবার ক্ষমতা কারো নেই, তার টানেই এগোতে হবে। বঁড়শিতে গাঁথা অতিকায় মাছটা টেনে নিয়ে চললো সান্টিয়াগোর নৌকো। মাঝে মাঝে জলের গভীর থেকে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ কানে এসে বাজতে লাগলো। সেদিন সে রাত, তার পরের দিন এবং পরের রাত—মোট আটচল্লিশ ঘণ্টা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বিরাট মাছটার সঙ্গে সান্টিয়াগো চালিয়ে যেতে লাগলো তার সংগ্রাম। সাগরের লোণা জল আর কাঁচা মাছ, এই তার খাদ্য এবং পানীয়। সেই যে সুতো ধরেছে শক্ত করে, তা আর ছাড়বার কথাও ভাবে না সে। এদিকে হাতে সুতো বসে গিয়ে রক্ত ঝরছে। সান্টিয়াগো এ বয়সে এই পরিশ্রম, অনাহার, অনিদ্রা যেন আর সইতে পারছে না। কিন্তু তবু দেখা যায় সে সয়ে চলেছে। কারণ সমস্ত রকম মাছের নাড়ী-নক্ষত্র তার জানা। সে জানে একটা মাছ শুধু মাছই, তার বেশি কিছু নয়, এক সময় সে হার মানবেই। কিন্তু মানুষ? মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু কখনোই পরাজিত হতে পারে না। সান্টিয়াগোও হার মানবে না।

এর পর দেখা গেলো হাতের সুতো (দড়ি) যেন একটু একটু করে ঢিল হচ্ছে। হ্যাঁ হচ্ছে। জলের তলায় যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। এমনি একটা আলোড়ন তুলে মাছটা মাথা জাগালো। সান্টিয়াগো তার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো এত বড়ো মার্লিন মাছ চাক্ষুষ দেখে নি। তাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। লম্বায় আঠারো ফুট মাছটাকে হার্পুন বিদ্ধ করে তার নৌকোর পাশে লাগিয়ে তীরের দিকে এগোতে লাগলো সান্টিয়াগো। এই একটা মাছেই কয়েক মাসের খরচ চলে যাবে মনে হতে ওর মনটা এতো কষ্টের মধ্যেও খুশিতে ভরে ওঠে। কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণিকের। সব আনন্দই স্বল্পস্থায়ী। ক্রমে দেখা যেতে লাগলো একটি একটি করে শার্ক মাছের আনাগোনা। সুরু হয়ে গেল সান্টিয়াগোর মাছটার চারপাশে। শার্ক মাছগুলির যেমন শক্তি প্রচণ্ড, তেমনি প্রকৃতিটাও হিংস্র। প্রথম শার্কটাকে সান্টিয়াগো মেরে ফেললো, কিন্তু সেই সঙ্গে তার হার্পুনটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। দ্বিতীয়টাকে মারলো হাতছুরিখানা ছুড়ে—এমনি ভাবেই চলতে লাগলো সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত একসময় দেখা গেল সান্টিয়াগো একেবারেই নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে। এদিকে কূলেও এসে ঠেকলো তরী। কিন্তু মাছটা? সান্টিয়াগো দেখলো আঠারো ফুট লম্বা মার্লিনের কঙ্কালটা লেগে আছে তার নৌকোর গায়ে। কিন্তু তবু হতাশ হলো না ও। সোজা নিজের কুটীরে গিয়ে শুয়ে পড়লো, ঠিক করে নিল মনে মনে যে এবার কোন্ দিকে যাবে মাছ ধরতে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেল। যেন কিছুই ক্ষতি হয় নি ওর।

হেমিংওয়ের নায়কদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই এমনিধারা। তারা মরছে কিন্তু দমছে না, ভুইছে না; ঠিক যেন হেমিংওয়ে স্বয়ং। ওরা প্রত্যেকেই যেন একটি সহজাত প্রকৃতির তাগিদেই জানে যে মানুষ মাত্রেই ধ্বংস হয় এবং হবে কিন্তু মানুষ কখনো পরাজিত হতে পারে না। পরাজয় সে মানবে না।

দি সান অলসো রাইসেস-এ বুলফাইটিং-এর প্রথম যে চিত্র দেখা গেলো তারপর থেকে তারই পুনরাবৃত্তি আরো অনেক লেখায় বহুবার বহুভাবে চিত্রিত হবার পরে এক শ্রেণীর সমালোচক বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে—হেমিংওয়ে? ও, হ্যাঁ, হেমিংওয়ে লেখে মন্দ নয়, তবে ওতো 'বুলফাইটিং'-এর লেখা! এবার সান্টিয়াগোর কাহিনী পড়বার পর কিন্তু তারাও স্তব্ধ হয়ে গেলো—ফুল ছোড়াছুড়ি নেই, গীটার নেই, মদের ফোয়ারাও শুকিয়ে গেছে, অকারণ গুলিগোলার ঝুনঝান আওয়াজ নেই, বিশাল সমুদ্রের অগাধ নীলিমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো চরিত্র। মানবচরিত্র। সে যে অজেয়। বিরূপ সমালোচকেরাও স্তব্ধ হলেন।

হেমিংওয়ে ছোটো গল্পও কম লেখেন নি। সব মিলিয়ে প্রায় একশ'র মতো হবে। তার মধ্যে বেশির ভাগই রসোত্তীর্ণ এবং কয়েকটি গল্প, যেমন ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প, দি আনডিফিটেড, দি কিলারস, স্নোজ, অব কিলিমানজারো প্রভৃতি গল্প ওপরের চারখানা উপন্যাসের মতোই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী-সংযোজন।

এক কলেজের চারটি মেয়ে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

দ্বিতীয় খণ্ড

ভাই বোনদের মধ্যে পুতুল দ্বিতীয়। প্রথমটিও মেয়ে। প্রথম মেয়ে হওয়াতে পুতুলের মা একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। মেয়ে তিনি চান নি। যাক্ মেয়ে হোক অন্য যাই হোক প্রথম সন্তান। কাজেই পুতুলের দিদি আদরেই বড় হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার সন্তান গর্ভে ধারণের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের মা আশার জাল বুনতে সুরু করেন। সাধারণত একটি মেয়ে হবার পর ছেলেই হয় এই তো নিয়ম। বড় মেয়ে ডলিকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, বল তো, তোমার ভাই হবে না বোন হবে।

—'ভাই' শব্দটির উপর অস্বাভাবিক জোর দেন তিনি।

—ভাই। উত্তর দেয় ডলি। মেয়েকে কোলে তুলে আদরে আদরে ভরে দেন মুখ। শিশুদের মুখের কথা সত্য হয়—এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় তাঁর।

প্রতিদিনই ঐ একই প্রশ্ন এবং একই উত্তর, কিন্তু শিশু জন্মাবার দু' মাস আগে হঠাৎ একদিন ডলি বলে, বোন।

কতক্ষণ স্থির হয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে বসে থাকেন তিনি। ডলি অবাক চোখে তাকায়। মায়ের ভাবান্তরের কারণ বুঝতে পারে না সে। তখন থেকেই একটু ভয় ধরে যায় পুতুলের মায়ের মনে। অকারণেই ডলিকে একটা চড় বসিয়ে দেন তিনি। কাঁদতে থাকে ডলি। সেই সোনা চোখের জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা চিন্তা ঘুরতে থাকে মনে যদি ছেলে না হয়...যদি.....

তারপরে ক্রন্দনরতা মেয়েকে কোলে তুলে নেন, আদর করে জিজ্ঞাসা করেন, কি হবে তোমার? ভাই না বোন।

—ভাই। চোখ মুছতে মুছতে জবাব দেয় ডলি।

আঁতুড়ে আশায় কণ্ঠ ভরে ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, কি?

উত্তরটা জানাই—তবু একবার প্রশ্ন করা।

—মেয়ে। উত্তর দেয় ধাত্রী।

—মেয়ে? না! বিশ্বাসের জোর এত বেশি যে, বাস্তবকে অতিক্রম করতে চান তিনি।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। মেয়েই। ধাত্রী হেসে বলে, সুন্দর, টুকটুকে মেয়ে।

—উঃ। দেহের যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। আবারও সেই মেয়ে। কোন দামই কি নেই ইচ্ছাশক্তির?

বিরক্তি পরিণত হয় বিরাগে।

ছোট পাতলা মেয়েটি। পিতা আদর করে নাম রাখেন পুতুল। পুতুল ধীরে ধীরে বড় হয়। শিশুর মুখের হাসির ছোঁয়ায় আধ-আধ কথায় মায়ের মনের বিরাগ পাতলা হতে থাকে।

তৃতীয়বারে আবার সেই ভাবনা—কি হবে! গর্ভ যন্ত্রণার চেয়ে এই যন্ত্রণাও কম নয়। এবারেও মেয়ে। মেয়ের উপর অসম্ভব রেগে যান পুতুলের মা। তাঁর মনে হয়, এই শিশুটিই যেন তাঁকে ফাঁকি দিচ্ছে। ছেলে হতে হতে হঠাৎ মেয়ে হয়ে এসেছে তাঁকে জব্দ করবার জন্য। ক্রোধে মন ভরে ওঠে।

বড় মেয়ে ডলির বয়স তখন প্রায় আট বছর। সেই ছোট বোনটিকে কোলে নিয়ে নিয়ে মায়ের ক্রোধের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো।

নিরাশার বুকেই আশা জেগে ওঠে। ছেলের আশা ছাড়েন না পুতুলের মা। আরও তিনটি মেয়ে। অসূয়া, অবসাদ, বিষাদ।

দুঃখে বিষাদে ভরে যায় মন। যে যা চায় তা কেন পায় না সে? এমন কি কঠিন প্রার্থনা ছিল তাঁর। দুনিয়ায় সকলেরই তো ছেলে হচ্ছে। তবে? প্রার্থনায় কাজ না হওয়ায় ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন সমস্ত রকমই চেষ্টা করে দেখেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই টলেন না ঈশ্বর। অগত্যা, ভাগ্যের উপর দোষারোপ এবং পৃথিবীর প্রতি বিরক্তি।

নব-পরিচিতা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন, ক'টি ছেলেমেয়ে আপনার।

মুখ কালো করে জবাব দিতেন, ছেলে আবার কোথায়? হয়েছে কয়েকটা মেয়ের ছাই।

ঠিক এইভাবেই একদিন উত্তর দিচ্ছিলেন ভাইয়ের প্রশ্নে। বাংলা দেশের বাইরে থাকে তাঁর ছোট ভাই। অনেকদিন পরে ফিরেছে দেশে।

—এমন দুর্ভাগ্য আমার। বুঝলি, একপাল মেয়ে।

—ক'টি? উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে ভাই।

—ছ'টি।

—ঠিক আছে। দেখ···

—তুই কি পাগল হলি নাকি? অবাক হয়ে বলেন পুতুলের মা।

—না, না, পাগলামি নয়, এ একটা থিওরী, একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির। দেখ, তোমার দ্বিতীয় সন্তান খুব ভাল হবে। পুতুল সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে কাছে টেনে নেয় সে।

—কিন্তু, একটা কথা, ভাই চকিতে তাকায়।

—কি?

—আটটির বেশি সন্তান যেন না হয়।

—মাথা খারাপ। এতক্ষণে নিশ্বাস ত্যাগ করেন পুতুলের মা। অবিবাহিত, সংসার জ্ঞানহীন ভাইয়ের মুখে এই সব কথা শুনে এ ছাড়া আর কি বা বলতে পারেন তিনি।

—মাথা খারাপ না একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির থিওরী। ভাই শান্ত গাম্ভীর্যে পুতুলকে কাছে টেনে বলে, দেখ, এই মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী হবে।

—হ্যাঁ। বুদ্ধির চোটে তো এবারে ফেল করেছে এক বিষয়ে।

—তা তো করবেই। ছেলেবেলার পরীক্ষা তারাই ভাল করে, যারা মুখস্থ করে। বুদ্ধিমতীরা যত বড় হবে তত ভাল ফল করবে।

মায়ের কথা শুনে পুতুল চোখ নীচু করেছিল এবারে মামার উত্তরে চোখের কোণে তাকায়। মামা উৎফুল্ল হয়ে বলে, দেখেছ, কি রকম চকচকে চোখ।

—তুইই দেখ। একটু হেসে উঠে গিয়েছিলেন পুতুলের মা।

—দিদি, শোন শোন···ডেকে ফিরিয়েছিল ভাই।

—কি?

—তোমার ছয়টি মেয়ে, ছেলে নেই তাতে কি হয়েছে?

—কি? ওঃ, এতক্ষণে বুঝি উত্তর দেবার সময় হল।

—হ্যাঁ। ভাই নিজের মনেই বলে, মেয়েরাই তো এখন asset—বিশেষত মধ্যবিত্ত ঘরে। ছেলেবেলায় সংসারে সাহায্য করবে, বড় হয়ে চাকুরী করে টাকা এনে দেবে। বিয়ে···

—রক্ষা কর ভগবান। পুতুলের মা চেঁচিয়ে উঠেন, মেয়ের রোজগারে যেন খেতে না হয় আমাকে। তার চেয়ে মরণও ভাল।

—বিয়ে হলে, ভাই নিজের কথানুসারেই বলতে থাকে, মেয়ে পৃথক হয়ে চলে যায়। তাদের সুখ, দুঃখ, সংসার নিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে বসন্তের বাতাসের মত। তখন শুধু উল্লাস ও শান্তি···

পুতুলের বাবা পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। এবারে হেসে বলেন, এতই যদি বোঝ, তবে বিয়ে করছ না কেন? ভয়ই বা কি? বিয়েও তো করবে একটি মেয়েকে।

—এদের সব থিওরীই পরের বেলায়। উত্তর দেন পুতুলের মা।

থিওরী মাত্রেই পরের প্রতি প্রযোজ্য। হাসতে সুরু করেন পুতুলের বাবা। ভীষণ জোরে হাসেন ভদ্রলোক। হাসির তোড়ে ভাসিয়ে দেন যেন পৃথিবী।

পুতুল যেবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় সেবারেই ওর বাবা হঠাৎ মারা যান। প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল পুতুল। কিন্তু সে খবর কারো মনে কোন দাগ কাটে না। পুতুলের মা দুর্ভাগ্যের এই চরম আঘাতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। এত দুঃখও তাঁর ভাগ্যে ছিল। কলকাতা থাকা সম্ভব হয় না। কাজেই, শ্বশুরের পৈত্রিক বাসস্থানে চলে আসেন তিনি।

স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথম ও প্রধান চিন্তা মেয়েদের বিয়ে। এতদিন স্বামীকে তাগাদা দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর কর্তব্য, কিন্তু এখন যেন দায়িত্বটা বিশেষভাবে তাঁর উপর এসে পড়েছে। অফিস থেকে 'কিছু' টাকাও পেয়েছেন। অন্তত প্রথম তিনটিকে বিয়ে দিতেই হবে।

পুতুল এখানে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। বড় বোন ডলি প্রবেশিকা পাশ করেই পড়া ছেড়ে বাড়িতে বসে আছে—ছোটরা সবাই স্কুলে ভর্তি হল।

পুতুলের বাবারা চার ভাই। একটা বাড়িই চারটে ভাগ করা—দু' জ্যাঠামশাই এক কাকা। একান্নবর্তী পরিবার না হলেও ওঁরা দেখাশোনা করতেন। ডলির বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেল।

—এবারে পুতুল—পুতুলের মা বলেন।

—না। আমি নই, কঠিন দৃঢ় পুতুলের স্বর।

—তার মানে? চমকে ওঠেন মা, পড়াশুনো শিখে খুব স্বাধীন হয়েছ? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

—বিয়ে আমি করবো না।

—তবে কি করবে তুমি?

—লেখাপড়া শিখে চাকুরী করে ছোটদের প্রতিপালন করবো।

—সে ভাগ্য নিয়ে কি আর জন্মেছি। তাহলে তো তুমি মেয়ে না হয়ে ছেলেই হতে।

—কি তফাৎ ছেলেতে মেয়েতে। আগে মেয়েরা লেখাপড়া না শিখে ঘরে বন্দী হয়ে চিরজীবন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতো এখন আর কি প্রভেদ ছেলেতে মেয়েতে।

—যা হয় না তা নিয়ে তর্ক করো না।

—যা হয় না তা করতে আমাকে বলো না। পুতুল উত্তর দেয়।

যুক্তিতে না পেরে পুতুলের মা এবারে ভিন্ন পথ গ্রহণ করেন। পুতুল বিয়ে করলেই যে তাঁদের সংসারে কত সুখ-সুবিধা হবে তারই নির্দেশ দিতে সুরু করেন তিনি। পুতুলের বিয়ে না হলে ছোটদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। আর বড় তিনটির বিয়ে হলে পরের তিনটেকে তোর কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়ে দিতে পারবে। তাহলেই তো তিনি নিশ্চিন্ত।

এ যুক্তি পুতুলের মনে লাগে। বস্তুত বিয়ের বিরুদ্ধে তার কোন বিদ্বেষ ছিল না। বরঞ্চ শিশুসুলভ কৌতূহল ও স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল। বিয়ে মানেই আলো, বাজনা, সাজসজ্জা। তার আপত্তি ছিল মা ও ছোট বোনদের ভবিষ্যৎ ভেবে। এখন সব ব্যাপারই সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হল সে।

বাড়িতে বিয়ের চেষ্টা চলতে থাকে।

কলেজে চারটি মেয়ের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হতে থাকে।

প্রিয়ার অকস্মাৎ অন্তর্ধানের পরই ফাটল ধরে—প্রিয়া কেন গেল কোথায় গেল, এবং কেনই বা কিছু বলে গেল না—এই কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা হবার পূর্বেই পাপড়ি-বিমানের ব্যাপার ঘনিয়ে ওঠে। কলেজের

নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

আজকের দিনে মানুষের চিন্তার আর শেষ নেই। চিন্তা যখন নিত্য সঙ্গী তখন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ যে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে সে আর বেশী কথা কি? নিত্য নূতন সমস্যা মানুষের স্নায়ু আর মস্তিষ্ককে যখন বিকল করে আনে তখন দেহে আর মনে আসে অপরিসীম ক্লান্তি—বেশীর ভাগ রাত্রিই তাই কাটে বিনিদ্রায় বা বিক্ষিপ্ত নিদ্রায়।

জবাকুসুম তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে তাই নিয়মিত জবাকুসুম তেল ব্যবহার করলে খানিকটাও নিশ্চিন্ত বিশ্রাম যে সম্ভব তা এ বাজারেও জোর করে বলা চলে।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস
কলিকাতা-১২

১, টাকার্স লেন, ব্রডওয়ে, মাদ্রাজ-১

সব মেয়েরা মুখরোচক সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে আলোচনা করে, প্রতিমা পিঙ্গল চোখের তারা কুঁচকে নিশ্চিন্ত মনে ভাবতে থাকে কিন্তু পুতুল চুপ করে থাকতে পারে না। কিছু করা দরকার। নিশ্চয়ই কিছু করা দরকার। অবিরত এই কথা মনে হয় তার।

কিন্তু কিছুই করবার দরকার হয় না। বিমান-পাপড়ির বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরই বিমান পাপড়িকে নিয়ে কলকাতা চলে যায়। ব্যবসা করবে ওখানে।

পাপড়িকে বিদায় দিতে গিয়েছিল পুতুল। পাপড়ির সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ, কানে চকচকে নতুন ঝুমকো, গলায় ভারী মোটা হার, হাতে একগাদা চুড়ি, রুলি, কঙ্কণ। শাড়ির পাড়টাও চওড়া।

চওড়া আর চকচকে। মোটা মোটা দাগ আর উজ্জ্বল রং, তবুও কি সুন্দর! একদিনেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে পাপড়ি। আজও হাসছে পাপড়ি। সেই পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আকাশের হাসি হাসছে। সবুজ মেয়ের নীল হাসি।

রং ধরেছে কিকে নীল হাসিতে। কুমারীর ঠোঁটের হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—মাধুর্যের রং লেগেছে।

বিমানের দিকে তাকিয়ে আরও অবাক হয়ে যায় পুতুল। আগেও কয়েকবার বিমানকে দেখেছে পুতুল। দেখেছে তার বাদামী বিদ্রূপভরা দুটি চোখ, ক্লান্ত বিরসতা। কিন্তু আজের বিমান সম্পূর্ণ পৃথক।

অমৃত সাগরে স্নান করে উঠেছে বিমান। তার সমগ্র দেহে অমৃতের আবেশ, চোখে অমৃত-অঞ্জন। বাদামী তারা দুটি নীলাভায় উজ্জ্বল-মধুর।

ঝিকিঝিকিয়ে উঠেছে ধূসর আলো। চোখ মেলে তাকায় পুতুল। কোণের টেবিলে রাখা পেতলের গ্লাসের উপর পড়েছে আলো।

কালো মৃত্যু ধূসরতা! ভীতি নয় শুধু অপরিচিতির ধূসর আবরণে মণ্ডিত। সাদা উদাস ধূসরতা! অনাস্থা আর ঔদাসীন্যের রং। ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে সেই ধূসর রং—জীবনের আলোর পরশ—

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পুতুল। কি চমৎকার রংয়ের এই একটু একটু বদলে যাওয়া রূপ!

সেই ছায়-ছায়া আলোতে জেগে ওঠে ঘরটা। কিছুই ছিল না এতক্ষণ। গাঢ় অন্ধকারে মিশে মিশে গিয়েছিল ঘরের সমস্ত আসবাব এমন কি পুতুল নিজেও। সব এক। এই মুহূর্ত জেগে উঠেছে পৃথক সত্তা।

কোণের ঐ টেবিলটা শুধুমাত্র একটি টেবিল, কাঠের তৈরি চতুষ্পদ। সে কিছুতেই মিশে যাবে না পাশে রাখা তিনপেয়ে টিপয়টার সঙ্গে। তার চেহারা ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন।

আর টেবিলের উপরে রাখা পেতলের গ্লাসটা। সে তো একেবারেই ভিন্ন সামগ্রীতে তৈরি।

এমনি প্রাণহীন বস্তুতে বস্তুতে—টেবিল, গ্লাস, শাড়ি, আলনা। পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে ওরা—তবুও কত পৃথক। কত পার্থক্য একের সঙ্গে অপরের।

পাশ ফিরতে গিয়েই ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ। একটু হাসে পুতুল। ছোট বোন পারুল। এতক্ষণ ছিল না ও। এইমাত্র ও উঠে এসেছে অজানা কালো গহ্বর থেকে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়ে চোখ দুটি স্থির হয়ে যায় পুতুলের। কি শান্ত-স্নিগ্ধ, নিশ্চিন্ত মুখ ওর। পুতুলেরই অনুজ—তবু কত প্রভেদ। অন্ধকার জঠরে—সেই একটুখানি জায়গায় একইভাবে তাদের ছোট ভ্রূণ ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারে চোখ বন্ধ ছিল তাদের—অন্ধ হয়ে ছিল তারা—কিন্তু যে মুহূর্তে আলোর স্পর্শ পেল পৃথকীকৃত হয়ে উঠল তাদের সত্তা।

পুতুল ও পারুল পাশাপাশি—ঘেঁষাঘেঁষি তবু কত লক্ষ যোজন ব্যবধান।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় পুতুল। উজ্জ্বল নীল আলোয় ভরে গেছে ঘর। উজ্জ্বল নীল আলো···

কতদিন আগে এই উজ্জ্বল নীল আলোর স্বপ্ন দেখেছিল পুতুল। কতদিন আগে—কত মাসে এক বৎসর। কতদিনে এক মাস। কত ঘণ্টায় একদিন। কত মুহূর্ত এক ঘণ্টা।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুহূর্ত কেটে গেছে স্বপ্ন দেখবার পর—স্বপ্নভঙ্গের পর।

জীবনের উনিশ বছর এক নিশ্বাসে কাটিয়ে দিল পুতুল—কোনদিন জানতে পারল না সময়ের হিসাব—কোনদিন তাকিয়ে দেখে নি সময়ের ঘড়ির কাঁটা—তন্দ্রার আবেশে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন হোঁচট খেয়ে তাকিয়ে দেখল—ঘড়ির কাঁটা দুটি স্থির শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—উনিশ বছর—

তারপরই বুকের মাঝে অশ্রান্ত অবিশ্রান্ত সেই টিক্ টিক্ ধ্বনি—ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এক-একটি মুহূর্ত। আর···

একটি মুহূর্তে কত যন্ত্রণা—ছিটে ছিটে কালো ছাপে ভরে উঠেছে সমস্ত মন।

পাপড়িকে বিদায় দিতে গিয়ে বিমানের বাদামী নীল আনন্দ আর পাপড়ির উজ্জ্বল মধুর হাসি দেখে মন ভরে উঠেছিল পুতুলের। প্রথম যৌবনা কুমারী মনের শুভ্র মন উঠেছিল রাঙিয়ে।

অন্তরে দীপ জ্বলে ওঠে। শুধু দেখা নয়—অনুভব করা—দেখার চেয়ে অনেক বড় অনুভব—মনের স্পর্শে চোখের তারা দুটি ভরে উঠেছিল মায়ায়—দৃষ্টিই সৃষ্টি।

সেই মায়াময় মন আর কালো স্বপ্নভরা চোখে কত আশা—কত স্পর্ধা। নীল আকাশকে ধরে নিতে চায় হাতের মুঠোয়—পৃথিবীর সব সবুজ তার পদতলে। নিজেকে ছাড়িয়ে মন ছুটে চলে যায় অনেক দূরে—যেখানে মিশেছে আকাশ আর মাটি—

তারপর—চোখ বুজেই ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসে পুতুল। অনেক অলীক স্বপ্ন দেখেছিল সেই মেয়েটি। যা কখনও হয় নি, যা কখনও হবে না সেই অসম্ভবকে প্রার্থনা করেছিল সে।

একটা গল্প লিখবো আমি। হাতটা চোখের উপর রাখে পুতুল। লিখবো, এক যে ছিল মেয়ে। ছোট, স্বাভাবিক। খিদে পেলে খায়, ঘুরে বেড়ায় অবসরকালে। পৃথিবীর কত জিনিস পড়ে তার চোখে। দেখে কিন্তু তখনই ভুলে যায়। যেভাবে যা দেখে ঠিক সেভাবেই দেখে তাকে—গাছকে গাছ দেখে, পাখিকে পাখি, মানুষকে মানুষ।

হঠাৎ একদিন কি হল? মনটা বড় হতে সুরু করে। সাড়ে

চন হাত মানুষটার মন বড় হয়ে হল চার হাত। এ এক ব্যাধি। দেহেতে আর আটকে রাখা যায় না তাকে। যা নয় তাই চাইতে সুরু করে সে। গাছের সবুজে, আকাশের নীলে আর মানুষের মনে খুঁজে পায় ছন্দ। আরও বড় হয়ে ওঠে তার মন। সামান্য ঘাসের শীষে সে দেখে মাটি আর আকাশের মিতালী। সে বলে,—

দ্যুলোক ভূলোকে মিলে শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁখির কোণায়।

তাই চোখের সামান্য অভিমানেই ফুটে ওঠে সুধা আর সুরের পরশ।

তারপর!

একদিন সেই মন দেহকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে এল। পৃথিবীর লোকরা হেসে ওঠে ওকে দেখে—হাঃ হাঃ, হাঃ! তার চারিদিকে নিষ্ঠুর অশ্রান্ত বিদ্রূপের হাস্যধ্বনি—ভয়ে কুঁকড়ে সে উঠে যায় অনেক উপরে—আকাশের কাছে চায় আশ্রয়।

কিন্তু···

কিন্তু, আকাশ তো আশ্রয় দেয় না—বজ্রের আঘাতে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নীচে। হাত-পা ভেঙ্গে চূর্ণীকৃত হয়ে মাটিতে পড়তে পড়তে সে শুধু শুনতে পায় চারিদিকে বিদ্রূপের হাসি। আকাশ হাসছে, বাতাস হাসছে, হাসছে পৃথিবীর লোক।·····

—পুতুল, পুতুল, ওঠ দেরী হয়ে যাচ্ছে। মায়ের গলা। প্রতিদিন জেগে শুয়ে থাকে পুতুল। সে কি এই আহ্বান-প্রতীক্ষায়? হয় তো তাই। ভাল লাগে শুনতে মায়ের এই ডাক। নিতান্ত প্রয়োজনের জন্যই ডাকছেন তিনি। তবু··

দিকচক্রবালের ঘোরাল রেখায় গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল তার মন। মনে জেগেছিল সেই নূতন আলো—অপরিচিত যে আলো—বারবার যে দোলা দেয় রক্তে, সাড়া দিয়েছিল সেই আহ্বানে। সে আহ্বান কখনও কানে শোনে নি।

তখন কুমুদের বুকে দেখেছিল চাঁদের আলোর তৃষা, আর পদ্মের হাসিতে সূর্য-মগন আনন্দ।

বাট! দাঁতে দাঁত চেপে হেসে ওঠে পুতুল। আর, তখনই পাশের বাড়ির পেটা ঘড়ি বেজে ওঠে—ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং—ছয়টা বাজে। কি সর্বনাশ, দেরী হয়ে যাবে নাকি।

কিছু নেই জগতে! স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, ভদ্রতা। শুধু আছে প্রয়োজন, জগতের প্রাণবিন্দু আবিষ্কার করে চলেছে সে আজ।

গোল হয়ে ঘুরছে এই পৃথিবী। একবিন্দু প্রাণকেন্দ্রে। গোল হয়ে ঘুরছে মানুষের মন।

প্রেমে নয় প্রয়োজনের জন্যই কুমুদী চাঁদের দিকে আর পদ্ম সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রেমে নয় প্রয়োজনের জন্যই সন্তানকে জন্মদান করে পিতামাতা।

বাইরে বেরুবার মুখে পারুলকে ধাক্কা দেয় পুতুল। ওঠ, ওঠ, কত বেলা হয়েছে।

ওর হাত ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে থাকে পারুল।

—বেশ আছে। ভাবে পুতুল। ভাবনা চিন্তা নেই। আর সে···

কিন্তু···

কে বাধা দিয়েছিল তাকে বেশ থাকতে! কে?

সেই ব্যাধিগ্রস্ত মনের খেলা। আধারের চেয়ে অনেক বড় হয়ে ওঠে যে মন—

পথটা বদলে গেছে। এই পথ দিয়েই যেত তারা—সে, প্রিয়া, প্রতিমা, পাপড়ি—গাছগুলি তখন ছিল আরও অনেক সবুজ। এত

উঁচুতে ছিল না তখন আকাশ। নেমে আসতো গাছের মাথায়—পৃথিবী আর আকাশে নীল-সবুজের খেলা।

শুষ্ক হয়ে উঠেছে সমস্ত পৃথিবী। এক টুকরো পাথর পুতুলের মন। তবু প্রশান্ত আমগাছটার কাছ দিয়ে মোড় ফিরতে গিয়ে পাতাগুলি নড়ে ওঠে আর পুতুলের কঠিন মনের উপর ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে কয়েকটা শব্দ—আপাতসাধারণতার মধ্যেই রয়েছে অসাধারণতা—প্রিয়ার বিরক্তিবিরস দু'টি চোখ, প্রতিমার পিঙ্গল চুলের ঝলক আর পাপড়ির হাসি। এক কলেজের চারটি মেয়ে।

কোথায় চলে গেছে ওরা? কোথায়? কোন বিশেষত্ব কি রঞ্জিত করেছে ওদের জীবন! না, ওরা নিতান্তই সাধারণ, নিস্তরঙ্গ। পুতুলের মত এত যন্ত্রণা নেই ওদের জীবনে।

পাপড়ির বিয়ের কিছুদিন পরেই পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়। তখনও পুতুলের মনে পাপড়ির নতুন আলোর হাসি, বিমানের চোখের নতুন রং বারবার দোলা দিচ্ছে—বিয়েতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না সে। উনিশ বছরের মেয়ে বারবার স্বপ্ন দেখে সেই উজ্জ্বল নীল মাধুর্যের।

—তুই দিন দিন ফরসা হচ্ছিস—ছোট বোন পারুল একদিন বলে।

—যা। উত্তর দিয়েছিল পুতুল।

—হ্যাঁ। বেশ 'কনে কনে' লাগছে।

—বাজে কথা বলিস না। রাগ করেছিল পুতুল।

—এখন আরও লাগছে। পারুল দুষ্টু হেসে দূরে সরে যায়।

শুধু পারুল নয় অনেকেই এই কথা বলে। পুতুলের চেহারা দিন দিন সুন্দর হচ্ছে। পুতুলের দূর সম্পর্কের ঠানদি ঠাট্টা করে বলেন, কি লো কন্যে, বিয়ের জল গায়ে না লাগতেই যে 'বিয়ে বিয়ে' ভাব।

পুতুল নিজেও বুঝতে পারে পরিবর্তন। কোন গোপন স্পর্শমণির প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীই বদলে গেছে। আকাশ সবুজ-নীল, পৃথিবী সোনালী-সবুজ।

উনিশ বছরের কুমারী মনের স্বপ্ন। বারবার তার মন ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় দিগ্বলয় রেখার সীমায়—আনন্দময় প্রতীক্ষায় কাঁপতে থাকে সে।

অসীম আশা ও অপরিসীম বিশ্বাস—অরূপ আনন্দ।

স্বল্পভাষিণী প্রতিমা একদিন বলে, সোনায় দেখি পড়েছে পালিশ।

—কৈ সোনায় পালিশ? অবাক হয় পুতুল।

—তোমার রং সোনার মত কি না? সেই সোনা রং আনন্দের পালিশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নিজের চেহারা সম্বন্ধে কোন ধারণাই এতদিন ছিল না পুতুলের। এই প্রথম সে চকিত হয়ে তাকায় হাতের দিকে। সত্যই মিশে গেছে। মিশে গেছে হাতের রুলির সোনা-রংয়ে গায়ের সোনালী রং।

—ছেলেবেলায় কিন্তু সকলে আমাকে কালোই বলতো—অন্যমনস্কভাবে বলে পুতুল।

—তা হবেই তো। মরা সোনার মত মলিন ছিলে তুমি।

—এখন যৌবনের উত্তাপে গলে মরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি··পুতুল পরিহাস করে।

—হ্যাঁ এবং বিয়ের স্বপ্নের আনন্দে পালিশ লেগেছে। প্রতিমা একটু হাসে। ওর সেই নিজস্ব নিরানন্দ হাসি। পৃথিবীর সমস্ত হাসিকে বিদ্রূপ এবং তুচ্ছ করবার জন্যই যেন হাসে ও।

প্রতিমার সেই বিদ্রূপভরা হাসির সামনে নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হয়। অজানার প্রতি এই আকর্ষণ, স্বপ্ন দেখা সবই যেন মিছক পাগলামি। প্রতিমার তুলনায় পুতুল যেন একটি শিশু।

প্রতিমার বিদ্রূপে একটু চমকে উঠলেও স্বপ্নভঙ্গ হয় নি পুতুলের। বিয়ের স্বপ্ন—অপরিচিত একটি লোককে ঘিরে স্বপ্নের জাল বোনা—নূতনের স্বপ্ন। নূতন একটি লোক। নূতন একটি সংসার। নূতন এক জীবন।

সেই স্বপ্নের মাধুর্যে বিরক্তি ও অপমানের রেশ বাজলো বিয়ের পিঁড়েতে বসে। ঘোমটার আড়ালে চোখ দু'টি একটু সরাতেই চোখ পড়ে একটা থালায়—চকচকে রূপোর টাকা। ও কি? ওর অবাক মন কারণ খোঁজে? তবে কি এর পণ নিচ্ছে? কৈ! কেউ তো বলে নি সে কথা।

বিয়ের মন্ত্রে নয় নগদ মূল্যে প্রবেশপত্র কিনে তবে তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে এদের সংসারে। এত ছোট সে। রূপের বস্তা পাশে রাখলে তবেই তার তুলাদণ্ড এদের সমান হবে। অপমান! উনিশ বছরের অনভিজ্ঞা আত্মসম্মানজ্ঞানপূর্ণা নারী চমকে জেগে ওঠে।

বিয়ের মন্ত্র কানে যায় না। আরও অনেকক্ষণ পরে মূর্ছিত মন একটু চেতনা পায়।

—টাকাগুলি দেখছি সবই রূপোর! আস্তে আস্তে বললেও কথাটা কানে এসে আঘাত করে। বক্তার মুখ দেখতে পায় না পুতুল। কিন্তু বুঝতে পারে তিনি কে। কণ্ঠের সতর্কভঙ্গী চিনিয়ে দেয় মানুষটিকে।

—হ্যাঁ। তাই দিলাম। পুতুলের জ্যাঠামশায়ের গলা। দেখতে ভাল দেখায়।

—দেখতে তো ভাল দেখায় বেইমশাই, কিন্তু দেখে নিতে যে কষ্ট, মিষ্ট হাসি হেসে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেন তিনি।

চন্দনচর্চিত মুখে, ওড়নার আবরণে আবৃতা পুতুলের মনে শুধু একটি কথাই বাজতে থাকে, টাকাটা দেখে নেবার জন্য এদের যত ব্যগ্রতা—কই একবারও তো তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলছে না। বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই তার সম্বন্ধে। পুতুল নামধারী একটি জীবকে বিয়ে করে ঘরে নিচ্ছে ওরা—পুতুল না হয়ে বুঁচি কিংবা কাজরী হলেও কোন আপত্তি ছিল না। দেখছি পুতুলকে এরা চেনে না, চিনতেও চায় না।

প্রথম যৌবনার অভিমানী মনে আঘাত লাগে। কেন এরা তাকে ছোট করে দেখল? কেন? সে তো ছোট নয়। সে একটি আত্মসম্মানে জ্ঞানসম্পন্না, শিক্ষিতা তরুণী। প্রকৃতির আশীর্বাদে, পৃথিবীর যত্নে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। কেন তাকে ছোট করলো এরা? তবে কি এরা নিজেরাই নীচ?

নীচ? শরীর কেঁপে ওঠে পুতুলের। নীচ? এত নীচ! মানুষের চেয়ে বেশি মূল্য দেয় অর্থের। এদের সংসারে ঘোমটা টেনে বৌ হয়ে থাকতে হবে তাকে। এই নীচ-লোকদের শ্রদ্ধাভক্তি দেখাতে হবে!

ভয়ে কুঁকড়ে সরে বসতে চায় সে।

মুখ তুলে স্পষ্টভাবে চোখে চোখ রেখে তাকাতে ইচ্ছে হয় ওর।

কম্ব শত চেষ্টাতেও তুলতে পারে না মুখ। চারিপাশের লোকদের কৌতূহল, বিবাহের আবহাওয়া নিথর করে দিয়েছে তার দেহকে। [illegible] মনে জমে গিয়েছে—একটা নির্জীব পাথরের মূর্তি।

[illegible] শীতল দেহে উষ্ণ মন। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে [illegible]। এক মুহূর্তও বিরাম নেই। সামনে এই যে লোকটি [illegible] হাত [illegible] তারও কি এই রূপ? কল্পলোকে [illegible] মন [illegible] রাঙিয়েছে, বস্তুলোকে কি [illegible] একটিই রং—নীচতা ও হীনতা। না, না তা হতে পারে [illegible] এই তো [illegible] সে বললো, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম—তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার।

হৃদয় বিনিময় হয়ে গেছে তাদের। আর নীচতার স্থান নেই তাদের মাঝে। কোন ভয় নেই। কেউ পৃথক করতে পারবে না তাদের।

[illegible] দুটিন মনের পেণ্ডুলাম ঠিক একই ভাবে দুলতে থাকে। [illegible] অবসরই বা কোথায়? অপরের হাতে যন্ত্রের মত চলতে হচ্ছে। একটির পর একটি। এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেই।

থমকে দাঁড়াল মন সেই রাতে—সেই সময়। যখন তাকে সাজিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে—ফিসফিসিয়ে [illegible]। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পুতুল। এই অবস্থায় কি [illegible] হবে তা সে জানে না। কোন পাঠ্যপুস্তকে পড়েনি।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুতুল। আর তার বুকের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সময়। [illegible] সেই সময়ের ভার [illegible] বুকটি নিঃশ্বাসে [illegible] করছে পুতুলের—তখন [illegible] দরজা বন্ধ করছে ভূপেন। [illegible] জানতো পুতুল। কেউ নেই এই পৃথিবীতে। [illegible] স্বামী, দিকচক্রবালের সীমায় [illegible] দাঁড়িয়েছে [illegible] চোখ তুলে তাকায় পুতুল। চোখে চোখ রেখে জেনে নিতে [illegible] কথা। হৃদয় বিনিময় তো হয়েই গেছে। এখন শুধু [illegible]। কান পেতে শোনা··

—[illegible] পৃথিবীতে ভূমিকম্পের মত কথাগুলি সেই নিস্তব্ধ ঘরে বেজে ওঠে বিপরীত সুর। পুতুলের কানে শব্দগুলি ঢুকলেও অর্থবোধ হয় না।

—রাত অনেক হয়েছে। কেন দেরী করছ?—আবার সেই কণ্ঠ।

দেরী হয়ে যাচ্ছে। কিসের দেরী! গয়না খুলবার? এই কি তার স্বামীর কণ্ঠ? এই কি তার স্বামীর প্রথম সম্ভাষণ? এই স্বপ্ন কি এতদিন ধরে দেখেছিল সে?

—আঃ। কেন দেরী করছ লক্ষ্মীটি। কণ্ঠস্বর এবারে নিকটতর। কণ্ঠও অপেক্ষাকৃত মৃদু ও মিষ্ট—এধারে এস, বস। পুতুলের হাত টেনে নেয় সে নিজের হাতে।

স্বামীর প্রথম স্পর্শ। পুতুল মনে মনে অনুভব করতে চেষ্টা করে কল্পলোকের বারবার অনুভব করা সেই ঝঙ্কার। কিন্তু কোথায়? দেহ কঠিনতর হয়ে উঠেছে।

—এস, এস। জানো তো সবই। কচি খুকী নও।

না, পুতুল কচি খুকী নয় উনবিংশ, বি-এ পরিক্ষার্থিনী। শিক্ষার এবং বয়সের ছাপ তার সর্বদেহে। সবই জানে সে। কিন্তু জানার সীমানার বাইরে এ কি অজানা। কোন সুদূর কল্পনাতেও তো এ দৃশ্য মনে হয় নি তার।

কল্পনা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে—তবু আমি দেখতে চাই বাস্তবে কি আছে। কোথায় শেষ! ধীরস্থির পায়ে এগিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়ায় পুতুল। নববধূ, লাজুক, ভীরু পুতুল নয় আত্মসম্মানজ্ঞানপূর্ণা বিবাহিতা পুতুল। গয়নাগুলি খুলতে থাকে একে একে।

—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ভূপেন, তোমরা হচ্ছ কলেজে পড়া মেয়ে। তোমাদের আর কি শেখাব?

টেবিলের উপর সমস্ত গয়না খুলে রাখে পুতুল। শেষ পর্যন্ত দেখবে সে। একটি কালোছায়া দুলছে সামনে। এক নয় একাধিক। মিলে-মিশে বিস্তৃত প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত দেখাচ্ছে।

অনেকক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পুতুল। কালো নির্জীব ধূসর কালো—প্রাণ নেই, মায়া নেই, রং নেই।

কালো ছায়াটা এগিয়ে আসছে একেবারে বুকের কাছে—

ভূপেন ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে বিছানায় বসিয়ে দেয়। হেসে বলে, এখনও এত লজ্জা। রাত হয়ে যাচ্ছে। কাল অফিস যেতে হবে।

উঁচুতে ছিল না তখন আকাশ। নেমে আসতো গাছের মাথায়—পৃথিবী আর আকাশে নীল-সবুজের খেলা।

শুষ্ক হয়ে উঠেছে সমস্ত পৃথিবী। একটুকরো পাথর পুতুলের মন। তবু প্রকাণ্ড আমগাছটার কাছ দিয়ে মোড় ফিরতে গিয়ে পাতাগুলি নড়ে ওঠে আর পুতুলের কঠিন মনের উপর ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে কয়েকটা শব্দ—আপাতসাধারণতার মধ্যেই রয়েছে অসাধারণতা—প্রিয়ার বিরক্তিবিরস দু'টি চোখ, প্রতিমার পিঙ্গল চুলের ঝলক আর পাপড়ির হাসি। এক কলেজের চারটি মেয়ে।

কোথায় চলে গেছে ওরা? কোথায়? কোন বিশেষত্ব কি রঞ্জিত করেছে ওদের জীবন! না, ওরা নিতান্তই সাধারণ, নিস্তরঙ্গ। পুতুলের মত এত যন্ত্রণা নেই ওদের জীবনে।

পাপড়ির বিয়ের কিছুদিন পরেই পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়। তখনও পুতুলের মনে পাপড়ির নতুন আলোর হাসি, বিমানের চোখের নতুন রং বারবার দোলা দিচ্ছে—বিয়েতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না সে। উনিশ বছরের মেয়ে বারবার স্বপ্ন দেখে সেই উজ্জ্বল নীল মাধুর্যের।

—তুই দিন দিন ফরসা হচ্ছিস—ছোট বোন পারুল একদিন বলে।

—যা। উত্তর দিয়েছিল পুতুল।

—হ্যাঁ। বেশ 'কনে কনে' লাগছে।

—বাজে কথা বলিস না। রাগ করেছিল পুতুল।

—এখন আরও লাগছে। পারুল দুষ্টু হেসে দূরে সরে যায়।

শুধু পারুল নয় অনেকেই এই কথা বলে। পুতুলের চেহারা দিন দিন সুন্দর হচ্ছে। পুতুলের দূর সম্পর্কের ঠানদি ঠাট্টা করে বলেন, কি লো কন্যে, বিয়ের জল গায়ে না লাগতেই যে 'বিয়ে বিয়ে' ভাব।

পুতুল নিজেও বুঝতে পারে পরিবর্তন। কোন গোপন স্পর্শমণির প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীই বদলে গেছে। আকাশ সবুজ-নীল, পৃথিবী সোনালী-সবুজ।

উনিশ বছরের কুমারী মনের স্বপ্ন। বারবার তার মন ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় দিগ্বলয় রেখার সীমায়—আনন্দময় প্রতীক্ষায় কাঁপতে থাকে সে।

অসীম আশা ও অপরিসীম বিশ্বাস—অরূপ আনন্দ।

স্বল্পভাষিণী প্রতিমা একদিন বলে, সোনায় দেখি পড়েছে পালিশ।

—কৈ সোনায় পালিশ? অবাক হয় পুতুল।

—তোমার রং সোনার মত কি না? সেই সোনা রং আনন্দের পালিশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নিজের চেহারা সম্বন্ধে কোন ধারণাই একদিন ছিল না পুতুলের। এই প্রথম সে চকিত হয়ে তাকায় হাতের দিকে। সত্যই মিশে গেছে। মিশে গেছে হাতের রুলির সোনা-রংয়ে গায়ের সোনালী রং।

—ছেলেবেলায় কিন্তু সকলে আমাকে কালোই বলতো—অন্যমনস্কভাবে বলে পুতুল।

—তা হবেই তো। মরা সোনার মত মলিন ছিলে তুমি।

—এখন যৌবনের উত্তাপে গলে গলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি···পুতুল পরিহাস করে।

—হ্যাঁ এবং বিয়ের স্বপ্নের আনন্দে পালিশ লেগেছে। প্রতিমা একটু হাসে। ওর সেই নিজস্ব নিরানন্দ হাসি। পৃথিবীর সমস্ত হাসিকে বিদ্রূপ এবং তুচ্ছ করবার জন্যই যেন হাসে ও।

প্রতিমার সেই বিদ্রূপভরা হাসির সামনে নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হয়। অজানার প্রতি এই আকর্ষণ, স্বপ্ন দেখা সবই যেন মিছক পাগলামি। প্রতিমার তুলনায় পুতুল যেন একটি শিশু।

প্রতিমার বিদ্রূপে একটু চমকে উঠলেও স্বপ্নভঙ্গ হয় নি পুতুলের। বিয়ের স্বপ্ন—অপরিচিত একটি লোককে ঘিরে স্বপ্নের জাল বোনা—নূতনের স্বপ্ন। নূতন একটি লোক। নূতন একটি সংসার। নূতন এক জীবন।

সেই স্বপ্নের মাধুর্যে বিরক্তি ও অপমানের রেশ বাজলো বিয়ের পিঁড়েতে বসে। ঘোমটার আড়ালে চোখ দু'টি একটু সরাতেই চোখ পড়ে একটা থালায়—চকচকে রূপোর টাকা। ও কি? ওর অবাক মন কারণ খোঁজে? তবে কি এর পণ নিচ্ছে? কৈ! কেউ তো বলে নি সে কথা।

বিয়ের মন্ত্রে নয় নগদ মূল্যে প্রবেশপত্র কিনে তবে তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে এদের সংসারে। এত ছোট সে। রূপের বস্তা পাশে রাখলে তবেই তার তুলাদণ্ড এদের সমান হবে। অপমান! উনিশ বছরের অনভিজ্ঞা আত্মসম্মানজ্ঞানপূর্ণা নারী চমকে জেগে ওঠে।

বিয়ের মন্ত্র কানে যায় না। আরও অনেকক্ষণ পরে মূর্ছিত মন একটু চেতনা পায়।

—টাকাগুলি দেখছি সবই রূপোর! আস্তে আস্তে বললেও কথাটা কানে এসে আঘাত করে। বক্তার মুখ দেখতে পায় না পুতুল। কিন্তু বুঝতে পারে তিনি কে। কণ্ঠের সতর্কভঙ্গী চিনিয়ে দেয় মানুষটিকে।

—হ্যাঁ। তাই দিলাম। পুতুলের জ্যাঠামশায়ের গলা। দেখতে ভাল দেখায়।

—দেখতে তো ভাল দেখায় বেইমশাই, কিন্তু দেখে নিতে যে কষ্ট, মিষ্ট হাসি হেসে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন তিনি।

চন্দনচর্চিত মুখ, ওড়নার আবরণে আবৃতা পুতুলের মনে শুধু একটি কথাই বাজতে থাকে, টাকাটা দেখে নেবার জন্য এদের যত ব্যগ্রতা—কই একবারও তো তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলছে না। বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই তার সম্বন্ধে। পুতুল নামধারী একটি জীবকে বিয়ে করে ঘরে নিচ্ছে ওরা—পুতুল না হয়ে বুঁচি কিংবা কাজরী হলেও কোন আপত্তি ছিল না। দেখছি পুতুলকে এরা চেনে না, চিনতেও চায় না।

প্রথম যৌবনার অভিমানী মনে আঘাত লাগে। কেন এরা তাকে ছোট করে দেখল? কেন? সে তো ছোট নয়। সে একটি আত্মসম্মানে জ্ঞানসম্পন্না, শিক্ষিতা তরুণী। প্রকৃতির আশীর্বাদে, পৃথিবীর যত্নে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। কেন তাকে ছোট করলো এরা? তবে কি এরা নিজেরাই নীচ?

নীচ? শরীর কেঁপে ওঠে পুতুলের। নীচ? এত নীচ! মানুষের চেয়ে বেশি মূল্য দেয় অর্থের। এদের সংসারে ঘোমটা টেনে বৌ হয়ে থাকতে হবে তাকে। এই নীচ-লোকদের শ্রদ্ধাভক্তি দেখাতে হবে!

ভয়ে কুঁকড়ে সরে বসতে চায় সে।

মুখ তুলে স্পষ্টভাবে চোখে চোখ রেখে তাকাতে ইচ্ছে হয় ওর।

—কথা বলছ না কেন? রমণীর এই একান্ত নীরবতায় একটু থমকে যায় ভূপেন।

—কথা একসঙ্গেই সব বলবো। দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে বলে পুতুল।

আবার খানিকটা কালো ভারী সময়। পুতুলের মনটাও কালো হয়ে উঠেছে। কিছুই ভাবছে না সে। ভাবতে পারছে না। মনটা একটুকরো কালো পাথর।

ঝন্…পাথরের টুকরোতে ধাতুময় স্পর্শ। কালো গরম শীর্ণ একটি হাত। গলার একান্তে এগিয়ে এসেছে। ব্লাউজের বোতাম খুলবার চেষ্টা।

—এ কি? তীরের মত উঠে দাঁড়ায় পুতুল। ঘোমটা খুলে পড়ে মাথা থেকে।

তখনই মুক্তি পায় সে।

ওর জ্বালাভরা চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে থমকে যায় ভূপেন। হাত দু'টি গুটিয়ে বিহ্বলচোখে বলে, কি…কি…

ভূপেনের সেই স্খলিত কণ্ঠ কুণ্ঠিত করুণ ভঙ্গী আজও মনে আছে পুতুলের। হাতটা কুঁকড়ে বিছানায় উবু হয়ে বসেছিল সে। ক্লেদাক্ত কামনাময় দু'টি চোখ।

এতক্ষণে ভূপেনের চোখে চোখে তাকিয়েছিল। আকাশ আর মাটির সীমানায় নয়, নগ্ন কঠিন পৃথিবীতে একটা ডাস্টবিনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। চাকার মত ঘুরছে ডাস্টবিনটা।

দৃপ্ত উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে পুতুল। একটু পরে মুখ ফিরিয়ে ভূপেন বলে, জামা-কাপড় খুলে রাখ। ভাঁজ ভেঙ্গে যাবে।

—জামার ভাঁজ নষ্ট হবে, গয়না ভেঙ্গে যাবে—আর আমি… কিছুই হবে না আমার। কিছু না। সবই সহ্য করে যাব আমি। দেখব কি আছে এর শেষে। যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম—তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার—

—বিয়ের অর্থ কি? ভূপেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সে। এই তার প্রথম স্বামী সম্ভাষণ।

—বিয়ের অর্থ স্বামীর পাশে শোওয়া। রূঢ় তিক্তকণ্ঠে ভূপেন বলে। বোধ হয় পুতুলের ব্যবহারে ক্রমাগতই বিরক্ত হচ্ছিল সে।

—তুমি বুড়ো মেয়ে, বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছ। তুমি জান না বিয়ের অর্থ কি? যোগ করে সে।

—বি-এ-র পাঠ্যপুস্তক বিবাহের রূপ সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা করায়। উত্তর দেয় পুতুল।

—বিবাহের রূপ সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করায়। ভেংচে ওঠে ভূপেন। যত সব কলেজে-পড়া ন্যাকামী।

—কলেজে পড়া ন্যাকা মেয়ে বিয়ে করেছিলে কেন?

—সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে চাই না।

—কৈফিয়ৎ! আমার কথার উত্তর দেওয়া মানে কৈফিয়ৎ। তুমি কি ভাব আমাকে?

—দেখ; বিরক্তভীষণ কণ্ঠে ভূপেন বলে, রাতদুপুরে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহের রূপ, নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে পারব না। আমি সোজা কথা ভালবাসি।

সোজা কথাই ভালবেসেছিল বটে ভূপেন। জীবন সম্বন্ধে সহজ-দর্শন। কিন্তু কি রূপ ছিল তার সেই সহজ দর্শনের? কি রূপ…

—দিদিমণি, আজ আপনার দেরী হয়ে গেছে। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছাত্রী। ঝকঝকে হাসি হেসে হাত ধরে পুতুলের। কচি মুখ। নতুন ফোটা একটি ফুল।

—কত দেরী হয়েছে? পুতুলের চোখে নকল ব্যস্ততা ও গাম্ভীর্য।

—এই, একটু। তর্জনী তুলে ধরে বুড়ো আঙুলে অগ্রভাগটুকু দেখিয়ে দেয়। কোঁকড়া চুলগুলি দুলে সামনে এসে পড়ে। মুখ নীচু করে ছাত্রীকে চুমু খায় পুতুল। চিন্তার একটু ছাপও পড়ে না সে চুম্বনে।

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে মা বলেন, তাহলে একটা ব্যবস্থা কর।

—তোমরা যত ঝামেলা বাধাবে। রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দেয় ভূপেন। চুমুকের সঙ্গেও বেজে ওঠে বিরক্তি।

—যা হবার হয়ে গেছে। বিছানার উপর বসেন মা।

—শিক্ষিতা বৌয়ের সখ। তখনই বারবার মানা করেছিলুম। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে ভূপেন।

—তোমার বাবার কাণ্ড। বললেন, পণ তো ওরা এক হাজারের বেশি দিল না। যা হোক, বি-এ পাশ মেয়ে। চাকুরী করেই তুলে দেবে।

—দিচ্ছে। বিরক্ত বিরস ভ্রূভঙ্গী করে ভূপেন।

—আবার বাহাদুরী কত। মা বলতে থাকেন, আমাকে বলছেন, দেখছ। কেমন বৌ আনলাম। বি-এ পাশ নগদ এক হাজার।

—টিকলো কই? বিদ্রূপ ঝলকে ওঠে ভূপেনের স্বরে।

—টিকলো না সে নাকি তোর দোষ। একটু দ্বিধা করে স্বামীর অভিমতটা জানিয়ে দেন ছেলেকে। তুই ভাল ব্যবহার করিস নি……

ভূপেন হঠাৎ চুপ করে যায়। চায়ে চুমুক দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কি বলেছিল সেই মেয়েটি! বিয়ের রাতে….

—দু'দিন পরে হলে দোষ পড়তো আমার ওপর, ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন মা, বলতো, শাশুড়ির ব্যবহারে পালিয়ে গেছে। তা এ নিতান্তই বিয়ের পরদিনই চলে গেল কাজেই……

মায়ের কথাগুলি ভূপেনের কানে ঢোকে মনে সাড়া জাগায় না। আজের সকালটা সরে যাচ্ছে, সরে সরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটা রাত্রির বুকে। কত রাত! বারোটা বেজে গেছে। প্রতীক্ষা করে বসে আছে ভূপেন। বিছানার চারিদিকে ফুল ছড়ানো। কেটে গেছে দু'দিনের প্রাণান্তকর বিরক্তিকর অনুষ্ঠান। এখন শুধু ক্লান্তির অবসাদ, প্রতীক্ষার উত্তেজনা।

এত দেরীতে ঢুকে আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মেয়েটা। কি অদ্ভুত বিরক্তিকর, তবু বিরক্তি দমন করে অবস্থা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু রাত্রি দুপুরে বিশেষভাবে ফুলশয্যার রাতে যদি কেউ প্রশ্ন করে—বিবাহ অর্থ কি। তবে কতক্ষণ লাগে ধৈর্যচ্যুতি হতে?

রাগে জ্বলে উঠে বিশ্রী ইঙ্গিতে সে বলছিল, বিবাহ অর্থ স্বামীর পাশে শোওয়া। এ ভাবে নতুন চেনা একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু কি করবে সে। তখন ধৈর্য রাখাই কঠিন হয়ে উঠেছিল।

আশ্চর্য হল তার কথা শুনে পুতুলের মুখে কোন ভাবান্তর না দেখে। কোন চিহ্ন ফুটে ওঠে নি সেখানে। না লজ্জা না বিরক্তি। যেন নিতান্তই একটা সাধারণ কথা বলেছে ভূপেন।

পিতার নিকটে বারবার শিক্ষিতা মেয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিল ভূপেন। নিজে নয় মায়ের দৌত্যে। পিতা স্বাভাবিক ভাবে ভেবে নিয়েছিলেন এটা মায়েরই আপত্তি। নইলে, আধুনিক শিক্ষিত ছেলে কি শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করতে আপত্তি করতে পারে! সরাসরি নিজে জানালে হয় তো ভূপেনের বাবা বুঝতেন না। মায়ের মুখে শুনে তিনি এই অভিমত গ্রাহ্যই করেন নি।

সত্যই, ভূপেনের শিক্ষিতা মেয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু বাইরের দিক থেকে যে কটি আপত্তির কারণ ও দেখিয়েছিল, সমস্তই কাটিয়ে দিয়েছিলেন ওর বাবা।

—আমাদের ঘরে শিক্ষিতা মেয়ে মানায় না। বলেছিল ভূপেন। এ অবশ্য মায়ের মারফতে।

পরদিন মা উত্তর নিয়ে এলেন, কেন?

—কেন? বুধবারে জবাব দিল ভূপেন, শিক্ষিত মেয়ে কোনো না হাতী পোষা।

উত্তর এল বৃহস্পতিবারে, আজকাল সব মেয়েরাই লেখাপড়া হয়ে উঠেছে। বরং অল্প শিক্ষিতরাই বেশি। তারা জানে না কোথায় কি লাগাতে হয়, কাজেই সব কিছুই সব জায়গায় লাগায়।

—শিক্ষিতা বৌয়ের কি প্রয়োজন আমাদের মত সাধারণ ঘরে? অনেক ভেবে শনিবার সকালে বললো ভূপেন।

বিকেলেই মা বললেন, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরেই তো শিক্ষিতা মেয়ে দরকার! দু'জনে চাকুরী করতে পারবে।

একটু থেমে মা নিজস্ব ভঙ্গীতে ফুটনোট দেন এবং এটিই হল তোমার বাবার আসল কথা।

সত্যই তাই। পাশের বাড়ির হরিহরবাবুর শিক্ষিতা বধূ চাকুরী সংসার একসঙ্গে করছে—সংসারে কোন ঝামেলা নেই—এই সমস্ত দেখে ভূপেনের বাবা এক রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যে করেই হোক শিক্ষিতা বধূ আনবেন।

ভূপেন আর আপত্তি করতে সাহস পায় না। এরপরই হয় তো তিনি বলে বসবেন, তাহলে তুমিই দেখে বিয়ে করো। তা করা অসম্ভব ভূপেনের পক্ষে।

শুধু একবার একটু মন্তব্য করেছিল—তা হাল্কা বিদ্রূপ—পুতুলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর বলেছিল, উনিশ বলছে—প্রকৃত বয়স দেখ গে ছাব্বিশ।

এবারে উত্তর আসে, গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলেছেন, তা দেখবার ভার তিনিই নিচ্ছেন।

এই গাম্ভীর্যের পর আর কোন কথা বলে নি ভূপেন। শৈশব থেকেই পিতাকে ভয় করতো সে। তখন দূর থেকে পিতাকে দেখে পালিয়ে যেত। বড় হয়ে এই পলায়ন মনোবৃত্তিকে সমীহ আখ্যা দিলেও মনটা ঠিক একই রকম ভীরুই আছে।

শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করতে আপত্তির প্রকৃত কারণ বলা সম্ভবপর ছিল না ভূপেনের পক্ষে। সে আপত্তির কোন দৃঢ়মূল নেই, শাখা প্রশাখাও নেই। আবছা-আবছা ভেসে থাকা সবুজ মস্ শ্যাওলার।

ছেলেবেলাতেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ভূপেন এবং একই স্কুল থেকেই পাশ করেছিল প্রবেশিকা। কাজেই একটা দল গড়ে উঠেছিল ওদের। কলেজেও দুই-একটি বাদ দিয়ে মোটামুটি সেই দল।

এই দলের নায়ক ছিলো উত্তম সরকার। উত্তমের দু' একজন সহকারী এবং তার অবর্তমানে উপনায়কত্ব করবার মত দু' একটি ছেলে থাকলেও উত্তমই অবিসংবাদিতভাবে নায়ক। বালক ও বালিকার প্রভেদ প্রথমে সেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, বয়ঃসন্ধিকালে দেহের ক্রমপরিবর্তন ব্যাখ্যা করেছে।

সেই উত্তমই একদিন বলে, এই যে মেয়েগুলি দেখছিস সবগুলি এক একটা ইয়ে... রোয়াকে বসেছিল ওরা। সামনে দিয়ে একটা স্কুলবাস দ্রুত চলে যায়। অনেকগুলি বিনুনী, আধা-বিনুনী আর খোলা চুল।

—বাঃ! সব মেয়ে কি আর 'ইয়ে' হতে পারে? প্রতিবাদ করে একজন।

ওদের সঙ্গেই আর একটি ছেলে বসেছিল। ঠিক ওদের দলের নয় নতুন বন্ধু। সে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা 'ইয়ে' মানে কি?

দলের সবাই উত্তমের দিকে তাকায়। শব্দটি তারই নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত।
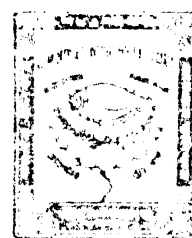
—'ইয়ে' মানে এই তোমরা যাকে প্রেম-ট্রেম বল তেমনি ভাব! উত্তর দেয় উত্তম।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তবে সব শ্রেণীর, সব বয়সের মেয়েদের নয়।

—কি রকম।

—যখন মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, যখন তাদের চোখের তারাগুলি কাল কাল এবং হাঁটবার ভঙ্গী থপথপ হয়ে উঠেছে, সেই বয়সের লেখাপড়া জানা মেয়েদের প্রেমের ভঙ্গীগুলিকে 'ইয়ে' বলি আমি।

—তুমি বলতে চাও সব স্কুল-কলেজে পড়া মেয়েরাই প্রেম করে। একটু আগে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সে আবার বলে।

—আমি বলতে চাই সুবিধে পেলেই মেয়েরা প্রেম করে। স্কুল-কলেজে পড়তে গিয়ে সেই সুবিধেটা পায় ওরা।

—কি রকম?

—প্রথমত বাইরের পৃথিবীতে পা দিতে পারে, কপালে জুটলে সেখানেও দু'চারটি লোক জুটে যাবে, দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিতে শাণ পড়ে, অনেক রকম চালাকি শেখে ওরা। তৃতীয়ত···

—থাক্। যারা মেয়েদের সাবধানে রাখে তাদের বাড়ির মেয়েরাও কি এমনি? যারা গাড়িতে স্কুলে যায়··· সেই ছেলেটিই আবার বলে।

উত্তমের হাসির তোড়ে কথা শেষ করতে পারে না ছেলেটি।

—শোন, হাসির দমক একটু থামিয়ে আবার বলে সে, আমাদের পাড়ার মায়াকে চিনিস্।

চেনে না কেউ। শুধু জানে, মায়ার সৌন্দর্যের খ্যাতিকে।

—মায়ার বাবা কি রকম গোঁড়া তা তো জানিস্। মেয়েকে পর্দা ঢাকা গাড়িতে স্কুলে পাঠান। বাড়িতে দারোয়ান। সেই মেয়ের কীর্তি শোন।

উত্তম ও মায়াদের বাড়ি একটিই—পার্টিশন করা। কাজেই সিঁড়ি ভিন্ন, তবে একই ছাদ। উত্তম বলে, সেদিন সন্ধ্যার একটু পরে আমি ছাদের সিঁড়ির ঘরটার কোণে বসেছিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া। নিজেদের দিকটায় না বসে মায়াদের দিকে বসেছি, হঠাৎ পায়ের শব্দ আর গলার আওয়াজ। অনেকটা মায়ার গলার মত মনে হল—আমি চমকে আর একটু কোণের দিকে সরে বসলাম। দেখি, সত্যি সত্যিই মায়া আর একটি লোক।

আকাশ অন্ধকার। তারার মিটমিটে আলোতেও আমি লোকটিকে চিনতে পারলাম। মায়ার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু। বহুদিন তাঁকে ঐ গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেছি।

কি করছে ওরা? গোটা ছাদটা ছেড়ে সিঁড়ি-ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে আসছে কেন? অন্ধকার কোণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। কৌতূহলে প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কি করছে ওরা। যা ভাবতেও পারি না তাই!··

এক মিনিট পরই মায়ার গলা শুনতে পেলাম, নাও এবারে ঘুড়িটা পাড়।

—কি দিয়ে পাড়ব?

—এই যে আঁকশী এনে রেখেছি।

—বা বাঃ! ধন্য তুমি।

—হ্যাঁ। দুপুরবেলা অনেকক্ষণ ভাবলুম। তারপরেই মাথায় বুদ্ধিটা এল। কত কষ্টে ঘুড়িটা আটকে রেখেছি।

লোকটা ঘুড়িটা পাড়তে চেষ্টা করতে থাকে।

—কি রকম গম্ভীর মুখে বললাম, কাকাবাবু, ঘুড়িটা পেড়ে দেবেন চলুন? বাবা-মা আর কথাটি কইতে পারলো না। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়েটি।

—পরশু তো আসছি, লোকটার গলা শোনা যায়, সেদিন কি হবে?

—পরশু দুপুরবেলা এসো। মায়ের সামনে আমি বলবো, কাকাবাবু, ছবিগুলি একটু দেখে দিন, তুমি চলে আসবে আমার ঘরে। মা তো তখনই ঘুমিয়ে কাদা। কাজেই ··

—বা বাঃ! কত বুদ্ধিই না আসে তোমার মাথায়।

দু'জনে হাসতে হাসতে নেমে যায়। উত্তম বলতে থাকে, আর হাসবেই বা না কেন? বাপ অত সাবধান, স্কুলের গাড়িতে মেয়েকে যেতে দেয় না, নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে ঘর থেকে বেরুতে দেয় না, সিনেমা দেখার অনুমতি নেই, সেই মেয়ে যদি বাপকে কলা দেখিয়ে এমন ধারা কাণ্ড করে তবে হাসবে না তো কি?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে ওরা। তারপরে উত্তমই আবার বলে, এই তো অবস্থা।

এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর কথা, দ্বিতীয় তৃতীয় বার্ষিকে ঐ একই দল, একই কথা, একই উপসংহার।

—এই জন্যই তো শাস্ত্রকাররা নারীকে নরকের দ্বার বলেছে। একদিন সমাপ্তি টানে উত্তম।

—তা হলে কোন মেয়েকেই বিয়ে করা চলে না, ভূপেন উত্তর দেয়।

—না, না, অশিক্ষিতারা ভাল। বিশেষত গ্রামের মেয়েরা, ওদের মনে ভয় আছে'।···

—কিসের ভয়! বাধা দেয় একজন!

—ধর্মের ভয়, পাপের ভয়। আমাদের কলকাতার মেয়েদের মত ভগবান নেই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না ওরা। তা ছাড়া, গ্রাম্য মেয়েদের মাথায় এত বুদ্ধিও নেই। ঐ দেখ, দিনে দুপুরে কি রকম প্রেম করছে। বলিহারী বাবা। পথের মাঝেই প্রেম। মাঝে মাঝেই পথ চলতি কালে উত্তম চেঁচিয়ে উঠতো।

তাকিয়ে দেখতো সঙ্গীরা। পাশাপাশি হয় তো দু'টি যুবক-যুবতী গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে; কিংবা বাস-স্টপেজের পাশেই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা কিছুই নয়। প্রতীক্ষা করছে—বাসের রোদ্র লেগেছে। দূরে সরে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু উত্তম অনেক অর্থ বের করতো। তার মতে, যুবক-যুবতী পরস্পরের সঙ্গে প্রেমের কথা ভিন্ন আর কি বলবে।

—আর বুড়-বুড়িরা!

—তারা তবু সন্তানের মঙ্গল, দুনিয়ার চর্চা নিয়ে কথা বলতে পারে। আমাদের মত ছেলেরা প্রেম ভিন্ন কি নিয়ে কথা বলবে।

কি জানি কি কারণে উত্তমের এই মতবাদ গড়ে উঠেছিল। হয় তো, আসলে এটা ওর শুধু মুখেরই মত। মনের কোন সায় ছিল না এতে। কিন্তু ওর মনে যতটুকু সাড়া না জাগাক ওর অনুগত

দলীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে। বিশেষত ভূপেনের। ন্যাবা রোগীর মত সবই হলদে দেখতে থাকে সে।

তাই ভূপেন যখন শুনলো গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে তার, খুশি হল সে। কিছুদিন পরেই জানতে পারলো সেটা গ্রাম নয় আধা সহর—মেয়ে কলেজে পড়া। মৃদু বিরক্তি ও আপত্তি সত্ত্বেও চুপ করে রইল সে। কিন্তু সর্বশেষ খবরটি তার মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

কিন্তু, তখন আর ফেরবার উপায় ছিল না। তাই ভূপেন শুধু মনে মনে গজরাতে থাকে, শেষটা বাবা এই করলেন। শেষটা বাবা এই করলেন!

মাকে একবার না বলে পারে না। রাত্রে মা বাবাকে বলেন, তোমার ছেলে বলছিল···

—কি? ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দেন বাবা।

—বলছিল, মেয়ে নাকি কি এক কলেজে পড়ে—কি···

—নতুন ধরণের?

—হ্যাঁ, কি কো···কোড কি বললো!

—কো-এডুকেশন।

—হ্যাঁ। তাই। সেটা কি গো?

—কো-এডুকেশন মানে সহশিক্ষা। তা তাতে কি হয়েছে!

—ঐ কলেজগুলি না কি ভাল নয়···

—তোমার ছেলেকে এ সমস্ত নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কাজ করতে বলো। চটে ওঠেন বাবা।

—কি এরা? একটু পরে আবার বলেন, এরা কি এ যুগের। না একশ' বছর আগের লোক?

—একশ' বছর আগের ভাবই তো আসছে, উত্তর দেন মা, দেখ না মেয়েদের গয়নার স্টাইলে।

—মেয়েদের গয়নায় আসবে বলে, ছেলেদের মনেও আসবে, ওর মনটা একটু পরিষ্কার রাখতে বলো বুঝলে—তা হলেই জীবনে শান্তি পাবে।

মাতার মুখ থেকে পিতার উপদেশ শুনে কোন কাজ হয় না। বিকল মন তার নিজস্ব ভাবনা ভাবতে থাকে, বরঞ্চ সে ভাবে, আমার মন খুব পরিষ্কার আছে বলেই এত অনাসক্তভাবে বিচার করতে পারছি মেয়েদের। মোহে নয়, ভাবে নয়, বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হই আমরা।

ভূপেনের বাবার গ্রামে বাড়ি ছিল! চাকুরী উপলক্ষে কলকাতায় আসেন। চাকুরীর মেয়াদ শেষ হতেই দেশের দিকে মন পড়লো এবং এই সঙ্গে ছেলের বিয়ে স্থির হয়ে যাওয়াতে সুবিধেই হল। বাড়ি সারিয়ে নেবার জন্য মাত্র এক হাজার টাকা পণ দাবী করলেন পুতুলের মায়ের কাছে।

দাবী করলেন, দাবী মিটলো, বাজনা লোকজন, বিয়ে···

—তুমি তো শেষ রেখা টেনে দিলে কিন্তু শেষ কি হলো? হঠাৎ বলে ওঠে ভূপেন।

মা টুকিটাকি গোছাচ্ছিলেন। অবাক হয়ে বলেন, কি বলছিস রে?

—না। এই বাবার কথা। তাঁর খেয়াল হল, কোথাকার এক আপদ এনে কাটালেন। এখন ভোগ তুমি। তাঁর আর কি!

—ও কথা বলো না বাবা। মা প্রতিবাদ করেন, তোমার বাবার উঁচু মাথা হেঁট হয় নি। অপমান তো তাঁরই। তিনি কি এ রকম হবে ভেবেছিলেন?

—সাত তাড়াতাড়ি করতে গেলে এমনিই হয়। দেখেশুনে নিতে হয়। শুষ্ক বিদ্রূপ বিমানের ঠোঁটে।

—দেখতে শুনতে তো ভালই ছিল। উত্তর দেন মা। তাঁর চোখে হাল্কা বিষাদ। কিন্তু কি যে হল···

কি যে হল···কি···রৌদ্রের আলো ফিকে হয়ে আসছে। আর সরে যাচ্ছে অনেক অনেক দূরে···কালো রাতের অন্ধকার · একটি ছোট আলো আর একটি মেয়ে···বিয়ের অর্থ কি?

পা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল ভূপেনের। ফুলের মালা পরে ফুলশয্যার রাতে প্রশ্ন করছে, বিয়ের অর্থ কি।

বিবাহের অর্থ জানিয়ে দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। যখন ওর রূঢ় উত্তরে, অশ্লীল ইঙ্গিতে পুতুলের মুখে কোন ভাব ফুটলো না, তখনই মনটা স্থির হয়ে গেল। অনেকক্ষণ স্থির হয়েছিল মন। কঠিন এক টুকরো পাথর।

ইচ্ছে হচ্ছিল, এক মুহূর্ত লাফিয়ে উঠে গিয়ে পুতুলকে চেপে ধরে দু'হাতে। আদিম মন আর পশুর হিংস্রতা নিয়ে দু'হাতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে মেয়েটির সভ্যতার আবরণ। কামনার ক্লেদাক্ত আঘাতে বুঝিয়ে দেয় ধীরে ধীরে···

কিন্তু কিছুই করতে পারে নি সে। নিজের মনের চারপাশেই সভ্যতার পলেস্তরা। তা থেকে উদ্ধার পাওয়া কি এতই সহজ! নিজের মনের চারি পাশের সঙ্কোচের আবরণই ছিঁড়তে পারে নি ভূপেন।

বিরক্তি, দ্বিধা ও সঙ্কোচভরা মন নিয়ে সে দেখছিল মেয়েটি ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল। সমস্ত দেহে এক অসহ জ্বালা। দেহ পুড়েঝুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু, একটা সবিরাম উত্তপ্ত যন্ত্রণা। আর মাঝে মাঝে তীব্রযন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠছে মন।

তবু চুপ করে রইল সে। দাঁতে দাঁত চেপে অসহ যন্ত্রণায় দেহ মনকে একত্রীভূত করে···যেন গোলাকার একটি পিণ্ড। সৃষ্টির মুখে যেভাবে ঘুরতে ঘুরতে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে এসেছিল পৃথিবী।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। জেগে উঠে দেখল ঘরে কেউ নেই।

ঘরে কেউ নেই। নেই নেই কোথাও। শূন্যতা আর বিরক্তি। গলা শুকিয়ে গেছে। শুকনো কতগুলি কাগজ চিবিয়ে ফেলেছে··· নিশ্বাস জমে জমে গলায় দলা পাকিয়ে গেছে—কেউ কোথাও নেই··· অতৃপ্ত নিদ্রা আর বিরক্তি-বিরস মনে চারিদিকে তাকায় ভূপেন··· তবে সেই স্বপ্নটা···সেই স্বপ্নটা·····

[ক্রমশ।

মধুসূদনের প্রহসন

নমিতা সেন

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে চৈত্র পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক বক্তৃতায় বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে মধুসূদন সম্পর্কে বলেছিলেন—

'তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য; তাঁহার ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহ মধ্যে মহামান্য হয়'—

মধুসূদনের প্রহসন সম্পর্কে এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার পর মধুসূদন পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে ১৮৬০ সালে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুটি রচনা করেন। অলীক কুনাট্যে রাঢ় বঙ্গের আপামর দর্শকের তুষ্টি মধুসূদনের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। তাই বিদেশী ভাব ও শৈলীর আমদানি করে তিনি নতুন পথ দেখাবার দুঃসাহস নিয়ে 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করেছিলেন এবং বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে 'শর্মিষ্ঠার' অভিনয় সাফল্য তাঁকে খুবই উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু প্রহসনের ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের সাড়া জাগে নি ততটা। প্রাচীনপন্থী এবং 'ইয়ং বেঙ্গলের' ব্যঙ্গচিত্র সকালের সমাজ সহ্য করে নি। পাইকপাড়ার রাজারা তাই অভিনয় বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং মধুসূদন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়েছিলেন—

'Mind you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese!'

—মধুসূদনের বিরুদ্ধে সমকালের এই বিদ্রোহ সত্ত্বেও বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে সর্বাগ্রে তাঁরই নাম করতে হয়।

শুধু তাই নয়, পরবর্তীদের ওপর প্রভাবের দিক থেকেও মধুসূদনের প্রহসনগুলির মূল্য কম নয়। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়েরই অতি বিস্তৃত সংস্করণ। 'বঙ্গ ভাষার লেখক' গ্রন্থে অক্ষয় সরকারের লেখা 'পিতা পুত্র' অধ্যায়ে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করেই দীনবন্ধুর ওপর মধুসূদনের প্রভাবের কথা বলেছেন। আবার মধুসূদনের নবকুমার যে দীনবন্ধুর নিমচাঁদের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং মধুসূদনই স্বয়ং যে নিমচাঁদের উৎস, সে কথাও জানিয়েছেন। মধুসূদনকে না দেখলে বা তাঁর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে নিমচাঁদ সৃষ্টি বোধ হয় দীনবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হত না। আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র' সঙ্গে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র যে বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, দীনবন্ধুর প্রহসনের বিস্তৃতি মধুসূদনে না থাকলেও রসাস্বাদনে কোন বিঘ্ন ঘটে নি। বরং মনে হয় যে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি যে দক্ষতার সঙ্গে ব্যঙ্গরস পরিবেশন করে গেছেন এবং চরিত্রগুলিকে যে রকম নিখুঁত রূপ দিতে পেরেছিলেন, রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র যুগে তা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রাচীন হিন্দু সমাজকে কটাক্ষ করে লেখা হয়। মধুসূদন এর প্রাথমিক নামকরণ করেছিলেন 'ভগ্ন শিব মন্দির'। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই প্রহসনটির বক্তব্য হচ্ছে—

'বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিল কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম ফললো ধর্ম,
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।'

ধর্মের নামাবলী গায়ে, হিন্দুয়ানির বুলি মুখে এই সব প্রবীণের দল যে কি রকম আচারপরায়ণ এবং তাঁরা যে কি পরিমাণে নীতি নিয়মের বশীভূত ছিলেন তারই সার্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই প্রহসনের ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের মধ্যে।

ভক্তপ্রসাদবাবু গোঁড়া হিন্দু—তিনি সব সময় হরিনাম জপে ব্যস্ত। হিন্দুয়ানি রক্ষার জন্য জাত-বিচারেও তাঁর নীতি বড় কঠোর। কিন্তু যেসব অস্পৃশ্য জাতির সঙ্গে পংক্তিভোজের কথা ভক্তপ্রসাদবাবু চিন্তা করতে পারেন না, তাদেরই সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কোন দ্বিধা বা আপত্তি নেই!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান!—যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদাধর। মহাশয়, মুসলমান হলো ত' বয়ে গেল কি? আপনি

আমাকে কতবার বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্তোন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হ্যা স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে—বড় সুন্দরী বটে অ্যাঁ?

শুধু ধর্মবিসর্জনই নয়, ভক্তপ্রসাদের মত কৃপণ এসব সুন্দরীদের আহরণ কাজে তাঁর বহুপরিশ্রমলব্ধ সঞ্চয়ের বেশ কিছুটা ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নন। তবে মাতৃদায়গ্রস্ত বাচস্পতির ক্ষেত্রে অন্যত্র যাবার উপদেশ দেওয়া ছাড়া ভক্তপ্রসাদবাবু আর কোন উপায় দেখতে পেলেন না। তার পরমুহূর্তে হরিনাম জপের মালা হাতে ভক্তপ্রসাদবাবু ভট্টাচায্যিদের মেয়ে ইচ্ছে আর পীতাম্বর তেলীর মেয়ে পঞ্চীর রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত হানিফের বিবি ফতেমার সাক্ষাৎলাভের জন্য ভাঙ্গা শিবমন্দির নির্দিষ্ট হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এতে ভক্তপ্রসাদবাবুর ধর্মবোধ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ ভগ্ন শিবের তো আর শিবত্ব নেই। তার উপর আবার স্বর্গের অপ্সরীর জন্য তিনি একটা হিন্দুয়ানি যদি ত্যাগই না করতে পারলেন, তো তাঁর জীবনই বৃথা। তাই আতর সহযোগে বিশেষ সাজসজ্জা করে তিনি এসেছেন ফতেমা বিবির পাণিগ্রহণ করতে। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত বাচস্পতি ও হানিফের কল্যাণে কর্তাবাবুর 'কিলের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে গোয়ের মেয়ে' হবার অবস্থা হল। তখন ভগবানের চরণে ভক্তপ্রসাদবাবু প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁর আর এ-কুকর্মে কখনও যেন মতি না হয়। কিন্তু এই সব ধর্মধ্বজাবৃত প্রবীণের শোধন কি সম্ভব?—তবু এদেরই কাছে অধর্ম অর্থ কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানে ঘৃণা এবং খৃষ্টিয়ানী মত পোষণ করা—পরনারী সংসর্গ উপভোগ করা নয়।

এ তো গেল ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের একদিক। আবার নব্যশিক্ষিত ইংরাজি বুলির বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের ভ্রূকুটি কুটিল মনোভাবকেও মধুসূদন তাঁর দুটি চরিত্র আনন্দ আর ভক্তপ্রসাদের সংলাপের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন।

আনন্দ। জ্যেঠামহাশয়, এমন ক্লেবর ছোক্‌রা তো হিন্দু কলেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোক্‌রা বললে বাপু?

আনন্দ। আজ্ঞে, ক্লেবর অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ হাঁ, ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল বাপু আমাদের কানে ভাল লাগে না। জহীন কিম্বা চালাক বললে আমরা বুঝতে পারি।

'জহীন' কথাটার প্রয়োগ খুবই অভিনব সন্দেহ নেই। ভাঙনধরা প্রবীণ সমাজের বিরুদ্ধে এ সব মন্তব্য যে অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়েছিল, তা সে যুগের মধুসূদন বিরোধী আন্দোলন থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়।

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের নায়ক ভক্তপ্রসাদ ছাড়াও

হানিফ, বাচস্পতি, গদাধর, পুঁটি ইত্যাদি চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনা যায় না। নিম্নশ্রেণীর রুচি তাদের পরিহাস, কর্তাদের সম্বন্ধে তাদের মন্তব্য এবং কর্তার অনুপস্থিতিতে তাঁর আসনে বসে তামাকু সেবন এবং অন্য ভৃত্যের সাহায্যে কর্তার অনুকরণে গা ঢেলানো ইত্যাদি ব্যাপারের ভূমিকায় গদাধরের অভিনয় খুবই বাস্তব।

হানিফ-ফতেমার আচার আচরণ ও সংলাপের মধ্যে আবার মুসলমান সমাজের অতি নিখুঁত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধুর পদী ময়রাণীর সগোত্রীয়া পুঁটিও বেশ দ্রষ্টব্য। মধুসূদনের অভিজ্ঞতা যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট ছিল, তা উপলব্ধি করা দুরূহ নয়। বরং এদিক থেকে দীনবন্ধুর অসঙ্গতিই পীড়াদায়ক। তবে অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে দীনবন্ধু বা মধুসূদন কেউই রেহাই পান নি।

এই প্রহসনের বিপরীত প্রান্তের ছবি হচ্ছে 'একেই কি বলে সভ্যতা'—সেকালের ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক অধোগতির সার্থক রূপায়ণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই প্রহসনের বাস্তব ভিত্তির সমর্থনে জানিয়েছেন—

'ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্‌ঘোষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদিগের জ্ঞানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।'

—মধুসূদনই এই সমাজের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা—শুধু দ্রষ্টা মাত্রই নয় তার আদর্শ প্রতীকও। মনে হয়, এই প্রহসনে মধুসূদন যেন আত্মবিশ্লেষণে ব্যাপৃত। যে ইয়ং বেঙ্গলের সংস্কারে তিনি আবাল্য লালিত হয়েছিলেন, পরিণত বয়সে তারই অসঙ্গতি তাঁকে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয় সমাজকে সচেতন করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রশ্নচিহ্ন তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। নবকুমার ও কালীনাথ সেই নব যুবসমাজেরই প্রতিনিধি। এই সব আলোকপ্রাপ্তের দল দেশহিতকর কাজে লিপ্ত থাকেন। সেই উদ্দেশ্যে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার প্রতিষ্ঠা। কালীনাথের ভাষায়—

'আমাদের কলেজ থেকে কেবল ইংরেজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।'

শুধু ভাষা শিক্ষাই নয়—এদের উদ্দেশ্য যে আরও মহৎ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অন্যতম বক্তা নবকুমারের বক্তৃতা থেকেই তা উপলব্ধি করা যাবে—

'কিন্তু জেণ্টলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা। এই গৃহ কেবল আমাদের লিবারটি হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান, এখানে যার যে খুসী, সে তাই কর। জেণ্টলম্যেন! ইন্ দি নেম অব ফ্রীডম লেট্ অস্ এঞ্জয় আওরসেলভস্!'

আবার নারীপ্রগতি বিষয়ক এবং হিন্দুস্থানি পোষাকের শিকলি কেটে 'ফ্রি' হবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। এই সঙ্গে এদের ইংরাজি জ্ঞানের ভ্রান্ত আভিজাত্যকেও মধুসূদন নবকুমারের মধ্য দিয়েই হাস্যকর করে তুলেছেন :

নব। (তুচ্ছভাবে) হোয়াট? তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জান না, আমি তোমাকে এখনি শুট্ করবো?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লিং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন?

নব। ট্রাইফ্লিং?—ও আমাকে লাইয়র বললে, আবার ট্রাইফ্লিং? ও আমাকে বাংলা করে বললে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন শালা রাগতো? কিন্তু লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়?

ডিরোজিওর রেনেসাঁর বাহকস্বরূপ এই ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিভা সে যুগে কিভাবে মদ্যপান এবং নারী সংসর্গে অপব্যয়িত হয়েছিল, কালীনাথ ও নবকুমার তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু মধুসূদনের এইসব চরিত্র যেন সেক্সপীয়রের অনুবর্তী বেনজনসনের ব্যঙ্গ নাটকের মতই অতিরঞ্জিত ও একপেশে হয়ে পড়েছে। মানব চরিত্রের বিরাট রহস্য, তার দুর্জ্ঞেয়তা, তার দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রতি তিনি নাট্যকারের স্বভাবসিদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গী নিয়ে তাকাতে পারেন নি। এর ফলে, তাঁর ব্যঙ্গ-নাটক শুধু carricature-ই হয়েছে, উচ্চাঙ্গের প্রহসন হতে পারে নি। কারণ প্রহসন তো শুধু ব্যঙ্গের পাত্রকে সুতীব্র বিদ্রূপবাণে ক্ষতবিক্ষত করা নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে চরিত্রের অসঙ্গতির প্রতি আলোকপাত করা এবং সেই সঙ্গে অধঃপতিত চরিত্রের মধ্যে অনুশোচনার তীব্র দাহকে প্রকাশ করা। অবশ্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে চরিত্রের এই দ্বৈততার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। দীনবন্ধুর সধবার একাদশী'তে সে বিস্মৃতির অভাব হয় নি। তাই নিমে দত্ত এত জীবন্ত, এত বাস্তব—এবং তার ট্রাজিডি এত হৃদয়বিদারক। বলা বাহুল্য, বহুদর্শী মধুসূদনের এ ত্রুটি অক্ষমতাজনিত নয়। তাঁর বিরাট প্রতিভা শূন্যচারী ঈগল পাখির মত মুক্তির বিশাল আকাশে ডানা মেলতে পারে নি—খাঁচার সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

এইজন্য সধবার একাদশী'র নিমে দত্তর তুলনায় নবকুমার যেন নিতান্তই ম্লান। নবকুমার পানোন্মত্ত অবস্থায় কেবল ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখেছে—

'হিয়র হিয়র আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।'—

তার এই অধঃপতনে নিমে দত্তর মত আত্মপ্রবঞ্চনার মর্মান্তিক উপলব্ধি নেই। তাই নবকুমারের পতনকে—

Into what pit thou seest, from what height fallen বলে মনে করা যায় না।

তবু নবকুমার যে মধুসূদনের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি,—সে যে কোনরকম কষ্টকল্পনা বা অভিপ্রায়ের ফল নয়, তা সে যুগের দুই বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এবং দীনবন্ধুর মতবিরোধ থেকেও বুঝতে পারা যায়। নবকুমার সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র কৃত্রিমতার অভিযোগ এনেছিলেন। দীনবন্ধু সে মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে মধুসূদনের সংলাপ খুবই বাস্তব এবং স্বাভাবিক—এবং এ উক্তি-প্রত্যুক্তি রচনা করা যে সেকালে মধুসূদন ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না, সে কথাও স্বীকার না করে পারেন নি। এ কথা সত্যিই যে স্রষ্টার আবেগ আন্তরিক না হলে রচনা এতটা সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সেকালের সুবিখ্যাত সাহিত্য বিচারক বঙ্কিমের উক্তি স্মরণ করেই বলতে হয়—

'Is this civilization : Is the best [farce] in the language.

এই প্রহসন দু'টির হাস্যরস শুধু সে যুগেরই নয় বর্তমানকালের পাঠকের কাছেও বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী। কিন্তু লেখক নিজে বোধ হয় তাঁর এই লেখাগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ খুশি হতে পারেন নি। তাই ক্ষোভের সঙ্গে তিনি তাঁর একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—

'As a scribbler, I am ofcourse proud to think that you like my farces but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have farces.'

হয় তো সে যুগের তীব্র সমালোচনাই তাঁর এই অসন্তোষের হেতু ছিল। কিন্তু প্রহসনকারের এই সংশয় সত্ত্বেও বলতে হয় যে বাংলা প্রহসনের তিনিই ছিলেন যথার্থ প্রবর্তক।

শেষ যাত্রা

শ্রীলীলা ঘোষ

তব যাত্রা পথে বন্ধু ডাক যদি মোরে
চলে যাব আমি অধীর সমীরে
আজি বিশ্বতটে বন্ধু তব প্রতীক্ষায়
বসে আছি আমি সন্ধ্যা দীপ লয়ে।

একদা প্রভাতে কোন অতল তিমিরে
তব যাত্রা প্রিয় নিষ্ঠুর বাতাসে
উপহার শেষে মোর, তুমি লয়ে গেছ সাথে
দিয়াছি তব কণ্ঠে ফুলমালা, ঝরা ফুল হাতে।

আজি চরণ ফেলিয়াছ তুমি ঝরা পাতা পথে
দীর্ঘ পথযাত্রী বন্ধু তুমি
আজি শত শত পথিকের সাথে।
হেরি পূর্ণ ঘটখানি মোর গেল আজি ভেসে
মরণ জলধি তলে মোর পানে হেসে।

আজি মনতরী মোর ভেসে যায় অতীতের তীরে
বীণাখানি বেঁধেছিলাম নব দু'টি তারে
বরষার মাঝে কোন চন্দ্রিমা নিশীথে
কাছে এসেছিলে বন্ধু মোর মাধুর্য রভসে
তব পাশে ছিল প্রিয়া আলস্য বিলাসে
সে মহালগনে তব মধুর পরশে।

আজি লুপ্ত সেই দিনগুলি, কোথা গেল ভেসে
অজানা উদ্দেশ্যে কোন বনছায়া দেশে। যদি ডাক মোরে
যাব আমি চলে অন্তহীন সেই কোন অতল তিমিরে।

নীল চোখে বিস্ময়

কণা বসু

স্কট এসে দাঁড়াল উঁচু টিলাটার উপরে। জিয়াভরালীর স্রোতের তলায় কালো পাথরগুলো। শেওলা জমে গেছে তার গায়ে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জল। স্কটের ছায়াটা ভাসছে। দুলছে গরম পোষাকটা। তামাটে চেহারাটা। আর একটা পোড়া চুরুট। ম্যানেজারী মেজাজটা দূরে তাকিয়ে। ঘোলা চোখের দৃষ্টি। বৃদ্ধের চোখের ছানির মত। স্কট বৃদ্ধ নয়।

বরফগলা জল। জিয়াভরালী চলেছে। পাক খাচ্ছে জলের ঘূর্ণিতে কদাকার চেহারাগুলো। ওরা ভয়াবহ। কুৎসিত। স্কটের কপালের পেশী ফুলে উঠল। ও চীৎকার করল। নিকলাও নিকলাও তার ছায়া কাঁপল টিলার উপরে। ও পকেট থেকে রিভলভারটা বার করল। দু'টো আওয়াজ। খানিকটা মাটি ধ্বসে গেল। কিন্তু ছায়াটা তখন কাঁপছে টিলার গায়ে। স্কটের ছায়া।

ও দেখল, মতন নয়। লখুয়া নয়। কেউ নয়। তবে কি, ভুল। ও তো শুনতে পাচ্ছিল, কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। স্কট স্পষ্ট দেখেছিল •ঘূর্ণির মধ্যে তাদের। কাফ্রির মত কুলিগুলো তাকিয়েছিল। গোগ্রাসে। মরতে চলেছে। চোখে তবু আক্রোশ প্রতিহিংসার।

স্কট আর দাঁড়াল না। এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। দুর্নিবার আড়ষ্টতা ওকে চেপে ধরল। অনেকবার তাকাল। পেছনে। জিয়াভরালী হাসছে। মতন নেই। লখুয়া নেই। কেউ নেই।

খাড়া পথটা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের তলায়। এবড়ো-খেবড়ো পথটা। ভাঙা ভাঙা কাঁকরের লাল পথ। ও নামতে লাগল। চা বাগানের ম্যানেজার স্কট।

পুং—ছোট্ট প্রস্রবন। অনবরত জল উঠছে সেখান থেকে। বুদবুদ শব্দ হচ্ছে। ওরা জল খেতে আসে রাতে। স্কট নিরীক্ষণ করল গাছের উপরের মাচাটাকে। এটা ওর রাতের আস্থানা। ও ঘুমোয় না চাঁদনী রাতে। সাপার সেরে আসে। তার পর মাচাটায় উঠে বসে। রাত খানিকটা গভীর হ'লে তারা আসতে আরম্ভ করে। সারারাত ধরে তারা আসে—বুনো জন্তুগুলো।

স্কটের চোখে বিদ্যুৎ খেলে। রাইফেলটা ডেকে উঠতে চায়। কিন্তু গুলি নেই। ফরেস্ট অফিস তো কাছেই। সরকারের দরওয়ানগিরি করছে। একটা গণ্ডারের চামড়া তোলার উপায় নেই। জন্তুগুলো কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। পোষা মিনির মত। তবু—ও লোভ সামলাতে পারে না। ও আসে।

পূর্ণিমার রাতে। ঐ মাচাটার উপরে বসে থাকে। বুলেটহীন রাইফেলটাকে কাঁধে নিয়ে। ও সাপের মত ফুঁসতে থাকে। রুক্ষ দৃষ্টিতে ওদের দেখে। অনেক পরে তারা চলে যায়। সমস্ত বনের পশুগুলো! তারা দাঁড়িয়ে থাকে না স্কটের অপেক্ষায়। স্কটের ইচ্ছে করে ঐ পাগলা হাতীর পিঠে চাপতে। তারপর? তারপর সব কটাকে সাবাড় করে ফেলতে।

শেষ পর্যন্ত ও আর পারে না সহ্য করতে। হুইস্কির বোতলটা.

টেনে নেয়! রাগে গর্ গর্ করে। গলগল করে মদ ঢালে। পিপাসা তবু মেটে না। ঢলে পড়ে মাচায়। পরদিন নেশা কাটলে ডেরায় ফিরে আসে।

ও একলাই পড়ে থাকে জঙ্গলে। বেমালুম জংলী হতে চলেছে। আপন মনেই বিড় বিড় করে। কখন কখন চীৎকার করে কথা বলে। উত্তর পায় না। হেসে ওঠে। আমিরী চালে হাঁকে, বেয়ারা। দূর কাঁহা বেয়ারা। উতো ভাগিয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্কট তো তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে হাণ্টার মেরে।

ম্যানেজারের গদিটা গেছে কিন্তু মেজাজটা যায় নি। জোয়ান শরীরটাকে খুইয়ে এসেছে চা বাগানে। মনটা আজও জোয়ান। কিসের ভয় তার! ও পরোয়া করে না কাউকে।

ক্লাব নেই। পার্টি নেই। বল-নাচের মজলিশ নেই। শুধু টিকে আছে খানাটা—খানাটা আজও সাহেবীই আছে।

ও হিটারে জল গরম করে নেয়। কিন্তু রুটি? সেটাই তো ফুরিয়ে গেছে। ঠিক হ্যায়। ও নেশা করেছিল আগের দিন রাতে। সে ভাব এখনও কাটে নি। ও টলছে। মাতালের মত। স্কট মাতাল হয় নি। টিপট্ থেকে চা ঢালছে। কাপ ভরে গেছে, পিরীচ ভরে গেছে। ও ঢালছে তো ঢালছেই। বারণ করার লোক নেই। করে দেবার লোক নেই। টিপট্ খালি হ'ল। ও ছুড়ে ফেলে দিল। অদ্ভুত খেয়াল। ভেঙে খান খান হয়ে গেল টিপট্টা।

স্কট এমনি করেই তছনচ্ করে কত কি। বুটে পিষে ধুলো করে দেয়। নেশার ঘোরে। নেশা কাটলে বুঝতে পারে। কিন্তু অনুশোচনা হয় না সেজন্য। বহুবার এই অবস্থা হয়েছে। সময়মত খেতে পারে নি। কাপের অভাবে। পিরীচের অভাবে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে নি। নিজের ওপরে রাগও হয় নি। বরং সেই মুহূর্তে ড্রেসিংঘরে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করেছে। মুগ্ধ হয়েছে প্রতিবিম্বতে, একটুকরো গর্বের হাসি ছুঁড়েছে আয়নায়। চা-বাগানের ম্যানেজার স্কট, হুঁ! স্কটের আবার টাকার অভাব—ঐ তো কলঘরে কাজ হচ্ছে। এখনও মেসিন ঘুরছে, স্কটের বুকে মেসিন চলছে। স্কট শুনতে পাচ্ছে সেই শব্দ। স্কট চলছে চাকার সঙ্গে সঙ্গে। ওর জুতোয় শব্দ হচ্ছে, টক্ টক্ টক্। মঙন, লখুয়া পাতা তুলতে চলেছে। মাইকিবাবু আছেন, মোটাবাবু আছেন। কেরাণীবাবু কলম পিষছেন, মাসের শেষে কিছু টাকা পাবেন বলে। সাহেবকে তোয়াজ করতে চলে তারা, কিন্তু সাহেব? তাকে হেঁট হতে হয় না কারো কাছে।

স্কট হাঁটছে। আবার সেই বুটের শব্দ, টক্ টক্ টক্। ও সমস্ত কলঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে—সে এসে দাঁড়াল পাতা তোলার ঘরে। মঙন মাত্র দু' কুড়ি পাতা তুলেছে, লাগাও হাণ্টার। নিকৃলাও। কেয়া রূপেয়া? নেহি, নেহি। নেচে উঠেছে চাবুক। রক্তের দাগে লাল হয়ে গেছে—সমস্ত কলঘরটা স্তব্ধ। সাহেবের ঠোঁটে বিদ্রূপের রেখা কুঁচকে উঠেছে। আয়নায় ফুটে উঠল সে ছাপ। স্কট শুনতে পেল—মুরতীয়ার কান্না, মঙনের কান্না, লখুয়ার কান্না। কিন্তু চমকে উঠল না।

ও পুরণো হাণ্টারটাকে টেনে আনল, ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিল। সপাং করে মারল দেয়ালের গায়ে। না, না, ওটা মঙন নয়, মুরতীয়া নয়, তারই ছায়া।

স্কট একটু ভাবল, ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে তাকাল। ভাঙা কাচের টুকরোগুলোকে জড়ো করল। ওর নীল মণি দু'টো নাচছে, নীল মণি দু'টো ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। স্কট ভাবল অনেকক্ষণ। চুরুটটাকে টানলো শেষবারের মত তারপর জীপটাকে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল তেজপুরের পথে।

চা-বাগানের ম্যানেজার স্কট, রিটায়ার্ড হয়ে এসেছে। ডেরা বেঁধে পড়ে আছে এই ভালুক পুং-এ। চাল নেই, চুলো নেই, তার জন্য ভাববার লোক নেই পৃথিবীতে। শুধু গডরেজের আলমারীতে আছে কিছু টাকা। একধার থেকে উড়িয়ে যাচ্ছে, ফুরোলে যে কি হবে। সে চিন্তা নেই।

স্কট ফিরছে তেজপুর থেকে, বাঁ হাতে চুরুট। ডান হাত স্টিয়ারিং-এর 'পরে। দু' ধারে জঙ্গল। ওর ঠোঁটে হাসির রেখা, সে হাসি তাচ্ছিল্যের। যে হাসিতে চমকে উঠত কুলির জান।

ডেরায় ঢুকেই হাঁকলো, চাপরাশি! লছমন সিং? নেহি নেহি উতো ভাগিয়ে গেছে। ও একা একাই বক্ বক্ করতে লাগল। পায়চারি করতে লাগল। পাগলের মত হেসে উঠল। কটা কটা চুলগুলো উড়ছে। খোঁচা খোঁচা একরাশ দাড়ি মুখে। চা বাগানের ম্যানেজার ঘুরছে। ডেরার মধ্যে।

হঠাৎ চমকে উঠল। ওর মনে হচ্ছে, কে হাসছে। চাপা হাসি। ও তাকাল চারদিকে। জনমানবহীন পথ। নির্জন ডেরা। স্কটের ছায়া স্তব্ধ। আবার সেই হাসি। খিলখিল করে হেসে উঠল। স্কটের বুকে হাতুড়ির শব্দ। পেরেক ঠুকছে, লক্ষ লক্ষ কামার।

ওর বন্দুকটা আওয়াজ করে উঠল। ফাঁকা শব্দ। হাসিটা চীৎকার করে উঠল। অট্টহাসি। স্কট্‌কে ব্যঙ্গ করল। যেন বলল, গুলি নেই। মিথ্যে ভয় দেখিও না। স্কটের মনে হ'ল লখুয়া আসছে। মুরতীয়া আসছে। মদন আসছে। ওরা কবর খুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। ওরা একসঙ্গে হেসে উঠেছে। ওদের চোখে জ্বালা। প্রতিহিংসার। ঠিক এদেরই তো দেখেছিল স্কট্। জিয়াভরালীর ঘূর্ণির পাকে।

স্কট্ হাঁটছে। জোরে জোরে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ও ঘেমে উঠেছে। শীতের রাতেও। হাসিটা কানের কাছে ঠিক পেছনে। একটা মেয়েলী গলা। বাবুজি! ডর লাগছে? স্কট্ পাথর, সমস্ত শরীরটা অসাড়। ও চোখ বন্ধ করেছে প্রাণপণ শক্তিতে। অন্ধকার, অন্ধকার। মনে হচ্ছে, মুরতীয়ার কথা। সাব! মঙনের জান নাই থাবি। ও আমার মরদ আছে। বাবুজি! হামার চানা-পিনা আছে। কাঁদছে মুরতীয়া। সে ছিট্‌কে পড়েছে স্কটের বুটের আঘাতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে মঙনের গা থেকে।

বাবুজি! এ বাবুজি! একটা নরম হাতের মুঠোয় তার হাত কাঁপতে লাগল। সে মরিয়া হয়ে তাকাল। দেখল, চা বাগানের কুলি নয়, যাদের কবর দিয়ে এসেছিল। এটা একটা জ্যান্ত ভূত। সেদিন বালির চরে যে কাঞ্চীটাকে দেখেছিল পাথর ভাঙতে।

ঘন হয়ে দাঁড়াল কাঞ্চী। যেন অনেক দিনের চেনা। তার আলাপী চোখ দু'টো হেসে হেসে মরল। স্কটের নীল মণি দু'টো ওকে

দেখছে। ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে। কপালের পেশী বাঁকা হয়ে উঠেছে। একটুকরো জিজ্ঞাসা, কেন এসেছো? কিন্তু উত্তর নেই।

কাঞ্ছী ধাক্কা মারল। বলল, পগলা ভয়ো? না, না স্কট্ পাগল হয় নি। শুধু অবাক হয়েছে। কেন, কেন এসেছো? ভয় করল না এখানে আসতে? চা বাগানের ম্যানেজারের গদিটা গেছে। মেজাজটা যায় নি আজও। স্কট্ বলল অস্ফুটে। ওর ঠোঁট নড়ে উঠল, কাঞ্ছী বুঝতে পারল না। বিজ্ঞের মত নাকের নোলক দোলাতে লাগল। চ্যাপ্টা ছোট চোখ দু'টোয় কথা বলল, অনেক কথা। বাবুজী! তুই একলা থাকিস্ জঙ্গলে। হামি তোর দোস্ত।

কাঞ্ছী হাসছে। শরীরটা দুলিয়ে দুলিয়ে বোকা চোখে আলাপী হাসি। স্কট্ নির্বাক। রাইফেলটা হাত থেকে খসে পড়ল। গর্জন করে উঠল না, হাঙ্গারটা ঝুলতে লাগল ডেরার গায়ে। স্কট্ দেখতে লাগল, মতন এসেছে, মুরতীয়া এসেছে, লখুয়া এসেছে। তারা চেয়ে আছে চাবুকটার দিকে। ওরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। সাহেবের গায়ে লাগছে, সে নিশ্বাস গরম।

কাঞ্ছী তখনও হাসছে, কোন কারণ নেই, অকারণে। স্কট্ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে, নীল চোখে বিপন্ন বিস্ময়। কাঞ্ছীর ভয় নেই। চা বাগানের ম্যানেজারের নীল চোখে। ও হাসছে, দেহে মাদকতা। বন্য কাঞ্ছী মদ খায় নি, মাতাল হয়েছে, দুলে দুলে উঠছে পাহাড়িয়া শরীরটা।

তাজমহল

প্রতিমা রায়

হে প্রিয়া আছ কি তুমি আজও
চিরসুপ্তা, মৌন নিদ্রিতা পাষাণ মর্মর মাঝে
প্রেমিক কবি-সম্রাটের প্রেমের দেউলে
মিটেছে কি তব প্রেমের ক্ষুধা?
জীবনের আশ??
বিরহীর একফোঁটা চোখের-জল
শুভ্র-সমুজ্জ্বল,—এ তাজমহল।
মমতাজহারা উন্মাদ-রাজ পাগল হৃদয় লয়ে
রচিল তোমারে মর্ম-নিঙাড়িয়া রক্তশ্বাস দিয়ে।
প্রেমকে করিতে সার্থক সাধন,
দিল কত শিল্পী জীবন বিসর্জন,
কত সাধনার পূতমন্ত্রে রূপ নিল তাজমহল,—
যুগ-যুগান্তরের প্রশংসাবাণী করিল সে অর্জন।
মুগ্ধ বিস্ময়
চিরকালের প্রশ্ন—
এ ভুবন ভোলানো প্রেমসৌধ।
কেহ বলে এ বিরহীর এক তাপিত হৃদয়-স্পর্শ
কেহ বলে এ নবসৃষ্টির নাম কিনিবার হয।
কেহ বলে এ অমর প্রেমের স্বাক্ষর রাখার সাধনা,
কেহ বলে এর মাঝে তো, প্রেমের বেদনা দেখি না।
কবি বলে এ স্মৃতিভারে আর্টের অবসান
উদয় শিখরে ভারমুক্ত আত্মা গাহে গান।

প্রশ্ন জটিল
তাই প্রিয়া তোমার কাছে প্রশ্ন আমার
আছ কি তুমি আজও?
তোমার প্রেম কি চিরন্তন অনাদিকালের স্রোতে
চির মিলনের হৃদয় উৎস হতে?!!!
কত চেঙ্গিশ, নাদির শাহ্, লুণ্ঠিল তোমার ধন
ইংরাজ নিল, সে সব তো তোমার বাহির অঙ্গাবরণ
অন্তরে তোমার প্রেমের যে অমিত ফল্গুধারা
বিরহের শেষে মিটেছে কি তার চির অনন্ত তৃষা?

ভাবিয়ে তোল মনকে তুমি,
এত রূপরাশির মাঝারে দাঁড়িয়ে ডাকি তোমা আমি তাই
বলো বলো তুমি একবার আজ, আছ কি তুমি আজও?

জটিলতার জট যায় খুলে,
বিস্ময়ে দেখি প্রেমের নদী যমুনার উপকূলে
চিরপ্রেমের, চিরকবির গাঁথা তুমি সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।
বাহিরে যদিও আজ নগ্ন তুমি
অন্তরে সমুজ্জ্বল,
চিরবিস্ময়ে উজ্জ্বল
শিল্পীর কুতূহল
চিরপ্রশ্নের স্থল,—
এ তাজমহল।

ফুলের মৃত্যু

সুনন্দা দাস

জানি এই ক্ষীণকায় নামহীন ছোট চারাগাছ,
স্বপ্ন দেখে বৃক্ষ হবে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে—
বেপথু বধূর মত লজ্জানত নব পুষ্পোদ্গমে
উদ্ধত শাখারা নেবে সুকোমল যৌবনের সাজ।

উদ্ধত শাখারা নেবে সুকোমল যৌবনের সাজ—
বসন্তের পদক্ষেপে নবীনতা উদ্বেল উৎসবে,
তবুও দিনান্ত হবে, যেন রাজ্যহীন মহারাজ
পথপ্রান্তে ফেলে যাওয়া সিংহাসনে ব্যর্থ স্বপ্ন রবে।

পথপ্রান্তে ফেলে যাওয়া সিংহাসনে ব্যর্থ স্বপ্ন রবে—
প্রখর প্রান্তরে একা, সহস্র ফুলের মৃত্যু লয়ে
মুমূর্ষু বিবর্ণ আশা, রিক্ত, তবু দিন গুণে যাবে
একদিন ফুটেছিল তারই মৃদু সৌরভ বয়ে।

একটি অমর প্রতিভাঃ কবি তরু দত্ত

প্রতিমা চক্রবর্তী

১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ফরাসী সাহিত্যিক ক্লারিস বাস্তার তাঁর প্রকাশকের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। চিঠিখানা লিখেছে এক বাঙালা মেয়ে, বাংলা দেশ থেকে। মেয়েটি লিখেছে, আমি আপনার লেখা La femmedans l'indeantique বইখানা ইংরেজীতে অনুবাদ করতে চাই। আপনার অনুমতি পেলে খুশি হবো।

বাস্তার একুশ বছর বয়সের বাঙালী মেয়ের লেখা চিঠিখানা পড়ে খুশি হলেন। সংগে সংগে চিঠির জবাবও দিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন, একজন বাঙালী মেয়ে তাঁর লেখা বইখানা অনুবাদ করতে চান জেনে তিনি খুশি হয়েছেন। বইখানার ইংরেজী অনুবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হলে প্রকাশক ও লেখকের দিক থেকে কোনও আপত্তি থাকবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে বইখানা অনুবাদ করতে পারেন।

বাস্তার যে মেয়েটিকে তাঁর লেখা La femmedans l'indeantique অনুবাদের অনুমতি দিয়ে খুশি করলেন তাঁর নাম কবি তরু দত্ত। তরু দত্তের জন্ম হয়েছিলো ১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ কোলকাতার দত্ত পরিবারে, তাঁর বাবার নাম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।

সে যুগে কোলকাতার দত্ত পরিবারের বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিলো। গোবিন্দ দত্তের ঠাকুরদা নীলমণি দত্ত আগে বর্ধমানের আঝাপুর গ্রামে বাস করতেন। কোনও কারণে তিনি কোলকাতায় এসে বাস করতে থাকেন এবং ক্লাইভ আর ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোলকাতার একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে ওঠেন। তাঁর সংগে যুগের অনেক বিশিষ্ট লোকের পরিচয় ছিলো। শোনা যায় মহারাজা নন্দকুমার তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এ ছাড়া তিনি নাকি আশ্রয়হীন কেরী সাহেবকে তাঁর মানিকতলার বাগানবাড়িতে আশ্রয় দিয়ে উদারতার পরিচয় দেন।

নীলমণি দত্তের তিন ছেলের ভেতরে রসময় দত্ত ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী। তিনি ইংরাজ মহলে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলেন। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের ব্যাপারে তিনি ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন। তাই ইংরেজরা তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে হিন্দু কলেজের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করে যথোচিত সম্মান দিলেন।

রসময় দত্তের ছেলে গোবিন্দ দত্তও বাবার মতো ইংরেজদের সুনজরে পড়ে গেলেন। ক্রমে তিনি কোলকাতার একজন বিশিষ্ট লোক হয়ে দাঁড়ালেন। ফলে ইংরেজ সরকারের অধীনে তিনি বড় চাকরি পেলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। তাই তিনি বেশিদিন ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করতে পারলেন না। তিনি যখন দেখলেন বাঙালীরা বড় পদ পেয়েও ইংরেজের কাছ থেকে যথোচিত সম্মান পান না, অকারণে অপমানিত হন তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চায় মন দেন।

গোবিন্দচন্দ্রের প্রথম ও শেষ পরিচয়, তিনি ছিলেন কবি। তাঁর লেখা ইংরেজী কবিতা সে যুগের অনেক বিলাতী মাসিক পত্রিকায় ছাপা হতো। শেষ বয়সে তিনি ও তাঁর সংসারের সকলেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

গোবিন্দ দত্তের মেয়ে তরু দত্তও বাবার মতো ইংরেজীতে কবিতা লিখতেন। তাঁর লেখা কবিতা সে যুগের বহু বিখ্যাত বিলাতী পত্রিকায় সাদরে ছাপা হতো। এ ছাড়া তিনি বহু ফরাসী কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন এবং ফরাসী ভাষায় Le Journal de Mlle. d' Arvers নামে একখানা উপন্যাসও লিখেছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তরু দত্ত বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষায় কেন কবিতা ও উপন্যাস লেখেন নি?

এর প্রধান কারণ হচ্ছে, তরু দত্ত যে যুগে জন্মেছিলেন, সে যুগে বাংলা দেশের উপর খৃষ্টান পাদ্রীদের আর ইংরেজী ভাষার প্রতিপত্তি ছিলো খুব বেশি। ইংরেজী-সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা আর ইংরেজী আদবকায়দা তখন বাংলার বুকে এক নতুন ভাবের জোয়ার এনেছে। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে ইংরেজের অন্ধ অনুকরণে মত্ত। তাই শুধু তরু দত্তই নন, তরু দত্ত ছাড়া আরো অনেকেই তখন ইংরেজীতে বই লিখে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করছেন। কাজেই তরু দত্ত কি ভাবে বাংলায় কবিতা ও উপন্যাস লিখবেন?

সে যুগে যে সব বাঙালী ইংরেজীতে কবিতা লিখে নাম করেছিলেন তাঁদের ভেতরে মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দ দত্ত, উমেশ দত্ত, নন্দকিশোর ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এঁদের কবিতার সংগে তরু দত্তের কবিতার পার্থক্য দেখা যায়। এঁদের কবিতায় প্রাণ ছিলো না। তাতে যেমন ছিলো ইংরেজী ভাব তেমনি ছিল ভারতীয় ভাব। এ দুয়ের মিশ্রণে এঁদের কবিতা হয়েছিলো না ইংরেজী না বাংলা। এঁদের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সমালোচক ডান সাহেব বলেছেন, এই সব কবিরা যেমন নিজের ভাষাকে ইংরেজী করে তুলেছিলেন তেমনি এঁরা এঁদের চিন্তাধারাকে ইংরেজী করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

তরু দত্ত কিন্তু তা করেন নি।

তিনিই একমাত্র কবি যিনি বাংলা দেশে ইংরেজী কবিতার ধারা বদলে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছে করে তাঁর কবিতাকে ইংরেজী করে তোলার চেষ্টা করেন নি। তাই তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয়, কবিতাগুলো ইংরেজীতে লেখা হলেও আমরা যেন ভারতীয় কবিতা পড়ছি। আর এজন্যেই অন্য বাঙালী কবিদের ইংরেজরা ভুলে গেলেও তরু দত্তকে ভুলতে পারবে না। তরু দত্ত যুগ যুগ ধরে বাঙালীর কাছে যেমন বাঙালী কবি হয়ে বেঁচে থাকবেন, তেমনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখলেও ইংরেজদের কাছে বাঙালী কবি বলেই সম্মান পাবেন।

তরু দত্তের লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা 'যোগাদ্যা উমা'। কবিতাটি ইংরেজী ভাষায়, ইংরেজী ঢংয়ে লেখা হলেও এর প্রতিটি ছত্রে ভারতীয় চরিত্রের ছোঁয়া আছে। তাই কবিতাটি পড়লে মনে হয়, একগোছা ভারতীয় ফুল যেন বিলেতের মাটিতে ফুটে উঠে ভারতীয় সুবাস বিতরণ করছে।

ইংরেজী ভাষার মতো ফরাসী ভাষাতেও তরু দত্তের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিলো। কারণ তা না থাকলে তিনি ফরাসী কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করতে পারতেন না, আর ফরাসী ভাষায় উপন্যাসও লিখতে পারতেন না।

ফরাসী ভাষায় তরু দত্তের লেখা উপন্যাসখানির নাম—Le Journal de Mlle. d' Arvers—'কুমারী আরভ্যারের দিনপঞ্জী'।

এই উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যুর পরে ছাপা হয়।

তরু দত্তের মৃত্যু হয় ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট কোলকাতায়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র একুশ বছর ছ' মাস।

তরু দত্ত মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবা উপন্যাসটির একটা নকল পাণ্ডুলিপি ফ্রান্সে ক্লারিস বাড্যারের কাছে পাঠিয়ে দেন। বাড্যার বাঙালী মেয়ের লেখা উপন্যাসখানি পড়ে মুগ্ধ হন এবং ফ্রান্সের এক বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ীকে বইখানা ছাপার জন্যে অনুরোধ করেন। তাঁরই অনুরোধে প্যারিসের Didier কোম্পানী থেকে ১৮৭৯ সালে বইখানা ছেপে বের হয়।

Le Journal de Mlle. d' Arvers ছেপে বের হওয়ামাত্র তরু দত্তের নাম সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই বইখানা পড়ে মুগ্ধ হন ও লেখিকার প্রশংসা করেন। বলেন, এমন একখানা উপন্যাস একজন বাঙালী মেয়ে যে কি করে এতো অল্পবয়সে লিখলো, তা সত্যিই ভাববার বিষয়!

Le Journal de Mlle. d' Arvers—'কুমারী আরভ্যারের দিনপঞ্জী' ফরাসী ভাষায় লেখা হলেও এর ভেতরে ফুটে উঠেছে ভারতীয় ভাবধারা। ক্লারিস বাড্যার নিজেই এই বইখানা সম্বন্ধে বলেছেন, 'বইখানার বিষয়বস্তু যদিও এদেশীয় তাহলেও বইখানা পড়লে বেশ বোঝা যায় যে, কতকগুলো ভারতীয় ফুল এদেশের মাটিতে ফুটে উঠে রূপে আর গুণে আমাদের মুগ্ধ করছে; ফুলগুলো থেকে তাদের দেশের স্বভাবজাত সুবাস ভেসে আসছে। আমার মনে হয়, ফ্রান্সের লোকে এজন্যেই বইখানা পড়ে এতো খুশি হয়েছে। বইখানা পড়লে মাদমোয়াজেল দরভ্যারের প্রেম আমাদের মনে এনে দেয় ভারতীয় নারীর তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার কথা। স্বামী সুখী হোক বা অসুখী হোক, নির্দোষ হোক বা দোষী হোক তবুও হিন্দু নারীর প্রেম যে অচল এই কথাই উপন্যাসের ভেতর দিয়ে নানাভাবে বলা হয়েছে।

তরু দত্ত ক্রিশ্চান হলেও মনে-প্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাঁর আত্মা ছিলো হিন্দু। তিনি তাঁর দেশকে, দেশের লোককে ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি বিদেশী ভাষায় কবিতা ও উপন্যাস লিখলেও তাতে ভারতীয় আদর্শ আর ভারতীয় ভাবধারা ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতের কথাই তিনি বিদেশী ভাষায় নানা ভাবে, নানা সুরে নানা ছন্দে বলে গেছেন। তাই বিদেশী ভাষায় কবিতা ও উপন্যাস লিখলেও ভারতবর্ষ তাঁকে কোনও দিন ভুলতে পারবে না।*

* এই প্রবন্ধটি লেখার জন্যে A Bengali Book of English Verse, Life and Letter of Taru Dutta; Kavi Taru Dutta by Rajkumar Mukherjee প্রভৃতি বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মহাশূন্যের থার্মোমিটার

জিনিষটার নাম ঠিক থার্মোমিটার নয়, এর সঠিক নাম 'থার্মোপাইলস'। থার্মোমিটারের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, থার্মোমিটারের কাজ সম্পর্কেও আমরা সকলেই জানি; থার্মোপাইলস ঠিক থার্মোমিটারের কাজই করে, অর্থাৎ উত্তাপের পরিমাপ করে। তবে একটু তফাৎ আছে। থার্মোমিটার মানুষ বা অন্যান্য জীবদেহের তাপের পরিমাপ করবার জন্যে ব্যবহার করা হয় আর থার্মোপাইলস-এর সাহায্য নিতে হয় মহাশূন্যে কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্রদের ভেতরকার উত্তাপ পরিমাপ করবার জন্যে।

থার্মোইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে অধ্যাপক সিবেক এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। দেখতে অনেকটা সাধারণ ইলেকট্রিক মোটরের ভেতরকার অংশের মতো। এই থার্মোপাইলস যন্ত্রটি তাপ পরিমাপের পক্ষে এতই নিখুঁত যে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে কয়েকজন লোক যদি কথাবার্তা বলতে থাকে, তা' হলে তাদের নিশ্বাস এবং তাদের কথার শব্দ উত্তাপে রূপান্তরিত হবার ফলে ঐ মাঠের আবহাওয়ায় কতটা পরিবর্তন ঘটায়, তা' পর্যন্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

গ্রহ-নক্ষত্রদের ভেতরকার উত্তাপ পরিমাপ করবার জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের টেলিস্কোপের সঙ্গে এই 'থার্মোপাইলস' যুক্ত করে নেন। শুনলেও অবাক লাগে, কিন্তু কথাটা সত্যি যে টেলিস্কোপে দেখা যায় এরকম যে কোনো নক্ষত্রের উত্তাপ এই যন্ত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

সর্বপ্রথম চাঁদের উত্তাপ পরিমাপ করা হয়েছিল থার্মোপাইলস-এর সাহায্যে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে চাঁদের যেদিক যখন সূর্যের দিকে থাকে তার উত্তাপ ২৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে; আর যেদিক যখন সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত থাকে তার উত্তাপ হিমাঙ্কের কয়েক শত ডিগ্রি নীচে নেমে যায়।

ঠিক একইভাবে মঙ্গলগ্রহের উত্তাপ পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে সূর্যোদয়ের সময়ে মঙ্গলগ্রহের মধ্যাংশের উত্তাপ হিমাঙ্কের ৮৫ সেন্টিগ্রেড নীচে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং দুপুর নাগাদ উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ১০ সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এ পৌঁছায়।

বৃহস্পতি, শনি এবং ইউরেনাস ও নেপচুনের উত্তাপও একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দির থেকে থার্মোপাইলস-এর সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে। প্রত্যেক মানমন্দির থেকেই থার্মোপাইলস একই উত্তাপের সঙ্কেত জানিয়েছে।

১০

স্টেশনটা যেন কংগো-রাত্রি ফুঁড়ে হঠাৎ উদয় হ'ল।

চারদিকে উজ্জ্বল আলো। সুতি-পোশাকপরা বহু দেশীয় লোক—সোল্লাসে চীৎকার করছে, হাত নাড়ছে। শ্বেতাংগও রয়েছে ক'জন—রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের রং এমনই বাদামি যে, প্রথমদৃষ্টিতে তাদের ইয়োরোপীয় বলে আলাদা করবার উপায় নেই।

ট্রেনের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে সিস্টার লুক, কামরার কোণে কোণে তিন দিনের ধূলো। এই তার লক্ষ্যস্থল, তার কনভেন্ট সহর। উত্তর কাটাংগার রাজধানী, তামার খনির জন্য বিখ্যাত। পথে অন্য যে সব সহর ছাড়িয়ে এল, তাদেরই মত।

জনাকীর্ণ প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে দু'টি কয়ফের দিকে নির্দেশ করে দেখালেন সিস্টার অগস্টিন, পাশে এসে দাঁড়ালেন তার।···ট্রেন থামছে।

যে নান দু'টি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন তাঁদের মুখগুলো দেখে নিতে চেষ্টা করল সিস্টার লুক। একজন তাঁদের মধ্যে মাদার ম্যাথিল্ডা—তার নতুন সুপিরিয়র, এখন থেকে তার জীবনের শাসনকর্ত্রী। মুখগুলো কিন্তু চেষ্টা করেও দেখতে পাচ্ছে না, মধ্যে অনেক হৈ চৈ অনেক চাঞ্চল্য। দেখতে গিয়ে নানদের চেয়ে অপরিচিত মুখই চোখের সামনে এসে পড়ছে বেশি। লাল টুপী আর খাকি শর্টস্ পরা দেশীয় ব্যাণ্ড-পার্টি মার্চ করে যাচ্ছে। তাদের বাজনার জাতীয় সংগীতের সুরে আর সব শব্দ ডুবে গেছে।···শুধু চোখে পড়ছে খুব বড় বড় ডানাওয়ালা পিঁপড়েগুলো আলোর ওপর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরছে।

মিশ্র জনস্রোতে কয়ফ দু'টি যেন দু'টি উষ্ণীষের মত চোখে পড়ছে। একুশ দিন আগে এ্যান্টওয়ার্প থেকে যাত্রার ক্ষণটা যেন ফিরে এল আবার, সামনে সেই একই দৃশ্য।···সিস্টার লুক অনুভব করল প্রায় অর্ধ-পৃথিবী ঘুরে এসেছে বটে, কিন্তু এসেছে কেবল এক কনভেন্ট থেকে আর এক কনভেন্টে—আসাটা দু'জন নান আর জাতীয় সংগীতের সুরের বন্ধনীর মধ্যে আটকানো। তবু জনতার দিকে লক্ষ্য করে খুঁটিনাটি অনেক কিছু দেখল যখন—পশুদন্ত আর মুদ্রার মালা, থোকা থোকা করে পাকানো তেল-চকচকে চুলের গোছা, উল্কিতে কালো অনাবৃত বুক—মনে হ'ল কনভেন্ট-জীবন যতই একছাঁচে গড়া হোক এতদিন তার যে রূপকে চিনে এসেছে এ পরিবেশে তার কিছু রদবদল হবেই, একেবারে এক রকম হতে কিছুতেই পারবে না।

আর প্রথম থেকেই চাক্ষুষ দেখল যে তা নয়ত।

জাতীয় সংগীত শেষ হওয়া মাত্রই তাদের কামরার দরজা খুলে গেল বাইরে থেকে।

ইউনিফর্ম-পরা শক্ত-সমর্থ একজন নিগ্রো চেঁচিয়ে উঠল, মামা অগস্টিন!

তাড়াতাড়ি তাদের দু'জনেরই স্কার্টের পিছনটা একটু তুলে ধরে সাহায্য করল নেমে আসার সময়, রুলের উপদেশ যেন সেও পড়ে রেখেছে।

সিস্টার অগস্টিনের কথা থেকে চিনতে পেরেছে কালুলুকে। কনভেন্ট কর্মচারী, শান্ত, বৃদ্ধা চ্যাপারিনের কলোনীয় রূপান্তর এরাই।

প্ল্যাটফরমে পা দিয়েই কংগো-রাত্রির গন্ধ এল নাকে। জাকারাণ্ডা গাছ ভরা ফুল···উত্তর কাটাংগায় এরাই বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করে।

এই সবই দেখছিল, চারপাশে আরও একটা সূচনা যে গড়ে উঠছে অনুভব করতে পারে নি। কারণ যে আলোচনায় অন্য যাত্রীরা মুখরিত, ওর কান সে দিকে যায় নি, সংযম বাধা দিয়েছে। ব্যবসায়ী, খনি-বিশেষজ্ঞ, সরকারী কর্মকর্তায় বোঝাই হয়ে এসেছে ট্রেনটা বন্দর থেকে—১৯১৯ সালের বিশ্ব-অর্থসংকটের পর এই ট্রেনটাই প্রথম এমন বোঝাই হয়ে এল। তিন বছরের অর্থ-নৈতিক নিশ্চলতার পর বেলজিয়ান-কংগোর চাকাগুলো আবার ঘুরতে শুরু করেছে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নানরা এগিয়ে আসছেন। নতুন সুপিরিয়রের মুখখানা ফ্রামস্ হল্‌সের ছবির মত—শান্ত, আনন্দময়, দ্বিধাশূন্য। সিস্টার লুকের মনে হ'ল মুখখানা সুপিরিয়র হবার পক্ষে বড্ড বেশি
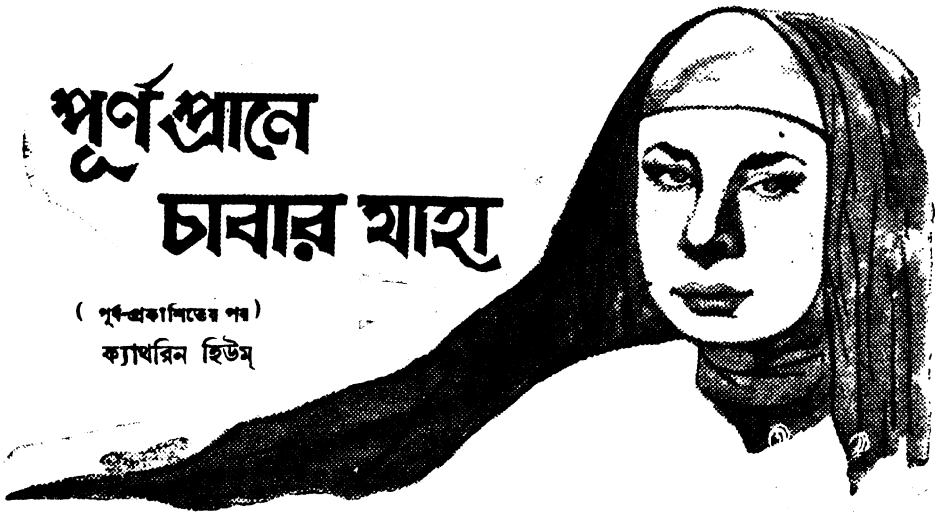
ভালোমানুষ যেন !···পরক্ষণেই কপোলে কঠিন ফ্রেমিস মুখের স্পর্শ অনুভব করল।

এই প্রকাশ্য স্থানে নিয়মানুগ অভিবাদন করতে দিলেন না মাদার ম্যাথিল্ডা। একটু কেবল হেসে নিরস্ত করলেন।

—তোমরা এসেছ, কি যে খুশি হয়েছি আমরা।

বাইরের দিকে রওনা হ'ল সবাই, মাদার ম্যাথিল্ডা আগে আগে চললেন।

কনভেন্টের ফোর্ড গাড়িটা স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাদার ম্যাথিল্ডা সিস্টার লুককে ইসারা করলেন পিছনের সিটে তাঁর পাশে বসতে। সিস্টার অগস্টিন আর অন্য সিস্টারটি বাইরে বসলেন কাল্লুর সংগে।

গাড়ি ছাড়তে মাদার ম্যাথিল্ডা তার একখানি হাত তুলে নিলেন হাত বাড়িয়ে, নিজের কোলের ওপর রাখলেন!

দু'ধারে ঝুঁকে পড়া গাছের ভিড়ে ছায়াচ্ছন্ন রাস্তা। গাড়ি ছুটে চলেছে।···

কোলের ওপর সস্নেহে হাতখানি ধরে রেখেছেন মাদার ম্যাথিল্ডা ···সিস্টার লুক ভাবছে এখানেও মানব-স্পর্শ দেবার মত কেউ আছেন রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের মত।

দৃষ্টিটা সামনের দিকে নিবদ্ধ, চোখে পড়ছে একটা কর্কশ চুলে ভরা মাথা আর দু'টো সাদা ভেল তার পাশে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত হৃদয়টা কখন যেন নতুন সুপিরিয়রের সামনে অনাবৃত করে দিয়েছে।···কি যাদু ছিল সেই কোমল হাতের স্পর্শে, সব বাধা অপসৃত হয়ে গেছে।

গাছের সুড়ংগ পেরিয়ে আসতে রাত্রির রূপটা আরও প্রসারিত হল। অস্ফুট গুঞ্জনে হুডখোলা ফোর্ডখানা চলছে···মাথার ওপর তারাভরা আকাশটা চাঁদোয়ার মত···একটা হাত মাদার ম্যাথিল্ডার হাতে বন্দী, মনে হচ্ছে অন্য হাতে যেন ছুঁতে পারবে এখনই ঐ চাঁদোয়াখানা।

সহরটাকে যেমন কল্পনা করে ভয় পাচ্ছিল, সে রূপটা সামনে থেকে খুব তাড়াতাড়ি সরে গেছে। সামনে মনে হচ্ছে শুধু অসের শুকনো অন্ধকার আর লজ্জাবতী লতার গন্ধ।···

মাঝে মাঝেই ঢালু রাস্তা পেলে কাল্লু পেট্রোল বাঁচাতে স্টার্ট বন্ধ করে দিচ্ছে, গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে গাড়িটা।···একটা তীক্ষ্ণ সুরের গান শোনা যাচ্ছে··আর একটা ছাড়া ছাড়া ক্ষীণ শব্দ অলক্ষ্য থেকে ভেসে আসছে।

এই সেই খবরাখবরের ঢাক! সিস্টার লুকের উত্তেজিত উপলব্ধি।

কংগো-রাত্রি ভেদ করে সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল হঠাৎ, এটা অতি পরিচিত।

চ্যাপেল ঘণ্টার পাঁচটি শব্দ, গ্র্যাণ্ড সাইলেন্সের প্রারম্ভ সূচনা। কাল প্রত্যুষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ছেয়ে থাকবে এই অধিত্যকা ব্যেপে। তারার আলোয় কনভেন্ট দেখা যাচ্ছে। ছায়া-ছায়া বাড়িগুলো, চারদিকে দেওয়াল নেই কোন।

কংগোর মঠ তার কল্পনার সংগে কোথাও মিলল না।

প্রথম দিন সকালে স্নানের জন্য সারিবদ্ধ সিস্টারদের দেখে অদ্ভুত লাগল। হেড ব্যাণ্ড দিয়ে মুখের কিছুটা অংশ স্বভাবতই ঢাকা থাকে সে অংশটুকু এখনও মাখনের মত সাদা নরম। বাকি মুখটা আফ্রিকা রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। মুখে যেন একটা করে ত্রিভুজাকৃতি মুখোশ আটকানো—চওড়া দিকটা তার ভ্রূর ঠিক ওপরে পড়েছে, সরু দিকটা চিবুকের ওপর।

পরবর্তী অপ্রত্যাশিত দৃশ্য—একটি কৃষ্ণকায় পুরুষের মুখ রান্নাঘরে জানলা দিয়ে খাবারঘরে উঁকি দিচ্ছে। নানদের খাবার সময় কোন পুরুষ যে দেখতে পারে আগে কোনদিন জানে নি। কিন্তু অণ্ড্রে শু দেখে না, বিচার-বিবেচনাও করে এবং সবচেয়ে সরেস খাবারটি নিজে যারা প্রিয় তাদের দেবার হুকুম দেয়। পরে জেনেছিল অবশ্য সেটা তার পরিবেশন করার পালায়। খাবারের সবচেয়ে নরম, সবচে ভাল অংশটা সব সময় মাদার ম্যাথিল্ডার। তিনি উপাস্য তার, তাঁ বসবার জায়গায় রোজ সকালে সে একগোছা ফুল রেখে দেয়; মাদার ম্যাথিল্ডাও সরিয়ে নিতে বলতে সাহস পান না, পাছে সেট রুক্ষ শোনায়, পাছে ওর মনে আঘাত লাগে।

বাসনপত্র ধোয়ার কাজ, রান্নার কাজ, কাপড়-চোপড় কাচার কা যে নানরা করেন মাদার হাউসে, এখানে তাঁদের জায়গা নিয়েছে এই নিগ্রো ছেলেরা। তারাই শিখিয়েছিল তাকে এ মঠের বে কোন জন এবং কে কোথায় কাজ করেন—স্কুলে, নার্সারিতে ব হাসপাতালে। অথচ তখনও সব সিস্টারের নামগুলো অবধি শিখতে পারে নি।

কোন সিস্টার মুহূর্তের জন্যও ওদের কাজের সম্মান দিতে ভুলে ছেলেগুলো তাদের জব্দ করতে যে সব ফন্দী খাটায়, তার মূলে থাকে তাদের নান-সুলভ কোন বিশেষত্ব। কোন সিস্টার হয় তো পরিচ্ছন্নতা ঝোঁকে আর সবার সামনে কাঁটাটা বদলে দেবার জন্য ফেরৎ দি অণ্ড্রেকে—অপরিষ্কার দেখাচ্ছিল কাঁটাটা। অণ্ড্রে অপমান বো করবে তাতে এবং দেশীয় মর্যাদা রক্ষার কথা বিস্মৃত হওয়ার জ পরবর্তী সপ্তাহকাল ভুগতে হবে। তার জায়গায় অণ্ড্রে কাঁটা রাখবে না আর! জানে তো খাবার টেবিলে বসে কিছুই চাইতে পারবে না সিস্টারটি, যতক্ষণ না অন্য কোন সিস্টার তার অসুবিধ লক্ষ্য করে চেয়ে দেয় একটা কাঁটা, অপেক্ষা করতে হবে তাকে। আর এও জানে সিস্টাররা সাধারণতই অতি পরিশ্রমে এমনই ক্লান্ত থাকে চারপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে চট করে খেয়াল করে না।

হয় তো কোন সিস্টার গরমে অতিষ্ঠ হয়ে কোন লণ্ড্রি ঘরের সংগে তীক্ষ্ণস্বরে কথা বলে ফেলল। কাচবার সময় তার সেমিজের আস্তিন ছিঁড়ে দেবে তারা—প্রায় সমস্তটা ছিঁড়ে একটুখানি কাপড়ে কেবল ছেঁড়া আস্তিনটা লাগিয়ে রেখে তার সেলে যেমনকার তেমন ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রেখে দেবে। পরদিন ভোরে তাড়াতাড়ি পরার জন্য টেনে নেবার আগে ছেঁড়াটা চোখেও পড়বে না এবং তখন একেবারে অব্যবহার্য সেটা। চ্যাপেলের ঘণ্টাধ্বনি ম্যাসের আগে মেরামত করে নেবার সময় দেবে না, কাজেই বাধ্য হয়ে লণ্ড্রি ব্যাগ থেকে আগের দিনের কোঁচকানো হ্যাবিটটা ধার করে নিতে হবে। চ্যাপেলে সেই কোঁচকানো-মোচড়ানো হ্যাবিট দেখেই বুঝতে পারা যায় কোন সিস্টার আজ বউলা, রাটসুক বা অণ্ড্রের মনে কা

দিয়েছে। তাদের বদলে তাদের কারো বৌ, বোন বা ভাইয়ের মনে হলেও সেই একই ফলাফল।

অথবা যে ছেলেটি কনভেন্ট ঝাঁট দেয়, ঘরগুলো মোছে, তার সংগে অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি কথা বলে যদি কোন নান, কিংবা যদি বকে সবার সামনে তাহলে ধুলো, পোকামাকড়ের ডানা, ফুল গাছের এটা-ওটা দিয়ে বলের মত একটা গোলা তৈরি করে সেই সিস্টারটির বিছানার তলায় রেখে দিয়ে অপমানের শোধ নেয় সে—মজা করে নাম দেয় পুসি বেড়াল। বিছানার তলায় পাথরের মেঝের ওপর যেটুকু দেখা যায়, ধোঁয়া ধোঁয়া রংয়ের একটা বেড়াল বলেই মনে হবে।

এমন কি মাদার ম্যাথিল্ডাও রিক্রিয়েশনে হাল্কা ঠাট্টার সুরে 'পুসি বেড়ালের' উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু যে নানের বিছানার তলায় বিশ্রাম করছিল সে তখন, সে কখনও হাল্কাভাবে নেয় না।

সে হয়তো চিন্তিতভাবে বলবে, কিছু একটা বলেছিলাম তাকে নিশ্চয়, কিংবা কিছু করেছিলাম—কি তা আর মনে করতে পারছি না মাই মাদার, তবে তার আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছি নিশ্চয়··· কোথাও···কোনভাবে···

মঠের বাগানের মাঝখানে কারুকার্যকরা একটা শামিয়ানার নীচে রিক্রিয়েশনের জায়গা।···বাদুড় উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে··· এদিকে-ওদিকে ডানাওয়ালা পিঁপড়ে উড়ছে এক-একটা···সিস্টার লুক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দেখে বাগানের গেটের ওপর টকটকে লাল বোগনভেলিয়া ঝুলে আছে বিশপের কোমরবন্ধনীর মত। দেখে আর মনে করিয়ে দেয় নিজেকে এখনও সে কনভেন্টের গণ্ডীতেই বাঁধা। প্রথম প্রথম কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ত!

চওড়া একটা ধূলাভরা রাস্তার ওপর কনভেন্টের ইটের বাংলো—রাস্তাটার একপ্রান্ত গেছে শহরে, অন্যপ্রান্ত জংগলে। চ্যাপেল আর খাবার ঘরটা পেরিয়ে সিস্টারদের শোবার ঘরগুলো, তার পিছনে ছোট বাগানটা, শামিয়ানাটা সেইখানেই। সব বাড়িগুলোতেই রং ঢাল দেওয়া লোহার ছাদ, ভিতর দিকে কাঠের আস্তরণ আছে বটে, কিন্তু লোহা আর কাঠের মধ্যের ফাঁকটা টিকটিকি গিরগিটি বা সাপের বাস করার পক্ষে যথেষ্ট, কাঠের ফাঁক দিয়ে তারা মাঝে মাঝেই পড়ে যায়।

কনভেন্টের একদিকে বড় সরকারী হাসপাতাল, বেলজিয়ামের যে-কোন সর্বাধুনিক হাসপাতালের সমতুল্য। অন্যদিকে ঔপনিবেশিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং ও ডে-স্কুল। ইয়োরোপীয় বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য নার্সারিও আছে—যাদের বাবা-মার কর্মস্থল জঙ্গলের মধ্যে কোন অস্বাস্থ্যকর কিংবা ভয়ংকর স্থানে। এই এতগুলো প্রতিষ্ঠান চালান কুড়িজনেরও কম নান। এ-ছাড়াও প্রাত্যহিক উপাসনায় নির্দিষ্ট সময় দিতেই হয় তাঁদের, মাদার হাউসের নিয়মানুগ সময়।

সিস্টাররা যে ছেলেগুলোকে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নিয়েছেন তাদের দেখার আগে সিস্টার লুক হতবাক হয়ে গিয়েছিল প্রায়, এই বিপুল কাজ কি করে এই মুষ্টিমেয় নার্সিং আর শিক্ষয়িত্রী নানের পক্ষে করা সম্ভব। কলোনীতে এদের বলা হয় 'বিবর্তিত'—ক্রম-বিবর্তনের ধারায় প্রাণীর দৈহিক গঠনে যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনই চোখে পড়বার মত পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে এদের মানসিক গঠনে—শিক্ষার গুণে। অনেকেই ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট মিশনারি স্কুলে পড়েছে—এই জাতীয় স্কুল ছেয়ে গেছে সারা কংগো। সুসভ্য ইয়োরোপীয় দক্ষতা আর তাদেরই এক ভাষায় নতুন শক্তি নিয়ে তাদের অভ্যুদয়। সে ভাষা ফরাসী ভাষা—অরণ্যের অর্ধনগ্ন স্বজাতীয়দের থেকে পৃথক করে দিয়েছে তাদের। এই কৃষ্ণকায় ছেলেগুলো স্কুল, নার্শারি, হাসপাতাল সর্বত্র ছেয়ে আছে—কেরাণী, টাইপিস্ট, শিশুবাহক, প্র্যাক্‌টিক্যাল নার্স। কনভেন্টের ভিতরের কাজ যারা করে তাদের ভাললাগা আর পক্ষপাতিত্বের ছোঁয়াচ যেমন সিস্টারদের গায়ে লাগে এরাও তেমনই প্রিয় সিস্টারদের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করে কাজ করে দেয়।

নতুন মঠ ঘুরে দেখেছে যখন স্পষ্টই অনুভব করেছে ওদের কালো চোখের দৃষ্টি তারই ওপর। অনুভূতিটা এতই স্পষ্ট যেন ওরা ওকে আলাদা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দেখছে তার হাসিটা কত গভীর, কথাগুলোয় কতটা আন্তরিকতা। মনটা ওদের কাছে ছুটে যেতে চাইছে, তবু সতর্ক হয়ে আছে অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি না প্রকাশ হয়ে পড়ে মনোভাব। জানে না তো কালুলু মারফৎ তার সম্বন্ধে বেশ একটা অনুকূল মতামত ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে—রেল স্টেশনে তার সংগে কালুলুর দেখা হবার পরই।

—ভারি ছেলেমানুষ, বাচ্চা হওয়ার বয়সও পেরোয় নি। কালুলু অবাধে ঘোষণা করেছে।—সিস্টার হাউসে ফেরার সময় সারা পথ বড় মামা ম্যাথিল্ডার সংগে হাত ধরাধরি করেছিল, অতএব খুব গুণের মেয়ে না হয়ে যায় না!···গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলাম যখন আমাদের ভাষায় বলেছে 'ধন্যবাদ'···তবে কিসৃওয়াহিলি ভাষা সত্যি কতটা বোঝে বলতে পারব না!···কথা কম বলে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেই বেশি।

লণ্ড্রি-বয় বউলা গুইম্প কাচবার সময় তার নম্বরটা দেখেছে। মতামত প্রচারে সেটাও জুড়ে দিয়েছে—শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিয়েছে নম্বরটা মামা মারিয়া-পলিকার্পের সংগে এক, সেই যিনি জংগল সফরে যেতেন আর তাদের গ্রামের খবরাখবর এনে দিতেন।

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে চিত্রটার পূর্ণ রূপ দিয়েছে অণ্ড্রে, আমাদেরই মত কুইনাইন খাবার ভান করে কেবল। ডিস থেকে দু' আঙুলে চিমটে তোলে কিন্তু জিভে যখন দেয় হাতে কিছুই থাকে না, অথচ দেবার সময় খুব একটা তিক্ত মুখভংগী করে।

হস্‌পিটাল-বয়রা বিছানা করতে ব্যাণ্ডেজের কাপড় পাকিয়ে রাখতে মেয়েদের মত কুশলী। তাদের পূর্বপুরুষরা যেমন করে জংগলে ঘুরত, তেমনই নিঃশব্দে খালি পায়ে প্যাভেলিয়নে চলাফেরা করে তারা—বড় বড় কালো হাতের থাবায় আলতো করে ট্রে ধরে হঠাৎ এমন পিছন থেকে এসে পড়ে চমকে উঠতে হয়। সুদক্ষ ল্যাবরেটোরি টেকনিসিয়ানদের সংগে কাজ করে এসেছে ট্রপিক্যাল মেডিসিনে আধুনিক পাঠ নেবার সময়, আর এখানে সার্জারির সহকর্মী এরা। কিন্তু আর বছর কয়েকের অপেক্ষামাত্র, নিগ্রো ডাক্তার তৈরি হবে তার মধ্যে, ক্রমবিবর্তনের গাছে ফল ধরবে।

সরকারী ল্যাবরেটোরিতে তাদের নিয়ে নতুন পাঠ সুরু করবার আগে অর্ডার পরিচালিত এদেশীয়দের হাসপাতাল দেখতে পাঠালেন

তাকে মাদার ম্যাথিল্ডা। আসবার দিন রাত্রে শহরের যে দিকটা থেকে ঢাকের শব্দ শুনতে পেয়েছিল, হাসপাতালটা সেইদিকে।

ফ্লাশ্‌ব্যাকে অতীত ঘটনা দেখার মত ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে দেশীয়দের শিক্ষাদান প্রণালীর সূচনা দেখল সেখানে।

মেটানিটি ক্লিনিকে দেশীয় মেয়েরা সদ্যোজাত শিশু নিয়ে আসছে, নানরা পরীক্ষা করবেন। তরুণী মার পিছনে তার স্বামীটি একটি পাত্রে গর্ভপুষ্পটি নিয়ে দাঁড়িয়ে—নার্সিং সিস্টারকে সেটিও দেখাবে। তিনি এক পলক দেখেই বলে দেবেন সমস্ত গর্ভপুষ্পটি বেরিয়ে গেছে কি না।

মেটানিটি সিস্টার বুঝিয়ে দিলেন, যতদিন না গর্ভফুলটি আনতে শেখাতে পেরেছি আমরা, মায়েদের মধ্যে প্রসবজনিত জ্বরের কেস প্রায়ই আসত।

ফরসেপে ধরে একটা রক্তবর্ণ মেমব্রেন তুলে পরীক্ষা করলেন, কেন যে এটাও ঠিক বাচ্চার মতই পুরোপুরি বেরিয়ে আসা দরকার এদের তা বোঝাতে বহুদিন লেগেছে।

—মনে তো হয় এখানে বাচ্চা হওয়া সবাই তারা চাইবে।

—না। সবাই ততটা বিশ্বাস করে না আমাদের···এখনও না। অনেকেই এখনও জংগলের মধ্যে নিজেরাই গর্ত খুঁড়ে নিজেদের প্রসব করানোর ব্যবস্থা করাই বেশি নিরাপদ মনে করে। শতাব্দীর পুরোনো ধারা বদলাতে অনেক সময় লাগবে, অধৈর্য হলে চলবে না।···কিন্তু একটা বীজাণু-প্রতিষেধক ওদের আমাদেরটার মতই ভাল, ঐ দেখ।

একটা বাচ্চাকে ওজন করা হচ্ছে, তাকে দেখালেন সিস্টার, ছোট কালো সংযোগ-নাড়ীটির শুকিয়ে আসা মুখটায় কি একটা কালো পাউডারের মত দেওয়া।

—গুঁড়ো কাঠকয়লা। এত বছর আমরা আছি, কোন বাচ্চাকে নাড়ী পেকে উঠেছে বলে নিয়ে আসতে দেখে নি। কি জানি কি করে ওরা জানল কাঠকয়লা জীবাণুমুক্ত, কাঠকয়লা জল টেনে নেয় সহজে। নাড়ী কাটার পর এটাই কেবল থাবড়ে দিয়ে রাখে, ব্যাণ্ডেজও লাগে না।

জন তিনেক দেশীয় মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে, হাতের পাত্রগুলো দেশীয় হস্তশিল্পের সুন্দর নিদর্শন। একজন মাত্র ফোর্স পাবলিকের শর্টস আর শার্ট পরেছে, আর দু'জনের পরণে কটিবস্ত্র। কিন্তু চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ, আগের জন হাতেরটা দেখাচ্ছে যখন সিস্টারকে, তারটা সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখব বলে ভীত-চোখে তাকিয়ে আছে পিছনের জনও।

কাণ্ডুলুর কথা মনে পড়ল, কন্‌ভেণ্টের ফোর্ডটার স্পার্ক প্লাগগুলো বেশ জানা হাতে মেরামত করে। হাসপাতালে কৃষ্ণকায় ছেলেরা এর মধ্যেই অনেক অচেনা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে। ল্যাবরেটারিতে যে দেশীয় টেক্‌নিশিয়ানরা কাজ করেন, তাঁদের সংগে কাজে যোগ দিয়ে বুঝেছে যত তাড়াতাড়ি ব্যাসিলি চিনে নিতে পারে বলে আস্থা ছিল নিজের ওপর, এঁরা তার চেয়েও তাড়াতাড়ি সারা কাটাংগা থেকে পাঠানো স্লাইড পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যাসিলি সনাক্ত করে দিচ্ছেন। ল্যাবরেটোরির ঐ নূতনালোকে উদ্বুদ্ধ মানুষগুলোর বস্তাভারা এই তার চোখের সামনে···হাতের পাত্রটায় তাদের সভ্যতার পথে প্রথম পদক্ষেপের ইংগিত।

সত্যটা অনুভব করার মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে।

এদের মধ্যে দিয়ে অরণ্য কাছে আসছে।

অরণ্য আরও কাছে এল। সিস্টার লুক দেখছে এই অরণ্য কি করতে পারে শ্বেতকায় মানুষগুলোর, যে মানুষগুলো শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে এই পরিবেশে থাকতে শেখে।

নিজেকে দিয়েই দেখছে।···ট্রপিক্যাল স্কুলে আধুনিক ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, এখানে ইয়োরোপীয় হাসপাতালে চীফ নার্সের পোস্ট নিল, সংগে নার্সিং সিস্টাররা। যে ব্যাক্টিরিয়া বানর আর গিনিপিগের গায়ে ইনজেকশান দিয়েছে, এখন তা মানব-আধারে দৃশ্যমান সামনে··· জ্বর, চুলকানি, দূষিত-ঘা।···এমারজেন্সী ওয়ার্ডে দেখে বুনো জন্তুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত মাথা। কাঁটা ফোটার ক্ষত থেকে পচধরা হাত-পা। কুমীরের সংগে লড়াইয়ের মারাত্মক আঘাত। অনুভবও করে না একটা শহরে হাসপাতালের চার-দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ সে, ডিউটির শৃংখলে তার হাত-পা বাঁধা—একদিন-দু'দিন নয়, দীর্ঘ দিন।

ডাক্তারটিও এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ডাঃ ফরচুন্যাটি—প্রধান সার্জেন, ধাত্রীবিদ্যাবিদ, যক্ষ্মা-ক্যান্সার ম্যালেরিয়া বিশারদ।

দেশীয় নার্সদের চোখে তিনি রোজা আর নানদের চোখে তিনি শয়তান—বেলজিবাব।

তাঁর চোখে ডাঃ ফরচুন্যাটি একটা প্রতিভা।

রোদের উত্তাপ এড়াতে রোজ ভোর পাঁচটার আগে তিনি অপরেশন শুরু করেন আর যত তাড়াতাড়িই মাদার ম্যাথিল্ডা তাঁকে সহকারিণী নার্স জোগান, ততই তাড়াতাড়ি তিনি অতি পরিশ্রমে তাদের নিঃশেষ করে ফেলেন।

তাঁর অপরেশন করা রোগীদের সিস্টার লুক দেখাশোনা করে, চার্ট রাখে। এমন অনেক কেস সারিয়ে তুলতে দেখতে পায় ঈশ্বর পাশে থেকে সাহায্য না করলে যা কোনমতেই সম্ভব হতে পারত না। ইচ্ছা হত তাঁর অপরেশন দেখে, একটা সুযোগও এসে গেল। ডাক্তারের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট নানটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় মাদার ম্যাথিল্ডা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সার্জারির উপরি কাজটা কিছুদিন সে নিতে পারে কি না।

—অপরেশনগুলো সব শেষ হয়ে যাওয়ামাত্র সার্জারি ছেড়ে চলে আসবে, কোনদিনও যেন ভুল না হয়। কোন কেসের আলোচনা করার জন্যেও দেরী করবে না—সে লোভ তোমার হবে জানি, ডাঃ ফরচুন্যাটি একজন বিশেষজ্ঞ মানুষ। কিন্তু মনে রেখ সেই সংগে তিনি একজন পুরুষমানুষ—অবিবাহিত এবং নাস্তিক। তাতে উনি ইটালিয়ান আর রক্তটা গরম।···মুহূর্তের জন্যেও ভেব না সিস্টার তোমার হ্যাবিট রক্ষা করবে তোমাকে।

পবিত্র শান্ত মুখশ্রী মাদার সুপিরিয়রের, শিশুমুখের মত সরল। কয়েক মুহূর্তমাত্র জাগতিক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওর কপালে দৃঢ়হাতে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিলেন—যে মানুষটি তার মঠ-জীবনে একটা প্রধান প্রভাব হয়ে থাকবেন তাঁরই কাছে পাঠানোর আগে।

মাস্ক-ঢাকা একটা হলদেটে মুখ···একজোড়া রক্তাভ চোখ···বিকট রসুনের গন্ধ, কাছে এলেই গা বমি-বমি করে—ডাক্তারের সংগে প্রথম পরিচয়ের এই ছবি আঁকা আছে।

ভোর রাতের অন্ধকারে রসুনের গন্ধে ভারি বাতাসটা ম্যাসের আগে শূন্য পাকস্থলিটার ওপর অত্যাচার করে।

অপরেশন-টেবিলে ডাক্তার যুদ্ধ করেন একটা জীবনের জন্য। আর সে বমি-বমি ভাবটার সংগে যুদ্ধ করে ও।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ অহংকারের জোরে খাড়া রইল। আর দেশীয় সহকারীদের ট্রেনিং দিয়ে আরও চটপটে করে তুলেছে, তাদেরই এগিয়ে দেয় সামনে। যে বয়টি ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে আর পাতলা কাপড়ে জড়ানো বরফের টুকরো দিয়ে তার কপাল মুছিয়ে দেয় মাঝে মাঝে, সে তার মাথা নাড়া থেকে সংকেতগুলো ধরে নেয়। যে মানটি সাধারণত স্ক্যালপেল, হেমোস্ট্যাট, ক্যাটগাট ডাক্তারের হাতে হাতে যুগিয়ে দিতেন, তাঁর জায়গায় একজন ইন্সট্রুমেন্ট-বয়কে দিয়েছে। অপরেশনে যা যা লাগবে, আগে থেকেই নিখুঁত ভাবে ঠিক পর পর ট্রেতে সাজিয়ে রেখে দেয় সে নিজে, বয়টি শুধু হাতে হাতে এগিয়ে দেবার কাজটা করে। খনির ডাক্তার সাহায্য করেন যখন—তাঁকে সাহায্য করতেও আবার একজন বয় থাকে।

একদিন সকালে কিন্তু ডাঃ ফরচুন্যাটি তাকে ডাকলেন সাহায্য করতে। টেবিলের অপর দিকে ঠিক তাঁর বিপরীতে দাঁড়াতে হ'ল। মাথাটা ঝুঁকে আছে তাঁর মাথার কাছাকাছি···চাপা কণ্ঠের প্রত্যেকটি নির্দেশের সংগে রসুনগন্ধী নিঃশ্বাসে দম বন্ধ হয়ে আসছে। বার বার বমি উঠে আসতে চাইছে, দমন করার পরিশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে কপালে। এখন আর বুঝতে বাকি নেই কেন একজন সার্জারি নানের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে এ কাজ করতে গিয়ে।

বোঝার সংগে সংগে এ প্রতিজ্ঞাও করে ফেলল, আমি কিন্তু ভেঙে পড়ব না। এত ভীতুও আমি নই, এত ভদ্রও আমি নই যে বলতে পারব না সোজাসুজি···আর নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে এমন অতি প্রাকৃত গর্বও আমার নেই যে এমনি করে উঠে আসা বমি গিলে ফেলব আর সহ্য করব দিনের পর দিন।

বাকি সময়টা কাজ করে গেল শুধু জেদের বশে।

অপরেশন শেষ হতে ডাক্তার প্রশংসা করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন ডবল ডিউটি নেওয়ার পর থেকে স্বাস্থ্য কেমন আছে তার।

—আমি চালিয়ে যেতে পারব ডক্টর, মাদার হাউস থেকে বদলি কেউ না আসেন যতদিন। কিন্তু একটা সর্ত আছে।

—কি রেভারেণ্ড সিস্টার?

—আপনাকে কথা দিতে হবে অপরেশনের আগের দিন রাত্রে রসুন খাবেন না আপনি।

এই প্রথম তাঁকে হাসতে শুনল সিস্টার লুক।

মাস্কটা তখনও পরা, কাপড়ের আবরণ ভেদ করে নিঃশ্বাসটা আসতেই পিছিয়ে গেল···ডাক্তার দস্তানা-পরা হাত দু'টো বাড়িয়ে দিচ্ছেন দেখবার আগেই। হাতের নাগালে পেলে যেন কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিতেন তাকে!

ম্যাডাম লামাটিনও সেই কথাই বলে—রোজ রাত্তিরে ডিনারের আগে।

উচ্চ হাসির দমক ছড়িয়ে পড়ছে সার্জারির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত···প্রাণোচ্ছল স্বচ্ছ হাসি—ছোটছেলের মত।

···উনি ওঁর রসিকতার কথা বলছেন! ভদ্রতার সীমাও অতিক্রম করে যাচ্ছে।

তাঁর হাসিতে দৃকপাত মাত্র না করে পিছন ফিরে নিজের দস্তানা দু'টো টেনে খুলে ফেলে দরজার দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, শুনতে পেল ডাক্তার বলছেন, আচ্ছা রেভারেণ্ড সিস্টার, আপনি যখন বলছেন···রাজীই হলাম আমি···

তিনি কথা রেখেছেন। সেও নিয়মিত সাহায্য করতে শুরু করেছে, যদিও তার অর্থ প্রতিদিন ভোর চারটের সময় ওঠা—গোটা দুয়েক অপরেশন থাকলেই। কেন না নভেম্বরের বৃষ্টির পর থেকেই গরম বাড়তে থাকে, সাতটার পর সার্জারি তেতে আগুন হয়ে ওঠে।

হাসপাতাল-বয়দের প্রধান এমিল, তার প্রধান সহকারী। প্রত্যেকে ষ্ট্রেচারের সংগে সার্জারিতে আসে, অন্য বয়রা যখন কেস টেবিলে তোলে ও দরকারি তথ্যগুলো বলে যায়।

—প্রি-অপ্ মেডিকেশন সব দেওয়া হয়েছে, মামা লুক। ল্যাব্‌ওয়ার্ক সব করা হয়েছে, ঠিক আছে সব। জ্বর নেই, অস্থিরতা কিছু নেই। বাঁধানো দাঁতটাত কিছুই নেই মুখের মধ্যে। ব্লাডপ্রেসার ওয়ান ফরটি ওভার সেভেনটি।

এমিলের বলার সংগে সংগে চার্টের পাতাগুলো সিস্টার লুকের সামনে খুলে ধরে অন্য একটি বয়, সে পড়ে অনুমোদন করে দেবে। ষ্টেরাইল করা হাতে নিজে ছোঁবে না।

সে অনুমোদন করে দিলে চার্টগুলো, ডাক্তার আর তাকিয়েও দেখেন না সেগুলো। তার বিচার-বিবেচনার ওপর এই আস্থা যে সম্মান দেয় নম্রতার সংগেই নেবার চেষ্টা করতো। কিন্তু বিচিত্র এই আত্র প্রত্যুষগুলোর প্রাক-অস্ত্রোপচার মুহূর্তটিতে প্রায়ই মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে সে সর্বাগ্রে একজন নান তারপর একজন সার্জিক্যাল নার্স।

ডাঃ ফরচুন্যাটি যা কিছু জানেন অপরেশন করতে করতে শেখান তাকে—যেমন যেমন কাটেন, ক্লাম্প দিয়ে বাঁধেন, সেলাই করেন, তেমন তেমন ধাপে ধাপে শিখিয়ে চলেন। প্রায়ই এমন হয় একটা অপরেশনের মাঝামাঝি যখন তারা, চ্যাপেলে দু'টার ম্যাসের ঘণ্টা বেজে ওঠে। সে কিন্তু একভাবেই কাজ করে যায়, জানে যথাসময়ে রোগীদের আশীর্বাদ জানাতে ফাদার আসবেন হাসপাতালে। ডিউটিতে থাকেন সিস্টার মারিয়া-রোজ, সে ডিউটিতে থাকলে ফাদার এলেই তিনি মাথা নেড়ে জানান।

প্রথমে মোমবাতি আর ঘণ্টাবাহী কালো অল্টার-বয়টি সার্জারির দরজার বাইরে এসে দাঁড়াবে। যে বয়টি ডাক্তারের কপাল মুছিয়ে দেয়, ঘণ্টার শব্দ পেলে সে গিয়ে দরজাটা টান করে খুলে দেবে, বেরিয়ে আসতে গিয়ে কোথাও এতটুকু ছোঁয়া না লাগে তার। নতজানু হয়ে হোস্ট গ্রহণ করে ফিরে যাবে সে···সমস্ত মিলিয়ে সেকেণ্ড কয়েকের ব্যাপার।

ডাক্তার তাকিয়েও দেখেন না। এই একটাই সময় তিনি ধর্মজীবন নিয়েও বিদ্রূপাত্মক কোন মন্তব্য করেন না এবং অপরেশন করতে করতে বোঝানোও থামান। তাঁর মুহূর্তের নীরবতায় মনে মনে বলে নেবার যথেষ্ট সময় পায়, 'ঈশ্বর আমার সংগে আছেন, আমি তাঁরই অনুগামিনী।'

তারপরই ডাক্তারের একটানা বোঝানো আবার শুরু হয়ে যায়।

প্রত্যেক এমারজেন্সী অপারেশনে ডাক্তার তাকে ডাকেন। আর প্রথম কয়েকটা মাসে কত যে অজস্র এমারজেন্সী অপারেশন কেস এসেছিল তার ঠিক নেই। হাসপাতালে তাকে খুঁজে না পেলে এমিলকে পাঠান চ্যাপেল থেকে ডেকে আনতে। এর ফল জানে। এই যে কমিউনিটির জীবন থেকে এত বেশি সরে আসছে, সিস্টাররা আলোচনা করবেন এ নিয়ে। তাঁরা অধিকাংশই শিক্ষয়িত্রী, মেডিক্যাল ক্রাইসিস তাঁরা বিশেষ বোঝেন না।

একদিন এমনি একটা ব্যাপারে ডেকে পাঠিয়েছেন, মনে হল আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করা চলত। সিস্টারদের সংগে একসংগে বসে একটা অফিস শেষ করবার সময়টুকু সে পেতে পারত তাহলে।

কথাটা না বলে পারল না।

চকিতে ডাঃ ফরচুন্থাটি ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আপনি কনভেন্টে থাকতে পারেন, আমি তো নেই! আমার যখন আপনাকে চাই, চাই-ই। সরকার মাইনে দেয় আপনাকে, সুতরাং সে অধিকারও আমার আছে—জপ-তপ করতে তারা দেয় না মাইনে, আমাকে সাহায্য করতেই দেয়।

···বহুবর্ণ দু'টি শ্রান্ত চোখ, কিভুক্তে উইক-এণ্ড পার্টিতে ঘুরে অ্যান্নার জের।

দু'জনের কাজ একা চালাবার অনুমতি যদি আপনাকে দিয়ে থাকেন আপনার সুপিরিয়র, তার মানে দ্বিগুণ সময় হাসপাতালের কাজে দিতে হবে আপনার—প্রার্থনার সময় খানিকটা কমবেই তাতে।

তাঁর কথাই ঠিক তা জানে। তার বাবা হলেও ঠিক এই একই কথা বলতেন। সম্ভবত নানদের চালানো হাসপাতালে অপারেশন করতে গিয়ে বলেছেনও বহুবার।

সুতরাং ডাঃ ফরচুন্থাটি না হয়ে তার বাবা থাকলেও এই একই পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ত।

তফাতের মধ্যে বক্তব্যটা জানিয়ে দিয়ে তিনি সদম্ভে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে চলে যেতেন।

ডাক্তারের বকাবকির কথা সুপিরিয়রকে বলল পরে। মাদার ম্যাথিল্ডা নিজে নার্স ছিলেন, সেই মন দিয়ে তিনি জেনেছেন কি গভীর অভিনিবেশে ডাক্তার লড়াই করেন অপারেশন টেবিলে মুমূর্ষু প্রাণের সংগে। তেমন মানুষের পক্ষে এ ক্ষেত্রে রূঢ় কথা বলাই স্বাভাবিক। নান বনাম নার্সের যে দুরূহ সমস্যাটা শংকিত করে তুলছে তাকে, মাদার ম্যাথিল্ডাকে সেটা বোঝাতে বেগ পেতে হ'ল না তাই।

—তা ছাড়া মাই মাদার, সিস্টারদের কথাটা ভাবতে হবে। কমিউনিটির জীবন থেকে আমি যদি এত বেশি সরে যাই টিচিং নানদের কাছে সেটা একটু বিসদৃশ লাগবেই—আমি ইচ্ছে করে সুযোগ তৈরি করে নিচ্ছি ভাবাও বিচিত্র নয়···

কথাটা এখানেই ছেড়ে দিল। ভরসা আছে বাকি ভাবনাটুকু মাদার ম্যাথিল্ডা বুঝে নেবেন। পরের কথায় এল।

—এ নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা—আমি জানি মাই মাদার বদান্যতার দায়েই করবেন, আমারই উপকার করতে—কিন্তু এ সব কথা থেকে নানা গোলমালের সৃষ্টি হয়। যখন যে মঠেই আমি থাকি, ঘটনাচক্রে আলাদা হয়ে পড়ি সিস্টারদের থেকে···এত করে প্রার্থনা করেছিলাম এখানে তা আর না হয় যেন। কিন্তু ওরা যাঁকে বলে বেলজিবাব তিনি উপাসনাগুলোয় অবধি এখন নিয়মিত যোগ দিতে দিচ্ছেন না—অবশ্য আপনার অনুমতি সব সময়েই থাকে, তাহলেও··· আমাদের এই ছোট্ট মঠে···একজনও যদি উপস্থিত না থাকে তো সেটা এত বেশি চোখে পড়ে···

দেখছে মাদার ম্যাথিল্ডা চিন্তার টুকরোগুলো গুছিয়ে নিয়ে বক্তব্যের খসড়া করে নিচ্ছেন একটা মনে মনে, বলতে গিয়ে কথা হাতড়ে সময় নষ্ট না হয়। নানরা সকলেই তাই করেন।

—এই মুহূর্তে সিস্টার, যা করতে হচ্ছে তোমায়, তাই করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ঈশ্বরের কাছে বল, উচিত যা তাই যেন করবার প্রেরণা দেন তিনি তোমায়। মাদার হাউসে আবারও লিখেছি আমি আর একজন নার্সের জন্যে—দু'টো কাজ একা কতদিন করবে তুমি? কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভাবছি আমি তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের কথা···সিস্টাররা যদি বলে কিছু সে বদান্যতার দায়েই বলবে তোমাকে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে রাখতে চায় বলেই। আমি জানি ঘুমও তোমার খুব কম হচ্ছে—এখানকার আবহাওয়ায় তার ফল ফলবেই তোমার স্বাস্থ্যের ওপর, আজই হোক বা দু'দিন পরেই হোক, কিন্তু আমি তা নিয়েও ভাবতে পারছি না। স্বাস্থ্য তোমার ভাল ঠিকই—তবু স্বাস্থ্যও নষ্ট করা চলে, নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলা যেতে পারে···কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন অপব্যয় করার অধিকার আমাদের নেই। এ ঈশ্বরের ধন। মাই সিস্টার, তোমার আধ্যাত্মিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে বলেই আমার ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

বলতে বলতে নিজের বুকের ক্রুশিফিক্সটার ওপর মৃদু মৃদু আঘাত করছিলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন একটু, মাথার কাছে দেওয়ালে ঝোলানো বড় ক্রুশিফিক্সটা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন যেন। শান্ত-মুখে বন্ধুত্বের ছায়া···মানবিক প্রাণের উত্তাপভরা।

—এমন একটা অবস্থাকে মেনে নিতে হয়েছে আমায় যাতে তোমায় আধ্যাত্মিক জীবন থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছ—সাময়িক হলেও। প্রার্থনার মধ্যে এখানে-ওখানে ছেদ পড়ে যায় হঠাৎ, হঠাৎ অকস্মাৎ ধ্যানের সময় কমিয়ে আনতে হয়, একটা প্যাভেলিয়ন থেকে আর একটায় যাওয়ার পথে রোজারি আবৃত্তি করে নিতে হয়—তখন তোমার মনের এক ভাগ ভাবছে যে সব রোগীদের এইমাত্র দেখে এলে তাদের কথা, অন্য ভাগ ভাবছে যাদের দেখতে যাচ্ছ তাদের কথা।

—আমি তো দুর্বল নই মাই মাদার।

—একমাত্র ঈশ্বর জানেন আমাদের মধ্যে কে শক্তিশালী আর কে দুর্বল। আধ্যাত্মিক শক্তিতে তুমি অনুগৃহীত বলেই মনে হয় তার ওপর আমি নির্ভরও করি। তা বলে স্থিরনিশ্চয় হতে পারব না কোনদিন। একমাত্র তোমার নিজের বিবেক বলতে পারে সিস্টার কতদিন এইভাবে চালিয়ে যেতে পারবে তুমি—ভিতরের মানুষটার ওপর অতিরিক্ত বোঝা না চাপিয়ে কতদিন কাজ করা সম্ভব হবে তোমার পক্ষে।

নভিসদের মিসট্রেসের শেষ উপদেশটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল শুনতে শুনতে।

'তুমি আমায় ঠকাতে পার, তোমার সুপিরিয়রদের ঠকাতে পার, মিথ্যা ছলনায় তোমায় অন্য সিস্টারদেরও ঠকাতে পার। কিন্তু একজন আছেন যাঁর কাছে হার মানতে হবে তোমায়, ঈশ্বরকে তুমি ঠকাতে পারবে না।'

যেন তারই চিন্তার সূত্রটা ধরে নিলেন মাদার ম্যাথিল্ডা, আমি যতটুকু দেখতে পারি—সামনে যেটুকু ধরা পড়ে, যেটুকু সহজে বোঝা যায় সেইটুকুই কেবল···সব সিস্টারের চোখে পড়ে যেটুকু, সেইটুকুই। সবাই যখন ধ্যান করছে তখন তুমি নেই বলেই আমি বলতে পারি না ধ্যান করছ না তুমি, কিংবা ম্যাসের সময় তোমার পিউ খালি দেখেই প্রার্থনা করছ না। যখন জানি বাধ্যতার নিয়ম তুমি মানবে, তখন না দেখেও জানি, কখন কোথায় কি কাজে তুমি আছ। ফাদার স্টফেন যখন চ্যাপেলে আমাদের ছেড়ে চলে আসেন হাসপাতালের জন্যে হোস্ট নিয়ে, তখনই জানতে পারি এখনই ম্যাসের আশীর্বাদ পৌঁছে যাবে তোমার কাছে। আর এও ওই পরিবেশে চিন্তার সময় তোমার থাকে না, ধন্যবাদ জানানোর কাজটা পূর্ণাংগ করতে তুমি পার না।

বলে বিষণ্ণভাবে হাসলেন সুপিরিয়র, একই সংগে ঈশ্বর আর ডাঃ ফরচুন্যাটির কাজ করা সহজ নয় সিস্টার।

কি বলতে চান তিনি সিস্টার লুক বেশ বুঝছে। এ কাজের মধ্যে একটা ঝুঁকি সর্বদাই আছে—নার্স ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নানকে। এই সমস্যা নিয়েই তো সে নিজে এসেছিল মাদার ম্যাথিল্ডার কাছে। এখন দেখছে এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জের সুর আছে।

···দুর্বল আমি নই, খণ্ডিত প্রার্থনা আর সংক্ষিপ্ত ধ্যানের মধ্যেও বেঁচে থাকব আমি !···যতদিন এমনি নার্সের অভিজ্ঞতা চলে, এক হাতে হাসপাতাল আর অন্য হাতে ঐ বেলজিবাবকে সামলে নিতে হবে আমায়···

—ভগবানের কৃপায় বিপদের কোন ঝুঁকি না নিয়ে চালিয়ে নিতে পারব আমি, মাই মাদার।

মাদার ম্যাথিল্ডা সোজা তাকালেন তার চোখের দিকে, এই মুহূর্তে অনুমতি দেওয়া ছাড়া আমার উপায়ান্তরও কিছু নেই কোন। কিন্তু মনে রেখ সিস্টার, তোমার আত্মা আমারই হেফাজতে দেওয়া হয়েছিল। তাতেই এইভাবে কাজ চালানোয় যে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে তার দায়িত্ব তোমারও যেমন, আমারও তেমনি।

হাসপাতালে ফিরল সিস্টার লুক। কি এক উত্তেজনায় মনটা ভরে আছে। কোন সিস্টারের সংগে কথা বলে এত অন্তরংগতা কোনদিন অনুভব করে নি। অনির্বচনীয় বিশ্বাসে মৃদু হেসে বলছিলেন···শেষ কথাগুলো গিয়ে লেগেছে অন্তরের গভীরে।

···তোমারও যেমন, আমারও তেমনি···

মাদার ম্যাথিল্ডা তার ঝুঁকির ভাগ নিয়েছেন।

···আমার ঝুঁকি···ভাবতে গিয়ে মনটা আবেগসিক্ত হয়ে উঠেছে।

এ ঝুঁকির বিস্তৃতি যে কতখানি, এই মুহূর্তে সেটাও চোখে পড়ছে। চিকিৎসার কাজ, শুশ্রূষার কাজ ভাল লাগে তার, আর তার সেই ভাল-লাগাটাকে ডাঃ ফরচুন্যাটি উৎসাহ দিয়ে পুষ্ট করে তুলেছেন। এমন একটা আসক্তি জন্ম নিতে পারে এ থেকে, বিবেক যাকে মানিয়ে নিতে পারবে না।

ডাক্তার যখন ডেকে পাঠান অন্য সব সিস্টারদের থেকে পৃথক হয়ে আসতে পেরে একটা গোপন তৃপ্তি কি আসে না মনে মাঝে মাঝে ?

এতগুলো বছর কেটেছে শুধু নিজেকে কণামাত্রও বৈশিষ্ট্য না দেওয়ার সংগ্রামে···আজকের অবস্থাকে মনে হয় না কি তারই পারিশ্রমিক ?

ওয়ার্ডের দিকে যেতে যেতে এ ঝুঁকির অন্য একটা দিকও চোখে পড়ে গেল।···দু'জন রোগীর স্ত্রী অপেক্ষা করে আছেন তার জন্য। জ্বরের ঘোরে ভদ্রলোকেরা যে কাহিনী শুনিয়েছেন তাকে ইতোমধ্যেই, স্ত্রীরা সে কাহিনীরই নিজেদের দিকটা বলবেন এখন। চিকিৎসার্থে প্রয়োজন।

হাসপাতালের প্রধান নার্স হিসেবে সংসারের নানা ঘটনার সংস্পর্শে আসতে হয় এখন, কনভেন্টে ঢুকে অবধি এ ধরণের ঘটনার সংগে কোন সংস্রব ছিল না। আর এখানে সব ব্যাপার অধিকাংশ সময় এমনই যা কোন নানের জানবার কথা নয়। অথচ সহানুভূতি জানাতে গিয়ে, পরামর্শ দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে জুয়াখেলা, পানাসক্তি কিংবা অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে বেশ জ্ঞান আছে তার। অন্তত মৃত্যুপথযাত্রী কোন মানুষকে এ সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে স্রষ্টার চরণে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্টই।

কিন্তু বৃদ্ধ কোন নাস্তিক ঔপনিবেশিকের কাছ থেকে মুক্তিদান অনুষ্ঠানের অনুমতি আদায় করে যখন, কতবার নিজের মনে তখনই বলতে মনে থাকে, এ জয় অন্য কারো প্রার্থনার ফল, আমি যন্ত্রমাত্র।

···আমার ঝুঁকি···আমার দায়িত্ব···

ভাবছে যত আত্মবিশ্বাস আতংকে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

ডিসপেন্সারিতে ঢুকল। সারা হাসপাতালে এই একটিমাত্রই জায়গা যেখানে একা হওয়া যায়।

জানলার বাইরে আফ্রিকার বিশাল দিগন্ত···দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে। মেঘে মেঘে কালো হয়ে গেছে আকাশ, দৈনন্দিন বর্ষণ শুরু হ'ল বলে। ঝুঁকি ওখানেও। বন্যার তোড়ে ঢল নামবে নদীতে···অসতর্ক মুহূর্তে কেউ একবার স্রোতের মুখে পড়লে হল, চোরাবালির দিকে টেনে নিয়ে যাবে তাকে···পায়ের তলায় সেখানে মাটি মেলে না।

···মুহূর্তের অসতর্কতায় আমিও এমনি ভেসে যেতে পারি স্রোতের টানে···

···হে প্রভু, মাদার ম্যাথিল্ডার বিশ্বাসের পরিপূর্ণ মূল্য যেন আমি দিতে পারি, তুমি সহায় থেক···

ডিস্‌পেন্সারির দরজা খুলে গেল।

—মামা লুক—এমিলের কালো মুখে এমারজেন্সী রুমে যাওয়ার ইসারা।

বেলজিবাব সার্জারি থেকে ডাকছেন শুনেই সাধারণত দৌড়োয়, আজ অচঞ্চল পায়ে হাঁটতে সুরু করল। হৃৎপিণ্ডটার চলার গতির হাঁটার তালে তালে মিলে যাচ্ছে।

টেবিল খালি ··· াল আলোটাও জ্বলে নি। ডাক্তারের পরনে রেশমী স্লীট জ্যাকেট।

মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা উইক্‌-এণ্ডে দিন তিনেক না থাকেন

যদি তো কাজ চালিয়ে নিতে পারবে কি না। কিছুতে মাছ ধরতে যাবেন।

—আপাতত এখানে বিপদের ঝুঁকি কিছু নেই।

এতক্ষণ যে কথাটা নাড়াচাড়া করছিল মনে, ডাক্তার ঠিক সেই কথাটাই উচ্চারণ করলেন! শুনতে অদ্ভুত লাগছে কেমন।

—আমি না থাকলে প্রার্থনার জন্যেও প্রচুর সময় পাবেন।

নিয়মমাফিক প্রশ্ন করল, আর যদি কোন জরুরি অবস্থা হয় তো কি হবে?—মনে মনে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে প্যাভেলিয়নের গুরুতর কেসগুলোয়।

ডাক্তার সহজ সুরে বললেন, তাহলে খনি থেকে কোন ডাক্তার আনিয়ে নেবেন।···টার্মিন্যাল ক্যান্সারটায় মরফিন দিয়ে রাখবেন···মারাই যাবে সম্ভবত···দেখা যাক। গ্যাংগ্রিন কেস তিনটেতেই কৌটাটা দিয়ে যাবেন। স্কিন্ গ্রাফ্‌টের ড্রেসিংয়ে হাত দিতে হবে না—গন্ধ বেরোতে শুরু করলেও না···অমনি আনাড়া থাক কেবল। ভাল ফল পাবার আমার ওটাই পদ্ধতি।

স্ক্যাপুলারের নীচে হাত দু'টি ঢুকিয়ে সিস্টার লুক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, শুনে নিচ্ছে নির্দেশগুলো···ডাক্তার একটুক্ষণ দেখলেন চেয়ে।

—আর নিজে একটু বিশ্রাম নেবেন সিস্টার, গেল ক'টা মাসে আপনাকে বড় খাটিয়েছি।

ডাক্তার চলে যাবার পরও সার্জারিতে রইল সিস্টার লুক। ডাঃ ফরচুন্যাটি যে ক'দিন থাকবেন না সেই দিনগুলোয় যে কাজগুলো করে ফেলতে হবে সেগুলো দেখেশুনে রাখবে। ফার্মেসি পরিষ্কার, হাসপাতাল রেকর্ডের কাজ, সরকারী রিপোর্টের মোটামুটি খসড়া করা একটা—ব্যাংক বিবৃতির মত নির্ভুল রিপোর্ট পাঠাতে হয় সরকারের কাছে। সংক্রামক বিভাগের অদ্ভুত আলসার কেসটার আর একটা স্লাইড নিয়ে জীবাণুটা সনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। শুধু কাজের কথাগুলো ভেবে যাচ্ছে পর-পর, কাজের কথায় মধ্যে বেঁধে রেখেছে নিজেকে।

আর প্রতিজ্ঞা করছে এই সবকিছুর সংগে পূর্ণাংগ ধর্মজীবনও যাপন করতে হবে তাকে।

চ্যাপেল···খাবারঘর···রিক্রিয়েশন···

টেলিফোন বাজল। সিস্টার অরেলি। পুরুষদের প্যাভেলিয়ন থেকে ফোন করে জানাচ্ছে ক্যান্সার কেসটা খুব অল্পসময়ের মধ্যেই খুব খারাপের দিকে ঘুরে গেছে, অবস্থার অবনতি ঘটছে ক্রমেই।

—এখনই একজন ফাদারের ব্যবস্থা করছি—

ব্রাদার ছডে টেলিফোন করল, এখান থেকে ক'টা মাত্র ব্লকের ব্যবধান। ওধারে ফাদার অগ্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তিনি তার মস্ত বন্ধু, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাও। নির্বিচারে তাঁকে ভালবাসে সবাই। তিনি যখন যান পথ দিয়ে মায়েরা তাদের শিশুসন্তানদের বাড়িয়ে ধরে সামনে, আশীর্বাদ নেবে বলে।

—এখনই আসছি সিস্টার, বুড়ো ফোর্ডখানার মোড়টুকু ঘুরতে যা দেরী। সদর দরজার অপেক্ষা কর আমার জন্যে।

রিসিভারটা রাখছে, চ্যাপেলের ঘন্টা বাজল। সিস্টারদের ডাকছে উপাসনায়। এই ঘণ্টাধ্বনি যীশুর আহ্বান—এ ধারণাটা মনের মধ্যে বদ্ধমূল তাই, না হলে এই মুহূর্তে ঐ ঘণ্টাধ্বনিতে বিদ্রূপের সুর শুনতে পেত।

আবারও কমিউনিটির উপাসনায় অনুপস্থিত থাকতে হবে। তবে এবার আর চঞ্চল হয় নি মনটা, শান্ত দৃঢ়চিত্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাদার ম্যাথিল্ডাকে ফোন করে অনুমতি নিয়ে নিল, ডিউটিতে থাকবে।

ব্রাদার হুডের ফোর্ডটার খস্‌খস্ আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় ছিল, রাস্তার মোড়ে ফাদার অগ্রেকে যখন দেখা গেল, চিনতে পারে নি। চারজন কাঁধে করে একটা চেয়ার বয়ে নিয়ে আসছে সেই দিকে তাকিয়েছিল। তার ওপর যে প্রিস্টটি পাশের দিকে হেলে বসে আছেন দেখেছিল, মনে হচ্ছে যেন ঢুলছেন তিনি। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় কোন মিশনারি ফাদার জংগলে দীর্ঘ সফর সেরে এমনি করে ফিরছেন, অতি পরিশ্রমে নিশ্চল একেবারে। লম্বা দাড়িতে যেন বিখ্যাত কোন প্রচারক মূর্তির মত দেখায়। কংগোর সব ফাদারই বড় দাড়ি রাখেন, কেন-না হোলি পিকচারে ঈশ্বরের ছবি দেখে দেশীয় লোকেরা আশা করে তাঁর নাম নিয়ে যে কেউ-ই আসবে সে তাঁরই মত দেখতে হবে।

চেয়ারটা বয়ে নিয়ে মানুষগুলো নেমে আসছে রাস্তা দিয়ে দেখছে তাকিয়ে।···দৃষ্টি সীমানার মধ্যে এসে পড়েছে এবার···কিন্তু ওরা তো এ দেশীয় নয়, ফাদার অগ্রের অর্ডারের মুণ্ডিত-মস্তক ফ্রায়ার।

হাসপাতাল-গেটে মোড় ফিরে ভিতরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

একজন ব্রাদার বললেন, মোড় নেবার সময় গাড়িটা টপ-গিয়ারে ছিল, সামলানো যায় নি, পাথরের দেওয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়েছে একেবারে।

আহত দৃষ্টিতে দেখল সিস্টার লুক আহত পাটি বেঁকে ঝুলে আছে। সাদা সুতি ট্রাউজার রক্তে লাল, একটা বাই সাইকেল ক্লিপ খুলে ফেলতে ভুলে গিয়েছিলেন বলেই সেটা খানিকটা শিরা চেপে ধরার যন্ত্রের কাজ করেছে—সম্ভবত মৃত্যুকেও ঠেকিয়েছে, না হলে এত রক্তপাতে এতক্ষণে কি হত বলা যায় না। ট্রিটমেন্ট রুমের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে করেকটা প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশ দিল। এমিল দৌড়ে গেল মাদার ম্যাথিল্ডাকে খবর দিতে। সিস্টার অরেলি ক্যান্সার রোগীটির জন্য অন্য একজন প্রিস্টকে ডাকতে ফোন করল একটা, অন্য একটা ফোন করে খনির ডাক্তারকে খবর দেবার চেষ্টা করল।

সুপিরিয়রকে নিয়ে এমিল ফিরল যখন, সিস্টার লুক ততক্ষণে ট্রাউজারটা চিরে ফেলে স্টেরাইল কমপ্রেস্ দিতে শুরু করেছে।

চুপিচুপি জানাল, স্টেরাইল কমপ্রেস্‌টা দেবার সময়টুকু যদি পাই আমরা, তাহলেই অপরেশন শুরু করে দিতে হবে।

মাদার ম্যাথিল্ডার চোখেও নার্সের দৃষ্টি। বুঝতে পেরেছেন সময় নষ্ট করা চলবে না একমুহূর্তও। সাদা লম্বা আস্তিন গুটিয়ে তুলে নিলেন।

তিনি ছেঁড়া শিরাগুলো পরীক্ষা করছেন দেখেই এমিল ট্রেতে রক্ত দেবার সাজসরঞ্জাম গোছাতে লাগল। মাদার ম্যাথিল্ডা রক্তের

টাইপ পরীক্ষা করলেন, একটি ব্রাদারের সংগে টাইপ মিলল শেষে। তখন সরাসরি দাতা থেকে গৃহীতের দেহে রক্ত দেবার জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হ'ল।

সিস্টার অরেলি এসে শান্তভাবে জানাল খনিতে কোন ডাক্তার পাওয়া গেল না, শহরে সরকারি অফিসেও না। টেবিলের পাশে নিজের জায়গা নিয়ে দাঁড়াল তারপর।

তিনজন নান ধীরভাবে কাজ করে চললেন যেন একটিই প্রাণী ছ'টি হাতে কাজ করছে। ট্রান্সফিউসান এবং এ্যানাসৃথেটিক প্রস্তুত হ'ল।

সিস্টার লুক একবার মাত্র স্থৈর্য হারিয়েছিল ফাদার অণ্ড্রে যখন একবার চেতনা পেয়ে বললেন তাঁকে কোন চেতনানাশক ওষুধ দেবার আগে তিনি কন্‌ফেস করতে চান।

তাঁর বেদনাবিকৃত মুখের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল প্রায় ?···কনফেস্ করার কি থাকতে পারে ওঁর !···ঐ নির্মল আত্মার বুকে ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টিকর্তার ছবি ফুটতে পারে।

বলে নি কিছুই, ঠোঁট কামড়ে নিরুত্তর থেকেছে।

ট্রান্সফিউসান নিডলটা বাহুতে ফোটাতে গিয়ে হাতটা কাঁপছিল। পরমুহূর্তে নিজেরই মনে হ'ল এমন দুর্বলতায় অপূর্ণতার আভাস আছে।

টুকরো ভাঙা হাড়গুলো বার করে দিতে গিয়ে হাত দু'টো তার এখনই অনেক যন্ত্রণা দেবে তাঁকে।

টেবিলের মাথার কাছে ব্রাদার তিনজন ফাদার অণ্ড্রের নিকলুষ আত্মাটি নিয়ে ব্যস্ত। পায়ের দিকে নানরা—একদিকে ডবল সিরিঞ্জের ব্লাড-ট্রান্সফিউসান চলছে, অন্যদিকে অনাবৃত ক্ষত···ভাঙা টিবিয়া···থেৎলানো মাংস।

তাদের দিকটায় কোন প্রার্থনা নেই। সবাই তারা নার্স এখন—চটপটে, দক্ষ, নির্ভীক, নিজেদের চিকিৎসা-জ্ঞানে নিঃসংশয়।

সবার সামনে নম্রভাবে স্বীকারোক্তি করছেন ফাদার অণ্ড্রে।

ওরই ভিতর সিস্টার লুক ভাবছে এ নম্রতার জন্য অনেকখানি মহত্ব, হৃদয়ের অনেকখানি প্রসারতার প্রয়োজন।

মাথা নেড়ে ইংগিত করল মাদার ম্যাথিল্ডাকে এ্যানাসথাসিয়া শুরু করতে।

অপরেশন করার জন্য সবে তৈরি করে নিয়েছে তারা আঘাতটাকে, সার্জারি ঘরের বয়রা চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। সিস্টার লুক ডেকে পাঠায় নি কাউকে, তবু তারা সবাই এসেছে সার্জারি ঘর থেকে তাদের জন্য স্টেরাইল করা গাউন আর দস্তানা নিয়ে। মাস্ক আনে নি। জানে, নানরা করফ খুলে নার্সিং ভেল পরবার সময়টুকুও পাবেন না, নার্সিং ভেল না পরে মাস্ক পরা যায় না। তারই হাতে তৈরি মানুষগুলো···নির্বাক কুশলতায় কাজ করে চলেছে। গাউনগুলো ঝেড়ে পরিয়ে দিল তাকে আর সিস্টার অরেলিকে, দস্তানাগুলো বড় করে তুলে ধরে তাদের উঁচু করা হাতে টেনে ঢুকিয়ে দিল।

টিবিয়ায় কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার, গোড়ালির শিরাগুলো থেঁতলে গেছে, পায়ের মাংসপেশীগুলোও···লাল একটা পিণ্ডের মত দেখাচ্ছে···আকৃতিহীন, নিষ্পেষিত।

একজন বয় স্টেরাইল ক্যাটগাটের টিউব ভাঙতে লাগল, যেন ওর মন পড়ে জানতে পেরেছে সেলাই হবে।

বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছে পাটার ওপর ছুরি চালাতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হ'ত, কিন্তু তা সম্ভব নয়। তবুও ভিতর থেকে কি একটা ঠেলা দিচ্ছে সবচেয়ে ভাল যাতে হয় তাই করতে। মাদার ম্যাথিল্ডা স্লো এ্যানাসথাসিয়া দিয়ে যাচ্ছেন, হার্টবিট রাখছেন, ফাদারের মুখের রং পরিবর্তন দেখছেন আর যেমন যেমন দরকার সুতোর কথা জানাচ্ছেন—প্রথমে গভীর সেলাইগুলোর জন্য, তারপর শিরার সূক্ষ্ম সেলাইগুলোর জন্য।

···আমি সেলাই করছি···ও কাটছে···উনি দেখছেন আর যা দরকার বলছেন বয়দের···এখানে আমরা তিনজন নান এখনকার মত পুরোপুরি নার্স হয়ে গেছি—মাদার ম্যাথিল্ডা, সিস্টার অরেলি আর আমি।···কি ঝুঁকির কথা ভাবছিলাম আজ সকালবেলা—এ ছাড়া আলাদা কিছু কি ?···

শিক্ষা ওদের ভেঙেচুরে নতুন করে গড়েছে—প্রতি অনুক্ষণের শিক্ষা···যত চওড়া হোক পথ, একপার ঘেঁষে চলবে, ছুটবে না কখনও, হেঁটে চল, ভ্রূকুটি অবধি করো না কখনও, মুখে সর্বদা স্মিতহাসি যেন থাকে,···এমনই একটা বিধির কথা ভাবছিল না কি ?

সিস্টার লুক সেলাই করছে। সিস্টার অরেলি কাটছে। সেলাই করতে যেমন সুতো লাগছে মাদার ম্যাথিল্ডা বলে দিচ্ছেন বয়দের। অল্পক্ষণের মধ্যেই দলিত মাংসপিণ্ডটাকে নির্দিষ্ট মাংসপেশীগুলোর আকারে দাঁড় করানো গেল, ছিন্নভিন্ন চামড়ার আবরণ পড়ল তার ওপর। একটি বয় গাট্যার মোল্ড প্রস্তুত করে রেখেছে, ক্ষতবিক্ষত পা'টি তারই মধ্যে রাখা হ'ল। ছুরি না চালিয়ে যতটা যা ভাল করে করা যায় তারা করেছে, এখন তার ওপর সতর্কভাবে ড্রেসিং করল।

কাজ প্রায় শেষ। ব্লাড ট্রান্সফিউসান কেমন চলছে চোখ তুলে তাই দেখতে গিয়ে সিস্টার লুক দেখল মাদার ম্যাথিল্ডা তারই দিকে তাকিয়ে আছেন।

তিনদিন পরে ড্রেসিং খুলে ডাঃ ফরচুন্যাটি তার হাতের সেলাই পরীক্ষা করলেন যখন, তাঁর চোখেও সেই একই দৃষ্টি দেখতে পেল। প্রশংসা-ভরা দৃষ্টি, ত্রুটিহীন চিকিৎসার জন্য যে দৃষ্টি আশা করা যায় একজন ডাক্তারের কাছ থেকে।

অস্বস্তি লাগছে।

—যেটুকু পেরেছি, করেছি। আমার বিবেক যেটুকু বলেছে, ঈশ্বরের করুণা যে পথ দেখিয়েছে। আমি জানি কাটা উচিত ছিল, কিন্তু পারি নি—নার্স হয়ে অতটা দায়িত্ব নেওয়া আমার উচিত হ'ত না।

আমি···আমার···নিজের বলা কথাটা নিজের কানে যেতেই এক ঝলক রক্ত ছুটে এল মুখে।

—মাদার ম্যাথিল্ডা আর সিস্টার অরেলি ছিলেন, তাঁরাই সাহায্য করেছেন আমায়।

ড্রেসিং বদলাতে ডাক্তারকে সাহায্য করতে করতে কেঁপে উঠল একটু···গত তিনদিনের কথা মনে পড়ছে। এই তিন রাত্রি ফাদার অণ্ড্রের পাশে জেগে বসে থেকেছে রোজ আর জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে শুনেছে তাকে। প্রলাপের মধ্যেও শুধুই ঈশ্বরের কথা ভেবেছেন ফাদার, তাঁর এই অরণ্যযাত্রার একমাত্র সহযোগী তিনিই। কখনও কখনও তাঁকে মঠের কোন ব্রাদার ভেবে সন্ন্যাস সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েছেন, সে সব পরামর্শ কেবল পুরুষের শ্রবণোপযোগী।···জেগে

ঘুমে থাকতে থাকতে দিনের অসম্পূর্ণ উপাসনাগুলো পূর্ণ করে রাখত—প্রাইম থেকে আরম্ভ করে সোজা পড়ে চলত মাটিন, লড্‌স্ পর্যন্ত। কাপড় বোনার সুতো জড়াবো কালো-কাঠিমের মত এমিল আসা যাওয়া করত তার আর মাদার ম্যাথিল্ডার মধ্যে—শয্যাপ্রান্ত থেকে ফাদারের স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে যেত মাদার সুপিরিয়রের কাছে আর তাঁর কাছ থেকে জেগে থাকার হুকুম এনে দিত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে এর বেশি আর কিছুই করা যেত না সিস্টার। শুধু ফাদারকেই বাঁচান নি আপনি, ওঁর পাটাও রক্ষা পেয়ে গেছে। আর আটচল্লিশ ঘণ্টা পর থেকেই এতে আমরা একটা ডুপ দিতে পারব অনবরত। বছরখানেক লাগবে হয়তো···কিন্তু আবার হাঁটতে উনি পারবেন।

কথাগুলো শুনে এক ঝলক গর্বের ঢেউ ছুটে আসতে চাইছিল, তার আগেই কাঠিন্যের আবরণে ঢাকল নিজেকে।···তখনই নিজেকে বলল সে একটা যন্ত্রমাত্র। বলতে গিয়ে আগের মত মাদার হাউসের একটি অসুস্থ সিস্টারের ছবি ফুটল না চোখের সামনে—এখান থেকে ফিরে যাওয়া একটি সিস্টার, কাশতে কাশতেও মিশনের মংগল-প্রার্থনা করেন তিনি। আজ চোখের সামনে ভাসছে শুধু বিছানাটা, যে বিছানাটায় শুয়ে আছেন সিস্টারটি··ধবধবে সাদা নরম হাসপাতালের বিছানা, ঘুমুতে ঘুমুতে পাশ ফিরলে খড়ের খস্‌খস শব্দ হয় না।

ঘুম···ঘুম···আর ঘুম। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার স্কুলে নতুন শিক্ষণ ব্যবস্থা

আমেরিকার স্কুলগুলিতে এখন একটি নতুন শিক্ষণ পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্ররা যেমন উন্নততর শিক্ষালাভ করছে, তেমনি শিক্ষকেরাও পেশাগত দিক থেকে উন্নতির সুযোগ পাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় একশ'টি সরকারী স্কুলে চিরাচরিত ব্যবস্থার পরিবর্তে এই নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এদের অধিকাংশই প্রাথমিক স্কুল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এতদিন পর্যন্ত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছে তাতে একটি শ্রেণীর ছাত্ররা একটি ক্লাসকক্ষে একজন শিক্ষকের অধীনে সারা-দিন শিক্ষালাভ করেছে। এই একজন মাত্র শিক্ষকই সমস্ত প্রধান বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করেছেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষকের শিক্ষাদানের প্রশ্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের পূর্বে ওঠেই না। নতুন শিক্ষাদান ব্যবস্থা একজন শিক্ষকের অধীনে একটি শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষাদানের বিপরীত। নতুন ব্যবস্থায় একটি শিক্ষকগোষ্ঠীতে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কতিপয় শিক্ষক থাকবেন। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। একটি ছয় শ্রেণী সম্বলিত ৫৫০ জন ছাত্রের স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের ১৮টি ক্লাসের জন্য ১৮ জন শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা তিন থেকে ছয়টি পর্যন্ত গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকবেন। প্রত্যেকে ১০০ থেকে ২০০ জন ছাত্রের দায়িত্ব নেবেন। এই গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেক শিক্ষক-সদস্য তাঁর অধীন ছাত্রদলকে তাঁর বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেবেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব নয় তাই এই নতুন পরিকল্পনার উদ্ভাবন হয়েছে। বহু মার্কিন শিক্ষাবিদ এই বাস্তব শিক্ষানীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এতে ছাত্রেরা প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ের জন্য উত্তম শিক্ষা পায়, আবার শিক্ষকেরাও বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা, পেশার দিক থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। অভিভাবকেরা বলছেন, নতুন ব্যবস্থায় তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা অনেক ভাল হচ্ছে, স্কুলে পড়াশোনা করতে তাদের উৎসাহ অনেক বাড়ছে। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৭ সালে ম্যাসাচুসেট্‌সের লেক্‌সিংটনে অবস্থিত ফ্রাঙ্কলিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই নতুন শিক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা হয়। ফ্রাঙ্কলিন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের তিনটি দলে ভাগ করা হয়: আলফা (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী), বিটা (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী) ও ওমেগা (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী)। এক একটি দলে থাকেন একজন নেতা—ইনি শিক্ষকতায় কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও পরিচালনায় কাজে সুদক্ষ—এবং দু'জন উর্ধ্বতন শিক্ষক ও তিনজন নিয়মিত শিক্ষক। নিয়মিত শিক্ষকেরা সদ্য কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়েছেন! প্রত্যেকটি দলে একজন সহায়ক থাকেন। এই সহায়ক সাধারণত শিক্ষণ বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন নন, কিন্তু ইনি শিক্ষা ব্যাপারে আগ্রহশীল এবং কেরাণীর কাজ করতে পারেন। এই সহায়কেরা শিক্ষকদের কাজ অনেকখানি লাঘব করেন। যেমন মধ্যাহ্ন-ভোজন ও খেলাধূলার সময়টা তাঁরা তদারক করেন, রেকর্ড রাখেন, হিসাব পত্র দেখাশোনা করেন। ফলে পাঠ তৈরি করা ও শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার অনেক সময় শিক্ষকেরা পেয়ে থাকেন। এই পরিকল্পনায় শিক্ষণ ব্যবস্থা এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে, যেমন ইলিনয়, কানেটিকাট, মিশিগান, ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া, কলোরাডো প্রভৃতি। শিক্ষাবিদদের একাংশ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানিয়েছেন। তাঁদের মতে এই ব্যবস্থায় শিক্ষকেরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারেন না, ছাত্রদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না এবং এই ব্যবস্থা অনেক সময় বেশ ব্যয়সাধ্য হয়। যাঁরা এই পরিকল্পনার সমর্থক তাঁরা বলেন যে, শিক্ষকতার পেশায় যাঁরা নতুন প্রবেশ করেন এটি তাঁদের নানা বিষয়ে সহায়ক। এতে নতুন শিক্ষকেরা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবার সুযোগ পান। নতুন ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন সাধন করে ও শিক্ষকদের সৃজনীশক্তি বৃদ্ধি করে। শিক্ষকেরা নিজেদের শিক্ষণ প্রণালীর গুণাগুণ যাচাই করে দেখবার সুযোগ পান এই ব্যবস্থায়। একটা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে ছাত্ররা কিন্তু বেশ খুশি। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের ওপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের পাঠের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। এই ব্যবস্থায় যে সব ছাত্র পিছিয়ে আছে তাদেরও যেমন অন্যান্যদের সঙ্গে সমান পর্যায়ে আনার জন্য বিশেষ সহায়তা করা হয়, তেমনি তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের আরও এগিয়ে দেওয়ার জন্যও চেষ্টা করা হয়। মোটের ওপর এই নতুন শিক্ষণ পরিকল্পনায় শিক্ষায় উন্নতি হয়েছে, [illegible] পেয়েছে।
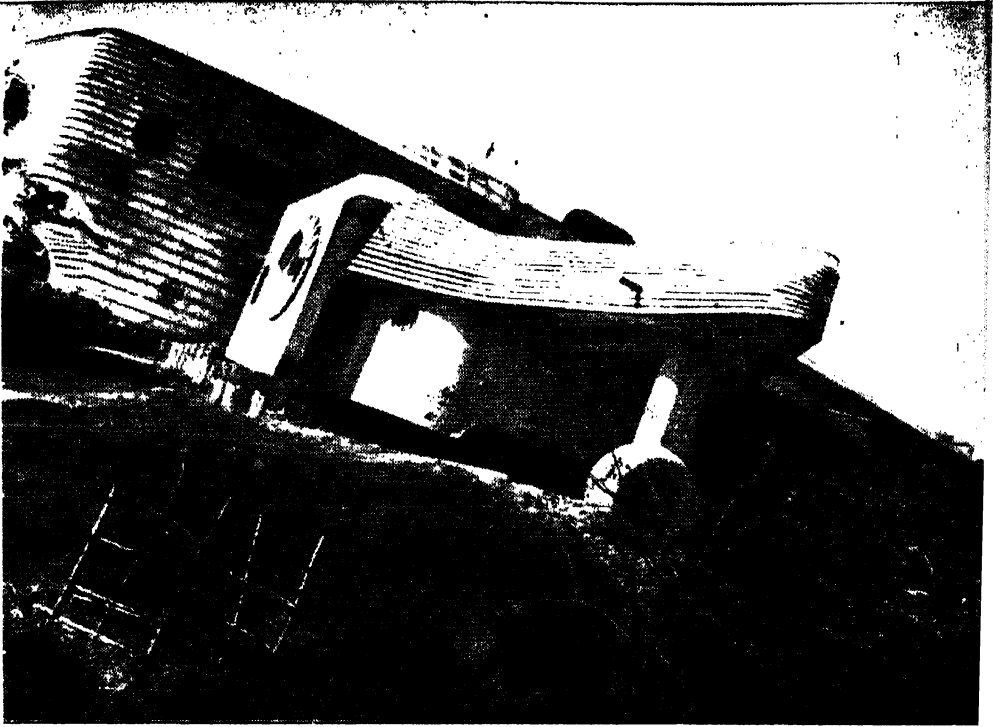
প্লেন-হাউস (রাঁচি)

—বিমলকান্তি সাহা

বার্ণপুর ফ্যাক্টরীর প্রবেশ-তোরণ

হিমালয়ের তীরন্দাজ

—নীরদ রায়
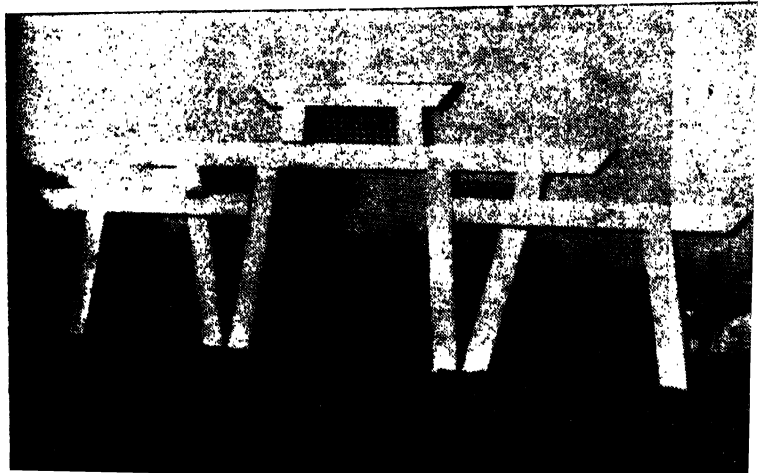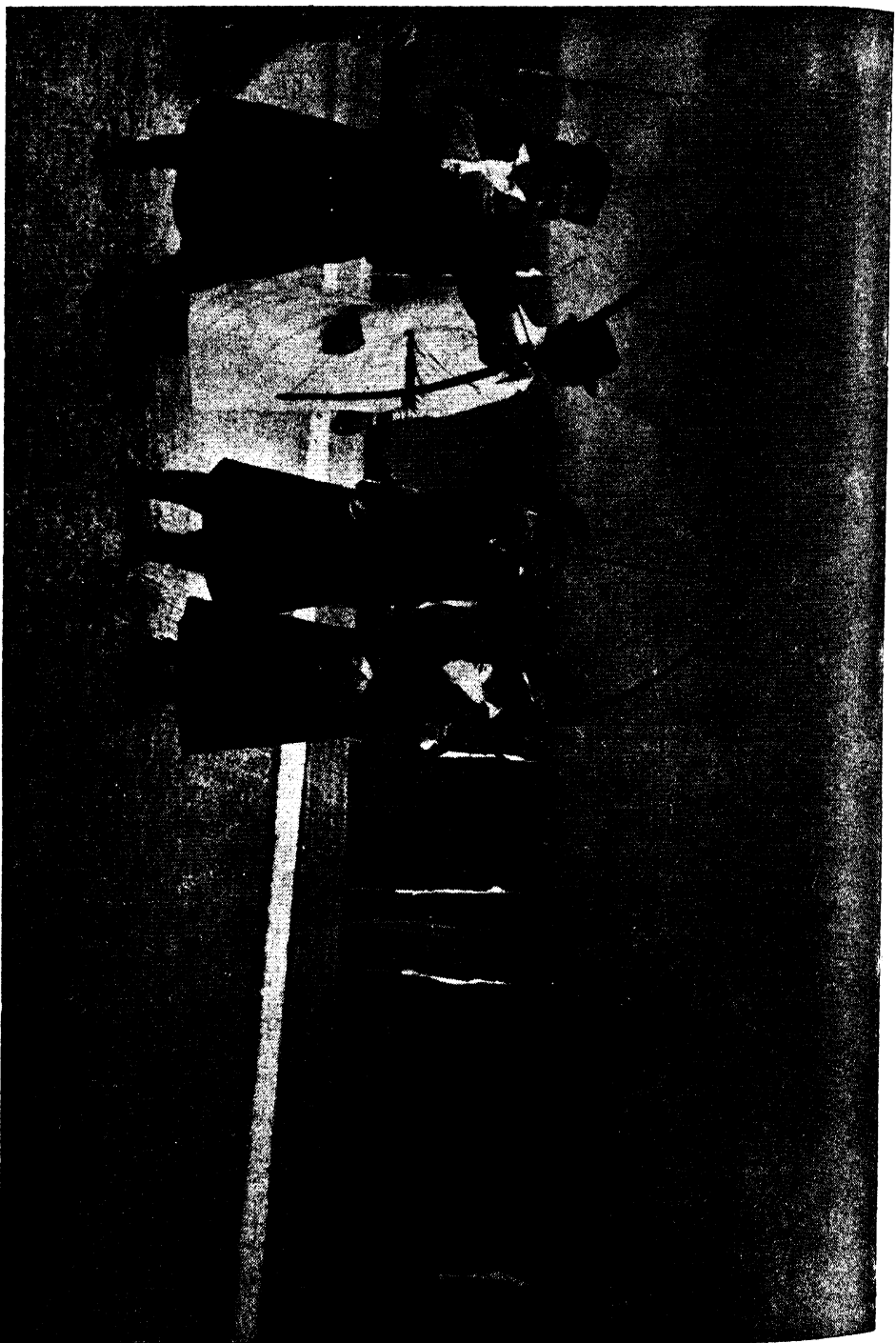
বাতাসিয়া লুপ —অরুণ সরকার

—মীরেন অধিকারী

কোণারকের মূর্তি

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

আলো-ঝলমলে খোলা বারান্দায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চাইতে বেশি এগোনো চলে না। শিবানীর হাতটা মুঠো করে ধরেই ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। গলার স্বরটা নকল গাম্ভীর্যে ভারী করে তুলে বললো, ভীষণ দেরী—

একটা আড়ষ্ট ভাব কেমন যে দু'জনার মধ্যখানে থেকেই যাচ্ছিল। ইন্দ্রনাথের কাটা-কাটা কথার প্রশ্ন আর তার উত্তরে কাটা কথার জবাব দেওয়া এটাই এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, ভেতরটা যে এখন শিবানীর কলকণ্ঠে বলে উঠতে চাইছিল, জানো, আমার একটুও দেরী করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি ঠিক করেছিলাম কি জানো? ঠিক করেছিলাম তোমার আগে বাড়ি আসবই। কিন্তু ললিতার জন্য পারলাম না। গিয়ে একেবারে অফিসে হাজির। তারপর টেনে নিয়ে গেল বাড়িতে। গেল দেরী হয়ে। তুমি অনেকক্ষণ এসেছ? কিন্তু পারলো বলতে! শুধু একটু হেসে বললো, সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেল।

শিবানীর ঘামে-ভেজা জামা-কাপড়ে বড্ড নোংরা লাগছিল নিজেকে। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, আমি আরো একটু সময় নেবো তোমার। স্নানটা সেরে এসে বসব।

তার সঙ্গে চলতে চলতে ইন্দ্রনাথ বললো, আমি কখন এসেছি জানো?

শিবানী তাকালো ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললো, ঠিক সাড়ে চারটায়।

আমার দু'ঘণ্টা আগে—

না, পাক্কা আড়াই ঘণ্টা আগে। তুমি এসেছ সাতটায়—দেখো ঘড়ি। হাতটা শিবানীর চোখের কাছে নিয়ে তুলে ধরল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী বললো, আমি সত্যি দুঃখিত।

আমি বসে বসে কি ভাবছিলাম জানো?

আবার তাকালো শিবানী ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললো, ভাবছিলাম স্ত্রীরা তো এমন কত অপেক্ষা করে স্বামীদের জন্য। কিন্তু স্বামীরা স্ত্রীদের জন্য অপেক্ষা করতে হলে এমন অধৈর্য হয়ে পড়ে কেন।

শুধু অধৈর্য নয় বলো, রাগ, ত্যক্ত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত—

আরে না না। সব সময় অতো কিছু হয় না। কিন্তু সব সময় অধৈর্য যে হয় সেটা ঠিক।

ওর ঘরের দরজার কাছে এসে গিয়েছিল শিবানী। ঘরের পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে বললো, ভাবনার উত্তর পেলে?

এক রকম পেলাম।

কি রকম?

কিছুই না। সোজা অভ্যাস আর নিয়মের ব্যাপার।

এ ছাড়া আর কিছুই নয়?

দেখতে পাচ্ছি নে। পাইপের তামাক বোধ হয় নিভে গিয়েছিল। পাইপের মাথাটি ডান হাতে মুঠো করে ধরে বাঁ হাত দাড়িতে বুলোতে বুলোতে ইন্দ্রনাথ বললো, এই যদি নিয়ম হতো যে, স্বামীরা ভাত বেড়ে অফিস ফেরৎ স্ত্রীদের জন্য অপেক্ষা করবে, তবে নিশ্চয়ই স্বামীদের অপেক্ষারত না দেখলে স্ত্রীরা সইত না। নিয়মের সুবিধেটা আমরা বরাবর পেয়ে আসছি তাই না পেলেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চায়।

হাতে ধরা পর্দা দুলে উঠল এমান করে হেসে উঠল শিবানী। বললো, নিয়মের নিয়মটা আবার কি তা জানো?

কি?

নিয়মের নিয়ম হচ্ছে অনিয়মের সঙ্গে সে এক পা' একত্রে চলে না।

তাই! দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী বললো, কিন্তু নিয়মের ব্যাপার কথাটা যত তুচ্ছভাবে বললে, নিয়মের ব্যাপার জিনিষটা তত তুচ্ছ নয়। বিশ্বচরাচর যদি নিয়মের বাঁধনে বাঁধা না থাকত তবে—কেবল লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটত। জীবন সৃষ্টি হতো না। হলেও তিষ্ঠতে পারত না। মানুষও যদি তার

জীবনকে নিয়মের বাঁধনে বেঁধে না রাখে তবে কেবল লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে। কোনো সুষমা তো থাকেই না, তার ছায়ায় বাঁচাও চলে না। তাই নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধার সীমা নেই আমার। কালকে স্বামীর জন্য ভাত বেড়ে পাখা হাতে বসে থেকে প্রমাণ দেবো তার—

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বেষ্টনে বেড়িয়ে ধরে শিবানীকে কাছে টেনে তক্ষুণি আবার ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। যেন ধন্যবাদ দিল, নয় তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

শিবানী ঢুকেগেল তার ঘরে।

ইন্দ্রনাথ গিয়ে বসল বারান্দায় বেতের চেয়ারে। নিভে যাওয়া পাইপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল বেতের গোল টেবিলটার ওপর। সেই টেবিলের ওপরই রাখা ছিল সিগারেটের টিন। সেটা তুলে নিয়ে তার থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপলো। টিনটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। পা দু'টো চটিশুদ্ধ সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সিগারেট খেতে লাগল। এইমাত্র শিবানী যা বললো, তার অর্থ অতি স্পষ্ট। সে বললো, কাল সে স্বামীর জন্য ভাত বেড়ে বসে থেকে প্রমাণ দেবে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা তার কত। মানে সে অফিসে যাবে না। শিবানীর অফিসে যাওয়া নিয়েই তো যত মানসিক যন্ত্রণা ইন্দ্রনাথের। তার তো খুশি হওয়া উচিত শিবানীর এই সংকল্পে।

খুশি সে হয়েছে। খুশির প্রকাশও সে করেছে শিবানীকে বুকে টেনে এনে। কিন্তু তবু যতটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠার তার কথা ছিল, ততটা যেন সে হতে পারলো না। ভেতরে ভেতরে আনন্দের টানের স্রোতটা নিরানন্দের দিকেই বইতে লাগলো। কাজ ছেড়ে দেবে এ কথা শিবানী বলে নি। সে কেবল ইঙ্গিত করে গেল কাজ ছাড়ার জন্য তৈরি সে। কিন্তু তার আগে সে বলে নিয়েছে, নিয়মের সব চাইতে বড় নিয়ম অনিয়মের সঙ্গে এক পা' একত্রে চলে না। সে নিয়মে চলবে তবেই না শিবানী নিয়ম মানবে।

হঠাৎ যেন নিজের উপর ত্যক্ত বোধ করলো ইন্দ্রনাথ। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলো নীচের বাগানে। উঠে পায়চারি করতে লাগল দু'হাত পেছনে রেখে। তার চরিত্রে অনিয়মের বীজ ঢুকিয়ে দিলো কে? বেশ তো লাগছে শিবানীর সঙ্গ। কিন্তু এই ভালোলাগার স্বাদ ক'দিনেই জোলো হয়ে যায় কেন? তার চরিত্রে কি বিশেষ কোন দুষ্টবীজ পোঁতা আছে? তার কি মূল চরিত্রই এটা না ইংরেজী প্রবাদে যে বলে, 'হ্যাবিট্ ইজ দি সেকেণ্ড নেচার' সেই অভ্যাসের গড়া দ্বিতীয় চরিত্র তার এটা?

ইন্দ্রনাথের অন্তরে সত্য সত্যই দু'দিন ধরে শুভেচ্ছা জেগেছে, সন্দেহ-যন্ত্রণা, রাগ-জ্বালা, রেশারেশি আর দ্বন্দ্ব-কলহ ছেড়ে স্নিগ্ধশান্ত সুন্দর জীবন বরণ করার।

আবদুলকে হুইস্কির বোতল আর সোডা গ্লাসের ট্রে হাতে তার ঘরের দিকে যেতে দেখে একবার যেন বাধা দিতে গিওে থেমে গেল ইন্দ্রনাথ। আবদুল চলে গেল। একটা বিরাট গাড়িকে হেড লাইটের জোরালো আলোয় বাগান আলো করে গেটে প্রবেশ করতে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করলো ইন্দ্রনাথ। এ নিশ্চয়ই সেই মিঃ চোপরার গাড়ি। লোকটা ওদের তৈরি মালের হোলসেল অর্ডার পাবার জন্য একেবারে নাছোড়বন্দা হয়ে লেগেছে।

গাড়িবারান্দায় ঢুকে গাড়ির হেড লাইটের আলো আস্তে আস্তে নিভে গেল। গাড়ির দরজা খোলা এবং বন্ধ হবারও শব্দ পাওয়া গেল। বেয়ারা কার্ড নিয়ে এসে ইন্দ্রনাথের হাতে দিল। হ্যাঁ ঠিক যা ভেবেছে—মিঃ চোপরা। একবার ভাবলে যাবে না। তারপরই আবদুলকে ডেকে ড্রেসিং গাউনটা নিয়ে আসতে বললো। আবদুল ড্রেসিং গাউন এনে পেছন থেকে গায়ে তুলে দিলো। ইন্দ্রনাথ সিগারেটের টিন আর লাইটার হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

শিবানী স্নান প্রসাধন সেরে যখন এসে বারান্দায় বসলো তখনও ইন্দ্রনাথ ওপরে আসে নি! শিবানী মনে মনে গাল দিল লোকটাকে, আসবার আর সময় পেল না বলে।

আবদুল দু' হাতে ধরে একটা প্যাকিং বাক্স তুলে নিয়ে এলো ওপরে। শিবানী কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। সে জানে, এটা কিসের বাক্স। যে লোকটা এসেছে সে নিশ্চয়ই মদের বাক্স ভেট দিলো। এমনি ভেট অনেক আসে ইন্দ্রনাথের। যেমন অনেক দেয় তেমনি পায়ও অনেক ইন্দ্রনাথ।

শিবানী যদিও হাসলো না। সে তো আর ইন্দ্রনাথের কিছুক্ষণ আগের মনোভাব জানত না। হাসলেন বিধাতাপুরুষ। কিংবা হয় তো তিনি হাসতে পারলেন না। তাঁর হাতে ইন্দ্রনাথের মতো সিগারেট নেই যে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে পায়চারি শুরু করবেন। কিন্তু ডাঁটিতে-ধরা পদ্মফুলটি নিশ্চয়ই আছে। হয় তো সেটা ইন্দ্রনাথেরই মতো নিজের ওপর ত্যক্ত হয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন হাত থেকে, ইন্দ্রনাথের সিগারেট ছোড়ার মতো। তারপর মেঝের ওপর পায়চারি করতে করতে আর চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবছেন, ইচ্ছা তো আমিই জাগাই। কিন্তু মানুষের ভেতর শুভ-ইচ্ছা জাগিয়ে আবার আমি নিজেই সে ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিই কেন? আমার চরিত্রের ভেতরেও কি কোন দুষ্টবীজ পোঁতা আছে!

কাচ্চি এলে গরম ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ রাখল শিবানীর সামনে! ইন্দ্রনাথ বা বিধাতাপুরুষের মানসিক দ্বন্দ্বের খবর শিবানী রাখে না। খুশিমনে চায়ের কাপ টেনে নিল সামনে। একবার ভেবেছিল খাবে না। অপেক্ষা করবে ইন্দ্রনাথের জন্য। কিন্তু সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। এটা ইন্দ্রনাথের চায়ের সময় নয়। চায়ে মন উঠবে না তার। রশি ধরতে হলে অনেক ঢিলে দিয়ে ধরলেই যে ছেঁড়বার ভয় কম থাকে, একথা শিবানী জানে। কাপ তুলে নিয়ে অল্প অল্প ঠোঁট ছোঁয়াতে লাগল শিবানী।

যদিও সন্ধ্যাটা আজ একেবারেই রমণীয় নয়। মেঘ-বাতাসশূন্য আকাশ। গাছের পাতাগুলো যেন নিশ্চল হয়ে আছে আঁকা ছবির পাতার মতো। এই যে বাথটাবের ঠাণ্ডা জলে শরীর ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা হয়ে এলো সে—এরই মধ্যে আবার তাপ বেরুচ্ছে শরীর থেকে। মাথার ওপর যে পাখাটা ঘুরছে তা থেকে যেন হাওয়া নয়, গরম বাষ্প বের হচ্ছে। কিন্তু তবু বাড়িটা আজ আশ্চর্য প্রাণচঞ্চল আর উৎফুল্ল। বাইরের হাওয়া নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই, ভেতরের হাওয়াটা আজ বড় সুন্দর! বড় প্রসন্ন! আর সেই প্রসন্নতাই যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

আবদুল বাক্স রেখে ঠাণ্ডা অরেঞ্জ স্কোয়াশের গোটা তিনচার বোতল আর ট্রে থালায় সাজিয়ে নীচে নেমে গেল।

কাচ্চি হাতের তালুতে ল্যাভেণ্ডারের তরল ক্রিম নিয়ে এসে বসল শিবানীর পায়ে ক্রিম মাখাতে। এটা শিবানীর বৈকালিক প্রসাধনের সব চাইতে আরামের অঙ্গ। কাচ্চিরও এটা গল্প করবার, বয়-বেয়ারা বাবুর্চিদের সম্বন্ধে নালিশ জানাবার, আব্দার করবার সময়। শিবানী সহানুভূতি বোধ করে কাচ্চির প্রতি। বেচারার কথা বলার কেউ নেই বাড়িটাতে। কাজের লোকগুলি সব হিন্দীভাষী। ঝগড়াটা এক রকম জগাখিচুড়ি ভাষায়—বা ভাষার চাইতে হাতনাড়া আর মুখভঙ্গীর সাহায্যে কাচ্চি ভালোই চালিয়ে যায়, কিন্তু দু'টো সুখ-দুঃখের গল্প পা ছড়িয়ে বসে কারুর সঙ্গে করতে পারে না! কাচ্চি জানে সেই রয়েছে কেবল শিবানীর জন্য। নইলে সে এই 'হায় হায়' ভাষীদের সব ক'টাকে তাড়িয়ে মনের সুখে কথা বলা যায় এমন সব লোক নিয়ে আসত।

কাচ্চির ধারণা সব কথার শেষে একটা 'হায়' শব্দ যোগ করলেই হিন্দী হয়ে যায়। তাই হিন্দী ভাষাটাকে সে বলে 'হায় হায়' ভাষা।

আজ কাচ্চি শিবানীর সঙ্গে গল্প করবার জন্য এসে বসে নি। সে জানে সাহেব এক্ষুণি যে কোন সময় এসে পড়বেন। তবে আবদুল যখন এইমাত্র ঠাণ্ডা সরবতের বোতল নিয়ে নীচে গেল, তখন কিছুটা সময় দেরী আছে। এই ফাঁকে শিবানীর পায়ে ক্রিমটা মেখে দেবার জন্য সে এসে বসেছে। পায়ের আঙুলের ভেতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রিম ঘষতে ঘষতে কাচ্চি বললো, আজকের রাঁধবার মেনু আমি করে দিয়েছি।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে শিবানী কাচ্চির মুখে মেনু শুনে হাসলো। বললো, মেনু তুই করে দিয়েছিস। বাবুর্চি শুনলো তোর কথা?

বাবুর্চির সঙ্গে কাচ্চির একেবারেই বনে না। তার ধারণা ঐ লোকটা সব চাইতে বেশি ম্লেচ্ছ। কোনো বিচার-আচার নেই। বাবুর্চির সম্বন্ধে কাচ্চির অনেক নালিশ। সে বাজার চুরি করে। ডিমের গোঁজামিল দেয়। রাঁধা মাংস চুরি করে নিয়ে যায়; বলে, সমস্তদিন খালি বাড়িতে লুটেপুটে খায় লোকটা। তাই শিবানী জিজ্ঞাসা করলো, বাবুর্চি শুনল তোর কথা? তুই যেমন তাকে দেখতে পারিস নে, সেও তো তোকে দেখতে পারে না।

কাচ্চি বললো, শুনত আর কি! বুদ্ধি খাটিয়ে বলেছি, বলেই শুনেছে বাছাধন।

কি রকম?

বলেছি, মেমসাব বলে গেছেন এই এই মেনু হবে আজ।

আচ্ছা!

কাচ্চি গৌরবে ঘাড় খাড়া করে বললো, তবে ! কিন্তু কেন করেছি এটা ? শুধু শুধু ওকে ঘাঁটাতে যাবো কেন। করেছি ম্লেচ্ছ তো, দিনকালের কোন জ্ঞানগম্যি নেই ওদের। আজ কি গরমীটা পড়েছে সেটা বুঝবে না, সাহেবকে খুশি করবার জন্য সব গরম রান্না করে বসে থাকবে। ওরা রোজার উপোস শুরু করে যা শেষরাতে সোরাবাটা দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে—যেন শিউরে উঠল কাচ্চি—

যাঃ। ধমক দিল শিবানী।

কাচ্চি বললো জোরের সঙ্গে, হ্যাঁ মা সত্যি বলছি। আমি রোজার সময় একটা মেয়েলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছে।

গরীব বলে খেয়েছে। টাকা থাকলে কি আর সোরাবাটা খেয়ে উপোস আরম্ভ করত।

বড়লোক হলে গরুর মাংস খেতো মা। ওদের এই নিয়ম যে। তুমি তো নিয়ম দেখো না, আমরা তো দেখি রোজার সময়: রোজার বড়ার দোকান বসে যায়। পেঁয়াজি, ফুলুরি, বেগুনি ভাজা হয় আর সে সব কিনে নিয়ে গিয়ে ওরা খেয়ে রোজার উপোস ভাঙে। কি জাত বাবা! সোরা খেয়ে উপোস আরম্ভ আর উপোস ভাঙা হয় পেঁয়াজের বড়া, বুট ভাজা খেয়ে।

ফের ধমক দিল শিবানী। বললো, তুই কতটুকু জানিস। ওরা ফলটলও খায়। কি রাঁধতে দিয়েছিস শুনি ?

মুরগীর রোস্ট বলেছি—পাতলা ঝোলই বলতাম কিন্তু সাহেব ভালোবাসেন না যে একেবারেই। তাই রোস্টই করতে বলেছি খুব কম ঘি দিয়ে। পোলাউ করতে মানা করেছি। তোমরা যে ফ্রাইডাইস না কি বলো তাই করতে বলেছি ভাত রেঁধে নিয়ে। ওটা পেটগরম করবে না: ভেটকি মাছের ভাজা করতে বলেছি। আর কচি আম দিয়ে পাতলা অম্বল করতে বলেছি একবাটি।

হেসে ফেলল শিবানী।

অবাক হলো কাচ্চি। বললো, হাসলে যে মা ? হ্যাঁ, কাঁচা আমের ঝোল খুব শরীর ঠাণ্ডা করে।

শিবানী বললো তা বেশ করেছিস। সাহেব নিশ্চয়ই একবাটি কচি আমের ঝোল চুমুক দিয়ে খাবেন। বলেই হেসে ফেলল শিবানী। টক যে নেশার মানুষ খায় না তা জানবে কি করে কাচ্চি।

অপ্রস্তুত মুখ করে বসে রইল কাচ্চি। বললো, সাহেব খাবেন না ?

তা সাহেব না খান আমি তো খাবই—তুই মুখ কালো করছিস কেন ?

আবদুল একটুকরো কাগজ এনে হাতে দিলো শিবানীর। সাহেব দিয়েছেন।

কাগজটা হাতে নিয়ে বুকটা ধক্ করে উঠল ওর। এটা কি বেরিয়ে যাওয়ার খবর পাঠানো ইন্দ্রনাথের। কিন্তু কাগজটা পড়ে ভারী আমোদবোধ করলো সে। একেবারে নতুন স্বাদ। ইন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়েছে— লাকটা দেরী করিয়ে দিচ্ছে। এক্ষুণি আসছি—

কাচ্চি গলা লম্বা করে শিবানীর হাতের চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে আচমকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেললো, কি মা ?

সাহেব যদি বেরিয়ে যাবার কথা লিখে থাকেন, এই মুহূর্তে বুঝি বাড়িটা তবে মরে যাবে।

কাচ্চির মনোভাব বুঝল শিবানী। কে কাচ্চির বুকে ওর প্রতি মায়ের মমতা ভরে দিয়েছে! সস্নেহে তার দিকে তাকালো শিবানী।

কিন্তু কাচ্চি ততক্ষণে উঠে পড়েছে। হাতের উল্টো পিঠে চুয়ানো ল্যাভেণ্ডারের তেলতেলে ভাবটাকে দু'হাতে ঘষতে ঘষতে বললো, হাত দু'টো মা আমারও মাখম হয়ে গেল। যাই এক বালতি কাপড় জাম জলেতলে তল করে রেখে এসেছে। এক্ষুণি না ধুলে যাবে রং নষ্ট হয়ে। তখন বলবে আবার কাচ্চি কি করে আমার দামী শাড়িটার এ সর্বনাশ করলি।

কাচ্চির এই বুদ্ধিটার জন্যই শিবানীর ওকে আরো পছন্দ। কথা যেমন বলে এবং বলায় এক এক সময় আবার না বলে এবং না বলিয়ে চমৎকার পার হয়ে যায়।

হাতটা এ-গালে ও-গালে বুলালো কাচ্চি—বললো, হাত দু'টো তোমার ক্রিম খেয়ে খেয়ে মাখম হলে হবে কি, গালের চামড়াটা যেন খা তোলা শিল পাথর।

যা মুখে মাখবার জন্য তোকে একটা ক্রিম দেবো।

কিছু হবে না এই কালো কুৎসিত মুখে মেখে।

কালো তো আ—

কি যে বলে মা! যেন আঁতকে উঠে থামিয়ে দিল কাচ্চি শিবানীকে।

কালো আমি তাও বলতে পারবো না ?

তুমি কালো মা। তোমার চাইতে সুন্দর আমি দেখি নি —

কাচ্চি ভালোবাসিস বলে অমন ডাহা মিথ্যে কথাটা বলিস নে রে।

এ কথার কি জবাব দিত কাচ্চি কে জানে। নীচের গাড়িবারা থেকে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল সে।

ইন্দ্রনাথের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসতে বসতে শিবানীর মনে পড়ে একটা ইংরেজী কথা: পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর হলো একটি সুন ফুল, তার চেয়ে সুন্দর হলো একটি সুন্দর মুখ, কিন্তু তারও চেয়ে সুন হলো একটি সুন্দর মন।

ইন্দ্রনাথের যদি এসে পড়ার সম্ভাবনা থাকত তবে শিবানীর এম ডাহা মিথ্যা বলিস না'র জবাবে কাচ্চি সবেগ মস্তক আন্দোলনে বল চাইত সে মিথ্যে বলছে না; তার মনোভাবে প্রকাশের এমন সুন একটা কথা আছে, তা তো কাচ্চি জানে না।

ইন্দ্রনাথ বারান্দায় এসে আর বললো না। গলার গেঞ্জী, গরা পাঞ্জাবী ভিজে ড্রেসিং গাউন পর্যন্ত ভিজে ওঠা পিঠ-বুক দেখিয়ে বলে দেখো অবস্থা। বসবার ঘরেও এয়ারকুলার না বসালে চলবে না এসো আমার ঘরে।

ইন্দ্রনাথ গিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলে তার পেছন পেছ গিয়ে ঢুকলো শিবানী। ঘরে ঢোকামাত্র শরীরটা জুড়িয়ে গেল শিবানীর মনে হলো ঘরে ঢুকল না তো যেন শীতল ঝরণার জলে শরী ডোবালো সে। আরামে বলে উঠলো শিবানী, আঃ।

পেছন থেকে দু' কাঁধে ধরে শিবানীকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ তার আরা কেদারায় বসিয়ে দিলো; বসে শিবানী বললো, তুমি ? ওর পায়ে তলার কার্পেটের ওপর বসতে যেতেই ইন্দ্রনাথকে বাধা দিলো

শিবানী বললো, না এখানে নয়।

কেন ?

আজ অনেক গল্প করব—

এখানে বসে গল্প করায় আপত্তি কি ?

এ ভাবে গল্প জমে না।

দেখো কেমন জমাই—

না, ইন্দ্রনাথকে দু'হাত ধরে আটকালো শিবানী। তুমি আবদুলকে বারান্দা থেকে একটা বেতের চেয়ার এনে দিতে বলো।

হাসল ইন্দ্রনাথ। বললো, ঠিক আছে।

কলিংবেল টিপতেই আবদুল এসে হাজির হলো। তাকে দিয়ে চেয়ার আনিয়ে বসলো ইন্দ্রনাথ। তারপর ড্রিঙ্কের থালাটা অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে বললো, তোমার বিশ্বপ্রকৃতি যে-নিয়মের বিধানে চলছে, তারই ছোটখাটো নিয়মের বিধানে ওটা ওখানে এসে রয়েছে। আমি কিন্তু এখনও ছুঁই নি।

কারণ ?

শিবানীর জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দিলো না ইন্দ্রনাথ। কি যেন ভাবতে লাগল শিবানীর দিকে তাকিয়ে।

শিবানী বললো, কিছু যেন ভাবছো মনে হচ্ছে।

ভাবছি মনে হচ্ছে—

তাই তো মনে হচ্ছে।

একটু ভাবছিলাম—

আমি আসবার আগে আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভেবেছ। আসবার পরও আবার সামনে বসে বসে ভাবছ। আমার সঙ্গে সবটাই ভাবনার ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।

শিবানী উঠে দাঁড়ালো। বললো, দেখা যাক তোমার ভাবনায় আমি সাহায্য করতে পারি কি না।

শিবানী জানে ইন্দ্রনাথের মনের দ্বন্দ্বটা কোথায় হচ্ছে। সে গিয়ে ড্রিঙ্কের থালাটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর চাবি তুলে নিয়ে সোডার বোতলটা খুলবার চেষ্টা করল টেনেটুনে। পারলো না। হুইস্কির বোতলটাও নয়। নিরাশ হয়ে বললো, না আমার দ্বারা হবে না। তোমার আবদুলকেই ডাকো।

ইন্দ্রনাথ দেখছিল শিবানী কি করে। বললো, আবদুলের দরকার হবে না। খুলতে হলে আমিই পারব।

খুলতে হবে যখন তখন খুলে দাও। আমি না হয় ঢালতে সাহায্য করি।

এখন থাক। শুধু থাক বলতে পারলো না ইন্দ্রনাথ। নিজের উপর এত জোর নেই।

শিবানী বললো, আচ্ছা বিরস মুখে বসে থাকবে। তার চাইতে—

বিরস মুখে বসে থাকব কেন। বললাম তো, দেখই না কেমন গল্প জমাই। তুমি কি ভাবো আমি মদের মুখেই কেবল সরস।

ছেড়ে দেবে ?

ইচ্ছে—

আমার জন্য ?

তোমার জন্য।

হেসে উঠল এবার শিবানী। বললো, আগে আমাকে ধরেই নাও তারপর না হয় একে ছেড়ো।

তোমাকে ধরি নি ?

পাগল। একে কি ধরা বলে।

একে কি বলে ?

একে বড় জোর ধরার মহড়া দেওয়া হচ্ছে বলা চলে—

উঠে এসে শিবানীর দু'কাঁধ দু'হাতে বলিষ্ঠ চাপে চেপে ধরে ইন্দ্রনাথ বললো, একে ধরা বলে ?

উঁহু একেও না।

শিবানীকে বুকের ওপর টেনে এনে আরো বলিষ্ঠ চাপে চেপে ধরলো ইন্দ্রনাথ। বললো, একে ?

শিবানী ঐ অবস্থায়ই মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, উঁহু, একেও না।

ইন্দ্রনাথকে যেন পাগলামোতে পেয়েছে। শিবানীর চোখে, মুখে, ঠোঁটে, চুলে চুম্বনের ঝড় বইয়ে দিতে দিতে তাকে নিয়ে কেদারার উপর বসিয়ে দিলো। আগের দিনেরই মতো কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে তার দু'পা বুকে তুলে নিয়ে চেপে ধরে বললো, একে ধরা বলে ?

শিবানী শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। তার শরীর দিয়ে যেন এই ঠাণ্ডা ঘরেও আগুন বের হচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, উঁহু, একেও বলে না।

মদ খায় নি তবু মনে হতে লাগলো ইন্দ্রনাথের—ভীষণ নেশা করেছে সে। চট করে ফের উঠে বসলো সে। শিবানীর কোলের ওপর দু' হাত রেখে বললো, আমায় নিশ্চয়ই অত মূর্খ তুমি ভাবছ না যে, তুমি কোন ধরাকে ধরা বলছ আমি বুঝতে পারছি নে। সে ধরাটা তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও শিবানী—

দু'চোখ বন্ধ করে শিবানী বোধ হয় ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো।

শিবানীর এই প্রার্থনা শুনে কি বিধাতাপুরুষ আবারও নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে হাতের পদ্মফুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ? মেঘের ওপর পদচারণ করতে করতে ভাবতে লাগলেন, শুভ-ইচ্ছা তো মানুষের মধ্যে আমিই জাগাই, কিন্তু জাগিয়ে আবার সে ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিই আমি কেন ? আমার চরিত্রেও কি কোন দুষ্টবীজ পোঁতা আছে ?

[ক্রমশ।

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রাতশ্রী মঞ্জিল

[৺নটবর মিত্তিরের ডায়েরি থেকে]

পেশা এ্যাটর্নীগিরি, নেশা কুস্তি। এই ভাবেই অনেকদিন ধরিয়া দিন কাটিতেছিল। কিন্তু গতকাল বিধাতা এ কি কাণ্ড ঘটাইলেন ? ? ? ? ?

জেনানাকে কুস্তি দেখাইব না বলিয়াছিলাম : শেষ পর্যন্ত সেই 'জেনানার' পাল্লাতেই পড়িতে হইল ?

ছান্নুদা'র পাল্লায় পড়িয়া কাল রবিবারের অতি প্রত্যূষে, এক রকম শেষ রাতে বলিলেই চলে, কুস্তি লড়িতে গিয়াছিলাম বাদ্‌শা পালোয়ানের কুস্তির আখ্‌ড়ায়। ঐ আখ্‌ড়ায় বাদ্‌শা পালোয়ানের সাগরেদদের সঙ্গে ছান্নুদা'র আখ্‌ড়ার কয়েকজন বাছাই করা কুস্তিগীরের 'ফ্রেণ্ডলি' অর্থাৎ কি-না দোস্তিপূর্ণ লড়াই এবং ছান্নুদা'র বিশেষ ব্যবস্থায় এ পক্ষে আমিই হইলাম প্রধান দ্রষ্টব্য। আমাকে 'দেখাইবার' জন্যই যেন তিনি ব্যস্ত। তিনি নিজেও যে কুস্তির একজন কত বড় ওস্তাদ, তাহা দেখাইবার গরজ তাঁহার যেন একেবারে নাই। তাই বাদ্‌শা পালোয়ানের প্রিয়তম সাগরেদ তরুণ পালোয়ান 'স্যামসন'-এর সঙ্গে আমাকে লড়াইলেন ! ছোকরা যে বিশেষ রকম বলবান তাহা দেহগঠন এবং ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলাম। উহার চোখে-মুখে চাতুরি এবং আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। আপাদমস্তক আমাকে কয়েক নজর দেখিয়া লইয়া সে বোধ করি আমাকে তেমন একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিল না, ভাবিল 'এই বাবুকে সহজেই কাবু করা যাইবে।' আর আমি উহাকে দেখিয়া কি ভাবিলাম ? উহাকে তুচ্ছজ্ঞান বা ভয়, এই দুয়ের কোনটাই করিলাম না। ভাবিলাম পালোয়ান এ্যাটর্নী বয়সে চল্লিশ পার হইয়া আসিলেও বাহুবল হারায় নাই, প্যাঁচ ঠেকাইবার এবং প্যাঁচ কষিবার কায়দা ভোলে নাই, সেইটি এই নওজওয়ান পালোয়ানকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ছোকরার স্যামসন নামটা নাকি কোন এক সাহেবের দেওয়া। উহার কুস্তির কায়দা আর গায়ের জোর দেখিয়া ভীষণ খুশি হইয়া সাহেব উহাকে বাহবা এবং স্যামসন নাম দিয়াছিলেন। সাহেবের দেওয়া নামের গর্বে গরবী কুস্তিগীর স্যামসন আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়া কয়েকবার নিজেই জব্দ হইয়া বিষম খেপিয়া গিয়া শেষটায় বেইমানি করিল। অমন বিশ্রী বেইমানির কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। হঠাৎ আমার সম্মুখে নত হইয়া কিছু গুঁড়া মাটি হাতে লইয়া সজোরে আমার দুই চক্ষু লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল।

অব্যর্থ তাহার লক্ষ্য। চোখে মাটি ঢুকিয়া যাওয়ায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া দুই হাতে দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিলাম। মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হইতে বাধ্য হইলাম। আমার সেই একমুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে বিদ্যুদ্‌গতিতে আমার পিছনে চলিয়া গিয়া শক্ত হাতের পাতাকে ভোঁতা অস্ত্রের মত ব্যবহার করিয়া স্যামসন আমার ঘাড়ের বোধ করি এক মর্মস্থানেই আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল কে যেন হঠাৎ এক বিদ্যুতের চাবুক চালাইয়াছে। অথবা যেন মাথা হইতে পা পর্যন্ত স্নায়ুর মধ্য দিয়া আগুনের একটা হল্কা বহিয়া গেল। পায়ের তলায় পৃথিবী টলিয়া উঠিল। আমি জ্ঞান হারাইয়া কুস্তির আখড়ার কোপানো নরম মাটির উপর পড়িয়া গেলাম। তখন সূর্য পূবদিকে মুখ তুলিয়াছে মাত্র ; আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু রোদ ওঠে নাই।

কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় মাটির উপর পড়িয়াছিলাম, তাহার পর

অনেকক্ষণ ধরিয়া কি হইল, কিছুই খেয়াল নাই। জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল, চোখ মেলিলাম, মেলিয়া দেখি আমার তলায় কুস্তির আখড়ার নরম মাটি নহে, একটি পালঙ্কের উপর নরম বিছানা। মুক্ত আকাশের তলায় কুস্তি লড়িতেছিলাম, উপরে তাকাইয়া আকাশ দেখিলাম না, দেখিলাম ঘরের ছাদের কড়ি-বরগা। আমার চারিদিকে ঘরের দেয়াল, অনতিদূরে একটা মস্ত জানালা খোলা রহিয়াছে, সেই জানালা দিয়া যে রোদ ঢুকিতেছে, মনে হইতেছে, তাহা বিকালের পড়ন্ত রোদ। বিকালের রোদের রং এবং ভাব আমার পরিচিত। বুঝিতে পারিলাম বিকাল হইয়াছে।

(এখন যেমন ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ঘরে বসিয়া গতকালের কথা ভাবিতে ভাবিতে এ জীবনের এক অদ্ভুত, অভাবিত পূর্ব, স্মরণীয় দিনের কথা লিখিতেছি, কাল বিকালবেলা পরের ঘরে পরের বিছানায় শুইয়া শুইয়া কিন্তু মাথাটাকে এমন ঠাণ্ডা রাখিতে পারি নাই।)

ভাবিলাম, আমি এখানে কেন? কাহার ঘরে? কাহার বিছানায়? কি করিয়াই বা এখানে আসিলাম? বোধ করি মাথাটা মন ওঠার ঝিম্-ঝিম্ করিয়া ওঠার ফলে, অন্তত তাহার অব্যবহিত পরেই বেজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম, ভোর হইতে এই বিকালতক একটানা অজ্ঞান হইয়া থাকিবার পর জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াও সেই ঝিম্-ঝিম্ ভাবটা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই!

কয়েকমুহূর্ত কাটিবার পর মনে পড়িল বাদশা পালোয়ানের আখড়ার মাটির উপরে ভোরে জ্ঞান হারাইয়াছিলাম।

চক্ষু মেলিয়া ছান্নুদা'কে দেখিতে পাইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু কোথায় ছান্নুদা'। কোথায় বা আমাদের আখড়ার অন্য কেহ? মনে হইল অপরিচিত ঘরে আমি একা, একেবারে একা! মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কার উদয় হইল। আমি কি বন্দী? আমি কি বিপন্ন? আমার কি কোনরূপ শঙ্কার কারণ আছে? কিন্তু তাহা থাকিলে কি ছান্নুদা' আমাকে বিপদের মুখে একা ফেলিয়া যাইতেন? অথবা···

নানারূপ দুশ্চিন্তা দল বাঁধিয়া মগজে ভূতের নৃত্য করিতে আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় আমার শিয়রের পিছন দিকে শুনিলাম বাদশা পালোয়ানের পরিচিত কণ্ঠস্বর: 'বাবুজি!'

সেই কণ্ঠস্বরে যেন আশ্বাসের আশ্চর্য যাদু ছিল। আমি ভরসা পাইলাম। দেহ তখনও অবসন্ন; ঘাড়ের চোট মগজকেও কিছুটা ঝাঁকাইয়া দিয়াছিল, তাহার জের তখনো পুরাপুরি কাটে নাই।

উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে যাইব, তাহা টের পাইয়াই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া পালোয়ান বলিলেন, 'উঠিবেন না, উঠিবেন না বাবুজি। হেকিম সাহেবের মানা আছে। উঠিলে আপনার লোকসান হইতে পারে।'

পালোয়ানের কণ্ঠস্বরে আমার জন্য গভীর উদ্বেগ, মিনতি এবং আদেশের সুর একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমি তাঁহার কথা না রাখিয়া পারিলাম না, বিশেষ যখন ক্ষতির ভয় আছে, হেকিম সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বুঝিলাম, হেকিম সাহেবের হুকুম ছাড়া বিছানা ছাড়িয়া ওঠা চলিবে না।

প্রশ্ন করিলাম, 'এ আমি কাহার গৃহে আনীত হইয়াছি, পালোয়ান সাহেব? আপনার?'

বাদশা পালোয়ান আমার দৃষ্টির পিছনে থাকিয়াই বলিলেন, 'না বাবুজি, এ বান্দার গরিবখানা নহে। এ দৌলতখানার মালিক—'

মালিকের নাম বলিতে বোধ করি পালোয়ানের কোন কারণে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ হইতেছিল। চেষ্টা করিয়া সেই সংকোচের বাধা কাটাইয়া উঠিয়া পালোয়ান বিশেষ মর্যাদার সুরে উচ্চারণ করিলেন: 'বাতাসী বিবি।'

ভোরে সাগরেদ শ্যামসনের হাতের আচমকা আঘাত যেমন বিদ্যুতের মত চমক লাগাইয়াছিল, বিকালবেলায় ওস্তাদ বাদশা পালোয়ানের মুখের এই কুখ্যাত নামটি উচ্চারণে তেমনি ধাক্কা খাইলাম! বাতাসী বিবির মোহিনী শক্তি, দুঃসাহসিকতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পুরুষ-সুলভ বাহুবল, বিবেকহীন ক্ষমাহীন নির্মমতা, সীমাহীন লোভ, বহু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এমন কি বহু ক্ষমতাবান রাজকর্মচারীর উপরও অসাধারণ গোপন প্রভাব ইত্যাদির কথা বহু শুনিয়া শুনিয়া এবং বহু প্রমাণ ও উদাহরণাদি পাইয়া মনে এই নামটির উপর নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। এই বিতৃষ্ণার সহিত কিঞ্চিৎ ভীতিও যে মিশ্রিত ছিল না এমন নহে। দুষ্কৃতসাধনে দক্ষ বিরাট দলের একচ্ছত্র নেত্রী বাতাসী বিবি, যে দলের সমুদ্রে নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায় আসিয়া মিশিয়াছে, যে দলের প্রত্যেকটি মানুষ, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, বাতাসী বিবির কথায় ওঠে-বসে। বাতাসী বিবির মুখের একটি কথায় জান দিতে পারে, জান নিতে পারে।

কোথাও কোন দুঃসাহসিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলেই—তাহা খুনজখমই হউক, লুঠতরাজই হউক, বা যাহাই হউক না কেন—অনেকে সন্দেহ করিতেন ইহা বাতাসী বিবির দলের কাণ্ড। ইংরাজি 'ইভিল' (evil) শব্দটি দ্বারা যাহা বোঝায়, পাপ, অকল্যাণ, কু, অমঙ্গল প্রভৃতি কোন প্রতিশব্দ দিয়া তাহা যথেষ্ট ভাবে বুঝানো যায় না। ঈশ্বরবিরোধী শক্তিকে বাইবেলে শয়তান বলা হইয়াছে: ঈশ্বরের যাহা কিছু অভিপ্রেত, শোভন, সুন্দর, মঙ্গলময়, তাহার ঠিক বিপরীত ঘটাইতে শয়তান বদ্ধপরিকর। শয়তানের যাহা ধর্ম তাহাই 'ইভিল'। এই 'ইভিল' শব্দটিই মনের ভিতরে বাতাসী বিবির নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গাঁথিয়া গিয়াছিল। বাতাসী বিবিকে শয়তানের স্ত্রী-সংস্করণ বলিয়াই ভাবিয়া নিয়াছিলাম। তাহাকে চোখে দেখি নাই, দেখিবার ইচ্ছাও ছিল না। যাহার নামের প্রতি এমন মর্মান্তিক ঘৃণা, বিতৃষ্ণা এবং অশ্রদ্ধা, সেই বাতাসী বিবির বাধ্যতামূলক আতিথ্য আমার ঘাড়ে চাপিয়াছে। বিধাতার এ কি শয়তানী? ইহা কি দৈব যোগাযোগ! না ইহার পিছনে কোনও চক্রান্ত আছে? স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই, মন একটা অস্বস্তিকর উদ্বেগে ভরিয়া উঠিল। সে উদ্বেগ আশংকার খুবই কাছাকাছি। আমার মুখ হইতে যেন আমার অজ্ঞাতসারেই বাদশা পালোয়ানের উচ্চারণের পূর্ণ প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলাম: 'বাতাসী বিবি!!!'

আমার পছন্দের বিরুদ্ধে যে আমি এখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তিনিই সেজন্য দায়ী, এই লজ্জায় বিষম লজ্জিত বাদশা পালোয়ান যেন আমার কণ্ঠস্বরের ধাক্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, 'কিন্তু আমি এখানে কেন পালোয়ান সাহেব? ছান্নুদা' কোথায়? আমার অন্য সঙ্গীরাই বা কোথায়?'

বাদশা বলিলেন, 'বাবুজি, আপনার উদ্বেগের বা ভয়ের কিছুমাত্র কারণ নাই। আপনার ভালর জন্যই বাতাসী বিবির হুকুমে হেকিম সাহেবের পরামর্শে আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে। অবশ্য যে দুর্ঘটনার ফলে আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে, তাহা যে ঘটিবে তাহা খোদা ভিন্ন অন্য কাহারও জানা ছিল না। আমার বেওকুফ সাগরেদের বেইমানির জন্য লজ্জায় আমি আপনাকে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন তবে আপনার সামনে গিয়া বসিয়া সব কথা আপনাকে খুলিয়া বলি।'

নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম বাদশা পালোয়ান আন্তরিক, খাঁটি, নির্ভরযোগ্য, তাঁহার মধ্যে একটুও ফাঁক নাই। তাঁহার ক্ষম প্রার্থনায় আমিই লজ্জিত বোধ করিয়া বলিলাম, ছি ছি, সে কি কথা, ওস্তাদ? আপনি ক্ষমা চাহিয়া আমাকে লজ্জা দিতেছেন। শ্যামসন রগচটা ছেলেমানুষ, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একটা বেইমানি করিয়া বসিয়াছে, তাহাতে আপনার দোষ কোথায়? আপনি নিশ্চয় তাহাকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেন নাই।'

বাদশা পালোয়ান আমার শিয়রের পিছনে একটা মোড়ার উপর বসিয়া ছিলেন। এইবার এদিকে আসিয়া আমার মুখোমুখি বসিলেন। আমাকে আরো কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া—হেকিম সাহেবের সেইরূপই নির্দেশ—বাদশা পালোয়ান আমাকে বিবরণ শুনাইলেন।

বাদশা পালোয়ান বলিলেন, 'বাবুজি, ছানুবাবুর মুখে আপনার কথা শুনিয়াই আপনাদের আখড়ায় আপনার কুস্তি দেখিতে গিয়েছিলাম। আপনাকে দেখিয়া এবং আপনার আশ্চর্য লড়িবার কায়দা দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলাম যে, বিষম লোভ হইল আপনার কুস্তি বাতাসী বিবিকে দেখাইতেই হইবে। বিবি সাহেবা কুস্তির বড় সমঝদার আর কদর দেন; আমার কুস্তির আখড়া বিবি সাহেবারই মেহেরবানি। তাঁর দরাজ হাতের দয়ায় আমাদের কিছুর অভাব নাই, আমরা কেবল কুস্তি কসরতেই লাগিয়া থাকি সবকিছু জোগান বাতাসী বিবি। তিনি নিজেও—বিশ্বাস করুন—কুস্তিবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ। আপনার মত এমন একটি আশ্চর্য জিনিষ—যাহা আমাকেও তাক লাগাইয়াছে—বাতাসী বিবিকে দেখাইতে না পারিলে মন খুশি হইবে না। তাই আমার আখড়ায় আপনাদের কুস্তির বন্দোবস্ত করি। আপনাকে দেখাইবার জন্য কুস্তি লড়িতে আপনার আপত্তি, তাই বাতাসী বিবি আখড়ার ওধারের বাড়ির জানালার আড়াল হইতে লুকাইয়া আপনার কুস্তি দেখিলেন। দেখিয়া তিনি আমার চাইতেও বেশি মুগ্ধ হইলেন। বাঙালীবাবুও যে এমন আশ্চর্য কুস্তি লড়িতে পারে ইহা তাঁহার কল্পনার বাহিরে ছিল। বাতাসী বিবি আড়াল হইতে কুস্তি দেখিতেছেন আপনি জানিতেন না, কিন্তু শ্যামসন জানিত। শ্যামসন যেমন আমার পেয়ারের সাগরেদ—আপনি নিজেই তো বুঝিতে পারিয়াছেন শ্যামসন অসাধারণ কুস্তিগীর—তেমনি বাতাসী বিবিও তাহার বড় তারিফ করিতেন, শ্যামসনের উপর বিশেষ মেহেরবানি আর নেকনজর ছিল বিবি সাহেবার। আপনাকে কুস্তিতে কাবু করিয়া বাতাসী বিবির বাহবা পাইবে, এই আনন্দেই শ্যামসন আপনার সঙ্গে লড়িতেছিল। কিন্তু সে দেখিল বারবার সে উল্টা আপনারই শক্তি আর কৌশলের কাছে জব্দ হইতেছে, আর বাতাসী বিবির চোখে ততই খেলো হইতেছে। আপনি আমার বাহবা পাইতেছেন—ভাল কুস্তি দেখিলে সাবাশ না দিয়া আমি থাকিতে পারি না—বাতাসী বিবিও নিশ্চয় আড়াল হইতে মনে মনে আপনার বড় তারিফ করিতেছেন, যার মুখের একটুকরা তারিফ পাইবার জন্য সে অনায়াসে জান দিতে পারে; যিনি আদর করিয়া তাহাকে 'বাহাদুর' বলিয়া ডাকেন, সেই বাতাসী বিবির কাছে সে বাহাদুরী হারাইতেছে, ইহাতে সে খ্যাপা কুত্তার মত হইয়া উঠিল। তারপর সে যে নোংরা বেইমানি করিল, তাহা তো আপনি জানেনই। আপনি জানেন না, বেইমান শ্যামসনকে আমি কি ভীষণ থাপ্পড় লাগাইয়াছিলাম, যাতে অত বড় জোয়ানও কিছুক্ষণ বেহুঁশের মত পড়িয়া ছিল। কিন্তু আপনাকে নিয়াই আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। আপনি কুস্তির মাটিতে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া আছেন; আমার সাগরেদ আপনার ঘাড়ে যে মার মারিয়াছিল সে মার আমারই শেখানো। অমন আঘাতে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। আপনাকে ঐ ভাবে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া বাতাসী বিবিও আড়াল থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিলেন, কুস্তির মাটির উপর উঠিয়া গিয়া আপনার সামনে বসিয়া পড়িয়া নিজের হাতে আপনার ঘাড়ে হাত জোরে বুলাইয়া দিলেন, যেখানে বেইমান শ্যামসন আঘাত করিয়াছিল। আপনি তাহা জানেন না। আপনি তখন বেহুঁশ। তারপর বাতাসী বিবির হুকুমে আপনাকে এখানে নিয়া আসা হইল, সঙ্গে আসিলেন ছানুবাবু। আমিও। আপনাদের আখড়ার অন্যান্য যাঁহারা কুস্তি লড়িতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন। হেকিম সাহেব আসিলেন, বাতাসী বিবির হেকিম সাহেব, যিনি ইচ্ছা করিলে নাকি মরা মানুষও বাঁচাইতে পারেন, এরূপ কথা লোকে বলে, এমনই আশ্চর্য তাঁহার চিকিৎসা। নিজের হাতে তিনি আপনার ঘাড়ে মালিশ করিয়া দিলেন মোক্ষম দাওয়াই।

বাতাসী বিবি দাঁড়াইয়া রহিলেন আপনার মুখের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাইয়া—বাতাসী বিবিকে অভয় দিয়া হেকিম সাহেব বলিলেন: খোদার মেহেরবানিতে ভয়ের কিছু কারণ নাই, একদিনের পুরা বিশ্রামেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। আপনি এ সবের কিছুও জানেন না, আপনি তখনও বেহুঁশ।'

'তারপর?'

'বোমভোলা পাঠকের ডাক পড়িল।'

'সে কে?'

'এ বাড়ির বাগানের বুড়া মালী, বাতাসী বিবির বড় প্রিয়। হেকিম সাহেবের দেওয়া কয়েক রকম শুষ্ক ফল জলে ফুটাইয়া সেই জল সে আপনাকে খানিকটা খাওয়াইয়া দিল। হেকিম সাহেব বলিলেন, ইহাতে দাওয়াইর কাজ হইবে। বিকালতক আপনাকে ঘুমও পাড়াইয়া রাখিবে। বিকালে আপনার ঘুম ভাঙিবে। দেখুন, ঠিক তাহাই হইয়াছে। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। প্রায় সারাক্ষণ কি উদ্বেগ নিয়াই না আপনার মাথার পিছনে বসিয়াছিলাম।'

প্রশ্ন করিলাম ছানুদা' কোথায়। বাদশা পালোয়ান বলিলেন, বুড়া মালী বোমভোলা পাঠক ছানুদা'র স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল, স্নানাহার সারিয়া বাতাসী বিবির ব্যবস্থা অনুসারেই পাশের ঘরে তিনি বিছানায় বিশ্রাম করিতেছেন।

মুখ হইতে হঠাৎ প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল : 'বাতাসী বিবি ?'

বাদশা পালোয়ান বলিলেন, 'অন্দরে আছেন। আমি যতক্ষণ গাশল করিতে আর খানা খাইতে অন্যত্র ছিলাম, ততক্ষণ তিনি নিজেই আপনার মাথার পিছনে বসিয়া পাহারা দিয়াছিলেন।'

আমি বিস্ময় বোধ করিয়া বলিলাম, 'সে কি ?'

বাদশা পালোয়ান বোধ করি আমার বিস্ময়ের কারণ কিছুটা বুঝিলেন। বলিলেন, 'বিবি সাহেবার ভাবনা আমার চাইতে কম নয়। তাঁহাকে দেখাইবার জন্যই আপনাকে কুস্তি লড়াইতে আনিয়াছিলাম। আপনার জান গেলে বা বড় কোনরকম লোকসান হইলে—তিনি মনে করেন, তাঁহারও কম দায়িত্ব নয়।'

খুন জখম যাহার দলের কাছে কিছুই নয়, সেই কুখ্যাত বাতাসী বিবির এত সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ! আমার মনে দ্বিধা-সন্দেহ, কিন্তু মনে হইল বাদশা পালোয়ানের মনে কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা নাই। ভাবিলাম বাদশা পালোয়ান কুস্তি লইয়াই ব্যস্ত, স্থূলবুদ্ধি সহজবিশ্বাসী মানুষ, বাতাসী বিবির চরিত্র-রহস্য বুঝিবার মত সূক্ষ্ম বা অন্তস্পর্শী বুদ্ধি তাঁহার থাকিবে, এরূপ আশা করাও বাতুলতা।

ভাবিতে লাগিলাম আমাকে এখানে আনিবার জন্য গোটা ব্যাপারটাই কি শয়তান বাতাসী বিবির চক্রান্ত ? ষড়যন্ত্র ? এই ষড়যন্ত্রে কি বাদশা পালোয়ানও সচেতন অংশীদার ? না তিনি বাতাসী বিবির হাতের পুতুল মাত্র এবং বাতাসী বিবির মতলব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ? যদি সচেতন অংশীদার হইয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে তিনি খুব ভাল অভিনেতা।

ভাবিতে লাগিলাম আমি কি বাতাসী বিবির বন্দী হইলাম, অর্থাৎ খপ্পরে পড়িলাম ? বাদশা পালোয়ানের আখড়ার সঙ্গে বাতাসী বিবির কিছুমাত্র ছোঁয়াচ আছে জানিলে বা সন্দেহ করিলে আমি কখনোই সেখানে কুস্তি লড়িতে আসিতে রাজি হইতাম না। কি কুক্ষণে না জানিয়া রাজি হইয়াছিলাম!

বাতাসী বিবি কি আমার উপর প্রতিশোধ নিবার জন্য এখানে আনিয়াছে, কারণ সে টের পাইয়াছে তাহার নাম শুনিলেই আমার মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার উদয় হয় ? কিন্তু একজন অ্যাটর্নী তাহাকে ঘৃণা করিলে তাহার কি আসে যায় ?

অথবা হয় তো সে আমাকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিয়াছে মুক্তিপণরূপে একটা মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করিবে বলিয়া। পাপীয়সী জানে আমার অ্যাটর্নীগিরির আয় প্রচুর, কিন্তু ব্যয় করিতে আমি তেমনি বেশি ব্যস্ত নহি। সুতরাং আমাকে এভাবে বেকায়দায় ফেলিয়া একটা বড় রকমের মুক্তিপণ দাবি করাটা তাহার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে এবং সেই দাবী মিটাইতে রাজি না হইলে আমাকে হত্যা করিতেও শয়তানের এই পূজারিণীর বাধিবে না।

ভাবিলাম এই কুস্তির আখড়াটাও হয় তো বাতাসী বিবির অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত গুণ্ডা তৈয়ারির কারখানা মাত্র। এইরূপ নানা উদ্বেগজনক চিন্তায় জর্জরিত হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িবার ইচ্ছা হইতেছিল। আমার মতলব বোধ করি আমার ভাবভঙ্গী হইতে টের পাইয়া বাদশা পালোয়ান বলিলেন, 'উঠিবেন না, বাবুজি। হেকিম সাহেবের হুকুম না হওয়াতক উঠিবেন না। বিকালে আপনার ঘুম ভাঙ্গিলে আর ভয়ের কারণ নাই, একথা তিনি বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাবধানেরও মার নাই।'

'কিন্তু বাড়ি ফিরিব কখন, পালোয়ান সাহেব ?'

'সে কথা বলিবেন হেকিম সাহেব আর বাতাসী বিবি। মনে করুন আপনি হাসপাতালে আছেন। এই দু'জনের হুকুম ছাড়া আপনার ছুটি মিলিবে না।' [ক্রমশ।

মহাভারতের গল্প

শ্রীসুলতা কর

ঋষি বিশ্বামিত্রের শিক্ষা

বিশ্বামিত্র চিরকালই ঋষি ছিলেন না। প্রথমে তিনি ছিলেন কান্যকুব্জ দেশের রাজা। ধন, ঐশ্বর্য, সৈন্যবল কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। রূপ, গুণের তাঁর তুলনা ছিল না। কিন্তু অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর একটি বিশেষ দোষ ছিল।

ক্ষমতার অহঙ্কারে তিনি সব লোককে তুচ্ছ করতেন। বিনয়, ধৈর্য এসব গুণ তাঁর চরিত্রে একেবারে ছিল না।

রাজা বিশ্বামিত্র খুব শিকার করতে ভালবাসতেন। একদিন তিনি সৈন্য সামন্ত দলবল নিয়ে ঘোর বনে শিকার করতে গেলেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বন তোলপাড় করে অসংখ্য বাঘ, ভালুক, হাতি, হরিণ মারতে মারতে তিনি ও তাঁর সৈন্যসামন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

তখন রাজধানীতে ফিরে যাবার জন্য রাজা বিশ্বামিত্র আদেশ দিলেন।

এমন সময় তাঁর সেনাপতি সভয়ে বললেন—'মহারাজ, আমরা রাজধানীতে ফিরে যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি। ঘোর বনে এসে পড়েছি। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে,—এখন কি করব পরামর্শ দিন।'

বিশ্বামিত্র বললেন—'আমরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খিদেয়-তেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠেছি। খুঁজে দেখ যদি কোন ঋষির আশ্রম পাও ত' সেখানে চল। ঋষিরা সব সময় অতিথি-সৎকার করেন।'

রাজার কথা শুনে সেনাপতি দলবল নিয়ে খুঁজতে বেরোলেন। কিছুক্ষণ খুঁজতেই বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম পেয়ে গেলেন। তখন রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্যসামন্ত, দলবল নিয়ে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

সেকালে ঋষির আশ্রমে অতিথিদের সম্মান দেবতার সম্মানের তুল্য ছিল। বশিষ্ঠ ঋষি এই সব মাননীয় অতিথিদের দেখে ব্রস্তব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। রাজা বিশ্বামিত্র পথ হারিয়ে ফেলেছেন শুনে, বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—'মহারাজ, রাত গভীর হয়েছে। এখন এই বনের মধ্য থেকে পথ খুঁজে বার করা কঠিন। আজ রাতের মত আমার আশ্রমে থেকে যান। কাল সকালে আমার শিষ্যেরা আপনাকে রাজধানীর পথ চিনিয়ে দেবে।'

বিশ্বামিত্র ভাবলেন—এই ঋষির আশ্রমে যে খাবার খাব, আর যে বিছানায় শোব তাতে আমাদের খুবই কষ্ট হবে। রাজকীয় ঐশ্বর্যে আমরা অভ্যস্ত, সে সব আর এই গরীব ঋষি কোথায় পাবেন?

কিন্তু কি আর করা যায়। উপায় যখন নেই, তখন রাজি হতেই হবে। এই ভেবে বিশ্বামিত্র বললেন—'তাই হবে বশিষ্ঠ ঋষি। আপনার আতিথ্য স্বীকার করলাম। আজ রাত এখানেই কাটাব।'

বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখের ভাব দেখে মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন—'মহারাজ, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনাদের সেবার কোন ত্রুটি হবে না।'

এখন বশিষ্ঠ ঋষি পাতার কুঁড়েঘরে থেকে গরীবের মত দিন কাটাতেন বটে, কিন্তু তাঁর আশ্রমে একটি মহামূল্যবান জিনিস ছিল। এই জিনিসটি হল একটি স্বর্গের গরু, তুষারের মত সাদা তার গায়ের রং, কুচকুচে কালো দু'টি ডাগর চোখ, কোমল তার দেহের গড়ন। বশিষ্ঠ ঋষি এই কামধেনুকে দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। একে তিনি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করতেন। আদর করে নাম রেখেছিলেন নন্দিনী। নন্দিনীর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, বশিষ্ঠ ঋষি তার কাছে যখন যা চাইতেন, তখন তাই পেতেন। স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে এমন কোন জিনিস ছিল না, যা নন্দিনী দিতে পারে না।

বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে এসে নন্দিনীকে ডাকলেন। নন্দিনী ছুটতে ছুটতে কাছে এল। বশিষ্ঠ ঋষি তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মা নন্দিনী, মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁর দলবল নিয়ে আমার অতিথি হয়েছেন। তুমি তাঁদের সেবার উপযুক্ত আয়োজন এখনি করে দাও।' নন্দিনী ঠিক মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত। নন্দিনী বলল—'বাবা, কিছু ভাববেন না। আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি!' এই বলে সে তিনবার হাম্বারব করে চীৎকার করে উঠল। অমনি এক অদ্ভুত ব্যাপার হল! প্রথম হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে হাজার হাজার সোনার পাত্রেভরা রাজভোগ, মিষ্টান্ন, ফল বার হয়ে এল। দ্বিতীয় হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে হাজার হাজার দামী মখমলের বিছানা বার হয়ে এল। তৃতীয় হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে হাজার হাজার দাস-দাসী রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর দলবলের সেবা করবার জন্য বেরিয়ে এল।

—তখন বশিষ্ঠ ঋষি রাজা বিশ্বামিত্রকে ও তাঁর সৈন্য-সামন্তদের সেই সব রাজভোগ খাবার জন্য ও তারপর মখমলের বিছানায় শুয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্য অনুরোধ করলেন।

রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্য-সামন্তরা পরম আনন্দে সেই রাজভোগ খেলেন। সেই ফুলের মত নরম বিছানায় শুয়ে অগাধে ঘুমিয়ে শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করলেন। দাস-দাসীরা তাঁদের সারাক্ষণ সেবা করতে লাগল।

পরদিন ভোর হল। বিশ্বামিত্র ঘুম ভেঙ্গে উঠেই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সাজ-পোষাক পরে আশ্রম ছেড়ে রাজধানীর দিকে চললেন।

বশিষ্ঠের শিষ্যেরা পথ দেখিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে চললেন।

যাবার সময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষিকে বললেন—'হে ঋষি, কাল আপনি যেভাবে অতিথি সংকার করেছেন, যে অমৃতের মত খাবার খাইয়েছেন, যে সুন্দর নরম বিছানায় শুইয়েছেন, তার জন্য কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। এখন যাবার সময় আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আপনার ওই কামধেনু নন্দিনীকে আমায় দান করুন। কাল রাতে ওর অদ্ভুত সব ক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। ওর বদলে আপনি যত টাকা চান দেব, আমার অর্ধেক রাজত্ব পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।'

বিশ্বামিত্রের অনুরোধ শুনে বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—'মহারাজ, অতিথি দেবতার মত সম্মানীয়। অতিথি যা চান তাঁকে তাই দেওয়া উচিত, কিন্তু তবুও আপনার এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না। তার কারণ আপনাকে বলছি শুনুন। কামধেনু নন্দিনীকে আমি দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। প্রায়ই আমার আশ্রমে রাজা-মহারাজা এসে অতিথি হন। তাঁদের সেবা করবার জন্য যে রাজভোগ আর যে সব বিলাসদ্রব্য দরকার হয় সে সবই আমি নন্দিনীর কাছ থেকে পাই। তা ছাড়া আমাকে প্রায়ই বড় বড় যজ্ঞ করতে হয়, তাতে দেবতা, ঋষি, রাজা, মহারাজা ও সাধারণ লোক সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। সে সব জিনিস নন্দিনী আমাকে দেয়। নন্দিনীকে দান করলে আমার অতিথি সংকার করা ও যজ্ঞ করা দুই-ই বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং কেন আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না, সে-কথা আপনি বুঝবেন এবং আমায় ক্ষমা করবেন। আর ধার্মিক ঋষিরা কখনও টাকার লোভে ভোলে না, এ-কথা আপনি জানেন। সুতরাং আপনার অর্ধেক রাজত্বের লোভে আমি নন্দিনীকে দেব না তা বুঝতেই পারছেন। এই বলে বশিষ্ঠ ঋষি চুপ করলেন।

বশিষ্ঠ ঋষির কথা শুনে রাজা বিশ্বামিত্র রাগে জ্বলে উঠলেন। দেশ-বিদেশের রাজারা পর্যন্ত তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস পায় না। আর সামান্য একজন গরীব ঋষি কি না তাঁকে অগ্রাহ্য করছে।

বিশ্বামিত্র কঠোর সুরে বললেন—'এই কামধেনু নন্দিনীকে দিতেই হবে। আমি শেষবার অনুরোধ করছি। যদি ভাল বোঝেন ত' দিয়ে দিন। নয়ত আমার সৈন্যেরা জোর করে এখুনি ওকে নিয়ে যাবে। আপনি কি আমার সঙ্গে ক্ষমতায় পারবেন?'

বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—'আমি গরীব ঋষি, আমার কি আর ক্ষমতা। তবে স্বেচ্ছায় নন্দিনীকে আমি দেব না। ইচ্ছা হয়ত জোর করে কেড়ে নিতে পারেন।'

এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র আরও রেগে উঠলেন। এত বড় স্পর্ধা গরীব ঋষির যে সে তাঁর সৈন্যবল অস্ত্রবলকে ভয় পায় না।

চীৎকার করে বললেন—'সেনাপতি সৈন্যদের বল নন্দিনীকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যাক। ওর বাছুরকেও মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাক।'

রাজার আদেশ শুনে সেনাপতি সেনাদের হুকুম দিলেন। সেনারা ছুটে এসে নন্দিনীকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে, লাঠি দিয়ে মারতে মারতে টানতে লাগল। লাঠির আঘাতে নন্দিনীর ফুলের মত কোমল শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু তবুও সে এক পা-ও নড়ল না, কাতর সুরে কাঁদতে কাঁদতে নন্দিনী বশিষ্ঠকে বলল—'বিশ্বামিত্রের সৈন্যেরা এভাবে আমায় মারছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনি এদের কিছুই বলছেন না! তবে কি আপনি আমাকে স্নেহ করেন না। আমি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে যাই, এই কি আপনি চান।'

বশিষ্ঠ ঋষি নন্দিনীর অভিমান-ভরা কথা শুনে বললেন—'মা, নন্দিনী, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করি, সে-কথা তুমি জান। আমি তোমাকে আশ্রম থেকে যেতে দিতে চাই না। কিন্তু রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্য দিয়ে জোর করে তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমি গরীব ঋষি অস্ত্রবল, সৈন্যবল নেই। কেমন করে তাদের বাধা দেব বল।'

বশিষ্ঠ ঋষির কথা শুনে নন্দিনী বলল—'বাবা, বুঝলাম—আপনি আমাকে যেতে দিতে চান না। এখন চেয়ে দেখুন কার সাধ্য আপনার নন্দিনীকে কেড়ে নেয়।'

নন্দিনীর কথা শেষ হতে-না-হতে এক অদ্ভুত ব্যাপার আরম্ভ হল। হঠাৎ নন্দিনীর শরীর বাড়তে বাড়তে বিরাট পাহাড়ের মত হল, আর সেই শরীর থেকে প্রচণ্ড আগুনের হল্কা বেরোতে লাগল। তার দুই চোখ প্রকাণ্ড বড় হয়ে দু'টো আগুনের গোলার মত হল। সেই চোখ থেকেও ঝলকে ঝলকে আগুন বেরোতে লাগল। তারপর নন্দিনী ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সেজে লক্ষ লক্ষ তেজস্বী সেনা নন্দিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারা বাইরে এসেই বিশ্বামিত্রের সেনাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করল।—এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্রের সেনারা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তবুও নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

কিন্তু কি প্রচণ্ড বিক্রম নন্দিনীর সেনাদের। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিশ্বামিত্রের সব সেনাদের হারিয়ে দিল। এমন ভীষণ ভাবে বিশ্বামিত্রের সেনারা মার খেল যে, তারা নন্দিনীকে আর তার বাছুরকে ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। রাজা বিশ্বামিত্র ছুটে পালাতে লাগলেন। পিছনে পিছনে নন্দিনীর সেনারা তাড়া করে চলল। একটু পরে বিশ্বামিত্র ও তাঁর সেনারা সভয়ে চেয়ে দেখল যে, নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে ঘিরে ফেলেছে, আর পালাবার উপায় নেই। এখুনি বুঝি প্রাণে মেরে ফেলে। বিপদে পড়ে রাজা বিশ্বামিত্র বুঝলেন, রাজা হয়ে অহঙ্কার করার ফল, বল ও দর্প দেখানোর ফল কি রকম বিষময় হতে পারে। যে বশিষ্ঠ ঋষি আশ্রয় দিয়ে অতিথি সংকার করলেন, ক্ষমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁর শত্রুতা করার ফল কেমন সাংঘাতিক হল। কিন্তু এখন আর ভেবে কি ফল। নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে বন্দী করেছে, প্রাণে মারবার জন্য তীরধনুক উঁচু করে ধরেছে। এই মুহূর্তেই তাঁরা সবাই মারা যাবেন।

প্রাণের ভয়ে রাজা বিশ্বামিত্র আর তাঁর সেনারা থরথর করে কাঁপতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা চাইলেন, প্রাণভিক্ষা চাইলেন।

প্রাণভয়ে বিশ্বামিত্রকে কাঁদতে দেখে দয়ালু ঋষি বশিষ্ঠ বললেন—'মা নন্দিনী, তোমার সেনাদের চলে যেতে বল। আমি ঋষি, ক্ষমাই আমার ধর্ম।'

নন্দিনী তখন আগের মত আবার ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সব সেনা তার মুখের মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেল। নন্দিনীর প্রকাণ্ড আগুনজ্বলা শরীরও শান্ত হয়ে গেল। সে আগের মত সুন্দর স্বর্গের গরুর রূপ ধরল।

বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—'মহারাজ, আপনি সৈন্যদের নিয়ে রাজ্যে ফিরে যান। আমার থেকে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। আপনি শরণাগত, তা ছাড়া অতিথি। শুধু অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বল ও দর্প দেখাতে চেয়েছিলেন বলেই এই কষ্ট সইতে হল।' আমি আপনাকে একটি মাত্র উপদেশ দিচ্ছি। যতই বড় রাজা হোন, অহঙ্কার, বল ও দর্পের বশ হবেন না। অহঙ্কারীর যে পতন হয় তা ত' দেখতেই পেলেন।'

বশিষ্ঠের কথা শুনে লজ্জায় অনুশোচনায় বিশ্বামিত্রের মন ভরে উঠল। বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করে তিনি বললেন,—'ঋষি, আজ থেকে আমি রাজ্য ত্যাগ করলাম। বনে গিয়ে হাজার বছর তপস্যা করে ঋষি হব।'

আপনার কাছে এসে বুঝলাম ঋষির ক্ষমতার কাছে রাজার সৈন্যবল, ধনবল, তেজ, গর্ব কত মিথ্যা।

তারপর বিশ্বামিত্র সেনাপতিকে বললেন,—'সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ে দেশে চলে যাও। প্রজাদের বল রাজা বিশ্বামিত্র রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন।' এই বলে বিশ্বামিত্র রাজবেশ ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশ পরলেন।

এমনিভাবে একদিন বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে রাজা বিশ্বামিত্রের অহঙ্কার ও গর্বের পতন হয়। আর তিনি রাজ্য ছেড়ে ঋষি হন।

আঁটুল-বাঁটুলের দেশে

পুষ্পদল ভট্টাচার্য

(গল্প)

আগডুম-বাগডুম, ইকড়ি-মিকড়ি আর এই রকম ঘরে বসে যত রকম খেলা করা যায় তার মধ্যে আঁটুল-বাঁটুল খেলাই খোকনের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। বারবার এই একই খেলা খেলে তার দুই বন্ধু মণ্টু ঝণ্টু বিরক্ত হয়ে বলে উঠল...'আঁটুল-বাঁটুল তিনবার খেলেছি। এবার আগডুম-বাগডুম খেলব।'

ওরা তিনজন শোবারঘরে খাটের উপর বসে খেলা করছিল। শীতের সন্ধ্যা তাই মা খোকনকে বাইরে যেতে দেন নি। মণ্টুরা এই বাড়ির একতলায় থাকে আর রোজ সন্ধ্যায় খোকনের সঙ্গে খেলতে আসে। মণ্টুরা আগডুম-বাগডুম খেলার কথা বলতেই খোকন বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল—'ঐ বিচ্ছিরি খেলা আমি খেলব না।'

শুনে মণ্টু ঝণ্টুরা রাগ করে বাড়ি চলে গেল। খোকন বিছানায় শুয়ে বন্ধ জানালার কাচের মধ্য দিয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগল।

'খোকন, খোকন ভাই।' হঠাৎ মিষ্টি গলায় কে যেন ডাকল। কে ডাকে? কই কেউ তো কোথাও নেই। চারদিক ভাল করে দেখে খোকন যেই শুতে গেল অমনি খাটের পাশ থেকে কে আবার বলল—'খোকন ভাই, তুমি আমাদের দেশে বেড়াতে যাবে?'

খোকন খাটের ধারে উঁকি মেরে দেখল একটি একবিঘৎ লম্বা ছেলের হাত ধরে একটি বুড়ো আঙুলের মাপের ছেলে মেঝেতে দাঁড়িয়ে বলছে ঐ কথা। খোকন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তোমরা?'

'বাঃ, আমাদের চিনতে পারছ না? এই তো খানিক আগে খেলবার সময়ে আমাদের ডাকছিলে।' সেই বুড়ো আঙুলে ছেলে বলল, 'আমারই নাম আঁটুল। এই আমার বাঁটুলদাদা। শামলা আমার দিদি আর শাঁটুল ছোট ভাই।'

'কোথায় তোমার দিদি আর ছোট ভাই?' খোকন চারদিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল।

'শাঁটুল খুব ছোট তো। সে এখন চলতে পারে না। তাই শামলাদিদি তাকে কোলে নিয়ে বাড়িতেই রয়েছেন। উত্তর দিল বাঁটুল। 'দিদিই তো আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। বললেন: 'যা খোকনকে নিয়ে আয়। সে আমাদের সঙ্গে খেলতে অত ভালবাসে। তাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এসে সবাই একসঙ্গে খেলব।' বলল আঁটুল।

খোকন অবাক হয়ে বলল, 'আঁটুল-বাঁটুল আবার মানুষ নাকি? সে তো একটা খেলা।'

'বেশ, আমরা তো মানুষ নয়। আর কখনো আসব না তোমার কাছে।' আঁটুল অভিমান করে বলল—'চল রে দাদা। দিদিকে গিয়ে বলি খোকন আসবে না।'

আঁটুলের অভিমান দেখে খোকন তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে তার হাত ধরবার চেষ্টা করে বলল—'তোমাদের সঙ্গে যাব না তো বলি নি। কিন্তু আমি তোমাদের বাড়ি চিনি না। আর তোমরা এত ছোট যে, তোমাদের হাত ধরতে হলে আমাকে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে। তখন চলব কি করে?'

খোকনের কথা শুনে আঁটুল-বাঁটুল হো হো করে হেসে উঠলো। 'তুমি ভারী বোকা খোকন। আমরা হচ্ছি গল্পের দেশের মানুষ। ইচ্ছে করলেই যত বড় কিংবা যত ছোট হতে পারি। তুমি যদি চাও তো তোমাকে ঠিক আমাদের মাপের করে দিতে পারি।'

খোকন ভয় পেয়ে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'না, না। আমি তোমাদের মতন অতটুকু হতে চাই না।'

'বেশ, তবে আমরাই তোমার মাপের হচ্ছি।' বলেই আঁটুল বাঁটুল ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে মন্ত্রপড়ার মতন সুর করে বলতে লাগল—

'আঁটুল বাঁটুল, শাঁটুল
শামলাদিদির ভাই।
খোকন যাবে মোদের বাড়ি
লম্বা হবো তাই।
লম্বা হবো কত?
খোকন সোনার মত
লম্বা হতে চাই।
তাই, তাই, তাই।'

খোকন অবাক হয়ে দেখল প্রত্যেক লাইন ছড়া বলার সঙ্গে সঙ্গে আঁটুল-বাঁটুল একটু একটু করে পাক দেওয়া স্প্রিংয়ের মতন লম্বা হয়ে উঠেছে। তারপর যেই না শেষ লাইন তাই তাই তাই বলেছে অমনি দুই ভাই একেবারে খোকনের মাথার সমান হয়ে গেল। ওরা দু'জনে খোকনের দুই হাত ধরে বলল—'চল। এবার যাবে তো আমাদের বাড়ি?'

আঁটুল-বাঁটুলের সঙ্গে চলতে চলতে খোকন একটা মস্ত বড় নদীর সামনে এসে পড়ল। নদীর জলের রং দুধের মতন সাদা। আঁটুল জিজ্ঞাসা করল—'তুমি সাঁতার দিতে জান তো খোকন?'

'আমি তো এখন ছোট। এখনি কি করে সাঁতার শিখব? মা বলেছেন যখন বড়দা'র মতন বড় হব তখন আমিও সাঁতার শিখব।'

খোকনের একথা শুনে আঁটুল বলল—'আমরা দু'জনেই তো তোমার থেকে ছোট। আমরা কিন্তু সাঁতার জানি।'

বাঁটুল খোকনের পক্ষ নিয়ে বলল—'আমরা যে গল্পের দেশের ছেলে কি না, তাই আমরা সব পারি। খোকন মানুষের দেশের ছেলে বলে এত দুর্বল আর ভীতু।'

খোকন প্রতিবাদ করল—'ইঃ, মানুষ বুঝি দুর্বল আর ভীতু হয়?'

'সবাই নয়। বয়সে বড় মানুষরা সবল আর সাহসী হয়। কিন্তু তোমাদের বয়সী ছেলেদের না থাকে গায়ে জোর, না মনে সাহস। কেন জান?' বাঁটুল জিজ্ঞাসা করল।

'কেন?'

'তোমরা দুধ খেতে চাও না তাই। তোমার মা যখন দুধের বাটি এনে তোমার মুখের কাছে ধরেন তখন তুমি নাক সিঁটকে বল—'ওমা, আমার খিদে নেই।' কিন্তু মা যদি সেই সময়ে একবাটি রসগোল্লা কিংবা একমুঠো টফি দেন অমনি তোমার সব অখিদে চলে যায়। তাই না খোকন?'

'বেশ তাই। আর তোমরা কি কর?' খোকন চটে গিয়ে বলে।

'আমরা? এই দেখ আমরা কি করি।' আঁটুল-বাঁটুল খোকনের হাত ছেড়ে তরতর করে নদীর ধারে নেমে গিয়ে আঁজলা ভরে নদীর জল খেতে আরম্ভ করল।

খোকন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল—'আহা অমন করে জল আমিও খেতে পারি।'

'বেশ তো খাবে এস না।' আঁটুল ডাকল। খোকন বুক ফুলিয়ে নদীর ধারে নেমে গিয়ে ওদের পাশে বসে আঁজলা করে নদীর জল মুখে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে বলল—'এঃ মা, এ যে দুধ!'

'দুধই তো। এটা হচ্ছে দুধের নদী। আমরা গল্পের দেশের ছেলেমেয়েরা দুধ খেতে ভালবাসি। তাই ভগবান আমাদের দুধের নদী দিয়েছেন। যার যত ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে খাও দুধ।' বলল বাঁটুল।

খোকন তখনও নাক সিঁটকে রয়েছে দেখে আঁটুল বলল—'আমরা গল্পের দেশের ছেলেমেয়েরা এত দুধ খাই বলেই তো আমাদের গায়ে কত জোর, মাথায় কত বুদ্ধি। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কত সাহসের, বীরত্বের আর বুদ্ধির কাজ করতে পারে।'

'আহা, ভারী বীর আর বুদ্ধিমান। কই, দেখাও তো একটা বুদ্ধির কাজ?'

'দেখবে? বেশ বিনা সাঁতারেই তোমাকে কেমন ওপারে নিয়ে যাই দেখ।'—বলে আঁটুল-বাঁটুল নদীর ধারের একটা কলাবাগানে ছুটে গেল। সেখান থেকে কয়েকটা কলা গাছ ভেঙ্গে কলাপাতা আর শুকনো কলার আঁশ দিয়ে গাছগুলোকে বেঁধে চমৎকার একটা ভেলা বানিয়ে নিয়ে এল। খোকন কিছু বোঝবার আগেই তাকে ঠেলে ভেলার উপর বসিয়ে দুই ভাই ভেলার দু'দিক ধরে সাঁতার দিতে দিতে একেবারে নদীর এপারে এনে ফেলল!

আঁটুল বলল, 'ঐ দেখ, নদীর ধারে ঐ তক্তাতে লেখা রয়েছে আঁটুল-বাঁটুলের দেশ।'

আঁটুল-বাঁটুলের সঙ্গে খোকন এবার এল তাদের বাড়ি। মস্ত সাদা ধবধবে পাথরের বাড়িতে থাকে তারা। বাড়িটা দেখে খোকন বলল, 'বাবার কাছে এই রকম সাদা পাথরের একটা ছোট তাজমহল আছে। বাবা বলছিলেন বড় তাজমহলটা তারও সুন্দর দেখতে। তোমাদের এই বাড়ির থেকেও অনেক ভালো দেখতে সেটা।'

'আহা, তাজমহল তো পাথরের। আমাদের বাড়িটা তো আর পাথরের নয়।' আঁটুল বলল।

'তবে কিসের?'

'বাড়ির একটা কোণ ভেঙ্গে খেয়েই দেখ না কিসের।' আঁটুলের এই কথায় খোকনের চোখ কপালে উঠল।

সে বলল—'তোমরা পাগল না কি? বাড়ি ভেঙ্গে আবার খায় না কি মানুষে? বাড়ি খেয়ে ফেললে থাকবে কোথায়?'

খোকনের কথা শেষ হবার আগেই আঁটুল-বাঁটুল বাড়ির দেওয়াল ভেঙ্গে খাব্‌লা খাব্‌লা করে খেতে আরম্ভ করল। খোকন অবাক হয়ে দেখল ভেঙ্গে-যাওয়া জায়গাগুলো সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভরে গিয়ে সমান হয়ে যাচ্ছে। আঁটুল-বাঁটুল খোকনকে টেনে নিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ে তার হাত ছুঁইয়ে দিয়ে বলল—'নাও, এবার তুমিও খাও।'

দেওয়ালের গায়ে হাত ঠেকতেই খোকন চমকে হাত সরিয়ে নিল—'আরে, এ যে নরম তুলতুল করছে।

'করবেই তো। দেওয়ালটা যে ছানার সন্দেশে তৈরি। দোতলার দেওয়াল রসগোল্লা আর পানতুয়ার। বাড়ির ছাদ হচ্ছে খাজার তৈরি।' পেছন দিক থেকে কে-যেন বলল।

খোকন সেদিকে চেয়ে দেখল সবুজ ডুরে শাড়ি গাছ-কোমর করে পরে তার থেকে অল্প একটু বড় শামলা রংয়ের মেয়ে হাসতে হাসতে বলছেন ঐ কথা। তাঁর কোলে একটি গোলগাল মোটা-সোটা খোকা। খোকন বুঝল এরাই হচ্ছে আঁটুল-বাঁটুলের দিদি শামলা আর ছোট ভাই শাঁটুল। শামলাদিদির কথায় সাহস পেয়ে খোকনও দেওয়াল ভেঙ্গে খেতে আরম্ভ করল। বাঃ, কি সুন্দর গোলাপ-গন্ধ মিষ্টি সন্দেশ। এমন সন্দেশ খোকন আর কখনও খায় নি। এমন কি মামার বাড়িতে দিদিমার তৈরি সন্দেশের থেকেও ভালো এই সন্দেশ। কিন্তু ভালো জিনিসও তো মানুষ একসঙ্গে বেশি খেতে পারে না। তাই একটু পরেই খোকনের গলা শুকিয়ে গেল। সে অনেক কষ্টে বলল, 'একটু জল।'

শামলাদিদি ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এলেন। কিন্তু চুমুক দিয়েই খোকন বলল—'ও মা, এ যে দুধ।'

'দুধই তো। আমাদের দেশে তো জল নেই। তেষ্টা পেলেই আমরা দুধ নদীর দুধ খাই।' শামলাদিদি খোকনের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—'নাও, লক্ষ্মী ছেলের মতন দুধটা খেয়ে নাও। তারপর তোমাকে নিয়ে আমরা হাটে যাব।'

'হাটে গিয়ে কি করবে দিদি? তোমাদের বাড়িতেই তো কত সুন্দর সুন্দর খাবার রয়েছে।'

খোকনের কথায় আঁটুল-বাঁটুল একসঙ্গে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল—'দুয়ো, দুয়ো। খোকনটা কিছু জানে না। শামলাদিদির হাটে আবার লোকে খাবার কিনতে যায় নাকি? শামলাদিদির হাট তো ছোটদের মেলার হাট।'

আঁটুল আবার তামাসা করে বলল—'দুধ না খেয়েই খোকনের বুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

শামলাদিদি ওদের ধমক দিয়ে বললেন—'ঢের হয়েছে বুদ্ধিমানেরা। থাম তো। খোকন কি এর আগে কখনও গল্পের দেশে এসেছে নাকি, যে এখানকার সব খবর জানবে? বোকা তোমরাই তাই খোকনকে সব বুঝিয়ে না দিয়ে ঐ রকম ঠাট্টা করছ।'

দিদির কাছে ধমক খেয়ে দুই ভাই লজ্জা পেয়ে বলল—'খোকন ভাই, আমাদের তুমি ক্ষমা কর। আমাদের দোষ হয়েছে।'

খোকনের সব রাগ জল হয়ে গেল। সে বলল—'না, না। তোমাদের দোষ হবে কেন? তোমরা তো আমাকে ঠাট্টা করছিলে।'

'হ্যাঁ ভাই, ওদের দোষ হয়েছে। শামলাদিদি খোকনের হাত ধরে হাটের পথে চলতে চলতে বললেন—'বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে তাকে অতিথি বলে জান তো? অতিথি ছোট ছেলেই হোক আর বয়সী লোকই হোক, গরীব হোক কি ধনী হোক, সবাইকে আদর করে সম্মান করে কথা বলতে হয়। আমাদের বাড়িতে যাতে তার কোন রকম অসুবিধে না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হয়। তুমিও আজ আমাদের বাড়ির অতিথি। আমরা তোমাকে ডেকে এনেছি। এমন আমাদের দেশের রীতিনীতি সব-কিছু তোমাকে না বুঝিয়ে দিয়ে কেবল তোমাকে বোকা বলে ঠাট্টা করা কি অন্যায় নয় ওদের? ওতে কি তোমার মনে দুঃখ দেওয়া হয় না? কারো মনে দুঃখ দেওয়া কি ভাল?'

শামলাদিদির কথায় খোকন আরো লজ্জা পেল। 'আমি তো ওদের কথায় কিছু মনে করি নি দিদি।' বলে সে দু'হাতে শামলাদিদির হাতটা জড়িয়ে ধরে মনে মনে বলল—এমনি একটা দিদি যদি আমার থাকতো।

হাটে পৌঁছে খোকন দেখল সেখানে একটা মস্ত বড় মেলা বসেছে। কোথাও নাগরদোলা, কোথাও ঘূর্ণিদোলা দুলছে। কোথাও বাঁদর, ভালুক আর সাপ নাচ হচ্ছে। এক জায়গায় একটা মস্ত বড় সার্কাসের তাঁবুতে নানা রকম সার্কাস হচ্ছে।

শামলাদিদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকন নাগরদোলায় চড়বে?'

খোকন শুকনো মুখে বলল—'আমার কাছে তো পয়সা নেই দিদি।'

'এ মেলায় কোন রকম পয়সা দিতে হয় না খোকন। মেলা দেখা হয়ে গেলে দামের বদলে প্রত্যেককে কিছু খেলা দেখাতে কিংবা গান গেয়ে কি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হয়। মানে যে যা জানে তাই দেখিয়ে কিংবা শুনিয়ে অন্যদের আনন্দ দেয়—তাহলেই মেলা দেখার দাম দেওয়া হয়ে যায়।'

খোকন বলল—'কিন্তু দিদি, আমি তো ওসব কিছুই জানি না। মন্টু, ঝন্টু, স্কুলে গিয়ে অনেক রকম খেলা ছড়াটড়া শিখেছে। আমি তো এখনো স্কুলে যাই না। বাড়িতে মায়ের কাছেই পড়ি।'

'তুমি তোমার মায়ের কাছে যা শিখেছ তাই বোল।' এই বলে শামলাদিদি খোকনকে আর ভাইয়েদের নিয়ে নাগরদোলায় উঠলেন। খোকন অবাক হয়ে দেখল নাগরদোলা দুলিয়ে দেবার লোক নেই। যেই একটা দোলায় যতজন বসবার ততজন বসে পড়ছে, অমনি সেটা উপরে উঠে গিয়ে অন্য দোলাটা নেমে আসছে। এইভাবে সব ক'টা দোলা ভরে গেলেই সেটা গড়গড় করে ঘুরতে আরম্ভ করছে। তারপর নয়পাক ঘুরে সেটা আপনিই থেমেও যাচ্ছে। অমনি যারা চড়েছিল তারা নিয়ম করে একের পর এক নেমে যাচ্ছে। কেউ দ্বিতীয়বার চড়বে বলে আবদার করছে না। বড় ছেলেমেয়েরা ছোটদের দোলায় উঠতে-নামতে সাহায্য করছে। ঠিক এই নিয়মেই ঘূর্ণিদোলাতেও চড়ছে সবাই।

এদিক থেকে খোকনরা এবার এল বাঁদর আর ভালুক নাচের দিকে। কিন্তু দু' পা এগিয়েই খোকন ভয় পেয়ে শামলাদিদির আঁচল ধরে টানল।

—'ও দিদি, বাঁদরওয়ালা, ভালুকওয়ালারা গেল কোথায়? বাঁদর, ভালুক কারো গলাতেই যে দড়ি নেই।'

শামলাদিদি তাকে সাহস দিয়ে বললেন—'ভয় নেই খোকন, ওরা কাউকে কিছু বলবে না। আমার হাটে পশুপাখিরাও স্বাধীন। এরা নিজেদের ইচ্ছাতেই খেলা দেখায়। এই খেলাতে সবাই সবাইকে ভালবাসে। কেউ কাউকে হিংসা করে না।'

এদিকে হয়েছে কি খোকনদের আসতে দেখেই বাঁদররা আর ভালুকরা উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে ওদের নমস্কার করল। তারপর কেউ ডুগডুগি, কেউ খঞ্জনী, কেউ ঢোলক বাজিয়ে কত মজার মজার নাচ দেখাল। খোকন সব ভয় ভুলে হেসে গড়াগড়ি। এদের নাচ যেই শেষ হল অমনি একটা নরম তুলতুলে হাত এসে খোকনের হাত ধরে টানতে লাগল। খোকন চমকে দেখে একটা বড় শিম্পাঞ্জী সার্কাসের জোকারের মতন সেজে তার হাত ধরে টানছে। দেখেই তো খোকন ভয়ে হাউমাউ করে উঠেছে। এবারও শামলাদিদি তাকে সাহস দিলেন। বললেন—'সামনের এই সার্কাসের জোকার হচ্ছে শিম্পাঞ্জীটা। সে আমাদের সার্কাস দেখবার জন্য ডাকছে।'

খোকনরা সার্কাসের তাঁবুর ভেতর গিয়ে দেখল সেখানে আরো অনেক ছেলেমেয়েরা বসে রয়েছে। খোকনরা যাবার পরই খেলা আরম্ভ হল। সার্কাসের খেলায় কোন মানুষ ছিল না। সব খেলা জীবজন্তুরা নিজেরাই দেখাল। খেলার আরম্ভতে নানা জাতের পাখিরা কেউ গান গাইল, কেউ শিষ দিল, কেউ বা মানুষের মত কথা বলল। ময়ূরেরা তাদের বাহারে পেখম তুলে নাচল। জন্তুদের নানারকম খেলার মধ্যে হনুমানদের পরস্পরের লেজ ধরে ট্রাপিজের খেলা, রূপী বাঁদর আর শিম্পাঞ্জীদের জোকার সেজে নানারকম দুষ্টামি আর সব শেষে হাতী, ঘোড়া, বাঁদর, শিম্পাঞ্জী, হনুমান, বাঘ, সিংহ, ভালুক

সকলের একসঙ্গে পাখিদের গানের তালে তালে হেলেদুলে নাচ—খুব ভালো লাগল খোকনের। শেষে সবাই নিজের নিজের সামনের পা কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল দর্শকদের।

এইভাবে মেলায় আরও সব মজার মজার খেলা দেখে খোকনরা এল একটা বড় তাঁবুর ভেতর। এতক্ষণ যারা নানা রকম খেলা আর নাচ দেখিয়েছিল, গান শুনিয়েছিল সকলকে, সেই সব পশুপাখি আর মানুষেরা এসে বসল এই তাঁবুর ভেতর। এবার এরা খেলা দেখবে আর অন্যরা এদের খেলা দেখিয়ে মেলা দেখার দাম দেবে।

প্রথমে শামলাদিদি তার সমবয়সী মেয়েদের নিয়ে গান শোনালেন। আঁটুল-বাঁটুল আর তার বন্ধুরা নানা রকম ব্যায়াম দেখাল। এরপর সবাই মিলে একটা খুব সুন্দর নাচের অভিনয় করল। সবশেষে হল ভারী মজা। খাঁটুলের মতন খুব ছোট্ট যারা তারা তাদের দিদিদের বলা ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও হাত ঘুরিয়ে নাড়ু দিল, কখন মাথা নেড়ে তেঁতুল পাড়া দেখাল, দোলে দোলে করতে করতে নিজেদের ইচ্ছামত সুর করে গান গাইল আর কুকুর-বেড়ালের ডাকের নকল দেখাল। এদের খেলা শেষ হয়ে গেলে শামলাদিদি বললেন, 'চল খোকন, বাড়ি যাই।'

'কিন্তু দিদি, আমার তো দাম দেওয়া হয় নি। আমিও ছড়া বলব।'

খোকনের এই কথায় খুশি হয়ে শামলাদিদি সবাইকে বললেন—'এবার খোকন আমাদের ছড়া শোনাবে।'

শুনে সবাই খুশি হয়ে হাততালি দিল।

স্টেজে উঠেই কিন্তু খোকন বেজায় ঘাবড়ে গেল। কিছুই যে মনে পড়ছে না। মা তো তাকে কতরকম ছড়া, গল্প সব শিখিয়েছিলেন। আহা, তখন যদি মন দিয়ে শিখত খোকন, তাহলে এখন লজ্জায় পড়তে হত না। খোকনের অবস্থা বুঝে শামলাদিদি বললেন, 'তোমার পড়ার বইয়ের সেই 'অ'য়ে অজগর ছড়াটাই বল খোকন।'

'অ'য়ে অজগর বলতে বলতে খোকনের আরো অনেক ছড়া মনে পড়ে গেল। সে সব শুনিয়ে ছোট টুনটুনি পাখির গল্প বলল খোকন। তারপর মায়ের কাছে শেখা বন্দেমাতরম্ গানটার যে লাইনটা তার মনে ছিল সেইটাই গাইল খোকন—'সুজলাং, সুফলাং মাতরম্।' শুনে সবাই খোকনের খুব সুখ্যাতি করল।

মেলায় এত আনন্দ করে বাড়ি ফিরে এসে সবাই দেখল শামলা দিদির বড় ভল পুতুল দু'টো বাড়ির সামনের পথে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে। শামলাদিদি তাদের বাড়ির ভেতর এনে নানা রকম খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু বেয়াড়া পুতুল দু'টো সে সব না খেয়ে তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতে বলল—'আমরা ও সব খাব না। ছোলাভাজা খাব।'

'বেশ, চুপ কর। ছোলাভাজাই দিচ্ছি।' শামলাদিদি ছোলা-ভাজা আনতে গেলেন।

তবু পুতুল দু'টোর কান্না আর থামে না দেখে আঁটুল-বাঁটুল রাগ করে বলল—'চুপ কর, চুপ কর, বলছি। নইলে তুলে আছাড় দেব।'

খোকনের ভয় হল তার ভালোমানুষ শামলাদিদির পুতুল দু'টো বুঝি ওরা সত্যিই আছড়ে ভেঙে ফেলবে। তাই সে পুতুল দু'টোকে আড়াল করে দাঁড়াল। কিন্তু সেই দুষ্টু পুতুলেরা হঠাৎ খোকনকে এমন ঠেলা দিল যে, সে ছিটকে পড়ল ঘরের মেঝেয়। তাই দেখে শামলাদিদি ছুটে এসে খোকনকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি রে খোকন, ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে গেলি?'

শুনে খোকন অবাক হয়ে সামনে তাকিয়ে দেখল কোথায় শামলাদিদি। তার মা তাকে ঘরের মেঝে থেকে তুলতে তুলতে বলছেন ঐ কথা। তাঁর অন্য হাতে একবাটি দুধ। মা বললেন—'নে, বিছানায় উঠে বসে দুধটা খেয়ে নিয়ে তারপর ঘুমো।'

খোকন বরাবরের অভ্যাস মতন নাক সিঁটকে 'ওমা, আমার খিদে নেই।' বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তখুনি তার মনে পড়ল আঁটুলের ঠাট্টা—'খোকনটা দুধ খায় না কি না, তাই সে অত বোকা ভীতু।' খোকন আর কোন আপত্তি না করে ঢক ঢক করে দুধের বাটি খালি করে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল। ঘুমের মধ্যে শামলাদিদি এসে যদি আবার তাকে আদর করে আঁটুল-বাঁটুলের দেশে নিয়ে যান এই সাধ খোকনের।

সবাই কাজের

সুলেখা দাশগুপ্ত

কাঠঠোকরা কাঠের কাজে
সবার সেরা মিস্ত্রী।
ইঁদুরগুলোর বুদ্ধি বেশি।
করছে কেমন ইস্ত্রি।
কাকের আছে তলোর দোকান
তাল পুকুরের পাড়ে।
হুতুম প্যাঁচা হাঁড়ি হোলা
সবাই বাটি গড়ে।
কিং-এর ফ্যানের কারখানাটা
চলছে তো ভাই মন্দ না।
চিংড়িমাছের চিড়িয়াখানায়
দোয়েল শ্যামা চন্দনা।
আরশুলারা আলুর চাষে
দু-দশ টাকা বেশ তোলে।
গিরগিটিদের গোবর বেচে
কোনমতে দিন চলে।
চিলের তৈরি চানাচুর আর
চপ, পকুড়ি খাও যদি।
কাকাতুয়ার কুলের আচার
শনপাপড়ি ক্ষীর দধি।
বিড়ালছানার বাদাম ভাজা
গরম মুড়ি কড়কড়ে।
দু-চার বার খেলে পরেই
বুদ্ধি হবে সর্ গড়ে।

সাহিত্য পরিচয়

পত্রাবলী

দেশজননীর বন্ধন মোচন মানসে অগণিত মুক্তিসাধকের দুর্বার সাধনা সিদ্ধিলাভ করল যাঁর কল্যাণে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সুভাষচন্দ্রের জীবনের বোধনলগ্ন থেকেই দেশের মুক্তি ও সামগ্রিক কল্যাণ তাঁর একমাত্র চিন্তায় পরিণত হয়। তাঁর রচিত পত্রাবলীর মাধ্যমে এই সত্যটিই সর্বতোভাবে প্রকটিত হয়। রাজনৈতিক জগৎ ছাড়া সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শনশাস্ত্রে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালেই তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৯১২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের লেখা পত্রগুলির একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়ে সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রতি এক নতুন আলোকপাত করেছে। এই পত্রগুলির মাধ্যমে তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, মানবতা, আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা, দেশের জন্য বিদেশীর হাতে লাঞ্ছনাবরণ প্রভৃতি এক সুস্পষ্ট বিবরণ পাঠকসাধারণ পাবেন। সহস্র কার্যের মধ্যে জড়িত থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক আত্মজনদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খোঁজখবর নেওয়ার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সামাজিক সত্তারও এক অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। চিঠিগুলির মধ্যে পাঠক শক্তিমান লেখকের অপূর্ব রচনাশৈলীর এক আশ্চর্য নিদর্শন পাবেন, পাবেন দেশের মুক্তির জন্য সর্বত্যাগী বীর সৈনিকের মুক্তিসাধনার পরিচয়, পাবেন বাঙলা দেশের একটি বিগত যুগের এক সামগ্রিক আলেখ্য, সুভাষচন্দ্রের ও তাঁর আত্মজনের কয়েকটি আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত। পত্রগুলি জননী প্রভাবতী দেবী, গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র, অগ্রজ শরৎচন্দ্র, ভ্রাতৃজায়া বিভাবতী দেবী, সতীর্থ দিলীপকুমার রায় ও হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতিকে লেখা। সঙ্কলনের ক্ষেত্রে শিশিরকুমার বসু যথেষ্ট পরিশ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সুন্দর সঙ্কলনকার্যে সাফল্যের জন্য নিঃসন্দেহে তিনি দেশবাসীর অভিনন্দনের দাবীদার। প্রকাশক—এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—আট টাকা।

ভারতের নৌ-শিল্প

প্রাচীন ভারতে নৌ-শিল্প এক উল্লেখ্য পটভূমির অধিকারী ছিল, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সে সম্বন্ধেই প্রভূত আলোকপাত করেছেন। ১৯১২ সালে এ বিষয়ে তিনি এক ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করেন, 'A History of Indian Shipping' নামীয় সে রচনা তৎকালীন সুধীসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে, আলোচ্য গ্রন্থের মূলও সেখানেই নিহিত, তবু এ গ্রন্থ সে রচনার আক্ষরিক অনুবাদ নয়, উভয় গ্রন্থে ব্যবহৃত উপাদান এক হলেও বর্তমান রচনা তার স্বক্ষেত্রে স্বাধীন ও মৌলিক। ভারতের নৌ-শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সবরকম তথ্যাদিই আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কয়েকটি সুমুদ্রিত ছবি বইটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বোদ্ধা পাঠকের চোখে এ রচনা প্রামাণ্য বলেই পরিগণিত হবে। বিখ্যাত সুধী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিত গ্রন্থ পরিচিতিটিও বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। লেখক—রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম এ, পি এইচ ডি, ডি লিট, এফ এ এস বি, প্রকাশনায়—কিতাব মহল, ৪১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—পনের টাকা।

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

বাংলার সাংস্কৃতিক, অধ্যাত্ম ও সমাজ-জীবনে রাজা রামমোহনের নাম চিরস্মরণীয়; জাতির জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে এই মহাপুরুষের বলদৃপ্ত পদক্ষেপ ঘটেছিল, বস্তুত তাঁর প্রবল ব্যক্তিসত্তা সেদিনের মুমূর্ষু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে যে কতটা সহায়ক ছিল তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা বোধ হয় আজও সম্ভব হয়ে ওঠে নি; বর্তমান গ্রন্থে লেখক জাতীয় শিল্পের অগ্রগমনে রামমোহনের অবদান সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। বিদেশীর করায়ত্ত জাতীয় শিল্পকে চরম সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি যেসব উপায় অবলম্বন করেছিলেন এই রচনায় তার বিশদ পরিচয় বর্তমান। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে একটা চিহ্নিত স্থান দাবী করতে পারে। লেখকের শৈলী একাধারে সমৃদ্ধ ও সাবলীল। প্রচ্ছদ রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশনায়—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—ছয় টাকা।

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে

বৌদ্ধধর্মের ব্যাপ্তি বিশ্বজুড়ে হলেও বাঙলা দেশে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন পুস্তকাদি রচিত হয় নি। বুদ্ধের জীবন ও ধর্মশিক্ষা প্রসঙ্গে বাঙালী যে সবিশেষ অবহিত নয়, চর্চার অভাবই তার মূল কারণ, সুতরাং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমান রচনার একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী এবং তৎ প্রচারিত ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিশদ পরিচয় বিবৃত হয়েছে, লেখিকা বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও নীতিগুলির সঙ্গেই শুধু আমাদের পরিচয় ঘটান নি, বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যে এ রচনাকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন এ আশা করা অসঙ্গত হবে না। লেখিকার শৈলীও পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদ শিল্প শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—আশা রায়, পরিবেশক—মিত্রালয়, ২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

Under The Shadow Of Gallows

আলোচ্য গ্রন্থটি কিছুটা আত্মজীবনীমূলক ও কিছুটা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ দিকের পরিচয়বাহী। লেখক যৌবনে বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, 'দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম প্রধান আসামীরূপে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিল, সেই মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতাকেই তিনি নিপুণভাবে রেখায়িত করেছেন এই রচনার মাধ্যমে। মতবাদে পার্থক্য থাকলেও জাতীয় আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবের ভূমিকা যে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বর্তমান গ্রন্থটি পাঠে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, বস্তুত লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শে তাঁর রচনা যেন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয় অথচ কিছুই কাল্পনিক নয়, যা ঘটেছিল তাই শুধু বর্ণিত হয়েছে। সুসভ্য ইংরাজের মুখোস পরা চেহারাটাও বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। লেখকের শৈলী সাবলীল, ভঙ্গি আন্তরিক। বইটির প্রচ্ছদ যথাযথ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—গুলাব সিং প্রকাশক—রূপচাঁদ অ্যাণ্ড প্রেস, দিল্লী, দাম—সাড়ে টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নেফার মানুষ

আজকের দিনে ভারতবর্ষের নর-নারীর কাছে নেফা অঞ্চলের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। রাজনৈতিক কোণ থেকে নেফা অঞ্চল আজ যে পরিমাণ গুরুত্ব বহন করে চলেছে তার মূল্য অপরিসীম, এই অঞ্চল সম্পর্কে যে কয়জন বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করা চলে সাহিত্যসেবী শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র তাঁদের অন্যতম। সেই জন্যে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নেফা সম্বন্ধে যে বিবরণাদি প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। গ্রন্থটিতে নেফা সম্বন্ধে এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, তার বিবরণাদি, সেখানকার নর-নারী, তাদের জীবনযাত্রা নিখুঁতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। নেফার একটি সামগ্রিক চিত্র লেখক এখানে যথেষ্ট কুশলতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। লেখকের রচনাশৈলী এবং বর্ণনভঙ্গী প্রশংসনীয়। গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকার নেফা সম্পর্কিত সমগ্র জিজ্ঞাসার অবসান ঘটাবার ক্ষমতা রাখে। প্রকাশক—আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

সহস্র গীতি (তিরুবায়্মোড়ি)

দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদকে অবলম্বন করে বহু গাথা ও সঙ্গীতাদি রচিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থে তামিল আড়বার গীতি পর্যায়ের ঐ ধরণের সহস্রটি গীতি বা পদ সংগৃহীত হয়েছে। বাঙলায় এবং সামগ্রিকভাবে উত্তর ভারতে বৈষ্ণব পদাবলী বলতে যা বোঝায় আলোচ্য গীতিমালিকাটিও দক্ষিণ ভারতে সেই পর্যায়ভুক্ত, দক্ষিণী পণ্ডিতগণ দাবী করেন যে, এ বিষয়ে এই আড়বারী গাথাই অগ্রসূরীর পদবাচ্য। বলা বাহুল্য মাত্র ভক্তি সংগীতের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ একটি চিহ্নিত স্থানের অধিকারী। বঙ্গাক্ষরে মূল তামিল পদ প্রতিপদের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দ বা বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ, বাঙলা পদ্যানুবাদ ও ভাবার্থ টীকা—এই সব নিয়ে এই গ্রন্থ বাঙলা অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সংযোজন বলেই পরিগণিত হবে। বইটির আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। অনুবাদক—আচার্য শ্রীবত্যাম রামানুজদাস, প্রকাশক—শ্রীহয়গ্রীব রামানুজদাস ও শ্রীবলরাম বাঁসোপাল। খড়দহ, ২৪ পরগণা, দাম—বারো টাকা।

সাগরে মিলায় ডন (২য় খণ্ড)

বিখ্যাত বিদেশী উপন্যাস। 'Don Flows Home to The Sea'-র অনুবাদ যখন প্রথম কিস্তিতে আত্মপ্রকাশ করে তখনই বাঙালী পাঠক উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন তার সমাপ্তি খণ্ডটি হাতে পাওয়ার আশায়, আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁদের সে প্রত্যাশাকে সার্থক করে তুলেছে। যুদ্ধের বিভীষিকাই মূল উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য, অনুবাদকও যে সে বক্তব্যকে প্রাণময় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, অতি নিপুণভাবেই যুদ্ধের পটভূমি ফুটে উঠেছে তাঁর অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে। বইটি পড়তে পড়তে পাঠক সহজেই একাত্ম হয়ে যান উপন্যাসোক্ত চরিত্রগুলির সাথে, বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলি অতি উজ্জ্বল, নারীহৃদয়ের সহজাত বৃত্তিগুলি যে দেশ কালের ব্যবধান এড়িয়ে সর্বত্রই এক, এ সত্য বর্তমান রচনার প্রতিছত্রের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই ধরা দেয়। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই এ রচনা নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—মিখাইল শলোখফ, অনুবাদ—রথীন্দ্র সরকার, প্রকাশনায়—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ। ১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—সাত টাকা।

The Story of Chandidas

বাঙলার বিশিষ্ট পদকর্তা বড়ু চণ্ডীদাসের নাম বিদগ্ধ বা রসিকজন মাত্ররই পরিচিত, আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁরই এক সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য জীবনী। সপ্তদশ শতাব্দীর এক অজ্ঞাতনামা রচয়িতার মূল সংস্কৃত ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি থেকে এই মহাকবি সম্বন্ধে কিছু প্রামাণ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়, আলোচ্য রচনার উৎসও সেটাই। লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষ অনুসন্ধানের পরই তিনি ওই সব তথ্যাদি নিজের রচনায় সন্নিবেশিত করেছেন আর তারই উপর ভিত্তি করে মহাকবি চণ্ডীদাসের ব্যক্তিজীবনের এক মনোরম আখ্যান পরিবেশন করেছেন। আমরা বর্তমান রচনাটি হাতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রিয়রঞ্জন সেন, প্রকাশনায়—ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পাত্র-পাত্রী

প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিরল সংখ্যক সাহিত্যকারগণ জনচিত্ত জয় করে নিয়েছেন, বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই একজন। এযাবৎ তাঁর যে রচনারীতি দেখা গিয়েছে আলোচ্য রচনায় তা অনুপস্থিত, বস্তুত উপন্যাস না বলে রসরচনা বললেই এর পরিচয়টি সম্পূর্ণ হয়। সমাজ জীবনের এক বিশেষ দিক নিয়ে এতে যে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তা শুধু উপভোগ্যই নয় সুচিন্তিতও; লেখকের মননে সামাজিক গলদ কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তারই সাক্ষ্যবাহী এ রচনা। জনপ্রিয় লেখকের এই নতুন দিগ্দর্শন তাঁর পাঠকবৃন্দকে ভাবিয়ে তুলবে বলেই বোধ হয়। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শংকর, প্রকাশক,—বাক্‌সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ক্রীড়াসম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

বাঙলা দেশের ক্রীড়াজগতে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী একটি স্মরণীয় নাম। শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, দেশের ও সমাজের নানাবিধ কল্যাণকর কার্যে যাঁরা চিরদিন যোগসূত্র রেখে চলেছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। বাঙলা দেশের বিখ্যাত সর্বাধিকারী পরিবারের সন্তান ইনি। সুরেশপ্রসাদ, স্যার দেবপ্রসাদ, রাজকুমার, যদুনাথ প্রমুখ বাঙলার একাধিক স্বনামধন্য কৃতী সন্তানরা পরিবারের গৌরব নানাভাবে বৃদ্ধি করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে নগেন্দ্রপ্রসাদের জীবনকে কেন্দ্র করে সর্বাধিকারী পরিবারের বিশদ ইতিহাস, ঐ পরিবারের বিভিন্ন কৃতী সন্তানের কাহিনী পরিবেশিত হয়ে পাঠকসাধারণকে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে পরিচিত করেছে। প্রবন্ধকার শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ গ্রন্থটির রচয়িতা। গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি যথেষ্ট শ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বহু শ্রমের বিনিময়ে তিনি বহু দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন এবং একটি বিগত যুগের পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রন্থটিকে সুশোভিত করেছে। প্রকাশক—এন পি সর্বাধিকারী, স্মারক সমিতি, ১, ওয়েলিংটন স্কোয়্যার, কলকাতা। দাম—চার টাকা।

জগাখিচুড়ী (নাটক)

ব্যঙ্গ-কৌতুকপূর্ণ এই নাটকটিতে নাট্যকার সমাজের একটি বিশেষ দিকের আবরণ উন্মোচন করেছেন। নাটকটি সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত এবং নাট্যকারের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। নাটকটির মধ্যে তাঁর সমাজ সচেতন মনের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র সৃষ্টিতে, সংলাপ যোজনায়, ঘটনার সংস্থাপনে তাঁর সৃজনক্ষমতা নাটকটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। লেখক—অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম উল্লেখ নেই।

লক্ষ তারার অন্ধকার

একটি উপভোগ্য কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রকৃতির কোলে শ্যামল-সবুজ সোনামুণ্ডি গ্রামে একদা নেমে এলো অভিশাপ যন্ত্রদেবতার মাধ্যমে, সরল সবল আদিবাসী মানুষ পরিণত হল লৌহশ্রমিকে, আর সেই সঙ্গে এল লোভ ও ঈর্ষা যন্ত্রযুগের যা ঘৃণ্যতম প্রতীক। হারিয়ে গেল শাল মহুয়া ও বন পলাশের ছায়ায় ঘেরা সহজ সরল জীবন, আর সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেই মানুষগুলোও—সত্য ও আনন্দই ছিল যাদের জীবনযাত্রার মূল পাথেয়। বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গেই লেখক তাঁর বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন, তাঁর চরিত্র চিত্রণে পারদর্শিতাও লক্ষণীয়; কয়েকটি চরিত্র বিশেষ করে শিবু, সুটারকিন ও মনচনিয়া বেশ উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে। আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—বিনয় চৌধুরী। প্রকাশক—কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৬৫, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা ৩। দাম—তিন টাকা।

বিধাতা

সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিশেষ দিগ্‌দর্শনের জন্য আলোচ্য উপন্যাসের লেখক ইতিমধ্যেই সুপরিচিত, তাঁর এই রচনাও একটি উল্লেখ্য আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কাহিনীতে অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক জগতের ছায়াপাত হওয়ায় সহজেই পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত হয়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে কৌতূহল অব্যাহতও থাকে লেখকের মুন্সীয়ানায় এবং তার ফলেই বইটি সম্পূর্ণ পাঠ করার জন্য একটা ঔৎসুক্যও দেখা দেয়। পাঠশেষে একটা সুপাঠ্য উপন্যাস পড়ার আনন্দে মন ভরে ওঠে, আর সেটাই এ রচনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব) প্রকাশক—বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বীর বিবেক

স্বামী বিবেকানন্দর জীবন ও বাণী ছন্দে রূপায়িত করেছেন লেখক, তাঁর এ প্রয়াস অভিনব বলেই অভিনন্দনযোগ্য। লেখকের শৈলী সহজ ও সাবলীল, সব ধরণের পাঠকই বর্তমান কাব্য গ্রন্থটির রসাস্বাদনে সক্ষম হবেন। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ, প্রকাশক—প্রশান্ত ঘোষ, ৫২, হালদার পাড়া রোড, কলিকাতা-২৬, দাম—তিন টাকা।

শুভ বিবাহ কথা

বিবাহ প্রথা মানুষের সমাজের এক অতি সুপ্রাচীন প্রথা, আলোচ্য গ্রন্থে অতি সরসোজ্জ্বল ভঙ্গিতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক এ প্রথার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় এই প্রথাটি কতরূপে বর্তমান, তাও বর্ণনা করেছেন। লেখকের বর্ণনা-কৌশলে সমস্ত বিষয়টি অতি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, সুতরাং এ রচনাকে একাধারে উপভোগ্য ও প্রামাণ্য বলে অভিহিত করাটা অসঙ্গত হবে না। প্রচ্ছদ কৌতুকপ্রদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—দিব্যদর্শী। প্রকাশনায়—নিরুপমা, ১৪১।১ডি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯। দাম—চার টাকা। একমাত্র পরিবেশক—মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বিয়ের বাজার (রঙ্গনাটক)

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সামাজিক রঙ্গনাটক। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে কৌতুক বা রঙ্গনাটক খুব অল্প। বিশেষ করে আধুনিক কালে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। নাটকটি রসিক পাঠক-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি। নাটকটির চরিত্রগুলির নামকরণ সত্যই বিচিত্র। নাটকটি অভিনয়োপযোগী। নাটকটির বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রকাশচন্দ্র বসু। প্রকাশক—শ্রীঅম্বরকুমার বসু। পরিবেশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম—দুই টাকা মাত্র।

স্বর্গের সন্ধানে মানুষ

পুরাযুগের মানুষ ও পুরাতন দিনের কথাই এ রচনার উপজীব্য। আদিযুগে চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একদিন চেয়েছিল মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করতে; মৃত্যুর মধ্য থেকে অমৃতের সন্ধানী মানব-মনের পিপাসা মেটাতেই সেদিন উদ্ভব হয়েছিল স্বর্গের; যে কালো যবনিকা জীবন-মৃত্যুর মাঝে সর্বদাই দুলছে, তার ওপারে কি আছে একথা জানবার অত্যুগ্র আগ্রহে আদি মানবের মনেই একদিন জন্ম হল স্বর্গ ও নরকের; বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে এর রূপও বিভিন্ন, কিন্তু মূল সূত্রটি একই। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সেই রূপ ও রীতিরই বিশদ বর্ণনা করে দেখিয়েছেন, তাঁর লিখনপটুত্বে সমগ্র রচনাটি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। আমরা এ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—শৈল চক্রবর্তী, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—তিন টাকা।

নির্বাসন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক সংক্ষিপ্ত কাব্য সংকলন, মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে এতে। আধুনিক কবিতা বললেই যে দুর্বোধ্য কথার সমষ্টিমাত্র নয়, কবিতাগুলি পাঠ করে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কবির মন যে সচেতনভাবেই জীবন সন্ধানী সে ইঙ্গিতও ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার মাঝে, হতাশাই যে জীবনের শেষ কথা নয়, তার পরিচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় বেশ কয়েক জায়গায়, এই প্রসঙ্গে 'স্মৃতিরেণু' নামে কবিতাটির কয়েক ছত্র উল্লেখ্য, যদিও আমি মূক অঙ্গীকারে হৃদয় বেঁধেছি, তবু প্রত্যয়ের হাল যদি ভেঙ্গে যেতে চায় তীব্র-ব্যথাভারে জানি, তবু স্মৃতিস্নানে পাবো তার মনের নাগাল। মিষ্টমধুর এক কারুণ্যের স্পর্শে কবিতাগুলি সত্যই উপভোগ্য, কাব্যানুরাগী পাঠক কবিতাগুলি পড়ে তৃপ্তিলাভ করবেন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—পরিমল চক্রবর্তী, প্রকাশক—কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১, সি রাণী শংকরী লেন, কলকাতা-২৬, দাম—দু'টাকা।

লক্ষ্মী ও গণেশ

হিন্দু দেব-দেবীদের আসরে লক্ষ্মী ও গণেশ অতি সুপরিচিত, প্রায় প্রতি গৃহেই এঁদের অর্চনা হয়ে থাকে, আলোচ্য গ্রন্থে এঁদের মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যত রকমে এঁদের রূপ পরিকল্পনা করা হয়ে এসেছে সে সকলেরই বিশদ বিবরণ দিয়েছেন প্রাজ্ঞ লেখক, সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে এঁদের পুরাণোক্ত পরিচয়, হিন্দু ধর্মানুরাগী পাঠকের কাছে এ রচনা মূল্যবান বলেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। লেখকের ভাষারীতি প্রাচীনপন্থী হলেও সাবলীল। বইটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ। লেখক—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রকাশনায়—পুরোগামী প্রকাশনী, ১০০।১, ভূপেন বোস এভেনিউ, কলিকাতা-৪, দাম—চার টাকা।

নৈরাজ্যবাদ

নৈরাজ্যবাদের কল্পনা বহু প্রাচীন, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চৈনিক দার্শনিক লাওৎসে প্রথম এর কল্পনা করেন এবং তদবধি বহু মনীষীই এই মতে আস্থা প্রদর্শন করে আসছেন, তবু আজও নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণের মনে বিশেষ কোন ধারণা নেই, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই অভাব মোচনেই প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে শুধু যে একটা ধারণা করাই সম্ভব তা নয়, প্রকৃত নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে বহুলপ্রচারিত ভ্রান্তি সমূহেরও সংশোধন করা যাবে। বস্তুত বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের চেয়ে আত্মিক নৈরাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে চাওয়াটাই লেখকের মৌল উদ্দেশ্য এবং তাতে তিনি সফলকাম হয়েছেন। নৈরাজ্যবাদ প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য পুস্তকটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোং, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

ব্রহ্মবিদ্ গুরু শ্রীশ্রীভূপতিনাথ সন্নিধানে
[তৃতীয় ভাগ]

সাধক ভূপতিনাথ সম্বন্ধে যে রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে আলোচ্য গ্রন্থ তারই অন্তর্গত। এই খণ্ডে গুরুদেবের শিষ্য ৺সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় ডায়েরিতে শ্রীশ্রীভূপতিনাথের যে সব বাণী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, সেগুলিও অবিকৃত আকারে গ্রন্থবৎ করা হয়েছে, গুরুদেবের ভক্ত মাত্রই বর্তমান রচনাটিকে অমূল্য সম্পদ স্বরূপ বিবেচনা করবেন, এ আশা দুরাশা নয়। বইটির অঙ্গসজ্জা, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী; প্রকাশক—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী, ঋষভ আশ্রম, কোঁড়া, ২৪ পরগণা।

ঈশপের গল্প

শিশুদের মনের মত করে গল্প লিখে সুখলতা রাও শিশুসাহিত্যের দরবারে ইতিপূর্বেই বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন। ঈশপের গল্প গ্রন্থখানি মূলত অনুবাদ হলেও লেখিকার পরিবেশনের গুণে ইহা অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে উঠেছে। গল্পের মাধ্যমে শিশুরা এই গ্রন্থখানির ভিতর হইতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও লাভ করবে। প্রত্যেকটি কাহিনীর শেষে সুন্দরভাবে উহার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণত ছোটদের জন্য এই ধরণের পুস্তকেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পাতায় পাতায় শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী অঙ্কিত ছবিগুলিও এই প্রসঙ্গে গল্পগুলির রসাস্বাদনের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে উঠেছে। আমরা বইটির বহুলপ্রচার হোক এই কামনা করি। সুখলতা রাও। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-৯ হইতে মহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

নয়াদিল্লীতে ভারতের জন্য ১০৭ কোটি টাকার মাকিন ঋণদানের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রী এল কে ঝা এবং মাকিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলস। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টি টি কৃষ্ণমাচারী।

শ্রমিক-কল্যাণ দিবসে চা-বাগানের নারী শ্রমিকদের হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে রাজ্য শ্রম ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার।

।। চিত্র-সংবাদ ।।

মাসিক
বসুমতী
ফাল্গুন / '৭০

কলিকাতা শিল্প মেলায়
ব্রেথওয়েট কোং লিঃ'র গগনচুম্বী টাওয়ার।

গরমের পালা শুরু হ'ল। তাই আইসক্রীমওয়ালা
যথারীতি রাস্তায়। শিশুদের ভিড়।

[illegible]
বসুমতী

নাচ গান বাজনা
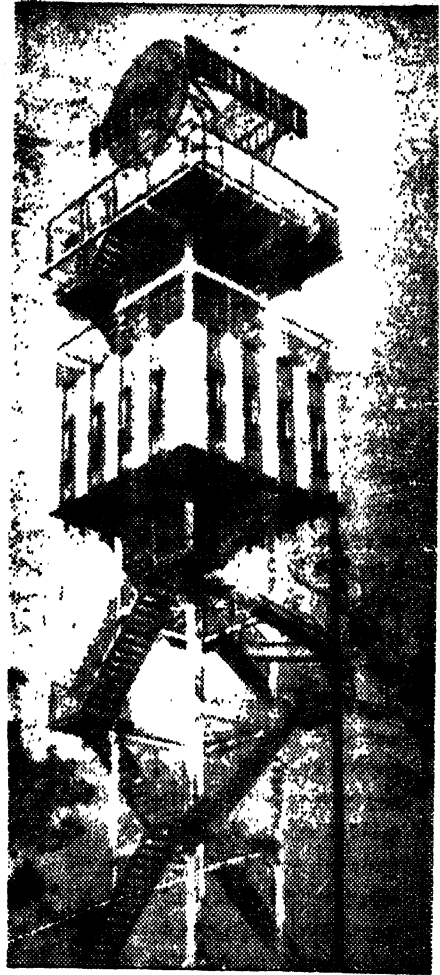
দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগ বা তারও আগে সিন্ধু সভ্যতার যুগ (খৃঃ পূঃ ৩০০০—২৫০০ সাল) থেকে এই ইতিহাস শুরু। এই সঙ্গীতই প্রধানত শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে। আজকে যেভাবে আমরা উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটক) এই দুই নামে দুই সঙ্গীত পদ্ধতিকে চিহ্নিত করেছি চতুর্দশ শতাব্দীর আগে এভাবে চিহ্নিত হয় নি। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিতে (২৮-৩৬) যে আলোচনা রয়েছে সেখানেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের পৃথক আলোচনা নেই।

খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী কাল ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে রাগ নাম কল্পনা, রাগ রূপ, রাগ বিকাশের মধ্যে দিয়ে রাগের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়। সমগ্র ভারতের সঙ্গীত ক্ষেত্রেই একটা শুদ্ধি যজ্ঞের সূচনা হয়। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে রাগনামগুলিই তার প্রমাণ। এই শুদ্ধি যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল আর্য ও অনার্য অধিবাসীদের দেশীয় ও জাতীয় গানের সুরগুলিকে পরিশুদ্ধ করে অভিজাত রাগগোষ্ঠিভুক্ত করা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দেশীয় ও জাতীয় সুরগুলি এই সময় সংস্কৃত হয়ে অভিজাত রাগ-তালিকায় স্থান পেল বটে, কিন্তু তাই বলে এই তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ এই ধরণের কোনও চিহ্ন রইলো না বরং সবগুলিই অখণ্ড ভারতের রাগ বলে গণ্য হতে লাগলো।

প্রখ্যাত তামিল নাটক 'শিলপ্পাদিকরম্' নাটকে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। এতে কট্ (দ্রুত), অসাই (লয়), তুক্ক্ (গুরু), অলবু (প্লুত) এবং চীর (অনুদ্রুত) প্রভৃতি কাল বা তালের পরিচয় আছে। তামিল সাহিত্য প্রধানত ইয়াল, ইসাই ও নাটকম এই তিনভাগে বিভক্ত এবং বহুজাতি সাতটি লৌকিক যন্ত্রের নাম কুরাল, তুত্তাম, কৈক্কিলাই, উলাই, ইলাই, বিলারি ও তারম। এরা নামে পৃথক, কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতি পৃথক ছিল না।

চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে লেখা রাজা সোমেশ্বর-এর 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে (১১৩১ খৃঃ) সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই গ্রন্থে আলোচিত গীতবিনোদ (গীতাধ্যায়) ও বাদ্যবিনোদ (বাদ্যাধ্যায়) পার্শ্বদেবের সঙ্গীত সময় সার (খৃঃ ১ম থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা) এবং শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থের আলোচিত গীত ও বাদ্য অধ্যায়েরই অনুরূপ। সুতরাং দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণভারতে গীতি, রাগ ও বাদ্যের অভিজাতরূপ, গতি ও বিকাশ প্রায় এক ধরণেরই ছিল।

এই সময় আমরা পাই সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেবকে (১২১০-৪৭ খৃঃ)। শার্ঙ্গদেব দেবগিরি রাজ্যের যাদববংশীয় রাজসভায় প্রধান সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। এই সময় মারাঠা সাম্রাজ্য দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জন্যই অনুমান করা চলে যে, শার্ঙ্গদেব দক্ষিণ ও উত্তর ভারত—এই দুই অঞ্চলের সঙ্গীতধারারই সংস্পর্শে আসেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সঙ্গীত রত্নাকর'(১) পাঠ করলে সেই কথাই মনে হবে। তবে তিনি দু'টি ধারার কোনও পার্থক্য নির্দেশ করেন নি।

উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটক) এই দুই নামে ভারতীয় সঙ্গীত পৃথকভাবে চিহ্নিত হয় শার্ঙ্গদেবের প্রায় ১০০ বৎসর পরে। তখন খিলজী সুলতানেরা দিল্লীর মসনদে সমাসীন। এই সময় চালুক্যরাজ হরিপালের লেখা 'সঙ্গীত সুধাকর' গ্রন্থে এই দুইটি পৃথক নাম দেখতে পাওয়া যায়(২) গ্রন্থটি ১৩০৯-১৩১২-এ লেখা। অনেকের মতে এই হরিপাল দেবগিরির যাদবরাজ হরিপাল দেব (১৩১২-১৩১৮) থেকে পৃথক ব্যক্তি।

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতিলাভ ঘটে। 'মুসলমান শাসকদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতের প্রসারে সাহায্য করেন। তাঁদের অধিকাংশই রাজসভায় সঙ্গীতজ্ঞদের স্থান দিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে পারসীয় সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং দক্ষিণ ও উত্তর এই দু'টি ধারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়।'

—[H. A. Popley—The Music of India]

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টির দিক থেকে বিশেষ ভাবে দুইজন মুসলমান শাসকের রাজত্বকাল স্মরণীয়: আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৫-১৩১৬) এবং আকবর (১৫৪২-১৬০৫) এবং আকবরের রাজত্বকাল। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় পারসীয় এবং ভারতীয় সঙ্গীতের মিশ্রণে উদ্ভাবিত কাওয়ালী পদ্ধতি আমীর খসরুই প্রথম প্রচলন করেন। আকবরের রাজত্বকালে পারসীয় প্রভাবে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর বেশ পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে যদিও সঙ্গীতের প্রচলিত গায়ন-রীতি উপেক্ষা করা হচ্ছিল, তথাপি মোটের উপর এই নূতন পদ্ধতি প্রিয় হয়ে ওঠে এবং উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

১। যাদবরাজ ২য় সিংহনের রাজত্বকালে রচিত।

২। South Indian Music, Bk I
by P. Sambamoorthy.

সূচিত হয়। এই আকবরের সময়ই (১৫৪২-১৬০৫) দরবারী সঙ্গীতের প্রচলন হয়।

উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়—এই দু'টি পৃথক ধারার সূত্রপাত হয় খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে। যখন পণ্ডিত রামামত্য 'স্বরমেলকলানিধি' (১৫৫০ খৃঃ) এবং পণ্ডিত সোমনাথ 'রাগবিবোধ গ্রন্থ' (১৬০৯) রচনা করেন। তার আগে দার্শনিক ও সঙ্গীতশাস্ত্রী বিদ্যারণ্য বা মাধব-বিদ্যারণ্য (১৪শ শতাব্দী) প্রবর্তিত ১৫টি মেল তথা জনকরাগ ও ৫০টি জন্যরাগ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তাতে ক'রে অখণ্ড সঙ্গীতধারার মধ্যে কোনও ব্যবধান সৃষ্টি হয় নি। তবে মনে হয়, যখন মাধব-বিদ্যারণ্যের জনক ও জন্যরাগগুলির ওপর ভিত্তি করে পণ্ডিত রামামত্য ২০টি জনকমেল ও ৬৪টি জন্যরাগ এবং সোমনাথ ২৩টি মেলরাগ ও ৭৭টি জন্যরাগের সৃষ্টি করেন তখন থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতধারার মধ্যে পার্থক্যের লক্ষণ কিছুটা দেখা দেয়। তারপর ১৭শ শতাব্দীতে বেঙ্কটমখী (১৬৩৭ খ্রীঃ) যখন ৭২টি মেলরাগ তথা মেলকর্তার (ঠাট) প্রচলন করেন তখন থেকেই বলতে গেলে বিশেষভাবে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতধারার সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি হ'ল কর্ণাটক সঙ্গীতধারার।' [রাগ ও রূপ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ]

আলাউদ্দিন খিলজীর সময় থেকে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারসীক সঙ্গীত উপকরণের যে মিশ্রণ সুরু হয়েছিল, মোগল আমলে তা ব্যাপক হয় এবং এই সময়ই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি হিন্দুস্থানী নামের আভিজাত্য গ্রহণ করে কর্ণাটক সঙ্গীতধারার সঙ্গে পৃথক হয়ে পড়ে।

এরপর থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত তার নিজস্ব ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য

প্রভূত ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কলা সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত, নৃত্য-গীতি, গীতিনাট্য, লোকসঙ্গীত—সবদিক থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত সমৃদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সমর-সঙ্গীত লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আধুনিককালে তার অভাব পূরণ করেছে 'গমন-গীত' (marching song) বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমরা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতকে মোটামুটিভাবে ৮ভাগে ভাগ করতে পারি :—

(১) **রাগমালিকা**—মধ্যযুগের সঙ্গীতে 'রাগ কদম্বকম' এই নামে রাগমালিকা পরিচিত ছিল। তখন এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাগে গাওয়া হতো। ক্রমশ বিভিন্ন অংশে রাগমুদ্রা সংযোজিত হয়। দীর্ঘ রাগমালিকা কতকগুলি অংশে বিভক্ত—প্রত্যেক অংশ আবার কতকগুলি রাগে গাওয়া হয়। প্রত্যেকটি অংশ শেষ করা হয় সেই অংশের আরম্ভের শব্দ দিয়ে। দীর্ঘ রাগমালিকার (যেমন মহা বৈদ্যনাথ আয়ারের ৭২ মেলরাগ মালিকা) প্রত্যেকটি অংশ শেষ করা হয় সেই অংশে ব্যবহৃত রাগের চিত্ত স্বর দিয়ে। এর পরেই পরবর্তী অংশ ব্যবহৃত রাগের চিত্ত স্বর দিয়ে পরবর্তী অংশের ভূমিকা রচিত হয়। তারপরে পরবর্তী অংশ গাওয়া হয়। রাগমালিকা অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং এর মধ্যে উচ্চ কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) **কৃতি**—কৃতি উচ্চ কোটির গান। কীর্তন থেকেই কৃতির উদ্ভব অর্থাৎ কীর্তনেরই এক উন্নত রূপ কৃতি। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে কীর্তনের সৃষ্টি হয়। তাল্লাপকম গীতকারের (১৪০০—১৫০০) যে কীর্তন রচনা করেন তা তিনভাগে বিভক্ত; পল্লবী, অনুপল্লবী এবং চরণ। কীর্তনে 'কথা'ই প্রধান, সুর সেখানে কথার বাহন। 'কৃতি'তে এর বিপরীত—এখানে সুরই প্রধান। তাল্লাপকম গীতকারেরাই প্রথম 'কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে প্রকৃতপক্ষে 'কৃতি'র উদ্ভব পুরন্দর দাসের পদ থেকে। বর্তমানে কৃতি কর্ণাটক সঙ্গীতের সাহিত্য ও রাগভেদের মূল বিকাশরূপে স্থানলাভ করেছে] কৃতি গাইবার পদ্ধতি এইরূপ :

'প্রধান গায়ক অথবা বাদ্যযন্ত্রী শুরু করেন 'বর্ণন' দিয়ে। তারপর তিনি মধ্যলয়ে কতকগুলো কৃতি পরিবেশন করেন রাগের বৈচিত্র্যময়তায়। এইভাবে গড়ে তোলা হয় সঙ্গীতের যথার্থ পরিমণ্ডল, যাকে সাঙ্গীতিক ভাষায় বলে 'মেলম্।' শিল্পী তারপর 'রাগ আলপনা' দিয়ে প্রবেশ করেন কৃতির বিলম্ব কাল-এ। কতকগুলি, সুনির্বাচিত আবর্ত দিয়ে তিনি 'সাহিত্য-এর 'নেরাভল' পরিবেশন করেন। রাগ ও লয়ের ওপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে তিনি কল্পনাস্বরে সঙ্গীতের উপসংহার টেনে আনেন। এইভাবে ঐকতান সঙ্গীত 'পল্লবীতে' গিয়ে পৌঁছয়। এটাই হলো সঙ্গীতের সর্বোচ্চ স্তর। পল্লবী 'আবর্ত'-এরই একটি সুর প্রকল্পনা যার সাহায্যে দক্ষতা ফুটিয়ে তোলা যায়। পল্লবীর পর সঙ্গীতে আসে সহজ ও চিত্তবিনোদনের সুর। সাঙ্গীতিক ভাষায় এদের বলা হয় 'পদম'। জাবালী, তিল্লানা, তিরুপ,পু-পায় প্রভৃতি। পরিশেষে মঙ্গলম বা ভক্তিমূলক দ্বারা সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, রাগ ও কৃতির পরিবেশনায় দু'টো মৌলিক রূপ প্রকাশ হয়েছে। সঙ্গীতানুষ্ঠানের অন্যান্য সমস্ত কলা-কৌশলই এই দু'টি মৌলিক উপকরণে এসে মিশে যায়। এই দু'টিই কর্ণাটক সঙ্গীতের সারবস্তু।

এই কৃতি চরম উৎকর্ষলাভ করে কর্ণাটক সঙ্গীতের ত্রয়ী শ্যামশাস্ত্রী, মুথুস্বামী দিক্ষীতর এবং ত্যাগরাজের হাতে। কৃতির কথাবস্তু ধর্মীয় হতে পারে আবার ধর্মনিরপেক্ষও হতে পারে। কৃতিকে চিত্তস্বরযুক্ত করেন রামস্বামী দিক্ষীতর এবং কবি মাত্রাভূত্যায় (১৮শ শতাব্দী)। সমষ্টিচরণের সঙ্গে কৃতি রচনা করেন প্রথমে মুথুস্বামী। বিভিন্ন ধাতুর চরণের সঙ্গে কৃতি রচনা করেন ত্যাগরাজ। শ্যামশাস্ত্রী, মুথুস্বামী এবং ত্যাগরাজ—এঁরাই প্রথম সমুদায় কৃতি রচনা করেন।

(৩) **পদম**—মধুর ভক্তি এবং নায়ক-নায়কী ভাব হচ্ছে পদম-এর উদ্ভব উৎস। মধ্যযুগে পদম বলতে সমস্ত ভক্তিমূলক গানকেই বোঝাতো। এই কারণেই পুরন্দর দাস এবং অন্যান্যদের পদকে বলা হতো 'দাসর পদগলু।' তার পরবর্তীকালে মধুর ভক্তি-সম্পর্কিত গানকে বলা হতে থাকে পদম্। ক্ষেত্রায় (১৭শ শতাব্দী) পদম্ রচনার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। তাঁকে আধুনিক পদম্-এর জনক বলা হয়। সুন্দর 'ধাতু' থাকায় এই শ্রেণীর গান ঐকতান বাদনের সঙ্গে গাওয়া হয়ে থাকে। অন্তর্নিহিতভাব এই শ্রেণীর গানকে সম্মিলিত নৃত্যাভিনয়ে ব্যবহার করা চলে। যমক সমন্বিত পদ রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন পরিমল রঙ্গ এবং স্বরাক্ষর সমন্বিত পদ রচনা করে

বিখ্যাত হয়েছেন শার্ঙ্গপাণি। ক্ষেত্রায়া রচনা করেছেন সমুদায় পদম্। মুভালুর সভাপতি আয়ার (১৯শ শতাব্দী) তেলেগু ভাষায় পদ রচনা করেছেন এবং ঘনম কৃষ্ণ আয়ার রচনা করেছেন তামিল ভাষায়। দুইজনের পদই অপূর্ব। কৃষ্ণ আয়ারের তামিল পদ ক্ষেত্রায়ার তেলেগু পদের সমতুল্য।

(৪) **জাবলি**-জাবলি সৃষ্টি হয় ১৯শ শতাব্দীতে। এটা একটু হাল্কা ধরণের গান। এই গানের ক্ল্যাসিকাল সৌন্দর্যও নেই—কথাও উচ্চ শ্রেণীর নয়। তেলেগু ও কানাড়া ভাষায় জাবলি গাওয়া হয়। রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা এই গানে নেই।

(৫) **তিল্লানা**—এই গান সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রাণবন্ত। নাচের সঙ্গে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। এই গানের সৃষ্টি ১৮শ শতাব্দীতে। প্রাচীন যুগের অন্যতম তিল্লানা রচয়িতা বীর ভদ্রায়।

(৬) **স্বরজাতি**—১৮শ শতাব্দীতে এই গানের সৃষ্টি। এই শ্রেণীর গানের প্রথম অংশে জাতির একটি অনুচ্ছেদ থাকায় এই গান নাচের সঙ্গে ব্যবহার সুরু হয়। পরবর্তীকালে শ্যাম শাস্ত্রী ঐ জাতির অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পুরাপুরি গানে রূপান্তরিত করেন। এই স্বরজাতি রচনায় শ্যাম শাস্ত্রীর কৃতিত্ব অসীম। স্বরজাতির চরণগুলি দৈর্ঘ্যের দিক থেকে নানা আকারের এবং সেগুলি বিভিন্ন ধাতুতে সন্নিবেশিত।

(৭) **জাতিস্বরম** ১৯শ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর গানের সৃষ্টি। এটা পুরাপুরি নৃত্যের গান। সম্পূর্ণ গানই জাতি প্রকরণে গঠিত। যদিও পল্লবী, অনুপল্লবী এবং চরণের অংশ জাতির সঙ্গে গাওয়া হতো, কিন্তু পরবর্তীকালে এই রীতি বর্জন করা হয়। শ্যাম শাস্ত্রী, মুথুস্বামী, ত্যাগরাজ, স্বাতী তিরুনল প্রভৃতি জাতিস্বর রচনা করেন।

(৮) **বর্ণম**—পদ বর্ণের চেয়ে তান বর্ণ প্রাচীন। প্রথম তান বর্ণ হচ্ছে বিরিবোনি বর্ণ—এটা রচিত হয় ভৈরবী রাগে। এর রচয়িতা পচ্ছিমিরিয়ান আদিয়প্পিয়াকে তাই বলা হয় বর্ণ মার্গদর্শী।

তান বর্ণের পরিপূরক অংশকে বলা হয় অনুবন্ধম। ধীরে ধীরে এই অংশ পরিত্যাগ করা হয়েছে। বিখ্যাত তান বর্ণ রচয়িতা পল্লবী গোপাল আয়ার, বীণা কুপ্পায়ার এবং স্বাতী তিরুনল অনুবন্ধম অংশ বাদ দিয়েই তান বর্ণ রচনা করেছেন।

পদ বর্ণ নৃত্যের ঐকতান বাদনের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রামস্বামী দিক্ষীতর সর্বপ্রথম পদবর্ণ রচনা করেন। তাঁর পুত্র মুথুস্বামী তোড়ী রাগে আদি তালে বিখ্যাত বর্ণ রচনা করেন। স্বাতী তিরুনলও চমৎকার পদবর্ণ রচনা করেন। —প্রভাতকুমার গোস্বামী

জার্মান-টেপে রবীন্দ্র কণ্ঠ

রবীন্দ্রভক্ত হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে জার্মানীর আসন প্রথম সারিতে। ১৯৩০ সালে কবিগুরুর সেখানে অবস্থানকালে তাঁর 'ঝুলন' কবিতাটির স্বকণ্ঠ আবৃত্তি রেকর্ড করা হয়। বলা বাহুল্য, এই আবৃত্তি শ্রবণেন্দ্রিয়কে যথেষ্ট পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে তোলে। বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির আবৃত্তি যেমনই অনবদ্য তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। ঐ টেপেই 'রিকনসিলিয়েশান অফ পিপলস' নামক বার্লিনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণটিও ধরে রাখা হয়েছে। আজকের সমস্যাজর্জর পৃথিবীর এক শঙ্কাজনক আলেখ্য দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর আগে ঋষিকবির ধ্যানদৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল এই অভিভাষণটিই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কলিকাতায় জার্মান দূতাবাস এই টেপ রেকর্ডের তিনখানি কপি যথাক্রমে কলকাতার আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারকে উপহার প্রদান করেছেন।

'তাসের দেশ'-এর শিল্পী: লাইটহাউস মিনিয়েচারে গ্রামোফোন কোম্পানী সাংবাদিকদের 'তাসের দেশ' লং-প্লেয়িং রেকর্ড শোনাবার ব্যবস্থা করেন—ওই অনুষ্ঠানে (বাঁ-দিক থেকে পিছনের সারি) সুবীরময় ঘোষ, মৃণাল চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, পি কে সেন, শ্রীঅর্ধ, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়, মিন্টু দাশগুপ্ত ও শৈলেন মুখো: (সামনের সারি) উৎপলা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা রায়, বনশ্রী ঘোষ ও বাণী ঠাকুর।

'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে 'তাসের দেশ'

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রূপক নাটক 'তাসের দেশ' বাংলা ভাষায় এক অবিনশ্বর সৃষ্টি। মঞ্চে এই নাটকের অভিনয় সাজসজ্জার চমকে, চলন বলনের গমকে এমন এক রূপলোকের সৃষ্টি করে যা কিছুতেই ভোলা যায় না। রেডিও বা রেকর্ডে এমন নাটক কেবল শ্রুতির মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কিন্তু সেই দুরূহ কাজই বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন—'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের কুশলী শিল্পিবৃন্দ। শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় এই নাটক পরিচালনায় যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা এক কথায় বিস্ময়কর বলা চলে।

বিবিধ ভূমিকার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন হিজ মাস্টার্স ভয়েসের প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকাগণ। তাঁদের মধ্যে কণিকা দেবী ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় তো আছেনই, আরও আছেন—শ্যামল মিত্র, সুবিনয় ঘোষ, উৎপলা সেন, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী ঘোষ, পবিত্র মিত্র, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, মিন্টু দাশগুপ্ত, বীরেন বসু, আলপনা রায় ও বাণী ঠাকুর প্রভৃতি।

সম্প্রতি কলকাতায় লাইট হাউস মিনিয়েচার সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে সাংবাদিক ও নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে 'তাসের দেশ'-এর রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। অংশগ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে ই জর্জ, আর্টিস্ট এণ্ড রেপার্টয়ার ম্যানেজার মিঃ পি কে সেন এবং পাবলিসিটি অফিসার মিঃ এস কে দে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। নাটকের সঙ্গীতাংশ অপূর্ব হয়েছে, আর অভিনয় অংশও যে সঙ্গীত-শিল্পীরা খুব চমৎকার উৎরিয়েছেন একথাও বিশেষভাবে স্বীকার্য। নিখুঁত রেকর্ডিং-এর এমন দৃষ্টান্তও খুব বিরল। সম্পূর্ণ নাটকখানি মাত্র একখানি লং প্লেইং রেকর্ডে বিধৃত হওয়ায় রাখবার পক্ষেও খুবই সুবিধা। রেকর্ডের প্রচ্ছদচিত্রও মনোরম এবং আকর্ষণীয় হয়েছে। মোটমাট, রেকর্ডে 'তাসের দেশ' সকল রবীন্দ্র সঙ্গীতানুরাগীকে আনন্দ দেবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রেকর্ডে 'তাসের দেশ' বাজিয়ে শোনাবার সময় উপস্থিত অতিথিবর্গের মধ্যে একাংশে সাংবাদিকদের দেখা যাচ্ছে সুমুখের সারিতে আছেন—শিল্পী শ্যামল মিত্র, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড), শিল্পী শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পরের সারিতে—সেবাব্রত গুপ্ত (দেশ), এন কে জি (অমৃত বাজার পত্রিকা), শিল্পী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, তার পশ্চাতের সারিতে—মিঃ পি কে সেন (এইচ, এম, ভি), সুপ্রিয় সরকার (অমৃত), প্রাণতোষ ঘটক (মাসিক বসুমতী), প্রসাদ সিংহ, গিরীন্দ্র সিংহ (উল্টোরথ) ও অন্যান্য।

আমার কথা (১০৮)

শ্রীমতী প্রতিভা কাপুর

সঙ্গীতানুশীলন ছিল সমগ্র পরিবারের ধ্যানজ্ঞান। পিতা মৃদঙ্গ বাজানোর সাথে গান গাইতেন—কন্যারাও নাচে গানে আগ্রহী ছিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতিময়ী গায়িকা শ্রীমতী প্রতিভা কাপুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী কাপুরের ভাষায়—হাওড়া জিলার আমতার নিকট কলবাঁশ গ্রামের বাসিন্দা ৺উপেন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী নলিনীবালা ঘোষের মধ্যমা কন্যা আমি, ১৯২৮ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করি। বড়দিদি বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার—তৃতীয়া শ্রীমতী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠা হলেন শ্রীমতী অলকা সেন।

শ্রীমতী প্রতিভা কাপুর

জ্যাঠতুতো ভাই শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের কাছে বড়দিদি ও আমি একত্রে গান শেখা আরম্ভ করি। পরে আন্দুল গ্রামের শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট চার বৎসর উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখার পর শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষার্থীনা হই। ১৯৪২ সালে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হই। গানের প্রতি এত ঝোঁক ছিল যে, প্রত্যহ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাইবোনে গানের আসর বসাতাম—মার বকুনীর জন্য সাঙ্গ হত অনেক বেলায়।

১৯৫৮ সালে কলিকাতার সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক অ্যাকাদেমীতে (বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী) ভর্তি হই এবং ১৯৬১ সালে তথা হইতে বাংলা গানে প্রথম শ্রেণীর প্রথম ও তৃতীয় দলের (batch) মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করি। সেই বৎসর আমি 'সুরতীর্থ' সঙ্গীত শিক্ষালয়ে যোগ দিই।

ইহার পূর্বে শ্রীমতী চারুশীলা ধর এমএল-এ প্রতিষ্ঠিত নাকতলা মণিলাল শিক্ষা পরিষদে চার বৎসর কাজ করি। এক বৎসর পূর্বে শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী গীতাঞ্জলি ক্ষেত্রী, সুপ্রভা সরকার, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি ভবানীপুর শ্যামদাস স্মৃতিসঙ্গীত বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করি। এখানে সঙ্গীত ও উহার উপর আলোচনা—দুয়েরই ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগোপেন মল্লিকের সুরে এচ এম ভি-তে আমার দুইটি রেকর্ড প্রথমে করা হয়। শ্রীগিরীন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায় আমার একটি ভজন রেকর্ড আছে। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ও সুর দেওয়া রেকর্ড এ কয়েকজনের সঙ্গে আমিও অংশগ্রহণ করি।

পরলোকগত Impressario হরেন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচালনায় সঙ্গীত ও নৃত্যদল (প্রগেসিভ্ ব্যালে ট্রুপ) দুই বৎসর উত্তর ভারত ও বোম্বাই পরিভ্রমণ করে। আমি তখন উক্ত দলের সদস্যা ছিলাম। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহার সহিত আমি পারস্য, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে সঙ্গীত পরিবেশন করি। তেহরাণ রেডিওতে আমি বাংলা গান গাই। পারস্যে শ্রীশচীন দেববর্মণের বাংলা গান খুবই জনপ্রিয় ছিল—এটা লক্ষ্য করেছি। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় নাচ ও গানের খুবই সমাদর আছে। ভারতীয় ভৈরোঁ সুরের সাথে পারসীর গানের সুরের বেশ মিল আছে।

১৯৪৫ সাল হইতে আমি বেতারশিল্পী আছি। ১৯৬০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত UNESCO-র অধিবেশনের সময় স্থানীয় বেতারকেন্দ্র হইতে সঙ্গীত পরিবেশন করি।

১৯৪৫ সালে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র কাপুরের সহিত বিবাহসূত্রে আমি আবদ্ধা হই।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী—শ্রীশচীন বিশ্বাস।

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

চুয়াল্লিশ

'এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।'

বার্ধক্যে বারাণসী লিখতে লিখতে গত কয়েকদিনের মধ্যে এমন একটি অভাবিত অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা অযাচিত ঘটে গেছে যার কথা না লিখে বারাণসীর পরবর্তী অধ্যায়ে পা দেওয়া অসম্ভব। পশ্চিমবংগ পুলিশের অধীন ২৪ পরগণার প্রায় সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এক অসাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই অমূল্য উপহার আমি পেয়েছি। হাত বাড়ালেই এমন উপহার সহসা উপস্থিত হয় না। মানবজীবনের গভীর বেদনায় সুগভীর আনন্দের এমন আশ্চর্য ঘটন-অঘটনের আস্বাদ বহু ভাগ্যে মেলে। এ অভিজ্ঞতা অলৌকিক; কিন্তু অলীক নয়। এটি এমন একটি ঘটনা যা যেকোনও মানুষের জীবনের মোড় দিতে পারে ঘুরিয়ে। যাঁরা যুক্তি আর তর্কের রাস্তায় অতিপ্রাকৃতকে অস্বীকার করেন তাঁদের চোখ খুলে দেবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম আমি জানি। কিন্তু সেই সংগে এও জানি যে বইয়ের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে চোখের পাতা খোলবার সময় পান নি তাঁরা। পেলে তাঁরাও কেউ কেউ কখনও কখনও এমন পরমাশ্চর্য পবিত্র পূর্ণিমার মুখোমুখি হতে পারেন হঠাৎ, হোরেসিও যার নাগাল পায় নি দর্শনের সুদূরতম কল্পনাতেও। এস অভিজ্ঞতার জন্যে কাশী যাবার দরকার হয় না ['অবশ্য জ্ঞানীর পক্ষে সর্বত্রই কাশী—ইহা সত্য।'—ডক্টর গোপীনাথ]। কলকাতার অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতেও, কখনও কখনও তার দেখা মেলে, চোখের পাতায় পড়া যায় তার বাণী, দর্শনের পাতায় মেলে না যার দিশা।

যে ভদ্রলোকের কথা বলতে বসেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রদের তিনি একজন। জলপাইগুড়িতে অধ্যাপনা করেছেন আই-পি-এস হবার আগে। তাঁর বাবাও প্রথম শ্রেণীর কৃতিছাত্র; এখন অবসর-জীবন যাপন করছেন। পুলিশ অফিসার হিসেবেও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাম বললে চিনবে না এমন লোক কলকাতায় কম। তবুও তাঁর নাম আমি এখানে দিলাম না; তার কারণ, আমি তাঁর নামপ্রকাশের অনুমতি নিই নি।

এই ভদ্রলোকের দশ বছরের একটি প্রিয়দর্শন পুত্রের মৃত্যু হয়; কয়েক বছর আগে পাগলা কুকুরের কামড়ে। হাওড়ায় ছিলেন তখন ভদ্রলোক। চিকিৎসাবিভ্রাটই তাঁর ছেলের মৃত্যুর আরও একটি গুরুতর কারণ। ছেলেটি এত আশ্চর্য অসাধারণ ছিল যে, যে তার দিকে তাকাত, বিশেষ করে তার একজোড়া আশ্চর্যতর চোখের দিকে, সেই-ই চোখ ফেরাতে পারত না। সে চোখের অমর আলোকে কি বাণী গোপন ছিল কে জানে। মরলোকের দশটি বছর সে উজ্জ্বল করে দিয়েছিল অমরলোকের আলোকে; সুধায় ভরে দিয়েছিল,—বসুধায় সকলকে।

বালক বীরের বেশে বিশ্বজয় করতে এসেছিলো যে, তার নাম ছিল ভাস্কর। গোপাল বলেও তাকে ডাকতেন বাড়ির লোকে। ছেলেটির মৃত্যুতে দুর্বহ বেদনায় বিস্ফারিত পিতৃহৃদয় শুখিয়ে যাওয়া জীবনে করুণাধারার সন্ধানে ক্ষ্যাপার মত খুঁজে ফিরছিলেন পরশপাথর। মৃতপুত্রের অমৃত সত্তার সংগে কোনও অলৌকিক উপায়ে যোগাযোগ করা যায় কি না এই কাতর প্রশ্ন বুকে বয়ে বয়ে হাতড়ে ফিরছিলেন সেই বন্ধদরজা। ব্যাকুল করাঘাতে একসময়ে খুলে গেল সেই দরজা। একজন লোক কথা দিলেন, তিনি ক্রিয়া করে এনে দেবেন মৃতপুত্রের সূক্ষ্মাত্মাকে।

ক্রিয়ায় বসে, পরলোকবিদ বললেন: আপনার ছেলে এসেছে,—

ছেলেটির বাবা, নাম জিজ্ঞেস করলেন তাঁর মৃতপুত্রের। অদৃশ্য হস্তে লেখা হল: ভাস্কর। রোমাঞ্চিত হলেন তিনি। তারপর অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজেই বসলেন ক্রিয়ায়। সাড়া পাওয়া গেল ভাস্করের। না। সাড়ার চেয়ে বেশি পাওয়া গেল কিছু। মৃতপুত্র জীবিত পিতাকে বিচলিত বিহ্বল করে বলল: আমি আবার আসব তোমার সন্তান হয়ে। 'I will come as a son.'—ইংরেজিতে জানিয়েছিল লামার্টিনেয়ার-এর ছাত্র ভাস্কর চক্রবর্তী।

আরেকদিন ক্রিয়ায় বসে ভাস্করের পিতা আরও স্পষ্টতর আভাস পেলেন। প্রশ্ন করলেন আশান্বিতহৃদয় পিতা: তুমি কবে আসবে বাবা আবার?

১৯৬২ সালে।

কত তারিখ?

২২শে ডিসেম্বর—

কি বার?

শনিবার—

যে ঘরে বসে ছেলেটির বাবা মৃতপুত্রকে আহ্বান করছিলেন সে ঘরে কোনও ক্যালেণ্ডার ছিল না। ভদ্রলোক পাশের ঘরে গিয়ে ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টে বার করেন, '৬২-র ডিসেম্বর মাস ২২শে তারিখের মাথায় সেখানে জ্বলজ্বল করছে: শনিবার। তখনও পর্যন্ত

তাঁর স্ত্রীর কোনও সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আমাকে বলেছেন যদি মৃতপুত্রের এই ভবিষ্যদ্বাণীর আগেই তাঁদের সন্তান সম্ভাবনা থাকত তাহলেও তাঁরা ভাবতে পারতেন এ সবই অবচেতন মনের খেলা। অর্থাৎ যেহেতু মনে মনে প্রিয়পুত্রের মৃত্যুর পর নবজাতক সম্ভাবনায় বাপ-মা মনে করতেই পারেন যে, সেই মৃতপুত্রই আবার তাঁদের ঘরে আসছে, সেইহেতু এই পারলৌকিক বার্তা অলীক অলৌকিক বলে উড়িয়ে দিতে তাঁদের আটকাত না। কিন্তু মৃতপুত্র ভাস্কর অথবা গোপাল জীবনমৃত্যুর ওপার থেকে যখন দীপ্ত সুনিশ্চিত উজ্জ্বল প্রত্যয়ে জানিয়েছে যে, সে আসছে ১৯৬২-র ২২শে ডিসেম্বর, শনিবার তখন ত' তাঁর স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনাই দেখা দেয় নি। তবে?

৬২-র এপ্রিল মাসে সে সম্ভাবনা প্রথম সোচ্চার হল। ডাক্তার নবজাতক-আবির্ভাবের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করলেন, ১৮-১৯ কিংবা ২৫-২৬ ডিসেম্বর। বিশ্লেষণ অতীত বিস্ময়ের শতদল সবে চোখ মেলছে তখন। একবার মনে হচ্ছে ভাস্করের বা গোপালের লেখা মিলবে; আরেকবার মনে হচ্ছে, সবটাই মনের ভুল। অসহ্য মন্থর মুহূর্তের মিছিল যেন দীপ্ত দ্বিপ্রহরে শ্লথ পদ ভারমুক্ত গোশকটের মত। সমস্ত দিনের দুঃখ-ধন্দার বিক্ষুপ্রান্তে কখন পৌঁছবে লক্ষ্য তারই চিন্তায় চালকের মত ছটফট করছেন ভাস্করের পিতা। শ্লথ কিন্তু সুনিশ্চিত পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম হোঁচট খেল ৮ই ডিসেম্বর।

যন্ত্রণায় অস্থির হলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। মহিলা ডাক্তার দেখে বলল: রক্তক্ষরণ হচ্ছে ভেতরে, বাচ্চার হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছে না। সিজারিয়ান অপারেশান করে বাচ্চাকে বার করতে হবে এখুনি। মন খারাপ হয়ে গেল বাপের নিমেষে। দুর্যোগের কালো মেঘে ঢেকে গেল উজ্জ্বল সম্ভাবনার সোনালি তারা। কিন্তু তখন আর মন খারাপ করার মতও অবস্থা ছিল না মনের। নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে গিনোকোলজিস্ট বললেন: না। হার্ট কোনদিকে বাচ্চার তাই ধরতে পারেন নি মহিলা ডাক্তার। কিছুই হয় নি। কোনও ভয় নেই, সন্তান অথবা জননীর।

মেঘ ফেটে আবার বেরিয়ে পড়ল অনন্ত আশার তিমিরবিদার চন্দ্রালোক। ভাস্করের কথাই ঠিক হবে। '৬২-র ২২শে ডিসেম্বর সে-ই ফিরবে তার 'মা'-টির ঘরে। স্বর্গ থেকে বিদায় নেবে সে। মনে পড়বে তার মায়ের করুণ মুখ। সে মুখ আবার নবারুণ উজ্জ্বল করবে সে; মায়ের বুক উচ্ছল করবে ভালোবাসার আলো-আশার বাঁধা-হাসার অমৃতে আবার! বাপের বসুধায় ভরে দেবে নবতর উদ্দীপনার অফুরন্ত সুধায় সে-ই। এসেই যে বলবে, মা, এই যে আমি···তোমার গোপাল।

আমি যখন সেই ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলাম তখন ভরা দুপুর। দক্ষিণ কলকাতার অতিব্যস্ত সরকারী বিচিত্র ধরণের বহু কর্মস্থলের সংগমক্ষেত্র তখন গমগম করছে নানা পায়ের আসা-যাওয়ার আওয়াজে; নানান কণ্ঠের কাকলীতে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ থেকে তখন জীবিকার মুখোস খুলে পড়ে গেছে। ক্ষণকালের পুলিশ অফিসার তখন চিরকালের পিতা। কান্নায় ভেজা তাঁর গলা। পুত্রের মৃত্যুর গভীর বেদনা এবং নবজাতকের বেশে তার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যয়ের সুগভীর আনন্দ সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসারকে নয়, অথণ্ডসত্তা পিতৃহৃদয়কে দুঃখসুখের এপারে-ওপারে দোলা দিচ্ছে বারে-বারে। কাশীর অন্ধকার বিতলে কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধকাশীর উপাখ্যান শুনতে শুনতে যেমন মনে হয়েছিল এ রূপকথা নয়, এ কোন্ অপরূপ কথা শুনছি,—আজও পুলিশ অফিসের রূঢ় বাস্তব পরিবেশে একটি বিস্ফারিত বিস্ময়ের মুখোমুখি বসে আমার মনে হল জন্ম ও মৃত্যু এই দুই-ই কেবল সত্য নয়; জন্মান্তরও সত্য। নবনব জীবনের চারণক্ষেত্রে মৃত্যু-রাখাল আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আব্রহ্মস্তম্ব রব উঠছে তাই অনন্তকাল ধরে; চরৈবেতি, চরৈবেতি···চলো, চলো, এগিয়ে চল।

ক্ষণকালের এই খেলাঘরে বাপ-মা ভাই-বোন এরাই আমাদের চিরকালের ধন। এদের নতুন করে পাব বলেই বুঝি হারাই ক্ষণেক্ষণ। এই মরলোকে যেসব বাসনা-কামনা জড়িয়ে থাকে জাতকের কর্মে মর্মে; তার স্বপ্নে, রক্তে, মজ্জায় মিশে থাকে যে অচরিতার্থ আনন্দ-বেদনা, মৃত্যুর সংগে সংগে তার ওপর যবনিকা পড়ে না। তারা আবার আসে, মর্ত্যধুলির ঘাসে ঘাসে পা ফেলে ফেলে, তারা জানার মাঝে অজানাকে সন্ধানের নেশায় মাতাল হয় বারে বারে। স্বর্গের সুধার চেয়ে 'মা'-টির বসুধার টানে অনেক বেশি। তাই ফিরে আসে তারা। পাপ-পুণ্যে পতনে-উত্থানে, মানুষ অকূল অন্ধকার থেকে অতল আলোর অভিসারে চলেছে নিত্যকাল। আলো হাতে তারা আঁধারের যাত্রী। জীবনের ধন মৃত্যুতেও যাবে না ফেলা। কারণ পুণ্যের, কারণ পূর্ণের পদপরশ তারও 'পরে। তমো থেকে মহত্তমে মানুষের যাত্রা থেমে যাবার নয় কোনওকালে। নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সাঁঝসকালে মহাকালের মন্দিরা বাজছে ডাইনে-বাঁয়ে দুই হাতে। সুখে-দুঃখে আনন্দে-শংকাতে জন্ম-মৃত্যুর উত্থান-পতনে মুহূর্তের তালভংগের উপায় নেই। সবাইকেই আসতে হবে বারবার, যতক্ষণ না জন্মমৃত্যুর চক্র ভেদ করে কেউ পৌঁছচ্ছে সে-ই স্তরে যেখানে এসেই সে জানছে, সে-ই সব। তারই চেতনার রঙে যে পান্না সবুজ এ উপলব্ধি যতক্ষণ চোখের পাতায় দর্শন না দিচ্ছে ততক্ষণ সব দর্শন সব সন্দর্শন মিথ্যা। সংস্কারের শেকলে বাঁধা সবাই। তাকে ছিন্ন করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য। লক্ষে একজন তা পারে। বাকী সবাই ঘুরে মরে গোলকধাঁধায়। তারপর একদিন সবার অলক্ষ্যে লক্ষ্যভেদ করে সেও। সব রত্নাকরই শেষ পর্যন্ত রামায়ণকার হয়। এরই নাম লীলা। ইহলীলা সেই লীলারই স্থূলরূপ মাত্র। এই দেহেই নিঃসন্দেহে তাঁর বাসা। মানবদেহর চেয়ে ভালো বাসা ভগবানের আর দ্বিতীয় নেই। এ জ্ঞান হওয়া মাত্র, এ গান দেহের বীণায় বাজামাত্রই বিনা তর্কশাস্ত্র, জ্ঞান বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যেই—যিনি রাজার রাজা তিনি হাজির। মানবদেহর চেয়ে বড় মন্দির নেই। দেহাতীত যিনি, নিঃসংশয়, নিরুপম, নিরাকার যিনি সন্দেহাতীত, তিনি এই দেহেই আছেন। এই দেহ ধরেই তিনি নিজেই নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যতক্ষণ না পাওয়া ততক্ষণ চাওয়া নিজেকেই। জন্মে জন্মে স্তরে স্তরে মানস সরোবরের ঘোমটা তুলে তুলে নিজেকেই নিজে দেখবার চেষ্টা। যতক্ষণ এক স্তরের সব বাসনা-কামনা না নিঃশেষে মেটা, ততক্ষণ সেই স্তরেই ঘুরে মরা। এই হচ্ছে একই ঘরে মৃতপুত্রের অমৃত আবির্ভাবের ব্যাখ্যা।

পুলিশের মস্ত বড় সেই অফিসার তাঁর সন্তানমৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন তিনি হতভাগ্য। আর আমার মনে হয়েছে এত সৌভাগ্য আর কার। দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামে, বক্ষের

দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামে, একথা যে নিছক কবিতা নয়, জীবনসত্য। এ তো তাঁর অজানা থাকত যদি না ঘটত প্রিয়মৃত্যুর অঘটন। দর্শনের ছাত্র, দর্শনের অধ্যাপক পুঁথির পাতায় কি পেতেন তার উত্তর, পুলিশ ফাইলের পাতায় চোখ নষ্ট করে কেটে যেত কাল, চোখের পাতায় এ সত্য প্রতিভাত হত কি, যে জন্ম-জন্মান্তর আছে। জাতিস্মর কথাটা অলীক নয়, অলৌকিক হলেও।

বনে গুহায় আশ্রমে সাধুর আস্তানায় ঘুরে কত মানুষ একটা প্রমাণ পায় না জন্মান্তর-তত্ত্বের। আর ঘরে বসে একজন নিজের ছেলের মৃত্যুতে জেনে যায় প্রত্যেক ছেলেই অমৃতের পুত্র। সেই একজনও যখন বলেন; তিনি ভাগ্যনিহত, তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে, যে কোন্ মুহূর্ত মানুষ পরশপাথর পেয়ে গেছে কোনও কোনও মানুষ তা জানে না। প্রথম জীবন কাটে পরশপাথরের অন্বেষণে; তারপর পরশপাথরের স্পর্শে বাসনা যখন সোনা হয়ে যায়, তার অনেক পরে যখন তা খেয়াল হয়, তখন বাকী জীবন কাটে সেই সোনার মুহূর্তটির ব্যর্থ সন্ধানে। এই হচ্ছে তাঁর খেলা, ধরা দিয়েও যিনি ধরা দেবেন না কিছুতেই।

২১শে ডিসেম্বর সকালে পুলিশ অফিসার তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, এবার শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুসদনে যাবার জন্যে তাঁকে তৈরি হতে হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রসববেদনারম্ভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা পর্যন্ত অনুপস্থিত। তাঁর স্ত্রী বলেন, কোথায় যাব এখন। ভদ্রলোকের এক আত্মীয় পরামর্শ দেন, আজই সন্ধ্যায় সন্তানসম্ভবাকে হাসপাতালে রেখে আসতে। যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয় তাহলে বড় জোর দু'চারদিন দেরী হবে। কিছু বেশি অর্থদণ্ড লাগবে। কিন্তু মৃতপুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী যখন এখনও মিথ্যে হয় নি, তখন নিঃশব্দটুকুও তার কথা মতো ২২শে ডিসেম্বরের জন্য তৈরি হওয়াই মংগল।

হাসপাতালে সবাই হাসে। বলে, নিয়ে যান; এখন দু'তিনদিনের মধ্যে কোনও কিছুর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসার স্ত্রীকে শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুসদনে রেখে আসেন ২১শে ডিসেম্বর। রাত তিনটের পর ব্যথা ওঠে। ২২শে ডিসেম্বর, সকাল ৯টা বেজে কত মিনিট আমার মনে নেই, সন্তান ভূমিষ্ঠ হল মাতৃগর্ভ থেকে।

ভাস্কর তার সব কথা রাখলেও, একটি কথা রাখতে পারে নি। কি সেই কথা? [ক্রমশ।

বিনা আয়াসে ইংরেজী

আগামী শিক্ষাবর্ষে হল্যাণ্ডের স্কুল টেলিভিশন শিক্ষাক্রমে, সহজে 'ইংরেজী ভাষা শিক্ষা' নামক একটি ভাষা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চালু করা হবে। অক্টোবর মাস থেকে টেলিভিশনে প্রথম 'স্কুল বর্ষ' চালু করা হয়েছে এতে, প্রতিটি ২০ মিনিটের অনুষ্ঠানে প্রায় ২০টি টেলিকাস্ট পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যাই হোক, বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের জন্য, ক্লাশের টেলিভিশন পর্দায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হবে। যাঁরা পরীক্ষা ও গবেষণার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক থাকবেন এই রকম ৩০০টি স্কুলে বিনামূল্যে টেলিভিশন সেট সরবরাহ করা হবে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে শিক্ষা গবেষণা কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য থাকবেন। নিয়মিত চ্যানেলেই অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে এবং যাঁরা দেখতে চান তাঁরাই দেখতে পাবেন। এক বছর পূর্বে যে নেদারল্যাণ্ড শিক্ষামূলক টেলিভিশন সংস্থা গঠন করা হয়েছে তাঁরা দেশের নেতৃস্থানীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানসূচী তৈরি করেছেন। স্কুলের উদ্দেশ্যে টেলিভিশন চালু করার ক্ষেত্রে নেদারল্যাণ্ড যদি অন্যান্য দেশের পেছনে পড়ে থাকে তা হলে তার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। প্রধান কারণটি হ'ল, বহু বছর যাবত অন্য আর একটি মাধ্যম, শিক্ষক ও ছাত্রগণের সন্তুষ্টি বিধান করে প্রচলিত আছে। সেই মাধ্যমটি হ'ল স্কুল ফিল্ম। বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার স্কুল নেদারল্যাণ্ড শিক্ষামূলক ফিল্ম সংস্থার সদস্য। বহু বছর যাবত অস্থায়িভাবে কাজ করার পর ১৯৪১ সাল থেকে এই সংস্থাটি, স্থায়িভাবে একটি স্কুল ফিল্ম সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। সদস্য স্কুলগুলি প্রতি বছর মোটামুটি ৩০টি ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা করে। নেদারল্যাণ্ড শিক্ষামূলক ফিল্ম সংস্থা, পরিচালক সংস্থা হিসেবে এর সদস্য স্কুলগুলিকে ফিল্ম বণ্টন করে। এরাই এই সব ফিল্ম রচনা ও প্রযোজনা করে। চার হাজার স্কুলে বণ্টন করার জন্য প্রতি বছর প্রায় ১২৫০০০টি প্রিণ্ট তৈরি করা হয়। স্কুলে যে সব ফিল্ম দেখানো হয় সেগুলি সাধারণত শিক্ষামূলক, যেমন রান্না করা, কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক কাজগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখানো হয়। আর এক ধরণের ফিল্ম হ'ল বর্ণনামূলক, যেমন জীববিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি। তৃতীয় ধরণের ফিল্মগুলি হ'ল সম্পূর্ণভাবে শিক্ষামূলক। এগুলিতে ছাত্রদের তাদের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে তাদের স্থান দেখানো হয়। এই রকম ফিল্মে ভদ্রতা, রাস্তায় চলার নিয়ম ইত্যাদিও দেখানো হয়। কিন্তু ফিল্মের মাধ্যমে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে এ পর্যন্ত শোনা যায় নি। এই ক্ষেত্রেই শিক্ষামূলক টেলিভিশনের উপযোগিতা বুঝতে পারা যায়। হল্যাণ্ডের স্কুলগুলিতে টেলিভিশন চালু করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ক্লাশের শিক্ষকগণকে প্রথমে এর সঙ্গে পরিচিত করানো হয় এবং টেলিভিশনে শিক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা কতখানি থাকতে পারে সেই সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়। এই পর্যায়ে শেষ হওয়ার ক্লাশরুমের ছাত্ররা এর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। প্রথম টেলিভিশন 'শিক্ষাসূচীতে' ছয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হ'ল পৌরবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ভূগোল, রাস্তায় চলার নিয়ম, ওলন্দাজ সাহিত্য। এগুলি নাটকের আকারে টেলিভিশনে দেখানো হয়। তারপর শেষ বিষয়টি হল ইংরেজী। বর্তমানে হল্যাণ্ডের স্কুলগুলিতে প্রথম বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজী শেখানো হচ্ছে বলে টেলিভিশনে ভাষা শেখানোর পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমেই ইংরেজীতে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষা যদি সফল হয় তা হলে শীগগিরই ফরাসী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমে দুই বছরের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রোম্যান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যাণ্ট এবং অন্যান্য শিক্ষা সংস্থার প্রতিনিধিগণকে নিয়ে, পনের জন সদস্যের একটি অনুষ্ঠান উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। হল্যাণ্ডের শিক্ষামূলক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান, তাদের কুড়িটি ছোট ছোট টেলিভিশন অনুষ্ঠান নিয়ে কোমলমতি দর্শকদের, শুধু জ্ঞানদানেরই চেষ্টা করবে না তাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনেরও চেষ্টা করবে।

গ্রাফিক আর্ট ও লণ্ডনে গ্রাফিক আর্টের শিক্ষা

শ্রীবিমান মল্লিক

গ্রাফিক শিল্পের মোটামুটি পরিচয় দেওয়া চলে কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া বেশ কঠিন। জার্মান শব্দ Graphik থেকে Graphics বা Graphic Art কথার উদ্ভব হয়েছে। আবার এই German 'Graphik' শব্দের উদ্ভব হয়েছে গ্রীক শব্দ Graphein থেকে। বলা বাহুল্য ইংরেজিতে এ শব্দের ব্যবহার সাম্প্রতিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে গ্রাফিক শব্দের ব্যবহার ইংরেজিতে ছিল না।

মূলত মুদ্রণের মাধ্যমে যে চিত্র রচনা করা হত তাকেই বলা হত Graphik. পরে এর অর্থ বিবর্তিত হয়েছে। মুদ্রণের জন্য বিশেষ চিত্র রচনার কৌশল গ্রাফিক আর্ট হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে গ্রাফিক আর্ট বলতে আরও ব্যাপক পরিমণ্ডল বোঝায়। কমার্শিয়াল আর্ট বা বাণিজ্যিক শিল্প, পাবলিসিটি ডিজাইন বা প্রচার চিত্রণ, এ্যাডভার্টাইসিং ডিজাইন বা বিজ্ঞাপন কলা, বুক ইলাস্ট্রেসন বা গ্রন্থ চিত্রায়ণ প্রভৃতি গ্রাফিক আর্টের অন্তর্গত।

নাট্যমঞ্চের পট, চলচ্চিত্রের সেট বা পরিপার্শ্ব, এমন কি বাসগৃহের সাজসজ্জা পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে গ্রাফিক আর্টের অন্তর্গত হতে পারে। মুদ্রণ বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে আজকাল প্রায় সকল প্রকার ছবিই মুদ্রণযোগ্য। সুতরাং মুদ্রণ যোগ্যতাই গ্রাফিক আর্টের একমাত্র গুণ নয়। মুদ্রণের সংগে যোগ অবিচ্ছিন্ন রেখেও বলতে পারি গ্রাফিক শিল্পের প্রধান গুণ তার প্রয়োগ যোগ্যতায়। এদিক দিয়ে একে এ্যাপ্লায়েড আর্ট বা ফলিতকলা তথা ব্যবহারিক শিল্পের অন্তর্গত করা চলে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে Durer সপ্তদশ সপ্তাব্দীতে Rambrandt অষ্টাদশ শতাব্দীতে Thomas Bewick, Goya প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীরা বিভিন্ন মুদ্রণ কৌশলের মাধ্যমে যে গ্রাফিক আর্টের চর্চা করেছেন, তার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল কম। বিশুদ্ধ শিল্প রচনার প্রয়াসই তাতে ছিল বেশি। সুতরাং তা' এক প্রকার চারুকলার চর্চা। চারুকলা হ'ল নিরংকুশ সৌন্দর্য রচনা। গ্রাফিক শিল্পে আসে সৌন্দর্যের সংগে প্রয়োজনের প্রশ্ন, 'বিউটির' সংগে 'ইউটিলিটির' যোগসাধন। এক কথায় প্রয়োজন ও প্রয়োজনাতীতের মণিবন্ধন।

যে শিল্প সৌন্দর্য প্রকাশেই ক্ষান্ত নয়, বক্তব্যেও মূর্ত হতে চায়, তার ধর্ম ও তার গুণও চারুকলা থেকে পৃথক হ'তে বাধ্য। সরলীকরণ, সাংকেতিকতা, বলিষ্ঠতা, বুদ্ধিগ্রাহিতা, যুক্তিবাদ প্রভৃতি চারুকলার ক্ষেত্রে যতটা প্রয়োজনীয় তা'র চেয়ে অনেক বেশি আবশ্যিক গ্রাফিক শিল্পের ক্ষেত্রে।

হেনরী মূরের 'পরিকল্পিত পরিবার' (১৯৪৫)

● ● ●

এদোয়ার্দো পাওলোজির 'জেলে ও জেলেনী' (১৯৪৬)
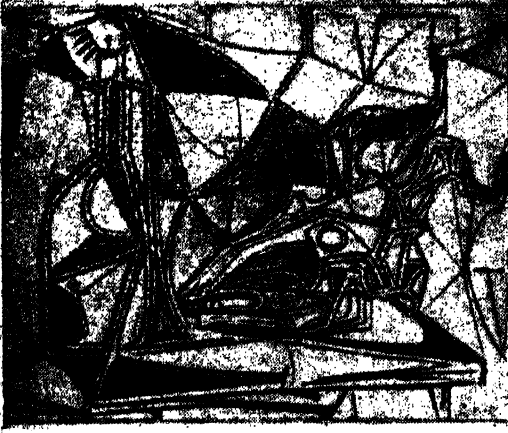
পাবলো পিকাসোর 'ছাগমুণ্ড, বোতল এবং বাতি' (১৯৫২)

যে বস্তুকে, যে বিষয়কে আমরা প্রতিনিয়ত দেখি শুনি, প্রতিদিনের দেখাশোনার ঘনিষ্ঠতার আধিক্যে তার আকর্ষণ, তার চমক অনেকাংশে কমে যায়। এই একই বস্তুকে যখন দশজনের চোখের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, যখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে তখন কিছুটা প্রসাধন অলংকরণের প্রয়োজন হয়। এই প্রসাধন বিবর্তিত হয় নির্মাণে, নির্মাণ সৃষ্টিতে। এই সৃষ্টি নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি নয়, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সাংকেতিকতা, সরলীকরণের সাহায্য গ্রহণ করেন শিল্পী। প্রতিদিনের দেখা মানুষ, গাছপালা, প্রকৃতি, জল, আকাশ-মেঘ নিজস্ব পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেও গ্রাফিক শিল্পীর হাতে নতুন আকার গ্রহণ করে ও বলিষ্ঠ আবেদনে মূর্ত হয়ে ওঠে।
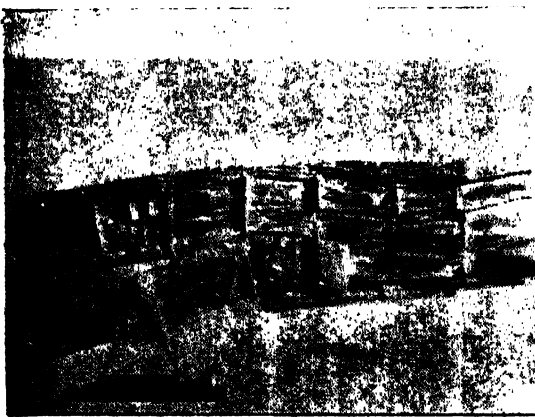
সেজারের 'সেন্ট ডেনিসের মাস্তুবট' (১৯৫৮)

আমার মনে হয় আবেদনের এই বৈশিষ্ট্যে, ধর্মের ভিন্নতায়, গ্রাফিক শিল্প চারুকলা হতে পৃথক। মুদ্রণযোগ্যতা তার বহিরংগ মাত্র, তা'র প্রাথমিক পরিচয় তা'র উদ্দেশ্যমূলকতায়।

লণ্ডনের বিভিন্ন উচ্চমানের আর্ট স্কুলে শিল্পের অপরাপর বিষয়ের সংগে গ্রাফিক আর্ট শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। জুনিয়ার আর্ট স্কুলের শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষা সাংগ করে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই উচ্চমানের আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে পারে।

প্রথম দু'বছর শিল্পের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করতে হয়। ড্রয়িং, শারীরতত্ত্ব, পিক্টোরিয়াল কম্পোজিসন ও কনষ্ট্রাকসন, ডিজাইনিং-এর মূলতত্ত্ব, বস্তু পরিচয়, শিল্পের ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্বের শিক্ষা চলে এই প্রথম দু'বছর। এই সময় থেকেই যাদুঘরে কিছু কিছু গবেষণার কাজ সুরু করতে হয়।

শেষের দু'বছর ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। গ্রাফিক আর্টের ব্যবহারিক শিক্ষা এই শেষ পর্যায়ে। এই পর্যায়ে থাকে অক্ষরশিক্ষা, বর্ণলিপি, বর্ণনামূলক চিত্র, বিজ্ঞাপন কলার বিভিন্ন বিষয়, টেলিভিসান ডিজাইনিং, চলচ্চিত্র নির্মাণ (লাইফ এ্যাক্সন ও এ্যানিমেশন) এবং বিভিন্ন মুদ্রণ কৌশল। সিল্ক-স্ক্রীন, লেটার প্রেস, লিথোগ্রাফী প্রভৃতি মুদ্রণকৌশল ছাত্রদের হাতে-কলমে শিখতে হয়। পাঠক্রমে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকে। ছাত্ররা এই সব আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞাপন-জগতের ও মুদ্রণ-জগতের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার জন্যে ছাত্ররা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সুযোগ পায়। গ্রীষ্মের ছুটিতেও ছাত্ররা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থায় শিক্ষানবিশী করার সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষার শেষ বছরে গ্রাফিক শিল্পের সমস্যা বা গ্রাফিক শিল্পের সংগে সংযুক্ত কোন কোন বিষয় নিয়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের কোন গবেষণা শেষ করতে হয়।

সাধারণত সকাল দশটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ক্লাস হয়। মধ্যে কফি ও মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি থাকে। এমনই চলে সপ্তাহে পাঁচ দিন। আর এই পাঁচ দিনের তিনদিন সন্ধ্যাতেও ক্লাসে যোগ দিতে হয়। সে-ও সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত। সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এমন ভাবেই চলে। শনি রবিবার ছুটি।

চার বছরের শিক্ষা সাংগ হলে ছাত্ররা স্কুলের স্বীকৃতি পায়। তারপর আসে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ ও আত্মবিকাশের অবকাশ। কেউ বিজ্ঞাপন সংস্থা ও স্টুডিওতে ডিজাইনার, ভিস্যুয়ালাইসার বা আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করে, কেউ যায় টেলিভিসন ও চলচ্চিত্রের জগতে। কেউ বা মুদ্রণশিল্পে আত্মনিয়োগ করে। কেউ পছন্দ করে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশনের বিস্তৃত ক্ষেত্র। বাণিজ্য-জগতের যেখানে শিল্পকলার যোগ আছে, সেখানেই প্রয়োজন হয় সুশিক্ষিত গ্রাফিক শিল্পীর। শিক্ষা সমাপ্তির সংগে সংগে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে আর বাণিজ্যের রূঢ়, পরুষ কাঠামোর ওপর সৌন্দর্যের চারুস্পর্শ এনে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করে।

—লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।

রোগী

গুণময় মান্না

কতকগুলো সামাজিক কৃত্যের এমন একটা বাধ্যবাধকতা আছে যে অরুণেন্দ্রবিকাশ রায়চৌধুরীর মতো একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরও তা স্বীকার করে নিতে হয়; অথচ এই সব সামাজিক কৃত্য করতে গিয়ে যেমন তাদের তেমনি অন্যদেরও মনে হয় এসব তাদের জন্য নয়, কোথায় একটা কাঁটার মতো খচখচ করতে থাকে। বিজয়া দশমীর পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ অরুণেন্দ্র যখন স্ত্রী বিনতাকে নিয়ে বি কে পাল এ্যাভেন্যুতে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হল প্রণাম জানাবার জন্যে, তখন জানা গেল, এখানে সে মিনিট পনেরোর বেশি থাকতে পারছে না এবং বাড়িতে ঢুকবার মুখে প্রথমেই সেটা উল্লেখ করলে। ওর গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনতার দিদি অনীতা নেমে এসেছিলেন, কথাটা শুনে খুঁতখুঁত করতে লাগলেন তিনি। বিনতা গাড়ি থেকে বেরিয়ে অপ্রয়োজনেই লাফাতে লাফাতে দিদির পাশে এসে দাঁড়াল, অনতিলক্ষ্য বিদ্রূপে হাসিটা ধারালো হয়ে উঠতে চাইল ওর। ব্যাখ্যা করে বললে, 'তা ওর বেশি উনি থাকবেন কি করে? এখান থেকে বেরিয়ে উনি যাবেন সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুতে, এক বন্ধুর বাড়ি, সেখানে থাকবেন পনেরো মিনিট; ওখান থেকে গোয়াবাগানে, ওঁর সেক্রেটারীর বাসায়, সেখানে পঁচিশ মিনিট; তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একটা লম্বা পাড়ি···ব্যারাকপুরে ওঁদের ফ্যাক্টরীতে, কি যেন সমস্যা আছে। থাকবেন রাত্রিতে সেখানেই; গাড়ি ফিরে এসে, ধরো সাড়ে দশটা নাগাদ আমাকে নিয়ে যাবে, অবশ্য রাসবিহারীর বাড়িতে···'

'তুই থাম···' অনীতা আগে থেকেই চেষ্টা করছিলেন ওকে থামাবার জন্য, মাঝখানে ফাঁক পাচ্ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত জোর করে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুইই অরুণের সেক্রেটারী হয়েছিস আজকাল। এসো ভাই এসো···' স্পষ্টত, ধনী ভগ্নীপতির প্রতি ভগ্নীর এই বিদ্রূপ-মেশানো মনোভাবে সায় দিতে পারছিলেন না তিনি।

কথাগুলো বলেই কিন্তু বিনতা পিছলে গিয়েছিল, 'তোমরা এসো, মাকে দেখি আমি···'। বেশি দূর যেতে হল না, দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মুখেই মাকে পেলেও, পায়ে হাত দিতে দিতে আদুরী-উচ্ছল স্বরে বললে, 'মা আমি এলুম···'। মা চিবুক স্পর্শ করতে না করতে সেখান থেকেও সরে গেল ও, 'বাবা তাঁর ঘরেই আছেন তো? আমি ওখানে যাচ্ছি, তোমরা ওঁকে দেখ···' বোধ হয় হাসি চাপবার জন্য পিঠের ওপর ঝোলানো সোনালী বর্ডার দেওয়া গোলাপী শাড়ির এক ফালি আঁচলটা ঘাড়ের ওপর বেড় দিয়ে এনে দাঁতে চেপে ধরল ও। সিঁড়িতে উঠবার সময় শাদা জামাতে ওর পিঠখানা অনাবৃত মনে হতে লাগল।

অনীতা মায়ের মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে নিজের সংশয়টাই যেন পড়তে পারলেন উনি। বিনতা তার এই জেদী উচ্ছলতার মধ্যেই যেন অরুণকে উপেক্ষা করে চলেছে। কিন্তু তার কি কারণ হতে পারে? বছর দুয়েক হল ওদের বিয়ে হয়েছে, ছ'মাস আগেও ওদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং আনন্দময় বলে মনে হয়েছে ওঁর, কিন্তু এরই মধ্যে ওদের জীবনে কি নতুন সমস্যা উপস্থিত হতে পারে তা বুঝতে পারলেন না।

মায়ের সঙ্গে অরুণকে ওপরের ঘরে নিয়ে এলেন উনি। মা বললেন, 'ভালো ছিলে তো অরুণ? রায় মশায় ভালো আছেন···উনি এলেন না কেন?'
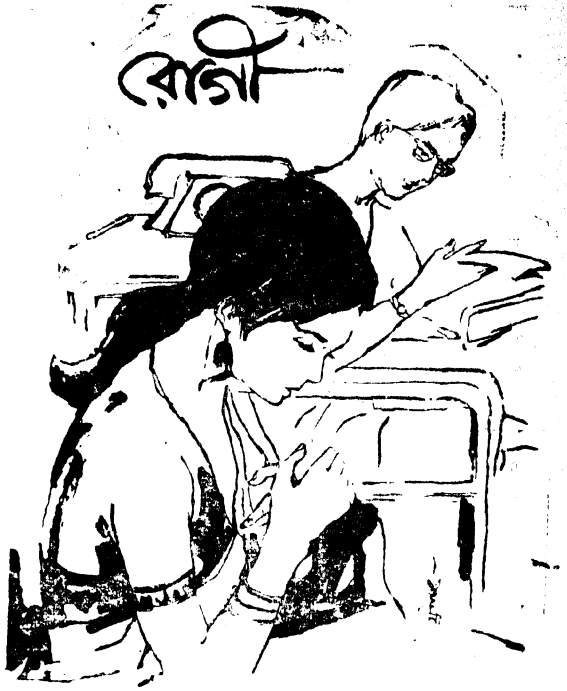
উত্তরে কেবল মৃদু হাসল অরুণেন্দ্র, ওঁদের দু'জনকে প্রণাম করে মাকে বললে, 'আপনি অনেক দিন আমাদের ও-বাড়িতে যান নি···'

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করলেন মা, মনে হল কোথায় একটা অভিমান রয়েছে তাঁর মনে, তারপর বললেন, 'ওঁর অসুখের কথাটা তো জান, রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না আজকাল, সব সময় কাছে থাকতে হয়···'

অরুণের মুখে আনন্দ-বেদনার কোনো আভাস ফুটে উঠল না, মৃদুস্বরে ও বললে, 'চলুন, ওঁকে দেখে আসি···'

'মা অনীতাকে বললেন, 'তুই ওর সঙ্গে যা, আমি এক্ষুণি আসছি···'

একটু পরে সেই ঘরেই অনীতা ওকে ফিরিয়ে আনলেন, সঙ্গে বিনতাও এসে ঢুকল। স্পষ্টত ওর উচ্ছল মুখরতা তখন ওর চোখে নীরব তীক্ষ্ণতায় ঝিকিয়ে উঠেছিল। অনীতা সেটা বুঝতে পারলেন, কিন্তু এই অকারণ আক্রমণাত্মক ভাবটা পছন্দ করতে পারলেন না।

তারপর মিষ্টিমুখ করানো হল অরুণেন্দ্রকে। অরুণেন্দ্র চামচের ডগা দিয়ে ঝকঝকে কাঁসার গেলাসের মুড়িতে মৃদু মৃদু টোকা দিতে লাগল, আলতো ভংগিতে আধখানা সন্দেশ কেটে নিয়ে মুখে দিলে, তারপর থেমে গেল। সত্যিই ব্যথিত হলেন অনীতা, কিন্তু উনি কিছু বলবার আগেই বিনতা বললে, 'ওঁর শরীর ভালো নয়···মানে যতটা উনি খেতে পারবেন, তাকে তিন ভাগ করলে যা হয়, এখানে তার বেশি খাওয়া ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়।' বলে ও খিলখিল করে হেসে উঠল।

'জানেন নীতাদি,' আজকাল আমাকে অর্ধেক কথা বলতেই হয় না, বিদুই সে কাজ করে!'

'রাইট রাইট, বেটার-হাফ তো, দ্বিতীয়পক্ষের হলেও···' বিনতা তথাপি টিপ্পনি কাটল।

'তুই খুব বাচাল হয়েছিস্···' অনীতা বললেন, তারপর অরুণের কথার সূত্র ধরে বললেন, 'সত্যিই তোমার শরীর খারাপ? তা'হলে খেয়ে কাজ নেই···' বলতে বলতে ওঁর কণ্ঠস্বরে একটা অকৃত্রিম উদ্বেগ ফুটে উঠল। এতক্ষণে যেন অরুণের চেহারার দিকে লক্ষ্য করতে পারলেন উনি, ওর শার্ট আর ট্রাউজার গায়ে কেমন ঢিলেঢালা মনে হল। বললেন, 'তুমি বেশ রোগাই হয়ে গেছ, কিন্তু কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু নয়···?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল অরুণেন্দ্র, কথা বদলে শ্বশুরের সম্বন্ধে বললে, 'কিন্তু মা যতটা বলছিলেন, ওঁর শরীর বোধ হয় ততটা খারাপ নয়। ওঁর ব্লাড-প্রেসারের অঙ্ক এখন কত?'

'কি জানি, ডাক্তার কিছুই বলেন না আমাদের, বলেন খুব সাবধানে রাখতে হবে।'

'তা নয়, দিদি, মায়ের কথাটায় বোধ হয় অতিরঞ্জন ছিল। উনি সন্দেহ করে যাচাই করে নিতে চাচ্ছেন···'

এবারে হেসে ফেললেন অনীতা, 'কি রে, মনে হচ্ছে আজকে শুধু ঝগড়াই করবি অরুণের সঙ্গে। এর পর কিন্তু আমি অরুণের পক্ষে যাব···' কিন্তু বুদ্ধিমতী অনীতা তৎক্ষণাৎ বুঝলেন, ওদের ব্যাপারটা অতখানি হাল্কা নয়। কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'আজকে দেখছি ঝগড়ার পালাই চলছে। একটু আগে শুকুমার এসেছিল, তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেল এক তরফা। খোঁজ করছিল তোর···'

চকিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল বিনতা, খানিকটা জোর করে আনা আগ্রহ দেখিয়ে বললে, 'তাই নাকি, সুকুমারদা' কখন এসেছিলেন? আর আসবেন না?'

'ও তো প্রায়ই আসে, বাবাকে দেখতে। কাল সকালেও আসতে পারে···তুই থেকে যা-না আজ?'

'তাই ভাবছি···আচ্ছা, দেখি···' বলে আবার ও স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিলে।

স্পষ্টত অরুণেন্দ্র চমকে উঠল, কিন্তু সম্ভবত নিজেকে গোপন করার জন্য টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে বইয়ের আলমারিটার সামনে দাঁড়াল ও। বইয়ের নামগুলোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে বললে, 'সুকুমারদা'···মানে, আমাদের অফিসের ক্লার্ক সুকুমার ব্যানার্জী?'

অনীতা বিস্মিত হলেন, 'সুকুমার তোমাদের অফিসে কাজ করে নাকি?'

'দিদি, অবাক হোয়ো না, আমিও এই সেদিন জানলাম যে সুকুমারদা ওঁর' অফিসেই চাকরী করেন। বেশ কাণ্ড, তাই না?'

'সত্যি! আমি এরপর সুকুমারকে বলে দেব তোকে ধরতে, ওর প্রমোশন আটকায় কে?'

'অমন কাণ্ড কোর না দিদি, তাহলে নির্ঘাৎ ডিমোশন হবে?'··· অরুণ চলে যাচ্ছে দেখে তারপর বিনতা বললে, 'কিন্তু উনি নিজেই তাঁকে প্রমোশন দিয়েছেন···' তারপর অনীতার কানে ফিসফিস করে বললে, 'দাঁড়াও, তোমাকে সব বলব!'

॥ দুই ॥

সমস্ত সৌজন্য রক্ষার আড়ালে অনীতা নিজেই অসহ্য কৌতূহল বোধ করছিলেন, কিন্তু কি করে বোনের কাছে কথাটা পাড়বেন ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলেন না। বিনতা নিজেই সেই সমস্যার সমাধান করে দিলে। চায়ের কথা আগেই বলে এসেছিল ও, ওদের ছোকরা চাকর শিবু দু' কাপ চা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে অরুণের পরিত্যক্ত মিষ্টির রেকাবিটা নিয়ে গেল। অনীতা বলে দিলেন, 'তুই ওগুলো খেয়ে নিস, শিবু···' চায়ে চুমুক দিয়ে তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর, কি ব্যাপার বল···' কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত আর সতর্ক হয়ে উঠলেন তিনি: বিনতার ঠোঁট দু'টো কাঁপছে, একটা অস্বস্তি আর উত্তেজনা বোধ করছেও। একটু আগেকার উচ্ছলতার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, বরঞ্চ এরই মধ্যে বিনতার কুমারী অবস্থার পরিচিত, গর্বিতা ভাবটাই পুনরায় দেখতে পেলেন যেন। বললেন, 'তোর যদি খারাপ লাগে তা হলে আমি শুনতে চাই নে···'

বিনতা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'তুমি কিছু আন্দাজ করেছ নিশ্চয়ই···'

'না, কি করে করব বল। আমি ভাবতেই পারি না যে তোদের মধ্যেও কোনো গোলমাল থাকতে পারে। সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেছি···'

আবার ঠোঁট কাঁপল বিনতার, মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করতে লাগল ও। তারপর খানিকটা জোর করেই ও বললে, 'কথাটা আর কিছু নয়, তোমাদের জামাইবাবু আমার চরিত্রে সন্দেহ করেন। আমি অন্যাসক্তা, একজনের সঙ্গে প্রেম করেছি এবং এখনো সেটা চালিয়ে যাচ্ছি···আর সেই একজন কে, তাও তিনি অনুমান করেন···'

ওকে থামিয়ে অনীতা বললেন, 'বলিস কি রে, তাও কখনো হয়।'

'হ্যাঁ, তাই হয়েছে। সেই নীচতার সঙ্গে সব সময়ই বোঝাপড়া করে চলতে হচ্ছে আমাকে, এর শেষ কোথায় হবে কে জানে!'

'ও কি বলে? এ নিয়ে তোর সঙ্গে কথা হয়েছে কিছু···'

'কি বলে? না, তেমন কিছু বলে না···' মনে হল মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে উঠল বিনতা, কিন্তু তারপরই উত্তেজিতস্বরে ও বলতে লাগল, 'মুখের ওপর বলবার সাহস আছে ওর? তা হলে বুঝতাম ওর পৌরুষ আছে! কিন্তু জানিস, বিষের থেকে বিষের ধোঁয়াটা আরো অসহ্য। ও কি চায় জানি না, কিন্তু আমাকেই আমার পথ দেখে নিতে হবে।'

'তার মানে, তুই কি ওকে ছেড়ে আসবি না কি?'

'নিশ্চয়ই, যদি না ও নিজেকে শোধরায়। বিপিন বোসের মেয়েকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারে না ও, সেটাই দেখিয়ে দিতে চাই। আমাকে ওর প্রথমা স্ত্রী পেয়ে যায় নি···সেই যে, বিলাসপুরের কাছে কোন কোলিয়ারির কোআর্টার্সে যে মরেছিল! মরেছিল, কি মেরেছিল কে জানে। যা শুনছি, আমার কাছে তা মিস্ট্রী বলে মনে হয়। শোন, তার বেলাতেও সন্দেহ ছিল। তবে সেটা উল্টো, স্ত্রীই নাকি সন্দেহ করত···'

আশ্চর্য মানুষের মন! বিনতার এই দৃপ্তভঙ্গিটাই কেমন করে অনীতার ভেতরটায় অস্বস্তিতে ভরে তুললে। যেখানে ওদের দু'জনের

মধ্যে একটা সমবেদনার সেতু নির্মাণ হতে পারত, সেখানে ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেবল তর্ক করতে লাগল।

অনীতা বললেন, 'আমি অবাক হচ্ছি, মনে হয় তুই কোথাও ভুল করেছিস। অরুণ এতটা নীচ হতে পারে না...'

ওর পক্ষপাতিত্বে ক্ষুব্ধ হল বিনতা, তীক্ষ্ণস্বরে ও বলে উঠল, 'তার মানে...কোনটার কথা বলছ তুমি। তাহলে আমিই সেই নীচ কাজ করেছি...' 'নীচ' কথাটার ওপর মোচড় দিলে ও।

'তুই উত্তেজিত হস নে বিনু, আমাকেও ভুল বুঝছিস তুই। যাক গে, কাকে ও সন্দেহ করে?'

'কেন, বুঝতে পারলে না। তখন...সুকুমারদা'র নাম শুনেই চমকে উঠল। আমি সেই জন্যেই বেশি করে ওর নাম করছিলাম...' বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল বিনতা, ওর শাড়ির সোনালি পাড়ের সঙ্গে কানের দুল সমানে ঝিকিয়ে উঠল।

কথাটা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন অনীতা, কেবল বললেন, 'ও', চোখ দু'টো মিটমিট করতে লাগল ওঁর। কিন্তু পরক্ষণেই ভিন্নতর স্বরে বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানিস, সুকুমারের সঙ্গে তুই অত মেলামেশা করিস বলেই বোধ হয় অরুণ কিছু ভেবে থাকবে।'

'ঠিক তাই, কিন্তু কেন, সুকুমারদা'র সঙ্গে মেলামেশা করলেই কি আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম...'

অনীতা তৎক্ষণাৎ বলতে চাইলেন, কে জানে, বাবা-মারাও বিয়ের আগে তোমায় বারণ করেছিলেন ওর সঙ্গে মিশতে...কিন্তু বলতে পারলেন না। আর তাইতেই ওঁর মনটা যেন আরো বিরূপ হয়ে উঠল।

বিনতা সেটা লক্ষ্য না করেই বলছিল, 'এটা অবশ্য ঠিক যে, সুকুমারদাকে আমার ভাল লাগে, ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা লাইফ আছে ...আমি সেটা ঠিক বোঝাতে পারব না, তুমিও দেখেছ সেটা!'

নিষ্প্রভ স্বরে অনীতা বললেন, 'বিনু, তুই এখন বউ হয়েছিস। কুমারী অবস্থায় যেটা সাজে বিয়ের পর তা হয় না। আমি তোর মতো লেখাপড়াও শিখি নি, বিয়েও হয়েছে অনেকদিন হল...কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস, যে আমাকে সব কিছুই দেবে, তার একটা পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলতেই বা ক্ষতি কি...'

'সব কিছু দেবে! কি বলছ তুমি দিদি—' ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের অলংকৃত দেহের দিকে একবার তাকাল বিনতা, অস্থির স্বরে বললে, 'শাড়ি-গয়নার কথা বলছ? এ-সবের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই, সেটা নিশ্চয়ই তুমি জানো, তা ছাড়া...'

এসব কথাবার্তা ওদের কোথায় টেনে নিয়ে যেত কে জানে, কিন্তু সেই সময় রাস্তার ওপর পরিচিত হর্ণের আওয়াজ শোনা গেল, আর দু'জনেই চমকে উঠল ওরা। অনীতা বললেন, 'তোর গাড়ি ফিরে এল বলে মনে হচ্ছে...' বলে উঠতে চাইলেন উনি।

'একটু পরেই শিবু এসে দাঁড়াল দরজার কাছে, বললে, 'জামাইবাবু বললেন দিদিমণিকে যেতে তোমার কোথায় যাবার কথা ছিল, যাওয়া হয় নি···'

'তার মানে?' ভ্রূ কুঞ্চিত হল বিনতার, 'আচ্ছা, বলগে, যাচ্ছি।' পরক্ষণেই পুনরুজ্জীবিত বিদ্রূপে ওর হাসিখানা ধারালো হয়ে উঠল। বললে, 'দেখলে তো, জল কতখানি ঘোলাটে হয়েছে? ওই যে তুমি তখন বললে, সুকুমারদা' আসতে পারেন, সেই জন্যে ফিরে এলেনউনি। রেখে যেতে সাহস হল না। এই করেই নিশ্চয়ই উনি আমাকে সামলাবেন।'

'সত্যিই তো রে, বেশ···এটা যেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে···আচ্ছা, যা তুই।'

গাড়ির কাছে যেতে না যেতেই অরুণ বললে, 'হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছি, মুখার্জীকেই (ওর সেক্রেটারী) পাঠিয়ে দিলাম ব্যারাকপুরে···' বোতাম টিপে পেছনের দরজা খুলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু বিনতা সামনের সীটেই অরুণের পাশে গিয়ে বসল। ঢুকবার সময় লাইট পোস্টের আলোতে মনে হল, একটা সংকল্পে ওর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে। অরুণের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায় ও। সম্ভবত দিদির কাছে এতক্ষণ তারই মহড়া দিচ্ছিল।

চাবি ঘুরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছিল অরুণ, সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ও বললে, 'তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ভাবি নি: সুকুমারদা' একটু আগেই এলেন, গল্প করছিলাম আমরা। আচ্ছা, ও তোমাকে এত ভয় করে কেন বল তো, তুমি এসেছ শুনে ও যেন কেমন হয়ে গেল'···হাসতে চাইলে বিনতা, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর ওর অজান্তেই কর্কশ হয়ে উঠল।

'তাই না কি···' মনে হল মুহূর্তের জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল অরুণ, কিন্তু তার পরেই আবার ও বললে, 'ভয় পাবে কেন। আমি কাউকেই ভয় করি না যেমন, তেমনি কাউকে ভয়ও দেখাই নে'···

বিনতার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, এই বীরপুরুষের ফাঁকা গর্বের ভেতরটা ফুটো করে দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠল ও। বললে, 'কাল সুকুমারদা'কে বিকেলে আমাদের বাসায় আসতে বলেছি···'

'আমাদের বাসায়? কেন···'

আমাকে একটা সিনেমায় নিয়ে যেতে চায় ও···তুমি চমকে উঠলে যে?'

'আমি মনে করছিলাম সীরিয়াস কিছু, কিন্তু নতুন কথা বটে। তুমি সিনেমায় যাবার জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছ!'

'না···মানে···গাড়িটা তোমার তখন দরকার হতে পারে।'

'আর একখানা তো আছে, বাবা আজকাল বেরোন না।'

ওকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে কানের ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল বিনতার। কিন্তু যতই ওর মনে হতে লাগল যে ও হেরে যাচ্ছে ততই মরিয়া হয়ে উঠল ও। হঠাৎ জোর করে বলে উঠল, 'সুকুমারদা'কে নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে'···কথা খুঁজে না পেয়ে অথচ কথাটা শেষ করবার তাড়ায় ও বললে, 'সেটা অস্বীকার কর তুমি?'

কতক্ষণ চুপ করে রইল অরুণ। বিবেকানন্দ-সেনট্রাল এ্যাভেন্যুর মোড়ে নীল আলোর অপেক্ষায় দাঁড়াতে হয়েছিল ওকে, তারপর গাড়ি ছেড়ে বললে, 'আগে মনে হয় নি, আজকে স্পষ্ট করে বুঝলাম!'

'কথা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন, তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও?'

'আমি!'

'হ্যাঁ, তুমিই! যে নোংরা জিনিসটা মনের মধ্যে রয়েছে, তাকে স্বীকার করতে চাচ্ছ না তুমি। কিন্তু আমি এই অবস্থার মধ্যে থাকতে চাই নে, একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।'

'বাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পার না? অন্যদিকে মন দিলে ড্রাইভিং-এর অসুবিধা হয় আমার···মে রান এ্যান এ্যাকসিডেণ্ট···'

বুক কেঁপে উঠল বিনতার, কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইল ও, স্পষ্টত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্তাবটা মেনে নিলে সে। কান্নায় গলার ভেতরটা রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইল ওর। চোখের কোণায় দেখলে, অরুণ স্টিয়ারিং-এর ওপর কেমন কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে। পাশ দিয়ে গাড়িগুলো ক্রমাগতই পেরিয়ে যাচ্ছে ওদের, ও কি জোরে চালাতেও পারে না? 'ভীতু, ভীতু'···চিবিয়ে চিবিয়ে ভাবলে ও: এতটুকু সাহস নেই!

অরুণ একসময় বললে, 'আমি কিছুদিন বিলাসপুরে গিয়ে থাকতে চাই, এখানকার স্ট্রেন্ সহ্য হচ্ছে না আমার···শরীরটা মনে হয় ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।'

'আমাকে যেতে বলছ না কি তুমি?'

'আমার খুবই ভালো লাগত তা হলে। ওখানে আমার একলা মনে হয় খুব···তা ছাড়া তোমারও ভালো লাগত। যেখানে আমরা থাকি, সেখানটা খুবই ভালো, সাচ বিউটিফুল সিনারিজ···'

'অসম্ভব! যেখানে তোমার উনি মরেছিলেন···আমিও মরে যাব তা হলে!'

হেসে ফেলল অরুণ, 'আচ্ছা ভীতু তুমি তো···তবে থাক, নাই বা গেলে!' আবার হাসল ও।

চমকে তাকাল বিনতা, একটু আগেই 'ভীতু' কথাটা ভাবছিল ও। অরুণ কি মনের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায় না কি?

।। তিন ।।

বাড়িতে ফিরে ওদের মধ্যে কি বোঝাপড়া হয়েছিল বলা মুস্কিল, কিন্তু একইভাবে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। বিনতা অসুস্থ হয়ে পড়ল একটু, সর্দির সঙ্গে জ্বরজ্বর ভাব। অরুণকে কথাটা জানানো হয় নি, জানাবার ইচ্ছেও ছিল না ওর। তা ছাড়া, অরুণের সঙ্গে ওর দেখা হয় না। কাল রাত্রে বাড়ি ফেরে নি, তার আগেকার রাত্রে ফিরেছিল কি না কে জানে। ড্রাইভারের কাছে শুনেছিল, ব্যারাকপুরেই ও কাটাচ্ছে। 'ও নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়, সেটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক'···একথা ভাবতে গিয়ে গা-টা রী-রী করে উঠল বিনতার।

সর্দিটা ছাড়ছে না, বাতাসে অল্প-অল্প শীতের আমেজ। সন্ধ্যার মুখে গরম কাপড় বের করিয়ে গায়ে ঢাকা দিয়ে বসল ও। ভাবলে, পুজোর এই ক'দিন বাইরে বাইরে থেকে ঠাণ্ডা লেগে ওর এমনি হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা অজানা আশংকা ওর বুকের ভেতর খামচে ধরল, অরুণের রোগটাই ওকে ধরল না তো? কে জানে ওর কি অসুখ, পরিষ্কার করে বলে না কিছুই।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল, কিন্তু বিনতার উঠবার মতো উৎসাহ দেখা গেল না। ও ভাবলে কেউ না কেউ ধরবে। কথাটা সেই একই, 'মিঃ চৌধুরী আছেন?' 'না, নেই, কি বলতে হবে বলুন'·····এ কথা যে কেউ বলতে পারে। হঠাৎ মনে পড়ল বিনতার, তাকে কেউ ফোনে ডাকে না, কদাচিৎ এক আধবার

ছাড়া। ফোন বেজেই চলেছে। 'ব্রিজলাল···ব্রিজলাল'···বসে বসে চেঁচাতে লাগল বিনতা। এত বড় বাড়িতে আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, তিনতলায় ঘরে বাবা ছাড়া। চাকর-বাকররা না থাকলে 'মঞ্জু ভবন' প্রেতপুরী হয়ে উঠত। কিন্তু ওরা গেল কোথায়, সন্ধ্যার মুখে সবাই কি বেরিয়ে গেছে না কি ?

একটু পরেই একতলা থেকে ছুটতে ছুটতে এল ব্রিজলাল, 'মা-জী' বলে সেলাম করে দাঁড়াল। বিনতা থামকা ধমকাল ওকে, 'তোমরা সব যাও কোথায়, একটা ফোনও ধরতে পারো না।···' কাচুমাচু মুখে সরে গেল ব্রিজলাল কিন্তু পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে ঢুকল, 'মা-জী, আপকো বোলাতে হেঁ···এক সুকুমারবাবু বোলতে হ্যাঁয়, ব্যারাকপুরসে···'

আমাকে ডাকছে ? সুকুমারবাবু···তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল বিনতা, পায়ের ওপর থেকে গরম শালটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু ব্যারাকপুরের কথা শুনে দমে গেল ও। এ আবার কোন সুকুমারবাবু ?

কথা বলতে গিয়ে নিঃসংশয় হল ও, সুকুমারই কথা বলছে। 'হ্যালো, সুকুমারদা'···আপনি কোত্থেকে বলছেন'·· বুক টিপ টিপ করতে লাগল বিনতার। 'ব্যারাকপুরে আমাদের বাড়ি থেকে···গেলেন কি করে ওখানে···কাল থেকে ওখানে রয়েছেন ? অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি ···সে কি, ওঁর অসুখ ? আমি আসছি এখনই···আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি।'

গাড়িতে ঢুকেই জোরে চালাতে বললে ওদের ড্রাইভার বণিককে। গাড়িটা যতই এগোতে লাগল, একরাশ এলোমেলো কথা ওর মাথার মধ্যে ঝাপট দিয়ে উড়ে যেতে লাগল যেন। সুকুমার ওখানে গেলই বা কি ভাবে, সেদিনকার সেই কথাবার্তার পরও অরুণেন্দ্র ওকে ডাকলই বা কি করে ? ও কি শুশ্রূষা করছে অরুণের ? শেষে ভাবলে, 'এই যে আমি চলেছি, এটা ঠিক হচ্ছে তো ? ও হয়তো সেটা পছন্দ করবে না···

রওনা হবার আগে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল···' যে সংশয় ওর মনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল ওখানে পৌঁছে সেটা বিমূঢ়তায় রূপান্তরিত হল। ও আশংকা করেছিল বাড়িতে ঢুকে ডাক্তার-নার্স আর লোকজনের ভিড় দেখতে পাবে, কিন্তু নীচেরএকতলার ঘরে সুকুমার ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলে না ও। ফাইলপত্র নিয়ে তাকে খুবই ব্যস্ত বলে মনে হল। বিনতা জিজ্ঞেস করলে, 'উনি কোথায় আছেন, ওপরে ? চলুন·····'

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল সুকুমার (এই আচরণটা নতুন আর বেমানান মনে হল বিনতার)। বললে, 'উনি কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন··ডক্টর সান্যালের চেম্বারে যাচ্ছেন বলে বললেন, ওঁর বোধ হয় একটা অপারেশন প্রয়োজন হবে··' তারপর ইতস্তত করে বললে· 'তুমি···আপনি যে রকম অবাক হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে আপনি কিছু জানেন না ?'

'চেষ্টা করে নিজের স্তম্ভিত ভাবটা কাটাল বিনতা কিন্তু ওর কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি আমাকে ফোনে ডাকলেন না ? তার মানে কি···'

'উনি ডাকতে বললেন। কিন্তু আপনার আসার আগেই বেরিয়ে যাবেন বুঝতে পারি নি। আমারও খানিকটা আশ্চর্য লাগছে···'

'তার মানে অসুখের কথাটা মিথ্যে ?'

ঘাড় নাড়ল সুকুমার, 'না, তা নয়, কাল সারা রাত উনি ঘুমোতে পারেন নি, ভোরের দিকে কেবল একটু ঘুমিয়ে ছিলেন···'

বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল বিনতার : সুকুমারই কোনো মতলব করে ওকে ডেকে পাঠায় নি তো ? জিজ্ঞেস করলে, 'সুকুমারদা,' আপনি এখানে এলেন কি করে ?'

'আমাকে কিছুদিন থেকে এখানে আসতে হচ্ছে। এসে দেখলাম আমাকে আর বোধ হয় কেরাণীর কাজ করতে হবে না। এখানে লেবার-রিলেশন্‌স নিয়ে গোলমাল চলছে, আমাকে সেই ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে···মিঃ মুখার্জী এখনই এসে যাবেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে আমাকে···'

বিনতা লক্ষ্য করলে এই নতুন দায়িত্ব আর পদমর্যাদা পেয়ে সুকুমার বিগলিত হয়ে উঠেছে। কি রকম একটা আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করলে ও। ওর মধ্যে যে 'লাইফ' আছে বলে মনে করত বিনতা, সেটা কি উবে গেল না-কি? সুকুমার যেন অরুণেন্দ্রকে আড়াল করে করে কথা বলে চলেছে। বুকের ভেতরটা যেন জ্বালা করে উঠল ওর। এই সুকুমার, তার কাছ থেকে এতটুকু ইঙ্গিত পেলে যার মাথা ঘুরে যেত, আর এখন যে ওপরওয়ালার কাছে যেন অনুগতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই কাছে অসম্মানিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ওকে। অরুণই তাকে এই অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। কঠিন স্বরে ও বললে, 'যাক গে, আমি ফিরে যাচ্ছি··· আচ্ছা ডাঃ সান্যালের চেম্বার কোথায় বলতে পারেন?'

যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি করে সুকুমার বললে, 'আপনার জন্যে একটা চিঠি আছে···ওপরের ঘরে ওঁর টেবিলটা দেখবেন···'

'চিঠি···কার চিঠি···উনি চিঠি রেখে গেছেন, আশ্চর্য।' কথাগুলো বলে ফেলেই কেমন হয়ে গেল বিনতা, সুকুমারের কাছে নিজের বিস্ময়টা প্রকাশ পাওয়াতে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে গেল ও।

কয়েক মিনিট মাত্র, সুকুমার আবার ফাইলপত্রের মধ্যে মন দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওপর থেকে রুদ্ধ, উত্তেজিত স্বরে বিনতা ডাকতে লাগল ওকে, 'সুকুমারদা'···সুকুমারদা'···'। এই ডাকার ভংগিতে শংকিত হয়ে উঠল ও, তার কারণ কি হতে পারে বুঝতে পারল না। তৎক্ষণাৎ ওপরে ছুটে গেল ও, কিন্তু যা দেখলে তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিনতাকে সুকুমার আত্মস্থ আর গর্বিতা মেয়ে বলেই জানত। গিয়ে দেখলে ওর চোখ-মুখ কঠিন, অদ্ভুত একটা হাসি ঠোঁটের ফাঁকে টানা হয়ে রয়েছে (সেটা ক্রোধের না বিদ্রূপের বুঝতে পারল না ও), চিঠির কাগজশুদ্ধ ডানহাতখানা কাঁপছে। সুকুমার জড়ানো স্বরে বলতে গেল, 'কি হয়েছে? মানে, ঐ চিঠিতে কিছু···'

কথার মাঝখানেই ওকে থামাল বিনতা, বললে, 'আপনি এই চিঠি পড়েছেন?'

'আমি! কি বলছেন আপনি···আপনার চিঠি পড়বার ইচ্ছে আমার হবে কেন, তা ছাড়া···'

'না পড়েছেন তো পড়ুন···এই চিঠি কেবল আমাকেই লেখা নয়, আপনাকেও···'

'আপনাকে লেখা চিঠি···আমাকেও। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে খুব হেঁয়ালি মনে হচ্ছে···'

'চুপ করুন, পুরুষ হয়ে পুরুষের মতো আচরণ করতে না পারলে লজ্জা করে না আপনার? প্রথম থেকেই দেখছি, ভয়ে আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে···' ধমক দিয়ে দিয়ে বলছিল বিনতা, কিন্তু ওর কথার মাঝখানেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সোজা সুকুমারের কাছে এগিয়ে এসে ওর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরল ও, অনুনয় করে বললে, 'সুকুমারদা' আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাইব, আমার কথা রাখবেন বলুন···'। ওর উত্তরের অপেক্ষা না করে ওকে টেবিলের পাশে টেনে নিয়ে গেল ও, ওকে বসতে বলে নিজে আর একটা চেয়ারে বসে সেই রকম স্ফুরিত কিন্তু চোখে জল-এসে যাওয়া স্বরে বললে, 'আপনি এককালে আমাকে ভালোবাসতেন, আপনি জানতেন আমার মনের মধ্যে কি ছিল। মাঝখান থেকে বাবা আমার শত্রুতা করলেন, তা না হলে এই ট্রাজেডি ঘটতে পারত না। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন···'

চেয়ারের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠল সুকুমার, দুই হাতের মুঠিতে হাতল দু'টো চেপে ধরল, যেন এখনই ও উঠে পড়তে চায়। কাঁপা কাঁপা স্বরে বললে, 'সে সব কথার কোনো প্রয়োজন আছে···কিন্তু আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করছেন?'

'পরীক্ষা? কাপুরুষ কোথাকার···একটা মেয়েকে বুঝবার মত ক্ষমতাও নেই আপনার!' ধিক্কারে ওর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

মনে হল কোথায় আহত হল সুকুমার, কিন্তু সেইটে ওর ভেতরে একটা পরিবর্তনও এনে দিলে। দেখতে দেখতে ওর মুখের ভীরু ভাবটা আমূল বদলে গেল। স্থির, তীব্রদৃষ্টিতে ও তাকাল বিনতার দিকে, কেবল ওর ঠোঁট দু'টো ঈষৎ কাঁপতে লাগল। বললে, 'চিনতে পারি না? চিনে কি লাভ···'

চোখ ফিরিয়ে নিলে বিনতা, ভীতস্বরে বললে, 'আপনি চিঠিখানা পড়ুন।'

'না, এ চিঠি পড়ার দরকার নেই আমার। আমি বুঝতে পারছি মিঃ রায় নিশ্চয়ই তোমার···'তুমি'ই বলছি···নিশ্চয়ই তোমার সম্বন্ধে কোনো অসম্মানের কথা বলেছেন, যার সঙ্গে আমিও জড়িত। উনি যখন অকারণেই আমাকে এতটা ফেভার করছিলেন, তখনই আমি সেটা অনুমান করেছিলাম। তা না হলে আমি ওঁর কে। তুমি না, উনিই আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। এটা যদি না হত, তাহলে তোমাকে এই অবস্থায় দেখতাম না। আমার কথা হচ্ছে এই: আমি তোমাকে নিয়ে কি করতে পারি না পারি তা আমিই জানি, তোমারও তা জানা নেই। তুমি আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলে, আই ওআজ উণ্ডেড···এ্যান্ উণ্ডেড্ এ্যানিম্যাল দেয়ার'ইজ ইন মাই হার্ট···'

মনে হল শুনতে শুনতে বিনতার চোখ দু'টো নিমীলিত হয়ে এল, কিন্তু পরক্ষণেই দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ওর গাল বেয়ে। ওর ডানহাতখানা সুকুমারের হাঁটুর ওপর রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'আমি জানতাম···আপনি আমার এই অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারবেন না। আপনাকে আমি সবই বলেছি···'

'আমি সেটাই জানতে চাই, তোমার দিক থেকে ব্যাপারটা ঠিক থাকলেই হল।'

'সুকুমারদা', আপনি ও···াকে নিয়ে···কিল মী ইফ ইউ লাইক, দিস মোমেণ্ট···'

উঠে দাঁড়াল সুকুমার, উত্তেজিতভাবে জানালার সামনে পর্যন্ত হেঁটে গেল ও, তারপর ফিরে এসে দাঁড়াল বিনতার সামনে, চোখে সেইরকম তীব্রদৃষ্টি।

'সুকুমারদা',···' বিনতার কণ্ঠস্বরে আবার অনুনয় ফুটে উঠল।

'না, আমি এখনও তাঁরই বাড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি সত্যিই অতখানি কাপুরুষ হই নি এখনো। পরশুদিন বিকেলে রেবা তোমার কাছে যাবে, তোমাকে নিয়ে আসবে আমাদের বাড়িতে। আমার নিজের

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

একটা নীতি আছে, আমার···আমাদের জীবন সেইভাবেই গড়ে ওঠা চাই···'

চমকে উঠল বিনতা, ওঁর চিঠিতে পরশুদিন সন্ধ্যাতেই বিলাসপুরে যাবার কথা লিখেছে! বললে, 'হ্যাঁ, ঠিকই হবে, পরশুদিনই আমি চলে আসতে চাই···'

'পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে···কিন্তু তুমি একটা জায়গার নাম বল, তোমাদের বাড়িতে আমার যাওয়া হবে না। তুমি তো জান, ভাইবোনে আমরা এমনভাবে মানুষ হয়েছি, উই প্রাইজ সেল্‌ফ-রেসপেক্ট এ্যাবাভ অল···'

একটা প্রসন্ন, ক্লান্ত হাসি ফুটে উঠল বিনতার মুখে, 'জানি···আর এও জানি যে, অন্যের সেল্‌ফ-রেসপেক্টও আপনি রক্ষা করতে পারবেন··· যাক গে, পরশু পাঁচটার সময় চৌরঙ্গীতে থাকব আমি, রেবাদি'র সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে।' বলে ও একটা হোটেলের নাম করে তার সামনে ফুটপাথের কথা বললে।

॥ চার ॥

গাড়িতে ঢুকেই বিনতা অনুভব করলে, এখানে আসবার আগে যে জ্বরজ্বর মনে হচ্ছিল ওর, সেটা বোধ হয় বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এতক্ষণ একেবারেই সেটা মনে পড়ে নি কি করে, সেইটে ভেবে আশ্চর্য হল ও। তারপর কথাটা মন থেকে সরে গেল ওর, ওই উত্তেজনার পর স্বতঃই নিঝুম হয়ে পড়ল বিনতা, কিন্তু পর পর ঘটনাগুলো ওর মনের ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। ভাবলে, অরুণের চিঠির একটা জবাব দেওয়া দরকার। ও-বাড়ি ছেড়ে যাবার আগেই সেই চিঠি লিখে রেখে যাবে। আরও একটা চিঠি লিখতে হবে, দিদিকে। বাড়ি ফিরেই যখন একটু পরে বিছানায় গেল ও, তখনই জবাবটা লিখে ফেলতে উদ্যত হল, অরুণের চিঠিটা বের করে আবার পড়তে আরম্ভ করলে। অরুণ লিখেছে:

'সেদিন তোমার সঙ্গে যে কলহ হয়েছিল সেটা আমি পছন্দ করতে পারি নি, তা হয় তো বুঝতে পেরেছিলে; আমার বিশ্বাস তোমারও তা ভালো লাগে নি। মানুষের আত্মসম্মানটাই সবচেয়ে বড় কথা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সেটা থাকা চাই—এবং তুমি জানো কলহই আত্মসম্মানের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, সেটা ঝগড়া করে মিটবে না। তুমি যা চাও আমি জানি, আমি যা চাই সেটাও তুমি জানো। তোমার পাওয়াটা তোমার নিজের থেকেই পেতে হবে, বুঝতেই পারছ আমি সেটা তোমাকে দিতে পারি না। তবে এটাও ঠিক, তোমার জানা দরকার যে আমি তোমার পথের প্রতিবন্ধক নই।'

'তোমার সঙ্গে এখন আমার দেখা হবে না। এখানে-ওখানে আমার নানা কাজ পড়ে রয়েছে, কলকাতা ছাড়ার আগে সেগুলোর মোটামুটি ব্যবস্থা করতে হবে, আমার এই অসুখ শরীরেই। পরশুদিন সন্ধ্যার গাড়িতে আমি বিলাসপুর রওনা হব, তুমি কি যাবে? তা হলে বণিক তোমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে। তোমার মতামত এর মধ্যে আর জানাতে হবে না, আসতে চাইলে স্টেশনে চলে আসবে, সেখানেই দেখা হবে তোমার সঙ্গে।'

নিজের অসুস্থতার জন্যেই হোক, বা অন্য কারণেই হোক, প্রথম এই চিঠি পড়ে যে রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও, সেটা আর মোটেই অনুভব করল না বিনতা। 'মানুষের আত্মসম্মানটাই সবচেয়ে বড় কথা···' অরুণের এই কথাগুলো একটা নতুন অস্বস্তিতে ভরে তুলল ওকে। সুকুমারও সেল্‌ফ-রেসপেক্টের কথা বলছিল। দু'জনের মুখেই ঠিক এই কথা ভালো লাগল না ওর। সে নিজেও যে নিজের সম্মানবোধ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সেটা কি অরুণের চিঠির জন্যই? তার কথা থেকে ধার করা?

তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে হল ওর: 'আমি যে বলছিলাম সুকুমারদা'কে যে তাকেও লেখা হয়েছে চিঠিখানা? কই ওর নাম?' বিনতা যদিও জানে সুকুমারই ওর চিঠির লক্ষ্য, তবু তার নাম পর্যন্ত নেই ওখানে। সুকুমার যদি চিঠিখানা পড়ত, কি হত তা হলে? তবে ও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারত। কিন্তু আশ্চর্য হল বিনতা অরুণের স্পর্ধা আর সাহস দেখে। অরুণ সুকুমারকে নিয়ে সন্দেহ করে না কেবল, সেটা সত্য বলেই জানে। ওর কি ঈর্ষা বলেও কোনো বালাই নেই, সুকুমার আর তাকে কাছাকাছি করে দেবার জন্যই ওর অসুখের নাম করে ওকে ডেকেছে? 'ও কি মনে করেছে, এতে আমি ভয় পেয়ে যাব? ওর মুখের ওপর তুড়ি মেরে চলে যেতে চাই···' বিনতা ভাবলে। 'তাছাড়া, কাউকে যদি আমি ভালোও বাসি, তা কি দান হিসেবে ওর হাত থেকে নিতে হবে?'

রাত্রে ও স্বপ্ন দেখলে, বিলাসপুরে অরুণ ওকে নিয়ে গেছে, সেখানে ওর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল বিনতার। অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে তিনি ওকে গ্রহণ করলেন। বিনতা বললে, 'তবে যে আপনার মৃত্যুর কথা শুনেছিলাম···কি বলুন তো, লোকে এত মিথ্যে রটাতেও পারে?'

পরের দিন একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙল বিনতার। জ্বরটা এখনো রয়েছে বলেই মনে হল, কিন্তু তা ছাড়া শরীরের মধ্যে আর কোনো গ্লানি নেই; বরঞ্চ বেশ খানিকটে ঝরঝরে মনে হতে লাগল। রাত্রির স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ল বিনতার আর তার ইঙ্গিতটা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর কাছে; বুঝল যে বিলাসপুরে গেলে সেও মরে যাবে। অরুণ যে তাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য এত জেদ করছে সেটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ও কি চায়, তাকে মেরে ফেলতে?

বিনতা সেদিন দুপুরেই অরুণের জন্য একটা চিঠি লিখে রাখল। সামান্য কয়েকটা কথা কিন্তু লিখে ভালই লাগল ওর। 'তুমি যা চেয়েছিলে তাইই মেনে নিলাম, আশা করি তুমিই সেটা স্বীকার করবে। এই তুমি চেয়েছিলে তো? যাক, এখন বুঝতে পারবে, কোনো মানুষের আত্মসম্মান কিনে নেওয়া যায় না। তাই নয় কি?' চিঠিটা লিখে রেখে দিলেও, ভাবলে এখান থেকে যাবার আগে বণিকের হাতে দিয়ে যাবে।

অনীতাকে লিখবার সময় ও কিন্তু উচ্ছসিত হয়ে উঠল, কেবলই নিজের মনে হাসতে লাগল ও। লম্বা চিঠিতে নিজের সব কথাই খোলাখুলি লিখলে ওকে। শেষ কালে লিখলে,···'দিদি, আমি এখন একলা, তোমাদের সঙ্গে কোনো যোগ নেই আমার, এদের সঙ্গেও এরপর আর যোগ থাকবে না। নিজেকে পেতে যে এত আনন্দ এর আগে এমন করে তা বুঝতে পারি নি। তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হত, কিন্তু ঠিক এখনই দেখা করতে চাই না। আমার ভাবী জীবন কি রকম হবে তা জানি না, সেটা যদি অন্ধকার হয় তো তাও আমার ভালো লাগবে। ভেসে যেতে চাই আমি···দেখতে চাই তার শেষটায় কি আছে। উনি কাল কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন, আমিও যাচ্ছি, কখন এবং কোথায় তা জানি না। পরে নিশ্চয়ই জানতে পারবে।'

পরের দিন সকাল থেকেই ব্রিজলাল কদ মিলিয়ে মিলিয়ে অরুণেন্দ্রের জন্য জিনিসপত্র গোছাতে আরম্ভ করল। বৃদ্ধ ড্রাইভার বণিক বিনতাকে জিজ্ঞেস করলে (নিশ্চয়ই অরুণের নির্দেশ মতো), 'মা-জী, সনঝে বেলা টিশনে যাবেন তো?'

'তোমাদের গাড়ি কখন?'

'সে হামি জানি না, সাড়ে পাঁচ বাজে সাহাবকো অফিসমে হামকো যানা···'

'পাঁচটার সময় আমি চৌরঙ্গীতে একবার যাব, সেখানে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওঁর কাছে যাবে, আধঘণ্টা পরে আমাকে আবার তুলে নেবে···'

'জী, হাঁ·'

অসুস্থের মতো হাসল বিনতা। ঠিক এটাই সে করবে আগে ভাবে নি, ঠিক সময় ঠিক জিনিসটাই মনে হয়েছে তার। একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে তা হলে।

* * *

যথারীতি সেই হোটেলের সামনে এসে নামল বিনতা। বণিক বললে, 'মা-জী খুব অসুখ আছেন···'। বিনতা তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, 'এই চিঠিখানা সাহেবকে দিও···আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে নিয়ে যেও আমাকে···'

'জী···' বলে চলে গেল বণিক।

রেবা হাসিমুখে এগিয়ে এল ওর দিকে, বললে, 'গাড়ি করে যে?' রেবা বিবাহিতা মেয়ে, এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সুকুমারের ছোট বোন, কিন্তু খুব ছোট নয়, পৃথুল চেহারা বলে আরো বয়স্ক দেখায়।

বিনতা তাড়াতাড়ি বললে, 'রেবাদি,' চলুন, আগে একটু চা খাওয়া যাক। পরে সব কথা হবে···' বলতে বলতে দু'পা এগিয়ে একটা কাফেতে ঢুকল ওরা। 'লেডিজ' নামাঙ্কিত একটা কুঠরীর মধ্যে ঢুকে চা-খাবারের অর্ডার দিলে ও, তারপর পর্দাটা নামিয়ে দিলে। বয়স্ক অভিভাবক অথচ বন্ধু এমনি একটা ভাব নিয়ে প্রথম থেকেই মৃদু মৃদু হাসছিল রেবা, বললে, 'গাড়িতে করে এলে বটে, এখন কিন্তু আমার সঙ্গে বাসে করে যেতে হবে, বাসেই আবার ফিরে আসতে হবে···'

এতক্ষণ নিজের খেয়ালেই ছিল বিনতা, ওর কথা শুনে চমকে উঠল, 'ফিরে আসতে হবে মানে?'

রেবাও বিস্মিত হল, ভুরু কুঁচকে বললে, 'ফিরে আসতে হবে তার আবার মানে কি···আমাদের বাসাতে তো থাকবে না তুমি?'

বিনতার ঠোঁট দু'টো ফাঁক হয়ে গেল, 'সুকুমারদা' আজ কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন না? আমি তো সেইজন্যে তৈরি হয়ে এসেছি···'

রেবা অবাক হল, কিন্তু মুহূর্তে ও বুঝতে পারলে বিনতার মনের ভেতর কি কাজ করছে। আবার হাসল ও, বিনতার কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললে, 'আমি তোমাকে বুঝতে পারি, মেয়েদের সম্মানে যখন ঘা লাগে তখন কতখানি মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো, মেয়েদেরই সবচেয়ে কঠিন সংগ্রাম করতে হয় সেই সম্মান রক্ষা করতে। আমার কথাই ধর; যার সঙ্গে আমার বিয়ে হল, বাবা-মা কেউ তাকে পছন্দ করতে পারেন নি, কিন্তু কাউকে মানি নি আমি। ও একটা কোম্পানীর সেলস্-অর্গানাইজার, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় ওকে। মাইনেও পায় খুব কম, তাতে ওর পকেট খরচা চলে না। আমাকেই সংসার চালাতে হয়, আর আমার ওপর কেউ কথা বলতে সাহস করে না···'

'তার মানে, আমাকেও স্কুলে চাকরী করতে হবে, নয় তো···'

'চাকরী পাওয়া সহজ নয়, কিন্তু আমার স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসকে আজই বলেছি আমি···সামনের জানুয়ারীতে টিচার নেবে ওরা···কিন্তু তুমি খাচ্ছ না যে কিছু?'

'রেবাদি' আমার মাথা ধরেছে। হাতে হাত দাও তো একবার, জ্বর আছে না?'

রেবা বাঁ-হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ তাই তো, বেশ জ্বর দেখছি···'

'আমি এই বন্ধ ঘরে আর থাকতে পারছি না, একটু বাইরে যাওয়া দরকার···বিলটা আপনি কাইগুলি দিয়ে দিন না···' বলে ওর মানি-ব্যাগটা ওর হাতে দিলে।

ফুটপাথের ওপর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিনতা, ওর ভয় হতে লাগল এখনই হয় তো ও পড়ে যাবে। রেবা পরক্ষণে এসেই ওর হাতে ব্যাগটা ফেরৎ দিলে, সেই চাকরীর প্রসঙ্গ তুলে বললে, 'মেয়েদের এই জোর না থাকলে কখনো সে স্বাধীন হয় না, আর অন্যের হুকুম তামিল করলে আত্মসম্মানও থাকে না, তা সে স্বামী হলেও···'

তাড়াতাড়ি বললে বিনতা, 'আমি ভেবেছিলাম আজই আমরা কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, পরের কথা পরে ভাবা যেত···'

'তুমি ছেলেমানুষ বিনু! তুমি এখনই যদি চলে যাও দাদার সঙ্গে তা হলে তার মানে কি হবে বুঝতে পারছ। ওর যা হবার হবে, কিন্তু তুমি মেয়ে হয়ে তোমার কি অবস্থা হবে তা জানো?'

'আমাকে তা হলে কি করতে হবে?'

'প্রথম তোমাকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে, তারপর তোমার বর্তমান বিবাহ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা···' বিনতা অস্থির হয়ে উঠেছে দেখে ও বললে, 'আচ্ছা, সত্যি বল তো, তুমি কি যে কোনো কলঙ্ক নিয়েই ওর সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিলে?'

'কই, না, তা নয় তো···আচ্ছা, আপনি যা বলছেন আমি তাই করব, আজ বরঞ্চ আমি ফিরে যাই···' ওদের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে বিনতা বললে। গাড়িতে উঠে বণিকের পাশে বসে মুখ বাড়িয়ে আবার ও বললে, 'একদিন আমাদের বাসায় আসুন না, সব কথা হবে তখন?'

'তার মানে?' রেবা প্রথমটা বিস্মিত তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। 'তুমি আমাদের ঠকাচ্ছ···আমাদের বাসায় যাওয়ার কথা ছিল না তোমার?'

'রেবাদি'···' যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল বিনতা, 'দেখলেন না আমার জ্বর হয়েছে···চলো···' গাড়িটা মুখ ফেরাতেই ও বণিককে বললে, 'কোনদিকে যাচ্ছ, হাওড়ায় যাবে না?'

অরুণ পেছন থেকে সামনের সীটের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'তুমি ওখানে যেতে চেয়েছ, খুব খুশি হয়েছি আমি। কিন্তু আজ থাক, তোমার জ্বর হয়েছে শুনলাম···তুমি একটু সুস্থ হলেই···'

'অসম্ভব! কে বললে আমি অসুস্থ···আমি যখন একবার বেরিয়েছি তখন যাবই। চল-চল, আমাকে বিরক্ত কোর না···' বলতে বলতে ওর মুখখানা ঝুঁকে পড়ল, অরুণ সে মুখখানা দেখতে পেলে না।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মিলার। বিভিন্ন দেশের যৌন-জীবন সম্বন্ধে আপাতদৃষ্ট বদ্ধ-সংস্কারে প্রভেদ থাকতে পারে অর্থাৎ প্রগতির পথে কে কতটা এগিয়ে গেছে এবং অপরাপরদের থেকে পৃথকীকৃত হয়ে

মনরো : মনরোর ভঙ্গিমায়

কতটা কি করেছে এবং বোধ হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরাই বেশি এগিয়ে গেছি—যদিও আমি সেটা সত্য কি-না নিশ্চিত জানি না।

ব্রাগুন। সুইডিশ জাতির স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী—আপনারা নারীত্ব, মনোহারিণী ভাব এবং রাগরঙ্গের ওপরে বেশি নির্ভর করেন।

মিলার। ও যৌবনকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে·····

মনরো। তাই যেন হয়—কারণ, আমি তাই করতে চাই। সুইডিস ছবিতে যৌবন খুব স্বাভাবিক মনে হয়। আমার ধারণা যে ওদের নীতিবাদ আমাদের মতো নয় এবং হয় তো সেই জন্যই স্বাভাবিক। ওদের ছবিতে ওদের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়, আমাদেরটায় আমাদের।

ব্রাগুন। নীতিবাদের কথা বলতে আপনি সামাজিক অথবা চিত্রজগতীয় কোন-··

মনরো। সামাজিক নীতি—যা প্রতিফলিতভাবে ছবিরও নীতি। এখনও আমাদের দেশ অত্যন্ত গোঁড়া। আমার মনে হয় মূলত আমরা তা ইংলণ্ড থেকে পেয়েছি। তাই না?

ব্রাগুন। আমেরিকাবাসীদের গোঁড়ামীতে কি আপনি অসুবিধে অনুভব করেন?

মনরো। আমি ওদিকে খেয়াল করি নি। ঠিক জানি না।

ব্রাগুন। মজার কথা এই যে এখানকার যে সব নীতি আপনাকে ঐ ধরণের ছবি যেমন, ধরুন ব্রিজিৎ বার্দো করে—করতে দেবে না, তারাই কিন্তু ঐ সব ছবি এখানে দেখাবার অনুমতি দেবে।

মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার

হেনরি ব্রাগুন

মনরো। হ্যাঁ। আমাকে নগ্ন ছবি করতে দেবে না—এখানে কাউকেই দেওয়া হয় না। তাহলে ওরা গ্রেপ্তার করবে কিংবা আরও কিছু করবে। ওরা কিছুতেই ছবিটা দেখাতে দেবে না। কিন্তু বিদেশী ছবিতে ওরা এই সবই পছন্দ করে ও গ্রহণ করে।

মিলার। গোঁড়ামীর এটাও একটা রীতি।

মনরো। এবং আমার মনে হয় সম্ভবত একটা দেশের প্রেমসম্বন্ধীয় মতবাদ অন্য দেশের ধারণায় ভিন্ন রূপ নেয়। এক দেশ অপর দেশের মধ্যে অধিকতর যৌনাবেগ কল্পনা করে।

ব্রাগুন। বর্তমান জগতে চিত্র ও অভিনয়ে যৌবন অত্যন্ত বেশি জায়গা জুড়ে আছে। আপনি কি বলেন?

মিলার। হয় তো এটা সহজভাবে জটিল জীবন-প্রকাশের একটা রূপ—(জীবন সম্বন্ধে কিছু বলাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে) কিন্তু সবদাই যৌবন সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলা যায়। আমার মনে হয় এটাই একটা বিশেষ কারণ। স্পষ্টতই দেখা যায় যে এর আকর্ষণে লোক অভিনয় দেখতে যায় এবং অভিনয় এখন বেশ খানিকটা ব্যবসায়িক ব্যাপারই বটে। আমার বিশ্বাস যৌবন সম্বন্ধে বদ্ধসংস্কার

প্রথা মাত্র। অনেক নাটক এই নিয়ে লেখা হয়েছে কারণ এটাই আমাদের চারিপাশের লোকদের জীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার একমাত্র সংক্ষিপ্ত উপায়। আমরা অনুভব করি যে, ওদের যৌন সমস্যার মধ্য দিয়েই আমরা ওদের জীবনে প্রবেশ করছি। অনেকের কাছে এই একমাত্র পথ যা সত্য।

ব্রাগুন। আপনার কি মনে হয় যে যৌবন সম্বন্ধে বদ্ধসংস্কারের একটা কারণ এই যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রমীলার রাজত্ব—হারবার তো তাই বলছেন।

মিলার। এটা আদিম সমাজ সম্বন্ধে থিওরি—যখন নারীকে আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সমস্ত ব্যাপারেই প্রবলভাবে মাথা গলাতে হোত, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তার দরকার নেই। তখন কর্মবিভাগই এমন ছিল যে তাকে সিদ্ধান্তে নিতে হোত যা তদানীন্তন ইয়োরোপীয় সমাজে হয় তো সে নিতো না। আমি জানি না বর্তমানে শ্রমশিল্পবাদের ফলে—যাতে পুরুষদের সমস্ত দিন বাইরে কাটাতে হচ্ছে—স্বতই মেয়েদের ওপরে সংসার চালাবার সিদ্ধান্ত নেবার ভার পড়বে কি না—কারণ অকুস্থলে সে থাকবে। হয় তো কালক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রবর্তিত হবে···অপরাপর সমাজ সম্বন্ধে আমিখুব বেশি অবশ্য জানি না···

ব্রাগুন। অনেকে বলেন এর একমাত্র কারণ এই যে, এখানকার রমণীরাই এমনভাবে বড় হয়েছে যে যৌন-জীবন সম্বন্ধে তারা-ই কর্ত্রী—তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় তা ঘটে থাকে।

মনরো। হ্যাঁ, আমার মনে হয় এখন দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, এর আগে ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে আমরা তো উচ্ছিষ্টের মতো ছিলাম।

ব্রাগুন। হয় তো আপনার তাই মনে হয়, আপনার বিশেষ অধিকার আছে। আপনি প্রতীক।

মনরো। চিরকালই আমি প্রতীক ছিলাম না—যদিও·· আমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ! যৌন-সংসর্গ রহিত করা অর্থে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

ব্রাগুন। অর্থাৎ রমণীরাই হ্যাঁ অথবা না বলে—সে নতি-স্বীকার করে না—সে-ই স্থির করে—এবং অত্যন্ত সচেতন ভাবে।

মনরো। তাই কি প্রকৃতির নিয়ম নয়?

ব্রাগুন। যে, সে সেটা স্থিরীকৃত করবে?

মনরো। তার অনেক দায়িত্ব।

মিলার। আমার ধারণা মিঃ ব্রাগুন 'ঝোঁকে'র প্রশ্ন তুলেছেন, ঘুরিয়ে বলছি, যদি সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন রমণীদেরই হয় তাহলে পুরুষের পক্ষে চড়াও হয়ে এগিয়ে যাওয়া লাম্পট্য। সেক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে মিল হলো না।

মনরো। তাই যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় এ তা জাগিয়ে তুলবে।

ব্রাগুন। আমি অবাক হয়ে ভাবি যৌন-জীবন সম্পর্কে এতো গোলমালই বোধ হয় এখানে মনস্তত্ত্ববিদদের এতো সমৃদ্ধির কারণ। আপনার কি ফ্রয়েডকে ভালো লাগে।

মনরো। খু-ব বেশি মাত্রায়। আমার মতে তিনি সমাজের অনেক উপকার করেছেন। তিনি এমন একটি বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন যা থেকে মানুষ উপকৃত হবে। এতে জীবন সুখকর ও ফলবান হবে। আমার মতে সুখ মানবজাতির প্রাপ্য। মনস্তত্ত্ব-বিদদের এই জন্য প্রয়োজন যে মানুষ কখনও নিজেই নিজের বিষয়বস্তু হতে পারে না। কতগুলি পারিপার্শ্বিকে মানুষ যদি নিজের সমস্যা

আর এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় মেরিলিন মনরো

ব্রিজিৎ বার্দো—মনরোর উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী

নিয়ে ভাবতে থাকে তাহলে হয় তো তাকে বৃত্তাকারে ঘুরতে হবে এবং সেই একই বৃত্তে।

মিলার। সত্য সত্যই, যুদ্ধোত্তর কালের রঙ্গমঞ্চ—যা আগে গুরুগম্ভীর ছিল এখন একদিকে যৌন-সংক্রান্ত বিচিত্র অদ্ভুত ব্যাপারে ও অন্যদিকে ভাবপ্রবণতায় পূর্ণ হয়ে কিম্ভুতকিমাকার হয়ে উঠেছে। হয় তো এর কারণ এই যে, যৌবন নিয়ে গভীর ভাবাবেগে লেখা যায় এবং দর্শকদের বিরক্তিকর প্রশ্নে উৎক্ষিপ্ত করতে হয় না। কিন্তু এর একটি বিশেষ গুণ আছে। আমার ধারণা যে স্টেজে আমরা সম্ভবত অপরাপর দেশ থেকে বেশি মাত্রায়, যে কোন দেশ থেকে বেশি মাত্রায় সব শ্রেণীর চরিত্রকে সুযোগ দিই। অল্পদিন আগেও বৃটিশ রঙ্গমঞ্চ কোন নাটক নিতো না যদি তাতে কোনও না কোনভাবে রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতারা থাকতেন। আমার মনে আছে আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন 'ভিউ ফ্রম দি ব্রীজ' (সেতুর ওপর থেকে দৃশ্য) বইটা করবার সময়ে শ্রমিকের পার্ট কারা করবে এবং কারা করতে পারে এ নিয়ে খুব অসুবিধে হয়েছিল। অনেক অভিনেতাই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিন্তু তাঁরা নিজেদের যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে তা ভুলতে বাধ্য করেছিলেন।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের রঙ্গমঞ্চ গণতান্ত্রিক—এবং আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীব্যাপী শক্তির এটাই একটা প্রধান কারণ। আমাদের রঙ্গমঞ্চের ব্যক্তিত্বের পরিধি অনেক বিস্তৃত। ইংরেজী নাটক অপেক্ষা এতে এদেশের জনসাধারণ অনেক বেশি প্রতিফলিত।

ব্রাগুন। এ থেকে কি সামাজিক ফলশ্রুতি লাভ হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়।

মিলার। আমার মনে হয় আমরা সমাজের এমন একটা স্তরে পৌঁছেছি (এটা অবশ্য আমার-ই নিজস্ব সংস্কার) যেখানে আগামী দিনে সমগ্র পৃথিবী পৌঁছবে। সংস্কৃতি ও শ্রমশিল্পের দিক দিয়ে আমরা সেখানে কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছি। বৃহত্তম জনতা—কয়েক মিনিটের জন্য যৌন-প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়া যাক—১৯৪৭ অথবা '৪৮ সালে প্যারিসে একটা স্টোরের সামনে দেখেছিলাম—যারা কাপড়-কাচার কল প্রদর্শন করছিল। আর সবাই বলে কি না আমেরিকার লোকরাই যন্ত্রপাতির জন্য পাগল। লোকগুলিকে দেখলাম একান্ত মগ্ন হয়ে দেখছে। এর কারণ এই নয় যে এটা একটি চমৎকার যন্ত্র-পদ্ধতি—এতে কাপড় কাচা যায় এবং সময়ও বাঁচে—আমার মনে হয় ঠিক আমরা যেজন্য পাগল ওদের কারণও ঠিক তাই। আমার একটা ধারণা আছে যে সু, কু যাই হোক না কেন সংস্কৃতি মানুষ যতটা স্বীকার করছে তার চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা খুব সাংঘাতিক কথা—কারণ জীবনে পার্থক্য থাকাই প্রীতিকর। সমগ্র পৃথিবীতে এখন কোকা-কোলা চিহ্ন এবং আপনার নিশ্চয়ই মনে হয় এ রকম না হলেই ভালো হোত। আমাদের সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা সহজ সমীকরণীভূত অংশ যা অপেক্ষাকৃত অসংস্কৃতিপরায়ণ বিরাট জনগণের মধ্যে বিরাজিত—তাই ইয়োরোপে রপ্তানী করা হয়। আমি জানি, ইয়োরোপের অনেক দেশে আমাদের সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা আছে, আমরা এত বেশি সিম্ফনি রেকর্ড বিক্রি করি—আমাদের দেশে চিন্তাশীল লেখক আছে জেনে অবাক হয়ে যায়······প্রখ্যাত আমেরিকান নামগুলিও তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় তখন তারা হঠাৎ সেই নাম ও আমার বক্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত করতে পারে। আমাদের সম্বন্ধে তারা যা জানে তা হচ্ছে কমিক বই, কমিক নাটিকা এবং চলচ্চিত্র ও আরও সব—খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। কোন জাত যদি পরদেশী সংস্কৃতি গ্রহণ করে তাহলে সেই জাত ক্রীতদাসে পরিণত হয়। তারা কখনও নিজেদের দানে একে সমৃদ্ধ করতে পারে না, শুধু কোন রকমে এর সমতা রক্ষা করে চলে এবং এর চমৎকারিত্ব কখনও স্থানান্তরে রোপণ করা যায় না। এমন কি ইয়োরোপের বিজ্ঞাপনগুলিও আমাদের নকল করছে। তারা সবই হারিয়ে ফেলেছে··যা আমি আগে ভাবতাম বিজ্ঞাপনে ইয়োরোপীয় আভিজাত্য কিন্তু এখন আমেরিকান বিজ্ঞাপন থেকে তাদের পৃথক করা যায় না—শুধুমাত্র একটা কথা এই যে তারা অত্যন্ত আত্মসচেতন। মোটের ওপরে আমার মনে হয় যে আমরা যেখানে আছি সেখানেই আপনারা পৌঁছবার চেষ্টা করছেন। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—রাণু ভৌমিক

One does not expect present-day dramatic critics to know much about music; as a matter of fact one no longer expects them to know much about drama. —*Noel Coward.*

শিল্প এবং ক্রোধ

সুভাষ সিংহ

'To be radical is to go to the root of the matter; for man, however, the root of the matter is man.'—Marx.

আর্নল্ড ওয়েস্কার এবং তাঁর নাটক Roots এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। পরিলক্ষিত যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যাঁরা নাটক লিখছেন তাঁদের মধ্যে, এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, ওয়েস্কার সবচেয়ে বেশি সমাজ সচেতন এবং শক্তিশালী নাট্যকার। যদিও আমরা জানি শিল্প সম্পর্কে আপ্তবাক্য উচ্চারণের চেয়ে মূর্খতা আর কিছু নেই, তবুও ওয়েস্কারের শক্তিমত্তাকে অভিনন্দন জানানো অনেক কারণে সঙ্গত ব'লে মনে করছি। বিজ্ঞ সমালোচকেরা বলেছেন যে, তিরিশের যুগের অডেন, স্পেণ্ডার, ঈশারউডের চেয়ে ওয়েস্কার অনেক বেশি সফল নাট্যকার।

Roots ওয়েস্কারের সবচেয়ে আলোচিত এবং সফল নাটক। কেউ কেউ এমত কথাও বলেছেন যে, এর মধ্যে জীবনের ছবি, বিশেষ ক'রে শ্রমিক জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলি যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বলেই এই নাটক জনচিত্তে অভাবিত সাড়া জাগাতে পেরেছে। অন্যত্র এমত বাক্যও উচ্চারিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র খণ্ড জীবনের টুকরো অংশ এই নাটকে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু শুধু কি ন্যাচারিলিজমের ছাপ মারা হ'লেই ঐ নাটক সম্পর্কে সব বলা হয়ে গেল? এই ধরণের লেবেল এঁটে বর্তমান নাটক নিয়ে কোনরকম আলোচনা অযৌক্তিক হ'বে—ফলত তাতে আমরা কোন লক্ষ্যে পৌছতে পারবো না। জীবনের খণ্ড অংশ যদি কোথায়ও সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তার প্রকাশ Roots-এর মধ্যে খুঁজলে পণ্ডশ্রমই হ'বে শুধু; তা খুঁজলে পাব আমরা অসবর্ণের Look Back in Anger অথবা Room At the Top-এর মধ্যে। যে-কোন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান বস্তু হচ্ছে তার গঠন বা দেহ এবং এদিক থেকে Roots প্রথমোক্ত দু'টি নাটক থেকে স্বতন্ত্র। তা'ছাড়া যে ডকুমেণ্টারী লক্ষণের দরুণ Roots-এর সফলতা অনেকাংশে দায়ী, একথা যাঁরা নির্বিচারে উচ্চারিত করেন, তাঁদের স্মর্তব্য যে, শিল্পের ক্ষেত্রে তথ্যের প্রতি আনুগত্য মুখ্য নয় গৌণ। ওয়েস্কার নিজেই ঐবিষয়ে পরিষ্কার ক'রে বলেছেন:

'This is a play about Norfock people; it could be a play about any country people and the moral could certainly extend to the metropolis......'

এখন প্রশ্ন কি এই শিল্পের দেহ, কি এই দ্বান্দ্বিকতা? এই যে, প্রথমত বেটি এবং তার পরিবারের মধ্যে বিরোধ; দ্বিতীয়ত বিরোধ সমাজতান্ত্রিকতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর জড়তা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে Roots ন্যাচারিলিষ্ট নাটক না হয়ে হয়েছে নিউ-লেভিয়ান ভাববাদী নাটক—এমত ধারণাও অনেকে পোষণ করেন।

কিন্তু তা কি যথার্থ? কি ক'রে বলি যে, নাটকে প্রতিফলিত ভাবগুলি মৌলিক নয়? Roots-এর নায়ক রোণির বোধ তার অপরিমিত উত্তমের মধ্যে নিহিত ছিল। রোণির উত্তম জিমির (Look Back in Anger-এর নায়ক) মতই লক্ষ্যহীন—এক্ষেত্রে সংজ্ঞা হিসেবে আমরা ক্রোধ না ব'লে উত্তম কথাটা ব্যবহার করা সঙ্গত ব'লে মনে করবো।

বেটি রোণির কথাই শ্লোগানের মত ব্যবহার ক'রে। যে মুহূর্তে আমরা বেটিকে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার সুরু করতে দেখতে পাই, আমাদের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, রোণির বোধ ভোঁতা। বেটি ধার করা কথা বললেও শ্রমিক শ্রেণীর জড়তার দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়। রোণির বোধের মধ্যে পঞ্চাশের ক্ষয়িষ্ণুতা, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সংস্কার বিশেষভাবে মূর্ত। তাকে সময়বিশেষে জিমির উল্টো পিঠ বলেই মনে হয়। এতদসত্ত্বেও যে
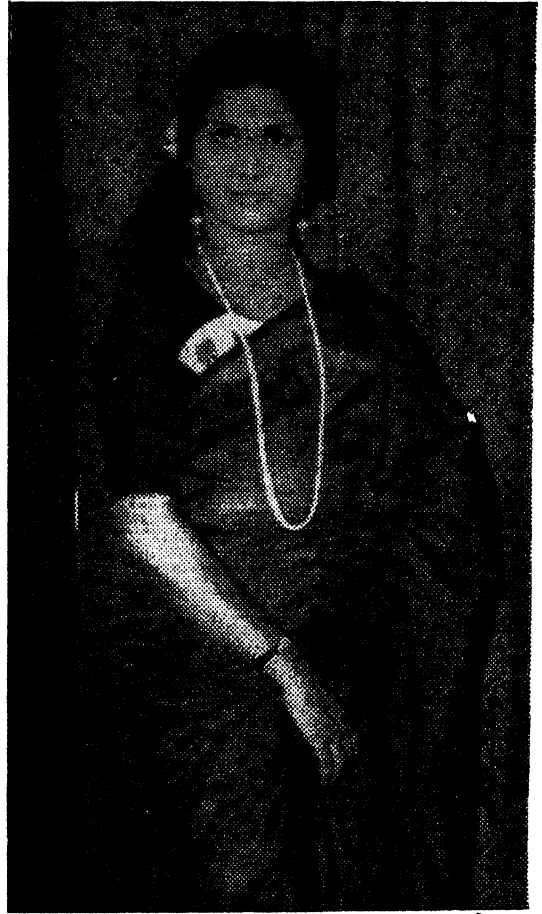
শ্রীমতী শ্রাবণী বসু—ছায়াছবির বাইরে

দ্বান্দ্বিক সংঘাত ওয়েসকার Roots-এর মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যে সংঘাত ছিল সমাজতান্ত্রিকতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর জড়তার (অজ্ঞতা) মধ্যে; তার পাশাপাশি আমরা ঐ সংঘাতও লক্ষ্য করি রক্তমাংসের চরিত্র হিসেবে বেটি এবং তার মায়ের মধ্যে অথবা বেটি এবং তার কনিষ্ঠা জেনির মধ্যে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে Roots নাটকে ওয়েসকার শ্রমিক জীবন সম্পর্কে বোধ করি এ' কথাই বলতে চেয়েছেন যে, শ্রমিক নিজেই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। যদি সংসারে পরস্পারের মধ্যে মিলনের সেতু ভাঙ্গা থাকে তবে বৃহত্তর সমাজজীবনে তাদের পরস্পারের মধ্যে কোনরকম যোগসূত্রই থাকবে না। এর নজির পাওয়া যায় জিমি, মিঃ ব্রান্ট এবং আরও কতিপয় মজুরদের ইয়ার্কীসুলভ কথাবার্তা এবং শ্রেণী হিসেবে তাদের ভবিষ্যতে আদৌ কোন স্থান থাকবে কি-না ঐ ধরণের আলাপ-আলোচনায়। নাটকের অন্তিমে আমরা দেখতে পাই যে, একটা ফার্মে আঠারো মাস কাজ করার পর বেটির বাবাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পুনরায় তাকে সেই ফার্মে সাময়িক শ্রমিক হিসেবে কাজ দিলে সে কোনরকম প্রতিবাদ না ক'রে নির্বিবাদে তাই মেনে নেয়—শুধুমাত্র ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারে না। এক ধরণের নিষ্ক্রিয়তা—যে কথা পূর্বে বলেছি, যার জন্যে এরা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন হয়ে অমানবিক জীবনযাপন ক'রে চলেছে।

কেবলমাত্র সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি Roots-এর আলোচনা করা যায় তা'হলে দেখা যাবে নিঃসন্দেহে এই নাটকে সাম্প্রতিক শ্রমিক-জীবনের নঙর্থক দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। সত্য যে, নরফোক খামারের শ্রমিকেরা শ্রেণীচরিত্র হিসেবে টিপিকাল নয়। ওয়েসকার মার্ক্সীয় দর্শন ভালভাবে হজম করেছিলেন! ফলত অতি সঙ্গত কারণেই তিনি নরফোক শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনা খুব জোরালো ক'রে নাটকে প্রতিফলিত করেন নি। কেন-না নরফোক শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা তখনো ভ্রূণাবস্থায় ছিল। এ সত্য ওয়েসকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিরিশের লেখকদের মত ভুল তিনি করেন নি।

স্মর্তব্য যে, কেবলমাত্র Roots-এর মধ্যে সামাজিক দিকগুলি অর্থাৎ তাদের ভুল-ভ্রান্তি, তাদের মরালিটি, তাদের জাড্যতা, জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশতা ইত্যাদির অনুলিপিই সব নয়, এ'ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যা অনালোচিত থাকলে বর্তমান নাটকের মূল্যায়ন অসম্ভব হয়ে পড়বে। তা'ছাড়া সব দিক থেকে বিচার করলে Roots-এর লক্ষ্য শুধুমাত্র নঙর্থক দিকগুলির উন্মোচন ছিল না। 'Lack of communication' এই দোষ ছিল Roots-এর পাত্রপাত্রীদের—ফলত তা যে-কোনরকম মুক্তির পক্ষে 'চরম বিঘ্নস্বরূপ এবং সে কারণেই নাটকের অন্তিমে নায়িকা বেটি সবকিছুকে ভেঙ্গে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পেরেছে।

বেটির এই বিদ্রোহ আকস্মিক নয় পরন্তু তা নাটকের মূল থিমের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রথম অঙ্কের মধ্যাংশে পৌঁছে আমরা বেটির বিদ্রোহের বা ভেঙ্গে ফেলার আভাস এবং তার তাৎপর্য লক্ষ্য করি। বেটি অনেক সময় তার বোধকে মননশীল পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারে নি এবং সেইসব ক্ষেত্রে সে নাচের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করতে চেয়েছে। (দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তিমে দ্রষ্টব্য)। এখনও পর্যন্ত বেটি রোণির ভাবনাগুলিকেই নিজের ব'লে চালিয়েছে। তার উপর সে ছিল নির্ভরশীল। কিন্তু এই নির্ভরতা বেশিদিন বজায় থাকে নি! তাই দেখা যায় যে, দ্বিতীয় অঙ্কে রোণির কাছ থেকে প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার ফলে তার চৈতন্য হয় এবং তারপর থেকে রোণির উপর নির্ভরশীলতা করবার প্রেরণাও উবে যায়। মনে হয় যেন এখন বেটি সত্যকে নিজের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং সদ্যোজাত সত্যের আলোকে তার পক্ষে তখন বলা সম্ভব হয়েছে:

God in heaven, Ronnie! It does work, it is happening to me, I can feel it's happened, I am beginning, on my two feet—I am beginning.....'

সমালোচকেরা বলেছেন যে, বেটি শুধুমাত্র কথাই বলতে জানে। তার সবকিছু আগাগোড়া ফাঁকা আওয়াজ। যদি রোণির সমাজতান্ত্রিকতা সম্পর্কিত সব কথাবার্তা বাগাড়ম্বর মাত্র হয়, তবে বেটির কথাবার্তার মধ্যে আমরা সারবস্তু কি করে আশা করি? কেন না বেটি রোণির কথারই তো প্রতিধ্বনি করতো। স্বাভাবিকভাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, বেটির পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো? নতুন চেতনাপ্রাপ্ত বেটি, যে চেতনা তাকে এতদিনকার জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে সবকিছুকে বিচার করবার শক্তি দিল,

বোম্বাই এর স্বনামধন্যা নৃত্যপটীয়সী বৈজয়ন্তীমালা।

কোনদিকে সে চালনা করলো তার এই পরম সম্পদকে ? এ' প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই জাগে কিন্তু দুঃখের বিষয় ওয়েস্কার এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উপর কোনরকম আলোকসম্পাত করেন নি। একদা ব্রেখট্ প্রশ্ন করেছিলেন, 'নোরা গৃহত্যাগ করার পর কি করলো ?' যে স্বাধীনতার জন্যে এত ত্যাগ, এত দুঃখ, এত কষ্ট সহ্য তা নিশ্চয়ই কোনকিছু প্রাপ্তির জন্যে। বেটি সম্পর্কেও কি প্রাগুক্ত প্রশ্ন মনে জাগে না ? গোটা নাটকে আমরা দেখেছি বেটি সুস্থ, স্বাভাবিক ; তার মধ্যে কোনরকম নিউরোটিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি। শুধু জানা গেছে সে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তারপর যখন সে আত্মনির্ভরশীল হ'ল, নতুন সত্যকে যখন সে লাভ করলো—এর পরেও কি কেউ নিষ্ক্রিয়াবস্থায় দিন কাটাতে পারে ? অথচ বেটির কোনরকম কার্যকলাপের নিদর্শন পাঠকেরা জানতে পারেন না।

এ'ছাড়াও নাটকে ত্রুটি অন্যত্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে স্টানের মৃত্যু কেমন যেন মেলোড্রামাটিক্ ব'লে মনে হয়। তার মৃত্যু অনেকটা দুর্ঘটনার মত এবং তার জন্যে প্রতীকী তাৎপর্য নাটকে উপস্থাপনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নাটকে স্টানের উপস্থাপনা নানা দিক থেকে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্টান ছিল মহৎ জীবনের প্রতীক। (যে মহৎ জীবনের স্পন্দন গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে)। বলা বাহুল্য, ওয়েস্কার স্টান চরিত্র সম্পর্কে আরো বেশি সতর্ক থাকলে বোধ করি ভাল করতেন।

২

সব সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা যেন কদাপি ওয়েস্কারের সাফল্য সম্পর্কে বিস্মৃত না হই। অরওয়েলের সাথে এদিক থেকে তাঁর কিছুটা মিল আছে। অরওয়েলের সাহিত্য বিচারের উপর ওয়েস্কারের মূল্যায়ন অপরিহার্য। ওয়েস্কার যতটা নিপুণভাবে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালের ইংরেজ শ্রমিক জীবনকে সামগ্রিকভাবে নাটকে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন, তুলনায় অরওয়েলের সীমাবদ্ধতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ফলত ইংরেজ শ্রমিক জীবন এবং সমাজতান্ত্রিকতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেক বেশি জোরালো। এর কারণ সম্ভবত তাঁর নিজের জীবন। তাঁর নিজের জীবন সুরু হয়েছিল ইহুদী উদ্বাস্তু হিসেবে। গরম রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্য থেকে তাঁর কৈশোর অতিবাহিত হয়। সমাজতান্ত্রিকদের অতি নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। এ'সবই যা কিনা অসম্ভব ছিল অরওয়েলের পক্ষে। এটন কলেজের পরিমণ্ডল নিঃসন্দেহে এর বিপরীত ছিল। ওয়েস্কার ইংরেজ সমাজে ছিলেন আউট-সাইডার।

ওয়েস্কার মার্ক্সীয় স্কুলে যে-ভাবে দীক্ষিত ছিলেন এবং মার্ক্সবাদকে যে-ভাবে নিপুণতার সাথে হজম করতে পেরেছিলেন ঠিক সে ভাবে সম্ভবত তাঁর সমসাময়িকেরা কেউ পারেন নি। এমন কি অ্যাঙ্গুস উইলসন্ বা আর্থার মিলারও পারেন নি। এদিক থেকে তিনি ভাগ্যবান। তিরিশের লেখকেরা যে-ভাবে একাধারে মার্ক্স এবং ফ্রয়েডকে পাঞ্চ ক'রে কিম্ভূতকিমাকার সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে ওয়েস্কার সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই এ' ধরণের ভ্রান্তি তাঁর মধ্যে আসে নি দেখে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। মানুষ সমাজ জীবন থেকে বিচ্যুত হ'য়ে কি অদ্ভুত কাণ্ডকারখানায় লিপ্ত থাকে, ওয়েস্কার সে ধরণের মানুষ নিয়ে কখনো উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর নাটকের চরিত্রেরা সামাজিক মানুষ হিসেবে উদ্ভূত হ'য়েছিল। আমার মনে হয় মানুষকে সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার যে ঝোঁক আমরা ওয়েস্কার এবং তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি—এর ফলে তাঁরা ঐতিহ্যের প্রধান ধারার সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পারবেন। ফলে তাঁরা শুধু ক্রোধের কথাই বলবেন না, নতুন সমাজের নব মূল্যায়ন করবেন নতুন নতুন নিরীক্ষার মাধ্যমে—তাঁদের হাতে নাটক শুধুমাত্র বিদ্রোহের ভঙ্গী হিসেবেই থাকবে না—বরং তাঁরা জীবনের গভীর অনুভবের কথা গভীরভাবে বলবেন। পাঠক হিসেবে তাঁদের কাছে আমাদের এ দাবী রইলো।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'অশান্ত ঘূর্ণি' চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল

বিভাস

একদিকে আশ্রয়দাতার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা অন্যদিকে অন্যায়, খলতা ও ক্রুরতার বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ—এই দোটানায় মানুষের অবস্থা কি রকম সমস্যাজর্জরিত হয়, নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে কি ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে, সেই পটভূমি ভিত্তি করে 'বিভাস' ছবিটি রূপ নিয়েছে। সাহিত্যিক সমরেশ বসুর একটি উপন্যাস অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

কাহিনীর নায়ক বিভাস আত্মজনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। আশ্রয় পায় অচিনপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত ডা: তারকেশ্বরের কাছে। তাঁর কার্যাবলীও নীতিসম্মত নয়। তখনই বিভাসের মনে জাগে বিদ্রোহ। আসে অন্তর্দ্বন্দ্ব। শেষে ঘটনার ঘনঘটায়, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তারকেশ্বরের পরাজয় এবং তদীয় কন্যাকে বিভাসের হস্তে সমর্পণে কাহিনীর সমাপ্তি।

একটি সংগ্রামী মানুষের জীবনযুদ্ধ, লাঞ্ছনাবরণ এবং পরিণতিতে সর্বাঙ্গীণ সফলতা অর্জনের একটি উপভোগ্য দলিল পরিচালক বিমু বর্ধন এখানে তুলে ধরেছেন। ভাগ্যচক্র নায়ককে বারবার আঘাত করেছে কিন্তু অসাধারণ মনোবল এবং অন্তরের দৃঢ়তা তাকে সাফল্যের সপ্তস্বর্গে পৌঁছে দিল—এই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিমু বর্ধন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্টই, কিন্তু অভিনবত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। গতানুগতিক ছকে কাহিনীকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আঙ্গিকে, বিন্যাসে, গঠন চাতুর্যে ছবিটি পরিচ্ছন্নতার ছাপ সর্বাংশে বহন করছে ঠিকই, তবে তাতে বৈচিত্র্যের কোন স্পর্শ নেই। কোন কোন অংশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। সেগুলি সংক্ষিপ্ত হলে ছবিটি আরও উপভোগ্য হত। ছবিটির শিল্পসজ্জা প্রশংসনীয়। সঙ্গীতাংশ সুপরিচালিত। ছবিটির আলোকচিত্রকর্ম প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিনয়াংশে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বিকাশ রায়। তাঁর প্রাণপূর্ণ অভিনয় যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দদান করে। অনুভা গুপ্তার চরিত্রায়ণও যথেষ্ট প্রশংসার দাবীদার। কমল মিত্রের অভিনয়ে চরিত্রের খলতা, নীচতা, ক্রূরতা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার এবং ললিতা চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু, অরুণ চৌধুরী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, গীতা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। সুরযোজনার কৃতিত্ব হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় ডেইজী ইরাণী।

"মুক্তাভস্ম"—চিত্ররূপ

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগের মাধ্যমে আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে একটি আনন্দ সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি। প্রাণতোষ ঘটকের বহুপঠিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'মুক্তাভস্ম' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হতে চলেছে। এই সুপঠিত উপন্যাসটির গল্পাংশ সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। বাঙলা দেশের একটি বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজের এক সুস্পষ্ট আলেখ্য অভূতপূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্য সহকারে শ্রীঘটক এই উপন্যাসটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই সার্থক উপন্যাসের চিত্রায়ণ বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে দেবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। বিশিষ্ট প্রযোজক শ্রীএস, মোদী স্বনামধন্য সাহিত্যিক-অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য, 'কাঞ্চনমূল্য' খ্যাত পরিচালক নির্মল মিত্র এবং খ্যাতিমান আলোকচিত্রী রামানন্দ সেনগুপ্ত এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সংবাদ বিচিত্রা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের নতুন উদ্যম

বাঙলা দেশের ছায়াচিত্রজগতের গর্ব ও গৌরব এবং অগণিত অবিস্মরণীয় ছায়াছবির নির্মাতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার বর্তমানে বোম্বাইতে দু'খানি ছায়াছবি নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল। পরিকল্পিত দু'খানি ছবির মধ্যে একটি বাঙলা ভাষায় এবং অপরটি হিন্দী ভাষায় গৃহীত হবে। দ্বিতীয় ছবিটি সঙ্গীতসমৃদ্ধ এবং বর্ণরঞ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। উভয় চিত্রেই প্রযোজনা করবেন শ্রীযুক্ত সরকারের পুত্র শ্রীদিলীপ সরকার।

শ্রীগোপাল রেড্ডীর নতুন পদ

বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে যে ভারতের প্রাক্তন তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী শ্রী বি গোপাল রেড্ডী সেন্ট্রাল কমিটী ফর স্টেট এ্যাওয়ার্ডস ফর ফিল্মসের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হচ্ছেন।

ভারতীয় ছবি দেখলেই বিশ্বাসঘাতকতা (?)

পাকিস্তানের ভারতবিদ্বেষ সম্পর্কে আজ আর নতুন কিছু বলার নেই। বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন নরনারী পাকিস্তান সরকারের এই নারকীয় আচরণ ও বর্বরতায় স্তম্ভিত হয়ে ধিক্কার হেনেছেন। সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যেই পাকিস্তানের ভারতবিদ্বেষ সীমাবদ্ধ নয়। ভারতীয় ছায়াছবিও তার কোপের আগুন থেকে নিস্তার পায় নি। এই কর্মে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে করাচী থেকে প্রকাশিত 'হারিয়াত' নামে এক উর্দু দৈনিক। স্থানীয় ভারতীয় হাই কমিশন থেকে একটি ভারতীয়

ছবি দেখে বহিরাগত দর্শকবৃন্দের এক আলোকচিত্র প্রকাশ করে মন্তব্য করা হয়েছে—'এ্যারেস্ট দিস ট্রেটার্স।' অর্থাৎ ভারতীয় ছবি যে সব পাকিস্তানীরা দেখে থাকেন তাঁরা সকলেই পাকিস্তানী সাংবাদিকদের চোখে বিশ্বাসঘাতক। অথচ কোন দর্শনীয় এবং উল্লেখযোগ্য উর্দু ছবি ভারতে প্রদর্শিত হলে সেই ছবির ভারতীয় দর্শকদের প্রতি ঐ বিশেষণ কি আমরা প্রয়োগ করি, না করাটা যুক্তিগ্রাহ্য? ভারতীয় পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য এই সংবাদটি আমরা প্রকাশ করলাম।

দুর্গাখোটের পুত্রশোক

ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রতারকা দুর্গা খোটে (৬৪) সম্প্রতি পুত্রশোকপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর পুত্র হরীন্দ্রনাথ (৩৮) গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেছেন। হরীন্দ্র পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। মঞ্চ এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। মহারাষ্ট্রের যশস্বিনী মঞ্চশিল্পী বিজয়া জয়ন্ত তাঁর সহধর্মিণী।

শান্তা আপ্তের পরলোকগমন

প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী ও কণ্ঠশিল্পী শান্তা আপ্তে গত ২৫-এ ফেব্রুয়ারী মাত্র ৪১ বছর বয়সে লোকান্তরিতা হয়েছেন। মাত্র ন' বছর বয়সে তিনি অভিনয়জগতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে অসংখ্য ছায়াচিত্রে তাঁর সার্থক ও অনবদ্য অভিনয় তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাধুবাদে বিভূষিত করে। গায়িকা হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারিণী ছিলেন। বাঙলা গানেও তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর গাওয়া দু'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত (দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে এবং জাগরণে যায় বিভাবরী) তাঁর দক্ষতার উজ্জ্বল পরিচায়ক।

দুগ্ধব্যবসায়ে দিলীপকুমার

আমরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে, বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনট দিলীপকুমার এক ব্যাপক ও বিরাট পরিসরে দুগ্ধব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে চলেছেন। এই পরিকল্পনায় তাঁর অংশীদার হয়েছেন নাসিকের ব্যবসায়ী শ্রীআব্বাস আলোভাই। তাঁরা এক সহস্র গাভী ক্রয় করা স্থির করেছেন এবং আশা করা যায়, প্রতিটি গাভীর কাছে দৈনিক এক থেকে দেড় মণ দুগ্ধ পাওয়া যাবে। এই ডেয়ারিতে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা হবে।

সমস্যা নিবারণে মহারাষ্ট্র সরকার

স্টুডিও ভাড়ার আধিক্যের জন্য চিত্রের নির্মাণব্যয় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে যাওয়ায় চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয় প্রযোজকদের মুস্কিলে পড়তে হচ্ছে। এই সমস্যা রাজ্য সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকার হস্ত প্রসারিত করেছেন। মহারাষ্ট্র সরকার হয় কোন স্টুডিওর স্বত্ব অর্জন করবেন নতুবা একটি স্টুডিও নির্মাণ করবেন। এই পরিকল্পনা সফল হ'লে আশা করা যায় প্রযোজকদের সমস্যা বহুলাংশে দূরীভূত হবে।

বৈজয়ন্তীমালার প্রথম ভক্তিমূলক চিত্রাবতরণ

জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গশীর্ষে যে শিল্পীরা আজ সমাসীন সেই তালিকায় বৈজয়ন্তীমালা একটি বিশেষ নাম। অসংখ্য চিত্রে তাঁর প্রতিভা, নৈপুণ্য ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া গেছে। বহু চিত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ চিত্রামোদীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। বর্তমানে মীরাবাঈয়ের পবিত্র জীবন অবলম্বন করে নির্মীয়মাণ চিত্রে নাম-ভূমিকার অভিনয়ের জন্য তিনি নির্বাচিতা হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভক্তিমূলক চিত্রে বৈজয়ন্তীমালার এই প্রথম অবতরণ। ইতঃপূর্বে তাঁর অভিনীত ছবির তালিকায় কোন ভক্তিমূলক ছবির নাম লিপিবদ্ধ হয় নি। সেদিক দিয়েও এই ছবিটি এক গুরুত্ব বহন করছে। ছবিটি পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে শ্রীনীতীন বসুর প্রতি।

চিত্রনগরী

ম্যানহাটান অঞ্চলে কুড়ি লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি 'চিত্রনগরী' গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের সমৃদ্ধির ইতিহাসে এই পরিকল্পনা একটি নতুন অধ্যায় যোগ করবে। এই চিত্রনগরী চিত্রনির্মাতাদের সুবিধার জন্যই সৃষ্ট হতে চলেছে। চলচ্চিত্রের ব্যাপক অগ্রগমনে এই বিরাট পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করবে।

আলোচনারত বোম্বাই-এর প্রখ্যাত গায়িকা লতা মুঙ্গেশকর ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

নিশিযাপন

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে 'নিশিযাপন' ছবিটি রূপ নিচ্ছে। এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, সুমিতা সান্যাল প্রভৃতি।

মোমের আলো

প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত 'মোমের আলো' ছবিটির পরিচালনভার অর্পিত হয়েছে সলিল দত্তের প্রতি। চরিত্রগুলির রূপায়ণের ভার গ্রহণ করেছেন উত্তমকুমার, রবি ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীর দল। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুবীর সেনও এই চিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন। এই ছবিটিতেই তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ।

কে তুমি?

কবি প্রণব রায় রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অনুসরণে 'কে তুমি?' ছবিটি গড়ে উঠছে শ্যাম চক্রবর্তীর পরিচালনায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সন্ধ্যা রায়, সবিতা চৌধুরী প্রমুখ শিল্পিবর্গ।

মধুমিতা

'মধুমিতা' নামক প্রণয়মধুর সামাজিক চিত্রটি পরিচালনা করছেন অগ্নিমিত্র। পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পী হিসাবে এই ছবিটির সঙ্গে যুক্ত আছেন।

দীক্ষা

রবীন প্রোডাকসান্সের নিবেদন দীক্ষা ছবিটি শ্রীমতী নীহার রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় রূপায়িত হচ্ছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান তিলক, রুমা গঙ্গোপাধ্যায়, মলি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন।

শৌখীন সমাচার

কালিন্দী

দিকপাল কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' মঞ্চস্থ করলেন জ্যাকস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। রবি বর্মণ নির্দেশনার ভার নেন। তারকদাস রায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত পাঠক, হরেন্দ্রকুমার পণ্ডিত, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী, গৌরমোহন রায়চৌধুরী, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দাশশর্মা, পঞ্চানন বসু, এ কে গোস্বামী, রথীন্দ্রমোহন ঘোষ, দীপঙ্কর সেন, অনিল চক্রবর্তী, সান্ত্বনা ঘোষ, সুতপা ভট্টাচার্য, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করেন।

বহ্নিবন্যা

স্বনামধন্য সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস 'বহ্নিবন্যা'র নাট্যরূপ দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত করেন বার্নস কালচারাল এ্যাসোসিয়েশান। নাট্যকার মণি দত্ত নাটকটির পরিচালনভারও গ্রহণ করেন। শচীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামলবরণ ভট্টাচার্য, পঞ্চানন সরকার, কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সুর, অজিত পাল, শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনিলকুমার দত্ত, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলকুমার বসু, রবীন চট্টোপাধ্যায়, মীরা হাজরা, মিতা চট্টোপাধ্যায় ও শিপ্রা সাহা শিল্পী হিসাবে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

গোধূলি লগ্ন

আন্তরিক সম্প্রদায় সরোজ ঘোষের 'গোধূলি লগ্ন' নাটকটি নিবেদন করলেন। শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেন শৈল চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশ ধর, সুধীর দাস, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব ঘোষাল, রবি বসু, চার্লি চক্রবর্তী, নবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার নিজেই।

তাই তো

নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাই তো' নামক বিখ্যাত নাটকটি অভিনয় করলেন টাটা স্বব ডিলার্স (সি এস) রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। প্রখ্যাত অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অজিত চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, জিতেন গুহ, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রমেন দত্ত, শীতল পোড়েল, কার্তিক গিরি, বীরেন বাগচী, সরল মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান দীপক, কেতকী দত্ত, শুক্লা দেবী, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

রাহুমুক্ত

বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' নাটকটিকে যাত্রার আঙ্গিকে অভিনয় করলেন কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটার। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন সুবোধ সরখেল, ধীরঞ্জন দত্ত, অমল ভট্টাচার্য, ভূমিকা ভট্টাচার্য, বেলা রায়, বেলা দাস প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে শ্রীবীরেন ধর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

'লাই' মানে 'মিথ্যা'

আয়ুব খাঁর দোস্ত চু-এন-লাইয়ের কপাল দেখিতেছি নিতান্তই মন্দ। কিছুতেই হালে পানি পাইতেছেন না, অথচ চেষ্টায় আন্তরিকতায় তাঁহার তিলমাত্র ত্রুটি নাই। কিন্তু ভাগ্যদেবী সেই যে মুখটি ফিরাইয়া রহিয়াছেন পাষাণফাটা সহস্র আকুল ডাকেও আর সাড়া দিতেছেন না। কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, দেশে দেশে অনুচর প্রেরণ, সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট ব্যাকুল আবেদন—কিছুই ফলপ্রসূ হইতেছে না। অবশেষে সিংহল? হয় তো ভাবিলেন দেখা যাক, কোমলচিত্ত নারীর সহানুভূতি যদি আকর্ষণ করা যায়। বিধি বাম; এখানেও সুবিধা হইল না; শ্রীমতী বন্দরনায়ক খোলাখুলি বলিলেন অবান্তর বাজে বকা একদম চলিবে না। ভদ্রলোকের পেটের কথা পেটেই রহিয়া গেল। গুমরানি আর দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া কথাগুলি মুক্তিলাভ করিল।

আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, লাই সাহেব—! (লোকটি না কি আদপেই খারাপ নন, ভারতই তো যত নষ্টের মূল) ভারত-চীন বিরোধ অবসানকল্পে কলম্বোয় শ্রীমতী বন্দরনায়কের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইবেন। বৈঠক হইল। কিন্তু ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। অদৃষ্টের পরিহাস?

চু-এন-লাই লোকটি আসলে যতখানি ধূর্ত ঠিক ততখানি যদি বুদ্ধিমান হইতেন তাহা হইলে অনায়াসে রাজনীতির খেলায় জিতিতে পারিতেন, কিন্তু সেইখানেই ঈশ্বরের অনন্ত করুণা, এই ব্যক্তিটিকে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি দিয়া সারা জগতের সর্বনাশ ঘটিতে তিনি দিলেন না। লাই সাহেব নিজেকে যদি ধূর্ত ও অসরল ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে অন্তত ভ্রান্তধারণার বশীভূত বলা চলে না, কিন্তু তিনি নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবিলেই শতকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি প্রকৃতই বুদ্ধিমান সে কখনও নিজেকেই একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া মনে করে না, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তাঁহার ধারণা, যে নিজের কতিপয় অনুচরের প্রতি তাঁহার যেমন একচ্ছত্র প্রভুত্ব তেমনই সারা জগতের বুদ্ধিসম্পদের উপরেও তাঁহার অবিসম্বাদিত অধিকার। এইখানেই একটি মোক্ষম ভুল তিনি করিয়া বসিলেন। ফলে তাঁহার স্বরূপটি আরও একবার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। চীনের নূতন চাল সহজেই মাৎ হইয়া গেল। চাতুরির দাবাখেলায় লাই আপাতক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিলেনই না। খেলা চালমাৎ হইয়া নষ্ট হইল।

চু-এন-লাই ভাবিয়াছিলেন যে, ভারত-চীন সমস্যার সমাধানকল্পে আলোচনার অছিলায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আসিবেন। এই সুযোগে সিংহল যাইয়া সেখানে পুরামাত্রায় মার্কিন বিরোধী প্রচারকার্য চালাইবেন—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোহাই পাড়িয়া আমেরিকার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করিবেন এবং সমগ্র সিংহলে পরিত্রাতার সম্মানটি লাভ করিবেন। কিন্তু চালটি ধোপে টিকিল না, আসল উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হইল। প্রচারিত উদ্দেশ্যটি উদ্দেশ্যই নহে, একটি অতি সস্তাদরের তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক চালমাত্র। ভারতের সহিত তাঁহার যদি সত্যই সখ্যতা স্থাপনের উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে তাহা বহু পূর্বেই হইতে পারিত এবং তাহার জন্য এত বিরাট ব্যাপক আয়োজনের কোন প্রয়োজনই ছিল না, এই বিরোধযজ্ঞের হোতা কে? ভারত নহে, চীন। সীমাহীন লোভ এবং বিবেকবর্জিত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত তাহার স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রনেতার দল। শান্তিকামী, বন্ধুত্বে, বিশ্বাসী, পারস্পরিক সম্প্রীতির পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত ভারতরাষ্ট্রের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা আজ বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য কে দায়ী? অকারণে, বিনাযুক্তিতে শুধু লোভ আর হিংসার দ্বারা চালিত হইয়া ভারতের সীমান্ত আক্রমণে যে ভয়াবহতার সৃষ্টি করিতে পারে,—তাহার মুখে শান্তির ললিত বাণী ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম চূর্ণের গল্পই স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতবর্ষের নরনারী এত নির্বোধ নয় যে, এই ধাপ্পাবাজিতে তাহারা ভুলিবে। আসলে লাই সাহেব শান্তির মুখোস পরিয়া সিংহলে পৌঁছাইলেন আপন অভীষ্ট সাধন করিতে। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রভুত্ববিস্তার করিতে চীন আজ সর্বস্বপণ করিয়া বসিয়াছে কিন্তু আয়ুব খাঁ ছাড়া ভণ্ডভ্রাতার মত আর কেহই পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া আসিতেছে না। পাদ্য-অর্ঘ্য তো দূরের কথা, কেহ তো পাত্তাই দিল না, এমন কি আফ্রিকা কিছুকাল পূর্বে যে অন্ধকারের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল সেখানেও শতসহস্র সাধনা করিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন চু-এন-লাই, কত শূন্যগর্ভ আশ্বাস দিলেন, কত ভাষাসর্বস্ব অভয়বাণী বর্ষণ করিলেন, কত হুঙ্কার ছাড়িলেন। হায়! আফ্রিকা ফিরিয়াও তাকাইল না। বেচারী মনের দুঃখে বনে না যাইয়া চীনেই ফিরিয়া গেলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে চু এন-লাই উদ্ভ্রান্তের মত শান্তি (?) খুঁজিয়া ফিরিতেছেন পরশপাথর খোঁজার মত, সেই চু-এন-লাই ভারতকে বিব্রত করার চেষ্টাও পূর্ণোদ্যমে এক সহযোগে চালাইয়া যাইতেছেন। সীমান্ত আক্রমণে আপন প্রস্তুতিতে বিন্দুমাত্র ছেদ টানেন নাই। শুধু তাহাই নহে, লোকটি আবার মেজাজী। মেজাজ বিগড়াইয়া গেলে তাঁহার রসনা হইতে ভারতের উদ্দেশে যে কত অম্লরসযুক্ত গালি বর্ষিত হয় সে সংবাদও আমাদের কানে আসে। আমাদের বক্তব্য যে, লাই সাহেবের স্বরূপ আজ জগতের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত নয়, তাঁহার মতলবও আজ সকলের নিকট পরিষ্কার, তাঁহার কুঅভিসন্ধিও জগতের দ্বারা নিন্দিত। তাঁহার ধোঁকাবাজিতে ভবি ভুলিবে না। তাঁহার যদি সত্যই বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা থাকে

তাহা হইলে সরাসরি ভারতের সহিতই এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করুন। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন কি? ইহাও উল্লেখ করি যে, এশিয়া ও আফ্রিকা আজ জাগ্রত। জাগরণের নব প্রভাতের উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় তাহারা শক্তিমান, অফুরন্ত সম্ভাবনা, আশা ও স্বপ্নে তাহারা ভরপুর নূতন জীবনের বৃহত্তর পটভূমিতে তাহাদের পদক্ষেপণ শুরু হইয়াছে সেক্ষেত্রে সেখানে প্রভুত্ব স্থাপনের কল্পনা একজন উন্মাদের মস্তিষ্কেও উদিত হওয়ার কথা নয়। আর চীনের মুখে অন্য রাষ্ট্রের নিন্দা একটি বহুকালের প্রবাদবাক্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রবাদটি হইল—'চালুনি বলে—সূচ, তোর গায়ে কেন ফুটা?'

ইংরাজী অভিধানেও 'লাই' বলিয়া একটি শব্দ আছে যাহার বাঙলায় অন্যাং অর্থ হইল—মিথ্যা।

অখণ্ড বঙ্গ

এক বিশেষ মহল হইতে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব উঠিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে উহার নাম হইতে পশ্চিম শব্দটি বর্জন করা হইবে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হইবে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার জন্য দুশ্চর তপস্যার, অনন্যসাধারণ আত্মাহুতির এক অপূর্ব পুরস্কার বঙ্গদেশ পাইল। দেশজোড়া স্বাধীনতার উল্লাসে সেদিন বাঙলা ও পাঞ্জাবের কান্নার ধ্বনি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আনন্দোৎসবে বিভোর ভারতবাসীর কর্ণে সেদিন এই দু'টি প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদজনিত নিদারুণ যন্ত্রণার অব্যক্তধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই। যাহাদের অক্লান্ত সাধনায়, বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বহুশত বৎসরের পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল হইতে ভারতবর্ষ মুক্তির আকাশের তলায় দাঁড়াইল উৎসবের মত্ততায় তাহাদের বেদনার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় সেদিন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ছিল না।

শুধু স্বাধীনতার ক্ষেত্রেই কেন, বাঙলা দেশ ভারতের ঘরে ঘরে যে নব-জাগরণের ধ্বনিতরঙ্গ তুলিয়া সমস্ত ভারতকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সমগ্র ভারতে যে বাঙলা জাতীয়তাবোধের এবং স্বাজাত্য চেতনার উন্মেষ ঘটাইয়াছিল যাহার কল্যাণে সারা ভারত ঝঞ্ঝামুখর রাত্রি অতিক্রম করিয়া মেঘমুক্ত আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের প্রসন্ন আশীষ লাভ করিবার শক্তি সংগ্রহ করিল—সেদিন ভারতবর্ষ তাহাকেই ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া গেল তাহার সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক নবজন্মের উৎসকে।

বঙ্গদেশ বলিতে আমাদের ধ্যাননেত্রে যে চিত্র চিরকালের দাবীতে অঙ্কিত, বঙ্গমাতার যে কল্যাণময়ী মূর্তি আমাদের স্বপ্নে চিরভাস্বর সেই চিত্র বদলাইয়া গেল, রাজনীতির বিষাক্ত ছুরিকায় আমাদের বঙ্গমাতার স্বর্ণাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। আকৃতির রূপান্তর ঘটিল। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিভাগের প্রাচীর উঠিল, উভয় উভয়ের কাছে—পররাষ্ট্র। তাহাদের বেদনা, যাতনার দিকে ভারতের মাথা ঘামাইবার সময় ছিল না।

পূর্ববঙ্গ পৃথকভাবে গঠিত হইবার পর তাহার নাম হইল পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পাক-সরকার তাহার নাম হইতে 'বঙ্গ' শব্দটি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, সেইজন্যই 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি অপরিবর্তিত রাখা দরকার কারণ 'পশ্চিম' শব্দটিই ভাবীকালের নরনারীকে 'পূর্ব'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, 'পশ্চিম' শব্দটির মধ্যে 'পূর্ব' শব্দটিও বাঁচিয়া থাকিবে। তাঁহারা আরও বলিতে পারেন যে, বঙ্গনামধারী বিভক্ত বঙ্গকেই ভবিষ্যতের মানুষ সমগ্র বঙ্গ ভাবিতে পারেন, কিন্তু আমরা এই নাম পরিবর্তনের মধ্যে এক সার্থকতার চিত্র দেখিতে পাইতেছি।

রাজনীতিই সবকিছুর শেষ কথা নয়। রাজনীতি অনেকের হইতে পারে কিন্তু রাজনীতি জীবন নয়। যেখানে জীবনে জীবনে পবিত্র প্রেমের মিলনে, প্রীতির বিনিময়ে এক অভিনব অনুভূতির জগৎ রূপ লইয়েছে, যেখানে হাসি, কান্না, ভালবাসায়, বেদনায়, জীবনে-জীবনে এক অপূর্ব সংযোগ, যেখানে উপলব্ধিতে, অনুভূতিতে, দর্শনে, মননে, ধেয়ানে, চিন্তায়, স্বপ্নে, ভাবে, ভাবনায় জীবন থেকে মহাজীবনে নিত্য উত্তরণ, সেখানে রাজনীতি কোথায়? পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে চিরকালীন ভালবাসার, মৈত্রীর ও সহানুভূতির বন্ধন বিদ্যমান রাজনীতির ফতোয়াতে কি সেই বন্ধন কদাপি ছিন্ন হইতে পারে? আবহমানকালের নাড়ীর যোগসূত্র কি রাজনৈতিক বিচারে ছিন্ন হইবার? একটি সীমারেখা টানিয়া দিলেই পৃথক করিয়া দেওয়া যায়? রাজনৈতিক দিক দিয়া বঙ্গ বিভক্ত হইলেও অন্তরের দিক দিয়া বঙ্গ মোটেই পৃথক নয় পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের আত্মিক বন্ধন ছিন্ন করার শক্তি কাহারও নাই। আমাদের পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পরের জন্য যে অপরিমাপ্য সহানুভূতি ও দরদ সঞ্চিত আছে তাহার এক বিন্দুও কখনও নিঃশেষ হইবে না। এবং যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ আমরা পৃথক নই। অজস্র রক্তপাত এই রক্তের বন্ধনকে যেন আরও দৃঢ় করিয়া দিতেছে। এই কারণে আমরা 'পূর্ব'-'পশ্চিম' মানি না। আমরা বর্তমানে বঙ্গদেশকে বঙ্গদেশ বলিয়াই জানি আমরা বঙ্গদেশকে বঙ্গদেশ বলিয়া ভবিষ্যতেও জানিব।

রাজনীতি আমাদের পৃথক করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে আজ পূর্ববঙ্গ অনুপস্থিত। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম বগুড়া, ময়মনসিংহ, যশোহর প্রভৃতি আজ আমাদের কাছে বিদেশ বলিয়া রাজনীতির ভাষায় গণ্য হইলেও আমাদের খাদ্য, ভাষা, জীবনধারায় কি কোনও পার্থক্য আসিয়াছে সেই একতার জোরেই আমরা বিশ্বাস রাখি যে বিভক্ত বঙ্গ মিলিত হইবে। মুসলিমশক্তি অক্লান্ত সাধনা করিয়া আজ পর্যন্ত উভয়বঙ্গে আত্মিক বিভেদ ঘটাইতে পারিতেছে না। পশ্চিমা মুসলিমগোষ্ঠী সহস্র কুটিলতা এবং অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও এই বিভেদ ঘটানোর কার্যে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

আবহমানকালের এই যোগসূত্র আবহমানকালই থাকিবে, বিভাগ বিচ্ছেদ দু'দিনের মাত্র। যে বিভেদের প্রাচীর অশ্রু দিয়া, শিশুর ও নারীর রক্ত দিয়া গাঁথা হইয়াছে, হাহাকারের পটভূমিতে যে প্রাচীরের ভিত্তি সে প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িবেই, ঈশ্বরের ইহাই অমোঘ বিধান।

পূর্ব-পশ্চিম এক হইয়া এক অখণ্ড গৌড় বঙ্গে পরিণত হইয়া মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক নবতর সভ্যতার জন্মদানে নতুন অখণ্ড বঙ্গের সৃষ্টি করিবে—সেই নববঙ্গ নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে সমগ্র বিশ্বের নবজাগরণের, পশ্চিমবঙ্গের নব নামকরণ যে তাহারই পূর্বাভাস নয় এ কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা চলে কি?

সাংবাদিক সম্মেলনে আইনমন্ত্রী

সম্প্রতি গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত সর্ব আসাম সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় আইন এবং ডাক ও তার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন মহাশয়ের ভাষণ বিশেষ সাধুবাদের দাবীদার। ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের সাংবাদিকতার যে তুলনামূলক চিত্রটি তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার গুরুত্ব যথেষ্ট। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ভারতের উদার নীতি এবং পাকিস্তানের অনুদার নীতি দেশ দুইটিকে যথাক্রমে লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। শ্রীসেন তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে বিশেষভাবে বলেন যে, সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করা ভারত সরকারের নীতি নয় সাংবাদিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া সত্য পরিবেশনের অকুণ্ঠ অধিকার দান তাঁহাদের নীতি। তাহার ফলে এই রাষ্ট্রে সাংবাদিকতা আজ ক্রমশই প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, কল্যাণধর্মী ভারতরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ ভরা দৈনন্দিন জীবনের বেদনামধুর আলেখ্য তুলিয়া ধরায় সাংবাদিকদের অধিকারে ভারত সরকার কদাচ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু পাকিস্তানে সাংবাদিকদের অধিকার সর্বতোভাবে ক্ষুণ্ণ, সরকারী অঙ্গুলি হেলনে সাংবাদিকদের গতিপথ নির্ধারিত হয়। নির্ভীকভাবে সত্য পরিবেশনের পথ তাঁহাদের রুদ্ধ। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের এবম্বিধ ব্যবস্থা কোনক্রমেই সমর্থনীয় নয়।

সংবাদপত্র আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিরাট অংশ জুড়িয়া আছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাহার প্রভাব অনতিক্রম্য এবং আবেদন অপরিহার্য। মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সংবাদপত্রে, জনমত গঠনে তাহার দান অপরিসীম, তাহার কণ্ঠরোধ বর্তমান যুগে কল্পনারও বাইরে।

শ্রীসেন বক্তৃতার মধ্যে সরকারী নীতি বিশ্লেষণে যে সমাজকল্যাণকামী মনের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য সাধুবাদ তাঁহার প্রাপ্য। সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ কখনই কোন দেশে কল্যাণের বার্তা বহন করিতে পারে না, এই গভীর সত্যটি তিনি হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন—যে সাংবাদিকতার প্রসার ও ব্যাপকতা দেশ ও জাতিকে নানাভাবে মঙ্গলের জগতের দিকে পরিচালিত করিতে পারে। সাংবাদিকতার দিক দিয়া উন্নত হইতে গেলে সাংবাদিকদের স্বার্থও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহাদের দ্বারাই সাংবাদিকতার উন্নতি ঘটিবে তাহার ব্যাপক প্রগতির চাবিকাঠি তাঁহাদেরই হস্তে সুতরাং তাঁহাদের কল্যাণ না ঘটিলে সাংবাদিকতার প্রগতি ব্যাহত হইবে।

এই বক্তৃতায় সাংবাদিকদের সম্বন্ধে তিনি যে গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধের পরিচয় দিলেন তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং এজন্য সাংবাদিকসমাজের বিপুল ধন্যবাদ তাঁহার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইতেছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সার্থক ব্যবস্থা

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ অকৃপণ হাতে তাহার দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। আমাদেরই আপনজন আমাদেরই জননী-ভগিনীদের চরম লাঞ্ছনার দিনে তাঁহাদের দিকে

সর্বপ্রকার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা আমাদের শুধু কর্তব্যই নয়, ধর্মও। ১৯৫০ সাল হইতে—যেদিন পূর্ব-পাকিস্তানের এই নারকীয় লীলা শুরু হইল—সেইদিন হইতেই শত শত লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, নিপীড়িত পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট আমাদের দুয়ার আমরা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এই চৌদ্দ বৎসরে অত্যাচার এতটুকু প্রশমিত হইল না, নরদানবের রক্ততৃষ্ণা মিটিল না, উদ্বাস্তু সংখ্যাও তাই স্বভাবতই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে অথচ পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান এইবার ক্রমশই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থা আজ এক জাতীয় সমস্যার রূপ লইয়াছে। ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি, আশার কথা, পুনর্বাসনকল্পে জমি দিতে স্বীকৃত হইয়া মানবিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের এই কার্য জাতীয় সমস্যা সমাধানে এক বিরাট ভূমিকা হিসাবে গণ্য হইবে।

সম্প্রতি কংগ্রেসনেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক জরুরী অধিবেশনে এই ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এ জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে ধন্যবাদ জানান।

ছিটমহল হইতে যাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন ভারতীয় নাগরিক হইলেও তাঁহাদের উদ্বাস্তু বলিয়াই গণ্য করা উচিত এই মর্মে শ্রীঘোষ যে অভিমত পোষণ করেন শ্রীসেন তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

দেশের এই চরম দুর্দিনে, দুর্যোগের এই নিদারুণ মুহূর্তে শ্রীঅতুল্য ঘোষ উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য শ্রীসেন আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন।

কংগ্রেসের এই দুই বিশিষ্ট নেতা এই জাতীয় সমস্যার দিনে যে ভাবে লাঞ্ছিত অবমানিত শোষিতদের দিকে তাঁহাদের সহযোগিতার কল্যাণহস্ত প্রসারিত করিতেছেন, উৎপীড়িতদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন ঘটাইয়া শুভপ্রদ নতুন জীবনের পথের সন্ধান দিতেছেন। দুঃখবেদনার কৃষ্ণা রজনী হইতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আনন্দঘন মঙ্গলালোকে উপনীত করিতেছেন—এ জন্য তাঁহারা বাঙালী জাতির বিশেষ কৃতজ্ঞতার অধিকারী। এই অধিবেশনটির বিশেষত্ব এই যে, কেবল বাগ্বিতণ্ডার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে—যাহার দ্বারা উদ্বাস্তুদের একটি নিদারুণ সমস্যার সমাধান ঘটিতে পারে। অন্নবস্ত্রের ন্যায় এই সমস্যাটিও যে কি নিদারুণ সে বিষয়টি সকলেই উপলব্ধি করিবেন এই সমস্যার সার্থক সমাধান যথেষ্ট শ্রম, অধ্যবসায় ও শক্তি সাপেক্ষ। আমাদের বিশ্বাস এই দুই বলিষ্ঠ জননায়কের নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় সমস্যা দূরীভূত হইয়া সর্বহারাদের জীবনে নতুন প্রভাত, অফুরন্ত আশা, আলো ও আনন্দের বারতা বহন করিয়া আবির্ভূত হইবে। আমরা পুনরায় এই বিরাট সমস্যা সমাধানের কার্যে অগ্রণী হওয়ার শ্রীঘোষ ও শ্রীসেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং প্রার্থনা করি তাঁহাদের এই মঙ্গল কর্ম সর্বতোভাবে সফলতায় বিভূষিত হইয়া বাঙালীর গৌরব ও আনন্দ বর্ধন করুক।

॥ শোক-সংবাদ ॥

কানাইলাল ঘোষাল

সুবিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক এবং রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওর কর্ণধার কানাইলাল ঘোষাল গত ৪ঠা ফাল্গুন ৫৩ বছর বয়সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গতায়ু হয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রযোজিত চিত্র 'বন্দী' ১৯৪২ সালে দর্শকসমাজে এক অভাবনীয় আলোড়ন জাগায়। ১৯৪৫ সালে রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওটি ঘোষাল ভ্রাতৃবর্গ অবাঙালীর হাত থেকে ক্রয় করে বাঙালীর বাণিজ্যিক গৌরব বহুগুণ বর্ধিত করেন। চিত্রাভিনেতা মোহন ঘোষাল ও চিত্রবিদ মাধব ঘোষাল তাঁর দুই অনুজ।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সুলেখক ও সাংবাদিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য গত ১৬ই ফাল্গুন ৫৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ফরওয়ার্ড পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার সূচনা। আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং আরও একাধিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ইনি সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। অগ্রণী পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনাও করেন। তথাপি, ছিন্নমূল প্রভৃতি কয়েকটি ছায়াচিত্র তাঁর রচিত কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত হয়। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেন। অনুবাদক হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন।

● বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ●

[আগামী সংখ্যা হইতে অর্থাৎ ১৩৭১ সালের বৈশাখের পত্রিকা হইতে 'মাসিক বসুমতী'র সূচীপত্রে এবং অঙ্গসজ্জায় পুনরায় এক অভিনব রূপান্তর লক্ষ্য করা যাইবে। বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও তথ্যসম্বল সুপাঠ্য রচনা ব্যতীত সুলিখিত কয়েকটি ধারাবাহিক উপন্যাস 'মাসিক বসুমতী'র পাঠমূল্য বৃদ্ধি করিবে। প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রসম্ভার হইবে আমাদের পত্রিকার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। তৎসহ মনোরম ও বিচিত্র আলোকচিত্রের সমন্বয়। মাসিক বসুমতীর সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত নিয়মিত বিভাগসমূহের কিছু কিছু রদবদল করা হইলেও পাঠক-পাঠিকার চিত্তবিনোদনের জন্য আরও কয়েকটি অধুনা অপ্রকাশিত বিভাগের প্রবর্তন হইতেছে। বিগত দুই যুগে বাঙলা দেশে সংখ্যাতীত পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব এবং তিরোভাব সত্ত্বেও মাসিক বসুমতী আপন বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব যথাপূর্ব রক্ষা করিয়াছে। আমরা আশা করি, আঙ্গিক এবং বৈষয়িক পরিবর্তনের দ্বারা 'মাসিক বসুমতী' বাঙলা দেশের অগণিত পাঠক-পাঠিকাবর্গকে আনন্দ, জ্ঞান ও তৃপ্তিদানে সমর্থ হইবে। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহিকা, সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা বিক্রয়ের এজেন্টগণ ও আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও আশীর্বাদ আমরা প্রার্থনা করি। **আমাদের সহৃদয় পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাবৃন্দকে আগামী নূতন বৎসরের গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে অনুরোধ জানানো হইতেছে। কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।**]

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[illegible]মতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রী[illegible] মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পত্রিকা-সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই, অদূরভবিষ্যতে তার সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছি না, তবে আপনার প্রায় প্রতিটি গ্রন্থ এবং আপনার সম্পাদন প্রতিভার সঙ্গে আমার গভীর পরিচয়। মাসিক বসুমতী আজ ভারতের সাময়িকপত্র সমাজে যে অননুকরণীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, সকলেই জানে তার মূলে আছে আপনার অসামান্য অবদান। মাসিক বসুমতী বহুকাল যাবং বাঙলার পাঠক সাধারণের পিপাসুমন ভরিয়ে আসছে—তবে আপনার হাতে তার যে ব্যাপক রূপান্তর ঘটল তা তুলনাবিরল।

মাসিক বসুমতীতে সম্পূর্ণ উপন্যাস গত কয়েক সংখ্যায় দেখতে পাচ্ছি—অনুরোধ করি প্রতি মাসেই ভবিষ্যতে একটি করে বড় লেখা দিতে। কৃতী ও খ্যাতিমান একাধিক লেখকের জীবনের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তাঁদের আবিষ্কারের গৌরব আপনার। আমাদের আশাই বলুন আর অনুরোধই বলুন—এইভাবে আরও অসংখ্য শক্তিমান আপনার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে বাঙলা সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারকে আরও মূল্যবান করে তুলুন। মাসিক বসুমতীতে আপনার সম্পাদনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য যা আমাদের চোখে পড়ে—তা হচ্ছে, পাঠকের রুচির আপনি উৎকর্ষ সাধন করেছেন, সাধারণ পাঠকের মধ্যে আপনার দ্বারা যে এক বিপুল সাহিত্য সচেতনতা এসেছে তা বিস্ময়কর সেইখানেই আপনার শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মাসিক বসুমতী উত্তরোত্তর আরও সুন্দর হোক, উজ্জ্বল হোক, চিত্তাকর্ষক হোক—নিয়তই এই কামনা করি। দেশবন্ধু সেনগুপ্ত, বারাণসী।

সবিনয় নিবেদন,

মাসিক বসুমতী যখন মাসে মাসে হাতে এসে পৌঁছয় তখনই মনে হয় যে আমরা বাঙলা দেশ থেকে দূরে নই বাঙলা দেশেই আছি। এ প্রবাসে মাসিক বসুমতীই দেশের সঙ্গে যেন এক বিরাট যোগসূত্র। প্রবাসবাসের ব্যথা বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাময়িকী মাসিক বসুমতীই ভুলিয়ে দেয়।

প্রচ্ছদ কিছুকাল দেখছি শিল্পীদের দিয়ে অলঙ্কৃত করে নেওয়া হচ্ছে। ভাল লাগছে এই নতুনত্বকে। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এক সংখ্যায় পাঠক সাধারণকে যথেষ্ট আনন্দ দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এক-এক সংখ্যায় এক-একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের বা শ্রেষ্ঠ লেখিকার একটি করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নিয়মিত প্রকাশ করলে আমরা যথেষ্ট আনন্দলাভ করব।

গল্প-উপন্যাস ছাড়াও আপনি অন্যান্য রচনাদির প্রতি যে সতর্ক দৃষ্টি দেন, তার ফলে সাধারণ পাঠক যে কত দিক দিয়ে উপকৃত হয় তার তুলনা পাওয়া ভার। কত জ্ঞানগর্ভ, চিত্তাকর্ষক, তথ্যসমৃদ্ধ লেখা সাধারণ মানুষের কত অজ্ঞতা দূর করে তা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বাঙলা দেশে শিক্ষণীয় রচনা মাসিক বসুমতীর মত অন্য কোন পত্রিকায় সে রকম চোখে পড়ে না। প্রতিটি লেখা প্রকাশে আপনি যে যত্ন নেন তার ছাপও বসুমতীর পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

মাসিক বসুমতীর প্রত্যেকটি বিভাগ আকর্ষণীয়। প্রতিটি বিভাগ বিশেষভাবে পঠনীয়। বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্র্যে এবং কৃতিত্বের স্পর্শে ভরপুর।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মাসিক বসুমতী সকল বিষয়ক রচনায় সুসমৃদ্ধ। সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অনুরাগিবৃন্দ প্রত্যেকেই মাসিক বসুমতীর ভিতর আপন আপন ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাবেন। সর্বশ্রেণীর পাঠকসাধারণকে সমানভাবে ভরিয়ে তোলা একজন সম্পাদকের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। বলা বাহুল্য, আপনার সম্পাদনায় সেই অভিনন্দনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর সগৌরবে জাজ্বল্যমান। ইতি—পত্রলেখা মুখোপাধ্যায়, নয়াদিল্লী।

চারজন

সবিনয় নিবেদন, মাসিক বসুমতীর বর্তমান বৎসরের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ অরুণকুমার নন্দীর জীবনীতে লেখা হইয়াছে যে, পার্ক সার্কাস শিশু বিদ্যাপীঠের উন্নয়নকল্পে তিনি ৬০,০০০৲ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার উন্নতির জন্য তিনি ৫০,০০০৲ দান করেন। কিন্তু, ইহাতে অঙ্কের ভুল আছে। উহা যথাক্রমে ৫০,০০০৲ ও ৬২,০০০৲ হইবে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেরও অন্যতম সদস্য। আপনার এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ইহা আপনাকে জানাইলাম। ইতি—১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭০, বিনীত—রাধামাধব ঘোষ, কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রী ডি ভট্টাচার্য, বি-এস সি, এ এম ই, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার: অবধায়ক—শ্রী এস সি দত্তর বাংলো, বর্ধমান কম্পাউণ্ড, কটক-৩, উড়িষ্যা * * * সচিব বালক বিবেকানন্দ পাঠাগার, ডাক-মইবং, এন সি হিলস, আসাম * * * শ্রী পি কে মিত্র, ইন্সপেক্টর সেণ্ট্রাল এক্সাইজ, লাউরিয়া সুগার মিল, ডাক-লাউরিয়া, জেলা-চম্পারন, বিহার * * * শ্রী এস সি বণিক, জি নং ৬৬৫১৮ 128, Construction Coy.

(G. R. E. F.) 56 A. P. O. * * * গ্রন্থাগারিক, মন্দার বাড়ি বিবেকানন্দ গ্রাম্য গ্রন্থাগার, গ্রাম ও ডাক—মন্দার বাড়ি, জেলা—বাঁকুড়া * * * শ্রীমতী কণা ভট্টাচার্য, অবধায়ক—এস সি ভট্টাচার্য, এ এস আই অব স্কুলস লক্ষ্মীসহর, ডাক—লক্ষ্মীসহর (হাইলাকান্দী) জেলা—কাছাড় * * * শ্রীমতী পারুল মজুমদার, অবধায়ক—ডাঃ এস সি মজুমদার, মতিধর টি, এস্টেট, ডাক—কমলা বাগান, জেলা—দার্জিলিঙ * * * শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্ত, অবধায়ক—অজিতকিশোর দাশগুপ্ত, নেপিয়ার টাউন, হাউস নং ১১৬১ ডাক—জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ * * * শ্রীমতী আর বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধায়ক—শ্রী এন সি বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার ডাক ও জেলা—সহিসা, বিহার (এন. ই, রেলওয়ে) * * * প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র বেসিক স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ডাক—নরেন্দ্রপুর, জেলা—২৪ পরগণা * * * অধ্যক্ষ, গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টার, নং I—II, গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডাক—চুঁচুড়া, জেলা—হুগলী * * * শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, আমবুকা ডাক—উখড়া, জেলা—বর্ধমান * * * শ্রীমতী উমা বর্মণ, অবধায়ক—পি, কে, বর্মণ, নিউ কলোনী, ডাক—পরাসিয়া, জেলা—ছিন্দওয়া, এম, পি, * * * শ্রীফণিভূষণ দত্তচৌধুরী, ডাক—রামকৃষ্ণ স্যানাটোরিয়াম, রাঁচী, বিহার।

I am sending herewith Rs. 15·00 being the yearly subscription of the Monthly Basumati, please send the magazine regularly. Secretary Jubiland Club. Dulaguri T. E. P. O. Letakujan, Dt. Sibsagar, Assam.

আমার মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫·০০ টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডাক্তার মনতোষ মুখোপাধ্যায়, গ্রাম—পাহাড়পুর, ডাকঘর—সুড়ে কালনা, জেলা—বর্ধমান।

Sending herewith Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please acknowledge receipt and send the magazine regularly. Mr. D. K. Bhattacharjee, Ahmedabad-14.

An annual subscription of Rs. 15/- is sent herewith for the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. Hony Secretary. Deulbera Colliery Institute. P. O. Deulbera Colliery. Dt. Dhenkanal, Orissa.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। প্রতিমাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী ইরা দেবী, অবধায়ক—কে, এন, মুখোপাধ্যায়, ভুষাউন।

Sending herewith Rs. 20/- towards the subscription of the Monthly Basumati. Please acknowledge receipt P, G, Dey. A. S. M. P. O. Nawrazabad. Dt. Sahadol.

I am sending Rs. 15/- as a subscription for 'Basumati' for the year 1964. Please acknowledge the receipt Librarian. Lady Shri Ram College for Women. New-Delhi-14.

দুইজন বন্ধুকে মাসিক বসুমতী উপহার দিবার উদ্দেশ্য ৩০৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এন্ এম্ বর্মণ, এ-সি-এস কুয়ারিটনা, নোয়াগাঁও।

Remitting Rs. 22·85 Naya-paisa being the renewal subscription of the Monthly Basumati for the next year by registered post. Please send the magazine every month. Jyoti Ranjan Sen, Hakimpara Siliguri, Darjeeling.

Herewith Rs. 15/- for one year's subscription from Agrahayan 1370 B. S. to Kartic 1371 B. S. Please send the magazine regularly. The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Calcutta.

I am sending herewith Rs. 15/- only being my annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the Monthly Basumati every month. Mrs. Uma Barman, C/o. P. K. Barman, New-Colony, P. O. Parasia, Dt. Chhindwara, M. P.

Sending herewith Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please acknowledge the receipt. The Headmistress, Govt. Girls' H. School. Krishnanagar, Nadia.

Herewith remitting Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine every month. Principal Gram Savak Training Centre, Chinsurah, No I & II, Chinsurah, Hooghly.

১৫৲ পাঠাইলাম। মাঘ মাস হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীঝরণা দাসগুপ্তা, জয়পুর-পাড়া টি, ই, বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি।

Sending Rs. 15/- in full settlement of your subscription bill. No 2179. Please acknowledge. The Information Officer, State Information Centre, Govt. of Orissa, New Capital, Bhubaneswar, Orissa.

I am sending Rs. 21/- being the annual subscription to the Monthly Basumati. Please send the magazine to Sri Rabindra Bhowmick, Kangsanagar, Comilla, E. Pak. regularly.—Librarian, Sub-Divisional Govt. Public Library, Tripura,

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৪১। শোক-সংবাদ—		
(ক) সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	... ...	১০৫৪
(খ) ক্যাপ্টেন কিরণ সেন	... ...	ঐ
(গ) কনকলতা মিত্র	... .	ঐ

• স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত •

৪২শ বর্ষ — দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র ১৩৭০ — ষষ্ঠ সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো স্ত্রীলোক তা হতে পারবে না কেন ? তাই বলছিলুম মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়েমানুষ জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।

স্ত্রীশিক্ষার জন্ম যাঁরা প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে ? এখন ধর্মকে Centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা Secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন, ব্রহ্মচর্যব্রতোদযাপন—এই জন্য শিক্ষার দরকার। বর্তমান কালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই Secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে।

একটি কেন্দ্র-বিদ্যালয় করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরীবের বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাক। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।

জীবন সংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয় নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে—আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে। সকল দেশেই ঐরূপ হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পাচ্ছে ও তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

তাই ত' বলি, তোরা এই mass এর (সাধারণ শ্রেণীর) ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বল গে—'তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না।' তোদের এই Sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ ; রমণী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা চরিত্রেই আশ্রিত ; আর সমগ্র আর্যাবর্ত ভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখনকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধা হইতে শুদ্ধাতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবনযাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্য বিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শপত্নী সীতা, সেই নরলোকের এমন কি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শীভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে
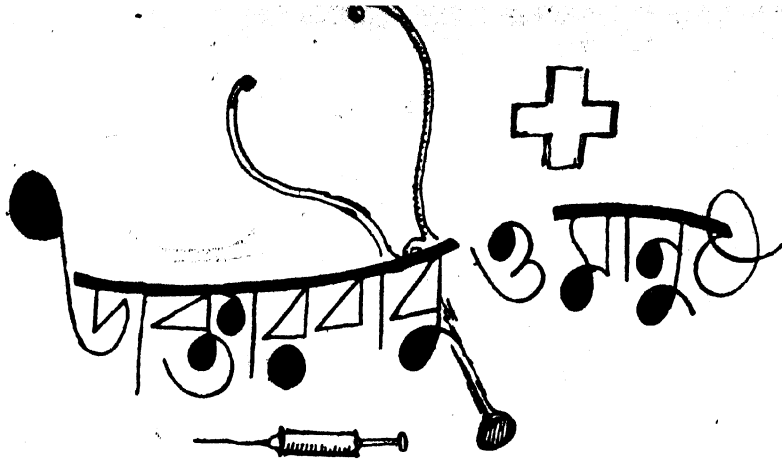
মনে পড়ে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের উক্তি। সেদিন স্পষ্ট বললেন : বুঝলেন মশাই, ডাক্তার মানেই হচ্ছে এক একটি জ্যান্ত শয়তান। দয়া নেই মায়া নেই, বুদ্ধি-বিবেচনা বলে যা আছে তা শুধু নিজের পকেট ভরাবার জন্যে। রোগী পেলেই হলো, সাধারণ যে কোনো একটা ব্যাধিকে ওষধপত্র দিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে তারপর কিছুকালের জন্যে একটা নিয়মিত রোজগারের ফিকির করে নেবে। নিজের যদি ফার্মাসী থাকে ত' পোয়াবারো, মোট বিশ নয়া পয়সার মালকেই মিক্সচার বলে দেড় টাকা আদায় করে নেবে।

বাধা দিয়ে বলেছিলাম : কি বলছেন এ সব!

—ঠিকই বলছি মশাই, অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেই বলছি। একই জাতের লোক, যাদের লাইসেন্স আছে তাদের ডাক্তার বলে, আর যাদের লাইসেন্স নেই তাদের আমরা ডাকাত বলি।

এ কথার পরে হো হো করে হেসে উঠেছিলাম আমি।

কিন্তু আমার হাসির বহর দেখেও ভদ্রলোক কিছুমাত্র দমলেন না। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে দেখলে আমরা যেমন নিশ্চয় করে বলে থাকি যে বৃষ্টি পড়ছে ; কিংবা একশ দশ ডিগ্রি তাপ উঠলে বলে থাকি যে গরম পড়ছে, উনিও তেমনি নিশ্চয়তার সঙ্গেই বললেন : আমি বাজী রেখে বলতে পারি, রোগী পেলেই ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনে মনে একটা রোজগারের তাক করে ফেলে। একজন রিক্সাওয়ালা যখন কোনো রোগের জন্যে ডাক্তারের কাছে যায়, তার কাছ থেকে যদি ১০৲ টাকা খসাবার তাক করে তা' হলে নিশ্চয়ই জানবেন যে ঠিক সেই রোগের জন্যেই কোনো কেরাণী গেলে ডাক্তারা সঙ্গে সঙ্গে ২৫৲ টাকা তাক করে ফেলে। আর যদি গাড়ি হাঁকিয়ে কেউ ঠিক সেই রোগ নিয়েই যায় ডাক্তারের কাছে তা হলে তো নির্ঘাৎ ২০০৲ টাকা খসাবে।

ভদ্রলোকের কথাটার মধ্যে যেটুকু ফাঁক পেলাম তার মধ্যে দিয়েই নাক গলাবার চেষ্টা করলাম। বললাম : তা' হলে তো বুঝতে হবে ডাক্তারবাবুদের দয়া-মায়া বেশ পুরোমাত্রায়ই আছে, গরীব মানুষও যাতে রোগ সারাতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখেন তাঁরা। কারণ রিক্সাওয়ালার ঘাড় ভেঙে ২০০৲ টাকা আদায় করবার তাক করলে তো বেচারা সিকি পরিমাণ রোগ সারাবার আগেই মরে ভূত হয়ে যাবে।

—রিক্সাওয়ালার ওপর ২০০৲ টাকা তাক করবে কেন মশাই। তা' হলে তো সে এমনিতেই ভেঙে পড়বে। সে যে ১০৲ টাকার বেশি দিতে পারবে না তা জানা বলেই তাকটা কিছু কম করে করতে হয় হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সমস্ত বিরক্তি চেপে রেখেও। তা' না হলে কোনো ডাক্তারই গরীব রোগী চায় না জানবেন।

এই শেষোক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে নিশ্চয়ই আর কোনো মানুষেরই অপর লোকের উপদেশের প্রয়োজন হবার কথা নয়। কাজেই বললাম : গরীব লোকদের কেই বা কাছে চায় দাদা, স্ত্রী-পুত্র কন্যা, ভাই-ভগ্নী থেকে আরম্ভ করে মা-বাপ, পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অফিসের মালিক মায় ভগবান পর্যন্ত গরীবদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চান। শুধু শুধু ডাক্তারবাবুদের দোষ দিয়ে লাভ কি এ জন্যে? আপনার চাইতেও আপনার যে বন্ধু গরীব আপনি কি চান যে ঘন ঘন সে আপনার কাছে আসুক?

আমার বক্তব্যের জোরের জন্যে হোক বা আমাকে নিতান্ত নির্বোধ মনে করেই হোক ভদ্রলোক এবার খানিকটা যেন দমে গেলেন মনে হলো। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—যা হোক এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আর বেশি কথা আমি বলতে চাই না। মোট কথা জানবেন যে ডাক্তাররা খুবই সাংঘাতিক চীজ। আমার কথার পুরো মানে বুঝতে হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, যে পর্যন্ত না কোন ডাক্তারের পাল্লায় পড়েন।

আর একটি অভিজ্ঞতা।

পথ চলতে চলতে সেদিন দেখা এক পুরণো বন্ধুর সঙ্গে। দু'চার কথার পরে শুনলাম তার ছেলেটি অসুস্থ। মেনিনজাইটিস হয়েছে। মেনিনজাইটিস আসলে কি জাতীয় ব্যারাম সে সম্বন্ধে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা সেদিনও ছিলো না বা এখনো নেই। তবে শুনেছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি। তাই একটু সহানুভূতি প্রকাশ করেই বললাম : মেনিনজাইটিস? তবে তো বড়ো চিন্তার কথা।

বন্ধু একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন : চিন্তার কথা মানে? ডাক্তারবাবু দেখছেন তো?

—হ্যাঁ, তা তো দেখছেনই, তবে রোগটা তো খুব ভালো নয়।

—রোগ আবার কোনটা ভালো হে? মাথাধরাটাই কি খুব ভালো রোগ মনে করো নাকি? নাকি কনস্টিপেশনটা খুব বাঞ্ছনীয় ব্যাধি বলে তুমি মনে করো? রোগ কোনোটাই ভালো নয়, সব রোগই খারাপ। তা সে রোগ যখন হয়েই পড়েছে ছেলেটার, তখন ডাক্তারবাবুকেও এনেছি সঙ্গে সঙ্গে। তিনি দেখছেন। ওপরে ভগবান আর নীচে প্রায় ভগবানেরই মতো ডাক্তারবাবুরা এঁদের ওপর নির্ভর না করে কি আর আমরা চলতে পারি? এর মধ্যে আর মিথ্যে দুশ্চিন্তার অবকাশ কোথায়? তবে হ্যাঁ বলতে পারো ভুলচুকের কথা। চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা। তা সে যদি হয়েই পড়ে তা'হলেই বা করবার কি আছে বলতে পারো? আমি তো একটা ব্যাঙ্কের লেজার কীপার। সারাদিন অফিসে কাজের মধ্যে হলো লেজারের পাতায় পার্টির নামটা বের করে জমার স্লিপের টাকাটা যোগ দেওয়া আর না হয় চেক থাকলে তার সংখ্যাটা বিয়োগ করা। এ কাজ করতে তো ক্লাশ থ্রি-ফোরের চাইতে আর বেশি বিদ্যার প্রয়োজন হবার কথা নয়। কিন্তু ঠিক সেই কাজটা করতে গিয়েও তো প্রতিদিনই একবার কি দু'বার ভুল করে বসি। এমন কি এর বাড়েরটা তার হিসেবেও চাপিয়েই দিই।

বি-কম পাশ করবার পরে দশ বছর লেজার কীপারী করবার পরেও যখন এতো বিশ্রী রকমের ভুল আমার নিজের প্রতিদিন হচ্ছে বা হতে পারে—এবং সেজন্যে কর্তৃপক্ষ আমাকে বরখাস্ত করেন না তখন একজন ডাক্তারবাবুর কোনো ভুল যদি হয়েই যায়, সেজন্যে খুব অসম্ভব কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে বলে মনে করবার কি কারণ থাকতে পারে। একজন ডাক্তারবাবুর ভুল হলে অনেক সময় মানুষ মারা যায় তা ঠিক, কিন্তু একজন রাজমিস্ত্রীর ভুল হলে কি বাড়ি' চাপা পড়ে মানুষ মরতে পারে না? একজন ড্রাইভারের ভুল হলে কি পথচারী মারা পড়তে পারে না? আসল কথা কি জানো—সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরীব দেশের মানুষেরা, আমরা অনেক সময়ই বেশ কঠিন কিছু হয়ে পড়লেও ডাক্তারবাবুদের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করি না। আমাদের যারা পোষ্য তাদের জন্যে যে অবস্থায় আমরা ডাক্তার দেখাই, নিজেদের জন্যে তার চতুর্গুণ কিছু হলেও ডাক্তার দেখাই না। আসল কথা একেবারে শয্যাশায়ী না হলে ডাক্তারবাবুদের সাহায্য নিই না। এর ফলে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় রোগটা তখন বেশ জটিল হয়ে গেছে। রোগের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে রোগীর নিজের শক্তি গেছে অনেক কমে। ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে প্রথমেই আমরা কাতরভাবে বলি: খুবই কাহিল বোধ করছি ডাক্তারবাবু।

শতকরা একশ'জন ডাক্তারবাবুই এ সমস্ত সময়ে সাধারণত মনে মনে বলে থাকেন: সে তো বুঝতেই পারছি, একটু আগে এলেই পারতেন, কেউ তো আর পথ আটকে ছিলো না। কিন্তু মুখে তিনি বলে থাকেন: কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে, সেরে উঠবেন।

ব্যস, ডাক্তারবাবুর ঐ একটি কথাই আমরা ধরে বসে থাকি। ডাক্তারবাবু বলেছেন সেরে উঠবো এবং তারপরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগী যখন বাস্তবিকই সেরে ওঠে না, তখন আমরা তাঁর দোষ দিই। বলি, ভদ্রলোক বলেছিলেন সেরে যাবে, কিন্তু সেরে গেলো না। যত সব বাজে।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সারিয়ে তুলবার আশা দেওয়াটা প্রত্যেক ডাক্তারবাবুরই প্রাথমিক কর্তব্য। তাঁর কথায় রোগী এবং তার বাড়ির লোক মনে বল পায়। সাফল্যের সঙ্গে যে কোন চিকিৎসা করবার জন্যে রোগী এবং তার বাড়ির লোকের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। কাজেই আশা আছে জানলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু আশা নেই জানলে নিছক কর্তব্য, মানবতার খাতির বা লোকনিন্দার ভয়ে আমরা কে কতদূর পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি?

ডাক্তারবাবুদের সম্বন্ধে যে দু' রকমের মত আমরা পেলাম, অর্থাৎ একেবারেই অনির্ভরযোগ্য অসৎ ইত্যাদি এবং তারপরে দ্বিতীয়টি, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এই দু' রকমের অভিমতই ডাক্তারবাবুদের সম্বন্ধে পোষণ করা হয়, তফাৎ শুধু ডিগ্রির।

প্রথম মতটির সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছুই নেই। কারণ ওর মধ্যে যুক্তির নামগন্ধও নেই। হয় ভদ্রলোক নিজের দোষে যথাসময়ে ডাক্তারবাবুর কাছে না যাওয়ার ফলে আশানুরূপ ফল পান নি আর না হয় দুর্ভাগ্যবশত প্রকৃতই কোনো অসৎ ডাক্তারের পাল্লায় পড়েছিলেন। তবে এই মতটিতে একটি কথা ভুল আছে। কোন বুদ্ধিমান ডাক্তারবাবুই ইচ্ছে করে রোগীকে ভোগান না। সভ্যতা বা মানবতার কথা বাদ দিয়েও সেটা তাঁর ব্যবসায়ের পক্ষেও মারাত্মক ক্ষতির সূচনা করে। কারণ, কোনো ডাক্তার ইচ্ছে করে রোগীকে ভোগান, এটা জানলে তাঁর কাছে কি আর রোগী যাবে? এই সাধারণ জিনিষটা বুঝবার মতো বুদ্ধি যে কোনো ডাক্তারবাবুরই থাকবার কথা।

আমরা যে দ্বিতীয় মতটি পেয়েছি তার মধ্যে একটা জিনিষ দেখা যায় যা আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও আসলে খারাপ। কোনো ডাক্তারবাবুই 'প্রায় ভগবানেরই মতো' নন। অন্তত কোনো ডাক্তারবাবুই কখনো নিজেকে সে-রকম কিছু মনে করেন না। বরং এই কথাই সত্য যে, সব ডাক্তারবাবুই আমার বা আপনারই মতো মানুষ, নিছক মানুষ।

শয়তান বা ভগবানের মতো কিছু একটা মনে না করে যদি মানুষ হিসেবে বিচার করা যায়, তবেই একজন ডাক্তারবাবুকে বুঝবার পক্ষে আমাদের সুবিধে হবে। আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু পেশা থাকে, জীবনযাত্রা সরল এবং সহজ করবার জন্যেই পেশার আশ্রয় নিতে হয়। ডাক্তারীকেও পেশা হিসেবে লোকে ঠিক একই কারণে নিয়ে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার ব্যাপারে প্রত্যেক ডাক্তারবাবুকেই কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে, ব্যক্তিগত জীবন বলতে আমরা যা বুঝি তার বারো আনা বাদ দিয়েই একজন ডাক্তারবাবুকে প্রাত্যহিক জীবন শুরু করতে হয়।

মনে করুন, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ডাক্তারবাবু তাঁর ছোট শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। এমন সময় ছুটতে ছুটতে কেউ এলো—ডাক্তারবাবু শীগ্‌গির আসুন, অমুক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

সবাই স্বীকার করবেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ অবস্থায় ডাক্তারবাবু শিশুটিকে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি আসবেন অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে। ভাবুন তো একবার : একটি ছোট নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গ ছাড়তে আমরা বাধ্য করলাম তাঁকে, যার মূল্য পৃথিবীর সমস্ত টাকার চাইতেও বেশি—তার থেকে আমরা বঞ্চিত করলাম তাঁকে। তা' ছাড়া ঘুম বা খাওয়ার সময়ে বাধা তো যে কোনো ডাক্তারবাবুকেই মাঝে মাঝেই পেতে হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কদাচিৎ আলোচনা করে থাকি, কারণ সেইটেই স্বাভাবিক ব্যবহার বা আমরা সাধারণত ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে পেয়ে থাকি।

কিন্তু কখনো যদি চাওয়া মাত্র আমরা কোনো ডাক্তারবাবুর সাহায্য না পাই তবে সেটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সে একটা রীতিমতো news, সে সময়ে আমরা একবারও বুঝতে চাই না যে, একজন ডাক্তারবাবুও একজন মানুষ—ব্যক্তিগত জীবনের নানা চাপ তাঁকেও সহ্য করতে হয়।

—নার্স মিত্র

অবিবাহিতা যাঁরা

পৃথিবীর সহজতম কাজগুলির অন্যতম হলো অপরের সমস্যার সমাধান করে দেওয়া। কথাটা নেহাৎ ঠাট্টা করেই বলছি না। বাস্তবিক একজনের পক্ষে অপরের সমস্যার সমাধান করে দেওয়া না হোক অন্তত সমাধানের পথ বাতলানো যতোটা সহজ, তার নিজের সমস্যার সমাধান করা বা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা ঠিক ততখানিই কঠিন। কারণটা খুবই সহজবোধ্য। অপরের সমস্যাগুলি বেশ কিছুটা 'অবজেকটিভলি' দেখা যায়—কিন্তু নিজের সমস্যাটি দেখা যায় না।

প্রসঙ্গত মেয়েদের কথা বলতে চাই। অবিবাহিতা মেয়ে যাঁরা। অবিবাহিতা মেয়ে যাঁরা অল্পবিস্তর লেখাপড়া করেছেন, যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি আছে এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতের সংখ্যাও অনেক—তাঁদের যে পর্যন্ত বয়সটা খুব বেশি না হয়ে পড়ে, এই তিরিশ কি বত্রিশ, সে পর্যন্ত আগামী দিনের সমস্যাটা ঠিক তাঁদের কাছে ধরা পড়ে না—তাঁরা সঠিক বুঝে উঠতে পারেন না কি দিন আসছে।

অবশ্য কথাটা সকলের পক্ষেই ঠিক একভাবে প্রযোজ্য নয়। এ রকম অনেক অবিবাহিতা মহিলা আছেন যাঁরা চল্লিশ কি তারো বেশি বয়সেও নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যেও হতাশাবোধ করেন নি। এঁরা হচ্ছেন একটা ভিন্ন টাইপ। বরং বিয়ে হলেই এঁরা জীবনে অনেক অসুবিধেয় পড়তেন।

আমাদের দেশে অবিবাহিতা মেয়েদের সমস্যা হয় তো এখনো ঠিক সমস্যার আকার ধারণ করে নি। এ সমস্যার সূচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই দেখা দিয়েছে এবং দিনের পর দিন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার যে ভাবে প্রসার ঘটছে এবং অন্য দিকে পুরুষের মধ্যে কর্মসংস্থান করা যেরকম দুরূহ হয়ে উঠছে তাতে এটা যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ একটা সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করবে এ কথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে।

আমরা এ সমস্যার কোনো সহজ সরল সমাধান আবিষ্কার করি নি এবং আজকের আণবিক যুগেও যে সমস্ত পুরনো সমস্যার কোনোই সমাধান দেখা যাচ্ছে না, অবিবাহিতা মেয়েদের সমস্যা তাদের অন্যতম।

ইয়োরোপের কতকগুলি দেশ এবং আমেরিকা, সেখানে অবিবাহিতা মেয়েদের সমস্যা বিগত তিন কি চার যুগ ধরে মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে রয়েছে, সেখানেও এ সমস্যার কোনোই সমাধান হয় নি। তবে হ্যাঁ, মনোবিজ্ঞানীরা একটু এগিয়ে এসেছেন—ব্যাধি তাঁরা নিরোধ করতে না পারুন অন্তত ব্যাধিটা হয়ে পড়লে তা সারাবার অনেক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে কিছু না কিছু মানসিক রোগ প্রায় শতকরা নব্বই জনের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। এ ব্যাপারটা যে কতো সাংঘাতিক তা আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না—কারণ আমার কি আপনার গোটা পাড়ায় তিরিশ কি পঁয়ত্রিশের ওপর বয়স এ রকম অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই একটি কি দু'টির বেশি নেই। কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপের অনেক দেশে, বিশেষ করে সহরাঞ্চলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বড় বড় সহরে দেখা যায় শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে অবিবাহিতাদের সংখ্যা কোথাও শতকরা তিরিশ জনের কম নয়—কোনো কোনো জায়গায় এ সংখ্যা ষাট-এ পৌঁছোয়। অর্থাৎ কি না শতকরা ত্রিশ থেকে ষাট জন শিক্ষিতা মেয়ে অবিবাহিতা রয়েছেন।

রূপকথার গল্প যেদিন থেকে তৈরি হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যতো কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং মনোবিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে তাঁদের বেশিরভাগই একটা বিষয়ে এক মত দেখা যায়। সে হলো মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে।

আমরা সকলেই জানি হাজারে—হাজার নয় লাখে দু'এক জন বাদে আর সব নারীরই অন্তরের সবচাইতে তীব্র এবং গভীরতম বাসনা হলো তার নিজস্ব ঘর-সংসার, স্বামী এবং সন্তানের জন্যে। এ কথাটা পৃথিবীর নগণ্যতম গ্রামের সবচাইতে অর্বাচীন নারীর পক্ষে যেমন সত্য, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকার পক্ষেও ঠিক তাই। এই যখন প্রকৃতির অনুশাসন তখন কোনো সমাজে

শিক্ষিত নারীসমাজের মধ্যে শতকরা ত্রিশ, চল্লিশ কি পঞ্চাশজন যদি তাঁদের ত্রিশ কি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্তও অবিবাহিতা থেকে থাকেন, তা হলে ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই আর খেয়াল মনে করা চলতে পারে না। প্রকৃতই এটা তাদের খেয়াল নয়। সম্ভব হলে তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই বিয়ে করতেন——এমনকি পঞ্চাশের কোঠায় পা দেবার পরেও করতেন—যেমন অনেকেই করে থাকেন।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে যথা সময়ে না হোক, বয়সটা ত্রিশ, চল্লিশ কি পঞ্চাশ হয়ে গেলো তবু যে বিয়ে অনেক নারীই করেন না দেখা যায় তার একমাত্র কারণই হলো বিয়ে করা সম্ভবপর হয় নি। অর্থাৎ পাত্র জোটে নি।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্তও দেখা যায় মেয়েদের তো বটেই এমন কি ছেলেদেরও বিয়ে ঘটানোর জন্তে ছেলে বা মেয়ে ছাড়া অন্য সবাই এগিয়ে আসেন। অভিভাবক স্থানীয়রা এটা এখন পর্যন্ত তাঁদের অন্যতম সাংসারিক 'কর্তব্য' বলেই মনে করেন। খুঁজে বের করবার দায়িত্বটা অন্যের থাকে বলেই আমাদের দেশের মেয়েদের এখনো পাত্র মেলে। যে সব মেয়েদের সে রকম দেখবার কেউ থাকে না, তাদের পক্ষে পাত্র জোগাড় করা কদাচিৎ সম্ভব হয়।

পশ্চিমে মেয়েদের পাত্র জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব অভিভাবকগণ দীর্ঘকাল ধরেই অস্বীকার করে আসছেন কাজেই আজকের আমেরিকার বড় বড় সহরে হামেশাই দেখা যায়, মেয়েদের ক্লাব এবং সভা-সমিতির সমস্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। হোটেলে, কাফে এবং রেস্টুরেন্টেও মেয়েদের সমাগম প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত নারীর মধ্যে বেশিরভাগই হলেন অবিবাহিতা। একজন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী একবার একটা হোটেলে শতাধিক বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুশিক্ষিতা বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত এবং রীতিমতো সিরিয়াস নারীকে দেখে তাঁর এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন: জানেন মশাই ঐ যে ভদ্রমহিলাদের দেখছেন, কেউ শিল্পী, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ হয় তো কোনো বিখ্যাত নারী-সমিতির বিখ্যাতা এবং উগ্রস্বভাবা সম্পাদিকা, কেউ হয় তো বা কোনো কোম্পানীর পদস্থ অফিসার—বাহ্যত দেখলে মনে হচ্ছে সকলেই যে-যার কাজে ব্যস্ত, কিন্তু একটা কথা আমি বাজী রেখে বলতে পারি—তা হলো এই যে, এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই যদি আজকেই বিবাহিতা হবার সুযোগ পান তা হলে কালই দেখবেন সবকিছু তাঁদের তিক্ত জ্বালায় বিশাল অতীতকে ভুলে বসেছেন। বাইরের কাজে তখন আর এঁদের উৎসাহ দেখা যাবে না, ঘরের কাজের 'পরে সময় থাকে না বলে নয়, আর ভালো লাগবে না বলেই।

কিন্তু এতো গেলো 'যদি'র কথা। যদি বিয়ে হয়ে যায়। যদি হয়ে যায় তার ওপর নির্ভর করা চলে না বা সেটা কোনো সমাধানও নয়।

সমাধানটা তা হলে কি? একাধিক সমাজতত্ত্ববিদ এবং মনো-বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এ সমস্যার সমাধান একমাত্র মেয়েরাই করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্যে আজকের দিনের মেয়েদের রীতিমতো চেষ্টা করতে হবে। নিজেকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার মধ্যেই সে চেষ্টার শেষ হতে পারে না। মিথ্যে সংকোচ মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। বিয়ে না হলে আধ-বুড়ো বা বুড়ো বয়সে কে দেখবে বা কি হবে এ দুশ্চিন্তার কবলে না পড়ে বরং বিয়ে আমাকে করতেই হবে, পাত্র জোগাড় করতেই হবে এই রকম একটা বলিষ্ঠ চিন্তার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন এবং সব শেষে—ইস্কুল-কলেজে বা অফিস-কাছারীতে আজকাল যেমন মেয়েরা 'অ্যাগ্রেসিভ'ভাবে চলছেন বিবাহিত হবার জন্যেও তেমনি 'অ্যাগ্রেসিভ' হতে হবে। —অনুসন্ধানী

মেয়েদের হাত খরচ চাই

যে খরচ খরচ নয়, তবে কি সে খরচ জমানোর সামিল? হ্যাঁ, জমানো তো বটেই এবং ইন্সিওরেন্স বা ব্যাঙ্কে টাকা জমানো চাইতে এ জমানোটা একটু ভিন্ন ধরণের। তা' ছাড়া এ জমানোর আর একটা দিকও আছে। ব্যাঙ্কে টাকা জমালে আপনি জানেন কত টাকা আপনার জমেছে, কাজেই প্রয়োজনের সময় কত টাকা আপনি সেখান থেকে পেতে পারেন তা'ও আপনার একরকম জানাই থাকে। কিন্তু ধরুন যদি এমন কোনো জায়গা থেকে প্রয়োজনের সময় আপনার হাতে কিছু টাকা এসে যায়, যে টাকা এক সময়ে আপনার ধারণায় আপনি খরচই করেছিলেন—তা' হলে ব্যাপারটা খুবই আনন্দের হয় না কি? ঐ টাকার অঙ্কটা আপনার অবস্থা অনুসারে হাজার কি দু'হাজারও হতে পারে; আবার একশ' কি দু'শোও হতে পারে, দশ কি বিশও হতে পারে। কতো আপনার হাতে এসে গেলো তার চাইতেও এর যে দিকটা লক্ষণীয় সে হলো এটা আসার আকস্মিকতা।

ব্যাপারটা খুব জটিল কিছু নয়। একটা নিতান্ত সাধারণ জিনিষ থেকেই সূত্রপাত হতে পারে এই আকস্মিক প্রাপ্তিযোগের। আমি মেয়েদের হাতের টাকার কথা বলছি।

জমাবার দিকে সকলের সমান নজর থাকে না। এ অভ্যাসটা একেবারে ছেলেবেলা থেকে বড়াদর দেখাদেখি বা বড়দের শিক্ষা অনুসারে গড়ে ওঠে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মেয়েরা জমাবার অভ্যাসটাকে ছেলেদের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি ধাতস্থ করতে পারে। একটা বয়সের পরে মেয়েদের বাইরে বেড়োনো খানিকক্ষণ কমে যায় বলে মা-বাবা কিম্বা দাদা-দিদির কাছ থেকে কখনো-সখনো যৎসামান্য বা খুব গরীব ঘরের মেয়েদেরও হাতে আসে—সেটা অধিকাংশ সময়েই সুযোগের অভাবে তাদের খরচ করা হয়ে উঠে না। কাজেই সে টাকাটা জমে যায়। এইভাবে কিছুদিন চলবার পরেই দেখা যায় জমানোর দিকে একটা ঝোঁক দাঁড়িয়ে গেছে এবং এই জন্যেই দেখা যায় কোনো পরিবারের পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটি ছেলের নিজস্ব যে জমানো টাকা আছে তার সমবয়সী ঐ একই পরিবারের যে কোনো মেয়ের বেশিরভাগ সময়েই তার নিজস্ব হিসেবে তার চাইতে অনেক বেশি জমানো টাকা আছে। তা' সে দুই-তিন কি পাঁচ টাকাই হোক বা একশ' দু'শোই হোক।

জমানোর দিকে এই যে ঝোঁকটা মেয়েরা অল্পবয়স থেকে আরম্ভ-

করেন এর সুফল পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব যখন সংসার গড়ে ওঠে তখন সকলেই পেয়ে থাকেন।

যে কোনো সংসারে—যতো দরিদ্রই হোক না কেন, মাঝে মাঝে যখন টাকার অভাব একেবারে চরমে ওঠে, গৃহকর্তা হয় তো দু'টাকা কি পাঁচ টাকার পাওনাদারের নজর এড়িয়ে ফুটপাথের কোল ঘেঁষে চলতে তৎপর—এ রকম সংসারের গৃহিণীদের নিজস্ব তহবিল থেকেও মাঝে মাঝে দশ টাকা কি বিশ টাকা বেরিয়ে পড়ে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঐ গৃহিণী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে নিজস্ব খরচের জন্যে অর্থাৎ হাত খরচ হিসেবে কখনো কিছু পান নি। গৃহকর্তা তাঁর অনুপস্থিতিতে সংসারের প্রয়োজনে এটা-সেটা কেনা-কাটার জন্যে কখনো-সখনো যা গৃহিণীর হাতে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। গৃহিণী সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সে জিনিষ তো কিনেছেনই, উপরন্তু হয় তো কিছু বাঁচিয়েছেন। এমনি করেই সাধারণত গরীব ঘরের গৃহিণীদের হাতে টাকা জমে। বলাই বাহুল্য, এ ভাবে হয় তো অনেক সময় দশটি টাকা জমাতে তাঁদের পুরো একটা বছরই কেটে যায়। কিন্তু তবু জমে এবং সেই সঞ্চিত অর্থে পরিবার উপকৃত হয়। এটা হলো সেই সমস্ত সংসারের কথা—যেখানে গৃহিণীরা নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যয়ের জন্যে সাধারণত স্বামীদের কাছ থেকে কিছু পান না।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের বিশ্বাস গৃহকর্তারা যদি জেনে-বুঝে নিয়মিত গৃহিণীদের হাতে প্রতিমাসে নগদ কিছু দেন, তা হলে ব্যাপারটা কেমন হয়? আরো বেশি জমবার সম্ভাবনা থাকে নিশ্চয়ই। কথা উঠতে পারে, আজকের দিনে বাড়ি ভাড়া দিয়ে খাওয়াপরা সামলে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় খরচ জোগাতেই কর্তারা যেখানে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন সেখানে আবার গৃহিণীদের হাত খরচ দেবার মতো একটা বেয়াড়া প্রস্তাব করা হচ্ছে কেন। আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবো যে ব্যাপারটা আসলে খুব বেয়াড়া নয়। আর তা ছাড়া গৃহিণীদের হাত খরচ দিতে হবে বললেই যে বাঁধাধরা বা বাড়িভাড়া কিম্বা আপনার ঠিকে-ঝিয়ের মাইনের মতো নিয়মনির্দিষ্ট কিছু দিতে হবেই ঠিক তা নয়—একটা টাকা দিলে যদি আপনার সুবিধে হয় তো তাই দিন, পাঁচ টাকা পারেন তো তাই দেবেন, কথাটা হচ্ছে—তাঁকে দিয়ে তিনি যেন তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন এবং খুশিমতো তা ব্যবহার করেন সে অধিকার যে তাঁকে দেওয়া হলো সেইটে পরিষ্কার থাকা দরকার। মেয়েদের হাতে টাকা দিলে সাধারণত দেখা যায় ছেলেদের চাইতে তাঁরা অনেক বেশি হিসেবীর মতো সে টাকা ব্যয় করছেন।

এই হলো সাদামাটা ভাবে জিনিষটা ভাবলে যা দাঁড়ায়। আসুন এবার অধিকারের কথা আলোচনা করা যাক। আপনার সংসারকে চালু রাখতে হলে ঠিকে-ঝি থেকে ডাক্তারবাবু বা পুরুতঠাকুর মশাই সবাইকেই আপনার নগদ দক্ষিণা দিতে হয়, নয় কি? বাড়ির কর্তারাও খাওয়া-দাওয়া থেকে আরম্ভ করে সবকিছু সম্পর্কেই খানিকটা বিশেষ সুযোগ-সুবিধে লাভ করে থাকেন সংসারে। কিন্তু গৃহিণীরা? তাঁরা কি পান? যে সংসারে গৃহিণীরাও কর্তাদেরই মতো বাইরে থেকে অর্থোপার্জন করে আনেন বোধ হয় তাঁরাও কর্তাদের মতন সমান সুযোগ বা সুবিধে লাভ করে থাকেন না। এ জন্যে কিছুটা অবশ্য আমাদের দেশের মেয়েরাই দায়ী, কারণ, নিজের প্রতি যত্ন নেওয়াটাকে এমন কি আজকের দিনেও তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে মনে করেন না, বা করলেও সেটা কার্যে পরিণত করতে লজ্জাবোধ করেন।

কিন্তু গৃহিণীরা যে নিজেদের প্রতি যথেষ্ট নজর দেন না এ জন্যেও বোধ হয় প্রধানত কর্তারাই দায়ী। বাড়ির বেড়ালটা মাছের কাঁটাগুলি ঠিকমতো পাচ্ছে কি না সে বিষয়ে তাঁরা নজর দিতে পারেন কিন্তু বাড়ির গৃহিণী সকলকে খাওয়াবার পর কি খাচ্ছেন, সেটা অনুসন্ধান করতে যাওয়া এমন কি অপরাধের?

এমনি ভাবে, খাওয়া-দাওয়া থেকে আরম্ভ করে যে কোনো ব্যাপারেই দেখা যায় গরীব ঘরের গৃহিণীদের শোচনীয় অবস্থা। সব না হোক এর কিছু কিছু পরিবর্তন করা যায়, শুধু একটু ইচ্ছে থাকলেই।

কাজেই যা বলছিলাম—ঠিকে-ঝি থেকে ডাক্তারবাবু সকলেই যখন নগদ কিছু পেয়ে থাকেন কর্তাদের কাছ থেকে তখন গৃহিণীরাই বা পাবেন না কেন? সাধারণ পরিবারের যে-কোনো গৃহিণীকেই একাধারে ঝি, রাঁধুনি, আয়া এবং ডাক্তার না হোক অন্তত নার্সের কাজ করতে হয়। এ কাজগুলি নগদ টাকায় অন্য লোক দিয়ে করালে কতো লাগতে পারে? একজন গৃহিণী কি তার চার ভাগ কিম্বা দশ ভাগের একভাগ টাকাটাও হাতখরচ হিসেবে পেতে পারেন না?

এ সমস্ত কথার উত্তরে একশ্রেণীর কর্তারা অকস্মাৎ ভালোবাসায় ফেটে পড়ে বলে থাকেন—আহা তাঁদেরই তো সংসার! আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে, ওতে গৃহিণীদের অমর্যাদা করা হয়।

কিন্তু আমরা এ দু'টো মতেরই বিরোধী। কারণ, গৃহিণীরা যে প্রকৃতই কর্তাদের অতোখানি ভালোবাসা লাভ করেন না (অন্তত বিয়ের পর থেকে) তা তো সংসারের মধ্যে তাঁর ছবি দেখলেই বোঝা যায়। আর দ্বিতীয় কথার উত্তর হলো যে, পুরস্কার কখনোই কারো অমর্যাদা ঘটাতে পারে না। গৃহিণীদের হাতখরচের যে দাবী তা বাস্তবিকপক্ষে পুরস্কারেরই দাবী। আর এ ভাবে মনে করলে কর্তাদেরও সুবিধে হবারই কথা। কারণ, পুরস্কারের কোনো রেট না-ও থাকতে পারে, পুরস্কার লোকে যার যার সাধ্যমতোও দিতে পারে।

যে ভাবেই দেওয়া যাক না কেন, গৃহিণীদের হাতে মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কর্তাদের উপকারই হয়ে থাকে।

—তথ্যান্বেষী

অম্লান অনুরাগ

আবদুল মজিদ

একদা আসবে জানি, তাই এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগে
জনশূন্য লোকালয়ে প্রতীক্ষার দীপ প্রজ্বলিত,
উন্মুখ গানের কলি সুরময় পাপড়ি পরাগে
নৈঃশব্দ্য ঘুচাতে চায় ফুটে ওঠে কুসুমের মতো।

তুমি আসবে তাই এই প্রতীক্ষার প্রহরে প্রহরে
আলোর আভায় আছে, রামধনু রঙ লাগে চোখে;
অন্তরের অনুরাগ অনাক্রান্ত পৃথিবীর 'পরে
এখনো অম্লান তাই, স্পন্দমান মৃত্তিকার বুকে

বিয়ে প্রেমের শেষ নয়

একটা সত্যি ঘটনাই বলি।

কফি-হাউসে বসে কথা হচ্ছিলো। কিন্তু কফি-হাউসে বসে কথাটা হচ্ছিলো বলেই নেহাৎ জলো আলাপ বলে অবজ্ঞা করবার কারণ নেই।

আমার এক বন্ধু আর আমি, এই দু'জনে কোণার দিকের একটা টেবিলে। প্রবেশদ্বার থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলেই সাধারণত আমরা ব'স এখানটায়। কারণ আমাদেরই মতো ঝানু কফি-খোর ছাড়া কেউ বড়ো একটা দরজা দিয়ে ঢুকে টেবিলটা খালি পড়ে থাকলেও আসে না এদিকে। কাজেই বেশিরভাগ সময়েই ফাঁকা পেয়ে যাই আমরা। আর একটা সুবিধে হলো এই দূরের টেবিলে এসে অর্ডার নিয়ে যাবার জন্যে বেয়ারাও অনেক সময় দেরি করে, অর্ডার নিয়ে যাবার পরে তা সার্ভ করতেও দেরি করে, পাঁচ টাকা কি দশ টাকার নোটে দাম দিলে চেঞ্জ দিতেও দেরি করে—কাজেই আমরা এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকি এবং এ সবের নীট ফল যা দাঁড়ায় তা' হলো একটি যেমন তেমন ড্রয়িংরুমের পরিবেশ।

ধূমায়িত কফির মাপে গোটা দুই সিপ দিয়ে বন্ধুটি বললে: জানলি, প্রেমে পড়েছি।

হকচকিয়ে উঠলাম—তার মানে?

মানেটা আসলে নিশ্চয়ই খুব দুর্বোধ্য নয় যদিও চোখে-মুখে একটা সেই রকম ভাণ করবার চেষ্টা করলাম।

আমার ভাণ করবার আর একটা কারণও ছিলো। আমার পক্ষে বন্ধুর ঐ খবরটা কিছুটা বিজলী-পরশের মতো। কারণ মাত্র মাস খানেক আগে ওর ছেলে—ওদের প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনের বিরাট ভোজে খেয়ে এসেছি। এখনো হয় তো হাত শুঁকলে পায়েসের গন্ধটা নাকে না হোক অন্তত মনে এসে যাবে।

আর দ্বিতীয়ত ওর স্ত্রীকেও আমি বিশেষ ভাবে চিনি বিয়ের আগে থেকেই এবং এ বিয়েটাও প্রেমঘটিত অবস্থাতেই ঘটেছিল। এখন কি না সেই ছেলেই আবার বলছে—প্রেমে পড়েছি।

আমার কথার উত্তরে বন্ধুটি আরো গোটা দুই সিপ দিয়ে বললে: হ্যাঁ রে, সত্যি বলছি প্রেমে পড়েছি।

দারুণ গরম পড়ে গেছে, বৃষ্টিও নিশ্চয়ই খুবই হবে, ফুটবল টীম-গুলিতে খেলোয়াড় অদলবদল হওয়ায় কোন টীম জোরদার হলো, ভূদেব সেনের মৃত্যুর জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি নেই, ইউ এন ও-র সদস্য পাকিস্তান নগদ টাকায় স্ত্রীলোক কেনাবেচার ব্যবসা কেঁদেছে, ভারতে উপযুক্ত নেতার একটি প্রসঙ্গ তুলতে আরম্ভ করলাম। আমার বন্ধু প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গেই তার নিজস্ব কিছু না কিছু মত জানালে। ইতিমধ্যে কফি আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি করে যাতে ওঠা যায় সেইজন্যে বেয়ারা ডাকিয়ে খুচরা পয়সাতেই দাম চুকিয়ে দিলাম। যাতে শীগগির করে ওঠা যায় সেইজন্যে এ সব করা। কারণ ওর এই নতুন প্রেমের কথা আমার শুধু যে আর শুনবার আগ্রহ ছিলো না তাই নয়—এটা শোনাও আমার মনে হলো আমার দিক থেকে অন্যায় হবে, ওকে উৎসাহিত করা হবে।

বন্ধুর স্ত্রী, ধরে নিন নামটা তার রাধা। এই দিন তিনেক আগেও যখন গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি, কথাবার্তায়, খাবার-দাবারে নানাভাবে আপ্যায়িত করেছিলো রাধা। অনেকখানি শ্রদ্ধা এবং আস্থা না থাকলে কেউ সচরাচর করে না ওরকম। আর এখন কি না সেই মেয়ের স্বামীকেই আমি প্রেমে ডুবতে উৎসাহিত করবো—তার কাহিনী, কাহিনী নয় কেচ্ছা শুনে? এ-ও কি সম্ভব? না, তা কখনোই হতে পারে না।

—একটু কাজ আছে, চল এবার বেরুই কথাটা বলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে বাধা পেলাম। ও আমার পাঞ্জাবির একটা কোণা ধরে টান দিলে: আরে বস না।

অগত্যা বসতে হলো।

—সত্যি বলছি, এ অভিজ্ঞতার কথা, এ অনুভূতির কথা তোকে বলতে না পারলে আমি একদম সোয়াস্তি পাচ্ছি না। বাস্তবিক এ একটা অভিজ্ঞতা।

কি একটু ভেবে নিয়ে বললে ও—আর একটু কফি আনাই, কি বল?

—না, না, আমার পেটটা ভালো নেই।

—এককাপ তো খেলি?

—ওতে কিছু ক্ষতি হবে না। বেশি খাওয়া ডাক্তারের বারণ আছে। যাক কি বলবি বল।

—তা' মুখটা ও রকম কুইনিন খেকোর মতো করে আছিস কেন? ঐ মুড নিয়ে কি আর রোমান্সের কথা বলা যায়, না শোনা যায়। আচ্ছা, থাক আজ বরং আর একদিন বলবো'খন।

বুঝুন আমার অবস্থা। একে বিশ্রী খবর তায় তার বৃত্তান্ত কি না আবার স্থগিত রাখবার প্রস্তাব। নিজের মনের অবস্থা নিজে যেটুকু বোঝা যায় তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, বন্ধুর এই সদ্য-প্রেমে পড়ার ভেতরের ঘটনাটা না শুনে কোনো মতেই ফেলে রাখা চলে না। বরং অবিলম্বে শোনা দরকার এবং তারপর ভেবে দেখা যদি চূড়ান্ত অধঃপতনের হাত থেকে বন্ধুকে রক্ষা করা যায়, আর রাধার মুখের হাসিটুকু অম্লান রাখা যায়। তাই বললাম—আচ্ছা, বল কি বলবি, শুনছি।

—বলছিলাম কি, মেয়েদের বুঝবার চেষ্টা করেছিস কখনো?

ও একটি সন্তানের জনক, আর আমি দু'টির। কাজেই ওর এখনো খাঁটি রস না হোক, অন্তত রসের কষটুকুও অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, বলতে লজ্জা নেই, আমার সেই কষটুকুও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মনের মধ্যে। তাই বললাম—ও সব বাজে হেঁয়ালী ছাড়তো, তোর বৌদির কানে যদি এ সব আলাপের কথা যায় কখনো তা হলে এরপর থেকে গেলে আর চাটুকুও পাবি না, সে বোধ আছে?

—হেঁয়ালী না ভাই, সত্যি বলছি। কাল লেকে বেড়াচ্ছিলাম দু'জনে। ওর পক্ষে এটা যে পরিমাণ আকর্ষণের, আমার পক্ষে এটা ঠিক তা নয়।

তার কারণটা অবশ্য আমার ভালোভাবেই জানা আছে। কারণ—বিয়ের আগে রাধাকে নিয়েও প্রচুর বেড়িয়েছে লেকে।

—কি হলো জানিস? প্রতিটি অক্ষরে ওর উত্তাপ ভেসে আসতে লাগলো—বার দুই আমার একখানা হাত ও নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিলে।

আমার যেন হাজার লোকের সামনে এভাবে হাত ধরাধরি করে চলতে লজ্জা লাগছিলো। তাই ছাড়িয়ে নিচ্ছিলাম আমি।

ও বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। বললে, আগে তো আপত্তি করতে না।

বন্ধু বলতে লাগলো—ও ঠিকই ধরে ফেলেছিল, সত্যি আগে আপত্তি করতাম না। এমন দিন গেছে যখন ওর হাত ধরে পাঁচজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারাটা একটা বিরাট গৌরবের ব্যাপার মনে করতাম। পরশের প্রতিটি অনুপলে মনে হতো যেন একটা করে নতুন পৃথিবী জয় করছি। কিন্তু এখন লজ্জা করছে কেন? ওর সম্বন্ধে আর কৌতূহল নেই মনে করি বলি? অকস্মাৎ মনে হলো—এমনও তো হতে পারে যে আমার মনে করাটাই ভুল, আসলে কৌতূহলের অনেক কিছুই এখনো আছে ওর মধ্যে। এই কথাটা মনে হতেই আমি কি করলাম জানিস? খপ করে ওর একখানা হাত এবার নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিলাম, তারপর একটুখানি টেনে নিলাম নিজের কাছে, একেবারে পাশে। মাঝে মাঝেই ওর মাথাটা ছুঁয়ে যেতে লাগলো আমার কাঁধ। কি খুশি! খুশিতে ভরে উঠলো ওর মুখ-চোখ। বিয়ের পরে গত তিন বছরে আর কখনো এ রকম দেখি নি রাধাকে।

—রাধা?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ রাধা রাধা, আমার ছেলের মা রাধা।

এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমিই এবার বেয়ারাটির নজর আকর্ষণ করে দু'কাপ কফি দিতে ইঙ্গিত করলাম। বললাম—তুই তা' হলে সত্যি অবাক করলি দেখছি, শেষ পর্যন্ত নিজের বিয়ে করা বৌয়ের সঙ্গেই প্রেমে পড়ে গেলি?

—হ্যাঁ, আর দেখলাম আনন্দটাও তাতে কিছু কম হয় না। বিয়ে যে হয়ে গেছে, শুধু এই কথাটা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে যেতে পারলেই বৌয়ের চহারাটা তখন অন্য রকম ঠেকে চোখে, মানসিকতায়ও পাওয়া যায় একটা নতুন স্বাদ। বিশ্বাস না হয় বৌদির ওপর পরখ করে দেখিস একদিন।

—ধ্যেৎ! হয়েছে তো, এবার চল বেরুই।

মুখে একটা 'ধ্যেৎ' বলে ফেললেও বন্ধুর মনের রঙের আভা যে নিজের মনেও সঞ্চারিত হয়ে গেলো তা অনুভব করতে লাগলাম। মনে হতে লাগলো প্রেমের যে ক্ষুধা তা অনির্বাণ, যে দেহ আশ্রয় করে তা জ্বলে তা কিছুই নয়, আসল হ'চ্ছে ইন্ধন—একটা নতুনতর মানসিকতা যা ভালোবাসতে চায় আর ভালোবাসা পেতে চায়। —অনুরাগী

রক্তের সাক্ষ্য

'রক্ত সাক্ষ্য দেবেই' এ ধরণের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ কথার আসল তাৎপর্য ধরা পড়ে না সব সময়। আগের দিনে 'রক্তের সাক্ষ্য' বলতে যা বোঝাত আজকের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা তাকে অলীক বলে সপ্রমাণিত করেছে। যেমন মানুষের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার, সাহসিকতা বা ভীরুতা ও সৎ বা অসৎ চরিত্রের জন্য এ যাবৎ তার বংশানুগত উত্তরাধিকারকেই বড় করে দেখা হত, কিন্তু আজ আর তা বলা চলে না, আজকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এ সবের জন্য তার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিককেই দায়ী করে অসন্দিগ্ধভাবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মাত্র 'রক্তের সাক্ষ্য' বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় সেটা মানুষের কাছে ধরা পড়েছে। রক্ত সাক্ষ্য দেয় তখনই যখন তার কাছে আবেদন করা হয় বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায়; ১৯০১ সালে এ সত্য আবিষ্কৃত হয় প্রথম, কারণ তখনই বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন যে, মানুষের দেহে বহমান রক্তধারা মূলত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত আর একমাত্র রক্তের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমেই সে শ্রেণী নির্ণয় সম্ভবপর। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানবদেহান্তর্গত এই রক্তধারার শ্রেণিবিভাগের জন্য প্রথমে প্রয়োজন রক্তের সঙ্গে রক্তের মিলন, মিলনের ফলে মিশ্রিত রক্ত যদি চটচটে ভাবে চাপ বেঁধে যায় তাহলেই বুঝতে হবে যে ওই রক্তের নমুনাগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর, সমশ্রেণীর রক্তের নমুনা এক অপরের সঙ্গে মিলিত হলেও তরল ও স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে। এই ধারার পরীক্ষা কার্য চালানোর ফলেই ক্রমে একের দেহে অপরের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পড়ে অগ্রগমনের এক চিহ্নিত পদক্ষেপ। রক্তের উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও মত বদলেছে, বর্তমানে একটা নির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমেই রক্তের শ্রেণিগত উত্তরাধিকারকে স্বীকার করা হয়ে থাকে যেমন কোন দম্পতির মধ্যে উভয়েরই 'রক্ত' যদি ক শ্রেণিভুক্ত হয় তা হলে তাদের সন্তানের ক্ষেত্রেও যে তা হতে বাধ্য একথা অনস্বীকার্যরূপেই সপ্রমাণিত হয়, যদি কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় তখন বুঝতে হবে যে, সন্তানটির পিতৃত্ব সম্বন্ধে রীতিমত সংশয়ের অবকাশ আছে। আজকের যুগে একেই বলা হয় 'রক্তের সাক্ষ্য' আর এ সাক্ষ্য প্রায়শ নির্ভুল। আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও 'রক্তের সাক্ষ্য' প্রামাণ্য বলে প্রমাণিত হতে দেখা গেছে, দেখা গেছে যে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে অনেকেরই ধমনীতে প্রবহমান বিশেষ এক ধরণের রক্তধারা সামগ্রিকভাবেই এশীয়, আফ্রিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও আমেরিকানদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত; এবং ইউরোপীয়ানদের মধ্যেও বিশেষ এক গোষ্ঠীর মধ্যেই তা প্রধানত নিবদ্ধ, যারা পুরুষানুক্রমে গোষ্ঠিগত জীবন যাপন করে আসছে, অর্থাৎ বিবাহাদি সংস্কার যাদের সম্পূর্ণভাবেই গোষ্ঠীনির্ভর। এ তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের মিলনের ফলেই রক্ত বৈচিত্র্যবাহী হয়ে ওঠে সচরাচর, আর এও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আমাদের অতীত সম্বন্ধেও এ ভাবেই রক্ত সাক্ষ্য দেয়। হয়ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভঙ্গীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সাক্ষ্য আরও মুখর হয়ে উঠবে অদূরভবিষ্যতেই; হয়ত অতীত ও বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ মানব সম্বন্ধেও তখন প্রামাণ্য তথ্যাদি উদ্ঘাটিত করতে সক্ষম হবে রক্তের সাক্ষ্য।
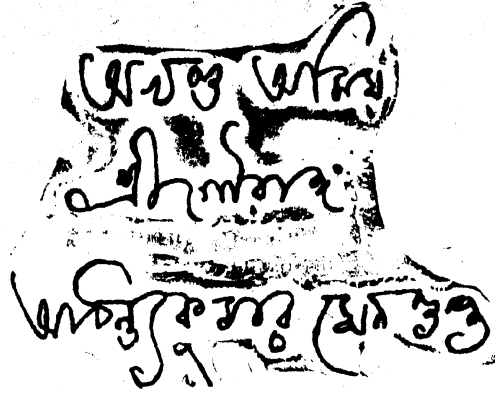
৬৭

বাহ্যিক বৈরাগ্য ছেড়ে অনাসক্তভাবে সংসার করছে রঘুনাথ। শান্তিপুরে যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হয়, মহাপ্রভু বলে দিয়েছিলেন মর্কট বৈরাগ্য ছেড়ে নির্লিপ্ত হয়ে বিষয় ভোগ করো। বাইরে এমন কোনো আড়ম্বর দেখাবে না যে লোকে বুঝতে পারে ভিতরে তোমার বৈরাগ্য জন্মেছে। লোক দেখানো বৈরাগ্যই মর্কট বৈরাগ্য। আর, বিষয়ী হয়ো না, 'বিষয়ীর মতন' হয়ো। অর্থাৎ বিষয়ে চোখ রাখো মন রেখো না। মন শুধু চৈতন্যচরণে।

রঘুনাথের বাবা গোবর্ধন দাস, জেঠা হিরণ্য দাস। বিস্তীর্ণ সপ্তগ্রাম-মুলুকের জমিদার। নবাবের ঘরে বিপুল রাজস্ব দিয়ে বিরাট উপস্বত্ব ভোগ করছে। আর তাদের দানধ্যান পুণ্যকর্মই বা কত। যে ব্রাহ্মণ তাদের দান পায় নি, মুলুকে প্রবাদ, সে ব্রাহ্মণই নয়। বিষয় যদি না বাড়ে তবে দানই বা বড় হয় কী করে?

সেই বিষয়ীদের ছেলে রঘুনাথ আবার বিষয়কর্মে মন দিয়েছে তাতে মা-বাপ সকলেই খুব খুশি।

ধনী হলেই তার শত্রু থাকবে। এক মুসলমান চৌধুরীর চোখ টাটাল। মুলুক থেকে আদায় বিশ লাখ, বারো লাখ রাজস্ব দিয়ে নীট আট লাখ ঘরে তোলে হিরণ্য-গোবর্ধন—হু' দু'টো হিন্দু—চৌধুরী জলতে-পুড়তে লাগল। নবাবের ঘরে গিয়ে নালিশ জানাল। কোনো কিছু খবর রাখেন? মুলুকের আদায় এখন বিশ লাখের অনেক বেশি। কিন্তু রাজস্ব সেই বারো লাখই আছে। আদায় যদি বেড়ে যায় তা হলে রাজার প্রাপ্য রাজস্বও কি বাড়বে না?

ঠিকই তো। তলব করো হিরণ্য-গোবর্ধনকে ফরমান দিল নবাব।

'রাজাকে কম দিয়ে নিজেরা বেশি খাচ্ছ এ কেমনতরো কথা?' চোখ কষায়িত করল নবাব: 'রাজস্ব দ্বিগুণ করতে হবে।'

এ জুলুম, এ জবরদস্তি। হিরণ্য-গোবর্ধন মানল না ফরমান।

কুমিরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা অসম্ভব।

হিরণ্য-গোবর্ধনের জমিদারী নবাব বাজেয়াপ্ত করল আর দু' ভাইকে ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরবার হুকুম দিলে।

নবাবের সৈন্য তাদের বাড়ি ঘিরল। কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। দু' ভাই আগে-ভাগেই সরে পড়েছে।

'তবে ছেলেটাকে ধরো।'

হিরণ্য-গোবর্ধনকে না পেয়ে রঘুনাথকে বেঁধে নিয়ে চলল।

'বল তোর বাপ-জেঠা কোথায়?' উজির হুমকে উঠল।

'তার আমি কী জানি।' নির্ভীক রঘুনাথ দাঁড়াল মুখোমুখি।

'কোথায় গেলে তাদের ঠিকানা পাওয়া যাবে?'

'তার আমি কী জানি?'

আমি শুধু জানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণ।

তর্জনে-গর্জনে হবে না, উজির উৎপীড়নের ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে তার আবার ভয় কী।

না, শুধু কথায় কাজ হবে না, সরাসরি প্রহার

দরকার। প্রহারই বশীকরণের একমাত্র ওষুধ। মার খেলেই ছেলেটা অন্ধিসন্ধি সব বলে দেবে।

কিন্তু ছেলেটার মুখে কী জানি কী আছে, মারতে হাত ওঠে না। কেন কে জানে মনের মধ্যে কে ডাক দেয়, মারলে ভালো হবে না পরিণাম।

আর ছেলেটার কী মিষ্টি কথা। কী বিনয়নম্রতা। কণ্ঠস্বরেই মনের কাঠিন্য গলে যায়।

'কেন অপ্রতুল হচ্ছেন? বিষয় তো অতি সামান্য এ তো নির্বিবাদেই মীমাংসা করে নেওয়া চলে।' অধিপতিকে রঘুনাথ বললে মধুস্বরে, 'আমার বাপ-জেঠা আপনারই ভায়ের মত। ভায়ে-ভায়ে সব জায়গায়ই ঝগড়া হয়, আবার মিটমাট হয়ে যায়। আমি যেমন আমার বাবার ছেলে তেমনি আপনারও ছেলে। আমার বাবা যদি আমার আবদার রাখেন, আপনিও বা রাখবেন না কেন?'

অধিপতির মন আর্দ্র হল। ছেড়ে দিল রঘুনাথকে।

বাপ-জেঠাকে নবাবের কাছে নিয়ে এল রঘুনাথ। কিছু রাজস্ব বেশি নাও আর জমিদারি ফেরৎ দাও।

মীমাংসা এত সহজ ছিল তা কে জানত। হিরণ্য গোবর্ধন আবার তাদের পুরোনো ঘরে অধিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এ কী উৎপাত।

রঘুনাথের প্রতি বাড়ির সকলের স্নেহমমতা প্রবলতর হয়ে উঠল। সন্দেহ কী, রঘুনাথের জন্যেই নবাবের রোষ নিবারিত হয়েছে, ফিরে এসেছে তালুক-মুলুক।

সংসারের সোনার শিকল রঘুনাথের সারা গায়ে কাঁটা হয়ে উঠল।

একদিন রাত্রে চুপি-চুপি পালাল ঘর ছেড়ে।

গোবর্ধন আবার তাকে ধরে আনল।

'ছেলে আমার পাগল হয়ে গিয়েছে', বললে মা, 'ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখো।'

বিষণ্ণ মুখে গোবর্ধন বললে, 'দড়ির সাধ্য কী ওকে বাঁধে। অপ্সরার মত স্ত্রী, ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্যও ওকে বশ করতে পারল না। আর সত্য কথা বলতে কী, জন্মদাতা পিতাও পুত্রের প্রারব্ধ খণ্ডাতে অসমর্থ। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ওর যদি সংসারে বৈরাগ্য এসে থাকে, সে ফল কেউ পারবে না হরণ করতে।'

'তাই বলে যে পাগল, তাকে তুমি বেঁধে রাখবে না?'

'যে চৈতন্যচন্দ্রের জন্যে পাগল তাকে বাঁধবার দড়ি কই।'

> ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরাসম।
> এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন।
> দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
> জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥
> চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
> চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে?'

বারে-বারে পালাই, বারে-বারেই ধরা পড়ি কেন? নিজের চেষ্টায় কি চৈতন্যচন্দ্রের কাছে যেতে পারব না? তবে কি নিত্যানন্দের কৃপা দরকার? সংসারসমুদ্র পার করে চৈতন্যবন্দরে পৌঁছে দেবার ভেলাই কি নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ পানিহাটিতে আছে, সেইখানে নিত্য নাম-উৎসব চলেছে, তার রঙ্গ একবার দেখে আসি।

> 'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
> আউলায় সর্ব অঙ্গ, অশ্রু গঙ্গা বয়॥'

বাবার কাছে যাবার অনুমতি চাইল।

'আবার ফিরে আসবে তো?' জিগগেস করল গোবর্ধন।

'আসব।'

নিত্যানন্দের গায়ে অনেক অলঙ্কার, তার কীর্তনের দলের সঙ্গে এক ডাকাত এসে জুটল। বর্ণে ব্রাহ্মণ কর্মে ডাকাত। মতলব, নিতাইয়ের গায়ের অলঙ্কার চুরি করে নেবে। নামরসে কত সময় বিবশ হয়ে থাকে, আলগোছে তুলে নিতে কতক্ষণ।

নবদ্বীপে হিরণ্যপণ্ডিতের বাড়িতে ভক্তগণ নিয়ে বিহার করছে নিমাই।

'এত দিনে আমাদের দুঃখ ঘুচল।' ব্রাহ্মণ-ডাকাত বললে দলবলকে, 'মা-চণ্ডী এক ভাণ্ডেই সমস্ত অলঙ্কার জমা করে রেখেছেন। লোকজন বিশেষ নেই ধারে-কাছে, রাত একটু ঘন হয়ে এলেই হানা দেব। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকো।'

রাত ঘন হয়ে আসতেই একজন চর পাঠাল, দেখে আয়, অবধূত কী করছে।

চর এসে খবর দিল, অবধূত খাচ্ছে।

আর তার লোকজন?

হৈ-হৈ করছে। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলছে। কেউ-কেউ অট্ট-অট্ট হাসছে, কেউ বা সিংহনাদ করছে।

করুক। কতক্ষণ করবে। একসময় না একসময় শোবে। ঘুমুবে। তখন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ততক্ষণ এই ঝোপে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকি। অপেক্ষা করি।

কে কোন গয়নাটা নেবে ডাকাতের দল তারই ফিরিস্তি করতে বসল।

আস্তে-আস্তে ডাকাতের দলই ঘুমিয়ে পড়ল। কী আশ্চর্য, রাত ভোর হয়ে গেল, তবু কারু চেতন নেই। কাকের ডাকে সবাই যখন জাগল, দেখল রাত কখন ধুয়ে-মুছে গেছে, কোথায় ডাকাতি করবে, কোন সাহসে?

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ঝোপে-জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলল ডাকাতেরা। একে-অন্যেকে গালি পাড়তে লাগল। তুই কেন আগে শুতে গেলি? তুই আর তা দেখলি কখন—তুই তো আগেই ঢলে পড়েছিস। যত দোষ তোর।

ব্রাহ্মণ-ডাকাত কলহ নিরস্ত করল। বললে, 'চণ্ডীর ইচ্ছায় হয়েছে। মাকে পুজো দিই নি। মাকে আগে পুজো না দিলে ডাকাতি নিষ্ফল হয়। তা একদিন গেলেই সকল দিন যায় না।

মদ্য-মাংস নিয়ে চণ্ডীর পুজো করল ডাকাতেরা, তারপর মধ্যরাত্রে, নিতাই ও তার সঙ্গীরা যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন বাড়ি ঘেরাও করতে গেল।

কিন্তু ও হরি, এ কী ভয়াবহ ব্যাপার। দেখল সশস্ত্র কতগুলি পাইক বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকের প্রকাণ্ড চেহারা, প্রচণ্ড তেজ। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য, সকলে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম গাইছে।

কী ব্যাপার? একটা সামান্য অবধূত এত সব পাইক-বরকন্দাজ জোগাড় করল কোত্থেকে? আগে থেকে কী করে বা বুঝল যে ডাকাতি হবে, প্রহরীর প্রয়োজন? নিশ্চয়ই গুণ জানে।

'ও সব কিছু নয়।' দলপতি ব্রাহ্মণ বললে, 'বড়-বড় লোক-লস্কর মাঝে-মাঝে আসে অবধূতকে দেখতে। তেমনি কেউ এসেছে আর ওরা তারই পাইক-বরকন্দাজ। ভক্ত-ভাবুকের চাকরি করছে বলে মুখে ঐ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। যাই হোক, আজ আর নয়, দিন দশেক চুপচাপ থাকি, তারপর আবার একদিন দেখা যাবে।'

ক'দিন পর আবার একদিন মধ্যরাত্রে দেখতে গেল।

এবার আর দ্বিধা নয়, আক্রমণ করল সদলে। বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই নিদারুণ অন্ধকার আচ্ছন্ন করল সকলকে। এ কী, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? এ কী, সকলে অন্ধ হয়ে গেলাম নাকি?

চোখে কিছু ঠাহর করতে না পেরে সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। কারু হাত ভাঙল, পা ভাঙল, কারু পায়ে-পায়ে কাঁটা ফুটল। অন্ধকারে কিছু দেখবার উপায় নেই, পোকা-মাকড় কামড়াতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর, বিপাকের উপর দুর্বিপাক, তখুনি কি না নামল শিলাবৃষ্টি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। চোখে দেখতে পায় না, ভেবে পেল না কোথায়, কোন দিকে আশ্রয় নেবে। ত্রাসে মূর্ছা গেল অনেকে। কারু বা শীতে বৃষ্টিতে গায়ে জ্বর এসে পড়ল।

দস্যুপতি ব্রাহ্মণের তখন সম্বিৎ হল, নিত্যানন্দ ছাড়া আর গতি নেই, যার ধন কাড়তে এসেছি তার কৃপাই এখন কাড়তে হবে। আর, আমার মত পতিতজনের পক্ষে মহতের কৃপাছাড়া আর ধন কী। পতিতজনকে উদ্ধার করবেন, তার দ্রোহকেও ক্ষমা দিয়ে আবৃত করবেন, তারই জন্যেই তো নিত্যানন্দ।

যে মাটিতে আছাড় পড়ে সে মাটিকে ধরেই আবার উঠে দাঁড়ায়। তুমিই ফেলেছ, তুমিই আবার তুলে ধরো।

নিত্যানন্দ-চরণ ধ্যান করলো ব্রাহ্মণ। চোখের দৃষ্টি খুলে গেল। দেখতে পেল পথ। যে পথ নিত্যানন্দ-চরণের দিকেই প্রসারিত।

নিত্যানন্দের পায়ে পড়ে ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল।

'রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্বজীব পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু, পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ॥'

বললে, 'পরহিংসা ছাড়া আমি আর কিছু

জানতাম না, আমাকে দেখে সমস্ত নবদ্বীপ কাঁপত। সেই চণ্ডাল-আচার প্রচণ্ডকে বার বার তিনবার তুমি দস্যুতার থেকে নিবৃত্ত করলে। তবু হিংসা যায় না। শেষবার তুমি অন্ধ করে দিলে। বুঝলাম, সে অন্ধকারের কী যন্ত্রণা। তখন সমস্ত অন্ধের যে সহায় সেই ভক্তিকে স্মরণ করলাম। আর অমনি কিনা মুহূর্তে চোখ খুলে গেল। হল লোচন-বিমোচন। তোমার প্রতি নির্দয় হতে চাইলাম আর তুমিই দয়া করলে। তবে আরো একটু দয়া দেখাও, অনুমতি করো, গঙ্গায় ডুবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।'

'নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায়।'

নিত্যানন্দ দস্যুপতিকেও চৈতন্য দান করল। বলল, তুমি ভাগ্যবন্ত, তোমার উপর পতিতপাবন চৈতন্য গোঁসাইয়ের কৃপা হয়েছে। তোমার সমস্ত পাতক আমিই মাথা পেতে নিলাম। তুমি সমস্ত অনাচার ছেড়ে দিয়ে ধর্মপথে চলে এস, তোমার দলবলকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো, তা হলে আর তোমার ভয় নেই।'

নিতাইয়ের পাদপদ্মে দস্যু তার মাথা রাখল।

নিতাইই চৈতন্যহেতু। নিতাইই চৈতন্যসেতু।

রঘুনাথও বুঝল নিতাই না দরজা খুলে দিলে চৈতন্যগৃহে পৌঁছুনো যাবে না। তাই সে চলল নিতাই সাক্ষাতে।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উচ্চভূমিতে জ্যোতির্ময় দেহে নিত্যানন্দ ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছে, রঘুনাথ এসে দণ্ডবৎ করল।

নিতাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'চোর। এত দিন পরে ধরা দিলে?'

চোর? চোর নয় তো কী। নিতাইয়ের সম্পত্তি গৌরচরণ যে নিতে চায় লুকিয়ে, যার সম্পত্তি তাকে না জানিয়ে, সে একশোবার চোর। চুরির যে চেষ্টা করে সেও চোর। কিন্তু চোর হয়েও সে প্রিয়, সে সুজন, সে মনোচোর।

নিজেই রঘুনাথের মাথা কাছে টেনে এনে পা রাখল নিতাই। বললে, 'যখন ধরতে পেরেছি তখন তোমাকে দণ্ড দেব।'

দণ্ড মাথা পেতে নেবার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল রঘুনাথ।

'আমাদের সকলকে দই-চিঁড়া খাওয়াও।'

এই দণ্ড।

মহানন্দে বাড়িতে খবর পাঠাল রঘুনাথ। প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার ও লোকজন আনাল। দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিলে পানিহাটিতে মহোৎসবের মেলা বসবে, যে যা পারো চিঁড়ে দই কলা চিনি ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস, সব রঘুনাথ কিনে নেবে উচিত দামে। আর যেখানে যত ভক্ত আছে, সকলের নিমন্ত্রণ। যে আসবে সেই পরিপূর্ণ প্রসাদ পাবে। সর্বত্র অঢেল, ধনে-জনে কুণ্ঠা নেই কোথাও। শুধু চলে এস। উপস্থিত হও।

পার্ষদেরা অনেকে এসেছে। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গঙ্গাধর, মুরারি, কমলাকর। আর এই যে সদাশিব কবিরাজ। পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাসও এসেছে। সবাই নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী। আর এসেছে গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, মহেশ, উদ্ধারণ দত্ত। আরো কত শত, কে গোণে, কে হিসেব করে?

তিন পঙক্তিতে খেতে বসেছে, বিশজন পরিবেশন করছে, এমন সময় রাঘব পণ্ডিত এল।

রাঘবের বাড়িতেই তো নিতাইয়ের আড্ডা।

আর রাঘবের বিধবা বোন দময়ন্তীই তো প্রভুর জন্যে বারো মাসের ভোগ তৈরি করে ঝালি সাজিয়ে দিচ্ছে। যে সব জিনিস সদ্য নষ্ট হবার নয়, পাকের গুণে এক বছর স্থায়ী হবে সেই সব জিনিস। মকরধ্বজ করের জিম্মায় সে ঝালি প্রতি বছর পৌঁছুচ্ছে নীলাচলে। আর তার নাম 'রাঘবের ঝালি।'

রাঘবকে দেখে নিতাই বললে, 'আমি গোপদের নিয়ে পুলিন-ভোজন করছি। তুমিও বসে যাও।'

এ কি বলরামের ভাবে কথা কইছে নিতাই? সেই যে রাখালদের নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যমুনা-পুলিনে ভোজন করেছিল এ কি সেই স্মৃতি? তবে কৃষ্ণ কোথায়?

নিতাই মহাপ্রভুর ধ্যান করল, আর অমনি মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন।

নিতাই মহাপ্রভুকে নিয়ে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সবাই নিতাইকেই দেখছে, মহাপ্রভুকে দেখছে না। আর প্রত্যেকের মালসা থেকে এক এক গ্রাস চিঁড়ে নিয়ে তাঁরা যে পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছেন তাও বা কে দেখে।

নিজের পাশে আসন পাতল নিতাই। সে আসনে নিমাই বসল। দু'ভাই চিঁড়ে খেতে লাগল।

এমন দৃশ্যও দেখে কোন ভাগ্যবান?

'হরি-হরি ধ্বনি তোলো।' আদেশ করল নিত্যানন্দ।

সন্দেহ কী, রঘুনাথের প্রতি এ নিতাইয়ের অকৃপণ কৃপা। শুধু তার সামগ্রীই অঙ্গীকার করল না, মহাপ্রভুকে উৎসবে টেনে নিয়ে এল। তার অর্থই রঘুনাথকে নিতাই চৈতন্যবরণ দান করলে।

রঘুনাথ কোথায়? সে বুঝি বসে নি।

না, সে বসবে কেন? নিত্যানন্দই ওকে বসতে দেয় নি। নিত্যানন্দ যে তাকে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ খাওয়াবে।

রঘুনাথ জানল এ বুঝি নিত্যানন্দের প্রসাদ। নিত্যানন্দের প্রসাদই তো মহাপ্রভুর করুণার আস্বাদ দিয়ে ভরা।

তারপরে দিনশেষে রাঘবমন্দিরে কীর্তন আরম্ভ হল। নিত্যানন্দ নাচতে লাগল। মহাপ্রভু চলে এলেন সেই নাচ দেখতে। কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া মহাপ্রভুকে কে দেখে?

না, রাঘবও বুঝি দেখল। যখন নিমাই খেতে বসে তার ডান পাশে আরেকখানা আসন পাতল।

সে কী, ওখানে কে বসবে?'

রাঘব বিস্ময় বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখল এ যে স্বয়ং মহাপ্রভু।

রাঘবের ঘরে রাধারমণ প্রতিষ্ঠিত, আর তার প্রসাদ অমৃতের সার যেহেতু অপ্রকাশ্যে স্বয়ং রাধাঠাকুরাণীই সে-ভোগ রান্না করে। মহাপ্রভু যে বারে বারে সে প্রসাদ খেতে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আর যে ভক্ত নিত্য নিয়মিত এমন অমৃত ভোজন করায় তাকে মাঝে-মধ্যে দেখা দিতে দোষ কী।

দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, 'তুমি চৈতন্য গোঁসাইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ববন্ধন খণ্ডন হল।'

'কোথায় চৈতন্য গোঁসাই?' ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

'তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত কখনো গুপ্ত। তিনি যে স্বতন্ত্র ভগবান। কখনো মানুষের মত হাঁটেন কখনো ভগবানের মত আবির্ভূত হন। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না, সংশয়েই সর্বনাশ।'

'না, সংশয় করি না, কিন্তু তিনি না আসুন আমি তাঁর কাছে যাব কী করে?' রঘুনাথ এবার নিতাইয়ের পা আঁকড়ে ধরল। বললে, 'কিন্তু চাঁদ যদি নিজে থেকে নেমে না আসে বামনই বা তাকে ধরে কী করে? যতবার গৃহ ছেড়ে পালাতে যাই ধরা পড়ি, মা-বাবা কঠোর শাসনে বেঁধে রাখে। আমি আর কিছু চাই না, শুধু চৈতন্য চাই, যেন কেউ আমাকে বাঁধতে না পারে, বন্ধনহীনতার চৈতন্য। তোমার কৃপা ছাড়া চৈতন্য অলভ্য, তুমি আমাকে কৃপা করো। জানি আমি অযোগ্য, কিন্তু অযোগ্য-অকৃতীরই তো কৃপালাভে অধিকার।'

'অযোগ্য মুঞিও, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাই, হইয়া সদয়॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও, কর আশীর্বাদ॥'

নিতাই ভক্তবৈষ্ণবদের বললে, 'তোমরা সব দেখ, এর ইন্দ্রসুখের মত বিষয়সুখ, কিন্তু চৈতন্যকৃপায় এতে এর রুচি নেই। যে একবার কৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধ পায় ব্রহ্মলোকের সুখও সে অগ্রাহ্য করে।'

'কৃষ্ণ পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥'

তাকাল রঘুনাথের দিকে। সস্নেহে বললে, 'তোমার পুলিন-ভোজনে চৈতন্য এসেছিলেন খেয়ে গেলেন দই-চিঁড়া। রাত্রে নাচ দেখতে এসে রাধারাণীর রান্না খেয়ে গেলেন। তুমি দু'বারই তাঁর প্রসাদ পেলে। এ সব কেন? তোমাকে উদ্ধার করতেই এই আয়োজন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। গৌরাঙ্গ নেবেন তোমাকে তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য করে।'

তবে আর কথা কী। নিত্যানন্দের সেবার জন্যে ভাণ্ডারীর হাতে রঘুনাথ কিছু অর্থ আর সোনা দিল গোপনে। বললে, 'এখন নয়, প্রভু যখন নিজঘরে যাবেন তখন বলবে।' আর শুধু প্রভুকেনয়, প্রভুর ভৃত্য ও আশ্রিত সর্বজনকেই আমি সেবা-প্রণাম জানাতে চাই।

রাঘব প্রকাণ্ড ফর্দ তৈরি করল। আর যাকে যা বলল তাই রঘুনাথ দিল নির্বিচারে।

'আর এই সামান্য আপনার জন্যে।' রঘুনাথ রাঘবকেও দিল টাকা আর সোনা। সকলের আশীর্বাদ মাথায় করে বাড়ি ফিরল রঘুনাথ।

বাবার কাছে দেওয়া কথা রাখল। এখন দেখি নিত্যানন্দ কেমন তাঁর কথা রাখেন। কেমন গৌরহরি তাকে টেনে নেন অন্তরঙ্গ করে। [ক্রমশ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় ব্রহ্মনাদবলী

বিজ্ঞানই করে যজ্ঞ এবং কর্মের বিস্তার।
সবার জ্যেষ্ঠ এই জ্ঞানরাশি উপাসনা করে,
ইন্দ্রিয়দল সকলে।
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানেন,—তাঁহার চিত্তে।
দেহবুদ্ধিতে উদ্ভূত তাঁর যত আছে পাপরাশি,
দেহেই তাদের ত্যাগ করে তিনি
জ্ঞানরূপে নেন সকল কাম্য ভোগ।
এই জ্ঞানময় সেই মনোময় পুরুষের আত্মা।
সেই জ্ঞানময়ের অন্তরালে আছেন আনন্দময়।
সেই আনন্দেই জ্ঞান পূর্ণ। এই আনন্দময়ও
পুরুষাকার। প্রিয় (অথবা প্রেম) তার
শির। আমোদ দক্ষিণবাহু ও প্রমোদ বামবাহু।
সাধারণ সুখ তার দেহমধ্যভাগ;
আর অদ্বৈত ব্রহ্মেই তার প্রতিষ্ঠা।
এ বিষয়েও অন্য শ্লোক আছে। ২।৫।

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্বস্য। অথাতোঽনু প্রশ্নাঃ—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতি। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্নুতা উ। সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা,—ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়ঞ্চানিলয়ঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

যে মনে করছে ব্রহ্ম অসৎ।
নিজে সেও জেনো মিথ্যা,
যে জানে হৃদয়ে, ব্রহ্ম সত্য,
জ্ঞানীরা তাকেই সত্যস্বরূপ বলে।
আনন্দ সেই জ্ঞানের আত্মা, একথা
স্মরণ করে,—শিষ্য প্রশ্ন করছে,—
মৃত্যুর পরে,—আনন্দলোকে,—
অবোধ কি যেতে পারে? না কি পারে না?
জীবনাবসানে, (আত্মসাধনে)
জ্ঞানীই কি লাভ করে।—
সে মহাসত্য চির আনন্দ, সে পরম আত্মাকে?
না কি করে না?—
(শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরদানের জন্যে ভূমিকা করছেন গুরু)
বহু হব আমি, জন্ম লভিব, নানা রূপে রূপে,
কোটি বিচিত্র জীবনে,—
এই হোল তাঁর কামনা।
এই কামনায় তিনি তপস্যা করলেন।
তপস্যা-করে সৃষ্টি করলেন,—এই সব চরাচর,—
সৃষ্টি করে তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করলেন,
প্রবেশ করে তিনি এই সমস্তই হলেন।
(কার্য-কারণে রইল না আর ভেদ।)
এই সৃষ্টিকে সবদিক দিয়ে, ব্যাপিয়া সর্বরূপে
বিরাজ করেন তিনি।
এই যত কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য রূপরাশি,
এই যাহা কিছু অমূর্ত আর মূর্ত,
কথিত এবং অকথিত ভাব, অনাশ্রয়,-আর আশ্রয়,
এই যাহা কিছু সাধারণভাবে সত্য এবং মিথ্যা
সকলি তাঁহাতে পূর্ণ, এই যাহা কিছু সকলই ব্রহ্মময়॥
ব্রহ্মবাদীরা তাই তাঁর নাম 'সত্য' বলিয়া জানে॥
এ বিষয়ে আরো একটি শ্লোক আছে।

সপ্তমোঽনুবাকঃ

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ রসঃ হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যে বৈষ এতস্মিন্ উদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৩৪।

আগে এ জগৎ অসৎরূপেই ছিল,
অসৎ হতেই সত্য জন্ম নিল।
'অসৎ' হইতে 'জগতে' তাঁহার (প্রকাশের চিরলীলা)
নিজেই নিজের রূপকার, তাই,
সুকৃত তাঁহার নাম।

যিনি 'সুকৃতম' তিনিই পরম রস।
সেই রসভরে এই জীবকুল
চির-আনন্দে মগ্ন।
(রয়েছেন তিনি আকাশে বাতাসে
অণুতে অণুতে লিপ্ত)
আনন্দরসে মর্মে মর্মে, এ আকাশ আছে সিক্ত।

না হলে কেই বা প্রাণে ও অপানে
শ্বাসে প্রশ্বাসে বাঁচত ?

(তিনি রসস্বরূপ বলেই জীবের জীবনে আনন্দ আছে। সেই পরমরসের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, তুচ্ছ, মহৎ বিভিন্ন উপলব্ধিতে জীবের বিচিত্র সুখ।)

ব্রহ্ম সত্য। রয়েছেন তিনি (আকাশে বাতাসে
অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত।)
সাধক যখন অভীক চিত্তে, চিত্ত স্থাপনা করে,
বচন অতীত আশ্রয়াতীত অভয় ব্রহ্ম মাঝে।
পরম অভয় চিত্তে গ্রহণ করে,—
তখনি সে হয় পূর্ণ ব্রহ্মভাবে॥
মুগ্ধ অবোধ অবিবেকী জীব যখনি করেছে,
বিন্দুও ভেদ কল্পনা,—
দ্বিতীয় বিহীন সর্বব্যাপী সত্যব্রহ্ম মাঝে।—
তখনই তাহার হয়েছে (মৃত্যু) ভয়।
মননবিহীন ভেদদর্শীর কাছে।—
অভয় ব্রহ্ম দেখা দেয় ভয় রূপে॥
(এ বিষয়ে আরো একটি শ্লোক আছে॥)

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী

তৃতীয়োঽনুবাকঃ

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি……তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৩

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং যত ইন্দ্রিয়দল,—
প্রাণেরই অধীনে রয়েছে সবাই ক্রিয়াশীল চঞ্চল।
পশু ও মানব প্রাণেরই অধীনে চলে।
প্রাণই জীবন সর্বভূতের ;—তাই তাকে বলে,—
সকলের আয়ু প্রাণ।
ব্রহ্মস্বরূপে এই প্রাণ যারা উপাসনা করে নিত্য ;
পূর্ণ জীবনে তাহাদের অধিকার।
এ প্রাণময়ের আড়ালে আছেন সেই মনোময় আত্মা।
সে মন আবার প্রাণকে পূর্ণ করেছে।
এ মনোময়কে (কল্পনা করে) মানুষের অনুকরে।—
যজুর্মন্ত্র তার শির ;—
ঋক্ দক্ষিণ ও সাম বাম বাহু।
ব্রাহ্মণ তার দেহমধ্যে ;—
অথর্বাদিরসে তার প্রতিষ্ঠা।
এ বিষয়ে আছে আরেকটি শ্লোক (শোন।)

* * *

প্রাণকে যদি সর্বান্তর্গত বায়ুরূপে ধরা যায়, তা হলে দেব অর্থে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা মনে করা যেতে পারে। অগ্নি, ইন্দ্র (বজ্র, বিদ্যুৎ বৃষ্টি) প্রভৃতি দেবতারা বায়ুর সাহায্যেই আপন কর্তব্য সম্পাদন করেন।—কিন্তু এই মন্ত্রে অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহসম্বন্ধী) উপাসনা বিহিত হয়েছে।—

তাই শঙ্করাচার্য বলছেন,—এখানে 'দেব' অর্থে ইন্দ্রিয়দলই বুঝিয়েছে। ইন্দ্রিয়েরা সকলেই প্রাণের দ্বারা বেঁচে থাকে।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ…তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৪

যারে নাহি পেয়ে ফিরে আসে মন,
প্রকাশিতে যারে পারে না বচন,—
ব্রহ্মের সেই পরমানন্দ,
যে জেনেছে,—তার
কিছুতেই নেই ভয়।
এই মন সেই প্রাণের আত্মা।
মনের গহনে আছে বিজ্ঞানময়।
সেই জ্ঞানময়ে পূর্ণ এ মনোময়।
সে মহাজ্ঞানও তেমনি পুরুষাকার।
শ্রদ্ধা এর শির ;—
ঋত (১) এর দক্ষিণ,
এবং সত্য এর বাম পক্ষ।
যোগসমাধি এর দেহমধ্যভাগ।
মহত্তত্ত্বে এর প্রতিষ্ঠা।
এ বিষয়ে আর একটি শ্লোক আছে।

* * *

সেই যে বেদে রূপায়িত মনোময় আত্মা তারো অন্তরে রয়েছেন জ্ঞানময়। অর্থাৎ মনের গভীরে রয়েছে বিশুদ্ধ জ্ঞান,—যার আর এক নাম প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞানের অভিব্যক্তিতেই মনের বিচিত্র প্রকাশ। সেই জ্ঞানকেও মানবদেহ রূপে কল্পনা করেছেন ঋষি। সেই কল্পদেহের বিবিধ অঙ্গের রূপকটি বড় চমৎকার।—

জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞানলাভ হয় না।—তাই শ্রদ্ধাই এর শির। 'ঋত' অথবা শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান এর দক্ষিণ এবং সত্য এর বাম বাহু।—যোগ অথবা ধ্যান এর দেহমধ্য। আর মহত্তত্ত্বেই এর প্রতিষ্ঠা।—মহত্তত্ত্বই তো সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি, অথবা মূল কারণ।

মহঃ বা মহত্তত্ত্ব—সাংখ্যমতে, সৃষ্টিতত্ত্বে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই মহঃ অথবা বুদ্ধি। প্রথমে এক অখণ্ড মহাবুদ্ধির মধ্যে সৃষ্টির সম্ভাবনা নিহিত হয়েছিল — অরূপ ব্রহ্মসত্তা হতে আবির্ভূত প্রথমজ বা প্রথম প্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি বলেও একে বলা হয়। পরে এই অখণ্ড বুদ্ধিতত্ত্ব প্রতি দেহে খণ্ডিত হয়ে সেই আধারের উপযুক্ত হয়ে, বাস্তব ব্যবহারে নিযুক্ত হয়।—

সমাধি ও সাধনার দ্বারা আপন সীমা লঙ্ঘন করে মানুষ বুদ্ধিকে ক্রমশ উন্নততর করতে করতে একসময়ে সেই

[illegible] ব্রহ্মের মহত্ত্বে গিয়ে পৌঁছতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের Supramental '-এর দিকে সাধকের যাত্রাপথের তত্ত্বও বোধ হয় এই মহত্ত্বের দিকে সাধনার যাত্রাপথের কাহিনীর মনোময়ের অন্তরে আছেন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।' সেই জ্ঞানের অন্তর্বর্তী পরমানন্দকে যে জেনেছে সে কখনো ভয় পায় না।

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে।...তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৫
বিজ্ঞানই করে যজ্ঞ এবং কর্মের বিস্তার।
সবার জ্যেষ্ঠ এই জ্ঞানরাশি,
উপাসনা করে ইন্দ্রিয়দল সকলে।
জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহার চিত্তে,—
দেহবুদ্ধিতে উদ্ভূত তাঁর যত আছে পাপরাশি,—
দেহেই তাদের ত্যাগ করে তিনি,—
জ্ঞানরূপে নেন সকল কাম্য ভোগ ॥৫

এই জ্ঞানময় সেই মনোময় পুরুষের আত্মা।
সেই জ্ঞানময়ের অন্তরালে আছেন আনন্দময়।
সেই আনন্দেই জ্ঞান পূর্ণ। এই আনন্দময়ও
পুরুষাকার।—প্রিয় (অথবা প্রেম) এর শির।
আমোদ দক্ষিণ বাহু ও প্রমোদ উত্তর বাহু।
সাধারণ সুখ তার দেহমধ্যভাগ ; আর
অদ্বৈত ব্রহ্মই তার প্রতিষ্ঠা

এ বিষয়ে অন্য একটি শ্লোকও আছে।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—চিত্রিতা দেবী

হৃদ্‌যন্ত্রকে সুস্থ রাখতে হলে

পরিশ্রম দুর্বল হৃদযন্ত্রের পক্ষে অ[illegible] ক্ষতিকর। এ ধরণের একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। শরীরের অপরাপর অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়েই হৃদ্‌যন্ত্রটি অনেক সবল, নিয়মিতভাবে শরীরে রক্ত ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন বায়ু সঞ্চালন করাটাই এর প্রধান কাজ, আর অবিরাম চালনার ফলে স্বভাবতই এর শক্তিও সমধিক। হৃদ্‌-যন্ত্র বা হার্ট মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত এবং ব্যায়ামে শরীরের সমস্ত পেশী সমূহেরই যেমন পুষ্টিলাভ হয়, এরও তেমন পুষ্টি হয়। কিন্তু অত্যধিক ব্যায়াম আবার হৃদ্‌যন্ত্রের কালস্বরূপ, সেক্ষেত্রে শরীর ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট। অত্যধিক উত্তেজনার ফলে চৈতন্য লোপ বা মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয় কিছু। বছর চল্লিশ আগেও চিকিৎসকরা হার্ট সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতেন না বললেও মিছে বলা হয় না। কিন্তু আজ আর সেকথা বলা চলে না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সি জে ব্রুকস্ যাঁকে বৃটিশ সমর বিভাগ এক জঙ্গী যোয়ান বলেই জানত ; দস্তুরমাফিক চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষিত হন, তখন তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রটির অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয় এবং সর্বপ্রকার শ্রমসাধ্য কাজ থেকে তাঁর বিরত থাকাই নাকি উচিৎ। সামরিক দায়িত্বভার থেকে অক্ষম বলে তাঁকে অব্যাহতিও দেওয়া হয়, কিন্তু স্বভাবত কর্মঠ ব্যক্তি বলে তিনি চিকিৎসকদের কথায় নিষ্ক্রিয়তা বরণ করতে রাজি হন না, ডাক্তারদের মুখের উপর তিনি সে কথা জানাতেও নাকি দ্বিধা করেন নি বিন্দুমাত্র। কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে বাধ্য হলেও জেনারেল তাঁর অভ্যস্ত ক্রীড়া কোনদিনই ত্যাগ করেন নি এবং পরে তিনি একবার এভারেষ্ট শৃঙ্গ বিজয়ের অভিযানেও নেতৃত্ব করেছিলেন সোৎসাহে। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরণের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শারীরিক শ্রম হৃদ্‌যন্ত্রকে জখম তো করেই না বরং সবলতর করে তোলে। বস্তুত আজকের দিনে হৃদ্‌রোগে যত সংখ্যক মৃত্যু ঘটে থাকে, তার শিকার হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের উপরতলার মানুষরা—দৈহিক শ্রম যাদের প্রায় অচেনা। এর থেকে মনে হয়, অত্যধিক সুখাদ্য গ্রহণ ও শ্রমহীন জীবনযাপন প্রণালীই হৃদ্‌যন্ত্রকে ক্ষয়ের পথে ঠেলে দেয়। 'করোনারি থ্রম্বোসিস্' নামক ভয়াবহ রোগটির কবলেও পড়েন এই ধরণের মানুষরাই বেশিরভাগ। দৈহিক শ্রম এ রোগের জন্য মোটেই দায়ী নয়, কারণ তাহলে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষদের ঘরে এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা এত অল্প কেন? অতএব হৃদ্‌যন্ত্রকে সুস্থ রাখতে হলে পরিমিত পানাহার আর নিয়মিত শরীর চালনা যে অত্যাবশ্যক, একথা অস্বীকার্য। শরীর চালনার মতই পানভোজনে সংযত হওয়াটাও একান্ত আবশ্যক, না হলে বহু এ্যাথলেটের মত আপনার আমার হৃদযন্ত্রটিও বিনা নোটিশে হঠাৎ ষ্ট্রাইক করে ফেলতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। সমসাময়িক ক'জন বিখ্যাত চিত্রতারকার আকস্মিক পরলোকগমনই উপরোক্ত কথার সাক্ষ্যবাহী। ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্, ক্লার্ক গেবল্, এরল, ফ্লিন প্রভৃতি ভুবন বিখ্যাত নামগুলির সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে, যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়ামাদি করা সত্ত্বেও এঁরা প্রত্যেকেই হৃদরোগের শিকার হয়ে প্রায় অকালেই এ দুনিয়ার দুনিয়াদারী শেষ করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে সংযমের কোন বালাই-ই ছিল না এঁদের ; মদ্যপান, অত্যধিক স্ত্রী-সম্ভোগ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলাই এঁদের অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। সুস্থ শরীরে সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হতে হলে পরিমিতিবোধই তাই আপনার, আমার ও অন্যান্য সকলের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। ভুলবেন না, নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিমিত পানাহার হৃদ্‌যন্ত্রকে সুস্থ রাখতেও অপরিহার্য।
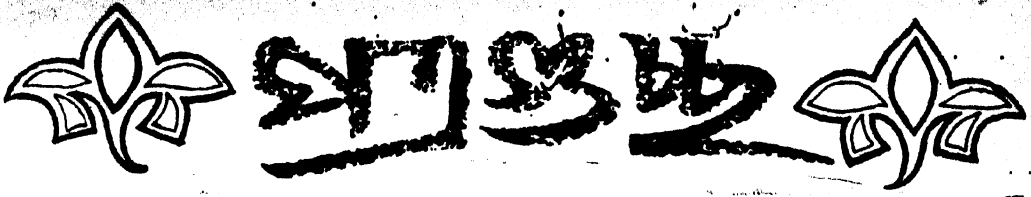
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

মান্দালয় জেল
১২।৮।২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার 'স্মৃতিকথা' তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় অপূর্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্কা করেছেন। বাস্তবিক 'পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশি।' এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তাঁর অনুগ্রহ, কর্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল—'একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই; পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।' বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে তা'হলে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয়, 'অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ।' আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে।···'আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।' প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না ক'রেও পারতেন না। আর তিনিও মতনির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্য চরিত্র বিচার করতে দেখি নি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বলিতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় 'রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচে গেছে।'

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন—'লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি-গালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা।' সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানা প্রকার অসত্যে এবং অর্ধসত্যে বাঙলার সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে দু' কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়িতে এক সময় লোকে ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ির পূর্ব গৌরব ঘুরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল,—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা বাহিরের লোক জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার—এই দুয়ের চাপে তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য ক'রতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খৃঃ 'ধর-পাকড়ের সময়ে স্থিরসঙ্কল্প করেছিলেন যে, একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে

না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এইরকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক চলে, কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারি নি। শেষে তিনি বলেন, 'এটা আমার আদেশ—পালন করতে হবে।' তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা(৩) বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা(৪) তখন বাগ্‌দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কি না—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল, তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থ, তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব প্রথমে ভোম্বল(৫) যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও উর্মিলা দেবী(৬) যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে মুহূর্তে আসবে তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে। আমার মনে হয় যে, মহাপুরুষের মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশি ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বসুমতী'তে, আমি দেশবন্ধুর সহকর্মী ও অনুগত কর্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ, কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা বলিতে পারি না।······দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা ও তাঁর অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা'হলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশি দাবী করি যে, কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকলমা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না, অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশিদিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে-দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যে যে সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি,—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতাম না সোনার বাঙলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

'সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে ওঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্তত এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙলার মাটি, বাঙলার জল—বাঙলার আকাশ, বাঙলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

কেন এ পত্র লিখে ফেললুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কখনও মনে আসে নি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসতে লিপিবদ্ধ করলুম। যখন লিখে ফেলেছি তখন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখি না, যদি উত্তর দেন এই আমার ঠিকানা দিলুম—

C/0, D. I. G. I. B. C. I. D,
13, Elysium Row.
Calcutta.

৩। অপর্ণা দেবী (১৮৯৮)।
৪। শ্রীমতী কল্যাণী দেবী (১৯০১)।
৫। দেশবন্ধু-পুত্র চিররঞ্জন দাশ (১৮৯৯—১৯২৮)।
৬। দেশবন্ধু-অনুজা (১৮৮৩-১৯৫৬)

অগ্রজ দেশনায়ক শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল
৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মিঃ মোবার্লীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত তাহা জানিবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবারও সময় আসিয়াছে। আমার মতের সহিত আপনাদের মত মিলিবে কি না জানি না; তবু আমার মতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

আমি মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব বার বার অতি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উচ্চারিত প্রতি শব্দ প্রতি কথা বার বার করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার বক্তব্যে বাক্য সংযোজনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সকল দিক অতি ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন করিতেছি, ক্ষণিক ঝোঁকের বশে হঠাৎ কোনও নির্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা বার বার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিংবা আমার তর্ক-নীতিতে যদি কিছু যোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্বিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মিঃ মোবার্লীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি এবং আমার মনে হয়—তাঁহার ন্যায় আমিও যদি স্পষ্টভাবে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে, আমার কর্তব্যও যথাযথরূপে পালিত হইবে না। স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাখুলি বলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই সর্বাপেক্ষা উপকার দর্শায়।

মিঃ মোবার্লীর কয়েকটি কথায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমার অতীত কার্যকাহিনী বা ভবিষ্যৎ কার্যপন্থার কোন স্বীকারোক্তি চাহেন না—যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমি যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার নিকট উপাপিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে সকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম তিনি আমাকে আত্মসম্মানবিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাঁহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্যরূপে আমি মাননীয় সভ্যের এরূপ ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় কাউন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থা-স্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথমেই উপস্থাপিত করার নিদর্শন বোধ হয় ইহাই প্রথম।

আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দূরীভূত করিতে চাই—ছোটদাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূর্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন কথা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূর্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম।

ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার পর যখন তিনি তাহা আমাকে জানাইলেন আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না এবং পরে আমার এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোটদাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অনুমোদনের কিরূপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সরকারই বা এ অনুমোদনকে কিরূপ রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না; তজ্জন্য আমিও তাঁহার এ কার্যের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার কয়েকজন রোগী সুইস্ স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অন্যান্য যক্ষ্মারোগীকেও যেরূপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান রোগী সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বাস ও শুশ্রূষার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনরূপে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার প্রদত্ত রোগ-বিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কর্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।' আমার জানিতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে 'অত্যধিক পীড়িত' বা 'একেবারে কর্মশক্তিহীন' মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, সেই দিন কি? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগ-বিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহুত তাহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাড়িতে যাইতে দেওয়া হইবে না। বা বিদেশে যাইবার পূর্বে আমি আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, আমি যে জাহাজে যাইব তাহা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে যতদিন অর্ডিনান্স আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃতপক্ষে বলিয়াছেন যে, দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে। তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিংবা (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জনের চেষ্টা ও অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই দুয়ের মধ্যে অন্য কোন মধ্যপন্থা অবশিষ্ট নাই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরেও পুনরায় নূতন করিয়া আলোচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি আই ডি পুলিশের কর্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয় এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইনে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয় তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়িভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ নির্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সুইট্জারল্যাণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল সি আই ডি বিচরণ করে, ভারত সরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত এবং যতদিন না মত পরিবর্তন করিয়া পুলিশ গোয়েন্দা হইতেছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে, এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে।

সুইট্জারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বৎসর মিঃ লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অর্ডিনান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাঁহাদের ভারতে ফিরিতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতের পার্লামেন্টের ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিশের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্যতৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন, আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন, তাঁহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকার পক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেনিনগ্রাড পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমার সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনিলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বার বার মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি ভারতে বৃটিশ শাসনরক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙলা দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াও সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি?

যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেসীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন আমি আমার নিজ জীবন ও কার্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃতই সেইরূপ নহি। আমি বাঙলার বাহিরে কোন রাজনীতিক কার্য করি নাই এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না, কারণ বাঙলাকেই আমি আমার কার্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙলা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কার্যে বাঙলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে? সিংহল ত' খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত সরকারের নিষেধ-আজ্ঞা আইনানুসারে তথায় খাটিবে কি না সন্দেহ। [আগামী সংখ্যায় চলবে।

[এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ও শিশিরকুমার বসু কর্তৃক সঙ্কলিত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী হইতে গৃহীত]

I've never met a man I didn't like.

—*Zsa Zsa Gabor.*

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

[লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, প্রবীণ চিত্র পরিচালক]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় দশকের সূত্রপাত। বাঙলা সাহিত্যের সমগ্র গগন জুড়ে সেদিন দ্বাদশ আদিত্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের মহিমান্বিত ব্যাপ্তি। রবীন্দ্র—আদর্শের পবিত্র ধারায় আলোকস্নাত যে স্বপ্নময় শক্তিমান তরুণবৃন্দ সেদিন বাঙলা সাহিত্যের পুষ্টি, সমৃদ্ধি ও গৌরব বিবর্ধনের সঙ্কল্প নিয়ে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হলেন আজ তাঁদের অনেকেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে যাঁরা এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান—বর্ষীয়ান সাহিত্যশিল্পী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁদেরই অন্যতম। সেদিনকার তরুণ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আজ জীবনের একটি শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশে উপনীত। সাহিত্য জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অর্ধশতাব্দীরও বেশি। এই সময়ের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের উন্নয়নে তাঁর অবদানও অল্পমূল্যের নয়।

প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ও সাহিত্যপ্রেমী স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম ১৮৯০ সালের ১লা জানুয়ারী জন্মস্থান ফরিদপুর। ঢাকা বিক্রমপুর আদি নিবাস।

ডাফ স্কুল, কেশব একাডেমী, সিটি কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম বয়েজ বোর্ডিং এণ্ড ডে স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছেন তিনি, কিন্তু এতগুলি বিদ্যালয়ের কোনটিই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। অধ্যয়ন এবং সাহিত্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ তাঁর আবাল্য স্বপ্ন, কিন্তু বাঁধাধরা যান্ত্রিক নিয়মের অধীনে পুঁথিগত বিদ্যাব্যবস্থার সঙ্গেই তাঁর বিরোধ—তাই মন যখনই হাঁফিয়ে উঠত বাড়ি থেকে সরে গিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলতেন। এই তাঁর বিদ্যাকৃত্য জীবনের ইতিহাস। তারপর কর্মজীবনের সূচনা। কার মহলানবীশ কোম্পানীতে কর্মী হিসাবে যোগ দিলেন তিনি। তার পূর্বে কেশব একাডেমী ও এ্যালবার্ট স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। বাণিজ্যক্ষেত্রেও তিনি অর্জন করেছেন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। দুগ্ধ, ঘৃত, বিনামা, সিগারেটের ব্যবসায়ে তিনি এককালে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 'ভারতী' গোষ্ঠীর ইনি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সেদিন যে শ্রদ্ধেয় সাহিত্য নায়কবৃন্দ এবং উদ্যমশীল তরুণ সাহিত্য-ব্রতীদের সমন্বয়ে ভারতী গোষ্ঠী রূপ নিয়েছিল প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সেই তালিকায় একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। আনুমানিক ১৯১৮ সাল থেকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভারতী বৈঠকে যোগ দিতে শুরু করেন। সেই সময়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয় তারপর পরিণত হয় এক অন্তরঙ্গতায়। ১৯৫১ সালে তাঁর রচিত তখত-এ-তাউস নাটকটি মঞ্চস্থ করেন শিশিরকুমার। জাহাঙ্গীর শাহের ভূমিকায় স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে বাঙলার অগণিত দর্শককুলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলেন শিশিরকুমার তাঁর ঈশ্বরদত্ত অনবদ্য অভিনয় প্রতিভায়। শিশিরকুমারের জীবনেও এই নাটকটি বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। তখত-এ-তাউস নাটকটি শিশিরকুমারের প্রযোজনার শেষ উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নাটকটি অবশ্য রচিত হয়েছিল বহু পূর্বে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় নাটকটি মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ভারতী গোষ্ঠীতে প্রেমাঙ্কুরের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ছেলেবেলার বন্ধু, সতীর্থ, বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম মহারথী স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মধ্যস্থতায়। বিগত যুগের সাহিত্যিকদের এক প্রধান আকর্ষণ ছিল স্বর্গত গজেন ঘোষের বাড়ির বৈঠক। সেই বিখ্যাত সাহিত্যিক বৈঠকটির প্রতিষ্ঠাতা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চা ও নাট্যানুশীলন চলেছে। বাড়ির গ্রন্থাগার তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, জুগিয়েছিল প্রেরণা—দিয়েছিল অফুরন্ত উৎসাহ। বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকাও তাঁর সাংবাদিক প্রতিভার স্পর্শলাভ করেছে। পাক্ষিক বৈঠক, মাসিক যাদুঘর, হিন্দুস্থান, সঙ্কল্প এবং ভারতবর্ষ পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাপ্তাহিক 'নাচঘর'-এর তিনি সম্পাদক ছিলেন। বেতার জগৎ পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক।

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র জগতের গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর সহায়তাও উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ শিল্পী ও সুদক্ষ পরিচালক চারু রায়ের সহকারী হিসাবে তিনি ছায়াজগতে প্রবেশ করেন। 'দেনা পাওনা' তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি। এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অপরাজেয় অভিনেতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবীণা শিল্পী শ্রীমতী নিভাননী দেবী। কপালকুণ্ডলা, পুনর্জন্ম ইহুদী-কা-লেড়কী, সুবে-কি-সিতারা ছবিগুলি তাঁর পরিচালন কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। পুনর্জন্ম ছবিটিতে অভিনেতারূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। চলচ্চিত্রজগতের অগণিত দিকপাল শিল্পী ও কুশলীবৃন্দের অনেকেই তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছেন এবং তাঁর অধীনে শিক্ষালাভ করেছেন।

সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ কম নয়। করমতুল্লা খান ও ককুভ খানের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছেন তিনি।

বাজীকর, অচল পথের যাত্রী, ডানপিটে, ঝড়ের পাখি, দুই রাত্রি, চাষার মেয়ে, আনারকলি, সোনার চাবি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সৃজনী-শক্তির কয়েকটি নিদর্শনমাত্র। 'মহাস্থবির' ছদ্মনামের অন্তরালে তাঁর জাতক গ্রন্থমালা বাঙলা সাহিত্যকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে।

অর্ধশতাব্দীরও আগে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন ঘটেছে। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান সে বন্ধনকে আজও শিথিল করতে পারে নি। তাঁর লেখনী আজও সচল। সাহিত্য পাঠকের পিপাসা নিবারণে আজও তিনি মুক্তহস্ত।

রাজা বিনয়েন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

[কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ ও সহ-পৌরপাল]

সকল ক্ষেত্রে না হ'লেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজনের নামের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতি অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে। এই ধারণা যে নিছক ভ্রান্ত নয় তার উজ্জ্বল প্রমাণ সন্তোষের রাজা বিনয়েন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বিনয়ের সঙ্গে সৌজন্যবোধ, আন্তরিকতা এবং সদালাপিতা প্রভৃতি মহৎ বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের করুণাময় হস্ত থেকে অবিরামধারায় তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়ে তাঁকে সামগ্রিকভাবে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

সন্তোষের জনহিতব্রতী ও বিদ্যোৎসাহী এবং বদান্য ভূস্বামী স্বর্গীয় মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান বিনয়েন্দ্রনাথের যখিদিতে যেদিন জন্ম হল বর্তমান শতকের বয়েস তখন মাত্র দশদিন। বাঙলার স্মরণীয় কবি স্বর্গীয় প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন মন্মথনাথের অগ্রজ। শিল্পের যাদুকর অসাধারণ শিল্পস্রষ্টা রবীন রায় (রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী) ও স্পেনের সহ-বাণিজ্য প্রতিভূ (ভাইস কনসাল) প্রীতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বিনয়েন্দ্রনাথের অনুজদ্বয়।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল শিক্ষালাভ করেন বিনয়েন্দ্রনাথ। ১৯১৮ সালে হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই-এ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ বি-এ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ও আইনের ডিগ্রীও হল অর্জিত। এম-এতে পঠিতব্য বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি। তারপর বিলাত যাত্রা। লিঙ্কনস ইনস থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন (১৯২৯)। বিদেশে থাকার সময় ইয়োরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তিনি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছেন।

রাজা বিনয়েন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

দেশে ফিরে এসে ব্যারিস্টার হিসাবে যোগ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। ব্যারিস্টার হিসাবে প্রথম জীবনে ইনি প্রখ্যাত আইনবিদ বটুক ঘোষ ও জননায়ক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছুকাল সহকারী ছিলেন। ১৯৩০ সালে পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে যে দু'জন বাঙালী হিন্দুকে সরকার মনোনীত করলেন তাঁদের একজন ভারতের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বিশ্বাস অপরজন বিনয়েন্দ্রনাথ। সরকার কর্তৃক পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ পর্যন্ত দীর্ঘ সতেরো-আঠারো বছর একাদিক্রমে বিনয়েন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন পৌর প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে। সরকার কর্তৃক পরিচালনভার গ্রহণের প্রস্তাবটিও তাঁরই। পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রায় প্রতিটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। কলকাতার সহ-পৌরপাল হিসাবেও তাঁকে একবার দেখা গেছে। সেবার পৌরপালের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন পশ্চিম বাঙলার প্রথম অর্থমন্ত্রী দিক্‌পাল অর্থনীতিবিদ স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকার। পৌর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাঙালীদের সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য বেঙ্গলি এক্স সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি হিসাবে আন্দোলন শুরু করেন। বৃটিশ সরকারকে সেদিন বাধ্য করিয়েছিলেন তিনি ভারতীয় উপকূল প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা ঘটাতে। সিক্সটিনথ বেঙ্গলি ব্যাটেলিয়ান (টেরিটোরিয়াল ফোর্স) তাঁর কর্মশক্তির এক অত্যাশ্চর্য ফল। যুদ্ধের সময়ে তাঁকে দেখা গেল ডেপুটি কম্যাণ্ডার অফ সিভিক গার্ড এবং চীফ এয়ার রেড ওয়ার্ডেন রূপে। দেখা গেল চীফ এয়ার-রেড ওয়ার্ডেনস কমিটির সভাপতিরূপে। তাঁর কর্মকুশলতা, সাংগঠনিক শক্তি এবং কার্য পরিচালন দক্ষতা সেদিন এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল, তাঁকে ভরিয়ে তুলেছিল জনসাধারণের মুঠো মুঠো অভিনন্দনে।

১৯৬২ সালে মহানগরীর শেরিফের আসনে সমাসীন ছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথ। হাইকোর্টের ইতিহাসে তাঁর আমলে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা থেকে সেই প্রথম দেখা গেল যে—সেবার সেসানে কোন মামলা ছিল না, বিলাতে এ জাতীয় ঘটনা ঘটলে সেসানের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতিকে 'হোয়াইট গ্লাবস' প্রদান করা হয়। তিনি শেরিফ থাকা সময়ে এই ঘটনা সর্বপ্রথম ঘটায় সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে 'হোয়াইট গ্লাবস' প্রদান করা হয় এবং এই প্রথা প্রবর্তিত হয়। তিনি শেরিফ থাকাকালীন কলকাতার হাইকোর্টের বয়ঃক্রম একশ' বছর পূর্ণ হ'ল।

১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার মহারাজকুমার বিনয়েন্দ্রনাথকে রূপান্তরিত করলেন রাজা বিনয়েন্দ্রনাথে। সেই সময় পশ্চিম বাঙলার বর্তমান এ্যাডভোকেট জেনারেল সুধাংশুমোহন বসু 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হলেন।

বাঙলার অন্যতম সুসন্তান বিনয়েন্দ্রনাথ বাঙলায় শিল্পকলার [illegible]

দিয়ে দেশীয় প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করে তাঁর শিল্পোৎসাহিতার নিদর্শন দেখালেন। কলকাতায় স্যার আশুতোষের সুবিখ্যাত মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা ঘটান মহারাজা মন্মথনাথ। মূর্তি নির্মাণের জন্য ইতালীয় ভাস্কর নিযুক্ত করা হচ্ছিল। বিনয়েন্দ্রনাথ বললেন—বাঙলা দেশে অবস্থিতব্য বাঙলার গৌরব আশুতোষের মূর্তি নির্মাণের ভার বাঙালী ভাস্করকেই দেওয়া হোক—দেশের প্রতিভাকে বহেলা করে বিদেশীর শরণাপন্ন হওয়ার সার্থকতা কি? পুত্রের যুক্তি পূর্ণ এবং দেশপ্রীতির পরিচায়ক কথাগুলি অন্তরস্পর্শ করল গ্রাহী মহারাজা মন্মথনাথের। আশুতোষের মূর্তি নির্মাণের ভার পেলেন বিদগ্ধ ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

কলকাতার রয়্যাল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি, ক্যালকাটা সিটিজেনস এ্যাসোসিয়েশান, অটোমোবাইল এ্যাসোসিয়েশান, ক্যালকাটা টেবিল টেনিস ক্লাব (প্রথম মেট্রোপলিটান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের আয়োজক) সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়াও আরও অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। কয়েকটি বিখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম কর্ণধার।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

[বাঙলা ভাষার ব্যাপক প্রসারের ইতিহাসে একটি বিশেষ নাম]

গণনাতীত স্রষ্টার সাধনাদীপ্ত, অতুলনীয় গৌরব ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ, মহামূল্য রত্নভাণ্ডারে গরীয়সী, রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা বাঙলা ভাষাকে সারা ভারতের ঘরে ঘরে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকায় ভারতের প্রতিটি নগরে, গ্রামে, জনপদে, আবালবৃদ্ধবনিতার দরবারে পৌঁছে দেওয়া ও ভারতের নরনারীকে অমৃতরসনিঃস্যন্দী বাঙলা ভাষা সম্বন্ধ সচেতন করে তোলা নিঃসন্দেহে এক মহান ও পবিত্র দেশপ্রেমেরই নামান্তর মাত্র। এই মহাযজ্ঞের ঋত্বিক দেশ ও জাতির অভিনন্দনের এক সার্থক ও সুযোগ্য অধিকারী, বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধির ও কল্যাণসাধনের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও কম গুরুত্বের নয়। এই তালিকায় জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

১২৯৪ বঙ্গাব্দের শ্যামাপূজার দিন (১৮৮৭ অক্টোবার) জ্যোতিষচন্দ্রের জন্ম হয় পদ্মপুকুর রোডের ৩৬ সংখ্যক বাড়িটিতে। বজবজ থানার অন্তর্গত বাওয়ালীর নিকটস্থ চাউলখোলা গ্রামে আদিনিবাস, পিতৃদেব স্বর্গত গোপালচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। মেদিনীপুরে অতিবাহিত হয় বাল্যজীবন। সেখানকার টাউন স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন জ্যোতিষচন্দ্র। ১৯০৩ সালে ভর্তি হলেন কলকাতার হিন্দু স্কুলে। সহপাঠী হিসাবে পেলেন জননায়ক ও সাহিত্য—নাটকপ্রেমী স্বর্গত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং কালীপ্রসাদ খৈতানকে। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী রসময় মিত্রের অনুপ্রেরণায় মন আকর্ষিত হয় সাংবাদিকতায়।

হাতে লেখা পত্রিকা 'স্টার'-এর প্রকাশে সহযোগিতা পান বন্ধু নির্মলচন্দ্র ও কালীপ্রসাদের। এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির নেতা শচীন বসু (এঁর সহধর্মিণী ছিলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী বসু) ছাত্রবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয় বর্জনের আহ্বান জানালেন। সেই আহ্বানে সেদিন সাড়া দিয়েছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র। জ্যোতিষচন্দ্রের জীবনে গতানুগতিক, পুঁথিগত শিক্ষার সেইখানেই সমাপ্তি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের যোগ। সেখানকার অন্যতম সহকারী সম্পাদকের আসনেও তিনি কিছুকাল সমাসীন ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসর'-এর সঙ্গেও তিনি ১৯৩৬ সাল থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, নারীশিক্ষা সমিতি, ব্রতচারী সঙ্ঘ, সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ প্রভৃতি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে গ্রন্থ প্রদর্শনী ব্যবস্থার তিনিই প্রথম প্রবর্তক।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি তাঁর জীবনের এক অবিনশ্বর কীর্তি। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের এক সম্পদস্বরূপ। আজ ভারতে সে সুপ্রতিষ্ঠিত, আত্মনির্ভরশীল কিন্তু তার জন্মলগ্নে তার চারপাশে এত আলোর সমারোহ ছিল না। সেদিন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক জ্যোতিষচন্দ্রের একক প্রচেষ্টায় এর পরিচর্যা চলেছিল, সময়ের অগ্রগমনে এই মহৎ সাধনা ক্রমে ক্রমে সম্মুখীন হতে লাগল খ্যাতি, যশ, প্রসিদ্ধির দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম, সারা ভারতে তার জন্যে দুয়ারগুলি একে একে উন্মুক্ত হতে লাগল, এগিয়ে এলেন অনেক গুণী, অনেক কর্মী, জ্যোতিষচন্দ্রের এই অনলস তপস্যা ও দুষ্কর সাধনাকে সফল করে তুলতে। 'ভাষা ভারতী' এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। এই সুসম্পাদিত পত্রিকাটি অবাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের সুপাঠ্য বাংলা রচনায় সমৃদ্ধ। ভারতের মোট পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও গ্রন্থাদি তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁরই উদ্যোগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহদাস আগরওয়ালার অর্থে 'নরসিংহদাস আগরওয়ালা বাংলা পুরস্কার' এবং বাঙলার অবিস্মরণীয় মহিলা কবি স্বর্গীয়া লীলা দেবীর পিতৃদেব ঠাকুর পরিবারোদ্ভূত স্বর্গীয় রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থে 'লীলা পুরস্কার' দেওয়া হয়ে থাকে।

এ ছাড়া ভারতের আরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন পুরস্কার প্রবর্তন তাঁরই উদ্যোগ ও সাধনার এক অমলিন দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতে নানাস্থানে তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য বঙ্গভাষা শিক্ষাকেন্দ্র। শুধু অবাঙালী নয় অভারতীয়েরাও দলে দলে এইসব শিক্ষাপীঠগুলিতে বাঙলা ভাষার পাঠ নিচ্ছেন। এই সব শিক্ষাদান পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্নাতকবৃন্দ অভিজ্ঞানপত্র পেয়ে থাকেন তাঁদের সার্থকতার স্বীকৃতিস্বরূপ।

বাঙলা ভাষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর এই দুর্বার সাধনা ভাবীকালের ইতিহাসে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[কলকাতার পৌরপাল]

'সত্যি কথা বলতে কি জনজীবনে আসার অর্থাৎ পাবলিক ম্যান হওয়ার কোন উদ্যোগ আমার দিক থেকে ছিলই না, অথচ ঘটনাচক্রে দেখ···' কালীঘাটের বাড়ির দোতলার হলঘরে বসে সেদিন এক উজ্জ্বল প্রভাতে কথাগুলি বলছিলেন কলকাতার পৌরপাল শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বাড়ির অপর পারেই পুণ্যতীর্থ কালীঘাটের শ্রীমন্দির। দোতলার হলে বসে পুণ্যভূমি কালীঘাটের সমুন্নত শীর্ষটি দেখা যাচ্ছে।

ভবিতব্য ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিল না তাঁর অর্থাৎ লোকলোচনের অন্তরালে তাঁর থাকা হল না, বলা বাহুল্য তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না হওয়া আমাদের কাছে অনেক খুশির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'লে বাঙলা দেশ আজ পেত না তাঁর মত একজন অনলস কর্মী, নিষ্ঠাবান সংগঠক, জনকল্যাণব্রতী সমাজসেবীকে।

সদালাপী, নিরহংকার, বন্ধুবৎসল মানুষটি পৌরপাল হিসাবে আজকের দিনে সর্বাধিক পরিচিত হলেও আইনজ্ঞ হিসাবেও তিনি অর্জন করেছেন প্রভূত সুনাম, সাংবাদিক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী।

বিগত যুগের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যকার পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের প্রপৌত্র চিত্তরঞ্জনের জন্ম ১৯০৩ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে। পিতৃদেবের নাম ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পরলোকগত স্বত্বাধিকারী এবং মাসিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কলকাতার প্রাক্তন পৌরপাল, বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান।

চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

তালতলা এম ই স্কুল ও বহুবাজার হাইস্কুলে পাঠান্তে ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমীর ছাত্র হিসাবে তিনি উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯২০ সালে। দু'বছর পড়লেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ডিস্টিংসন নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে। ১৯২৬ সালে অর্থনীতিতে (খ বিভাগ) এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সসম্মানে। এম-এতে বিশেষ পঠনীয় ছিল আন্তর্জাতিক আইন। ১৯২৮ সালে অর্জন করলেন বি-এল ডিগ্রী। ১৯২৯ সালে আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি যোগ দিলেন আলীপুর আদালতে।

তিন বছর পর প্রবেশ করলেন সাংবাদিক জগতে। ১৯৩২ সালে যুক্ত হলেন এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত উক্ত সূত্রে থাকতে হল বোম্বাই। ঐ সময় তিনি মধ্যপ্রদেশে বদলী হলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে, ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত ছিল। সাংবাদিক-কুশলতার স্বীকৃতিস্বরূপ ঐ সময়ে তিনি ভার পেলেন ইণ্ডিয়ান নিউজ এজেন্সীর। সংবাদপত্রে প্রকাশের পূর্বে সরকারী মহলে বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি পূর্বাহ্ণে পৌঁছে দেওয়ার ভার ছিল এই প্রতিষ্ঠানের। এই গুরুদায়িত্ব তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কুশলতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন, কিন্তু বাধা দিলেন গর্ডন সাহেব। তিনি রাজ্যপাল হয়েই এই প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে না পেরে তাকে বাতিল করে দিলেন, কলকাতার ছেলে ফিরে এলেন কলকাতায়। নিযুক্ত হলেন অন্যতম সহকারী সম্পাদক। আবার বেরোতে হল ঘর ছেড়ে। কর্মভার দিয়ে তাঁকে পাঠান হ'ল পাটনায়। পাটনাতেই তাঁর সাংবাদিক জীবনের সমাপ্তি। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে আইনজগতে পুনঃপ্রবেশ, ছিন্ন হয়ে যাওয়া সূত্র আবার জোড়া লাগল ও সেই যোগসূত্র আজও অটুট। কলকাতার অন্যতম দক্ষ আইনজ্ঞ হিসাবে আজ তিনি প্রসিদ্ধ।

কলকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হ'ল ১৯৫২ সালে। সরকারের হাত থেকে পৌরপ্রতিষ্ঠান আবার যখন কর্মপরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন সেই সময় চিত্তরঞ্জন নির্বাচিত হলেন অন্যতম পৌরপিতা। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে মেয়রের ঐতিহাসিক আসন অলঙ্কৃত হ'ল তাঁর দ্বারা।

জনজীবনে ব্যাপকভাবে আজ তিনি যুক্ত। সাধারণের কল্যাণকর অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি দেশ ও জাতির সেবা করে চলেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সদস্য। কলকাতা যাদুঘর ও মহাজাতি সদনের তিনি আছেন। কালীঘাট মন্দির কমিটী এবং চিড়িয়াখানার কার্য পরিচালন সমিতির তিনি সদস্য। এ ছাড়া আরও বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং উপদেশনায় পরিচালিত হয়ে দেশের কল্যাণ করে চলেছে।

আইন জগতের অন্যতম মহারথী স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতমা ভ্রাতুষ্পুত্রী ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

সবুজ দ্বীপ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রতিভা গুপ্ত

আরেকবার বুশপুলিশ জারোয়াদের তাড়া দিতে দিতে তাদের গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিল। একটি জারোয়া স্ত্রীলোক তিনটি বাচ্চা নিয়ে পালাতে পারে নি। পুলিশরা তাকে অনেক খাবার-দাবার খাইয়ে তার গ্রামে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। কিছুদিন পর তারা আবার জারোয়া এলাকার কাছাকাছি যেতে দেখতে পেল সেই আগের স্ত্রীলোকটি বাচ্চাগুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তা হারিয়েছে ভেবে পুলিশ-পার্টি হাতের ইসারায় জারোয়া এলাকা দেখিয়ে দিল। স্ত্রীলোকটি কিছুতেই সেদিকে গেল না। পুলিশরা তখন তাকে ও তার বাচ্চাদের নিয়ে পোর্টব্লেয়ারে চলে আসে। মনের দুঃখে চুপচাপ করে জড়ের মত থাকতে থাকতে কয়েক মাস পরে জারোয়া স্ত্রীলোকটি মারা গেল। সকলের ধারণা যে, স্ত্রীলোকটি সভ্য মানুষের খাবার খেয়েছিল বলে বোধ হয় সে সমাজ পরিত্যক্তা হয়েছিল। তার ছেলেমেয়েরা নিকোবরে বিশপ রিচার্ডসনের কাছে মানুষ হয়েছে। আমরা নিকোবরে গিয়ে জারোয়া মেয়েটিকে দেখেছি। নিকোবরীদের মত ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরা। কুচকুচে কালো এবং অদ্ভুত কুৎসিত দেখতে।

সেদিন ছিল একাদশী, রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে রামনাম কীর্তনের দিন। সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই সেখানে গেলাম। মন্দিরটি ছোট, কিন্তু ভারি সুন্দর। ভিতরে রাধাগোবিন্দের শ্বেতপাথরের বিগ্রহ। অনেক লোক হয়েছিল। সবাই মিলে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরী শতনাম কীর্তন করল। এই কীর্তন আমি কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ লাইব্রেরীতে একবার গাইতে শুনেছিলাম। আমার খুবই ভালো লেগেছিল। অনেক দিন পর আবার শুনে মনে বড় আনন্দ হল। প্রতি একাদশীতে এখানে রামনাম সংকীর্তন হয়। পোর্টব্লেয়ারে হিন্দুদের দেবমন্দির ছাড়া এখানে আছে মুসলমানদের মসজিদ, ক্রীশ্চানদের গির্জা, শিখেদের গুরুদ্বার, আর আছে বর্মীদের ফুঙ্গিচাঙ্গ (Fungi-Chang).

এককালে আন্দামানে বর্মীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। কয়েদী হয়ে বহু বর্মী এখানে এসেছিল তা'ছাড়া স্বাধীনভাবে বসবাস করতেও অনেকে এসেছিল। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও বর্মী গুণ্ডাদের অত্যাচারে সকলে রাত্রিবেলা নির্জন রাস্তা দিয়ে চলতে ভয় পেত। এখনও কথায় কথায় মাথায় লাঠি মারতে বা ছুরি চালাতে বর্মীরা পিছু-পা নয়। স্বাধীনতার পর অনেক বর্মী দেশে ফিরে গিয়েছে তা'হলেও বেশ কিছুসংখ্যক এখনও আছে। Maymio গ্রামটি সম্পূর্ণ বর্মী গ্রাম। আন্দামানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলহাওয়া দুই-ই বর্মা দেশের অনুরূপ হওয়ায় বর্মীদের এখানে অভ্যস্ত হতে কোন অসুবিধা হয় নি।

কয়েদী ছাড়া বর্মার আর একটা জাত স্বাধীনভাবে বসবাস করতে এসেছিল তারা হল 'Karen' (কারেন)। বেশিরভাগ কারেন মিডল্ আন্দামানে বাস করে। মায়া বন্দরের কাছে Webi গ্রামে তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। জীবিকার্জনের জন্য কারেনরা চাষবাস বেছে নিয়েছে। জাতে ওরা খৃষ্টান। ওয়েবিতে তাদের জন্য একটি গির্জা আছে আর আছে একটি বর্মী স্কুল। নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহার নিয়ে কারেনরা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাস করছে। Webi শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বর্গ, মনে হয় কারেনরা সেখানে স্বর্গ সুখেই আছে।

অনেক ফিরিঙ্গি পরিবারও স্বাধীনভাবে বাস করতে এসেছিল, এখন বেশিরভাগই ফিরে গিয়েছে দুই এক ঘর ছাড়া। আর একটা Criminal trible এখানে আছে তারা হল মধ্যভারতের Bhantus. চলতি কথায় এখানে বলে ভাঁতু। দেশে এদের পেশা ছিল চুরি-ডাকাতি করা। দল বেঁধে যাত্রীদের আক্রমণ করা, লুটপাট করাই ছিল এদের প্রধান কর্ম। এই ভাঁতুদের একটি দল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে এসেছিল। এখানে এসে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের পেশা ভুলে গিয়ে শান্ত হয়ে বসবাস করতে লাগল এবং চাষবাসে মনোযোগ দিল। ভাঁতুরা জাতে হিন্দু হলেও অনেকটা আমাদের দেশের অস্পৃশ্যদের মত। অনেকে আবার মিশনারীদের কৃপায় খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছে। Cadell গঞ্জেই বেশিরভাগ ভাঁতুরা বাস করে।

বর্মীদের ফুঙ্গিচাঙ্গ ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে Jadwet Co-র পেট্রোল পাম্প। তারই কাছে মহাত্মা গান্ধীর একটা প্রমাণ সাইজ প্রতিমূর্তি। উল্টো দিকে 'মোহনপুরা' টাউনশিপের জমি। তারপরই বাজারের সুরু। বেশিরভাগ দোকানপাটই কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয়দের। পোর্টব্লেয়ারে আসার পর আমাদের মনে হয়েছিল বোধ হয় মাদ্রাজ ও কেরালার কোন অঞ্চলে এসেছি এত বেশি এখানে দক্ষিণ ভারতের লোকজন। দোকানদার, কুলি, মজুর, মিস্ত্রী-চাকর-বাকর ছাড়া অফিস-আদালতেও বেশিরভাগ মাদ্রাজী ও মালয়ালীরা। বাজারের ভেতরে ও বাইরে, লোকাল বর্নদের (Local born) বাড়িঘর। এবার লোকাল বর্নদের সম্বন্ধে বলছি। আন্দামানী, ওঙ্গি, জারোয়া ও সেন্টিনেলিজের যদি বলি আদিবাসী বা Son of the soil তা হলে পরে যারা এখানে বসবাস করতে এসেছে কয়েদী হয়েই হোক বা স্বাধীনভাবেই হোক তাদের বলব ঔপনিবেশিক বা Emigrants। আন্দামানের অধিবাসী বলতে আজকাল এই ঔপনিবেশিকদেরই বোঝায়। প্রথম প্রথম অনেক ভদ্রলোককে বা ভদ্রমহিলাকে যখন জিজ্ঞেস করতাম তাঁদের দেশ

কোথায় তাঁরা বলতেন আমরা এখানকার লোক local borns. প্রথমটা বুঝতে পারতাম না পরে অবশ্য শুনেছি লোকাল বর্ন শব্দটার অর্থ হচ্ছে কয়েদীদের বংশধর।

কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের পর দেখা গেল যে সমস্ত কয়েদী দণ্ড পেয়ে এখানে আসে সকলেই কবে দেশে ফিরে যাবে সেই আশায় দিন কাটায়—এবং এই আন্দামানের উপর তাদের কোন প্রাণের টান থাকে না। গভর্নমেণ্ট দেখলেন এভাবে চললে এ দেশটার কোন উন্নতি হবে না। নিজের দেশ বলে ভাবতে না পারলে এখানকার কোন কাজে কারও উৎসাহ থাকবে না। তাই ১৯২০ সনে নূতন আইন জারী করা হয়, দ্বীপান্তরের জন্য কোন কয়েদীকে জোর করে আন্দামানে পাঠানো হবে না। তার পরিবর্তে যারা স্বেচ্ছায় পাকাপাকি ভাবে সেখানে বাস করতে চায়—তাদেরই আন্দামানে পাঠানো হবে। কয়েদীদের বাড়িঘর করার জন্য ও চাষবাস করার জন্য জমি গভর্নমেণ্ট থেকে দেওয়া হবে, এ ছাড়া যে সব কয়েদী মুক্তি পেয়েও দেশে ফিরে না গিয়ে আন্দামানে থাকতে চায় তাদেরও জমিজমা দেওয়া হবে।

১৯২৩ সনে Colonel Ferror চীফ কমিশনার হয়ে এলেন পোর্টব্লেয়ারে। তিনি দুর্দান্ত প্রকৃতির কয়েদীদের সব দেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং অন্য কয়েদীদের দেশে গিয়ে পরিবার নিয়ে আসতে অনুমতি দিলেন। বহু কয়েদী বড় আশা নিয়ে দেশে পরিবার আনতে গেল। লজ্জায় ঘৃণায় তাদের স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজন তাদের স্বীকার করতে চাইল না। মনের দুঃখে সেই সব কয়েদীরা আন্দামানে আবার ফিরে এল এবং অনেকে মেয়ে কয়েদীদের বিয়ে করে পাকাপাকি ভাবে সেটল্ করল। কয়েদীদের বৈবাহিক বন্ধনটিও ভারি অদ্ভুত ছিল। সাদিপুর বলে একটি অঞ্চলে মাসে একবার করে মেয়ে কয়েদী ও পুরুষ কয়েদীদের প্যারেড হত—চীফ কমিশনার এবং অন্যান্য অফিসার সকলেই সেই প্যারেডে উপস্থিত থাকতেন। একদিকে মেয়ে কয়েদী ও আরেকদিকে পুরুষ কয়েদীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। তারপর এক একজনের স্বভাব, গুণ ও জাতের পরিচয় দেওয়া শেষ হলে কয়েদীদের অনুমতি দেওয়া হত পরস্পরের সঙ্গী নির্বাচন করার জন্য। নির্বাচন শেষ হলে চীফ কমিশনার তখন সেখানেই তাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করতেন। কিছুদিন ঘর করার পর পছন্দ না হলে আবার নূতন করে কয়েদীরা সঙ্গী নির্বাচন করতে পারত, তাদের জাতিগত বা ধর্মগত কোন সমস্যা ছিল না। কাজেই যে সব কয়েদীরা এখানে বাস করতে চাইলো, সরকারের নূতন আইনে তাদের জমিজমা দেওয়া হল। কয়েদী হয়ে এসে পরে পাকাপাকিভাবে বাস করছে এই রকম অনেক পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ এখানকার একজন বহু পুরাণো বাসিন্দা। ভদ্রলোক আগে ফরেস্ট অফিসার ছিলেন, এখন অবসর নিয়ে লরীর ব্যবসা করছেন; বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। দুর্গাপ্রসাদ আমাদের কাছে গল্প করেছেন:

'আমার বাবা ছিলেন সাহারণপুর জেলার এক গ্রামের জমিদার। প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গায় তাকে খুন করেন আমার বাবা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়ে এলেন তিনি আন্দামানে। দীর্ঘদিন পরে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে গেলে আমার কাকা তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না, কারণ সমস্ত জমিদারি তিনি একাই ভোগ করছিলেন। মনের দুঃখে আমার বাবা কয়েক মাইল দূরে তাঁর মাসীর বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে আমার কাকা পুলিশকে খবর পাঠালেন—আন্দামান থেকে আমার খুনীভাই ফিরে এসেছে। সে এসেই আবার আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। তোমরা তাকে গ্রেপ্তার কর।

মাসীর বাড়ি যাবার কয়েকদিন পর পুলিশ ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। আমার বাবাকেই তারা জিজ্ঞেস করল আন্দামান থেকে যে খুনী আসামী ফিরে এসেছে, সে কোথায়? বাবা সব বুঝতে পারলেন কিন্তু পরিচয় না দিয়ে তাদের খাতির করে বসালেন, খাবার খাওয়ালেন তারপর তাঁরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর বললেন, 'আমিই সেই আসামী।' পুলিশেরা তো অবাক। তারা বলল, 'তোমাকে তো বেশ ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে, যাই হোক তোমার নিমক খেয়েছি, কাজেই তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করব না। তবে তুমি এদেশে না থাকলেই তোমার পক্ষে মঙ্গল। তখন আমার বাবা তাঁর জমিজমা ছেড়ে দিয়ে আমার মাকে নিয়ে আবার আন্দামানে ফিরে এলেন। আমাদের জন্ম এখানেই হয়েছে। আন্দামানই আমাদের জননী জন্মভূমি।'

আরেকজন কয়েদী (ex-convict) আছে এখানে তার নাম দাদুলাল। ব্যাম্বু ফ্ল্যাটের কাছে পানিঘাটে থাকে। তাকে খবর পাঠালে একদিন সে এল আমাদের বাড়ি। প্রায় আশি বছর বয়স লোকটির, কিন্তু এখনও কি লম্বা চওড়া চেহারা, অনেকটা ডাকাত ডাকাত দেখতে। দাদুলালকে আমি বললাম, 'আন্দামান সম্বন্ধে আমার কিছু লেখার ইচ্ছে আছে, তুমি তো বহুদিনের লোক তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

দাদুলাল বলল, 'হাঁ, হাঁ, মেমসাব, কয়েক বছর আগে আর একজন সাহেব এসেছিল নোবিল লিখবে বলে, সে আমার বাড়ি গিয়েছিল।'

আমি বুঝলাম সে সুরেশ বৈদ্যর কথা বলছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করে এখানে এলে?'

দাদুলাল বলল, 'আমার বাড়ি মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায়। আমাদের গ্রামের জমিদার বড় অত্যাচারী ছিল। মেয়েছেলেরা তার ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারত না। গ্রামের লোকেরা জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাকে এসে ধরল। আমি সঙ্গে আমার গুপ্তি নিয়ে গেলাম জমিদারবাড়ি তাকে সাবধান করে দেবার জন্য। আমার কথা শুনে উল্টে জমিদার একটা পাথর তুলে আমার মাথায় মারতে এল, আমি আর সহ্য করতে না পেরে গুপ্তি বের করে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেটে ফেললাম। তারপর তার হাত-পা টুকরো টুকরো করে কেটে রেখে ঘরে ফিরে এলাম।'

আমি বললাম, 'জমিদারবাড়ির লোকজন কোথায় ছিল?'

দাদুলাল বলল, 'গ্রামের বেশিরভাগ লোক সেদিন সকাল থেকে বনে মহুয়া তুলতে গিয়েছিল। আর আমি যখন জমিদারবাড়ি গেলাম, তখন সময়টা ছিল ভরা দুপুর, সবাই খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছিল। তাই তো আমি মনের সুখে জমিদারকে টুকরো টুকরো করে কেটেছি এমন কি তার রক্তও খেয়েছি।'

গুপ্ত সাহেব শিউরে উঠে বললেন, 'কি সর্বনাশ রক্ত খেয়েছ? কি করে খেলে?'

আমার তো তখনই মাথা ঝিম ঝিম করতে সুরু করেছে। কি সাংঘাতিক লোক রে বাবা, কি রকম বড়াই করে নিজের খুনের কথা বলছে।

দাতুলাল বলল, 'সাহেব, সে কি আর এখন মনে আছে। আক্রোশের বশে তখন খেয়েছিলাম, তবে মনে আছে গরম রক্তে আমার মুখ ভেসে গিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'ধরা পড়লে কি করে?'

দাতুলাল বলল, 'গুপ্তিটা আমি ভুলে সেখানেই ফেলে এসেছিলাম। বাড়ি এসে স্নান করে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছি, রাত প্রায় বারোটার সময় পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করল।'

আমি বললাম, 'ফাঁসি না হয়ে দ্বীপান্তর হল কেন?'

দাতুলাল বলল, 'আত্মরক্ষার জন্য মেরেছি বলে ফাঁসির দড়ি এড়াতে পেরেছি। প্রথমে ফাঁসির হুকুমই হয়েছিল। পরে আপীল করাতে বিশ বছরের জন্য দ্বীপান্তর হল। প্রবল বর্ষায় আমি এবং আরও ১১০ জন কয়েদী পোর্টব্লেয়ারে এলাম, সেটা ছিল ১৯০৮ সন। সে সময় খুনী আসামীদের সকলেই বেশ ভয়ের চোখে দেখত। সেলুলার জেলের মেয়াদ শেষ হবার পর আমাকে রাস্তা তৈরির কাজে লাগিয়ে দিল। সে সময় শুধু রাস্তা তৈরি হত। ঘন জঙ্গল কেটে কত কষ্ট করে আমরা এই রাস্তা তৈরি করেছি। আমাদের পিঠ চিরে কত রক্ত বেরিয়েছে চাবুকের ঘায়ে। আমাদের কত লোক জংলীদের তীর খেয়ে মারা গিয়েছে তার ঠিক নেই। তারপর গুপ্ত সাহেবকে উদ্দেশ করে বলল,—কি আপনাদের গভর্নমেন্টের কাজ হয় ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, আমাদের সময়ে—রাস্তা ভেঙ্গে গেলে, ব্রীজ ভেঙ্গে গেলে, রাতারাতি পাঁচশো-ছ'শো লোক লাগিয়ে মেরামত হয়ে যেত। কেউ এক মিনিট বসে থাকতে পারত না। ইংরেজ সাহেবরা এমনই করিতকর্মা লোক ছিল।'

আমি বললাম, 'দেশে ফিরে যাও নি কেন?'

দাতুলাল বলল, 'গিয়েছিলাম মেমসাব, জেলে থাকাকালীন আমার রিপোর্ট খুব ভালো থাকায় আমাকে চোদ্দ বছর পর মুক্তি দেয়। দেশে ফিরে গেলাম। কিছুদিন পর আমাদের গ্রামে একটা খুন হল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করল, কারণ আমি আন্দামান ফেরৎ খুনী আসামী। অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে ছাড়ান পেলাম। আবার একদিন গ্রামে ডাকাতি হল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করল। মহা মুস্কিল যেখানেই চুরি-ডাকাতি হয় আমাকেই সন্দেহ করে। শেষে ভাবলাম দরকার নেই এখানে থেকে। এমনিতেই সবাই আমাকে ঘৃণার চোখে দেখে তার উপর নিত্যদিন এ রকম সন্দেহ আর ভাল লাগে না। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আবার এখানে ফিরে এলাম। সরকার থেকে জমিজমা পেলাম।

আমার এখন কোন অভাব নেই। তিন-চার খানা বাড়ি, দেড়শ' মতন গরু-ছাগল আছে। যদিও জাপানীরা অনেক নষ্ট করেছে তবুও এখনও আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, নিজেদের জাতে দেশে গিয়ে তাদের বিয়ে দিয়েছি। এবার ভাবছি এলাহাবাদ গিয়ে ত্রিবেণীর নাম করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন আন্দামানে এসেছিলেন তিনি আমার বাগান দেখতে এসেছিলেন। অনেক করে তাঁকে বাগানে ঢুকতে বললাম, কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় নামতে পারেন নি কিন্তু আমাকে খুব 'সাবাস্' দিয়েছিলেন।'

আমরা মাউন্ট হ্যারিয়েট যাবার কালে দাতুলালের বাগানের পাশ দিয়েই গিয়েছিলাম। এমনি আরও অনেক আছে, কেউ নিজে খুন করে এসেছে, কারও বা বাবা-মা খুন করে এসেছে। জলজ্যান্ত এত খুনী দেখার সুযোগ আন্দামানে না এলে পাওয়া যায় না।

বৃটিশ আমলে ইংরেজ শাসিত প্রায় সমস্ত দেশ থেকেই কয়েদীদের আন্দামানে পাঠাত। ভারতবর্ষ ছাড়া বর্মা, সিলোন, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি সব দেশ থেকেই কয়েদী আসত। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন রীতিনীতির লোকগুলির ক্রমান্বয়ে বহু বৎসর একসঙ্গে বাস করার ফলে পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ ধরণের সমবেদনা, সহানুভূতি বা compassion জন্মায়। তারা নিজেদের একটা অখণ্ড জাত বলে মনে করে। সর্ব দেশের, সর্বধর্মের, সর্বজাতির সমন্বয়ে এক নূতন জাতের সৃষ্টি হয়। তাদের সন্তান-সন্ততিরা পরিচিত হয় local born বলে। শিক্ষাহীন, সংস্কৃতিহীন, ঐতিহ্যহীন এক দল কয়েদীর বংশধর।

লোকাল বর্ন শব্দটার মধ্যে কেমন একটা অপমান, কেমন একটা হীনতা মেশান আছে যার জন্য মেনল্যাণ্ডের অন্যান্য লোকেরা যাঁরা সরকারী কার্য উপলক্ষে এখানে আসেন তাঁরা লোকাল বর্নদের একটু অবজ্ঞা একটু ঘৃণার চোখে দেখেন। সামাজিক জীবনেও সমানভাবে মিশতে একটু ইতস্তত করেন। তাঁদের সমাজে লোকাল বর্নরা অপাংক্তেয়। লোকাল বর্নদের সামাজিক জীবন ও আচার ব্যবহারও ভারতবর্ষের অর্থাৎ মেনল্যাণ্ডের লোকদের থেকে আলাদা। এদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নেই। বিয়ের বাঁধনও এদের কাছে খুব শক্ত নয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোন নিন্দা নেই। মেয়েরা ইচ্ছা করলে অনেকবার বিয়ে করতে পারে তাতে এদের সমাজে নিন্দার কিছু নেই। 'ময়্যালিটি' সম্বন্ধেও কোন কড়াকড়ি নেই। তা ছাড়া যে কোন জাত বা যে কোন ধর্মের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। কারও পাঁচ মেয়ে থাকলে কোন জামাই হিন্দু, কোন জামাই মুসলমান, কোন জামাই খৃষ্টান, কোন জামাই বাঙালী অথবা কোন জামাই মাদ্রাজী হলে লোকাল বর্নদের সমাজে কিছু এসে যায় না। এই সূত্রে শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর বর্মী ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে—যাঁর এক এক জামাই এক এক জাতের ও এক এক দেশের ছিলেন।

আগে লোকাল বর্নরা সাধারণত মেনল্যাণ্ডের লোকেদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে চলত বোধ হয় তাদের একটা 'কমপ্লেক্স' ছিল। এখন এদের মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আন্দামান administration থেকে লোকাল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য বহু প্রাইমারী ও দুইটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা হয়েছে। সমস্ত স্কুলই অবৈতনিক। এখানকার লোকাল বর্নদের ভাষা হিন্দুস্থানী। মনে হয় প্রথম দিকে উত্তর ভারত থেকেই বেশিরভাগ কয়েদী আসায় এখানকার ভাষা হয়ে-

গিয়েছে হিন্দুস্থানী। ভাষাটাও কিন্তু শুদ্ধ হিন্দুস্থানী নয় তার মধ্যে বহু অন্য ভাষার মিশেল আছে। লোকাল বর্ন ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতি বছর কলকাতা ও মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট কলেজে একটি করে ছাত্র পাঠান হয়। ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং অথবা অন্য কোন লাইনে পড়তে চাইলে আন্দামান সরকার বন্দোবস্ত করে দেন। আজকাল বহু লোকাল ছেলেমেয়ে মেনল্যাণ্ড থেকে উচ্চশিক্ষা পেয়ে এখানে সরকারী কাজে যোগদান করেছেন। লোকাল বর্ন শব্দটা আপত্তিকর মনে হওয়ায় এদের সাধারণত বলা হয় Andaman Indians.

পোর্টব্লেয়ারে ঢোকার মুখেই একটি ছোট দ্বীপ পড়ে তার নাম রস্ আয়ল্যাণ্ড। বৃটিশ আমলে রসেই Administrative Head Quarters ছিল। চীফ কমিশনার এবং আরও কয়েকজন বড় অফিসার রসে থাকতেন। পোর্টব্লেয়ারে থাকতেন ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য অফিসাররা। কি রকম করে জীবন উপভোগ করতে হয় তা বোধ হয় ইংরেজদের মত খুব কম লোকেই জানে। এত দূরে এই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে সেই একশ বছর আগেও তারা যে কি পরিমাণ আরাম ও বিলাসে দিন কাটাত তার প্রমাণ পাওয়া যায় রস্-এ গেলে। Government House অর্থাৎ চীফ কমিশনারের বাংলো, Club House, Swimming Pool, Tennis Court বাঁধানো রাস্তাঘাট এখনও তার সাক্ষী দিচ্ছে। ইয়োরোপীয়ান অফিসাররা বেশির ভাগ রস আয়ল্যাণ্ডে থাকতেন। বোধ হয় কয়েদীদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা তার একটা কারণ, সর্বক্ষণ পোর্টব্লেয়ার ও রসের মধ্যে ফেরী চলত। দৈনিক পাঁচশো কয়েদী নাকি রসের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করত।

বর্তমানে রস আয়ল্যাণ্ড দেখলে দুঃখ হয়। এত সুন্দর দ্বীপটা একেবারে জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। একবার ভূমিকম্পের ফলে রস্-এর বহু জায়গায় ফাটল হয় তারপর একবার জিওলজিস্টরা এসে রস্ পরীক্ষা করে বলেছেন রস্ ধীরে ধীরে ডুবছে। তাই আগে থেকেই সকলে রস ছেড়ে চলে এসেছে। অযত্নে, অবহেলায়, অব্যবহারে রস্-এর বাড়িঘর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে। বর্তমানে রস আয়ল্যাণ্ডে পিকনিক করা ছাড়া কেউ বড় একটা যায় না। সরকারথেকে এখানে ন্যাশনাল পার্ক করার পরিকল্পনা আছে।

১৯০৩ সালে Mr. C. Boden Kloss আন্দামানে এসেছিলেন এখানকার বনসম্পদ দেখার জন্য। তিনি রস সম্বন্ধে বলেছেন,—

'বন্দরে ঢোকার আগেই একটি ছোট্ট দ্বীপ নাম তার রস আয়ল্যাণ্ড। আয়তনে ২০০ একর। দ্বীপটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। একেবারে উঁচুতে চীফ কমিশনারের বাংলো, অনেকটা আমাদের Windsor Castle-এর অনুকরণে তৈরি। তার কাছেই চার্চ ও ইয়োরোপীয় প্রহরীদের ব্যারাক। আর একটু নীচে সেটলমেন্ট অফিসারদের বাংলো, মাঝে মাঝে তার নানারকম সুদৃশ্য গাছপালা ও পামের সারি। তারও নীচে প্রায় সমুদ্রের ধারে তোষাখানা ও Commissariat Stoves ও অন্যান্য সরকারী বাড়িঘর। সমস্ত দ্বীপটির অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুপরিকল্পিত বাড়িঘর, রাস্তাঘাট দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। এতদূরে পৃথিবীর এককোণে এমন সুন্দর একটি জায়গা আছে আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। 'রসের' পেছনে লেগে আছে অগণিত কয়েদীর অমানুষিক পরিশ্রম।'

রস থেকে বহুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত সমুদ্র, ধারে ধারে কোথাও আর কোন দ্বীপ নেই। কাজেই শত্রুপক্ষের জাহাজের ওপর নজর রাখতে হলে রস আয়ল্যাণ্ড হচ্ছে আদর্শ স্থান। জাপানীরা আন্দামানে থাকাকালীন রস-এ বহু pill box, magazine তৈরি করেছিল। কোন নূতন বাড়িঘর করার প্রয়োজন হলে তারা রস-এর পুরোণো বাড়িঘর ভেঙ্গে ইটকাঠ বার করে নিয়েছে।

আন্দামান পুনরধিকার করার অনেক পরে ১৯৫৩ সনে 'রসের' সমস্ত বাড়িঘর মেরামত করা হল। কথা ছিল সেখানে সৈন্যদের ব্যারাক হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সৈন্য এসে এখানে পৌঁছায় নি। পরের বছর আন্দামান স্পেশ্যাল কমিটির মেম্বাররা এসে রস দেখে বলে গেলেন সামান্য অদলবদল করে এখানেই জেলখানা করা হোক। ৩০,০০০ টাকা খরচ করে পি ডব্লিউ ডি জেলখানা ও জেলকর্তৃপক্ষের জন্য 'রসের' বাড়িঘর ঠিক করে দিল। শেষ পর্যন্ত জেলখানাও এখানে হল না। জিওলোজিষ্টরা বলেছেন 'রস' ডুবছে। আবার অনেকের মতে আন্দামানও নাকি ডুবছে। প্রমাণ হিসাবে অনেকে বলেছেন নর্থ আন্দামানে পোর্ট কর্নওয়ালিসের উপনিবেশ উঠে যাবার অনেক পরে সেখানকার চ্যাথাম দ্বীপের উপর নির্মিত গুদাম ঘরটি ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে চলে গিয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত গাছপালা সমুদ্রের ধারে জন্মানো সম্ভব নয় নোনা আবহাওয়ার জন্য, সেই সব গাছপালা এখন সমুদ্রের তীরেই দেখতে পাওয়া যায়। ডাঃ হেলফার তাঁর ষ্টিমার নিয়ে যে সব খাড়ির ভেতর অনায়াসে ঢুকে পড়তেন এখন সে সব জায়গায় ছোট ডিঙ্গি নিয়ে ঢোকাও অসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই সব রিপোর্ট আন্দামান কমিটি গভর্নমেন্টের কাছে পেশ করেছিল। Mr. G. H. Tipper এবং R. B. Swell আন্দামান কমিটির এ তথ্য অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ডুবছে এ-কথা সত্য নয়। আন্দামান ডুবছে কি না জানি না তবে বর্ষাকালে যে রকম ধ্বস্ নামে জায়গায় জায়গায় তাতে মনে হয় পাহাড়ের তলা দিয়ে ক্ষয় হতে হতে কবে একদিন আন্দামান সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায় তার ঠিক নেই।

আন্দামানের ইতিহাসের একটা chronological হিসাব রাখলে মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়।

১৭৮৯—ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার বর্তমান পোর্টব্লেয়ারে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

১৭৯২—পোর্টব্লেয়ার থেকে নর্থ আন্দামানে উপনিবেশ স্থানান্তরিত করা হয়।

১৭৯৬—ম্যালেরিয়ার জন্য উপনিবেশ তুলে দেওয়া হয়।

১৮৫৭—ডাঃ মট্ নূতন করে পোর্টব্লেয়ার উপনিবেশের জন্য মনোনীত করেন।

১৮৫৮—ডাঃ জে পি ওয়াকার প্রথম সেটলমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে আসেন।

১৮৭২—লর্ড মেয়ো হোপ টাউনে এক কয়েদীর হাতে নিহত হন।

১৯২০—পেনাল সেটলমেন্ট তুলে দেবার প্রস্তাব হয়।

১৯৪২—চীফ কমিশনার C. F. Waterfalls I. C. S. জাপানীদের হাতে বন্দী হন।

১৯৪২-১৯৪৫—জাপানী রাজত্ব।

১৯৪৫—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পুনরধিকার।

১৯৪৭—ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দা য়ত্ব গ্রহণ।

আন্দামানের কয়েকটা বছরের ইতিহাস বড় করুণ। তা হল জাপানী রাজত্ব বা reign of terror.

১৯৪২ সন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসার ও কর্মচারী রেখে বাকি সব অফিসারদের ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এখানে অল্পসংখ্যক অফিসার ও কর্মচারীদের সঙ্গে রয়ে গেলেন চীফ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সাহেব। আন্দামান সম্বন্ধে কারও কোন ভয় ছিল না, কেউ কল্পনাও করেন নি কোন শত্রু এখানে আসতে পারে। একদিন রেডিওতে একটা সংবাদ প্রচার হল 'Japanese left from Singapore for unknown destination.' এই খবর পেয়ে ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা কেন যেন আন্দাজ করলেন জাপানীরা আন্দামানের উদ্দেশ্যেই রওনা দিয়েছে। এখন কি করা যায়? অনেক ভেবে তাঁরা পালানোই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। পোর্টব্লেয়ার থেকে ৩০ মাইল দূরে Shoal Bay-তে একটি মোটরবোট তৈরি রাখলেন। সব বন্দোবস্ত করে তাঁরা চীফ কমিশনার মিঃ ওয়াটারফলস্কে বললেন তাঁদের সঙ্গী হতে। মিঃ ওয়াটারফলস্ নিজের দায়িত্ব ছেড়ে কাপুরুষের মত পালাতে রাজী হলেন না। ডি. সি; এস. পি এবং আরও কয়েকজন শোল বে থেকে রওনা হয়ে খাড়ির ভেতর দিয়ে খানিক দূর গিয়ে সমুদ্রে পড়লেন। ছোট বোট নিয়ে অনেক কষ্টে নেহাৎ আয়ুর জোর থাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাদ্রাজ গিয়ে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

এদিকে ২২শে মার্চ সন্ধ্যাবেলা প্রায় চব্বিশ পঁচিশটি জাপানী জাহাজ পোর্টব্লেয়ারের চারপাশে এসে ভিড়ল। সহরের লোকেরা আলো নিভিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল কি হয় দেখবার জন্য। প্রথম রাত্রিতে কিছু হল না। ভোরবেলা প্রায় চারটার সময় জাপানীরা দলে দলে জাহাজ থেকে নামতে সুরু করল।

জাপানীরা এখানে আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই একটি জাপানী ফটোগ্রাফারকে ক্যামেরা হাতে সারা সহরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলত, 'কি সুন্দর তোমাদের দেশ, কি picturesque! জানই তো আমরা সৌন্দর্যের পূজারী তাই এই সুন্দর সুন্দর জায়গার ছবি তুলে নিচ্ছি।' অতি নির্দোষ কথা, সন্দেহ করার কিছু নেই। জাপানী ফটোগ্রাফারটি কিন্তু পোর্টব্লেয়ারের প্রতিটি জায়গার ছবি তুলে জাপানীদের জানিয়ে দিচ্ছিল। তার হাতে খুব ছোট অদ্ভুত ধরণের একটি ঘড়ি ছিল, সকলে সন্দেহ করত সেই ঘড়িটাই হয়ত transmitter-এর কাজ করত। Re-occupation-এর পর যখন ফটোগ্রাফারকে গ্রেপ্তার করা হল তখন প্রথমেই সে হাতের ঘড়িটি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে বলেছিল, 'Now you can arrest me.'

দলে দলে সৈন্য চারদিক থেকে নামতে থাকায় উপায়ান্তর না দেখে চীফ কমিশনার শ্বেত পতাকা নিয়ে জেটীতে গিয়ে দাঁড়ালেন। জাপানীরা তাঁর হাত থেকে পতাকা কেড়ে নিয়ে তাঁকে বন্দী করল এবং গভর্নমেণ্ট হাউসে অন্তরীণ করে রাখল। তারপর তারা বিজয় দর্পে পোর্টব্লেয়ারে জাপানী পতাকা উত্তোলন করল।

Executive Engineer Mr. Lindsey যখন দেখলেন আন্দামান সম্পূর্ণ জাপানীদের দখলে চলে গেল তখন তিনি ডিনামাইট দিয়ে Wireless Stationটি উড়িয়ে দিলেন। জাপানীরা গেল এতে বিষম ক্ষেপে। তারপরেই তারা খোঁজ করল কতজন বৃটিশার, কতজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহরে আছে। তাদের সবাইকে ধরে 'রস্' এ নিয়ে অন্তরীণ করে রাখল। এবার জাপানীদের প্রধান কাজ হল সহরে যত গাড়ি আছে যত বন্দুক আছে সব বাজেয়াপ্ত করা। প্রাথমিক কাজগুলি শেষ হ'লে তারপর ম্যাপ দেখে ও ফটো দেখে বার করল কোথায় saw mill আছে, কোথায় power house আছে, কোথায় water tank আছে। তারা স্থানীয় লোকেদের সাহায্য চাইল এ সব জায়গা ধ্বংস করার জন্য। বেশির ভাগ লোকেই রাজি হল না। তবে সব দেশেই মীরজাফরের দল আছে কাজেই, এখানেও সে রকম লোকের অভাব হল না। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় কেউ কেউ জাপানীদের সর্ব প্রকার সাহায্য করতে উঠে পড়ে লাগল। বিশেষ করে ব্যক্তিগত জীবনে যাদের সঙ্গে বিরোধ আছে এই সুযোগে তাদের সম্বন্ধে জাপানীদের কাছে নালিশ জানাতে সুরু করল।

পোর্টব্লেয়ারে এক সঙ্গে প্রায় কুড়ি হাজার জাপানী সৈন্য এসেছিল। জাপানীদের সব চেয়ে আক্রোশ ছিল বৃটিশারদের ওপর। যত জন ইয়োরোপীয়ান তখন এখানে ছিলেন তাদের সবাইকে এমন কি চীফ কমিশনারকে দিয়ে জাপানীরা রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, নালা পরিষ্কার করা এই সব কাজ করিয়েছে। আন্দামানের লোকাল লোকেদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার বেশ ভালই ছিল প্রথম দিকটায়। আমি দুর্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'জাপানী দখলে যখন আন্দামান চলে গেল, তখন আপনাদের কেমন লাগল?' দুর্গাপ্রসাদ বললেন, 'আমরা কিছু পরিবর্তন বুঝতেই পারি নি। জাপানীরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করত, আমাদেরও তাদের বেশ ভালই লাগত। আমাদের যখন 'স্পাই' বলে সন্দেহ করতে সুরু করল তখন থেকেই আরম্ভ হল তাদের অকথ্য নির্যাতন।'

জাপানীরা এসেই আন্দামানের জঙ্গল চষে ফেলেছিল বৃটিশ সৈন্য লুকিয়ে আছে কি না দেখবার জন্য। পোর্টব্লেয়ার কতটুকু জায়গা, কি বা তার সামর্থ্য? কুড়ি হাজার সৈন্যের রসদ সে কোথা থেকে জোগাড় করবে? অগত্যা জাপানীরা তাদের জাহাজে করে রেশন আনার বন্দোবস্ত করল। রেশন ভর্তি জাপানী জাহাজ পোর্টব্লেয়ারের কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতেই বৃটিশ সাবমেরিন এসে সেগুলি ডুবিয়ে দিতে লাগল। আবার অনেক সময় ওপর থেকে প্লেন এসে জাহাজে বোমা ফেলে যেতে লাগল। জাপানীরা পড়ল দারুণ অসুবিধায়। তারা বুঝতে পারল এখান থেকে কেউ বৃটিশারদের কাছে খবর পাঠাচ্ছে। জাপানী প্লেনও মাঝে মাঝে পোর্টব্লেয়ারের আশে পাশে বোমা ফেলতে লাগল।

জাপানীরা এসেই জেলের কয়েদীদের ছেড়ে দিয়েছিল খুব সম্ভব তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব এড়াবার জন্য। কয়েদীরা ছাড়া পেয়েই সুরু করল লুট-পাট। রেশনের গুদাম, লোকের বাড়ি চড়াও হয়ে হামলা করতে সুরু করল। বহুদিন পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মেয়েছেলের জন্য গ্রামে গ্রামে হানা দিতে লাগল। কিন্তু বেশিদিন তাদের এ রকম উচ্ছৃঙ্খলতা চলল না, জাপানীরা চুরির অপরাধে বড় কঠিন শাস্তি দিতে লাগল।

দিনে দিনে সহরের যা খাদ্যদ্রব্য ছিল তা ফুরিয়ে আসতে লাগল। এই কুড়ি হাজার সৈন্যকে কি খেতে দেওয়া যায়? কোন উপায় না দেখে জাপানীরা সকলের বাড়ি চড়াও হয়ে গরু, বাছুর, হাঁস, মুরগী সব জোর করে নিয়ে যেতে লাগল। যারা আপত্তি করে, বাধা দেয় তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে লাগল।

স্থানীয় বহুলোকের কাছে আমরা জাপানী অত্যাচারের কাহিনী শুনেছি। দুর্গাপ্রসাদের কাছেই আমার বেশির ভাগ জাপানী রাজত্বের গল্প শোনা। আরেকজন ভদ্রলোকের কাছেও অনেক গল্প শুনেছি। এই ভদ্রলোকের নাম যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন:

'আমি ১৯০৬ সনে আন্দামানে এসেছি। আমার বাড়ি বরিশাল জেলার মাহিনাড়া গ্রামে, মৈমনসিং-এ আমি কেরাণীর কাজ করতাম। একদিন আফিসে বসে সহকর্মীর সঙ্গে বচসা হওয়ায় সে আমাকে রুমাল ছুঁড়ে মারে। আমার তখন অল্প বয়স, রক্ত গরম। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতের কাছে কাগজকাটা ছুরি ছিল তাই দিয়ে তাকে আক্রমণ করি। ক্রমাগত তের-চোদ্দ বার ছুরি দিয়ে মারার ফলে সহকর্মী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমার তাকে খুন করার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। পুলিশ আমাকে তক্ষুণি গ্রেপ্তার করে এবং বরিশাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। বিচারে আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আন্দামানে এসে সেলুলার জেলে তিনমাস থাকার পর আমি একটু লেখাপড়া জানা লোক বলে অফিসে কাজ দেয়। সেখানে convict writer হিসাবে বহু বছর কাজ করেছি। আমার কাজ ছিল কয়েদীদের সব রেকর্ড রাখা। জাপানীরা সে সব রেকর্ড পুড়িয়ে ফেলেছে। মুক্তি পাবার পর সরকার থেকে জমিজমা পেয়ে এখানেই থেকে যাই এবং এক কয়েদীর মেয়েকে বিয়ে করি। আমার মেয়েকে প্রথমে এক বাঙালীর সঙ্গে বিয়ে দিই, জাপানীরা তাকে মেরে ফেললে পরে এক লোকাল বর্ন ছেলের সঙ্গে মেয়ের আবার বিয়ে দিই।'

দুর্গাপ্রসাদ ছিলেন বেশ তেজী স্বভাবের লোক এবং আর্থিক অবস্থা ছিল খুব ভাল। যতজন ex-convict অথবা তাদের বংশধরদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সকলেই দেখেছি বেশ অবস্থাপন্ন লোক। জমিজমা, বাড়িঘর, গরুবাছুর, হাঁসমুরগী নিয়ে সবাই বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ।

আন্দামানে সাধারণত যে সব কয়েদী দ্বীপান্তরে আসত তারা ছিল সমাজের অবাঞ্ছিত জীব। চুরি ডাকাতি, খুন, জোচ্চুরি, জালিয়াতি সব রকম অন্যায় অসামাজিক কাজ করে তারা আসত আন্দামানে। এখানে থাকাকালীন কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে তারা নানা ধরণের কাজ করার শিক্ষা পেত। সেলুলার জেল থেকে বের হবার পর কয়েদীদের লাগানো হত উপনিবেশের নানা ধরণের উন্নতির কাজে, কিম্বা পরিশ্রমিকে। পাঁচ বৎসর পর মাসিক বারো আনা হিসাবে তারা বেতন পেত, অবশ্য খাওয়া দাওয়া কাপড়চোপড় সব সরকার থেকেই দিত। দশ বছর শিক্ষানবিশী ভাবে থাকার পর কয়েদীরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের বাড়িঘর করে থাকার অনুমতি পেত। কিন্তু সর্বত্র ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা ছিল না, নিজের গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকতে হত। এই ভাবে পনের-কুড়ি বছর থাকার পর তারা সম্পূর্ণ মুক্তি পেত। ক্রমাগত এতগুলি বছর কড়া শাসন ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে কয়েদীদের স্বভাব সম্পূর্ণ বদলে যেত এবং দেশে ফিরে গিয়ে নাগরিক জীবনে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হত না। মিঃ বডেন ক্লস্ বলেছেন:

'The difference between transportation to Port Blair and imprisonment in a jail is Port Blair returned convict is a man fitted to support himself, the prisoners released from a jail is not only a pauper but has been pauperised.'

কাজেই মুক্তি পাবার পর যে সব কয়েদীরা এখানে রয়ে গেল নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা অর্থ উপার্জন করে সকলেই বেশ স্বচ্ছলভাবে বাস করতে লাগল। প্রথম দিকে জাপানীরা এই সব সম্পন্ন গৃহস্থ ex-convict-দের বাড়ি চড়াও হয়ে গরু বাছুর জোর করে দখল করত। সহরের যা খাবার জিনিষ সব চলে যায় জাপানী পল্টনের জন্য, অন্যান্য লোকেরা কেউ একবেলা খায়, কেউ আধপেটা খায়। এর পর সুরু হল জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচার। আন্দামানে জাপানীদের প্রতিটি কার্যকলাপের বিবরণ কোন লোক বেতারে বৃটিশারদের কাছে পাঠাচ্ছিল। প্রতিদিনের অত্যাচারের, অরাজকতার কাহিনী প্রচার হত বেতারকেন্দ্র থেকে। জাপানীরা গুপ্তচর সন্দেহ করে সহরের ইংরেজী জানা সব লোককে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরতে লাগল। তাতেও খবর পাঠানো বন্ধ হল কই? কে খবর পাঠায়? কোথা থেকে পাঠায়? জিজ্ঞেস করলে সকলে অস্বীকার করে। অথচ সত্যি-সত্যিই গভীর জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি লোক বেতার যন্ত্র নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকত এবং সহর থেকে যা-যা খবর পেত সব খবর পাঠাত দিল্লীতে। পোর্টব্লেয়ারে বসে জাপানীরা শুনতে পেত বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রতিদিন তাদের কথা। সন্দেহে সন্দেহে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যাকেই সন্দেহ হয় নির্বিচারে তাকেই গুলি করে মারতে লাগল। কুকুর বিড়ালের মত পিটিয়ে, জলে ডুবিয়ে, মাটিতে পুঁতে, গুলি করে কত রকমভাবে যে মানুষ মেরেছে জাপানীরা তার ঠিক নেই।

দুর্গাপ্রসাদকে যখন জাপানীরা তাদের সাহায্য করতে বলে, সহরের সব গোপন-কথা জিজ্ঞেস করে, দুর্গাপ্রসাদ তখন তাদের কোন বিষয়ে সাহায্য করেন নি, তখন থেকেই জাপানীদের বিষ নজরে পড়েছিলেন তিনি। সুযোগ বুঝে এই সময় অনেকে দুর্গাপ্রসাদকে গুপ্তচর বলে জাপানীদের কাছে জানায়। আগে থেকেই রাগ ছিল, এখন আর কোন দ্বিধা না করে দুর্গাপ্রসাদকে তারা গ্রেপ্তার করে। জেলে আটকে রেখে বহু প্রকারে তাঁর স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। দুই হাত বেঁধে দুই দিকে আটকে রেখে কাগজ রোল করে তাতে আগুন ধরিয়ে দুর্গাপ্রসাদের শরীরের বহু জায়গা জাপানীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। নখের মধ্যে গরম ছুঁচ

ঢুকিয়ে, মাথায় ব্যাটারী চার্জ করে কত লোককে পাগল করে দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় অনেকে মিথ্যা করে বলেছে তারা গুপ্তচর। দুর্গাপ্রসাদ গল্প করছিলেন, 'আমি যদি কোন দিন ক্ষমতা পাই, পরশুরাম যেমন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, আমিও তেমনি পৃথিবী থেকে জাপানীদের নিঃশেষ করে দেবো। এ রকম বর্বর, নিষ্ঠুর অত্যাচারী জাত পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। তবু, আমি স্বীকার করছি, যে তিনটি গুণ আমি তাদের মধ্যে দেখেছি তার তুলনা হয় না।

(১) ডিসিপ্লিন।
(২) কর্মক্ষমতা।
(৩) স্ত্রী-জাতির সম্মান রক্ষা।

ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে জাপানীরা ছিল অত্যন্ত কড়া। সামান্যতম অপরাধে শাস্তি হত অতি কঠোর। আর পরিশ্রম করতে পারত অসম্ভব। সব চেয়ে বড় অফিসার থেকে সুরু করে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই আসুরিক পরিশ্রম করত। তারা নিজেদের সঙ্গে লোকাল লোকেদেরও খাটিয়ে নিত।

খাদ্যসঙ্কট যখন চরমে উঠল তখন সুরু হল সহরের লোকসংখ্যা কমানো। পথে ঘাটে লোকজনদের ধরে জিজ্ঞেস করত জাপানী ভাষায় 'খোরে দামেদা?' অর্থাৎ 'তুমি খারাপ লোক?' উত্তর দিক বা না দিক সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালাত। জাপানীদের তরফ থেকে একজন Civil Governor ছিল এখানে। সেই ছিল এখানকার সর্বে-সর্বা। তাকে বলত 'মিন-সি-বুচো' (Min Si Bucho).

আগেই বলেছি অনেকে ব্যক্তিগত জীবনের শত্রুদের সর্বনাশ করবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। বাগচী বলে একজন বাঙালী আন্দামানে এসেছিল কয়েদী হয়ে। জাপানীরা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে দেখা করে বলল যে সে নেতাজীর আত্মীয়। জাপানীরা বিশ্বাস করে তাকে Chief Naval Intelligence Officer করে দিল। বাগচী সহরে ঘুরে ফিরে খবর জোগাড় করে আর জাপানীদের কাছে পেশ করে। Mr. A. D. Bird ছিলেন চীফ কমিশনারের সেক্রেটারী। তিনি কোন কারণে একবার বাগচীকে শাস্তি দিয়েছিলেন। সেই রাগ মনে মনে পোষণ করে এতদিনে বাগচী সুযোগ পেল প্রতিশোধ নেবার। জাপানীদের সে জানাল মিঃ বার্ড একজন গুপ্তচর। কোন দ্বিধা না করে জাপানীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞেস করল কি তাঁর শেষ ইচ্ছা। মিঃ বার্ড এক গ্লাস জল খেতে চাইলে জাপানীরা জল এনে তাঁর সামনে মাটিতে ঢালল তারপর তাঁর গলা কেটে ফেলল। বাগচীর আর একটা কাজ ছিল সৈন্যদের জন্য স্ত্রীলোক সরবরাহ করা। চারদিক ঘুরে মেয়ে জোগাড় করে জাপানীদের recreation ক্লাবে পাঠাত। কিছুদিন পর জাপানীরা এই সব মেয়েদের ফেরৎ পাঠিয়ে ফরমোসা থেকে মেয়ে আনিয়ে নিয়েছিল।

সাধারণত যখন কোন দেশ বিদেশী সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয় প্রথমেই তারা সুরু করে নানা রকম অত্যাচার বিশেষ করে মেয়েদের ওপর থাকে তাদের দারুণ লোভ। আন্দামানে জাপানী সৈন্যরা মেয়েদের ওপর কোন অত্যাচার করে নি শুনে খুবই অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এর এরকম ব্যতিক্রম কি করে হল? অনেকদিন পর একবার যখন ইণ্ডিয়ান নেভির জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে এল তখন একজন Naval Officer Commander Mukherjee-এর সঙ্গে আলাপ হওয়ার তিনি গল্প করছিলেন যে, re-occupation-এর সময় তিনি এখানে এসেছিলেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'জাপানীরা নাকি এখানে মেয়েদের ওপর কোন অত্যাচার করে নি, এটা কি সত্যি? জাপানীরা কি সত্যিই এত ভদ্র?'

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'মোটেই না, জাপানীরা মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মাতে মেয়েদের ওপর যা অত্যাচার করেছে তার তুলনা হয় না। তবে আন্দামানে তারা কেন অত্যাচার করে নি, কারণ এটা নেতাজীর দেশ তাই। রি-ক্রিয়েশন ক্লাবে যে সব মেয়েদের পাঠানো হত তারা সব স্বেচ্ছায় যেত।'

Dr. Dewan Singh ছিলেন পোর্টব্লেয়ার হাসপাতালের Senior Medical Officer. জাতে শিখ। ইনি খুব ভালো লোক ছিলেন। মধ্য ভারতের ভাঁতুরা ছিল অত্যন্ত নীচ জাতের হিন্দু। এখানকার মুসলমানরা তাদের চাইছিল মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দিতে। দেওয়ান সিং তাদের সেই প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়াতে মুসলমানরা তাঁর উপর খুব ক্ষেপে গেল। সুযোগ বুঝে জাপানীদের কাছে নালিশ করল—দেওয়ান সিং গুপ্তচর বলে। আবার কেউ কেউ বলেন তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কয়েকজন দেওয়ান সিং-এর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। জাপানী সিভিল গভর্নর দেওয়ান সিং ও তাঁর আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোককে গুপ্তচর বলে গ্রেপ্তার করল। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চলল তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। অনেকে যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে জেলের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেল। জাপানী অত্যাচারের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল কোমর থেকে পা পর্যন্ত পুড়িয়ে দেওয়া। কিছুতেই যখন কেউ কিছু স্বীকার করে না তখন জাপানীরা শেষ চাল চালল। সিভিল গভর্নর বন্দীদের স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে এল। বন্দীদের বলা হল 'তোমরা যদি স্বীকার না কর, তবে তোমাদের সামনে এই সব মেয়েছেলেদের বিবস্ত্রা করব।'

আতঙ্কে সকলে হাত জোড় করে বলল, 'আমরা স্বীকার করছি আমরা গুপ্তচর, তোমরা মেয়েদের ছেড়ে দাও।'

কিন্তু তাদের নেতা দেওয়ান সিং কিছুতেই মিথ্যা অপবাদ স্বীকার করবেন না। অথচ জাপানীদের তাঁর স্বীকারোক্তি চাইই। মেয়েদের জাপানী গভর্নর বলল, 'তোমরা দেওয়ান সিংকে রাজি কর তবে তোমাদের স্বামীদের ছেড়ে দেব।'

মেয়েরা দেওয়ান সিং-এর কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে বলল,' বাবা, আমাদের সোহাগ সিন্দুর রক্ষা কর।'

দেওয়ান সিং বললেন, 'বেটি, তোমাদের সোহাগ সিন্দুর থাকবে না, তোমরা জাপানীদের চেন না, ওরা সবাইকে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলবে।'

জেলখানার মধ্যে পিটিয়ে পিটিয়ে দেওয়ান সিংকে জাপানীরা মেরে ফেলল। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত দলটিকে গুলি করে মারল। কি পৈশাচিক আচরণ, কি নির্মম নিষ্ঠুরতা।

Mr. Macurthy ছিলেন পোর্টব্লেয়ারের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। জাপানীরা আসার আগেই ইনি মোটর বোটে করে মাদ্রাজ পালিয়ে গিয়েছিলেন। এবার এলেন তিনি espionage-এর কাজে সাবমেরিন নিয়ে পোর্টব্লেয়ারের খবরাখবর নিতে। সঙ্গে ছিল কয়েকজন করেস্টের পুরোনো কুলি। শোল বে'তে সাবমেরিন নামিয়ে মিঃ ম্যাকার্থি

কুলিদের সেখানে নামিয়ে দিতেন। তারা সারাদিন ঘুরে চারদিক থেকে সব খবর নিয়ে আবার সন্ধ্যাবেলা শোল বে'তে ফিরে যেত। একদিন মিঃ ম্যাকার্থি সাবমেরিনে করে এসে কয়েকজন গুর্খাকে শোল বে'তে নামিয়ে দিলেন। গুর্খারা যখন পোর্টব্লেয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল স্থানীয় কয়েকজন লোক বুঝতে পারল যে তারা গুপ্তচর। গুর্খাদের চুপি চুপি তারা ফিরে যেতে বলল। গুর্খারা ফিরে গেলে মঙ্গেজি নামে একজন বর্মী জাপানীদের সে কথা বলে দেয়। সারা সহরে দারুণ হৈ-চৈ, গুর্খা গুপ্তচর এসেছে। জাপানী সৈন্য দলে দলে বেরিয়ে পড়ল তাদের খোঁজে, ততক্ষণে গুর্খারা সাবমেরিনে করে উধাও। কোথায় যেন জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি পাহাড়ী কুলি গাছ কাটছিল জাপানীরা তাদের গুর্খা বলে ধরে নিয়ে এল। পরে যখন জানা গেল তারা গুর্খা নয় তখন মঙ্গেজিকে ধরে বেদম প্রহার দিল।

দিন দিন পোর্টব্লেয়ারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে। সহরে খাবার জিনিসপত্র নেই, ঔষধপত্র নেই, সবাইকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে প্রচুর অথচ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। বহু লোক না খেতে পেয়ে মরতে লাগল। জাপানীরা অনন্যোপায় হয়ে পাহাড় কেটে মিষ্টি আলু ও টেপিওকার চাষ আরম্ভ করল। জাপানীরা নাকি দিনের পর দিন মিষ্টি আলু খেয়ে কাটিয়েছে তাদের কোন কষ্ট হত বলে মনে হত না। এরপর জাপানীরা ঠিক করল সহরের লোকসংখ্যা কমাতে হবে তা না হলে খাদ্য সমস্যার কোন সমাধান হবে না। দলে দলে অশক্ত, বৃদ্ধ, পীড়িত লোকেদের জাহাজ ভরে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে লাগল। সাঁতরে কেউ উঠতে চাইলে মেশিন গান চালাতে লাগল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এলেন পোর্টব্লেয়ারে ১৯৪৩ সনে ডিসেম্বর মাসে। প্লেনে করে এসে এয়ার পোর্টে নামলেন। পোর্টব্লেয়ারেই সর্বপ্রথম নেতাজী স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাপানী সিভিল গভর্নর রাজকীয় সম্মানে নেতাজীকে নিয়ে গেলেন। সহরের গণ্যমান্য লোকেদের সেখানে ডাকা হল। সকলে অনেক আশা নিয়ে গেল নেতাজীকে নিজেদের দুঃখের কথা জানাবে। বাঙালী যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভাবলেন বাংলায় একটু নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাবেন। কিন্তু জাপানীরা তা আগেই বুঝতে পেরে নেতাজীর চারদিকে কড়া নজর রাখল। পরদিন জিমখানা গ্রাউণ্ডে নেতাজী হিন্দীতে ভাষণ দিলেন :

'ইংরেজের দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি হিন্দুস্থান উদ্ধারের জন্য সিঙ্গাপুরে সৈন্য মজুত রেখেছি। জাপানীদের সঙ্গে আমাদের বাহাদুর পল্টন এক হয়ে লড়াই করে যে জমি উদ্ধার করবে তা ভারতবাসীর। আমরা যেমন যেমন অগ্রসর হব, সেখানকার নওজোয়ানদের সৈন্য বিভাগে ভর্তি করে নেবো। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে আমরা পাটনা পর্যন্ত যাব, সেখানে ভারতীয় সৈন্য আমাদের সাহায্য করবে। আপনারা সকলে সৈন্যবিভাগে যোগদান করুন। আপনাদের সাহায্য বিনা জাপানীরা একা লড়াই করতে পারবে না। আপনারা আমাকে রক্ত দিন, আমি আপনাদের স্বাধীনতা দেব।'

এখানকার লোকেরা বলেন বয় বাবুচিরা সহরের অবস্থা সম্বন্ধে সুভাষ বোসকে কিছু কিছু জানিয়েছিল। তিনি এখান থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে গেলে পর কর্নেল লোকনাথনকে পোর্টব্লেয়ারে পাঠালেন আন্দামানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। জাপানীরা তাতে রাজি হল না। কর্নেল লোকনাথনের চোখের সামনেই কত লোকের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তিনি নিরুপায় হয়ে সব দেখেছেন।

এদিকে যুদ্ধের চাকা ঘুরে গিয়েছে, জাপানীরা আত্মসমর্পণ করার পর বৃটিশ জাহাজ এল পোর্টব্লেয়ারে আন্দামান দখল করার জন্য। জাপানীদের বলা হল তোমাদের পরাজয় হয়েছে, তোমরা এখন আত্মসমর্পণ কর। জাপানীরা জবাব দিল তিন বছরের মত যুদ্ধ চালাবার অস্ত্রশস্ত্র আমাদের মজুত আছে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব। তারপর যখন জাপান থেকে রাজার আদেশ এল তখনই তারা আত্মসমর্পণ করল।

৮ই আগস্ট ১৯৪৫ সনে প্রথম এক Mercy Ship এল প্রচুর রেশন ও ঔষধপত্র নিয়ে, সেই জাহাজে আসেন পোর্টব্লেয়ারের প্রাক্তন ফরেস্ট অফিসার মিঃ ফস্টার। সারা সহরে ঘুরে ঘুরে Mr. Foster সকলকে রেশন দিলেন, ঔষধপত্র দিলেন। পোর্টব্লেয়ারের সে সময়কার অবস্থা অবর্ণনীয়। সহরের পথে-ঘাটে মৃতদেহ পড়ে আছে, খাদ্যের অভাবে মানুষগুলি কঙ্কালসার হয়ে গেছে, মরণের প্রতীক্ষায় তারা দিনের পর দিন কাটাচ্ছে।

South East Asiatic Command-এর তরফ থেকে S. S. Dilwara জাহাজ প্রায় ৮ হাজার সৈন্য ও ৫০০ সিভিল লোক নিয়ে এল আন্দামান পুনরধিকার করতে। ইংরেজ ব্রিগেডিয়ার জাপানী সিভিল গভর্নরকে জাহাজে ডেকে পাঠালেন। সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের একটা হিসাব তার কাছে চাওয়া হল এবং তিনি আদেশ দিলেন সমস্ত জাপানী সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে পোর্টব্লেয়ারের বাইরে গ্যারাচার্মা গ্রামে নিয়ে যেতে। পরদিন সকালে পোর্টব্লেয়ারে বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করল। জিমখানা গ্রাউণ্ডে ব্রিগেডিয়ারের কাছে জাপানী সিভিল গভর্নর যথারীতি আত্মসমর্পণ করল। কিছুদিন পর্যন্ত জাপানীরা গ্যারাচামায় ছিল, বৃটিশ সৈন্যরা তাদের দিয়ে তখন কুলির কাজও করিয়েছে। পরে জাপানীদের সব সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এখনও লোকে জাপানী অত্যাচারের কাহিনী বলতে বলতে শিউরে ওঠে। সে সব গল্প শুনলে মনে হয়, যে দেশের লোকেরা এত সৌন্দর্যের উপাসক বলে পৃথিবীতে বিখ্যাত সে দেশের লোক এমন পাশবিক অত্যাচার কি করে করতে পারে? তিন বছর জাপানী রাজত্বে আন্দামানের প্রায় শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন লোক মারা গিয়েছিল।

জাপানী আমলের কোন কাগজ-পত্র, কোন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ কোন ইতিহাসও লিখে রাখেন নি। যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি সবই স্থানীয় লোকেদের মুখ থেকে। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা সব ঘটনা বলেছেন।

১৯৪৫ সনে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আন্দামান পুনরধিকার করেন। এই সময় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ একেবারে তুলে দেওয়া হল এবং সব কয়েদীদের সরকারী খরচে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শতবর্ষব্যাপী একটা কলঙ্কের অধ্যায় এতদিনে শেষ হল এবং 'কালাপানি'র ভয়াবহতা এতদিনে অনেকটা দূর হল। 'কয়েদী উপনিবেশ' বা Convict Colony বলে আন্দামানের কুখ্যাতি দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে নূতন যুগের সূচনা হল। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার নানারকম ভাবে উন্নতির চেষ্টা করছেন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের। কয়েদী উপনিবেশের স্মারক হিসাবে আজও এখানে সেলুলার জেল দাঁড়িয়ে আছে। [আগামীবারে সমাপ্য।

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

নিঃসীম অন্ধকার আকাশে তারার দল কেবল নির্নিমেষ চেয়ে আছে। তাদের চোখে ঘুম নেই। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তাদের ছায়া বুক নিয়ে রাতের গঙ্গা ছুটে চলেছে অসীমের বুকে নিজেকে বিসর্জন দেবার আকাঙ্ক্ষায়। ওপারে ধু-ধু করা বালুচর আর গহন সবুজ সীমাও রাতের নিস্তব্ধতায় একান্ত নিভৃত হয়ে পড়ে আছে। দূরে দেখা যায় শ্মশানের চিতা দাউ-দাউ করে জ্বলছে, গঙ্গার বুকেও ফুলছে সেই ছায়াচিহ্ন। জ্বলছে মহাশ্মশানের চিতার আগুন। বারাণসী ধামের মণিকর্ণিকা ঘাট উত্তরে আর দক্ষিণে হরিশ্চন্দ্র ঘাট।

সমস্ত কাশীর ঘাটগুলির ছায়া বুকে নিয়েই উত্তরবাহিনী গঙ্গা চলেছেন কুলকুল করে সাগরের উদ্দেশ্যে। বিরাট এক দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে পাষাণগড়া বিরাট এক প্রাসাদ। উদয়পুরের রাণাদের রাণামহল—নামেই শুধু রাণামহল, কেটে ছেঁটে ভাগে ভাগে প্রায় সবটাই বিক্রি হয়ে গেছে এখন। সেদিনের সেই মহল আজ আর মহল নেই, মহল্লা হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা জাতের বিভিন্ন মানুষের সমাবেশে। গঙ্গার বুকে তারও ছায়া পড়েছে। একের পর এক অসংখ্য সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার ঘাটে। পাষাণগড়া বিরাট পাড়ের উপর সিমেন্ট বাঁধানো বিরাট বিরাট গোল চত্বর—যাত্রীদের বিশ্রামস্থান। কত যে ঘাট, কত যে সিঁড়ি, কত যে দেবতা আর কত যে দেউল! সবকিছুই রাতের অন্ধকারে প্রাণহীন ; নিঃসঙ্গ।

রাণামহল! এই বিরাট পাষাণগড়া মহলের আনাচে-কানাচে আজও আমার তৃষিত প্রাণ খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে যাওয়া সেই সুখ স্মৃতিটুকু। দিন বদলেছে, কাল পাল্টে গেছে আর সেইসঙ্গে সেই মানুষগুলোও যেন কেমন পর হয়ে গেল। সবকিছুই যেন কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে। আপন করে চাইলেও তাদের আর কোনদিনই বুঝি আপন করে পাওয়া যায় না। গঙ্গার ঘাটে দেখা হলে আজও তেমনি করে নমস্কার জানায় মহেশপাণ্ডা, কিন্তু এই হাসিতে তেমন আর আন্তরিকতা নেই, সহজ সেই প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস নেই। তার মনের স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারে এসেছে ভাঁটার শূন্যতা। দুই পারে শুধু কেবল শুকনো বালুচর। সেদিনের রাণামহল আর আজকের এই রাণামহল কত তফাৎ কত ব্যবধান। আজকের রাণামহলে শুধু কেবল ভাঙনের আমন্ত্রণ। চারিপাশের বাড়িগুলোর অধিকাংশই মাটিতে ভেঙ্গে পড়েছে, চারিদিকে কেবল ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ। বিরাট সে অশ্বত্থ গাছটারও বয়স বেড়েছে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন কত যে ঝুরি নেমেছে মাটিতে। কোণের সেই মহলাটার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই. কেবল বিরাট ফটকটাই রূপকথার সাক্ষীর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনাদৃত শিবমন্দিরের পাশের ঐ সুড়ঙ্গটি নিয়ে কিন্তু সমস্যার আজও শেষ নেই। এককালে নাকি এখান থেকেই সরাসরি সুড়ঙ্গ পথটি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছিল। সেই সুড়ঙ্গ মুখে আজ শুধু পাথরের মেলা। চিরকালের মত স্তব্ধ হয়েছে সুড়ঙ্গ পথে সন্তঃস্নাতা অবগুণ্ঠিতা বরনারীর চঞ্চল পদধ্বনি কিংবা রাতের অন্ধকারে ত্রস্ত অভিসারিকার চকিত গমনের ভীরু পদসঞ্চার। ভাড়াটেদের শিশুরা আজকেও তেমনি করেই জটলা পাকায়, তেমনি করেই গল্প ফেঁদে আসর জমায়।

দেখতে দেখতে রাণামহলে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। সেদিনের রাণামহল কত জমজমাট ছিল মানুষের সমাগমে আর আনন্দের কল-কোলাহলে। গঙ্গার পাড়ে বিরাট এই রাণামহলে সারি সারি কত বাড়ি, প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে কত লোকের ভিড়। সকাল-সন্ধ্যা

মুখর হয়ে থাকত তাদের কথোপকথনে কিংবা অকারণ কলহের উচ্চ কলরোলে। ভোর না হতেই সুরু হত মানুষের ফিসফাস কথাবার্তা, স্তোত্রগান, মন্ত্রপাঠ আর গঙ্গাস্নানের প্রস্তুতি।

গঙ্গার ঘাট মুখর হয়ে উঠত স্নানার্থীদের কলভাষণে। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে আমাদের রাণাঘাটের স্বামীজী উদাত্তকণ্ঠে সূর্যের স্তব পাঠ করতেন, মহিমবাবু ভৈরবীতে ভজন গাইতেন, আর মাসিমা তাঁর পূজার ঘরে ধ্যানে বসতেন। সূর্য উঠতে তখনও অনেক বাকি। মাঝি-মাল্লারা তখনও ঘুম থেকেই ওঠে নি। কেউ বা চোখমেলেই তামাক টানবার উদ্যোগ করছে। মালসাভরা গনগনে আগুন আর ছই-এর এককোণে লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছে টিমটিম করে—ধোঁয়ায় কালো অন্ধকার চিমনিটা। রাতের অন্ধকারেই সুরু হয়ে যেত কাশীর মানুষের কাজকর্ম ধর্মকর্ম সবকিছু। সুরু হত গঙ্গাবক্ষে ঝুপ ঝুপ স্নানের আওয়াজ। দূরের কেদারঘাটের মন্দির থেকে বাতাসে ভেসে আসত কর্ণাটক সঙ্গীত—শিবের স্তোত্রগান। অত ভোরেও মহেশপাণ্ডা ঠিকই এসে গেছে তার নির্দিষ্ট আসনটিতে—বাঁশের গোল ছাতাটার নীচে। চন্দন বাটার ধুম পড়ে যেত। একটু পরেই ত' যাত্রীর ভিড়ে নিঃশ্বাস ফেলবার পর্যন্ত সময়টুকু পাবে না। আগেভাগেই কাজ গুছিয়ে রাখত রাণাঘাটের মহেশপাণ্ডা। নতুন পাণ্ডা হয়ে অবধি মহেশের আর ফুরসৎ নেই দম ফেলার। ভোর চারটার আগে ঘুম থেকে উঠে ছোটাগৈবীতে রোজকারের ডনকুস্তিটা সেরেই মহেশপাণ্ডা তার নিজের ঘাটে চলে আসত। এত বড় একটা ঘাটের পুরো দায়িত্ব একলা তার। ধুয়ে-মুছে, ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে রাখত ঘাটখানাকে। তারপর ঝুপ করে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়েই এসে বসত নিজের আসনটাতে, গোল ছাতাটার গায়ে মেলে দিত ভেজা গামছাখানা আর লাল লেঙটিটা। আপন মনে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ত আর মস্ত বড় পাথরের টুকরোটাতে চন্দন ঘষে ঘষে ভরে রাখত ছোট ছোট বাটিগুলো—কিশোর মহেশপাণ্ডার কত ভাবনা কত চিন্তা। এত বড় রাণাঘাটের পাণ্ডা সে—বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধি।

কি শীত কি গ্রীষ্ম এই রীতিই চলে আসছে সেই আবহমান কাল থেকে। একই নিয়মে চলছে রাণামহলের রাত্রি আর দিন, উদয় আর অস্ত। রাণামহলের বাসিন্দাদের অধিকাংশই ছিলেন বিধবা। মাসিমা বলতেন—কাশীতে রাজত্ব করেন ষাঁড়ে, বিধবায় আর শিবে। কাশী ভরাই বিধবা—তাঁরা যে কতকাল কাশীবাস করছেন আর বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছেন সে খবর খোদ তাঁরাও সঠিক জানেন না। মনোদি' বলতেন—স্বামী চক্ষু বুজলেন কিন্তু ঠিকই জানতাম কাশীর দোর ত' খোলাই রইল। বিশ্বনাথ ত' আছেনই ভাবনাটা কি! যুদ্ধের আগে মাত্র পাঁচ টাকায় সংসার চালিয়েছি তেলে-খেলে—দুইবেলা দই-রাবড়ি খেয়ে একখানা ঘরের মাসিক ভাড়া ছিল আট আনা, দুধের সের দু'আনা, টাকায় সের ভর ঘি, চালের মণ পাঁচ টাকা। একটা বিধবার পেট চালাতে আর লাগেটা কি শুনি! আর এখন চল্লিশ পঞ্চাশ টাকাতেও একটা মানুষের পেট চলে না—এমনই দিন পড়েছে। মাসের শেষে গোয়ালার কাছে ধার, মুদি দোকানে ধার, ফুলওয়ালী বুড়ির কাছে পর্যন্ত ধার। নানা ঝামেলাতে সদাই বিব্রত, একটু প্রাণখুলে যে বিশ্বনাথকে ডাকবে সে ফুরসৎটুকু পর্যন্ত নেই। বিশ্বনাথও হয়েছেন যেমনি নির্বিকার নিশ্চিন্ত। তাঁর কি! ফুল বেলপাতার ত' আর অভাব নেই।

সেই কতকাল যাবৎ—সেই আমাদের ছোট্টবেলা থেকে মনোদি'কে সেই একই রকম দেখে আসছি। রাণামহলের বড় ফটকটা পেরিয়ে এলেই সরু গলিটার মুখে নিম গাছের নীচে একটা ছোট্ট ঘরে মনোদি' থাকতেন। মনে পড়ে তাঁর সাজানো ছোট্ট ঘরখানাকে। এককোণে ঠাকুরের আসন, আর এককোণে তাঁর রান্নার ব্যবস্থা। পূবের খোলা জানালাটার পাশেই ছিল একখানা দড়ির খাটিয়া। দিনের বেলায় বিছানাটাকে গোল করে গুটিয়ে রাখতেন। দেয়ালের গায়ে কত যে দেব-দেবীর ছবি টাঙানো ছিল—কাশীর বিশ্বনাথ, অন্নকূটের মাতা অন্নপূর্ণা, ওর মাঝখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন, গার্হস্থ্য জীবনের দশবিধ কর্তব্য ও নরকভোগের শতাধিক বীভৎস চিত্রাবলী। দরজার মাথায় টাঙানো ছিল সবুজ সুতোর কাজ করা একটি কার্পেটের ছবি —একটি কাকাতুয়া। নীচে লেখা—'যাও পাখি বল তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।' অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম। মনোদি' বলতেন—অমন অবাক হয়ে কি দেখছিস! এটা আর এমন কি! ভালো ভালো কার্পেটের ছবিগুলি ত' দেশের বাড়ি থেকে আনতেই পারলাম না। এখনও ভাসুর-পো লোক ডেকে দেখায়।

মনোদি'র কাছেই শুনেছি তাঁর শ্বশুরবাড়ির গল্প। গ্রামের জমিদারবাড়ির ছোটবৌ ছিলেন মনোদি'। কত বলেছেন তাঁর দেশের কথা, ঠাকুরবাড়ির কথা আর জোতজমির গল্প। জমজমাট শ্বশুরের সংসার। নিত্য সেখানে ঠাকুরের সেবা, দোল-দুর্গোৎসব, অতিথি সৎকার, ব্রাহ্মণভোজন, দানধ্যান কত কি! বলতে বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতেন মনোদি'।

কত দিন চলে গেছে, আজও চোখ বুজলেই যেন তেমনি করেই মনোদি'কে চোখের সামনে দেখতে পাই। সূর্য ওঠার অনেক আগেই গঙ্গাস্নান সেরে বিশ্বনাথ দর্শন করে ঘরে ফিরে আসতেন। একরাশ ভেজা চুল পিঠের ওপরে ছড়িয়ে আছে। হাতে একটা পিতলের কমণ্ডলু। মাথার ঘোমটাটা জলে ভিজে গেছে, আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা কাঁধ ঘুরিয়ে রেখেছেন, বুকের ওপর দুলছে সেই থোকাটি। কপালে গঙ্গাতিলক, চোখের পাতায় জলের রেখা। অবাক হয়ে দেখতাম। কি রূপ ছিল মনোদি'র যেন সাক্ষাৎ দুর্গা প্রতিমা। চুল শুকাতে শুকাতে বলতেন—মরণ হয়েছে আমার এই চুলগুলো নিয়ে। কত দিন ভাবি চুলের এই বোঝাটাকে কেটে খালাস হয়ে যাই, আর পাঁচজন বিধবার মতই নেড়া হবো, কিন্তু তখনই দেশের বাড়ির আমার ভাসুর-পো'র কথা মনে পড়ে। দেশ ছাড়ার আগে তিন সত্যি করে দিব্যি দিয়েছে যেন এমন গোছা-গোছা চুলগুলোকে কখন না কেটে ফেলি। কি জ্বালাই না হয়েছে চুলগুলো। রূপ দিয়ে আর হবেই বা কি!

জমিদারবাড়ির গর্বটুকু মনোদি'র অটুট ছিল শেষদিন পর্যন্ত। জমিদারবাড়ির ছোটবৌ মনোদি'—সেকথা কখন ভোলেন নি তিনি। একাই পড়ে থাকতেন একান্তে নিজের ছোট্ট ঘরখানায়—নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে। পরের কথায় কোন উৎসাহ কিংবা কোন অনুসন্ধিৎসা ছিল না মনোদি'র। পূজা-আহ্নিক ও বাসিকাজ সেরেই বেরিয়ে পড়তেন আর ফিরতেন দুপুর গড়িয়ে গেলে। তারপর উনানটা

ঝালিয়ে চালে-ডালে যা হোক একটা কিছু সেদ্ধ করে বিধবার একবেলার আহারটুকু শেষ করে নিতেন। কতদিন জিজ্ঞাসা করেছি রোজ-রোজ কোথায় যাও মনোদি'। এত বেলায় বাড়ি ফের কেন!

—ধান্দার কি আর শেষ আছে রে ভাই। হেসে মনোদি' জবাব দিতেন।

মধ্যাহ্নে রাণামহলের সবাই যখন দিবানিদ্রায় কিংবা পরনিন্দায় ব্যস্ত—মনোদি'কে দেখতাম একান্ত নিবিড় হয়ে সুর করে তিনি মহাভারত পড়ছেন।—

'অহিংসা পরমধর্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি কহে জ্ঞানী জনে ॥
আগু হতে হিংসাবুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চমহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে ॥
জগতে অকীর্তি ঘোষে লোকে নাহি মান।
কহিব পূর্বের কথা কর অবধান ॥'

পূর্বের কথা বলতে বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতেন মনোদি'। বলতেন—সবকিছুই মনে হয় যেন স্বপ্ন। কত বড় বাড়ি, দরদালান—লোকে-জনে গম্‌গম্ করছে। পাশেই নদী শীতললক্ষ্যা কুল কুল করে বয়ে চলেছে। ওপারে টিয়ারঙ সবুজ সীমা, দুধরঙ সাদা কাশের গুচ্ছ হাওয়ায় দুলছে। দূরের সেই আবছা গ্রামখানা এখনও চোখের পাতায় ভাসে। পাল তুলে সারি সারি নৌকো চলেছে। দেবদারুগাছের সেই বনবীথি এখনও যেন তেমনি করেই নদীর জলে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। খেয়াঘাটের কলকোলাহল তেমনি করেই যেন ভেসে আসে বাতাসে। সময় পেলেই নদীমুখো বারান্দাটায় এসে দাঁড়াতাম। অবাক হয়ে দেখতাম আকাশ আর মাটির মিলনবেলায় প্রকৃতির অনন্তরূপের অসীম ব্যাপ্তি। নিঃশব্দ পদসঞ্চারণে কখন যে উনি পেছনে এসে দাঁড়াতেন—টেরই পেতাম না কিছু। হঠাৎ একটা উৎকট শব্দ করে আমাকে ভয় পাইয়ে দিতেন, চমকে দিতেন আমাকে। তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসি বাতাসের তরঙ্গে ভেসে ভেসে নদী পার হয়ে ওপারের আকাশে মিলিয়ে যেত।···বলতে বলতে মনোদি' হঠাৎ মাঝখানেই থেমে যেতেন, বলতেন—তোর সঙ্গে গল্প করলেই চলবে! পোড়া পেটের ব্যবস্থাও ত' একটা করতে হবে—কি বলিস।

সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখতাম মনোদি' তন্ময় হয়ে সেই অন্তরঙ্গের সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছেন, ঘরের কোণে পীলসুজে প্রদীপ জ্বলছে মিটমিট করে, ধূপের ধোঁয়ায় আকুল হয়েছে বাতাস, উতলা হয়েছে সেই ছোট্ট পরিবেশ। বংশীগোপালের পিতলের মূর্তিটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। কি রূপ গোপালের। মাথায় শিখীচূড়ো, ময়ূরপুচ্ছ, হাতে সোনার কাঁকণ, পায়ে রূপোর নূপুর। পরণে পীতবাস, শ্বেত উত্তরীয়, হাতে মোহন বাঁশী। চন্দনের শুভ্র বিন্দু বিন্দু সাজিয়ে মনের মতন করে সাজিয়েছেন মনোদি' তাঁর মনের ঠাকুরকে। সাদা যূঁইফুলের মালা দুলছে গলায়।···সংসারের সব ধান্দা সব চিন্তাও সেই মুহূর্তে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে সুদূর দিগন্তে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠতেন এবং পরমুহূর্তেই ডাক দিতেন—আয়, আয়, ভিতরে আয়। পা-দু'টো তুলে বস কিচ্ছু ভাববার নেই এবার ডান হাতের মুঠোটা খোল দেখি—বলেই আমার হাতের পাতাটা ভরে দিতেন ঠাকুরের প্রসাদে··দু'টো চিনির বাতাসা, কদমা, কিংবা একটি ক্ষীরের নাড়ু, অথবা একটি ছানার জিলিপি। প্রসাদের লোভটাও বড় কম ছিল না···আজও যেন তার স্বাদটুকু ভুলতে পারি নি।

—জানিস রে আমাদের দেশের বাড়ির ঠাকুরঘর নিয়েই ত' পড়ে থাকতাম সর্বক্ষণ। তাই নিয়ে কত সময় কত ঠাট্টাই না করতেন উনি। বলতেন—পুরুতবাড়ির মেয়ে কি সাধে এনেছেন দাদা চৌধুরী-বাড়ির ছোটবৌ করে। সব সময় অভিযোগ করতেন উনি—আমার কথা তুমি একটুও ভাবো না। এখন মনে হয় সত্যি ত' ওঁর কথা ভাবতে সময়ই পাই নি কোনদিন। মরবার আগে শাশুড়ি কাছে ডেকে বলেছিলেন—তুমি আমার বংশীগোপালকে দেখো, ঠাকুরবাড়ির সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম—বলতে বলতে মনোদি'র চোখ দু'টো জলে ভরে আসত, বাকিটুকু আর শোনাই হোল না কোন দিন।

মনোদি'র কাছে তাঁর শ্বশুরবাড়ির গল্প অনেক শুনেছি। ভোরের আলো জাগার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠতেন, স্নান সেরে মন্দিরের কাজে লেগে যেতেন। জমিদারবাড়ির দরদালান পেরিয়ে নদীর পারে গৃহদেবতা বংশীগোপালের মন্দির। নদীর ওপারে সূর্যিঠাকুর যখন উঁকি দিতেন এপারের মন্দিরের চূড়ায় পেতলের কলসটায় এসে ঠিকরে পড়ত তাঁর আলোকরশ্মির বর্ণচ্ছটা। ভেজা-চুল শুকিয়ে যেত ভোরের হাওয়ায়।

রোজ ভোরবেলা বাউলবাবাজি একতারাটি নিয়ে মন্দিরের চত্বরে এসে বসতেন। ডাক দিতেন কই-গো। আমার মা-লক্ষ্মী কই গো।—কত যে গান শোনাতেন। পূজারীর ডাকে মনোদি'র চমক ভাঙত। বিরাট তামার টাটে ভাগে ভাগে আলাদা করে ফুল সাজাতেন, প্রতিটি তুলসীপাতা বেছে বেছে সাজিয়ে রাখতেন, ছোট ছোট বাটিগুলো চন্দন ঘষে ঘষে ভরে রাখতেন তারপর নৈবেদ্য সাজিয়ে ছুটে যেতেন ভোগের ঘরে। নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগ রান্না—এটাই ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দ। এইটুকু নিয়ে ছিল ছোটবৌর স্বপ্ন—এটুকুই ছিল তার পৃথিবী।—জানিস মন্দিরের পূজারী আমাকে রোজ আশীর্বাদ করে কি বলতেন! বলতেন—বৃদ্ধের কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না। সারাটা জীবন একমনে ঠাকুরের সেবা করেছি, আমার আশীর্বাদ সত্য হবেই। তুমি সুখী হবে মা, চিরসুখী হবে।···আজ কোথায় উনি আর কোথায় আমার সেই ঠাকুরঘর। সংসারের সমস্ত কাজ সেরে যখন ঘরে আসতাম, রোজই দেখতাম উনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। সংসারের কিছুই বুঝতেন না। নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন, ছাত্র পড়াতেন। জমিদারবাড়িতে এ নিয়ে কত হাসাহাসি শুনেছি। জমিদারের ছেলে পাঠশালার পণ্ডিত হয়েছেন। জমিজমা, সেরেস্তার সমস্ত কাজ দেখতেন বাড়ির বড়বাবু। যেমন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী তেমনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। লোকে বাঘের মত ভয় করত, দেবতার মত শ্রদ্ধা করত। সে সব দিনের কথা বলতে বলতে মনোদি' যেন সব ভুলে যেতেন। সময় পেরিয়ে যেত কারুর খেয়ালই থাকত না।······

মনোদি'র কথা মনে হলে কাশীর সেই দিনগুলির কথা আমার পরিষ্কার মনে পড়ে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতায় আমাকে চিঠিও লিখতেন। যদি ছুটিতে কাশী যাই তবে যেন অতি অবশ্য তাঁর জন্য

পড়ায় একটা চাদর, ঘাটের স্বামীজীর জন্য পাঁচ-ছ' টাকার মধ্যে একটা ঝরণা কলম, একজোড়া গন্ধ লেবু এবং গোটা কয়েক চালতা যেন নিশ্চয়ই নিয়ে যাই। যদি বাজারে নতুন কাঁচা আম দেখা দিয়ে থাকে তবে যেন তা-ও গোটাকতক নিয়ে যেতে ভুল না করি।

সেবার পূজোর ছুটিতে অনেকদিন পরে কাশী গিয়েছি। প্রায় বছর পাঁচেক পরে। শুনলাম বিয়ে-সাদি ক'রে সংসারী হয়েছেন ঘাটের পাণ্ডামশাই মহেশঠাকুর। ঘাটের প্রতি আগের মত আর মায়া নেই, শেওলা জমেছে স্থানে-স্থানে। বানের জল সরে গেছে কোনকালে কিন্তু পলিমাটির আস্তরণে রাণাঘাটের অধিকাংশ সিঁড়িগুলো তখনও মাটির নীচে। দিন চলেছে গা এলিয়ে। রাণামহলেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক। উদয়পুরের রাণারা তাঁদের সাধের মহল ভাগে ভাগে বিক্রি করে দিচ্ছেন। মালিক আর নেই। সেদিনের ঐ একরত্তি ছেলেগুলোই ডন-কুস্তি করে ইয়া বড়া পহেলওয়ান হয়েছে, গলায় কালোতাগায় বজরঙ্গবলীর মাদুলি লাগিয়েছে। রাণামহলের বিধবা বুড়ি ও বুড়োগুলোকে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখায়। ওরাই এখন মাতব্বর। রাণামহলের মাসিমার বারান্দাটায় দাঁড়াতেই সবাই একে একে ছুটে এলেন আমাকে দেখতে। সবার মুখেই এক কথা—কাশী আর সেই কাশী নেই রে। কার গোয়ালকে কে আর বাতি দেয়। সন্ধ্যায় মাঠের কোণে সেই বড় বিজলি বাতিটাও আর জ্বলছে না। কে নাকি খুলে নিয়ে গেছে বাল্বটা। ময়লা জলে ড্রেন ভরে আছে, কার সাধ্যি বাস করে এমন নরককুণ্ডে! নিশ্চিন্তে যে বিশ্বনাথকে একট ডাকবো তারই কি উপায় আছে বাবা। রাণামহলে যে এত অশান্তি কিন্তু দু'টি মানুষকে দেখলাম তারা তখনও পরম নিশ্চিন্ত। একজন হলেন মনোদি' আর একজন মোতিমা। সেই এক চেহারা সেই একই ধরণ-ধারণ। কোন দিকেই মোতিমার সেথে নাক গলাবার উৎসাহ নেই। বেশ আছেন মোতিমা—তাঁর গণ্ডা তিনেক অপোগণ্ড মানে বিড়ালের পোষ্য নিয়ে। কত না নামের বাহার, কত না খাবার ব্যবস্থা তাদের জন্য। কোনটা ভালবাসে পাতলা দুধ, কোনটা বা ঘন ক্ষীর, কোনটার বা আবার মাছ ছাড়া ভাতই রোচে না মুখে। বেশ আছেন মোতিমা।

শরতের রঙ লেগেছে আকাশে। নীল আকাশের অসীম জুড়ে লেগেছে আনন্দ। ঘাটে-ঘাটে মানুষের ভিড়, কত আনন্দের কল-কোলাহলে মুখর হয়েছে কাশীর গঙ্গার তীর। কুলকুল করে বয়ে চলেছেন উত্তরবাহিনী সুরধুনী গঙ্গা। শীতলাঘাটে গঙ্গাপূজার আয়োজন চলেছে। মধুর সুরে সানাই যেন প্রাণের অব্যক্ত কথার সুর নিয়ে আকাশকে আকুল করে তুলেছে। একা একাই ঘাটে-ঘাটে ঘুরছিলাম আর অবাক হয়ে দেখছিলাম এই মানুষের মিছিলে মানব মনের অখণ্ড প্রতিচ্ছবি। হাঁটতে হাঁটতে দশাশ্বমেধঘাট, ঘোড়াঘাট মান-মন্দির ছাড়িয়ে ত্রিপুরা ভৈরবীঘাট, নেপালীঘাট পেরিয়ে অনেকটা দূরেই এসে পড়েছিলাম। মণিকর্ণিকা শ্মশান গোয়ালিয়র ঘাট, বেণী-মাধবের ঘাট ছাড়িয়ে প্রায় রাজঘাটের কাছাকাছিই এসে পড়েছিলাম। ঘাটের উপর পাণ্ডাঠাকুরের গোল ছাতাটার নীচে বসে বসে দেখছিলাম মানুষের এই সমাবেশ, এই গঙ্গার জলে তাদের পুণ্য অবগাহন। ভেজা পায়ের ছাপে ছাপে কত মানুষের কত কাহিনী আঁকা রইল এই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। কত বিচিত্র তাদের জীবনের ধারা, তাদের চলার গতিপথ। কোন মিল নেই একজনের চেহারার সঙ্গে আরেকজনের,

কোন মিল নেই একজনের চলার সঙ্গে অপরের। উদ্দেশ্য শুধু এক—এই নদীর জলে পুণ্য অবগাহন মানসে সবাই ছুটে এসেছে দূর দূরান্ত থেকে। মানুষ এসেছে মেলার আসরে একটু আনন্দের আশায়। কত জপ, কত তপস্যা। কত গৃহী কত সন্ন্যাসী একই ঘাটে ভিড় জমিয়েছে। গেরুয়ায় রঙ ধরেছে সাদা মনে। কত তর্পণ কত শ্রাদ্ধ চলেছে প্রতিটি ঘাটে-ঘাটে; কত দান কত যাগযজ্ঞ চলেছে। বসে বসে অবাক হয়ে তাই দেখছিলাম। বনহংসীর দল চলেছে এ-দেশ থেকে ও-দেশে, নীল আকাশের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাদা মেঘের ঝলকে পিছনে রেখে। নদীর জলে ভেসে চলেছে কত মালা কত ফুল কত মানুষের মনের অর্ঘ্য নিয়ে। নৌকা চলেছে কত তীর্থযাত্রী নিয়ে পঞ্চকুশীর পরিক্রমায়। মুখে তাদের এক নাম—হর হর মহাদেব, শম্ভু কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে। মনে ঐশী আনন্দের আকুল চেতনা। ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে প্রতিটি ঘাট, প্রতিটি মন্দিরের দুয়ার। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, নেই প্রাদেশিকতার সামান্য একটু সঙ্কীর্ণতা। প্রতিটি নৌকাই যাত্রীতে ঠাসা। সবাই চলেছেন আপন মনের উদ্দেশ্য বুকে নিয়ে।

কোন কাজ নেই, চিন্তা নেই, কোন ভাবনা নেই। ছুটির আনন্দে মশগুল মন, মুহূর্তের এই আনন্দে সে সব ভুলে গেছে—পিছনের যত কিছু হতাশা আর অবসাদের চিন্তা। ছুটির ঘণ্টা বেজেছে বাতাসে। গঙ্গার ঘাটে বসে বসে অবাক হয়ে দেখছিলাম, জনতার এই চলমান মিছিল—হাসি আর কান্নার মিশে আছে। সন্তবিধবা ঐ বালবধূটি কেমন করে অত সহজে সব ভুলে গিয়ে স্নান সেরে ঘাটের পাণ্ডাঠাকুরের কাছে এসে বসেছে, কোলে তার ছোট্ট শিশুটি। কত চিত্রবিচিত্র করে চন্দন লেপনে সাজিয়ে দিচ্ছে শিশুটিকে, বৌটি অবাক হয়ে দেখছে। সব ভুলে গেছে সে। সব ভুলেছে সেই ক্ষণে ঐ বৃদ্ধা জননী—সন্তানহারার দুঃসহ বেদনা। দরিদ্র অতিদরিদ্র ঐ ভিখারীটিও সব ভুলে গেছে—তার জীবনের যত অভাব যত বেদনা, পুঞ্জীভূত যত নিষ্ফল কান্না। গঙ্গার ঘাটে আজ আনন্দের হাট, মুখোসের মেলা বসেছে।

বেলা এগিয়ে চলে মধ্যাহ্নের উদ্দেশ্যে। ঘাটের ভিড়ও কমে আসে ধীরে ধীরে। স্নান সমাপন করে যে যার ঘরে ফিরে চলেছে। ভিখারীর দল ভিক্ষার অন্ন, দানের পয়সা সব গুছিয়ে রাখছে শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের খুঁটে। ঘাটের নাপিতরাও সব কাজের শেষে ক্ষৌর যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে গৃহ প্রত্যাবর্তনের আশায় অধীর হয়েছে। দেখতে দেখতে ভিড় হাল্কা হয়ে এল। আসন ছেড়ে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে সরু গলিটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। গলিটার মুখ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক ধর্মের ষাঁড়, বাবা বিশ্বনাথের বাহন। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ভক্তের দল ঐ সুযোগেই গুঁতো বাঁচিয়ে কমণ্ডলুর একটু জল কিংবা দু'টো বেলপাতা আর দু'টো আতপ চাল বৃষদেবতার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে চলে যায়! বিশ্বাস, কি যে আকুল বিশ্বাস কাশীর এই মানুষগুলোর সে কথা ভাবতে ভাবতেই ছুটির সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়।

গলির পর গলি পেরিয়ে চলেছি। গলির শেষে বড় রাস্তায় পৌঁছুতে পারলেই হোল—একটা একা কিংবা একটা টাঙ্গা নিয়ে সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটের কালীতলায় পৌঁছে যাব। চলেছি ত' চলেছি গলিটার আর যেন শেষ নেই।

একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছের নীচে ভাঙা এক শিবমন্দির। খুব ভিড় সেখানে। দস্তুরমত ঠেলাঠেলি চলেছে। একে ঠেলে ওকে সরিয়ে পা উঁচিয়ে সামনের মানুষটির মাথার উপর দিয়ে দেখলাম গাছের নীচে অপূর্ব সুন্দরী এক ভৈরবী চোখ বুজে ধ্যানে সমাধিস্থা। সোনার মত গায়ের রঙ, কপাল জুড়ে মস্ত বড় একটা সিন্দুরের টিপ জ্বল-জ্বল করছে। দীর্ঘ জটা মাথায়, পরণে রক্তাম্বর শাড়ি, হাতে মাটির কঙ্কণ; আর গাছের গোড়ায় মাটিতে পোঁতা সিন্দুরমাখা একটা ত্রিশূল। সন্ন্যাসিনী নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। ভক্তের দল পয়সা দিয়ে যাচ্ছে; কেউ বা এক মুঠো চাল কিংবা ফলমূল—যার যা মন চায় রেখে গেছে ভৈরবীর পায়ের কাছে। মাটিতে বিছানো চাদরটা ভরে গেছে চাল, পয়সা, শশা, বেল আর পাকা পেয়ারায়।

বেলা পড়ে এল। ভিড় পরিষ্কার হয়ে এল। সন্ন্যাসিনী উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে—যেন মধ্যাহ্ন গায়ত্রী, অপূর্ব আলোর রশ্মিতে চির-উদ্ভাসিত। হঠাৎ ভৈরবীর সমস্ত মুখখানা যেন এই প্রথম পুরোটা নজরে এল। কিন্তু; এ কি! কে এ! পায়ের তলার মাটিটুকু পর্যন্ত যেন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। কাকে দেখছি চোখের সামনে। এ-যে আমাদের রাণামহলের মনোদি'!

তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু উজাড় করে পা চালিয়ে দিলাম। বুকটা আমার ভয়ে কাঁপছে। নিজের নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম।

—শোন। এমন গম্ভীর এমন উদাত্ত, এমন ভয়ঙ্কর ডাক জীবনে সম্ভবত আগে আর কখনও শুনি নি। থমকে দাঁড়ালাম।

গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—অভিনয়টুকুই শুধু দেখে যাবি—তা হবে না, বাকিটুকুও দেখে যা নিজের চোখে।

যন্ত্রচালিতের মত তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। চলতে চলতে একটা অতি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় পোড়ো দালানের নীচতলায় এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকার, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার—দিনের আলোয় কিছুই দেখা যায় না। তেমনি স্যাঁৎসেঁতে। রেড়ির তেলের প্রদীপটা জ্বেলে দিলেন। ছোট্ট ঘরখানা। মেঝের সিমেন্ট ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, দেয়ালের গায়ে শেওলাধরা ইটগুলো যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে, ফাঁকে ফাঁকে বট অশ্বত্থের চারা উঁকি দিয়েছে। ছাতের ফুটো চুঁইয়ে জল গড়িয়েছে বর্ষার সময়—সে চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। যে কোন মুহূর্তে সমস্ত ঘরখানাই সম্ভবত মাটির কোলে গুঁড়িয়ে পড়বে—এমন কুৎসিত অবস্থা। কেমন যেন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ঘরের সিলিং-এ রাশি রাশি বাদুড় ঝুলছে। মানুষের উপস্থিতিতেও ইঁদুরগুলির ভয়-ডর নেই একটুও। দেয়ালের গায়ে দেখতে পেলাম একটা পেরেকের মাথায় একটা লাল টকটকে শাড়ি ঝোলান আর একটা জটাজুট পরচুলো।

—এটাই আমার সাজঘর।

সমস্ত গলাটা শুকিয়ে গেছে, বুকটা যেন জ্বলছে দারুণ তৃষ্ণায়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন আমার নিঃশেষিত হয়ে গেছে। পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

—মনোদি'র মুখোসটাই শুধু দেখে যাবি—তা'হবে না। শুনে যা বাকিটুকুও নিজের কানে শুনে যা। কি দারুণ দুঃখে কত

অপমান সহ্য করে যে এমন অভিনয় করে চলেছি সারাটা জীবন ধরে··· বলব, আজ সব বলব তোকে। মনোদি' তোকে কিছুই মিথ্যা বলে নি, শুধু শেষটুকু ছাড়া। যাকে আমি নিজের কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলাম, নিঃসন্তান মনোদি'র ও ছাড়া যে আর কেউ ছিল না— আমার সেই ভাসুর-পো,—স্বামীর মৃত্যুর পর ওই ত' আমাকে এক বস্ত্রে তাড়িয়ে দিয়েছে দেশের বাড়ি থেকে। বেনামীতে নিলামের ডাকে ওই আমার শেষ সম্বল জমিটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে চোরের মত পালিয়ে এসেছিলাম কাশীতে। চুরি করে নিয়ে এসেছিলাম আমার বংশী.পাপালকে। এ-ছাড়া জীবনে কোনদিন আর কিছু চুরি করে নি তোর মনোদি'। এই অভিনয় আর এই মুখোসটি ছাড়া আমার যে আর অন্য কোন উপায় ছিল না রে।·····শুনলি ত' সব, এবার চলে যা যেখানে তোর খুশি। অনেক বেলা হয়ে গেছে, তোর ভাত নিয়ে নিশ্চয় মাসিমা না খেয়ে বসে আছেন। কাল একাদশী গেছে। যা শীগ্‌গির চলে যা। আর দেরি করিস না— এক রকম জোর করেই আমাকে বাইরে ঠেলে দিলেন মনোদি'। চোখের সামনেই ভাঙা দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন।·····

তারপর.।

তারপর আরও কতদিন চলে গেছে, কতবার কাশী গিয়েছি, কিন্তু আর কোনদিনও খুঁজে পাই নি মনোদি'কে। কত খোঁজ করেছি। রাণামহলে ত' নয়ই সারাটা কাশীর কোথাও আর খুঁজে পাই নি তাঁকে। চিরদিনের মতই মনোদি'ও সম্ভবত হারিয়ে গেছেন মানুষের ঐ জনারণ্যের মাঝখানে। কিন্তু লোকে বলে বিশ্বনাথের রাজত্বে কাশীধামে কোন-কিছুই নাকি কোনদিনও হারায় না।

ঝরা পাতা

সাবিত্রী দেবী

ব্যর্থতা আর গ্লানির পসরা রাখিয়া আমার তরে
জীবনের ভরা-বসন্ত দিন তিলে-তিলে গেল ঝরে।
বিত্ত-অর্থ সবই আছে মোর, নাহি শুধু সেই গৃহ
যেথা সন্তান পথ চাহি আছে, আছে দয়িতের স্নেহ।

কোন সে বাল্যে পুতুল-খেলায় কল্পনা পথ ধরি
বাসর-শয্যা রচিয়াছি কত আমি শাশ্বতী নারী।
সে আশা আমার করিতে সফল সাথী যে হবে না কেহ
আজ আমি হায় গত-যৌবনা একটি নারীর দেহ।

কি যে বেদনায় আজ স্মরি তাহা গোপনে অশ্রু ঝরে
এসেছিল সখা, ফিরে গেছে সে যে বার বার ডাকি মোরে।
মোর সুখ-নীড় রচিতে প্রয়াসী পিতারে বারংবার
ব্যর্থ করিয়া গড়িয়াছি নিজ নিয়তি দুর্নিবার।

উনিশ বছর বয়সে লভিয়া স্নাতকের সম্মান
করেছিনু পণ পর-নির্ভর হব না থাকিতে প্রাণ।
পর বৎসরে রাজ-দপ্তরে বিঘ্ন লঙ্ঘি শত
করণিকা হয়ে করিনু প্রবেশ সাধিতে জীবন-ব্রত।

এ দেহে যেদিন ভরা বসন্ত নন্দন-বন শোভা,
পত্র-পুষ্পে রূপ-লাবণ্যে সবাকার মনলোভা।
চাহিয়া জীবনে আমারে সেদিন যাহারা করিত স্তুতি
শিক্ষা-স্বাস্থ্যে উদার-সুঠাম চক্ষে ক্ষরিত প্রীতি।

ফিরায়ে দিয়াছি সবাকারে করি নিষ্ঠুর পরিহাস
করেছি বিফল একে-একে যত জীবনের মধুমাস।
তারকার দ্যুতি করিয়াছি হেলা আমি-যে চাঁদেরে খুঁজি
মিলিল না চাঁদ, বয়সের মেঘ ঢাকিল তারকা-রাজি।

আজি মোর পাশে কেহ নাহি আসে বাঁধিতে প্রেমের ডোর
লালসা পীড়িত পুরুষ কেবল চাহে যে দেহটি মোর।
অর্থ-মূল্যে করিবারে ক্রয় চাহে যে হৃদয় সুধা
প্রৌঢ়-কামুক জ্বালিয়া চক্ষে কুৎসিত নারী ক্ষুধা।

নাহি সন্তান, নাহি ভালবাসা, নাহি গৃহ, নাহি আশা
শ্রমের পণ্যে জীবনযাপন, তারি তরে যাওয়া-আসা।
নিয়তিরে স্মরি কভু মনে হয়, হইয়া সর্বনাশী
বিশ্ব-নারীরে নিঃস্ব করিয়া হাসি যে অট্টহাসি।

মোর লাগি কভু মঙ্গল-ঘট শোভিবে না কোন গৃহে
দাঁড়াবে না কেহ দ্বার পথে আসি বরণ করিতে স্নেহে।
আমি না জ্বালিব সন্ধ্যা-প্রদীপ কল্যাণী কুল-বধূ।
মা বলিয়া মোরে ডাকিবে না কেহ নারীর শ্রবণ মধু।

অশ্রু-অর্ঘ্যে হবে না মগন আমার শেষের দিন
অগ্নি শিখায় পরিশোধ হবে সকল ভুলের ঋণ।
ছাই হয়ে যাবে বুক ভরা আশা একটি নারীর দেহ
সৃজিয়া যাহারে দিল না বিধাতা স্বামী-সন্তান-গৃহ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

কিংশুকরাগিনী

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৮

তরুবালা আনাজ কুটছিলেন পশুর মা এসে বললে—ও বাড়ির গিনীদিদি আর তার মা এয়েছে। আপনাকে ডাকছে।

—গিনীদিদি আর তার মা! কোথায়?

—গোয়ালঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

—ওমা, সে কি। ঠাকুরঝি কোথায়?

—পিসীমা আহ্নিকে বসেছে।

—চল তো।

তরুবালা গিয়ে দেখেন মেয়েকে নিয়ে শৈলজা দাঁড়িয়ে আছেন। তরুবালা বললেন—এ কি শৈল, এখানে কেন? ভেতরে আয়।

শৈলজা বললেন—না দিদি ভোট নিয়ে কর্ত্তাদের মধ্যে যাই হোক, কি আমি তোমার কাছে যত দোষই করে থাকি আমার গিনী এ বাড়ির কি ক্ষতি করেছিল বলতে পার, যে তার এত বড় সর্বনাশের পথটা এবাড়ি থেকেই বাতলে দেওয়া হল।—বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন।

—সর্বনাশের পথ! সে আবার কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না রে।

—উনি অখিল নাপিতের সঙ্গে গিনীর বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

কথাটা যে তরুবালা না শুনেছেন এমন নয় এবং শুনে মনে মনে কষ্ট পেলেও কথাটাকে ভোট যুদ্ধেরই একটা অঙ্গ বলে ধরেছিলেন। সেটা যে বাস্তব রূপ নেবে এটা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শুনে প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। পরে বললেন, কি বলছিস্ তুই।

—ঠিকই বলছি। অখিল এ বাড়ির হয়ে খাটছে, উনি চেয়েছিলেন অখিলকে ওঁর দিকে টানতে, বহু চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু পারেন নি। তাই নিয়ে চারদিকে লোকে হাসাহাসি করছে। এ বাড়ি থেকে ঠাট্টা করে বলা হয়েছে যে, অখিলকে জামাই করলেই তো গোল চুকে যায়। তা হলে সে শ্বশুর ছাড়া আর কারুর হয়েই খাটবে না। সেদিন গরু নিয়ে অত কাণ্ড হল লোকে হাসাহাসি করলে আজ আবার অখিলকে নিয়ে এই ব্যাপার। ওঁকে তো জান জেদী মানুষ, যা গোঁ ধরবেন তাই করবেন। ঠিক করছেন অখিলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে তোমাদের ওপর টেক্কা দেবেন। কারুর কথা শোনেন নি। অখিলকে ধরে আনতে বেরিয়েছেন, আজই বিয়ে হবে। আমি ভেতরে ছিলুম বিষ্টুবাবু আমায় খবরটা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে বললে। আমি তোমার কাছে এসেছি, হয় তুমি ওকে বাঁচাও না হয় যখন তোমার বাড়ি' থেকেই পরামর্শটা দেওয়া হয়েছে তখন সর্বনাশটা তোমার চোখের সামনেই হোক। আমি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে মেয়ের সর্বনাশ দেখতে পারব না।

শুনে চুপ করে মিনিট দু'য়েক কি যেন ভাবলেন তারপর তরুবালা ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন—অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে তোকে সর্বনাশ দেখতে হবে না। গিনী, তুই না সাহেবদের স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিস্। এই বুঝি তোর লেখাপড়া শেখার নমুনা। এইটুকুতেই ভয়ে একেবারে মরে আছিস্। ছিঃ ছিঃ, আয় তোরা আমার সঙ্গে।

শৈলজা ও রাগিণীকে ভাঁড়ার ঘরে বসিয়ে তরুবালা দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে গিয়ে আলমারী খুলে বেনারসী শাড়ি, ব্লাউজ, ধুতি-পাঞ্জাবী ও কিছু টাকা নিয়ে এসে শাড়ি-ব্লাউজ রাগিণীকে দিয়ে বললেন—পরে ফেল।—বলে পশুর মাকে বললেন—বৈঠকখানায় শুকদেব আছে আমার নাম করে এক্ষুণি তাকে ডেকে নিয়ে আয়, আর অমনি শ্রীকান্তকেও বলে আসবি দৌড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি গলির দরজায় নিয়ে আসুক।

কিংশুক এসে শৈলজা ও রাগিণীকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তরুবালা ধুতি ও পাঞ্জাবী ছেলেকে দিয়ে বললেন—চট্ করে জামা কাপড় পাল্টে নে।

—কেন? কোথায় যাবে।

—মায়ের মন্দিরে। আজ তোর বিয়ে। আর সময় নেই কাপড় পরে আয়।

শৈলজা ও রাগিণী দু'জনেই একথা শুনে অবাক বিস্ময়ে তরুবালার মুখের দিকে তাকাল। শৈলজা তরুবালার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে শুধু বললেন—দিদি।

তরুবালা ছেলেকে বললেন—দাঁড়িয়ে রইলি যে।

কিংশুক বললে—কিসের বিয়ে।

—গিনীর সঙ্গে তোর বিয়ে। বেশি কথা বলবার সময় নেই। যা বললুম তাই কর। কাপড় পরে নে।

—না মা, তা হয় না।

(১) লরেটো বিদ্যালয়
(২) নৃত্য—ইন্দ্রাণী রহমন
(৩) চন্দ্রিমা
(৪) চিড়িয়াখানা (দি
(৫) চিত্র প্রদর্শনী

—শম্ভু সাহা

—শম্ভুনাথ সরকার

—অনিল দে

॥ শিশু-মহল ॥

—কল্যাণী ঘোষ

ত্রয়ী

—শান্তিলতা ঘোষ

বিস্ময়

—তরুণকুমার মিত্র

অর্জুন-লক্ষ্য

—ভোলানাথ দেব

॥ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বের চিত্র ॥

'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই। এক-এক বার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল—কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। অন্যেরা কলসী, ঘটি এসব হতে পারে; নরেন্দ্র জালা। ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা কাঠি-বাটা এই সব।'—শ্রীরামকৃষ্ণ
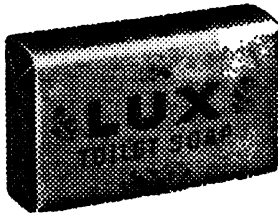
—কেন ? তুইও কি ওঁর মত চাস্ যে নাপিতের সঙ্গে বিয়ে হোক।

—না তা আমি চাই না।

—তবে ?

—তবে চাই যে ওর মনের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও।

—কে সে ?

—কাজল। আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়া আর অখিলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া ওর কাছে একই কথা। আমাকে দেখলে ওর ঘেন্না হয়। বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞেস কর।

রাগিণী একথা শুনে মাথা নীচু করে রইল। শৈলজার মুখ দিয়েও কথা সরলো না।

তরুবালা বললেন—হয়েছে, হয়েছে তোমাকে আর অভিমান করতে হবে না। কবে কি রাগের মাথায় বলেছে ছেলের আমার মানের গোড়ায় আঘাত লেগেছে। জামা-কাপড় পরে নে আর সময় নেই। আলাস্ নি শুকদেব।

কিংশুক দৃঢ়স্বরে বললে—না, তা হয় না মা। এ বিয়ে হতে পারে না।

তরুবালা ঠাস্ করে কিংশুকের গালে এক চড় কষিয়ে বললেন—হতভাগা বাঁদর কোথাকার। আমার কথার ওপরে কথা। ওর ঘেন্না হবে কেন আমারই ঘেন্না হচ্ছে তোকে দেখে। মেয়েটা ভয়ে আতঙ্কে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে কোথায় ওকে অভয় দেবে তা না, বীরত্ব ফলান হচ্ছে! বলে হাত থেকে ধুতি-পাঞ্জাবী টান মেরে ফেলে দিয়ে এক হাতে ছেলের ও অন্য হাতে রাগিণীর হাত ধরে বললেন—পরতে হবে না তোকে নতুন ধুতি। তুই যেমন বাঁদর তোর এই বাঁদরের বেশেই বিয়ে হোক। আয় শৈল।—বলে হিড় হিড় করে দু'টোকে টানতে টানতে খিড়কির দোরের দিকে চললেন, পেছনে পেছনে শৈলজাও গেল।

শ্রীকান্ত গাড়ি নিয়ে এল। তরুবালা গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময় শুনতে পেলেন দামিনী বলছেন—এরা আবার কারা! পাঁঠা বেচা বাড়ির সব কোত্থেকে এল। কোথায় চললে বৌদি।

—যমের বাড়ি। কান্ত ওপরে উঠে কোচম্যানের পাশে বস। মায়ের মন্দিরে যাব। তাড়াতাড়ি চালাতে বল।

মন্দিরে পৌঁছে শ্রীকান্তর হাতে টাকা দিয়ে তরুবালা বললেন—ভাল দেখে মিষ্টি ফল আর একপাতা ভাল সিঁদুর কিনে নিয়ে আয়। দেরি করিস নি।—তারপর বৃদ্ধ পুরোহিতকে বললেন—বাবা আমার ছেলের বিয়ে, কনে শৈলর মেয়ে রাগিণী।

বৃদ্ধ পুরোহিত খুশি হয়ে বললেন—ভাল কথা। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে। কবে দিনস্থির হল।

—আজকে।

—আজকে ? আজ তো বিয়ের দিন নয় মা।

—তা নাই বা থাকলো, মায়ের সামনে আবার দিনক্ষণ কি। মায়ের আশীর্বাদে সব দিনই শুভদিন। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

—সাহায্য !

বৃদ্ধ পুরোহিত ভাবনায় পড়লেন। তিনি উভয়কেই জানেন এবং ভোটের ব্যাপারে দুই পরিবারের মধ্যে যে দারুণ একটা রেষারেষি চলছে এটাও তাঁর অজানা নয়। তিনি শঙ্কিত হলেন। শেষে কোনও হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হবে না তো। তা ছাড়া এ ধরণের বিয়ের কথা তাঁর শোনাই আছে। তিনি নিজে কখনও দেন নি।

তরুবালা বুঝলেন যে পুরোহিত মশাই চিন্তায় পড়েছেন, তিনি বললেন—আপনাকে কিছু করতে হবে না। মিষ্টি আর সিঁদুর নিয়ে আসছে আপনি তা মাকে নিবেদন করে দিন।

মিষ্টি ও সিঁদুর নিবেদন করার পর তরুবালা কিংশুকের হাতে সিঁদুর তুলে দিয়ে বললেন—সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দে আর মনে মনে মা-কে বল, মা তোমার সামনে একে আমার ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করছি, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর। গিনী, তুইও মনে মনে মা-কে বল, মা তোমার সামনে একে আমার স্বামী বলে গ্রহণ করলুম, মৃত্যু ছাড়া কেউ যেন আমাদের পৃথক করতে না পারে। কথাগুলো বলবার সময় আবেগে থর থর করে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

শৈলজা তাড়াতাড়ি তরুবালাকে জড়িয়ে ধরলেন।

মন্দিরের বাইরে তখন ভিড় জমে গেছে। কারুর মুখে কথা নেই। সকলেই অবাক হয়ে এ-দৃশ্য দেখছে।

তরুবালা বললেন—ছাড় শৈল, ভয় নেই আমি সামলে নিয়েছি। শুকদেব, গিনী এবার মা-কে প্রণাম কর।

প্রণাম সেরে মায়ের আশীর্বাদী ফুল কপালে ঠেকিয়ে তরুবালা পুরোহিতকে বললেন—বাবা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি।

বৃদ্ধ পুরোহিতের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরছিল। বহু বিয়ে তিনি শালগ্রাম শিলা সামনে রেখে, যজ্ঞ করে, মন্ত্র উচ্চারণ করে, দিয়েছেন—কিন্তু আজকের এই পবিত্র ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠানটুকুর তুলনায় তা সবই কৃত্রিম বলে মনে হল। তিনি বললেন—কর মা কি জিজ্ঞেস করবে।

—বাবা আমি মূর্খ মেয়েমানুষ কিছুই জানি না। এ বিয়ে আমিই জোর করে দেওয়ালুম, আইন হয়ত এদের স্বামী-স্ত্রী বলে মেনে নেবে না, কিন্তু ধর্ম, ধর্মও কি এদের স্বীকার করবে না ?

—মা। সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি যিনি ধারণ করে আছেন সেই জগজ্জননী বিশ্বমাতার সামনে এরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছে। মা ওদের আশীর্বাদ করেছেন এরপর মানুষের গড়া ধর্ম স্বীকার করল কি না করল তাতে কি আসে যায় মা।

শৈলজা এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি, তিনি বললেন—মা ওদের আশীর্বাদ করেছেন ?

—হ্যাঁ মা। কোনও দুর্যোগের হাত এড়াবার জন্যে তোমরা যে ওদের নিয়ে মায়ের মন্দিরে এসেছ তা বুঝতে পেরে ভয় পেলেও মনে মনে এটুকু ভরসাও আমার ছিল যে মা কৃপা করবেন। তাঁর আশীর্বাদে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নি। একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখ, লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে কিন্তু কারুর মুখে একটি কথা নেই। ঐ ভিড়ের মধ্যে কুঞ্জবাবু ও দীনুবাবুও আছেন। বলে হেসে বললেন—মা যদি আশীর্বাদ না করতেন তাহলে কি বাধা উপস্থিত হত না ? সকলে ফিরে তাকিয়ে দেখে সত্যই দুই ঘরের দুই কর্তা সেই জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানছেন। তরুবালা দ্রুতপায়ে স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন—তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, ছেলে-বৌকে আশীর্বাদ কর। শুকদেব, গিনী তোমরা এদিকে এস।

দীনু দত্ত আশে পাশে জনতার দিকে আড়চোখে চাইলেন কোনও কথা বললেন না। ছেলে-বৌ প্রণাম করল, আশীর্বাদ করলেন কি না তাও বোঝা গেল না। তরুবালা এরপর ছেলে-বৌ নিয়ে কুঞ্জ রাহার কাছে গিয়ে বললেন—মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করুন ঠাকুরপো।

মেয়ে জামাই প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে কুঞ্জ রাহা গম্ভীর ভাবে মেয়েকে বললেন, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তোমার মা-কে ডেকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠ।

রাগিণী একথা শুনে এমন ভাবে তরুবালার গা ঘেঁষে দাঁড়াল যে মনে হল পারে যদি তবে তাঁকে আঁকড়ে ধরে। তরুবালা রাগিণীর মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, ভয় কি বাড়ি যাও। শুকদেব, কান্তকে বল কিছুটা প্রসাদ ঠাকুরপোর গাড়িতে তুলে দিয়ে আসুক। আর আসবার সময় তোর কাকীমাকেও ডেকে নিয়ে আসিস। আয় গিনী, আসুন ঠাকুরপো।—বলে দীনু দত্তর কাছে গিয়ে বললেন—চল।

বিকেলে মহাবীর এল।

—কনগ্রাটুলেশ্যনস্ ওল্ড এগ—কিংশুকের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মহাবীর বললে—খুব খুশি হয়েছিস না রে?

কিংশুক কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলো।

—হবারই কথা। আমাদেরই যা আনন্দ হয়েছে তা বলবার নয়। মামা টিপিক্যাল ফড়ে সে তোদের বিয়ে দেখে কি বললে জানিস্, বললে মহাবীর ইচ্ছে করছে ছুটে বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে ডেকে নিয়ে এসে আর একবার ঝুলে পড়ি।

—তোরা তখন ঐখানে ছিলি নাকি?—

—বাঃ ছিলুম না! আমি, মামা, দুলাল, বলাই চারজনে বিভূতি ময়রার দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমি কি জানতুম যে এই কাণ্ড হচ্ছে, আপিস যাব বলে বেরিয়েছি মামার সঙ্গে দেখা—বললে, দেখবি আয় মা-র বাড়িতে কিং হাড়ি-কাঠে চেপেছে।

—এগিয়ে এলি না কেন?

—ক্ষেপেছিস্। ঐখানে ধরা ছোঁয়া দিতে আছে? তাহলে অমন জমাটি সীন্ মার্ডার হয়ে যেত। কোথায় লাগে 'ঝড়ের শেষে' ফিলিম্। এমন বিয়ে কোনও ফিলিম ডিরেক্টারের মাথায় ঢুকবে না। এ যা প্রীসিডেন্ট ক্রিয়েট করলি না, আর দেখতে হবে না, রোমান্টিক এ্যাণ্ড এট দি সেম টাইম রোমাঞ্চিক। খাঁড়া হাতে জিভ বার করে মা দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে মাথা ঝুলছে দেখলে পিলে চমকে ওঠে তাঁর সামনে বিয়ে হচ্ছে। তার ওপর সস্তা, গোটা ম্যারেজ সেরিমনীর খরচা মোটে স'পাঁচ আনার পুজো য়্যাণ্ড ইউ বীকাম্ ম্যান্ য়্যাণ্ড ওয়াইফ। এরই মধ্যে ব্যাপারটা ওয়াইল্ড ফায়ারের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাল থেকে দেখবি কেমন ধ্যাড়াধ্ধ্যাড় বিয়ে লেগে যায়। এক্সট্রা একজন লোক রাখতে হবে শুধু মায়ের পায়ে ভাব ঠেকাবার জন্যে।—বলে পকেট থেকে সিগারেট বার করে কিংশুককে দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে গোটা দুই টান মেরে বললে—দেশটা যদি সাফিসিয়েন্টলি এ্যাডভানসড হোত তাহলে তোদের গ্রেট সোসিয়াল রিফরমার বলে স্যালুট করত।

কিংশুক বিস্মিত হয়ে বললে—রিফরমার!

—তা নয় ত কি। কত বাপ-মার দুর্ভাবনা ঘুচে গেল জানিস্। নো পুরুত, নো মন্তর, নো ভোজ। এখন নেমন্তন্নর চিঠি পেলে লোকে ফুটনোটের 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়' পড়ে আর গালাগাল দিয়ে ওঠে। তোদের এ বিয়ের প্রশেস্ চালু হলে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। র‍্যাসেম্বলীর সেশুন্ আরম্ভ হলে কোনও অপজিশুন্ পার্টির মেম্বারকে ধরে যদি মুভ করাতে পারিস্ তা' হলে কাজ হবে।'

—অপজিশুন্ পার্টি থেকে মুভ করলে তো ভোটে হেরে যাবে।

—হারলেই তো কাজ হবে। চীৎকারের ঠেলায় গগন ফেটে যাবে। দু'দিনেই পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে দ্রাবিড়ের লোকেরা অবধি জেনে যাবে।···ভাল কথা, দীনুকাকা কি বললেন রে?

—কিছু বলেন নি।

—বলিস্ কি! একেবারেই কিছু বলেন নি?

—বলতে আরম্ভ করেছিলেন, মা বাধা দিয়ে বললেন, যা বলতে হয় আমাকে বলো। বাবা আর কোনও কথা বললেন না, খেয়েদেয়ে দলবল নিয়ে মুকুন্দপুরে চলে গেলেন। আমাকে ডাকলেনও না।

মহাবীর সিগারেটে শেষ একটা লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আপন মনেই বললে, থ্যাঙ্ক গড ব্রাদার যে তোর বাপ-মা স্পেশালী মাদার বেঁচে আছেন। আমার বাপ-মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা হলে—বলে কথাটা শেষ না করেই চাপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে।

কিংশুক বললে—থামলি কেন, বল।

—না, বলছি তা' হলে—তা' হলে হয়ত আমাদেরও বিয়ে হত।

—বিয়ে তো তোরা করবি না বললি। তোদের হবে মিলন, ইনটেলেকটুয়াল ম্যারেজ, যাকে বলে বুদ্ধিতে-বুদ্ধিতে গাঁটছড়া বাঁধা, তার—।

—তার চেয়ে বল্ না মাথা ঠোকাঠুকি বিয়ে! ইনটেলেকট্ ত' মাথাতেই থাকে। এমন একটা কথা বলিস্ যে পিত্তি জ্বলে যায়। ইনটেলেকটুয়াল ম্যারেজই হোক আর সোশ্যাল ম্যারেজই হোক, ম্যারেজ তো, গার্ডিয়ান না থাকলে বিয়ে হয়?···তোদের যা বিয়ে হল এ শুধু মাদারই দিতে পারে, আর এই রকম বিয়ে করতেই আমরা চাই। দুইদিকে দুই মা একজন পার্সোনাল আর একজন ইউনিভার্সাল; একজন মর্টাল আর একজন ইমমর্টাল; একদিকে লিমিট আর একদিকে ইনফিনিট এই দু'জনার মাঝে দাঁড়িয়ে তোরা বললি আমরা এক হলেম। এ বিয়ের তুলনা আছে?

চা ও খাবার এল। খাওয়া শেষ করে মহাবীর বললে—চল ঘুরে আসবি।

—কোথায় যাবি?

মহাবীর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—রাস্তায় নামি তো আগে তারপর দেখা যাবে।

—বস, যাব'খন।

—তোর কি রাস্তায় বের হতে লজ্জা করছে?

—না না লজ্জা করবে কেন, আমি কি মেয়েমানুষ?

—তোদের ঐ এক কথা। সবকিছু মেয়েদের দিয়ে বসে আছিস। কেন, পুরুষ মানুষের লজ্জা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? নে ওঠ আর বকাস্ নি।

—কোথায় যাবি বল দেখি।

—যাব তনুদের বাড়ি। চল গেলে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।

তনুকা ওপর থেকে ওদের দেখে একগাল হেসে তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে—বেশ শুকদেবদা', একবার জানাতেও পারলে না?

কিংশুক জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল।

মহাবীর তনুকাকে বললে—সাকসেসফুল?

—হ্যাঁ। যা মেহনত করতে হয়েছে, তা শুধু আমিই জানি। কিছুতেই আসবে না···অনেক কষ্টে টেনে এনেছি।

কিংশুক ওদের কথা বুঝতে না পেরে বললে—কার কথা বলছ।

তনুকা বললে—তা দিয়ে তোমার দরকার কি?··

তনুকার মা কনকলতা রান্নাঘরে ছিলেন গলার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এসে কিংশুককে বললেন—এস বাবা। কিংশুক কোন কথা না বলে হঠাৎ নীচু হয়ে কনকলতাকে প্রণাম করলো, কনকলতা আশীর্বাদ করলেন—বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।···

মহাবীর বললে—জোড়ে প্রণাম করলে গ্র্যাণ্ড হতো। ডেকে আনবো।

তনুকা বললে—না আর ডাকতে হবে না।

কনকলতা বললেন—যা তনু ওপরে নিয়ে যা।—বলে তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন।

তনুকা বললে—ওপরে চল শুকদেবদা'।···তুমি কোথায় আসছ? তুমি এখানে থাকো।

মহাবীর বললে—বাঃ এটা কি তোমার মত কথা হল? এতখানি মেহনতের এই পুরস্কার।

কিংশুক বললে—আয় না, ওপরে আসবি তাতে কি।

তনুকা বললে—এখন তো বলছ আয় না, শেষে ওপরে গিয়ে মনে মনে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাবে।···

—না না গালাগাল দেব কেন?

মহাবীর বললে—শুনিস্ কেন ওদের কথা, চল। ওপরে কড়া আড্ডা দেওয়া যাবে।

ওপরে উঠে নিজের ঘরের সামনে এসে তনুকা দাঁড়িয়ে কিংশুককে বললে—একজনকে দেখবে শুকদেবদা'?···বলে দরজার পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললে—ঐ দেখ। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল। মহাবীরও সে হাসিতে যোগ দিলে।

—গিনী!

—তনুকা হাসি থামিয়ে বললে—এখন আর শুধু গিনী নয় গিন্নীও বটেন। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঘরে ঢোক—বলে কিংশুকের একটা হাত ধরে টান দিলে।

মহাবীর বললে—দাঁড়াও দাঁড়াও—বলে কিংশুকের পিঠে দু'হাত দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে বললে—মারো জোয়ান—।

তনুকা বললে—হেঁইয়ো।···

তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কিংশুককে রাগিণীর পাশে

দাঁড় করিয়ে তড়্কা বললে—আমরা চললুম। ঠিক আধঘণ্টা বাদে দরজা খুলবো।—ভয় নেই ঘরের দরজা ভেতর থেকেও বন্ধ করা যায়।

মহাবীর বললে—এখনই দরজা বন্ধ করবার জন্যে ব্যস্ত হলে কেন? একটু গল্প-গুজব হবে না?

—চা খেতে খেতে হবে। চল···দেখছ না ওরা মনে মনে চটে যাচ্ছে। বলে মহাবীরকে বাইরে টেনে এনে দরজায় শিকল তুলে দিলে।

স্ত্রীর ব্যবহারে রেগে আগুন হলেও তাকে কিছু বলবার সাহস দীনুবাবুর ছিল না। যা অভিমানী, কিছু বললে—সটান স্টেশানে গিয়ে কলকাতার টিকিট কেটে বসবেন। তা হলে লোকসমাজে মুখ দেখান যাবে না, গলায় দড়ি দিতে হবে। এম-এল-এ হওয়া আর এ জন্মে হবে না। তাই সাত-পাঁচ ভেবে স্ত্রীকে কিছু বললেন না। কিন্তু বাড়ির কর্তা হয়ে এত বড় একটা কাণ্ড চুপচাপ হজম করলেও তাঁর পৌরুষে বাধলো। কি করবেন ঠিক করতে না পেরে মনে মনে গজরাতে লাগলেন। এদিকে বেলা বাড়তে লাগলো মুকুন্দপুরে যেতে হবে। শীতকালের বেলা, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না পৌঁছলে দু'জায়গায় মিটিং করা যাবে না। বাড়ির ভেতর থেকে স্নানাহারের তাগাদা এল। দত্তমশাই জবাব দিলেন না নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগলেন।

ভবতারণ তৈরি হয়ে এলেন এবং এসে বন্ধুকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন—ব্যাপার কি হে? এখনও তৈরি হও নি। বেলা যে গড়িয়ে এল।

—ওদিকে আমিও যে গড়িয়ে গেছি সে হুঁস আছে।

—কি হল আবার?—ভবতারণ এমনভাবে কথাটা বললেন যেন কিছুই জানেন না।

—কেন সকালের ব্যাপারটা শোন নি।

—ওঃ, এই কথা। তা এই নিয়ে আবার ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করেছ না কি?

—করি নি, তবে করব।

—দীনু, মাথা গরম করো না। অষ্টম-ফষ্টম কাটুক তারপর যা করবার হয় করো। এখন তৈরি হয়ে নাও। ওরা সব এসে গেছে! নাও আর দেরি করো না।···আহা বলি বৌঠাকরুণ পালাচ্ছে না আর তোমার রাগও পালাচ্ছে না, চোটপাট পরে হবে।

—তুমি কি বলছ ভবতারণ, বাড়িতেই আমার মুখ দেখান ভার। চাকর-বাকরগুলো অবধি মুখটিপে হাসছে।

—ওটা তোমার মনগড়া কথা।

—আমি নিজের চোখে দেখলুম দে আর লাফিং, তবু বলবে মনগড়া কথা।

আজকাল দত্তমশাই বাক্যালাপে দু'চারটে করে ইংরেজী কথা ভেড়াচ্ছেন। এটা ভবতারণেরই পরামর্শ। ওতে নাকি ইংরেজীটা বেশ সড়গড় হবে। কাউন্সিল-এর মেম্বার হয়ে নির্জলা বাংলা বললে লোকের কাছে খাটো হয়ে থাকতে হবে। তবে এখন অবধি দত্তমশাই-এর মুখে ইংরেজী কথা ভবতারণ ছাড়া আর কারুর শোনার সৌভাগ্য হয় নি। ভবতারণ আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন

যে, বাড়িতে যখন কলেজে পড়ুয়া ছেলে রয়েছে এবং সে ছেলের ইংরেজীতে বেশ এলেম আছে তখন দত্তমশাইর ভাবনা কি। বাড়ির ভেতর ছেলের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা অষ্টপ্রহর চালালে দু'দিনেই জিভের আড় ভাঙবে, কথা আপনা হতেই ঠোঁটের আগায় আসবে, সাহস বাড়বে। দত্তমশাই প্রথমটা রাজি হন নি। শেষে বন্ধুর তাড়নায় একদিন সাহসে বুক বেঁধে ছেলের সঙ্গে কথায় কথায় ইংরেজী ফোড়ন দিলেন। ছেলে শুনে কিছুক্ষণ বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল তারপর বাপের বলা ইংরেজী কথাগুলো ঘুরিয়ে বলতেই বাপের আক্কেল গুড়ুম। বুঝতে পারলেন ম্যাঞ্চেস্টারকে মাই সিস্টার বললে পুরোহিতের কাছে রেহাই পাওয়া যাবে কিন্তু পুত্র ছেড়ে কথা কইবে না। সেদিন থেকে ও-পথ মাড়ান একেবারে ছেড়ে দিলেন। বন্ধুর কাছেই ইংরেজী ছাড়তে লাগলেন।

ভবতারণ বললেন, বেশ তো না হয় সত্যি-সত্যিই তারা হাসছিল কিন্তু সেটা যে তোমাকে নস্যাৎ করার হাসি তা-তো নাও হতে পারে।

—সেটুকু ব্রেন আমার আছে। তুমি কি আমাকে ঐ কুঞ্জটার মত ব্রেনলেস ভাবো নাকি। এম-এল-এ হতে চলেছি কি মাথা কিছু না নিয়ে।

—গোবিন্দ বল। আমি তা বলছি না হে। তবে কি জান আমার মনে হয় চাকর-বাকরগুলো এ বিয়েতে, অবিশ্যি যদি এটাকে বিয়ে বলে মেনে নাও খুব খুশিই হয়েছে। রাহাদের পাঁটা বেচা ঘর হলে কি হয় কুঞ্জর মেয়েটি ভাবি সুশ্রী আর সুলক্ষণা। তুমিও তো একসময়ে বিয়ের প্রস্তাবে মত দিয়েছিলে। তা ছাড়া কুঞ্জর তোমাদের মত না হলেও যা আছে, তা নেহাৎ কম নয়। ঐ একটিমাত্র মেয়ে, কাজেই মালকড়ি আজ না হয় কাল তোমাদেরই হবে। লোকসানটা কি হল বল দেখি? নাও ও ভাবনা ছেড়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

রাগের মাথায় মালকড়ির কথাটা দীনু দত্তর মাথায় আসে নি। কথাটা কানে ঢুকতেই রাগটা ঝপ্ করে পড়ে গেল। তবুও একেবারে জল হলে বন্ধু কি ভাববে মনে করে গম্ভীরভাবে বললেন, তোমরা খালি টাকার দিকটাই ভাব, মানুষের ফ্যামিলি প্রেস্টিজটা তোমাদের কাছে কিছুই নয়। দামিনী সেই থেকে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছে তা জান। ও ভীষণ শক পেয়েছে।

—হ্যাঁ, মেয়েছেলে তো তাই প্রথমটা শক্ পেয়ে শয্যা নেয় আবার তারপরেই দেখা যায় শক্-এর জিনিষ সখের বস্তু হয়ে উঠেছে। ও কিছু না, সব ঠিক হো জায়গা। তুমি ওঠ। দামিনীকে সামলাবার ভার আমি নিলুম। বিষ্ণু ভট্টচাজকে দিয়ে একমাস গীতাপাঠের ব্যবস্থা করলেই দামিনীর মুখে হাসি ফুটবে। আজ তোমার ভারি শুভদিন হে। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত পুত্রবধূ পেলে সেই সঙ্গে পুরো রাজত্বও।

দীনু দত্ত ভেতরে ভেতরে বেশ খুশি হয়েই খাবারঘরে গেলেন রান্না হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করতে। রান্না যে হয়েছে, সেটা দত্তমশাই জানতেন ওটা আর কিছুই নয় তরুবালার সঙ্গে কথা বলার একটা ছুতো খোঁজা।

কিংশুক খাচ্ছে, তরুবালা সামনে বসে আছেন। দীনুবাবু দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। পত্নী এত কাণ্ডের পর নিশ্চিন্তমনে পুত্রকে খাওয়াচ্ছে দেখে দীনুবাবুর ভেতরে গৃহস্বামী নামে যে পুরুষসিংহটি ঘুমিয়ে আছেন, তিনি জেগে উঠলেন, তবে গর্জে উঠলেন না। দীনুবাবু ভাবলেন এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল এখন আর কিছু না হোক অন্তত লোক দেখানো রাগ দেখাতে হয় নইলে সবাই ভাববে বাড়ির কর্তাটি ভেড়া।

দত্তমশাই গম্ভীরভাবে ছেলেকে বললেন, খাওয়া দাওয়ার পর ওপরের ঘরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তরুবালা সেকথা শুনে তাড়াতাড়ি রাঁধুনী কুসুমকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ওকে নয় যা' বলবার হয় আমাকে বল। ওকে কোনও কথা বলতে পারবে না।

কথাটা শুনে কালবিলম্ব না করে দ্রুতপায়ে দত্তমশাই সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং কোনও রকমে নাকে-মুখে গুঁজে দলবল নিয়ে মুকুন্দপুরের দিকে রওনা হলেন। ভেতরের রক্ত ততক্ষণে আবার ফুটতে শুরু করেছে। তরুবালা বুঝলেন সন্ধ্যাবেলায় বর্ষণ শুরু হবে।

শশী কবিরাজের বাড়িতে যে মহাবীর ও তমুকার সহায়তায় গোধূলিলগ্নে চক্রবাক-চক্রবাকীর মিলন হয়েছে তা ভাল করে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার আগে ক্ষেপী তার সই পশুর মা'র কানে পৌঁছে দিয়ে গেল। ফলে কথাটা দত্তবাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে সেকেণ্ড কয়েকের বেশি সময় লাগলো না। কথাটা শুনে তরুবালা শঙ্কিত হলেন। কারণ অপরাধ তাঁর নেহাৎ কম নয়। কুঞ্জ রাহা গোঁ-এর মাথায় যা করতে যাচ্ছিলেন, তাতে লোকের কাছে এমনভাবে খেলো হতেন যে, ইহজীবনে তাঁকে আর মাথা তুলে তাকাতে হত না। ভোটের বদলে থুতু তাঁর অদৃষ্টে জুটত। বিনা আয়াসে আবার প্রমাণিত হত দত্তদের চেয়ে রাহারা কত ছোট। দরকার হলে ওরা নিজেদের সম্ভ্রম বিলিয়ে দিতেও পেছপা নয়। ওরা কি মানুষ? আসন্ন ইলেকশনের আগে এইভাবে একহাত নেওয়া গেলে আর দেখতে হত না; যারা কুঞ্জ রাহাকে 'ব্যাক' করবে বলে এঁচে ছিল, তারা অ্যাবাউট টার্ন-এর পর কুইক মার্চ করে এ শিবিরে চলে আসত। ভোটের আগেই বাড়িতে 'নেমপ্লেট' বসানো যেত 'শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত এম-এল-এ। তরুবালা স্ত্রী হয়ে স্বামীর এতবড় একটা সুযোগকে কেবলমাত্র বানচালই করে দেন নি কুলোর বাতাস যার অদৃষ্টে লেখা ছিল বরণডালা তার কপালে ঠেকিয়ে তাকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলেছেন। এছাড়া আরও কারণ ছিল। বিয়ের পর থেকেই তরুবালা দেখে আসছেন যে, শত অন্যায় অপরাধ করলেও স্বামী দেবতাটি সরাসরি তাঁকে কিছু বলতেন না, হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি করে বাড়ি মাথায় করে নিতেন। সবচেয়ে লজ্জার কথা হল সে হাঁকডাকে রাগ যতটা না প্রমাণ পেত তার চেয়ে বেশি করে ফুটে উঠত ছেলেমানুষি অভিমান—যা নিতান্ত অপোগণ্ডের পক্ষেই সাজে। সে সময়ে সমস্ত চোটটা গিয়ে পড়ত দামিনীর ওপর।

দামিনী ছেড়ে দেবার পাত্রী নন, সটান দাদার মুখের ওপর বলে বসতেন আর তো কাকেও পাও না তাই বৌদির কাছে মুখ-ঝামটা খেয়ে আমার ওপর চোটপাট কর। আর হতভাগীর তো যাবার জায়গা নেই তাই লাথি-ঝাঁটা খেয়েও পোড়া পেটের জন্য

মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। শুনে দীনুবাবুর মুখে বাক্য সরত না। দাদাকে চুপ করে থাকতে দেখে বোনের জিভের স্পিড বেড়ে যেত, বলতেন, তার চেয়ে পষ্ট বল না কেন দাদা। তুই এবার তোর পথ দেখ। এখনও গতর আছে পাঁচ বাড়ি থালাবাসন মাজলেও একবেলা একমুঠো আতপ চাল জুটবে।—বলে এমন ভাবে দুমদাম করে পা ফেলে, রণস্থল ত্যাগ করতেন যে, মনে হত এখুনি বুঝি শালপাতা হাতে নিয়ে খাটবার দক্ষে বেড়িয়ে পড়বেন। তবে সৌভাগ্যের কথা, সদর দরজার দিকে না গিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতেন এবং ঘরে ঢুকে পাড়া কাঁপিয়ে দরজা বন্ধ করতেন। তারপর তরুবালা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বার কয়েক জল খেয়ে নেবার জন্যে বৃথা অনুরোধ করে ফিরে যেতেন। পরদিন দেখা যেত বের হবার আগে দীনু দত্ত আহ্নিকেরত বোনের কাছে এদিক-ওদিক চেয়ে ধারে-কাছে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে বলছেন, মূলো দিয়ে মটর ডাল গেলে হত। বাস্, দামিনীর আহ্নিক মাথায় উঠতো৷ রান্নাঘরে ঢুকে পড়তেন।

এইভাবেই চলছিল। তারপর এল কিংশুক, দামিনীর পর সেই হল টার্গেট। দামিনী যদি তখন ভাইপোর হয়ে কোনও কথা বলতেন তখন দীনুবাবু জবাব দিতেন, তোকে কিছু বলেছি, তবে তুই কথা বলতে আসিস্ কেন? নিজের ছেলেকেও শাসন করতে পারব না?

একথা শুনে দামিনী কোনও জবাব না দিয়ে কিংশুককে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল আঁটতেন, দীনুবাবুকেও বাধ্য হয়ে তারপর সরে যেতে হত। খাবার সময় হত। তরুবালা আবার দরজার বাইরে থেকে ঠাকুরঝিকে অনুরোধ জানাতেন তিনি যেন দয়া করে ভাইপোকে খাইয়ে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ অনুনয়ের পর ঠাকুরঝি জানাতেন যে ভাইপোর এ-বাড়ির অন্নে স্পৃহা নেই, সে খাবে না। কথাটা খাঁটি, পিসীর ঘরে রেডিমেড খাদ্য সব সময়ই মজুত থাকত, কাজেই বাড়ির অন্নে যে ভাইপোর বিগতস্পৃহ হবে এ আর বেশি কথা কি।

ছেলে বড় হলে তরুবালার লজ্জা বাড়ল। বাপের হাঁকাহাঁকি দাপাদাপির কারণ যে কি, তা ছেলে জেনে ফেলেছে তা তার চুপ করে থাকা থেকেই তরুবালা বুঝতে পারতেন। ছেলে যতদিন বাপের ক্রোধের উৎস সন্ধান করতে পারে নি ততদিন কাঁদত, রাগ করত কিন্তু যেদিন থেকে বুঝতে পারল সেদিন থেকেই চুপ করে গেল। এ যে কি লজ্জা, তা আর বলবার নয়। তরুবালা তখন নতুন পথ আবিষ্কার করলেন। আবহাওয়া বুঝতে পেরে আগে থেকেই ছেলেকে সরিয়ে দিতেন। ছেলে মার অবস্থা বুঝতে পারত। দ্বিরুক্তি না করে মার কথা মেনে নিয়ে সরে যেত। দীনুবাবু বারকতক ছেলের খোঁজ করে না পেয়ে হয় রাগ হজম করতেন, না হয় কিছুক্ষণ আপন মনে গজগজ করে চুপ করে যেতেন।

কিন্তু আজ? গুরুতম কথাটা যদি খাটে তা হলে বলা যেতে পারে অপরাধ গুরুতর হওয়াতে মেজাজ সপ্তমে এবং মেজাজের ঝাঁজ সইবার পাত্রটিও হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল, অথচ··· এখানেও বাধ সাধলেন, তরুবালা ছেলেকে আগলে রাখলেন। দীনুবাবুকে রণে ভঙ্গ দিতে হল।

এত সহজে যে অব্যাহতি পাবেন, তা তরুবালা ভাবেন নি। বুঝলেন এ সবই 'মায়ের' দয়া। সেই থেকে সারা দুপুর মায়ের চরণে—ওঁর মেজাজটা যাতে সপ্তম থেকে খাদে না হোক অন্তত কোমল পর্দায় নেমে আসে—এই প্রার্থনা। সমানে চালিয়ে সবেমাত্র সন্ধ্যাবেলায় তরুবালা মনের মধ্যে একটু বল সঞ্চয় করেছেন, এমন সময়ে কবরেজী ঘটনা কানে এসে পৌঁছল। বুঝলেন আজ আর রক্ষে নেই। বাড়ি পা দেওয়া মাত্র কি তার আগেই কথাটা ওঁর কানে উঠবে অমনি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়বে। আজ দীনুবাবু একলা নন; সঙ্গে দোসর আত্মজা-সহোদরা, যার লক্ষ্য হবেন তরুবালা। মেঘ দেখলে ময়ূর যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়—বৌঠাকুরাণীদের উদ্দেশে ননদিনীদের জিভও তেমনি প্রলয় নৃত্যে মেতে ওঠে।

রাত আটটা। শীতকালের পক্ষে বেশ রাত। তরুবালা কিংশুকের পড়ার ঘরে এলেন। টেবিলের ওপর বই খোলা, কিংশুক রাস্তার দিকের জানলার পানে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। মা যে ঘরে ঢুকেছেন তাঁ অবধি তার খেয়াল নেই। তরুবালা ছেলের অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন। কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে চেয়ারের পাশে এসে কিংশুকের মাথায় হাত রাখলেন। কিংশুক চমকে উঠল। তরুবালা মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাবছিলি রে?

কিংশুক লজ্জিত হয়ে বললে, কই কিছু না তো। এমনি তাকিয়েছিলুম।

তরুবালা কোনও কথা না বলে ছেলের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

কিংশুক বুঝতে পারলো মা কিছু বলতে চাইছেন, বললে—কিছু বলবে মা?

—গিন্নীর সঙ্গে দেখা হল?

কিংশুক মাথা নীচু করে বললে—হ্যাঁ।

—কি বললে?

জবাব পেলেন না।

—বল না, আমাকে বলতে লজ্জা কিসের? কুঞ্জ ঠাকুরপো গালমন্দ করে নি তো?

—না।

—ভোট না হওয়া অবধি চুপচাপ থাকবে, ভাবিস নি মা'র কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। নে ওঠ, এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। সারাদিন দেহের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

—এত সকালে! এখন তো মোটে আটটা, বাবা এখনও ফিরলেন না। বাবা আসুন, তারপর খাবো।
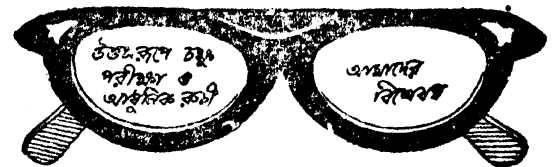
—না, তার আগেই খেয়ে শুয়ে পড়।

কিংশুক বুঝতে পারলো, কেন মা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে বলছেন। বললে, বুঝেছি কেন আগে খেয়ে নিতে বলছ। কিন্তু কোনও অন্যায় তো করি নি, তবে অত ভয় কিসের।

ছেলের কণ্ঠস্বরে তরুবালা ভয় পেলেন, এমন দৃঢ়স্বর এর আগে আর শোনেন নি। বুঝলেন আজ রণক্ষেত্রে পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ হলে পুত্র পাদার্ঘ্যবাণ নিক্ষেপ করে পাদবন্দনা করেই ক্ষান্ত হবে না, দরকার হলে 'গৃহভেদী' বাণ ছাড়তেও দ্বিধা করবে না। তাড়াতাড়ি বললেন, ভয়ের কথা নয় রে, লজ্জার কথা। অন্যায় যে কিছু আমরা করি নি তা উনিও জানেন, তব অমতে কাজটা হয়েছে তো তার ওপর এই সময়ে। কাজেই রাগারাগি না করলে উনি শান্তি পাবেন না। এ ব্যাপার নিয়ে চাকর-বাকরদের সামনে কথা কাটাকাটি হলে নিজেদেরই লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আমার কথা শোন বাবা, ওঠ।

—আমি না হয় খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লুম কিন্তু তুমি?—বলে একটু হেসে বললে—কাল সকালে যাব কোথায়?

—তা জানি। তবুও একটা রাত কাটবে, রাগ পড়লেও পড়তে পারে। আর আর দেরি করিস্ নি।

একটা রাত। নিতান্ত 'বেহেড' স্বামী না হলে যে কোনও স্ত্রীর স্বামীর গরম মেজাজ নরম করবার পক্ষে একটা রাত যথেষ্ট।

কিংশুককে শুতে পাঠিয়ে তরুবালা নিজের ঘরে এলেন। দোতলার একদিকে বাগানের লাগোয়া ওঁদের শোবার ঘর। ঘরের মাঝখানে সে আমলের বিরাট খাট, প্রায় ছোট-খাট একটা স্টেজ বললেই হয়। তখনকার দিনে ছেলেমেয়ে রীতিমত বড় না হওয়া অবধি স্বামী-স্ত্রীকে একই শয্যায় শুতে হত; শয্যা আলাদা হলেই টি-টি পড়ে যেত। কাজেই পালঙ্কটি হত বিরাট, শয্যাটিও হত প্রশস্ত, দু'জন ছাড়া আরও দু'-একটি কচি-কাচা যাতে শুতে পারে সে প্রভিশনও রাখা হত। এখনও বিয়ের সময় সে আমলের মত মন্তর আউড়ে বলা হয় বটে যে, আমাদের হৃদয় হাড়-মাস ইত্যাদি যাবতীয় সব-কিছু আজ এক হল কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় পদবী ছাড়া প্রায় সব-কিছুই আলাদা, এমন কি শয্যা অবধি। কাজেই হাড়-মাস ভাল করে এক না হতে হতেই দু'জনে দু'মুখো হাঁটে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের যদি মতের মিল হয় তা'হলে নাকি 'ইনডিভিডুয়ালিটি' লোপ পায়। এদিক থেকে কম্যুনিস্ট দেশ ভাল। সব 'কালেকটিভ'। মিলন থেকে মরণ (!) অবধি। 'ম্যানিফ্যাস্টর'—ফেস্ট্‌ন-এ বাঁধা।

খাটে পরিপাটি করে দীনুবাবুর শয্যা পাতা। তরুবালা তবুও একবার বিছানা হাত দিয়ে ঝাড়লেন, চাদরের কোণাগুলো ঠিক করলেন, বালিশ দু'টো তুলে আবার পাতলেন। এ তাঁর নিত্য কর্ম। তারপর গেলেন নিজের বিছানার দিকে। তাঁর বিছানা মেঝেতে বাগানের দিকের জানালা ঘেঁসে। কিংশুক প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পরতেই একদিন তরুবালা নিজের বিছানা আলাদা করে নেবার কথা স্বামীর কানে তুলেছিলেন কিন্তু দীনুবাবু রাজী হন নি। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি হলে কি হয়, বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, দাঁত পড়ে নি, চুল পাকে নি—এখনও এক নাগাড়ে বার-তের ঘণ্টা খাটতে পারেন। আধসের মাংস পাঁচ ছটাক চালের ভাত দিয়ে টানতে পারেন। তাঁর পক্ষে এক কথায় স্ত্রীর আলাদা শয্যার প্রস্তাবে মত দেওয়া সম্ভব নয়। তরুবালা ওজর দেখালেন ছেলে বড় হয়েছে এখন এক বিছানা চোখে লাগে। দীনুবাবু ছেলের ওপর চটলেন, যেন সে ইচ্ছে করে বড় হয়েছে। ছেলে মাঝে মাঝে বকুনি খেতে লাগল। আবহাওয়া দেখে তরুবালা শয্যা আলাদার কথা চেপে গেলেন। কিন্তু যেই কিংশুক স্কুল থেকে কলেজের দিকে পা বাড়াল তরুবালা কোনও আপত্তি শুনলেন না। বললেন, দু'দিন বাদে ছেলের বৌ আসবে, আর নয়। দীনুবাবু সাধ্য-সাধনা করে বশতে না পেরে হাল ছেড়ে দিলেন। তবে খুব বৃষ্টি হলে কি ঠাণ্ডা পড়লে দীনুবাবু যদি বলতেন, বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে মেঝেতে শুয়ো না, সর্দি কাশি হবে; কি, বৃষ্টি জোরে হলে ছাট এসে বিছানা ভিজে যাবে ওপরে বরং উঠে এস, তরুবালা আপত্তি করতেন না, মৃদু হেসে উঠে আসতেন।

মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা তার ওপর বিছানা গোটানো রয়েছে। তরুবালা তোষকটা একভাঁজ পেতে কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর নিজের বালিশ দু'টো ও লেপটা বার করে খাটের ওপর রেখে তোষক গুটিয়ে রাখলেন। শীতের দিন হলেও সেদিন ঠাণ্ডাটা অন্য দিনের তুলনায় অনেক কম আর আকাশে মেঘের নাম গন্ধও ছিল না। নীচ থেকে আওয়াজ এল, বুঝতে পারলেন উনি এসেছেন।

খেতে খেতে দীনুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—শুকদেব শুয়ে পড়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ। বুঝতে পারলেন গলাটা একটু কাঁপল।

—এত তাড়াতাড়ি?

—তাড়াতাড়ি কোথায়, দশটা বেজে গেছে।

—ওঃ!

খাওয়া শেষ করে দীনুবাবু ওপরে চলে গেলেন। তরুবালা খেতে বসলেন।

তরুবালা ওপরে এসে দেখেন দীনবাবু শুয়ে পড়েন নি। চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন। তরুবালা বুঝলেন গতিক সুবিধের নয়। মনে মনে তৈরি হলেন।

—তরু।

তরুবালা চমকে উঠলেন, এ যে সে আমলের সম্বোধন। শুনে কেমন ভয় হল, বোধ হয় আশাতীত বলেই।

—কাছে এস।

পায়ে পায়ে তরুবালা এগিয়ে গেলেন যেন এক সদ্য বিবাহিতা কিশোরী বধূ। দীনুবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে খাটে বসে স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে তাঁর দু'খানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—তুমি ঠিকই করেছ।

—কি ঠিক করেছি।—তরুবালা বুঝতে পারলেন না।

—শুকদেব আর রাগিণীর মিল করিয়ে। ভোটটা শেষ হোক, তারপর ঘটা করে উৎসব করা যাবে।

শুনে তরুবালা অবাক বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর বললেন—তুমি তা হলে রাগ কর নি।

দীনুবাবু ছোট ছেলের মত হেসে বললেন—করেছিলুম তবে এখন আর রাগ নেই।

তরুবালা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে বললেন—আঃ তুমি আমায় বাঁচালে, তুমি আমায় বাঁচালে। আমার কি ভয়ই যে করছিল।

—ভয় কিসের? তুমি জান না এতে আমাদের মান কত বেড়েছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মানুষের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ

অনুসন্ধানী

জীব-সৃষ্টির মৌল প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের গবেষণায় যে ফল পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, বিবর্তন ক্রিয়াও বিজ্ঞানীরা কোন একদিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তাঁদের পক্ষে সবরকম জীবেরই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

গোলাকার নিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকেই শুরু হয় প্রতিটি মানুষের জীবন, একথা বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকেই জানেন। সেই ডিম্বাণু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, চোখে দেখা যায় না। প্রতিটি অণুর ব্যাস এক ইঞ্চির তিনশো ভাগের একভাগ, ওজন এক আউন্সের দু'কোটি ভাগের একভাগ। একটি কোষ থেকে দু'টি, দু'টি থেকে চারটি, এমনি করে কোষসমূহ বেড়ে যায়। তারপর মাতৃজঠর থেকে এটি যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন দেখা যায়, সাত পাউণ্ড ওজনের শিশুটির দেহ পাঁচলক্ষ কোটি কোষ নিয়ে গঠিত হয়েছে।

বংশের ধারা ও গুণাগুণ যে প্রথম কোষটিতেই নিহিত থাকে, এটি যে পরবর্তী কোষসমূহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাও বিজ্ঞানীরা বহুকাল আগে থেকেই জানেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জর্জ ডব্লিউ বিডেল ঐ নিষিক্ত প্রথম কোষটিকে বলেছেন, একটি বাড়ি তৈরির নক্সা বা ব্লু-প্রিন্টের মতো। সেই ভবিষ্যৎ মানুষটি যে কি রকম হবে, তারই নির্দেশ থাকে তার মধ্যে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডাঃ বিডেল ১৯৫৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ডায়োক্সিরিবো-নিউক্লিক (Dioxyribo-Nucleic Acid) সংক্ষেপে ডি এন এ (D N A) সাম্প্রতিককালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। ১৯৪৬ সালে আমেরিকার রকফেলার ইনষ্টিট্যুটের বিজ্ঞানীরা এই জিনিষটি আবিষ্কার করেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, সকল জীবন্ত কোষের কেন্দ্রেই রয়েছে—ঐ বস্তুটি। জীবনটি যেভাবে গড়ে উঠবে তারই নির্দেশ থাকে এর মধ্যে। কোষসমূহের বৃদ্ধির নির্দেশ ও নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে ঐ এসিডই।

এই ডি এন এ সম্পর্কে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য উদ্ভাবনের জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেমস্ ডি ওয়াটসন্ সহ ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীদ্বয় ডাঃ ফ্রান্সিস এইচ ক্রিক এবং ডাঃ মরিস এইচ উইলকিন্সকে ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ডি এন এ অণুসমূহ মাঝখানে বিভক্ত হয়ে যায়। তারপর একই ছাঁচে এরা বাড়তে থাকে। মানুষের প্রতিটি দেহকোষের নিউক্লিক এসিডের মধ্যে নিহিত থাকে প্রায় পাঁচশ কোটি নানা টুকরো তথ্য। বহু জটিল প্রক্রিয়ায় ঐ সব তথ্য
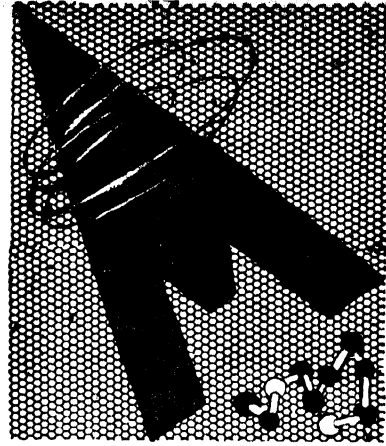
ঐ এসিডের মধ্যে ধরা পড়ে এবং এরাই প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে তার নির্দেশ দেয়।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই নিউক্লিক এসিডের প্রতিটি অংশের কি অর্থ এবং কিভাবে তাদের নির্দেশ কার্যকরী হয়ে থাকে, কি তাদের ফলাফল সে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এই প্রজননিক বা জন্মসংক্রান্ত রীতির (Genetic Code) তথ্য উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস লেবরেটরীর ডিরেক্টার ডাঃ ওয়েনডেল এম স্ট্যানলী এই গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

'যেমন নিউক্লিক এসিডের কোন বিশেষ অংশের সঙ্গে চোখের রং-এর সম্পর্ক রয়েছে, এই কথা প্রমাণ করতে পারলে, রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই রং-এর বদলানোর পন্থা আমরা উদ্ভাবন করতে পারি, তার সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, তেমনই এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।'

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে রোগবীজাণু ও ভাইরাসের বংশগতির মৌল পরিবর্তনসাধনে সক্ষম হয়েছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে মানুষের দেহকোষ সৃষ্টির মৌল প্রণালী নির্ণয় করতে পেরেছেন। প্রজনন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সব শল্য চিকিৎসা বা 'জেনেটিক সার্জারী' বলে বিজ্ঞানীরা অভিহিত করেছেন। তবে প্রজননরীতি বা 'জেনেটিক কোডা' জানা গেলে বংশগতি নির্ধারক রাসায়নিক উপাদানের যে কোন পরিবর্তনের ফলাফল বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই সঠিকভাবে বলে দিতে পারবেন।

এ সম্ভব হলে রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি নূতন পথ উন্মুক্ত হবে এবং প্রজনন ব্যাপারে যে সব ত্রুটি

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে সংশোধন সম্ভব হয় না, সে সব সংশোধনের একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে।

১১০ কোটি বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু বংশগত বৈশিষ্ট্য এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে কি ভাবে অনুবর্তিত হয়ে থাকে, তা মাত্র দশ বছর হল মানুষ বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছে।

রাসায়নিক প্রজনন বিজ্ঞান বা কেমিক্যাল জেনেটিকসের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে ঐ বিষয়ে এগারো জন বিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিই তার প্রমাণ।

যে প্রক্রিয়ায় সব জীবন্ত প্রাণী নিজেদের মতই প্রাণীর জন্ম দিয়ে থাকে, সেই প্রক্রিয়া নিয়েই তাঁরা গবেষণা করেছিলেন। জীবনবিদ্যা সম্পর্কে বর্তমানে যে সব তথ্য আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা হচ্ছে তাদের ফলাফল হবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; মানুষের সর্বাধিক কল্যাণসাধনেই তা নিয়োগ করার চেষ্টা হবে।

আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা

শ্রীদীপংকর ঘোষ

কিছুদিন হ'ল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্যারিসে মিলিত হয়ে এক আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণার সংস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য বৃটেন, রাশিয়া, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী ও বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। লণ্ডনে এই উপলক্ষে বিশেষ কর্মতৎপরতা দেখা গেছে।

বৃটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন।

আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতাদের এ সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এই যে, আরো ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে গবেষণা চালাবার জন্য কিভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায়। শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তারা প্রস্তাব করেন যে, যে দেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগদান করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের দেশরক্ষাখাতের ব্যয়-বরাদ্দ থেকে শতকরা অন্তত দশমিক পাঁচভাগ অর্থ এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গবেষণা-ভাণ্ডারে দান করবেন।

হিসেব করে দেখা গেল যে, এতে বৃটেনের বাৎসরিক দেয় হ'ল প্রায় ন' মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ বারো কোটি টাকার মত। প্রস্তাব অনুযায়ী ফ্রান্সের দেয় প্রায় সাত মিলিয়ন পাউণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানীর প্রায় সাড়ে আট মিলিয়ন পাউণ্ড। রাশিয়া ও আমেরিকার ব্যয়-বরাদ্দের হিসেব বাদ দিয়েও বোঝা গেল যে, আর্থিক দিক থেকে গবেষণা সংস্থার ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল নয়।

পশ্চিমী দেশগুলোতে নতুন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার খরচ এবং অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ থেকে টাকা কেটে ক্যান্সার গবেষণার জন্য তা' নিয়োগ করার প্রস্তাব প্রত্যেক বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে বলেই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মনে করেন। তাঁরা বলেছেন, সারা দুনিয়ায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর যত লোক মারা যাচ্ছে, তাদের সংখ্যা যুদ্ধকালীন মৃত্যু সংখ্যার চেয়ে খুব একটা কম নয়। প্রতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক আর মারা যাচ্ছে প্রায় বিশ লক্ষ লোক। জীবন নিয়ে যাঁরা বেঁচে থাকেন, বাঁচার আনন্দ থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিন গুণে চলেন। তাই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, ধ্বংসাত্মক আর পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হয়ে এখন ক্যান্সারের সংগে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিই সবচেয়ে আগে দরকার।

আজকে ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা। এই প্রস্তাবিত সংস্থার বিশেষ কাজ হবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংযোগব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করা। আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোক্তাদের মতে ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার সমস্যাটা তত জটিল নয়। অভাব হ'ল উদ্যোগী গবেষক, বিজ্ঞানী ও উৎসাহী লোকের। এ কথা যেমন সত্যি যে, কোন দেশে হয়ত উদ্যমশীল, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আছেন কিন্তু অর্থাভাবে তাঁরা কাজে নামতে পারছেন না তেমনি একথাও ধ্রুব সত্য যে, কোথাও অর্থ হয় তো সমস্যাই নয়, অভাব হ'ল ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী গবেষকের। তাই অনেকেই মনে করেন, এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি পৃথক পৃথক সমস্যাগুলোর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান দিতে পারবেন।

ক্যান্সার সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত গবেষণা এমনই অপ্রতুল যে, কোনো ডাক্তারই জোর দিয়ে বলতে পারেন না যে এ-রোগের নাড়ি-নক্ষত্র তিনি জানেন। এটুকু মোটামুটি আমরা জানি যে, ক্যান্সার হ'ল এক ধরণের ক্ষত যা' ধীরে ধীরে শরীরকে দূষিত ও নষ্ট করে ফেলে অর্থাৎ দেহের জীবন্ত কোষগুলো যখন বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখনই আমরা বলি ক্যান্সারের আক্রমণ হয়েছে। ক্যান্সারে কতকগুলো কোষের বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের অন্য সমস্ত কোষ তার ফলে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে।

কোষবৃদ্ধি তো জীবন্ত মানুষের শারীরধর্ম। যদি অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য কোষ নষ্ট হয়ে থাকে, তাদের পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে শরীরে স্বাভাবিকভাবেই নতুন কোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঘা বা ক্ষত নিরাময়ের জন্যেও দেহে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোষবৃদ্ধি বা কোষ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থাকে।

পার্থক্য হ'ল এই যে, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যে কোষ বৃদ্ধি পায় তার বৃদ্ধির কোন প্রয়োজনই নেই। অথচ ক্রমাগত তা' এমনই বাড়তে থাকে যে, দেহের অন্যসমস্ত কোষ তার ফলে দুর্বল ও অকেজো হয়ে পড়ে। ক্যান্সারের এই কোষবৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে যখন শরীরের আর সমস্ত কোষই একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখনই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের হেতু কি, কি ভাবেই বা এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে তা' নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অনুসন্ধান করে চলেছেন গবেষকরা।

একশ্রেণীর গবেষকরা ক্যান্সারের লক্ষণ ও মূল কারণ নিয়ে অক্লান্ত পরীক্ষা করে চলেছেন। এঁরা Carcinogenic Agent বা এক ধরণের স্বাভাবিক ও রাসায়নিক মিশ্রণের মাধ্যমে পশুর দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন কারসিনোজেনিক এজেন্টের অন্যান্য প্রয়োগ ও ফলাফল নিয়ে একনিষ্ঠ পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। মানুষের দেহের ক্যান্সারের কোন যোগসূত্র এর থেকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না তা নিয়েই এই অনুসন্ধান।

গবেষকদের অন্য দল চেষ্টা করে চলেছেন যে, এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করা যায় কি না যা' দিয়ে ক্রমান্বয়ে ক্যান্সারের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হতে পারে। এই ওষুধ সম্বন্ধে তাঁদের পরিকল্পনা এই যে তা' দেহের স্বাভাবিক কোষের কোন ক্ষতিসাধন করবে না অথচ ক্যান্সারের অতিরিক্ত কোষগুলোকে একে একে নষ্ট করে ফেলবে।

তৃতীয় ধরণের গবেষকরা পরীক্ষা করে চলেছেন যা'তে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ামাত্র রোগ নির্ণয় করা যেতে পারে। এ রোগের নিশ্চিত কোন নিরাময় পদ্ধতি আজও আবিষ্কার হয় নি। কিন্তু সুরুতেই যদি লক্ষণ দিয়ে রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়, তা হলে দেহের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ক্যান্সারগ্রস্ত টিউমারটি কেটে বাদ দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে করে রোগের প্রকোপ কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজন রোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষণ দেখে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া। আজও তা সম্ভব হয় নি বলেই গবেষকদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

তবে রোগের লক্ষণ বিশ্লেষণ করার ব্যাপার পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষভাবে সাহায্য করছে। বলতে কি সংখ্যাতত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই বৃটেন ও আমেরিকার চিকিৎসকরা বর্তমানে ধূমপান ও দূষিত বাতাসের সংগে ফুসফুসের ক্যান্সারের একটা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন।

স্বাভাবিক কোষ যখন ক্যান্সার কোষে রূপান্তরিত হতে সুরু করে সেই স্বাভাবিক কোষের প্রতি সেকেণ্ডের পরিবর্তন লক্ষ্য করাও একেবারে সাম্প্রতিক গবেষণার একটা অপরিহার্য দিক। অনেকেই চেষ্টা করেছেন এই সূত্র থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় কি না।

নীতিগত কতকগুলো কারণের জন্য মানুষের দেহের ওপর ক্যান্সারের পরীক্ষা চালানো প্রকৃতপক্ষে অসম্ভবই বলা চলে। সুতরাং গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে পশুর দেহে ক্যান্সারের আক্রমণ হলে শুধু রক্ত বা মলমূত্রের নমুনা পরীক্ষা করে মতামত স্থির করা হয়। আর কোনো ক্ষেত্রে ক্যান্সারগ্রস্ত টিউমারের একটা অংশ কেটে নমুনা হিসেবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালানো হয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চালাবার জন্য বাধ্য হয়ে সাদা ইঁদুর, গিনিপিগ বা ঐ ধরণের জীবই সাধারণত ব্যবহার করা হচ্ছে।

গবেষণায় কিছু কিছু আশাপ্রদ ফলও পাওয়া গেছে। মানুষের দেহের ক্যান্সারের মধ্যে প্রধানত স্তনের ক্যান্সার নিয়েই গবেষণা চলেছে। এই ধরণের ক্যান্সারের সংখ্যাধিক্যই এর প্রধান কারণ এবং অপেক্ষাকৃত সহজেই এই ধরণের ক্যান্সার নিরূপণ করা যায়। স্ত্রীলোকদের অধিকাংশই স্তনের ক্যান্সারের রোগী। শুধু বৃটেনেই পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে বর্তমানে প্রতি বছর প্রতি হাজারে একজনের স্তনের ক্যান্সার রোগ দেখা দিচ্ছে।

স্ত্রীলোকদের দেহের টিসুগুলো ডিম্বকোষের দ্বারা নিঃসৃত হরমোনের নিয়ন্ত্রাধীনে থাকে। ক্যান্সার ছড়িয়ে পরেও এই টিসুগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে হরমোনই। কাজেই হরমোনের উৎস, ডিম্বকোষ এবং এ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড ও পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড যদি অস্ত্রোপচার করে শরীর থেকে বাদ দেওয়া যায়, তা'হলে তা' অনেক ক্ষেত্রেই রোগিনীকে দুই অথবা তার চেয়ে বেশি কয়েক বছরের আয়ু দিতে পারে।

অনেক গবেষণার পর এই ধরণের ক্যান্সার আবিষ্কার করার একটা মোটামুটি পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফলের ওপর রোগের নির্ধারণ সহজ হয়েছে ইদানীংকালে। কিন্তু এ ব্যাপারেও সংখ্যাতত্ত্বের ওপর নির্ভর করতে হয় অনেকখানি এব একমাত্র স্তনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়।

ক্যান্সার রোগ ও এর গবেষণার ব্যাপারটা এতই জটিল যে, একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে আসা যাবে এমন আশা করা চলে না।

আগেই আমরা বলেছি যে, সংখ্যাতত্ত্বের ওপর নির্ভর করে আমেরিকা ও বৃটেনের গবেষকরা কিছুদিন হ'ল একমত হয়েছেন যে, যাঁরা অত্যধিক সিগারেট খান তাঁদের ফুসফুসের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা, যাঁরা একেবারেই ধূমপান করেন না তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা চালিয়ে এ তথ্যও জানা গেছে যে, বাতাস সহজেই দূষিত হতে পারে এমন অঞ্চল ও বড় বড় শহরের যাঁরা বাসিন্দা, তাঁদের ফুসফুসে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা, যাঁরা বড় শহরে বাস করেন না তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি।

কিন্তু আজকে একটা প্রশ্নই সমস্ত বিশ্ববাসীর মনে কাঁটার মত হয়ে জেগে আছে, তবে কি ক্যান্সারের নিরাময় সম্ভব নয়?

গত বিশ বছরে কয়েক ধরণের ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, যা'তে অল্প কিছুদিনের জন্যে এ রোগের উপশম সম্ভব। কিন্তু স্থায়িভাবে এ রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন আলোকপাত আজও কেউ করতে পারে নি।

সম্প্রতি ফ্রান্সের মঁসিয়ে নাঁসো রক্তের ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া সারাবার সিরাম আবিষ্কার করেছেন বলে যে দাবী করেছিলেন, আপাতত তা' দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য পাঠানো হয়েছে।

মঁসিয়ে নাঁসো নিজে ডাক্তার না হয়েও কি করে এই সিরাম আবিষ্কার করলেন তা' অনেক লোককেই অবাক করছে। অনেকেই এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিগ্ধ। আপনারা কাগজে পড়ে থাকবেন যে, স্কটল্যাণ্ডে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত এক শিশুর মাতা শেষ চিকিৎসা হিসাবে মঁসিয়ে নাঁসোর সিরাম চিকিৎসা প্রার্থনা করেন, যদি তাঁর শিশুকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যায়। কিন্তু মঁসিয়ে নাঁসো ডাক্তার না হওয়ার জন্য এবং সিরাম যথেষ্ট পরীক্ষিত নয় বলে ফ্রান্সের সরকার এ চিকিৎসায় মত দেন নি। শেষ পর্যন্ত নাঁসো চিকিৎসা করেও শিশুকে বাঁচাতে পারেন নি।

তা হ'লেও কোনদিন যদি সিরামের উপকারিতা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা সুনিশ্চিত প্রমাণ দিতে পারে তবে জগতের বহু মৃতকল্প মানুষই প্রাণ ফিরে পাবে।

কোন বিষয়েই কেউ সুনিশ্চিত নন। কেউ মনে করেন আগামী বিশ বছরের আগে ক্যান্সারের মহৌষধি আবিষ্কার করার আশা নেই। যাঁরা খুবই আশাবাদী তাঁরা বলেন, পাঁচ বছরের মধ্যেও তা' পাওয়া যেতে পারে। আমাদের কাছে এ কথাটাই আজ সবচেয়ে বড় যে, সারা বিশ্বের গবেষকরা প্রাণপাত করে ক্যান্সারের নিরাময়ের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।—লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।

রাত্রির সঙ্গে পরিচয়

রবার্ট ফ্রস্ট

একদা আমার চেনাজানা ছিল রাত্রির সঙ্গে,
ঘুরেছি অঝোর বৃষ্টিধারায় ফিরেছি বৃষ্টিজলে।
তা' ছাড়া শহর আলোর সঙ্গে ঘুরেছি অনেক রাতে।

ঘৃণাও করেছি শহরের যত বিষণ্ণতম গলি,
প্রহরীর আনাগোনাও দেখেছি, নামিয়েছি নুয়ে চোখ।
সে বর্ণনায় ইচ্ছুক নয় আমার ইচ্ছাগুলি।

কিন্তু যখন অন্যপথের গৃহ হতে ভাসা কান্না
শুনেছি, তখনই থামিয়ে দিয়েছি নিজের পায়ের শব্দ।
ব্যাকুলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছি হয়েছি নিথর, স্তব্ধ।

তবু সে কান্না পিছু ডাকে নি কো, জানিয়ে যায় নি বিদায়,
কেঁপেছে সে স্বর অপার্থিব দর্ঘ সামানামর।
চাঁদের আলোর ঘড়ির কণ্ঠে সংকিত চারদিক,
সে ঘড়ির কাঁটা বলেছে, সময় নয় কো ভুল বা ঠিক।
একদা আমার রাত্রির সাথে হয়েছিল পরিচয়।

অনুবাদ : সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার ঘরে

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

কি হবে জানালা খুলে মিছে রৌদ্র মেখে
তার চেয়ে ঘরে থাকো,—এ অনাদি তমস আঁধারে।

ঋতামিত্র, ওই দ্যাখো আঁধারের পারে
শৈশবের ডাক নামে,—আমাকে কে ডাকে।

ঋতামিত্র, তোমার ঐ চারু কবরী বন্ধনে—
অন্ধকার ভরে থাক, সুরভিত অন্ধকার স্তর
কবিতার পাণ্ডুলিপি, তোমার মুখের রেখা
মেঘরন্ধ্রে সুরভিত চন্দন আঘ্রাণে
ভরে থাক অন্ধকার ঘর।

দুপুরে ঘাসের বুকে কি তীব্র বেদনা, আহা
কি উত্তাপ বাবলার বনে, প্রজাপতি
কুসুমিত নোনা রক্তে,—কি আশ্চর্য স্বাদ পায়,
স্বাদ ঝরে রৌদ্রসিক্ত বয়সী আশ্বিনে।

ঋতামিত্র, ঘরে থাকো,—বিমল আঁধারে,
বাইরে দুরন্ত রোদ, একা উড়ে ধূসর-শকুন।
ঋতামিত্র, তুমি আর জানালা খুলো না॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

—'Dream' মানে কি দিদি ?

—স্বপ্ন ! উত্তর দেয় পুতুল।

—D-r-e-a-m স্বপ্ন...bad dream—খারাপ স্বপ্ন, ছাত্রীর একটানা সুর।

ঐ একটানা সুর শুনতে শুনতেই কখন হারিয়ে গেছে মন। 'ড্রিম···স্বপ্ন, ব্যাড ড্রিম—দুঃস্বপ্ন। মানুষ স্বপ্ন দেখে দিনে আর দুঃস্বপ্ন দেখে রাতে···সেই রাতের···সেই স্বপ্ন···

সেই শাড়ি, ব্লাউজ আর ফুলের গয়নার চাপে বন্ধ হয়ে এসেছিল নিঃশ্বাস। তবু সেগুলি গা থেকে খোলে নি পুতুল। চুপ করে বসেছিল চেয়ারে। এ এমন একটা অবস্থা যখন মনও শান্ত স্থির হয়ে গিয়েছে। একটুকরো কাদার তালকে গনগনে আগুনে ফেলে দিয়েছে—পুড়ে লাল হয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে তালটা। পাথরের মত শক্ত আর চামড়া তুলে নেওয়া মাংসের মত রং। সেই মাটির তালে কালো একটা দাগ—একটি মাত্র চিন্তা—দেহটাও যদি অমনি শক্ত হয়ে যেত পুতুলের।

বিকল ঘড়ির কাঁটার মত স্থির হয়ে থাকতে চেয়েছিল পুতুল। সে নড়তে চায় নি, উঠতে চায় নি, এমন কি নিঃশ্বাসও ফেলতে চায় নি। রাত্রির এই অন্ধকার বিন্দুই স্থির হয়ে থাক পৃথিবীর বুকে। প্রভাতের আলো দেখতে চায় না পুতুল।

চেয়ারে বসে বসেই মনে হল শরীরটা ভারী হয়ে উঠছে। ভাল লাগে সেই অনুভূতি। একটু একটু করে পাথরই হয়ে যাচ্ছে তার দেহ। ইচ্ছে হলেই হাতটা তুলতে পারছে না—নাড়াতে পারছে না পাটা। আর মন···

নিদ্রিত, মূর্ছিতপ্রায় অর্ধমৃত মনটা জেগে উঠেছে···অন্ধ আবেগে মাথা কুটছে—বেরিয়ে আসবে সে—সে থাকতে চায় না এই বন্ধ খাঁচায়—টিপ, টিপ, টিপ···হাতুড়ির শব্দের মত একটানা অবিরাম ধ্বনি—বেরিয়ে আসবেই সে।

কিন্তু বেরুতে পারে না। উপরে শক্ত লোহার খাঁচা। সেই খাঁচার নীচে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে মন···সবুজ-নীল—হলদে-নীল পান্নামিশালী কালো অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে—ডুবে যাচ্ছে পুতুল—সমুদ্রের ঠাণ্ডা জল···আর সেই জলে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে মনের শক্তটুকরোটা—অক্টোপাশের মত কি যেন এসে চেপে ধরে তাকে—ঠাণ্ডা শুঁড়ের মত কতগুলি হাত—ক্লেদাক্ত, বীভৎস, কলুষতা।

শিউরে ওঠে পুতুল। আজও সেই স্বপ্নের কথা পরিষ্কার মনে আছে। মনে আছে, সেই ভয় পেয়ে হঠাৎ জেগে ওঠার কথা। জেগেও কিন্তু সেই একই অনুভূতি। কয়েকটা ঠাণ্ডা শুঁড় তাকে বেড়িয়ে ধরছে বারবার। তবে কি সে জাগে নি ? এই জাগরণবোধও স্বপ্নেরই একটা অংশ। নিজেকে বারবার নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চায় পুতুল।

অনেক কষ্টে, ধমক খেয়ে ভয় পাবার মত দমকে চোখ দু'টি খুলে ফেলে।

চমকে ওঠে। দু'টি চোখ জ্বলছে। সরীসৃপের মত দু'টি চোখ জ্বলছে আদিম হিংস্রতায়—নগ্ন শীতল দশটি আঙুল তার দেহের উত্তাপে কি যেন খুঁজে মরছে। আঙুলের অগ্রভাগে ক্লেদাক্ত কামনার বিষ·

জাগরণ-তন্দ্রার মাঝামাঝি সেই একটু ক্ষণ। সেই ক্ষণটুকু সে ব্যথায় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তখনও সমস্তটা বুঝতে পারছে না সে।

আঙুলগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সাপের মত ছোবল মারছে তাকে বারবার।

একটু স্তব্ধতা !

একটু বিস্ময় !

পরক্ষণেই লাফিয়ে ওঠে পুতুল। তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে নগ্ন বীভৎস একটি দেহ। চারিদিকের দেয়ালে সেই বীভৎসতার শত শত ছবি।

বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, ভয়। চারিদিকের সেই লোমশ বীভৎসতা চেপে ধরতে চায় পুতুলকে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পুতুল।

ভোর হয়ে এসেছে। সামনেই দপ দপ করছে শুকতারা। কি সুন্দর ! কি স্নিগ্ধ ! কি উজ্জ্বল ! অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে পুতুল।

এই শুকতারা কি পেরিয়ে আসে নি অজানা পিচ্ছিল গহ্বর; ক্লেদাক্ত ক্লান্তি কালো রাতের বীভৎসতা। তবু তো সে হাসছে। নতুন প্রভাতের তীরে দাঁড়িয়ে নতুন আশায় হাসছে সে।

সেই তারার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পুতুল। ধীরে ধীরে হাসতে হাসতেই চলে গেল শুকতারা। ভোর হয়ে এল। সূর্যের আলোয় ধৌত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো পৃথিবী।

তারপর ?···

—তারপর সে কি করিল ? তাই না দিদি ! ছাত্রীর প্রশ্ন।

—কি করলো ? পুতুলও অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করে।

—আপনি শুনছেন না···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ···শুনছি···বল···

কি করলো ? অনেক কাজ···অনেক যন্ত্রণা···অল্প চিন্তা···অল্প কথা। দু-একটি রাত্রি—কয়েক ঘণ্টা সময় তার জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনলো। কেউ দেখলো না, কিন্তু একলাফেই শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছে গেল তার মন।

বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় ছোট একটি বাড়ি নেওয়া হয়েছিল বরপক্ষীয়দের বাড়ির কাছেই। একাই চলে গেল পুতুল—একটুও ভয় না পেয়ে। জীবনে এই প্রথম একা পথ চলে সে। কিন্তু তার মনে হয়, সমস্ত জীবনই যেন পথ চলছে সে। কোনদিন থামে নি। রাস্তায় লোক নেই—তবু ভয় করে না তার। ছোট গলিপথ পেরিয়ে বাড়ির কড়া নাড়তে শুরু করে। বাড়ির নম্বর সে দেখে নি—তবুও মনের কোন গোপন আদেশ তাকে ঠিক চালিয়ে নিচ্ছে বিবাহ-পূর্ব পুতুল আর আজের রাতে পালিয়ে আসা এই পুতুলের মধ্যে লক্ষ যোজন ব্যবধান।

দোর খুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মা। চোখে অপরিচিতের আভাস। একটি রাত নয়···লক্ষ যোজন ব্যবধান···বিড়বিড়িয়ে বলে পুতুল। মায়ের সঙ্গে কোন কথা না বলে, মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকে যায় ও। কেন মাকে ধাক্কা দিয়েছিল সেদিন ? পরবর্তী জীবনে বহুবার এই প্রশ্ন জেগেছে মনে—কিন্তু কারণ খুঁজে পায় নি।

ঘরে ঢুকে বড় মোড়াটা টেনে নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যে বসে থাকে সে। অনেকক্ষণ পরে মা ঘরে ঢোকেন। হয় তো তিনি এতক্ষণ খোলা দুয়ারের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তিনি পুতুলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পুতুল একবার ওঁর দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

সাদা শাড়ি পরা এই মহিলার ভাবহীন চোখ আর বিস্ফারিত ঠোঁটের বোবা-বিস্ময় রেখায় গা জ্বলে যাচ্ছিল তার—বিরক্তি, বিদ্বেষ, অসূয়া এই প্রায় বৃদ্ধা মহিলা সমস্ত জীবন নেকা আর বোবা সেজে কি চমৎকার ভাবেই না কাটিয়ে এল।

ঠিক এই ভাবেই বিয়ে হয়েছে এই মহিলাটির—তারপরেও সে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মনে সংসার করেছে—স্বামীকে ভালবেসেছে—জন্ম দিয়েছে সন্তানের—এমন কি তাকেও। যদি এই মহিলা তার মত উঁচু মাথায় বেরিয়ে আসতো তবে এ জগতে অস্তিত্ব থাকতো না পুতুল বসুর। তা না করে এই মহিলাটি আত্মসমর্পণ করেছে সেই ঘৃণ্য বর্বর আদিমতার নিকট—আর নিজ সন্তানকে একটি কথা না বলে একটুও সতর্ক না করে দু'হাতে ঠেলে পাঠিয়েছে সেই গহ্বরে। হিংস্র আনন্দে মুখ মাখিয়ে বলেছে—সন্তানের প্রতি কর্তব্য করছি। আর···

হঠাৎ একটা চীৎকার—সেই স্তব্ধতা, পুতুলের চিন্তাধারাকে ছিন্ন-ভিন্ন টুকরো টুকরো করে দেয়—চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছেন পুতুলের মা—কি হলো! এ কি হলো আমার!

ওঘর থেকে জ্যাঠামশাই ছুটে আসেন। ভাস্তুরকে দেখেও মাথায় শাড়ি তুলে দেন না তিনি। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বোবা চোখ আর বিহ্বল মুখে তিনি শুধু চেঁচাতে থাকেন—কি হল ? এ কি হল !

ভ্রাতৃবধূর অদ্ভুত ব্যবহারে চকিত হলেও পুরুষোচিত অভ্যাসবশেই কারণ জিজ্ঞাসা না করেই ধমক দেন জ্যাঠামশাই, কি হয়েছে ? চেঁচাচ্ছ কেন ?

পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান। স্তব্ধ হবারই কথা। যে মেয়েকে সাজিয়ে গাড়িতে তুলে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন, যাকে সর্বসমক্ষে দান করে সমস্ত দাবী-দাওয়া নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, সেই মেয়ে এভাবে ভোররাতে এসে উপস্থিত। জীবনে এরকম ঘটনা দেখেন নি তিনি, শোনেনও নি—এমন কি নাটকেও পড়েন নি।

তিনজনে তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। কিন্তু কারো চোখেই কোন ভাষা নেই। একটু পরে পুতুলের ভ্রূ দু'টি ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠতে থাকে আর সেই কোঁচকান ভ্রূর দিকে তাকিয়ে চোখ দু'টি বুজে ফেলেন জ্যাঠামশাই আর সঙ্গে সঙ্গেই জমানো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। দোর, জানালা বন্ধ করে দেন।

—কি হয়েছে ? পুতুলের একান্তে এসে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি।

—কি হবে ? পাল্টা প্রশ্ন করে পুতুল।

—ওরা তোকে বের করে দিয়েছে ? পুতুলের প্রশ্ন শুনতেই পান না।

—বের করে দেবে। ভ্রূ কুঁচকে ভাবে পুতুল। স্পর্ধা ওদের কিন্তু আশ্চর্য···এ কথাটাও সম্ভবপর বলে ভাবতে পারে ওরা!

—মেরেছে তোকে !

—না। ঠন শব্দে বেজে ওঠে হাতুড়ির ঘা।

—তবে ? তখনও তাঁর কণ্ঠে প্রশ্ন ও কৌতূহল। নিশ্চয়ই গুরুতর কোন কারণ আছে। নইলে এ ভাবে কোন মেয়ে কি চলে আসতে পারে ?

—তবে ? ভ্রূ দু'টো এত কোঁচকায় যে, চোখ ছোট হয়ে যায় পুতুলের। তবে, কেন চলে এসেছে সে। কেন ? কি উত্তর দেবে ? ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েছে সেই আদিম লোমশ কামনার বীভৎস পশুত্বকে। তাই পালিয়ে এসেছে···

কি লাভ বলে। বিশ্বাস করবে কি ? অনুভব করতে পারবে তার মনকে ? না এরাও তো ঠিক এই ভাবেই কাটিয়েছে জীবন। এই মা···এই জ্যাঠামশাই। বিয়ের রাতে জ্যাঠামশাই হয় তো ঠিক এই ভাবেই জড়িয়ে ধরেছিল তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটি মেয়েকে। জ্যাঠামশাইয়ের গায়েও লোম ছিল কি ?

—কিছুই যদি হয় নি তবে তুই চলে এলি কেন ? জ্যাঠামশাইয়ের কণ্ঠে ঈষৎ কঠোরতা। এখনও তিনি কারণ বের করতে চেষ্টা করছেন—ভীষণ একটা সাংঘাতিক কারণ—ভূমিকম্পের মত কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়—যাতে সমস্ত সহজ জীবন উল্টে-পাল্টে যায়—

পুতুল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওঁদের দিকে। যে কোন

একটা কারণ বললেই সুখী হবেন এঁরা। যে কোন—এমন কি ও যদি মিথ্যা একটি অপবাদও দেয় বরপক্ষীয়ের নামে—কিন্তু···

মিথ্যা কথা বলতে পারবে না সে আর সত্য কথা বললে বুঝতে পারবে না এরা। কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে নেয় সে।

—ঠিক অমনি। চেঁচিয়ে এগিয়ে আসেন মা। মনে হয় যেন তিনি আঘাত করবেন পুতুলকে। চিরকালই ঠিক এমনি। আমি ওকে এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি। মত্ত শুধু নিজের খেয়াল, নিজের জেদ, নিজের স্বার্থ নিয়ে। আর কোনদিকে তাকাবে না···

—আঃ, তুমি চুপ করো বৌমা। জ্যাঠামশাই কঠিনকণ্ঠে বলেন, এ ভাবে এসে কি স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে ওর। অকারণে যদি এসে থাকে তবে ঐ তো ভুগবে সমস্ত জীবন। জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে ওর।

কান্নায় ভেঙে মাটিতে বসে পড়েন মা। এতক্ষণ তিনি ব্যক্তি-পুতুলের চরিত্রের দুর্বিনয় ও স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য দেখছিলেন, রাগে সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছিল তাঁর। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কথায় ব্যক্তি-পুতুল সরে যায় অনেক দূরে—তার মেয়ে—একান্ত আদরের মেয়ের জীবন নষ্ট হতে চলেছে। চোখের সামনে তিনি দেখতে পান একটি দৃশ্য—আর দ্বিগুণ কান্নায় ভেঙে পড়েন।

জ্যাঠামশাইয়ের কথা, মায়ের কান্না কিছুই শুনতে পায় নি, দেখতে পায় নি পুতুল। ওর কানে শুধু বাজছিল কয়েকটি কথা—নিজের স্বার্থ, নিজের জেদ আর কোনদিকে তাকাবে না।

সিঁড়ির নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটি মেয়ে। কালো প্যান্ট পরণে—খালি গা। খোলা চুল উঁচু করে ধরে পিঠের উপর অনবরত মেরে চলছেন পুতুলের মা—বল, বল আর তর্ক করবি! কি জেদ মেয়ের···তবু 'না' বলবে না।

ছোট মেয়েটা কি ভাবে তাকিয়েছিল? ঠিক আজের মতই কি? উদ্ধত, দুর্বিনীত। কিছুতেই কোন কথা না বলাতে পেরে শেষটা কাঁদতে সুরু করেন মা—কি কপাল নিয়েই জন্মেছি। আর আমার ভাগ্যে কি সবই একরকম! এ মেয়ে আমার পেটে এসেছে শুধু আমাকে জ্বালাতে—মরেও না—মলেও বাঁচতুম আমি।

মায়ের চোখের প্রথম ফোঁটা জলেই পুতুলের মন নরম হয়ে গিয়েছিল। মাকে জড়িয়ে ধরে বলতে চেয়েছিল সে, আমি আর করব না মা।

এক পা এগিয়ে থেমে যায়। কি জানি কেন সেই শিশু পুতুলের মনে, যে মন তখনও তৈরি হয় নি—সেই কাঁচা মনে ধাক্কা লাগে। মনে হয়, মায়ের এই কান্নাও এতক্ষণের আক্রোশেরই রূপান্তর। পুতুলকে ভালবেসে কিংবা নিজে পরাজয় স্বীকার করে নয়, নিজ মনের আক্রোশের মুক্তি দেবার জন্যই কাঁদছেন তিনি···

হঠাৎ চোখে পড়ে মায়ের কান্না। ইনিয়ে-বিনিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছেন তিনি। উদারা-মুদারা-তারা—না, তারায় উঠছে না তার গলা। পুতুলের ভবিষ্যতে কি কি সর্বনাশ হবে, সংসারের অশান্তি, এরই দীর্ঘ ফিরিস্তি আর ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ।

মুখ ফিরিয়ে নেয় পুতুল। আক্রোশ। বিরক্তি! জেদ! তাঁর কথা না শুনলেই পৃথিবী রসাতলে যাবে। তাই যাক্। দেখতে চায় পুতুল কত নীচে নামতে পারে পৃথিবী।

সেদিনও ঠিক এমনিভাবে জেদের বশে চেঁচিয়েছিলেন পুতুলের মা। আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল বালিকা পুতুল। চেঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বাবা।

—কি হয়েছে? বিরক্তি নয়, কি রকম যেন একটা বিস্ময় তাঁর কণ্ঠে। তাঁর কথায় মনে হয় ঠিক এ-রকম ঘটা উচিত নয়—তবু ঘটছে দেখে তিনি অবাক।

—কি আবার হবে? ঝরঝরিয়ে প্রায় দশ মিনিট ভাগ্য ও ভগবানকে দোষারোপ করে চলেন পুতুলের মা।

নিশ্চল নীরবতায় শুনে যান তিনি। পুতুলের মা একটু থামামাত্র তাঁর নিজস্ব প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেন, এ তো দেখছি তোমার ভাগ্যের দোষ আর তোমাকে যে তৈরি করেছেন সেই ভগবানের দোষ। তবে এ বাচ্চা মেয়েটাকে এখানে অপরাধীর মত দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?

বলতে বলতেই তিনি একটু ঝুঁকে পড়েন। ভ্রূ দু'টো কুঁচকে ওঠে। সিঁড়ির ধাপ ক'টি নেমে পুতুলের গায়ের উপর ঝুঁকে বলেন, এ কি। পিঠটা লাল। মেরেছ নাকি!

শেষের কথায়, কণ্ঠস্বরে, চেহারায় এমন একটা দুঃখের সুর বেজে ওঠে যে, পুতুলের মা চমকে ওঠেন। অপ্রতিভভাবে কৈফিয়তের সুরে বলেন, না মেরে কি করবো? যা জ্বালায়।

—তাই বলে তুমি ওকে মারবে! দুঃখবোধ মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠে।

পুতুলের মায়ের সর্ব অবয়বে কারুণ্য ফুটে ওঠে, সত্যি, কত লেগেছে ওর? আর কখনও মারবো না আমি।

—কত লেগেছে ওর বল দেখি। বাবা আবার বলেন।

মায়ের দিকে তাকিয়ে, বাবার কথা শুনে একমুহূর্তেই সমস্ত দুঃখ বেদনা ক্রোধ ভুলে যায় পুতুল, বলে—আমার একটুও লাগে নি বাবা।

মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা· আমি আর তোমার অবাধ্য হব না।

নিজের অজান্তেই তাকায় পুতুল। নেই। সিঁড়ি নেই। নেই সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ান সেই সদাহাস্যময় মূর্তি। চোখ দু'টি বুজে ফেলে পুতুল। কয়েকফোঁটা নোনা জল—একটুও মিষ্টত্ব নেই তাতে।

—এতগুলি টাকা খরচ করে বিয়ে দিলাম, সর্বস্বান্ত হলাম ওর জন্যে আর ও এই কাণ্ড করে এল। কান্নাভেজান কণ্ঠ মায়ের।

—টাকা···আর টাকা—, জল শুকিয়ে গেছে। দু'গালে শুধু দু'টি নুনের রেখা। জ্বালা করছে সমস্ত মুখ। টাকা···

—টাকা তো ফেরত পাওয়া যাবে না। কিন্তু গয়নাগুলি যেভাবেই হোক আনতে হবে।

জ্যাঠামশাই বিরক্ত বিরস গলায় বলেন, দেখি কি করা যায়। এই রকম যে ও করবে তা কে ভেবেছিল। মান সম্মান, টাকা-পয়সা···।

—টাকার জন্য ভাবতে হবে না আপনাদের। তীব্র তীক্ষ্ণতা পুতুলের কণ্ঠে। যে টাকা খরচ করেছেন আপনারা তার দ্বিগুণ এনে দেব উপার্জন করে।

দ্বিগুণ কেন বহুগুণ উপার্জন করেছে। চোদ্দোর মধ্যেই এনিজ

বসে পুতুল। সকাল থেকে সন্ধ্যা কাজ করে—কত টাকা রোজগার করে প্রতি মাসে। হ্যাঁ প্রতি মাসে কত টাকা পায় পুতুল। প্রতি মাস—প্রতি বছর। কত মাসে এক বছর। কত বছর চলে গেছে পুতুলের জীবন থেকে!

আশ্চর্য! সেদিন কিন্তু পুতুলের ঘোষণা বিশ্বাস করেন নি ওঁরা। কিংবা?—হয় তো বিশ্বাস করেছিলেন বলেই প্রতিবাদ অত উগ্র হয়েছিল। দ্বিগুণ বেগে কেঁদে উঠেছিলেন মা।

—বুড়ো বয়সে এই তো আমার কপালে আছে—মেয়ের রোজগার খেতে হবে। হায় রে, আমার মরণ হয় না কেন? মায়ের সেই পুরানো কথাই নতুন সুরে বেজে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠে।

জ্যাঠামশাই গম্ভীরভাবে তাকিয়েছিলেন। যেন দূরের মনে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন পুতুলের কথা। হ্যাঁ, উপার্জন করতে হবে তোমাকেই—মানুষ করতে হবে ছোটদের। কিন্তু··কিন্তু ঠিক এই টাকাগুলি তো আর ফিরে আসবে না। এগুলি ফিরিয়ে আনবার কি হবে?

বিরক্তি বিদ্বেষে ভরে উঠেছিল মন। মনে হয়েছিল বাবার কথা। তাঁর সেই শুভ্র-সুন্দর হাসি—সেই হাসির একটুকরো এখানে থাকলেও সমস্ত পবিত্র সুন্দর হয়ে উঠতো।

পুতুলের দুর্বোধ্য, দুর্বিনীত নীরবতা সত্ত্বেও এঁরা ধরে নিয়েছিলেন, ভূপেনের কোন দোষ আছে। এমন কোন দোষ যা ভূপেনের পিতামাতার পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। যে কথা পুতুলের পক্ষে নিজ মুখে জানান অসম্ভব।

কিন্তু সে জন্য কি পুতুলের স্বামী-ত্যাগ করা উচিত হয়েছে? বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই প্রশ্ন করেন তাঁরা। ওতে, দাম্পত্য-জীবনে একটু অশান্তি আসতে পারে কিন্তু স্বামী-ত্যাগ···

পুতুল একদম চুপ। কেন সে চলে এসেছে—এই সকল বিচার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর যেমন দেয় নি তেমনি তাদের বিচার-পর গালাগালির বিরুদ্ধেও বলে নি একটি কথা।

দু'টি বিভাগ হয়ে গেছে তার। সুস্পষ্ট দু'টি ভাগ। একটি দেহ—অপরটি মন। দেহটি সংসারের আর সকলের মত খায়, ঘুমায়, সকলের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন দেখে গল্প করে—মনটা কিন্তু একদম আলাদা হয়ে গেছে। সে জানে এদের কারো সঙ্গে কথা বলা চলবে না তার।

অনেক চেষ্টা করেছিলেন জ্যাঠামশাই গয়নাগুলি ফিরিয়ে আনবার জন্য, অনুরোধ করেছিলেন বারবার—একবার শুধু পুতুল ওখানে যাক—গয়নাগুলি পরে চলে আসুক। গা থেকে নিশ্চয়ই খুলে নেবে না তারা।

ভ্রাতৃবধূর জিজ্ঞাসুদৃষ্টির উত্তরে বলেছিলেন, যেন কিছুই ঘটে নি এমনভাবে পুতুলকে নিয়ে আমি যাব। মাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে চলে এসেছে ও। ছেলেমানুষি করেছে—বোকামি করেছে—সেজন্য বকবো কিছুক্ষণ। তারপর গয়নাগুলি পরে ও চলে আসবে আমার সঙ্গে।

পুতুল রাজী হয় নি। সে বলেছিল, নিজের জিনিস চুরি করে আনব কেন?

—তবে কি করে আনবে?

—আনবার দরকার হলে জোর করে আনব?

—তবেই হয়েছে। মুখভঙ্গী করেন জ্যাঠামশাই। আইন-আদালত করব না কি তোর জন্যে।

—ঐটুকুই বাকী আছে। নিষ্করুণ ভঙ্গি মায়ের। আমাদের শেষ করল ও।

সেই যে সুরু হল আজ পাঁচ বছর ধরে ঐ এক কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনিয়ে আসছেন মা। একশ'···দু'শ'···তিনশ'···যে মাসে যা পেয়েছে সব এনে দিয়েছে মায়ের হাতে। মা হাত পেতে নিয়েছেন আর হয় তো মেয়ের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেবার বিকৃত অভিমানে রান্নাঘরে গিয়েই অকারণে ছোট বোনেদের মেরেছেন—নিজের মৃত্যু কামনা করেছেন। যাক্···

গয়না আদায় করতে পারেন নি জ্যাঠামশাই। পুতুলকে ফিরে যেতেও বলে নি তারা। কয়েকখানা চিঠি দিয়েছিল। তাদের সামাজিক সম্মান নষ্ট করবার জন্য কেন আদালতে নালিশ করবে না এই প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিল বারবার।

বিয়ে দিতে দশ-পনের দিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন পুতুল-পক্ষীয়রা। পুরো একমাস থেকেও কোন মিটমাট না করাতে পেরে ফিরে এসেছিলেন ওঁরা। সিঁথিতে সিঁদুর হাতে শাঁখা পরে ফিরে এল পুতুল। এখানকার লোকেরা নানা প্রশ্ন, আনন্দমেশান কৌতূহল, যৌবন—রহস্য। তারপর ধীরে রহস্য থেমে যায়—শুধু কৌতূহল। পরছিদ্রান্বেষীদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর আনন্দভরা খোঁচান প্রশ্ন। পুতুলের শাঁখা ভেঙে গেল—আর শাঁখা কিনলো না সে। সিঁথির-সিঁদুর ধীরে ধীরে সরু হতে হতে মুছে যায় একেবারে। লোকদের কৌতূহল ধীরে ধীরে থেমে যায়, সবাই যেন বুঝে যায় সব কথা।

বাড়িতে ঢুকবার মুখেই মায়ের কণ্ঠ কানে যায়। নিজের মনেই বক্-বক্ করছেন—সেই চিরাচরিত ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ। মেয়ের উপার্জন খাবার লাঞ্ছনা। মাসের শেষেই তাঁর বক্তৃতা বেড়ে ওঠে।

হঠাৎ পুতুলের মাথা গরম হয়ে যায়। মায়ের সামনে গিয়ে বলে, মা থাম, মেয়ের রোজগার খেতে তোমার প্রাণ চলে যাচ্ছে। যদি ছেলে উপার্জন করতো আর বৌয়ের মুখঝামটা খেয়ে সেই ভাত খেতে তবে খুব ভালো লাগতো।

—কি! কি বললি। স্বল্পভাষী পুতুলের মুখে এ রকম কথা শুনে একটু বিহ্বল হয়েই প্রশ্ন করেন তিনি।

—বলছি, মেয়েদের রোজগার খেতে তোমার এত আপত্তি, তাই ভাবছি আমি আর চাকুরী করব না—পারুলকেও মানা করে দেব। বসেই থাকব বাড়িতে—দেখি তাতে তোমার মনে শান্তি হয় কি না?

মা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। একটু পরেই তিনি পুতুলের কথা এবং বক্তব্যের অন্তর্নিহিত বিদ্রূপ বুঝতে পারেন। চোখ জলে ভরে ওঠে।

—আমার কি ইচ্ছে হয় না আর পাঁচজনের মত মেয়ে-জামাই নিয়ে আনন্দ করি। একটু থেমে শান্তস্বরে ভয়ে-ভয়েই বলেন।

—ইচ্ছে করে। অনেক কিছুই ইচ্ছা করে অনেকের। মায়ের চোখের জল দেখেও থামে না পুতুল। তিক্তকণ্ঠে বলে, কিন্তু জামাইরা এলে বসতে দিতে কোথায়? দিতে পারতে এককাপ চা!

—তোরা এ ভাবে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াস তা দেখে দুঃখ হয় না আমার।

—কিন্তু অনবরত গায়ে গরম জল ছিটালে তো মুখের শুষ্কতা কমবে না আমাদের—উত্তর দেয় পুতুল।

মা চোখ মুছে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন পুতুলের দিকে। সেই ভিজে-ভিজে চোখের দিকে তাকিয়ে পুতুলের চোখ দু'টি ভিজে ওঠে। এতদিন পরে দু'জনে বুঝতে পারে দু'জনকে। একের মনের যন্ত্রণার কিছুটা ছাপ পড়ে অপরের মনে।

পাউডার-পাফ্‌টা থমকে যায়। আয়নার মুখটির দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করে পুতুল। কেন? কেন পাউডার মাখছে সে। বিছানায় পড়ে আছে ধোপার ধোয়া একটি শাড়ি ও ব্লাউজ। দামী বা রঙিন নয়। তবু ওরই মধ্যে একটু চাকচিক্য। শাড়ির পাড় নীল—ব্লাউজের হাতায় নীল বর্ডার। টিউশানিতে পরে যাবার শাড়ি-ব্লাউজ ভাঁজ অবস্থায় পড়ে আছে আলনায়—মোটা মেটেপাড়ের শাড়ি—রঙিন ব্লাউজ।

কেন ঐ শাড়ি-ব্লাউজ পরে এখন যাচ্ছে না পুতুল। কেন?

কেন এই তফাৎ পোষাকে? প্রসাধনে! তবে কি···তবে কি নরেশবাবু যা বলেন···

হাত থেকে পাফ্‌টা পড়ে যায় নীচে। শরীরটাই কি রকম অবশ হয়ে গেছে। পাঁচ বছর এই লোকটার সঙ্গে কাজ করছে পুতুল কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে চিনতে পারলো না। এক কথায় অদ্ভুত—আশ্চর্য! প্রথম দিনের বিস্ময়ের রেশ আজও চলছে···

প্রথম দিন···

সেই পাঁচ বছর আগে। কলকাতা থেকে ফিরে এসেই চাকুরীর চেষ্টা করছিল পুতুল। এখানে পাঁচটা স্কুল। প্রথম যে স্কুলটায় গেল সেখানকার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অত্যন্ত মোটা—বিপুলকায়া। চেয়ারের চারিধার দিয়েই তাঁর মাংসপিণ্ড বেরিয়েছিল।

পুতুল দাঁড়াতেই মোটা গলায় প্রশ্ন হল, কি চাই?

—একটা চাকুরীর জন্য···

—চাকুরী এখানে নেই। যাও···। হাতটা এমনভাবে নাড়েন যার ভাবাগত অর্থ হয় একমাত্র হিন্দীতে—বাহার হো যাও।

তবু পুতুল দাঁড়িয়ে থাকে। সে শুনেছে চাকুরী পেতে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সইতে হয়। অপমান সুরু হয়ে গেছে। কাজেই আর একটু ধৈর্য ধ'রে থাকলে হয় তো চাকুরীও হয়ে যেতে পারে।

—কি ব্যাপার, দাঁড়িয়ে রইলে যে···কাগজ থেকে মুখ তুলে উনি হুঙ্কার ছাড়েন।

—আমার বিশেষ দরকার···

—তোমার দরকারে তো কেউ তোমাকে চাকুরী দেবে না। সেক্রেটারীর হুকুম হবে, তবে···

পুতুল ভাবে, সেক্রেটারীর আদেশেই যদি চাকুরী হয়ে যায়, তবে ও সেখানে গিয়ে যেভাবেই হোক তাঁকে বুঝিয়ে চাকুরী নেবে। ওর কোন আঘাত না পাওয়া তরুণ-মনে স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, ওর অবস্থা শুনলে সেক্রেটারী নিশ্চয়ই তাকে চাকুরী দেবেন। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকেও সে নিশ্চয়ই সব কথা খুলে বলে চাকুরী নিতে পারতো কিন্তু স্কুলটা তো তাঁর হাতে নেই···কাজেই···

—সেক্রেটারীর ঠিকানাটা যদি আমাকে দিতেন···আস্তে আস্তেই কথাগুলি বলে পুতুল।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এমনভাবে চমকে ওঠেন যে ভয় পেয়ে যায় সে। পাশের চেয়ারে বসে থাকা সেই সরু লম্বা মেয়েটাও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

পুরো এক মিনিট সেই চায়টে চোখ তাকিয়ে থাকে। দু'টো বড় বড় ড্যাবডেবে ঝকঝকে স্পর্ধিত—আর দু'টি ভীত অথচ mischievous.

—তুমি সেক্রেটারীর কাছে যাবে? পুতুলের দিকে নয় পাশের মেয়েটির দিকে কোণাচে-চোখে তাকালেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। দু'জনের মুখে ফুটে ওঠে একই ভাষার হাসি।

—তুমি সেক্রেটারীর কাছে যাবে? বেশ, বেশ। পুনরাবৃত্তি করেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, তা সকালের দিকে নয়—সন্ধ্যার দিকে যেও কেমন।

—সন্ধ্যায় উনি বাড়িতে থাকেন বুঝি?—জিজ্ঞাসা করে পুতুল।

—না, বাড়িতে তো উনি সব সময়ই থাকেন। কিন্তু সন্ধ্যায় উনি মেজাজে থাকেন বুঝলে। আর যাবার সময় ঐ একখানা শাঁখাও খুলে রেখে, চুলগুলি ফুলিয়ে একটু সেজেগুজে যেও।

—মানে? ভ্রূ কুঁচকে ওঠে পুতুলের। এতক্ষণে ওদের হাসির অর্থ বুঝতে পারে সে।

—মানে, একটু উর্বশী টাইপ না সেজে গেলে চাকুরী হবে কি করে!

—আপনি কেন আমাকে শুধু শুধু অপমান করছেন? তখনকার দিন হলে ভ্রূ কুঁচকে তাই বলতো পুতুল। কিন্তু, তখন কিছুই বলতে পারে নি। চট করে বয়োজ্যেষ্ঠ্যাদের প্রতি-উত্তর দেবার অভ্যাস হয় নি তখনও। অপমানের জ্বালায় চোখ ভরে উঠেছিল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছিল সে।

—ছেলেমানুষ···ক্ষীণ দেহের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়

—আরে, রেখে দাও তোমার ছেলেমানুষ। পেট থেকে পড়েই আজকালকার মেয়েরা বুড়ি। নইলে সেক্রেটারীর কাছে যেতে চায়। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া···

—অন্যায় হয়েছে হয় তো। ভেবেছিল পুতুল। কিন্তু উনি তো বুঝতে পারেন না তার মনের তাগিদ—একমুঠো ঘাস খাবার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে গিয়েছে সে। যাক্ পৃথিবী রসাতলে কিংবা উঠে যাক নভো নীলিমায়—সে শুধু চায় একমুঠো ঘাস—একটি চাকুরী।

দ্বিতীয় স্কুলের শিক্ষয়িত্রী খুবই ভাল ব্যবহার করলেন। বসতে বললেন চেয়ারে—সব কথা শুনে মিষ্টিভাবে হেসে বললেন, এখন তো চাকুরী খালি নেই। তুমি একটা দরখাস্ত রেখে যাও—বি-এর ফলটাও বের হোক—সুবিধে হলেই ডেকে পাঠাব।

—বি-এর ফল বেরুনো তো অনেক দেরি।

—চাকুরী খালি হতে তার চেয়েও দেরি হতে পারে—শিক্ষয়িত্রী হাসেন। তুমি কি ভেবেছ এখনই কাজ হয়ে যাবে।

—আমার যে বড় দরকার ছিল।

—পৃথিবীর নিয়ম এই,···উনি উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে থাকেন।

—কি? একটু পরে জিজ্ঞাসা করে পুতুল।

—প্রত্যেক জিনিস, প্রতি জীব, প্রতি কাজ নিজের দরকার অনুসারে চলে। অপরের দরকারের কথা ভেবে চলে না কেউ। ফুল নিজের প্রয়োজনে ফুটছে—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সবই ঘুরছে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে। চাকুরীর যখন দরকার হবে সে তোমাকে ডাকবে—তোমার প্রয়োজনে সাড়া দেবে না।

মিষ্টি মধুর একটা আবেশ। ঘর পেরিয়ে সেই অবধি মনে সেই আবেশের ঝঙ্কার। দোর পেরিয়েই পথ। আর···

সেই পথের দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে এল। চাকুরী হয় নি তার। একজন রূঢ়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে অপরে মিষ্টি আবেশে। কিন্তু দুয়ের ফল এক। কি প্রভেদ—

তবে কি মিষ্ট কথা, ভাল ব্যবহারের কোন মূল্য নেই।

না নেই। অন্তত এই মুহূর্তে কোন মূল্য নেই পুতুলের কাছে। কেউ যদি ডাকে দশ ঘা বেত মেরেও একটি চাকুরী দেয় তবে সে খুশি হয়ে নিয়ে নেবে।

প্রয়োজনের উগ্রতার কাছে ব্যবহারিক ভদ্রতার নেই কোন মূল্য। ড্রইংরুমে নীল আলো জ্বালাবার মত সৌখীন জীবনেই ভাল লাগে ঐ সব।

পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে পুতুল। শুকনো কঠিন পথ। এই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে তাকে—দোরে-দোরে টোকা দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি স্থান না খুঁজে পায়।

ফিরিওয়ালাদের মত নিজের শক্তি, সামর্থ্য শিক্ষার পসরা সাজিয়ে ফিরি করতে বেরিয়েছে সে।

তারপর!

সেই একই ইতিহাস। নিজেকে ফিরি করা আর ফিরে আসা।

শেষটা আর যেন পারে না। যে ভাবেই হোক চাকুরী ঠিক করে তবে বাড়িতে ফিরবে—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু···

—আর একটি জায়গা এবং এখানেই শেষ। একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী নিজে থেকেই—হয় তো পুতুলের মুখ দেখে তার দয়া হয়েছিল —এই ঠিকানাটা দিয়েছে।

নতুন এসেছে ওরা—অনেক বাচ্চা দেখলাম টিউশানি হয় তো একটা পেতে পার—বলেছিল সেই শিক্ষয়িত্রী।

পুরানো একটা বিরাট বাড়ি। কলেজে যাবার পথে বহুদিন দূর থেকে সহরের প্রান্তের এই বাড়িটা দেখেছে পুতুল। কার বাড়ি হতে পারে ওটা! কচিৎ মনের মধ্যে হাল্কাভাবে ঘুরে বেরিয়েছে কথাটা।

ক্লান্ত শ্রান্ত পুতুল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেই বাড়িটার মুখোমুখি। গেট খোলাই—তবু ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় না তার। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নয়—স্কুলের দুয়ারে ঘুরে ঘুরে সমস্ত সঙ্কোচ চলে গিয়েছিল তার।

সমগ্র দিনের আশা, অবসাদ, ক্লান্তি কেন্দ্রিত হয়ে আছে এই বাড়িটির চারিদিকে। এই শেষ, পুতুল ভাবে। যদি এখন এই বাড়িতে সে না ঢোকে তবে—আজ, কাল, পরশু—হয় তো সমস্ত জীবন ভরে সে আশা করতে পারবে—হয় তো হত ওখানে গেলে চাকুরী হতো তার। কিন্তু, এই পরাজিত হয়ে বেরিয়ে আসা মাত্রই সব শেষ।

এক মুহূর্ত। হাজার হাজার বছরের পুরানো পৃথিবীর যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে।

মনকে দু'হাতে শক্ত করে চেপে দোর খুলে ঢুকে যায় পুতুল। আঁট করে শক্ত করে চেপে রেখেছে মনকে—যেন সে ভাবতে না পারে চেঁচাতে না পারে। তবুও একটু চেঁচিয়েছিল, মনের সেই চাপা আর্তনাদে কান দেয় নি পুতুল।

শুকনো পথ আর শুকনো লন্। সেই পথ পেরিয়েই প্রকাণ্ড বারান্দা।

—কে? রুক্ষ কঠিন ধাতব কণ্ঠের প্রশ্নে থমকে দাঁড়ায় পুতুল।

—আমি। ভীত বিহ্বল স্বরে উত্তর দেয় পুতুল। সামনেই বসে আছে প্রশ্নকর্তা। এটুকু অনুভবে বুঝছে পুতুল—তাকিয়ে দেখবার মত অবস্থা নয় তার।

—আমি কি? আবার ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে সেই কণ্ঠ। পুতুল প্রকৃতিস্থ থাকলে বুঝতে পারতো কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের রেশ।

—আমি পুতুল বসু···এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছে পুতুল। কথা শেষ করতে পারে না।

—পুতুল বসু? এমন বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসভরে চিবিয়ে-চিবিয়ে উচ্চারণ করে যে পুতুলও চমকে তাকায়।

সাধারণ চেহারার মধ্যবয়সী একটি লোক। চকিত দৃষ্টিতে কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। শুধু মনে হয়, নাকটা যেন একটু বেশি বাঁকান আর চোখের দৃষ্টিটা···।

—পুতুল বসু! বক্তা আবার বললেন, ক'টি নাম আপনার?

—ক'টি নাম?

—হ্যাঁ। এইমাত্র নাম জিজ্ঞাসা করায় বললেন—আমি··। উপাধি জিজ্ঞাসা করায় বলছেন পুতুল বসু। এ কি রকম?

সত্যই কি লোকটা এতটা নির্বোধ। পুতুল ভাবে না, ভাণ করছে। তাকিয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করতে চায় পুতুল। কিন্তু লোকটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে আর পুতুলের দেহে এতটুকু জোর কিংবা মনে উৎসাহ নেই।

—নরেশ মুখার্জি আছেন? হাতের কাগজের দিকে একনজর তাকিয়ে প্রশ্ন করে পুতুল।

—কি দরকার বলুন? উত্তর দেয় লোকটি। আর, তখনই পুতুল বুঝতে পারে এই লোকটিই নরেশ। শরীর শিউরে ওঠে তার। চোখ বন্ধ করে পালিয়ে যেতে চায় সেখান থেকে।

কিন্তু চাকুরী···

—শুনেছিলাম ওঁর ছেলেমেয়েদের জন্ত একজন টিউটর দরকার তাই আমি···কথা শেষ না করেই পুতুল তাকায়। লোকটির চোখে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

—হবে না।

—না। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে শব্দটা এসে বাজে বুকের মাঝে— যেখানে ছোট একটি শব্দ বেজে চলছে টিকটিকিয়ে··না··না··না···। হবে না তা তো জানতই পুতুল। তবু···! কত আশা মানুষের!

ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে যেতে যেতে সেদিন মনে হয়েছিল পৃথিবীটা কি অদ্ভুত ভাবে ঘুরছে—হেলেদুলে মন্থরগতিতে কারো জন্ত এতটুকু চিন্তা নেই তার।

অনেকটা পথ চলে এসেছে—হঠাৎ পেছন থেকে আহ্বান—শুনুন।

পুতুল ফিরে তাকিয়ে দেখে অপরিচিত ভৃত্যস্থানীয় একটি লোক। মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকে সে।

—আপনাকে ডাকছেন। লোকটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কে?

—বাবু। আপনাকে একবার যেতে বললেন।

কোন কথা না বলে পুতুল এগিয়ে যায়।

—আপনি যাবেন না! লোকটির মুখে ফুটে ওঠে ভয়। যেন পুতুল ফিরে না গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ওর।

অনেকক্ষণ লোকটির দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে পুতুল ফিরে চলে। ভাবে, কেনই বা নরেশ মুখার্জি ও'কে তাড়িয়ে দিল আবার ডাকলেই বা কেন? পরে বুঝেছিল, ওর মুখের, পদক্ষেপের হতাশা, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনার ছায়া একটু একটু করে উপভোগ করছিল নরেশ। যেমন মৃদু পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে ছেলেরা ফড়িং-এর পায়ে দড়ি বেঁধে।

—আমি বললুম, না—আর আপনি অমনি চলে গেলেন, একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না কেন নয়? প্রথম কথা নরেশের।

—আপনি কি এই কথাটা বলবার জন্য আমাকে আধ মাইল পথ হাঁটিয়ে আনলেন! পুতুলের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

—না। না। আরও কথা আছে। বসুন বসুন··। সম্পূর্ণ ভিন্ন—আন্তরিকতার সুর। ফড়িং-এ বাঁধা দড়িটা একটু আলগা করে দিয়েছে ছেলেরা।

—চা নিয়ে আয়। চাকরকে আদেশ দেন।

—আপনাকে টিউশনিটা না দিতে পারবার একমাত্র কারণ হচ্ছে··· আচ্ছা যাক, আপনি কত টাকা পাবেন আশা করে এসেছিলেন।

—যাপাই। ভূতগ্রস্তের মত উত্তর দেয় পুতুল।

—কমের পক্ষে কত?

—ত্রিশ।

—বেশির পক্ষে।

—একশ'।

চা এসে গিয়েছিল। নরেশ বলে, নিন চা খান। আর ঠিক তেমনি ভাবেই বিচার-বিবেচনা দ্বিধাহীন চিত্তে চায়ের কাপে চুমুক দেয় পুতুল। এক-দুই-তিন···আবার বেঁচে উঠেছে পুতুল। মৃতসঞ্জীবনী সুধা।

—তা আপনাকে যদি একশ' টাকাই দি'···

—আপনি তো প্রথমেই বললেন—হবে না।

—ওঃ। সে তো আমার ছেলেমেয়ের টিউশানী। না সেটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ···

—কি?

—আমার ছেলেমেয়ে নেই।

চা চুমুক দেওয়া বন্ধ করে একটুখানি তাকিয়ে থাকে পুতুল। কি অদ্ভুত এই লোকটা। কত রকম ভাব-ভঙ্গীতেই না এই সামান্য কথাটা বললো। খুব সহজে এক কথায় যা শেষ হতে পারতো।

কলেজ জীবনের কথা মনে হয়। দু'খানা শেক্সপীয়ার আর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের গোটাকতক লেখা পড়েই ভাবতো সবই বুঝি বুঝে গেছে। কলেজসঙ্গিনী প্রিয়া প্রতিমা, পাপড়ি, পরিচিতা, অর্ধপরিচিতা, অপরিচিতা সহপাঠিনীদের দেখে ভাবতো সমস্ত জগৎ মুখস্ত করা কবিতার মতই জানা।

এখন মনে হচ্ছে, জগতের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে সে। ভেতরে যাবার টিকিটই এখনও কাটা হয় নি।

বিচিত্র এই জগৎ। বিচিত্রতর তার সৃষ্টি।

—আপনাকে আমি একটা চাকুরী দিতে পারি—এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত কাজ—একশ' টাকা মাইনে'—অন্যমনস্ক পুতুলের কানে কথার রেশ পৌঁছায় কিন্তু অর্থবোধ হয় না। একটু পরে হঠাৎ বুঝে নিয়ে জোরে হেসে ওঠে।

—হাসছেন যে?

—আপনি আমাকে পরিহাস করছেন তা-কি বুঝতে পারি নি মনে করেন।

—পরিহাস?

—নয় তো কি? তবে এখন এই মুহূর্তে পরিহাসটা একটু মর্মান্তিক মনে হচ্ছে। সেই সকাল দশটা থেকে ঘুরে ঘুরে আর তাড়া খেয়ে খেয়ে···

—না, না, সত্যই পরিহাস নয়। ধাতবকণ্ঠেও বেজে ওঠে অনুনয়। চোখের বিদ্রূপে ঈষৎ ধূসর ছায়া। পুতুল চমকে তাকায়।

—এখানে নামটা লিখুন তো।

পুতুল নাম লেখে।

—চলবে। মাথা নাড়েন তিনি।

—কি?

—হাতের লেখা।

—ওঃ।

—আপনাকে ভাল লাগে কেন জানেন?

পুতুল চুপ। ভাল লাগবার কোন কারণ কিংবা সম্ভাবনা খুঁজে পায় না সে।

—আপনি নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করেন না বলে! গম্ভীর ভাবে কথা শেষ করেন ভদ্রলোক।

—প্রশ্ন সব হারিয়ে গেছে। মনে মনে বলে পুতুল।

—তা হলে ঐ কথা রইলো। আপনি কাল থেকে চাকুরীতে যোগ দিচ্ছেন।

—কি চাকুরী? তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর।

—কি চাকুরী! পুতুলের গলা অনুকরণ করে হেসে ওঠেন উনি। চোখ দু'টো জ্বলে ওঠে অপরের যন্ত্রণা উপভোগের মৃদু পৈশাচিক আনন্দে।

—কেন এত ঘুরতে গেলেন রৌদ্রে!

—চাকুরী একটি ঠিক না করে ফিরবো না বলে···

—চাকুরী তো পেয়ে গেলেন, তা প্রতিজ্ঞা রক্ষার আনন্দ কই? এখনও কি দেহে অবসাদ ক্লান্তি।

—না। চাকুরী পাবার বিস্ময়, চাকুরী না পাবার ক্লান্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি শুধু ভাবছি, ব্যাপারটা কি? এবং কেন হলো?

—ওসব 'কি' 'কেন' 'কোথায়' এর প্রশ্ন সরিয়ে রাখুন দূরে। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিন। কাল এগারোটায় আসবেন—সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন ধীরে ধীরে। [আগামীবারে সমাপ্য।

আলেয়া

শ্রীডলি চট্টোপাধ্যায়

ভাঙ্গা জানলাটার পাশে এসে দাঁড়াল মেখলা। ওদের সরু গলিটার ও মোড়ে চাঁপা রং-এর তিনতলা বিরাট বাড়িখানা বেলা শেষের লাল আভায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। আর চাঁপা রং-এর বাড়িটার ওই নীল আলো জ্বলা আর নীল লেসের পর্দা ছুলে ছুলে ওঠা ঘরখানা! ওই ঘরখানার দিকেই কেমন একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখা চোখে চেয়ে আছে মেখলা।

নোংরা সরু গলিটার মধ্যে অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছে মেখলার চুণ-বালি খসা স্যাঁৎস্যাঁতে খুপরিখানার নিরাবরণ লজ্জা।—ও পাশের খুপরি থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে আসছে, হকার অনিমেষ ঝগড়া করছে কার সঙ্গে ছ'বেলার পিণ্ডি আসবে কোথা থেকে তারই পুরান প্রশ্ন তুলে। ছ' পয়সার বিড়ি কিনতে গিয়ে এত দেরি হয় কেন—কে কাকে ধমকাচ্ছে। মায়ের পিটুনী খেয়ে শীর্ণ ক্ষুধার্ত ছেলেটা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে চোখ ছ'টোকে এ পাশে ফিরিয়ে আমল মেখলা। অন্ধকারেই হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে ভাঙ্গা চিরুণীটা খুঁজে নিতে গিয়ে খড় খড় করে কি একটা পালাল—ইঁদুর বোধ হয়! রুক্ষ চুলের খোঁপাটা খুলে একটা বেণী করে নিলে। তারপর মাটির কলসিটা তুলে নিয়ে অন্ধকার স্যাঁতলা পেছল কলতলায় এসে লাইনের শেষে দাঁড়াল, যেখানে তখন খণ্ডযুদ্ধ চলেছে আগে আসার স্বত্বাধিকার নিয়ে··

ছেঁড়া শাড়িখানা রিপু করতে করতে ভাতের হাঁড়ির ঢাকাটা ঠেলে দিলে মেখলা। খানিকটা চাপা বাষ্প বেরিয়ে গেল—অমনি একটা চাপা বাষ্প মেখলার কণ্ঠেও ঠেলে ঠেলে ওঠে—দেয় না কেউ ঢাকাটা সরিয়ে? বড় বাড়িটার শাসন এড়িয়ে একঝলক রোদ এসে খেলা করছে উঠানটার ওপাশে। একঝাঁক পায়রা রায়গিন্নীর মেলে দেওয়া মুগুর খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। হাঁড়ির বাষ্পটা ঘুরে ঘুরে নিঃসীম শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে, যেমন করে মেখলার ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, যেখানে ওর আজও ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট হয়ে আছে কত জামা, কত খেলনা, বাবার আদর। তারপর মেঘ-ছাওয়া রাত—মেঘনার কোল থেকে কোলকাতায় ছিটকে পড়া—বাবাকে হাসপাতালে রেখে প্রতিবেশীর হাত ধরে এই ব্যারাকবাড়িটায় অমলাঠাকরুণের হাতে—যেন ঘসা কাচের ওপাশে সব!

একটা চড়ুই উড়ে এসে বসল মেখলার হাঁড়ির কাছে—দেখাদেখি আরও একটা এল—ভাঙ্গা কার্নিশটায় ওরা বাসা বেঁধেছে।

মাকে কিন্তু মনে পড়ে না ওর। মনে পড়ে অমলাঠাকরুণের শক্ত হাত ছ'খানাই। কারণে-অকারণে পিঠের হাড় ক'খানাও যখন আর আস্ত থাকত না।

—একটু আগুন দেবে মেখলা? বিড়িটা ধরিয়ে নিতে অনিমেষ রোয়াকের পেরা কোণটার একপাশে দাঁড়াল। অমন মাঝে মাঝে এসে একটু আগুন চায় অনিমেষ। ঐ সঙ্গে যেন মেখলা একটু হাসুক—বলুক না, আজ কেমন বিক্রি হ'লো অনিমেষদা'? কিন্তু মেখলা শুধু আগুনটুকুই এগিয়ে দেয়। অনেকগুলো ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস বুকের একপাশে লুকিয়ে রেখে মেখলার তৈরি ছিটের জামা, পশমের বোনা ফেরী করে দেয় অনিমেষ। ছল ছল চোখের একটুখানি পরশ, পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে ঝরেপড়া ক'টি কথা—ও মা, সেই লাল জামাটাও বিক্রি করেছ অনিমেষদা'?—ছোট্ট একটা রঙ্গিন দুরাশা, একটা রঙ্গিন স্বপ্নের কোল ছুঁয়ে যায়।

তা ছ' বেলার না হোক্ মেখলার একটা বেলার নুন-ভাতটাও তো জোগাড় করে দেয় অনিমেষ। কিন্তু··

বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে শব্দ করে একটু হাসল অনিমেষ, তালি দিয়ে চড়ুই ছ'টোকে উড়িয়ে দিলে। ছাই জমে উঠবার আগেই বিড়িটা একবার ঝাড়ল। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এই রকম ভাবে বললে—ভালো কথা, খানিকটা ভালো পশম পেয়েছি মেখলা, বাইরে যাবার সময় তোমাকে দিয়েই যাব।

—ও আমার এখন দরকার নেই অনিমেষদা', ও তোমার কাছেই থাক। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা টিপে ধরে মেখলা পেছন ফিরে ভাতের ফ্যান গালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার সেই চাপা বাষ্পটা মেখলার গলায় ঠেলে ঠেলে উঠছে।

তারপর কখন মেখলার শুভ্র নিটোল মণিবন্ধ ছ'টি ধরে জোর করে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনার অদম্য বাসনাকে দমন করে অনিমেষ চলে যায়—কখন পায়রাগুলো মুগুরের কৃতজ্ঞতা ভুলে উড়ে যায়, আর কখন মেখলার চোখের কোল ছাপিয়ে খানিকটা জল ঝরঝর করে ঝরে পড়ে, তাও টের পায় না মেখলা।

কিন্তু তা হোক, তা বলে পারবে না মেখলা ওই শীর্ণ দরিদ্র অনিমেষের ঘরণী হতে। বিয়েই করবে না মেখলা, এমনি করেই এই ব্যারাক্‌বাড়িটাতেই আঁকড়ে ধরে থাকবে সকাল সন্ধ্যে আর দুপুরের চাকাটা।

ওর অসুখ করেছে ডাকো মেখলাকে। বৌমা বাপেরবাড়ি গেছে, দত্তগিন্নী সব দিক সামলাতে পারছেন না—মেখলা আছে।

মালতীর পঙ্গু স্বামী—তার রান্নার সাহায্য। ঝি আসে নি বাড়ুয্যে-গিন্নীর বাসন মেজে দেওয়া।

এর একটু ডাল, ওর একটু তরকারী কালে-ভদ্রে কুচোচিংড়ীর অযাচিত দাক্ষিণ্য! আর আড়ালে আব্ডালে ঠোঁট উল্টানি ··'ছুঁড়ির রূপের দেমাক্ দেখেছিস্ লো মালতী'? ·তারপর ব্যারাকের বুড়ি ঠানদির পাশে নিজের ছেঁড়া বিছানাটা, মাঝে মাঝে চোখের জলে ভিজে-ওঠা ময়লা ছেঁড়া বালিসটা—অন্ধকার রাতের কটা ঘণ্টা···

মেখলার আধঘুমন্ত স্বপ্নের মতো ওই নীল আলো জ্বলা আর নীল লেসের পর্দা দুলে দুলে ওঠা ঘরখানা!···ওই ঘরখানাতেই তো থাকে সেই সুমিত্র! উদাস আর আবিল যার চোখ?···রায়গড়ের জমিদারের ছেলে।

···জানলার কাছে চেয়ারটায় বসে বসে কি যেন ভাবে দিনরাত! আচ্ছা, কি ভাবে ও?—মেখলা ভাবে,—হয় তো ওর ফেলে আসা ছায়াস্নিগ্ধ গ্রামটা—তার সেই নদীর ধারে যেখানে ও পড়ন্ত বিকেলে বসে থাকতো সবুজ ঘাসের ওপর, কালো জলের স্রোতে ভেসে ভেসে যাওয়া বেগুনী রং-এর ফুলগুলোর দিকে চেয়ে! ও ভাবতো কি সেই ঘুমন্ত পুরীটার কথা? যার পাষাণ ঘরে থাকে বন্দিনী রাজকন্যা? সেই ঘুমন্ত পুরীটাই কি এই অন্ধগলিটা? এরই পাষাণ ঘরে থাকে কি সেই বন্দিনী রাজকন্যা?

ভাঙ্গা জানলাটায় মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে যখন মেখলা, কতদিন জানলায় মুখ রাখা মেখলাকে দেখে চমকে ওঠে নিস্তব্ধ দুপুর সাবান তরল আল্তার করুণ মিনতিতে। কতদিন সন্ধ্যেবেলা চাই বেল ফুলের আওয়াজে অন্ধ গলিটার সঙ্গে মেখলাও যখন চমকে ওঠে তখনও ও ঘরের ছেলেটি তেমনি বসে থাকে—উদাস আর আবিল যার চোখ?

রায়গড়ের জমিদারের বাড়ি ওটা! শিকারী জমিদার অনঙ্গমোহন কলকাতায় কাজেকর্মে এসে দিনকতক থাকেন। অন্যসময় কর্মচারীরাই দেখাশুনা করে।

খেয়ালী বিপত্নীক জমিদার রাশভারী লোক। তাঁরই একমাত্র সন্তান সুমিত্র। তাকে না কি কখনও শহরের প্রলোভনের মধ্যে রাখেন না অনঙ্গমোহন। বাড়িতেও রাখেন না—আত্মীয়বন্ধুর ভিড়।

এবার কিছুদিন থেকে অনঙ্গমোহন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় এসেছেন। সঙ্গে করে সুমিত্রকেও এনেছেন।

তারপর চাপা রং-এর বাড়িটার ওপর একদিন থমথমে স্তব্ধতা নেমে আসে—

ডাক্তার বোসের কালো বুইকখানাও এসে দাঁড়াল ওদের গেটের সামনে দেখতে পায় মেখলা। কার মুখে শুনতে পায় ওরা, খবর এনেছে অনিমেষ—ডাক্তার অনঙ্গমোহনকে না কি শেষ জবাব দিয়েছেন, অর্থাৎ আজই কিংবা এক মাসই হোক আর মাত্র জমিদারের জীবনের মেয়াদ।

খদ্দেরকে—জামা মুড়ে দিতে গিয়েই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল অনিমেষের।

—অতি গরীব ঘরের পরমাসুন্দরী মেয়ে চাই। পাত্র লক্ষপতির একমাত্র সন্তান—কোন দাবী-দাওয়া নেই—জমিদার, রায়গড়, ২৪ পরগণা।

গরীব ঘর? সুন্দরী মেয়ে? বিড়বিড় করল অনিমেষ। লক্ষপতি?—ফুটন্ত ফুলের মতো একখানি মুখ অনিমেষের কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে ভেসে উঠছে। বাতাসে ফিস্ফিস্ করছে ছোট্ট একটি ডাক—'অনিমেষদা'। কিন্তু—দেখবে না কি অনিমেষ একবার চেষ্টা করে? তারপর ও চলে যাবে অনেক-অনেক দূরে! আর দাঁড়াবে না অনিমেষ মেখলার কাছে হাত পেতে একটু আগুন, একটু হাসির জন্যে। কাউকে জানাবে না—কাউকে দেখাবে না ওর রক্তমঞ্জুষায় সঞ্চিত রক্ত আর হতভাগ্য জীবনটার চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ছোট একটা দুরাশা।

অনেকগুলো খদ্দের উত্তর না পেয়ে অবাক হয়ে গাল দিয়ে চলে গেল। মাথার চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরলো অনিমেষ—হ্যাঁ, সেই ভালো, সেই ভালো।

সত্যিই একদিন বিজ্ঞাপনটা হাতে নিয়ে অনিমেষ 'রায় ক্যাসেলের' সামনে এসে দাঁড়াল। আবার কি মনে করে ফিরে গেল সরু গলিটার মোড়ে। কোমরে ঘুন্সি বাঁধা দু'টো ছেলে গলির মোড়ে গুলি খেলছিলো। পা দিয়ে একটার গুলিটায় স্যুট্ মারলো, খানিকটা ছটফট করলো। পকেটের মধ্যে কি একটা জিনিষ মুঠো করে চেপে ধরলো। তারপর আবার ফিরে এলো। এসে 'রায় ক্যাসেলেই' ঢুকে পড়লো এবং দারোয়ান ম্যানেজারের অনেকগুলো দরজা পার হয়ে একটা চাকর সঙ্গে করে মাঈজীর সঙ্গে দেখা করবার হুকুমনামা যখন পেলো, তখন অভুক্ত অনিমেষের বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গেছে।

সুমিত্রর দূরসম্পর্কের পিসীমা গম্ভীরমুখে এসে দাঁড়ালেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো অনিমেষ! বললে বড় বংশের সুন্দরী মেয়ে—ঝড়ে উড়ে এসে পড়েছিলো। ছোট্ট মেয়েটার গলায় সোনার সরু চেনের সঙ্গে গাঁথা একটা লকেট ছিলো। তাতে ছিলো এক ভদ্রলোকের আবক্ষ ফটো আর ফটোর পেছনে ছোট্ট করে লেখা মেয়েটার পিতৃ-পরিচয়। অমলাঠাকরুণ মরবার সময় গোপনে সেটা অনিমেষের হাতে দিয়ে যান। যখের মতোই এতদিন সেটা রেখেছিলো অনিমেষ। আজ·····

পকেট থেকে সাদা কাগজে মোড়া একটা সরু চেনের সঙ্গে গাঁথা একটা লকেট বার করলো অনিমেষ। মুহূর্তের জন্যে ওর হাতের মুঠিটা একবার বিদ্রোহ করলো। শক্ত হয়ে উঠলো মুখের পেশীগুলো। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করলো অনিমেষ। তারপর লকেটটা পিসীমার হাতে তুলে দিয়ে 'রায় ক্যাসেল' থেকে বেরিয়ে এলো—পৃথিবীর সমস্ত রক্তটা যেন নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে। মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা ওকে যেন বিচূর্ণ করতে চাইছে।

তারপর একদিন ব্যারাকটার সমস্ত হাওয়াটাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দাসীকে সঙ্গে করে পিসীমা নাক কুঁচকে সরু গলিটুকু পায়ে হেঁটেই এলেন আর মেখলার সমস্ত চেতনাকে স্তব্ধ করে দিয়ে হাতের হীরের আংটিটা খুলে মেখলাকে আশীর্বাদ করেও গেলেন।

শুধু দু'টি শাঁখ, শুধু দু'টি মালা, অভ্যর্থনা করলো সুমিত্রকে।

গোটা কতক গ্যাস আর খানিকটা কোলাহল। তারপর আচ্ছাদনীর নীচে ফুটে উঠলো সেই দু'টি চোখ—আবিল আর উদাস!—

—মালা বদল করো, মালা বদল করো, মেখলা—পিঁড়ির কাছ থেকে কে বললে। নিঃশব্দ আনন্দে আবিষ্ট চেতনায় মালাখানি তুলে দিলো মেখলা সুমিত্রর গলায়।

বরযাত্রী কেউ আসে নি। অভিভাবক হয়ে এসেছেন বরের পিসতুতো ভাই। তিনিই বলে পাঠান জমিদারের অসুখের জন্তে সুমিত্রর মন খারাপ। বরকে যেন কোন রকম বিরক্ত করা না হয়। একদম কথা বলানো যেন না হয়, সুমিত্রর মাথা ধরেছে।—না, অতখানি স্পর্ধা নেই এই ছোট ঘরখানিতে কারো। বরের সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিলো সেই বর-কনেকে উঠিয়ে বসিয়ে জলখাবার খাইয়ে চলে যায়। তাই আর দোষ অপরাধ ঢাকবার কড়ি নিয়ে কেউ বসে না। এর ওর মুখে মিষ্টি খাইয়ে নতুন জীবনের অনাগত দিনগুলোকে মিষ্টি করবার চেষ্টাও কেউ করে না। একলাই বাসর জাগে স্তিমিত আলোটা···

গম্ভীর সুমিত্র ঘুমোয় কি না বোঝা যায় না। জড়সড় মেখলা একপাশে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরের বাতাসে এলো বিদায় লগ্ন·····এলো বিনা আড়ম্বরে অনঙ্গমোহনের স্টুডিবেকার। বর-কনেকে নিয়ে গলিটুকু হেঁটেই স্টুডিবেকারে উঠলেন সুমিত্রর দূরসম্পর্কের পিসতুতো ভাই। খানিকটা ঘুরে এসে দাঁড়ালো স্টুডিবেকার অনঙ্গমোহনের প্রাসাদে।

জমিদার মৃত্যুশয্যায় তাই সানাই গাইলো না মেখলার আগমনী। একটা শাঁখও কেউ জোরে বাজালো না। সুমিত্রর দূরসম্পর্কের পিসতুতো বৌদি বরণ করলেন মেখলাকে। শান্ত, স্তিমিতভাবেই অনুষ্ঠানটুক সারা হ'লো। তারপর মেখলাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো জমিদার অনঙ্গমোহনের ঘরে।

—মৃত্যুর ইসারায় নিস্তব্ধ ঘর।···খসখসে ভেজা মৃদু গন্ধ হাল্কা অন্ধকারের সঙ্গে শিলিং ফ্যানটার ফিসফিসানি···মেহগ্নি পালঙ্কে শুভ্র বিছানায় শায়িত জমিদার—সুগৌর বর্ণ রোগে ভুগে ম্লান। দীর্ঘনাসা, স্বল্প রজত-শুভ্র কেশে অনেক অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর।

মেখলা মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে অনঙ্গমোহনের পাশে বসল।

চোখ মেললেন অনঙ্গমোহন। মেখলার চন্দনচর্চিত মুখের দিকে চেয়ে যেন একটু চমকে উঠলেন। চোখের দৃষ্টিতে ফুটলো মুগ্ধ বিস্ময়। তারপরই কিসের একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা শীর্ণ বলিরেখাঙ্কিত মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

অনঙ্গমোহনের ইসারায় বালিশের পাশ থেকে মুক্তোর নেকলেস নিয়ে এক আত্মীয়া মেখলার গলায় প'রিয়ে দিলেন। তারপর মেখলাকে সেখান থেকে স'রিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

ঝকঝক করছে মার্বেল ফ্লোর—ঝকঝক করছে দেওয়ালের প্লাষ্টিক পেন্ট। সিঁড়ির বাঁকে অজন্তার মেয়ের ছন্দিত ভঙ্গী। লিভিং-এর দেয়ালে আলোর ফ্যাসান। বড় বড় আয়নার শুধু ঐশ্বর্যের প্রতিবিম্ব।

চাকর দাসী সসম্ভ্রম তটস্থতায় সরে সরে যাচ্ছে—

একটা ডিভানের উপর বসে আছে মেখলা। সামনের আয়নাটায় ওর চোখ পড়ল। হীরে মুক্তো আর সোনালী বেনারসীর ঝলমলানি—রাজেন্দ্রাণীর মতো অনিন্দ্য রূপ! নিজেকেই যেন আর চিনতে পারছে না মেখলা, চিনতে পারছে না ব্যারাকবাড়ির সেই মেয়েটাকে—অন্ধকার স্তব্ধ রাতে যে স্বপ্নের মধ্যে ও দেখতো নীলাভ আলোয় এক সুন্দর পুরুষকে—উদাস আর আবিল যার চোখ।

অনিমেষদা'! কে অনিমেষদা'? ও হ্যাঁ, এবার ও চাকরী পাইয়ে দেবে অনিমেষকে রায়গড়ের স্টেটেই—সাহায্য পাঠাবে মালতীর পঙ্গু স্বামীকে—সেনগিন্নীর বাতের ওষুধ পাঠিয়ে দেবে—মাসোহারা দেবে বুড়ি ঠানদিকে।···এখন সব পারে···সব পারে মেখলা। কিন্তু সমস্ত প্রাসাদ যেন একটা চাপা মর্মন্তুদ বেদনায় স্তব্ধ হয়ে আছে। বোবা মুখে ঘোরা ফেরা করছে লোকজন। নেই কোথাও আনন্দের মুখরতা। খালি একটা ফিস্ ফিস্—হিস্ হিস্ গুঞ্জন! হয় তো জমিদার মৃত্যুশয্যায় তাই।

আত্মীয় যাঁরা বিয়েতে দু'তিন জন এসেছেন তাঁরা ফুলশয্যার পরদিন চলে যাবেন। মেখলার হাতে চাবি তুলে দিয়ে পিসীমাও চলে যাবেন পুত্রবধূর কাছে। একটা বুকচাপা বিষণ্ণতায় গুমরে উঠছে মেখলার সমস্ত মন। বরণের পর থেকে সুমিত্রকেও ও আর দেখে নি। মার্বেল ফ্লোর পায়ের তলায় পিছলে যাচ্ছে। উজ্জ্বল আলোর নীচে ঝলমল করছে মেখলার বেনারসী—গায়ের গয়না। তবুও কেমন যেন আর ভাল লাগছে না মেখলার এসব। সেই বোবা কান্নাটা গলার কাছে এসে আবার থমকে রয়েছে।·····

···ফুলশয্যার মধুলগ্ন।···আকাশের বুক থেকে রূপালী স্বর্ণ ছড়িয়ে পড়ছে 'রায় ক্যাসেলের' ছোট্ট একটুকরো ফুল-বাগিচায়·····

মেখলাকে বসিয়ে রেখে বৌদি বিদায় নিলেন। কেমন একটা চাপা কান্না বোজা নিস্পন্দ গলায় বললেন, কেউ আড়ি পাতবে না ভাই, চললাম।

—সেই ঘর! যে ঘরে নীল আলো জ্বলে আর যে ঘরের জানলায় কাঁপে নীল লেসের পর্দা।···ঘরটার সামনেই একটুকরো খোলা বারান্দা—সেখানে এরেকা পামের টবগুলো সারি সারি রাখা। সারা ঘরে ফুলের স্তবকে স্তবকে সাজান বিচিত্র ডিজাইনের ঝকঝকে খাট—রেশমের বিছানায় ফুল ছড়ানো—মাথার বালিশে দু'টি মালা পাশাপাশি রাখা—দামী বিলিতী সেন্ট আর দিশী ফুলের গন্ধে মেখলার কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে মাথাটা।

স্বপ্ন দেখছে নাকি মেখলা?

বুড়ো ঠানদি,···

ছেঁড়া বিছানা··

অন্ধকারে ডোবা খানিকটা রাতে?···

না, ওই তো, সোফার ওপরে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে সুমিত্র। কোঁচানো শান্তিপুরের ধুতির কোঁচাটা পার্শীয়ান কার্পেটের ওপর লুটোচ্ছে। সূক্ষ্ম পাঞ্জাবীর ভেতর দিয়ে ঋজু সুগঠিত অঙ্গের তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা ফুটে বেরোচ্ছে···স্তব্ধ আর গম্ভীর।

কেন? শিকারী জমিদারের নিষ্ঠুর খেয়ালেই মেখলার এ ঘরে ঢোকবার স্পর্ধা হয়েছে—সেই কথাই কি ভাবছে সুমিত্র? না, মেখলাকে ওর পছন্দ হয় নি? কিংবা মৃত্যুকল্প জমিদারের অসুখের

জন্তেই ও এমন বিষণ্ণ গম্ভীর ? তাকিয়েও দেখছে না একবার যে ওরই সামনের বড় আয়নাটায় সিল্কের শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ঝলমল করছে মেখলার যৌবনোচ্ছল রূপ। কালো কবরীতে জড়ানো বেলের কুঁড়ির মালা, গন্ধ ছড়াচ্ছে আর ভ্রমরের পাখার মতো খুশির ভারে কাঁপছে ডাগর দু'টি চোখের পাতা।

—রাত ঘন হয়ে আসে···

প্রতীক্ষাক্লান্ত দামী ঘড়িটা মুহূর্ত গুণে গুণে চলে।

সুমিত্রর মাথাটা সোফার পিঠের ওপর হেলানো—ঘুমোচ্ছে না ভাবছে বোঝা যাচ্ছে না।

···দূরে কাদের বাড়ির পোষা পাপিয়াটা থেকে থেকে চিৎকার করছে—'পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল মেখলা। জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। নিঝুম নিস্তব্ধ চারিদিক। এই মুহূর্তে ওর মনে হ'লো ও আর পাপিয়াটা ছাড়া বুঝি আর এ রাতে কেউ জেগে নেই। একটুক্ষণ কি ভাবলো মেখলা। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে সুমিত্রর পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলো।

* * *

নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো মেখলা···

খোঁপার বাসি মালাটা খুলে ছুঁড়ে পাম গাছটার ওপর ফেলে দিয়ে মেখলারই কান্নাঝরা চোখের মতো লাল আকাশটার দিকে সারা রাতের কান্না-ভেজা চোখ রেখে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মেখলা···সুমিত্র মূক!···সুমিত্র জড়!!···

বারো ঘণ্টা

শ্রীনন্দা কর

অবনীশ চলে গেল।

সুনীতা জানে ও আর কোনদিন এখানে আসবে না।

বিছানার উপর বালিসে তার কনুই চেপে বসার দাগ। আর জলের গেলাসে সিগারেটের ছাই। চায়ের কাপ-এ ট্রেনের টিকিট। বাসের টিকিট। আধপোড়া সিগারেটের টুকরো। টেবিলের উপরকার বই-খাতা এদিক-সেদিক ছড়ান।

ঝি চলে যাবার পরে সুনীতা আবার চুপি চুপি এ ঘরে এসে বসেছে। ঝিকে এ ঘর ঝাঁট ও দিতে দেয় নি। কেন দেয় নি তা ও নিজেও জানে না বোধ হয় ভাল করে।

বালিসের উপর কনুই চেপে বসার দাগ ও ধরে রাখতে পারে নি। তারা কখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়েছে। যেমন ধরে রাখতে পারে নি সকালবেলাকার সেই হঠাৎ চমকে যাওয়া মুহূর্তগুলোকে। কিন্তু

চায়ের কাপের আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, বাসের টিকিট তাদেরও যেতে দেবে না। দিতে পারে না! ধরে রাখবে সে যেমন করেই হোক্।

একটা অন্ধ বোবা ব্যথায় আদিম প্রবৃত্তির বশেই ও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আর সেই সঙ্গে সেই অসহ্য ব্যথার উৎসের কাছেও নিজেকে নিয়ে এসেছে অজ্ঞাতসারে। ব্যথাটাকে বুকের ভিতরে আরো ভাল করে লালন করে তাকে আরো তীব্রভাবে অনুভব করার জন্ত।

কিন্তু সত্যিই কি অবনীশ এসেছিল? বসেছিল ঐখানে ঐ গেরুয়া শান্তিনিকেতনী চাদর ঢাকা বিছানায় বালিসে হেলান দিয়ে। আর দীর্ঘ বারো বছর পরে আজ হঠাৎ তার কুমারী মনটার সব শান্তি, সব স্থৈর্য একপলকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তচ্‌নচ্‌ করে চলে গেল ধূমকেতুর মতন।—না সবই তার কল্পনা। যৌবন সীমান্তে এসে অলস মনের বিলাসমাত্র।

তাই বা কেমন করে হবে। এ তো সাক্ষী রয়েছে তার টেবিলের উপরে, বিছানায়, মেঝেতে ছড়ান।

সুনীতা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। যাকে ভুলবার সাধনায় তার জীবনের এতগুলি বছর পার হয়ে গেল সে সামনে এসে দাঁড়ানমাত্রই কি তার এতদিনের সাজান পৃথিবী যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেল। এতখানি সময়ের সিঁড়ি পার হয়ে এসে এতো সাধনা, এত কৃচ্ছ্রসাধন সবই কি বৃথা হল শেষ পর্যন্ত? কিছুরই কি কিছু মূল্য নেই?

সেই সে কবে অবনীশের সংগে প্রথম আলাপ হল দিদির বিয়ের সময়। তারপর কত কিছু পার হয়ে গেল। কত ঢেউ এল। কত ঢেউ গেল। সেদিনের বেণী দোলান ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী সুনীতা সান্যাল আজ সোনাপুকুর গার্লস্ স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিস্ সান্যাল।

এখন মিস সান্যালের নামে সবাই ভয় পায়। কিন্তু সেও তো একদিন ছেলেমানুষ ছিল ক্লাস টেনের বেঞ্চে বসে থাকা বেণী দোলান মেয়েগুলির মত! কোথায় গেল সেই সব দিনগুলো? তারা কি একেবারেই হারিয়ে গেল! ফুরিয়ে গেল।

কত বছর আগেকার কথা। কিন্তু আজো মনে হয় যেন সেদিনের কথা। সেদিন প্রথম আলাপ হল ওর সংগে অবনীশের।

মনে পড়ে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির সেই এক চিলতে ছাদ। মাটির টবে রজনীগন্ধা যুঁই বেল আরো কত কি। মনে পড়ে সেই ছাদের উপরে মাদুর পেতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প, যে গল্পের শেষ নেই, সুরু আছে।

তারপর বাবা মারা গেলেন করোনারী থম্বোসিসে। আধঘন্টার মধ্যে একটা সুখী-তৃপ্ত পরিবার যেন সেই আকস্মিক আঘাতে জমে পাথর হয়ে গেল। মা বাতে শয্যাশায়ী হলেন, সংসারের যাঁতা পিষে কেমন এক সতেরো বছরের কিশোরীকে। ছোট ছোট বোনেদের একে একে ভাল ঘরে বিয়ে হল, ছোট ভাইয়ের পড়া শেষ হল। তারপর একদিন সে বিয়ে করেও নিয়ে এল তারই এক সহপাঠিনীকে। মাঝখানে কয়টা বছর কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল সে টেরও পেল না। একদিন হঠাৎ সুনীতা আবিষ্কার করল তার সংসারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কোথাও আর তাকে দরকার নেই, সব জায়গাতেই সে অবাঞ্ছিত অনাবশ্যক। সরকারী অফিসের কাজ ছেড়ে সুনীতা চলে এল এই মফস্বল শহরের ছোট মেয়েস্কুলে, সেও কত বছর হয়ে গেল। তারই প্রাণঢালা চেষ্টায় সোনাপুকুর গার্লস স্কুল ছোট জুনিয়র হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী হয়েছে। এ তল্লাটে সকলেই তার স্কুলের নাম করে এবং সেই সঙ্গে তারও, কিন্তু এই কি সব? শুধু এই কি সে চেয়েছিল?—ভগবান জানেন এক এক সময় সে কত শ্রান্ত, কত ব্যর্থ মনে করে নিজেকে।

আরো মনে পড়ে সেইদিনটির কথা। যেদিন বাড়ির সকলে গিয়েছিল খিদিরপুরে খুড়তুতো দিদির ছেলের অন্নপ্রাশনে, ওর শরীর ভাল ছিল না বলে ও যায় নি। বাচ্চা চাকর রাস্তু গলির অন্ত ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল খেলতে ব্যস্ত। ও উপুড় হয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিল। বই পড়তে পড়তে ওর তন্দ্রার মত এসে গিয়েছিল। কতক্ষণ পরে কে জানে, আচমকা ঘুম ভেঙ্গে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে অবনীশ। তারপর, তারপর আর কিছু মনে নেই। সব ঝাপসা হয়ে গেছে। কেমন করে কতকগুলো ঘটনা সেদিন পর পর ঘটে গিয়েছিল। তারপর বারো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল।

সেদিনের বেকার বেপরোয়া দুঃসাহসী অবনীশ বোস আজ নামকরা কলেজের প্রফেসর। আর সেই লাজুক ভীরু মেয়েটি? সে কোথায়? সে মরে গেছে।—একেবারেই কি মরে গেছে? ঐ তো সামনের হাত-আয়নাতে একটা ছায়া পড়েছে একটি মুখের। ঈষৎ স্থূল ভারি শরীর, কিছু দাম্ভিক চাপা ঠোঁট কিন্তু চোখের কোণে সঞ্চিত অনেক ক্লান্তি। ওকেই তো সে চেনে। ওকেই তো সে জানে। সে তো কল্পনা করতে পারে না দুই বিনুনী দোলানো মিলুকে।

এখন হেডমিস্ট্রেস মিস্ সান্যালের নাম সবাই জানে। সবাই তাকে ভয় পায়। মেয়েদের তো কথাই নেই। সহকর্মীরা পর্যন্ত তাকে এড়িয়ে চলে। সে স্পষ্টই বুঝতে পারে, সে সামনে এসে পড়লে তাদের কলগুঞ্জন যায় থেমে এক নিমেষে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন তারও তো এক এক সময় ইচ্ছা করে ওদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে, গল্প করতে। কোন কোন দিন সে গিয়েছেও কমনরুমে। এককাপ চা কি খবরের কাগজটা হাতে করে বলতে চেয়েছে হাল্কা এলোমেলো খুচরো দু'টি-একটি কথা! কিন্তু সবাই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তারপর আবার যখন ও নিজের কুঠুরীতে নিজের চেয়ারখানিতে এসে বসেছে তখন ও অনুভব করেছে সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। আর ও যেন হাঁফ ছেড়েছে। কূয়োর ব্যাং আবার কূয়োয় ফিরে এসেছে।

বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ততায়। স্কুল আর কোয়ার্টার। কোয়ার্টার আর স্কুল। ছুটিছাটাতেও সুনীতা আজকাল আর বাড়ি যায় না। কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে?

ছোট ভাই-বোনেদের বিয়ে হয়েছে অনেক দিন। তারা যে যার মত সংসার পাতিয়ে বসেছে। তাকে তাদের প্রয়োজন আর নেই। তারও ঐসব ছেলেপুলের লোকজনের ভিড় ঝামেলা ভাল লাগে না। এখানে সে বেশ আছে। অন্তত বেশ ছিল সে—আজ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

অবনীশ বোস, সুকীয়া ষ্ট্রীটের তিনতলার ছাদের মাটির টবে রজনীগন্ধা, বেলফুলের ঝাড় সবই সে ভুলে গিয়েছিল। কারণ,

ভুলবার সাধনাতে তার গত বারোটা বছর কেটেছে। আশা ছিল আরও বারো বছর পরে ও একেবারেই ভুলে যেত—যদি না আজ সকালে ধূমকেতুর মত অবনীশ এসে হাজির হত।

অবনীশের গলা শুনে চিনতে পেরেছিল বাথরুমের মধ্যে থেকেই। সুনীতা বুকে একটা হাত চেপে দাঁড়িয়েছিল। ও বুঝতে পারছিল না হঠাৎ যেন কেমন ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই ও নিজের চারিদিকে শামুকের মত একটা খোলস তৈরি করছিল। সময়ও নিচ্ছিল ও। ভাবছিল—যদি অবনীশ ওকে খোঁচা দেয় সেও ছেড়ে কথা কইবে না।

কিন্তু অবনীশ পুরণো কথা তুলে কিছুই বললো না, এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললো, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল সুনীতা।—যেন কালই ওর সঙ্গে অবনীশের দেখা হয়েছে এমনি করে। তারপর ওকে এতটুকু ভাববার বা নিজেকে তৈরি হবার সময় না দিয়ে বললো—অনেক দিনই তো কাটলো এমনি করে? আর কতদিন এমনি করে সময় নষ্ট আর নিজেকে নষ্ট করবে? ভুল বোঝাবুঝি আর মান-অভিমানের পালা কি এতদিনেও শেষ হল না?

ও শুনছিলো আর একটু একটু করে পাথর হচ্ছিলো।

শুনলো অবনীশ বলছে,—এখন চাকরী করি রাজস্থানের এক কলেজে। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় এসেছি। তোমার খোঁজ পেতেই দু'দিন কেটে গেল। যদি রাজী থাকো—থাকা না-থাকার কথাই বা ওঠে কেন?—সবকিছু চটপট গোছগাছ করে নাও?—তারপর রাজস্থান থেকেই তোমার স্কুলে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিও। সুনীতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো! বিয়ে—সংসার। এই বয়সে ও আবার সংসার করবে নতুন করে? যখন তার প্রথম ছাত্রীরা তাদের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে নিয়ে আসে, তার কাছে বসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, বড়দিদিমণি—তাদের সকলের শ্রদ্ধার আসন ধুলোয় লুটিয়ে দেবে ও? ওরা হাসবে টিটকিরি করবে। গা টেপাটিপি করে নিজেদের মধ্যে কতকিছু বলবে। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! তা সে কিছুতেই পারবে না, না না কিছুতেই না! ও বিহ্বল শূন্যদৃষ্টিতে অবনীশের দিকে তাকিয়ে রইলো। অবনীশ কিছুটা কৌতূহলী আর কিছুটা বুঝি বিরক্ত হয়ে ওর কাছে এসে কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কি হল তোমার, কথা বলছো না কেন? সুনীতার এক মুহূর্ত মনে পড়ে গিয়েছিল—সেই সন্ধ্যাবেলাটির কথা। ও যেন চোখে দেখার চেয়ে অনুভব করেছিল অবনীশের ফর্সা চওড়া কব্জিতে লাল হয়ে ফুলে ওঠা একটা ক্ষতচিহ্ন। সে ক্ষতচিহ্ন ওর দাঁতের দাগ।

সুনীতা অবনীশের হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর অবনীশের চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললো, তা আর হয় না অবনীশ।

অবনীশ বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলো—কেন হয় না কেন. না হবার কি আছে?

সুনীতা অবনীশের চোখের দিকে চেয়ে বললো, তোমার প্রস্তাব যে কতটা হাস্যকর তা কি বুঝছো না?

অবনীশ বিছানার থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দু'টো জ্বলে উঠেছিল। তারপর আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো—হাস্যকর?—ও আচ্ছা। আচ্ছা, চলি তাহলে। বিরক্ত করলাম এসে, মনে কিছু কোর না। বলেই এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে চলে গেল।

তারপর বহুক্ষণ কেটে গেছে। তখন ছিল সকাল সাড়ে আটটা। এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল। শীতকাল। যদিও ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা মাত্র। বাইরে রাত্রির অন্ধকার। বাইরে থেকে বিন্দু বিন্দু অন্ধকার ওকে গ্রাস করেছে। ঘরে আলো জ্বলে নি। ঝি দু' একবার ভয়ে ভয়ে ডেকে চলে গেছে। আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শুধু সাদা শাড়ির ঈষৎ ঝাপসা ঝলকানি। কোয়ার্টারে আর কেউ নেই সবাই চলে গেছে। হয় বেড়াচ্ছে, নয় গল্প করছে। হাসছে। আনন্দ করছে প্রিয়জনদের সঙ্গে। আজকের দিনে কেউ ঘরের কোণে বসে নেই তার মত।

ও কি কিছু ভাবছে? বোধ হয়—না। ওর ভাববার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। মাথাটা সীসের মত ভারি হয়ে গেছে। একটা ভোঁতা ব্যথা থেকে থেকে চাড়া দিয়ে উঠছে—রগের দুই পাশে, তলপেটের নীচে।

দূরে ট্রেনের সিগন্যাল দেওয়ার ক্ষীণ আর্তনাদে সুনীতা একসময় সোজা হয়ে বসলো। যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা তুলে নিল। রেডিয়াম ডায়াল ঝকঝক করে উঠলো অন্ধকারে। কিন্তু প্রায় দু'তিন মিনিট লাগলো ওর ঘড়ির কাঁটার সঙ্কেতের অর্থটা বুঝতে। আটটা পঁয়ত্রিশ। অবনীশের আসার পরে বারো ঘণ্টা কেটে গেছে।

মাথার কাছ থেকে ছোট্ট সুটকেশটা টেনে এনে নোট, খুচরো-খাচরা যা পেল হাত-ব্যাগটায় পুরলো। কিছু কিছু টাকা-পয়সা বিছানার উপর ছড়িয়ে পড়লো। সুটকেশের ডালাটা খোলাই রইল। অভ্যাসমত ঘড়িটা পরতে যাচ্ছিল, কি ভেবে আবার নামিয়ে রাখলো, তারপর উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে উঠলো আর পেটের ব্যথাটা বোবা যন্ত্রণায় ওকে আচ্ছন্ন করে দিল কিছুক্ষণের জন্য। ওর মনে পড়লো—আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নি। এক মুহূর্তের জন্যে চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো—এই বারো বছর ধরে ও যা সঞ্চয় করেছে—সংগ্রহ করেছে। ছোট কাচের আলমারি। সেলাই কল। বইয়ের তাকে সারি সারি ঝকঝকে নতুন বই। তারপর অন্ধকারে পা বাড়ালো।

দারাশিকোর কান্দাহার অভিযান

অসিতরঞ্জন ঘোষ

মুঘল যুগের অনেক ছোটবড় সামরিক অভিযানের কথা আমরা পড়েছি, কিন্তু শাজাহান পুত্র দারাশিকোর ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার অভিযানের কথা পড়লেও তার ভেতরের রহস্য অনেকেই জানে না। কান্দাহার দিল্লী সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমান্তস্থিত একটি প্রদেশ। এই কান্দাহারকে কেন্দ্র করে ভারত এবং পারস্যের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বিরোধ ছিল। আকবরের রাজত্বের সুরুতেই গোলযোগের সুযোগে পারস্যরাজ কান্দাহার পুনরুদ্ধার করলেন। কিন্তু সাঁইত্রিশ বছর পর আকবর আবার কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যরাজ শাহ-আব্বাস মুঘলদের কাছ থেকে কান্দাহার প্রদেশ ছিনিয়ে নিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আলীমর্দন নামক পারস্য রাজের জনৈক বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর সাহায্যে শাজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু এগারো বছর পরেই ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ আবার কান্দাহার পুনরধিকার করেন। শাজাহান পুনরায় কান্দাহার পুনরধিকারের জন্য ক্রমান্বয়ে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেও ব্যর্থ হলেন। এই তিনটি অভিযানের শেষ অভিযানটির নায়ক ছিলেন দারাশিকো। দারার এই অভিযানের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী অতিশয় বিচিত্র এবং বর্তমান প্রবন্ধে তারই উল্লেখ করবো।

দারা এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের দায়িত্ব কেন নিয়েছিলেন তা বলা প্রয়োজন। তাঁর এই সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সামরিক খ্যাতি অর্জন করা, যা এতকাল তাঁর ভাগ্যে জোটে নি, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ঔরঙ্গজেব ও সাদুল্লার (শাজাহানের প্রধানমন্ত্রী) চেয়ে তিনি যে অনেক বেশি সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন, সেটা প্রমাণ করা এবং সবশেষে সাম্রাজ্যের সামরিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, কান্দাহারের বিরুদ্ধে প্রেরিত প্রথম দু'টি অভিযানের নেতৃত্ব করেন ঔরঙ্গজেব ও মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ। ঔরঙ্গজেব এবং সাদুল্লার ব্যর্থতাই দারাকে শেষ অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। তিনি পিতাকে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি সপ্তাহকালের মধ্যে কান্দাহার মুঘলসাম্রাজ্যভুক্ত করবেন। যাই হোক, তৃতীয় কান্দাহার অভিযানের নায়ক দারা হয়েছেন শুনে রাজ্যের সমস্ত লোক একেবারে হতবাক। সত্যই অবাক হবারই কথা, দেশের লোক তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথাই জানে সামরিক নিপুণতার কথা এতকাল তো তারা শোনে নি। দেশের লোকের আস্থা না থাকলে কি হবে, দারার নিজের উপর পুরো আস্থা ছিল এবং তিনিই একমাত্র তাঁর সামরিক প্রতিভার সব থেকে বড় সমঝদার ছিলেন।

যাই হোক ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর দারা সসৈন্যে কাবুলের পথে চললেন। এই অভিযানে শাজাহান তাঁর প্রিয় পুত্রের সঙ্গে সে যুগের প্রায় সমস্ত বিচক্ষণ সেনাপতিদের পাঠিয়েছিলেন, এছাড়া নানা ধরণের প্রচুর সৈন্য দারার সঙ্গে গিয়েছিল। এনায়েৎ খানের শাজাহান নামায় এই অভিযানে দারার সামরিক বাহিনীর যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে আমরা তা উল্লেখ করবো না। দারার সৈন্যদলে শুধু যুদ্ধ করনে-ওয়ালা সৈন্যরাই ছিল না, বেশ কিছুসংখ্যক ফকির, সাধু এবং যাদুকরও স্থান পেয়েছিল। উদ্দেশ্য হল এইসব সাধু ফকিররা তাদের অলৌকিক ভোজবাজির সাহায্যে দুর্ভেদ্য কান্দাহার দুর্গের পতন ঘটাবে। দারা পার্থিব শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির উপর অধিক আস্থাবান ছিলেন, তাই এই সমস্ত সাধু-ফকিরদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপই হ'ল অভিযানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্র তাঁর কাছে। এবার আমরা ফকির, সাধু ও যাদুকরদের বিচিত্র ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করবো।

দারা তখন কাবুলে, যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চলেছে। এমন সময় দু'জন ফকির এসে দারার কক্ষে প্রবেশ করলো এবং সংগে সংগে তারা নিজেদের অদ্ভুত আলখাল্লার মধ্যে মাথা লুকিয়ে ঘাপটি মেরে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলো, তারপর সহসা মাথা তুলে একজন বলল, 'আমি এখন ইরাণের সব ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। পারস্যের শাহ (রাজা) এখন 'মৃত' সংগে সংগে দ্বিতীয় ফকিরটিও বলে উঠলো, 'আমিও তাই দেখছি। কিন্তু শাহের কফিন মাটিতে চাপা পড়ার আগে আমি সেখান থেকে ফিরবো না।'

এবার যুবরাজের পালা—এইকথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'আমিও ঐ একই স্বপ্ন দেখেছি, আমাকে এক সপ্তাহের বেশি কান্দাহারে থাকতে হবে না।' কারণ, যুবরাজ স্থির জানেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই কান্দাহারের পতন হবেই।

ইতিমধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। যুবরাজ স্থির করলেন—দুর্ভেদ্য কান্দাহার দুর্গ কিভাবে জয় করা যায়, তার একটা মহড়া দেওয়া উচিত। এই বিবেচনা করে লাহোরে কান্দাহার দুর্গের অনুকরণে একটি ছোট্ট কৃত্রিম দুর্গ তৈরির আদেশ দিলেন। তারপর নির্ধারিত দিনে অভিজ্ঞ সৈন্যরা যুবরাজের নির্দেশমত কৃত্রিম দুর্গ

ধ্বংস করে ফেলল—এই জয়কে 'দারাশিকোর প্রথম জয়লাভ' বলে যুবরাজের আদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

যাই হোক এইভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে জ্যোতিষী-নির্ধারিত দিনে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হলেন যুবরাজ সসৈন্যে। অবশেষে বিরাট মুঘল বাহিনী কান্দাহারে উপস্থিত হল। বিভিন্ন বিভাগের সেনাপতিরা পরিখা খনন করে নিজ নিজ সৈন্য সাজিয়ে ফেললেন। কান্দাহার দুর্গের আশেপাশে মুঘলদের ছাউনি পড়ল। এই দুর্ভেদ্য দুর্গটি জয় করতে পারলেই কান্দাহার জয়। চারিদিকে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, কিন্তু মুঘল সৈন্যরা পারসিকদের অতর্কিত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। বিশেষ করে গভীর রাত্রে মুঘল প্রহরীরা যখন ঘুমে ঢুলতো সেই সুযোগে পারসিক সৈন্যরা মুঘল পরিখায় হানা দিয়ে প্রহরীদের মুণ্ড কেটে নিয়ে যেত। এইভাবে এবং দিনের পর দিন যুদ্ধে মুঘলপক্ষে হতাহতের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই যেতে লাগলো। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে যখন কিছুতেই সুবিধা হল না তখন দারা ফকির, যাদুকর এবং সাধুবাবাদের স্মরণাপন্ন হলেন। প্রথমেই ডাক পড়লো ইন্দ্রগির নামে একজন তান্ত্রিক সাধুর। ইন্দ্রগির এযাবৎ দারার মদ-মাংস খুব উড়িয়েছে—দুর্গ সহজে জয় করে দেবে এই আশ্বাসে। ইন্দ্রগির চল্লিশটি অপদেবতার প্রভু। এই চল্লিশটি অপদেবতার সাহায্যে পারসিকদের ভেল্কি দেখিয়ে দেবে এই সর্তে দারার শিবিরে স্থান পেয়েছিল। সংকটমুহূর্তে ইন্দ্রগিরকে দারা বললেন—'তুমি তোমার অপদেবতাদের দিয়ে এই দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীর ভেঙে ফেলার সত্বর ব্যবস্থা কর।'

এই কথা শোনামাত্র ইন্দ্রগির এতটুকু দ্বিধা না করে সোজা হেঁটে চলে গেল দুর্গদ্বারে। সেখানে প্রহরারত রক্ষীদের জানাল যে, সে যুবরাজ দারার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। রক্ষীরা সাধুবাবাকে দুর্গাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে গেলে ইন্দ্রগির তার পরিচয় দিয়ে বলল—'আমি তোমাদের দুর্গের উচ্চ চূড়ায় বসে একছিলেম তামাক খেতে চাই।' অদ্ভুত খেয়াল।

যাই হোক, তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল। সাধুবাবা দুর্গের চূড়ায় বসে মনের সুখে সুখটান দিলেন। এরপর দুর্গের মধ্যে কিছুদিন আরামে কাটালেন। কিছুদিন পর ইন্দ্রগির মুঘল শিবিরে ফিরে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়ায় পারসিকদের মনে সন্দেহ হল। ঠ্যাঙানির গুঁতোয় এবার ইন্দ্রগির তার আসল পরিচয় প্রকাশ করে ফেলল—দুর্গাধ্যক্ষ তখন সাধুকে বলল, 'তুমি এমন যাদু দেখাও যাতে মুঘলরা সত্বর অবরোধ তুলে দেশে ফিরে যায়।'

অনেক চেষ্টা করেও যখন ইন্দ্রগির কোন ভেল্কিই দেখাতে পারলো না, তখন তাকে চ্যাংদোলা করে দুর্গের চূড়া থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আদেশ দিলেন দুর্গাধ্যক্ষ।

ইন্দ্রগির পর্ব শেষ হল, দারা এবার কি করবেন ভাবছেন। ওদিকে যথারীতি অন্যান্য সাধু-ফকির-যাদুকরেরা তাদের কাজ করে চলেছে। কেউ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে চলেছে, কেউ অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলেছে, কেউ বা পারসিকদের খাদ্যের মধ্যে রোগ-জীবাণু সঞ্চারের চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, এমন সময় এক হাজি যাদুকর এসে উপস্থিত হলেন দারার শিবিরে। তিনি যুবরাজকে জানালেন যে, তাঁর যাদুবিদ্যা এবং অলৌকিক মন্ত্রের প্রভাবে প্রতিপক্ষ-দুর্গের কামান বন্দুকগুলিকে ঘন্টা তিনেকের মত অচল করে রাখতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে দারার সৈন্যদের পক্ষে দুর্গ জয় করা খুব সহজসাধ্য।

যুবরাজ তখনই এই হাজির জন্য প্রত্যহ মোটা পারিশ্রমিক এবং বিনামূল্যে আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন, হাজি সাহেব জানালেন যে, যাদুকরী বিদ্যা সম্পন্ন করার জন্য দু'জন নর্তকী, দু'জন জুয়াড়ী, দু'টি চোর, একটি মহিষ, একটি ভেড়া ও পাঁচটি মোরগ চাই। দারার আদেশে তঁাকে সব কিছু দেওয়া হল।

এবার এলেন চল্লিশ জন শিষ্যসহ একজন যোগী এবং কতিপয় দক্ষিণ ভারতীয় সাধু। অলৌকিকভাবে যুদ্ধ জয়ের আশ্বাসের পরিবর্তে সবাই মুঘলশিবিরে স্থান পেল। দক্ষিণ ভারতীয় সাধুরা জানালেন যে, তাঁরা অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা যুবরাজের জন্য একটি উড়োজাহাজ নির্মাণ করে দেবেন, যাতে চড়ে দু'তিন জন লোক হাত-বোমা বহন করে প্রতিপক্ষের দুর্গের মধ্যে ফেলতে পারবে। দারা তখুনি তাঁদের ভাল থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এদিকে পরদিন সেই হাজি সাহেব সেনাপতি জাফরকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দুর্গ জয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে গেলেন। সবাই প্রস্তুত। কিন্তু হাজির দেখা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যের সময় তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন 'আমি মন্ত্রবলে এতক্ষণ শত্রুপক্ষের দুর্গের মধ্যে ছিলাম, আগামী মঙ্গলবার আমি সৈন্যদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করবো, প্রস্তুত থেকো।'

যাই হোক নানারূপ টালবাহানা করে অবশেষে ২৬শে জুলাই (১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ) হাজি সাহেব তাঁর অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করলেন। একটি দীপ প্রজ্বলিত হল—তাতে কিছু মটর নিক্ষিপ্ত হল, এবার

আরম্ভ হল হাজির যাদুকরী নৃত্য। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে হাজি কখনো শূন্যে লাফান, কখনো মাটিতে পড়েন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চললো। নৃত্যশেষে প্রথমে একটি কুকুরকে, তারপর ভেড়া এবং মোরগগুলিকে বলি দেওয়া হল। এবার নর্তকী, জুয়াড়ী এবং চোরদের পালা—এদের বলি দেবার কথা কিন্তু বিকল্পভাবে হাজি সাহেব নিজের জানুদেশের রক্ত নিহত পশুগুলির উপর ছড়িয়ে দিলেন। আবার আরম্ভ হল সেই জাদুকরী নৃত্য। চলল খানিকক্ষণ। নৃত্যশেষে দারার বিচক্ষণ সেনাপতি জাফরের ডাক পড়লো। জাফরকে নিহত পশুদের রক্ত দিয়ে তার তরবারি ধৌত করতে বললেন হাজি। এই রুধিরস্নাত তরবারি লৌহ পর্যন্ত ভেদ করতে পারে আর এই জাদুকরী ক্রিয়া তাকে গোড়ালিহীন অ্যাকিলিজে পরিণত করবে, অর্থাৎ সে অপরাজেয় যোদ্ধা হবে।

পরদিন রাত্রে জাফর দলবল নিয়ে যাদুকরের কাছে গেল; শত্রুশিবির জয়ের আশায়। যাদুকর ঘুম ঘুম চোখ খুলে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তিনটি অপদেবতা শত্রুশিবির পাহারা দিচ্ছে। গত রাত্রে আমার সংগে তাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে এবং তাদের দু'জনকে বন্দী করে ফেলেছি, কিন্তু তৃতীয়টিকে—যেটি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী তাকে বন্দী করতে পারা যায় নি, তাই যতক্ষণ তৃতীয়টি না বন্দী হয়, ততক্ষণ অবরোধ স্থগিত রাখা হল।'

এদিকে পারসিকরা মুঘলদের যাদুর কথা জানতে পেরে সেই যাদু খণ্ডন করার জন্য কুকুর ও মোরগের পেট কেটে তার মধ্যে ভাত ভর্তি করে রাত্রে চুপি চুপি মুঘল পরিখাতে নিক্ষেপ করতে লাগলো—এবার চলল উভয়পক্ষে যাদুযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ এখন বন্ধ।

সেনাপতি জাফর এদিকে নির্দিষ্ট দিনে সাগ্রহে হাজির কাছে গেলেন। হাজি কিন্তু নিরাশ হয়ে বললেন, বন্দী দু'টি ভূতকে মুক্ত না করলে তৃতীয়টি তাঁকে মেরে ফেলতো তাই তিনি সে দু'জনকে মুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব কি আর করা যায় এখন যুদ্ধ জয়ের আশা ত্যাগ করাই ভাল। এই হল দারাশিকোর কান্দাহার অভিযানের আভ্যন্তরীণ রহস্য। এর পরবর্তী ঘটনা অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত। নানাভাবে দুর্গ আক্রমণ করে দারা যখন কিছুই জয় করতে পারলেন না তখন দিল্লী থেকে শাহজাহান দারাকে অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে আসার আদেশ দিলেন। কারণ ইতিমধ্যে প্রচুর অর্থক্ষয় এবং লোকক্ষয় হয়েছে। এই যুদ্ধে মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা বিশেষ করে প্রকাশ পায়।

টীকা ঃ—

I. Qanungo R. K.—Darashikoh

II. M. L. Roychoudhury—State and Religion in Mughal India

III. Warith—Badshah Namah

IV. Inayat Khan—Do

V. Khafi Khan—Muntakhab-Ul-Lubab.

VI. Ishwari Prossad—A Short History of Muslim Rule in India

VII. মাখনলাল রায়চৌধুরী—ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়। (মধ্যযুগ)

যদি না লাগে ভালো

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আমারে না যদি, সখি, লাগে গো ভালো,—
না জাগে কমল চোখে, প্রেমের আলো,
না ঝরে বাণীতে মোর অমিয়ধারা,
হোক্ না হৃদয় মোর, আলোকহারা।

যদি নারিনু করিতে তব, হৃদয় জয়,
যৌবনে নাহি হ'ল কোন সঞ্চয়,—
আমার আঁধার দিক্ আশায় ঘিরে,
হোক্ সমাপন পূজা আঁখির নীরে ;

প্রিয়ে, কোমল তোমার প্রাণে যে দিল ব্যথা,
প্রেমের গরব তার কত যে বৃথা,—
তাই ত' আজিকে মোরে বুঝালে ভালো,
নিভেছে প্রাণের দীপ,—নিভেছে আলো।

আলোকিত উপলক্ষ

সন্তোষ চক্রবর্তী

তোমার সঙ্গীতে আজ নক্ষত্র রঙিন হ'য়ে ওঠে,
হৃদয়ে আশ্বিন নামে অরুণাভ আলোর পাখায় ;
স্মৃতির কোমল তাপে সান্নুনয়ে সূর্যমুখী ফোটে।
আকাশ এ-ঘরে শুধু ফিরে ফিরে নিঃশব্দে তাকায়।

আমার জন্মের বেলা সম্পন্ন। শপথ হয় হীরে ;
কি এক শান্তির পাখি জানালায়, উদার প্রতিমা।
কনকে কাঁকণে ক'নে-দেখা আলো, চতুর্দিক ঘিরে—
আকাশ এ-ঘরে তার বারবার হারাবেই সীমা।

আমরা কান্নার পায়ে নির্মাল্য সাজিয়ে দিই পাছে,
এবং বিশ্বাস চারু সহজিয়া মন্ত্র হয় যদি !
আকাশ এ-ঘরে এসে নীল, নীলকণ্ঠ ; এইখানে
আমার কৃতজ্ঞ চোখ, তুমি এক গীতাঞ্জলি নদী।

আড্ডা

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু আড্ডার সংখ্যাই নয় সেই সঙ্গে আড্ডাবাজ মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে দিনে দিনে। আড্ডার এই জনপ্রিয়তার কারণ কি? কারণ আড্ডায় প্রাণ আছে। আড্ডায় বসে সহজ হওয়া যায়, মন খুলে কথা বলা যায় আর প্রাণখুলে হাসা যায়। আড্ডা কি? আড্ডা আসর নয়, বাসর নয়, জনসভাও নয়। কতকগুলো মানুষের একসঙ্গে বসে জটলা। গাঁজালিও বলতে পারেন তবে আড্ডা জিনিষটা সঠিক কি তা যাঁরা আড্ডা না মেরেছেন তাঁদের বোঝানো শক্ত। কারণ, আড্ডা আড্ডাই কিছু লোকের একত্রে সমাবেশ অবশ্যই। কিছু বলতে তা বলে হাজার নয়, একশোও নয়। মনের মত ক'জনের। তাদের বয়েসের পার্থক্য থাকতে পারে এবং পেশারও। টাকার পার্থক্যেও ক্ষতি নেই। তবে থাকা চাই কিছুটা মনের মিল এবং আড্ডার নেশা। এ দু'টো না হলে আড্ডা তেমন জমবে না। আড্ডার কোনো সময় অসময় নেই, কোনো স্থায়ী জায়গাও নেই। ক'জন এক জায়গায় জমলেই হ'ল। আড্ডার নেশায় আড্ডাবাজেরা এক জায়গায় জমেও ঠিক। আড্ডার জায়গা মাঠ, ময়দান, হোটেল। অনেকের বাড়িতেও প্রত্যহ আড্ডা বসে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মারতে দেখা গেছে। আড্ডার যেমন সময় অসময় নেই, আড্ডায় বসলে তেমনি সময়ের কথাও মনে থাকে না। খাবার কথা মনে থাকে না, বাড়ির কথা, বাজার যাবার কথা। এমন কি নতুন বিয়ে করা বৌয়ের কথাও।

আছে তাসের আড্ডা, দাবার আড্ডা, পাশার আড্ডা, জুয়োর আড্ডা এমন কি মদের আড্ডা। কিন্তু সব আড্ডার আদি ও অকৃত্রিম হ'ল, স্রেফ আড্ডা। আড্ডায় কি কথা হয়? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কথা নেই যা আড্ডায় আসে না। কবে কোন কথা হবে এবং কখন কোন কথা থেকে কোন কথায় মোড় ঘুরবে তা বলা শক্ত। তবে আড্ডায় যা খুশি আলোচনা করা যায় এবং সেই সঙ্গে বলা যায় যা ইচ্ছে। মুখ খারাপ করার এমন জায়গা নেই। মানুষ বাড়িতে আর অফিসে সারাক্ষণ ভদ্র হয়ে মেপে-মেপে ধোপদুরস্ত কথা বলে হাঁপিয়ে ওঠে। তাই আড্ডায় অসভ্য হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আড্ডার গাড্ডায় গিয়ে না পড়তে পারলে তার ভাল লাগে না কিছুতেই। আড্ডায় আলোচনা গুরু থেকে গুরুগম্ভীর হয়, কখনো আবার লঘু থেকে লঘুতর হতে হতে নীচু পর্যায়ে নামে। আড্ডায় জমতে সবাই পারে, কিন্তু আড্ডা জমাতে তা বলে সবাই পারে না। আড্ডা জমাবার বিশেষ গুণ অনেকের থাকে এবং এদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে আড্ডা তেমন জমে না।

আড্ডা নেশার পর্যায়ে পড়লেই সর্বনাশ। তখন একদিন আড্ডা না মারতে পারলে পেটের ভাত হজম হয় না, শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করে এবং মেজাজ থাকে তিরিক্ষে হয়ে। আড্ডার গাড্ডায় পড়ে গোল্লায় গেছে এমন উদাহরণও কম নয়। তবে আড্ডা থেকে অনেক কিছু শোনা যায়, জানা যায়। তাতে উপকারও হয় অনেক সময়। মানুষ অবশ্য আড্ডায় মজে এই জন্যে যে, সেখানে সহজ হওয়া যায়, অসভ্য হওয়া যায়। আড্ডায় কোন কিছুরই লাগাম নেই।

আড্ডার সমালোচনা যতই করুক জ্ঞাতিপক্ষরা, আড্ডা বেড়েছে এবং বাড়ছে। যে দিকেই তাকান, কোথাও না কোথাও কিছু লোক আড্ডা মারছেই। হাটে-মাঠে বাজারে-হোটেলে অফিসে-বাড়িতে। চায়ের কাপ, সিগারেটের ধোঁয়া এবং তুমুল আড্ডা। কোথাও রাজনীতি, কোথাও অর্থনীতি, কোথাও ক্রিকেট, কোথাও সিনেমা ও কোথাও সেক্স। আড্ডা দিচ্ছে বাপেরা, বাপের বাবারা এবং বাপের ছেলেমেয়েরা। কলেজের কমনরুম থেকে পার্কের কোণ, কিছুই খালি নেই। বাড়ি ও পাড়ার মা-মাসি-পিসিরাও আড্ডার আসর বসাচ্ছে দুপুরে। মোট কথা আড্ডা এমন মুখরোচক নেশা যে, এর হাত থেকে নিস্তার নেই কারো। বাচ্চা থেকে বুড়ো, যারা—যখন সময় পাচ্ছে আড্ডা দিয়ে নিচ্ছে। আড্ডার আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে যারা আড্ডা মারছে তাদের ওপর।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আড্ডাই হ'ল আসল আড্ডা। মুখ খুলে ও মন খুলে। তবে তাই বলে বাড়িতে কি অহরহ আড্ডা হচ্ছে না? হচ্ছে। বাপ-মায়ে আড্ডা হচ্ছে, ছেলে-বৌতে, ভাই-বোনে এবং এর ওপর কখনো বাপ-মা ভাই-বোন সবাই মিলে। তবু বাইরের আড্ডাই হ'ল আসল আড্ডা। মুখ খুলে আর মন খুলে অসভ্য না হ'তে পারলে আড্ডা কি জমে। আড্ডাই হল সজীব প্রাণের স্পন্দন। পা ছড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক এবং সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে প্রাণখুলে মনের কথা কইতে না পারলে এবং অন্যের সঙ্গে আজেবাজে প্রসঙ্গ কখনো গম্ভীর ও কখনো লঘুভাবে গ্যাঁজাতে না পারলে আড্ডা আর হ'ল কি।

মাঠ থেকে ছাদ, হাসপাতাল থেকে শ্মশান, আড্ডা কোথায় নেই। পৃথিবীর যদি কখনো শেষ হয়ে যায়, দেখা যাবে যে ক'জন তখনো বেঁচে আছে গোল হয়ে বসে কষে আড্ডা মারছে।

॥ এগারো ॥

অ্যান্টার ক্লথের রং বদলালো একে একে—এ্যাড্‌ভেন্টের বেগুনি, পেন্টের টক্‌টকে লাল, মধ্যে ক্রিসমাসের সাদা আর সোনালী। অতিক্রান্ত বর্ষের নিশানা।

অথবা আর এক ভাবেও করা যায় হিসেবটা—বাড়িতে বছরে যে চারখানা চিঠি লেখবার অনুমতি আছে, সে চারখানাই লেখা হয়ে গেছে। চারপাতার চিঠি—তার চেয়ে আর একটা লাইনও বেশি লিখতে হলে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। ওর তা দরকার হয় না-ই বলা চলে। তার বদলে হাতের গোটা গোটা অক্ষরগুলো ছোট করে ফেলে, এক এক পাতায় বেশি লেখা ধরে তাতে। ক্রমে আবিষ্কার করেছে সেও ঠিক অন্যান্য মিশনারী সিস্টারদের মতই লিখছে।

দুর্ঘটনার পর তিন মাস ফাদার অন্দ্রের পায়ে অনবরত ড্রেসিং দেওয়া হ'ল। তন্তুগুলো জুড়ছে ধীরে ধীরে, একমাস অন্তর তোলা এক্স-রে প্লেটগুলো তার সাক্ষী। এই এক্স-রে প্লেটগুলো প্রতিবার অহংকারের সংগে তার লড়াইটাকে জাগিয়ে তোলে। আর মাদার ম্যাথিল্ডা প্রায়ই জানান মাদার হাউসে তিনি তাগিদ দিয়ে পাঠিয়েছেন আর একজন নার্স পাঠানোর জন্য···এখনও এল না তা। এ সংবাদও ঐ একই যুদ্ধে লিপ্ত করে তাকে।

উত্তরকালে কংগোর এই প্রথম বছরটার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে হয়েছে এ সময়টায় তার জীবনে একটি মাত্রই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে। অথচ এমন কিছুই নয় যা জীবনের প্রধান একটা প্রস্তাব হিসেবে লেখা চলে বাড়িতে। বাড়িতে এ অভিজ্ঞতার মূল্য কেউ বুঝবে না; এ অভিজ্ঞতার মূল্য বুঝতে হলে নান হতে হবে।

আরও একবার সুযোগ দিয়েছিলেন ত'কে ঈশ্বর বিনা বাধায় যাতে তাই উচ্চারণ করতে পারে সে। তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে চুলচেরা বিশ্লেষণে তাকে জানালেন কতটুকু নম্রতা তার আছে।

ঘটনাটা এই, আমাশয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। মনে হয়েছিল এই শয্যাই তার মৃত্যুশয্যা, প্রার্থনাও করত তাই যেন হয়। অহোরাত্র একটা সুতীব্র যন্ত্রণাবোধ···তার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েও যে বাঁচা যায় ভুলেই গিয়েছিল। আর ঐ যন্ত্রণার বিভীষিকা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়েছিল বাঁচবার সব বাসনাও।

নিজের অবস্থা বুঝতে পেরেও যতদিন পারল লুকিয়ে রাখল। এ অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ার মধ্যে একটা অবমাননা আছে। একটা কাজের হাত কমে যাবে···নিজের অনবধানতায় ঈশ্বরের সময়ের অপচয়।

বুঝেছে দেশীয় ফলের জন্যই অসুখটা করেছে তার। কোন পোকার হুল ফোটানো ছিল হয় তো কোন ফলে।

সপ্তাহে দু'বার লাম্বার পাংচার নিতে দেশীয়দের হাসপাতালে যেতে হত। সেই সময় একটি চাকর সোৎসাহে ক্লিনিকের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত তার অপেক্ষায় একটুকরি বরফ দেওয়া ফল নিয়ে। সাধারণতই আম, দেশীয় বাজার থেকে কেনা। ওকে যে তার ভাল লাগে, তা জানানোর পদ্ধতি এই। সেই ভিজে-ভিজে সকালে পর পর গোটা বারো লাম্বার পাংচার করতে হ'ত যখন, তারপরও স্লিপিং সিক্‌নেসের ট্রাইপ্যানোসোমের খোঁজে স্পাইন্যাল ফ্লুইডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষাগুলো করবার থাকত, আমের কনকনে ঠাণ্ডা সোনালী শাঁসটা সে সময় অমৃতের মত লাগত!

দেখতে দেখতে অসুখটা বেড়ে গেল হু-হু করে, সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল।

সমস্ত শক্তি হারিয়ে সার্জারিতে যেদিন হঠাৎ পড়ে গেল, মনে হ'ল এই তার শেষ।

···স্ট্রেচারে শোয়াতে শোয়াতে ডাক্তার রাগ করতে লাগলেন।

—আগেই বলা উচিত ছিল···এ কি ছেলেমানুষি, বোকা কোথাকার! এত কিসের দম্ভ!

মুখখানা ঝুঁকে এল কাছে, এই চব্বিশ ঘণ্টায় কতবার হয়েছে!

—তিরিশ বারেরও বেশি—

মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিতে গিয়ে দেখল সিস্টার লুক—হলদেটে মুখখানা পাংশু হয়ে গেল।

কন্‌ভেন্ট হাসপাতাল। সারা দেহে বেদনা আর শ্রান্তির আচ্ছন্নতা।···তারই মধ্যে ডাক্তার যা দিলেন গিলে ফেলল, তাঁর

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম্

হাতের ওপিয়াম ইনজেক্‌সনের সূচ ফোটানো টের পেল একাধিকবার। রাত্রি গভীর হয়ে এল···এমিলের কালো মুখখানা, ডাক্তারের হলদেটে মুখখানা, মাদার ম্যাথিল্ডা আর সিস্টার অরেলির কোমল মুখ দু'টো ক্রমান্বয়ে ভাসছে চোখের সামনে। নিজেরই মনে হচ্ছে শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে সে যেন, এমন সময় শুনতে পেল মাদার ম্যাথিল্ডা ডাক্তারকে বলছেন একজন প্রিস্ট আর সিস্টারদের তিনি ডেকে পাঠাতে চান।

···সে যেন শয্যার ওপর ভাসছে আর দৃষ্টি নত করে দেখছে অল্প-বয়সী একটি নানকে মরতে।···তিনটে বেজে গেল, রাত শেষ হয়ে এসেছে। কানে আসছে এই ঝিল্লী-ঝংকৃত শেষরাতে ডরমিটোরি থেকে হাসপাতালের পথে সিস্টাররা কোমল কণ্ঠে মিসারেরে গাইতে গাইতে আসছেন···কুড়িজন সিস্টারকেই দেখতে পাচ্ছে, হাতে তাঁদের প্রজ্বলিত মোমবাতি। সিনিয়র নানটি হোলি অয়েল হাতে নিয়ে।

···নানের কাছে মৃত্যু বড় মহানরূপে আসে। নাচু হয়ে আবারও তাকিয়ে দেখছে শয্যার দিকে—এক মৃত্যুপথের যাত্রিণী শুয়ে আছে সেখানে—ছেলেমানুষ, সাহসী, সবিনয়ে করজোড়ে অপেক্ষা করে আছে কখন তার দুই হাতের মধ্যে একটুকরো পার্চমেণ্ট কাগজ স্থান পায়···একটা প্রতিজ্ঞার কথা লেখা আছে সেখানে—বহু যোজন দূরে কয়েক বছর আগে স্বাক্ষরিত এক প্রতিজ্ঞা।

কানে আসছে মিসারেরে আবেদন জানাচ্ছে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনার শক্তি যেন থাকে তার, সব অপরাধ তাঁর কাছে স্বীকার করার শক্তিও। একটি অনুতপ্ত নম্র হৃদয় যেন আপনাকে নিবেদন করে দিতে পারে তাঁর চরণে। মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর কাছে এগিয়ে আসতে আসতে তার সম্বন্ধে ওঁরা আশার কথা ব্যক্ত করছেন এখন।···আর যখন সে চলে যাবে সংগীতে ওঁরা ধন্যবাদ জানাবেন ঈশ্বরকে তার নিঃস্বতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, তাই।

···এ সবই তার জন্য। শুধু এই নয়, আরও আছে। আগামীকাল কেব্‌ল্ করে মাদার হাউসকে জানানো হবে তার মৃত্যু-সংবাদ, তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই কমিউনিটির প্রত্যেক কনভেণ্ট তার নামে স্টেশনস্ অব্ দি ক্রশ করবে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ইয়োরোপের প্রতি হাউসে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে। শুধু সেখানেই নয়, সারা প্রাচ্য ঘুরে, ভারতবর্ষ হয়ে এই কংগোতে এসে পৌছোবে সেই বিশেষ উপাসনার ঢেউ।

···আহা কি যে সুন্দর হয় অনুষ্ঠানগুলো। নিজে সে যতবার যোগ দিয়েছে আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে তার।···আর কত রাত্রির অপার্থিব ক্ষণে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে স্বর্গীয় সংগীতের আবরণে মরণোন্মুখ কোন নানকে ঢেকে দিতে, এই এখন যে সিস্টাররা এগিয়ে আসছেন গান গাইতে গাইতে, তাঁদেরই মত।

ফাদার স্টিফেন তার ঘরে ঢুকতে ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির আভাস ফুটল তার।

ভারাটিকামটি উঁচু করে তুলে মহিমা স্তব আরম্ভ করেছেন তিনি। তাঁর উদাত্ত পরুষকণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের মধ্যে, এই ধামে শান্তি আসুক।

—এবং যাহারা এখানে বাস করে তাহাদের সকলের অন্তরেও, সিস্টাররা গাইছেন উত্তরে।

ছোট ছোট মোমবাতি প্রত্যেকের হাতে ধরা, মুখে তারই আলো এসে পড়েছে···

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সে সেরে উঠল। কেন সেরে উঠল তা সে নিজেই জানে। সে যে স্বেচ্ছায় মরতে গিয়েছিল, সিস্টাররা সেজন্য অভিনন্দন জানালেন তাকে কমিউনিটিতে ফিরে যেতে—তার আগেই সে কিন্তু বুঝতে পেরেছে কেন সে সেরে উঠল। ক' সপ্তাহ হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে একে একে অনেক হীন সত্য আবিষ্কার করেছে নিজের অসুস্থতার পিছনে। মরবার সমস্ত প্রস্তুতিটাই একটা প্রতারণা—শুধু বীরত্ব দেখানোর লোভ আর আত্মকরুণা। স্মিতহাসিকে সিস্টাররা ভেবেছেন বীরোচিত, সে কেবল এই চিন্তার তৃপ্তি যে হাজার হাজার নান তারই স্মৃতি-শোভাযাত্রায় সারা পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। অতি বিষণ্ণ সর্বশেষ শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের সময়ও এমন একটা মুহূর্তও কি ছিল যখন মনটা সত্যই বিনীত হয়েছিল, সমস্ত সত্তা শুধুমাত্র ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকেছিল?

ক্রমে যতই বল পেল দেহে, আত্মবিশ্লেষণে ততই কঠোর হ'ল। যেমন মাইক্রোস্‌কোপের স্লাইড তৈরি করে, টিউবের মধ্যে নিরীক্ষণ করে করে বীজাণু নির্ণয় করে, তেমনই অতি সতর্কতায়।···নানের মতই তুমি হাঁটছ, কথা বলছ, নানের মতই তুমি লিখছও। তবু নান তুমি নও, এখনও নও। নানের ছাঁচেই গড়ে উঠেছে তোমার বাইরেটা—কিন্তু সেই বিভ্রান্তিকর বহিরাবরণের অভ্যন্তরে এখনও জন্ম নিচ্ছে দম্ভ আর মিথ্যা আত্মশ্লাঘা, পার্থিবতা আর আত্মাসক্তি।

রিক্রিয়েশন সামিয়ানার চারপাশে উড্ডীন পতংগের ভিড়··· তাপদগ্ধ অপরাহ্ন। তারই মধ্যে একদিন কমিউনিটিতে ফিরে এল সিস্টার লুক।

রোগশয্যা থেকে একটা নিশ্চিত ধারণা নিয়ে এসেছে—প্রকৃত নম্রতা যতদিন না শিখতে পারে, ততদিন ভগবান এমনি অবমাননার পরীক্ষায় ফেলবেন তাকে। যে মৃত্যু গৌরবের, সে কেবল অধিকারীর জন্য সংরক্ষিত। সিস্টারদের মধ্যে ফিরে এসে প্রথম ঘণ্টাখানেকেই ধারণাটা বদ্ধমূল হ'ল। যে সাহসের সংগে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তার জন্য তাঁরা অভিনন্দিত করলেন যখন লজ্জায়, সংকোচে মূক হয়ে গেল সে।

শেষে প্রশংসা আর সহ্য করতে না পেরে বলল, সাহস সেটা ছিল না—সেটা একটা—একটা—

যে সত্যটা আবিষ্কার করেছে নিজে, সেটা ছাড়া অন্য কোন কথা দিয়ে বক্তব্যটাকে বোঝাতে কথা হাতড়ে বেড়াল।

নানরা জানেন কি সে বলতে চায়, কিন্তু কখনও কখনও নিজেকে যতই নীচু করা যায়, বিনীত করা যায়—ততই উঁচু, ততই অসাধারণ মনে হয় নিজেকে। নানদের কেউ কেউ এই স্পষ্টভাবে আহত হলেন তাই, অন্যেরা প্রশংসা করলেন।

মাদার ম্যাথিল্ডা চেয়ারের হাতলে আঘাত করলেন দু'বার। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টায় তাঁর বক্তব্য আছে কিছু।

শান্তকণ্ঠে বললেন, সিস্টার লুক যে মারা গেল না তার কারণ ওর কাজ শেষ হয় নি এখনও। তা ছাড়া ঈশ্বর তো ওকে পরীক্ষা করলেন না, করলেন আমাদের কমিউনিটিকে।

কথাটায় জোর দিয়ে মাথা নাড়লেন মাদার, সত্যিই ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখছিলেন আমাদের মধ্যে একজনকেও আমরা ছেড়ে দিতে রাজী কি না। এমনিতেই আমাদের কাজের হাত কম রয়েছে যখন, আমাদের মধ্যে থেকে আরও একজন কমে গেলে আমরা খুবই মুশকিলে পড়ে যেতাম।

তাঁর মুখের মৃদুহাসি স্পর্শ করল রিক্রিয়েশন বৃত্তের সবাইকে—মনে করিয়ে দিল তারা এক-একটি সংখ্যা কেবল।

একজন সিস্টার কমে যাওয়া নয়, চেনা নামের, চেনা-পরিচয়ের একজন নান কমে যাওয়া নয়, একটা নম্বর কম কেবল। সিস্টার লুক একবার সুপিরিয়রের দিকে তাকিয়ে দেখল—আধ্যাত্মিক জীবনের মূল আদর্শগুলো কখনও ভুল হয় না তাঁর।

···কিছু হবার আগে কিছু না হও।

যে নাম-গোত্রহীন পরিচয় তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন মাদার ম্যাথিল্ডা তারই চাপে ভিতরটা পিষ্ট হচ্ছে সবার।

সিস্টার লুক অনুভব করতে পারছে সেটা। আর ভাবছে, এ চাপ আমারই ওপর সবচেয়ে বেশি।

ডিউটিতে ফিরে অল্পদিনের মধ্যেই সে তার ড্রেসিং বয়দের ট্রেনিং দিয়ে নিল, আর এমিলকে ডেপুটি করল নিজের।

দু'টো পরিবর্তনই তাকে একটা বিশেষত্বের আলোয় দাঁড় করাল।

হাসপাতালের প্রধানা নার্স যে—সব দায়িত্ব যার ওপর থাকে—সব সময় একজন নান ডেপুটি থাকে তার। তাকে যেমন সিস্টার অরেলিকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নান কেন? বয়স্ক ঐ কালো মানুষটি কেন নয়? এমিল? ওদের কত দলকে আসতে-যেতে দেখল যে এই হাসপাতালে? যে ওদের মত যে কোন ভাল নার্সের তুল্য শুশ্রূষার কাজ জানে?

—আমি ওকে আমার ডেপুটি করে নিতে চাই মাই মাদার, তা'হলে সিস্টার অরেলিকে পুরো সময় মেটার্নিটি প্যাভেলিয়নের জন্যে ছেড়ে দিতে পারি আমরা। তা ছাড়া এমিল আমার ডেপুটি হলে দেশীয় লোকজন যারা কাজ করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থাও নানদের বদলে সে করবে—আমার মনে হয় ভাল হবে সেটা। তিনশ' বেড···এদিকে এই ক'জনমাত্র আমরা··নিগ্রো বয়দের নিঃশ্বাসে সিম্বার গন্ধ খোঁজার চেয়ে গুরুতর অনেক কিছুই ঘটছে হাসপাতালে অহরহ।

মাদার ম্যাথিল্ডা একমুহূর্ত ভাবলেন, প্রস্তাবের চেয়ে উদ্দেশ্যটাকেই যাচাই করে দেখতে চান। তাঁর উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণদৃষ্টির আঁচ লাগল দেহে। ও জানে কি ভাবছেন তিনি। একটা কিছু বদলানোর ইচ্ছে···অন্য কোন কারণ না থাকলেও কেবল অন্যরকম কিছু একটা করবার ঝোঁক—প্রত্যেক নানের কাছেই একটা মস্ত প্রলোভন। এই যে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হ্যাবিটটা ঠিক একইভাবে ভাঁজ করতে হয়··অন্য কোন কারণ নেই, কেবল রুল এই এই বলেছে আর এই এই বলে নি এটাই কারণ—প্রলোভনটা এই সামান্য ব্যাপারেও হাত বাড়াতে চায়, হঠাৎ একদিন ইচ্ছে হয় হ্যাবিটটা অন্য ভাঁজে ভাঁজ করি। কোন 'কারণে নয়, বদলানোর ইচ্ছেটাই একমাত্র কারণ। মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, প্রায় দৈহিক আর্তির শক্তিতেই তাড়িয়ে তোলে তোমাকে। তাকে জয় করাও প্রায় তেমনই কঠিন। বিদ্রোহ করে সে মন্ত্রে কবিয়ে দেবে বাধ্যতা নামক সদ্‌গুণটা এত নির্জীব নয় যে সহজেই বন্দী করে রাখতে পারা যাবে তাকে।

—বেশ, আমি নিজেই ডাক্তারকে জানিয়ে দেব। আমার যতদূর মনে হয় তাঁর কোন আপত্তি হবে না।

হাসপাতালে ফিরে এসে সিস্টার লুক তার সব ক'টি রেজিস্টার্ড পুরুষ নার্স আর টেকনিসিয়ানকে ডাকল—তাদের অধিকাংশ চার বছরের কোর্স পড়েছে, অনর্গল ফরাসীতে কথা বলতে পারে। ফাইফরমাস শোনে যে বয় বা তাদের ঝাড়ুদার আর রান্নার দিকের লোকদেরও ডেকে আনল।···আজ সে একটি নিগ্রোর ওপর প্রায় তারই সমান দায়িত্ব তুলে দেবে।···ওদের জানাল এখন থেকে এমিল ওদের ক্যাপিটা হবে আর কর্তৃত্ব হিসেবে কে কার পরে তা সেই ঠিক করে দেবে। ও জানে এই সব শ্রেণীবিভাগ-টিভাগ ওরা বোঝে বেশ আর ভালও বাসে।

—তোমরা কোন সমস্যায় পড়লে এখন থেকে তোমাদের ক্যাপিটা এমিলকে বলবে। সে আমায় বলবে, আমি বড় মামা ম্যাথিল্ডার সংগে পরামর্শ করব আর তিনি আবার ভগবানের নির্দেশ চাইবেন। সব সমস্যাই এখন থেকে এইভাবে সমাধান করা হবে।

শুনে ওদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অসুবিধের কথা এমিলের কাছে জানানো সহজ হবে অনেক, সে তাদের বক্তব্য অনুবাদ করে শ্বেতাংগদের দরবারে পৌঁছে দেবে। জংগলের মধ্যে নিজের গাঁয়ে একবার ঘুরে আসার আকস্মিক বাসনা···ট্যাবুর ভয়···আরও নানা ভয়—এসব কথা মাতৃভাষা ভিন্ন ব্যক্ত করাই কঠিন। এখন দেখা যাচ্ছে এমিলের মাধ্যমে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে ওদের সব সমস্যা সোজা ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছোবে এবং একইভাবে আবার ফিরে আসবে। নির্ভুল সমাধান হবে সব কিছুর।

—আরও একটা কথা—সিস্টাররা আর শাস্তির হুকুম দেবেন না। সব অন্যায়ের বিচার তোমাদের ক্যাপিটা করবে, শাস্তির হুকুমও দেবে সে-ই।

ওরা আরও বেশি খুশি হ'ল। ঘর জুড়ে অনুমোদনের মৃদু আলোড়ন তার সাক্ষী।···বয়রা নতুন করে শ্রদ্ধার চোখে তাকাল এমিলের দিকে—জাতে সে-ও তাদেরই মত নিগ্রো, তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় বয়সে আর সবচেয়ে বেশি দিন আছে এই হাসপাতালে—এ সম্মানের পদ তারই প্রাপ্য। শাস্তির ব্যবস্থাটা সব সময়ই বেশ মজার ব্যাপার—এখন থেকে সেটা থাকবে এমিলের হেফাজতে। মাইনের অংশ হিসেবে ওরা যে শুকনো রেশন পায় সেটা যেমন মেপে দেয় সে, তেমনই নিখুঁত পাল্লায় বিচার করে শাস্তিরও ব্যবস্থা করবে এবার থেকে।

আগামী কুড়ি বছরে পুরোপুরি দেশীয় ছেলেদের মধ্যে থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র এবং যাজক তৈরি করার যে বিশাল পরিকল্পনা হয়েছে এই নতুন ব্যবস্থা যে সেই পরিকল্পনারই এক ক্ষুদ্র সংযোজন এ কথা কেউ বললে সিস্টার লুক অবাক হ'ত। ঔপনিবেশিক নীতি বা পরিকল্পনার কোন খবরই সে রাখে না। এইমাত্র জানত এই কালো মানুষগুলোর সাহায্য না পেলে হাসপাতাল চালাতে সে পারবে না।

এও জানত না তার নাম এবং তার দেওয়া এমিলের অফানীর

পদোন্নতির সংবাদ, অরণ্যের পথে রওনা হয়ে গেল সেই রাত্রেই। কোনদিন জানতেও পারত না সে কথা, একজন সিস্টার যদি না ড্রামের ভাষা পড়তে জানতেন।

রিক্রিয়েশন-সামিয়ানার নীচে ইলেকট্রিক আলোয় ওরা বসেছিল। আশপাশ দিয়ে বাদুড় উড়ে যাচ্ছে, তার ডানার ঝাপটা এড়াতে হচ্ছে সরে গিয়ে···হাওয়া দিয়ে তাড়াতে হচ্ছে পোকা-মাকড়···কিপুশি বুশ, স্টেশন থেকে একটি ভিজিটিং সিস্টার এসেছেন···তিনিও আছেন তাদের সংগে। হঠাৎ শুনল তিনি মাদার ম্যাথিল্ডার কাছে হাসপাতাল পরিচালনার কোন ব্যাপার নিয়ে প্রশংসা করছেন।

আর তারপরই—রিক্রিয়েশন বৃত্তটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করতে পারি কি মামা লুক কে?

···ড্রামের মৃদুশব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে।

এমিল তার ছায়া হয়ে উঠল। তার ওপর অতিরিক্ত নাইট ডিউটির ভার পড়লে বুলেটিন বোর্ড থেকে দেখে নিয়ে সেও তার ভাগ নেয়। সে যখন কনভেন্টের ফোর্ড গাড়িতে শহর ছাড়িয়ে দেশীয় হাসপাতালে যায় সে-ও যায় সংগে, যন্ত্রপাতিগুলো সেই বয়। এর আগে কখনও এ সব যন্ত্রপাতি দেশীয় কোন মানুষের হাতে বিশ্বাস করে দেওয়া হয় নি।

তার কাছ থেকে কংগোর কথা, তার বারো লক্ষ অধিবাসীর কথা অনেক বেশি জানা হ'ল। এই বারো লক্ষের অধিকাংশই বান্টু, এই এমিলের মত। এমিল তাকে শোনায় তার অদেখা বহু নদীর কথা, জলের ঘূর্ণিতে যে সব অশরীরী শক্তি বাস করে তাদের কথা, চির-বর্ষা বনের কথা, যে সব পাহাড়ে বড় বড় বেবুন থাকে তাদের কথা। সে সব অঞ্চলে যে সব উপজাতি বাস করে তাদের নাম বালুবা, বাটেম্বো, বাটেটেলা, বালাম্বা, বায়েকে, বাসুকু। এমিলের পুরু কালো ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস কিংবা ঘৃণার কুঞ্চনে এই সব উপজাতিদের কোনটার প্রতি প্রশংসা আবার কোনটার প্রতি বীতরাগ প্রকাশ পায়।···কখনও হয় তো বাজারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে দেশীয় কোন লোককে দেখায়—সব দেশীয় মানুষেরই যেমন স্বভাব, এও সিস্টার লুকের চোখের দিকে চেয়ে আছে—এমিল বলে দেয় ও একজন বানগালা। ওর কপালের উল্কি দেখে যে কেউ চিনতে পারবে তাকে বানগালা বলে। কিংবা ঐ যে লোকটা একটা আবলুস কাঠের মূর্তি বিক্রি করছে ও হয় বাকুবা না হয় টুক্‌শিয়োকোয়াই—এ সব জাতের লোকেদের হাতের কাজ খুব ভাল, ওরা ভাস্কর।

পরিবর্তে এমিল যা কিছু জানতে চায় তার দেশের মানুষের কথা, সে জানায় তাকে, তবে এমিলের কৌতূহল খুব বেশি নয়। এতকাল আছে শ্বেতকায়দের মধ্যে—প্রথমে মিশনারী স্কুলে, তারপর হাসপাতালে—ওরা চোখে সয়ে গেছে তার। ওদের ও স্বীকার করে নিয়েছে বলা চলে। বুঝে নিয়েছে এদের ভয় করবারও কিছু নেই, পুজো করবারও না—তবে সম্মান করা উচিত, কারণ এরা তার চেয়ে বেশি জানে।

একদিন কেবল স্বীকার করে ফেলেছিল 'সাদা মামাদের' ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে লাগে তার। তাঁদের স্বামীরা গেলেন কোথায়?

তাকে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে সিস্টার লুক আবিষ্কার করল এই আরণ্যকের মনোবৃত্তিতে সতীত্বের ধারণা কতটা দুর্বোধ্য। তবু তো এমিল রীতিমত আলোকপ্রাপ্ত—কথায় তার 'এ্যাপেনডেকটোমি'র মত শব্দও থাকে আর যত অপরেশনে সে এ্যাসিস্ট করেছে, দু' একটা বোধ হয় নিজেই করতে পারে—তেমন মানুষকেও এই অতীন্দ্রিয় বিবাহের কথা বোঝানো অসম্ভব, বলতে গেলেই বহু বিবাহের কথা এসে পড়বে। একজন সিস্টারের হয়েছিলও তাই এতগুলি সিস্টারের আপাত নিঃসংগ অবস্থার পিছনের রহস্যটা বোঝাতে গিয়ে একজনকে—তার নিজের পাঁচটি বৌ।

শেষ পর্যন্ত এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করল সিস্টার লুক এই বলে যে স্বামী তার সত্যিই আছেন, তবে তিনি স্বর্গে আর তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে সে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে না কখনও।

প্রতিজ্ঞা এমিল বোঝে, বিধবাও বোঝে। সহানুভূতিতে বিমর্ষ হয়ে মাথা নাড়ল সে।

আর কোনদিন এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করে নি।

আবারও একটা নতুন পরিকল্পনা করেছে সিস্টার লুক—ক'জন পুরুষ নার্সকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে নেবে। এতদিন দেখে দেখে বুঝেছে কংগোলীরা খুব নিয়ম মেনে কাজ করে। যে পদ্ধতি একবার দেখিয়ে দেওয়া হবে, ওরা দিনের পর দিন সেই পদ্ধতি মেনে চলবে, তারপর একচুলও ইতরবিশেষ হবে না। এরই ওপর ভরসা করে এগোল লুক, এমিল রইল পাশে।

এ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে গড়া, কিন্তু এর বিস্তৃতি—তার ক্ষুদ্র জগতেই শুধু সীমিত ছিল না।

উনিশ শ' তিরিশের যুগে কংগোর জিগীরই ছিল এই। ক্ষমতা অনুসারে কাজে লাগাও মানুষকে। সমস্ত দেশটা এক বিশাল তরংগ-ভংগের কিনারায় দাঁড়িয়ে। তার ফল ফলবে আগামী কয়েক বছরে—শ্বেতকায় লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে, পাঁচগুণ দেশীয় কালো মানুষ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াবে আলোয়—এদেশের হাসপাতাল, খনি আর টেক্সটাইল মিলে জমা হবে এসে। ইয়োরোপের মানুষদের খাবার খেয়ে, আচার-ব্যবহার শিখে, তাদের সংগে মিশে তারাই প্রথম কাজ করবে, এই তার বয়রা যেমন। বিবর্তিতদের সমাজে একদিন ওরাও ঢুকবে—এ সমাজের লোকেরা যেন কালোও নয়, সাদাও নয়—ধূসর। পোড়াবার আগে ছানামাটির মত। বহু ইয়োরোপীয় যা করছেন, একই সময়ে সেও করছে তাই—দেশীয় মানুষগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সাহস দিচ্ছে, জ্ঞান দিচ্ছে। তফাতের মধ্যে সবাই জানে সময়ের সংগে পা ফেলে চলেছে তারা। তারা খবরের কাগজ পড়ে, পুরোনো দিনের ঝোপ-জংগল থেকে যে নতুন পৃথিবী মাথা তুলছে, তাকে দেখছে তারা, তার মধ্যে বাস করছে। আর সিস্টার লুক এ সবের কিছুই জানে না। সে শুধু দেখেছে এমিল যখন ওয়ার্ডে ড্রেসিং-ট্রলি ঠেলে নিয়ে নিয়ে ঘোরে ওর সংগে, যখন যেটা চায় সে হাতে হাতে যুগিয়ে দেয়, বয়রা উদগ্রীব চোখে লক্ষ্য করে তাকে। ওদের চোখের ভাষা বলে ওদেরই একটা মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

পরিকল্পনাটা মাথায় আসতে এমিলকে বলেছিল ওদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে চালাক-চতুর জনা চারেককে বাছাই করতে।

তারপর তাদের ডাকল একসংগে।

কালো এই মানুষগুলোকে কিছু বলতে বা দেখাতে হলে সব সময় অল্পবিস্তর নাটকীয়তা আনতে হয়, যে আধুনিক শিক্ষা তারা পেতে যাচ্ছে তাতে একটু অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করতে। ড্রেসিংঘরে এসে বয়রা দেখল ব্যাণ্ডেজকরা অবস্থায় এমিল টেবিলে শুয়ে।

একটা বিস্মিত গুঞ্জন উঠল ঘরে।

ওরা থামতে সিস্টার লুক জানাল, এই হচ্ছে মঁসিয়ে ক, হার্নিয়া অপরেশনের পর সেরে উঠছে।

—আমি ওর ড্রেসিংটা বদলাব, তারপর দেখাব তোমাদের। কিছুদিন সেইভাবে অভ্যাস করবে তোমরা, তারপর তোমরা চারজনই একদিন পাকা নার্সের মত ড্রেসিং বদলাতে পারবে। তখন আমাদের সব পুরুষ রোগীর ড্রেসিং বদলানোর ভার তোমাদের ওপরই বিশ্বাস করে দিয়ে দেওয়া হবে।

বাহ্যত ওরা কেউ নড়লও না, কিন্তু সে অনুভব করল সহজাত ধারণাবশেই ওদের মন পিছিয়ে যেতে চাইছে। কেন তাও জানে। যত দক্ষই হোক না কেন, কোন কালো মানুষ এ পর্যন্ত শ্বেতকায় কোন মানুষের ক্ষত স্পর্শ করে নি কোনদিন। লিখিত আইন যে আছে তা নয়, কিন্তু এই চলে আসছে। কিন্তু এমন অনেক তরুণ রোগী আসে যারা এই কংগোতেই বড় হয়ে উঠেছে দেশীয় তত্ত্বাবধায়কের কাছে—পায়ের তলা থেকে সে কাঁটা বার ক'রে দিয়েছে কতবার, কাটা-ছড়া কি কালশিরায় কাদা লেপে দিয়েছে। তাদের কথা ভাবলে এই অলিখিত আইনটা অর্থহীন মনে হয়।

ড্রেসিং ট্রলি থেকে একটা ফরসেপ তুলে নিল।

—আমরা সবকিছু ফরসেপ দিয়ে করি। রোগীকে হাত দিয়ে কখনও ছোঁবে না, বুঝলে। ড্রেসিংয়েও হাত দেবে না কখনও, স্টেরাইল দস্তানা পরেও না।

এমিলের কালো তলপেটের চারপাশ তোয়ালে দিয়ে উঁচু করে দিল, ফরসেপ দিয়ে আস্তে আস্তে ড্রেসিংয়ের প্রথম স্তরটা তুলতে শুরু করল তারপর।

বয়রা টেবিলের চারপাশে ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুরো এক সপ্তাহ গোপনে এমনি ট্রেনিং দেওয়া চলল। আর সে যখন ডাক্তারের সংগে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দেয়, এমিলের তত্ত্বাবধানে ওরা পরস্পরের ওপর অভ্যাস করে। শেষে একদিন সকালে সিস্টার লুক জানাল ওরা এবার তৈরি। স্টেরাইল গাউন আর দস্তানা পরে ড্রেসিং ট্রলি ঠেলে পুরুষদের প্যাভেলিয়নে চলুক তার আগে আগে।

চার বছরের ট্রেনিং নেওয়া প্র্যাক্টিক্যাল নার্স ওরা। ঘরে ঘরে যে শ্বেতকায় মানুষরা আছে, সবাই ওদের চেনা···দিনের মধ্যে কতবার ওরা ট্রে নিয়ে তাদের কাছে যায়···বেডপ্যান বার করে আনে···ঘুমের সময় কাছে থাকে···রক্ত বা গ্লুকোজ দেওয়া হয় যখন যন্ত্রপাতিগুলো দেখাশুনা করে। তবু একটা দরজার বাইরে মামা লুক তাদের থামবার ইসারা করল যেই, ভয়ে হাত-পা এলিয়ে এল তাদের। সম্পূর্ণ একটা নতুন জিনিস করতে যাচ্ছে, ভয়-ভাবনায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখগুলো।

দ্রুত কিসুওয়াহিলিতে নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়ে গেল একপ্রস্থ। একদল পাখি যেন, কিচির-মিচির করে পরস্পরকে সাবধান করে দিল।

সিস্টার লুক শান্তভাবে প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকল, যার নাম ধরে ডাকা হবে সে যে জিনিসের দায়িত্বে আছে সেটা তুলে নেবে তখনই।

—মাফুটা—স্টেরাইল তোয়ালে, বানুজা—কিড্‌নি বেসিন, এডওয়ার্ড আর ইল্লনগা—ফরসেপ্‌—দৃঢ়কণ্ঠে হুকুম দিয়ে হাসল একটু। ঢোকবার আগে আমরা আর একবার ঝালিয়ে নেব। আজ উরুর একটা গভীর ক্ষত ড্রেস করতে যাচ্ছ তোমরা···মাফুটা সেটার চারপাশে পুরু করে তোয়ালে মুড়ে দিল, বিছানার চাদরটা অবধি যাতে না একটুও দেখা যায়। এডওয়ার্ড—তাকে সাহায্য করছে ইল্লনগা—ফরসেপ দিয়ে ড্রেসিংগুলো তুলে নিয়ে কিড্‌নি বেসিনে ফেলবে, বানুজা তৈরি হয়ে আছে সেটা ধরে। কলোডিয়ন গ্যাজ পর্যন্ত ড্রেসিং সরিয়ে ফেলবে ওরা—সেটা উজ্জ্বল হলদে রংয়ের, তোমরা তো জানই। তারপর ওরা পিছিয়ে গেল···আমি এগিয়ে এলাম, গ্যাজ তুলে স্টিচগুলো দেখলাম, সময় হয়ে থাকলে কেটে দিলাম, এমিল দরকারমত ওষুধপত্র এগিয়ে দিল। তারপর তোমরা আবার···

ওদের কাছে ভাঙে নি যে এই নতুন ব্যবস্থার জন্য রোগীও সে তৈরি করে রেখেছে—নির্ঝঞ্ঝাট এক ভদ্রলোককে ঠিক করে রেখেছে ওরা প্রথম দিন সত্যি সত্যি নিজের হাতে কাজ করবে বলে। নানের বদলে তার বয়রা তাঁর ড্রেসিং করে দেবে শুনে তিনি কৌতুকবোধ করেছেন।

মাথা নেড়ে জিনিসগুলো সব ট্রলিতে রেখে দিতে ইসারা করল ওদের।

—আমরা তৈরি এখন—বলে বয়দের দিকে চেয়ে প্রত্যয়ের হাসি হাসল একটু। আগে আগে ঘরে ঢুকল তারপর।

পক্ষকালের মধ্যে কাজের ছকে বাঁধা পুরো একটা দল ড্রেসিং বদলানোর কাজ করতে লাগল। এইভাবে কাজ চললে এক ঘণ্টায় পঁচিশটা উত্তর-অস্ত্রোপচার কেস ড্রেস করে প্রত্যেকের পুরো রিপোর্ট লিখে ফেলাও সম্ভব। সাড়ে আটটার ডাক্তার যখন রাউণ্ডে আসেন সব রিপোর্ট তখন তৈরি। কর্মরত ড্রেসিং বয়দের যেদিন দেখলেন ডাঃ ফরচুন্যাটি, দৃষ্টিটা তখনই তাদের ওপর থেকে তার ওপর এসে পড়ল। ফাদার অণ্ড্রের পায়ে তার হাতের সেলাই দেখে যেমন করে তাকিয়েছিলেন, আজকের দৃষ্টিতেও সেই একই অভিব্যক্তি।

—তা হলে দেখা যাচ্ছে সিস্টার, আপনি একজন মাস্টারণীও বটে!

তিনি যদি বড়াই করে খনি অঞ্চলের ডাক্তারদের কাছে না বলতেন তাঁর হাসপাতালের সবকিছু কিরকম নিখুঁত ভাবে চলছে আর কালো মানুষগুলোর প্রচণ্ড কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে হলে খনি অঞ্চলের হাসপাতালেও একজন নানের কি প্রয়োজন তা নিয়ে উপদেশ না দিতেন যদি, তা হলে এমন নজর পড়ত না কারো। উপনিবেশ জায়গাটা গল্পগুজবের পক্ষে ছোটই, তার ওপর যা কিছু কথাবার্তা তা যখন শ্বেতাংগ মানুষগুলোর মধ্যেই সীমিত। আর তারা আবার জাত ঠিকাদার—এই তাম্র-সমৃদ্ধ শহরে নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশাতেই মশগুল হয়ে আছে।

সুতরাং একটি নানের খবর মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—ড্রেসিং বয়দের শেখানো দল আছে যার। প্রাদেশিক প্রচার বিভাগীয় প্রতিনিধি মাদার ম্যাথিল্ডাকে টেলিফোন করে জানালেন কথাটা—তাঁর একজন নান প্রকাশ্যেই প্রচলিত নিয়মের বাইরে পা বাড়িয়েছেন, হাটে-বাজারে তাঁর নাম শোনা যাচ্ছে।

কোন সিস্টারের সম্প্রদায়ের নামে তার উল্লেখ করা চলতে পারে—ডোমিনিক, ফ্রান্সিস্, বেজিডিক্ট বা আরসুলি—কয়ফ আর হ্যাবিট দেখে বুঝতে পারলে তবেই অবশ্য। অথবা কেউ বলতে পারে টিচিং সিস্টার, নার্সিং সিস্টার, ভিজিটিং সিস্টার কিংবা ইভেনজেলাইজিং সিস্টার—যাঁরা ভগবানের নাম প্রচার করে বেড়ান। কিন্তু কনভেন্টের বাইরে, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের গণ্ডী পেরিয়ে কোন নানকে তাঁর ক্রাইস্টের নামে কেউ ডাকবে না, এটাই নিয়ম। কিছু যে লিখিত নির্দেশ আছে তা নয়, কিন্তু ডাকা হয় না। আর যদি হয় তো বুঝতে হবে কোনভাবে তুমি নিজেকে লোকচক্ষে বিশিষ্ট করে তুলেছ।

সেদিন মাদার ম্যাথিল্ডা যেই পুরুষদের প্যাভেলিয়নে এলেন ড্রেসিং বয়রা কাজ করছে যখন সেই সময় দেখবেন বলে, সিস্টার লুক বুঝল নিয়মিত পরিদর্শন এটা নয়, অন্য কারণ আছে পিছনে। মাদারের সদাস্মিত হাসির পিছনে একটা ছায়া ছিল যা অন্য আর কারো চোখে পড়বে না, কিন্তু নানের চোখে ধরা পড়বেই। বয়রা তখন একটি উত্তর-অপরেশন ক্যান্সার কেস ড্রেস করছিল—তারা বুঝলও না, নিপুণ হাতে কাজ করে গেল। ভাবছে বড় মাদার ওদের প্রশংসা করতে এসেছেন।···নিঃশব্দ ত্বরিৎ হাতে এডওয়ার্ড ফরসেপ্ দিয়ে ময়লা ড্রেসিং তুলে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে কিডনি বেসিনে—ঠিক জায়গায় পড়ল কি না চেয়েও দেখছে না। সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ বানজার, সে ঠিকমত ধরে থাকবে।···ইল্লুনগা ট্রলির ওপর থেকে গোটানো স্টেরাইল ড্রেসিং নিয়ে খুলছে এবার।···কিড্নি বেসিনটা ভরে গেলেই মাফুটা ময়লা ড্রেসিংয়ের পাত্রটার ঢাকনা খুলে ধরছে, বানজা তার মধ্যে, উপুড় করে দিচ্ছে কিড্নি বেসিনটা।···ইতোমধ্যে এড্ওয়ার্ড কলোডিয়ন গ্যজে এসে পৌঁছোল—অমনি সবাই সৈনিকের মত একসংগে সরে গেল পিছনে। এমিল চোখের ইসারায় সিস্টার লুককে বেডের কাছে ডেকে আনল।

রোগীটি বালিশের ওপর মাথাটা একটু ঘুরিয়ে মাদার ম্যাথিল্ডার দিকে চেয়ে হাসলেন, কি সুন্দর দলবদ্ধ কাজ ওরা শিখেছে রেভারেণ্ড মাদার—আপনার নানরা সত্যই আপনার গর্বের জিনিস। টেক্সটাইল মিলে আমরা যে পরিচালনার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি এর চাইতে সে অনেক নিরেস।

সিস্টার লুক গ্যজ তুলে সেলাইগুলো দেখলো। এ রকম অবস্থায় সাধারণত বয়দের এটা-ওটা হলে···অন্যদিন হলে হয় তো বলত কেন ওদের হাত এখনও গ্যজটাও সরাবার মত পাকে নি, আজ কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরটাকে বিশ্বাস করতে সাহস হ'ল না। যে দৃঢ় কণ্ঠস্বর ওদের চেনা, সে কণ্ঠস্বর আজ আর ফুটবে না। মাদার ম্যাথিল্ডার পাশে দাঁড়িয়ে সে অঘটনের আড়ালে হৃৎপিণ্ডটা কাঁপছে, সেই কম্পন তার স্বরেও লাগবে এখন। কিছু ভুল হয়েছে, সুপিরিয়রের কাছে ত্রুটি ঘটেছে কোন! বাহ্যত মাদার ম্যাথিল্ডার কণ্ঠস্বরে বা ব্যবহারে সুনিপুণ একটি শুশ্রূষার কাজের প্রতি সমজদারি আগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় নি। কিন্তু প্রকাশ যা পেয়েছে তা নেহাৎ অর্থহীন, আসল ব্যাপারটা আড়ালেই রয়ে গেছে। কারণ, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে কোন নান অন্য নানকে বকেন না, এটাই নিয়ম।

চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে মন আলোড়িত।···ত্রুটি ঘটেছে কোথাও, ত্রুটি ঘটেছে মাদার ম্যাথিল্ডার কাছে।

···হে ঈশ্বর, আর যে কোন মানুষের কাছে দোষী হতে রাজী আছি আমি···ডাক্তারের কাছে···কোন রোগীর কাছে···অন্য আর যে কোন সিস্টারের কাছে···কিন্তু ওঁর কাছে না···ওঁর কাছে নয়!

হাত দু'টো থামে নি মুহূর্তও—মাফুটাকে ইংগিত করেছে পরিষ্কার একটা কলোডিয়ন গ্যজের জন্য। ক্ষতের ওপর দিয়ে দিল সেটা, সরে এল তারপর। বয়রা এগিয়ে এল, ড্রেসিংয়ের বাকি কাজটা শেষ করবে।

দেখা শেষ। মাদার ম্যাথিল্ডা বিদায় নিলেন রোগীটির কাছ থেকে।

—আমায় এবার যেতে হচ্ছে ম'সিয়ে, আপনি তো যোগ্য হাতেই আছেন, দেখে যাচ্ছি।

যেমন নিয়ম, সিস্টার লুক প্যাভেলিয়নের দরজা পর্যন্ত সংগে এল। করিডরের ভিড় এড়িয়ে দেওয়ালের ধারে নির্জন কোণে একমুহূর্ত থামলেন সুপিরিয়র।

সস্নেহে বললেন, তোমার কেবল দোষ হয়েছে সিস্টার, আগে

থেকে আমায় জানিয়ে না রাখা। এখন দেখতে পাচ্ছি যে প্রশংসার হৈ-চৈ উঠেছে তার জন্যে তুমি দায়ী নও—এ ব্যাপারে যে সিস্টারই প্রেরণা যোগাক, শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য সবার পড়তই। কিন্তু আমি জানতে পারায় আগেই আমাদের ডেলিগেট যখন ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমার একজন নান নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলতে চাইছে, আমি উত্তর দিতে পারি নি।

এই কথাটুকুর প্রতিক্রিয়া যা হ'ল, এক ঘা চাবুক এর চেয়ে মৃদু ভর্ৎসনা হ'ত। সারা শরীরটা কেঁপে উঠল একবার···ডেলিগেট ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে···কোমরে লাল বেল্ট আঁটা। বুকের মধ্যেটা জ্বালা-জ্বালা করছে, ইচ্ছে করছে তাঁকে আবার ঘুরিয়ে আঘাত করে। মাদার ম্যাথিল্ডাকে যেচে ফোন করে জানিয়েছেন তাঁর একটি নান নিজের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত হয়ে নেই—সংবাদটা মর্মবিদারক। মাদার আঘাত পেয়েছেন মনে, দুঃখ পেয়েছেন। তার জন্য দায়ী যে মানুষটি, জানে কি ধরণের বিনীত, দুঃখিত কণ্ঠে তিনি নিবেদন করেছেন কথাটি। জানে, কারণ একবার তাঁর সংগে দেখা হয়েছিল তার। যতটুকু দেখেছিল সেদিন এবং যতটুকু অনুভব করেছিল, কংগোর বিরাটত্ব তাঁকে এতটুকুও স্পর্শ করে নি। বিচিত্র বটে!

মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার বলা উচিত ছিল মাই মাদার···বোধ হয় আপনাকে আমি অবাক করে দিতে চেয়েছিলাম···

গলার স্বরটা ভেঙে যাবে এবার ঠিক, তার আগেই থেমে গেল তাই।

—এখন আমি উত্তর পেয়েছি সিস্টার। এবার আমাদের ডেলিগেটকে টেলিফোন করে বলে দেব। অনুরোধও করতে পারি প্রয়োজনমত নার্সিং সিস্টার না পাওয়া সত্ত্বেও কিভাবে কাজ চালিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছি আমরা দেখে যেতে। সেই সংগে দু' দেশের মানুষ পরস্পরের কাছে এসেও দাঁড়াচ্ছে।

মাদার সুপিরিয়রের কণ্ঠে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সুর। যাবার আগে তাঁর মুখের মৃদুহাসি সমস্ত ব্যাপারটাকেই লঘু করে দিতে চাইল।

কিন্তু ব্যাপারটা লঘু নয়, সামান্য নয়। সামান্য নয় তুমি যখন একজন নান। সে সুপিরিয়রকে বলে নি, এইটুকুই তার অপরাধ, এ অপরাধ ক্ষমার্হ বলেই গণ্য। কিন্তু অপরাধী সে তার নিজের মনের কাছে, সে অপরাধের গুরুত্ব কমবে না কোনমতেই। পূর্ববর্তী সব অপরাধের সংগে এটাকেও যোগ করতে হবে তাকে, ধর্মজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

দিনে দিনে নিজেকে যতই বিচার করে দেখছে সিস্টার লুক দেখছে দোষ-ত্রুটির বোঝা ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে। পদে পদে নিজের অসম্পূর্ণতার ভার মনের মধ্যে পাথরের মত চেপে বসছে। ফলে মনের প্রফুল্লতা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমেই, বিষণ্ণতার ছায়া পড়ছে চোখের কোণে।

পরিবর্তনটা সব প্রথম ধরা পড়ল ডাক্তারের চোখে।

একদিন সকালে অপরেশনের কাজ মিটে যেতেও সার্জারিতে আটকে রাখলেন তাকে, ফাদার অগ্রের পায়ের ফাইন্যাল এক্স-রে প্লেটটা দেখালেন।

আর তারই একটা ফটো প্রিন্ট দিলেন তাকে, আপনি যে খুব ভাল নার্স সব সময় যাতে মনে পড়ে তাই দিচ্ছি।

বিনা মন্তব্যে ছবিটা ও নিজের পকেটে রেখে দিল দেখলেন তাকিয়ে তাকিয়ে।

তারপর বললেন, কিন্তু একটা কথা কি জানেন সিস্টার, আপনি বড় বেশি কঠিন, একেবারে নিয়মের ছকে বাঁধা। এখানকার জীবনের কোন কিছুর জন্যেই নিশ্চয় এমন হয়ে গেছেন আপনি! আমার মনে পড়ে প্রথম যখন এলেন কেমন ছিলেন। সম্প্রতি লক্ষ্য করছি আপনি কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছেন, গুটিয়ে গেছেন নিজের মধ্যে। আমি ভেবে পাই না কেন। কি হয়েছে বলুন তো সিস্টার?

অসতর্কভাবে এমন ধরা পড়ে গিয়ে চকিতে একঝলক রক্ত ছুটে এল মুখে। অধার্মিক এই মানুষটির কাছে তার মনের দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে গেছে ভেবে চোখে প্রায় জল এসে গেল। দাঁড়ায় নি আর, তাড়াতাড়ি ঘুরে সার্জারি থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু ঐ যে তীক্ষ্ণ একখানা মুখ হঠাৎ সমবেদনায় কোমল হয়ে আসতে দেখল মন থেকে তাকে সরানো শক্ত। আর কথা বলার ধরণটা কেমন—সেও যেন সংসারের আর পাঁচটা মানুষেরই একজন, তাদেরই মত কোন সংকটে পড়েছে···কোন বন্ধু বুঝতে পেরে সাহায্য করতে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তাই।

এক জাতের নান আছেন যাঁরা মনে করেন প্রতিটি হৃদয়ানুভূতি সুপিরিয়রকে জানানো উচিত, ও জানে সে দলে ও পড়ে না। তা হলে ডাক্তারের এই ব্যক্তিগত মন্তব্যে তার প্রতিক্রিয়ার কথা তাঁকে জানানো উচিত ছিল।

কি করবে স্থির করতে না পেয়ে অস্থির মনে দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট।

স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নভিসদের মিস্ট্রেস বলছেন, সুপিরিয়রের কাছে তোমার প্রতিটি ত্রুটি-বিচ্যুতির অর্থ হ'ল—তা সে যত সামান্যই হোক, যত নিষ্পাপ মনেই করে ফেলে থাক—সাংসারিক আকর্ষণ···পৃথিবী তোমার জামার আস্তিন ধরে টানছে, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

কিন্তু সেদিন সে সত্যই যেত কি না কোনদিনও আর জানতে পারে নি। সিদ্ধান্ত কিছু করবার আগেই দেখল কর্তব্য এগিয়ে আসছে সামনে থেকে।

করিডর ধরে পাশাপাশি এগিয়ে আসছেন কুষ্ঠ-কলোনির বিখ্যাত ফাদার ভারময়লেন আর শহরের নামকরা হেয়ার ড্রেসার এটিনে। ফাদার ভারময়লেন এসেছেন তাঁর বাৎসরিক প্রতিষেধক পরীক্ষা করাতে। আর এটিনে এসেছে ব্যাংক মালিকের স্ত্রীর চুল ড্রেস করতে।

ওর সংগে ব্যবধানটা কমে আসছে ক্রমশ।

···পুণ্যাত্মা আর পাপী।···

বিশেষণ দু'টো আপনি এল মনে।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

উদ্ভিদ্-অভিধান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গাঁজা—[সং গঞ্জে, ওং গঞ্জা, হিং গাঁজা, ভাং, তাং গাঞ্জাইলাই, তেং কল্লম—যেণ্ট মং ভাঙ্গা, ইং hemp] ভাং। বর্ষজীবী উদ্ভিদ। connuabis satina. ৪-৮ ফুট লম্বা। কাণ্ডের উভয় দিকে পত্র হয়। ফল ও বীজ চ্যাপ্টা, ফলের গায়ে কাঁটা থাকে। ইহার আদি জন্মস্থান—সাইবেরিয়া। ভারতে, উড়িষ্যা ও হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে। পর্য্যায়—গঞ্জিকা, বজ্রদারু, ভাঙ্গা, ভরিতা, গঞ্জাশন, গঞ্জাকিনী, মৎকুণারি, মাতুলী, মাতুলানী মাদিনী, শক্রাশন, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ইন্দ্রাশন, জয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজয়া আনন্দা, প্রকাশিনী, হর্ষিণী।

গাঁধাল—[সং গন্ধালী, গন্ধভদ্রা, প্রসারণী, ওং পসারুণি] আচ্ছুকাদি-বর্গের দুর্গন্ধরোহিণী pacderia foetida শরৎকালে ফোটে।

গাঙ্গেরুক—গোরক্ষ তণ্ডুলের বীজ।

গাঙ্গেরুকী—গোরক্ষতণ্ডুলা।

গাঙ্গেরুহী—নাগবল। রাজনিং।

গাজর—[সং গর্জর, পিণ্ডমূল, ইং carrot] ধান্যকাদিবর্গের শাকবিং daucus carpota. পশ্চিমভারতে ইহার বহুল আবাদ হয়।

গাণ্ডীবিন—গাণ্ডীবিন অর্জুন গাছ।

গাণ্ডেরী—আখের এক প্রকার জাত। ঢাকা বিভাগে ইহার আবাদ হয়।

গাত্রভঙ্গা—শূকশিম্বী, আলকুশী।

গাধ্যণ্ডা—ভূম্যামলকী।

গান্ধারী—দুরালভা।

গাব—[সং তিন্দুক, গালব, হিং গাব, তেন্দু, ওং মাকড়কেন্দু, ইং date plum] বৃক্ষ বিং diospyrus embryopteris. ঘনশ্যামল পত্রবিশিষ্ট। ফল পীতবর্ণ, আঠাল, মিষ্ট। আধপাকা ফলের আঠা নৌকার তক্তা জুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রকার ভেদ—বনগাব—c. cordifolia. গাবভেরেণ্ডা—রেড়ী গাছ।

গাবনল—[ইং Bengal reed] amphidonax bengalensis.

গামার (দেশজ)—গাম্ভারী।

গায়ত্রিন্—খদির বৃক্ষ।

গায়ত্রী—খদির।

গারকলাই—soja bispida

গারুড়—polygala cilita, minor.

গারুত্মতপত্রিকা—পাটালতা। রাজনিং।

গালব—১ লোধ্রবৃক্ষ। মেদিনী। ২ কেন্দুক বৃক্ষ। শব্দচং।

গালোভা—১ ধান্যবিশেষ, ২ পামবীজ, কোঁপল। রাজনিং।

গিমা—[সং গ্রীষ্মসুন্দরক, ওং পিতাশাগ, ইং lady bed straw] গিমেশাক, erythroea centauroids, c. roxb. প্রায় বর্ষায় ছোট শাক বিশেষ। পাতা সরু, ফুল সাদা, ছোট। শীতকালে হয়। তিক্ত। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়।

গিন্দুক—গেন্দুক বৃক্ষ। হেমং।

গিরিকদম্ব, গিরিকদম্বক—নীপ, ধারাকদম্ব। রাজনিং, সুশ্রুত।

গিরিকদলী—দয়ে কলা, পাহাড়ে কলা, ডমরে কলা, কলাদ্রু। পর্য্যায়—গিরিরম্ভা, পর্বতমোচা, অরণ্যকদলী, বহুবীজা, বনরম্ভা, বিরিজা, গজবল্লভা।

গিরিকর্ণী—অপরাজিতা লতা।

গিরিকর্ণিকা, গিরিকর্ণী—১ অপরাজিতা। ২ শ্বেতকিনিহীবৃক্ষ।

গিরিঙ্গা—[সং গিরি, ওং গিরিঙ্গা, ইং bastand cedar] নেপাল তুঁদ। বন্ধুকাদিবর্গের আরণ্যবৃক্ষবিং, guazuma tomentosa. পাতায় রোঁয়া আছে। গুচ্ছাকারে ফুল হয়। ফল শুকনো লম্বা অর্বুদময়। বাঙলা দেশে প্রায় দেখা যায়।

গিরিজা—১ মাতুলুঙ্গা, কমলা। মেদিনী। ২ শ্বেতবৃহ্না, ৩ ক্ষুদ্রপাষাণভেদলতা, ৪ ক্রয়মানলতা, বলাডুমুর, ৫ কারীবৃক্ষ, ৬ মল্লিকা, ৭ গিরিকদলী।

গিরিনিম্ব—ঘোড়া নিমগাছ। রাজনিং।

গিরিপীলু—পুরুষক বৃক্ষ, ফলসা। রাজনিং।

গিরিপুষ্পক—শৈলেয়।

গিরিভিদ—গিরিভেদ, পাষাণভেদক বৃক্ষ, হিমসাগর।

গিরিমল্লিকা—কুটজ বৃক্ষ, কুরচী।

গিরিরম্ভা—পাহাড়ে কলা।

গিরিবাসিন্—হস্তীকন্দ বৃক্ষ।

গিরিশালিনী—অপরাজিতা। বামন পুং।

গিরিহ্বা—অপরাজিতা। সুশ্রুতং।

গির্যাহ্বা—অপরাজিতা। সুশ্রুতং।

গিলা গাছ—[ওং গিল] বকুলাদিবর্গের বৃহৎ লতা বিং, entada hursoetha. ফুল ছোট হলুদ রংয়ের। ফল দীর্ঘ।

গীর্লতা—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, বড়লওয়া কটকী।

গীর্বাণকুসুম—দেবকুসুম, লবঙ্গ।

গুআগুদি—একজাতীয় বৃক্ষ।
গুআমউরী—[হিং সোয়া] anethum graveolena, গুইয়া বাবলা—
গুএলা—দ্রাক্ষালতার ন্যায় এক প্রকার বুনো গাছ, vitis latifolia.
গুঁড়ি কচু—ক্ষুদ্র একজাতীয় কচু।
গুগ্‌গুল, গুগ্‌গুলু—[সং গুগ্‌গুলু, পালঙ্কষা, পুরঃ, হিং গুগল, ভৈষা-গগল, গুং গুগুল, মং ক্ষশাং গুঠ্‌ঠ্‌,
ক'ইউবোল, তেং গুগিগ্‌লমুচেট্টু, মহীসাচী, কাং বোএজ-ছদান, অং মুস্কিলের্জক, ওঁ শিলা, ইং ameris] balsamodendron mukul, b. agallocha, amyris—commiphora, commifora africana. ছোট তরু, কাঁটাযুক্ত। গুগ্‌গুল গাছ আরব, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় জন্মে। গাছের আঠাই গুগ্‌গুল (সুগন্ধী)। ভারতের মধ্যে রাজপুতানা, সিন্ধুপ্রদেশ, আসাম ও পূর্ব পাকিস্তানে জন্মে। ভাবমিশ্রের মতে গুগ্‌গুল ৫ প্রকার—(১) মহিষাক্ষ (সকলবী), (২) মহানীল (মুকুল-ই আরব্), (৩) কুমুদ, (৪) পদ্ম (মুকুল-ই-আজরক্) (৫) হিরণ্য (মুকুল-ই-আহুদ্)। ভূমিজ গুগ্‌গুলু—[সং দৈত্যমেদজ, দুগাহ্ব, মহিষাসুর সম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানে ও আসামে আর এক গাছ b. roxburghii হইতে গুগ্‌গুল নির্যাস বাহির হয়।
গুচ্ছকণিশ—ধান্যবিং, রাগীধান। রাজনিং।
গুচ্ছকরঞ্জ—এক প্রকার করঞ্জ, পত্রস্নিগ্ধ, পুষ্পগুচ্ছাকার। কামিনী পুষ্পবৃক্ষকে কেহ কেহ বৈদ্যশাস্ত্রবর্ণিত গুচ্ছকরঞ্জ বলে। আবার কেহ আশশেওড়া বা আছুটীকে বলে। পর্যায়—স্নিগ্ধদল, গুচ্ছ-পুষ্পক, নন্দী, গুচ্ছী, সানন্দ, দন্তধাবন।
গুচ্ছদন্তিকা—কদলী। রাজনিং।
গুচ্ছপত্র—তালবৃক্ষ। রাজনিং।
গুচ্ছপুষ্প—১ ছাতিম, ২ অশোকবৃক্ষ। বৈদ্যকর।
গুচ্ছপুষ্পক—১ রাধাকরঞ্জ, ২ গুচ্ছকরঞ্জ।
গুচ্ছপুষ্পী—১ ধাতকীবৃক্ষ, ২ শিমূড়ীবৃক্ষ। ক্ষুপবিং।
গুচ্ছফল—১ রাধাকরঞ্জ, ২ রাজাদনী, ৩ নির্মালী ফল, ৪ গুচ্ছকরঞ্জবৃক্ষ।
গুচ্ছফলা—১ অগ্নিদমনী বৃক্ষ, ২ কাকমাচী, ৩ দ্রাক্ষা, ৪ কদলী।
গুচ্ছবধ্রা, গুচ্ছামূলিকা—গুণ্ডাসিনী তৃণ, চিপিটা লতা।
গুচ্ছাল—গুচ্ছমালতি, গন্ধখড়।
গুচ্ছাহ্বকন্দ—গুলঞ্চকন্দ, ফুলী।
গুচ্ছী—গুচ্ছকরঞ্জ। রাজনিং।
গুঞ্জ, গুঞ্জা—কুঁচ দ্রং। obrus precaforius. [সং রক্তগুঞ্জন, চূড়ামণি, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতকাম্ভোজী, সিতোচ্চটা] পর্যায়—কাকচিঞ্চি, কৃষ্ণলা, সজুষ্ঠা, রক্তিকা, কাকণন্তিকা, কাকাদনী, কাকতিক্তা, কাকজঙ্ঘা, শিখণ্ডিনী, সৌম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, ভিল্লভূষণা, বক্তা, শ্যামলচূড়া।
গুড়কামাই—[সং কাকাদমী] কাকমাচী দ্রং।
গুড়তৃণ, গুড়ব্রিণ্—ইক্ষু।
গুড়দারু—ইক্ষু।
গুড়দল-শিম (দেশজ)—Lablab purpurascens.

গুড়পুষ্প,—পুষ্পক—মধুকপুষ্প, মৌলগাছ।
গুড়ফল—পীলু বৃক্ষ।
গুড়মূল—১ অম্লমারিষ শাক, চাঁপা নটে, ২ ইক্ষু।
গুড়বীজ—মসুর।
গুড়শিগ্রু—লাল সজনে।
গুড়ালা—গুণ্ডাসিনী বৃক্ষ। ভাবপ্রং।
গুড়াশয়—আখ্‌রোট। রাজনিং।
গুড়ী—দেশজ বৃক্ষ।
গুড়ূচী, গুড়ুচি—[সং গুড়ূচী, অমৃতা, হিং গিলোয়, মং গুঠ্‌ঠবেল, গুং গলো, কং অমরদবল্লী, তেং তিপ্পতিগা, তিয়াতিজ্, গোধুচি, তাং সিন্দি, লকোদি, কাম্বং গুরুঞ্চী, কাং গিলাই, অং গিলোই, কোং গুলটাই, গুল্লাই] গুলঞ্চ, লতা বিং cocculus cordifolius, tinospora cordifolia. অনেক দিনের হলে মানুষের হাতের মত মোটা হয়। ছাল পাতলা। পাতা প্রায় পানের মত। ফুল হরিদ্রাভ শাদা, ফল মটর কলাইয়ের মত, পাকিলে লাল রং হয়। প্রকারভেদ—১ পদ্মগুড়ূচী, পদ্মগুলঞ্চ—[সং সুদর্শনা] c. tomentosa, t. t. পাতা অপেক্ষাকৃত গোল, পদ্মপাতার মত, তাহাতে তিনটা আঙুল, পাতা লোমশ। ২ কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী—সুপরিচিত ও সুলভ নহে। পর্যায়—বৎসদিনী, ছিন্নরুহা, তন্দ্রিকা, অমৃতা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, চক্রলক্ষণা, অমৃতবল্লী, জ্বরারি, শ্যামা, বরা, সুকৃতা, মধুপর্ণিকা, ছিন্নোদ্ভবা, অমৃতলতা, রসায়নী, সোমলতিকা, ভিষক্-প্রিয়া, কুণ্ডলিনী, বয়স্থা, নাগকুমারিকা, ছন্নিকা, চন্দ্রহাসা, মধুপর্ণী, সুধা, সোমা, মণ্ডলী, দেবনির্মিতা।
গুড়ূচ্যাদি—বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত একটি গণ—গুড়ূচী, নিম, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, চন্দন।
গুণ—Aloe, s. p. zeylanica.
গুণাঢ্যক—অঙ্কোট বৃক্ষ, ধলা আঁকড়া।
গুণ্ডালা—ক্ষুদ্র ক্ষুপবিং। পর্যায়—জলোদ্ভূতা, গুচ্ছ বধা, জলাশয়া।
গুণ্ডাসিনী—তৃণবিং। পর্যায়—গুণ্ডালা, গুড়ালা, গুচ্ছমূলিকা, চিপিটা, তৃণপত্রী, যবাসা, পৃথুলা, বিষ্টরা।
গুত্তিশেওড়া (দেশজ)—[সং নহ্যডুম্বুর] ঘটিশেওড়া, ficus heterophylla.
গুৎথ—দেধান।
গুৎথ পুষ্প—ছাতিম গাছ।
গুন্দ্র—[সং মুঞ্জ, ইং a kind of pen-read grass] শরপত্র দ্রং, sachharum sara. পর্যায়—পটরক, অচ্ছ, শৃঙ্গবেরাহ্বমূল।
গুন্দ্রমূলা—হোগলা।
গুন্দ্রা—১ হোগলা, ২ ভদ্রমুস্তক, ৩ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, ৪ গবেধুকা।
গুপ্তস্নেহ—ধলা আকড়া।
গুপ্তা—আলকুশী।
গুয়বাবুল—[হিং বিলাতী বাবুল, তাং ভেদ্দাবানা] গুয়েবাবলা Aeacia farnesiana.
গুরি—Quinquangular.
গুরুস—শ্বেতসরিষা ॥ রাজনিং ॥ [ক্রমশ।

॥ অপ্রকাশিত নক্সানাট্য ॥

স্বর্গত অসিতকুমার হালদার

সূত্রধার

(একজন ডানপিটে ছেলের সর্দার)

[আপনারা আজ এই নাট্যে দেখবেন এক পণ্ডিত দার্শনিক খুড়োকে। ইনি সামনের বস্তু দেখেন না। কেবল আকাশের দিকে তাকিয়েই পথ চলেন। সেদিন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে একটা রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের ধারে এগিয়ে গিয়ে চশমাটা নাকের উপর তুলে ধরে দেখছিলেন ঘড়ি—বিজ্ঞানসম্মত এবং বয়সোচিত ভাবে তাঁর চলা ঠিক হচ্ছে কি না স্থির করার জন্যে। এমন সময় একটা ডানপিটে ছেলে পিছন থেকে এসে সহসা তাঁর টাকমাথায় ধাঁ করে একটা হ্যাণ্ডবিল এঁটে দিয়ে পালাল'—তিনি তা' বুঝতেই পারলেন না। অন্যমনস্ক হ'য়ে আবার একদিন সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ি মনে ক'রে অন্যের অন্দরমহলে ঢুকে মার খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। এমনতর বহু ঘটনা অন্যমনস্কতার দরুণ তাঁর কপালে বহুবার ঘটেছে। খুড়োর জীবনের এম্‌নি বহু ঘটনা থেকে নির্বাচন করে পাঁচ মিনিটের অভিনয়-উপযোগী প্রহসনটির কবিশিল্পী আমাদের অসিতদা' রচনা করেছেন—তা' দেখুন, শুনুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। নমস্কার।] (সূত্রধারের প্রস্থান)

দৃশ্য

[বারান্দার উপর কার্পেটে মোড়া একটা ছোট্ট টেবিল; আর তার পায়ায় বাঁধা বাজে কাগজের ঝুড়ি—লেখার সরঞ্জাম টেবিলে রাখা। ফুলদানও একটি আছে। দেয়ালের উপর রঙ্গিন ক্যালেণ্ডার টাঙানো এবং তার পেরেকে চেন সমেত একটি সোনার ঘড়ি ঝোলান আছে। দার্শনিক খুড়োর বেশ বয়স হয়েছে—নাকে ভাঙা চশমা—ক্রমাগত নস্য নিচ্ছেন আর বারান্দায় পায়চারি করছেন। একটু বেশ 'নার্ভাস' প্রকৃতির লোক।]

দার্শনিক। (বারান্দায় পায়চারি করতে করতে) দেখ না? বেঘোটা এখন গেল কোথায়? বারোটা যে বেজে গেল, ব্যাটার হুঁস নেই। সময়ের যে কি মূল্য তা জানে না।

(এমন সময় অদূরে ঝি, বলায়ের মাকে তাঁর নিজের নাতনীকে কোলে করে আসতে দেখে)

বলি, ও বলায়ের মা—শোন, শোন।

ঝি। (সমীহের ভরে ঘোমটা টেনে সলজ্জভাবে প্রণাম করে) আজ্ঞে, বলুন।

দার্শনিক। এই ভাল, কি বলছিলুম ভুলে গেলুম।

দেখ, একটা খুব বড় তত্ত্বকথা আমার মাথায় এসেছিল—অবশ্য সেটা দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত—তা' হোক্ গে। তুমি একটু বোস বাছা, বলছি

(দাসী শিশুকন্যাকে বসিয়ে ঘোমটা আরো সংযত ক'রে টেনে নিয়ে নিজে বসল। দার্শনিক টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে নার্ভাসভাবে কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে বললেন)

দার্শনিক। দেখ বাছা, মানুষ এত ভোলে কেন? এ এক সমস্যা:—সে ত' গরু নয়, গাধা নয় তবুও সে ভুলে যায়? কারণ হচ্ছে এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন অবস্থা বর্তমান আছে, তা ত' জান বাপু?—এটা জানতে হ'লে ত' আর লেখাপড়া শিখতে হয় না? সবাই জানে। বর্তমানে আমরা আছি, কিন্তু ভূতকালে আমরা হয়ে যাই ভূতগ্রস্ত;—আর ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার। বুঝলে কি না? এটা তর্কের বিষয় নয়, ভাববার বিষয় মানুষের এই তিনকালের মধ্যে ভূত আর ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক! কি বল?

দার্শনিক গৃহিণী। (নেপথ্যে) ও বলায়ের মা—খুকুনকে নিয়ে গেলি কোথায়? তার নাওয়া-খাওয়ার সময় হ'ল যে? বৌমা ওর জন্যে যে হা-পিত্যেস ক'রে বসে আছেন?—কোথায় গেলি?

দার্শনিক। আঃ এ এবার কি উপদ্রব! আমার বক্তব্য বিষয়ের মর্মদ্বার উদ্ঘাটন করার পূর্বেই ওকে ডাক পড়লো?—কি উপদ্রব। কি উপদ্রব!

['স্বজন-সুত শরীরদানি বিত্তাচ্চলানি ক্ষণিকামিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসারসত্ত্বম্' শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে পায়চারি দিতে লাগিলেন।]

(দাসীর শিশুকে নিয়ে অন্দরে প্রবেশ)

রামু। (রামু চাকর দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে) বাবু ডাকছেন কি? তা' নাইবার জল, তেলের শিশিটা দেব না কি? বারোটা বাজল হুজুর।

দার্শনিক। আঃ কি উপদ্রব! কি উপদ্রব! গবেষণা করতে করতে মাথাস টাক ধরে গেল, কিন্তু এ ব্যাটাকে আদব-কায়দা আর শেখানো গেল না। (চাকরের প্রতি) যা, যা ঠাকরুণকে বল গে যা, একটা কূট তর্কের মীমাংসায় ব্যস্ত আছি।

(নমস্কারান্তে ভৃত্যের প্রস্থান)

[এমন সময় দার্শনিক খুড়োর বারান্দার সামনে রাস্তায় একদল নৃত্যরত ব্যক্তির আগমন।]

(নৃত্যগীতি করতে করতে)

কান মা বিঁড়ুয়া ডালি
হাঁত মা লোটুয়া থালি
মু মা পান-মশালি
ম্যায় চলু শ্বশুরাল্।
দুলাইন্ হামারিক্ আছি
জইসি কি কালী-মায়ী
জলদ্ ম্যা মিঠাই খায়ি
অব্ চলু শ্বশুরাল্॥
শাস উপাস্ রহি
আবতি না রোটওয়া খায়ি
খটিয়া পর্ লেইটি রহি
ম্যায় যাউ শ্বশুরাল্।
বিবি কিন ঘুঁংগুটকাড়ি
পহনি ছায় বঁড়িয়া শ্যাড়ি
ম্যায় যা কর্ আঁখি মারি
যব্ গয়ি শ্বশুরাল॥

প্রথম ব্যক্তি। (নেপথ্যে) যা' না। হাত-সাফাই ক'রে ফেল্।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (নেপথ্যে) না রে, বুড়োটা বসে আছে—ও, হবে না।

তৃতীয় ব্যক্তি। (নেপথ্যে) ওরে, তোরা দার্শনিক খুড়োকে চিনলি নে? ও লেখাপড়ায় মশগুল, বজ্রপাত হলেও নড়বে না।—সোনার ঘড়িটা চেয়ে আছে আমাদের দিকে—হাতছানি দিচ্ছে—সাফাই কর।

[প্রথম লোকটা টপ করে বারান্দায় উঠে নিমেষেই ক্যালেণ্ডারের উপর থেকে দার্শনিকের ঘড়িটা সরিয়ে ফেলে সবাই তারা পালাল]

দার্শনিক। (ব্যাপার দেখে চমকে উঠে) ওরে রামু—ওরে রামু হতভাগা! ব্যাটারা এখানে সবাই মিলে নাচগান করছিল ত' বেশ,—এ আবার কি উপদ্রব করলে বলত? সোনার ঘড়িটা যে স্বর্গত শ্বশুরমশাইয়ের দেওয়া। তাঁর প্রপিতামহকে নাকি জন কোম্পানীর দপ্তরের বড় সাহেব বিলাত থেকে এনে উপহার দিয়েছিল।

(রামুর প্রবেশ)

রামু। দেখ্ বাপ্ধন, ঘড়িটা আমার চোখের উপর থেকে ছোবল মেরে নিয়ে গেল? কি নির্লজ্জ! সোনার ঘড়ি ওটা, নিয়েই বা কি করবে বলত? তার চেয়ে যদি পয়সা চাইতো ত' দু'দশটা না হয় নিয়েই দিতুম—খেয়ে বাঁচতো। কি উপদ্রব! কি উপদ্রব! গবেষণা আর করতে দিলে না, ব্যাটারা!

(ঠিক সেই সময় দার্শনিকের গৃহিণী নেপথ্যে একটি আগন্তুককে বলছেন)

হ্যাঁ-হ্যাঁ। কি চাই তাই বলুন? এত ভণিতা করতে হবে না।

(নেপথ্যে ভদ্রলোকটি বলছেন)

আজ্ঞে, বাড়ির কর্তা—অর্থাৎ বিখ্যাত দার্শনিক খুড়ো মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

নেপথ্যে গৃহিণী। আমিই বাড়ির কর্তা। যা'

বল্‌বার থাকে আমার বক্তব্য। দার্শনিক মহাশয়ের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।

(নেপথ্যে ভদ্রলোক)। না, আর কিছু নয়, সেদিন খুড়ো মশাই গিয়েছিলেন বাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ি; ভুলক্রমে খুড়ো আল্‌না থেকে তাঁর রেশমী চাদরটা নিজের মনে ক'রে কাঁধে ফেলে এনেছেন। তাই...

(নেপথ্যে গৃহিণী সজোরে দরজা বন্ধ করে)। তা বেশ তাই যদি হয় ত' রামুকে দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব'খন বাচস্পতি মশাইকে—আপনি যান।

দার্শনিক। (নেপথ্যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে স্ত্রীর কথোপকথন শুনে) স্বয়ং কালিদাসই ত' বলে গেছেন,—

অশ্বপ্লুতং মাধবগর্জিতঞ্চ
স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্যভাগ্যম্
অবর্ষণং চাপ্যাতিবর্ষণঞ্চ
দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ।

স্ত্রীলোককে প্রশয় দিতে নেই। দেখ না, শাস্ত্রী মশাই এলেন, গিন্নি তাকে দিলেন খেদিয়ে।

(এমন সময় খবরের কাগজ হাতে গৃহিনীর প্রবেশ)

গৃহিনী। কৈ গো, মনোযোগ দিয়ে কি সব মাথা মুণ্ডু লিখ্‌ছ? খবরের কাগজে দেখ ত' সোনার দাম (১) বাজারে এখন কি বলছে?

(খবরের কাগজ দেখে)

দার্শনিক। ওগো—কাগজে লিখছে ঘি-তেলে ভেজাল ঢুকেছে—'দাল্‌দায়' ভিটামিন নেই (২)। এখন করা যায় কি? বেশ, তাহ'লে আমি বলি, তেল-ঘি বাদ দিয়ে দাও, জলেই লুচি ভাজ, কি বল?

(কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে)

গৃহিনী। হায় কপাল! জলে কি করে লুচি ভাজা হবে? সিদ্ধ হয়ে যাবে যে? (প্রস্থান)

[এমন সময় একটা লোককে পুলিশ কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়ি দিয়ে আন্‌লে দার্শনিক খুড়োর কাছে সনাক্ত করার জন্যে]

(দার্শনিককে সেলাম করে আসামীকে দেখিয়ে)

পুলিশ। হুজুর, এহি আদ্‌মির কাছে আপনার নাম লিখাহুয়া ঘড়ি মিল্‌লো—সনাক্ত করনেকো লিয়ে এনেছি হুজুর।

(চশমা নাকের উপর থেকে তুলে ধরে)

দার্শনিক। এঁ্যা—এ্যা—এই লোকটাই ত' মনে হচ্ছে?

(চশমা ভাল করে আবার নাকে এঁটে নিয়ে) হ্যাঁরে ব্যাটা,—চুরি করতে গেলি কেন? কথামালায় পড়িস্ নি? 'না-বলিয়া কোনো দ্রব্য লইলে, চুরি করা হয়?' চাকরী ক'রে উপার্জন করেও ত' খেতে পার্‌তিস?

চোর। আজ্ঞা কর্তা, তার চেষ্টাও করেছি। এই গত ছ'য় মাস ছ'জায়গায় কাজ করেছি—তারা আমায় ছাড়িয়ে দিয়েছে।

দার্শনিক। কেন বাপু? তোমার নিশ্চয় দোষ আছে। নইলে ছ'মাসে ছ'জায়গায় কাজ করেছ আর ছেড়েছ কেন বলত?

চোর। কি করব বাবু, বাজার থেকে রোজ আট-আনা মাত্র ডিয়ারনেস্ য়্যালাউন্স বাবদ সরাতাম—সেটা ওরা দিতো না ব'লে। তাতে আবার চোটে লাল। —আমায় বলে কি-না চোর?

দার্শনিক। নিশ্চয় এ'ছাড়া আরো বহু অপগুণ তোমার আছে, না?

চোর। তারপর বাবু, আরো এক জায়গায় এক কর্তা দিলেন গুণে ছ'আনা পয়সা—খোকনবাবুর খাতা কিনতে বাজার থেকে। দু'আনা নিজের পকেট থেকে তাতে গুঁজে 'হম্‌দ কা লেড়াক' সিনেমা দেখে যেই রাত্তিরে দশটায় ফিরেছি—আর অম্নি আমায় দিলেন অর্ধচন্দ্র। বাবু কি আর বলি আপনাকে। (বলেই চোখ দু'হাত দিয়ে ঢেকে হাউ হাউ করে কান্নার ভাণ)

পুলিশ। হুজুর ইয়ে পাক্কা চোর হ্যায়—ইস্‌কা জেব্‌সে আপ্‌কা ঘড়ি মিল্‌লো—কবুল নেহি কর্‌তা হ্যায়। (বলেই চোরকে বেদম চড়-চাপড় দিতে সুরু করলে)

দার্শনিক। (ব্যাতিব্যস্ত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পুলিশকে বাধা দিয়ে) আ-হা, কর কি—কর কি? কেষ্টর জীব—মেরো না ওকে। আমি জামিন রইলাম—কান ধ'রে উঠ্‌বোস করিয়ে ছেড়ে দাও।

(পুলিশ চোরকে তথাকরণ)

দার্শনিক। (চোরের প্রতি) দেখ্ হতভাগা, এরূপ অপহরণ বিদ্যে ছেড়ে দে। মানুষ হ' মানুষ হ'। স্বোপার্জিত অন্নে স্ত্রী পুত্র পালন শাস্ত্রে লেখে। নইলে উচ্ছন্নে যা—উচ্ছন্নে যা।

(পুলিশ দার্শনিককে তাঁর সোনার ঘড়িটা ফেরৎ দিয়ে সেলাম করে প্রস্থান করলে—চোর পালাল]

রামু। (প্রবেশ ক'রে) হুজুর, চানের জল দেওয়া হয়েছে।

(দার্শনিকের প্রস্থান)

বাবুর অসীম দয়া, অসীম দয়া চোরের উপরেই দেখ্‌ছি হ'ল। কেবল গিন্নিমার দয়া এই অধম ভৃত্যের প্রতি যদি হ'তো ত' এই ক্ষীণ, অধম ক্ষীর ননী খেয়ে বেশ একটু—হ্যাঁ হ্যাঁ—পুষ্ট হ'তো। সবই কপাল রে দাদা—সবই কপাল।

যবনিকা পতন

১। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মুরারজি দেশাই সোনার মূল্য তামায় পরিণত করার বহু পূর্বে লেখা নাট্য—লেখক।

২। দালদায় ভিটামিন পরে যোগ করা হয়—তার আগে লেখা এই নাট্য—লেখক

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাতাসী মঞ্জিল

[৺নটবর মিত্তিরের ডায়েরি থেকে]

ছুটি মিলিল না। যে ঘরে চোখ মেলিয়াছিলাম সেই ঘরেই রাতটা কাটাইতে হইবে, ছুটি মিলিবে 'কাল ভোরে'। 'আজ ভোরে' ছাম্মুদা' আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন বাদ্‌শা পালোয়ানের কুস্তির আখড়ায়, সন্ধ্যার অন্ধকার আসিবার আগেই আমাকে বাতাসী বিবির এই আস্তানায় রাখিয়া ছাম্মুদা'কে একা ফিরিয়া যাইতে হইল। ছাম্মুদা' অভয় দিয়া গেলেন 'কোন ভয় নেই', কিন্তু তাঁহার সেই অভয়বাণীর সুর শুনিয়া কেমন যেন মনে হইতে লাগিল। ক্ষমতা থাকিলে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গেই নিয়া যাইতেন, একা ফিরিতেছেন শুধু বাতাসী বিবি না ছাড়িলে তাহার কবল হইতে আমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া। মনে হইল পরিস্থিতিটা যে এরূপ দাঁড়াইবে বা দাঁড়াইতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই এবং বিধাতার প্যাঁচে পড়িয়া আমার এই অস্বস্তিকর অবস্থার কারণ হইয়া তিনি আফসোস করিতেছেন।

ছাম্মুদা' চলিয়া গেলেন। বাদ্‌শা পালোয়ানও বিদায় নিয়া গেলেন, তাঁহাকে এ বেলাও কুস্তির আখড়ায় যাইতে হইবে, সাগরেদদের কুস্তির তদারক করিতে এবং তালিম দিতে। তাঁহার আখড়ায় দু'বেলাই কুস্তির চর্চা হয়; ভোরে বেশি, বিকালে-সন্ধ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। বাদশা পালোয়ান চলিয়া গেলে আমার কাছে পাইলাম বৃদ্ধ মালী বোমভোলা পাঠককে। তিনি আসিলেন হাতে একটি চমৎকার ফুলের তোড়া লইয়া। তোড়ার মাঝখানে কয়েকটি আশ্চর্য গোলাপ, আর সেই কয়েকটি গোলাপকে ঘিরিয়া নানারকম ফুলের বিচিত্র সমারোহ। তোড়ায় ফুলের সুগন্ধ বাস্তবিকই নাকে আসিয়া পৌঁছিতেছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মনে হইতেছিল যেন ফুলের রূপে যেমন আমার চোখ জুড়াইতেছে, ফুলের গন্ধেও বুঝি তেমনই নাক জুড়াইয়া গেল। মনে হইল, এতগুলি ফুলের মিলিত আবির্ভাবে এই অপরিচিত ঘরের আবহাওয়াটাও যেন কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লাভ করিয়াছে। এখানে এ সময়ে এমনভাবে এত ফুলের আগমন আশা করিতে পারি নাই। আমি 'পালোয়ান-এ্যাটর্নী', এ্যাটর্নীগিরি করি আর কুস্তি লড়ি, এক পেশা আর এক নেশা যেন একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে; ফুলে যে এত যাদু আছে তাহা আগে কখনও বুঝি নাই, ফুলের কথা কখনও ভাবি নাই। বাতাসী বিবির ডেরায় বন্দী অবস্থায়—বন্দী ছাড়া আর কি?—ফুলের মাধুরী এ জীবনে প্রথম খেয়াল করিলাম।

বাতাসী বিবির বাগানের মালী এই বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠক, ইহাও কম আশ্চর্য মনে হইল না। লোকটির মাথায় চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা এবং পিছন দিকে একটি টিকি। টিকিটি বেশি লম্বা নহে, নিজের অস্তিত্ব জাহির করিবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুই। বাদশা পালোয়ান যদি আমাকে মিছা কথা বলিয়া না থাকেন—এবং মিছা কথা কেনই বা তিনি বলিবেন—তাহা হইলে টিকিওয়ালা বৃদ্ধ মালী এই বোমভোলা পাঠক বাতাসী বিবির অতিপ্রিয়। লোকটির মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল নিজের নিজস্বতা পুরাপুরি বজায় রাখিয়াই তিনি বাতাসী বিবির মালীগিরির চাকুরিতে পরমানন্দে বহাল আছেন, মনের ভিতরে কোনরকম অতৃপ্তি বা অস্বস্তির ভাব নাই।

বোমভোলা পাঠকের মুখে শুনিলাম এই আস্তানায় বাতাসী বিবি

যতদিন থাকে, প্রাত্যহিক সন্ধ্যায় তাহার জন্ত এমনই একটি ফুলের তোড়া তৈয়ারি করিয়া দেওয়া মালী বোমভোলা পাঠকের অবশ্যকর্তব্য।

এই তোড়াটিও অন্যান্য দিনের মতো বাতাসী বিবির জন্যই বানানো; কিন্তু বাতাসী বিবিরই বিশেষ হুকুমে তোড়াটি তাহার মেহমান অর্থাৎ অতিথির সম্মানার্থে এ ঘরে আনা হইয়াছে। আমার শয্যার অনতিদূরে একটি দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি;—মূর্তিটি কি জিনিষের তৈয়ারি তাহা বলিতে পারি না—তাহার হাতে একটি ফুলদানী। সেই মূর্তিটিকে আমার আরও কাছে টানিয়া আনিয়া বোমভোলা পাঠক তাহার হাতের ফুলদানীতে সেই ফুলের তোড়াটি সযত্নে রাখিয়া দিয়া আমার সামনে বাদশা পালোয়ানের পরিত্যক্ত মোড়াটির উপর বসিয়া পড়িলেন।

এইবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সহজ সুযোগ পাইলাম। দেখিয়া বুঝিলাম বৃদ্ধের বয়স বেশি হইয়াছে, কিন্তু পাতলা ছিপছিপে হইলেও শরীরে বার্ধক্যের ছাপ এখনো দেখা দেয় নাই। অর্থাৎ যে বয়সে অনেকে জরাগ্রস্ত হইয়া থাকেন, সে বয়সে বোমভোলা পাঠককে জরা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার গায়ের চামড়া ঢিলে হয় নাই, মুখের চামড়া কুঞ্চিত হয় নাই। বুঝিতে পারিলাম বুড়া বয়সে দেহটাকে তিনি বেশ তোয়াজেই রাখিয়াছেন, মনটাকেও যথাসাধ্য উদ্বেগমুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন।

কুখ্যাত দলের নেত্রীর ডেরায় বাধ্যতামূলক আতিথ্যে যে নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম, এই লোকটির আগমনে সেই অস্বস্তির বোঝা যেন একটু হাল্কা হইল। মনে হইল যেন একান্ত অপরিচিত পরিবেশে হঠাৎ একজন কিঞ্চিৎ পরিচিত মানুষের সাক্ষাৎ পাইলাম। এক সাধারণ মালীকে 'আপনি' বলিব, না 'তুমি' বলিব, ঠিক করিতে একটু সময় লাগিল। তারপর ঠিক করিলাম তিনি বয়োবৃদ্ধ, তা ছাড়া পাঠক ব্রাহ্মণ, অতএব অন্তত এই দুই কারণে ইহাকে 'আপনি' সম্বোধনেই মর্যাদা দিব। আরও ভাবিলাম ইহাকে এরূপ মর্যাদা দান শুধু আমার শোভন কর্তব্যই নহে, এ অবস্থায় আমার পক্ষে একটি বুদ্ধির কাজ বা 'পলিসি'-ও বটে। ইহাকে খুশি করিয়া মন ভিজাইতে পারিলে ইহার নিকট হইতে অনেক কিছু জানিতেও পারা যাইবে। সোজাসুজি প্রশ্ন করিলে ইনি প্রশ্ন এড়াইয়াও যাইতে পারেন, তাই কৌশলে, ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিয়া পরোক্ষ আভাস, ইঙ্গিতে, অনুমানের সহায়তায় অনেক কিছু বুঝিয়া নিতে হইবে।

একটি আশ্চর্য জিনিষ লক্ষ্য করিলাম, বৃদ্ধ বামভোলা পাঠকের আচরণে। বাদশা পালোয়ান বলিয়াছিলেন, 'মনে করুন আপনি হাসপাতালে আছেন।' আমিও তাহাই মনে করিতেছিলাম; অন্তত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম আকস্মিক আঘাতে আহত হইয়া হাসপাতালের বিছানায় আশ্রয় নিয়াছি, আমি হেকিম সাহেবের 'পেসেন্ট' অর্থাৎ রোগী। কিন্তু বোমভোলা পাঠক আসিয়া

প্রশ্নমাত্র করিলেন না আমি এখন কেমন আছি। ভাবটা যেন আমার কিছুই হয় নাই, স্বেচ্ছায় বিছানায় দেহ এলাইয়া দিয়া আমি একটু আরাম করিতেছি মাত্র, অতএব কুশল প্রশ্ন অবান্তর। এখন এই কথাটা দিনপঞ্জীতে লিখিবার সময়ে মনে হইতেছে এই লোকটি ফুলের তত্ত্ব, বিশেষ করিয়া আহত বা অসুস্থ মানুষের মনের তত্ত্ব ভালই বোঝেন, তাই ঐ ফুলের তোড়াটির সাহায্যে আমার মনটা আমার দিক হইতে অন্যদিকে সরাইয়া নিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, 'এই তোড়াটি আমার এখানে আসিয়া পড়িল, বাতাসী বিবির জন্য আরেকটি বানাইতে হইবে না?'

বোমভোলা পাঠক বলিলেন 'না। ঐ তোড়া দিনে একটির বেশি তৈয়ারি করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। বাতাসী চাহিলেও পাইত না; বাতাসী চাহেও নাই।'

বাতাসী! 'বিবি' শব্দটার উচ্চারণ পাঠকের পক্ষে কি অনাবশ্যক? প্রশ্নটি মনে জাগিলেও মুখে আনিলাম না। প্রশ্ন করা সমীচীন হইবে কি না, সে বিষয়ে মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল।

পাঠক আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, প্রত্যহের এই অভ্যস্ত আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াই বাতাসী বিবি অতিথি-আমাকে বিশেষ সম্মান দিয়াছে। ফুলের তোড়ার নেশা তাহার এমনই প্রবল যে, শিয়রের কাছে ফুলের তোড়া রাখিয়া সে ঘুমায়। কে জানে তাহার শিয়রের পাশে প্রতি রজনীর মতো অভ্যস্ত ফুলের তোড়াটি না থাকায় আজ রজনীতে তাহার ঘুম হইবে কি না।

'আজ রজনী'-তে বাতাসী বিবির অনিদ্রা সম্ভাবনার কথা বোমভোলা পাঠক মহাশয় যেভাবে বলিলেন, তাহাতে আমি ঈষৎ শংকিত হইয়া উঠিলাম। যে ফুলের তোড়াটির অনুপস্থিতির দরুণ বাতাসী বিবির ঘরে বাতাসী বিবির ঘুম হইবে না, ঠিক সেই তোড়াটিই এই ঘরে আমার অদূরে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে ঘুমাইতে দিবে কি? তোড়াটি না থাকিলেই বা কি হইত? তাহাতেও আমার ঘুমের কিছু সুবিধা হইত কি? আর, আমাকে মর্যাদা দিবার জন্য বাতাসী বিবির নিজেকে অভ্যস্ত ফুল-বিলাস হইতে বঞ্চিত করিবারই বা কি কারণ? আমি এমন কি এক অসাধারণ ব্যক্তি?

এই প্রশ্ন আমি বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠককে করিলাম। পাঠক মহাশয় বলিলেন, 'বাবুজি, আপনাকে তবে সব কথা খুলিয়াই বলি। বাতাসীকে আমি এত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন হইতে কখনো দেখি নাই, যদিও অনেকদিন ধরিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি। বাতাসী বলিতেছি বলিয়া বিস্মিত বোধ করিবেন না। বাতাসী বিবির দল প্রকাণ্ড; এই প্রকাণ্ড দলের অন্য সবাই তাহাকে বিবি বলিয়া সমীহ করে, ভয় করে। অবশ্য শ্রদ্ধা করে এবং ভালও বাসে। কিন্তু দলের দুই বড় বৃদ্ধ, হেকিম সাহেব আর আমি, আমাদের দুইজনের কাছে সে বিবি নহে, বাতাসী। এই বাতাসীকে আজিকার মত এমন বিচলিত আর কখনো দেখি নাই। আপনি আজ যে ঘরে যে বিছানায় শুইয়া আছেন, সেই ঘর সেই বিছানা যাহার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সে কে অনুমান করিতে পারেন?'

চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

বোমভোলা পাঠক আমার মনে চমক লাগাইয়া বলিলেন, 'স্যামসন।'

'স্যামসন????'

'স্যামসন।' যাহার কাপুরুষোচিত অন্যায় আক্রমণে এবং অখেলোয়াড়োচিত ভয়ানক এবং যে আইনী আঘাতের ফলে আপনি আজ এখানে। না না, আপনি অস্বস্তি-চঞ্চল হইবেন না। ঐ বিছানা স্যামসনের ব্যবহৃত নহে, আনকোরা নতুন। বাতাসীর সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ হইতেই স্যামসনের এখানে ঠাঁই নিবার কথা ছিল। কিন্তু কি হইতে কি হইয়া গেল। হতভাগ্য স্যামসন।'

আমি বলিলাম, 'হতভাগ্য কেন? একটা রাতের ব্যাপার বই তো নয়। কাল ভোরেই তো আমি চলিয়া যাইব, তারপরেই তো স্যামসন—'

বোমভোলা পাঠক বলিলেন, 'এখানে স্যামসনের আর কখনো স্থান হইবে না, বাদশা পালোয়ানের আখড়াতেও নয়।'

আরেকবার চমকাইয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'কেন?'

বোমভোলা পাঠক বলিলেন, 'বাতাসীর বিচার। এক মুহূর্তের শয়তানীর ভুলে স্যামসন নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিয়া বসিয়াছে।'

'কি শয়তানী? কি ভুল স্যামসনের?'

'আপনার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত কুস্তিতে সুবিধা করিতে না পারিয়া আপনার দুই চোখে মাটি ছুড়িয়া দিয়া আপনার অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগে পিছন হইতে অন্যায় ভাবে আপনার ঘাড়ের একটি মর্মস্থানে আঘাত করে। যে আঘাতে আপনি—'

আমি বলিলাম, 'বাদশা পালোয়ান বলিয়াছিলেন বটে যে ঐ আঘাতে আরেকটু হইলেই আমার মৃত্যু হইতে পারিত। বরাত জোরে বাঁচিয়া গিয়াছি।'

'তাই স্যামসনও বাঁচিয়া গিয়াছে। আপনার মৃত্যু হইলে সেই অপরাধে স্যামসনকেও মরিতে হইত।'

'আদালতের বিচারে ফাঁসিতে?'

'না। কুস্তি লড়িতে গিয়া চোট লাগিয়া মারা গিয়াছেন, ইহা হত্যাকাণ্ড বলিয়া গণ্য হইত না, দুর্ঘটনা বলিয়াই বিবেচিত হইত। স্যামসনকে মরিতে হইত বাতাসীর বিচারে, তার উপর কোনো আপীল চলিত না এবং দুনিয়ার কোনও শক্তির সাধ্য ছিল না স্যামসনকে বাঁচাইবার।'

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'কি আশ্চর্য!'

বোমভোলা পাঠক বলিলেন, 'বাবুজি, বাতাসীকে চিনিলে আপনি ইহাকে আশ্চর্য বলিতেন না। বাতাসী একবার যাহার মৃত্যুদণ্ড মুখে উচ্চারণ করে, তাহার আর রক্ষা নাই। স্যামসনের বেইমানি-আঘাতে আপনার মৃত্যু হইলে বাতাসীর আদেশে হয় তো আমিই স্যামসনকে সাবাড় করিতাম।'

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া বিস্ময় এবং কৌতুক বোধ করিলাম। বলিলাম, 'কিরূপে?'

'আপনাকে স্যামসন যে কায়দায় আঘাত করিয়াছিল, অমনি আঘাতে।'

'স্যামসন বাধা দিত না?'

'সুযোগ পাইত না। সুযোগ দিতাম না। এক আঘাতেই সাবাড় করিতাম।' বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার ডান হাতের পাঞ্জাটি তুলিয়া
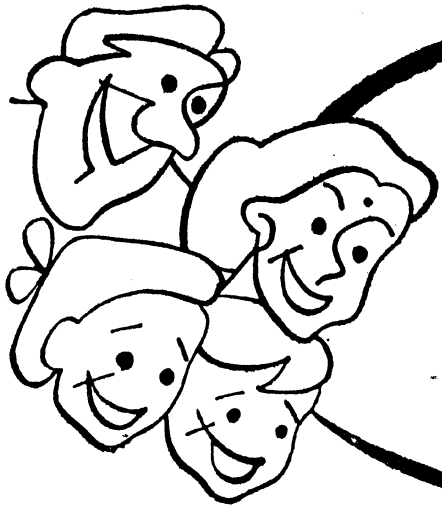
ফিলিপ্স

আদি

মিল্ক অফ্

ম্যাগনেসিয়া

পরিবারের সকলের
পক্ষেই আদর্শ

বিরেচক-অম্লনাশক

এই নিশ্চিত উপায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হচ্ছে!

কেবলমাত্র একটিই খাঁটি ফিলিপ্স মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়া আছে—সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক যে অম্ল-নিরোধক কোষ্ঠ পরিষ্কারক ওষুধটি জানেন ও ব্যবহার করেন। কোষ্ঠকাঠিন্য ও তার উপসর্গ থেকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্যে মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়ার চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।

[illegible] রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী: দে'জ মেডিকেল স্টোর্স (ম্যানুঃ) প্রাঃ লিঃ

IPB/MOM—L-1/64/

হাওয়ার আঘাত করিয়া দেখাইলেন কিভাবে ঘাড়ের কোন্ মর্মস্থানে মারাত্মক আঘাত করিয়া স্যামসনকে তিনি হত্যা করিতেন।

বলিলাম, 'আপনি ব্রাহ্মণ তো?'

পাঠক বলিলেন, 'কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়াটা এমন কি অপরাধের, যে দরকার হইলে প্রাণ নিতে বা প্রাণ দিতে দ্বিধা করিব? বাবুজি, এই দুই হাতে এখন ফুলের চাষ করি, কিন্তু এককালে এই দুই হাতে অনেক মানুষের প্রাণ নিয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখনও নিতে পারি।'

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, কিন্তু অবিশ্বাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। স্বয়ং বাতাসী বিবির দলে যে ব্যক্তির সমাদরে স্থান হইয়াছে, নরহত্যা তাহার পক্ষে অসম্ভব না হওয়াটাই তো বরং বেশি স্বাভাবিক।

আমাকে স্তব্ধ দেখিয়া পাঠক বলিলেন, 'বাবুজি হয় তো ভাবিতেছেন ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া আমি নরঘাতী চরিত্র কিরূপে পাইলাম। তবে বলি শুনুন। আজ আমাকে বৃদ্ধ দেখিতেছেন, কিন্তু চিরদিন এমন ছিলাম না। যখন বালক ছিলাম তখন সাহসী ছিলাম, ডানপিটে ছিলাম, কিন্তু কোনো মানুষকে হত্যা করিবার কথা ভাবিতেও পারিতাম না। এমনি সময় একদিন শুনিলাম ইংরাজের হুকুমে ফাঁসি হইবে মঙ্গল ভাইয়ার।'

'মঙ্গল ভাইয়া কে, পাঠকজি?'

'ব্যারাকপুর সিপাহী পল্টনের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে।'

বুঝিলাম বোমভোলা পাঠক বলিতেছেন সুদূর অতীতের কথা, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা। সিপাহী বিদ্রোহকে যদি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশ বা অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বপ্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে। আজ লিখিবার সময়ে ইতিহাস-গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিতেছি ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ বিকালবেলা ব্যারাকপুর শিবিরের সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রথম গুলী ছোঁড়েন এবং তাঁহার গুলীতে দুইজন ইংরাজ—একজন লেফটেন্যান্ট এবং একজন সার্জেন্ট মেজর—আহত হন। আহতদের মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু সিপাইদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মন হইতে বিদ্রোহ করিবার দুঃসাহস চিরতরে দূর করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিচারে সিপাই মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির হুকুম হয়।

১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিল ভোর সাড়ে পাঁচটায় ব্যারাকপুর ছাউনির কুচকাওয়াজের মাঠে মঙ্গল পাণ্ডেকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ছাউনির সমস্ত সৈন্যকে উপস্থিত থাকিয়া এই ফাঁসি দেখিতে বাধ্য করা হয়। ফাঁসিকাঠে শহীদ হইবার সময় মঙ্গল পাণ্ডের বয়স হইয়াছিল ছাব্বিশ বছর দুই মাস নয় দিন।

পুঁথির পাতায় স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপার অক্ষরে পড়িয়াছি। কিন্তু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলাম যখন বেলাশেষে আমার সামনে উপবিষ্ট বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠক সেই সুদূর অতীতের নির্মম করুণ ভোরবেলার কথা স্মরণে আনিয়া মঙ্গল পাণ্ডের শহীদ হইবার দৃশ্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সুদূর অতীতের সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটি যেন আমার চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া উঠিল।

'ছাউনির সৈন্যদের সঙ্গে মিশিয়া আমিও মঙ্গল ভাইয়ার ফাঁসি দেখিলাম।' বলিলেন বোমভোলা পাঠক। 'মাথা উঁচু করিয়া, বুক ফুলাইয়া ইংরাজের অন্যায় বিচারের মুখে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল আমাদের বড় আদরের বড় গর্বের মঙ্গল ভাইয়া। ফাঁসিতে ঝুলিয়া পড়িবার আগে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল: 'ভাই সব, তোমাদের সবার চোখের সামনে মরিতে পারিলাম, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি রক্ত দিয়া গেলাম। এই রক্তের কথা তোমরা ভুলিও না।'

বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠকের কণ্ঠে মহতী সভার বক্তৃতার মতো চীৎকার বা উল্লাস নাই, উন্মাদ উত্তেজনা নাই, আছে বহুদূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের গাম্ভীর্য। আমি অভিভূত হইলাম। মঙ্গল পাণ্ডে এতদিন আমার কাছে ইতিহাস-গ্রন্থের পাতায় ছাপা একটা নামমাত্র ছিল; বাতাসী বিবির আস্তানার এই নিরালা ঘরে বোমভোলা পাঠকের আবাহনে সেই নামটি যেন জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিল। আমি যেন চোখের সামনে দেখিতে পাইলাম, সেই সুদূর অতীতে ব্যারাকপুরে কুচকাওয়াজের মাঠ, সেই মাঠের ফাঁসিমঞ্চে ইংরাজের হুকুমে ইংরাজের তত্ত্বাবধানে ফাঁসি হইতেছে ভারতের প্রথম বিদ্রোহী শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের। মঙ্গল পাণ্ডের দুটি পা এবং দুটি হাত দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা। বিদেশীর হুকুমে মঙ্গল পাণ্ডের গলায় ফাঁসি পরাইতেছে এদেশী দুটি হাত।

ফাঁসিমঞ্চের চারিদিকে মঙ্গল পাণ্ডের সহকর্মী এদেশী সিপাইদের ভিড়, বিদেশীর আদেশে বাধ্য হইয়া তাহারা মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি দেখিতেছে। তাহাদের ভিড়ে দাঁড়াইয়া আছে মর্মাহত, মলিনমুখ বালক বোমভোলা পাঠক। এই অতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, বন্ধুকে এই বীভৎস মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার সমবেত সাহসও তাহাদের নাই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাগরপারের মানুষের অঙ্গুলি হেলনে এদেশী বহু সিপাহীর ভিড় প্রভাতী সূর্যের আলোকে খোলা ময়দানে এক সহকর্মীর ফাঁসি দেখিতেছে। প্রত্যেকের বুকের ভিতরে হাহাকারের ঝড় বহিতেছে, কিন্তু সবাই ভীত, নিষ্ক্রিয়, হতভম্ব। মুষ্টিমেয় বিদেশীরা এই নেটিভ সেপাইগুলির অসহায় হায় হায় ভাব এবং দুঃসহ মর্মযাতনার দৃশ্য পরম পুলকে উপভোগ করিতেছে—নেটিভগুলি দেখুক সাদা মনিবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তার জন্য কি শাস্তি পাইতে হয়!

মঙ্গল পাণ্ডে নির্ভীক, বলিষ্ঠ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, 'ভাই সব! আমি রক্ত দিয়া গেলাম। এই রক্তের কথা তোমরা ভুলিও না।' তারপর বিদেশী পায়ের বুটের এক লাথিতে তাহার পায়ের তলা হইতে শেষ অবলম্বন সরিয়া গেল। অনন্ত শূন্যে ঝুলিয়া পড়িয়া মঙ্গল পাণ্ডে বীভৎস মরণ-দোলায় দুলিতে লাগিল। এদেশী জনতা সমবেতকণ্ঠে হাহাকার করিয়া উঠিল। বিদেশী চক্ষুগুলি বিজয়ের দাম্ভিক পুলকে উজ্জ্বল।...

অদূরে নারীমূর্তির হাতের ফুলদানীতে বাতাসী বিবির জন্য তৈয়ারি ফুলের তোড়ার মধ্যমণি রক্ত-গোলাপগুলির দিকে তাকাইয়া মনে হইল যেন শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের বুকের রক্তেই ঐ গোলাপগুলি অমন লাল হইয়া উঠিয়াছে।

'বাবুজি!'

জাগিয়া জাগিয়া দিবাস্বপ্ন দেখিতেছিলাম ; সহসা বোমভোলা পাঠকের ডাকে স্বপ্ন ভাঙিল।

'কি ভাবিতেছিলেন বাবুজি ?'

'ভাবিতেছিলাম মঙ্গল পাণ্ডের কথা।'

বোমভোলা পাঠক বলিলেন, 'মরিবার আগে মঙ্গল ভাইয়া তার নিজের হাত হইতে খসাইয়া একটি স্মৃতিচিহ্ন আমাকে দিয়া গিয়াছিল, বাবুজি। সেই হইতে আজ পর্যন্ত সেটি আমার হাতে বাঁধা আছে, একটি দিনের তরেও তাহাকে হাতছাড়া করি নাই।'

অত্যন্ত কৌতুহল হইল। বলিলাম, 'সেটি কি, পাঠকজি ?'

'এই মঙ্গলকবচ।' বলিয়া গায়ের চাদর সরাইয়া ডান হাত বাহির করিয়া দেখাইলেন। সেই হাতে একটি চ্যাপ্টা চতুষ্কোণ কবচ বাঁধা রহিয়াছে। ভারতের প্রথম বিদ্রোহী শহীদ ৺মঙ্গল পাণ্ডের দুর্লভ স্মৃতিচিহ্ন, অর্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিক পুরাতন কবচ।

পাঠকজির মুখে শুনিলাম সিপাহী পল্টনে নাম লিখাইবার আগে একজন তন্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জ্যোতিষীকে দিয়া তৈয়ারি করাইয়া এই মঙ্গলকবচ হস্তে ধারণ করিয়াছিল মঙ্গল পাণ্ডে। এই কবচ অসাধারণ শক্তিশালী, বিধিমতে ধারণ করিলে—শাস্ত্রে বলে—ধারণকারীকে কোনও অমঙ্গল স্পর্শ করিতে পারে না। ধারণ করিবার কতদিনের মধ্যে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হইয়াছিল, বোমভোলা পাঠকের হাতে বাঁধা সেই মঙ্গল কবচটির দিকে তাকাইয়া সেই প্রশ্নটি মুখে উচ্চারণ করিতে মন সরিল না। ভাবিলাম সেই প্রশ্নে ব্যঙ্গ ও অবিশ্বাসের সুর শুনিয়া বোমভোলা পাঠক বিষণ্ণ বা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। অথবা হয় তো মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি-মৃত্যুকে তাঁহার জীবনে অমঙ্গল বলিয়া মনে করেন নাই বোমভোলা পাঠক।

পাঠক বলিতে লাগিলেন, 'বাবুজি, মঙ্গল ভাইয়া শহীদ হইয়া যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিল, তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল তাহা তো আপনারা বিদ্বান লোক ভালই জানেন, তাহা লইয়া অনেক মোটা মোটা কিতাবও লেখা হইয়াছে। আপনারা যাহা কিতাবে পড়িয়াছেন তাহার অনেক কিছুই আমি চোখে দেখিয়াছি, আরো অনেক দেখিয়াছি যাহা কিতাবে লেখা হয় নাই। সে সব কথা থাকুক—বলিতে গেলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়া যাইবে। শুধু বলি চোখের সামনে মঙ্গল ভাইয়ার [illegible]াসি দেখিয়া আর মঙ্গল ভাইয়ার শেষ কথা [illegible] আমার নরম মন একদিনে শক্ত হইয়া উঠিল, সেইদিন হ[illegible]তে আমি আলাদা মানুষ হইয়া গেলাম। স্বর্গীয় পিতাজি ছিলেন সাত্বিক ব্রাহ্মণ, অহিংসার পূজারী, বিশ্বাস করিতেন দুনিয়ায় ধর্মের আর সত্যেরই জয় অধর্ম আর মিথ্যার পরাজয়। আমিও শৈশব হইতে ঐ বিশ্বাসের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া ঐরূপই বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু মঙ্গল ভাইয়ার ফাঁসির আঘাতে আমার ঐ ভুয়া বিশ্বাস চুরমার হইয়া গেল। আমি নিষ্ঠুর সত্য বুঝিতে পারিলাম, দুনিয়ায় শক্তিরই জয়, সত্য ও ধর্মের নয় ; অশক্তিরই পরাজয়, মিথ্যা ও অধর্মের নয়।'

আমি এ্যাটর্নী আর কুস্তিগীর হইলে হইবে কি, কলেজে পড়িয়া গ্র্যাজুয়েট হইয়াছি, 'উচ্চশিক্ষিত' বলিয়া গর্ব বোধ করি। সত্য ও ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, এই তত্ত্ব জীবনের পুঁথিতে পড়িবার চেষ্টা না করিলেও ছাপা পুঁথিতে অনেক পড়িয়াছি, উচ্চাঙ্গ বক্তৃতায় অনেক শুনিয়াছি। এই তত্ত্ব বিশ্বাস করাটাই উচ্চ 'কাল্‌চার'-এর লক্ষণ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি। বলিলাম : 'কিন্তু সত্য আর ধর্ম কি জয়ী হয় না পাঠকজি ?'

বোমভোলা পাঠক হাসিয়া বলিলেন, 'হয়, যদি তার পিছনে শক্তি থাকে। নতুবা নয়। সুতরাং শক্তিই দুনিয়ায় প্রধান জিনিষ, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-অসত্য এসব ফালতু। এই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। এই আমার জীবনের নীতি। বাতাসীরও তাই।

বিস্মিত হইয়া বোমভোলা পাঠকের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিলাম মালীগিরিটা তাঁহার ভাঁওতা মাত্র ; তাঁহার আসল রূপ অন্য, মালী রূপটা ফালতু।

পুরাতন কথার খেই ধরিয়া পাঠকজি বলিতে লাগিলেন, 'তারপর জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টার মধ্য দিয়া আসিয়াছি। অনেক মারামারি, অনেক লুট, অনেক হত্যা করিয়াছি এই দু'হাতে, মৃত্যুর হাত হইতে অনেকবার বাঁচাইয়াছি নিজেকে, অন্যকে। সে সব বলিতে শুরু করিলে কথা কোনোদিন ফুরাইবে না।'

বলিলাম 'পাঠকজি, একটি বিষয়ে বড়ই কৌতূহলী হইয়াছি। বাতাসী বিবির সহিত আপনার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল কবে এবং কি প্রকারে ?'

বোমভোলা পাঠক কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তারপর বলিলেন, 'সে কাহিনী কি আমার মুখে শুনিবেন, না বাতাসীর মুখে ?'

শুধাইলাম 'বাতাসী বিবির সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি ?'

বোমভোলা পাঠক আবার কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'হইবে বলিয়াই আমার সন্দেহ হইতেছে।'

'কবে ? কখন ?'

'আজই রাত্রে।'

সন্ধ্যার অন্ধকারের অগ্রিম আভাস ঘরের ভিতর দেখা দিতে শুরু করিয়াছিল। ভৃত্য আসিয়া ঘরের দীপগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল।

[ক্রমশ।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

বিংশ স্তবক

রাস-বিলাস

৩৩। তারপরে নেমে এলেন সুন্দরী শ্রান্তি। সহচরীর মত, তিনি কুরঙ্গনয়নাদের ললাটমূলে বেঁধে দিলেন মুক্তোর মালার মত ঘর্মাম্বুর। এক চুমুক মাধ্বীকের মত, তিনি অলস করে দিলেন তাঁদের অঙ্গ, কিন্তু পুষ্ট করে তুললেন শ্রী।

লীলাবেশে অলস হয়ে গেলেন এক বধূ। পার্শ্ব-বিলাসী শ্রীহরির কাঁধের উপর বাহু দু'টি স্থাপন করতে করতে তিনি মোচড়াতে লাগলেন নিজের লতার মত তনু। সৌভাগ্যের এত ভার অসহ্য, তাই যেন ক্ষণিক বিশ্রামের আশায় তিনি সেই ভার সঁপে দিলেন পরাণ-বধূর হাতে।

এতটুকুও লজ্জা হল না তাঁর; কাপিশায়ন-মধু খেয়ে মত্তা হয়ে রঙ্গ করতে যেমন এতটুকুও লজ্জা হয় না ললনার। আদরিণী ফেটে পড়তে লাগলেন গরবে। তাঁর শ্রম যেন আজ আশ্রম খুঁজে পেয়েছে লালিত্য-ভরা লাবণ্যের। তিনি কাঁপতে লাগলেন। রসিকভাবে কৃষ্ণ তখন তাঁর সুঠাম কাঁধের উপর বিন্যস্ত করলেন নিজের ভুজদণ্ড; যেন গচ্ছিত রাখলেন...রত্নদণ্ড...তাঁর কাছে। আহা, কৃষ্ণের সেই চন্দনের গন্ধ-বিধুর হাতখানি। চর্ম-মধুতে ভেসে বেড়াচ্ছে সহজাত মহোৎপলের সুরভি। কী অপূর্ব। ভাব-তরঙ্গে তোষ-তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে, সেই ভুজদণ্ড সমাঘ্রাণ করতে লাগলেন বধূটি। অনুলোমে লোমহর্ষের উৎকর্ষ দেখে উৎকণ্ঠায় ভরে গেল তাঁর মন। চুম্বনে চুম্বনে তিনি আচ্ছন্ন করে দিলেন রোমাঞ্চ।

৩৪। কিন্তু অশ্রান্ত আজ কৃষ্ণ-তাণ্ডব। আননে তাঁর তন্দ্রাহীন চন্দ্রমার স্বপ্নবিলাস। বিলম্বিত-লাস্যে নেচে চলেছে রাতুল দু'টি চরণকমল। আর গণ্ডের উপর ছায়া ফেলে কাঁপছে কর্ণের বীরবৌলি...নৃত্যলোল। পারলেন না...আর স্থির থাকতে পারলেন না একটি সুন্দরী। সোহাগভরে ছুটে এসে গালের উপর রাখলেন গাল। আর নাচতে নাচতে কৃষ্ণও চিবুক ধরে তাঁর মুখটি তুলে রেখে দিলেন চর্বিত তাম্বুল...বধূর মধুর মাধুরী-ধর অধরে।

৩৫। আর একটি সুন্দরী, তিনি বিভোর হয়ে পড়লেন তাঁর সৌভাগ্যের ভগবত্তার পরিমলে। শ্রান্তিহীন তাঁর সৌন্দর্য। গীতমাধুরী পরিবেশন করে নাচতে নাচতে শ্রান্তা হয়ে পড়লেন তিনিও। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল তাঁরো বক্ষোবাস। বুকের উপর, ভালবাসার মত, সে কি অপূর্ব তাঁর হারহিল্লোল। শ্রীকৃষ্ণের একখানি পাণি গ্রহণ করে তিনি তাঁর যুগল-স্তনের উপর রাখলেন। দু'টি স্বর্ণকুম্ভের শিখরে এ যেন সমাবরণ-শোভা একটিমাত্র কমলের। যাঁরা পৃথক্ না হয়ে নিকটেই থাকেন, তাঁরা কি একই ফলের অধিকারী হন জগতে ?

দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল শ্রান্তা সুন্দরীদের নৃত্যাবেশ। শ্রম-জলকণিকায় ভারি হয়ে ঢলে পড়ল কর্ণোৎপল। নীরব হয়ে গেল কিঙ্কিণী, নীরব হয়ে গেল নূপুর। তাঁদেরও যেন বাধা হলেন শ্রেয়সী শ্রান্তি।

৩৬। তবুও তাঁদের মধ্যে অশ্রান্তা রইলেন একটি সুন্দরী। নৃত্যসঙ্গিনী হয়ে তিনি চমৎকার নেচে চললেন কৃষ্ণের সঙ্গে। থামতে চায় না তাঁর সবিভ্রম ভ্রমণ। কোমল ঝঙ্কার তুলে কণ্ঠে তাঁর খেলতে লাগল কলগীত।

৩৭। শারদ-ফুল্ল-মল্লিকা সেই আয়ামিনী যামিনী, ...তিনিও থমকে দাঁড়ালেন। তবে কি আর ফিরে আসবে না এঁদের এই অন্তরঙ্গ রসতরঙ্গের লীলা? তিনিও থমকে দাঁড়ালেন চমকিতা।

আর শ্রীরমণোত্তম মুগ্ধ শ্রীহরি, তিনিও খেলতে লাগলেন,...বালক যেমন করে তার সমস্ত উদ্যমের সমস্ত কলানৈপুণ্যের অংশীদার ঐ নিজের ছায়াগুলির সঙ্গে খেলা খেলে। তেমনি খেলা শ্রীহরি খেলতে লাগলেন... রাস-বিলাস-প্রীতিময়ীদের সঙ্গে, স-যূথাধিপ সেই ব্রজসুন্দরীযূথের সঙ্গে; সাধন হল আশ্লেষ, অধরপান, চুম্বন, রসালাপ এবং হাস্যভরা নয়নের চাহনি।

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সুখের মাধুর্যে এত মগ্ন হয়ে গেল তাঁদের বুদ্ধি, তাঁর ইচ্ছাস্রোতে এত গা ভাসিয়ে দিলেন তাঁরা, যে মৃগনয়নারা বুঝতেই পারলেন না, কখন স্খলিত হয়ে গেল তাঁদের অম্বর, কোথায় হারিয়ে গেল তাঁদের কঞ্চুলিকা, কখন শিথিল হয়ে গেছে তাঁদের কেশ-পাশ।

৩৮। নিখিল ভুবনের পথ—আঁখিদের মানস-ঐশ্বর্য হরণ করতে করতে যখন এই ধারায় বিহার করে চলেছেন শ্রীহরি, তখন ব্রজরাজনন্দনের ভাগবত বিক্রীড়িত দর্শন করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ঈশ্বরগণ। তাঁরা পূজায় বসলেন। কেমন করে ঐ নিরুপম আধারের গোপন অধিকারিণী হওয়া যায়, এই ভাবতে ভাবতে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে বারংবার জ্ঞান হারাতে লাগলেন দ্যুলোকের

দেববধূরা। তারানাথকে নিয়ে গতিহারা হলেন আকাশের তারাদল। রাসের আরম্ভ থেকেই যিনি অনুভব করছিলেন গতি-বিপ্লব, সেই হরিণাঙ্ক মহাদেব নিষ্পন্দ হয়ে গেলেন। একই দশা হল আয়ামিনী যামিনীর।

কুঞ্জে কুঞ্জে যেখানে যত ছিলেন মহানুরাগিণী, তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ উপভোগ করলেন মদনমোহনের প্রেমারতি। যাঁর যেমন সাধ তেমনি পেলেন তথানুরাগ কৃষ্ণপ্রেমের সম্পূর্ণতা। যিনি শুভব্রত নায়ক একমাত্র তিনিই নায়িকাকে দান করতে পারেন প্রণয়-রহস্যের মর্যাদা।

বিহারশ্রান্তা ব্রজসুন্দরীদের ক্লান্ত মুখগুলি ভাসতে লাগল দরদর হাসিতে আর বিন্দু বিন্দু ঘর্মে। কোমল করকমল দিয়ে প্রত্যেকের মুখ থেকে ক্লান্ত বিন্দুগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারিত করে দিলেন প্রেমার্দ্র শ্রীহরি।

কিন্তু দিলে হবে কি। কৃষ্ণের পাণিকমলের স্পর্শ পেয়ে আবার দরদরধারে ঘাম ঝরাতে লাগল ব্রজসুন্দরীদের সেই মুখগুলিই। এরপর আর যখন এগিয়ে এল না কৃষ্ণের ঘর্মমোক্ষের কুশলতা, লজ্জায় তখন অঞ্চল দিয়ে নিজেদেরই মুছতে হল নিজেদের মুখ।

তারপরে ব্রজগোপীরা প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাঁধতে লাগলেন গান, গাইতে লাগলেন ধীরে ধীরে; আর সেই কৃষ্ণ কীর্তি-কীর্তনের মুগ্ধ-মধুর পদাবলীতে ফুটে উঠল কৃষ্ণ-লাবণ্য, কৃষ্ণ-বিলাস, কৃষ্ণ-লাস্য, কৃষ্ণ-বৈদগ্ধ্য এবং সর্বমূলে কৃষ্ণকৃপা।

৩৯। শ্রীকৃষ্ণের তখন চোখে পড়ল, প্রেমের লীলায় যেন অতিবশ্রান্তা হয়ে পড়েছেন গোপাঙ্গনারা। একটা বিরাট শ্রম-বাঁধা যেন তার বিপুল আলস্যবেগ নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে তাঁদের আনন্দের। 'এবার তাহলে সলিল-লীলায় গা ভাসিয়ে দিয়ে লয় পাওয়াতে হবে এঁদের শ্রম'...এই মনস্থ করে তাঁদের দিকে পুনর্বার চোখ ফেলতেই তিনি দেখতে পেলেন, যমুনাপুলিনের বালুবেলায় নাচতে নাচতে সত্যিই তাঁদের প্রত্যেকের শিরোভাগ ধূসর হয়ে গেছে রেণুতে। ব্যস, তবে আর দ্বিধা নয়,...ক্ষিপ্রমদা প্রমদাদের সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম ছুটে চললেন কালিন্দীর কালো ধারার দিকে, যেখানে ফুটে রয়েছে কুমুদ-কহ্লার, যেখানে গুঞ্জন তুলে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে মধুমাতাল মধুকর-গাথকেরা। জলে নামলেন, খেলায় মাতলেন, করেণুদের দল নিয়ে কিশোর করীর মত মহানন্দে।

জয় জয়, সর্বত্রই জয় সুন্দর মুখের। তাই বোধ হয়, ব্রজবধূরা যমুনার জলে অলস দেহ ভাসিয়ে দিতেই, তাঁদের মুখের আলোর কাছে মাথা নোয়ালো কমলবন, বাহুর বলন দেখে তেজ হারাল মৃণালিকার সংহতি, বুকের গড়ন দেখে নীরব হয়ে গেল চক্রবাকীর সমাজ।

বধূরা জলে নামতেই রূপ বদলিয়ে গেল যমুনার কুক্ষি-দগ্ধ সলিলের। মনে হল তাঁর জলতল মৃণালবল্লী-বলিত হয়ে উঠল বাহু বিক্ষেপে বধূদের, মনে হল তাঁর তরঙ্গদল চক্রবাক-পুলকিত হয়ে উঠল স্তনসমারোহে বধূদের, মনে হল তাঁর জলের উপরকার আকাশখানি স্বর্ণসরোজময় হয়ে উঠল মুখমাধুরীতে বধূদের।

বধূরা জলে নামতেই, দেহসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পদ্মিনীদের পরিত্যাগ করে গুঞ্জনগীতের সমাদর জানিয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠল ভৃঙ্গদল। আর চপল ডানার চামর দুলিয়ে তাঁদের শ্রান্ত দেহগুলিকে বাতাস করতে লাগল হংসকামিনীরা...সোহাগে।

একখানি ছবি আঁকা হয়ে গেল,...যখন বধূদের মাথার উপর আকাশজোড়া গোল বাঁধল নীলভ্রমরের দল, আর সেই পরিধির প্রান্ত বেয়ে ঝুর ঝুর ঝুর ঝরতে লাগল পুষ্পবৃষ্টি দেবতাদের। এ কি আকাশ-লক্ষ্মীর মুক্তার-ঝালর-দেওয়া এক বাতাসে-কাঁপা নীল চাঁদোয়ার স্বপ্ন নয়?

তারপরে হাতের পদ্ম খেলিয়ে জল-ছোড়া-ছুড়ির সে কি অপূর্ব ঢঙ্ সুন্দরীদের! মণ্ডল রচনা করে মাঝখানে কৃষ্ণকে নিয়ে, তাঁরা কৃষ্ণের বুকের উপর ভাসিয়ে দিতে লাগলেন জলের ঢেউ, ছোট্ট ছোট্ট ছোট্ট;...বলাবলি করতে লাগলেন, 'এগুলো ঢেউ নয় গো এগুলো রোমহর্ষ সূর্যনন্দিনী যমুনার।'

বলতে বলতে তাঁরা আঙুলে আঙুল গেঁথে করগুলোকে কুঁড়ির মত করে, জল ভরে নিয়ে, কব্জি আর কড়ে আঙুলের ফুলো ফুলো পাশদু'টোর ফাঁক দিয়ে ফোয়ারার মত ছিটোতে লাগলেন জল। এ যেন মন্মথের বারুণাস্ত্রের সাক্ষাৎ ব্যবহার। ধারায় ধারায় ভিজে ভিজে চমকাতে লাগলেন শ্রীহরি।

নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন,...এ অস্ত্র কামদেবেরই বারুণাস্ত্র, এর সংহার নেই, এর বারণ নেই। প্রতিবিধানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবার কিন্তু তিনি ডুব দিলেন জলে। আর ডুব দিয়েই যেই তিনি সুন্দরীদের নীবিদাম হরণ করবার বাসনায় ব্যগ্র হস্তখানি বাড়িয়েছেন, অমনি জল-ছপ্‌ছপ্ ভেঙে গেল বধূদের মণ্ডল-রচনা, তাঁরা পালালেন। একলাই শ্রীহরি চপ্‌চপে করে ভিজিয়ে দিতে লাগলেন সকলকে। তখন কি হট্টগোল কি লড়াই জলাঙ্গনে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রত্যেক ব্রজাঙ্গনাকেই জয় করে নিলেন শ্রীকৃষ্ণ লহমায়। হারিয়ে দিয়েই তিনি কেড়ে নিলেন সকলকার বুকের হার। কাড়তে আর কতক্ষণ। কিন্তু হারবার মেয়ে নন শ্রীরাধা। তিনি টপ্ করে চলে গেলেন কৃষ্ণের পিঠের দিকে; আর লঘুহস্তে এমন পীড়ন করলেন কৃষ্ণের দু'বাহু, সে জলচুড়ির সুড়সুড়িতেই যেন খুলে গেল কৃষ্ণের কক্ষ-মুদ্রা, আর টুক্ করে জলে পড়ে গেল হাতের

গোছা। সেগুলিকে হরণ করতে রাধারই বা লাগে কতক্ষণ? এবার কৃষ্ণ দৌড়লেন রাধাকে ধরতে।

অল্প জলে পদ্ম-চয়ন এক, আর অথৈ জলে হঠাৎ পতন আর এক। কৃষ্ণের আক্রমণের মহিমায় আবার তাঁকেই না অথৈ জলে পড়তে হয়, এই হল রাধার ভাবনা। শঙ্কায় পঙ্কিল হয়ে গেল তাঁর চক্ষু। এমন সময় সখীরা দেখতে পেলেন...উঃ কত আর হাসা যায়...জল থেকে কান্তাটিকে উঠিয়ে নিয়েছেন তাঁর কান্ত, আর সুনিবিড় পীড়নের মধ্যে দু'বাহু দিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেলেছেন বক্ষ-ক্ষেত্রে। হাসতে লাগল জয়, হাসতে লাগল পরাজয়।

রাধাকে বুকে নিয়ে জল ভেঙে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণ। তাঁর ভারি মিষ্টি লাগল যখন শফরীরা ফরফর করে চলে গেল তাঁদের পাশ দিয়ে, আর ভয়ে চমকে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলেন শ্রীরাধা। অতএব আলিঙ্গন ফিরিয়ে দিতে দিতে মুচ্‌কি হেসে কৃষ্ণকে প্রশংসা করতেই হল শফরীদের এবং তাদের নিরুপাধি বন্ধুত্বের। বেশি বেশি করেই করতে হল।

এরি মধ্যে বধূরত্নরাও বাধিয়ে দিয়েছেন এক কাণ্ড হাসি চাপ্‌তে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ। কেউ কি কখনও চোখে দেখেছে এমন লীলা-বিলোল লড়াই? স্ত্রীরত্নদের মৃণালবাহু আর পদ্মহাত পদ্ম তুলছে মৃণাল তুলছে জল থেকে; এবং তারপরে সেই পদ্মে পদ্মে লাগল লড়াই, সেই মৃণালে মৃণালে লাগল লড়াই। ধুম কোলাহল! রক্ষে নেই। আর সর্বশেষে সেই পদ্ম আর মৃণাল দিয়ে কৃষ্ণকে প্রণয়-পূজার কি প্রহার! এমন সুন্দর মন্মথ-প্রহার কৃষ্ণ আগে কখনও উপভোগ করেন নি। তাই তাঁরও হৃদয় আতুর হয়ে পড়ল মদনাবেশে...সহাস্যে।

কৃষ্ণপ্রেমের আশঙ্কায় পাগল হয়ে উঠলেন মহাভাবময়ীরা।

হাত বাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ কাছে টেনে নেন চক্রবাক-মিথুনকে, আর অমনি দু'হাত দিয়ে স্বস্তিক রচনা করে বুক ঢেকে ফেলেন তাঁরা।

কৃষ্ণ গলায় মালা করে পরেন মৃণাল, আর অমনি তাঁদের ভুজলতা যেন ভেঙে পড়তে পড়তে বলে ওঠে,—'না না না।'

কৃষ্ণ শুঁকতে যান পদ্ম, আর অমনি তাঁরা হাতের পাতা দিয়ে ঢাকেন মুখ।

কি লজ্জা গো ছিঃ!

আর ঐ জলের খেলায়, যেখানে ইঙ্গিতের ভঙ্গিতে জন্ম নেয় প্রেমের রস, সেই জলের খেলায় তাঁদের ধুয়ে মুছে গেল পীনস্তনের পত্রলেখা, নির্গুণ হয়ে গেল কণ্ঠহার, নিরঞ্জন হল নয়ন, নীরাগ ওষ্ঠাধর, নিগ্রন্থি মণিমেখলা, মোক্ষ পেল কেশভার। প্রসাধনে ঘটে গেল প্রলয়। কিন্তু ঘটা সত্ত্বেও দ্বিগুণ বেড়ে গেল সলিল-বিক্রীড়িত মহাভাবময়ীদের রূপ। শৃঙ্গার-ঘন-রসে যাঁরা মগ্ন তাঁদের এমনিই হয় অপরূপ রূপ।

সলিলক্রীড়া সাঙ্গ হতেই তাঁরা সকলে মিলে পদ্মের আভরণ পরলেন কেশে, কানে দোলালেন উৎপল, মৃণাল দিয়ে গড়লেন গলার হার, শৈবাল দিয়ে মেখলা; এবং সর্বশেষে মাথা থেকে মণিময় শিরোভূষণ খুলে নিয়ে প্রেমেরভরে নিবেদন করে দিলেন যমুনায়।

তারপরে বাম করপদ্ম দিয়ে তাঁরা যমুনার জল উল্লসিত করতে করতে একসঙ্গে ঝঙ্কৃত করতে লাগলেন তাঁদের দক্ষিণ করের স্বর্ণ-কঙ্কণ। জল-মণ্ডুক-বাদ্যলীলার সুচারুতা ফলিয়ে ব্রজসুন্দরীরা এইভাবে সমাপ্ত করলেন তাঁদের জলবিহার।

যথারীতি স্নান সেরে এবার যখন তাঁরা তীরে উঠ্‌লেন, তখন হৈম-পদ্মিনীকেও হার মানিয়ে দিল তাঁদের স্পর্ধিত বিভা। নিতম্বের উপর দিয়ে নীচে এলিয়ে পড়েছে অজস্র কুন্তলভার, টুপ্‌টুপ্‌ করে ঝরে পড়ছে স্নানান্তের বিন্দু বিন্দু সলিল, তীর ধরে যখন তাঁরা এগিয়ে চললেন তখন মনে হল, চাঁদের অংশুমালারাই বুঝি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছেন আর তাঁদের পৃষ্ঠানুসরণ করে আসছে...বড় বড় অশ্রু ফেলতে ফেলতে বন্দী তিমিরের দল।

৪০। বিভোর হয়ে এগিয়ে চললেন ভাবময়ীরা। এত বিভোর যে, তাঁরা জানতেই পারলেন না, কখন তাঁদের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছেন অলক্ষ্য-কল্যাণ-বিধায়িনী ভগবতী যোগমায়া, আর কখনই বা তিনি চলে গেছেন এবং যাবার আগে তাঁদের সাজিয়ে দিয়ে গেছেন বসনে-ভূষণে, মৃগমদে চন্দনে, কুঙ্কুমে-অঞ্জনে। হঠাৎ তাঁদের মনে হল, এ সবই যেন তাঁদের স্বপ্নে পাওয়া। বোবা হয়ে গেলেন যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁরা বদলিয়ে গেছেন; প্রত্যেকেই যেন এক একটি সরস-কলা-পালনী লাবণ্যলক্ষ্মী স্বরূপিণী; প্রত্যেকেই যেন শ্রেষ্ঠাধার শুদ্ধস্নাতা মধুরতার। বিপুল প্রণয়ের অতুল আলোকে শিহরিত তনু...তাঁরা চলতে চলতে প্রবেশ করলেন শেষে সেইখানে, যেখানে উপবনের ললিত পরিসরে, বাদীদের মত, মণ্ডলে মণ্ডলে বিচরণ করছিল মদকল কলহংস আর কারণ্ডবেরদল; এবং যেখানে কুঞ্জপ্রাঙ্গণ আলোকিত করে বিরাজ করছিলেন কৌস্তুভধারী শ্রীনন্দকিশোর। প্রাঙ্গণে মণ্ডল রচনা করে ব্রজগোপীরা আসন গ্রহণ করলেন রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে।

মণিময় ঘট ভরে ভরে ক্ষুদ্র-বনদেবীরা সেখানে নিয়ে এলেন কৌসুম মদিরা...স্বাদু স্বচ্ছ ও অতি সুগন্ধ। গন্ধে গন্ধে ভিড় করে সেখানে এসে জুটল, অত জ্যোৎস্না থাকা সত্ত্বেও. আকাশ অন্ধকার করে নীল [illegible]।
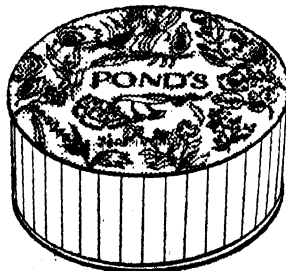
রূপোর জলের মত উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ঝক্‌ঝক্ করছে সমস্ত পুলিন, বনদেবীরা সেখানে এসে যখন তাঁদের প্রত্যেকের সামনে রাখলেন স্ফটিকের চষক-শ্রেণী, তখন চোখ দিয়ে ধরা গেল না, হাত লাগিয়ে তবে বুঝতে হল এগুলি পানপাত্র; কোনো তফাৎ নেই এদের সঙ্গে জ্যোৎস্নার, এক রঙ এক রূপ।

৪১। সত্যিই, এত সুন্দর এত বিস্ময়কর এই পাত্রগুলি। কৃষ্ণেরও মনে হল, তাঁরও চোখের সামনে বুঝি বসানো রয়েছে কামোদ্দীপক হর্ষ-কদম্বের একটি অদ্ভুত সম্পূর্ণতা। চষকটিকে দেখতে দেখতে তাঁরও যেন উন্নীত হতে লাগল বুদ্ধি, সরস হয়ে উঠল মন। অতএব, এই অনায়াসসিদ্ধ রস-সম্পত্তির ভূরি প্রশংসা না করে তিনি থাকতে পারলেন না। তারপরেই খেয়াল হল, তিনি দেখবেন কি আলস্য কি লালস্য নিয়ে আসে এই মদিরা, ভাবময়ীদের চিত্তটিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কি মাধুরীই না বিকাশ করে এই কৌসুমশীধুর মত্ততা।

একটি একটি করে পানপাত্র স্বেচ্ছায় মধুপূর্ণ করতে করতে তাই শ্রীকৃষ্ণ লীলাভরে প্রিয় সহচরীদের ডেকে ডেকে বললেন,—

'তোমরা সুন্দরীরা এক এক করে ভাগ করে নাও

মদিরা, আর যুথ-প্রধানাদের মুখে এগিয়ে দাও।'

কৌতুক করে কৃষ্ণও যেমন বললেন, তাঁরাও তেমনি সকৌতুকে তাঁরও মুখের কাছে তুলে ধরলেন তাঁর অংশ মধুপাত্রে।

দেখতে দেখতে, 'সুরত-সমর অতি-আসন্ন...এই কথাটিই যেন ঘোষণা করে দিয়ে যেতে উঠল, বীরপানের প্রমোদ। তখন চিক্‌চিক্ করছে যমুনার কর্পূররাঙা বালুবেলা; চাঁদ কিরণ ছিটোচ্ছেন অমৃতের, বাতাসে কাঁপছে কুমুদ-কহ্লারের আনন্দগন্ধ;...ব্রজসুন্দরীদের প্রত্যেকের সামনে স্ফটিকের চষক; টল্‌টল্ করছে তরল মাধ্বীক; মাধ্বীকের মধ্যে নাচছে আকাশের চন্দ্রবিম্বের ঢলঢল প্রতিবিম্ব; উৎপল-গন্ধী মদিরা; এমন সময় সেখানে এসে জুটল মাতাল যত ভ্রমর, মাতাল যত ভ্রমরী। তারা আরম্ভ করে দিল আবর্তনর্তন।

একটি সুন্দরী কিন্তু মাধ্বীক-পানের দিকে এতটুকুও ঘোরালেন না তাঁর মনের রথটিকে। পানের চেয়ে আরো বড় সুখের প্রত্যাশায় তাঁর কেবল দেখতে ইচ্ছে হল,...প্রথম পানে নয়ন দু'টি কেমন করে লাল হয়, দ্বিতীয় পানে কতখানি বিবশ হয় বাক্য, আর তৃতীয় পানে কেমন করে ঠাঁই বদলায় হাসি আর ভয়। তারপরে কি নৈপুণ্যে অন্যেরা মিলে পরাণ-প্রিয়কে পরিহাসের রসে মজাবেন, সে দেখার সুখ কি ছেড়ে দিতে পারেন তিনি? সত্যিই তো পানক্রীড়া-পরিষদে আরো তো কত কি হয়! উঁহু নাঃ,...মধুপান করতে এতটুকুও ইচ্ছে হল না তাঁর।

আর এদিকে রাধা আর কৃষ্ণ। তাঁদের কাছে তাঁদের শ্রীবদন দু'টি যেন ধারণ করল চষকের রূপ। রাধার মুখের চাঁদ অমৃতে ভরালো কৃষ্ণের মুখের কমলটিকে, আর কমলের মধু প্রবেশ করল চন্দ্রে। চুম্বনের মৈত্রীতে ধর্ম-বিপর্যাস ঘটে গেল...অমৃতের আর মধু-র। অধর পানের মহোৎসবে ওষ্ঠাধর হল উপদংশ।

৪২। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি, আনন্দের ও হর্ষের যিনি সিন্ধু। মাধুর্যের মাণিকগুলো সামনে নিয়ে বসে যেন বিভোর হয়ে গেছেন এক মহাধনিক। সত্যিই তিনি কি এক মদন-মাতোয়ারা মহাগজ, যাকে বিনয় শেখাতে চায় মদিরা-বিভ্রান্তা গজকামিনীর ব্যূহ? টলব? না। নিরঙ্কুশ হয়ে গেল কৃষ্ণের মন। কিন্তু পরক্ষণেই মাতালের মত ছিন্নও হয়ে গেল তাঁর বিচারবুদ্ধি। অধীর হয়ে পড়লেন। হয়েও, কান পেতে মুখ বন্ধ করে তিনি শুনতে লাগলেন সখীদের সঙ্গে প্রমদাদের আলাপ। পূর্ব-পানের কৃপাতেই পিপাসা মিটে গিয়েছিল ক্ষিপ্রমদা প্রমদাদের। জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল তাঁদের উচ্চারণ। তাঁরা কথা কইছিলেন...

'দেখেছিস্ সই দেখেছিস্, ঐ চাঁদটা...আমার মধু খেয়ে যাচ্ছে!' (পাত্রস্থ প্রতিবিম্বিত চাঁদ)

'তোমার মুখের ছিরি চুরি করে বেজায় বাড় বেড়ে গেছে চাঁদের। ওলো সই, ওকে শুদ্ধ পান করে ফেলো।'

'কি যে বলো, গলায় আটকে থাকবে যে।' 'ওতো অমৃতময়, দাঁত দিয়ে কুট কুট করে কেটে ফেললেই হবে।'

'সত্যিই, ও উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে মধু। ও মধু আমি খাব না, যাঃ।' বলতে বলতে একটি মধুমতী হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন মদিরার পাত্র।

আর একটি ব্রজাঙ্গনা, তাঁর কখনও এড়োচ্ছে, কখনও বাড়ছে, কখনও পড়ে যাচ্ছে কথার অক্ষর,...বলে উঠলেন,—

'কি ক-কষ্ট সই কি ক-কষ্ট, আকাশ প-প-পড়ছে, মা-মাটি ঘু-ঘুরছে, কেন সই? আ-আমার গা নড়নড় ক-করছে, লাঠির মত প-পড়ছে, ওগো আমায় ধ-ধ-ধরো ধরো।' বলতে বলতে তিনি ত্রাসে তরতর করতে করতে জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণের কণ্ঠদেশ দু'হাত দিয়ে।

পানপাত্রের উপর গুনগুন করে ঘুরছিল ভৃঙ্গের দল। তাদের ছায়া পড়েছিল মদিরায়, যেন কস্তার কাজ। ব্যস্ আর যায় কোথা! ওমা, এ মধু কি তুলে দেওয়া যায় কৃষ্ণের মুখে! ছিঃ!...সুন্দরী ছাঁকতে বসে গেলেন মধু, এ পাত্র থেকে অন্য পাত্রে। তারপর...ছাঁকছেনই তো ছাঁকছেন।

৪৩। বাধাহীন বিপুল আনন্দে যখন এই রের

মন্ডলীলা বিলক্ষণ উপভোগ করছিলেন বনমালী, তখন হঠাৎ মধু মদাধিকা রাধিকা তাঁর সৌন্দর্যের গভীর ভিতর থেকে ডাক দিয়ে উঠলেন,—'আলি…'

আহ্লাদে চকিত হয়ে উঠলেন বনমালী। ডাক শুনেই, যা হয় না তাই হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণের। প্রকৃতির হঠাৎ যেন ঘটে গেল এক বিকৃতি। এক বলতে আর এক বেরুল ওঁর মুখ দিয়ে।

তিনি উত্তর দিলেন,—'হে প্রিয়তম…'

রাধা বলে উঠলেন,—'তুমি চোর তুমি শঠ…'

সব ভুল হয়ে গেল কৃষ্ণের। তাঁর মুখ থেকে বেরুল,—'তুমি বড় রাগ করেছ কৃষ্ণ, আমার দিকে চাও, প্রসন্ন হও বন্ধু…'

এবার সব ভুল হয়ে গেল রাধিকার। তিনি বলে উঠলেন,—

'শ্যামা, সে তোর অভিসারে চলেছে শ্যাম…'

এবার কৃষ্ণ বলে বসলেন,—

'কি হয়েছে প্রিয়তম, তুমিই তো আমার উপাস্ত…'

অর্থান্বয় করা চলে না এই হেন প্রলাপের। কিন্তু… মূঢ় হয়ে গেলেন পুষ্পধনু।

তারপরে যখন জীর্ণ হয়ে আসতে লাগল মধুরসের মাদকতা, যখন আত্মপরকে চেনার বাধা না রইলেও রইল কেবল শেষের রেশটুকু মাদকতার, তখন রমণীয়া মহাভাব-ময়ীদের সত্তায় অপূর্ব এক মিশ্রণ ঘটতে লাগল মধুরের সঙ্গে প্রেমের। মিশ্রণের কৃপায় যতই সমৃদ্ধ হতে লাগল মনসিজের বাহুবল, ততই অনন্ত-গভীর হয়ে উঠতে লাগল পরাণপ্রভুর সঙ্গে তাঁদের প্রেমের খেলা। শরতের ফুল্লমল্লিকা রাত্রি সেদিন না জানি কত দীর্ঘই না হয়েছিল।

সান্দ্রানন্দ কলেবর যিনি রসিকশেখর, এই হেন মহাভাবময়তায় তাঁর সাঙ্গ হয়েছিল রাসক্রীড়া। কাব্যকথার যাথার্থীকরণের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণ নিজেই আলম্বন হয়ে বিহার করেছিলেন তাঁর স্বরূপভূতা আনন্দিনী শক্তিসমূহের সঙ্গে। তাঁর চতুর্দিকের এই গোপাঙ্গনা রাই সেই শক্তিসমূহের নামান্তর। সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণের এই মাধ্বীক পান প্রভৃতি সাধু প্রচেষ্টা; সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর এই সুরতোৎসব। তাঁর কৃপাতেই কৃতার্থীকৃত হয়েছিলেন কাম।

৪৪। ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এল রাত্রি। আঙুল দিয়ে গোণা যায়, আকাশে এত কম হয়ে গেল তারা। পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে মঙ্গল-লাজ বর্ষণ করেছিলেন অমরবধূরা, তারই কতকগুলি ঝরা খইয়ের মত ফুট্ ফুট করতে লাগল রাত্রি শেষের ঐ তারাদল। ওরা যেন সেই খই যা ঐ ভবাচাঁদ,…গগন বিটকের যিনি শুভ্র পারাবত,…খেয়ে শেষ করে উঠতে পারেন নি, ফেলে চলে গেছেন ছড়িয়ে। মাত্র কতকগুলি মুক্তোরদানার মত মিট্ মিট্ করতে লাগল ঐ তারাগুলি। মনে হল, রজনী-রমণের বিহারকালে রজনী-রমণীর কণ্ঠ হতে ছিঁড়ে গড়িয়ে পড়েছিল যে দেবচ্ছন্দ সাতনরী মুক্তাহার, গ্রন্থনের জন্যে তার অনেক কুড়িয়েও যেন একটিই বাকি পড়ে আছে দানা।

ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এল রাত্রি। দেখা গেল, আকাশসাগরে ভাসতে ভাসতে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে পাড়ি জমায় যে রূপোয়-মোড়া চন্দ্রতরণী, যেটি এতক্ষণ উজান-পবনে দুলতে দুলতে ভিড় জমিয়েছিল রাসবিলাসের ঘাটে, সেটি এখন চলতে চলতে পৌঁছে গেছে পশ্চিমের দিগন্ত-দ্বীপে।

ভোর হল।

এবার যেন ভেঙে পড়লেন বরণীয়া বিভাবরী দেবী। কি হবে এই শরীর রেখে যদি ভবিষ্যতে ভুগতেই হয় শ্রীভগবানের বিরহ-দুঃখ? তাই তাঁর শরীর পরিত্যাগের উদ্যম দেখে শঙ্কিত-বেদনায় হায় হায় করে উঠলেন দেববধূদের দল। তাঁরা আকুল হলেন। তাঁদের মনে হল কে যেন তাঁদের হৃদয়ের গভীরে অতি প্রোথিত করে দিয়ে গেল শল্য। তাঁরা আর থাকতে পারলেন না, তিরোহিতা হলেন।

দীর্ঘাতিদীর্ঘ নিশার অবসান হতেই যেই সমাপ্ত হয়ে গেল রাসবিলাস, প্রীতিময়ী স্ত্রীরত্নদের সঙ্ঘও তৎক্ষণাৎ পৌঁছে গেলেন পতিম্মন্যদের সদনে।

পত্নীদের গুণগুলিকে দোষ বলে দেখা যাঁদের স্বভাব, সেই সব পতিম্মন্যেরা লেশমাত্রও দোষ ধরতে পারলেন না পত্নীদের। কারণ তাঁরা সর্বক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন… পত্নীরা ছায়ার মতই বিরাজ করছেন তাঁদের পার্শ্বে।

যিনি এক, শক্তিমান,…পরপুরুষত্ব তাঁর হয় না। যাঁরা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি,…পরনারীত্ব তাঁদের হয় না। লীলারস-পুষ্টিময়ী লোকরীতির অনুগ্রহেই, শ্রীকৃষ্ণ আধারে আসে পরপুরুষত্বের এবং গোপাঙ্গনা-আধারে আসে পরনারীত্বের বিজ্ঞানতা।

তাঁর ও তাঁদের এই বিবিধ বিক্রীড়িত…নিত্যসিদ্ধ। লোকানুগ্রহের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র অবনীতেই ঘটেছিল এর মহা-প্রকাশ।

যাঁর কান আছে তিনি যদি এই কর্ণ-রমণীয় রাসপ্রসঙ্গ আকর্ণন করেন এবং যাঁর বর্ণনাশক্তি আছে তিনি যদি বর্ণনা করেন এই প্রসঙ্গ, তা হলে নিঃসন্দেহে তাঁরা উভয়েই হবেন অনির্বাচ্য সৌভাগ্যের অধিকারী।

ইতি রাসবিলাসো নাম বিংশ স্তবকঃ।

[ক্রমশঃ।

সুষ্ঠু জীবন গড়ে তোলো

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমরা দেশের প্রাণ-পুতুল। তোমাদের কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু আশা করে, তাই তোমরা হবে ন্যায়নীতির ধারক ও বাহক। কিন্তু জীবনকে গড়ে তুলতে হলে ছোটবেলা থেকেই তো শিক্ষা-দীক্ষা-আচরণে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃত মানুষরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে লেখাপড়া ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে অনেক আচার-বিধি পালন করতে হয়। সে বিষয়ে আজ কিছু কিছু বলবো। তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা কারুর সঙ্গে যখনই প্রথম দেখা হবে অবস্থা অনুযায়ী তুমিই প্রথমে ভালবাসা, সম্ভাষণ বা প্রণাম জানাবে। এতে তোমার মহত্ব প্রকাশ পাবে, বিনয় প্রকাশের এই নিয়ম। বিনয় শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে। নিজের যদি গর্ব করার মত গুণ থাকে তা নিজে প্রকাশ করবে না। অহংকার প্রকাশ করে নিজের মহত্বকে ক্ষুণ্ণ করো না। তোমার গুণাবলীর প্রশংসা দেখবে সবাই নিজ থেকেই করবে।

লোকের নিন্দাচর্চা তো সর্বদাই হয়। নিন্দাচর্চায় ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই, শুধু নিজেকে খর্ব করা হয়। তোমাকে এ পথ থেকে দূরে থাকতে হবে। নচেৎ সংব্যক্তি তোমাকে ভাল চোখে দেখবে না নিশ্চয়ই। তা ছাড়া যার নিন্দে হচ্ছে তার প্রশংসা করার চেষ্টা করবে, তার কিছু না কিছু প্রশংসনীয় গুণ আছেই। তাই খুঁজে তুলে ধরতে চেষ্টা করবে। এভাবে নিজেকে প্রকাশ করো— প্রভাবিত করো। এতে তোমার মহত্বই প্রকাশ পাবে। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে যখন তখন অপরের কথা বিশেষ মন দিয়ে শুনবে। হোক না যে কোন ধরণের কথা। তোমাকে শুনিয়ে যদি কেউ শান্তি পায় তাতে তোমার আপত্তি কি বিনা আয়াসে একজন শোকাতুরকে সান্ত্বনা দিলে। তা ছাড়া কারুর কথার মধ্যে কথা বলবে না। এ বদ অভ্যাসটা অনেকের আছে। এটা অধৈর্যের প্রকাশ, অভদ্রতাও বটে। কথা শেষ হলে তোমার বলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অন্যের দুঃখে তোমার যেন সহানুভূতি থাকে। এতে আর কিছু না হোক কেউ হয়ত তোমার বাণীতে অপরিসীম একটা শান্তি বা সান্ত্বনার পথ পেতে পারে। এও তো কম নয়? তা ছাড়া মানুষের দুঃখে মানুষের সহানুভূতি থাকা মানবধর্ম। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করবে না। যদি মনোমালিন্যের কারণ থাকে তা অবশ্য মিটিয়ে ফেলবে। নিজের স্বার্থের যদি কিছুটা ক্ষতি হয় তবুও। কারণ দেখা যায়, যার সঙ্গে বিবাদ করলে তার কাছ থেকে এমন উপকার পেলে যে লজ্জায় তাতে তোমার মাথা নুয়ে আসবে। সহজে তো মানুষের বিচার হয় না ভাই। বন্ধুত্ব বাড়াও, মালিন্য কমাও। জীবনের ছোটখাটো প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নাও। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ব্যাপার উপলক্ষ করে তোমার জীবন গঠনে আসতে পারে অনেক গ্লানি, অথচ এ সব দূর করে জীবনকে চালিয়ে নেওয়া যায় আদর্শপথে। তোমরা ছোটবেলা থেকেই সে পথ বেছে নাও, জাতিকে দাও সেই শিক্ষা।

বালক বীর

মানসী বসু

মাগো শোন যুদ্ধে যাব,
অস্ত্র হাতে সেনা হব,
বীর দর্পে শত্রু দেব হটিয়ে।

তুষারমৌলী হিমালয়ে,
অতন্দ্র প্রহরী হয়ে,
সীমান্ত পাহারা দেব দাঁড়িয়ে।

শত্রু যদি দেখতে পাই,
মাগো তাতে ভয় তো নাই,
কট্ কটা কট্ মেসিন গান চলবে।

জানি, আমি নই ত' একা,
আছে আমার অনেক সখা,
সবাই মিলে একতালে পা ফেলবে।

যুদ্ধাহত আসবে যেবা,
করবে দিদি তাদের সেবা,
মাগো, তুমি তাদের কোরো সাহস দান ;

বোলো তাদের শহীদ যারা,
চিরজীবী হবেই তারা,
যাহারা দেয় প্রাণের চেয়েও দেশের মান।
আমার সাথে বল মাগো, জয়তু হিন্দুস্থান

ফরাসী দেশের টেলিভিশনে আমার সফল যাদুপ্রদর্শনীর দৌলতে যখন ফরাসী দেশে, বিশেষ ক'রে প্যারিস সহরে আমার যাদুকর খ্যাতি প্রসিদ্ধিলাভ করেছে তখনকারই এক সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হলাম প্যারিসের 'এতোয়াল' এলাকার এক বড় দোকানে—ছোটখাট কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ কেনার জন্য। দোকান তখন খরিদ্দারের ভিড়ে গিজগিজ করছে। প্রসাধন-সামগ্রীর কাউণ্টারে যে মহিলাটি ছিলেন তাঁর সামনে এগিয়ে যেতেই তিনি মৃদুহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। একটা গায়েমাথা সাবান তুলে নিলাম। দাম গুণে দিয়ে সাবানটা পকেটে পুরে রাখলাম আর পকেট থেকে বের করলাম একটা সিগারেট। সিগারেটটা ঠোঁটে লাগাতে লাগাতে কোটের পকেটে ডান হাত পুরে টেনে বের করলাম একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি!

পকেট থেকে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে দেখে মেম সাহেব তো অবাক! অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাকিয়ে থেকেই মেম সাহেব আমাকে চিনে ফেললেন—'বনসোয়ার মঁসিয় এ সি সোরসার' বলে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

কেমন করে পকেট থেকে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি বের করার খেলাটা ক'রেছিলাম তাই এখন বলছি। একটা দেশলাইয়ের বাক্স ভেঙ্গে তার থেকে বারুদ লাগানো ধার দু'টো খুলে নিয়ে শক্ত আঠা দিয়ে জুড়ে আর তিন ধারে কাগজ মুড়ে একটা খাপ বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি। এই খাপটা এমনভাবে তৈরি করেছিলাম যাতে বারুদ লাগানো পিঠ দু'টো থাকে ভেতরের দিকে মুখোমুখি অবস্থায়। এই খাপের ভেতরে খুব সাবধানে গুঁজে রেখেছিলাম একটা নতুন দেশলাইয়ের কাঠি এমনভাবে, যাতে বারুদ-লাগানো কাঠির ডগাটা খাপের ভেতরে বেশ আঁটভাবে সেঁটে থাকে। এই অবস্থাতে এই খাপটাকে একটা সেপটিপিনের সাহায্যে আটকে রেখেছিলাম আমার কোটের বাঁ দিককার নীচের পকেটে। খেলা দেখানোর সময়ে ডান হাতটা পকেটে ভ'রে জোর ক'রে টেনে কাঠিটা বের করার সময়ে খাপের ভেতরকার বারুদ লাগানোর ধারের সঙ্গে কাঠির বারুদের ঘষা লাগাতে সহজেই কাঠিটা জ্বলে উঠে অবাককাণ্ড ঘটিয়েছিল। খুব সাবধানতার সঙ্গে এ ব্যাপারটা করতে হয় নইলে পকেটে আগুন লাগতে পারে।

স্যার রোনাল্ড রস ও ম্যালেরিয়া

মানসকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমরা নিশ্চয় ম্যালেরিয়া রোগের নাম শুনেছ। কিন্তু এই রোগের কারণ আবিষ্কার ও প্রতিকার ব্যবস্থা কে প্রথম করেন জান? অন্যান্য রোগের মত এই রোগের পিছনেও যে রোগবীজাণু আছে আর সেই বীজাণুও যে অন্যান্য রোগের মত কীটপতঙ্গ দ্বারা বাহিত হচ্ছে তা প্রথম আবিষ্কার করেন যিনি তাঁর নাম স্যার রোনাল্ড রস।

ম্যালেরিয়া একটি অতি পুরাতন ব্যাধি। অনেক সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনায় বিঘ্নসৃষ্টি করেছে এই রোগ। এইগুলির মধ্যে পানামা খাল কাটার পরিকল্পনা প্রধান. পূর্বে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে দূষিত বাতাস লাগাই এই রোগের কারণ। কিন্তু রোনাল্ড রস এই ভ্রান্ত ধারণা বদলিয়ে দিলেন এই বিষয়ে গবেষণা করে।

স্যার রোনাল্ডের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। তাঁর পিতা ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ক। বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল। কিন্তু পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে প্রবেশ করেন।

এই সময়, অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দ্য লেসেপ্সের নেতৃত্বে প্রথম পানামা খাল কাটার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এর কারণ এই ম্যালেরিয়া। বস্তির ঘরে ঘরে শ্রমিকরা এই ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় ও প্রাণ হারাতে থাকে। অবশিষ্ট শ্রমিকরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়, বাধ্য হয়ে খাল কাটা স্থগিত রাখতে হয়। দ্য লেসেপ্স রসকে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা আবিষ্কারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লাভের্যাঁ নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একজন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো বিন্দু দেখিতে পান। লাভের্যাঁ আবিষ্কার করলেন যে এইগুলি এক প্রকার পরাশ্রয়ী ক্ষুদ্র জীব—অণুবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। এরা রোগীর দেহে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করে ও ম্যালেরিয়া রোগ ঘটায়।

রস-এর গবেষণার প্রথম প্রশ্ন হ'ল—কিভাবে এই জীবাণুগুলি

রোগীর দেহে প্রবেশ করে? তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যারা মশারি ব্যবহার করে তারা, মশারি যারা ব্যবহার করে না তাদের চেয়ে কম ম্যালেরিয়ায় ভোগে। আরও লক্ষ্য করলেন যে, বদ্ধ জলাভূমি যেগুলো মশক দ্বারা পরিপূর্ণ, তার নিকটবর্তী অধিবাসীরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয় ও ক্রমশ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় তিনি ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি দেখলেন যে, একটি মশা একটি শ্রমিককে দংশনরত আবার সেই মশাটিই তাঁকেও দংশন করল। শীঘ্রই তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস হল যে, মশকেরাই কোনো-না-কোন ভাবে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। তিনি এদের শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিকার ব্যবস্থার জন্ত গভীরভাবে গবেষণা করতে লাগলেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক হলেন স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকগুলি নতুন মশক দেখলেন। এদের ডানায় তিনটি কালো দাগ ছিল। এরা লেজ উঁচু করে বসে। তিনি এদের নাম দিলেন এনোফিলিস। দিনের পর দিন পরীক্ষায় তিনি আবিষ্কার করলেন যে, ম্যালেরিয়ার জীবাণু কেবলমাত্র মানবদেহে ও স্ত্রী-এনোফিলিসের দেহে বাস করে। এরাই যখন ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ায় তখন নিজের দেহে বীজাণু বহন করে ও সুস্থ মানুষের শরীরে কামড়াবার সময় এই বীজাণু তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এর ফলেই মানুষ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয় এবং রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে স্থিরপ্রত্যয় হবার পর হতেই তাঁর কাজ হল এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। মশকদের নিশ্চিহ্ন করলেই এর প্রতিকার হবে। কিন্তু কিভাবে এটা নিশ্চিহ্ন করা যায়? মশকরা অগভীর বদ্ধজলে লালিত হয় অর্থাৎ বদ্ধ অগভীর পানাভরা জলাশয়ই মশকদের প্রিয় বাসস্থান। লোকালয়ের নিকটবর্তী এইরূপ জলাশয়গুলি সেচ করতে হবে এবং এর উপরিভাগে মশক নিরোধক তেল ছড়াতে হবে। রাত্রে শয়নের সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। তিনি আবর্জনা পরিষ্কার করালেন, ঘন ঝোপঝাড় কাটালেন। মশক যাতে বাসা করতে না পারে তার জন্ত চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলেন। কারণ অপরিষ্কার স্থানই মশকের বাসস্থান করবার জন্ত প্রিয়। এইভাবে সমগ্র মানব জাতি একটি ব্যাধির কবল হতে পরিত্রাণ পেল। এইভাবে এই মহৎ কার্য সম্পাদন করে এই মহান কর্মী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন।

রূপকথার অন্তরালে

শ্রীঅমল সেন

শিশুরা একটু বড় হয়ে যেই কথা ব'লতে সুরু করে অমনি বলে 'গল্প বলো।' সেকালের ঠাকুরমা-দিদিমারা নাতি-নাতনীদের কোলের কাছে নিয়ে গল্প বলতে সুরু ক'রতেন, 'এক যে ছিল রাজা'—সেকালের ঠাকুরমা-দিদিমারা লেখাপড়া জানতেন না, বই পড়ে গল্প শেখার বিদ্যে তাঁদের ছিল না, তবুও তাঁদের গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। সেই ভাণ্ডার থেকে গল্পের মণি-মুক্তা তাঁরা বের করতেন। রাক্ষস-খোক্কস, রাজপুত্র, কোটাল-পুত্রের গল্প শুনে শিশুরা খুশি হ'ত। পক্ষীরাজের লাগাম ধ'রে শিশুরা তাদের কল্পনার সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ঘুরে বেড়াত, উড়ে যেত কল্পনার স্বর্গরাজ্যে মেঘের পাহাড় পার হ'য়ে।

আজ সেকাল নেই, সেকালের ঠাকুরমা-দিদিমারা নেই। সেকালের রূপকথা-উপকথাও নেই। একালের ঠাকুরমা-দিদিমারা সব আধুনিকা আর বিদুষী, তাঁরা তাঁদের নাতি-নাতনীদের এখন আর কোলে নেন না, গল্প বলেন না, গল্প বলতে জানেনও না।

পৃথিবীতে কবে কোন্ শিশুটি প্রথম তার ঠাকুরমার কাছে 'গল্প বলো' ব'লে বায়না ধরেছিল তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু মানুষের গল্প শোনার ঝোঁক চিরকালের, ইতিহাসের যেদিন সুরু তারও অনেক দিন আগে থেকে মানুষ গল্প বানাতে সুরু করেছে। রূপক, রূপকথা, উপকথার যুগ নেই—যদি থাকে এখন, গল্প বলা এখনো আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষা জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে যুগে যুগে মুখে মুখে লেখায় লেখায় গল্প যা জ'মে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে।'

পাহাড়ের গুহায় শিলাপঞ্জরে আমরা আদিম মানুষের আঁকা অনেক ছবির সন্ধান আবিষ্কার করতে পেরেছি। সেগুলির দিকে যখন আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তখন বিস্মৃত অতীত যুগের সেই দিনগুলির কথা মনের ছায়াপটে ভেসে ওঠে যেদিন মানুষ ছিল 'অসভ্য বর্বর।' অন্তত এখন আমরা সভ্যতার গর্বে গর্বিত মানুষেরা তাদের তাই বলি। তাদের মুখে তখনো ভাষা ফোটে নি, বর্ণলিপির জন্ম হয় নি। কিন্তু তাদের প্রাণ যে তখন মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তার সুস্পষ্ট নিদর্শন তারা রেখে গেছে পাহাড়ের গায়ে আঁকা এইসব হরিণ গণ্ডার বাইসন আর হাতীর ছবির মধ্যে, শিলালেখের দুর্বোধ্য বর্ণমালায়, সেদিনই মানব-সভ্যতার প্রথম যাত্রা সুরু, সেদিন থেকেই মানুষের প্রথম গল্প বলা আরম্ভ।

গল্প শুধু শিশুদেরই মন ভোলায় না, বয়স্করাও গল্প শুনতে ভালোবাসে। তাই তো রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদের কাহিনী রচিত হ'য়েছিল আমাদের দেশে, তাই তো হোমর, দান্তে, কালিদাসের এত নাম সারা জগৎ জুড়ে। এই গল্প শোনার আর গল্প লেখার বিরামহীন স্রোত এখনো চলছে।

আনন্দ দানই গল্প বলার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—মানুষকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য ও সৎজীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রূপকথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে অনেক নীতিকথা ও উপদেশ প্রচার করার রীতিও সকল দেশে দেখা যায় এবং এইসব নীতি উপদেশ শেখাবার উদ্দেশ্যে পশু-পাখীর কণ্ঠে মানুষের ভাষা দেওয়া হ'য়েছে এবং তাদের চাল-চলনও অবিকল মানুষের মতোই দেখানো হ'য়েছে। মানুষের মত তাদের জীবনও হিংসা-দ্বেষে, লোভে লালসায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোলায়িত? আসলে গল্প রচয়িতারা মানুষকে নী. কথা শোনাবার ও সং উপদেশ দেবার সোজা পথে না গিয়ে পরোক্ষে তা করার চেষ্টা ক'রেছেন। এই যে রূপকথার জীব-জন্তুর মধ্য দিয়ে নীতি উপদেশ দেবার পন্থা তা অনেক সময় অযথা দীর্ঘ এবং শ্রুতিক্লান্তিকর হ'য়েছে, দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' অথবা স্পেন্সারের 'ফেয়ারী কুইন' কিংবা বুনিয়ানের 'পিল্‌গ্রিমস প্রোগ্রেস' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

সবচেয়ে প্রাচীন রূপকথার দেশ হ'চ্ছে ভারতবর্ষ, পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম এখানেই রূপকথার সৃষ্টি হ'য়েছে। 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশ, কথাসরিৎ সাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জাতকের গল্প' প্রথম রূপকথার বই—সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই অমূল্য গ্রন্থগুলি যীশুখৃষ্ট জন্মাবারও কয়েকশো বছর আগে লেখা হ'য়েছিল এই ভারতবর্ষে এবং প্রথম রচিত হবার পর থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অজানা বহু লেখকের হাতে বহুবার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের বহু পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘ'টেছে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের প্রায় প্রত্যেকটা গল্পেরই দু'টো ক'রে অর্থ র'য়েছে—একটা অর্থ সোজাসুজিই বুঝতে পারা যায়, দ্বিতীয় অর্থ বুঝবার জন্য খানিকটা মাথা ঘামাতে হয়। এই মজার গল্পগুলিকে ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পত্তি ক'রে দেশের সীমানার মধ্যে বন্দী ক'রে রাখা সম্ভব হয় নি। বহু দেশের বহু পর্যটক এ দেশে বেড়াতে এসে গল্পগুলিকে নিজেদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছেন আপন আপন দেশে, এমনিভাবে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পগুলি বিশ্ব পর্যটনে বের হ'য়ে আরব ও পারস্য দেশের মধ্য দিয়ে গ্রীস এবং রোমে পৌঁছে ছিল। সে সব দেশে গিয়ে গল্পগুলি নতুন কলেবর ধারণ ক'রে নতুন রূপ নিল, তাদের নতুন নাম হ'ল 'Fables of Pilpay' অথবা 'Fables of Bidpat'—খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বিষ্ণুশর্মা নামে একজন পণ্ডিত এই গল্পগুলি সংকলন ক'রেছিলেন ব'লে সম্ভবত তাঁর নাম অনুসারে গল্পগুলির এই নাম দেওয়া হ'য়েছে। আরব এবং পারস্যের লোকেরা এই সব গল্পের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিল, তারাই এই গল্পগুলিকে নিয়ে গেল ইউরোপে। আরব্যোপন্যাসের দেশ আরব, আরবের লোকদের নিজেদেরও রূপকথা ছিল Fables of Halkan, গ্রীকদের ছিল Fables of Aesop—এই রূপকথা-গুলোতে Fables of Piplay'র সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর কতগুলোতে ভারতীয় রূপকথার কাহিনী অবলম্বন ক'রে গল্প সাজানো হ'য়েছে। তারপরে উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে চীন ও জাপানের প্রাচীন রূপকথা—সেগুলিও নেওয়া ভারতীয় রূপকথা থেকে। বৌদ্ধ-শ্রমণেরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজে চীন, জাপান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহল প্রভৃতি দেশে গিয়েছিল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, সেই অতীত যুগে তারা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল এই সব রূপকথার গল্পগুলি। চীন-জাপানের রূপকথা তারই ভিত্তিতে রচিত হ'য়েছে। প্রাচীন মিশর, সুমেরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেও রূপকথার প্রচলন ছিল—কিন্তু এই সব রূপকথার ভারতীয় রূপকথার সঙ্গে যে কোনও রূপ সম্পর্ক ছিল তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার আগে সিন্ধু-উপত্যকার শিলালিপির পাঠোদ্ধার আমাদের ক'রতেই হবে।

আধুনিককালে চীন, জাপান ও আমেরিকার রূপকথাগুলির কথা যদি ছেড়েও দিই, সেগুলি বাদে আরো যে সব রূপকথা রয়েছে তার মধ্যে ফ্রান্সের লা পেঁতে'র রূপকথা, জার্মানীর লেসিং-এর রূপকথা, ইংলণ্ডের গে'র উপকথা, স্পেনের ইরিয়টের উপকথা, ইটালির পিনোতির কথা এবং রাশিয়ার আইভান ক্রিলভের রূপকথা এবং ভারতীয় দার্শনিক ও সাধু-সন্তদের আধুনিক রূপকথাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গল্প, কাহিনী ও উপকথায় আক্ষরিক অর্থের বা প্রত্যক্ষ তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে যা বোঝায় তা ছাড়া আরও একটা গূঢ় অর্থ তার থাকে—'বুঝ লোক যে জান সন্ধান'।

সত্য বলতে আমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে শাস্ত্রে সেই শাস্ত্রই আবার আমাদের অপ্রিয় সত্য বলতে নিষেধ করেছে। অপ্রিয় সত্য তাই সোজাসুজি না ব'লে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা রূপকথা ও গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে বলেছেন। কতগুলি গল্প ও রূপকথার মধ্যে তাঁরা সাংসারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে এমন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা বিস্ময়ের সঞ্চার করে মনে। পঞ্চতন্ত্রের 'দুই মুখওয়ালা পাখির' উপাখ্যানও এই জাতীয় একটি গল্প। একদিন এই পাখি একটা মধুচক্রের সন্ধান পেলো। আগেই বলেছি পাখির দুইটি মুখ। একটি মুখ সবটা মধু একাই ভোগ করতে চাইলো, দ্বিতীয় মুখটিকে সে মধুর ভাগ দিতে কিছুতেই রাজি হ'ল না। তখন দ্বিতীয় মুখটি ভয়ঙ্কর রেগে গেল। সে খুঁজে-পেতে একটা তীব্র বিষের ভাণ্ড জোগাড় করে প্রথম মাথাটার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ দেবার জন্য সেই তীব্র বিষপান করলো। এর ফলে প্রতিশোধ উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক হ'ল—পাখিটাই মরে গেল। এই গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হ'ল এই যে, শাসনকর্তা ও শাসিত প্রজা, মালিক ও ভৃত্য, শিক্ষক ও ছাত্র, স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও পুত্র, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সম্পর্ক হচ্ছে অবিকল দুই মুখওয়ালা পাখির দুই মুখের মতো। একের লাভে অন্যের লাভ, একের ক্ষতিতে অন্যেরও ক্ষতি। সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ সবকিছু তাদের সকলকে আপন-আপন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদরূপে মেনে নিতে হবে। প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে উঠে একপক্ষ যদি অপর পক্ষের ক্ষতিসাধন ক'রতে চায় তবে সে ক্ষতি পরিণামে তাদের সামগ্রিক ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে দুই মুখওয়ালা পাখির মতো।

প্রাচীন ভারতের যশস্বিনী গণিতবেত্তা লীলাবতী এই জিনিষটাকেই আর এক রকমভাবে খুব সুন্দর ক'রে বলেছেন। তিনি ব'লেছেন, পাঁচটা ১-কে আলাদা আলাদা ভাবে রাখলে তাদের যোগফল শুধু পাঁচই হবে কিন্তু সেই পাঁচটা ১-কে যদি একটার পিঠে আর একটা রেখে সাজানো হয় তবে তার সমষ্টি হবে—১১,১১১ (এগারো হাজার একশো এগারো) অথবা পাঁচের দুই হাজার গুণ বেশি। এইভাবে একতার শক্তি যে কত বেশি তা ব্যাখ্যা ক'রে তাকে আরো বিশদভাবে দেখানো হ'য়েছে ইসপের 'এক বাণ্ডিল কাঠি' গল্পে। এক চাষার ছিল চার ছেলে, তারা দিনরাত কেবল ঝগড়া ক'রত। একদিন চাষা এক বাণ্ডিল কাঠি এনে এক এক ছেলেকে তার এক একটি কাঠি দিয়ে তা ভাঙতে ব'ললে। ছেলেরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাঠি অনায়াসে ভেঙে ফেললো। তখন সেই চাষা গোটা বাণ্ডিলটা তাদের হাতে দিলে এক এক ক'রে, কিন্তু তাদের কেউই তা ভাঙতে পারলো না। এই-ই হ'ল একতার শিক্ষা, সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এক হ'য়ে থাকলে তাদের মিলিত শক্তিকে পর্যুদস্ত করা অতিবড় শত্রুর পক্ষেও সম্ভব হয় না।

লীলাবতীর আর একটি গল্প আছে বেশ মজার, সেও অঙ্কের গল্প। আমাদের এই ভারতবর্ষ হাজার হাজার বছরের ঐক্যের বন্ধনে বাঁধা, অমিতশক্তি আমাদের এই দেশের। তিনি ব'লেছেন, 'বিয়ের আগে স্বামী ও স্ত্রী শুধুমাত্র একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই নয়, বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ার পরে তারা হয় এগারো জন—স্বামী-স্ত্রী ও তাদের নয়টি সন্তান।'

মহাভারতে একটা রূপক কাহিনী আছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ এবং জীবনের প্রয়োজনের তাগিদ নিয়ে বাঁচি। এই থেকেই 'নিজে বাঁচো এবং অন্যকেও বাঁচতে দাও' কথাটি মানুষের আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ-চিন্তার এই হল প্রথম সোপান। মহর্ষি ব্যাস একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন একটি পোকা একটা গাড়ি আসতে দেখে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে যাতে গাড়ির চাকার তলায় প'ড়ে পিষে না মারা যায়। তিনি কৌতূহল দমন ক'রতে না পেরে পোকাটিকে জিজ্ঞেস ক'রলেন: ওহে পোকা, তোমার জীবনে কি আনন্দ তুমি পাচ্ছো যার জন্য জীবন বাঁচাতে তুমি এতটা কষ্ট করছো? এতো স্রেফ শক্তির অপচয়!

পোকাটি হেসে জবাব দিল: আমাদের পোকাদের জীবনেও আনন্দ আছে, আর সে আনন্দের মূল্য শুধু আমরা পোকারাই বুঝি—আপনারা বুঝবেন না এবং এইজন্যেই আমরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা করি।

এই প্রসঙ্গে ঋষি টলস্টয়ের বিখ্যাত একটি বাণী আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—'জীবনে বেঁচে থাকো, যদি কষ্টও পাও তবুও জীবনকে ভালোবেসো, কারণ জীবনই সবকিছু, জীবনই ঈশ্বর। জীবনকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা।'

কারণ যে মুহূর্তে আমরা জীবনের ওপরে আমাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলি, পৌরাণিক ভারতবর্ষের আদর্শ অনুযায়ী, সেই মুহূর্তে আমরা তীব্র গতিতে পিছনে হ'টে যাই। কর্মের ভাষ্যতেও ঠিক এই কথাই বলে—'আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকি ততক্ষণই আমাদের পক্ষে ভালো বা মন্দ কাজ করা সম্ভব, ম'রে গেলে পরে ভালো-মন্দ কোন কাজই করার শক্তি থাকে না।

একটা জাপানী রূপকথায় আছে, এক বৃদ্ধা তার আদরের বিড়ালটাকে হারিয়ে পাগলের মতো সেই বিড়ালটাকে সারা শহরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একজন ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হ'লে বৃদ্ধা তাঁকে বিড়ালটার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলো। তখন সেই ধার্মিক ব্যক্তি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—যে রকম ব্যগ্র হ'য়ে তুমি তোমার বিড়ালটাকে খুঁজছো তার অর্ধেক ব্যগ্রতা নিয়েও কি তুমি কখনো তোমার আত্মার সন্ধান ক'রেছ? বৃদ্ধার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল, সে উপলব্ধি ক'রলো তার আত্মার সন্ধান করার এখন তার সময় হয়েছে।

খৃষ্টের একটি স্মরণীয় বাণী এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে—'আত্মাকেই যদি হারাও সমস্ত জগতের অসপত্ন অধিকার পেলেই বা তোমার কি লাভ?'

জাপানী একটা গল্প আছে দু'টো ব্যাঙের। একটা ব্যাঙ থাকতো ওসাকায়, আর একটা থাকতো কিয়োটোতে। ওসাকার ব্যাঙের ইচ্ছে হ'ল কিয়োটো জায়গাটা কেমন তাই একবার দেখে আসতে, আর কিয়োটোর ব্যাঙের ইচ্ছে হ'ল ওসাকা দেখবার। দু'জনেই রওনা হ'ল দু' জায়গা থেকে। মাঝামাঝি একটা পাহাড়ী এলাকায় দু'জনের দেখা হ'ল। দু'জনেই যে যার নিজের জায়গার গুণবর্ণনা ক'রলো। তারপরে ঠিক হ'ল পাহাড়ের উপর থেকে নিজের নিজের দেশ তারা একবার ভালো ক'রে দেখে বিচার ক'রে ঠিক ক'রবে আর অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে উচিত হবে কি না।

তারা দু'জনে পাহাড়ে উঠলো। তারপর যে যার নিজের দেশটাকে দেখে নিয়ে ওসাকার ব্যাঙ তাকালো কিয়োটোর ব্যাঙের দিকে, আর কিয়োটোর ব্যাঙ ওসাকার ব্যাঙের দিকে—একজন বিস্ময়ের সঙ্গে ব'লে উঠলো—'আরে! কিয়োটো যে দেখতে অবিকল ওসাকারই মতো!'

দ্বিতীয় ব্যাঙটা বললো, 'তাই তো হে! ওসাকাও যে দেখতে অবিকল কিয়োটোর মতো।'

দু-জনেই যে যার আপন দেশে ফিরে গেল। আসল ব্যাপারটা ছিল একটু অদ্ভুত। দু'জনেই পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে যখন দেখছিল তখন তারা গন্তব্যস্থল না দেখে নিজের দেশকেই দেখছিল, কারণ দু'জনেরই চোখ ছিল মাথার পিছন দিকে। কত ধার্মিক মহাপুরুষ এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিরোধী তত্ত্ব আলোচনা ক'রতে গিয়ে যে এমনি ভুল করে তার ইয়ত্তা নেই।

একটা চীনা গল্প আছে আরো মজার। হঠাৎ একটা বাড়িতে আগুন লেগে বাড়িটা পুড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা শূয়োরও পুড়ে সিদ্ধ হ'ল। লোকেরা খুব তৃপ্তির সঙ্গে সেই সেদ্ধ শূয়োরের মাংস খেলো। এর আগে কখনো তারা সেদ্ধ শূয়োরের মাংস খায় নি। এর পরে যখনি তাদের শূয়োরের মাংস খাবার সখ হত তারা একটা ঘরের মধ্যে শূয়োরটাকে রেখে সেই ঘর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিত। তারা জানতো এইটেই শূয়োরকে পোড়াবার একমাত্র নিয়ম। পরে অবশ্য তারা বুঝতে পেরেছিল শূয়োর সেদ্ধ করার জন্যে ঘর পোড়াবার দরকার হয় না। এ-জগতে এমন বহু লোক আছে যারা শূয়োরকে পুড়িয়ে সেদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন লাগায়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

একটি চড়ক-মেলার কাহিনী
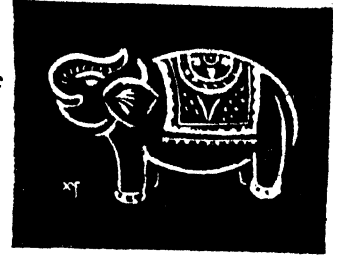
কালপুরুষ

অত্যাচারে জর্জরিত হওয়া এক কথা, আর নিজেকে স্বেচ্ছায় সেই অত্যাচারে আহুতি দিয়ে পারলৌকিক পথ আলোকোজ্জ্বল করার দুর্বোধ্য কামনায় শারীরিক নির্যাতন সহ্য করা—দুয়ের মধ্যে কোথায় প্রভেদ তা আমার মত স্থূল বস্তুবাদীর বুদ্ধির অগম্য। তবু দুর্লভ জিনিসের প্রতি অশ্রদ্ধায় হউক, শ্রদ্ধায়ই হউক—আকর্ষণ একটা অনুভব করি আন্তরিকভাবেই। সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে তা কিছু জমা পড়ে অবশ্যই, ভুলি না কিছুই।

কর্মসূত্রে ঘুরে বেড়াই এখান থেকে ওখানে। দেখি মানুষের কর্মধারার বিচিত্রতা, শুনি মানুষের অন্ধকার গলিপথের কাহিনী, অনুভব করি মনুষ্যত্বের বিরাট অপচয়ের বিশাল বোঝা। কচিৎ কখনও তারই মধ্যে থেকে ভেসে আসে দু' একটি করুণ কাহিনী; না, কাহিনী নয়, পরিপূর্ণ জীবন-সংগ্রামের ব্যর্থতার ইতিহাস, কাল বোশেখীর ঝড়ে উড়ানো দু' একটি ঝরা-পাতার মত!

'নাটু'-কে দেখেই এত কথা মনে হয়েছিল তখন-তখনই। হাজতী আসামী 'নাটু'। বাড়ি এদিকেই। জন্ম কোন এক অজ্ঞাত, অখ্যাত পরিবারে সীমাহীন দারিদ্র্যের মাঝখানে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ-টাকার স্বপন দেখাও যাদের ভাগ্যে কোনদিন জোটে নি। এমন কি সেটা বোধ হয় তাদের পরিবারে পাপের তালিকায় পড়ে।

উপযুক্ত বয়সে পুত্র উপার্জনে অক্ষম হলে পিতামাতাই শুধু নয়,—পাড়াপড়শীরাও ক্ষমা করে না। নাটুর মা-বাবাও করে নি। এ নিয়ে অবশ্য বাবা-ই বেশি বলতেন! মা বলতেন মাঝে-মাঝে—দেখ না বাবা, যা হোক একটা কিছু। নাটু উত্তর দিত না। বস্তুত দেওয়ার মত ছিলও না কিছু তার।

কাউকে না জানিয়ে 'নাটু' গাজনের সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে গেল। যাক ফল-মূল-কলা ইত্যাদি যা জুটত, বাড়িতে দিত কিছু অংশ। এখানে থেকেই তার চোখ খুলে যায়, আয়ের এক বিচিত্র পন্থা দেখে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।—

কর্মের রথ যেখানে আমাকে নামিয়ে দিয়েছে সে-ক্ষেত্র উত্তরবঙ্গের কোন এক সহর। ছোটখাটো সহরটির অঙ্গে অঙ্গে একদিকে আছে সন্ত-ভূমিষ্ঠের চেহারা, অপর দিকে আছে তার পুরাতন ঐতিহ্যের এক কলঙ্কের ইতিহাস! কিন্তু অতীতের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়কে সহরের ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মত চেষ্টা বা উৎসাহ কারও আছে বলে মনে হয় নি সেদিন আমাদের।

এখানে চড়কের মেলায় উপলক্ষে চড়ক-গাছে পিঠে বঁড়শি বিঁধিয়ে ঘুরপাক খায় উপবাসী সন্ন্যাসীর দল—জানি না পারলৌকিক কোন পরমার্থের আশায়। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনায় এই কারণে যে, দু'শ বছর দোর্দণ্ড-প্রতাপ বৈদেশিক শাসনের পরেও এ ধরণের নির্মম, নিষ্ঠুর কোন প্রথা ধর্মের নামে চলতে পারে—এমন কথা সহজে কেউ মানতে চাইবে না। সতীদাহ-প্রথা আজ বিলুপ্ত; গঙ্গাগর্ভে সন্তান-নিক্ষেপ আজ অতীত ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠা। এরপরেও পিঠে বঁড়শি বিঁধিয়ে ঘোরার কাহিনী, কাহিনী বলেই মনে হয়। কিন্তু না—সত্যি। চোখে দেখেই বলছি। ভুলতে পারব না ধর্মোন্মাদনার কি বীভৎস চেহারা! আর অর্থোপার্জনের জন্য মানুষের কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা!

সকালেই স্থির করলাম যেতে হবে এ হেন 'তীর্থক্ষেত্রে'। বিকেলে রওনা হতে হবে, নতুবা শুধু মেলা-ই দেখা হবে—দর্শনীয় বস্তুটি হারাতে হবে।

বর্ষ-শেষের দিন। সারাদিন অমিততেজপুঞ্জ বিকীর্ণ করে মৃত্তিকা তথা মানুষকে দগ্ধ করে ক্লান্ত সূর্যদেব ধূলোয়-ভরা ঘোলাটে আকাশে ঢলে পড়েছেন।

বেরোতেই বেজে গেল ৪॥-৫টা। সঙ্গীদের কেউ কেউ তাড়া দিতে লাগলেন—এর পর গেলে আর আসল বস্তুটি দেখা যাবে না।

সময় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্ণতম রাস্তা, নদীর ধার, জলা প্রভৃতি কোনটা ডিঙিয়ে, কখনও প্রাণটুকু হাতে করে পার হয়ে দ্রুতগতিতে হেঁটে যখন মেলায় গিয়ে পৌছুলাম, তখনও সূর্যদেব একেবারে অস্ত যান নি। কিন্তু ধূলার ঘন আবরণ ভেদ করে তার যে চেহারা মালুম হচ্ছে, তা বেশ ম্লান ও বিষণ্ণ।

লোক জমেছে বিস্তর, অনুমান—বঁড়শি-বেঁধা দেখার জন্যই। আমাদের বুড়ো জমাদারকেও দেখলাম। আরে, ও যে আমাদেরও পরে যাত্রা করেছে। তবে নিশ্চয় ছুটতে ছুটতে এসেছে। আমরাও তো প্রায় ছুটেছি!

শুধাতে জানলাম, অদূরে লাল-পতাকার নীচে পূজার বেদী এবং ঐখানে বঁড়শি-বিঁধানোর পুণ্য কাজটি সম্পন্ন হয়। ইতস্তত করতে লাগলাম। ইচ্ছাও জাগছে; আবার সে নিষ্ঠুর প্রথা মনের দিক থেকে সহ্য হবে কি না ভাবছি। শেষে জোর করেই এগিয়ে চললাম আমরা তিনজন। কিন্তু ভিড়ের চাপে প্রার্থিত স্থানে পৌছুতে পারলাম না; বোধ করি মনের দিক থেকেও তেমন সাড়া আর পাচ্ছিলাম না।

দাঁড়িয়ে আছি আর ভিড়ের ঠেলায় কখনও পূবে, কখনও পশ্চিমে যাচ্ছি। মন্দির নেই, কিন্তু পূজারী আছে। পূজার উপকরণেরও অভাব নেই। আছে ভক্তিমতী নারীর দল, চপল শিশু ও বালকের বাহিনী; চটুল আলাপরত যুবকের দলও আছে এখানে-ওখানে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অপেক্ষমাণ জনতা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল, মাঝখানে পথ করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দেখলাম, ঢাক বাজিয়ে প্রথমে এল ঢাকী, তারপর মাছের ঝুড়ি কাঁধে একজন নিকষ-কালো ব্যক্তি, তারপর দু'জন লোকের কাঁধে দুই সন্তোস্নাত, রক্তাম্বর-পরিহিত নগ্নগাত্র নিরম্বু উপবাসী সন্ন্যাসী। দু'জনেরই জিভের অগ্রভাগ লৌহশলাকা বিদ্ধ—প্রায় একহাত লম্বা সেই লৌহশলাকা। শলাকার দুই প্রান্তে দুইটি কাঁচা আম। প্রথম দর্শনেই সারা শরীরে কেমন একটা আর্ত শিহরণ অনুভব করলাম। কিন্তু সে অল্পকালের জন্যই।

দাঁড়িয়ে আছি এক পূজারীর সামনে। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সরু পথ বেয়ে চলল সন্ন্যাসী দু'জন। তারপর ঘুরে পূজারীর পিছন দিক দিয়ে গিয়ে আবার সামনের দিকে এল। এইভাবে প্রদক্ষিণ করে চলল শতবার। ইতিমধ্যে দেখলাম, এক সন্ন্যাসীর জিভ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে ফোঁটায়-ফোঁটায়। আবারও শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। কিন্তু ভক্তের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই! যতক্ষণ তারা বাহকের কাঁধে ছিল, ততক্ষণ একহাতে বাহকের মাথা, অপর হাতে লৌহশলাকা আড়াআড়ি করে ধরে ছিল। একজনের জিভ থেকে লালা ঝরে নগ্ন কালো গাত্রে নির্ঝরের মত রেখা এঁকে দিয়েছে।

এবার শুনলাম দু'জন সন্ন্যাসীকে নিয়ে যাওয়া হবে চড়কতলায়। আমরা আবার চললাম সেদিকে। এসে দেখলাম শ্রীচ—এসেছেন। তিনি আমাদের প্রবাসের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গীদের একজন। হাসিতে, গল্পে, গানে আমাদের অবসর ভরিয়ে রাখবার পক্ষে অপরিহার্য। আর সর্বদাই পরার্থে তার মন-প্রাণ যেন 'উৎসৃজেৎ' হয়েই আছে। মোট কথা, জীবনের পথে চলতে গেলে এমন একজন লোককে পাশে একান্ত করে পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য। আমরা এসে পৌঁছুবার পরেই, মিনিট দশ-পনের বাদে তিনি এসে পৌঁছেছেন। এতক্ষণ ওদিকে 'সাঁওতালী নাচ' দেখছিলেন। তাকে বললাম—জিভ ফোঁড়ানো যদি দেখতে চান ওদিকে চলে যান—বলে পতাকা প্রোথিত জায়গাটা অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিলাম। কি ভেবে তিনি রাজী হলেন না। বললেন—বঁড়শি বেঁধানোটা দেখবার জন্যই আসা।

হেসে বললাম—আমাদেরও তাই।

উত্তরে তিনি হেসে বললেন—তবে সবাই এখানেই দাঁড়ানো যাক।

এলোমেলো কথাবার্তা চলছিল আমাদের মধ্যে; হঠাৎ সামনের ভিড়টা যেন আচমকা গায়ের উপর চেপে এল। কি ব্যাপার? কেউ আমরা জানি না। চড়কগাছের উপর চোখ পড়তেই দেখি—একটি বাঁশের দুই প্রান্তের গুটানো দড়ি খোলা হচ্ছে। এই সময় একটা গুঞ্জন শোনা গেল—এইবার, এইবার। অনুক্ত মন্তব্যটুকু বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এইবার সেই বহু-প্রতীক্ষিত বঁড়শি-বেঁধা সন্ন্যাসীদ্বয়কে দেখা যাবে। তবে যে কিছুক্ষণ আগে শুনেছিলাম, বঁড়শি-বেঁধানোর অনুমতি এবার মেলে নি, সে-কথা সত্যি নয়।

যেন বঁড়শিগুলো আমাদের পিঠেই বেঁধা হচ্ছে, এমনই একটা শ্বাসরোধক অনুভূতি নিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমরা অপেক্ষা করছি। ভিড়ের চাপ আমাদের দিকেই কেন ঠেলে আসছে বুঝতে পারছি না। চড়কগাছের গোড়ার দিকে দৃষ্টি চলে না—জনতার মাথায় তা বাধা পায়। চড়কগাছের মাথায় বাঁশের প্রান্তে দড়িগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জনতার কোলাহল বাড়ছে। ধূলায় ধূসর হয়ে উঠেছে চড়কগাছের গোড়া। আমরা যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছি—কি হচ্ছে ওখানে? হয়ত এখনই শুনতে পাব গোঙানির শব্দ; হয়ত কানে আসবে অসহায় আর্ত, যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর; হয়ত বা শুরু হবে চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটবে অগ্নিদগ্ধ পশুর মত মানুষের দল।

কিন্তু না, এসব কিছুই হল না। মানুষের মাথার উপর দিয়ে যতটুকু দেখা যায় দেখতে পেলাম—দড়িগুলো অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খানিক পরেই দেখলাম, একজনের কাঁধের উপরে পিঠে বঁড়শি-বেঁধা এক সন্ন্যাসীকে। অপর একজনের কাঁধে চেপে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি চড়কগাছের দড়ির সঙ্গে বঁড়শির গোড়ার দিক বেঁধে দিচ্ছে। প্রায় মিনিট দশেক ধরে চলল বাঁধা-ছাঁদার ব্যাপার। তারপর যা হল, তা রীতিমত শিহরণ জাগায় সারা দেহমনে। দুই পাশের দুই নির্ভর গেল সরে—আর ঝুলতে লাগল সন্ন্যাসী শূন্যে—হাওয়ায়, পিঠে বেঁধানো দুই মস্ত বঁড়শির সাহায্যে। শুধু একদিকেই নয়;—বাঁশের অপর প্রান্তেও ঠিক অমনিভাবে ঝুলছে দ্বিতীয় একজন সন্ন্যাসী। যেন দাঁড়িপাল্লার দুই প্রান্তে সমান ওজনের জিনিস। সন্ন্যাসীদ্বয়ের গায়ে সবাই যেন ধূলা ছিটিয়ে দিল—ওগুলো নাকি মন্ত্রপূত ধূলো!

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়েই ছিলাম। কিন্তু এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না দলের তিনজন, মাথা ঘুরে উঠল তাঁদের। বসে পড়তে বললাম; না হলে পরে হয়ত নিজেরাই শুয়ে পড়তে বাধ্য হবেন বালু-প্রান্তরে। তিনজনের প্রথমেই যাঁর নাম তিনি আমারই সর্বধর্মের সঙ্গিনী—ছায়ার ন্যায় ঘিরে থাকেন আমাকে। কিন্তু এখন আর পারলেন না। দ্বিতীয় জন ন'—বাবু; আমারই সহকর্মী। চিনি তাঁকে ভালভাবেই। বাইরের দিকটাই নয়, তাঁর অন্তরও জানি। কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে থেকে কোন্ ছিদ্রপথে যে এমন একটা দুর্বলতা বেরিয়ে এল, সেটা বোধ করি তাঁরও জানা ছিল না। তৃতীয় জন—শ্রীচ—। দীর্ঘ, সবল, সুস্থ দেহের মধ্যে যে এমন একটা নার্ভাসনেস বাসা বেঁধে ছিল এবং তা এত সহজে এমন অতর্কিতভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তাতে তিনিও বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

তিনজনেই বসে রইলেন। শুধু বসেই রইলেন না—একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ তা পারলেন না। অদেখা, অজানার প্রতি আকর্ষণ—তা সে ভয়ের বস্তু হলেও—মানুষের চিরন্তন। শিশুও তার লোভ, তার দুর্নিবার আকর্ষণ এড়াতে পারে না।

চড়কগাছে যখন ঝুলন্ত অবস্থায় সন্ন্যাসীরা ঘুরতে আরম্ভ করেছে, তখন আবার এই তিনজনের আগ্রহ হয়ে উঠল দুর্বার। কিন্তু তারা একনজর তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজলো, কেন না তখন সন্ন্যাসীদের পিঠের চামড়া বঁড়শির টানে ইঞ্চি তিনেক উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন ছিঁড়ে পড়ল বুঝি। বুকের চামড়াতে টান ধরেছে—সব টেনে নিচ্ছে পিঠের দিকে। এ-দৃশ্য তাদের কাছে আরো বীভৎস—

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

আরো নির্মম। একটু আগে তাঁরা একবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন চড়ক-গাছ ঘুরতে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে; কিন্তু আবার বসে পড়লেন চোখে আঙুল দিয়ে। দেখার সখ মিটেছে তাঁদের।

আশ্চর্যের কথা এই যে, সন্ন্যাসীদের মুখে যন্ত্রণার লেশমাত্র চিহ্ন ফুটে নেই। নেই কোন কাতরোক্তি কোন অভিযোগ। বরং চড়কগাছ জোরে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তারা শূন্যে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ছে এবং কোঁচড়ের ভিতর থেকে নিয়ে ছুড়াচ্ছে কলা-বাতাসা প্রভৃতি নীচের জনতার উদ্দেশ্যে। মনে হয় এ যেন তাদের অভ্যাসগত প্রকৃতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এত সহজ, এমন নিশ্চিন্ত তাদের এই বঁড়শি-বেঁধানো অবস্থায় ঘোরা।

চার-পাঁচ বার ঘোরার পর চড়কগাছ থামল। আমরা এরপর চলে এসেছি।

সন্ধ্যের খানিক পরেই আমরা এসে পৌঁছেচি বাসায়।

প্রচুর লোকজন, বাস্তভাণ্ড এবং উজ্জ্বল আলোর মিছিলে আমরা চমকে উঠলাম। আবার দেখি সেই দল। দু'জন সন্ন্যাসী, পিঠে বঁড়শি-বেঁধানো! অত্যন্ত নিকট থেকে দেখলাম, বঁড়শিগুলো ইঞ্চি আষ্টেকের কম হবে না—পিঠের উপর পরম নিশ্চিন্তে আঁকড়ে বসে আছে। কালো চেহারায় সাদা বঁড়শিগুলো, অন্ধকার আকাশের বুকে বিদ্যুৎ রেখার মত। সঙ্গী-সাথীর দল বড় বড় পেট্রোম্যাক্সগুলো পিঠের সামনে উঁচু করে ধরে আছে—যেন ভাল করে সবাই দেখতে পায়। ওরা বলল—বঁড়শি খুলবার জন্যে কিছু সাহায্য চায়। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে পকেটে যা ছিল, দিয়ে দিলাম। যত আমার দেরি হবে, ততই ওদের বঁড়শি খুলতে দেরি হবে—এ যেন কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওদের বিদায় করতাম। হাত তুলে নমস্কার করে ওরা চলে গেল। চকচকে সাদা বঁড়শিগুলো আলোর উজ্জ্বল আভায় যতদূর দেখা যায় দেখলাম।

'নাটু'কে শুধালাম—ওরা আবার বাড়ি বাড়ি ঘোরে কেন? বঁড়শিগুলো সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেললেই হয়।

'নাটু' উত্তর দিল—এ তাদের উৎসবের অঙ্গ। তা ছাড়া এইভাবে যে-টাকা পাওয়া যায়, সেগুলো তার অতিরিক্ত প্রাপ্য। এই বখশিসগুলো ওদের ব্যক্তিগত পাওনা।

এবার আমি বুঝতে পারলাম—নির্যাতন, অত্যাচার বা অসম্মানও মানুষ ভুলে যায় অনেক ক্ষেত্রে যা পেলে, সেই জিনিস-ই এদের মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে।

কত টাকা পাও—আমার প্রশ্ন।

—ঠিক নেই। যেবার যেমন হয়। আদায়ের উপর নির্ভর করে। তবু,—একটু থেমে বলল নাটু,—চল্লিশ-পঞ্চাশের কম হয় না; কোন কোনবার ষাট টাকাও হয়েছে। যে বঁড়শি-বেঁধানোর পুণ্য কাজটুকু করে সে নেয় দু' টাকা।

ওটাকে পুণ্য কাজ বলছ? আমি বিস্ময়সূচক প্রশ্ন তুলে ধরলাম।

নয়ত কি বাবু? আপনারা তো শিক্ষিত ব্যক্তি, ধর্মকর্ম কি আর তেমন মানেন? যারা পিঠে বেঁধায়, তারা তো আরও পুণ্যের কাজ মনে করে। না হলে আমি কি এতবার বিঁধাতে পারতাম? অবশ্য ঐ সঙ্গে আয়ের কথাটাও ভাবতে হবে বৈ কি। এ একরকম রথ-দেখা কলা-বেচা আর কি!

কতবার বিঁধিয়েছ তুমি?

অফিস ঘরের টানা-পাখার দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন একটা হিসাব করল নাটু। তারপর বলল—তা ষোল-সতের বার হবে। এই দেখুন—বলে পিছন ফিরে জামাটা তুলে ধরল। দেখলাম—পাঁজরার পিছনে পিঠের দুপাশের মাংসপেশীতে ধর্মোন্মত্ততার কি বীভৎস নিষ্ঠুর চিহ্ন—আমরণের সঙ্গী হয়ে আছে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে নাটু শুধাল—দেখলেন?

অস্ফুট স্বরে আমি বললাম—হ্যাঁ। আচ্ছা, অত বড় বঁড়শি চামড়ার মধ্যে বিঁধে যায়, তা বিঁধোবার সময় লাগে না বা যন্ত্রণা হয় না?

ঐ সূঁচ বিঁধানোর মত একটু লাগে—সে কিছু না! না হলে আমি কি আর অতবার বিঁধাতে পারতাম। এবারও বাইরে থাকলে বিঁধাতাম।

সেটা 'নাটু'র দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য সে প্রশ্নের মীমাংসা আমি আজও করতে পারি নি। যাক। কিন্তু গতকাল রাত্রিতে বঁড়শির যে চেহারা আমি দেখেছি, তাতে 'নাটু'কে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না।

আচ্ছা, কি করে বেঁধায়?

সেখানে কাউকে যেতে দেয় না, কেউ দেখতে পায় না। দু'জন মাত্র লোক থাকে—যার পিঠে ফুঁড়বে এবং যে ফুঁড়বে।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু কেমন করে ফোঁড়ায় তা তো তোমরা টের পাও?

হেসে ফেলল নাটু—আজ্ঞে, তা আর পাই নে?

তবে?

যার পিঠে বিঁধাবে সে পিঠ পেতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। পিঠের চামড়াটা খুব করে দলাই-মলাই করতে করতে ঘি-মাখানো সূঁচালো-মুখ বঁড়শিটা উঁচু করে ধরা পিঠের মাংসপেশীর মধ্যে বিঁধে দেয় পড়-পড় করে।

শুনেই সারা শরীরটা আমার যেন মোচড় দিয়ে উঠল। আর শুনবার প্রবৃত্তি হল না।

নাটুর কথা ভাবতে লাগলাম। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়েই কি এই পথ ও বেছে নিয়েছে—এর মধ্যে ধর্মে মতি আর অর্থের মোহ, কোন্‌টাকে মনে-প্রাণে কামনা করে মধ্যবয়সী এক অজ্ঞাতনামা হাজতী আসামী? কোন্‌টা তাকে টানে বেশি? একদিনের উপার্জনকারী পুত্রকে কি তার মা-বাবা ক্ষমার চোখে দেখেন?

নাটুর অতীত ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন কথা বলে।

(পর্ব-প্রকাশন্তের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু বেলা যে কত হয়েছে ইন্দ্রনাথের ঘরে তা বুঝবার উপায় নেই। সে ঘরে বাইরের প্রকৃতি প্রবেশ করতে পারে না। তার পরিমণ্ডল তার নিজস্ব সৃষ্টি। তার আলো-অন্ধকার গরম-ঠাণ্ডার নিয়ন্তা সে নিজে। দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দা যে সকালের আলোয় ঝলমল করছে, শিবানীর ঘরের শূন্য বিছানায় যে তার শিয়রের জানালাটা রোদের ছায়ায় পিঠ রেখে শুয়ে থাড়া শরীরটাকে একটু আয়াস করিয়ে নিচ্ছে বা দিনটা যে কি গরম নিয়ে আসছে, যার আভাস এই সকালের রোদ-হাওয়ায় পাওয়া যাচ্ছে—সে সব কিছুই বোঝবার উপায় নেই ইন্দ্রনাথের ঘরে। সেখানে জমাট ঠাণ্ডায়—ব্যারোমিটারের পারা ষাট ডিগ্রিতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার সমুদ্রের বুকের উপর ঢেউ তোলা চাঁদের আলোর মতো আলো ঢেউ তুলছে, ঘর জোড়া ভেলভেটের পর্দার ভাঁজে ভাঁজে।

দেয়ালে ঘোর তামা-রং-এর শেডে ঢাকা শূন্য পাওয়ারের সবুজ ক্ষীণ আলো জ্বলছে। একটা নিস্তেজ আলোর বিচ্ছুরণ, ঠিক আলোটার বরাবর কার্পেটের উপর সামান্য জায়গায় বৃত্তাকারে পড়ে ঘরের অন্ধকারের কালোত্বটাকে ফিকে করছে মাত্র তার বেশি একটুও নয়। তার বেশি চাহিদাও নেই ঘরের অধিকর্তার তার কাছে। ঘুমের আগেই যেন দু'জনার দৃষ্টির মধ্যখানে নিঃসীম অন্ধকার জমাট বেঁধে না থেকে, মুখের কথার সঙ্গে যেন দু'জনের চোখের প্রতিফলন মিলতে পারে—ক্ষীণ-আলোর কাছে যে এটুকুই শুধু চাহিদা ঘরে অধিকর্তার—তা বুঝতে পারা যায়

ইন্দ্রনাথের এই ঘরে, ইন্দ্রনাথের শয্যায় চোখ মেলে শিবানা প্রথমটায় ঠাহরই করে উঠতে পারলে না, ও কোথায়। ভীষণ অপরিচিত ঠেকতে লাগল জায়গাটাকে ওর। শুয়ে শুয়েই তাকিয়ে রইল ঘরটার দিকে। চোখ যা দেখছে ঘুমের ঘোর ভরা মাথাটা যেন তা ঠিক ধরে উঠতে পারলে না কিছুসময়। ঘুমের জড়তা কাটিয়ে মাথা কাজকরা আরম্ভ করলে তবে বুঝল শিবানী—এটা ইন্দ্রনাথের ঘর। মনে পড়ে গেল গত রাতটাকে।

সুখী মুখটাকে নরম বালিশটার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎ শরীরটাকে কাৎ করল শিবানী।

বাড়িটাতে মধ্যবিত্ত বাড়িগুলির মতো সকালে বিকেলে বাসন-মাজা, জল তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া বা ঠিকে-ঝি আসার, গয়লার দুধ আনার মতো সময় নির্ধারক কোন শব্দ ওঠে না। যদি বা ওঠে এক-আধটুকু তাও এই বন্ধ ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। ইন্দ্রনাথ উঠে গেছে দেখে শিবানী বুঝল সকাল হয়েছে। সকালে ওঠাই ইন্দ্রনাথের অভ্যেস।

তা হোক গে সকাল।

ওর সকালে ওঠা অভ্যাস নয়। ও উঠবে না এখন।

গায়ের মোটা চাদরটা দ্রুত করে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমোবার ইচ্ছার সঙ্গে আর একটা ইচ্ছাও ছিল। ইন্দ্রনাথের ঠোঁটের ছোঁয়ায় ও চোখ মেলবে।

সে যেন কত যুগ আগের কথা—

ইন্দ্রনাথ ওর দেরিতে ওঠার অভ্যাসটা সযত্নে জিইয়ে রাখত—শুধু ওর ঘুমন্ত চোখে ঠোঁট ছোঁয়াবার জন্যে। ও ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে উঠতে চাইলে উঠতে দিত না সে কিছুতেই বলত, দু'জনে উঠে এক সঙ্গে মার্চ করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তার কি মানে। তুমি একেবারেই রসজ্ঞ নও শিবানী। এক সঙ্গে ওঠা হবে না। হয় স্বামী ঘুমিয়ে থাকবে স্ত্রী এসে স্বামীকে জাগাবে, নয় তো স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকবে স্বামী এসে স্ত্রীকে জাগাবে। দাম্পত্য-জাগরণের এই রীতি হওয়া উচিত।

তখন ওরা বেহালার বাড়িতে। ইন্দ্রনাথ বিয়ের পর প্রথম ওকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল তার বেহালার পৈতৃকবাড়িতে বাবা-মা'র কাছে। এক ঘরেই তখন ওরা থাকত। অনেক অমিল, অনেক বিরাগ

সত্ত্বেও এক ঘর মেলাতে চায়। ওদের সেই এক ঘর, এক শয্যাও ওদের ছিন্ন মনকে অনেক জোড়া লাগিয়েছে। তারপর তৈরি হলো জজকোর্ট রোডে ওদের এই হাল-ফ্যাসনের বাড়ি। তৈরি হলো স্বামী-স্ত্রীর জন্য পাশাপাশি দুই ঘর। আর এই ভিন্নঘর চলল কেবল দু'জনের মধ্যখানের ব্যবধান বাড়িয়ে। একদিনের রাগ যেখানে হয়ত একদিনেই মিটে যেত, নয় তো বড়ো জোর দু'দিনে, সেখানে জমা হয়ে উঠতে লাগল তা। অপরাধী ইন্দ্রনাথের প্রথম দিনের ভয় দ্বিতীয় দিনে আরো বাড়ল—তৃতীয় দিনে আরো। দুই ঘরের মধ্যখানের ভারি পর্দাটা উঠল পাথরের দেয়াল হয়ে। কখনো বিরাগ-বিতৃষ্ণায়। কখনো সঙ্কোচ-দ্বিধা-চক্ষুলজ্জায়।

না, যে সম্পর্কটার সবকিছু অভিন্ন—অর্থাৎ যে সম্পর্কের প্রাণবায়ুই অভিন্নত্বের ভেতর নিহিত, সে সম্পর্কটার ভিন্ন ঘর, ভিন্ন শয্যা ভালো নয়। পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজা সবখানে যথার্থ নয়।

ডানলোপিলোর গদি তলিয়ে এ-পাশ থেকে ও-পাশে ফিরল শিবানী। ইন্দ্রনাথের বালিশটা টেনে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে বুকের তলায় ঠাসল। ঘুমের আমেজটা একেবারেই চলে গেছে আর ঘুম আসবে না বুঝল শিবানী। কিন্তু থাক ঘুমের আমেজ, আমেজ এখন শিবানীর সর্বশরীরে। বুকের তলার বালিশটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে হাত দু'টো কপালের উপর রেখে শুয়েই রইল সে।

আজ ওর তাড়া নেই।

অফিস ?

না, অফিসে ও আজ যাবেই না। ইচ্ছেই করছে না। ভালোই লাগবে না।

কবেই বা ওর অফিসকে, চাকরীকে, অফিসের বস অমল বোসকে ভালো লেগেছে। মিঃ বোস যখন ওর দিকে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে তাকান তখন ওর যেমন হাসি পায়, তেমনি বিরক্তিও লাগে ; মনে হয়—তায়! যে তোষামোদ আর অধ্যবসায় পুরুষ অন্য নারীর মন পাওয়ার জন্য খরচ করে সে অধ্যবসায়টা সে যদি স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্য খরচ করত তবে সংসারগুলি কি প্রাণের মাধুর্যে ভরপুর হ'য়েই না গড়ে উঠতে পারতো!

প্রেমে প্রীতিতে মধুরতায় ; সম্ভোগে সাহচর্যে এমন একটা গভীরতর এবং প্রয়োজনীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন দায়িত্ববোধই যেন গড়ে ওঠে না পুরুষের মনে।

কিন্তু কেন ওঠে না ?

তার জন্য দায়ী কে ?

পুরুষ না নারী ?

দায়ী নারী নিজেই।

স্ত্রীর মন বলে যে কোন একটা পদার্থ রয়েছে এ-শিক্ষা নারী কোনদিন দেয় নি পুরুষকে। এখনও দেয় না।

কেন দেয় না ?

গভীরভাবে সে কথাটাই ভাবতে লাগল শিবানী।

স্বামীর মন পাওয়ার জন্য যে শিক্ষা নারী তার মেয়েকে দুধের বয়স থেকেই দিতে আরম্ভ করে, স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্য ছেলেকে তেমন শিক্ষা দিতে তাকে দেখা যায় না কেন ? স্বামীর ঘরে যাত্রা করিয়ে দেবার কালে অশ্রুমুখী কন্যার মুখটি কাছে টেনে এনে সংশয়াকুল ভীরু মা যেভাবে আশীর্বাদ করেন, স্বামীর মন ও ভালোবাসা পেয়ে স্বামী-সোহাগিনী হও, পুত্রের মুখ কাছে টেনে মা'কে সে আশিসবাণী উচ্চারণ করতে শোনা যায় না কেন ? কেন তার মুখে শোনা যায় না স্ত্রীর মন ও ভালোবাসা পেয়ে কল্যাণময় আনন্দের নীড় রচনা কর। কন্যার জীবন-যাত্রার পক্ষে স্বামীর মন পাওয়াটা নারীর যেমন অপরিহার্য মনে হয়, পুত্রের জীবন-যাত্রার পক্ষে স্ত্রীর মন পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নটা নারীর এমন অবান্তর আর অপ্রয়োজনীয় মনে হয় কেন ?

সেই আদিকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আজও নারীমন ঠেকে আছে এক স্থানে। মা হিসাবে মেয়ের জন্য যে সুখ নারীর নিয়ত প্রার্থনার বস্তু। বধূর জন্য সে সুখ তার অন্তর থেকে উত্থিত হতে চায় না কিছুতেই।

বোকা বোকা কি বোকাই না মেয়েগুলি!

বোঝে না তার কন্যাকে স্বামী-সোহাগিনী হতে বলার আশীর্বাদ একেবারেই মিথ্যে, যতক্ষণ না স্ত্রীকে সুখী করার শিক্ষাটি পুত্রদের দিয়ে উঠতে পারছেন।

আসতে পারি—জিজ্ঞাসা করল কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। কথার সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে এসে ঘরে প্রবেশ করল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী উঠে পড়তে যাচ্ছিল—

নিষেধ করল ইন্দ্রনাথ। বলল, প্লিজ, উঠো না। আমি কেদারাটা নিয়ে এসে খাটের পাশে বসছি। গল্প করব।

কেদারাটা তুলে এনে খাটের সঙ্গে লাগিয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। বলল, আমি আজ 'বেডটি' বারান্দার চেয়ারে বসে খেয়েছি। তোমারটা তোমার আয়া নিয়ে আসছিল আমি নিষেধ করেছি। তোমাকে ভীষণ ঘুমোতে দেখে গিয়েছিলাম। আয়া এসে তুলে ফেলুক, চাই নি। ভেবেছিলাম আমি জাগাব। বলে ইন্দ্রনাথ শিবানীর দিকে তাকাল।

শিবানীর দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হলো তার দৃষ্টি।

না, ইন্দ্রনাথ ভোলে নি আগের কথা!

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ। বলল, এখন আবদুলকে তোমার বেডটি নিয়ে আসতে বলে এসেছি।

শিবানী ইন্দ্রনাথের দিকে পাশ ফিরে গদির ওপর কনুই আর হাতের তালুতে মাথা রাখল।

কালকে আমি ড্রিঙ্ক করেছিলাম শিবানী ?

অবাকভাবে শিবানী তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথের দিকে।

আবার জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথ, করেছিলাম ?

তোমার মনে নেই করেছিলে কি না-করেছিলে ?

না।

মাথা খাড়া করে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকাল শিবানী। যদিও সে আশ্চর্যবোধ করছিল তবু পরিহাসের সুরেই বলল, আমার সঙ্গে ভাব করা নিয়ে ভাবনা করা পর্যন্ত সইবে কিন্তু পাগল হয়ে যাওয়াটা সইবে না। তার চাইতে অ-ভাবই আমার ভালো।

হাসল ইন্দ্রনাথ চোখ মিটমিটে দৃষ্টিতে শিবানীর দিকে তাকিয়ে।

ইন্দ্রনাথের এই আকর্ষণীয় হাসিটা যেন শিবানী ভুলেই গিয়েছিল।

শিবানীর কোমরে একটা হাত রাখল ইন্দ্রনাথ। বলল, তুমি বলই না খেয়েছিলাম কি না।

যদি বলি, না ?

তবে—যেন ভাবতে লাগল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী তাকিয়ে রইল তার দিকে একলক্ষ্যে।

ইন্দ্রনাথ সিগারেট থেকে একমুখ ধোঁয়া টেনে নিয়ে ছেড়ে দিতে দিতে বলল, তুমি যখন বলছ আমি যদি না বলি। তার মানে হচ্ছে কাল করেছি ম। খুব বেশি খেয়েছিলাম?

এখন তো তাই দেখছি। পরিমাণ বেশি না হলে সব ভুলে গেলে কি করে।

সব ভুলে গেছি? তা-কি হয়। এক ড্রিঙ্ক করার কথাটা ছাড়া আর সব মনে আছে। তার মানে ওটাতে আমার কাল মন ছিল না তাই মনে নেই। কালকের পুরো নেশাটা ছিল আমার এখানে। বলে শিবানীর শরীরের ওপর ন্যস্ত হাত দিয়ে শিবানীকে চাপড়ালো ইন্দ্রনাথ।

এবার শিবানী বুঝল এই কথাটা বলার জন্যই ইন্দ্রনাথের আগের কথাগুলি বলা।

প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সময় যে সন্দিগ্ধ, অবিনীত, ঈর্ষালু ইন্দ্রনাথকে দেখে, সে আর এ ইন্দ্রনাথ কি এক।

ইন্দ্রনাথ বলল, এসে দেখলাম কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছ। নিশ্চয়ই কড়িকাঠ গুণছিলে না। কড়িকাঠ নেই-ই। ভাবছিলে? কি ভাবছিলে?

কি ভাবছিলাম—বলে এবার হাতের তালু থেকে থুতনী তুলে শয্যার ছেড়ে শুয়ে পড়ল শিবানী। ইন্দ্রনাথ এসে ওকে যে ভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিল, ঠিক সেই ভাবে ছাদে চোখ রেখে বলল, ভাবছিলাম স্বামীর মন পাওয়ার জন্যে মেয়েদের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, ছেলেদেরও স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্য সে রকম প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে, এ সত্যটা স্বীকৃত হচ্ছে না কেন।

তারপর?

শিবানী উত্তর দিতে যাচ্ছিল—

দরজায় নক করার শব্দ হলো।

ইন্দ্রনাথ শিবানীর শরীরের ওপর থেকে হাত তুলে নিল।

শিবানী বুকের শাড়ির কাপড় গুছিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে কাত হয়ে হাতের উপর মাথা রাখল।

যদিও আবদুল চা নিয়ে এসেছে বুঝেছে, তবু ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল, কে?

সাব চা।

নিয়ে এসো।

আবদুল এসে চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। হাতের ট্রে মেঝের কার্পেটের ওপর নামিয়ে ঘরের কোণ থেকে কাচের নিচু সাইড টেবিলটা এনে খাটের পাশে রাখল। কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে কাচটাকে ফের পরিষ্কার করল। তারপর কার্পেটের ওপর থেকে ট্রে তুলে সাইড টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল।

শিবানী অর্ধশায়িত অবস্থায় থেকেই বাঁ হাতে চা বানাতে লাগল। টি-পটের মাথা থেকে টি কেটলি তুলে ফেলল। উপুড় করা কাপ ছুঁটো চিৎ করল। পটের চা চামচে দিয়ে নাড়তে গিয়েও হাতের চামচ নামিয়ে রাখল। ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত পাতলা লিকার খায়। না নেড়ে চায়ের ওপরের সোনালী রং-এর জলটা তার কাপে ঢেলে দিয়ে তারপর চামচে দিয়ে বেশ করে নেড়ে নিজের কাপে কড়া চা টা ঢালল। চিনি মেশাল। দুধ মেশাল। ইন্দ্রনাথের কাপটা ট্রের ওপর রেখে নিজের কাপটা অতি সন্তর্পণে ভারসাম্য বজায় রেখে রাখল বিছানার ওপর।

ইন্দ্রনাথ বলল, পড়ে যাবে।

না পড়বে না—বলতে গিয়ে যেটুকু নাড়া খেল তাতেই ডানলোপিলো দুলে উঠল, চায়ের কাপ ঝাঁকুনি খাওয়ার শব্দ তুলল প্লেটের ওপর। তাড়াতাড়ি কাপটা হাতে তুলে নিয়ে শিবানী হাসল।

ইন্দ্রনাথ সাইড টেবিলটা আরো এগিয়ে দিল ওর দিকে কাপ রাখবার।

ইন্দ্রনাথ গা ছেড়ে কেদারায় হেলান দিয়ে বলল, আজ ছুটি। অফিসে যাচ্ছি নে। অন্য কাজে বেরুচ্ছি নে। কিচ্ছু করছি নে। এ ঘর থেকে নড়ছি নে। ব্রেকফাস্ট এখানে খাবো। লাঞ্চ—তা তখন ভেবে দেখা যাবে। এখন কেবল গল্প—বল, তোমার মিঃ বোসের গল্পই শোনা যাক—

মিঃ বোসের গল্প। ঠোঁট কঠিন হয়ে উঠল শিবানীর। কাপের ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল—ইন্দ্রনাথের দিকে।

না, সে মুখে কোন হিংসা জ্বালা, চোখে কোন কুটিলতা নেই। শরৎ আকাশের মতো পরিষ্কার সে মুখ। আরাম বোধ করল শিবানী।

আর কিছু নয়, এক্ষুণি ওর সকালের স্বপ্ন ভেঙে গেলে ভারি কষ্ট পেতো সে।

আবার দরজায় নক করার শব্দ হলো।

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো ইন্দ্রনাথের।

ইন্দ্রনাথ সাড়া দেবার আগেই আবদুল জানাল, নতুন ম্যানেজার সাহেব এসেছেন দেখা করতে। জরুরি কথা আছে।

ও, বলে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শিবানী একবার করে চায়ে চুমুক দিতে লাগল আর মাঝখানের সময়টা চামচ দিয়ে কাপে প্লেটে টুং-টাং শব্দ তুলতে লাগল জলতরঙ্গের সুরে।

মিষ্টি শব্দটা ওর মনের সুরের সঙ্গে বেশ একটা ঐকতান তুলতে লাগল যেন।

ইন্দ্রনাথ তার নবনিযুক্ত ম্যানেজার অরুণের সঙ্গে বারান্দার যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেটা ঠিক শিবানীর শিয়র। যদি মাঝখানের দেয়ালটা তুলে নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে অরুণ শিবানীর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবানী অরুণকে চেনে না।

ইন্দ্রনাথের ম্যানেজার বদল হবার সংবাদ সে রাখে না।

ইন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে যেমন ঘরের কার্পেট বদল, পর্দা বদল দেখে বুঝেছিল অনেকদিন বাদে সে ইন্দ্রনাথের ঘরে এলো, তেমনি হয় তো যেদিন অরুণকে দেখবে সেদিন বুঝবে ইন্দ্রনাথের ম্যানেজার বদলের খবরও অনেকদিন পরে সে জানল।

কিন্তু খুব বেশিদিন দরকার হলো না। শীগ্‌গিরই অরুণকে শিবানীর চিনতে হলো। আর সে চেনা স্তম্ভিত করে ফেলল ওকে।

শিবানী তার অফিস-টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে খুব তোড়ে কলম চালিয়ে যাচ্ছিল। স্তূপীকৃত হয়ে তার টেবিলের উপর জমে রয়েছে অফিসের যোগাযোগ পত্র, বেশ কিছু চিঠির জবাব দিয়ে ফেলা সম্বন্ধে সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদিও ওর বস মিঃ বোস কাজেই কাজে যে ঢিলেমিটা ও দিয়েছে তাতে ভীত হবার কিছু নেই। অবশ্যি ভীত শব্দটা শিবানীর ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না। চাকরিটা ওর না প্রয়োজনের, না সখের। প্রথমত কিছু করার জন্য করা। কিন্তু কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে বাড়িতে বসে বইপড়া এর চাইতে ঢের বেশি ভালো কিছু করা, যা সত্যি সত্যি কিছু করা। দ্বিতীয়ত ইন্দ্রনাথকে যে যন্ত্রণাটা দেবার জন্য ওর কাজ করা তাও মনে হচ্ছে আর টেনে চলতে পারছে না। চাকরিও ধাতে সয় না, অমল বোসদের জাতটাকেও ধাতে সয় না ওর। ইন্দ্রনাথ যদি হঠাৎ এমনি করে ওর হাতে নিজেকে সমর্পণ না করত তবে হয় তো ইতিমধ্যে ও কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বই নিয়ে নিবিড় হয়ে বসত।

কিন্তু ঠিক এখন আর কাজ ছাড়া যায় না।

কিছু অপেক্ষা ওকে করতেই হবে। নইলে ওর কাজ ছাড়ার সঙ্গে এখন যে কারণটা যোগ হবে সেটা সত্য নয়।

এই ভুলের উপর দাঁড়িয়ে অযথা ইন্দ্রনাথও অস্বস্তি বোধ করবে।

তারও লজ্জা রাখবার ঠাঁই মিলবে না যদি ইন্দ্রনাথের এই আত্মসমর্পণ দু'দিনের হয়।

ওর কাজ নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের একটা অঙ্গ ছিল ইন্দ্রনাথের সেখানে এ ক'দিনের ভেতর একটা কথাও সে বলে নি এ নিয়ে।

নিজের ওপর তার বিশ্বাস নেই।

কিন্তু কোন ফাঁকিও নেই তার ভেতর।

তাই নিজের সম্বন্ধে নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত সে নীরব থাকবে।

ঠিক এখন আর কাজ ছাড়া চলে না শিবানার।

আর যতক্ষণ কাজ করছে ততক্ষণ অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে ঠিকমতো। জরুরি কাজ ফেলে রাখা চলবে না। মিঃ বোস ওর ওপরওলা হতে পারে কিন্তু তাঁরও ওপরওলা আছেন। আজ অফিসে এসে শিবানী একটুও সময় নষ্ট করে নি। প্রথমে চিঠির পর চিঠি খুলেছে আর পড়েছে। যে চিঠিগুলিকে বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সেগুলোকে এক জায়গায় রেখেছে। বাকিগুলিকে অন্য জায়গায়। তারপর একের পর এক চিঠি টেনে নিচ্ছে আর জবাব লিখে চলছে। সবগুলির জবাব লেখা হলে একসঙ্গে গেঁথে মিস জেনির হাতে তুলে দেবে। মিস জেনির ম্যানিকিওর করা ফর্সা লম্বা আঙুল নৃত্যের ছন্দে টাইপরাইটার মেশিনের চাবির ওপর নেচে বেড়াবে আর চিঠিগুলি টাইপ হয়ে বেরিয়ে আসবে।

মিস জেনি আর শিবানী দু'জনার সামনেই দু'টো শূন্য কফির পেয়ালা। কাজের অবসরে হয়ত এরই মধ্যে এক সময় কফি খেতে খেতে দু'জনেই একটু গল্প করে নিয়েছে। আবার এখন মগ্ন হয়ে কাজ করছে।

একটা জুতোর শব্দ মচমচ-শব্দে এগিয়ে আসতে লাগল।

জুতোর চলাটা ওদের দু'জনেরই চেনা।

মিঃ অমল বোস আসছেন ওদের ঘরে।

কিন্তু প্রতিদিনের চলা যেমন মিঃ বোসের 'আসছি' বলতে বলতে হেঁটে চলে আসে আজকেরটা যেন তা নয়। আজকের জুতোর শব্দটা যেন মচ্‌মচ্‌, মচ্‌মচ্‌ শব্দে বলছে, অধিকারীর চোয়ালের হাড় শক্ত।

মিস জেনি এবং শিবানী দু'জনেই শব্দটার ভিন্ন সুর লক্ষ্য করল। মিস জেনির ও নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই। মিঃ বোস ওর কাছে আসছেন না। কিন্তু যার কাছে আসছেন সেই শিবানীরও তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। তার হাতের কলম থামল না। কাজের ওপর থেকে মন এতটুকু সরল না। মিঃ বোস এসে ঘরে প্রবেশ করলে মিস জেনি হাতের কাজ সমান তালে চালাতে চালাতে তারই ভেতর মাথা নেড়ে নড করল। শিবানী করল না। করল না এজন্য নয় যে সে মিঃ বোসের সঙ্গে অভদ্রতা করতে চায়। করল না এইজন্য যে, মিঃ বোস তার চলা থেকে চোয়ালের হাড়ে পর্যন্ত যে বক্তব্য নিয়ে এসে ঘরে ঢুকছেন সেই বক্তব্যটাকে সে প্রশ্রয় দেবে না এতটুকু মাথা নেড়েও।

মিঃ বোস শিবানীর সামনের চেয়ারের পিঠ ধরে এসে দাঁড়ালেন। বোধ হয় শিবানীর বসতে বলার জন্য একটু সময় নিলেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্রই। তারপর চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, মিসেস সেন কি খুব ব্যস্ত?

না—হাতের কাগজের উপর মাথা নিচু করে সমান ভাবে লিখতে লিখতে উত্তর দিল শিবানী। তারপর একটানে আরো লাইন দুই লিখে কলমের মুখ বন্ধ করে মাথা তুলল। একটু হেসে বলল, একটু বসিয়ে রাখলাম। কিছু মনে করবেন না।

মিঃ বোস গম্ভীর থমথমে গলায় বললেন, না।

যেন অভিমানী কিশোর।

বিশ্রী লাগল শিবানীর। লিখতে লিখতে আঙুল ধরে গিয়েছিল। বাঁ হাতে ডানহাতের আঙুলগুলি ঈষৎ দলাইমলাই করতে করতে ভেতরের বিশ্রী তিক্ততাকে যেন একটু থিতিয়ে নিতে লাগল শিবানী।

আমাকে দেখলেই কি আজকাল আপনি বিরক্ত বোধ করেন মিসেস সেন?

সে কি—এ কি বলছেন আপনি!

হাতের ব্যঞ্জনায় হতাশা প্রকাশ করে মিঃ বোস বললেন, কি যে আমি বলতে চাইছি, তা নিজেই বুঝছি নে।

তবে আগে নিজেই সেটা বুঝে আসুন—রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে শিবানীর এ কথাটাই বলতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু বলল না। তার ভদ্রতাবোধ বাধা দিল।

মিস জেনির সমক্ষে মিঃ বোসের এই ভাবভঙ্গি—কথা অত্যন্ত অপছন্দ লাগছিল শিবানীর। যদিও মিস জেনি যতই বাংলা কথা বলুক দু'জন বাঙালীর কথোপকথন বোঝবার সাধ্য তার নেই। কিন্তু ভাষা না বুঝুক ভাবটা তো বুঝছে। বিশ্বে শব্দের অভিধান যতই বিভিন্ন থাক ভাবের অভিধান এক। ভাব বোঝার জন্ত ভাষা দরকার হয় না। যদিও জেনি চোখ নিচু করে একাগ্র মনে টাইপ করে চলেছে। অর্থাৎ সে বলছে, আমি তোমাদের ভাষা বুঝি নে। ভাবটাও চোখ তুলে দেখছি নে। আমার দিক থেকে তোমরা নিঃসঙ্কোচ থাকো।

কিন্তু তার এই বলাটাই বলে দিচ্ছে ভাষা আর ভাব ছাড়াও বোঝার জগতে অনুভূতির বোঝা বলে একটা কথা আছে এবং বোঝার জগতে যার শক্তি এতটুকু দুর্বল নয় ভাষা আর ভাবের চাইতে। বরং সময় সময় সে ভাষা আর ভাবকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

মিঃ বোস হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে কাগজ-চাপাটা তুলে নিয়ে তার ভেতরকার লাল টকটকে ফুলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কিছুক্ষণ সেটাকে টেবিলের উপর লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতে লাগলেন।

বিশ্রী—কি বিশ্রী যে লাগতে লাগল শিবানীর—

মিস্ জেনি হয় তো শিবানীর অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে পেরে কিংবা হয় তো প্রয়োজনেই কাগজ-পত্র হাতে নিয়ে হাই হিলের ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলতে তুলতে বেরিয়ে গেল।

যতই হোক একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে মিঃ বোসও সহজ বোধ করতে পারছিলেন না। এবার জেনি বেরিয়ে গেলে কাগজ-চাপা রেখে টান হয়ে বসলেন। বললেন, আজ সাত দিনের ওপর হয়ে গেল

হয় এসেও ফিরে যাচ্ছি নয় তো দেখাই পাচ্ছি নে। সিনেমার টিকিট জেনেশুনে নষ্ট করলেন—

একটু হেসে শিবানী বলল, আপনাদের বৃথাই অপিস মস্ত মস্ত টাকার অঙ্ক গুণে দেয়। আপনাদের কখনোই কাজ করতে দেখি নে কিন্তু। কেবল ঠাণ্ডাঘরে বসে বসে আরাম করেন।

আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা কাজের সময়?

দেখুন কত চিঠি পড়ে রয়েছে। হাত দিয়ে চিঠি-পত্র ছড়ান টেবিলটা দেখাল শিবানী।

বেশ তো আপনি কাজ করবেন। আপনাকে কিছুতেই ধরে উঠতে পারছি নে তাই এখন এলাম এ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে রেখে যেতে। আজকে অফিস ছুটির পর অমনি চলে যাবেন না। আমার একটু কথা আছে মিসেস সেন—দরকারী কথা।

নাঃ, এদের কিছুতেই দমান যায় না। হতাশ বোধ করল শিবানী।

মিঃ বোস শিবানীকে নীরব দেখে আশান্বিত হলেন। শিবানীর দিকে ঝুঁকে পড়ে অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, প্লিজ মিসেস সেন, আপত্তি করবেন না।

আজ হবে না।

যতটুকু সামনে ঝুঁকে ছিলেন তার চাইতে বেশি পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন মিঃ বোস শরীরটাকে। অনুনয় সুর উবে গেল। কিছুটা রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

কাজ আছে।

কোথায়

অসহ্য ঠেকল প্রশ্নটা শিবানীর। একমুহূর্ত চুপ করে রইল সে। তারপর বলল, বাড়িতে।

বাড়িতে! যেন ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন মিঃ বোস।

দৃঢ় কঠিনকণ্ঠে শিবানী বলল, হ্যাঁ বাড়িতে।

এ সাতদিন ধরে রোজ বাড়িতেই দরকার চলছে?

লোকটার গালে একটা চড় কষিয়ে দেওয়া যায় না — না, যায় না। এটা অফিস।

তা এত দরকার ক'দিনের মধ্যে হঠাৎ বাড়িতে জোগাড় করলেন কোথা থেকে মিসেস সেন?

ঘরেই ছিল।

তাই।

হ্যাঁ। জানতাম না তো।

আমার ঘরের কথা তো আপনার জানবার কথা নয় মিঃ বোস, তাই সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু নিজের ঘরের কথাই যে জানেন না আপনারা।

জানি নে?

না জানেন না।

তা আপনি আমার ঘরের কথা জানলেন কি করে?

আপনার ঘরের কথা আর আমার ঘরের কথা এক বলে—যা অধিকাংশ ঘরের কথা এই বলে। সত্যি মিঃ বোস আমি এক এক সময় অবাক বিস্ময়ে ভাবি, এই যে মিঃ চক্রবর্তীর স্ত্রীর পেছনে মিঃ ব্যানার্জি ছুটছেন, আবার মিঃ ব্যানার্জির স্ত্রীর পেছনে মিঃ মুখার্জি ছুটছেন; মিঃ সেনের স্ত্রীর পেছনে মিঃ বোস আর মিঃ বোসের স্ত্রীর পেছনে মিঃ মিত্র—ব্যাপারটা কি—হঠাৎ কেমন যেন আবেগ এসে গিয়েছিল শিবানীর গলায়। সেই জন্যই হয় তো ঝট করে থেমে গেল সে। বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিল, কফি, তিনকাপ। বেয়ারা চলে গেলে পার্কার পেনটা হাতে ঘুরোতে ঘুরোতে পরিহাসের সুরে বলল, আমি ভাবছি বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করব। থিসিস লিখব।

মিস জেনি এসে ঘরে ঢুকে হাসিমুখে গিয়ে তার টাইপ মেশিনের সামনে বসল।

বেয়ারা এলো তিনকাপ কফি নিয়ে।

মিস জেনির কাছে পেয়ালা রাখতেই সে অবাক কণ্ঠে বলল, আমার জোন্তে? আমি তো ছিলাম না। ধন্যবাদ।

মিঃ বোস কফির পেয়ালায় দু'এক চমুক দিলেন কি দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে কবে পর্যন্ত এ্যাপয়েন্টমেন্ট হতে পারে?

আমি জানাব।

ঠিক জানাবেন তো?

হাসল শিবানী, বলল জানাব।

[ক্রমশ]

শরৎ-নাট্য সংগ্রহ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাস চরিত্রহীন, স্বামী ও চন্দ্রনাথকে একদা নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যথাক্রমে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, দেবনারায়ণ গুপ্ত ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নাটকগুলি বহুবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে কিন্তু একটি গ্রন্থের মধ্যে সেগুলিকে একত্রে পেয়ে এবার শরৎচন্দ্রের ভক্ত পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। শরৎচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। নাট্যরূপ খুবই সুন্দর। একত্রে তিনটে বইয়ের দামও খুব বেশি নয়। আশা করি শরৎ-নাট্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) পাঠকমহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করবে। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা।

প্রেম ও প্রয়োজন

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেম ও প্রয়োজন' একখানি উপন্যাস। বইখানি দীর্ঘকাল আগে একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত একদা 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হলেও একটি সংস্করণের পর উপন্যাসটি আর মুদ্রিত হয় নি। বহুকাল অপ্রকাশিত থাকার পর সম্প্রতি ত্রিবেণী প্রকাশন গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারীতি সম্পর্কে বিশেষ বলার প্রয়োজন হয় না। 'প্রেম ও প্রয়োজন' তারাশঙ্করের একটি সার্থক উপন্যাস। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দুই পাখি

সংসারে স্ত্রী-পুরুষকে দু'টি পাখির সঙ্গে তুলনা করা চলে। স্ত্রী-পুরুষ সংসারে নীড় রচনা করে আবার মুক্ত বিহঙ্গের মতন অবাধ বিচরণেও তারা পিয়াসী। সুখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার প্রবোধকুমার সান্যালের 'দুই পাখি' গ্রন্থ আলোচ্য বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। প্রবীণ লেখকের মধুর ভাষা ও অপূর্ব চরিত্র চিত্রণে 'দুই পাখি' সত্যিই মহান। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বসন্ত রজনী

প্রবীণ কথাসাহিত্যিকের এই নবীন রচনা, তাঁর অনুরাগী পাঠককে খুশি করে তুলবে। কাহিনী অতি সহজ ছন্দে এগিয়ে গিয়েছে, নারী-পুরুষের সেই চিরন্তন সমস্যা। প্রেমই এ রচনার মূল উপজীব্য, কিন্তু পরিণতিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। নায়ক মৃণাল ভালবাসল বন্ধু পত্নী টুলুকে, স্বামী পরিত্যক্তা টুলুও আশ্রয়দাতার সহৃদয়তার প্রতিদানে সমুৎসুকা, কিন্তু সংস্কারের দাসত্বে অভ্যস্ত সাধারণ নারী ভালবেসেও ধরা দিতে পারে না। কি যেন আশঙ্কায় সে সতত চঞ্চল, আর সে জন্যই দেখি কাহিনীর শেষে সংস্কারের হাতে আত্মসমর্পণেই তার সমাপ্তি; কিন্তু মৃণালের বসন্ত রজনী কি তবে বিফলেই যাবে? নিপুণভাবে এর উত্তর দিয়েছেন লেখক—নায়কের জীবনে অপর এক নায়িকাকে উপস্থিত করে দিয়ে, দেহবাদের পথেই যে মুক্তি নিহিত, সে মুক্তিতেই সান্ত্বনা পেল মৃণাল অবশেষে রাধাকে আশ্রয় করে। লেখকের আন্তরিকতায় কাহিনী প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল, একখানি উপভোগ্য রচনা হিসাবেই সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রকাশনায়—সেকাল একাল, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯, দাম—আড়াই টাকা।

কার্ল মার্ক্স (সংক্ষিপ্ত জীবনী)

সমাজতন্ত্রবাদের জনক কার্ল মার্ক্সের জীবন ও বাণী-ই আলোচ্য গ্রন্থের ভিত্তি, এই রচনার মাধ্যমে সাম্যবাদের গোড়াকার আদর্শই আত্মপ্রকাশ করেছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পৌঁছনোর যে পথ মার্ক্স নির্ধারিত করে গেছেন, আজকের দিনের শ্রেণিসংগ্রাম প্রণালীর গতিও চলেছে সেই পথেই এবং একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, গণমানসে মার্ক্সবাদের প্রভাব নিয়তই বর্ধমান। উপরোক্ত কারণেই এ রচনা একটা বিশেষ মূল্য দাবী করতে পারে। মূল গ্রন্থটি থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন বর্তমান অনুবাদক এবং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তিনি সম্পূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গেই নিজের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। মূল রচনা—ই, স্তেপানোভা, অনুবাদ—করুণা সেনগুপ্ত, প্রকাশনায়—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, প্রাঃ, লিঃ। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দু'টাকা।

ভাবি এক হয় আর

আলোচ্য গ্রন্থটি উপন্যাসাকারে এক স্মৃতিচারণ। লেখক সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, বিদগ্ধ সমাজে তাঁর খ্যাতিও বড় সামান্য নয়, সুতরাং তাঁর স্মৃতিচারণ যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়ার দাবী রাখতে পারে, এ আশা দুরাশা নয় এবং এই রচনা সেই প্রত্যাশাকেই মূর্ত করে তুলেছে। কথকতার ভঙ্গীতে কৈশোর ও যৌবনের আশাভরা দিনগুলির এক অনবদ্য ছবি এঁকেছেন লেখক; কাহিনীর নায়ক পল্লব তাঁরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র এবং ঠিক সেভাবেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অন্যতম মুখ্যচরিত্র কুসুমকে; বস্তুত নায়ক-চরিত্রের চেয়েও এ-চরিত্রটি যেন অনেক প্রাধান্য লাভ করেছে। মনে হয়, লেখকের সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত আবেগ যেন এই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার অবশ্য কিছুই নেই, কারণ লেখক যে তাঁর প্রাণপ্রতিম সতীর্থ, নেতাজী সুভাষের এক অন্তরঙ্গ পরিচয়ই এই কুসুম চরিত্রটির মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন, একথা বোদ্ধা পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন। নারী-চরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, তবু মিসেস্ নর্টন, আইরিন, গীতা প্রভৃতি চরিত্র পাঠকের মনে বেশ রেখাপাত করে। প্রেমের নানা ভঙ্গী ও বেদনা যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে এঁদের মাঝে। লেখকের শৈলী একটু বেশি মাত্রায় উচ্ছ্বাস প্রবণ হলেও এক সুষম মাধুর্যে মণ্ডিত, স্বপ্নবিলাসী সাহিত্যকারের সমস্ত অন্তরটিই যেন এই ভাষা মাধুরীর ভেলায় চড়ে পাঠকের মনের দরজায় উপস্থিত হয়ে যায়। প্রচ্ছদ অতি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—দিলীপকুমার রায়। প্রকাশনায়—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, প্রাঃ লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১২, দাম—আট টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বাংলা ছন্দের নানা কথা

ছন্দের দোলা হৃদয়ে সাড়া জাগায় সহজেই, আর সেজন্যই কাব্য পাঠকের সংখ্যাও সর্বকালে, সর্বদেশে অধিক, কিন্তু এই ছন্দের প্রাণ ভোমরা অর্থাৎ নিয়মকানুন সম্বন্ধে আমরা অর্থাৎ সাধারণ পাঠকেরা সাধারণত অজ্ঞতার অন্ধকারেই থেকে যাই, বর্তমান রচনা এ বিষয়ে আমাদের সহায়করূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। আলোচ্য-গ্রন্থে বাংলা ছন্দের রীতিনীতি বা আইন কানুন সম্বন্ধে বেশ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে, অত্যন্ত সহজবোধ্য হওয়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ পাঠকও এর বক্তব্যকে অনুসরণ করতে পারেন, সাহিত্যরসিক ও শিক্ষার্থী এই উভয়বিধ পাঠকই যে বর্তমান রচনাটিকে সমাদর করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—দুলালচন্দ্র দাস, পরিবেশক—মডার্ণ বুক এজেন্সি, প্রাঃ, লিঃ, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা মাত্র।

বেণুবনে মূর্খ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক অনুবাদ কর্ম, বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ শাখার প্রসার ও প্রচার যে আজ ক্রমবর্ধমান এটা সত্যই বড় আশার কথা, কারণ এই পথেই বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা যায় এবং সাহিত্যেও নতুন রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। চীন দেশ ভারতের বহু পুরনো প্রতিবেশী, এই বৃহৎ উপমহাদেশটির সাহিত্যও কম প্রাচীন নয়, আলোচ্য গ্রন্থে এই দেশেরই বিগত ভাবধারা ও সামাজিক রূপের এক প্রকৃষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে। অনুবাদিকার ভাষা সহজ ও সাবলীল, বিষয়-বস্তুকে যা আন্তরিকতায় মণ্ডিত করে তুলেছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের শাখায় বর্তমান গ্রন্থটি এক আশাপ্রদ সংযোজন বলেই গণ্য হবে। বইটির আঙ্গিক অত্যন্ত সাধারণ। রচনা—চেন চি-ইং। আইলীন চ্যাং দ্বারা চীনভাষা হইতে অনূদিত। বাংলা অনুবাদ—রাণু ভৌমিক। প্রকাশনায়—পরিচয় পাবলিশার্স, ৩।১, নফর কোলে রোড, কলিকাতা—১৫। দাম—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

সারদা রামকৃষ্ণ ও চণ্ডাতত্ত্ব বিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড)

পরমহংস রামকৃষ্ণকে কলির অবতার বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, এ মতের পরিপোষকে যেমন অনেক কথা বলার আছে তেমনি এর বিরুদ্ধবাদিগণেরও যুক্তির অভাব নেই। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এ সম্বন্ধেই বিশদ আলোচনা করেছেন। লেখক রামকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং শ্রীশ্রীমা সারদামণিকেও তিনি জগন্মাতার অংশস্বরূপা বলে মনে করেন, নিজের মতের সপক্ষে তিনি বেদ পুরাণকেও নজির স্বরূপ ধরেছেন, বর্তমানকালে পরমহংসদেবের নতুন কোন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক এবং তাঁর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মহিমা কীর্তনেও অযথা বাগাড়ম্বর করা অপ্রয়োজনীয়, কাজেই এ রচনার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও অসংলগ্নতার দোষে পাঠক খেই হারিয়ে ফেলেন, অতিভাষণ ও অত্যধিক জটিলতার গভীর অরণ্যে দিশেহারা হয়ে গ্রন্থপাঠের সমস্ত আনন্দকেই এককালে বিসর্জন দেন। আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই লেখকের অনেক সংযমী হওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীতারকদাস মল্লিক, প্রকাশক—শ্রীতারকদাস মল্লিক, ১।১।৩এ, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫। দাম—ছয় টাকা।

আশ্বিনের ফেরিওলা

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি, কবির শক্তিমত্তার ইঙ্গিতবাহী। হরপ্রসাদ মিত্র আজকের দিনে অপরিচিত নন, তাঁর কবিতা রসাস্বাদনের সুযোগ আমাদের হয়েছে। এমন একটা নির্মল প্রশান্তির আভাস মেলে তাঁর রচনায় যা সত্যই উপভোগ্য; আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলিও সেই জাতের, ভাবে, ভাষায় ও ধ্বনি-মাধুর্যে এরা সত্যই কুলীন জাতীয়; ভোরের শিশিরের মতই একটা স্বচ্ছ সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়ে এরা পাঠকের মননে আবেদন রেখে দেয়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—হরপ্রসাদ মিত্র, প্রাপ্তিস্থান—সিগনেট বুক শপ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

চকিত চমকে

আলোচ্য রচনা স্মৃতিচারণমূলক রচনা। লেখকের জীবনে যে সব রসের নির্ঝর বয়ে গিয়েছে তারই নমুনা ক'টিকে সংগ্রহ করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। নির্মল হাস্যকৌতুকের এই প্রামাণ্য উদাহরণগুলি রসিক পাঠকের মনোহরণ করবে বলেই মনে হয়। আমরা বইটি পড়ে খুশি হয়েছি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিনয়জীবন ঘোষ, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, প্রাঃ লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১২, দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী (শ্রীশ্রীরাসলীলা)

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের মূল শ্লোকসমূহের প্রতি শব্দের সংস্কৃত ব্যাখ্যা বঙ্গানুবাদ এবং মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত টীকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদান্তসূত্রই এই ব্যাখ্যার মৌল উপাদান এবং সেজন্যই সামগ্রিক ভাবেই বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু টীকাকারের নৈপুণ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুও সহজবোধ্য হয়ে প্রকাশিত, অনুবাদকও এজন্য প্রভূত সাধুবাদের অধিকারী। অনুবাদক—শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, প্রকাশক—সরযু ভবন, ১১নং, বাগুই আটি রোড, ঘাটগাছি, কলিকাতা—২৮. দাম—কুড়ি টাকা।

বিন্দু ও ত্রিভুজ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প সংগ্রহ; ছোট ছোট কয়েকটি সহজ ও সুন্দর গল্পে লেখিকা আজকের দিনের নানাবিধ সমস্যা ও নারী-মনের চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ এঁকেছেন। সাবলীলতাই এই গল্পগুলির সর্বোত্তম সম্পদ, বিশেষ কোন সাহিত্য-গুণাশ্রিত না হয়েও তাই এরা সহজেই পাঠকের মনে দাগ কেটে দেয়। লেখিকার শৈলী সহজ ও সুন্দর। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—চিত্রিতা দেবী, পরিবেশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

প্রথম পদক্ষেপ

আলোচ্য উপন্যাসটি বর্তমান সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী ইনটেলেক্‌চুয়াল বা মননশীল জাতীয় নয়, যে ধরণের সহজ রচনার স্বাদ আজকের দিনের পাঠক প্রায় ভুলতেই বসেছেন, তারই স্বাক্ষরবাহী এটি। গ্রামের জীবন নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রবীণ সাহিত্যকার কাহিনীর মাধ্যমে, কয়েকটি সরল সাদাসিধে মানুষের জীবন বিধৃত হয়েছে, সেই সঙ্গে উঁকি দিয়ে গেছে একটুকরো প্রেমের আগুন, সমাজ-বিরোধী এই প্রেমকে কোথাও বিশেষভাবে স্বীকৃতি লেখক দেন নি, তবু লালন করেছেন তাকে সহৃদয়তার সঙ্গে আর সেজন্যই বিধবা নয়নতারা পাঠকের সহানুভূতি বুঝি অনেকটাই কেড়ে নেয়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—রামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—আধুনিক সাহিত্য ভবন। এ।৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

আলোকদৃষ্টি

ছোটগল্পের লেখক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে সতীনাথ ভাদুড়ী বিশেষ পরিচিত। সতীনাথবাবু খুবই কম লেখেন। সম্প্রতি তিনি পত্র-পত্রিকায় যে কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন তার দশটির সুনির্বাচিত সংকলন 'অলোকদৃষ্টি'। অলোকদৃষ্টিতে বহু স্বাদ ও নানান জাতের গল্প আছে। প্রত্যেকটি গল্পই লেখকের লেখনকৌশলে সু-উজ্জ্বল। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট খুবই মনোহারী। অলোকদৃষ্টি রুচিশীল পাঠক-মহলে বিশেষ সাড়া জাগাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ক্ষুব্ধ হাঙ্গেরীর রুদ্ররূপ

বর্তমানে বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে, আলোচ্য রচনাটিও সেই জাতীয়। হাঙ্গেরীর শাসন ব্যবস্থা ও রীতিনীতির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনার মাধ্যমে, লেখকের বক্তব্য সহজভাবেই পাঠকের মননে ঘা দেয়, অনুবাদ সহজ ও অনাড়ষ্ট। ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—তামাস জ্যাবো, অনুবাদক—কালীপ্রসাদ বসু। প্রকাশনায়—হোমশিখা প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর। দাম—এক টাকা।

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আদিবাসীদেরও যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, বর্তমান রচনার মাধ্যমে লেখক তা দেখাতে চেয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির এক আন্তরিক কর্মী হিসাবে লেখক যখন 'ময়মনসিংহ' অঞ্চলে কৃষক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখন থেকেই আদিবাসী কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বও অনেকটা তাঁর উপরই ন্যস্ত হয়। সুতরাং এই রচনাকে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নজির বলাটাও বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। ভারতের কত জায়গায়, দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানের কত জায়গায় মুক্তিকামী জনগণের কত সংগ্রামই যে হয়ে গেছে, তার সব ইতিহাসও পাওয়ার উপায় নেই, অথচ ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য ইতিহাস লিখতে হলে সে সবই তো অত্যাবশ্যক মাল-মশলা, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমান রচনার দামও বড় কম নয়, আর সেজন্যই লেখকও কিছুটা সাধুবাদের অধিকারী। আঙ্গিক শোভন। লেখক—প্রমথ গুপ্ত, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ, লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

মাটি ও মানুষ

আলোচ্য রচনাটি এক সংক্ষিপ্তায়তন নাট্য-গ্রন্থ, নাট্যকার সাহিত্যের আসরে বোধ হয় এই প্রথম পদক্ষেপ করলেন এবং সেটুকুই যা তাঁর পক্ষ সমর্থনে একমাত্র বক্তব্য, কারণ এত দুর্বল ও অপরিণত রচনা কমই দেখা যায়। নাটকটির গ্রন্থনা ত্রুটিপূর্ণ ও শৈলী অত্যন্ত কাঁচা, বিসদৃশ বাক্য-প্রয়োগের প্রাচুর্যও পীড়াদায়ক। ভবিষ্যতে নাট্যকার এসব বিষয়ে মনোনিবেশ করলে উপকৃত হবেন। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দোলুই, পরিবেশনে—গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—তিন টাকা।

সদ্‌গুরু শরণে

আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ধর্ম পথের দিশারী হতে পারেন শুধু গুরু-ই। অতএব সদ্‌গুরুর সন্ধান করে তাঁরই হাতে তুলে দাও নিজের ভার, তিনিই দেবেন শ্রেয়পথের নির্দেশ, নামান্তরে দীক্ষা। অতএব দীক্ষার গুরুত্ব বড় কম নয়, আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয়েই এক সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে, ধর্মপ্রাণ পাঠকমাত্রই যে এ রচনাকে সমাদর করবেন, এ আশা বড় দুরাশা নয়। আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—স্বামী বিষ্ণুপুরী। প্রকাশক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৪৫, বর্ধমান কম্পাউণ্ড, রাঁচী, দাম—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত

ব্যাসদেব রচিত মূল মহাভারত থেকে ছোটদের উপযোগী করে মহাভারত রচনা করেছেন লেখক; শুধু সংক্ষিপ্ত করা ছাড়া মূল কাহিনী যথাযথভাবে বজায় রেখে গিয়েছেন তিনি। ঘটনা ভাব ও ভাষা এ সবের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। 'মহাভারত' আমাদের অন্যতম মাত্র নয়, প্রাচীন ভারতের এনসাইক্লোপিডিয়াও বটে কারণ এর মাধ্যমেই সে যুগের সমাজ, রীতিনীতি প্রভৃতির একটা স্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি আর সেজন্যও এই অমূল্য গ্রন্থের সম্বন্ধে বাল্যাবধি একটা ধারণা গড়ে ওঠা প্রয়োজনীয়; প্রাজ্ঞ লেখক সে সম্পর্কেই অবহিত হয়ে সাহিত্য তথা সমাজের পক্ষে এক কল্যাণকর কর্ম সম্পাদন করেছেন। লেখকের শৈলী সহজ ও সাবলীল, রচনার মাধুর্য তাতে আরও বেড়ে গিয়েছে। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রকাশনায়—শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রাঃ, লিঃ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯, দাম—দুই টাকা মাত্র।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী (প্রথম খণ্ড)

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় এক বিশেষ ধরণের ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত, আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এঁরাও একটি চিহ্নিত স্থানের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থে এই ধারার সাধক ও তাঁদের পন্থা সম্বন্ধে এক পরিচ্ছন্ন আলোচনা করা হয়েছে। ধর্ম-পিপাসু পাঠক যে এ রচনাকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন একথা সহজেই বলা যায়। বইটির আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—ব্রজবিদেহীমন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমোহন্ত, শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা, তর্ক—তর্ক ব্যাকরণতীর্থ। প্রকাশক—শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য, কাঠিয়া বাবা কা স্থান, গুরুকুল রোড, পোঃ—বৃন্দাবন, জিলা—মথুরা।

সারোয়ানের গল্প

আর্মেনিয়ান জীবনযাত্রার পুরাতন পদ্ধতি সম্বন্ধে রচিত ছোট ছোট গল্পগুলির মাঝে বেশ একটা সরল লাবণ্যের আভাস পাওয়া যায়, মূল ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করাতেও অনুবাদকের দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—উইলিয়াম সারোয়ান। অনুবাদক—কালীপ্রসাদ বসু, প্রকাশক—হোমশিখা প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর, দাম—এক টাকা।

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

রাত এগারোটার সময় সত্যব্রতকে নামাবার জন্য গাড়ি আবার এল এ বাড়ির সামনে। আর ততক্ষণ জেগে বসে রইল ইলা। আর একবার দেখবে বলে—শুধু আর একবার।

গাড়ির শব্দ পেতেই উঠে দাঁড়াল সে আবার, চোখ দিয়ে দাঁড়াল ঝিলমিলিতে। কিন্তু শুধু ফর্সা সাদা হাত বাড়িয়ে বিদায় নেওয়া ছাড়া হাতের অধিকারিণীকে দেখবার সুযোগ তার হল না।

নিরাশ হয়ে শুতে গেল ইলা।

সত্যব্রতও কাপড় ছেড়ে স্লিপিং সুটটা গলিয়ে শুতে গেলেন। আলো নেভানর আগে সুচরিতার ছবির দিকে একবার তাকালেন। ওর সব থেকে আকর্ষণীয় বড় বড় ঘন পল্লব দেওয়া চোখ দু'টি যেন ওঁরই দিকে তাকিয়ে আছে।

কাছে এসে ছবিটা তুলে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন তিনি। তারপর হঠাৎ ছবিটাতে একটা আলগা ঠোঁটের স্পর্শ রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, বুঝতেই পারেন নি। ঘরে আলো জ্বালা দেখে আবার উঠে পড়লেন।

হঠাৎ সবিতার কথা মনে হল তাঁর, সেই সঙ্গে অতীত জীবনও।

কিন্তু না। সে ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। জীবনের সে অধ্যায়কে একেবারে মুছে ফেলেছেন তিনি।

তাই হোক। আবার সুচরিতার ছবির দিকে তাকালেন। সন্ধ্যার ভাললাগার মদিরতা অনেকটা কমে গেছে বুঝি, তাই শুতে যাবার আগে ছবিটাকেই আদর করেছেন ভেবে হঠাৎ যেন নিজের কাছেই লজ্জা হল তাঁর।

ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেলেন তারপর ছবির দিকে একবারও না তাকিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বিয়েতে যতটা জাঁকজমক হবে সকলে ভেবেছিল তার কিছুই হোল না।

তবে হঠাৎ ব্যাণ্ড পার্টির শব্দে সচকিত হল পাড়া। এ পাড়াতে সব বিয়েতেই যে বাজনা আসে তা নয়, তবে সাধ্যমত সানাইওলাই বাঁশীতে সুর তুলে একটা মধুর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তাই বলে গোরার বাজনা?

ইলার দাদা তো হেসে খুন। সর্বক্ষণই সে ইলাকে তার সিনেমা ভক্তির জন্য ক্ষেপাত। আজ এ হেন সুযোগ সে ছাড়ল না।

কি রে ইলু। তোর সিনেমা স্টাররাই দেখালে।

কেন কি করেছে তারা?

শেষকালে ব্যাণ্ড? বলিস কি রে?

বা রে।

ইলা সমর্থন করবার কোন জবাব খুঁজে পেল না। কি-ই বা এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে তাতে? দাদার সবই বাড়াবাড়ি, আসলে সিনেমার ওপর চটা ব'লে তাই!

ছোটপিসি ইলাকেই সহানুভূতি জানালেন। আহা তাতে কি হয়েছে? একটু অন্য রকম চাই তো!

তাই নাকি? হো হো ক'রে হেসে উঠল বিনয়। তা হলে আরও উদ্ভট কিছু করলে তো আরও ভাল হয়। পুরান চিরকালের চেনামতে বিয়েই বা করা কেন?

বা রে, তোমার সব এমন কথা দাদ

প্রায় ক্ষেপে গেল ইলা।

ব্যাণ্ড বাজালেই বুঝি উদ্ভট কিছু হোল? কি হয়েছে এতে? যার যেমন ইচ্ছে।

সেটাই তো বড় কথা রে। এমন ইচ্ছে হয় কেন?

জানি না যাও। কথাটায় ছেদ টানল ইলা।

সারাদিন ইলার উৎকণ্ঠা আর কাটে না। ঢাকা বারান্দার ঝিলমিলি ছেড়ে আসা তার পক্ষে কঠিন হোল।

হঠাৎ এক সময় বিনয়ের পাশে দাঁড়িয়ে মুচকে-মুচকে তাকে হাসতে দেখে বিনয় সত্যিই অবাক হল।

কি রে ব্যাপার কি ? তোর হাসি যে আর ধরে না।

দাদা ! কত ভাগ্য বলত আমাদের ?

কিসে বোঝা গেল ?

বাঃ আমাদেরই বাড়ির তলায় থাকবেন সুচরিতা। সব—সময়। ও দাদা আমি তো ভাবতেও মরে যাচ্ছি।

দেখ কাণ্ড। বাবাকে বলতে হবে তো। ভাড়াটে বসিয়ে শেষে মেয়ের মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি হ'ল।

যাও—

লজ্জা পেল ইলা।

ওগো শোন শোন।

স্ত্রী অরুণাকে ডাকল বিনয়।

ইলা কি বলে দেখ।

কি ?

অরুণা, অর্থাৎ ইলার বৌদি এসে দাঁড়াল !

আর ভাবনা নেই। আমাদের ভাগ্য ফিরে গেছে।

হাসতে হাসতে বলল বিনয়।

ভাগ্য ফিরেছে মানে ?

চমকে উঠল অরুণা। তবে কি কোন খবর এল আবার ?

ইলুর মতে এখন থেকে আমাদের মত সৌভাগ্য আর কারও নেই, আমরা এখন সিনেমা স্টারদের বাড়িওলা বুঝলে ?

তাই বল।

হেসে ফেলল অরুণা।

কেন মেয়েটাকে ক্ষেপাচ্ছ।

না না সত্যি। আর ভাবনা কি ? কি বল ইলু ? পাড়ার প্রেস্টিজ বেড়ে গেল বল ?

যাও !

ছোটপিসিমা সত্যিই অবাক হলেন এদের কথাবার্তা শুনে। বলে কি সব ? এসব নিয়ে আবার সরস আলোচনা ?

তোদের সব বাড়াবাড়ি। এখনকার দিন বলে তাই। আমাদের সময় হলে ওসব মেয়েদের কেউ মুখ দেখত ?

কেন পিসিমা ?

রীতিমত আহত হয়ে প্রশ্ন করল ইলা। ছোটপিসিমার সব ভাল শুধু বড্ড···

কেন আবার কি ? স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে এ্যাকটো করে তো ? মরণ আর কি ?

ছোটপিসিমা বাল্যকাল থেকেই স্বামী পরিত্যক্তা।

বিয়ের সময় যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলে বৌভাতের পরদিনই চলে গেলেন। আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ আসেন নি। তবে এবার টুলটুলও চলে গেল তার মায়ের সঙ্গে। তার পরিবর্তেই বোধ হয় সত্যব্রতর খুড়তুতো ভাইপো রবীন থেকে গেল।

যাবার আগের দিন ইলার সঙ্গে দেখা করতে গেল ওপরে।

ওমা কি সৌভাগ্য ! রাজপুত্তুর নিজেই ওপরে ?

সত্যিই খুশি হল ইলা।

আসব না চলে যাচ্ছি যে ?

চলে যাচ্ছ ? কোথায় ?

কেন জান না ? যার সঙ্গে যাচ্ছি, আর আসব না।

সে কি গো টুলটুল।

ইলা অবাক না হয়ে পারল না। টুলটুলের যে অন্য বাড়ি আছে তা ভাবতেও পারে নি সে।

হ্যাঁ গো সত্যি। মাকে জিজ্ঞেস কোর।

কেন ? তোমার অমন সুন্দর মামীমা হোল, আর তুমি চলে যাচ্ছ ?

ওকে কাছে টেনে নিল ইলা।

সুন্দর তো রাণীর মত না ? সাগ্রহে বলল টুলটুল।

হ্যাঁ রাণীর মত, পরীর মত !

ইলা ওকে আদর করল।

কিন্তু আমার সঙ্গে কথাই বলে না ?

কেন তোমায় ভালবাসে না ? আদর করে না ?

হুঁ ! আমাকে কেন ভালবাসবে ? মা কি বলে জান ?

কি বলে ?

মা তো দিদিমাকে কালই বলল—মামী এখন মামাকে আদর করতেই ব্যস্ত !

জোরে হেসে উঠল ইলা। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল তার বৌদিকে। এমন কথা একা উপভোগ করা যায় না।

বৌদি ! ও বৌদি ! শোন, শোন !

কি বলে যাও, খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছি।

ও-ঘর থেকে অরুণা সাড়া দিল। টুলটুলকে নিয়ে ওর ঘরে গিয়ে অরুণাকে কথাটা আর একবার বলে জোরে জোরে হাসতে লাগল ইলা। মামাকে খুব আদর করে বুঝি মামী ?···হি-হি···রাতদিন ?···হি-হি···

হাসি যেন আর থামতে চায় না ইলার। কি মিষ্টি কথা বলে যে ছেলেটা।

শেষের কথাটাই ওর মিষ্টি লেগেছে সব থেকে বেশি।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে টুলটুল। এত হাসির কথা সে কি বলল ? ইলাদি'টা যে কি ?

কপট কোপের ভঙ্গিতে অরুণা ধমকাল ইলাকে···

যা ছেলেটাকে পাকাস নে, ছেড়ে দে ওকে।

খোকাকে দুধ খাওয়ান শেষ করে শোয়াতে গেল তাকে অরুণা।

কিন্তু ইলা ছাড়ল না টুলটুলকে।

অনেক কথা জিজ্ঞেস করল তাকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার। জানবার কথা তার যেন আর শেষ হতেই চায় না।

নীচের থেকে ডাক শোনা গেল। ওরা টুলটুলকে খুঁজছে।

আমি যাই ইলাদি' ?

দাঁড়াও।

আলমারি খুলে একরাশ বিস্কুট আর লজেন্স বার করে ওর হাতে দিল ইলা। তারপর ওর গালটা টিপে আদর করে বলল, আমাকে মনে রাখবে তো টুলটুল ?

নিশ্চয়ই।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেমে গেল টুলটুল।

বৌদির কাছে গিয়ে বসল ইলা। তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার বড়ি দিতে লাগল অরুণা।

বৌদি!

কি ব্যাপার?

জানো বৌদি। সুচরিতা খুব ভালবাসে সত্যব্রতবাবুকে।

তা বাসুক। তুমি ভাবছ কেন?

ভাবছি কে বললে?

তবে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি ইলু? তুমিও তোমার বরকে এমনি ভালবাসবে।

বাসবে—আহা!

ডাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে ছোটপিসিমা বললেন। স্বামী তো ভালবাসারই জিনিষ মা!

বেচারা ছোটপিসিমা একদিনের জন্যও স্বামীর ভালবাসার স্বাদ পান নি।

ইলা লজ্জা পেল অরুণার কথায়। তার মনটা এখনও কাঁচা আছে। সিনেমা পর্দায় নায়ক-নায়িকার ভালবাসা দেখে সে রোমাঞ্চ অনুভব করে ঠিকই, তাদের সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে আবার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সুখ-দুঃখেও তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার ছোট সীমাবদ্ধ জীবনে অন্য কোন চিন্তার সুযোগ নেই। নিজেকে সে ভালবাসে। আয়নার সামনে কতবার সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে। ঠোঁট উল্টে হেসে নিজেকেই সে অভিনন্দন জানিয়েছে কতবার। তার সৌন্দর্যকে সে মনে মনে স্বীকার না করে পারে নি।

তার এই লজ্জাটুকু অরুণার নজর এড়াল না। হেসে সে বলল।

সত্যি ছোটপিসিমা! ইলুর এবার বিয়ে দেওয়ার দরকার। ওরও তো খুব ইচ্ছে। কি বল ইলু?

যাও,··তোমায় বলেছে···

টেনে টেনে হাসতে লাগল অরুণা, আর ইলা ঘর থেকে পালাল। গিয়ে দাঁড়াল একেবারে ঝিলিমিলিতে।

সুচরিতাদের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি? মনে মনে অবাক হল ইলা। অবাক কাণ্ড। সিনেমা স্টারদের কাণ্ডই আলাদা।

দিন পনের বাদে আরও অবাক হ'ল ইলা। সুচরিতা।

একেবারে ওপরে উঠে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে। রীতিমত বিগলিত হয়ে গেল ইলা। কি ভাগ্য আমাদের! আসুন আসুন!

ওদের বড় বড় আয়না মোড়া সেকেলে আমলের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল ওকে ইলা।

সদ্য স্নান করে হাল্কা সবুজ রং-এর সিল্কের একটা শাড়ি পরেছে সুচরিতা। গায়ে সেই রং-এর ব্লাউজ। কাঁধ অবধি রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে এসে মুখে পড়ছে। জরির কাজকরা হাত-কাটা জামার ভেতর থেকে মোমের মত সাদা নিটোল হাত দেখে ইলা মুগ্ধ। ফর্সা তো নিজেও খুব! তাই বলে এমন?

বাড়িতে সকালবেলা স্নানের পর যে পরিমাণ প্রসাধন মুখের ওপর করা হয়েছে তাতে ঐ এনামেল করা মুখের ওপর রক্তমাংসের সজীবতা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কিন্তু এতে ইলা বুঝি আরও মুগ্ধ।

সত্যিই অন্য জগতের জীব এরা, তাদের মত নিতান্ত সাধারণভাবে থাকলে এদের চলবে কেন? কিন্তু কি আশ্চর্য তাদেরই মত সাধারণ ভাবেই বৌদিকে সুচরিতা বৌদি ডেকে বসল।

আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি বৌদি।

বসুন!

তাই বল। অরুণা মনে মনে ভাবল। শুধু এমনি ভদ্রতার জন্য আলাপ করতে আসার লোক যে এরা নয়, সে পরিচয় তো সত্যব্রত আসার দিনটি থেকেই পেয়ে গেছে।

আজ সাত মাস নীচেরতলা ভাড়া নিয়েছেন সত্যব্রত, একদিনের জন্যও কারও সঙ্গে ডেকে কথা বলেন নি। পুজোর পর বিজয়াতে সকলেই আশা করেছিল সকলের সঙ্গে এবার পরিচয় হবে তাঁর, কিন্তু সে লৌহযবনিকা আর উঠল না।

অবশ্য অরুণারা তাতে অসুখী নয়। ওরাও মিশতে চায় না সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে। তবে সত্যব্রতর কথা আলাদা। ওঁরা সমস্ত জগৎ ভুলে বিয়ের পর থেকে শুধু স্বামী-স্ত্রীই নিজেদের ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করে বসে আছে। সারাক্ষণ তাদের ঘরের দরজা বন্ধ। বোধ হয় দিবারাত্রই প্রেমালাপ।

শুধু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের দিন হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই প্রচুর সাজসজ্জা করে বেরিয়ে যায় এরা গাড়ি করে। যখন ফেরে তখন রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর ছাড়া আর কেউ-ই বিশেষ জেগে থাকে না। আর না হয় তো বাড়িতেই হৈ-চৈ অনেক রাত অবধি। অবশ্য বিয়ের পর থেকে যেন সান্ধ্য-আসরও আর তেমন জমে না।

সবাই চুপ করে অপেক্ষা করছে দেখে সুচরিতা সপ্রতিভ হাসি হেসে বলল,—কই আপনারা বসুন।

হ্যাঁ বসছি।

অরুণা আর ইলা বড় সোফাটায় বসে পড়ল।

বৌদি, আপনাকে আমাদের একটা উপকার করতে হবে।

কি বিষয়ে?

কিছুই না, আপনাদের তো অতগুলো গ্যারাজ খালি পড়ে আছে···

হ্যাঁ, এখন তো আর গাড়ি নেই অতগুলো···

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো ইলা। ওর দিকে একবার তাকাল অরুণা, ইলা চুপ করে গেল। আমিও তাই বলছিলাম।

সুচরিতা সোৎসাহে বলল, আপনাদের তো কোন দরকারে লাগে না, তাই যদি···ওর একটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে বৌদি। আমরা একটা নতুন বড় গাড়ি কিনছি, সেটার জন্য।

কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল অরুণা। মৌন সম্মতি ভেবে সুচরিতা আবার বলল, ভাড়ার জন্য ভাববেন না, সে যা হয় ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করবো।

কঠিন হয়ে গেল অরুণার মুখ। সত্যি বটে, গাড়ির অভাবে গ্যারাজগুলো খালি পড়ে আছে, কিন্তু তাই বলে···

এ বাড়িতে যখন সে বৌ হয়ে আসে, তখনও শাশুড়ি বেঁচে,

লিলিপাও্ড়িও বেঁচে। এক বিরাট জমজমাট সংসারের বৌ-এর পদ-মর্যাদায় গর্বিতই ছিল সে।

তারপর একে একে বড় বড় ব্যবসাগুলো ডুবে, জমিদারীর সব অংশ চলে গিয়ে তাদের অবস্থা খারাপ হ'ল বটে, কিন্তু তাই বলে সুচরিতার মুখে ভাড়ার প্রলোভন? আর সুচরিতার বিষয় সে কি জানে না? হঠাৎ দু'দিন টাকার মুখ দেখেছে যে।

নিজেকে তবু সামলে নিল অরুণা—অসংযম প্রকাশ করার শিক্ষা সে পায় নি।

তাই আস্তে আস্তে বলল,—দেখুন, এ-সবের কর্তা তো আমি নই ওঁদের জিজ্ঞেস না করে কিছু বলা কঠিন।

জোরে হেসে উঠল সুচরিতা।

তা হোক! আমি জানি কর্তার কর্তা আপনি। আর আপনি যা বললে তিনি কি আর না করতে পারেন?

তা বলা যায় না।

খুব বলা যায়, আমার কোন কথার ওপর কর্তা না বলতে পারেন নাকি?

মনে মনে হাসি পেল অরুণার। এর ভেতরেই এত প্রেম? এত অধিকার! কর্তা?

কি জানি ভাই। অরুণা বলল। জিজ্ঞেস করে বলব। এ-সব ব্যাপারে আমরা কর্তাদের কখনও কিছু বলি না। ও-সব হয় বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার, এখানে মেয়েদের নাক গলান কর্তারাও তেমন পছন্দ করেন না এ বাড়িতে।

মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল সুচরিতার। তার অনুরোধ ঠেলতে পারে এমন লোক আছে? ক' বছর ধরে খালি স্তাবকতাই শুনে আসছে সে। তার একটি ইচ্ছা, মুখের একটি কথা পালন করার জন্ত শত লোক যেন কৃতার্থ বোধ করেছে নিজেদের। সে তো জানে, একবার বললে লাখ টাকার চেক কাটতে পারে এমন লোক দুর্লভ নয়। আর এরা?

সামান্ত বাড়িওলা ব'লে এত অহঙ্কার নাকি? এরা কি তার আসল পরিচয় জানে না? হ'তে ও পারে যা সেকেলে। হয়ত সিনেমাই দেখে না। কে জানে।

আঘাত পেয়ে আবার যেন তার মনটা উল্টো সুরের আশ্রয় নিল। যে জীবনকে সে ভুলতে চেয়েছিল কিছুক্ষণ আগে আবার তাকেই আঁকড়ে ধরে সেই পরিচয়ের জন্তই সে গর্বিত বোধ করল।

দেখুন বৌদি! আমার যা প্রফেসন তাতে একটি গাড়িতে তো চলে না, আমার নিজেরই একটা গাড়ি দরকার হয় সর্বক্ষণের জন্ত।

কোন উত্তর না দিয়ে ওর দিকে সোজা তাকিয়ে থাকল অরুণা। ইলা উঠে গিয়েছিল তাই রক্ষা, অরুণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আর তা ছাড়া···সুচরিতা যেন মরিয়া হ'য়েছে, এদের কাছে তার নিজের পরিচয়টুকু দেবেই। তা ছাড়া, শুধু গাড়ি নয় বড় আর নতুন মডেলের দামী গাড়ি না হলে মানও থাকে না। তাই ঐ বড় গ্যারাজটার প্রয়োজন সব থেকে বেশি।

খাবারের একটি রেকাবি, আর এক গেলাস সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল ইলা। সুচরিতা লক্ষ্য করল অপূর্ব কারুকার্য করা দু'খানি পাত্রই রূপোর।

এ সবের কোন প্রয়োজন ছিল না। নরম করে হাসল সুচরিতা।

প্রয়োজন তো নয় লৌকিকতা! নতুন বৌ বাড়িতে এলে এ সব করতে হয়।

নতুন বৌ?

কথাটা ভারি ভাল লাগল সুচরিতার।

সে তো এটুকুই চেয়েছিল। বৌ—নতুন বৌ। তার মনটা আবার নরম হয়ে গেল। আন্তরিকতার এ স্পর্শটুকুকে সে অমর্যাদা করতে পারল না।

হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিল। কিন্তু মিষ্টি খাওয়া অসম্ভব বৌদি। ও আমি কিছুতেই পারব না।

পারতে যে হবেই ভাই।

না বৌদি, প্লিজ।

বাঃ, প্রথম আলাপ মিষ্টি মুখ না করে শেষ করা যায় কি?

অরুণা জোর করল। তা ছাড়া মিষ্টি না খেলে আপনার সঙ্গে যে মিষ্টি সম্পর্ক থাকবে না, আর আপনিও আসবেন না। গদগদ হয়ে ইলা বলল।

আর তোমার মিষ্টি কথার বুঝি দাম নেই?

সুচরিতা ইলার হাতটি ধরে ফেলল। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে কর নি তো?

না না সে কি?

প্রায় গলে গেল ইলা। তুমিই তো বলবেন, বাঃ রে,···

আর মনে মনে ভাবল যে আপন লোককেই তো তুমি বলা যায়। আপনিটা যেন কেমন জানি পর পর মনে হয়।

বন্ধুদের কাছে ইতিমধ্যেই দাম বেড়ে গেছে। আজকের কথা তারা যখন শুনবে তখন তাদের ঈর্ষাকাতর মুখগুলো কল্পনা করেও সুখ পেল ইলা।

আচ্ছা আজ উঠি। আপনি কিন্তু ভুলবেন না বৌদি। একটু বলবেন ওঁদের। অবশ্য উনিই কথা বলবেন এরপরে প্রয়োজন হ'লে। ···আজ চলি।

কোন কথা না বলে হাসল অরুণা। মনে মনে সে স্থিরই করেছে গ্যারাজটি দেবে, আর বিনা ভাড়াতেই। মেয়েটার ব্যবহার ভাল। হয়ত আঘাত করা তার উদ্দেশ্যও ছিল না, তবে হঠাৎ টাকার মুখ দেখেছে তো?···

যাক গে, এখন কিছু বলার দরকার নেই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই মনে করিয়ে দেব বৌদিকে···

সুচরিতাকে সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে দিতে দিতে বলল ইলা, তারপর হঠাৎ অরুণার স্থির চোখের দিকে দৃষ্টি পড়াতে থেমে গিয়ে ওপরে উঠে এল।

বিদায় নিয়ে খুব আস্তে আস্তে যেন গুণে গুণে পা ফেলে নীচে নেমে গেল সুচরিতা।

নীচে নেমে শোবার ঘরে ঢুকে সুচরিতা দেখল সত্যব্রত তখনও বিছানায়।

এই?
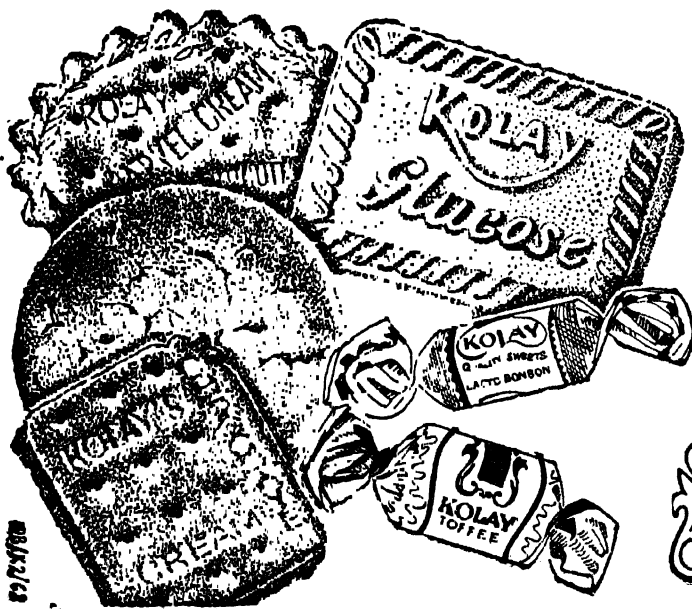
আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
Glucose
KOLAY
KOLAY
TOFFEE
Kb
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০

পাশে বসে পড়ল সুচরিতা।

ও,···

একহাত দিয়ে স্ত্রীকে কাছে টানলেন সত্যব্রত। কখন উঠবে?

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

ঘুম জড়ান গলায় প্রশ্ন করলেন সত্যব্রত।

সত্যব্রতর মাথাটা ওর দামী সিল্কের কাপড়ের ওপর তুলে নিল সুচরিতা। তারপর মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, খানিকটা কাজ এগিয়ে দিয়ে এলাম।

কোথায়।

ওপরে গিয়েছিলাম যে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, জান, লোক বেশ ভাল ওরা, তবে ওদের বৌটি শক্ত ব'লে মনে হ'ল।

বলেছ যে ভাড়া যত লাগে তত দেব।

হ্যাঁ কথা প্রসঙ্গে তাও বলেছি তবে এ নিয়ে বেশি বলা মুস্কিল হল।

কেন?

ওদের বৌটি···কিন্তু জান ওদের মেয়েটি ভারি মিষ্টি।

কে মেয়ে?

আহা জান না?

আছে নাকি কোন?

তুমি এর আগে দেখ নি বলতে চাও?

তোমার আগে কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছি বলে মনে কর নাকি?

আহা···প্রায় গড়িয়ে পড়ল সুচরিতা স্বামীর গায়ের ওপর।

সত্যি গো।

স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন সত্যব্রত।

রীতা।

কি গো।

গ্যারেজের ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে এসেছ তো?···

হ্যাঁ।

ভাল···আজ আর দেরি করলে চলবে না, অনেক কাজ।

না কোন কাজ নেই। তুমি শুয়ে থাক, তোমাকে উঠতে হবে না।

আব্দারের সুরে বলল সুচরিতা। কাজ তো চিরকালই আছে, কিন্তু আমার কিছু ভাল লাগে না তোমাকে ছাড়া।

পাগল···

ওর গালে টোকা দিয়ে উঠে পড়লেন সত্যব্রত। থাক না শুয়ে, আমাকে বল না, আমি সব কাজ করে দেব।

তোমাকেই তো করতে হবে।

খাটের তলায় রাখা স্লিপারটা পায়ে গলাতে গলাতে হঠাৎ বলে উঠলেন সত্যব্রত। আচ্ছা খোকা মিত্তির এখন কোলকাতায়ই তা না?

জানি না।

আহত হল সুচরিতা। মানে হয় কোন এ কথা এখন বলায়?

দেখ। একটা কথা।

কি?

ওর দিকে সবিস্ময়ে ফিরে তাকালেন সত্যব্রত। ও নামটা আমার কাছে আর কোন না। কোন ইন্টারেস্ট আমার নেই। সত্যি বলতে কি, জীবনের এই অধ্যায়টি আমি ভুলতে চাই।

নিঃশেষে ভুলে যাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা জিনিষ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

সুচরিতার সমস্ত রক্ত যেন মুখে চলে এল।

কি?

তার গলার স্বরও বুঝি কেঁপে উঠল।

তোমার সেই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুচরিতা। তবু ভাল সহজ হওয়ার চেষ্টা করল সে

সে পরে হবে, অত ভেবো না।

না না, দেরি করলে হবে না।

বাথরুমে ঢুকে গেলেন সত্যব্রত।

মুখ ধুয়ে যখন বেরিয়ে এলেন তখনও সুচরিতা বসে ভাবছে।

কি ভাবছ?

ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন সত্যব্রত, কিছু না।

শোন। কাল তোমার এ মাসের স্যুটিং-এর ডেটগুলো জানিয়েছে ওরা।

কখন?

কাল বিকেলে একজন এসে দিয়ে গেছে।

মানে হয় কোন এর?

কেন?

বাঃ, তারা তো জানে আমার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। এত বড় একটা ঘটনা, তবু ওরা,···

মায়া হল সুচরিতার জন্য সত্যব্রতর। বিবাহিত জীবনের শান্তির জন্য কি কাঙালই হয়ে আছে মেয়েটা। তার সারাদিনের সমস্ত চিন্তা ভাবনা যেন ঐ একটিমাত্র উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে চাইছে।

কিন্তু বাস্তব? তাকে কি অত সহজে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়? বরং এইসব ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দিলেই তো ক্ষতি আরো বেশি। তাই সুচিন্তিতভাবেই উচ্চারণ করলেন সত্যব্রত।

তাতে ওদের কিছু আসে যায় না।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন সত্যব্রত।

আসলে সকলেই তো নিজের স্বার্থ দেখবে রীতা। তোমার জন্য তারা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করবে কেন বল?

তা তো আমি বলছি না কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

কি?

ভাবছি···ওদের কিছু টাকাকড়ি দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলে হয় না? মাত্র কয়েকটা সট তো নেওয়া হয়েছে।···আর আমি তো ঠিক করেছি আর ফিল্মে নামব না।

পাগল না কি।

ওর শেষ কথাটা প্রায় কানেই নিলেন না সত্যব্রত।

সেধে টাকা তুলে দেবে ওদের হাতে? এর থেকে মূর্খের কাজ আর কি হ'তে পারে?···বরং···

প্রায় হঠাৎ পাওয়া সমাধানের মত বেশ উৎসাহের সুর টেনে রেখে আবার বললেন, আচ্ছা, খোকা মিত্তিরকে বললে কেমন হয়?

না না—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুচরিতা। ওঁকে আর নয়, আমি তো বলেছি, সবই তো বলেছি তোমাকে আমি।

তা জানি রীতা! লোকটার সংস্রব আমিও এড়াতে চাই, কিন্তু বাজে সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে এতগুলো টাকা হাতছাড়া করবার কি কিছু অর্থ আছে?

অন্য উপায় ভাবতে হবে।

হঠাৎ গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল সুচরিতা বিছানার ওপর। এই সকালেই এত ক্লান্তি এল কোথা থেকে কে জানে!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রসাধন করলেন সত্যব্রত। পুরুষ হয়েও এ বিষয়ে তাঁর বিলক্ষণ তৎপরতা আছে।

আয়নার ভেতর দিয়েই দেখতে পেলেন সুচরিতা চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর এগিয়ে এসে বিছানার পাশে বসে সুচরিতার সাদা কপালে আস্তে চুম্বন ক'রে ডাকলেন,—

রীতা···সু—

উঁ,···চোখ বুজেই উত্তর দিল সুচরিতা।

আজ সন্ধ্যার সিনেমায় না গিয়ে চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

টিকিট তো কাটা হয়ে গেছে।

যাক গে।···

বেশ।

খুশি তো। তুমি তো বেড়াতেই ভালবাস?

বাসি তো।

তবে চল আজ অনেক দূর বেড়াতে যাব।

বেশ।

সন্ধ্যার পরই বেরুব, রাত করব না বেশি।

বেশ।

সব বেশ না?

ওকে নাড়া দিলেন সত্যব্রত।

হ্যাঁ সত্যিই গো সব বেশ। তুমি যা বলবে সব শুনব শুধু একটি বাদে।

উঠে পড়ল সুচরিতা।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, তোমায় চা দিতে বলি।

সন্ধ্যায় সত্যব্রতর ইচ্ছেমতই সাজল সুচরিতা।

এমনিতেই সে জাঁকজমকের সাজ পরতেই ভালবাসে। জমকালো বেনারসী আর প্রচুর গয়না ছাড়া সে সাজতেই পারে না। আজ সত্যব্রতর কাছে উৎসাহ পেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে সাজ করল।

সত্যব্রত বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলেছেন যাতে বসনভূষণ কোনটাই আভিজাত্যে খাটো না হয়। সত্যব্রতর মতে আভিজাত্য মানুষের গোটা শরীরেই ছড়িয়ে থাকা চাই। তা না হলে নাকি ঠিক বনেদী-আনা প্রকাশ পায় না।

সাজের আধিক্যেও অপূর্ব দেখাচ্ছিল সুচরিতাকে।

ওর দিকে একবার মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন সত্যব্রত। তৃপ্ত হল সুচরিতা সে নীরব প্রশংসাতে।

গাড়িতে উঠে ঘন হ'য়ে বসল সে স্বামীর কাছে। ওর হাতটা নিজের হাতের ভেতর টেনে নিলেন সত্যব্রত।

গাড়ি যখন টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর সামনের রাস্তা ধরল, তখন সুচরিতা অবাক না হয়ে পারল না—এই! কি ব্যাপার?

কেন?

কোথায় যাচ্ছি আমরা?

চলই না, দেখতে পাবে।

না এদিকটা মোটেও ভাল লাগে না আমার, অন্যদিকে চল।

আচ্ছা চলই না।

আবার বললেন সত্যব্রত গম্ভীর হ'য়ে, হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল সুচরিতা। এমনি গম্ভীর সত্যব্রতকে তার ভাল লাগে না। জানে প্রশ্ন করলেও আর উত্তর পাবে না এর মধ্যেই সুচরিতা বুঝে নিয়েছে প্রয়োজন না থাকলে মন খুলে ধরবার লোক নয় সত্যব্রত। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা অনর্থক।

কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কায় মন ভরে উঠল সুচরিতার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল তা হোতে পারে না, সত্যব্রতর মত উদার লোক, তার ওপর তার স্বামী, তাঁর দ্বারা এতটা নীচ হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাঁর যতই বাস্তববুদ্ধি থাক না, এ কখনও হতে পারে না, স্বার্থই তো সব সময়ে সব থেকে বড় কথা নয়।

কিন্তু তার সমস্ত আশাকে নির্মূল করে গাড়ি ঢুকল খোকা মিত্তিরের বিরাট কম্পাউণ্ডওলা বাড়ির ভেতর।

লাল কাঁকরের চওড়া রাস্তা এ গেট থেকে আরম্ভ হয়ে গাড়ি বারান্দার তলা ঘুরে ও গেটে গিয়ে মিশেছে।

বাড়ির সামনের বাগানের মাঝখানে নিরাবরণা পরীমূর্তি; তার মাথা থেকে জলের ফোয়ারা শতধারায় ঝরে পড়ছে অনবরত। এখানে ওখানে শ্বেতপাথরের বেঞ্চি, আর ছোট বড় নানারকম মূর্তি। অবশ্য সব ক'টি মূর্তিই নারীদেহের বিভিন্ন ভঙ্গিমার স্থূল প্রকাশ।

ওদের গাড়ি গিয়ে থামতেই লম্বা সেলাম দিল দরোয়ান।

সুচারিতা এদের অচেনা নয়। প্রকৃতপক্ষে কয়েকদিন আগেও সুচরিতাকেই এরা মনিবগৃহিণী মনে করত। সুচরিতার হুকুমেই তাদের কাজ করতে হয়েছে। আজ তাই লম্বা সেলাম দিয়ে ও সহাস্য অভ্যর্থনায় সম্মান প্রদর্শনে কোন ব্যতিক্রম করল না।

ঢোকবার বড় দরজার সামনের শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে খোকা মিত্তিরের খাস চাকর অনন্ত নেমে এল দ্রুতপায়ে।

সুচরিতাকে সে সত্যিই পছন্দ করে।

গাড়ির দরজা খুলে সাদর অভ্যর্থনা জানাল সে।

আসুন মা। বাবু ঘরেই আছেন। ভাল আছেন তো মা?

বহুদিন একথা শুনেছে সুচরিতা, প্রায় প্রত্যহই, আর অভ্যস্ত

পায়ে নেমে গেছে হাসিমুখে। কিন্তু আজ এই কথাগুলোই যেন তাকে বিঁধতে লাগল।

কি নামবে না? গম্ভীর গলায় বললেন সত্যব্রত।

সত্যব্রতর দিকে একবার বড় বড় চোখ তুলে তাকাল সুচরিতা। তারপর প্রায় ধরা গলায় বলল, আমায় আগে বল নি কেন?

তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। কারণ পরে বলব। এখন নাম, এখানে সিন কোর না।

আরও গাম্ভীর্য আমবার চেষ্টা করলেন সত্যব্রত?

নেমে আসুন মা। কতদিন বাদে এলেন।

অনন্ত ডাকল সাগ্রহে একমুখ হাসি নিয়ে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সুচরিতা।

নামবার আগে একমুহূর্ত ভাবল সুচরিতা, তারপর মুখে সেই পরিচিত হাসি টেনে বহুদিনের অভ্যাসমত সোজা চলল খোকা মিত্তিরের খাস-কামরার দিকে।

কোন ঘরে আছেন? সত্যব্রত জিজ্ঞেস করলেন অনন্তকে।

মা ঠিক জানেন। আজ্ঞে ওঁর তো সবই জানা। সবিনয়ে উত্তর দিল অনন্ত।

মুখটা কালো হয়ে গেল সত্যব্রতর। এসব ঘটনা কিছু অভাবনীয় নয়। ইচ্ছে করলেই এ অপমানকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। এখানে এলে যে সরল প্রাণ চাকর-বাকররা সামলিয়ে কথা বলতে পারবে না, সেটুকুও তাঁর অজানা নয়!

নাকি জেনেশুনেই অনন্ত এ কথা বলল তাঁকে শুধু অপমান করবার জন্য। তাও যদি হয় এই গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, ইচ্ছে করলেই···

কিন্তু নাঃ, বৃহৎ স্বার্থের কাছে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিতে সত্যব্রত জানেন। তাই এসব তুচ্ছ কথা সহ্য করবার শক্তি তাঁর যথেষ্ট আছে। আর জীবনে এসব তো কম হয় নি। কবেই বা পিছুপাও হয়েছেন তিনি। তাই আজও কোন কথা গায়ে না মেখে সোজা এগিয়ে যান, যেদিকে সুচরিতা গেছে।

এটি খোকা মিত্তিরের বসতবাড়ি নয়। তাঁর পরিবারের সকলে থাকে উত্তর কলকাতায় তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে। সে বাড়িতে এখনও একশ' বছর আগেকার নিয়মে দিন কাটছে। বাড়ির মেয়েরা এখনও সেখানে মর্যাদা অনুযায়ী কেউ রেঁধে, কেউ নভেল পড়ে, আর কেউ ময়নাকে কথা শিখিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে কোনমতে। বাইরের বিরাট জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, রাখবার দরকারও তারা মনে করে না। মাঝে মাঝে ঢাকা গাড়ি বা মোটরে করে নেমন্তন্ন রাখতে যাওয়া বা থিয়েটার-যাদুঘর যাওয়ার সময়ই তারা বাইরে আসে, না হলে সুখ-দুঃখে কেটে যায় তাদের দিন, বিরাট সেকালের চকমেলান বাড়িতে, যেখানে প্রতি ইটের পাঁজরে বোধ হয় অত্যাচার আর অবিচারের কাহিনী জমা হয়ে আছে।

বাড়ির অনেক পুরুষ নানা কাজে কেউ বা বাইরে, কেউ বা পৈতৃক আয়ের ওপর নির্ভর করেই চর্বিত-চর্বণে দিন কাটাচ্ছে। বেশির ভাগেরই বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক কম। মেয়েদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেই তারা ক্ষান্ত। হয়ত বা নতুন বিয়ের পর কিছুদিন স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকে তারপর আবার যে কে সেই। বেশি খোঁজ রাখার প্রয়োজন তাঁরা মনে করেন না।

খোকা মিত্তিরের সঙ্গে সে বাড়ির সম্বন্ধ বহুদিন ঘুচেছে, মাঝে মাঝে যাওয়া ছাড়া।

এখানে স্টুডিওর কাছে নিজের কাজের সুবিধের অছিলায় এই বিরাট বাগানওলা বাড়ি তৈরি করেছেন খোকা মিত্তির।

তাঁর একটা ভাল নাম ছিল বোধ হয় কোনকালে, কিন্তু আজ সে নাম সবাই ভুলেছে। খোকা মিত্তির বলেই সর্বত্র পরিচিত তিনি। সে নামই তাঁর পরিচয়।

জনশ্রুতি শোনা যায়, যৌবনে নাকি বড় ভালবেসে এক অভিনেত্রীকে এই বাড়ি তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই অভিনেত্রী নামকরার পর এত টাকার মালিক হল যে না কি দশজন খোকা মিত্তিরকে কিনতে পারে। তার তখন সুদিন, তাই বুঝি মানুষের স্বভাব নিয়মেই দুর্দিনের বন্ধু আর প্রণয়ীকে তার আর প্রয়োজন হ'ল না। ব্যবহৃত মদের পেয়ালার মত খোকা মিত্তিরের প্রেম কার্পেটের ধুলোয় গড়াতে লাগল আর নতুন জীবনের আস্বাদনে বিহ্বল হয়ে দিন কাটতে লাগল সেই বিখ্যাত অভিনেত্রীর।

খোকা মিত্তিরের কপালটাই বুঝি খারাপ। না হলে সুচরিতাও চলে যাবে কেন?

সুচরিতার বিয়ের খবরে ফিল্ম জগতের সব লোকই প্রায় প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাদের সহানুভূতি জানিয়েছে, বেচারা ভদ্রলোক। স্টুডিও মহলে তো তাঁর নামই হ'য়ে গেছে মিস্টার লাভার বলে। অর্থাৎ কি না তিনি চিরদিনের জন্য কারও নন, প্রয়োজন ফুরোলেই সদা পরিত্যক্ত।

সুচরিতাকে এগোতে দেখেও বিশেষ ভরসা পেলেন না মনে সত্যব্রত।

নিজের ব্যক্তিত্বে আস্থা রেখেই তিনি সুচরিতাকে এখানে না জানিয়েই নিয়ে এসেছিলেন। তিনি জানতেন সুচরিতার এখানে আসাটাই বড় কথা। কেন না তিনি তো অন্য কোথাও যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন খোকা মিত্তিরের কাছে। সে খোকা মিত্তির শুধু বড়লোক নয়, শুধুই সীমাহীন টাকা নেই তার, শুধুই যে টাকার পরোয়া করে না খোকা মিত্তির তা নয়, সে খোকা মিত্তির। অর্থাৎ টাকা খরচের তাগিদ যদি আসে কোন মেয়ের কাছ থেকে তা হলে তো কথাই নেই।

আর এখানে সে মেয়েও আর কেউ নয়। স্বয়ং সুচরিতা। সুতরাং একটু মুখের কথা খসালেই যে কার্য উদ্ধার অনিবার্য এমন একটা আশা তাঁর মনে স্থির হয়েই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ সুচরিতার হাবভাব তাঁর ভাল লাগছে না। মোটেই আশাপ্রদ নয়।

সত্যব্রত তাই মনে মনে একটু ভয় পেলেন। এতটা ভাবেন নি তিনি সুচরিতাকে। হাজার হোক এককালে তো ভালই বাসত। আর আজ?

সবই যেন বেশি বেশি আর বাড়াবাড়ি মনে হয় তাঁর কাছে। এতদিন ফিল্মে অভিনয় করছে, এত লোকের সঙ্গে মিশছে অথচ এখনও এত কোমল? না কি সত্যিই এতটা নয়? কে জানে!

যতই হোক, সব মেয়েই বোধ হয় মূলে এক, মনে মনে স্বীকার করলেন তিনি।

বিরাট দেহের ওপর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, গলায় চেন হার আর সবকয়টা আঙুলে প্রায় বড় বড় জলজ্বলে হীরের আংটি পরে বসেছিলেন খোকা মিত্তির।

এটি তাঁর খাসকামরা। বিলেতী প্রথার সাজান নয়। মোটা নরম গদির ওপর ধবধবে সাদা চাদরের ফরাস পাতা একদিকে, তার এখানে-ওখানে সাদা ওয়াড় পড়ান সিল্কের ঝুমরি ঝোলান তাকিয়া। ও-পাশের ঘরে বিলাতী নেটের মশারিঢাকা বিরাট খাটের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেটাই তাঁর শয়ন-ঘর।

একটা মোটা তাকিয়ার ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় তামাকে সুখটান দিচ্ছিলেন খোকা মিত্তির।

আসতে পারি?

চমকে উঠলেন খোকা মিত্তির! স্বপ্ন দেখছিলেন না তো তিনি?

সুচরিতা?

এই সন্ধ্যাবেলায়? আবার তাঁর ঘরে?

ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন, হাত থেকে মুখনলটা খসে পড়ে গেল তাঁর। সোজা হ'য়ে বসবার চেষ্টা করলেন তিনি?

কি ব্যাপার? বসতেও বলবেন না নাকি?

এত সহজ হয়ে গেছে সুচরিতা? আপনি? তাঁদের অতদিনের সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে এতটুকুও সময় নেয় নি?

কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে চটিটা হাতড়াতে লাগলেন।

ঘরে ঢুকলেন সত্যব্রত। এই যে আপনি বাড়িতেই আছেন? আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।

অমায়িক হাসিতে মুখ ভরে তুললেন সত্যব্রত।

আমারই অশেষ সৌভাগ্য বলুন। জোড়হাতে প্রায় গলে পড়লেন খোকা মিত্তির। আপনারা যে কষ্ট করে এই দীনের কুটিরে পদধূলি দেবেন তা তো স্বপ্নেও ভাবি নি।

ওঁর চোখের কোণে জল এসে পড়েছে, লক্ষ্য করল সুচরিতা।

কি যে বলেন, আমাদেরই আরও আগে আসা উচিত ছিল। কেবল সুচরিতার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না ক'দিন তাই।

শরীর খারাপ?

সুচরিতার দিকে উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে তাকালেন খোকা মিত্তির।

না না এখন ভাল আছে। ও তো রোজই বলছে একবার করে এখানে আসার জন্য। আফ্‌টার অল পুরোন বন্ধুত্ব তো!

একবার স্বামীর দিকে তাকাল সুচরিতা। তারপর ঘটনার হাতে একান্তভাবেই নিজেকে যেন সে ছেড়ে দিল।

সুচরিতার দিকে তাঁর সোনাবাঁধান সব ক'টি দাঁত বিকশিত করে তাকালেন খোকা মিত্তির, সুচরিতা তাকাল সত্যব্রতর দিকে, দেখল সত্যব্রত তারই দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখছেন। চোখ নামিয়ে নিল সুচরিতা।

সুচরিতা! বসবে না?

বসে পড়ল সুচরিতা ফরাসেরই এক পাশে।...বসবে বৈ কি। বসবে ব'লেই তো এসেছে।

তোমাদের মত অতিথিকে আপ্যায়ন করার ক্ষমতা আমার কি আছে? গদগদ স্বরে বললেন খোকা মিত্তির।...তব যখন দয়া করে এসেছ...তখন...

বেজায় চেঁচামেচি করে ডাকাডাকি করতে লাগলেন অনন্তকে।

নিঃশব্দে অনন্ত এসে দাঁড়াল ঘরে। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মেজবাবু?

ব্যস্ত হব না? এঁরা সব এসেছেন?

জানি, আর তো কেউ নয়, মা এসেছেন, আপনি ভাবছেন কেন? সব ব্যবস্থা হয়েছে। আপনি স্থির হয়ে বসুন তো।

ও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

আর সুচরিতার কান দু'টো জ্বালা করে উঠল।

মাত্র দশমাস আগের সুচরিতার নিজের পছন্দ করা সেটেই চা এল। চায়ের কাপ নিতে গিয়ে একবার যেন হাতটা কেঁপে উঠল তার। এবার আড়চোখে সারা ঘরটায় একবার তাকিয়ে দেখল; কোন পরিবর্তনই হয় নি।

সব তেমনি আছে। তারই পছন্দকরা ছবি, তারই পছন্দকরা পর্দা সব যেমনটি তেমন রয়েছে। সেই চিরদিনের চেনাজানা ঘর।

তবু আজ সেই একান্ত পরিচিত ঘরটিতে বসেই যেন সব থেকে বেশি ভয় করতে লাগল সুচরিতার। সেই বহুদিন আগে তার প্রথম যৌবনের প্রথম দিনগুলোর মত। সে যেন এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

ও কি তুমি কিছু খাচ্ছ না যে?

সুচরিতার ভর্তি খাবারের প্লেট দেখে খোকা মিত্তির বলে উঠলেন।

খাচ্ছি তো!

খুব মৃদুস্বরে বলল সুচরিতা।

কই খাচ্ছ? ভাল হয় নি বুঝি কচুরি? ··হ্যাঁ-রে অন্তা কচুরিতে আবার হিং দিস নি তো?

অভ্যস্তস্বরে ওর জন্য ব্যস্ত হলেন তিনি।

না মেজবাবু। আমি আর মার পছন্দ জানি না। নতুন করে শেখাতে হবে?

পরিতৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরিয়ে খোকা মিত্তির বললেন। তবে? তুমি তো কচুরি ভালবাস।

গলা দিয়ে খাবারটা যেন নামছে না। আটকে যাচ্ছে বার বার।

এখনও মনে রেখেছে চিরকাল মনে রাখবে লোকটা, সে কি ভালবাসে না বাসে, কি খায়, না খায়, তার কি অভ্যাস আছে না আছে। চিরদিন, চিরকাল মনে রাখবে।

আজ না থাক একদিন তার এ অধিকার ছিল। ভালবাসার অধিকার নয়? আরও অনেক বেশি। কিছুতেই জীবনের এ অধ্যায়টুকুকে মুছে ফেলতে পারবে না সুচরিতা। পাতা ওল্টাতে পারে কিন্তু যখন ইচ্ছে সে পাতা আবার ফিরে পড়া যাবে। কিছুতেই তাকে নির্মূল করে শেষ করতে পারবে না সে।

আর এটুকু সে ভাল করেই বুঝেছে এই নির্মূল ক'রে শেষ করার ইচ্ছে বুঝি তার স্বামীরও নেই। প্রয়োজনমত এই বন্ধ দরজার চাবি খোলবার ইচ্ছে বোধ হয় সত্যব্রতর আছে। না হলে আজ কেন?

চোখ দু'টো জ্বালা করে উঠল সুচরিতার।

ফেরবার পথে গাড়িতে সুচরিতার কাছে নিজে থেকেই সরে এসে ঘন হয়ে বসলেন সত্যব্রত।

ওর হাতটা নিজের হাতের ভেতর তুলে নিলেন। তাঁর সস্নেহ স্পর্শে সুচরিতা কেঁপে উঠল। তারপর ওঁরই হাতের ওপর মুখ ঢাকল।

আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন সত্যব্রত।

তুমি আমাকে কেন এখানে আনলে? রুদ্ধকণ্ঠে বলল সুচরিতা।

তাতে কি হয়েছে? তোমার বন্ধু তো?

এখন আর নয়, তুমি জান না আমার কত খারাপ লাগে এখন ওঁকে।

এখন! সবই এখন।

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন সত্যব্রত। কিন্তু এককালে তো খুবই ভাল লাগত, না? কি নিষ্ঠুর তুমি।

জলভরা চোখ তুলে সত্যব্রতর দিকে তাকাল সুচরিতা।

সত্যব্রতর মুখ দেখে তার বুকটা কেঁপে উঠল। সে মুখ গম্ভীর, স্থির, কঠিন। মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা সে মুখে কোন নির্ভরতা যেন খুঁজে পেল না সে। চলন্ত গাড়িতে আলোছায়ার খেলা সে মুখকে আরও সুদূর রহস্যময় মনে হল সুচরিতার।

সুচরিতা ভয় পেল।

সত্যব্রত বুঝতে পারলেন সুচরিতা ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

তোমার এ রকম ব্যবহার করার মানে?

ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন সত্যব্রত মোটা গম্ভীর গলায়।

কি রকম?

ভয়ে ভয়ে বলল সুচরিতা।

কি রকম বোঝ নি?

কোন উত্তর দিল না সুচরিতা।

এতদিন তো কত অভিনয় করে এলে। মস্ত বড় অভিনেত্রী তুমি। কিন্তু বোবার অভিনয় করবার জন্যই আজ এখানে এসেছিলে নাকি?

আমি কি বলবো?

কি বলবে?

বিরক্ত হয়ে বললেন সত্যব্রত। কেন কথাটা অতবার করে পাড়লাম, তুমি কি একবারও মিত্তিরকে নিজের মুখে রিকোয়েস্ট করতে পারলে না।

কঠিন হয়ে গেল সুচরিতার মুখ। তুমি তো জানতে আমি পারব না।

না, তা জানতাম না।

কেন?

তোমার আর আমার স্বার্থ একই বলে জানতাম তাই। না হলে এই সন্ধ্যাবেলায় এতটা পেট্রোল পুড়িয়ে এখানে আসতাম না।··· নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে খোকা মিত্তিরের দেখা করিয়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

ছিঃ—

সরে এসে বসল সুচরিতা। এই নীচ কথার কি উত্তর দিতে পারে সে? রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এত জোরে ছুটছে গাড়ি, এত হাওয়া—তবু সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজতে লাগল তার।

কত বড় ক্ষতি যে করলে আমার। তা তোমাকে বলতে পারি না। আমি যে তোমাকে নিয়ে এখানে এসেছি তা জানতে আর কারও বাকি থাকবে না, অথচ কোন কাজও হ'ল না।···কত কৌশলে আমি কথাটা পাড়লাম, প্রতিমুহূর্তে তখন আশা করছিলাম এবার বুঝি তুমি নিজে বলবে, অথচ··

সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

ছোট্ট করে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল যেন সুচরিতা।

আচ্ছা রীতা, তুমি তো জান তোমার মুখের একটি কথায় এখনও চেক কাটতে পারে লাখ টাকার খোকা মিত্তির।

তোমার কথা বলতে চাই না, কিন্তু আমার পক্ষে সেটা গৌরবের নয়। সুচরিতা দৃঢ়স্বরে বলল।

গৌরবের নয় জানি, কিন্তু প্রয়োজনীয়।

প্রয়োজনটাই কি জীবনে সব থেকে বড়?

আস্তে আস্তে বলল সুচরিতা।

হ্যাঁ তাই। বোকার মত বেশি প্রশ্ন ক'র না। আমার ভাল লাগছে না।

অন্তদিকে মুখ ফেরালেন সত্যব্রত।

স্বামীর কাছে প্রথম ধমকের জন্তে আর অপমানের জ্বালায় দু'চোখ জলে ভরে এল সুচরিতার।

অন্ধকার রাত আর রাস্তার দু'পাশের আলো। হট্টগোল, আর লোকজন। গাড়ির আওয়াজ আর চলতি পথের শুনতে পাওয়া গান সবকিছু থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে একটা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল সুচরিতা।

সমস্ত কিছুই তার কাছে ফাঁকা বোধ হ'তে লাগল যেন।

ফিরে এসে ওরা দেখল ওদের জন্ম ডিরেক্টর অপেক্ষা করছেন।

ওদের দেখে কোনরকম সম্ভাষণ না করে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল সুচরিতা।

ওদের আপ্যায়ন করে নিয়ে বসালেন সত্যব্রত। তারপর তাড়াতাড়ি চলে এলেন শোবার ঘরে।

সুচরিতা সেই পোষাকেই শুয়ে পড়েছে বিছানার ওপর।

এই কি করলে ?

কেন ?

বাঃ, ওঁরা সব বসে আছেন। তুমি তো ওদের কোনরকম ··

ইচ্ছে হোল না।

পাগলাম কোর না। ওঠো অন্তত কিছু ব'লে এস ওঁদের।

আমি পারছি না। অসম্ভব মাথা ধরে আছে।

না না সে হয় না।

ওকে অনুরোধ করলেন সত্যব্রত।

কি করবো ? আমি উঠতে পারছি না। চোখে হাত চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শুল সুচরিতা।···আর তা ছাড়া ওসব পুরোন পরিবেশে আমি আর স্যুটিং করবও না।

দৃঢ় গলায় বলল সুচরিতা।

বেশ তো! এখুনি তো আর তোমাকে স্যুটিং করতে হচ্ছে না। আপাতত অভদ্রতা—ওদের ঠেকাও লক্ষ্মীটি।

সত্যব্রতর গলার স্বরের কোমলতা স্পর্শ করল সুচরিতাকে। এ-পাশ ফিরে সত্যব্রতর দিকে তাকাল সে।

শোন! প্রস্পেকটিভ্ ডিরেক্টর, এঁকে চটান ঠিক নয়। আর ইনি তো বলছেনই, প্রডিউসার বললে ওঁদের তো আর কিছু বলবার নেই। তবে ?

তবে আবার কি ? প্রডিউসার তো ?···

আহা তাও তো সব ঠিক ক'রে এনেছিলাম। তুমিই তো শুধু··· বাক্ এখন ওঠো। আহা ভদ্রতাও তো একটা আছে।

আধঘণ্টা পরে সুচরিতা ড্রইং-রুমে এল। অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। সন্ধ্যার নিখুঁত সাজসজ্জা এখনও সে খোলে নি, এনামেলকরা মুখটাকে আর একটু ঘষে মেজে নিয়েছে, অল্প একটু পারফিউম স্প্রে করে নিয়েছে।

সত্যব্রত নিজেও মুগ্ধ হলেন।

নাঃ গ্ল্যামার গার্ল বলতে যা বোঝায় সত্যিই তাই লাভ করেছেন তিনি। দু'বছর আগে স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিলেন তিনি ?

গর্বিত মনে নিজের নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন সত্যব্রত।

বিদায় নেবার সময় বেশ দুঃখ করে গেলেন তাঁরা। সুচরিতার মত মেয়ে যে চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নেবে এতে সত্যিই চিত্রজগৎ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

প্রথমটা যেন তাঁরা বিশ্বাসই করতে চান নি। সুচরিতা আর ফিল্মে নামবে না ? যশ-নামের এই শীর্ষ সময়ে ? কিসের জন্ম ? ভাল লাগে না আর ? অবাক না হয়ে পারেন নি তাঁরা।

অবশ্য তাঁদের ভরসা ফাইনাল কিছু এখনও হ'ল না। সবই নির্ভর করছে প্রডিউসারের ওপর। ব্যক্তিগতভাবে দুঃখপ্রকাশ করলেন ডিরেক্টর, সুচরিতার বিবাহিত জীবনের সুখ কামনা করে বিদায় নিলেন তাঁরা।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি জেগে রইল সুচরিতা।

আজ কি ভাবে দিনটা শেষ হ'ল। শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা না বলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন সত্যব্রত।

কি করতে পারে সুচরিতা ? স্যুটিং মানেই আবার সেই খোকা মিত্তির, ধনঞ্জয় চৌধুরী আর ওদেরই মত অনেককে সহ্য করা, বহুলোকের সঙ্গে চলাফেরা। ভাবতেও অসহ্য লাগে তার। আবার অন্যদিকে টাকা দিতে যে কেবল সত্যব্রতই চাইবেন না তাই নয়, সে নিজেও ভেবে দেখেছে অতগুলো টাকা চলে যাওয়া মুখের কথা নয়। দারিদ্র্যকে বড় ভয় পায় সুচরিতা। নাঃ সে জীবন যাপনের কথা ভাবতেও পারে না সুচরিতা।

আর অন্য উপায় কি ?

এক খোকা মিত্তিরকে নিজের মুখে অনুরোধ করা। ক্ষতিপূরণ দেবার লোক সত্যব্রত নন। বিশেষ করে সে ক্ষতিপূরণ যদি দিতে হয় খোকা মিত্তিরকে।

আবার মনে মনে ভাবল সে। খোকা মিত্তিরকে অনুরোধ করার থেকে বরং টাকাটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু সে টাকাও তো তার নেই। তার নিজের নামের সব অ্যাকাউন্টই তো সে সত্যব্রতর নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছে।

মনে মনে হাত কামড়াল সুচরিতা। বিয়ের পরই তাড়াহুড়ো করে সব টাকাকড়ি সত্যব্রতর নামে না করে দিলেই হোত। এখন একটা পয়সার জন্ম সে সত্যব্রতর মুখাপেক্ষী। পরক্ষণেই সে নিজের ভাবনার জন্ম লজ্জিত হল। ছিঃ ছিঃ তার এ মনোভাব হওয়া উচিত নয়। সে কি নিঃশেষে সব কিছু দেওয়ার জন্তই সত্যব্রতকে ভালবাসে নি ? কি হবে তার অর্থ নিয়ে ? প্রচুর অর্থ সে দেখেছে। প্রচুর বিলাসিতা সে করেছে। হ্যাঁ দারিদ্র্যকে সে ভয় পায়, অপছন্দ করে, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য নয়, আজ তার একমাত্র কাম্য স্বচ্ছল সুখী গার্হস্থ্য জীবন।

সত্যব্রতর ভালবাসা, সুন্দর একটি সংসার আর শিশুর কাকলিতে ভরা দিন। ভাবতেই রোমাঞ্চ হল তার। সেও মা হবে একদিন সে

মাতৃত্বের সম্মান পাবে, সে মাতৃত্বের স্নিগ্ধতা আছে, গর্ব আছে, আর আছে ভবিষ্যতের আশা।

একবার পাশে ঘুমন্ত সত্যব্রতর দিকে তাকাল সুচরিতা। কপাল থেকে চুলগুলো আলগোছে সরিয়ে দিল। ভারি মায়া হোল লোকটার জন্য। কত কষ্ট করে দরিদ্র অবস্থা থেকে শুধু নিজের পরিশ্রমে এত বড় হয়েছেন তিনি। তা ছাড়া প্রতিভাবান তিনি। অথচ কতদিন বাদে পেয়েছেন প্রতিভার সমাদর।

আহা! টাকার জন্য মায়া হওয়া তাঁর স্বাভাবিক। তারও তো মায়া আছে, সে কি কম সহ্য করেছে নিজের জীবনে? তবে? সমব্যথী মনে হল তার স্বামীকে। কাছে সরে এল সে, ঘুমন্ত স্বামীর হাতটার ওপর মাথা রেখে স্বামীর বুকের কাছে ঘন হ'য়ে শুয়ে চোখ বুজল সুচরিতা।

সত্যিই সুচরিতাও কম সহ্য করে নি। ও নিজের বাল্যকালটি ভাবতে ভয় পায়। সে সময়টুকু ওর কাছে কোন সুখের স্মৃতি আনে না, সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা জ্বালা একটা অসহায় আক্রোশ হয়েছিল তার। যখন সুচরিতা হয় নি, যখন সে শুধু রত্না, রত্না ঘোষ।

ভবানীপুরের একটি অন্ধকার গলির পুরোন বাড়ির একতলায় থাকত তারা। ওপাশের ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাগ করা কল-পায়খানা। দিন-রাত জল পড়ত, চুঁয়ে চুঁয়ে জল আসত তাদের শোবার ঘর অবধি, চটের থলে পেতে তার হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করত তারা। রীতিমত যুদ্ধ করে যেন বেঁচেছিল ওরা।

ওরা মানে ওদের পুরো পরিবার। রত্না, ওর বাবা নগেন ঘোষ, রত্নার মা, দিদি, দাদা আর ছোট দু'টি ভাই।

নগেন ঘোষের আদিবাড়ি পাবনা জেলার কোন গ্রামে। চাকরির আশায় চলে এল কোলকাতায়। পরিশ্রম করে পড়াশুনো বা চাকরি কোনটাতেই মন ছিল না তাই, জীবনে সম্মানের সঙ্গে দাঁড়ানোর থেকে কৌশলে বিনা পরিশ্রমে অর্থ রোজগারটাই বড় হয়ে উঠল তার কাছে।

আর সেখানেই রত্নার মায়ের সঙ্গে গোলমাল বাঁধতো বাবার।

আজীবন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই জীবন কেটেছে তাদের। দারিদ্র্য মানে শুধু অর্থের অভাব নয়, সেখানে তার বাবার স্বভাবের জন্য জড়িয়ে ছিল সম্মানের অভাব আর নিত্য পাওনাদার ঠেকাবার হীনতা।

তেমনি ভাবেই বেড়ে উঠেছিল ওরা নয় ভাই বোন।

মা এর ভেতরই চাইতেন একটু ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে, তাই বড় ছেলে যখন পর পর দু' বছর ফেল করে বাপের পথই ধরলে তখন তার আশা ছেড়ে দিলেও মেয়েদের ওপরই নির্ভর করলেন তিনি।

রত্নার দিদি লতা ম্যাট্রিক পাশ করবার পর আর এগোতে পারল না। বুদ্ধি নেই বলে নয়, তখন রত্না আর ছোট ভাই দু'টিও পড়ছে। তাদের সকলের খরচ জোটান সম্ভব নয় ব'লে। তাই দিদি পাড়ারই স্কুলে কাজ নিল আর রত্নারা পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগল স্কুলে।

এই সময়ই নগেনবাবুর এক নতুন রূপ দেখা গেল। এতদিন পর্যন্ত নানা কৌশলে তিনি রোজগারের চেষ্টা করেছেন অবশ্যই তার মোটা অংশ যেত তাঁর নিজেরই নেশার খরচে। কিন্তু যা হোক কিছু অনিশ্চিত হলেও সংসারে আসত। এবার তাঁর প্রস্তাব শুনে চমকে উঠলেন রত্নার মা।

বল কি? ভদ্রলোকের মেয়ে না?

তাই জন্যই তো আরও সুবিধে।

ছিঃ, ছিঃ! ঘেন্নায় মুখ ফেরালেন তিনি।

ছিঃ ছিঃ-র কি আছে? আমার দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে লতা বেড়াতে যাবে, তাতে ছিঃ! ছিঃ! বলবার কি আছে?

তারা তো বাপের বন্ধু হয়ে আসছে না।

এই দুঃসময়ে যারা সাহায্য করছে তারা বন্ধু নয় তো কি শত্রু?

শত্রু বৈ কি? দারিদ্র্যের যারা সুযোগ নেয় তাদের দয়া না নেওয়াই ভাল!

বোকা বোকা কথা ব'ল না। আজ লতাকে সাজিয়ে রাখবে। আরে আমিও তো সঙ্গে যাব।···একটু বেড়িয়ে আসবে, ভালমন্দ খাবে, এতে আপত্তির কি আছে?

কিন্তু মায়ের শত আপত্তিও টেকে নি। তর্জনগর্জন, রাগারাগি শেষে জোর করে বাবা দিদিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

যখন ফিরে এসেছে—তখন লতার মুখ ভার কিন্তু বাবার হাতে বড় বড় প্যাকেট।

মা জিজ্ঞেস করে জেনেছে সত্যিই ভাল লোক ওরা, কিছুই না শুধু গঙ্গার ধার, নানা দোকান ঘুরে এসব কিনে দিয়েছে।

রত্না খুশি সব চাইতে। সব থেকে ভাল শাড়িখানা বেছে নিয়েছে সে, ওটাই তার হবে। ও ভেবে পায় না তবু দিদির মুখ ভার কেন? তারা গরীব ব'লে যদি বড়লোকরা তাদের কিছু দেয় তবে আপত্তি কেন? আপত্তি কোথায়?

মা ছোঁয় নি ওসব শাড়ি-জামা খাবার দাবার। নগেনবাবু তাতে ভ্রূক্ষেপ করে নি। ছেলেদের ডেকে ভাগ করে দিয়েছে খাবার। তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুম লাগিয়েছে তক্তপোষে।

অনেক রাত অবধি মা আর লতা কথা বলেছে, রত্না টের পেয়েছে।

ভারি রাগ হয়েছে তার ওদের ওপর। দিদিটা যেন কি? সে হ'লে খুশি হত কত। আর সেধে আসা সুখ মা আর দিদি পায়ে ঠেলছে।

পরদিন স্কুলে যাবার সময় বেঁকে দাঁড়াল সে।

আমি আজ স্কুলে যাব না।

কেন?

শুধু আজ নয়, কোন দিনই যাব না?

কেন?

অবাক হয়ে মা জিজ্ঞেস করল। মাইনে দাও না, মেয়েকে স্কুলে পাঠাও কেন?

কি করব বল মা?

কি করব মা। প্রায় ভেংগে উঠল রত্না।

আমি জানি না। রোজ রোজ আমি অপমানিত হতে পারব না! ···জান রোজ দিদিমণি ক্লাশে নাম ডেকে বলেন এবার মাইনে না দিলে নাম কাটা যাবে। জান পরশু থেকে আমার নাম ডাকছে না।···

চোখে প্রায় জল এসে গেল রত্নার। আচ্ছা আজ যা মা। দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি। তোর দিদির একটা ট্যুইশনি জুটেছে—দেখি কি হয়।

আমি জানি না—

মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল রত্না।

যাঃ যাঃ স্কুলে যা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

না যাব না মাইনে না দিলে।

এবার তো আটকাত না। তোর ছোট ভাইয়ের অসুখে না হাক ক'টা টাকা বেরিয়ে গেল। কোথায় পাব বল ?

হ্যাঁ সাধা টাকা নেবে না, আর···

সাধা টাকা !

মা হাঁ হ'য়ে গেল ?

নয় ? বাবার বন্ধুরা টাকা দিতে চায় না ?

ঠাস ক'রে এক চড় মারল মা রত্নার গালে।

যাও—স্কুলে যাও।

রত্না স্কুলে গেল বটে, কিন্তু ফিরে এল হাঁড়ির মত মুখ করে।

সেদিন শনিবার না খেয়েই স্কুলে যায় সে। এসে ভাত খায় সে।

ওকে দেখেই মা বললেন, রত্না এসেছিস, ভালই হল। যা মা, পাশের উমাদের বাড়ি থেকে একটু তরকারি চেয়ে নিয়ে আয়।

কেন ? তরকারি নেই ?

চালই ছিল না, আর তরকারি। অনেক কষ্টে এক সের চাল আনিয়ে ভাত রেঁধেছি। কোন তরকারি নেই। ঘরে দু'টো আলুও নেই যে ভাতে দেব। যা মা যা, ভাই দু'টোও খেতে পায় নি।

না পাক্।

ঘরের কোণে বসল গিয়ে রত্না।

রোজ রোজ লোকের বাড়ি হ্যাংলার মত তরকারি চাইতে যেতে পারব না।

তা খাবি কি দিয়ে ?

তোমরা খাও নি ?

আমার আজ শরীর ভাল নেই, খাব না।

বুঝেছি।···আমিও খাব না।

যা মা, আচ্ছা না হয় দু'টো পেঁয়াজ চেয়ে আন। ছেলে দু'টো এখনও খায় নি।

আমি যাব না—

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রত্না। তোমাদের সংসারে আমার থাকতে ইচ্ছে করে না। খাবার নেই, কাপড় নেই, কিছু ভাল লাগে না আমার।

সংসার তো তোদেরই নিয়ে মা···কি করবো বল যেমন অদৃষ্ট। বড় খোকাটাও যদি মানুষ হ'ত। তা নয়, কোথায় থাকে কি করে কে জানে। মা-বোনের খোঁজ নেয় কখনও ?

কোন উত্তর না দিয়ে দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে রত্না। মা বোঝে জেদী মেয়ে ওকে এখন নড়ান যাবে না। নিজেই বেরিয়ে যায় পাশের বাড়িতে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেল ওরা।

মাও আজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কিছুতেই লতাকে নিয়ে যেতে দেবে না। লতা এককোণে কাঁদছে দাঁড়িয়ে। দু'খানি মাত্র ঘর তাদের। ঘর না বলে খুপরি বলা ভাল। তার ভেতরই বাইরের দিকের ঘরটাতে দখল নিয়েছে নগেনবাবু আর তার বড় ছেলে।

ভেতরের ঘরটার তক্তপোষে শোয় রত্না আর ছোট ভাই দু'টো। মেঝের অল্প জায়গাটুকুতে কাঁথা পেতে শোয়—মা আর লতা।

তক্তপোষের তলায় থাকে রাঁধবার বাসন-পত্র ও অন্ন-স্বল্প ভাঁড়ার।

কলতলায় কিছু ফেলে রাখা যায় না, চুরি হবার ভয়, তাই রাতে বাসন না-মাজা হলে ঐখানেই এঁটো বাসনও থাকে এককোণে। ভোররাত থাকতে উঠে মা আর লতা, যখন হাতাহাতি করে মেজে নেয় তখন রত্নাও ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা তুলে ভাইদের জামা-কাপড় পরায়।

সকাল বেলা সেদিন একে বড় ভাই-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি আর চেঁচামিচিতে ঘুম ভেঙেছে তাদের। শেষ পর্যন্ত মা আর পারে নি। ঠাস করেছে চড় মেরেছে অত বড় বাইশ বছরের ছেলের গালে।

শাসাতে শাসাতে বেরিয়ে গেছে সে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাবা ঢুকে কৈফিয়ৎ তলব করেছে মায়ের কাছে।

কোন উত্তর না দিয়ে মা নিজের কাজ করে গেছে। ছেলে-মেয়েরা ভয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু প্রতীক্ষা করেছে একটি ভয়ঙ্কর কিছুর।

সেই ভয়ঙ্কর কিছুটা ঘটল সন্ধ্যার ঠিক পরেই।

সকালেই বাবা বলে গেছে দিদিকে, আজ একজন বড়লোক বন্ধু আসবেন তার। লতা যেন তৈরি হয়ে থাকে।

কোন উত্তর দেয় নি মা। দুপুরবেলা লতা আর মা বেরিয়ে গেল।

ছোট ভাইটার জ্বর। রত্নাকে কাছে বসতে বলে মা চলে গেল লতাকে নিয়ে।

কোথায় যাচ্ছ মা ?

কাজ আছে একটু।

বেশ। আমি বুঝি একা থাকব ?

থাকবে বৈ কি ? ভাইয়ের অসুখ ওর কাছে বসে থাক।

মায়ের গলার স্বরে আদেশের সুর। হ্যাঁ নিজেরা বেশ বেড়াতে বেরোচ্ছ, আর আমি খালি বাড়িতে থাকবো না !

হ্যাঁ তাই থাকবে। কথা বাড়িও না।

একখানা মাত্র আস্ত শাড়ি মা'র। সেখানা পরে নিল তাড়াতাড়ি। লতাকে বের করে দিল মায়ের সযত্নে রাখা বহুদিনের একটা পার্সি শাড়ি। লতা আপত্তি করলেও শুনল না। আর রত্নার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল।

নিজের শতচ্ছিন্ন জামাটার দিকে একবার তাকাল সে। তারপর মুখ গোঁজ করে গিয়ে ভাইয়ের কাছে বসল।

সন্ধ্যে হ'য়ে এল, মায়া তখনও ফিরল না। রত্নার কেমন ভয় করতে লাগল। ঘরে মুড়ি ছিল—ভাইদের খেতে দিয়েছে, নিজেও খেয়েছে কিছু। হ্যারিকেনটা জ্বেলে নিয়ে হঠাৎ দেয়ালে টাঙান আয়নাটার দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। আজ স্নান করে নি সে, সারাদিন তার একরাশ রুক্ষ চুলে তার টসটসে মুখখানা হঠাৎ তার নিজেরই কাছে ভারি সুন্দর মনে হল।

সকলে দিদিকে সুন্দর বলে। তার মত কি? লতা তার মত সুন্দরী নয়, রত্নার মত সুন্দরী সহজলভ্যা নয়, একথাও সে অনেকবার শুনেছে। তবে? দিদির এত আদর কেন সকলের কাছে? শুধু বড় হয়েছে বলে? সেও তো বড় হয়েছে। ক্লাশ টেনের ছাত্রী সে, শাড়ির অভাবে ফ্রক পরে। বৈ তো নয়? না হলে তার মত চোদ্দ বছর বয়সেও ফ্রক পরা যে মানায় না, সে কথা কি সে জানে না?

হঠাৎ মনে হল সেও আজ শাড়ি পরবে। বাবার বন্ধুর দেওয়া সেই শাড়িটা বাক্সে তোলা আছে, দিদি একদিনও পরে নি।

ভাই দু'টোকে ঘুম পাড়িয়ে বাক্সটা খুলে ফেলল সে। ভাঁজ খুলে অনেকক্ষণ ধরে পরল শাড়িটা, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হ'ল যেন।

সেই সময় বাইরে কড়া-নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

ভয় হল নিদারুণ।

মা এসেছে বোধ হয়। কাপড়টা ছেড়ে রাখবার সময়ও নেই। তারপর মনে হ'ল পরলেই বা সে কাপড়খানা, মা আর দিদি তো ছোঁবেও না বলে দিয়েছে। তবে?

মনকে বুঝ দিয়ে দরজা খুলে দিতে গেল সে। দরজা খুলতেই চোখে পড়ল—বাবা। সামনে দাঁড়িয়ে একটা বিরাট গাড়ি। তাদের সারা গলিটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রত্নাকে দেখে নগেনবাবুও কম অবাক হয়ে যায় নি। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে ওকে জিজ্ঞেস করল—তোর দিদি কোথায়?

উত্তর পাওয়ার আগেই আবার ফিরে গেল গাড়ির কাছে, তারপর বিনয়ে গলে গিয়ে গাড়ির আরোহীকে নামতে বলল।

এতক্ষণে দেখতে পেল রত্না ভদ্রলোককে। কি অসম্ভব মোটা আর থলথলে। হেসে দুলে হাতীর মত নামতে চেষ্টা করছে ভদ্রলোক।

চোখের ইঙ্গিতে ওকে ভেতরে যেতে বলে ভদ্রলোককে নিয়ে এসে বসাল নগেনবাবু।

ভেতরে এসে চাপা গলায় আবার জিজ্ঞেস করল।

রত্না তোর দিদি কোথায়।

বেরিয়েছে।

বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেল রত্না।

তোর মা?

মাও বেরিয়েছে?

ওরা কি আমায় পাগল করবে? কখন বেরিয়েছে? কোথায়? কখন আসবে?

অধৈর্য হয়ে প্রশ্নগুলো করে গেল নগেন।

জানি না।

ভয়ে ভয়ে বলল রত্না।

এখন কি করি ···পায়চারি করতে লাগল নগেন। মাঝে মাঝে মনে হয় মাগীকে···

দাঁতে দাঁত চেপে বাকি কথাগুলো উচ্চারণ করল নগেন।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন প্রতিটি যুগ কাটছে। বাইরে বসে আছেন সেই ভদ্রলোক, তাদের ভাঙা তক্তপোষের ওপর, হ্যারিকেনের আলোতে। বিরাট যাঁর গাড়ি, বিপুল যাঁর শরীর।

রত্না ঘামতে লাগল।

বাবা।

কি?

প্রায় গর্জন করে উঠল নগেন।

বাবা! বাইরে ভদ্রলোক বসে।

চুপি চুপি বলল রত্না।

বসে তো? ওঃ আমার··কি যে করি।···

হঠাৎ চোখ পড়ল রত্নার ওপর।

এই শোন্।

কি?

চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

কোথায় আবার?

মুখ ভেংচে উঠল নগেন।

বাইরের ঘরে। চল্ আমার সঙ্গে। আয় এক্ষুণি।

বেরিয়ে গেল নগেন। আর চুপ ক'রে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল রত্না।

হঠাৎ তার যেন কেমন ভয় হতে লাগল। দিদিকে দেখে সে যেটা আনন্দের ব্যাপার ভেবেছিল সেটা যে ততটা সত্যিই আনন্দের নয় তা যেন সে আজ বুঝতে পারল।

কিন্তু সময় নেই।

বাইরের ঘর থেকে বাবার ডাক এল, রত্না মা।

ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল রত্না। আর ওকে দেখে সেই বিরাট মাংসল মোটা মুখ হাসিতে ভরে গেল।

এই বুঝি আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ।

খুব ছোট তো! বয়স কত?

বয়স হয়েছে, দারিদ্র্যের সংসার তো—তেমন বাড় হয় নি।

অবাক হ'ল রত্না, অথচ সে শুনে আসছে বরাবর বয়সের তুলনায় তার বাড়ন্তই গড়ন। কিন্তু চুপ করে থাকল সে।

কি নাম তোমার খুকি।

বাবার কথা গায়ে না মেখে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

আর রাগে গা জ্বলে গেল রত্নার। সে বুঝি খুকি?

রত্না!

বাঃ, বেশ নাম তো? বেশ দেখতে আপনার মেয়েটি।

হেঁ হেঁ···হাত কচলাতে থাকল নগেন।

আচ্ছা আজ উঠি।···চলুন যাবেন না কি?

হ্যাঁ চলুন! রত্না যাবি না কি?

কোন উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন: না না, ও ছেলেমানুষকে আর সন্ধ্যেবেলায় কষ্ট দেবেন না।···

পার্স খুলে একটা দশ টাকার নোট বার করলেন তিনি।

নগেন তাড়াতাড়ি সেটা হাতে নিল। তারপর—ভদ্রলোককে

নিয়ে বাইরে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল,—রত্না মা। দরজাটা বন্ধ করে দিস।

কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল রত্না। দরজাটা বন্ধ করে ফিরতে যাবে আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

বাবা ফিরে এসেছে। চোখ দু'টো জ্বল জ্বলছে। ভদ্রলোকের কি কাজ আছে, তাই বাবাকে আর সঙ্গে নেয় নি।

তোর মা এখনও ফেরে নি ?

ঘরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করতে করতে বলল নগেন।

কই না !

উত্তর দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল রত্না। আর তার একটু পরেই আবার কড়া নাড়ার শব্দ আর বাবার গর্জন।

বেরিয়ে এল রত্না বাইরের ঘরে।

ব্যাপার কি ?

মা ফিরে এসেছে। সঙ্গে লতা !

কিন্তু এ কি বেশ লতার ? মাথাভর্তি সিঁদুর আর পরণে লাল পাড় কোরা শাড়ি।

কোথায় গিয়েছিলি হারামজাদী। গর্জে উঠল নগেন।

মেয়ের বিয়ে দিতে ?

কি ?···

হ্যাঁ।

ন্যাকামি পেয়েছ ? আমি ব্যাটা এখানে হা পিত্যেশ করে বসে আছি, ভদ্রলোকের কাছে চূড়ান্ত অপমান···আর তোমরা মা-বেটিতে বিয়ে করতে গেছ ?

কোন উত্তর না দিয়ে মা লতাকে নিয়ে ভেতরের ঘরে যেতে চাইল।

পথ আটকে দাঁড়াল নগেন ? কোথায় যাচ্ছিস শুনি ? কার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এলি ? সেই ক্ষয়রোগী চিটারটার সঙ্গে বোধ হয়।

হ্যাঁ, তারই সঙ্গে ? তবু সে বিয়ে, তাতে সম্মান আছে।

সম্মান আছে···মুখ ভেংচে উঠল নগেন।

বের করছি তোমার সম্মান···দেখি কেমন করে এ বিয়ে ঠিক থাকে !···এখনই যেতে হবে লতাকে আমার সঙ্গে···

কোথা থেকে শক্তি পায় মা, কে জানে। চিরকালের সেই চুপচাপ সহিষ্ণু মায়ের ধৈর্য যেন আর থাকে না। প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বাবার আগলে-রাখা প্রসারিত হাতকে ঠেলে দিয়ে প্রায় চীৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, এখনই যেতে হবে লতাকে, তবে তোমার সঙ্গে নয়, তার স্বামীর সঙ্গে। ওকে ওর জিনিষ গুছিয়ে দেব, ও ভাইবোনদের কাছে বিদায় নিতে এসেছে, এখনই ও চলে যাবে।

যাওয়া বার করছি···

লতার দিকে এগিয়ে যায় নগেন।

খবরদার !

সামনে এসে দাঁড়ায় মা। আজ আমার মেয়ের বিয়ের দিন। বাপ যার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না, সে-মেয়ের বিয়ে এভাবেই হয়। তাতে দুঃখ নেই কিন্তু ওকে আমি বাঁচিয়েছি। ও সুখী হোক, এটুকুই চাই।

চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে মা'র। মনে রেখ ও সাবালিকা, আইনমতে ওর বিয়ে হয়েছে, বাইরে ওর স্বামী অপেক্ষা করছে। নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছি ওদের, বাধা দিও না।

সব জোর যেন চলে গেছে নগেনের। চুপ করে বসে থাকে সে তক্তপোষের ওপর আর তার সামনে দিয়ে লতা বেরিয়ে যায়। ভাই-বোনদের চুমু খেয়ে, মাকে আর শেষে বাবাকেও প্রণাম করে।

ওকে বিদায় দিয়ে এসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে মা।

এতক্ষণ ভয় পেয়ে ছোট ছেলেরা ঘুম থেকে উঠে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠের মত বিছানার ওপরই বসে ছিল।

এখন মাকে কাঁদতে দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠল তারা।

রত্নার চোখে একফোঁটাও জল পড়ল না।

সমস্ত ঘটনাটা এখনও তার বিশ্বাস হোল না। হচ্ছে না। কি সব নাটকীয় ব্যাপার ঘটে গেল। স্বপ্ন দেখছে না তো ?

কতক্ষণ সে এমনি শূন্য মাথা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই, হঠাৎ বাইরের ঘরে তক্তপোষের দিকে তাকিয়ে দেখে বাবা কখন উঠে বেরিয়ে গেছে।

সে রাত্রেই প্রবল জ্বর এল মার।

বোধ হয় আগে থেকেই ছিল, তার ওপর অত্যাচার, না খাওয়া, পরিশ্রম আর সবশেষে সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা।

বাবার প্রায় দেখাই নেই।

মা ভুগছে, রুগ্ন কোলের ভাইটা মর-মর, বাবার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে হয়ত আসে, স্নান করে, ভাত থাকলে খায়, না থাকলে তেমনিই বেরিয়ে যায়—অভুক্ত। একবার জিজ্ঞেসও করে না মায়ের খবর, বা ভাইরা মরল কি বাঁচল।

মধ্যে দাদার একটা চিঠি এসেছিল। ও নাকি ভালভাবে বাঁচবার জন্য দক্ষিণে কোথায় কাজ নিয়ে চলল।

দিদির কোন খবর জানে না রত্না। তার দিন যেন কাটতে চায় না। পাড়াপড়শীর কাছে ধার নেওয়ারও সীমা আছে, ক্রমশ বাড়ির সামান্য বাসনপত্রেও টান পড়তে লাগল, ছোট ভাইকে দিয়ে বিক্রি করতে পাঠাল রত্না। যে রত্না কিছুই জানত না এ সংসারের, তাকেই শক্ত হাতে হাল ধরতে হল আর সমস্ত পৃথিবীর ওপর আক্রোশে সে ফুলতে লাগল যেন।

কিন্তু মাসখানেকের ভেতরই কোলের ভাইটার মৃত্যুতে মা সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, আর জ্ঞান ফেরে না।

কান্না রেখে, প্রতিবেশীদের সাহায্যে ভাইয়ের সৎকারের ব্যবস্থা করে রুগ্ন মাকে নিয়ে বসে রইল সে। সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি পড়ছে, কেরোসিন তেল নেই যে হ্যারিকেন জ্বালাবে। প্রদীপের মিটমিটে আলোয় একা বসে আছে সে অজ্ঞান অচৈতন্য মায়ের পাশে। অন্য ভাইটাকে নিয়ে গেছে পাশের বাড়ির কাকীমা।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ।

বাবা এল বোধ হয়। মনে মনে ভরসা পেল রত্না, আস্তে করে মায়ের মাথাটা নামিয়ে প্রদীপটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিল রত্না।

বাবা নয়, সেই ভদ্রলোক।

সামনে দাঁড়ান সেই বিরাট গাড়ি। দামী সেন্টের গন্ধে সারা দিক সুরভিত করে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ভদ্রলোক।

নগেনবাবু নেই ?

না।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ছি।···

শুনতে পাই নি।

আবেগহীন পাথরের মত গলায় বলল রত্না।

তুমি একা না কি বাড়িতে ?

না, মায়ের অসুখ। বড্ড অসুখ মার।

তোমার বাবা বা আর কেউ।

কেঁপে উঠল রত্নার গলা।

কেউ নেই।···

আচ্ছা কাণ্ড তো···চল দেখি···

যদিও ইচ্ছে ছিল না খুব, বাবা নেই এঁর সঙ্গে কথাই বা কে বলবে তবু আজকের এই অসহায় নির্জনতায়, একজনকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল রত্না, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে।

মায়ের সব ব্যবস্থাই শুধু তিনি করলেন না, নিজের লোক দিয়ে ওষুধপত্র আনিয়ে ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, সবই করলেন তিনি অতি শুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মীয়ের মত।

কৃতজ্ঞতায় যেন গলে গেল রত্না।

হঠাৎ যেন তার মনে হল পৃথিবীটা কেবলই স্বার্থপরতায় ভরা নয়। দারিদ্র্যটা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, যে পৃথিবীতে এই রকম মানুষ থাকতে পারে, এমন হৃদয়বান মানুষ সেখানে অতি সহজেই দারিদ্র্যের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে সহজ সুন্দর রঙিন দিনগুলো ফিরে পাওয়া যায়।

মায়ের মনও কেমন ক'রে জয় করলেন ভদ্রলোক। রত্না নিজে মাকে বলেছে ভদ্রলোক কত দয়ালু। বিশ্বাস করতে বাধে নি মায়ের। লতার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার শেষ জোরটুকুকেও যেন বিদায় দিয়েছে মা।

মায়ের অসুখ বেড়েই চলল। চিকিৎসার ত্রুটি না হ'লেও বাঁচান গেল না মাকে।

ইতিমধ্যে অন্ত ছোট ভাইটাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে তার পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছে রত্না। দাদার কোন খবর নেই, রত্না প্রয়োজনও বোধ করে না।···

যাকে সংসারে বাবা কোন মর্যাদাই দেয় নি, তারই অনুগ্রহে আজ সংসারে এ স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে এই অনুভূতি রত্নাকে গর্বিত ক'রে তুলেছে' আর এই গর্বের পথ করে দিয়েছেন ব'লে, তার অন্ধকার জগতে আনন্দ উৎসবের আলো এনেছেন বলে, কখন সে ধীরে ধীরে একান্ত আপন হ'য়ে উঠেছে ভদ্রলোকের।

বেশি রকমই ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারা। পাড়াপড়শীর নিন্দাবাদ গায়ে মাখে নি। তাই মা মারা যাবার পর তারা উঠে এসেছে খোকা মিত্তিরের রিজেন্ট পার্কের প্রাসাদে সকলের সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দিয়ে।

নগেন ঘোষকে আর চেনার উপায় নেই। সেই পরম অত্যাচারী নগেন ঘোষ আজ রত্নারই কৃপার পাত্র।

বাবাকে ভালবাসে নি কোনদিন রত্না, মায়ের ওপর রাগ করে মাকেই ভালবেসেছে। আজ পরিবর্তন হলেও নগেন ঘোষকে সে আর বাবা ব'লে শ্রদ্ধা করতে পারে নি। কৃপাই করেছে সে তার কৃপার পাত্র রুগ্ন অনিয়মে ভগ্নস্বাস্থ্য বাবাকে।

হঠাৎ প্রস্তাব আনলেন খোকা মিত্তির। এত রূপ রত্নার। সিনেমায় নেমে অনায়াসে বহু টাকার মালিক হ'তে পারে সে।

আনন্দে আবেগে ঘুমুতে পারে নি রত্না। খোকা মিত্তিরের কাছে আরও ধরা দিয়েছে সে। খোকা মিত্তিরই এনেছেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। তাই ভেসে চলল তার দিনগুলো রঙিন স্বপ্নের মত, আনন্দে, উজ্জ্বলতায়, বিলাসে।

খোকা মিত্তিরের সঙ্গে তার অস্বাভাবিক জীবনকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে তার বাধে নি।

বেশিদিন বাঁচে নি নগেন ঘোষ।

রত্নার প্রথম বই রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন জীবন যেন শুরু হ'ল রত্নার। জন্ম হ'ল সুচরিতার। রত্নার পুরোন বিবর্ণ জীবনের মৃত্যু হল। সুরু হল অন্য জীবন, যে জীবনকে তার মাঝে মাঝে খারাপ লাগলেও কোনদিনই পরিত্যাজ্য বা অসহ্য মনে হয় নি।

কিন্তু ক্রমশ ক্লান্তি এল তার। বিলাসের ক্লান্তি নয়। ভোগের ক্লান্তি নয়। নেশা কেটে যাওয়ার মত যখন এই সমস্ত লঘু-বৈভবের দিনগুলো তার কাছে অভ্যস্ত আরামের মত সহজ হয়ে উঠল তখনই যেন সেই ক্লান্তি অনুভব করল।

প্রচুর ক্লান্তি।

সেই ক্লান্তিটুকু ক্রমশ বাড়তে বাড়তে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

সেই সময়ই সে দেখা পেল সত্যব্রতর। দূর দিগন্তে সোনার আলো যেন তাকে প্রলোভন দেখাল, যার ফলে নিজেই আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এল সে।

সত্যব্রতকে আর অনুরোধ করতে হল না।

একটা চিঠি লেখে সুচরিতা খোকা মিত্তিরকে, আর উত্তর পেয়ে পরদিনই গিয়ে দেখা করল তাঁর সঙ্গে।

তাকে অনুরোধটুকু মুখ ফুটে ছু'বার করতে হল না। যেন এটুকু তার প্রাপ্য। বরং কৃতার্থ হলেন খোকা মিত্তির। আর সত্যিই অবাক হ'য়ে গেল সুচরিতা।

সত্যিই ভালবাসেন তাকে খোকা মিত্তির। তাঁর নীরব বেদনা একবার তার মন ছুঁয়ে গেল। অনেক পেয়েছে সে এর কাছ থেকে কিন্তু বিনিময়ে সে তার শ্রেষ্ঠ জিনিষই দিয়েছে, তার সম্মান। কোনদিনই খোকা মিত্তির বিয়ে করতেন না তাকে। বয়সের জন্য নয়, সত্যব্রতরও বয়স হয়েছে। এসব ব্যাপারে বিয়ে করবার কথা এঁরা কোনদিনই ভাবেন না বলে। এঁদের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে এঁদের বিশেষ সম্বন্ধ না থাকলেও সেখানে চিড় ধরাতে চান না এঁরা। অটুট থাকে সে জীবন, এমন কি ছেলেমেয়ে হওয়াতেও বাধা নেই, তারা পিতৃ-পরিচয় বহন করে গর্বের সঙ্গে।

কিন্তু সুচরিতার মত সঙ্গিনীরা? সমস্ত জীবন কাটিয়েও তারা বাইরের লোকই থেকে যায়। এমন কি তাদের ছেলেমেয়েদেরও সমাজে কোন স্বীকৃতি নেই।

সুচরিতা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসব ভেবেছে, আর যত ভেবেছে তত এ জাল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করেছে। আবার এই

আরাম বিলাস, এই সুখৈশ্বর্য ছেড়ে অন্য জীবনের কথা ভাবতেও পারে নি। সত্যব্রতকে বিয়ে করে তাই এ দোটানা থেকে মুক্তি পেয়েছে সে।

তবু যেন পুরো মুক্তি নয়।

ওর আগের কন্‌ট্রাক্ট তাকে পীড়িত করতে লাগল রাত্রিদিন। শেষে মনস্থির ক'রে সে খোকা মিত্তিরের কাছেই অনুরোধ জানাতে দ্বিধা করল না।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নেবার সময় ওর হাতটা ধরে বললেন খোকা মিত্তির—সুচরিতা!

এ নামটা ওঁরই দেওয়া।

আমাকে আর ডাকবেন না।

তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক কি শেষ হল?

নিশ্চয়ই!

কিন্তু তোমার বাবা তোমাকে আমারই হাতে···

থাক, তাঁর কথা বলবেন না··তাঁর জন্যেই আজ আমার এ অবস্থা···

না ব'লে পারল না সুচরিতা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল সে।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন খোকা মিত্তির। সুচরিতা মুখ ঘোরাবার আগে দেখতে পেল তাঁর চোখে জল।

মনটা ভারি নরম হয়ে গেল।

করুণ হাসিতে সে স্বীকৃতি দিল যেন সে অশ্রুজলের।

তারপর মুখটা নীচু করে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে।

সত্যিই এবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলল সুচরিতা।

যেন এবার প্রাণভরে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার সুযোগ পেল সে। কিন্তু মুক্তির মূল্য স্বরূপ তাকে যে আবার যেচে খোকা মিত্তিরের কাছে যেতে হয়েছে, অনুরোধ করতে হয়েছে, তাঁর অনুরোধে শেষবারের মত সুচরিতার নিজের পছন্দকরা চায়ের সেটে চা ঢেলে খাওয়াতে হয়েছে, এসব কথা কিন্তু সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

কিন্তু ভুলতে তাকে হবেই। তার নতুন জীবনের আনন্দে সে এই অধ্যায়টির কথা নিঃশেষে ভুলে যেতে চাইল।

লিখিত পত্রে কোম্পানীকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার পর শুধু সে নয় সত্যব্রতও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

সুচরিতার হাবভাবে রীতিমত ভয় পেয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত টাকাটা দিতে হতে পারে এই আতঙ্কে তাঁর ব্যবহারও কঠিন হ'তে আরম্ভ করেছিল।

বাঁচলেন তিনি সুচরিতা এসে খবরটা দেবার পর। একটু পরিহাস করবার লোভও ছাড়তে পারলেন না।

কিন্তু সুচরিতা মর্মান্তিক চটে গেল।

মুখটা লাল হয়ে গেল তার। এসব নিয়ে আর কোনদিন আমাকে ব'ল না।

দরকারও হবে না আশা করি—সত্যব্রত কঠিন মুখে বললেন অপ্রস্তুত হ'য়ে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল সুচরিতা। কাছে এগিয়ে এলেন সত্যব্রত।

রীতা? এই!

মুখ তুলল না সুচরিতা।

জোর ক'রে ওর মুখটা তুলে ধরলেন সত্যব্রত। দু'চোখ জলে ভাসছে।

এই তুমি কি? কি বলেছি তোমাকে?

না, না—

জড়িয়ে ধরল স্বামীকে সুচরিতা। আমার বড় ভয় করে···

কিসের ভয়, পাগল নাকি?

ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন সত্যব্রত। কিসের ভয় রীতা। আমি তো আছি, কেন ভাব? তোমার কিসের ভাবনা?···

আমি জানি না, আমি জানি না।

স্বামীর কোলে মুখ ঘষে কাঁদতে লাগল সুচরিতা।

মাসখানেক বাদে একদিন সকালে উঠে ওপরের বারান্দায় ইলাকে দেখতে পেয়ে অকারণ খুশিতে মনটা ভরে উঠল সুচরিতার। কি ইলা? এত সকালে? একলা দাঁড়িয়ে কি করছ?

এখন বুঝি সকাল?

ইলা হেসে ফেলল।

জানেন, বেলা ন'টা বেজে গেছে।

তাই নাকি? মোটে তো ন'টা।

ওঃ ন'টা বুঝি মোটে হল?

তা নয় তো কি?

তা বটে আপনাদের কাছে তো সবে ভোর।

তা বলতে পার, আজ একটু সকালেই উঠেছি অন্য দিনের তুলনায়, তোমার বৌদি কোথায়?

খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

হঠাৎ কেমন যেন হিংসে বোধ করল সুচরিতা।

বেশ আছে এই সব মেয়েরা। কোন জ্বালা নেই, জটিলতা নেই। স্বামী-পুত্র নিয়ে নিয়মমাফিক গতানুগতিক সুখের সংসার, সে সংসারে বৈচিত্র্য না থাক শান্তি আছে।

সত্যিই হিংসে হল তার অরুণাকে। একটি সংসারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী তার ওপর তার খোকা।

কত সময় শুনতে পায় খোকাকে সুর করে ঘুম পাড়াচ্ছে, না হয় খোকাকে আদর করছে, আর আধ-আধ ভাষায় তার জবাব দিচ্ছে খোকা, কখনও নবনীকোমল দেহে তেল মাখাচ্ছে। দুষ্টুমি করে খোকা মায়ের চুল ধরে টানছে আর স্নেহের দৌরাত্ম্যে পাগল করছে মা'কে।

অরুণা তো এমনিতে ভাল। কিন্তু একটু বোধ হয় নাক তোলা। বড়লোকের বৌ ব'লে নাকি? মানে হয় না কোন এর, টাকা তো তাদেরও কম নেই। তবে? অবশ্য তারাও খুব মিশতে চায় না কারও সঙ্গে, অন্তত সত্যব্রত তো নয়ই।

সুচরিতাও চায় না, শুধু ঐ দুধের শিশুটি তাকে টানে, সত্যিই টানে। তাকে কোনদিন নীচে নামতে দেয় না অরুণা। কত ইচ্ছে করে সুচরিতার খোকার ঐ ফর্সা মাখনের মত নরম দেহ আদর করে

জড়াতে, ওর ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁটে চুমু খেতে, কিন্তু সুযোগ পাবে কি ক'রে ?

মনে মনে স্থির করে সে অরুণার মনটা ভারি ছোট। যদিও বিনা ভাড়াতেই গ্যারাজটা অরুণা বন্দোবস্ত করে দিয়েছে তবু অরুণার ওপর মন বিশেষ প্রসন্ন হয় নি সুচরিতার। ঐ বিনা ভাড়ায় দেওয়াই তো চাল। আবার না নিয়েও পারে নি ওরা। অবশ্য সত্যব্রত এতে বিশেষ খুশিই হয়েছেন। কিন্তু সুচরিতা প্রসন্ন মনে নেয় নি এ অনুগ্রহ। আসলে বড়লোকী চাল ফলান হল। কিন্তু নিরুপায় ব'লেই অরুণার কাছ থেকে এ দয়ার দান গ্রহণ করতে হ'ল।

না'হলে অহঙ্কার সুচরিতারও কম নয়। হঠাৎ সুচরিতার মনে হল ক'দিন আগে খোকার জ্বর শুনেছে। জিজ্ঞেস করল,—খোকা কেমন আছে ?

আজ ভাল—জ্বর ছেড়েছে কাল। কিন্তু আপনি তো একদিনও কই এলেন না।

ইলার অনুযোগে অপ্রস্তুতে পড়ল সুচরিতা। সত্যিই একবার খোঁজ নেওয়া দরকার ছিল। রবীনের কাছে সুচরিতা খবর পেয়েছিল। রবীনের ওপরে যাতায়াত আছে বললে কম বলা হয়, ওর বোধ হয় বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে অরুণাদের সঙ্গে।

আজ ভারি লজ্জা পেল সুচরিতা। সরল ব'লেই বোধ হয় মুখের ওপর এভাবে কথা বলতে পারে ইলা। তাড়াতাড়ি বলল সুচরিতা, হ্যাঁ যাব, আমি সত্যিই লজ্জিত। আজ নিশ্চয়ই যাব।

যেন কৃতার্থ হ'ল ইলা।

এই কয় মাসে ও তো সর্বক্ষণই দেখছে সুচরিতাকে, কিন্তু তাতে ওর কৌতূহল বেড়েছে ছাড়া কমে নি। কি করবে সে ? তার যে সুচরিতার সবকিছু ভাল লাগে। অরুণার সঙ্গে তার কম ঝগড়া হয় নাকি এই নিয়ে।

অরুণা তো স্পষ্টই বলে সুচরিতা সম্বন্ধে ইলার এতটা বাড়াবাড়ি নাকি ভাল না। সেদিন তো রীতিমত তর্কই বেঁধে গেল। অরুণা বলল—রূপ থাকলে কি হবে মেয়েটার ? রুচি বলে কোন পদার্থ নেই।

কিসে বুঝলে ?

অত গয়না গায়ে চাপায় কি করে ? যা আছে সবই বুঝি পরতে হবে ? হঠাৎ পয়সা কি না।

তা হোক।

রীতিমত আহত হয় ইলা।

তোমার ভারি ইয়ে বৌদি। ওঁর গায়ের রংয়ের সঙ্গে গয়নাগুলো কেমন মিশে যায় বলতো ? একেবারে ঝলমল করে।

তা হলে সোনার পাতে সর্বাঙ্গ মুড়ে দিক না, আরও ঝলমল করবে।

এমনিতেই তো ঝলমলে। সকলের চেয়ে বেশি।

ইলা রাগ করল।

কত ভাগ্য বলতো আমাদের ? উনি এই বাড়িতেই আছেন। বন্ধুদের কাছে আমার কত মান বেড়ে গেছে জান ? আগে জীবনেও এ বাড়ির ছায়া মাড়াত না যারা তারা তো প্রায়ই আসে দেখতে পাও না ? সবই ঐ সুচরিতাদি'র জন্য তা জান ?

জানতে চাই না। আমি হ'লে, আমাকে বাদ দিয়ে যে বন্ধুরা অন্যের কারণে আসে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতাম না ইলা।

হাসতে হাসতে বলল অরুণা। ইলা আরও ক্ষেপে গেল।

তাই বৈ কি। ভাগ্যিস বাবা রাজী হলেন ভাড়া দিতে। না হলে এ সব কিছুই তো হোত না।

ভাগ্যিস।

কথাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অরুণার বুক থেকে।

ভাগ্যিসই বটে। কত বড় অবস্থার বিপর্যয়ে অবিনাশের মত অহঙ্কারী লোক আজ নিজের বসতবাড়ির একাংশ ভাড়া দেন, তা ইলা না জানুক, অরুণার তো জানতে বাকি নেই।

বয়স হ'লেও মনের দিক থেকে তো শিশু ইলা। অরুণা ভুলতে পারে না এ বাড়ির মর্যাদা আর ঐশ্বর্য। কিন্তু ইলা তার কতটুকু খবর রাখে ? ইলাকে ওরা বুঝতে দেয় নি। থাক, ইলা এমনি হেসে-খেলে, আপন সরল জগতে বনহরিণীর মত। সংসারের দুঃখ, দৈনন্দিন জীবনের কোন দুঃখ কষ্ট তুচ্ছতা যেন তাকে স্পর্শ না করতে পারে।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ খুব উচ্ছসিত হয়ে উঠল সুচরিতা।

জান এত মিষ্টি করে হাসে খোকাটা। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট মুঠি দিয়ে ঘুঁষি মারে আর লাল মাখিয়ে দেয়, এমন মিষ্টি তোমাকে কি বলবো।

ওর উচ্ছাসের জবাবে নিস্পৃহভাবে প্রশ্ন করলেন সত্যব্রত। কোন খোকা ?

কেন ওপরের ? তুমি দেখ নি ?

হ্যাঁ দেখেছি, ভারি সুন্দর বাচ্চাটা।

বলতে হয় বলে যেন বললেন তিনি। শুধু সুন্দর নয়, এত মিষ্টি ; আমি তো পাগল হয়ে যাই ওর হাসি দেখলে। এত ভাল লাগে, সত্যি বলছি আমার ইচ্ছে করে, খুব ইচ্ছে করে অমনি সুন্দর একটা…

হঠাৎ থেমে গেল সুচরিতা। কথাটা শেষ না করে, মুখটা অন্যদিকে ফেরাল।

ওর মুখটা দু' হাতে ধরে এদিকে ফেরালেন সত্যব্রত। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি থামলে কেন ? কি ইচ্ছে করে বল ?

না বলব না। লজ্জা পেয়ে স্বামীরই বুকে মুখ লুকোল সুচরিতা।

বুঝেছি। হাসতে হাসতে বললেন সত্যব্রত।

কি বুঝেছ ?

আরও গভীরভাবে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল সুচরিতা।

জানি গো জানি। রীতা! আমি তোমার সব মনের কথা বুঝতে পারি।

যাও…

সত্যি, কিন্তু…

কিসের কিন্তু ?

কিছু না।

ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরলেন সত্যব্রত। একটু বাদে সুচরিতা আবার ওঁর দিকে তাকাল। লাল হয়ে গেছে ওর মুখটা।

তবে,···তবে ?

কি তবে ?

সকৌতুকে ওর মুখের দিকে তাকাল সত্যব্রত।

তোমার বুঝি ইচ্ছে করে না ?

প্রায় ফিসফিস করে বলল সুচরিতা।

না—স্পষ্ট গলায় বললেন সত্যব্রত। ভারি অদ্ভুত তুমি।

তা হয়ত অদ্ভুত। কিন্তু তোমারও এ ইচ্ছে হওয়া উচিত নয়।

উচিত নয় কেন ?

স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে সরে এল সুচরিতা। কারণ এখন তোমায় বলব না, কিন্তু জেনে রেখ ওসব পেটি মিড্‌ল ক্লাশ সেণ্টিমেণ্টালিটি আমি পছন্দ করি না।

সত্যিই অবাক হয়ে গেল সুচরিতা। তার মানে ? চিরাচরিত স্বাভাবিক মানবধর্মের মধ্যে আবার মিডল ক্লাশ আর এ্যারিষ্টোক্র্যাট কি ?

আছে—আছে, ওকে কাছে টানেন সত্যব্রত।

কি যে বল।

ঠিকই বলি। আচ্ছা রীতা তুমি কি বোঝ না, একটা বাচ্চা হয়ে গেলে তোমার ফর্ম কি হয়ে যাবে ? তখন তোমার চেহারার ভ্যালু কি দাঁড়াবে ভেবেছ একবার ?

ছিটকে সরে এল সুচরিতা। কি সাংঘাতিক কথা! সত্যব্রতও তাকে এই ভাবেন। তার চেহারার ভ্যালু। তার ফর্ম।

তা হলে খোকা মিস্তিরের কাছে শুধু শুধু কেন সে আবার গেল ? সে তো চিত্রজগত থেকে চিরকালের জন্যই বিদায় নিয়েছে, তবে ? কি আসে যায় তার ফর্ম ভাল থাকল কি মন্দ থাকল বলে দেহের সৌন্দর্যকে সে তো আর পণ্য করবে না। তবে ? সে তো আজ সত্যব্রতর স্ত্রী ; সে তো ছায়াচিত্রের নায়িকা সুচরিতা নয়। তবে ?

অনেকগুলো প্রশ্ন তার মনে ভিড় করে এল।

এই তার স্বামী! সবসময়ই বুঝি তাকে একটি ভাল কমোডিটি হিসেবেই ভাবছে। আর একেই সে···অসম্ভব! এরই দেহসংলগ্ন হ'য়ে শুয়ে থাকতে অন্তত এই মুহূর্তে আর ইচ্ছে করছে না।

কি হোল ? শোন! শোন !

ওকে কাছে টানতে চেষ্টা করেন সত্যব্রত।

না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সুচরিতা। দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শুয়ে থাকেন সত্যব্রত, ওর আসার অপেক্ষায়।

আশ্চর্য লাগে তাঁর সুচরিতাকে। এত নাম করেছে, এত ভোগ করেছে, শিল্পী হিসেবে সম্মান-অর্থ সবই লাভ করেছে আশাতীত পরিমাণে অথচ সামান্য সংসারের লোভে সে যেন পাগল হয়ে থাকে।

সত্যব্রত নিজেও তো তাকে বুঝিয়েছেন কতবার ফিল্মের মত একটা এতবড় শক্তিশালী শিল্পে তার মত মেয়েকে কত প্রয়োজন। আর সত্যি সত্যিই এটা তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু সুচরিতা নিজেরই

মূল্য জানে না. বুঝতেও চায় না, তাকে কি বোঝাবেন সত্যব্রত ? জানে না সুচরিতা এই সময়টুকু পদ্মপত্রে জলের মত, কত ক্ষণস্থায়ী। যে ক'রে হোক এই স্বল্পস্থায়ী সময়টুকুর সদ্ব্যবহার ক'রে নিতেই হবে। পরে না হলে সত্যিই অনুতাপ করতে হবে। কিন্তু সুচরিতা কি সত্যই বোঝে না ?

ও তো ছেলেমানুষ নয়। জীবনকে ও দেখেছে, চিনেছে। আর পাঁচজন মেয়ের মত সহজভাবে তার জীবন কাটে নি। তা হলে ?

সত্যব্রত নিজে জানেন মর্মে মর্মে টাকার মূল্য, টাকা না থাকার মূল্য সমস্ত দিয়েও শোধ করা যায় না। নিজের প্রথম জীবনের কথা তো কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। যাঁরা তাঁকে তখন টাকা না থাকার জন্য অবজ্ঞা করেছেন তাঁরাই আজ সত্যব্রতর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যগ্র ? সে কি শুধু তিনি প্রতিভাবান বলে ? তা তো নয় ! তিনি নিশ্চিত তাঁর প্রতিভা তাঁকে অর্থ, প্রচুর অর্থ এনে দিয়েছে বলেই এ স্বীকৃতি, হ্যাঁ এটি অর্থেরই স্বীকৃতি—প্রতিভার নয়।

তাই তাঁরও প্রতিজ্ঞা অর্থ, প্রচুর অর্থ রোজগার করবেন তিনি, যে ভাবে হোক, চাঁদির জুতো মেরে তিনি সকলকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখবেন। অর্থ দিয়েই জগতকে কিনবেন তিনি।

কিন্তু সুচরিতাও কি জানে না এ সত্য ? ও কি সহ্য করে নি দিনের পর দিন খোকা মিত্তিরকে, তার জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলিকে ?

নাকি ভালই বাসত সে খোকা মিত্তিরকে ?

একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন তিনি। তাঁর মত শক্ত লোকের মনে এই কথাটা কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করে বেঁধে।

একটা সিগারেট ধরালেন সত্যব্রত। প্রথম জীবনের সেই গ্লানিময় জ্বালাভরা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। চাকরির কোন সম্ভাবনা নেই, অথচ মধ্যবিত্তের চালটুকু বজায় রাখতে কি নিদারুণ দুশ্চিন্তায় কেটেছে তাঁর দিন—প্রায় অনাহারে, অর্ধাহারে।

মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন সে সব চিন্তা। অতীত, অতীতই।

জীবনের ঠোক্কর অনেক খেয়েছেন তিনি। আজ তাঁর একমাত্র লক্ষ্য টাকা। ভালবাসা, মধুরতা সবই আছে কিন্তু সীমার মধ্যে। হাসি পায় সত্যব্রতর সীমাহীন ভালবাসার কথা শুনলে! বাস্তব জীবনে কতটুকু দাম এই সব সেন্টিমেন্টালিটির ? বড় সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই টাকা। আর সেই টাকা রোজগার করছেন ছলে-বলে-কৌশলে—এখন তাঁর অনেক টাকা। সুচরিতা আসার ফলে আরও বেড়েছে। কিন্তু আরও চাই, আরও আরও। এ তৃষ্ণার শেষ নেই।

নাকি এরও শেষ আছে ?

ভালবাসা না হোক অন্য কিছু ? না হ'লে তাঁরও মাঝে মাঝে মনে হয় কেন ! কেন মনে হয় আরও কিছু টাকা হলে সুচরিতাকে নিয়ে নতুন ক'রে তিনি জীবন আরম্ভ করবেন।

কিন্তু তার জন্য অন্তত: আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে, করা উচিত। সুচরিতারও এসব কথা জানা দরকার। ওকে বোঝাতে হবে স্থির করলেন সত্যব্রত। সুচরিতাকে জানতে হবে তিনি প্ল্যান, নিয়ম ভালবাসেন। আবেগের মাথায় এলোমেলো কাজ করে অনুতাপ করতে তিনি চান না।

সুচরিতা তাঁর স্ত্রী। ওরও বোঝা দরকার, জানা দরকার সব কথা।

সে কথাই ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন তিনি সুচরিতাকে। সুচরিতা তাঁর স্ত্রী।

কথাটা নিজের মনে উচ্চারণ করলেন সত্যব্রত, তাঁর স্ত্রী। বড় আপন, ভাবতে বেশ ভাল লাগল সত্যব্রতর। একেবারে নিজস্ব। নিজস্ব সম্পত্তি···হ্যাঁ, সুচরিতা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি।

মনে পড়ল, স্ত্রীর প্রতি এই মনোভাবের নিন্দে করিয়েই প্রায় পাঁচ মিনিট একটি বক্তৃতা তিনি তাঁর নায়কের মুখে বসিয়েছেন, তাঁর আগের ছবিটিতে। সমস্ত হল হাততালিতে ফেটে পড়েছিল। সত্যব্রতর কাছে এসেছিল অজস্র অভিনন্দনপত্র। বেশির ভাগই মেয়েদের কাছ থেকে।

সুচরিতা এসব জানে। তা ছাড়া তিনিও তাকে বলেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনিও সত্যি সত্যিই চান সমাজ থেকে ঐসব মনোবৃত্তির লোককে একেবারে আগাছার মত উপড়ে ফেলতে। এরা সমাজের কীট। সময়ে বিনষ্ট না করলে সমাজকে নীরবে কুরে কুরে খাবে। সমাজের যত কিছু ভাল সৎলোকেদের মনোবল সবকিছু হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে পড়বে ঘুণধরা কাঠের মত।

এসব কথা সুচরিতা শুনেছে। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন প্রসঙ্গে এসব কথা, সত্যব্রতর মতামত সুচরিতা শুনেছে আর মুগ্ধ হয়ে গেছে। সত্যব্রতর চোখে সে মুগ্ধতা এড়ায় নি।

কিন্তু আরও দরকার, তার আরও জানা দরকার। বাস্তবকে সে যেন জেনেও জানে নি। তা হলে হবে না। কঠিন বাস্তবকে তার জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন বাস্তব আর কল্পনা এক নয়।

সিগারেটটা শেষ করে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি।

রীতা ! কোথায় তুমি।

অন্ধকারেই বেতের একটা চেয়ারে হাতে মাথা রেখে বসে আছে সুচরিতা।

কি হচ্ছে ? ঘরে বস, ঠাণ্ডা লাগবে।

না—

কেন অবুঝ হচ্ছ রীতা, ঘরে এস।

না না—কান্নাভরা গলায় সুচরিতা বলল।

দেখ কাণ্ড।

বিব্রত হলেন সত্যব্রত।

কিনা কি বলেছি, তার জন্য এই কাণ্ড ক'রে লোকে ?

কোন কথার উত্তর না দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে সুচরিতা। ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন সত্যব্রত। ওর ভেজা মুখটা দু'হাতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন নি—কি ছেলেমানুষি কর রীতা ? চল অনেক রাত হয়েছে। রাত জেগে শরীর নষ্ট ক'র না। লক্ষ্মীটি এস···আচ্ছা আমি মাফ চাইছি···হয়েছে তো ? চল ঘরে চল, তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। চল রীতা লক্ষ্মীটি··

ওকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন সত্যব্রত।

[আগামী সংখ্যায় তৃতীয় পর্ব।

গির্জা (কলিকাতা)

—এস ধর

স্নানের আধার

—গোপাল রায়

খেলোয়াড়
—শুভ্রাংশুরঞ্জন মজুমদার

ছায়া-কালো কালো
—শ্যামলেন্দু দত্ত

গুড বাই
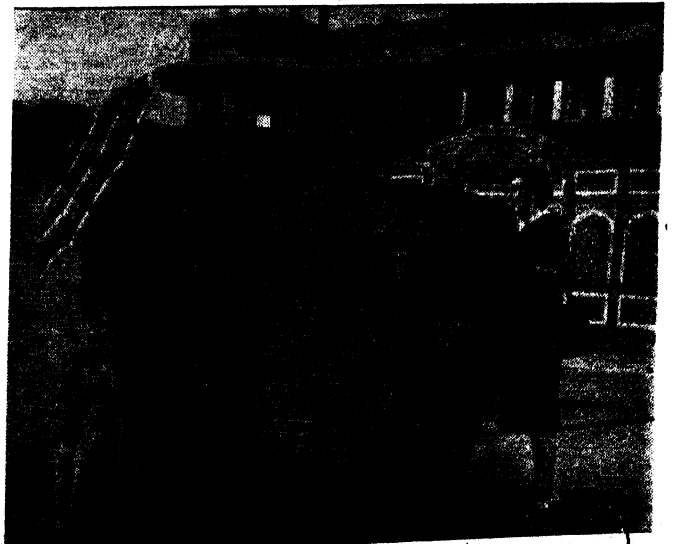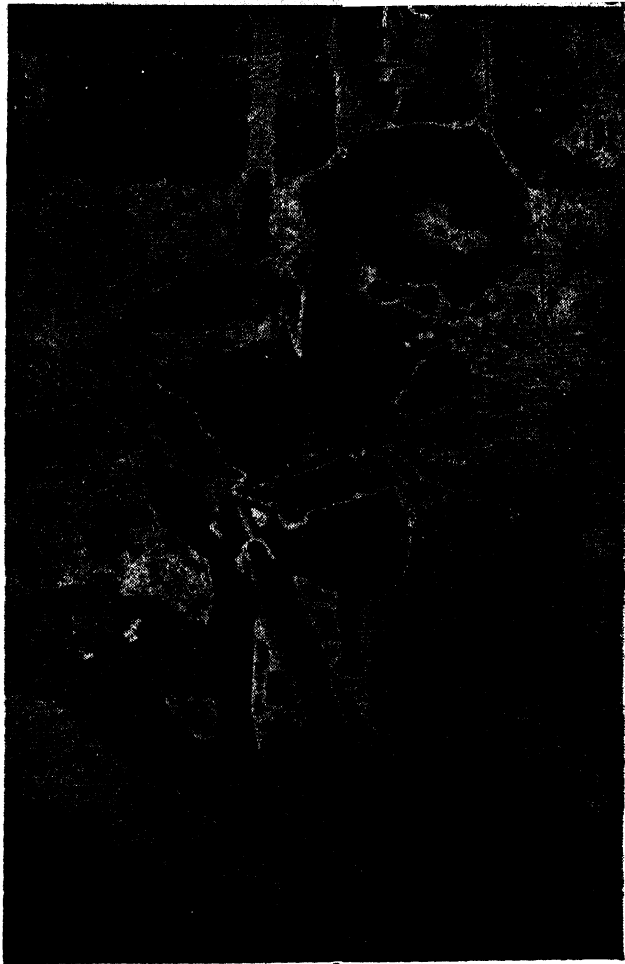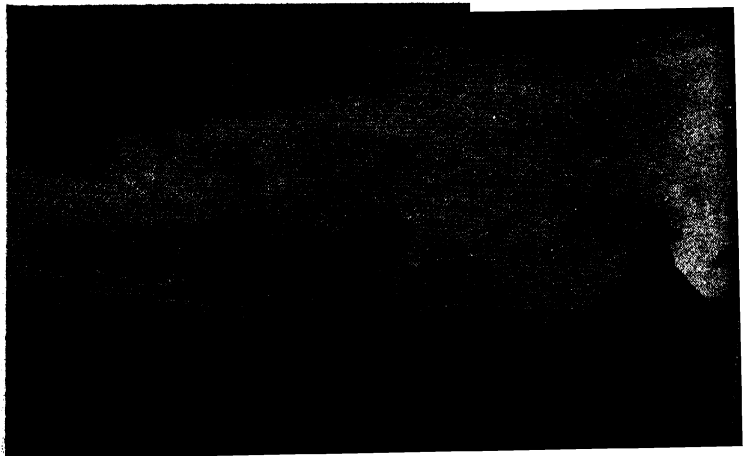
—সতীশচন্দ্র সেন
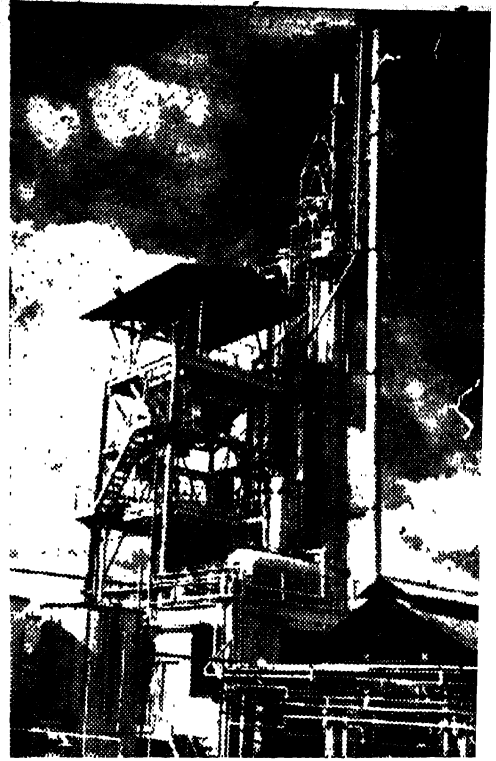
গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র
(ধানবাদ কয়লাখনি)

—ইউ এস আই এস

মাসিক বসুমতী
চৈত্র/ '৭০

কাশ্মীরের হ্রদ

—এস সি সেন

অপত্য স্নেহ — বিনয় মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত রচয়িতা ষ্টিফেন ফষ্টার

স্মরগ্রাহী
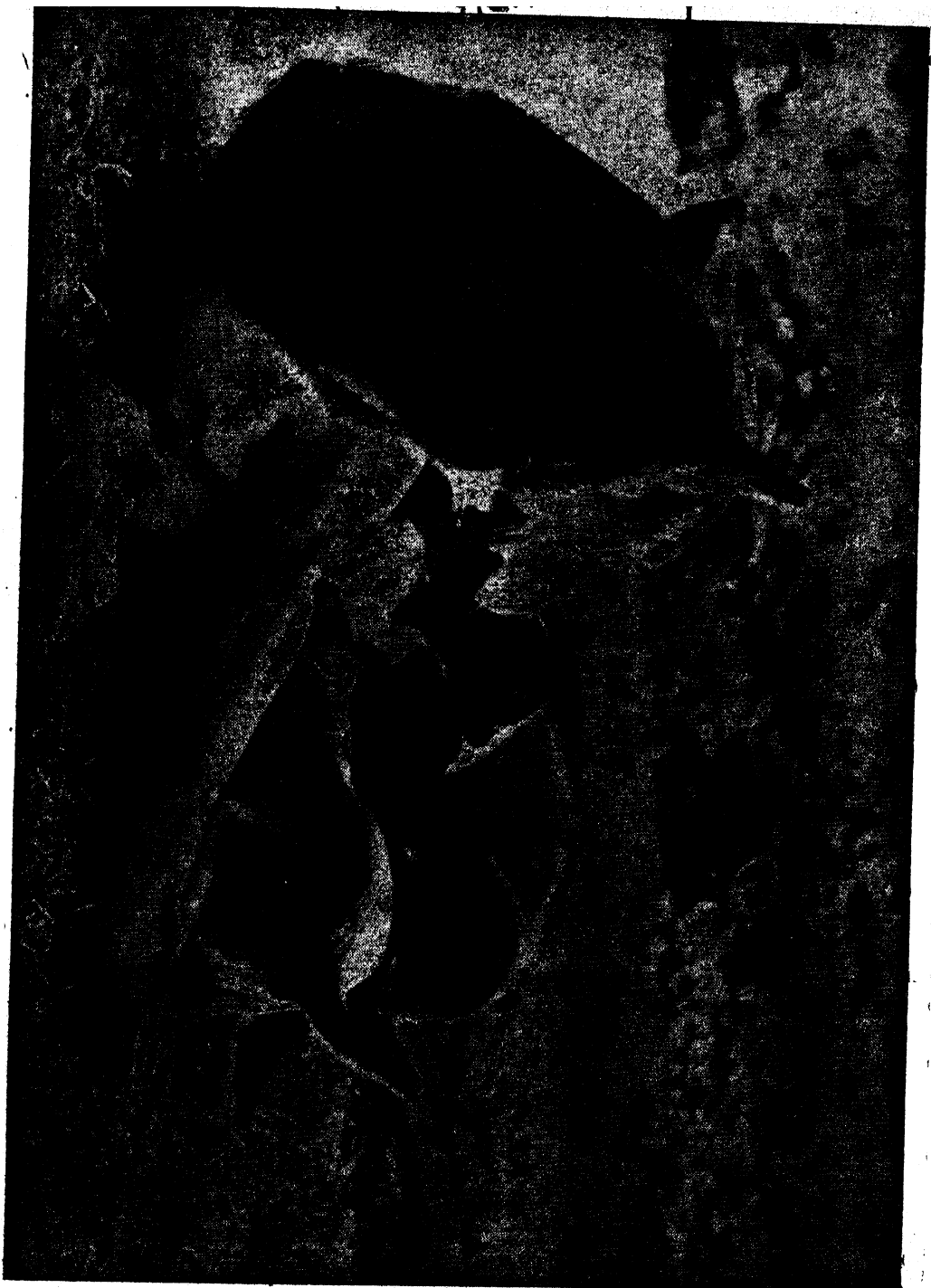
প্রিয় বন্ধু ও সুহৃদবর্গ...

এই পাঁচটি শব্দ যেদিন লেখা হয়েছিল, তারপর এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। এই ক'টি কথা লেখা ছিল একটুকরো কাগজে। সেই মৃত সঙ্গীত-রচয়িতার পকেটে ঐটিই মাত্র ছিল, আর কিছু নয়, আর কোন কথা নয়, এ হয় তো বা কোন পল্লীগীতির প্রথম কলি। সে কথা আজ মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে। তবে হারিয়ে যায় নি সেদিনকার সেই অখ্যাত রচনাকারের দু'শো গান। আজও সে গান দেশে দেশে কত কণ্ঠে বাজে। সেই রচনাকার ছিলেন আমেরিকার তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতাদের অন্যতম, তাঁর নাম ষ্টিফেন ফষ্টার।

যে গান তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তার ব্যঞ্জনায় রয়েছে যে মাটিতে তিনি জন্মে ছিলেন, যাদের সঙ্গে তিনি বড় হয়েছিলেন, সেই পল্লী-জনপদের সরল সুর, সহজ কথা। তাঁর গান ছিল—সে যুগের ইতিহাসের মর্মবাণী। আমেরিকার ইতিহাসের সেই পর্বটি ছিল ঘরোয়া সংগ্রামের সমাপ্তি-পর্ব, সংগ্রামোত্তর যুগ। কিন্তু এ সব গানের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গান, যেমন 'ওল্ড ফক্স্ অ্যাট হোম', 'মাই ওল্ড কেনটাকী হোম,' 'ওল্ড ব্ল্যাক জো' সে যুগকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছে, পরিণত হয়েছে চিরকালের মানুষের চিরদিনের সম্পদে।

দেশের জন্য, ঘরের জন্য, প্রিয়জনের জন্য, মানুষের যে অন্তরের টান, ঘরছাড়া, দেশছাড়া, মানুষের সেই অন্তর-পোড়ানি বিরহ-বেদনা প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে তাঁর গানের প্রতি ছত্রে ছত্রে। সহজ কথায় তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই গীতি-কাব্যের অন্তরস্পর্শী অমর বাণীতে পড়েছে চিরন্তনের স্বাক্ষর। তাই ষ্টিফেন ফষ্টার আজ কোন বিশেষ দেশের কোন বিশেষ কালের নন, তিনি সর্বকালের সর্বদেশেরই সঙ্গীত রচয়িতা। ষ্টিফেন ১৮২৬ সালের ৪ঠা জুলাই পেনসিলভ্যানিয়ার লরেন্সভিলে জন্মগ্রহণ করেন। এটি বর্তমানে পিটসবার্গ সহরেরই অংশ বিশেষ।

সঙ্গীতে তাঁর যে বিশেষ প্রতিভা রয়েছে, তার পরিচয় তাঁর ছেলেবেলাতেই পাওয়া গিয়েছিল। সে বাজাতো বাঁশী আর পিয়ানো। আপনভোলা, পাগলা ছেলে পড়াশুনার ধার ধারতো না।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সে 'দি টায়োগা ওয়ালজ' নামে যে গানটি রচনা করলে, তাতে স্কুলে সাড়া পড়ে গেল। তাঁরই রচিত গান 'ওপন দাই লেটিক লাভ' প্রথম প্রকাশিত হল ১৮৪৪ সালে। তারপর নিগোদের গানের অনুকরণে রচিত যে ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত চারণ কবিরা গাইতেন, সেই ধরণের গান রচনায় তিনি হাত পাকাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গির্জায় গির্জায় নিগোদের যে গান হত, নদীতে নৌকা থেকে মালতোলা, মালবোঝাই করার সময়ে তারা যে গান গাইত সে গান তাঁকে যেমন আকুল করেছিল, সেই ব্যঙ্গাত্মক গান তেমন তাঁকে আকুল করে নি—তা তাঁকে প্রভাবিত করে নি।

ফষ্টারের 'লুইজিয়ানা বেল' গানটি এইত আদৃত হয়েছিল যে, ঐ গান রচনার পরের সপ্তাহেই তিনি ঐ ধরণের 'ওল্ড আংকল নেড' নামে আর একটি গান রচনা করেন। সেদিন পিটসবার্গের বহুজনের কণ্ঠেই গুনগুনিয়ে উঠেছিল এই গান—কেউ বা গাইছে কেউ বা শিস্ দিচ্ছে। তবে তাঁর প্রথম দিককার গানের মধ্যেও সুসানা গানটিই সবচেয়ে অভিনন্দিত হয়েছিল। এটি হল ননসেন্স বা অর্থহীন পর্যায়ের গান। আমেরিকার সোনা আবিষ্কারের পরেই ১৮৪৮ সালে এই গানটি প্রকাশিত হয়। বহু দুঃখ পেরিয়ে ভাগ্যের অন্বেষণে সেদিন যারা গিয়েছিল আমেরিকার ঐ পশ্চিমাঞ্চলে, তাদের প্রাণে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ঐ গানটিই, ঐ ছিল সেদিনকার যাত্রা-সঙ্গীত বা মার্চিং সং। কালক্রমে সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ল তাঁর এই গানটি। ফষ্টারেরও ভাগ্যের মোড় ফিরল। নিউইয়র্কের একটি সঙ্গীত প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

'সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁর গান করা হবে, এই সর্তে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হল প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ক্রিষ্টি মিনিসট্রেলস-এর সঙ্গে। তারপর ১৮৫০ সালে পিটসবার্গে ফিরে এলেন ও ছেলেবেলার বান্ধবী জেন ম্যাকডোনেলকে বিবাহ করলেন। তখন সঙ্গীতই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, তাঁর সর্বকিছু।

ফষ্টারের জীবনের অনেক ফসল ঐ সময়েই ফলেছে। তবে তাঁর বহু সঙ্গীতই রামধনু রং-এর মত মনের আকাশ ক্ষণিকের জন্য রাঙিয়ে দিয়ে চলে যায়। অন্তরে ছায়াপাত করে না। কিন্তু চিরন্তনের স্বাক্ষরও রয়েছে তাঁর বহু কবিতায়, বহু গানে। অন্তত এ-রকম একটি গান তিনি প্রতি বছরেই রচনা করেছেন যেমন ১৮৫০ সালে 'ক্যাম্পটাউন রেসেস' ও 'নেলী ব্লাই', ১৮৫১ সালে 'ওল্ড ফকস্ অ্যাট হোম', ১৮৫২ সালে 'মাসাস ইন দি কোল্ড', 'কোল্ড গ্রাউণ্ড' এবং ১৮৫৩ সালে রচিত 'ওল্ড ডগ ট্রে' ও 'মাই ওল্ড কেনটাকী হোম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু সঙ্গীত রচনায় স্ত্রীরও বিশেষ অনুপ্রেরণা রয়েছে। এই সব সঙ্গীতের মধ্যে ১৮৫৪ সালে রচিত 'জেনি উইথ লাইট ব্রাউন হেয়ার' এবং ১৮৫২ সালে রচিত 'কাম হোয়ার মাই লাভ লাইজ ড্রিমিং' বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'ওল্ড ফক্স অ্যাট হোম' হয় তো তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি. এ তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। হারিয়ে যাওয়া আনন্দ দিনগুলির বেদনা ও ঘরছাড়া অন্তর পোড়ানোর দুঃখ ঐ গানের প্রতিটি কথায় ও ছন্দে ছন্দে অনুরণিত। ফষ্টারের জীবনে ঐ ছিল ফুল-বসন্ত। মাত্র কয়েক বছর ভাগ্যের প্রদীপ উজ্জল হয়ে উঠেছিল তারপরেই সেই শিখা এলো স্তিমিত হয়ে। এলো অর্থাভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ, সংসারের নানা দুশ্চিন্তা। এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ পেলেন তিনি মদের পেয়ালায়, তখনও নূতন সৃষ্টির বিরাম ছিল না। তাঁর স্ত্রীর পরিবারের একটি সহৃদয় বৃদ্ধ ক্রীতদাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'ওল্ড ব্ল্যাক জো' নামে ১৮৬০ সালে গান রচনা করলেন। এ তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি। ঐ বছরই তিনি এলেন নিউইয়র্কে। আগের চেয়ে অনেক বেশি সঙ্গীত রচিত হল, কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস এদের অধিকাংশই সুরের দিক থেকে হয়ে গেল ব্যর্থ। তারা শ্রোতার মনোহরণ করতে পারলো না।

সকল উদ্যম সংহত করে শেষবারের মত নিভে যাওয়া প্রদীপের মতো তিনি আবার জ্বলে উঠলেন। রচিত হ'ল 'বিউটিফুল ড্রিমার ড্র'। সেই অপূর্ব সঙ্গীতের ব্যাকুল বাণীতে ছিল মর্মস্পর্শী করুণ আবেদন, দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াস।

এর এক বছর পরেই ১৮৬৪ সালে ১৩ই জানুয়ারী কবি ফষ্টার পরলোকগমন করেন। জামার পকেটে ছিল ৩৮ সেন্ট, আর একটি ছেঁড়া কাগজে লেখা এই ক'টি কথা—

প্রিয় বন্ধু ও সুহৃদবর্গ...

জীবনের অপরাহ্নে দারুণ দুঃখের দিনে, তাঁর মনে হয়েছিল তিনি অবহেলিত, তাঁর বাস চির বিস্মৃত-লোকে, কেউ আর তাঁকে স্মরণ করবে না কিন্তু তাঁর পরলোকগমনের পর বহুবার, এ যে মিথ্যা, তা প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র দেশে তাঁর অসংখ্য স্মৃতি-মন্দির গড়ে উঠেছে।

এই ইট-কাঠ-পাথরের ভঙ্গুর স্মৃতি-মন্দির ছাড়াও ফষ্টারের সহজ ও স্বতোৎসারিত প্রাণমাতানো সঙ্গীত বিশ্বের সঙ্গীত পিপাসুদের চিত্তে যে আসন রচনা করেছে, তাদের অন্তরের মণিকোঠায় সেই আসন অক্ষয় হয়েই থাকবে।

আমার কথা (১০৯)

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী নৃত্যরত্নাকর

'সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি
বিধি মিলাইবে পুরস্কার'।

কথাটি অক্ষরে অক্ষরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যাদের মধ্যে—বিশিষ্ট নৃত্যবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী নৃত্যরত্নাকর তাঁদেরই অন্যতম। নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতির উপাসনা তাঁর জীবনের ব্রত। সহস্র প্রতিবন্ধকতা বারবার এসেছে পথরোধ করতে, কিন্তু সাধকের নিষ্ঠা একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বারংবার ব্যর্থ করে দিয়েছে সর্বপ্রকার বাধাকে। পরিশেষে সিদ্ধিস্বরূপ জীবনে এসেছে সার্থকতা। সফলতার আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে প্রাণমন, এনে দিয়েছে যথেষ্ট স্বীকৃতি, বিভূষিত করেছে বিপুল জনপ্রিয়তায়।

১৩৩৪ সালের কার্তিক মাসে রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর জন্ম। বাবা ফণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ছিলেন সরকারী অফিসার। ছেলেবেলা থেকে সাংস্কৃতিক আরাধনায় প্রভূত প্রেরণা পান কাকা স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর কাছে। বিদ্যাভ্যাসও যথাসময়ে শুরু হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় আর জি কর (তখনকার কারমাইকেল) মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন আর ভর্তি হলেন বঙ্গীয় কলালয়ে নৃত্যশিক্ষার জন্যে। প্রথম গুরু হিসাবে লাভ করলেন কিরীট রায়কে। ডাক্তারী পড়ার ছাত্র হিসাবেই সংস্পর্শে এলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং স্বনামধন্য শান্তি বর্ধনের সংস্পর্শে। ১৯৪৬ সাল থেকে নৃত্যশিক্ষক জীবনের শুরু। গুরু কিরীট রায়ের ইচ্ছানুসারেই শিক্ষকতার সূত্রপাত। অনুষ্ঠান পরিচালনাও এই সময় থেকেই শুরু হ'ল। জীবনের পথ তাঁর কাছে সহজ সরল মূর্তি নিয়ে আসে নি, এসেছে রীতিমত দুর্গম হয়ে, সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে নানা সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তা তাঁর উদ্যম বা মনোবলকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারে নি বরং তা বর্ধিতই করেছে বহুগুণ। অঞ্চলে অঞ্চলে লোকশিল্পী সম্প্রদায়সহ তিনি মুক্তাঙ্গনে

মাধ্যমে ভারতের সনাতন সভ্যতা ও ঐতিহ্যের আলেখ্য তুলে ধরে সাধারণ্যে জাতীয় চেতনার বীজ উপ্ত করতে লাগলেন। দিদি স্বর্গীয়া বীণাপাণি দেবী ও ভগ্নীপতি নরেশ মৈত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল মেদিনীপুর কলাকেন্দ্র। রামকৃষ্ণ হলেন এর অধ্যক্ষ। ১৯৫৩ সালে গীতায়ন মিউজিক বোর্ড তাঁকে ভূষিত করলেন নৃত্যরত্ন কর উপাধিতে। শিক্ষামূলক নৃত্যনাট্যের সার্থক স্রষ্টা হিসাবে রৌপ্যাধার দ্বারা তাঁকে পুরস্কৃত করে গুণীর প্রতি সমাদর জানালেন পশ্চিমবঙ্গের জনবরেণ্য রাজ্যপাল শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। 'হরেন্দ্রকুমার স্বর্ণ পদক'ও তিনি প্রাপ্ত হন। কয়েকটি ছায়াচিত্রের সঙ্গেও নৃত্য-পরিচালক হিসাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। অল বেঙ্গল এ্যামেচার ক. য়াল কনফারেন্স তাঁকে সম্বর্ধিত করেন, শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী হিসাবে পশ্চি ঙ্গ যুব উৎসবে তাঁর নৃত্যালেখ্য 'শিল্পী ও সাধনা' শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং ভারতের একমাত্র নৃত্য সম্প্রদায় হিসাবে সসম্প্রদায় তিনি ওয়ারশর বিশ্ব যুব উৎসবে আমন্ত্রিত হন। ১৯৫৭ সালে শৈলো সংস্থার প্রতিষ্ঠিত মলয় গীতবীথিতে নৃত্যাধ্যক্ষ ও অনুষ্ঠান পরিচালক হিসাবে যুক্ত হন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে মানব সভ্যতা ও সমাজ বিবর্তনের পটভূমিতে রচিত তাঁর নৃত্যনাট্য আহ্বান এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সুকান্ত ভট্টাচার্যের অবাক পৃথিবীর নৃত্য পরিবেশন তাঁর যথেষ্ট দক্ষতার ও স্বকীয়তার পরিচয় বহন করে।

নৃত্যবিদ হিসাবে যখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত—খ্যাতি, যশ, সুনাম সবই যখন তাঁর অধিকারগত তখন প্রাইভেটে বি-এ পাশ করে অতন্দ্র জ্ঞানপিপাসার পরিচয় তিনি দিলেন (১৯৬০)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারপর তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায়। বর্তমানে 'ভারতীয় মুদ্রাভিনয়ের ভাষা' সম্বন্ধে তিনি গবেষণারত। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিরত।

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী

শুধু নৃত্যবিদ ও গীত পটীয়ান হিসাবেই তিনি পরিচিত নন। সুলেখক, গীতিকার এবং নাট্যকার হিসাবেও তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ভগবান কি ?

আলেয়ার্দো আলেয়াদি

আবছা ধূসর আকাশে
সোনা রূপার বিন্দুগুলি কাঁপছে।...
তাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করি—
'বলো আমায় ওগো জ্যোতির্বিন্দু
ভগবান কি ?'
'শৃংখলা।' জবাব দেয় তারকারাজি।

এপ্রিল মাসে যখন পাহাড়, উপত্যকা, নদীতট,
প্রান্ত প্রান্তর ফলে ফুলে ছেয়ে যায়
তখন তাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করি—
'বলো আমায় ওগো বর্ণচ্ছটা
ভগবান কি ?'
'সৌন্দর্য।' জবাব দেয় ফুলরাশি।

যখন আমার সামনে
তোমার শুভ্র সৌম্যদৃষ্টি ঝিকমিক করে
তখন আমি তোমার
চোখের তারার ঝ্যাচিবে প্রশ্ন করি—
'যদি জান বল আমায়
ওগো 'হৃদয়ের সুধীর দূত
ভগবান কি ?'
'প্রেম।' জবাব দেয় চোখের তারা।

অনুবাদ : সুধীরকান্ত গুপ্ত

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

পঁয়তাল্লিশ

পশ্চিমবংগ পুলিশের মস্ত বড় সেই অফিসারের মৃতপুত্র ভাস্কর বলেছিল ইহলোকের সীমানার ওপার থেকে অসীম কালের কণ্ঠস্বরে যে, সে আসবে ২২শে ডিসেম্বর, '৬৩, শনিবার, 'ছেলে' হয়ে। ১৯৬৩-র ২২শে ডিসেম্বর, শনিবার সকাল ৯টা ১৭ মিনিটে যে এল শুকিয়ে যাওয়া সংসারের রৌদ্ররুক্ষতায় মৃত্যু জাহ্নবীর জটামুক্ত যে করুণাধারা, সে সন্তান এল 'মেয়ে' হয়ে। এই রহস্য। এই জিজ্ঞাসা আকুল করেছে পিতৃহৃদয়কে। সব মিলেও এই শেষটুকু কেন মিলল না। জাতিস্মরের যত গল্প, জন্মমৃত্যুর যত তত্ত্ব তারা প্রায় সবাই বলে যে মৃতপুত্র পুত্র হয়েই জন্মায় : মৃতকন্যা পুনরাবির্ভূত হয় কন্যারূপেই। একটি ব্যতিক্রমের কথাই পুলিশ অফিসার এখনও পর্যন্ত পুঁথিতে পেয়েছেন। ভাস্কর কি ব্যতিক্রম ; না, সে ভুল করেছে ? একজন অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিময়ী নারী বলেছেন তাঁকে যে এ কন্যা ভাস্কর নয়, তবে এ-ও অসাধারণ কন্যা হবে এবং ভাস্করও আবার আসবে তার বাপ-মায়ের কাছেই। আসবে, 'ছেলে' হয়েই।

যত শুনেছি ভদ্রলোকের কথা তত মনে মনে বলেছি ফেলে দাও পুঁথি ; দূরে যাও অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিময়ী নারী। কে জানতে চায় কি এর ব্যাখ্যা ! মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়, এই অশেষ বিশ্বাসের একমুঠো উজ্জ্বল আলো যদি এসে থাকে অমরলোক থেকে এই মরলোকে তবে আঁকড়ে ধর তাকে, তবে বল—

'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূর আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

বিদ্যা আর বুদ্ধির বড়াই আজ আর করি নে। ওসব ছেলেমানুষি ছেড়ে গেছে অনেক কাল। চলে যাবার আগে, জ্বলে যাবার আগে চিতায়, ব'লে যেতে দাও আমাকে, জ্ঞানের ওপারে সে দাঁড়িয়ে আছে তাকে বিজ্ঞানের ঠুলি পড়ে দেখতে যেও না। অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধর তাকে। লোভে অন্ধ হয়েছি, বিদ্যায় হয়েছি মূঢ়, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে সং সেজেছি সারাজীবন, রাগে অন্ধ হয়েছি কতবার, অনুরাগে অন্ধ কর আমাকে একবার। তুমি বিদ্যা দিয়েছ, তুমি বুদ্ধি দিয়েছ, এজন্যে তোমার আরাধনা করি না ; তোমাকে 'না মানলে তুমি লখিন্দরকে ছোবলাবে সাপ হয়ে, এই ভয়ে নয়,—তুমি 'তুমি' বলেই তোমাকে চাই। হও তুমি সুখ, হও তুমি দুঃখ, সাফল্যরূপে এসো, এসো ব্যর্থতায় অপরূপ হয়ে, পাপ হয়ে এসো, পুণ্য হয়ে নষ্ট কর পাপকে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, মহামারী, বিপ্লবের বেশে এসো, ক্রুশবিদ্ধ অসীম করুণার পায়ে বরফ হয়ে গলবে বলে হৃদয়হীনতার হে পাষাণ তুমি, দেখতে দাও তোমাকে, আর রেখো না আঁধারে।

মৃতুদীপদীপ্ত জীবনের জ্যোতির্ময়ী শিখা জ্বলছে অনির্বাণ সেই আলোয় দেখতে দাও তোমাকে। ভাস্কর হয়ে আসবে বলে, শেষ মুহূর্তে কেন আস তুমি ভাস্বতী হয়ে, [পুলিশ অফিসার তাঁর মেয়ের নাম রেখেছেন ভাস্বতী] তা বুঝতে চাই না। তা নিয়ে তুলতে চাই না কোনও প্রশ্ন। শুধু বুকে বাজুক এই আনন্দ-বেদনার বীণা, যে তুমিই এসেছিলে ভাস্কর হয়ে ; তুমিই ভাস্বতী হয়ে এসেছ আবার। তরুণ বালক-বিস্ময়ের বেশে এসে কেঁদে হেসে চলে গেছ তুমি। ভাসিয়ে দিয়ে গেছ চোখের জলে ; শূন্য করে দিয়ে মায়ের বুক, আবার এনেছ তুমি নূতন রূপে হে অপরূপ। তুমি জন্ম, তুমি মৃত্যু, তুমিই আনন্দ, তুমিই বেদ, তুমিই বেদনা, তুমিই বুঝতে দাও, আবার তুমিই বুঝতে দাও না, কে তুমি ? আমার প্রার্থনা কেবল এই :

'আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।'

যে মেয়ে হয়ে এল পুলিশ অফিসারের নিরানন্দ গৃহে আনন্দের বান ডাকিয়ে তার সংগে মৃতপুত্রের মিল মুহূর্তে মুহূর্তে, নিজের বিকাশের দল মেলে মেলে বিস্ময়ের পূর্ণ শতদল হয়ে দেখা দিল দিনে দিনে। ভাস্কর নামের সংগে নাম মিলিয়ে নাম রাখা হল মেয়ের ভাস্বতী। কিন্তু কেবল নামের মিল নয়। ভাস্বতী সে ভাস্করই প্রত্যাবৃত, সন্দেহ রইল না তাতে। কথা বলতে সুরু করার পরই মেয়েকে জিজ্ঞেস করে যদি কেউ ভাস্করের ডাকনাম গোপাল, ভাস্বতীর মনে পড়ে কি না তাই পরীক্ষা করতে, গোপাল কই ? সংগে সংগে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ভাস্বতী : এই যে ! গোপালের ছবি কোথায় ? প্রশ্ন করার সংগে সংগে ঘরের যেখানে মৃত গোপালের ছবি, সেখানে অঙ্গুলি সংকেত করে একটুকুন মেয়ে : ওই যে !

কবির কথাই ঠিক। কে বলেছে তুমি কেবল ছবি ? এই গ্রহ, তারা, রবি, এদেরই মতো সত্য তুমি। তুমি থেমে গেছ, কে বলেছে ? তুমিও চলেছ 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী'। শুধু অপরূপের বেশে নয়, রূপ ধরে এসেছ তুমি, তোমার সেই ফেলে-যাওয়া খেলাঘরের ধুলোয় পড়ে থাকা বাঁশী আবার বাজাবার জন্যে। সেবার যদি বাঁশী বাজিয়েছিলে পূরবীর সুরে, আসন্ন বিদায়ের বেদনায় বিষণ্ণ সেই আকাশ এবার ভৈরবীতে ভরে দাও। আলোর আনন্দে উদ্ভাসিত হও তুমি। এই মাটির 'মা'-টিকে জড়িয়ে ধর তোমার কচি হাতের মুঠো দিয়ে যে মুঠোর গোপন আছে বসুধার সবটুকু সুধার সঞ্জীবনী।

সবে কথা বলতে শুরু করেছে তখন ভাস্বতী। একা একা ফুল দেখে স্বগতোক্তি করছে : লাল··· কি সুন্দর। রং-এর সংগে সুন্দরের এই চেতনাই তো বিশ্বচৈতন্য। এই ত' বলে :

'আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ।'

ওইটুকু মেয়ের মুখে, 'কি সুন্দর,' শুনে, আমরা অবাক হই। কারণ ও বয়সে ও কথা বলার নয়। বলি কারণ, আমরা আমাদের কাল দিয়ে মহাকালের মাপ করি। ফিতে দিয়ে হিমালয়ের করি পরিমাপ। তাই হিমালয় আমাদের কাছে ২৯ হাজার ২ ফিট উচ্চতার প্রতীকমাত্র। আর চোখ খুলে গেছে যার সে বলছে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে :

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ-মেঘ।'

আমাদের কালের বয়স আছে। মহাকালের কোনও বয়স নেই। আমরাই বলি, ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। মহাকালে,—এ সব কিছুই নেই। ইটার্নাল প্রেসেন্ট। যে ভাস্কর ছিলো সে-ই ভাস্বতী হয়ে এসেছে,—একথা কালের। মহাকালের কথা হচ্ছে ভাস্করই ভাস্বতী হয়ে আছে। ভাস্বতী অথবা ভাস্কর, এই খণ্ড খণ্ড করা অখণ্ড চৈতন্যকে, এ আমরা কে। সেকথা আমরা ভুলেছি বলেই, এই ভুল ফুস হয়ে ফুটবে একদিন যেদিন আমরা অনায়াসে দেখতে পাব :

'ফুরায় না তো ফুরাবার এই ভাণ।'

স্কুলে যাবার সময় ভাস্কর প্রণাম করে যেত মাকে। পনের মাসের মেয়ে ভাস্বতী, স্কুলে যাবার তার বয়স হয় নি। দিদির কোল থেকে নেমে সে মাকে প্রণাম করে, অবিকল বড়দের মতো করে। কে তাকে শেখালে যে এমন করে মায়ের পায়ে মাথা নীচু করতে হয়। ভাস্কর না ফিরে এলে ভাস্বতী হয়ে, ঐটুকু, একরত্তি মেয়ে পায় কোথায় সেই প্রেরণা। যদিও বয়স বাড়ার সংগে সংগে ভাস্বতীর পূর্বজন্মের স্মৃতি প্রভাবিত আচরণের পাণ্ডুলিপি ধূসর হয়ে আসছে বিস্মৃতির ধূলি লেগে লেগে, তবু ভাস্বতীর মা-বাবা একথাও আমাকে বলেছেন, ভাস্বতী যদি মেয়ে না হত তা হলে আকৃতি ও আচার অনুযায়ী অবিকল ভাস্করই আবার এসেছে বলা যেত।

ভাস্করের মৃত্যুর আগে আরও একটি ঘটনার পটভূমিকা রয়েছে যেটি এখানে তুলে ধরা দরকার। ভয়ংকর রঙে আঁকা সেই পটভূমিতে রয়েছে কিরীটানগর থেকে নিয়ে আসা একটি শিবলিংগের মূর্তি। কিরীটানগর হচ্ছে সতীর কর্তিত দেহাংশের পতনে উত্থিত তীর্থক্ষেত্র। সেই শিবলিংগটি আনার পর থেকেই পুলিশ অফিসারের বাড়িতে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে। লালবাজারে যে দারোয়ান পূজা করত সেই লিংগের, সে দুর্ঘটনায় পড়ে। যে গাড়োয়ালী পরে এই শিবের পূজার ভার নেয় সে মারা যায়। মারা যাবার আগে সে আসন্নমৃত্যুর পদধ্বনি শোনে। চিঠিতে জানায় তার প্রভু পুলিশ অফিসারকে যে সে মারা যাবে সুনিশ্চিত। তার টাকাকড়ি কোথায় কত আছে তা উদ্ধার করার এবং ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্যে অনুরোধ করে প্রভুকে। পুলিশ অফিসারের প্রিয় সন্তান ভাস্করের মৃত্যু ভেংগে দেয় প্রায় পুলিশ অফিসার-পত্নীর মনোবল।

ভদ্রলোককে আমি বলেছিলাম, শিবলিংগটিকে ত্যাগ করতে। শেষমুহূর্তে তাঁর স্ত্রী বহুদিন পুজোর পর, শিবলিংগকে বিদায় দেবার আসন্ন বেদনায় কাঁদেন। তারপর মুহূর্তে মনস্থির করেন, না। শিবলিংগকে তিনি ত্যাগ করবেন না কিছুতেই। আসুক যত দুর্যোগ সংসার ঘিরে। আমার অভিমান হয়েছিল,—অহংকার। মনে করেছিলাম, শিবলিংগকে ত্যাগ করতে বলে ঠিক কাজ করেছি। এখন বুঝি, ওর চেয়ে বেঠিক আর কিছু হতে পারত না।

যিনি বিপদে শিবকে ভাসিয়ে দেন নি জলে, সন্তান-মৃত্যুতে চোখের জলে ভেসেও সেই সতীকে ভয় দেখানো স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য। তাঁর জয় হোক! তাঁর সাধনাকে নমস্কার।

এই প্রসংগে আরেকজনের কথা বলেছেন পুলিশ অফিসার এবং তাঁর স্ত্রী। দার্জিলিং-এর উচ্চপদস্থ এক কর্মচারীর। এঁর পরিচয়ই কেবল মিত্র নয়; বিপন্ন মানুষের সত্যিকারের মিত্র ইনি। এঁর নাম আমি শুনেছি; দেখি নি অনেক দিন। এঁর অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অনেকেরই জানা। জ্যোতিষী নন; জ্যোতিষীর চেয়ে ইনি বড়। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসার আগের দিন, এই মিত্র ভদ্রলোক পুলিশ অফিসারকে বলেন, পায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখছি আপনার ছেলের। ভাস্করের পায়েই কামড়ায় পাগলা কুকুর। তারপর যত চিঠি লেখেন ভাস্করের বাবা-মা, তার একটিরও উত্তর আসে না এই পরিবারের সেই পরম মিত্রের কাছ থেকে। তারপর পুলিশ [illegible]র যান তাঁর কাছে। তিনি বলেন, মংগলময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

আর একটি কথা। ভাস্কর যে বাঁচবে না, ভাস্কর তা জানত না। ভাস্করের দাদু টাকা দিয়েছিলেন বই কিনতে। ভাস্কর বলেছিল মা-কে, ও আমার কাজে লাগবে না। কি খেতে দিতে চেয়েছিলেন তার মা, ভাস্কর বলেছিল, গুরুর নিষেধ। তখন মনে হয়েছিল যাকে নিছক প্রলাপ, আজ তাকে মনে হয় মৃত্যুর সুনিশ্চিত পূর্বাভাস ধরা দিয়েছিল সেই জীবনদীপ্ত দুই চোখে। মৃত্যুর পূর্বে, কেবল মা-কালীর নাম করেছিল ভাস্কর।

'কালী নামে দাও রে বেড়া তাঁর কাছে ত' যম ঘেঁসে না,'···

যদি যম বেড়া টপকে নিয়েও যায় ভাস্করকে, তবু তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হয় সতীর কোলজোড়া ভাস্বতীরূপে!

পুলিশ অফিসারের পরিবারের এই ঘটন অঘটনের একটি মৌখিক চিত্র আমি উপহার দিয়েছিলাম আমার বন্ধু শ্রীরামপরায়ণ রায়কে। রামপরায়ণ বন্ধু হলেও বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়। মানুষ হিসেবে কেবল আমার চেয়ে নয়, এত মানুষের চেয়ে এত বড় যে তাকে অসামান্য মানুষ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। অসাধারণ মানুষ বলে আমার সমকালে যাঁরা খ্যাত, তাঁদের অনেকের সংগেই আমার পরিচয় আলাপের স্তর পেরিয়ে সখ্যতার গণ্ডীতে পৌঁছেছে। তাঁদের কেউ ভালো লেখেন কিংবা গান অথবা ছবি আঁকেন। কেউ বড় বাগ্মী, কেউ খ্যাতনামা অভিনেতা, কেউ বা আন্তর্জাতিক কীর্তিমান চলচ্চিত্রকার। এঁদের, এই সব অসাধারণ মানুষদের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, খ্যাতির লালসা, আদর্শকে বলি দেবার এমন প্রবণতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরল। সাধারণ মানুষের মধ্যেই বরং অসাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছি। রামপরায়ণ রায় এমনই একজন লোক যাঁর মধ্যে একটি গোটা নির্ভেজাল নিরহংকার পুরুষের পরিচয় প্রদীপ্ত।

যাকে খ্যাতি-কীর্তি-প্রতিপত্তিওলা নাম বলে রামপরায়ণের নাও তার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এমন একজন বিপদে সহায়, সংকটে মুক্তিদাতা," সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্যে কদাচ পরাঙ্মুখ ব্যক্তির আমার দেখার জগতে প্রায় ব্যতিক্রম। রামপরায়ণের কাছে যারা ঋণী তাদের অনেকেই গর্ব করে তাঁর আড়ালে বলে: 'রামপরায়ণের ঘাড় ভাংগবার আর।' তারা জানে না যে রামপরায়ণের ঘাড় বড় শক্ত। সে ইচ্ছে করে ভাংগতে না দিলে তার ঘাড় ভাংগে এত বড় কৃতবিদ্য কৃতিকর্মা এখনও জন্মায় নি। রামপরায়ণ বোকা বনে, বোকা বনবার জন্যে। কার প্রয়োজন জেনুইন আর কারটা ধাপ্পা, রামপরায়ণের নখদর্পণে তা প্রতিফলিত। তবুও সে 'না' বলে না। বলে না এই জন্যে যে রামপরায়ণ মানুষ চেনে। কোন অবস্থায় পড়ে মানুষ ধারের নাম করে ঠকায়, তা রামপরায়ণের জানা। জানা বলেই প্রতারকের প্রতি তার রাগ হয় না। রাগ হয় এই সমাজের উপর যে সমাজে সৎ থাকার উপায় নেই অসৎ উপায়ে রোজগারের রাস্তায় পা না বাড়ালে।

এই রামপরায়ণকে ভাস্কর-ভাস্বতী বলার কারণ হচ্ছে রামপরায়ণ ঈশ্বর, জন্মান্তর, এসবে বিশ্বাস করে না। মানুষে বিশ্বাস করে। সমাজের জন্মান্তর তার কাছে, ব্যক্তি মানুষের জন্মান্তরের চেয়ে অনেক জরুরী। তবুও তাকে এই ঘটনা বলেছি,—কোনও অলৌকিক অভিজ্ঞতা তার আছে কি না জানবার জন্যে। রামপরায়ণ বলেছে: 'যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না, এমন দু'টি ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। তাতে আমি ঈশ্বর অথবা অলৌকিকে বিশ্বাসী হই নি, কিন্তু যুক্তির অগম্য ঘটনা যে দু'টিই এবিষয়েও আমি এখনও পর্যন্ত স্থির আছি।'

প্রথম ঘটনা, রামপরায়ণের ছাত্রাবস্থায় ঘটে। বাড়িতে তার বাবার একটি ব্যাটাশে পাঁচশো টাকা শুদ্ধ চুরি যায়। পরের দিন ব্যাগটা বাগানে পাওয়া যায় খালি। কিন্তু টাকাটা উধাও হয়ে যায়। রামপরায়ণের পিতৃদেব বিপুল বিত্তবান। তার বাবা-মা সেজন্যই ঐ-দিকে বিশেষ মাথা ঘামান না। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে আসা যাওয়া করে এমন একজন বিধবা এই চুরিতে বিমর্ষ হন। তাঁরও প্রচুর অর্থ কিন্তু তাঁর ছেলেটি বিগড়ে যাওয়ায়, তাঁর ধারণা হয় যে, হয়ত তাঁর ছেলেই এই টাকা চুরি করে থাকবে। ব্রাহ্মণের অর্থ আত্মসাৎ করায় তিনি মহাপাপের ভাগী হবেন এই ভয়ে তিনি একজন লোকের সন্ধান দেন যাঁর কাছে গেলে তিনি ক্রিয়া করে একজনের হাত দিয়ে চোরের নামটা লিখিয়ে দিতে পারেন। রামের মা তাতে রাজী হন না। বলেন, প্রয়োজন নেই। যা গেছে তা যেতে দাও। রামপরায়ণ শুনেই বদ্ধপরিকর হয় বুজরুকি ভেঙে দেবার জন্যে।

সেখানে আসনে বসবার আগে 'ক্রিয়া'-কারী লোকটি বলে মায়ের অথবা প্রিয়জন কারুর চেহারা মনে মনে ভাবতে এবং যখন নামটা লেখা হবে তখন যেন 'লিখব না' এ রকম মনোভাব না হয়। রামপরায়ণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কোনওটাই সে মানবে না। মায়ের কথা যত না ভাববার চেষ্টা করে, তত মা সামনে বসে আছেন, দেখতে পায়। একটু বাদে খুব ঠাণ্ডা, খুব সুগন্ধমাখা একখানা করস্পর্শ অনুভব করে মাথায়। সে যত লেখাবার চেষ্টা করে রামপরায়ণ তত না লেখবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। শেষ পর্যন্ত মাথায় রাখা সেই হাত মায়ের হাত দিয়ে লিখিয়ে দেয় তস্করের নাম।

না। বিধবার পুত্র চোর নয়। এ চোর,—রামপরায়ণের আরেক আত্মীয় যাকে চোর বলে স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে না। পরে জানা যায় চোর সেই আত্মীয়।

রামপরায়ণ স্বীকার করেছে আমার কাছে যে এই ঘটনার যুক্তি দিয়ে কোনও ব্যাখ্যা সে আজও করতে পারে নি।

দ্বিতীয় যে ঘটনা রাম আমাকে বলেছেন, সেটি চমৎকারিত্বে অদ্বিতীয়। রামপরায়ণের নিজের বিবেচনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অবজারভেসানের ক্ষমতার পরিচয় যেমন এই দ্বিতীয় ঘটনায় প্রকট হয়েছে দিবালোকের মতো, তেমনই এর মধ্যে অলৌকিকের একটুকরো আলোও কি রকম করে না জানি এসে পড়েছে, যার সাহায্য ছাড়া রামের সব যুক্তি-বিচার অবজারভেসান ব্যর্থ হতো।

[ক্রমশঃ।

মোম

সুধীরকুমার গংগোপাধ্যায়

পুরণো দিনের প্রান্ত গলে গলে পড়ে
শিখাদগ্ধ মোমের মতন। সময়ের মনের আঁচড়ে
ক্ষতচিহ্ন আঁকা হয়।
কোন কিছু হবে না অক্ষয়।

তুমি আমি ছিলেম তো সুখে;
তখন জানি নি কি যে রয়েছে সমুখে।
সেদিনের আয়োজন, সেদিনের যত সমারোহ,
সেদিনের যতকিছু মোহ,—
সবকিছু মিশে গেছে সময় সাগরে।
পুরণো দিনের প্রান্ত গলে গলে পড়ে।

পুরণো দিনের প্রান্ত গলে গলে পড়ে
শিখাদগ্ধ মোমের মতন।
আজ তারা বেদনার ধন।
জানি সে বেদনা দিয়ে স্মৃতির মিনার
সময় রচনা করে। থাকে তার সোনার কিনার—
দুখের স্মরণে। জানি এই প্রত্যহের ক্ষয়—
পূরণ করিয়া দেবে নতুন সময়—
সব ব্যথা দেবে ঢাকি।
তথাপি এ দুঃখ কোথা রাখি—?
তোমার পৃথিবী নিয়ে চলে গেলে তুমি
অপরিচিতের মত রহিল আমার মর্ত্যভূমি।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এপার

॥ ক ॥

মৃন্ময়ীর কথায় শিবনাথও শব্দটা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে।

মিথ্যে নয়।

সত্যিই কার যেন পায়ের শব্দ—বেশ ভারি পায়ের শব্দ এদিকেই এগিয়ে আসছে। শিবনাথ মুহূর্ত আর দেরি করে না। চট্ করে উঠে পড়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের কুলঙ্গীতে রক্ষিত প্রজ্বলিত প্রদীপটি—ঘরের একটিমাত্র আলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়।

মুহূর্তে ঘর অন্ধকার হয়ে যায়।

চাপা শংকিতকণ্ঠে মৃন্ময়ী শুধায়, এ কি করলে শিবনাথ, আলো নিভিয়ে দিলে কেন?

কিন্তু মৃন্ময়ী শিবনাথের কোন সাড়া পেল না।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে, এদিক-ওদিকে আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতেও পায় না।

পুনরায় আগের চাইতেও চাপাকণ্ঠে যেন কতকটা ফিস্ ফিস্ করে শুধায়, চলে গেলে। শিবনাথ—

অন্ধকারে এবারে পাশ থেকেই সাড়া এলো সতর্ক চাপাকণ্ঠে, না, আস্তে, কথা বলো না—

ইতিমধ্যে সেই ভারি পায়ের শব্দটা যেন মনে হলো ওদের ঘরের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেল। মনে হলো যেন সুন্দর সাহেবের ঘরের দিকেই গেল। ক্লান্ত শ্লথ মন্থর পদশব্দ।

অন্ধকারেই আন্দাজে মৃন্ময়ী শিবনাথের একেবারে গা ঘেঁষে বুকের কাছটিতে দাঁড়ায়। মৃন্ময়ীর বক্ষের ধুকধুকুনিটা পর্যন্ত শিবনাথ শুনতে পায়।

ওর নিশ্বাসটাও যেন শিবনাথের গায়ে এসে লাগছে।

ফিস্ ফিস্ করে পুনরায় চাপাকণ্ঠে শুধায় মৃন্ময়ী, কে গেল শিবনাথ?

মৃন্ময়ী না বুঝতে পারলেও শিবনাথ বুঝতে পেরেছিল ঐ ভারি পায়ের শব্দটা যে একটু আগে ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল সেটা কার পায়ের শব্দ।

চাপা সতর্ককণ্ঠে জবাব দেয় শিবনাথ সুন্দর সাহেব।

কি হবে শিবনাথ, যদি এখুনি এ ঘরে এসে হাজির হয়।

বোধ হয় আসবে না। ওর ঘরের দিকেই ত' চলে গেল। দাঁড়াও এক কাজ করি—সামনের দরজা দিয়ে বেরুব না। আমি ঐ পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি—তুমি দরজাটা আটকে দাও—

শিবনাথ কথাটা বলে অন্ধকারে পিছনের দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতেই মৃন্ময়ী ওর একটা হাত চেপে ধরে—

কি হলো?

তুমি না একটু আগে বলেছো কবরে ত'? এপার থেকে তুমি যখন যাবে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ত'?

নিশ্চয়ই—

ভুলে যাবে না ত'।

না না, ভুলব না।

সত্যি বলছো?

সত্যি, সত্যি বলছি মৃন্ময়ী—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারেই হঠাৎ শিবনাথ তার বলিষ্ঠ দু' বাহু বাড়িয়ে মৃন্ময়ীকে আপন বক্ষের উপর টেনে নেয়।

দু'বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে মৃন্ময়ী যেন নিষ্পেষিত হয়ে যায়। হারিয়ে যায়।

মৃন্ময়ী··মৃন্ময়ী—

শিবনাথের কণ্ঠের মধ্যে যেন ডাকটা হারিয়ে যায়।

অন্ধকারেই শিবনাথের তপ্ত তৃষিত দু'টি ওষ্ঠ তার বন্যতা। মৃন্ময়ীর পুষ্পকলির মত ওষ্ঠের 'পরে নেমে আসে।

মৃন্ময়ীর ঘর থেকে বের হয়ে অন্ধকারে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঘুরে এক সময় শিবনাথ তার ঘরের মধ্যে ফিরে এলো।

সমস্ত দেহটা তখনও যেন তার অবশ। সমস্ত স্নায়ু শিথিল। মৃন্ময়ীর দেহের স্পর্শস্পর্শটা তখনো যেন তার প্রতি রোমকূপে রোমকূপে শিহরিত হয়ে চলেছে।

হ্যাঁ—চলে যেতে হবে তাকে, যেমন করেই হোক। আর যাবার সময়ে মৃন্ময়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

কিন্তু কোথায়।

একটা কাজ করলে ত' হয়। জীবনকৃষ্ণকে সব কথা খুলে বললে ত' হয়। সে হয় ত' একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

[illegible] রাজা রামমোহন রায়ের কথা জীবনকৃষ্ণের মুখে শুনেছে শিবনাথ—[illegible] কাছে সমস্ত কথা গিয়ে খুলে বললে কি তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না।

সে [illegible] তাঁর বাড়ি চেনে না কিন্তু জীবনকৃষ্ণ চেনে।

জীবনকৃষ্ণকে নিয়েই ত' সে অনায়াসে তাঁর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে।

কিন্তু তবু মনটার মধ্যে যেন পুরোপুরি সায় পায় না শিবনাথ। রাজা রামমোহন প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক বটেন কিন্তু তাঁর বিরোধীপক্ষেরও ত' অভাব নেই।

কার কাছে তা হলে পরামর্শ নেওয়া যায়।

কে তাকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারে।

হঠাৎ ঐ সময় মনের পাতায় ভেসে ওঠে শিবনাথের এক দেবী-প্রতিমার সহাস্য সুন্দর মুখখানি।

নরেন্দ্র—সহাধ্যায়ী নরেন্দ্রজননী দুর্গা দেবী। পরিধানে একটি লাল চওড়া পাড় শাড়ি, অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কিছুটা কেশরাশি মুখের 'পরে নেমে এসেছে। কপালে একটি বড় সিন্দুরের টিপ। সিঁথিতে ডগড়গে সিন্দুর, হাতে শাঁখা, লোহা ও মোটা হাঙ্গরমুখী সুবর্ণ বলয়, টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ। সত্যিই যেন মা দুর্গা।

শোভাবাজারের রাজবাড়িতে রাধাকান্ত দেবের গৃহে পূজার সময় যে দুর্গা প্রতিমা দেখেছে ঠিক সেই মা দুর্গার মতই যেন মুখখানা।

প্রণাম করবার পর শিবনাথ পিতৃমাতৃহারা জেনে গভীর স্নেহে দুর্গা দেবী শিবনাথকে আপন বক্ষের 'পরে টেনে নিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ঠিক—এতক্ষণ মনে পড়ে নি। দুর্গা দেবীর কাছেই ত' গিয়ে সে মৃন্ময়ীর হাত ধরে সোজা দাঁড়াতে পারে।

বলতে পারে, মা, মৃন্ময়ীকে আশ্রয় দাও—

মা কি মৃন্ময়ীকে বক্ষে টেনে নেবেন না। নিশ্চয়ই নেবেন।

আশ্চর্য!! এতক্ষণ একবারও এ কথাটা তার মনে হয় নি কেন। কাল—কালই সে দুর্গা দেবীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়—কাল কেন। আজ রাত্রেই ত' তারা চলে যেতে পারে সেখানে।

ঠিক শুভস্য শীঘ্রম্।

আর দেরি নয়। আজ—রাত্রেই মৃন্ময়ীকে নিয়ে সে বের হয়ে পড়বে।

মৃন্ময়ীর একটা আশ্রয় হলে তারপর তার নিজের জন্য সে ভাবে না। একটা আশ্রয় সে খুঁজে নিতে পারবে, এতবড় শহরে একটা আশ্রয়ের অভাব।

যেমন করে যেখানেই হোক একটা আশ্রয় তার জুটে যাবেই।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি করে না শিবনাথ। [illegible] করে সে অন্ধকারেই পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

টানা বারান্দাটা অন্ধকার, তবু শেষপ্রান্তে নজর পড়ে শিবনাথের, আলোর একটা রশ্মি এসে অন্ধকার বারান্দায় পড়েছে।

থমকে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ।

কত রাত কে জানে। কিন্তু এত রাতেও বোধ হয় সুন্দর সাহেব এখনো ঘুমায় নি। জেগেই আছে। তার ঘরের খোলা দরজা পথেই আলো এসে অন্ধকার বারান্দায় পড়েছে।

সুন্দর সাহেব এখনো জেগে।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল শিবনাথ তারপর পা টিপে-টিপে সুন্দর সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

খোলা দরজাটার কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়ে: ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে আর একটা দীর্ঘ ছায়া দেওয়ালের উপর দিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করছে।

সুন্দর সাহেব ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

সুন্দর সাহেবের ঘরের দু'খানা ঘরের পরেই মৃন্ময়ীর ঘর। সাহস হয় না শিবনাথের মৃন্ময়ীর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ডাকতে।

সুন্দর সাহেব এখনো জেগে আছে। যদি জেনে ফেলে ত'—রক্ষা থাকবে না কারো, তাকে এবং মৃন্ময়ীকে কাউকেই ছেড়ে দেবে না সুন্দর সাহেব।

শিবনাথ পা টিপে-টিপে পুনরায় ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। ঘুরে অন্ধকারে বাগানের দিকে গেল বাড়ির পশ্চাতে।

অন্ধকারে বাগানটার এদিকে-ওদিকে গাছপালাগুলো মনে হয় যেন এক-একটা ভৌতিক স্তূপ, ঘাপটি দিয়ে বসে আছে যেন অন্ধকারে।

বাগানে নারকোল গাছের সরু সরু পাতাগুলো হাওয়ায় অদ্ভুত সিপ সিপ শব্দ করছে। মাথার উপরে কালো আকাশের গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তারা। আর কিছু দেখা যায় না, একটা সীমাহীন শূন্যতা যেন চারিদিকে থমথম করছে।

শিবনাথের বুকের ভেতরটা কাঁপে।

ভয়ে আশংকায় না উত্তেজনায় কে জানে। কাঁপে শিবনাথের বুকের ভিতরটা, হঠাৎ ঝিঁ-ঝিঁ ডাকতে শুরু করল।

পায়ের নীচে শুকনো পাতা মচ মচ করে গুঁড়িয়ে যায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় শিবনাথ। মৃন্ময়ীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ঐ দরজা পথেই সন্ধ্যারাত্রে আজ সে বের হয়ে এসেছিল মৃন্ময়ীর ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় সেই স্পর্শের কথাটা।

শিরশির করে ওঠে সারা দেহ।

বন্ধ দরজায় গায়ে মৃদু টোকা দিয়ে টুক্ টুক্ করে চাপা সতর্ককণ্ঠে ডাকে, মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী—

আশ্চর্য।

দু'বার টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'বার নাম ধরে ডাকতেই ভেতর থেকে চাপাকণ্ঠে সাড়া এলো, কে?

মৃন্ময়ী!

কে!

আমি—শিবনাথ। দরজাটা খোল মৃন্ময়ী—

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল।

ঘর অন্ধকার। আবছা ছায়ার মত অন্ধকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ী।

শিবনাথ—

শিবনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

কি হলো শিবনাথ?

চুপ—আস্তে কথা বল। সুন্দর সাহেব এখনো জেগে তার ঘরে।

কিন্তু এ সময় এখানে এলে কেন শিবনাথ! সুন্দর সাহেব জানতে পারলে—

জানতে পারার আগেই এখান থেকে আমরা চলে যাবো।

চলে যাবো!

হ্যাঁ—তোমাকে না আজই সন্ধ্যায় আমি বলছিলাম এখানে আর একমুহূর্ত আমার থাকবার ইচ্ছা নেই, আমি এধুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

এধুনি!

হ্যাঁ—

এই রাত্রেই?

হ্যাঁ—এই রাত্রেই। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও ত' চলো।

কিন্তু কাল যখন সকালে সুন্দর সাহেব জানতে পারবে আমরা দু'জনে পালিয়ে গিয়েছি—

তা জানলেই বা—তা ছাড়া জানবে ত' নিশ্চয়ই—কিন্তু আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে সুন্দরমের ক্ষমতা নেই আমাদের ছিনিয়ে আনে—

কিন্তু—

আর দেরি করবার সময় নেই মৃন্ময়ী। এসো—বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে শিবনাথ মৃন্ময়ীর একটা হাত চেপে ধরে।

কিন্তু শিবনাথ—

আঃ! এসো—

না। আমার ভয় করছে। এই রাত্রে—

ভয় কি! আমি ত' আছি সঙ্গে—

মিথ্যা নয়। তবু ভয় করে মৃন্ময়ীর। বিচিত্র মানুষের মন, এ ক'দিন আগেও সে ভেবেছে এখান থেকে সে পালাবে। কোথায় পালাবে তা না জেনেই ভেবেছে পালাবে। অথচ আজ সেই যাবার সুযোগ যখন সামনে—সবটাই মনে হচ্ছে যেন অনিশ্চয়তার একটা সংশয়। যেখানে এই মুহূর্তে পা বাড়াতে আর সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু মৃন্ময়ীকে ভাববারও সময় দেয় না শিবনাথ, তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সোজা ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়।

তারপর একপ্রকার হাত ধরে মৃন্ময়ীকে টানতে টানতেই একসময় বাগান পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে।

নির্জন রাস্তা—যতদূর দৃষ্টি চলে—জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই খাঁ-খাঁ করছে। হন হন করে দু'জনে সেই অন্ধকার রাত্রির মধ্যখানে বড়বাজারের দিকে এগিয়ে চলে।

কিন্তু দীর্ঘদিন হাঁটায় অনভ্যস্ত মৃন্ময়ী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পা দু'টো ভারী হয়ে ওঠে—আর যেন চলতে চায় না।

শিবনাথ—

কি হলো!

পা দু'টো ব্যথা করছে, আর চলতে পারছি না—

আর বেশিদূর নয়—চল—

একটু বোস—

বুঝতে পারে শিবনাথ সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হাঁটতে হাঁটতে মৃন্ময়ী। কিন্তু এখন রাস্তার মধ্যে কোথায়ও থামলে দেরি হয়ে যাবে।

বড়বাজার এখনো কিছুটা দূর।

না—এখন বসতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। চল—

আমি আর পারছি না শিবনাথ—একটু বোস।

অগত্যা শিবনাথকে একটা বটগাছের তলায় পথের ধারেই বসতে হয়। কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতেই আবার তাড়া দিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

অবশেষে ওরা যখন ধনী-ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র মল্লিকের বিশাল চৌহদ্দি জোড়া চারমহলা বাড়ির দেউড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

দেউড়ি বন্ধ।

থমকে দাঁড়ায় শিবনাথ। সেও তখন দ্রুত অনেকটা পথ একনাগাড়ে হেঁটে এসে রীতিমত হাঁফাচ্ছে। কিন্তু দেউড়ি বন্ধ। কি করবে। কেমন করে এখন দেউড়ি খোলাবে শিবনাথ। প্রবেশ করবে কেমন করে এখন মৃন্ময়ীকে নিয়ে ঐ প্রাসাদে।

হঠাৎ ঐ সময় ঘোড়ার ক্ষুরের খটা-খট আওয়াজ দূর থেকে ভেসে এলো শিবনাথের কানে এবং শিবনাথ পিছন ফিরে দেখলো ঝাপসা অস্পষ্ট একজোড়া ঘোড়া জোর কদমে ছুটে আসছে দেউড়ির দিকে। অশ্বক্ষুরের শব্দ ও সতর্ক ঘণ্টাধ্বনি ঢং-ঢং করে রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি মৃন্ময়ীর হাতটা চেপে ধরে একপাশে সরে দাঁড়ায়, ঝকঝকে একটা যুগল অশ্ববাহিত পাল্কিগাড়ি দেউড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ দেখতে পেল কে একজন একটা বাতি হাতে এসে দেউড়ি খুলে দিচ্ছে। দেউড়ি খোলা হলো, দ্বাররক্ষী হাতের বাতিটা উঁচু করে তুলে ধরল—পাল্কিগাড়ি ধীরে ধীরে দেউড়ি পথে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যায়। আর সেই আলোয় দেউড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে শিবনাথের চোখে পড়ল পাল্কিগাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট সুরেন্দ্র মল্লিক মহাশয়। মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। গলায় গোড়ের মালা।

পাল্কিগাড়ি ভিতরে চলে যাবার পর দ্বাররক্ষী দেউড়ির পাল্লা বন্ধ করতে যাচ্ছে এমন সময় শিবনাথ মৃন্ময়ীর হাত ধরে সামনে এসে দাঁড়াল।

কোন্ হো?

আমি শিবনাথ—আমি তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—

হাতের বাতিটা উঁচু করে আবার তুলে ধরে দ্বাররক্ষী, মৃন্ময়ীর চোখে আলো পড়তেই সে চোখের পাতা বুজিয়ে ফেলে।

মনে কেমন সন্দেহ জাগে দ্বাররক্ষীর। তবু সে বলে, আভি ত' দাদাবাবু নিদ যাতা হ্যায়—

ও তো হাম জানতা হ্যায়—তুম যাকে বলো শিবনাথবাবু আয়া হ্যায়। বহুৎ জরুরী। একদফা নীচু সে বোলাতো হ্যায়—

লোকটা কি ভাবল কে জানে। চলে গেল ভেতরে।

দু'জনে দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটা কিন্তু এলো না।

একটু পরে লোকটা ফিরে এসে বললে, চলিয়ে—মাঈজী অন্দর মে বোলাতা হ্যায়। মাঈজী—অর্থাৎ নরেনের মা—দুর্গা দেবী।

চল মৃন্ময়ী, ভালই হলো—ভেবেছিলাম নরেনকে দিয়েই মাকে সব কথা বলবো। তা তিনিই যখন ডেকে পাঠিয়েছেন—

মৃন্ময়ী শিবনাথের কথার কোন জবাব দেয় না। সে তখন পথশ্রমে এত ক্লান্ত যে, কোথাও বসে একটু বিশ্রাম করতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

শিবনাথ অন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। মৃন্ময়ী তাকে অনুসরণ করে ক্লান্ত শিথিলপদে।

অন্দরমহলে প্রবেশ করবার আগেই বহির্মহল। লম্বা একটা টানা বারান্দা অতিক্রম করে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়। সেরাস্তা-ঘরের পাশেই যে ঘরটা সেই ঘরটার মধ্যে একটা কৌচের 'পরে পা এলিয়ে দিয়ে তাম্বুক সেবন করছিলেন আলবোলায় সুরেন্দ্র মল্লিক।

বাঈজীর আসর থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এখনো তিনি অন্দরে প্রবেশ করেন নি। সামনের দরজাটা খোলাই ছিল—সেই দরজা পথেই বারান্দা অতিক্রম করবার সময় শিবনাথ ও মৃন্ময়ীর প্রতি নজর পড়ল সুরেন্দ্র মল্লিকের। হাঁক দিলেন, কে যায়?

জাঁদরেল গুরুগম্ভীর গলার সে ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিবনাথ। আর মৃন্ময়ীও তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আবার প্রশ্ন করলেন সুরেন্দ্র মল্লিক, কে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে!

শিবনাথ বা মৃন্ময়ীর দিক থেকে কোন সাড়া আসে না, তবু। তারা যেন বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভোলা!—

ভৃত্যের নাম ধরে হাঁক দিলেন সুরেন্দ্রনাথ, দেখ তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে কারা?

ভোলা বাইরেই বোধ হয় কোথাও ছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় শিবনাথের সামনে, কে গা—কে তোমরা! কর্তা শুধোচ্ছেন সাড়া দিচ্ছ না কেন?

সুরেন্দ্র মল্লিক ততক্ষণে আলবোলার নলটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অত্যধিক নেশার একটু একটু টলছেন।

ঘর থেকে বের হয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালেন, কে?

ওরা তবু জবাব দেয় না এবং অন্ধকারে ওদের স্পষ্ট করে দেখতেও পান না সুরেন্দ্রনাথ। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন ভৃত্য ভোলার দিকে তাকিয়ে, হারামজাদা—এখানে বাতি জ্বালাস নি কেন? বাতিটা জ্বালা—

ভোলা তাড়াতাড়ি বারান্দার দেওয়ালে বসানো বাতিটা জ্বেলে দেয়। মৃদু আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে বারান্দাটা এবং সেই আলোতেই নেশার রক্তিম দু' চোখ তুলে একবার [illegible] মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকান।

মৃন্ময়ীর রূপ যেন তাঁর নেশা ছুটিয়ে দেয় মুহূর্তে।

কে! কে তুমি?

আজ্ঞে আমি—আমি, এতক্ষণে কোনমতে কথা বলে শিবনাথ, নরেন্দ্রর সহাধ্যায়ী আমি—

কি বললে!

সহাধ্যায়ী—

এ কে?—

মৃন্ময়ী—

শিবনাথের কথাটা শেষ হলো না বারান্দার অপরপ্রান্তে ঠিক অন্দরমহলে প্রবেশের মুখ থেকে সহসা এক নারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ভোলা ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দে।

শুধু একটা কথা নয়—যেন একটা আদেশ। কথা নয়—যেন ঘোষণা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ দু' পা পিছিয়ে এলেন।

দুর্গা দেবীর কণ্ঠস্বর এবং তাঁরই নির্দেশ।

ভোলা এগিয়ে আসে নিশ্চিন্তে এবারে,—চলেন—ভেতরে চলেন গো।

শিবনাথ ও মৃন্ময়ী ভোলাকে অনুসরণ করে অন্দরের দিকে অগ্রসর হয় অতঃপর।

ঠিক অন্দরের প্রবেশ মুখেই অলিন্দের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন দুর্গা দেবী। অলিন্দের আলো দুর্গা দেবীর চোখে-মুখে এসে পড়েছে।

পরিধানে সেদিনকার মতই লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ি। তেমনি বক্ষের 'পরে লম্বিত কেশরাশি।

শিবনাথ—

দুর্গা দেবীর চিনতে শিবনাথকে কষ্ট হয় না।

শিবনাথ এগিয়ে এসে দুর্গা দেবীর পদধূলি নেয়—মৃন্ময়ীও এসে পদধূলি নেয়।

থাক—থাক—বেঁচে থাক—দীর্ঘজীবি হও। কিন্তু এটিকে ত' চিনলাম না শিবনাথ—

ও মৃন্ময়ী, মা—

মৃন্ময়ী?

হ্যাঁ—আপনার পায়ের তলায় একটু আশ্রয়—

কিন্তু মেয়েটি কে শিবনাথ। তোমার কেউ হয়?

না—আমার মানে—কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না শিবনাথ। থেমে যায়।

[ক্রমশ।

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—শ্রীঅর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

● চিত্রে-সংবাদ ●

● প্রধানমন্ত্রী সকাশে জর্ডানের রাজা হোসেন।

● সাইপ্রাসে রাষ্ট্রসংঘের শান্তি-রক্ষাবাহিনী কম্যাণ্ডার জেনারেল প্রেম সিং গিয়ানী। কানাডীয় সৈন্যদের লইয়া গঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন।
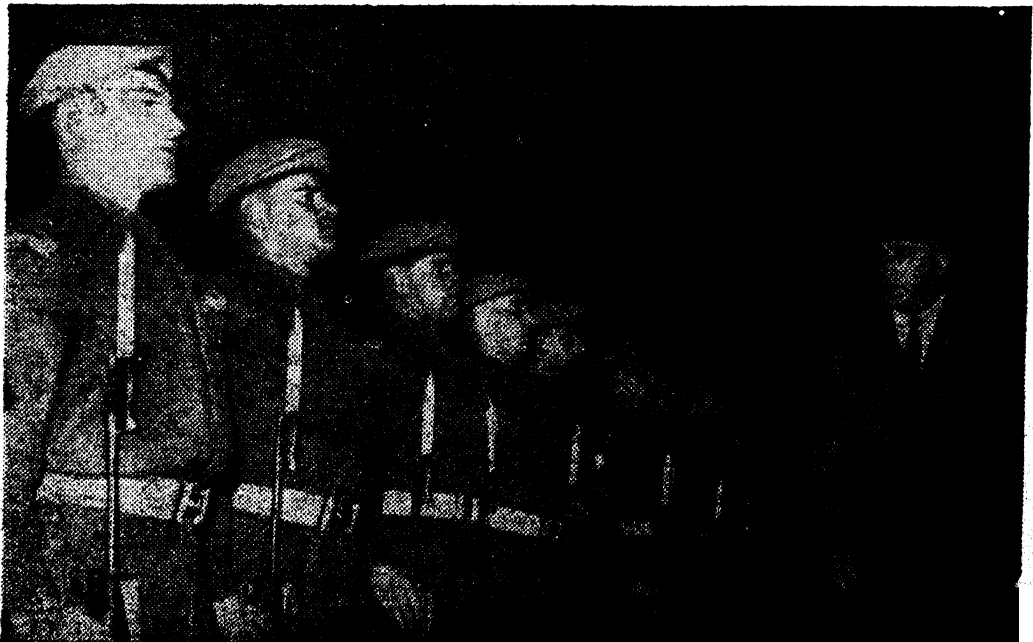
বলিভিয়ার রাষ্ট্রদূত ডাঃ জার্মান কিরোগা গ্যালডো রাষ্ট্রপতি-ভবনে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার পরিচয়পত্র পেশ করিতেছেন।

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সফরকালে গ্রাম-পঞ্চায়েতে উপনীত মহিলাবৃন্দ উপরাষ্ট্রপতিকে আরতি করিয়া স্বাগত জানান।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

পঁচিশ

জগদীশ মেহতার শরীরের যন্ত্রণা কমে জীবনের যন্ত্রণা বাড়ল। ছোটখাট ক্ষতগুলো তার শুকিয়ে গেছে, হাড়ের উপর আঘাত লেগে যে ব্যথা তাও মরে গেছে। এখন তার পিছনের হাড় জোড়া লাগছে। এ জোড়া লাগবে কি-না, কত দিনে লাগবে, কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে কি-না, এই সমস্ত প্রশ্ন সারাক্ষণ তার মনকে পীড়িত করছে। তার চেয়েও বেশি যন্ত্রণা কাঠুরে চৌধুরীর জন্য। এই অনাত্মীয় অপরিচিত লোকটি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থব্যয় করছে। জগদীশ যত দেখছে তত বিস্মিত হচ্ছে, কিন্তু এই ব্যবহারের কারণ নির্ণয় করতে না পেরে [illegible] হচ্ছে।

দময়ন্তী এসে পাশে বসতেই জগদীশ জিজ্ঞাসা করল: এখান থেকে আমরা কবে যাব?

অত্যন্ত [illegible] দময়ন্তী বলল: জানি নে।

জগদীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: এই ভদ্রলোকের কাছে আমাদের ঋণ যে প্রতিদিন বাড়ছে।

তা তো বাড়ছে।

তাই ভাবছি একটা [illegible] কর তাড়াতাড়ি।

তুমিই বল, কি ব্যবস্থা করব।

[illegible] জগদীশ বলল: চল, রাঁচিতে ফিরে যাই।

তা কি সম্ভব?

সম্ভব করতেই হবে। এমন করে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

[illegible] দময়ন্তী বলল: আমারই কি ভাল লাগছে! কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।

জগদীশ চুপ করে থাকে। দময়ন্তীকে তার ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছা করে না।

[illegible] কাঠুরে চৌধুরী [illegible] দেখছে। কিন্তু [illegible] তাড়াতাড়ি। এসেই চেঁচামেচি শুরু করে: ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের খবর কি?

ঘরে ঢুকে দময়ন্তীকে দেখলে বলে: [illegible] আচ্ছা।

দময়ন্তী এসে বলে: কি বলছেন [illegible]?

আমিও ষড়যন্ত্র করব।

কার সঙ্গে? আপনার সাহেব আর মেমসাহেবের সঙ্গে তো?

কেন, ওরা কি মানুষ নয় যে আমরা কিছু পারব না?

ওরা আপনার আর যাই পারুক, ষড়যন্ত্র করতে পারবে না।

দময়ন্তী হাসবার চেষ্টা করে।

জগদীশ নীরবে তাদের কথাবার্তা শোনে কিন্তু যোগ দিতে পারে না। শরীরের মতো তার মনটাও বোধ হয় ঝিমিয়ে পড়েছে, সেই মন তার সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। কাঠুরে চৌধুরীর মতো সবল মানুষের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেও তার সঙ্কোচ হয়। তার মনে হয়, কথাতেও সে বুঝি হেরে যাবে। দময়ন্তীর সামনে এ পরাজয় তার সহ্য হবে না।

কাঠুরে চৌধুরী পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে ডাকল: এই হতভাগা সাহেব। তোরা কি মরেছিস নাকি!

লবাটের বৌ-এর হাসি শোনা গেল আড়াল থেকে। এরা তাকে ভয় পায় না, অশ্রদ্ধাও করে না। এমন সহজভাবে মেশে যে একই পরিবারের মানুষ বলে মনে হয়। প্রথম প্রথম দময়ন্তীর চোখে বড় বিসদৃশ ঠেকত, এখন দেখে দেখে সয়ে গেছে। তবু যেন কোথায় একটু খোঁচা আছে। দময়ন্তী এই আচরণ এখনও মেনে নিতে পারে নি।

চায়ের ট্রে নিয়ে লবাট বেরিয়ে এল। সে গাড়ির আওয়াজের অপেক্ষায় বাইরে বসে থাকে। দূর থেকে হর্নের শব্দ পেলেই গরম জল তৈরি করে। চা দিতে তার কোনও দিন দেরি হয় না।

কাঠুরে চৌধুরী আগে এসে বারাণ্ডায় বসত। নীরবেই বসে থাকত। চায়ের জন্য কোনদিনই তাড়া দেয় নি। এখন রোজই ভেতরের বারান্দায় এসে চেঁচামেচি করে। আর লবাটের বৌ হাসে আড়াল থেকে, সে জানে যে সামনে পড়লে কাঠুরে চৌধুরী তার রোজারাসনা সহ্য করবে না, চুলের মুঠি ধরে ঘুরপাক খাইয়ে দেবে।

লবাটকে দেখে কাঠুরে চৌধুরী বলল: ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে দিয়েছিস?

না।

না কেন?

আপনি না এলে ওঁরা চা খেতে চান না।

ব্যাটা মিথ্যেবাদী। চায়ের সময় চা না দিয়ে এখন মিথ্যেকথা বলছে। বলে ঘরের ভিতরে ফিরে এল।

দময়ন্তী বলল : না না, ও মিথ্যে কথা বলে নি ; আমিই তাকে বারণ করেছিলাম।

বুঝেছি।

দময়ন্তী হেসে বলল : কি বুঝেছেন ?

হতভাগা দেখছি আপনাদের দু'জনকেই হাত করেছে।

দময়ন্তী হাসতে লাগল, কিন্তু জগদীশ কোন কথা কইল না।

চা শেষ করে কাঠুরে চৌধুরী তার পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল। জগদীশ এতক্ষণ উসখুস করছিল কিছু বলবার জন্যে। এইবারে বলেই ফেলল : আপনাকে একটা অনুরোধ করব মিস্টার চৌধুরী।

সর্বনাশ : একে মিস্টার চৌধুরী, তার উপর অনুরোধ। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম মনে পড়ছে না।

দময়ন্তী হেসে বলল : আমার মুখ নিশ্চয়ই নয়।

বোধ হয় আপনারই মুখ দেখেছি !

আমার মুখ দেখলে বিপদে পড়তেন।

বিপদেই তো পড়েছি।

জগদীশ বলে উঠল : আমার কথাটা দয়া করে শুনবেন ?

কাঠুরে চৌধুরী গম্ভীর হয়ে বলল : নিশ্চয়ই শুনব।

বলে জগদীশের মুখের দিকে তাকাল।

জগদীশ বলল : আপনি তো আমাদের জন্য অনেক করলেন, এবারে আমাদের রাঁচি যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

আপনাদের যে খুবই কষ্ট হচ্ছে তা বুঝি।

দময়ন্তী বলে উঠল : ছিঃ ছিঃ, এ কি বলছেন আপনি !

জগদীশও বলল : আমাদের কষ্টের কথা আমি বলছি না, বলছি আপনার কষ্টের কথা।

আমার কষ্ট !

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল, এই হাসিতে এরা এখনও অভ্যস্ত হয় নি। মাঝে মাঝে চমকে ওঠে, আজও তারা চমকে উঠল।

জগদীশ বলল : আপনি হাসলেন যে ?

আপনার কথা শুনে।

মানে ?

এ কথারও মানে বলতে হবে ! আপনি কোমর ভেঙে বিছানায় শুয়ে আছেন, কষ্ট আপনার নয়, কষ্ট আমার। এ কথা আর কাউকে বলবেন না।

টাকার কথা জগদীশ বলতে পারল না, বলল : আপনার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।

ঋণ কিসের ?

জগদীশ করুণভাবে হাসল। বলল : ক্ষমতা থাকলে আমিও এবারে আপনার মতো করে হাসতাম।

কেন ?

কিসের ঋণ, তা কি আপনাকে বোঝাতে হবে ?

কাঠুরে চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল : আপনার কাছে আর বসা যাবে না দেখছি। এ ছাড়া আপনি আর কোন কথা বলতে পারেন না।

জগদীশ বলল : আপনি রাগ করলেন ?

রাগ করাই তো উচিত।

না, না, রাগ করলে আপনি আমার উপর অবিচার করবেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কাঠুরে চৌধুরী বলল : এখান থেকে চলে যেতে চাইলেও আপনি আমার ওপর অবিচার করবেন।

দময়ন্তী হাসল না, কোন কথাও বলল না। কাঠুরে চৌধুরীকে সে আজও চিনতে পারে নি।

ছাব্বিশ

দময়ন্তী একদিন রাঁচি ঘুরে এল। জীপে করে ওরা তাকে ঘুরিয়ে আনল। সকালে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় এল ফিরে। জগদীশকে দেখাশুনো করল লখাই। কাঠুরে চৌধুরীও আজ বেশি সময় রইল জগদীশের কাছে।

একসময় জগদীশ বলল : আমার চাকরিটা বোধ হয় গেল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল না যে প্রাণটাই যেতে বসেছিল। বলল : চাকরির রস আমি বুঝি না।

রস থাকলে ঠিকই বুঝতেন। আমাদের উপায় নেই বলেই চাকরি করি।

বলেন কি : কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হল : আপনারা হলেন মহাত্মা গান্ধীর দেশের লোক, হাত বেঁধে। আপনারা যদি এ কথা বলেন তো আমরা দাঁড়াই কোথায় !

জগদীশ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল : মিঃ ভট্টাচার্য রাজি হয়ে গেলে আমার একটা ব্যবস্থা করতে পারতেন।

মিঃ ভট্টাচার্য কে ?

আমার ওপরওয়ালা।

একটু থেমে বলল : এমন দুর্ভাগ্য যে, এই অ্যাক্সিডেন্টের দিন কয়েক আগে তিনি ছুটিতে চলে গেলেন। রাঁচিতে আর ফেরেন নি করবেন না।

তাঁকে একটা খবর দেওয়া যায় না ?

তাঁর ঠিকানা জানি নে। আর ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকবেন বলে মনে হয় না। হয় তো সিংহলে গিয়েছেন, কিংবা জাভায়।

কাঠুরে চৌধুরীর কাছে এ সংবাদ বড় আশ্চর্যের মনে হল। ভারতবর্ষে বেড়াতে যাবার কি স্থান নেই যে এমন বেয়াড়া জায়গায় বেড়াতে যেতে হবে। বলল : ভারি মজার লোক তো !

সত্যিই মজার লোক। স্ত্রী মারা গেছেন, ছেলেমেয়েদের বোর্ডিংএ রেখে পড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝেই এমনি বেরিয়ে পড়েন। এমন এমন জায়গায় যান, যেখানে সচরাচর কেউ যায় না। কিছুদিন থেকে ভারতের সংস্কৃতির কথা পড়ছিলেন। কয়েক শো বছর আগে এদেশের সভ্যতা নাকি সাগর পেরিয়ে বিদেশে গেছে। শুধু সিংহলে নয়—শ্যাম, মালয়, যবদ্বীপে। এই সবই দেখতে গেছেন।

দেখে কি করবেন ?

আনন্দ পাবেন। ফিরে এসে গল্প করবেন আমাদের কাছে।

ব্যস্ ?

আবার কি : বলবেন, এই তো জীবন। ও দেশের জীবনও তিনি দেখে আসবেন। বলবেন, ভারি চমৎকার ও দেশের মেয়েরা, কিংবা ভারি ভাবুক ; কিন্তু খারাপ কিছুতেই বলবেন না।

জগদীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ পরে জগদীশ বলল: ঐ মানুষটার দূরদৃষ্টি ছিল। মোটর কিনতে আমাকে বারণ করেছিলেন।

কেন?

তিনি বলতেন, সংসারকে তুমি বাঁধো, কিন্তু সংসার যেন তোমাকে বাঁধতে না পারে।

কাঠুরে চৌধুরী এ কথায় মানে বুঝল না।

জগদীশ বলল: সংসারে থাকো একটা খাটিয়া আর লোটা-কম্বল নিয়ে। সন্ন্যাসীর মতো গৃহীর জীবনটা উপভোগ কর বৈরাগীর মতো মন নিয়ে। দরকার হলেই যেন ঘরের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে পার। দময়ন্তী বলত, না দাদা, এ কখনও সম্ভব নয়। দময়ন্তীকে তিনিই শিখিয়েছিলেন দাদা বলতে।

কি উত্তর দিতেন মিস্টার ভট্টাচার্য?

তিনি বলতেন, দুনিয়ায় সবই সম্ভব। সন্তানের জন্য মা নিজের প্রাণ দিতে পারে হাসিমুখে, কিন্তু সেই সন্তান চলে গেলেও তো মা হাসিমুখে জীবন কাটায়। জীবনের ক্ষত জীবনই মিলিয়ে দেয়, নিজেই করে নিজের ক্ষতিপূরণ।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: সন্তানের জন্য মা সারাজীবন কাঁদে।

মিস্টার ভট্টাচার্য এ কথা মানেন না। বলেন, চোখের জল বৃষ্টির জলের মতো। বর্ষায় বান ডাকে, তারপর খটখটে শুকনো। কখনও সখনও মেঘ জমে এক-আধটু বৃষ্টি হয়। সে নিতান্তই সাময়িক।

কাঠুরে চৌধুরী তার মাকে আজও ভুলতে পারে নি, এখনও মাঝে মাঝে মায়ের কথা মনে হয়। বিপদের সময় যেমন ভগবানকে মনে পড়ে, তেমনি মাকে মনে পড়ে কষ্টের সময়। মনে হয়, মা থাকলে তার কোন কষ্ট থাকত না। সেই সঙ্গেই তার বাবার কথাও মনে পড়ে। বাবাকে সে আজও ক্ষমা করতে পারে নি। আজও মাঝে মাঝে তার প্রতিহিংসা জানাবার ইচ্ছা করে। জিজ্ঞেস করল: আপনার বাবা-মা কোথায়?

জগদীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে: তাঁরা বেঁচে নেই।

কাঠুরে চৌধুরী এ কথা ভুলে গিয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্টের পরের দিনই সে দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করেছিল খবর দেবার জন্য। দময়ন্তীই তাকে বলেছিল যে তার বাবা-মা বেঁচে নেই। বড় ভাই আছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও সম্বন্ধ গেছে ঘুচে। তাদের বিবাহ নিয়েই বিবাদ হয়েছে। তাঁকে খবর দিয়ে লাভ নেই। নিজের বাপ-মার কথা হতেই সে অন্যমনস্ক হয়ে জগদীশকে এই কথা জিজ্ঞাসা করে ফেলেছে। জগদীশ বোধ হয় দুঃখ পেল তার কথায়। তাই তাড়াতাড়ি বলল: চিরদিন তাঁরা বেঁচে থাকেন না। আমার মা তো আমার শৈশবেই মারা গেছেন।

আপনার বাবা?

বাবার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

কেন?

তাঁর কথা উঠে পড়লে আমি লজ্জা পাই। তিনিও বোধ হয় আমার নামে লজ্জা পাবেন।

জগদীশ বুঝল যে এ সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চাওয়া উচিত নয়। তাই বলল: আমার দাদা খুব বড়লোক। কলকাতায় তাঁর অনেক সম্পত্তি। ইচ্ছা করলে আমার মতো ইঞ্জিনীয়ার তিনি নিজেই কয়েকটা রাখতে পারেন।

এই দাদার কথাটি কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর কাছে শুনেছে। বলল: তাঁর সম্পত্তিতে আপনারও নিশ্চয়ই ভাগ আছে।

জগদীশ একবার ঘরের চেহারাটা দেখে নিল। ঘরে এখন আর কেউ নেই। বলল: আছে বৈ কি। দু'ভাই-এ আমাদের সমান ভাগ।

তারপরে একটু থেমে বলল: কিন্তু কি জানেন! ও সম্পত্তির আমি ভাগ চাই নে। চাকরি করতে যেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সেদিনই তাঁকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছি। পরের জিনিষের ভাগ নিয়ে কোন গৌরব আছে! নিজের পায়েই আমি দাঁড়াতে চাই।

নিজের পায়ে জগদীশ আর কোনদিন দাঁড়াতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। তাই কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, এ অভিমান আর তার সাজে না। বলল: এখন একটা খবর দিলে দোষ কি!

জগদীশ যেন চমকে উঠল: না না, তার দরকার নেই। আর ক'টা দিন পরেই আমি উঠে দাঁড়াতে পারব। আর আপনার চেয়ে কি আর কেউ বেশি করতে পারবে!

দময়ন্তীর কথা মনে হতেই কাঠুরে চৌধুরী চুপ করে গেল। দময়ন্তী তাকে অন্য কথা বলেছিল। তাই বলল: থাক তবে। দূরের মানুষকে ব্যস্ত না করাই ভাল।

বিকেল গড়িয়ে এখনও সন্ধ্যা হয় নি। জগদীশ জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বলল: বেলা এখন কত হবে?

পাঁচটা বাজে নি।

আমার মনে হচ্ছে, পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

কেন বলুন তো?

আপনি তো অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, আপনি ফিরবার পরেই অন্ধকার হয়ে যায়।

আজ আমি অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগে ফিরেছি।

তাই নাকি!

ভাবলাম, আপনি একা আছেন, আপনার সময় হয় তো কাটছে না। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

সত্যিই আজ সময় কাটছিল না। কিন্তু দময়ন্তীর এত দেরি হচ্ছে কেন?

কই, দেরি আর কি। যাতায়াতে অনেকটা পথ তো। তার ওপর সাবধানে যেতে বলেছি।

আপনার ওরা বেশ ভাল ড্রাইভার।

অনেক দিনের পুরণো ড্রাইভার, খুব বিশ্বাসী।

তা বুঝেছি। তা না হলে কি আর অমনি দময়ন্তীকে ছেড়ে দিতেন!

কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল: কিছু খাবেন?

না, এখন কিছু খাবার দরকার নয়। আমি ভাবছি, দময়ন্তী না গেলেই পারত। রাঁচিতে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যবস্থা করবে। অফিসে আর আপনি খবর দিয়েই দিয়েছিলেন।

কাঠুরে চৌধুরীর এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল। রেজেস্টি, তাকে চিঠি গেছে, তার সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেট। রসিদ ফিরে এসেছে। কিন্তু অফিসের কোন উত্তর আসে নি। জগদীশের কোন বন্ধু-বান্ধবও একটা খবর নেয় নি। এখানে এসে দেখে যাওয়া দূরের কথা, একখানা চিঠি লিখেও কেউ খবর চায় নি। কাঠুরে চৌধুরী এটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে করেছে। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ দেখতে পায় নি। স্বার্থ নিয়েই পৃথিবী চলছে, পরার্থে পরিশ্রমের নাম মূর্খতা। এখনও কিছু মূর্খ বেঁচে আছে বলেই পৃথিবীটা মরুভূমি হয় নি। প্রয়োজনে একটু আশ্রয়, একফোঁটা অশ্রু ও খানিকটা ভালবাসা পাওয়া যায়। মানুষ তো এই নিয়েই বাঁচে।

দময়ন্তীকে কাঠুরে চৌধুরী এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল: কই, রাঁচি থেকে তো কোন খবর এল না!

আসবে কি: দময়ন্তী সন্দেহ প্রকাশ করেছিল: বোধ হয় আসবে না।

কেন?

ওর বন্ধু কে আছে!

কেউ নেই।

সরকারি বন্ধু আবার বন্ধু নাকি! এখন সবাই আমাদের ভয় পাচ্ছে, পাছে কিছু সাহায্য চাই।

দময়ন্তীর কথায় কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হয়। নরোত্তম খেমলানির বাড়িতে যখন সে তাকে প্রথম দেখেছিল, তখন কি সে এসব কথা জানত? কবে শিখল এসব কথা। এতো মিথ্যা নয়! দুঃখ পেয়েই কি জীবনে সত্য মেলে! অল্পদিনে দময়ন্তী অনেক দুঃখ পেয়েছে। তার জন্যে দুঃখ হয় কাঠুরে চৌধুরীর।

জগদীশের কথার উত্তরে বলল: তা দিয়েছিলাম।

তবে আর কি! একদিন দেখবেন, হুট করে সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে।

কাঠুরে চৌধুরী জানে যে আসবার হলে তারা এতদিনে অনেকবার আসত। কিন্তু সে কথা তার মুখের উপর বলতে পারল না। জগদীশ যদি তার আত্মীয়বন্ধুর কথা ভেবে গর্ব বোধ করে, তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। বরং লাভ আছে জগদীশের। নিজেকে সে নিঃসহায় ভাবতে পারবে না।

জগদীশ হঠাৎ প্রশ্ন করল: আপনার বুঝি আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?

অনেক আছে।

কই, তাদের কারুকে যে দেখি না।

কেউ আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে নি।

কেন?

দোষ আমারই। আমিই সবাইকে অস্বীকার করেছি। আমার দাদা জার্মানীতে আছেন। দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বিদেশে গিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি। সেখানেই বিয়ে-থা করে তিনি সংসারী হয়েছেন।

কোন সম্বন্ধ রাখেন নি আপনার সঙ্গে?

রেখেছেন। প্রতি বছর বিজয়ার পরে একখানা চিঠি পাই। আমিও তার উত্তর দিই।

আর সবাই?

আর সবাই!

কাঠুরে চৌধুরীর মুখের চেহারা বিকৃত হল। গরিলার মতো হিংস্র বীভৎস। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে জগদীশের ভয় হল। আর কোন প্রশ্ন করবার সাহস হারিয়ে ফেলল।

কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী নিজেকে সামলে নিয়েছিল। বলল: আর কারও কথা জানতে চাইবেন না। আর কারও খবর আমি রাখি না।

জগদীশ জানালার দিকে আবার তাকাল। আকাশের আলো মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। পাশের ঐ গাছটার ডালে পাখির বাসা আছে। অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে কলরব করছে। এই সময় রোজই তারা কলরব করে। জগদীশও রোজ তাদের কলরব শোনে। চোখ বন্ধ করে থাকলেও সে বলতে পারে যে সন্ধ্যা নেমেছে, আর পাখিরা ফিরে এসেছে তাদের নীড়ে। দময়ন্তী এখনও ঘরে ফেরে নি।

এক সময় জগদীশ জিজ্ঞাসা করল: আপনার জীপটা তো পথে কখনও আটকায় না?

পথে আটকাবে কেন?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি।

কাঠুরে চৌধুরী এইবারে বুঝতে পারল যে দময়ন্তীর জন্যেই জগদীশ ব্যস্ত হচ্ছে। বলল: পথ তো বিপজ্জনক নয়, এইবারে ফিরে আসবেন।

জগদীশ যে এই আশ্বাসে ভরসা পেল না তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। সে অন্য কথা ভাবছিল। কি দরকার ছিল দময়ন্তীর রাঁচি যাবার! এমন কি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আছে যা না আনলে অসুবিধা হয়। কার সঙ্গেই বা দেখা না করলে নয়। এ শুধু দময়ন্তীর একটা জেদ। এখানে তার সেবা করে করে বোধ হয় হাঁফিয়ে পড়েছে, তাই গেল রাঁচিতে বেড়াতে। ফিরে আসবে তো?

এ প্রশ্ন মনে আসতেই জগদীশ চমকে উঠল। দময়ন্তী যদি ফিরে না আসে! কিন্তু কেন আসবে না! ফিরে না আসার কি কারণ থাকতে পারে। আজ না হয় ভাগ্যদোষে সেই শয্যাগত, তার বদলে দময়ন্তীও তো জখম হতে পারত! তা হলে কি জগদীশ তাকে পরিত্যাগ করে চলে যেত! না তাকে সঙ্গে নিয়েই রাঁচি ফিরত।

কেন সে বাঁচি ফিরতে পারবে না। এমনি করেই শুয়ে-শুয়েই তো সেও যেতে পারত। দময়ন্তী তাকে নিয়ে যাবে না, কাঠুরে চৌধুরীও দেবে না যেতে।

কিন্তু এই লোকটার কি স্বার্থ তাকে আটকে রাখায়। তাকেই তো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে, আর খরচও হচ্ছে তারই। তবু কেন বিরক্ত হয় না এই ব্যবসাদার মানুষটা। সে কি কোন লাভের অঙ্ক কষছে!

ছিঃ ছিঃ, কাঠুরে চৌধুরীর সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবলে অন্যায় হবে। বড় খোলা-মেলা মানুষ, সরল নিরহঙ্কার। দময়ন্তীও নিশ্চয়ই তাকে ভাল ভাবছে। কিন্তু দময়ন্তী একথা কোনদিন বলে নি। সে তো তাকে আরও বেশি দেখছে, আরও বেশি সময় কাটায় তার সঙ্গে। বাইরের বারান্দায় সে তাদের গল্প শোনে, আর শোনে তাদের হাসি। কাঠুরে চৌধুরীর হাসিটা তার ভাল লাগে না। ভয় করে। কিন্তু দময়ন্তী যেন ভয় পায় না!

কাঠুরে চৌধুরী বলল: শুধু শুধু আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন।

জগদীশ চমকে আবার চেতনার জগতে ফিরে এল। বলল, কি বললেন?

বলছি, এমন কিছু রাত হয় নি যে ব্যস্ত হওয়া উচিত।

জগদীশ এ কথার উত্তর দিল না।

দময়ন্তীর ফিরতে একটু দেরিই হয়েছিল। জগদীশ তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখেই চটে উঠল, বলল, এত হাঙ্গামা করবার যে কি দরকার ছিল, আমি বুঝতে পারি নে।

দময়ন্তীর মুখে হাসি ছিল না, বেদনাও না। জগদীশের কথার কোন উত্তর দিল না।

জগদীশ বলল: উত্তর দিচ্ছ না যে?

কি উত্তর দেব বল।

বাইরে কাঠুরে চৌধুরী—এতক্ষণ হৈ-চৈ করছিল: হতভাগারা সব মরে গেছে। কাজের সময় একটা লোকও নেই। জিনিষপত্র সব তুলতে হবে না! লবাট, এই লবাট!

জীপের পেছন থেকে লবাট মাল নিয়ে বেরিয়ে এল। আর দরজার আড়াল থেকে তার বৌ উঠল হেসে।

কাঠুরে চৌধুরী আরও চটে উঠল: তা নবাব পুত্তুরের সাড়া দিতে কি হয়েছিল! বলে জগদীশের ঘরে এসে ঢুকল।

জগদীশ একটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: মুখ হাতটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিন। আমি খাবার দিতে বলছি। বিকেলে চা খেয়েছেন তো?

দুপুরের খাবার লবাট বেঁধে দিয়েছিল। চাও দিয়েছিল ফ্লাস্কে। তবু তার দুর্ভাবনা দেখে দময়ন্তী হাসল। কোন উত্তর দিল না।

জগদীশ দেখল, দময়ন্তী আর অপেক্ষা না করে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

[ক্রমশ।

আকাশ অনেক উঁচু

সুধীর বেরা

আকাশ অনেক উঁচু,
পৃথিবী অনেক বিশাল,—
তার মাঝে স্থান খুঁজছি,
আমার প্রকৃত স্থান।

যা চাইলাম হল না।
যা চাই না
মনে-প্রাণে
তাই বারে বারে হ'য়ে বসে।
নিয়তি মানি না,
তাই কোন সান্ত্বনাও পাই নি।

ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে
বড়ই জড়িয়ে গিয়েছিলাম
যেমন করে গুটিপোকা
নিজের জালে নিজে জড়িয়ে মরে।
নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ
বড় বেশি করে প্রাণে আঁচড় কাটল।

বাইরের জগতে তাকানো হয় নি—
নিজের দৈন্য বিকটতর হয়,
দাঁত বের কোরে ব্যঙ্গ করে।
গণ্ডী আরো ছোট হয়
দম বন্ধ হ'য়ে আসে।
এ অবস্থা দুঃসহ।
না বাঁচা, না মরা।
শেষে মরিয়া হ'য়ে
গণ্ডীর প্রাচীরে করলাম
করাঘাতের পর করাঘাত।
প্রাচীরটায় ফাটল ধরল,
ঢুকলো একঝলক আলো।
আলোর ডাক এলো—
পৃথিবী অনেক বিশাল,
আকাশ অনেক উঁচু,
জীবনে অনেক রঙ, অনেক আলো।
বৃথাই গণ্ডীতে আবদ্ধ হ'য়ে মরা।

ব্রাগুন। আচ্ছা, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি অর্থে আপনি কি বলতে চাইছেন ?

মিলার। এমন একটা জিনিস যা শুধুমাত্র জনসাধারণের মনে কতটুকু সাড়া জাগিয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষমতানুসারে বিচারিত হবে। এই হচ্ছে উপন্যাস, এই কবিতা, এই চলচ্চিত্র। পুরণো ধারণা যে—প্রতিটি জিনিসেরই একটা নিজস্ব মূল্য তাই সাধারণ দর্শককে না টানতে পারলেও এর টিকে থাকবার দাবী থাকে—এখন পরিত্যজ্য। ইংলণ্ডে আপনাদের বি বি সি'র ঠিক অনুরূপ অবস্থা। আপনারা এটা বাঁচিয়ে রেখেছেন কারণ আপনারা ভাবেন যে টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না। এখন ঠিক এর পাশেই সস্তা টেলিভিশন—আমেরিকার একটি সুন্দর আবিষ্কার যা সব দর্শকদের টানছে। আমি ভেবে দেখেছি কেউ যদি প্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে কোন সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে দেশের অর্থনীতির সংগে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। ওরা আপনাকে বলবে গণতন্ত্রের মূল্য দেশের জনগণ এই চায় এবং গণতন্ত্রের আদর্শানুসারে তাদের তা পাবার অধিকার আছে—এমন কি নিজের সরকারের কাছ থেকেও তা ছাড়া আপনি কে যে আপনার কথা ওরা শুনবে ! এই দেশের অভিজ্ঞতা অনুসারে বলতে পারি যে সেই যুক্তির

মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার-৩

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হেনরি ব্রাগুন

বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন। তার একটা কারণ এই যে এটা নগ্ন লোককেও নৈতিক ক্ষমতা দেয়। আমি বলছি না যে এই রকম ঘটনা খারাপ কিন্তু বেশি সংখ্যক ভোটের ওপরে নির্ভর করা অর্থ অধিকতর দায়িত্ব নেওয়া। যদি একমাত্র জনপ্রিয়তার ওপরই মূল্যায়ন নির্ভর করে তা হলে চর্বিতচর্বণ ও অসত্যকে পুনরাবৃত্ত করা ছাড়া আর কিছু করা দিন দিন-ই কঠিনতর হয়ে উঠবে। সম্পূর্ণ নূতন মতবাদ প্রবল বাধার সম্মুখীন হবেই। এই এর সংকল্প। বিক্রীর আর্ট হচ্ছে বাধা বিমুক্ত হবার আর্ট।

ব্রাগুন। কি আপনাকে লিখতে প্রেরণা দেয়।

মিলার। আমি যদি তা জানতে পারতাম তা হলে হয় তা' এর প্রারম্ভ সূচনা আরও ভালোভাবে করতে পারতাম। আমাকে তো এর কল্পনার ওপরে নির্ভর করতে হয়। আমি সত্য সত্যই জানি না। যে বিষয়বস্তু আমি ভালোভাবে জানি তা নিয়ে আমি লিখতে পারি না। যদি সেই বিষয়টাকে আমি জানতে পারি—যদি আমার অভিজ্ঞতায় শেষটুকু পর্যন্ত ধরা পড়ে যায় তাহলেও আমি এ নিয়ে লিখতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় যেন একই গল্প দু'বার করে বলা হচ্ছে। লিখতে লিখতেই লেখাকে আমি আবিষ্কার করি। নিজে নিজেকেই বিস্মিত করাতে হয় এবং এটা খুবই কঠিন ব্যাপার—যখন তুমি একটা খুব কোণে গিয়ে বলতে পারো যে তোমার ভাবনার নীচের কোষ আবিষ্কার করা তোমার পক্ষে অসম্ভব এবং তোমার মনে একটা আকারহীন ভাবনা আছে যা নিজে আর্ট নয়। এটা অনির্বচনীয় এবং এটাকে ছেড়ে দিতে হবে যতক্ষণ না অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে এ একটা আকারবিশিষ্ট হয় এবং পরস্পরের মনে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয়। এ ভাবে নবকলেবরে বেঁচে উঠতে এর এক, দুই, তিন, চার বৎসরও লাগতে পারে।

ব্রাগুন। তা হলে নাটক লিখতে আরম্ভ করে আপনি নিজেই জানেন না কোথায় এর শেষ।

মিলার। না জানি না। মোটামুটি একটা ধারণা থাকে··· যেমন ধরুন কোন নাটকের নায়ক থাকবে, তার মৃত্যুও হবে, কিন্তু আমাকে নিশ্চিত জানতে হবে বিপর্যয়ের বাজটি কোথায় কিন্তু গল্পের গতি

মেরিলিন মনরো : খুব কাছ থেকে

সম্বন্ধে কিছুই জানার দরকার হয় না। নাটকের আকৃতি মানে নাটকের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত নাটকের অন্তরেই সৃষ্ট হতে থাকে।

ব্রাগুন। এই ধরুন নতুন চিত্রনাট্য 'মিসফিট্' লিখবার সময়ে আপনি কি স্ত্রীর কথা ভেবেছিলেন, ওর জন্ত একটা চরিত্র সৃষ্টি করবার কথা।

মিলার। ওখানে আমার দ্বৈত সত্তা কাজ করেছে—কারণ আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল যে ও পর্দায় যা খুশি তাই ফোটাতে পারবে।

ব্রাগুন। মিসেস মিলার, রঙ্গমঞ্চে আপনার কোন আকর্ষণ আছে কি?

মনরো। খুব বেশি।

ব্রাগুন। কেন? এ দুইয়ের মধ্যে কোথায় প্রভেদ।

মনরো। অভিনেতা স্টুডিওতে যোগদানের পরে আমি একটা ছোট থিয়েটারে কাজ করি। দেখলাম একটা দৃশ্য—মাত্র একটা দৃশ্য করলেও এর যেন একটা অখণ্ড ধারাবাহিকতা আছে। গোড়াতেই করবার বেশ কিছু আছে এবং এটা যেন বড় হয়—পূর্ণতা লাভ করে এবং সেখানে এমন একটি স্থান আছে যেখানে তুমি যাচ্ছ—এমন একটি স্থান যেখানে তুমি ছিলে—নাটকটির সব ঘটনাতেই পরস্পর সম্পর্কিত। চলচ্চিত্রের দৃশ্যগুলি আপনার তো জানাই আছে—কাটা কাটা এবং প্রায়ই পরিণতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। সেজন্যই, কোন তৃপ্তি বোধ হয় না। রঙ্গমঞ্চ অনেক অর্থ ও ইঙ্গিতবোধক—অভিনেতাদের পক্ষ থেকে আমি বলছি।

ব্রাগুন। আপনি কি কোন নাটক করবেন স্থির করেছেন?

মনরো। না। সে সম্বন্ধে কিছু ভাবি নি।

মেরিলিন মনরো কথা বলছেন

ব্রাগুন। আমি ভাবছিলাম আপনি খুব সহজেই একটা করতে পারেন।

মনরো। আমার এখনও নাটক করবার মতো প্রস্তুতি আছে বলে মনে হয় না।

মিলার। আমার পক্ষে কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে লেখা অসম্ভব—কারণ, আমার কল্পনা সম্পূর্ণ পৃথককেন্দ্রে একীভূত—সেই চিরন্তন ধাঁধার। সে সময়ে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কথা মনের কোণেও স্থান পায় না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি যখন 'মিসফিট' প্রায় শেষ করে এনেছি তখন আমার আনন্দের সঙ্গে মনে হয়েছিল যে এই চরিত্রে মেরিলিনকে খুব মানাবে।

ব্রাগুন। ফরাসী কায়দায় যা গোলকধাঁধা সেই অর্থে কি?

মিলার। এই অর্থে গোলকধাঁধা—না, হয় তো অপেক্ষাকৃত ভালো কথা হচ্ছে অমৌলিক অবস্থা—যেখানে এর শক্তি 'বি' কে নাড়িয়েছে—যা আবার 'এ' কে 'সি'তে রূপান্তরিত করেছে—যা আবার 'ডি' সৃষ্টি করেছে এই রকম আর কি। জীবনের শক্তিগুলো কি রকম অজ্ঞতার ভাণ করে থাকে সেই বিষয়ের ইঙ্গিতে নাটকটি লেখা—এবং এতে মনের অবরুদ্ধ বিদ্রূপ, মর্মান্তিক পরিহাস সবই পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়।

ব্রাগুন। তা'হলে এটি প্রকৃতই কষ্টকর জন্মলাভ, তাই না।

মিলার। হ্যাঁ, বক্তব্যটা তাই ঘটে। আমি অনর্গল লিখি, খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। একটি নাটক—বিশেষত এই রকম একটি চিত্রনাট্য লিখবার যথার্থ সময় প্রায়ই আট সপ্তাহ—কিংবা তার চেয়েও কম—কিন্তু এ হচ্ছে একদম শেষের দিকের সহজ কাজ। তখন তো আমি জীবনের দেওয়ালগুলি দেখতে পেয়েছি—তাদের অনুভব করতে পারছি—আমার ঘর পূর্ণ হয়ে গেছে এবারে আমি অগ্রসর হ'তে পারি। যখন কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে না তখনই মুস্কিল হয়।

ব্রাগুন। আপনি কি মনে করেন যে সাহিত্যে নাটকই একমাত্র আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গীর দেশজ প্রকাশ।

মিলার। এটা আমেরিকান জীবনের কোন স্তরের কথা আপনি বলছেন তার ওপরে নির্ভর করে। প্রত্যেক জাতেরই নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে চিরাচরিত প্রথাগত ধারণা আছে। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, আমেরিকাবাসীরা নিজেদের মুক্তহস্ত, ন্যায় সমর্থনকারী, জিনিষ-পত্র কেনা সম্বন্ধে খেয়ালহীন, অমিতব্যয়ী—কিন্তু মূলত ভালো লোক ও আশাবাদী ভাবে। হ্যাঁ, এর অনেকটাই সত্য। এটাই একটা জানার স্তর। কিন্তু এই স্তরের নীচে আর একটি স্তর আছে যার ইঙ্গিত স্বল্প কয়েকটি চলচ্চিত্র ও নাটকে আছে কিন্তু তুলনায় চলচ্চিত্র থেকে নাটকেই বেশি। সেই স্তর যা আমাদের চকিত বিস্ময়, আমাদের নির্জন একক গ্রাম্যতা, আমাদের উদ্দেশ্য অন্বেষণের হাহাকার প্রকাশ করে।

ব্রাগুন। আপনি কি ফিল্মে ওয়েস্টার্ন ছবির মতো—রঙ্গমঞ্চেও এ রকম খাঁটি দেশীয় কিছু খুঁজে পেয়েছেন?

মিলার—ওয়েস্টার্ন ছবিতে ওয়েস্টার্ন ছবিই আজকাল যুক্তপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা মেকি—এ কথা আক্ষরিক সত্য। গো-প্রজননকারী ও রাখাল বালকের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। বরং পশ্চিমের বেশি

সংখ্যক লোক ব্যবসা ও শ্রমশিল্পে নিয়োজিত। অবশ্যই পশ্চিমের এই ওয়েস্টার্নরা জননায়ক—কিন্তু তারা বিশেষ কোন ভাবের রূপ দেয় না—শুধু যেন একটা স্মৃতিচিহ্ন এবং লোকরা ভাবতে ভালোবাসে যে, অতীত এ রকম ছিল। এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যে উদাহরণের কথা মনে হচ্ছে, তা সামন্ততন্ত্রযুগের—যখন 'নাইট'দের কোন অস্তিত্ব ছিল না অথচ লোকে সেই সব চরিত্র যেমন জোয়ান অফ আর্ক, রাজা আর্থার আরও এমনিই সব লোকের কথা বলতো। শত শত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রে এমন কিছু ছিল না কিন্তু তবুও তাদের স্মৃতি বিশেষ একটি স্থান, পরিচয় এবং আশাপ্রদ ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার মনে হয়, সেলসম্যানরাই আমেরিকান জীবনে অধিকতর জাতীয় চরিত্র বিশিষ্ট জীবনদর্শন ও সংখ্যা দু'দিক থেকেই। ঈশ্বর জানেন, জনপ্রতি একটি রাখাল বালক এক লক্ষ সেলসম্যান।

ব্রাগুন। আচ্ছা এক মিনিটের জন্য আমরা আধুনিকতর একটি সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি। আপনি কি মনে করেন যে, এদেশে ম্যাকার্থিবাদ মৃত?

মিলার। তাই বটে। দু'টো ব্যাপার ঘটেছে: একটা হচ্ছে যে সৈন্যদল তাঁকে পরাস্ত করেছে—দুঃখের বিষয় এরা উদার, বামপন্থী কিংবা তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকরা নয়; অপর একটি রক্ষণশীল দলই তাঁকে পরাজিত করেছে। উনি-যুক্ত প্রদেশের সরকারকে যে পরিমাণ আঘাত করে ফিরে এসেছেন, তা আর কেউ পারতো বলে আমি বিশ্বাস করি না। যা হোক না কেন, ম্যাকার্থির উত্তরাধিকারীরা এখনও আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু জনগণের সহানুভূতি ছিল না, যাতে কয়েক বৎসর আগে তারা সঙ্কটকাল বলে ঘোষণা করতে পারতো।

ব্রাগুন। আপনি বলতে চাইছেন উনি অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছেন।

মিলার। হ্যাঁ, উনি অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছেন, তাঁর এমন একদলের সঙ্গে শত্রুতা হয়েছিল—যাদের অনেকেরই মতবাদে মূলত তাঁর সঙ্গে অমিল ছিল। আমার নিজের মত হচ্ছে যে, তিনি শেষের দিকে বিকৃতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে ছিলেন, নিজের ক্ষমতা ও শক্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না।

ব্রাগুন। তা হলে কি আপনি বলতে চান যে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

মিলার। যদি কোন তীব্র আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব আমাদের পিষে ধরে আমার মনে হয় এরকম কিছু আবার ঘটতে পারে—হ্যাঁ, সত্যই পারে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এখানে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ভোট নেওয়া হয় যেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি তারা পছন্দ করে কি না? তাদের জানানো হয় না যে প্রকৃতপক্ষে এগুলি নাগরিক অধিকারবধের তালিকা? অধিকাংশ লোকরা বিপক্ষে ভোট দেয়। তাদের মতে এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি এবং বৈপ্লবিক। সেই মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে এরকম কোন লক্ষণ দেখি নি। মোট কথা এই যে, যতদূর জানি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কোন সাংঘাতিক পরিবর্তন হয় নি।

ব্রাগুন। তবুও, তিনি আমেরিকানদের চোখে খারাপ বলে প্রচারিত।

মিলার। হ্যাঁ, তিনি তাই বটেন, কিন্তু তিনি যা করেছেন সেটা নয়। যেমন ধরুন, সরলোবে খারাপ আমি বলতে চাই আগে যত লোক বিশ্বাস করতো এখনও তত লোক করে। জানি না অন্যভাবে বললে তারা ম্যাকার্থিবাদ চিনতে পারতো কি না?' যখন কোন ব্যক্তিকে মূলনীতি অনুসারে পরাজিত করা যায় না, তখন সে শুধু ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হয়—তার প্রেতাত্মা জনদর্পে ঘুরে বেড়ায় যতদিন না সে যে মূলনীতি লঙ্ঘন করে অন্যায় করেছিল সে সম্বন্ধে লোকের সম্যক জ্ঞান হয়। কিন্তু ব্যক্তির পরাজয় কখনও সেভাবে হয় না অন্তত অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে হয় না।

ব্রাগুন। অল্প কিছুদিন আগে আমি পিটার উস্টিনোভের সঙ্গে আপনারই একটা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে, আমেরিকান নাট্যকাররা প্রয়োজনীয় সামাজিক নাটক লেখে, কিন্তু তারা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে বেশিমাত্রায় ওয়াকিবহাল নয়। পিটারের মতে আপনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে অনুভূতির অভাব আছে—এবং এভাবে বললে চেকভ সম্বন্ধেও বলা যায় যে, তিনি দেউলিয়া হবার প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান ক্লান্ত একদল জমিদারকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, বিপ্লব আরম্ভ হবার পরেই এগুলি খুব যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা বলে গৃহীত হয়েছিল। উনি বলেন, ওদের স্বভাবই এরকম—যে ওরা

হাস্যময়ী মেরিলিন

হাঁবতে ভালোবাসে যে পাঁচা ছোটগল্প না লিখে উপন্যাস লিখলে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্থান আরও দৃঢ়ীকৃত হতো। পিটারের মতে লেখকের কাজ পাঠকের মনে চিন্তাধারা সঞ্চারিত ও চালিত করা, সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং এখানেই শেক্সপীয়ারের মহত্ত্ব যে, তিনি কখনও কোন উত্তর দেন নি। তিনি বলেছেন, 'হওয়া অথবা না হওয়া, কিন্তু কোন সমাধান দেন নি।

মিলার। উস্টিনোভ চেকভের সম্বন্ধে ভুল করেছেন' এবং আমার সম্বন্ধেও। আমি বুঝতে পারি না কেন তাকে অনুভূতিহীন বলা হবে যদি সে কোন কার্যকারণ এবং কোন আশার আশায় ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজের দিকে তাকায়। উল্টোটাই বরঞ্চ সত্য, বলে মনে করি। আমার মনে কখনও এই ভ্রান্তধারণা নেই যে, চেকভ কতকগুলি ক্লান্ত জমিদারকে নিয়ে লিখেছেন। বলশেভিকরা তাঁকে এই অপবাদ দিয়েছে এবং রক্ষণসাধক রক্ষণশীলরা আশা করেছে যে এটা সত্য হোক, কিন্তু একথা সত্য হলে তিনি শুধু দৈনন্দিন ঘটনা আঁকিয়ে একটা কিউরিও হতেন। এটা একটা আন্তর্জাতিক ভ্রান্তি। এমন কি এখনও লোকে তাঁকে জীবনের উদ্ভট, অসঙ্গতির লেখক, নিরর্থকতার প্রচারক ভাবে। [আগামী সংখ্যায় চলবে।

অনুবাদিকা—রীণু ভৌমিক

আমার নাট্যজীবন

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংবাদিকবৃত্তিই ছিল আমার প্রধান জীবিকা। সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও রাজনীতি ও পররাষ্ট্র বিষয়ে স্বনামে, ছদ্মনামে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতাম দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়। যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কেও বাংলা সাহিত্যে কিছু দান আছে আমার। বন্ধু-বান্ধবরা তখন আমাকে 'রণবিশারদ' বলেই পরিহাস করতেন। কিন্তু দু'দিক রক্ষা করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। অবস্থা তখন, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি? 'অন্তরাল' ও 'দীপশিখা' ইতিমধ্যে লেখা হয়ে পাদপ্রদীপের সামনে স্থান পেয়েছে। রসিক সমাজের তারিফ পেয়ে নিজের ওপর প্রত্যয় এসেছে। পুরো একটা বছর সংগ্রাম চললো নিজের সঙ্গে নিজের। কা'কে রেখে কা'কে ছাড়ি? প্রকাশকদের তাগাদা রাজনীতির ওপর বই পাবার জন্যে। কিন্তু আমি লিখতে পারছিলাম না। এটা ১৯৪৪ সালের কথা। অতীত জীবনের দিকে তাকালাম। প্রথম কি লিখেছিলাম আমি? জীবনের পাতা উল্টে উল্টে দেখলাম —আমার প্রথম লেখা-নাটক, নাম দিয়েছিলাম 'জাহ্নবী'। অষ্টবসু চুরি করলেন বশিষ্ঠের কামধেনু। সেই থেকে আরম্ভ করে ভীষ্মের জন্ম পর্যন্ত ছিল কাহিনী বিধৃত। রামায়ণ মহাভারত পড়েছিলাম ছেলে বয়সেই। তারই প্রভাব পড়েছিল মনে। তখন আমি বিদ্যালয়ের নিম্নমানের ছাত্র। ১৯২২ কি '২৩ সালের কথা। সেটা নাটক হয়েছিল কি না মনে নেই—কিন্তু সেই পুরনো স্মৃতিই যেন আমাকে অকস্মাৎ পথ দেখালো বুঝলাম নাটকই আমার ধাতস্থ—নাটক নিয়েই থাকবো। ছেড়ে দিলাম রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে লেখা। একটা নিশ্চিত আয়ের পথ বন্ধ হলো। ভাগ্যের চাকা সেখানেই থামলো না। আঠারো পাতার একটি নাটক আমার আঠারো বছরের কর্মজীবনকে অবসিত করলো। হারালাম জীবিকা। দারিদ্র্যের অভিশাপ নেমে এলো জীবনে। কঠোর অগ্নিপরীক্ষা।

অজয় বিশ্বাস পরিচালিত 'প্রথম প্রেমের' একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

বাল্য কেটেছে আমার মাতুলালয়ে। আমার মাতুল ছিলেন একজন দক্ষ অভিনেতা—অবশ্য শখের অভিনয়ে। হাস্যরস পরিবেশনে তাঁর নৈপুণ্য আজো আমার স্মরণে আছে। মামারবাড়ির দুর্গামণ্ডপে ছিল স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। গ্রীষ্মের পুজোর ছুটিতে সেখানে বড়রা নাটক করতেন। কলকাতা থেকে দেশে যেতেন কলেজের পড়ুয়া ও চাকুরেরা। আজো মনে পড়ে, তাঁরা কলকাতার থিয়েটারের নকল করতে চাইতেন। নামকরা অভিনেতাদের ভাবভঙ্গি নিয়ে তর্ক হতো। একপাশে চুপ করে বসে শুনতাম তাঁদের তর্ক বিতর্ক। মনে মনে থিয়েটার সম্বন্ধে একটা স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করতাম। তাকে রূপকথার রাজপুরী বললেও চলে। আমার মনে নাটকের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তখনই। না হলে

প্রতিবেশীর গোয়ালের মশারি চুরি করে তাতে খবরের কাগজের ছবি সেঁটে সীন বানাতে যাব কেন। সেদিন নিজের রচিত মঞ্চে নাটক করতে গিয়ে কপালে যে লাঞ্ছনা জুটেছিল, সে কথা ভাবতে গেলে সত্যি আজ বেদম হাসি পায়।

কৈশোরে ছাত্রাবস্থায়ই দেশের মুক্তি-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম। জাতীয় বিদ্যালয়ে কেটেছিল কয়েকটি বছর। সেখানকার পরিবেশ ছিল সাধারণ বিদ্যালয় থেকে আলাদা। শুধু পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই বিদ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী খুলে দিয়েছিল আমার মনের দোর। আদর্শবাদী জিতেন্দ্রিয় শিক্ষকরা সেদিন আমার তাজা সবুজ মনের ওপর যে জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করেছিলেন, উত্তরকালে দুর্যোগের ঘনান্ধকারে পথের নিশানা দিয়েছে তা আমাকে—সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকার সাহস যুগিয়েছে।

অল্পবয়সেই মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসম্ভার আকৃষ্ট করেছিল আমাকে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বালোচনা 'কৃষ্ণচরিত্র'ও পড়েছিলাম বাল্যাবস্থায়ই। অভিভাবকরা রগড় করে আমাকে বলতেন 'বইয়ের রাক্ষস'। দোর বন্ধ করে বই নিয়ে বসলে আমার আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকতো না। মায়ের কত তিরস্কার শুনতে হয়েছে সেজন্যে। 'রবীন্দ্রনাথ' ছিল আমার কাছে এক রহস্যের মায়াপুরী। প'ড়ে অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না—কারণ বোঝার মতো বয়েস তখনো আমার হয় নি; কিন্তু সেই মায়াপুরী ছেড়ে মন যেন বেরিয়ে আসতে চাইত না কিছুতেই। এক দুর্জ্ঞেয় দুর্বার আকর্ষণ। শরৎচন্দ্রের বই পড়তাম লুকিয়ে চুরিয়ে—কারণ, তখন আমার যে বয়স, সে বয়সে শরৎসাহিত্য পড়া ছিল নিষিদ্ধ। তবু না পড়ে থাকতে পারতাম না। বলা বাহুল্য, সেদিন এই যুগন্ধরগণ আমার অপরিণত মনে যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, উত্তরকালে আমার নাট্যচিন্তাকে তাই পরিপুষ্ট করেছে। তখন থেকেই আমার মনে একটা ক্ষীণ ধারণা জন্মে নাটকের প্রধান নির্ভর সাহিত্যে—যাতে সাহিত্য নেই, তা নাটক নয়। মঞ্চমূল্য যতই থাক, সাহিত্যহীন নাটক সাহিত্যের ভাণ্ডারে স্বল্পায়ু। নাট্যজীবনের প্রথম অধ্যায়ে আমার নাট্যকর্মেও যে এই চিন্তাই প্রাধান্য লাভ করেছিল, এখন বিচার-বিশ্লেষণ করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। প্রচলিত মঞ্চসফল নাটকগুলির চাইতে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শরৎচন্দ্রের গল্পের নাট্যরূপের দিকেই ঝোঁক ছিল আমার বেশি। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পেরও নাট্যরূপ দিতাম। সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক নিয়ে মেতে উঠতাম। ১৯৩০ সালের আগেই পাড়াগাঁয়ে মঞ্চস্থ করেছিলাম 'গোড়ায় গলদ', 'মুকুট' ও 'হালদার-গোষ্ঠী' গল্পের নাট্যরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের বিচার' ও আমার উদ্যোগে অভিনীত হয়। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' 'মেজদি' ও 'পরিণীতা'র নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করি। বড়রা তখন কস্টিউম প্লেই পছন্দ করতেন বেশি। আমার এই প্রচেষ্টায় তেমন একটা উৎসাহ দেখাতেন না; বরং তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবটাই প্রকট ছিল। এজন্যে সমবয়সীদের নিয়ে দল করতে হতো আমাকে। আমিই অধিকারী—একাধারে প্রযোজক, পরিচালক মঞ্চসজ্জাকার, রূপকার। সিন বা পোশাক ভাড়া করার টাকা ছিল না। নিজেদেরই মঞ্চ তৈরি করতে হবে। লতাপাতা দিয়ে করা হতো মঞ্চসজ্জা। পরার কাপড় সেলাই করে তৈরি করা হতো পর্দা। কাগজ জুড়ে তুলি-রংএর সাহায্যে আঁকা হতো ঘরের দৃশ্যপট। প্রতিমার চুল দিয়ে বানানো হতো পরচুলা। পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে আনা হতো শাড়ি প্রয়োজনায় অভিনবত্ব আনার প্রবণতা আমার ছিল। আঁকা দৃশ্যপট আমি কোনদিনই বেশি পছন্দ করতাম না। হয় তো সেক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মঞ্চধারণা আমার ওপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। অনাবশ্যক সামগ্রী দিয়ে মঞ্চকে ভারাক্রান্ত করতে আমার রুচিতে আটকাতো। স্বল্পের মধ্যে সাংকেতিকতা প্রকাশ করতে চাইতো মন। 'মেবার পতন', 'মন্ত্রশক্তি', 'চণ্ডীদাস', 'রাতকানা', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম পেছনে শুধু কালো পর্দা রেখে। সামান্য

'কাশ্মীর কি কলীর' নায়ক শাম্মী কাপুর

আসবাবপত্র পরিবর্তন করে দৃশ্যান্তর বোঝানো হতো। বার বার পর্দা ফেলে বিরক্তিকর কালক্ষেপ যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া হতো। তাতে নাটকের গতি বাড়তো।

নাট্যরূপ দেওয়া ছাড়া আরো একখানা পূর্ণাঙ্গ মৌল নাটক লিখেছিলাম সেই পর্বে। সামাজিক নাটক। নাম দিয়েছিলাম 'পরশমণি'। দু'বার অভিনীত হয়েছিল সে নাটক। বলতে দ্বিধা নেই—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের খানিকটা প্রভাব পড়েছিল তাতে। দু'একটি একাঙ্ক নাটকও লিখেছিলাম মনে পড়ে। সেখানেও রবীন্দ্রনাট্যই ছিল আমার প্রেরণা। তারপরে লিখতে আরম্ভ করি নীল বিদ্রোহ নিয়ে একটি নাটক।

নীল বিদ্রোহ নিয়ে যখন নাটক রচনায় হাত দিই তখন নাটকের রূপরীতি নিয়ে আমার মনে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। প্রচলিত রীতিতে নাটক লিখে যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। চরিত্রগুলি যেন অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু নতুন কোনো পথও আমার কাছে খোলা ছিল না। পূর্বসূরীরাই বার বার আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। তাঁদের রূপরীতিকে অগ্রাহ্য করার সাহস তখনো হয় নি। একমাত্র মাইকেল ও দীনবন্ধুর মধ্যে যেন পথের নিশানা খানিকটা পাচ্ছিলাম। কিন্তু তাও কুয়াশাচ্ছন্ন। ভাবনাটা আরো বেশি করে পেয়ে বসলো যখন কারান্তরালে এক ধর্ষিতা হিন্দু-নারীর জীবন ট্র্যাজেডি নিয়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলাম। কিছুতেই বাংলা নাটকের প্রচলিত রূপরীতি থেকে তাকে মুক্ত করতে পারছিলাম না। দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটলো সাত-আট বছর। একখানা নাটকও লেখা হলো না। তারপর হঠাৎ একদিন আমার সামনে পথ খুলে গেল। ১৯৩৭—৩৮ সালের কথা। অকস্মাৎ যেন পথ পেয়ে গেলাম। জীবন যে-ভাবে প্রকাশ হতে চায়, সেভাবেই তাকে প্রকাশ করতে হবে। নাটকের প্রয়োজনে বাঁধা ছকের মধ্যে জীবনকে ধরে রাখা হবে কেন! তাকে বাড়তে দিতে হবে তার নিজের স্বভাব অনুযায়ী। জীবন তো রীতির দাস নয়। তবে নাটকের জীবনই বা বিশেষ কোন রূপরীতির দাস হবে কেন? জীবনের দাবিতে প্রয়োজন হলে নাটকের রীতিকে ভাঙতে হবে। একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নাটকের চরিত্রগুলি স্ব স্ব ধর্ম অনুযায়ী যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তারই

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা' চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

সংহত রূপ হবে নাটক। বৃত্তপ্রত্যয়ে পৌঁছুতে দু'টি বছর কেটে গেল। ১৯৩৯ সালে হাত দিলাম 'অভিযান' রচনায়। একটি দৃশ্য লিখেই আবার বন্ধ। অবৈধ সন্তান মমতা নিয়ে নাটক। শুধু কি বেদনায় করুণ চিত্র এঁকে মানুষের চোখে জলই ঝরাবো—না মানুষকে ভাববারও কিছু দেব।

বন্ধ করলাম নাটক লেখা। দু'বছর গেল মনস্থির করতে। ১৯৪১ সালে লিখে শেষ করলাম সেই নাটক। তখন নাটকের নাম ছিল 'দাবি'।

দু'টি জীবন দর্শনের সংঘাত এলো নাটকে। বুর্জোয়া নীতিবোধ ও সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধের দ্বন্দ্ব। সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধে সন্তানের অবৈধতা অস্বীকৃত। কিন্তু তখনকার ভারতীয় সমাজ বাস্তবের পটভূমিতে সমাজতন্ত্র শুধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের দিকে দৃষ্টি রেখেই ট্র্যাজেডিতে নাটকের শেষ। সাহিত্যিক বন্ধুরা নাটক শুনে বাহবা দিলেন। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সেই নাটকের সূত্রেই আমার ঘনিষ্ঠতা। শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে পূর্বেই আলাপ ছিল। আমার নাটক পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। উৎসাহিত হয়ে শ্রীরঙ্গমের নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে দিলাম নাটকটি পড়তে। আমার পরম সৌভাগ্য, একদিনের মধ্যেই তিনি নাটকটি পড়ে ফেললেন এবং জানালেন শ্রীরঙ্গমের আর্থিক অবস্থার একটু সুরাহা হলেই তিনি নিজে শ্রীরঙ্গমে এই নাটক প্রযোজনা করবেন। প্রায় বছর দুই নাটকটি পড়ে থাকার পরে হঠাৎ একদিন তিনি বললেন, তাঁর বি টি রোডের বাসস্থলে আমাকে যেতে। সেখানে নাটকটির ভূমিকা বন্টন সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হবে। আমি যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে শুনলাম তিনি অসুস্থ। বাড়ি ফিরবার পথে নানা' কথা মনে উদিত হলো। ভাবলাম, আমি হয় তো আলেয়ার পেছনে ছুটেছিলাম। শিশিরকুমার নাট্যজগতে নমস্য যুগাচার্য; কিন্তু তাঁরও দৃষ্টি একটি যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে-যুগ অতিক্রম করে নবযুগের বার্তাবহ হতে হয় তো তিনি খানিকটা কুণ্ঠিত। ইংলণ্ডের নাট্যজগতের দিকপাল সার হেন্‌রি আরভিং বার্নার্ড শ'র কোনো নাটকই মঞ্চস্থ করেন নি। তার জন্যে দু'জনের কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না—এটা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা। এ উপলব্ধি এসেছিল বলেই শেষদিন পর্যন্ত আমি নাট্যাচার্যের স্নেহভাজন থাকতে পেরেছিলাম।

সেদিনটি আমার কাছে খুবই স্মরণীয়—কারণ সেদিনই আসতে আসতে পথে সঙ্কল্প করেছিলাম, নবযুগের বাণী নাটকে আনতে হলে নাট্যশালার চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে পথে নামতে হবে। সুসজ্জিত মঞ্চ থাকবে না, আলোর বাহার থাকবে না, দুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকবে না, এমন কি প্রয়োজনীয় অর্থও মিলবে না—তবু নাটক করতে হবে। নতুন দল গড়তে হবে, আন্দোলন করতে হবে, প্রয়োজন হলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাটক সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হবে, মানুষকে টানতে হবে প্রাণের আকর্ষণে। সেদিনও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের জন্ম হয় নি; তবু যেন মানসনেত্রে দেখতে পেয়েছিলাম একটি নতুন নাট্য আন্দোলন। সেদিনের সেই সঙ্কল্প নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম পথে—আজও আমি পথেরই নাট্যকার; কারণ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে আমার স্থান হয় নি। এই পথে চলতে চলতে কত বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছি আমি, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার জীবনে, কত বিচিত্র উপলব্ধি এসেছে আমার মনে। পেয়েছি কত লোকের ভালোবাসা, কত লোকের আশীর্বাদ, মানুষের মিছিলের মধ্যে থেকে অনুভব করেছি জীবনের উত্তাপ। দেখেছি মহত্ত্বের পাশে ক্ষুদ্রতা, দেবতার পাশে শয়তান, স্বর্গের পাশে নরক, ঐশ্বর্যের পাশে দারিদ্র্য, ক্ষমার পাশে জিঘাংসা, জীবনের পাশে মৃত্যু। মানুষের এই পূর্ণ সত্তাকে জানবার অবোধ্য কৌতূহল আমার। তাই আমার নাটকের মধ্যে বন্দী করে তাদের আমি কাছে পেতে চাই—শুনতে চাই তাদের কথা। সমাজের ভয়ে, দণ্ডের ভয়ে, ক্ষতির আশঙ্কায় যে কথা তারা প্রকাশ্যে বলতে সাহস করে না, আমার কাছে অকপটে সে কথা খুলে বলে তারা। আমিও আমার কথা শোনাই তাদের। মিলন-বিরহ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, বাস্তব-কল্পনা সব কিছু দিয়ে গড়া সেই জগতে আমি তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। মানুষের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে অপার আনন্দ পাই। কোন্‌টুকু আমার কথা, কোন্‌টুকু তাদের কথা, হিসেব করে বলা শক্ত। সবার কণ্ঠস্বরের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর যখন মিলিয়ে যায়, তখনই বুঝি জন্ম নেয় আমার একটি নাটক।

'কান্নার কি কাদির' নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর

আপনাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, নব যুগের এমন কি বার্তা এসেছে আমার নাটকে যাতে আমি যুগের বার্তাবহদের একজন হিসেবে দাবি করতে পারি? কিছুটা দুঃখের ছবি? কিছুটা হতাশার বেদনা? কিছুটা ব্যর্থতার ইতিহাস? অথবা কিছুটা কাল্পনিক বিপ্লবের বাণী? না। তার কোনোটাই বোধ হয় নয়। তা যদি হতো তবে এরই মধ্যে আমার নাটকগুলি যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে উঠতো—চলমান জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখে সভ্যতার সংকটে রবীন্দ্রনাথ যে বেদনা অনুভব করেছিলেন সে বেদনা শুধু তাঁর একারই ছিল না—ছিল আমাদের সবারই। সেই বেদনার মধ্যেও তিনি মানুষে বিশ্বাস রেখেছিলেন। আমরাও সেই বিশ্বাসেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এ প্রশ্নটিও জাগে যে, সভ্যতার এই সংকট কেন? নিশ্চয়ই মানব সমাজে এমন কোনো একটা বৈষম্য ও বৈপরীত্য আছে যা এই সংকটকে ডেকে এনেছে। যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে থেকেও কোন্ প্রাণ-সত্তাবলে টিকে আছে তারা, কোথায় তাদের জীবনের অবলম্বন, আপাতদৃষ্টিতে যারা নিঃসহায়, নিরালম্ব ও নির্বীর্য বলে প্রতীয়মান হয় তাদের কোন্ সুপ্ত শক্তি জেগে উঠে এই মহাবিপ্লব সাধন করবে, নব মানবতায় বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সন্ধানী আলোক ফেলে সেই মহাজীবনের মহাশক্তিকেই দেখায় ও দেখাবার চেষ্টা করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই দেখার মূলে থাকে এক সত্যনিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয় এবং প্রত্যয় থাকে বলেই তাঁরা নিচের তলার মানুষের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের যথেষ্ট উপাদান খুঁজে পান। তাঁরা দেখতে পান, নিচের তলার মানুষের জীবন শুধু ক্লেদাক্তই নয়, তাদের মধ্যেও এমন মহত্ত্ব থাকে, এমন মানবিক মূল্য থাকে যা নিয়ে মহানাটকের সৃষ্টি হতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই, এই নতুন মানবতা-বোধই আমার চল্লিশোত্তর কালের নাট্যরচনার মূল প্রেরণা। পুরণো মূল্যবোধকে নতুন মানদণ্ডে ফেলে বিচারের চেষ্টা করেছি। যদি কেউ বলেন এ তো বিদেশ থেকে ধার করা চিন্তা।

সবিনয়ে বলবো—না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক নাটকে কি যুগের এই ইংগিতই দিয়ে যান নি? 'অচলায়তন,' 'রক্তকরবী,' 'রথের রশি'তে তিনি কোন্ ইংগিত দিয়ে গেছেন? চিন্তার ভৌগোলিক সীমারেখায় আমি বিশ্বাসী নই। সূর্যের আলোর মতোই মহৎ ভাবরাশি বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ—তাতে অধিকার আছে সবারই। ভারতীয় হয়েও রবীন্দ্রনাথ যদি বিশ্বচিন্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে থাকেন তবে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমার পদচারণায় লজ্জিত বা সংকুচিত হবার কোনো কারণই নেই।

'জীবনস্রোত'ই আমার শেষ মৌল পূর্ণাঙ্গ নাটক। জীবনস্রোতের পরেও দু'খানা পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছি—তবে কাহিনী নিজের নয়। গর্কির 'মাদার' ও রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটারি' নাট্যরূপ দিয়েছি। 'মাদার' এ যাবৎ অভিনীত হয় নি; 'ল্যাবরেটারি' একবার মাত্র অভিনীত হয়েছে। গত পাঁচ-ছ' বছর ধরে একান্তভাবে একাঙ্ক নাটক রচনা নিয়েই সাধনা করেছি। তার ফলে একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা নি তান্ত কম দাঁড়ায় নি—পাঁচ-ছ' ডজন হবে। অবশ্য তার মধ্যে কতগুলো শিশুনাট্যও আছে। একাঙ্ক নাটকগুলোর মধ্যে নতুন বক্তব্যকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশের খানিকটা চেষ্টা করেছি। কিছুটা সফলও হয়েছি মনে হয়; কারণ রসিকজনের দৃষ্টি তা আকর্ষণ করেছে। নাটক রচনা ছাড়াও কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয় আমাকে প্রবন্ধ রচনায়। নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে আমার চিন্তা ও ধারণা প্রকাশ করে থাকি সেগুলিতে। এ যাবৎ দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় নাট্য-বিষয়ে আমার যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা শতাধিক হবে। সেগুলো সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আমার চিন্তার স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ও আর ডি বনশাল প্রযোজিত 'চারুলতা চিত্রের' একটি আবেগময় মুহূর্তে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়

দুই-ই আপনারা দেখতে পেতেন। হয় তো নাটক সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারার বিবর্তনের একটা স্পষ্ট সূত্রও আপনারা খুঁজে পেতেন তাতে। কিন্তু সে সৌভাগ্য আজও আমার হয় নি।

অপেশাদারমহল-নির্ভর বলেই অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে আমাকে পরিচালক প্রযোজকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। নিজের নাটক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন' ও 'ল্যাবরেটরি' প্রযোজনা করেছি। সম-সাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সলিল সেনের 'মৌ চোর', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন', কুমার রায়ের 'কিংবদন্তী', মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আজকের উত্তর', কিরণ মৈত্রের 'নাটক-নয়' প্রভৃতি নাটক পরিচালনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' পুনরুজ্জীবনের পেছনেও ছিল আমার ক'বছরের অক্লান্ত শ্রম। আমার নাট্য কর্মকে কোনো একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পাই নি কোনোদিনই। যেখানেই নটনাথের পূজোর ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছি সেখানেই ছুটে গিয়েছি—মন্দিরদ্বারে তীর্থযাত্রীর পদধূলোয় নিজের মাথা লুটিয়েছি—যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছি মনের অহঙ্কার। নাট্যবেদীর অমর্যাদা আমি সহ্য করতে পারি নে। তাই পূজোয় কারো অবহেলা বা নিষ্ঠার অভাব দেখলে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি, তিরস্কার করেছি—কিন্তু কাউকে আঘাত দেবার জন্যে নয়। আরাধনার ঐকতান যাতে ছন্দহীন না হয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের আরো কাছে পাবার জন্যে বন্ধুভাবে সমালোচনা করেছি আর সেই নিরিখেই নিজের নিষ্ঠা পরখ ক'রে নিতে চেয়েছি বার বার।

নাট্য-জীবনে আমার বড়ো লাভ মানুষের প্রীতি। অসংখ্য বন্ধুর প্রীতিতে আমার হৃদয় ভরপুর। আর একটি সম্পদের অধিকারী হয়ে আমি গর্ব অনুভব করি। বাংলার বহু তরুণ শিল্পীর আমি কাছের মানুষ। বিভিন্ন নাট্য প্রতিষ্ঠানে শত শত ছেলেমেয়ে এসেছে আমার কাছে কিছু নাট্যবোধ পেতে, অভিনয় বিদ্যা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করতে। তাদের মধ্যে অনেকে আজ শিল্পজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কর্মজীবনে দূরে থাকলেও তারা আমার হৃদয় জুড়ে আছে। তাদের অস্তিত্ব আমি অন্তরে উপলব্ধি করি। তারাও করে। কোথাও অকস্মাৎ দেখা হলে কাছে ছুটে আসে তারা—জানায় তাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা—স্নেহের প্রস্রবণ উৎসারিত হতে থাকে আমার মনে। আমার নাটকের চাইতেও তারা আমার কাছে বেশি প্রিয়—কারণ তারাই যে আগামী দিনের বার্তাবহ।

সরকারী বাধা এসেছিল প্রথম 'অন্তরাল' নিয়েই। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ 'দীপশিখা'র অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে 'বাস্তুভিটা' দু'বার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের নাট্যালেখ্য 'তরঙ্গ'র-অভিনয় স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। কটকে 'মশাল' নাটক যাতে পাদপ্রদীপের সামনে না আসতে পারে তার জন্যে সেখানকার পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। 'মোকাবিলা' এক বছর লালবাজারে আটকে রাখা

উত্তমকুমার স্বগৃহে

হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধাই ভেঙে গেছে, সর্বসাধারণের দাবিতে আমার নাটকগুলি সকল প্রতিবন্ধ অতিক্রম ক'রে জনসম্পদে পরিণত হয়েছে। সেদিন থেকে আমি ভাগ্যবান।

চলতি ছবির বিবরণ

মহানগরীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বর্তমানে যে বাঙলা ছবিগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে আমাদের বর্তমান সংখ্যার রূপপট বিভাগে আলোচ্য জতুগৃহ, স্বর্গ হতে বিদায় এবং গোধূলিবেলায়।

বাঙলা দেশের সাহিত্য জগতে প্রথম সারিতে যাঁদের আসন সসম্মানে সুনির্দিষ্ট, প্রখ্যাতনামা কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষ তাঁদেরই একজন। তাঁর লেখনী সাহিত্যক্ষেত্রে যে কত উল্লেখযোগ্য ফসল ফলিয়েছে তার তুলনা নেই। তাঁর অনবদ্য রচনাসম্ভারের একটি পরমাশ্চর্য নিদর্শন জতুগৃহ। স্বামী-স্ত্রীর আদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে এই সারগর্ভ কাহিনী রূপ নিয়েছে। বিচ্ছেদই শেষ কথা নয়, সহস্র সংঘাত আদর্শ বিরোধ মহান প্রেমের অবসান ঘটাতে পারে না,—এই সত্যই প্রকটিত হয়েছে কাহিনীটির মধ্যে। তপন সিংহ পরিচালনায় যথেষ্ট শিল্পবোধ এবং বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিকে সর্বতোভাবে রসসমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে পরিচালক কোন ফাঁক রাখেন নি। শক্তিমান কথাশিল্পীর অভিনব অনুভূতিজাত হৃদয়ধর্মী রচনা বলিষ্ঠ পরিচালকের পরিচালনায় একটি পরম উপভোগ্য ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অভিনয়াংশে উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী, বিনতা রায়, কাজল গুপ্ত প্রভৃতি যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

স্বর্গ হতে বিদায় ছবিটি পরিচালনার দিক দিয়ে একটি বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মঞ্জু দে। ইতঃপূর্বে পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঙলার চিত্রজগতে আরও একজন মহিলার আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে, অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী দে-ই প্রথম পরিচালিকা। জীবনের পতন, উত্থান, ঘাত-সংঘাতের এক বিচিত্র আলেখ্য অতীব নৈপুণ্য সহকারে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলিষ্ঠ পরিচর্যার এবং সুষ্ঠু সংগঠনে ছবিটি দর্শকচিত্তে আবেদন জাগাতে সক্ষম হয়েছে। বিন্যাসে ও গল্পবিস্তারে পরিচালিকা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দেয়। পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্তা প্রভৃতি শিল্পীরাও সু-অভিনয় করেছেন।

বাঙলা চিত্রজগতের প্রবীণ পরিচালকদের তালিকায় চিত্ত বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর সাম্প্রতিক অবদান গোধূলিবেলায়, একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে গল্পের বিস্তার। হত্যাকারী পিতাকে বাঁচাবার জন্যে পুত্র অপরাধের বোঝা নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে। নানা ঘটনার স্রোত বইয়ে কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। একটি অপরাধধর্মী কাহিনীতে যে পরিমাণ কৌতূহল ও শিহরণ-সৃষ্টির প্রয়োজন—সেই পরিমাণ কৌতূহল ও শিহরণের সঞ্চারে পরিচালক আশানুরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন নি। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত এই কাহিনীর রচয়িতা। প্রবীণ দক্ষ পরিচালকের পরিচালিত এই ছবিটিতে কয়েকটি দৃশ্য পরিকল্পনা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। সুরাবেদনে ছবিটি ভরপুর, সেদিক দিয়ে যথেষ্ট সাধুবাদ পরিচালকের অবশ্য প্রাপ্য। বলিষ্ঠ শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় ছবিটির সম্পদবিশেষ। বিকাশ রায়ের অসাধারণ অভিনয় ভোলবার নয়। সন্ধ্যারাণী দেবীর অভিনয় দর্শকচিত্তের গভীরে রেখাপাতে সমর্থ হয়। বিশ্বজিতের অপূর্ব অভিনয় দর্শককে বিস্মিত করার উপকরণ বহন করে। অন্যান্য ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, তরুণকুমার প্রভৃতি শিল্পীদের অভিনয়ও যথেষ্ট সার্থক ও চিত্তগ্রাহী।

সংবাদ বিচিত্রা

অভিনেতৃসঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচন

কলকাতার অভিনেতৃসঙ্ঘের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাৎসরিক নির্বাচনে তার আগামী বর্ষের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাঙলার প্রথিতযশা অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল। প্রবীণ নট পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়-প্রতিভা বাঙলার চিত্রজগতকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটি আরও বহুল উন্নতির দিকে অগ্রসর হোক এই কামনাই করি।

নষ্ট নীড়ের নাম পরিবর্তন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' নামক অমর রচনাটি সুবিখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়ে মুক্তির দিন গুণছে। চিত্রানুসন্ধিৎসুদের দরবারে এ সংবাদ আজ আর কোন নতুনত্ব বহন করে না। যথাসময়েই রূপালী পর্দায় তার আত্মপ্রকাশ নিয়মানুযায়ীই ঘটবে, সেই বিখ্যাত কাহিনী দর্শকসাধারণ রূপালী পর্দায় দেখতে পাবেন—তবে—ভিন্ন নামে। কাহিনীর নায়িকার নামানুসারে তার মূল নাম পরিবর্তিত করা হয়েছে অর্থাৎ রবীন্দ্ররচনা নষ্ট নীড়ের সত্যজিৎ-পরিচালিত চিত্ররূপের নাম হল 'চারুলতা'।

বালা সরস্বতী সম্বন্ধীয় চিত্রনির্মাণের উদ্যোগ

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে বালা সরস্বতী একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। ভারতীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের তুলনা মেলা ভার। বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় ভারতনাট্যমের ক্ষেত্রে তাঁর স্মরণীয় অবদানগুলি সম্বন্ধে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। বালা সরস্বতীর অল্পকালপূর্বে কলকাতা অবস্থানের সময়ে তাঁর সঙ্গে শ্রীরায়ের সাক্ষাৎ ঘটেছে এবং তাঁকে তাঁর এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে শ্রীমতী বালা সরস্বতী পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সলিল চৌধুরী

বাঙলা দেশ বোম্বাইয়ের চিত্রজগতে যে একাধিক গুণী-সন্তানকে উপহার দিয়ে ভারতীয় চিত্রলোকের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাটভাবে সহায়তা করেছে, সলিল চৌধুরী তাঁদেরই অন্যতম। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই তরুণ

নৃত্যের নানা ভঙ্গিমায় সন্ধ্যা রায়
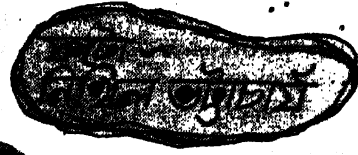
প্রতিভাবান প্রভৃত সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে পরিচালক হিসাবেও তিনি কুশলতার পরিচয় দিতে চলেছেন। শোভা চিত্র নিবেদিত 'পিঞ্জরে-কি-পাঞ্ছি' ছবিটির পরিচালনভার তিনি গ্রহণ করায় বোম্বাইয়ের শক্তিমান বাঙালী পরিচালকদের তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হ'ল।

দৈনিক কাজের সময় নির্ধারণে সরকারী বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ২৭-এ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কাজের সময় একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। প্রদর্শন, স্টুডিও, ল্যাবোরেটারি ও পরিবেশন সংস্থার কর্মীদের জন্যে দৈনিক আটঘণ্টা (মধ্যে আধ ঘণ্টার বিরতি) এবং দপ্তরকর্মীদের জন্যে সাতঘণ্টা (আধঘণ্টার বিরতিসহ) পরিশ্রমের সময় হিসাবে ধার্য হয়েছে। সপ্তাহে একদিন পূর্ণ বিরতির ব্যবস্থা হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী দিবসে কাজের সময় হিসাবে ধার্য হয়েছে সাড়ে পাঁচঘণ্টা।

মীনা-আমরোহী প্রসঙ্গে

হিন্দী চিত্র জগতের 'ট্রাজেডি-কুইন' মীনাকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের আকাশও ট্রাজেডির কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। তাঁর স্বামী বিখ্যাত প্রযোজক কমল আমরোহীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং গত ৫ই মার্চ তিনি স্বামিগৃহ ত্যাগ করেছেন। বর্তমানে মীনাকুমারী তাঁর ভগ্নী, অভিনেতা মামুদের সহধর্মিণী শ্রীমতী মাধুর কাছে অবস্থান করছেন। এই বিচ্ছেদ, বলা হয়েছে সম্পূর্ণ পারিবারিক, তাঁদের উভয়েরই কর্মজীবনের সূত্রে এর কোন যোগ নেই। কমল আমরোহী পরিচালিত 'পাকিজা' চিত্রে মীনা অভিনয় করছেন—সেক্ষেত্রে তাঁর দিক থেকে কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। তিনি প্রসঙ্গত আরও জানিয়েছেন এই পৃথক হওয়ায় অন্তরালে কোন দ্বিতীয় প্রণয়ের স্পর্শ নেই। সংশ্লিষ্ট মহল অনুমান করছেন যে, এই সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ-বিচ্ছেদেও পরিণত হতে পারে।

প্রযোজনার ক্ষেত্রে গীতাবলী

সুপ্রসিদ্ধা চিত্রতারকা গীতাবলী বর্তমানে প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন। 'রাণো' নামক প্রথম বর্ণযুক্ত পাঞ্জাবী চিত্রটি তাঁরই প্রযোজনায় গৃহীত হচ্ছে। এই ছবির কাহিনী রাজেন্দ্র সিং বেদীর বিখ্যাত উর্দু উপন্যাস 'এক চাদর মেলি সি' অবলম্বনে রূপ নিয়েছে। অভিনেত্রী হিসাবে গীতাবলী আজ যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারিণী। প্রযোজিকা হিসাবে তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য সারগর্ভ ছবি উপহার দিন এ প্রসঙ্গে এই আমাদের বক্তব্য।

অভিনয়কালে শিল্পীর করুণ মৃত্যু

সম্প্রতি চিত্রগ্রহণকালে এমন একটি দুর্ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে গেল—যা সারা ভারতের চিত্রজগতে এক নিদারুণ বেদনার সঞ্চার করেছে। ১৯৬২ সালের অক্টোবরে সংঘটিত নেফা যুদ্ধের একটি দৃশ্যের চিত্রায়ণের সময় খাদের মধ্যে ঝাঁপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা
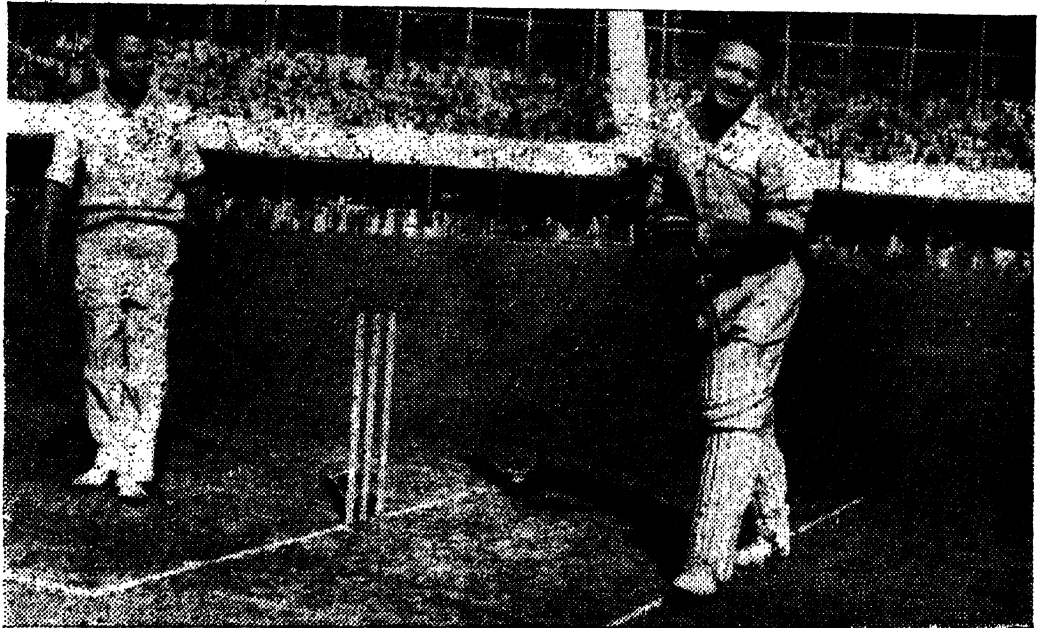
উত্তমকুমার ও অনিল চট্টোপাধ্যায় : খেলার মাঠে

লাজাহ্ দশরথ গায়কোয়াড় (৪৭) সাংঘাতিক আহত হন এবং তার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মর্মন্তুদ ঘটনা সকলের মনেই বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে তুলবে। আমরা এই দুর্ঘটনায় আন্তরিক দুঃখিত এবং বেদনাবিহ্বল চিত্তে লোকান্তরিত শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সেন্সর ব্যবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী

ভারতবর্ষের ছায়াছবিগুলির সেন্সর ব্যবস্থা আরও কঠিন এবং দৃঢ় হোক, ভারতীয় লোকসভায় এই মর্মে এক দাবী উত্থাপিত হ'লে তার উত্তরে কেন্দ্রীয় তথ্য এবং প্রচার-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ সদস্যবৃন্দের উদ্দেশে সেন্সর ব্যবস্থাকে কঠিন ও দৃঢ় করার পক্ষপাতী না হওয়ার জন্ম এক আবেদন জানান। তাঁর বক্তব্য যে, প্রেম কোন কুৎসিত বস্তু বা নিন্দনীয় পদার্থ নয়, বিভিন্ন শ্লোক ও কাব্য উদ্ধৃত করে আপন বক্তব্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন—তিনি বলেন যে, 'Puritanism' আজ অতীতের স্মৃতিমাত্র। আজকের চলচ্চিত্রে তার কোন স্থান নেই সেই কারণে এখনকার দিনে সেন্সর বোর্ডকে কঠোর না করার স্বপক্ষেই তিনি আবেদন জানেন। অবশ্য তিনি এও বলেন যে, ছায়াচিত্রে রুচি ও শালীনতা বিন্দুমাত্র বিসর্জিত হতে না দেওয়াই তাঁর দপ্তরের নীতি। রুচি, শালীনতা বজায় রেখে আবার অতীতের সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা দেশের ছায়াছবির রূপ দেওয়া হোক, এই তাঁ অভিপ্রায়। তাঁর বক্তব্য, বলা বাহুল্য, বিপুল সাধুবাদ অর্জন করে।

এ্যানা নিগল অভিনীত 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া'

স্বনামধন্যা চিত্রতারকা এ্যানা নিগলের (৫১) অবিস্মরণীয় অভিনয়ে যে সকল চরিত্রগুলি দর্শকের মনে জীবন্ত হয়ে আছে 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া' তার অন্যতম। বহু বৎসর পূর্বে ভিক্টোরিয়ার ভূমিকায় তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের স্মৃতি তৎকালীন দর্শকদের চিত্তে অম্লানদীপ্তিতে বিরাজিত। এ যুগের দর্শকবৃন্দ জেনে আনন্দ লাভ করবেন যে, এ্যানা নিগল পুনরায় ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে অবতীর্ণা হচ্ছেন। হার্বার্ট উইলকক্স প্রযোজিত ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের জীবনীচিত্রে এ্যানাকে দেখা যাবে ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে রূপদান করতে। বর্তমান বর্ষের শেষভাগে ছবিটির কাজ শুরু হবে বলে জানা গেল।

কার্ক ডগলাসের ভারত সফর

সম্প্রতি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে গেলেন প্রখ্যাত অভিনেতা কার্ক ডগলাস (৪৮) দক্ষশিল্পী কার্ক তাঁর সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে ভারতে এসেছিলেন এবং বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মিলিত হন ও আলাপ-আলোচনা করেন। প্রযোজক মেহবুব খান তাঁকে আমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেন।

টেলার-বার্টন পরিণয়

কিছুকাল যাবৎ হলিউডের চিত্রমহলে তথা সমগ্র পৃথিবীর চিত্রামোদী-সমাজে এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টনের ঘনিষ্ঠতা যে পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার তুলনা বিরল। এই শিল্পি-যুগলের অন্তরঙ্গতা চিত্রজগৎ তথা দর্শকজগতের দৈনন্দিন আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সমসাময়িককালে চিত্রজগতে বহু উল্লেখযোগ্য, চমকপ্রদ এবং অভাবিত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এ ধরণের আলোড়ন জাগানো আর কোন ঘটনা ঘটে নি। এই দুই শিল্পীর মেলামেশাকে কেন্দ্র করে কত জল্পনা-কল্পনা, মন্তব্য, অনুমান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! বর্তমানে এই সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে শিল্পিযুগল পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বার্টন (৩৮) হলেন লিজের (৩৩) পঞ্চম স্বামী।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

আলোর পিপাসা

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী বনফুল রচিত 'আলোর পিপাসা'র চিত্ররূপ গড়ে উঠছে শক্তিমান পরিচালক তরুণ মজুমদারের পরিচালনায়। বাইজীদের বিড়ম্বিত জীবনের করুণ বেদনার পটভূমিতে ছবির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। পাহাড়ী সান্যাল, বসন্ত চৌধুরী, অসিতবরণ, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অনুভা গুপ্ত, সন্ধ্যা রায়, সবিতা সিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুর-যোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

পাশাপাশি

তরুণ পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পাশাপাশি' ছবিটি রূপ নিচ্ছে। অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, আশীষকুমার, বিল্টু ভাওয়াল, গঙ্গাপদ বসু, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুশীল চক্রবর্তী এবং খুব সম্ভবত বোম্বাইয়ের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অমল মুখোপাধ্যায়।

পতি-সংশোধনী সমিতি

প্রবীণ সাহিত্যিক অনমঙ্গ মুখোপাধ্যায়ের 'পতি-সংশোধনী সমিতি' চলচ্চিত্রে পরিণত হতে চলেছে বিভু দাসগুপ্তের পরিচালনায়। পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, প্রবীরকুমার, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন গৌর সী।

● বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ●

[আগামী সংখ্যা হইতে অর্থাৎ ১৩৭১ সালের বৈশাখের পত্রিকা হইতে 'মাসিক বসুমতী'র সূচীপত্রে এবং অঙ্গসজ্জায় পুনরায় এক অভিনব রূপান্তর লক্ষ্য করা যাইবে। বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও তথ্যসবল সুপাঠ্য রচনা ব্যতীত সুলিখিত কয়েকটি ধারাবাহিক উপন্যাস 'মাসিক বসুমতী'র পাঠমূল্য বৃদ্ধি করিবে। প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রসম্ভার হইবে আমাদের পত্রিকার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। তৎসহ মনোরম ও বিচিত্র আলোকচিত্রের সমন্বয়। মাসিক বসুমতীর সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত নিয়মিত বিভাগসমূহের কিছু কিছু রদবদল করা হইলেও পাঠক-পাঠিকার চিত্তবিনোদনের জন্য আরও কয়েকটি অধুনা অপ্রকাশিত বিভাগের প্রবর্তন হইতেছে। বিগত দুই যুগে বাঙলা দেশে সংখ্যাতীত পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব এবং তিরোভাব সত্ত্বেও মাসিক বসুমতী আপন বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব যথাপূর্ব রক্ষা করিয়াছে। আমরা আশা করি, আঙ্গিক এবং বৈষয়িক পরিবর্তনের দ্বারা 'মাসিক বসুমতী' বাঙলা দেশের অগণিত পাঠক-পাঠিকাবর্গকে আনন্দ, জ্ঞান ও তৃপ্তিদানে সমর্থ হইবে। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহিকা, সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা বিক্রয়ের এজেন্টগণ ও আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও আশীর্বাদ আমরা প্রার্থনা করি। **আমাদের নবাগত পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাবৃন্দকে আগামী নূতন বৎসরের গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে অনুরোধ জানানো হইতেছে। কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।**]

শৌখীন সমাচার

দেবদাস

সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'-এর নাট্যরূপ অভিনীত হল নর্থ ক্যালকাটা ডিভিসন (পি ডব্লিউ-ডি) রিক্রিয়েশান ক্লাবের দ্বারা। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করেন অনিল আচার্য, আবদুল করিম, নির্মল মুখোপাধ্যায়, অমর মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোতকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাণু রায়, শিপ্রা সাহা, মালা নাথ (চৌধুরী), ইরা মিত্র প্রভৃতি।

দুই পুরুষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকটি মঞ্চস্থ হল এ্যাঞ্জেলো ক্রীক ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা। শ্যামাকান্ত ঘোষাল, অজিত বিশ্বাস, লক্ষ্মীকান্ত নস্কর, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, অনিল বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ দাস, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত আচার্য, নিতাই দে, সঞ্জীব দাস, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী চক্রবর্তী, শিপ্রা সাহা, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি চট্টোপাধ্যায়, বীণা চক্রবর্তী প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন।

নদী বয়ে যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নদী বয়ে যায়' নাটকটি মঞ্চস্থ হ'ল সেণ্ট্রাল স্টোর্স এ্যাণ্ড ওয়ার্কশপ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগোষ্ঠীর দ্বারা। নির্মল নাথ, উমেশ হালদার, মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী বীরেন ধর, নিখিল ভট্টাচার্য ও শান্তিময় সান্যাল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

এবার দেখা হবে

শ্যামলী রায়

শীত চলে গেল দূরে ;
দখিন হাওয়ার হাত অকস্মাৎ শিথিল ভঙ্গুর
রৌদ্রের তলায় থেকে নবীন ঘাসের শীষে জাগে
সবুজের দীপ্ত উচ্চ সুর।

এবার হয়ত দেখা হবে—
প্রতীক্ষা প্রতিমা দেখে যে হারাল কুয়াশার অন্তরে—
জীবনের যত মায়া সব নিয়ে পলাতক সেই
প্রিয়জন আসবেই ঘরে।

এবার হয়ত দেখা হবে—
সে বিশ্বাসে রঙিন আকাশে ফোটে নীলিমার আলো
আমার দিনের থেকে রাত্রির থেকে
[illegible]

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

পূর্ববঙ্গের হিন্দু নির্যাতন যখন ক্রমশই ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া মানব সভ্যতাকে আর্ত-বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে, সে সময়ে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হবিবুল্লা খানের ভারতে আগমন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বর্বর সাম্প্রদায়িকতার প্রেরণাপুষ্ট এই অমানুষিক অত্যাচারে যে ভীষণ ভয়াবহতার উদ্ভব হইয়াছে তাহার অবসানকল্পে পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিল্লী আগমন। এখানে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের সহিত তিনি এক আলোচনাচক্রে মিলিত হইতেছেন। অতএব, সে দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই আলাপচক্র শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, আকাঙ্ক্ষিতও।

এই বৈঠকের সংবাদ বহুজনের উদ্বেগাকুল এবং বেদনাবিহ্বল চিত্তে যথেষ্ট পরিমাণে আশার আলোক বিকিরণ করিতেছে। বৈঠকটি সম্বন্ধে আমরাও যথেষ্ট আশা পোষণ করি, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয়ও বিশেষভাবে চিন্তনীয়। পাকিস্তানে হিন্দুনির্যাতন এই প্রথম নয়। দেশ বিভক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই এই সকল বিভীষিকাময় হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের সূত্রপাত। সেই সময় হইতে বিষয়টি লইয়া একাধিক বৈঠক বসিয়াছে, নানা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল শুধু আলাপ-আলোচনাই হইল, কাজের কাজ কিছুই হইল না। চতুর্দশ বৎসরেও হত্যাকাণ্ড, নারীনিগ্রহ, অমানুষিক লাঞ্ছনা, অত্যাচার, নিপীড়ন অটুট রহিয়াছে। ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিও বিপুল আশার সঞ্চার করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিণতি কি হইল?

উপমাস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বিদেশী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া, অজস্র লাঞ্ছনা বরণ করিয়া, অপরিমাপ্য রক্ত বিসর্জন দিয়া স্বাধীনতা অর্জনই শেষ কথা নয়, তাহা রক্ষা করার দায়িত্বই মূল কথা, তাহাকে অক্ষত রাখিবার সাধনাও কম গুরুত্বের বিষয় নয়, বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বৃটিশযুগেও ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বহু আলাপ-চক্র ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সকল আলোচনার সমষ্টি আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলিয়া দেয় নাই—দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে অসংখ্য সন্তানের মহিমান্বিত আত্মদানে। স্বাধীনতার বেদীমূল যে কত মুক্তিকামী সন্তানের রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না। এ দেশের অসংখ্য সন্তান দেশজননীর সোনার অঙ্গ হইতে বিদেশীশাসকের শৃঙ্খল মোচন করিবার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই সুনিশ্চিত, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনের সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া দুর্গম দুস্তর পথে পদক্ষেপণ করিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দেশের মুক্তিযজ্ঞে অমূল্য জীবন আহুতি দিয়া স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। জননীর স্নেহাকুল, প্রেয়সীর প্রেমালিঙ্গন, সন্তানের আকর্ষণ, বিলাস-ব্যসন তাঁহাদের নিকট উদ্দাম স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, অসহ্য নির্যাতন, চরম লাঞ্ছনা, অকথ্য অত্যাচার তাঁহাদের পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। সেই কালজয়ী নমস্য সন্তানদের অবিরাম আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ বহু কষ্ট অর্জিত এই স্বাধীনতা লব্ধ হইয়াছে। তেমনই এখানেও আলোচনা ও বৈঠকই শেষ কথা নয়, পাকিস্তানের সহিত আমাদের আলোচনা বৈঠক এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইতেছে না। পূর্বেও হইয়াছে। কিন্তু কাগজে লিখিত চুক্তিগুলি বাস্তবে দেখা গিয়াছে কার্যে পরিণত হয় নাই বরং তাহার বিপরীতই ঘটিয়াছে এবং বর্তমানেও ঘটিয়া চলিতেছে। যে চুক্তি কেবল বহু আয়োজন ও আলোচনান্তে সম্পাদিত হইল অথচ কার্যে পরিণত হইল না, সে চুক্তি সম্পাদিত হওয়াও যা না হওয়াও তা, সম্পাদিত চুক্তি যদি কার্যে পরিণত না হয় তাহা হইলে তাহার কোন মূল্যই নাই। আমরা ধরিয়া লইলাম যে, বৈঠক ফলপ্রসূ হইল, উভয় রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় আলোচনাদি দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই কল্যাণকর এক সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাহার পর বৈঠক ফলপ্রসূ হওয়ার আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিলেই চলিবে না। তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে যথাযথভাবে সফল হয় এবং তাহার অন্তর্গত চুক্তি ও ব্যবস্থাগুলি যাহাতে যথাযথভাবে পালিত হয়, সেই দিকে প্রখরদৃষ্টি এবং প্রভূত যত্ন লওয়া অবশ্য প্রয়োজন। না হইলে, সেই পুরাতন ঘটনারই একই নিন্দনীয় পুনরাবৃত্তি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়িবে এবং এত আয়োজন, উদ্যোগ ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হইবে। এতাবৎ এই জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে, অত্যাচারে নিপীড়নে মানুষ আজ সর্বহারা সর্বনাশের সীমান্তবিন্দুতে উপনীত। তাহার ঘরে ঘরে আজ ধ্বংসের মহোৎসব, তাহার ভাগ্যের আকাশে আজ ঘন কৃষ্ণমেঘের বিরাট মিছিল, জীবনের চতুর্দিকে শুধু মৃত্যুর ইশারা, আশেপাশে কেবল সর্বনাশের ভয়াল স্বাক্ষর, অসুন্দর, অশিবের উন্মত্ত তাণ্ডব, দিকে দিকে শুধু কান্নার ধ্বনি, বেদনায়, বঞ্চনায়, হাহাকারে চতুর্দিক ভরপুর। হাসি, গান, আনন্দ, কাব্য, ছন্দ, লালিত্য আজ শুধু স্মৃতিমাত্র। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় প্রাণভয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষগুলির অবস্থা প্রগতির যুগে সভ্যতার এক নিদারুণ ব্যঙ্গ—মানবজের এ এক চরম লাঞ্ছনা। পূর্ববঙ্গের দুর্গত মানুষগুলির ভাগ্যের আকাশের দিকে একবার অনুভূতি ও উপলব্ধির চোখ মেলিলে দেখা যাইবে যে সে আকাশ আজ তারায় তারায় অনবদ্য নয়, সে আকাশে আজ নীলের একটুকু স্পর্শও অবিদ্যমান, সে আকাশ নির্মেঘ নয়, সে আকাশ হইতে সূর্যের প্রসন্ন আশীষের পরিচায়ক অফুরন্ত রশ্মি বিকিরিত হয় না। এ যেন আর এক পৃথিবী, শুধু বেদনা, শুধু লাঞ্ছনা আর শুধু হাহাকার। এ অবস্থায় শুধু বৈঠক এবং বৈঠকের সাফল্য তাহাদের মন ভরাইতে পারে না, বৈঠকের গৃহীত প্রস্তাবগুলির যথাযথ

রূপায়ণই তাহাদের নিকট একমাত্র নবজীবনের বার্তাবহ। নব প্রভাতের প্রতিশ্রুতি নূতন পথের দিকনির্দেশ। তাহাদের জীবনও উপেক্ষার নয়, নয় অল্পমূল্যের। তাহাদের জীবনের সর্ব প্রকার নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্তি ফিরাইয়া দিতে হইবে। দুঃখ দুর্যোগের ভয়াল সঙ্কুল যাত্রাপথের অবসানে তাহাদিগকে আবার উপনীত করিতে হইবে সমৃদ্ধির ও প্রতিষ্ঠার সপ্তস্বর্গে। দুর্যোগের এই ত্রিযাম রাত্রি অতিক্রমণের শক্তি, প্রেরণা ও উদ্দীপনা সর্বতোভাবে তাহাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে, ধ্বংসস্তূপের শ্মশান প্রাঙ্গণে আবার নবসৃষ্টির মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে, তাহাদের জীবন আবার ভরাইয়া দিতে হইবে আনন্দে, হাসিতে, গানে। এই হৃতসর্বস্ব অগ্নোত্তম নর-নারীদের আবার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে সমগ্র বিশ্ববাসার সহিত তালে তাল রাখিয়া জীবনের পথে চলার মত। তাহাদের দীপ্তিহীন নেত্রে আবার আঁকিয়া দিতে হইবে নবজীবনের স্বপ্ন, তাহাদের ভীত প্রাণে সঞ্চার করিতে হইবে আশার স্পর্শ। তাহাদের মৌন ওষ্ঠকে আবার করিতে হইবে বাঙ্ময়ুখর। না হইলে মহাকালের দরবারে ভারত-পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকেই এক মানবতার বিলোপ সাধনের জন্য চিরকালের ভিত্তিতে দায়ী থাকিতে হইবে। তাই···তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে, তাহাদের প্রাঙ্গণের শ্মশান ও ধ্বংসস্তূপকে পুনরায় সুশোভিত পত্রপুষ্প সমন্বিত আঙিনায় পরিণত করার ইহা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই।

পঞ্চমবাহিনী সম্বন্ধে সাবধান

সম্প্রতি একটি ভোজসভায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজ পঞ্চমবাহিনী সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা বুদ্ধিজীবী এবং দেশপ্রেমিক মহলে যথেষ্ট পরিমাণে সাড়া জাগাইয়াছে। কামরাজ জানাইয়াছেন যে, ভারতে বর্তমানে চীন ও পাকিস্তান অপেক্ষা আরও ভয়ানক ধরণের শত্রুরা বর্তমান। ইহারা দেশের ভিতরে থাকিয়াই দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া চলিয়াছে। ইহারা পঞ্চমবাহিনী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ আসনে আজ যিনি অধিষ্ঠিত—সেই প্রবীণ জননায়ক শ্রীকামরাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দূরদৃষ্টি এবং প্রগাঢ় দেশ প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এই সতর্কবাণী উচ্চারণে তিনি যে মনোভাব এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিলেন, তাহা তাঁহার বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইতিহাসের আলোয় আমরা শুধু অতীতের আলেখ্যই দর্শন করি না, সেই সঙ্গে পাই নানাবিধ প্রয়োজনীয় শিক্ষা। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জানিয়াছি যে, এই জাতীয় গৃহশত্রুরা বরাবরই ছদ্মবেশে দেশের সর্বনাশ করিয়া দেশকে অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন করিয়াছে। আপন আপন স্বার্থই ইহাদের কাছে একমাত্র সারবস্তু। সেই স্বার্থসাধনে কোনপ্রকার মনুষ্যত্ববর্জিত ও বিবেকবিরোধী কর্ম সম্পাদনে ইহারা পরাঙ্মুখ নয়। দেশ, জাতি, মানবকল্যাণের ইহারা কোনপ্রকার ধার ধারে না। আমাদের দেশ যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত, সেই সময় ইহাদের প্রাদুর্ভাব একমাত্র মহামারীর সহিতই তুলনীয়। দেশের বাহিরে অবস্থিত শত্রু অপেক্ষা দেশের ভিতরে বসবাসকারী শত্রুরা আরও মারাত্মক। ইহারা জনসাধারণের পরম মিত্র সাজিয়া তাহাদের ভুল পথে পরিচালিত করিয়া থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরলচিত্ত জনগণ এই চাতুরীর ভাবা বুঝিতে অপারগ হয়, তাহার ফলে ফাঁদে পা দিয়া নিজের অজান্তেই নিজেদের সর্বনাশ ঘনাইয়া আনে—ক্রমে যাহা জাতীয় সর্বনাশের আকার ধারণ করে। মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টে প্রপীড়িত অবস্থায় দিনযাপন করে, জঠরাগ্নির দহনে তাহার জীবনধারণই যখন অসহ হইয়া ওঠে তখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, বিশ্লেষণী-শক্তি, বিচার তৎপরতা কাজ করে না, সেই অবস্থায়—তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরিত্রাতার ভূমিকায় তাহাদের সামনে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে প্রতারিত করা মোটেই অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য কার্য নয়। প্রকাশ্য শত্রুকে চিনিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু এই শত্রুগুলি যে কতরকমের ভেক ধারণ করে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কাজে ইহারা যেন আর বিন্দুমাত্র সফলতা লাভ করিতে না পারে, ইহাদের সর্বপ্রকার কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া যথেষ্ট শাস্তি প্রদান যাহাতে হয়—সেইদিকে এই মুহূর্তে সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্য প্রয়োজন। সরকার যদি ইহাদের সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে সারা দেশ এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইবে, সময় চলিয়া গেলে তখন আর ব্যবস্থা অবলম্বনে ফল হইবে না। রোগ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে ঔষধ প্রয়োগ ফলদায়ী হয় না, তেমনই ইহারা যদি একবার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তাহা হইলে ইহাদের আয়ত্তে আনা সহজসাধ্য হইবে না, রীতিমত বেগ পাইতে হইবে। শুধু আমাদের দেশেরই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আমাদিগকে জানাইয়া আসিতেছে দেশের ভয়াবহ সঙ্কটঘন ঘোর দুর্যোগের সময়ে দেশের মানুষ যখন তিলমাত্র নিশ্চয়তারও বাহিরে, চতুর্দিকে কেবল যে সময়ে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সমারোহ এক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকের আবির্ভাব দেশের দুর্যোগকে তখন আরও ঘনীভূত করিয়া তোলে, দেশের সর্বপ্রকার স্থিতাবস্থা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন তখনই রীতিমত অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়। এই বিশ্বাসঘাতকদের প্রাদুর্ভাব এবং কার্যকলাপ সমগ্র দেশের ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, সংহতি বিনষ্ট হইয়া সারা দেশে বীভৎসতা, বিশৃঙ্খলা, ভয়াবহতার আধিপত্য বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইয়াছে। এখন আমাদের দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, এ দেশের আভ্যন্তরীণ চিত্র পরিপূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। শত-সহস্র সমস্যার নিদারুণ আক্রমণে এ দেশের মানুষের প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। খাদ্যাভাব, অর্থাভাব, গৃহ সমস্যা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যাগুলি এ যুগের মানুষকে নাগপাশ বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই এখন এক ভীষণ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সারা দেশের

স্বাভাবিক অবস্থা আজ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত, অতএব এ হেন সময়ে পঞ্চমবাহিনীর আবির্ভাব পুষ্টিসাধন ও কার্যকলাপ ইতিহাসেরই একটি ভয়াবহ পুনরাবৃত্তি ঘটাইবে মাত্র। এখন ইহাদের দমনে সর্বপ্রকার শক্তি ও কুশলতা প্রদর্শনের প্রয়োজন, এই বিরাট ব্যাপারটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করিলে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর চরম অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে এবং সারা দেশ সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সে ক্ষতিপূরণ কোনক্রমেই সহজ সাধ্য নয় এবং তাহার জন্য আবার বহু শক্তি, শ্রম ও আয়াসের প্রয়োজন। অতএব দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাদের অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করিয়া জনগণকে কুহকের মায়াজাল হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের কল্যাণসাধনই সরকারের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিৎ।

পৌরসভা প্রসঙ্গে

মহানগরীর পৌর প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে যাহা সর্বসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে তাহা কমিশনার শ্রীসুনীলবরণ রায়ের প্রস্থান। সুনীলবরণ রায়ের এই কর্মভার ত্যাগ, আমরা বিশ্বাস করি, জনসাধারণের মধ্যে কেহ স্বাভাবিক চিত্তে গ্রহণ করিবেন না। এই প্রস্থান সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়াছে তাহাও লক্ষণীয়। সুনীলবরণ ছিলেন কর্মীপুরুষ। যাঁহার কর্মপ্রতিভায় সংগঠনশক্তিতে, সততায় ও নিষ্ঠায় পৌর প্রতিষ্ঠান নানাভাবে উন্নত হইতেছিল এবং বহুকালপোষিত একাধিক দুর্বলতা, ত্রুটি ও দুর্নীতির রাহুগ্রাস হইতে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল তাঁহার এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সময়ে প্রস্থান নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। সেই কারণেই এই পদত্যাগ জনসাধারণে সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুনীলবরণ স্বেচ্ছায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, অনেক আগ্রহ ও পরিকল্পনাকে মূলধন করিয়া তিনি পৌরসভার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে পড়িতে হইল এক চক্রান্তে. তাঁহার নিরপেক্ষ, পরহিতব্রতী স্বার্থশূন্য মনোভাব কয়েকজন পৌরপিতার কায়েমী স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটাইল। তাঁহাদের মৌরসীপাট্টা যায় যায়, এ অবস্থায় পথের কাঁটা এই কর্মী মানুষটির অপসারণ প্রয়োজন হইল। আশ্চর্য! ঘটিলও তাই। অথচ সুনীলবরণের কার্যকালে পৌর প্রতিষ্ঠান যে কত উন্নতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহা কাহারও অজানা নয়। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করিলেই দেখা যাইবে যে, কোন প্রতিষ্ঠানে (এমন কি কোন নির্দিষ্ট মানবচরিত্রেও) একটি ছিদ্র দিয়াও যদি কোন প্রকারে একবার দুর্নীতি প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাহা তিলে তিলে প্রসারিত হইয়া পড়িবে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইতে ব্যাপ্ততর হইতে থাকিবে। সে যে কি সর্বনাশা অবস্থা সে বিষয় কাহারও অজানা নাই। পৌর প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সুবৃহৎ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে যদি দুর্নীতি ও গলদের প্রসার ঘটিতে থাকে তাহা হইলে তাহার বিষময় ফলও সাধারণ্যেই ছড়াইয়া পড়িবে, তাহার ফলস্বরূপ যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে জনগণকেই আর লাভের (?) মধ্যে একটি মহান প্রতিষ্ঠান হইবে ছিন্ন-ভিন্ন, ক্ষত-বিক্ষত, খণ্ড-বিখণ্ড. জাতীয় মঙ্গলের অন্যতম মহান সম্ভাবনাকে এই ভাবে বিনষ্ট হইতে দেওয়ার পিছনে কখনও কোন শুভবুদ্ধির স্বাক্ষর থাকিতে পারে না। পরিলক্ষিত হয় দেশদ্রোহিতা ও সমাজ বিরোধিতারও চিহ্ন। পৌরপ্রতিষ্ঠান এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহার নিজস্ব কার্যাবলী ছাড়াও একাধিক লোকমঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ করিতে হয়, অতএব পৌরপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্ষতির কবল হইতে মুক্তি পাইবে না। একটি প্রতিষ্ঠান তখনই এক সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তি পরিগ্রহ করে যখন তাহার সহিত জড়িত প্রতিটি মানুষের মনে স্বার্থচিন্তা, আত্মতুষ্টি, কাজে অবহেলা, কর্তব্যপালনে ত্রুটি, ঔদাসীন্যের লেশমাত্র থাকে না এবং অপরিসীম অধ্যবসায়, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কর্তব্যপালন ও যথাযথরূপে কার্যসম্পাদনই যাঁহাদের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন সাধনা হইয়া দাঁড়ায়। বহুজনের সম্মিলিত সাধনাই এক একটি মহৎ প্রচেষ্টাকে সার্থকতার সিংহদ্বার অভিমুখে লইয়া যায়—এই মহৎ সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়া পৌর প্রতিষ্ঠানকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন শ্রীরায়। তাঁহার কর্মিবৃন্দের মধ্যে সততা, আন্তরিকতা ও নিয়মানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তিনি চাহিয়াছিলেন সেই আদর্শই প্রতিটি কর্মীর মধ্যে সঞ্চারিত করিতে, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে কর্মী-সম্প্রদায়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সমাবেশ ঘটিলেই পৌরসভার উন্নতি সম্ভব। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, সুনীলবরণ যদি এই প্রকার বাধা-বিপত্তির কবলে না পড়িতেন সরকার পক্ষ হইতে যদি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতা পাইতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার দক্ষতা ও প্রতিভার আরও উজ্জ্বল নিদর্শন দেখাইতে পারিতেন। এমন কি সেক্ষেত্রে কর্মভার ত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠিত না। দুর্ভাগ্য পৌরসভার, যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর স্বার্থের কবলে পড়িয়া তাঁহাকে একজন অভিজ্ঞ এবং সুযোগ্য কর্মীকে হারাইতে হইল।

পৌরসভা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়, পৌরসভার কার্যাবলীর সহিত মহানগরীর লক্ষ লক্ষ নরনারীর, দেশের অসংখ্য আশা-ভরসা ভবিষ্যতের স্বার্থ জড়িত, অথচ সেখানে এই প্রকার ব্যক্তিস্বার্থের পূজা যে কি প্রকারে হইতে থাকে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অগণিত মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বভার যাহার উপর ন্যস্ত সেই প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতি ও গলদমুক্ত করার দুর্বার সঙ্কল্প যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাগ্যের পরিহাসে তাঁহাকে আসন ত্যাগ করিতে হইল যে কারণে সেই কারণটিই দুর্নীতি ও গলদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সরকার পক্ষ হইতে যদি এ জাতীয় ঘটনা বারবার নীরবতা দ্বারা মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখের আর কিছুই নাই। এই ঘৃণিত চক্রান্তকে নীরবতার দ্বারা মানিয়া লইলে দুর্নীতিরই জয়গান গাওয়া হইবে, স্বীকৃতি দেওয়া হইবে জনস্বার্থ-বিরোধী আত্মতুষ্টির প্রচেষ্টাকে যাহা জাতীয়তাবাদী বৃহৎ আদর্শপুষ্ট সরকারের নিকট কোনক্রমেই আশা করা চলে না। সুনীলবরণ রায়ের মত আরও একাধিক সুযোগ্য

ও নির্ভরযোগ্য কর্মী যদি এই জাতীয় কুৎসিত চক্রান্তের বলি হইতে থাকেন তাহা হইলে দেশের যে কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় এখনও কি আসে নাই? দুর্নীতিই কি তাহা হইলে জয়লাভ করিবে, তাহার জয়যাত্রা কি কখনই ব্যাহত হইবে না, আর সরকারী শাসনদণ্ড কি নির্জীবের মত তাহাকে ক্রমান্বয়ে সহ্য করিয়া চলিবে! ন্যায়-নীতির পবিত্র রক্ষক সরকার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে হস্ত প্রসারিত করিবেন আর কবে? সে দিন আর কতদূরে? আর দুর্নীতির এই দুর্বার জয়যাত্রা এবং তাহার পশ্চাতে সরকারের এই রহস্যজনক নীরবতা আমাদের মনে এই প্রশ্নই জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে।

কিশলয় দুষ্প্রাপ্য কেন?

বর্তমানে কলিকাতায় বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ 'কিশলয়'কে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সে সম্বন্ধে কেহই অনবগত নন। এই সমস্যার পিছনে যাহাই থাকুক কোনপ্রকার যুক্তি যে নাই সেইরূপ মন্তব্য করার ক্ষেত্রে কোন বাধা পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় না। কিশলয় আজ এক নিদারুণ ভীতির বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। অভিভাবকবৃন্দ আজ কিশলয়ের নাম শুনিলে আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, পুত্রকন্যাদের জন্য একখণ্ড কিশলয় সংগ্রহ করা তাঁহাদের নিকট যে কি ভীষণ সমস্যার ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন। বাজারে কিশলয়ের দুষ্প্রাপ্যতার স্বপক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা সহস্র চেষ্টায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রধানতম ও বৃহত্তম মহানগরীতে বালক-বালিকাদের বিদ্যালয় পাঠ্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রকার বিভ্রাট ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের ও আশ্চর্যের কূলকিনারা পাওয়া যায় না। আমরা নানা প্রকার দুর্ভিক্ষের সহিত পরিচিত, কিন্তু এ জাতীয় গ্রন্থ-দুর্ভিক্ষের সহিত কখনও পরিচিত ছিলাম না। কিশলয় সমস্যা ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বনাশ করিল ঠিকই আবার তেমনই দুর্ভিক্ষের অঙ্গসৌষ্ঠবের সৌকর্যসাধন করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইল, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যভ্রষ্ট হওয়ার অপরাধে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হয়। বাঙলা পৌষ মাসেই বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন নবপর্যায়ে শুরু হয় কিন্তু পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিতে ছাত্র-ছাত্রীদের এবং তাহাদের অভিভাবকের জীবনে এই পৌষমাস সর্বনাশের রূপ লইয়া প্রতিভাত হয়। অথচ, ইহা আদৌ সমস্যা নয়। কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা এখানে তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীর সমগ্র সংখ্যা যত তাহার কিছু বেশি সংখ্যা মুদ্রিত করিয়া শহরের পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে গ্রন্থ সরবরাহ করিলেই সব গোলযোগের অবসান হয়। অকারণে, স্বেচ্ছায় একটি স্বাভাবিক বিষয়কে অস্বাভাবিক করিয়া তোলার মধ্যে যে নৈপুণ্য এবং কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। প্রয়োজনের অনুপাতে স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ ছাপা এবং কেবল 'অনুমোদিত' দোকানগুলিতে তাহা বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করাই এই এত গোলযোগের কারণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলি সংগ্রহে এ জাতীয় পরিস্থিতি উদ্ভব হয় না।

বালক-বালিকার পাঠ্যগ্রন্থ সংগ্রহে এই প্রকার হয়রানি তাহাদের অপরিণত শিশুচিত্তে যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে সে বিষয়ও উপেক্ষা করিবার নয়। জীবনের যোধনলগ্নেই শিক্ষারম্ভের সূচনায় পাঠ্যগ্রন্থ সম্পর্কে যদি তাহাদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার জের যে জীবনব্যাপী ইহা কি কাহারও বুদ্ধিতে উদিত হইতেছে না? শিশুর অপরিণত মনে একবার যাহা রেখাপাত করে পরবর্তীকালে সহস্র যুক্তি-তর্কের অবতারণায়, বিচার-বিশ্লেষণে তাহার প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্ত করা অতীব কঠিন প্রচেষ্টা। এই ঘটনা একটি

শিশুকে অধ্যয়ন সম্বন্ধে সারাজীবনের মত ভয়গ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে।

এদিকে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হইতে থাকে, প্রচুর সময় ব্যয় করিয়া ছাত্রের হাতে কিশলয় যখন আসিল তখন সে দেখিল ক্লাস অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে—ক্লাস যে পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে, সেই অনুসারে পাল্লা দেওয়া ছাত্রের পক্ষে তখন কঠিন হইয়া পড়ে ফলে পড়াশুনা তাহার ব্যাহত হয়। ইহাতে পরে দেখা যাইবে, দেশের শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কত নিম্নগামী হইয়াছে। অথচ এ সবের তো কোন কারণই নাই, যে দেশের শিক্ষাদীক্ষা সারা জগতকে একদা বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল, যে দেশের শিক্ষাচার্যদের সাধনা সারা পৃথিবীর সুধীসমাজে লাভ করিয়াছে শ্রদ্ধামিশ্রিত অকুণ্ঠ স্বীকৃতি, যে দেশের মাটি সংখ্যাতীত শিক্ষানায়কের পবিত্র আবির্ভাবে ধন্য, সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এই তিলে তিলে হত্যাকে কোন বুদ্ধি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না।

বাঙালীর তো আজ সর্বস্বই গিয়াছে। তাহার নিরাপত্তা অন্তর্হিত, শান্তি বিঘ্নিত। জীবনযাত্রাই হইয়া উঠিয়াছে দুর্বিবহ। তথাপি, শিক্ষাজগতে এখনও আপন কৃতিত্বে ও গৌরবে বাঙালী মাথা উঁচু করিয়া বিরাজমান। শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার কৃতিত্ব ও অবদান আজও বিশেষ স্বীকৃতির দাবীদার। বিগত যুগের পূজনীয় শিক্ষাচার্যগণ শিক্ষাক্ষেত্রে যে ধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সে ধারা আজও অম্লান। ভবিষ্যতে তাহার এই গর্বটুকুও নষ্ট করিবার এই প্রচেষ্টাকে আমরা যদি 'ষড়যন্ত্র' বলিয়া আখ্যা দিই তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় ধারণা তাহা বিন্দুমাত্র অসত্য বা অতিরঞ্জন নয় এবং তাহা সফল হইলে বাঙালীর সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হইতে আর কিছুই বাকি থাকিবে না। অতএব বিশেষভাবে সেই কারণেই অবিলম্বে আমরা এই সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করি। অকারণে এই অপরিহার্য গ্রন্থটিকে কয়েকটি অনুমোদিত দোকানে কুক্ষিগত না করিয়া বিভিন্ন দোকানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হোক এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী কিছু বেশি ছাপিবার ব্যবস্থা করা হোক—ইহাই আমাদের বক্তব্য। কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এ বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ এবং যথোচিতব্যবস্থা অবলম্বন আমাদের কাম্য।

২৪এ চৈত্র ১৩৭০

॥ শোক-সংবাদ ॥

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী এবং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অন্যতম ছাত্র সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত গত ১৬ই চৈত্র ৭৭ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ইনি বিদগ্ধ সুধী ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র ছিলেন। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ইনি যথেষ্ট অভিনবত্বের পরিচয় দিয়ে ভারতের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে প্রভূত প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পে বিশেষ রীতির ইনি উদ্ভাবক। পার্বত্য ও প্রাকৃতিক চিত্রে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। লাহোরের মেয়ো স্কুল অফ আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফটের ইনি প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। ঐ প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধি সাধনে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ক্যাপ্টেন কিরণ সেন

সুপ্রসিদ্ধ চক্ষুচিকিৎসক এবং লেক মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন কিরণলাল সেন গত ১ই চৈত্র ৭২ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজগুলির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৭ সালের পর থেকে ইনি মেডিক্যাল কলেজের এমারিটাস প্রফেসার ছিলেন। তিন বছর পূর্বে তাঁরই প্রচেষ্টায় চক্ষুসম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্র ইনষ্টিটিউট অফ অপথালমোলজি গঠিত হয় এবং ইনি তার প্রথম পরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত হন ছাত্রজীবনেও ইনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং বিদেশ থেকে সসম্মানে এফ-আর সি-এস ডিগ্রী অর্জন করেন। ইনি ইণ্ডিয়ান এ্যাকাডেমী অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের ফেলো এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্পাদক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং অন অপথালমোলজি বিভাগের ডীনের আসনও তাঁর দ্বারা অলংকৃত হয়। চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ কনক সেন তাঁর পুত্র।

কনকলতা মিত্র

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বকনিষ্ঠ অনুজা এবং শ্রীনলিনীনাথ মিত্রের সহধর্মিণী কনকলতা মিত্র গত ৪ঠা চৈত্র ৬২ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে স্বর্গীয় জানকীনাথ বসুর ছয় কন্যার মধ্যে বর্তমানে আর কেউই জীবিত রইলেন না।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বি, বসু প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৩৩নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার ভবকুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
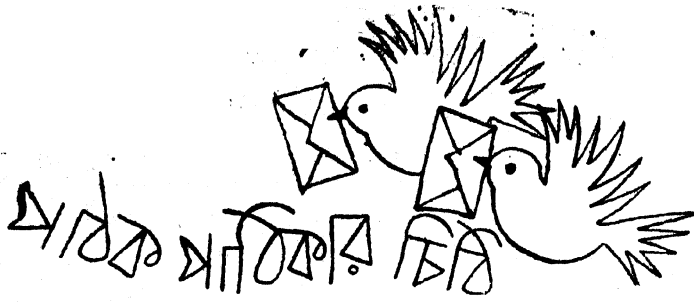
পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়,

আমার মতে মাসিক বসুমতী প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা। এই পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। পত্রিকার গল্প, উপন্যাস যখন আমি পড়ি তখন মানুষের দুঃখ, বেদনা, হাসি, কান্না, সুখ, শান্তি যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে ধরা দেয়। নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ দুপুরে এই মাসিক বসুমতী বিশ বছর ধরে আমাকে সঙ্গ দান করে আসছে। সার জীবনের একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, সকাল থেকে একটানা খাটুনির পর দুপুরে এই কর্মক্লান্ত শরীর সতেজ করে তুলতে মাসিক বসুমতী অমৃতের কাজ করে। আর একটি কথা জানতে চেয়ে আমার লেখা শেষ করব। জানি বসুমতীর মত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার লেখিকা হবার যোগ্যতা আমার নেই। তবুও ইচ্ছা জাগে, মনে হয় দেখি না চেষ্টা করে। আচ্ছা মাসিক বসুমতীতে লেখা পাঠাতে হলে কি কি নিয়ম মেনে কোন ঠিকানায় লেখা পাঠাতে হয়, আশা করি মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠির পৃষ্ঠায় এর উত্তর পাবো। আপনি আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—শ্রীমতী গীতারাণী মুখোপাধ্যায়, সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় রোড, চন্দননগর

শ্রদ্ধাস্পদেষু, নবকলেবরে মাসিক বসুমতী প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এ চিঠি শুরু করছি। গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীমতীজীর লেখা 'ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য' রচনাটির জন্য অভিনন্দিত করছি। কিন্তু লেখিকার সঙ্গে প্রায় সর্বত্র মতভেদ হওয়ায় এ পত্রের অবতারণা। নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের অন্নবস্ত্রের সমস্যার মত বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদও একটি জৈবিক সমস্যা (Vital Problem)। বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি মুক্তির আনন্দ আনয়ন করে সত্য, কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রে তার যে অশুভ ছায়াপাত হচ্ছে তা প্রত্যেক সুস্থমনা মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। এই দু'ধের টানাপোড়েনে আমরা পরিত্রাহী চিৎকার শুরু করেছি। সমাধানের উপায় কি? ঘুণ ধরেছে বহু নীচে, সুতরাং তার মূল উৎপাটন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু করবে কে? মজা এই, বিচ্ছেদোত্তর জীবনে মেয়েরা দেন ছেলেদের দোষ আর পুরুষরা বলেন, মেয়েদের বিশ্বাস নেই, ওরা সব পারে। অর্থাৎ পারস্পরিক দোষারোপ করাটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। 'শ্রীমতীজী'র রচনাটিও তা থেকে মুক্ত নয়। প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃতি দিচ্ছি,'...পুরুষের স্বৈরাচারই সে জন্য ষোল আনা না হোক অন্তত চৌদ্দ আনা দায়ী।'—ষোল আনা বা চৌদ্দ আনার হিসেব এত সহজে কষলে বিদ্বেষ বাড়বে বৈ কমবে না। কারণ অকারণে এত সাবলীল আক্রমণ যে নারী চেতনা জাগরণের ও মুক্তির আনন্দের, সে বিষয়ে মন প্রশ্ন করার হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। বিচ্ছেদে কার দোষ বেশি এ নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। কারণ এটি এক দেশদর্শী মতবাদ। বিচারক আসামীকে জেল দেবার আগে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হন বলে শুনেছি, কিন্তু আলোচ্যমান রচনাটি পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি এই ভেবে যে, মেয়েরা কি অনায়াসে পুরুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে এবং সামান্যতম সম্ভ্রমের খাতিরেও লোকে শত্রুকে 'ডিফেণ্ড' করার সুযোগ দেয়, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, লেখিকার রচনায় সেটি আশ্চর্য রকমের অনুপস্থিত।...বিচ্ছেদের প্রধান হিসেবে তিনি অত্যন্ত ...ভাবে শুধু যৌন-চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন কারণ তাতে পুরুষ 'ভিকটিম' করা কিছু সহজ। তবে লেখিকার 'জনৈক বিশেষজ্ঞ' ...হেন ব্যক্তিটি যে নারী সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। স্বামী মাত্রে সে চরম নির্বোধ এবং আত্মসুখ-পরায়ণ ও যৌনতা দোষে দুষ্ট— থিয়োরী বটতলায় বইতে পাওয়া যায় বলে শুনেছি। তবে এ কথা ঠিক যে পুরুষের যৌনচিন্তা এবং তার প্রবণতা (desire for sex and its intensity) ব্যক্তিবিশেষে প্রকট। তবে সব পুরুষেই যে তা—এ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে মানি কি করে? লেখিকা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, 'ব্যক্তিবিশেষ' বলে একটি কথা লিখেছি পুরুষের বেলায়। সুতরাং এই শব্দটি লেখিকা অনায়াসে মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন।—(অবশ্য তিনি যদি যুক্তিবাদী হন)। দ্বিতীয় একটি বিষয় লেখিকা খুব ধীরভাবে চিন্তা করে এড়িয়ে গেছেন বলে আমার ধারণা। বর্তমান যুগে বিবাহ একটু বেশি বয়সে হয়। ফলে অনেক দম্পতি নানারকম অসুবিধায় পড়েন—বিশেষ করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের নানারকম শারীরিক খুঁত আসে—যেগুলোকে ঢাকবার নিরন্তর চেষ্টা করে তাঁরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ফলে সংঘাত অনিবার্য। ফল বিচ্ছেদ।—এ দিকটি লেখিকার বলা উচিত ছিল যেহেতু তাঁর লেখায় যৌনচিন্তা মুখ্য। সবশেষে একটি কথা বলতে চাই। বিচ্ছেদ শুধু পুরুষের জন্যই এ ভ্রান্তধারণা নিরসন করা আশুকর্তব্য। পুরুষের প্রতি এই ঘৃণার ফল কি—তা ভেবে তবে লেখনী ধারণ করা উচিত। নচেৎ ফলের ঘরে শূন্য। লণ্ডনের একজন বিচারপতি স্ত্রীদের বলেছেন, 'creatures of mood.' তাই স্বামীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'If they get into a mood, it is upto the husband to get them out of it.' (উদ্ধৃতিটি 'link' পত্রিকা থেকে নেওয়া) সুতরাং বিচ্ছেদের আগের মুহূর্তেও স্বামী...আশা রাখি

এই কথাগুলো ভাববেন। তাতে ফল ভালো বই খারাপ হবে না। নিবেদন ইতি—পরমেশ চক্রবর্তী, ৮।এ, যাত্রিক রজন রোড, ডাকঘর—ভদ্রকালী, জেলা—হুগলী।

ভ্রম-সংশোধন

(১৩৭০) মাসিক বসুমতীতে চার ... প্রবন্ধে শ্রীঅরুণকুমার রায়ের কথা পড়লাম। একটু ভুল আছে শ্রীরায়ের আদি পিতৃনিবাস নদীয়ার কৃষ্ণনগরে নয়। তাঁর আদি নিবাস বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার কাছে কৃষ্ণদেবপুরে। এখন বাগনাপাড়া স্টেশনের যে গ্রামে, তারই নাম কৃষ্ণদেবপুর। বাগনাপাড়া গ্রাম একটু দূরে। কননগরে (গোয়াড়ীতে) শ্রীরায়ের মাতুলালয়। বস্তিত তাঁহার মাতামহের আদি নিবাস যশোহরের বিজ্ঞানন্দ বাটীতে। গোয়াড়ী শ্রীরায়ের জন্মস্থান। ইতি—শ্রীঅনিলকুমার রায় (শ্রীঅরুণ কুমারের অগ্রজ) ৫২, সর্দারশঙ্কর রোড। কলিকাতা—২৬।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ দাস কানুনগো, ডাক—...নপুর, জেলা—মেদিনীপুর —— অধ্যক্ষ, সেন্ট জন ডায়াসেশন গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৭, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০ • • • শ্রীমতী গীতা রায় অবঃ—ডাঃ বি এম রায়, ডাক—গঙ্গারামপুর, জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর • • • শ্রী এ কে নিয়োগী, অবঃ—এ কে নিয়োগী এ্যাণ্ড কোং, ... , পার্ক বক্স নং ২০১, কানপুর • • • Sri S P Sen Varma S; I. Secy. Ministry of Law & Member Law Commission of India. 33 Lodi Estate New Delhi—3. • • • অধ্যক্ষ রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশান, ভুবনেশ্বর পুরী • • শ্রীমতী বাণু মুখোপাধ্যায়, আটেন্ড সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কলেজ অব নার্সিং, এস ওয়াই এইচ কম্পাউণ্ড, ইন্দোর, ইউ পি • • গ্রন্থাগারিক, গঙ্গাজলঘাটি উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক—গঙ্গাজলঘাটি, জেলা—বাঁকুড়া • • • শ্রীমতী অরুণা পাল, ৭৮-১, কলেজ রোড, ডাক—বোটানিক গার্ডেন, জেলা—হাওড়া • • • গ্রন্থাগারিক বোগাড পাঠাগার বীরগ্রাম, জেলা—বর্ধমান • • • প্রধান শিক্ষক, নরেন্দ্রনাথ স্মৃতির উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক—নরেন্দ্রপুর, জেলা—২৪ পরগনা (কাকদ্বীপ হয়ে), শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, সচিব, যুগের আলো, গ্রাম—সুভাষ নগর, ডাক—বনগাঁ, জেলা—২৪ পরগণা।

Remitting the amount Rs. 20/- in full settlement of your bill No 2167. Please send the magazine regularly. The Librarian, Univer-sity of Sougar, Sougar University Library, Sagar, M. P.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী প্রভাবতী পাত্র, ব্রাহ্মণপুর, মেদিনীপুর।

Sending herewith Rs. 7·50 n. p. being the half-yearly subscription to the Monthly Basu-mati. Please acknowledge receipt. Sm. Sovana Das, Old Monail, Power House, Jalpaiguri.

পূর্বপ্রদত্ত চাঁদা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নিঃশেষিত হওয়ায় পুনরায় এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া পৌষ সংখ্যা হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীঅজিতা ভট্টাচার্য, অবধায়ক—এন সি ভট্টাচার্য, অশোক রাজপথ, পাটনা—৬।

আপনার নির্দেশমত আমাদের বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। গ্রন্থাগারিক, শিক্ষানিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, ডাকঘর—কল্যাণগ্রাম, বর্ধমান।

আমার প্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। দয়া করিয়া নিয়মিত সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী কল্যাণী গাঙ্গুলী, ডাকঘর—চাকুলিয়া, জেলা—সিংভূম, বিহার।

Please send herewith Rs. 15/- in advance in full settlement of your bill. Please supply the magazine from the date of receipt of the money. The Librarian District Library Silchar, Cachar.

I am sending herewith Rs. 15/- towrds the annual subscription of the Monthly Basumati, Please continue to despatch the same. Sm. Anjali Burman, C/o. S. D. O (Roads) P. O. Contai, Dt. Midnapur.

Sending herewith the sum of Rs. 15/- being the renewal subscription of the Monthly Basu-mati for one year. Please acknowledge and send the magazine to the address regularly. Sm. Kajal Sengupta. C/o S. C. Sengupta, Head Master, Raja A. T. High School. P. O. Khariar, Dt. Kalahandi, Orissa.

I am sending herewith the annual subscrip-tion of Rs. 15/- only for Masik Basumati. Please acknowledge it and supply the magazine at an early date. The Principal, Gaya College, Gaya.

Remitting Rs. 15/- being the yearly sub crip-tion to the Monthly Basumati. Please send the magazine every month.—Paresh Nath Banerjee, Manager, Sri Ram Saw Mills, P.O. New Capital Bhubaneswar, Orissa.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার, বালি, হাওড়া।

Sending Rs. 15/- being the annual subscrip-tion of the Monthly Basumati. Please continue to send the journal as usual.—The Secretary, Jamira Union Club, Jamira T. E. Po. Dibrugarh, Assam.

আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী ইরা ঘোষ, অবধায়ক—শ্রীলাবণী ঘোষ, 'পুরবী' ডাকঘর—চন্দননগর, হুগলী।